প্রবাসী, ৪৭শ ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৫৪

সূচীপত্র

কার্ত্তিক—চৈত্র

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী

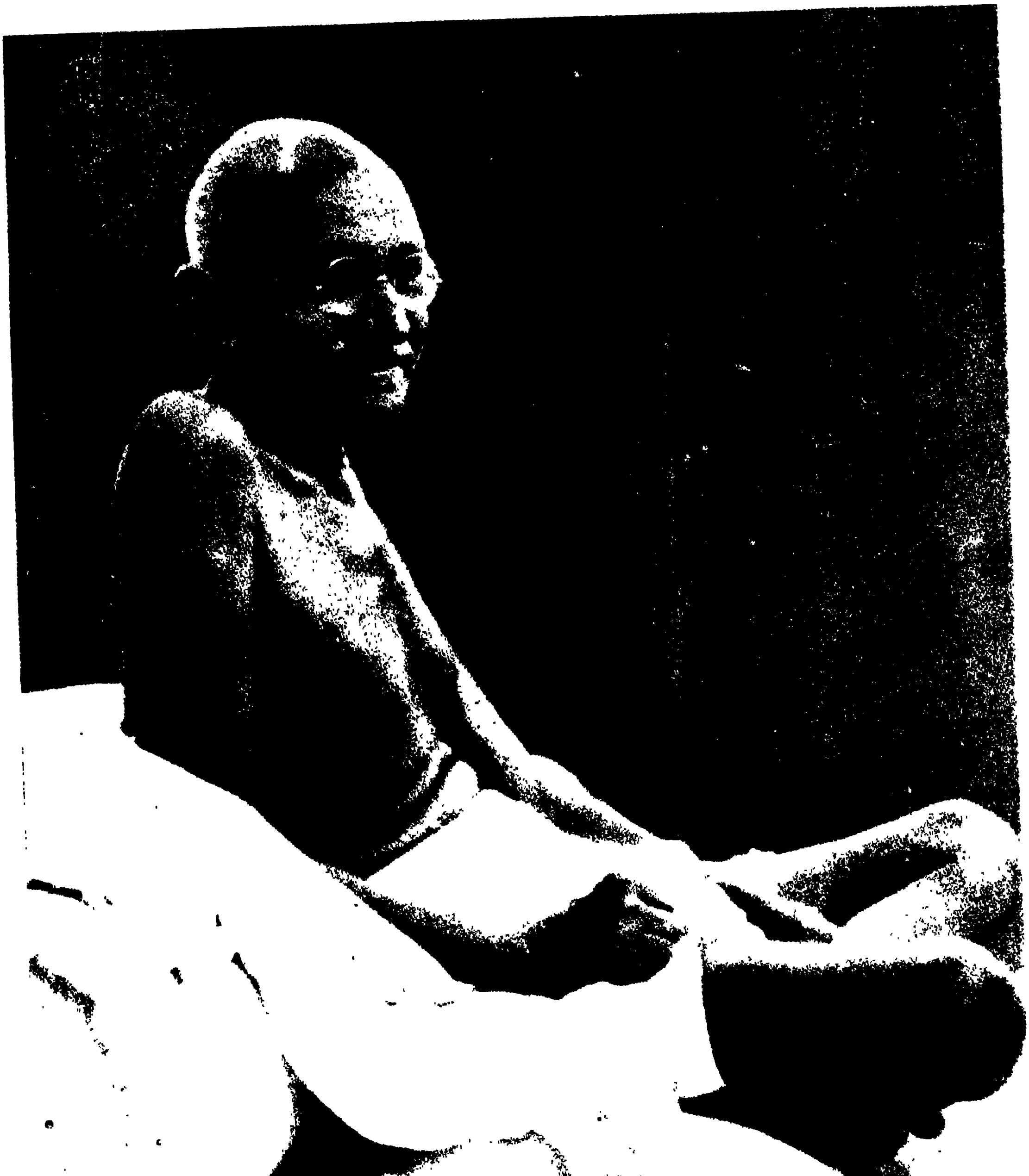
রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ



প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



মহাত্মা গান্ধী

প্রবাসী

'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'

৪৭শ ভাগ ২য় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৫৪ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলার অবস্থা ও প্রতিকার

বাংলার অবস্থা ও প্রতিকার সম্পর্কে গত মাসে আমরা সবিশেষ লিখিয়াছিলাম। উহাতে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বর্ত্তমান গণ্ডীর মধ্য হইতে ভাল লোক পাওয়া অসম্ভব। ঐ কমিটির কর্ণধারদিগের মধ্যে নিজের স্বার্থ ও নিজের দলের স্বার্থ চিন্তা ভিন্ন আর কোনও চেষ্টার চিহ্ন বাংলাদেশ বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে পায় নাই বলিলেও চলে এবং উহার কার্য্যপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন না হইলে আগামী বিশ বৎসরেও ঐ অবস্থার অবনতি ভিন্ন আর কিছুই হওয়া সম্ভব নহে। সম্প্রতি যে ভাবে নূতন কমিটির সভ্য ও কংগ্রেসের দলবৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে তাহার মধ্যেও ঐ একই পুরাতন কার্য্যপদ্ধতি পাওয়া গিয়াছে। ইহারও সংস্কার প্রয়োজন। বর্ত্তমানে সারা বাংলাদেশের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন তিন চারি জন লোকের হাতে। ইঁহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সততা কাহারও কাহারও আছে, অর্থাৎ অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন বা পরস্বাপহরণ তাঁহারা করেন না। কিন্তু নিজ দলের ক্ষমতা বা প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য দেশের মঙ্গলচিন্তা কখনও বিসর্জ্জন দেন নাই এরূপ একজনও ইঁহাদের মধ্যে নাই। নিজ দলের আজ্ঞাবাহী চর নহে এরূপ সৎ ও কর্ম্মঠ লোক যাহাতে বি. পি. সি. সি.তে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারে ইহার জন্য ইঁহারা সকলেই সতত চেষ্টিত এবং দেশের মঙ্গলকামনায় নিজ দলের স্বার্থ বলিদান দিতে ইঁহারা কেহই প্রস্তুত নহেন। বরঞ্চ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইঁহারা দেশের ও দশের কল্যাণের বিষয় জলাঞ্জলী দিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থাই এতদিন করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের বিষয়ে শেষ কথা এই যে, ইঁহাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে সৎব্যক্তিগণ প্রায়ই হিতোপদেশের জরদগব জাতীয় লোক এবং ইঁহাদের প্রত্যেকেরই গোষ্ঠীতে মার্জ্জার শ্রেণীর নীচ লোক আছে, যাহাদের পক্ষে এমন কোনও অসৎ কাজ নাই যাহা অসম্ভব, এবং তাহারই ফলে বাংলার আজ এই দুর্দ্দশা, যাহার আশু প্রতিকার না হইলে ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী জাতি অতি শীঘ্রই চরম দুর্গতির পথে চিরদিনের মত নামিয়া যাইবে।

এরূপ অবস্থায় দেশবাসীর কর্ত্তব্য কি? দেশবাসীর সর্ব্বপ্রথমে জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে কংগ্রেস কাহারও পৈতৃক জমিদারী নহে। যদি কোনও ক্ষেত্রে কোনও জেলায়, নগরে বা মহকুমায় দেখা যায় যে সৎ বা কর্ম্মঠ লোকের পরিবর্ত্তে অসৎ বা অকর্ম্মণ্য লোক প্রাদেশিক কমিটিতে স্থান পাইয়াছে —যাহা পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলায় সর্ব্বত্রই এতদিন হইয়া আসিয়াছে—তাহা হইলে সেই অঞ্চলের যাঁহারা কর্ম্মী বা দেশহিতকামী তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে তাহার প্রতিকারের জন্য যেন তখনই উদ্যত হইয়া উঠেন। প্রয়োজন হইলে সেই স্থলে যেন তখনই একটি পৃথক কংগ্রেস দল গঠিত হয় যাহা কেন্দ্রীয় সমিতির নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করে এবং সেখানে সুবিচার না পাইলে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসে প্রতিকার প্রার্থনা করিবে। যাঁহারা কর্ম্মঠ লোক তাঁহাদের সকলেরই অবিলম্বে কংগ্রেসে যোগদান করা প্রয়োজন এবং পরিচিত সকলকেই কংগ্রেস দলভুক্ত করা প্রয়োজন। আজ্ঞাবাহী ভিন্ন অন্য কেহই যাহাতে কংগ্রেসের দলভুক্ত না হয় এইরূপ অপচেষ্টা নানা অজুহাতে বহুদিন হইতেই এই প্রদেশে চলিতেছে। লোক মনোমত হইলে তাহার ফর্ম্ম পাইতে বা মেম্বর হইতে এক মুহূর্ত্তও লাগে না। অন্যথায় এক মাস চেষ্টা করিলেও কিছুই ফল হয় না ইহা পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে এবং এখনও দেখা যায়। এতদিন এই সকল গর্হিত পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলা বা লেখা যায় নাই কেননা তাহাতে বিদেশী ও বিপক্ষের সম্মুখে কংগ্রেসকে অপদস্থ করার পথ খোলা হইত, কিন্তু এখন এই সকল অনাচার দূর করিয়া পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসকে সত্যসত্যই দেশের কল্যাণকর জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে। অন্যথায় বাংলা ক্রমেই সকল দিকে পিছাইয়া পড়িবে।

আজ বাংলাদেশ ভারত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অতি অধম স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। বিহারী চোখ রাঙাইতেছে, আসামে বাঙালীর উপর যথেচ্ছাচার ও দুর্ব্যবহার চলিতেছে, অন্য প্রদেশের লোকে কৃপা, অবজ্ঞা বা অবহেলার সহিত বাংলা ও বাঙালীর কথা মনে আনে। আমাদের অবনতি কি এতদূর গড়াইয়াছে যে ইহাতেও আমাদের চৈতন্য হইবে না, দৈনিক কাগজের

ঘুমপাড়ানো মাদক অথবা তথাকথিত রাষ্ট্রচালকগণের স্তবস্তুতি-প্রশস্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া আমরা দেশের অবস্থার দিকে তাকাইব না? দেশের পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতিতে বা চতুর প্রদেশপরিচালকের স্তোকবাক্যে ভুলিয়া অবস্থ ও আশুকর্ত্তব্য কাজে হাত না দিলে আর দু'দিন পরে দেশের কি হইবে সে বিষয়ে চৈতন্য আমাদের কবে হইবে?

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির শুধু আমূল সংশোধন প্রয়োজন নহে ইহা হইতে বহু অনিষ্টকারী উপাদানের বহিষ্কারও অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল উপাদান যাঁহাদের হাতের অস্ত্র, যে অস্ত্রের সাহায্যে তাঁহারা এতদিন দেশের জনসাধারণের চোখে ধূলা দিয়া ভেল্কী চালাইতেছেন, তাঁহাদেরও প্রকৃত পরিচয় পশ্চিমবঙ্গবাসীর পাওয়া প্রয়োজন; নহিলে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠদল তো ডুবিবেই, পশ্চিমবঙ্গের গরিষ্ঠ দলেরও পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। এই উপাদানগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হইল কংগ্রেস প্রতিনিধি মনোনয়ন। বাঙালী জনসাধারণের এতদিন একটা ধারণা ছিল যে তাঁহাদের প্রতিনিধি হিসাবে নির্ব্বাচিত হইয়া যে সকল ব্যক্তি বিবিধ ব্যবস্থাপক বা কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা সমিতি ও প্রতিষ্ঠানে স্থান লাভ করেন তাঁহাদের সকলেই কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক নিয়মানুসারে মনোনীত ও নির্ব্বাচিত হন। এই ভুল শোধরাইবার সময় হইয়াছে, কেননা এই ভুলেই দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে। বস্তুতঃপক্ষে তিন-চারি জন চক্রান্তকারী কলিবাজ লোক, আপোষে মিলিয়া, সর্ব্বপ্রথমে নিজ নিজ দলের ওজন হিসাবে কাহার কয়জন চেলা-চামুণ্ড দেশের লোকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবার সুযোগ পাইবে ইহা স্থির করেন। তাহার পর তাঁহারা নিজ নিজ দলের স্বার্থ অনুযায়ী যথাসংখ্যক কয়েক ব্যক্তির পিঠে কংগ্রেসের লেবেল আঁটিয়া জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে ভোটের বাজারে ছাড়িয়া দেন। এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে চোরাকারবারী স্থান পায় পার্টি-ফণ্ডে মোটা টাকা দেওয়ার দরুন—যাহা সে দেশের লোককে আরও ঠকাইয়া উসুল করিয়া লয় অল্পদিনেই—এবং স্থান পায় ধূর্ত্ত, চালবাজ, পেশাদার "দেশভক্ত", যাহাদের মহিমায় আজ বাংলার এই অধঃপতন; এবং সেই সঙ্গে স্থানলাভ করেন কতিপয় মূকবধিরপ্রায় অন্ধভক্ত। স্থান পায় না শুধু সে, যে প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্মী, নির্ব্বাচিত হয় না সে-ই যাহার সত্যাসত্য জ্ঞান লোপ পায় নাই অন্ধভক্তির প্রভাবে এবং বর্জ্জিত হয় সে জন যাহার পৌরুষ আছে, কার্য্য নির্ব্বাহের ক্ষমতা আছে, পাছে সে শক্তিমান্ দেশপরিচালকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে দেশের লোকের কাছে। বলা বাহুল্য, দেশের লোক নির্ব্বাচনের সময় কংগ্রেসের আদর্শের উপর আস্থা দেখাইবার জন্য যাচাই না করিয়া শুধু লেবেল দেখিয়া, এই সকল মেকী গ্রহণ করে খাঁটি সোনার দরে। আজ বাংলার জনসাধারণকে সতর্ক করার দিন আসিয়াছে, তাহাদের অবিলম্বে জানা প্রয়োজন যে কংগ্রেস নামের এমন কোন অলৌকিক মাহাত্ম্য নাই যাহাতে খুঁটা সাজা হয়, জড়ে প্রাণ আসে। দেশের লোকের আজ বুঝিবার সময় হইয়াছে যে যাঁহারা তাঁহাদের প্রতিনিধি সাজিয়া দিল্লীতে ও কলিকাতায় বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাদের অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে কাহার প্রতিনিধি ও কাহার স্বার্থের চিন্তা তাঁহারা করিয়া থাকেন।

দুর্নীতি দমনের পথ

দুর্নীতি দমনের জন্য ডাঃ ঘোষ অর্ডিনান্স করিতেছেন, নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্পত্তির হিসাব দাখিল করিবার জন্য সার্কুলার দিয়াছেন। কিন্তু পুলিস যে ভাবে এই সব অর্ডিনান্স ও সার্কুলার প্রভৃতি কার্য্যে পরিণত করিবার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে তাহা গভীর হতাশাব্যঞ্জক।

সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি নিবারণের ব্যবস্থা না হইলে চোরাকারবার কিছুতেই বন্ধ হইতে পারে না। সরকারী চাউল অন্যায়ভাবে সরাইবার যে কয়টি চেষ্টা ইতিমধ্যে ধরা পড়িয়াছে তাহার সহিত সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত কেহ কেহ জড়িত রহিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। মিঃ কেসী যখন বাংলার গবর্ণর ছিলেন তখন তিনি একবার এই দুর্নীতি বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার আগে রোলাণ্ড কমিটি দুর্নীতি নিবারণের কতকগুলি উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। রোলাণ্ড কমিটির সুপারিশগুলির পরিসর কম ছিল বলিয়া মিঃ কেসী শ্রীযুক্ত বিজয়বিহারী মুখোপাধ্যায়কে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে দুর্নীতি নিবারণের উপযুক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা দাখিল করিতে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল জমি জরীপ বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন, শাসনকার্য্যে তাঁহার দক্ষতা অসাধারণ এবং চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। মিঃ কেসী উপযুক্ত লোককেই ভার দিয়াছিলেন এবং তিনিও অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া দাখিল করেন। মিঃ কেসি যখন তাঁহাকে নিযুক্ত করেন তখন ৯৩ ধারার শেষের দিকে। রিপোর্ট যখন তিনি দাখিল করেন তখন লীগ মন্ত্রীসভা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, যে লীগ মন্ত্রীসভা ঐ রিপোর্ট অনুসারে কাজ করেন নাই, এমন কি উহা প্রকাশও করেন নাই। রিপোর্টটি ধামাচাপা পড়িয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি নিবারণে ডাঃ ঘোষের আন্তরিকতা যদি সত্য হয়, ডাঃ ঘোষের মস্তিষ্ক স্বরূপ শ্রীঅন্নদা চৌধুরী যদি সত্যই এ বিষয়ে আগ্রহশীল হন তবে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ঐ রিপোর্টটি বাহির করিয়া অভিনিবেশ সহকারে উহা পাঠ করা এবং তদনুসারে অবিলম্বে কার্য্যে ব্রতী হওয়া। রিপোর্ট দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নাই কিন্তু শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়কে আমরা ব্যক্তিগত ভাবে জানি, বাংলার শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার রচনা পাঠ করিয়াছি। আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে ডাঃ ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত চৌধুরী রিপোর্টটি পাঠ করিলে পথের সন্ধান পাইবেন।

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের বিবৃতি

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহু লোক চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব বঙ্গের কোথায়ও কোন বড় ঘটনা না ঘটিলেও লীগ ন্যাশনাল গার্ডদের অত্যাচার এবং অন্যান্য কয়েকটি কারণে তাহারা আর পূর্ব্ব পাকিস্থানে নিজেদের জীবন এবং ধনসম্পত্তি নিরাপদ মনে করিতেছে না।

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়ের বিবৃতির মূল বক্তব্য এইরূপ :

"জনসাধারণ একথা জানেন যে, উত্তর এবং পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে বিশেষ ত্রাসের ভাব দেখা দিয়াছে। তাহারা আশঙ্কা করিতেছে যে, পঞ্জাবে যাহা ঘটিয়াছে তাহা পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গেও ঘটিতে পারে। সেই কারণেই অনেকে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতেছে। ইহার জন্য তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তাহারা আশঙ্কা করিতেছে যে, তাহাদের ধনসম্পত্তি, জীবন এবং তাহা অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান তাহাদের স্ত্রীলোকদের সম্মান পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের অধীনে নিরাপদ নয়। সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ, শ্রীহট্টের রাস্তার উপর জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের উপর অত্যাচার, যুবতীদের পিতার নিকট কুপ্রস্তাব করিয়া পত্র প্রেরণ এবং লীগ ন্যাশনাল গার্ডদের দ্বারা হয়রান হওয়ার বহু বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সব বিষয়ে অভিযোগ করা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। শান্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার কর্ত্তারা হয় এবিষয়ে উদাসীন, না হয় বিশৃঙ্খলা দমনে অত্যন্ত দুর্ব্বল। তাহার উপর এক দল মুসলমানের মধ্যে একটা মারমুখো ভাব বর্ত্তমান। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত মুসলমানরাও গণ্ডগোল করিতেছে। এই সমস্ত ব্যাপারের জন্যই পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গের হিন্দুরা নিজেদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে। বড় রকমের ঘটনা কোথাও ঘটে নাই, সে কথা সত্য; কিন্তু লোকেরা কি ঘটিয়াছে তাহার জন্য ভয় পাইতেছে না; তাহারা ভয় পাইতেছে কি ঘটিতে পারে সেই কথা ভাবিয়া। তাহারা আশঙ্কা করিতেছে যে, পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গে পূজার সময় যদি কোন গণ্ডগোল হয় তবে গবর্ণমেণ্ট তাহা আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইবে না।

"পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করিয়া এবং সেখানকার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, অধিকাংশ মুসলমানই হিন্দুদের সহিত শান্তিতে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেরা—তাহাদের সংখ্যা কম হইলেও—অধিকাংশ লোককে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে এবং গবর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থার মধ্যে আনিয়া ফেলিতেছে। গুণ্ডাদের কাজকে সহজ করিয়া তুলিতেছে খবরের কাগজগুলির মিথ্যা সংবাদ প্রচার। আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই যে, গবর্ণমেণ্ট যদি গুণ্ডা, মিথ্যা সংবাদপ্রচারক এবং সমাজের অন্যান্য অহিতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে এই অবস্থা সহজেই আয়ত্তে আনা সম্ভব।

পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলি সম্পর্কে মিঃ নাজিমুদ্দিন এবং তাঁহার কয়েকজন সহকর্মীর সহিত আমি খোলাখুলিভাবে আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলাম। অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যাই থাকুক না কেন, এ কথা আমি বিনা দ্বিধায় বলিতে পারি যে বিশৃঙ্খলা দমন এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য মিঃ নাজিমুদ্দিন এবং তাঁহার সহকর্মীরা সত্যই আগ্রহান্বিত। তাঁহাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তবে অসুবিধা এই যে, পূর্ব্ববঙ্গের গবর্ণমেণ্ট এখনও ঠিকভাবে চালু হয় নাই। তাহাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে কিছু সময়ের প্রয়োজন। মিঃ নাজিমুদ্দিনের সহিত আমার আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল, লীগ ন্যাশনাল গার্ডদের কার্য্যকলাপ বিশেষ করিয়া তাহাদের তল্লাসীর ব্যাপার। তিনি স্বীকার করেন যে, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক এইরূপ তল্লাসী তাঁহারা অনুমোদন করেন নাই এবং উহা বে-আইনী। এইরূপ বে-আইনী কার্য্যকলাপ বন্ধ করার জন্য তিনি নির্দ্দেশ দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি আরও বলেন যে শান্তি রক্ষার পুলিসকে সাহায্য করার জন্য তাঁহার গবর্ণমেণ্ট সকল সম্প্রদায়ের লোককে লইয়া হোম গার্ডের ন্যায় একটি রক্ষিবাহিনী গঠন করার কথা ভাবিয়াছেন। লীগ ন্যাশনাল গার্ডদের কার্য্যকলাপের পরেই যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশী অসুবিধা ঘটাইতেছে সেটি হইল জিনিষপত্র এবং যন্ত্রপাতি সরান সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের কোন সুস্পষ্ট নীতির অভাব। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নীতি সম্পর্কে কোন কথা বলেন নাই। তবে মিঃ নাজিমুদ্দিন বলেন যে, এই বিষয়টি সম্পর্কে তিনি ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের সহিত আলোচনা করিবেন এবং গবর্ণমেণ্টের নীতি পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিবেন।

সরকারী কর্ম্মচারীরা কোন্ রাষ্ট্রে যাইবেন সে সম্পর্কে তাঁহাদের মত পুনর্ব্বিবেচনা করার জন্য আর একটি সুযোগ দিবার যে অনুরোধ আমি করিয়াছিলাম পূর্ব্ববঙ্গ সরকার তাহাতে সম্মতি দিতে পারেন নাই। আমার মত দূর মনে হয় এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অসুবিধা হইল এই যে, হিন্দু অফিসাররা চলিয়া যাওয়ার ফলে যে সব মুসলিম কর্ম্মচারীর চাকুরীতে উন্নতি হইয়াছে, হিন্দু কর্ম্মচারীরা ফিরিয়া গেলে তাহাদের আবার নামিয়া যাইতে হইবে। পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ইহাকে কার্য্যকরী বা ভাল প্রস্তাব বলিয়া মনে করেন না। তবে প্রধান মন্ত্রী আমাকে এ কথা বলেন যে বর্ত্তমানে তাঁহারা কোন সম্প্রদায় হইতেই অফিসার লইতেছেন না। এই পদগুলি এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে বদলীর দ্বারা পূর্ণ করা যাইতেছে। তাঁহারা শীঘ্রই পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দ্বারা সাম্প্রদায়িক হার অনুযায়ী অফিসার নিয়োগের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া জানান।

কংগ্রেস-পতাকা উত্তোলন এবং বন্দেমাতরম্ ধ্বনি সম্পর্কে

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ইহাতে বাধা দেওয়া কাহারও উচিত নহে। বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণের সময় এ বিষয়ে তিনি তাঁহার মতামত পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিবেন।

খাদ্যনীতি এবং গৃহ দখল সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই দুইটি বিষয়ে প্রতি শহর, জেলা এবং মহকুমার বে-সরকারী কমিটিগুলির পরামর্শ অনুযায়ী পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্ট কাজ করিতে প্রস্তুত।

প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব রহিয়াছে; কিন্তু কয়েকটি জেলা হইতে আমি খবর পাইয়াছি যে, সেখানকার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরা কংগ্রেস এবং হিন্দুদের সহযোগিতার প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছেন। এই সব কর্ম্মচারীর কথা বলিয়া আমি সকল অফিসারকেই দোষ দিতেছি না। উঁহারও ব্যতিক্রম আছে সত্য; তবে সাধারণভাবে অফিসারদের মধ্যে একটা উপেক্ষা বা অসহায়ের ভাবই লক্ষিত হয়। আমরা স্বীকার করি যে, পূর্ব্ববঙ্গে একটি শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের হিন্দুদের গবর্মেণ্টকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। আমরা সহযোগিতা করার জন্য সব সময়ই আগ্রহান্বিত। তবে সেই সহযোগিতার মূলে সংখ্যালঘুদের রক্ষার কথা থাকিবে না—থাকিবে তাহাদের অধিকার স্বীকৃতির অঙ্গীকার। এখন সবার আগে যে সমস্যা সেটি হইল আইন এবং শৃঙ্খলা। যদি তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমস্ত রকমের বিশৃঙ্খলা কঠোরভাবে দমন করা হয়, তবে অন্যান্য সমস্ত বিষয় পরে করা সম্ভব হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে দুই-একটা কথা বলিতে চাই। তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, কংগ্রেস পূর্ব্ববঙ্গে ক্ষমতার অধিকারী নয়। সেইজন্য সেখানে কংগ্রেসের পক্ষে তাহাদের রক্ষার নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়। এইরূপ অবস্থায় পূর্ব্ববঙ্গ যাঁহারা ত্যাগ করিয়া আসিতে চান তাঁহারা আসিবেন। ইহাতে আমাদের বলার কিছু যায় আসে না। তবে সকলেই চলিয়া আসিতে পারেন না। তাঁহাদের প্রতি কংগ্রেস তাহার কর্ত্তব্য করিবে। তবে যাঁহারা পাকিস্থানে থাকিবেন তাঁহাদের প্রধানতঃ নিজেদের শক্তির উপরই নির্ভর করিতে হইবে। এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, পশ্চিম বঙ্গে ১ কোটি ৩০ লক্ষ হিন্দুর জায়গা নাই। আর যদি জায়গাও থাকে তাহা হইলেও এইরূপ স্থানান্তরকরণে কয়েক বৎসর সময় লাগিবে। আমি সেইজন্য একটি মধ্য-পথের কথা বলিতেছি।

গবর্মেণ্টের সহযোগিতায় একটি জেলা, মহকুমা, এমন কি থানার মধ্যে লোকবিনিময়ের ব্যবস্থার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। এই কাজটি কঠিন হইলেও দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে লোক-বিনিময়ের কাজ অপেক্ষা অনেক সহজ।

পূর্ব্ববঙ্গের সমস্যা সমাধানের উপায়

পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদিগের আশঙ্কা উদ্বেগের কথা স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া ঐ সমস্যার সমাধানের কোন যথাযথ চেষ্টা এত দিন হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। হিন্দু-মহাসভা যে ভাবে সে প্রশ্নের সমাধানের পথ দেখিয়াছেন তাহা অন্ধের ও অবিবেচকের পথ। কিরণবাবুর বিবৃতিতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি নিজের দায়িত্ব স্খালনের চেষ্টাই করিয়াছেন অধিক, তবে কিছু সুযুক্তিও দিয়াছেন। সত্য কথা বলিতে কি, যুক্তপ্রদেশের মুসলমানদিগের জন্য চৌধুরী খালিকুজ্জমান বা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদিগের জন্য সুরাবর্দী যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদিগের জন্য কোনও হিন্দুনেতাকে তাহার এক-শতাংশ চেষ্টা করিতে বা দায়িত্ব-গ্রহণ করিতে প্রস্তুত দেখিতেছি না।

পলায়নের পথ দেখান অতি সহজ, কেননা পরে যদি কিছু ঘটে তবে নেতা মহাশয় আস্ফালন করিয়া বলিতে পারিবেন, "আমি ত আগেই বলেছিলাম।" নেতৃস্থানীয় সকলকেই আমরা একথা ভাবিতে ও বলিতে দেখিতেছি। কিন্তু "যঃ পলায়তি স জীবতি" ইহা কি সম্পূর্ণ সত্য? যাহারা পলাইয়া আসিবে তাহাদের পথের ও পাথেয়ের ব্যবস্থা করিবে কে? তাহাদের আশ্রয় ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেছে কে? সুসময়ের "নেতা" দুঃসময়ে সর্ব্বাগ্রে ভীতচকিত এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হাল ছাড়িবেন, ইহা ত বাংলা দেশের নিয়মই দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের স্পষ্ট ভাবে একথা বলিবারও সাহস নাই যে যাঁহারা ঐ আতঙ্কিত লোকদের বলিবেন, "মাভৈঃ, নিজের জোরের উপর দাঁড়াও। চলিয়া আসিলে পথের বিপদ—যাহা দলে দলে পলাইতে আরম্ভ করিলেই চতুর্দ্দিকে দেখা দিবে—কাটাইয়া যদিই-বা এদিকে পৌঁছাইতে পারা যায়, তবে এখানে পথের ভিখারীর মত ঘুরিতে হইবে। পিতৃ-পিতামহের অর্জ্জিত ধনসম্পত্তি ত চিরদিনের মত যাইবেই, নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করার কোন উপায়ও পাওয়া যাইবে না। অতএব দলবদ্ধ হইয়া নিজের অধিকার, নিজের স্বত্ব-স্বামিত্ব রক্ষার জন্য ফিরিয়া দাঁড়ানো ভিন্ন অন্য কোনও উপায় নাই।"

পূর্ব্ববঙ্গে ভয়ের আশঙ্কা এখনও ছায়ার মত রহিয়াছে। তাহা যে ঘনীভূত হইবে না, একথা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু বিপদ হইতে পরিত্রাণের একমাত্র পথ কি পলায়ন? আমরা জানি ঢাকা, বরিশাল, বিক্রমপুর, কুমিল্লা ইত্যাদি অঞ্চলে এখনও এরূপ লোক আছেন যাঁহারা চিরাচরিত পৌরুষের পথই একমাত্র পথ বলিয়া জানেন। ইঁহাদের সহায়তা করা ও ভার লাঘব করাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। নোয়াখালিতে সতীশবাবুর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সকলে উদ্বুদ্ধ হউন।

পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান সমস্যার দুইটি দিক আছে। পূজা ও ঈদের সময়ে যে গোলযোগের আশঙ্কা হইতেছে তদ্বিষয়ে অবিলম্বে সতর্কতা অবলম্বন এবং স্থায়ীভাবে হিন্দুরা যাহাতে সেখানে বাস করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। প্রথমটির সমাধানের জন্য হিন্দু-মুসলমান নেতারা একত্রে প্রচারকার্য্যে বাহির হইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং ঢাকায় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু-মহাসভা প্রভৃতির এক মিলিত বৈঠকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে নিম্নলিখিত কর্ম্মসূচী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে—

(১) পূজা এবং বকর ঈদ চিরাচরিত প্রথায় স্বাভাবিক ভাবে উদ্‌যাপিত হইবে, কেহ তাহাতে বাধা দিবে না।

(২) মসজিদ হইতে ১০০ গজ দূরবর্ত্তী বাড়ীতে পূজার বাজনাতে আপত্তি হইবে না।

(৩) মসজিদ হইতে ১০০ গজের মধ্যে যে সব বাড়ী অবস্থিত সেগুলিতে নমাজের সময় বাজনা বন্ধ থাকিবে।

(৪) নমাজের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে এবং সকলকে তাহা জানাইয়া দেওয়া হইবে। যে সব লাইসেন্স দেওয়া হইবে তাহাতেও নমাজের সময়ের উল্লেখ থাকিবে।

(৫) বিজয়ার শোভাযাত্রা বাহির করা হইবে কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় কোন মসজিদের ১০০ গজের মধ্যে বাজনা হইবে না। শোভাযাত্রীদের সঙ্গে কোন অস্ত্র অথবা আঘাতের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এরূপ কোন বস্তু থাকিবে না। পটকা হাউই বা বোম ফাটানো হইবে না।

(৬) বকর ঈদের সময় গো-কোরবানী হইবে কিন্তু চিরাচরিত প্রথায় অপরের মনে আঘাত না দিয়া বাহিরের লোকের চক্ষের অন্তরালে কোরবানী করা হইবে।

(৭) কেবলমাত্র আনন্দ-উৎসব প্রভৃতিতে হিন্দুরা মুসলমানদের নিমন্ত্রণ করিতে পারিবেন এবং মুসলমানেরা উহা গ্রহণ করিবেন। বকর ঈদ উপলক্ষে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পর শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিবেন।

(৮) পূজার কয় দিন সমগ্র জেলায় ১৪৪ ধারা জারী করিয়া প্রকাশ্যে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চলাফেরা নিষিদ্ধ করা হইবে। এই আদেশ কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হইবে এবং যাহারা উহা ভঙ্গ করিবে তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ মামলায় সোপর্দ্দ করা হইবে।

শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় বলিতেছেন যে কলিকাতা যদি বিজয়া এবং ঈদে শান্ত থাকে তবে পূর্ব্ববঙ্গেও কোন অশান্তি হইবে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কলিকাতা শান্ত থাকিবে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে কলিকাতার লোক দেখাইয়াছেন যে তাঁহারা অশান্তি চান না, কোন দুষ্টবুদ্ধি লোক হাঙ্গামা বাধাইবার চেষ্টা করিলে ছাত্র ও তরুণেরা বুকের রক্ত ঢালিয়া তাহা থামাইয়াছেন, ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হইলে তাঁহারা পিছাইয়া থাকিবেন না। তবে এবার প্রথম হইতেই তাঁহাদের সতর্ক থাকা ভাল। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুমহাসভা পূর্ব্ববঙ্গ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিজ্ঞজনোচিত হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যাঁহারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদের পিছনে হিন্দুমহাসভার কোন কোন "নেতার" উস্কানি রহিয়াছে ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। মানুষের দুর্ভাগ্যের ও অসহায়তার সুযোগ লইয়া তাহাকে শোষণ করা যেমন ঘোর অন্যায়, উহার দ্বারা রাজনৈতিক অভীষ্ট সিদ্ধিও তেমনি অন্যায়। আতঙ্ক প্রচারের দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে ও কলিকাতায় বহু লোক আনিয়া ফেলিয়া গবর্ণেণ্টকে বিব্রত করিয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন এরূপ লোক অনেক রহিয়াছেন, হিন্দুমহাসভা বর্ত্তমানে তাঁহাদের এই কার্য্যের কেন্দ্র। মানুষের প্রতি দরদ ইঁহাদের থাকিলে আমরা এই সকল লোককে রাণাঘাট, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে সেবাকার্য্যে ব্রতী দেখিতে পাইতাম। হিন্দুমহাসভার নামে এইরূপ কার্য্যকলাপ এবং প্রচারকার্য্য যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদের উপর বাঙালীকে এখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইঁহারা দেশের মঙ্গল করিতে পারেন না কিন্তু অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা যথেষ্টই রাখেন। গত এক বৎসরের দাঙ্গায় এবং তৎপূর্ব্বে দুর্ভিক্ষের সময় ইঁহাদের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা আসিয়াছে, তাহার সদ্ব্যয় হইয়াছে কিনা সে বিষয়েও লোকের সন্দেহ আছে। বেলিয়াঘাটা গান্ধীশিবিরের ঘটনাতেও ইঁহাদের সুনাম বাড়ে নাই। এই সকল "নেতা" এখনও যদি প্রকৃত দেশসেবায় ব্রতী না হন, দুর্ভিক্ষে ও রাষ্ট্রবিপ্লবে ব্যক্তিগত ও দলগত সুবিধা সঞ্চয় যদি এখনও ইঁহাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে তবে ইঁহাদের কার্য্যকলাপের পূর্ণ বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়া উঠিবে।

পূর্ব্ববঙ্গে বড় 'পকেট' সৃষ্টি করিয়া হিন্দুদের স্বস্তি সহকারে বাঁচিবার সুযোগ করিয়া দিবার জন্য শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সমীচীন। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া বাস্তুত্যাগে কোন লাভ নাই, আর্থিক সর্ব্বনাশ নিশ্চিত। তবে যাঁহারা আসিয়া পড়িতেছেন তাঁহারা যাহাতে রেল-ষ্টেশনে বা বাজারে অসহায় ভাবে বাস করিতে বাধ্য না হন তৎপ্রতি ঘোষ মন্ত্রিসভার দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদের বিশ্বাস পূর্ব্ববঙ্গে পূজা ও ঈদ নিরুপদ্রবে কাটিলে ইঁহাদের প্রায় সকলেই ফিরিয়া যাইবেন। আপাততঃ কিছুদিনের জন্য ইঁহাদিগকে একটু নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য দানের ব্যবস্থা করা হইলে মানবতার মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে।

পুলিস কর্তৃক "ব্ল্যাকমার্কেট দমন"

ডাঃ ঘোষের মন্ত্রিসভা যেমন প্রথমটা সর্ব্ববিষয়ে নীরব ঔদাসীন্য দেখাইয়া আসিয়াছেন এবার ঘোষণার পর ঘোষণা, অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্সের বিপুল সমারোহে ও কোলাহলে তাহা পোষাইয়া লইতে চাহিতেছেন। কিন্তু শুভ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার বাস্তব আগ্রহের অভাব আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনি রহিয়াছে। বক্তৃতা ও অর্ডিনান্সেই যদি রাজ্যশাসন চলিত তবে সুরাবর্দী সাহেবের পতন কোনকালেও হইত না।

ডাঃ ঘোষ ব্ল্যাকমার্কেট অর্ডিনান্সের দ্বারা চোরাকারবারীদের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইবে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, বিরাট জরিমানা, ব্যবসায়ের লাইসেন্স খারিজ, প্রদেশ হইতে বহিষ্কার প্রভৃতি বড় বড় ভয় দেখাইয়াছেন কিন্তু অর্ডিনান্স

প্রয়োগের ভার দিয়াছেন পুলিসের সেই বিভাগের সেই সব পুরনো কর্ম্মচারীদের উপর, যাহারা এতদিন চোরাকারবারী-দের হাতে হাত মিলাইয়া চলিয়াছে। বিড়িওয়ালা দেশলাই-ওয়ালা প্রভৃতি ধরিয়া ইহারা কেস দেখাইয়াছে এবং অজ্ঞাত কিন্তু অনুমানযোগ্য কারণে বড় বড় অসাধু ব্যবসায়ীদের নির্ব্বিবাদে ব্যবসায় চালাইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে। এবারও ঠিক তাহাই হইতেছে। লোকের বাড়ী বাড়ী চড়াও হইয়া পাঁচ দশ সের বা এক মণ অতিরিক্ত চাউল বাহির করিবার জন্ত ইহাদের উৎসাহ অতি প্রচণ্ড, কিন্তু বড় ব্যবসায়ীদের অথবা অসাধু সরকারী কর্ম্মচারীদের নিকটবর্ত্তী হইতে ইহারা একান্ত পরাঙ্মুখ। অর্ডিনান্সের কথা প্রকাশ হইবার সময়েই কলি-কাতার একটি দৈনিক পত্রিকা লিখিয়াছিলেন যে এনফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চ পুলিশ এই অর্ডিনান্স প্রয়োগ করিবে তাহার কর্ম্মচারীরা এ বিষয়ে উপযুক্ত অথবা নির্ভরযোগ্য কিনা ইহাদের সার্ভিস রেকর্ড দেখিয়া তাহা স্থির করা হউক। লীগ আমলে এই লোক দেখানো বিভাগটির কর্ম্মচারীরা দুর্নীতির প্রচুর অবসর পাইয়াছে, বড় বড় চোরাকারবারীদের সহিত ইহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধুত্বের সুযোগও ঘটিয়াছে, ইহারা এখন সেই সব ব্যবসায়ীর বাড়ী তল্লাস করিবে ইহা আশা করাই অন্যায়। সার্ভিস রেকর্ড যাচাই করিলে এই বিভাগের প্রায় দেড় শত কর্ম্মচারীর মধ্যে ডজনখানেকও উপযুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য লোক বাহির হইবে কিনা সে বিষয়ে আমাদেরও ঘোরতর সন্দেহ আছে। এখনই ইহারা পুরনো পদ্ধতিতে চুণাপুঁটি ধরিবার চেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছে। সরকারী দোকানে প্রায়ই চাউল বা আটা পাওয়া যায় না বলিয়া যাহারা বাধ্য হইয়া কয়েক সের বা এক আধ মণ চাউল বা আটা প্রাণের দায়ে ও শিশু পুত্র-কন্যার মুখ চাহিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, এন্‌ফোর্সমেণ্ট ব্রাঞ্চের পুলিসদল পরমোৎসাহে ঘটা করিয়া তল্লাসী করিয়া ইহাদের এই সঞ্চিত চাউল উদ্ধার করিয়া বাহাদুরি দেখাইতেছে। সারাদিন ২৫ জায়গায় তল্লাসী ঘুরিয়া তিন মণ চাউল উদ্ধার করিয়া যাহারা বাহাদুরী দেখায়, অথচ ২৫ দিনের চেষ্টার পরও এক জন প্রকৃত চোরাব্যবসায়ী ধনীকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাইতে পারে না তাহাদের প্রশংসা করার আমরা কিছু তো দেখিই না, উপরন্ত মন্ত্রিমণ্ডলের উল্লাস ও জোয়ারার মত উচ্ছ্বাসের কারণও কিছুই পাই না। সুরাবর্দীর হুকুমকে আইনের মর্য্যাদা দিয়া স্বাধীন ভারতে ছাপোষা গৃহস্থকে আরও বিব্রত করিয়া, নষ্টের মূল যাহারা তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় যে মন্ত্রীসভা, তাহা কখনও মঙ্গলকর কাজ করিতে পারিবে না। খাদ্যসংগ্রহের দায়িত্ব লইয়া ইঁহারা খাদ্যদানে অসমর্থ, সরকারী দোকানে প্রায়ই হয় চাউল না হয় আটা থাকে না, এই অবস্থায় খাওয়ার জন্ত যাহারা সামান্য চাউল সংগ্রহ করিয়াছে তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়ার রীতি ডাঃ ঘোষ অবিলম্বে বন্ধ করুন। জমির কাটকাবাজী, বাড়ীর সেলামী, মাছের গলাকাটা দর, ডাল তেল, ঘি কাপড় প্রভৃতির বড় বড় চোরাকারবারী ধরিবার চেষ্টা তীব্র করুন, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল বন্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হউন। লোকে খাওয়ার জন্য মাথাপিছু দশ সের চাল রাখিতে পারিবে এইটুকু বলিয়া দিলেই পুলিশের এই অত্যাচার বন্ধ হইয়া যায়।

রেলওয়ে মাল বুকিং আপিসে দুর্নীতি

দৈনিক 'ভারত'-এর ১৫ই আশ্বিন তারিখের সংখ্যায় নিম্ন-লিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে, উহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন কিন্তু প্রতিকার আবশ্যক,—

আমাদের দেশে কি ঘুষ নেওয়ার চিরাচরিত প্রথা কোন-দিনও বন্ধ হইবে না? আমি রেলওয়ে বুকিং-এর কথাই বলিতেছি। যে-কোন ভদ্রলোক যে-কোন বুকিং আপিসে যান, দেখিবেন একটা মালের উপর কোন বাবু চার আনা, কোন বাবু আট আনা কোন বাবু ১৲, ২৲ লইতেছেন। আর যদি সেই মাল গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পাঠান নিষিদ্ধ হয় তবে তাঁহারা উহার তিন গুণ হইতে চতুর্গুণ লইয়া থাকেন। ব্যবসায়ীরা অম্লানবদনে উহা দিয়া যান। কিন্তু উঁহারা কি জনসাধারণের উপর হইতে চক্রবৃদ্ধি হারে সেই টাকা আদায় করেন না? বুকিং আপিসের সকল বাবুই 'খরচা দিন' এই বলিয়া আদায় করেন। খরচাটা কিসের? কোম্পানী কি ইঁহাদের মাহিনা দেন না? সমস্ত দিনে যে টাকাটা আদায় হয়, দারোয়ান হইতে বড় সাহেব পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে ভাগ হয়—সেইজন্ত যখনই কোন উপরওয়ালা তদারকে যান তখনই ইঁহারা সাবধান হইতে পারেন। এটা আমার নিজের চোখে দেখা। এই দুর্নীতি কম বেশী সমস্ত বুকিং আপিসেই চলিতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে 'আরমানি ঘাট' হইতে (বি এন আর গুডস্) রাঁচীতে এক বস্তা (১ হন্দর) নাট বল্টু পাঠাই। ফরওয়ার্ডিং পাস করিতে ২৲, ছাপ মারিতে ।০, ওজন করিতে ।০, মার্কা দিতে ।০, ইনচার্জ্জ দিতে ।০, 'এ' ফরম লাগাইতে ।০ (চাবি ॥০), রেজিষ্ট্রি করিতে ।০, রসিদ আনিতে ৵০, একুনে ৩॥৵০—মনে রাখিতে হইবে একটা মালের উপর—অথচ ভাড়া ২৲ টাকার মধ্যে।

হয়ত বলিবেন মশায় দেন কেন? কিন্তু এমনই কল পাতিয়া রাখা হইয়াছে যে, না দিলেই বা উপায় কি? যিনি এই সব দক্ষিণা না দিবেন, পড়িয়া থাকিবে তার মাল অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্ত। সুতরাং এই কলটাকে বিগড়াইয়া দেওয়া দরকার।

প্রত্যেকে যখন ১০টার সময় কাজে আসেন তখন শূন্য পকেট। কিন্তু বেলা ৪টার সময় পকেট এবং ড্রয়ার সার্চ করুন এক এক জনের নিকট কমপক্ষে ৫০৲ হইতে ২০০৲ পর্য্যন্ত পাইবেন। এরূপ প্রত্যহ হইতেছে।

জনসাধারণকে এরূপ অহেতুক ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করার জন্ত সরকারের নিকট আবেদন করিতেছি এবং জন-সাধারণকে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি। স্বাঃ গজেন্দ্র নাথ মিত্র, ৪৭-এ, বীডন ষ্ট্রীট।

পরলোকে মৃণালকান্তি ঘোষ

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ গত ২৪শে আশ্বিন সাতাশী বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। অমৃত বাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, শিশিরকুমার ঘোষের মধ্যমাগ্রজ হেমন্তকুমার ঘোষ মহাশয়ের তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র। পত্রিকার প্রায় প্রথমাবস্থা হইতে ইহার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। যে সব কর্ম্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমে পত্রিকা আজ এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে মৃণালকান্তি ছিলেন অন্যতম। তিনি নিজে পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ হইতে প্রকাশিত 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী'র সম্পাদনায় এবং 'গোবিন্দদাসের করচা' নামক আলোচনা-পুস্তক রচনায় ইহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার 'পরলোকের কথা' আর একখানি সুপাঠ্য গ্রন্থ। তিনি গবেষক ও সাহিত্য-সেবীদের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গেও তাঁহার গভীর যোগ ছিল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা একজন আত্মীয় বিয়োগের বেদনা অনুভব করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইবার জন্য মানভূমবাসীদের দাবি

গত ৫ই অক্টোবর পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য-মন্দির হলে মানভূম জেলাবাসীদের এক বিরাট সভা হয়। সভায় দাবি করা হয় যে সমগ্র মানভূম জেলা, সিংভূম জেলার ধলভূম মহকুমা, দুমকা সদর মহকুমার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চল এবং পূর্ণিয়া জেলার কিষেণগঞ্জ মহকুমা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের সংলগ্ন। এই সকল অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বাংলাভাষাভাষী। বাংলার সহিত ইহাদের সর্ব্বপ্রকার যোগসূত্র রহিয়াছে। কাজেই গণপরিষদ যেন এই সকল অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন।

পুরুলিয়ার তরুণ সাহিত্য সঙ্ঘ ও মাঙ্গলিক সাহিত্য-বীথির উদ্যোগে এই সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীচারুচন্দ্র দাস। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন,

"আমাদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবি তুলবার সঙ্গে সঙ্গেই পাটনার কয়েকটি সংবাদপত্র যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করতে আরম্ভ করেছেন তাতে চুপ করে থাকা বা দুই কথা বলায় কর্ত্তব্যের ত্রুটি হবে। তাঁরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন যে, বিহারের এক ইঞ্চি জমিও তাঁরা কাকেও দেবেন না। বিহার সাংবাদিক মহলের এই যুদ্ধ ঘোষণা অশোভন। বিহারবাসী জনসাধারণের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আমাদের দাবির যৌক্তিকতা ও ন্যায়ানুগত্য স্বীকার করে যাতে আমাদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবি সাফল্যমণ্ডিত হয় সে বিষয়ে তাঁরা উদারতার সহিত যত্নশীল হবেন। আমাদের সঙ্গে তাঁরাও যোগ দেবেন। বিহার ও বিহারীদের সহিত আমরা কোন রকম তিক্তভাবের সৃষ্টি করতে চাই না। আমরা মাত্র ফিরে যেতে চাই আপন মায়ের স্নেহের ক্রোড়ে, এতে রাগ করার কোন স্থান নেই।

ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি ইত্যাদির ভিত্তিতে বর্ত্তমান প্রদেশগুলির সীমানা নির্দ্ধারণ করতে হবে—এ কথা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বহুবার আনুষ্ঠানিকভাবে বলে এসেছেন। এ ছাড়া গণ-পরিষদ একটি সীমানা নির্দ্ধারণ কমিটিও গঠন করেছেন এবং তার প্রাথমিক কাজ সুরু হয়েছে। এদের সমক্ষে বঙ্গভুক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার দাবি যুক্তি ও প্রমাণসহ উপস্থাপিত করতে হবে। কাজেই আমাদের চুপ করে থাকা চলে না। আমাদের দাবিতে আমরা অটল। আমরা অবশ্য প্রাদেশিক মৈত্রী ও সখ্যের কথা ভেবে, নিরপেক্ষ বিচার ও বিদ্বেষ-বিহীন চিত্তে পরস্পরের সঙ্গে যুক্তিবাদমূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে রাজী আছি। এ বিষয়ে বিহারের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহের আপোষ-মনোভাবমূলক আবেদনের আমি সমর্থন করি। বিহারী ভাইদেরও উচিত আমাদের প্রতি অযথা দোষারোপ ও বিদ্বেষ প্রচার না করা। এই প্রসঙ্গে একটি দুঃখের ব্যাপারের উল্লেখ করতে বাধ্য হচ্ছি। শহরের দু-এক জন বহিরাগত বণিক মানভূমবাসীর মধ্যে শ্রেণী-বিদ্বেষের বিষ ছড়াবার চেষ্টা করছেন। বাংলার সঙ্গে মানভূমের নাড়ীর অচ্ছেদ্য যোগের কথা যদি অস্বীকার করতে হয় তা হলে অস্বীকার করতে হবে নিজেদেরই মাতৃভাষা বাংলাকে। মানভূমবাসী যদি বাংলাকে অস্বীকার করে তা হলে তার নিজের প্রকৃতি ও সত্তাকেই অস্বীকার করা হয়। মানভূম পশ্চিম বাংলার আর পশ্চিম বাংলা মানভূমের। এ দুয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্ত্তমান।"

সভায় মানভূম জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তি আসিয়া যোগদান করেন। এই আন্দোলন আরও তীব্র ও ব্যাপক করিয়া তোলা একান্ত আবশ্যক। প্রবল আন্দোলন ভিন্ন বাঙালীদের এই ন্যায়সঙ্গত দাবি গণ-পরিষদের কর্ণগোচর করা কঠিন হইবে। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙালীদের তরফ হইতে কথা বলিবার মত যোগ্য ব্যক্তি বর্ত্তমানে গণ-পরিষদে বাংলার প্রতিনিধি দলের মধ্যে নাই বলিলেই চলে। সুতরাং বাহিরের আন্দোলনের দ্বারাই বাঙালীর কথা গণ-পরিষদকে শুনাইতে হইবে।

আসামে বাঙালী

আসামে বাঙালীদের উপর উৎপীড়ন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। গৌহাটি হইতে বাঙালী সমিতির সম্পাদক জানাইতেছেন যে ৪ঠা অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় এক অসমিয়া জনতা শহরের প্রধান প্রধান রাজপথের বাঙালী দোকানসমূহ হইতে বাংলায় লেখা সাইনবোর্ড জোর করিয়া টানিয়া নামাইয়াছে। তাহাদের আপত্তি এই যে, সাইনবোর্ড বাংলায় না লিখিয়া

অসমিয়ায় লিখিতে হইবে। সাত দিন আগে ইহারা সাইনবোর্ড বদলাইবার জন্য নোটিশ দিয়া গিয়াছিল। জেলার ডেপুটি কমিশনারকে উহা জানানও হইয়াছিল কিন্তু তিনি এই গুণ্ডামি বন্ধ করিতে পারেন নাই।

আসামে দীর্ঘকাল যাবৎ 'বঙ্গাল-খেদা' আন্দোলন চলিতেছে। আসাম রেলওয়েকে বি-এ-আর হইতে পৃথক করিয়া উহার হেড আপিস গৌহাটিতে স্থানান্তরিত হওয়ায় বহু বাঙালী কর্ম্মচারী সেখানে গিয়াছেন। ইঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারী। কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে গৌহাটি হেড আপিসে বাঙালী কর্ম্মচারী না পাঠাইয়া মাদ্রাজী বা অন্য প্রদেশের লোক পাঠাইতেও পারিতেন। এই বাঙালী কর্ম্মচারীরা অসমিয়াদের চক্ষুশূল হইয়াছেন এবং তাঁহাদের উপর নানা ভাবে নির্যাতন চলিতেছে। শ্রীঅম্বিকাগিরি রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে আসাম জাতীয় মহাসভা নামক একটি প্রতিষ্ঠান এই বঙ্গাল খেদা আন্দোলনের নায়ক এবং রেলের চাকুরি অসমিয়াদের দিতে হইবে ইহাই ইঁহাদের প্রধান দাবি। ইঁহাদের আন্দোলন শুধু সভা-সমিতিতে আবদ্ধ থাকে নাই, বাঙালী দোকানে ঢিল ছুঁড়িয়া ক্ষতি করা, বাঙালীদের আক্রমণ করা প্রভৃতির সংবাদও আসিয়াছে। এই সব নিন্দনীয় কার্য্যের প্রতিবাদ হইলে আসামের প্রধান মন্ত্রী একটা ভাসা ভাসা রকমের জবাব দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে প্রদেশের লোকের অভিযোগ থাকিলে তিনি আর কি করিতে পারেন। অসমিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ এই আন্দোলনের সহিত জড়িত এরূপ সংবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদলৈর মন্তব্য ঠিক মত রিপোর্ট হইয়াছে কি না জানি না তবে এইটুকু দেখা যাইতেছে যে এই সব গুণ্ডামি বন্ধ করিবার জন্য তিনি উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা করেন নাই।

বাঙালীদের বিরুদ্ধে অভিযান এবং বাংলা হরফে আপত্তি অসমিয়াদের পক্ষে বিচিত্রই বটে। আসামের নিজস্ব কোন অক্ষর নাই, বাংলা অক্ষরই তাহাদের অক্ষর, তফাৎ শুধু দুইটি বর্ণের—র এবং য। অসমিয়া ভাষার নিজস্ব কোন ব্যাকরণ নাই, বাংলা ব্যাকরণই তাহারও ব্যাকরণ। আসামের প্রতি বাংলাদেশের দানের পুরনো কথা না তুলিয়া গত কয়েক বৎসরের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ প্রধান মন্ত্রীর আসনে বসিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায়। বাংলা ও আসাম লইয়া গ্রুপ গঠনের যে প্রস্তাব ক্যাবিনেট মিশন করিয়াছিলেন তাহাতে বাংলার লাভ ছিল, ক্ষতি ছিল আসামের। আসাম গ্রুপে বসিতে আপত্তি করে এবং আসামের প্রতি অন্যায় হইয়াছে ইহা ভাবিয়া বাংলাদেশ নিজের স্বার্থের ক্ষতি করিয়াও আসামকে সমর্থন করে। বাঙালী ও শ্রীহট্টবাসীরা আসামকে এ বিষয়ে সমর্থন না করিলে, বাংলার সংবাদপত্রসমূহে আসামের আপত্তি বিপুল ভাবে প্রচারিত না হইলে হয়ত ভারতের রাজনীতি আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করিত। উহাতে আসামের অস্তিত্ব লোপের ব্যবস্থাও হয়ত হইতে পারিত। ময়মনসিংহে পূর্ব্ব পাকিস্থান কিল্লা স্থাপন করিয়া আসামে যখন পাকিস্থান অভিযান আরম্ভ হয় তখন বাংলা ও শ্রীহট্ট তাহাকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করিয়াছিল। আসামের যে কুখ্যাত লাইন প্রথার বিরুদ্ধে পণ্ডিত নেহরু পর্য্যন্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন, বাংলা ও শ্রীহট্ট তাহাও সমর্থন করিয়াছে এবং সমর্থন করিয়া আসামকে মুসলমান অভিযান হইতে বাঁচাইয়াছে। গত সাত বৎসরের মধ্যে বাংলার নিকট হইতে এত উপকার লাভ করিয়াও বাংলা ও শ্রীহট্টের নিকট অসমিয়ারা যে কৃতজ্ঞতার অভাব প্রদর্শন করিলেন, তাঁহাদের সহিত যে তিক্ততার সম্পর্ক সৃষ্টি করিলেন তাহার পরিণাম তাঁহাদের পক্ষেই অশুভ হইবে।

শ্রীহট্টবাসী সরকারী কর্ম্মচারীদের সহিত বরদলৈ গবর্মেণ্ট যে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা অতিশয় নিন্দনীয়। ৩রা জুনের পর আসামের শ্রীহট্টবাসী সরকারী কর্ম্মচারীরাই সরকারী সারকুলার অনুসারে ভারতীয় ইউনিয়নে কাজ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। শ্রীহট্টে গণভোটের ফল বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বরদলৈ গবর্মেণ্ট ইঁহাদের সকলকে আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীহট্ট জেলায় বদলী করেন। অন্যান্য প্রদেশ এ বিষয়ে যাহা করিয়াছে তদনুসারে ইঁহাদিগকে আসামে রাখিয়া শ্রীহট্টে কর্ম্মরত যে সব কর্ম্মচারী ভারতীয় ইউনিয়নে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও আসামে বদলী করা উচিত ছিল। বরদলৈ গবর্মেণ্ট ইহার ঠিক বিপরীত কাজ করিলেন এবং এই বলিয়া সাফ জবাব দিলেন যে শ্রীহট্টের বাড়তি লোক লইয়া তাঁহারা স্থানীয় লোকদের সরকারী চাকুরিতে প্রবেশের পথ সঙ্কুচিত করিতে পারিবেন না। এ দিকে পাকিস্থান সরকার ইঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিতেছেন। এই অবস্থায় শ্রীহট্টবাসী কর্ম্মচারীদের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছে। বরদলৈ গবর্মেণ্টের এই কার্য্য অতিশয় অসাধুতার নামান্তর এবং এ বিষয়ে ভারত-সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত। ভারত-সরকার এপর্য্যন্ত যাহা করিয়াছেন তাহাতে বিশেষ কিছুই ফল হয় নাই।

অসমিয়াগণের সমগ্র আসামে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

অসমিয়ারা সমগ্র আসামে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের কথায় ও কাজে এই ভাবটিই ফুটিয়া উঠিতেছে যে আসাম অসমিয়াদের, অপর সকলে অবাঞ্ছিত আগন্তুক মাত্র। এইটি ঐতিহাসিক সত্য নয়। আসামের খাসিয়া, গারো, নাগা, মিরি, মিশমি, আবর, কুকি, লুসাই, কাছাড়ী প্রভৃতি অসমিয়াদের চেয়ে অনেক প্রাচীন অধিবাসী, অসমিয়ারা মাত্র কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে আসামে প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজ এই প্রদেশের নাম দিয়াছে আসাম এবং তাহারই জন্য

অসমিয়ারা সমগ্র আসাম তাহাদেরই দেশ এই মনোভাব পোষণ ও প্রচার করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে। শ্রীযুক্ত বরদলৈ জানাইয়াছেন যে আসামে অসমিয়া হইবে রাষ্ট্রভাষা এবং উহাই হইবে শিক্ষার বাহন। তবে পার্ব্বত্য অঞ্চলগুলিতে পার্ব্বত্য-জাতিদের ভাষা দ্বিতীয় ভাষারূপে গণ্য হইবে। গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও শ্রীহট্টের বাংলাভাষাভাষীদের দাবি কোন ক্ষেত্রেই স্বীকার করা হয় নাই যদিও ইহারা অসমিয়াদের চেয়ে আসামের পুরাতন অধিবাসী। ভাষার দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় আসামে শতকরা প্রায় ২০ জন অসমিয়া ভাষী, ২৫ জন খাসিয়া, গারো, নাগা, মণিপুরী, কাছাড়ী প্রভৃতি ভাষা-ভাষী এবং বাংলাভাষাভাষী শতকরা ৪৩ জন। শ্রীহট্ট বাহির হইয়া যাওয়ার পর বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে বটে, তবে যে অসমিয়া ভাষীদের চেয়ে খুব নীচে নামিয়া গিয়াছে তাহা বলা কঠিন। জাতি হিসাবে দেখিলেও দেখা যাইবে শ্রীহট্ট বিদায়ের আগে আসামের এক-তৃতীয়াংশ ছিল হিন্দু, এক-তৃতীয়াংশ পার্ব্বত্য জাতি এবং এক তৃতীয়াংশ মুসলমান। হিন্দুর মধ্যে অসমিয়া ও বাঙালী উভয়ই আছে। শ্রীহট্ট বাহির হইয়া যাওয়ার পর আসামের লোকসংখ্যা এখন হইবে প্রায় ৭১ লক্ষ; তন্মধ্যে ৩১ লক্ষ খাসিয়া, গারো, নাগা প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি, ২২ লক্ষ অসমিয়া এবং প্রায় ১৮ লক্ষ বাঙালী। এদিক দিয়াও অসমিয়ারা আসামের উপর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব দাবি করিতে পারে না, সে অধিকার বরং পার্ব্বত্যজাতিদের কতকটা আছে। আসাম ব্যবস্থাপক সভায় অসমিয়াদের যতগুলি সদস্য আছে—অপর সকলের মিলিত প্রতিনিধি সংখ্যা তার প্রায় দ্বিগুণ। পার্ব্বত্য জাতিদিগকে বাঙালীদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যাপ্রচারের দ্বারা উত্তেজিত করিয়া অসমিয়ারা তাহাদের একাংশ ও ইংরেজ চা-করদের সাহায্যে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন। এখন পার্ব্বত্য জাতিরা এই ভাঁওতা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইংরেজ চা-করদের ক্ষমতাও অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই অবস্থাতেও শ্রীযুক্ত বরদলৈ কোন্ ভরসায় বাঙালীদের বিরুদ্ধে অসমিয়াদের অভিযানে পরোক্ষে সহায়তা করিতেছেন তাহা উপলব্ধি করা বস্তুতঃই দুরূহ। বরদলৈ মন্ত্রীসভার স্বৈরাচার, সঙ্কীর্ণতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিষদের অসমিয়া ভিন্ন অপর সকল দল মিলিত হইলে শ্রীযুক্ত বরদলৈ কিরূপে তাঁহার মন্ত্রীসভা বজায় রাখিবেন তাহা বুঝা দুষ্কর।

খাসিয়া নাগা প্রভৃতি জাতিরা বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে অসমিয়াদের চেয়ে বিশেষ পিছনে নাই। খাসিয়া ও নাগাদের উপযুক্ত নেতা এবং কর্ম্মীরও অভাব নাই। বাঙালীদের সহিত ইহাদের কোন বিরোধও নাই। আসামের উপর অসমিয়ারা যে অধিকার দাবি করেন, তাঁহাদের অধিকার ইতিহাস, জনসংখ্যা এবং প্রগতিশীলতা, কোন দিক দিয়াই তার চেয়ে কম নয়।

পার্ব্বত্য জাতিদের স্বার্থ

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে পার্ব্বত্যজাতি অধ্যুষিত কতকগুলি অঞ্চলকে স্বায়ত্তশাসনের বহির্ভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সব এলাকায় অধিবাসীদের নিজ নিজ প্রাদেশিক আইন সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় নাই। এখানকার শাসনভার নামে ছিল গবর্ণরের হাতে কিন্তু কার্য্যতঃ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরা ছিলেন সর্ব্বেসর্ব্বা। পার্ব্বত্য-জাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতেই সাধারণতঃ খনিজ পদার্থগুলি পাওয়া যায় এবং খনিগুলি ইংরেজ বণিকদের হাতে। স্থানীয় লোকদের দ্বারা খনির কাজ করানো হয় এবং লাভ যায় ইংরেজের পকেটে। ম্যাঙ্গানিজের খনিতে কাজ করিয়া পুরুষ-শ্রমিক যেখানে পায় চারি আনা এবং স্ত্রী-শ্রমিক দশ পয়সা, ইংরেজ কোম্পানীর অংশীদার সেখানে পায় চৌদ্দ টাকা এবং খনির ইংরেজ পরিচালক পায় তিন শত টাকা। মহাজনের হাত হইতে অশিক্ষিত আদিম অধিবাসীদের বাঁচাইবার জন্য ইংরেজ এত ব্যাকুল যে ভারত-শাসন আইনে একটা আলাদা ব্যবস্থা করিয়া ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার খোদ লাট সাহেবদের হাতে রাখিয়া দিয়াছে। একটু সন্ধান লইলেই দেখা যাইবে যে দেশী মহাজনের হাত হইতে রক্ষা করিবার নামে ইহাদিগকে ইংরেজ শোষকের কবলে হাত-পা বাঁধিয়া নিক্ষেপ করা হইয়াছে। এই সব অঞ্চল প্রদেশের আর সব স্থানের ন্যায় আইন সভার অধীনে থাকিলে শ্রমিক আন্দোলন এখানেও ছড়াইয়া পড়িত এবং তাহার ক্ষতি হইত ইংরেজ বণিকদের।

শাসন-সংস্কার-বহির্ভূত এই সব অঞ্চল সম্পর্কিত সমস্যা বিবেচনা করিয়া রিপোর্ট দেওয়ার জন্য গণপরিষদ একটি সাব-কমিটি গঠন করিয়া দিয়াছিলেন। এই সাব-কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত-গুলি প্রধান:

(১) শাসনতন্ত্রে পার্ব্বত্য জাতিদের মঙ্গলের জন্য পৃথক বিভাগের ব্যবস্থা, (২) পার্ব্বত্য অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভায় তাঁহাদের জন্য কতকগুলি আসন সংরক্ষণ, (৩) অনুন্নত ও পার্ব্বত্য জাতিদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য একটি বিশেষ কমিশন নিয়োগ।

উক্ত বিবরণীতে আরও বলা হইয়াছে যে, পার্ব্বত্য অধিবাসীদের সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং বিহারে পার্ব্বত্য জাতিদের মঙ্গলের জন্য এক জন স্বতন্ত্র মন্ত্রী নিযুক্ত করা উচিত। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং উড়িষ্যার পার্ব্বত্য জাতিদের একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা উচিত।

যে সব অঞ্চল শাসন-বহির্ভূত নহে সেখানকার পার্ব্বত্য জাতিদের সংখ্যালঘু বলিয়া গণ্য করা উচিত। তাহাদের জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে এবং বয়স্ক লোকের ভোটাধিকার সমেত যৌথ নির্ব্বাচন ব্যবস্থায় কয়েকটি পৃথক আসন রাখা উচিত।

প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী করার কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে। সাব-কমিটির অন্যান্য সুপারিশগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :— (১) পার্ব্বত্য জাতি সম্পর্কিত উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ ব্যতীত পার্ব্বত্য অঞ্চলে জমি ও সামাজিক রীতিনীতি সম্পর্কে কোন আইন প্রণয়ন করা উচিত হইবে না; (২) পার্ব্বত্য অঞ্চলে যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে পঞ্চায়েৎ গঠন করা উচিত; (৩) মহাজনদের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা উচিত; (৪) পার্ব্বত্যজাতীয় লোকদের নিকট হইতে জমি লইয়া অন্য লোকদের দেওয়া বন্ধ করা উচিত।

আদিবাসী নেতা জয়পাল সিং এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, ভারত-সরকারকে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ফিরিয়া পাওয়ার দাবি জানাইতে হইবে। র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

রিপোর্টে প্রকাশিত সারাংশে খনিতে ইংরেজের শোষণ বন্ধের কোন কথা নাই; মূল রিপোর্টে আছে কি না তাহা জানিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। না থাকিলে উহা সংযোজিত হওয়া উচিত এবং বাংলা হইতে যাঁহারা গণ-পরিষদে গিয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে উহা করিতে পারেন।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদে যে অন্যায় করা হইয়াছে তাহার তুলনা নাই। ভৌগোলিক হিসাবে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম বাংলার সীমানার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সেখানকার কোন প্রতিনিধি বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ছিলেন না, বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে আইন সভায় মত প্রকাশের অধিকার তাঁহারা পান নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য শাসন-সংস্কার-বহির্ভূত অঞ্চল-গুলির সঙ্গে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামও এক পর্য্যায়ে পড়ে এবং সে দিক দিয়া অন্যান্য স্থানের সঙ্গে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামও গণপরিষদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত শাসন-সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চল সাব-কমিটির অধীন। এই অবস্থায় ঐ জেলাটিকে ভারতবর্ষ হইতে কাটিয়া পাকিস্থানে জুড়িয়া দেওয়া ঘোরতর অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের এই অন্যায় সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছে এবং উহার পাকিস্থান ভুক্তিতে বাধাদানের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের চেষ্টা সকলের সহানুভূতি ও সাহায্যলাভ করিবেই, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের নেতারাও উহাতে বঞ্চিত হইবেন না ইহা নিশ্চিত।

কয়লার অভাব

বিহার ও বাংলার কয়লার তীব্র অভাব দেখা দিয়াছে। ঝরিয়া হইতে প্রেরিত ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে মালগাড়ীর অভাব এই সঙ্কটের কারণ। মাল-গাড়ীর অভাবে মাল স্থানান্তরে প্রেরণের ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় বিহার ও বাংলার প্রায় সমস্ত খনিতে কয়লা জমিয়া যাইতেছে। ইহার ফলে রাণীগঞ্জের দুইটি কয়লার খনির মালিক খনির কাজ বন্ধ রাখিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে এবং অবিলম্বে কয়লা চালান দেওয়ার বন্দোবস্ত না হইলে আরও অনেক খনি বন্ধ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পরও আমাদের গতানুগতিক মনোবৃত্তি যে দূর হয় নাই এই শ্রেণীর সংবাদে তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ পাই-তেছে। মালগাড়ী মিলিলে তবে কয়লা খনি হইতে রওনা হইবে নচেৎ খনিতে পড়িয়া পচিবে এবং খনির কাজ বন্ধ থাকিবে এই মনোবৃত্তি এখনও রহিয়াছে ইহাই আশ্চর্য্য। মাল-গাড়ী ছাড়া আর কি কোন উপায় নাই? কলিকাতা শহরে হাজার হাজার লরী রহিয়াছে। দুই বা তিন দিনের জন্য তার অর্দ্ধেক লরী রিকুইজিশন করিয়াও কি কাজ সমাধা করা যায় না? মেদিনীপুরে মন্ত্রীদের চেষ্টায় বহু চাউল সংগৃহীত হইয়াছে কিন্তু খোলা জায়গায় ধান ও চাউল পড়িয়া পচিতেছে। কৈফিয়ৎ সেই সনাতন, মালগাড়ীর অভাব। আজকের দিনে একটি চাউলের দানা অথবা এক টুকরা কয়লা নষ্ট হওয়া অমার্জ্জনীয় অপরাধ—যাহাদের দোষে ইহা ঘটিবে তাহারা যত উচ্চপদস্থই হউক না কেন তাহাদিগকে অপরাধী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অনশনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সংগ্রাম রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মানীর যুদ্ধ ঘোষণার চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। অন্ন ও ইন্ধনের সংস্থানের দায়িত্ব যে রাষ্ট্র স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে এবং নিজে এই দুই বস্তু সরবরাহের ভার লইয়া স্বাভাবিক ও সাধারণ উপায়ে ঐগুলি প্রাপ্তির পথ সকলের নিকট বন্ধ করিয়াছে তাহার পক্ষে উহা সরবরাহ করিতে না পারা শুধু চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় নহে, অপরাধও বটে। চাউল, কয়লা প্রভৃতি আনিবার দায়িত্ব গবর্মেণ্টের, মালগাড়ীর অভাবের দোহাই দিয়া নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকিবার চেষ্টা না করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যদি সকলকে লরী এবং নৌকা প্রভৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইতেন তবে লোকে সন্তুষ্ট হইত।

ভারতে বস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস

বোম্বাই বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রস্থান। বর্ত্তমানে এখানে মিলের মালিকদের সহিত শ্রমিকদের প্রবল বিরোধ চলিতেছে এবং ধর্ম্মঘটের ফলে লক্ষ লক্ষ গজ বস্ত্র কম উৎপন্ন হইতেছে। যদি এখনও এই বিরোধ বন্ধ করা না হয়, তাহা হইলে অচিরেই ভারতবর্ষ অতি কঠোর বস্ত্রসঙ্কটের সম্মুখীন হইবে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে মনে হয় যে, কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বাই ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কোর্ট শ্রমিকদের বেতন সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদকল্পেই শ্রমিকগণ বস্ত্র-উৎপাদনের হার কমাইয়া দিয়াছে। এই কমিটি শ্রমিকদের মজুরীর হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কমিটির নির্দ্দেশে শ্রমিকদের কার্য্যের অনুপাতে মজুরী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যেমন, যত গজ কাপড় বোনা হইবে, শ্রমিকেরা সেই অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট হারে তত পয়সা পাইবে। বোম্বাই মিলমালিক সমিতির পরামর্শক্রমে

মিলমালিকেরা কমিটির সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিবার জন্য শ্রমিকদের মাসিক বেতনের পরিবর্ত্তে মাসিক উৎপন্ন দ্রব্যের সাধারণ হার অনুসারে প্রতিটি কার্য্যের মজুরী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এবং ইহার ফলে বোম্বাইয়ে বহু মিলে শ্রমিকেরা স্ব স্ব বিভাগে কার্য্য কমাইয়া দিয়াছে। তাহারা ইহা দ্বারা মালিকদের দেখাইতে চাহিতেছে যে তাহাদের কার্য্যের অনুপাতে মাহিনা কম দেওয়া হইতেছে।

এই রূপে শ্রমিকেরা কাজ কম করায় বোম্বাই কটন মিলে একমাত্র জুলাই মাসেই ২৭ লক্ষ ঘণ্টা কাজের ফল পাওয়া যায় নাই। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে আগষ্ট মাসে গড়ে ৬৫০টি তাঁতের কাজ বন্ধ ছিল। শ্রমিকদের কার্য্যে শিথিলতার জন্য যেখানে মাথাপিছু ৮৬ পাউণ্ড সূতা তৈয়ারি হইত, সেখানে জুলাই মাসে মাত্র ৪৮·১ পাউণ্ড সূতা প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রমিকদের কার্য্যের শিথিলতার মূলে আছে শ্রমিকনেতাদের উস্কানি। ইনডাষ্ট্রিয়াল কোর্ট শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা নষ্ট করিয়া দিবার জন্যই শ্রমিকনেতাদের এই প্রচেষ্টা। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট এই সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া শ্রমিকদের কার্য্যে শিথিলতার তীব্র নিন্দা করিয়া সম্প্রতি এক প্রেসনোট বাহির করিয়াছেন। ইনডাষ্ট্রিয়াল কমিটির সুপারিশে শ্রমিকদের যদি আপত্তিজনক কিছু থাকে তবে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক যে অস্থায়ী কমিটি (Ad Hoc Committee.) স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের কোন প্রতিনিধি না যাওয়ায় মনে হয় যে শ্রমিকদের সত্যকার অভাব অসুবিধা কিছু নাই।

যুদ্ধপূর্ব্বকালে সাধারণ সময়ে শ্রমিকদের কার্য্যশিথিলতার জন্য মাহিনা কমাইয়া দিলেই তাহারা ক্রমশঃ নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিত। কিন্তু বর্ত্তমানে সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে ইহা করা যায় না। কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান অনটন অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। এখন উৎপাদন হ্রাস করা কেবলমাত্র মূর্খতা নহে, গুরুতর অপরাধ। উৎপাদন হ্রাস করিবার ইচ্ছা সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহা দেশের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। ইনডাষ্ট্রিয়াল কমিটির রায়কে বানচাল করিবার জন্য যে সুসংবদ্ধ, দৃঢ় প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয়, শ্রমিকদের মনে একবার যদি ধারণা জন্মিয়া যায় যে নিরপেক্ষ বিচারকদের অভিমত যে কোন দল ইচ্ছা করিলে নিষ্ফল করিতে পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে শ্রমিকদের কোন সমস্যারই শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাধান করিবার আশা একেবারে থাকিবে না। গবর্ণমেণ্টের এখন চিন্তা করা প্রয়োজন যে যাহারা নিজেদের স্বার্থে দেশের লোকের অনিষ্ট ও বিদেশীর সুবিধা করিয়া এইরূপ উস্কানি দিতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে কি ভাবের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

বিলাতে বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি

ভারতীয় শিল্পের ভাগ্যাকাশে যখন নিত্যনূতন সমস্যার আবির্ভাব ঘন কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, তখন বিদেশের দিকে তাকাইয়া আমরা দেখিতে পাই যে ল্যাঙ্কাশায়ারের কটন মিলগুলি ধীরে ধীরে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থাপন করিয়া অতি সহজে জনসাধারণের চাহিদা মিটাইতেছে। এমন কি যুদ্ধের সময়েও বিভিন্ন কারখানাগুলি পুরাতন যন্ত্রপাতী বদলাইয়া নূতন যন্ত্র স্থাপনের বিরাট ব্যয়ভার বহন করিয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের পশ্চাতে ছিল ল্যাঙ্কাশায়ার কটন কর্পোরেশনের উৎসাহ ও পরিকল্পনা। গত ডিসেম্বর মাসে গবর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তাহার বহুপূর্ব্বেই কর্পোরেশন ১,৫০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে একটি সাত বৎসরের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ভাইস-চেয়ারম্যান বিখ্যাত শিল্পপতি সার ফ্র্যাঙ্ক প্ল্যাট।

কয়লার সাহায্যে যে সকল মেসিন চলিত, তাহাদের পরিবর্ত্তে এখন দ্রুতগতিশীল বৈদ্যুতিক যন্ত্রের আমদানী হইতেছে। কক্স মিল, ম্যাজেষ্টিক মিল, হক মিল, কেণ্ট মিল প্রভৃতি স্থানে প্রচুর অর্থব্যয়ে নূতন মেসিন স্থাপন করা হইয়াছে। ম্যানর মিলে নূতন যন্ত্র প্রবর্ত্তনের ফলে যে সকল শ্রমিক কর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল, তাহাদের অন্যত্র কাজে নিয়োগ করা হইয়াছে।

কর্পোরেশনের ডিরেক্টরবর্গ শ্রমিকদের সুখ-সুবিধার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেন নাই। মিলের অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক আলো, ক্যাণ্টিন, শিশুদের জন্য বিদ্যালয় প্রভৃতির বন্দোবস্ত রহিয়াছে।

শিল্প কেন্দ্রগুলিতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য অবসর সময়ে কাজ করিবার লোক (part-time worker) নিয়োগ করা হইতেছে ও স্ত্রী মজুরদের খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ম্যানচেষ্টার সম্পর্কে শ্রমিক মন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, যে সকল বিবাহিতা স্ত্রীলোক মিলে কাজ করিতে উৎসুক, তাঁহাদের সুবিধা মত কাজ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইবে। ফলে, বহুসংখ্যক শ্রমিক রমণী কাজে যোগ দিতেছে। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ এবং ইহারা সপ্তাহে ১৯ হইতে ২০ ঘণ্টা কাজ করিতেছে। রাত্রিতেও তাঁত চলিতেছে। একটি মিলে সোমবার হইতে শুক্রবার পর্য্যন্ত সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত ৪০০ শত রমণী কাজ করিতেছে এবং আরও ২০০ জন কাজ করিবে বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। আর একটি মিলে বর্ত্তমানে ১২০ জন কাজ করিতেছে এবং তালিকায় এখনও ৫০০ জনের নাম রহিয়াছে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিবার পক্ষে এই সকল শ্রমজীবিনীদের দিয়া কাজ করাইবার যথেষ্ট অসুবিধা আছে বটে, কিন্তু অল্পদিন সাপেক্ষ পরিকল্পনার পক্ষে

ইহাদের দ্বারা যথেষ্ট উপকার হয়। তুলা নিয়ন্ত্রণের দ্বারা বস্ত্রের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বণিক সম্প্রদায় রপ্তানী মালের উপর যে লাভ করিতেছিল, তাহার কিয়দংশ বর্ত্তমানে শ্রমিকরা পাইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

গবর্মেণ্ট তুলা সম্পর্কে যে পন্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন তাহার সহিত বাণিজ্য দপ্তরের (Board of Trade) তুলা ক্রয় করিবার নীতির সামঞ্জস্য থাকিবে না। এখন পর্য্যন্ত প্ল্যান সম্বন্ধে কোন সুনির্দ্দিষ্ট বিবৃতি প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু তুলা সম্বন্ধে পরামর্শদাতা কমিটি এই সমস্যা সম্পর্কে বহু চিন্তা করিয়াছেন। গত যুদ্ধের সময় মিশর হইতে প্রচুর তুলা আমদানী হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য সকল সাম্রাজ্যেই তুলা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা চলিতেছে। সুদান প্ল্যানটেশন সিণ্ডিকেট দ্বারা পরিচালিত এক পরিকল্পনা পূর্ব্ব-আফ্রিকাতে কার্য্যকরী হইতেছে। তাহা ১৯৫০ সালে গবর্মেণ্ট হস্তে গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। উগাণ্ডায় যে নূতন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাতে সুদানের কয়েকজন অভিজ্ঞ লোককে পাঠান যাইতে পারে।

বিদেশের মিলগুলির উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের দেশের মিলগুলির সংস্কার করিতে হইবে ও উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণের চাহিদা মিটাইতে হইবে। তুলার ব্যবসায় অথবা কাপড় উৎপাদন সম্বন্ধেই আমাদের দেশ অত্যধিক পশ্চাতে রহিয়াছে। যুদ্ধের পর গত দুই বৎসরে যে সময় ও সুযোগ পাওয়া গিয়াছিল তাহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার যদি হইত, গবর্মেণ্ট, মালিক এবং শ্রমিক তিনজনেই যদি জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতেন তবে বিলাতের ন্যায় আমরাও অনেক উন্নতি করিতে পারিতাম। দেশের এই ভীষণ বস্ত্রাভাব থাকিত না। আমেরিকা, ব্রিটেন ও জাপান হইতে যে পরিমাণ বস্ত্র আমদানী সুরু হইয়াছে তাহাতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অবস্থা কি দাঁড়াইবে তাহাও চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার ও ভারতের কৃষি

দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী এডেলেড পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম ও সুসজ্জিত শহরগুলির মধ্যে অন্যতম। শহরটির চতুষ্পার্শ্বে বিহারভূমি; ইহার পরেই দেখা যায় সুবিস্তৃত আধুনিক শহরতলী। শীতকালে এখানে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়, আবার তারপরেই দেখা দেয় চমৎকার চক চকে রৌদ্র। কৃষিকার্য্যের পক্ষে ইহার জলবায়ু অত্যন্ত অনুকূল। এডেলেড শহরের চতুষ্পার্শ্বের জেলাগুলিতে বৎসরে বিশ হইতে ত্রিশ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। ইহার মধ্যে মে হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত অধিক বারিপাত হয়। দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়াতে কৃষকগণ ও পশুপালকগণ তাহাদের যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার উপত্যকা ও ঢালু স্থানগুলি ইক্ষুক্ষেত, বাদাম, জলপাই প্রভৃতি ফলের বাগানে পূর্ণ। ইহার জেলাগুলির কৃষিক্ষেত্র বিশেষ সমৃদ্ধ। তৃণভূমিতে গরু ও মেষ পালন করা হয়। বিস্তৃত জমিতে গম-চাষ হয় এবং প্রচুর গম পাওয়া যায়। এখানে ৫০০ একর জমির এক ফার্মে ৯০০ ভেড়ী, ৫০টি গাভী ও প্রায় ৭০টি শূকরশাবক পালন করা হয়। এই জোতজমির মাত্র ১৪ একর ভূমি চাষ করা হয়; ইহার মধ্যে আবার বার্লি ও ওট শুক করা হয়। বাকি অংশটিতে পশুচারণ ভূমি আছে। প্রত্যেক বৎসর ভূমিতে অধিক পরিমাণে সার দেওয়া হয়। ফলে নানা জাতীয় তৃণ জন্মায় প্রচুর।

ওয়েট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম ও শ্রেষ্ঠ গবেষণাগার। এখানে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে, তাহার জন্যই দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়াতে কৃষিকার্য্যের এত উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান হইতে কৃষকগণ তাহাদের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিতে পারে ও উৎসাহ পাইয়া থাকে।

এডেলেড শহরের চার মাইল দূরে ওয়েট ইনষ্টিটিউট অবস্থিত। মিঃ পিটার ওয়েট এডেলেড বিশ্ববিদ্যালয়কে যে অর্থ দান করিয়াছিলেন তাহার দ্বারা ১৯২৪ সালে এই বিদ্যালয়টি গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের পাঁচ শত একর জমি আছে এবং ভাল গবেষণাগার, কাঁচের ঘর ও আধুনিক জোত-বাড়ীসকল রহিয়াছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে, যে সকল লোক পশুপালন ও কৃষিকার্য্য করে তাহাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করা। ওয়েট বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ বৃক্ষাদি ও জমি সম্বন্ধে গবেষণা করা হয় বটে, কিন্তু ইহা ব্যতীত এখানে একটি কৃষি বিদ্যালয় আছে এবং এখান হইতে ডিগ্রী পরীক্ষাও (B. Ag. Sc.) দিতে পারা যায়। এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ কৃষি-বিভাগের মন্ত্রী ও জনসাধারণকে কৃষি বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ দিয়া থাকেন। এই প্রতিষ্ঠানের সহিত Agronomy, Agrostology এবং Plant Breeding এই তিনটি অধীতব্য বিষয় আছে। ভবিষ্যতে ভারতে যে কৃষি-বিষয়ক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার সহিত এই তিনটি অধীতব্য বিষয় অবশ্যই রাখিতে হইবে।

ওয়েট প্রতিষ্ঠানে যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে তাহার কার্য্যাবলী নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা—(১) স্থায়ী ও অস্থায়ী পশুচারণ ভূমির উন্নতিসাধন, (২) কৃষিক্ষেত্রে ও উদ্যানে উৎপন্ন শস্যে এবং বনবৃক্ষে যে সব অনিষ্টকর কীটপতঙ্গ জন্মে সে সম্বন্ধে গবেষণা এবং (৩) বিভিন্ন সময় বীজ বপনের ফলাফল, সার ও শস্যের বিশেষতঃ গমের বীজ বপনের নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে পরীক্ষা। দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়াতে সমগ্র শস্যক্ষেত্রের দুই-তৃতীয়াংশ ভূমিতে গম উৎপন্ন হয়। ডাঃ ট্রামল

দেখাইয়া দিয়াছেন যে, তিন-চার বৎসর গম উৎপাদনের পর ক্ষেত্রে কলাইশুঁটি প্রভৃতি খুব ভাল উৎপন্ন হয় এবং ইহার দ্বারা ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হয়। অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে শণ, তিসি ও ভাক ফ্লাওয়ার নামক তৈলবীজ উল্লেখযোগ্য।

ওয়েট ইন্‌ষ্টিটিউটের পার্শ্বে একটি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং এই বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী ফার্মটি ইন্‌ষ্টিটিউট পরীক্ষামূলক কার্য্যের জন্য লীজ লইয়াছে। ইহার ফলে কৃষি-বিদ্যা ও কৃষিবিষয়ে গবেষণার মধ্যে নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং যাঁহাদের এই সকল বিষয়ের সহিত সংযোগ আছে তাঁহাদের যথেষ্ট সুবিধা হইতেছে। ভারতে উক্ত ব্যবস্থা সম্ভব হইলে গবর্মেণ্টের কার্য্য ও গবেষণা প্রতিনিধিগুলির নাম ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে। ওয়েট ইন্‌ষ্টিটিউটের জমি পরীক্ষার ফলে জমির সমস্যাগুলির উপর আলোকপাত হইয়াছে এবং ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য মূল্যবান তথ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার একটি মূল্যবান তথ্য হইতেছে এই যে ভূমির অনুর্ব্বরতার সহিত চারাগাছের এবং পশুর রোগের সহিত সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধে আরও গবেষণা করা প্রয়োজন।

অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন পল্লীগ্রামে এগ্রিকালচারাল ব্যুরোর শাখা আছে। কৃষকেরাই এই শাখাগুলি গঠন করে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ইহার অধিবেশন হয় এবং সেখানে সভ্য ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরা কৃষিকার্য্যের সমস্যাগুলির আলোচনা করেন। দক্ষিণ-অষ্ট্রেলিয়াতে এইরূপ ৩৭০টি শাখা আছে। এই সকল শাখা হইতে প্রতিনিধি লইয়া প্রতি বৎসর একটি বার্ষিক অধিবেশন হইয়া থাকে।

আর আমাদের দেশে? বাংলায় বহু আন্দোলন ও আলোচনাতেও একটি কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার উচ্চ প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল না। ফসল বৃদ্ধির আন্দোলনের নামে কোটি কোটি টাকা অপচয় হইয়াছে কিন্তু স্থায়ী কাজ কিছুই হয় নাই। এখন সময় আসিয়াছে। আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা, ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যে যত্ন ও উদ্যমের সহিত কৃষিসমস্যা সমাধানে ব্রতী হইয়াছে আমাদেরও তাহা করিতে হইবে। এতেলেড আমাদের নিকট একটি ছোট দৃষ্টান্ত মাত্র।

ইউরোপে কৃষির উন্নতি

অনেক দিন হইতেই জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে জনসাধারণ আন্দোলন করিতেছে। বর্ত্তমানে দেশের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হইয়াছে। এখন আশা করা যায় জমিদারি প্রথা প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির প্রতি প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট সকল মনোযোগ দিবেন। বিহারের মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ একটি প্রবন্ধে জমিদারি প্রথা বিলোপের পর কি কর্ত্তব্য এই সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা দিয়াছেন। বহু দিন ধরিয়া আন্দোলন করিবার ফলে জমিদারি প্রথার বিলোপ সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এখন ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের সম্মুখে নানা প্রকার সমস্যা দেখা দিয়াছে। জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, ফলে জমির মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। ভূমিহীন লোকের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছে; মালিকগণ অন্যায় ভাবে জমি দখল করিতেছেন এবং বেশীর ভাগ কৃষক কপর্দ্দকশূন্য, জল-সেচন বা জল-নিষ্কাশন করিবার কোন উপায়ই তাহাদের নাই। এই সকল অব্যবস্থার ফলে কৃষিকার্য্যে কোনই লাভ হয় না। জমিদারি প্রথা বিলোপ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দুর্ব্যবস্থার প্রতিকার করিতে হইবে, নতুবা পুনরায় জমিদারি প্রথা দেখা দিবে এবং কৃষকদের দুর্গতির অন্ত থাকিবে না। কৃষিকার্য্যের আমূল পরিবর্ত্তন দরকার। কৃষকের সহিত জমিদারের এবং গবর্মেণ্টের কিরূপ সম্বন্ধ থাকিবে এবং তাহার আয় ইত্যাদি প্রশ্নের উপর কৃষিকার্য্যের ভাল মন্দ নির্ভর করে।

কৃষিকার্য্যের উন্নতি এক দিকে যেরূপ কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আইনগত অধিকারের উপর নির্ভর করে, অপর দিকে সেইরূপ কৃষিকার্য্যের উপকরণ ও পদ্ধতির উপরও নির্ভর করে। ভারতবর্ষে বহু দিন ধরিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্যের উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহা আশানুরূপ ফলপ্রসূ হয় নাই। দুর্ভিক্ষ-তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে কৃষিবিভাগের এক জন বিচক্ষণ ডিরেক্টর বলিয়াছেন যে প্রচুর শস্য উৎপাদনের পথে প্রধানতম বাধা হইতেছে কৃষকদের দৈন্য। তাহাদের নিকট ইহা অপেক্ষা বেশী ফসল আশা করা যায় না। আর এক জন বিশেষজ্ঞও বলিয়াছেন যে কৃষিকার্য্য করিবার যে পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার উন্নতি অবিলম্বে প্রয়োজন। কিন্তু কৃষকগণ এতই ঋণগ্রস্ত যে তাহাদের নিকট এই সকল কথা বলা বৃথা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে ফসল উৎপন্নের জন্য যে বৈজ্ঞানিক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল এবং কৃষিব্যবসাতেও যে নূতন পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল জমি সম্বন্ধে পুরাতন আইনগুলির নূতনরূপে সংস্কার। এইরূপ সংস্কার না হইলে কৃষিকার্য্যে কোন পরিবর্ত্তনই হইত না। কৃষিকার্য্যের উন্নতি পরিকল্পনায় জমি সম্বন্ধীয় আইনগুলির পুনর্গঠন যে একান্ত প্রয়োজন তাহা চিন্তা করিতে হইবে।

পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে কৃষিকার্য্যে আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জমিদারি প্রথা, শুল্ক, কৃষকের দুরবস্থা প্রভৃতির জন্য কৃষিকার্য্যের সকল প্রকার উন্নতি ব্যাহত হইতেছিল। এই পরিবর্ত্তনের মূলে ছিল এক শক্তিশালী স্বাধীন কৃষকসম্প্রদায়ের সৃষ্টি ও জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনের ইচ্ছা। নিম্নলিখিত নীতি অনুসারে এই পরিবর্ত্তন হইয়াছে:

(১) জমিগুলি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে তাহারা স্ব স্ব জমির উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে থাকে। জমিদারের পরিবর্ত্তে কৃষক জমির প্রকৃত মালিক হওয়ায় স্বাধীন কৃষকের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। (২) কৃষক ব্যতীত অন্য কেহ যাহাতে জমির মালিক না হইতে পারে সে

বিষয় লক্ষ্য রাখা হয়। (৩) দেশের ও দশের মঙ্গলের জন্য এই জমির উপর কাহারও ব্যক্তিগত অধিকার (private ownership) থাকিতে দেওয়া হয় নাই। এই সকল নীতির প্রবর্তনের জন্য পূর্ব্ব-ইউরোপ কৃষির উন্নতিতে অভূতপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছিল। পশ্চিম-ইউরোপে ১৯১৯-৩৮ সালে যেখানে শস্যাদি ও আলু শতকরা ৩৪·৫ উৎপন্ন হইত, পূর্ব্ব-ইউরোপে সেখানে বর্দ্ধিত শতকরা ৪৯·৬।

১৯১৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ার গবর্ন্মেণ্টে যে সংস্কার হয়, তাহার ফলে রাজনৈতিক ক্ষমতা আসে জনসাধারণের হস্তে। অবিলম্বে তাহারা কৃষিক্ষেত্রের প্রতি মনোযোগ দেয় এবং কৃষকেরা জমির প্রকৃত মালিক বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। ১৯১৯ সালের Land Restriction Act-এর জন্য আরও সুবিধা হয়। বড় বড় জমিগুলি ভাগ করিয়া কৃষকদের দেওয়া হয় এবং কৃষকেরা প্রাপ্ত জমি ভাগ করিতে, ইজারা দিতে বা বন্ধক রাখিতে পারিবে না বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। পরবর্ত্তী আইনের ফলে কৃষকেরা যে পরিমাণ জমি বাহিরের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজেরা চাষ করিতে পারিবে সেই পরিমাণ জমির তাহারা মালিক হইতে পারিবে বলিয়া স্থির হয়। ১৯১৩ হইতে ১৯১৫ সালের মধ্যে জমির যে মূল্য ছিল, জমিদারগণ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাহাই পাইলেন। গবর্ন্মেণ্ট শতকরা চার টাকা হিসাবে সুদ দিতে লাগিলেন এবং বৎসরে ঋণের অন্ততপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ শোধ দিবেন বলিয়া ঠিক করা হয়। ইহার ফলে, জমির উন্নতি হইল এবং সেই সঙ্গে সামাজিক পরিবর্ত্তনও সাধিত হইল। কৃষকেরা নিজস্ব জমিতে প্রচুর ফসল উৎপাদন করিতে থাকে।

রুমানিয়াতেও জমিবিষয়ে পরিবর্ত্তন হয় এবং ইহার ফলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ইউরোপের দেশসমূহ যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে এইগুলি প্রধান যথা—(১) বড় বড় জমিগুলি ক্রয় করিয়া দরিদ্র কৃষকদিগকে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা, (২) জমি হস্তান্তর বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা, (৩) জমি ক্রয় করিবার জন্য প্রজাদিগকে আর্থিক সাহায্য করা এবং (৪) কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য সুযোগ-সুবিধা দান করা।

তুরস্ক দেশে জমিদারদিগকে ২০টি কিস্তিতে শতকরা চার টাকা সুদে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে বলিয়া ১৯৪৫ সালে জুন মাসে একটি আইন পাস হইয়াছিল। যাহারা জমি পাইল তাহারা বিনা সুদে ২০ কিস্তিতে এই টাকা দিবে। তাহাদের একটি সুবিধা করিয়া দেওয়া হইল যে তাহাদের ছেলেমেয়েদের যখন প্রাথমিক শিক্ষার বয়স হইবে তখন তাহাদের শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া কম দিতে হইবে।

জমিদারি লোপের পর ভারতবর্ষের কর্ত্তব্য

ভারতবর্ষে আমরা কেবলমাত্র জমিদারি প্রথার স্থানে রাইওতারি প্রথা চাহিতেছি না, কারণ এই উভয়বিধ প্রথাতেই কৃষকদের অবস্থা প্রায় সমান। দেশের মঙ্গলের জন্য গ্রামে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কৃষক ও জমিদারের মধ্যবর্ত্তী সম্প্রদায়ের লোপ করিয়া সর্ব্বত্র সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এখন হইতে কৃষিকার্য্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধন এবং নিজেদের জীবনযাত্রার উৎকর্ষসাধন করিবার জন্য সমবায় সমিতিগুলিকে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। গ্রামের সমবায় সমিতির নিকট অবশ্যই তাহাদের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধাগুলি বিসর্জ্জন দিতে হইবে। সমবায় সমিতিগুলি এই ভূসম্পত্তি. পরিচালনা করিবে, বীজ, সার, কৃষিকার্য্যের যন্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিবে, জলসেচের বন্দোবস্ত করিবে, এবং গ্রামের কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে। ইহা কৃষকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবে এবং দেশের শক্তিশালী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা গঠন করিবে।

১৯৩৮ সালে বঙ্গদেশে ফ্লাউড কমিশন ও মাদ্রাজ প্রদেশে ল্যাণ্ড এষ্টেটস্ এক্ট কমিটি নামক দুইটি ভূমি-ব্যবস্থা তদন্ত কমিটি স্থাপিত হয়। এই দুইটি কমিটিই জমিদারি প্রথা যাহাতে উঠিয়া যায়, এবং প্রকৃত মালিক কৃষকেরা যাহাতে জমি পায়, তাহার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন—জমিদারগণ ক্ষতিপূরণ পাইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে তবে খুব অল্পদিনে ইহা নিষ্পন্ন হইবে না বলিয়া তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন। কারণ তাহা হইলে তাঁহাদের মতে দেশের আর্থিক অবস্থার অবনতি হইবে। বিহার প্রদেশেও জমিদারি প্রথা রহিত হইবে এবং জমিদার শ্রেণীকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। কিন্তু আর্থিক সমস্যার সমাধান হইতে সময় লাগিবে।

জমিদারি প্রথা রহিত হইবে বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে বটে, কিন্তু জমিদারগণের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। কারণ এক এক জন জমিদারের আশ্রিত লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। পরিবারবর্গ ও আশ্রিতগণ লইয়া এই জমিদারগণের সংখ্যা প্রায় ৫০ হইতে ৭৫ লক্ষের মধ্যে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই আবার প্রকৃত পক্ষে কৃষক। সুতরাং ইহাদের যদি অর্থ দিয়া সাহায্য করা যায়, তাহা হইলে তাহারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি করিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহাদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক অটুট থাকিবে। তাহাদের পরিচালনা ক্ষমতার সহায়তায় গ্রামে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করা এবং ব্যবসায় চালান সহজ হইবে। কিন্তু অপর পক্ষে এই সম্প্রদায়কে যদি শত্রু হিসাবে দেখা হয় তাহা হইলে দেশের ও দশের ক্ষতি হইবে।

জমির খাজনা আদায়ের জন্য যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে তাহারা কৃষকদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে পারে। সমবায় সমিতি মারফৎ খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা হইলে এই সম্ভাবনা থাকিবে না।

জমিদারির ক্ষতিপূরণ দানের উপায়

নিম্নলিখিত উপায়ে জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাহাদের যথেষ্ট ব্যয়ও করিতে হয়। তথাপি তাহারা কিছু লাভ করিয়া থাকে। গত কয়েক বৎসরে তাহারা ইহার দ্বারা তাহাদের প্রায় সমস্ত ঋণ শোধ করিয়া দিয়াছে। গ্রামের উন্নতির জন্য তাহাদের লভ্যাংশ ব্যয় করা উচিত। তাহা না হইলে এই টাকা মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতিতে অপব্যয় হইবে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। সেইজন্য এই অর্থদ্বারা আগামী তিন বৎসরের মধ্যে জমি ক্রয় করা ও জমিদারের ঋণ শোধ করিয়া দেওয়া উচিত। গ্রামের সমবায় সমিতি কৃষকদের সাহায্যে এই টাকা জোগাড় করিয়া এই সকল কার্য্য করিতে পারে। ইহার দ্বারা বার বৎসরের জমির খাজনা তিন বৎসরে আদায় করা যাইবে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রতি একর জমির খাজনা পাঁচ টাকা করিয়া দিবার জন্য কৃষককে দেড় মণ চাউল বিক্রয় করিতে হইত। এই দেড় মণ চাউল দিয়া বর্ত্তমানে সে কয়েক বৎসরের খাজনা দিতে পারে এবং তাহারও দ্বিগুণ খাজনা দিতে তাহার তিন মণ চাউল লাগিবে। সুতরাং এখন তাহার চাউল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাগিতেছে না। যতদিন চাউলের মূল্য এইরূপ থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত সে নিয়মিত খাজনা দিতে পারিবে এবং আগামী কয়েক বৎসরেরও খাজনা দিয়া রাখিতে পারিবে। ইহার পর যখন চাউলের দাম কমিয়া যাইবে তখন সে যে কয়েক বৎসরের আগাম খাজনা দিয়া রাখিবে তাহা হইতে প্রতি বৎসর প্রকৃত খাজনার অর্দ্ধেক করিয়া খাজনা হিসাবে লওয়া হইবে। সুতরাং তাহাদের দুর্ব্বৎসরে কিছু সুবিধা তাহারা পাইবে। এই প্রকারে অবশ্য গ্রামের সমবায় সমিতির আয়ের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া যাইবে, তথাপি চাউলের মূল্য ও পারিশ্রমিক হ্রাস পাইলেও কৃষকগণ পূর্ব্বের মত জমির উন্নতির জন্য কাজ করিতে পাইবে। পরবর্ত্তী কালে যে কৃষকের নির্দ্ধারিত পরিমাণের জমি অপেক্ষা কম জমি আছে, তাহাকে খাজনা হইতে আংশিক মুক্তি দেওয়া সম্ভব হইতে পারে। ইহা না হইলেও সমবায়-সমিতি খাজনার পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে। এইরূপে গ্রাম্য সমবায়-সমিতি কৃষকদের সামাজিক ও আর্থিক সুখ-সুবিধা দিতে ও পাইক-পেয়াদাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারিবে।

জমিদারদের পক্ষে ক্ষতিপূরণের অর্দ্ধেক টাকা পাইয়া ও বাকী অর্দ্ধেক জাতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিয়া শোধ লইলে ভাল হইবে। নতুবা কাঁচা টাকা মামলা মোকদ্দমা ও বাজে খরচে উড়াইয়া দিবার সম্ভাবনা অধিক। শেয়ার কেনা থাকিলে তাহারা প্রতিবৎসর নিয়মিত টাকা পাইতে থাকিবে। ইহার দ্বারা প্রধান প্রধান শ্রম-শিল্পকে জাতীয়করণ, কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন প্রভৃতি কার্য্য করিতে পারা যাইবে।

দেশের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে কেবলমাত্র তাহাদেরই যে অন্নসংস্থান হইবে তাহা নহে, দুর্দ্দশাগ্রস্ত গ্রাম্য জীবনেরও উন্নতি হইবে। দেশে এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে যাহাতে নেতৃবর্গ তাহাদের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের প্রচেষ্টাতেই দেশের উন্নতি করিতে পারিবেন। গ্রামের লোকেরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গ্রামেরই কল্যাণ করিবে এবং গবর্মেণ্ট হইতে প্রবর্ত্তিত যে কোন কল্যাণকর নীতি তাহারা দ্রুত কার্য্যকরী করিতে পারিবে। উৎপন্ন দ্রব্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা বিক্রয় করিয়া লভ্যাংশও বৃদ্ধি পাইবে, এবং গ্রামের সমবায় সমিতিগুলি এই প্রকারে ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া গ্রামের শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষা, সামাজিক ও আর্থিক সকল প্রকার উন্নতি করিতে সমর্থ হইবে। এইরূপে সমবায় সমিতিগুলি জনসাধারণের হস্তে প্রকৃত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলিয়া দিয়া প্রজাতন্ত্র শাসন গঠন করিতে পারিবে।

এনি বেশান্ত জন্মশতবার্ষিকী

গত ১লা অক্টোবর ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম অগ্রদূত এনি বেশান্তের জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের ভাবধারার সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া যে কয়েকজন বিদেশী নরনারী এদেশের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইয়া ভারতবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন, এনি বেশান্ত তাঁহাদের মধ্যে এক জন। "নরনারী সকলের সমান অধিকার, যার আছে শক্তি পাবে মুক্তি নাহি জাতিবিচার"— এই তত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বেশান্ত। বালিকা বয়সে ধর্ম্মপ্রবণতা ইঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। যৌবনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিষয়ে প্রথমে একেশ্বরবাদী ভয়েসির শিষ্যা হন। পরে সংসার হইতে মুক্ত হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন। ব্রাড-ল'র সংস্পর্শে আসিয়া ইনি নাস্তিক্যবাদে আকৃষ্ট হন। ব্রাড ল'র প্রভাবে জীবনের নানাক্ষেত্রে ইঁহার কর্ম্ম-পরিধি বিস্তৃত হয় এবং নিজের জ্ঞান-ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এই সময়ে বিজ্ঞানচর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। ইহার কিছু দিন পর তিনি সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ইংলণ্ডের ফেবিয়ান সোসাইটির সহিত যুক্ত হইয়া সাম্যবাদ প্রচার আরম্ভ করেন। এই মতবাদ প্রচারের সময়েই তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতার খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।

এই সময়ে তিনি যে সব কল্যাণকর কর্ম্মে রত হন তন্মধ্যে মনীষী লেখক জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'কে আবিষ্কার করিয়া তাঁহার প্রথম জীবনের রচনা "ইররেশন্যাল নট" নামক পুস্তক প্রকাশ করা অন্যতম। কোন প্রকাশক না পাওয়াতে বার্ণার্ড শ' এই সময়ে ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িতেছিলেন। বেশান্ত এই তরুণ লেখকের রচনায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পুস্তক প্রকাশের দ্বারা বার্ণার্ড শ'র প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হইলেন।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বেশান্তের জীবনে বিপর্য্যয়কর পরিবর্ত্তন ঘটে। এই বৎসর তিনি ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্‌স্কির সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং অতি সহজেই তাঁহার মুগ্ধ ভক্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার লুপ্ত ধর্ম্মবোধ পুনরায় নব আকারে ফিরিয়া আসাতে তিনিএক নূতন মানুষ হইয়া উঠেন। ব্ল্যাভাট্‌স্কির প্রভাবে

ভারতীয় সংস্কৃতির সন্ধান লাভ করিয়া এই ধারার রসে নিজের জীবনকে সিক্ত করিয়া তুলেন। তাঁহার মনে হইতে থাকে যে, এই ধারার সহিত যেন তাঁহার জন্ম-জন্মান্তরের যোগ আছে। তিনি থিওসফিক্যাল সোসাইটির কাজে উৎসাহের সহিত যোগদান করেন। এই সমিতির মতবাদ প্রচারে মার্কিণ যুক্তরাজ্যে যখন তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন মিঃ জি. এন. চক্রবর্তী নামক একজন অধ্যাত্মতত্ত্ব ও প্রেততত্ত্বজ্ঞের সহিত পরিচিত হওয়াতে ভারতবর্ষে আসিবার অভিলাষ জন্মে। ম্যাডাম ব্ল্যাভাট্স্কির মৃত্যুর পর কর্ণেল অলকট থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি পদে বৃত হইলেও বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার কিছু করিবার ক্ষমতা অত্যন্ত কমিয়া যাওয়াতে বেশান্তই উক্ত সমিতির প্রকৃত কর্ণধার হন ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল অলকটের মৃত্যু হইলে বেশান্ত এই সমিতির সভানেত্রী পদে বৃত হইয়া আইনতঃ ও কার্য্যতঃ এই উভয় প্রকারেই অবিসম্বাদিত নেত্রী হন। আদিয়ারে (মাদ্রাজ) থিওসফিক্যাল সোসাইটির যে বিরাট কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে বেশান্তের কর্ম্মকুশলতা। ইঁহার অদ্ভুত কর্ম্মদক্ষতা ও কার্য্য-পরিচালনক্ষমতার অন্যতম নিদর্শন হইতেছে কাশীর সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ। এই কলেজকেই মধ্যবিন্দুরূপে পাওয়াতে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় বিরাট শিক্ষা আয়তন গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বেশান্ত ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সহিত যুক্ত হন। "কমন উইল" ও "নিউ ইণ্ডিয়া" নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া উহার দ্বারা অতি অল্পদিন পরেই "হোম-রুল" আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া ভারতের স্বয়ং-শাসনের অধিকার দাবি অত্যন্ত জোরের সহিত প্রচার করিতে থাকেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেস আন্দোলনের প্রথম উল্লেখযোগ্য ইতিহাস রচনা করিয়া তিনি "হাউ ইণ্ডিয়া রট ফর হার ফ্রিডম" (*How India wrought for her Freedom*) নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডের টি জ্যাও সি জ্যাক কোম্পানী প্রকাশিত "পিপলস সিরিজ" নামক বিশ্বের জ্ঞান-প্রচারক পুস্তকাবলীর অন্যতম "ইণ্ডিয়া এ নেশন" নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কামনার কথা বিশ্বে প্রচার করিতে সহায়তা করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে "হোমরুল লীগ" নামক সংস্থা স্থাপন করিয়া তিনি সুসম্বদ্ধ রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রিক প্রগতির সহায়তা করেন। এই আন্দোলনে ভীত হইয়া ভারতের আমলাতন্ত্র নির্বাতন করিয়া তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা বন্ধ করিতে প্রয়াসী হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে তারিখে 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার নিকট দুই হাজার টাকা জামানত চাওয়া হয়। তাহার কিছুদিন পরেই অর্থাৎ ১০ই জুলাই তারিখে বোম্বাই-সরকার এক নিষেধাজ্ঞার বলে বেশান্তের বোম্বাই প্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন। সেপ্টেম্বর মাসে মধ্যপ্রদেশ-সরকারও অনুরূপ আদেশ জারি করেন। বেশান্ত দমিবার পাত্রী ছিলেন না, তাই এই সব নির্যাতনে তাঁহার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড পেণ্টল্যাণ্ড শ্রীমতী বেশান্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে হোমরুল বা অন্য কোনও রাষ্ট্রিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত না হইতে অনুরোধ করেন। বেশান্ত উহা বন্ধ রাখিতে অস্বীকার করেন। ইহার ফল কি হইবে বুঝিতে পারিয়া বেশান্ত 'নিউ ইণ্ডিয়া'তে তাঁহার বিদায়-বাণী প্রকাশ করেন। তাহার সৌন্দর্য্য অনুবাদে নষ্ট না করিয়া তাঁহার ভাষাতেই বলি—

"I write plainly for this is my last word. I go into enforced silence and imprisonment because I love India and have striven to arouse her before it was too late. It is better to suffer than to consent to wrong. It is better to lose liberty than to lose honour. I.....God save India, Vande Mataram."

বেশান্তের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। গবর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ পরিসমাপ্তির এক ঘণ্টা পরেই অ্যানি বেশান্ত ও তাঁহার কর্ম্মসহচর মিঃ বি. পি. ওয়াডিয়া ও মিষ্টার জি. এস. আরুণ্ডেলের বিরুদ্ধে অন্তরীণের পরোয়ানা বাহির হইল। তাঁহার এই বন্দিত্বে ভারতে হোমরুল আন্দোলন আরও উগ্র হইয়া উঠিলে ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গণিলেন এবং লর্ড মণ্টেগু ভারতে আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া শাসন-সংস্কার সাধন করিবেন প্রতিশ্রুতি দিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই জনমতের চাপে ভারত-সরকার বেশান্ত প্রভৃতিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন।

কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন তখন আসন্ন। বাংলার প্রগতিপন্থী দল সদ্যমুক্ত ভারতের এই মুক্তি সংগ্রামিকাকে সভানেত্রী করিতে চাহিলেন কিন্তু নরমপন্থী দল তাহার বিরোধিতা করেন। প্রগতিপন্থী দল কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া বেশান্তকে সভানেত্রী করিতে উদ্যোগী হইলেন। নরমপন্থী দলের সহিত একটা রফা হয় যাহার ফলে বেশান্ত সভানেত্রী হইলেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সভার সভাপতি পদ অন্যতম নরমপন্থী নায়ক বৈকুণ্ঠনাথ সেনকে ছাড়িয়া দিলেন।

এ পর্য্যন্ত বেশান্তের কর্ম্মধারা ভারতের মুক্তি আন্দোলনের সহিত এক ছিল, কিন্তু রাউলাট আইন ও জালিনওয়ালাবাগ হত্যার পর ভারতের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের যে নবরূপান্তর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ঘটে এই ইংরেজ-রমণী তাহার সহিত যুক্ত থাকিতে পারিলেন না। এই দিন হইতে বেশান্তের রাষ্ট্রিক ক্ষেত্র হইতে প্রভাব কমিতে থাকে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর ভারতহিতৈষী এই নারীর দেহাবসান ঘটে।

পূজার ছুটি

শারদীয়া পূজা উপলক্ষ্যে প্রবাসী কার্য্যালয় ২রা কার্ত্তিক (২০শে অক্টোবর) হইতে ১৫ই কার্ত্তিক (২রা নবেম্বর) পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। এই সময়ে প্রাপ্ত চিঠিপত্র-টাকাকড়ি প্রভৃতি সম্বন্ধে ব্যবস্থা কার্য্যালয় খুলিবার পর করা হইবে।

বৈদিক আর্য ও অবৈদিক আর্য

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

পূর্বের এক প্রবন্ধে (বৈদিক আর্য ও আবেস্তিক আর্য, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩) বৈদিক ও অবৈদিক আর্যজাতি সম্বন্ধে মতবাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে এই মতবাদের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া আর্যজাতি সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করা হইবে।

বৈদিক ও অবৈদিক আর্যজাতি সম্বন্ধে মতবাদকে নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক মতবাদ আখ্যা দেওয়া যায়। এই মতবাদের জন্মবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করা প্রয়োজন।

স্যর হারবার্ট রিজলের *People of India* প্রকাশিত হইলে এদেশে প্রতিবাদের একটা ঝড় উঠে। এই বিতর্ক এখন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। রিজলে সাহেব নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের সূত্রমতে মাপজোখ করিয়া এ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লম্বা মুণ্ড ও দুই শ্রেণী গোল মুণ্ড টাইপ আবিষ্কার করেন। লম্বামুণ্ড টাইপের একটি আর্য ও অপরটি দ্রাবিড়, গোল মুণ্ডের একটি মোঙ্গলীয়ান ও অপরটি সিথিয়ান (Scythian)। মাপজোখ করিয়া যে সকল সংখ্যা তিনি পান তাহা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিয়া দিয়াছেন, কোন্ অঞ্চলে কোন্ টাইপের প্রাধান্য ও কোন্ অঞ্চলে বিভিন্ন টাইপের সংমিশ্রণ হইয়াছে। উত্তর ভারতের পঞ্জাব অঞ্চলে ইন্দো-এরিয়ান বা আর্য টাইপের প্রাধান্য। ইহা বাদে দেশের প্রায় সর্বত্র প্রাচীন অধিবাসী ছিল দ্রাবিড় জাতি। দ্রাবিড় জাতির সহিত কোথাও গোল মুণ্ড সিথিয়ান, কোথাও গোল মুণ্ড মোঙ্গলীয় সংমিশ্রণ হইয়াছে। কয়েকটি অঞ্চলে দ্রাবিড় ও সিথিয়ানের সহিত আর্য টাইপের সংমিশ্রণের কথা তিনি বলিয়াছেন। বাঙালী মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর প্রতিবেশী। কাজেই তাঁহার মতে দ্রাবিড় টাইপের সহিত মোঙ্গলীয় টাইপের সংমিশ্রণে বাঙালী টাইপের উৎপত্তি হইয়াছে।

আর্যকৃষ্টির উত্তরাধিকারী দলের মধ্যে পরিগণিত এবং আর্যভাষাভাষী বাঙালী হিন্দু স্বভাবতঃই রিজলে সাহেবের এই সিদ্ধান্তে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিল। প্রতিবাদ অনেক হইল। কিন্তু নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের সূত্রমতে মাপজোখের ফলে যে গোল মুণ্ডের প্রাধান্য বাঙালীদের মধ্যে নির্ণিত হইয়াছে তাহা শুধু উচ্ছ্বাসের তোড়ে উড়াইয়া দিবার নহে। তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচারিত সিদ্ধান্তের প্রভাব শিক্ষিত মনের উপর বেশী হইয়া থাকে। এজন্য দেখা যায় যে রিজলে সাহেবের গবেষণার ফলে বাঙালীর আর্যত্ব উড়িয়া গেলে একদল ক্ষুণ্ণ হইয়া আপত্তি তুলিলেন কিন্তু আর এক দল বাঙালীর মধ্যে এই মোঙ্গল-দ্রাবিড় সংমিশ্রণের থিওরী মানিয়া লইয়া বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের ধুয়া তুলিয়া তাহাতেই আত্মপ্রসাদ লাভের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন।

যাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইলেন তাঁহারা প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রতিকারের উপায় চোখের সম্মুখে ছিল কিন্তু দেশে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনার তখনও বিশেষ প্রচার হয় নাই। প্রতিকারের উপায় হইল বাঙালীর মধ্যে এই গোল মুণ্ডের উৎপত্তির অন্য প্রকার ব্যাখ্যা।

রিজলে সাহেবের সিদ্ধান্তের কয়েকটি বাহিরের ত্রুটির উল্লেখ করা হইয়াছে: প্রথমতঃ, ভাষাবিজ্ঞানের এ সম্পর্কে যাহা বক্তব্য আছে তাহা তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন। তারপর পঞ্জাবের লম্বামুণ্ড টাইপকে আর্য টাইপ বলিয়া ঘোষণা করিবার মূলে রহিয়াছে য়ুরোপীয় আর্যবাদের প্রবল প্রভাব। আর্যজাতি যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠী ইহা য়ুরোপীয় আর্যবাদের স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত, যদিও যাহারা বাস্তবিক আপনাদিগকে আর্য বলিত তাহাদের মাথার মাপ লওয়া কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর পক্ষে এখন আর সম্ভব নহে। তারপর, যে সিথিয়ান টাইপের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন সে টাইপটি আসলে কি তাহা অজ্ঞাত, কারণ সিথিয়ান কথাটির মত অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট ও যথেচ্ছ ব্যবহারে জর্জরিত জাতীয় সংজ্ঞাবাচক পদ প্রাচীন ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি আছে কিনা সন্দেহ।

সে যাহা হউক, পূর্ব-ভারতের মত পশ্চিম-ভারতেও গোলমুণ্ড টাইপের প্রাধান্য দেখা যায়। রিজলে সাহেবের মতে এই অঞ্চলে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর সহিত সিথিয়ানগোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ফলে এই গোলমুণ্ডের প্রাধান্য আসিয়াছে।

তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে পঞ্জাবে ও আরও উত্তরে আর্য, যুক্তপ্রদেশে আর্য ও দ্রাবিড় সংমিশ্রণ, পূর্ব-ভারতে দ্রাবিড়ের সহিত মোঙ্গলীয় সংমিশ্রণ, পশ্চিম-ভারতে দ্রাবিড়ের সহিত সিথিয়ান সংমিশ্রণ হইয়াছে ও দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় টাইপের প্রাধান্য। যে বৈদিক ও অবৈদিক আর্যজাতি সম্বন্ধে মতবাদের কথা বলা হইবে তাহা প্রধানতঃ পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদিগের মধ্যে গোলমুণ্ড টাইপের উৎপত্তির একটি নূতন নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

রিজলের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর যে প্রতিবাদের কলরব উত্থিত হইল তাহা বৈজ্ঞানিক রূপ পাইল প্রায় দশ বৎসর পরে রমাপ্রসাদ চন্দের হাতে। তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে

(*Indo-Aryan Races*, 1916) তিনি এই মত ব্যক্ত করিলেন যে পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে গোলমুণ্ড টাইপের (brachycephaly) উৎপত্তি মোঙ্গলীয় ও সিথিয়ান সংমিশ্রণ হইতে হয় নাই। হিন্দুকুশ পর্বতের উত্তর পামীরের উপত্যকাসমূহে বর্তমানকালে গোলমুণ্ড আর্য-ভাষাভাষী জাতি দেখা যায়। পামীরের পূর্বে তারিম অববাহিকায় ও আরও পূর্বে লপ মরুভূমির বালুকাস্তূপের নিম্নে এক কালে সমৃদ্ধিশালী মনুষ্য-বসতির যে সকল ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা আর্য গোষ্ঠীর জাতির কীর্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই আর্য গোষ্ঠী গোল মুণ্ড (Alpine)। পূর্ব-ভারতীয় ও পশ্চিম ভারতীয় গোল মুণ্ড টাইপ এই আলপাইন টাইপ, ইহা সিথিয়ান নহে, মোঙ্গলীয়ও নহে। এই আলপাইন জাতি হইতেছে অবৈদিক আর্য জাতি।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অতি প্রাচীনকাল হইতে বিভিন্ন জাতি নানা অঞ্চল হইতে হিন্দুকুশ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। বৈদিক আর্যজাতির সহিত ভাষা ও কৃষ্টির সম্বন্ধের দিক দিয়া এবং নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের সূত্রের দিক দিয়া পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় গোলমুণ্ড টাইপের উৎপত্তি সম্বন্ধে চন্দের এই ব্যাখ্যা এরূপ সন্তোষজনক যে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীসমাজে উহা সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য হইয়াছে।

রমাপ্রসাদ চন্দের প্রচারিত এবং প্রসিদ্ধ বৈদেশিক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের দ্বারা গৃহীত এই মতবাদ অনুসারে ভারতবর্ষে দুই টাইপের বা শ্রেণীর আর্যজাতি রহিয়াছে, এক শ্রেণী লম্বামুণ্ড ও অপর শ্রেণী গোলমুণ্ড। গোষ্ঠীলক্ষণ বা ethnic stock হিসাবে এবং অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও এই দুই টাইপের জাতিকে আর্য বলিয়া বর্ণনা করিবার হেতু কি পরে দেখা যাইবে। এখানে এই মাত্র বলিয়া রাখা যাইতে পারে যে চন্দের বক্তব্য হইতে দেখা যায় যে গোলমুণ্ড জাতিকে তিনি round-headed invaders of Aryan speech বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

যে ভাবে চন্দ স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা হইতে যাঁহারা তাঁহার পরবর্তী রচনার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নহেন তাঁহাদের সন্দেহ হইতে পারে যে তাঁহার পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে alpine brachycephalyর মতবাদ সর জর্জ গ্রীয়ারসনের ভাষা সম্বন্ধে মতবাদের নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক ভাষ্য মাত্র। চন্দ গ্রীয়ারসনের ভাষাতাত্ত্বিক মতবাদের কাঠামোকে নিজে কাজে লাগাইয়াছেন ইহা সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অংশের যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছেন তাহা মৌলিক। এখন যে মতবাদ বৈজ্ঞানিক সমাজে সাগ্রহে গৃহীত হইয়াছে সংক্ষেপে তাহার পটভূমির কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

চন্দ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে মধ্যদেশ ও তাহার চারিদিকের প্রতিবেশী অঞ্চলগুলির মধ্যে জাতিগত ও ভাষাগত পার্থক্য এবং সমাজ-ব্যবস্থার পার্থক্য অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান। এই পার্থক্য তাঁহার মতবাদের ভিত্তি। প্রকৃত অবস্থা কি দেখা যাউক্।

মনুর মতে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি ও এই উভয় পর্বতের মধ্যস্থানে বিনশন দেশের পূর্বে ও প্রয়াগের পশ্চিমে যে অঞ্চল তাহাকে মধ্যদেশ বলে। (মনু ২।২১)। বিনশন দেশ বলিতে যে অঞ্চলে সরস্বতী নদী অন্তর্হিত হইয়াছে তাহা বুঝায়। সরস্বতী অম্বালার নিকটে সিরমুর রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া পাতিয়ালা রাজ্যে ঘাঘরের সহিত মিলিত হইয়াছে। এখানে সরস্বতীর অন্তর্ধানের অর্থ সম্ভবতঃ ঘাঘরের সহিত মিলন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে (৮।১৪) মধ্যদেশের অর্থ কুরুপঞ্চাল দেশ। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদি এই কুরুপঞ্চাল দেশে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং এই কেন্দ্র হইতে ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টি পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে প্রসারিত হয় পণ্ডিতগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রধান ব্রাহ্মণগুলি কুরুপঞ্চাল দেশে রচিত হইয়াছিল। এই দেশের ভাষা, যজ্ঞানুষ্ঠান বিধি, আচার প্রভৃতির উচ্চ প্রশংসা, এই দেশের ব্রাহ্মণদিগের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে অনেক স্থানে বিঘোষিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে বিদেহ রাজসভার প্রসিদ্ধ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য পঞ্চাল দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত উদ্দালক আরুণির শিষ্য।

ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির এই কেন্দ্রের পণ্ডিতগণের কেহ কেহ প্রাচ্য, পাশ্চাত্য ও উদীচ্য সকল দেশের সম্বন্ধে উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রাচ্য দেশের প্রতি উপেক্ষাটা বেশী প্রকট। প্রাচ্য দেশ বলিতে পরবর্তী কালে কাশী, কোশল, বিদেহ ও সম্ভবতঃ মগধ বুঝাইত। কিন্তু প্রাচীনতম ব্রাহ্মণগুলিতে বৈদিক কৃষ্টির কেন্দ্র ছিল উদীচ্য বা সিন্ধু উপত্যকা। কুরুপঞ্চাল বা মধ্যদেশ তখন ছিল প্রাচ্য। তারপর বৈদিক কৃষ্টির কেন্দ্র কুরুপঞ্চাল দেশে সরিয়া আসিলে পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চলগুলি প্রাচ্য দেশ বলিয়া পরিগণিত হইল। একদিকে কুরুপঞ্চাল ও অন্যদিকে কাশী, কোশল, বিদেহ ও মগধ—এই দুই অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত বিরোধের ইঙ্গিত করা হইয়াছে কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধের স্পষ্ট উল্লেখ বিশেষ পাওয়া যায় না। কাশীর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভরতবংশীয় রাজা শতানীক সাত্রাজিতের হস্তে পরাজিত হইলে কাশ্যগণ শতপথ ব্রাহ্মণের সময় পর্যন্ত পবিত্র অগ্নির প্রজ্বলন বন্ধ রাখিয়াছিলেন এইরূপ একটা কিম্বদন্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সে যাহা হউক,

রাজনৈতিক বিরোধকে, অন্য প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাবে, জাতিগত পার্থক্যের ফল বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

প্রাচীন ভরত ও পুরু গোষ্ঠী মিলিয়া পরবর্তীকালে কুরু গোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়। পাঞ্চাল জাতির উৎপত্তি প্রাচীন ক্রিবি, তুর্বশ, সৃঞ্জয়, কেশিন ও সোমক গোষ্ঠীর সমবায়ে। ঋগ্বেদীয় বৈকর্ণ গোষ্ঠী ক্রিবি ও কুরুদিগকে লইয়া গঠিত ছিল এইরূপ বলা হইয়াছে। ইহারা ব্যতীত মদ্র, উশীনর, চেদি, মৎস্য প্রভৃতি গোষ্ঠীকে মধ্যদেশের মধ্যে কেহ কেহ ধরেন। কেকয়গণ গান্ধারে বাস করিতেন। প্রাচ্যদেশের গোষ্ঠীগুলি যে কুরুপাঞ্চাল গোষ্ঠী হইতে ভিন্ন জাতীয় ছিলেন তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ম্যাকডোনেলের মত এই যে কুরুপঞ্চালের লোক প্রাচ্যদেশগুলিতে অগ্রসর হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর মতে জনমেজয়ের অধস্তন কুরু-রাজাদিগের আমলে কুরুরাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে এবং কুরুপাঞ্চাল গোষ্ঠীর বহু সাধারণ লোক ও রাজ-বংশীয়গণ প্রাচ্যদেশে বসতি স্থাপন করে। এই সময়ে কুরু বা ভরত বংশের রাজধানী কৌশাম্বীতে স্থানান্তরিত হয়। কুরুরাজবংশের পতনের পরে বিদেহ রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। বিদেহের রাজা জনকের বংশীয়গণের হাত হইতে রাজশক্তি লিচ্ছবীদিগের হাতে চলিয়া যায়। কাশী, কোশল ও মগধের অভ্যুদয় ইহার পরের ইতিহাস।

শতপথ ব্রাহ্মণের আমলে ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির কেন্দ্র কুরু-পঞ্চাল দেশ হইলেও দেখা যায় যে প্রাচ্য দেশ তখন এই কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিদেঘের (বিদেহের প্রাচীন রূপ) রাজা ও তাঁহার পুরোহিত গোতম রাহূগণের সঙ্গে অগ্নি-বৈশ্বানরের সরস্বতী নদীর অঞ্চল হইতে পূর্বদিকে আগমন ও সদানীর (গণ্ডক) নদীর তীরে আসিয়া অবস্থিতির যে পুরাণ শতপথে বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে প্রাচ্য-দেশে আর্যকৃষ্টি প্রচারের ইতিহাস বলিয়া পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়াছেন। সদানীর বিদেহ ও কোশলের সীমানা বলিয়া পরিচিত ছিল। শতপথের আমলে ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টি সদানীরের অপর তীরবর্তী অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছিল এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিন্তু দেখা যায় যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক শতপথেও প্রাচ্যদেশের মৃত দেহ সৎকার করিবার প্রথার নিন্দা করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮।১৪) দেখা যায় পশ্চিম দেশীয় রাজাদিগকে নীচ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাচ্যদেশের মধ্যে মগধের প্রতি উপেক্ষার ভাব বেশী প্রকাশ পাইয়াছি বলা হইয়াছে। ম্যাকডোনেলের মতে বাজসনেয়ী সংহিতায় পর্যন্ত এই উপেক্ষার পরিচয় পাওয়া যায় এবং কয়েকটি শ্রৌত সূত্রে বিদ্বেষের ভাব প্রকট হইয়াছে। অথর্ববেদের অঙ্গ ও মগধ এবং বিভিন্ন শ্রৌত সূত্রে ব্রাত্যস্তোমের বর্ণনায় মগধের অধিবাসীর উল্লেখ উপেক্ষা ও ঘৃণার পরিচায়ক। একটি কৌতুকজনক ব্যাপার এই যে অর্বাচীন ও অখ্যাত পুরাণকার পর্যন্ত প্রাচীন যুগের মধ্যদেশ বাসীর অন্যান্য অঞ্চলের প্রতি এই অবজ্ঞার ভাব অনুকরণ করিয়াছে :

> অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাশ্চ সৌরাষ্ট্রং গুর্জরং তথা
> আভীরং কৌঙ্কণঞ্চৈব দ্রাবিড়ং দক্ষিণাপথম্‌
> অন্ধ্রাশ্চ মাগধশ্চৈব দেশনেতাংশ্চ বর্জয়েৎ।

কেন এই সকল অঞ্চল বর্জন করিতে হইবে তাহার উল্লেখ নাই।

প্রাচ্যদেশ, বিশেষ করিয়া মগধের প্রতি মধ্যদেশবাসীর অবজ্ঞা ও বিরূপতার কারণ নানারূপে ব্যাখ্যা করা হই-য়াছে। রাজনৈতিক কারণের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে। একটি ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে এই অবজ্ঞার কারণ মগধের লোকের আচার অনুষ্ঠানে নিষ্ঠার অভাব। ওলডেন-বার্গের মতে মগধের অধিবাসী কোন কালে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম পুরাপুরি গ্রহণ করে নাই। ম্যাকডোনেল ও কীথের মতে

> "It is probable that the East was less Aryan than the West, and that it was less completely reduced under Brahmanical supremacy."

এখানে "less Aryan" সম্ভবতঃ জাতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। ওয়েবার মগধ সম্বন্ধে এইরূপ মত পোষণ করিতেন। তিনি বলেন যে মগধে আদিবাসীর প্রাধান্য ছিল। পার্জিটরের মতে মগধে আর্যগণ সমুদ্রপথে আগত এক দল ভিন্ন জাতির আক্রমণকারীর সম্মুখীন হইয়াছিল। ম্যাকডোনেল অন্যত্র যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মতানুসারে কুরুপাঞ্চাল জাতির লোক প্রাচ্য প্রদেশগুলিতে অগ্রসর হইয়া বসতি স্থাপন করে কিন্তু দূরত্বের জন্য এবং আদিবাসীদিগকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহারা আপনা-দিগের প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টি হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

তাহা হইলে মোটামুটি এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত এই দাঁড়াইতেছে যে আর্যজাতি প্রাচ্যদেশগুলিতে বসতি স্থাপন করিয়াছিল কিন্তু নানা কারণে ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টির কেন্দ্র কর্তৃক তাহারা ব্রাত্য বা পতিত বলিয়া গণ্য হয়। ম্যাকডোনেল ও কীথের তাহারা একটি ইঙ্গিত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

> "That the Kosala-Videhas *were originally settlers of an older date* than the Kuru-Pancalas is reasonably obvious from their geographical position."

অন্যত্র,

> "The geographical position of the Kuru-Pancalas renders it probable that they were later immigants into India than the Kosala-Videhas or the Kasis, who

must have been pushed into their most eastward territories by a new wave of Aryan immigration."

এই মতের উল্লেখ পরে আবার করা হইবে।

এইবার রমাপ্রসাদ চন্দের মতবাদের আলোচনায় ফিরিয়া আসা যাউক। প্রাচীন সাহিত্যে প্রাচ্যদেশবাসীর প্রতি মধ্যদেশীয়দিগের অবজ্ঞার উল্লেখ, গ্রীয়ারসনের ভাষা তাত্ত্বিক গবেষণার ফলে Midland ও Outer Band এই দুই অংশে ভারতীয় আর্যভাষা অঞ্চলগুলির বিভাগ ও রিজলের আবিষ্কৃত পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর প্রাধান্য এইগুলি মিলাইয়া চন্দের মতবাদ গঠিত হইয়াছে।

নিজের মতবাদের ভিত্তি পত্তন করিতে গিয়া চন্দ বলিতেছেন,

"Not only social institutions and language but an important physical feature also, the shape of the skull, lends support to the testimony of the Sruti, Smriti and Purana that the Indo-Aryans of the outer countries originally came of an ethnic stock that was different from the stock from which the Vedic Aryans originated."

এখানে বৈদিক আর্য বলিতে তিনি সম্ভবতঃ মধ্যদেশবাসী কুরুপাঞ্চাল জাতির কথা বলিতেছেন। কিন্তু শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের সাক্ষ্য হইতে এই পৃথক জাতীয়তার মত যে বিশেষ সমর্থিত হয় না উপরে তাহা খানিকটা দেখা গিয়াছে, পরে আরও বিশদভাবে দেখা যাইবে। অন্যত্র বৈদিক আর্যজাতির পরিবর্তে তিনি "হিন্দুস্থানী" কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,

"To account for the linguistic, social and physical difference between the Hindusthanis on the one hand and the Indo-Aryans of the outer countries on the other, we have to assume the immigration of round and medium-headed invaders of Aryan speech in the prehistoric period."

ভাষা, সমাজ-ব্যবস্থা ও দৈহিক লক্ষণের যে পার্থক্যের উল্লেখ করা হইতেছে তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলা দরকার। ভাষার পার্থক্য প্রাচীন সাহিত্যের সাক্ষ্যের দ্বারা বিশেষ প্রমাণিত হয় না, ইহা প্রমাণিত হয় পরবর্তী সাহিত্যের সাক্ষ্যে ও গ্রীয়ারসনের ভাষার শ্রেণী বিভাগের দ্বারা। ভারতীয় ভাষাসমূহের শ্রেণী বিভাগের বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যে না যাইয়া সংক্ষেপে বলা যায় যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ব্যবহৃত আর্য ভাষা দুইটি প্রধান শাখায় ভাগ করা হইয়াছে। ইন্দো-এরিয়ান ও দর্দিক। দর্দিক-শাখার খোয়ার, দরদ ও কাফিরী ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের চিত্রাল প্রভৃতি অঞ্চলে, কাশ্মীরে, গিলগিট এজেন্সী অঞ্চলে, কোহিস্থানে এবং হিন্দুকুশের কাফির উপজাতির মধ্যে প্রচলিত। এই দরদ শাখার প্রাচীন নাম পিশাচ ভাষা। ইন্দো-এরিয়ান শাখার উপশাখাগুলির মূল সংস্কৃত, ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে এইমাত্র বলা যায়। প্রাচীন সাহিত্যে কখন উদীচ্যের ভাষার বিশুদ্ধতার প্রশংসা, কখন মধ্যদেশের ভাষার প্রশংসা দেখা যায়। প্রাচ্য দেশাদির ভাষা সম্বন্ধে যে অবজ্ঞার ভাব লক্ষ্য করা যায় তাহা ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টির কেন্দ্রের পণ্ডিতগণের পক্ষে তেমন অমার্জনীয় নহে এবং তাহাকে ভাষার গুরুতর বা মৌলিক পার্থক্যের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

সমাজ-ব্যবস্থার দিক দিয়া ইহা স্বীকার্য যে চারি বর্ণের বিভাগ পূর্ব ও পশ্চিম ভারতে দুর্বল দেখা যায়। ইহাকে পৃথক জাতিত্বের প্রমাণ বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের দৃষ্টি প্রাচীন সাহিত্যে উল্লিখিত দুই একটি ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট করা যাইতে পারে। বিশ্বামিত্রের বংশীয়গণ কি করিয়া পুলিন্দ, শবর, অন্ধ্র, পুণ্ড্র ও মূতিবদিগের পূর্বপুরুষ হইতে পারেন তাহার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক গ্রন্থে এ কথা বলা হইয়াছে। যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়ের কথা মনু কি হিসাবে বলিতেছেন? তারপর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে উপনিবিষ্ট আর্যজাতির একটি অংশের মধ্যে যে সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনে করা হয় অন্যান্য অংশে সেই ব্যবস্থা পুরাপুরি গৃহীত হইয়া না থাকিলে উহা সেই সকল অংশের বিজাতীয়তা প্রমাণিত করে ইহা কি করিয়া মানিয়া লওয়া যায়? ভাষা ও সমাজ-ব্যবস্থার পার্থক্যের উপর চন্দ এত জোর দিয়াছেন কেন পরে দেখা যাইবে।

তারপর দৈহিক লক্ষণের পার্থক্য। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যে দৈহিক লক্ষণের পার্থক্যের কথা বলা হয় তাহা শুধু মস্তকের আকৃতিতে সীমাবদ্ধ, গাত্রবর্ণ, নাসিকার আকৃতি, কেশ, চক্ষু তারকার বর্ণ, দৈর্ঘ্য প্রভৃতি লক্ষণের পার্থক্যের কথা বলা হয় না। কিন্তু এখানেও দেখা যাইতেছে যে চন্দ স্বীকার করিতেছেন যে, গোলমুণ্ড আর্যজাতির মস্তকের আকৃতি নিষাদ, বৈদিক আর্য ও দ্রাবিড়গণের সংমিশ্রণে পরিবর্তিত হইয়াছে। "In India this type (অর্থাৎ আল্‌পাইন টাইপ) has turned into mesaticepyalic Indo-Aryan of the outerland by Nisada, Vedic Aryan and Dravida admixture."

এখন চন্দের গোল এবং মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের আর্যভাষাভাষী আক্রমণকারীদিগের প্রসঙ্গে আসা যাউক।

এই গোলমুণ্ড আক্রমণকারিগণ বিভিন্নদলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এ সম্বন্ধে চন্দের বক্তব্য সংক্ষেপে এইরূপ: প্রথম দল গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রবেশ করে। অপর একটি দলের মধ্যে রাষ্টিক বা রাষ্ট্রগণ ছিল। ইহাদের নাম হইতে মহারাষ্ট্র ও সৌরাষ্ট্র দেশের নাম আসিয়াছে। আর একটি

দলের মধ্যে ছিল পঞ্জাবের বাহীকগণ। সর্বশেষে আসে পিশাচ ভাষাভাষী কাশ্মীর, দরদিস্তান ও কাফিরীস্তানের অধিবাসী। এই গোলকুণ্ড আক্রমণকারীরা সিন্ধু উপত্যকার বৈদিক কৃষ্টি প্রায় ধ্বংস করিয়া দেয়। পরবর্ত্তী একখানি গ্রন্থে (*Indus valley in the Vedic Period*) চন্দ সূত্র সাহিত্য হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া এই আক্রমণকারীদিগের তালিকা আরও সম্পূর্ণ করিতে চাহিয়াছেন। বৌধায়ন শ্রৌত সূত্রে (১৮।১০) অরট্ট, গান্ধার, সৌবীর, কারস্কার, কলিঙ্গের নাম আছে। চন্দের ব্যাখ্যা মতে ইহারাই alien immigrants, যাহাদের আক্রমণে উদীচ্যের বৈদিক কৃষ্টি বিনষ্ট হয় এবং মধ্যদেশ ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। বৌধায়ন ধর্ম সূত্রে (১, ১, ৩২-৩৩) বলা হইতেছে যে অনর্ত, অঙ্গ, মগধ, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণ উপবৃত, সিন্ধু ও সৌবীরগণ মিশ্র জাতি। যাহারা অরট্ট, কারস্কার, পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ, কলিঙ্গ ইত্যাদি দেশে গমন করে তাহাদিগকে সর্বপৃষ্টি যাগ করিতে হইবে।

প্রথম আক্রমণকারী দলের যে সকল জাতি গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রবেশ করে তাহাদের নাম চন্দ উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ ইহারাই অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, কলিঙ্গ প্রভৃতি পূর্ব দেশীয় জাতি। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহাদের সহিত গান্ধারের একত্র উল্লেখ দেখা যায় এই হেতুতে তাঁহার মতে গান্ধারগণ ও ইহারা সম্ভবতঃ এক গোষ্ঠীর ("of the same stock)।" অথর্ব বেদে (৫।২২) গান্ধারের সঙ্গে মগধ, কলিঙ্গ, বাহ্লীক, মহাবৃষ ও মুজবংদিগের উল্লেখ দেখা যায়। দ্বিতীয় দলের মধ্যে চন্দ শুধু রাষ্টিকগণের নাম করিয়াছেন। আশোকের শিলালিপিতে (Asoka Edicts V and XIII) রাষ্টিকগণের সঙ্গে ভোজ, অন্ধ্র ও পুলিন্দগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১৮) আবার অন্ধ্র ও পুলিন্দের সঙ্গে পুণ্ড্র, শবর ও মূতিবদিগের উল্লেখ দেখা যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে পুলিন্দাদিগের সঙ্গে পুণ্ড্রক, কেরল, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, আভীর, বিদর্ভ ও কুন্তল প্রভৃতির একত্র উল্লেখ দেখা যায়। বিষ্ণু পুরাণ পুলিন্দদিগের সঙ্গে এক দিকে ভোজ, দশার্ণ, মেকল, উৎকল ও অন্য দিকে সিন্ধু ও করুষের একত্র উল্লেখ করা হইয়াছে। ভোজগণ বিদর্ভে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সাত্বতগণ তাঁহাদের অধীন ছিল। সাত্বত, বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ এক জাতির শাখা। বৃষ্ণিগণের উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। মৎস্য পুরাণের মতে ভোজগণের সঙ্গে হৈহয়গণের সম্বন্ধ ছিল। মহাভারতের মতে (১৮৫) ভোজগণ (বৈভোজ) ঋগ্বেদীয় দ্রুহ্যু গোষ্ঠী হইতে উদ্ভুত। দ্রুহ্যু যযাতির পুত্র। অপর তিন পুত্র যদু, অনু ও পুরু হইতে যবন জাতি, ম্লেচ্ছ জাতি ও পৌরব বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। বৌধায়ন সূত্রের অরট্টদেশের কথা উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে। মহাভারতে আরট্ট, জর্ত্তিক, বাহীক প্রভৃতির এক সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। বাহীকদিগের একটি নাম জর্তিক। ইহাদিগের প্রধান নগর শাকল। মহাভারতে বাহীকদিগের বিশেষ করিয়া বাহীক স্ত্রীদিগের বর্ণনা ঘোরতর বস্তুতান্ত্রিক। বাহীকগণ গৌড়ী সুরা, লশুনের সহিত ভৃষ্ট যব, অপূপ ও গোমাংস ভক্ষণ করিত। (৮,৪৪।১১) বাহীক কামিনীগণ মত্ত, বিবস্ত্র ও মাল্যচন্দন রহিত হইয়া নগরের গৃহপ্রাচীর সমীপে নৃত্য এবং গর্দভ ও উষ্ট্রের ন্যায় চীৎকার করিয়া অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। বাহীকদিগের বর্ণনা, ব্রাত্যানাং দাসমীয়ানাং বাহীকানামযজ্বানম্। দেখা যাইতেছে বাহীকদিগকে ব্রাত্য, দাস ও অযজ্বান বা যজ্ঞহীন বলা হইতেছে। ঋগ্বেদের আলোচনার কালে অযজ্বান কথাটির সহিত বিশেষ পরিচয় হইয়াছে। বাহীকদিগের সঙ্গে কারস্কার, মাহিষক, কালিঙ্গ, কেরল, কর্কোটকদিগকে ধর্ম-বর্জিত বলা হইয়াছে। বাহীকদিগের মত কুৎসিত আচার প্রস্থল, মদ্র, গান্ধার, খশ, বসাতি, সিন্ধু ও সৌবীর দেশেও প্রচলিত।

বাহীকদিগের সম্বন্ধে একটা বড় সংবাদ মহাভারতে দেওয়া হইয়াছে। আরট্টদিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয়রা ধনাধিকারী হয় (ভাগহরা ভাগিনেয়া ন সূনবঃ)। বাহীক, মদ্রক ও পঞ্চনদদিগের তুলনায় কুরু, পঞ্চাল, শাল্ব, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশী, পৌণ্ড্র, কলিঙ্গ, মগধ ও চেদি প্রভৃতি দেশের অসাধু ব্যক্তিরাও ধর্মজ্ঞ হইয়া থাকে এইরূপ বলা হইতেছে। পাণিনি বাহীক সঙ্ঘের (republic) সঙ্গে মালবা ও ক্ষৌদ্রক্যদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা গ্রীক ঐতিহাসিকদিগের Malloi ও Oxydrakoi ; শতপথ ব্রাহ্মণে বাহীকদিগের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে তাহারা অগ্নিকে ভব নামে উপাসনা করিত এবং প্রাচ্যদেশে সর্ব নামে অগ্নি উপাসিত হইতেন। মহাভারতের কয়েকটি তালিকায় বাহ্লীক জাতির উল্লেখ দেখা যায়। কেহ কেহ এই বাহ্লীক ও বাহীক অভিন্ন মনে করেন। বাহ্লীকদিগের সঙ্গে কোন কোন তালিকায় কাশ্মীর, সিন্ধু সৌবীর, গান্ধার, দর্শক, উলূত, অভীসার ও শৈবল দেশীয়দিগের উল্লেখ দেখা যায়। দ্রোণপর্বে কাশ্মীরকগণের সঙ্গে মুদগল, কাম্বোজ, দরদ, ত্রিগর্ত, মালব প্রভৃতি দেশ এবং খশ, শক ও যবনগণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই তালিকায় পিশাচ বলিয়া একটি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে দরদদিগকে আভীর ও কাশ্মীরকের সঙ্গে একত্র উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই বিবরণ আর না বাড়াইয়া বলা যায় যে দক্ষিণ

ভারতীয় বৌধায়ন মতের ধর্ম ও শ্রৌত সূত্রের যে ধরণের প্রমাণকে দুইটি পৃথক গোষ্ঠীর আর্যজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণের মতবাদ প্রতিষ্ঠার অন্যতম সূত্ররূপে রমাপ্রসাদ চন্দ গ্রহণ করিয়াছেন সেই প্রমাণের মূল্য খুব বেশী নহে। বৌধায়ন সূত্রসমূহ যখন রচিত হয় সম্ভবতঃ সেই সময়ে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক কর্মকেন্দ্র মগধে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টির কেন্দ্রগুলি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে আবদ্ধ না থাকিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া ছিল। এইরূপ না হইলে ১০০০ বৎসর দেশের প্রধান রাজশক্তি অভারতীয় ধর্মাবলম্বীদিগের হস্তগত থাকিবার পরে দেশের প্রাচীন ধর্ম ও কৃষ্টির ধারা প্রাণবন্ত থাকিত না।

ব্রাহ্মণ্য কৃষ্টির কেন্দ্রসমূহ বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও প্রাচীন ঐতিহ্যের ন্যাসরক্ষকগণ আচার অনুষ্ঠানে নিষ্ঠার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন এবং সকল রকম ব্যতিক্রমকে ম্লেচ্ছাচার বলিয়া আক্রমণ করিতেন। উপরে একত্র উল্লিখিত বিভিন্ন জাতির তালিকায় যে গরমিল চোখে পড়িবে সম্ভবতঃ তাহার কারণ এইরূপ। এই ধরণের আক্রমণ ও নিন্দাকে বৈজ্ঞানিক হিসাবে race বলিতে যাহা বুঝায় তাহার পার্থক্যসূচক প্রমাণরূপে ব্যবহার করিলে ভুল করা হইবে কিনা তাহা বিচার্য।

সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিবাসী, পঞ্জাবের বাহীকগণ ও পিশাচ ভাষাভাষী দরদগণ আক্রমণকারী দলসমূহের মধ্যে ছিল এইরূপ চন্দের মত। ইহারা সকলেই গোলমুণ্ড, আর্যভাষাভাষী আক্রমণকারী। ইহাদের সহিত আর কোন্ কোন্ দল ছিল তাহা নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া "একত্র উল্লেখে"র যে সূত্র চন্দ ব্যবহার করিতেছেন সেই সূত্রানুসারে বিচার করিলে দেখা যায় যে ঠক বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া যায়। মহাভারত ও রামায়ণের যুগে সিন্ধুনদের পশ্চিম ও পূর্বতীরবর্তী জাতিগুলি, পঞ্জাব হিমালয়ের বিভিন্ন জাতি, পশ্চিমের সিন্ধুসৌবীর প্রভৃতি জাতির তালিকা ও অন্যান্য অঞ্চলের জাতিসমূহের সহিত তাহাদের সম্বন্ধের ইতিহাস বিচার করিলে এ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সূত্র পাওয়া কঠিন। মধ্যদেশের শূরসেন গোষ্ঠীগণ পশ্চিম ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল ইহা প্রসিদ্ধ কিন্তু দেখা যায় যে বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগকে মহাভারতে ব্রাত্য বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে।

এই বিচার ছাড়িয়া দেখা যাউক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মতে কোন্ পথে গোলমুণ্ড আর্য আক্রমণকারিগণ ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে গোলমুণ্ডের প্রাধান্য যে অঞ্চলে দেখা যায় সেই সকল অঞ্চলের মধ্য দিয়া আক্রমণ ঘটিয়াছিল এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

দেখা যায় যে পণ্ডিতগণের এক দলের মত এই যে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলি, বেলুচীস্থান ও সিন্ধু হইতে কচ্ছ, গুজরাত, দক্ষিণ মারাঠা দেশের মধ্য দিয়া দক্ষিণ পশ্চিমে কুর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। তারপর দক্ষিণের মালভূমির মধ্য দিয়া কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে। পূর্ব উপকূলের এই অঞ্চল হইতে তাহারা বঙ্গ ও বিহারে অগ্রসর হয়। চন্দের মত এই যে ইহাদের প্রথম দল গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তর অংশ বৈদিক আর্যগণের অধিকৃত দেখিয়া মধ্য ভারতের মালভূমি অতিক্রম করিয়া বিহারে উপস্থিত হয়। ডাঃ হাটনের ব্যাখ্যা এই যে এই গোষ্ঠীর কয়েকটি দল পশ্চিম উপকূল বাহিয়া কুর্গ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। অপর কয়েকটি দল অগ্রগামী বৈদিক আর্যদিগের চাপে গাঙ্গেয় উপত্যকা বাহিয়া বঙ্গদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। "Where the Bengali element seems very definitely intrusive, forming a wedge between Assam and Orissa." এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে অবৈদিক আর্যগণ বৈদিক আর্যগণের পূর্বে বা পরে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল ইহা লইয়া মতদ্বৈধ দেখা যাইতেছে। এ সম্বন্ধে পরে বলা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মত এই যে যাহাদিগকে গোলমুণ্ড ইন্দো-এরিয়ান জাতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে তাহারা ছাড়াও তেলেগু, কানাড়ী ও তামিল ভাষাভাষীদিগের মধ্যে বহুসংখ্যক গোল বা মধ্যমাকৃতি (round or medium-headed) মুণ্ডের লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরে উল্লিখিত অঞ্চলগুলির বর্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে কাহারা এই গোলমুণ্ড বা অবৈদিক আর্যজাতির বংশধর কোন কোন নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানী তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। হাটনের মতে প্রভু, মারাঠা, কুনবী, বিল্লবা, কুর্মী, কাপু প্রভৃতি এই গোলমুণ্ড আর্যদিগের বংশধর। হাটনের আর একটি মত উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন কুনবী, কুর্মী কাপু প্রভৃতি কৃষিজীবী জাতি যাহারা গোলমুণ্ড আক্রমণকারীদিগের বংশধর তাহারা ইরাণের প্রাচীন অধিবাসী তাজিক জাতির প্রতিনিধি। এখানে চন্দের অবৈদিক আর্যদিগকে তাজিকদিগের সহিত সম বা এক গোষ্ঠীয় বলিয়া মত প্রকাশ করা হইতেছে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে। চন্দ অবৈদিক আর্যদিগকে প্রাচীন ইরাণীদিগের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া মনে করেন না।

অবৈদিক আর্যগণের ভারত আক্রমণের সময় সম্বন্ধে

মতদ্বৈধের কথা বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বলা যায় যে একা রমাপ্রসাদ চন্দ ব্যতীত অন্যান্য নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী, যাঁহারা তাঁহার অবৈদিক, গোলমুণ্ড আর্যজাতির ভারতবর্ষ আক্রমণের মতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই মত পোষণ করেন যে এই জাতি প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তার পরে বৈদিক আর্যগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। হাটন প্রমুখ একদল পণ্ডিতের মতে এই গোলমুণ্ড আর্যভাষাভাষী জাতির আক্রমণে সিন্ধু উপত্যকার তাম্র যুগের সভ্যতা ধ্বংস হয়, পরে বৈদিক আর্যজাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। রমাপ্রসাদ চন্দের মত কতকটা এইরূপ যে সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংস হয় বৈদিক আর্যগণের আক্রমণে এবং উত্তর ভারতে বৈদিক কৃষ্টি বিনষ্ট হয় অবৈদিক আর্যগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে। বর্তমান প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আলোচনায় আর অধিক অগ্রসর না হইয়া এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে উপরের দুইটি মতের মধ্যে যে মতই গ্রাহ্য হউক ইহা বুঝা যাইতেছে যে আর্য জাতি সিন্ধুসভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়াছিল।

চন্দ মধ্য দেশ ও চতুপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের (Outer Band) অধিবাসীদিগের মধ্যে ভাষা ও সমাজব্যবস্থার পার্থক্যের উপর অত্যধিক জোর দিয়াছেন উপরে এই কথা বলা হইয়াছে। এইরূপ করিবার একটি কারণ বৈদিক আর্যগণ, অবৈদিক আর্যগণের পূর্বে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, এই মত প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস।

গোলমুণ্ড অবৈদিক আর্যজাতি একদা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল এই মতবাদের পটভূমির ও আনুষঙ্গিক প্রশ্নগুলির পরিচয় দেওয়া হইল। এই মতবাদের ফলে মস্তকের গঠন, ভাষা, সমাজ ব্যবস্থায় ও কৃষ্টিতে পরস্পর হইতে ভিন্ন দুইটি আর্যগোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই দুইটি আর্যজাতির গোষ্ঠী (ethnic stock) ভিন্ন, উৎপত্তির স্থান ভিন্ন, ভারতবর্ষে প্রবেশের সময়ও ভিন্ন। এখন প্রশ্ন উঠে, এই দুইটি গোষ্ঠীর মধ্যে এত পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় গোষ্ঠীকেই আর্য বলা হইতেছে কেন? বৈদিক আর্যগণের সম্বন্ধে বলা যায় যে ঋগ্বেদে তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অবৈদিক আর্যগণের আর্যত্বের ভিত্তি কি? গোলমুণ্ড আক্রমণকারীদিগকে যে সকল পণ্ডিত আর্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় তাঁহারা আর্য-ভাষাভাষী ছিল, ইহাই তাহাদের আর্যত্বের একমাত্র দাবি। তাহা হইলে চন্দ ভাষার পার্থক্যের উপর যে জোর দিয়াছেন তাহা অনাবশ্যক বলিয়া দেখা যাইতেছে। ইহার পর অজস্র প্রশ্ন উঠিবে। দুইটি এতগুলি বিষয়ে পৃথক গোষ্ঠীর জাতির মধ্যে এই ভাষার ঐক্য কি ভাবে আসিল? সমাজ ব্যবস্থা, কৃষ্টি ও ধর্ম—নিরপেক্ষ ভাষার ঐক্য কি ভাবে সম্ভব? দুইটি পৃথক গোষ্ঠীর জাতির যদি সে কালে এক ভাষাভাষী হওয়া সম্ভব ছিল তাহা হইলে ভাষা বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সাহায্যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের মতবাদ গঠন করা কি নিরাপদ? ইত্যাদি।

এই সকল প্রশ্ন এড়াইয়া বৈদিক ও অবৈদিক আর্য জাতির মতবাদের আলোচনায় ফিরা যাউক। এই মতবাদের পটভূমির যে আলোচনা উপরে করা হইয়াছে তাহাতে আর দুই একটি কথা যোগ করিতে হইবে।

বৈদিক ও অবৈদিক আর্যজাতির নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা লম্বামুণ্ড এবং গোলমুণ্ড (dolichocephalic ও brachycephalic)। রমাপ্রসাদ চন্দ ও তাঁহার মতের সমর্থনকারী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিসমূহ যে সিথিয়ান বা মোঙ্গলীয় নহে তাহা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া প্রচলিত আর্যবাদ বা আর্যদিগের নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাটি মানিয়া লইয়াছেন। বিনা প্রশ্নে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে বৈদিক আর্যগণ লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীয় এবং উত্তর ভারতের লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর আর্যভাষাভাষী জাতিগুলি ইহাদের বংশধর। বৈদিক আর্যজাতি সম্বন্ধে এই প্রচলিত মতবাদ পুরাপুরি গ্রহণ করিবার ফলে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীকে আর্যজাতি কিন্তু "অবৈদিক" বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেক কথা বলিতে হইয়াছে।

এই মতবাদের নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক ভিত্তি পরীক্ষা করিবার অবসর এখানে নাই। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা বর্তমানে মুলতবী রাখিয়া সংক্ষেপে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে বৈদিক আর্যগণ,—তাঁহাদের ৩০০০ বৎসরের পরের উত্তর-ভারতীয় বংশধরদিগের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক, যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীয় ছিলেন এই মত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত নহে, ইহা দাঁড়াইয়া আছে শুধু প্রেষ্টিজের উপর। যদি মস্তকের গঠনের মত একটি প্রধান গোষ্ঠীয় লক্ষণে দুইটি দল পৃথক বলিয়া স্বীকার করা হয় তবে প্রকৃত আর্য কাহারা ছিল? নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণের ভাব এ সম্বন্ধে অত্যন্ত অস্পষ্ট। মনে হয় একটিকে তাঁহারা racially আর্য ও অপরটিকে ভাষায় আর্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের হাতে আর্যপদের এইরূপ ব্যবহার বিজ্ঞানসম্মত নহে, সন্তোষজনকও নহে।

আর্যজাতির দৈহিক লক্ষণ (ethnic characteristics) সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে যাহারা আপনাদিগকে আর্যনামে অভিহিত করিত তাহাদের প্রাচীন বাসস্থানের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে, উরল পর্বতের দক্ষিণপূর্বে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিলে বিশেষ ফল হইবে না। আর্যজাতির এই প্রাচীন বাসভূমির নাম আইরিয়ানা। এই আইরিয়ানা হইতে আর্যপদ আসিয়াছে।

অনুমান করা যায় যে অতি প্রাচীন যুগে, ঋগ্বেদ ও

জেন্দাবেস্তা রচিত হইবার বহু পূর্বে, এই বাসভূমি হইতে আর্যজাতি পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঋগ্বেদের প্রমাণ হইতে এইরূপ অনুমান করা যায় যে ঋগ্বেদীয় ঋষিকুল যখন যমুনার পশ্চিমে বাস করিতেন আর্যজাতি ও আর্যকৃষ্টি তাহার পূর্বে পূর্বভারতে প্রসারিত হইয়াছিল। ম্যাকডোনেল ও কীথের কাশী, কোশল ও বিদেহ এবং কুরুপঞ্চালের আর্যবসতির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে ইঙ্গিতের উল্লেখ উপরে করা হইয়াছে তাহা এই প্রসঙ্গে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যজ্ঞীয় দক্ষিণাসম্ভার লইয়া বিশ্বামিত্রের পূর্বদিক হইতে শতুদ্রি ও বিপাশা অতিক্রম করিবার কাহিনী তাৎপর্যহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণের অগ্নিবৈশ্বানরের পূর্বদিকে অভিযানের কাহিনীকে প্রচলিত ব্যাখ্যা মতে আর্যসভ্যতা বা আর্যজাতির বিস্তৃতির ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ না করিয়া মনে করা যাইতে পারে যে এই প্রাচীন কাহিনীর ভিত্তি একটি প্রাচীনতর কিম্বদন্তী এবং যাহাকে আর্যসভ্যতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে উহা বাস্তবিক ব্রাহ্মণ্যকৃষ্টি; ব্রাহ্মণ আর্য হইতে পারেন কিন্তু সকল আর্যই ব্রাহ্মণ নহেন। পারস্যের হাকামণি সম্রাট প্রথম দারিয়ুস খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতকে আপনাকে আর্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সিন্ধুসভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন তাহা সঠিক হইলে দেখা যায় যে চন্দ যাহাদিগকে গোলমুণ্ড অবৈদিক আর্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং বৈদিক আর্যদিগের পরবর্তী বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহারা সিন্ধুসভ্যতার অভ্যুদয়কালে অর্থাৎ ঋগ্বেদ রচনার সহস্রাধিক বৎসরের পূর্বে (ঋগ্বেদ রচনার কাল সম্বন্ধে প্রচলিত মতানুসারে) সিন্ধু উপত্যকায় বর্তমান ছিল। গোলমুণ্ড আর্যভাষাভাষী জাতি সিন্ধু সভ্যতার যুগে মোহেঞ্জো দারো, হরাপ্পা প্রভৃতি নগরে বাস করিত এই তথ্য বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মহলে স্বীকৃত হইলেও ইহার সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য উপেক্ষিত হইয়াছে, প্রচলিত, প্রাচীন য়ুরোপীয় আর্যবাদ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। সিন্ধুসভ্যতার আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিবার অবকাশ পাওয়া যাইবে।

গোলমুণ্ড অবৈদিক আর্যজাতি কোন অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল সে সম্বন্ধে চন্দের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে চন্দের মতের ভিত্তি প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী উজ্ফাল্ভি (ujfalvy) ও ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞানী সর অরেল ষ্টাইনের সংগৃহীত নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের জয়েস (T. A. Joyce) কৃত ব্যাখ্যা। কিন্তু দেখা যায় যে জয়েসের নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণের ফলে যে সিদ্ধান্ত অপরিহার্য তাহা গ্রহণ না করিয়া চন্দ তাকলামাকান মরুভূমির প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসীদিগকেই অবৈদিক গোলমুণ্ড আর্যদিগের পূর্বপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যদিও এই অধিবাসীদিগকে একটি নিসম্পর্কিত মনুষ্যগোষ্ঠী বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। এই গোষ্ঠী প্রাচীন পামীরী বা ইরাণী গোষ্ঠী, ইহাই জয়েসের সিদ্ধান্ত। আরেকটা কথার উল্লেখ করা যায়। তাকলামাকান ও লপ মরুভূমির বালুকাস্তূপের নিম্নে প্রোথিত নগর সমূহের যে সকল ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হান আমলের (খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী) বা তাহার কিছু পূর্ববর্তী বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। সে যাহা হউক, জয়েস ও অন্য পণ্ডিতগণ তাকালামাকানের প্রাচীন অধিবাসী ও পামীরের অধিবাসীদিগকে ইরাণী গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মনে করেন। অতি প্রাচীনকালে পূর্ব ইরাণ অঞ্চল হইতে এই গোষ্ঠীর লোক পূর্বদিকে চীনের হোনান ও মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, পণ্ডিতগণ এইরূপ বলেন। এই প্রসঙ্গে রমাপ্রসাদ চন্দের ব্যবহৃত যুক্তিকে অতি দুর্বল মনে না করিয়া উপায় নাই। এই দুর্বলতার কারণ তিনি বৈদিক আর্য ও আবেস্তিক বা ইরাণী আর্য লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার পরে দেখা যাইবে বৈদিক ও আবেস্তিক আর্য যে লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর ছিল ইহার কোন নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই।

এ সম্বন্ধে আর আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে বলা যায় যে গোলমুণ্ড অবৈদিক আর্য বলিয়া যাহাদিগকে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহারা তারিম অববাহিকার কোন স্বতন্ত্র মনুষ্যগোষ্ঠী নহে, তাহাদিগকে, পামীরের আলাই, রোশান, সিগনান, ওয়াখান উপত্যকা, তাসকুরগান, সারিকোল, বাদাকসান, বালখ, হিরাট, বোখারা, খোরাশানের ইরাণী ভাষাভাষী তাজিক নামে পরিচিত যে গোষ্ঠী দেখা যায় তাহাদের সম বা এক গোষ্ঠীয় বলিয়া মনে করা হয়।

সুতরাং গোলমুণ্ড অবৈদিক আর্যদিগকে নিঃসন্দেহে পূর্ব ইরাণীয় আর্যগোষ্ঠী হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যে পামীরী আলপাইন জাতি—সিন্ধুসভ্যতার যুগে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল তাহারা তাজিকদিগের প্রতিনিধি,—ডাঃ হাটনের উপরে উল্লিখিত মত হইতে এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

উপনয়ন

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১

পত্রের বৃত্তান্ত শুনে হরিমতীর মুখ হাসিতে ভরে উঠল। বললেন, তাহলে কালই তো যাত্রা করতে হয়।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, কাল কিংবা পরশু। কতকগুলি জিনিস আবার যোগাড় করে নিয়ে যেতে হবে তো? হোমের জন্ত বেল কাঠ—বেউড় বাঁশ—এক মালসা বালি—

হরিমতী বললেন, ভারি তো—আজই যোগাড় হয়ে যাবে'খন। ভুদেকে বলে দাও না।

ওঁর তর সইছে না আর। শহর দেখার কৌতূহল ঠিক না হলেও—দুদিনের জন্ত ঠাইনাড়া হবার একটি ইচ্ছা মনের মধ্যে বলবতী হয়েছে—পত্রের মর্ম্মার্থ জেনে। যৌবনের প্রান্ত-সীমায় সংসার কায়েমীভাবে কাঁধে চেপেছে। রোজকার রোজ একঘেয়ে কাজ—এক রকমের কথাবার্ত্তা—তাই পারি-পার্শ্বিকে স্বাদহীন লাগে। প্রথম যৌবনে দু'চার দিন বাপের বাড়ি গিয়ে স্থান বদল আর কাজ থেকে অবসর নেবার আনন্দ কিছু বা ভোগ করা যেত। তারপর মাঝে মাঝে দূর দূরান্তরের দেবতার মানত শোধের ব্যাপারে পুরো একটি দিন বৈচিত্র্যে অপরূপ হয়ে উঠত। কখনও কোন মেলায় বা রথ-দোল-দুর্গাপূজা উপলক্ষে একটানা সংসারের স্রোতকে এক বেলার জন্তও হাত দিয়ে ঠেলে একটুখানি সোতা—কিছু বা শব্দ-সমারোহ সঞ্চয় করে মনে খুশির রং ধরত। এখন প্রৌঢ়ত্বের বালু-বেলায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইবার অবসর-টুকু তো গেছেই—মনেও নতুন রং ধরে না। তবু বৈচিত্র্য-লোভী মন কোথাও যাবার জন্ত উস্‌খুস্ করে—নতুন কিছু দেখবার জন্তও আগ্রহ হয়। মানুষের মন তো!

যজ্ঞেশ্বর বললেন, ছেলেদের নিয়ে যাবে তো?

ওমা—ওদের কোথায় রেখে যাব! একে তো বাছারা কোথাও যেতে পায় না—ভাল মন্দ কিছু খেতে পায় না—

যজ্ঞেশ্বর মাঝপথে বাধা দিয়ে বললেন, সংসার দেখবে কে? মেনী?

তা দুটো দিন আর পারবে না? আমাদের দেশ ঘর—তর ভীত তেমন নেই। আর বাড়ির পিঠে দুষণোয়া রয়েছে—জোরে হাই তুললে ওরা তুড়ি দিতে পারে—জান?

সুতরাং বিধবা মেয়ে মেনকাকে রেখে উপনয়নের ফর্দ মাফিক জিনিসগুলি সংগ্রহ করে পরের দিন দুপুরের ট্রেনে যজ্ঞেশ্বর সপরিবারে শহর যাত্রা করলেন।

২

ষ্টেশনে নেমেই দৃষ্টি আটকে যায়—ঠাসাঠাসি বাড়ির স্তূপে। আবার বাড়ির মধ্যেও এক জায়গায় সুস্থির হয়ে দাঁড়াবার যো নেই! সামান্ত পোঁটলা-পুঁটলি আর ছেলে মেয়েদের নিয়ে দাঁড়াতেই ছোট্ট উঠোনটুকু ভর্ত্তি হয়ে গেল। কাজের আগের দিনের বাড়ি—আত্মীয়-কুটুম্ব সমাগমে থই থই করছে। ভোজ রান্নার অতিকায় বাসনকোসনগুলি অনেকখানি জায়গা জুড়ে পড়ে আছে—কেনা আনাজপাতি আর উপনয়নের আবশ্যক জিনিসপত্রে একটা ঘর আকণ্ঠ বোঝাই। ন'মাসে ছ'মাসে নিমন্ত্রণ পেয়ে ভোজ খেয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণের যেমন অবস্থা হয় তেমনি আর কি! তবু বাড়িটা নেহাৎ ছোট নয়। উঠোন সঙ্কীর্ণ বটে, ঊর্দ্ধমুখী; চার তলা পর্য্যন্ত পাল্লা দিয়ে উঠেছে আকাশ ছোঁবার জন্ত। আকাশ ছুঁতে পারে নি বলেই বুঝি চিলে কোঠার তর্জ্জনী উঁচিয়ে মানুষকে নির্দ্দেশ দিচ্ছে—আর একটুখানি তুলে দেবার জন্ত।

উঠোনে দাঁড়িয়ে হরিমতী ও যজ্ঞেশ্বর উপর পানে চাইলেন, অবশ্য বাড়ি দেখবার কৌতূহলে নয়—যদি কোথাও চেনা মুখ নজরে পড়ে এই আশায়। এক তলায় এঘরে ওঘরে যারা রয়েছে—যারা সিঁড়ি দিয়ে নামছে কিংবা উঠছে, যারা কুটনো কুটছে—বাটনা বাটছে—বাসনকোসন ধুচ্ছে কি সোরগোল করছে তাদের কেউ এঁদের পরিচিত নয়। এদের অধিকাংশই সুবেশ;—অলঙ্কারে কাপড় জামায় প্রসাধিতা মেয়েরা ফাল্গুন দিনের অপরাহ্ণে ভেসে-বেড়ান প্রজাপতির মতই বিচিত্র—আর ছেলেরা গঙ্গা ফড়িঙের মত লাফিয়ে লাফিয়ে অন্দর থেকে সদরে যাচ্ছে—সদর থেকে সিঁড়ি টপ্‌কে উপরে উঠছে। ঝি চাকর জাতীয় যারা কাজ করছে তাদের মনোযোগও এই নবাগত দলটির উপর পড়ল না—আশ্চর্য্য! বরং কাজের অসুবিধা হওয়ায় একজন বললে, একটু সরে দাঁড়াও না গা—বাসন ধোয়া জল গায়ে লাগলে তখন বলবে—

কিন্তু সরে দাঁড়াবার জায়গা কোথায়? ঘরে জায়গা নেই, সিঁড়ির মুখে জনস্রোত আটকে দাঁড়ানো চলবে না; সঙ্কীর্ণ বারান্দায় তো অতিকায় বাসনকোসন—জলের বালতি—আর দালানটায় জুতোর রাশি। দাঁড়াবার জায়গা কোথায়!

অবশেষে একজন বর্ষীয়সী বিধবা তাঁদের ঘর থেকে বেরিয়ে হরিমতীকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের তো চিনতে পারছি না বাছা—

আমরা গুপ্তিপাড়া থেকে আসছি।

ও—গিন্নির বাপের বাড়ির লোক তোমরা! তা এখানে দাঁড়িয়ে কেন মা—ওপরে যাও। একেবারে তেতলায় গিন্নি যেখানে আছেন।

অভ্যর্থনা না হোক—তবু ভাল যে এতক্ষণে একটা নির্দ্দেশ পাওয়া গেল। বাহিনী সমেত যজ্ঞেশ্বর আর হরিমতী ঊর্দ্ধমুখী হলেন।

৩

সম্পর্ক এককালে হয়ত নিকটই ছিল, দূরত্ব নিবন্ধন সেটির বাঁধন ক্রমশঃ শিথিল হয়েছে। গুপ্তিপাড়া থেকে কলকাতা এমন বেশী দূর নয়, কিন্তু সম্পদের সপ্তযোজন পাহাড়ের অন্তরালে সে দূরত্বের পরিমাপ চলে না। যাজনিক ব্রাহ্মণের কুটির আর পদস্থ অফিসারের প্রাসাদ জ্যাতির্গোত্রে স্বর্গ মর্ত্য-তলের মতই সম্পর্কহীন। তবু মাঝখানে মর্ত্যের ছোঁয়া একটু-খানি আছে বলেই নিমন্ত্রণপত্রের সূত্রে ওঁদের শহরে আসবার সৌভাগ্য হয়েছে। এই বাড়ির গৃহিণী পিত্রালয় সম্পর্কীয় লোকদের একেবারে বিস্মৃত হন নি। সম্পদের চূড়ায় উঠবার আগে যে ক'টি সিঁড়ি ছিল তা তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে, এবং উপরে উঠেও সেই পুরাতন ধাপগুলির দিকে মাঝে মাঝে তিনি চেয়ে থাকেন। ফলে গ্রামস্থ বা দূরস্থ আত্মীয় স্বজনেরা বাড়ির ক্রিয়াকর্মে নিমন্ত্রিত হন। সকলে না হোক কেউ কেউ আসেন বৈকি।

লাল সিমেন্টের মেঝের পা ছড়িয়ে বসে মেদময়ী গৃহিণী কি হিসেব করছিলেন। তাঁর পাশে ক্যাসবাক্স কোলে করে বসে রয়েছে অলঙ্কারবহুলা একটি গৌরী মেয়ে—আর সামনে ফর্দ হাতে দাঁড়িয়ে আছে একটি সুবেশ যুবক। যজ্ঞেশ্বর এদের চেনেন বলেই সঙ্কোচ করলেন না, সরাসরি ঘরে ঢুকে গৃহিণীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

কে—যজ্ঞ? কখন এলি ভাই? এই মাত্তর? তা বউকে কি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে করে আনতে নেই।

ওরাও এসেছে দিদি।

দিদি ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন—বারান্দা উপচে পড়ছে। যজ্ঞেশ্বর কাউকে-না-আনার অনুযোগ করবার সুযোগ দেন নি। অনুযোগ না করতে পেলে মানুষের স্বভাবের অঙ্গহানি হয় বুঝি—আর সেই কারণে গাছের-মাথায়-জড়িয়ে-থাকা কুয়াশায় সবুজ পাতা কেমন ধূসর ফিকে বোধ হয়। তবু তিনি মুখ ফিরিয়ে হাসলেন।

এস ভাই এস—বস।

হরিমতী পায়ের ধুলো নিলে—ছেলে মেয়েরাও মায়ের দেখাদেখি পা ছুঁয়ে ভিড় করে দাঁড়াল ঘরের মধ্যে। মাথার ওপর পাখা চলছে বন বন করে, তবু মনে হল—বাইরের বাতাসের সঙ্গে ঘরের বাতাসও বুঝি অসহযোগ করলে।

ক্যাস বাক্স কোলে করে বসেছিল যে মেয়েটি সে হাঁটু মুড়ে উঠবার উপক্রম করলে—ছেলেটিও ফর্দখানি গুটিয়ে পকেটে রাখলে। গৃহিণী ওদের মনোভাব বুঝে গলা ছেড়ে ডাকলেন, ও মনোর মা—মনোর মা। মাগী মরেছে নাকি?

ডেকে দিচ্ছি। বলে ছেলেটি ভিড় ঠেলে বাইরে এল।

মনোর মা না আসা পর্য্যন্ত গৃহিণী রাগে গজ গজ করতে লাগলেন। এরা যে ভিড় করে ঘরের মধ্যে রয়েছে—সেদিকে বুঝি তাঁর নজর নেই, কিম্বা বাপের বাড়ির সম্বন্ধে আরও বহু কথা জিজ্ঞাসা করবার ছিল—তাও ভুলে গেছেন। হরিমতী ছোট মেয়েটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কোথায় বা যাবেন—মানুষের মত—ঘরগুলিও অপরিচিত অবিনয়ী।

মনোর মা আসতেই ফেটে পড়লেন গৃহিণী, বলি নবাব-নন্দিনীর কি রাজকার্য্য হচ্ছিল। দাসী বাঁদীর কথা—

মনোর মা নাকে কাঁদতে আরম্ভ করলে, আমার কপালের দোষ মা। ভাবছু চড়চড়ে রোদে বেলকাঠগুলো শুকো গেছে—এই বেলা তুলে ফেলি। ছাদের ওপর থেকে হাঁক ডাক সেঁদয় বরে?

আচ্ছা—আচ্ছা—এখন বক্তৃতা রেখে এদের বসবার জায়গা করে দে দিকি। দোতলার কলঘরের পাশে—

ওমা—সেখানে যে কুটুম রয়েছেন। কাল হাজারীবাগ থেকে এল—

ও—তা কোথায় এদের জায়গা দিই—বলত। গরম কাল, রাত্তিরে না হয় ছাদে শোবে'খন। দিনের বেলায় জিনিসটা পত্তরটা—

আর কোন ঘর তো খালি নেই মা। তোমার পাঁচ মেয়ে- তিন নাতনী সবাই এয়েছেন। একটা ঘর তো দক্তি ঘর হবে। আর নীচের রান্না ভাঁড়ার বৈঠকখানা। বউদের ঘরগুলো আর তোমার ঘরটা তো দেয়া চলবে না। থাকে একটা ঘর। তা এসোজন বসোজন--আছে--কোন কুটুম হুট করে কোথে এসবেন—

গৃহিণী বললেন, যে ঘরে ঘুঁটে রাখা হয়—সেটায় কে আছে?

ওমা—ঘুঁটে কি কম তোমার। ঘর বোঝাই।

না-না-সরিয়ে ফেল ওসব। গরম কাল এখন বিষ্টি হবে না। যদিই হয়—ছাদের একধারে সাজিয়ে ত্রেপল ঢাকা দিয়ে রাখগে। তাই বলে কুটুমেরা ঘর পাবে না—এ কেমন কথা?

মনোর মা দলটির দিকে অপ্রসন্ন কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বললে,—আসুন আপনারা—ছাদে বসবেন—আমি ত্যাতক্ষণে মুক্ত করে ফেলি জায়গাটা।

গৃহিণী বললেন, তোর যদি একটু আক্কেল থাকে মনোর মা। একখানা মাদুর নিয়ে যা—পেতে দে ছাদে। বালতি করে জল দিস পা ধোবার জন্যে, আর—

বারান্দা থেকে একটা আধপুরানো মাদুর টেনে নিয়ে মনোর মা বললে, সে আর বলতে হবে নি মা—কুটুমকে আদর যত্ন করতে হয় কি করে...আজই না হয় কপাল পুড়েছে...আসুন গো আপনারা।

৪

আকাশের দিকে আঙুল-উঁচানো চিলে কোঠার দেওয়াল ঘেঁষে বসলেন হরিমতী। ছেলেরা কেউ বসলে—কেউ বা

জানলের বুক দিয়ে ঝুঁকে পড়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। ঝিরঝিরে বাতাসে দেহের ঘাম শুকিয়ে যেতেই শরীরটা ঠাণ্ডা বোধ হ'ল।

হরিমতী জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁগা—গিন্নির ক'টি ছেলে?

পাঁচটি। যজ্ঞেশ্বর উত্তর দিলেন।

সবাই উপার্জ্জন করে তো?

না হলে সংসারের আর এমন শ্রী। বড়টি উকিল—মেজটি ইঞ্জিনিয়র—সেজ ডাক্তার—ন কোন আপিসে ভাল চাকরি করে—আর ছোটটি বুঝি এম-এ পড়ছে।

হরিমতী উজ্জ্বলমুখে বললেন, আহা—তা হোক ভগবান যাকে দেন—সব দিক দিয়েই ভরিয়ে দেন। সবাইর বিয়ে হয়েছে তো?

ছোটটির এখনও হয় নি। কেন—চিঠির ফাইলে ওদের বিয়ের নেমন্তন্ন চিঠিগুলো গাঁথা আছে দেখ নি? কোন ক্রিয়া-কর্ম্মে আমাকে জানাতে ভুলতেন না রঘু বাবু—আহা কি মানুষই ছিলেন!

গিন্নিও খুব ভাল। কেমন হাসি-হাসি মুখ। আমাদের কষ্ট হবে বলে ঘুঁটেগুলো বার করে দিতে বললেন।

যজ্ঞেশ্বর কথা কইলেন না। সত্যি বলতে কি এরকম অভ্যর্থনা উনি প্রত্যাশা করেন নি। যখনই যে কোন কাজে উনি এসেছেন—প্রচুর না হোক পরিমিত আদর-আপ্যায়ন পেয়েছেন। সংসারের মধ্যে ওঁর ঠাঁই হয়েছে আর সংসারের সুখ দুঃখের কাহিনীর আদান-প্রদানে বেশ সহজ হয়ে বাস করবার সুযোগ লাভ করেছেন।

স্বর্গীয় কর্ত্তার তুলনা হয় না—একথা একশো বার স্বীকার করেন যজ্ঞেশ্বর। এমন কি কর্ত্তার শ্রাদ্ধে যখন আসেন—তখনও সংসার থেকে হাদে নির্ব্বাসিত হন নি। এ কথা সত্য—ছেলে মেয়ে নাতি নাতিনীতে ঘরগুলি ক্রমশঃ ভরে উঠছে—বাড়তি লোকের মাথা গুঁজবার স্থান সঙ্কুলান হওয়ার কথা নয়। স্থান-সঙ্কুলান নাই যদি হয় তো ঘটা করে নিমন্ত্রণ করার অর্থ কি? তিনি একলা হলে কথা ছিল না। যেখানে হোক শুয়ে বসে—যা কিছু হোক খেয়ে কাজের বাড়িতে খেটে খুটে—হৈ চৈ করে কাটিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু ছেলে মেয়ে পরিবার ওরা তো তেমন ভাবে স্রোতে কুটোর মত ভেসে ভেসে বেড়াতে পারবে না। ওদের ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে—সময়ে অসময়ে ঘুম আছে—নানান রকমের আব্দার অভিযোগ আছে—সংসার-বহির্ভূত এই জায়গাটিতে বাস করে এইসব ঠেকানো রীতিমত দুষ্কর।

হরিমতীর কোলের ছেলেটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। বুঝতে পারলেন খিদে পেয়েছে। এমন সময় বড়রাও শহর-দেখা শেষ করে—মায়ের চারদিক ঘিরে বসল। মা বুঝলেন—ওদের নীরব ভাষা। ট্রেনের রাস্তা কমখানি নয়। নতুন নতুন দৃশ্য দেখার আনন্দ যতই থাকুক—ক্ষুধা তৃষ্ণা যথাসময়ে তাদের দাবি জানাবেই। বরং ট্রেনে আসতে আসতে ওদের দাবিটা অতিরিক্ত বলে বোধ হয়। হরিমতীর পর্য্যন্ত মনে হচ্ছে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পেলে মন্দ হ'ত না।

ঘুঁটে সরাতে সরাতে মনোর মা একবার এদিকে এল। বললে, হাত পা গুটো বসে রইলে কেন মা—উই হোথা ট্যাঙ্কে জল রয়েছে—মগ ডুব্যে বেশ করে হাত পা মুখ ধুয়ে নাও—শরীল সুস্থ হোক।

বাহিনী সমেত হরিমতী ট্যাঙ্কের দিকে অগ্রসর হলেন। ছেলেরা কেউ লাফিয়ে উঠল—ট্যাঙ্কের মাথায় কেউ বা—ওর গায়ে হাত চাপড়ে বাজনার সুর তুললে—কেউ কেউ জলে-ভাসা বলটাকে চেপে ধরে ছড় ছড়াৎ জলের শব্দ শুনে চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে।

মনোর মা মুখ ফিরিয়ে বললে, ওমা একি কাণ্ড গো, ট্যাঙ্ক দফা গয়া করবে নাকি! অমন দস্যিবিত্তি করলে—মানুষ ক্ষ্যাপা হয়ে যায়—তার ট্যাঙ্ক! নাব—নাব শীগ্‌গির। গিন্নি দেখলে আমাকে আস্ত রাখবেক নি—মাইনের ট্যাকা থে যদি না কাটে তো—

হুড়মুড় করে সবাই নেমে পড়লে।

মনোর মা বললে—মগে করে করে জল নেসে হাত পা ধোও। ধুয়ে বসগে উই—হোথায়।

৫

হাত পা মুখ ধুয়ে শরীর ঠাণ্ডা হ'ল—উগ্র হয়ে উঠল পেটের ক্ষুধা। আকাশ আর শহর পুরানো হয়ে গেছে কিংবা কাক দেখিয়ে ছোটদের আর ভুলিয়ে রাখা সম্ভব নয়; বড়রাও খুঁত খুঁতুনির রূপ স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করছে—মা খিদে পেয়েছে। হরিমতীর মনে হচ্ছে, একটুখানি গুড়—আর ঠাণ্ডা জল পেলে এদের খানিকক্ষণের জন্ম শান্ত করা যেত। কিন্তু কাকেই বা বলেন সে কথা!

মনোর মার ভঙ্গি তেমন সান্ত্বনাদায়ক নয়। মনিব বাড়িতে কর্ত্তব্যপরায়ণা বলে তার খ্যাতি আছে বলে যে কাজটি ও ধরেছে সেটি শেষ না করে কর্ম্মান্তরে মনোযোগ দেবে না বুঝি। ঘর ঠাসা রয়েছে ঘুঁটেতে—সবগুলি বার করতে আরও কত-ক্ষণ লাগবে কে জানে!

উপায় না দেখে যজ্ঞেশ্বরকে বললেন, একবার নীচের নেমে দেখ না—এক ঘটি জল যদি আনতে পার।

যজ্ঞেশ্বর মনে মনে যথেষ্ট উষ্ণ হয়ে উঠছিলেন। এই কথায় উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, হুঁ— কাজের বাড়িতে ঘটি যোগাড় করা সোজা নাকি। জল বললেই জল পাওয়া যায়? যত সব ঝঞ্ঝাট।

হরিমতী মরমে মরে গেলেন। সত্যি ঝঞ্ঝাট তিনিই বাধিয়েছেন। কোন বারই বিদেশে যাবার দুর্ম্মতি তাঁর হয় না—এবার কেন যে হ'ল! সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল—তাঁর ইচ্ছাকে বলবতী করার মধ্যে যজ্ঞেশ্বরের সহযোগিতা আছে

বৈকি। প্রতি নিমন্ত্রণের শেষে বাড়ি ফিরে যে সমারোহ শহরের ও ভোজবাড়ির—যে আদর-আপ্যায়নের—যে ভূরি-ভোজের—যে লোক-সমাগমের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন—তা সহজে মন থেকে মুছে যাবার নয়। যেমন ছেলেবেলায় শোনা রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী মনের কোণে অক্ষয় হয়ে আছে—আর প্রতিদিন আকর্ষণ করে সেই পুণ্য তীর্থ-ভূমির দিকে। হয়ত তীর্থযাত্রার স্বপ্ন সফল হবে না কোন দিন—তবু তাদের আকর্ষণ শিথিল হয় না—এক মুহূর্তের জন্যও। তবে এ সব কথা বলে লাভ নেই; দায় দোষ যারই হোক—একবার এসে পড়েছেন যখন—মুখ বুজে সবই সয়ে যেতে হবে। নিজের বাড়ি হলে ঘ্যান ঘ্যানানির জন্য ছেলেদের দুটো চড়চাপড় দিতে পারতেন—এখানে সে উপায় নেই।

যজ্ঞেশ্বর বুঝলেন—এদের কোন দোষ নেই। এদের ব'কে—মেরে কিংবা হরিমতীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিলেই ব্যাপারটির আশু নিষ্পত্তি হবে না। একটা মিষ্টি আর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল—তাঁর ইচ্ছাকেও কি উদ্দীপ্ত করে তুলছে না? তিনি গাত্রোত্থান করলেন।

এদিকে যজ্ঞেশ্বরের ফিরে আসতে যত দেরী হচ্ছে—ছেলে-রাও স্বর উচ্চগ্রামে তুলছে। এই এল—এই এল করে আশ্বাস দিয়েও যখন তাদের বর্দ্ধিত কোলাহল রোধ করা গেল না—তখন হরিমতী যে ক'টাকে হাতের নাগালে পেলেন—দুমদাম করে পিটিয়ে দিলেন।

মর—মর তোরা—আপদ যা।

মনোর মা ঘুঁটে হাতে এদিকে এগিয়ে এসে চোখ উল্টে বললে, ওমা কেমন পোয়াতি গা আপনি—ছেলেগুলোকে না-হক পিট্‌ছেন!

হরিমতী রাগ করে বললেন, কি করব—জল খাব বলে সেই যে বায়না ধরেছে—

আহা বাছারে! জিভে তালুতে সহানুভূতিসূচক চুক্ চুক্ শব্দ করে মনোর মা বললে, এই আর ক'খান ঘুঁটে সইয়েই—এনে দিচ্ছি জল। আহা!

হরিমতী উঁকি মেরে দেখলেন—তখনও আধ ঘর ঘুঁটে রয়েছে—সরাতে অনেক সময় যাবে। বললেন, আমি সরাব ঘুঁটে?

মনোর মা আঁতকে উঠে বললে, ওমা, কুটুম মানুষ—আপনি সরাবে কি গো! আমিই এই কষ্ট করে…বাতের ব্যথায় হাত পা যেন আড়ষ্ট তাই…। আহা—হা—আবার আপনি হাত লাগালে? তা না গিন্নী যেন জানতে না পারে। জানতে পারলে আমার পেটে পা দিয়ে দেবে না।

এমন সময় নীচে থেকে গিন্নীর গলা শোনা গেল, মনোর মা—ও মনোর মা—বলি মরে গেলি নাকি!

মনোর মা ত্রস্তে ঘুঁটে ফেলে হাঁক দিলে, যাই মা।

খানিক পরে সে ফিরে এসে বললে, এস মা নাবোর এস—গিন্নী জল খেতে ডাকতেছে তোমাদের। ওমা—সব ঘুঁটে যে সইয়ে রেখেছ? যাও—মা—যাও, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে দিচ্ছি আমি।

৬

এক-গ্রাস আনন্দ-নাড়ু আঁচলে করে হরিমতী ছাদে এলেন। ডাকলেন ছেলেদের, ওরে—খ্যাঁদা—গুটকে—তোতন—পুঁটি ভোঁদড়—মিণ্টু—টুবলি—গুপলু—হাবা—টুনু—ইদিকে আয়, খাবার খেয়ে যা।

যজ্ঞেশ্বর এক কলসী জল নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এই সময়ে উপরে উঠলেন। গোটা-দুই মাটির গ্লাস আর কলসীটা ছাদে নামিয়ে দিয়ে বললেন, জল আনা কি কম ঝকমারি! কলে এক ফোঁটা জল নেই—সেই পথের টিউবওয়েল থেকে—

হরিমতী ততক্ষণে ছেলে মেয়েদের ব্যূহবদ্ধ হয়ে খাবার বণ্টন করে দিচ্ছেন। বললেন—তুমিও দুটো নাড়ু নিয়ে একটু জল খাও।

নাড়ুতে কামড় দিয়ে যজ্ঞেশ্বর আঁতকে উঠলেন, ওরে বাবা—এযে লোহার কলাই—এর নাম আনন্দ-নাড়ু!

চিবোও—মিষ্টি লাগাবে'খন।

তুমি চিবোও। বয়স আমার কম নয়—দাঁতের গোড়া একেই তো আল্‌গা মেরে গেছে—

বড় ছেলে খাঁদা বললে—রসগোল্লা আনলে না কেন মা?

রসগোল্লা! সে কাল খাবি পেট ভরে।

খাঁদা বললে, বাঃ রে, ভাঁড়ারে এক গামলা রয়েছে দেখ-লাম। পিসিমা তো একটা বউকে আর তার ছেলেদের খেতে দিলেন।

হরিমতী রেগে উঠলেন, দিয়েছেন—বেশ করেছেন! পরের বাড়ি এসে আদেখ্‌লেপনা করিস—কোন্ লজ্জায় খ্যাঁদা! কখনও কি খাস্‌নি রসগোল্লা?

তাড়া খেয়ে খাঁদা বললে, এই মিণ্টু—দেখবি একটা মজা? উই যে কাকটা বসে রয়েছে না চিলের ছাদে, ওকে বাঁটুল মারি দেখ্। বলে ঠাঁই করে একটা নাড়ু ছুড়ে দিলে সেদিকে। কাকটা কা—কা করে উড়ে গেল।

যজ্ঞেশ্বর বললেন, ছেলেটা মন্দ বলেছে কি! কতকগুলো শুকনো কট্‌কটে নাড়ু না দিয়ে—একটা করে রসগোল্লাও যদি দিত—

চুপ কর—মনোর মা আসছে।

মনোর মা নেহাৎ হাবাগোবা নয়। এ বাড়ির হালচাল আর কুটুম সাক্ষাতের আদর যত্নের বহর দেখে বুঝে নিয়েছে কে কোন্ দরের লোক। ছাদে উঠে একখানা ছেঁড়া ময়লা কাপড় হরিমতীর দিকে ফেলে দিয়ে বললে,—ঘরটা মুছে নিও মা—আমার আবার নাবোর কাজ করতে হবে। তোমাদেরই তো বাড়িঘর—দেখে শুনে নিও মা। আর উই যে কোণে তের-পল রয়েছে ওটা ঘুঁটেগুলোর ওপর চাপা দিও। যদি একখানা

ঘুঁটে তাতে তো অসুখ করবে গিন্নী—মিষ্টি ওনার সর্ব্বত্রই রয়েছে কিনা।

ঘর মোছা আর ঘুটে ঢাকা হবা মাত্র মনোর মা ফিরে এসে বললে—একবার নাবোয় এস মা—গিন্নী ডাকছেন। বলছেন —কুটনোগুলো যদি কুটে দেয় সব্বাই মিলে—তো উবগার হয়। এস মা—

রাত দুটো পর্য্যন্ত কুটনো কুটে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সকলের অনুরোধে ভাতের থালাটা টেনে নিয়ে বসলেন বটে —রুচি হ'ল না আহারে। কোন্ বিকেলে রান্না তরকারি—ঘেঁটে ঘেঁটে বিস্বাদ আর টক হয়ে গেছে। ডালগুলো দলা পাকানো, আর ডালের বর্ণ বা আকারে বুঝা দুষ্কর কি জাতীয় জিনিস ওটা। মাছ নাকি ফুরিয়ে গেছে—মিষ্টি একটা করে দেবার কথা ছিল, কিন্তু রাত বেশী হয়েছে বলে ভাঁড়ার বন্ধ করে গিন্নী গেছেন শুতে। তাঁকে জাগিয়ে বরাদ্দের মিষ্টি বার করে নেওয়া মানে···

মনোর মা চোখ কপালে তুলে বললে, তার চেয়ে পেটে একটা কিল মেরে মিষ্টি খেনু বলে মনকে প্রবোধ দেয়া ঢের ভাল মা। খাওয়ার পাট এই পজ্জন্ত থাক—একটু গড়িয়ে নি চল। কাল আবার গতর জল করে খাটতে হবে—নইলে লুচির আশা নবডঙ্কা। উচ্ছিষ্ট বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে সে হাসতে হাসতে উঠে পড়ল।

হরিমতী ছাদে এসে দেখলেন, সবাই সার বেঁধে ঘুমুচ্ছে। কারো মাদুর আছে—কেউ বা লোটাচ্ছে ধুলোয়। বালিশ মস্ত বড় বিলাস বলেই কারো ত্রিসীমাতে নেই। কাজের চাপে পড়ে খোঁজ নেওয়া হয়নি এরা খেয়েছে কিনা। না খেলে কি আর অকাতরে ঘুমুচ্ছে সব।

কৃষ্ণপক্ষ-ঘেঁসা তিথি—মাঝরাতে চাঁদ উঠেছে। মেটে মেটে রং জ্যোৎস্নার। ওদের কারো মুখে—কারো বা পিঠে পড়েছে সেই রং। অদ্ভুত দেখাচ্ছে মানুষগুলিকে। ওরা যেন হরিমতীর কেউ নয়। এই অপরিচিত বাড়ির মতই নিরাসক্ত নির্ব্বিকার। কলকাতার বাড়িগুলি এমনি বুঝি। মানুষকে আশ্রয় দেয়—ভালবাসে না।

৭

উপনয়নের প্রচণ্ড একটি ঢেউ এ বাড়ির গায়ে এসে লাগল। এর নাম শুভকর্ম্ম—উৎসব। ছেলে বুড়ো-স্ত্রী-পুরুষ সবাই হয়ে উঠল চঞ্চল। সবাই একসঙ্গে চাইছে কাজ করতে—একসঙ্গে চেঁচাতে—একই সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে এধার ওধার ঘুরতে। পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্রে আর হোমের ধোঁয়ায় বাড়িটা গম গম করছে। সেই সঙ্গে মিশেছে ভিয়ানশালার ঘিয়ের গন্ধ আর যজ্ঞিশালার মাছের গন্ধ। কলতলার বাসনের ঝন্ ঝন্ ঝম্ ঝম্ ঝমর ঝমর শব্দের সঙ্গে তরকারি সাঁতলানোর শব্দ মিশে মনে হচ্ছে প্ল্যাটফর্মের সামনে এসে রেলের এঞ্জিনটা স্টীম ছাড়ছে অনর্গল। কাল রাতে মনে হয়েছিল—এখানকার বাড়ির কোন ভাষা নেই—সে সব বিষয়ে উদাসীন নির্ব্বিকার; কিন্তু এই মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে উৎসবকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করবার জন্ত এ-ও চেঁচাতে পারে অপরিমিত।

উপর থেকে হাঁকছেন একজন গিন্নী গোছের মহিলা:—ওগো কে কে ভিক্ষে দেবেন—আসুন। হোম শেষ হয়েছে—ব্রহ্মচারীকে কে ভিক্ষে দেবেন আসুন।

মানুষের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে সিঁড়িতে উঠল ঢেউ। নানা বর্ণের—নানা গোত্রের ও বিচিত্র বসনের মেয়ে পুরুষের চাপ উঠোন থেকে দেখলে ঢেউ বলেই মনে হবে। কলকাতা শহরের মানুষ বুঝি মিলেছে এখানে। খুট্ খুট্ খটাস—অগণিত জুতোর শব্দ উঠছে। নানা প্রকার অস্ফুট আলাপ আর নানা জাতীয় পুষ্পসার সৌরভ উঠোন থেকে সিঁড়ি—সিঁড়ি থেকে দোতলার ঘর আর সেখান থেকে বাড়িটার সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। গায়ের ভিতর কেমন যেন পাক দিচ্ছে—তবু হরিমতী অসঙ্কোচে আঁচলের গেরোটা একবার ডান হাত দিয়ে টিপে ধরে সেই স্রোতে গা ঢেলে দিলেন।

মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকবসনপরিহিত কৃশতনু গৌরবর্ণের ছেলেটি দণ্ড আর গৈরিক ঝুলি নিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। নির্ব্বাপিত হোমাগ্নি থেকে তখনও সামান্ত ধোঁয়া উঠছে আর গাওয়া ঘিয়ের সুগন্ধে ঘরের বাতাস মন্থর। ঘরের এক কোণে সাজানো রয়েছে মাঙ্গলিক দ্রব্য—নৈবেদ্য গামছা কাপড়। তেলতেলে পিতলের বালতি—হরিমতী গুণলেন কুড়িটাই হবে। আলনায় রয়েছে গরদের চেলি—কম্বলের ওপর রয়েছে টোপর ছাতা—এসব রাজবেশ নেবার সময় দরকার হবে।

ঘরের মধ্যে একখানি বড় আয়না আর অনেক রকমের ছবি—আলোর যে শেডটা ঝুলছে তা-ও খানিকক্ষণ চেয়ে দেখবার মত। তা ছাড়া ঘরের মধ্যে স্তরে স্তরে জমে উঠছে ভিক্ষার জিনিস। যেন মনোহারী দোকান সাজানো হয়েছে। একখানি ফুলকাটা মিনে করা রূপোর থালে জমছে নোট আর টাকা।

বহুদিন আগের একটা ছবি মনের কোণে ভেসে উঠল হরিমতীর। তখন তিনি বালিকা মাত্র। পয়লা বৈশাখ ভগবতীযাত্রার দিন নতুন খাতা মহরতের নিমন্ত্রণে বাপের সঙ্গে এ-দোকান সে-দোকান ঘুরতেন। ফরসা চাদর বিছিয়ে তার ওপর ধূপ-চন্দন-শোভিত কাঠের বাক্সটি রেখে ফরসা জামা কাপড় পরে বসতেন দোকানের মুহুরি। দোকানী টাকাটি নিয়ে নাম হেঁকে হেঁকে ফেলতেন একখানা বড় থালায় (সেটা পিতলের কি কাঁসার ঠিক মনে নেই)। আর মুহুরি লাল খেরো-বাঁধানো খাতাটিতে জমার অঙ্কপাত করতেন। তারপর হাতের বাক্সটাতে জমে উঠত মিঠাই বা ঐ জাতীয় কিছু মিষ্টি। কোথাও বা জলযোগ সমাধা করতে হত। থালায় ওপর নোট ও টাকা জমে উঠতে দেখে হরিমতীর স্মৃতি পুরানো ও হারানো

দিনের মধ্যে পাক খেয়ে ফিরতে লাগল। গেরো-বাঁধানো খাতাটা শুধু নেই—কিন্তু গেরুয়া ঝুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হাসিখুশী ভরা একটি ছেলে। ব্রহ্মচারী ছেলে—মুণ্ডিতমস্তক কানে বীরবৌলি, গলায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত, পায়ে খোলো দেওয়া খড়ম, মুখে সংস্কৃত শব্দ—'ভবতি ভিক্ষাং দেহি'। এই কিছুক্ষণ আগে শাস্ত্রবিধি-অনুসারে সে দ্বিজত্বে উন্নীত হয়েছে—নতুন জন্ম বলতে পারা যায়। তিন রাত্রি, তিন দিন এই দণ্ডী-ঘরে সূর্য্য-বঞ্চিত হয়ে আরও অনেক অনুশাসন মেনে নিয়ে হবিষ্য ও ফলমূলাহারে তাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করতে হবে। সর্ব্বপ্রকার সুখবিলাসসমৃদ্ধ সৌধের একটি সুন্দরতম কক্ষে পুরাকালীন উপনয়ন-যজ্ঞের অনুবর্ত্তন…জানালা দিয়ে দেখতে লাগলেন হরিমতী।

ছেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন গৃহিণী। ছেলের হাত থেকে নিয়ে তিনি গালচের ওপর সাজিয়ে রাখছিলেন ভিক্ষা-উপহারের সামগ্রীগুলি। ঝুলিটা ভারি হোক আর না হোক একজন ভিক্ষা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে জিনিস থালায় বা গালচের ওপর জমা হচ্ছে। হরিমতীর বার বার মনে হচ্ছে—লাল গেরো-বাঁধানো খাতাটি নেই শুধু—জমার ঘরে অঙ্ক পড়ছে নির্ভুল। মুহুরী করেছেন বেশ বদল।

ক্রমশঃ ভিড় কমে এল—জানালা থেকে সরে ঘরের সামনে দাঁড়াতে সাহস হ'ল না হরিমতীর। তাঁর অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে ও গ্রাম্যরীতিপুষ্ট মনে কোথায় সংশয় জেগেছে, জেগেছে লজ্জা। নতুন ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত সংশয় আর লজ্জার ভারে চাপা পড়ে গেছে। এ একটা উৎসবের ব্যাপার—উপহারে তার ছাপ স্পষ্ট; লজ্জা সংশয় কাটিয়ে উঠা দুষ্কর। অঞ্চলগ্রন্থিচ্যুত একটি টাকা ঘর্ম্মসিক্ত হাতের মুঠোয় ক্রমশঃই তেতে উঠছে।

ভিড় সরে গেছে। এ বাড়ির কয়েকটি মেয়ে ও বউ এসে দাঁড়িয়েছেন ঘরের মধ্যে। ওঁদের মুখে চোখে খুশীর ছটা। উপহারের জিনিসগুলি গালচের উপর থেকে তুলে তুলে দেখছে ওরা—প্রশংসা করছে, হিসাব-নিকাশও হচ্ছে সেই সঙ্গে।

এই ক্যামেরাটা কে দিলে মা? বাঃ কি সুন্দর সেফার্সের কলমটা! এভারসার্প আর পার্কারের জিনিসটাই বা মন্দ কি! রিষ্টওয়াচটা তুমি দিলে বুঝি মা? মাভি কিনা! আংটির তো দেখছি বৃন্দাবন! বারটা না চোদ্দটা? আবার বইও একরাশ দিয়েছে কারা। টাকা গুনেছ?

একটি মেয়ে হেঁট হয়ে টাকা গুনতে লাগল। গোনা শেষ হলে সে বললে, একশ' নিরেনব্বই আর একটি হলেই দু'শ হয়। তামার কোশাকুশি বুঝি বড়দি দিলে? মাগো, কি বুড়ুটে ধরণ! আংটি দিয়েছিলে—দিয়েছিলে—ওসব আবার কি হবে? দণ্ডী-ঘর থেকে বেরিয়ে ছেলে সন্ধ্যে আহ্নিক যা করবে!

তুই চুপ কর দিকি। মা সস্নেহ ধমক দিলেন। ওগুলো এক পাশে সাজিয়ে রাখ। রাত্রে অনেকে আসবেন খেতে—অনেকে ভিক্ষে দেবেন।

মেয়েটি ধমক খেয়ে হেসে উঠল। বললে, তা যাই বল মা—নাতির পৈতে দেওয়ায় লাভ আছে। যা জিনিস পেয়েছ তাতে আর একটা পৈতে দেওয়া চলে।

ওর শিশু-সুলভ মন্তব্যে সবাই হেসে উঠল শব্দ করে।

জানালা থেকে সরে আসছিলেন হরিমতী—গৃহিণীও সেই সময় ঘর থেকে বার হয়ে এলেন। সামনা-সামনি পড়ে গেলেন।

গৃহিণী হাসিমুখে বললেন, ভিক্ষে দেবে বউ? তা বেশ তো—যাও ঘরের মধ্যে। এতখানি বেলা হয়েছে—ভিক্ষে না দিয়ে তো জল খেতে পাবে না, যাও, ভিক্ষে দিয়ে এস।

হরিমতীর মুখ চোখ তখন অত্যন্ত শুকনো বোধ হচ্ছে—কানের গোড়ায় জ্বালা তো করছেই—আর ভোঁ ভোঁ শব্দ হচ্ছে—গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোন রকমে টাকাটা তিনি ব্রহ্মচারীর প্রসারিত ঝুলিতে ফেলে দিলেন। তারপর আর চেয়ে দেখলেন না কোন দিকে, শুধু দেহটাকে টেনে কোনক্রমে তেতালার সিঁড়িটার কাছে এসে বসে পড়লেন। সিঁড়ির ধাপের উপর একটা জলপূর্ণ ঘটি বসানো ছিল। হরিমতী সেটি তুলে নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে জল পান করতে লাগলেন।

ইয়োরোপের শরৎ

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

বাতায়ন পথে আসে সায়াহ্নের শেষ রশ্মি রেখা
কম্পিত বিহঙ্গসম মৃদু শান্ত ভীরু; যায় দেখা
নিয়ে পথে পদচারী ক্রীড়াক্লান্তা বালিকার হাসি
দিনান্তের অন্তরাগে ভরা। তরুর ঐশ্বর্য্যরাশি
ঝরে পড়ে উদাস বিধুরে; ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর
দিনগুলি রেখে যায় আনমনে সুদীর্ঘ খাক্ষর
দীন কক্ষকোণে মোর; নগরীর দূর কোলাহল
অস্পষ্ট আসিছে ভেসে তরীতলে নীরে ছল ছল
সুদূর তরঙ্গসম; অলক্ষিতে তরল আঁধার
ছড়াইছে পথ 'পরে; অতীতের সুখস্মৃতি তার
ব্যাকুল নিঃশ্বাস ফেলি' ঘুরিছে আমারি চারি পাশ
দিগন্তের বর্ণম্লানিমায়, চিন্তাহীন এ প্রবাসে
কত অতীতের সুখ, কত প্রীতি, বিস্ময়ের দান
শরতের নভতলে লভিছে করুণ অবসান।



মাটির কথা লেখা হয় ভূগোলে, দেশের ও সময়ের কথা লেখা হয় ইতিহাসে, মানুষ প্রকাশিত হলে দেশের প্রকাশ। ইতিহাস কিংবা ভূগোলে রচনা থাকে না। শুধু ঘটনা ও রটনা থাকে। মানুষ যা রচনা করে ও সৃষ্টি করে, তার প্রকাশেই দেশেরও প্রকাশ। শিল্প, সাহিত্য, কবিতা ও বিজ্ঞান এই সব এক এক দেশে এক এক সময়ের বিচিত্র ভাবের সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়। আমরা সাধারণতঃ যা কিছু চোখে দেখি, মনের উপর তার যে ছায়া পড়ে তাকেই ছবি বলি। যা কিছু কানে শুনি তাকে মনে মনে দেখি। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই সবগুলোকে নিয়ে অল্প কথায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তবে সকল অনুভূতিই একই কোঠায় বাঁধা। সুতরাং এই দেখা-শোনার মধ্যে যে ছবি গড়ে উঠে তাকে প্রকাশ করাই হ'ল তার অভিব্যক্তির ছবি। শব্দেও চলে, নিঃশব্দেও হয়। শব্দকে যা আশ্রয় করে সে ভাষা, নিঃশব্দে যা চলে সে ছবি। ভাষার সুর নিয়ে যে রূপ পায় সে মনের তরঙ্গই শুধু রচনা করে না, সে আসলে ছবি গড়ে। তাকেই বলা হয় গান।

যে কথা বলতে চাই এবং যা দেখাতে চাই, তার বিষয়বস্তুর প্রকাশ-ভঙ্গীই হচ্ছে তার 'আর্ট'। প্রাচীন কালের বিখ্যাত শিল্পী অথবা কবিরা যে নিদর্শন রেখে অমর হয়েছেন, তার প্রকাশ-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন যদি কোন দিন না হতে দেওয়া হ'ত, তবে আজ সাহিত্য কিংবা শিল্পের অগ্রগতি থেমে যেত। কারণ, আধুনিক কালের কোন কবি কিংবা লেখক পুরনো লেখার নকল না করে যদি নূতন ভাবে প্রকাশ করেই থাকেন তাতে তাঁদের সৃষ্টির মাধুর্য্য কিছুমাত্র কমে নাই। শিল্পী বিভিন্ন রকমে চিরকাল ধরে একই কথাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করে আসছেন।

বিজ্ঞানের দিক থেকেও এ কথা বলা চলে যে, বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির যে সব নিয়ম আবিষ্কার করেছেন সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা তাঁদের কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করেন এবং তার মধ্যেই রয়েছে তাঁদের সৃষ্টির পথ। সেইরূপ সকল



বনের ভিতর গরীবের ঘর

ক্ষেত্রেই শিল্পে সত্যের স্পর্শ থাকা নিতান্তই প্রয়োজন। অবশ্য যখন 'রূপ কথা' মানে 'রূপ ও কথা' তখন কথা দিয়েই যে রূপ সৃষ্টি করা হয় সেটা নেহাৎ রূপক হলেও সত্যের কাঠামোটা কিছু থেকেই যায়। জগতে সব লোকের কাছেই ভাল লাগা

এবং না লাগার কথা আছে। সুতরাং পৃথক পৃথক তাদের প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীর হাতে বিভিন্ন রকমে হয়। আসলে মানুষ কত সুন্দর ক'রে যে বাঁচতে জানে, এই আত্মপ্রসাদ আছে সকল রচনার পিছনে। বিজ্ঞানের কল এবং কলে গড়া মানুষকে স্রষ্টা বলা চলে না। ভগবান ও মানুষকেই শুধু স্রষ্টা ও দ্রষ্টা দুই-ই বলা চলে।

ছবি আঁকা সম্বন্ধে এখন গুটিকতক কথা বলতে চাই। মোটামুটি ভাবে তা হচ্ছে এই :

ল্যাণ্ডস্কেপ পোর্ট্রেট এবং সামাজিক পৌরাণিক ও কাল্পনিক বিষয়বস্তু এই কয় ধরণের ছবিই সচরাচর আঁকা হয়। কি করে ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকলে ভাল দেখাবে? দেখা গেল—বিরাট আকাশ, মাটি-জল এবং তার পারিপার্শ্বিক সব কিছুকে নিয়ে ভাল লাগছে। এই যে দেখছি আরও এমন দেখেছি কিনা? আর এর ভেতর নূতনত্ব কি? নূতন স্বভাবতই চোখে আগে পড়ে। নূতন কিছু থাকলে মনে একঘেয়ে লাগে না এবং লাগে না বলেই খুশী হই।

আকাশ এবং মাটির ভিতর যা আছে তার সব কিছুকে নিয়ে ছবি আঁকলে সাধারণতঃ ভাল না লাগবারই কথা। যখন ট্রেনের কামরায় বসে জানালা দিয়ে একই দৃশ্যকে টুকরো টুকরো করে দেখি, মনে হয়, দাঁড়িয়ে দেখার চেয়ে গতিশীল



শ্রীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

অবস্থায় দেখাটাই ভাল লাগছে। একটা গাছ, দিগন্ত ও হেঁটেচলা একটা লোক—এইটাই চোখে পড়ল বেশী। এই সামান্য দৃশ্যকে ছবিতে পরিণত করে যখন দেখি, তখন দেখা ও অদেখা অনেক কিছু তার সঙ্গে যোগ করে দেখি। মনের চোখ দিয়ে চাওয়া এবং চোখে দেখা এই দুই ইচ্ছারই পরিতৃপ্তি হয়। হুবহু সবটুকু আঁকলে মনে মনে আর দেখা হয় না, মন তাতে খালি থাকে। তাই বলে বীথিকার মধ্যে গৃহস্থ-নারীদের সংসার-যাত্রার ছবি আঁকলে যে অনেকগুলো গাছপালা, ঘর ও কয়েকটি লোকজনের ছবি খাপছাড়া হবে, তাও নয়। আবার হাটের অথবা রাস্তার ছবি আঁকলে যে



ডাকঘর : রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ

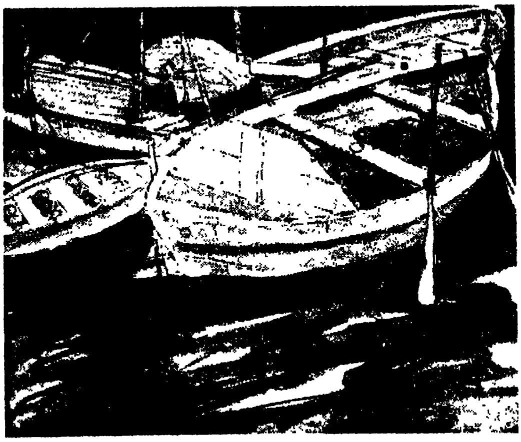


পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু

ফুরিয়ে যাবার পর যখন দেখে যে, জগতের কোনও কাজে লাগে নাই—তখন হতাশায় অনেকের জীবন-প্রদীপ স্তিমিত-প্রায় হয়ে আসে। আজ সবাইকে জগতের অনেক সমস্যার বোঝা মাথা পেতে নিতে হচ্ছে। সময়ের অপব্যয়কে সংক্ষেপ না করলে বেঁচে থাকা দুষ্কর। এ যুগের শিল্পীর পক্ষে এ কেন সুন্দর, এ কিসে সুন্দর, এ সকল ঘন্টার পর ঘণ্টা বিচার করে দেখার সময় ও সম্ভাবনা কম। সময় অল্প, কিন্তু দিতে হবে বেশী, এমন তাগিদে সকলের পক্ষেই গতিশীল না হয়ে আর উপায় রইল কই? স্থলে ও জলে গরুর গাড়ী ও নৌকার চেয়ে বর্ত্তমানে মোটরগাড়ী জাহাজ ও উড়ো-জাহাজ বেশী প্রয়োজন। সময় অল্প বলে, অল্প কথায়, অল্প রেখায় ভাব-প্রকাশের ধরণে পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছে, তার ভালমন্দের বিচার এখনও হচ্ছে, পরেও হবে। অল্প সময়ের দেখাকে ছবিতে হিজিবিজি লাইন টেনে প্রকাশ করা হয়। অবশ্য প্রকাশ করতে রেখার উপর অনেকখানি দখল থাকা দরকার। উদ্দেশ্যের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও লক্ষণ লাইনের Stroke এবং Force অনেকখানি ফুটিয়ে তোলে। তারই মধ্যে 'চার্ম্ম' অত্যন্ত বেশী, স্কেচ বলতে ঐ রকমই বুঝায়। একে অসম্পূর্ণ বলব, সম্পূর্ণ বললেও ক্ষতি নেই। কিন্তু সম্পূর্ণের সঙ্গে অসম্পূর্ণের প্রভেদ যেমন গুরুতর বলে মনে হয় আসলে তেমন নয়। কারণ অসম্পূর্ণকে মন একটি মাত্র লোক দিয়ে হাট কিম্বা রাস্তাকে পরিপূর্ণ বুঝাবে, তেমন কথাও বলি না।

উদ্দেশ্যের অনুপাতে যা দরকার এর বাইরে যেগুলো থাকবে তাকে বর্জ্জন করতে হবে। আবর্জ্জনাযুক্ত না করে মুক্ত করতে হবে। সাধারণতঃ সকল ক্ষেত্রেই এই রকম একটা নিয়ম গড়ে তোলা হ'ল বলে ব্যতিক্রম যে হওয়া নিষেধ এমন কোনও আইন নেই। নৌকাকে গতিশীল ও স্থিতিশীল উভয় অবস্থায় দেখায় একই ধরণের আনন্দ।

পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে জগদ্ব্যাপী সব কিছুই দ্রুত গতিতে চলেছে। চল্লিশ বছর যার আয়ু অর্দ্ধেক জীবন তার ঘুমে কাটে, দশ বছর তার শৈশবকাল, লেখা-পড়া, মাঠের খেলাধুলা, আড্ডা দেওয়া ইত্যাদিতে সাত বছর, পেটের ধাঁধায় ঘোরাফেরায় আড়াই বছর। এই উ'চল্লিশ বছর ছয় মাস



ঘাটের কোলে



বাহুর শক্তি

দিয়ে পূরণ করে নিলেই, দর্শককে বঞ্চিত করা হয় না ; বরং তৃপ্তি বেশী দেওয়া হয়। মনের ভেতর সাড়া বেশী জাগায়। রং দিয়েও এই পদ্ধতি কার্য্যে পরিণত করা যায় কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে বলব রং তুলির টানে এটা ওটার সঙ্গে সঙ্গে এদিক ওদিক গিয়ে যে-রূপ সৃষ্টি করে, তার মধ্যে সবলতা (boldness) প্রচুর ও বেগ (speed) অত্যন্ত প্রখর।

ছবির মধ্যে আলো-ছায়ার (Light and Shadow) দিকে নজর না রাখলেও ক্ষতি নাই। চাঁদকে অনেকে কালো করেও আঁকে। শুভ্র বস্তু কালোতে পরিণত হওয়ায় ভাল লাগে, এও দেখা গেছে।

সামাজিক ছবির বেলায় যখন মজুর ও চাষীদের ছবি আঁকা হবে, তা দেখতে কেমন হবে? জীবিকা নির্ব্বাহ তারা কি করে ক'রে? শহরের বাইরে এদের বস্তি। এরা দৈন্যে জর্জ্জরিত এবং মানুষের মত এদের বেঁচে থাকা নয়, ধনীর দরজায় শক্তি ব্যয় করে এরা উদরপূর্ত্তি করবার চেষ্টা করে। এই অসমত্ব (contrast) দেখাতে হবে সমৃদ্ধিশালী নগর অথবা শহরের পাশে অত্যন্ত নোংরা অপরিচ্ছন্ন বস্তির ছবি এঁকে। গণ-আন্দোলনকে যদি ছবিতে রূপায়িত করতে হয় তা হলে কি করতে হবে? গণ-আন্দোলনের ছবি হবে—'খাদ্য, অর্থ ও বস্ত্র চাই,' এই মনোভাবের প্রকাশক। এরা কেমন করে এবং কি ভঙ্গীতে নিজেদের দাবি জানাচ্ছে—তা হুবহু দেখানো চাই।

জাহাজ অথবা কল-কারখানা কয়লার সাহায্যে চলে, নৌকা চলে বাহুর শক্তিতে। পুঁজীবাদীর সঙ্গে শ্রমিকের এই যে তফাৎ তা দেখিয়ে তার জীবনযাত্রার প্রতিটি ঘটনার বহু রকমের ছবি আঁকা যায়। তেমনি দালাল ও মহাজন খাদ্য-শস্য মজুত রেখে যে প্রলয়ঙ্করী দুর্ভিক্ষ ঘটিয়ে তোলে তার ছবিও হবে এই ধরণের যেন তা মর্ম্ম স্পর্শ করে। এ ধরণের ছবির উদ্দেশ্য হবে বৃহত্তর সমাজের সম্মুখে যারা লাঞ্ছিত ও অসহায় তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করা এবং কারা এর জন্য দায়ী তা দেখিয়ে দেওয়া।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে দেশে ও দেশের জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ওলটপালট চলেছে। মানুষ তাই নিয়ে যে সারাক্ষণ ব্যাপৃত। শিল্পীরও সমসাময়িক প্রতিটি ঘটনার ছবি আঁকা প্রয়োজন। অতীত কালের শিল্পকলা পর্য্যালোচনা করলেও দেখি, যখন যা ঘটেছিল তাই নিয়ে বহু ছবি আঁকা হয়েছিল। আজকের দিনে শিল্পকলার দ্বারা সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত হওয়া



দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষকারী দালাল

অত্যাবশুক, কারণ শিল্পই মানুষের মনে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলতে পারে। মনুষ্য-সমাজে একটা বিপর্য্যয় ব্যাপার যে বর্ব্বরতামূলক মনোবৃত্তির দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে তার পুনরাবৃত্তি প্রতিরোধ করতে শিল্পীদের আজ দেশকর্ম্মী হতে হবে। যত দিন পর্য্যন্ত সকলে মাথা তুলে দাঁড়ানোর ক্ষমতা না পাচ্ছে, তত দিন শিল্পীর তুলিতে গণ-আন্দোলনের ছবি ফুটিয়ে তুলতে হবে। আসলে news and views যে ছবির একটা প্রধান অঙ্গ এইটাই আজ বিশেষ করে উপলব্ধি করবার সময় এসেছে। পোর্ট্রেট ও পৌরাণিক ছবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখার প্রয়োজন কম। তবে প্রতিকৃতির অর্থ প্রতিবিম্ব নয়, কোনো লোকের মুখের আদল ও ধরণ-ধারণ কোন্ প্রকারের তার উপর জোর দিয়ে, তার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব ফুটিয়ে তোলাই প্রতিকৃতির মোটামুটি অর্থ। জোর করে সুন্দর করাটা সুসমঞ্জস শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক নয়।

পৌরাণিক ছবিতে পুরনো গল্পের ব্যাখ্যা করাই প্রধান কাজ। কাল্পনিক ছবি ও পৌরাণিক ছবি বর্ত্তমানে দুইই সমান, কারণ অতীতের ঘটনাকে বর্ত্তমানে কল্পনা করেই নিতে হয়।

সামাজিক ছবি ছাড়া আর যে সব ছবি আঁকা হয় তারও প্রয়োজন সমাজের কাছে বেশ আছে।

স্বাধীনতা ও বাংলা ভাষা

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

দীর্ঘকালের পরাধীনতার বন্ধন হইতে দেশ আজ মুক্ত। ফলে গুরুদায়িত্ব আজ তাহাকে মাথা পাতিয়া লইতে হইল। সকল বিষয়ে আজ তাহাকে স্বাবলম্বী হইতে হইবে—পরের মুখ চাহিয়া থাকিলে আর চলিবে না—বিদেশের অন্ধ অনুকরণ আর তাহার পক্ষে শোভা পাইবে না। কেবল বাহির হইতে নয়, অন্তর হইতে তাহাকে বিদেশী পরগাছা উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। বিদেশ হইতে নানা উপকরণ তাহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে নিজের পরিপুষ্টি ও শোভাবৃদ্ধির জন্ত—তাহারই চাপে যাহাতে নিজের আকৃতি ও প্রকৃতি বিকৃত না হইয়া যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্ত—আমাদের স্কুল কলেজ আপিস আদালত সভাসমিতির কাজকর্ম্মে এখন হইতে যথাসম্ভব দেশীয় ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। বিদেশী ভাষাকে অবশ্য ত্যাগ করিব না। বিদেশের সহিত, দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের সহিত ভাবের আদান-প্রদানের জন্ত বিদেশী ভাষাকে গ্রহণ করিতে হইবে, বিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বারা নিজের দেশীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করা অনেকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া একই প্রদেশের মধ্যে পরস্পর কথা বলায়, চিঠিপত্র লেখায় যে ইংরেজী-মিশ্রিত দেশীয় ভাষাপ্রয়োগের ব্যাধি দেশের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে তাহার আশু প্রতিবিধান অবশ্যকর্ত্তব্য। চিঠিখানি যদি বা বাংলায় লিখি, তাহার শিরোনামা ইংরেজী অক্ষরে লিখিবার লোভ আমরা কয়জন সংবরণ করিতে পারি ? কয়জনে নিজের বইয়ে মালিকের নাম হিসাবে নিজের নাম বাংলায় লিখিয়া রাখি ? বাড়ীর নাম ও মালিকের নাম ইংরেজী হরফে বিজ্ঞাপিত করাই মর্য্যাদাসূচক বলিয়া ধারণা করি। অতি-সাধারণ ব্যক্তিও চিঠির কাগজের শিরোভাগে ইংরেজী অক্ষরে নিজের নাম মুদ্রিত করিয়াই গৌরববোধ করেন। ব্যাধির ব্যাপকতার ইহাই হইল প্রধান লক্ষণ। সকলকে সমবেত ভাবে একাগ্রচিত্তে সংকল্প করিয়া এই মানসিক ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে হইবে। ব্যাধিজনিত মোহ কাটিয়া গেলেই নিজের দেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিবে এবং তাহার উৎকর্ষ সাধনের জন্ত ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টা দেখা দিবে।

অনেকের ধারণা নিজের মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন ও প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। ফলে ইংরেজী শিক্ষার জন্য আমরা যে পরিমাণ পরিশ্রম করি মাতৃভাষা শিক্ষার জন্য তদনুপাতে কিছুই করি না। তাই যখন মাতৃভাষার মধ্য দিয়া কোন গুরু বিষয়ের আলোচনা করি তখন ভাষার অন্তরালে বিদেশী ছাপ লক্ষ্য করা যায়। ইহার বিকট রূপ, ইহার দেশীয় আকৃতি ও বিদেশী প্রকৃতি সাধারণ পাঠকের চিত্তকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে। কারণ বিদেশী চিন্তাধারা দেশীয় ধরণে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমাদের অনেকেরই নাই। অনুবাদের বেলা এই অক্ষমতা চরমমাত্রায় উঠে। তাই অনেক ক্ষেত্রে বাংলা সংবাদপত্রের ইংরেজী সংবাদের যে অনুবাদ প্রকাশিত হয় তাহা পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে—তাহা পড়িয়া অনেক সময়ই মূলের তাৎপর্য ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। সেইজন্য অনেকে বাংলা সংবাদপত্র না পড়িয়া ইংরেজী সংবাপত্র পড়িতে বাধ্য হন। জনসাধারণকে কোন রূপে দুধের আস্বাদ ঘোলে মিটাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। বিদেশী ও দেশী উভয় ভাষারই সৌন্দর্য ও মাধুর্যের আস্বাদ হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত থাকিতে হয়।

এই অসুবিধা দূর করিতে হইবে—দেশের জনসাধারণের মধ্যে দেশবিদেশের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত ও সুখপ্রবেশ করিয়া তুলিতে হইবে। স্বাধীনতাসৌধের ভিত্তিপত্তন এইরূপ ভাবেই

করিতে হইবে। দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন ব্যতীত দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না, একথা ভুলিলে চলিবে না। সুখের বিষয়—দেশের শাসনব্যবস্থার ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন নহেন। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সর্ব্বোচ্চ মান পর্যন্ত দেশীয় ভাষার মধ্য দিয়াই হওয়া উচিত। পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী মহাশয় তাহা স্পষ্টতই স্বীকার করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এ বিষয়ে তাঁহাদের আগ্রহ ব্যক্ত করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের অধিকনায়ক প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা সম্পন্ন হইলেই পৌর সভার কার্য বাংলা ভাষাতে নির্বাহিত হইবে। বাংলা ভাষার অনুরাগীদের পরম আশ্বাসের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সর্ব বিষয়ে বাংলা ভাষার প্রয়োগ সম্প্রসারণের পূর্বে বা সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আধুনিক ভাবপ্রকাশের উপযোগী শব্দ সংকলনের সুব্যবস্থা অবশ্য-করণীয়। এইরূপ ব্যবস্থার অভাবে ইংরেজীগন্ধি ভাষা অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজী না জানা ব্যক্তির পক্ষে দুর্বোধ্য বা অযথার্থবোধক হইয়া পড়িয়াছে। লেখকগণ যে যাহার প্রয়োজন ও খেয়াল-মত ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি করিয়া থাকেন—অনেক ক্ষেত্রে এক জনের সঙ্গে আর এক জনের কোনও মিল থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাল মন্দ বিচার না করিয়া এক জনের সৃষ্ট শব্দ অপরে গড্ডালিকা প্রবাহের মত অনুকরণ করিয়া চলেন—বহু স্থলে অপ্রসিদ্ধ লেখকের সৃষ্ট উৎকৃষ্ট শব্দ-সাহিত্য-ব্যবসায়ীর দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। ফলে এ বিষয়ে বাংলা সাহিত্যে এক বিরাট বিশৃঙ্খলার রাজত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। 'সাহিত্যের হট্টগোলে এমন শব্দের আমদানি হয়, যা ভাষাকে চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে।' রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির যাথার্থ্য আমরা পদে পদে অনুভব করিতেছি। মনীষিবর্গের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই বলা যায় না। বহু দিন পূর্বে স্বর্গত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় বিদেশী শব্দের আক্ষরিক অনুবাদের অসুবিধার উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আধুনিক বাংলায় ব্যবহৃত এই জাতীয় শব্দের একটি তালিকা সংকলন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন 'অনুবাদ-চর্চা' প্রবন্ধে তিনি ইংরেজীর অনুবাদে সাধারণতঃ যেরূপ ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়, তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন। 'শব্দচয়ন' প্রবন্ধে তিনি ইংরেজী শব্দের অনুবাদ হিসাবে বাংলায় ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের দোষত্রুটি দেখাইয়াছেন এবং অনুবাদের নমুনা হিসাবে সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার হইতে কতকগুলি শব্দ সংকলন করিয়া দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন পুস্তকে তিনি নানা প্রসঙ্গে অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নূতন শব্দ তৈয়ার করিয়াছেন।

বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানও এই বিষয়ে অনেক কাজ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ হইতে প্রায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ সংকলনের চেষ্টা হইতেছে। এই চেষ্টার ফল নানা সময় নানা পত্রিকায় স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশিত গ্রন্থ ও নিবন্ধের একটি তালিকা কিছুদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন।[১] এই তালিকা যে সর্বাংশে সম্পূর্ণ তাহা বলা যায় না। তাহা ছাড়া, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে অপ্রকাশিত সংকলনও প্রচুর রহিয়াছে।

কিন্তু কার্য যতদূরই অগ্রসর হইয়া থাকুক না কেন এ বিষয়ে এখনও প্রচুর কাজ বাকী রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের অপ্রাচুর্যবশতঃ অনেক পরিভাষা অব্যবহৃত রহিয়া গিয়াছে—অনেকগুলির ব্যবহারযোগ্যতা ও অর্থপ্রকাশক্ষমতা এখনও সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। পরিভাষাগুলি সাধারণত বৈজ্ঞানিকেরাই তৈয়ার করিয়াছিলেন। ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতে তাহাদের উপযোগিতা বিচার করা হয় নাই। এজন্য চাই সাহিত্যিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সহযোগিতা। বস্তুতঃ পরিভাষা-রচনা কোন বিষয়বিশেষে পারদর্শী ব্যক্তিবিশেষের কার্য নহে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বসু মহাশয় বলেন—

'বলা বাহুল্য এই কাজে বিভিন্ন বিদ্যায় বিশারদ বহুলোক চাই। তাঁদের মৌলিক গবেষণায় খ্যাতি অনাবশ্যক, কিন্তু বাংলা ভাষায় দখল থাকা একান্ত আবশ্যক। যে সমিতি সংকলন করবেন তাঁদের মধ্যে দু-এক জন সংস্কৃতজ্ঞ থাকা দরকার। এমন লোকও চাই যিনি হিন্দী উর্দু প্রভৃতি ভাষার খবর রাখেন। সর্বোপরি আবশ্যক এমন গুণী লোক যিনি শব্দের সৌষ্ঠব ও সুপ্রয়োজ্যতা বিচার করিতে পারেন, বিশেষত সঙ্কলিত সংস্কৃত শব্দের।'

এই জন্যই প্রবেশিকা পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ের পঠনপাঠনে মাতৃভাষার প্রবর্তনের সূচনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞানের পরিভাষা সংকলনে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে কেবল বৈজ্ঞানিকদিগের উপরই সমস্ত ভার ন্যস্ত হয় নাই। বৈজ্ঞানিকগণ স্ব স্ব বিষয়ে পরিভাষা সংকলন করিয়া কেন্দ্রীয় সমিতি বা সমন্বয় সমিতির নিকট উপস্থাপিত করিতেন। এই সমিতির সভ্য ছিলেন বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতব্যবসায়ী। দেখা গিয়াছে—এই সমিতির অধিবেশনে অনেক সময় এক একটি শব্দ লইয়া দীর্ঘকাল আলোচনা চলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকের প্রস্তাবিত শব্দ সম্বন্ধে সাহিত্যিক ও সংস্কৃত পণ্ডিতের সম্মতি লওয়া হইত। কোন শব্দ সম্বন্ধে তাঁহাদের আপত্তি থাকিলে তাঁহারা অর্থানুসারে নূতন শব্দ গঠন করিয়া দিতেন এবং বৈজ্ঞানিকের সম্মতি হইলে উহা গৃহীত হইত। এই অতিসুন্দর পদ্ধতি অনুসারে কাজ হইলেও অবশ্য সর্বত্র সুফল পাওয়া যায় নাই—প্রস্তাবিত সমস্ত শব্দ গ্রহণযোগ্য বা নির্দোষ হয় নাই। তবে সেজন্য পদ্ধতির ত্রুটি দেওয়া চলে না। এই পদ্ধতিকে সর্বথা কার্যকর ও সুফলপ্রসূ করিতে হইলে পরিভাষাসমিতির সকল সদস্যের ঐকান্তিকতা ও কর্মনিষ্ঠা অবশ্যপ্রয়োজনীয়—ইহার অভাবে প্রতিপদে ত্রুটির

১ প্রকৃতি, ১৩৪৪, গ্রীষ্মসংখ্যা।

সম্ভাবনা স্বাভাবিক। বিবিধ কর্ম্মের মধ্যে বিক্ষিপ্ত চিত্ত লইয়া অবসরবিনোদনের জন্য সভায় বসিয়া কাজ করিবার উপায় নাই। এই সমিতির কার্যের উপর দেশীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ব্যস্ততাসহকারে দায়িত্ব উপেক্ষা করিয়া 'যেন তেন প্রকারেণ' কাজ করিলে চলিবে না, কয়েকজনকে এই কার্যের গুরু দায়িত্ব মাথা পাতিয়া লইতে হইবে—ইহাকে জীবনের ব্রতহিসাবে, সাধনা হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

কেবল বিভিন্ন বিজ্ঞানবিষয়ক শব্দ নয়, বিজ্ঞানের গণ্ডীভুক্ত অনেক সাধারণ শব্দেরও সার্থক প্রতিশব্দ উদ্ভাবন করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক শব্দ অপেক্ষা ইহাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন অনেক বেশী। প্রতিদিন খবরের কাগজ মারফত এই জাতীয় বহু শব্দের সাক্ষাৎকার ঘটে—কিন্তু সুষ্ঠু অনুবাদের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। যদৃচ্ছাক্রমে কয়েকটি উদ্ধৃত করার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি না। নিশ্চল অবস্থা বা স্থিতাবস্থা (Standstill arrangement), হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল (Hindu majority area), বায়ুশীতল (air-conditioned), প্রার্থনান্তিক বক্তৃতা (post-prayer speech), গণপরিষদ (Constituent Assembly), বনিয়াদি শিক্ষা (basic education), হিম বিন্দু (freezing point)। এইরূপ আরও বহু শব্দ আছে, বিস্তৃত তালিকা উপস্থাপিত করার অবকাশ এখানে নাই। অবশ্য নিঃসংশয়ে বলা চলে যে একটু চিন্তা করিবার অবসর পাইলে এই সকল স্থলে সুন্দরতর অন্বর্থক শব্দ নিরূপণ করা খুব কঠিন ব্যাপার নহে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণ রাখা দরকার। তিনি বলিয়াছেন—'ইংরেজীতে যে সব শব্দ অত্যন্ত সহজ ও নিত্যপ্রচলিত, দরকারের সময় বাংলায় তার প্রতিশব্দ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা বানিয়ে দিতে হয়। সেটা অনেক সময় বেখাপ্পা হয়ে দাঁড়ায়, অনেক সময় মূল ভাবটা ব্যবহার করাই স্থগিত থাকে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয়তো তার অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব্দ দুর্লভ নয়।' বস্তুতঃ সংস্কৃতের সাহায্যে প্রকৃতার্থবোধক শব্দপ্রণয়ন দুঃসাধ্য নহে। উদ্ধৃত শব্দগুলির স্থলে আমি কয়েকটার কিছু কিছু পরিবর্তন এই প্রসঙ্গে প্রস্তাব করিতে পারি। যথাপূর্ব বা যথাস্থিত ব্যবস্থা, হিন্দুবহুল বা হিন্দুভূয়িষ্ঠ অঞ্চল, তাপনিয়ন্ত্রিত, প্রার্থনান্ত বক্তৃতা, সংঘটন পরিষদ বা গঠন পরিষদ—এই শব্দগুলি বোধ হয় নিশ্চল অবস্থা বা স্থিতাবস্থা, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল, বায়ুশীতল, প্রার্থনান্তিক বক্তৃতা, গণ-পরিষদ প্রভৃতি নবপ্রবর্তিত শব্দ হইতে অধিক অর্থদ্যোতক ও ভাষার দিক হইতে দোষমুক্ত।

তবে এই ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। বাংলা শব্দটি ভাল হইল কি মন্দ হইল তাহাতে সাধারণের কিছু আসিয়া যায় না, সাহিত্যিকেরাও অনেক ক্ষেত্রেই ইহা লইয়া আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভব করেন না—অনেকে অনাস্থিকে বাংলা লেখকদের যথেচ্ছাচারিতার ইঙ্গিত করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করেন। জীবিত ভাষার দোহাই দিয়া ও এইরূপ আলোচনাকে পাণ্ডিত্যের আড়ম্বরমাত্র বলিয়া উপহাস করিয়া আলোচনার মুখ বন্ধ করিবার লোকেরও অভাব নাই। আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছি—জীবিত ভাষার নির্বাধ স্বতন্ত্র গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা বাতুলতামাত্র—উচ্ছৃঙ্খলতাই ইহার শোভা, নিয়মনিষ্ঠা ইহাকে পঙ্গু ও বিকৃত করিয়া ফেলিবে। তবে স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করিলেও উচ্ছৃঙ্খলতার আধিপত্য কোনও ভাষাই উপেক্ষা করে বলিয়া মনে হয় না। তাই পণ্ডিতসমাজে ভাষার খুঁটিনাটি লইয়া আলোচনার প্রচলন সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, প্রায় দেড় শত বৎসর হইল শিক্ষিত বাঙ্গালী বাংলা ভাষার চর্চায় ধীরে ধীরে মনোনিবেশ করিতে থাকিলেও এ বিষয়ে তাহার তেমন দৃষ্টি পড়ে নাই। এ বিষয়ে বাঙালীর মনোভাবের বিশ্লেষণ করিয়া রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন—'পদ্মবনে মত্তকরীসম বাংলা-ভাষার বানান এবং ব্যাকরণ ক্রীড়াচ্ছলে পদদলিত করিতে পারেন অথচ ভ্রমক্রমে ইংরেজীর ফোঁটা বা মাত্রার বিচ্যুতি ঘটিলে ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলেন।'

কিন্তু আজ আমাদিগকে এ মনোভাব ত্যাগ করিতেই হইবে। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষা ও বিকাশসাধনের জন্য আমাদিগকে মনে-প্রাণে চেষ্টা করিতে হইবে। বিদেশী-ভাবধারাকে নিজের ভাষায় নিজের মত করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

এই কাজের জন্য বিশেষজ্ঞদের যদৃচ্ছ যথাবসর চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। আজ দেশের শাসন ও রক্ষণের ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে অগ্রণী হইতে হইবে—শিক্ষা-বিভাগের সহযোগিতায় বিশেষজ্ঞদের লইয়া। একটি স্থায়ী সমিতি গঠন করিতে হইবে। সমিতির সদস্যগণের একমাত্র কাজ হইবে বাংলা ভাষায় আধুনিক ভাব-প্রকাশের উপযোগী শব্দ সংকলন করা। এজন্য তাঁহাদিগকে জাপান তুর্কী প্রভৃতি দেশের ব্যবস্থা আলোচনা করিতে হইবে—অন্যান্য প্রদেশের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে—অন্যান্য প্রদেশে অনুরূপ প্রয়োজনে ব্যবহৃত শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ মন্থন করিতে হইবে—সম্পূর্ণরূপে এই কাজেই তাঁহাদিগকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে—অন্য কাজের ভার তাঁহাদের আর বহন করা চলিবে না—কারণ অন্য কাজের অবসরে এ কাজ করিবার মত সময় সুবিধা ও মানসিক অবস্থা খুব কম লোকেরই হইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা-সমিতির কর্ম্মধারার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এটুকু নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে ঐ সমিতির কার্যের যাহা কিছু ত্রুটি দেখা গিয়াছে বা যাইবে তাহার কারণ সমিতির সদস্যদের অনন্যকর্মা ও নিশ্চিন্ত হইয়া কাজ করিবার সুযোগের অভাব। ভবিষ্যতেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে অনুরূপ ত্রুটির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই—ইহা ধ্রুব সত্য।

সঙ্গীতদামোদর

(বাঙ্গালীর রচিত চিরলুপ্ত সঙ্গীত গ্রন্থ)

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একবার দুঃখ করিয়াছিলেন, বাঙালী এক আত্মবিস্মৃত জাতি। সংস্কৃত সাহিত্যের বিরাট্ ও সমৃদ্ধ ভাণ্ডারে বাঙালীর অবদান বিষয়ে বাংলার শিক্ষিত সমাজের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যই তাঁহার ঐরূপ উক্তির নিদান। বর্ত্তমানে বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চ্চার শোচনীয় দুর্গতি ও দুর্দ্দশার আর একটি ভয়াবহ পরিণতি দেখিয়া আমাদের আশঙ্কা হইয়াছে, বাঙালী আত্মঘাতী জাতির মধ্যেও কালে পরিগণিত হইতে পারে। কোন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতগ্রন্থকার বাঙালী ছিলেন বলিয়া উল্লেখযোগ্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হইলে কোন কোন বাঙালী মনীষী ঐ প্রমাণ উপেক্ষা ও খণ্ডন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের একজন খাঁটি বাঙালীর রচিত সঙ্গীতশাস্ত্রের বিবরণ প্রকাশ করিয়া আমরা ঐরূপ আত্মহত্যা ও আত্মবিস্মৃতির কলঙ্ক যৎকিঞ্চিৎ মোচন করিতে প্রয়াস পাইব।

"সঙ্গীত দামোদর" গ্রন্থের তিনটি মাত্র পুঁথি এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা জানি। তন্মধ্যে নবদ্বীপাধিপতির গ্রন্থাগারে রক্ষিত ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বর্ণিত সম্পূর্ণ পুঁথি (L. 309, পত্রসংখ্যা ১২১, লিপিকাল ১৬৪৩ শক) এখন অপ্রাপ্য। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজেও একটি সম্পূর্ণ পুঁথি ছিল (Des. Cat., No. 30, 1913 pp. 420-24 দ্রষ্টব্য, পত্র-সংখ্যা ৫৬, লিপিকাল ১৬৩৩ শক)। দুঃখের বিষয়, বহুতর মূল্যবান্ পুঁথির সহিত ইহাও কলেজের পুঁথিশালা হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। আমাদের নিকট একটি খণ্ডিত পুঁথি আছে (পত্র-সংখ্যা ৪৭)—তদ্দৃষ্টে এই বিবরণ সঙ্কলিত হইল। গ্রন্থটি পাঁচ "স্তবকে" বিভক্ত। গ্রন্থারম্ভে প্রতিপাদ্যবিষয় বর্ণনাচ্ছলে "কৃষ্ণলীলা" (১ম শ্লোক) ও "হরি"র তুষ্টি প্রার্থনা (২য় শ্লোক) করিয়া প্রমাণপঞ্জী উল্লিখিত হইয়াছে (Des. Cat., ঐ, পৃ, ৪২১ আমাদের পুঁথিতে এই অংশ লুপ্ত)। যথা—

জনয়তি সততমিদমতীব মোদং লোচনয়োঃ।
সঙ্গীতকল্পবৃক্ষে দশরূপে নাট্যদর্পণে যচ্চ ॥৩
সঙ্গীতচূড়ামণি-রত্নকোষ-সঙ্গীতসর্ব্বস্ব-মটোরসীষু।
বসন্তি সর্ব্বে চ গুণাঃ প্রযুক্তা ভাবাবলী-নারদসারদাসু ॥৪
যদ্‌যচ্চ সারং ভরতাদিকেষু তত্তৎ সমাকৃষ্য রসাঙ্কুরাঢ্যং।
"শুভঙ্করঃ" সন্তমাদরেণ সঙ্গীতদামোদরমাতনোতি ॥৫

"সঙ্গীতসর্ব্বস্ব" মৈথিল মহাপণ্ডিত জগদ্ধররচিত বটে। জগদ্ধরের কালনির্ণয়ে ইহার উপযোগিতা লক্ষণীয়। গ্রন্থমধ্যে সর্ব্বত্র উদাহরণচ্ছলে যমুনাবিহারী শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রথম স্তবকের প্রতিপাদ্য বিষয় নাট্যভাব। তৎপ্রসঙ্গে ছয় জন আদি নাট্যশাস্ত্রকারের নামোল্লেখ আছে :—

বিরিঞ্চির্নারদো রম্ভা হুহুর্ভরতভুম্বুরু।
যত্তেতে নাট্যভাবানাং বক্তারো লোকবিশ্রুতাঃ ॥

স্থায়িভাব (৯) ব্যভিচারিভাব (৩৩) ও সাত্ত্বিকভাব (৮) সমূহের নাম ও লক্ষণাদির পর চতুর্দ্দশপ্রকার "হাবে"র নাম ও লক্ষণ এবং অনুভাব বর্ণিত হইয়াছে—

শুভঙ্করোক্তা ধুর্য্যন্তি চিত্রং নন্দস্তনন্দয়ং।
হৃষ্যতি স্ম হৃষীকেশোঽনুভাবৈর্নবীকৃতৈঃ ॥

তৎপরে ক্রমান্বয়ে অভিসারিকাদের গমনকাল (১২), নায়িকাদের দশবিধ মনোভব দশা, সঙ্কেতস্থান, দ্বাদশপ্রকার দূতী ও দ্বিবিধ বিভাবের ব্যাখ্যা শেষ করার পর সমাপ্তিসূচক পরিচয়শ্লোক লিপিবদ্ধ আছে :—

খ্যাতো যঃ কবিচক্রবর্ত্তিপদতো বিদ্যাচণৈরক্ষিতঃ
সৌভদ্রেয়মিমং যমজ্জুনযশাঃ সোঽজীজনৎ শ্রীধরঃ।
তস্য শ্রীলশুভঙ্করস্য ভণিতৌ সঙ্গীতদামোদরে
সঙ্গীতঃ স্তবকোঽভিলাঙ্কমভবো (?) ভাবাদিনামাদিমঃ ॥পৃ৪

অর্থাৎ শুভঙ্করের পিতা ছিলেন বিদ্বৎপূজিত শুভ্রযশাঃ শ্রীধর "কবিচক্রবর্ত্তি" ও মাতা সুভদ্রা। এই শ্লোকটিই কেবল শেষ পঙ্‌ক্তি পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যেক স্তবকের শেষে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যথা—

বিস্তারী স্তবকো বকারিচরিতৈশ্চারু দ্বিতীয়ো গতঃ ॥ পৃ ১২
তানাদ্যঃ স্তবকোঽচ্যুতস্তবকৃতো যাতস্তৃতীয়ঃ পটুঃ ॥ ১৯
বংশীয়াংস্তবকোঽদহারনটনোচ্চৈস্তুরীয়ো গতঃ ॥ ৩৯
সাম্ভোগঃ স্তবকঃ প্রপঞ্চিতরসঃ শ্রীমানয়ং পঞ্চমঃ ॥ সর্ব্বশেষে

দ্বিতীয়স্তবকে (৪-১২) নানাবিধ নায়িকা (মোট সংখ্যা ৩৮৪, পৃ, ৫।২), চতুর্ব্বিধ নায়ক, নাদ ও বহুবিধ গীতের বিবরণ আছে। স্থলে স্থলে বরাং আছে,

"এতেষামেলাদীনাং প্রবন্ধগীতানাং লক্ষণসহিতো ভেদঃ সঙ্গীতচূড়ামণি-সঙ্গীতরত্নাকরাদৌ বিশেষেণ বোদ্ধব্যঃ।" (৭।১ "অতো লক্ষণমেতেষাং জ্ঞেয়ং তুম্বুরুনাটকে" (ঐ)। ধ্রুবকাদির বিস্তৃত ব্যাখ্যার পর গ্রন্থকার লেখকের প্রতি সাবধানোক্তি করিয়াছেন,

অবলেপান্মুখৌ মর্মমুদ্ধার শুভঙ্করঃ।
সাবধানৈরিদং লেখ্যং লিপিদোষো যমঃ স্বয়ং।
কুঞ্চটৈর্নৈকাচান্তা তিমিরং যমনীপটঃ ॥ (১১।২)

গ্রন্থকার বহুস্থলে মনোহর শ্লোকে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন। দ্বিতীয় স্তবক হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

ক্বণৎ-কনককিঙ্কিণীরণিতমঞ্জিরদ্বাদনে
মৃদঙ্গধনসোত্তবধ্বনিতভাজি বৃন্দাবনে।
সবংশমধুরাধরস্ফুরিতগীতফুৎকারতঃ
কুরঙ্গনয়নামনো বত জহার হারী হরিঃ ॥ (১২।১)

তৃতীয় স্তবকে : (১২-১৯) স্বর, স্বরপ্রস্তার, গমক, গণ, মূর্চ্ছনা, বর্ণ, তান, গ্রাম, রাগ রাগিণী, গীতপাদ, তাল, তাল-প্রস্তার ও তালঘাতনপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে। স্তবকসমাপ্তির একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল :

শ্রীরঙ্গো মণিবদ্ধকঙ্কণবরো মুক্তাবলীমণ্ডন:
ক্রীড়াহেতুবসন্তরক্তহৃদয়ো গন্ধর্ব্বলীলারত:।
সাক্ষাল্লোকপতিশ্চতুর্মুখনতো যো রাজচূড়ামণি:
সোঽয়ং তালময়স্তুণেচ্ তৃণবৎ সংসারবন্ধং হরি: ॥

চতুর্থ স্তবক : (১৯-৩১) সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। ইহাতে প্রকৃতি, বিদূষকাদি নায়কসচিব, দূত, কলা, নানাবিধ বাদ্য, অঙ্গহার, বিষমাঙ্গ, নৃত্য, নাট্যোৎপত্তি প্রভৃতি নাটকীয় বস্তু বর্ণিত হইয়াছে। এক স্থলে (২৫।১) স্বরচিত "হস্তমুক্তাবলী" গ্রন্থের উল্লেখ আছে : "এতেষাং লক্ষণং মমৈব হস্তমুক্তাবলীগ্রন্থে জ্ঞাতব্যং।"

"অতো মৎকৃতহস্তমুক্তাবল্যাং সকলানি বিশেষতো বোদ্ধব্যানি।

পঞ্চম স্তবকে : (৩১-৪৭) প্রধানত: রসের লক্ষণাদিবিচার দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকার বহুস্থলে অল্পবিস্তর নূতন কথা বলিয়াছেন, যাহা অন্যত্র পাওয়া যায় না। রূপকের উদাহরণস্থলে, "প্রহসন"মধ্যে "শুদ্ধং ক্রীড়াশকরাখ্যং সংকীর্ণং ভবদঙ্কং।" যথা চ "ধূর্ত্তসমাগমং" নাম প্রহসনং (৩৪।২), উপরূপকের উদাহরণমধ্যে "দময়ন্তীসংহার" ও "বালিবধ" (প্রেক্ষণ) (৩৬।২), "সত্যভামা" (গোষ্ঠী) ও "মায়াকাপালিক" (সংলাপ) (৩৭।১) উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় স্তবকে নৃত্যে "বৃদ্ধা"র উল্লেখ কালে কৌতুকজনক কথা লিখিত হইয়াছে : "অথ "রাঢ়া"দি-দেশভেদেন কচিদঙ্গে বৃদ্ধা প্রবিশন্তি। সা যথা :

চক্ষুর্ভ্যাং কোটরাক্ষী চ নাসয়া চৈব চেপ্টরী।
দন্তকর্ত্তিকাপাটী হস্তিকর্ণযুগা তথা॥" ইত্যাদি (৫।২)

রসবিচারের শেষে আছে, "কশ্চিদত্রাহ প্রেমনামাঽপরো রসোঽস্তি তন্মতে দশ রসা ভবন্তি।....এতস্যৈব প্রেমনাম্নো রসস্য "মালতীমাধবটীকায়াং" বৎসল ইতি নাম। অথাত্র কেচিত্তু উদাত্তো বলদৈবত: উদ্ধত: পরশুরামদৈবত ইতি বচনমকিঞ্চনা কাঞ্চনমিব চার্ব্বাকা: ক্ষণভঙ্গমিব কদাচিৎ প্রাহো ন যুক্তিশ্চেৎ তদানীং রসানাং দ্বাদশত্বং ন ব্যভিচরতি। (৪৫।১) অর্থাৎ প্রেম অথবা বৎসলরস, উদাত্ত ও উদ্ধতরসের সংযোগে মোট রসের সংখ্যা প্রাচীনমতে দ্বাদশ, যদিও গ্রন্থকার স্বয়ং উদাত্ত ও উদ্ধত রসকে বীররৌদ্রের অন্তর্ভুক্ত ধরিয়াছেন। রসের বিচারে এক জন প্রাচীন আচার্য্যের নামও গ্রন্থকার উল্লেখ করিয়াছেন :—

অতএবাহুরাচার্য্যা-"ভালুকি"প্রমুখা ইহ।
অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণং ॥(৪৫।২)

গ্রন্থশেষে রসবিচারের পর একটি মূল্যবান অভিধান সংযোজিত হইয়াছে : "এক: শান্তরসো শুক্লোচনো রজনীমণি:।" প্রভৃতি হইতে "রতি-দেবস্য নৃপ-ত: পুত্রা: কোটি শুযোদিতা:।" পর্য্যন্ত (৪৫।৬)। দু:খের বিষয়, একটি মাত্র পুথি অবলম্বনে এই গ্রন্থরত্ন মুদ্রিত করা যায় না।

গ্রন্থকারের পরিচয় : শেষস্তবকের পরিচয়শ্লোকে একটি বিশেষণ পদ আছে 'সাভোগ:' স্তবক:। আভোগ গীতের একটি অংশবিশেষ—"যত্রৈব কবিনাম স্যাৎ স আভোগ ইতীরিত:।" (৭।২) পূর্ব্বোক্ত অভিধানের পর গ্রন্থকার সবিস্তার আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন।

নারায়ণানিরুদ্ধ-শ্রীধরকুলসিন্ধুকুমুদিনীবন্ধু:।
দোষাকরতাভঙ্গোঽনঙ্ক: স শুভঙ্করো জয়তি ॥

অর্থাৎ নারায়ণ, অনিরুদ্ধ ও শ্রীধরের বংশের অলঙ্কারস্বরূপ কলঙ্কহীন চন্দ্র শুভঙ্করের জয় হইতেছে। শ্লোকে তিন জন পূর্ব্বপুরুষের নাম আছে।

শ্রীদেবকীনন্দন-রাজশেখরৌ সুষেণ-দামোদরকৌ সহোদরৌ।
এষাং মদীয়াঙ্গভুবাং চতুর্ণাং হৃতে কৃতি: বিত্ত রসেন পূর্ণাং ॥

অর্থাৎ দুই পত্নীতে গ্রন্থকারের ৪ পুত্র হয়—দেবকীনন্দন ও রাজশেখর, সুষেণ ও দামোদর। ইহাদের জন্যই এই রসপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়। সুতরাং লক্ষ্য করিতে হইবে গ্রন্থকার বার্দ্ধক্যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

অপুনর্ভব এবাস্তু ভবশ্চেদিতি জগ্রহু:।
"লাহাড়ীয়"-কুলে জন্ম কবিতা-হরিভক্তয়: ॥

অর্থাৎ কবিতা ও হরিভক্তি নামক দেবতা "লাহাড়ীয়" বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন এই ভাবিয়া, যদি জন্মই হয় আর যেন পুনর্জ্জন্ম না হয়। বুঝা যায় এই বংশে অবিচ্ছিন্নধারায় বহু কবি ও বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অত:পর দুই শ্লোকে গ্রন্থে কোন কোন স্ফুট কিম্বা অপর বস্তুর লক্ষণাদি কেন পরিত্যক্ত হইল তাহার কারণনির্দ্দেশ আছে। তৎপর গ্রন্থকারের কৃতবিদ্যতাসূচক শ্লোক যথা,

ব্যাকার-স্মৃতি-কাব্য-কোষ-ভরতালঙ্কার-তর্কাগম-
জ্যোতি:পিঙ্গল-নাটক-প্রহসন-ক্রীড়ামৃতাদীশ্বর:।
যো দ্বৈপায়নবর্ণিতেঽমৃতকথোদ্গারে নিমগ্নান্তর:
স শ্রীমানকরোৎ শুভঙ্করকবি: সঙ্গীতদামোদরম্ ॥

অর্থাৎ কবি শুভঙ্কর ব্যাকরণাদি ১৩টি শাস্ত্রের চর্চ্চায় (পার্ব্বতীতে শিবের ন্যায়) রত ছিলেন। তৎপর রচিত গ্রন্থদ্বয়ের নাম :

সঙ্গীতদামোদর-হস্তমুক্তা-বলী সুধাসেবনমেব সেবি:।
সঙ্গীতশাস্ত্রৈরপরৈস্তৈ: কিমন্যৈর্যথা বিমুক্তেষু পুলাকসিক্থৈ: ॥

অর্থাৎ গ্রন্থদ্বয়ে যে অমৃত সঞ্চিত হইল তাহাই নির্বিঘ্নরূপ, তাহাতে তৃপ্ত ব্যক্তির নিকট অন্য সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রয়োজন নাই ভুক্তব্যক্তির নিকট পোলাও যেমন নিরর্থক। অত:পর দুই শ্লোকে সঙ্গীতদামোদর গ্রন্থের প্রশস্তি ও খ্যাতিপ্রার্থনা আছে। গ্রন্থের শেষ পুষ্পিকা, "ইতি শ্রীলশুভঙ্করকৃতং সঙ্গীত-দামোদরং সমাপ্তং।"

ইংরেজশাসনে পাশ্চাত্যপ্রভাবের একটি কুফল বাংলা

দেশে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে, পূর্ব্বপুরুষের নামকীর্ত্তনে ও কীর্ত্তিখ্যাপনে অবজ্ঞা। এই শোচনীয় অবজ্ঞার ফলে অদ্য প্রায় ১০০ বৎসর মধ্যে ঘটকসম্প্রদায় ও তাঁহাদের কুলপঞ্জী-সমূহ লোপ পাইয়াছে। শুভঙ্করের উপরিধৃত পরিচয় অতি সামান্য চেষ্টায় বারেন্দ্র শ্রেণীর মুদ্রিত ও হস্তলিখিত সমস্ত কুল-পঞ্জী হইতে যথাযথ উদ্ধার করা যায় এবং তদ্দ্বারা অবি-সংবাদিতরূপে তাঁহার অভ্যুদয় কালও নির্ণীত হয়। আমরা সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছি। শুভঙ্করের উল্লিখিত "লাহাড়ীয়"-কুল সুপ্রসিদ্ধ বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন "লাহিড়ী"-বংশই বটে। এই বংশের আদি কুলীন বল্লভাচার্য্য বিখ্যাত সামাজিক নেতা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর কন্যা লীলাবতীকে বিবাহ করেন (নগেন বসু: বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, পৃ. ৫১)। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র "কেশাই গেলেন নকৈড়" (যাদব চক্রবর্ত্তী: কুলশাস্ত্রদীপিকা, ২য় সং, ১৩১৩, পৃ. ১৬৪)। কেশাইর পুত্র শ্রীনারায়ণ "তস্য নাম খেখাই" (হস্তলিখিত পুথি), তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র "আনুরাই" অর্থাৎ অনিরুদ্ধ (নগেন বসু, ঐ, পৃ. ৬৭)। তজ্জ্যেষ্ঠপুত্র "শ্রীধরাই", তৎপুত্র "বাপি গদাই পক্ষে নরসিংহ সহদেব কামদেব, অন্য পক্ষে শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী, আর পক্ষে কোকাই" (হস্তলিখিত লাহিড়ীকুলের ব্যাখ্যা, ২।২ পত্র)। অর্থাৎ শুভঙ্করের পিতা শ্রীধরের ৪ পত্নী ছিল, তৃতীয় পত্নী সুভদ্রার একমাত্র পুত্র শুভঙ্কর। শুভঙ্করও প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন—"কালির দাগ" অবসাদ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় (নগেন বসু, পৃ ৭১-২)। শুভঙ্করের ৪ পুত্রের মধ্যে কুলপঞ্জীতে ৩ পুত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—শেখর, দুর্ল্লভ, দামোদর (কুলশাস্ত্রদীপিকা, পৃ. ১৬৬)। শেখর অর্থাৎ রাজ-শেখরের পৌত্র গঙ্গাদাসের নামে "তের আনি" অবসাদ (নগেন বসু, পৃ. ৮৩) এবং তৎপুত্র মহেশের নামে "মুদাখানী" অবসাদ হইয়াছিল (ঐ, পৃ. ৮৭)। মহেশের পুত্র শিবনারায়ণ পর্য্যন্ত কুলপঞ্জীতে নাম পাওয়া যায়। লাহিড়ী বংশের এই ধারা এখনও বিদ্যমান আছে কিনা অনুসন্ধানযোগ্য।

শুভঙ্করের অভ্যুদয়কাল: উক্ত বংশ পরিচয়ের আলোচনা দ্বারা শুভঙ্করের অভ্যুদয়কাল ও গ্রন্থরচনাকাল সহজেই নির্ণয় করা যায়। প্রাক্-শিরোমণি যুগের বিখ্যাত নৈয়ায়িক "প্রগল্ভাচার্য্য" (যাঁহাকে সকলেই, এবং বাংলার মনীষীগণও এতকাল "মৈথিল" বলিয়া ধরিতেছিলেন) স্বরচিত খণ্ডনখণ্ড-খাদ্যের টীকার প্রারম্ভে শুভঙ্করের ভাষার সহিত আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য দেখাইয়া বংশের নাম ও পিতার নাম উল্লেখ করিয়া-ছেন:

যস্মিন্ দেবা অপি সুরপুরীবাসমাস্বাদয়ন্তো
ধন্যাঃ স্মঃ কিং বয়মিতি জনিং সাদরং কাময়ন্তে।
"লাড়ী"বংশে কলুষরহিতে তত্র পুণ্যপ্রভাবাৎ
ধীরঃ "শ্রীমন্নরপতি-মহামিশ্র"-বর্য্যো বভূব॥

অর্থাৎ (প্রগল্ভের পিতা) নরপতি মহামিশ্র পুণ্যবলে সেই "লাড়ী" বংশে জন্মিয়াছিলেন, যে বংশে অমরাবতীতে বাস করার সুখ আস্বাদন করিয়াও দেবতারা "আমরা কি ধন্য হইব?" এই ভাবিয়া সাদরে জন্ম কামনা করেন।

এই মহামিশ্রের পিতা "মাধাই" (অর্থাৎ মাধব) শুভঙ্কর জনক শ্রীধর কবিচক্রবর্ত্তীর পিতা অনিরুদ্ধের সহোদর দ্বিতীয় ভ্রাতা ছিলেন এবং প্রগল্ভের মাতা "জাহ্নবী" মহামিশ্রের দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় পত্নী ছিলেন (নগেন বসু, পৃ. ৮১, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৭, পৃ. ৭১-৭৩)। সুতরাং শুভঙ্কর ও প্রগল্ভাচার্য্য ভ্রাতৃসম্পর্কিত ও সমবয়স্ক ছিলেন নিঃসন্দেহ। প্রগল্ভাচার্য্য মৈথিল শঙ্করমিশ্রের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন (সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৭, পৃ. ৭৫)। আমরা সার্ব্বভৌমের জন্মকাল ১৪৩০-৪০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে অনুমান করিয়াছি (ঐ, ১৩৫৩, পৃ ৯)। তদনু-সারে প্রগল্ভাচার্য্যের জন্ম ১৪১৫-২৫ সন মধ্যে অনুমান করিয়া তাঁহার গ্রন্থরচনাকাল ১৪৫০-৭৫ সন মধ্যে স্থাপনীয় (ঐ, ঐ, পৃ. ১১)। প্রগল্ভের পিতা "ন্যাসপ্রকাশ" নামক ব্যাকরণ-টীকার রচয়িতা মহাপণ্ডিত নরপতি মহামিশ্রের অভ্যুদয়কালও ১৪০০-৫০ সন মধ্যে আমরা নিরূপণ করিয়াছি (পুরুষোত্তমের পরিভাষাবৃত্তি প্রভৃতি, রাজশাহী সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ. ১৬)। প্রগল্ভের ভ্রাতৃসম্পর্কিত ও সমবয়স্ক শুভঙ্করের জন্ম ১৪১৫-২৫ সনে ধরিলেও শেষ বয়সে গ্রন্থ রচনা করায় তাঁহার রচনাকাল ১৪৭৫-১৫০০ সনের মধ্যে স্থাপন করিতে হইবে। শুভঙ্করের গ্রন্থে 'প্রেম'-রসের উল্লেখ থাকিলেও তাহা 'বৎসল'-রসের নামান্তররূপে ধরা হইয়াছে, গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গোস্বামী-গণ যে "উজ্জ্বল"-রস স্থাপনা করেন, তাহা শুভঙ্করের অজ্ঞাত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া প্রগল্ভ ও শুভঙ্করের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ বল্লভাচার্য্যের শ্বশুর সুবিখ্যাত উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী ও তদীয় সহকর্ম্মী কুল্লূকভট্ট প্রভৃতি খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর প্রথম পাদে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ শতাব্দীর ৩য় ও ৪র্থ পাদে (১২৫০-১৩০০ সন) কর্ম্মতৎপর ছিলেন নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাহার পরেও নহে পূর্ব্বেও নহে। ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে উক্ত প্রগল্ভাচার্য্যেরও প্রকৃত নাম ছিল "শুভঙ্কর" (সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৭, পৃ ৭০-১)। উপযুক্ত ভ্রাতার সহিত বিরোধাশঙ্কায় বোধ হয় প্রগল্ভ নামই অধিক প্রচারিত করা হইয়াছিল। প্রগল্ভের বংশ এখনও নানাস্থানে বিদ্যমান আছে।

বাঙালীর আত্মবিস্মৃতি যদি শোচনীয় হয় বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণদের আত্মবিস্মৃতি অধিকতর শোচনীয়। মহামিশ্রের "ন্যাসপ্রকাশ", প্রগল্ভরচিত নব্যন্যায়ের নানা গ্রন্থের উপরি টীকা (যাহা হইতে ৺কাশীধামে একশতাব্দী যাবৎ নব্যন্যায়ের একটি পৃথক্ সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল) এবং শুভঙ্করের "সঙ্গীত-দামোদর" ও "হস্তমুক্তাবলী"—একটিমাত্র বারেন্দ্র-পরিবারের এই বরণীয় অবদান বাংলার শিক্ষিত সমাজ এতকাল পরের জিনিস বলিয়া স্বকীয় ভাণ্ডারে গ্রহণযোগ্য মনে করে

নাই। মিথিলার শিক্ষিত সমাজ শুভঙ্করকেও মৈথিল বলিয়া দাবি করিবেন (S. N. Sinha : Hist. of Tirhut, 1922, p. 172), তাহা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অতঃপ্রাদেশিক শান্তিকামনায় আমাদের অকাট্য দাবীও এ সময়ে উত্থাপন করা অনুচিত বলিয়াই হয়ত কোন কোন বাঙালী মনীষী মন্তব্য করিবেন!

হস্তমুক্তাবলী : অভিনয়শাস্ত্রের এই গ্রন্থটি বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। নেপালরাজ্যের গ্রন্থশালায় ইহার প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (বঙ্গাক্ষরে লিখিত, পত্রসংখ্যা ৪২)। নেপালাধিপতি জগজ্জ্যোতির্ম্মল্লদেবের (১৬১৭-৩৩ খ্রী:) দৌহিত্র অনন্তের জন্য "ঘনশ্যাম" নামক পণ্ডিত হস্তমুক্তাবলীর এক বিস্তৃত টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহারও প্রতিলিপি উক্ত গ্রন্থশালায় আছে (পত্রসংখ্যা ২৬৩, লিপিকাল ৭৯৫ নেপালাব্দ অর্থাৎ ১৬৭৪ খ্রী:। H. P. Sastri : Darbar Lib. Cat., 1905, pp. 270-73 দ্রষ্টব্য)। রাজদরবারে এই গ্রন্থের সমাদর লাভ স্বাভাবিক। নবদ্বীপাধিপতি রাজা রাঘব রায় (১৬২৫-৭৬ খ্রী:) স্বয়ং বিদ্বান্ এবং বিদ্বৎসেবী ছিলেন। তিনি "হস্তমুক্তাবলী" অবলম্বন করিয়া "হস্তরত্নাবলী" নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গাক্ষরে লিখিত ইহার প্রতিলিপি (পত্র সংখ্যা ৪৩) এখন অক্স্‌ফোর্ডে রক্ষিত আছে (Aufrecht : Oxf. Cat, pp. 201-2)। গ্রন্থারম্ভের চতুর্থ শ্লোকটি উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীহস্তমুক্তাবলীকৃৎ-প্রবন্ধে ভূয়ো যদুক্তান্ বিষয়ান্ ববন্ধ।
শ্রীরাঘবক্ষোণিপতিস্তদেতাং শ্রীহস্তরত্নাবলীমাতনোতি॥

রাজা রাঘব অভিনয় সম্বন্ধেও একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিলেন। ইহার একটি প্রতিলিপি আমরা নবদ্বীপে পরীক্ষা করিয়াছিলাম (নবদ্বীপ এংলো-সংস্কৃত পাঠাগারে রক্ষিত ২৪৩ সংখ্যক পুথি, পত্রসংখ্যা ৩১—গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের নাম নাই)। শেষাংশ এই :—"ইতি সর্ব্বাভিনয়নিরূপণং।

ব্রাহ্মণ্যমূর্ত্তিঃ কুমুদেন্দুকীর্ত্তিঃ, শ্রীরাঘবো রায় ইতি ক্ষিতীশঃ।
জীয়াৎ স দীর্ঘং বিজিতারিবর্গো গ্রন্থঃ সমাপ্তোঽয় যদাজ্ঞয়া ময়া॥
শ্রীরস্তু।"

হস্তমুক্তাবলী আসামে মুদ্রিত হইতেছিল—Journal of Assam Research Saciety Vol. VIII-IX-এ মাত্র ১১৩ শ্লোক এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে। মিথিলায়ও হস্তমুক্তাবলীর পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে (Mithila mss. Vol. II pp. 170-2), তন্নিমিত্তই শুভঙ্করের উপর মিথিলার দাবী উঠিয়া থাকিবে। গ্রন্থের শেষ শ্লোকে গ্রন্থকারের প্রার্থনা অনেকাংশে সার্থক হইয়াছে। শ্লোকটি এই—

কীর্ত্তির্দিগন্তবিশ্রান্তা পুত্রপৌত্রেষু * * *।
সর্ব্বলোকানুরাগশ্চ নৃপচিত্তে সদাস্থিতিঃ॥

আরম্ভের চারিটি শ্লোক ব্যতীত সমগ্র গ্রন্থই সরল অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত। সঙ্গীতদামোদর এক সময়ে পূর্ব্বাঞ্চলে অতি প্রামাণিকগ্রন্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, এইরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়। কোচবিহারের শিববংশীয় রাজা মল্লদেব নরনারায়ণ অতি বিদ্বৎসেবী ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে (১৫৫৫-৮৭ খ্রী:) তৎপ্রদেশে সংস্কৃতচর্চ্চার যেরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল পূর্ব্বাঞ্চলে তাহার তুলনা হয় না। মল্লদেবের ভ্রাতা যুবরাজ শুক্লধ্বজের আদেশে "সদর্পকন্দর্প" নামে কামশাস্ত্রের একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থশেষের সমাপ্তিশ্লোক ও পুষ্পিকা এই—

"আজ্ঞামবাপ্য বসুধাধরবন্দ্যাৎ "শুক্লধ্বজ"-
ক্ষিতিপতের্যুবরাজ।
ব্যক্তীকৃতং সকলমপ্রকতপ্রসাদ (যয়া) ন্বিতায়্য কৃতিনো
নমু ভূষয়ন্ত॥"

"ইতি মহামহোপাধ্যায়-শ্রীভবানন্দঠাকুরবিরচিতে সদর্পকন্দর্পে পঞ্চমো বাণঃ সমাপ্তঃ।"

(কলিকাতা রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পুথির পৃ. ২৩-২৪ দ্রষ্টব্য)

গ্রন্থকার কামশাস্ত্রে কৃতবিদ্য ছিলেন এবং বহুতর প্রাচীন গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থটিকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছেন। আমরা একটি বর্ণানুক্রমিক প্রমাণপঞ্জী সঙ্কলন করিয়া দিলাম—মোগল-পাঠানের সংঘর্ষকালেও ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে নিভৃতে বসিয়া ভবানন্দ ঠাকুর কি কি গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন আমরা বিস্মিতচিত্তে জানিতে পারিব।

অমরু। আচার্য্য। কণ্ঠাভরণ। কথাসংগ্রহ (কামকবিকল্পহারো বিদ্যাপতিঃ কথাসংগ্রহে, পৃ. ২)। কামদীপিকা। কাব্যপ্রকাশ। গীতগোবিন্দ। গুণপতাকা। ঘোটকমুখ। জ্যোতীশ্বর। তাৎপর্য্যটীকা। দামোদরভট্ট। দামোদরে। বসন্তবিশ্বরৎ (পৃ ৯)। নাগরসর্ব্বস্ব। নাট্যলোচন। নারদ ("ব্রহ্মা-নারদ-বিরিঞ্চি তুম্বুরুকুক্কু-ভরতাচার্য্যপ্রভৃতীনাং মতং" পৃ. ৭)। নিবন্ধ। পঞ্চশায়ক। ভরত। ভানু। ভোজরাজ। মঞ্জরী। মদনোদয়। মালত্যাং ভবভূতিঃ। মূলদেব। রতিকন্দর্প। রতিরহস্য। রুদ্রট। বর্দ্ধমানচরণাঃ (পৃ. ১৫ নৈয়ায়িক)। বাৎস্যায়ন। বিদ্যাপতি। শারদাতিলক। শৃঙ্গারতিলক। শ্রীগর্গাচার্য্য। সঙ্গীতদামোদর। সারদা। স্মরতত্ত্বসর্ব্বস্ব। স্মরদীপিকা।

গ্রন্থের 'তৃতীয়বাণে' রসপ্রকরণে নিম্নলিখিত সন্দর্ভ উদ্ধৃত হইয়াছে (পৃ, ১১) তথাচ "সঙ্গীতদামোদরে"

শৃঙ্গারে চ রতিঃ স্থায়ী বীরে চোৎসাহসংজ্ঞকঃ।
ভয়ানকে ভয়ং ভাতি রৌদ্রে ক্রোধগুণোদয়ঃ॥
বীভৎসে চ জুগুপ্সা স্যাৎ করুণে শোক উচ্যতে।
অদ্ভুতে বিস্ময়োনাম শান্তে শান্তিসমুদ্ভবঃ॥
হাস্যে হাস ইতি স্থায়িভাবা এষু রসেষমী।

স্থায়িভাবের গণনা সাহিত্যদর্পণাদি প্রাচীনতর গ্রন্থের পরিবর্ত্তে শুভঙ্করের অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত

হওয়ায় বুঝা যায় শুভঙ্কর তৎকালে পরমপ্রামাণিকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এবং হাস্যরসের বর্ণনাকালে সঙ্গীতদামোদর গ্রন্থে শুক্লবর্ণ বস্তসমূহের উৎকৃষ্ট পরিগণনামধ্যে শুভঙ্কর স্বকৃত-গ্রন্থের যে উল্লেখ করিয়াছেন—"হস্তমুক্তাবলীকর্তুরিয়ং কবিমুদে কৃতিঃ" (৪।১২)—তাহাও সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছিল। বলা বাহুল্য হস্তমুক্তাবলী সঙ্গীতদামোদরের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

পরিশেষে আমরা শুভঙ্কররচিত সঙ্গীতদামোদর গ্রন্থের সহিত লক্ষ্মীধরসূনু চতুর-দামোদর রচিত সঙ্গীতদর্পণ গ্রন্থের পার্থক্যবিষয়ে অবহিত হইব। সঙ্গীতদর্পণকার কল্লিনাথের পরবর্ত্তী এবং সম্ভবতঃ শুভঙ্করেরও পরবর্ত্তী এবং ভিন্নদেশীয়। গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের প্রায় অভিন্ন নাম এখানে ভ্রান্তি উৎপাদন করিতে পারে।

রবীন্দ্রসংলাপ কণিকা

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য

১

"শাস্ত্রী মশায়ের মীনাশন!"

তখন আমি কাশীতে। ছাত্রাবস্থা। এক দিন বসিয়া আছি, হঠাৎ মনে হইল ব্রাহ্মণের মাছ-মাংস খাওয়া ঠিক নহে। সঙ্গে-সঙ্গে ছাড়িয়া দিলাম।

শান্তিনিকেতনে আসিবার কয় মাস পরেই আমার পেটের অসুখ হয়। বহু দিন হইলেও ইহা আর ভাল হইতে চায় না। আমার পরের "ফ্যামিলী ফিজিশিয়ন" গুরুদেব আমাকে মাছ খাইবার জন্য বলিতে লাগিলেন। কিন্তু আমার মন তাহাতে রাজি হইতেছিল না। এদিকে অসুখটাও বাড়িতেছিল বৈ কমিতেছিল না। শেষে আমার পরাজয় হইল। গুরুদেবের সঙ্গে আমার এই একটা সর্ত্ত হইল যে, তাঁহার কথায় আমি এক মাস মাত্র মাছ খাইব। যদি ইহাতে অসুখ সারে তবে আরো কিছু দিন খাইব। অন্যথা সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করিব। গুরুদেব ইহাতে খুব খুসি হইলেন। আমি মাছ খাইতাম না, পরে খাইতে যাইতেছি, ইহা লইয়া তখনকার ক্ষুদ্র আশ্রমটির মধ্যে সকলেরই বেশ একটা কৌতুকের সৃষ্টি হইল। ইহার মধ্যে বেশী উৎসাহ ছিল স্বয়ং গুরুদেবেরই। তিনি বলিতে লাগিলেন "শাস্ত্রী মশায়ের মীনাশন হইবে, ইহার উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই।" নিজেই তাহা করিলেন। ব্যবস্থা হইল, প্রতিদিন দিনে ও রাত্রে এক-একটি মাগুর মাছের ঝোল। ইহার ভার দেওয়া হইয়াছিল, বোধ হয়, আমাদের সেই সময়ের আশ্রমের কর্ম্মচারী ক্ষুদিরামবাবুর উপরে, এবং ইহা ঠিক মত চলিতেছে কি না, তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন স্বয়ং গুরুদেব। এক মাসে ষাটটি মাগুর মাছের জীবন গেল, কিন্তু তাহাতে আমার জীবনের কোন কিছু ভাল হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। আমি গুরুদেবকে ইহা জানাইয়া সর্ত্ত-অনুসারে উহা সঙ্গে সঙ্গেই বর্জন করিলাম। তাহার পর আমার নিরামিষ আহার অব্যাহত আছে। আমি মনে করি ইহাতে আমি খুব ভাল আছি।

নিরামিষ আহারের আর একটা গুণ আমার মনে হয়। যখন মাছ খাইতাম তখন এক দিন তাহা না থাকিলে মনটা কেমন করিত, ভাল লাগিত না। কিন্তু তাহা বর্জন করিবার পর ভুলেও কখনো সেজন্য আমার মনে ঐ অস্বস্তিভাব আসে না। শাস্ত্রে পড়িয়াছি, কামনাই হইতেছে বন্ধন, অন্য বন্ধন নাই—"কামবন্ধনমেবেদং নান্যদস্তীহ বন্ধনম্।" এ যেমন ছোট বন্ধনের সম্বন্ধে তেমনি বৃহৎ বন্ধনেরও সম্বন্ধে।

পরে আমি দেশী ও বিদেশীদের লেখা নিরামিষ আহারের অনুকূলে ছোট-খাট অনেক বই পড়িয়াছি। এই সমস্ত বই-এর কোন-কোন খানিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখান হইয়াছে যে, মানুষ মাংসাশী (carnivorous) জীব নহে, ফলাশী (frugivorous)। একখানি পুস্তিকায় পড়িয়াছিলাম যে, বৈজ্ঞানিকেরা তো বহু বিষয় বিচার করেন, কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই বিচার না করিয়াই আহার করেন, যাহা ভাল লাগে তাহাই তাঁহারা খান।

২

কাছে বসা

আমি গুরুদেবের কাছে প্রায়ই সন্ধ্যার সময় যাইতাম। গুরুদেবও প্রায় সেই সময়ে রাত্রির আহার গ্রহণ করিতেন। তিনি খাইতেন, আমি কাছে বসিয়া গল্প করিতাম। এক দিন তাঁহার কাছে গেলেই তিনি বলিলেন "শাস্ত্রী মশায়, আজ আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার খুব কাছে বসিতে পারেন।" তিনি কী বলিতে চাহিতেছেন, আমি বুঝিলাম। সেদিন তাঁহার খাদ্যের মধ্যে মাংস ছিল না।

গুরুদেব কখনো মাংস খাইতেন, কখনো বা অনেক দিন খাইতেনও না। কখনো কখনো খাদ্য সম্বন্ধে পরীক্ষাও করিতেন। কখনো কখনো কাঁচা খাদ্য খাইতেন। একটা

অদ্ভুত খাদ্যের কথা বলি। ঘিয়ের ময়ন দিয়া রুটি-লুচির কথা সকলেই জানেন, কিন্তু গুরুদেব কখনো কখনো রেড়ির তেলের ময়ন দিয়া করা রুটি খাইতেন। একদিন তিনি ইহা নূতন-নূতন খাইয়া কতই না ইহার প্রশংসা করিলেন। আমি কিন্তু এ পর্যন্ত ইহার স্বাদ গ্রহণ করি নি, করিবারও আশা রাখি না। কোন রসজ্ঞ পাঠক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আমি যেদিনকার কথা বলিতেছি সেদিন প্রশান্তবাবু কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। গুরুদেবের জন্য যে কয়খানি রুটি হইয়াছিল তাহা হইতে তিনি কিছু ভাগ পাইয়াছিলেন।

৩

মাংসাহার

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমিষ আহার নিষিদ্ধ। ইহা একখানি প্রস্তরফলকে খোদাই করা আছে। প্রথমে ইহা ঠিক পালন করা হইত, তারপর, যেমন হইয়া থাকে, ইহা উল্লঙ্ঘন করা হয়, বা আঙুলের আড়াল দিয়া পালন করা হয়। মাঝে মাঝেই ইহা লইয়া আশ্রমে বাদানুবাদ হইত। দেখা গিয়াছে, কখনো ইহা বন্ধ করা হইয়াছে, কখনো বা আবার চালান হইয়াছে। গুরুদেবের মন এ বিষয়ে দৃঢ় ছিল না। এক দিন কথা হইল, এই বিষয়ে একটা আলোচনা করিয়া কিছু স্থির করিতে হইবে। রাত্রে সভা হইবে। নিজ-নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য আমরা প্রস্তুত হইতেছি। আমি ছিলাম নিরামিষ-ভোজীর পক্ষে। সকলেই ভাবিতেছেন, সেদিন তুমুল তর্ক হইবে। কিন্তু গুরুদেব অতি শান্ত ভাবে চমৎকার মীমাংসা করিলেন। তিনি বলিলেন, আমিষ আহার ভাল কি মন্দ ইহা লইয়া তর্ক করিয়া কাজ নাই। যে হেতু আমাদের দেশে অনেকে ইহা চান না, সেই জন্য তাঁহাদের মনে যাহাতে কোন আঘাত না লাগে ইহাই ভাবিয়া আমাদের উহা ত্যাগ করাই উচিত। সকলে ইহা মানিয়া লইল। সেদিন যে রূপেই হউক জয়লাভ করিয়া আমি উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলাম।

ইহা লইয়া গুরুদেবের সঙ্গে আমার একাধিকবার তর্ক হইয়াছে। ইহা যে সব সময় খুব শান্ত ভাবে হইয়াছিল তাহা নহে। আমি যেন তাহাতে কিছু মনে না করি গুরুদেব ইহাও আমাকে বলেন।

আধুনিকদের মধ্যে অনেকেই ডিমকে নিরামিষ খাদ্যের অন্তর্গত মনে করেন। তাঁহারা আরো বলেন যে, তাহাতে জীবহত্যা করার পাপও হয় না। আমার মত ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি বলিতাম, যদি ডিম খাইলে জীবহত্যার পাপ না হয়, তবে ভ্রূণহত্যায় পাপ হয় না, ইহা বলিতে হইবে। যে সব ডিমে বাচ্চা হয় না সেই সব ডিমই খাওয়া হয়, তাঁহাদের এই যুক্তিরও মূল্য অতি অল্প। কারণ, এইরূপ বাছিয়া বাছিয়া ডিম আনা হয় না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শান্তিনিকেতনেই সেই সময়ে পাওয়া গিয়াছিল। এণ্ড্রুজ সাহেবের এক প্রিয় ও প্রাচীন বাবুর্চি ছিল, নামটি মনে আসিতেছে না। এণ্ড্রুজ সাহেব ঐ সময়ে "বেণুকুঞ্জে" থাকিতেন, পরে তিনি তাহা আমাকে থাকিবার জন্য দেন। একদিন দেখা যায় সেই ঘরে ঐ বাবুর্চি তাঁহার জন্য যে সব ডিম আনিয়াছিল তাহার মধ্যে একটি ফুটিয়া গিয়া বাচ্চা হইয়াছে।

আজকাল সেখানে এ প্রশ্নের কোন বালাই নাই।

৪

সন্ন্যাসগ্রহণের কল্পনা

যখনকার কথা বলিতেছি তখন আমাদের আশ্রমের আর্থিক অবস্থা বড় খারাপ। এ জন্য খুব ভাবনায় থাকিতে হইত। কিন্তু তাহা হইলেও, আশ্রমের দিক্ হইতে বলিতে হইলে বলা যাইতে পারে তাহাই ছিল সেখানে উৎকৃষ্ট কাল। আমরা শান্তিনিকেতনে বাস করিতাম। অর্থের চিন্তায় আমাদের মনে হইত, যদি আশ্রমে ১০০টি মাত্র ছাত্র হয় তবে আমাদের আর কোন অভাব থাকিবে না। কিন্তু পরে দেখা গিয়াছে, ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভাবও নানামুখে বাড়িয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক, একদিন গুরুদেবের সঙ্গে কথাকৌতুক হইতেছে; প্রসঙ্গক্রমে আশ্রমের আর্থিক অবস্থার কথা উঠিল। আমি বলিলাম 'একটা কাজ করুন। তা যদি করিতে পারেন, তবে আর কোন অভাব থাকিবে না। তা কেবল আশ্রমেরই নহে, আপনারও নহে, এই আমাদের সকলেরই। পরম সুখে আমাদের দিন যাইবে।'

'বলিয়া ফেলুন।'

'সেটা খুব সোজা। আপনি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। একটা কৌপীন আঁটিয়া যদি কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে একবার বসিতে পারেন, তবে আর ভাবনা কী? আপনার দাড়ি-চুল তো লম্বা-লম্বা আছেই। চেহারাখানাও সুন্দর। লোকে যখন জানিবে, রবিঠাকুর সন্ন্যাস লইয়াছে, কৌপীন আঁটিয়া, ছাই মাখিয়া দশাশ্বমেধে বসিয়াছে, তখন টাকাকড়ি ফল-মূল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর কথা কী, দেখিতে-দেখিতে শ্বেতপাথরের একটি মন্দির করিয়া তাহাতে আপনাকে স্থাপন করিবে।* সেখানে ভক্তদের শিষ্যদের ভিড় ঠেলা অসাধ্য হইয়া পড়িবে।'

'কিন্তু আমি যে, সংস্কৃত বচন ঝাড়িতে পারিব না।'

'সেজন্য চিন্তা কী? ক্ষিতি ও আমি আপনার চেলা

* আমি এইরূপ একটি ঘটনার কথা জানি

হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই থাকিব, থাকিতেই হইবে, অন্যথা ভক্তদের দানগুলি সামলাইবে কে? ক্ষিতির বপুখানিও তো স্বয়ংই একটি সন্ন্যাসীরই মত। তাহাকে বেশ মানাইবে। তা ছাড়া, আপনি মৌনী থাকিবেন। যাহা কিছু বলিবার-কহিবার থাকে আমরা দুই জনে তাহা করিব।'

'তা ভালই হইবে। আমি মৌনী থাকিয়া একটা আঙুল তুলিব, আর আপনারা তাহা দেখিয়া দুইটি আঙুল তুলিয়া উহার এটা সেটা যা হয় একটা ব্যাখ্যা করিয়া, সমবেত ভক্ত ও শিষ্য-মণ্ডলীকে তাক করিয়া দিবেন!'

আমাদের মনে করা ভাল, শত-সহস্র অ-রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেমন একটি মাত্র রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" হইয়াছে, শত-সহস্র ভণ্ডের মধ্যে একটি মাত্র সাধুর আবির্ভাবও তেমনি হইয়া থাকে।

৫

অনাবৃত স্থানে মৃত্যু

একদিন গুরুদেবের সঙ্গে কাশীর কথা হইতেছিল। কাশীর গঙ্গার ঘাটের সম্বন্ধে তিনি বলিতেছিলেন। তিনি বলিলেন 'দেখিলাম মাঝ গঙ্গায় ছোট একখানি নৌকায় একটি আসন্নমৃত্যু সন্ন্যাসীকে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া যাওয়া হইতেছে। নৌকাখানি তর-তর করিয়া চলিয়াছে। সন্ন্যাসী চিৎ হইয়া আকাশের দিকে মুখ করিয়া রহিয়াছেন।'

আমাদের সমাজে কাশীতে মৃত্যু, বিশেষতঃ মণিকর্ণিকায় মৃত্যু শ্লাঘনীয়।

গুরুদেব বলিতে লাগিলেন 'সন্ন্যাসীকে ঐ ভাবে লইয়া যাওয়া হইতেছে দেখিয়া আমাকে খুবই ভাল লাগিয়াছিল। মরণের সময় এইরূপই মুক্ত অনাবৃত আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকাই ভাল। চোখের সামনে যেন কোনরূপ আবরণ না থাকে। আমার মৃত্যু যেন এইরূপেই হয়। আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আমাকে ঘরের মধ্যে মরিতে দিবেন না।'

ঘরের মধ্যে মরিতে না দেওয়া আমাদের সমাজের রীতি।

গুরুদেবের মৃত্যুর সময়ে এই কথাটি কর্তৃপক্ষের কয়েকজনকে জানাইয়াছিলাম, কিন্তু কাজে ইহা হয় নি। তাঁহার ঐ অনুরোধ আমি রক্ষা করিতে পারি নি! তাঁহার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে ঐ সময়ে এত জনতা, এত ভিড় যে বলিবার নহে। কবির ন্যায় ব্যক্তির মৃত্যুতে সাধারণের যে সংযম, ধৈর্য, গাম্ভীর্য ও ভদ্রতা পালন করা স্বভাবতই কর্তব্য ছিল, তাহা বিন্দুমাত্রও দেখা যায় নি। ঐ উচ্ছৃঙ্খলতা এতদূর উঠিয়াছিল যে, তাঁহার চিতায় তাঁহার একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথ অগ্নিসংযোগ করিতে পারেন নি, যদিও তিনি কাছেই ছিলেন। পুত্রই পিতার চিতায় অগ্নিসংযোগ করিবেন ইহাই সামাজিক পদ্ধতি।

স্বাধীনতা-তীর্থে

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

আসিয়াছি পথপ্রান্তে।—থেমো না, থেমো না,
তীর্থযাত্রী, যাত্রা তব হয় নাই শেষ,
হে বিশ্রান্ত, বাকি আছে আরো কিছু ক্লেশ,
গতি শ্লথ কোরো না কো, হোয়ো না বিমনা।
বিচারের কাল নাই, নাই বিবেচনা,
বিদ্রূপ করেছে অন্তে, সয়েছ সে শ্লেষ,
তবু সে চলার ছন্দে আসে নি আবেশ,
কিছু পথ বাকি আজো,—মিটিবে কামনা।

গন্তব্যের সীমা এল, তবু উচ্ছৃঙ্খল!
মন্দিরের চূড়া ওই দেখা যায় হোথা।
ধৈর্য্য হারায়ো না, আজ হোয়ো না চঞ্চল,
সেথায় বিরাজ করে আমার দেবতা।
চেনো তারে, হে দিগ্‌ভ্রান্ত ব্যগ্র যাত্রীদল?
সে কোন্ দেবতা জানো, সে যে স্বাধীনতা!

শোন, শোন বিশ্ববাসী দেখেছি তাঁহারে,
দেখেছি সে মন্দিরের অপূর্ব্ব দেবতা!
প্রাঙ্গণে মিলেছে আসি অগণ্য জনতা
প্রবেশের অধিকার লভি' মুক্ত দ্বারে,
উত্তীর্ণ হয়েছে তারা পরীক্ষার পারে।
লুপ্ত হোক্ পথশ্রম, প্রতীক্ষার ব্যথা,
মোছ অতীতের গ্লানি, কোরো না অন্যথা,
ভোল ত্রুটি, নহ নত শৃঙ্খলের ভারে।

চেয়ে দেখ পূর্ব্বাকাশ নির্মেঘ, নির্ম্মল,
কোন্ বিভীষিকা পারে দেখাইতে ভয়?
এল দিন, এল দিন, হোয়ো না বিহ্বল,
চিত্ত হোক্ দ্বিধাহীন, হও সুনিশ্চয়।
আবার ভারত হবে আলোকে উজ্জ্বল,
শোন, শোন সে দেবতা দিব্য জ্যোতির্ম্ময়।



পরিমল গোস্বামী

প্রকাণ্ড সভায় মাঝে মাঝে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় সম্প্রতি ঘরোয়া বৈঠকেই আন্দোলনটা চালানো হচ্ছিল।

ধরণীকান্তের যুক্তি ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছিল। বহুদিন প্রবাসে বাস করেও বাঙালীত্বের অভিমান তার অতি প্রবল। নানা নির্যাতন সহ্য করেছে সে এজন্যে। সে চায় প্রবাসে থেকেও বাঙালী বাংলা ভাষায় কথা বলুক, বাংলা সাহিত্য বেশি ক'রে চর্চা করুক, বাংলার সংস্কৃতিকে আরও উজ্জ্বল করে তুলুক। বলা বাহুল্য অবাঙালীরা এটাকে বাঙালীর ঔদ্ধত্য ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারেনি, তারা বলে, ধরণীকান্তের এই বাঙালীত্ববোধ ভারতবর্ষের পক্ষেই বিপজ্জনক। কারণ সমস্ত ভারতবর্ষ যখন দিল্লী ভাষা এবং দিল্লী সংস্কৃতির অধীন হতে চলেছে তখন তার মধ্যে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কীলক প্রবেশ করালে দ্বিখণ্ডিত ভারত আরও কত খণ্ডে ভাগ হয়ে যাবে কে জানে।

কিন্তু এ সব কথার মধ্যে কোনও যুক্তি নেই। ধরণীকান্তর এ বাধা ঠেলে চলার উৎসাহ আছে।

সে দিন প্রবাসী বাঙালীদের আহুত সভায় সে এই কথাগুলো বলছিল—

"বাংলা সাহিত্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র, উন্নতও বটে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে যুগ এসে শেষ হ'ল, শুধু সেই যুগের হিসাব ধরলেও দেখা যায় বাংলা ভাষায় যে সাহিত্য রচিত হয়েছে তা পৃথিবীর যে-কোন সাহিত্যের সঙ্গে সমান আসন দাবি করতে পারে, এবং সে দাবি তার স্বীকৃতও হয়েছে এক দিক দিয়ে। কিন্তু একা রবীন্দ্রনাথের রচনার মধ্যে দিয়ে আমাদের এই গৌরব লাভ হলেও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা উদ্বুদ্ধ যুগে বাংলা ভাষায় যে উৎকৃষ্ট উপন্যাস, ছোট গল্প, কাব্য এবং নাটক রচিত হয়েছে তা ইউরোপে প্রচার না হলেও, বাঙালীর জাতীয় জীবনে এই উপলক্ষে যে সাহিত্যবোধ জেগেছে, বাঙালী বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সাহিত্যমূল্য যাচাই করার যে ক্ষমতা লাভ করেছে, তার সাহায্যে সে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে যে সেগুলোও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমপর্যায়ভুক্ত। আর এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকেই সার্থক করেছে। এ থেকে আমরা আর একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছি। সে হচ্ছে বাংলা ভাষা সম্পর্কে। আমাদের গল্প-উপন্যাস-কাব্য-নাটক বাংলা সাহিত্যকে যে গৌরব দান করেছে তাতে প্রমাণ হয় যে বাংলা ভাষাও এমন উৎকর্ষ লাভ করেছে যাতে তা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বাহন হবার উপযুক্ততা লাভ করেছে।

"কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এটাই শেষ কথা নয়। সম্প্রতি বাংলা ভাষায় শিল্প-দর্শন বিজ্ঞান-ইতিহাস বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে আহৃত বিষয়গুলিও অনুবাদ গ্রন্থরূপে বাংলা ভাষার উৎকর্ষ প্রমাণ করছে।

"কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এই যে সমস্ত ভারতবর্ষে বাংলাভাষীর সংখ্যা অন্তত সাত কোটি। অতএব বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার অন্যতম ভাষারূপে গ্রহণ না করার কোনও যুক্তি নেই। একাধিক ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়ার আইনত কোন বাধাও নেই, এবং সুবিধার দিক বিবেচনা

করে, সাত কোটি বাঙালীর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার দিক বিবেচনা করে, এবং বঙ্গ ভঙ্গের কৈফিয়ৎ না দেখিয়ে এ দাবি পূরণ করা উচিত। বিভক্ত বঙ্গের জন্যে বাঙালীত্ব বিভক্ত হয় নি, তা ছাড়া আমরা সবাই আশা করছি এই বিভাগ সাময়িক মাত্র, এবং ভবিষ্যতে সে কথা সবাই উপলব্ধি করে আবার আমরা এক সঙ্গে মিলব একথা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই করছেন।"

এ ভিন্ন আরও অনেক যুক্তি সে দেখাল। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে এই দাবির চাপ দিতে হবে গণসভার উপরে—উপস্থিত সবাই এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'ল। সবাই উৎসাহিত এবং উল্লসিত বোধ করল সভার সাফল্যে।

ধরণীকান্ত উঠে পড়ে লাগল তার স্বপ্ন সফল করতে। হিন্দি ভাষা সে খুব ভালই জানে, কিন্তু তবু সে অবাঙালীর সঙ্গে বাংলা ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা করে। হিন্দুস্থানীরা বাংলা-দেশে এসেও হিন্দি ছাড়ে না, ইংরেজরা আমাদের দেশে এসে ইংরেজী বলে, শুধু বাঙালী ঘরে বাইরে সর্বত্র বাংলা বলতে লজ্জা পায়। এ লজ্জার হাত থেকে সে সমস্ত বাঙালীকে উদ্ধার করবে এই তার ব্রত। এ ব্রত সে অনেক দিন গ্রহণ করেছে। কিন্তু পদে পদে বাধা। বাঙালীরাই অনেক সময় নিজেদের উদ্দেশ্য ভুলে যায়, অর্থাৎ আত্মসম্মান-বোধ হারিয়ে ফেলে।

ধরণীকান্ত সবাইকে বার বার বলেছে প্রবাসে থেকে হিন্দিভাষীদের মধ্যে বাংলা ভাষার প্রচার করতে, তাদের উপর ভাষার প্রভাব বিস্তার করতে। বাংলা শুনে শুনে যাতে অবাঙালীরা বাংলা ভাষাকে বিজাতীয় মনে না করে এ রকম আবহাওয়া গড়ে তুলতে, কিন্তু অনেকেই তার মত সাহস পায় না। অসুবিধা বোধ করে অনেকে এবং সেই অসুবিধা সহ্য করতে চায় না। বিদ্রূপ করে হিন্দুস্থানীরা। এ বিদ্রূপ অনেকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু তবু ধরণীকান্ত ধৈর্যের সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে, তার লক্ষ্য পথে এগিয়ে চলার সাধনা করে। বাংলাদেশের কোনো অপমান সে সহ্য করতে পারে না। বাঙালীকে কেউ ছোট করলে সে দপ করে জ্বলে ওঠে, তার মাথা ঘুরে যায়। এ জন্যে সে অনেকবার লাঞ্ছিতও হয়েছে অবাঙালীর হাতে। তার সভা আক্রান্ত হয়েছে কয়েক-বার। ভাষার ভিত্তিতে নতুন ক'রে প্রদেশ বিভাগ হওয়া উচিত এ কথার সহিংস প্রতিবাদ হয়েছে। একটা সভায় মারপিটও হয়ে গেছে।

প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে ধরণীকান্তের এই আন্দোলন অনেক দিনের হলেও ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে অবাঙালীর বাঙালী বিদ্বেষ কখনও এমন প্রবল আকার ধারণ করেনি। কিন্তু ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন ভারত বিভাগ হ'ল প্রদেশ বিভাগ হ'ল, তখন প্রাদেশিকতা নামক এক নতুন ধরণের উগ্র "ভাগডালিজম্" জাগতে লাগল অনেকগুলো প্রদেশে। ধরণীকান্তের মনেও ক্রমশ বৈরাগ্য জাগতে লাগল তার ফলে।

বাঙালী বিদ্বেষ সর্বত্র অবশ্য অহেতুক নয়। ধরণীকান্ত তা জানে। কারণ সব বাঙালী সব জায়গায় অবাঙালীর সঙ্গে খোলাখুলি বন্ধুত্ব করেনি, তাদের স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেক সময় অতি-অহঙ্কারে পরিণত হয়েছে এবং সে অনেক সময় অবাঙালীকে ছোট নজরে দেখেছে। কিন্তু তার জন্যে ভারত ইউনিয়নভুক্ত প্রদেশগুলির মধ্যে হঠাৎ এ রকম সঙ্কীর্ণতা জাগল কেন তা ধরণী বুঝতে পারে না। সে এসব ভাবতে গিয়ে আরও দমে যায়।

এমন সময় এক সমাজতন্ত্রীনেতা প্রচার করলেন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্বিভাগ আজগুবি কল্পনামাত্র, কারণ ভারত ভাগ হয়েছে, প্রদেশ ভাগ হয়েছে, এর পর যদি আরও ভাগ হতে থাকে ভাষার ভিত্তিতে তা হলে ভারতবর্ষের আর কোন আশা নেই।

ধরণী প্রথমে বেশ লজ্জা বোধ করল এ রকম যুক্তি শুনে। এ রকম নির্বোধ যে কোনো নেতা থাকতে পারে তা তার ধারণায় ছিল না। প্রদেশের জেলা অদলবদল করা আর প্রদেশ বহু খণ্ডে বিভক্ত হওয়া যাঁর যুক্তিতে এক, তিনি কি বিচার-বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে দুষ্টবুদ্ধির দ্বারা চালিত নন?

এই কথা কোনো নেতা সম্পর্কে ভাবতে গেলে লজ্জা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ধরণী লজ্জা পেয়ে পিছিয়ে যাবার পাত্র নয়। সে বরঞ্চ আরও নির্ভীক হয়ে উঠল তার মত প্রচারে। সে সমস্ত প্রবাসী বাঙালীকে ঐক্যবদ্ধ করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রাণপণে রক্ষার আবেদন প্রচার করে বেড়াতে লাগল। বঙ্কিম বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের ভাষার মানরক্ষা বাঙালী পৃথিবীর সর্বত্র করবে, কাউকে তার লজ্জা পাবার কারণ নেই।

এই ভাবে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ও বাধাকে অগ্রাহ্য ক'রে ধরণী এগিয়ে যেতে লাগল তার আদর্শপথে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার আসনে বসাতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরিষদে তার আবেদন গ্রাহ্য হ'ল না। একমাত্র হিন্দুস্থানী হ'ল রাষ্ট্রভাষা।

ধরণী প্রচণ্ড আঘাত পেল তার এই ব্যর্থতায়। রাগে ক্ষোভে অপমানে সে অস্থির হয়ে উঠল। ধরণী দ্বিধাগ্রস্ত হ'ল। সে ক্রমে বুঝতে পারল এ আন্দোলন শুধু প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে আর চলবে না। বাংলাদেশে গিয়ে সেখানে প্রচার চালাতে হবে। সমস্ত বাঙালীকে এই আন্দোলনে টেনে আনতে হবে। এ কথা মনে হওয়ার আরও কারণ এই যে বাংলাদেশ থেকে তার সমর্থক কোনো প্রতিধ্বনি সে এখনও পর্যন্ত কিছু শোনে নি।

কিন্তু বাংলাদেশে আসায় তার কিঞ্চিৎ বাধা ছিল। তার কর্মস্থল হ'ল প্রবাসে, সেখানে তার জীবিকা উপার্জন। সংসার



চালাতে হয় সেখানে। বাংলাদেশে এসে দীর্ঘ দিন থাকার দরকার হবে। কারণ এসে সপরিবারেই আসতে হবে, এবং তাতে বহুদিনের জন্তে প্রবাসের সংস্রব ত্যাগ করতে হবে।

এটা কঠিন কাজ। ধরণী ভাবতে লাগল।

কিন্তু এর পিছনে যে মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্যেরই জয় হ'ল। এই উদ্দেশ্য স্মরণ করে ধরণী শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে আসাই ঠিক করল। বাংলাদেশের, বাংলা ভাষার এবং বাঙালীর সংস্কৃতির এত বড় অপমান সে আর সহ্য করবে না। যারা সহ্য করেছে তারা নিজেদের ক্ষতি করেছে, তারা বাংলা দেশের ক্ষতি করেছে। তাদের অনেকে এখন আর বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে না, তাদের পরিবারের মেয়েরাও হিন্দি বলে এবং হুঁকো টানে। অনেকে কিছু কিছু বাংলা বলতে পারে কিন্তু তাদের উচ্চারণ বিকৃত। ধরণী অনেক দিনের চেষ্টায় এদের অনেকের মনে চেতনা-সঞ্চার করতে পেরেছে যে ভাষার পরাজয় মানেই জাতির পরাজয়।

ধরণীর প্রবাস ছেড়ে আসায় স্বভাবতই একটু দেরি হ'ল। এর মধ্যে একটি বছর কেটে গেছে। ১৯৪৮ সাল এসেছে। একটি বছর ধরে সে আঠার উনিশ বছরের প্রবাস বন্ধন একটু একটু করে ছিন্ন করল। কষ্ট হচ্ছিল খুবই, কিন্তু ধরণী কর্মী, সে কোথায়ও চুপ করে কেবলমাত্র ঘটনার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলতে পারে না। নিজ হাতে তার কিছু গড়ে তোলা চাই, নিজ হাতে তার পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন ঘটান চাই, নইলে সে বাঁচতে পারে না।

সুতরাং তার সকল দুঃখ সে তার সঙ্কল্পের দ্বারা অতি সহজে অতিক্রম করে গেল। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল ভবিষ্যতের দিকে।

সে চলেছে বাংলাদেশে যেখানে বাংলা কথায় বাংলা গানে সমস্ত আবহাওয়া মুখরিত।

কিন্তু একটি কথা তার মনকে বড় বিষন্ন করে তুলল।

বাংলাদেশ বড় অসহায়। সেখানে দুর্ভিক্ষ লেগে আছে বারো মাস। খাদ্য নেই, পরিধেয় নেই, আছে বন্যা, মহামারী আর ব্যাপক মৃত্যু। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের অন্য সব দেশ থেকেও যেন বাংলাদেশ একটু বেশি ভাগ্যহীন।

এই অভিশপ্ত প্রদেশে বাংলা-সংস্কৃতির আন্দোলন বৃথা হবে না তো?

তার একমাত্র ভরসা বাংলার সাহিত্যিকেরা। তারা দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে বসে দুঃখদৈন্যের গান গেয়েই তাকে অতিক্রম করে যায়।

ধরণীর মনে কিছু আশা জাগল। হয়তো সে সফল হবে, হয়তো দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত বঙ্গজননী তাকে স্থান দেবেন।

আপাতত তাকে সপরিবার তার কাকার বাড়িতেই উঠতে হবে। কাকার অবস্থা ভাল, কোনো অসুবিধা হবে না। পাঁচ বছর আগে কাকাও সপরিবারে ধরণীদের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন। রওনা হবার আগে সে খবর জানিয়ে দিল, এবং রওনা হয়ে 'তার' পাঠাল।

শরৎকালের এক আলোঝলমল প্রভাতে এসে পৌঁছল ওরা হাওড়া ষ্টেশনে।

দেখে খুশি হ'ল যে তার কাকা কাকীমা ও তাঁদের ছোট ছেলেমেয়েরা ষ্টেশনে এসেছেন ওদের অভ্যর্থনা করতে।

কাকা ও কাকীমা ওদের দেখে খুশি হয়ে এগিয়ে গেলেন ওদের কামরার দিকে।

কাকা বললেন, "রাস্তামেঁ কোই তকলীফ নহী হুঈ ?"

কাকীমা ধরণীর স্ত্রীকে বললেন, "যব তুম ইতনে লম্বে অর্সে বাদ বংগালমে আইহো, তো কুছ অধিক সময় তক য়হা রহো ন।"

ছোট ছেলে বলে উঠল, "ভৌজী, তুম্হারে গোদী মে চঢ়েঙ্গে।"

ধরণী খুব হেসে উঠল এদের হিন্দিতে কথা বলতে শুনে, বলল, "আমরা বাঙালীই আছি, হিন্দুস্থানী ব'নে যাই নি—বাংলাতেই বলুন।

কাকা হিন্দিতেই বললেন, "নহী শায়দ তুমলোগ নহী হুয়ে

পরন্ত হম্‌লোগ হয়ে হ্যাঁয়। অব্‌ হম্‌লোগ রাষ্ট্রভাষা মেঁ হী বাত্‌চীত্‌ করতে হ্যাঁয়।"

ধরণী স্তম্ভিত হয়ে প্রশ্ন করল, "কেন ?"

কাকা বললেন, "নহী কহনে সে অসম্মান হোতা হ্যায়।"

ধরণী কঠিন হয়ে উঠল। বলল "তা হোক আপনি বাংলায় বলুন।"

কাকা এদিক ওদিক চেয়ে চাপা গলায় বাংলা ভাষাতে বললেন, "বেশ, আপাতত বলছি।"

ধরণী গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল, "সবাই কি হিন্দি বলছে ?"

"শিক্ষিতেরা সবাই। ঐ দেখ না, বাংলা খবরের কাগজও কেউ বিশেষ পড়ে না। এক পয়সা দামের একখানা করে বাংলা কাগজ ছাপা হয়, কিন্তু দেখ, ইংরেজী কাগজগুলো সব হিন্দুস্থানীতে ছাপা হচ্ছে।"

ধরণী স্টলের দিকে চেয়ে দেখল, অমৃতবাজার পত্রিকার গায়ে দেবনাগরী ছাপ।

তার আর কথা বলার প্রবৃত্তি ছিল না। তবু জিজ্ঞাসা করল "বাংলা দেশের সাহিত্যিকেরা কি করছে ?"

"তারা সবাই রাষ্ট্রভাষায় লিখতে সুরু করেছে।"

ধরণী বলল, "কাকাবাবু, আপনাদের কষ্ট দিলাম ষ্টেশনে টেনে এনে। আমি আর যাব না।"

"সে কি কথা, যাবে না কেন ? সে হয় না"-- -ইত্যাদি বলে ওদের টানতে লাগলেন সবাই মিলে।

ধরণী অটল।

কাকা ঘণ্টাখানেক সাধাসাধি করেও ওদের সঙ্কল্পচ্যুত করাতে পারলেন না। ওরা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঠায় প্ল্যাটফর্মে বসে থেকে ফেরত গাড়িতে ফিরে চলে গেল পুরাতন প্রবাসে।

ইন্দোনেশিয়া ও তাহার মুক্তি-সংগ্রাম

শ্রীসত্যকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকস্থ উপনিবেশটি বিশ্বের সুসমৃদ্ধ উপনিবেশগুলির মধ্যে অন্যতম। উহা ওলন্দাজ-অধিকৃত। এরূপ ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত দেশের অধিকারী বলিয়া ওলন্দাজদের প্রতি জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলি বিশেষ ঈর্ষ্যান্বিত। ইহার কাঁচা মাল ও প্রাকৃতিক সম্পদ-আহরণ-লোভে উচ্চাকাঙ্ক্ষী জাপান সহজেই প্রলুব্ধ হইয়া পড়িল। যাতায়াত-ব্যবস্থা সহজসাধ্য থাকায় উহার ঐশ্বর্য্য অপহরণের লোভ বিদ্যুৎ-গতিতে বর্দ্ধিত হইল। জাপশক্তি যখন 'বৃহত্তর পূর্ব্ব-এশিয়া' গঠনের জন্য সংগ্রামে উদ্যত তখন ওলন্দাজেরা তিলমাত্র বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই। সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধশেষে ওলন্দাজেরা ইন্দোনেশিয়ার পটভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের অভিলাষানুরূপ কাজ করিতে লাগিল।

ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় বণিকদল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমেই এই সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিল। দুঃসাহসী ডাচ বণিক ও নাবিকগণ এই দ্বীপপুঞ্জেরই অন্তর্গত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মশলাদ্বীপ বা মলাক্কায় ছোটখাট ব্যবসায় আরম্ভ করিল। ইংরেজ-ডাচ বাণিজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং ডাচদের একচেটিয়া মশলা-ব্যবসায়ের ফলেই সুদূর প্রাচ্যে ইতিহাস-বিখ্যাত এমবোয়না (Amboina) হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। তারপর ব্রিটিশেরা ভারতে আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে আর ডাচরা প্রাধান্য লাভ করে ইন্দোনেশিয়ায়। হল্যাণ্ডের রাজধানী হেগ নগরে অবস্থিত ডাচ-মন্ত্রিগণের অধীনে ও তত্ত্বাবধানে একজন ডাচ-গবর্ণর-জেনারেল দ্বারা পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ শাসিত হইতেছে।

বিষুবরেখার প্রায় সমস্তত্রে এশিয়া হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত মালয় দ্বীপপুঞ্জ নামে যে সুদূরপ্রসারী দ্বীপমালা রহিয়াছে পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ তাহারই এলাকাভুক্ত। উহাতে সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলিবিস, বাঁকা, বিলিটন, বলী, লমবোক, সামবাওয়া, সোয়েমবা, ফ্লোরেস, টিমর, মলক্কা ইত্যাদি আরও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ রহিয়াছে, তদ্ভিন্ন নিউগিনির সুবিস্তীর্ণ ভূ-ভাগও ইহারই অন্তর্ভুক্ত। উহাদের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ-গুলিকে সুন্দা দ্বীপশ্রেণী এবং টিমর, মলাক্কা ও নিউগিনি প্রভৃতি লইয়া সমগ্র ভূভাগকে মালয়েসিয়া বলা হয়। এই দ্বীপশ্রেণী সুদূর প্রাচ্য ও অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকায় ইহার ভৌগোলিক অবস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে সহজেই একটা উচ্চ ধারণা হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী লণ্ডন হইতে পোর্ট ডারউইন হইয়া সিডনী পর্য্যন্ত যে বিমান-পথ আছে বিমানগুলি ঐ দিক দিয়া যবদ্বীপস্থ বাটাভিয়া হইয়া যাতায়াত করে।

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আয়তন সর্ব্বসাকুল্যে ৭৩০,০০০ বর্গমাইল। এই দ্বীপপুঞ্জ সুবিস্তীর্ণ মহাসাগরের উপর দিয়া প্রায় ৩০০০ মাইল বিস্তৃত। লিভারপুল হইতে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত যতটা দূরত্ব, মোটামুটি এই দ্বীপপুঞ্জেরও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত ততটা দূরত্ব ধরা যাইতে পারে। বোর্ণিওর উত্তর-পশ্চিম অংশের বৃহত্তম দ্বীপগুলিকে সুন্দা দ্বীপপুঞ্জ বলা হয়। এইগুলি ব্রিটিশ শাসনাধীন এবং তন্মধ্যে সারাবাক ও ক্রনি ব্রিটিশের আশ্রিত রাজ্য। এক জন শ্বেতকায় রাজা সারাবাকের এবং এক জন মালয়-সুলতান ক্রনির শাসনকার্য্য চালাইয়া থাকেন।

লণ্ডনস্থ সনদপ্রাপ্ত কোন একটি কোম্পানী দ্বারা ব্রিটিশের উত্তর-বোর্ণিও শাসিত হয়। কেবলমাত্র নিউগিনীর পশ্চিমাংশ ডাচদের অধিকৃত। টিমর দ্বীপটি ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজ উভয়ের শাসনাধীন। নিউগিনী যদিও এই পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের এলাকাভুক্ত তথাপি ইহা অষ্ট্রেলেসিয়ার একটি প্রাকৃতিক অংশ-মধ্যে পরিগণিত। ইহার স্বর্ণ, পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ আজিও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। ইহার অধিকাংশ স্থলভাগই নিবিড় বনভূমিসমাচ্ছন্ন। যুদ্ধের কল্যাণে ইহার কোন কোন অংশ আজ আর পূর্ব্বের মত অপরিজ্ঞাত নয় বটে, তবে অভ্যন্তর ভাগ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আজও জানা যায় নাই। ইহার অধিবাসিগণকে পাপুয়া বলা হয়। ইহাদের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রা-প্রণালী দৃষ্টে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা আদিম জাতি এবং ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখনও নরখাদক।

ইন্দোনেশিয়া সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ। উহা প্রাকৃতিক সম্পদে সুসমৃদ্ধ। উহার বন-সম্পদে আজিও কেহ হস্তক্ষেপ করে নাই। উহার সুবিস্তীর্ণ বনভূমি নানাপ্রকার কাষ্ঠে, বিশেষতঃ সেগুন ও বাহাদুরি কাষ্ঠে পরিপূর্ণ।



মানুষের মাথার চুল এবং পশুলোমশোভিত ঢাল ও বর্শাধারী ডায়াক যোদ্ধা

এই দেশটি খনিজ সম্পদেও ভরপুর। এখানে কয়লা, লোহা, টিন, নিকেল, ম্যাঙ্গানীজ, স্বর্ণ, গন্ধক, তাম্র প্রভৃতি ধাতব দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে এখানকার জমির উর্ব্বরতা এবং আবহাওয়ার কথা উল্লেখযোগ্য। কেননা এইরূপ আবহাওয়ার দরুনই এখানে রবার, তামাক, ধান, ইক্ষু, সিনকোনা-ছাল, সাগু, তুলা, শুষ্ক নারিকেল-শাঁস, শণ, মশলা, কফি, চা প্রভৃতি নানাবিধ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দ্রব্য প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইন্দোনেশিয়া কয়লা, লোহা, টিন, রবার, তেল, উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ প্রভৃতি শ্রমশিল্পের কাঁচা মালে



'প্রাউ' বা ডোঙা নৌকায় ডায়াক জেলের মৎস্য-শিকার

সমৃদ্ধ। সম্প্রতি এই দেশ পেট্রোলিয়ম উৎপাদকরূপেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও ভারতের বাজারে উহা প্রচুর পরিমাণেই বিক্রীত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব্ব বোর্ণিওর বালিক-পাপান তৈল-খনি এবং তারাকানের তৈল-খনিগুলি গত যুদ্ধের সময় হইতে বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়া প্রচুর টিন ও রবার-উৎপাদনকারী একটি দেশ। টিন প্রধানতঃ সিঙ্গাপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থ বাঁকা ও বিলিটন হইতে এবং কয়লা যবদ্বীপ ও বোর্ণিওর খনিগুলি হইতে উত্তোলিত হয়। যবদ্বীপে প্রচুর পরিমাণে উষ্ণমণ্ডলীয় কৃষিদ্রব্য উৎপাদিত ও সংরক্ষিত হয়। যবদ্বীপের পরেই সুমাত্রাকে উন্নত ধরণের কৃষি-সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসাবে ধরা যায়। সুমাত্রায় খনিজ দ্রব্যও বিস্তর। উহা উষ্ণমণ্ডলীয় ফসল প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করিয়া থাকে। মলাক্কা ও সেলিবিস দ্বীপপুঞ্জে লঙ্কা, জায়ফল, লবঙ্গ প্রভৃতি মশলা এবং সেলিবিসে কাষ্ঠ, স্বর্ণ, লৌহ, গন্ধক ও টিন প্রভৃতি খনিজদ্রব্য যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ইন্দোনেশিয়া শুধু উৎপাদনকারী দেশ নয়, উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্য্যনিবন্ধন উহা রপ্তানীও করিয়া থাকে। যদি ইহার সম্পদ যথাযথভাবে আহরণ করা যায় তবে বিশ্বের মধ্যে উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য রপ্তানির অঞ্চল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। বর্ত্তমানে যবদ্বীপ ছাড়া



বোর্ণিও দ্বীপের আদিবাসী ডায়াকদের বিবাহ-বাসরে গ্রামের সর্দার বরকন্তাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে

ইন্দোনেশিয়ার সমগ্র অঞ্চলের অনেকাংশ প্রায় অপরিজ্ঞাত এবং বহুবিধ উদ্ভিজ্জে সমাচ্ছন্ন। পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের শোষণকার্য্য সবেমাত্র সুরু হইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার স্বাভাবিক সুযোগ-সুবিধা যাহা আছে তাহা যদি পরিপূর্ণভাবে কার্য্যকরী করিয়া তোলা যায় তবে তাহার কৃষিসম্পদ শতগুণ বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। শাসন-ক্ষমতা নিজেদের হাতে পাইলে এবং উপযুক্ত মূলধনের ব্যবস্থা হইলে দেশলাই, রবার, তামাক, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি শ্রমশিল্পেও তাহাদের প্রচুর উন্নতি-সাধিত হইতে পারে।

যত দূর জানা যায়, ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে যবদ্বীপই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ধরণের দেশ। উহার সমীপবর্ত্তী মাদুরা প্রভৃতি দ্বীপ লইয়া উহার আয়তন প্রায় ৫০,০০০ বর্গ মাইল। উহার লোক-সংখ্যা ৫ কোটি। পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলির মধ্যে যবদ্বীপ অন্যতম। উহা আগ্নেয়গিরিসঙ্কুল দেশ। বহ্ন্যুৎপাত হইতে উহার উৎপত্তি। উহার উৎক্ষেপ হইতেই যবদ্বীপের সৃষ্টি ও আংশিক ক্ষয়ক্ষতি চলিয়া আসিতেছে এবং উহার উর্ব্বরতা তাহাতেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আদিম অরণ্যাদির অধিকাংশ পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং তাহাতে চাষ-আবাদ চলিতেছে। যব দ্বীপে যখন সর্ব্বপ্রথম মনুষ্যবসতি স্থাপিত হইল তখন উহার বহু আগাছা বিনষ্ট করা হয়। এখানে সারা বৎসর ধরিয়া প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। সাগরের আবহাওয়ার প্রভাবে এখানকার জলবায়ুর রুক্ষতা অনেকটা কমিয়া থাকে।

যবদ্বীপ ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরি-উৎক্ষিপ্ত মৃত্তিকা অতীব উৎকৃষ্ট ও উর্ব্বর। আবহাওয়ার স্নিগ্ধতা, মৃত্তিকার উর্ব্বরতা এবং অধিবাসিগণের শ্রমশীলতায় যবদ্বীপ দুনিয়ার একটি কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে। এখানে জাপানের মত ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য্য চলিতেছে। পাহাড়ের শীর্ষে ও পার্শ্বদেশে লাঙ্গল দিয়া চষিয়া মাটির ঢিবি তৈরি করা হয়; হঠাৎ বৃষ্টি হইলে উহা ধুইয়া নামিয়া যাইতে পারে না। এখানকার আবাদী জমিগুলি সাধারণতঃ ওলন্দাজ ও চীনাদের অধিকৃত। যবদ্বীপবাসীদের অধিকারে অতি অল্প পরিমাণ ভূমিই আছে। যবদ্বীপের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে রবার, ধান, তামাক, জনার, শুষ্ক নারিকেল-শাঁস, চা, সিনকোনা-ছাল, কফি, নীল, সাগু, চীনাবাদাম, শণ, গমজাতীয় দ্রব্য ও নানাবিধ ফল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই স্থানটি উষ্ণমণ্ডলীয় উৎপন্ন দ্রব্যের বিপুল ভাণ্ডার। উহা লোহা, কয়লা, টিন প্রভৃতি বহুবিধ খনিজ দ্রব্যের আগার। ইন্দোনেশিয়ায় গবাদি পশু যথেষ্ট পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু যবদ্বীপে ঐ সকল গৃহপালিত জীবজন্তুর মোটেই অভাব নাই।

ঐশ্বর্য্য ও সংস্কৃতি উভয়েরই জন্য যবদ্বীপের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। তাহার নিতান্ত অনুন্নত অংশগুলিতে পর্য্যন্ত যে ঘনবসতি ও বিস্ময়কর উন্নয়ন-ব্যবস্থা দেখা যায় তাহা ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপাবলীর অন্যত্র বিরল। জনবলই তাহার শ্রেষ্ঠবল। এই ঘন-বসতিপূর্ণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ৭ কোটি বা তদূর্দ্ধ সংখ্যক লোকের দুই-তৃতীয়াংশই এখানে বাস করে। যবদ্বীপবাসিগণ বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন হওয়ায় মালয়েসিয়া, মেলানেসিয়া ও পলিনেসিয়ার সমস্ত লোকের অপেক্ষা তাহারা অধিক পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ। কর্ম্মদক্ষ শ্রমিক এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। এই শ্রমশীলতা সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় সাধারণ ভাবে এবং যবদ্বীপে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, লোকসংখ্যা অনেক সময় জাতির সবলতার কারণ না হইয়া দুর্ব্বলতার কারণ হইয়া থাকে। পূর্ব্ব-ভারতীয় অপরাপর দ্বীপের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পার্থক্যই এই দ্বীপটির বিপদের কারণ হইয়াছে। যদি কোনপ্রকারে উহার অধিবাসিগণ ঐ বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারে তবে তাহারা যথেষ্ট উন্নতিলাভের সুযোগ পাইবে। উহার অধিবাসীদের স্থান-পরিবর্ত্তন, শ্রমশিল্পের উন্নতিসাধন, সমস্ত কর্ষণযোগ্য ভূমির চাষ-আবাদ ও সম্প্রসারণ, বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালীর প্রচলন, জনসংখ্যা-সমস্যার সমাধান প্রভৃতি কার্য্য সন্তোষজনক ভাবে করিতে পারিলে উহা উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিবে। যবদ্বীপের অবস্থিতি ইন্দোনেশিয়ার মধ্যস্থলে এবং বিশ্ববাণিজ্যের চৌরাস্তায় বলিয়া উহার প্রাকৃতিক সম্পদ সহজেই আহরণ ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরণ করা যায়। বড় বড় রাস্তা, রেলপথ ও তৎসহ বিস্তর খাল ও পয়ঃপ্রণালীর সংযোগ থাকায় এই দ্বীপটির সর্ব্বত্র



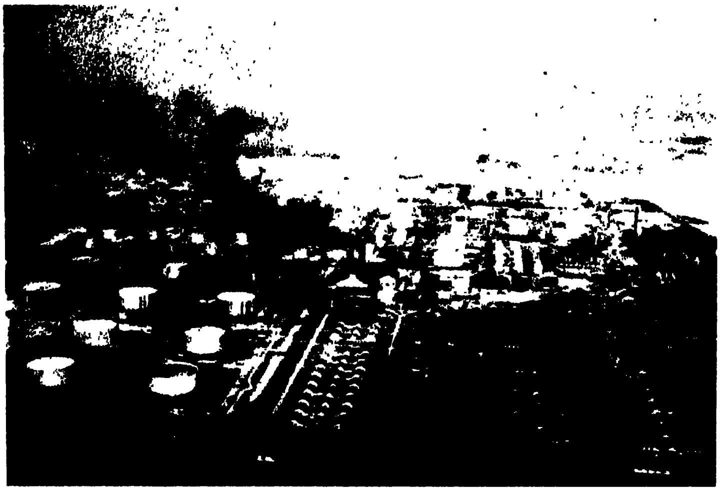
সুমাত্রার অন্তর্গত ডেলির রাজধানী মেডান। এখানে ডাচ রেসিডেন্সী এবং সুলতানের আধুনিক প্রাসাদ বিদ্যমান

যাতায়াতের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সমস্ত কারণে এবং ওলন্দাজদের শ্রমশীলতায় এই দ্বীপটি একটি বিশেষ কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে। তবুও সেখানে আরও অনেক কিছু করিবার আছে। অন্যান্য দ্বীপের কথা ছাড়িয়া দিলেও শ্রম-শিল্পের উন্নতির জন্য আবশ্যক কাঁচামাল চলাচলের সুবিধা, দক্ষ শ্রমিক, বাজার ও সমুদ্রপথের সান্নিধ্য থাকা সত্ত্বেও এই দ্বীপটি শ্রম-শিল্পে যথেষ্ট পিছনেই রহিয়া গিয়াছে; স্বাতন্ত্র্যই ইহার উন্নতির প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ সুমাত্রা প্রভৃতি কয়েকটি দ্বীপ খনিজ ও তৈল সম্পদে ইহা অপেক্ষা অনেকাংশে সমৃদ্ধ। কতকগুলি ছোট ছোট শিল্প-প্রতিষ্ঠান এখানেই অবস্থিত এবং ইন্দোনেশিয়ার এই অংশটিও জনবসতি পূর্ণ ও বিশেষভাবে সুসমৃদ্ধ। বিগত দশ বৎসরের অর্থনৈতিক অবনতির পরে এই সকল শিল্প, বিশেষতঃ বয়ন- ও চিনি-শিল্প এবং রবার, তামাক, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি কয়েকটি বড় শিল্পও বিশেষভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব এই সব শিল্প-প্রস্তুতিতে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। যুদ্ধের দরুণ ভাঙন, জাপানীদের সাময়িক অধিকার এবং আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা উহার শিল্পোন্নতির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলেও ভবিষ্যতে এখানে শ্রম-শিল্পের প্রচুর উন্নতির সুবিধা রহিয়াছে।

যবদ্বীপের অধিবাসীদের প্রধান পেশা কৃষিকার্য্য; অবশ্য কেহ কেহ শ্রমশিল্প, বিশেষভাবে হস্তশিল্পে নিযুক্ত। বহুসংখ্যক লোক মৎস্য-শিকারেও ব্যাপৃত। ব্যবসা-বাণিজ্য সাধারণতঃ আরব ও চীনাদের হাতে। ইন্দোনেশিয়াবাসীদের পরেই চীনারা এখানকার প্রধান অধিবাসী; এখানে তাহাদের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজার হাজার ইউরোপীয় ও ভারতীয় এখানে বাস করে। যুদ্ধের পূর্ব্বে এই জনবহুল প্রদেশটি হল্যাণ্ডের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য এবং তাহাদের শ্রমশিল্পের জন্য আবশ্যক কাঁচামালের বাজার-স্বরূপ ছিল। যবদ্বীপ তাহার নিজ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করিয়াও চিনি, চা, কফি, সিনকোনা-ছাল, রবার, শুষ্ক নারিকেল-শাঁস ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করিয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতের প্রয়োজনীয় চিনির অধিকাংশই এখান হইতে সরবরাহ হইত। সিনকোনা ছাল হইতে কুইনিন প্রস্তুত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর চাহিদা মিটায়—তাহার বেশীর ভাগই ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, বিশেষতঃ যবদ্বীপ হইতেই আসে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পরম শত্রু ম্যালেরিয়া দমনের অমোঘ ও মূল্যবান ঔষধ হইতেছে কুইনিন; উহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যথেষ্ট বিক্রীত হইয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রচুর কুইনিন আমদানী করিত। ঐ স্থান জাপানের হস্তগত হওয়ায় ভারত ইহা হইতে বঞ্চিত হয়। ঐ সময় স্থানীয় উৎপাদন অপ্রচুর হওয়ায় ভারতবাসীদের অপরিসীম কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। যুদ্ধকালীন প্রবল অর্থনৈতিক ভাঙনের দরুণ ইন্দোনেশীয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যে বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে আবার উহার উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। বর্ত্তমান সময়ে এবং কিছু দিন পরে এখানকার অধিবাসীরা ভারতের বাজারে যথেষ্ট উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহ করিতে পারিবে।

যদিও ভারতের মত যবদ্বীপের গ্রামগুলিতেই অধিকসংখ্যক লোক বাস করিয়া থাকে তথাপি অধুনা সেখানে অনেক শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। বৃহৎ নগরী বাটাভিয়া যবদ্বীপ এবং ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী ও প্রধান বন্দর। প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়া দেখিলে পূর্ব্ব-যবদ্বীপস্থ প্রধান বন্দর ও পোতাশ্রয় সুরাবায়ার স্থান বাটাভিয়ার পরেই। উহার অভ্যন্তরভাগস্থ বাণ্ডুং একটি বিখ্যাত নগরী ও পার্ব্বত্যনিবাস; সামেরাং এবং ম্যালেলং নামে আরো দুইটি প্রসিদ্ধ নগরী রহিয়াছে। ইহার অভ্যন্তরভাগে যোগজাকর্ত্তা ও সোয়েরাকর্ত্তা নামে আরও দুইটি অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগরী বিদ্যমান। দুই জন সুলতানের নাম হইতেই শেষোক্ত নগরী দুইটির নামকরণ হইয়াছে।

ইন্দোনেশীয়গণ মালয়-বংশ হইতে উদ্ভূত। তাহারা অপরাপর জাতির সংস্পর্শে যথেষ্ট সভ্য ও উন্নত হইয়াছে। আদিম মালয়ের অধিবাসিগণ হিন্দু ও অপরাপর জাতিদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া শ্রমশীল হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দোনেশীয়গণের



বাসীরা এখনও হিন্দু সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। এই দুইটি দ্বীপের অধিবাসিগণের অধিকাংশই হিন্দুধর্মের অনুগামী এবং হিন্দু আচার-ব্যবহারই তাহারা অনুসরণ করিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়া বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক সূত্রে আবদ্ধ ছিল। বলীদ্বীপে ও যবদ্বীপে যে সমস্ত ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন ও বিরাট দেবমন্দির রহিয়াছে তন্মধ্যে বোরো বুদুর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জাঁকজমকপূর্ণ। ইহা পৃথিবীর স্থাপত্য-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আগ্নেয়গিরি-সমুত্থিত বহু প্রস্তর কাটিয়া নির্ম্মিত ঐ মন্দিরটি এবং উহার খোদিত মূর্ত্তিগুলি সমগ্রবিশ্বের বিস্ময়-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

পালেমবাঙে তৈল উৎপাদন ও পরিশ্রুত করিবার কারখানা

সংস্কৃতি ও সভ্যতা হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত। যদিও তাহাদের অনেকেই মুসলমান ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া লইয়াছে তথাপি মূলতঃ যে তাহারা হিন্দুই ছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে অতিশয় গোঁড়া বা ভাবপ্রবণ নহে। কোনো কোনো দিক দিয়া মুসলমান সংস্কৃতির বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও সকলেই নিজেদের মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয় এবং মক্কায় তীর্থযাত্রী হইতে পারিলে গৌরব বোধ করে।

কৃষিকার্য্যে এবং কারুশিল্পেও ইন্দোনেশীয়দের দক্ষতা আছে। তাহারা সাধারণতঃ বাঁশের তৈরি গৃহে বাস করে এবং সাদাসিধা ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভাত ও মাছই তাহাদের প্রধান খাদ্য। ঐ দেশের অনেকগুলি দ্বীপে সাগুও খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। তাহাদের প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, তাহারা যুদ্ধপ্রিয় ও শক্তিশালী জাতি ছিল। তাহারা অতি শান্তশিষ্ট, সরল, পরিশ্রমী, দক্ষ নাবিক এবং মৎস্যশিকারী। মালয়, পলিনেশিয়া ও পাপুয়ার লোকদের চেয়ে তাহারা অধিকতর সভ্য ও উন্নত।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জের প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটু দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে যে বহু শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব এই সকল দেশে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন স্থান এবং কাম্বোজে গিয়া হিন্দুগণ বড় বড় রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ, মন্দির, ভাষা, আচার-ব্যবহার এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলী হইতে ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দু-কৃষ্টির প্রভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। অতীতের হিন্দু-সভ্যতার বহু চিহ্ন ইন্দোনেশিয়ার নানাস্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। যবদ্বীপের পূর্ব্বদিকস্থ দুইটি ক্ষুদ্র দ্বীপ, বলী ও লাম্বকের অধি-

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানদিগের আক্রমণের পর যবদ্বীপের ইতিহাসে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সূচনা হইল। ঐ সময়ের শেষের দিকে ওখানকার মোজাপাহিতের বৃহৎ হিন্দুরাজ্যের পতন এবং স্রিরিউইজোয়া ও মাতরম্ প্রভৃতি অপরাপর হিন্দু রাজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমান প্রভাব প্রসার লাভ করিল। এইরূপে বহু ছোটবড় রাজ্য গড়িয়া উঠিল। চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সেখানে যে হিন্দু ও বৌদ্ধপ্রভাব বিদ্যমান ছিল তাহা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল এবং তৎপরিবর্ত্তে মুসলমান-প্রাধান্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইল।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয়গণ, বিশেষতঃ পর্ত্তুগীজরা, মালয় দ্বীপপুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ওলন্দাজগণ ইন্দোনেশিয়ায় আগমন করিয়া প্রায় দুই শতাব্দীব্যাপী চেষ্টায় উহার অধিকাংশ অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিল। ব্রিটিশ ও অপরাপর ইউরোপীয় শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিগত শতাব্দীর ভয়াবহ অন্তর্বিপ্লব সত্ত্বেও তাহারা পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ রাজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা দাসত্ব-প্রথা উচ্ছেদ করিল বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বলপ্রয়োগে শ্রমিক নিয়োগ-প্রথা প্রবর্ত্তন করিল। সুশৃঙ্খল ও সমুন্নত শাসন-প্রণালীর প্রচলন না করিয়া ঔপনিবেশিকদিগের উপর আর্থিক শোষণ-নীতি চালানোই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যদিও ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ায় তিন শত বৎসরেরও অধিককাল অবস্থান করিতেছে তথাপি জনসাধারণের উন্নতির জন্য তাহারা বিশেষ কিছুই করে নাই।

যুদ্ধের পূর্ব্বে দেশরক্ষী বাহিনী, শাসকসম্প্রদায় ও অপরাপর কর্ম্মচারীর সহায়তায় পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ রাজ্যই একজন ওলন্দাজ গবর্ণর-জেনারেল দ্বারা

শাসিত হইত। ওলন্দাজদের অধীনে অনেক ছোট ছোট মুসলমান রাজ্য ও অন্যান্য রাজ্য ছিল। সেখানে ইন্দোনেশীয় ওলন্দাজদিগকে লইয়া একটি জনপরিষদও গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার কার্য্য কেবলমাত্র পরামর্শ দানেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাক্-যুদ্ধকালে এখানকার রাজনৈতিক অগ্রগতি অতিশয় মন্থর ছিল। সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অল্পসংখ্যক ঔপনিবেশিক ওলন্দাজদের হাতে ন্যস্ত ছিল এবং শাসনকার্য্য পরিচালনায় তথাকার জনগণের কোনো হাত ছিল না। শাসনকার্য্যে ওলন্দাজদের তিলমাত্র ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই; প্রজাগণকে শোষণ করিয়া তাহারা কেবল নিজেদের ভোগ-বিলাসের মানের উন্নয়ন ও ধনসম্পদ বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত থাকিত। শাসন-সৌকর্য্যের দিকে তাহাদের মোটেই লক্ষ্য ছিল না। সেখানে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠারও স্বাধীনতা মোটেই ছিল না। শাসকসম্প্রদায় জনগণকে দরিদ্র, অজ্ঞ ও শিল্পের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনগ্রসর করিয়া রাখিয়াছিল।



সুন্দা প্রণালীতে ক্রাকাটাউ দ্বীপে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অগ্ন্যুদ্গার

যুদ্ধের প্রারম্ভে দুর্দ্ধর্ষ জাপানীরা যখন ধীরে ধীরে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া অধিকার করিয়া লইতেছিল তখন ওলন্দাজেরা তাহাদিগকে বাধা দিয়া দেশরক্ষা করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সামরিক শক্তি যথেষ্ট না থাকায় তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। যুদ্ধের শেষ অবস্থায় জাপানী শক্তি ভাঙিয়া পড়ায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় জাপ সাম্রাজ্যবাদের বজ্রমুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল। তখন অকস্মাৎ জনগণের মধ্যে একটি স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হইয়া তাহাদের সমস্ত পরিকল্পনা উল্টাইয়া দিল। উহাতে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হইল যাহা ছিল ওলন্দাজদের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এই অবস্থায় ওলন্দাজের আবার যবদ্বীপে নিজেদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা সুরু করিল— সেখানকার অধিবাসীরা তখন স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া বাধা প্রদান করিল। তাহাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অবসান আজও হয় নাই। বিশ্বের সকলের দৃষ্টি এখন উহার উপর নিবদ্ধ। মুক্তি-সংগ্রামে ব্যাপৃত এশিয়ার বিভিন্ন দেশের পরাধীন জনগণ ইন্দোনেশীয়গণের মুক্তিযুদ্ধ যথেষ্ট সহানুভূতি ও ঔৎসুক্যের সহিত লক্ষ্য করিতেছে। তাহাদের রণহুঙ্কার "মারদেকা" (স্বাধীনতা) আজ এশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে ইন্দোচীনেও যে অনুরূপ মুক্তি-আন্দোলন চলিতেছে তাহাও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়। আনামীরা যে ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করিতেছে তাহা তাহাদিগকে চরম গৌরবের অধিকারী করিয়া তুলিয়াছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ ও চালের ফলেই ইন্দোনেশীয় ও আনামীদের মুক্তি-সংগ্রামের উদ্ভব হইয়াছে। এই যুদ্ধের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য্য পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনাবলী হইতে সহজেই অনুমেয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বেশীদূর অনুসন্ধান করিতে হইবে না। ইহার অর্থ পরিষ্কার- তাহা হইতেছে সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক শোষণকার্য্য। ওলন্দাজদের কুশাসন, জনগণের বিদ্রোহ, জাপানীদের আগমনজনিত বিশৃঙ্খলা ও সেজন্য ইন্দোনেশীয়দের অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্তির সুযোগ, ওলন্দাজদের প্রতিশ্রুতিতে অনাস্থা, ওলন্দাজ ও অপরাপর ইউরোপীয় শক্তির সাময়িক সামরিক প্রতিপত্তিহানি প্রভৃতি অন্যবিধ নানা কারণেও বর্ত্তমান অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু সবল ও সুসংহত ওলন্দাজ-জাতি দুর্ব্বল ও পদানত ইন্দোনেশীয়দিগের প্রতি দীর্ঘকাল নিষ্ঠুর শোষণ-কার্য্য চালাইয়া আসিতেছিল বলিয়াই গোড়ায় এইরূপ তিক্ততার উদ্ভব হইয়াছিল। তাহারা স্বায়ত্ত শাসনের উপযুক্ত কি অনুপযুক্ত সে বিষয়ে ওলন্দাজরা কিছুমাত্র ভাবিয়া দেখে নাই। এইরূপ অবস্থায় তাহারা যদি বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া যবদ্বীপবাসীদের অধিকার স্বীকার করিয়া লয় কেবলমাত্র তবেই ইন্দোনেশিয়ায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সম্ভবপর হইতে পারে।

ইন্দোনেশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ যদি স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে পারে তবে উহা ভবিষ্যতে আরও অধিকতর সমৃদ্ধিশালী একটি দেশে পরিণত হইবে এবং বিশ্বের বাজারে উহা বিস্তর কাঁচা মাল, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উৎপন্ন

দ্রব্য রপ্তানি করিতে সমর্থ হইবে। এই গ্রীষ্মমণ্ডলীয় প্রদেশটির বিশেষত্ব এই যে, এখানকার লোক অল্প পরিশ্রমে যথেষ্ট আয় করিতে পারে। বাস্তবিকই পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রাকৃতিক পরিবেশে ও কাঁচামালে এত সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী যে ইহাকে বিশ্বের একটি সঞ্চয়াগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুন্দা-দ্বীপপুঞ্জ আসলে প্রবালদ্বীপ—ইহা সৌন্দর্য্যমণ্ডিত সাগর অঞ্চলে অবস্থিত। এই দ্বীপশ্রেণীর পশ্চাদ্‌ভাগে বিস্তর পর্ব্বতশৃঙ্গ রহিয়াছে; তাহাদের কতকগুলি হইতে এখনও অগ্নি উদ্‌গীরিত হইতেছে এবং কতকগুলি চিরসবুজ ঘন তরুরাজিতে পরিপূর্ণ। নানা বর্ণ-সমন্বিত পূর্ব্বদেশীয় এই দ্বীপগুলির শ্যামসমারোহ যেমন আমাদের নয়নমনোমুগ্ধকর সেইরূপ এই স্থানের স্বদেশ-ভক্ত জনগণের মুক্তি-সংগ্রামও আমাদিগের হৃদয়ের প্রীতি-বর্দ্ধক। ইন্দোনেশিয়া এবং ইন্দোচীনে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্ব ও শোষণ-কার্য্যের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ঐ সমস্ত অবাঞ্ছিত ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রিটিশ ও মার্কিন গবর্ণমেণ্ট পৃথিবীর প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তিসমূহের সমর্থন করিয়া চলিয়াছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় তথাকথিত ট্রুম্যান-নীতির বিস্তার লাভের ফলে ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে সুবিধা পাইয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার যুদ্ধ, তথাকার জনগণের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীলদের যুদ্ধ। কেবলমাত্র ওলন্দাজরাই নহে, পরন্তু ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল দলও এই যুদ্ধোদ্যমে সাহায্য করিয়াছে। জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইন্দো-নেশীয়দের প্রাণপাত মুক্তি-সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী দলকে, তথা মার্কিন বণিকসম্প্রদায়কে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সংগ্রাম মীমাংসার ভার বর্ত্তমানে স্বস্তি-পরিষদের উপর পড়িয়াছে। ইহার ফলাফল ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত।

শতাব্দী চলে

শ্রীনারায়ণ দত্ত

শতাব্দী চলে, শতাব্দী চলে, ভেঙে ভেঙে পড়ে স্মৃতির পাড়,
শোণিত জোয়ার রাঙা ইতিহাস বালুচরে লেখা আছে
এই সৃষ্টির নীরব সাক্ষী মরা মানুষের হাড়—
ইতিবৃত্তের মরু অক্ষর পাণ্ডুর তার কাছে।

অজানা হাতের মায়া-সঙ্কেতে সুরু যে পুতুল খেলা
জীবনের পথে আশা-নিরাশার খেলা
রাঙা সকালের পাখীর কাকলি আর সায়াহ্নবেলা
সহসা ভাঙিয়া গেছে—
শতাব্দী বুকে দিনের চাওয়ার অবসাদ ঘনায়েছে;
আকাশে আকাশে সীমাহীন হাহাকার
পথে পথে শুধু মহামৃত্যুর গাণ্ডীব টংকার
বুকে বুকে শুধু রক্তের ঝনঝনি
এই জীবনের প্রতি বাঁকে বাঁকে মানুষের হানাহানি
হারানো যুগের প্রেমের মন্ত্র আঁধার পাথারতলে
হিংস্র জনতা ছুটিয়াছে দলে দলে
ত্রাসিত রিক্ত শতাব্দী ছুটে চলে।

শতাব্দী চলে—
অনাহারীদের ক্ষুধার আগুনে দিগ্‌ দিগন্ত রাঙা
ঘরে ঘরে শুধু মাটির পাত্র ভাঙা
কারখানা-মিলে ধূমেল বাতাসে পেশীহীন হাতগুলি
মুঠো মুঠো শুধু কুড়ায় পাথর-ধূলি
তাপচৌচির ক্ষেতের প্রান্তে মূর্চ্ছিত মানবতা—
শূন্য নয়নে দিগন্ত ছেয়ে আছে—
বাঁচিবার এক তীব্র নেশায় মিশে গেছে সব কথা
সোনার ফসল অলীক তাহার কাছে।
গাছের আড়ালে নগ্নতা ঢাকি ভীরু চাহনীটি মেলি
শঙ্কিত চোখে এই পৃথিবীরই মেয়ে
অকারণে আছে চেয়ে
চোখ দুটো শুধু জলের নেশায় থেকে থেকে ওঠে জ্বলে
শতাব্দী যায় চলে।

চলে শতাব্দী চলে—
তবু তার পথে মহামানবের স্বাক্ষর ফুটে ওঠে
একাকী চলার চরণচিহ্ন লোটে
দুর্গম অভিযানে
শ্মশানের বুকে সাহসশুভ্র জীবনের বাণী আনে।
অন্ধতামসী রজনীর বুকে জেগে ওঠে দীপশিখা
খুলে পড়ে যায় নিরাশার যবনিকা
মাতাল জনতা সহসা কেন যে থামে
কোন্ সাপুড়ের যাদুর মন্ত্রে, কোন্ দেবতার নামে?
দিগন্তলীন পাহাড় চূড়ায় শতাব্দ রবি নামে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২

‘হামচূপামূহাফ’ বা ‘সঞ্জীবনী সভা’

১৮৭৭ সনে (?) যুবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠন্‌ঠনের এক পোড়ো বাড়ীতে হামচূপামূহাফ বা সঞ্জীবনী সভা নামে মাৎসিনীর ‘কার্বোনারি’র অনুকরণে একটি গুপ্ত সভা স্থাপন করেন। ইহার সভাপতি ছিলেন— স্বদেশপ্রেমিক বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু। কিশোর রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দুমেলার প্রধান উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র সভার সভ্য ছিলেন। নিয়মানুযায়ী সভ্যগণকে তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ সভাকে দিতে হইত। এই সভা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :—“জ্যোতিদাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়ীতে তার অধিবেশন, ঋগ্বেদের পুঁথি মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত ; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম” (‘আত্মপরিচয়,’ পৃ. ৮৭)। সঞ্জীবনী সভা সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে যেটুকু সংবাদ পাওয়া যায়, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

“জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্য্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। যেদিন নূতন কোনও সভ্য এই সভায় দীক্ষিত হইতেন, সেদিন অধ্যক্ষ মহাশয় লাল পট্টবস্ত্র পরিয়া সভায় আসিতেন। সভার নিয়মাবলী অনেকই ছিল, তাহার মধ্যে প্রধান ছিল, মন্ত্রগুপ্তি ; অর্থাৎ এ সভায় যাহা কথিত হইবে, যাহা কৃত হইবে এবং যাহা শ্রুত হইবে, তাহা অ-সভ্যদের নিকট কখনও প্রকাশ করিবার কাহারও অধিকার ছিল না।

“আদি ব্রাহ্মসমাজ-পুস্তকাগার হইতে লাল রেশমে জড়ান বেদমন্ত্রের একখানা পুথি, এই সভায় আনিয়া রাখা হইয়াছিল। টেবিলের দুই পাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষুকোটরে দুইটি মোমবাতি বসান ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত ভারতের প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাঁহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারের ইহাই মূল কল্পনা। সভার প্রারম্ভে বেদমন্ত্র গীত হইত—“সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্।” সকলে সমস্বরে এই বেদমন্ত্র গান করার পর, তবে সভার কার্য্য (অর্থাৎ কি না গল্প-গুজব) আরম্ভ হইত। কার্য্যবিবরণী জ্যোতিবাবুর উদ্ভাবিত এক গুপ্ত ভাষায় লিখিত হইত ; এই গুপ্ত ভাষায় ‘সঞ্জীবনী সভা’কে ‘হামচূপামূহাফ’ বলা হইত।...ইহার দীক্ষা অনুষ্ঠানে একটা ভীষণ গাম্ভীর্য্য ছিল। দীক্ষাকালে, নবদীক্ষার্থীর সর্ব্বাঙ্গ একটা অজ্ঞাত ভাবাবেগে শিহরিয়া উঠিত।

“প্রথম প্রথম সভার কাজ পুরা দমেই চলিতে লাগিল। নিত্য নূতন প্রস্তাব গৃহীত হইত, কিন্তু কাজে পরিণত করা পর্য্যন্ত ধৈর্য্য কোনও বিষয়েই বড় কাহারও থাকিত না। যাহার যেরূপ কল্পনা খেলিত, সে সেইরূপই প্রস্তাব করিত। এইরূপ কাল্পনিক সুখে এক রকম দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। একদিন সভায় আমি প্রস্তাব করিলাম যে, ভারতবর্ষে সার্ব্বজাতিক ঐক্য-সাধন করিতে গেলে, একটা সার্ব্বজনিক পোষাক হওয়া আবশ্যক। এ প্রস্তাবটি সকলে একবাক্যে অনুমোদন করিলে, ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবী ঐক্য-বিধায়ী, সার্ব্বভৌম মিলনোপযোগী পোষাকের পরিকল্পনা করার ভার পড়িল আমারই উপর। শেষে স্থির হইল যে, মালকোঁচা মারিয়া কাপড় পরিলে যেমন হয়, ঐরূপ একটা পোষাক ও মাথায় যাহাতে রৌদ্র-বৃষ্টি না লাগে এইরূপ একটা সোলার টুপির উপর পাগড়ী বসাইয়া একটা শিরস্ত্রাণ, বেশ সার্ব্বজনীন পরিচ্ছদরূপে গৃহীত হইতে পারে। সকলেই সোৎসাহে মহা-কলরব করিয়া এবং বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীতে বলিল—‘ঠিক ঠিক।’... তৎক্ষণাৎ দর্জ্জির দোকানে গিয়া, মালকোঁচা-মারা কাপড় সেলাই ও পূর্ব্বোক্তরূপ শিরস্ত্রাণ প্রস্তুত করিতে হুকুম দেওয়া হইল। যথাকালে পোষাক প্রস্তুত হইয়া আসিল ; কিন্তু এ অভিনব পোষাক পরিয়া প্রথমে পথে বাহির হইবে কে ? আমিই প্রথম বাহির হইব। একদিন মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে সার্ব্বজনিক ঐক্যসাধক এই পোষাক পরিয়া, আমি কলিকাতা সহর ঘুরিয়া আসিলাম। লোকে এ পোষাকের অন্তর্গূঢ় হিতকর উদ্দেশ্য বুঝিল না কেবল পরিহাস-বিদ্রূপই করিল, কিন্তু আমি সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিলাম না।...একমাত্র আমি ছাড়া, কেহই এ পোষাক কখনও পরিধান করেন নাই। সভ্যগণ যখন দেখিলেন যে, আন্তর্জাতিক পোষাক দেশের কেহই গ্রহণ করিল না, তখন অগত্যা এ কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা দেশে শিল্পবাণিজ্যের কল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইলাম। সর্ব্বপ্রথম দিয়াশলাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক আয়াসে এবং বহু অর্থব্যয়ে কয়েক বাক্স দিয়াশলাই প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু এ পদার্থ সাধারণের পক্ষে ক্রয়সাধ্য বা ব্যবহারের মোটেই উপযোগী হইল না। একে ত খরচ খুব বেশী পড়িত, তাহা ব্যতীত দেশে কাঠির অভাব, সেজন্য যে-সে কাঠের কাঠি ব্যবহৃত হওয়াতে দিয়াশলাই শীঘ্র জ্বলিতও না। এই জন্য লোকে এই দিয়াশলাই পছন্দ করিত না। যখন পদে পদে এইরূপ অসুবিধা হইতে লাগিল, তখন সভ্যগণ দেখিলেন যে, এ অসাধ্য-সাধনে সময় নষ্ট করা অপেক্ষা, দেশের অন্য কোনও সহজসাধ্য মঙ্গলকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করাই উচিত।

"এই সুবুদ্ধির ফলে, সভায় এক নূতন কাপড়ের কল আনানো হইল। আবার প্রবলভাবে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা সুরু হইল। সভ্যদেরও উত্তম আবার দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সভায় ইহাও স্থির হইল যে, ভবিষ্যতে আরও কয়েকখানি তাঁত বসাইতে হইবে এবং এজন্য একখানি বাড়ীও প্রস্তুত করিতে হইবে। সভ্যেরা চাঁদা দিতেন, তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ। এইরূপে যে সামান্য কিছু টাকা জমিয়াছিল, তাহাতেই এইরূপ এক বিরাট কল্পনা করা হইল। দেখিতে দেখিতে নবপ্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কলে একদিন একখানি গামছা প্রস্তুত হইল। ব্রজ বাবু সেই গামছাখানি মাথায় বাঁধিয়া উন্মত্তের মত তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিলেন। সভার সে এক স্মরণীয় দিন! একে একে প্রায় সকল সভ্যই শেষে তাঁহার সঙ্গে নৃত্যে যোগ দিলেন। তারপর কল উঠিয়া গেল। এই গামছাখানি ছাড়া, অন্য আর কিছুই সে কলে প্রস্তুত হয় নাই।

"এই 'সঞ্জীবনী সভা'র সভ্যগণের মধ্যে জাতিবর্ণনির্বিচারে আহারেরও একটি বিধি ছিল। আমাদের মধ্যে নানা জাতি-বর্ণের লোক ছিল। কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে শুঁড়ী পর্য্যন্ত। কোন এক ব্রাহ্মণ জমিদার-সভ্যের গঙ্গার ধারের একটি বাগান-বাড়ীতে একবার আমাদের একটা প্রীতি-ভোজ হয়। জমিদার-সভ্যটি একটু নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইলেও, তিনি সভার সভ্যদিগের সঙ্গে একত্র আহারাদি করিতে একেবারেই কুণ্ঠিত হইলেন না। বোধ হয়, তিনি সভার গণ্ডীকে জগন্নাথ-ক্ষেত্রেরই সামিল মনে করিতেন। খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে খুব এক বড় উঠিল। রাজনারায়ণ বাবু সেই সময় গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া "আজি উন্মদ পবনে—"* বলিয়া রবীন্দ্রনাথের নবরচিত একটি গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।"

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "বাঙ্গালীদের মধ্যে সৎসাহস বর্দ্ধিত করিবার জন্য...বন্দুক-ছোঁড়া ও শিকারের প্রবর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন।"

সঞ্জীবনী সভা অল্প দিনই জীবিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন:—"অবশেষে দুই-একটি সুবুদ্ধি লোক আসিয়া আমাদের দলে ভিড়িলেন, আমাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।"

পাট ও নীলের ব্যবসা

অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভগ্নীপতি জানকীনাথ ঘোষালের সংযোগে হাটখোলায় একটি পাটের আড়ৎ খুলিয়াছিলেন। অল্প দিন পরেই এ কার্য্য বন্ধ করিয়া তিনি লাভের টাকায় শিলাইদহে নীলের চাষ আরম্ভ করেন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:—

"এইরূপে চার পাঁচ বৎসরেই আমার নীলের চাষে খুব উন্নতি হইল। কিন্তু হঠাৎ নীলের বাজার পড়িয়া গেল। শুনা গেল, জার্ম্মানেরা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এক রকম কৃত্রিম নীল প্রস্তুত করিতেছে, তাহাতেই আসল নীলের বাজার একে-বারে খারাপ হইয়া গেল। আমিও কাজ উঠাইয়া দিয়া কলি-কাতায় চলিয়া আসিলাম।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সময়ে 'ভারতী'তে (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯, মে ১৮৮২) "নীলের বাণিজ্য" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহাতে প্রকাশ:—"কিন্তু নীলের বাণিজ্য বোধ হয় আর থাকে না। সম্প্রতি একজন জর্ম্মান পণ্ডিত রসায়ন-বিদ্যার সাহায্যে এক প্রকার নীল রঙের সৃষ্টি করিয়াছেন।... নীলকরদিগের এক্ষণে সমূহ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত।"

সারস্বত সমাজ

কলিকাতায় ফিরিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবার বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য একটি সাহিত্য-সমালোচনী সভা স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। এই কল্পনা মাথায় প্রবেশ করিবামাত্র তিনি রবীন্দ্র-নাথকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শ লইতে ছুটিলেন। সকল কথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর বলিলেন, "তোমরা বড় মানুষের ছেলে, কোনও বদখেয়ালি না করিয়া এই সব লইয়া যদি সময় কাটাও ত সে ভালই। কিন্তু, বাবা, একটা কথা আমি তোমাদের বলিয়া দিতেছি। বড় বড় হোমরা-চোমরা লোকদের ইহার মধ্যে লইও না- তাহা হইলেই সব মাটি হইয়া যাইবে।"

রবীন্দ্রনাথ স্বল্প কথায় সভার উদ্দেশ্য 'জীবন-স্মৃতি'তে এই-রূপ বিবৃত করিয়াছেন:—

"বাংলার সাহিত্যিকগণকে একত্র করিয়া একটি পরিষৎ স্থাপন করিবার কল্পনা জ্যোতিদাদার মনে উদিত হইয়াছিল। বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্ব্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্ত্তমান সাহিত্য-পরিষৎ যে-উদ্দেশ্য লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহার সঙ্গে সেই সংকল্পিত সভার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।"

১৭ জুলাই ১৮৮২ তারিখে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সভাপতিত্বে ঠাকুর-বাড়ীতে সভার প্রথম অধিবেশন হয়। উপস্থিত অধি-কাংশ সভ্যের সম্মতিক্রমে সভার নামকরণ হয়—সারস্বত সমাজ। আরও স্থির হয়:—

"বিদ্যার উন্নতি সাধন করাই এই সমাজের উদ্দেশ্য।... যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাংলা ভাষার উন্নতি সাধনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন।...বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণ সমাজের কর্ম্মচারীরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন—

* গানটি প্রথমে ১২৮৪ সালের আশ্বিন (সেপ্টেম্বর ১৮৭৭) সংখ্যা 'ভারতী'তে ("ভানুসিংহের কবিতা") প্রকাশিত হয়।

সভাপতি—ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সহযোগী সভাপতি—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

২ ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখে আলবার্ট-হলে সারস্বত সমাজের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। ইহার আর কোন অধিবেশনের সংবাদ আমরা পাই নাই। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—

"বঙ্কিমবাবু সভ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। বলিতে গেলে যে-কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষানির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি ছাপাইয়া অন্যান্য সভ্যদের আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়াছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশের নামগুলি সেই সেই দেশে প্রচলিত উচ্চারণ অনুসারে লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্পও আমাদের ছিল।"

সারস্বত সমাজ মুকুলিত হইবার পূর্ব্বেই অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়াছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন :—

"আমরা কিন্তু হোমরা-চোমরা লোক লইয়াই কাজ আরম্ভ করিলাম।...দুই তিন অধিবেশন পর্য্যন্ত বেশ কাজ চলিয়াছিল—কিন্তু তাহার পরেই নানা কারণে সভা বন্ধ হইয়া গেল: বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল।"

পত্নীবিয়োগ

১৮৮৪ সনের ১৯এ এপ্রিল (১২৯১, ৮ বৈশাখ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী অকস্মাৎ আত্মহত্যা করেন। বৌ-ঠাকুরাণীর মৃত্যু যুবক রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। এই দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরে প্রকাশিত 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (২৯ এপ্রিল ১৮৮৪), 'শৈশব সঙ্গীত' (২৯ মে) ও 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১ জুলাই) তিনি পরলোকগতা বৌঠাকুরাণীকেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

সাহিত্যানুরাগিণী কাদম্বরী দেবীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র প্রমুখ 'ভারতী'র পরিচালকগণ পত্রিকার প্রচার রহিত করাই সাব্যস্ত করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ঘোষণা করেন :—"ভারতী বিশেষ কারণে আর প্রকাশিত হইবে না।" কবি অক্ষয়চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী শরৎকুমারী চৌধুরাণী যথার্থই লিখিয়াছেন :—

"ফুলের তোড়ার ফুলগুলিই সবাই দেখিতে পায়, যে-বাঁধনে তাহা বাঁধা থাকে তাহার অস্তিত্বও কেহ জানিতে পারে না। মহর্ষি-পরিবারের গৃহলক্ষ্মী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী ছিলেন এই বাঁধন। বাঁধন ছিঁড়িল—ভারতীর সেবকেরা আর ফুল তোলেন না, ভারতী ধূলায় মলিন। এই দুর্দ্দিনে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী নামীর পালন-শক্তির পরিচয় দিলেন।"

বরিশালে স্বদেশী ষ্টীমার

নীলের ব্যবসায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মন্দ অর্থাগম হয় নাই। এই টাকায় তিনি একটি নূতন ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হইলেন ; উহা বরিশালে ষ্টীমার পরিচালনা। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

"নীলে আমি বেশ লাভ করিয়াছিলাম। এখন এই টাকা লইয়া আমি কি করিব ? এই চিন্তা তখন আমার মনে খুব প্রবল হইয়া উঠিল। এই সময় এক দিন হঠাৎ 'এক্সচেঞ্জ গেজেটে' দেখিলাম, একটা জাহাজের খোল নিলাম হইবে। ভালই হইল, এই খোলটা কিনিয়া একখানা জাহাজ তৈরি করাইয়া জাহাজ চালান যাইবে, স্থির করিলাম। এই সময়ে আবার, কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত রেলও হইবে, কথা ছিল। তাহা হইলেই খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত বেশ জাহাজ চালান যাইতে পারে। খোল কেনার পক্ষে এ একটা বেশ সুযুক্তিও হইল।...সেই খোলে যে প্রথম জাহাজ প্রস্তুত হইল, তাহার নাম রাখিলাম 'সরোজিনী'।"

২৩ মে ১৮৮৪ তারিখে* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথমে 'সরোজিনী' লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কার্য্য আরম্ভ করিবার পর তাঁহাকে যে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহারই ভাষায় বর্ণনা করিতেছি :

"'সরোজিনী' তৈরি হইতেই এত বেশী বিলম্ব হইয়া গেল যে, আমি আসিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ফ্লোটিলা কোম্পানি কাজ ফাঁদিয়া বসিয়াছিল। আমার জাহাজ যদি ঠিক সময়ে তৈরি হইত, তাহা হইলে আমি ইহার অনেক আগেই কার্য্য চালাইতে পারিতাম ; তাহা হইলে হয়ত এ কোম্পানি এদিকে না-ও আসিতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। এখন আমরা দুই পক্ষই এই একই লাইনে ষ্টীমার চালাইতে লাগিলাম। কাজেই উভয় দলে খুব প্রতিযোগিতাও আরম্ভ হইল। একখানি মাত্র ষ্টীমার লইয়া কার্য্যে অসুবিধা হওয়ায় আমি আরও চারখানি জাহাজ ক্রমে ক্রমে ক্রয় করিলাম। এ জাহাজগুলির নাম ছিল 'বঙ্গলক্ষ্মী' 'স্বদেশী' 'ভারত' এবং 'লর্ড রিপন'। তখন এই পাঁচখানি জাহাজ খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত যাত্রী লইয়া গমনাগমন করিত এবং সময় সময় মাল লইয়া কলিকাতাও আসিত। এ সময় আমি জাহাজেই বাস করিতাম। বাঙ্গালীর জাহাজ-চালনায় তখন বরিশালের ছাত্রসমাজ এবং নব্যদলের মধ্যে একটা প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল।†... এইরূপে আমার কাজ বেশ দিন দিন লাভজনক হইয়া উন্নতির পথে চলিতে লাগিল। আমার এই ব্যবসাকে যেন সমস্ত

* ১২৯১ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র ও অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত "সরোজিনী প্রয়াণ" দ্রষ্টব্য।

† এই প্রসঙ্গে 'বালকে' (শ্রাবণ ১২৯২) প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লিখিত "বরিশালের পত্র" পঠিতব্য।

জাতির উদ্যম ভাবিয়া বরিশালবাসিগণ নিয়তই ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেন। কিন্তু এত সুখ আমার সহিল না। ইংরেজের ব্যবসায়ে ব্যাঘাত লাগিয়াছে, আর কি তাহারা চুপ করিয়া থাকিতে পারে? ব্যবসায়ী সাহেবেরা আমার যৎপরোনাস্তি বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিল। তাহারা যখন দেখিল যে যাত্রী আর হয় না, তখন তাহারা ভাড়া কমাইতে আরম্ভ করিল, আমিও কমাইলাম। এইরূপে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও আমি প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইলাম।...এই সময় খুলনা হইতে মাল বোঝাই লইয়া 'স্বদেশী' কলিকাতা আসিতেছিল। সারা পথ বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল—আলোকমালা-সমুদ্ভাসিত কলিকাতা বন্দরেও প্রবেশ করিল। কিন্তু শেষে হাওড়ার পুলের নীচে দিয়া যাইবার সময় একখানা জেটিতে না-কিসে ধাক্কা লাগিয়া ষ্টীমারখানি নিমেষমধ্যে গঙ্গাগর্ভে নিমগ্ন হইল। এক জাহাজ মালের এক কণাও উঠিল না।...একে ত প্রতিযোগিতার জন্য কিছু দিন হইতেই আমি ক্ষতিস্বীকার করিতেছিলাম, যদি কোনও রূপে টিকিয়া যায়—এই ভরসায়; কিন্তু এবার এই দুর্ঘটনার জন্য এক ক্ষতিপূরণ ব্যাপারেই আমি অত্যন্ত জেরবার হইয়া পড়িলাম, কিন্তু তবুও নিজে হইতে উঠাই কিরূপে?...এমন সময় ফ্লোটিলা কোম্পানীর পক্ষ হইতে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (তখনও রাজা হন নাই) আমার নিকট এক সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আসেন। তিনি বলিলেন, 'উভয় পক্ষেই আর এরূপ বৃথা অর্থব্যয়ে লাভ কি? আপনি নিজেই একটা মূল্য ধার্য্য করিয়া দিউন্। ফ্লোটিলা কোম্পানী আপনার সমস্ত কারবার কিনিতে প্রস্তুত আছে।' আমি দেখিলাম যে, এ একটা মহাসুযোগ উপস্থিত।... আমি মগ্নাবশিষ্ট চারিখানি জাহাজ ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত ফ্লোটিলা কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া দিলাম। ফ্লোটিলা কোম্পানীর নিকট হইতে যাহা ন্যায্য তাহাপেক্ষা অনেক বেশী টাকা পাইলেও, আমি আমার ঋণ-পরিশোধ করিতে পারিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাত হাজার টাকায় ক্রীত শূন্য খোল "একদা ভরতি হইয়া উঠিল শুধু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে—ঋণে এবং সর্ব্বনাশে। কিন্তু তবু একথা মনে রাখিতে হইবে, এই-সকল চেষ্টার ক্ষতি যাহা সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবি অব্যবসায়ী লোকেরাই দেশের কর্ম্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারংবার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে-পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতিবহন করিয়াই আসিয়াছেন, মৃত্যুর পরবর্ত্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।"

ফ্রেনলজি বা শিরোমিতি-বিদ্যা

ষ্টীমার-পরিচালন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহিত্যের প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন না। এই সময়ে তিনি ফ্রেনলজি বা শিরোমিতি-বিদ্যার রীতিমত চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার কয়েকটি রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

(ক) "শিরোমিতি-বিদ্যা" (সচিত্র)—'কল্পনা', ৪র্থ বর্ষ (ইং ১৮৮৫)।

(খ) "মুখচেনা" (সচিত্র)—'বালক', বৈশাখ ১২৯২।

(গ) "আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেনলজি"—'সাধনা', আষাঢ় ১২৯৯।

শিরোমিতি বিদ্যার চর্চ্চাকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্ধুবান্ধব অনেকের মাথা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। "পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একবার মাথা দেখিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের চরিত্র, বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বভাবের সহিত এই বর্ণনা অনেকটা মেলে বটে।"..."জ্যোতিবাবুর সঙ্গীতপ্রিয়তা, ফ্রেনলজি ও চিত্রাঙ্কন-পটুতা লক্ষ্য করিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ একবার একটি ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

বেয়ালা কি মিঠে অমৃতের ছিটে
ঐ হাতটিতে শুনায়,
পিয়ানো ঢং ঢং ঢ ঢং ঢং,
সেতার গুনগুনায়।
মাথায় তত্ত্ব খুঁজি, পুঁথি করেন পুঁজি,
মাথা পেলে আর কিছু চান না।
ল'ন যবে ছবি মনে ভাবে কবি
"হইয়াছে, থামো—আর,
চক্ষে আসিয়াছে মোর কান্না।"

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "অতিলৌকিক ব্যাপার" উদ্‌ঘাটনের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবন-স্মৃতিতে প্রকাশ :—

"কোথাও কোনও প্রসিদ্ধ গণৎকার বা ভবিষ্যদ্বক্তা বা ঐ জাতীয় একটা-কিছু আসিয়াছে শুনিলেই, তিনি অমনি বন্ধু-বান্ধবসহ সেইখানেই গিয়া হাজির হইতেন। কিন্তু পনের-আনা ভাগই আন্দাজ ও বাকিটুকু ফাঁকি দেখিয়া অবিলম্বেই তাঁহার সে সখ মিটিয়া গিয়াছিল। কোষ্ঠীর ফলাফলেও তিনি আর বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন, 'এ সমস্ত ব্যাপার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি-অনুসারে পরীক্ষিত হওয়া উচিত।'

প্লাঞ্চেটের কাণ্ড দেখিয়া, তিনি কখনও কখনও খুবই আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছেন।"

অতঃপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পুনরায় সঙ্গীতে মনোনিবেশ করেন—সে কথা পরে আলোচিত হইবে।

পুনা-প্রবাস ও মরাঠী শিক্ষা

১৮৯৪ সনের মার্চ হইতে ১৮৯৭ সনের প্রথম ভাগে অবসরগ্রহণ পর্য্যন্ত সত্যেন্দ্রনাথের কর্ম্মস্থল ছিল সাতারা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই সময়ে মেজদাদার পুনার বাসায় কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি একজন মরাঠী পণ্ডিতের সাহায্যে মরাঠী ভাষা অধ্যয়ন করেন। ১৩০২ সালের (ইং ১৮৯৫) 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার "মারাঠী ও বাঙ্গলা", "তুকারামের অভঙ্গ", "ঝাঁশির মহারাণী শ্রীমতী লক্ষ্মীবাই" প্রভৃতি রচনা এই মরাঠী শিক্ষারই ফল।

পুনায় অবস্থানকালে মেজ-বৌঠাকুরাণীর পীড়াপীড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অনেক দিন পরে 'হিতে বিপরীত' নামে একখানি কৌতুক-নাটিকা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রচনা করিয়াছিলেন। ইহা জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ীতে ও পরে ভারত-সঙ্গীতসমাজে অভিনীত হইয়াছিল।



'শান্তিধাম'—রাঁচী

সঙ্গীত সাধনা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কেবলমাত্র সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন না—সুরশিল্পীও ছিলেন। সঙ্গীতে তাঁহার বিশিষ্ট দান—বাংলা গানে নূতন রীতিতে সুর-সংযোজনা। এই রীতির পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথে। 'জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

"জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে রাগিণীগুলির এক-একটি অপূর্ব্বমূর্ত্তি ও ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে-সকল সুর বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্য্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্ব্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বাবু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সুরে কথাযোজনার চেষ্টা করিতাম।"

স্বরলিপিকার।—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চরিতকার লিখিয়াছেন :—"জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় 'ভারতী' ও 'সাধনা' মাসিকপত্রে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়।" এই উক্তি ঠিক নহে। মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় কথা ও সুর-সম্বলিত স্বরলিপি প্রথম প্রকাশের গৌরব জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের। তিনি ১৭৯১ শকের কার্ত্তিক (১৮৬৯, অক্টোবর) মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র শেষে অতিরিক্ত ৬ পৃষ্ঠায় "সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী" ও পাঁচটি ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশ করেন।* দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বরলিপি-প্রণালী 'বালকে'ও (১২৯২) অনুসৃত হইয়াছিল (আশ্বিন-কার্ত্তিক সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের "নূতন স্বরলিপি" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব—স্বরলিপি-প্রণালী শিক্ষার্থীর পক্ষে অধিকতর সহজবোধ্য করা। তিনি 'বালকে' প্রকাশিত স্বরলিপি-প্রণালীর সংস্কার করিয়া সংখ্যা-মাত্রিক স্বরলিপি উদ্ভাবন করেন (১২৯৫ সালের পৌষ-সংখ্যা 'ভারতী ও বালকে' প্রকাশিত "গানের স্বর-লিপি" প্রবন্ধ পঠিতব্য)। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি অধিকতর সহজ ও সরল আকার-মাত্রিক স্বরলিপি-পদ্ধতি প্রচলন করেন। এই প্রসঙ্গে ১২৯৮ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যা 'সাধনা'য় প্রকাশিত তাঁহার "সার্গম স্বরলিপির 'আকার-মাত্রিক' নূতন পদ্ধতি" ও ১৩০৯ সালের ভাদ্র-সংখ্যা 'সমালোচনী' পত্রে প্রকাশিত "আকারমাত্রিক স্বরলিপির চিহ্নাবলী" (রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা'র ১ম দৃশ্য, ও ২য় দৃশ্যের প্রথমাংশের স্বরলিপি সহ) দ্রষ্টব্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত আকার-মাত্রিক স্বরলিপিই বর্ত্তমানে প্রচলিত; ইহা দ্বারা মাসিকপত্রে স্বরলিপি-প্রকাশের পথ সুগম হইয়াছে।

স্বরলিপি-গীতি-মালা।— ১৮৯৭ সনের জুন মাসে বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র-বিক্রেতা ডোয়ার্কিন্ এণ্ড সন্ জ্যোতিরিন্দ্র-

* ১২৯২ সালের বৈশাখ-সংখ্যা 'বালকে' প্রকাশিত প্রতিভাসুন্দরী দেবীর "সহজে গান-শিক্ষা" প্রবন্ধের ১৩ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

নাথ কর্তৃক "সঙ্কলিত ও ব্যাখ্যাত" 'স্বরলিপি-গীতি-মালা' প্রকাশ করেন। ইহাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচিত মোট ১৬৮টি গানের আকার-মাত্রিক স্বরলিপি আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত গানের সংখ্যা ৩২; তন্মধ্যে ২টি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ, এবং ১টি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্রের সম্মিলিত রচনা।

'বীণা-বাদিনী'— 'স্বরলিপি-গীতি-মালা' প্রকাশের অব্যবহিত পরেই ১৩০৪ সালের শ্রাবণ (১৮৯৭, জুলাই) মাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'বীণা-বাদিনী' নামে সঙ্গীতপ্রকাশিনী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। জোয়াকিন্ এও সন ইহার প্রকাশক ছিলেন। সঙ্গীত-বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্রিকার গৌরব 'বীণা-বাদিনী'রই প্রাপ্য। তৃতীয় সংখ্যা পত্রিকার শিরোভাগে "সাহিত্য সঙ্গীত কলাবিহীনঃ সাক্ষাৎপশুঃ পুচ্ছ-বিষাণহীনঃ" মুদ্রিত হইয়াছে। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে পত্রিকার শীর্ষদেশে

বীণাবাদন তত্ত্বজ্ঞঃ রাগবিদ্যা-বিশারদঃ
মূর্চ্ছনাশ্রুতিসম্পন্নঃ মোক্ষমার্গং গচ্ছতি

এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত। সঙ্গীত-বিষয়ক মূল প্রবন্ধ, প্রেরিত পত্র, স্বরলিপিতে ব্যবহৃত চিহ্নের ব্যাখ্যা, নানা-বিষয়ক বাংলা ও হিন্দী গানের এবং গতের স্বরলিপি এই পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিত। ইহাতে কয়েকটি গানের ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুযায়ী স্বরলিপিও প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বীণা-বাদিনী'র আয়ুষ্কাল দুই বৎসর।

'ভারত-সঙ্গীতসমাজ':—পুনায় অবস্থানকালে স্থানীয় "গায়ন-সমাজ" দেখিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে কলিকাতায় অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার বাসনা হয়। 'বীণা-বাদিনী'র ১ম সংখ্যায় তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন:—

"কলিকাতা সঙ্গীত-সমাজ।—উৎসাহদাতার অভাবে, হিন্দু-সঙ্গীতের ক্রমশই অবনতি ও লোপাপত্তি হইতেছে। ইহার প্রতি-বিধানার্থ সঙ্গীত-সমাজ নামক একটি সভা যাহাতে আমাদের মধ্যে স্থাপিত হয়, তাহার চেষ্টা ও উদ্যোগ চলিতেছে। হিন্দু সঙ্গীতের সংরক্ষণ, ও উন্নতি সাধনই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সমাজের অধীনে, একটি সঙ্গীত-শালা থাকিবে। সঙ্গীত-নিপুণ সঙ্গীতানুরাগী সৌখীন ব্যক্তিগণ প্রতিদিন কিম্বা আপাততঃ সপ্তাহের মধ্যে একদিন সায়াহ্নে, তথায় একত্র সমবেত হইয়া গান বাদ্য এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে আলাপ ও আলোচনা করিবেন। সভার বেতনভুক্ একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ও বাদক সঙ্গীত-শালায় নিয়ত উপস্থিত থাকিবেন। উপস্থিত সভ্যদিগের মধ্যে যিনি যাহা পারেন, কেহ বা কোন যন্ত্র বাজাইবেন, কেহ বা গান গাহিবেন, কেহ বা সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন প্রবন্ধ পাঠ করিবেন; মধ্যে মধ্যে কোন পেষাদার গুণীজনকে আহ্বান করিয়া তাঁহার গান-বাদ্য শুনা যাইবে। কখন কখন উৎকৃষ্ট যাত্রা, কীর্তন, কথকতা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া সভ্যগণের চিত্ত বিনোদন করা হইবে। বর্ষে বর্ষে, সভার সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন, কিম্বা সরস্বতী পূজার দিন, দেশ-বিদেশ হইতে সঙ্গীত গুণীগণকে আহ্বান করিয়া সঙ্গীত-উৎসবের অনুষ্ঠান ও তাঁহাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করা হইবে। ২৲ টাকা মাসিক চাঁদা ও দুই টাকা প্রবেশ-মুদ্রা প্রদান করিলে এই সভার সভ্য হওয়া যাইবে। আপাততঃ দেড় শত সভ্য জুটিলেই সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে। যাঁহারা এই সভার সভ্য হইতে চাহেন, তাঁহারা সম্পাদকের ঠিকানায় পত্র লিখিয়া বাধিত করিবেন।" (শ্রাবণ ১৩০৪)

ইহার অল্প দিন পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় কলি-কাতায় 'ভারত-সঙ্গীতসমাজ' স্থাপিত হয়। বিশুদ্ধ সঙ্গীতের চর্চ্চা হইবে শুনিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানের জন্য সহস্র মুদ্রা চাঁদা দিয়াছিলেন।* ঠাকুর-পরিবারের আরও অনেকে অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন, ইহার পরিমাণও বড় কম ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে ভারত-সঙ্গীতসমাজ সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন:—

"প্রথমে সমাজ স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীতেই বসিত। সকলশ্রেণীর লোকেই এই সমাজের সভ্য হইতে লাগিলেন। সম্মিলিত উদ্যমে এবং ঐকান্তিক আগ্রহে বেশ কাজ চলিতে লাগিল; সমাজও নিজের উদ্দেশ্যপথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। কোনও গুণীব্যক্তি কলিকাতায় আসিলেই, এই সমাজে তাঁহার গানবাজনা হইত। কলিকাতার অনেক বড়-লোক এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থ নিয়মিতভাবে সভায় যোগদান করিতেন এবং পরস্পর বেশ মেলামেশাও হইত। কিন্তু বাঙ্গালীর সমবেত কার্য্যে দেবতার অভিশাপ আছে, সেই অভিশাপের ফলে অনতিবিলম্বে মতদ্বৈধ ঘটিল এবং সমাজও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল।...অন্যত্র বাড়ী ভাড়া লইয়া সেইখানে 'ভারত-সঙ্গীতসমাজ' নামে সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইল।...এ দলের পৃষ্ঠপোষক হইলেন, কুমার মন্মথনাথ মিত্র।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথই ভারত-সঙ্গীতসমাজের প্রথম সম্পাদক; পরে অন্যতম সভাপতিও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রথমাবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়া-ছিল। তাঁহার 'অশ্রুমতী,' 'পুনর্বসন্ত,' 'বসন্তলীলা,' 'ধ্যানভঙ্গ', 'হিতে বিপরীত,' 'অলীক বাবু' প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থ এখানে বহুবার অভিনীত হইয়াছে।

সঙ্গীত-প্রকাশিকা।—'বীণা-বাদিনী' রহিত হইবার তিন বৎসর পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ত্রিপুরাধিপতি রাধাকিশোর মাণিক্য দেববর্ম্মণের অনুরোধে ও মাসিক ৫০৲ অর্থসাহায্যের

---

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর: "পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি"—'প্রবাসী', মাঘ ১৩১৮।

প্রতিশ্রুতিতে, ভারত-সঙ্গীতসমাজের মুখপত্র-স্বরূপ 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১৩০৮ সালের আশ্বিন (সেপ্টেম্বর ১৯০১) মাসে প্রকাশ করেন। ইহার কণ্ঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটি শোভা পাইত :—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

পত্রিকা-প্রকাশের "প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য" সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হয় :—

"আজকাল, শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ-কাব্য প্রভৃতি বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থসকল অনুবাদিত হইয়া জনসাধারণের মধ্যে বহুলরূপে প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত সঙ্গীত বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থাদির অনুবাদ কার্য্যে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। সঙ্গীত-নির্ণয়, সঙ্গীত-দর্পণ, সঙ্গীত-দামোদর রাগ-বিবোধ, রাগসর্ব্বস্ব-সার, রাগার্ণব, নারদ-সংহিতা, ধ্বনি-মঞ্জরী, প্রভৃতি বিবিধ সঙ্গীত-গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই পাণ্ডুলিপি অবস্থায় রহিয়াছে। দুই একখানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে মাত্র। অনেকগুলি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও এখন দুষ্প্রাপ্য এবং আরও কিছুকাল পরে একেবারে বিলুপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। এই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া মূল ও অনুবাদ আমরা ক্রমশ এই পত্রিকায় প্রকাশ করিব, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি। ইহার দ্বারা, 'গ্রহ', 'অংশ,' 'ন্যাস,' 'গ্রাম', 'মূর্চ্ছনা', 'বাদী', 'সম্বাদী,' 'ষাড়ব', 'ঔড়ব,' প্রভৃতি আর্য্য-সঙ্গীত-বিষয়ক পারিভাষিক শব্দের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হইবে এবং পূর্ব্বে রাগ-রাগিণীর কিরূপ মূর্ত্তি ছিল ও কালক্রমে কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহাও অবগত হওয়া যাইবে।

"আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য,—তানসেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ওস্তাদদিগের পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ করা। স্বরলিপির অভাবে, অনেকগুলি পুরাতন গান বিলুপ্ত হইয়াছে এবং যাহা এখনও প্রচলিত আছে, তাহাও কালক্রমে মুখ-পরম্পরায় বিকৃত হইয়া যাইতেছে। অতএব, এ বিষয়ে আমাদের আর উদাসীন থাকা উচিত নহে; যাহাতে পুরাতন গীতগুলি স্বরলিপিবদ্ধ হয়, সঙ্গীত-বেত্তা মাত্রেরই সে বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।...

"আমাদের ভারতবর্ষই সঙ্গীত-কলার জন্মস্থান। কোন কোন পণ্ডিত বলেন, এইখানেই সপ্তস্বর প্রথমে উদ্ভাবিত হইয়া পরে দেশবিদেশে প্রচারিত হয়। আমাদের সঙ্গীত-পদ্ধতিতে, বিশেষতঃ আমাদের রাগ-রাগিণীর স্বরবিন্যাসে ও মূর্ত্তি-কল্পনায় যেরূপ একটি কলা-নৈপুণ্য ও গুণপনা দেখা যায়, তাহা অন্য কোন সভ্যজাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় কি না সন্দেহ। এই সঙ্গীত-বিদ্যা আমরা কোন জাতির নিকট হইতে ধার করিয়া পাই নাই—ইহা আমাদের নিজস্ব সম্পত্তি। এই জন্য বলিতেছি, যাহাতে আমাদের পুরাতন সঙ্গীত-বিদ্যা ও সঙ্গীত-কলার বহুল প্রচার ও স্থায়িত্ববিধান হয়, সে বিষয়ে শুধু সঙ্গীতানুরাগী কেন স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য।"

সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ

ভারত-সঙ্গীতসমাজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা কালেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাটকগুলির বঙ্গানুবাদে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন,—

"একদিন মেজ'বৌঠাকুরাণী আমাকে 'শকুন্তলা' পড়িতে বলিলেন। ইহার আগে আমি সংস্কৃত নাটক একখানিও পড়ি নাই। 'শকুন্তলা' পড়িয়া আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, এ জিনিষ এখনও কেন বাঙ্গলা ভাষায় তর্জ্জমা হয় নাই। দুই-এক জনকে অনুবাদ করিতে অনুরোধও করিয়াছিলাম। কিন্তু কেহই তেমন গরজ করিলেন না। আমি নিজেই আরম্ভ করিয়া দিলাম।"

অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৮৯৯ হইতে ১৯০৪ সনের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৭খানি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন—এই প্রবন্ধের 'গ্রন্থপঞ্জী' বিভাগ দ্রষ্টব্য। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, ইহা 'তাঁহার স্মৃতির, তাঁহার যোগ্যতার, তাঁহার মেধার, তাঁহার পাণ্ডিত্যের, তাঁহার কবিত্বের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ হইয়া থাকিবে" ('রঙ্গালয়', ৪ মাঘ ১৩০৮)।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

১৩০৯-১০ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯০২-৩) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক বৎসরের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ তারিখে পরিষদের মাসিক অধিবেশনে "ভারতে নাট্যের উৎপত্তি" নামে একটি সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।

চিত্রাঙ্কন

হিন্দুস্কুলে পঠদ্দশায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শিক্ষকদের ছবি আঁকিতেন। চিত্রাঙ্কনের অভ্যাস তাঁহার বরাবরই ছিল। ইহাতে অনুরাগবশতঃ তিনি পরিচিত-অপরিচিত অনেকেরই মুখাকৃতি খাতায় আঁকিয়া রাখিতেন। ইহার ফলেই আমরা 'সারদামঙ্গলে'র কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী এবং রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের রেখাচিত্রগুলি লাভ করিয়াছি। ১৩১৮ সালের ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি ১৯১২) সংখ্যা 'ভারতী'তে সরলা দেবীর 'কবি-সম্বর্দ্ধনা' প্রবন্ধে প্রকাশিত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের (১৮৭৭-৮৩-৯১-৯২-১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথ) পাঁচখানি রেখাচিত্র দেখিয়া বিলাতের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রোটেনষ্টাইন (Rothenstein) আকৃষ্ট হন। তিনি তৎকালে-বিলাত-প্রবাসী রবীন্দ্রনাথকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত কতকগুলি মূল চিত্র আনাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। চিত্রগুলি বিলাতে পৌঁছিলে রবীন্দ্রনাথ ও রোটেনষ্টাইন উভয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১২ তারিখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে যে দুইখানি পত্র লেখেন, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' পুস্তক হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভাই জ্যোতি দাদা,—আপনার ছবির খাতা আমি

Rothensteinকে দেখিয়েছি। তিনি এখানকার একজন খুব বিখ্যাত artist; তিনি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হোয়ে গেছেন। তিনি আমাকে বল্লেন,—আমি তোমাকে বল্‌ছি, তোমার দাদা তোমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রী। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর ড্রইং যাঁরা করেন, তাঁদের সঙ্গেই ওঁর তুলনা হ'তে পারে। এত দিন যে আমাদের দেশে এ ছবির কোনো সমাদর হয় নি, এর মত এমন অদ্ভুত ঘটনা কিছু হ'তে পারে না। Most marvellous, most magnificent—এই ত তাঁর মত। তিনি বলেছেন, এখানকার সব চেয়ে বিখ্যাত art criticকে তিনি এই ছবি দেখাবেন, এবং এর একটা ছোট সমালোচনা তিনি নিজে লিখবেন। Portfolioর আকারে একটা selection তোমাদের করা উচিত।…যেটা যথার্থ আপনার নিজের জিনিষ এবং যাতে আপনার শক্তি এমন আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পেয়েছে, সেটাকে লুপ্ত হ'তে দেওয়া উচিত হয় না। আপনার এই ছবি এখানে যাঁরাই দেখেছেন, সকলেই খুব প্রশংসা করছেন: রোটেনষ্টাইন খুব একজন গুণজ্ঞ লোক, এঁর মতে আপনার চিত্রশক্তি একেবারেই প্রথম শ্রেণীর গুণীর উপযুক্ত; এ কথা চাপা রাখলে চল্‌বে না। আপনার স্নেহের রবি। ২৯ ভাদ্র ১৩১৯।

My dear sir,—Let me thank you for your kindness in sending over the three books containing your drawings. As I expected from the reproductions I saw in an article on your brother, they are admirable. I know of few drawings which show at the same time so much sensitiveness of line and sincerity in characterisation, and there is a beauty and nobility in the expression you give to your sitters which it would be difficult to match. I do not know which I prefer, the drawings of the men or of the women. Your drawing of ladies remind me of the early drawings by Dante Gabriel Rossetti and the admirable drawings by the great French artist, Puvis de Chavanes. Indeed the books have been—and still are a source of great delight to me, and all to whom I have shown them have had similar feelings regarding them. ..(Sept. 11, '12.)

১৯১৪ সনে রোটেনষ্টাইন একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা সহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অঙ্কিত ২৫খানি রেখাচিত্র বিলাতে মুদ্রিত করেন; এই চিত্র-পুস্তকের নাম—*Twenty-five Collotypes* from the original Drawings of Jyotirindra Nath Tagore. 1914.

জাতীয় সঙ্গীত

বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসী রাষ্ট্র-সঙ্গীত "লা-মার্সে ইয়েজ" এবং ইহার মূল সুরের অনুগত বঙ্গানুবাদ ও স্বরলিপি 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় (ভাদ্র ১৩২২) প্রকাশ করেন। উহা এইরূপ:—

আয় রে আয় দেশের সন্তান
গৌরবের দিন এসেছে;
অত্যাচার ঐ দ্যাখ্—গগনে
রক্ত-ধ্বজা তুলেছে।
শুনিছ না ক্ষেত্র-মাঝে
ভীষণ সৈন্যের হুঙ্কার?
ওরা আসে বুকের পরে
করিতে স্ত্রী-পুত্র সংহার।
ধর অস্ত্র পৌরজন
কর ব্যূহ সংগঠন;
চলো—চলো—মোদের ক্ষেত্রে
শত্রু-রক্ত হোক্ সিঞ্চন।

পুনায় অবস্থানকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে মৌলিক জাতীয় সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছিলেন, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলে অশোভন হইবে না। এই ভারত-গানটি স্বরলিপি সহ প্রথমে ১৩০৪ সালের চৈত্র-সংখ্যা 'বীণা-বাদিনী'তে প্রকাশিত হয়।—

শঙ্করা—কাওয়ালী

চল্ রে চল্ সবে ভারত-সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান!
বীর-দর্পে পৌরুষ-গর্ব্বে
সাধ্ রে সাধ্ সবে দেশের কল্যাণ।

পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈন্য
কে করে মোচন?
উঠ, জাগো, সবে বল— মা গো!
তব পদে সঁপিনু পরাণ।

এক তন্ত্রে কর তপ,
এক মন্ত্রে জপ;
শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোক্ষ এক,
এক সুরে গাও সবে গান।

দেশ-দেশান্তে যাও রে আন্‌তে
নব নব জ্ঞান
নব ভাবে, নবোৎসাহে মাতো
উঠাও রে নবতর তান।

লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন
না করি দৃকপাত
যাহা শুভ, যাহা ধ্রুব, ন্যায্য
তাহাতে জীবন কর দান।

দলাদলি সব ভুলি
হিন্দু-মুসলমান ;
এক পথে এক সাথে চল
উড়াইয়ে একতা-নিশান।

জীবন-সায়াহ্নে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবনের শেষ সতের বৎসর রাঁচীতে যাপন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি মোরাবাদী নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে "শান্তিধাম" এবং পর্ব্বতশীর্ষে উপাসনা-মন্দির রচনা করাইয়াছিলেন। শহরের কলকোলাহল হইতে বহু দূরে এই নিরালা পল্লীতে নিঃসঙ্গ অবস্থায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শেষ দিনগুলি সাহিত্য সঙ্গীত-চিত্রবিদ্যার অনুশীলনে ও ভগবৎ-আরাধনায় অতিবাহিত হইয়াছে ; মাঝে মাঝে আত্মীয়-বন্ধু-বিয়োগের বার্ত্তা আসিয়া তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে। তিনি ভগ্নী স্বর্ণকুমারীকে একখানি পত্রে লেখেন:—

রবিবার [৯ ডিসেম্বর ১৯২৩]

ভাই স্বর্ণ,—তোমার আন্তরিক শুভ কামনা পেয়ে খুব তৃপ্তিলাভ করলুম। মেজদাদা [সত্যেন্দ্রনাথ] গেলেন, দিদি [সৌদামিনী] গেলেন, শরৎ [কুমারী চৌধুরাণী] গেলেন, একে একে সবাই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, আমার পুরাতন বন্ধুবান্ধব আর একজনও নেই। এইবার আমার পালা। বোনের মধ্যে তুমি আর বর্ণ· তোমরা দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাক, এই আমার একান্ত বাসনা। যতই দিন যাচ্ছে, যতই সংসারে শোক-তাপ পাওয়া যাচ্ছে, ততই স্নেহ-ভালবাসার লোকদের আঁকড়ে ধরে থাকতে ইচ্ছে করে। বোনদের স্নেহ-ভালবাসার মর্য্যাদা এখন আরও বুঝতে পারছি। এমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা কেউ দিতে পারবে না। তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাক,ভগবানের কাছে আমার এই প্রার্থনা।—স্নেহের নতুন দাদা। ('জ্যোতিরিন্দ্রনাথ,' পৃ. ১৭৯-৮০)

মৃত্যু

৪ মার্চ ১৯২৫ (২০ ফাল্গুন ১৩৩১) তারিখে সায়াহ্নে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রাঁচীতে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে ঘটা করিয়া একাধিক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কিন্তু কেবলমাত্র বক্তৃতা বা হা-হুতাশ স্মৃতিরক্ষার প্রকৃষ্ট পন্থা নহে। তাঁহার সমগ্র রচনাবলীর একটি সুষ্ঠু সংস্করণ (জীবনী সহ) প্রকাশ করিলে তাঁহার স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রকাশ করা হইবে। এই কার্য্যে বিশ্বভারতী অগ্রণী হইলে পুণ্যের ভাগী হইবেন।

গ্রন্থপঞ্জী

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমগ্র গ্রন্থের প্রথম-প্রকাশকাল-সহ একটি কালানুক্রমিক তালিকা সংকলন করা সহজসাধ্য নয়। তাঁহার কোন কোন গ্রন্থে প্রকাশকাল মোটেই মুদ্রিত হয় নাই। বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে সকল গ্রন্থ স্থান পায় নাই, এমন কি কোন্ গ্রন্থ কোন্ সালে প্রথম প্রকাশিত তাহারও নির্দ্দেশ নাই। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' পুস্তকে সকল গ্রন্থের সঠিক প্রকাশকাল দিতে পারেন নাই। এই সকল কারণে আমরা বিশেষ পরিশ্রম সহকারে একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করিয়াছি ; তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকতালিকা হইতে গৃহীত।

১। কিঞ্চিৎ জলযোগ (প্রহসন)। ১৭৯৪ শক (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২)। পৃ. ৮৬।

২। পুরুবিক্রম নাটক। ১৭৯৬ শকাব্দা (৯ জুলাই ১৮৭৪)। পৃ. ১৪৭।

ইহার ২য় সংস্করণে (ইং ১৮৭৯) মুদ্রিত "এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" গানটি রবীন্দ্রনাথের রচিত।

৩। সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক। ১৭৯৭ শকাব্দা (৩০ নবেম্বর ১৮৭৫)। পৃ. ২৪০।

ইহার অন্তর্গত "জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ" গানটি যে রবীন্দ্রনাথের রচনা, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'তে তাহার উল্লেখ আছে।

৪। এমন কর্ম্ম আর ক'রব না (প্রহসন)। আষাঢ় ১৭৯৯ শক (৭ জুলাই ১৮৭৭)। পৃ. ১১৬।

১৯০০ সনের এপ্রিল মাসে এই প্রহসনখানি 'অলীক বাবু' নামে প্রকাশিত হয়।

৫। অশ্রুমতী নাটক। শ্রাবণ ১২৮৬ (৪ নবেম্বর ১৮৭৯)। পৃ. ২০৪।

ইহাতেও রবীন্দ্রনাথের রচিত গান আছে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ "গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে" গানটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৬। মানময়ী (গীতি-নাটিকা)। ১৮০২ শক (ইং ১৮৮০)। পৃ. ১২।

ইহাতেও রবীন্দ্রনাথের গান, যথা, "আয় তবে, সহচরি" আছে।

৭। স্বপ্নময়ী নাটক। ১২৮৮ সাল (২৪ মার্চ ১৮৮২)। পৃ. ১৮৯।

ইহাতে রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় বার হিন্দুমেলায় পঠিত কবিতাটি —"দেখিছ না অয়ি ভারত-সাগর" কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে স্থান পাইয়াছে।

৮। হঠাৎ-নবাব (প্রহসন, ফরাসী হইতে)। বৈশাখ ১৮০৬ শক (২৫ এপ্রিল ১৮৮৪)। পৃ. ১২৬।

মলিয়ের-কৃত 'লে বুর্জোয়া জাঁতিয়ম্' হইতে।

৯। হিতে বিপরীত (কৌতুক-নাটিকা)। ২৬ বৈশাখ ১৩০৩ শক (৭ মে ১৮৯৬)। পৃ. ৩০। গানের স্বরলিপি-সহ।

১০। স্বরলিপি-গীতি-মালা। ১৩০৪ সাল (১২ জুন ১৮৯৭)। পৃ. ৩২০।

১১। পুনর্বসন্ত (গীতিনাট্য)। ১ চৈত্র ১৩০৫ (১৪ মার্চ ১৮৯৯)। পৃ. ৩০+৶০

১২। অভিজ্ঞান শকুন্তলা (নাটক)। ১৩০৬ সাল (১৮ অক্টোবর ১৮৯৯)। পৃ. ১৪৬।

১৩। বসন্ত-লীলা (গীতি-নাটিকা)। ১৩০৬ সাল (২৯ মার্চ ১৯০০)। পৃ. ৩২।

১৪। ধ্যান-ভঙ্গ (গীতি-নাটিকা)। ১৩০৬ সাল (১৫ এপ্রিল ১৯০০) পৃ. ৪৮।

১৫। উত্তর-চরিত (নাটক)। জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ (৭ জুন ১৯০০)। পৃ. ১৫২।

১৬। রত্নাবলী নাটক। ভাদ্র ১৩০৭ (২৬ সেপ্টেম্বর ১৯০০)। পৃ. ৯৫।

১৭। মালতী-মাধব (নাটক)। ১৩০৭ সাল (২৯ সেপ্টেম্বর ১৯০০)। পৃ. ১৫১।

১৮। মৃচ্ছকটিক (নাটক)। ? ৮ মার্চ ১৯০১)। পৃ. ২৩১।

১৯। মুদ্রা-রাক্ষস (নাটক)। ১৩০৭ সাল (১০ মার্চ ১৯০১)। পৃ. ১৫৭।

২০। বিক্রমোর্ব্বশী (নাটক)। ১৩০৮ সাল (৪ জুন ১৯০১)। পৃ. ৮৪।

২১। মালবিকাগ্নিমিত্র (নাটক)। ১ আষাঢ় ১৩০৮ (১৫ জুন ১৯০১)। পৃ. ৯৫।

২২। মহাবীর-চরিত (নাটক)। ১৩০৮ সাল (৮ অক্টোবর ১৯০১)। পৃ. ১৮৫।

২৩। চণ্ডকৌশিক (নাটক)। ১৩০৮ সাল (৪ ডিসেম্বর ১৯০১)। পৃ. ৮৮।

২৪। বেণীসংহার নাটক। ১৩০৮ সাল (১৪ ডিসেম্বর ১৯০১)। পৃ. ১৫৯।

২৫। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় (নাটক)। ১৩০৮ সাল (২৪ মার্চ ১৯০২)। পৃ. ১১৭।

২৬। নাগানন্দ (নাটক)। ১৩০৯ সাল (১ আগষ্ট ১৯০২)। পৃ. ৮৭।

২৭। দায়ে পড়ে' দার-গ্রহ (প্রহসন, ফরাসী হইতে)। ১৩০৯ সাল (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০২)। পৃ. ৫৯।

মোলিয়ের-কৃত 'মারিয়াজ ফোর্সে' অবলম্বনে।

২৮। ভারতবর্ষে (ভ্রমণ, ফরাসী হইতে)। ১৩১০ সাল ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৩) পৃ. ৬৫।

আঁদ্রে শেভ্রিয়োঁ-কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে।

২৯। ঝাঁশির রাণী (জীবনী, মরাঠি হইতে)। ১৩১০ সাল (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৩)। পৃ. ৭৩।

৩০। বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা (নাটক)। ১৩১০ সাল (২০ ডিসেম্বর ১৯০৩)। পৃ. ৭৩।

৩১। রজত-গিরি (ব্রহ্মদেশীয় নাটক)। ১৩১০ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪)। পৃ. ৫৯।

৩২। ধনঞ্জয়-বিজয় (নাটক)। ১৩১০ সাল (৩ মার্চ ১৯০৪)। পৃ. ৩৬।

৩৩। কর্পূর-মঞ্জরী (নাটক)। ১৩১১ সাল (২৩ এপ্রিল ১৯০৪)। পৃ. ৬৪।

৩৪। প্রিয়দর্শিকা (নাটক)। ১৩১১ সাল (২৩ মে ১৯০৪)। পৃ. ৫৪।

৩৫। ফরাসী-প্রসূন (গল্প-কবিতা, ফরাসী হইতে)। ১৩১১ সাল (২৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪)। পৃ. ২৫৬।

৩৬। প্রবন্ধ-মঞ্জরী। ১৩১২ সাল (১২ আগষ্ট ১৯০৫)। পৃ. ৫৮৬।

৩৭। এপিক্‌টেটসের উপদেশ (ইংরেজী হইতে)। ১৩১৪ সাল (১৮ জুন ১৯০৭)। পৃ. ৷০+৮০।

৩৮। জুলিয়স সীজার (নাটক, ইংরেজী হইতে)। ১৩১৪ সাল (২৮ অক্টোবর ১৯০৭)। পৃ. ১৩৩।

৩৯। ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ। পিয়ের লোটির ফরাসী হইতে)। ? ১২ মার্চ ১৯০৯)। পৃ. ৩৭৩।

৪০। মার্কাস অরিলিয়সের আত্মচিন্তা (ইংরেজী হইতে। আষাঢ় ১৩১৮ (১১ নবেম্বর ১৯১১)। পৃ. ৯৫।

৪১। সত্য, সুন্দর, মঙ্গল (ভিক্টর কুজাঁর ফরাসী হইতে)। ? (২০ ডিসেম্বর ১৯১১)। পৃ. ৷৶০+৩৬৯।

৪২। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। ফাল্গুন ১৩২৬ (ইং ১৯২০)। পৃ. ২৪০।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক বিবৃত ও শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লিখিত "পিতৃদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি" ('প্রবাসী', মাঘ ১৩১৮) প্রবন্ধটি এই পুস্তকের পরিশিষ্ট-স্বরূপ মুদ্রিত হওয়া উচিত।

৪৩। শোণিত-সোপান (গল্প, ফরাসী হইতে)। জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ (ইং ১৯২০)। পৃ. ১০৪।

৪৪। অবতার (উপন্যাস, গতিয়ের-এর ফরাসী হইতে)। শ্রাবণ ১৩২৯ (ইং ১৯২২)। পৃ. ১৩২।

৪৫। মিলিতোনা (উপন্যাস, গতিয়ের-এর ফরাসী হইতে)। বৈশাখ ১৩৩০ (৭ জুন ১৯২৩)। পৃ. ১৫৫।

৫৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র। ইং ১৯২৪। পৃ. ৮৭২।

বালগঙ্গাধর তিলক-কৃত 'গীতারহস্য' নামক মরাঠী গ্রন্থের অনুবাদ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী, ১ম-৫ম ভাগ (বসুমতী)। ইং ১৯৩৬।

এশিয়ার কথা

শ্রীসুনীলকুমার বসু

মানব-সভ্যতার আদিম জন্মভূমি এশিয়া আজ শীতান্তের পুনর্নবীভূত সর্পের মত সমস্ত জড়িমা, সকল আবিষ্টতা ঝেড়ে ফেলে নূতন অগ্রগতির অপ্রতিহত আবেগ নিয়ে জেগে উঠেছে। এক দিন ইতিহাসের এক আদিম উষায় এই এশিয়ার পর্ব্বত-সঙ্কুল বক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছিল অভিযানী যাযাবর দল—মধ্য এশিয়ার 'গ্রেট হেভন্' থেকে সেই প্রথম অভিযানের বিচ্ছিন্নীকৃত ধারা একে একে বিশ্ব-ইতিহাসের বিস্তৃত সমতলকে সমৃদ্ধ করেছে—পূর্ব্বে জাপান থেকে সুরু করে পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত, দক্ষিণে পঞ্চনদের তীরে, ইউরোপের অন্তর্প্রাঙ্গন পার হয়ে, ভূমধ্যসাগরের কূলে কূলে এশিয়ার ভ্রাম্যমাণ আত্মা নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে, মিশিয়ে দিয়েছে, ভেঙেছে, আবার গড়েছে। এত বৈষম্য, এত বৈচিত্র্য, তবু কোথায় যেন লুকিয়ে আছে এশিয়ার প্রাণ—প্রতীচ্য 'European mind'-এর অহমিকা নিয়ে যে প্রাণকে বুঝতে চায় নি, বুঝতে পারে নি। এই মরু-পর্ব্বত-অরণ্যচারী ভ্রাম্যমাণের দল পশুপালন ছেড়ে কি করে হলকর্ষণ শিখল, লুণ্ঠন হত্যা ছেড়ে গড়ে তুলল জনপদ, যাদের হাতে ছিল ধ্বংসের মহামারী, কোথা থেকে তাদেরই হাতে এল বুদ্ধের বরাভয়, অগ্নিবর্ষী অস্ত্রের ফলকে কি করে ফুটল শান্তির বাণী, সে কথা মানব-সভ্যতার এক মৃত্যুহীন মহাকাব্য। বর্ত্তমান সমস্যা এই যে এই বিরাট মহাদেশের সমস্ত বৈষম্য, বিচ্ছেদ, বৈসাদৃশ্য ছাড়িয়ে, সমস্ত আবর্ত্ত মন্থন করে যে আফ্রোডিটির মত মানসমূর্ত্তি উঠেছে, কি তার রূপ, কোথায় তার সংহতির অদৃশ্য সূত্র।

এশিয়ার বৈশিষ্ট্য তার বৈচিত্র্যে, তার বিভেদে। 'ইউরোপীয়' শব্দটি যে ঐক্য এবং সমতা সূচিত করে, সে ধরণের বাহ্যিক সমতা এশিয়ার বিভিন্ন ভাষা, গোষ্ঠী, ধর্ম্ম ও কৃষ্টির মধ্যে সম্ভব নয়। এশিয়ার সমতা তার আশায় ও আদর্শে। এশিয়ার প্রাণ সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে চায়নি, চেয়েছে শান্তি ও নিরুপদ্রব জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে;—যেমন চীন ও ভারতবর্ষ। তাই প্রলুব্ধ ইউরোপকে সে বাহির থেকে বিদায় দেয় নি। বহু পাশ্চাত্য পর্য্যটক, ধর্ম্ম-যাজক, এমন কি, লুণ্ঠনকারীও প্রাচ্যের আতিথ্যের সুযোগ গ্রহণ করেছে। মাত্র কিছু দিন পূর্ব্বে টি, ই, লরেন্স দুর্দ্ধর্ষ আরব জাতির অন্তরে সাদরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এশিয়ার দুর্ব্বলতা তার মহত্ত্ব—সে মহত্ত্বের সুযোগ নিয়ে ইউরোপ তার সর্ব্বনাশ সাধন করতে চেয়েছে। রাজনৈতিক টাগ-অব-ওয়ারে মহত্ত্বের মূল্য না থাকায় এশিয়া ইউরোপের দাবা খেলার ছকে পরিণত হয়েছে। জন গান্থার এ বিষয়ে বলেছেন,

"The history of mode n Asia has been that of Western Powers struggling among themselves for the rich and postrate body of the eastern continent. Geographically Europe is an appendage of Asia. The appendage has wagged,—and perhaps poisoned the main body."

ইউরোপের যে সব ভ্রাম্যমাণ দল ইংলণ্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ থেকে নবাবিষ্কৃত সমুদ্রপথে যাত্রা করেছিল প্রাচ্যের দিকে, তাদের মধ্যে এক দল ছিল ব্যবসায়ী যারা প্রয়োজনানুসারে জলদস্যু হয়ে উঠতে পারত, আর এক দল ছিল ধর্ম্মযাজক, অশিক্ষিত প্রাচ্যকে অন্ধকার থেকে যারা আলোতে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এদের সবারই আন্তরিক উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যের অপুষ্ঠিত সম্পদ হস্তগত করা। তাই খ্রীষ্ট রাজ্যের স্থানে স্থাপিত হ'ল খ্রীষ্টান রাজ্য। তাই অবধূরে সামুদ্রিক দস্যু হয়ে উঠল নৌ-সেনাপতি, নিরীহ বণিক হয়ে উঠল রাজ্যাধিকারের প্রধান সহায়। দস্যু, বণিক ও পাদ্রীর আবিষ্কৃত মসৃণ পথে এল সাম্রাজ্যবাদ। ভারতের উপকূলে ফরাসী ও ওলন্দাজদের বিয়োগান্তক নাটকের অবসানে শোনা গেল ব্রিটিশ সিংহের গর্জ্জন। মালয় উপদ্বীপে ডাচ, পর্ত্তুগীজ ও ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভিতর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ কায়েম হ'ল। পর্ত্তুগীজরা ক্যান্টনের ব্যবসায়-বনিয়াদ গাঁথল দৃঢ় করে। এদেরই বাণিজ্যতরী চীনের কূলে এসে লাগল আগ্নেয়াস্ত্র, আফিং আর মিশনরির সওদা নিয়ে। অনতিবিলম্বে জাপান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'ল তাদের প্রাধান্য। কিন্তু এই এশিয়া অভিযানে ইংরেজ-বণিকই বোধ হয় সব চেয়ে সুবিধাজনক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সমর্থ হয়েছিল। তাই যখন অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগুলি এশিয়ার কূলে কূলে মাত্র আংশিক প্রাধান্য বিস্তার করতে পেরেছিল, ইংরেজ তখন রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়ে অকস্মাৎ অনেক পরিমাণে রাজনৈতিক শক্তি ও বাণিজ্যিক অধিকার করতলগত করেছিল—যেমন ভারতবর্ষে ও চীনে। এই অধিকার রক্ষা করতে ইংরেজ বারবার অস্ত্রধারণও করেছে। চীনের বেলায় সে অস্ত্র আফিং ও আগ্নেয়াস্ত্র। প্রথমটা অহিংস অস্ত্র, কিন্তু অত্যন্ত ফলপ্রদ। তাই নানকিঙের সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে দূর প্রাচ্যে ইংরেজের সার্ব্বভৌমত্ব দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সাম্রাজ্য-প্রতিযোগিতার হিংস্র রূপ আজও বদলে যায় নি। এশিয়া কিন্তু আজ আর নিজেকে লুঠের ভাণ্ডার হিসাবে দেখতে প্রস্তুত নয়। এশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের বিভেদ এইখানে যে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা চায়, সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা চায় না, সংগ্রাম চায় না, চায় শান্তি, শ্বেত জাতির অন্যায় প্রাধান্যের অবসান ঘটিয়ে চায় সংহতি। পণ্ডিত নেহেরু সেজন্যে বলেছিলেন, "এই আণবিক বোমার যুগে শান্তিরক্ষার জন্য এশিয়াকে তাই সাফল্যের সহিত কার্য্য করিতে হইবে।" সঙ্কীর্ণ ও সংগ্রামশীল যে জাতীয়তাবাদ ইউরোপকে দাহস্তূপে পরিণত করেছিল, এশিয়া সে জাতীয়তাবাদ স্বীকার করে না। রেস থিওরিকে সম্বল করে ইউরোপ এই দাম্ভিক জাতীয়তাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, যদিও জীবতাত্ত্বিকগণ একবাক্যে প্রমাণ করেছেন যে রক্তের অবিমিশ্রতার কথা কবি-কল্পনা মাত্র। সমস্ত ইউরোপ

এই জাতীয় আভিজাত্যের অহমিকায় রাহুগ্রস্ত। কিন্তু অসংখ্য জাতির বাসভূমি এই এশিয়ায় ঐ ধরণের জাতীয় আভিজাত্যের ও অবিমিশ্রতার অবকাশ নেই। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে লোহিত সাগর পর্য্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডে, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতিবিশিষ্ট নর-নারী বারবার কত বিভিন্ন ধরণের সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। সেই সভ্যতার দুটি শাখা পৃথিবীর নব-বসন্তে ভারত ও চীনে পুষ্পিত হয়ে উঠেছিল; দর্শন, শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যের মঙ্গলময় পথে অগ্রসর হয়েছিল শান্তির ধ্রুব লক্ষ্যে।

এশিয়ার জাতীয়তা যেমন বিকাশলাভ করতে পারে নি, ঐক্যের অভাবও তেমনি সেখানে গভীর ভাবে বর্ত্তমান। একই এশিয়ার মধ্যে আর্য্য দ্রাবিড় থেকে সুরু করে কত বিভিন্ন জাতির বসবাস, একদিকে মরুচারী আরব, অন্যদিকে পর্ব্বতচারী মোঙ্গল। আবার সিন্ধু-গঙ্গার শস্যশ্যামল উপত্যকায় শান্তি-প্রিয় ভারতবাসী, তাই 'রেস' থিওরি বা উগ্র নররাজ্যলোলুপ জাতীয়তা এখানে বিকশিত হয় নি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে এখানে সেই জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছে, প্রথম যুদ্ধ যাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যাকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করেছে—সে এক সুস্থ ন্যায়সঙ্গত জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবি। উদাহরণ-স্বরূপ, আরব-সঙ্ঘের উল্লেখ করা যেতে পারে। ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে একটা বাহ্যিক সমতা সাধন করতে পেরেছিল—এশিয়ায় ধর্ম্মমতের বিভিন্নতার জন্য তা সম্ভব হয় নি। আজ অবশ্য বিজ্ঞানের প্রভাবে, উন্নততর রাজনৈতিক বিবর্ত্তনের ফলে ধর্ম্ম তার মুষ্টি শিথিল করেছে। প্যান-ইসলামের স্থানে এসেছে প্যান-আরব। সোভিয়েট-এশিয়া থেকে ধর্ম্মান্ধতা দূর হয়েছে। ভারত ও চীন উদারতার ঐতিহ্য নিয়ে অগ্রসর হতে সুরু করেছে।

দস্যু, বণিক ও ধর্ম্মযাজকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এল যে সাম্রাজ্যবাদ, তার আধিপত্যে বিঘ্ন ঘটল কি করে? এশিয়ার বুকে শ্বেত জাতি তো দেবতার মত বাস করছিল, ওলিম্পাস নিবাসী উদাসীন দেবতার মত সাগ্নিস্থিত প্রাচ্যের পানে তাকিয়ে সে শুধু কৃপার হাসি হাসছিল। কি করে তার এই নিরাপত্তা হঠাৎ ভেঙে গেল? শ্বেত জাতির এই ধ্বংসের বীজ লুকান ছিল তার নিজেরই আত্মগরিমার মধ্যে। যে সংহতির গর্ব্ব নিয়ে সে প্রাচ্যকে করায়ত্ত করে রেখেছিল, দেখা গেল তা কল্যাণময় নয়, অতএব ধ্বংসাভিমুখী। দূর তমসাবৃত মধ্যযুগ থেকে বাণিজ্যের অধিকার নিয়ে জাতিমণ্ডলীর মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে আসছিল তারই একটা উগ্ররূপ দেখা গিয়েছিল আধুনিক কালে। ইউরোপের অগ্রসর রাষ্ট্রগুলি চাইল উপনিবেশ, উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভারের উপযুক্ত বিক্রয়স্থান, বর্দ্ধিষ্ণু জনসঙ্ঘের জন্য আহার্য্য। বিরাট অনুন্নত এশিয়ার দিকে চলল তাদের অভি-যান। প্রথম মহাসমরের পর পাশ্চাত্ত্য জাতির কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ল আভিজাত্যের ছদ্মবেশ বিদীর্ণ করে। এশিয়া দেখল, নিছক সাম্রাজ্য নিয়ে সুসভ্য পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলি কি পরিমাণে হিংস্র, অমানুষিক হয়ে উঠতে পারে। এশিয়া বুঝল যে শ্বেত জাতি শুধু দাম্ভিক ও হিংস্র-ই নয়, প্রতারকও—মুখে তাদের বিশ্বমৈত্রীর রঙীন প্রলাপ, অন্তরে তাদের ফেণায়িত হিংসার বিষ। সেই দিন এশিয়ার জাগ্রত বুকে ইউরোপের মৃত্যু হ'ল।

এশিয়ায় শ্বেতাধিপত্য অবসানের আর একটি কারণ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা। এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমগ্র এশিয়ায় এক বিরাট আলোকপ্রাপ্ত যুব-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল, ন্যায় ও নীতি যাদের একমাত্র আদর্শ, রুশো-ভল্টেয়ার যাদের অন্তরকে উদ্বোধিত করেছে, মিল-জেফারসন যাদের চোখে অমৃতের স্পর্শ বুলিয়েছে, বার্ক দিয়েছে যাদের মুখে বাণী। এই যুব-সম্প্রদায় দেখতে পেল কি করে পাশ্চাত্ত্য রাজনীতি ও বাণিজ্যনীতি—হীন প্রতারণার পথ, প্রয়োজন হলে বর্ব্বরতার পথ অবলম্বন করে সাম্রাজ্য-স্বার্থ কায়েম করে রাখবার চেষ্টা করছে: পাশ্চাত্ত্যের এই বিরাট বিশ্বব্যাপক প্রতারণা ক্ষুব্ধ করল যুব-এশিয়াকে, যে যুব-এশিয়া পাশ্চাত্ত্যের কাছে শিখেছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবতার আদর্শ, পাশ্চাত্ত্যের আলোতেই দেখেছে সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়ের উজ্জ্বল মূর্ত্তি। এর পর এই বিক্ষুব্ধ, ভ্রান্তিমুক্ত যুব-এশিয়ার হাতে এল ইউরোপের মারণাস্ত্র, সে তার সমর-বিজ্ঞান। তাই প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তে এশিয়ার অনেকগুলি রাষ্ট্র রণশ্রান্ত ইউরোপের শিথিল মুঠি থেকে বেরিয়ে আসবার আংশিক সফল প্রয়াস করেছিল। মরীয়া ইউরোপ প্রথম মহাসমরের পর রক্তমোক্ষণক্লান্ত হয়ে চরম চেষ্টা করল এশিয়ার উপর তার আধিপত্য বজায় রাখতে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তাই ত দেখা যায় সাম্রাজ্য নিয়ে, অধিকার নিয়ে এত হিংস্র হানাহানি কাড়াকাড়ি বিভিন্ন শক্তির মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদকে প্রথম মহাসমর যে ভাবে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিলে, তাতে করে ইউরোপ বুঝতে পারল যে তার কায়েমী স্বার্থের দিন ফুরিয়ে এসেছে। এদিকে যুদ্ধের পর তুরস্ক নিজেকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করে শক্তিশালী স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হল। এমনই পরিবর্ত্তিত তার রূপ যে প্রাচ্য বলে তাকে আর চেনা যায় না। পশ্চিম এশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান, বাণিজ্য ও সামরিক গুরুত্ব উপলব্ধি করার ফলে ইউরোপের শক্তিগুলি সহজে তাকে মুক্তি দেয় নি, বক্কামের মত কেটে কেটে ছোট ছোট রাষ্ট্রে ভাগ করে দিয়েছে, কায়েম স্বার্থকে অব্যাহত রাখতে। প্রাচ্য বারবার অস্বীকার করেছে এই কার্পণ্যের দান নিতে। ইবন সাউদের নূতন আরব রাষ্ট্রের মধ্যে, সিরিয়া ও লেবাননের গণতন্ত্রের মধ্যে, ইরাকের স্বাধীনতার স্বপ্নে আত্মপ্রতিষ্ঠার নূতন দাবি ও আংশিক সফলতা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষে কি করে এই স্বাধীনতার স্বপ্ন ন্যায্য বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল তা সবারই জানা আছে। চীনে দীর্ঘ আত্মকলহের অবসানে সান-ইয়াট-সেন নূতন জাতীয়তাবাদের বনিয়াদ দৃঢ় করেন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায়,

যেখানে বণিকের মানদণ্ড কার্য্যতঃ রাজদণ্ডরূপে বহুদিন প্রতিষ্ঠিত, সেখানেও বর্ম্মা থেকে সুরু করে শ্যাম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থানে জাতীয়তার তীব্র স্ফুরণ সুরু হ'ল। জাপান শ্বেতজাতির আধিপত্য ধ্বংস করবার জন্ত কূটনৈতিক সামরিক প্রচেষ্টা সুরু করল, মহা-এশিয়ার নামে। কোরিয়া উইলসনের চতুর্দ্দশ পয়েন্ট নিয়ে স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় ব্রতী হ'ল।

ইউরোপের মুষ্টি শিথিলতর করল সাম্যবাদ ও রাশিয়া। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডে শ্রমিকদল সর্ব্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদের তীব্র বিরোধিতা সুরু করেছিল। কিন্তু সাম্যবাদের জীবন্ত ল্যাবরেটরি রাশিয়া তখনও ইউরোপে অপাংক্তেয় লীগ-অব-নেশনসের বহির্ভূত এবং ইউরোপীয় সমাজের অযোগ্য বলে পরিগণিত। ইউরোপ থেকে এই নির্ব্বাসন রাশিয়াকে এশিয়াভিমুখী করবার জন্ত অনেক পরিমাণে দায়ী। তা ছাড়া, এশিয়ায় রাজনৈতিক ও সামরিক সম্ভাবনার যে আয়োজন ছিল তা রাশিয়ারও দৃষ্টি এড়ায় নি। আরও একটি কথা এই যে, জাতি ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে রাশিয়া এশিয়া-সংশ্লিষ্ট। একজন মার্কিনী লেখক, বলছেন, "Russia is essentially Asiatic"—আমেরিকা ও ইউরোপ যেমন রাশিয়াকে অর্দ্ধোন্নত দেশ হিসাবে অবহেলিত মনে করত, সেইরূপ রাশিয়ার জনগণের অন্তর ধীরে ধীরে এশিয়ার প্রাণ-স্পন্দনকে গ্রহণ করে নিয়েছে। এশিয়ার একটা বিরাট অংশ, জারদের অধীনে যা 'Prison house of nations বলে কথিত হ'ত, সেই অত্যাচারিত, অধুন্নত মানবসমাজের অভিশপ্ত বাসভূমি সোভিয়েটের শাসনাধীনে সুন্দর ছোট ছোট রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে, বহুদিনের অন্যায় ও অত্যাচারের অবসানে, সুস্থ কল্যাণময় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারায় মুক্তিস্নান করে উঠেছে।

পররাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে নিরাপত্তার অপরিহার্য্য অভিযানে রাশিয়াকে এশিয়াভিমুখী হতে হয়েছিল। কোন লেখিকা বলেছেন যে, রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির পিছনে কোন আদর্শগত অগ্রগতি নেই, আছে সেই শাশ্বত এবং মৌলিক "Search for safety" (*Oxford Pamphlets*, no. 34)। এ কথা অনেকাংশে ঠিক, কিন্তু শুধু কূটনীতির অতীত একটা সৌভ্রাত্রের ভাব তার পররাষ্ট্রনীতিতে দেখা যায়—যখন রাশিয়া উপযাচক হয়ে শ্বেতজাতির চক্রান্ত ব্যর্থ করে 'ক্যুওমিন্টাং' গঠনে চীনকে সহায়তা করে। রাশিয়ারই অদৃশ্য প্রেরণায় সান-ইয়াট-সেনের Pan-Asianism শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং অনেকটা বলশেভিক ভঙ্গিতে 'ক্যুওমিন্টাং' পুনর্গঠিত হয়। সেইরূপ তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে রাশিয়ার প্রেরণায় জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্রবাদ ও শ্বেতবিরোধী মনোভাব দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়। মুস্তাফা কামাল যখন শ্বেতসাম্রাজ্যকে অগ্রাহ্য করে তুরস্ককে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তাঁর পিছনে ছিল রাশিয়ার সহানুভূতি। ইরাণে জাতীয়তা, ভারতে গণ-আন্দোলন, এবং আফগানিস্থানে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব অনেক পরিমাণে রাশিয়ার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, বলা যেতে পারে। রাশিয়ার এই নূতন "live and let live" নীতি,—অনেকে যার নাম দিতে চান "enlightened imperialism,"—সেই নীতি এশিয়ার অবহেলিত এবং নিপীড়িত দেশগুলির কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠে।

এশিয়ার এক প্রান্তে তুরস্ক ও অপর প্রান্তে জাপান, চীন এবং ভারতের মত শান্তি ও প্রেমের বাণী নিয়ে বিদেশীকে অভ্যর্থনা করে নি, তরবারির সহায়তায় পররাজ্যলোভী বিদেশীকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে জাপান শক্তিশালী ও অগ্রগামী জাতি হিসাবে শ্বেত-জাতির সমকক্ষ হয়ে দেখা দিলে এবং দূর প্রাচ্যে এশিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করলে। তুরস্ক যদিও প্রথম মহাসমরে লাভবান হয় নি, তবু বেশী দিন তাকে আর 'Sick man of Europe' হয়ে থাকতে হয় নি। মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে পশ্চিম এশিয়ার নেতৃত্ব সে গ্রহণ করেছে।

আজ এশিয়ায় শ্বেতনেতৃত্ব নির্ম্মম আঘাত পেতে বসেছে, অথচ এই এশিয়ায়ই আবার তিনটি প্রধান শ্বেতজাতির মধ্যে পুনরায় সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাচীন নাটক অভিনীত হতে সুরু হয়েছে। একদিকে দেখা যায় ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের সজীব সগৌরব আত্মপ্রতিষ্ঠা; অন্য দিকে পরিলক্ষিত হয় আমেরিকা, ইংলণ্ড ও রাশিয়ার মধ্যে সার্ব্বভৌমত্ব নিয়ে কুটিল রেষারেষি। আমেরিকা কখনও এশিয়াকে ভালবাসে নি। উপরন্তু, বিভিন্ন এশিয়া-বিরোধী আইনের দ্বারা এশিয়াবাসীর স্বাধীনতা খর্ব্ব করতে চেষ্টা করেছে, যেমন Immigration Act of 1917। প্রাণিজ্যের একটা বিরাট ক্ষেত্র হিসাবে আমেরিকা চিরদিনই এশিয়াকে দেখেছে। তা ছাড়া, আমেরিকা হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাঙ্কার এবং এশিয়াকে তার কাছে থেকে সবচেয়ে বেশী ঋণ করতে হয়েছে। তাই ইউরোপীয় রাজশক্তিগুলির মত প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার না করলেও আমেরিকার এশিয়া-নীতিকে 'enlightened imperialism' ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। দ্বিতীয় মহাসমরের পর ইংলণ্ডের আধিপত্য অনেক পরিমাণে খর্ব্ব হওয়ায় এশিয়ায় আজ মার্কিন-প্রাধান্ত সুরু হয়েছে।

দিল্লীর পুরান কিল্লায় নূতন করে এশিয়ার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'ল। এশিয়াকে যদি আজ বাঁচতে হয়, তবে এই সংহতির মধ্য দিয়ে বাঁচতে হবে। এশিয়াকে এই মহাব্রত গ্রহণ করতে হবে যে এশিয়া থেকে শ্বেতজাতির সমস্ত আধিপত্য নষ্ট করে দিয়ে 'Asia for Asiatics' এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতি-পালন করতে হবে। এশিয়ার যা প্রাকৃতিক সম্পদ, এশিয়ার যে জনশক্তি,তাকে পাশ্চাত্ত্য জাতির লোভ ও স্বার্থের যজ্ঞে আর ইন্ধন দেওয়া চলবে না। এশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি কণা নিয়োজিত হবে তার কোটি কোটি অনুন্নত, অর্দ্ধোন্নত নরনারীর জন্যে, আর তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির উদ্দেশ্যে।

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৪

হেমলতার প্রকাশ-বেদনা সুরু হ'ল। মন্দাকিনী ও সুচিত্রা এরা ঘরের বউ—বাইরের মন-রোচক খবর রঙ ফলিয়ে বিস্তার করে রোজ দু'তিন বার বলে যে সান্ত্বনা লাভ করবে—সে তো হাতের পাঁচ রইলই—বাইরের রটনা না হলে আপাতত তিনি সুস্থ হন কি করে। সুচিত্রা খবরটা শুনলে—কোন মন্তব্য করলে না। মন্দাকিনী মন্তব্য করলে বটে—কথাটাকে বিস্তার করবার প্রয়াস পেল না—কাজেই তিনি দোক্তার কৌটো আঁচলে বেঁধে—বউদের উদ্দেশ করে বললেন, সদর দরজাটা দাও বউমা—আমি একবার আশুর মায়ের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

পথে বেরিয়ে মনে হ'ল—আশুর মায়ের কাছে না গিয়ে প্রশান্তদের বাড়িতেই প্রথমে গেলে ভাল হয় না কি। খবর যতটুকু শুনেছেন—তাতে সবিস্তার পরিবেশনে বাধা জন্মাবে না—তবু সবটুকু খুঁটিয়ে শুনলে—রসবিস্তারে পাঁচ জনকে সুখী করে নিজেও পরিতৃপ্ত হবেন তো। তাই ভাল।

প্রশান্তর মা ঘরের ভিতর কুলোয় করে ডাল বাছছিলেন—মেয়ে শান্তি রোয়াকে ইট সাজিয়ে খুরি মুচি নিয়ে আসল সংসারের মক্স করছিল. দলিজ পেরিয়ে হেমলতা রোয়াকে উঠে বললেন, কিলো শান্তি—কি রাঁধলি ? মা কোথায় লো ?

শান্তি উত্তর দেবার আগেই ঘরের ভিতর থেকে প্রশান্তর মা বললেন, এস দিদি।

কুলো রেখে তাড়াতাড়ি তিনি একখানি আসন পেতে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, পান খাবে দিদি ?

ওমা—পান আবার খাব না—বলে পান দোক্তা চা এই নিয়ে কোন রকমে বেঁচে আছি। নইলে বড় শত্তুর যে দাগা দিয়ে গেছে তারই জ্বালায় দিন রাত জ্বলে যাচ্ছে বুকের ভেতরটা। স্বরটি অশ্রুর আভাসে করুণ হয়ে উঠল—চোখে আঁচল ঘষে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন তিনি।

প্রশান্তর মা বললেন, তুমি ভেবনা দিদি—মথুরা তোমার ফিরে আসবে।

তোমরা সতীলক্ষ্মী সেই আশীর্ব্বাদই কর মা। আর একবার চোখে আঁচল ঘষে তিনি ভাল হয়ে বসলেন।

প্রশান্তর মা দুটি পান সেজে—ছোট রেকাবিতে করে তাঁর সামনে দিয়ে বললেন, দোক্তা লাগবে ?

না ভাই—ওটি আমার কাছ ছাড়া হলে চলে না। এই দেখ সঙ্গের সাথী। বলে অঞ্চলগ্রন্থি মোচন করে কৌটাটি বার করলেন।

চুন দেব ?

না ভাই—তোমার হাতের পান এমন চমৎকার যে চুন খয়ের সব সমান সমান থাকে। এ গাঁয়ে এমন পান সাজতে তো আর কাউকে দেখি না। বলে—বাইরে উঠে গিয়ে বার দুই পিক ফেলে ঘরে এসে বসলেন।

তারপর—জিজ্ঞাসাবাদ হ'ল রান্না নিয়ে। মুগের ডাল খেলেই পেটে অম্বল গোলা ওঠে তাই সবিস্তারে জানিয়ে হেমলতা বললেন, তা অম্বলের আর দোষ কি ভাই—ভাবনায় চিন্তেয় দেহ পাত হয়ে গেল। ছেলে না হলে এক জ্বালা—হলে শতেক জ্বালা ! এই দেখ না—নিদ্‌্ধী মথুরা—। নচ্ছার জমিদারের পাল্লায় পড়ে বাছা যে কোথায় গেল ! ছোটটা তাও চাকরিতে স্থিতস্থিত হ'ল না ! শুনি তো—রোজগার করে দু'হাতে—ছোকরা গিন্নিও তেমনি ! অযচ্ছল খরচ ভাই ! কি সব খদেশীর দল· তাদের পেছনেই ঢালছে টাকা। বাড়ীতে যখন দেয় ঢেলে দেয়—একেবারে দুশো পাঁচশো।

তবে ন'মাসে ছ'মাসে তো ! পেটের বলতে নেই সংসার তো ছোট নয়—মাস গেলে চারশো-পাঁচশো টাকা খরচ। রোজ বাজার খরচই বলে-তিন টাকা ! কর্ত্তাদের যাই বিষয় সম্পত্তি কিছু ছিল তাই এতগুলি হাত মুখে উঠছে—নইলে কি হত ভাই !

তা ত বটেই ! নিজেদের দিয়েই তো দেখছি ভাই—

এই বোঝ ভাই, নিজে হাতে সংসার না করলে কেউ খরচের মর্ম্ম বুঝতে পারে ! সে দিন আশুর মা বললে—রোজ তিন টাকা বাজার খরচ এ তোমার বড্ড বেশী ভাই ! বড্ড বেশী হ'ল ? এক টাকার জিনিষটা পাঁচ টাকায় কিনতে হচ্ছে, বেশী হ'ল ? তবে যদি ছাই পাঁশ খেয়ে পেট ভরাতে হয় সে হলো গিয়ে আলাদা কথা ! আলু কপি না হলে কেউ তরকারি পাতে পাড়বে না—চুনো মাছ আনবার যো নেই, শেষ পাতে দুধ সবারই একটু চাই—

তা ত বটেই !

. এই যারা বুঝদার— তাদের দুবার বলতে হয় না ! কথায় আছে না—

পড়ল কথা সভার মাঝে
যার কথা তার গায়ে বাজে !

আশুর মার হলো গিয়ে ভাই। বাপের বাড়ির যেমন হাড়ি খেতে গন্ডি নেই—শ্বশুরবাড়িতেও তেমনি ! তোরা ভাল খাওয়া ভাল পরার মর্ম্ম কি বুঝবি লা !

প্রশান্তর মা মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

হেমলতা বললেন, তাই বলছিলাম মা—ছেলের মত পরম মিত্রও নেই—পরম শত্তুরও আর নেই। এই তোমার প্রশান্তর কথাই ধর—রূপে গুণে বিদ্যেয় এমন ছেলে এ গ্রামে কমই দেখতে পাই। সোনা এক দিকে আর ছেলে এক দিকে—

ওজন করলে তুল্য-মূল্য তবু এ হেন সোনার ছেলের এমন মতিগতি হল কেন ভাই!

প্রশান্তর মা শুষ্ক স্বরে বললেন, কেন দিদি—

না অন্ত কিছু নয়। স্বভাব-চরিত্তির আচার-ব্যাভার শুনবে ছেলে তোমার তামার পাত্তরে গঙ্গাজল। শুনলাম ভাল একটি চাকরিও পেয়েছে। কিন্তু ছেলের নাকি চাকরিতে মতিগতি নেই?

প্রশান্তর মা বললেন, আমাদের ঘরে চাকরি না করলে চলে? ও সব খেয়ালের কথা দিদি। কর্ত্তা বলছিলেন—সেখানে গিয়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে ছেলে যাতে চাকরি করে সেই ব্যবস্থা করবেন।

বেশ বেশ ভাই, মাথার খামিজ না থাকলে ছেলে ভাল হয়। বেশ ভাই—ভগমান ওর সুমতি দিন। তাই শুনলাম কিনা—কথা হচ্ছিল পাশা খেলতে খেলতে। মনটা খারাপ হয়ে গেল, বলি ওদের তো আর জমিজমা বিষয় আশয় নেই—চাকরি না করলে খাবে পরবে কি? আর একটি পান চেয়ে নিয়ে তিনি উঠলেন। আসল কথাটা জানা হয়ে গেছে—আগুর মার ওখানে এখন না গেলেই নয়।

সন্ধ্যা বেলায় বেড়িয়ে এসে দুর্গামোহন পত্নীকে ডেকে বললেন—এ সব কি কথা বলেছ তুমি মথুরার মাকে?

পত্নী বিরাজমোহিনী সাশ্চর্য্যে বললেন, কি বলেছি?

যে প্রশান্ত আমার কথা না শুনলে—আমি ওকে ত্যাজ্য-পুত্র করব।

বিরাজমোহিনী বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত্ত থ মেরে রইলেন।

দুর্গামোহন বললেন, মথুরার মাকে তুমি তাদেই জান—ওর সঙ্গে কোন কথা—

বিরাজমোহিনীর অত্যন্ত অভিমান হ'ল। মুখ ফিরিয়ে ভারি গলায় বললেন, ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করবে—এই কথা আমি বলেছি—তুমিও বিশ্বাস করলে!

দুর্গামোহন অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়—এ সম্বন্ধে আলোচনাটা—মানে সংসারের ভেতরের খবর বার করা—

তোমার বৈঠকখানার উত্তর দিকের জানালাগুলো আগে বন্ধ কর দিকি—

দুর্গামোহন অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললেন, ঠিক—ঠিক—খেলতে খেলতে মাথার ঠিক থাকে না—তা কালকেই কলকাতায় যাই—কি বল?

যাও—কিন্তু একটা কথা।

কি?

মলয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবে না—বা কোন অনুরোধ তাকে করবে না। নিজের ছেলেকে শাসন কর—উপদেশ দাও নিজেই করবে।

দুর্গামোহন বললেন, তুমি মিছে রাগ করছ। মলয়ের মাতে আর মলয়ে আকাশ পাতাল তফাৎ।

তা জানি। কিন্তু পরের খোঁটা সইতে পারব না তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি।

দুর্গামোহন হেসে বললেন, আচ্ছা তাই হবে।

৫

দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উঠবার মুখে মলয়ের সঙ্গে প্রথমেই দেখা হয়ে গেল। মলয় হেঁট হয়ে প্রণাম করতেই জিজ্ঞাসা করলেন, ভাল আছ ত বাবা?

মাথা নেড়ে মলয় বললে, হাঁ। আপনি হঠাৎ এলেন যে? কাকীমা ভাল আছেন?

ভাল। চল তোমার ঘরে। বলেই তার পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে কি ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আপিসে চলেছ?

আপিস! অল্পক্ষণের মধ্যে বিস্ময় কাটিয়ে মলয় হাসি মুখে বললে, আমার তাড়া নেই—আসুন।

মেসের ঘর—লম্বায় চওড়ায় বাসগৃহের মত নয়—কোন রকমে দুটি সিটের ব্যবস্থা আছে। যারা সে ঘরে বাস করে তারাও গোছালো নয়—সারাদিন খাটুনির পর সন্ধ্যায় একটু বিশ্রাম ও রাত্রিতে নিদ্রা এই দুটি কাজ সুসম্পন্ন হলেই এর প্রয়োজন মিটে যায়। প্রয়োজনের বেশী কিছু করতে গেলে নিজস্ব রুচি ও শিক্ষার স্বাধীনতা চাই—বারো রাজপুত্রের তের হাঁড়ির ব্যবস্থায় সে ত সম্ভব নয়, কাজেই শুধু দিন যাপনের শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানিটুকু গায়ে না মেখে দিনের পারে দিনকে আর রাত্রির পিঠে রাত্রিকে ঠেলে দেবার আয়োজন করে এরা। কর্ম্মক্ষেত্রের জগৎ—বিশ্রামক্ষেত্রের জগৎ—বাইরের জগৎ বা বাড়ীর জগৎ—এই ভিন্ন ভিন্ন জগতে বাস করে যারা—তারা কোন দিক দিয়েই অখণ্ড একটি সত্তা—তা সে রুচির হোক বুদ্ধির বা চিন্তারই হোক গড়ে তুলতে পারে না। স্রোতে ভাসা শেওলার মত—কিংবা শরৎকালের বায়ু ভরবাহী হালকা মেঘের মত—তারা চলেছে ত চলেছেই।

হাতের ব্যাগটিকে মাটিতে নামিয়ে শিমুল কাঠের তক্তার উপর আসন গ্রহণ করলেন দুর্গামোহন। বললেন, জানি তুমি আপিস যাচ্ছ না—খদ্দরের জামা গায়ে দিয়ে কেউ আপিস যায় না।

মলয় বিনীত হাস্যে বললে, যায় বৈকি কাকাবাবু।

সায়েবরা কিছু বলে না?

সায়েবদের আপিস নয় ত। তাকে বিস্ময়ের অবকাশ না দিয়ে মলয় বললে, ওসব কথা থাক—, আপনার নিশ্চয় খাওয়া হয় নি—ঠাকুরকে বলে দিই।

না—আজ একাদশী, ভাত খাব না। রাত্রিতে ফলমিষ্টি কিছু আনিয়ে নিলেই চলবে। কিন্তু তোমার কথা ত আমি বুঝতে পারছি না বাবা। খদ্দর পরে আপিসে গেলে—

ও কিছু নয়—খদ্দর এমন কিছু মারাত্মক বস্তু নয় যা দেখলে

সায়েবরা কেঁপে উঠবে। তা ছাড়া পঁচিশ বছর একই জিনিস দেখে দেখে চোখসহা বা বাতসহা হয়ে গেছে কাকাবাবু।

মলয়ের হাসির ধরণে দুর্গামোহন প্রীত হলেন না।

ঈষৎ গম্ভীর স্বরে বললেন, যাই হোক চাকরি যারা করে তাদের এসব জেদ ভাল নয়।

হবে। মলয় অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিলে।

যেখানে উন্নতি করবে—সেখানে একটি পথই বেছে নেয়া ভাল। না ঘাটের না ঘরের এতে কোন দিকেই সামঞ্জস্য থাকে না।

মলয় চুপ করে রইল।

দুর্গামোহন বললেন, প্রশান্ত কি করছেন? চাকরি, না না খদ্দর পরে স্বদেশী?

ওঁর কথার ধরণে মলয় হেসে ফেললে। সংযত স্বরে বললে, এই দশ মিনিট আগে সে আপিসেই ত গেল।

সে নাকি চাকরি করবে না? স্বরে ঈষৎ জোর দিয়ে বললেন, চাকরি না করে কি করবে বলতে পার? আমি এমন কিছু তালুক মুলুক রেখে যাব না যাতে করে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে তার দিন চলে যাবে।

মলয় হেসে বললে, তালুক মুলুক রেখে গেলেও পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাবার সুযোগ কারও থাকবে না কাকাবাবু।

কেন হে ছোকরা—নিজের জমির ধান নিজের সংসারে আসবে—

না কাকাবাবু—জমি তারই যে চাষ করবে। চাষার রক্ত শুষে জমিদারদের দেহ মোটা হবার দিন চলে যাচ্ছে, ওসব উদাহরণ না রাখাই ভাল।

দুর্গামোহন সক্রোধে বললে, তবে সে করবে কি শুনি? ঘোড়ার ঘাস কাটবে?

...যে যা পারে সে তাই করবে। যার যোগ্যতা ঘোড়ার ঘাস কাটার সে তাই করেই বেঁচে থাকবে। পরের শ্রমে পরিপুষ্ট হবার দিন চলে যাচ্ছে।

আচ্ছা—আচ্ছা—দেখা হোক তার সঙ্গে সে বোঝাপড়া তখন হবে। আচ্ছা তুমি যে বড় লম্বা লম্বা লেকচার দিলে—শুনি ত তোমাদেরও জমি আছে—যার আয়ে পরিবার প্রতিপালন হচ্ছে, জমি গেলে তোমাদের দশা কি হবে শুনি?

মলয় হাসলে—কোন উত্তর দিলে না।

মলয়ের হাসিতে দুর্গামোহন বেশী মাত্রায় উষ্ণ হয়ে উঠলেন। সেই সঙ্গে তিনি বুঝলেন—এদের সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই। এরা চড়া কথা বলে তর্ককে শাণিত হবার অবকাশ দেয় না—বেফাঁস বললেও হাসিমুখে জবাব দেয়। সেকালের ছেলেদের জিদ বা একগুঁয়েমি একালের ছেলেদের মধ্যেও যথেষ্ট আছে—রূপান্তর খানিকটা হয়েছে শুধু। ওদের ওই নম্রতা বা হাসি-হাসি ভাবের মধ্যে দিয়ে ঊর্দ্ধতনকে অবজ্ঞা করার ভাবটি সুস্পষ্ট। নিজের আপিস-জীবনের শেষ ভাগে এই রকম নম্র-ঔদ্ধত্যের নমুনা তিনি যথেষ্ট পেয়েছেন।

যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে হেঁট হয়ে তিনি জুতোর ফিতে খুললেন—কাঁধের চাদরটা তক্তাপোষের উপর রাখলেন। তারপর বুক পকেট থেকে ঘড়িটা বার করে সময় দেখলেন।

মলয় জিজ্ঞাসা করলে, কোথাও যাবেন কি?

যাব। হাঁ দুই-এক জায়গায় ঘুরে প্রশান্তর আপিসে একবার যাব ভাবছি।

তা হলে এক কাজ করুন—চাবিটা রেখে দিন, আমি কখন ফিরব—

না—না চাবি তুমি রাখ। প্রশান্ত ওই সামনের ঘরেই থাকে ত? ওকে সঙ্গে করে একেবারে আসব।

মুখে হাতে জল দিয়ে একটু বিশ্রাম করুন।

তুমি ব্যস্ত হয়ো না—আমাদের হাড় অত পলকা নয় যে অল্প শ্রমেই নুয়ে পড়বে।

তিনি ঘরের চার দেয়ালে চোখ বুলিয়ে নিলেন। একটি তেরশো ছেচল্লিশের ইংরেজী ক্যালেণ্ডার ছাড়া কোন ছবিপত্র কোথাও টাঙানো নেই। কোনের দিকে একটা কেরোসিন কাঠের র‍্যাকের উপর স্তূপাকার বই অগোছালো পড়ে রয়েছে—একটা বইয়েরও নাম পড়া যায় না। এমনি অগোছালো। মেসের ঘর কোনকালে গোছানো হয়—না তিনি জানেন তবু—এরা যেন বেশীমাত্রায় বিশৃঙ্খল। তাঁদের সময়ে নির্ব্বিঘ্ন চাকরীতে আর সংসার চালনার দায়িত্বে যে জীবন বাঁধাধরা ছকের মত সরল ছিল আজ সেই কেন্দ্র থেকে সে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এদের দেখে দুঃখ হয় তবু এদের ওপর মমত্ববোধও পোষণ করা দুরূহ। দুটি যুদ্ধ দেশের ওপর যে ক্ষতচিহ্ন রেখে গেল—সমাজও সে আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে নি। কিন্তু আত্মরক্ষা করা আশু প্রয়োজন। পশ্চিমের রাষ্ট্রমুখী মন পূর্ব্বের সমাজমুখী মনের থেকে পৃথক নয় কি?

ভাবলেন এখন থাক—ফিরে এসে এ নিয়ে ওদের সঙ্গে তর্ক করা যাবে। মানে ওদের বুদ্ধির জট ছাড়াতে হলে কিছু শাণিত যুক্তির প্রয়োজন।

পথে বেরিয়ে মনে হ'ল বাস্তব শহরের কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। দু' একটা বাড়ির সংস্কার হয়েছে—দু' একটা পথের সৃষ্টি হয়েছে এই মাত্র। সনাতন ট্রাম, বাস, সনাতন প্রথায় চলছে, মোড়ের মাথায় সনাতন ট্রাফিক পুলিস—তার উদ্যত করের ইঙ্গিতে যানবাহনের স্রোত কখনও সচল কখনও বা স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের মরশুমে যে বিদেশী লাল মুখের প্রাচুর্য্য পথে, ফুটপাথে বা বিচিত্র যানবাহনে দেখা যেত আজ তা নেই বললেই হয়। অতিকায় ট্রাকগুলিতে কচিৎ লালমুখো নগ্নদেহ গোরা দেখা যায় নচেৎ সবাই দেশীয়দের রাজত্ব। এখনও ট্রাকের পর ট্রাক কনভয় প্রথায় চলে তবে

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অসামরিক মানুষের অসুবিধা ঘটায় না। যুদ্ধ-জলের জাঁটাটা স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ।

তবু যুদ্ধ যে থামেনি সেটা নিত্যকার জীবন যাপনের মধ্যে বুঝতে পারা যায়। আহারে, পরিচ্ছদে—দ্রব্যমূল্যে ওরা ক্লেশভার বহন করছে সেটাও বাইরের, আর মনে জাগছে যে অভাববোধ—তা প্রাক্-যুদ্ধের সমাজ-শৃঙ্খলার সঙ্গে যুদ্ধোত্তর সমাজ-বিপ্লবের সংঘাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

গোলদীঘিতে পৌঁছবার মুখে মিটিং ভাঙা ভিড় তাঁকে গ্রাস করলে। কি যেন একটা প্রতিবাদ সভা বসেছিল এলবার্ট হলে—জনস্রোতের সঙ্গে যথেষ্ট উত্তেজনা পথের মাঝে আছড়ে পড়ল। ও দলে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের অস্তিত্ব নাই, সবাই তরুণ—মেয়ে আর পুরুষ। সবাই এক একটা দিক নিয়ে উত্তেজনার স্রোত সৃষ্টি করে পথের চার দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বিস্তীর্ণ বালু-বেলায় সমুদ্রের ভাঙা ঢেউ শেষ হয়েও খানিকটা গড়িয়ে যায় যেমন—তেমনি। এদের ভঙ্গি দেখে মনে হয়—কোন একটা মীমাংসা করতে এরা এক জায়গায় মেলে নি। হয়তো এটা প্রতিবাদ সভা ছিল। কিন্তু প্রতিবাদের মধ্যে প্রতিকার প্রার্থনার সুরটি শোনা গেল না তো! কি চায় এরা? এ যুগের যৌবন—বিনয়ে উদ্ধত—নম্রতায় অহঙ্কারমত্ত—স্বাধিকারপ্রমত্ত যৌবন—কিসের প্রতিবাদে আজ আর কাল, কাল কিম্বা পরশু দিনের পর দিন ধরে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে? কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ?

একটা কথা কানে গেল—ইংরেজকে ভারত ছাড়তেই হবে। সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। বেয়নেট বন্দুক—আকাশচারী লৌহশ্যেন অথবা অতিকায় ট্যাঙ্ক কি মৃত্যুবীজ-বাহী মেসিনগান এসব সাম্রাজ্যবাদকে আসন্ন মৃত্যু থেকে বাঁচাতে পারবে না। ওদের ধনবল, জনবল ফাঁকা শ্লোগানের চীৎকার ধ্বনিতে হতবল হয়ে গেল! দুর্গামোহন অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। ঈষৎ উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন।

পাশের একজন তরুণ উষ্ণ হয়ে উঠল, কি মশাই—হাসছেন যে! ব্রিটিশ ভারত ছাড়বে এ বুঝি বিশ্বাস হ'ল না?

একটি মেয়ে বললে, ওঁরা জনবুলের যুগের লোক—তার মুখের দাপটই জানেন।

দুর্গামোহন বাছা বাছা প্রমাণ প্রয়োগ করতে যাচ্ছিলেন—কি ভেবে বিরত হলেন। শুধু বললেন, ওরা যতক্ষণ না কথা রাখছে—

ছেলেটি উষ্ণস্বরে বললে, কথা রাখতে বাধ্য করাব আমরা। ভাবছেন ওদের অস্ত্র আছে—

দুর্গামোহন বললেন, সে ভাবনা তো তোমাদেরও রয়েছে—

ছেলেটি বললে, আছে। আর বিশ্বাসও করি আমরা যে একদিন-না-একদিন নিজেদের অধিকার আমরা ফিরে পাবই।

আরও কয়েকটি ছেলে মেয়ে দুর্গামোহনের চারদিকে জড়ো হয়েছে দেখে উনি তর্ক করলেন না। শুধু বললেন, আমরা হয়ত তেমন দিন চোখে না দেখেও যেতে পারি।

সে আপনার ভাগ্য! একজন পরিহাসের ভঙ্গিতে বললে। আর সে সৌভাগ্য এলেও উপভোগ করতে পারবেন কি?

একটি তরুণী বললে, বাধা কিসের!

দেখছেন না—ব্রিটিশ দপ্তরের আধ্ মাড়াই কলে—কেমন সহজে হজম হয়ে গেছেন উনি।

হো হো করে ওরা হেসে ছিট্‌কে ছড়িয়ে পড়ল এপাশে ওপাশে।

দুর্গামোহনের চোখ জ্বালা করে উঠল—সামনে গোলদীঘির বেঞ্চে আশ্রয় না নিলে একটা দুর্ঘটনা হওয়া বিচিত্র ছিল না।

বেঞ্চের আর এক প্রান্তে একজন যুবক বসে ছিল। পরণে তার আধময়লা কাপড়—জামার কাঁধের কাছটায় একটা তালি দেওয়া—একটু অন্যমনস্ক ভাব। একটা বিড়ি ধরে সে কয়েকবার টান দিলে—একবার কাসলে—দুর্গামোহনের দিকে একটু নড়ে সরে বসলে। তারপর মৃদুস্বরে বললে, সর একটা খবর জানেন? সাপ্লাই আপিসের হ্যারিংটন সায়েব আজকাল কোন সেকশনের চার্জ্জ নিয়ে আছেন?

দুর্গামোহন নিজের জগতে ফিরে এলেন। সেই সঙ্গে ফিরে এল তাঁর আহত পৌরুষ। বললেন, আমায় দেখে কি মনে হয় যে আমি সাপ্লাই আপিসের বড়বাবু?

যুবকটি অপ্রতিভ না হয়ে বললে, কি জানেন সর অনেক রিটায়ারড্ হ্যাণ্ড তো চাকরিতে ঢুকেছেন—তাঁরা ভাল রকম ইন্‌ফরমেশন রাখেন বলেই—

দুর্গামোহন নরম গলায় বললেন, চাকরি করতে চান?

চাইব না কেন। চাকরি করতে কে না চায়! প্রতি-বিস্ময়ে যুবক তাঁর পানে চেয়ে রইল।

দুর্গামোহন বললেন, একটু আগে ওই হলে মিটিং হয়ে গেল খবর রাখেন কি? আপনার মত যুবকরা তো থোড়াই কেয়ার করে চাকরির।

ও কথা বলবেন না আর, এখনও বুড়ো বাপ মা বেঁচে—ভাইদের মানুষ করতে হবে—বোন আছে একটি তার বিয়ে—

শহর সম্পূর্ণরূপে বদলায় নি তা হ'লে। দুর্গামোহন পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাইলেন যুবকটির পানে। দেহের প্রত্যেকটি ভঙ্গি প্রাক্-যুদ্ধ যুগের ক্লান্তিতে অত্যন্ত ম্লান। কণ্ঠস্বরে ভিক্ষার বিনম্র সুর—যা আপিসের চেয়ারে বসে বহু বছর ধরে শুনে শুনে ক্লান্ত হয়েছেন তিনি। ঈষৎ কৌতূহল হ'ল ছেলেটিকে ভাল করে জানতে।

বললেন, চাকরি তো অমনি হয় না বাপু—কিছু দক্ষিণা দিতে হয়।

ছেলেটির চোখে উৎসাহের দীপ্তি দেখা গেল। বললে, বেশি তো পারব না—অবস্থা দেখছেনই তো—

তবু কত?

খানেক টাকা—বলেই এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে সে দুর্গামোহনের পায়ের দিকে হাত নামালে।

দুর্গামোহন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওর হাত দুখানি ধরে ফেললেন। কি কোমল অসহায় হাত! কি জানি কেন—দেহ তাঁর খিন্ খিন্ করে উঠল—ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল সরীসৃপের স্পর্শে যেমন স্নায়ুকেন্দ্রে আঘাত লাগে। বলতে গেলে—এটি তাঁর অতীত স্মৃতির ঋণ—তাঁর সমাজে পরিবার-প্রতিপালনেচ্ছু এমনি এক বাধ্য ছেলের স্বপ্ন কে না দেখেন! তিনি যে কলকাতায় এসেছেন—তার মূলেও ছেলের রাষ্ট্র চৈতন্যকে সমাজ-স্বর্গের সাধনার পানে পূর্ণ বিকশিত করে তুলবার কামনা। অথচ এই মুহূর্তে এই ছেলেটির স্পর্শ সহ্য করতে পারছেন না কেন?

নিজের বিরক্তি দমন করতে প্রশ্ন করলেন, কতদূর পড়েছ তুমি?

মাট্রিক পাশ করেছি।

ম্যাট্রিক! মন সান্ত্বনা লাভ করলে। তাঁর ছেলের সঙ্গে এর তফাৎ অনেকখানি। কিন্তু আপিসে যখন ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল—তখন তাঁর ছেলের চেয়েও কত গুণী জ্ঞানী কিংবা মানী বংশের ছেলেরা তাঁর পায়ের কাছে এমনি ভিক্ষার আশায় নত হয়ে প্রার্থনা-বাণী উচ্চারণ করেছিল—তা তো তিনি ভোলেন নি। তাদের কাতর প্রার্থনায় মন তাঁর আত্মপ্রসাদে স্ফীত হয়ে উঠত না কি? বিদ্যাকে—ক্ষমতার সেবায় কৃতার্থন্মন্য দেখে—স্ফীত হওয়াই তো ক্ষমতার ধর্ম্ম। আপিসে উঁচু গদিতে বসে স্বধর্ম্মেই অনেকগুলি বছর কেটে গেছে—সেই খুসির স্বর্গে বাস করে আজও তিনি সেই স্বর্গকে সমস্ত কামনায় ধন্য রেখেছেন। তবু মলিনবেশী এই ছেলেটিকে তিনি সহ্য করতে পারলেন না। বললেন, শোন বাপু, চাকরি গোলদীঘির বেঞ্চিতে বসে লাভ করা যায় না। আপিসে যাও—খবর নাও—কে কোথায় আত্মীয় আছে ধর—

আপনি কিছু সাহায্য করতে পারেন না স্যর?

না। অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে কথাটি উচ্চারণ করে তিনি বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

গোলদীঘির জলে—দুপুরের রোদ ছোট ছোট তরঙ্গের মাথায় ছিটিয়ে পড়েছে। মাছগুলো লাফাচ্ছে বলেই বীচি-বিক্ষোভ, নতুবা স্রোতহীন জলে বিনা বাতাসে ঢেউ ওঠে না।

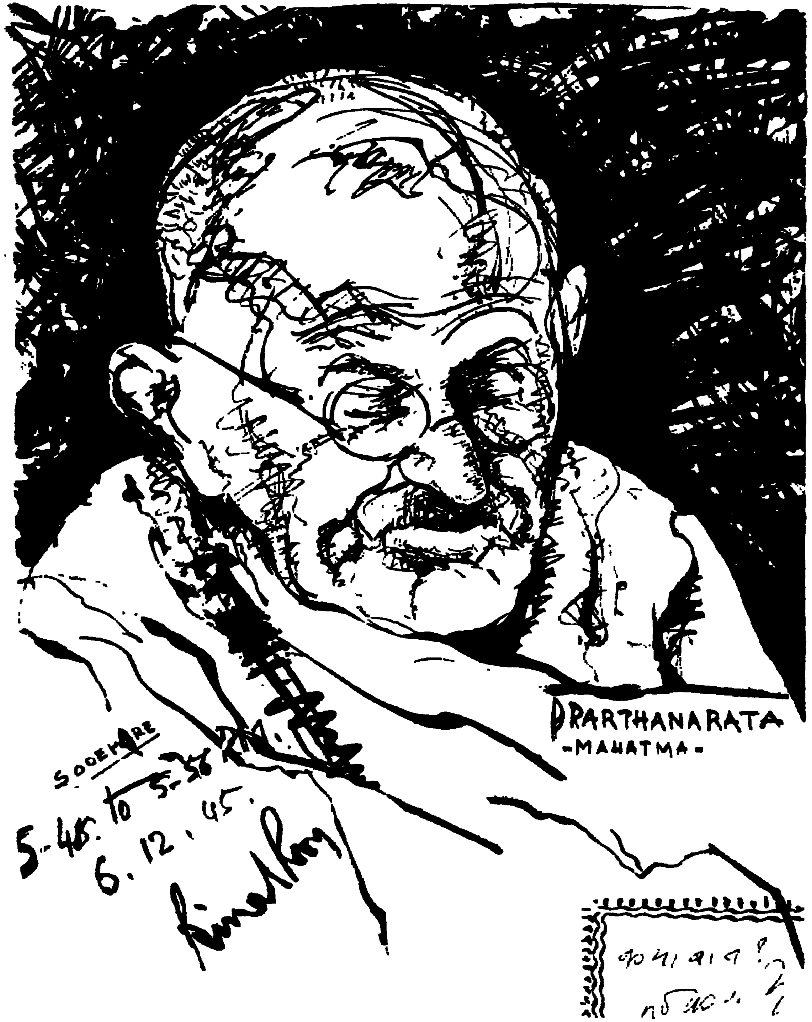
৬

অবশ্য ছেলের সঙ্গে এ ভাবে সাক্ষাৎ হবে দুর্গামোহন আশা করেন নি।

গোলদীঘি থেকে গেলেন নিজের আপিসে। নিজের আপিস ছাড়া অন্য কথা তাঁর মনেই আসে না। জীবনের চল্লিশটি বছর—জীবনের সেরা দিনগুলি যে বিরাট সৌধের জঠরে নির্বিঘ্নে কেটেছে তাকে নিজস্ব নয় ভাবতেও কষ্ট বোধ হয়। যারা সহকর্মী ছিল তারা আজ নেই। কেউ অবসর নিয়েছে সংসার থেকে—কেউ বা আপিস থেকে। যে ঘরে বসে কাজ করতেন সে ঘরের চেহারাও বদলে গেছে আমূল। যে র‍্যাকের মাথায় ফাইলের স্তূপ থাকতো আর র‍্যাকের গোড়ায় টুলের ওপর বসে ঝিমুতো দপ্তরী রহমৎ—তারা কাঠের পার্টিশনের কুল্যাপে অদৃশ্য হয়েছে। এ ঘরে বড়বাবুর ছিল আধিপত্য—আজকাল কাঠের ছোট ঘরের মধ্যে রিভলভিং চেয়ারে বসে একজন নতুন গোঁফ-ওঠা ছোকরা সায়েব ঘন ঘন পাইপ টানে আর কলিং-বেল বাজায়। সুইং ডোর ঠেলে বাবুরা আর চপরাসীরা মিনিটে মিনিটে যাওয়া আসা করছে। বাবুরা সব তরুণ। ফিটফাট্ চটপটে। ফাইল সাজিয়ে দেরাজ দুরস্ত রেখে—টেবিল সাফ্ করে সিগারেট টানছে। তাঁদের কালের কাজগুলো তাদের যতটা কাবু করে রাখতো এদের কালের কাজগুলো সে অনুপাতে লঘু বলতে হবে। এরা এত ঘেঁষাঘেঁষি বসে যে কোণের লোকের কাছে পৌঁছুতে হলে মাঝের বা পাশের লোকগুলির চেয়ার সরিয়ে কাত হয়ে হেলে দশ হাত দূরে যেতে রীতিমত পরিশ্রম হয় আর সময়ও লাগে। তবু এরা মানবে না—লোক বেড়েছে। বলে—আপনাদের কালে কাজের অত ঝৈক্কত ছিল না স্যর। এত নোটের পর নোট—এন্‌কোয়রি, ডি ও লেটার এ সবের হাঙ্গামা ছিল না। যুদ্ধ যেমন গতি এনে দিয়েছে—তেমনি জটিল করে তুলেছে সব বিভাগকে।

বেশীর ভাগ লোকই তাঁকে চেনে না। কেউ কেউ খাতির করে। তবে খাতির করে বলে যে মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে শ্রদ্ধা জানায় তা নয়। যেমন গোলদীঘির ছোকরাটি প্রার্থী হয়েও সিগারেটে সব শেষ টান দিতে কার্পণ্য করে নি। লুকিয়ে ধূম পান করাটা এ কালের নীতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপনচিহ্ন বলে স্বীকৃত না হলেও—সেকালের আচার-অভ্যস্ত মনে বিশেষ করে এই আপিসের পরিমণ্ডলে বেশী করেই দোলা দেয়। তবু কলকাতায় এলে কাজ না থাকলেও আপিসে তিনি একবার আসবেনই। যে টানে মানুষ দূর প্রবাসী হয়েও জন্মভিটা দেখতে আসে—সেই অলক্ষ্য-প্রসারিত রজ্জু তাঁকে আকর্ষণ করে কিনা বুঝা দুষ্কর—তবে এই পরিত্যক্ত কর্ম্মক্ষেত্রকে সর্ব্বতোভাবে আপনার করেই নিয়েছেন তিনি। তাঁর যৌবন এই আপিসের কর্ম্মসৃষ্টির সার্থকতায় নিবেদিত হয়েছিল একদা—জন্মভূমির চেয়ে এই কর্ম্মভূমি তাঁর কাছে তাই এত প্রিয়।

আপিসের সব তলায় ঘুরে ঘুরে দেখলেন—পরিচিত কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ করলেন—কাজের ব্যবস্থা সম্বন্ধেও কিছু কথা হ'ল—সায়েবরা তাঁকে আপ্যায়িত করলেন। তার পর এলেন বড় গম্বুজওয়ালা জি, পি, ও, আপিসে। ছেলে কাজ করে যে বিভাগে জানা ছিল—কিন্তু সে বিভাগে কেউ তার সন্ধান দিতে পারলে না। অনেক ঘুরলেন—তবু সে বিরাট আপিসে ঠিকমত সন্ধান পাওয়া গেল না। একবার



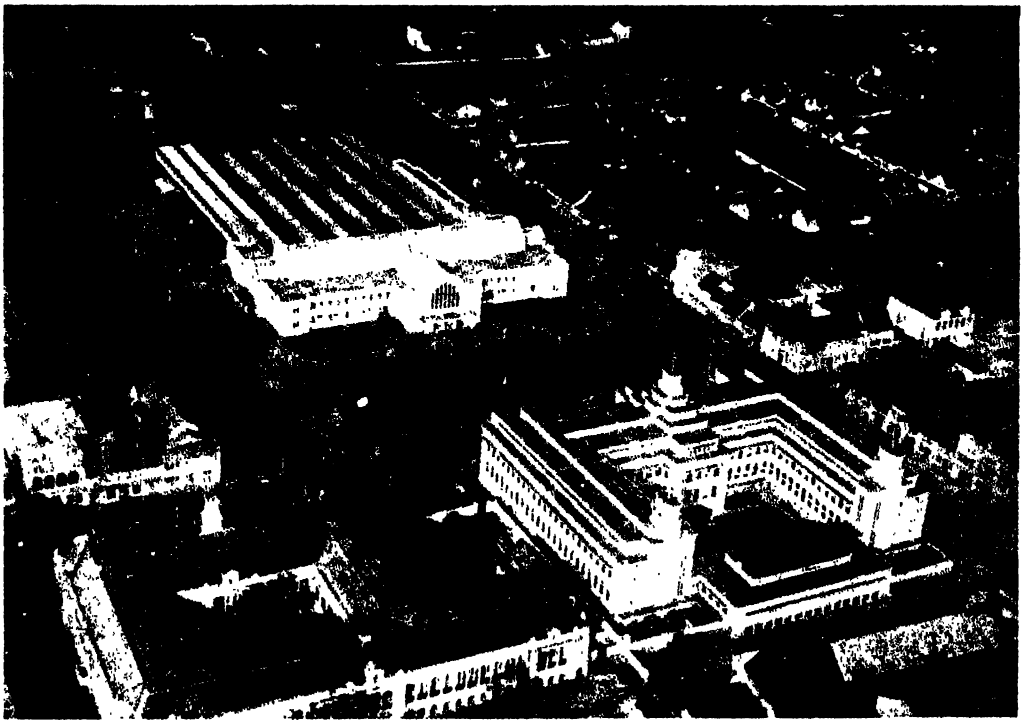
সোদপুর আশ্রমে প্রার্থনারত মহাত্মা গান্ধী
(প্রার্থনা-সভায় শ্রীবিমল রায় কর্তৃক অঙ্কিত)



লণ্ডনের পার্লামেন্ট ভবন



যবদ্বীপের 'ওয়ায়াং' নাট্যের অভিনেতাগণ



যবদ্বীপের রাজধানী বাটাভিয়া—উপরে সিটি রেলওয়ে ষ্টেশন, নীচে নেদারল্যাণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির ভবন

মনে হ'ল এই আপিসটির বিরাট জঠরে আশ্রয় নিলে মানুষকে পুরাতন পরিচয়ে খুঁজে পাওয়াই মুশকিল।

অবশেষে এক জন বুড়ো মত লোক বললে, বেশ ফরসা রঙ ফিটফাট ছোকরা—প্রায়ই সিগারেট টানছে—বুকে ফাউণ্টেন পেন সেই তো? সেত পরশু একখানা রেজিগনেশন লেটার সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের আপিসে দিয়ে গেল।

সত্যাসত্য যাচাই করতে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর কাছে যাওয়া নিরর্থক ভেবে তিনি পথে বার হয়ে পড়লেন। লালদীঘির বেড়াগুলো যুদ্ধের সময় থেকেই ভেঙে দেওয়া হয়েছিল—দীঘিটা পথের সঙ্গে মিশে—আগেকার আভিজাত্য হারিয়েছে। নানান দিক দিয়ে তার পথ বেরিয়েছে—মানুষের চলাফেরায় ঘাস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—মরসুমী ফুলের কেয়ারীগুলি হৃতশ্রী—বিলাতী পাম কুঞ্জ ছাড়া ত দীঘিটায় দু'দণ্ড বসে ক্লান্তি দূর করবার জায়গাও বড় একটা নেই।

সেইখানে বসেই দুর্গামোহন ভাবতে লাগলেন—অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য। দেশে ফিরে যাবেন—না প্রশান্তকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবেন? পিতৃত্বের দাবিতে এই চেষ্টা সার্থক হবে কি? মাথা নেড়ে দৃঢ়নিশ্চয় হলেন—অবশ্য হবে। উপার্জ্জন না করলে ছেলেদের ভরসা ত পিতৃবিত্ত। কাজেই তাঁর আদেশের গুরুত্ব অস্বীকার করা প্রশান্তর পক্ষে সহজ হবে না।

জি, পি, ও-র ঘড়িটায় চারটে বাজেনি—তখন থেকেই অনেক লোক বাড়ি ফিরতে সুরু করেছে। এরা নিশ্চয় আপিস থেকে পালাচ্ছে। দুর্গামোহন ভাল করে এদের দেখতে লাগলেন। হাঁ—আপিস থেকে পালাচ্ছে এরা। সিনেমার ওরা না রেসের তাড়া। আগে শনিবার ছাড়া রেস হতো না, আজ কাল ছুটির দিন মাত্রেই রেস হয়। যুদ্ধের বাজারে টাকাটা ফেঁপে উঠেছে এ-ও একটি প্রমাণ। আজ ছুটির বার নয়—রেস হবে না। তবে রেসের প্রস্তুতি আছে তো। সবাই তো স্বহস্তে টিকিট কিনে রেস গ্রাউণ্ডে বসে চেঁচামেচি করে না—বুকির মারফৎ খেলাটা চলে বলেই আট আনার খেসুড়ে কেরাণী একখানা বই কিনে বা খবরের কাগজ থেকে নিজের ইচ্ছামত ঘোড়ার নাম টুকে বুকির এজেণ্টদের দেয়। এই ভাবে ঠিকুজি কোষ্ঠী মিলিয়ে অঙ্ক কষে অশ্বের জাতি নির্ণয় করতে রীতিমত সময় নষ্ট হয় না কি? আর সিনেমা? রেসের মত তারও সার্ব্বজনীনত্ব আছে বৈকি? কম আয়ের মানুষই তো কষ্টকে অগ্রাহ্য করবার সোজা পথটি বেছে নেয়। রেঁস্তোরায় বসে প্রহরে প্রহরে চা খাওয়া এও আজকালকার নেশা বা ফ্যাশান। আর সিগারেট? এক বছর সিগারেট ত্যাগ করলে স্বরাজ আসবে এ প্রলোভনও একদিন দেখান হয়েছিল। ফলে যে বেগ সেদিনকার প্রতিজ্ঞা পালনের ভাটায় দেখা গিয়েছিল—আজ গ্রহণের জোয়ার দেখলে ভাবা আশ্চর্য্য নয় যে ভারতবর্ষের আর কোথাও না হোক অন্তত আপিস কোয়ার্টারে আহার-পানীয়ের সঙ্গে প্রধানতম রসদ হচ্ছে ঐ সিগারেট। দুর্গামোহন গুনতে আরম্ভ করলেন—এই দীঘির পথ দিয়ে যারা যাচ্ছে তাদের মধ্যে ধূমপায়ীর সংখ্যা কত।

গুনতে গুনতে তাঁর নেশা চেপে গেল—কাছের লোকগুলিকে গুনে দূরের লোকগুলিকেও লক্ষ্য করতে লাগলেন। আর তারই ফলে—যা আশা করেন নি তাই ঘটে গেল অকস্মাৎ।

দূরে ঐ বিধ্বস্ত মরসুমী ফুল-বাড়টার ওপিঠে একটি মেয়ের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে যে লম্বা আর ফর্সা মত যুবকটি সিগারেট টানতে টানতে আসছে—ওই প্রশান্ত না! প্রশান্তই তো।

আর একটু এগিয়ে এসে লক্ষ্য করলেন—ঘেঁষাঘেঁষি নয়—মেয়েটির ডান হাতের সঙ্গে ওর বাঁ হাতখানি সংযুক্ত। পথ ওরা চলছে বটে—লক্ষ্যটা পথের আশেপাশে বা সম্মুখে নয়। হাসি আর গল্প আর সিগারেট খাওয়া এই নিয়েই ওরা মশগুল। ওধারে লালদীঘির জল—এধারে বিশ্রামরত মানুষ কিছুই ওদের লক্ষ্যে পৌঁছচ্ছে না—ওরা স্বয়ংসম্পূর্ণ।

দুর্গামোহনের মনে হ'ল—পায়ের তলা থেকে হাতের তালু থেকে সব রক্ত মাথায় উঠে আসছে—চন্‌চন্‌ করছে মাথাটা। রগের রক্তবাহী শিরাগুলি রক্ত চলাচলের দ্রুততায় দপ্‌ দপ্‌ করছে—চোখেও দুপুরের রোদ লেগে মুছে এক হয়ে গেল। অসহ্য ক্রোধে চীৎকার করে উঠলেন—প্রশান্ত—প্রশান্ত।

একটা চাপা বিকৃত ধ্বনি বার হল গলা দিয়ে—কেউ চেয়ে দেখলে—কেউ চেয়ে দেখলে না। প্রশান্ত তার সঙ্গিনীর হাত ধরে নির্ব্বিকার চিত্তে তাঁর সামনের রাস্তা দিয়ে মাত্র দশ গজের হাত ব্যবধানে গট্‌ গট্‌ করে চলে গেল।

অনেকক্ষণ পরে দুর্গামোহনের সম্বিৎ ফিরে এল। আকাশ ইতিমধ্যে ঘোলাটে বোধ হচ্ছে—গাছের ছায়া হয়েছে দীর্ঘতর আর লালদীঘির চারধারে বয়ে চলেছে মানুষের বন্যা। মাথার ওপর সেই সঙ্গে ভেসে চলেছে ধোঁয়ার একটা ঘন স্তর—শীতের সন্ধ্যায় শহরের বস্তিপ্রধান জায়গাগুলি থেকে যেমন ধোঁয়ার কুয়াসা জমায় অনেকটা সেই রকম। ক'টা মানুষ সিগারেট টানছে—এ নির্ণয় করা সম্ভব নয়—সারা শহরটাই ধূমপায়ী হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে তিনি চোখ বুজলেন।

চোখ চেয়ে দেখলেন তখনো পৃথিবী উজ্জ্বল নয়। এটা ফাঁকা খোলা জায়গা নয়, মাথাটাও বেশ ভারি বোধ হচ্ছে। একটি সঙ্কীর্ণ ঘরে তিনি শুয়ে আছেন—ব্রাকেটে টিক্‌ টিক্‌ করে টাইমপিস চলছে। অদূরে কারা ফিস ফিস করে কি যেন বলছে। ঘরটায় তরল ধোঁয়ার স্রোত—নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। পাশ-ফেরার চেষ্টা করে অতিকষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আমি কোথায়?

এক অচেনা যুবক তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, ভয় নেই—একটু দুধ খাবেন।

তার হাতে কিছিৎ কাপ দেখে দুর্গামোহন আচ্ছন্নের মত বললেন, না—না—আমি সিগারেট খাই না।

যুবকটি মিষ্টস্বরে বললে, সিগারেট না—দুধ।

দুর্গামোহন মাথা নাড়লেন। যুবকটি এগিয়ে এসে তাঁর মুখে কাপটা ধরলে। গলাটা শুকিয়ে গেছে—তরল পানীয় এক নিঃশ্বাসে শেষ করলেন। একখানি তোয়ালে দিয়ে যুবক তাঁর মুখ মুছিয়ে দিলে।

দুর্গামোহনের নাসিকায় পাতিতীব্র একটা গন্ধ ভেসে আসতেই তিনি প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—তুমি সিগারেট খাও?

যুবক চমকে উঠে বললে, এখন তো খাইনি?

না—খেয়েছ? তোমার গায়ে সিগারেটের গন্ধ—তোমার হাতে—

যুবক কি বলতে যাচ্ছিল—দুর্গামোহন চেঁচিয়ে উঠলেন, গেট আউট, গেট আউট।

তাঁর উচ্চ চীৎকারে আর দু'জন যুবক দুয়ার ঠেলে ঘরে ঢুকল। তার মধ্যে এক জন মলয়।

মলয় বললে, ব্যাপার কি সুশীল?

মনে হয় ডিলিরিয়ম। আবার সেই সিগারেট—গন্ধ—

মলয় বললে, প্রশান্তর নাম করেন নি?

না।

দুর্গামোহনের কানে প্রশান্তর নাম গেল। যেন কত দূর থেকে কারা—পরম বার্তা বয়ে নিয়ে এল। ঘাড় ফিরিয়ে তিনি বললেন—প্রশান্ত কই? প্রশান্ত।

মলয় কাছে বসে বললে, সে আসছে কাকা বাবু।

বউমাকেও আসতে বল- আমি ওদের আশীর্বাদ করব।

যুবক ক'জন পরস্পরের পানে চেয়ে কি ইঙ্গিতাভিনয় করলে। মলয় বাইরে এসে বললে, এর মানে কি সুশীল, উনি নিশ্চয় জানেন যে প্রশান্ত বিয়ে করে নি।

সুশীল বললে, ফ্রয়েড বলেছেন—মানুষের অবচেতন মনের স্তরে যে চিন্তা—

মলয় বিরক্ত হয়ে বললে, মেডিকেল লাইনে তোমার ফ্রয়েডিয় গবেষণা উপকার দেবে—আপাতত—

সুশীল বললে, এই প্রশান্ত আসছে—একেই জিজ্ঞাসা কর।

প্রশান্ত সব শুনে বললে, বাবার মাথা খারাপ হয়েছে।

সুশীল জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কাছ থেকে কোন দিন কি উনি ইঙ্গিত পেয়েছেন—

প্রশান্ত হেসে বললে, আয়ের পথ খোলা না থাকলে মানুষের বিলাস-চিন্তা আসে?

সুশীল বললে, বিবাহ বিলাস?

মলয় বললে, যাই হোক—তোমার বাবা তোমাকে খুঁজছেন—একবার যাও।

প্রশান্ত ঘরে এসে ডাকলে, বাবা?

দুর্গামোহন পাশ ফিরে শুলেন—কোন উত্তর দিলেন না। আচ্ছন্ন অবস্থায় তাঁর নাক ও ভ্রূ দু'টি বার কয়েক কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

জ্ঞান ফিরে আসতে আরও কয়েকদিন গেল। যে দিন বালিশ ঠেস দিয়ে বিছানায় উঠে বসলেন—সেদিন বাইরের আকাশটা ভারি ভাল লাগল তাঁর। পৃথিবীর রূপ আর রঙ মনের মধ্যে নতুন করে প্রলেপ লাগিয়ে দিলে। সেই সঙ্গে ফিরে এল পুরাতন কামনাগুলি। প্রশান্তর পানে ফিরে তিনি মৃদু স্বরে বললেন, চাকরি ছেড়ে দিয়েছ—কেমন?

সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টিপথ থেকে নিজেকে আড়াল করে অর্থাৎ মুখ ফিরিয়ে প্রশান্ত মৃদু স্বরে বললে, হাঁ।

তারপর কি করে চলবে—কিছু ঠিক করেছ?

প্রশান্ত একটু নড়ে বসল—কোন জবাব দিলে না।

তুমি নিশ্চয় জান উপযুক্ত ছেলেকে বসে খাওয়াবার জন্য আমি পেনসন পাই না—সে প্রত্যাশা তুমিও কর না নিশ্চয়।

প্রশান্ত মাথা নেড়ে সংক্ষিপ্ত জবাব দিলে, না।

তবে করবে কি শুনি? ঈষৎ উষ্ণ স্বরেই তিনি প্রশ্ন করলেন।

যা হয় কিছু করব—কেরাণীগিরি ছাড়া।

মানে—কেরাণীগিরিটা তোমার কাছে সব চেয়ে নীচু চাকরি। প্রশান্তর উত্তর না দেওয়াতে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, স্বাধীনতা বলতে কি বোঝ তুমি? চাকরি না করা? সিগারেট টানা আর অনাত্মীয়া মেয়েকে নিয়ে পথে পথে আড্ডা মারা?

প্রশান্ত সহসা ঘুরে দাঁড়াল। তার চোখ দু'টিতে অস্বাভাবিক দীপ্তি—মুখখানা লাল টকটকে হয়ে উঠেছে—ঠোঁটের কাছটা কাঁপছে। একটা কঠিন প্রত্যুত্তরকে অত্যন্ত সংযমের সঙ্গে সে ওষ্ঠচ্যুত হতে দেয় নি বেশ বোঝা গেল।

দুর্গামোহন বুঝলেন—মাত্রাটা বেশি হয়ে গেছে। হয় ত শালীনতার গণ্ডি ছাড়িয়েছে—কিন্তু ধৈর্য্যের কি দোষ সে যদি আযৌবন প্রত্যাশার শেষ তৃণগাছি হতে অবলম্বনচ্যুত হয়ে পড়ে।

মিনিট দুই একদৃষ্টে বাপের মুখের পানে চেয়ে থেকে প্রশান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সিঁড়ির মুখে মলয় দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলে, কাকাবাবু কি খুব রেগে উঠেছেন?

প্রশান্ত বললে, ওঁকে আজই দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা কর ভাই—নইলে ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে। ক্রমশঃ

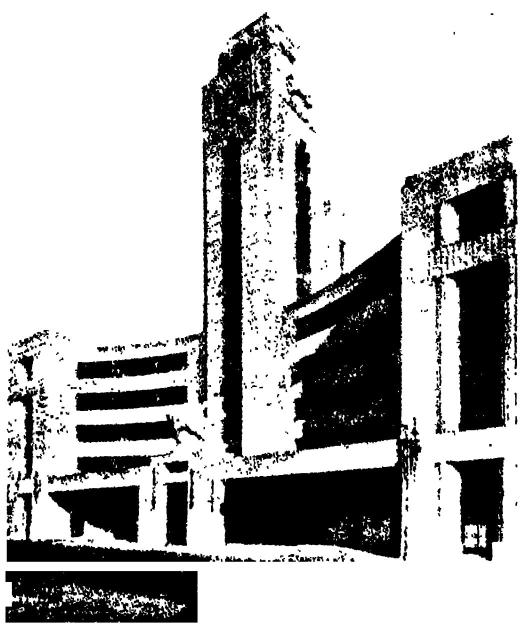
বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের সময় লণ্ডনে মুর্শিদাবাদ অপেক্ষা কম লোকের বাস ছিল। সেদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত দুই শত বৎসরও হয় নাই, ইহার মধ্যে লণ্ডন পৃথিবীর বৃহত্তম শহরে পরিণত হইয়াছে। ইংলণ্ড পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু পর পর দুইটি মহাযুদ্ধের ফলে সে সেই গৌরব হারাইয়া ফেলিয়াছে। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিভলিউশন বা শিল্প-বিপ্লবের ফলে যন্ত্রশক্তিতে ইংলণ্ড অগ্রণী হইয়াছিল; যন্ত্রশক্তির সহায়তাপুষ্ট ইংরেজ-মজুরের উৎপাদনীশক্তি সবাইকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল; নির্ভীক, নিরলস ইংরেজ বণিক পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিপত্তন করিয়াছিল। লণ্ডন হইয়াছিল সমস্ত পৃথিবীর বাণিজ্য-কেন্দ্র; সমস্ত পৃথিবীকে মূলধন যোগান দিত লণ্ডন এবং সমস্ত পৃথিবীর বাণিজ্যের মাল বহন করিত লণ্ডনের জাহাজ। লণ্ডনের সে গৌরব আজ আর নাই। যুদ্ধোত্তর লণ্ডনের রূপ, সমস্যা ও সমাধান-প্রয়াস বিশেষরূপে প্রণিধানের বিষয়।

লণ্ডনের ডক এলাকায় বোমাবর্ষণের ফলে সংঘটিত বিস্তর ক্ষতি আজও দেখিতেছি। মধ্য-লণ্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রীট এলাকায়ও কিছু কিছু বিধ্বস্ত গৃহ দেখিতেছি। পার্লামেণ্টের কমন্স ভবনের এখনও পুনর্নির্ম্মিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত লণ্ডনের বাহ্যিক রূপের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন দেখি না। কিন্তু ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক ভিত্তি একদম ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে পৃথিবী ব্যাপিয়া ইংলণ্ডের মূলধন খাটিত; তাহার সুদ ছিল ইংলণ্ডবাসীর একটা বড় আয়ের উপায়। আজ সে মূলধন নাই; উপরন্তু সে নানা জাতির নিকট দায়িক। অন্যত্র হইতে কোন সুদ আর ইংলণ্ডে আসে না; তাহার নিজের আয়ের এক অংশ ঋণশোধের জন্য বাহিরে পাঠাইতে হইতেছে। পূর্ব্বে সে যত জিনিষ বাহিরে পাঠাইত, বাহির হইতে আনিত তার অনেক বেশী। কারণ সুদ প্রভৃতি বাবদ সে অনেক মাল পাইত। এখন সেই মূল্যের মাল বাহির হইতে আনিতে হইলে তাহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী মাল বাহিরে চালান দিতে হইবে। তারপর দেনাশোধ ত আছেই। কাজেই পূর্ব্বের চাল বজায় রাখা তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে। পূর্ব্বের চাল বজায় রাখিবার একমাত্র উপায় দেশের উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং তৎসহ বহির্বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন। প্রচুর জিনিষ উৎপাদন করিয়া বিদেশে বিক্রয় করিতে না পারিলে তাহার পূর্ব্বেকার অবস্থা ত ফিরিয়া আসিবেই না, পরন্তু বিদেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যবস্তু আমদানী করাই তাহার পক্ষে কষ্টকর হইবে। ইংলণ্ড এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত এবং এ দিকে তাহার চেষ্টার অবধি নাই।

প্রথমতঃ, ইংলণ্ড নিজেকে সর্ব্বতোভাবে সংযমের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। খাদ্য এবং বস্ত্রের রেশন পুরাদমে চলিয়াছে। প্রত্যেকের পরিমিত খাদ্য বরাদ্দ আছে। রুটি, মাখন, মাছ, মাংস, ডিম, তরকারী, চিনি সবই নিয়মিত বরাদ্দপ্রথার অন্তর্গত। প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন এবং নৈশভোজন সাধারণের এই ত্রিবিধ আহার। প্রতি বারে দু-এক টুকরো রুটি পাওয়া যায়। মাখন নামমাত্র। ডিম সপ্তাহে দুটো।



আধুনিক বিমান-কেন্দ্র—'ইম্পিরিয়্যাল এয়ারওয়েজ', লণ্ডন

মাংসের মধ্যে মেষ-মাংসই বেশী। মুর্গী দুর্লভ। তরকারীর মধ্যে আলু প্রচুর। অন্য তরকারী খুব কম। ফুলকপি দুর্লভ। বাঁধাকপি জন্মাইতে সময় বেশী লাগে; তার বদলে খুব ছোট বাঁধাকপি জাতীয় ব্রাসেল্‌স্ স্প্রাউট দেওয়া হয়। এগুলি খুব তাড়াতাড়ি জন্মায়। মধ্যাহ্ন ও নৈশভোজনে তিনটি পদ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ একটি ডাল বা ঝোল; দ্বিতীয় পদে এক টুকরা মাছ বা এক টুকরা মাংস, সঙ্গে কিছু তরকারী-সিদ্ধ এবং তৃতীয় পদে এক টুকরা কেক, পুডিং বা অন্য জাতীয় মিষ্টান্ন। পরে আধ কাপ কফি বা এক কাপ চা দেওয়া হয়। ইহাই প্রত্যেকের প্রাত্যহিক খাদ্য। আইনতঃ কোন হোটেলে ৫ শিলিঙের বেশী দাম লইতে পারে না। বড় বড় হোটেলে অবশ্য ঘরভাড়া, বাসনভাড়া প্রভৃতি বাবদ আরও কিছু আদায় করিয়া লয়। খাদ্য একঘেয়ে এবং অপ্রচুর। চকোলেট

জিনিসেও কুপন লাগে। সবাইকে এই আহারে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। সকালে বিকালে গৃহিণীদের রেশনের দোকানে লাইন দিতে হয়।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় আপিসবহুল অঞ্চলে হোটেলের সামনে লম্বা লাইন দেখা যায়। কখনও কখনও এক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া তবে খাদ্য মেলে। ফল অপ্রাপ্য। শিশু বা রোগীর জন্য বেশী দুধ লাগিলে তাহার জন্য আলাদা কুপন সংগ্রহ করিতে হয়। বস্ত্রের কুপনও প্রচুর নয়। মোজা, জুতা, টুপী, টাই, সার্ট, কোট, হ্যাট, বর্ষাতি প্রত্যেক জিনিষটি কিনিতে কুপন চাই। সব সময় সকল জিনিষ পাওয়া যায় না। বড় বড় দোকান এক এক সময়ে মালশূন্য হইয়া যায়। সুটের অর্ডার দিলে তিন মাসের কম পাওয়া যায় না। তৈরি জিনিষই বেশীর ভাগ কিনিতে হয়। সাধারণত লোকের প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির দাম অবশ্য খুবই কম। ৫ পাউণ্ড হইতে ১০ পাউণ্ডের মধ্যে সুট এবং ৫ পাউণ্ডে ওভারকোট পাওয়া যায়। গৃহের অভাব অত্যন্ত বেশী। হোটেলে স্থান নাই। যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া বিবাহিত ব্যক্তিগণ বাসোপযোগী গৃহ পাইতেছে না। সরকার গৃহনির্মাণ এবং ক্যাণ্টনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। সাধারণতঃ সরকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানের মারফতে গৃহ নির্মাণ করাইয়া বিলি করিতেছেন। রক্ষণশীল দল এই প্রথার পক্ষপাতী নন। তাঁহারা মনে করেন ধনীদিগকে গৃহনির্মাণের স্বাধীনতা দিলে বেশী গৃহ নির্মিত হইত। সরকার এ মত মানেন না। ইহা লইয়া তুমুল বিতর্ক চলিতেছে। মোটের উপর অন্ন, বস্ত্র এবং আশ্রয়স্থল সবই এখন সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং কোনটাই প্রচুর নয়।

অন্নবস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যও অপ্রাপ্য বা দুষ্প্রাপ্য। আমদানী রপ্তানী এবং মুদ্রাবিনিময়ের উপর সরকারের কড়া শাসন। বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা শিল্পের জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ভিন্ন অন্য দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করিতে দেওয়া হয় না। স্বদেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদির মধ্যেও বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যতীত স্বদেশে বেচিবার অনুমতি মিলে না। আমার লণ্ডনে অবস্থানকালে এক বিরাট প্রদর্শনী হইয়াছিল। প্রত্যহ বিশহাজার লোক প্রবেশমূল্য দিয়া এই প্রদর্শনী দেখিত। শিল্পজাত সর্ব্ববিধ দ্রব্য এবং গৃহস্থের প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য ইহাতে দেখান হইয়াছিল। সবই ইংলণ্ডে প্রস্তুত। প্রদর্শনীটির নাম দেওয়া হইয়াছিল "ইংলণ্ড ইহা তৈরি করিতে পারে" প্রদর্শনী। কিন্তু ইহার কোন জিনিষই ইংলণ্ডে বিক্রয়ের জন্য নহে; সবই বিদেশে চালান দিবার জন্য। সাধারণ লোকে ইহার নাম দিয়াছিল "ইংলণ্ড ইহা পাইতে পারে না" প্রদর্শনী। অর্দ্ধেক বিলিতী জিনিষ আমরা কলকাতায় পাই, কিন্তু তাহা বিলাতে অপ্রাপ্য। ভাল কাউন্টেন পেন, নাইলন প্রভৃতি জিনিষ বিলাতে শুধু দুষ্প্রাপ্য নয়, অপ্রাপ্য। সাবান ও তোয়ালেও সহজে পাওয়া যায় না।

সরকারের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হইতেছে সর্ব্বতোভাবে দেশের উৎপাদনবৃদ্ধি। এ বিষয়ে মজুরদের নিকট প্রধানমন্ত্রী এটলীর ঘন ঘন আবেদন আমরা প্রায়ই শুনি। পূর্ব্বোক্ত প্রদর্শনীটি এই উৎপাদনবৃদ্ধির প্রেরণা দিবার জন্যই করা হইয়াছিল। বিলিতী মালের অন্যান্য বিষয়ে সুনাম থাকিলেও ডিজাইনের বিশেষ সুনাম নাই। তাই এঁরা এবার ডিজাইনের দিকে বিশেষ নজর দিয়াছেন। যাবতীয় জিনিষের কত রকমারি ডিজাইন হইতে পারে তাহাই এই প্রদর্শনীর প্রদর্শনীয় বিষয় ছিল। আমার ইংলণ্ডে অবস্থানকালে অপর একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল। সেটি প্লাস্টিক্‌স্‌ প্রদর্শনী। কত রকমের প্লাষ্টিক্‌স হইতে পারে, প্লাষ্টিক্‌সের কত রকম ব্যবহার্য্য জিনিষ হইতে পারে এবং সেই সকল জিনিষের গুণ কি, ইহা দেখানোই ছিল এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। আজকাল প্লাষ্টিক্‌স্‌ দিয়া না হইতেছে এমন জিনিষ কম। কাপড় পর্য্যন্ত প্লাষ্টিক্‌স দিয়া তৈরি হইতেছে।

শিল্পবিপ্লবের ফলে যন্ত্রকৌশল এবং সংগঠনশক্তিতে ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিল। বিশাল সাম্রাজ্য তাহাকে কাঁচামাল যোগান দিত এবং তাহার বিপুল শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভার খরিদ করিত। এশিয়া তখন অবনত। শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমেরিকা শিশুমাত্র। ইউরোপের উঠন্ত এবং পড়ন্ত জাতিগণের মধ্যে শক্তিসাম্য রক্ষা করিত ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রনীতি। তখন উৎপাদন যন্ত্রশক্তির সাহায্যে দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল; কাজেই আভ্যন্তরীণ অশান্তির সম্ভাবনা ছিল কম। কারণ সকলের ভাগেই যথেষ্ট জুটিত এবং সকলেরই আয় বাড়িয়া চলিয়াছিল। ইংলণ্ড ছিল তখন জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু জনবল, প্রাকৃতিক সম্পদ, যন্ত্রকৌশল ও সংগঠনশক্তি—সব দিকেই আজ ইংলণ্ডের অগ্রগতি ব্যাহত হইয়াছে। রাশিয়া এবং আমেরিকা দ্রুত বাড়তির পথে চলিয়াছে। জনবল এবং প্রাকৃতিক সম্পদে উভয় দেশই আজ ইংলণ্ডের অগ্রগামী। যন্ত্রকৌশল এবং সংগঠন শক্তিতে আমেরিকা সবাইকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে। রাশিয়া তাহার বলিষ্ঠ সংগঠন-শক্তির পরিচয় দিয়া জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে। ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক প্রথার মূলে কিন্তু ভাঙ্গন ধরিয়াছে। আমেরিকা বহু পূর্ব্বেই ইংলণ্ডের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়াছে। ক্যানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া এখন সাম্রাজ্যের বৃহত্তম অংশ। কিন্তু তাহাদের নিজেদেরই সাহায্য-প্রয়োজন খুব বেশী। ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যবশে দুর্ব্বল। ইউরোপে শক্তিসাম্যের দিনও ফুরাইয়া গিয়াছে। কাজেই আজ ইংলণ্ড নিজের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছে, জগতে একচ্ছত্র প্রভুত্ব বজায় রাখা সম্বন্ধে তাহার মনে সংশয় জাগিয়াছে। নব নব যন্ত্র-কৌশলের উদ্ভাবনী শক্তিতে পিছাইয়া পড়ায় ইংলণ্ডে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িতেছে না। ফলে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। দীর্ঘকালীন কঠোরতার ফলে এই দ্বন্দ্ব বাড়িতেছে এবং কর্ম্মের

উৎসাহও কমিয়া যাইতেছে। যদি বেশী কাজের ফলে বেশী ভোগ্যবস্তু না পাওয়া যায় তবে কাজে স্বতঃই উৎসাহ থাকে না। ধর্মঘটের মীমাংসা করা এ অবস্থায় কঠিন হইয়া পড়ে। শিল্পপতিগণ এ অবস্থায় উৎসাহহীন হইয়া পড়িতে পারেন। ইংলণ্ড আজ সর্ব্বপ্রকারেই বেতনভুক্‌গণের গণতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। বেতনভুকের প্রধান স্বার্থ তাহার বেতনের পরিমাণে এবং কর্ম্মের অবস্থায়; উৎপাদন-ব্যবস্থায় তার প্রত্যক্ষ স্বার্থ নাই। অথচ উৎপাদন না বাড়িলে তার ভাগ বাড়ানও কষ্টকর। শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট ঘন ঘন মজুরদের প্রতি আবেদন জানাইয়া এবং কোন কোন শিল্প সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনিয়া এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তথাপি আজ ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র এই দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ইচ্ছা বা প্রয়োজনানুরূপ উৎপাদন বাড়িতেছে না। যদিও কঠোর ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র লাঘব করা হইতেছে না তথাপি ইংলণ্ড তাহার পূর্ব্বের চাল ফিরাইয়া আনিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। তাই তাহার স্বেচ্ছাকৃত কঠোরতা এবং অভিনব উৎপাদন প্রচেষ্টা বিস্ময়কর হইলেও করুণারই উদ্রেক করে।

আজ ইংলণ্ডকে নূতন আদর্শে ঘর গুছাইতে হইবে। পরবর্ত্তী বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার সময়। ভারতবর্ষ ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ যদি আজ দারিদ্র্য ও ভেদ-প্রবর্দ্ধক-শাসন-মুক্ত হইয়া স্বাধীন ও স্বাবলম্বীভাবে ক্রম-বর্দ্ধমান শক্তি ও সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া ইংলণ্ডের বন্ধুভাবে দাঁড়াইতে পারে তবেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ ইংলণ্ডের অনুকূল হইতে পারে। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে রহিল বা বাহিরে গেল সে কথা এখানে অবান্তর। সাম্রাজ্যভুক্ত আয়ার্লণ্ড অপেক্ষা সাম্রাজ্যবহির্ভূত আমেরিকাই গত যুদ্ধে ইংলণ্ডের অধিকতর মিত্রতা করিয়াছে। সকল বিষয়েই ইংলণ্ডের বর্ত্তমানে চাই সাহস, দূরদৃষ্টি এবং সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টা। ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের নূতন নীতি এই দূরদৃষ্টি ও সাহসেরই ফল। ইহা আকস্মিক উদারতাও নয় বা তাহার দুর্ব্বলতার পরিচায়কও নয়। তবে এইরূপ দূরদৃষ্টি ও সাহস ইংলণ্ডের বিশেষত্ব। শেষ পর্য্যন্ত নিজ শাসনাধীন দেশকে নিঃশেষে শোষণ করিবার চেষ্টা না করিয়া কালের ইঙ্গিত মানিয়া লইয়া অধীন দেশকে এবং স্বদেশকে পুনরুজ্জীবিত হইবার এইরূপ সুযোগ দিবার মত দূরদৃষ্টি, সাহস ও উদারতা অন্য কোন সাম্রাজ্যবাদী জাতির আছে কিনা সন্দেহ।

এ যুগসন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষেরও আজ সাহস, উৎসাহ ও দূরদৃষ্টি প্রয়োজন। এই অপূর্ব্ব সুযোগের সদ্ব্যবহার তাহাকে করিতেই হইবে। কালের ইঙ্গিত আজ তাহার অনুকূল। এ ইঙ্গিতে সাড়া না দিলে সে আত্মহত্যার পাপ করিবে। যে আজ অন্তঃকলহে ইন্ধন যোগাইয়া বাধা সৃষ্টি করিবে সে দেশের শত্রু।

লণ্ডনে অবস্থানসময়ে রবিবারগুলি প্রায়ই বাহিরে কাটাই-তাম। এইরূপে চারিটি রবিবার কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, ব্রিষ্টল ও ব্রাইটনে কাটাই। এগুলি লণ্ডনের অনতিদূরবর্ত্তী সুন্দর ছোট ছোট শহর। লণ্ডনের অগাধ জনসমুদ্র হইতে এখানে আসিয়া যেন থৈ পাওয়া যায়।

কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড কলেজ-প্রধান শহর। শহর দুইটি লণ্ডন হইতে যথাক্রমে প্রায় ৬০ ও ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। রাস্তায় ঘাটে ছাত্রই বেশী নজরে পড়ে। কলেজগুলি বাস্তবিকই দর্শনীয় বটে। সেগুলির ভিতরে হৈ চৈ কম—সত্য সত্যই বিদ্যাচর্চ্চার উপযুক্ত নিকেতন। ছাত্রদের নৌকাবিহারে খুব আগ্রহ। শীর্ণকায়া ক্যাম্ নদী কেম্ব্রিজের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। নদীটি প্রশস্ততায় কালীঘাটের গঙ্গার অর্দ্ধেক। লম্বা লম্বা নৌকায় চড়িয়া ইহাতেই ছাত্রগণ বাচ খেলে। নদীপথে ৪।৫ মাইল অতিক্রম করিলে 'গ্র্যাণ্ট চেষ্টার' নামক স্থানে 'রেডলায়ন' হোটেল ও বায়রনস্ লকে পৌঁছানো যায়। লর্ড বায়রন নাকি এই বাড়ীতে থাকিতেন এবং এই হোটেলের পানীয় পছন্দ করিতেন। বাড়ীটির বর্ত্তমান অধিবাসিনী এক তরুণীর সহিত আলাপ করিলাম। তিনি এ বিষয়ে খুব সচেতন বলিয়া বোধ হইল না। লর্ড বায়রন এ বাড়ীতে থাকিতেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্মিত হাস্যে সংক্ষেপে উত্তর করিলেন, 'লোকে বলে।' অদূরে কবি রূপার্ট ব্রুকের বাড়ী। আশে পাশে জনবসতি খুব বেশী নয়। রাস্তার দু'পাশে কিছু কিছু পাতলা জঙ্গল। অক্সফোর্ডের এক পাশে টেম্‌স্ নদী, অপর পাশে চেরওয়েল নদী। চেরওয়েল ক্যাম হইতেও ছোট। টেম্‌স্ নদীর এখানকার দৃশ্য নয়নানন্দকর; স্বাতিপ্রশস্ত স্বচ্ছ-সলিলা এবং সলীলগমনা নদীটির পাড়ে বড় বড় ক্লাব ঘর। নদীতে বহু বাচের নৌকা। নদীর পাড় দিয়া ভ্রমণ খুব লোভনীয়। শহরের মধ্যে বিচরণকালে শেলী হাউস, অর্ডিং হাউস প্রভৃতি মনের ঔৎসুক্য বাড়ায়। এখানকার বিখ্যাত বডলিয়ন লাইব্রেরী অষ্টম হেনরীর আমলে নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে আমেরিকার রক্-ফেলার ফাউণ্ডেশনের অর্থসাহায্যে লাইব্রেরী-গৃহের আয়তন বাড়ান হইতেছে। পুস্তকপ্রকাশের বর্ত্তমান হার অপরিবর্ত্তিত থাকিলে আগামী পাঁচ শত বৎসরে পুস্তক প্রকাশিত হইবে তাহা রাখিবার পক্ষে এই বর্দ্ধিত অংশ (extension) পর্য্যাপ্ত। আমার লণ্ডনে অবস্থান কালে রাণী স্বয়ং এই বর্দ্ধিত অংশের উদ্বোধন করেন। তখন ছাত্রগণ সেক্সপীয়রের একটি নাটক অভিনয় করে।

এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় দুইটি স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে তাহাদের গোঁড়ামি আজও সম্পূর্ণ ছাড়িতে পারে নাই। পূর্ব্বে স্ত্রী-লোকের বিদ্যার অধিকার ছিল না। এখন স্ত্রীলোকদিগকে পড়িতে দেওয়া হয় এবং পরীক্ষা দিতেও দেওয়া হয়। কিন্তু পাশ করিলে তাহাদিগকে অনেক বিষয়ে উপাধি দেওয়া হয় না; একটি ডিপ্লোমা দিয়াই বিদায় করা হয়। বিদ্যার অধিকার স্বীকৃত হইলেও ডিগ্রির অধিকার আজও স্বীকৃত হয় নাই।

ব্রিষ্টল লণ্ডন হইতে ১১৬ মাইল। যাইতে তিন ঘণ্টা লাগে। বোমাবিধ্বস্ত অনেক বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখানে দেখিলাম। ভারতবাসীর নিকট ব্রিষ্টল তীর্থস্বরূপ। এখানে রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দির বিদ্যমান।

এভন নদীর তীরে ছোট ছোট পাহাড়ময় ব্রিষ্টল শহরটি দেখিতে মনোরম। পাহাড়ের গায়ে ও উপরে গৃহরাজি। শহরের বাহিরে একটি ঝুলানো সেতু প্রকৃতির লীলা-নিকেতনের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। দুইটি শ্যামল পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গকে সংযোগ করিয়াছে এই সেতু। নীচে পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্য দিয়া এভন নদী প্রবাহিত। তাহার পাড় দিয়া রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। পোলের উপর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া রেলগাড়ীকে চলিতে দেখিয়া বক্রগতি অজগরের কথা মনে পড়ে।

রামমোহনের সমাধিস্থানটি শহরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম অংশে অবস্থিত। একটি অর্দ্ধবৃত্তাকার পাহাড়। শিখর হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত ঢালু পর্ব্বতগাত্রে সমাধি-মন্দিরের শ্রেণী। পাহাড়টি খাড়া নয়। ধীরে ধীরে উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। শিখরে অনেকটা সমতল-ভূমি। ঢালু অংশ সমাধিতে সমাধিতে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে। এখন শিখরস্থ সমতল অংশ ব্যবহৃত হইতেছে। রামমোহনের সমাধি পাহাড়ের পাদদেশে— ফটক দিয়া ঢুকিয়া ডাইনে। মন্দিরের ছবিটি ভারতীয়গণের নিকট পরিচিত। প্রবেশমাত্র সুপরিচিত ছবির বাস্তব মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। রামমোহনের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন সমাধি দেখিলাম না। সে দিন রবিবার ১০ই কার্ত্তিক, ২৭শে অক্টোবর। অপরাহ্ন-সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া অর্দ্ধবৃত্তাকার পর্ব্বতগাত্রস্থ সমাধিমন্দির-শ্রেণীর চূড়ায় স্বর্ণকিরণ ঢালিতেছিল। কত নরনারী তাহাদের প্রিয়জনের সমাধিপার্শ্বে বসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। কেহ সমাধিমন্দিরের গাত্র সম্মার্জ্জিত করিয়া পুষ্পস্তবকে সাজাইতেছে। পাহাড়ের পাদদেশে লোকসমাগম নাই। সে সমাধিগুলি শতাধিক বর্ষের। শিখরে লোকসমাগম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সেখানকার সমাধিগুলি আধুনিক। অপরাহ্ণ-সূর্য্যের ক্রমবিলীয়মান কিরণ-লেখায়, প্রাকৃতিক শোভার অপূর্ব্ব পরিবেশে, পর্ব্বতগাত্রস্থ সহস্রাধিক সমাধিশ্রেণীর মধ্যে শত শত নরনারীর নীরব আকৃতি যখন জীবন ও মরণের মধ্যে সেতু নির্ম্মাণ করিতেছিল, তখন এক অভিনব অনুভূতিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বেদনাকাতর চিত্তেই সে দিন লণ্ডনে ফিরিয়াছিলাম।

ব্রিষ্টলে দুইটি ভদ্রলোকের আচরণ বেশ মনে পড়ে। সে-দিন পূর্ব্বাহ্নে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। রাস্তায় লোক খুব কম। জনৈক পথচারীর কাছে রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ঝুলন্ত সেতুর দিকে চলিয়াছি। খানিক দূর গিয়া রাস্তা জিজ্ঞাসা করিবার লোক আর পাইতেছি না। এমন সময়ে একটি পথিক সেই পথে আসিয়া উপস্থিত। তাহাকে রাস্তার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—"আমি যুদ্ধের সময় অনেক দেশে গিয়াছি। কলিকাতাও ছিলাম! বিদেশে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া অজানা পথ চলার অসুবিধা আমার ভালই জানা আছে। আমার সঙ্গে আসুন।" আমার আপত্তি সত্ত্বেও ভদ্রলোক অনেক দূর পর্য্যন্ত আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দিলেন। শেষে একটি পায়ে চলা পথের উপর দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এই পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেতু পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আপনি এই পথ ছাড়িবেন না। তাহা হইলেই যথাস্থানে পৌঁছাইতে পারিবেন। সেতু কাছেই।" পাহাড়টির নাম ক্লিফটন। আঁকা বাঁকা পাহাড়ের রাস্তায় খানিকদূর উঠিয়া আবার সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করিলাম। সহসা একটি যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাস্তা জিজ্ঞাসা করিতেই যুবকটি আমাকে প্রশ্ন করিল —"আপনি ভারতীয়?"

আমি—"হাঁ।"

যুবক— আমি যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে ছিলাম। কিছুদিন করাচীতে কাটাইয়াছি।

আমি— করাচী তাহার সুন্দরতম অংশের নাম আপনাদের শহর হইতেই ধার করিয়াছে দেখিতেছি।

যুবক—হাঁ, করাচীতে ক্লিফটনের সমুদ্রসৈকত সত্যই মনোরম।

যুবকটি আমাকে সেতুর খুব নিকট পর্য্যন্ত আগাইয়া দিল। তারপর আর কাহারো সাহায্য বিনাই সেতু পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম।

লণ্ডনে পৌঁছিয়া একমাস বেশ ভাল আবহাওয়া পাইয়াছিলাম। গোটা অক্টোবর মাসটাই খুব রৌদ্র ছিল। কুয়াশা, মেঘ বা বৃষ্টি মোটেই ছিল না। তাপ সাধারণতঃ ৬৫° হইতে ৫৫° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠা-নামা করিত। নবেম্বরের প্রথমে রৌদ্র কমিয়া আসিল। কুয়াশা, মেঘ ও বৃষ্টি দেখা দিল। তাপ কমিয়া ৪০° ডিগ্রীতে নামিল; কখনও বা আরও নীচে যাইতেছিল। দিন ছোট হইয়া আসিল। আমার কাজও তখন শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমেরিকা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। কবে বিমানে স্থান জুটিবে সেই সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছি। খারাপ আবহাওয়া এবং ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে মন খুব প্রফুল্ল নাই। এই অবস্থায় এক রবিবারে ব্রাইটন্ দর্শনে বহির্গত হইলাম। ব্রাইটন্ লণ্ডন হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণে। রেলে যাইতে এক ঘণ্টা লাগে।

ব্রাইটন নগর আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। সম্রাট চতুর্থ জর্জ্জ সমুদ্রবাসের জন্য এখানে একটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। প্রাসাদটি ১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের হাসপাতালরূপে ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি এই শহরের লোকেরা যে সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ পাতিয়ালার মহারাজ প্রাসাদটির দক্ষিণে একটি সুন্দর খিলানযুক্ত ফটক তৈরী করাইয়া দেন। সেটি আজিও স্থানটির

শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ব্রাইটনের নাগরিকগণও ভারতীয় সৈন্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করেন। স্তম্ভটি সুদৃশ্য। শহর হইতে দূরে।

এখানে সমুদ্রের তীরে বালি নাই। তীর অপ্রশস্ত। ছোট বড় নানারূপ নুড়িতে ভর্ত্তি। প্রশস্ত বাঁধানো রাস্তা তীর ধরিয়া বরাবর চলিয়া গিয়াছে। বেড়াইবার বেশ সুবিধা। দুইটি বড় বড় ঘাট বা 'পায়ার' আছে; বেশ সুন্দর। কাঠের মঞ্চ তীর হইতে সমুদ্রের মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। তার উপরে বড় বড় কাঠের ঘর ও অঙ্গন। খোলা আঙ্গিনায় বেড়াইতে খুব ভাল লাগে। বসিবার জন্য চেয়ার পাতা আছে। বসিলে তিন পেনি ভাড়া দিতে হয়। একটি ঘরে খাইবার সু-বন্দোবস্ত আছে। বড় হলঘরে সমুদ্র দেখিতে দেখিতে আহার চলে। অন্যান্য ঘরে আমোদ-প্রমোদের নানারূপ বন্দোবস্ত। সর্ব্বদাই উৎসব চলিতেছে। বেশ লোকের ভিড়। সমুদ্র দেখিতে অনেকটা মান্দ্রাজের সমুদ্রের মত। পুরীর সমুদ্রের মত ঢেউ নাই। তীরের কাছে হংসশ্রেণী সাঁতার কাটিতেছে। বেড়াইবার জন্য ছোট ছোট নৌকাও ভাড়া পাওয়া যায়।

সেইদিন সকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বৈকালে বেশ রৌদ্র উঠিল। 'পায়ারে'র উপর দাঁড়াইয়া দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র দেখিতেছি। অপরাহ্ণ সূর্য্য আকাশের গায়ে হেলিয়া পড়িয়াছে। কবি কল্পনা যেন চোখের সামনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—

"জ্বলিতেছে জল তরল অনল
গলিয়া পড়িছে অম্বর-তল
দিক্‌বধূ যেন ছল ছল আঁখি
অশ্রুজলে।"

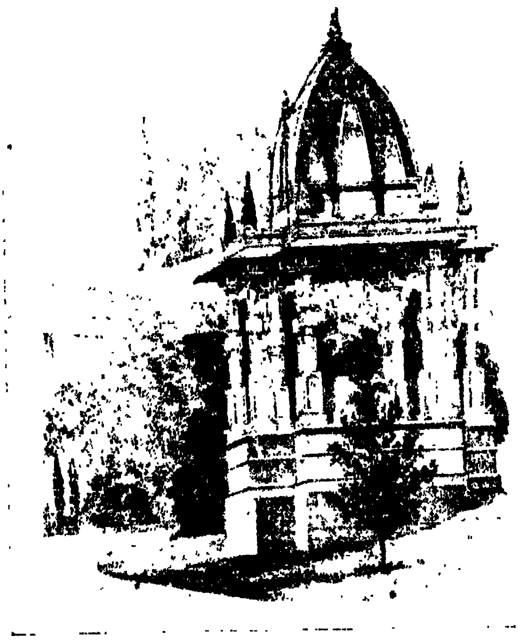
দিগন্তের পরপারে এই ঊর্ম্মিমুখর মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া শীঘ্রই আমাকে আমেরিকায় যাইতে হইবে। কেবলই মনে হইতেছে

কি আছে হোথায়—চলেছি কিসের
অন্বেষণে?

কিন্তু "সংশয়ময় ঘননীল নীর" নিরুত্তর।

তপন নীরবে দূরে পশ্চিমে গগনকোণে ডুবিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের "নিরুদ্দেশ যাত্রা" কবিতাটি মনে মনে আবৃত্তি করিতে করিতে ষ্টেশনাভিমুখে ফিরিলাম।

৩রা নভেম্বর (১) রবিবার ব্রাইটন যাই। ১৪ই নভেম্বর লণ্ডন হইতে আমেরিকা যাত্রা করি। এই কয়দিনে আবহাওয়ার অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইল। শীত বাড়িল। রৌদ্র অবলুপ্ত হইল। কুয়াশা ও মেঘে সর্ব্বদাই আকাশ আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়ে।



রামমোহন রায়ের সমাধি-মন্দির, ব্রিষ্টল

লোকজন দ্রুত কাজ সারিয়া গৃহে ফিরিয়া আগুন পোহায়। পার্ক জনশূন্য। আফিসের পর রাস্তাও প্রায় জনশূন্য। সাত আট তারিখের মধ্যে আমার কাজ শেষ হইয়া গেল। তখন এই আবহাওয়ায় মনের প্রফুল্লতা রাখা কষ্টকর হইল। ১০ই নবেম্বর রবিবার কিউ উদ্যানে গেলাম। কিন্তু সে সুরম্য উদ্যান আজ রিক্ত। গাছে পাতা নাই, ফুল নাই। বৃষ্টিপ্লাবিত হওয়ায় ঘাসে ঢাকা মাঠগুলিরও আর সে শ্রী নাই। লণ্ডনের অবিশ্রাম জনস্রোতের মধ্যেও আর সজীবতা নাই বলিয়া মনে হয়। যেন যন্ত্র-চালিতের মত সবাই আপিসে যায়, আবার আপিসের কার্য্য অন্তে দ্রুত গৃহে ফেরে। মাঝে মাঝে মনে হইত চিড়িয়াখানায় গিয়া জীবজন্তুর গতিবিধি ও সজীবতা দেখিয়া আসি। এই সময় প্রায়ই ন্যাশন্যাল আর্ট গ্যালারীতে যাইতাম। এই গৃহটি সজীবতা ও আনন্দের নিত্য-লীলাভূমি; শীত ঋতুর জড়তা আনয়নকারী প্রভাবের অতীত। প্রবেশমাত্র মনের সমস্ত গ্লানি দূর হইয়া যায়। সমগ্র মানব-জাতির সুখ ও দুঃখ, প্রেম ও ঘৃণা, দম্ভ ও বিনয়, বীরত্ব ও ভীরুতা, আকূতি ও প্রত্যাখ্যান, দয়া ও হিংসা প্রভৃতি যাবতীয় ভাব ও রস শিল্পিগণের প্রতিভায় যেন পরিপূর্ণ মহিমায় এই ঘরে বিরাজমান।

অর্থ ও অনর্থ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

বিয়ের অনতিকাল পরে যশোদা যখন বিনাদোষে স্বামী-গৃহ থেকে বিতাড়িত হ'ল তখন পাপের পিচ্ছিল পথে পা বাড়াবার প্রচুর প্রলোভন তার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু যশোদা সকল প্রলোভন জয় করে মুক্তাকরি গ্রামে গিয়ে প্রভুনন্দন গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করলে। প্রথম যৌবনেই সে যোগিনী-বেশ ধারণ করলে। গলায় কণ্ঠী, পরণে থানধুতি, ললাটে ও নাসিকায় চন্দনের অলকাতিলকা—এই তরুণী বৈষ্ণবী যেদিন রামচন্দ্রপুরের কাছারীতে এসে হাজির হ'ল সেদিন তার সম্বন্ধে কাছারীর লোকদের কৌতূহলের আর অন্ত ছিল না।

তার পর কেটে গেল দীর্ঘকাল। ধীরে ধীরে মাথলার খালের পাড়ে কেমন করে যশোদার আশ্রমটি গড়ে উঠল সে অনেক কথা—আর তা না জানলেও আপনাদের কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু কাছারীর দক্ষিণ দিক দিয়ে যে মেঠো রাস্তাটা বরাবর মেঘনা নদীর তটাভিমুখে চলে গিয়েছে সেইটি ধরে যদি একবার যশোদার আশ্রমে গিয়ে হাজির হন তা হলে চতুষ্পার্শ্বের প্রাকৃতিক পরিবেশ আপনার মনে এক অভিনব অনুভূতির সঞ্চার করবে। মনে হবে সম্পূর্ণ এক নূতন জগতে এসে হাজির হয়েছেন—আপনাদের পরিচিত পৃথিবীর সঙ্গে তার কত পার্থক্য। লোকালয়ের কোন কোলাহল সেই নিভৃত নিকেতনে এসে পৌঁছয় না। যে টিলার ওপর আশ্রমটি অবস্থিত তার পাদদেশ ধৌত করে মাথলার খালের রজতশুভ্র ক্ষীণ জলধারা বিরাট শ্যামল প্রান্তরের প্রান্তদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে—টিলার শীর্ষদেশ থেকে তাকালে মনে হয়, পৃথিবীর বুকের ওপর জরির পাড় দেওয়া একখানি সবুজ মখমলের শাড়ি বিছানো। মাথলার খাল গিয়ে মিশেছে মেঘনার সঙ্গে। নিঃসীম নীল আকাশের নীচে মেঘনার দিগন্তপ্রসারিত মসীবরণ বারিরাশির অনন্ত বিস্তার মনকে তুচ্ছতার গণ্ডী থেকে দূরে টেনে নিয়ে যায়, হৃদয়ে জাগায় অসীমের আভাস।

লোকালয়ের বাইরে এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে থেকে যশোদার প্রকৃতিও গিয়েছিল বদলে; সে বাস করত এক সৃষ্টি-ছাড়া জগতে আপনার চতুষ্পার্শ্বে এক বিরাট শূন্যতার পরিমণ্ডল রচনা করে। পুরুষরা তাকে রীতিমত ভয় করত। তার তপ্ত-কাঞ্চনসন্নিভ গৌরবর্ণ অনেকের চোখ ঝলসে দিয়েছিল; তার সান্নিধ্যলাভের জন্যে যারা লালায়িত হয়ে উঠেছিল, তার প্রদীপ্ত দুই চক্ষুর জ্বলন্ত দৃষ্টিকে তারা সহ্য করতে পারে নি। সেই তীব্র দৃষ্টিতে ছিল বঞ্চিত ভোগ-জীবনের বিফলতার তীব্র জ্বালা।

কিন্তু মেয়েমহলে তার খাতিরের অন্ত ছিল না। কাছারীর প্রত্যেক পরিবারের অন্তঃপুরে তার অবাধ গতায়াত। পাহাড়ের পাষাণ গুহাহিত ঝরণাধারার মত তার কঠোর হৃদয়েও সুরের অমিয়ধারা ছিল সঞ্চিত। যশোদার মুখে আগমনী গান আর কীর্তন গান শুনে গাঁয়ের মেয়েরা তন্ময় হয়ে যেতেন, অশ্রু সম্বরণ করতে পারতেন না।

বাইরে থেকে দেখলে অবশ্য মনে হয় যে, যশোদার হৃদয়ে দয়ামায়া ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তির বালাই নেই। তার রুক্ষমূর্তি হৃদয়ের ভীতিরই উদ্রেক করে, কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় যখন সে আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত বালগোপালের মূর্তিটির সামনে আরতি করে, ভোগ দেয় তখন সে যেন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়ে ওঠে। তার মুখের কঠিন রেখাগুলো যেন আচমকা মিলিয়ে যায়, সারা মুখখানি স্নেহে মমতায় করুণায় মেদুর হয়ে ওঠে। সেই সময় তার আত্ম-বিস্মৃতি ঘুচে যায়। তার বুকের ভেতর জেগে উঠে চিরন্তনী মা। ঐ পাথরের মূর্তিটিকে অবলম্বন করেই সে মাতৃত্বের অপরিসীম বুভুক্ষাকে প্রশমিত করবার প্রয়াস পায়।

এমনিধারা যশোদার দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল একঘেয়ে ভাবে, এমন সময় দেখা দিলে পঞ্চাশের মন্বন্তর। অনাহারে আর রোগে ভুগে লোকেরা মরতে লাগল। যশোদা আর্তের সেবায় ঢেলে দিলে মনপ্রাণ। যশোদার পাষাণ-বুকে যে এত স্নেহধারা লুক্কায়িত ছিল তার পরিচয় পেয়ে সবাই বিস্মিত হ'ল।

হুকুম মণ্ডলের বিধবা বৌটি যখন ব্যাধিতে ভুগে ভুগে মৃত্যুপথযাত্রিণী হ'ল তখন যশোদা আহার-নিদ্রা বাদ দিয়ে দিনরাত তার সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও তাকে সে বাঁচাতে পারলে না। মরবার সময় হুকুমের বৌ তার একমাত্র অনাথ ছেলেটিকে যশোদার হাতে সঁপে দিয়ে বললে, "বোষ্টমী দিদি, আমি চলে যাচ্ছি—কিন্তু এটাকে তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম। যশোদা তোমার গোপালকে তুমি দেখো।"

হুকুমের বৌ মারা গেলে যশোদা গোপালকে কোলে করে আশ্রমে ফিরে এল।

রক্ত-মাংসের গোপালের আগমনে যশোদার আশ্রমে পাথরের গোপালের সেবাযত্নের ত্রুটি হতে লাগল। এই জীবন্ত গোপালটিই অনুক্ষণ তার কোল জুড়ে রইল। এতদিন পরে যশোদা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলে যে, পাথরের ঠাকুরের সেবায় সবটা মন ভরে না, যদিও তার পেট ভরাতে ভিক্ষালব্ধ খুদকুঁড়োই যথেষ্ট। কিন্তু যে রক্ত-মাংসের ক্ষুদে শিশুটি তার সমস্ত অন্তরকে অনির্বচনীয় মাধুর্যে পূর্ণ করে তুলেছে তার উদরপূর্তি করতে হলে শুধু ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভর করলে চলবে না। অন্য ব্যবস্থার দরকার। কিন্তু কি করা যায়!

অনেক ভেবে চিন্তে যশোদা স্থির করলে যে, সে কাছারির

নায়েবের বাসায় চাকরি নেবে। একদিন সকালবেলা সে নায়েবগিন্নীর কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। নায়েবগিন্নী তো তাকে দেখে মহাখুশী, বললেন—"এসো, বোষ্টমী দিদি বস, দুটো গোপালের গান গাও।" পূজো আসন্নপ্রায়। শরতের এক ফালি সোনালী রোদ উঠানের একপার্শ্বস্থ পেয়ারা গাছের মাথায় যেন সোনা মাখিয়ে দিয়েছে। গাছের ছায়ায় বসেই দু'জনাতে কথাবার্তা হচ্ছিল। দূরে মাখলার খালের পেছনে মেঘনার কালো বারিরাশির অনন্ত প্রসার নজরে পড়ে। সুনীল আকাশে শেফালি ফুলের মত সাদা মেঘগুলো মেঘনার বুকের উপর দিয়ে ওপারের উদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে। মাখলার খালের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে নীল পাল তোলা একটি ছৈওয়ালা নৌকা। মাঝি পিছনে হাল ধরে বসে তার-স্বরে ভাটিয়ালী গান জুড়ে দিয়েছে। গানের দুটো কলি নায়েব-গিন্নীর কানে ভেসে এল—

"মেঘনা নদীর ঐ পারে
থানা নাছিরনগরে···"

—শুনে নায়েবগিন্নীর বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল, "মেঘনা নদীর ঐপারে, থানা নাছিরনগরেই" যে তার কন্যার শ্বশুরবাড়ী।

নায়েবগিন্নীর অনুরোধে কণ্ঠের সবটুকু মাধুর্য্য ঢেলে দিয়ে যশোদা গাইতে সুরু করলে—

"শুন ব্রজরাজ স্বপনেতে আজ
দেখা দিয়ে গোপাল···

গোপাল পর্য্যন্ত বলেই যশোদা থেমে গেল···তার নিরুদ্ধ আবেগ অশ্রুপ্লাবনের মধ্যে মুক্তি পেল—তার গোপাল যে আজ তিন দিন যাবৎ আধপেটা খেয়ে আছে।

নায়েবগিন্নী অবাক—সমবেদনার সুরে বললেন—"কি হ'ল বোষ্টমী দিদি, তোমার আবার দুঃখ কিসের, নাও চোখ মোছো—দুটো ধর্মকথা শোনাও দিকি।"

যশোদা আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে বললে—"না দিদি, ধর্মকথা শোনাবার মত অবস্থা এখন আমার নয়—আমার গোপাল আজ অভুক্ত। আচ্ছা দিদি, আমাকে তোমাদের বাড়ীতে চাকরাণী রাখবে—মাইনে যা খুশী দিয়ো—গোপালকে যে আমি দু'বেলা পেটভরে খেতে দিতে পারি নে।"

নায়েবগিন্নীর মুখে রা নেই। যশোদা বোষ্টমী তাঁর কাছে চাকরিপ্রার্থিনী হয়ে এসেছে—সেই যশোদা জীবনে যে কখনও কারও কাছে হাত পাতে নি।

শেষ পর্য্যন্ত নায়েবগিন্নী রাজী হলেন। সবেতনে যশোদা নায়েববাড়ীতে কাজে নিযুক্ত হ'ল। জল তোলা বাসন মাজা কাপড় কাচা—এ সমস্ত টুকিটাকি কাজের ভার পড়ল তার ওপর।

এদিকে নূতন পরিবেশে এসে ধীরে ধীরে যশোদার মনোজগতেও ঘটল বিরাট পরিবর্ত্তন। এদের ঐশ্বর্য্যের ছটা, বধূদের বেশভূষার বাহার, অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য তার চোখ ঝলসে দিলে। নিজের নারী-সত্তা যেন এক নূতন তাৎপর্য্যে মণ্ডিত হয়ে তার কাছে দেখা দিলে। এতদিন পরে তার মনে হ'ল সংসারে তার যা পাওনা, সে তার কিছুই পায় নি। সারা জীবন সে শুধু বঞ্চিত হয়েই এসেছে। ঐ বিত্তশালী অভিজাত পরিবারের ঐশ্বর্য্যসম্ভার অনবরত তার মনকে প্রলুব্ধ করতে লাগল। তার সর্ব্বসুখবঞ্চিত জীবনের রিক্ততা অনুক্ষণ তার মনকে পীড়া দিতে লাগল। অজানা বেদনার সহিত তার মনে পড়ল—ধনী পরিবারে তার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের পানপাত্র তার ওষ্ঠের সামনে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কার অভিশাপে দূরে সরে গেল। একটি সুখৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্নেহনীড়ের মধ্যে কেন তার ঠাঁই হ'ল না। তার স্বপ্ন কেন ভেঙে গেল?···

ক্রমে অর্থের প্রতি জন্মাল যশোদার উৎকট মোহ, তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন তার হাতে প্রথম মাইনের টাকা কয়টি এল সেদিন। বাড়ীতে এসে সে টাকা কয়টিকে যে কতবার মেঝে ঢেলে টুংটাং করে বাজিয়ে দেখতে লাগল তার আর অন্ত নেই, বার বার বুকের উপর চেপে ধরে সেগুলোর স্পর্শসুখ সে অনুভব করতে লাগল; তার পর এক টুকরো কাপড় দিয়ে মুড়ে ঘরের খুঁটির মধ্যে ফুটো করে তাতে রেখে দিলে।

স্বজনপরিত্যক্তা যশোদা আবার গোপালকে কেন্দ্র করে ঘর-সংসারের নীড়-রচনায় স্বপ্ন দেখতে লাগল।···যদি তার হাতে প্রচুর টাকা হয়, তা বড় হলে গোপালকে বিয়ে করিয়ে সে ঘরে আনবে টুকটুকে রাঙা বৌ, তার সর্ব্বাঙ্গ দেবে সে সোনার গয়নায় মুড়ে।···এমনি ভাবে চলল তার দিবা-স্বপ্নের জালবোনা।···একটি সংসারের সে হবে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তার নীড়রচনার আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যতে সার্থক ও সফল হয়ে উঠবে।

যশোদাকে পেয়ে বসল সঞ্চয়ের মোহে—প্রাণ গেলেও সে ঐ টাকা থেকে পাই পয়সাটি খরচ করবে না এই হ'ল তার পণ। গোপালের জন্যেই সে নায়েববাড়ীতে চাকরি নিয়েছিল।, কিন্তু গোপালের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে তার বর্ত্তমান সম্বন্ধে সে হয়ে উঠল উদাসীন। টাকা জমানোর বাতিক তার মাথায় এমনভাবে চেপে বসল যে প্রাণান্তেও সে তার মাইনের টাকা থেকে একটি পয়সা খরচ করত না—ফলে, আধপেটা খেয়েই গোপাল গোকুলে বাড়তে লাগল। এমনি করে লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষই যশোদার কাছে বড় হয়ে উঠল।

এমনি ভাবে কাটল কয়েক মাস। যশোদার হাতে জমল টাকা ত্রিশেক। এখন এই টাকাকে কি ভাবে বাড়ানো যায় সেই হ'ল তার বিষম চিন্তা। কেউ কেউ সুদে টাকা খাটানোর পরামর্শ দিলে—কিন্তু সে টাকা কবে পাওয়া যাবে

তার কোনো স্থিরতা নেই সুতরাং প্রস্তাবটা তরে মনঃপূত হ'ল না। সে শুধু ভাবতে লাগল, এমন কোন উপায় যদি থাকত যাতে রাতারাতি অঢেল টাকার মালিক হওয়া যায়।...

যশোদার একান্ত মনের প্রার্থনা ভগবান বোধ করি, শুনলেন। হঠাৎ কাছারীতে লটারীর টিকিট বিক্রীর হিড়িক পড়ে গেল। কাছারীর কয়েকজন ছোকরা ত্রিপুরা লটারীর টিকিট এনে ধনী গরীব সবাকারই কাছে বিক্রী করতে লাগল। যে যার সাধ্যমত টিকিট কিনতে লাগল।

যশোদা যখন শুনলে যে বরাতে থাকলে এই লটারীর দৌলতে সে লাখ টাকার পর্য্যন্ত মালিক হয়ে যেতে পারে তখন সেও টিকিট কিনলে—একখানা ছু'খানা নয় ছু'টাকা করে পনেরখানা ত্রিশ টাকার টিকিট। এই কয় মাস হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে যা সে জমিয়েছিল, তার বুকের পাঁজরের মত সেই ত্রিশটি টাকা খরচ করে সে কিনলে পনেরখানি ছোট ছোট ছাপানো কাগজের টুকরো। সেগুলো সে সেই বাঁশের খুঁটির মধ্যেই সযত্নে রেখে দিলে।

তারপর প্রতি রাত্রে নিজের নিভৃত কুটিরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে শুয়ে যশোদা লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে লাগল।

যাকে পায় তাকেই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লটারীর কথা জিজ্ঞাসা করে। লোকেরা তাকে নিয়ে একটু মজা করবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারে না, বানিয়ে বানিয়ে তারা লটারী সম্পর্কিত নানা কাহিনী বলতে সুরু করে। কোথায় কবে কোন্ পথের ভিখারী লটারীর টিকিট কিনে লক্ষপতি হয়েছিল মন্ত্রমুগ্ধের মত সে কাহিনী শুনতে শুনতে যশোদা একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তার ভাবান্তর দেখে গাঁয়ের লোকেরা তার নূতন নামকরণ করলে লটারী-বৈষ্ণবী।

লাখ টাকা হাতে পেলে যশোদা কি করবে তাই নিয়ে সে সময় সময় ভাবতে বসে। কিন্তু কি করবে সে সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা তার মনে দানা বেঁধে ওঠে না। খানিকক্ষণ চিন্তা করবার পর তার মনের মধ্যে সব যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। মহাসমুদ্রের সামনে বসে তার বিরাটত্বের কথা চিন্তা করে মানুষ যেমন ভাবনার অতলে তলিয়ে যায়, যশোদার মনের অবস্থাও অনেকটা তেমনিধারা।

এমনি করে কাটল তিনটি মাস। শেষে লটারীর ফল বেরুল, অধিকাংশেরই অদৃষ্টে অষ্টরম্ভা। ভাগ্যবান দু'এক জনের নামে টিকিট উঠল বটে, কিন্তু কারুর প্রাপ্তির অঙ্কই লাখ তো দূরের কথা, শতের কাছ ঘেঁষেও গেল না।

যশোদার ত্রিশটা টাকাই জলে গেল।

লটারীর ফল বেরিয়েছে শুনে যশোদা খুশী হয়ে উঠল, তার ধ্রুব বিশ্বাস টাকা তার নামে নিশ্চয়ই উঠেছে। হন্তদন্ত হয়ে সে যে ছোকরাটি তার কাছে টিকিট বিক্রী করেছিল তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল। সামনে তাকে পেয়েই জিজ্ঞাসা করলে—„আমার নামে কত টাকা উঠল ?" ছোকরাটি প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি, প্রশ্ন করলে, "কিসের টাকা বোষ্টমী ?" যশোদা এবার রীতিমত চটে গিয়ে বললে—"কিসের আবার! তোমার কাছ থেকেই তো টিকিট কিনলাম গো—সেই যে কি বলে লটরী না কি।" ছেলেটির নিকট এতক্ষণে ব্যাপারটা খোলসা হ'ল। যশোদার লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার কথা তার অজানা ছিল না, রঙ্গ দেখবার জন্যে সে বললে—"তোমার নামে লাখ টাকাই তো উঠেছে।" "লাখ টাকা!"- আনন্দে যশোদা আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠল। পুলকে সে যেন উপচে পড়েছে—নিজেকে আর যেন ধরে রাখতে পারছে না। খুশীভরা সুরে বললে—"তা টাকাটা কখন কোথায় পাবো বল না গো।" ছোকরাটি ভাবলে বোষ্টমীকে নিয়ে একটু মজা করা যাক্, বললে—"বল কি, টাকাটা এখনও তোমার হাতে আসে নি। সে তো অনেকক্ষণ হ'ল নায়েব বাবুকে দিয়ে এসেছি, তা তুমি পাওনি বুঝি।" শুনে যশোদা সেখানে আর মুহূর্ত্তকালও দাঁড়াল না, একছুটে চলে এল নায়েব-বাড়ীতে। হাঁপাতে হাঁপাতে নায়েব-মশায়ের সামনে হাজির হয়ে বললে— "আমার লাখ টাকা।" নায়েবমশাই তো হতভম্ব! ব্যাপারখানা কি ? যশোদার মাথাটা কি শেষ পর্য্যন্ত খারাপ হয়ে গেল নাকি! তিনি চুপ করে রইলেন, তাকে নীরব দেখে যশোদা আবার বললে—"সেই যে লটরীর টাকা গো—সতু বললে, আপনার কাছেই নাকি আমার টাকাটা পাঠিয়েছে। এখন টাকাগুলো আমায় দিয়ে দিন।" এবার আসল ব্যাপারটা কি তা বুঝতে নায়েবমশায়ের আর বাকী রইল না, সতুর দুষ্টামির কথা চিন্তা করে তিনি হঠাৎ উচ্চহাস্য করে উঠলেন। দেখে যশোদার মন সন্দেহে পূর্ণ হয়ে উঠল, এ বিষয়ে তার মনে লেশমাত্র সংশয় রইল না যে, নায়েব টাকাটা গাপ করবার মতলবে আছেন। সে মনিব-চাকরাণী সম্পর্ক ভুলে গিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠল—"হয়েছে আর দাঁত বের করে হাসতে হবে না, ভালোয় ভালোয় আমার টাকাগুলো দিয়ে দাও দেখি।" নায়েব দেখলেন আচ্ছা বিপদ! তিনি ধমকে তাকে বিদায় করলেন।

ক্ষুব্ধ মনে যশোদা নিজের বাড়ীর পানে রওনা হ'ল। মনে মনে সে নায়েবের মুণ্ডপাত করতে লাগল।

এখন কি করে টাকাটা পাওয়া যায় তাই হ'ল তার একমাত্র চিন্তা। নায়েবমশাই টাকাটা মেরে দিয়েছেন, একথা ভাবতে ভাবতে তার মাথা প্রায় বিকৃত হবার উপক্রম হ'ল। নায়েব-বাড়ীর চাকরি সে ছেড়ে দিলে, নাওয়া-খাওয়াও এক রকম বন্ধ হবার যোগাড়। যেদিন মন-মেজাজ ভাল থাকত সেদিন বালগোপালের ভোগ দিত—তারপর রান্না-বান্না করত। কিন্তু প্রায়ই তার উনুনে হাড়ি চড়ত না, পাথরের দেবতার অদৃষ্টে ভোগ জুটত না—আর একদিন যে সদ্যমাতৃহারা অনাথ শিশুটিকে পরম স্নেহে সে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিল তার সেই আদরের গোপালের অদৃষ্টে

জুটত চূড়ান্ত দুর্ভোগ—কুটিরের আঙিনায় পড়ে সে ক্ষুধার জ্বালায় ধুঁকত।

গোপাল যখন ক্ষুধার জ্বালায় আকুলভাবে কাঁদত তখন যশোদা তার দিকে কেমন যেন অসহায়ভাবে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। তারপর তাকে কোলে টেনে নিয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলত—"গোপাল বাপ আমার, কাঁদিসনে—আর ক'টা দিন। লটরীর টাকাটা হাতে এলেই আর আমাদের পায় কে? বড় হলে তোকে বিয়ে করাব, রাঙা বৌ ঘরে আসবে।" রাঙা বৌয়ের আশ্বাসে গোপালের ক্ষুধার যাতনা তিলমাত্র প্রশমিত হ'ত কিনা কে জানে।

দিনকতকের মধ্যে তার বয়স যেন দশ বৎসর বেড়ে গেল। শেষ পর্য্যন্ত তার মনে এ বিষয়ে আর লেশমাত্র সংশয় রইল না যে, তার পাওনা লাখ টাকা এ জীবনে তার হাতে আসবে না। তার স্বপ্ন তো সফল হ'লই না, বরং অসম্ভবের প্রত্যাশায় তার এত কষ্টে সঞ্চিত সবগুলো টাকা জলে গেল। একথা ভাবতে ভাবতে যশোদার মস্তিষ্কের স্নায়ু-কেন্দ্রের মধ্যে কি যেন একটা বিপর্য্যয় হয়ে গেল। ঠিক পাগল সে হ'ল না বটে, কিন্তু তার চেহারায় আচরণে উক্তিতে সরলধারণে স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের কোনো লক্ষণই রইল না। দিন-রাত সে শুধু হাতের আঙুলে গুণে কি হিসাব করে, আর মুখে বিড় বিড় করে আওড়ায়—"লাখ টাকা…এককুড়ি দশ টাকা আর এককুড়ি……"

এককুড়ি দশ টাকার অর্থাৎ ত্রিশ টাকার কত গুণ লাখ টাকা তাই ভাবতে ভাবতে বোধ করি সে দিশেহারা হয়ে যেত।

পাগল বাস্তবকে ভুলে যায়। সে বাস করে তার কল্পনার জগতে, কিন্তু কঠোর বাস্তব সত্য যশোদার মনে সদা জাগ্রত—তার বুকের রক্ত জল করা ত্রিশটি টাকা হারানোর দুঃখ তার জীবনের মর্ম্মমূলে বাসা বেঁধেছে, তার সমস্ত সত্তাকে বিষিয়ে তুলেছে।

মানুষের দুর্ভাগ্য নিয়ে কৌতুক করা মানুষের চিরন্তন প্রবৃত্তি—এতে মানুষ একটা উৎকট উল্লাস অনুভব করে। মহা-পুরুষদের কথা আলাদা। কিন্তু কারো সর্ব্বনাশ হয়েছে শুনলে সাধারণ মানুষের মনে প্রথম স্বতঃই যে অনুভূতি জাগে সে হচ্ছে পুলকানুভূতি। দুঃখবেদনার ভরা নিয়েই তাকে জীবন-নদীতে পাড়ি জমাতে হয়, তাই কারুর ভরাডুবি হতে দেখলেই সে মনে খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করে।

মালীপাড়ার বঙ্ক মালী একদিন হাটে যাচ্ছে, হঠাৎ যশোদা বোষ্টমী তার পথ আগলে জিজ্ঞাসা করলে সেই একই প্রশ্ন-লটারীর টাকাটা কি করে পাওয়া যায়। নায়েবকে যে যশোদা সন্দেহ করত সেটা লোকের মুখে মুখে সারা গ্রামে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। মজা করবার জন্তে বঙ্ক বললে—"তা যাও না গো, পেসিডেন্ বাবুর কাছে। তাঁর কাছে গিয়ে নালিশ কর, তখন দেখা যাবে নায়েবের কত মুরদ—টাকা না দিয়ে তিনি কি করে পার পান।"

যশোদা ভেবে দেখলে পরামর্শটা যুক্তিযুক্ত বটে। নায়েবের বিরুদ্ধে নালিশ করবার মতলবে সে সোজা গিয়ে হাজির হ'ল য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট সুরেশবাবুর কাছে।

নালিশ শুনে প্রেসিডেণ্ট একটুখানি মুচকি হাসলেন। বড় দুর্ভাবনায় পড়ে গেল যশোদা—তা'হলে টাকাটা ভাগাভাগির ব্যাপারে ইনিও আছেন নাকি! খানিক বাদে প্রেসিডেণ্ট বললেন—"তা বোষ্টমী, তুমি হলে সন্ন্যাসিনী, তোমার আবার টাকার দরকার কি? ধর না যে টাকাটা তোমার হাতছাড়াই হয়ে গেছে, তাতেই বা ক্ষতি কি?

আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। যশোদা গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে গর্জ্জে উঠল "কি বল্লে আমি সন্নিসী। আমি সন্নিসী হতে যাব কেন? আমার বাড়ী-ঘর নেই—আমার ছেলে নেই। গোপাল বড় হ'লে তাকে বিয়ে করিয়ে বৌ আনতে হবে না। সে কি চাট্টিখানি কথা। তাতে কত টাকার দরকার ভেবে দেখেছ? তুমি সন্নিসী হওনা গো—না কাঁড়ি কাড়ি টাকা জমিয়ে তোমরাই শুধু মজা লুটবে…আর…" যশোদা আর কিছু বলতে পারলে না, উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল।

হঠাৎ যেন প্রেসিডেণ্টের দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল—যশোদার অবচেতন মনের চেহারাটা যেন তিনি সুস্পষ্টরূপে দেখতে পেলেন, বুঝলেন কল্পনার স্বর্গলোক রচনা করে যশোদা তার বিড়ম্বিত রিক্ত জীবনের ব্যথাবেদনা ভুলবার জন্তে প্রাণপণ প্রয়াস পাচ্ছে। তিনি ভেবে দেখলেন, যশোদার এ স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে তাকে আশাহত করে লাভ নেই। বরং এমন কথা তাকে বলে দেওয়া যাক্ যাতে টাকাটা এক সময় তার হাতে আসবে এই আশা নিয়েই সে দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিতে পারে। খানিক বাদে খুব দরদ ভরা সুরে তিনি বললেন—"বোষ্টমী, তোমাকে ওরা ভুল খবর দিয়েছে। টাকা তুমি পেয়েছ বটে, কাগজে তোমার নামও বেরিয়েছে আমি নিজে দেখেছি, কিন্তু টাকাটা এখনো আসে নি। তা আসবে পোষ্ট আপিসে তোমার নামে। তোমাকে ওরা ভুল বুঝিয়েছে। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে তো টাকা দেবে না।"

শুনে যশোদার মনের ওপর থেকে একটা দুর্ভাবনার বোঝা যেন নেমে গেল। এক মুহূর্ত্তেই সে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠল। শ্রাবণের আকাশ থেকে বহু দিনের পুঞ্জীকৃত মেঘভার কেটে গিয়ে হঠাৎ একদিন যেমন সারাটা আকাশ উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে ঝলমল করতে থাকে তেমনি প্রসন্ন হাস্যে যশোদার সারা মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

এর পর থেকে যশোদার কাজ হ'ল রোজই একবার বিকালের দিকে পোস্ট আপিসে হাজিরা দেওয়া। গ্রাম-প্রান্তে

বাঁশঝাড়ের তলায় ছায়ানিভৃত পোস্ট আপিসটিতে রোজই বৈকালিক আড্ডা জমে, এক একজন করে গ্রামের লোকেরা সেখানে এসে জড়ো হয়—গল্প-গুজবে সেই নিরালা জায়গাটি মুখরিত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে পিয়ন আসে ডাক ঘাড়ে করে। চিঠি মনি অর্ডার ইত্যাদি লোকেরা পোস্ট আপিস থেকেই নিয়ে যায়।

প্রতিদিন বিকালের পড়ন্ত রোদে বাঁশগাছের মগ-ডালের মসৃণ-চিক্কণ পাতাগুলো যখন সবুজে সোনায় মেশানো ঝালরের মত ঝলমল করতে থাকে তখন নিয়মিত ভাবে পোস্ট আপিসে এসে হাজির হয় যশোদা। যতক্ষণ চিঠি মনি অর্ডার ইত্যাদি বিলি হয় ততক্ষণ সে ডাকের টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে—চোখে তার একাগ্র প্রলুব্ধ দৃষ্টি। যখন এক এক জন মনিঅর্ডারের টাকা নেয় তখন তার কোটরগত চোখ দুটো শ্বাপদের মতো জলে ওঠে, সে ভাবে এবার তার পালা—লাখ টাকা হাতের মুঠোর মধ্যে এল বলে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যখন চিঠি মনি অর্ডার ইত্যাদি বিলি শেষ হয়ে যায়—সুরু হয় ডাকঘর বন্ধ করবার তোড়-জোড় তখন তার চোখের সে অস্বাভাবিক দীপ্তি নিবে যায়। তার মুখে ঘনিয়ে আসে হতাশার কালো ছায়া।

রোজই সে নিরাশ হয়, কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দেয় না। নিত্যনিয়মিত সময়ে ডাকঘরে এসে হাজিরা দেওয়া তার চাই-ই।...

* * *

সন্ধ্যার ছায়া ডাকঘর সংলগ্ন বাঁশ-বনে ঘনিয়ে এসেছে। সবেমাত্র পোষ্ট আপিস বন্ধ হ'ল। সবাই যে যার ঘরে ফিরে গেছে। যশোদা তখনো ঠায় বসে আছে পোস্ট আপিসের বারান্দায় পৈঠার উপর। খানিক বাদে সে উঠে দাঁড়াল, তার পর ছায়ান্ধকার বাঁশবনের ভেতর খানিকক্ষণ অকারণে ঘুরে বেড়াল—শেষে মাথলার খালের পাড়ের সুঁড়ি পথ ধরে রওনা হ'ল বরাবর মেঘনা নদীর পানে।

সারারাত হয় তো সে লক্ষ্যহীন ভাবে মেঘনার তীরে বিচরণ করেই কাটিয়ে দেবে। অসম্ভব অবাস্তবের আশা তার দিনের শান্তি, রাতের ঘুম সব কিছুই হরণ করে নিয়েছে।

ঊর্মিমুখর মেঘনার কূলে বসে সারারাত সে হয় তো স্বপ্ন দেখবে—লাখ টাকার স্বপ্ন—টাকাগুলো তার হাতে এসে পড়ল। আর তার অভাব নেই। দেখতে দেখতে গোপাল বড় হয়ে উঠল—ঘরে এল রাঙা বৌ। ধনজনপরিপূর্ণ শান্তিভরা একটি পরিবার—আর যশোদার সেই পরিবারে একচ্ছত্র আধিপত্য।

যশোদার রাতের পর রাত হয় তো এমনি করে স্বপ্ন দেখেই কাটবে, কিন্তু তার কুটিরে ব্যাধিক্লিষ্ট কঙ্কালসার যে শিশুটি ক্ষুধায় ভয়ে মৃতপ্রায় হয়ে বাল গোপালের মূর্ত্তির পাশে পড়ে ধুঁকছে, যাকে কেন্দ্র করে যশোদার এই স্বপ্নসৌধ রচনা—তার এ রাত হয় তো কাটবে না। চারদিকে মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতা, বনের ভেতর থেকে ভেসে আসছে একটা পেঁচকের কর্কশ কণ্ঠের ভীতিজাগানো চীৎকার। ঘরের ভেতর মিট মিট করে জ্বলছে একটি মাটির প্রদীপ। সেই ক্ষীণ আলো চারদিকের নিরানন্দ পরিবেশকে যেন শতগুণে ভয়াবহ করে তুলেছে। গোপাল অতি কষ্টে ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে গেল বাল-গোপালের মূর্ত্তির সামনে। একটা পাথরের বাটিতে খানিকটা চালকলা মাখানো শুকনো দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ—যাকে প্রসাদ বললে প্রসাদ কথাটার অপমান করা হয়। তাতে পোকা কিলবিল করছে।

কবে যে যশোদা বালগোপালকে এই ভোগ দিয়েছিল তা গবেষণার বিষয়।...

ঘরে এক কণাও খাদ্যদ্রব্য নেই।

চার দিনের অভুক্ত গোপাল সেই মহাপ্রসাদই গোগ্রাসে গিলতে লাগল।

যবনিকা

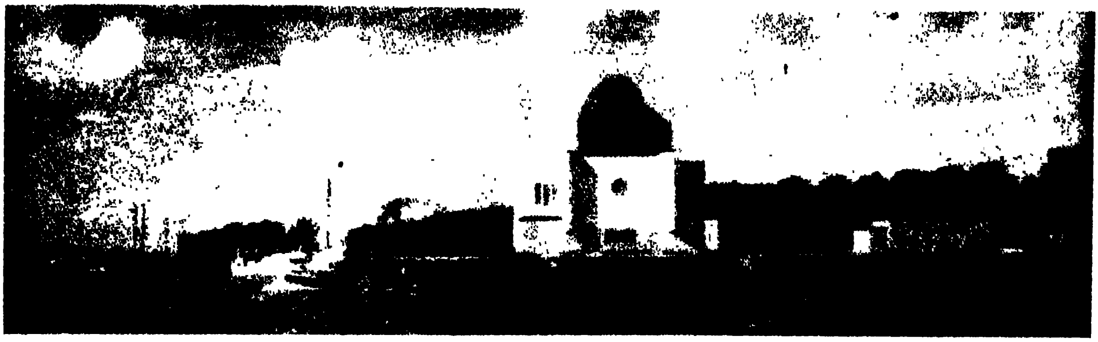
শ্রীমণীন্দ্র গুপ্ত

ধূ ধূ করা পথে রৌদ্র যখন ঝরে পড়ে
লক্ষ হয়ে নীল পৃথিবীটা ছোট ঘরে ;
ভারি ভালো লাগে ভাবতে তখন মনে মনে
তোমার যে কথা ফুল হয়ে দোলে মন-বনে।

কখনো প্রভাত চায় না তোমায় ভালোবাসি,
বিরাট আকাশে ভাসেনাকো তাই রাঙা হাসি ;
অথচ জ্যোছ্‌না জীবনে আসে না একবারো
তাইতো আমার সন্ধ্যা স্বপন-ঘুমে গাঢ়।

এদিকে তোমার মুকুলিত দেখি মঞ্জরী,
একটি কুসুম স্থির হয়ে চায় শর্ব্বরী ;
অদনে ছায়া, কাজল ছড়ানো নীল চোখে,
ছোট্ট কুটির তবু ভরা যেন মায়ালোকে।

অথচ আমার পৃথিবী কেন যে শেষ হোলো,
মালতী লতায় ফুল ঝরে গেল ছলছলো ;
তুমি ছায়া হ'লে প্রদীপে ছড়ালে বিভীষিকা,
পায়ে পায়ে তাই এঁকে দিয়ে গেলে যবনিকা।



রটারডামের নিকটবর্ত্তী মাস নদীর নীচেকার সুড়ঙ্গের একটি আলোবাতাসযুক্ত গৃহ

ইউরোপের নিম্নভূমি—বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ড

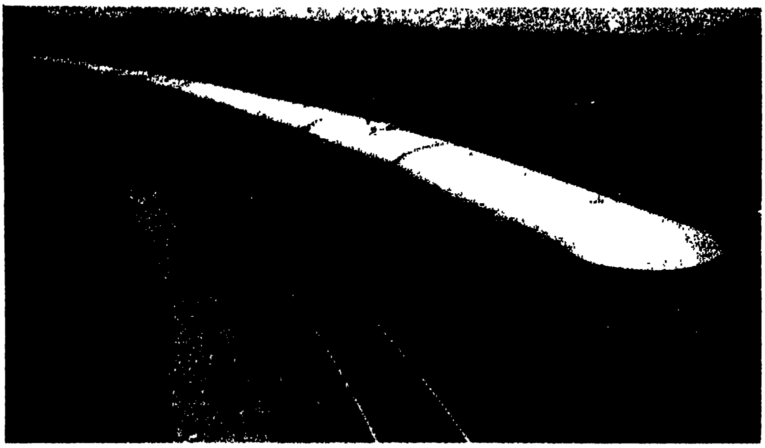
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

ইংরেজী 'নেদারল্যাণ্ডস' মানে নিম্নভূমি বা নিম্নপ্রদেশ। 'নেদারল্যাণ্ডস' বলিতে পূর্ব্বে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম ও ইদানীং রাজনৈতিক কারণে মাত্র হল্যাণ্ডকে বুঝায়। কিন্তু এই উভয় অঞ্চলকে নৈসর্গিক অবস্থার দরুন ঐ নাম দেওয়া হইয়াছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থল নিম্নে, এইজন্যই ইহার ঐ নাম। এই দুইটি দেশ সমুদ্রতীরে অবস্থিত হইয়াও কেন জলে প্লাবিত হয় না, বা ডুবিয়া যায় না? ইহার কারণ সমুদ্রতীর ধরিয়া উঁচু বাঁধ নির্ম্মিত রহিয়াছে। বাঁধের কোন অংশ ভাঙিয়া গেলে যে উহা জলে প্লাবিত বা নিমগ্ন হইয়া যাইতে পারে তাহা সদ্যগত মহাসমরকালেই বুঝা গিয়াছে। জার্ম্মান নাৎসীগণ যুদ্ধের মধ্যে বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া হল্যাণ্ডের বহু অঞ্চল জলে একেবারে ভাসাইয়া দেয় এবং সেখানকার জীবজন্তু, কৃষিক্ষেত্র সমস্তই বিনষ্ট করিয়া ফেলে। গত মহাসমরে বেলজিয়ম হল্যাণ্ড উভয় দেশেরই বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। তাহাদের এই ক্ষতির তুলনাই হয় না। তবে যুদ্ধ থামিবার তিন বৎসরের মধ্যেই দুইটি দেশ পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠন কার্য্যে আশ্চর্য্য-রকম অগ্রসর হইয়াছে। বিধ্বস্ত নগরী পুনর্গঠন, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ী পুনর্নির্ম্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, খাদ্যসমস্যার সমাধান প্রভৃতি কার্য্যে দুইটি দেশই যেরূপ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে তাহা শুনিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। অথচ দুইটিই ইউরোপের অতি ক্ষুদ্র রাজ্য, প্রত্যেকটিরই জনসংখ্যা এক কোটিও হইবে না। আয়তনেও আমাদের এখানকার দুই তিনটি জেলার সমান। এক জন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে উভয় দেশের বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিব। প্রথমেই হল্যাণ্ডের কথা বলি।

হল্যাণ্ড

নাৎসীদের উপদ্রবের বিষয় একটু আগেই উল্লেখ করিয়াছি। সমুদ্রের বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া উহারা হল্যাণ্ডের অধিবাসীদের যে ভীষণ ক্ষতি করিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু জার্ম্মানীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবার অল্প সময়ের মধ্যেই তাহারা এই ক্ষতি অনেকটা পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়, পূর্ব্বেকার যান-বাহন ব্যবস্থা একেবারে বাতিল করিয়া দিয়া আধুনিকতম বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণপূর্ব্বক নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে ও হইতেছে। হল্যাণ্ডের রেল লাইনের দুই-তৃতীয়াংশ নাৎসীরা যুদ্ধের মধ্যেই তুলিয়া লইয়া যায়। এখন রেল লাইনও পুনঃ-স্থাপিত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া বৈদ্যুতিক রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৩ সন নাগাদ হল্যাণ্ডের সর্ব্বত্রই বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীর প্রচলনের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে বলিয়া সরকার আশ্বাস দিয়াছেন। হল্যাণ্ডের মোয়ারডিক সেতু ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। নাৎসীরা ইহারও কতকটা ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। সেতুটির ভগ্ন অংশ ইদানীং সম্পূর্ণ মেরামত হইয়া গিয়াছে।

হল্যাণ্ডের নগরী-পুনর্গঠন কার্য্যও একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হইতেছে। 'দি হেগ' নগরী বিখ্যাত স্থপতি উইলিয়ম মেরিনাস ডাডকের নির্দ্দেশে পুনর্নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণে পুরাতন রীতি-পদ্ধতি আর পছন্দ করে না, তাহারা নূতনেরই পক্ষপাতী। হেগ নগরী একটি নূতন ধরণের শহর হইবে, না গতানুগতিক পুরাতন প্রথানুযায়ী ইহাকে গড়া হইবে এ বিষয় লইয়া সেখানে জোর তর্ক চলে। ডাডক বলেন, মানুষের কর্ম্ম ও বাসোপযোগী করিতে পারিলেই নূতন নগরী নির্ম্মাণের সার্থকতা। দেশের সংস্কৃতি ও সরকারী কর্ম্ম-কেন্দ্র হইবে এই নূতন শহর। শহরের কেন্দ্রস্থলে থাকিবে একটি প্রকাণ্ড পার্ক, প্রতিটি অঞ্চলেও এক একটি ছোট পার্ক



হল্যাণ্ডে বৈদ্যুতিকশক্তি চালিত আধুনিক ট্রেন

থাকিবে। স্থপতি ডাডক পুরাতন রীতির মধ্যে যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তিতে শহর গড়িতে লাগিয়া গিয়াছেন।

নাৎসী আক্রমণ হইতে আমষ্টার্ডাম আকস্মিকভাবে রক্ষা পায়। এ শহরটি হইল "Venice of the North" অর্থাৎ উত্তরের ভেনিস। এই নগরীর মধ্যে বহু খাল, প্রত্যেকটি খালের দুই তীরে তরুবীথি। গৃহাদি প্রাচীন শিল্পের নিদর্শনস্বরূপ এখনও এখানে বিদ্যমান। সাধারণগম্য পার্ক বা উদ্যানও বিস্তর। উদ্যানে উদ্যানে ফুলের ফেরিওয়ালার প্রাচুর্য্য অধিবাসীদের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার দ্যোতক। এখানকার রিজ্‌ক মিউজিয়ম বা যাদুঘরটি হল্যাণ্ডের খ্যাতনামা শিল্পীদের চিত্রে সমৃদ্ধ। নাৎসীদের আমলে এই সকল শিল্পীর চিত্রভাণ্ডার বিস্তর বিনষ্ট হইয়াছে, আবার বহু চিত্র দেশান্তরিত হইয়া তবে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। রেমব্রাঁ, ফ্রান্স-হল্‌স, মেইজ, জিন-ষ্টীন প্রভৃতি প্রখ্যাত শিল্পীদের কত চিত্র যে নষ্ট হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ভ্যান গগের বহু ভাল ভাল ছবি কোপেন-হেগেনে চলিয়া গিয়াছে। ব্রাসেল্‌স এবং প্যারিসেও কিছু কিছু গিয়াছে। বিদেশে মৃত শিল্পীই পার্লামেণ্টের সদস্য, বণিক প্রভৃতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর রাজদূত বা দেশ-প্রতিনিধি।

প্রাচীন হল্যাণ্ডের অস্তিত্ব যা কিছু আমষ্টার্ডামেই অনুভূত হয়। কিন্তু রটার্ডাম সম্বন্ধে তাহা আদৌ প্রযোজ্য নয়। এই বন্দরটির ডকে আগে কিছু কম করিয়াও প্রতি মাসে অন্ততঃ হাজারখানা জাহাজ নঙ্গর করিত। নাৎসী আক্রমণে, বিশেষতঃ ১৯৪০ সনের ভীষণ বোমাবর্ষণের ফলে এই ডকটি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়। রটার্ডাম বন্দরটি পুনর্গঠনের জন্য বর্ত্তমানে সেখানে অতি দ্রুত কাজ হইতেছে। কিন্তু এখনও পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে বেশ সময় লাগিবে। প্রত্যহ সকালে বিকালে মোটর বাসে করিয়া লোকে রটার্ডামের পুনর্গঠন কার্য্য দেখিতে যায়। প্রথম বার দেখিবার কয়েক দিন অন্তর আর এক বার সেখানে গেলে বুঝা যাইবে পুনর্গঠন কার্য্য কত দ্রুত অগ্রসর হই-তেছে। যেখানে কয়েক দিন পূর্ব্বেও কোন ঘর-বাড়ী দেখা যায় নাই, দ্বিতীয় বারে গিয়া সেখানে নূতন নূতন বড় বড় বাড়ী দৃষ্টিগোচর হইবে নিশ্চয়।

রটার্ডামের ইঞ্জিনীয়ার হইলেন ভ্যান ট্রা। রট নদীর উপর এই বন্দরটি অবস্থিত। ইহাকে সম্পূর্ণ আধুনিক বন্দর ও শিল্পনগরীর মত করিয়া গঠন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। শহরের একাংশে উন্মুক্ত অঞ্চলে শিল্পকারখানাগুলি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাতে শ্রমিকগণের স্বাস্থ্য অটুট থাকিবে। তাহাদের নিমিত্ত অন্য নানা রকম সুখ-সুবিধারও ব্যবস্থা করা যাইবে। জাহাজগুলি নগরীর মধ্যে রেল-ষ্টেশন এবং ব্যবসায়-কেন্দ্রের নিকট যাহাতে পৌঁছিতে পারে এইজন্য সমুদ্র হইতে শহরের মধ্য দিকে কিয়দংশ গভীরভাবে কাটিবারও ব্যবস্থা করা হইতেছে। ব্যবসায়-কেন্দ্রে লোকের বাসগৃহ খুব কমই থাকিবে। লোকের বাসভবন, বাগান, বিদ্যালয় দূরে দূরে যথাযোগ্য স্থানেই করার ব্যবস্থা হইতেছে।

হল্যাণ্ডে যে পুনর্গঠন কার্য্য এত দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিয়াছে তাহার একটি প্রধান কারণ লোকজনের আর্থিক সুখ-সুবিধার দিকে সরকার পক্ষ হইতে প্রথম দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখা। শ্রমিক সঙ্ঘগুলি খাদ্যশস্য, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য এবং শ্রমিকদের বেতনের হার উভয়ই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের সম্মতি দেওয়াতে ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। কারণ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে যে, এরূপ ব্যবস্থা করা না হইলে দুঃস্থদের অভাব কোন মতেই মিটিতে পারে না। শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন ও রপ্তানি, নগর ও রাস্তাঘাট পুনর্নির্ম্মাণ এবং আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি একটি চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনানুযায়ী নিয়ম-শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করা হইতেছে।

বড়ই সুখের বিষয়, হল্যাণ্ডে চোরাকারবারের মাথ তুলিবার আর সাধ্য নাই। আমাদের- ভারতবাসীদের পক্ষেও ইহা অনেকটা আশার কথা বটে। কারণ হয়ত এক দিন হল্যাণ্ডে যাহা হইয়াছে এখানেও উপযুক্ত পন্থা অবলম্বিত হইলে তাহা সম্ভব হইবে। এখনও হয়ত হল্যাণ্ডে কাপড়চোপড়, রেডিও-যন্ত্র, সিগারেট প্রভৃতিতে কতকটা চোরাকারবার চলি-তেছে, কিন্তু তাহা একেবারেই নগণ্য। দুইটি উপায়ে হল্যাণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষ চোরাকারবারের পথ বন্ধ করিয়াছেন---প্রথমতঃ,

কম দামে প্রচুর খাদ্যদ্রব্যের আমদানী এবং দ্বিতীয়তঃ চোরা-বাজারের চড়া দামের ভিত্তিতে বেতনের হার বাড়াইয়া লইতে অস্বীকৃতি। প্রথমটি কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে এই রূপে,—অত্যাবশ্যক খাদ্যদ্রব্যের জন্য লোকেদের রেশন-কূপন শুধু দেওয়া হয় না, কম-আয়ী প্রত্যেক পরিবারের ক্রয়শক্তির সাক্ষ্যস্বরূপ ক্রেডিট কূপনও প্রদত্ত হইয়া থাকে।



হল্যাণ্ডের রেলপথে যুদ্ধের সময় আংশিকভাবে ভগ্ন আগেকার আমলের একটি রেলগাড়ি

প্রচুর খাদ্যশস্য রপ্তানী করিয়াও হল্যাণ্ডে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য মজুত রহিয়াছে। এখানকার হোটেল রেস্তরাঁতেও আহারাদির জন্য ন্যায্য দামই লওয়া হয়। খাদ্যদ্রব্যের সুবিধা হেতু বিদেশ হইতে বিস্তর লোক হল্যাণ্ড ভ্রমণে যায়। এবারে লাখখানেক মার্কিনীও হয়ত সেখানে গিয়া ভিড় জমাইবে।

বেলজিয়ম

হল্যাণ্ডের প্রতিবেশী হইল বেলজিয়ম। এই দুইটি ক্ষুদ্র রাজ্য ১৮১৫ হইতে ১৮৩০ সন পর্য্যন্ত এক রাজারই অধীন ছিল। শেষোক্ত বৎসরে বেলজিয়ানরা বিদ্রোহী হয় এবং হল্যাণ্ড হইতে আলাদা হইয়া স্বতন্ত্র রাজ্য ও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। তদবধি স্বতন্ত্র পথে চলিলেও একটি বিষয়ে উভয়েরই মিল রহিয়াছে, তাহা হইল আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক উহাদের নিরপেক্ষতা (neutrality) নীতি স্বীকৃতি। প্রথম মহাসমরে জার্ম্মানী এই নীতি অস্বীকার করিয়া বেলজিয়ম আক্রমণ ও অধিকার করে। দ্বিতীয় মহাসমরে জার্ম্মানী ঐ একই অপরাধে অপরাধী হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বেলজিয়মে বসিয়া ব্রিটিশ সেনা জার্ম্মানীর সঙ্গে যখন আর কিছুতেই পারিয়া উঠিল না তখন তাহারা কিরূপে এখানকার সেতু ভাঙিয়া, রাস্তা কাটিয়া, সমুদ্রের বাঁধ ভাঙিয়া দিয়া বেলজিয়মকে জলে প্লাবিত করিয়া দেয় এবং ডানকার্ক হইতে সগর্ব্বে পলায়ন করে সে কথা এখনও আমাদের মনে আছে। বেলজিয়মও হল্যাণ্ডের মত নিম্নভূমি বলিয়া তখন জলে প্লাবিত করা সম্ভব হইয়াছিল।

নাৎসী জার্ম্মানীর পরাজয়ের পর বেলজিয়মও পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে এবং বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহের পুনর্গঠনে কর্ত্তৃপক্ষ সম্যক অবহিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পথ হল্যাণ্ডে অবলম্বিত পন্থা অপেক্ষা অনেকটা স্বতন্ত্র। চোরা-কারবার দমনেও বেলজিয়ম ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। বেলজিয়মে বিদেশী মূলধন রহিয়াছে প্রচুর। তাহার নিজস্ব মূলধনই একুশ শত কোটি স্বর্ণ-ফ্রাঁ। মার্কিনী সেনাদল যখন বেলজিয়মে অবস্থিতি করিতেছিল সেই সময়ে বিশেষ করিয়া ঐ দেশে খরচ করিবার জন্য প্রত্যেক সৈন্যকে "সেনা ডলার" দেওয়া হইত। নাৎসীরা বেলজিয়মে দ্রুত রণসম্ভার প্রস্তুত করার জন্য যে সব কাঁচামাল ও রসদপত্র আমদানী করিয়াছিল তাহারা চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলে ঐ সকল বেলজিয়ানদের অধিকারে আসে। তখন তাহারা চড়া দামে যুক্তরাষ্ট্র বাহিনীর নিকট ঐসব বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ লাভ করে। ইহা ছাড়া আফ্রিকায় বেলজিয়ান কঙ্গোও বেলজিয়মের একটা মস্ত বড় সম্পদ। এখানে তামা ও রবার এবং ইউরেনিয়াম ধাতু প্রচুর আছে। ইউরেনিয়াম ধাতু এখানে যে পরিমাণে আছে এমনটি আর কোথাও নাই। এই সকল কারণে অর্থের প্রাচুর্য্য হেতু কারখানায় নূতন করিয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই বেলজিয়ম বিদেশ হইতে দ্রব্যাদি আমদানী করিতে সক্ষম হয়।

অর্থের প্রাচুর্য্য হেতু বেলজিয়ম সরকারের কর্ম্মপদ্ধতিও অনেকটা স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। চোরাকারবারের বিরুদ্ধে অবলম্বিত পদ্ধতির কথাই এখানে ধরা যাক। স্বাধীনতা পুনর্লাভের অব্যবহিত পরেই ব্যাঙ্কে টাকা আবদ্ধ করিয়া রাখার ব্যবস্থা হয়। দৈনন্দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামান্য টাকাই তাহারা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিতে পারিত। দেনা-পাওনা শুধু কাগজে-কলমে এক ব্যাঙ্ক হইতে আর এক ব্যাঙ্কের মারফত চুকাইয়া দেওয়া যাইত। ইতিমধ্যে বাজারে মাল ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বাহির হইতে বেশী পরিমাণ কাপড়-চোপড় এবং অন্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্রও আমদানী করা হইল। ইহার ফলে লোকের ক্রয়শক্তির অনুপাতে অতিরিক্ত মাল পাওয়া যাইতে

লাগিল। রেশন-মূল্য স্থির রাখা ত হইলই না, বরং ফ্রান্সের মত মধ্যে মধ্যে কমাইয়া দেওয়াই হইতেছে।

লোকের ক্রয়শক্তি হ্রাস এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত মালের আমদানী এই দুই কারণে চোরাবাজারের জিনিষের মূল্য ক্রমশঃ কমিতে কমিতে এখন প্রায় ইহার উচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কিন্তু বিদেশ হইতে এতাদৃশ অতিরিক্ত মাল আমদানীতে বেলজিয়মে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে ভাটা পড়িয়াছে, লোকের ক্রয়-শক্তিও ক্রমে কমিয়া যাইতেছে। অধুনা ব্রাসেলসের বিপণি-সমূহে নয়ন-মনোহারী মালের অভাব নাই, কিন্তু কিনিবে কে? লোকের হাতে যে খরচ করিবার মত পর্য্যাপ্ত টাকা নাই। বেলজিয়ানরা বিজয় লাভের পুলকে তখন আমেরিকা হইতে বিস্তর জিনিষ ক্রয় করে। আজ কোন আমেরিকান বেলজিয়মে তাঁহার স্বদেশজাত দ্রব্য কম দামেই কিনিতে পারিবে।

লারোচ বেলজিয়মের একটি ছোট শহর, ছোট হইলেও বহু বিদেশী এখানে যুদ্ধের আগে আগমন করিত এবং এখান-কার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিত। আমেরিকান পর্য্যটকের নিকট এই শহরটি বড়ই প্রিয় ছিল। আজ কিন্তু ইহার রূপ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। জার্ম্মান নাৎসীরা বেলজিয়ম অধিকার করিয়া এই ছোট শহরটিতে একটি ঘাঁটি করে। এই ঘাঁটিটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই স্থানটি শত্রুহস্ত হইতে অধিকার করা মিত্রশক্তির পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে, এ কারণ মার্কিণ বাহিনী এখানে উপর্য্যুপরি বোমাবর্ষণ করিতে বাধ্য হয়। আজ নাৎসীদের নামগন্ধও নাই, বেলজিয়মও তাহার স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছে, কিন্তু লারোচ শহরটির পূর্ব্বসৌন্দর্য্য একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে।

এই লারোচ নগরীকে কেন্দ্র করিয়াই বেলজিয়মের মুক্তি-ফৌজ গড়িয়া উঠে। গির্জ্জার রোমান কাথলিক পুরোহিত, হোটেলের মালিক ও অন্যান্য উদ্যোগীদের লইয়া এই বাহিনী গঠিত হয়। নাৎসী-গুপ্তচরের চক্ষে ধুলি দিয়া আর কত কাল স্বদেশে বিচরণ করা যায়? তাই তাহারা একে একে লারোচ ছাড়িয়া গিয়া ফ্রান্সে আশ্রয় লয়। এখানে থাকাও নিরাপদ ছিল না। কেননা এ দেশটিও তখন নাৎসী তাঁবেদার। তথাপি এখানে বসিয়াই স্বদেশ উদ্ধারের আয়োজন করিতে লারোচের রোমান কাথলিক গির্জ্জার পুরোহিত রত ছিলেন। এই পুরোহিতটি এখন জনবিরল লারোচে বসিয়া লোকহিতে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন এবং প্রত্যাবৃত্ত নরনারীর বাসস্থান ও খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করিতে তৎপর রহিয়াছেন। লারোচের এই কাথলিক গির্জ্জাটি নাৎসী বোমায় বিধ্বস্ত হয় নাই।

শত্রু দ্বারা বেলজিয়মের যেমন অশেষ ক্ষতি হইয়াছে, এক লারোচ হইতেই দেখা যায় মিত্রবাহিনীর পুনরধিকার কার্য্যেও তাহার কম ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই। বেলজিয়মের বহু নরনারী-শিশু, ঘরবাড়ী, হাসপাতাল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মিত্র-শক্তির বোমায়ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ এ কথা নিতান্তই অবান্তর। এহেন স্বার্থত্যাগের ফলে বিশ্ববাসীর সঙ্গে বেলজিয়মের যে যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে তাহা অবিচ্ছেদ্য। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম নূতন জগৎ সৃষ্টিতে নিজ নিজ ভাবে সচেষ্ট রহিয়াছে। ইহার মধ্যে চোরাকারবার উচ্ছেদে তাহাদের কৃতিত্ব আমাদের রাষ্ট্র-পরিচালকদের বিশেষ অবধানের বিষয়।

বাণিজ্য-বায়ু

John Masefield-এর Trade Winds কবিতার তর্জমা

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

বন্দরে আর দ্বীপে-দ্বীপে, স্পেনীয় সাগর পারে
ভেসে ভেসে ওঠে সাদা বাড়ীগুলি—কমলা-লেবুর বন,
বাণিজ্য-বায়ু সেথায় এখন তুলিছে গুঞ্জরণ।

স্পেনীয় সুরা যে লাল হ'ল হোথা, ডালিমের রঙে রাঙা;
নেশায় বিভোল নর্ত্তকীকুল, মোন্‌ভা দেহ ও মন;
ছলনা-কলায় অনুরাগে হ'ল কত কি যে গড়া-ভাঙা;
বাণিজ্য-বায়ু সেথায় এখন তুলিছে গুঞ্জরণ।

রাত্রে যেথানে জোনাকীরা জ্বলে, আকাশে হলুদে চাঁদ,
ভৌতিক যতো দেবদারু গাছ ঘুমায় দুঃশাসন;
বাণিজ্য-বায়ু সেথায় এখন তুলিছে গুঞ্জরণ।

দূরাতীতের পটভূমিকায় বাংলা-কাব্যের সূচনা ও প্রগতির আভাস

শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত

আমাদের পরম গৌরবের সামগ্রী এবং প্রিয় কাব্য-সাহিত্য কোন এক মুহূর্তে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয় নি অথবা প্রথম প্রকাশেই পূর্ণতারূপ গ্রহণ করে নি। অণু-পরমাণু পরিমাণ সঞ্চয় ক্রমান্বয়ে পুঞ্জীভূত হয়ে যেমন প্রবালদ্বীপ বিশাল বারিধির অঙ্কে আকৃতি ও আয়তন লাভ করে তেমনিভাবে পুষ্টি ও স্ফূর্তি হয়েছে বাংলা কাব্যের—বিস্মৃতপ্রায় অতীতে কত কবির রচনা, কত কথকের ছড়া ও বাণীবিন্যাস, কত গায়কের, বাউল চারণের গান তার মধ্যে ঢেলে দিয়েছে তাদের অন্তরের আবেগ, প্রাণের নিভৃতপুরের মধুর ও স্নিগ্ধকর মূর্চ্ছনাটি, তাদের নিরহঙ্কার সহজ সাধনার ফল। এই অসংখ্য কবির অগণিত কাব্যের জটিলতা অতিক্রম করে প্রাচীনের কাব্য-প্রাণ কি অপরূপ উল্লাসে আপনার অস্তিত্ব-ভঙ্গিটি সমস্ত রেখায় টেনে নিয়ে এল পরিচিত কালের কল্লোলিত মহাসমুদ্রের মধ্যে, তার ইতিহাস বিচিত্র। এই ভারতবর্ষে, কত বিবিধ মানবের সম্মেলন ঘটেছে এই পুণ্যতীর্থে—বৈদেশিক আর স্বাদেশিকে, পরিচিত আর অপরিচিতে, প্রবীণ আর নবীনে ("শক হুণ-দল পাঠান মোগল এক দেহে হ'ল লীন"); কত বিচিত্র ভাবধারা বাহির হতে এসে আপনাদের মিশিয়ে দিয়েছে ভারতীয় ভাবধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে; কত বিভিন্ন ভাষার নিবিড় সান্নিধ্য এবং সংমিশ্রণ ঘটেছে এখানে—পারস্পরিক ব্যবহারিক আদান-প্রদানে তাদের কোনটির উত্তরকালে ঘটেছে সমৃদ্ধি, কোনটির হয়ত হয়েছে বিপুল পরিবর্ত্তন, আবার কোনটি হয়ত ঘটনার রূঢ় নিষ্পেষণে হারিয়ে বসেছে প্রাণশক্তি। পালি, প্রাকৃত, চর্য্যা-চর্য্য, অপভ্রংশের ভাষা আজ জাতির প্রগতিশীল চিন্তাশক্তি থেকে বিযুক্ত হয়ে অতীতের সামগ্রী রূপে স্মৃতির কক্ষে গিয়ে স্থান লাভ করেছে। অপর পক্ষে প্রদীপ্ত সংস্কৃতের স্নেহরসপুষ্ট বাংলার প্লাবনীধারা আজ বঙ্গসীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে এবং বহির্ভারতে পৌঁছে দিয়ে চলেছে তার অন্তর্নিহিত রসের, অমৃতত্বের বাণী। এই রসের উৎস অনুসন্ধান করতে হলে অবশ্যই প্রান্তবর্ত্তী হলেই চলবে না, তার অন্তঃপুরে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত কক্ষের ভিতর উপস্থিত হওয়া চাই। কি কারণে তার উল্লেখ করছি। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখি ভারতবর্ষের বিপুল-বিস্তৃত স্থলভূমি, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তের সুদূর ব্যবধান, এক সীমান্তে ব্যবহৃত লিপিপদ্ধতির সঙ্গে আর এক প্রান্তের লিপির বৈসাদৃশ্য, তার উপর একের পর এক বহিঃশক্তির উপর্য্যুপরি আধিপত্য, চিরকাল এক ধর্ম্মদীক্ষায় অনুগত থাকার পরিবর্তে কত বিভিন্ন ধর্ম্মের আবির্ভাব, প্রতিষ্ঠা ও বিলয় এখানে; কাল যেন এখানে থেমে থেমে চলেছে, খণ্ডিত গতিতে, ক্ষতি টেনে টেনে। এই ভাবে ভারতবর্ষের শতধাবিদীর্ণ ইতিহাস কল্পনা করলে, তাকে সংকীর্ণ স্থান এবং কালের মধ্যে নিবদ্ধ করে দেখলে, বাংলা কাব্যের সূচনার প্রসঙ্গে সংস্কৃতের আলোচনা না করলেও চলে। তবে এই কালসংক্ষেপের সার্থকতা একটা বিশেষ সীমান্বিত কালের উপর অত্যধিক লক্ষ্য বা মনোযোগ নিবদ্ধ করার সহায়ক হতে পারে, কিন্তু আমরা যেখানে দেখছি ভারতবর্ষের বিপরীত রূপ, আমরা যেখানে সাহিত্যের সূক্ষ্মতম মূল ধারাটি অবলম্বন করে তার বহিঃপ্রকাশকে নির্ণয় করতে, চিহ্নিত করতে চাই সেখানে এই কালের স্বল্প পরিসরের সীমা লঙ্ঘন করে চলার বাধা নেই। তদ্বিবেচনায় আমরা এখানে বৈদিক কাব্যের থেকেই আলোচনার সূচনা করতে চাই। তবে পূর্ব্বাহ্নে তার সপক্ষে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে হয়। দুটি জিনিষের উপর লক্ষ্য দিতে হবে। প্রথমত, সভ্যতা-সংস্কৃতির স্ফুরণ হয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে, এখানে ওখানে, কয়েকটি স্বল্পপরিসর ভূমির আয়তনকে কেন্দ্র করে—যেমন প্রাচীন পঞ্জাব বা গাঙ্গেয় উপত্যকা। পরবর্ত্তী কালে যে সকল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আত্মপ্রকাশ করল তাদের মধ্যে তক্ষশীলা, নালন্দা বিহার বা বিক্রমশীলার নাম স্বতঃই মনে হয়। এই সাংস্কৃতিক স্ফুরণ যে বিভিন্ন স্থানে ঘটেছে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে একটা একান্তভাবে নিজস্বতা বা বৈশিষ্ট্য আছে। অর্থাৎ একই জিনিষের প্রতিচ্ছায়া অপরগুলি নয়। তবে সেই সঙ্গে আর একটি মহামূল্য বস্তু সকল প্রকার বিভিন্নতা, বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়েও এক ভাবে আবহমান কাল চলে এসেছে, সকলের মধ্য একটি মর্ম্মগ্রাহী ঐক্যের সুর বেঁধে দিয়ে—সেটি ভারতীয় চেতনার সুর। আমি ভারতীয় এই মূল অন্তঃপ্রেরণার, বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেই বর্ত্তমান আলোচনায় অগ্রসর হব। ভারতীয় চেতনার গভীর রহস্যের যে অপূর্ব্ব প্রকাশ হয়েছিল ঋগ্বেদের কাব্যে, ভারতের আন্তর ঐশ্বর্য্যের যে প্রথম স্ফুরণ হয়েছিল ঋষি-কবির মন্ত্রে, তার রেশ আজ পর্য্যন্ত চলে এসেছে। তাই ভারতের ভাষাগত বিভিন্নতার ভিতরেও তার চিত্রকলা ও শিল্পসাহিত্যকে আশ্রয় করে একটা দেশব্যাপী সত্যকার ঐক্য ভিতরে ভিতরে রূপ নিয়েছে। তাকে

সহজে দেখা যায় না বলে অস্বীকার করা চলে না। সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণা বা রূপবোধ বললে তার ব্যাখ্যা হয় না, তার প্রকৃতির বিশেষত্ব, অলৌকিক কিছুর প্রতি আকর্ষণ—মানবিকতার পার্থিবের মধ্যেই, ক্ষণিকের তুচ্ছের মধ্যেই আপনাকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলা নয়। আধুনিক কবির কণ্ঠে তারই প্রতিধ্বনি শুনি—

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্ খানে।"*

কোন সুদূর অতীতে যে মানুষ পেয়েছিল উচ্চতর জ্ঞান তা চিন্তা করলে বিস্ময়কর মনে হয়। বৈদিক কবির যে সৃষ্টি তা থেকে প্রাচীন মানব-মনের এবং মানবসমাজের যে মহান্ চিত্র পাই তার মহিমার তুলনা হয় না। শুধু সাহিত্যের কথা নয়, প্রাচীন সমাজের যে পূর্ণ শ্রী ও শৃঙ্খলা ছিল, প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে বিংশ শতাব্দীতে তার জ্বলন্ত প্রমাণ ধরা পড়েছে। হরপ্পা, মোহেঞ্জো-দারো তার দৃষ্টান্ত। হয়ত ভবিষ্যতে এরূপ দৃষ্টান্ত আরো পাওয়া যাবে। এখন, মানুষের ভাষাকে আশ্রয় করে ভারতের আত্মার প্রথম যে সমর্থ সুন্দর প্রকাশ বৈদিক সংস্কৃত তারই বাহন হয়েছিল; সেই দেশগত আত্মার বাণী অদ্যাপি ধ্বনিত হয়ে চলেছে, কিন্তু যে আকারে, সংস্কৃত ভাষার রূপে, এক বিশেষ মূর্ত্তিতে সে একদা আপনাকে প্রকট করে ধরেছিল আজ তার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কিম্বা বলতে পারি, বিবিধ রূপের মধ্যে আপনাকে এখন সে যেন ঢেলে দিয়েছে। বৈদিক কবির ভাষা একটা বিশেষ ধরণের চেতনারই প্রতিভাস নিয়ে আসে। ভারতের চেতনার কেন্দ্রমধ্যে যখন এসেছিল একটি সত্যের ঋজুতা, স্বচ্ছতা, দৃঢ়তা, তখন সেই রূপ প্রকাশের ভাষা প্রাচীন সংস্কৃত। বৈদিক কাব্য রচনা করে-ছিলেন যাঁরা তাঁরা পেয়েছিলেন মানসোত্তর লোকের আলো, মনের অসামর্থ্যকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এই কবিরা। ঋষি-কবির মন্ত্রকাব্যের মধ্যে ছিল এমন অনির্ব্বচনীয়তা যে তা যথার্থই হয়ে উঠেছিল দেবতার ভাষা বা দেব-ভাষা—উপলব্ধির গভীর-তম রহস্যাবলী তাতে সম্পূর্ণ ধরা যেত, অপার্থিব অলৌকিকের সত্য যেন তার মধ্যে নেমে এসেছিল অক্লেশে। উপনিষদের কাব্যেও রয়েছে লোকোত্তর প্রতিভার স্পর্শ। তবে উপনিষদের কবি হয়ে উঠেছেন বুদ্ধির আরও নিকটবর্ত্তী। পুরাণে বুদ্ধি যেন আরো আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে—তার সঙ্গে বহুল পরিমাণে মিশেছে মানসেতর স্তরের জগৎ। বাল্মীকি একটা সত্যকারের পুনর্জীবন ফিরিয়ে আনলেন এই কাব্যজগতের চেতনাতে। মন এবং হৃদয় যেন তাঁর মধ্যে এক হয়ে মিশে গিয়েছে; শ্রেষ্ঠ কাব্যের এই একটা নিশ্চিত শুভ লক্ষণ। মন বলতে এখানে দৈনন্দিন জীবনের স্থূল প্রয়োজন মিটিয়ে চলে যে মন তার কথা বলছি না, আর এক যে মন, মনসো মনঃ, স্বার্থের ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর সত্যের সঙ্গে একান্ত ভাবে

* 'বলাকা'—রবীন্দ্রনাথ।

থেকে যে দেখে তারই কথা বলছি। ক্রৌঞ্চমিথুনের কাহিনীর কতটা সত্য তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু কবির হৃদয়ানুভূতির যে সাক্ষ্য তার মধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে* সমগ্র রামায়ণ তার সপক্ষে সম্মতি দান করবে। কবিসত্তার এই দুই কেন্দ্র ধরে রামায়ণে দেখা দিয়েছে এক মহান জীবনাদর্শ ও তাহার অনুপম ললিত ধ্বনিশিল্প। পৃথিবীর যে-কোন ভাষায় বাল্মীকির সমতুল্য কবি বিরল। রামায়ণে মহাভারতে এসেও কবিচেতনা চলছিল ঊর্দ্ধলোকেরই আব-হাওয়া অটুট রেখে। রামায়ণ বা মহাভারতে দেখি সে যুগের কবির সূক্ষ্মবোধকে আশ্রয় করে সমষ্টিগত চেতনারই একটা আভ্যন্তরিক প্রতিফলন। তাই এই দুই মহাকাব্য প্রকাশ হয়েছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে, কবিদ্বয়কে আদর্শের জন্ত কোথাও কষ্টকল্পনার আশ্রয় নিতে হয় নি।

মানুষের চেতনায় তারপর এল আর একটা পরিবর্ত্তন। পঞ্চম শতাব্দীর কাছাকাছি সংস্কৃত সাহিত্যে আর সেই বৈদিক কবির ঊর্দ্ধলোকগামিতার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, তখন তার মধ্যে এসে পড়েছে স্থূলসভ্যতার চারুতা ও মার্জ্জনা, মননজাত সঙ্গতিবোধ এবং পারিপাট্য। কালিদাসের ধীবর পর্য্যন্ত কতখানি আত্মমর্য্যাদাবোধ নিয়ে কথা বলছে।† বাণভট্টের রচনার মধ্যেও এই মানসিক আভিজাত্য, সর্ব্বত্র তার সুপুষ্পিত হস্তের সযত্ন স্পর্শ লেগে রয়েছে। মনের থেকে মানুষের প্রচ্ছন্ন গতির ইতিহাস নেমে এল যেন আর এক মোহের শক্তির টানে,—শক্তির, শৃঙ্খলার, সৌন্দর্য্যের রাজ্য ছেড়ে নীতিদ্বন্দ্বের আচার-বিচারের বিধানের মধ্যে। বাহিরের ইতিহাসেও অনুরূপ একটা বিপর্য্যয় লক্ষ্য করা যায়। গুপ্তযুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা অনিশ্চিত হয়ে উঠল। যশোবর্ম্ম, ললিতাদিত্য প্রভৃতি কর্ত্তৃক পৌনঃপুনিক আক্রমণে ও অন্তর্বিবাদের ফলে দেশে এল বিশৃঙ্খলা। বাহিরাগত আরবজাতি ইতিমধ্যে সিন্ধুদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিল। ক্রমশঃ বৈদেশিকরা ভারতীয় জীবনের একেবারে অন্তস্তলে এসে উপনীত হ'ল। এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে বাংলাকাব্যের আদিযুগের সূচনা। দেশ ও দেশের মধ্যে সীমানা যখন অলঙ্ঘ্য নয়, দেশ ও দেশের সীমা ছাপিয়ে যখন জনতার বন্যা সর্ব্বত্র প্লাবিত করে ফেলছে, জাতীয় জীবনে এমনই যখন একটা বিশৃঙ্খলিত প্রাণের খেলা, তখন থেকেই বাংলাবাক্যের আদিযুগের আরম্ভ। এই নূতন যুগের বিশিষ্টতার কথা বিচার করে দেখা যাক।

অতীতে বৈদিক যুগের সংস্কৃত ছিল অধ্যাত্ম-সাধকের ভাষা। তারপরে বহুদূর পথ অতিক্রম করে এসেও সংস্কৃত হয়েছে অভিরূপভূয়িষ্ঠের ভাষা, শিক্ষিত বিদগ্ধজনের ভাষা, রাজসভার অলঙ্কার-স্বরূপ। যে শিক্ষা, যে উপলব্ধির গাম্ভীর্য্য, ভাষার যে গরিমা একদা এক মহা কৌলীন্যবোধ নিয়ে আপনার

* "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।"

† "ভট্টা মা এবং ভণ"—ভর্ত্তঃ, মা এবং ভণ।

আত্মকেন্দ্রিক বৃত্তের মধ্যে আত্মরক্ষা করে চলছিল তার একটা পরিবর্তন ঘটল বুদ্ধের সময়ে। বুদ্ধদেব ভাষাকে, তাঁর সাহিত্যের ভাষাকে, আপামর সাধারণের কাছে সুলভ্য এবং সহজবোধ্য করে তুললেন; জনসাধারণের ভাষাকেই মর্য্যাদা দিলেন তিনি। এইরূপে প্রাকৃতজন ভাব ও ভাষার দরবারে এসে আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করল। একটা উদাহরণ গ্রহণ করছি—

"আইএ অণুমাত্র জগ রে ভাংতি এঁসো পড়িহাই
রাজসাপ দেখি জো চমকিই যারে কিং তং বোড়ো খাই॥
অকট জোইআ রে মা কর হে বা খোল্লা
আইস সভাবে জই জগ বুঝথি তুট বাষণা তোরা॥
মরু মরীচিগন্ধন ইরীদাপতি বিম্বু জইসা
বাতাবর্তে সো দিট অপে পাথর জইসা॥"*

এখানে ভাষায়, উপরন্ত ভাবের উপরেও, বৌদ্ধধর্ম কি অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল তারও চিহ্ন পরিস্ফুট। ক্রমে জনসাধারণের স্তর থেকে যখন কবি মুখর হয়ে উঠল তখন সাধারণের সহজ ধর্মবিশ্বাস, অকৃত্রিম বোধ, মানস জগতের অথবা প্রাণজগতের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই তার বিষয়বস্তুর রূপ পরিগ্রহ করল। এই সমসাময়িক রচনার মধ্যে স্থানে স্থানে বিভিন্ন ধর্মের বিরোধী উক্তি লিপিবদ্ধ আছে। তবে সে সবুদয় নীরন্ধ্র যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করে নি, অনেক পরে ঈশ্বর গুপ্তের যে সরস শ্লেষাত্মক রচনা দেখি এ জিনিষ তা-ও নয়, এখানে মূল অসহিষ্ণুতা, ক্ষুদ্র প্রাণাবেগের আবর্তই প্রেরণাদাতা। এই যে কাব্যের একটা পরিবর্তনের ধারা নিয়ে নেমে আসার উল্লেখ করলাম, আমাদের পক্ষে মনে রাখা ভাল, সেটি ঋজু ধারায় ঘটে নি; অনেক বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে তাকে আসতে হয়েছে, কখনো একই উপলব্ধির পুনরুক্তি করে। হয়ত তার অন্তঃশক্তির সারবত্তার পরীক্ষার প্রয়োজনে এই পুনরাবৃত্তি ঘটে। সেই হেতুই সম্ভবত সময়ের দীর্ঘ ইতিহাসে এক যুগের বহুল প্রতিচ্ছায়া আর এক যুগে ফুটে উঠতে দেখি। উপনিষদের আবহাওয়া ও ভাবরাশি রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রচুর নিয়ে এসেছেন বিংশ শতাব্দীর পৃথক জগতে। তা হলেও সব মিলিয়ে আসলে কিন্তু ঘটতে থাকে কোন একটা অন্তিম পরিণতির সার্থকতার দিকে অগ্রগতি। একটা জাতির যে

* জগৎ যে অনুৎপন্ন, পরমার্থজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা একথা জানেন। তাঁরা জানেন যে, জগৎকে সৎ বলা ভ্রান্তি মাত্র। দড়িকে রাজসাপ বলিয়া যাহারা চমকিয়া ওঠে, সত্য সত্যই কি বোড়া সাপে তাদের খায়? ভ্রম গেলেই সত্য প্রকাশ হয়। কি আশ্চর্য্য, হে বালযোগিন্, ইহাতে হাত লোনা করিও না, যদি জগতের শূন্যস্বভাব অবগত হও তাহা হইলে তোমার বাসনা দূর হইবে। মরীচিকা, গন্ধর্ব্ব-নগর, দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেরূপ, জগৎও সেইরূপ।

—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কৃত অনুবাদ

প্রতিভা, যে বিশেষত্ব, কলা-সাহিত্য-শিল্পকে আশ্রয় করেও তার রশ্মি বিকীর্ণ হতে থাকে। ভারতে শিল্পসাধনার অন্তর্দেশে ছিল ভারতের অন্তরাত্মারই সমর্থন এবং অনুপ্রেরণা।

তা হলেও এই সময়কার বাংলাকাব্যের সৃষ্টি উপযুক্ত স্তরের হতে পারে নি। তার হেতু কি? সাহিত্য শিল্প কাব্যের জীবন দুটি দিক নিয়ে তৈরী—ভিতরের ভাব এবং বাহিরের আকার-গত রূপ। বাংলা কাব্যের শৈশবে এই পর্য্যন্ত আমরা দেখেছি, একটা দ্রুত রূপ পরিবর্ত্তন এবং আকৃতির পরীক্ষা চলছিল, ছন্দগত পরিবর্ত্তন নয়, ভাষাগত পরিবর্ত্তনের কথাই বলছি। প্রাচীন প্রাকৃত-জর্জ্জরিত পালাগানগুলি ছন্দের নির্ভুলতা বা সুষ্ঠু এবং বহুবিধ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে চলছিল না। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, গোবিন্দদাসের হাতে পয়ার ক্রমে শ্রীবৃদ্ধিলাভ করতে থাকে। প্রতিভার সংস্পর্শে, শব্দ-সম্ভারের গুণে, ভাষা যতই পূর্ণতা পেয়ে ওঠে ভাবকে নিপুণভাবে প্রকাশ করার ততই তার সুবিধা।

এই পূর্ণতার সার্থকতার জন্যে আবার চাই নূতন উপলব্ধির উন্মেষ (ঋগ্বেদের ঋষিরা যেমন বিচিত্র ঊষার বার বার আগমন হতে পেলেছেন জীবনে)। সংস্কৃতে জয়দেব 'গীতগোবিন্দে'র সুললিত পদে (কবির নিজের ভাষায়, 'মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি') এক নূতন ভাবরসের প্রবাহ নিয়ে এসেছিলেন।* তারই অনুভাবে বাংলা-কাব্যে চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি নবযুগের উদ্বোধন করলেন।† প্রেমের, ভক্তির, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, এই নবযুগ হয়েছে অপূর্ব্ব শ্রী-মণ্ডিত। আমরা পড়েছি বেহুলা-লখিন্দরের কথা, লাউসেনের কথা, গোপীচাঁদের কথা, কালকেতু-নিশাপতি-শ্রীমন্তের কথা; বিশেষ করে বেহুলা-লখিন্দরের কথার মধ্যে যে হৃদয়ের কথা, কারুণ্যশ্রী, নেই তা নয়, তবে তার এক বৃহদংশ চলেছে প্রাণের অনুভূতিতেই আচ্ছন্ন হয়ে,‡ আপনার বৃহত্তর ধর্ম্মের স্বাভাবিক প্রেরণাবশে ঊর্দ্ধমুখী হয়নি।

কাশীরাম দাস এবং কৃত্তিবাস যখন এলেন বাঙালীর কবি-চিত্তে প্রেমোচ্ছ্বাস তখন যেন মন্দীভূত হয়ে এসেছে। মানব-জীবনকে আরও বিস্তৃততর পরিসরের মধ্যে গ্রহণ করা প্রয়োজন তখন। রামায়ণ মহাভারতের বিচিত্র সমৃদ্ধ অনুভূতি, বহুবিধ ভাবের প্রাচুর্য্য এই অভাব পূর্ণ করে দিল—যদিও ভাষার দিক বিবেচনা করলে বাংলা কাব্য পূর্ণতার মহত্ত্বের থেকে তখনও অনেক দূরে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এলেন মধুসূদন। মধুসূদনের মধ্যবর্ত্তিতায় প্রথম পাশ্চাত্যের প্রভাব বাংলা-কাব্যের উপর পড়ল। মধুসূদনে আরম্ভ হ'ল কাব্যের অত্যাবশ্যক গুণাবলীর একটা গাঢ় সমন্বয়ের প্রয়াস—ভাবাবেগ, ভাষাশক্তি এবং অঙ্গগঠন—এই ত্রয়ীর একত্রীকরণের দুরূহ সাধনা। কিন্তু বলতে হবে মধুসূদন এই আদর্শ সাধনে পূর্ণাঙ্গ সফলতা লাভ করতে পারেন নি। এই মাত্র যে ত্রিগুণের উল্লেখ করা হ'ল কবির চেতনায় তারা একেবারে মিশে এক অভিন্নাঙ্গ হয়ে যায় নি। মধুসূদনে ছিল যার শুভ সূচনা রবীন্দ্রনাথে হয়েছে তার পরিণতির সফলতা। বর্ত্তমান যুগে মধুসূদনই প্রথম আধুনিকের দাবি নিয়ে (অতি আধুনিকেরা আবার এক পৃথক শ্রেণীর বলে গণ্য), আধুনিক মনোবৃত্তির প্রতিনিধি হয়ে বাংলা-কাব্যের সভায় প্রবেশ করেছিলেন। মাইকেলের পরবর্ত্তী ইতিহাস আমাদের নিয়ে এল পরিচিত সমসাময়িক কালের নিবিড় সংস্পর্শের মধ্যে, প্রাচীনের প্রসঙ্গে যার আলোচনা অপরিহার্য্য নয়।

—

* "তব বিরহে বনমালী সখি সীদতি।"—জয়দেব

† "মাধব, সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝর নীঝর
জনু ঘন সাওন বালা।"—বিদ্যাপতি

‡ "অভাগিনী বেহুলার সহায় কেবা আছে"—বিজয় গুপ্ত

যুক্তপ্রদেশের প্রান্তিক লোকসঙ্গীত

শ্রীমায়া গুপ্ত

বিবাহ-সঙ্গীত বর ও বধূ উভয়ের গৃহেই গাওয়া হয়। অবশ্য কন্যার গৃহেই সঙ্গীতের, তথা অন্য সমারোহের ব্যাপার অধিক থাকে। কিছু কিছু গান উভয় পরিবারেই গীত হয়। এখানে কয়েকটি বিবাহ-সঙ্গীতের উল্লেখ করা হবে—যা বরের গৃহেই গাওয়া হয়। প্রবাসীর বিগত এক সংখ্যায় বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠানেরই কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বরের বিবাহের গানও বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে গীত হয়।

নিম্নলিখিত গানটি পুরাতন—সেকালে বরকে কন্যার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হ'ত এবং সবিনয়ে কন্যার পাণিপ্রার্থনা করতে হ'ত। পশ্চিম ভারতের নারীদের সেই গৌরবময় যুগের গান এটি :

কেহি কেয়া পূত তপসিয়া আঙ্গন মোরে তপ করৈ রে
এজি কেহি কেরী বেটী কুআঁরী সুন্দর বর মাঁগৈ রে।
বাপ ক পূত তপসিয়া আঙ্গন মোরে তপ করে রে
এজি বাপ কী বেটী কুআঁরী সুন্দর বর মাঁগৈ রে।
ভিতরাসে নিকসৌ সাসজী আর ভর মোতী লিয়ে রে
এজি লেহ তপসী আপনি ভিচ্ছা আঙ্গন মোর ছোড়উ রে।

মোতিয়া তো অপনী ঘরহৈঁ ধরৌ অপনী সৈঁতী ধরৌ
রে লাহু তুমবর কন্যা কুআঁরী তপস্যা মোর পূরবহু রে।

"কার তপস্বী পুত্র আমার অঙ্গনে তপস্যা করছে আর কার কুমারী কন্যা সুন্দর বর চায়? অমুকের পুত্র আর অমুকের কন্যা এরা। ঘরের ভিতর হতে শ্বশ্রূমাতা থালা ভরে রত্ন-ভিক্ষা দিতে এসেছেন—'ভিক্ষা নিয়ে আমার অঙ্গন ত্যাগ কর।' বর বলছেন, 'তোমার ধন রত্ন ভিক্ষা চাইতে আমি আসি নি, এসব ঘরেই রাখ। তোমার কুমারী কন্যাকেই আমি ভিক্ষা চাই'।"

মোরে পিছবরবা বাঁস বসেরী কোইলী লীন্হ বসের
ছোড়উ ন কোইলী মোরা পিছ বরবা জাও নন্দন বন সেউ
মঁড়বন মঁড়বন ঘুমৈ দুলহে রাম বাপ কোইলী হম লেব
কোইলী বেটে ন মাট কী মিলিহৈঁ না চড়ি হাট বিকায়ঁ।
কোইলী তো হোইহৈঁ সমুধীজীকে মঁড়য়েঁ জিন ঘর কন্যা
কুআঁরী

গলিয়ন গলিয়ন ঘুমৈ দুলহে রাম কৌন হৈ সমুর দুআর।
সোনেকে কলস পর দিয়না জরত হৈ বহ দেখো সমুর দুধার।
মঁড়বে কী থুনী লাগে ঠাঢ়ি দুলহিন দেঈ দুলহে জো পুছত বাত
তুম হরে দাদুলিজীকে সোনে ধৌরাহর হমহুঁ কা দেব বসের।

"আমার গৃহের পিছনে কোকিল বাসা নিয়েছে। হে কোকিল, নন্দন-বনে বাসা যাও, এখন এ স্থান ত্যাগ কর।' ওদিকে অমুক বর ঘুরে ঘুরে কোকিল খুঁজে বেড়াচ্ছে—'হে পিতা আমি কোকিল নেব।' পিতা বলছেন, 'কোকিল মাটি দিয়ে তৈরী হয় না এবং বাজারেও বিক্রয় হয় না। বৈবাহিক মহাশয়ের বাড়ীর পিছনে কোকিল আছে—যাঁর ঘরে কন্যা কুমারী। বর গলি গলি খুঁজে ফিরছেন—'শ্বশুর মহাশয়ের ঘর কোথায়?' যেখানে সোনার স্তম্ভে দীপ জ্বলছে সেইখানে। যাঁদের কাছে কন্যা ছিলেন, বর তাঁকে অনুরোধ করছেন—'তোমার পিতৃদেবের স্বর্ণমণ্ডিত ঘর, আমায় সেইখানে বাস করতে দাও।'

প্রকৃতির কোলে লালিত, গ্রাম্য জীবনের উপযুক্ত গান। কোন আড়ম্বরের কথা অবশ্য এ গানে নেই, তবে স্বর্ণপ্রসূ ভারতের সমস্ত প্রদেশের লোকসঙ্গীতে স্বর্ণের ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে। অবশ্য তাই বলে একথা ভাববার কোন কারণ নেই যে, সেকালে গ্রামের ঘরে ঘরে স্বর্ণভাণ্ডার থাকত।

কোইলী জো বোলৈ অমবা কেরা ডগিয়া
তোঁয়া বোললে কচনার জী
বোলৈ দুলরইতা দুলহা সমুরজীকে বাগিয়া
হাথে ভলেল মুখ পান জী।

কাহে লোভ লৈলি বহুআ অমুৱা কী বাগিয়া
কাহে লোভ লৈলি সমুরার জী।
অমুৱা লোভে গেলুঁ অম্মা অমুৱা কি বাগিয়া
ধনী লোভে গেলুঁ সমুরার জী।
কা কা খৈলো বাবু অমবা কী বাগিয়া
কা কা খৈলো সমুরার জী
অমবা কলল খৈলুঁ অমবা কি বাগিয়া
খাঁড় দুধ খৈলুঁ সমুরার জী।
নওহঁ মহীনা তোঁহি বাবু কোখিয়া রখলুঁ
অবরু দস দুধবা পিলায় জী
দুধ পানি বাবু একো ন দিহলে
কৈসে চিন্হল সমুরার জী।
দুধ পানী অম্মা তবে হম দীহব
জবৌ ধনী লৈবৌ লিআয় জী
হমহুঁ জে হোইবোঁ অম্মা বাবু জী সেবকিয়া
ধনী হইবো দাসী তোহার জী।

"কোকিল আমের শাখায় গান গাইছে, ভ্রমর কচনারের উপর গুঞ্জন করছে। আদরের বর শ্বশুরের ঘরে কথা বলছে—হাতে ফুল এবং মুখে পান। মা জিজ্ঞাসা করছেন 'পুত্র তুমি কিসের লোভে আমের কুঞ্জে যাও এবং কিসের লোভে শ্বশুর-গৃহে যাও।' পুত্র উত্তর দিচ্ছেন, 'আমের লোভে যাই বাগানে, আর পত্নীর সন্ধানে আসি শ্বশুরগৃহে।' মা আবার জিজ্ঞাসা করছেন 'কি খাও সেখানে?' উত্তর হ'ল, 'বাগানে আম এবং শ্বশুরগৃহে গুড় ও দুধ'।"

মা বলছেন 'আমি তোমায় নয় মাস গর্ভে ধারণ করেছি এবং পরে দশ মাস দুগ্ধ পান করিয়েছি। তুমি তো আমায় দুধ-জল কিছুই দিলে না। তুমি শ্বশুরের গৃহ চিনলে কি করে?' পুত্র বলছেন, "স্ত্রীকে আনলে তবেই আমি তোমায় দুধ-জল দিতে পারব। আমি পিতার সেবা করব এবং আমার স্ত্রী তোমার দাসী হয়ে থাকবেন'।"

পুত্রের বিবাহে জননীর আশঙ্কাধর্মী স্নেহপ্রবণ চিরন্তন মনোভাবের ইঙ্গিত এই গানটিতে আছে। পুত্রটি পাছে পর হয়ে যায় এই আশঙ্কায় বিচলিত জননীর ঈর্ষা ও অভিমানের সুর এই গানটিতে অনুরণিত।

এবার একটি মজার গানের পরিচয় দিচ্ছি। গানটি নিশ্চয় লোকশিক্ষার জন্য রচিত হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে কন্যাপক্ষকে শোষণ করার যে রীতি চলে আসছে তারই বিরুদ্ধে যেন একটি আদর্শ স্থাপিত করার জন্য কোন নারী-কবি গানটি রচনা করে-

ছিলেন। কন্যাপক্ষের হাতে শোষণরোধের ক্ষমতা নেই, বরপক্ষের বা বরের উদারতাই একমাত্র ভরসা।

সম্ভবত সম্প্রদানের সময়কার গান এটি :—

কনক দিয়ট দিয়না বরে ; দিয়না বরা হৈ আকাশ
আহো ছুলহ ছুলহী গজ চৌকী
ছুলহকে চীরা সোনহলা জৈসে সন্‌ঝা পলাস কৈ টেশু
অহো রঙ্গহ ন বাবুল খিচড়িয়া।

"বর্ণ-দেউটিতে দীপ জ্বলছে,—সু-উচ্চে আকাশের উপর যেন প্রদীপ জ্বলছে, বরকন্যা গজচৌকির উপর আসীন। বরের শিরস্ত্রাণ কনকবর্ণের—যেন সন্ধ্যাকালে পলাশের ফুল। 'হে পিতা, ঐ কনক-শিরস্ত্রাণ বিভিন্ন রং দিয়ে রঙিন করে দাও।'

তারপর হ'ল কি—বর বেঁকে বসেছেন :—

সসুর মনাবন বৈ চলে বাবুল
লেহু ন গজবা পচাস
সে হাথ উঠাবহু ন।
গজ ধরি রাখহু গজ সার মেঁ
হমর গজ হৈ অনেক
বাবা নাহিঁ ভুখল হাথী হউদকে।
সার মনাবন বৈ চলে জীজা লেহু ন তরঙ্গ পচাস
আহো হাত উঠাবহু তই দের সে।
ধরি রাখহু ঘোড় ঘোড়সার মে
হমরে ঘোড়ে হৈ অনেক
বাবু ভুখে নহী হম ঘোড়ে জীন কো।

শ্বশুর এসেছেন জামাইকে প্রলোভন দেখিয়ে ভোলাতে—বলছেন, 'হাতীশালা হতে পঞ্চাশটি হাতী নিয়ে নাও এবং হাত তোলো।' জামাই উত্তর দিচ্ছেন 'হে পিতা, হাতী আপনার হাতীশালায় থাক—আমার পিতার অনেক হাতী আছে, তিনি গজের কাঙাল নন।' তারপর এলেন শ্যালক—এবারে লোভ দেখালেন পঞ্চাশটি ঘোড়ার। বড়ই বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে, লগ্ন সমাগত। উত্তর হ'ল, ঘোড়ার কাঙাল তিনি নন, তাঁর পিতার আলয়ে বহু ঘোড়া আছে।"

এবার এলেন শাশুড়ী—

সাসু মনাবন বৈ চলে বাবুল
লেহুন মানিক মুঁদরিয়া
সে হথবা উঠাবহু ন।
ধরি রাখহু হীরা মোতী সাসুজী
হীরন ভরা হৈ অমার।
আহো নহী ভুখে মুঁদরী মালকে।
সরহজ মনাবন বৈ চলী বাবুল
লেহু ন হথনা বিজায়ট
সে হাথ উঠাবহু ন।
ধরি রাখহু আপনা বিজায়ট
গহন ন ভরি হৈ সন্দুক,
বীবী নাহী বিজায়ট সাথ হৈ।

শাশুড়ী এলেন, বেঁকে বসা জামাইকে বাগ মানাতে মাণিক মুঁদরী হাতে—'বাছা এই নাও অলঙ্কার, এবার হাত তোলো।' উত্তর হ'ল 'হে মাতা, হীরা মোতী তোমার ঘরেই রাখ, আমার ও বস্তু যথেষ্ট আছে—আমি অলঙ্কারের কাঙাল নই।'

তখন এলেন শ্যালক-পত্নী 'বিজায়ট' হাতে—বর বলছেন, 'অলঙ্কারে আমার বাক্স ভরা আছে, আপনার 'বিজায়ট' রাখুন আমার ও জিনিষের সাধ নেই।'

সবশেষে এলেন শ্যালিকা, বিনয়ের সঙ্গে বললেন,—

শারী মনাবন বৈ চলী
জীজা হমরে ন কুটহী কউড়িয়া
কা তোহরে ভেঁট দৈ।
জীজা আপন যাদ দেই জাহু
অহো জীজা অপনে পরেম
ভেঁট দেউ সে হথবা উঠাবহু ন।
ইতনা বচন যৌসে সুনলৈ আহো সুনহু ন পবলৈ
সে চৌকী বইঠ জেবনা সে জেবলৈ সে পান লেই বাহের গয়ে।

শ্যালিকা বলছেন, 'হে জীজা, আমার কাছে তো ফুটো কড়িও নেই, তোমাকে আর আমি কি উপহার দেব? তোমার স্মৃতি এখানে রেখে যাও। আমার স্নেহ-ভালবাসার দান গ্রহণ কর এবং হাত তোলো।

এতক্ষণে বর বিগলিত হলেন, এবার তিনি হার মানিলেন। শ্যালিকার কথা শেষ হতে না হতেই 'চৌকায়' বসে ভোজন করলেন এবং পান খেয়ে বাইরে গেলেন।

বিবাহের পর রন্ধনের স্থানে (চৌকা) বসে আহার করার রীতি আছে। গানটি সম্ভবতঃ সম্প্রদানকালে, আর নয় তো বিবাহের পর চৌকায় বসে ভোজনের সময়ই গাওয়া হয়। এ গানটি ছেলের বাড়ীতে কেন গাওয়া হয় তা বুঝতে পারা যায় না—আসলে এটিতো মেয়ের বাড়ীতেই গীত হওয়া উচিত।

খাদ্য ও পথ্য বিভ্রাট

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম, এসসি

যে সময় অন্নসঙ্কট চরমতম অবস্থায় উপনীত সে সময় খাদ্যের গুণাগুণের আলোচনা সাধারণতঃ অপ্রীতিকর হওয়াই স্বাভাবিক। তথাপি খাদ্য সম্বন্ধে কয়েকটি ভ্রান্তধারণার নিরসন জাতির প্রকৃত কল্যাণের দিক হইতে অসমীচীন হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

আবহমানকাল হইতে আমাদের ধারণা আছে যে, আতপ চাউল সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সে ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সিদ্ধ চাউলে আতপ চাউলের চেয়ে ভিটামিন বি১, নিকোটিনিক এসিড প্রভৃতি উপকারী ভিটামিন বেশী থাকে বলিয়া জানা গিয়াছে। অনেকেই অবগত আছেন যে, বি-শ্রেণীর ভিটামিনগুলি সহজেই জলে দ্রবীভূত হয় এবং এগুলির অধিকাংশই থাকে ধানের তুষের ঠিক নীচেই চাউলের উপরের পর্দাতে। ধান সিদ্ধ করিবার সময় ভিটামিনগুলি জলে দ্রবীভূত হয় এবং চাউলের দানা নরম হইয়া ফুলিয়া উঠিলে তাহার মধ্যে ভিটামিনযুক্ত জল শোষিত হয় এবং ধান শুকাইলে ভিটামিনগুলি চাউলের ভিতরে আটকা পড়িয়া যায়। এখন একই জাতীয় সিদ্ধ করা এবং অসিদ্ধ ধান যদি সমভাবে ছাঁটা বা ভানা হয় তবে সিদ্ধ চাউলের মধ্যে আতপের অপেক্ষা অধিক-পরিমাণে ভিটামিন থাকিবে, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কেহ কেহ শুনিয়া থাকিবেন যে, আমেরিকার ব্যবসায়ীগণ রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত বি-ভিটামিন মিশ্রিত চাউল বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছেন, ইহাকে নাকি 'রি-এনফোর্স্‌ড্‌ রাইস' আখ্যা দেওয়া হইবে। আশ্বাসের কথা এই যে, প্রস্তাবিত এই চাউলের অপেক্ষা আমাদের সিদ্ধ চাউল, বিশেষতঃ ঢেঁকি-ছাঁটা সিদ্ধ চাউল আদৌ নিকৃষ্ট হইবে না; সুতরাং বাংলা দেশে ঐ চাউল কাটতির আশা কম। আর একটি কথা এই যে দুই বার সিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধ চাউলের ভাত আতপ অন্নের চেয়ে সহজপাচ্য।

চাউল-প্রসঙ্গে পথ্য সম্বন্ধেও একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক। অসুখের পর অনেক চিকিৎসক প্রথম পথ্য হিসাবে আটা বা ময়দার রুটির ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ঐ রুটির চেয়ে সরু চাউলের ভাত অনেক সহজে হজম হয়; সুতরাং প্রচলিত ধারণার পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়।

এতদিন আমরা মসুর ডালকেই আমিষ বলিয়া ধরিয়া আসিতেছি। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে কিন্তু দেখা যায়, মুগ মটর ছোলা মাষকলাই অড়হর খেসারি প্রভৃতি ডালের আমিষের অংশ ও মসুর ডালের আমিষের পরিমাণেরই (শতকরা ২৫) কাছাকাছি। এ বিষয়ে একটি নূতন তথ্য এই যে, মসুর ডালের আমিষ-পদার্থ অপরাপর ডাল অপেক্ষা আমাদের শরীরের পক্ষে যে অনেক কম উপকারী তাহা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিক্যাল বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও বর্ত্তমানে বাঙ্গালোরের রাজকীয় ডেয়ারি রিসার্চ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ডক্টর কালীপদ বসু মহাশয় পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন। ডাল সম্বন্ধে একটি অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, রান্নার সময় উহা সুসিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কদাচ সোডা দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাহাতে ডালের উপকারী বি-ভিটামিনগুলি নষ্ট হইয়া যায়।

ডিম কদাচ কাঁচা খাওয়া উচিত নয়। অনেক খাদ্যতত্ত্ববিদের পরীক্ষায় ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ডিম কাঁচা খাইলে উহার শ্বেতাংশ বা অ্যালবুমিন আদৌ হজম হয় না। চিকিৎসকগণের ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার।

অনেক ক্ষেত্রে ডিমের মধ্যে এক প্রকারের ব্যাক্টেরিয়া বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়—উহা অল্প উত্তাপেও মরে না, ফলে উহা খাইলে এক প্রকার সংক্রামক রোগ দেখা দেয়। সুতরাং কাঁচা ডিম কোনও ক্রমেই খাওয়া উচিত নয়। আমাদের প্রচলিত ধারণা, মহিষের দুধ গরুর দুধের চেয়ে হজম করা কঠিন। এই ধারণাবশতঃ কলিকাতা প্রভৃতি শহরে অনেকে আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও খাঁটি গোদুগ্ধ দুর্লভ বিধায় দুধ খাওয়াই ছাড়িয়া দেন। মহিষ ও গোদুগ্ধের প্রধান প্রধান উপাদানগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হইল—

দুগ্ধ	আমিষপদার্থ	মাখন	দুগ্ধশর্করা	লবণপদার্থ	জল
গোদুগ্ধ	৩·৪	৪	৫	০·৭	৮৭
মহিষদুগ্ধ	৪·৪	৭·৩	৪·৫	০·৮	৮৩

উপরের তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, মহিষদুগ্ধে একমাত্র মাখনের পরিমাণই অনেক বেশী। গোদুগ্ধের সহিত ইহার অন্যান্য উপাদানের পার্থক্য তেমন অধিক নয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, মাখনের পরিমাণ বেশী থাকা সত্ত্বেও মহিষদুগ্ধ গোদুগ্ধের মতই সহজে পরিপাক হয়।

যাঁহারা অগ্নিমান্দ্যবশতঃ পাতলা দুধ সহ্য করিতে পারেন না তাঁহারা দুধ ঘন করিয়া বা ছানা কাটিয়া খাইলে উহা সহজে হজম করিতে পারিবেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ছানার জল যেন তাঁহারা ফেলিয়া না দেন; কারণ ছানার জলে ল্যাক্‌ট অ্যালবুমিন নামক দুধের একটি উপকারী আমিষপদার্থ, দুগ্ধশর্করা, লবণ-পদার্থ এবং রিবো-ফ্ল্যাভিন, এনিউরিন, অ্যাসকরবিক এসিড (বি$_2$, বি$_1$, সি,) প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ভিটামিন থাকে।

তৈল সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ করা যাইতেছে। ভিটামিন তালিকায় কোনও নিদর্শন না দেখিয়া অনেক শিক্ষিত লোকেও সরিষার তেলে দেহপুষ্টিকারক কিছুই নাই বলিয়া মন্তব্য করেন। দুই-একখানি খাদ্য-বিষয়ক পুস্তকেও ইহা দেখা গিয়াছে। এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, উদ্ভিজ্জ তৈলে সচরাচর ভিটামিন না থাকিলেও স্নেহপদার্থের প্রধান যে গুণ শক্তি সরবরাহ করা তাহা সরিষার তেলে পুরামাত্রায় আছে।

পূর্ব্ব-বাংলার কলিকাতা-প্রবাসী মধ্যবিত্ত সচ্ছল পরিবারের যাঁহারা বাল্যে ও কৈশোরে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়াল খাঁ, ধলেশ্বরী, মেঘনা বা মধুমতীর সুস্বাদু টাট্‌কা মৎস্য খাইয়া আসিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের একটি পঙ্‌ক্তি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া যাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যায়—"এখনো সে সব মৎস্য অমৃত-পিপাসা মুখেতে রয়েছে লাগি"—তাঁহারা বরফ দেওয়া ইলিশ প্রভৃতি মৎস্য ভালবাসেন না। 'এ যেন মাছ খাওয়াই নয়' বলিয়া তাঁহারা কেহ কেহ অনুযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনুযোগ অস্বীকার করা যায় না, তবে তাঁহাদের একথা মনে রাখা উচিত যে, বরফে মাছের মৎস্যত্ব নষ্ট হয় না। উহার আমিষ-পদার্থ অক্ষুণ্ণই থাকে, স্বাদের কিঞ্চিৎ তারতম্য হয় মাত্র। অবশ্য তাই বলিয়া সময়ে বরফ না দেওয়ায় যে মাছ পচিয়া গিয়াছে তাহা খাইবার পরামর্শ কেহই দিবেন না। জাহাজের শীতল কক্ষে রক্ষিত অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানের আমদানী মাংস বিলাতের লোকেরা পরম পরিতোষের সহিতই খাইয়া থাকে। সুতরাং গোয়ালন্দের ইলিশ বরফ দেওয়া বলিয়া নাক সিটকাইলে আমাদের চলিবে না; বরং যাহাতে মাছ অধিকতর সুরক্ষিতভাবে ও প্রভূত পরিমাণে কলিকাতায় আমদানীর ব্যবস্থা হয় গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তাহার ব্যবস্থা করার জন্য আন্দোলন আবশ্যক। প্রবন্ধের গোড়াতেই ডালের আমিষ-পদার্থ আমাদের শরীর রক্ষার্থে যথেষ্ট নয় বলা হইয়াছে। উহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণে দুধ বা ছানা খাইলে শরীরের যথাযথ পরিপুষ্টি হইতে পারে; অন্যথা উপযুক্ত পরিমাণে মাছ বা মাংস না খাইলে সুস্থদেহে মানুষের মত বাঁচা অসম্ভব। দুধ যখন দুর্লভ তখন মাছের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

কিঞ্চিৎ অবান্তর হইলেও একটি বিষয় উল্লেখ করিতে হইতেছে তাহা পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের স্থানত্যাগ সম্পর্কিত। পূর্ব্ববঙ্গের অপর্য্যাপ্ত মাছ-দুধে সুগঠিত দেহ, সবল মন ও সতেজ সর্ব্বগ্রাহী মেধা লইয়া একদা যাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা হুগলী বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বাসা বাঁধিয়া অপ্রচুর মৎস্যাহার করিয়া আর কত দিন নিজেদের স্বাস্থ্যসম্পদ বজায় রাখিতে সমর্থ হইবেন? এক্ষেত্রে দুটি পন্থার নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতে পারে। যদি অগত্যা মাটির মায়া ছাড়িয়া আসিতেই হয় তবে যাঁহারা আসিবেন তাঁহাদের রুচির আমূল পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে মাংসাহারের অভ্যাস করা; দ্বিতীয় এবং প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে অসীম মনোবল ও আত্মত্যাগ বরণ করিয়া সংঘবদ্ধভাবে পৈতৃক ভিটা আঁকড়াইয়া থাকা।

খাদ্যপ্রসঙ্গে বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে বিষয়গুলির উল্লেখ করা হইল আশা করা যায়, তাহাতে দেশবাসীর উপকার সাধিত হইবে।*

* প্রবন্ধটি লেখার নির্দ্দেশদানে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহোদয় আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

সুইজারল্যাণ্ডের সমৃদ্ধি

শ্রীবগলাকুমার মজুমদার

আর্থিক উন্নতির উৎকট আকাঙ্ক্ষা যে তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে, তাতে করে একদিকে যেমন কাল্পনিক অভাবের মাত্রা বেড়ে চলেছে, অপর দিকে তেমন অনর্থের আগুন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে এবং আন্তরিকতা একেবারে বিদায় নিতে বসেছে। বিজ্ঞান এর ইন্ধন যোগাচ্ছে। ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ আজ নানাভাবে মানবীয় সম্বন্ধকে কলুষিত করছে। অর্থোপার্জ্জনের চেয়ে অর্থবণ্টনে সামঞ্জস্য বিধান করা জটিল ব্যাপার। কৃষিপ্রধান দেশে এই সমস্যা ততটা তিক্ততা এনে দেয় নি যতটা দৃষ্টিগোচর হয় শিল্পপ্রধানদেশগুলিতে। জ্ঞানের রুদ্ধদ্বার উদ্ঘাটন করেছে বিজ্ঞান—তাতে তার দানও অফুরন্ত ও বিস্ময়কর। কিন্তু অর্থোপার্জ্জন ও শক্তিপ্রয়োগের যন্ত্র হিসেবে যখন একে ব্যবহার করা হ'ল, যত জটিল সমস্যা তখন এসে জুটল। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ জটিল হয়ে উঠল। ভারতীয় সভ্যতার মূলগত আদর্শ হ'ল শান্তি ও সংযম। প্রাণের প্রাচুর্য্য এনে দেয় প্রেম। অর্থের প্রাচুর্য্য বিভ্রান্তি এনে দেয় রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে। মানবীয় ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে যারা জড়বস্তুর প্রাধান্য মেনে নেয় তারা মহতী বিনষ্টির পথ প্রশস্ত করে দেয়।

এমন সুন্দরী পৃথিবী সুন্দরতর হয়েছে মানুষের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের আলোকে। যে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার সমূহের দ্বারা বিভিন্ন দেশ সমৃদ্ধি লাভ করেছে ও জাতিতে জাতিতে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ স্থাপিত হতে চলেছে, তার অগ্রগতি প্রতিরোধ করার মানে মানুষের মনীষা ও সৃজনীশক্তির বিরুদ্ধাচারণ করা।

বিজ্ঞানের দান ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যে আকাশ-পাতাল আর্থিক অসমতার সৃষ্টি করা হয়েছে তার সামঞ্জস্য বিধান করবার জন্য চেষ্টা চলেছে সত্য; কিন্তু আন্তরিকতার আলো এখনও পথের সন্ধান দেয় নি।

ধনতন্ত্রী দেশগুলির মধ্যে ক্ষুদ্র সুইজারল্যাণ্ড যে ভাবে ধনিক ও শ্রমিক উভয়ের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করেছে তাতে বিস্মিত হতে হয়। সুইজারল্যাণ্ডে কৃষির উপযোগী এমন জমি নাই যা সেখানকার অধিবাসীদের অর্দ্ধেককেও বাঁচিয়ে রাখতে পারে। না আছে তার কয়লা, না আছে লৌহখনি বা অন্যান্য খনিজ পদার্থ, এমন কি কাঁচা মাল পর্য্যাপ্ত নেই। সমুদ্রে বের হবার পথ নেই তার। তবু যুদ্ধের দুর্ব্বৎসরেও তার

আর্থিক অবস্থা জটিল হয়ে উঠে নি—বেকার-সমস্যা দেখা দেয় নি। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় মাথাপিছু ২০৯৮ ষ্টার্লিং আয় ছিল, অথচ সুইজারল্যাণ্ডে ছিল ৩১২৬ ষ্টার্লিং।

শিল্পের জাতীয়করণের ধুয়া যখন চারদিকে উঠছে তখন ধনতন্ত্রী সুইজারল্যাণ্ড ব্যক্তিগত শিল্পনিয়ন্ত্রণের সাহায্যে শিল্পপতি ও শ্রমিকের মধ্যে অনেকটা সমতা রক্ষা করতে পেরেছে। এটা সম্ভব হয়েছে তার রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত বিশেষ অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ের জন্য। ধনতন্ত্রী-দেশে ধনিকগণ অধিকতর ধনী হয় এবং দরিদ্রেরা আরও দরিদ্র হয়—এটা মার্কস ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রীদের মত। বস্তুত সুইজারল্যাণ্ডে বহু মূলধন খাটে ও অপর্য্যাপ্ত লাভ হতে পারে এমন শিল্প-প্রতিষ্ঠান খুব কমই আছে। সুইজারল্যাণ্ডের অর্থনীতি আর্থিক প্রাচুর্য্যের সৃষ্টি করে না। প্রত্যেক ঘড়ি-শ্রমিক ১০ ষ্টার্লিং হতে ২০ ষ্টার্লিং আয় করে থাকে। অন্যান্য শিল্পেও শ্রমিকগণ অনুরূপ আয় করে থাকে। বড় বড় কোম্পানীতে ১০০ বা তার কিছু বেশী শ্রমিক কাজ করে থাকে। তা ছাড়া বেশীর ভাগ প্রতিষ্ঠানেই ২০ জনের কম লোক কাজ করে। কোন কোন আদর্শ হাতঘড়ি বা বড় ঘড়ি-শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ১০ থেকে ১৫ জন লোক খেটে থাকে এবং ম্যানেজারই হ'ল ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক। মালিক ও কর্ম্মীর মধ্যে বড় একটা তফাৎ দেখা যায় না। কোন সুইস-সহরে গেলে দেখতে পাওয়া যায়, মালিক ও কর্ম্মীরা একই বাড়ীতে বাস করছে এবং ভাড়াটে মটরে চড়ে কারখানায় যাচ্ছে।

সুইজারল্যাণ্ডের প্রতিটি অধিবাসী যে কিরূপ আত্মনির্ভরশীল ও কর্ম্মঠ তা সেখানকার গোয়ালাদের কথা পর্য্যালোচনা করলে জ্ঞাত হওয়া যায়। সু-উচ্চ আল্‌পসের গায়ে তারা বাস করে। সাধারণতঃ ৭ বা ৮ একর জমির মালিক হচ্ছে এক-একটি গোয়ালা। পাথর, নুড়ি ইত্যাদি পরিষ্কার করে সেখানে সারমাটি দিয়ে সে অপর্য্যাপ্ত বিচালী জন্মায়। এই ঘাস সে গরুগুলিকে খাওয়ায়। মুরগীছানা ও শুকর পুষে থাকে। শক্ত মাটিতে জলসেচন করবার জন্য নিকটবর্ত্তী একটি পাহাড়িয়া নদীর জল কৌশলে কেটে নিয়ে আসে।

শীতকালে সেই গোয়ালা ও তার পরিবারস্থ সকলে নীচে সমতলভূমিতে নেমে আসে। তাদের একটা ছোট কারখানা আছে। নদীর জলের দ্বারা পরিচালিত একটা কুঁদও আছে। ঘড়ির বিভিন্ন অংশ, কাঠের পাত্রাদি এবং চুরুট প্রভৃতি তারা তৈরি করে। মেয়েরা সূচীকর্ম্ম করে ও তৃণাদি দ্বারা বেণী, খোঁপা ও ডালা প্রস্তুত করে। ঘড়ির অংশগুলি অন্য কারখানা হতে এনে সম্পূর্ণ রূপে জোড়া দিয়ে দেয়। এ কাজেও তাদের বিশেষ দক্ষতা পরিদৃষ্ট হয়। তাদের মজুরীও বেশী।

সুইসরা পরিবার নিয়ে একত্রে থাকতে ভালবাসে। তা বলে তারা উপত্যকার অন্যান্য পরিবারের সহিত মেলামেশা যে করে না তা নয়—বাস্তবিক নানাভাবেই উপত্যকাবাসীদের সহিত তারা সংযোগ রক্ষা করে থাকে। গ্রীষ্মকালে সকলের সমবেত চেষ্টায় নিযুক্ত রাখালের তত্ত্বাবধানে সকলের গরু পাহাড়ের তৃণবহুল সানুদেশে পাঠান হয়। গ্রামস্থ পনিরের কারখানা সমবায়-প্রতিষ্ঠান বিশেষ। প্রত্যেক চাষীরই তাতে অংশ আছে। অংশের অনুপাতে সে লাভ ও খবরদারি করে থাকে। সমবায় সমিতিতে প্রত্যেকের যোগদান করা ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তাকে পনিরের কারখানায় দুগ্ধ দিয়ে আসতে হয় না। কৃষক নিজে অন্যের সহিত কাজ করে; বৎসরান্তে কিছু জমাতেও পারে।

এইরূপ জীবন কঠোর কিন্তু শান্তিদায়ক। দিনান্তে টেবিলের একপাশে মেয়ে ও মা, অন্য পাশে ছেলেরা বসে এবং তাদের মাঝখানে সব্জির ঝোল, শুকর-মাংস, পনির ও জাল-রুটী থাকে।

কৃষকের বেলায় যা বলা হ'ল সুইস শ্রমিকদের বেলায়ও তা সত্য। কঠোর পরিশ্রম ও ব্যক্তিগত কর্ম্মকুশলতার দ্বারা তারা বেশ ভালভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ করতে পারে। তারা বেশীক্ষণ পরিশ্রম করে, দক্ষতাও তাদের অন্যের চেয়ে বেশী। তাদের জিনিষগুলো এত খাসা যে প্রতিবেশী দেশের কাঁচা মাল থেকে তৈরি পাকা মালগুলো সেই সেই দেশই আবার কিনে নিয়ে থাকে। রপ্তানীর ওপরই তাদের জীবিকা নির্ভর করে। বড় ঘড়ি, ছোট ঘড়ি, মাপযন্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, বারি-বিজ্ঞান যন্ত্র প্রভৃতি তাদের প্রস্তুত জিনিষগুলি বিশেষ উন্নত ধরণের। গুণাধিক্যই তাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির মূলে।

সুইস-সরকার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য আবিষ্কারের জন্য বেশ উৎসাহ দিয়ে থাকেন। আমেরিকা প্রতি বৎসর ১০ লক্ষে ৩৩০টি পেটেণ্ট মঞ্জুর করে থাকে। অপর পক্ষে সুইস-সরকার করে ৯৩০টি পেটেণ্ট। নূতন আবিষ্কারের জন্য প্রত্যেক কারিগর অনবরত গবেষণা ও পরীক্ষা করে থাকে। এটা কেবল বড় বড় কর্পোরেশনের গবেষণাগারে সীমাবদ্ধ নহে, ছোট ছোট ব্যবসায়-কেন্দ্র ও ব্যক্তিবিশেষও এ বিষয়ে উৎসাহী। প্রতিবেশী দেশের অধিবাসীদের অপেক্ষা সুইসদের উদ্ভাবনী-শক্তি ঢের বেশী। অবশ্য সুইজারল্যাণ্ডে শিল্পের জগতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত একথা মনে করবার কারণ নেই; এখানেও ধর্ম্মঘট, কারখানা-বন্ধ, তিক্ততা সৃষ্টি ও মারামারি চলে থাকে। তবে অন্য দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম।

এ দেশের শ্রমিকসঙ্ঘ বেশ জোরালো। আবার অনুরূপ কারিগর-সমিতিও আছে। কোনটিই অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানেই মজুরি, কাজের সময়, ব্যবসায়ের অবস্থা ও বিরোধ সমাধানকল্পে কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক কোম্পানীতে শিল্পী ও শ্রমিকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করার ব্যবস্থা

আছে। মিলিত সমিতিতে উভয় পক্ষের সমসংখ্যক সদস্য থাকে। এই সকল সভায় মালিকরা শুধু শ্রমিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করে না, শিল্পের আর্থিক অবস্থা, নীতি, তার অসুবিধা ও সম্ভাব্যতা এই বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনা হয়ে থাকে।

সুইস সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক আইন প্রণয়ন করে থাকে। এ বিষয়ে সুইসগণ তিনটি নীতি দ্বারা পরিচালিত—প্রথম, ব্যক্তিগত আত্মনির্ভরশীলতা ক্ষুণ্ণ করতে পারে এমন কোন আইন প্রণয়ন করা যাবে না; দ্বিতীয়, স্বেচ্ছায় প্রত্যেকে নিরাপত্তা রক্ষা করবে; তৃতীয়, স্থানীয় অবস্থা দৃষ্টে আইন বিধিবদ্ধ হবে।

একটি বড় কথা হ'ল এই যে সুইসরা নিজেরাই সাধারণের উপযোগী আইন প্রণয়ন করে থাকে—এর জন্য সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের ধার ধারে না। প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠানেই যুদ্ধের বীমা, বেকার বীমা, রুগ্নের সুবিধাদান ইত্যাদি বিষয়ের সুব্যবস্থা আছে। এতে মালিক, শ্রমিক এবং সরকারও চাঁদা দিয়ে থাকেন। প্রচলিত নিয়ম এই যে, যে রক্ষা-ব্যবস্থা না চায়, তাকে টাকা দিতে হবে না, আর এই সুবিধা থেকেও সে বঞ্চিত হবে। সুইসগণ ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে বিশ্বাসী, কিন্তু একচেটিয়া ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের বিরোধী। যখন কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিশেষ কারণে একচেটিয়া হতে বাধ্য হয় তখন সুইস-সরকার তাকে নিজের হাতে নেয় অথবা নিয়ন্ত্রিত করে।

সুইজারল্যাণ্ডে একটিমাত্র রেলওয়ে আছে এবং সেটি সরকারের অধীনে। চলাচল বিভাগ, পূর্ত্তবিভাগ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনবিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সরকার থেকে পরিকল্পনা করা হয় না। যেহেতু এ দেশের উৎপন্ন জিনিষপত্রের শতকরা ৯০ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয় সেইজন্য তারা অন্যান্য দেশের মুদ্রামূল্যের সমতা কামনা করে। সুইসগণ স্বাধীনতা ও সচ্ছলতা অবিভাজ্য বলে মনে করে—তাদের মতে একটি অপরটির পরিপূরক। যদিও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দিকে আধুনিকদের ঝোঁক বেশী এবং তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে তবুও ধনতান্ত্রিক দেশ শিল্পে ও ব্যবসায়ে উদারনীতি অনুসরণ ও ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা যে বণিক এবং ব্যবসায়ের ও কারখানার মালিকদের লাভ কম হয়ে শ্রমিকদের উন্নতি হতে পারে, সুইজারল্যাণ্ডের সমৃদ্ধির কারণ খতিয়ে দেখলে সেটা উপলব্ধি করা যায়।

তুমি আর আমি

শ্রীকরুণাময় বসু

সোনালি পাখার মতো তোমার শাড়ীর প্রান্ত উড়ায়েছ দূর মত পারে,
সৌন্দর্যের গিরিশৃঙ্গে চলো যাই দু'জনাতে, সেথা আছে বসন্ত আকাশ,
আধখানি বাঁকা চাঁদ লাজুক মেয়ের মতো দেখা দেবে ছায়া অন্ধকারে,
নির্ঝর ঝর্ঝর জলে বাজিবে তোমার চুড়ী, শালবনে ববে দীর্ঘশ্বাস।

চলো যাই লক্ষ্মী মেয়ে, পৃথিবীতে কাজ নাই, এ জীবন পিছে পড়ে থাক,
বিকীর্ণকুসুম বনে দু'জনে গাঁথিব মালা, কতো কথা হ'বে চোখে চোখে,
পড়িব করুণ স্বরে রবীন্দ্রের সুধাকাব্য, সে মুহূর্ত চকিতে মেলাক,
ভালো যদি লাগে তবে কুসুম-মঞ্জরী কটি বেঁধে দিব তোমার অলকে।

মৌমাছি গুঞ্জন ক্লান্ত বসন্তের ছায়া-রৌদ্রে নীলপুঞ্জ নিঃশব্দ আকাশ,
তার নিচে বয়ে যাবে নিঃসঙ্গ নদীর ধারা, তার তীরে বাঁধিব কুটির;
দিনগুলি উড়ে যাবে যেন কোন পথভোলা পরদেশী শূন্যচারী হাঁস,
নায়ক নায়িকা মোরা একান্ত নেপথ্যে র'বো, কেহ আসি করিবে না ভিড়।

চলো যাই, ফিরে যাই চাঁদের সোনালি দেশে, রূঢ় গদ্য পৃথিবী কি হবে?
এসো হেথা হাত ধরি মুখোমুখি দু'জনাতে, যদি মরি, মরিব নীরবে।

পুস্তক-পরিচয়

চারশ' বছরের পাশ্চাত্ত্য দর্শন—অধ্যাপক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। সংস্কৃতি বৈঠক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য ২।০।

সমালোচ্য পুস্তকটি সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে প্রথমেই বলিতে হয় গ্রন্থকারের ভাষার কথা। শুধু সরল নয়, এমন সরস বাংলা ভাষায় যে দর্শনশাস্ত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারা যায় তাহা নিশ্চয়ই অনেকেরই ধারণার অতীত। অধ্যাপক মহাশয়ের বলিবার ভঙ্গীও এরূপ মনোরম যে ভাল গল্পের বইয়ের মত পড়িয়া যাইবার একটি আগ্রহ শেষ পর্য্যন্ত স্বতঃই জাগরূক থাকে।

দর্শনশাস্ত্রের চিরন্তন বিষয়বস্তু সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ গত চারি শত বৎসর ধরিয়া যে ভাবে গবেষণা করিয়া আসিয়াছেন তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রায় গল্পের মত করিয়াই গ্রন্থকার এই পুস্তকে দিয়াছেন। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মৌলিক কোন কথা বলিবার অবশ্য তাঁহার অবসর ছিল না, বলেনও নাই। শুধু শেষের দিকে ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত ধারণা কিছু জানাইয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শন হইতেও যে শ্রদ্ধাভক্তির সহিত গ্রহণ করিবার অনেককিছু আছে উপসংহারে এই কথা তিনি বলিয়াছেন। সমালোচক এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার সহিত একমত। পাশ্চাত্ত্য দর্শন জড়বাদী বা পদার্থবাদী (materialistic) বলিয়া নাসিকাকুঞ্চনের সাহায্যে তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা এই দেশীয় অনেক তথাকথিত দার্শনিকের প্রায় ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া অধ্যাপক মহাশয় সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন।

এই ধরণের পুস্তকে স্বতঃই অনেক বিষয়েরই যথাযথ আলোচনা অসম্ভব, অনেক বস্তুই অনুল্লিখিত থাকিয়া যায়। মূল গবেষণা কিছু বা না পড়িলে এই অনুল্লেখ ত্রুটি বলিয়া ধরা যায় না। একটি কথা শুধু বলিতে চাই। গ্রন্থকার মনোবিজ্ঞানের আবির্ভাবের কথা যেখানে আলোচনা করিয়াছেন সেখানে ভুণ্ডট্-এর (Wundt) নামোল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রেরই অধ্যাপক ভুণ্ডট্ মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞানের আসরে আনয়ন করেন। মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে ফ্রয়েডের আসিয়া পড়া একটি আকস্মিক ঘটনা।

ছাপার ভুলের কথা গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে এগুলি আর থাকিবে না। Spinoza-র উচ্চারণ স্পিনোজা, স্পাইনোজা নয়। ৭৫ পৃষ্ঠায় যে ইংরেজী কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

But let a lord once own the happy lives,
How the wit frightens! How the style refines!
—*Pope's 'Essay on Criticism'*. Lines 420—2

প্রাচ্য দর্শন সম্বন্ধে এইরূপ একখানি মনোরম পুস্তক গ্রন্থকারের নিকট দাবি করিলে নিশ্চয়ই অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

পদব্রজা—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য। ডি. এম. লাইব্রেরী। মূল্য চার টাকা। পৃ. ২৩৩।

ঘরের বন্ধন কাটিয়া গেলে মানুষ যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায় তখনই তার সম্মুখের পথ নব নব বৈচিত্র্যের সন্ধান দেয়। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে সেই পথের দু-ধারে তাকাইবার কালে মন কখন যে তাহাতেই জড়াইয়া পড়ে—সে তথ্য সে নিজেও জানে না। এই ভাবে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণকালে শোকভারগ্রস্ত অন্তরের বেদনাকে লঘু করিবার প্রয়াসের মধ্যেই অলক্ষ্য-প্রসারিত স্নেহ-ভালবাসার সূত্রে নূতন করিয়া গ্রন্থি পড়ে, নব-সৃষ্টির কামনায় আবার সে চঞ্চল হইয়া উঠে।

নায়ক রাসবিহারীর জীবনে এই ধরণের বৈরাগ্য ও বন্ধনের চিত্রটি লেখক দক্ষতার সঙ্গে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তার পথ-চলার সঙ্গে বাংলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশের খানিকটা অংশ—সেখানকার বিভিন্ন নরনারীর চরিত্র, আচার-অনুষ্ঠান বিধি-বিধান সব মিলাইয়া যে ছবিগুলি পাওয়া যায় তাহা চমৎকার। কোথাও অতিরঞ্জন চোখে পড়ে না, কোন চরিত্রই প্রাণহীন বলিয়াও মনে হয় না। বিশেষ প্রশংসার কথা—উন্নত ধরণের ইক্ষু-চাষ ও শর্করা-শিল্প প্রতিষ্ঠার কথা গল্পাংশকে ব্যাহত করে নাই। শেষ পর্য্যন্ত ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণস্তূপে পথসন্ধানী মানুষকে অবলুপ্ত করিয়া দিয়া বিয়োগের সুরটি লেখক পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

হে নারী রহস্যময়ী—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ। বরেন্দ্র লাইব্রেরী। ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫৮, মূল্য ২৷০।

উপন্যাস। শ্রীযুক্ত বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ইতিপূর্ব্বে বড়দের, কিশোর এবং ছোটদের জন্ত বহু নানা জাতীয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসখানিতে পাকা হাতের মুন্সীয়ানার বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হইল। স্থানে স্থানে আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক জীবনের বহু জটিল অংশ লইয়া তিনি নাড়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু যতখানি শক্তির প্রয়োজন ছিল তার অভাবে ঘটনগুলি স্পষ্ট এবং গভীর হইয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই।

উপন্যাসের প্রধান নায়িকা জয়ন্তী এবং মৈত্রেয়ী। মৈত্রেয়ীকে চিনিতে কষ্ট হয় না। ভালবাসা তাকে আত্মত্যাগী করিয়াছে। সে ত্যাগ দয়িতকে সুখী দেখিতে সজাগ এবং সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু জয়ন্তীকে আগাগোড়া যে পরিবেশের মধ্যে পাইয়াছি—যে তেজস্বিতা এবং আত্মনির্ভরতা তার প্রতিটি কাজে এবং কথায় আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া আসিয়াছে, উপন্যাসের শেষে যেন সে জয়ন্তীকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অমিতাভকে সে ভালবাসিত এবং উভয়ের মধ্যে বিবাহের কথাবার্ত্তাও বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু যেহেতু অমিতাভ সোজা ভাষায় জয়ন্তীকে বিবাহ করিতে দ্বিধা দেখাইয়াছে সেই হেতু জয়ন্তী তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এই আশঙ্কায় পাছে তার নির্ম্মল ভালবাসায় কোথাও এতটুকু দাগ লাগে। ভাল কথা—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে শেখরকে বিবাহ করিল কিসের অনুপ্রেরণায়? নারীমনের রহস্য কি লেখক এই পথেই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন?

উপন্যাসে চম্পার আকস্মিক আবির্ভাব এবং তিরোধান ঘটান হইয়াছে নিতান্তই উপন্যাসের গতি ভিন্ন পথে চালনা করিবার জন্ত। কিন্তু অমিতাভের ভুল ভাঙ্গাইবার প্রয়োজনে চম্পার চরিত্রের যে দিকটা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তার প্রকাশ-ভঙ্গি চিত্তাকর্ষক হয় নাই।

ইডিয়ম সম্বন্ধেও বলিবার আছে—যেমন "গোগ্রাসে চা গেলা"। এরূপ অপপ্রয়োগ আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধিত হইবে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দৃষ্টিপাত—যাযাবর। নিউ এজ পাবলিশার্স লিঃ, ২২ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৩৲ টাকা।

বাংলা ভাষায় গত কয়েক বৎসরে যে অল্প কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে 'দৃষ্টিপাত' তাহাদের মধ্যে একটি, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। ইংরেজী সাহিত্যে যাহাকে বেলে-লেটার্স বলা হয়, 'দৃষ্টিপাত' সেই ধরণের বই। চৌদ্দটি পত্রের সমষ্টিতে বইখানি সম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি পত্রের নিজস্ব বিশেষত্ব আছে, আবার সবগুলি পত্রের সমষ্টি এই বইখানিকে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থের রূপ দান করিয়াছে। পত্রগুলির রচনাস্থল নয়া দিল্লী এবং উপলক্ষ্য ক্রিপস মিশন। পত্রলেখক সাংবাদিক। সমাজের মর্ম্ম-

স্থলে তাঁহার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যেমন সঞ্চালিত হইয়াছে, তেমনি ইতিহাসের পুরানো পাতার উপরেও প্রতিফলিত হইয়া পুরাতন কাহিনীকে নূতন আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। দিল্লীর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্গ, দরগা, দীঘি অথবা মিনারের বর্ণনার সহিত উহাদের প্রাচীন ইতিহাস এত গভীর দরদ দিয়া ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে যে, প্রতিটি স্মৃতিসৌধ যেন জীবন্ত হইয়া চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে। চতুর্থ পত্রে সম্রাট সাজাহানের নন্দিনী জাহানারার সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া লেখক বলিতেছেন, " াহানারার অনুগ্রহে ইংরেজেরা বাণিজ্য নিরঙ্কুশ করলেন ভারতবর্ষে, সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপনা করলেন সকলের অলক্ষ্যে। সেই জাহানারার চরিত্রেই কলঙ্ক আরোপ করে ইতিহাস রচনা করেছে ইংরেজ। এতে বিস্মিত হই নে। যে সিভিলিয়ান ভারতবর্ষের পেন্সনে ষ্ট্যাফোর্ডশায়ারে বাড়ী হাঁকিয়ে আছেন, তিনিই ভারতের নিন্দা করেন সবচেয়ে জোর গলায়। লিওপোল্ড এমারীই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু, কারণ তাঁর জন্মস্থান গোরখপুরে।"

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের জাতীয় চরিত্রের উপর লেখকের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। দশম পত্রটিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ভারতবাসীকে সামরিক ও অসামরিক জাতিতে ভাগ করার উদ্দেশ্য ও তাহার কুফল আলোচনা করিয়া লেখক বলিতেছেন, "কোন বিশেষ অঞ্চল থেকে সৈন্য সংগ্রহের সুবিধা এই যে, তার ফলে একটা নতুন জাতি প্রথা সৃষ্টি করা চলে।…পুরুষানুক্রমে পিতামহ থেকে পিতা এবং পিতা থেকে পুত্রে সেই বৃত্তি প্রসারিত হয় এবং একই বাহিনীতে বংশপরম্পরা চাকুরির দ্বারা বাহিনীর প্রতি একটা কায়েমী স্বার্থবোধ জাগে।…বিদেশী শাসকের পক্ষে শাসন-যন্ত্রের প্রতি শাসিতদের এই মমত্ববোধসৃষ্টির সার্থকতা সামান্য নয়।" সামরিক জাতির প্রতি এই পক্ষপাত বৃটিশ শাসনের পক্ষে সহায়ক হইয়াছে সন্দেহ নাই। পঞ্জাবের বর্ত্তমান অধঃপতনের অন্যতম মূল কারণও ইহাই। সিপাহী বিদ্রোহের সময় পঞ্জাব ছিল একমাত্র প্রদেশ যেখানে ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশীয় জনগণ অস্ত্র ধরে নাই। আধুনিক কালেও পঞ্জাবে জাতীয় জাগরণের চিহ্ন অনেকটা ক্ষীণ। সাধারণ পঞ্জাবী সচ্ছল জীবনযাত্রা, মোটা আয়, অজস্র আহার ও দামী পোশাক পাইলেই খুশী থাকে, দেশ লইয়া বড় একটা মাথা ঘামায় না। ভগৎ সিংহেরা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। সেনাবাহিনীর সংহিতায় বাঙালীরা 'হরিজন' এবং কেন তার কারণ সকলেরই জানা আছে।

প্রত্যেকটি চিঠি এক দিকে যেমন ঐতিহাসিক তথ্যের সমাবেশে সারগর্ভ, তেমনি অপর দিকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত চরিত্র-চিত্রণে উজ্জ্বল। গাম্ভীর্য্য ও তরলতা, ইতিহাস ও প্রেমের কাহিনী কেমন করিয়া এক একটি পত্রের স্বল্পপরিসরে অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিতে পারে 'দৃষ্টিপাত' তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শ্রীদেবজ্যোতি বর্ম্মণ

জয়হিন্দ বা সোনার স্বপন (নাটক)—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী। আলবার্ট লাইব্রেরী। নবাবপুর রোড, ঢাকা। মূল্য—১।০

'জয় হিন্দ' বা 'সোনার স্বপন' একখানি প্রতীক-নাট্য (Symbolic Drama)। মাটী, সাগর, বায়ু, আগুন প্রভৃতিকে যথাক্রমে চাষী, নাবিক, শ্রমিক ও শৃঙ্খলিত ভারতীয় রূপে কল্পনা করিয়া জাতির পরবশ্যতার দুঃখ, বিদেশী শাসনের নিষ্ঠুর পীড়ন এবং শেষ পর্য্যন্ত ঐক্যবদ্ধ জাতির স্বাধীনতা লাভের কাহিনীই নাট্যকার এই নাটকে রূপকচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন। আজ নাট্যকারের 'সোনার স্বপন' বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। সম-সাময়িক রাষ্ট্রীয় আন্দোলন চিরকাল লেখকদের কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। বর্ত্তমান নাট্যকারও জাতির মুক্তি-সংগ্রামের বিপুল আবেগকে রচনার মধ্যে দিয়া পাঠকের মনে সঞ্চালিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং কিছু সাফল্যও লাভ করিয়াছেন। এইজন্য তিনি প্রশংসার দাবি করিতে পারেন। কিন্তু পাত্রপাত্রীর মুখে, সংলাপের ভিতর দিয়া কাহিনীর প্রতি-বিস্তার বা কোন মহৎ তত্ত্ব প্রচারই নাটকের বড় কথা নয়। নাটকের নিজস্ব একটা ধর্ম্ম আছে। গঠন-পদ্ধতি পরিবেশন-কৌশলে নাট্যকার যেমন খুশি নূতনত্বের আমদানী করুন ক্ষতি নাই, কিন্তু তাঁহাকে নাটকের সেই বিশিষ্ট 'ধর্ম্ম' ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আলোচ্য নাটকে নাটকীয় সংঘাতের অভাব এবং দীর্ঘ বক্তৃতা-গন্ধী সংলাপের দরুন নাট্যরস বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে—লেখককে নাট্যরচনার এই মূল নীতির কথা স্মরণ রাখিতে বলি। সঙ্গীতাংশ চমৎকার। শেষের গানটিতে বিশেষ শক্তির পরিচয় আছে।

তরঙ্গ—শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পুস্তকালয়, ২৯ বাদুড় বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে দেশের রাজনৈতিক মুক্তি-আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া উপন্যাস ও নাটক রচনার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় তন্মধ্যে বেশীর ভাগই প্রচারমূলক হওয়ায় সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে সার্থক হইয়া উঠিতে পারিতেছে না। 'তরঙ্গ' নাটকখানিও রাজনৈতিক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত হইলেও, ঠিক সেগুলির সগোত্র নহে। লেখক নিজেকে কাহিনী হইতে নির্লিপ্ত রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়া নাটকটি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের এক পল্লীকে পটভূমিকা করিয়া লেখক এই নাটক রচনা করিয়াছেন। পল্লীর জনজাগৃতি, দেশের মুক্তিকল্পে পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমানের মিলিত চেষ্টা, সরকারের দমননীতি, হিন্দু-মুসলমান বিরোধের পূর্ব্বাভাস, এই সমস্ত বিষয়কে একটি সূক্ষ্ম, সুদৃঢ় নিরবচ্ছিন্ন সূত্রে বিধৃত করিয়া তিনি কাহিনীটিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। গোপাল, নন্দ, মইনুদ্দীন প্রভৃতি গ্রাম্য লোকের মুখে পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষা ব্যবহার করায় সংলাপ অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে এবং নাট্যকারের পক্ষে বিশেষ কৃতিত্বের কথা যে ইহাতে রসসৃষ্টি কোথাও ব্যাহত হয় নাই। এই ভাষা নাটকের চরিত্রগুলির ভাবাবেগ প্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। দিগিন্দ্রবাবু পূর্ব্ববঙ্গের কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের আসরে জাতে তুলিয়াছেন। নাটকের শেষ দৃশ্যটি সবচেয়ে বেশী উৎরাইয়াছে এবং কাহিনীটি একটি অপূর্ব্ব নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। গোপালের শেষ উক্তিটি সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত, লেখক ঐ দৃশ্যের গোড়ার দিক হইতে এমন চমৎকার 'সিচুয়েশান' সৃষ্টি করিয়া আনিয়াছেন যে, তাহা মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের মর্ম্ম-কথাটি বড় সুন্দরভাবে বলিয়াছেন।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

জগতের সেরা মানুষ (সচিত্র)—শ্রীপ্রভাত বসু। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং। ৮সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৬৯, মূল্য ৸০।

ছেলেদের উপযোগী সহজ সরল ভাষায় বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, হজরত মোহম্মদ, গুরু নানক ও শ্রীচৈতন্য জগতের এই পাঁচ জন শ্রেষ্ঠ মহামানবের জীবনকথা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহাত্মা গান্ধীর

জীবনী এই সঙ্গে গ্রথিত হইলে বইটি আরও উপাদেয় হইত। যাহাতে অল্প বয়স হইতে ছেলেদের মনে ধর্ম্মশিক্ষা এবং মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও মহান্ আদর্শ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান জন্মে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই ধরণের পুস্তকের যতই প্রচার হয়, ততই দেশের মঙ্গল।

অভয়-বাণী—শ্রীফণীভূষণ বিশ্বাস। প্রকাশক—শ্রীঅরুণকুমার বসু, বিশ্বাস-নিকেতন, কৃষ্ণনগর। পৃ. ৩২, মূল্য ।•

কবিতার বই। ঘুম-ভাঙানো, দেশ-জাগানো মুক্তিমন্ত্রের অভয়-বাণী বিঘোষক কবিতাগুলি পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। ছন্দের উপর লেখকের বেশ দখল আছে, কবিতাগুলিতে নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের ছাপ খুব বেশী ধরা পড়ে। কয়েকটি বানান ভুল বিসদৃশভাবে বইটির সৌন্দর্য্যহানি করিয়াছে।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

তৃষিত মরু—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। রবীন্দ্র পাবলিশিং হাউস; ৫০, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৩৲ টাকা।

উপন্যাসটির আখ্যানবস্তু জটিল, অনেকগুলি নরনারীর চরিত্র এবং বহু-বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে পুস্তকটিতে। তবে মূলতঃ করবীর সহিত কবি সন্দীপের বাল্যপ্রেম লইয়া ইহার আরম্ভ এবং করবীর অন্তরের একটি মহান আদর্শের মধ্যে ইহার সমাপ্তি—লেখক নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। কণিকা ও প্রদীপের স্নেহের আবেষ্টনীতে করবীর অন্তরের পরিপুষ্টি এবং ছন্দার সাহচর্য্যে সন্দীপের জীবনে বৈচিত্র্যের বিকাশ বিশেষ উপভোগ্য। নিবারণ নামক জনৈক ব্যক্তির আবির্ভাবে ছন্দার জীবনে ছন্দপতনের সূচনা ইত্যাদির মধ্যে যে মনস্তাত্ত্বিক নিগূঢ়তা আছে তাহা পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে। মালবিকার চরিত্রটিও ভালই ফুটিয়াছে—কিন্তু তাঁহার অঙ্কিত বাংলার পল্লীর সমাজ-জীবনের চিত্র, সংঘা এবং সংস্কার দ্বারা প্রভাবিত পিতার চরিত্র যেন একটু অস্বাভাবিক ও বিসদৃশ মনে হয়।

শেষের দিকে পরাগের চরিত্রে যে দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা লেখক দেখাইয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। কয়েকটি মারাত্মক ছাপার ভুল নজরে পড়িল। প্রচ্ছদপট সুন্দর।

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ—শ্রীললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—১৸•।

ভারতবর্ষ আজ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। পূর্ণ স্বাধীনতা এখনো আমাদের করায়ত্ত হয় নাই বটে, কিন্তু স্বাধীনতার পথে আমরা যে অনেকদূর আগাইয়া আসিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। গোড়া হইতেই এই স্বাধীনতা আন্দোলন দুইটি পথ ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে—একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ, আর অপরটি বৈপ্লবিক পন্থা। এই বৈপ্লবিক আন্দোলনে বাংলাদেশ সমগ্র ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

বাংলার বিপ্লব আন্দোলনকে দুই অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতি প্রথম অধ্যায়ের নায়ক। ১৯১৪ সাল হইতে বিপ্লব আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হয়। ১৯১৫ সালে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র ভারত-ব্যাপী বিদ্রোহের যে পরিকল্পনা করা হয়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাহাতে বাংলাদেশের নেতৃপদে বৃত হন। বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অধিনায়করূপে যতীন্দ্রনাথ ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বালেশ্বরের—কোপতিপোদার জঙ্গলে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে তাঁর মৃত্যুবরণের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী যুগ যুগ ধরিয়া সকল দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকদের অনুপ্রাণিত করিবে।

বর্ত্তমান পুস্তকে বাংলার এই বিপ্লবী বীর সন্তানের আংশিক জীবনকাহিনী প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। লেখক যতীন্দ্র-নাথের মাতুল। তাঁহার সহকর্ম্মীরূপে বৈপ্লবিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি যথেষ্ট নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন এবং যতীন্দ্র নাথকে বুঝিবার ও জানিবার দুর্ল্লভ সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তিনি বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের প্রকৃত স্বরূপটিকেই ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পুস্তকের ভাষা ওজস্বিনী এবং বর্ণনা আবেগমুখর। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, একটা পুরুষসিংহের জীবনকাহিনী পড়িতেছি বটে!

এই কাহিনীতে বর্ণিত যতীন্দ্রনাথের জীবনের যাবতীয় ঘটনা এই কথাই আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে তার "বাঘা যতীন" উপাধি সর্ব্বতোভাবে সার্থক হইয়া ছিল। যে বৈপ্লবিক আন্দোলনের পটভূমিকায় যতীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন ও জীবনাদর্শ ক্রম-

বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, গ্রন্থারম্ভে তাহার স্বরূপ-বিশ্লেষণে লেখক নিজের যুক্তিবাদী মন ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকের উপসংহারটি চমৎকার—তাহা সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর।

লেখক যতীন্দ্রনাথের জীবনের যতটুকু কাহিনী আমাদের শুনাইয়াছেন সেজন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞ, কিন্তু মনে হয়—তিনি আমাদের ক্ষুদকুঁড়া দিয়া বিদায় করিয়াছেন। সাধারণ পাঠক শুধু যতীন্দ্রনাথের বিপ্লব-প্রচেষ্টার কথা জানিয়াই পরিতৃপ্ত হইবে না—সবলতা-দুর্ব্বলতা, দোষ-গুণ সবকিছু লইয়া 'মানুষ' যতীন্দ্রনাথকে পুরাপুরি জানিবার জন্য তাহার আগ্রহের অন্ত নাই। এই পুস্তকের সেই আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি কিন্তু হইবে না।

যুযুৎসু জাপান—শ্রীরামনাথ বিশ্বাস। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য তিন টাকা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান হঠাৎ পার্ল হারবার আক্রমণ করিয়া সমস্ত পৃথিবীর বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছিল। সাম্রাজ্যবাদের বুভুক্ষাই যে সেদিন তাহাকে মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। যুযুৎসু জাপানের পররাজ্য-গ্রাসের উৎকট মনোবৃত্তির পরিচয় কিন্তু পাওয়া যায় ১৯৩১ সাল হইতেই যখন সে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। বিখ্যাত ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাস এই সময়েই সাইকেলে জাপানে বেড়াইতে যান। তিনি জাপানের কোবে, ওসাকা, নারা, ইয়াকোহামা, টোকিও প্রভৃতি নগরীতে পর্য্যটন করিয়া জাপান ও জাপানীদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। ইতিপূর্ব্বে বিদেশে জাপানীদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহার যে ধারণা হয় খাস জাপানে গিয়া তাহা বদলাইয়া যায় এবং দোষত্রুটি দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও জাপানীদের জাতিগত মহত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন হইয়া উঠেন। একটা জাতিকে পুরাপুরি ভাবে জানিতে হইলে দেশের যারা প্রাণ, জাতির যারা মেরুদণ্ড সেই সমস্ত গরীব লোকদের সঙ্গেই প্রাণ খুলিয়া মেলামেশা করা দরকার। রামনাথ বাবু একদা ভিক্ষার ঝুলি হাতে লইয়া নিঃসম্বল অবস্থায় ভূপর্য্যটনে বাহির হইয়া ছিলেন, অন্যান্য স্থানের ন্যায় জাপানের দরিদ্র লোকেরাই তাঁর ঝুলি পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া তিনি জাপানের সমাজ-জীবনের ভিতরের কথা যতটা জানিতে পারিয়াছিলেন কেবলমাত্র পুস্তক পাঠ করিয়া বা বাহির হইতে ভাসা ভাসা ভাবে দেখিয়া তাহা অবগত হওয়া সম্ভব নহে।

যুযুৎসু জাপানের কথা রামনাথবাবু বড় চিত্তাকর্ষক ভাবে বলিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ-কথা গল্পের মত মনকে শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। ভাষার মারপ্যাঁচ নাই, বিদ্যা ফলানোর উৎকট প্রয়াস নাই—নিজের চোখে যেমনটি তিনি দেখিয়া থাকেন এবং নানা মুনির মুখে নানা মত ও পথের যে সমস্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন কেবলমাত্র তাহাই বর্ণনা করিয়া যান। তাঁর চোখ দিয়া একটা দেশের আসল চেহারিটিকে যেন আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই।

পুস্তকটিতে বর্ণনা আছে, চিন্তা আছে—কতকগুলি কাহিনী রচনাকে আরো সরস করিয়াছে। 'জাপানের বাহাদুর ছেলের বীরত্ব-কথা' আর 'রাসবিহারী বসুর রোমাঞ্চকর জীবন কথা' এই সুন্দর ভ্রমণ-কাহিনীকে অধিকতর উপভোগ্য করিয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

পুরোহিত-দর্পণ—পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সঙ্কলিত এবং কলিকাতা, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ শ্রীগুরু লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। পৃ. ১০১৬। মূল্য নয় টাকা।

পুরোহিত ব্রাহ্মণদের এবং ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু নরনারীদের একান্ত প্রয়োজনীয় নিত্যকর্ম, দেবদেবীপূজা, ব্রতকথা স্তবমালা এবং ক্রিয়াকাণ্ডের বিধিসম্বলিত এই বিরাট্ গ্রন্থের ২৮তম সংস্করণ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

দেশ-বিদেশের কথা

বিবেকানন্দ স্মৃতি-মন্দির ও ভবন

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি ইংরেজী ১৯০২ সনে ভগিনী নিবেদিতা কর্ত্তৃক স্থাপিত একটি ধর্ম্ম ও সেবা প্রতিষ্ঠান। চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ এই প্রতিষ্ঠান ভারতের জাতীয় আদর্শ—ত্যাগ ও সেবায় মহান্ ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সোসাইটি বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় দীর্ঘকাল যাবৎ বিবিধ জনহিতকর কার্য্য করিয়া আসিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-রক্ষাকল্পে কলিকাতা নগরীতে একটি উপযুক্ত স্মৃতিমন্দির ও ভবন নির্ম্মাণ সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য। এই মহৎ উদ্দেশ্যের সাফল্য দেশবাসীর অর্থ-সাহায্য, অকুণ্ঠ সহানুভূতি ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করিতেছে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটির জন্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার কাছাকাছি ইতিমধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে। এই স্মৃতি-মন্দিরের জন্য যিনি যাহা দান করিবেন তাহা সম্পাদক, বিবেকানন্দ সোসাইটি, ২১, বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।



স-রস তরু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীমাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়



কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর—সাধারণ দৃশ্য



ঝিলাম নদীতীরের দৃশ্য

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৭শ ভাগ ২য় খণ্ড | অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলার সমস্যা

বাংলার সমস্যা ক্রমেই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। এমনিই দেশে নিদারুণ অন্নবস্ত্রের অভাব, খালি ঘরবাড়ী তো নাই বলিলেই হয়, উপরন্তু উদ্বাস্তু ও সন্ত্রস্ত আশ্রয়প্রার্থীর দল বাড়িয়াই চলিয়াছে। কাজকর্মের বিশৃংখলা, শ্রমিকনেতা ও তথাকথিত কম্যুনিষ্ট দলের কৃপায় বাড়িয়াই চলিয়াছে। বাংলা দেশের আয়ব্যয়ের হিসাব-খতিয়ানের কৈফিয়ৎ এখনকার মত ভাল, কেননা কেন্দ্রীয় সরকার এত দিন দু'হাতে যে টাকা ঢালিয়াছেন তাহা হইতে লীগমন্ত্রীদলের লুটপাট সত্ত্বেও কোষাগারে কিছু রস থাকিয়া গিয়াছিল, সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের তহবিলে বৎসরের শেষে তিন কোটি টাকাও উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে বলিয়া আশা দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ পরিশোধের কথা এখন ভাবিতে হয় নাই, নহিলে অবস্থা বিপরীত দাঁড়াইত। কিন্তু তিন কোটি টাকায় দেশের গঠন ও রক্ষণের কাজ কতটাই বা অগ্রসর হইবে?

খাদ্যাভাবের জন্য চাষের জমি বাড়াইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জমির উৎপাদন শক্তিও অনেক বাড়াইতে হইবে। অন্যান্য অভাব পূরণের জন্য দেশের লোকের আয় বাড়াইতে হইবে, শিল্পে, বাণিজ্যে, কৃষিতে, খনিতে ও অরণ্যে অতি শীঘ্রই আয় বৃদ্ধির ও উন্নতির পথ বাহির করিতে হইবে; কেননা দেশের দুর্দশা বৃদ্ধি যে ভাবে হইতেছে তাহাতে বাংলার ও বাঙালীর চরম দুর্গতির দিন আসিতে আর বেশী দেরি নাই। কিন্তু সে পথ খুঁজিবেই বা কে এবং সে কথা ভাবিবেই বা কে? যে বাক্যবাগীশ বুদ্ধিমানের দলের হাতে দেশ এখন রহিয়াছে তাঁহারা ফাঁকি দিয়া স্বার্থসিদ্ধিতেই পটু এবং ততোধিক পটু তোতাপাখীর মত ঊর্দ্ধতন নেতৃবর্গের শিখানো ফাঁকা বুলি আওড়াইতে।

আজ প্রায় ছয় মাস যাবৎ ইঁহারা পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধাররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। প্রথম আড়াই মাস কাটাইয়াছেন লীগদলের সঙ্গে ছায়ারূপে অর্থাৎ "শ্যাডো ক্যাবিনেটে"—এবং তৎপরে, ক্ষমতাপ্রাপ্তি ঘটিবার পর, বিরাজ করিয়াছেন আরও তিন মাসের উপর। অবশ্য আমরা অনেকের মুখেই শুনিতেছি যে কাজ দেখাইবার মত সময় ইঁহারা এখনো পান নাই। কিন্তু যোগ্যতার পরিচয় মাত্র দিবার পক্ষেও কি ছয় মাস সময় যথেষ্ট নয়? বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং এই সভার সভ্যগণের খাতিরে আমাদের আরও কিছু সময় হয়ত দেওয়া উচিত, যাহাতে তাঁহারাই এই যাচাইয়ের কাজটা করিয়া অন্ততঃপক্ষে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণটাও দিতে পারেন। অতএব আমরা আরও এক মাস পরে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলের যোগ্যতার বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিব এবং সেই সঙ্গে যাঁহারা দেশোদ্ধারে ব্রতী বলিয়া বিভিন্ন লেবেল লাগাইয়া দেশের প্রতিনিধিরূপে ব্যবস্থাপক সভায় আসন লাভ করিয়াছেন তাঁহাদেরও কৃতিত্বের আলোচনা করিব।

সময়ের বিষয়ে যাঁহারা উদারভাবে লম্বা ফরমাইশ করেন এবং দেশে শান্তি-শৃংখলা ও রামরাজ্য স্থাপিত হইবার আশায় ধৈর্যের সহিত বসিয়া থাকিতে বলেন তাঁহাদের প্রতিও আমাদের কিছু নিবেদন আছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুর অভাব নাই, মিত্রের একান্ত অভাব। ঘরের ভিতরে বিশ্বাসঘাতকের দল স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিত্যই চতুর্দিকে গোলমালের সৃষ্টি করিতেছে, যাহার ফলে দেশের শিল্প ও কৃষির উৎপাদন-ক্ষমতা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে ও দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া চলিয়াছে, উপরন্তু আছে অর্থপিশাচ চোরাকারবারির দল যাহাদের চক্রান্তে আজ চতুর্দিকে অভাব-অনটন বাড়িয়াই চলিতেছে। দেশের বৃহৎ সাধারণের দুর্দশা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে, কমিবার কোনই লক্ষণ নাই, অবশ্য বক্তৃতা ও উপদেশের অভাব নাই, অভাব কেবলমাত্র ব্যবহার। ঘরের বাহিরে আছে বিদেশী শত্রু, নূতন ও পুরাতন, যাহাদের গুপ্তচর ও পঞ্চমবাহিনী

আমরা কেবলমাত্র কাশ্মীরের জন্যই এই সঙ্কটপূর্ণ দিন কাটাই নাই, সমগ্র ভারতবর্ষের জন্যও। সেই বিপদ বর্তমানে কম কিন্তু এখনও তাহা কাটে নাই। আমাদের সম্মুখে অনেক বিপদ আসিতেছে। যে কোন অবস্থার জন্য আমাদিগকে অত্যন্ত সজাগ ও প্রস্তুত থাকিতে হইবে। প্রস্তুতির প্রথম ধাপ হিসাবে ভারতে সর্বোপায়ে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান ঘটাইতে হইবে এবং আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হইতে গেলে এক ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে দাঁড়াইতে হইবে। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকিলে এবং জাতি সুগঠিত হইলেই কার্যকরীভাবে বাহিরের বিপদের সম্মুখীন হওয়া যায়।

আমরা কাশ্মীরে আক্রমণকারী ও হানাদারদের কথা বলিয়া থাকি ; কিন্তু এই সমস্ত লোক সশস্ত্র ও সুশিক্ষিত এবং তাহাদের উপযুক্ত নেতা আছে। এই সমস্তই পাকিস্থান হইতে ও তাহার মধ্য দিয়া আসিয়াছে। ইহারা কেন এবং কি করিয়া সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া আসিতে সমর্থ হইল এবং কিরূপে তাহারা অস্ত্রসজ্জিত হইল তাহা পাকিস্থান গবর্মেণ্টকে জিজ্ঞাসা করার অধিকার আমাদের আছে। ইহা কি আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গ নয়? ইহা কি প্রতিবেশী দেশের বিরুদ্ধে অসুহৃদের কাজ নয়? পাকিস্থান গবর্মেণ্ট কি এতই দুর্বল যে, তাহারা অন্য দেশ আক্রমণের জন্য তাহাদের অঞ্চলের মধ্য দিয়া অস্ত্রশস্ত্র আসা বন্ধ করিতে পারেন না? অথবা ইহাই কি তাঁহাদের ইচ্ছা? তৃতীয় কোন কারণ নাই।

হানাদারদের আসা বন্ধ করিতে এবং যাহারা আসিয়াছে তাহাদিগকে সরাইয়া লওয়ার জন্য আমরা পাকিস্থান গবর্মেণ্টকে বার বার অনুরোধ করিয়াছি। ইহাদের আসা বন্ধ করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ। কারণ কাশ্মীরে যাওয়ার পথ খুব কম এবং কতকগুলি পুলের উপর দিয়া যাইতে হয়। আক্রমণের বিপদ কাটিয়া গেলে কাশ্মীরে আমাদের সৈন্যদলকে কাজে লাগানোর ইচ্ছা আমাদের নাই। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, কাশ্মীরের ভাগ্য জনসাধারণই নিয়ন্ত্রণ করিবে।

কেবলমাত্র কাশ্মীরের জনগণের নিকটই আমরা এ প্রতিশ্রুতি দিই নাই, সমগ্র বিশ্বের নিকটই দিয়াছি। মহারাজও তাহা সমর্থন করিয়াছেন। আমরা এই কথা খেলাপ করিতে পারি না এবং করিব না ; শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইলে পর সম্মিলিত যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে গণভোট গ্রহণ করিতে আমরা প্রস্তুত। আমরা জনগণের নিকটই ইহা প্রেরণ করিতে চাই এবং তাহাদের সিদ্ধান্তই আমরা মানিয়া লইব। আমি ইহা হইতে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবের কথা ভাবিতে পারি না। ইতিমধ্যে আক্রমণকারীদের হাত হইতে কাশ্মীরকে রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি আমরা কাশ্মীরের অধিবাসীদিগকে দিয়াছি তাহা আমরা রক্ষা করিব।

লিয়াকৎ আলি খানের বক্তব্য

মিঃ লিয়াকৎ আলি খানের পূর্ণ বেতার-বক্তৃতাটি নিম্নরূপ :

অদ্য রাত্রে আমি আপনাদের নিকট রোগশয্যা হইতে এই আলোচনা করিতেছি। আপনাদের নিকট আমি কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা করিব, কারণ কাশ্মীরের পরিস্থিতি বর্তমানে এক সঙ্কটজনক পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। আমি জানি, আমার ন্যায় আপনাদেরও মনে কাশ্মীর সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করিতেছে।

নিজেদের বহুবিঘোষিত শৌর্য ও বীর্যে আত্মহারা হইয়া কাশ্মীরের নির্যাতিত জনগণের কতিপয় তথাকথিত অত্যুৎসাহী সহানুভূতিশীল ব্যক্তি এই মনোরম জনপদের ইতিহাস ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং তাহাদেরই হিতার্থে আমরা সংক্ষেপে উহার আলোচনা করিতে পারি।

কাশ্মীরের পর্বত ও উপত্যকার অধিবাসীসহ আল্লার সৃষ্ট এই মনোরম জনপদ কুখ্যাত অমৃতসর-চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ কর্তৃক সামান্য ৭৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এক ডোগরা প্রধানের নিকট বিক্রীত হয়। কাশ্মীরের বর্তমান মহারাজা কাশ্মীরের জনগণকে গো-মহিষাদি পশুর ন্যায় পূর্বপুরুষের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছেন। ব্রিটিশ কর্তৃক বিক্রীত নির্যাতিত দাসদের রক্তস্রোত বহাইয়া বর্তমানে ভারতীয় সৈন্যদল শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়া এই নীতি-বিরুদ্ধ ও বে-আইনী মালিকানা রক্ষা করিতেছে।

অতীত শত বৎসরের ডোগরা শাসনে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ও সর্বাধিক আকর্ষণীয় কাশ্মীরী জাতি দুর্ভাগ্যের চরম পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে। সাম্প্রতিক কয়েক বৎসরে তাহারা স্বাধীনতা-সংগ্রামের বহু চেষ্টা করিয়াছে। বারংবার তাহাদিগকে দমন করা হইয়াছে এবং বারংবার তাঁহারা অত্যাচার মুক্ত হইবার জন্য জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।

অক্টোবর মাসের প্রারম্ভ হইতে কাশ্মীরের নিরপরাধ জনগণের উপর পৈশাচিক অত্যাচারের ছিটেফোঁটা সংবাদ পাওয়া যাইতে থাকে। অনতিকাল মধ্যেই এইরূপ সংবাদ স্রোতধারার মত পৌঁছিতে থাকে। মারি পাহাড় হইতে প্রজ্বলিত গ্রামসমূহের দৃশ্য দেখা যাইতে থাকে। সহস্র সহস্র আতঙ্কগ্রস্ত শরণাগত পাকিস্থানে প্রবেশ করিতে থাকে।

এইরূপ অবস্থায় কাশ্মীরের জনগণ মরিয়া হইয়া জালেমদের বিরুদ্ধে ফিরিয়া দাঁড়ায়। হাজরা ও পশ্চিম পঞ্জাবে কাশ্মীরীদের ও বিশেষভাবে পুঞ্চবাসীদের বহু আত্মীয়স্বজন রহিয়াছে। ফলে পাকিস্থানের কোন কোন অংশের মনোভাব বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও উপজাতীয় অঞ্চলের কতক লোক কাশ্মীরের জুলুমে বিচলিত হইয়া তাহাদের ভ্রাতৃবৃন্দের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়। ইহা কাশ্মীরের নির্যাতিত, দাসত্বে আবদ্ধ ও জালবদ্ধ জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং তাহাদের ও তাহাদের প্রতি

সহানুভূতিশালীদের জীবনরক্ষার সংগ্রাম—যাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ভারত-সরকার সাহায্য করিতেছেন। ভারত-সরকারের বিঘোষিত নীতি হইতেছে মহারাজার হস্তকে বলিষ্ঠ করা। এই হস্ত যে কতটা শোণিতসিক্ত, ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাহা ভালভাবেই জানেন, যদিও তাঁহারা বর্তমানে সুবিধামত উহা ভুলিবার চেষ্টা করিতে পারেন।

তথাকথিত হানাদারদের উপর ইচ্ছা করিয়াই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে, যেন কাশ্মীরের জনগণ আকস্মিকভাবে শতাব্দীর নির্যাতনের স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছে এবং জালেম নির্যাতনকারীর প্রেমে রাতারাতি মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ জনগণের বিদ্রোহকে বাহিরের কতক লোকের সহানুভূতি আছে বলিয়াই বহিরাক্রমণ বলিয়া ঘোষণা করা ইতিহাসের অসাধু পুনর্লিখন ব্যতীত আর কিছুই নয়। সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে আধুনিক অস্ত্র প্রয়োগের অভিযোগ করিয়া বহু আলোচনা করা হইয়াছে এবং উহার খুঁটিনাটি বিষয় লইয়া অবমাননা ও পরোক্ষ ইঙ্গিতের একটা বিরাট কাঠামো তৈরি করা হইয়াছে। ইহা অবশ্য ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছে যে ভারতের আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীর সহিত সংগ্রামরত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে পঞ্চাশ-যাট হাজার প্রাক্তন সৈনিকের অন্তর্ভুক্ত, যাহারা শত্রুদের নিকট হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইতে মোটেই অসমর্থ নহে।

হানাদারদের বিরুদ্ধে কাশ্মীরের মনোরম জনপদ ও উহার অধিবাসীদের রক্ষার জন্য "সাহসী" ভারতীয় সৈনিকদের ব্যাপকভাবে চিত্রিত কষ্ট-কল্পিত চিত্র দর্শনে আমাদের বিভ্রান্ত হইলে চলিবে না, ভারতীয় বাহিনী কাশ্মীরের দেশপ্রেমিকদের উপর গুলি ও বোমাবর্ষণ করিয়াছে—হানাদার দলের উপর নহে। ভারত-সরকার ও তাঁহাদের তাঁবেদার দল কাশ্মীরকে রক্ষা করার চেষ্টা করিতেছে না—এক স্বৈরাচারী পতনোন্মুখ সরকারের রক্ষার চেষ্টা করিতেছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার বেতার-ভাষণে বায়ুচালিত যন্ত্রের মত ক্রমাগত খোঁচা দিয়া চলিয়াছেন। জুনাগড় ও মানভাদার রাজ্য পাকিস্তানে যুক্ত হওয়ার পর ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যেমন যে-কোন অজুহাতে ঐ সকল রাজ্যের মধ্যে অগ্রসর হইয়াছে, পাকিস্তান বাহিনী তেমন কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করে নাই। ভারত-সরকার জুনাগড়ের পাকিস্তানে যোগদানকে তাঁহাদের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে বিপদ-সম্ভাবনা বলিয়া মনে করেন। কাশ্মীরের ভারতে যোগদান পাকিস্তানের নিরাপত্তার পক্ষে বৃহত্তর বিপদ-সম্ভাবনার কারণ। আমরা এই যোগদান স্বীকার করিয়া লইতে পারি না। কাশ্মীরের ভারতে যোগদানে ভারত-সরকারের আক্রমণমূলক সাহায্য লইয়া কাপুরুষ মনোভাবসম্পন্ন শাসক কাশ্মীরী জনগণকে প্রতারণা করিয়াছেন। গুরুতর রাজদ্রোহের অপরাধে কারারুদ্ধ শেখ আবদুল্লার মুক্তি এবং খুঁটিনাটি অপরাধে দণ্ডিত মোসলেম সম্মেলনের নেতৃবৃন্দের ক্রমাগত কারাবাস ষড়যন্ত্রের অংশ মাত্র। এই বিয়োগান্ত ঘটনাবলীর ইতিহাস যখন লিপিবদ্ধ হইবে, তখন বহু আত্ম-প্রতারণাকারী দেশপ্রেমিক ও বিচারপ্রেমিকের বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাইবে, কিন্তু কাশ্মীরের প্রকৃত দেশপ্রেমিকগণ শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, এই ষড়যন্ত্রের মুখোস খুলিয়া ফেলিতে সমর্থ হইবেন—তাঁহাদের বিরুদ্ধে যত বেশী শক্তি সমাবেশ করা হউক। এই নৈতিক সংগ্রামে আমাদের অন্তর আমাদের ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গেই রহিয়াছে, কারণ তাঁহাদের বর্তমান নির্বাচনীয় বিষয় স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু। শত্রুদের পরিকল্পনা সার্থক হইলে ভারতের বিভিন্ন স্থানের মুসলমানদের ন্যায় তাহারাও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। সম্ভবতঃ এই পরীক্ষার পরেই ভারত-সরকার গণভোটের ব্যবস্থা করিতে চাহেন। ভোটারগণকে গৃহ হইতে বিতাড়ন বা মৃত্যুর কবলে ফেলিয়া গণভোট গ্রহণে কি লাভ হইবে?

কাশ্মীর-সরকারের সহিত সম্মানজনক মীমাংসার জন্য আমরা সুসমঞ্জসভাবে বারংবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা বিশ্বের নিকট বিদিত। কাশ্মীর-সরকার সকল অনুরোধ অবহেলা বা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ২রা অক্টোবর তারিখে আমি কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীর নিকট প্রস্তাব করি যে, দুই রাষ্ট্রের অবশিষ্ট প্রশ্নাবলী স্থিতাবস্থা চুক্তিতে জনগণের সমস্যা ও সীমান্ত হানা সম্পর্কে পারস্পরিক অভিযোগ সম্বন্ধে দুই সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন। কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী উত্তরে জানান যে, তিনি বর্তমানে এত ব্যস্ত যে, তিনি এইসব ব্যাপারের আলোচনা করিতে পারিতেছেন না। এতৎসত্ত্বেও আমরা কাশ্মীর রাজ্যের সহিত আলোচনার জন্য আমাদের প্রতিনিধিকে শ্রীনগরে প্রেরণ করি। অবশ্য প্রধান মন্ত্রী তাঁহার সহিত আলোচনায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, এবং আমাদের প্রতিনিধিকে ফিরিয়া আসিতে হয়। ১৭ই অক্টোবর কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী আমার নিকট প্রেরিত তারবার্তায় হুমকী দেন যে, পাকিস্তান নিরপেক্ষ তদন্তে সম্মত না হইলে কাশ্মীর সীমান্তে পাকিস্তানের জনগণের বন্ধুত্ববিরোধী কার্য-কলাপ প্রতিরোধের জন্য তিনি বাহিরের সাহায্য চাহিতে বাধ্য হইবেন। তৎক্ষণাৎ আমি নিরপেক্ষ তদন্তের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করি এবং এই উদ্দেশ্যে একজন প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য আমি কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করি। কাশ্মীর-সরকার অতঃপর এ সম্পর্কে আর কোন পত্রালাপ করেন নাই। ২০শে অক্টোবর কাশ্মীর-সরকারের এক তার-বার্তার উত্তরে কায়েদে-আজম কাশ্মীরের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলেন যে, কাশ্মীরের সহিত সম্পর্কের উন্নতিবিধানের জন্য বারংবার চেষ্টা চলিতেছে এবং কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রীকে করাচীতে আসিয়া আলোচনা করার অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের কোন উত্তর দেওয়া হয় নাই। কায়েদে-আজম আরও নির্দেশ করেন যে, বাহিরের সাহায্য লওয়ার হুমকী

অনেকটা চরমপত্রের অনুরূপ এবং উহাতে দেখা যায় যে, কাশ্মীর-সরকারের নীতির প্রকৃত লক্ষ্য যে-আইনী অবরদস্তি-মূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত যোগদানের সুবিধা খোঁজা।

কাশ্মীর সমস্যার আলোচনার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ ও নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য প্রতিনিধি মনোনয়নে কাশ্মীর-সরকারের অস্বীকৃতি, করাচীতে আগমনের জন্য প্রধান মন্ত্রীর নিকট কায়েদে-আজমের আমন্ত্রণের উত্তরদানে কাশ্মীর-সরকারের অসামর্থ্য, তাঁহাদের সৈন্যদল দ্বারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাইয়া স্বেচ্ছাকৃত উপদ্রব সৃষ্টি, ভারতীয় ইউনিয়নে কাশ্মীরের যোগদানের দিন পূর্বাহ্ণ ৯টায় বিমানবাহিত ভারতীয় সৈন্যদলের শ্রীনগরে অবতরণ ইত্যাদি হইতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইউনিয়নে যোগদানের পরিকল্পনা পূর্ব হইতেই চলিয়াছিল এবং উহা ভারতীয় সৈন্যদল কর্ত্তৃক কাশ্মীর দখল দ্বারাই মাত্র সম্ভব হইতে পারে।

যদিও কাশ্মীর-সরকার পাকিস্থানের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার দোষারোপ করিয়াছেন (এবং এই তথাকথিত অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য ভারত-সরকারের নিকট সামরিক সাহায্য প্রেরণের দাবি কাশ্মীর-সরকার করিতেছেন) তথাপি কোন স্তরেই ভারত ডোমিনিয়ন এই সব দোষারোপ সম্পর্কে পাকিস্থান-সরকারের নিকট কোনরূপ প্রশ্ন করেন নাই বা যুক্ত আলোচনা দ্বারা এই সমস্যা সমাধানের কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। ভারত কর্ত্তৃক কাশ্মীরের যোগদান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ও কাশ্মীরে সৈন্য প্রেরণের পরেই মাত্র পাকিস্থান-সরকারকে অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্পর্কে জানান হয়।

ভারত-সরকার কর্ত্তৃক কাশ্মীর রাজ্য অবাঞ্ছিতভাবে দখলের পর কায়েদে-আজম প্রস্তাব করেন যে, অবিলম্বে লাহোরে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। উহাতে উভয় ডোমিনিয়নের গবর্ণর-জেনারেল, প্রধান মন্ত্রীদ্বয় এবং কাশ্মীরের মহারাজা ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী যোগদান করিবেন। তাঁহার আমন্ত্রণ গৃহীত হয় এবং ২৯শে অক্টোবর সম্মেলনের তারিখ ধার্য হয়। শেষ মুহূর্তে পণ্ডিত নেহরু পীড়িত থাকায় সম্মেলন স্থগিত থাকে। অতঃপর ব্যবস্থা হয় যে, ১লা নবেম্বর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে এবং উভয় গবর্ণর-জেনারেল ও প্রধান মন্ত্রীদ্বয় উহাতে যোগদান করিবেন। এই সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয় নাই, কারণ ১লা নবেম্বর পূর্বাহ্ণে পুনরায় শেষ মুহূর্তে আমাদিগকে জানান হয় যে, পণ্ডিত নেহরু লাহোরে আসার মত সুস্থ নহেন। এইভাবে ভারতীয় ডোমিনিয়ন কর্ত্তৃক সম্মেলনের ধারণা পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হয়। ভারত-সরকার যদি প্রকৃতপক্ষে এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী ব্যাপারের আলোচনা করিতে চাহেন, তাহা হইলে পণ্ডিত নেহরুর স্থলে সহকারী প্রধান মন্ত্রীও আসিতে পারিতেন। ১লা নবেম্বর কেবল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন লাহোরে যুক্ত দেশরক্ষা পরিষদে যোগদানের জন্য আসেন এবং কায়েদে-আজমের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের সময়ে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের নিকট কতিপয় প্রস্তাব করা হয়, কিন্তু আমি বা কায়েদে-আজম ভারত-সরকারের নিকট হইতে আর কোন সংবাদ পাই নাই। তৎপরিবর্তে সত্য ঘটনা বিবেচনা না করিয়া পণ্ডিত নেহরু নির্বিচারে পাকিস্থান সরকারের বিরুদ্ধে দোষারোপ করিতেছেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার বেতার-ভাষণের ব্যবস্থা হয় এবং তাঁহার অভিযোগের তাৎপর্য আমি পূর্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি। ভারত-সরকারের বর্তমান পরিস্থিতি ইহাই। এই সমস্যার বিচার ভার আপনাদের ও বিশ্ববাসীর উপর ন্যস্ত রহিয়াছে।

লিয়াকৎ আলি খানের প্রতিবাদে সর্দ্দার পাটেল

সর্দারজী বলেন, বরমূলায় ধর্মযাজকশ্রেণীর কতিপয় ব্রিটিশকে নৃশংসভাবে হত্যা এবং কয়েকটি ইউরোপীয় পরিবারকে অতি নির্মম ভাবে নিহত করার মধ্যে এই সব তথাকথিত মুক্তিকামী সৈনিকের চরিত্রের আসল রূপটি স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ক্রমাগত যে সব প্রলাপোক্তি করিতেছেন এবং আক্রমণকারীরা যে সব লোক লইয়া গঠিত ও তাহারা যে সব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বলিয়া জানা গিয়াছে, তাহাতে পার্শ্ববর্তী একটি রাষ্ট্র এ সম্পর্কে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইতেছে। অথচ সেই রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দই একদিন সার্বভৌম ক্ষমতার অবসানের পর দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীন সত্তা এবং যে কোন ডোমিনিয়নে যোগদানে দেশীয় রাজ্যগুলির পূর্ণ স্বাধীনতার কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন।

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী শুধু যে কাশ্মীরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি ভরতপুর, পাতিয়ালা, ফরিদকোট এবং কপূরতলা রাজ্য সম্পর্কেও অভিযোগ করিয়াছেন। অথচ এই রাজ্যগুলি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছে এবং পাকিস্থানের সহিত ভারতীয় ইউনিয়নের সৌহার্দের সম্পর্ক রহিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী যে চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজের সুবিধা অনুযায়ী সত্যকে এড়াইয়া গিয়াছেন অথবা সম্পূর্ণ বিকৃত করিয়া দেখাইয়াছেন।

আলোয়ার ও ভরতপুর রাজ্যে যখন গোলযোগ হয়, তখন, পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী ভারতীয় শাসন-পরিষদের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং ইহাও তাঁহার জানা উচিত যে, তখন দেশীয় রাজ্যসমূহের ব্যাপার রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। ঐ সকল গোলযোগ প্রথম মেওরা আরম্ভ করে। জাঠ ও রাজপুতদের সহিত সময় সময় তাহাদের কলহ হইত। এই সকল গোলযোগের ফলে অমুসলমানদের

বাড়ীঘর ভস্মীভূত ও গবাদি পশু লুন্ঠিত হয় এবং ক্ষেত-খামারে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে আমার কোনই সন্দেহ নাই যে, মুসলিম লীগ যদি দুই-জাতি মতবাদের প্রচারকার্য দ্বারা জাতির মজ্জায় মজ্জায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকাইয়া না দিত, তবে এই জাতীয় সমস্ত বিবাদই আপোষ-আলোচনা দ্বারা সন্তোষজনক-ভাবে মিটাইয়া ফেলা যাইত। কিন্তু বাহিরের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলগুলির কারসাজিতে এমন অবস্থা দেখা দেয়, যাহার ফলে উভয় পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে নির্মম হইয়া উঠে।

তাহা সত্ত্বেও মেওরা পুনরায় হাজারে হাজারে এই সকল রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে। যাহারা চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে কোন যুক্তি দ্বারাই আটকাইয়া রাখা যাইবে না; কারণ অমুসলমানদের বাড়ীঘর ও সম্পত্তির কি পরিমাণ তাহারা ধ্বংস করিয়াছে, তাহা তাহারা জানে।

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর যদি কোন গোপন অভিসন্ধি না থাকিয়া থাকে, তবে পাতিয়ালা, ফরিদকোট ও কর্পূরতলা রাজ্যের গোলযোগকে তাঁহার পূর্ব ও পশ্চিম পঞ্জাবের সাধারণ হাঙ্গামা হইতে পৃথক করিয়া দেখার কি কারণ আছে আমি বুঝিতে পারি না। পঞ্জাবের গোলযোগের জন্য কোন একটি মাত্র সম্প্রদায়ের উপর সমস্ত দোষ চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। ঐ সকল রাজ্যের শাসনকর্তারা সাম্প্রদায়িক গোলযোগ বন্ধ করিয়া মুসলমানদের স্থানান্তর গমন বন্ধ করিতে না পারায় যদি কলঙ্কভাজন হইয়া থাকেন, তবে পাকিস্থানসহ অন্যান্য গবর্মেণ্টও সেই কলঙ্ক হইতে মুক্ত নহেন। পাকিস্থানও অমুসলমানদের স্থানান্তর গমন বন্ধ করিতে পারে নাই।

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মুসলমানদের নির্মূল করিবার জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনার কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু যে রাজ্যটি পাকিস্থানের সম্পূর্ণ প্রভাবাধীন এবং যাহা কিছুকাল পূর্বে পাকিস্থানে যোগ দিয়াছে—সেই ভাওয়ালপুর রাজ্যে অমুসলমানদের উপর অনুষ্ঠিত অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথা তিনি নিজের সুবিধার্থে চাপিয়া গিয়াছেন। ঐ রাজ্যে বহু অমুসলমান নারী, পুরুষ ও শিশু হতাহত হইয়াছে এবং তাহাদের ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হইয়াছে। পাকিস্থান গবর্মেণ্ট নিশ্চয়ই মনে করেন যে, পাকিস্থানের যাহা করিতে দোষ নাই, ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষে তাহা দোষাবহ।

পাকিস্থান ও উহার প্রতিবেশী দেশীয় রাজ্য হইতে অমুসলমানদের বর্বরভাবে উৎসাদন করায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে উহার অনিষ্টকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়; কারণ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা পূর্বোক্ত রাষ্ট্রে তাহাদের স্বধর্মীরা যেরূপভাবে ভাগ্যের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছে, তাহারা আদৌ তাহা মানিয়া লয় নাই। এই বিকৃত যুক্তির উপর পাকিস্থান গবর্মেণ্টের সমগ্র নীতি ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, এই বিকৃত যুক্তিতর্কই পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী তাঁহার শ্রোতা ও বিশ্ববাসীকে বিচার করিতে বলিয়াছেন।

পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী নিম্নোক্ত বিবৃতিও দিয়াছেন—"আমরা যখন ঐ সব দেশীয় রাজ্যের মুসলমানদের রক্ষার জন্য ভারত গবর্মেণ্টকে অনুরোধ ক'রি তখন আমাদের বলা হয় যে, উহা দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং ভারত গবর্মেণ্ট উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অপারগ।"

যখনই উভয় গবর্মেণ্টের মধ্যে এ জাতীয় প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে তখনই দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সীমাবদ্ধ অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর শেষবার উভয় গবর্মেণ্টের প্রতিনিধিদের বৈঠকে এই প্রশ্ন আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হয়। প্রকৃত-পক্ষে অতীতে লীগ নেতৃবৃন্দই ব্রিটেনের অধিরাজ ক্ষমতার অবসানে দেশীয় রাজ্যসমূহের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা আছে বলিয়া সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছেন।

এখন পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর মুখে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও উহাতে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক বিকৃত করিয়া দেখান শোভা পায় না। তিনি যদি আন্তরিক-ভাবে অথবা গুরুত্বপূর্ণ ভাবে এ সব কথা বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি যেন নিজের ঘর প্রথমে গুছাইয়া পাকিস্থানে যোগদানকারী ভাওয়ালপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী যে সব দেশীয় রাজ্যে অনুষ্ঠিত অত্যাচারের বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, ভাওয়ালপুর এ ক্ষেত্রে তাহাদের চেয়ে কম দোষী নয়।

স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে যে, সংবাদের বিকৃতি, ভুল সংবাদ প্রচার, গোপনীয়তা ও ঘটনার এক তরফা বিবরণ প্রদান পাকিস্থান গবর্মেণ্টের পক্ষে একটি প্রচার-কৌশল হইয়া উঠিতেছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে ও যুদ্ধ চ'লবার সময় ডাঃ গোয়েবেলসের প্রচারকার্যের সহিত জগদ্বাসীর পরিচয় আছে। ডাঃ গোয়েবেলস পরলোকগত হইলেও তাঁহার প্রচার-পদ্ধতির পুনর্জন্ম হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই যে, পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী সমস্ত ব্যাপার বিচারের ভার যে জগদ্বাসীর বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন, সেই জগদ্বাসীকে তিনি প্রতারিত করিতে পারিবেন না।

পূর্বসীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা

নববঙ্গ সমিতির সভাপতি ডাঃ এস কে গাঙ্গুলী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বসীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্মে এক বিবৃতি দিয়াছেন:

"পঞ্জাবের হাঙ্গামা ও কাশ্মীরে হানা প্রদান হইতে আমরা এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছি যে, আশু সমস্তাগুলি সম্পর্কে আমাদের সুদৃঢ় কর্মপন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতীয় জনসাধারণের নিরাপত্তা লইয়া আমরা এই ধরণের ছিনিমিনি খেলা চলিতে দিতে পারি না।" বিবৃতিটিতে আরও বলা হইয়াছে, "ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব সীমান্তে পশ্চিম বঙ্গই তাহার সীমান্ত-প্রদেশ। এই নূতন সীমান্তের রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। অতথায়, উত্তর ও

পশ্চিম সীমান্তে আমাদের যে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, পূর্ব সীমান্তে আমাদিগকে তাহা অপেক্ষাও ব্যাপক বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের রক্ষাব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিবার ব্যাপারে এ যাবৎ কিছুই করা হয় নাই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের মধুর বাণী যেন আমাদের প্রকৃত বিপদ সম্পর্কে উদাসীন না করিয়া তোলে। দুর্বলতার সুযোগে বিপদ আরও ঘনাইয়া আসে।"

এ সম্পর্কে নববঙ্গ সমিতির পাঁচ দফা কর্মনীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে ডাঃ গাঙ্গুলী আরও বলিয়াছেন, "উপযুক্তসংখ্যক সশস্ত্র সৈন্ত দিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বসীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাণিজ্য ও যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্ত সীমান্তে মাত্র একটি পথ উন্মুক্ত রাখিয়া অন্তান্ত পথ অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। একটি বাঙালী সৈন্তবাহিনী গঠন করিয়া উহাতে লোক ভর্তি করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সৈন্তবাহিনীর সহায়তার জন্ত একটি গৃহরক্ষী দল গঠন করিতে হইবে এবং ২১ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তিকে উহাতে বাধ্যতামূলকভাবে যোগদান করাইতে হইবে। তাহা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ভারত-সরকারের নৌ ও বিমানবাহিনীর কয়েকটি স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপন করিতে হইবে।"

এই দাবি কলিকাতায় এক বিরাট জনসভাতেও ধ্বনিত হইয়াছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত উহা কার্যে পরিণত করিবার কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই।

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রীসভা তিন মাস যাবৎ বহাল রহিয়াছেন। পশ্চিম বাংলা এখনও ভারতের পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ। এই তিন মাসের মধ্যে সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা তো করাই হয় নাই, বরং যাঁহারা এই দাবি করিয়াছেন তাঁহাদিগকে 'ওয়ার-মংগার' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ভাবী বিপদের সংবাদ না রাখা এবং তাহার জন্ত প্রস্তুত না হওয়া যে কত বড় মারাত্মক ও লোকক্ষয়কর হইতে পারে, কলিকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামে এবং পঞ্জাবে তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে। পশ্চিম পঞ্জাবে আক্রমণের প্রস্তুতি কিভাবে চলিতেছিল তাহার সংবাদ রাখা হয় নাই বলিয়াই হিন্দু ও শিখদের বাস্তত্যাগ না করিবার জন্ত উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তার পর কি ঘটিয়াছে তাহা সর্বজনবিদিত।

পাকিস্থান অস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে গত এক বৎসর যাবৎ। ভারত-সরকার সে সংবাদ রাখিয়াছিলেন এমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্থান গবর্মেণ্ট ব্রিটিশ আইন বাতিল করিয়া সবল দেহ প্রত্যেক মুসলমানের হাতে অস্ত্র দিয়াছেন। ভারত-সরকার এ বিষয়ে প্রস্তুত থাকিলে পশ্চিম পঞ্জাবের আক্রমণ আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা বুঝিতে পারিতেন এবং তথাকার হিন্দু ও শিখদের আত্মরক্ষার অস্ত্র দিলে এত লোকক্ষয় হইত না।

পূর্ববঙ্গেও এইরূপ কখনও ঘটিবে কিনা তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। পাকিস্থান তাহার মাইনরিটি সমস্যা কিভাবে সমাধান করিবে পঞ্জাবে ও সীমান্তে তাহার পরিচয় দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে কয়েক লক্ষ লোক যদি অস্ত্র চালনায় দক্ষতা অর্জন করে এবং অস্ত্রের লাইসেন্স দানের কৃপণতা বাতিল করিয়া উপযুক্ত লোকদের হাতে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্র দিয়া রাখা যায় তবে পূর্ববঙ্গের পাকিস্থানীরা হিন্দুদের উপর উপদ্রব করিবার পূর্বে চিন্তা করিতে বাধ্য হইবে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের স্বগৃহে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার সুযোগ দানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক শক্তি সংগ্রহ। ডাঃ ঘোষ এই সহজ পথে পদার্পণের লক্ষণ দেখানো তো বহু দূরের কথা, তাঁর সাধের পুলিস-বাহিনীর সুপারিশকে বেদবাক্য জ্ঞান করিয়া অস্ত্রের লাইসেন্স দান বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন এবং বে-আইনী অস্ত্র আদায়ের জন্ত বখ্‌সিস্‌ কবুল করিয়া কর্তব্য সমাপন করিতেছেন।

অদূরদর্শী ও অযোগ্য নেতারা কংগ্রেসী চক্রান্তের দ্বারা গবর্মেণ্ট দখল করিতে পারেন কিন্তু অন্ধের মত ইঁহাদিগকে অনুসরণের পরিণাম কি ভয়াবহ হইতে পারে দেশ কি আজও তাহা বুঝিবে না? নিরস্ত্র দেশ কখনও কোন সমস্যার সমাধান করিতে পারে না এই সহজ সত্য ডাঃ ঘোষের মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইতে না পারিলে বাঙালীকে আরও ভয়াবহ লাঞ্ছনার ও রক্তপাতের সম্মুখীন হইতে হইবে।

বিপদের সময় এই শ্রেণীর কংগ্রেস নেতারা কোথায় থাকেন জনৈক পত্রপ্রেরক মহাত্মা গান্ধীকে তাহা লিখিয়া জানাইলে গান্ধীজী এক প্রার্থনা সভায় তাহার উল্লেখ করেন। পত্রলেখক লিখিয়াছেন—

"জনসাধারণকে দাঙ্গার মুখে ফেলিয়া রাখিয়া পশ্চিম পঞ্জাব ও পাকিস্থানের অন্তান্ত বহু স্থানের বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতারা নিরাপদ স্থানে পলাইয়া আসিয়া সেখান হইতে আতঙ্কগ্রস্ত না হইবার এবং সাম্প্রদায়িক মৈত্রী রক্ষার জন্ত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বড় বড় বুলি ও লম্বা লম্বা ফতোয়া ঝাড়িতেছেন। আশ্রয়প্রার্থীদের সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার অংশ গ্রহণ করা তো দূরের কথা এইসব কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতে বহু দূরে পলাইয়া আসিয়া প্রাসাদোপম অট্টালিকায় নিশ্চিন্ত আরামে নির্ভয়ে দিনযাপন করিতেছেন। অথচ দাঙ্গাদুর্গত আশ্রয়প্রার্থীদের মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। ক্ষুন্নিবৃত্তির খাদ্য নাই, শীত নিবারণের উপযুক্ত বস্ত্র এমন কি বদলানোর মত দুখানি বস্ত্র পর্যন্ত নাই।"

বাংলাদেশেও ঠিক ইহাই ঘটিয়াছে। কলিকাতার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এবং নোয়াখালীর বীভৎসতার দিনে যাঁহারা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারাই বাংলা-সরকাররূপে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের কর্ণধার। আমরা মনে করি জনসাধারণের অপরাধ ইহাদের চেয়েও গুরুতর। বার বার একই ব্যাপার দেখিয়াও যাহাদের চোখ খোলে নাই, অকর্মণ্য "নেতা" এবং তাঁহার স্বার্থান্বেষী দলকেই ভোটের সময় ভোট দিয়া যাহারা ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, প্রায়শ্চিত্ত তাহাদেরই করিতে হইবে।

শ্রমিক বিরোধের সমাধান

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের শ্রমমন্ত্রী শ্রীযুক্ত গুলজারীলাল নন্দ এক বেতার বক্তৃতায় শ্রমিকদের নিকট শ্রম সংক্রান্ত বিরোধ সম্বন্ধে আপোষরফার আবেদন জানাইয়া জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করিবার জন্ত শ্রমিকদের অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ এইরূপ :—

(১) শ্রমিকদের নেতৃ-নির্বাচনে সদ্‌বিবেচনার পরিচয় দিতে হইবে। অতিরিক্ত দাবি উত্থাপন করিয়া যাহারা শ্রমিকদের সমর্থন লাভ করিতে চায় এবং শ্রমিক বিরোধ সম্পর্কে একটা মীমাংসায় আসা অপেক্ষা বিরোধকে জীয়াইয়া রাখিতে এবং গোলমাল পাকাইতে যাহারা ভালবাসে সেইসব নেতৃবৃন্দ হইতে শ্রমিকদের দূরে থাকিতে হইবে। (২) উপযুক্তসদস্ত লইয়া শক্তিশালী ইউনিয়ন গঠন, সালিশীর দ্বারা শ্রমিক বিরোধ মিটান যতক্ষণ সম্ভবপর ততক্ষণ ধর্মঘট সর্বতোভাবে বর্জনের নীতিই শ্রমিকদের গ্রহণ করা উচিত। (৩) শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের এবং বিরোধ মীমাংসার যে সকল ব্যবস্থা সরকারী আইনে আছে তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার শ্রমিকদের করিতে হইবে। শ্রমিক বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ের মীমাংসায় কোনরূপ দেরি বা অসুবিধা দেখা দিলে তৎপ্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি শ্রমিকগণ আকর্ষণ করিবেন। (৪) অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত শ্রমিকগণ কাজে যোগদানে বিরত থাকিবেন না। (৫) কাজের সময় মনোযোগ দিয়া কাজ করিবেন; (৬) মন্থর গতিতে কাজ করা অত্যন্ত অন্যায়। শ্রমিকগণ যত বেশী সম্ভব উৎপাদনে সচেষ্ট হইবেন। (৭) প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে যাহাতে উৎপাদন সম্পর্কে একটি যুক্ত কমিটি গঠন সম্ভব হয় শ্রমিকদের সে সম্বন্ধে তৎপর হইতে হইবে। এই কমিটি যাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে তজ্জন্ত শ্রমিকদের সচেষ্ট হইতে হইবে। (৮) শ্রমিকদের মনে রাখিতে হইবে যে, প্রতিষ্ঠানের কলকব্জা এবং অন্যান্ত সম্পত্তির অপচয় ও ক্ষতিতে জাতিরই ক্ষতি এবং (৯) উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে শ্রমিকদের যদি কোন প্রস্তাব থাকে তাহা হইলে তাঁহারা ইউনিয়ন বা উৎপাদন কমিটির নিকট তাহা পেশ করিবেন।

পশ্চিম বাংলা গবর্ণমেণ্টও এক প্রেস নোটে জানাইতেছেন যে অবস্থান ধর্মঘটকারী এবং "সত্যাগ্রহী"গণ কর্তৃক কর্ত্তব্য সম্পাদনে ইচ্ছুক শ্রমিক ও কর্মচারীদিগকে কারখানা বা আপিসে প্রবেশে বাধা দানের জন্ত কম কাজ হইতেছে এবং ইহাতে দেশের ক্ষতি হইতেছে। এই ধরণের বাধা দান বন্ধ করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্ট অতঃপর কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া জানাইয়া দিয়াছেন।

ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাংলাদেশে শ্রমিক আন্দোলন এক অতি কদর্য্য অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই প্রদেশে আন্দোলনের নেতারা প্রায় সকলেই বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান এবং ইহাদের দ্বারা যাহারা উপকৃত হইতেছে তাহারা প্রায় সকলেই অবাঙালী, বাংলার অর্থ শোষণ ভিন্ন বাংলাদেশে তাহাদের আর কোন স্বার্থ নাই। কলকারখানার শ্রমিক হইতে সুরু করিয়া বিড়িওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, রিক্সওয়ালা, মুটে প্রভৃতি ইউনিয়নের গঠন প্রণালীর প্রতি তাকাইলেই দেখা যাইবে ইউনিয়নের কর্মকর্তারা বাঙালী এবং শ্রমিকেরা অবাঙালী, আসানসোলে পা দিয়াই যাহারা 'কমবোখ্‌তিকা পানি' বলিয়া বাংলাদেশকে কটূক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে, ইউনিয়নের দৌলতে মজুরি বৃদ্ধি করিয়া লইয়া দেশে বেশী করিয়া টাকা পাঠায় এবং এ দেশে একটা পয়সা খরচ করিতে চায় না। কেননা বাংলা ও বাঙালীর সর্বনাশেও তাহাদের কিছুই আসে যায় না। ষ্টেশনে মালে হাত দিয়াই এক টাকা, রিক্সা দু' পা গেলে আট আনা, ঠেলা গাড়ীতে মাইলখানেক দূরে মোট পাঠাইলে তিন টাকা প্রভৃতি ইহাদের দাবি, না দিলেই কটূক্তি। পিছনে ইউনিয়ান অত্যাচারের সার্টিফিকেট লইয়া বসিয়া আছে, বাধা দানের উপায় নাই। কাজ পারতপক্ষে করিবে না, করিলেও যথাসম্ভব ফাঁকি দিবে, মজুরির বেলা ষোল আনা, তার উপর কথায় কথায় বোনাস দাবি। ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে নূতন কেহ আর কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্যে নামিতে চাহে না।

বাঙালী ব্যবসা করে সকলের শেষে, কমিউনিজম করে সবার আগে। কমিউনিজম করিবার আগে ভাবিয়া দেখে না চাপটা কাহার উপর পড়ে। শ্রমিকের বেপরোয়া মজুরি বৃদ্ধিতে জিনিষপত্রের দাম চড়িতেছে, অবাঙালীর লাভ হইতেছে কিন্তু মরিতেছে বাঁধা আয়ের গৃহস্থ-সাধারণ, কমিউনিষ্টদেরই আত্মীয়স্বজন, স্ব সমাজের লোক। মজুরি বাড়িতে বাড়িতে এমন এক কোঠায় আসিয়া ঠেকিতেছে যে শ্রমিককে আর পুরা সপ্তাহ কাজ না করিলেও চলে। কাজে উপস্থিত হইয়া ফাঁকি তো নিত্যকার ব্যাপার। মালিকের কিছু বলিবার উপায় নাই, অমনি ধর্মঘট এবং কলকব্জার সর্বনাশ। এই অত্যাচারে একে একে কারখানা বন্ধ হইতেছে, বিদেশী মাল আমদানী হু হু করিয়া বাড়িতেছে, দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সর্বনাশ হইতেছে। কমিউনিষ্টদের ইহা কাম্য হইতে পারে কিন্তু দেশের সদ্যলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার এত বড় পরিপন্থী আর কিছু হইতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের পর যে সময়ে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের উচিত ছিল সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি সেই সময়ে উৎপাদন হ্রাসের চেষ্টা 'সাবোটেজ' ভিন্ন আর কিছু নহে।

স্বাধীনতা লাভের পর শ্রমিকদের আলাদা প্রতিষ্ঠানেরও কোন প্রয়োজন আর নাই, তাহারা ইচ্ছা করিলেই কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারে। কংগ্রেস গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, সর্বসাধারণের উহাতে যোগদানের অধিকার আছে এবং কংগ্রেসের

শ্রমনীতি, কৃষিনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সবই নির্ধারণের অধিকার আছে সাধারণ সদস্যদের। কমিউনিষ্টদের পরিচালনায় দেশের বৃহত্তর স্বার্থ হইতে নিজেদের স্বার্থ আলাদা করিয়া ফেলিয়া শ্রমিকেরা এখনও যে ভুল করিতেছে তাহা আর বেশী দিন চলিলে তাহাদিগকে তার জন্য ভবিষ্যতে গভীর অনুতাপ করিতে হইবে। যুদ্ধের সময় যখন কৃষক এবং অন্যান্য দরিদ্রেরা অনশনে ও বিনা চিকিৎসায় লাখে লাখে মরিয়াছে, শ্রমিকদের জন্য তখন খাদ্য ও ঔষধের দরাজ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কারণ সে দিন তাহাদের সাহায্য ইংরেজের একান্ত প্রয়োজন ছিল। স্বাধীনতা-সংগ্রামে লেশমাত্র সাহায্য কমিউনিষ্ট-পরিচালিত শ্রমিক সঙ্ঘেরা করে নাই, অথচ যুদ্ধের সময়, বিশেষতঃ বিয়াল্লিশের বিপ্লবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য চিরতরে ধ্বসাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা ইহাদেরই হাতে আসিয়াছিল। দেশের স্বাধীনতার চেয়ে মজুরি এবং রেশন সেদিন ইহাদের নিকট বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল একথা সাধারণ দেশবাসী যেন কখনও না ভুলে। কৃষক ভুলিতে পারে না যে তাহাকে ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াই সস্তায় শ্রমিকের গ্রাস জোগানো হইয়াছে এবং তার খেসারত ট্যাক্সের আকারে তারই ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সিভিল সাপ্লাইয়ের ড্রাইভার ধর্মঘটে দেশবাসী যে কঠোর মনোভাব দেখাইয়াছে ভবিষ্যতে সর্বপ্রকার শ্রমিক ধর্মঘটের চেষ্টায় সেরূপ ঘটিবে; লক্ষণ ক্রমশঃ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। ধর্মঘটের বা উৎপাদন হ্রাসের দ্বারা দাবি আদায়ের চেষ্টায় কোন প্রয়োজন এখন আর নাই, কারণ গবর্মেণ্টকে এখন জনমত মানিয়া চলিতে হইবে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় উৎপাদন হ্রাস সাবোটেজ বলিয়া গণ্য হয়। বাংলাদেশেও এরূপ আইন প্রণীত হওয়া আবশ্যক যাহাতে শ্রমিকদের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া কোন রাজনৈতিক দল উৎপাদন হ্রাসের দ্বারা গবর্মেণ্টকে বিব্রত করিবার জন্য দেশের অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে। রাশিয়ায় সাবোটেজের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধি আছে, আমাদের দেশে অন্ততঃ দ্বীপান্তরের বিধান থাকা আবশ্যক।

পশ্চিম-বঙ্গ মুসলমান সম্মেলন

কলিকাতায় ডাঃ আর আহমদের সভাপতিত্বে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের এক প্রকাণ্ড সম্মেলনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে সঙ্কীর্ণ দুই জাতিতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদিগকে এখন কংগ্রেসে যোগ দিতে হইবে এবং ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থ কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান বা রাজনীতির দ্বারা রক্ষিত হইতে পারে না। ঐ দিন মিঃ সুরাবর্দীও একটি গোপন বৈঠক আহ্বান করিয়া উহাতে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। উহাতে বাঙালী মুসলমানেরা উপস্থিত ছিলেন না। সুরাবর্দী সম্মেলনে দুই জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া উহা এড়াইয়া যাওয়া হয় এবং লীগকে আরও শক্তিশালী করিয়া নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিবার দিকেই ঝোঁক দেখা যায়।

মুসলিম লীগ পরিত্যাগের জন্য মুসলমানদের আহ্বান জানাইয়া ডাক্তার আর আহমদ যে অভিভাষণ প্রদান করেন তাহার সারমর্ম এইরূপ :

"দুই জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হইয়াছে। লীগ-নেতারা মুসলমানদের বুঝাইয়াছিলেন যে, পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাহাদের পরমার্থ লাভ হইবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা কি দেখিতেছি? পাকিস্থানের সংগঠনে পর্যন্ত ব্রিটিশ ও মার্কিন বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। এই সকল বিদেশী ব্যবসায়ীরা আর যাহাই করুক না কেন, জনসাধারণের কোন উপকার করিবে না—এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

"সাম্প্রদায়িক লীগওয়ালারা বলিতেছেন যে তাঁহারা ঐ প্রতিষ্ঠানের মারফতে ভারতের মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা করিবেন। আবার এ বিষয়ে নাকি পাকিস্থান-সরকারের সাহায্যও পাওয়া যাইবে।

"এদিকে চৌধুরী খালেকুজ্জমান ভারত রাষ্ট্রের প্রতি একান্ত আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহার উপর একটি পৃথকরাষ্ট্র হইতে লীগনায়করা ভারতীয় মুসলমানদের চালিত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ভারতরাষ্ট্র ও মুসলিম লীগ এই দুইটির প্রতি একযোগে আনুগত্য রক্ষা করিতে গিয়া মুসলমানগণ নিজেদের বিরুদ্ধে সন্দেহ সৃষ্টি করিতেছেন।

'এই সুযোগ লইয়া সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দুরা মুসলমানদের পাকিস্থানের পঞ্চম বাহিনী বলিয়া প্রমাণ দাখিলের সুবিধা পাইতেছে। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সুবিধা করিয়া দিতেছে। ইহাতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষতি হইতেছে বেশী।

"এই অবস্থায় আমাদের অধিকার রক্ষার উপায় কি? উপায় অতি সহজ। দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে আরও বলশালী করিয়া তুলিলেই আমাদের অধিকার সুরক্ষিত হইবে। এই জন্য আমরা মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দিতে আহ্বান জানাইয়াছি। আমরা জানি যে, কংগ্রেসেও কিছু প্রগতি-বিরোধী আছে। কিন্তু কংগ্রেসে প্রগতিপন্থীরাই শক্তিশালী, এই কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বই এই কথার প্রমাণ।

"কলিকাতার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতেই প্রমাণ হইয়াছে যে, সম্মিলিত গণতান্ত্রিক শক্তি দ্বারাই সকল সম্প্রদায়ের বিপরীত-পন্থীদের পরাজিত করিয়া মুসলমানদের এবং অপর সকলের স্বার্থরক্ষা করা যায়।

"স্বাধীনতা দিবসের ঐক্য ও মৈত্রীর পর সেপ্টেম্বরে যখন কলিকাতায় মুসলমানদের সঙ্কট উপস্থিত হইল তখন তাহাদের মুসলিম লীগ বা পাকিস্থান রক্ষা করিতে আসে নাই। মহাত্মা

গান্ধীর ডাকে শান্তিকামী হিন্দু-মুসলমান তাহাদের রক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছিল—সেই চেষ্টায় শচীন মিত্র, স্মৃতীশ ব্যানার্জী শহীদ হইয়াছেন।

"আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে পূর্ণ অধিকার লইয়া বাঁচিতে চাই। আমরা উপযুক্ত বেতন, কার্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকারী হইয়া মানুষের মত বাঁচিবার দাবি করি। এই দাবি হিন্দু-মুসলমান সকলের। এই দাবি আদায় করিতে হইলে দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির সহিত হাতে হাত মিলাইয়া জমিদার, সামন্তরাজ, পুঁজিপতি, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রভৃতি বিপরীতপন্থীদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে।

"আমরা চিরদিন পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার বিরোধী হইলেও এখন উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তির পক্ষপাতী। কাশ্মীর ও দেশীয়রাজ্য সম্পর্কে ভারত-সরকারের নীতি ও কার্যাবলী আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। পাকিস্থানের প্রগতিপন্থীদের আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

"আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারত ও পাকিস্থানে প্রগতি-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদীরা পরাস্ত হইলে পর গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে আবার এই দুই রাষ্ট্র যুক্ত হইবে। এই গণতন্ত্রসম্মত সমাজতান্ত্রিক অখণ্ড ভারতই আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ। জয় হিন্দ।"

সৈয়দ নৌশের আলি বলেন যে মুসলমানদিগকে এ কথা আজ স্বীকার করিতেই হইবে যে মুসলিম লীগের অনুসরণ করিয়া তাহারা অপরাধ করিয়াছে। লীগ শুধু মস্ত ক্ষতিই করে নাই, তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে। লীগের পতাকা তলে তাহারা সুখশান্তি সমৃদ্ধ আবাসভূমি লাভ করিবে—এই অলীক স্বপ্নের পিছনে যাহারা ছুটিয়াছিল আজ বুঝিতেছে তাহারা মহা ভুল করিয়াছে। কাজেই বিভক্ত ভারত যাহাতে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের জন্ত তাহাদিগকে দেশের প্রগতিশীল দলগুলিতে যোগ দিতে হইবে।

সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একটিতে বলা হয় যে, মুসলিম লীগের পাকিস্থানের দাবি মিথ্যা দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত; দেশ বিভাগের জন্ত এবং দেশ বিভাগের ফলে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছে তজ্জন্ত ইহাই দায়ী। মুসলমানদিগকে দ্বিজাতিতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া মুসলিম লীগের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তাহাদের নিজস্ব নিরাপত্তার জন্ত এবং তাহাদেরও সমগ্র দেশের উন্নতি বিধানের জন্ত কংগ্রেসে যোগ দিবার আহ্বান জানানো হয়। সাম্প্রদায়িকতা দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হইয়াছে। এই অবস্থায় যে কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গড়িলে তাহা আত্মহত্যার সামিল হইবে। অতএব প্রগতি বিরোধী শক্তিকে দমন করিয়া গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্ত মুসলমানদিগকে কংগ্রেসেই যোগ দিতে হইবে। আর একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে মিঃ সুরাবর্দী তাঁহার কার্যের দ্বারা মুসলমান-সমাজের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন। পাকিস্থানের প্রতি তিনি আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের সম্মেলন আহ্বান করিবার কোন অধিকার তাঁহার নাই। মুসলমানদিগকে মৌলানা আজাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেও বলা হয়।

মিঃ সুরাবর্দী তাঁহার পৃথক বৈঠকের বক্তৃতায় শুধু যে আসল সমস্যা এড়াইয়া যান তাহা নহে, সাম্প্রদায়িক দাবিতে সেনাবাহিনী, পুলিশ, সরকারী চাকুরি, এমন কি মন্ত্রীমণ্ডলে লীগ মুসলমান লওয়ার দাবিও তিনি তুলিয়াছেন। ট্রেন আক্রমণ, নরহত্যা, নারীহরণ, নারীধর্ষণ, বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ প্রভৃতি যে সব কার্য পাকিস্থানে অবাধে চলিতেছে সেগুলি চাপা দিবার জন্ত তিনি এমন ভাব দেখান যেন উভয় ডোমিনিয়নেই এই সব ব্যাপার চলিতেছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে ইহা যে কত দূর মিথ্যা তাহা মিঃ সুরাবর্দী খুব ভাল করিয়াই জানেন।

কলিকাতার সব কয়খানি লীগ পত্রিকা মিঃ সুরাবর্দীর সম্মেলনকে সমর্থন করিয়া ডাঃ আহমদ ও তাঁহার সহকর্মীদের প্রতি বক্রোক্তি করেন। লীগ পত্রিকাগুলি দাবি করিয়াছেন যে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী বা কংগ্রেসী মুসলমান বলিতে অতি সামান্ত কয়েকজন মাত্র আছেন তাঁহারা মুসলমানদের প্রতিনিধি নহেন, লীগওয়ালা মুসলমানেরাই মুসলিম সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধি। অদূর ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের ব্যবস্থা-পরিষদের কোন মুসলমান আসন শূন্য না হইলে বাঙালী মুসলমানেরা সত্যই লীগ অথবা কংগ্রেস কোন্‌টি চাহেন তাহার যথার্থ যাচাই করা যাইবে না। বাঙালী মুসলমানদের ইহাই হইবে চরম পরীক্ষা। দুই-জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী মুসলমানের স্থান ভারতবর্ষে হইবে না ইহা এতদিনে পরিষ্কার ভাবেই তাঁহাদিগকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। চরম পরীক্ষার দিন আর খুব বেশী দূরে নয়। কথায় ও কাজে, মনে ও মুখে গরমিলের অবসান হইয়াছে ভারতীয় মুসলমানদিগকে এবার ইহা সপ্রমাণ করিতে হইবে। যুক্ত প্রদেশের জনরক্ষা আদেশ সংশোধনী বিলের বিতর্কে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ সরকার-বিরোধী লীগ সদস্যদিগকে বলেন, "শান্তিরক্ষার খাতিরে আপনারা সরকার এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের উপর দোষ চাপাইবার পুরাতন নীতি পরিহার করুন এবং মুসলিম লীগ ভাঙিয়া দিন। কারণ সমস্ত সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মূল হইতেছে মুসলিম লীগ। এই প্রতিষ্ঠানটিই দেশে বিচ্ছেদ ও ঘৃণার বীজ বপন করিয়াছে। আমি চাই মুসলিম লীগ ভাঙিয়া দেওয়া হউক। যদি একটি ধর্ম নিরপেক্ষ গণ-রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিতে হয় তবে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সহ্য করা অসম্ভব।

যে সব লীগপন্থী পাকিস্থানে যাইতে চায় তাহারা অনায়াসেই যাইতে পারে।"

বরিশালে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনে বাধা

সংখ্যালঘুদের ধর্ম্মকর্ম্মের অধিকার পূর্ববঙ্গে কি ভাবে ব্যাহত হইতেছে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। ঢাকায় জন্মাষ্টমীর মিছিল শেষ পর্য্যন্ত বর্জন করিতে হইয়াছিল। বরিশালে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রাও বাতিল করিতে হইয়াছে। এ বিষয়ে বাখরগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংখ্যালঘুদের প্রাথমিক অধিকার কি ভাবে সেখানে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বিবৃতিটি পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যাইবে :

> পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্টের প্রধানমন্ত্রিগণ এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মৌলানা আক্রাম খাঁ সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্টভাবে এই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ঈদ ও পূজার শোভাযাত্রা সম্পর্কে পূর্ব্ব প্রথাই বলবৎ থাকিবে।
>
> পূর্ব্ববঙ্গের মন্ত্রী মিঃ আফজল খান তাঁহার শান্তি মিশন সম্পর্কে বরিশাল আসিয়াছিলেন, তখন তিনিও এই বিষয়ের উপর জোর দেন।
>
> এমন কি ১৯২৮ সালে মিঃ ডোনোভান যখন ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন সেই সময় শোভাযাত্রার অধিকার সম্পর্কে এই বৎসরের ৭ই জুলাই হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে এক চুক্তি হয়।
>
> বিভিন্ন সভায় শোভাযাত্রা সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে আলোচনা হয়। মিঃ আফজল ইহার একটিতে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, চকবাজার দিয়া (ইহার পাশে একটি মস্‌জিদ আছে) শোভাযাত্রা যাইতে পারে কিনা। হিন্দুরা তাঁহাদের চিরাচরিত অধিকারের দাবি করিলে মুসলিম নেতারা তাহাতে আপত্তি করেন। ফলে কর্তৃপক্ষ চকবাজার দিয়া শোভাযাত্রা বাহির হইতে দেন না।
>
> এই চকবাজার দিয়া জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা বাহির করিতে দেওয়া হয় নাই, গান্ধী-জয়ন্তী সপ্তাহেও শোভাযাত্রা বাহির করিতে দেওয়া হয় নাই। তার পর আসিল দুর্গাপূজার নিরঞ্জন শোভাযাত্রা।
>
> বরিশাল শান্ত ছিল। কোন হাঙ্গামার আশঙ্কা ছিল না। হিন্দুরা স্বভাবতঃই ভাবিয়াছিল যে, চকবাজার দিয়া শোভাযাত্রা বাহির হইবার কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। যখন এই অধিকার অস্বীকার করা হয়, তখনই শোভাযাত্রা বাহির করিবার প্রস্তাব বর্জন করা হয়। প্রতিমাসমূহ নিকটবর্ত্তী পুকুর, খাল অথবা নদীতে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়।

হাসপাতালের অবস্থা

কলিকাতা শহরের বড় বড় হাসপাতালগুলিতে প্রবেশ দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত রোগীদের পক্ষে এক প্রকার নিষিদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। হাসপাতালের অনাচারের প্রতিকারকল্পে অনেক দিন আগেই আন্দোলন আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সংবাদপত্র এবং নেতৃবৃন্দ সকলেই এ বিষয়ে এখনও নীরব রহিয়াছেন। সুখের বিষয়, 'যুগান্তর' পত্রিকা এই অত্যাবশ্যকীয় সমস্যাটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজ, মারোয়াড়ী হাসপাতাল, হাওড়া হাসপাতাল প্রভৃতির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিযোগ উহাতে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। ২০শে কার্ত্তিকের 'যুগান্তরে' যে মন্তব্য প্রকাশ হইয়াছে তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। হাসপাতালগুলির অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে উহা হইতে তাহা কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। মনে রাখিতে হইবে যে ১৫ই আগষ্টের পর হাসপাতালগুলির বিধি-ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন ত হয়ই নাই, ডাক্তার নার্স ঝাড়ুদার প্রভৃতির মনোবৃত্তিও ঠিক একই রহিয়াছে।—

> সহায়সম্বলহীন দীন-দরিদ্র রোগীর পক্ষে অভ্যন্তরবাসী রোগীরূপে হাসপাতালে প্রবেশই দুঃসাধ্য—সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ ওয়ার্ডের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার যাঁহারা থাকেন তাঁহাদিগকে আগে বাড়ীতে 'কল' দিয়া, তাঁহাদের পদ ও পদবী অনুযায়ী দক্ষিণা যোগাইলে, তবেই তাঁহাদের আদেশে হাসপাতালে সিটের ব্যবস্থা হয়, নতুবা সিট থাকুক আর না থাকুক, ঠাঁই নাই বলিয়া বিদায় দেওয়াই হইল প্রচলিত রীতি। এ রীতি আগেও ছিল, এখনও আছে, নূতন রাজনীতিক পরিবর্ত্তনের ফলে এ মুল্লুকে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই বাধা অতিক্রম করিয়া যাঁহারা কোনক্রমে হাসপাতালে মাথা গলাইতে পারেন, তাঁহারাও যে যথেষ্ট সুচিকিৎসা ও সদ্ব্যবহার পান, তাহারও কোন উল্লেখযোগ্য নজীর নাই। চিকিৎসক, নার্স হইতে সুরু করিয়া ধাঙড়, মেথর পর্য্যন্ত সকলেরই মনোযোগ দক্ষিণাদানে সমর্থ কেবিনবাসী রোগীদের উপর নিবদ্ধ—পক্ষান্তরে ওয়ার্ডে অবস্থিত অবৈতনিক রোগীদের সম্পর্কে সকলেই উদাসীন, উপেক্ষাপরায়ণ, উদ্ধত। তাঁহাদের জন্য অভিপ্রেত ঔষধ অনেক সময়ই মেলে না, ইঞ্জেকশন, অস্ত্রোপচার ইত্যাদি ব্যাপারে যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয় না, তাঁহাদের কষ্ট ও অসুবিধা লাঘবের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না, সঙ্গত দাবি-দাওয়ায় কর্ণপাত করা হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু অভিযোগ প্রতিনিয়ত পাওয়া যায়, তাহার খুব কম অংশই জনগণ জানিতে পারেন।
>
> হাসপাতাল হইল আরোগ্য-শালা—রুগ্ন, আর্ত্ত,

অতএব শক্তি নরনারী সেখানে যায় রোগমুক্ত হইতে। যাঁহাদের হাতে তাঁহারা গিয়া পড়েন, তাঁহারা যদি মানব-করুণাবোধবির্জিত হন, যদি হন বেতনভুক চাকুরিয়া মাত্র, যথারীতি হাজিরা বজায় রাখা, যেন তেন প্রকারে ডিউটি হাসিল করা এবং যা পান তাহা পকেটে পোরাই যদি হয় তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাহা হইলে তাঁহাদের দ্বারা হাসপাতালের কাজ চলিবে না, চলিতে পারে না। তাঁহাদের জন্য বিধিসম্মত গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহাদিগকেও দায়িত্বশীল, কর্তব্য-নিষ্ঠ সেবক মনোভাবাপন্ন হইতে হইবে। বিপন্ন, পীড়িত মানুষকে বিপদমুক্ত করিবার জন্য যে বিজ্ঞানের উদ্ভব সেই বিজ্ঞানের প্রাত্যহিক প্রয়োগে যাঁহারা নিয়োজিত তাঁহারা যদি নিছক জীবিকার্থীর মনোভাবাপন্ন হইয়া পড়েন, তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে?

এতদিন এই সব অনাচারের দোষ লীগের ঘাড়ে চাপান হইয়াছে। কিন্তু এখনও উহা চলিতেছে কেন? শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী অর্থ, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এই তিনটি বড় বড় বিভাগের পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন এবং মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য হাসপাতালে নিজের প্রিয়পাত্রদের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। নিজের দেখার সময় নাই বলিয়াই হয়ত তিনি নিজের লোক বসাইয়াছেন কিন্তু তিন মাসের পরেও ইঁহারা একটি হাসপাতালেরও সামান্য উন্নতি মাত্র দেখাইতে পারিতেছেন না কেন? মেডিকেল কলেজে আর একটি নূতন জিনিষ অনেকে লক্ষ্য করিতেছেন। মন্ত্রীদের প্রিয়পাত্র এবং ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের লইয়া নূতন আর একটা বিশেষ শ্রেণী গড়িয়া উঠিতেছে। ইঁহাদের এবং ইঁহাদের প্রিয়পাত্রদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও বিশেষ মনোযোগ লাভ সহজেই মিলিতেছে।

বাংলার খাদ্য-সমস্যা

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে বাংলা-সরকার খাদ্যসমস্যার সমাধান করিবার জন্য চাষের জমি বিস্তৃতির চেষ্টা করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ আজ এক সঙ্কটময় অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। ব্রিটিশ ও সম্প্রতি লীগ-শাসনের ফলে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশে খাদ্যশস্যেরও ঘাটতি হইয়াছিল; এবং ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশবাহিনীর পরাজয়ের ফলে এই ঘাটতি গুরুতর আকার ধারণ করে। সেই অবধি আমরা গুরুতর অন্নসমস্যার মধ্য দিয়া চলিয়াছি।

সম্প্রতি র‍্যাডক্লিফ সাহেবের অদ্ভুত রোয়েদাদের ফলে অধিক উর্বর জেলাগুলি পূর্ব-পাকিস্থানভুক্ত হইয়াছে এবং যে সকল অঞ্চল লইয়া পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত অনুর্বর।

গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া চাউল ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের মূল্য চতুর্গুণের অধিক বাড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং যে জমি পূর্বে চাষ হইত না, তাহাতে ফসল উৎপন্ন করিয়া লাভবান হইবার ইচ্ছা কৃষকগণের পক্ষে স্বাভাবিক। এই কারণে চাষের সীমা বিস্তৃত হইয়াছে; সুতরাং এখন যে সকল চাষের জমি অনাবাদী হইয়া আছে তাহার আবাদ না হওয়ার কারণ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া আইন বা অর্ডিনান্স দ্বারা সেই সব জমিতে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য।

ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা এই দেশের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া ভারতবর্ষের অর্থনীতির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা ব্রিটিশ শাসনের কলঙ্কহীনতার কৈফিয়ৎ দিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় কৃষকের বুদ্ধিহীনতা ও উদ্যমের অভাব বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয় অর্থনীতিকারগণ উত্তরাধিকার সূত্রে এই মনোবৃত্তি লাভ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় সাধারণ বাঙালী কৃষকের তথাকথিত উদ্যমহীনতার উপর ভিত্তি করিয়াই বর্তমান বাংলা-সরকার এই অকর্ষিত ভূমি গ্রহণ অর্ডিনান্স লিপিবদ্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

এই ব্যবস্থাকে চলতি ইংরেজী ভাষায় "ঘোড়ার সামনে গাড়ী জুড়িয়া দেওয়া"—অভিহিত করা চলে। পশ্চিমবঙ্গের যে সকল অংশে ভূ-ভাগ অসমতল, অনুর্বর ও প্রস্তর কঙ্করময় তাহা আবাদের চেষ্টা করিবার পূর্বে যথোপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। যে সকল উদ্যোগী পুরুষের চেষ্টায় এই সকল অঞ্চলে কৃষির প্রবর্তন হইয়াছিল তাঁহারা এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সাধ্য ও সামর্থ্য অনুসারে সর্বত্রই ক্ষেত্রে সেচনের জন্য জলের ব্যবস্থা করিয়া কৃষির সূচনা করিয়াছিলেন।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে সেই সময় রেলযোগে দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারত হইতে বা ষ্টীমারযোগে বর্মা বা অন্য দূরদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করিবার উপায় ছিল না এবং সময় মত পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হইলে যখন গ্রামের ফসল শুকাইয়া যাইত তখন রাজার যথাসাধ্য চেষ্টা সত্ত্বেও সহস্র সহস্র লোক প্রাণত্যাগ করিত। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের চিত্র আনন্দমঠের প্রথম অধ্যায়ে উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

সেচনের বাঁধ ও পুষ্করিণী

কৃষির সফলতার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। বিহার, যুক্ত-প্রদেশ ও পঞ্জাবে কূপ হইতে জল লইয়া ভূমি সেচন করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের যে অংশে সেচনের আবশ্যকতা আছে সেখানে বহু শত বৎসর হইতেই বাঁধ ও পুষ্করিণীর দ্বারাই সেচনের প্রথা প্রচলিত আছে। সেচনের জন্য কূপ এই অঞ্চলের উপযোগী নয়। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় যখন বাঁকুড়া জেলার কলেক্টর ছিলেন তখন তিনি এই সকল সমস্যা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া গবর্মেণ্ট ও সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও তৎকালীন সমবায় সমিতির রেজিষ্ট্রার যামিনীমোহন মিত্র মহাশয়ের সহায়তায় সমবায়

পদ্ধতি অনুসারে এই সকল মজা ও নষ্ট বাঁধ পুকুরের পঙ্কোদ্ধারের চেষ্টা করা হয়। কিছু কাজও হইয়াছিল কিন্তু মিত্র মহাশয়ের পরবর্তী রেজিষ্ট্রারগণের অকর্মণ্যতা ও ঔদাসীন্যের ফলে এই চেষ্টা প্রসারলাভ করে নাই। যে সকল সমিতি গঠিত হইয়াছিল তাহাও কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানের অভাবে কালক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রায় পনর বৎসর পরে সরকারী মহলে আলোচনা হয় যে, সমবায় প্রথা এই ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হইবে না ; কারণ প্রতি গ্রামেই দলাদলি আছে এবং যাহাদের স্বার্থ আছে তাহারা সকলে স্ব-ইচ্ছায় সমিতিতে যোগদান না করিলে অচল অবস্থার উদ্ভব হয়। পরে বঙ্গদেশে প্রচলিত সমবায় আইন সংশোধন করার সময় ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইয়াছে।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনার ফলে ১৯৩৯ সালে সেচনের পুকুরের পঙ্কোদ্ধারকল্পে একটি আইন লিপিবদ্ধ হয়। ১৯৪০-৪১ সালে বীরভূম জেলায় গুরুতর দুর্ভিক্ষের সময় তদানীন্তন কালেক্টর শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সরকার এই আইন জারী করিয়া প্রায় পাঁচশত বাঁধ ও পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করেন এবং পূর্ব-পূর্ব দুর্ভিক্ষের সময় সরকারী ও বেসরকারী সড়কের পার্শ্বের অনাবশ্যক মাটি কাটিয়া সাধারণের টাকার যে অনর্থক অপব্যয় হইত তাহা নিবারণ করেন।

তখন বাংলাদেশে লীগ মন্ত্রীমণ্ডলী অপ্রতিহতভাবে কর্তৃত্ব করিতেছিল। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের প্রতি তাঁহাদের কোনও দরদ ছিল না, সুতরাং এই আইন অনুসারে বিশেষ কোনও কাজ হয় নাই। ১৯৪৫ সালে মন্ত্রীমণ্ডলী অপসারণের পর যখন বাংলার গবর্ণর স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল তখন এই আইন পরিচালনা করিবার জন্য এক জন পৃথক কর্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে আশানুরূপ কাজ হয় নাই এবং এখনও হইতেছে না। সংবাদপত্রের রিপোর্টে প্রকাশ, দেশের উন্নতিকল্পে নানাবিধ পরিকল্পনা ঘোষ-মন্ত্রীমণ্ডলীর বিবেচনাধীন আছে। তাঁহারা কার্যক্ষেত্রে শীঘ্রই অগ্রসর হইবেন এইরূপ আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

বাঁধ-পুকুরের পঙ্কোদ্ধার ও মেরামতের জন্য কোনো পরিকল্পনা, আলোচনা বা পরীক্ষার প্রয়োজন নাই। জেলায় জেলায় এই কার্যের জন্য যথেষ্ট কর্মচারী নিযুক্ত আছে এবং পূর্ববঙ্গ হইতে আতঙ্কগ্রস্ত বহু কর্মচারীর আগমনে ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলীর নির্দেশ এবং কলিকাতা হইতে পরিচালনার অভাবে এই কার্যে নানাপ্রকার অব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং ঘোষ-মন্ত্রীমণ্ডলী যদি বাংলায় প্রকৃতই খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কৃতসঙ্কল্প হন তাহা হইলে এই বিষয়ে কালক্ষেপ করা অনুচিত। কারণ হেমন্তের প্রারম্ভ হইতে মজা ও ভরাট পুকুরগুলির পঙ্কোদ্ধার করার সময় আসিবে এবং হৈমন্তিক ধান গৃহজাত হইলে গ্রামের কৃষিমজুরগণের কোন কাজ থাকিবে না।

জলসেচনের অন্যান্য ব্যবস্থা

কৃষিক্ষেত্রে সেচনের জন্য সাধারণতঃ বাঁধ ও পুকুরের ব্যবস্থা থাকিলেও এই অঞ্চলে কৃষক ও জমিদারগণ সাধ্যানুসারে অন্য ব্যবস্থাও করিতেন, তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুর রাজসরকারের দেওয়ান বিখ্যাত গণিতশাস্ত্রবিদ শুভঙ্কর তাঁহার নিজগ্রামে ও সমীপবর্তী অঞ্চলে জলসেচনের জন্য দামোদর নদের সমান্তরালে যে প্রণালী প্রস্তুত করেন তাহা এখনও বিদ্যমান আছে কিন্তু কালক্রমে মেরামতের অভাবে অকেজো হইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের যে সকল অঞ্চলের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি তাহার মধ্য দিয়া বহুসংখ্যক ছোট ছোট স্রোতস্বতী বা জোড় প্রবাহিত হইয়া নিম্নদেশে ছোট বড় নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহারা বর্ষার সময় গৈরিক জলপ্রবাহে পরিপূর্ণ হয় কিন্তু অন্য সময়ে শুকাইয়া যায়। কোথাও বা বালির মধ্য দিয়া ক্ষীণ জলধারা প্রবাহিত হয় এবং কোথাও বালি খুঁড়িলে সামান্য জলের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রাচীন কালে এই সকল জোড় বাঁধিয়া বাঁধে আবদ্ধ জলপ্রণালীর দ্বারা পরিচালিত করিয়া আপন আপন কৃষিক্ষেত্রে সেচন করিত এবং অনেক স্থলে নিম্নভাগে অবস্থিত পুষ্করিণীতে সঞ্চয় করিয়া শীতকালের আবাদের ব্যবস্থা করিত। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে তৎকালে রেল বা ষ্টীমারের উদ্ভাবন হয় নাই। সুতরাং গম, ডাল, ইক্ষু ও সরিষা ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য দূরদেশ হইতে বহন করিয়া আনিবার উপায় ছিল না ; প্রয়োজন মত দেশেই উৎপন্ন করিতে হইত।

ব্রিটিশ শাসনের কল্যাণে ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে কৃষকদের স্বার্থের প্রতি উদাসীন হইলেন এবং শিক্ষিত ও সঙ্গতিশালী ব্যক্তিগণ গ্রামাঞ্চল ছাড়িয়া চাকুরী ও ব্যবসা করিতে শহরে বাসস্থাপন করিলেন। সুতরাং দেশের কৃষি পল্লীসমাজের নিম্নতম স্তরের অশিক্ষিত, সঙ্গতিহীন কৃষকগণের হাতে থাকিল। তাহাদিগকে সাহায্য, উৎসাহ ও সংহতি দিবার লোক গ্রামে রহিল না বলিলেই হয়।

ব্রিটিশ সরকার কৃষির উন্নতির জন্য কোথাও কিছু করে নাই বলিলে সত্যের অপলাপ হয়। পঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশে নদ ও নদীতে বাঁধ দিয়া জমিতে জলসেচন করার জন্য বহু কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার ফলে ঐ সব অঞ্চলের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত লায়ালপুর জেলার অনুর্বর ও বালুকাময় ভূমি আজ এসিয়া মহাদেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতবর্ষেও স্থানে স্থানে বহু অর্থ ব্যয়ে জলসেচনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কিন্তু এ কথাও সত্য যে বাংলাদেশের সরকার চিরকালই দেশবাসীর স্বার্থের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং জলসেচনের অসংখ্য বাঁধ ও পুষ্করিণীগুলি মজিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহাদের উদ্ধারের কোনো চেষ্টাই হয় নাই, এবং গত পঁচিশ বৎসরে যাহা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত অসন্তোষজনক।

গুরুসদয় দত্ত মহাশয় যখন পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভিক্ষ সমস্যার সহিত সেচন-ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সাধারণের গোচরীভূত করিলেন তখন সরকাররূপী কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সেচ-বিভাগের কর্তাদের আকস্মিক কর্মতৎপরতা লক্ষিত হইল। ফল যাহা হইয়াছে তাহা 'পর্বতের মূষিক প্রসব' বলিলেই চলে।

সরকারী দপ্তরের যাবতীয় সংবাদে আমরা ওয়াকিবহাল নহি কিন্তু আমাদের নিজেদের জেলা বাঁকুড়া হইতে যাহা জানি তাহা হইতে সরকারী কার্যপদ্ধতির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

দত্ত মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে ১৯২২ সালে বাঁকুড়ায় সেচ-বিভাগের একটি আপিস স্থাপিত হয় এবং গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া এই আপিস চালানো হইতেছে। যাঁহারা এই আপিসের ভার-প্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুই জন বিলাতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং এক জন বাংলার চীফ ইঞ্জিনীয়ারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি দামোদর-পরিকল্পনার উপদেষ্টা রূপে নিযুক্ত আছেন। এই সকল কর্মচারী গত পঁচিশ বৎসরে ছোট বড় অনেক স্কীম পরীক্ষা করিয়া ও তৎসংক্রান্ত আনুপূর্বিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া নক্সা ও এষ্টিমেটসহ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু ১৯২৩ সালে আমবোড় ও শালবাঁধ নামক দুইটি ক্ষুদ্র বাঁধ ব্যতীত অদ্যাবধি আর কোন কাজ এই জেলায় হয় নাই। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, দরিদ্র করদাতাগণের অর্থে ছোট বড় কর্মচারী সমন্বিত বাঁকুড়ার সেচ-আপিস কি কারণে চালানো হইয়াছিল?

কিন্তু যাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব সেই সকল ব্রিটিশ ও লীগ শাসকগণ আমাদের প্রশ্নোত্তরের সীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং প্রশ্ন করা নিরর্থক। নবনিযুক্ত মন্ত্রীমণ্ডলী আমাদিগকে বার বার আশ্বাস দিতেছেন যে তাঁহারা দরিদ্র কৃষক মজদুরগণের স্বার্থের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং যাহাতে দেশবাসী সকলে পেট ভরিয়া খাইতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিবেন। কয়েক দিন পূর্বে প্রধান মন্ত্রী ডাঃ ঘোষ বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, বিদেশ হইতে ভিক্ষা করিয়া খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিলে চলিবে না, আমাদের প্রদেশকে নিজের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে অর্থাৎ আমাদের প্রয়োজনমত খাদ্যশস্য যাহাতে আমরাই উৎপন্ন করিতে পারি, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা যদি ডাঃ ঘোষের অন্তরের কথা হয়, তবে তাঁহার মত বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকের জানা উচিত যে সেচনের সুব্যবস্থার অভাবই আমাদের কৃষির পথে প্রধান অন্তরায়।

সুতরাং প্রধান মন্ত্রী মহাশয় ও তাঁহার সহকর্মী-কৃষীমন্ত্রী ও সেচ-মন্ত্রিগণের বর্তমান অবস্থায় বিশেষ জরুরী কর্তব্য এই যে পশ্চিমবঙ্গের সেচ-ব্যবস্থার অভাব দূরীকরণার্থ কি করা হইবে তাহা পরিষ্কার ভাবে বিবৃত করা এবং সেচ-বিভাগের যে সকল ছোট বড় কর্মচারী প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ না করিয়া বিরাট শাসনযন্ত্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে বিরাজমান ছিলেন তাঁহাদের পঁচিশ বৎসরব্যাপী কার্যকলাপের একটি হিসাব-নিকাশ তলব করা।

যদি এই কথাই সত্য হয় যে, প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্য হেতু ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত পশ্চিমবঙ্গের নদী-নালার উপর বাঁধ নির্মাণ করিয়া সেচ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন অসম্ভব হয় তবে নিরর্থক এই সকল কর্মচারীকে পোষণ করিয়া কোন লাভ নাই। অনতিবিলম্বে ইঁহাদের অবসর গ্রহণের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যদি সম্ভব হয় এবং বিভাগীয় কর্মচারীগণের অকর্মণ্যতা ও শাসক সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্যের ফলেই এত দিন কোন পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত না হইয়া থাকে, তবে আশা করি মন্ত্রীমণ্ডলী এই বিভাগের কর্মচারীগণের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিবেন এবং তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিবেন।

মন্ত্রিগণের আরও একটি কর্তব্য আছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে বর্তমান বৎসরের মধ্যে ২২টি জলসেচনের স্কীম প্রণয়ন সম্পূর্ণ করা হইবে, কিন্তু তাহার কোন তালিকা প্রকাশিত হয় নাই। একবার শুনিলাম যে বাঁকুড়া জেলার মধ্যে শুভঙ্করী দাঁড়া ও বিড়াই বাঁধের নির্মাণ কার্য শীঘ্রই আরম্ভ হইবে কিন্তু এখন শুনিতেছি যে বিলম্ব হইতে পারে। সংবাদপত্রে ইহাদের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়াও সকল সময় সংবাদ সংগ্রহ করা যায় না। বাংলা-সরকারের প্রচার-বিভাগের দ্বারা এই সকল প্রয়োজনীয় সংবাদ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয়

মহাত্মা গান্ধী 'হরিজন' পত্রিকায় "নূতন বিশ্ববিদ্যালয়" শীর্ষক এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন আবশ্যক। গান্ধীজী লিখিতেছেন—

"প্রত্যেক প্রদেশে নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার একটা হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। গুজরাট গুজরাটিদের জন্য, মহারাষ্ট্র মারাঠিদের জন্য, কর্ণাট কন্নড়দের জন্য, উড়িষ্যা উড়িয়াদের জন্য, আসাম আসামীদের জন্য এক-একটা বিশ্ববিদ্যালয় চাহিতেছে। কে যে চাহিতেছে না জানি না। আমি মনে করি, এই সকল সমৃদ্ধ প্রাদেশিক ভাষাকে ও এই ভাষাভাষী লোকদিগকে যদি যথোচিত উন্নতি লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে।

"কিন্তু সেই সঙ্গে আমার এ কথাও মনে হইতেছে যে, আমরা অত্যন্ত বেশী তাড়াতাড়ি করিতেছি। এ বিষয়ে প্রথম কর্তব্য হইল ভাষা অনুসারে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন। ভাষা অনুসারে পৃথক পৃথক প্রদেশ গঠিত হইলে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় নাই সেখানে স্বাভাবিকভাবেই এক-একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিবে। বোম্বাই প্রদেশ গুজরাটি, মারাঠি ও কন্নড় এই তিনটি ভাষাকে আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছে এবং সেইজন্য কোনটিরই উন্নতি হইতেছে না। মাদ্রাজ প্রদেশে চারিটি ভাষা: তামিল, তেলুগু, মালয়ালম ও কন্নড়। সুতরাং দুই প্রদেশে এক ভাষাও আছে। অন্ধ্রদেশে একটি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় আছে সত্য। কিন্তু আমার মতে অন্ধ্র বিদেশীশাসনমুক্ত একটি পৃথক প্রদেশ না হওয়ায় এই বিশ্ববিদ্যালয় যেরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারিত তাহা করে নাই। মাত্র দুই মাস হইল ভারতবর্ষ বিদেশী শাসন হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও সেই একই কথা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তামিল কি তাহার প্রাপ্য অধিকার পাইয়াছে?

"নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্কুল-কলেজের প্রয়োজন। এই সকল স্কুল-কলেজে প্রাদেশিক ভাষার মধ্য দিয়া শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা হইলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র রচিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় তো উপরের জিনিস। উপরের জিনিসকে বড় তখনই করা যায় যখন নীচের ভিত শক্ত হয়।

"আমার মতে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য লোকায়ত্ত রাষ্ট্রের টাকার নিমিত্ত চিন্তার প্রয়োজন নাই যদি লোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভব করে, তাহা হইলে তাহারাই ইহার জন্য টাকা দিবে। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে সে বিশ্ববিদ্যালয় সেই দেশের অলঙ্কারস্বরূপ হইবে। যেখানে দেশের শাসনভার বিদেশীদের হাতে থাকে, সেখানে যাহা কিছু লোকের কাছে আসে তাহাই উপর হইতে আসে এবং তাহার ফলে লোকে ক্রমশঃই বেশী পরনির্ভরপরায়ণ হইয়া পড়ে। দেশের শাসন যেখানে দেশের লোকের ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় সেখানে সমস্তই নীচে হইতে উপরে যায় এবং তাহা স্থায়ী হয়। ইহা দেখিতেও ভাল হয় এবং ইহার ফলে লোকের শক্তিও বৃদ্ধি পায়। উর্বর জমিতে একটা বীজ পুঁতিলে তাহাতে যেমন ফল ভাল হয়, তেমনই এইরূপ লোকায়ত্ত শাসন-ব্যবস্থায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাহা দশগুণ ফল দিয়া থাকে। বিদেশীর প্রভুত্বাধীনে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার ফল উল্টাই হইয়াছে। অন্যরূপ ফল হওয়া বোধ হয় সম্ভবও ছিল না। এইজন্য যত দিন না আমরা আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা হজম করিতে পারিতেছি, তত দিন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সাবধান হইয়া চলাই যুক্তিযুক্ত।"

গান্ধীজী বলিতেছেন যে, আমরা আপাততঃ রাজনীতি ক্ষেত্রে বিদেশীপ্রভুত্ব হইতে মুক্তি পাইয়াছি বলিয়াই যে আমরা বিদেশী ভাষা ও বিদেশী চিন্তার সূক্ষ্ম প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়াছি একথা হয়ত কেহ বলিবেন না। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে নবলব্ধ স্বাধীনতার স্বাস্থ্যপ্রদ নির্মল বায়ুতে বুকটা ভরিয়া লওয়াই কি যুক্তিযুক্ত নয়? আমাদের দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ কি এই কথাই বলে না? বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বড় বড় বড় অট্টালিকা এবং রাশি রাশি অর্থের প্রয়োজন নাই। এজন্য যাহা সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন তাহা হইতেছে জাগ্রত জনমতের সুচিন্তিত সমর্থন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে বহু শিক্ষকের প্রয়োজন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের দূরদর্শী হওয়া আবশ্যক।

দেশের মুক্তিসংগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দেশে যে ভূমিকা অভিনয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাহা করিতে পারে নাই। চীনদেশে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি চিয়াং কাই-শেককে অভূতপূর্ব সাহায্য করিতেছে। দেশের বিভিন্ন সমস্যার তথ্য সংগ্রহ, আলোচনা ও সমাধান চেষ্টায় অসাধারণ সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হাতে আছে। খাদ্যসমস্যার কথাই ধরা যাউক। "ফুড ষ্টাটিষ্টিক্স" বলিয়া যে বস্তুটি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে এবং যাহার উপর ভিত্তি করিয়া ভারতব্যাপী কণ্ট্রোল খাড়া করিয়া সাধারণের অর্থ, স্বাস্থ্য, সময় ও শক্তির বিপুল অপচয় চলিতেছে তাহার মূলে আছে অশিক্ষিত চৌকিদারদের আন্দাজী হিসাব। গ্রামাঞ্চলের ফসল সম্বন্ধে তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা দেশের স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের দ্বারা সংগৃহীত হইলে উহা নিরক্ষর চৌকিদার সংগৃহীত 'ষ্টাটিস্টিক্স' অপেক্ষা সহস্রগুণে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য হইবে ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইচ্ছা করিলে এই কাজ করিতে পারিতেন না বা এখনও পারেন না ইহা অবিশ্বাসযোগ্য কথা।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির পুনর্গঠন করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় গঠন আবশ্যক ইহা নিঃসন্দেহ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বৎসর অন্ততঃ কয়েকটি করিয়া তরুণকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া দিবে ইহা কি আশা করা যায় না? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বৎসর পঞ্চাশ-ষাট হাজার ছাত্র ম্যাট্রিক পাস করিয়া থাকে এবং এম-এ পাস করে কয়েক হাজার। কিন্তু বাংলাদেশের যে কোন বিভাগে কাজের জন্য উপযুক্ত লোকের একান্ত অভাব দেখা যায় ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শাসনকার্যে, অধ্যাপনায়, শিক্ষকতায়, সাংবাদিকতায় বা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য পদের উপযুক্ত একটি ছাত্রও কি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আজকাল বাহির হয়? বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ আন্তরিক চেষ্টা করিলে বৎসরে দশটি দক্ষ ও উপযুক্ত চরিত্রবান ছাত্র কি দেশকে দিতে পারেন না? রাশি রাশি অর্থব্যয়ে অট্টালিকা নির্মাণ করার চেয়ে মানুষ গড়ার দিকে মনোযোগ দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগিতা সর্বসাধারণ উপলব্ধি করিয়া উহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইত।

সিন্ধু যুগ হইতে বৈদিক যুগ

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে আলোচনা হইয়াছে তাহার বৈজ্ঞানিক অংশ, অর্থাৎ পূর্বে হরাপ্পা হইতে পশ্চিমে বেলুচীস্থানের প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন ধ্বংসস্তূপ হইতে যে সকল বস্তু উদ্ধার করা হইয়াছে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ বাদ দিলে যাহা থাকে তাহা হইতেছে প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞানীগণের তথ্য বিশ্লেষণ, তুলনামূলক আলোচনা ও ব্যাখ্যা। অবিশেষজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তি আলোচনার এই অংশ হইতে প্রেরণা সংগ্রহ করিয়া আপনার মতামত গঠন করিয়া থাকেন। বর্তমান আলোচনায় এই অংশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হইবে।

সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনার এই দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে সকল জিজ্ঞাসু ব্যক্তির স্মরণ রাখিতে হইবে যে যাহাকে Indus Script বলে তাহার বৈজ্ঞানিক মহলে সর্বসম্মতভাবে গ্রাহ্য পাঠোদ্ধার এখনও হয় নাই। সুতরাং সিন্ধুসভ্যতার বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি, অন্যান্য প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সঙ্গে উহার সম্বন্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল ব্যাখ্যা পণ্ডিতগণ প্রচার করিয়াছেন যে কোন দিন উহার একটা বড় অংশ বাতিল হইয়া যাইতে পারে। গোড়ার এই ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।

সিন্ধু-উপত্যকার এই প্রাগৈতিহাসিক তাম্রযুগের (Chalcolithic) সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনাকে মোটামুটি ঐতিহাসিক, ধর্মসম্বন্ধীয় ও নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক, এই কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। শ্রেণী বিভাগ করিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইবার ফলে আশা করা যায় যে, বিভিন্ন বিভাগের জ্ঞাতব্য তথ্য ও মতবাদগুলি বিশ্লেষণ করিয়া সমগ্র সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা করিবার অবকাশ পাওয়া যাইবে। ঐতিহাসিক, ধর্মসম্বন্ধীয় এবং নৃতত্ত্ববৈজ্ঞানিক আলোচনার মূল ভিত্তি বিভিন্ন ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ যে সকল বস্তু উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকলের বিস্তারিত পরিচয় সর জন মার্শাল, ডাঃ ম্যাকে ও মাধো স্বরূপ ভাটসের গ্রন্থে এবং প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ১৯২৩-২৪ হইতে আরম্ভ করিয়া বার্ষিক রিপোর্টগুলিতে পাওয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে পৃথক কোন আলোচনা বাহুল্য।

সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে সিন্ধুযুগের সহিত বৈদিক যুগের সম্পর্কের প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া।

প্রচলিত মত এই যে সিন্ধুযুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে যে ব্যবধান বর্তমান কোন প্রকার সেতুবন্ধন দ্বারা তাহাদের মধ্যে সংযোগ সাধন করা সম্ভব নহে। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞানী মত প্রকাশ করিয়াছেন 'the gulf is unbridgeable'। ইহার অর্থ এই যে বৈদিক যুগ হইতে ভারতীয় সভ্যতার যে ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় বৈদিক যুগের পূর্বে সেইরূপ কোন ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় না। সিন্ধুসভ্যতা প্রাক্-বৈদিক ও প্রাক্-আর্য, বৈদিক সভ্যতার সহিত সম্পর্কবিহীন। এই দুই যুগের মধ্যে ১০০০ হইতে ১৫০০ বৎসরের ব্যবধান বর্তমান। সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংস হইবার সহস্রাধিক বৎসর পরে আর্যজাতি দূর অঞ্চল হইতে আসিয়া একটি নূতন সভ্যতার পত্তন করে। সিন্ধু-উপত্যকার তাম্রযুগের সভ্যতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল, নূতন যে সভ্যতা খ্রীঃ পূঃ ২০০০-১৫০০ বৎসরের মধ্যে সিন্ধু-উপত্যকায় গড়িয়া উঠে তাহার সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই।

এই মত কতখানি যুক্তিসহ বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা হইবে। প্রথমে সিন্ধুযুগ ও বৈদিক যুগের যে কাল নির্ণয় করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সিন্ধুযুগের কাল নির্ণয় করা হইয়াছে প্রধানতঃ দুই প্রকার প্রমাণের সাহায্যে। একটি প্রমাণ geological stratification, অর্থাৎ প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ খননকালে বৈজ্ঞানিক মতে ভূ-স্তরের বিন্যাস হইতে কোন নির্দিষ্ট স্তরের বয়স বিচার করিবার যে সূত্র আছে, সেই সূত্র অনুসারে প্রাপ্ত হিসাব। দ্বিতীয় প্রমাণ dating of analogical archaeological finds from pre-historic sites in other countries, অর্থাৎ অন্যান্য দেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্তূপ হইতে প্রাপ্ত অনুরূপ দ্রব্যাদির যে বয়স নির্ণয় করা হইয়াছে সেই বয়সের হিসাব। সর জন মার্শাল তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই দুইটি প্রমাণ ব্যবহার করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় প্রমাণটি তিনি সিন্ধুসভ্যতার, বিশেষতঃ সিন্ধুযুগের ধর্মের ব্যাখ্যা করিবার কাজেও ব্যবহার করিয়াছেন। বৈদিক যুগের কাল নির্ণয় করা হইয়াছে কতকটা অনুমানের সাহায্যে এবং কতকটা খ্রীঃ পূঃ ১৬শ হইতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যাহাদের মধ্যে আর্যভাষা-ভাষী লোক ছিল এইরূপ কয়েকটি জাতির অভ্যুদয়ের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া। যে অনুমানের সাহায্য লওয়া

হইয়াছে তাহার ভিত্তি দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ায় আর্যজাতির আদি বাসস্থান হইতে ইরাণ ও ভারতবর্ষের দিকে আর্যজাতির সম্প্রসারণের মতবাদ।

সিন্ধুযুগের কালনির্ণয় সম্বন্ধে যে geological stratificationএর প্রমাণের কথা বলা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিশেষজ্ঞদিগের ব্যাপার। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা বাহুল্য। মার্শালের হিসাবমতে মোহেঞ্জোদারোর স্তূপ হইতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি হইতে যে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০ অব্দের। এই সভ্যতার বাহকগণ অনুমান ৫০০ বৎসর মোহেঞ্জোদারোতে বসবাস করিয়াছিল এবং এই সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠিতে অনুমান হাজার বৎসর লাগিয়াছিল। (M.I.C.I. pp. 107-108)। এই হিসাবের মধ্যে যে ফাঁক দেখা যায় সে সম্বন্ধে পরে বলা হইবে। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে geological stratificationএর প্রশ্নেও পণ্ডিতগণ ঘুরিয়া ফিরিয়া দ্বিতীয় প্রমাণের উপর অধিক নির্ভর করিতেছেন। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ১৯২৩-২৪ সনের বার্ষিক বিবরণীতে সর জন মার্শাল বলিতেছেন, ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মোহেঞ্জোদারোর স্তূপ খনন করিতে আরম্ভ করেন এবং "it is to him that we mainly owe the subsequent discoveries that have been made." তারপর তিনি বলিতেছেন মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার মত পরস্পর হইতে দূরবর্তী ও সমুদ্র হইতে দূরে অবস্থিত অঞ্চলে সুমেরীয় টাইপের সীল (seal) ইত্যাদি ভূপৃষ্ঠ হইতে অল্প নিম্নে পাওয়া গিয়াছে। যে স্তরে এই প্রকারের সীল পাওয়া গিয়াছে তাহার নীচে অনেকগুলি স্তর দেখা যায় ("clear evidence of multiple strata lower down.") ইহাতে প্রমাণ হয় যে মেসোপটেমিয়ায় সুমেরীয়দিগের ইতিহাস যাহাই হউক সিন্ধু-উপত্যকায় সুমেরীয় সভ্যতার অনুরূপ একটি সভ্যতা বহু বিস্তৃত ছিল এবং এই সভ্যতা আরও প্রাচীনযুগে অগণিত শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের ভূমিতে বিকাশ লাভ করিয়াছিল ("undergone a development reaching back incalculable ages")।

Geological stratificationএর প্রমাণ হইতে দাঁড়াইতেছে যে সুমেরীয় সভ্যতার সহিত সংযোগ সিন্ধু-সভ্যতার পরিণত অবস্থায়, ঐ সভ্যতার বাহকগণ মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা পরিত্যাগ করিবার বা ঐ দুই নগর ধ্বংস হইবার কিছু পূর্বে ঘটিয়াছিল। সুমেরীয় সভ্যতার সহিত সংযোগ ইতিহাসের হিসাবে খ্রীঃ পূঃ কোন সহস্রকে ঘটিবার সম্ভাবনা পরে তাহা দেখা যাইবে। এখানে এই তথ্য পাওয়া যাইতেছে যে সিন্ধু-সভ্যতার আদিযুগ ও মধ্যযুগ পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতার সহিত হয়ত সম্পর্কহীন ছিল। এই তথ্যের বিশেষ তাৎপর্য আছে। পণ্ডিতগণের মতে সুমেরীয় সভ্যতা প্রাচীন বাবিলোনীয়, আসিরীয় ও সাধারণ ভাবে পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি এবং প্রাচীন ইতিহাসের যতখানি উদ্ধার করা হইয়াছে তাহার সাহায্যে এ কথা মোটামুটি প্রমাণিত হইয়াছে বলা যায়। মার্শাল নিজেও এই কথা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে যদি Sayce ও Goddard-এর মতে সুমেরীয়গণ অন্যত্র হইতে মেসোপটেমিয়ায় গিয়াছিল একথা সত্য হয় তবে ইহা অসম্ভব নহে যে ভারতবর্ষই সুমেরীয় সভ্যতার জন্মভূমি ("the possibility is clearly suggested of India proving ultimately to be the cradle of their civilisation.")। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার ব্যাখ্যাতা অনেক পণ্ডিত এই সম্ভাবনা উড়াইয়া দিয়া পশ্চিম এশিয়ার ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল হইতে সিন্ধু-সভ্যতার আমদানীর কথা বলেন, geological stratificationএর ইঙ্গিতকে তাঁহারা পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন।

পূর্বের এক প্রবন্ধে (বৈদিক আর্যগণ কি সেমিটিক? প্রবাসী, পৌষ ১৩৫২) প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা অর্থাৎ সুমেরীয়, বাবিলোনীয় ও আসিরীয় সভ্যতার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হইয়াছে। সিন্ধু সভ্যতার সহিত মেসোপটেমিয়ার সম্পর্ক এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে, সুমেরীয়গণের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার কালনির্ণয় প্রসঙ্গে যে সুমেরীয় সভ্যতার সহিত সংযোগের কথা উঠে তাহা প্রথম সারগণের পূর্ববর্তী সুমেরীয় সভ্যতা, অথবা সুমেরীয় সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় কালের সভ্যতা, অথবা পরবর্তী কালের অর্থাৎ বাবিলোনীয় আমলের পরিবর্তিত সুমেরীয় সভ্যতার ভগ্নাবশেষের সহিত সংযোগ, তাহা সঠিক নির্ণয় করিবার উপায় নাই। মার্শাল এই মত পোষণ করেন যে কতকগুলি এরূপ নিদর্শন বা বস্তু পাওয়া গিয়াছে যাহা "prove active intercourse between Mesopatamia and the Indus valley in pre-Sargonic or relay Sargonic times." দেখা যায় যে নিও-বাবিলোনীয় কিম্বদন্তী মতে আকাদের অধিপতি সারগণ বা সারুকিনের (Sharrukin) অভ্যুদয় কাল খ্রীঃপূঃ ৩৮০০। কেহ কেহ বলেন যে ইহা খ্রীঃপূঃ ২৮০০ হইবে। সে যাহা হউক, মার্শালের উপরে উল্লিখিত মত হইতে অনুমান করিতে হয় যে সিন্ধু সভ্যতার পরিণত অবস্থা সারগণের অন্ততঃ সমসাময়িক, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩৮০০ বৎসরের ব্যাপার। যদি সিন্ধু সভ্যতা পরিণত অবস্থা লাভ করিতে পূর্বের হিসাবমত

১০০০ বৎসর লাগিয়াছিল ধরা যায় তাহা হইলে অনুমান করিতে হয় ঐ সভ্যতার পত্তন হয় খ্রীঃ পূঃ ৪৮০০ অব্দে।

বলা বাহুল্য এই প্রকারের হিসাব সম্পূর্ণ অনুমানমূলক যদিও এই অনুমানের একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেখা যায়। পণ্ডিতগণের অনুমান অনুসারে সিন্ধু সভ্যতা কত প্রাচীন হইতে পারে তাহা দেখান ছাড়া আর একটি উদ্দেশ্যে এই হিসাব দেওয়া হইল। সিন্ধু-উপত্যকায় ধর্মের যে ব্যাখ্যা পণ্ডিতগণ করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিবার সময় দেখা যাইবে যে সিন্ধু সভ্যতার এই আনুমানিক কাল নির্দেশের কথা স্মরণ রাখা তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন নাই। তারপর পশ্চিম এশিয়া, ভূমধ্যসাগর, ঈজিয়ান সাগর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার যে সকল analogical finds বা অনুরূপ নিদর্শন আবিষ্কারের প্রমাণে সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে সেই সকল সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক বলিয়া প্রমাণিত না হইলে তাঁহাদের সিদ্ধান্তে অনেক ত্রুটি আসিয়া যায়। দেখা যাইবে যে গোড়ার এই ত্রুটি তাঁহাদিগকে বিরত বা দ্বিধাগ্রস্ত করিতে পারে নাই।

উপরে যাহা বলা হইল তাহার মোটামুটি তাৎপর্য এই যে দুই প্রকার প্রমাণের বলে সিন্ধু সভ্যতার যে কাল নির্ণয় করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অনেকখানি অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যাইতে পারে যে, অভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার সহিত তুলনামূলক আলোচনায় যে জাতীয় যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসের সম্পূর্ণ ম্যাপের মধ্যে সিন্ধু যুগের প্রকৃত স্থান কোথায় তাহা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

যে সকল যুক্তির বলে বৈদিক যুগের কাল নির্ণয় করা হইয়াছে তাহার বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বের কতকগুলি প্রবন্ধে করা হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে বলা যায় যে পশ্চিম এশিয়ার মিটানী, কাসাইট, হিটাইট প্রভৃতি জাতির কতকগুলি দলিলের প্রমাণ ও উত্তর-পশ্চিম খিরগিজ অঞ্চল বা দক্ষিণ-পূর্ব রুশিয়ায় আর্যজাতির আদি বাসভূমি হইতে আর্যজাতির বিভিন্ন দলের পশ্চিম ও পূর্ব দিকে অভিযান করিবার কাল্পনিক ইতিহাস মিলাইয়া যে মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে এবং এই মতবাদের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বৈদিক যুগের যে কাল নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা সন্তোষজনক নহে। খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ বা ২০০০ হইতে ১৫০০ বৎসরের মধ্যে আর্যজাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সিন্ধু উপত্যকায় আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল ধরিয়া লইলে পশ্চিম এশিয়ার উপরে উল্লিখিত জাতিসমূহের বৈদিক আর্যদিগের সহিত সম্পর্কের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, আবেস্তা ও বেদের এবং আবেস্তিক আর্য ও বৈদিক আর্যদিগের সম্পর্কের সন্তোষজনক ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না।

সিন্ধু যুগ ও বৈদিক যুগের সম্পর্ক নির্ণয়ের ব্যাপারে প্রধান ত্রুটি আসিয়াছে পণ্ডিতগণের অপ্রমাণিত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই ধারণা যে বৈদিক সভ্যতা ভারতবর্ষের পক্ষে কতকটা exotic বা বিদেশীয়। ইহা যে অত্যুক্তি নহে ঋগ্বেদের অধিকাংশ সূক্ত ভারতবর্ষের বাহিরে রচিত হইয়াছিল ওলডেনবার্গ প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতবাদ তাহার প্রমাণ। আর্যজাতির ভারতবর্ষে আগমন এবং ঋগ্বেদের রচনা আরম্ভ অনেক পণ্ডিতের মতে সমসাময়িক। এই মত ও বৈদিক সভ্যতা যে খানিকটা exotic এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার পরে দেখা যাইবে যে সমগ্র সিন্ধু সভ্যতা বিদেশীয়—কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই। বৈদিক সভ্যতা সম্বন্ধে যে মতের উল্লেখ করা হইল তাহা খণ্ডন করিবার একটি প্রধান উপায়ের অভাব দেখা যায়। বৈদিক সভ্যতা বা বৈদিক যুগের সঙ্গে যুক্ত করা যায় এরূপ কোন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের দাবি এ পর্যন্ত করা হয় নাই। বলা বাহুল্য, এই অভাবের ফলে সিন্ধু-সভ্যতার সহিত বৈদিক সভ্যতার সম্পর্ক নির্ণয় করিবার ব্যাপারেও খানিকটা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

সিন্ধু যুগ ও বৈদিক যুগের কালনির্ণয় সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তা দেখা যায় এবং সেই অনিশ্চয়তার দরুণ এই দুই যুগের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিচারে যে সমস্যা দেখা যায় সে প্রসঙ্গ আপাততঃ ত্যাগ করিয়া বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া সমগ্র বিষয়টির বিচার করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এই চেষ্টার ফলে কি তথ্য পাওয়া যায় দেখা যাউক। এই তথ্যের আলোকে দুই যুগের ব্যবধান কিরূপ মনে হয় দেখা যাইবে।

উপরে বলা হইয়াছে যে পণ্ডিতগণের কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার স্তূপের বিভিন্ন স্তর হইতে যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে সিন্ধু সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে হাজার বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই দুই নগরের স্তূপ হইতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ যে সমৃদ্ধ ও বলিষ্ঠ সভ্যতার পরিচয় দেয় হয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের অথবা শত্রু আক্রমণের ফলে মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা পরিত্যক্ত হইবার পরেও যে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল তাহা মনে করা কঠিন। এই সভ্যতার উত্তরাধিকার যাহাদের উপর বর্তিয়াছিল তাহারা কাহারা?

কোন একটি বিশেষ ধরণের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার

population of the Indus valley")। আর্যজাতির প্রতিনিধি ছিল ঋষিকুলগুলি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উপাসনার প্রচারকরূপে তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সিন্ধু উপত্যকার ঐ সকল দেশীয় রাজার আশ্রয়ে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। দেশীয় রাজন্যগোষ্ঠীকে তাঁহারা আর্য দেবতার উপাসনায় দীক্ষিত করেন। তিনি আরও মত প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে যে যতির উল্লেখ দেখা যায় তাহারা ছিল সিন্ধু উপত্যকায় প্রাক্-আর্য অধিবাসীদিগের পুরোহিত শ্রেণী, ("priests of non-Vedic rites practised by the indigenous pre-Aryan population of the Indus valley.")। বৈদিক ধর্ম প্রচারিত হইলে এই পুরোহিত শ্রেণী ব্রাত্য নামে পরিচিত হন। পণি নামক ঋগ্বেদে উল্লিখিত দস্যু জাতি তাঁহার মতে তাম্র যুগের সিন্ধু উপত্যকার বণিক শ্রেণীর প্রতিনিধি।

উপরে লিখিত চন্দ মহাশয়ের অভিমতের মধ্যে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। তিনি তাম্রযুগের সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদিগকে প্রাক্-আর্য বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন আবার ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ ভরত, পুরু, যদু প্রভৃতি গোষ্ঠীকে এই তাম্রযুগের সিন্ধু উপত্যকার শাসক-শ্রেণীর প্রতিনিধি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই সকল ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠীও প্রাক্-আর্য এইরূপ মনে হইতে পারে। হাটন, ল্যাংডন, হেডন, জিউফ্রিডা রুগ্গেরী প্রভৃতি পণ্ডিতের মতে যে দরদ ভাষা (আর্য ভাষা)ভাষী গোলমুণ্ড পামীরী বা ইরাণী জাতি সিন্ধু সভ্যতার অভ্যুদয়ের যুগে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল এবং *Indo-Aryan Races* গ্রন্থে যাহাদিগকে অবৈদিক আর্য জাতি বলিয়া চন্দ মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন তাম্রযুগের সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদিগের কথা বলিবার সময় তিনি তাহাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহার একটি হেতু এই যে ইহারা তাঁহার মতে বৈদিক আর্যদিগের পরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ এবং অধিকাংশ পণ্ডিত এই মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

সে যাহা হউক, উপরে উদ্ধৃত অভিমতসমূহ হইতে সিন্ধু যুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে সংযোগ ছিল ইহা সহজে অনুমান করা যায়।

জাতি, রাজন্যগোষ্ঠী ও অন্যান্য সম্প্রদায় (পুরোহিত ও বণিক সম্প্রদায়), ধর্ম এবং ভাষার দিক দিয়া সিন্ধু যুগ ও বৈদিক যুগের মধ্যে যে সংযোগের কথা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, তাহার পর সিন্ধু সভ্যতাকে প্রাক্-আর্য সভ্যতা বলিবার কি বিচারসহ যুক্তি আছে? নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার পর বেদসমূহ বা ঋগ্বেদ রচিত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষে আর্যজাতি ছিল না এ কথা কি করিয়া বলা সম্ভব? প্রাক্-আর্য ও প্রাক্-বৈদিক যে একার্থবাচক নহে তাহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। তারপর বৈদিক ধর্ম ও কৃষ্টি বলিয়া যাহা পরিচিত আর্যজাতির প্রাচীন কৃতিত্বের তাহাই একমাত্র বা প্রথম নিদর্শন ইহা কি কারণে মনে করিতে হইবে?

সিন্ধু যুগ ও বৈদিক যুগের যে সময় নির্দেশ করা হইয়াছে তাহার ভিত্তি যতটা অনুমান ততটা প্রমাণিত তথ্য নহে একথা বলা হইয়াছে। সিন্ধু যুগ বৈদিক যুগের পূর্ববর্তী মোটামুটি এই মত গ্রহণ করিয়া অনুমানমূলক সময়নির্দেশের ফলে দুই যুগের মধ্যে যে কাল্পনিক ব্যবধানের প্রাচীর তোলা হইয়াছে এই দুই যুগের মধ্যে বাস্তবিক ঐ প্রকার কোন ব্যবধান ছিল না এ কথা মনে করা যাইতে পারে। যদি তর্কের খাতিরে এই কথা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে কি দেখা যায়?

আনুমানিক সন ও তারিখের উপর অন্ধ বিশ্বাস, ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক আর্য এবং প্রাক্-আর্য বা অনার্য সভ্যতা সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদ ও আর্যজাতি সম্বন্ধে কতকগুলি বদ্ধমূল সংস্কার ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের সভ্যতা ও কৃষ্টির পরিচিত ইতিহাস হইতে অপরিচিত ইতিহাসের যে সন্ধান মিলে তাহার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলে উপলব্ধি করা যায় যে পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার দুইটি প্রাগৈতিহাসিক কৃষ্টির—সিন্ধু কৃষ্টি ও বৈদিক কৃষ্টি—যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা নূতন করিয়া অঙ্কন করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এই নব অঙ্কিত চিত্রের পটভূমিতে দৃষ্ট হইবে হিমালয় ও হিন্দুকুশের তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গসমূহ অতিক্রম করিয়া আমুদরিয়ার আরলগামী জলপ্রবাহ। দক্ষিণে সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা ও উত্তরে অকসাস উপত্যকা এই সীমানার মধ্যে মধ্য-এশিয়া বা ব্যাকট্রিয়ার সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, বৈদিক সভ্যতা ও আবেস্তিক সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছিল। এই সকল সভ্যতার সম্মেলনের ফল ফুটাইয়া তুলিতে হইবে এই নব অঙ্কিত চিত্রে। পূর্বগামীদিগের অপ্রমাণিত বা যথেচ্ছ সিদ্ধান্তের গুরুভারে যাঁহাদের কল্পনা-শক্তি ও অনুসন্ধিৎসা পিষ্ট ও ক্লিষ্ট হয় নাই সেই সকল নবীন পণ্ডিতকে এই কার্যে অবহিত হইতে হইবে।

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৭

অতীতকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলে—নূতন করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা—সঙ্কল্প বাক্যে আর কার্য্যে অনেকখানি তফাৎ।

প্রশান্ত পথ চলতে চলতে ভাবছিল, চাকরিটা ছেড়ে দিয়েও উপার্জ্জনের চিন্তা মন থেকে যায় না—এ বড় আশ্চর্য্য! যে বিদ্যা সে অর্জ্জন করেছে—তার মূলে রয়েছে এই প্রেরণা। না হলে হাতে কলমে সে এমন কিছু শিখল না কেন—যা বইয়ের হরপের চেয়ে বেশী কার্য্যকরী। স্থূল সংসারকে অগ্রাহ্য করা চলে না—যেহেতু ক্ষুধা-তৃষ্ণা-আরাম-শয়নের দাবি নিয়ে দেহ প্রতি দণ্ডে মানুষকে তাড়না করছে; তার দাবি মিটিয়ে যে উদ্বৃত্ত সময় পাওয়া যায়—তাই নিয়েই তো জ্ঞানের বন্যাই ভাল লাগে।

দুর্গামোহন এই ভাবের রূঢ় কথা বলবেন—সে অনুমান করা কঠিন নয়। নিজ উপার্জ্জনের উপর আশ্রয় না করলে—পৃথিবী সত্যকার রূপে বারবার দেখা দেবেই। স্নেহ-ভালবাসার রঙীন উত্তরীয়ে নিজেকে শোভন করে রাখা সহজ ততক্ষণ—যতক্ষণ না ঝড় উঠে সব বিপর্য্যস্ত করে দেয়। যে কোন প্রকারে উপার্জ্জনের দায়িত্ব নিয়ে সংসার প্রতিষ্ঠার আশু কল্পনা তার ছিল না—অথচ দৈবচক্রে সংসার গুটিয়ে আসছে তার চার দিকে।

কালও শুভার সঙ্গে তার কথা হয়েছে। নীড়-বাঁধার তাগিদ কোন দিক থেকেই নেই—তবু ছোট মত একটি বাসা চাই। শুভা করবে উপার্জ্জন—সেও বসে থাকবে না। কি কি দিয়ে সাজাবে গৃহ—কোথায় কোন্ জিনিসটি রাখলে মানাবে—তার একটা ছক প্রশান্ত মুখে মুখেই দিতে পারে।

শুভার তাতেই আপত্তি। এই নিয়ে ও বহুবার পরিহাস করেছে। বলেছে, কমরেড, খুব বড় ঘরের ছেলে তুমি নও—তবু বুর্জ্জোয়া মনোভাব তোমার কেন?

প্রশান্ত জবাব দিয়েছে, নিজস্ব একখানি ঘরের দাবিকে তুমি কি বলতে চাও—

হেসে জবাব দিয়েছিল শুভা, কিছুই বলব না কমরেড। যত সামান্যই হোক—পুঁজির বীজ যেন মনের মধ্যে না থাকে। আমাদের সাম্যবাদের স্লোগান—ধনীদের হিংসা করে তৈরি হয় নি—নিজেদের শুদ্ধ করে নেবার মন্ত্র ওটি। ওদের ধন ঘুচিয়ে নিজেদের আরাম চাই না আমরা—সমস্ত জগৎকে অসাম্য থেকে বাঁচানোই হচ্ছে আমাদের নীতি।

তা কি করে হবে! ধনটা কমিয়ে না বাড়িয়ে অসাম্য দূর করবে? ধন কমবে কেন—ব্যক্তিগত মুনাফা শুধু থাকবে না। তোমার মোটা দেহের চর্ব্বি বৃদ্ধি করতে আমরা দেহের রক্ত ব্যয় করব কেন! তোমরা চড়বে মোটর আমরা পড়ব তার তলায় চাপা—এ কেমন বিধান কমরেড?

তা হলে সকলের একখানি করে মোটর থাকুক এই চেষ্টাই করতে হবে তো?

না কমরেড, মানুষের মনের খবর যাঁরা জানেন তাঁরা বলেন—ধনকে রাখতে হবে লোভের সীমানার বাইরে। ব্যক্তিগত আরাম বিলাস একটুতেই মানুষকে পেয়ে বসে—ওটা একেবারে বাড়তে না দেওয়াই ভাল।

মানুষের বৃত্তিকে ছেঁটে ফেলবার ব্যবস্থা! এতে তোমরা স্বস্তি পেতে পার—জগৎ সুস্থ থাকবে তো!

কেন?

এই ধর, প্রতিভাহীনের পর্য্যায়ে যদি প্রতিভাবানদের ফেলা যায়—জগৎ আবার পিছিয়ে যাবে না কি!

তুমি হাসালে—প্রতিভাকে অস্বীকার করবে কে? সোভিয়েটে এর প্রথম পরীক্ষা কি হয় নি? সোভিয়েট কি পিছিয়ে পড়েছে জগতের অগ্রগতি থেকে!

তাকেও অনেক জিনিস বর্জ্জন করতে হয়েছে তো যা তোমাদের নীতিভুক্ত ছিল না।

তাও না। নীতির পরিমার্জ্জন মানে আমূল বদল নয়। পরীক্ষার কষ্টি-পাথরে যাচাই না করলে কাজের সোনাটুকু বার করবে কি করে।···একটু থেমে বলেছে, তোমার পৃথিবী তোমায় ক্ষমা করবে না কমরেড যদি নীতিকে কষে মেজে জীবনযাত্রার উপযোগী করে না নাও। ছোট ঘর বাঁধবার আশ্বাস দিয়েছ কিন্তু—বড় ঘর যখন ডাক দেবে তখন সে ঘরের মায়া তোমাকে ছাড়তেই হবে। ধন হচ্ছে নদীর জল ওকে কোথাও আটকে রাখলে চলবে না।

তা হলে মোটর থাকবে না কারও? পরিহাসের ভঙ্গিতে প্রশান্ত কথাটি উচ্চারণ করেই হেসে ফেলেছে। শুভাও হেসেছে সেই সঙ্গে।

না—না প্রশান্ত, আমাদের মটো মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে—মানুষের মত 'বেঁচে থাকিবারে চাই। একটু পরিবর্ত্তন করলাম—মানেটা দুষ্ট হ'ল না?

হাঁ, যে মানুষ কীর্ত্তিহীন তার পক্ষে যথেষ্ট সুন্দর বলা যেতে পারে।

একটু একটু করে এগিয়ে এসেছে প্রশান্ত। শিরায় তার নীল রক্ত ছিল না কিন্তু নীল রক্তের মোহ তো ছিল যথেষ্ট। যে বিদ্যা সে সঞ্চয় করেছে—উপকথা শুনে দৃষ্টান্ত দেখে সুখ সৌভাগ্যের নিরিখ নির্ণয় করে—তারই মাঝে আত্মনিমজ্জন করা সহজ ছিল না কি! একটু চেষ্টা—হয়তো বিশেষভাবের

চেষ্টা—তা কে না করে থাকে। উচ্চপদ, অট্টালিকা, মোটর, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স, কেশবতী রাজকন্যা, সোনার পালঙ্ক, এর মধ্যেই তো রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের ছোট্ট একটি বীজ। এর মধ্যেই কি ছিল না জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা—চরম স্বর্গবাস কল্পনা? তবু সে কেন্দ্র থেকে সরে এল কিসের প্রেরণায়? শুক্লার?

প্রশান্ত অস্বীকার করে না—যৌবনের নীতিকে। সেই সঙ্গে অস্বীকার করে দেহগত বিলাসকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্ব্বোত্তম পরীক্ষা হয়ে যায় নি কি সোভিয়েট রণভূমিতে? ফ্যাসিবাদকে ধ্বংস করতে ওরা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছিল। সে ব্রহ্মাস্ত্র সহসালব্ধ কোন দিব্যাস্ত্র নয়—রীতিমত তপস্যার দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়েছে। কত বিপ্লব—কত অনর্থপাত, দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আর রক্তনদী অতিক্রম করে একে আয়ত্ত করতে হয়েছে। একটি অনগ্রসর বহুজাতি অধ্যুষিত, বহুধর্ম্ম ও কুসংস্কার পোষিত দেশে যা সম্ভব হয়েছে—পৃথিবীতে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত না বলে অগ্রাহ্য করবে কে? তবে এ কথা ঠিক, এক মাটিতে যে গাছ যে ফল প্রসব করে অন্য মাটিতে তার তারতম্য ঘটবেই। যাঁরা জ্ঞানী গুণী তাঁরা মূল নীতিকে অস্বীকার করেন না; উপযুক্ত সার দিয়ে আবহাওয়াকে অনুকূল করে সামান্য অদল বদল করে ফসলকে তাজা রাখবার চেষ্টাই করে থাকেন। প্রশান্তর প্রথমটা মনে হয়েছিল—মানুষের জন্মগত বৃত্তি হিংসাকে সহজে লালন করা যায় বলেই বুঝি সাম্যবাদকে সে অত শীঘ্র মেনে নিতে পারলে। চিন্তাটার তলায় কিছু সত্য যে নেই তা নয় তবে ওগুলিকে সাধনার পথে বাধা বলে জয় করার চেষ্টা করতে ক্ষতি কি! ক্রমে সত্য আলোকের পুণ্যভূমিতে সে পৌঁছবে আশা হচ্ছে। সন্দেহ এখনও লেগে রয়েছে মনে—জয় সম্বন্ধে সন্দেহ নয়—প্রকৃত কল্যাণ বা সত্য এই পথে লাভ হবে কিনা এবং এই নীতিতে আত্মাবান পৃথিবী স্বর্গভূমি হয়ে উঠবে কিনা! একটু সন্দেহ থেকে যায় বই কি! জার্ম্মানী থেকে নাৎসীরা ইহুদি বিতাড়ন সম্পূর্ণ করে ভেবেছিল—যুদ্ধ জয়ের বাধা সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হ'ল! গায়ের জোরে মানুষকে কোন কিছুতে আটকে রাখা—তা সে যতই কল্যাণ-প্রদ ও উত্তম প্রথা হোক—সম্ভব নয়। সু ও কু প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে জীবন দোলায়িত। চির শান্তি—জীবনকে অস্বীকার করার আর একটি স্বাদহীন শোভাহীন বৈচিত্র্যহীন দিক নয় কি! তা ছাড়া রক্তস্বাদলোলুপ বৃত্তিকে বিলুপ্ত করতে হলে আরও কঠিন ও বৃহত্তর পরীক্ষা দিতে হয়।

শুক্লার প্রতি মোহ—যার জন্য এই নীতিতে তার অনুরাগ বেড়েছে—এটা ঠিক নয়। যে নীতিতেই সে বিশ্বাস করুক—যৌবন তার ধর্ম্ম পালন করবেই। আর যৌবন তার ধর্ম্মে যে প্রভাব বিস্তার করে তাতে চোখ কান বুজে ঝাঁপ দেওয়াকেই বলে মোহ। এমন মোহ মনের কোথাও ছায়াপাত করে নি। শুক্লা যদি বলত—একশো টাকার চাকরি না ছাড়লে আমায় পাবে না—তা হলে খোলা চোখে মোহের একটা রূপ দেখা যেত। ওরা বলে না যে চাকরি করো না—শুধু বলে ধন উপার্জ্জনে সঞ্চয়ের নেশা যেন না লাগে। তর্ক হয়েছিল পুঁজি-বাদীর চাকরি করে পুঁজিবাদকে ধ্বংস করার চেষ্টা চলে কি না! চলবে না কেন। টাকাটাকে অস্বীকার করছে না কেউ—জীবন যাত্রার মানে ওটি অপরিহার্য্য বলে—কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের যে অন্যায় অত্যাচার—যে লোভ বহু-জনকে নামিয়ে একজনকে উঁচুতে তোলে—বহু অস্থিচূর্ণ সারে পরিবর্দ্ধিত একটি সুন্দর গোলাপ গাছ—এ কোন কল্যাণ-কামীই চাইবে না। একে ধনীর প্রতি ধনহীনের হিংসা বলে না—মানুষের ন্যায্য অধিকারে বেঁচে থাকবার সহজ ও সুসঙ্গত একটি দাবি।

তবু সে চাকরি ছেড়ে দিলে। চাকরি অসহ্য বোধ হ'ল। চাটুবৃত্তি—দাসমনোভাব সকলের ধাতে সয় না। দু'পুরুষের বৃত্তি—বন্দীর বন্দনা ছাড়া কি! আপিসকে প্রথমটা মনে হয়েছিল—নিরাকার একটি প্রতিষ্ঠান। ধনিকতাবাদের উদ্ধত অহমিকায় সে কারও দুর্গতিকে বাড়াচ্ছে না বরং বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাই করছে। কিন্তু সে প্রতিষ্ঠানের চাকায় তেল দিতে গিয়ে বুঝলে দেহের রক্তকে বিশুদ্ধ রাখা সম্ভব নয়। এই প্রতিষ্ঠানের মূলে—সহস্রটা শিকড় রয়েছে, রস শোষণ-ক্রিয়া চলেছে অলক্ষ্যে। অত্যন্ত শান্ত ও নিয়মানুগ বিভাগ—তবু কিছুদিন আগে নিরুপায়ের শেষ অস্ত্র ধর্ম্মঘট ঘোষণা করেছিল। ধর্ম্মঘট সাফল্য লাভ করে নি। পুঁজিবাদ সূক্ষ্ম কৌশলে ভেদনীতির প্রয়োগে তা ব্যর্থ করে দিয়েছে। একটা লাভ হয়েছে এই যারা মাসমাহিনায় চোখ বুজে দুঃখ অভাবকে ঘাড়ে নিয়ে মনে করত ভগবানের দান—কর্ম্মফল—কিংবা অদৃষ্ট—তারাও এইটুকু বুঝলে যে মানুষ অনেক কিছুই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করে আর নির্ব্বিচারে মেনে নেয় বলেই সেগুলি চিরকালের সত্য নয়। আর একটা মহৎ শিক্ষা তারা পেয়েছে যে—সব জায়গায় নির্যাতিতরাই এক গোত্রের। স্বদেশী হোক কিংবা বিদেশীই হোক—ধনিকদেরও গোত্রভেদ নেই। দুই গোত্রকে সমভূমিতে দাঁড় করাবার চেষ্টাই হ'ল সাম্যবাদের মূল নীতি।

এসপ্ল্যানেডে শুক্লা অপেক্ষা করছিল। প্রশান্তকে আসতে দেখে চীৎকার করে বললে, হ্যালো কমরেড—এত ভাবছ কি? ঘর একটা ঠিক করলে বুঝি?

প্রশান্ত ম্লান হেসে বললে, তা করলাম। আকাশ তার আচ্ছাদন।—কুলোবে না আমাদের দু'জনকে?

শুক্লা বললে, অবশ্য। কিন্তু ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে!

প্রশান্ত বললে, পিতৃবিত্তের যত নিন্দাই করি—আহার আর আচ্ছাদন থেকে সে যে নিশ্চিন্ত করে রাখে।

শুক্লা বললে, নিজের উপর নির্ভরতা কমে গেলেই মানুষ সব দিকে উপায়হীন মনে করে। নিজেকে সৃষ্টি করে নাও না কমরেড—জীবনে সম্পদ কিছুমাত্র কমবে না।

না শুভা—পুঁজিবাদ যে জাতেরই হোক—বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

দু'জনে হেসে ঘাসের ওপর বসলে। মাথার ওপর একটা পুষ্পাকীর্ণ অজানা গাছ ছায়া বিস্তার করেছে—দুপুরের রোদ গরম লাগছে। ও'দিকে চলছে ট্রাম—বিদ্যুৎবাহিত রঙ করা কতকগুলি সরীসৃপের মত এঁকেবেঁকে চলেছে—এদিকে অতিকায় বাস—আর মসৃণ গতি মোটর। রাজকীয় উদ্যান পরিক্রমায় এরা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

ব্রিটিশ পতাকা লাটভবনের মাথায় পত্ পত্ করে উড়ছে।

সামনের ও দু'ধারের সৌধশ্রেণীকে—ট্রামকে, মোটর ও অতিকায় বাসকে প্রতিযোগিতায়—উৎসাহিত করছে। এদের সৌভ্রাত্রকে স্বাগত জানাচ্ছে আরও উপরের আকাশ। ঘাসের আসনে বসে শুভা বললে, পরিত্যাগ করলে তোমার বাহাদুরিটা কি। ওদের জয় করে নিজের করে নিতে হবে।

আপাতত আমায় আশ্রয় দাও।

শুভা বললে, দিলাম আশ্রয়। তবে এ আশ্রয়ে এলে নিজেকে মনে রাখলে চলবে না কমরেড।

শুভা পরিহাস করছে মনে করে প্রশান্ত সব খুলে বললে।

শুভা বললে, ওঠ।

প্রশান্ত উঠলে।

শুভা তার হাত ধরে বললে, এস।

কোথায়?

শুভা হাসতে হাসতে বললে, রসাতলে।

৮

জায়গাটা রসাতলের কাছাকাছিই বটে। চন্দ্রসূর্য্য-লাঞ্ছিত এক গলির গহ্বরে নোনাধরা স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল-ঘেরা একখানি বাড়ি। এমন জীর্ণ বাড়ি কি করে যে পৌর আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আজও খাড়া রয়েছে ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। অথচ সে বাড়িতেও মানুষ বাস করছে।

শুভা বললে, আমার একটি অনুরোধ—এখানে যা কিছু চোখে পড়বে তাতে আশ্চর্য্য হবে না—কোন কথা জিজ্ঞাসা করবে না। শুধু জানবে পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে যা তোমার কল্পনার বাইরে। অথচ তা সত্য।

খলিতদন্ত বৃদ্ধের মত সিঁড়ি একটা পাওয়া গেল। কিন্তু একতলার সঙ্গে দোতলার পার্থক্য খুব কম। সেই পলস্তরা-খসা ইঁট-বার-করা দেওয়াল—দেওয়ালের গায়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে—দু' পাশের বাড়ির পক্ষপুটে ঢাকা পড়ে শীত না থাকা সত্ত্বেও বাড়িখানা যেন কাঁপছে। ব্যাধিগ্রস্ত বাড়ি।

ওরই মধ্যে চওড়া একখানি ঘরে প্রবেশ করে শুভা বললে, বস।

প্রশান্ত ইতস্ততঃ চাইলে—বসবে কোথায়। ঘরের অপ্রচুর আলো ভেদ করে দৃষ্টি বেশী দূর অগ্রসর হচ্ছে না। মনে হচ্ছে একটিও জানালা নেই—আলো আসবে কোন্ ফাঁকে।

শুভা ওর হাত ধরে মেঝের ওপর বসালে। একটা মাদুরের ওপরই বসলে—যদিও সেটার চেহারা স্পষ্ট নয়। শুভা ডাকলে, মানিয়া রে—

একটা মোমবাতি নিয়ে আধবুড়ি গোছের একটি মেয়ে ঘরে ঢুকলে। বাতিটা মেঝের বসিয়ে বললে, মেঙ্টুর খোখার হয়েছে দিদিজী। বহুৎ তাত আছে—

আচ্ছা আমি যাচ্ছি।

মেয়েটি চলে গেলে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলে, ওটি কি ঝি?

ঝি! এই বাড়িতে ঝি রাখা চলে—না আমাদের ঝি রাখা সম্ভব!

শুভার হাসিতে অপ্রতিভ হয়ে প্রশান্ত বললে, কিন্তু ওতো বাঙালী নয়।

বাঙালী পরিবারের সঙ্গে এক হ'ল কি করে এই চাইছ জানতে? একটু বিশ্রাম কর সব জানতে পারবে।

প্রশান্ত ঘরের চারি দিকে চাইছে দেখে হেসে বললে, পছন্দ হয় তো এই ঘরখানি নিতে পার। বাড়ির এক টেরে—কেউ তোমায় বিরক্ত করবে না।

প্রশান্ত মনে মনে বললে, সব সময়ে মানুষই মানুষকে বিরক্ত করে কি!

এই ঘর—! কারাকক্ষের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই তবু এর চেয়ে নিকৃষ্ট বন্দীনিবাস কল্পনাতে আসে না। এ ঘরের কোন দিকে একটি মাত্র দরজা ছাড়া আর ছিদ্র নেই কেন! ঘরে দিনের বেলায় আলো জেলে পরিচিতকে সম্ভাষণ না করলে অভদ্রতায় বাধে। সুস্থ মন বা সুস্থ দেহ নিয়ে এ আশ্রয়ে একটি রাত্রি কাটানো দুষ্কর।

শুভা বললে, এ ঘরটি পৃথিবীর আরও বহু অকল্পিত আশ্চর্য্য জিনিসের অন্তর্গত। অথচ এদের পরিহার করবার উপায় নেই।

অসাম্যের এই রূপ প্রশান্ত কখনো দেখে নি। এ বড় অকল্পিতই বটে। সে বললে, চল না ছাদে গিয়ে বসি।

ছাদ! এত বড় বিলাস আশা কর তুমি কমরেড!

তবে মানুষ থাকে কি করে এখানে! সাশ্চর্য্যে প্রশান্ত প্রশ্ন করলে।

শহরের পথ নিরাপদ নয় বলে।

বুড়িটা দুটি ঠোঙা নিয়ে ফিরে এল। বললে, লাই চানা আছে দিদিজী। ঠোঙা দুটো মাদুরের ওপর নামিয়ে দিলে।

নাস্তা কর কমরেড—মুড়ি আর ছোলা। একটা ঠোঙা সে তুলে নিলে।

প্রশান্ত তবু সহজ হতে পারছে না। এই ভাবের জীবন যাপন—সে পারবে কি? এ বাড়িতে আলো রোদ নেই—আকাশ দেখা যায় না, শুধু নোনাধরা নির্ম্মম ইটের দেয়াল চার ধারে শাস্ত্রীর মত খাড়া হয়ে পাহারা দিচ্ছে।

বললে, তুমি নিশ্চয়—এই বাড়িতে থাক না শুভা?

শুভা হাসলে, রাজ অট্টালিকা কোথায় পাব কমরেড ?

তা বলে এই নোংরা বাড়িতে—, খানিকটা ক্ষোভযুক্ত ক্ষোভে সে প্রতিবাদ করলে।

উপায় কি। রুপোর চামচে মুখে পুরে জন্মাবার সৌভাগ্য সকলের হয় না।

কিন্তু তুমি—

বাড়িটার দোষ কি ? এখানে মানুষকে নোংরা মনে হচ্ছে—বিশ্রী মনে হচ্ছে কিন্তু অপরিষ্কার এর কোথাও নেই। এই বাড়ি থেকে বেরুলেই তো পথে চলা মানুষের গোত্রে অদ্ভুত ভাবে খাপ খেয়ে যাই কমরেড। আমার শাড়ী—চালচলন—কোথাও এই বাড়ির ছাপ লেগে থাকে কি ?

তবু এখানে মানুষ সুস্থ ভাবে বাস করতে পারে না।··· এই বদ্ধ ঘরে সঙ্কীর্ণ হয়ে যাওয়া কিছু আশ্চর্য্যও নয়।

হাসালে—তোমরাই গীতা আওড়াও—দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা—সুখেষু বিগতস্পৃহ—।

প্রশান্ত কোন কথা বললে না।

মুড়ি খাও কমরেড।

খিদে নেই।

মুড়ি খেয়ে খিদে মেটে কখনও ! বার বার এত ভুল করছ কেন প্রশান্ত ! ওহো—একটু ব'স—মেন্টু কেমন আছে দেখে আসি।

সে চলে গেলে প্রশান্ত নিরুপায় দৃষ্টিতে ঘরের পানে চাইলে। না—এই অবারিত নির্লজ্জ দারিদ্র্যে কোথাও এতটুকু সম্মান বা গৌরব নেই। এর থেকে পরিত্রাণ না পেলে মানুষের মূল্যই বা কি ! শুভা তার সঙ্গে পরিহাস করছে না তো !

শুভা ফিরে এসে বললে, বাঃ রে—মুড়ির ঠোঙাটি ছোঁও নি ? সত্যি কি ভাল লাগছে না প্রশান্ত ?

প্রশান্ত মনকে সজোরে শাসন করে ঠোঙাটি টেনে নিয়ে বললে, তুমি পরীক্ষা করছ কিনা—তাই ভাবছি।

পরীক্ষা !—এমন নিষ্ঠুর পরীক্ষা করে আমার লাভ ! তুমি জান না প্রশান্ত—যার মাথার ওপর পুরুষ অভিভাবক নেই—ছোট দুটি ভাই বোন—রুগ্ন মা—অথর্ব্ব ঠাকুরমা এদের নিয়ে জীবনের যুদ্ধ চালাতে হয়—তাদের এ ছাড়া গতিই বা কি ? এ বাড়ির চারদিকে যে বাড়িগুলি মাথা উঁচু করেছে—তাদের নিরুপায় হয়ে মাথা তুলবার অধিকার দিয়েছিলেন বাবা। তখন তাঁর উপার্জ্জন ছিল না—আমরা ঝুলছি গলায়—এ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।···বলবার সময় একটুও গলা কাঁপল না—মুখের ভাব বদলাল না—অত কারও দুর্ভাগ্যের কথা অত্যন্ত সহজ ভাষায় গড়গড় করে যেন বলে গেল।

প্রশান্ত বিচলিত হ'ল যথেষ্ট। দুটি ছোট অসহায় ভাই-বোন—রুগ্না মা—অথর্ব্ব ঠাকুরমা অথচ বাইরে কোন দিন শুভা এ নিয়ে আক্ষেপ করে নি। কি করে চালায় সে সংসার ! পার্টির কাজ করে কতই বা পায় ! পার্টিতে কাজ করে কি না তাই বা কে জানে। কোন আপিসেই কি কাজ করে ! মনে তো হয় না। পরিষ্কার শাড়ী সব সময়েই শোভন করে পরে—সব সময়ে অপরিমিত হাসে—তর্ক করে—সিনেমাতেও তার অরুচি নেই। রেস্তোরাঁয় ঢুকে কত দিন চা খেয়েছে—প্রশান্তর সঙ্গে। তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা কি বন্ধুত্বের অভিনয় মাত্র নয় ?

আধবুড়ি দাসিয়া ফিরে এসে বললে, দিদিজী—মাজী বোলাতা আপকো।

না—। প্রশান্তর পানে ফিরে বললে, এস প্রশান্ত—এ বাড়িতে থাকবেই যখন—সকলের সঙ্গে পরিচয় করে রাখা ভাল।

পরিচয়ের আগ্রহবশত নয়—এই ঘর থেকে পরিত্রাণ পাবার আশাতে প্রশান্ত উঠে দাঁড়ালে। ঘরের বাইরে সরু মত একটা পথ—দুধারের দেয়ালের দৌলতে এটিকে সুড়ঙ্গ বলা যেতে পারে। তার পরে যে ঘরটায় এসে পৌঁছল ওরা—সেটা অপরিসর আর অন্ধকার আর আগেকার ঘরখানির মতই স্যাঁতসেঁতে ও নিরানন্দময়। ঘরের এক পাশে ছোট খাটিয়ায় এক স্থবিরা অশীতিপর বৃদ্ধা শুয়ে ছিল। বাতির আলোটা তার জরা-শিথিল বহুধা-কুঞ্চিত মুখখানিতে পড়েছিল—চোখের দৃষ্টি বোধ হ'ল ভাবলেশহীন। এক হাতে মাথার বালিশটা ঠিক করছিলেন—অন্য হাতে গায়ের স্থানচ্যুত কাপড়খানি টেনে দেহ আবৃত করার চেষ্টা করছিলেন। এটা সম্ভ্রম-রক্ষার অভ্যাসবশতই হয়ত ঘটছিল। কারণ দৃষ্টি বা শ্রুতি কোনটাই নতুন আগন্তুককে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠার অনুকূল নয়।

শুভা পায়ের শব্দ করে বললে, এটি ঠাকুমার ঘর—অই যে উনি—

বৃদ্ধার কানে হয়তো শব্দটা প্রবেশ করল কিংবা অভ্যাসবশতই তিনি বললেন, কে ? দাসিয়া ? আজ আমাকে খেতে দিবি নে তোরা ?

ঠাকুমা—আমি ! শিয়রে এসে শুভা বৃদ্ধাকে সচকিত করলে।

কে নাতনী ? বলি হ্যাঁলা—তোদের আক্কেল কি—আজ সারাদিন জলস্পর্শ করলাম না—

শেষের দিকে তাঁর স্বর অশ্রুর আভাসে কেঁপে উঠল।

প্রশান্ত বেদনা বোধ করলে। চলচ্ছক্তিহীন হয়ে বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা কেউ ঠেকাতে পারে না ! ক্ষুধা-তৃষ্ণা—হাসি-কান্না তারই মাঝে নির্দ্দয় জরার আঘাত—নিষ্ঠুর বিস্মৃতি। এ বেঁচে থাকার মত করুণ ব্যাপার পৃথিবীতে নেই। তবু বৃদ্ধা একবারও আক্ষেপ করলে না—মরণ প্রার্থনা করলে না।

তোমার খাবার দিচ্ছি। কানের কাছ থেকে মুখ উঠিয়ে শুভা বললে, আসুন।

পিঠোপিঠি ঘর। এ ঘরেও একখানি খাটিয়া পাতা, তবে খাটিয়ার ওপর কেউ শুয়ে নেই—মেঝেতে বসে এক বর্ষীয়সী কি যেন করছিলেন। শুভা ডাকলে, মা। এই এঁরই কথা তোমায় বলেছিলাম—প্রশান্ত।

প্রশান্ত অদূরেই দাঁড়িয়ে রইল—প্রথম পরিচয়ের ক্ষেত্রে একটা প্রণাম—অন্তত কিছু সম্বোধন করা উচিত এ তার মনেই হ'ল না। বর্ষীয়সী এদিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদুস্বরে কি যেন বললেন—প্রশান্ত অর্থহীন দৃষ্টিতে তাঁর পানে চেয়েই রইল। বর্ণহীন, অবয়বহীন এমন অস্থি-কাঠামো তার চোখে পড়ে নি এর আগে। মুখের লাবণ্য মারীচিহ্নে নিঃশেষিত—ভ্রূতে বা চোখের পাতায় নেই লোম—গণ্ডাস্থিতে চোখ দুটি অপ্রকট—প্রেতিনী ছাড়া এ মূর্তিকে কিছু বলা যায় না।

বর্ষীয়সী হতবাক্ প্রশান্তর মনোভাব বুঝলেন কিনা—কে জানে। শুধু বললেন, ছেলেকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে বস—কিছু খেতে দে।

ওঘরে মানে আগের ঘরখানিতে। প্রশান্তই এবার প্রথম পা বাড়ালে। মনে হ'ল আগের ঘরখানি এ বাড়ির মধ্যে সত্যই ভাল। ঈষৎ প্রশস্ত বলে নয়—নির্জন বলেও নয়—জীবনের বিকৃত রূপ ওখানে অন্ততঃ চোখে পড়বে না—এই আশ্বাসে ও দ্রুত পা চালালো।

শুভা বললে, আস্তে হাঁট প্রশান্ত—এ বাড়ি সহজ মানুষের পক্ষে গুরুপাক তো বটেই।

শুভা হাসলে কি নিঃশব্দে? হাসুক। বাড়ির সঙ্গে নতুন পরিচয়টা কোন দিক দিয়েই ভদ্রতার গণ্ডিতে বাঁধবার উপযুক্ত নয়। সৃষ্টির মাঝে সৃষ্টিছাড়া এই সব বস্তু—এরা মানুষের সহজাত আচার-ব্যবহার আদর-আপ্যায়ন এ সব দাবি করতে পারে না নিশ্চয়।

আগেকার ঘরে ফিরে আসতেই জীবনের আভাস পাওয়া গেল। দশ-বারো বছরের একটি মেয়ে কোন অন্ধকারের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে সে শুভার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রশান্তর পানে চেয়ে অস্ফুটস্বরে বললে, দিদি—

শুভা হেসে বললে, তোর দাদা—প্রণাম কর খুকি।

মেয়েটি সসঙ্কোচে এগিয়ে এসে প্রশান্তর পায়ে হাত রাখলে। প্রশান্ত তাকে দু'হাতে তুলে ধরতেই ও কলকণ্ঠে হেসে উঠল। সেই হাসিতে মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে কোথায় ছিটিয়ে পড়ল—প্রশান্ত ফিরে এল জীবনের রাজ্যে।

৯

ক্রমশ সহজ হয়ে এল পারিপার্শ্বিক। গভীর অন্ধকারে পথে নামলে প্রথমটা নিশ্বাস রোধ হয়ে আসে দৃষ্টি অন্ধকারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে—এক পা এগিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব বোধ হয়—সে মাত্র কয়েক দণ্ডের ব্যাপার। তারপর দৃষ্টিতে সয়ে যায় অন্ধকার—অন্ধকার তরল হয়—বুক প্রান্তর হাতছানি দিয়ে তাকে রহস্যপুরীর অভিমুখে। একবার চলা শুরু হলে সঙ্কোচ ভয়, ইতস্ততঃ ভাব কিছুই বাধা জন্মায় না।

তবু একটা কিছু করা দরকার। সংসারে ভার হয়ে থাকলে চলে না। এই পরের দিন সকালে মনে হ'ল।

পরের দিন সকালে সবে ঘুম ভেঙে সে উঠে বসেছে বিছানায়—শুভার মা এসে দাঁড়ালেন ঘরের সামনে। উঁরা এ ঘরে বড় একটা আসেন না।

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে ও জিজ্ঞাসা করলে, আমায় কিছু বলছেন?

শুভার মা বললেন, একটা টাকা দিতে পার বাবা—শুভা কোথায় বেরুল—সে এলেই দিয়ে দেব।

কয়েকটি টাকা মাত্র পকেটে আছে—তা থেকে একটি টাকা অনায়াসে দেওয়া যায়। তার নিজের খরচও তো আছে। কিন্তু টাকাটা ধার দেওয়ার মত করে চাইলেন কেন শুভার মা। উনি কি জানেন না—শুধু কয়েক দিনের জন্ত প্রশান্ত এ বাড়িতে বাস করতে আসে নি!

টাকাটা দিয়ে আরও তার মনে হ'ল—উপার্জ্জন চাই বইকি। সাম্যবাদী হওয়ায় আপত্তি করবে না কেউ (বাবা-মায়ের কথা বাদ দেওয়া যাক—ওঁরা নিজ স্বার্থবিরোধী যে কোন সংকাজেই আপত্তি তোলেন!) কিন্তু যে নীতিতেই আস্থাবান থাকুক—অলস হয়ে বসে থাকলে মুখে প্রবিশন্তি মৃগাঃ হয় না। জীবন রাখতে জীবিকা বেছে নিতেই হবে। রেজিগনেশন-পত্রটা আপিসের উর্দ্ধতন কর্তার কাছে যদি না পৌঁছে থাকে তো ফিরিয়ে নিতে হবে। আত্মসম্মানে বাধবে? সেখানে কিংবা এখানে সর্ব্বত্র আত্মসম্মানকে অক্ষুন্ন রাখা চলে না।

শুভা এলে সে বললে, আমি যদি আপিসের চাকরিটা ফিরে পেতে চেষ্টা করি—অন্যায় হবে কি?

শুভা বললে, নিশ্চয় নয়। বাঁচবার দাবিটা আমাদের জন্মগত দাবি।

প্রশান্ত ইতস্তত করে বললে, একবার রেজিগনেশন দিয়ে—

শুভা বললে, পুরাতন বৃত্তিকে শেষ করে দাও কমরেড। মান-সম্মান ভক্তি ওসব নতুন পৃথিবীতে মানাচ্ছে না—অনেক দিনের পুরনো জিনিস।

প্রশান্ত বললে, তাই বলে মানুষ আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দেবে?

শুভা বললে, আত্ম-সম্মান তো পরের কাছ থেকে ধার করা জিনিস নয় যে নষ্ট হবে! যা তোমার মনের সঙ্গে জড়িয়ে বেড়ে উঠেছে—তা মনেরই জিনিস, কিন্তু কমরেড, বড় সাংঘাতিক জিনিস ওই আত্ম-সম্মান। ওকে যতই বাড়তে দেবে—অহঙ্কার ততই প্রবল হবে। সামাজিক মূল্য আমাদের চেষ্টা করে যারা ওই আত্ম-সম্মানের দাবি জানিয়ে তাদের মনোভাব জনকল্যাণ-প্রবুদ্ধ নয়।

প্রশান্ত বললে, পথের ধুলোয় সব মিশিয়ে হীন হয়ে যাওয়া সেও তো ভাল নয়।

কে করবে কাকে হীন। বিত্ত দিয়ে এক দিন সমাজবিধান তৈরি হয়েছিল—শ্রেণী বিভাগে বুদ্ধির বা প্রতিভার ইতরবিশেষ প্রভেদ অস্বীকার করি না—কিন্তু বিত্তবানেরা কি তথাকথিত মর্যাদা মান পূজা ভক্তি এ সবের বিধান দেন নি? তাঁরা পৃথক হয়ে গড়লেন রাজাকে—দেবতাকে। শ্রেণী ভাগ হ'ল। আরম্ভ হ'ল মানুষের দুঃখ-দুর্দশা।

প্রশান্ত বললে, আজ এসব তর্ক করব না—মানুষের বিধি-বিধানে যথেষ্ট গলদ ছিল বলেই এতবড় প্রমাদ ঘটতে পেরেছে আজ। এসব দূর করা কর্তব্য এও বুঝি, কিন্তু পুরাতন জিনিস মাত্রেই যে খারাপ এ সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

কি জান কমরেড—শ্রেণীস্বার্থ—ব্যক্তিস্বার্থ থেকে দানা বেঁধেছে। শুভা দুয়ারে দুটি টোকা মেরে হাসলে। পুঁথিতে বিধানকে আটকে ফেলতে পারলেই—ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল—কিংবা অপৌরুষেয় কিছু লাভ করলাম এ ভাবা উচিত নয়। দেশের সঙ্গে দেশ মিশছে—মহাদেশে—মহাদেশে আজ কোলাকুলি—পৃথিবীর বিস্তার কমে যে এসেছে সে তো অস্বীকার করে লাভ নেই। নানান দেশের সেরা মানুষরা চেষ্টা করছেন কিসে মানুষ সুস্থ থাকতে পারে—স্বচ্ছন্দে চলতে পারে—বার বার যুদ্ধের নামে যে নরহত্যার অভিনয় হয়—তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে। সত্য কিনা?

প্রশান্ত বললে, যাই হোক—তুমি বলছ পুঁজিবাদীর দুয়োরে ধর্না দিতে আমার লজ্জা হওয়া উচিত নয়।

শুভা বললো, যা তোমার প্রাপ্য—তা আদায় করতে দ্বিধা করবে কেন? পুঁজিবাদকে ধ্বংস করতে হলে তার মধ্যে না গিয়ে উপায় কি। দূর থেকে আগুন জ্বলছে দেখে হায় হায় করা—আর ভাল ভাল স্লোগান আউড়ে—জনযুদ্ধ জয় করা—একই ধরণের।

তর্ককে চালিয়ে যেতে উৎসাহ আসছে না। মনের সম্বন্ধে অটুট থেকে প্রশান্ত বললে, একবার ঘুরে আসি।

ব্যাগে কয়েকটা টাকা ছিল—সোজা গিয়ে উঠল একটা মাঝারি গোছের রেস্তোরাঁয়। একই রাত্রিতে জিহ্বার রুচি-বোধ প্রবল হয়ে উঠেছে।

অনেক ঘুরে সে এল আপিসের সামনে। কত লোকই স্বচ্ছন্দে গোল গম্বুজশোভিত আপিসের বিরাট জঠরে প্রবেশ করছে—বেরিয়ে আসছে। রামায়ণের একটা বর্ণনা মনে পড়ল। নিদ্রিত কুম্ভকর্ণের বিরাট দেহ ঘুমে অচেতন—তার ব্যাদিত বদনের মধ্যে নিশ্বাসের টানে যে সব প্রাণী মুহূর্তেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—তারাই নাসিকা- ও শ্রবণ-ছিদ্র পথে স্রোতের মত বার হয়ে আসছে। বস্তু গ্রহণ ও বর্জনের লীলায় নিদ্রা ভালই জমেছে কুম্ভকর্ণের। জি. পি. ও'র গোল গম্বুজ ওয়ালা সাদা বাড়িটাকে তমনি মনে হচ্ছে। সময়ের সঙ্কেত তার তিন পিঠ ওয়ালা ঘড়িটায়—তিনটি মুহুমুহু চোখে—যারা আসছে আর যারা যাচ্ছে—তাদের লেহন করছে—ওর বিরাট জঠরে যারা উদয়াস্ত কলম চালনা করে—তারাই কি খাদ্যরূপে পরিপুষ্ট করছে না কুম্ভকর্ণকে। রাজকীয় উপচারে কুম্ভকর্ণের দেহে জমছে মেদ—চোখে জ্বলছে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা—নিশ্বাসে বেজে চলেছে কালের জয়ডঙ্কা—কত এল আর কত গেল—এক পুরুষ—দুই পুরুষ—বহু পুরুষ রাজানুরক্তির প্রমাণ রেখে গেল—ধুলো-জমা পুরাতন ফাইলে তাদের জাতি গোত্র লেখা আছে। অল্প মূল্যে জীবন বিকিয়ে যায়—গম্বুজের ঘড়িতে টুং টাং করে শব্দ করে মহাকাল—মানুষ মুগ্ধ হয়ে গোনে আর এগিয়ে যায়।

প্রশান্ত ফিরে এল। আত্মসম্মান বটগাছের শিকড় ও পুরাতন ইমারতের প্রতিটি অস্থিপঞ্জরে—তার দাঁত সুদৃঢ় হয়ে জড়িয়ে আছে—উপড়ে ফেলব বললেই উপড়ানো সহজ নয়। অন্ত আপিসে চেষ্টা দেখা ভাল তার চেয়ে।

যুদ্ধ থেমে গেছে—পৃথিবীতে শান্তি ফিরে এসেছে কি? হয়ত শান্তি আসবে এই আশ্বাসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে সবাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ চেষ্টা করছেন যাতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বে। কিন্তু জাতিতে জাতিতে দরকষাকষির ব্যাপারটা চলছে পুরোদমে। যারা যা গ্রাস করে আছে—তারা তা কণামাত্রও ছাড়বে না। সাম্রাজ্যবাদ শিথিল করবে না তার হাতের মুঠো—গণ-তন্ত্রীরা নতুন পৃথিবীর নতুন বিধান তৈরি করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবেন—এই আনন্দে মশগুল। আমেরিকা জয়ের পথে সৌভাগ্যের সন্ধান পেয়েছে—নিজেদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে প্রসারিত হতে চাইছে—রাশিয়া য়ুরোপে সাম্যবাদের নিশান তুলছে—আর বৃটিশ শঙ্কিত দৃষ্টিতে সন্দেহ-দোলায়িত মনে একবার চাইছে রাশিয়ার পানে আর বার স্বস্তি উচ্চারণ করছে নতুন পৃথিবীর। তার উপনিবেশে যুদ্ধ দোলা দিয়েছে প্রচণ্ড ভাবে—তার অধীন রাষ্ট্রগুলি সব কামনার বহ্নি বেদনায় বিপ্লবোন্মুখ। এশিয়ার গণ-বিদ্রোহের বীজ মহীরুহে পরিণত হতে চায়। আগুন জ্বলছে ভারতবর্ষে—ব্রহ্মে—ইন্দোচীনে—ইন্দোনেশিয়ায়। দ্বীপময় ভারতের সমুদ্রে দাবানল প্রসারিত হচ্ছে। সুদূর ফিলিপাইনে তার অগ্রগামী শিখা পৌঁছে গেছে—কোরিয়ায় তার একটি স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়েছে। পারস্যে—প্যালেষ্টাইনে—মিশরে—প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে—সেখান থেকে—আরব সাগরে—ভূমধ্যসাগরে পৌঁছে গেছে বার্তা। লেক সাক্সেসে—লণ্ডনে—প্যারীতে—কাসাব্লাঙ্কা—তেহরান—ইস্তাম্বুলে প্রতিক্রিয়া চলছে। এক একটি ঘোষণার অদ্ভুত্পাতের দীপ্তি বিশ্বের আকাশ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে—ইনি ভাবছেন ওঁর ত্যাগেই শান্তিপ্রতিষ্ঠা—উনি ভাবছেন—প্রথমে গ্রাস করেছেন বলেই সম্পত্তিটা চিরকালের থাকবে এই বা কোন্ কথা—সুতরাং ছাড় তার স্বত্ব—শান্তি আসবে। ইহুদী আর

আয়ব—পারস্ত আর আজারবাইজন—কংগ্রেস আর লীগ—ব্রহ্মের জাতীয় দল ও সীমান্ত দল—কুওমিন্টাং ও কম্যুনিষ্ট—সাম্রাজ্য নীতির দাবার ছকে চালের পর চাল দিয়ে যাচ্ছে। আগে-আসার দাবিতে ও ডলার পাউণ্ডের স্বর্ণ ভারে—পৃথিবীকে ডাইনে থেকে বাঁয়ে—আর ঊর্দ্ধ থেকে নীচে হেলাচ্ছে যারা—তাদের গোত্র স্বর্ণ চিহ্নিত হলেও—অবশিষ্ট যে ক্ষমতা তাদের হাতে আছে—তাতে দাবার ছকে খেলাটা আরও খানিক চলবে। তবে সব খেলারই যেমন শেষ আছে—এ খেলাও এক দিন থামবে। সাম্রাজ্যবাদ ভেঙে পড়বার আগে যে চরম আঘাত হানবে—তারই সূচনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে দেখা দিয়েছে।

কতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত বসেছিল প্রশান্ত জানে না। পায়ে পায়ে সে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে মনুমেণ্টের তলায়—স্লোগানবিদ্ধ পতাকা হাতে অপরিমিত চেঁচাচ্ছে—মজদুর দল। ওদের ক্ষোভ অভিযোগ প্রকাশ করবার দ্বিতীয় রাস্তা নাই। মাঠের চারধারে যে সব প্রাসাদ কেল্লা প্রমোদ-উদ্যান চোখ রাঙিয়ে শাসন করছে—এই অল্প পরিসর মাঠকে আর অবারিত আকাশকে—তারা কেঁপে উঠছে কি ধ্বংস কামনার উষ্ণ নিশ্বাসে? ওরাই হানবে শেষ আঘাত শান্তিপ্রিয় মানুষকে—আর ওরাই মিশে যাবে এই নব জাগ্রত জীবনের উদ্বোধন মন্ত্রে? ভাবতে ভালই লাগছে। দিবাস্বপ্নের মত মধুর—আবেগ-মদির চিন্তা। এ চিন্তা সফল হবেই—আসিবে সে দিন আসিবে।

কিসের মিছিল তোমাদের? চাকরি ছাঁটাইয়ের। কিসের অভিযোগ করছ তোমরা? মাগ্‌গি ভাতা—বেতন বৃদ্ধির? ধর্মঘটের হুমকি কেন? মানুষের নিম্নতম পর্য্যায়ে বেঁচে থাকবার অধিকারটুকু চাই আমরা। আমাদের বাঁচতে দাও শুধু। বেশনে অর্দ্ধাহার—বসনে আদিম যুগের ব্যবস্থা—পশুত্বের স্তরে নামাবার প্রাণপণ আয়োজন কেন। তোমাদেরই সৃষ্ট সভ্যতাকে তোমরা হনন করছ। স্বর্ণ সঞ্চয়ের বাসনাকে নিরুদ্ধ কর—বাঁচাও আমাদের। দূরে চলে যাচ্ছে চক্‌চকে মোটর—মোটরের পর্দ্দানশী কোন সুবেশ—মানুষ চেয়ে দেখছে ময়দানের দিকে সকৌতুকেই। রেস্তোরাঁয় বাজছে জ্যাজ ট্রটের হাল্কা সুর—মেট্রোর নিয়ন লাইটের নীলিমায় অগ্নি-অক্ষরে 'বেদিং বিউটি'র ঘোষণা—আর রেড স্কেলটনের প্রায়-নগ্ন নির্লজ্জ দেহভঙ্গিমা। পণ্যসম্ভারে চৌরঙ্গী কণ্টকিত, দোকানে কত রকমের খাবার—সাজে সজ্জায় নব নব ফ্যাসানের রীতি—সাম্রাজ্যবাদ শেষ আঘাত দেবার জন্ত প্রস্তুত হয়েছে।

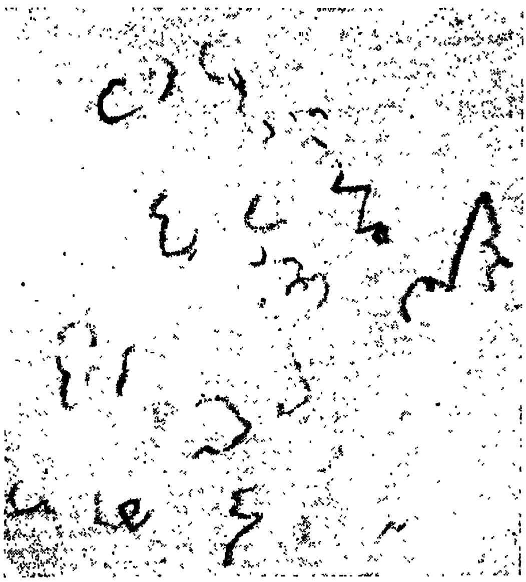
(ক্রমশঃ)

আদর্শ শিক্ষায় প্রাথমিক চিত্রাঙ্কন ও হস্ত-শিল্পের দান

শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুশারী

আদর্শ শিক্ষায় মানুষের বৃত্তিগুলি এমন পরিমার্জ্জিত হয় যে, সংসারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তি সে লাভ করতে পারে। চার্লস ডারউইন তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, মানুষকে কেবল বুদ্ধিজীবী করবার চেষ্টা করলে তার অন্যান্য উৎকৃষ্ট সুকুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং বহুমুখী শিক্ষালাভে বঞ্চিত হওয়ায় এক-ঘেয়েমিতে ও অবসাদে তার জীবন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

আমাদের শিক্ষা-প্রণালীতে বহুমুখী শিক্ষার অভাব এত বেশী যে, বৈচিত্র্যহীন জীবনে নূতনত্বের উদ্দীপনা সঞ্চার করবার এতটুকু সামর্থ্য তার নেই। মনের সঙ্গে মাংসপেশীর যোগাযোগ স্থাপনের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে ওঠে নি, তাই আজ পরের মুখের দিকে চেয়ে আমাদের দিন কাটে। আমাদের বিদ্যালয়সমূহে শিশুশিক্ষা যে আজ উপযুক্ত মর্য্যাদালাভ করছে না, বিদেশী শিক্ষানায়কগণই চোখে আঙুল দিয়ে তা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যক্ষজ্ঞান ও পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি যে চিত্রাঙ্কন ও হস্ত-শিল্প শিক্ষার মূলভিত্তি-স্বরূপ বৈদেশিক শিক্ষাতাত্ত্বিকদের কাছ থেকে আজ তা আমাদের শিখতে হচ্ছে। দেশের উৎপন্ন কাঁচামাল বিদেশে যায়। সেখানকার কারখানায় সেইসব মাল থেকে বিলাসের সামগ্রী প্রস্তুত হয়ে আসে, আমরা নিত্য ব্যবহার করে সখ মেটাই। উদ্ভাবনী-শক্তি ও হস্ত-শিল্প শিক্ষায় জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা যে অনেক পিছনে পড়ে আছি তাতে সন্দেহ নেই। প্রাথমিক শিক্ষার কথাই ধরা যাক না। এ দিক দিয়ে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে কি আমাদের তুলনা চলে? এক আমেরিকায় প্রায় ২,০০,০০০ লক্ষ প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় আছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রদের স্বাধীন মনোবৃত্তি বিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা করেছেন। এইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার ভিত্তি হ'ল ভবিষ্যৎ জীবন গঠনোপযোগী কার্য্যকরী শিক্ষাদান। তাদের শিক্ষাতন্ত্রে আছে লেখাপড়া, ভাষাশিক্ষা, সংখ্যা ও রাশিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল চিত্রকলা, সঙ্গীত, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্যায়ামচর্চ্চা ইত্যাদি বহু বিষয় শেখাবার ব্যবস্থা। অনেক ক্ষেত্রে চিত্রকলার সঙ্গে থাকে অন্যান্য হাতের কাজ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।



অঙ্কনের প্রথম অবস্থা
সত্যব্রত কুমারী, বয়স ২ বৎসর, ১০ মাস। ফেব্রুয়ারী—১৯৪৫

ছবি আঁকা, হাতের কাজ ও গান-বাজনা আমাদের বিদ্যামন্দিরে এত কাল অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। এখন এগুলো বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পেয়েছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত মর্য্যাদালাভ করেছে, একথা বলা চলে না। অনেকের ধারণা, সাধারণ বিদ্যালয়ে এ সকল শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলে ছেলেদের বিদ্যাচর্চ্চার ব্যাঘাত হবে। এ ধারণা যে কতদূর ভ্রমাত্মক তা আজ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

এমার্সন বলেন, "The healthy growth of the mind is just in proportion to the activity of thoughts on the study of outward objects."

অর্থাৎ—বাস্তব পদার্থের বিচার-জ্ঞানের অনুপাতে মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শশক্তির দৌলতে বাস্তবের জ্ঞান আমরা লাভ করে থাকি। মনোবিদ্‌গণ বলেন শিশু প্রথমে লাভ করে স্পর্শজ্ঞান। শুধু বস্তুর গুণ বা বর্ণ জেনে নিলে সে বস্তু সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। তার ব্যবহার জানতে হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ হয় দৃষ্টিশক্তি ও স্পর্শশক্তির যোগাযোগ হলে এবং এই জ্ঞান যখন সক্রিয় হয় তখনই বাহ্য জগতের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা দৃষ্টি ও স্পর্শশক্তির মধ্যে সহযোগিতা স্থাপন করা যায়। ব্যবহারিক জীবনে এই যুগ্ম শক্তিই আমাদের চিন্তা-রাজ্যের ভিত্তিস্বরূপ।

পুঁথিগত জ্ঞান লাভ করে বুদ্ধিজীবী হওয়া যায়, কিন্তু তা দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ শক্তি লাভ করা অসম্ভব। স্নায়ুমণ্ডলীর উপর শিশুদের কর্ত্তৃত্ব না থাকায় তাদের মাংসপেশীগুলো অনিয়ন্ত্রিত গতিতে চলতে থাকে। তাই তারা ভালমন্দ বিচার-সমস্তাকে অগ্রাহ্য করে কলম বা পেন্সিলের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষণশক্তিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করে।

১ নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে শিশুটি কতকগুলি তির্য্যকৃতি দাগ কেটেছে যার কোনই অর্থ হয় না। শিশুটির বয়স ৩৪ মাস। তার দু-বৎসর বয়সের সময় ছবি আঁকাবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কাগজের কোন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আঁকা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। এ চিত্র দেখলে মনে হবে তার পর্য্যবেক্ষণশক্তিকে সে কাজে লাগায় নি অথবা কাজে লাগাতে পারে নি, শুধু খেলা হিসাবেই ঐরূপ এঁকেছে। এগুলো তাদের সহজ জ্ঞানের প্রেরণা দ্বারা সম্পন্ন হয়।

শিশুগণ কতকগুলি সংস্কার নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। হিন্দুশাস্ত্র মতে এই সংস্কার বা সহজ জ্ঞান পূর্ব্বজন্মার্জিত। অভ্যাসের দ্বারা এই জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হয়। শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে এর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

শিশুগণ বালক বয়সে পা দিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন মনঃসংযোগ দ্বারা কোন বস্তু নিরীক্ষণ করতে পারে না, তাদের অঙ্কিত রেখা বা বর্ণ সমাবেশে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মনের চিত্র অপরিস্ফুট হলে অঙ্কিত চিত্রে তারই ছায়াপাত হবে। তাদের হাতের মাংসপেশী প্রথমে থাকে অনিয়ন্ত্রিত, মনের ছবিকে অঙ্কনের ভাষায় ব্যক্ত করতে গিয়ে তাদের হাতে পেন্সিল ইত্যাদির ডগায় হিজিবিজি রেখাই কেবল ফুটে ওঠে। স্মৃতিশক্তির অভাব ও ভাব প্রকাশের অক্ষমতাই এর কারণ।

২ নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার পর্য্যবেক্ষণশক্তিও বাড়ছে। বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ছবিটি লেখকের সাড়ে তিন বৎসর বয়স্ক পুত্রের আঁকা। এক সময় আমি ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ লেখায় মনোযোগ দিয়েছিলাম, সেই সময় শিশু আমার কাছে এসে আমি কি করছি তা নিরীক্ষণ করতে লাগল। আমিও তার কৌতূহল জাগাবার অভিপ্রায়ে আমার লেখার অনুকরণ করে লেখবার চেষ্টা করতে উপদেশ দিই। এ ভাবে কিছু দিন গেলে এক সময় দেখতে পেলাম আমারই নিকটে মেঝের উপর খড়িমাটি দিয়ে সে হিজিবিজি আঁকছে এবং মাঝে মাঝে আমার লেখার হরফগুলো দেখে নিচ্ছে। কালবিলম্ব না করে আমি তাকে দিয়ে দু'তিনখানা চিত্র আঁকিয়ে নিয়েছি। চিত্রটি যে ইংরেজী হরফের অনুকরণে আঁকা হয়েছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না।

ছবি আঁকা, হাতের কাজ এবং লেখা ইত্যাদি দ্বারা পর্য্যবেক্ষণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বস্তুর বাহ্যরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়৮ পৈশিক স্পর্শশক্তি বাড়িয়ে দিতে এদের ক্ষমতা অপরিসীম।

আর্নল্ড বলেন, "The value of art of drawing has become so self-evident that it provides a most excellent means of training the eye to an accurate perception of form and its beauty and of cultivating a habit of exact observation."

পর্যবেক্ষণ দ্বারা মনের ভেতরে বস্তুর রূপ গ্রহণ করা ও হস্তদ্বারা তা প্রকাশ করা—এ উভয়বিধ কার্য্যের মধ্যে অবিরত প্রেরণা যোগায় একটা শক্তি—মন সে শক্তির বাহন এবং প্রেরণা চালিত হয় স্নায়ু দ্বারা। বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী স্নায়ু আদান-প্রদানে সর্বদাই ব্যস্ত থাকে। অন্তর্মুখী স্নায়ু বস্তুর রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে বয়ে নিয়ে যায় মস্তিষ্ককেন্দ্রে। সেখান থেকে বহির্মুখী স্নায়ু কর্তব্যের প্রেরণা বয়ে নিয়ে এসে হাতের মাংসপেশীকে সজাগ করে দেয়। এ ভাবেই বাহ্য জগতের সঙ্গে মনের যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে। চক্ষু ও হস্ত এই দুই কর্মেন্দ্রিয় মনকে প্রেরণা যোগায় আর মন আপনাকে প্রকাশ করে অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানের ভিতর দিয়ে।

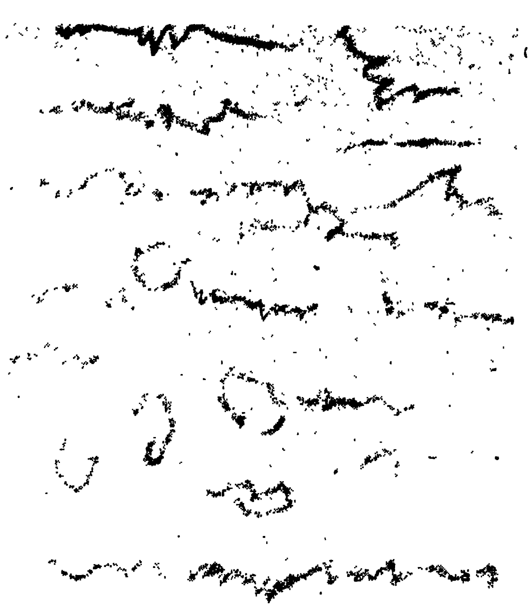
ছবি আঁকতে হলে প্রথমে অঙ্কনীয় বস্তুকে মনে টেনে আনতে হবে—অর্থাৎ তার রূপ অনুধ্যান করতে হবে একাধিক বার তাকে নিরীক্ষণ করে। এই নিরীক্ষণ করার ফলে বস্তুর বর্ণ ও আকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হয়।

তাই বলছিলাম মানুষকে আদর্শ শিক্ষা দিতে হলে তার যাবতীয় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের অনুশীলনের ব্যবস্থা করে দেওয়া আবশ্যক।

মনোবিদ্‌গণ সমস্বরে বলছেন, "The factual sense is the basis of all sense." কিন্তু এ কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা এখনো সচেতন হয়ে উঠি নি। স্পর্শনেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয়ের অনুশীলন বাদ দিয়ে আমাদের শিক্ষানীতি চলে আসছে দীর্ঘকাল ধরে।

চিত্রাঙ্কন ব্যতীত শিশুর মন ও মস্তিষ্কের শক্তি এবং জ্ঞান-বৃদ্ধির সহায়ক আরো কতকগুলো বিষয় আছে যেগুলোকে উপেক্ষা করা চলে না। আমাদের দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ চিত্রাঙ্কনকে একটু স্থান দিয়ে থাকেন বটে, কিন্তু মাটির কাজকে নিতান্ত অবজ্ঞা ও অনাদরের চক্ষে দেখে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় মাটির কাজ শিক্ষার প্রয়োজন চিত্রাঙ্কনের চেয়েও বেশি। সমতল পৃষ্ঠে কতিপয় রেখা, বর্ণ অথবা আলোছায়া প্রতিফলিত করে একটি ফলের প্রতিরূপ অঙ্কন করার তুলনায় নরম মাটি দিয়ে তা প্রস্তুত করা অনেক সহজ এবং ফলের স্বাভাবিক আকৃতি ও ঘনত্ব বিকাশের জন্য শিশুদের কাছে এটা বেশ চিত্তাকর্ষক হয়।

প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণ একান্ত উদাসীন। এই শিক্ষা ব্যবহারিক বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। কতিপয় টেকনিক্যাল বিদ্যালয় ব্যতীত যথাযোগ্য ভাবে এ শিক্ষার প্রবর্তন খুব অল্প স্থানেই হয়েছে। এ দেশের বিদ্যালয়সমূহে যে পরিমাণ ছাত্র

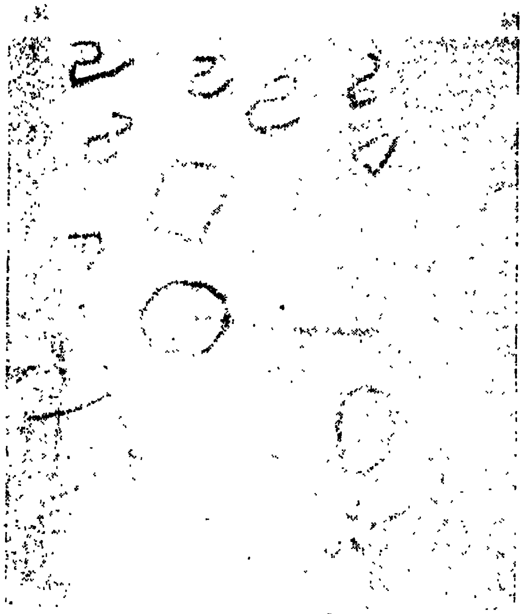


অঙ্কনের দ্বিতীয় অবস্থা
সত্যব্রত কুমারী, বয়স ৩ বৎসর, ৬ মাস। অক্টোবর—১৯৪৬

শিক্ষালাভ করে তন্মধ্যে শতকরা প্রায় ৪০ জন মাত্র হস্তশিল্প, চিত্রশিল্প, কারুশিল্প, শ্রমশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে যৎসামান্য শিক্ষালাভ করেই জীবিকা অর্জনে রত হয়। আমাদের যে শিক্ষাপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে তাতে দেখা যায়, ছাত্রগণ প্রকৃত ব্যবহারিক বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক খ গ আরম্ভ করে প্রায় ১৬ কি ১৭ বৎসর বয়সে। তাতেও সুনিয়ন্ত্রিত প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা খুব অল্পই দেখা যায়। আবার কতক ছেলে অভিভাবককে সন্তুষ্ট রাখার জন্য বছরের পর বছর, যে ভাবেই হোক ক্লাস ডিঙিয়ে যাচ্ছে, পাশ দিতে হবে বলে। কেউ তাদের মনের দিকে, কর্মশক্তির দিকে, রুচির দিকে তাকায় না। অভিভাবকগণও এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

শিক্ষায় অগ্রগামী প্রত্যেক দেশেই প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষা বিষয়ে ব্যাপক আন্দোলন চলছে। তথায় শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিদ্‌গণ সমিতি গঠন করে এ বিষয়ে নূতন নূতন পরিকল্পনা করছেন। সে সমস্ত পরিকল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করবার জন্যেও সাধ্যমত প্রয়াস চলছে। এমনিভাবে পরীক্ষা ও গবেষণা দ্বারা শিক্ষার নব নব অধ্যায় রচিত হচ্ছে। আর আমরা সকল সমস্যাকে ধামাচাপা দিয়ে গতানুগতিক রীতি-পদ্ধতিরই অনুসরণ করে চলছি।

অধুনা কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রাথমিক-হস্তশিল্প শিক্ষার প্রচলন হয়েছে। এটা আশার কথা। আমাদের দেশে প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাতন্ত্রে অঙ্কন, মাটির কাজ ও প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষা, অন্যান্য বিষয়ের মত বাধ্যতামূলক



অঙ্কনের তৃতীয় অবস্থা

সত্যব্রত কুমারী, বয়স ৪ বৎসর, ২ মাস। জুন—১৯৪৭

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে শিশুর প্রকৃতিগত পর্যবেক্ষণ শক্তি কিরূপ বৃদ্ধি পায় এই চিত্রে তার নিদর্শন পাওয়া যাবে।

শিক্ষা হিসাবে নির্দ্দিষ্ট হলে, শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যবহারিক জীবনের এক বড় সমস্যার সমাধান হয়। প্রাথমিক হস্ত-শিল্প শিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপনের কোনই প্রয়োজন হয় না।

অনেকের ধারণা লেখা-পড়া শিক্ষাদানের বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা শুধু অবসর বিনোদনের জন্য—অর্থাৎ শিক্ষার একঘেয়েমিকে পরিহার করার জন্য। কিন্তু সত্যি কি তাই? অবসর বিনোদনের জন্য আছে খেলা ও সঙ্গীত। অবশ্য শিশুদের চিত্রাঙ্কন ও হাতের কাজ অনেকটা সে পর্য্যায়ে পড়ে। কিন্তু বালকদের জন্য শুধু অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে আদর্শ শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে বলে আমার ধারণা।

এবার প্রাথমিক চিত্রাঙ্কন ও হস্তশিল্পের ব্যবহারিক দিকটা সম্বন্ধে একটু বলব।

অঙ্কন শিক্ষা দেবার জন্য ছাপানো আদর্শ চিত্রের প্রচলন আছে। একটু বয়স্ক বালক-বালিকাদের শিক্ষায় কোন বিশেষ শ্রেণীর পক্ষে এ সব চলতে পারে কিন্তু কচি শিশু-দের এ সকল আদর্শ চিত্র দৃষ্টে আঁকতে উৎসাহিত করা অনুচিত। ছবির অনুকরণ করা শিক্ষার আদর্শ হতে পারে না। প্রাকৃতিক বস্তুকে আদর্শরূপে গ্রহণ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, বিশেষত শিশুশিক্ষায়। আদর্শ চিত্র সর্বাঙ্গসুন্দর হওয়া উচিত। বাজারে এমন কতকগুলি আদর্শ চিত্রাঙ্কন-পুস্তক চালু হয়েছে যাতে আদর্শ চিত্র বলে কিছু নেই।

শিশু কি আঁকতে পারে, তার মনের অবস্থা প্রবণতা কোন্ ধরণের ছবি আঁকার দিকে, প্রথমে তা পরীক্ষার দ্বারা বুঝে নিতে হবে। কোনরূপ হদিস না দিয়ে তাদের ইচ্ছামত আঁকতে দিলেই শিক্ষক বুঝে নিতে পারবেন, কোন্ ধরণের ছবির দিকে তাদের আকর্ষণ, দর্শনেন্দ্রিয় ও হস্তের উপর কতটা অধিকার তাদের আছে, পর্য্যবেক্ষণশক্তি কি পরিমাণ আছে ইত্যাদি। পরীক্ষার পর নূতন নূতন বিষয় তাদের সামনে উপস্থিত করতে হবে এবং সতর্কতার সহিত সেগুলো তাদের দিয়ে আঁকাবার ব্যবস্থা করতে হবে যেন তাদের কৌতূহল কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়। শিশুদের এমন ভাবে উপদেশ দিতে হবে যেন তারা সে উপদেশ অনুসারে নিজেরাই প্রয়োজনমত স্ব স্ব চিত্রের সংশোধন করে নিতে পারে। একান্ত অপারগ হলে শিক্ষক সাহায্য করবেন। অতিরিক্ত উপদেশ বা একই চিত্র নিয়ে তাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটান অসঙ্গত। উপদেশের ভিতর দিয়ে শিশুদের সহজাত সংস্কার তাদের স্মৃতিপথে টেনে আনতে হবে।

ছাত্রগণ সাধারণত যন্ত্রাদি ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জন করে ১২ বৎসর বয়সে। এই সময় থেকেই তারা প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষা আরম্ভ করবে। বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে, সকল দিক বজায় রেখে, কি প্রকারে প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় নিয়ে সেইরূপ একটি পরিকল্পনা দিলাম :—

১ম বৎসর (বয়স ১২)

১।	হস্তশিল্পে প্রয়োজনীয় ভাষা ও অঙ্ক শিক্ষা—	সপ্তাহে	২ ঘণ্টা
২।	অঙ্কন শিক্ষা—	"	২ ঘণ্টা
৩।	মাটির কাজ—	"	২ ঘণ্টা
৪।	কাঠের কাজ—	"	২ ঘণ্টা
৫।	রঙের কাজ—	"	২ ঘণ্টা

২য় বৎসর (বয়স ১৩)

১।	অঙ্কন—	বৎসরে ৪	সপ্তাহ
২।	রঙের কাজ—	৪	"
৩।	মাটির কাজ—	৩	"
৪।	কাঠের কাজ—	৪	"
৫।	দপ্তরীর কাজ—	৩	"
৬।	সেলাইয়ের কাজ—	৪	"
৭।	মেসিন সপ—	৪	"
৮।	লিপি	৩	"
৯।	খেলনা তৈরি—	৩	"

এই ব্যবস্থায় সপ্তাহে ৩ ঘণ্টা হিসাবে কাজ চলবে।

৩য় বৎসর—(বয়স ১৪)

১। উপরিউক্ত ৯ টি বিষয়ের যে কোন ৩টি বিষয় গ্রহণ করে তার প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য ১০ সপ্তাহ করে শিক্ষার সময় নির্দিষ্ট থাকবে।

২। মেকানিক্যাল ড্রইং—সপ্তাহে ২ ঘণ্টা।

হস্তশিল্প ব্যবহারিক বৃত্তিমূলক শিক্ষা হিসাবে যারা গ্রহণ করবে কেবল তারাই ৩য় বৎসরের শিক্ষাপ্রণালী অনুসরণ করবে। যাঁরা শিল্প বিভাগের শিক্ষক, সুপারভাইজার, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ডিরেক্টর তাঁরাও উপরি-উক্ত পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী শিক্ষালাভ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন। হাতে কলমে কাজ শিক্ষা না করে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করলে যাওয়ার বিপদ অনেক। অনভিজ্ঞ শিক্ষকের হাতে ছাত্রদের শিক্ষা অথবা অজ্ঞাবধানের দায়িত্বভার ন্যস্ত করলে তার পরিণাম অশুভ না হয়ে যায় না। বলা বাহুল্য যে ১ম ও ২য় বৎসরের শিক্ষা-ব্যবস্থা সকলের পক্ষেই বাধ্যতামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অনেকে মনে করতে পারেন প্রাথমিক হস্তশিল্প শিক্ষার নির্বাচিত বিষয়গুলির পরিমাণ অধিক হওয়ার ফলে এ শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ হবে না। এ ধারণার মূলে কোন সত্য নেই। প্রাথমিক শিক্ষা কেবল পূর্ণ শিক্ষালাভের সহায়তা করে মাত্র। বালকবালিকাদের স্বভাব, একটা বা দুটো জিনিস নিয়ে বেশী সময় তারা ব্যাপৃত থাকতে ভালবাসে না। এর আর একটি দিক আছে। ঐ বিষয়গুলি কার্যে পরিণত করতে গিয়ে পৌনঃপুনিক অভ্যাসের দ্বারা তারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করবে সেই অভিজ্ঞতা তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে সাহায্য করবে। হারবার্ট বলেছেন, "Interest is the keystone of instruction."

কৌতূহল জাগিয়ে দিতে না পারলে শিক্ষা সফল হবে না। এই কৌতূহল সৃষ্টির অভাবই হ'ল আমাদের শিক্ষার গলদ। বাল্যশিক্ষা থেকে আরম্ভ করে সকল শিক্ষাতেই এই ত্রুটি কায়েম হয়ে বসেছে। বালকবালিকাদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যেন ভবিষ্যৎ জীবনে জ্ঞানের সকল বিষয়েই তাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়।

ড্রইং শিক্ষকের শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। লেখা পড়া শিখলে যেমন বুদ্ধিজীবী হওয়া যায়, হাতের কাজ শিখলে তেমনি কারিগর হওয়া যায়। এই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষা করে যিনি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন তিনিই আদর্শ শিক্ষক হবার উপযুক্ত। সাধারণতঃ দেখা যায়, যাঁরা শিল্পকলা প্রভৃতি হাতের কাজ শিক্ষা করেন, পুঁথিগত বিদ্যার দিকে তাঁরা বিশেষ নজর দেন না। এরূপ হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কাজ যেমনই থাক, আদর্শ শিক্ষার ভিত্তি কোনক্রমেই শিথিল হওয়া সঙ্গত নয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ড্রইং শিক্ষকের শিক্ষণীয় :—

১। মনোবিদ্যা (ড্রইং এবং হাতের কাজের উপযোগী যতটা প্রয়োজন) শিক্ষা করতে হবে।

২। বৈজ্ঞানিকদের নির্দেশিত পথে গবেষণা করে বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির সত্যতা প্রমাণিত করবার চেষ্টা করতে হবে।

৩। দেশ-বিদেশের শিক্ষাবিদ ও মনোবিদ্গণ কি বলেন সে সকল বিবরণ পড়ে প্রয়োজনীয় তথ্য অবগত হতে হবে।

৪। চিত্রাঙ্কনের যাবতীয় বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানলাভ করতে হবে এবং অভ্যাসের দ্বারা অঙ্কন-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করতে হবে।

৫। যে পাঠ্যতালিকা প্রাথমিক হস্তশিল্পের জন্য নির্দিষ্ট হবে, হাতেকলমে তা শিক্ষা করতে হবে।

মূক-বধির শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশু ও বালকদের সঙ্গে প্রায় ২৫ বৎসর ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তারই উপর নির্ভর করে চিত্রাঙ্কন ও হস্তশিল্প শিক্ষা সম্বন্ধে দুচারটি কথা বললাম।

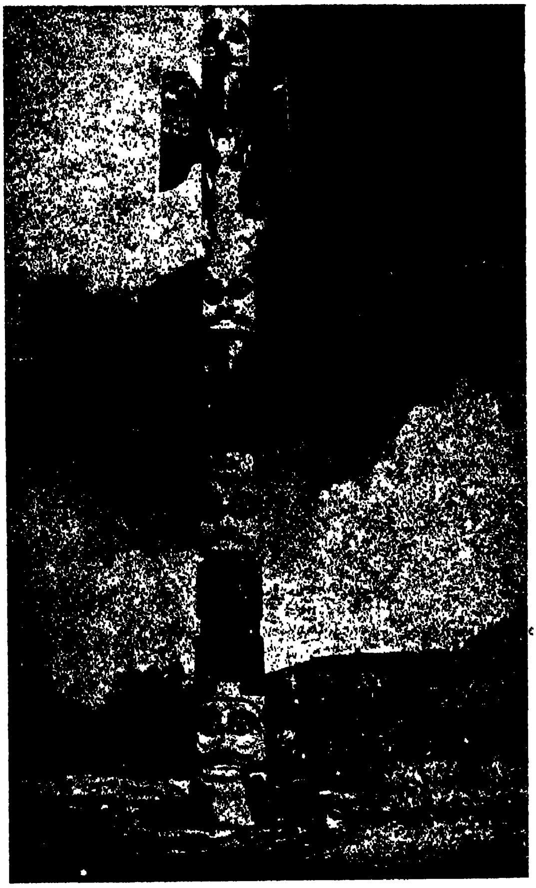
সম্প্রতি বৈশাখের 'প্রবাসী'তে শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় "ভারতের শিক্ষাতন্ত্রে কলাশিল্পের স্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে শিক্ষার উদ্দেশ্য, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, সুরজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রবাসীতে মিঃ এস, এম, বদ্রুদ্দিন "হাইস্কুল ও শিল্পশিক্ষা" নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ যে এ সকল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেছেন এটা খুবই আশার কথা। আমাদের শিক্ষানীতিকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করবার জন্যে আজ সকলের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ বংশধরদের অগ্রগতির পথ আমাদের সর্ব্বপ্রযত্নে খুলে দিতে হবে। দেশের আশাভরসা শিশুসমাজ। সর্ব্বাগ্রে তাদের আদর্শ শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে কোন শিক্ষাই সার্থক হবে না।

আলাস্কা

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে যে দুইটি মহাসমর হইয়া গেল তাহার ফল প্রত্যেকটি দেশকে ভোগ করিতে হইয়াছে। বিশেষ করিয়া সভ্যতা-বিধ্বংসী দ্বিতীয় মহাসমরের ধাক্কা এত প্রবল হইয়াছিল যে এখনও তাহার যন্ত্রণা হইতে পৃথিবী মুক্তি-লাভ করিতে পারে নাই, অদূর-ভবিষ্যতে যে পারিবে তাহারও



খোদিত কাষ্ঠনির্ম্মিত স্তম্ভ। কবে কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই

বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমেরিকাই একমাত্র সৌভাগ্যশালী মহাদেশ যাহাকে সর্ব্বগ্রাসী মহাযুদ্ধ আংশিক ভাবেও বিব্রত করিতে পারে নাই। দুইটি মহাসমরেই আমেরিকা (অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) অভিভাবকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে এবং এখনও অভিভাবকত্ব ফলাইতেছে। প্রকৃতির বিধানে আমেরিকার অবস্থিতি এমন এক জায়গায় যেখানে প্রবেশ সহজসাধ্য নহে। অবশ্য এইবারের জার্ম্মান বোমার হাত হইতে তাহারও নিষ্কৃতি ছিল না।

কিন্তু আমেরিকার এবার চিন্তা ঢুকিয়াছে। এইবার যদি মহাযুদ্ধ বাধে, যাহা দুদিন আগে আর পরে হোক্ বাধিবেই, তবে আমেরিকার প্রতিপক্ষ যে রাশিয়া হইবে তাহা সকলেরই জানা আছে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরবিভাগের সর্ব্বাধিনায়ক এক বিজ্ঞপ্তি বাহির করিয়া মার্কিন সেনা-বাহিনীতে আমেরিকার ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। ঐ বিবরণে দেখা যায় যে, রাশিয়ার পক্ষে আলাস্কার পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আক্রমণ করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নহে। প্রকৃতপক্ষে গত মহাযুদ্ধের সময়ই এমন একটা কথা উঠিয়াছিল যে জাপান আলাস্কা দিয়া আমেরিকা-প্রবেশের চেষ্টায় আছে। আলাস্কা হইতে মার্কিন সরকারের নিকট এমন অভিযোগ গিয়াছিল যে জাপানী ধীবরেরা মাছ ধরিবার ছলে আলাস্কার উপকূলের মানচিত্র গ্রহণ করিয়া বেড়াইতেছে। তখনই সর্ব্বপ্রথম সভ্যজগতের দৃষ্টি আলাস্কার উপর পতিত হয়। তবে জাপানের পরাজয়ের ফলে ঐ প্রসঙ্গ তখনকার মত



স্বর্ণোত্তোলন কার্য্যে নিরত শ্রমিক

চাপা পড়ে। বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওয়ার আবার আলাস্কার কথা উঠিয়াছে। কাজেই এই প্রায়-অপরিচিত দেশটির পরিচয় গ্রহণের চেষ্টা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কানাডার উত্তর-পশ্চিমে গা ঘেঁষিয়া যে দেশটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে তাহাই আলাস্কা। এশিয়ার মানচিত্র খুলিলে জাপানের আরও অনেকটা উত্তরে হাতীর শুঁড়ের মত যে স্থানটিকে আমরা দেখিতে পাই তাহার নাম হইল কামচাটকা। কামচাটকার আরও একটু উত্তর-পূর্ব্বে গেলে সাইবেরিয়ার

সীমা শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ঐ সীমারেখা হইতে আলাস্কার দূরত্ব মাত্র ৫৬ মাইল। ঐ ৫৬ মাইল স্থান জুড়িয়া বেরিং উপসাগর অবস্থিত। এতটা ব্যবধানের জন্যই আমেরিকা পৃথিবীতে একক হইয়া পড়িয়াছে। অন্যথায় এশিয়া হইতে পদব্রজে ওয়াশিংটনে গিয়া পৌঁছান যাইত। ভৌগোলিক এবং ভূতত্ত্ববিদরা বলেন যে প্রকৃতপক্ষে এশিয়া এবং আমেরিকা একই ভূভাগে অবস্থিত। ৫৬ মাইলের ব্যবধানকে তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা মনে



একপ্রকার নীলবর্ণের শৃগাল। পৃথিবীর আর কোথাও ইহাদের দোসর নাই

করেন যে পৃথিবীর সমস্ত জলরাশি যখন শুষ্ক হইয়া স্থলভাগ-সমূহের সৃষ্টি হইতেছিল তখন যদি ঐ শুষ্ক হওয়া কার্য্য আর কয়েক দিন মাত্র চলিত তবে ঐ ব্যবধানের কোন চিহ্নই আজ আমরা দেখিতে পাইতাম না। যাহা হোক, এই আণবিক বোমার যুগে ৫৬ মাইল ব্যবধান কিছুই নহে। আর বেরিং উপসাগরের জল এত অগভীর যে নৌকাযোগে পর্য্যন্ত উহা অতিক্রম করা যায়। কাজেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিরঃপীড়ার কারণ আছে বৈকি?



বাদামী রঙের ভালুক। পৃথিবীর অন্য কোথায়ও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না

আলাস্কা প্রকৃতপক্ষে একটি সুবৃহৎ উপদ্বীপ। আলাস্কার আয়তন সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-পঞ্চমাংশ। ইহার উপকূলরেখা ৩৩,৯০৪ মাইল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপকূল-রেখা হইতেছে ৫৩,৪১৩ মাইল। এই সুবিস্তীর্ণ উপকূলরেখার উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে এক সুবৃহৎ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এলুসিয়ান, আট্টু, মাকশ্লাথ প্রভৃতি আলাস্কার অন্তর্ভুক্ত অন্যতম বৃহৎ দ্বীপ। আলাস্কায় সর্ব্বশুদ্ধ চারিটি পোতাশ্রয় আছে। ১৯৪৪ সাল হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহাদিগকে সুরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছে।



পেঙ্গুইনের মত একপ্রকার পাখী। আলাস্কার উপকূলে অহরহ ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়



সিট্‌কা সহরের একটি রাস্তার দৃশ্য

আলাস্কার প্রধান সম্পদ হইতেছে শীল ও তিমি মৎস্য। ১৯৪১ সালে আলাস্কা প্রায় ১৫ কোটি টাকার মৎস্য সরবরাহ করিয়াছিল। মৎস্যের তৈল সরবরাহ করিয়াও আলাস্কা প্রতি বৎসর কয়েক কোটি টাকা পাইয়া থাকে। এখানে নানাবিধ লোমশ জন্তু আছে। এই সূত্রে এখানে কয়েকটি বৃহৎ পশমশিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। আলাস্কার আরণ্যসম্পদও কম নহে। তবে প্রায় মেরু-অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া কৃষিসম্পদ এখানে বিশেষ নাই। তবে মার্কিনরা আলাস্কাকে কৃষিসম্পদে পূর্ণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। স্বর্ণই আলাস্কার একমাত্র খনিজ সম্পদ।

আলাস্কার জলবায়ু মোটেই অস্বাস্থ্যকর নহে। তবে ইহার উত্তরাংশের অর্থাৎ মেরু-অঞ্চলের সংলগ্ন স্থানের জলবায়ু মনুষ্যবাসের উপযোগী নহে।

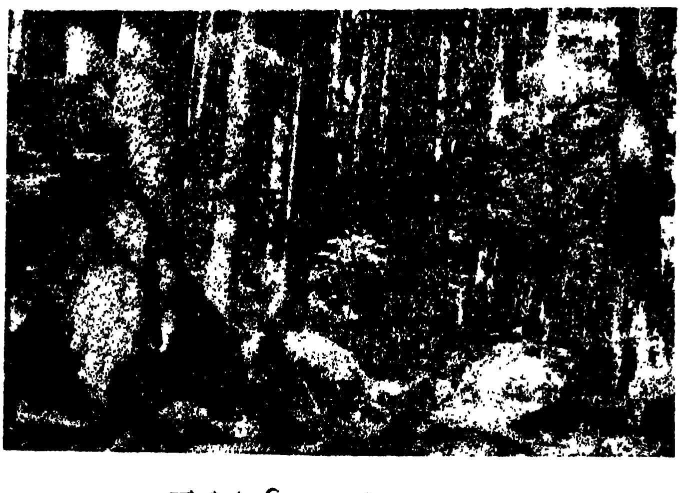
আলাস্কায় মোটামুটি গোটা ত্রিশেক শহর আছে এবং সমস্ত অধিবাসী শহরে বাস করিয়া থাকে। ১৯৩৯ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় যে, আলাস্কার জনসংখ্যা মাত্র ৭২,৫২৪ জন। ইহার মধ্যে ৩৯,১৭০জন বিদেশী অর্থাৎ শ্বেতকায় এবং অবশিষ্ট অন্যান্যরা রেড ইণ্ডিয়ান, এস্কিমো প্রভৃতি স্থানীয় অধিবাসী। শ্বেতকায়দের অধিকাংশই হইতেছে নরওয়ে, সুইডেন এবং ফিনল্যাণ্ডের বাসিন্দা। সুখের বিষয়, সেখানে এক জনও ইংরেজ নাই।

আলাস্কার শাসনকার্য্য মার্কিন পদ্ধতিতেই হইয়া থাকে। আইনপ্রণয়ন ও শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য একটি সেনেট সভা আছে। ইহার সদস্যসংখ্যা মাত্র আট জন। সর্ব্বোপরি আছেন এক জন গবর্ণর। সেনেটের পরামর্শক্রমে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া থাকেন। আইন-আদালত, মিউনি-সিপ্যালিটী, স্কুল-কলেজ, গির্জ্জা, রেলওয়ে, এমন কি যাদুঘর ও পশুশালা পর্য্যন্ত এখানে আছে। আলাস্কাকে পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের অন্যতম বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তাহার বিপুল সম্পদের সাহায্যে আলাস্কার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধনে তৎপর রহিয়াছে। অবশ্য ইহা নিছক স্বার্থত্যাগ নহে। আলাস্কার প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ঐশ্বর্য্যশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও উপেক্ষণীয় নহে। সিট্‌কা আলাস্কার প্রধান নগর।

অনেকে হয়তো জানেন না যে এক শত বৎসর পূর্ব্বেও আলাস্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে ছিল না। কি করিয়া ইহা মার্কিনের হাতে যায় তাহার ইতিহাস বড়ই চিত্তাকর্ষক।

রাশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট মহামতি পিটার তাঁহার মৃত্যুর (১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ) কিছুদিন পূর্ব্বে অজ্ঞাত সাইবেরিয়ায় এক বিস্তৃত অভিযান চালাইবার জন্য রুশীয় একাডেমী অব সায়েন্স এবং রুশীয় নৌবাহিনীকে নির্দ্দেশ দেন। পিটার অবশ্য স্বচক্ষে এই অভিযানের ফলাফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

পিটারের নির্দ্দেশক্রমে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেন ভাইটাস বেরিং-এর নেতৃত্বে এক দল অভিযানকারী সাইবেরিয়ার প্রান্ত-সীমায় আসিয়া উপনীত হন এবং এক উপসাগরের সন্ধান পান। বেরিং-এর নামানুসারে ইহার নাম হয় বেরিং



আলাস্কার বিস্তৃত অরণ্যানীর একাংশ

উপসাগর। ওখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা বেরিংকে জানায় যে ঐ উপসাগর অতিক্রম করিলেই এক বিস্তীর্ণ ভূভাগের সন্ধান পাওয়া যাইবে। কিন্তু বেরিং তাহাদের কথা বিশ্বাস না করিয়া ফিরিয়া আসেন। এইভাবে তখনও আলাস্কা সভ্যজগতের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া যায়।



দেশীয় ছেলেমেয়েরা মার্কিন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে

১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে বেরিং পুনরায় কামচাটকা হইতে এক অভিযান চালান এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে ঐ উপসাগরের অপর পার্শ্বে কি আছে তাহা না দেখিয়া তিনি ফিরিয়া আসিবেন না। ঐ অভিযানের কাহিনী বড়ই রোমাঞ্চকর। বহু ঝড়ঝঞ্ঝা এবং বিপদ আপদ অতিক্রম করিয়া বেরিং আলাস্কার উপকূলে গিয়া অবতীর্ণ হন। ফিরিবার পথে এক দুরন্ত ব্যাধিতে বেরিং প্রাণ হারান। তাঁহার দলের লোকেরা আসিয়া রুশীয় সরকারের নিকট আলাস্কার প্রাকৃতিক সম্পদের বিবরণী দাখিল করেন। রুশীয় সরকার কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল চেষ্টা করিয়াও আলাস্কার সম্পদ আহরণের বিশেষ কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে অনেক চেষ্টা করিয়া ১৮০৫ সালে সিট্‌কাতে একটি বন্দর স্থাপন করিলেন এবং আমেরিকাকে বন্দরের অংশীদার করিয়া দিলেন। এইভাবে প্রায় ৬০ বৎসর কাটিয়া যায়।



অসংখ্য সীল মৎস্য আলাস্কার সমুদ্রদিকতে রৌদ্র পোহাইতেছে। ইহারা আলাস্কার এক অমূল্য সম্পদ

তারপর টাকার লোভেই হোক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হোক ১৮৬৭ সালে রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট মাত্র ২১ লক্ষ টাকায় সমগ্র আলাস্কা বিক্রয় করিয়া দেয়। তদবধি আলাস্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই আছে।

স্বপ্ন

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

১

অত্যুচ্চ পর্ব্বতে গ্রীষ্মাধিক্য অনুভূত হয়। মনে হয় এখুনি নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবে। আমি সারাদিন ঘুরেই বেড়াচ্ছি, এবং সেইজন্য আমার আপাদমস্তক ঘর্ম্মাক্ত। পা দুটিতে কোস্কাও পড়ে গিয়েছে। আর পারা যায় না। অবসাদে সমস্ত দেহ শক্তিহীন। বিশ্রাম গ্রহণ না করলে মৃত্যু অনিবার্য্য বলেই যেন আমার মনে হতে লাগল।

অবশেষে এক সময়ে পর্ব্বতের এক ক্রমনিম্ন স্থলে উপনীত হলাম। ক্রমান্বয়ে নীচে নামতে নামতে একটা হ্রদ আমার দৃষ্টিপথে পড়ল। তংতিং হ্রদ। সূর্য্য তখন অস্তোন্মুখ। মৃদু-মন্দ শীতল বাতাস বইছে। এই হ্রদের আশেপাশে কোথাও আশ্রয়প্রার্থীর সমাগম দেখা যায় না। পথে ঘাটে লোক চলাচলের একটুও ভিড় নেই। এ ছাড়া জাপানী বিমানকেও মাথার উপর ঘুরতে দেখা যায় না। আমার নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে একটা পরম পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

জলাশয়ের অপর প্রান্ত থেকে শ্রুতিমধুর একটা জলপ্রবাহের ধ্বনি কানে এল। কিন্তু সেটা ক্ষণকালের তরে। সেই ক্ষণকালটি অতিবাহিত হবার পর হ্রদের চারদিকে বিরাজ করতে থাকে প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা।

আমার পিঠের উপর একটা পুঁটুলি বাঁধা। এই পুঁটুলির মধ্যে আছে—ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কতকগুলি জামাকাপড়। পুঁটুলিটা পিঠ থেকে নামিয়ে ঘাসের উপর রাখলাম। ঘাসের উপর রেখে সেই পুঁটুলিটাকেই মাথার বালিশ করে, ঘাসের উপরেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। মাথার উপরে স্বচ্ছ নীলাকাশ—ঠিক আকাশের নীচে ঐ জলাশয়ের নির্ম্মল নীলজলের মতোই।

পশ্চিমাকাশের দিকে এক ঝাঁক হাঁস হ্রদটার উপর দিয়ে উঠে গেল। বোধ করি এরা ফিরে যাচ্ছে নিজেদের নীড়ে।

উড়ে যাবার সময় ওদের ডাক কানে আসে। সেই ডাকে আনন্দের কোনো রেশ নেই; আছে বিষাদের করুণ সুর।

সূর্য্য গিয়েছে অস্তাচলে।

কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য এখানে কোনো শব্দই শোনা যায় না। এমনকি এখানে আসবার পথে যে গঙ্গাফড়িঙের শব্দ শুনেছিলাম, তাও আর কানে আসে না। কিন্তু ক্রমান্বয়ে একটা ক্ষীণ সুর বহুদূর থেকে ভেসে এসে আমার কানে প্রবেশ করে। সুরটা এত ক্ষীণ যে প্রথমটা বহুক্ষণ কান পেতে থাকলে তবে ধরা পড়ে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই সুরটা যে কি, তা আমার কাছে ধরা পড়ে। গান—গানের সুর এটা। একটা অত্যন্ত প্রিয় গান। মনে হ'ল, এই গান আমি মধ্য-চীনের দিগন্তপ্রসারিত গোচারণভূমিতে নারীদের মুখে বহুবার শুনেছি। শুনেছি তখন, যখন আমি ছিলাম রাখাল, মাঠে মাঠে গরু চরিয়ে বেড়াতাম। এই গানটা আমাকে ব্যথিত করে তুলত—

'তোমার সঙ্গে আমাকে আকাশপথে নিয়ে চল,
তোমার সঙ্গে আমাকে সমুদ্রের শেষপ্রান্তে নিয়ে চল
সমুদ্র যেতে পারে শুষ্ক হয়ে,
পর্ব্বত হতে পারে বিলুপ্ত ;
কিন্তু হৃদয় আমার কভু হবে না পরিবর্ত্তিত,
ওরে! আমার হৃদয় কভু হবে না পরিবর্ত্তিত।'

এই গান, এই জনশূন্য, নির্জ্জন স্থানে?—আমার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। চিন্তা করতে লাগলাম, এই অতি সাধারণ সঙ্গীতের মধ্যে মানবতার কত বড় না পরিচয়ই পাওয়া যায়! মানবতা! আশ্চর্য্য, যে মুহূর্ত্তে এ সম্বন্ধে নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করতে গেলাম, সেই মুহূর্ত্তে সহসা আহার্য্যের কথা আমার মনে পড়ল। মজা এই যে, যতই আহার্য্যের কথা ভাবতে থাকি, ততই আমার ক্ষুধার আধিক্য অনুভূত হতে থাকে। আর ক্ষুধারই বা অপরাধ কি? আজ সারাদিনই আছি উপবাসী। পেটে কিছু পড়ে নি।

খাই নি, খেতে পাই নি, আজ সমস্ত দিন ধরে এই কথাটা বারংবার আমার মনে হচ্ছিল। শুধু আজ বলেই নয়, এক সপ্তাহ আমি অভুক্ত আছি।

কিন্তু নির্ব্বোধের মতো আর কতক্ষণ এই ঘাসের উপর শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকব? ওদিকে আকাশ তো সন্ধ্যার আগমনে ধূসরবর্ণ ধারণ করছে। না—আর এমনি ভাবে নিশ্চেষ্ট থাকা যায় না। সুতরাং গাত্রোত্থান করলাম। যেদিক থেকে সঙ্গীতের সুললিত সুর আসছিল ভেসে, বোচকা পিঠে ঝুলিয়ে সেই দিক পানে পা বাড়ালাম।

ম্যাপেল-বৃক্ষের পশ্চাদ্ভাগে, হ্রদের দক্ষিণ দিকে একটা গ্রাম আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল। এই গ্রামে এক দল চাষী মেয়ে-পুরুষের দেখা পেলাম। এদের মধ্যে আছে যৌবনভারে অবনমিত বহু নারী। জীর্ণ-শীর্ণ শিশুকুল। বুড়োদের লম্বা পাইপের সাহায্যে ধূমপান করতে দেখা গেল। এরা সবাই একটা গ্রাম্য বাগের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে আসছিল বেরিয়ে। আমি এই বাগটির দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে তখনো জনকয়েক নর্ত্তকীর চারপাশে অনেকগুলি লোক দাঁড়িয়ে। মনে হ'ল, সবে নর্ত্তকীরা তাদের নৃত্য থামিয়েছে। ওদের মুখের দিকে চোখ মেলে তাকাতেই দেখা গেল সুন্দর মুখগুলিতে

বিষণ্ণতার রেখাসমূহ সুপরিস্ফুট, কারো বা শ্রান্ত ক্লান্ত মুখে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। বাগ থেকে বেরিয়ে আসতেই তিন জনের সঙ্গে একেবারে সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল। এরা প্রত্যেকেই অপরিচিত। একজন বৃদ্ধ। একে দেখলেই মনে হয় অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক। সোজা কথায় যাকে আমরা বোকা বলি। ভবঘুরে। সঙ্গে আর দু'জন তরুণী। একজন একটু স্থূলকায়া, কিন্তু চোখে মুখে বেশ কমনীয়তা। অপরটি শাখাশ্রয়ী লতার মতোই ক্ষীণ। এই নিরতিশয় ক্ষীণকায়া তরুণীটি সুমুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বোধ করি ভাবে বিভোর হয়েই আছে।

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকি কিছুক্ষণ। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি সহসা এক সময়ে বেশ সহজ কণ্ঠেই আমাকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করে, তুমি বুঝি আমাদেরই মতো ছন্নছাড়া ভবঘুরে?

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলি, হাঁ, জাপানীদের হাত থেকে কোনো মতে পরিত্রাণ পেয়েছি। মধ্য-চীনের রাজধানী ওয়াচাং জাপানীরা দখল করেছে।

'তা হলে বলো, আমরা সকলেই সমদুঃখী। কিন্তু আমাদের একটা আশ্রয় খুঁজতে হবে যে, রাত কাটাবার মতো আশ্রয়।'

এই বলে বৃদ্ধ অগ্রসর হয়। আমি ওকে অনুসরণ করি। ঠিক যেন সম্মোহিত সাপ, সাপুড়েকে অনুসরণ করে।

আমার পিছনে— সেই দুটি তরুণী।

কিন্তু আমার মনটা এক অব্যক্ত অস্বস্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। দুটি অপরিচিতা তরুণী আমার পিছন পিছন আসছে। এতে আমি অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলাম।

যাই হোক, বৃদ্ধ হঠাৎ কথা বলতে সুরু করে। তার কথাগুলি অস্পষ্ট। কারণ, সম্মুখভাগের অনেকগুলি দাঁত ওর পড়ে গিয়েছে।

বৃদ্ধ বলে, বুঝেছ ছোকরা, আমি একজন বাজিয়ে, বুঝেছ? উত্তরে জানালাম, হাঁ, বুঝেছি।

ওর কাঁধের উপর দিয়ে প্রায় হাত দুই লম্বা আর দু' আঙুল চওড়া একটা চামড়ার জীর্ণ বন্ধনী নীচের দিকে নেমে এসেছে। একটা ছোট ড্রাম বাঁধা ঐ চামড়ার বন্ধনীতে। স্পষ্টই বোঝা গেল—বৃদ্ধ একজন বাদক এবং এই ড্রামই ও বাজায়, তথাপি ইচ্ছা করেই ওকে প্রশ্ন করলাম, খুড়ো, কি বাজনা আপনি বাজান বলুন তো?

বৃদ্ধ বললে, আমি ড্রাম বাজাই। আমার কাঁধে ঝোলানো ড্রামটা দেখে কি বুঝতে পারছ না?

এই বলে ও এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে দৃঢ়কণ্ঠে পুনশ্চ বললে, আমি একটা দলের ম্যানেজারও বটে!

বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ম্যানেজার? কোন্ দলের ম্যানেজার?

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ বললে, থিয়েটারের ম্যানেজার আমি। হাঁ। থিয়েটারের ম্যানেজারই তো বটে! তোমার পেছনে দুটি মেয়েকে দেখতে পাচ্ছ না? ওরা আমার মেয়ে। ওরা নাচিয়েও বটে। কি চমৎকারই না নাচতে পারে! একেবারে চমৎকার। যাকে বলে চমৎকার, সুন্দর, অপূর্ব্ব।

কথায় কথায় আমরা আর একটি ছোট-খাটো পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম। এখানে একটা অতি পুরাতন মন্দির দেখা গেল।

বৃদ্ধ লোকটি আমাকে উদ্দেশ করে বললে, এই মন্দিরেই আমাদের থাকতে হবে।

সকলেই ভিতরে প্রবেশ করলাম।

সম্পূর্ণ নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, অন্ধকার স্থান। কিছুই দেখা যায় না।

বৃদ্ধ এক সময়ে বললে, তোমার কাছে দেশলাই আছে ছোকরা? দেখ দিকিন, কি মুশকিলেই পড়া গেল। দেশলাই, একটা দেশলাই তো আমার কাছে ছিল বলেই মনে হচ্ছে। বিনা বাক্যব্যয়ে একটা দেশলাই বের করে একটা কাঠি কস্ করে জ্বেলে দেখি, সুমুখেই একটি কাচের চিমনির ভিতর একটা বড় মোমবাতি। বাতিটার সলতেতে আমার হাতের প্রজ্জ্বলিত কাঠিটা স্পর্শ করাতেই বাতিটা উঠল জ্বলে। কিছু আলো হ'ল। কিন্তু এই স্বল্পালোক যথেষ্ট নয়। বিশাল মন্দিরের কতটুকু অংশই বা এ দিয়ে দেখা যেতে পারে?

আমার সুমুখে সেই স্থূলাঙ্গী তরুণীটি দাঁড়িয়ে ছিল। বৃদ্ধ ওর দিকে একটা আঙুল দেখিয়ে আমাকে উদ্দেশ করে বললে, ও আমার বড় মেয়ে। ভায়লেট ওর নাম। একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, আর ও হ'ল স্প্রিং—আমার ছোট মেয়ে। এই বলে বৃদ্ধ ছোট মেয়েটিকে দেখিয়ে, নিজে একগাদা শুষ্ক খড়ের উপর ধীরে ধীরে উপবেশন করল। তারপর পরিতৃপ্তির একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করলে।

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে অতিবাহিত হয়।

এক সময়ে বলি ভগবানকে ধন্যবাদ যে, দিন অবসান হয়েছে। নর্ত্তকী দুটির মুখের পানে চেয়ে নিঃশব্দেই হাসি। ওরাও হাসে। নীরবেই হাসি বটে, কিন্তু এই মৌন হাসির মধ্য থেকে প্রীতির আভা বিচ্ছুরিত হয়ে এল। ওদের হাসি দেখে মনে হ'ল, ওরা আমার সঙ্গলাভ করে অতিমাত্রায় প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে।

সহসা বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে বললাম, খুড়ো, আপনাদের দলে আমি ভর্ত্তি হতে পারি?

শুনে বৃদ্ধ পরম বিস্ময়ে আমার মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকায়। বলে, সে কি? তোমার বয়েস অল্প। মনে হচ্ছে তুমি এখনো লেখাপড়া ছাড় নি। না না, তোমার এ-কাজ সহ্য হবে না। সত্যি কথা বলতে কি, এ অতি ছোট কাজ। এ কাজের যোগ্য ব্যক্তি আমরাই। তুমি নও, বাবা।

দৃঢ় কণ্ঠে বলি, হোকগে ছোট কাজ। আমি দু' ভাবের

'এক' বাজাতে জানি। আপনি নিজে একজন ওস্তাদ বাজিয়ে, মনে হয় আপনার কিছু কাজে আমিও আসতে পারি। আপনার কাজে আমাকে নিয়োজিত করতে পারেন অনায়াসে। আমাকে বাজিয়ে হিসেবে আপনার দলভুক্ত করলে আপনি ঠকবেন না, এটা সুনিশ্চিত।

বৃদ্ধ আমার এই দৃঢ় উক্তিতে সম্ভবতঃ মনে মনে খুশী হয়ে উঠলেন। বললেন, ভাল কথা, তুমি যদি তাই চাও, আমার আপত্তি করবার নেই কিছুই। আমার কাছে সব মানুষই ভাই। সবাইকে আমি ভাই বলেই জানি।

সত্য কথা বলতে কি, বৃদ্ধের এই আন্তরিকতাপূর্ণ উক্তিতে আমি সাতিশয় আনন্দিত হলাম। পূর্ব্বে মেয়ে দুটির সম্বন্ধে যেটুকু বিতৃষ্ণার ভাব আমার মনকে আশ্রয় করেছিল, এখন সেটুকুও অপসারিত হয়ে গেল। ওদের রন্ধনকার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাহায্য করতে সুরু করলাম।

ক্রমে আমাদের কথাবার্ত্তা, আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। চলতে থাকে প্রাণখোলা ভাবে। ঢাক্-ঢাক্ গুড়-গুড় ভাব থাকে না মোটেই। বেশ সোজাসুজি পরিষ্কার আলোচনা—বড় তৃপ্তি হ'ল আমার।

আহারাদির পর বৃদ্ধ বিনা বাক্যব্যয়ে খড়ের গাদার উপর শয়ন করলেন এবং ক্ষণকাল পরেই তন্দ্রালু হয়ে পড়লেন। কিন্তু আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার এই যে, নিদ্রিতাবস্থায়ও ওঁর জিহ্বা ওষ্ঠদ্বয় লেহন করতে সুরু করে। ওঁর মুখের দিকে নিস্পলকচক্ষে চেয়ে আমি বেশ মজা উপভোগ করতে লাগলাম। ঘুমন্ত অবস্থায় কোন লোককেই আমি ইতিপূর্ব্বে এরকম করতে দেখি নি। এই প্রথম।

ভায়লেটের কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙে। ও আমাকেই লক্ষ্য করে কোমল কণ্ঠে বলছে, ওরকমভাবে ওর দিকে দেখবেন না। চাঁদের পানে চোখ ফিরিয়ে দেখুন তো, কি সুন্দর চাঁদ, আর কি নির্ম্মল ওর জ্যোৎস্নাধারা।

মাথা তুলে দেখলাম—মন্দিরের প্রাঙ্গণে এসে পড়েছে ফুটফুটে জোৎস্না। মেঘশূন্য আকাশে পরিষ্কার চাঁদ। প্রাণের ভিতর একটা অব্যক্ত আনন্দ আমার সর্ব্বদেহ রোমাঞ্চিত করে তুললে। এমনতর বিমল জ্যোৎস্নাধারা বহুদিন আমার চক্ষে পড়েনি। চক্ষে পড়েনি—যেদিন থেকে জাপানীরা মধ্য-চীনে আক্রমণ আরম্ভ করেছিল।

আনন্দের আতিশয্যে চীৎকার করে উঠি, অপূর্ব্ব, সত্যি অপূর্ব্ব এ।

কিন্তু স্প্রিং আমাকে বাধা দেয়। একটু রুদ্ধস্বরে বলে, চুপ। দেখুন, ওখানে কি হয়েছে।

বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গণের প্রাচীন দেবদারু বৃক্ষটার পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে।

বহু প্রাচীন দেবদারু বৃক্ষ। বোধ করি একশো বছরের পুরানো গাছ। বৃক্ষটার পানে পলকহীন দৃষ্টিতে বহুক্ষণ নিঃশব্দেই চেয়ে থাকি। শুনতে পাই—ঐ দেবদারু বৃক্ষের শাখার উপর একটা পাখীর ডানা ঝাপটা মারার শব্দ। হায় রে! বেচারা বুঝি ঘুমের মধ্যেই হঠাৎ কোন কারণে অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে!

স্প্রিং পূর্ব্বাপেক্ষা কোমল কণ্ঠে বললে, প্রবাদ আছে, কেউ যদি একটা ঘুমন্ত পাখীকে তিন বার ডানা ঝাড়তে শোনে, তা হলে ঘুমের সময় সে সুখ-স্বপ্ন দেখতে পায়। আর সেই স্বপ্ন তার জীবনে সত্যি হয়ে দেখা দেয়।

অতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে প্রশ্ন করলাম, কিন্তু আপনি ক'বার শুনতে পেয়েছেন? ক'বার?

—তিন বার। তিন বার শুনেছি। ঠিক তিন বার।

--তবে তো আপনি সুখ-স্বপ্ন দেখবেনই।

স্প্রিং অভিমানযুক্ত বিমর্ষতায় ক্ষীণকণ্ঠে বললে, তিনটি বছর ধরে আমরা রাত্রিবেলা কেবল ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেই এসেছি। বোবায় পাওয়া দুঃস্বপ্ন।

—সুখ-স্বপ্ন আদৌ এতকাল দেখেন নি আপনারা? ভারি আশ্চর্য্য! কিন্তু কেন বলুন তো?

আমার এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে স্প্রিং কিছুই বলতে পারলে না। শুধু নিজের একজোড়া কালো হরিণ-চোখের স্থির চাহনি আমার মুখের উপর নিক্ষেপ করলে। ওর চেহারা দেখে মনে হ'ল, কি একটা দুর্ব্বোধ্য জিনিষ বুঝতে না পেরে ও দ্বিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছে।

স্প্রিং-এর এই অবস্থা দেখে আমার নিজের বুকখানা সহসা টন্-টন্ করে উঠল। টন্-টন্ করে উঠল অসহ্য বেদনায়। ওর নিজের অসহায়তার জন্য আমার অন্তঃকরণ কেন যে এতখানি আকুল হয়ে উঠল, বুঝতে পারলাম না।

কিন্তু চালাক মেয়ে—ভায়লেট। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলে উঠল, সুখ-স্বপ্ন দেখি নি এই কারণে যে, আমাদের জীবন-মন চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ এবং উদ্বেলিত। আজ থেকে চার বছর পূর্ব্বে জাপানীরা আমাদের গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত একটি দিনের তরেও শান্তি কাকে বলে, বুঝতে পারি নি।

বলতে বলতে ভায়লেটের চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। চোখ মুছবার কোন চেষ্টা না করে পুনর্ব্বার বলে, যেখানেই আমরা যাই না কেন, জাপানীরা, আমাদের শত্রু জাপানীরা, আমাদের অনুসরণ করে।

স্প্রিং সহসা বলে উঠল, কিন্তু এখন আমরা বেশ শান্তিতে আছি। আজ তিন দিন হতে চলল, এখানে জাপানীদের কোন উপদ্রবের কথা শোনা যায় নি।

ওর কথাটা আমার মনে লাগল না। তবুও ওকে উৎসাহিত করে বললাম, তা হলে সুখ-স্বপ্ন আপনারা দেখবেন। দেখবেন নিশ্চয়। কিন্তু কি ধরণের সুখ-স্বপ্নের প্রতীক্ষা করেন আপনারা? একটা যাদুদণ্ড হাতের মধ্যে পাবেন, আর তাই

দিয়ে সারা পৃথিবীটাকে সোনায় পরিণত করবেন? কিংবা একজোড়া ডানা, যার সাহায্যে আপনারা নন্দনকাননে নিমেষের মধ্যেই গিয়ে পৌঁছবেন?

আমার এই উক্তিতে শ্রিং একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে। তারপর প্রশান্ত মুখে বললে, ভবঘুরের মেয়ে আমরা—আকাশ কুসুমের আশা আমরা করি না। আমার একান্ত মনের কামনা চিরকাল ছাত্রী হয়ে থাকা। আজীবন লেখা-পড়ার চর্চা নিয়ে থাকব, এই আমার কামনা, এই আমার সুখ-স্বপ্ন!

একটুখানি মৌন থেকে বললে, আপনি এটা ভাল করে জেনে রাখুন, গানের রস উপলব্ধি করতে পারা এবং গান রচনা করতে শেখা আমার বহুদিনের ইচ্ছা। মনে পড়ে, মা যখন মুখে মুখে আবৃত্তি করে আমাদের গান শেখাতেন, তখন কি ভালই না লাগত! মা বিখ্যাত নাচিয়ে ছিলেন। তাঁর রোজ-গার আমাদের বাপীর চেয়ে অনেক বেশী ছিল।

ভায়লেট এতক্ষণ কোন কথা কয় নি। কিন্তু এইবার সে কথা কইতে সুরু করে। একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে উদাসকণ্ঠে বললে, শ্রিং-এর মত আমারও গান শেখবার আকাঙ্ক্ষা আছে।

জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কথা শুনে শ্রিং মৃদু-ভর্ৎসনা করে। বলে, তুমি থামো দিদি। কত আগেই তো তোমার সকল সাধ মিটতে পারত। আজ তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি বলে দুঃখ করছ। কিন্তু মনে কর সেদিনের কথা যেদিন গ্রামের বাগে তোমার নাচ দেখে, গ্রামের জমিদার যখন তোমাকে মানুষ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে বাপীর কাছে মিনতি করলে, তখন তুমি রাজী হওনি। তোমাকে স্কুলে পাঠিয়ে লেখা-পড়া শেখাবারও তার প্রবল বাসনা ছিল। কিন্তু তুমি কি ভাবলে, তুমিই জান! বলে বসলে—তুমি ওসব চাও না। বাপীর দুঃখের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে মিলিয়ে দিতে চাও।

কনিষ্ঠা ভগিনীর কথা শুনে ভায়লেটের সারা মুখে বিরক্তির ছায়াপাত হ'ল। একটু পরে রুদ্ধকণ্ঠে বললে, কিন্তু সেই বৃদ্ধ জমিদারের মনে ভিন্নরূপ অভিসন্ধি ছিল। দুরভিসন্ধি বলা যেতে পারে অনায়াসে। তুমি তাকে ভাল মানুষ ভেবেছ? আসলে সে কিন্তু ঠিক এর বিপরীত।

এই সময় অকস্মাৎ একটা আর্তস্বর কানে এল:—রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমার স্ত্রীকে দাও ফিরিয়ে।

স্বরটা এসেছে বৃদ্ধের কণ্ঠ থেকে।

তখনও সে খড়ের গাদার উপর শয়ন করে নাসিকাধ্বনি করছে।

ভাবলাম, বোধ করি সাপ-খোপ কিছু ওকে দংশন করতে উদ্যত হয়েছে। একটা লাঠির খোঁজ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লাম।

কিন্তু ভায়লেট আমাকে নিবৃত্ত করলে। বললে, ভয় পাবেন না। জাপানীরা যেদিন থেকে আমাদের গ্রাম হতে মাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, সেইদিন থেকে বাপী রোজ রাত্রে এই রকম চীৎকার করে উঠে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চীৎকার করে। এই বলে ক্ষণকাল ও নীরবে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর এক সময়ে সজল চক্ষে বললে, জাপানীরা আমার মাকে ধরে নিয়ে যাবার পর থেকে আর আমরা কোনো সংবাদই তাঁর পাই নি। মনে হয়, মা আর ইহজগতে নেই।

সবই বুঝলাম। বুঝতে আর কিছু বাকী রইল না। ওদের জীবনের সঙ্গে যে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে একটা বেদনাকরুণ শোচনীয় কাহিনী! ওদের মনকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বললাম, আর নয়। রাত্রি বোধ করি অনেক হয়েছে। এখন শুয়ে পড়বার আয়োজন করা যাক। কাল সকালে আপনাদের আবার কাজের চাপ পড়বে। কেননা, আমি একটা বাড়তি মানুষ। আমার খাওয়া দাওয়ার দায়িত্ব পড়েছে আপনাদের উপর। বেশী রাত্রি করে ঘুমালে সকালে উঠতে পারবেন না।

বলে অল্পক্ষণের জন্য মৌন থেকে ওদের মনে আশার সঞ্চার করবার উদ্দেশ্যে বলি, আমাদের দেশ যখন শত্রুকবল-মুক্ত হবে, যখন আমরা স্বাধীন হবো, তখন প্রত্যেকের জন্যে অবৈতনিক বিদ্যালয় আমরা প্রতিষ্ঠা করবো। তখন সকলেই স্বাধীনভাবে বিদ্যার্জন করবে, সকলেই স্বাধীনভাবে গান রচনা করতে পারবে।

২

পরদিন প্রভাত বেলায় এই গ্রামের নিকটবর্তী ভিন্ন গ্রামের একটি বাগে আমরা সকলে উপনীত হলাম। আমি দু-তারের 'এস্রু' বাজাতে সুরু করতেই, বৃদ্ধ তার ড্রাম বাজিয়ে সঙ্গত আরম্ভ করলে। সঙ্গতের দৌলতে আমার বাজনার হাত খুলে গেল, এস্রু বাজনা চলল চমৎকার ভাবে। মনে হ'ল, এমনি নিখুঁত ভাবে বহুকাল 'এস্রু' বাজাতে পারি নি। নিজের বাজনায় নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

ওদিকে আবার ভায়লেট নৃত্য সুরু করে দিয়েছে! আমার সুমধুর যন্ত্রসঙ্গীতে বোধ করি ও মুগ্ধ হয়ে নাচ সুরু করে দিয়েছে। ওর দেহ যদিও কিঞ্চিৎ স্থূল, তবুও নৃত্যকলায় ওর যথেষ্ট নৈপুণ্য পরিলক্ষিত হ'ল। খাসা নাচে ও। নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভায়লেট গান গাইতে আরম্ভ করলে। প্রাণস্পর্শী সে গানের কথা। ওর অপূর্ব কণ্ঠস্বর আমাকে মোহিত করে।

কিন্তু আশানুরূপ দর্শক সমাগম হয় না। বেচারা ভায়লেটের জন্য আমার কষ্ট হ'ল। মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত ও নৃত্য উপভোগ করবার মত কি কেউ এ গ্রামে নেই? একখানি পরিশ্রম করা সত্ত্বেও কারুর হাততালি পর্য্যন্ত ভায়লেট পায় না? মন্দভাগ্য বৃদ্ধ শেষের দিকে মিনিট কয়েক ধরে পাগলের

মত একটানা ড্রাম বাজিয়ে সহসা এক সময়ে ড্রামের কাঠি দুটি দূরে নিক্ষেপ করে একটা পাথরের উপর গিয়ে বসল। হাঁপাতে হাঁপাতে টেনে টেনে বলে, ভায়লেট মা, তুমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছ। আর নয়। এইবার তুমি বিশ্রাম করগে, যাও মা।

ভায়লেট দ্বিরুক্তি না করে ধীরে ধীরে গিয়ে পিতার পাশে বসে। তখনও ওর নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে ঘন ঘন উষ্ণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে।

কিছুকাল পরে আমরা বাদ্যযন্ত্রাদি বেঁধেছেদে নিয়ে আবার আর একটা গ্রামের দিকে পা বাড়ালাম। মধ্যাহ্ন-কাল। পথে বহু পথচারীর দেখা পেলাম। এদের মাথা সমুখের পানে ঝুঁকে পড়েছে। পৃষ্ঠে এদের ঝুড়ি বাঁধা, আর সেই ঝুড়িতে বসে আছে ছেলেপুলে। গোটা কয়েক কুকুরকেও এদের সঙ্গে যেতে দেখা গেল। কুকুরগুলির জিভ মুখের বাইরে এক হাতখানি বেরিয়ে আছে। টস্-টস্ করে জিভ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে লালা। পথচারীদের ললাটে ললাটে প্রখর সূর্য্যের কিরণ ঝরে পড়ছে। ক্লান্তপরিশ্রান্ত তাদের দেহ। কি ঘটেছে সেটা অনুমান করলাম। তবু নিঃসন্দেহ হবার জন্য একজন বৃদ্ধ কৃষককে কাছে ডেকে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করি।

ও বললে, জাপানীরা আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ল বলে। আজ সকাল বেলায় কোথাও একটা লোহার ঈগলপাখী আমাদের গাঁয়ে অসংখ্য ডিম প্রসব করে। ঐ ঈগল পাখীর ডিম জনা পঁচিশ বয়স্ক লোক, দুটি শিশু এবং তিনটি গাভীর জীবলীলা সাঙ্গ করেছে।

শুনে ভায়লেটের বাবা সজোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলে। বললে, একবার দুনিয়ার বিচারটা দেখো। আজ চার বছর ধরে এই ভয়েই আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি, অথচ এখনও পর্য্যন্ত কোথাও একটুখানিও শান্তির আলো দেখতে পেলাম না, কোনো ভরসাও পেলাম না।

বলেই ও কন্যাদের মুখের পানে তাকাল, বললে, কি করে যে তোমাদের আমি রক্ষা করব, ভেবে পাইনে। আমার হাড়ের ভেতর পর্য্যন্ত ঘুণ ধরে গিয়েছে। তোমরা বড় হয়ে উঠেছ—তোমাদের কি করেই বা রক্ষা করা যাবে?

ওরা উত্তরেই কোন জবাব দিতে পারে না। আনতমুখে নীরবে নিস্তব্ধ ভাবে বসে থাকে।

৩

গ্রামের পর গ্রাম প্রদক্ষিণ করলাম। কোন গ্রামেই লোকজনের চিহ্নমাত্রও দেখা গেল না। সব গ্রাম জনশূন্য। যেন শ্মশান। খাঁ খাঁ করছে। আমরা তখনও পর্য্যন্ত অভুক্ত। কারণ আজ এক কপর্দকও উপার্জ্জন হয়নি।

বৃদ্ধ এক সময়ে বললে, গতকাল যে মন্দিরে আমরা রাত্রি যাপন করেছিলাম, চল সকলে সেখানে। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে কোনই লাভ হ'ল না। আর আমি ঘুরতে পারি নে। একেবারে ভেঙে পড়েছি আমি।

ওর কথামত আমরা চলতে আরম্ভ করলাম। বৃদ্ধ যায় এগিয়ে। আমরা তাকে অনুসরণ করি। ক্রমে আমরা মন্দিরে এসে পৌঁছলাম। ক্লান্তিতে আমরা এত অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম যে দাঁড়িয়ে থাকা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। তরুণীরা তো খড়ের গাদার উপরই উপবেশন করলে। ওদের একটু তফাতে একটা স্থান বেছে নিয়ে আমিও বসে পড়লাম। বৃদ্ধ আমাদের বিপরীত দিকে আসন গ্রহণ করলে। আমরা সবাই চুপ করে রইলাম, কথা বলি না কেউ। যেন আমাদের জিভটা খসে গিয়েছে

কিন্তু সেই সরলপ্রাণ তরুণী দুটির বিষণ্ণ চক্ষে হঠাৎ এমন একটা জিনিষ আবিষ্কার করলাম, যার অর্থ অবিসম্বাদিত রূপে উচ্চারিত বাক্যের অপেক্ষাও সুস্পষ্ট, পরিষ্কার। ওদের স্থির দৃষ্টি বৃদ্ধের মুখের উপর ন্যস্ত। বৃদ্ধ তার কেশবিরল মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে হঠাৎ এক সময়ে লাফিয়ে উঠল; বললে, অন্ন, অন্ন চাই আমাদের। যে করেই হউক আমাদের সামান্য কিছু পেটে পড়া দরকার। এই গাঁয়ের জমিদারের কাছ থেকে কিছু চাল ধার করে নিয়ে আসি। বৃদ্ধ ভায়লেটের মুখের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে: পুনশ্চ বললে, ভদ্রলোককে ত খারাপ লোক বলে মনে হয় না। বরঞ্চ ভাল বলেই ধারণা জন্মে। তোমার ভরণপোষণের ভার উনি স্বেচ্ছায় নিতে চেয়েছিলেন। সজ্জন ছাড়া কি কেউ অনাত্মীয়ের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে চায়?

এই বলে বৃদ্ধ আর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে না। বাতাসের বেগে মন্দির থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে বৃদ্ধ ফিরে এল। হাতে একটা থলি। থলিতে চাল ভরা। আমাদের সকলেরই মনে আশার সঞ্চার হ'ল। যাক, তা হলে আজ কিছু পেটে পড়বে। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের হাত থেকে থলিটা গ্রহণ করে মাটিতে নামিয়ে রাখি। বেশ ভারি বলেই মনে হ'ল। ওদিকে স্প্রিং ওকে হাত ধরে বসিয়ে দেয়। ভায়লেট বাতাস করতে থাকে ধীরে ধীরে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর, বৃদ্ধের বুক ভেদ করে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস—দুঃখের নিঃশ্বাস। বলে, ভায়লেট, স্প্রিং বস তোমরা। একটু থেমে শুধু ভায়লেটের মুখের পানে একদৃষ্টে তাকায়। বলে, মা ভায়লেট, তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করে এসেছি। ভাল ব্যবস্থা, হ্যাঁ নিশ্চয়ই ভাল উপায়। ভাল, ভাল—খুব ভাল, খুব ভাল উপায়।

ভায়লেট কিছু বুঝতে পারে না। বোকার মত বাপের

মুখের দিকে ক্যাল-ক্যাল করে চেয়ে থাকে। একটা ঢোক গিলে প্রশ্ন করলে, তুমি কি বলছ বাপী ?

বৃদ্ধ বরাগলায় থেমে থেমে বললে, তুমি বুঝতে পেরেছ, কার কাছ থেকে আমি চাল এনেছি ভিক্ষা করে। সেই জমিদার, যিনি এক সময়ে তোমার ভরণপোষণের ভার নিতে চেয়েছিলেন, সেই জমিদারের কাছ থেকে ঐ থলি ভর্তি চাল পেয়েছি। কিন্তু এখন তিনি চান তোমাকে বিয়ে করতে। তোমায় সুখী করবেন, এ প্রতিশ্রুতি আমায় আজ দিয়েছেন।

জায়লেটের দুটি চোখে জল এল। বাষ্পরুদ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি কি তাকে কথা দিয়েছ, বাপী ?

—নিশ্চয়ই।

বাপী ! আমি তোমার সঙ্গেই থাকতে চাই। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না।

জায়লেটের চোখের জল শ্রাবণের ধারার মত গাল বেয়ে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে লাগল।

বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললে, আহাম্মক কোথাকার ! নিজের জীবনটা আমার সঙ্গে থেকে মাটি করবে ? না, এ কোনমতেই আমি হতে দেব না।—এই বলে মুহূর্তকাল নীরব থেকে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললে, তাঁর বয়েস হয়েছে ঢের সত্যি। তোমার বয়েসের অনুপাতে তাঁকে তোমার পাশে মানায় না। কিন্তু মা, ভেবে দেখো, আমার সঙ্গে এ ভাবে থেকে তুমি কোন দিনই সুখী হবে না। তোমার বয়েস বাড়ছে। আমিও বুড়ো হয়ে গেছি। আমার অবস্থার পরিবর্তন আর এ জীবনে হবে না। কিন্তু জমিদার হচ্ছেন মস্ত বড়লোক। খাওয়া-পরার কষ্ট তাঁর ওখানে কোনদিনই হবে না। ভবিষ্যতে তোমার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। কিন্তু আমি তোমার কি করতে পেরেছি ? জবগুরের মেয়ে ছাড়া তোমার আর কি পরিচয় আছে ?

—শুনে জায়লেট মাথা হেঁট করে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বাপের দিকে তাকাতেও ওর ভরসা হ'ল না।

বৃদ্ধ ক্ষণকাল চুপ করে থেকে আবার বলতে সুরু করলে, জমিদার তোমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যেতে চান। শত্রুরা এগিয়ে আসছে। আর সময় নেই। অনর্থক কালক্ষেপ করা আর সমীচীন নয়। জমিদার একটা নিরুপদ্রুত অঞ্চলে চলে যাবেন। বোকামি করো না। তুমি প্রস্তুত হও।

যথাসময়ে মন্দিরদ্বারে একটা লাল রঙের ঘেরা-টোপ দেওয়া ডোলা এসে থামল। সুসজ্জিত ডোলা। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি যুবাপুরুষ। অতি রুক্ষ চেহারা ওর। লোকটি নাকি জমিদারের দেওয়ান।

দেওয়ান মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলে।

বৃদ্ধ দেখলে ওকে। কিন্তু স্বাগত করলে না। উদাস মনে বহুক্ষণ মৌন ভাবে বসে থেকে হঠাৎ এক সময়ে বলে উঠল, আমাকে যদি তুমি কোনো দিন মুহূর্তের জন্যেও ভালবেসে থাক জায়লেট, তা হলে আমার কথা শোন। ডোলা এসেছে জমিদারের কাছ থেকে। উঠে বস ওতে। আমি তোমার বাবা। তোমাকে সংসারে আমিই এনেছি। আমারই চোখের সামনে কেমন ভাবে একটু একটু করে বেড়ে উঠে এত বড়টি হয়েছ, তাও দেখেছি। তোমার সুখৈশ্বর্য্য আমার একমাত্র কামনা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তুমি জমিদার-পরিবারে সুগৃহিণী হয়ে সুপুত্রের জননী হও।

বৃদ্ধ প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু দমন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। হু-হু করে শিশুর মতই কেঁদে ফেলে।

জায়লেটের মুখে কথা নেই। ঠিক যেন সম্মোহিতের মতো উঠে সেই ডোলার কাছে গিয়ে ভিতরে ঢুকলে।

সন্ধ্যা নেমে আসছে। আকাশের পূর্ব্ব দিকে একটা অসম্পূর্ণ চমৎকার রামধনু দৃষ্টিগোচর হ'ল। বোধ করি কোথাও ঝড় উঠেছে। বাতাসে শৈত্য অনুভূত হচ্ছে।

জায়লেট চলে গেল। জীবনে আর হয়ত দেখা হবে না। আমার অন্তরাত্মা চীৎকার করে বলতে চাইল, এই আমার দেশের সমাজ, এই আমাদের জীবন।

মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করলাম, প্রতিকূল অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার কোনো পথ আপাততঃ আমাদের নেই। আর কোথাও আশ্রয় মিলবার সম্ভাবনা নেই। এখানকার মাটিতে আমি জন্মেছিলাম। এই মাটির বুকেই আমাকে জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃদ্ধের কাছে এগিয়ে আসি।

বৃদ্ধ দুটি চোখ মুদিত করে অনড় পাষাণের মত এক পাশে শুয়ে ছিল। বললাম, ক্ষমা করুন। আপনার ধ্যানের ব্যাঘাত করলাম। একটু থেমে আবার বললাম, জাপানীদের বাধা দিতে আমি গরিলা বাহিনীতে যোগদান করবো। আপনাকে ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না, কিন্তু না গিয়েও উপায় নেই। জাপানীদের বাধা দিতেই হবে।

বৃদ্ধ বাজকর ধীরে ধীরে চোখ মেলে আমার দিকে চাইল। তারপর অস্পষ্ট ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, ভাল কথা। দুনিয়ার অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত লোক তো তোমরাই। যাক সে কথা। কিন্তু আজ এবেলা পর্য্যন্ত তোমার কিছুই খাওয়া হয় নি। খাওয়া-দাওয়া করে রাত্তিটা এখানে থাক। কাল যেও, কিন্তু আজ নয়। অভুক্ত অবস্থায় আমি কোনো অতিথিকে ছাড়ি নে। কাল যেয়ো।

বৃদ্ধ আবার চোখ বুজল।

প্রিং-এর কাছে ফিরে এলাম।

মনে হয়েছিল নিদারুণ দুঃখে মুহ্যমান হয়ে গোপনে সে অশ্রুপাত করছে। কিন্তু তার সন্নিকটে গিয়ে বুঝলাম, আমার অনুমান সত্য নয়। প্রিং মাথেল বৃক্ষের হাওয়ায়-দোল-খাওয়া পাতাগুলির দিকে অপলক নেত্রে চেয়ে থেকে আপন মনেই ফিস্ ফিস্ করে বলছে, আশ্চর্য্য ! গত রাত্রে আমি

তো কোনো স্বপ্ন দেখলাম না ! অথচ স্পষ্টই আমি পাখীটাকে তিন বার ডানা নাড়তে শুনেছিলাম।

বললাম, ওটা কুসংস্কার।

আমার এই মন্তব্যে স্প্রিং-এর চমক ভাঙে। ফিরে তাকায় আমার পানে। বলে, কি বললেন ?

বলছিলাম ওটা কুসংস্কার।

স্প্রিং-এর চেহারা দেখে মনে হ'ল, আমার এই কথাটা ও মেনে নিতে পারছে না। দৃঢ় কণ্ঠে আমার কথার প্রতিবাদ করলে, বললে—আপনি কি বলছেন ? কুসংস্কার এটা হতেই পারে না। যদি কুসংস্কার হবে, তা হলে আমার মা কেন এই প্রচলিত বিশ্বাসকে অভ্রান্ত বলে মনে করতেন।

তা জানি নে। কিন্তু ওটা কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই না।

আপনি জানলেন কি করে ?

প্রচুর পড়াশুনা করলে এসব জানা যায়।

আপনি তা হলে খুব লেখাপড়ার চর্চা করেছেন বলুন ?

তা করেছি বৈকি !

স্প্রিং যেন হাতে চাঁদ পেলে। নিঃসঙ্কোচে আমার একখানা হাত ধরে আমাকে পাশে বসালে এক প্রকার জোর করেই। তার পর মিনতিভরা স্বরে বললে, তা হলে বৃথা সময় নষ্ট না করে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু কি করে বিশ্লেষণ করে দেখতে হয়, আমাকে তাই আপনি একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিন।

স্প্রিং নাছোড়বান্দা। অগত্যা বালুর উপর একটা কঞ্চির সাহায্যে রামধনুর ছবি এঁকে তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে লেগে গেলাম।

আমি অনেকটা বক্তৃতার ভঙ্গীতে একটু উচ্ছ্বসিত ভাবেই ব্যাখ্যা করছিলাম। শুনতে শুনতে স্প্রিং হঠাৎ বলে উঠল, আমাদের ভাষা কি সুন্দর ! কি চমৎকার, কবিত্বময় ভাষা ! মাতৃভাষা ভাল করে শেখবার ইচ্ছা আমার প্রবল। আমার মা যে সব গান আমাকে গেয়ে শোনাতেন, সেই সব গান ছাপার অক্ষরে পড়তে আমার ভারি ইচ্ছা হয়। আমাকে আপনি পড়তে শেখান।

স্প্রিং-এর ছেলেমানুষের মত কথা শুনে আমার রাগ হ'ল। এদিকে পেটের অন্ন জুটবার উপায় নেই, ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত সময়ই বটে এটা !

আমি তার কথার কোন জবাব দিলাম না। শুয়ে পড়লাম অন্য এক স্থানে—স্প্রিং-এর কাছ থেকে বেশ একটু ব্যবধানে। নিদ্রার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কোথায় নিদ্রা ? চোখ বুজলেই যে জাম্‌লেটের সেই করুণ মুখচ্ছবি চোখের উপর মূর্ত হয়ে ওঠে।

• • •

পরদিন সর্ব্বাগ্রে আমিই ঘুম থেকে উঠলাম। রওনা হবার পূর্ব্বে ভাবলাম—বৃদ্ধের এবং তার কন্যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়াটাই সমীচীন। কিন্তু বৃদ্ধের মুখের পানে চোখ ফেরাতেই দেখলাম—ওর চক্ষুদুটি মুদিত, বর্ষাধারার মতই অশ্রুধারা ওর শুকনো গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। মন চাইল না ওকে আবার নূতন করে দুঃখ দিতে। স্প্রিং-এর দিকে চোখ ফেরালাম। সেও নিমীলিত চক্ষে নিশ্চল ভাবে এক পার্শ্বে পড়ে আছে।

সুতরাং বিদায় না নিয়েই চলে আসবার জন্য বাইরের দিকে পা বাড়ালাম।

হঠাৎ কানে এল :—চলে যাচ্ছেন ? শুনুন—কাল রাত্রে কিন্তু আমি স্বপ্ন দেখেছি।

সেই কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে স্প্রিং-এর মুখপানে দৃষ্টিপাত করলাম। ওর চোখের কোণে অশ্রু সঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

বললাম, সুখ-স্বপ্ন তো ?

ওষ্ঠপ্রান্তে একটা ক্ষীণ হাস্যরেখা জোর করে টেনে এনে স্প্রিং জবাব দিলে—হ্যাঁ, সুখ-স্বপ্নই বটে ! স্বপ্ন দেখলাম——সুন্দর একটি শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে জাম্‌লেটের বিয়ে হয়েছে এবং সে এখন গান পড়ে তার মানে বুঝতে এবং গান রচনাও করতে পারে।

বলতে ইচ্ছা হ'ল, আহা, তাই যেন হয়। স্বপ্ন যেন তোমার সত্য হয়েই দেখা দেয়। কিন্তু শত চেষ্টা করেও মুখ দিয়ে একটা কথা বেরুল না। কি একটা অজানা শক্তি আমার কণ্ঠরোধ করে আমাকে নির্ব্বাক করে দিলে। নির্ব্বোধের মত ওর দিকে চেয়ে নির্ব্বাক্যে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অবশেষে এক সময়ে স্প্রিং-ই স্বেচ্ছায় আমাকে বিদায় দিলে। তার মুখ দিয়ে বিদায়-সম্ভাষণ-বাক্যটিই শুধু উচ্চারিত হ'ল।

ওর চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠল অরণ্যানীর মত গভীর, সেই দৃষ্টির তাৎপর্য্য আমি উপলব্ধি করতে পারলাম না।

বৃদ্ধ এবং তার কন্যাকে মন্দিরে রেখে আমি চিরকালের মত চলে এলাম।

তখন বহুবার স্প্রিং-এর সেই দৃষ্টির মানে বুঝতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু সে চেষ্টা আমার ব্যর্থ হয়েছিল।

কিন্তু আজ তার অর্থ আমার নিকট জলের মতই পরিষ্কার। আজ তাতে দুর্ব্বোধ্যতা কিছুই নেই।

---

* চীনা লেখক চুং চাং ইয়ের গল্প অবলম্বনে।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ

১৮৪৫–১৯১০

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম :

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে ২৩ জুলাই ১৮৪৩ (৮ শ্রাবণ ১২৪৩০) কালীপ্রসন্নের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম শিবনাথ ঘোষ।

বাল্য-শিক্ষা

বঙ্গবাসী-কার্য্যালয় হইতে ১৩১১ সালে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে কালীপ্রসন্নের জীবিতকালে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী মুদ্রিত হয়। ইহা হইতে তাঁহার বাল্য-শিক্ষার কথা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কালীপ্রসন্নের পিতা শিবনাথ বড় প্রগাঢ় বিশ্বাসী ও ভক্তিমান্ হিন্দু ছিলেন। পাছে কালীপ্রসন্ন ইংরেজী শিখিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হন, তিনি এই হেতু তাঁহাকে ইংরেজী পড়িতে দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং বাড়ীতে যে একটি কার্সীর মক্তব ছিল, তাহাতেই কালীপ্রসন্নকে তিন বৎসর বয়সের সময় প্রথম শিক্ষার্থ প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন।...তাঁহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন 'পন্দেনামা'র বয়াৎ ও কীর্ত্তিবাসের পয়ার তাঁহার কণ্ঠস্থ।...অল্প কিছু দিনের মধ্যে কাশীরাম দাসের মহাভারতও কালীপ্রসন্নের কণ্ঠস্থ হইল।...ভরাকর গ্রামে তখন কলাপ ব্যাকরণের একটা বৃহৎ টোল ছিল।...ষষ্ঠ বৎসরে কালীপ্রসন্ন কলাপের শব্দরূপ অর্থাৎ চতুষ্টয় বৃত্তি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ীর অন্যান্য বালকেরা তখন ইংরেজী পড়ে। কালীপ্রসন্ন ইংরেজী পড়িতে সুযোগ পাইতেছেন না বলিয়া সময় সময় সমান-বয়স্কদিগের নিকট চক্ষের জল ফেলিতেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার প্রার্থিত সুযোগ ঘটিল।...তিনি বরিশালে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শম্ভুনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাসায়...থাকিয়া [পাদ্রীদের স্কুলে] ইংরেজী পড়িতে লাগিলেন।...তাঁহার নবম বর্ষ বয়সের সময় বরিশালে গবর্ণমেন্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। কালীপ্রসন্ন দুই বৎসর সেখানে অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার দশম বর্ষ বয়সের সময়েই তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন এবং সেখানে দুটি বৎসর কাল বিশেষ উদ্যম ও আগ্রহের সহিত ইংরেজী পড়িলেন। এই দুই বৎসর তিনি ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্য এবং ইতিহাস ও ভূগোলের পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়া অনেক মূল্যবান পুস্তক প্রাইজ পাইয়াছিলেন।...কালীপ্রসন্ন যে বৎসর এন্ট্রান্স ক্লাসে উঠিলেন, সেই বৎসর তাঁহার বুদ্ধি বিপড়াইল। তিনি দীনবন্ধু গোস্বামী নামক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণের নিকট মুগ্ধবোধ, রঘুবংশ ও মেঘদূত এবং শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক আর একটি পণ্ডিতের নিকট ভট্টি পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং পাঠ্য পুস্তকে উপেক্ষা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার পুনরুজ্জীবনের উৎসাহে ডুবিয়া গেলেন। আট নয় মাসে সংস্কৃতে তাঁহার ভাল প্রবেশ হইল, এবং এই সময়ে তাঁহার রচিত দু-একটি বাংলা প্রবন্ধ পণ্ডিতদিগের প্রীতি আকর্ষণ করিল। কিন্তু কলেজের শিক্ষা এক প্রকার মাটি হইয়া গেল। ঐ সময়ে ঢাকা কলেজে Lewis Society নামে একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সমিতি ছিল।...কালীপ্রসন্ন সেই সভায় তাঁহার তের বৎসর বয়সের সময় "পদার্থবিদ্যা অনুশীলনের ফল" এবং "বন্ধুতা না হৃদয়-বন্ধন" এই নামে দুইটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া খুব বেশী প্রশংসা পাইয়াছিলেন।...কিন্তু কালেজে রীতিমত অধ্যয়ন করিলেন না বলিয়া তাঁহার অভিভাবকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে কটু তিরস্কার করিলেন। এই তিরস্কার তাঁহার প্রাণে সহিল না। তিনি কিছু কাল পরেই কলিকাতা চলিয়া গেলেন এবং...ইংরেজী শিখিতে লাগিলেন। সে সময় কলিকাতায় বাংলা সাহিত্যের প্রতি লোকের তেমন অনুরাগ ছিল না।...কালীপ্রসন্ন সাময়িক স্রোতে প্রবাহিত হইয়া ইংরেজী অধ্যয়নেই একেবারে ডুবিয়া গেলেন, এবং কএক বৎসর কাল ইংরেজী



কালীপ্রসন্ন ঘোষ

* "ভাবি" : শ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।—'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন,' শ্রাবণ ১৩২৮।

সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান এবং ধর্ম্মতত্ত্বের ইতিহাস বা বিবরণি প্রভৃতি গ্রন্থরাশি পাঠ করিয়া ইংরেজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তিনি এ সময়ে প্রতিদিন দিবা রাত্রিতে অতি কম হইলেও চৌদ্দ পনর ঘণ্টা অধ্যয়ন করিতেন।...

"তাঁহার বয়স যখন সবে বিশ বৎসর, সেই সময় তিনি ইংরেজী বক্তা বলিয়া বিখ্যাত হন। তাঁহার বক্তৃতার প্রথম আরম্ভ ভবানীপুরে। সে সময় ভবানীপুরে একটি সুপরিচিত সাহিত্যসভা ছিল।...ভবানীপুরস্থ বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধে কালীপ্রসন্ন...সেখানে The Christianity of Christ and the Christianity of Church অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্ম ও প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্ম এই দুইয়ের পার্থক্য বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃবর্গ তিন ঘণ্টা কাল মন্ত্রমুগ্ধবৎ উপবিষ্ট ছিলেন।...বক্তৃতার পর...মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে নিকট আসিয়া কালীপ্রসন্নকে গাঢ় আলিঙ্গন ও ললাটে চুম্বন দানে কৃতার্থ করিলেন। আর রেভারেণ্ড ডল্‌ও (Dall) তাঁহাকে নানারূপ প্রিয় বাক্যে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপদেশ দিলেন। একদিন ডল সাহেবের একটি কথায় তাঁহার জীবনের স্রোতে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। ডল সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ কালীপ্রসন্ন, ইংরেজী আমাদিগের বস্তু। উহা তোমাদিগের মাতৃভাষা নহে। তোমরা ইংরেজীর জন্য যত কেন পরিশ্রম না কর, উহা কখনও তোমাদিগের নাম-মুদ্রায় মুদ্রিত হইয়া পৃথিবীতে প্রচলিত হইবে না। যদি স্বদেশের জন্য প্রকৃত কিছু কার্য্য করিতে চাও, তাহা হইলে আপনার মাতৃভাষার সেবা কর। পৃথিবীর যে সকল মহাত্মা মানব জাতিকে হাসাইয়া কিংবা কাঁদাইয়া জাতীয় জীবন স্রোতে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মাতৃভাষার সেবা করিয়াছেন।" ডল সাহেবের কথাগুলি কালীপ্রসন্নের অস্থিতে অস্থিতে লিখিত হইল এবং তিনি কিরূপে বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন করিবেন ও বর্ত্তমান কালের প্রবর্দ্ধিত ইংরেজি বাংলার শক্তি ও উদ্দীপনার একটা তরঙ্গ প্রবাহিত করিবেন—এই চিন্তাই তাঁহার চিত্তের প্রধান চিন্তা হইল। তিনি ইহার পর একদিন অতি গভীর ভক্তির সহিত সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা করিয়া বাংলা ভাষার সেবাব্রত গ্রহণ করিলেন। বাংলায় তৎকালে যে সকল ভাল পুস্তক পাওয়া গেল, তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পুনঃ পুনঃ পড়িলেন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি না জন্মিলে বাংলা ভাষার উপর যথার্থ আধিপত্য হয় না বলিয়া এবার তিনি পাণিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী, বৃত্তি ও বার্ত্তিকের সহিত বিশাল গ্রন্থ। উহা পড়িতে হইলে মূল গ্রন্থ এবং ভট্টোজী দীক্ষিতের প্রক্রিয়া-বিবৃতি ঘরে ঘরে মিলাইয়া পড়িতে হয়। তিনি উহার সহিত আবার কলাপ ও মুগ্ধবোধের সূত্র মিলাইয়া পড়িলেন এবং কয়েক বৎসরেই পাণিনি ব্যাকরণে অসাধারণ অধিকার লাভ করিলেন। এখন হইতে বাংলা তাঁহার চক্ষে আর এক বস্তুর মত হইল। তিনি বাংলা ভাষায় প্রস্রবণ-স্থানে পঁহুছিয়া, উহাকে ইচ্ছামত চালনা করিবার শক্তি লাভ করিলেন। এবং তাঁহার সংস্কৃত অধ্যয়ন শেষ হইবার পূর্ব্বেই, তিনি বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিলেন।"

সরকারী চাকুরী

বাইশ বৎসর বয়সের সময় কালীপ্রসন্ন ঢাকা জোট আদালতের 'ক্লার্ক অফ দি কোর্ট' পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতেই তিনি স্থায়ী ভাবে ঢাকায় বাস করিতে থাকেন।

"ঘোষ মহাশয় তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার প্রভাবে ও বিদ্যাবত্তার গৌরবে ঢাকার সাহেবদিগের নিকট বড় সম্মানিত ছিলেন। তখন এ দেশে কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্স হয় নাই; সাহেবেরা এ দেশের প্রায় সমস্ত সভাসমিতিতেই বাঙালীর সহিত মিশিতেন; কোন কোন সভায় নামতঃ পৃষ্ঠভূমিতে থাকিয়া সভার সমস্ত কার্য্য কর্ত্তৃত্বের সহিত চালাইতেন। ঐরূপ সভাসমিতিতে ঘোষ মহাশয়ই তাঁহাদিগের অগ্রণীরূপে কার্য্য করিতেন; এবং সভায় বক্তৃতা ও সভাসংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য সম্পাদনের দ্বারা বাঙালীর সহিত সাহেবদিগের সৌহার্দ্দবর্দ্ধনে যত্নপর হইতেন। এই সকল কারণে দেশের একজন উচ্চ-শ্রেণীস্থ সমাজচালকের ন্যায় সাহেবদিগের নিকট তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল।"

চাকুরীতে নিযুক্ত থাকিলেও কালীপ্রসন্ন কখনও অধ্যয়নে বিরত হন নাই। তাঁহার অধ্যয়নের প্রথম ফল 'নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব' ২৩ বৎসর বয়সে ১৮৬৯ সনে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। ঢাকায় অবস্থানকালেই তিনি ১৮৭৪ সনে 'বান্ধব' পত্র প্রকাশ করেন। এই সময়ে কার্য্যোপলক্ষে ঢাকায় আগত বহু সুসাহিত্যিক—দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসু, গঙ্গা-চরণ সরকার ও তদীয় পুত্র অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতির সহিত তিনি পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার "পিতা পুত্র" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—"পিতা যখন প্রথম ঢাকায় গেলেন [১৮৭৬-৮২], তখন সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ সরকারী চাকরী করিতেছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই পিতার কাছে আসিতেন। সাহিত্য, অসাহিত্য, অনেক বিষয়েই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বান্ধবের প্রসাদে কালীপ্রসন্ন বাবুর কীর্ত্তি প্রসারিত হইল। তিনি বঙ্গের সর্ব্বত্র কীর্ত্তিমান বলিয়া প্রথিত হইলেন।" ('বঙ্গ-ভাষার লেখক,' পৃ. ৫৬৩)

কালীপ্রসন্ন ১১ বৎসর ঢাকা জোট আদালতের হেড্ ক্লার্কের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। কর্ম্মদক্ষতাগুণে চাকুরীতে তাঁহার সুনাম হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজ

কালীপ্রসন্ন পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের পরম হিতৈষী ছিলেন।

ঢাকা ব্রাহ্ম স্কুলের সম্পাদক-রূপে ১৭ জানুয়ারি ১৮৬৯ তারিখের 'ঢাকাপ্রকাশে' তাঁহার একটি বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছে। ১৮৬৯ সনের ৫ই ডিসেম্বর পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্ম-সমাজ-গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়; পর-বৎসরের ২৩শে জানুয়ারি (১১ মাঘ ১২৭৬) এই গৃহে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের চত্বারিংশ উৎসব উপলক্ষে "ব্রাহ্মসমাজের পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় একটি সুদীর্ঘ উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করেন, বক্তৃতাটি আদ্যোপান্ত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের গৌরব ও মহিমার কথাতে পরিপূর্ণ এবং অতীব শ্রুতিমধুর ছিল। ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে সম্মাননা ও প্রীতি করিবার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম যে অতীব প্রাচীন, প্রাকৃতিক, বুদ্ধিমানের তৃপ্তিকর, শান্তি ও মুক্তিপ্রদ ধর্ম্ম বক্তৃতায় তাহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে" ('ঢাকাপ্রকাশ,' ৩০ ১-৭০)।

ব্রাহ্ম যুবকগণের দ্বারা ঢাকায় পূর্ব্ববঙ্গ শুভসাধিনী নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয় (ফাল্গুন ১২৭৬)। সভার মুখপত্র-স্বরূপ ১২৭৭ সালের বৈশাখ (১৮৭০, এপ্রিল) মাসে 'শুভসাধিনী' নামে সুলভ মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। কালীপ্রসন্ন এই সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। 'শুভসাধিনী'র পরমায়ু এক বৎসর।*

বান্ধব

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'র আদর্শে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়া কালীপ্রসন্ন ১২৮১ সালের আষাঢ় (১৮৭৪, জুন) মাসে ঢাকা হইতে সুলভ মূল্যে (সডাক বার্ষিক ১।৴০) 'বান্ধব' প্রচার করেন। এই মাসিকপত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন, আনন্দচন্দ্র রায়। প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত "অবতরণিকা"র সম্পাদক লেখেন :—

"বান্ধব আজ হইতে বঙ্গীয় বিদ্যানুরাগিদিগের অনুরাগের ভিখারী হইয়া রহিল। ইহার ভবিষ্যৎ ও ভরসা তাঁহাদিগের হস্তে। ইহা অবশ্যই, অনুগত সুহৃজ্জনের ন্যায় সতত সাবধান থাকিয়া, নানাবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গে পাঠকসমাজের মনোমোদনে যত্নশীল হইবে,—বাংলার প্রতি যাহাতে বাঙালীর অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং স্বদেশ বলিয়া যাহাতে দেশীয়দিগের মনে মমতার সঞ্চার হয়, অবশ্যই তদর্থ ইহার নিয়ত চেষ্টা থাকিবে; কি পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবে, তাহা বলা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। মনুষ্যের ইচ্ছা ও আশা যে গগনে উড্ডীন হয়, ক্ষমতা তাহার অর্দ্ধ পথে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় কি না, সন্দেহের বিষয়।"

প্রথম সংখ্যা 'বান্ধব'র সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (শ্রাবণ ১২৮১) যে অনুকূল মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :-

"ইহা একখানি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র।...আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে, অন্ত কোন পত্রাপেক্ষা লঘু বলিয়া আমাদিগের বোধ হইল না। রচনা অতি সুন্দর এবং লেখকদিগের চিন্তাশক্তি অসামান্য। ইহা যে বাংলায় একখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পত্রমধ্যে গণ্য হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই।"

"মাসিক পত্রের সম্পাদকের দায়িত্ব বড়ই কঠিন এবং গুরুতর বলিয়া কালীপ্রসন্নের ধারণা ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি একটি সুন্দর কথা বলিতেন, তাহা এই—'সম্পাদক কেবল তাঁহার পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির ভাষার শুদ্ধির জন্য দায়ী, তাহাই নহেন। প্রত্যেক পত্রেরই একটা সম্পাদকীয় বাঁধা সুর থাকা চাই। যাত্রাগান কিংবা থিয়েটারে যেমন প্রথমেই একটা সুর বাঁধিয়া লওয়া হয় এবং তারপর যিনি যা গান না কেন, সেই সুরেই গাহিতে হয়। তেমনই প্রত্যেক মাসিক পত্রেই সম্পাদকের একটা সুর থাকা আবশ্যক। লেখকেরা যাঁর যে সুরে ইচ্ছা লিখিয়া যাইবেন, ইহা ঠিক নহে।' বাঙ্গালা মাসিকপত্রের মধ্যে তিনি 'সাহিত্য'কে বড় ভালবাসিতেন।"—চন্দ্রশেখর কর : 'পরলোকগত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর' (১৩১৭) পৃ. ১৫।

'বান্ধব' কালীপ্রসন্নের অতুলনীয় কীর্ত্তি। ১২৮২ সালের চৈত্র মাসে "বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ" প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—"যে অভাব পূর্ণ করিবার জন্য বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আর্য্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই।" লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের রচনা 'বান্ধবে'র পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। রমেশচন্দ্রের 'জীবন-প্রভাত' ইহাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত কালীপ্রসন্নের অধিকাংশ রচনাই 'বান্ধবে' প্রকাশিত প্রবন্ধের মার্জ্জিত রূপ। 'বান্ধব'-সম্পাদন-কালে কালীপ্রসন্নের স্কন্ধে ভাওয়াল রাজ্যের গুরুভার ন্যস্ত হয়; ইহার ফলে 'বান্ধব' কিছুকাল অনিয়মে প্রকাশিত হইয়া শেষে লোপ পাইয়াছিল। ভাওয়াল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি 'বান্ধব'কে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। 'বান্ধবে'র বিভিন্ন খণ্ডগুলি এইভাবে প্রকাশিত হয় :—

১ম বর্ষ…১২৮১, আষাঢ়-চৈত্র। ২য় বর্ষ…১২৮২, বৈশাখ-চৈত্র। ৩য় বর্ষ…১২৮৩, বৈশাখ-চৈত্র। ৪র্থ বর্ষ…১২৮৫। ৫ম বর্ষ…১২৮৭। ৬ষ্ঠ বর্ষ…১২৮৮। ৭ম বর্ষ…১২৮৯। ৮ম বর্ষ…১২৯১। ৯ম বর্ষ…১২৯২ (বৈশাখ-আশ্বিন)—১২৯৩ (কার্ত্তিক-চৈত্র)। ১০ম বর্ষ…১২৯৪, ১ম-৫ম সংখ্যা। ১১শ বর্ষ…১২৯৫, ১ম-২য় (?)। (পুনঃপ্রচার) ১ম বর্ষ…১৩০৮ ফাল্গুন—১৩০৯ মাঘ। ২য় বর্ষ…১৩১০ (বৈশাখ-চৈত্র)। ৩য় বর্ষ…১৩১১। ৪র্থ বর্ষ…১৩১২। ৫ম বর্ষ…১৩১৩, বৈশাখ-ভাদ্র।

ভাওয়াল-রাজ্যের কর্ম্মসচিব

ভাওয়ালের রাজ্যাধিকারী স্বদেশবৎসল কালীনারায়ণ

---

*কেদারনাথ মজুমদার : 'বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য', পৃ. ৪২৩-২৪

রায় মৃত হওয়ার একজন যোগ্য প্রতিনিধির সন্ধান করিতেছিলেন ;—বিশেষতঃ তাঁহার একমাত্র পুত্র, রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ তখন অপ্রাপ্তবয়স্ক। 'বান্ধব'-সম্পাদক কালীপ্রসন্নের বিদ্যাবত্তা ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল ; তিনি এক দিন কালীপ্রসন্নকে আমন্ত্রণ করিয়া ভাওয়ালের কর্মাধ্যক্ষের পদ গ্রহণের জন্ত অনুরোধ করিলেন। "কালীনারায়ণ নির্ব্বন্ধাতিশয়ের সহিত বলিলেন—আমার কার্য্যভার গ্রহণ করিলে আপনার সাহিত্যসেবার বিঘ্ন হইবে না, অথচ আমার বৃহৎ উপকার হইবে। আপনি আপনার কর্ত্তব্য বোধ অনুসারে, যখন ইচ্ছা তখন ঢাকায় যাইতে পারিবেন এবং জয়দেবপুর থাকিয়া ঢাকায় প্রেসের তত্ত্বাবধান করিতে সুযোগ পাইবেন। পরন্ত আপনি এখানে কোন অধীনতার ক্লেশ পাইবেন না। আমি এক্ষণে কর্ম্মে অপটু, তাই আমি আপনার হাতে সমস্ত সঁপিয়া দিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার প্রতিনিধিরূপে শ্রীমান্ রাজেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন। এই ভাবে আপনি যাহা করিবেন, তাহাই আমার কার্য্যরূপে পরিগণিত হইবে।" কালীপ্রসন্ন বৃদ্ধের এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন নাই ; তিনি ২৮ মার্চ ১৮৭৭ (১৬ চৈত্র ১২৮৩) প্রধান কর্ম্মচারীর পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার ন্যায় সুধী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ যে অচিরাৎ সুশিক্ষিত হইয়া উঠিবেন, বৃদ্ধ কালীনারায়ণ এইরূপ আশাই করিয়াছিলেন ; এমন কি পুত্র যাহাতে বিষয়কার্য্যে পারদর্শী হইয়া উঠিতে পারে, এজন্ত তিনি তাহার হস্তে রাজকার্য্যের কতক কতক ভারও ন্তস্ত করিয়াছিলেন। অল্প দিন পরেই রাজা কালীনারায়ণ পরলোকগমন করেন (১৬ জুন ১৮৭৮)। রাজ্যপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজেন্দ্রনারায়ণ (তখন ১৯ বর্ষ বয়স্ক) উদ্দাম হইয়া উঠিলেন ; তিনি অচল বিশ্বাসে রাজ্যের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব-ভার প্রতিনিধি কালীপ্রসন্নের উপর ন্তস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ধনিজনসুলভ অসার আমোদ-প্রমোদে মত্ত হন। কালীপ্রসন্ন দীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল ভাওয়াল-রাজ্যের গুরুভার বহন করিয়াছিলেন। ১৯০১ সনের ২৬এ এপ্রিল রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয় ; ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি ভাওয়াল-রাজ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

"১৩০৮ সনের ১৩ই বৈশাখ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ পরলোক গমন করিলে, তদীয় বিধবা রাণী বিলাসমণি দেবী ঢাকার দ্বিতীয় সবজজ আদালতে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নামে কিঞ্চিদধিক দশ লক্ষ সাড়ে বারটি হাজার টাকার দাবীতে এক অভিযোগ করেন। রাজার মৃত্যুর অব্যবহিত পর রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে রাণী বিলাসমণি দেবী রাজকার্য্যের আভ্যন্তরীণ অনেক বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি প্রখরা বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন বলিয়া রাজার জীবিতাবস্থাতেই রাজ্যের বিস্তারিত বিবরণ সমূহ অবগত ছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে রাজ্যসংক্রান্ত অনেক গুপ্তকথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। তার পর...১৩০৮ সনের ১৪ই অগ্রহায়ণ [৩০ নবেম্বর ১৯০১] ঘোষ মহাশয়কে ম্যানেজারের পদ হইতে অপসৃত করেন। ঘোষ মহাশয়ও নানা বিভ্রাটে পতিত হইয়া ভাওয়াল পরিত্যাগ করিলেন। পরে বহু চেষ্টায় সেই মোকর্দ্দমা আপোষে মিটিয়া যায়।" *

সাহিত্য-সমালোচনী সভা

ভাওয়াল-রাজসংসারে কার্য্যকালে কালীপ্রসন্ন একটি মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহারই ঐকান্তিক যত্ন-চেষ্টায় ও রাজেন্দ্রনারায়ণের আনুকূল্যে জয়দেবপুরে 'সাহিত্য-সমালোচনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাবধি কালীপ্রসন্ন এই সভার নায়ক ছিলেন। 'বান্ধবে' মুদ্রিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন হইতে সভার উদ্দেশ্য পরিস্ফুট হইবে :—

সাহিত্য-সমালোচনী সভার বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত মহাশয়গণ জয়দেবপুরস্থ শ্রীযুক্ত কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সমালোচনী সভার অধ্যক্ষ কমিটির সভ্য হইলেন। এই কমিটির কোন সভ্য কোন বাঙ্গলা গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি কি শ্রীবৃদ্ধির অনুকূল জ্ঞান করিয়া সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিলে, সভা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পুস্তকালয়ে কিংবা বিদ্বৎসমাজে বিতরণের জন্ত সেই গ্রন্থের বহু খণ্ড ক্রয় করিয়া লইবেন, অথবা অন্ত প্রকারে গ্রন্থকারের সাহায্য করিবেন। এইরূপ পুরস্কার বিতরণ কিংবা সাহায্য দানে সম্পাদকের পূর্ব্ববৎ অধিকার থাকিবে এবং সম্পাদকও উল্লিখিত অধ্যক্ষ কমিটির অন্ততম সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

অধ্যক্ষ কমিটির সভ্যদিগের নাম।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল্। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম এ, বি এল্। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাচরণ সরকার। শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র রায়বাহাদুর C. I. E. শ্রীযুক্ত রেবারেণ্ড ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার। শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম, এ। শ্রীযুক্তবাবু রজনীকান্ত গুপ্ত।

ঢাকা জয়দেবপুর, ২৮ এ ফাল্গুন, ১২৮৮ } শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ। সম্পাদক

১৮ জানুয়ারি ১৮৮৯ তারিখের 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ'

---

* হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী : 'স্বভাব-কবি গোবিন্দদাস' (১৩৩০), পৃ. ৩৩-৪ ; ১৫১-২। এই মামলা সম্পর্কে 'ভাওয়াল মামলায় রায় ও কুমারের আত্মকথা' (১৩৪৩) পুস্তকের পরিশিষ্ট পৃ. ১২,১৩ পঠিতব্য।



বিমান হইতে নিউ ইয়র্কের দৃশ্য



শ্রীনগর : চেনার বাগ খালের দৃশ্য



পুরনো সাঁকো,—শ্রীনগর

পত্রে প্রকাশিত কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের একখানি পত্র উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে সাহিত্য-সমালোচনী সভার বদান্যতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। রাজকৃষ্ণ লেখেন :—

"আমি হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, ভাওয়ালাধিপতি ও সাহিত্য সমালোচনী সভার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর মহোদয় আমার পদ্যানুবাদিত মহাভারতের রাজকীয় সংস্করণের সমস্ত মুদ্রণ-ব্যয় ১২,০০০৲ বার হাজার টাকা দান করিতে অঙ্গীকৃত হইয়া, অনুগ্রহপূর্ব্বক সংখ্যানুক্রমে টাকা পাঠাইতেছেন। আমি তজ্জন্য তাঁহাকে এবং তাঁহার সুযোগ্য প্রধান মন্ত্রী ও বান্ধব পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

'সাহিত্য-সমালোচনী সভা'র দ্বারা কালীপ্রসন্ন বহু সাহিত্যিকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু "গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না" এই প্রবাদ-বাক্যের সার্থকতা ভাওয়ালের স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের জীবনে দেখিতে পাই। তাঁহার দুর্ভাগ্যময় জীবনের ইতিহাস কালীপ্রসন্নের কর্তৃত্বাধীন ভাওয়ালের সহিত জড়িত হইয়া আছে।

বাগ্মিতা

কালীপ্রসন্ন বাগ্মী ছিলেন। তিনি ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর এবং ভাষা মার্জ্জিত ও আবেগময়ী ছিল। ১৩১০ সালের ৩১এ জ্যৈষ্ঠ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আমন্ত্রণে তিনি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে) "বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি" বিষয়ে যে বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিবার সৌভাগ্য যাঁহার ঘটিয়াছে তিনিই জানেন কালীপ্রসন্ন কি অপূর্ব্ব বাগ্মিতা-শক্তির অধিকারী ছিলেন।

গুণের সম্মান

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক কালীপ্রসন্নকে ১৩০১ সনে "বিশিষ্ট সদস্য," ১৩০৪-৫,-৭ সালে অন্যতম সহকারী সভাপতি, ও ৪ আষাঢ় ১৩১০ তারিখে সম্বর্দ্ধিত করিয়া যথার্থই গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

'অনুসন্ধান'-কার্য্যাধ্যক্ষ দুর্গাদাস লাহিড়ীর ঐকান্তিক যত্নে, "বিবিধ বিধানে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে," ১৩০৬ সালের ৯ই শ্রাবণ কলিকাতায় 'সাহিত্য-সম্মিলনে'র জন্ম হয়। কালীপ্রসন্ন এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।●

সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য কালীপ্রসন্ন শেষ জীবনে বঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতে "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

গবর্মেণ্টও তাঁহার প্রতি উদাসীন ছিলেন না। কালীপ্রসন্ন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে (জুন ১৮৯৭) "রায়-বাহাদুর" ও ১৯০৯ সনের ১লা জানুয়ারি "সি-আই-ই" উপাধি ভূষিত হইয়াছিলেন। তিনি এক সময়ে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য ও সদর-লোক্যাল বোর্ডের সভাপতিও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

মৃত্যু

কালীপ্রসন্ন ২৯ জুলাই ১৯১০ (১৩ শ্রাবণ ১৩১৭) তারিখে ঢাকায় পরলোকগমন করেন।† মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর হইয়াছিল।

গ্রন্থাবলী

কালীপ্রসন্নের রচিত গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সংকলিত মুদ্রিত-পুস্তকের তালিকা হইতে গৃহীত।

১। নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব। আশ্বিন ১৯২৬ সংবৎ (৫ ডিসেম্বর ১৮৬৯)। পৃ. ২৪২।

"ইহা কোন পুস্তক বিশেষ অবলম্বন করিয়া লিখিত হয় নাই। কিন্তু যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে তৎসমুদয়ই ইংলণ্ড ও আমেরিকার নানাবিধ পুস্তক ও প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত এবং কতিপয় প্রধান ব্যক্তির বাক্যও ইহার স্থানে স্থানে অনুবাদিত হইয়াছে।"

২। সমাজশোধনী। (১৩ মার্চ ১৮৭২)। পৃ. ২৬
কৌলীন্য-প্রথার সমালোচনা।

৩। সঙ্গীতমঞ্জরী। (২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৭২)। পৃ. ৭১
ভক্তিরসাত্মক গীতাবলী।

৪। প্রভাত-চিন্তা। ২২ শ্রাবণ ১২৮৪ (৭ আগষ্ট ১৮৭৭)। পৃ. ১৩০।

সূচী: নীরব কবি, অভিমান, প্রকৃতিভেদে রুচিভেদ, মনুষ্যের জীবনচরিত, ক্লিওপেট্রা, শক্তি, ভালবাসে কে? লোকারণ্য, রাজা ও প্রজা, হরগৌরী, রিপিল্, বিনয়ে বাধা, সাধনা ও সিদ্ধি।

৫। ভ্রান্তিবিনোদ। ইং ১৮৮১ (২৫ আগষ্ট)। পৃ. ১৩৬।

সূচী: রসিকতা ও রসের কথা, স্বার্থপরতার স্বপ্নভেদ, চাটুকার, ষট্কারক, সামাজিক নিগ্রহ, চোরচরিত, প্রচলিত

● ৬ বৈশাখ ১৩০৭ তারিখের 'অনুসন্ধান' পত্রে "সাহিত্য-সম্মিলন" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† কালীপ্রসন্ন সেদিন দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিলেই হয়, প্রায় সকল সাময়িক-পত্রেই তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁহার মৃত্যু-তারিখ গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকার—ডঃ সুকুমার সেনের মতে তাঁহার মৃত্যু-সন "১৯০৭," আবার সুবল মিত্রের অভিধান অনুসারে উহা "১৯১১"।

ও অপ্রচলিত মিথ্যা কথা, কাষারম্ভ বর্ষ, দেবতার বাহন, যুগপৎভিবাদ, মানবজীবন, মিলনমিলন।

৬। নিভৃত-চিন্তা। ১২৮৯ সাল (২৯ মার্চ ১৮৮৩)। পৃ. ১৪২।

সূচী: অমৃত, ঐহিক অমরতা, বিরাট্ পুরুষ, রাজা ও রাজ-শক্তি, জীবনের ভার, মহত্ত্ব ও মিতব্যয়, লোকরঞ্জন, আশুন আর আকাঙ্ক্ষা, সাহিত্য ও জাতীয় বিকাশ।

৭। প্রমোদলহরী অথবা বিবাহ-রহস্য। ১৮ চৈত্র ১৩০১ (ইং ১৮৯৫)। পৃ. ১৮৩।

সূচী: বিবাহ (প্রলাপ), বিবাহ (ব্যাকরণ-রহস্য), ঘোমটা, বুধরা ভার্য্যা অথবা গৃহিণীরোগ, বিবাহ কত প্রকার।

৮। ভক্তির জয় অথবা হরিদাসের জীবন-যজ্ঞ। ১৮ শ্রাবণ ১৩০২ (১৭ আগষ্ট ১৮৯৫)। পৃ. ২২২।

ঠাকুর হরিদাসের ভক্তিলীলাত্মক বিচিত্র জীবন-কথা।

৯। নিশীথ-চিন্তা। আশ্বিন ১৩০৩ (২১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬)। পৃ. ১৮০।

সূচী: রাত্রিকাল, নদীর জল, দুঃখে সুখ, তারা আর ফুল, বিরহ, আশার ছলনা, চন্দ্রবদন।

১০। মা মা মহাশক্তি। অগ্রহায়ণ ১৩১১ (১৪ জানুয়ারি ১৯০৫)। পৃ. ১০৪।

১১। জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা। ফাল্গুন ১৩১১ (২০ এপ্রিল ১৯০৫)। পৃ. ১৩৪।

১২। ছায়াদর্শন (The Philosophy of Apparitions)। মাঘ ১৩১৬ (ইং ১৯১০)। পৃ. ৩।৶০+২১৬।

"শ্রীউমেশচন্দ্র বসু কর্তৃক সম্পাদিত।"

পাঠ্য পুস্তক।—কালীপ্রসন্ন কয়েকখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; সেগুলি—'কোমল কবিতা' (ইং ১৮৮৮); 'বর্ণপাঠ' (ইং ১৮৯৬); 'আদর্শ' (বড় অক্ষরে মুদ্রিত দেখিয়া লিখিবার বিবিধ পাঠ); 'ভারতবর্ষের ইতিহাস,' ১ম ও ২য় খণ্ড (ইং ১৯০৯) ও 'সুপ্রভাত'।

অপ্রকাশিত রচনা

কালীপ্রসন্নের কতকগুলি অপ্রকাশিত রচনা,—প্রবন্ধ, কবিতা ও গান তাঁহার মৃত্যুর পরে 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' (১৩২২, ১৩২৫-২৮) ও 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে (১৩২৫) প্রকাশিত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে "নাটক" প্রবন্ধটি ('ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন,' কার্ত্তিক-পৌষ ১৩২৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কালীপ্রসন্ন ও বাংলা-সাহিত্য

বাংলা-সাহিত্যে কালীপ্রসন্ন তাঁহার চিন্তা ও ভাষার অপূর্ব্ব সমন্বয়গুণে অমর হইয়া আছেন। তাঁহার রচিত 'প্রভাত-চিন্তা,' 'নিভৃত-চিন্তা,' 'নিশীথ-চিন্তা' বাংলা-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কালীপ্রসন্নের রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া চন্দ্রশেখর কর লিখিয়াছেন:—"সকল সাধনারই একটি সংকল্প এবং একটি মূলমন্ত্র থাকে। কালীপ্রসন্নের সংকল্প ছিল—মাতৃভাষার সেবা, আর মূলমন্ত্র ছিল—শুদ্ধি এবং সৌন্দর্য্যের সমাবেশ।...জ্ঞান-বৃদ্ধ সাহিত্যসাধক এক দিন আমাকে কহিয়াছিলেন—'আমার জীবনের ব্রত বঙ্গ-সাহিত্যে শুদ্ধি এবং সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ করা।—শুদ্ধি বিদ্যাসাগরের, আর সৌন্দর্য্য ইংরেজী নবিসদিগের অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, চন্দ্রনাথ প্রভৃতির।' যাঁহারা কালীপ্রসন্নের গ্রন্থগুলি এবং তাঁহার রচিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, তিনি ভাষার শুদ্ধ-সংরক্ষণে কেমন যত্নবান ছিলেন। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতেও তাঁহার চেষ্টা যথেষ্ট ছিল। কালীপ্রসন্ন শুদ্ধিকে উপাস্য দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, আর সৌন্দর্য্যকে প্রিয় সুহৃদের ন্যায় ভালবাসিতেন। সৌন্দর্য্য শুদ্ধির বিরোধী হইলে, তিনি কখনই তাহার প্রশ্রয় দিতেন না। ফলতঃ ইহাই কালীপ্রসন্নের বিশেষত্ব।...তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, 'মাতৃভাষার সেবা করিতে হইলে, ভক্তির সহিত করা কর্ত্তব্য এবং শব্দ-প্রয়োগে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করিলে, মায়ের অবমাননা করা হয়।' মাতৃভাষার প্রতি কালীপ্রসন্নের প্রগাঢ় ভক্তি এবং ঐকান্তিক অনুরাগের নিদর্শন-স্বরূপ 'সাহিত্য-সম্মিলন'-সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ীকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রের অংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি:—

"বাঙ্গালা ভাষা যেমন আপনার, তেমন আমার এবং সেইরূপ আমাদিগের প্রত্যেকেরই মাতৃস্বরূপা। বিখ্যাত দার্শনিক অগস্ত কোম্ সমগ্র মানব জাতিকে একটি মনঃকল্পিত দেবতা-জ্ঞানে ধ্যান ও আরাধনা করিতে উপদেশ করিয়াছেন। আমার মনঃকল্পিত দেবতা মাতৃরূপিণী বঙ্গভাষা। আমি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল বঙ্গভাষাকে মনে মনে মা বলিয়া ডাকিয়াছি—মা বলিয়া ভাল বাসিয়াছি, এবং মাতৃজ্ঞানে—আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিমাণে পূজা করিয়াছি। আর, যাঁহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও মায়ের সুসন্তান মনে করিয়া ভ্রাতৃসম্ভাষণে সম্মান করিয়াছি। ৯ই ফাল্গুন ১৩০৬।" ('অনুসন্ধান', ৬ বৈশাখ ১৩০৭)

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

তৃতীয় অধ্যায় : আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম

সেদিন ২৮শে কার্ত্তিক, ১৪ই নবেম্বর বৃহস্পতিবার। সারা দিন টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। দুর্দিনে পথিক মাত্রই গৃহ-প্রত্যাবর্ত্তনে ত্বরান্বিত। ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী দিবালোক নির্ব্বাণ হইবার অনতিকাল পরেই আমি হোটেল হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিমান কোম্পানীর সহরের আপিসে উপনীত হইলাম।

কোম্পানীর বাস যাত্রিদল লইয়া ৭টা ৩৫ মিনিটে আপিস ত্যাগ করিল। প্রায় সাড়ে আটটায় আমরা পুল বিমান-ঘাটিতে পৌঁছাই। পুলিশ ও শুল্ক-ঘাটি অতিক্রম করিয়া, চা পানে পরিতৃপ্ত হইয়া রাত্রি দশটায় বিমানে উঠি। সাড়ে দশটায় বিমান উড়িতে আরম্ভ করে। কৃষ্ণা ষষ্ঠীর মেঘে ঢাকা "ঝিম্‌ঝিম রাত"। সাড়ে ছ' হাজার ফুট উঁচু দিয়া ঘণ্টায় ২১৪ মাইল বেগে উড়িয়া রাত্রি বারটায় আইরিশ স্বাধীন রাষ্ট্রের শ্যানন বিমান-ঘাটিতে অবতরণ করি। শ্যানন আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। এখান হইতে বিমান মহাসাগর অতিক্রম সুরু করিবে। এখানে যাত্রীদের প্রচুর খাইবার ব্যবস্থা ছিল। ডিম, মাখন, চিনি ও ঘিয়ে ভাজা মেষমাংসের প্রাচুর্য্য দর্শনে অনটন-ক্লিষ্ট ইংরেজ নরনারীগণ আনন্দ চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলেন।

রাত্রি প্রায় আড়াইটায় বিমান উড়িতে সুরু করিল। বিমানটি স্পিড্‌বার্ড শ্রেণীর। ইয়র্ক শ্রেণীর বিমান অপেক্ষা অনেক বড়; কিন্তু গর্জ্জন কম। চারিটি ইঞ্জিন। চল্লিশটি আসনে কুড়িজন যাত্রী। প্রত্যেককে পাশাপাশি দুইটি করিয়া আসন দেওয়া হইয়াছে। আসনগুলি বেশ প্রশস্ত। দুইটি আসনের মধ্যবর্ত্তী হাতলটি উঠাইয়া লওয়া যায়। প্রত্যেক আসনের পিঠ ইচ্ছামত উঠান বা নামান যায়। যাত্রিগণ কখনও ইচ্ছামত আসনের পিঠ নামাইয়া আরাম করিতেছেন, কখনও বা আসনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হাতলটি তুলিয়া লইয়া দুইটি আসনের উপর একটু লম্বা হইতেছেন। একটি ষ্টুয়ার্ড ও একটি ষ্টুয়ার্ডেস যাত্রিগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আহার সম্বন্ধে সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়া উড়িতেছি। আট হাজার ফুট উচ্চে ঘণ্টায় প্রায় দুই শত মাইল বেগে বিমান সগর্জ্জনে ছুটিয়াছে। একঘেয়ে গর্জ্জন ও সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। যাত্রিগণ সকলেই নিদ্রাচ্ছন্ন। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন আমার ঘড়িতে সাতটা। উপরে স্বচ্ছ উদার নীলাকাশে কৃষ্ণা ষষ্ঠীর চাঁদ উজ্জ্বল লাবণ্য বিকীরণ করিতেছে। কালপুরুষ ও অন্য দু' একটি তারা পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। নীচে পুঞ্জীভূত মেঘ ও কুয়াশা মহাসাগরকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এত পরিষ্কার আকাশ পূর্ব্বে কখনো দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বিমানে যে মহাসাগর অতিক্রম করা কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে দুঃসাহসিক যুবকের স্বপ্নমাত্র ছিল, আজ তাহা তন্দ্রা-চুম্বিত-নেত্রে ঐ প্রসন্ন আকাশেরই মত প্রফুল্লচিত্তে অতিক্রম করিতেছি।

সাড়ে আটটা বাজিতে পূর্ব্বদিগন্তে ঈষৎ রক্তিমাভা দেখা দিল। চাঁদ ও তারাগুলি ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হইতে লাগিল। নীচে মেঘমালার মধ্য দিয়া নীলাম্বুরাশি দৃষ্টিগোচর হইল। সাড়ে ন'টা বাজিবার আগেই পূবের লাল আভা কাটিয়া গেল।

পূর্ব্বদিগন্তে আকাশের খানিকটা অংশ পরিষ্কার হইল। তাহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে নানা বর্ণের কৃষ্ণাভ মেঘ দেখা দিল। ক্রমশঃ ঐ কৃষ্ণাভ মেঘে লাল রঙ ফুটিয়া উঠিল। বিচিত্র রঙের খেলা সুরু হইল। তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা দেবকন্যাগণ যেন সুবর্ণ-মণ্ডিত হইয়া সূর্য্যদেবকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গলানো স্বর্ণাঞ্চল বিছাইতেছেন। কি রঙের খেলা আর কি সাজের আড়ম্বর! চোখ ফেরানো যায় না। ঠিক দশটায় নীলাম্বুরাশি ভেদ করিয়া সূর্য্য ঈষৎ আত্ম-প্রকাশ করিলেন। সূর্য্যের সবটা দৃষ্টিগোচর হইতে পাঁচ মিনিট লাগিল। তখনও সূর্য্য ঈষৎ লম্বা আকারের। সম্পূর্ণ গোলাকার হইতে আরও দু-তিন মিনিট লাগিল। তখন বাল-সূর্য্যোদ্ভাসিত আটলান্টিক মহাসাগর ও আকাশের সুনীল রূপ সম্পূর্ণ সুপ্রকট। চারি দিকে প্রসন্নতা বিরাজ করিতেছে। আকাশ, মহাসাগর ও সমস্ত প্রকৃতি শান্ত। দুই শত মাইল বেগে চলন্ত বিমানও যেন স্থির। লোকালয়ের বহুদূরে আকাশ-ঘেরা মহাসাগরের মধ্যে আট হাজার ফুট ঊর্দ্ধে প্রকৃতির অন্তঃপুরে বসিয়া আছি। রাত্রে চন্দ্রকিরণ-বিধৌত নীলাকাশ যখন হাস্যচ্ছটা বিস্তার করিতেছিল, তখন মেঘলোকের ঊর্দ্ধে বসিয়া ভাবাবেশে সেই রূপরাশি উপভোগ করিতেছিলাম। প্রাতঃকালে সদ্যঃস্নাতা ধরিত্রী যখন বালসূর্য্যের সিন্দুর-বিন্দু নীলাকাশ-সীমন্তে ধারণ করিয়া নবরূপে আত্ম-প্রকাশ করিলেন, তখন মেঘলোকের ঊর্দ্ধে থাকিয়াও—"সভ্রম ভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে দূরে অবনত শিরে।"

লণ্ডন সময় দশটায় ঠিক সূর্য্যোদয়কালে বিমানে প্রাতরাশ পরিবেশিত হইল। মহাসাগরের উপর দিয়া চলিয়াছি। নীচে মসৃণ নীলাম্বুরাশি। উপরে ও চারি দিকে নীলাকাশ। মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের সজ্জা। সহসা স্থলভাগ দৃষ্টিগোচর হইল। ধূসর বন্ধুর প্রান্তর। মহাসমুদ্র যেন পৃথিবীর সমস্ত গ্লানি ধোয়াইয়া দিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে আদর করিতেছেন। লণ্ডন-সময় একটা পনর মিনিটে আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম তীরবর্ত্তী গেণ্ডার বিমান-ঘাটিতে অবতরণ করিলাম।

গেণ্ডার নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে অবস্থিত। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী অনুর্ব্বর ভূমি। ইতস্ততঃ ছোট ছোট পাহাড়। সবুজের রেখা দেখা যায় না। বহুক্ষণ জলের উপর দিয়া উড়িবার পর পৃথিবীর পর্ব্বত-সঙ্কুল ধূসর রূপ বেশ লাগিতেছে। গেণ্ডারে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিয়া লণ্ডন-সময় আড়াইটায় পুনরায় উড়িলাম। নীচে শুধু সাদা মেঘের রাশি বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে বিছানো একটি বিরাট করাসের মত পড়িয়া আছে। উপর হইতে তাহার 'পর প্রখর রৌদ্র পতিত হওয়ায় মেঘমালা আরও শুভ্র দেখাইতেছে। উপরে পরিষ্কার নীলাকাশ। আট হাজার ফুট উচ্চে ঘণ্টায় দুই শত পঁয়ষট্টি মাইল বেগে উড়িতেছি। নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড পাড়ি দিয়া একটি সমুদ্রের খাড়ির উপর আসিলাম। খাড়ি পার হইয়া নোভাস্কাটিয়ার উপকূল দিয়া উড়িতেছি। দূরে সমুদ্র দেখা যাইতেছে। উপকূলভাগ জলা, স্যাঁতসেঁতে, অনুর্ব্বর ও লোকবসতিশূন্য। আর একটি সমুদ্রের খাড়ি পার হইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পড়িলাম। লণ্ডন সময় প্রায় সাড়ে পাঁচটায় নিউ ইয়র্কের লাগার্ডিয়া বিমান-ঘাটিতে অবতরণ করিলাম।

শুল্ক, পুলিস ও স্বাস্থ্য বিভাগের ঘাটি অতিক্রম করিতে প্রায় আধঘণ্টা গেল। আমার জন্য ওয়াশিংটনের টিকিট লইয়া এক জন আমেরিকান ভদ্রলোক বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা হইল। আমার ঘড়িতে তখন বৈকাল সোয়া ছয়টা। তখন স্থানীয় সময় সওয়া একটা। ঘড়ি পাঁচ ঘণ্টা পিছাইয়া দিলাম। পার্শ্ববর্ত্তী একটি ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন —আপনি দেখিতেছি ফাঁকি দিয়া পাঁচ ঘণ্টা সময় লাভ করিয়া লইলেন।

আমি (সহাস্যে)—আবার আগামী মাসেই অষ্ট্রেলিয়া যাইবার সময় সুদসহ এই লাভ শোধ করিতে হইবে।

ভদ্রলোকটি (সহাস্যে)—এত শীঘ্র! এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

যে ভদ্রলোকটি আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন তিনি বলিলেন, এখন মাত্র দেড়টা। আপনার ওয়াশিংটনের বিমান" চারটায় ছাড়িবে। এখন মধ্যাহ্নভোজন সমাপনান্তে খানিকটা বেড়াইয়া লইতে পারেন। এই বলিয়া ওয়াশিংটনের টিকিট আমাকে দিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, এখানে এখন মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় বটে, কিন্তু আমার মধ্যাহ্ন-ভোজন গেণ্ডারে হইয়া গিয়াছে, আমি ক্ষুধার্ত্ত নই। মালের বন্দোবস্ত করিয়া খানিকটা ঘুরিতেই চাই। ভদ্রলোক আমার লগেজ লণ্ডনের বিমান হইতে খালাস করিয়া ওয়াশিংটনের বিমান-কর্ম্মচারীদের হেফাজতে দিলেন। তারপর আমাকে চা ও "হট্-ডগ্" খাওয়াইয়া আপ্যায়িত করিলেন। "হট-ডগ" ছোট এক টুকরা গরমবরাহ-মাংস সহ ছোট এক টুকরা রুটী। রাস্তায় বা মাঠে যাইয়া আমরা যেমন চানাচুর বা আলুভাজা খাই, আমেরিকানরা সেইরূপ "হট-ডগ্" খায়। কয়েকদিন পরে কাগজে দেখিয়াছিলাম যে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান খেলা দেখিতে গিয়া খেলার মাঠে সবার সঙ্গে "হট্-ডগ্" খাইলেন।

"হট-ডগ" খাইয়া ভদ্রলোকটির সহিত ইতস্ততঃ ঘুরিলাম। নির্ম্মল আকাশ। চমৎকার রৌদ্র। এমন সুন্দর দিন ভারতবর্ষ ছাড়িবার পর দেখি নাই। লাগার্ডিয়া বিমান-ঘাটি পৃথিবীর বৃহত্তম বিমান-ঘাটি। এক অংশ বিদেশে যাতায়াতের বিমানের জন্য এবং অপর অংশ আভ্যন্তরীণ বিমানের জন্য নির্দ্দিষ্ট। অনবরতই যাত্রী লইয়া বিমান উড়িতেছে বা নামিতেছে। আমেরিকা বৃহৎ দেশ। আয়তনে ভারতবর্ষের দেড়গুণ। ধনে ও ব্যবসায়ে আমেরিকাবাসীরা পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কাজেই এখানে বিমানের যাতায়াত খুব বেশী। নিউ ইয়র্ক সহরের কেন্দ্রস্থল বিমান-ঘাটি হইতে ১২।১৩ মাইল হইবে। বিমান-ঘাটির চারি দিকে ঘুরিয়া ভদ্রলোকটির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ওয়াশিংটনের বিমানে চড়িলাম। বিমানটি বিরাট, কন্‌ষ্টিলেশন্ শ্রেণীর। এই শ্রেণীর বিমানই নাকি এখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। বিমানটিতে চারটি ইঞ্জিন, পঞ্চাশটি আসনে পঞ্চাশ জন যাত্রী। এক জন তত্ত্বাবধায়িকা যাত্রীদের সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতেছেন ও আহারাদি পরিবেশন করিতেছেন। নিউইয়র্ক হইতে ওয়াশিংটন দুই শত মাইলের কিছু বেশী। যাইতে এক ঘণ্টা লাগিল। চারিটায় রওনা হইয়া ঠিক পাঁচটায় ওয়াশিংটন পৌঁছিলাম।

লণ্ডন হইতে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত তিন লক্ষে ৩২৭৩ মাইল পথ উড়িয়াছি। লণ্ডন হইতে শ্যানন ৩৭২ মাইল এবং শ্যানন হইতে গেণ্ডার ১৯৭৫ মাইল এবং গেণ্ডার হইতে নিউইয়র্ক ৯২৬ মাইল। শ্যানন ও গেণ্ডার আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের উভয় তীরে অবস্থিত। শ্যানন হইতে মহাসাগর অতিক্রম সুরু হয় এবং মহাসাগর পাড়ি দিয়াই গেণ্ডার। নৈশভোজনের পর লণ্ডন ত্যাগ করিয়া পরদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় বিমান নিউ ইয়র্কে উপনীত হইল।

কবি শিবনাথ শাস্ত্রী

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়

যাঁহারা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে দেখিয়াছেন ও তাঁহার উচ্ছ্বসিত আবেগময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছেন, কিম্বা তাঁহার সুললিত রচনাবলী বা উপদেশমালা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে স্বভাবতঃই এই কথা উপস্থিত হইয়াছে যে, শাস্ত্রী মহাশয় যদি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যে তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ না করিয়া তাহার কিয়দংশ সাহিত্যসেবায় ব্যয় করিতেন তবে তিনি যে আজ বাংলা সাহিত্যে একটি অতি সুপরিচিত স্থান অধিকার করিতেন এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

হেমলতা সরকার লিখিত শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনচরিত হইতে জানা যায় যে, রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ও এইরূপ খেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বসু মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়কে নবীনচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তদানীন্তন বাঙালী কবিদের সমকক্ষ মনে করিতেন, এবং সেইজন্য তিনি বলিয়াছিলেন, "হায়, কি পরিতাপ, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের যাঁতায় পড়িয়া শিবনাথের সাহিত্যিক জীবন খর্ব্ব হইল। এত বড় কবিকে ব্রাহ্মসমাজ মারিয়া ফেলিল।" সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা সত্যই পরিতাপের বিষয় মনে হয়। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের এ বিষয়ে কোন ক্ষোভ ছিল না। তিনি লিখিয়াছেন—"আমার জীবনের লক্ষ্য বঙ্গীয় যুবকযুবতীর মনে নৈতিক বল, ধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া যাওয়া। বিধাতা সেই দিকেই আমাকে লইয়া আসিয়াছেন। আমার বক্তৃতা, আমার গ্রন্থাবলী, আমার কবিতা সকলেরই এই দিকে গতি। আমি অনেক বার আপনার মনে মনে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছি, আচ্ছা, যদি আমার প্রণীত সমুদয় গ্রন্থ পুড়িয়া যায় এবং আমার নামগন্ধ না থাকে তাতে আমি দুঃখিত হই কিনা। আমি মনকে বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাতে আমার দুঃখ হয় না, কারণ আমি যে পরিমাণে জাতীয় জীবনে নৈতিক বলের সঞ্চার করিতে পারিয়াছি সেইটুকু আমি। আমার নাম থাকুক না থাকুক, সেই পরিমাণে আমার জীবন সার্থক হইয়াছে।"

সুতরাং এই শ্রেণীর ক্ষোভের বিশেষ কোন অর্থ নাই। শিবনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য হইতেছে তাঁহার জীবন। জীবনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার জীবনবীণার তার-গুলি বাঁধিয়া আসিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার সমগ্র জীবনের গভীরতম আকাঙ্ক্ষা ও সুতীব্র অনুভূতিসকল পরিপূর্ণরূপে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। তিনি চাহিয়াছিলেন, সত্যের যে ক্রূর আহ্বান, প্রেমের যে নিবিড় বিনিময়, পবিত্রতার যে উন্নত স্পর্শ, সকলই যেন ধ্বনিত হয় সেই বীণায়। তাঁহার কল্পনা, সাধনা দ্বারা তিনি চাহিয়াছিলেন আমাদের বাঙালী সমাজকে একটি শ্রেষ্ঠ কাব্যে রূপান্তরিত করিতে। তাই রূপলোকের কল্পরচনাকে পশ্চাতে ফেলিয়া তিনি সম্মুখে চলিয়া গিয়াছিলেন এই বস্তুলোকের মধ্যে তাঁহার জীবনের পরম সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে। তাঁহার কাব্য ছিল তাঁহার প্রতিদিনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি। জীবনে তিনি ছিলেন প্রচারক। অলক্ষিতে তাই তাঁহার রচনাও অনেক ক্ষেত্রে হইয়া উঠিয়াছিল প্রচারেরই আর একটা অঙ্গস্বরূপ। সেই জন্য লোক তাঁহার কাব্য অপেক্ষা তাঁহার জীবনকে বেশী মূল্য দিয়াছিল।

অবশ্য এ কথা সত্য যে, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার যা দান তাহার সমুচিত মূল্য তিনি লাভ করেন নাই। তাঁহার কবিতা, ইতিহাস ও জীবনী, তাঁহার উপন্যাস ও ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাকে একটি প্রকৃষ্ট স্থান দিতে বাধ্য। কিন্তু সে-স্থান যে তিনি লাভ করেন নাই তাহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম, বাংলা সাহিত্যের যাহারা পসারী তাহারা অনেক বিষয়ে অজ্ঞ—মোহাচ্ছন্নও বটে। বাংলা সাহিত্যে ব্রাহ্ম-সমাজের দানের কথা উল্লেখ না করিয়াও বাংলা সাহিত্যের "সম্পূর্ণ" ইতিহাস প্রকাশিত হইতেছে। দ্বিতীয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার কবিতা ও উপন্যাস দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে।

যাহাই হোক শাস্ত্রীমহাশয়ের রচনা যে কতখানি আদরণীয় তাহা বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। এই উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাঁহার কবিতার কিঞ্চিৎ আভাস দিব বলিয়া অভিপ্রায় করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার কবিতা ও অপরাপর লেখার মধ্যে এত অঙ্গাঙ্গি যোগ আছে যে প্রসঙ্গতঃ সে-গুলির উল্লেখ না করিলে তাঁহার কবিতার রসোপলব্ধি সম্পূর্ণ হইবে না।

শাস্ত্রী মহাশয় একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, ঐতিহাসিক, ব্যাখ্যাতা ও ধর্ম্মতাত্ত্বিক ছিলেন। নৈতিক প্রেরণা ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা তাঁহার সকল রচনাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। নূতন সত্যের উজ্জ্বল আলোকে সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করা ও মানব-মনকে উচ্চ গ্রামে উন্নীত করাই তাঁহার সকল প্রচেষ্টার মূল ছিল। পঙ্কের মধ্যে যে পবিত্রতা, বিচ্ছিন্নের মধ্যে যে সূত্র, খণ্ডের মধ্যে যে অখণ্ডতা, ক্ষুদ্রের মধ্যে যে বৃহৎ এবং সত্য, প্রেম, পবিত্রতা তাঁহার সকল লেখার মূল উপাদান।

সাধারণতঃ তিনি "মেজ বউ", "রামতনু লাহিড়ী ও তৎ-কালীন বঙ্গ সমাজ" ও তাঁহার "আত্ম-চরিতে"র জন্য

সুপরিচিত। কিন্তু এতদ্ব্যতীত তিনি আরও কয়েকখানি উপন্যাস ও ধর্মগ্রন্থাবলীর রচয়িতা, যথা—নয়নতারা, যুগান্তর ও বিধবার ছেলে, ধর্মজীবন, গৃহধর্ম ও প্রবন্ধাবলী। তাঁহার বহু উপদেশ এবং বক্তৃতাও অনুলিখিত হইয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। কাব্যগ্রন্থের মধ্যে "নির্ব্বাসিতের বিলাপ," "পুষ্পমালা", "পুষ্পাঞ্জলি", "হিমাদ্রিকুসুম" ও "ছায়াময়ীর পরিণয়" উল্লেখযোগ্য। তিনি ইংরেজীতে যে সকল লেখা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে *The Man I have seen* ও *The Histroy of the Brahmo Samaj* সুপ্রসিদ্ধ।

তাঁহার কবিতাসকল পাঠ করিলে স্বতঃই এই কথা মনে আসে যে তিনি স্বভাবকবি ছিলেন। কবিপ্রতিভা তাঁহার জন্মগত। তাঁহার কবিতায় আর যত দোষই থাকুক কেহ বলিতে পারিবে না যে ইহা চেষ্টাপ্রসূত ও কষ্টকল্পনাদোষে দুষ্ট। তাঁহার কবিতা ছিল স্বতস্ফূর্ত, বেগবতী, আগ্নেয়গিরির গলিত ধাতুস্রোতের মত নিৰ্বাধ, অদমনীয়। তাঁহার সতের বৎসর বয়সের লেখা 'নির্ব্বাসিতের বিলাপ' হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সর্ব্বশেষ কবিতাগ্রন্থ 'ছায়াময়ীর পরিণয়' পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই বাধাহীন গতিশীলতা তাঁহার রচনার প্রধান লক্ষণ মনে হয়। নির্ব্বাসিতের বিলাপের শেষ পর্ব্ব 'হরিষে বিষাদে'র কয়েকটি পঙ্‌ক্তি দেখুন :

শুভ্র শুভ্র মেঘে হেরে পাগলের প্রায় ;
শ্মশ্রু, কেশ, পরিচ্ছদ ধূসর ধূলায়।
এদিকে দিবস শেষ ডুবু ডুবু রবি,
আঁখি-মুহু-মুহু যেন প্রকৃতির ছবি।

তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতাগ্রন্থ 'পুষ্পমালা'য় প্রায় প্রত্যেক কবিতাতেই এই স্বতঃস্ফূর্ত গতি লক্ষিত হয়। এই গ্রন্থের "উৎসর্গে" প্রায় প্রত্যেক কলিই এই সাক্ষ্য বহন করিতেছে :

চাই না সভ্যতা, চাষা হয়ে থাকি
দেও ধর্ম্মধন প্রাণে পুরে রাখি!
হায় জন্মভূমি! পুণ্যভূমি তুমি
দেও পুণ্যবারি দগ্ধ প্রাণে মাখি!

তাঁহার কবিতাসকলের মধ্যে 'ছায়াময়ীর পরিণয়' সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহা ১৮৮৯ সালে লিখিত। কবি এখন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত ও সহস্র কাজের চাপে তাঁহার কাব্যচর্চ্চা উপেক্ষিত। কবির প্রাণ সজীব বটে, কিন্তু কবিকণ্ঠ জড়তাগ্রস্ত। কবিতা এখন নিরাভরণ হইয়া উঠিয়াছে :

ফুলের বনে ফুল-কুমারী বেড়ায় সেখেনে,
সাজি ভরে যতন করে কতই ফুল তোলে।
ফুলের ডালা, ফুলের মালা, কাণে ফুলের দুল,
সোণার হাতে ফুলের বালা, খোঁপা-ভরা ফুল।

কিন্তু এই নিরাভরণতার মধ্যে প্রাণশক্তির নাশ হয় নি :

নির্জ্জনে—নির্জ্জনে—ঘোর গভীর নির্জ্জনে,
নির্ঝরিণী গাইছে যথায় ;
উপলে শৈবাল-শয্যা পাতিয়া গোপনে,
তাতে শুয়ে প্রকৃতি ঘুমায়।

শিবনাথ যে যুগে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন সেই যুগ ছিল হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের। মাইকেল মধুসূদনের প্রভাব তখনও জীবন্ত। এই সকল প্রভাব ও সংস্পর্শের মধ্যে মানুষ হইয়া শিবনাথও তাঁহার সমসাময়িকদিগের মত নূতন নূতন ছন্দ, পদসমষ্টি ও পদচ্ছেদ বাংলা কবিতায় প্রয়োগ করিয়াছেন। পয়ার, অমিত্রাক্ষর, ত্রিপদী, প্রভৃতি ছন্দ ও ষট্‌পদী, অষ্টপদী, দশপদী প্রভৃতি বহুবিধ পদগুচ্ছ ব্যবহার করিয়া বাংলা কবিতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যের উদাত্ত গম্ভীর সুর তাঁহার কবিতায় যেমন আমরা পাই, তেমনি পাই হেমচন্দ্রের বিখ্যাত ছন্দ :

কোটি বিশ্ব, কোটি চন্দ্র তারা,
কোটি পৃথ্বী, কোটি জীব, স্তব্ধ যার ভয়ে,
সেই তুমি! আমি কীট কি আর বর্ণিব!

অথবা

ক্ষত্রিয়ের তরবার সহ্য করে সাধ্য কার!
ভূতলে লুটাবে আজ ভূধর শিখর।
গজ বাজী রথ রথী কে পাবে নিস্তার রে
কে পাবে নিস্তার?

ইংরাজী কবিতার সঙ্গে নূতন পরিচিত এই যুগ বহুবিধ পাশ্চাত্য ছন্দ বাংলা কবিতায় আমদানী করিতে আরম্ভ করে। ফলতঃ এই যুগের বহু সুপরিচিত কবিতা ইংরেজী ছন্দ ও অলঙ্কারের অনুবৃত্তি মাত্র। কিন্তু এই যুগেই আবার নূতন নূতন ভাব আসিয়া জাতীয় জীবনকে প্রভূতভাবে আলোড়িত করিতে আরম্ভ করে, ফলে বাংলা সাহিত্যও নূতন ভাবধারা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এই যুগ সংস্কারের যুগ। এই সময়ে নূতন ধর্ম্মভাব ও স্বদেশপ্রীতি বঙ্গীয় সমাজকে আন্দোলিত করে ও বাংলা সাহিত্যকে তাহার নিভৃত কুঞ্জগৃহ হইতে লোকালয়ের কোলাহলের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে। মধুসূদনের কাব্যকে কতকটা সমাজনিরপেক্ষ আর্টের অভিব্যক্তি বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু হেমচন্দ্রের "বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে"কে বা নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ"কে শুধু সৌন্দর্য্যবিলাসী কবির কল্পনা বলিয়া মনে করা যায় না। যাহা হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের পক্ষে সত্য তাহা শিবনাথের পক্ষে অধিকতরভাবে সত্য, কেননা তিনি ছিলেন সেই নূতন প্রাণধারার একজন বিশিষ্ট বাহক, সেই আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, সেই সংগ্রামের বিশিষ্ট যোদ্ধা। যুদ্ধক্ষেত্রের অন্তস্থলে বসিয়া তিনি কাব্য রচনা করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার কবিতায় তাঁহার সংগ্রামময় প্রাণের গভীরতম বাণীটি মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বাল্যকাল হইতেই শিবনাথ একটা গভীর ভাবাবর্ত্তের মধ্যে বৰ্দ্ধিত হইয়াছেন যাহার ছবি পাই আমরা নয়নতারায়

ও যুগান্তরে, এমন কি মেজবৌ-এ। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে ও ব্রাহ্মধর্ম্মের আঘাতের ফলে প্রাচীন সনাতন সমাজের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভাঙিয়া পড়িতেছিল। যাহা চিরন্তন, সনাতন ও অনতিক্রমণীয় বলিয়া এতকাল সমাদৃত হইয়া আসিতেছিল তাহা হঠাৎ চারিধার হইতে আক্রান্ত হইয়া ব্যাকুল আত্ম-সমর্থনে ব্যাপৃত হইল। যাহা এতকাল শৈলভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাকে একদিন বন্যার জলে ভাসিতে দেখা গেল ও প্রসারিতবাহু হইয়া আবার সৈকত-ভূমির নিশ্চিন্ত আশ্রয় সন্ধান করিতে উদ্যত হইল।

বাঙালী হিন্দুসমাজের এই জীবনসন্ধিক্ষণে, এই ভাসিয়া যাওয়ার যুগে, যাঁহারা জীবনের স্থিরভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে শিবনাথ একজন প্রধান। আদর্শ-দ্বন্দ্ব তাঁহাদের নিকট কি আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার প্রকৃত রূপ বুঝিতে হইলে আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে তাঁহার 'যুগান্তরে'। নিজ নিজ আত্মার মুক্তির সংগ্রাম তাঁহাদের প্রাণবায়ুর কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেন যে তাঁহার জীবনে এমন বহুদিন গিয়াছে যখন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ বন্ধুগণের সহিত গোলদীঘির আলোক-স্তম্ভ ধরিয়া আলোচনা করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে। এই সত্য-সন্ধানের যুগে, এই ধ্বসিয়া-পড়া ভিতের উপর নূতন সৃষ্টির যুগে যাঁহারা নিজ নিজ জীবনে অন্তরের আহ্বান লাভ করিয়াছিলেন শিবনাথ তাঁহাদের অন্যতম। একদিকে ফরাসী মৈত্রীবাদ ও অপরদিকে অন্ধ প্রাচীনাসক্তির মধ্যে নূতন সৃজনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ শিব-নাথ তাঁহার জীবনের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহা বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলেন :—

যার আছে ভাষা, দিক সে রসনা ;
কবি যদি থাকে দিক সে কল্পনা ;
শিবরাত্রি মত থাক অবিরত
জ্বালায় সলিতা বসে যত জনা।
হবে না কথাতে কেবল লেখাতে
করিতে হইবে কঠোর সাধনা।

তিনি দরিদ্রের সন্তান। তাঁহার পিতামাতা আত্মীয়স্বজন আশা করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী সন্তান তিনি, উপার্জ্জন করিয়া সকলের দুঃখ ঘুচাইবেন। কিন্তু কি হইল ? যে-দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছিলেন "রুধির-শোষিণী পৈতৃক দেবতা"কেই তিনি আলিঙ্গন করিয়া লইলেন। কেননা তাহার মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠতর সুখের সন্ধান পাইয়াছিলেন :

আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই
পরে সুখী করে সুখী হতে চাই ;
নিজেত কাঁদিব কিন্তু মুছাইব,
অপরের আঁখি এই ভিক্ষা চাই।
সত্য,—ধন মান চাহে না এ প্রাণ,
যদি কাজে আসে তবে বেঁচে যাই ;
খাটিতে বাঁচিব খাটিয়া মরিব
এই বড় আশা, পূর্ণ কর তাই।

এই আকাঙ্ক্ষা তাঁহার জীবনকে এমনভাবে পূর্ণ করিয়াছিল যে নির্জ্জন উদ্যানে পাখীর স্বর-সুধা শুনিতে শুনিতে প্রকৃতির শোভা তাঁহার চিত্তকে আবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না। স্বদেশের জাগরণ, স্বাধীনতার সংগ্রাম ও আত্মিক দ্বন্দ্বের সমাধানের প্রশ্ন তাঁহার প্রাণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল :—

নির্জ্জন কাননে আপনার মনে
কি হবে ডাকিলে ? কি হবে শুনিলে
একা এই স্বর ? ইচ্ছা দেশবাসী
শুনুক সকলে ; ইচ্ছা দলে দলে
উঠুক সকলে নয়ন বিকাশি।

দেশপ্রেম হইতেই শিবনাথের ত্যাগৈষণার জন্ম। দেশকে তুলিয়া ধরিতে এমন কিছু ছিল না যাহা তিনি করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইহার জন্য অদেয় কোন বস্তু ছিল না, অগ্রহণীয় কোন পণ ছিল না। তাহার উপন্যাস ও কাব্যে তাঁহার জীবনের একটু প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত :

জীবন-আকাশ, বিপদ-দুর্দ্দিনে
ঘেরিয়া আমার হোক অন্ধকার ;
সব কষ্ট সয়ে রব স্থির হয়ে,
কে পায় পৌরুষ দুঃখ কষ্ট বিনে ?

তাঁহার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া যখন সকলে ধিক্কার দিতেছিল, তখন কোন সান্ত্বনা তাঁহার বল যোগাইতেছিল ?

রক্ত-বিন্দু হতে শুনি এ জগতে
শত রক্ত-বীজ জন্মে যে প্রকার !
জীবন সংগ্রামে ভারতের নামে
যত রক্ত-বিন্দু পড়িল এবার
শত পুত্র হবে বীর অবতার !
ভারত আঁধার ভারতের ভার,
ঘুচাইবে তারা, ভেবে মরে যাই। —

তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি এই ছিল যে বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও শুদ্ধ চরিত্র ব্যতীত এদেশের স্বাধীনতা কখনও আসিবে না :

ইন্দ্রিয়ের দাস, সেবা বার মাস,
দেশের উদ্ধার তার কর্ম্ম নয়।

তাঁহার 'উৎসর্গ' নামক কবিতা, যাহাতে এই সকল উচ্চশ্রেণীর ভাব সন্নিবদ্ধ আছে সেগুলিকে রবীন্দ্রনাথের "এবার ফিরাও মোরে"র সমধর্ম্মী বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মত শিব-নাথও এই কবিতার মধ্য দিয়া দেশের কাজে তাঁহার সকল শক্তি সমর্পণ করিতেছেন। আর্টের রূপলোক হইতে অবতরণ করিয়া দেশের সেবাতে তাঁহার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেছেন। কেননা তিনি দেখিয়াছিলেন :—

কোটি কোটি লোক অজ্ঞান-আঁধারে
চির মগ্ন, যেন আছে কারাগারে ;
দারিদ্র্য ভাবনা, অসহ্য যাতনা
শোণিত শুষিছে তাদের সংসারে,
নির্ব্বাক হইয়া কাঁদে পরস্পরে।

[বহু দূর নয়]

শুধু বাংলাদেশ লইয়া তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা ছিল না। অখণ্ড ভারতের পরিপূর্ণ মুক্তি তাঁহার হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলিল। তাই তিনি ডাকিলেন বোম্বাই, মাদ্রাজকে। ডাকিলেন মহারাষ্ট্র, রাজপুত, শিখকে যাহাতে সকলে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভুলিয়া একপ্রাণ হইয়া, ভাই ভাই হইয়া দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে উন্মুখ হইতে পারে :

আয় রাজপুত আয় প্রিয় শিক্,
জাতি-ধর্ম্ম-ভেদ সকলি অলীক,
ভারত রুধির সবার শরীরে
ভাই বলে দিতে তবে শঙ্কা কিরে।

["বহু দূর নয়

এই মুক্তির বিপুল আহবে তিনি মুসলমানকেও ভুলেন নাই

শেষে ডেকে বলি ওরে মুন ভাই
প্রাচীন শত্রুতা প্রয়োজন নাই ;
দেশের দুর্দ্দশা দেখ হলো ঢের
তোরা ত সন্তান প্রিয় ভারতের,
সে শত্রুতা ভুলে আয় প্রাণ খুলে,
পুতে রাখ কথা মস্লেম কাফের,
বল শুধু—"মোরা প্রিয় ভারতের"।

["বহু দূর নয়"]

সমাজক্ষেত্রে তথাকথিত সভ্যজীবন হইতে চাষার সরল সাধু জীবন তাঁহাকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল। "চাষার অহঙ্কার" ও "মহেশ" নামক কবিতাদ্বয়ে তিনি দারিদ্র্যের মধ্যে সাধুতার সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়াছেন। ইউরোপীয় শিক্ষা আমাদের যে নৈতিক অবনতি আনয়ন করিয়াছে তাহার স্বরূপ উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠে যখন আমরা সরল চাষার জীবনের মহত্ত্ব উপলব্ধি করি। বীর্য্য ছিল তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এইজন্ত যেখানে বীরত্বের কাহিনী পাইয়াছেন সেইখানেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। এইজন্ত রাণী দুর্গাবতীর বীরত্ব তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে :

হের হের রণ মাঝে নাচিছে, সুন্দরী রে
নাচিছে সুন্দরী।
করে অসি খরশাণ মুখে ডাক হান হান
পদতলে কাঁপে ধরা থর থর করি।
রণমদে মত্ত সতী পাগলিনী প্রায় রে
পাগলিনী প্রায়।

বীরত্বের ন্যায় পবিত্রতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা তাঁহার হৃদয়কে অতি সহজেই আকুল করিয়া তুলিত। তাই এক দিকে সীতার পবিত্রতা, অপর দিকে শ্রীচৈতন্যের প্রেমোচ্ছ্বাস তাঁহার কবিতার বিষয়বস্তু হইয়া পড়ে। তাঁহার অধিকাংশ কবিতা যদি বাংলা দেশ ভুলিয়া যায় তবু তাঁহার "চৈতন্যের সন্ন্যাস" কখনও বিস্মৃত হইবে না।

ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া তিনি কতকগুলি অতি উপাদেয় গাথা রচনা করিয়াছেন এই সকল গাথার মধ্যে "মোহিনী", "মহেশ" ও "বিধবার হরিণ" অতুলনীয়।

মোহিনী একটি কুৎসিত অন্ধ রমণী। শহরের একটি গাছ-তলায় বসিয়া সে গান ধরিয়াছে। তাহাকে এমনি দেখিলে ঘৃণা হয়। কিন্তু তাহার গান যেই কানে আসে অমনি লোকে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া যায়। একটি ভারবাহী ঝাঁকাপৃষ্ঠে সেই দিক দিয়া যাইতেছিল। কিন্তু যেই তার গান শুনিল অমনি

ঝাঁকা পৃষ্ঠে এক দৃষ্টে আনন্দে মগন,
সর্ব্বেন্দ্রিয় সে রসে ডুবিল।
তার শ্রম, তার কষ্ট, তার অনাহার,
কোথা আজ! আজ রাজপথে
দেহ তার, প্রাণ কিন্তু গগনে বিহার
করে যেন কল্পনার রথে।

এইরূপে সেখানে আসিল একজন বৃদ্ধ সূত্রধর, "ছিন্নতনু কৃষ্ণবর্ণ-কায়" কর্ম্মকার, তারপর তিনজন কেরাণী, একজন বার-বিলাসিনী "হেলে দুলে উড়ায়ে অঞ্চল।" কিন্তু "চারিনেত্রে শুধু বহে জল।" এইরূপে যেই আসে সেই মগ্ন হইয়া যায় :

কাণা, খোঁড়া, ধনী, ভৃত্য, বার-বিলাসিনী
আজ অশ্রু বহে শত মুখে।
সে সঙ্গীত, যোগীবর ব্রহ্মাস্বাদ সম,
ভাবে ভাবে উঠায় লহরী ;
গভীর অস্ফুট সুখ দেয় নিরুপম,
ভোবে জীব আপনা পাসরি।

তাঁহার "বিধবার হরিণ" একটি করুণ মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী। হতভাগিনী বিধবা একমাত্র প্রিয় পুত্র হারাইয়া একটি হরিণ শিশুর মধ্যে তাহাকে ফিরিয়া পাইয়াছিল।

পীযূষ-পূরিত স্তন দিল তার মুখে,
মৃগশিশু মহানন্দে খায় ;
কোলে করি যেন নারী পাসরিল দুখে,
দু'কপোলে চুম্বিল তাহায়।

বিধবা মাতা কড়ি গাঁথিয়া তাহার গলায় ঝুলাইল, কচি তৃণ কাটিয়া তাহাকে রোজ খাওয়ায়, তাহাকে বাবা বলিয়া ডাকে। মৃগশিশু পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজে তাহার পায়ের নূপুর। এইভাবে তাহার যৌবন উদগত হয়, আর তার সৌন্দর্য্য দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়।

কিবা চক্ষু! কিবা গতি! সব মনোহর,
শৃঙ্গরেখা মস্তক উপর।

বাহিরে গেলে বালকেরা তাড়া করিয়া ধরিতে আসে আর সে তিন লাফে খানাখন্দ ঝাঁপাইয়া তাহার মাতার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। এইরূপে নিরন্তর সুখে দিন কাটিয়া যায়। একদিন সন্ধ্যা হইয়া গেল অথচ সেই মৃগ আর ফিরে না। ভীত মাতা পথে পথে কাঁদিয়া বেড়ায়। কেহ খবর দিতে পারে না। অবশেষে সন্ধ্যার অন্ধকারে এক হিংস্র জন্তু দ্বারা তাড়িত ও আহত হইয়া হুড়-মুড় করিয়া সে বাড়ীর মধ্যে আসিয়া পড়ে। বিধবার দেহে প্রাণ আসিল বটে, কিন্তু সে দেখে মৃগের সর্ব্বাঙ্গ রুধিরাপ্লুত ও দংষ্ট্রাহত। সে আবার তাহার মুখে কচি ঘাস ধরে, দুধ আনিয়া মুখে ঢালিয়া দেয়। কিন্তু কিছুতেই মৃগের প্রাণ রক্ষা পায় না। তখন সে নারীর দশা যে কি হইল তাহা বর্ণনা করা কঠিন।

> কচি ঘাস কচি পাতা, লইয়া যতনে,
> পথে পথে ডাকিয়া বেড়ায়।
> ধুলা মাটি ফেলে মারে যত শিশুগণে,
> "ক্ষেপী ক্ষেপী" বলিয়া ক্ষেপায়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের "হিমাদ্রি-কুসুম"ও একটি পদ্যে বিরচিত কণিকা। ১৮৮৬ সনে কার্সিয়াঙে বাসকালে এই কবিতা লিখিত হয়। কবি এখন নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার নায়কও এইরূপ নানাবিধ ত্যাগ, সংস্কার ও সৎকর্ম্মের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া জীবনের নষ্ট শান্তি ফিরিয়া পাইল। নায়কটি ধনীর সন্তান ও পত্নীপ্রেমে আত্মহারা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাহার পত্নী তাহার প্রেমের যথাযোগ্য সমাদর করিতে না পারিয়া একদিন তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার জীবনে আসিল ঘোর আত্মগ্লানি, লোকবিতৃষ্ণা ও নিরাশা। সংসারের প্রতি ঘৃণায় পূর্ণ হৃদয় লইয়া বাড়ীঘর ছাড়িয়া সে দেশভ্রমণে চলিল। সঙ্গে চলিল তাহার স্নেহময়ী ভগ্নী। তাহারা অবশেষে হিমালয়ে আসিয়া পৌঁছিল ও প্রকৃতির মনোরম দৃশ্যের মধ্যে প্রাণ জুড়াইল। একদিন ভগ্নী ডরথি যেমন জীবনের ঘোরতম দুর্দিনে ভ্রাতা ওয়ার্ডস্বার্থকে প্রকৃতির মধুর স্পর্শের মধ্য দিয়া সুস্থ করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেইরূপে এই নায়কের ভগ্নীও আবার তাহার ভ্রাতাকে নিরাময় করিয়া তুলিল। আবার তাহার আত্মার মুদিত চক্ষু উন্মীলিত হইল। মানুষকে আবার ভালবাসিবার ইচ্ছা জাগ্রত হইল এবং মানুষের কল্যাণকর্ম্মে ভ্রাতা ও ভগ্নী জীবন উৎসর্গ করিল।

তাঁহার শেষ কবিতাপুস্তক হইতেছে 'ছায়াময়ীর পরিণয়'-কাব্য। ইহা ১৮৮৯ সনে রচিত। ইহা সংকেতাত্মক কবিতা, পাঠকালে বানিয়ানের পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেসের কথা স্মরণ হয়। ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের বহু খণ্ড কবিতা আছে। যথা "আসক্তি, বিরক্তি ও ভক্তি", "ব্রহ্মবিদ্যা" প্রভৃতি। এইবার তিনি ধর্ম্মজীবনের পথে যত প্রকার পরীক্ষা, বাধা ও প্রলোভন আছে ও তাহা কি ভাবে জয় করা যায় তাহা বিন্যাস করিয়া এই কবিতা রচনা করিলেন। কবিতা হিসাবে ইহা তাঁহার কবিতাসকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল। কবিতার ছন্দ পঙ্গু, ভাষা গদ্যপ্রধান ও নিরলঙ্কার, ভাবও পুরাতন। মনের মধ্যে বিশেষ বিস্ময় বা পুলকের সঞ্চার হয় না। কবিতার বেশীর ভাগ পয়ার ছন্দে লেখা। ত্রিপদী ও হেমচন্দ্রীয় ছন্দও বিশেষ বিশেষ স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এইগুলিই একমাত্র হৃদয়কে আকর্ষণ করে। তবে স্বীকার করিতে হইবে যে ইহার অন্তর্নিহিত শিক্ষা চিরন্তন ও কবির নিজ জীবনের সাধনার সাক্ষী-স্বরূপ।

উপসংহারে এই কথা বলিতে হইবে যে, তাঁহার কবিতার অনেকগুলি বিশেষ আনন্দ ও অনুপ্রেরণা দেয় ও সেগুলি বাঁচিয়া থাকিবে। বিগত শতাব্দীর বাংলা কবিতার ইতিহাসে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বিশেষ উল্লেখ যদি না থাকে তবে সে ইতিহাস অঙ্গহীন হইবে।

"অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু"

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

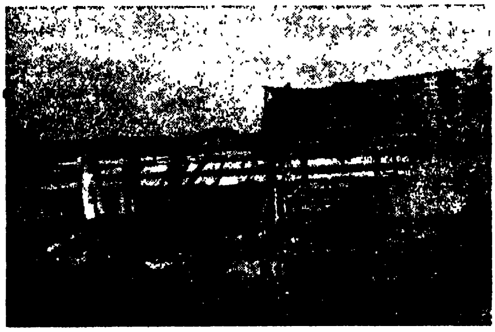
রাজবর্ত্ম রাঙিয়াছে তাজা রক্ত-স্রোতে,
দেশ-ব্রতী সন্তানের আত্ম-বলিদানে।
বজ্রাহত বেদনার্ত্ত বীর জনগণ
তবু চলেছিল ধেয়ে মুক্তির সন্ধানে।
তাই দুই শতাব্দীর তমিস্রা ভেদিয়া
ভাতিল নবীন ভানু পূর্ব্ব দিগঙ্গনে।
ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ে প্রতি ঘরে ঘরে,
সমাগত স্বাধীনতা শুভ-শঙ্খরবে।

সাধনা লভেছে সিদ্ধি লক্ষ শহীদের।
মূক জনগণ আজ পাইয়াছে ভাষা।
দুঃখ এক, মাতৃভূমি হলেন খণ্ডিতা,
পুরোপুরি মিটিল না স্বাধীনতা-আশা।
শুভ হোক, ধ্রুব হোক, এ যাত্রার পথ।
একতায় বীর্য্য-দৃপ্ত হউক ভারত।

অস্তরাং ও দুলাহাজরা

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ

কোথায় অস্তরাং আর কোথায় দুলাহাজরা, কিন্তু দুটি মনোরম স্থানের স্মৃতি মাঝে মাঝে এক সঙ্গেই জাগিয়া উঠে—কারণ পশ্চিম বাংলার সমুদ্রতটের পুনর্বিকশিত লবণশিল্পের কথা ভাবিতে গিয়া সমুদ্রোপকূলবর্তী এই দুটি স্থানের উন্নত লবণশিল্পের কথা মনে পড়ে। বোধ হয় অতি অল্প লোকের নিকট ইহাদের প্রকৃত পরিচয় জানা আছে। ভাগ্যক্রমে গত বৎসর আমার এই দুটি জায়গা পরিদর্শন করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল।



চট্টগ্রামের দুলহাজরায় ব্রহ্মদেশীয় পদ্ধতিতে লবণ প্রস্তুতি

অস্তরাং হিন্দুস্থানের অন্তর্গত, কিন্তু বঙ্গবিভাগের ফলে আজ দুলাহাজরা পাকিস্থানের মধ্যে পড়িয়াছে। সেইজন্য দুলাহাজরাকে এখন বিশেষ করিয়া মনে পড়ে। অস্তরাং পুরী জেলায় কোণারক মন্দিরের কিছু উত্তরে সমুদ্রতীরের নিকট একটি অজপাড়াগাঁ। ডাক পৌঁছিতে সপ্তাহের উপর লাগে। ইহা কাকটপুর থানার অন্তর্বর্তী একটি লবণ প্রস্তুতির কেন্দ্র। এখানে ভ্রমণের গল্প পরে বলিতেছি।

দুলাহাজরা চট্টগ্রাম জেলায়, কক্সবাজারের ১৬ মাইল উত্তরে। চট্টগ্রাম শহর হইতে বোধ করি ৭০ মাইল হইবে; একেবারে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমানা ঘেঁসিয়া ইহার অবস্থিতি। কক্সবাজার রোডের প্রায় পাশেই বলা চলে। দুলাহাজরা নিতান্ত অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীগ্রাম নয়। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইহা বেশ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানকার অধিবাসীদের অবস্থাও উন্নত। ইহার এক পাশে বনভূমিতে আরণ্য সম্পদের প্রাচুর্য, অপর পাশে মহিষখালির তীরে নিম্নভূমিতে পৌষ হইতে বর্ষার পূর্ব পর্যন্ত বিপুল পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হয়।

দুলাহাজরার প্রাকৃতিক দৃশ্যসৌন্দর্য্য আমাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বিশেষতঃ বনবিভাগের ডাকবাংলোটি এমন সুন্দর জায়গায় অবস্থিত যে ইচ্ছা করে দিন কতকের জন্য সেখানে আবার গিয়া গ্রামবাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করিয়া আসি। তখন বাংলার ভাগ্যাকাশ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের মেঘে সমাচ্ছন্ন ছিল না। নিশ্চিন্ত মনে চট্টগ্রামের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে রাত্রি ৯টা ১০টা পর্যন্ত চাঁদের আলোয় গর্জন গাছের তলায় বসিয়া আড্ডা দিয়াছি, গল্প-গুজবে মাতিয়া উঠিয়াছি এবং লবণ-শিল্পের প্রসারের জন্য কত কথাই না কহিয়াছি! চট্টগ্রামের দুর্বোধ্য ভাষা আমাদের পারস্পরিক ভাববিনিময়ের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারে নাই।

এবার ভ্রমণ-কথা সুরু করা যাক—

সে সময়টি বোধ হয় ফাল্গুনের শেষ বা চৈত্রের প্রারম্ভ হইবে। চট্টগ্রাম পৌঁছিয়া সকাল সাড়ে নয়টার পটিয়া লাইনের একটি ট্রেন ধরিলাম। এই লাইনের শেষ ষ্টেশন দোহাজারীতে পৌঁছিয়া বেলা বারটায় রাঙ্গুর একটি বাস ধরা গেল। পন্টুনের পথ নদী পার হইয়া আঁটাবাসখানি তরুশোভিত পাহাড়ের চড়াই উৎরাই ভাঙ্গিয়া কক্সবাজার রোডের উপর দিয়া দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিল। কি মনোরম দৃশ্য! রাস্তার এক দিকে সমতল-ভূমি, মাঝে মাঝে চষা ক্ষেত, আর অন্য দিকে বনাকীর্ণ গিরিমালা। বহুদূরে সু-উচ্চ পাহাড়ের ধূসর রেখাঙ্কিত শৃঙ্গরাজি পাণ্ডুনীল আকাশের গায়ে মিশিয়া রহিয়াছে যেন।

কাঠের সাঁকোয় মাতামুহুরী পার হইয়া চকরিয়ায়। পথে চুনটী, এটামগরা প্রভৃতি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামগুলি অতিক্রম করিয়া আসা গেল।



লবণ-জল জ্বাল দিবার একটি চুল্লী—

মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাত হইয়া গেছে—মেঘলা দিনের পড়ন্ত অপরাহ্ন বেলায় ঘনবনাচ্ছন্ন পার্বত্য পথের দৃশ্য মনোরম লাগিল। কক্সবাজারে পৌঁছিলাম সন্ধ্যায়—বন্ধুবর শ্রীবিষ্ণু রিলিফ অফিসার, সবে চা খাবার আয়োজন করিতেছিল।

কক্সবাজার রোডের ভ্রমণ, চট্টগ্রাম কক্সবাজার ষ্টীমার ভ্রমণ অপেক্ষা কিছু কম ভাল লাগে নাই। ভাত মাংস কফি না পাওয়া গেলেও চা কলা বিস্কুট প্রায়ই মিলিটারি রোডের পার্শ্বে

দোকানে পাওয়া যায়। অবশ্য তফাৎ বেশ—এক ভ্রমণ জলপথে, অন্যটি স্থলপথে—এখানে পাহাড় ওখানে সমুদ্র। কক্সবাজার কিন্তু আমার পুরী গোপালপুরের মত ভাল লাগে নাই, সমুদ্র বড়ই অগভীর—যদিও পটভূমিকায় গিরিমালার দৃশ্য মনোরম। তটভূমিতে বালিয়াড়ি সমতল করিয়া, রানওয়ে তৈরী করাতে সমস্ত সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সহরের মধ্যেকার পথগুলি অবশ্য বাড়ি ও কৃষ্ণচূড়ার আচ্ছাদনীতে ভারি সুন্দর। রঙীন লুঙ্গী ও পোষাক পরা ইতস্ততঃ বিচরণশীল মগেরা দৃষ্টিকে বিশেষভাবেই আকর্ষণ করিতেছিল।



লবণ-গোলা অন্তরাং

দুলাহাজরায় কয়েক বাংলোতে আমার অবস্থান করার উদ্দেশ্য ছিল—কি ভাবে ওখানকার লবণশিল্প সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা পর্যবেক্ষণ করা। মাতারবাড়ি চ্যানেলের জল বেশ লোণা—সেই জল জোয়ারের সময় নিম্নভূমিতে বহু খাড়ি দিয়া প্রবেশ করে। গ্রামবাসীরা সেই জল চারিটা করিয়া আল-দেওয়া চাতরে (Condenser) রৌদ্র-তাপের সাহায্যে ঘনীভূত করিয়া জমা করে। নিকটেই চুলী বসাইয়া লোহার কটাহে এই ঘন ব্রাইন বা লোণা জল জ্বাল দিয়া পরিষ্কার দানা দানা লবণ প্রস্তুত করে। এই প্রণালীটা মাত্র ৪।৫ বৎসর ওই অঞ্চলে চালু হয় বর্মা ইভ্যাকুইদের কল্যাণে। নিকটস্থ জঙ্গল হইতে জ্বালানী কাঠ তাহারা বিনা ব্যয়েই পায় দেখিলাম। কি ব্যাপক ভাবে ইহারা লবণ প্রস্তুত করিতেছে তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। ইহাদের এক একটি বড় ইউনিটের উৎপাদনের সহিত বোধ করি পশ্চিম বাংলার কোন কারখানার তুলনা করিতে পারা যায় না।

অথচ ঐ অঞ্চলের বারিপাতের পরিমাণ পশ্চিম বাংলার সমুদ্রতীরস্থ স্থানসমূহের তুলনায় দ্বিগুণ এবং যে মাস পড়িতে না পড়িতে এমন বর্ষা আরম্ভ হইয়া যায় যে লবণ প্রস্তুত বন্ধ রাখিতে হয়। মাত্র ৪।৫ মাস কাজ করিয়া গ্রামবাসীরা প্রায় দুই লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত করে। ইহারা বড় বড় উচ্চ বাঁধ দিয়া বা বড় বড় জলাধার নির্মাণ করিয়া অর্থ ও শ্রম উভয়েরই অযথা অপব্যয় করে না। উহারা জানে বন্যার হাত হইতে রক্ষা পাইলেও বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিপাত হইতে লবণ বাঁচানো সম্ভব নয়। অতএব বর্ষণের সময় কাজ বন্ধ রাখাই সমীচীন। বর্ষান্তে সামান্য বাঁধ দিয়াই আবার যথারীতি তাহাদের কাজ চলিতে থাকে।

২

প্রবাসী বাঙালী শ্রদ্ধেয় শ্রীশরৎ চন্দ্র দত্তের সহায়তা ও আতিথ্য না পাইলে বোধ করি অন্তরাং যাওয়া ঘটিত না। এক দিন সকালে তিনি তাঁহার নিজের মোটরে আমাদের পুরী হইতে নিমাপাড়া ডাকবাংলোয় লইয়া গেলেন। এই নিমাপাড়া হইতে একটা পথ কোণারকের দিকে চলিয়া গিয়াছে, আর একটি পথ কাকটপুর হইয়া অন্তরাং গিয়াছে।



নৌপদায় লবণ জল ঘনীভূত করিবার আধার

নিমাপাড়ার রাস্তাটি পুরী রোড হইতে পিপলীর* নিকট শাখারূপে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। পুরী-ভুবনেশ্বর বাস সার্ভিসে পিপলীতে নামিয়া নিমাপাড়া যাওয়া যায়। পূর্বে একবার এই পথে কোণারক যাইবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। নিমাপাড়ায় এক দিন থাকিয়া পরদিন প্রত্যুষে অন্তরাং যাই। রায়সাহেব ইন্‌স্পেক্‌সনে বাহির হইয়াছেন। আবগারী বিভাগের সকল কর্মচারী খুব ব্যস্ত। অন্তরাং পৌঁছাইতে বেশ বেলা হইয়া গেল। পথ এতই দুর্গম যে মোটরের গতি বাড়ান অসম্ভব। কাঁচা মেঠো পথ অর্জুনপুর, কাকটপুর হইয়া অন্তরাঙে দেবী নদীর মুখ পর্যন্ত আসিয়াছে।

অন্তরাং অনুন্নত পল্লীগ্রাম হইলেও লবণ-শিল্পের ক্রমোন্নতিতে ইহার গুরুত্ব যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। উড়িষ্যার প্রথম লবণ প্রস্তুতির সমবায় প্রতিষ্ঠানটি এই স্থানে কি ভাবে সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া প্রণিধানযোগ্য। পুরীর এই সমস্ত সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে কেবলমাত্র রৌদ্র-সাহায্যে কিরূপে লবণ-প্রস্তুতির প্রসার ঘটিতেছে তাহাও দেখিবার জিনিষ বটে।

* পিপলী হইতে পুরী মাত্র ২৫ মাইল। পিপলী খ্রীষ্টান মিশনরীদের একটি কেন্দ্র।

এই অঞ্চলের সীমানা অতিক্রম করিবার পর হইতেই উত্তর দিকে দেখা যায়, বালেশ্বর, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা ইত্যাদি সর্বত্রই জ্বাল দিয়া পাঙ্গা লবণ প্রস্তুত হয়। কোম্পানীর এজেন্সীর অধীনে এখানেও জ্বাল দিয়াই লবণ প্রস্তুত হইত, কিন্তু ১৯৩১ সনের গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর হইতে এখানে মাদ্রাজের প্রণালী চালু হইয়াছে।

রৌদ্র-সাহায্যে কি ভাবে ইহারা লবণ প্রস্তুত করিতেছে এবং এই প্রণালী কি উপায়ে বাংলায় চালু করা যায় তাহা অনুসন্ধান করিতেই আমার অস্তরাং আসা।



নৌপদার লবণ-প্রস্তুতি কেন্দ্র

জ্বালানীর অভাবে আমাদের বাংলাদেশের লবণ-শিল্প প্রায় নষ্ট হইতে বসিয়াছে, কিন্তু আমাদের লবণ উৎপাদনকারী গ্রামবাসীরা যদি এই বিষয়ে পুরী জেলার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, তাহা হইলে বোধ করি এই ধ্বংসোন্মুখ শিল্প আবার উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

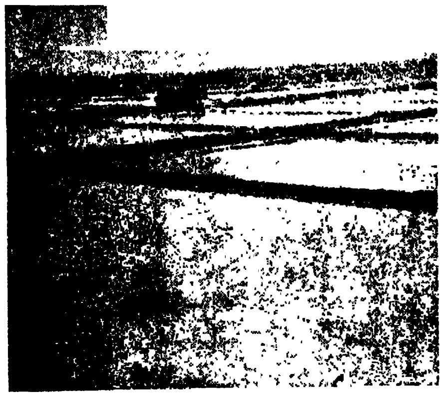
অস্তরাংএর প্রাকৃতিক পরিবেশ ছুলাহাজরার সম্পূর্ণ বিপরীত। বালুময়, অল্প ঢেউ-খেলানো পথ বরাবর দূরের পানে চলিয়া গিয়াছে। ছু'ধারে মাঝে মাঝে ধানের ক্ষেত, আশেপাশে পাহাড়ের লেশমাত্র নাই। সুদূর আকাশের পটে পূর্বঘাটের গিরিমালার রেখাগুলি অস্পষ্ট দৃশ্যমান হয় মাত্র। রাস্তা এত কাঁচা যে অল্প বর্ষণ হইলেই মোটরে পার হওয়া বিপজ্জনক। সেইজন্য নৈঋত কোণে ঘন মেঘের উদয় হওয়াতে অস্তরাং হইতে সেই দিনই আমাদের ফিরিতে হইল।

নিতান্ত পাড়াগাঁ হইলেও ওখানে ডাকবাংলো দাতব্য চিকিৎসালয় এবং একটা ডাকঘর আছে। তাহার উপর লবণ প্রস্তুতি ও বিক্রয়ের সমবায় প্রতিষ্ঠানটির জন্য সরকারী কর্মচারী ও আবগারী ইন্‌স্পেক্টর কয়েকজন এখানে বাস করেন। পুরী হইতে সমুদ্রের ধার দিয়া গোপ এবং কোণারকে আসা যায়, আর একটু উত্তরে আসিলেই অস্তরাং। গোপের নিকট কুশভদ্রা নদী পার হইতে হয়।

প্রাচী নদীর কোলে কাকটপুর। আমরা কিছুক্ষণের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। এখানে ঠাকুরাণী মন্দির উল্লেখযোগ্য—চৈত্র সংক্রান্তিতে বহু তীর্থযাত্রী সমবেত হয়।

অস্তরাং পৌঁছিতে অল্প বেলা হইল। সূর্যের তেজ রীতিমত প্রখর। ডাকবাংলোয় আসিয়া চা পান করিয়া ডাক্তার বাবু ও সমবায় প্রতিষ্ঠানের রেজিষ্ট্রার প্রভৃতি কয়েকজন সহ 'সল্ট গার্ডেন' দেখিতে গেলাম। অস্তরাংএর লবণ-ক্ষেত্র দেখিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল আমাদের বাংলাদেশ এ বিষয়ে কতই না পিছনে পড়িয়া আছে। বাংলার লবণের কারখানা-সমূহের কর্তৃপক্ষের উদ্যমহীনতা আমার মনে হতাশার সঞ্চার করে। এই অস্তরাং প্রতি বর্ষায় ভাসিয়া যায়, কিন্তু মাঘ ফাল্গুন হইতে আষাঢ়ের বর্ষণ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা তারই বুকে লক্ষাধিক মণ লবণ প্রস্তুত করে।

এ বৎসর খবর পাইয়াছি, সমবায় প্রতিষ্ঠানটি ১২০ একর জমিতে তিন মাস মাত্র কাজ করিয়া প্রায় ৫০ হাজার মণ লবণ প্রস্তুত করিয়াছে। আসা-যাওয়ার সুব্যবস্থা না থাকায় এবং লবণ প্রেরণের অসুবিধার জন্যই ইহারা গত কয়েক বৎসর যাবৎ সে রকম প্রচুর পরিমাণ লবণ প্রস্তুত করিতে পারে নাই। সমবায় প্রতিষ্ঠানটি ছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও কাহারও কাহারও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবণক্ষেত্র আছে। ইহারা নিকটস্থ বাজারে বা দূর ব্যবসায়-কেন্দ্রেও লবণ বিক্রয় করিয়া আসে।



নৌপদার আর একটি দৃশ্য

ইহা যখন সম্ভব হইয়াছে তখন আশা করা যায় উড়িষ্যার গঞ্জাম, ইচ্ছাপুরম হইতে অস্তরাং এবং অস্তরাং হইতে বালেশ্বর-তালপাদা পর্যন্ত রৌদ্রতাপে লবণ প্রস্তুতি এক দিন না এক দিন বিস্তার লাভ করিবে। এই সমস্ত অঞ্চলের তুলনায় কাঁথির বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব বেশী নহে। কাঁথির সমুদ্রোপকূলে এই প্রণালী প্রত্যেক লবণ উৎপাদন কেন্দ্রে চালু হওয়া চাই। জ্বালানী পুড়াইয়া এত খরচ করিয়া লবণ প্রস্তুতি আর্থিক দিক দিয়া আশানুরূপ লাভজনক নহে। অস্তরাঙে মাদ্রাজের মত আর একটি জিনিষের রেওয়াজ হইয়াছে। এখানেও উন্মুক্ত স্থানে লবণের পাহাড় করিয়া প্রত্যেকটি স্তূপকে খড় চাটাই বা তালপাতার আবরণী দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। এখানকার লবণ উৎপাদনকারীরা গোলার জন্য বিশেষ গুদামের ব্যবস্থা করিয়া ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করে না।

সান ইয়াৎ-সেনের সাধনা

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর রাষ্ট্রপতি উইলসনের ঘোষণা এবং বিশ্ব-শান্তির জন্য জাতি-সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা নিপীড়িত জাতিপুঞ্জের মনে আশা এবং আনন্দের দীপশিখা প্রজ্বলিত করিয়াছিল। ইহার পর যখন আন্তর্জাতিক শান্তিবৈঠকে যুদ্ধকালে জাপান চীনের যে অংশ গ্রাস করিয়াছিল, তাহার উপর জাপানের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইল এবং জাতি-সাম্য সম্বন্ধে জাতি-সঙ্ঘ তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিল তখনও এই আশাদীপ নির্ব্বাপিত হয় নাই।

আধুনিক চীনের জনক সান ইয়াৎ-সেন এবং অন্যান্য অনেকেই প্রথমে বিশ্বাস করিতেন যে, প্রতিক্রিয়াপন্থীদিগের এই জয় স্থায়ী হইতে পারে না। সান বিশ্বাস করিতেন যে বৈদেশিকগণ চীনের উপর ভবিষ্যতে আর জুলুমবাজি না করিয়া তাহাকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করিবেন। 'দি ইণ্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেণ্ট অব চায়না' নামক গ্রন্থে তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রম-শিল্পে উন্নত দেশসমূহের পক্ষে চীনে গণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও তাহার শিল্পোন্নতির সহায়তা করা একান্ত কর্ত্তব্য—ফলে সংশ্লিষ্ট সকলেরই উপকার হইবে। কিন্তু ইংলণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডাঃ সানকে উন্মাদ কল্পনাবিলাসী বলিয়া উপেক্ষা করিল। চীন সম্বন্ধে ইহাদিগের নীতির কোন পরিবর্ত্তন ঘটিল না।

ইহারই ফলে সান ইয়াৎ-সেন সোভিয়েট রুশিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং চীন-সোভিয়েট মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল (১৯২৩)। সোভিয়েট রাষ্ট্র ঘোষণা করিয়াছিল যে, সে চীনকে সর্ব্বপ্রকারে নিজের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত। রুশিয়ার অন্তর্বিরোধ তখন সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। চীনের শিল্পোন্নতির মূলধন যোগাইবার বা চীনকে কোন প্রকার আর্থিক সহায়তা করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। তবে ক্যাণ্টন জাতীয় সরকারের জন্য রুশিয়া হইতে পরামর্শদাতা এবং কিছু অস্ত্রশস্ত্র প্রেরিত হইল। সোভিয়েট বিরোধী প্রতিক্রিয়াপন্থিগণ জোরগলায় প্রচার করিতে লাগিলেন যে ক্যাণ্টন সরকার বলশেভিকদিগের সহিত যোগদান করিয়াছেন।(১)

ডাঃ সান এবং ক্যাণ্টনে প্রেরিত সোভিয়েট প্রতিনিধি মিঃ জোফের একটি বিবৃতি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে এই অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে ডাঃ সান মনে করেন চীনে সাম্যবাদ অথবা সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠা করা কোনক্রমেই সম্ভব নহে; কারণ চীনের অবস্থা সাম্যবাদ বা সোভিয়েটতন্ত্র স্থাপনের অনুকূল নহে। মিঃ জোফও তাহাই মনে করেন। তাঁহার (মিঃ জোফের) মতে জাতীয় ঐক্য স্থাপন এবং পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা চীনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা। এই দ্বিবিধ সমস্যার সমাধানকল্পে তিনি চীনকে সোভিয়েট সরকারের পক্ষ হইতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।(২)

ডাঃ সানের আন্তরিকতায় সন্দেহ করিবার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রুশিয়া কি কারণে চীনকে সহায়তা করিতে সম্মত হইয়াছিল তাহাও সহজেই বুঝা যায়। রুশিয়া চীনের একান্ত নিকট-প্রতিবেশী। সুতরাং চীন যদি পূর্ব্বের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের শোষণের ক্ষেত্রই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে সাম্যবাদী রুশিয়ার বিপদ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্যই রুশিয়া মনে প্রাণে কামনা করিতেছিল যে চীন ঐক্যবদ্ধ এবং বৈদেশিক প্রভাব-মুক্ত হইয়া একটি শক্তিশালী, প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হোক। এই অবস্থায় উন্নীত চীন কোন দিনই স্বেচ্ছায় রুশিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ ডাঃ সান প্রতিষ্ঠিত ক্যাণ্টন সরকারকে প্রগতিশীল মনে করিতেন বলিয়াই ইহাকে সহায়তা করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।

এই সময়কার ক্যাণ্টন সরকারকে কোনক্রমেই সাম্যবাদী মনে করা চলে না। বরোডিনের মতে কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে অন্যান্য দেশে রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য যে সংগ্রামের অবসান ঘটিয়াছে, ক্যাণ্টন সরকারের অধীনস্থ অঞ্চলসমূহে সেই সংগ্রাম তখন সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে।(৩)

(১) "Shanghai journalists like Rodney Gilbert . . . . . manufactured tales in which both Sun and his military lieutenant, Chiang-Ki-Shek, were assailed daily as blood-stained anarchists, who had gone over to the enemies of mankind. Actually, nobody had gone over to anybody."—**The Unfinished Revolution in China by I. Epstein, p. 41.**

(২) "Dr. Sun Yat-Sen holds that the communistic order or even the Soviet system cannot actually be introduced into China, because there do not exist here the conditions for the successful establishment of communism or socialism. This view is entirely shared by Mr. Joffe, who is further of the opinion that China's paramount and most pressing problem is to achieve national unification and attain full national independence, and regarding this task he has assured Dr. Sun that China . . . . can count on the support of Russia."

(৩) "Canton is not communistic; there is a hard struggle for political, economic, and social progress such as other countries have gone through several hundred years ago."—**Borodin.**

ডাঃ সানের চরমপত্র পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে একমাত্র রুশিয়াই চীনকে সমকক্ষ রাষ্ট্রের মর্য্যাদা দান করিতে প্রস্তুত ছিল বলিয়াই তিনি রুশিয়ার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন। যে-কোন রাষ্ট্র চীনকে এই মর্য্যাদা দান করিত বা নিজে এই মর্য্যাদা লাভের জন্য সচেষ্ট হইত, তাহার সহিতই তিনি মৈত্রী স্থাপন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং তিনি চীনের সাম্যবাদী এবং অন্যান্য দেশে প্রতিক্রিয়াবিরোধীদিগের সহযোগিতা কামনা করিতেন।

রুশিয়ার দৃষ্টান্ত হইতে সান এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন যে মুক্তির জন্য জনসাধারণকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে। চীন-সোভিয়েট মৈত্রী স্থাপনের পর তিনি কুওমিণ্টাং দলকে আবার ঢালিয়া সাজিলেন। প্রতিক্রিয়াবিরোধী যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে দলের সদস্য হওয়ার পথে আর কোন বাধা রহিল না। সাম্যবাদীগণ ইতঃপূর্ব্বেই শ্রমজীবীদিগের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বরোডিনের পরামর্শে সান ইহাদিগকে কুওমিণ্টাং দলের সদস্য হইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। কুওমিণ্টাং এবং কম্যুনিষ্ট এই উভয় দলের গ্রহণযোগ্য একটি কর্ম্মসূচী গৃহীত হইল। কৃষকদিগের মধ্যে রাজনৈতিক প্রচার কার্য্য আরম্ভ করা হইল।

কেহ কেহ বলেন যে ডাঃ সান মৃত্যুর পূর্ব্বে সাম্যবাদ নীতি এবং আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে তিনি কোন দিনই সাম্যবাদী ছিলেন না। তবে এ কথা সত্য যে তিনি সামন্ত-তন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধন করিয়া এক নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টি করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। সাম্যবাদীগণও ভাল করিয়াই জানিতেন যে প্রতিক্রিয়ার দুইটি প্রধান বাহন সামন্ত-তন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস সাধন ব্যতীত তাঁহাদের স্বপ্ন কোন দিনই সফল হইবে না। ডাঃ সান বুঝিয়াছিলেন, কুওমিণ্টাং ও কম্যুনিষ্ট দলকে বহুদিন একযোগে কাজ করিতে হইবে, আর আদর্শের দিক হইতেও তাহাদিগের বিরোধ শীঘ্র প্রবল আকার ধারণ করিবে না।

১৯২৫ সালে যখন সান ইয়াং-সেন মৃত্যুমুখে পতিত হন, সেই সময় চীন বিপ্লবের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেলেও তখন পর্য্যন্ত বৈপ্লবিক আদর্শ জয়যুক্ত হয় নাই। তিনি নিজেও ইহা ভাল করিয়াই জানিতেন। তাঁহার অন্তিম পত্রে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—৪০ বৎসর কাল আমি গণ-বিপ্লব আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছি। চীনের স্বাধীনতা অর্জ্জন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত তাহার সমকক্ষতা স্থাপন আমার উদ্দেশ্য। ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে, লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে আমাদিগকে মহাচীনের গণ-চেতনা জাগ্রত করিয়া, যে সমস্ত জাতি আমাদিগকে নিজেদের সমকক্ষ মনে করে তাহাদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপনপূর্ব্বক তাহাদের সমর্থন এবং সহযোগিতায় সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হইবে।

আজও বিপ্লবের অবসান ঘটে নাই। আমার সহকর্মীবৃন্দ যেন আমার জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য করেন। তাঁহারা যেন আমাদের দলের প্রথম জাতীয় অধিবেশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত ঘোষণা অনুসারে কার্য্য করিয়া এই ঘোষণা এবং জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে সচেষ্ট হয়েন। চীনের জনসাধারণের জাতীয় সম্মেলন আহ্বান এবং অসম সন্ধিবন্ধনসমূহ ছিন্ন করা সম্বন্ধে আমার সাম্প্রতিক ঘোষণাবলী অবিলম্বে যেন কার্য্যে পরিণত করা হয়।(৪)

ডাঃ সানের জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনায় সরকারকে জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য দায়ী করা হইয়াছে। জনসাধারণ যাহাতে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং যাহাতে আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হইতে না পারে সেইজন্য তিনি প্রত্যেক জেলায় নির্ব্বাচনমূলক শাসন-ব্যবস্থা এবং জেলা কর্ত্তৃপক্ষের হাতে স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সর্ব্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করিবার কথা বলিতেন। ডাঃ সান জাতীয় মূলধন নিয়ন্ত্রিত করিবার স্বপ্নও দেখিতেন এবং রেলপথ, সংবাদ আদানপ্রদান-ব্যবস্থা এবং প্রধান প্রধান শ্রমশিল্পগুলির উপর রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্ব স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার 'সান্-মিন্চুই' বা জনগণের তিনটি নীতির উদ্দেশ্য : চীনের জাতীয়তা-বোধের বিকাশ, গণতন্ত্র স্থাপন এবং জনসাধারণের জীবন-যাত্রার সৌকর্য্যসাধন। এই শেষোক্ত কথাটিকে তিনি কখনও কখনও সমাজতন্ত্রবাদ বা 'সোশ্যালিজমের' পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতেন। তিনি আরও বলিতেন যে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে উৎসাহ দান করিয়া 'সান্-মিন্চুইয়ের আদর্শকে বাস্তব রূপদান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

চীনের অধিবাসী বিভিন্ন জাতিকে একতাবদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন ডাঃ সান পরিকল্পিত জাতীয়তার আদর্শ। জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত চীনের অধিবাসিগণ চিরাচরিত প্রথা

(৪) "For forty years I have devoted myself to the cause of the people's revolution with but one end in view: the elevation of China to a position of freedom and equality among the nations. My experiences during these forty years have convinced me that to attain this we must bring about an awakening for our own people and ally ourselves in a common struggle with those peoples of the world who treat us as equals.

The Revolution is not yet finished. Let all our comrades follow my plan for National Reconstruction and the Manifesto issued by the First National Convention of our party, and make every effort to carry them out. Above all, my recent declarations in favour of holding a National Convention of the people of China and abolishing the unequal treaties should be carried into effect as soon as possible."—The Will of Dr. Sun Yat-Sen.

অনুযায়ী কেবলমাত্র স্ব-স্ব পরিবার এবং বংশের প্রতি অনুরক্ত না থাকিয়া সমগ্র জাতির প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হইবে। তিনি জানিতেন যে জাতীয়তাবোধের বিকাশ হইলে চীন বৈদেশিক রাষ্ট্রপুঞ্জের চাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

লোকায়ত্ত রাষ্ট্র এবং সরকারের প্রতিষ্ঠা ডাঃ সান পরিকল্পিত গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য। এই ধরণের রাষ্ট্র এবং সরকারই জন-কল্যাণে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ। জীবনযাত্রার সৌকর্য্যসাধন বলিতে তিনি বুঝিতেন শ্রমিকদিগকে অন্যায় উৎপীড়নের হাত হইতে রক্ষার ব্যবস্থা। তিনি বলিতেন যে ভূমি ব্যবস্থার আমূল সংস্কারসাধন পূর্ব্বক কৃষক এবং শ্রমিকদের আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া উভয়েরই রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, কৃষককে জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে ("The land must belong to the tillers")।

১৯২৪ সনে যে জাতীয় সম্মেলনের (The First National Convention) অধিবেশন হয় তাহাতে চীনের মুক্তির জন্য 'সান-মিন্‌চুই'য়ের আদর্শে কার্য্যসূচী স্থিরীকৃত হয়, এই অধিবেশনেই কুওমিণ্টাং এবং কম্যুনিষ্ট এই দুই দলের মধ্যে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত এবং সুগম হয়।

'সান মিন্‌চুই'য়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে ইহার আদর্শ সাম্যবাদবিরোধী নহে। বিনা প্রয়োজনে বৈদেশিকগণের বিরুদ্ধাচরণ করাও ইহার উদ্দেশ্য নহে। চীনে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির প্রবর্তন করিয়া তাহাকে অন্যান্য প্রগতিশীল এবং প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের সমকক্ষ করিয়া তোলা ইহার লক্ষ্য।

ডাঃ সান বলিতেন যে নূতন চীনরাষ্ট্র গঠন করিতে হইলে পর পর তিনটি ধাপ অতিক্রম করিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীকে দেশে একতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করিতে এবং বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে তৎপ্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার পর প্রচার এবং সংগঠনে অভিজ্ঞ কুওমিণ্টাং সদস্যদিগকে কুওমিণ্টাং সৈন্যদল কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চলসমূহে প্রেরণ করিয়া জনসাধারণকে স্বায়ত্ত শাসন পদ্ধতি শিখাইতে হইবে। এই শিক্ষাদানকার্য্য সমাপ্ত হইবার পর প্রত্যেক জেলা হইতে প্রতিনিধি আহ্বান করিয়া স্থানীয় প্রথানুযায়ী প্রাদেশিক আইন প্রণয়ন এবং গণভোটদ্বারা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নির্ব্বাচন করিতে হইবে। সমগ্র চীনের অর্দ্ধেকের অধিক প্রদেশে যখন এইরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে তখন গণ-পরিষদ আহ্বান করা যাইবে। এই পরিষদ সমগ্র চীনের জন্য একটি রাষ্ট্র-বিধি প্রণয়ন করিয়া দেশে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করিবেন।

সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পরিকল্পিত প্রণালীতে কাজ হয় নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কোন কাজই যে হয় নাই এমন কথাও বলা চলে না। এক দিক হইতে দেখিতে গেলে ডাঃ সান উল্লিখিত প্রথম সোপান অর্থাৎ যুদ্ধের যুগ এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। রণ-নায়কগণের সহিত কুওমিণ্টাং বাহিনীর সংগ্রাম শেষ হইতে না হইতেই কুওমিণ্টাং-কম্যুনিষ্ট সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া যায়। আবার এই দুই দলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হইল জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জীবন-মরণ সংগ্রাম। দীর্ঘ ৯ বৎসরব্যাপী অবিরাম যুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতির পূরণ হইতে না হইতেই আবার কম্যুনিষ্ট-কুওমিণ্টাং বিরোধের আগুন সর্ব্বধ্বংসী গৃহযুদ্ধের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই জন্যই স্বীকার করিতে হয় যে ডাঃ সান-কথিত সংগ্রামের অধ্যায় এখনও শেষ হয় নাই।

কিন্তু তাহা হইলেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের কাজ আরম্ভ হয় নাই এমন কথা বলা চলে না। কম্যুনিষ্ট কুওমিণ্টাং সংঘর্ষের প্রথম পর্ব্ব হইতেই এই দুই বিরোধী দল ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে চীনের অধিবাসীবৃন্দকে রাজনীতির দিক হইতে সচেতন এবং সক্রিয় করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। চীন-জাপান যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন কম্যুনিষ্ট এবং কুওমিণ্টাং দলের মধ্যে একটা আপোষ রফা হয় (ডিসেম্বর, ১৯৩৬), তখন শাসনযন্ত্রের উপর জনসাধারণের আংশিক কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। এই সময় গঠিত 'পিপল্‌স্ কাউন্সিলের' সহায়তায় জনসাধারণকে প্রকৃত প্রস্তাবে না হইলেও নামে শাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। সাম্প্রতিক চীন রাষ্ট্রবিধি পূর্ণমাত্রায় গণতান্ত্রিক না হইলেও ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী যে-কোন যুগে চীনে প্রচলিত শাসন-ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিকতর গণতান্ত্রিক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ডাঃ সানের চরমপত্রের একটি প্রধান কথা এই যে "The revolution is not yet finished" অর্থাৎ এখনও বিপ্লবের অবসান ঘটে নাই। ১৯২৫ সনের ন্যায় আজ ১৯৪৭ সনেও এই উক্তির সত্যতা অনস্বীকার্য্য। বিগত দ্বাবিংশতি বৎসরে এক দিকে যেমন কোন কোন ক্ষেত্রে চীনের অগ্রগতি হইয়াছে তেমনই আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অবনতিও ঘটিয়াছে। সমাগত যুদ্ধের ফলে চীন আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে অন্যান্য রাষ্ট্রের সমকক্ষতা লাভ করিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা এখনও সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত হয় নাই। সান ইয়াৎ সেনের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিকল্পনা চীনের কোন কোন অঞ্চলে রূপ পরিগ্রহ করিলেও অধিকাংশ স্থানে ইহা এখনও কল্পনাই রহিয়া গিয়াছে। তিনি যে ধরণের জাতীয় মহাসম্মেলন আহ্বান করিবার কথা বলিয়াছিলেন আজ পর্য্যন্ত সে প্রকার সম্মেলন আহূত হয় নাই। ১৯৪৬ সনের নবেম্বর মাসে চিয়াং কাই-শেক উল্লিখিত শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যে সমিতি আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা জাতির সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের দাবি করিতে পারে না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও সান ইয়াৎ-সেনের স্বপ্ন আজ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই।

মহিলা-সংবাদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৫ সনের এম-বি পরীক্ষায় শ্রীমতী মীনাক্ষী সেনগুপ্তা যাবতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম হওয়ার দরুন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত সমাবর্ত্তন উৎসবের সময় ইঁহাকে নিম্নলিখিত চারিটি সুবর্ণপদক প্রদান করা হইয়াছে: (১) রায় ডাঃ সরোজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর সুবর্ণপদক, (২) ধাত্রীবিদ্যা সম্পর্কিত সুবর্ণপদক, (৩) ডাঃ মহেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি স্বর্ণপদক ও (৪) রমাপদক। এতদ্ব্যতীত তিনি স্বাস্থ্যনীতি এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়েও 'সার্টিফিকেট অব অনার্স' লাভ করিয়াছেন। পরীক্ষায় শ্রীমতী মীণাক্ষী যেরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাসে তাহা বিরল। সম্প্রতি তিনি চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে সিনিয়র হাউস সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ডাঃ মীনাক্ষী সেনগুপ্তা এডভোকেট মিঃ বি. পি. সেনগুপ্তের দ্বিতীয়া কন্যা। ইঁহার মাতা শ্রীযুক্তা সুষমা সেনগুপ্তা এম-এ একজন বিদুষী মহিলা। তিনি লেক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল ও সেক্রেটারী।



ডাঃ মীনাক্ষী সেনগুপ্তা

রূপান্তর

শ্রীবিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুটি তারা,—ওরা মুখোমুখী আছে দাঁড়িয়ে
নীলিমার পথে ওরা যাবে কি গো হারিয়ে।
কালো দাগ কেটে উড়ে চলে পাখী,
উলটো দোয়াত, কালি মাখামাখি,
আকাশে কে বুঝি লেপে দিলে ভুষা
অদেখা হস্ত বাড়িয়ে।
দুটি হাতে ঢাকে জলভরা চোখ,
ওরা চোখোচোখী দাঁড়িয়ে।
গগনের নীল হারিয়ে যাবে কি এখুনি—
আকাশের মেয়ে, কার কাছে খেলে বকুনি।
দুটি তারা ডাকে অস্ত তারারে,
রঙের কলসী খালি কি ভাঁড়ারে—
ফলে ফুলে-ফুলে, শাখায় শাখায়,
কালী মাখামাখি পাখীর পাখায়,

বলেছে বুঝি সে নামহারা কোন
কালো পাথারের শকুনি—
রক্ত অধরে রং নিভে গেছে
কার কাছে খেলে বকুনি।
কালো ঘোড়া চ'ড়ে ছুটে ছুটে বুঝি আসে ঐ—
উলটো দোয়াত, দিকে দিকে কালী থৈ থৈ,
পোষাক পরেছে কালো পর্দার,
কালো ঘোড়া চ'ড়ে আসে সর্দার;
কোন্ তারা ওরা, হায় নামহারা
সাড়া প'ড়ে গেছে এ পাড়া ও পাড়া—
কালো ঘোড়া চ'ড়ে আসে সর্দার,
অম্বর ভরা, ধরা থৈ,
রূপের জলধি উথলিয়া ওঠে
ভুবনবিজয়ী আসে ঐ।

সেমসাইড গোল

শ্রীনীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমার যে একটা ভাল নাম আছে, সে আমি কেন, আমার মাতাপিতারও বোধ হয় মনে নেই। ফুটবলের মাঠে, চায়ের দোকানে, আত্মীয়বন্ধু সকলের কাছেই আমি ডাক নামে পরিচিত। ভাল নামটি আমার সেই কোন্ অতীতে একবার ইস্কুলের খাতায় প্রবেশ করেছিল, তার পর আর একবার কলেজের খাতায়-- ব্যস্, তার পর সেই সীমাবদ্ধ গণ্ডী থেকে বেরিয়ে বাইরের মুক্ত বায়ুতে এসে ছাত্রাবস্থায় আর কোন দিনই আমার সঙ্গে আমার নামের শুভ সংযোগ ঘটতে পারে নি। অবশ্য এখন আমি ভাল নামেই পরিচিত, খবরের কাগজ খুলুন, কোন ডাইরেক্টরী দেখুন, বাড়ীর দেয়ালে মার্বেল-পাথরে খচিত আমার পরিচয়পত্র দেখুন, সর্বত্রই আমি ডক্টর সুকোমল ডাট্, বার্মিংহামের পাস করা বিখ্যাত ডাক্তার।

অনেকের ভাল নামের সঙ্গে ডাকনামের একটা সম্বন্ধ থাকে, যেমন সন্তোষ ভাল নাম হলে ডাকনাম সাধারণত হয় সন্তু, গণপতি ভাল নাম হলে গনা বা গনু হতে পারে ডাকনাম। অনেকের আবার নাম নির্ভর করে জন্ম-মুহূর্তের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর। পূর্ণিমার রাতে চাঁদের হাসি প্লাবন এনেছে পৃথিবীর বুকে, এমন মুহূর্তে নবজাতকের ভাল নাম পূর্ণশশী এবং ডাকনাম সংক্ষেপে শশী হওয়া বিচিত্র নয়। আবার আষাঢ়ের আর্দ্র সন্ধ্যায় জন্মগ্রহণ করলে শিশুর বাদলা নামই সাধারণত হয়ে থাকে। আবার অনেকের নামকরণ হয় আকৃতির সৌসাদৃশ্যের ওপর, শ্যামবর্ণ নিয়ে জন্মায় যে শিশু তার নাম কালো হতে পারে, জন্মের সময় মাথায় চুল না থাকলে ডাক নাম ন্যাড়া হতেও শোনা যায়। আর এক শ্রেণীর নামকরণের বহর দেখে মনে হয় বাঙালী সমস্ত মাতাপিতাই কবি। এক একটি পুত্র যেন তাঁদের কবিতার এক একটি চরণ। প্রথম পুত্রের নাম বীরেন্দ্র হলে, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুত্রের নাম যথাক্রমে ধীরেন্দ্র, হীরেন্দ্র হতে পারে; কবিতার লহরী ডাকনামের পাহাড়েও বাধা পায় না, ছন্দ বজায় রেখে ডাকনামের কবিতা গেয়ে চলে বীরু, ধীরু, হীরু।

কিন্তু ওপরের কোন ফরমুলাতেই আমার নামের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না, না ভাল নামের, না ডাকনামের। ডাকনাম আমার ভালনামের খণ্ডিত অংশবিশেষ তো নয়ই, এমন কি স্বর্গ ও মর্ত্যেও এত পার্থক্য বোধ করি নেই। ভাল নাম আমার আগেই শুনেছেন, এখন ভাবতে পারেন আমার ডাকনামটা কি হতে পারে? কোনই কূলকিনারা পাবেন না ভেবে—ডাকনাম আমার বটু। বটু যদি সব সময় বটুই থাকত তাহলেও হ'ত, মাতাপিতার মনোভাবের তারতম্যের ওপর আবার বটুর প্রকারভেদ ঘটত। লক্ষী ছেলে হয়ে পড়াশুনা শেষ করে উঠলাম, মা আদর করে ডাকলেন, বটুমণি, দুধ খাবি আয়। দুধ খাওয়ার পর ছোট বোনটির গালে এক চড় কসিয়ে দেওয়ার জন্যে সে যদি ডুকরে কেঁদে ওঠে, মায়ের কণ্ঠে বটু তখন হয় বটা।

যাক, যে সময়ের কথা বলছি, তখন আমার ছাত্রাবস্থা। বটু নামেই পরিচিত। মেডিক্যাল কলেজে পড়ি, থাকি হোস্টেলে। ছেলে ভালই ছিলাম, সত্যি কথা বলতে কি ফুটবলের মাঠে, চায়ের দোকানে, কলেজের লেকচার হলে, সেকেণ্ড কখন হই নি। ভারতের ডাক্তারি-শাস্ত্রের সমুদ্র মন্থন করার পর, বিলাতের চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমুদ্রেও ডুব দেবার ইচ্ছাটা আমার প্রবল, বাড়ীর অবস্থাও ভাল; পিতা ইচ্ছা করলেই বিলাতে পাঠাতে পারেন, কিন্তু তাঁর ধারণা বিলাতের কলেজ শিক্ষার দিক থেকে কলকাতার কলেজ অপেক্ষা কোন অংশেই উন্নত নয়। প্রচুর অর্থ নষ্ট করে এদেশের যাবতীয় কল্যাণকর আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করে ওদেশের নিদারুণ অশুভ দোষগুলি আয়ত্ত করতে যাবার কোনই মানে হয় না। অবশ্য একথাও স্বীকার করেন, ওদেশের ডিগ্রির দাম আছে চাকরির বাজারে, কিন্তু চাকরির প্রয়োজনে আমি ডাক্তারি পড়ছি না, আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে নিজের শিক্ষা ও পারদর্শিতার ওপর। বিলাতী ডিগ্রির প্রলেপে চাকরি সুলভ হতে পারে, কিন্তু রোগী আরোগ্য হয় নিজের শিক্ষার সূক্ষ্মতার দ্বারা, যা ইচ্ছা থাকলে কলকাতাতেই আয়ত্ত করা সম্ভব। সুতরাং পিতৃ অর্থে যে বিলাত যাওয়া আমার অদৃষ্টে নেই, তা পূর্বদিকে সূর্য ওঠার নির্মম সত্যের মতই বুঝতে পেরেছিলাম।

বিলাত যাওয়ার রঙীন নেশা কিন্তু কাটে না। চিন্তাতেও আনন্দ। স্বপ্নেতে জাহাজে উঠলাম, আরব্যোপসাগরের নীল ঢেউয়ের দোলায় দুলছি, দূর থেকে এডেন বন্দরের লাল নীল আলোগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকছে, লোহিত সাগরের স্তিমিত স্রোতধারায় চাঁদের লুকোচুরি, সুয়েজের দু'পাশের তাল-খেজুরের তীরভূমি, ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গায়িত ফেনিল উচ্ছ্বাস।

যৌবনকালের উচ্ছ্বাস, জাগেও যেমন হঠাৎ, নিবেও যায় তেমনি অতর্কিতে। ফ্রয়েড অবশ্য বলেন, নিবে সে যায় না, জাগ্রত চেতনা থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় মনের অপর এক কুঠরিতে, ঝিমিয়ে থাকে সেখানে, মাঝে মাঝে উঁকিঝুঁকিও মারে, লাফিয়ে আবার বেরিয়ে আসে সুযোগ পেলেই।

যাই হোক, বিলাত যাওয়া হবে না এইটাই ধরে নিয়েছিলাম। আর এক চিন্তায় সময় কাটাবার সুযোগই বা কোথায় বটু দত্তের। ফুটবল মাঠে বটু দত্ত না হলে ইলিয়ট

শীল্ড বিদ্যাসাগর কলেজেরই মেয়ে নেবার সম্ভাবনা। আমার খেলার তারিফ সকলেই করে, তবে অ্যানাটমির বৃদ্ধ প্রফেসর জ্ঞানবাবু ক্লাসে একবার যা বলেছিলেন, তা ক্লাসিক হয়ে আছে। আগের দিন বিদ্যাসাগর কলেজকে তিন গোলে হারিয়ে ইলিয়ট শীল্ড পেয়েছি আমরা, তিনটি গোলই করেছিলাম আমি। ক্লাসে খেলার কথাই হচ্ছিল, জ্ঞানবাবু বললেন, খেলে তো বটু দত্ত, স্কোর করতে করতে বল নিয়ে যায়। সেই থেকে ফুটবলের কথা উঠলেই সকলে বলত, বটুর সঙ্গে চালাকি নয়, স্কোর করতে করতে বল নিয়ে যায়।

চায়ের দোকানের আড্ডা—বটু দত্ত না হলে গরম চা-ও আসর গরম করতে পারে না। এই চায়ের দোকান থেকেই আসল গল্পের সুরু। রবিবারের সকাল, পূর্ব রাত্রে নাইট-ডিউটি হেতু ঘুম ভেঙেছে বেলায়, দেরি করেই এসেছি দোকানে। দেখি চাঁদের হাট আগে থেকেই বসে গেছে নিশীথই প্রধান বক্তা, এক হাতে একটা সিগারেট, তখনও ধরানো হয় নি, আর এক হাতে একটা চিঠি, মুখ চলছে অনর্গল। সকলকে উদ্দেশ করে হলেও সমরেশের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে বলছে, তুই একটা লিষ্ট করে ফেল, কে কে যাবে, উত্তরপাড়া তো হাতের কাছেই, সন্ধ্যাবেলা গিয়ে রাত্রেই ফেরা যাবে।—সমরেশের হাতের লেখা ভাল, লেখার ভার তার ওপরেই পড়ে। তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কিন্তু ভেবে পেলাম না, এমন কি ঘটল যাতে লিষ্ট তৈরি করতে হবে, উত্তরপাড়া সন্ধ্যাবেলা গিয়ে আবার রাত্রেই ফিরে আসতে হবে। আর এত জায়গা থাকতে উত্তরপাড়াই বা কেন? সকলেই ঘটনার আকস্মিকতায় বা অভিনবত্বে এতই বিভোর যে, বটু দত্তের আগমনও যেন লক্ষ্য করবার মত নয়।

হোষ্টেল থেকে চায়ের দোকানে আসতে পথের মাঝেই স্লিপারের একটা ষ্ট্র্যাপ বিশ্বাসঘাতকতা করায় পায়ের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুল দিয়ে সাঁড়াশিব্যূহ তৈরি করে অপর ষ্ট্র্যাপটাকে কোন রকমে কায়দা করে ধরে আমাকে একটু আলগা ভাবে খুঁড়িয়ে চলতে হচ্ছিল। সেই অবস্থায় চায়ের দোকানে ঢুকে, অমিয়র পাশের খালি চেয়ারটা দখল করে বসে চায়ের অর্ডার দিলাম। নিশীথ ততক্ষণে হাতের সিগারেটটা ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলে চলেছে, প্রেজেন্ট কিনতে সকলের যাওয়ার দরকার নেই, টাকা দিয়ে দাও, শরৎ-দা আর বটু দত্ত বেঙ্গল ষ্টোর থেকে কিনে নিয়ে আসুক। আর রবীন যেন ডেপুটি-সুপারিন্টেডেন্টের সঙ্গে দেখা করে রাত্রের ডিউটি থেকে আমাদের—আমি চায়ে চুমুক দিয়ে নিশীথের কথার মাঝখানে আবৃত্তি করার ভঙ্গীতে বলে উঠলাম —"আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি, বল কোন্ পারে ভিড়বে তোমার সোনার তরী"—তার পর আবৃত্তির ভাষ্য করে বললাম, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না, লিষ্ট, উত্তরপাড়া যাওয়া, ফিরে আসা, প্রেজেন্ট, বেঙ্গল ষ্টোর—আর কত দূরে নিয়ে যাবে বল।—এতক্ষণে যেন সভার আর সকলের চোখ পড়ল আমার ওপর।

শরৎ-দা বেঙ্গল ষ্টোরে প্রেজেন্ট কিনতে যাওয়ার পার্টনার। মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছে সেই দূর অতীতের কোন এক শুভ প্রভাতে, সে প্রভাতের সন্ধ্যা তার জীবনে আর এল না। ধৈর্য্যের অভ্রভেদী হিমাচল শরৎ-দা। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নিয়ে কলকাতাতেই বাস করেন। পিতাও ডাক্তার, বেশ বড় ডাক্তার, নামডাক আছে। পিতার ইচ্ছা বাড়ী, গাড়ি, অর্থ-সমেত উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্রকে ডাক্তারিবিদ্যায়ও কায়েম করে দিয়ে যান। শরৎ-দা কিন্তু বলে, রাজার ছেলে রাজা হয়, তা সে মূর্খ হোক, রোগা হোক, অসুস্থ হোক; রাজকার্য্য চালানো বিদ্যায় পাসই করুক আর ফেলই করুক। যত গোলমাল ডাক্তারের ছেলের বেলায়। রাজপুত্র যে সূত্রে রাজা হবে, ডাক্তারপুত্রও সেই সূত্রে ডাক্তার হবার অধিকারী। যদি বলা হয়, ডাক্তারের হাতে নির্ভর করে লোকের জীবন, সুতরাং এ শাস্ত্র ঠিকমত না শিখলে তোমায় লোকের জীবন নিয়ে খেলা করতে দেবে কেন, তার উত্তরও শরৎ-দার তৈরি—বলে, রাজার হাতেও তো রাজ্যের লোকের জীবন নির্ভর করে, আমরা এক একটি ডাক্তার জীবনে আর কত লোককেই বা পরপারে পাঠাতে পারি, কিন্তু ভাব দেখি একবার রাজার কথা, তাঁর ডায়াগনোসিসের ভুলে রাজ্যসুদ্ধ লোক যে পরপারে যেতে পারে, এবং গিয়েছেও কতবার। —এই হ'ল শরৎ-দার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

শরৎ-দা আমার আবৃত্তির উত্তর দিলে একটি গানের কয়েকটি চরণ আবৃত্তি করে, 'বন্ধু হে চল চল, মিলিত প্রাণের উৎসবে, প্রিয় পুষ্পের ঘন সৌরভে, নিখিল দিনের সামগানে, বন্ধু হে চল চল।' আবৃত্তি শেষ করে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, মিলিত প্রাণের উৎসব উত্তরপাড়ায়। একটি প্রাণ নিখিলের, অপর প্রাণ গীতারাণীর, এইমাত্র চিঠি এসেছে নিশীথের কাছে।

আঙুলের সাঁড়াশির মধ্যে স্লিপারটিকে কায়দা করতে করতে শরৎ-দার পাশে গিয়ে বসে বললাম, তা উত্তরপাড়ায় কেন, নিখিলের যাতায়াত তো ছিল বালীগঞ্জে দক্ষিণ পাড়ার দিকে।

শরৎ-দা হিউমার ছাড়া কথা বলে না, এক মিনিট ভেবে বললে, তুমিও তো প্রথমে উত্তরপাড়ার গোল আগলে দক্ষিণ দিকের গোলে স্কোর করতে করতে বল নিয়ে যাও। কিন্তু হাফটাইমের পর দক্ষিণ পাড়া ত্যাগ করে উত্তরপাড়ার দিকে ধাওয়া কর কেন? নিখিলেরও তাই, দক্ষিণ পাড়া হাফটাইমের আগে, এখন লক্ষ্য উত্তরপাড়ার গোল।

আমার আজ সকালের অস্বস্তি ঐ ষ্ট্র্যাপ-ছেঁড়া স্লিপার পায়ের নীচে থেকে কখন দূরে সরে গেছে, সাঁড়াশির মধ্যে ওটাকে বাগ মানাবার চেষ্টা করতে করতে অন্যমনস্ক ভাবে বলে উঠলাম, সে তো বিপক্ষকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে। মুখের

কথা কেড়ে নিয়ে শরৎ-দা বললে, নিখিলও কিছু বিপক্ষকে আস্ত রাখবে না, শুধু বিধ্বস্ত কেন, তাকে সন্ত্রস্ত করে ছাড়বে, গোলের মালা পরিয়ে দেবে দেখে নিও। হাসির ধুম পড়ে গেল। একটু থেমে আবার বললে, বন্ধু নিখিল আবার উত্তরপাড়ার পর পশ্চিম পাড়া যাত্রা করবেন, টাকা দেবেন গৌরী সেন।

আবার সমস্ত অবস্থাটা দুর্বোধ্য হয়ে উঠল, পশ্চিম্ পাড়া আবার কোথায়, তাতে টাকারই বা প্রয়োজন কিসের, আর গৌরী সেনই বা কে? আমি বললাম, নাঃ, আজ দেখি করে আসায় সব বিষয়েই আমার পরাজয়, হেঁয়ালির পর হেঁয়ালি!

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শরৎ-দার বোধ হয় একটু মায়া হ'ল, চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, নিখিল এবার এখানকার পাঠ সাঙ্গ করে নরমেধ-যজ্ঞের বিলাতী উপায় শিখতে যাচ্ছেন, রসদ যোগাবেন লিগ্যাল-ফাদার, ফাদার-ইন্-ল।

নিখিলের বিলাত যাওয়ার কথায় ফ্রয়েডের মতে অন্ত কুণ্ঠিত স্বপ্ন আমার বিলাত যাওয়ার কল্পনা তড়িৎবেগে একটা অস্বস্তিকর প্রশ্নের আকারে আমার জাগ্রত মনের পর্দায় ফুটে উঠল। নিখিলের পক্ষে যা সম্ভব হ'ল, তা কি আমার হয় না? কিন্তু সে নেহাতই ক্ষণিকের তরে, চায়ের দোকানে চায়ের হাট এমন কল্পনার পরিপোষক নয়, তাই মুহূর্তেই আবার তলিয়ে গেলাম ছেঁড়া স্লিপারের বিরক্তিকর অস্বস্তির ভিতর।

নিখিলের বিয়ে হয়ে গেছে। তার বিলাত যাওয়ার সম্ভাবনাকে ঘিরে আমার মনের যে সুপ্ত বাসনা প্রশ্নের আকারে মনের দুয়ারে একবার উঁকি দিয়ে চায়ের দোকানের প্রতিকূল আবহাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল, সেই প্রশ্নের উত্তরে নিখিলের কাছে এইটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পারলাম যে, খবরের কাগজের পাত্রপাত্রীর বিজ্ঞাপনের তালিকার মধ্যে গীতারাণীর পিতার মত অর্দ্ধেক রাজত্বসমেত রাজকন্যা প্রদানকারী পিতার সন্ধান মিলতে পারে। বিলাত কত দিনের স্বপ্ন আমার, সে কি শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে!

খবরের কাগজ লোকে পড়ে খবরের জন্যে, আমি পড়তে লাগলাম পাত্র পাত্রীর তালিকা। ভগবানের কৃপায় তিন-চার দিনের মধ্যেই উপযুক্ত এক কন্যার পিতার সন্ধানও মিলে গেল। কন্যার পিতা চান কায়স্থ ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়র পাত্র—মনোনীত হলে নিজ খরচে বিলাত পাঠাবেন। এ যেন আমাকে লক্ষ্য করেই শরসন্ধান। তবে ঠিকানা দেওয়া নেই, চিঠি দিতে হবে পোষ্ট-বক্স নম্বরে।

শরৎ-দার সঙ্গে একবার আলোচনা করতে হবে। একে তো এত বড় ব্যাপারে অভিভাবক পিতার মত না নিয়ে, এমন কি তাঁকে গোপন ক'রে। গোপন অবশ্য থাকবে না তিনি জানবেনই, তবে সে একেবারে একাদশ ঘটিকায়, যখন মত তাঁকে দিতেই হবে। আর মত না দেবারই বা কি আছে, পুত্রের বিবাহে তাঁর আপত্তি নেই, বরং বিয়ে করায় অনুযোগ ইতিমধ্যেই দু-চার বার মার দিক থেকে এসেছে, আমিই হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। বিলাত যাওয়াতেও পিতার সেরকম আপত্তি নেই, আপত্তি তাঁর নিজের অর্থ নষ্ট করে বিলাত যাওয়া, সুতরাং যে অর্থ বিলাত গমনে নষ্ট হবে, তা যদি তাঁর বৈবাহিকের হয়, তা হলে তিনি আপত্তি করবেন কেন?

শরৎ-দার বাড়ী গেলাম। যেমন শরৎ-দা তেমনি তাঁর স্ত্রী, দু'জনেই সমান। তিন জনে পরামর্শ করা গেল। বউদি উর্মিলাকে স্মরণ করে বললেন, বিলাত তো যাবে, কিন্তু ম্লানমুখী সেই তরুণী যিনি একবার মাত্র তোমার জীবনে উদিত হয়ে মাঙ্গলিক রচনা ক'রে চোখের জলে পরদিন তোমাকে ভাসিয়ে দেবেন সাগর-দোলায় বিলাতের পথে, তারপর কোথায় তার উদয়াচল আর কোথায় অস্তাচল সে কথা ভুলে যাবে না তো?

আমি হেসে কাব্যের সুর বজায় রেখেই বললাম, বাল্মীকির হাতে উপেক্ষিতা হয়ে যেটুকু দুঃখ উর্মিলার ছিল, রবীন্দ্রনাথের করস্পর্শে তা বোধ হয় আর নেই। বাল্মীকির উপেক্ষা না পেলে রবীন্দ্রনাথের লেখনীস্পর্শের গর্ব তার থাকত কোথায়? আমার উর্মিলা উপেক্ষিতা হয়ে রবীন্দ্রের আশীর্বাদ না পেলেও শরৎ চন্দ্রের কমণ্ডলুর বারিসিঞ্চনও কি পাবে না—বলে হেসে শরৎ-দার দিকে তাকালাম।

এত কাব্য আলোচনার মাঝে চুপ করে থাকতে শরৎ-দার কষ্টই হচ্ছিল, এতক্ষণে কথা বলবার অবকাশ পেয়ে যেন বেঁচে গেল, বললে, শরৎ চন্দ্র ওসব কাব্যের উপেক্ষিতার ধার ধারে না, সমাজের উপেক্ষিতা, পরিত্যক্তা, এদের ওপরই আমার দরদ বেশী। তোমার উনি যদি উর্মিলা না হয়ে সাবিত্রী হন তো চেষ্টা করতে পারি।

আমি কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বউদিকে মধ্যস্থ মেনে বললাম, দেখছেন বউদি, ভদ্র-কন্যাকে উনি সাবিত্রী বানাচ্ছেন। বউদিও উত্তর নিয়ে প্রস্তুত, বললেন, সাবিত্রীও তো ভদ্রকন্যা ছিল বলেই মনে হয়, তবে সত্যবান ডাক্তারী পড়তে বিলাত গিয়েছিল কিনা জানি না।

বললাম, বউদি, আমি পরাজিত, এখন আমার কার্যোদ্ধারের উপায় ঠিক করে বাতলে দিন, সাইট ভিউটি আছে, উঠতে হবে এবার।

বউদির মতে ঠিক হ'ল পাত্রীর পিতার নিকট চিঠি আমিই লিখব, তবে ঠিকানা থাকবে শরৎ-দার। কারণ, হঠাৎ যদি আমার উর্মিলা বা সাবিত্রীর পিতা যথারীতি পাত্র দেখে ব্যবস্থা করতে আমার ঠিকানা অনুযায়ী সোজা হোষ্টেলে এসে ওঠেন, সেটা আমার পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে। চিঠিতে তাঁকে গোপনও করা হবে না কিছু, শুধু একটি মাত্র অনুরোধ থাকবে, আমার পিতার সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা—পাত্র দেখার পর তাঁর পছন্দ যদি হয়, তখন হবে, তার আগে নয়।

ভগবানের নাম করে শরৎ-দার ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিলাম

হেড়ে। বহুদিন পরে ভাল নামটা ব্যবহার করবার সুযোগ ঘটল। চিঠি দেওয়ার পর সুরু হ'ল আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। প্রথমে মনে হয়েছিল, বিলাত যাওয়া বুঝি হয়েই গেল, কয়েক সপ্তাহের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু যতই দিন যায় আশার আলোক ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসে। এমন কি, বিলাত যাওয়ার রঙীন কল্পনা মনের পর্দায় আবার যেন ঝাপসা হয়ে এল।

আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি, এমন সময় একদিন শরৎ-দা এসে হাসতে হাসতে বললে, একট্টা টাইমে হলেও, ফাষ্ট-রাউণ্ডে জিত। এই দেখ চিঠি, বলে একখানা খাম আমার হাতে দিলে। চিঠি এসেছে দিল্লী থেকে, ভদ্রলোক সেখানে রেলওয়ের বড় অফিসার, লিখেছেন, কন্যা তাঁর শিক্ষিতা, সুন্দরী কিনা সে বিচার পাত্রের ওপর, পাত্র মনোনীত হলে অর্থব্যয় করতে কার্পণ্য নেই। শীঘ্রই কলকাতা আসবেন, পাত্র দেখবেন, অন্যান্য বিষয়েও বিবেচনা করবেন। আরও দু-একটি উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান কলকাতায় পেয়েছেন, তাদেরও দেখবেন—সংক্ষিপ্ত চিঠি।

আরও ক'দিন পরে। বোধ হয় মেডিসিনের ক্লাস। আমরা সবাই হাঁ ক'রে ভেষজতত্ত্বের কথা শুনছি, এমন সময় ডাক এল শরৎ-দার, ফোন এসেছে। ফোন শুনে, শরৎ-দা ফিরে এসে গ্যালারিতে আমার পাশে বসে বললে, সেই ভদ্রলোক দিল্লী থেকে এসেছেন, আমার মিসেস এখনি ফোনে বললে। আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হয় নি, শ্রীমতীকে তো জানিসই, সব সুষ্ঠুভাবে পালন করেছে, আমাকে যেতে বলেছে এখুনি। আমি ভদ্রলোককে নিয়ে ঠিক পাঁচটার সময় তোর ওখানে আসব। ঘরটা গুছিয়ে রাখিস, বড্ড নাকি সাহেব আবার, বিলাত ফেরত।—প্রিন্সিপ্যালের কাছে সেদিনকার মত ছুটি নিয়ে শরৎ-দা চলে গেল বাড়ী, আমি হোষ্টেলে।...

ঘরের এ কি অবস্থা! টেবিলের উপর ছোট্ট সুন্দর ক্যালেণ্ডারে এপ্রিলের তিন তারিখের পর আর হাত পড়ে নি যদিও সেদিন জুন মাসের মাঝামাঝি। ময়লা তোয়ালের সঙ্গে কোলাকুলি ক'রে অন্তত শরীরের পনরটা বিভিন্ন অংশের পরিধেয় বস্ত্র, আলনায় নয়, চেয়ারেও নয়, বিছানায় শায়িত। যে ভাবে বইগুলো থাকা উচিত নয়, ঠিক সেই ভাবেই রয়েছে; কতক বিছানায়, কতক টেবিলে, কতক চেয়ারে, এমন কি টেবিলের তলায়ও দু-একটা। জুতো আর স্লিপারের রাশি ছড়িয়ে আছে ঘরের সর্ব্বত্র, কেউই আপন আপন যুগল মূর্ত্তিতে নয়। সে যেন এক স্বৈরাচারের রাজত্ব—গ্রিসিয়ান্ স্লিপার কেড্সের আলিঙ্গনে, অক্সফোর্ড সু-এর একপাটি জড়িয়ে ধরেছে অ্যালবার্টের আর এক পাটিকে। এহেন ঘরকে পরিষ্কার করতে হবে। একবার ভাবলাম, বিলাত গিয়ে দরকার নেই, বরঞ্চ শুয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করা যাক! কিন্তু তা হয় না, উঠে লেগে গেলাম কাজে, অপটু হাতে যতটা সম্ভব ঘরখানার সংস্কার করলাম। পরে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম ঘরের পরিপাটি মূর্ত্তি দেখে, দেয়ালে টাঙানো নরকঙ্কালটা পর্য্যন্ত ভদ্র দেখাচ্ছে।

নমস্কার মেয়েদের। কোমল শরীরের মধ্যে এত কঠিন শক্ত মন থাকে কি ক'রে; অবলীলাক্রমে রূপ আর গুণের পরিচয় দিতে বসে কুতূহলী পুরুষের চোখের সামনে! পাঁচটার সময় শরৎ-দা আসবে দিল্লীর সেই সাহেবকে নিয়ে, রূপের পরীক্ষা দিতে হবে না, চুল খুলে চুলের বহরও দেখাতে হবে না, হাত ঘষে পাউডার তুলে প্রকৃত বর্ণের পরিচয়ও দিতে হবে না, তবু আমার অবস্থা সঙ্গীন, করুণ।

দুয়ারে শব্দ হ'ল। মুখে পাইপ, হাতে ভার্জিনিয়া টোবাকোর টিন, পরনে সাহেবী স্যুট, শরৎ-দার সঙ্গে প্রবেশ করলেন লিলির পিতা, আমার পিসেমশাই! তবে কি—! হঠাৎ আসা কালবৈশাখীর ঝড়ের মত কি যেন আমার সমস্ত মনটাকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেল, সমস্ত পৃথিবীটাকে সীমাহীন একটা অন্ধকার গ্রাস করতে আসছে আর সেই সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকারের মধ্যে অসহায় আমি ভেসে চলেছি। মন্দিরস্থ পাবার নিশ্চিত আশা নিয়ে হাত বাড়িয়ে হাতে যেন লাগল সাপের শীতল পিচ্ছল স্পর্শ। সম্মুখে দাঁড়িয়ে পিসেমশাই, পাত্র দেখতে এসেছেন—আমাকে। পাতাল-প্রবেশের পূর্ব্বে সীতার মানসিক অবস্থা এর চেয়ে খারাপ হয়েছিল কি না জানি না!

পিসেমশাই ঘরের মধ্যে সুকোমলকে না পেয়ে তার জায়গায় আমাকে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হলেন। আমার দিকে চেয়ে বললেন, হ্যালো বটু, ইউ আর হিয়ার! —আমার উত্তর দেবার মত অবস্থা নয়। শরৎ-দাও অবাক, কন্যার পিতা বটুকে আগে থেকে চিনলেন কি করে? পিসে-মশাই একটা চেয়ার টেনে বসে শরৎ-দাকে আরও বিস্মিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, সুকোমল কোথায়, আই মিন, পাত্র? তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগলেন, দু' বছর পর দেশে এলাম, তুই ত বেশ বড় হয়েছিস! চিঠি-পত্রও লেখা হয় না, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে যে দিল্লী বদলী হয়েছি সে খবরটাও তোদের দেওয়া হয় নি। এবার ঠিক করেছি, বাংলাদেশে যখন এসেছি, সব দেখাশুনা করে তবে যাব। তোর পিসিমা, লিলি, এরাও এসেছে।

পিসেমশাই কি বকে যাচ্ছেন, তার একটা বর্ণও আমার কানে প্রবেশ করছে না, তাঁর কথা বলার এক অসতর্ক মুহূর্ত্তের সুযোগ নিয়ে শুধু ইসারায় নিজের ঠোঁটে আঙুল রেখে শরৎদাকে কথা বলতে বারণ করে দিয়েছি। শরৎ-দা সব কিছু পরিষ্কার বুঝতে না পারলেও, কোথাও যে একটা গোল-মাল রয়েছে তা বুঝে নিয়েছে। ভগবান বাঁচিয়েছেন ভাল নামটার আমার ব্যবহার হয় না। পিসেমশাই চুপ করতেই, শরৎ-দা কিছু বলার আগেই আমি বলে উঠলাম, সুকোমল এই ঘরেই থাকে, কলেজ থেকে ফিরে এক টেলিগ্রাম পায়,

বাবার অসুখ, এই চারটের ট্রেনে দেশে চলে গেছে। আপনি আসবেন, তাই আমাকে তার হয়ে রেখে গেছে এখানে—বলে করুণ মিনতিভরা চোখে শরৎ-দার দিকে তাকালাম। পিসেমশাই বললেন, পুয়োর চ্যাপ, বাট হাইলি ইন অস্পিসাস্ ফর নিগোসিয়েসন্স্ টু ষ্টার্ট (বেচারি, তবে বিয়ের কথা-বার্তার সুরুতেই এটা অশুভ)।

শরৎ-দা এতক্ষণে মুখ খুলবার অবসর পেলে, পিসেমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনি বটুকে চেনেন নাকি? পাইপটা জোর করে টেনে পিসেমশাই হিউমার করে বললেন, চিনি না, এ যে আমার শালার ছেলে! শরৎ-দা এবং পিসেমশাই হো হো করে হেসে উঠলেন। অতি সঙ্কটজনক পরিস্থিতিকেও তরল করতে শরৎ-দার তুলনা নেই, শরৎ-দার কৃপায় সে যাত্রা মানরক্ষা হ'ল। শুধু পিসেমশাই যখন নিবে যাওয়া পাইপটা ধরাতে ব্যস্ত, সেই সুযোগে একবার চুপি চুপি আমায় বললে, শেষে সেমসাইড গোল!

কে বাঁশী বাজায়

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

ডাকিছে নিকট শোনো ডাকিছে সুদূর,
প্রিয় বাঁধে বাহু-ডোরে, অজানা বঁধুর
উদাত্ত আহ্বান আসে সীমাহীন স্রোতে
সীমাহারা আকাশের তট-প্রান্ত হতে
নিভৃত অন্তরে। চকিতে ফিরিয়া চাই।
ডাকিল যে সে কি হেথা আছে কিম্বা নাই!
স্বপ্ন যেন, মোহ যেন, যেন কিছু নয়।
তবু যেন তার চেয়ে বড় পরিচয়
বিকশিয়া ওঠে নিত্য প্রভাত-সমীরে,
ঊষার উদয়-তটে, রজনী-তিমিরে,
শিখরের শীর্ষে শীর্ষে, সমুদ্র বেলায়,
বিচিত্র আকাশ-বক্ষে মেঘের লীলায়,
কুসুমিত কাননের পল্লবে পল্লবে,
পাপিয়ার কল-কণ্ঠে পিক-কলরবে।
কামনায় উদ্বেলিত শ্রান্ত হৃদয়ের
নিমীলিত আঁখি-পাতে স্বপ্ন পরশের
কমনীয় স্পর্শটুকু যেন ছুঁয়ে যায়
সুখাতীত সুখে ভরা হৃদয়-বেলায়।
শুনেছি আহ্বান। অজ্ঞাত পুলিনে বসি'
কে বাঁশী বাজায়। তাই ছোটে রবি শশী
গ্রহ উপগ্রহ আর ছুটে যায় তারা,
উন্মত্ত পৃথিবী ছোটে শ্রান্তি-ক্লান্তিহারা।
অই যে ধূসর বালু, ভ্রান্ত মরীচিকা,
দুঃখেরে নিবিড় করি' আসে কুজ্ঝটিকা,
উন্মাদ পবন আসে দুর্নিবার বেগে
বজ্র-অগ্নি গর্ভে নিয়ে ঘন নীল মেঘে,
সেও শোনে সে আহ্বান উদাও গম্ভীর।
তাই এ বিপুল বিশ্বে কেহ নহে স্থির।
পাষাণ কারায় রুদ্ধ নির্ঝরের কানে,
মাটির আড়ালে লুপ্ত সুপ্ত বীজ-প্রাণে,
পশে সে আহ্বান। তাই পাষাণ পঞ্জর
খুলে দেয় রুদ্ধ দ্বার, মাটির অন্তর
স্নেহেতে সরস হয়ে মুকুলেরে ডাকে।
পত্রে পুষ্পে ফলে ফুলে ছড়াইতে থাকে
চিরন্তন সে আহ্বান। পথের ধূলায়
প্রতিধ্বনি পদচিহ্ন এঁকে রেখে যায়
অযত্ন-বর্দ্ধিত গুল্মে লতায় ও তৃণে,
ঝরা পত্রে ঢাকি পথ রাত্রি আর দিনে।
যারা আসে তারা যায়, কেহ নাহি জানে
কোন্ লোকাতীত লোকে অমৃত-সন্ধানে।
কবে যাত্রা হ'ল সুরু —সে এক বিস্ময়!
কবে যাত্রা হবে শেষ, তার পরিচয়
কেহ নাহি জানে। শুধু শুনি সে আহ্বান—
বাঁধে প্রেমে, আর গাহে বৈরাগ্যের গান।
তাই যারা এসেছিল, যারা আসে নাই,
এখানে পেয়েছে যারা ক্ষণেকের ঠাঁই,
যারা আপনার, আর যারা কেহ নয়,
চিনি যাহাদের, যে অজ্ঞাত পরিচয়,
সকলের সাথে তুমি বাঁধিলে যে মোরে
বাণীশূন্য সীমাহীন আহ্বানের ডোরে।

যানবাহন ও চলাচল ব্যবস্থায় অরাজকতা

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন দ্রব্যাদি যাহাতে সুষ্ঠুভাবে খাদকগণের (Consumers) নিকট পৌঁছায় তাহার উপযুক্ত বন্দোবস্ত থাকার প্রয়োজন। এজন্য উৎপাদক ও খাদকের উভয়ের স্বার্থের জন্য উন্নত যানবাহন চলাচল-ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। ইহাতে বাধা হইলেই ক্ষতি। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও চলাচল নিয়ন্ত্রণকারিগণ লাভের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করেন, সাধারণের স্বার্থ তাঁহাদের কাম্য নহে।

চলাচল যাহাতে সুষ্ঠু ভাবে হয় এবং যাহাতে কোনরূপ অপচয় বা অসুবিধা না হয় এজন্য জল, স্থল ও আকাশ যানের চলাচল সম্পর্কে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজন। কিন্তু তাহা না হইয়া পরস্পর প্রতিযোগিতার দরুন প্রতিপদেই অপচয় লাগিয়াই আছে। বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে জাহাজ কোম্পানীগুলি খোলাখুলিভাবে অপব্যয়ের প্রতিযোগিতা চালাইতেছে। নদী ও খালের জলযানগুলি রেলের সঙ্গে অথবা নিজেদের মধ্যে এবং কখনও কখনও স্থলপথের-যানবাহনের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইতেছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দেশের মধ্যেও আকাশযানের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সুরু হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আজও জাহাজের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী। কৃষি ও শিল্পে কোন ভূখণ্ড উন্নত হইলে স্থলপথের উন্নতি সাধন করিয়া উহাকে নিকটবর্ত্তী সামুদ্রিক বন্দরের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হয় এবং সেখান হইতে বড় বড় জাহাজে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলে।

আজ পৃথিবীর সপ্ত সমুদ্র অর্ণবপোতে ছাইয়া গিয়াছে। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে কোথায় সকলে সহযোগিতা দ্বারা অপব্যয় কমাইবে, না তাহার বদলে বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহ বহু অনুৎপাদক জাহাজ চালু রাখিয়াছে। আন্তর্জাতিকতার দিক দিয়া এই নীতি একটি গুরুতর অপরাধ এবং ফরাসীদেশ এই বিষয়ে বড় অপরাধী। লৌহ-শিল্পকে সাহায্য দিবার জন্যই জাহাজ নির্ম্মাণ ও জাহাজ চলাচলে সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে রাজকোষ হইতে জাহাজের মালিকগণকে অর্থ দেওয়া হয়, অথচ গবর্ণমেণ্ট ইহার বদলে কিছুই পান না।

এইরূপ অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়া বাড়িয়া বর্ত্তমানে অসম্ভব রকম স্ফীতি লাভ করিয়াছে এবং শেষে ঐ সাহায্য বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। সাহায্য আবার নূতন ভাবে সুরু হইল ডাক বহিবার জন্য। জাহাজ কোম্পানীগুলিকে—বিশেষতঃ মাদাগাস্কার, সোমালীল্যাণ্ড, ইন্দোচীন এবং নিউ কেলিডোনিয়া প্রভৃতি দেশের জন্য প্রচুর অর্থসাহায্য দেওয়া হইল। এই সকল স্থানের মেল চলাচল কার্য্যের জন্য অসম্ভবরকম বেশী অর্থসাহায্য দেওয়া হইত। ভৌগোলিক অবস্থান ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিলে ফরাসী দেশের পক্ষে বিরাট নৌবহর অনাবশ্যক। ফরাসী দেশ নিজের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করে আর বাহির হইতে কাঁচা মালের আমদানীর আবশ্যকতাও তাহার কম।

ইটালীও স্বীয় স্বার্থের প্রয়োজনে বহু অর্থ অপব্যয় করিয়া বিরাট নৌবহর পোষণ করিত। বিদেশের বাণিজ্যকেন্দ্রের সহিত স্বদেশের ও আফ্রিকাস্থিত উপনিবেশের সহিত যোগাযোগ রাখিবার জন্য ইটালীকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইত।

প্রশান্ত মহাসাগরের নৌবহরের কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ১৮৯৬ হইতে ১৮৯৯ সন পর্য্যন্ত এই চারি বৎসরে জাপান জাহাজ নির্ম্মাণ, জাহাজ চলাচল ও ডাক বহনের জন্য ছয় গুণ খরচ বাড়াইয়াছিল। কেবলমাত্র লাভের আশাতেই জাহাজী ব্যবসা বাড়িয়া চলিয়াছিল। প্রতিযোগিতার ফলে মালের মাশুলও খুব কমিয়া গেল এবং জাহাজ কোম্পানীগুলির যথেষ্ট লোকসান হইতে লাগিল। পরে যখন জাহাজ তৈরীর উপরে সরকারী সাহায্য বন্ধ করা হইল, তখনও পরোক্ষভাবে জাহাজে ব্যবহৃত ইস্পাতনির্ম্মিত দ্রব্যাদি সরকারী সাহায্য পাইত। এইরূপে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত জাহাজ কোম্পানীগুলি পরস্পরের সহিত ও বিদেশী বাণিজ্য-জাহাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিত। এইরূপ ব্যবস্থা থাকার দরুন অল্পদিনের মধ্যেই জাপান সমুদ্রে পৃথিবীর তৃতীয় শক্তিরূপে প্রাধান্য লাভ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের নৌশক্তি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও প্রশান্ত মহাসাগরে ঐ একই পন্থা ধরিয়াছে। ইহারই ফলে আমেরিকার জাহাজ-ব্যবসা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমেরিকা এই নীতি অনুযায়ী বহু বাণিজ্য জাহাজ তৈয়ার করিয়া নিজেদের মাল স্বদেশী জাহাজে চালান করিয়াছে এবং সরকারী সাহায্যপুষ্ট জাহাজ কোম্পানী দ্বারা অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড লাইনে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছে। এই কার্য্যে মার্কিন সরকার কোটি কোটি ডলার খরচ যোগাইয়াছে। মার্কিন ডলারের ও আইনের প্রভাবে কেবল বিদেশী জাহাজী কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। আমেরিকার সমুদ্রতীর এবং দেশের মধ্যকার নদীসমূহ হইতে বিদেশী জাহাজীরা বিতাড়িত হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—অর্থাৎ আমেরিকা এবং আলাস্কা, হাউয়াই, মার্কিন

সামোয়া, টুটুইলা ও প্রশান্ত সাগরস্থ অন্যান্য বন্দরে বিদেশী জাহাজের যাতায়াত নিষিদ্ধ হইয়াছে।

নিজের বিরাট জাহাজ-শিল্প ও ব্যবসায়ের উপর খুব বেশী নির্ভর করিতে হয় বলিয়া আমেরিকার 'স্বদেশী' নীতিতে ইংলণ্ডই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। শতাব্দীকাল ধরিয়া বৃটিশ বাণিজ্য-পোত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য-সম্ভার বহন করিয়াছিল।

ইংলণ্ডের ভৌগোলিক অবস্থান জাহাজ-শিল্পের উন্নতির সহায়ক হইয়াছিল। জাহাজ নির্ম্মাণে অত্যাবশ্যক কয়লার খনি ও লৌহখনি উভয়ই নিকটে থাকার দরুন এই সুবিধা হয়। ইংলণ্ডের সমুদ্রতটও বহুবিস্তৃত এবং বন্দরগুলির অবস্থানও উহার পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য বিস্তারের অনুকূলে। কিন্তু ইহা সত্বেও প্রত্যেক দেশ লোকসান দিয়াও নিজ নিজ নৌ শিল্পকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতে থাকায় ইংলণ্ডের নৌ-বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছিল এবং এইজন্য বৎসরের বিভিন্ন সময় বহু জাহাজ বন্দরে নোঙ্গর করিয়া থাকিত। এই সকল জাহাজের দ্বারা অন্যান্য জাতির বাণিজ্যে সহায়তা করার দরুন ইংলণ্ডের যে লাভ হইত তাহা হ্রাস পাওয়ায় ইংরেজ জাতির এতৎসম্পর্কীয় "অদেখা রপ্তানী" কমিয়া গিয়া দিন দিন আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যিক লেন-দেনের গতি ইংলণ্ডের বিপক্ষে যাইতেছিল। বর্ত্তমানে ইংরেজ জাতি এই জন্যই চরম আর্থিক দুর্গতির সম্মুখীন হইয়া ঋণের জন্য মার্কিনের দ্বারস্থ হইয়াছে।

অবস্থার উন্নতির জন্য গবর্ণমেন্ট প্রথমে জাহাজ নির্ম্মাণ কমাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহা সম্ভব না হওয়ায় জাহাজ কোম্পানীগুলিকে বৎসরে ২০ লক্ষ পাউণ্ড দান (bounty) করিবার ব্যবস্থা করে। অতলান্তিক মহাসাগরের কোম্পানীগুলিকে ডাক-চলাচলের জন্য ব্যবস্থার মোটা টাকা দিবার ব্যবস্থা হয়। আমেরিকাও এই উপায়ে উহার জাহাজ কোম্পানীগুলিকে চাঙ্গা করিতেছিল। ইহা ব্যতীত প্রবল জার্ম্মান প্রতিযোগিতা এড়াইবার জন্য নামমাত্র সুদে কোম্পানীগুলিকে বিস্তর মূলধন যোগানো হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এই ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় চলিতেছিল। সাম্রাজ্যবাদী নীতি হিসাবেও ইংলণ্ড যাহাতে সমস্ত সমুদ্রপথে প্রভুত্ব করিতে পারে সেদিকে গবর্ণমেন্টের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ভারতবর্ষে যাইবার পথ ছিল ইংলণ্ডের পক্ষে 'সব লাল' (all red) অর্থাৎ জিব্রালটার, মাল্টা, এডেন, সাইপ্রাস এবং সুয়েজ খাল সমস্তই ছিল ইংরেজের করতলগত।

দুই সমুদ্রের সংযোগকারী হিসাবে সুয়েজখালই ছিল পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জলপথ। ইংলণ্ড এই বাণিজ্য-সরণী দখলে রাখিবার জন্যই মিশর দেশকে তাঁবে রাখিয়াছে এবং খালটা ফরাসীদের কাটা হইলেও সুকৌশলে ইহার বড় অংশীদার হইয়াছে।

ঐ একই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পানামা খাল আরও দৃঢ়ভাবে দখল করিয়া বসিয়াছে। আমেরিকার প্রশান্ত ও অতলান্তিক মহাসাগরের মধ্যে যাতায়াতের ইহাই একমাত্র জলপথ। দেশরক্ষার অজুহাতে এই খালটা আমেরিকা খুব সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে এবং সুয়েজ খালে বিভিন্ন জাতির জাহাজ চলাচলের যে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থা আছে এখানে সে বালাই নাই। এই খাল এলাকা (canal zone) সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত রাখিবার জন্য আমেরিকাকে ম্যালেরিয়া, চতুষ্পার্শ্বের ক্রমবর্দ্ধমান ও অবাঞ্ছিত নিগ্রো জনসংখ্যা এবং নিজ দেশের ও বহিরাগত শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। বহু অর্থব্যয় করিয়া তবে পানামা অঞ্চলে ঘাঁটি মার্কিন উপনিবেশ স্থাপন করা হইয়াছে

যদিও জাহাজের ব্যবসা আন্তর্জ্জাতিক হওয়াই বাঞ্ছনীয় তবু প্রত্যেক জাতিই ইহাকে বিশেষভাবে নিজের আয়ত্তে রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। উদ্দেশ্য অন্যান্য সকল জাতিকে তাঁবে রাখা। ইহা ব্যতীত রেল কোম্পানী অল্প দূরত্বের পথে জাহাজ-কোম্পানীকে কাবু করিবার চেষ্টা করে, কারণ সাধারণতঃ জলপথেই সস্তায় মাল চলাচলের ব্যবস্থা করা যায়। স্থলপথে মাল চলাচল বেশীর ভাগ রেলের সাহায্যেই হইয়া থাকে। জলপথে অনেক স্থানে খুব ঘুরিয়া যাইতে হয়। রেলপথে দূরত্ব কম হয়, কিন্তু খরচ বেশী পড়ে। রেলপথ নির্ম্মাণেও খরচ খুব বেশী পড়ে। বড় জাহাজ কোম্পানী আন্তর্জ্জাতিক হিসাবে গঠিত হইয়াছে কিন্তু রেলপথগুলি দেশের মধ্যেই বদ্ধ, তাহাও আবার বহু প্রতিষ্ঠানদ্বারা পরিচালিত। সকল দেশে এখনও রেলের মালিক গবর্ণমেণ্ট নহে। ভারতবর্ষে অবশ্য গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সমস্ত রেলই সরকারের হাতে আসিয়াছে। কোন কোন দেশে গবর্ণমেণ্ট রেলের আংশিক মালিক মাত্র, আবার কোথাও নিছক কোম্পানীর হাতে রেল পরিচালনের দায়িত্ব আজও রহিয়াছে। এই প্রাইভেট রেলের দৃষ্টান্ত দুটি অতিবৃহৎ মার্কিন রেলপথ। আমেরিকায় আড়াই লক্ষ মাইল রেলপথ রহিয়াছে। ইহা ইংলণ্ড ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মোট রেলপথের ছয় গুণ। আমেরিকায় আজও ১৫০টি বিভিন্ন রেল কোম্পানী আছে। ইহাদের বৎসরে প্রায় দশ লক্ষ ডলার মুনাফা হইয়া থাকে। বেপরোয়া প্রতিযোগিতা দ্বারা কিরূপ আর্থিক ক্ষতি হয় তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত ইংলণ্ড। এখানে কোন প্ল্যান বা জাতীয় পরিকল্পনা না করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রেল লাইন বসাইয়াছে, এবং 'ফলং অপচয়ং'। ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৭ সালের মধ্যে ইংলণ্ডে অন্যূন ৬৩৭ রেল কোম্পানী রেজিষ্ট্রী হয় এবং অবাধ প্রতিযোগিতা সুরু হয়। খাল, রাস্তা, জমি সব কিছুর মালিকগণই প্রতিযোগিতায় ব্যতিব্যস্ত হয়। অবশ্য এই কোম্পানীগুলির সংখ্যা পরে অনেক কমিয়া যায়, কিন্তু রেল ব্যবসা গোড়ার অপব্যয়ের ও অপচয়ের বোঝা এখনও বহন করিতেছে। এইজন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বহু পূর্ব্বেই সার উইলিয়ম একওয়ার্থ রেল কোম্পানীগুলিকে

জাতীয়করণের সপক্ষে মত দিয়াছেন। ইহা অপচয় নিবারণেরই পন্থা বলিয়া বর্ণিত হয়।

ইংলণ্ড বা আমেরিকা অপেক্ষা পশ্চাৎপদ দেশে প্রতিযোগিতা দ্বারা আরও বেশী ক্ষতি হইতেছে। অনেক সময় পরস্পর প্রতিযোগী কোম্পানীগুলি বেপরোয়াভাবে খরচ করিয়া এবং অনাবশ্যক রেল-লাইন নির্ম্মাণ করিয়া অপচয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে।

চীন দেশে তিনটি পৃথক পৃথক রেল-লাইন আছে। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথকে সাইবেরিয়ার রেলপথের বিস্তার বলা চলে—ইহা চওড়া গেজের (Broad gauge)। কিন্তু চাইনিজ ইষ্টার্ণ রেল আর এক গেজের। চীন-সরকারের নিজ রেলপথ আবার অন্য মাপের। সুতরাং কোন রেলপথের সহিত অপর রেল-পথের যোগাযোগ নাই, ফলে চলাচলে অসুবিধা। নানা বিদেশী পুঁজিপতিগণকে রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে দেওয়ায় এইরূপ অপচয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ১৮৯৪-৯৫ সনের চীন-জাপান যুদ্ধে চীন পরাজিত হইলে বিদেশী শক্তিগুলি চীনকে নানা সুবিধার জন্য চাপিয়া ধরে। শেষে রুশকে উত্তর মাঞ্চুরিয়ায় রেললাইন নির্ম্মাণ করিতে, জার্ম্মানীকে উক্ত লাইন পোর্ট আর্থারের সহিত যুক্ত করিতে, ইংরেজ কোম্পানীকে ইয়াংসী উপত্যকায়, বেলজিয়ান কোম্পানীকে পিকিং হইতে হাংকাও, মার্কিন কোম্পানীকে হাংকাও হইতে ক্যাণ্টন পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দেওয়া হইল। ১৯২০ সনে আবার ফরাসী, ইংরেজ, মার্কিন ও জাপানী পুঁজিপতিগণকে যুক্তভাবে ভবিষ্যতের রেললাইন নির্ম্মাণের সুবিধা দেওয়া হইল।

দক্ষিণ আমেরিকায় এই একই অব্যবস্থা। আরজেণ্টাইনে রেলপথ অপেক্ষাকৃত বেশী, কিন্তু এখানে ইংরেজ, ফরাসী ও দেশীয় পুঁজিপতিগণের হাতেই সমস্ত কর্তৃত্ব। একমাত্র ইংরেজ কোম্পানীগুলির হাতেই ১৫০০০ মাইল রেলপথ। দশটি রেলপথ দশটি এলাকায় যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করে, এবং সমস্ত লাইনই বিয়ানো আয়ার (Buenos Aires) বা অপর সমুদ্র-বন্দরে গিয়া পড়িয়াছে। রেল-লাইনগুলি তিন মাপের (gauges), সুতরাং দেশের মধ্যে অবাধ চলাচল বিশেষভাবে [illegible] হইয়াছে। অথচ রেল-ব্যবস্থা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত হইলে এই পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষিত না হইয়া দেশের সর্ব্বসাধারণের সুখ ও সুবিধাই দেখা হইত।

ভারতের রেলপথেও ত্রুটির অভাব নাই। এখানে বিদেশী গবর্ণমেণ্ট বেশীর ভাগ মূলধনের মালিক হইলেও বিভিন্ন ইংরেজ কোম্পানীকে তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির উপযোগী যথেচ্ছভাবে রেল-লাইন নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দিয়াছে। ইহাতে এক দিকে পরিকল্পনার অভাব এবং বিভিন্ন মাপের রেল-লাইন হওয়ায় চলাচলের অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য বর্ত্তমানে ভারতের অধিকাংশ রেলপথ জাতীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতে এগুলির উন্নতির আশা করা যায়।

অষ্ট্রেলিয়ার রেলপথ প্রায় ২০,০০০ মাইল অর্থাৎ ভারতের প্রায় অর্দ্ধেক। এখানেও বিভিন্ন ষ্টেটে বিভিন্ন মাপের রেলপথ ও তজ্জনিত অসুবিধা বিস্তর। বৎসরের পর বৎসর বিভিন্ন ষ্টেটের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের হার বাড়িতেছে এবং সেই সঙ্গে রেল চলাচলের যাতায়াতেও অসুবিধাও বৃদ্ধি পাইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় যানবাহন চলাচল ব্যাপারে বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে। রেলগুলি বিভিন্ন ষ্টেটের মধ্যে যাতায়াত ব্যাপারে ষ্টীমারের সহিত প্রতিযোগিতা করে। মোটর-যান মাল আমদানী রপ্তানীতে রেলের সহিত প্রতিযোগিতা চালায়। আকাশ-যান রেল, জাহাজ ও মোটরের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইয়া ডাক ও যাত্রী বহন করে। যানসমূহের মধ্যে দর কষাকষি লাগিয়াই আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে দেখা গিয়াছিল রেল কোম্পানী, জাহাজ কোম্পানী ও মোটর কোম্পানীগুলি সকলেই লোকসান দিতেছে, আর আকাশ-যান কোম্পানীগুলি সরকারী সাহায্যে বাঁচিয়া আছে। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার পুঁজিপতি-সমাজেই সম্ভব।

রেলে এবং মোটরে প্রতিযোগিতা আজ পৃথিবীব্যাপী। যে সকল দেশ শিল্পপ্রধান সেখানে উৎকট অবস্থা যথা—আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রে ত্রিশ লক্ষ মাইল পথ—পৃথিবীর মোট রাস্তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং সে দেশের মোটর চলাচলও পৃথিবীর সকল দেশ অপেক্ষা বেশী। মোটর চলাচলের দরুন পনর বৎসরে আমেরিকার রেল-রাজস্বে শতকরা ৬৬ ভাগ কমিয়া গিয়াছিল। দুই কোটি সত্তর লক্ষ প্রাইভেট মোটর গাড়ী থাকায় রেলযাত্রীর ভাড়ায় ঘাট্‌তি পড়িয়াছিল এবং পঁচিশ লক্ষ মোটর-লরী রেলের মাশুল কমাইয়া দিয়াছিল। ছোট ছোট রেলপথগুলি সম্পূর্ণ লোকসান দিয়া চালাইতে হইয়াছিল। গ্রেট ব্রিটেনেও মোটর প্রতিযোগিতার জন্য রেল কোম্পানীগুলি বৎসরে এক কোটি ষাট লক্ষ পাউণ্ড লোকসান দিয়াছিল। অথচ জার্ম্মানীতে রেলরাস্তাগুলি সুবিন্যস্ত ও রাষ্ট্র-নায়কদের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া সেখানকার অধিবাসীরা এই সকল অপচয় হইতে রক্ষা পাইত। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে সুপরিচালিত রেলপথ ও মোটরলরী কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অবশ্য অল্প দূরের পথে লরী দ্বারাই সস্তায় কাজ হয় এবং দূরপথে রেল-লাইন সুবিধাজনক।

আবার রেলপথের সহিত দেশাভ্যন্তরস্থ জলপথেরও প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। ভারী ও সহজে নষ্ট হয় না এরূপ দ্রব্য জলপথেই পাঠানো সহজ ও স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ। কোন কোন অঞ্চলে নদী, হ্রদ ও খালের ভিতর দিয়া খুব সস্তায় মাল চালান হয়। জার্ম্মানীর জলপথগুলি অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু রেলের ভাড়া কমানোর প্রতিযোগিতায় এই জলপথগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রাইনের জলপথ কেবল ইউরোপে নয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট জলপথ। কিন্তু বেলজিয়াম ও ফরাসী রেল কোম্পানীগুলির প্রতিযোগিতায় (ভাড়া

কমাইয়া) এই জলপথের বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সার উপত্যকার কয়লা, আল্‌সেসের তুলাজাত দ্রব্য,এবং লোঁয়ার লৌহ-প্রস্তর রপ্তানী এবং নানা খাদ্যশস্য আমদানী এই রাইনের জলপথেই হইত। কিন্তু রেল-কোম্পানীগুলি ভাড়া অসম্ভব রকম কমাইবার জন্য রাইনের বাণিজ্য আন্টওয়ার্প বন্দরে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং ঐ পথেই ফরাসী ও লরীযান্ যেচেলে সুইজারলণ্ডগামী বিদেশী বাণিজ্য-জাহাজ যাতায়াত করিতেছে। দানিউব নদীপথের বাণিজ্যও রেলের প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, অবশ্য ক্ষতির পরিমাণ রাইন অপেক্ষা কম। ইউরোপের অভ্যন্তরস্থ দেশগুলি নদীর মারফতই সমুদ্রের সঙ্গে তথা বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ রাখিত এবং নদীগুলিকেও আন্তর্জাতিক যাতায়াতের পথ বলিয়া স্বীকার করা হইত। কিন্তু জার্ম্মানী যখন নিজ এলাকায় নদীগুলিকে নিজের বলিয়া দাবি করিয়া ইহাদের আন্তর্জাতিক চলাচল বন্ধ করিল তখন এক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল।

ইউরোপের নদীসমূহের যোগাযোগের জন্য যে সকল খাল কাটা হইয়াছে সেই সকল বাণিজ্য-পথগুলিও প্রতিযোগিতার ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অনেকগুলি খালে বাণিজ্য-দ্রব্যের চলাচল একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডে এই খাল খননের চরম অপব্যয়ের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রেল-লাইনগুলি ব্যাপক ভাবে তৈরি হইবার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই খালগুলি পুঁজিপতিগণ ব্যক্তিগত দায়িত্বে খনন করে। নানা-লোকের কাজ বলিয়া এই সকল খাল আকার-প্রকারে, লক্-বন্দোবস্তে, গভীরতায় ও অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন রকমের ছিল এবং একজ পণ্যদ্রব্য চলাচল ব্যবস্থায় পদে পদে বাধার সৃষ্টি হইত। কুত আদায়েরও বহু ঘাঁটি ছিল। কিন্তু এত অসুবিধা সত্ত্বেও অল্প খরচ এবং সোজাপথে ভারি মালগুলির চলাচলের ব্যবস্থা করা হইত এবং খালের মালিকগণও যথেষ্ট লাভ পাইত। দক্ষিণ ল্যাঙ্কাশায়ার ও ওয়েষ্ট রাইডিঙের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে কয়লা ও লৌহ-প্রস্তর চালান দেওয়ায় সহায়তা করিয়া ঐ খালগুলি শিল্প-বিপ্লবের সহায়ক হইয়াছিল। কিন্তু রেলপথের বেপরোয়া প্রতিযোগিতায় শেষে জলপথগুলি অকেজো হইয়া পড়ে। কোন কোন রেল কোম্পানী নিজেদের লাভ বাড়াইবার জন্য জলপথগুলি কিনিয়া লইয়া ফেলিয়া রাখে ও অপব্যয়ের চরম দৃষ্টান্ত দেখায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও খাল ও রেলের প্রতিযোগিতায় ঐ একই ব্যাপার দেখা যায়। অবশ্য গ্রেট লেক্ অঞ্চলে জলপথের বাণিজ্যকে রেললাইন হঠাইতে পারে নাই। কিন্তু দরকষাকষি করিয়া রেল জলপথের বাণিজ্যকে বেশ কিছু ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। খালপথে চলাচলের জন্য বহু নূতন সুবিধার চেষ্টা করা হইয়াছে, এমন কি ২০ কোটি ডলার খরচ করিয়াও বিশেষ কোন উন্নতি সম্ভব হয় নাই। জলপথ ও রেলপথ পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় অপব্যয় বাড়াইয়া চলিয়াছে মাত্র।

চলাচল-পথে নূতন প্রতিযোগিতা আসিয়াছে আকাশ-যান। ষ্টীমার ও রেল উভয়ের সহিত ইহার প্রতিযোগিতা চলিয়াছে, তবে এখন পর্য্যন্ত প্রতিযোগিতা যাত্রী ও ডাক এবং কতকাংশে মূল্যবান দ্রব্যাদির চলাচলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চলাচল-ব্যবস্থার এই ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্ত্তন হইতেছে। সদ্যগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে নানা দিক দিয়াই যুগান্তকারী বলা যাইতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ ভাগেই আকাশ-যানের বিপুল সম্ভাবনা দেখা যায়। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যেই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশে ইহার প্রভূত উন্নতি হয়। রুশ দেশে ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আকাশ-যানের উন্নতির পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রভৃতি উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশসমূহও সুদূর সাম্রাজ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য বিরাট আকাশপথ রক্ষা করিতে বাধ্য ও মনোযোগী হন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরই বহু মনীষী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে পরবর্ত্তী মহাযুদ্ধ আকাশ-পথে হইবে এবং যে জাতি তাহাতে শক্তিমান হইবে সে-ই জয়ী হইবে। সে ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছে। কিন্তু এই সফলতার পশ্চাতে কোটি কোটি সরকারী মুদ্রার অপব্যয় দেখা যায়। অনেক পুঁজিপতির দ্বারা খরচ হইলেও ইহার পশ্চাতে রাষ্ট্রের বেপরোয়া সাহায্য ছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য প্রত্যক্ষ ভাবে কোন কোম্পানীকে সাহায্য দেয় নাই তবে ডাক প্রভৃতি বহিবার জন্য যে খরচ দিয়াছে তাহা সাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাশুলের বহু গুণ। মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষ জয়ী হওয়ায় আকাশপথে যাতায়াতের নূতন নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। জার্ম্মাণী, ইতালী ও জাপান একেবারে দমিয়া গেলেও বর্ত্তমানে আমেরিকা ও সোভিয়েটের মধ্যে প্রতিযোগিতা মারাত্মক আকার ধারণ করিতেছে। দূরবর্ত্তী দেশের সহিত যোগাযোগের আকাশপথগুলি বহু দেশের উপর সম্প্রসারিত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন বিবাদের কারণ ঘটিলে সংশ্লিষ্ট যে কোন দেশ চলাচলে বাধা দিতে পারে। সম্প্রতি ভারতীয় ডোমিনিয়ন ভারতবর্ষের আকাশপথে ওলন্দাজ বিমানের চলাচল নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছে কারণ ডাচ ও ইন্দোনেশীয়ার বিবাদে ভারতবর্ষ ওলন্দাজদের সঙ্গে কোনরূপ সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত নহে

অল্পদিনের মধ্যে ভারতবর্ষেও কয়েকটি এরোপ্লেন কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দিবার পূর্ব্বে অবশ্য অনুসন্ধান ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া কার্য্য করিতেছেন। তবুও এ বিষয়ে কড়াকড়ি ব্যবস্থা না করিলে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে অপচয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে। আকাশপথের ব্যাপার একেবারে রাষ্ট্রের নিজের অধিকারে রাখা বাঞ্ছনীয় কিনা তাহাও বিশেষ ভাবে চিন্তার প্রয়োজন। সৌভাগ্যক্রমে রেলপথগুলি রাষ্ট্রের নিজের মালিকানায় আসায় সরকার তথা দেশবাসী লাভবান হইয়াছে এবং কোম্পানীগুলির পরস্পর প্রতিযোগিতায় অপচয় ও অপব্যয় বন্ধ হইয়াছে। আকাশ-

ধানের নূতন প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যাহাতে অপচয়ের আমদানী না হয় রাষ্ট্রকে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুষ্ঠুভাবে জাতীয়করণ দ্বারাই সকল অপব্যয় নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু নানা অবস্থা ও স্বার্থের চাপে পড়িয়া সকল রাষ্ট্রের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। কিন্তু বেপরোয়া প্রতিযোগিতা বর্তমান কালে কোন রাষ্ট্রই বরদাস্ত করে না, কারণ একালে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বার্থ জাতির ও সমষ্টির স্বার্থের নিয়ে এ কথা সকল সভ্য দেশই স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

নেপালীদের খাদ্যদ্রব্য

শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী

নেপালী স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে রন্ধনকার্য করিয়া থাকেন। কাঠমাণ্ডু সহরে সম্পন্ন ভদ্রলোকের বাটীতে কেবল স্ত্রীলোকেরা রান্না করেন। নেপালী ব্রাহ্মণ মাত্রেই রন্ধন ও ভোজনকালে ধুতি পরিধান করেন। * যেখানে রন্ধন করা হয়, সেই স্থানকে 'চৌকা' বলে। রন্ধন-স্থানটি একটু উঁচু করিয়া লওয়া হয়। রন্ধনকালে 'চৌকা' ছাড়িয়া কাহারও বাহির হওয়া দেশাচারবিরুদ্ধ। চৌকার পার্শ্বে আর একটি 'চৌকা' থাকে। যিনি রন্ধন করেন, সেখানে তিনি খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া দেন এবং সেখান হইতে উহা বণ্টন করা হয়। নেপালে এক জাতি অপর জাতির লোককে হেঁসেলে প্রবেশ করিতে দেয় না, কিংবা এক জাতি অপর জাতির প্রস্তুত অন্ন আহার করে না। অন্য জাতিকে স্পর্শ করিয়া জলপান করা কিংবা 'চৌকা'র বাহিরে বসিয়া প্রস্তুত অন্ন ভোজন করা চলে না। সকলে স্ব স্ব 'চৌকায়' ভোজন করিয়া থাকে। প্রত্যেক সংসারে দুই-তিনটি করিয়া 'চৌকা' থাকে। যদি স্বজাতীয় কাহারও 'চৌকা' ব্যবহার করিবার আবশ্যক হয়, তিনি শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া পবিত্রভাবে তাহা করিতে পারেন।

নেপালে ভাত রাঁধার যে-কোনও হাঁড়িকে 'ভসলা' বলে। এখানে পিতলের হাঁড়ি ভিন্ন মাটির হাঁড়িতে কেহ রন্ধন করে না। নেপালে ভাল পিতল পাওয়া যায়। চাউল নেপালী-দিগের প্রধান খাদ্যদ্রব্য। তাহারা প্রধানতঃ আতপ চাউল রন্ধন করিয়া ভোজন করিয়া থাকে। নেপালে প্রচলিত পাহাড়িয়া ভাষায় আতপ চাউলকে 'শ্বেত চামল' এবং নেওয়ারী ভাষায় 'জাকি' বলে। নেপালে সিদ্ধ চাউলের প্রচলন থাকিলেও সেখানকার কোনও সদাচারী হিন্দু উহা কদাচ ব্যবহার করে না। নেপালীরা ভাতের ফেন গালে না। নেপালে অনেক রকম চাউল দৃষ্ট হয়, যথা—মসিনা, তুলরাজ, থাপাচিনা, থাপামাসি, চিনিয়া চামল, পঠুয়া চামল, খৈয়া চামল (ইহা ভাদ্র, আশ্বিন মাসে হয়), গোল-মাসি প্রভৃতি। থাপাচিনা দেখিতে একটু লাল বর্ণের। চিনিয়া চামল সাধারণতঃ ভাজিয়া খাওয়া হয়। এই চাউলের ভাত ভাল হয় না। খৈয়া চামলে নেপালীরা বেশীর ভাগ চিঁড়া প্রস্তুত করে। থাপামাসিতে চিঁড়া এবং ভাত দুই-ই প্রস্তুত হইতে পারে। জুংরি ধান, থাপা চিনিয়া ধান, মাসি ধান কিংবা গোল মাসি ধানেও খই হয়। নেপালীরা চাউল ভাজাকে 'ধটে' এবং খইকে 'লাজা' বলে। নেপালে জনচল নেওয়ার জাতির লোকেরা মুড়ি ভাজে; কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ছত্রি (ক্ষত্রিয়) জাতির মধ্যে ইহার রেওয়াজ নাই। সেখানে চিঁড়াকে 'চিউড়া' বলে। ব্রাহ্মণ হইতে ডোটে পর্য্যন্ত সকল জাতির লোকেরা 'চিউড়া' প্রস্তুত করে।

নেপালীরা আটাকে 'পিঠো' বলে। সে দেশে গম, ভুট্টা (মকা) ও ফাপর হইতে তিনটি বিভিন্ন প্রকারের 'পিঠো' প্রস্তুত করা হয়। তন্মধ্যে ভুট্টার 'পিঠো'ই বেশী তৈরি হয়। নেপালে 'ফাপর' কম জন্মে। উহা দেখিতে খেসারীর ডালের মত, কিন্তু গোল ও কাল বর্ণের। নেপালীরা 'তাপকে' নামক লৌহ-কটাহে জল গরম করিয়া উহাতে মুঠা মুঠা 'ভুট্টার পিঠো' (মকার গুঁড়া) ফেলিয়া দেয়। এক এক বার নিক্ষেপ করিবার কালে তাহারা 'পানিউ' (তাড়ু অথবা হাতা) বা খন্তা দিয়া যথাশক্তি মাড়িয়া লয়। মাড়িবার পূর্ব্বে বাম হাত দিয়া 'তাপকের' দণ্ডটি দৃঢ় ভাবে ধারণ করিতে হয়। উক্ত গরম জলে নিক্ষিপ্ত ভুট্টার গুঁড়া সকল অনবরত মাড়ার ফলে কাইয়ের আকারে পরিণত হয়। এই কাইকে নেপালীরা 'ঢিঁড়ো' বলে। পার্ব্বত্য অঞ্চলের যে সকল স্থানে শীতের প্রকোপ অধিক, তথায় ভাত রান্না করা অত্যন্ত কষ্টকর। এ কারণ 'ঢিঁড়ো' কেবল শীতপ্রধান অঞ্চলস্থ নেপালীদেরই প্রিয় খাদ্য নহে, তিব্বত ও ভুটানের অধিবাসীরাও ভাতের পরিবর্ত্তে 'ঢিঁড়ো' খাইতে ভালবাসে। আশ্বিন হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত নেপাল, ভুটান ও তিব্বত অঞ্চলের সাধারণ লোকেরা ঢিঁড়ো আহার করে। নেপালীরা রাইশাকের ঝোলে ঢিঁড়ো ভিজাইয়া লইয়া খাইয়া থাকে। কাঠমণ্ডু উপত্যকায় সম্পন্ন ভদ্র গৃহস্থদের মধ্যে ঢিঁড়োর প্রচলন খুবই কম।

* আহারের সময় মারাঠা গৃহস্থেরা 'সোলা' (রেশমের পট্টবস্ত্র) পরিধান করিয়া থাকেন।

নেপালীরা খুকরী (ভোজালী) দিয়া কুটনা কোটে, বঁটির ব্যবহার তাহাদের মধ্যে খুবই কম। তাহারা প্রত্যেক তরকারিতে যথেষ্ট লঙ্কা এবং আবশ্যকমত জিরা, মরিচ, ঘৃত বা তৈল ও লবণ ব্যবহার করে। পার্ব্বত্য ভাষায় ঘৃতকে 'ঘিউ' এবং নেওয়ারী ভাষায় 'ঘিয়' বলে। নেপালে লবণ উৎপন্ন হয় না। পূর্ব্বে ভুটান হইতে নেপালে লবণ আমদানি হইত। নেপালীরা ইহাকে 'সুঁদো লবণ' বলে। এখন বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে নেপালে লবণ রপ্তানি হয়। নেপালীদের রান্না তরকারিগুলিতে মারাঠাদিগের মত ঝালের আধিক্য। তাহারা মারাঠাদের মত দুই তিনটি তরকারি মিশ্রিত করিয়া রাঁধিতে জানে না—প্রত্যেক তরকারি স্বতন্ত্র ভাবে রাঁধিয়া থাকে। কেবল সম্পন্ন নেপালীদের বাটীতে অধুনা পাঁচমিশালী রান্না হইয়া থাকে।

অড়হর এবং মাষকলাইয়ের ডাল নেপালীদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। এই দুইটি তাহারা প্রচুর পরিমাণে খায়। নেপালীরা কলায়ের ডালকে 'মাষকো ডাল' বলে। তাহারা কলাই ডাল প্রথমে ধুইয়া সিদ্ধ করে। সিদ্ধ হইলে উহাতে লবণ দিয়া একটু ফুটান হয়। তৎপরে উহাকে উনুন হইতে নামায়। ঘৃত গরম করিয়া উহাতে 'জিম্বু' (তিব্বত দেশীয় এক প্রকার শুকনা শাক) ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেই 'জিম্বু' কড়া হইলে ডালে ফেলিয়া দিয়া অল্পক্ষণ পরে নামান হয়। জিম্বু দেওয়া না হইলে তৈলে বা ঘৃতে পাঁচফোড়ন দেয়। পাঁচফোড়ন কড়া হইলে পর উহাতে কাঁচা ধনেপাতা ও লঙ্কা কুচি কুচি করিয়া দিয়া 'পানিউ' (হাতা) দ্বারা নাড়িয়া লওয়া হয়। উহা কড়া হইলে উহাতে ডাল ঢালিয়া দেয়। সেই ডাল নামাইয়া একটু ফুটাইয়া লওয়া হয়। নেপালীদের মধ্যে মসুর ও মুগের ডাল খাওয়ার রেওয়াজ নাই। কোন কোনও নেপালীর বাটীতে মসুর ডাল তো অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য।

নেপালীরা সচরাচর যে সকল শাক খাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে, সেগুলির নাম—পালং, ফর্সি শাক, (কুমড়া শাক), কেরাউ (মটর শাক), তুরি (সরিষা শাক), চমসু, বথুয়া, জাঙ্গেরাজ প্রভৃতি। শেষোক্ত শাক তিনটি বাংলা দেশে জন্মে না। কুমড়ার ডাঁটা খাওয়ার প্রথা নেপালীদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও তাহারা কদাচ উহার কচি পাতা খায় না এমন কি গরুকেও খাইতে দেয় না। শুকনা শাক পাতা খাওয়ার রেওয়াজও নেপালীদের মধ্যে যথেষ্ট আছে। তাহারা উহাকে 'গুণদ্রুক' বলে। কেহ 'গুণদ্রুক' ভাজা খায় না। নেপালীরা ইহার সহিত 'বড়ি' (বড়বটি কড়াই) দিয়া মসলা সংযোগে অল্প ঝোলসিক্ত করে। 'গুণদ্রুক' দ্বারা চাটনিও হয়। তিব্বত ও ভুটান হইতে এক জাতীয় শুকনা শাক প্রচুর পরিমাণে নেপালে আমদানি হইয়া থাকে। কাঠমণ্ডুতে অবস্থান কালে কয়েকজন নেপালী ভদ্রলোকের নিকট অনুসন্ধানান্তে আমরা জানিতে পারি—উক্ত দুই অঞ্চলে উহাকে কি বলে নেপালীরা তাহা অবগত নহে। তাহারা উহাকে জিম্বু বা জিম্বু বলে। নেপালী মাত্রেই তৃপ্তি সহকারে জিম্বু খাইয়া থাকে। সরিষার তৈলে উহা ফোড়ন দিলে উহা হইতে পিঁয়াজের গন্ধ বেশ পাওয়া যায়। নেপালীরা ডালে, মাংসে ও চাটনিতে জিম্বু ব্যবহার করিয়া থাকে।

আলুর বড়া করিয়া খাওয়ার বহুল প্রচলন নেপালীদের মধ্যে আছে। নেপালীরা ভাজাভুজি জাতীয় জিনিষকে বলে তারে, যথা—আলু ভাজা=আলু তারে, শাক ভাজা=শাক তারে। গরীব নেপালীরা ভটমাস (swabean) নামক এক প্রকার কড়াই ভাজিয়া চিঁড়া অথবা ভুট্টা কিংবা গমের সঙ্গে খাইয়া থাকে। ভটমাসের আচারও প্রস্তুত হয়। বাংলা দেশে যাহাকে 'বটবটি কড়াই' বলে, নেপাল উপত্যকায় তাহাকে বড়ি বলা হয়। বড়ির গাছ লতানে। নেপালীরা বড়ির ব্যবহার যথেষ্ট করিয়া থাকে। বাংলাদেশের পদ্ধতি অনুযায়ী নেপালের ভদ্রসমাজেও বাটা ডাল হইতে 'বড়ি' প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা হয়। নেপালীরা এই বড়িকে মসোরা বলে। নেপালে মাষকলাই ডালের বড়ি গৃহস্থরা প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া থাকে। সে দেশে কলার থোড় তরকারি রাঁধিয়া খাইবার রীতি নাই। নেপালীরা স্বক্ত প্রস্তুত করিতে জানে না। কোনও নেপালী হিংচা কিংবা পলতার ব্যঞ্জন করিয়া খান না। শতমূল জাতীয় কুলিরা নামক গাছের এবং তুসা নামক এক জাতীয় বাঁশের ডগা নেপালীদের উপাদেয় খাদ্য। 'তুসা' কাটিয়া চাকা চাকা করিয়া শুকান হয়। ইহা হইতে নেপালীরা চাটনিও প্রস্তুত করে।

• কোনও নেপালী সিদ্ধ বা ভাজা কাঁচকলা এবং ওল ভাজা দিয়া ভাত খায় না। কাঁচকলা কেবল পূজার অর্ঘ্যে আবশ্যক হয়। ওল সিদ্ধ করিয়া উহাতে জিরাবাটা ও লবণ মাখাইয়া ভাতের সঙ্গে খাইবার রীতি তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। তাহারা ওলের ডালনা খাইয়া থাকে। ওল চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া মসলা মাখান হয় এবং তৎপরে তৈলে ভাজিয়া লইয়া আলু ও পিঁয়াজ সহ সিদ্ধ করা হয়। যথা সময়ে উহা নামাইয়া ঘৃত সংযোগ করা হয়। নেপালীরা এইরূপে ওলের ডালনা প্রস্তুত করে। পার্ব্বত্য ভাষায় ডালনাকে রসভয়কো তরকারি বলে। নেপালীরা মানকচু ও জলকচুর তরকারি রাঁধিয়া থাকে। পাহাড়িয়া ভাষায় জলকচুকে পিঁড়ালো এবং নেওয়ারী ভাষায় খিখি বলে। নেওয়ার জাতির লোকেরা তরকারিতে স্থলকচুর ব্যবহার অধিক করে। এই কচুকে তাহারা 'ক্যাক' বলে। নেওয়াররা ছুকুনি ও ভ্যাতল নামক তরকারি খাইতে খুব ভালবাসে। কচু গাছ প্রথমে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া হয়। যাহাতে কোনরূপ ময়লা না থাকে, তজ্জন্য উহাকে জল দিয়া ধুইয়া লইয়া তৈল-সংযোগে ভাজিয়া লওয়া হয়। ইহাকেই

'ঢুকুনির তরকারি' বলে। ঢুকুনিতে জল দিয়া মকার ভুঁড়া সহ তরকারী রাঁধিলে উহাকে 'ভ্যাতন' বলে।

অম্ল ও চাটনি :—নেপালীরা অম্ল খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে। পূর্ব্বে শীতকালে ঘটা করিয়া অম্ল খাইবার জন্য একটি বিশেষ দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। তদুপলক্ষে নেপালীরা কাজকর্ম্ম বন্ধ করিত এবং বিভালয় ইত্যাদিরও ছুটি হইত। কার্ত্তিক মাসে তাহারা পাতি ও কাগজি নেবুর আচার বা চাটনি যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকে। নেপালীরা অত্যন্ত চাটনিপ্রিয়। তাহারা কমলা লেবুর খোসা দিয়া এক প্রকার চাটনি করে। উহা খাইতে বড় উপাদেয়। নেপালীরা যত প্রকার চাটনি প্রস্তুত করে, তত প্রকার চাটনি ভারতখণ্ডের অন্যত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কতকগুলি চাটনির নাম, যথা :—আমের চাটনি, অমিলির (তেঁতুলের) চাটনি, কমলা লেবুর চাটনি, পাতি নেবুর চাটনি, আলুর চাটনি, বেগুনের চাটনি, টমাটোর চাটনি, কচি লঙ্কার চাটনি, তিলের চাটনি, কচি রশুনের চাটনি, ধনে পাতার চাটনি, কালভরি শাকের চাটনি, দুর্ব্বার চাটনি, কর্কলোর (কচু গাছের) চাটনি, ভটমাসের চাটনি, ডিম ও টমাটোর চাটনি ইত্যাদি।

মৎস্য :—গো-দুগ্ধের ন্যায় মৎস্যও নেপালে দুষ্প্রাপ্য। একারণ মৎস্যাহারে নেপালীদিগের আসক্তি কম। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে কাঠমণ্ডুতে ও অন্যত্র মৎস্য পাওয়া যায় না। সে সময় নেপালের অনেক স্থানে রুই, বাটা, পুঁটি, পাবদা, সিঙ্গি প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়। নেপালে প্রচুর পরিমাণে তপসে মাছ পাওয়া যায়। এত বড় আকারের তপসে বঙ্গদেশের কোথায়ও মিলে কি না সন্দেহ। নেপালী ব্রাহ্মণ ও ছত্রি ব্যতীত অন্যান্য জাতির লোকেরা তপসে ভোজন করে। উচ্চ শ্রেণীর নেপালী হিন্দুরাও 'বাম' (বাম মাছ) ও সিঙ্গি মাছ খায়। নেপালী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের (ছত্রির) বিধবাদের মধ্যে মৎস্য ভোজনের রীতি আছে। শুকনা মাছ আহারের বহুল প্রচলন আমরা নেপালে দেখিয়াছি। নেপালের ভুঁটি মাছ দেখিতে হিলে মাছের মত। এই মাছের রং কাল এবং লম্বাটে আকারের। হিলে মাছ সাধারণতঃ এক ছটাকের বেশী হয় না। হিলে মাছ একটু কাল রঙের। পাহাড়ী ভাষায় মাছকে 'মাছা' এবং নেওয়ারি ভাষায় 'নিয়া' বলে।

মাংস ভোজন :—একাদশী তিথিতে এবং অমাবস্যা (পিতৃপক্ষ বা প্রেতপক্ষ বলিয়া) এই দুই তিথিতে মাংসভোজন করা নেপালী হিন্দু মাত্রেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করে। পূর্ণিমা তিথিতে মাংসভোজনের প্রথা তাহাদের সমাজে প্রচলিত আছে। নেপালী মাত্রেই মাংসাহারী। কেবল নেপাল রাজ্যের সর্ব্বজ্ঞ, উপাধ্যায় এবং ভট্ট উপাধিধারী ব্রাহ্মণেরা কোনও প্রকার জীবজন্তুর মাংসভোজন করেন না। তাঁহারা নিরামিষাশী। সেখানকার অন্যান্য ব্রাহ্মণেরা কিন্তু পাঁঠা, হরিণ, ভুটে, ভেড়া, ছেঁড়া (এক জাতীয় হরিণ), কালিজ, কবুতর, তিতির প্রভৃতি পক্ষীর মাংস ও হাঁসের মাংস ভক্ষণ করেন। নেপালে শুকনা মাছের ন্যায় শুকনা মাংসেরও বহুল প্রচলন আছে। সাধারণতঃ নেপালীরা মাংসের শুকুটি, মাংসের কাবাব, মাংসের ডালনা (আলু ও পিঁয়াজ সংযোগে), মাংসের সুপ, মাংসের বল্দিকী, মাংসের চপ, মাংসের শিকর্ষি এবং মাংসের লড্ডু খাইয়া থাকে। নিম্নে কয়েকটির প্রস্তুত প্রণালী বিবৃত করা হইল :—

(ক) মাংসের শুকুটি—মাংস আগুনে কিংবা রৌদ্রে ঝলসাইয়া লওয়া হয়। তৎপরে মসলাসহ বেসন মিশাইয়া তৈল সংযোগে ভাজিয়া লওয়া হয়। মাংসের শুকুটির মসলাদি হইতেছে ধনিয়া, লঙ্কা, জিরা, আদা ও রশুন। এইরূপে মাংসের শুকুটি প্রস্তুত করা হয়। (খ) মাংসের কাবাব—ইহাতে সকল রকম মসলা ও হিং দেওয়া হয়। মাংসের সুপ—সম্ভ্রান্ত লোকেরা মাংসের ঝোলকে 'সুপ'ও বলেন। পাঁঠার মাথার মুড়া কিংবা ঠ্যাং দিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। মুড়া হইতে চক্ষু ও জিহ্বা তুলিয়া ফেলা হয়। মাতা অথবা পিতা বিদ্যমান থাকিতে কোনও সদাচারী নেপালী হিন্দু উহা ভক্ষণ করেন না। অন্যথায় ঐ দুইটি প্রত্যঙ্গ তাহাদের নিষিদ্ধ খাদ্য নহে। পূর্ব্বোক্ত প্রতিবন্ধকাদি না থাকিলে জিহ্বা ও চক্ষু সহ মুড়াটি কাটারী দ্বারা কাটাইয়া টুকরা টুকরা করিবার পর সেগুলিকে সিদ্ধ করিবার জন্য গরম জলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সিদ্ধ হইলে উহাতে মসলা দেওয়া হয় এবং অল্প ঝোল থাকিতে নামাইয়া লওয়া হয়। পাঁঠা-খাসীর ঠ্যাং দিয়া সুপ প্রস্তুতপ্রণালী নিম্নলিখিত রূপ :—খাসীর ঠ্যাং হাড় সহ কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া অন্যূন দুই ঘণ্টা কাল জলে সিদ্ধ করা হয়। তৎপরে উহাতে মসলা দিয়া স্বতন্ত্র পাত্রদ্বারা চাপা দেওয়া হয়। ঝোল অগ্নির উত্তাপে মরিয়া সামান্য পরিমাণে থাকা পর্য্যন্ত উহাকে উনানে চড়াইয়া রাখা হয়। তৎপরে উহা নামাইয়া টুকরাগুলি হইতে হাড় ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ভোজন করা হয়। আমরা শুনিয়াছি—পাঁঠা বা খাসীর মুড়ি হইতে উক্ত প্রকারে প্রস্তুত 'সুপ' বলবর্দ্ধক এবং ঠ্যাং হইতে প্রস্তুত সুপ এবং ঝোল রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

মাংসের বল্দিকী—ইহা প্রস্তুত করিতে অধিক পরিমাণ আদা, জিরা, লঙ্কা, হরিদ্রা, ধনিয়া ও ছোট এলাচ-চূর্ণ—এই এই কয়টি সংমিশ্রিত দ্রব্য, রক্ত এবং ঘৃত আবশ্যক। সুদীর্ঘ অন্ত্রটির অভ্যন্তরভাগ সর্ব্বপ্রথম জল দিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার করা হয়। তৎপরে ঐগুলি দিয়া ভর্ত্তি করিবার পর উহার দুই প্রান্ত সূতার সাহায্যে বন্ধ করা হয়। তৎপরে সেটিকে গরম জলে ফেলিয়া সিদ্ধ করা হইলে তুলিয়া লইয়া প্রায় এক অঙ্গুলি পরিমাণ মাপে কাটিয়া সরিষার তৈলে ভাজিয়া লওয়া হয়।

মাংসের লড্ডু—দা দিয়া মাংসখণ্ড খুব কুচি কুচি করিয়া

কর্ত্তন করা হয়। তৎপরে একসঙ্গে উত্তমরূপে বাটা ধনিয়া পাতা, জিরা ও ছোট এলাচ সহ ঐ কর্ত্তিত মাংস এবং পরিমাণমত লবণ সংমিশ্রিত করিয়া গুলি পাকান হয়। ইহার পর সেগুলিকে লইয়া দধি মাখাইয়া ঘৃত দিয়া ভাজিবার পর পুরাতন আচারের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। দুই দিন পরে ঐগুলিকে স্বতন্ত্র পাত্রে তুলিয়া রাখা হয়। নেপালীরা এইরূপ প্রণালীতে মাংসের লড্ডু প্রস্তুত করিয়া থাকে।

শূকর ও মহিষ-মাংস—ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে ছত্রি, নেওয়ার প্রভৃতি জাতির লোকেরা বন্য বরাহের মাংস ভোজন করিয়া থাকে। উহা তাহাদিগের উপাদেয় খাদ্য। উৎসবের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে নেপালী ছত্রিরা বন্য বরাহ ধরিয়া রাখে। ভোজনের জন্য উহাকে গুলি করিয়া মারা হয়। বাংলা দেশে শূকরকে যেরূপ নৃশংস ও বীভৎস ভাবে হত্যা করা হয়, নেপালে তদ্রূপ প্রথা অজ্ঞাত। বরাহের মাংসকে নেপালীরা বঁদেল বলে। নেপালে নেওয়ার জাতির মধ্যে চাষী, কসাই ও ওংপো-ডে—এই তিন শ্রেণীর লোক ও লিম্বু বা রাই আদি অন্ত্যজ জাতির লোকেরা তৃপ্তি সহকারে মহিষের মাংস খাইয়া থাকে। কাঠমণ্ডু সহরের মধ্যে মহিষের মাংস বিক্রয় করিবার অধিকার কাহারও নাই। সহরের বাহিরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উহা বিক্রয় হয়। সহরের মধ্যে মহিষের মাংস আনিতে হইলে উহাকে খড় অথবা অন্য কিছুর দ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদন করিয়া লইতে হইবে, যেন ধরা পড়িবার সম্ভাবনা না থাকে, নতুবা অর্থদণ্ড অনিবার্য্য।

নেপালে গো-হত্যার রীতি নাই, তবে মগর, তামাং ও ভোটে এবং হিন্দুভাবাপন্ন নেওয়ার জাতির অন্তর্গত অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে কামী, দমাই ও সার্কি—এই তিন শ্রেণীর লোকেরা মরা গরুর মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। নেপাল হিন্দুরাজ্য বলিয়া এখানে গো-হত্যা করিলে প্রাণদণ্ড হইয়া থাকে।

নেপালের ব্রাহ্মণেরা 'কালিজ' নামে এক জাতীয় পক্ষীর মাংস খাইয়া থাকেন। এই পাখীর আকৃতি অনেকটা মুর্গীর মত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য জাতির বহু লোক কবুতর, তিতির আদি পক্ষীর মাংস খাইতে ভালবাসে। নেপালের ব্রাহ্মণেরা হংস কিংবা উহার ডিম খান না। সেখানকার ছত্রি ও অন্যান্য জাতির লোকদিগের কিন্তু এই দুইটি দ্রব্য ভোজন করা সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ নহে। কোনও নেপালী ব্রাহ্মণ বা ছত্রি কুক্কুট মাংসও ভোজন করেন না। অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুরা অবশ্য কুক্কুট-মাংস ও কুক্কুট-ডিম্ব ভক্ষণ করিয়া থাকে। পার্ব্বত্য ভাষায় হংসডিম্বকে হাঁসেফুল এবং নেওয়ারী ভাষায় হাঁহেখে বলে, প্রথমোক্ত ভাষায় মুর্গীর ডিম্বকে কুখুরাফুল এবং নেওয়ারী ভাষায় খাঁখে বলা হয়। Sir Edward Blunt তাঁহার *The Social Economy of Himalayan* নামক গ্রন্থে (পৃ. ১২৬) লিখিয়াছেন:—"Poultry farming in Kumayan is confined to depressed classes only but in the neighbouring kingdom of Nepal. Conditions are quite different and every household owns a few hens and ducks." এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে বিগত ১৩৫২ বঙ্গাব্দে কাঠমণ্ডু উপত্যকায় বহু হিন্দুর বাটিতেও আমরা জাঁদরেল চেহারার মোরগ ও মুর্গী দেখিয়াছি।

কোনও ভদ্রলোক বাটীতে আসিলে তাহাকে তামাকু ও পানের মসলা দিয়া অভ্যর্থনা করাই ঐ দেশের চিরন্তন রীতি। সচ্ছল অবস্থার ব্যক্তির বাটিতে একটি রেকাবে করিয়া জলখাবার দেওয়া হয়। এই জলখাবারের উপকরণ হইতেছে মিষ্টান্ন, দুগ্ধ ও দধি, চিউড়া (চিঁড়া), আলুভাজা, ডিমের মামলেট ও আচার। এতদুপলক্ষে তুলার বিছানা পাতিয়া দেওয়া হয়। অভ্যাগত উহাতে উপবেশনপূর্ব্বক ভোজন করেন। উক্ত রেকাবের দুই পার্শ্বে দুইটি জলের গ্লাস দেওয়া হয়। তন্মধ্যে একটি গ্লাসের জল পান করা হয় এবং আর একটি গ্লাসের জল দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করা হয়। ইহার পর পানের মসলা দেওয়া হয়। এই মসলাতে সুপারি, লবঙ্গ, দারুচিনি, সুকমেল (ছোট এলাচ), জিভান, কাজু, ওখর, সোপ, ছোরা, পেস্তা, মনকা, মিছরির কুচি বা টুকরা ও মাখন—এই কয়টি দ্রব্য থাকে।

বিষাক্ত যুগ

শ্রীবিশু দত্ত

নগরীর বুকে ঘোলাটে চাঁদের ম্লান আলো পড়ে নামি,
শেষ ট্রাম চলি গেছে তুলি তার ঘর্ঘর কোলাহল।
দূরে বহুদূরে হয়তো রয়েছে যুগ-অন্তর্যামী,
কাজ নাই কিছু, শুধু আছে তার বিচার করার ছল।

পথ-ভিখারীরা রাজপথে পড়ি পোহাইছে কাল রাত্রি,
আগামী কালের দিনের আলোতে আছে কিছু আশ্বাস?
হয়তো সহিবে ক্ষুধার যাতনা, হয়তো নেশার মাতি'
দেখিতেও পারে নবীন যুগের ক্ষণিক পূর্ব্বাভাস।

কারাপ্রাচীরের অন্তরালেতে এখন জাগিছে কারা?
এ যুগকে শুধু মেনে নিতে হবে, যদি বিষাক্ত তার
বাহু দুটি মেলি ক'রে ফেলে গ্রাস। হে কবি আত্মহারা,
আমাদের তবু তার কাছে আজ নিষ্কৃতি নাই আর।

সাগর-বেলায় ফুঁসিতেছে শুধু নীল সাগরের ঢেউ,
কোথায় শান্তি? কবে হবে বলো এ যুগের সব শেষ?
জনগণ-মনে উঠিয়াছে ক্ষোভ, তোমরা দেখেছ কেউ?
এ যুগের শেষে হয়তো দেখিব "সকল পাওয়ার দেশ।"

কণ্ট্রোলের দিনকাল

শ্রীসুষমা সেনগুপ্ত, এম-এ

ধোপার সঙ্গে হিসাবটা কেবল মেলাতে আরম্ভ করেছেন গিন্নী—"অ, কেশব, তুমি তো ডোবাবে বাবা এই রেশনের দিনে, এ ধোপেও বাবুর ধুতি একখানা দাও নি, গত ধোপের বাকী গেঞ্জিটা তো বলছ এ বারেও আন নি, এ ভাবে তো চলে না বাছা, বাবু তো শুনলে রেগে অনর্থ করবেন।" হঠাৎ পর্দার আড়াল থেকে আওয়াজ এল—"মা এসম এনেছি, কোথায় রাখব বলে দিন শীগ্‌গির, কাজের টাইন্‌ চলে যায়।" (ঝি-চাকররা আজকাল সময়কে বলে টাইন্‌)। একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দেন গিন্নী "রাখ্‌না বাছা, ওঘরের মটকিতে, এত দিন ধরে কাজ করছিস, এর এত বলাবলি কি? আমার তো দশটা হাত নেই।" চাকর চলে যায়। হঠাৎ কি মনে পড়ে, গিন্নী ছুটে যান পাশের ঘরে। হরি সবে মটকির ওপর থেকে সারি সারি সাজানো তিনটে সস্‌প্যান নামিয়েছে, সেদিক পানে হাত বাড়িয়ে বলেন, "ও হরি, থাম্‌ থাম্‌ বাবা! দেখি কি চাল দিয়েছে, ভুলেই গেছলাম, ধুতি হারানোর তালে।" একটু থেমে: "ওমা, এ যে দেখছি আতপ চাল দিয়েছে, দাঁড়া, দাঁড়া, মটকিতে ঢালিস্‌ না বাছা, দেখি একটু"—এই না বলে গিন্নী সারি সারি টিন, সস্‌প্যান এসবের ঢাকা খুলে নতুন আনা চালের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, কোনটার সঙ্গে মেলে না। হরি ঝাঁঝালো সুরে বলে ওঠে, "মা, একটু তাড়াতাড়ি করুন, চায়ের বাসন পড়ে আছে, ঘর মুছতে বাকী।" সংসার যেন তারই। গিন্নী বলেন অপরাধীর মত, "তা বাবা! একটু দেরি হ'ল, কিন্তু কোনটার সঙ্গেই তো মিলছে না, যা লক্ষ্মী সোনা দৌড়ে নীচের থেকে আর একটা টিন নিয়ে আয়।" "টিন আর কোথায় পাব মা? এই তো এ ঘরেই সাতটা রয়েছে। ওঘরে চার রকমের ময়দা, আটা, চারটি টিনে রেখেছি, তারপর ছ রকমের চিনি আছে আলাদা আলাদা টিনে, গত বার আপনি তাই তো সস্‌প্যানে চাল আটা সব রাখলেন, ভুলে গেলেন নাকি?" অপ্রস্তুত হয়ে গিন্নী বলেন, "তাই তো, তাই তো, মনের কি আর কিছু ঠিক আছে বাবা নানারকম ধন্দে, আচ্ছা দাঁড়া একটু, ও কেশব, চলে যেয়ো না, একটু বসো বাছা"—হেঁকে বলেন ধোপাকে উদ্দেশ করে। তারপর চলে যান নীচে। বাসনের সিন্দুক খুলে বের করে আনেন দাগধরা একটা বড় পেতলের হাঁড়ি। বাপ দিয়েছিলেন বিয়ের সময়, সেকালের ভারী জিনিষ, আজকালকার হাল্কা এলুমিনিয়মের বাসনের আমলে কাজে লাগে না, তোলাই আছে। এনে ধরে নামান, হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, "নে বাবা চাল এতে।" ঘরের মধ্যে সাজানো অজস্র টিন, হাঁড়ি, প্যান, একটার ওপর আর একটা। কোনটাতে এক পো চাল, কোনটাতে আধ সের, কোনটাতে এক সের, সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের চাল, মেলাতে পারেন না গিন্নী। সে কালে ছিল বটে, চিনিশুঁড়ো চাল, বাতাসাভোগ, গোবিন্দভোগ, কাটারী-ভোগ, কত কি, কি তাতে সুগন্ধ, আর কি তার স্বাদ! তা সে সব চলে গেল কোথা? ভাবেন গিন্নী, এখনকার রেশনের পঞ্চাশ রকমের চাল, সবই অখাদ্য, তবু একটার সঙ্গে আর একটাকে মেশাতে প্রবৃত্তি হয় না।

ঘরের এক কোণে টেবিলে বসে মেয়ে পড়া করছিল। পেতলের হাঁড়ি দেখে ক্ষেপে ওঠে "আচ্ছা মা, তোমার কি হয়েছে বলত? পড়ার ঘরটাকে তো ভাঁড়ার করে তুললে, বরং ভাঁড়ারটাই পরিষ্কার করে দাও, সেখানেই গিয়ে পড়া-শুনো করি।" মা বলেন, "তা কি করবে মা, যখনকার যে চাল, তা বুঝে তো চলতে হয়। তোমরা হলে গিয়ে মেয়ে-ছেলে, এটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা তো তোমাদের থাকা উচিত। এই দুর্বৎসরে চাল ভাঁড়ারে রাখলে কি আর হপ্তা কুলোত? ওপরে রাখি বলেই না কিছু জমেছে। নইলে সব সাবাড় হয়ে যেত।" "তা ভাঁড়ারে তোমার অত বড় তালাটা ঝুলছে, এ অবস্থায় চুরিই বা হবে কেমন করে।"—জবাব দেয় মেয়ে। "তালা দিলে কি হবে? ভাঁড়ার দিয়ে, কুটনো কুটে ওপরে তো এলাম। সঙ্গে সঙ্গেই হয় ছুটো তেজপাতা চাই, নয় গরম-মশলা, নয় বেসন, এমনি একটা না একটা ছুতো করে বার বার ঝি-চাকরগুলো ওপরে আসবেই—চাবি ওদের হাতে দিতেই হয়, পারি না বাবা বার বার ওপর নীচ করতে।...তা মশলা-পাতি কিছু তো ওপরে আনি নি, চাল হ'ল গিয়ে লক্ষ্মী, তাকে অশ্রদ্ধা করতে নেই, আছে এক পাশে, তাতে তোমার পড়ার ক্ষতিটা কি হচ্ছে বল? বার বার পারি না বাপু ওপর নীচ করতে মোটা শরীর নিয়ে।" "না, ক্ষতিটা আর কি, তবে আরশুলা আর ইঁদুরের উৎপাতে ঘরে টেঁকা দায় হ'ল যে।" "তা চাল যখন হ'ল গিয়ে লক্ষ্মী, এক কাজ কর না কেন, ড্রয়িং-রুমের এক পাশে সাজিয়ে রেখে দাও। লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ঠিক জায়গায়ই হবে।" লেখাপড়া জানা মেয়ের লম্বা লেকচার শুনবার সময় নেই, পড়ে রয়েছে শত কাজ, করবার সময় নেই, ঘর থেকে বেরিয়ে যান গিন্নী। শুধুই যে মেয়েদের পড়ার ঘরে তা নয় নিজেরও শোবার ঘরে, খাটের নীচে, দরজার আড়ালে, আলমারীর ফাঁকে রয়েছে আটার টিন, ঘিয়ের টিন, চিনির বয়াম, বাতাসার কৌটা, গুড়ের ভাঁড়, তবে অতটা চোখের উপর নয়, কর্তার নজর এড়িয়ে। মাঝে মাঝে কর্তা বলেন একটু লেখাপড়ার চর্চা করতে, খরর্‌ খরর্‌ করে উড়ে বেড়ায় আরশোলা—চেঁচিয়ে ওঠেন

কর্তা, "তোমার ভাঁড়ার নীচে সরাবে কিনা বল। নয়তো ভাঁড়ারঘর পরিষ্কার করে দাও। আমি না হয় সেখানে গিয়েই আশ্রয় নিই।" এসব কথার জবাব দেন না গিন্নী, সংসারে থাকতে হলে এসব কথায় কান দিলে কি আর চলে!

কর্তার পাঞ্জাবী সব ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু কালোবাজারে কাপড়-চোপড় কেনবার পক্ষপাতী নন তিনি। গিন্নী আর ছেলেমেয়ে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে স্পষ্টাক্ষরে একথা জানিয়ে দিয়েছেন—ওসব চলবে না।

সবাই খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেলে, কাপড়ের কার্ড ক'খানা হাতে নিয়ে গিন্নী ধীর মন্থর গতিতে রওনা হন রেশনের কাপড় আনতে। এবারে দোকানে এসেছে শুধুই ড্রিল। তাই কেনেন ১২ গজ, কিছু পাওনা কাপড় বাকি রেখেই ফিরে আসেন, কর্তার পাঞ্জাবী না বানালেই নয়। অথচ ওমাসে উনি ট্রাউজার বানাবার জন্ম বাজারে কাপড় খুঁজে না পেয়ে, দোকান থেকে অর্ডার দিয়ে বানিয়ে আনলেন, তাতে খরচ পড়ল ঢের বেশী।

বিকেলে ইস্কুল থেকে বাড়ী এসে মেয়ে বলে, "মা, তুমি ক্ষেপেছ, ড্রিল দিয়ে পাঞ্জাবী হবে কি করে?" "তা কি করি মা, সব তো আর ইচ্ছেমত পাওয়া যায় না, যা দিনকাল পড়েছে।" কর্তা দেখে বলেন, "ঠিক আছে, ওটা সংস্কার বই তো নয়! যে কাপড়ে প্যান্ট কোট তৈরি হয় তাতে পাঞ্জাবী হবে না, এ কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? সবাই পরতে শুরু করলে দু'দিনেই চালু হয়ে যাবে।"—সপ্তাহ খানেক বাদে কর্তার গায়ে চড়ে ড্রিলের পাঞ্জাবী।

আর তিনখানা কার্ডের কাপড় পাওনা আছে। সামনের সপ্তাহে যেতে বলে দিয়েছে, মিহি কাপড় আসতে পারে। নির্দিষ্ট তারিখে গিন্নী গিয়ে দাঁড়ান লাইনে, ধৈর্যের চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পান বেশ চমৎকার মিহি মলমল। ভাবেন, আহা, কিছুদিন অপেক্ষা করলেই হ'ত, মোটা মানুষ গরমে এই ভারী পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে বেড়ান, তা রেশনের কাপড়-ওয়ালারা শুধু মিথ্যা আশ্বাস দেয় এটাই তো হামেশা দেখে আসছি, এরা যে আবার সত্য কথা বলবে তা কে জানত! মলমল নিয়ে আসতে কর্তা বলেন, "পাঞ্জাবী তো হ'ল, এখন চারটে পায়জামা করিয়ে নিই এবারকার কাপড় দিয়ে।" ধুতি পরা ছেড়েছেন বহুকাল, আপিসে যান প্যান্ট কোট পরে, বাড়ীতে পায়জামা। গিন্নী বলেন, "সে কি গো, এই পাতলা কাপড়ে পায়জামা?" কর্তা বলেন, "তাতে কি হয়েছে, কিন্‌কিনে ঢাকাই, শান্তিপুরে ধুতি পরতে দেখ নি বাবুদের? এত পাতলা কাপড় পরা যদি চলতে পারে তো পায়জামার কথায় চমকাবার কি আছে?"

হাল্কা মলমলের পায়জামার ওপর মোটা ড্রিলের পাঞ্জাবী চড়িয়ে নির্বিকার চিত্তে ঘুরে বেড়ান কর্তা, হাটে বাজারে পার্কে। দুখানা ধুতি আছে, ভদ্রবেশধারী হয়ে নিমন্ত্রণের আসর ইত্যাদিতে গিয়ে লৌকিকতা রক্ষার সেই একমাত্র সম্বল।

"মা, একটা টাকা দিও, আজ সেলাইয়ের কাপড় দেবেন বলেছেন টিচার" মেয়ে এসে জানায়। হঠাৎ গিন্নী প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা তোদের ইস্কুলেও রেশন কার্ড দেয় নাকি রে? কাপড় কেনে কোথা থেকে?" "ও, সে আমাদের সরকার থেকেই দেয়, দরখাস্ত দিতে হয়।"—বিজ্ঞের মত জবাব দেয় মেয়ে।

মেয়ে বিকেলে ইস্কুল থেকে দু' টুকরো কাপড় এনে দেখায়, চমৎকার মিলের শাড়ী-কাটা একটা টুকরো, একটা টুকরো, ধুতি-কাটা। "এ কিরে! আহা, এমন ফাইন শাড়ী ধুতি কেটে এ দশা করলে গা! তোদের টিচারদের এ কি কাণ্ড?" "বাঃ রে, এ ছাড়া কি আর করবে, আমাদের যে সেলাই শেখবার জন্য সরকার থেকে কাপড় বলতে পাঠিয়েছে শুধু ধুতি আর শাড়ী, তাই দিয়েই নাকি কাজ চালাতে হবে। তাই তো কেটে কেটে দিচ্ছে আমাদের সব, এক টুকরো দিয়ে হবে ব্লাউজ, আর এক টুকরোতে রুমাল করতে হবে আমাদের।" গিন্নীর পরনে রঙীন লংক্লথের শাড়ী, পুরনো পাড় বসানো। তিনি ভাবেন মনে মনে, হাড় জ্বালানে সরকার, ব্যবসা যদি ঠিকমত করতেই না পারবি তো ঝক্কি নেওয়া কেন ঘাড়ে? তোদেরও জোড়াতালি, আমাদেরও হয়রানি।

* * *

এদিকে ভোরের বেলা চায়ের টেবিলে বসে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, "মা, মুড়ি কেন সকালেই?" কর্তা বলেন, "ঘুম থেকে উঠেই মুড়ি চিবোবার মত দাঁতের জোর কি আর আছে? চা দাও এক পেয়ালা, গিলে উঠি।" "পাঁউরুটি পাওয়া যাচ্ছে না।"—বললেন গিন্নী। কর্তা বলেন, "হাতে গড়া রুটি তো চলতে পারে।" "রেশনে আটাই মেই ক' হপ্তা ধরে, তা হাতগড়া রুটি।"

দুপুরে খেতে বসেন কর্তা, গিন্নী সামনে বসেন হাত-পাখা নিয়ে, এটা দীর্ঘকালের অভ্যাস। পাতে পড়ে ডেলা ডেলা ভাতের দলা, গরম হয়ে ওঠেন কর্তা, "ঠাকুর ভাত চড়িয়ে কোথায় বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ সারতে গিয়েছিলে, ভাত যে একেবারে পুলিপিঠে হয়ে উঠেছে।" ঠাকুর উত্তর দেয়—"তা কি করব বাবু, একে আতপ চাল তায় আবার নয়া পুরোনো মেশানো, পুরোনো চাল সেদ্ধ হতে হতে নয়া চাল যায় গলে, তা আমি কি করব।" গিন্নীর ওপর চটে ওঠেন কর্তা "বলি টিনে টিনে রকমারি চাল সাজিয়ে তো গোটা বাড়ীটাকে চালের একটা প্রদর্শনী করে তুলেছ। এখনকার রেশনের চালের সঙ্গে সরু চাল না মেশাবার জন্যে রোজ তারস্বরে ঠাকুরকে যে নির্দেশ দিয়ে থাক তাও কানে আসে। ও সব চাল রেখেছ কি আমার শ্রাদ্ধের জন্য?" গিন্নী বলেন, "কথার ছিরি দেখ না, ওই দুটি তো মোটে চাল, অসুখ-বিসুখ আছে, লোকজনকে খাওয়ানো-দাওয়ানো আছে, মেয়ে জামাই আত্মীয় কুটুম আসে—ও দুটি

জমা না রাখলে চলে কি করে?" চুপ করে যান কর্তা, সেই ভাতের ওপর ডাল ঢেলে দিয়ে গর্জে ওঠেন—"তা ভাতের মাঝে তোমার পুলিপিঠেই না হয় গিলতে হবে কিন্তু ডালে এমন ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে গন্ধ কেন? এসব কি তুমি পিণ্ডি চটকাচ্ছ ঠাকুর।" মুখ কাঁচু-মাচু করে বলে ঠাকুর, "গন্ধ! পোড়া তো লাগে নি।" নির্ব্বিকার ভাবে ডালের বাটি নাকের কাছে তুলে বলে, "ও:! ধোঁয়ার গন্ধ হবে, বাবু ও কিছু না, ডালটা হতে হতে আঁচটা নিবে গেল কিনা, তা দুটি কয়লা দিয়ে হাওয়া করে আঁচটা ঠিক করে নিলাম, নইলে তো আপনাদের টাইনের ভাত হবে না। তা কণ্ট্রোলে এবার কয়লা দিয়েছে একদম কাঁচা, বেজায় ধোঁয়া উঠল, ডালটা উনুনের ধারে ছিল কিনা তাই একটু গন্ধ হ'ল বটে, তা খেয়ে নিন্, কি আর করবেন? কণ্ট্রোলের বাজারে অমন একটু আধটু হয়।"—বলে ঠাকুর নির্ব্বিকারভাবে পরিবেশনে মনোনিবেশ করে। অনেক দিনের পুরোনো লোক, কর্ত্তার বকুনি তার গা-সওয়া হয়ে গেছে। কর্ত্তা আর কথা বলেন না, ডালের ওপর ঝোল তরকারি সব ঢেলে দিয়ে কোনমতে গলাধঃকরণ করেন নিঃশব্দে। খাওয়া শেষ হলে উঠতে উঠতে গিন্নীকে বলেন, "দেখ, এক কাজ করা যাক, কি দরকার এত সব ঝামেলায়? সকালে উঠে এক হাঁড়ি জলে চাল, ডাল, তেল, নুন, তরকারি, মশলা একত্র মিশিয়ে ঘেঁটে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায় আর ঠাকুর চাকরের খরচটাও বাঁচে।"

সবাই খেয়েদেয়ে চলে যায়। গিন্নীর চোখে জল এসে পড়ে। কর্ত্তা চিরকাল খাইয়ে লোক, তাঁকে যে অখাদ্য গলাধঃকরণ করে কোন মতে পিত্তরক্ষা করতে হয় এ দুঃখ তাঁর মনে বড় বাজে। মনে মনে কণ্ট্রোলের দিনকালকে তিনি অভিসম্পাত দেন। খেয়ে উঠে ভাবেন, বিকেলে কি জলখাবার করি? হঠাৎ মনে পড়ে রেডিয়োতে শুনেছিলেন কুমড়োর হালুয়া, আর চালকুমড়োর পোলাও, এ দুটির প্রস্তুত-প্রণালীর কথা। অথৈ জলে যেন ডাঙায় আশ্রয় পান গিন্নী। রান্নাঘরে গিয়ে বসেন তরকারির ডালা নিয়ে। কুচি কুচি করে কাটতে থাকেন কুমড়ো আর চালকুমড়ো—তাই দিয়ে তৈরি হবে কণ্ট্রোলের দিনের অভিনব হালুয়া আর পোলাও।

ফারমেণ্টেশন

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায়

এ বিশ্বজগতে প্রাণিদেহ এবং বিভিন্ন বস্তুর রূপান্তরের মূলে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান সাধারণের তাহা জানা নাই। ক্ষুদ্র উদ্ভিদ-বীজের বিশাল মহীরুহে পরিণত হওয়ার মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটি প্রশস্ত অধ্যায় নিহিত আছে। পাহাড়ের ক্রমবিবর্দ্ধন বা ক্রম-সংকোচন, দুগ্ধের অম্লত্বপ্রাপ্তি, পচনশীল বৃক্ষাদি লতাপাতা, জীব-জন্তুর পূতিগন্ধময় অবস্থা, ধাতব পদার্থের মরিচা, অগ্নি-কর্ত্তৃক কাষ্ঠদাহন প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়—ঐ রাসায়নিক প্রক্রিয়ারই বৈচিত্র্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। জলজ চিনি যেদিন সুরাসারে পরিণত হইয়াছে সেই দিন হইতে রসায়ন-শাস্ত্রের কিণ্ন বা ফারমেণ্টেশন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। ইহা রসায়নশাস্ত্রবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

প্রকৃতির মহলে সংযোজন ও বিয়োজন অনবরত প্রকট। ফারমেণ্টেশন সাধারণতঃ রাসায়নিক বিয়োজনের অঙ্গ। ইহার ফলে উত্তাপ বৃদ্ধি পায় আবার কখন কখন গ্যাস সৃষ্টি হয়। ইহার প্রকৃত স্বরূপ কি, ইহার কাজই বা কি এ প্রশ্ন স্বভাবতঃ মনে উদিত হয়। এক প্রকার সূক্ষ্ম জীবাণু বা উদ্ভিদ-শরীর ফারমেণ্টেশনের উৎপাদক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। উহারা নিজেরা অথবা উহাদের প্রতিনিধিগণ ফারমেণ্টেশন উৎপাদনকার্য্য সাধন করে। ঐ প্রতিনিধিগণ রাসায়নিক জৈব পদার্থ এবং প্রোটিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানীরা উহাদের এনজাইম্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

ফারমেণ্টেশন কথাটি কিন্তু বহুদিন আগেকার। প্রাচীনকালে চিনি বা গুড় হইতে সুরাপ্রস্তুত-পদ্ধতির নাম ছিল ফারমেণ্টেশন। উক্ত ব্যাপারে একটি গ্যাস উত্থিত হইতে দেখিয়া সম্ভবতঃ এ নামটা দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত গ্যাসের উৎপত্তি ও ক্রমবর্দ্ধমানতাই ফারমেণ্টেশনের পরিচয় দিত। পুরাতন মিশরীয়গণ মদ তৈয়ার করিবার প্রণালী জানিতেন। ক্রমে ফরাসীদেশ ইহা বিশেষ করিয়া গ্রহণ করে এবং প্রস্তুত-প্রণালীটির সম্যক্ উন্নতিসাধন করে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশে মদ প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। আঁশ বা সেলুলজ, শ্বেতসার ও শর্করা প্রভৃতি পদার্থকে সাধারণতঃ সুরায় পরিণত করা যায়। যদি আর্দ্র তৃণ বা খড়কুটাকে কোথাও স্তূপাকারে সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়, কিছুদিন পরে দেখা যাইবে উহাদের মধ্যে পচন আরম্ভ হইয়াছে। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় উহাদের মধ্যে তাপোদ্রেক হইয়াছে। ফেলিয়া রাখিলে ফল, মূল, পত্র, ফুল ইত্যাদি পদার্থেরও একই

পরিণতি হয়। জীবশরীরও ঐ অবস্থায় গলিতগলিত পূতি-গন্ধযুক্ত হয়। এগুলি সবই ফারমেণ্টেশনের দৃষ্টান্ত। বৃক্ষচ্যুত পত্র বা ডালপালা ডোবা বা পুকুরে পতিত হইলে ক্রমশঃ পচিয়া একটি গ্যাস উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা ফারমেণ্টেশনের আর একটি উদাহরণ। এমনকি ভূগর্ভে কয়লার উৎপত্তিও কতকটা ফারমেণ্টেশনের দরুন হইয়া থাকে।

ফারমেণ্টেশনের সৃষ্টির রাসায়নিক তাৎপর্য্যটা কি? কোন অদৃশ্য এজেণ্ট ইহার পেছনে আছে কিনা। এ সমস্ত প্রশ্ন লইয়া অনেক জল্পনাকল্পনা হইয়াছে। এদিকে বহু বিজ্ঞানী নিজেদের অভিজ্ঞতার ফলাফল ব্যক্ত করিয়াছেন। উক্ত গবেষকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক লাভোসিঁও, গে-লুজাক, পাস্তর, ট্রবে, বুক্‌নার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। লাভোসিঁও প্রমাণ করেন যে মদ প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে যে গ্যাসটি উত্থিত হয় তাহা অঙ্গার গ্যাস। গে-লুজাক দেখাইলেন যে, ফারমেণ্টেশনে বায়ুর বিদ্যমানতা একান্ত আবশ্যক। কগনিয়ার্ড প্রমাণ করেন যে ইষ্ট নামক যে ক্ষুদ্র জৈব পদার্থ দ্বারা চিনি পচান হয়, তাহা একটি অতি সূক্ষ্ম এক-কোষ উদ্ভিদশরীর। তিনি ইহাও প্রমাণ করেন, প্রথমে অঙ্কুরোদ্গম হইয়া ইষ্ট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। মনীষী পাস্তর বলেন, ফারমেণ্টেশনের পিছনে ক্ষুদ্র জীবাণুর ক্রিয়া বর্ত্তমান। উহাদের পরিবর্ত্তনে ফারমেণ্টেশন সঞ্জাত হয়। পাস্তরের গবেষণা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। কিন্তু তিনি ফারমেণ্টেশনের রাসায়নিক ব্যাখ্যার দিকে বিশেষ অবহিত হন নাই। ১৮০৮ সনে ট্রবে যে বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেন তাহার মোটামুটি যুক্তিযুক্ততা বৈজ্ঞানিক জগৎ গ্রহণ করিয়াছে। ট্রবে বলেন যে উক্ত প্রক্রিয়াটির পিছনে একটি রাসায়নিক পদার্থ সক্রিয় থাকে। এই পদার্থটি নিজ দেহ হইতে ক্ষুদ্র জীবাণু সরবরাহ করে। ফারমেণ্টেশনের স্বরূপ ও ক্রিয়া সম্বন্ধে ট্রবের ব্যাখ্যা মনীষী বুক্‌নার কর্ত্তৃক বিশেষভাবে সমর্থিত হয়। বুক্‌নার ইষ্ট পিষিয়া নির্য্যাস গ্রহণ করেন এবং প্রমাণ করেন যে উক্ত রস দ্বারাও ফারমেণ্টেশন সমুৎপন্ন হইতে পারে। তিনি ইষ্টের মধ্যে 'জাইমেজ' নামক এনজাইমটির বিদ্যমানতা নির্দ্ধারণ করেন। এনজাইম গোষ্ঠির মধ্যে জাইমেজের সঙ্গেই প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রথম পরিচয় স্থাপিত হয়।

এনজাইম সরবরাহের জন্য জীবাণুসকল উপযুক্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। এই জীবাণুদের সহায়তা ছাড়া এনজাইম পাওয়া কঠিন। উহাদের সরবরাহের ব্যবস্থা অতি চমৎকার। উহারা অতি শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে ফারমেণ্টেশন সৃজন করে। অত্যন্ত কঠিন জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পর্য্যন্ত উহারা তাপের সমতা রক্ষা করিতে পারে। দেখা গিয়াছে, ফারমেণ্টেশন বা পচন-ক্রিয়াক্ষেত্রে সাধারণতঃ উষ্ণতা থাকে ৩০°—৪৫° মাত্র। মানুষের রাসায়নিক বিক্রিয়া ও প্রাকৃতিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য এক্ষণে সম্যক্ অনুভূত হয়।

ইষ্ট কোষগুলি এনজাইম (জাইমেজ ইত্যাদি) জোগান দিয়া চিনিকে মদে পরিণত করে। ফারমেণ্টেশন ব্যাপারে এনজাইমের এরূপ আরও অনেক প্রকার কর্ম্মতৎপরতা দেখা গিয়াছে। কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণুদ্বারা যে বহুবিধ ফারমেণ্টেশন সঞ্জাত হয় তাহার প্রমাণও বিরল নহে। সেখানেও সম্ভবতঃ এন্‌জাইমগুলির ক্রিয়া বিদ্যমান থাকে। বুটাইল এলকহল, এসিটোন, এসেটিক এসিড প্রভৃতি কতকগুলি জৈব পদার্থ প্রস্তুতিতে ক্ষুদ্র জীবন্ত কোষের ক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। কারণ ঐ সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ তৈয়ার করিবার জন্য জীবাণুদের সাহায্য লওয়া হয়। উদ্ভিদ জাতীয় সূক্ষ্ম কোষের কর্ম্মতৎপরতা ইষ্টের মধ্য দিয়া প্রমাণিত হয়। অঙ্কুরিত বার্লি বা মণ্টদ্বারা শ্বেতসার যে ফারমেণ্টেড হয় ইহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আজকাল মদ প্রস্তুতিতে কাঁচামাল হিসাবে শ্বেতসারই ব্যবহৃত হয়। ইহা মণ্ট ও ইষ্টের মিশ্রণজাত প্রক্রিয়ায় ক্রমশঃ মদে পরিণত হয়। এক প্রকার ব্যাঙের ছাতা বা মউল্ড (mould) দ্বারাও ফারমেণ্টেশন উৎপাদন সম্ভব হয়। জার্ম্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেন প্রভৃতি স্থানে মদ প্রস্তুতিতে এই মউল্ডই ব্যবহৃত হয়। মিউকর বিটা বা রিজোপাস্ নামক এক জাতীয় ছত্রাক (mushroom) শ্বেতসারকে বিচূর্ণ করিয়া মদ প্রস্তুত করে। যে সমস্ত জীবাণু বা কোষ ফারমেণ্টেশনের মূলাধার তাহাদিগকে ফারমেণ্ট নামেও অভিহিত করা হয়। ফারমেণ্টগণ উপযুক্ত আহার পাইলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সাধারণতঃ উহারা নাইট্রোজেন, ফস্ফরস, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত খাদ্য পছন্দ করে। উক্ত যৌগিক পদার্থযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করিয়া ইষ্ট ব্যবসায়ীগণ প্রচুর ইষ্ট তৈয়ার করেন। এনজাইমগুলি প্রোটিনজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। ফারমেণ্ট নামক সূক্ষ্ম কোষগুলিতে যথেষ্ট এনজাইম থাকায় আজকাল ঐরূপ কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ মনুষ্য-খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। বলবর্দ্ধক খাদ্য বা ঔষধ হিসাবে ইষ্ট বটিকা বাজারে নাম করিয়াছে।

ফারমেণ্টেশন দ্বারা ল্যাকটিক এসিড ও সাইট্রিক এসিড প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। ল্যাকটিক ফারমেণ্ট নামক একটি জীবাণু দুধ হইতে ল্যাকটিক এসিড আহরণ করে এবং এসপার গিলাস নাইগার জাতীয় ছাতা গ্লুকোজকে সাইট্রিক এসিড রূপ দিয়া থাকে।

রাষ্ট্রের গোড়ার কথা

শ্রীআশা মুন্সী

রাষ্ট্রের গোড়ার কথা বলতে গেলে মানুষের সামাজিক জীবনের ক্রমবিকাশের কথা প্রথমে বলতে হয়। মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ ছাড়া তার চলে না। রাষ্ট্র সমাজেরই একটি বিশেষ অঙ্গ। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক দার্শনিক এ্যারিস্টটল রাজনীতি বিষয়ক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'মানুষ রাষ্ট্রীয় জীব' (political animal)। গ্রীক-সমাজে তখনকার দিনে সমাজ বলতে রাষ্ট্রই বোঝাত। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে বিশেষ কোনও পার্থক্য আছে তা গ্রীক মনীষীরা মানতেন না। রাষ্ট্রের যখন সৃষ্টি হয় নি, তখনও মানুষ ছিল সামাজিক জীব। সমাজে এক একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে তারা বাস করত। রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন কবে থেকে হ'ল, সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হলে সমাজের ক্রমোন্নতি কি করে হ'ল, সেইটে আগে দেখতে হয়।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে দার্শনিকেরা গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, মানুষ রাষ্ট্রের ভিত্তি পত্তন করে পারস্পরিক চুক্তির দ্বারা। চুক্তিটি নিষ্পন্ন হবার আগে মানুষ ছিল নিছক প্রকৃতির সন্তান। যে জগতে সে বাস করত তাকে বলা চলে প্রকৃতির রাজ্য। সে রাজ্যে মানুষ প্রকৃতির নিয়মের দাস ছিল। মানুষের তৈরী আইন কানুন মেনে চলবার কোনও বাধ্যবাধকতা সেখানে ছিল না। সে রাজ্যে না ছিল রাজা, না ছিল প্রজা। বিভিন্ন দার্শনিক এই প্রকৃতির রাজ্যের বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা করেছেন। ইংরেজ দার্শনিক টমাস হব্‌স তাঁর বই *Leviathan*-এ এই প্রকৃতির রাজ্যের যে বর্ণনা করেছেন, তা ভয়াবহ। তাঁর মতে তখন মানুষের একমাত্র চিন্তা ছিল কি করে আর একজনের সর্ব্বনাশ করা যায়। তিনি বলেছেন সেই আদিম যুগে—'A life was solitary, poor, short, brutish, nasty'। ঐ ধরণের জীবন যাপন করে যখন মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, তখন সবাই মিলে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক চুক্তি করলে। তারা সম্মিলিত ভাবে বললে, 'আমাদের প্রত্যেকের শক্তি আমরা আজ থেকে একজনের হাতে দিয়ে দিলাম, আমাদের সম্মিলিত শক্তি সেই একজনকে মহাশক্তিশালী করে তুলবে। আজ থেকে সে হ'ল আমাদের রাজা, আর আমরা হলাম তার প্রজা। এই রাজার আদেশ নির্ব্বিচারে মেনে নিতে আমরা বাধ্য।' রাজা হলেন সর্ব্বশক্তিমান, তার বিরুদ্ধে প্রজার আর কোনও শক্তিই রইল না, হব্‌সের মতে এই হ'ল রাষ্ট্রের ভিত্তিপত্তনের মূল কথা। প্রকৃতির রাজ্যের ধারণায় এবার এল মানুষের রাজ্য বা রাষ্ট্র। লক্‌ তাঁর *Treatise of Civil Government*-এ আবার প্রকৃতির রাজ্যের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে মোটের ওপর সুখেই ছিল, কিন্তু তাদের শাসন করবার কেউ ছিল না বলে, নানা রকম অসুবিধা তাদের ভোগ করতে হ'ত। সবাই মিলে তখন তারা এক চুক্তি করে একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করলে। সকলের সম্মিলিত শক্তি এই শাসনতন্ত্র বা গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতাশালী করে তুললে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই দায়িত্ব রইল যে, তার সকল শক্তি সর্ব্বসাধারণের হিতকর কাজে লাগাতে হবে। ক্ষমতার অপব্যবহার হলেই তার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হবে। যতদিন গবর্ণমেণ্ট এই সর্ত্ত মেনে চলবে ততদিন সবাই তার নির্দ্দেশ বা আইন মেনে চলতে বাধ্য। এমনি ভাবেই সৃষ্টি হ'ল শাসক ও শাসিত এই দুই সম্প্রদায়—যাদের নিয়ে গঠিত হ'ল রাষ্ট্র। ফরাসী দার্শনিক রুশো তাঁর *Contract Social*-এ লিখেছেন, প্রকৃতির রাজ্যের যুগ ছিল স্বর্ণযুগ। মানুষ সে-যুগে নিজেদের পরম সুখী মনে করত। অবাধ স্বাধীনতা ছিল তার, কোনও রকম সামাজিক বিধিনিষেধ ছিল না। অত সুখের রাজ্যেও এমন কয়েকটি অসুবিধা দেখা দিলে যাতে মানুষ উপলব্ধি করলে যে, তার শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে শাসকের প্রয়োজন, আইনের প্রয়োজন। তখন তারা নিজেদের মধ্যে এক চুক্তি করে, সকলের ইচ্ছা বা will দিয়ে সম্মিলিত এক ইচ্ছাশক্তি বা General will গড়ে তুলল; স্থির হ'ল এই General will কার্য্যকরী হবে গবর্ণমেণ্টের হাত দিয়ে, যার আদেশ বা আইন মেনে নিতে সবাই বাধ্য। মানুষের অবাধ স্বাধীনতা গেল, কিন্তু গড়ে উঠল রাষ্ট্র—যার ভেতরে মানুষ হ'ল আইনের নিগড়ে আবদ্ধ।

ঐতিহাসিকেরা কিন্তু রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন সম্পর্কিত এই মতবাদ মেনে নিতে রাজী নন। তাঁদের মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি একটি চুক্তির ওপর নির্ভর করে হয়েছে, এ ধরণের উক্তি কোনও ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় না। তাঁরা বলেন, রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ হয়েছে—তা হঠাৎ গজিয়ে ওঠে নি। যুক্তিবাদীরা বলেন, চুক্তি-মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁরা এই যুক্তি উত্থাপন করেন যে, মানুষ চুক্তি করেই যদি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে থাকে, তা হলে তখন রাষ্ট্র সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের জন্মই যদি চুক্তির পর হয়ে থাকে তা হলে চুক্তির আগে মানুষের রাষ্ট্র সম্বন্ধে জ্ঞান এল কোথা থেকে? এই সমস্ত যুক্তি প্রদর্শনের দরুন এবং আরো নানা কারণে চুক্তি-মতবাদ আর টিকল না।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে লোকেদের ধারণা ছিল রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি, রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। প্রজার পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে

সন্তুষ্ট হয়ে ঈশ্বর ভারবান, দয়ালু রাজা পাঠাতেন। আবার প্রজার পাপের শাস্তিস্বরূপ আনতেন অত্যাচারী রাজা। বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ রাষ্ট্রের উৎপত্তির এত সহজ ও আজগুবি মীমাংসাতে সন্তুষ্ট নয়। তা ছাড়া রাজাকে নির্বিচারে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মেনে নেবার মত মনোভাবও আর লোকের নেই।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ আছে—যাকে বলা হয় Theory of Force বা বলপ্রয়োগনীতি। এই মতবাদ অনুসারে গোড়ার রাষ্ট্র দৈহিক শক্তি বা বাহুবল দ্বারা সৃষ্ট হয়। কি করে হয়, ওপেনহ্যাম তাঁর বই 'দি ষ্টেট'-এ তার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে কয়েকটি ধাপ বা যুগ আছে। সেই আদিম যুগে মানুষ বনে-জঙ্গলে বিচরণ করত আর শিকার করে জীবিকা অর্জ্জন করত। এই যুগে মানুষ স্থায়ীভাবে কোনও এক জায়গায় বসবাস করত না। শিকারের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াত। তারপর এল পশুপালনের যুগ। সে যুগে মানুষ, যতদিন পর্য্যন্ত এক জায়গায় পশুর আহার মিলত, ততদিন পর্য্যন্ত সেখানেই আস্তানা গেড়ে বাস করত। পশুর আহার ফুরিয়ে এলেই, যেখানে পশুখাদ্যের প্রাচুর্য্য তেমন কোনো জায়গায় সরে যেত। তারপর এল চাষবাসের যুগ, এই যুগে মানুষ যে জমি চাষ করত, সেই জমির নিকটেই স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগল কারণ তা না হলে জমি চাষ করে বীজ বপন করে ফসল তোলা সম্ভবপর নয়।

মানুষের সামাজিক জীবনের উন্নতি সকল জায়গায় সমভাবে হয় নি। কোথাও কেউ এগিয়ে গেছে আবার কোথাও বা কেউ পিছিয়ে পড়েছে। এক জায়গায় যখন একদল শুধু শিকার করে জীবনধারণ করছে, অন্য জায়গায় তখন আর একদল পশুপালন করছে, আবার আর এক জায়গায় হয়তো তখন আর একদল চাষবাস করতে সুরু করেছে, এই সব বিভিন্ন দলে প্রায়ই সংঘর্ষ বাধত। একদল শিকারী এসে হয়তো একপাল পশুপালক বা চাষীকে আক্রমণ করলে, বা এক দল পশুপালক হয়তো চাষী বা গৃহস্থদের এলাকায় এসে চড়াও হ'ল। এই সব সংঘর্ষের ফলে বিস্তর প্রাণহানি ও প্রচুর ক্ষতি হ'ত। প্রথম প্রথম বিজয়ী দল বিজিত দলকে একেবারে নির্ম্মূল করে দিয়ে তাদের যা কিছু পুঁজিপাটা সব নিয়ে চলে যেত। ধীরে ধীরে মানুষের এই জ্ঞান হ'ল যে এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের দ্বারা আখেরে তারা খুব লাভবান হচ্ছে না। পরাজিতকে একেবারে নির্ম্মূল না করে যদি বাঁচিয়ে রাখা যায়, তা হলে ভবিষ্যতে তাদের নানাভাবে খাটিয়ে নিজেদের মতলব হাসিল করবার আশা থাকে। এরপর সুরু হ'ল পরাজিতের উপর বিজয়ীর প্রভুত্ব ফলানোর প্রচেষ্টা। বিজিতেরা মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেল বটে, কিন্তু এই অনুগ্রহ লাভের পরিবর্ত্তে তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হ'ল যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথানির্দ্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বা প্রয়োজনীয় বস্তু তারা বিজেতাদের ভাণ্ডারে এনে জমা করবে। এইখানে বিজেতা হ'ল প্রভু, বিজিত হ'ল তার দাস। প্রথমোক্তের দায়িত্ব রইল, বাইরের আক্রমণ থেকে শেষোক্তকে তার রক্ষা করতে হবে। পরাজিতেরা তখন বিজেতাদের অধীনে থেকে তাদের আদেশ অনুসারে চলতে বাধ্য হ'ল। Theory of Force বা বলপ্রয়োগনীতি অনুসারে এমনি করে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হ'ল। বলপ্রয়োগনীতির মূলকথা—দুর্ব্বলের ওপর সবলের অত্যাচারই হচ্ছে রাষ্ট্রের ভিত্তি। এখনও রাষ্ট্রের পেছনে অনেকখানি ক্ষমতা আছে বলেই আমরা রাষ্ট্রের আদেশ মেনে চলতে বাধ্য হই। ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন, এই মতবাদে যথেষ্ট সত্যতা আছে। কিন্তু তবু তাঁরা এটাকে পুরোপুরি ভাবে মেনে নিতে রাজী নন। তাঁরা বলেন, দুর্ব্বলের ওপর সবলের অত্যাচার রাষ্ট্রসৃষ্টির একটা কারণ হতে পারে, কিন্তু এইটেই একমাত্র কারণ নয়—রাষ্ট্রসৃষ্টির মূলে আরো নানাবিধ কারণ কার্য্যকরী হয়েছিল। রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্বন্ধে ক্রমবিকাশ মতবাদই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। এই মতবাদই আজকালকার পণ্ডিতগণ স্বীকার করে নিয়েছেন, চলেন, তাঁরা বলেন, রাষ্ট্রের সৃষ্টি আকস্মিক নয়। মানুষের সমাজ-জীবনে নানা অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ সাধিত হয়েছে। মানুষ পৃথিবীর বুকে জন্ম নেবার পর থেকেই নিজেকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রাণপণ চেষ্টা করে থাকে। যুগ-যুগান্তর ধরে সেই চেষ্টা চলে আসছে এবং এরই ফলে ক্রমবিকাশের পথ ধরে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষের সঙ্গে পশুর একটা মূলগত পার্থক্য এই যে শেষোক্তটির তুলনায় মানুষের শৈশবকাল দীর্ঘ। মানবশিশুকে দীর্ঘকাল অসহায় অবস্থায় কাটাতে হয়। এই সময়টা তাকে মাতা পিতা বা অন্যের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকতে হয়। দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করার ফলে স্বভাবতই স্নেহ গভীরতর হয়। এই স্নেহের জন্যেই শিশু যখন স্বাবলম্বী হয়, তখন সে তার মাতাপিতা বা প্রতিপালকদের সহজে ত্যাগ করে যেতে পারে না। মাতাপিতা ও সন্তানকে নিয়ে এমনি করে পরিবারের সৃষ্টি হয়। নৃতাত্ত্বিক তথ্যানুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে এই পরিবার থেকেই রাষ্ট্রের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। মাতাপিতা ও সন্তানকে নিয়ে পরিবার ক্রমশঃ যৌথ পরিবারে বা Clan-এ সম্প্রসারিত হয়। কয়েকটি গোষ্ঠী (Clan) নিয়ে এক একটি জাতির (tribe) সৃষ্টি হয়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুরুষ যিনি তিনিই হন এই বৃহৎ পরিবারের কর্ত্তা। তাঁর আদেশ মেনে চলতে আর সকলে বাধ্য, এইখানে আমরা রাষ্ট্রের সৃষ্টির মূলসূত্রের সন্ধান পাই। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেখানে একটি tribe বা জাতি পরিচালিত হ'ত একটি বয়স্কদের সভা (Council of Elders) দ্বারা—এরই মধ্যে শাসনতন্ত্র বা গবর্ণমেন্টের বীজ

নিহিত। কালক্রমে কাউন্সিল অব এলডার্স ই গবর্ণমেন্টে নামান্তরিত ও রূপান্তরিত হয়।

অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, যাঁর উপর ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করবার ভার ছিল, তিনিই ক্রমে একাধিপত্য বিস্তার করে সকলের উপর কর্তৃত্ব কলাতে বসতেন। আদিম যুগে প্রকৃতির রহস্য মানুষ বুঝে উঠতে পারত না। কাজেই তাদের মনে প্রকৃতি-ভীতি বিদ্যমান ছিল। যে-কোনও বুদ্ধিমান লোক যদি প্রকৃতির উপর খানিকটাও আধিপত্য লাভ করে লোককে ভয় দেখাতে বা ভোলাতে পারত, তা হলে তার কর্তৃত্ব তারা অবনত মস্তকে স্বীকার করে নিত।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে হয়েছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যে। শুধু প্রকৃতি নয়, মানুষের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যেও মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হয়েছিল। আদিম কালে মানুষকে যুদ্ধের জন্যে প্রায়ই প্রস্তুত থাকতে হ'ত। যুদ্ধ করতে হলে শৃঙ্খলা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক। শৃঙ্খলা রক্ষা যাতে হয় তা দেখবার জন্যে বা দলবিশেষকে সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত করবার জন্যে দলপতির প্রয়োজন, দলপতির আদেশ নির্ব্বিচারে মেনে না চললে শৃঙ্খলা বজায় থাকে না, শৃঙ্খলা না থাকলে শত্রুকবল থেকে আত্মরক্ষা করা যায় না, কাজেই আত্মরক্ষার জন্যে মানুষকে সংঘবদ্ধ হতে হয়, দলপতির আনুগত্য স্বীকার করতে হয়। এক পক্ষে আধিপত্য ও অন্য পক্ষে আনুগত্য এর থেকেই রাষ্ট্রোৎপত্তির সূচনা, কাজেই এখন আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, অতীতে মানুষ প্রয়োজনবশতঃই প্রথমে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েই রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিল। এই প্রয়োজন হচ্ছে তার জীবন ধারণের ব্যবস্থা করা, তার আহার সংগ্রহের, তার আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ। এই প্রয়োজন থেকেই উৎপত্তি তার দলে থাকবার প্রবৃত্তির বা gregarious instinct-এর। মানুষ একা থাকতে পারে না, সমাজে বা দলে থাকবার আকাঙ্ক্ষা তার স্বভাবজাত। এই আকাঙ্ক্ষার জন্যেই বিভিন্ন দলের, গোষ্ঠীর বা সমাজের সৃষ্টি। সমাজের যখন সৃষ্টি হ'ল, মানুষ তখন এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বোধ করলে, যে প্রতিষ্ঠান সমগ্র সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে, মানুষকে বাইরের ও ভেতরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে, মানুষ যাতে নিরুপদ্রবে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেয়। মনুষ্য-সমাজে এ ধরণের প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রেরও ভিত্তিপত্তন হ'ল। রাষ্ট্রের গোড়াকার কথা সম্বন্ধে এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়।

দিগ্বধূ আজ কাঁপে থরোথর

শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্ত্তী

মণিবেদী হ'তে দেবতা আমার আজ কি এসেছ নেমে ?
অতীত যুগের গুণ্ঠন হ'তে ধ্যান কি গিয়েছে ভেঙে।
ক্ষমাসুন্দর দেবতা আমার কোথা আজ তব বাণী,
কোথা আজ ক্ষমা, কোথা ভালবাসা, শুধু ক্লেদাক্ত গ্লানি।
আজ কি জেগেছে বাসুকী নাগের শতসহস্র ফণা,
কুটিল জিহ্বার লেলিহ শিখায় বিষবাষ্পের কণা ;
ছেয়েছে ধরণী দিগ্‌দিগন্তে নিঠুর স্বার্থজালে
দিগ্বধূ আজ কাঁপে থরোথর অঞ্চল পড়ে খুলে।

দুঃশাসনের কামনা বেড়েছে পাঞ্চালী কাঁদে একা,
নিবিড় তিমিরে অমানিশা রাতে জ্বালে ধূমকেতুলেখা।
অমঙ্গলের কালো শয়তান উঁকি দেয় ঘরে ঘরে
অতুর পুতুল জননী ধরণী তিতিছে রক্তনীরে।

শ্মশানপ্রান্তে হাঁকে ফেরুপাল ক্ষমা নাই, ক্ষমা নাই
মণিবেদী হ'তে দেবতা আমার আজ কি নেমেছ তাই ?

তুমি এস আজ সবাকার মাঝে শ্যামল চক্রপাণি
দূর করো তুমি কাল ভেদাভেদ দীনতা হীনতা গ্লানি।
দূর ক'রে দাও ফেরুপালে সব, টুটিয়া নিবিড় অন্ধকার
শতদীপালোকে আলোকিত হোক সবার প্রাণের গোপন দ্বার,

সামসাম্যের নবীন মন্ত্রে ভরিয়া উঠুক ধরণীতল
শুভ্র ক্ষমায় মধুরহিয়ায় জাগুক বক্ষে দৃপ্তবল ;
মিলনামৃত সিঞ্চন করো ধরণীর গেহে গেহে
তব আগমন উজ্জ্বল হোক মুক্তির সমারোহে।

পাথুরিয়া কয়লা হইতে বাংলায় রাসায়নিক শিল্পের সম্ভাবনা

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস, এম-এসসি, ডি-ফিল

সকলেই জানেন ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলাদেশেই পাথুরিয়া কয়লা-সম্পদ সবচেয়ে বেশী। আমরা পাথুরিয়া কয়লাকে শুধু উত্তাপ উৎপাদনের প্রধান উৎসরূপেই জানি—কারণ রেলগাড়ী ষ্টীমার প্রভৃতি চালনায় এবং আমাদের দৈনন্দিন রন্ধনকার্য্যে পাথুরিয়া কয়লার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কিন্তু পাথুরিয়া কয়লা যে রাসায়নিক শিল্পের অপরিহার্য্য একটি মূল উপাদান তৎসম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই ধারণা নাই। ধারণা না থাকার জন্য আমাদের দোষী করা যায় না; কারণ আমাদের দেশে রাসায়নিক শিল্প, বিশেষতঃ রাসায়নিক শিল্পের যে বিভাগ পাথুরিয়া কয়লার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা খুব বিকাশলাভ করে নাই। তারপর সাধারণের বোধগম্য মাতৃভাষার মাধ্যমে শিল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাদিরও আমাদের দেশে যথেষ্ট অভাব। দেশের শতকরা দশ জন মাত্র লোক লেখাপড়া জানেন। শিশুরা যেমন রসনাতৃপ্তিকর খাবারের প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হয় আমাদের মধ্যেও যাঁহারা বর্ণজ্ঞান লাভের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহারাও লঘু সাহিত্য কাব্যাদিরই বেশী অনুরক্ত। কঠিন জ্ঞানগর্ভ বিষয় সম্বলিত পুস্তকাদি পাঠে আমরা এখনও ততটা আগ্রহান্বিত হইয়া উঠি নাই। যাহা হউক, আশা করা যায় দেশের স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের এই মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইবে এবং বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরা শিল্পবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকপাঠে অধিকতর মনোযোগী হইবেন। এতদিন আমরা শুনিতাম কয়লা হইতে উৎপন্ন হয় কুসুমের সুকুমার বর্ণচ্ছটাকে হার মানায় এরূপ অসংখ্য কৃত্রিম রং, বিবিধ সুগন্ধি পুষ্প ও ফলের গন্ধসার, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, আমাশয় প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধি প্রতিষেধক ঔষধ, টি-এন-টি, পিকরিক এসিড প্রভৃতি, প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরক পদার্থ ও আখের চিনির চেয়ে পাঁচ শত গুণ অধিক মিষ্টতাযুক্ত স্যাকারিন। বর্ত্তমানে নানা প্রকারের প্ল্যাসটিকস, এরোপ্লেন, মোটর প্রভৃতি চালনায় পেট্রোল, চিনির চেয়ে চার হাজার গুণ মিষ্ট এন-প্রোপোক্সি নামক দ্রব্য, বিবিধ ভিটামিন এবং শরীর রক্ষার অন্যতম অপরিহার্য্য উপাদান স্নেহ-পদার্থও (কৃত্রিম মাখন) প্রকৃত প্রস্তাবে কয়লা হইতেই প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

আমি এক নিশ্বাসে যে বিষয়গুলির উল্লেখ করিলাম তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে লাগিয়াছে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিকের শতাধিক বর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়। পাথুরিয়া কয়লা হইতে যে রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার পিছনে রহিয়াছে লিবিগ, ফ্যারাডে, হফম্যান, পার্কিন, উইলিয়মসন, পিটার গ্রিস, কেকুলে, ডুমাসন, বেয়ার, কারো, ফিশার, বার্থেলো, বার্গিয়স প্রভৃতি প্রথিতযশা রাসায়নিকগণের জীবনব্যাপী সাধনা। বৃক্ষের পত্রপুষ্পশোভিত সৌন্দর্য্যই আমাদের চোখে পড়ে, কিন্তু যে মূল নিরন্ত নিভৃতে পুষ্টি যোগায় তাহার কথা সাধারণতঃ আমরা ভাবিয়া দেখি না। পাথুরিয়া কয়লাজাত রাসায়নিক শিল্পের গৌরবমণ্ডিত বিরাটত্বেই আমরা মুগ্ধ হই; কিন্তু সেই গৌরবের মূলে যে একাগ্রতা, যে তন্ময় সাধনা এবং যে সত্য ও জ্ঞান পিপাসা রহিয়াছে তাহার খবর আমরা কয়জনেই বা রাখি? যে সব মনীষীর নামোল্লেখ করা হইল তাঁহাদের কাহাকে বাদ দিয়া কাহার কথা বলিব? তবে ইঁহাদের সম্বন্ধে দুই-একটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। মহামতি কেকুলে বলিতেন—রসায়ন-শাস্ত্রের পুস্তকাদি পড়িতে পড়িতে স্বাস্থ্যহানি না ঘটাইলে ঐ শাস্ত্রে কেহ পারদর্শিতা অর্জ্জন করিতে পারেন না। আর পড়িতেও হইবে বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষ করিয়া জার্ম্মান ভাষার মাধ্যমে। কেকুলে এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। তিনি বলিতেন, এক রাত্রি পড়াশুনায় জাগিয়া কাটানো তিনি কর্ত্তব্যের মধ্যেই মনে করিতেন না। যখন পর পর দুই তিন রাত্রি একাদিক্রমে জাগিয়া পাঠে নিমগ্ন থাকিয়া কাটাইতেন তখনই তিনি অনেকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। আর ল্যাবরেটরিতে পরিশ্রমও করিতেন তিনি অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে। অনেকেই জানেন এই কেকুলের বেনজিন ফরমুলা আবিষ্কৃত না হইলে আজ জৈব রসায়নশাস্ত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পগুলি এত দূর উন্নতি লাভ করিতে পারিত কিনা তদ্বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ রহিয়াছে। অধ্যাপক বেয়ারের সম্বন্ধে কথিত আছে, নির্লোভ নিস্পৃহভাবে তিনি ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় আত্মনিয়োজিত থাকিতেন—তাঁহার গবেষণার ফলে অ্যালিজারিন, নীল প্রভৃতি মূল্যবান রঞ্জন-পদার্থ বিরাট শিল্পের রূপ পরিগ্রহ করে, কিন্তু তিনি কখনও কোনও বিষয় পেটেন্ট করিয়া লইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। শিক্ষার্থীদেরও তিনি সাহায্য করিতেন প্রাণ দিয়া—তাহাদের সতত পথ দেখাইয়া জ্ঞানরাজ্যের পরিচিত সীমা হইতে অজানা রাজ্যের ভিতর লইয়া যাইতেন, কিন্তু তাহাদের সাফল্য-গৌরবে তিনি কখন ঈর্ষাবোধ করিতেন না। নিভৃতে সাধনা করিতেন বেয়ার—প্রকাশ্য সভাসমিতিতে নিজের কাজের প্রচারে তিনি সতত কুণ্ঠাবোধ করিতেন। ফলতঃ এই মনীষীর নিষ্ঠা ও চরিত্রাদর্শে আমাদের বর্ত্তমান বিজ্ঞানসেবীদের অনুপ্রাণিত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা কাজ করি কম কিন্তু কথা বলি বড় বেশী।

এই প্রসঙ্গে আজ এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সব ভারতবাসী কালাপানি পাড়ি দিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা যদি উচ্চ রাজপদের মোহে ইংলণ্ডে না গিয়া জার্মানীর তদানীন্তন দিকপাল রাসায়নিকগণের নিকট শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতেন তবে রসায়নশাস্ত্র ও রসায়নশিল্পে আমাদের দেশ আজ এত শোচনীয়ভাবে পিছনে পড়িয়া থাকিত না।

এখন রাসায়নিক শিল্পের ক্রমবিকাশ ও আমাদের দেশে তাহার কি কি সম্ভাবনা রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে।

পাথুরিয়া কয়লা পোড়াইয়া যে কোক প্রস্তুত হয়, জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হওয়া ছাড়া উহা ধাতব লৌহ নিষ্কাশনের একটি অপরিহার্য্য উপকরণ। এই কোক হইতে আর একটি বিরাট রাসায়নিক শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহা হইতেছে ক্যালসিয়াম কার্বাইড শিল্প। চুন ও কোক বৈদ্যুতিক চুল্লীতে একত্রে নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত অবস্থায় উত্তপ্ত করিলে উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়ম কার্বাইড। বহুবিধ অত্যাবশ্যক রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামাল প্রস্তুত হয় এই ক্যালসিয়ম কার্বাইড হইতে। আমরা কেবলমাত্র পাড়াগাঁয়ের মেলায় বা বিবাহাদি ব্যাপারে ক্যালসিয়াম কার্বাইড দ্বারা বাতি জ্বালাইতে দেখিতে অভ্যস্ত, কিন্তু ইহা হইতে যে কত বিচিত্র রকমের রাসায়নিক পদার্থ জাত হয় তৎসম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা নাই বলিলে চলে। কার্বাইডের উপর নাইট্রোজেন গ্যাসের ক্রিয়াতে উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়ম সায়ান-অ্যামাইড। ইহা জমির পক্ষে একটি উৎকৃষ্ট সার। সায়ান-অ্যামাইড হইতে অ্যামোনিয়া গ্যাস এবং তাহা হইতে জমির অপর একটি সুপরিচিত সার অ্যামোনিয়ম সালফেটও প্রস্তুত করা যায়। সায়ান-অ্যামাইড ও সাধারণ লবণ একত্রে উত্তপ্ত করিলে উৎপন্ন হয় সোডিয়ম সায়ানাইড। সোডিয়ম এবং পটাস সায়ানাইড তীব্র বিষ বলিয়া সকলেই জানেন। কিন্তু খনি হইতে স্বর্ণ নিষ্কাশনে এই সায়ানাইড একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপকরণ। একমাত্র দাক্ষিণাত্যের কোলার স্বর্ণখনির জন্যই প্রতি বৎসর আমাদের দেশে তিন লক্ষ টাকার সায়ানাইড আমদানী করিতে হয়। সুতরাং ক্যালসিয়ম কার্বাইড শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যে আমাদের দেশে অপরিহার্য্য তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। তাহার পর দেশের ভূমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া অধিক শস্য-ফলানোর ব্যাপারেও কার্বাইড শিল্প প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। দেশে চুন বা কোকের অভাব নাই, এখন সুলভ বৈদ্যুতিক শক্তি ও উপযুক্ত যন্ত্রপাতি যোগাড় করিতে পারিলেই কার্বাইড শিল্প প্রতিষ্ঠার বাধা বিদূরিত হয়। এই কারণেই দামোদর-পরিকল্পনা যত শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল।

আজকাল এদেশে প্লাসটিক্‌স্‌, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি শিল্পের ভিত্তিপত্তনের জন্য দেশের অনেক সুধী ব্যক্তিই মাথা ঘামাইতেছেন—বেতার বক্তৃতাতেও এই বিষয়ের গুরুত্ব ঘোষিত হইতেছে; কিন্তু এই সব শিল্পের কাঁচামালও উৎপন্ন হয় ক্যালসিয়ম কার্বাইড হইতে। ক্যালসিয়ম কার্বাইডের উপর জলের ক্রিয়াতে জন্মে অ্যাসেটিলিন গ্যাস। এই অ্যাসেটিলিন গ্যাস আজকাল আলাদীনের প্রদীপের মত আশ্চর্য্য বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। কারণ ইহা হইতেই উৎপন্ন হয়—অ্যাসিট অ্যালডিহাইড, অ্যাসেটিক এসিড, অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইড, অ্যাসেটোন, ইথাইল অ্যাসিটেট প্রভৃতি মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ এবং পলিভিনাইল অ্যাসিট্যাল জাতীয় প্লাসটিক্‌স্‌। অ্যাসিটোন, অ্যাসিটিক এসিড ও অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড প্রভৃতি পদার্থ যে শুধু কৃত্রিম রেশমশিল্পেরই অপরিহার্য্য উপাদান তাহা নহে, বিবিধ রঞ্জন-পদার্থ, ঔষধ ও বিস্ফোরক পদার্থেরও এগুলি অত্যাবশ্যক উপাদান ও দ্রাবকরূপে পরিচিত।

অনেকেই জানেন কয়লা পোড়াইলে কার্বন ডাই অক্সাইড নামে গ্যাস জন্মে। মানুষ এবং প্রাণীমাত্রেই প্রতিনিয়ত এই গ্যাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে ছাড়িতেছে। উত্তপ্ত কয়লার উপরে জলীয় বাষ্প চালিত করিলে জন্মে হাইড্রোজেন ও কার্বন মনক্সাইড। এই মিশ্র গ্যাসের কার্বন মনক্সাইডকে প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত করা হইয়া থাকে। এই কার্বন-ডাইঅক্সাইড জলে দ্রবীভূত অবস্থায় সংগ্রহ করা হয় এবং বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। এই হাইড্রোজেন গ্যাস বহুবিধ রাসায়নিক শিল্পের অপরিহার্য্য উপাদান। দুর্গন্ধ তেলকে গন্ধহীন কঠিন পদার্থে পরিণত করিতে, নাইট্রোজেন গ্যাসের সম্মিলনে এমোনিয়া প্রস্তুত করিতে এবং কয়লা হইতে পেট্রোল জাতীয় তেল প্রস্তুত করিতে হাইড্রোজেনের ব্যবহার সুপরিচিত। শেষোক্ত উপায়ে কয়লা হইতে প্রস্তুত প্যারাফিন শ্রেণীর হাইড্রো-কার্বন হইতে চর্বিজ অম্ল (fatty acid) তৈয়ারী করিতে এবং সেগুলিকে গ্লিসারিনের রাসায়নিক সম্মিলনে কৃত্রিম চর্বিতেও পরিণত করিতে জার্মান রাসায়নিকগণ গত যুদ্ধের সময় সমর্থ হইয়াছেন। এই কৃত্রিম চর্বি যে কেবল সাবানশিল্পেই ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু জার্মানীর চরম খাদ্যসংকটের দিনে ইহা হইতে মার্গারিন প্রস্তুত করিয়াও লোকেরা খাইয়াছেন। ফলতঃ কয়লা হইতে খাদ্য প্রস্তুতের ব্যবস্থা এই সর্বপ্রথম হয়।

হাইড্রোজেন তৈরির সময় যে কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস জন্মে উহা যে কেবল সোডা-ওয়াটার প্রস্তুতেই লাগে তাহা নহে; কার্বন-ডাইঅক্সাইড লবণজল হইতে এমোনিয়া সাহায্যে সোডা তৈরি করিতে ইহা প্রধান উপাদান রূপে ব্যবহৃত হয়। তদ্ভিন্ন কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও এমোনিয়ার রাসায়নিক সম্মিলনে উৎপন্ন হয় ইউরিয়া। ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী আবিষ্কৃত

কালাজ্বরের ঔষধ ইউরিয়া ষ্টিবামিনের কল্যাণে ইউরিয়া কথাটি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেরই পরিচিত। ঘুমের ঔষধ লুমিনাল প্রভৃতিরও ইউরিয়া একটি প্রধান উপাদান। ইউরিয়া ফরম্যালডিহাইড রেজিন নামক প্লাসটিক্‌সের জন্য ইউরিয়া একটি অত্যাবশ্যক রাসায়নিক পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে জমির সাররূপে ইউরিয়ার ব্যবহারের পরীক্ষা চলিতেছে। সুতরাং কার্বন-ডাইঅক্সাইড রাসায়নিক শিল্পের যে একটি বিশিষ্ট কাঁচামাল-স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে তাহার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে উত্তপ্ত কয়লার উপরে জলীয় বাষ্প চালিত করিলে হাইড্রোজেন ও কার্বন-মনঅক্সাইড গ্যাস জন্মে। অনেক ক্ষেত্রে কার্বন-মনঅক্সাইডকে কার্বন-ডাইঅক্সাইডরূপে পৃথক না করিয়া বিশেষ প্রকার প্রক্রিয়া সাহায্যে প্রথমোক্তটিকে হাইড্রোজেন গ্যাস হইতে বিযুক্ত করিয়া বিশুদ্ধ অবস্থায় সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। এই কার্বন-মনঅক্সাইডও কয়েকটি বিশিষ্ট রাসায়নিক শিল্পের কাঁচামালে পরিণত হইয়াছে।

এতদিন আমরা শুনিয়া আসিতেছি ভাত গুড় প্রভৃতি পচাইয়া কোহল বা সুরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু রাসায়নিকগণের চেষ্টায় এই কার্বন-মনঅক্সাইড গ্যাস হইতে হাইড্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণে সুরা প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণ সুরাকে রাসায়নিকগণ বলেন ইথাইল এলকহল। রসায়ন-শাস্ত্রে এলকহল অনেক প্রকারের আছে। আমাদের সুপরিচিত সুরা বা কোহল এই শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানীয়। প্রথম হইতেছে মিথাইল এলকহল। ইহা পূর্বে কাঠ distil (পরিশোধন) করিয়া পাওয়া যাইত, কিন্তু কয়লা হইতে ক্যাটালিটিক উপায়ে কার্বন-মনঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন প্রস্তুতপ্রণালী আবিষ্কৃত হওয়ায় ইহা যথেষ্ট পরিমাণে পাইবার সুবিধা হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩০ সনেই এক কোটি গ্যালন মিথাইল এলকহল প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতেন এত মিথাইল এলকহল কোন্ কাজে লাগে? অনেকেই ফরম্যালিন বা ফরম্যালডিহাইডের নাম শুনিয়াছেন। বীজঘ্ন হিসাবে ফরম্যালিনের ব্যবহার সুপরিচিত। রঞ্জন-পদার্থ ও কৃত্রিম আধুনিক ঔষধপত্রাদিতে যথেষ্ট পরিমাণে মিথাইল এলকহল ও ফরম্যালডিহাইড ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ইউরিয়া ফরম্যালডিহাইড, ফিনোল ফরম্যালডিহাইড প্রভৃতি শ্রেণীর প্লাসটিক্‌স্ প্রস্তুতকল্পে টন টন ফরম্যালডিহাইড আজকাল দরকার হয়।

পাথুরিয়া কয়লা হইতে প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা কোক করিবার সময় কয়েক প্রকার তেল ও আলকাতরা পাওয়া যায়। আলকাতরা আধুনিক অনেক ঔষধপত্র, কৃত্রিম রঞ্জন ও বিস্ফোরক পদার্থ এবং কৃত্রিম সুগন্ধি-দ্রব্যের মূলাধারস্বরূপ।

সবহারাদের কবি

শ্রীপ্রভাত বসু

সোনার রথে যে রাজকুমার আসে
আমার তুলি আঁকে না তার ছবি ;
ব্যর্থ যারা, সদাই কাঁপে ত্রাসে
আমি যে সেই সবহারাদের কবি।

জয়ের তিলক যাদের ললাট 'পরে
অত্যাচারী গর্ব্বী সমাজপতি—
যশের ভেরী বাজায় সাড়ম্বরে,
তাদের পায়ে জানাই নে ক' নতি।

রক্তমাখা কঠিন রণভূমে
মৃত্যুমুখে পড়ে আছে যারা ;
আমার এ মুখ তাদেরি শির চুমে,
কাব্যে আমার অমর হবে তারা।

দেশের মাঝে বিখ্যাত লোক যিনি,
বিলাত-ফেরত সিবিলিয়ান ছেলে
অচেনা মোর—আমি কেবল চিনি
দুর্গতদের, বন্দী যারা জেলে।

গাঁয়ের মাঝি, তাঁতি, মজুর, চাষী,
শ্রান্তদেহ ক্লান্ত কলের কুলি ;
তারা আমার কল্পভুবনবাসী,
তাদের ছবি আঁকে আমার তুলি।

সুরা, নারী, চাঁদের হাসি নিয়ে
অন্য লোকে রচুক কাব্যকলা ;
কণ্ঠ ভরে' দুঃসহ বিষ পিয়ে
মিথ্যা আমার মধুর বাণী বলা।

স্বর্ণপ্রদীপ জ্বলুক তাদের ঘরে
সোনার রঙে যারা ছবি আঁকে ;
ঘর-ছাড়া ঐ সবহারাদের তরে
দাঁড়িয়ে আমি রইনু পথের বাঁকে।*

* মেসফীল্ডের অনুসরণে

কালিদাস-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক শ্রীক্ষুদিরাম দাশ

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি সম্পর্কে ইতিহাস স্তব্ধ থাকিলেও কবিগণ নীরব নহেন। ভবভূতি মাঘ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত কবি যে কত বিচিত্র ভাবে কালিদাসের কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। অনুকরণে, সাদৃশ্যে, ভাবান্তরে, রূপান্তরে এই মহাকবি ভারতীয় কবিচিত্তকে অভিভূত করিয়া অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। এরূপ ব্যক্তিত্বশালী কবির প্রভাব অতিক্রম করা সহজসাধ্যও নহে। কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিজয়গৌরবের কালে কোনো কোনো দিক দিয়া তাঁহার সমধর্মী ও সমকক্ষ অপর এক মহাকবির দৃষ্টিতে যতক্ষণ না তাঁহার স্বরূপের পরিচয় পাওয়া গেল ততক্ষণ আমাদের নিকট তাঁহার পরিচয় অসম্পূর্ণই ছিল। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আলোচনায় এবং মল্লিনাথ প্রমুখ পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যায় কাব্যরসিকগণ যে রসাস্বাদ করিয়া আসিতেছিলেন তাহাকে রবীন্দ্রনাথ এক অভিনব উন্নত স্তরে স্থাপন করিলেন। এক বিরাট কবিপ্রতিভা অতীতের অপর এক অপূর্ব্ব কবিপ্রতিভার অভিনব রূপ আবিষ্কার করিল। ইতিপূর্ব্বে কালিদাস-সম্পর্কে এরূপ সূক্ষ্ম অথচ ব্যাপক রসবিচার আর কেহই করেন নাই, এরূপ অনুরাগের সহিত কালিদাসের যুগকে চিত্রিত করিতেও কেহ সাহসী হন নাই।

ঊনবিংশ শতকের বাংলা-সাহিত্যের স্বর্ণযুগের কথা স্মরণ করা যাক। হোমার-মিল্টন এবং সেক্সপীয়র-স্কটই তখন সাহিত্যিকগণের আদর্শ ও শিক্ষিত বঙ্গবাসীর পূজ্য। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিলেও মধুসূদন কাব্য-প্রেরণার জন্য পাশ্চাত্যের ঋণ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সেকালে আইনের বলে মাতৃভাষা বিকৃত হইল, সংস্কৃত-শিক্ষার প্রতি ঔদাস্য অবমাননায় পর্য্যবসিত হইল। মেঘদূত ও নৈষধ চরিত, পাণিনি ও রঘুনাথ বিজন পল্লীর মুৎকুটিরে রসবোধহীন ব্যাখ্যাকারদিগের ভাষ্যে শ্বাসরোধ হইতে কথঞ্চিৎ আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, লোকব্যবহার —সর্ব্বত্র পাশ্চাত্যের প্রভাব বিস্তৃত হইল। এ সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা বাহুল্য মাত্র। কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে পাশ্চাত্যের এ হেন বিজয়োৎসবের কালে এমন এক অসাধারণ প্রতিভার আবির্ভাব হইল যাহা স্বাভাবিক প্রবণতাবশেই স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল। এই প্রতিভাই কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে, এবং সভা-সমিতিতে বাঙালীর তথা ভারতীয়দের স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত করিয়া তুলিল।

রবীন্দ্র-প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতীয় মানস-প্রকৃতির সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের একটি অবিচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, এবং যেহেতু কালিদাসের কাব্যে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সর্ব্বাপেক্ষা সুষ্ঠু ও ব্যাপক ভাবে রূপময় ভাষায় প্রকাশ লাভ করিয়াছে সেই হেতু রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে লইয়া এত কবিতা ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বহু স্থানে আন্তরিক অনুরাগের সহিত কালিদাসের কবি-প্রকৃতি ও কাব্যসৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা অবশ্য একথা মনে করি না যে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবি-ব্যক্তিত্বই কালিদাস তথা প্রাচীন ভারতের দান। ঊনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক সৌন্দর্য্য-চেতনা, নূতন জীবনবেদ, দুঃখ ও মৃত্যু সম্পর্কে অভিনব ধারণা, বিচিত্র কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত হইয়া তাঁহার কাব্যকে যথার্থ ভাবে আধুনিক মনের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। এমন কি কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি অত্যাধুনিকও বটেন। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে যে প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শ ও মহিমা কবি কেবল কবিতা ও প্রবন্ধের মধ্যে বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কার্য্যেও তাহার রূপ দিতে চাহিয়াছেন। অতি প্রাচীন ভারতের তপোবনের চিত্র শকুন্তলা, কুমারসম্ভব ও রঘুবংশে যেরূপ মনোরম ও পরিপূর্ণ সেরূপ অন্য কোথাও নহে, অপর কোনও কবিই তপোবনাদর্শে সেরূপ আকৃষ্ট হন নাই। কালিদাসের পর বর্ত্তমান কালে একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সেই আদর্শের পুনরাবৃত্তি দেখিতেছি। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপনের পূর্ব্ব হইতেই কবির চিত্ত কালিদাস ও প্রাচীন ভারতের তপোবনের জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। অতঃপর তাঁহার কণ্ঠ হইতে এই আদর্শের জয়গান নানাভাবে উৎসারিত হইয়া উঠিল। কবি আধুনিক সভ্যতার দান—এই ভোগসর্ব্বস্ব সঙ্কীর্ণ অথচ জটিল জীবনযাত্রা হইতে মুক্তি চাহিলেন—

> দাও সেই তপোবন পুণ্য ছায়ারাশি,
> গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
> সেই গোচারণ সেই শান্ত সামগান,
> নীবার ধান্যের মুষ্টি, বল্কল বসন,
> মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন ১
> মহাতত্ত্বগুলি।

কখনও বিশ্বদেবতাকে প্রাচীন ভারতের আদর্শের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেখিলেন—

ধ্বনিছে তোমার স্তবের মন্ত্র অতীতের তপোবনেতে।
অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।

নববর্ষের দিনে কবি প্রাচীন ভারতের মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া তাহার আদর্শ অনুসরণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন—

যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে
মুক্তদীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব।

এইরূপ বহু কবিতায় এবং ধর্ম, স্বদেশ প্রভৃতি নানা প্রবন্ধে কবি কালিদাস-বর্ণিত তপোবন ও জীবনাদর্শের প্রতি অনুরাগ জ্ঞাপন করিয়াছেন। ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখিলে পুরাতনের প্রতি এই অনুরাগ কবির রোমান্টিক কবিমনের বিরোধী নহে। যাহা আমাদের যুগ হইতে বহু পশ্চাতে, যাহা আমাদের নিকটে কতক আলো কতক ছায়া মেশানো, ইতিহাস ও কল্পনায় মিশ্রিত সেই যুগ আধুনিক কবির নূতন বর্ণসম্পাতে আমাদের চক্ষে মোহাঞ্জন লাগাইয়া দেয়, কল্পনায় সুদূরকে নিকটে আনিয়া তাহার সহিত চিত্তের ভাবসম্মিলন সাধিত করে। কবিগুরুর মেঘদূত, স্বপ্ন, সেকাল প্রভৃতি কবিতা এবং 'কথা ও কাহিনী' কাব্য এই দিক দিয়া সার্থক সৃষ্টি। এতদ্ব্যতীত ইহাও মন্তব্য করা অসঙ্গত হইবে না যে, কালিদাস ক্লাসিক্যাল কবি হইলেও তাঁহার কাব্যে আধুনিক মনকে মুগ্ধ করিবার উপযোগী উপকরণ প্রচুর রহিয়াছে। হয়ত সকল বড় কবির কাব্যেই এইরূপ থাকে। মেঘদূতের বিরহ, কুমারসম্ভবের ও শকুন্তলার প্রেম, কবির বিশিষ্ট প্রকৃতিপ্রীতি এবং আরো নানা বিষয় কবিগণের চিন্তা ও অনুভূতির একান্ত উপযোগী। তাই প্রাচীন কালের কালিদাস ও আধুনিক আমলের রবীন্দ্রনাথ সমধর্মী।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ঋতু-উৎসব ও বৃক্ষরোপণ উৎসব প্রবর্তিত করেন। ইহার প্রেরণা হয়ত তিনি কালিদাস হইতে পাইয়াছিলেন। মূক প্রকৃতির সহিত মানবের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। ইহা কালিদাস শকুন্তলা ও পার্বতীর বৃক্ষপালনের চিত্রে পরিস্ফুট করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত বৃক্ষরোপণ উৎসব হইতে ও উত্তরকালে রচিত তাঁহার 'বনবাণী'র কবিতাগুলি পাঠ করিয়া মনে হয় কবির জীবন ও কাব্যের উপর কালিদাসের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। কিন্তু এ সকল বর্তমানে আমাদের আলোচ্য নহে। কালিদাসের সহিত স্বীয় চিত্তের ঘনিষ্ঠ যোগ আবিষ্কারের পথে কবিগুরু কালিদাস ও তাঁহার কাব্য-সম্পর্কে কোথায় কি আলোচনা করিয়াছেন সর্বপ্রথম তাহাই দেখিতে হইবে। এই পথেই উভয়ের মানসিক যোগসূত্র আবিষ্কার করা সহজ হইবে।

কালিদাস ও তাঁহার কাব্যসম্পর্কে কবিগুরু যে সকল কবিতা লিখিয়াছেন এবং সময় সময় গদ্যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা মোটামুটি উল্লিখিত হইতেছে। (১) মেঘদূত, চৈতালির কয়েকটি কবিতা, সেকাল, বিচ্ছেদ এবং যক্ষ প্রভৃতি কবিতা, (২) শকুন্তলা ও কুমারসম্ভব সম্পর্কে আলোচনা এবং The message of the forest প্রবন্ধ, (৩) অন্য বহু ইংরেজী ও বাংলা প্রবন্ধে ও পত্রে প্রাসঙ্গিক আলোচনা।

'চৈতালি'-কাব্যে ঋতুসংহার, কুমারসম্ভব ও মেঘদূত সম্বন্ধে একটি করিয়া এবং কালিদাস সম্বন্ধে তিনটি চতুর্দশপদী কবিতা রহিয়াছে। সবগুলিতেই কালিদাস ও তাঁহার কাব্য সম্পর্কে কবির মুগ্ধ হৃদয়ের অনুভূতির প্রকাশ। ঋতুসংহারের যৌবনশ্রী, মেঘদূতের প্রকৃতি, আর কুমারসম্ভবের প্রেমের মাধুর্যের বর্ণনা কবিকে কি পরিমাণ আকৃষ্ট করিয়াছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায় এই কবিতাগুলিতে। এগুলিতে মুগ্ধ কবিহৃদয়ের স্তুতিগান আছে। কালিদাস-বর্ণিত প্রাচীন ভারতের মহিমামণ্ডিত জীবনযাত্রা ও তপোবনের আদর্শ সম্পর্কিত আরও কয়েকটি কবিতা 'চৈতালি'তে রহিয়াছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত প্রাচীন ভারতের প্রতি কিরূপ আকৃষ্ট হইতেছিল এগুলি তাহারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 'তপোবন' কবিতাটি শকুন্তলার প্রথমাঙ্কের একটি মনোরম শব্দ-চিত্র। গোটা চৈতালি কাব্যেই রবীন্দ্রনাথের গভীর প্রকৃতি-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তপোবনে মানবের সহিত বৃক্ষলতা, পশুপক্ষীর সম্পর্ক অতিশয় ঘনিষ্ঠ ছিল। সেখানে যেমন চৈতালি কাব্যেও তেমনি প্রকৃতির সব কিছুই কবির অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। শকুন্তলা-রঘুবংশে আমাদের প্রাচীন কবি যেমন বৃক্ষলতা, পশুপক্ষীর সহিত মানবের আত্মীয়তার চিত্র আঁকিয়াছেন এখানেও আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ কবি তাহারই অনুগামী। হৃদয়-ধর্ম শীর্ষক কবিতায় কবি বলিতেছেন—

হৃদয় পাষাণভেদী নির্ঝরের প্রায়,
জড়জন্তু সবাপানে নামিবারে চায়।
মধ্য দিনে দগ্ধদেহে ঝাঁপ দিয়া নীরে।
মা বলে' সে ডেকে উঠে স্নিগ্ধ তটিনীরে।
যে চাঁদ ঘরের মাঝে হেসে দেয় উঁকি,
সে যেন ঘরেরি মেয়ে শিশু সুধামুখী।
যে সকল তরুলতা রচি উপবন
গৃহপার্শ্বে বাড়িয়াছে তারা ভাইবোন।
যে পশুরে জন্ম হ'তে আপনার জানি,
হৃদয় আপনি তারে ডাকে পুঁটুরাণী।

'দুই বন্ধু' কবিতায় মানুষ ও পশুর স্নেহসম্পর্ক কবি পুনশ্চ ব্যক্ত করিতেছেন—

সে দিনের আত্মীয়তা গেছে বহুদূরে—
তবুও সহসা কোন কথাহীন সুরে
পরাণে জাগিয়া উঠে ক্ষীণ পূর্বস্মৃতি,
অন্তরে উছলি উঠে সুধাময়ী প্রীতি,

মুগ্ধ মূঢ় স্নিগ্ধ চোখে পশু চাহে মুখে
মানুষ তাহারে হেরে স্নেহের কৌতুকে।
যেন দুই ছদ্মবেশে দু' বন্ধুর মেলা—
তার পরে দুই জীবে অপরূপ খেলা।

কালিদাসের কবিপ্রকৃতির সহিত 'চৈতালি'র রবীন্দ্র-মানসের সমধর্ম্মিত্ব বুঝাইতে অধিক উদাহরণের প্রয়োজন নাই। কালিদাসের রচনার সহিত পরিচিত পাঠক 'চৈতালি' পাঠ করিলেই উহা দেখিতে পাইবেন। তথাপি সমধর্ম্মী উভয় কবির আর একটি বিশেষ সাদৃশ্যের উল্লেখ না করিলেই নয়। কালিদাস সম্পর্কে বর্ণনা করিতে গিয়া কবিগুরু তাঁহার কাব্যের আনন্দরূপের উল্লেখ করিয়াছেন। রূঢ় বাস্তব জগৎকে অবলম্বন করিয়া কালিদাস তাঁহার কাব্যকে রসোত্তীর্ণ করিতে চাহেন নাই। ব্যবহারিক জীবনের নৈরাশ্য ও দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার কাব্য অপার্থিব আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের বাণী বহন করিতেছে। বাস্তব জগতের জীবনসংঘাত ও কোলাহলকে দূরে পরিহার করিয়া তিনি কাব্যসৃষ্টিকে সৌন্দর্য্যের রসলোকে স্থাপিত করিয়াছেন; কবিগুরুর মতে ইহাই কালিদাসের কাব্যের বৈশিষ্ট্য।

তবু সে সবার ঊর্দ্ধে নির্লিপ্ত নির্ম্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য্য-কমল
আনন্দের সূর্য্যপানে; তার কোনো ঠাঁই
দুঃখদৈন্য দুর্দ্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৃষ্টি সম্পর্কেও আমরা তো একই কথা বলি। বাস্তব জগতের দুঃখদৈন্য এবং কদর্য্য নগ্নরূপ রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা যোগায় নাই একথা সত্য নহে, কিন্তু তথাকথিত বাস্তবতা তাঁহার সাহিত্যে আসন লাভ করিতে পারে নাই। জাতীয় জীবনের সঙ্কীর্ণতা, দুর্দ্দশা ও হাহাকারের বেদনা তাঁহার চিত্তে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এবং তিনি এ সকলের ঊর্দ্ধে কালিদাসের মতই এক সৌন্দর্য্যলোকে তাঁহার সৃষ্টিকে স্থাপন করিয়াছেন।

মানসী-পর্য্যায়ের মেঘদূত কবিতাই কালিদাসের কাব্য সম্পর্কে রচিত কবিগুরুর সর্ব্বপ্রথম কবিতা। ইতিপূর্ব্বে কৈশোরে তিনি রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন মাত্র। 'মেঘদূত', কি প্রাচীন, কি আধুনিক—বিরহের এক অতুলনীয় কাব্য। কবিগুরুর তৎকালীন সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রেরণার মূলে কালিদাসের এই কাব্য কতদূর সহায়তা করিয়াছিল তাহা কবিতাটি পাঠ করিলেই স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। একটি সুদূর অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যলোকের প্রতি অবরুদ্ধ মানবচিত্তের চিরন্তন আগ্রহ, সীমাহীন বিরহ ও ব্যাকুল ক্রন্দন এই কবিতাটিতে ধ্বনিত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে রচিত 'সোনার তরী' ও 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায় ও 'চিত্রা' কাব্যে এই সৌন্দর্য্য-বেদনা কিরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। 'মেঘদূত' কবিতায় এক দিকে অলকার চিরন্তন সৌন্দর্য্যলোকে বিরহিণী সৌন্দর্য্য-প্রতিমা এবং অপর দিকে বিরহী মানব চিত্ত এই দুইয়ের বিরহব্যাকুলতা বর্ণিত। কবির মতে একমাত্র কালিদাস ব্যতীত অপর কোন কবিই সৌন্দর্য্য-লোকের এরূপ অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কন করিতে পারিতেন না।

সেথা কে পারিত
লয়ে যেতে তুমি ছাড়া করি অবারিত—
লক্ষ্মীর বিলাসপুরী—অমর ভুবনে।

এই সৌন্দর্য্য-লোকের বিরহিণীর সহিত যক্ষের বিরহকল্পনা হইতে কবির চিত্তে এই সৌন্দর্য্য-বিচ্ছেদ-বেদনা সঞ্চারিত হইয়াছিল। কালিদাসকে উদ্দেশ করিয়া কবিগুরু বলিতেছেন—

কবি, তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়
রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা।
লভিয়াছি বিরহের স্বর্গলোক—

পরবর্ত্তীকালে রচিত মেঘদূত প্রবন্ধে কবি এই বিরহ-বেদনাকে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কবিতার শেষে কবির যে বেদনার প্রকাশ, উক্ত প্রবন্ধেও তাহারই আভাস পাওয়া যায়।

"আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানস সরোবরের অগম্যতীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনও পথ নাই।"

পরিশেষে কালিদাস-বর্ণিত যক্ষের বিরহাবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া আবেগভরে কবি বলিতেছেন—

"হে নির্জ্জন গিরিশিখরের বিরহী, স্বপ্নে যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ, মেঘের মুখে যাহাকে সংবাদ পাঠাইতেছ, কে তোমাকে আশ্বাস দিল যে, এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-লোকে শরৎ-পূর্ণিমা রাত্রে তাহার সহিত চির-মিলন হইবে। তোমার তো চেতন-অচেতনে পার্থক্য জ্ঞান নাই, কি জানি যদি সত্য ও কল্পনায় মধ্যেও প্রভেদ হারাইয়া থাক!" কবিতাটির মধ্যে কবিগুরু পূর্ব্বমেঘে বর্ণিত নদী-গিরি-জনপদের যে সংক্ষিপ্ত চিত্র দিয়াছেন তাহা অতি অপূর্ব্ব হইয়াছে। কবিগুরুর চোখে আমরাও পূর্ব্বমেঘকে নূতনরূপে দেখিলাম। মেঘদূতকে অবলম্বন করিয়া 'বিচ্ছেদ' ও 'যক্ষ' নামক আরও দুইটি কবিতা রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে রচনা করেন। এই কবিতা দুইটিতে পরিপূর্ণতার পথে বিশ্বের যাত্রা, পথের আনন্দ এবং হৃদয়ের করুণ বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে।

'সেকাল' কবিতাটি কালিদাসের যুগ সম্পর্কে কবিগুরুর কাব্যানুভূতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এবং তাঁহার রচিত শ্রেষ্ঠ লিরিক কবিতাগুলির অন্যতম। কবিতাটিতে বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার পটভূমিকায় কাব্যের অনাবিল আনন্দময় জগৎ। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে কোনও চিন্তা নাই, কোনও আদর্শবাদের কচকচি নাই, নিছক আনন্দের সমুস্পর্শে 'কণিকা'র এই কবিতাটি

এবং অন্যান্য কবিতাগুলি তাঁহার কবি-প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় দিতেছে। কালিদাসের কাব্যে তৎকালীন ভারতের জীবন-যাত্রার যে চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় তাহা যেরূপ অনাড়ম্বর সেরূপ আনন্দময়। তাহাতে অভাব-অভিযোগের দ্বন্দ্ব নাই, জীবনযুদ্ধেরও ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ নাই। মেঘদূতের ভাষায়—

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈঃ
নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্ট সংযোগসাধ্যাৎ।

দুঃখ যেটুকু আছে তাহাকে অস্বীকার করিয়া প্রেম ও সৌন্দর্য্যস্পৃহাকে সকলের ঊর্দ্ধে স্থান দিয়া তাঁহার কাব্যে চিত্রিত নরনারী জীবন-রস উপভোগের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে আধুনিকার কবি তাহার দ্বারা সহজেই আকৃষ্ট হইয়াছেন। 'সেকাল' কবিতাটির মধ্যে এই রমণীয় সুদুর্লভ জীবনের ছবিই কবি আঁকিয়াছেন। কবিতাটি পাঠকালে মেঘদূতের জীবন-চিত্র মুহুর্মুহু স্মৃতিপথে উদিত হয়। তৎকালীন নায়ক-নায়িকার নামগুলির প্রতি কবিগুরুর কি অপরিসীম মোহ! প্রাচীন নামগুলির মধ্যে যে এত মাধুর্য্য আছে তাহা কবিগুরুই আমাদের সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়া দিলেন। কালিদাসের যুগে জন্ম হইলে কবি তাঁহার ভাবনাহীন জীবন কিরূপ উপভোগ করিতে পারিতেন তাহার একটি বর্ণনা দিয়াছেন। বর্ত্তমান জীবনে উক্ত পরিবেশের অভাবে সেকালের জন্য আক্ষেপ হওয়াই স্বাভাবিক। কবিতাটির শেষের দিকে এরূপ আক্ষেপের আভাসও রহিয়াছে।

হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল

এবং

যাদের সঙ্গে হয়নি মিলন সে সব বরাঙ্গনা
বিচ্ছেদেরই দুঃখে আমায় করেছে অন্যমনা

কিন্তু বর্ত্তমান কালের আনন্দরসাস্বাদনের জয়গান গাহিয়াই কবিগুরু কবিতাটি শেষ করিয়াছেন—

মরব না ভাই নিপুণিকা চতুরিকার শোকে
তাঁরা সবাই অন্যনামে আছেন মর্ত্ত্যলোকে।

'অভিজ্ঞানশকুন্তল' ও 'কুমারসম্ভবের' গভীরতায় প্রবেশ করিয়া কবি যে নিগূঢ় সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে বিস্মিত করে। এই আলোচনা দুটিতে আছে ভারতীয় আদর্শের সহিত মিলাইয়া সমগ্রভাবে কালিদাসের অনির্ব্বচনীয় রসসৃষ্টি অনুধ্যান করিবার প্রয়াস। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের জয়গান গাহিয়া পরিসমাপ্তিতে তাহাকে কল্যাণের মধ্যে স্থাপন করা ইহা কালিদাসের কাব্যের একটি বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের কল্যাণই ভারতীয় ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির মূল কথা। পাশ্চাত্য সাহিত্যে কল্যাণের রূপ ভারতীয় সাহিত্যের মত বিকাশ লাভ করে নাই। ভারতীয় সাহিত্যে কেবল মানুষ নহে, জড়প্রকৃতির সহিতও কিরূপ হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন করা যাইতে পারে তাহার আদর্শ দেখাইয়াছে। কবিগুরুর 'শকুন্তলা' সম্পর্কে আলোচনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই মূলগত পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। টেম্পেষ্ট ও শকুন্তলা নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন—"টেম্পেষ্টে পীড়ন, শাসন, দমন—শকুন্তলায় প্রীতি, শান্তি, সদ্ভাব। টেম্পেষ্টে প্রকৃতি মানুষের আকার ধারণ করিয়াও তাহার সহিত হৃদয়ের সম্বন্ধে বদ্ধ হয় নাই—শকুন্তলায় গাছপালা পশুপক্ষী আত্মভাব রক্ষা করিয়াও মানুষের সহিত মধুর আত্মীয়ভাবে মিলিত হইয়া গেছে। বহিঃপ্রকৃতিকে যেখানে দূর করিয়া পর করিয়া ভাবে, যেখানে মানুষ আপনার চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া জগতের সর্ব্বত্র কেবল ব্যবধান রচনা করিতে থাকে, সেখানকার সাহিত্যে এরূপ সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে না।" The Message of the Forest প্রবন্ধে এ সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা আছে। সেখানে কবিগুরু শেকস্পীয়র ও মিলটনের রচনায় মানব ও প্রকৃতির এই বিরোধ দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "At the bottom of this gulf between man and Nature there is the lack of the message"—"ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বম্—know all that is, as enveloped by God—" অর্থাৎ 'মানুষ ও প্রকৃতির এই পার্থক্যের মূলে এই বাণীর অভাব রহিয়াছে,—'ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বম্'—বিশ্বে যাহা কিছু বর্ত্তমান তাহা সমস্তই ভগবানের শক্তি দ্বারা আবৃত বলিয়া মনে করিতে হইবে।" পাশ্চাত্যে রোমান্টিক যুগে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ প্রভৃতির কবিতায় হঠাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্ত্তন যে হইয়াছিল—"তাহার মূলে রহিয়াছে জার্ম্মানীর মধ্য দিয়া নবাগত প্রাচ্য দর্শনের প্রভাব।"

• কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা প্রসঙ্গে কবিগুরু কালিদাসের রসসৃষ্টি সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। সৌন্দর্য্য ও প্রেম বর্ণনায় কালিদাসের অসামান্য কৃতিত্বের কথা কবিগুরুর অপূর্ব্ব আলোচনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ সকলের ঊর্দ্ধে কালিদাসের কবিপ্রকৃতি যে মহত্তর ও পরিপূর্ণতার আদর্শে অনুপ্রাণিত বিশ্লেষণের দ্বারা কবিগুরু তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যে নরনারীর প্রেম সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "যে প্রেমের কোনও বন্ধন নাই, কোন নিয়ম নাই; যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযম-দুর্গের ভগ্ন প্রাকারের উপর আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে, তাহা ভর্ত্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে।" সৌন্দর্য্য ও আর্ট সম্বন্ধে কবিগুরু শ্রেয়বাদী। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যও কল্যাণাশ্রয়ী। কবিগুরুর মতে সৌন্দর্য্যের সহিত 'শিবমে'র অর্থাৎ কল্যাণের যোগ যেখানে সেখানেই

সাহিত্যসৃষ্টি সার্থক। সৌন্দর্য্যবোধ সম্বন্ধে আলোচনায় কবি কুমারসম্ভব ও শকুন্তলায় এই দিকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন (সাহিত্য)।

বলা বাহুল্য, এই নূতন রসসৃষ্টি অলঙ্কার-শাস্ত্রে মিলিবে না, কিন্তু আধুনিক কালের মহাকবি অভিনব দৃষ্টিতে কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্যের যে বিচার করিলেন তাহার তুলনায় পূর্ব্বসূরিগণের বিচার ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। কবিকৃতির উপর নূতন আলোক সম্পাত করিয়া পাঠকের চিত্তকে ঊর্দ্ধস্তরের রসলোকে আকর্ষণ করিবার এই প্রয়াস চিরকাল সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে গণ্য হইবে।

আলোচনা

"কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ"

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

গত শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীতে (পৃ. ৩৮২-৮৫) আমি তন্ত্রসার-রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহাতে প্রসঙ্গক্রমে দেখানো হইয়াছিল যে, কৃষ্ণানন্দের অধস্তন সপ্তম পুরুষ রামতোষণ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণতোষণীতন্ত্র রচনা করেন; সুতরাং প্রবীণ ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৫ বৎসরে এক পুরুষ গণনা করিলে, ঐ সময়ের প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ আনুমানিক ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসার রচনা করিয়া থাকিবেন। অধিকন্তু, ১৫৮০ শকাব্দ বা ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত তন্ত্রসারের একখানি পুঁথির কথা শুনা যায়। একথা সত্য হইলে, কৃষ্ণানন্দ যৌবনে অর্থাৎ সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তন্ত্রসার রচনা করিয়া থাকিবেন। তবে এ বিষয় নিশ্চিত হইবার পূর্ব্বে উক্ত পুঁথির তারিখটি পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। এতৎ সম্পর্কিত তথ্য নির্ণয়ে কেহ আমাকে সাহায্য করিলে অনুগৃহীত হইব।...ইত্যাদি। উক্ত তারিখ পরীক্ষা বিষয়ক প্রয়োজন বোধের কারণ এই যে, ঐতিহাসিক তথ্যনির্ণয় ও লিপিবিদ্যা বিষয়ে যাঁহারা বিশেষ শিক্ষা পান নাই, তাঁহাদিগকে অনেক সময় উদ্ধৃত পাঠের মূলানুগত্য সম্পর্কে সম্যক্ সচেতন দেখা যায় না। এইজন্য তাঁহাদের উদ্ধৃত ভ্রান্ত বা কাল্পনিক পাঠ অনেক সময় প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের অনুকূল হয় না।

ভাদ্রসংখ্যা প্রবাসীতে (পৃ. ৫০৬-৮) শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আমার প্রবন্ধটির সমালোচনা করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কয়েকটি যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করা যায় না। কৃষ্ণানন্দ যদি গোঁড়া শাক্ত ছিলেন, তবে তিনি কেন কৃষ্ণবন্দনা দ্বারা গ্রন্থ রচনা করিলেন, ইহার ব্যাখ্যায় তিনি যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহার আলোচনা বাহুল্যমাত্র। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কুলপঞ্জিকাগুলির অনুরাগী গবেষক; তাঁহার মতে এগুলি অভ্রান্ত এবং যেখানেই কুলশাস্ত্রোদ্ধৃত বংশলতার সহিত অন্যত্র প্রাপ্ত নামের অমিল দেখা যায়, সেখানে কোন কোনটিকে প্রকৃত নাম, কোনটিকে রাশিনাম ও কোনটিকে বা ডাকনাম ইত্যাদি কল্পনা করিয়া সামঞ্জস্য আনিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, এইরূপ ব্যাখ্যায় তথ্যান্বেষীর সন্তুষ্ট হওয়া অসম্ভব এবং সেইজন্য তাঁহাকে সংস্কৃতমনীষের বিরূপ সমালোচনা সহ্য করিতেই হইবে। বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গীয় পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী এবং ব্যুলার সাহেব দেখাইয়াছিলেন যে, "in India the duration of a generation amounts, as the statistical tables of the life-insurance companies show, at the outside to only 26 years", অর্থাৎ কোন বংশের অনেক পুরুষের কালগণনা ব্যাপারে ভারতবর্ষে গড়পড়তা একপুরুষে ২৬ বৎসরের অধিক ধরা চলে না। অধুনা ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত গবেষণা করিয়া একপুরুষে ৩০।৪০ বৎসর স্থির করিলে তাহাতে কাহারও কাহারও আপত্তি না হইতে পারে। কিন্তু সেই অভিনব সিদ্ধান্ত কেহ গ্রহণের অযোগ্য মনে করিলে, তাহাকে অর্ব্বাচীন বলিয়া উপহাস করা অশোভন। ন্যায়শাস্ত্রের ইতিহাস রচয়িতা সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় রঘুনাথ শিরোমণির জন্মকাল লিখিয়াছেন আনুমানিক ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দ; ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন যে, উহা ১৪৬০-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইবে। এখন কেহ যদি দ্বিতীয় অনুমানটি অগ্রাহ্য করিয়া প্রথম অনুমানের অনুবর্ত্তী হয়, তবে উহাতে নিশ্চয়ই প্রমাণ হয় না যে, সে ব্যক্তি কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং দ্বিতীয় অনুমানটির প্রবর্ত্তকের ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি বিরল। বঙ্গবাসী প্রকাশিত তন্ত্রসার-সম্পাদনায় ব্যবহৃত সমস্ত অখণ্ড পুঁথিতেই এক স্থলে পূর্ণানন্দের এবং অপর এক স্থলে তৎকৃত শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির (১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) উল্লেখ আছে। তন্ত্রসারের কোন সম্পূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য পুঁথিতে এই দুটি উল্লেখের অনস্তিত্ব প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাকেই তন্ত্রসার রচনাকাল সম্পর্কিত আদি সীমাবোধক অকাট্য ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ কিছুই দিতে না পারিলেও আমাকে উপহাস করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তন্ত্রসারের তিনখানি প্রাচীন পুঁথির পরিচয় দিয়া ঐতিহাসিক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন



প্রতি উৎসবে
রূপ সাধনার
প্রধান অঙ্গ
সি. আর. দাশের
রাঙ্গাজবা
সিন্দুর
কুমকুম
আলতা
"রূপং দেহি. জয়ং দেহি"—রূপের এই আরাধনা বিলাস প্রচেষ্টা নহে। সুন্দর হ'বার সুনিবিড় আহ্বান মানুষ পেয়েছে তার অন্তর-পুরুষের কাছ থেকে। তাই কোটর ছেড়ে প্রাসাদ—বল্কল ছেড়ে সে সৃষ্টি করেছে বিচিত্র বসন-ভূষণ। এ তার কত বড় গর্ব্ব ও আনন্দ! প্রসাধন দ্রব্যও ক্রমোন্নতির পথ ধ'রে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। তার পরিচয় পাওয়া যায় ঘরে ঘরে "রাঙ্গাজবা"র নিত্য ব্যবহারে। বিশুদ্ধতায় ও বর্ণসম্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি, তাই আজ প্রতি উৎসবে "রাঙ্গাজবা"র স্থান সবার উপরে। জাতি, ধর্ম্ম ও বয়স নির্ব্বিশেষে ভারতনারীর প্রিয়তম প্রসাধন সি, আর, দাশের রাঙ্গাজবা-সিন্দুর, কুমকুম ও আলতা।
অনুপমা কেমিক্যাল : কলিকাতা

সন্দেহ নাই। চাটিগ্রাম হইতে তিনি একখানি পুথি পাইয়াছেন; উহার লিপিকাল "রূপাম্বরষ ভক্তৌ চ ভচৌ মাসে চ ভার্গবে। লিখিতা পুস্তিকা চৈব শ্রীকৃষ্ণবল্লভধীমতা।" অর্থাৎ ১৬০১ শকাব্দ বা ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঊর্দ্ধতন নবম পুরুষ বলিয়া কথিত নরসিংহ বাচস্পতি মহাশয়ের নামাঙ্কিত তন্ত্রসার পুথিখানির তারিখ লিখিত হইয়াছে ১৫৬৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। অতঃপর তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংগৃহীত এবং ১৫৫৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের তারিখ সংবলিত একখানি তন্ত্রসার পুথিকে ঐ গ্রন্থের সর্ব্বপ্রাচীন পুথি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং আমাকে উক্ত তারিখটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তত্রত্য পুথিশালার তত্ত্বাবধায়ক পণ্ডিত মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি ঐ পুথিখানি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে তারিখটি ১৫৫৪ শকাব্দরূপে পড়া হইয়াছে, উহার তৃতীয় অঙ্কটির নিম্নাংশ অবলুপ্ত এবং উহার অধুনা বর্ত্তমান ঊর্দ্ধাংশের আকার দ্বিতীয় অঙ্কটির ঊর্দ্ধাংশের অনুরূপ নহে। চতুর্থ অঙ্কটিরও নিম্নভাগ অবলুপ্ত দেখা যায়। সুতরাং ঐ তারিখের পাঠ অনিশ্চিত। অবশ্য আমি বলিতেছি না যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধে উদ্ধৃত সমস্ত পাঠই বর্ত্তমান তারিখ পাঠের অনুরূপ কাল্পনিক; কারণ তাহা ঐ সকল পুথি পরীক্ষা না করিয়া বলা সম্ভব নহে।

যাহা হউক, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের জীবনকাল যদি আনুমানিক ১৫৯৫-১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ হয় এবং তিনি যদি জীবনের প্রথমার্দ্ধে তন্ত্রসার গ্রন্থখানি রচনা করিয়া থাকেন, তাহাতে আপত্তি করিবার মত আমি কিছু দেখিতে পাইতেছি না। আমি শুধু বলিতে চাই যে, তন্ত্রসারের তথাকথিত প্রাচীন প্রাচীন পুথিসমূহের তারিখ পরীক্ষা করিয়া এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। সেই পরীক্ষাকার্য্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে সাহায্য করিলে আমি উপকৃত হইব। প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ই ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্য; আমি কোন ভুল করিলে আমিই সর্ব্বাগ্রে উহার সংশোধন কামনা করিব।

যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ডঃ সরকারের দ্বিতীয় আলোচনাটির ভাষায় যে উষ্মা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে আমরা অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিয়াছি। মজা এই যে, এই বিরূপ সমালোচনার অন্তরালে মূল বিষয়ে তাঁহার নিজের ভ্রম স্বীকার লুকায়িত আছে। গোঁড়াই হউক আর কোমলই হউক "শাক্ত" অর্থ শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিক, বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত তান্ত্রিক নহে। ডঃ সরকার এবার কৃষ্ণানন্দের জীবনকাল আনুমানিক ১৫৯৫-১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ ও তন্ত্রসারের রচনাকাল তাহার "প্রথমার্দ্ধে" ধরিয়াছেন। অর্থাৎ রচনাকাল হয় ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে, কিম্বা 'যৌবন' অর্থে অনধিক ৩০ বৎসর বয়স ধরিলে হয় ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দ। তদনুসারে এক পুরুষের গড়পড়তা কিন্তু ২৫-২৬ বৎসরের বেশী হয় এবং ডঃ সরকারের নিজ পক্ষই "অগ্রাহ্য" হইয়া যায়।

পরিষদের জীর্ণ পুথিটির লিপিকাল (১৫৫৪ শক)। ডঃ সরকার 'অনিশ্চিত' কিম্বা 'কাল্পনিক' বলিয়াছেন, অথচ স্বয়ং অপর কোন পাঠ দেন নাই। 'আশ্চর্য্য' না হইয়া ধীর ভাবে পরীক্ষা করিলে তিনি দেখিতে পারিতেন (আমরা তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছি) তৃতীয় অঙ্কটির বিদ্যমান ঊর্দ্ধাংশ ০ হইতে ৯ পর্য্যন্ত ১০টি অঙ্কের মধ্যে একমাত্র ৫ অঙ্কের সহিত মিলে। ৫ অঙ্কের দুইটি পৃথক্ রূপ পুথিটির শেষ পত্রের সূচিতে এবং অন্যত্র বহুস্থলে বিদ্যমান আছে—৫৫ পাতার ত্রুটিত পত্রাঙ্কে ও পাশাপাশি দুইটি ৫ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন। তৃতীয় অঙ্কটি যে ৭ নহে তাহা ৫৭ পত্রাঙ্কের সহিত মিলাইলে স্পষ্ট বুঝা যায়। অন্য কোন অঙ্কের সহিত ঘুণাক্ষরেও সাদৃশ্য নাই।

ডঃ সরকার আমাদের বহু কথার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া পাঠকদের বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। "এ স্থলে মূল কুলপঞ্জীতে কোনই ভুল নাই" বলায় তিনি বুঝিয়াছেন, আমার মতে সব কুলপঞ্জীই "অভ্রান্ত"। গড়পড়তা বিষয়ে আমরা তাঁহাকে "অর্ব্বাচীন বলিয়া উপহাস করি" নাই, ভ্রান্ত বলিয়াছিলাম। শিরোমণির কালনির্দ্দেশ বিনা যুক্তিবিচারে "অগ্রাহ্য" করা "কাণ্ডজ্ঞানহীনে"র কাজ—ইহা আমাদের বক্তব্যও নহে, এবম্বিধ ভাষা প্রয়োগও আমাদের নহে, তিনি অকারণ উষ্মা প্রকাশ করিয়া নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন।

তন্ত্রসারে পূর্ণানন্দের ও তদীয় শ্রীতত্ত্বচিন্তামণির উল্লেখ বঙ্গবাসী ভিন্ন অপর কোন মুদ্রিত সংস্করণে নাই-- রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের ১২৮৫ সনের সংস্করণ পৃ. ১৫৮ ও ৩৯৫-৬, প্রসন্ন কুমার শাস্ত্রীর চতুর্থ সং (১৩১৮) পৃ. ১০৪ ও ৩১৫, বসুমতীর ৩য় সং পৃ. ৮৪ ও ২৪২-৩ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য-- এবং কোন পুথিতেও আমরা পাই নাই। তথাপি এখনও ঐ উল্লেখ "অকাট্য ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ" বলিয়া স্বীকার করিতে ডঃ সরকারের দ্বিধা নাই। অথচ বঙ্গবাসী সংস্করণে ব্যবহৃত ১৫৮০ শকাব্দের পুথি সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন প্রমুখ পণ্ডিতগণের শকাঙ্ক পাঠ, "ভ্রান্ত বা কাল্পনিক" বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। কারণ, "ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় ও লিপিবিদ্যা বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ শিক্ষা পান নাই।"

ডঃ সরকার যদি ১৬০১ শকের পুথিটি দেখিতে চান কিম্বা কৃষ্ণানন্দের কাল নির্ণয়ে অপরাপর উপকরণরাজি আলোচনা করিতে চান, আমরা তাঁহাকে আমাদের বাসগৃহে সাদরে আহ্বান করিতেছি।



ভাঙা-গড়া

শ্রীনারায়ণ দত্ত

এই তো সেদিন জয়যাত্রার পথে
মরু-প্রান্তরে দিগন্তব্যাপী ঝড়…
আর বিদ্যুৎ…
শাণিত হাসিতে এসেছিল তারা মৃত্যুদূত,
এই সেদিনো তো দ্রুত ধাবমান রথে
ঘন বেদাক্ত অশ্বের খুরে খুরে ;
কালবোশেখীর ঝঞ্ঝা-কঠিন সুরে
বেজেছে প্রত্যাদেশ
এই পৃথিবীর যা-কিছু সৃষ্টি আজ হ'তে হোক শেষ।

কঠিন প্রত্যাদেশ
সোনার ফসল ঢেকেছে সহস্র মানুষের কংকাল ;
বোমারে বোমারে এ আকাশ উত্তাল
রেখায় রেখায় কেঁপে কেঁপে মিলে-মিশে গেছে কত দেশ
মানচিত্রের বুকে ফুটিয়াছে রক্তরঙীন মৃত্যুর রেশ
মহাসময়ের সংকেতভরা গভীর প্রত্যাদেশ।

যত তমসায় পিচঢালা হোক সেদিনের সেই নিশা
মানুষের বুকে জেগে তবু ছিল সুতীব্র জিজীবিষা।
অসীতা ধরার মৃত্তিকা চিরে চিরে
শত সংহারের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে
শঙ্কিত ভাবে তবু জেগেছিল সৃজনের অঙ্কুর
নবজাতকের আতঙ্ক নিয়ে—কম্পিত ব্যথাতুর।

সে দিনের সেই সৃষ্টি-প্রভাতে দেখেছিলে চেয়ে তুমি
দিগন্ত জুড়ে অটুট সম্ভাবনা,
ঝঞ্ঝামলিন ধরণীরে আছে চুমি ?
নব জাতকের কণ্ঠে শোন নি সেদিনের বন্দনা।
শোন নি মানুষ তুমি
মরণাতঙ্কে দেখ নি তন্দ্রাতুর
অজানা স্বপ্নে কেঁপে উঠেছিল সেদিনের অঙ্কুর ?

আজি দিকে দিকে জীবনের সাড়া আবার উঠেছে জেগে
রেখায় রেখায় তপন উঠেছে ঝঞ্ঝায় কালো মেঘে ;
অঙ্কুরে আজ বনস্পতির ছায়া
আশঙ্কা নেই অনাগত দিনে এ ছায়াও পাবে কায়া
ব্যর্থ হবে না কখনো বিবর্তন
শতাব্দীব্যাপী ইতিবৃত্তের এ ধারা চিরন্তন।

নিদ্রা-নীরব রাতের মত

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

নদীতীরের শ্যামল ছায়া ভুলায় আমার মন,
আশেপাশে কিশলয়ের গান।
সন্ধ্যাপ্রাতে স্নেহের পরশ বুলায় সমীরণ,
কানে আসে স্রোতের কলতান।
ঘাটের ধারে দুল্‌ছে তরী আলোধারায় নেয়ে,
পারে যাবার সাধ হয়েছে বইঠাখানি বেয়ে।

নিদ্রা-নীরব রাতের মত শান্তি পেলেম মনে,
বনতলে বেড়ায় প্রাণের মায়া।
সাদা মেঘের টুক্‌রোগুলো নীল আকাশের কোণে
কালো জলে পড়্‌ছে তাদের ছায়া।
ঝাউয়ের বীথি স্তূপের ধারে গাইছে অবিরত,
বেণুশাখার অন্তরালে ঘুমায় স্মৃতি কত।

সুদূরে ওই দেউলচূড়া বনের শিরে জাগে,
পথ-রেখা পাইনে খুঁজেতো তাই।
পলকহারা নয়নতারা পারের অনুরাগে ;
জানা শোনা গ্রাম তো কোনো নাই।
পায়ে-চলা পথের সনে নেইকো পরিচয়,
তবু আমায় যেতেই হবে দিনটি মধুময়।

বাবুই পাখী বাঁধ্‌ছে বাসা ভরা দুপুর বেলা,
তরুমূলে ফুলের পরাগ ঝরে।
আমক্ষেতে বকের সাথে গাঙ্‌শালিকের খেলা
নদীকূলে নিঝুম পথের 'পরে।
শূন্যচরে হাঁসের দল হ'ল যে আন্‌মনা,
তৃণের জালে জড়িয়ে আছে ফুলের আল্‌পনা।

তুমি হেথায় একেলা রহ ঢেউ-দোলানো বাঁকে,
পাতাঝরা ভাঙা ঘাটের কোলে ;
বন্ধু আমায় আস্‌বে যখন বুঝিয়ে বলো তাকে',
আলোভরা পারে গেলাম চলে।
এ পার হ'ত ও পারে মোর ছুটবে তরী বেগে,
হৃদয়ে মোর ঢেউ উঠেছে উতল হাওয়া লেগে।

পুস্তক-পরিচয়

ভারত-মুক্তি-সাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্দ্ধ শতাব্দীর বাংলা—শ্রীশান্তা দেবী। পৃঃ ১৪+৩০২। প্রাপ্তিস্থান—পি ২৬ রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা। ১৯৪৭ অক্টোবর। সচিত্র মূল্য—ছয় টাকা।

এই বইখানি বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে এবং একাধারে স্নেহশীলা ও গুণজ্ঞা কন্যার দ্বারা লিখিত পুণ্যচরিত পিতার জীবন-কথা বলিয়া এই বই বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরকাল নিজ বিশিষ্ট আসনে বিরাজমান থাকিবে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের তিরোধান ঘটিয়াছে চারি বৎসর পূর্ব্বে। কিন্তু যাহার জন্য তিনি সারা জীবন ধরিয়া সাধনা করিয়া গিয়াছেন, সেই ভারতবর্ষের মুক্তি, পুরাপুরি না হোক, আংশিক ভাবে ঘটিয়াছে, মাত্র দুই মাস হইল। এই মুক্তি বা মুক্তির আভাস আমরা পাইয়াছি যে সমস্ত ত্যাগী অক্লান্ত-কর্ম্মী দেশসেবকের ভাবশুদ্ধি নিষ্ঠা ও শ্রমের ফলস্বরূপ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান পুরুষ ছিলেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁহাদের প্রতি সমগ্র জাতির শ্রদ্ধানিবেদন করিবার উপযুক্ত অবসর এখনই। জীবনের বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র পথে আমাদের দেশের মুক্তি-কামীরা তাঁহাদের অবদান দ্বারা ভারতের আধুনিক ইতিহাসকে গৌরবময় করিয়া গিয়াছেন। কেহ জ্ঞান-সাধনার পথে গিয়াছেন, কেহ বা আমাদের অনুভূতি-শক্তির উদ্বোধন করিয়াছেন, অর্থনৈতিক পরবশতা হইতে মুক্তি দিতে কেহ চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ বা সক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা অত্যাচার অবমাননার কবল হইতে স্বজাতিকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়া সজ্ঞানে ও কোনও রূপ ক্ষোভ না করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শিক্ষার মাধ্যমে দেশের প্রাণশক্তির উদ্বোধনে ব্যাপৃত ছিলেন; সাধারণ শিক্ষক হিসাবে তিনি প্রথম তরুণদের চিত্তবৃত্তির উন্মেষ করিয়া দিবার জন্য আত্ম-নিয়োজিত হন এবং পরে এই অধ্যাপক জীবন ছাড়িয়া দিয়া, মাসিক পত্রের সম্পাদক রূপে জনগণের শিক্ষায় ব্রতী হন। এই পথে তাঁহার সমস্ত শক্তির পূর্ণতম প্রকাশ ঘটে এবং বাঙ্গালার ও ভারতবর্ষের জনগণও তাঁহার এই সেবার দ্বারা স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইবার উপযোগী পাথেয় বহুল পরিমাণে অর্জ্জন করে। দেশের সাধারণ পত্রিকা-পাঠক, রাজনীতির অথবা রাষ্ট্রীয় ঘটনা-বলীর গতির সহিত সাক্ষাৎ বা ঘনিষ্ঠ পরিচয় যাহাদের পক্ষে সম্ভব-পর ছিল না তাহাদের জন্য নিরপেক্ষ ভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া, ও অবস্থা সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ মনোভাব গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়া, মাসের পর মাস বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অতন্দ্র ভাবে পরিশ্রম তিনি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "প্রবাসী" ও "মডার্ণ-রিভিউ" পত্রিকা দুইটি এই রাজনৈতিক বোধকে দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে দৃঢ় করিয়া দিতে অপূর্ব্ব কাজ করিয়াছে। কেবল রাজনৈতিক ব্যাপারে যাহা এই দুই পত্রিকা দ্বারা সংগঠিত হইয়াছে, তাহার কৃতিত্ব মুখ্যতঃ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাপ্য। রাজনৈতিক ব্যতীত, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাপারে রামানন্দ বাবু যে সমস্ত শিল্পী ও সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহায়তায় তিনি বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের চিত্তকে সুসংস্কৃত ও সমৃদ্ধ করিবার জন্য পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া শ্রেষ্ঠ মানসিক ও সাংস্কৃতিক রসবস্তু উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলার ও ভারতবর্ষের তাবৎ লোকহিতকর চিন্তা ও কর্ম্মের সঙ্গে রামানন্দ বাবু জীবনের অর্দ্ধশতক ধরিয়া ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন।

এ হেন কর্মী ও চিন্তা-নেতা মহাপুরুষের প্রসঙ্গ দেশের মধ্যে যত হয় ততই ভাল। সুখের বিষয়, রামানন্দ-সম্বন্ধে প্রথম এই যে লক্ষণীয় বইখানি বাহির হইল, এখানি তাঁহার কন্যারই লেখা। শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী সুসাহিত্যিকা, বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য তাঁহার দানের দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। এরূপ মহৎ চরিত্রের পিতার সান্নিধ্য তাঁহার দৃষ্টি ও লিখনভঙ্গীকে যে এই পুণ্যশ্লোক পুরুষের জীবনী লিখিবার জন্য উপযোগী করিবে, তাহা সহজেই আশা করা যায়। প্রস্তুত রামানন্দ-জীবনীতে যথা-আবশ্যক তথ্যের সমাবেশ আছে। রামানন্দ-জীবনীর পারিপার্শ্বিকের উপযুক্ত বিচার-বিশ্লেষণও আছে এবং রামানন্দ-চরিত্রের মহত্ত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিবার সার্থক প্রয়াসও আছে। এই বই বিশেষ রুচিকর ভাবে লিখিত হইয়াছে এবং ইহা হইতে রামানন্দ-চরিত্রের বহুমুখিতার একটি ভাল পরিচয় পাওয়া যাইবে। ভক্তির অসংযত উচ্ছ্বাসে লেখিকা এবং তাঁহার পিতা উভয়েরই কৃতিত্বকে ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই, লেখিকা যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই এই চরিত্রকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালাদেশ তথা ভারতবর্ষের শতকার্দ্ধের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটা মনোজ্ঞ দিগ্দর্শন এই বই হইতে পাওয়া যাইবে এবং ইহা হইতেছে এই বইয়ের অন্যতম উপযোগিতা। আশা করি এই বইয়ের যোগ্য সমাদর বাঙ্গালার পাঠক সমাজে হইবে।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—পঞ্চম খণ্ড। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। ১৩৫৩।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায়ের অন্ত নাই, এবং বর্ত্তমান সময়ের নানাবিধ সঙ্কট ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যেও তাঁহার একাগ্রতার ব্যাঘাত নাই। এই গ্রন্থমালায় এ পর্য্যন্ত আশী জনেরও অধিক খ্যাতিমান্ বাঙালী সাহিত্য-সাধক ও তাঁহাদের গ্রন্থাবলীর যে সংক্ষিপ্ত অথচ তথ্যবহুল পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা মূলগ্রন্থ ও সাময়িক নথিপত্রাদি হইতে বহু যত্নে উদ্ধার করা হইয়াছে বলিয়া যেমন প্রামাণ্য তেমনই মূল্যবান্। অন্যান্য খণ্ডের বিস্তৃত সমালোচনায় আমরা যাহা বলিয়াছিলাম তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু বর্ত্তমান পঞ্চম খণ্ড প্রথম চারি খণ্ডের মর্য্যাদা ও গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। এই খণ্ডের একটি আকর্ষণ এই যে, ইহাতে যে-সকল লোকপ্রিয় লেখকের প্রতিষ্ঠা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী সময়ের—যথা, প্রভাতকুমার, তারকনাথ, গিরীন্দ্রমোহিনী, অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্র সেন, কামিনী রায়, সত্যেন্দ্র দত্ত, সুরেশ সমাজপতি, অক্ষয় মৈত্রেয় প্রভৃতি।

একনিষ্ঠ ও অক্লান্তকর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনাথ বাংলা-সাহিত্যের যে বহু অজ্ঞাত ও বিক্ষিপ্ত উপাদান এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলিতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহার মূল্য বাংলা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের নিকট গুপ্ত হইবে না। কিন্তু এ সংকলন শুধু বিশেষজ্ঞের জন্য নয়, সাধারণ পাঠকের জন্যও রচিত বলিয়া, গত যুগের বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিক কীর্ত্তি-কাহিনী সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইবার কথা।

শ্রীসুশীলকুমার দে

রাত্রির যাত্রী—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়। দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ। ৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা। মূল্য ৩।০।

রাজনৈতিক উপন্যাস। বর্ত্তমানে রাজনৈতিক বাংলা-সাহিত্যে উপন্যাসের প্লাবন আসিয়াছে। কিন্তু পড়িবার মত বই সচরাচর চোখে পড়ে না। আলোচ্য উপন্যাসখানি কিন্তু ভাল লাগিল। পঞ্চাননবাবু বাংলা সাহিত্যজগতে নিতান্ত অপরিচিত নহেন। ইতিপূর্ব্বে খানকয়েক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি কবি পরিচিতি লাভ করিয়াছেন। উপন্যাস রচনায়ও তাঁর পাকা হাতের পরিচয় পাওয়া গেল।

উপন্যাসের আরম্ভ হইয়াছে শিবানী গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া। ম্যালেরিয়া জর্জ্জরিত জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামখানি যে সময় জনকয়েক বণিকের [ইংরেজ] শ্যেনদৃষ্টিতে পড়িয়া একটি শিল্পাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে, সেই সময় হইতেই কাহিনীর আরম্ভ। ইন্দ্রদেব এই গ্রামের ছেলে—যার মনের বিকাশ ঘটিয়াছে এই গ্রামের পরিবর্ত্তনশীল আবহাওয়ায় এবং চরিত্রের প্রকাশ দেখা গিয়াছে গান্ধীজীর লবণ-আইন ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া। বিপিন বাবু এ গ্রামের লোক নন, কিন্তু ব্যবসা উপলক্ষে এখানে আসিয়া শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছেন। শাশ্বতী এঁর কন্যা, উপন্যাসের প্রধান নায়িকা। বলদেব, আভা রায়, দুর্গা, দারোগা বাবু, পুলিস সাহেব মিঃ লাহিড়ী, রাইচরণ আরও বহু বিচিত্র চরিত্র উপন্যাসে ভিড় করিয়া আছে, কিন্তু প্রধান চরিত্রগুলি আপন আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া যায় নাই। শাশ্বতীর চরিত্র বিশেষভাবে ভাল লাগিল। ইন্দ্রদেবের প্রতি তার আসক্তির কোথাও উদ্দাম প্রকাশ নাই, ফল্গুধারার মতই তাহা নিঃশব্দে বহিয়া গিয়াছে। কোথাও সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য সে আদর্শচ্যুত হয় নাই। লেখকের ভাষা সাবলীল, সংলাপ প্রশংসনীয়।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

স্বরাজ ও গান্ধীবাদ—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু। আই, এ, পি, কোং লিঃ। ৮সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ২১৫, মূল্য—তিন টাকা মাত্র।

ভারতীয় জনগণের আত্মশক্তির উদ্বোধন করিয়া স্বরাজলাভ ও বিশ্ব-মানবের কল্যাণ সাধনই মহাত্মা গান্ধীর জীবনের ব্রত। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাও পৃথিবীতে অভিনব এবং যুগান্তরকারী সম্ভাবনায় পূর্ণ। মুষ্টিমেয় বিপ্লবী সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা রাষ্ট্রশক্তি ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া উপর হইতে জনসাধারণের স্কন্ধে স্বরাজ চাপাইয়া দিবে না, বরং অহিংস বিপ্লবের দ্বারা জনসাধারণ রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব লাভ করিবে, অহিংস অসহযোগের প্রয়োগে শোষিত মানব শোষক সম্প্রদায়ের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিবে ইহাই মহাত্মাজীর অভিপ্রায়।

গান্ধীজী বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবপ্রেমিক। হিংসাদ্বেষ-কলুষিত পৃথিবীতে তিনি অটল শান্তিসাধক; ভারতভূমিতে সাম্প্রদায়িক হানাহানি নিবারণে জীবন পণ করিয়া শ্মশানের প্রেতনৃত্যের মধ্যে তিনি যোগীশ্বরের মত শান্তির সাধনায় রত।

ভারত আজ স্বাধীন, কিন্তু মহাত্মাজীর অভিপ্রেত প্রকৃত স্বরাজ এখনো বহুদূরে। ইহার জন্য জনসাধারণকে আত্মশুদ্ধি, মানসিক বল ও নিঃস্বার্থপরতা অর্জ্জন করিতে হইবে। আলোচ্য গ্রন্থে গান্ধীজীর সহচর অধ্যাপক বসু মহাত্মার রাজনৈতিক মতবাদ মনোজ্ঞভাবে আলোচনা করিয়াছেন। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহের একটি প্রবন্ধ সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া তদুত্তরে নির্ম্মলবাবু গান্ধীজীর অহিংস বিপ্লবের আদর্শ, স্বরূপ ও পন্থা বিবৃত করিয়াছেন। লেখকের ভাষা স্বচ্ছ ও সাবলীল। বাঙলার রাজনৈতিক সাহিত্যে 'স্বরাজ ও গান্ধীবাদ' এক বিশিষ্টস্থান গ্রহণ করিবে, সন্দেহ নাই। মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের নিপুণ বিশ্লেষণ হিসাবে বাংলা ভাষায় পুস্তকখানির জুড়ি নাই। মহাত্মাজীর মত ও পথের সহিত ভালভাবে পরিচিত হইতে হইলে এ গ্রন্থ প্রত্যেক বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

নিঝুম রাতের প্রেম—শ্রীউমাপদ দাশ। প্রকাশক—রাউজী ভাই প্যাটেল, পশুপতি বুক ডিপো, ৯৮।২, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১২৪, মূল্য ১৷৵০।

আলোচ্য গ্রন্থখানি উপন্যাস। বন্ধু নববিধানের দূরসম্পর্কীয়া বিধবা বোন মীনাকে শৈলেন ভালবাসে,—বাধা দেয় সমাজ, বাধা দেয় আত্মীয়স্বজন,—নববিধানের স্ত্রীর মনে হিংসার আগুন জ্বলে উঠে। ব্যর্থ-প্রেমিক শৈলেন শেষে এক বিড়ির ব্যবসায়ীর অর্থ-সাহায্যে বিলাতে ডাক্তারী পড়তে যায়। ফিরে এসে সে মেডিক্যাল কলেজের ভিজিটিং সার্জ্জন হয়। ঘটনাচক্রে মীনা 'ট্রাম-একসিডেণ্টে' আহত হয়ে মেডিক্যাল কলেজে এসে তার শৈলেনদার সামনেই মারা যায়।

তরুণী বিধবাদের প্রতি গ্রন্থকারের গভীর সহানুভূতি আছে। কাহিনী কিন্তু সার্থক হয়ে ওঠে নি। মাঝে মাঝে উদ্ভট বানান ও শব্দপ্রয়োগে রচনা শ্রান্ত ও দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে,—দু'একটি যথা,—অস্যাখ্যাত, না হেঁসে পারলাম না, ছলের অধিবধি থাকে না, তাত এতদিন করি নী, বল দিকি নী...

শ্রীতারাপদ রাহা

প্রেমানন্দ—প্রথম ভাগ (২য় সং) ১৪৬ পৃ. এবং দ্বিতীয় ভাগ (১ম সং) ১৯০ পৃ. স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ সঙ্কলিত ও বৈদ্যনাথ ধাম দেওঘর, পোঃ কুণ্ডা, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন মন্দির হইতে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য যথাক্রমে ২।০ ও ২৷৵০।

যাঁহার নামাঙ্কিত এই গ্রন্থ, তিনি পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ

শিষ্যদের অন্যতম। তাঁহার সন্ন্যাস আশ্রমের নাম স্বামী প্রেমানন্দ হইলেও জন-সাধারণের কাছে তিনি বাবুরাম মহারাজ বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন। এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বেলুড়মঠাগত ব্রহ্মচারীদের সর্ব্ববিষয়ে দোষত্রুটিহীন ও সুশিক্ষিত করার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিতেন। শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী একদা বলিয়াছিলেন,—'মঠের শক্তি, ভক্তি, মুক্তি সব আমার বাবুরামরূপে গঙ্গাতীর আলো করে বেড়াচ্ছে!'

এই গঙ্গাতীর আলোকরা শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসহচর বাবুরাম মহারাজ বা প্রেমানন্দ স্বামীর সংস্পর্শে গিয়া তাঁহার মুখনিঃসৃত যেসব অমূল্য আলোচনা শুনিবার ও জানিবার সৌভাগ্য সঙ্কলনকারীর হইয়াছিল তৎসমুদয় এই দুই খণ্ড গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পত্রাবলী, উপদেশাবলী, ঠাকুর ও মা ঠাকুরাণীর চিত্রাবলী দ্বারাও গ্রন্থ সুসমৃদ্ধ। ভাষার সরলতায়, ঘটনার বিচিত্রতায়, ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনায়, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের সত্য পরিকল্পনায়, হাস্যরসের মধুরতায় এবং মানব মহত্ত্বের উচ্চ চিন্তাধারায় সকলকেই এই গ্রন্থ তৃপ্তি দান করিবে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

ফেরে নাই শুধু একজন—(সচিত্র অনুবাদগ্রন্থ)—অনুবাদক: শ্রীনেপালশঙ্কর সরকার। জিজ্ঞাসা ১৩৩-এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

১৯৩৮ সনের আগষ্ট মাসের শেষ দিকে জাপানী আক্রমণে বিপর্যাস্ত চীনের সাহায্যার্থে ভারতীয় কংগ্রেস কর্ত্তৃক যে মেডিকেল মিশন প্রেরিত হয় ডাঃ অটল, ডাঃ চোলকার, ডাঃ মুখার্জ্জি, ডাঃ বিজয়কুমার বসু এবং ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস এই পাঁচ জন ছিলেন তার সদস্য। এঁদের মধ্যে চার জন চার বৎসর চীনপ্রবাসের পর দেশে ফিরিয়া আসেন—ফেরেন নাই শুধু এক জন; তিনি মারাঠী যুবক, ডাক্তার কোটনিস। তিনি কমরেড কুও চিন লাং নামক একটি চীনা মেয়েকে বিবাহ করেন এবং চীনদেশেই ১৯৪২-এর ৯ই ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়। উক্ত মিশনের সদস্য ডাঃ বসুর ডায়েরি এবং তাহার প্রদত্ত উপকরণাদি অবলম্বনে ইংরেজী ভাষায় সুলেখক খাজা আহম্মদ আব্বাস *And one who did not come back* নামক যে বিখ্যাত পুস্তকখানি রচনা করেন তাহা প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে। সমালোচ্য পুস্তকখানি ইহারই বঙ্গানুবাদ।

পুস্তকখানি আগাগোড়া সত্য ঘটনামূলক হইলেও ইহাতে স্থানে স্থানে উপন্যাসের চমৎকারিত্ব আছে। ইহাতে "নরকের রাজপথ" প্রভৃতি অধ্যায়ে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করে। ৬৪ নং শিবির হাসপাতালের বর্ণনা, রিমার্কের "অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্টে"র হাসপাতালের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের অবস্থা অবগত হইয়া রিমার্কের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—'A single hospital alone shows what war is!' যে দরদ দূরকে নিকট এবং পরকে আপন করে তাহা এই পুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং সেইজন্যই মিঃ এলে প্রভৃতির লিপিচিত্রও সার্থক হইয়াছে। মেডিক্যাল মিশনের যে কয়জন সদস্য চীনে গিয়াছিলেন তাঁহারা সে দেশের প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম হইয়া গিয়াছিলেন। ভারত ও চীনের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন ছিল তাঁহাদের ব্রত। পুস্তকখানি পড়িয়া চীন ও ভারতের চিরন্তন মৈত্রীর সম্পর্কের কথাই নূতন করিয়া মনে উদিত হয়। ডাঃ বসুকে লেখা ডাঃ কোটনিসের মৃত্যুর পূর্ব্বেকার কতকগুলি চিঠি, উত্তরচীনের একে অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীগ্রামে মাটির কুটিরে কোটনিসের মৃত্যুর মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা এই সবের দরুন ভ্রমণ-কথার উপসংহারে বিয়োগান্ত উপন্যাসের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। অনুবাদকের ভাষা যেমন মূলানুগ তেমনি শ্রীমণ্ডিত। 'Good earth'এর বাংলা রূপান্তর 'শ্রীময়ী ধরিত্রী' বড় ভাল লাগিল।

ছাড়পত্র—শ্রীসুকান্ত ভট্টাচার্য্য। দি বুকম্যান, ৮৭ চৌরঙ্গী রোড। মূল্য দেড় টাকা।

এই কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে লেখক পরলোকগমন করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে লোকান্তরিত কবির মোট পঁয়ত্রিশটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। অধিকাংশ কবিতাতেই স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভার স্বাক্ষর রহিয়াছে। তন্মধ্যে 'ছাড়পত্র' 'আগামী' 'চারা গাছ' 'প্রস্তুত' 'প্রার্থী' 'আগ্নেয় গিরি' ঠিকানা, বিবৃতি, চট্টগ্রাম ১৯৪৩ 'ঐতিহাসিক ও 'বোধন' এই কয়টিকে আমরা নিঃসংশয়ে প্রথম শ্রেণীর কবিতা বলিতে পারি। পুরুষালী রচনাভঙ্গী সুকান্তর কবিতার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রকাশভঙ্গীর দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়:

আমি যাযাবর কুড়াই পথের নুড়ি,
হাজার জনতা যেখানে, সেখানে
আমি প্রতিদিন ঘুরি,
বন্ধু, ঘরের খুঁজে পাইনাকো পথ,
তাইতো পথের নুড়িতে গড়বো
মজবুত ইমারত।

বন্ধু, আজকে আঘাত দিও না
তোমাদের দেওয়া ক্ষতে
আমার ঠিকানা খোঁজ ক'রো শুধু
সূর্য্যোদয়ের পথে।" (ঠিকানা)

সুকান্ত ছিলেন আশাবাদী কবি। এই আশাবাদ পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও আদর্শবাদ সঞ্জাত। উনিশ বৎসর বয়সেই কবি বলিতে পারিয়াছেন; "সুস্পষ্ট আমার কাছে জীবনের সুতীব্র সংকেত" (ফসলের ডাক: ১৩৫১)। আশাবাদে উদ্দীপ্ত কবি বলিয়াছেন—

"বিপন্ন পৃথিবীর আজ শুনি শেষ মুহুর্মুহু ডাক
আমাদের দৃপ্ত মুঠি আজ তার উত্তর পাঠাক।
ফিরুক দুয়ার থেকে সন্ধানী মৃত্যুর পরোয়ানা,
ব্যর্থ হোক কুচক্রান্ত, অবিরাম বিপক্ষের হানা।"
(বিবৃতি)

বাঁচিয়া থাকিলে এই প্রতিভাশালী কবির রচনাধারা বাংলা সাহিত্য যে বিশেষ সমৃদ্ধ হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

পাটনায় "কিশোর-সপ্তাহ"

সম্প্রতি পাটনা রোটারি ক্লাবের সহযোগিতায় ও পাটনা কেন্দ্রের "কিশোর দলের" উদ্যোগে ১৫ই অক্টোবর হইতে ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত "কিশোর-সপ্তাহ" উদ্‌যাপিত হইয়াছে। স্থানীয় ছাত্রবৃন্দ ও প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা এই কিশোর সপ্তাহের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করে। এই সম্মেলনের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কিশোররাই ইহার যাবতীয় কর্ম্ম পরিচালনা করে। ভারতীয় বয় স্কাউট পরিচালিত কিশোর-মিছিল, কিশোর-কল্যাণ-সম্মেলন, কিশোর-পার্টি, কিশোর-সামাজিক-বৈঠক, বিহার প্রাদেশিক আন্তঃ-বিদ্যালয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, ছোটদের সিনেমা এবং কিশোর-কর্মী-পরিষদের অধিবেশন প্রভৃতি কয়েকটি অনুষ্ঠান দর্শকদের বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করে। পাটনার ও অন্যান্য প্রদেশের যে সকল বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী সাংবাদিক, সমাজ-কর্মী ও সাহিত্যিক এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন তন্মধ্যে অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, ফাদার মোরান, ডাঃ জে, সি, মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শচীন সেন, ডক্টর বিনয় দাশগুপ্ত, বিচারপতি বি. পি. সিংহ, মণীন্দ্রচন্দ্র সমাদ্দার, শিবকুমার মিত্র, মিসেস কামরুন্নিসা বেগম প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ধরণের "কিশোর-সপ্তাহের" আয়োজন আমাদের দেশে ইহাই সর্ব্বপ্রথম।



ভারতীয় বয় স্কাউট দল পরিচালিত কিশোর শোভা-যাত্রা



কমলা সমাদ্দার পরিচালিত কিশোরপাটির মিছিল



পাটনা মিউজিয়ম পরিদর্শনে কিশোর-দলের সভ্যাগণ

অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১০ই কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোকগমন করেছেন। তাঁর এই শোচনীয় অকালমৃত্যুর সংবাদ বাঙলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।



অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙলাদেশের অনেকেই অম্বুজনাথকে জানতেন, অনেকে জানতেনও না। আমি তাঁর একজন নিকট-আত্মীয় বলেই যে তাঁকে জানতাম তা নয়; ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অতিক্রান্ত ক্ষেত্রেও বহু বার তাঁর সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল বলে আমি তাঁর পরিচয় পাবার কিঞ্চিৎ সুযোগ লাভ করেছিলাম।

সুবিখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর পিতা; নিজে তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের দুই বিভিন্ন বিভাগে দু'বার (তন্মধ্যে একবার প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে) এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরে মূল্যবান গবেষণাত্মক আলোচনার ফলে পি-আর-এস সম্মান লাভ করেন। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব, মূর্ত্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন, এ সকল পরিচয় নগণ্য পরিচয় না হলেও ইহা অপেক্ষাও দুর্লভ এবং গৌরবজনক যে পরিচয়ের তিনি অধিকারী ছিলেন, সে পরিচয় অনেকেরই নিকট অবিদিত ছিল। সে পরিচয় ছিল, তাঁর প্রবল কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে নীরব এবং নির্বিরোধ্য করে রাখবার ঐকান্তিক সংযম এবং নিষ্ঠা।

গাছ যেমন তার মূল সত্তাকে ভূমির মধ্যে লুকায়িত রেখে শাখা-প্রশাখাকে আকাশের বায়ুতে তুলে দেয়, অম্বুজনাথও তেমনি কর্মের মধ্যে আবৃত হয়ে থেকে নিজেকে লোকচক্ষুর বহির্ভূত করে রাখতেন। সন্ধানী লোকেরা কিন্তু অম্বুজনাথের জ্ঞানবৃক্ষের সন্ধান রাখত এবং প্রয়োজনকালে বৃক্ষতলে উপস্থিত হয়ে নাড়া দিয়ে অভীষ্ট ফল লাভ করত। এই সন্ধানী দলের মধ্যে দেশবিখ্যাত ঐতিহাসিক, হাইকোর্টের বিচারপতি একনিষ্ঠ দেশসেবক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোককেই দেখা যেত।

ইংরজীতে একটা কথা আছে, No man is educated until he has forgotten his Latin। অম্বুজনাথ তাঁর Latin অর্থাৎ বিদ্যার কচকচি সম্পূর্ণরূপে ভুলেছিলেন। তাই অনেকেই তাঁর শিশুসুলভ সরলতা এবং অকৃত্রিম নিরহঙ্কার ভাব দেখে ভুল করত, তিনি বুঝি এক খণ্ড নিস্তেজ তামার তার; কিন্তু স্পর্শ করবার প্রয়োজন হলে চমকিত হয়ে দেখত, সে তারের মধ্যে প্রবহমাণ বিদ্যা এবং জ্ঞানের উচ্চ ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক্তি।

সর্বদিক দিয়ে আমাদের দেশকে গড়ে তোলবার প্রচেষ্টায় যে সকল নীরব কর্মীর কর্মসাধনা প্রতিনিয়ত সক্রিয় আছে, সেই কর্মীদের অন্যতম ছিলেন অম্বুজনাথ এ কথা বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গৌরীহর মিত্র

সুসাহিত্যক গৌরীহর মিত্র গত ২০এ আশ্বিন পরলোকগমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল একনিষ্ঠ ভাবে তিনি সাহিত্যসেবা করিয়া গিয়াছেন। প্রবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। তাঁহার লিখিত পুস্তকসমূহের মধ্যে "বীরভূমের ইতিহাস", "চরিত কীর্ত্তন", "জ্ঞানের জাহাজ", "ভারত কথা", "মহাপুরুষ প্রসঙ্গ", "বিজ্ঞানের বাহাদুরী", "ছেলেদের উপকথা" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বীরভূমের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতির গবেষণায় তাঁহার ঐকান্তিকতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। "বীরভূমের ইতিহাস" নামক পুস্তকখানি তাঁহার সমগ্র জীবনের সাধনার ফল। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবিতাবস্থায় উহার দুইখণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে, বাকী বিরাট দুইখণ্ডের পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন ঃ—পৃ. ১৫৭, পংক্তি ৪, "১২৪৩৬*" স্থলে "১২৫০*" পড়িতে হইবে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা



শ্যামা   রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ' হইতে

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা



শ্রীনগরে একটি জনসভায় বক্তৃতাপ্রদানরত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

পৌষ, ১৩৫৪

৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্ব সমস্যা

পশ্চিম-পঞ্জাবে, কাশ্মীরে, হায়দরাবাদে ও অন্যান্য পাকিস্থান সংযুক্ত বা প্রভাবিত প্রদেশে যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুদিগের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাদের মনোবৃত্তি এবং কার্য্য-ক্রমের অভ্রান্ত ও সুস্পষ্ট নির্দ্দেশও পাওয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে আমাদের বুঝিবার ও বিচার করিবার সময় আসিয়াছে যে কংগ্রেসের মনোনীত নেতৃবর্গের ঐ শত্রুদিগের মুক্ত ও গুপ্ত অভিযান ব্যর্থ করিয়া এই রাষ্ট্রের গঠন ও পরিচালনার জন্য সম্যক্ ও যথার্থ বুদ্ধিবিবেচনা ও ক্ষমতা আছে কিনা। আচার্য্য কৃপালনী তাঁহার ইস্তফাপত্র দাখিল করার সময় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে স্বয়ং রাষ্ট্রপতিই সে বিষয়ে বিশেষ সন্দিগ্ধ। যে বিশেষ উদ্দেশ্য ও সংকল্প লইয়া বর্ত্তমান কংগ্রেস গঠিত, চালিত ও উদ্দীপিত হইয়াছিল তাহা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ভারতে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করা। আজ সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে। কেননা ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে এ দেশের ব্রিটিশ শাসক ও শোষকবর্গ দেশ বিভাগ করিয়া, অশেষ নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়া এমন এক পরিস্থিতির সূচনা করিয়া গিয়াছে যাহা অতি বিচক্ষণ, অতি নিপুণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ রাষ্ট্রপরিচালকবর্গের পক্ষেও বিষম জটিল। উপরন্তু এখন বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতিও ক্রমেই অত্যন্ত শঙ্কাজনক ও সমস্যাবহুল হইয়া পড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের ভার বহন করিবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা আমাদের নেতৃবর্গের কাহার কতটা আছে তাহার বিচার এখনই প্রয়োজন, কেননা বিলম্বে এইরূপ কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বিপাকে পড়িয়া নষ্টপ্রায় হইতে পারে।

অনেকের ধারণা, সময় পাইলে এই নেতৃবর্গ সমস্ত সামলাইয়া অনেক অসাধ্য সাধনে দেশকে ঠিকপথে চালাইয়া লইয়া গন্তব্য স্থলে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবেন। এইরূপ ধারণা যে শুধু ভ্রান্ত তাহা নহে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে উহা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমাদের বুঝা উচিত যে আমরা সময় দিতে প্রস্তুত থাকিলেও বিপক্ষ তাহাতে রাজী হইতে পারে না। পাকিস্থান ও কাশ্মীরের ঘটনাবলী তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আমাদের জানা উচিত যে বিদেশী শোষকবর্গের বিচারে আমাদের ধ্বংস ও পরাজয় যত শীঘ্র হয় তত শীঘ্রই তাহাদের মঙ্গল, এবং ইহাও জানা উচিত যে আমাদের অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির অভাব, দীর্ঘসূত্রিতা ও অন্যান্য দুর্ব্বলতা যত দিন আছে তত দিনই আমাদের শত্রুপক্ষের সুবর্ণ সুযোগ। তাহারা যে সে সুযোগ ত্যাগ করিয়া, আমাদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাইয়া আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি-বিবেচনা উদ্রেকের অপেক্ষায় অস্ত্রসংবরণ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে একথা মনে স্থান দেওয়াই বাতুলতার পরিচায়ক। অন্য দিকে তাঁহারা সেই সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়া আমাদের দুর্ব্বলতার অবকাশে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবে যদি আমরা অহিংসা, আদর্শবাদ বা অন্য অজুহাতে কেবলমাত্র আক্ষেপ ও নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া তোষণনীতির পথেই চলিতে থাকি, তবে সময় যতই বহিয়া যাইবে বিপক্ষ ততই সবল সক্ষম হইবে এবং আমরা ততই দুর্ব্বল ও অক্ষম হইতে থাকিব। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সময় অক্ষমের সহায়ক নহে, সংহারক।

বস্তুতঃপক্ষে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র এখন যে পরিবেশের মধ্যে রহিয়াছে, তাহাতে রাষ্ট্রনেতৃত্বে দৃঢ়চেতা, অভিজ্ঞ বাস্তববাদীর প্রয়োজন চতুর্দ্দিকে, কেবলমাত্র আদর্শবাদ সম্বল করিয়া কল্পনা-ক্ষেত্রে বিচরণ করার অবকাশ আর নাই। দেশের বাহিরে শত্রু ও দেশের ভিতরেও নানাপ্রকারের অসংখ্য প্রচ্ছন্ন শত্রু রাষ্ট্রের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ফিরিতেছে। এখন বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও অতি দ্রুত গতিতে রাষ্ট্রকে সবল ও সক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে। নচেৎ দেশের উন্নতির আশা ত সুদূরপরাহত হইবেই, দেশকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করাই অসম্ভব হইয়া উঠিবে। দেশের লোক যাঁহাদিগকে রাষ্ট্রনেতৃত্বে বরণ করিয়াছে তাঁহাদের বুঝিতে হইবে যে দেশ এখন প্রতি পদে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদের নিকট হইতে কার্য্যতঃ যোগ্যতার পরিচয় ও সবল সক্ষমতার নিদর্শন চাহিতেছে। স্তোকবাক্যে জনসাধারণ আর ভুলিবে না। দেশ এখন চাহিতেছে প্রতিশ্রুতির পূরণ।

বর্ত্তমান গণতন্ত্রের যুগে দেশের জনসাধারণের সমষ্টিগত সম্মতিই (sanction) রাষ্ট্রের প্রবলতম শক্তি। এই শক্তিকে

সংযত ও নিয়মানুবর্ত্তী করিয়া চালনা করিতে পারিলেই রাষ্ট্রের মঙ্গল, না হইলে বিপদ। জনমতকে উপেক্ষা বা অবহেলা করিয়া চলিলে হয় সে শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া রাষ্ট্রকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে নচেৎ সে শক্তি বিপরীতগামী হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে। চীনদেশে আজ এই দুর্ব্বিপাকের পূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। আমাদেরও বিচারের সময় আসিয়াছে যে আমাদের নেতৃবর্গই বা রাষ্ট্রকে কোন্ পথে লইয়া যাইতেছেন। তাঁহারা দেশের জনসাধারণের যে গরিষ্ঠ অংশের সম্মতি, সহায়তা ও সমর্থনের ফলে আজ রাষ্ট্র-পরিচালনার অধিকার লাভ করিয়াছেন, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সেই সমর্থকদিগের পূর্ণ বিশ্বাস ও অবিমিশ্র সম্মতি তাঁহারা রাখিতে পারিতেছেন কিনা। রাষ্ট্রে এখন চতুর্দ্দিকে অভাব-অভিযোগের স্রোত বহিতেছে। লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারার হা-হুতাশ ও অভিশাপে লোকের মন ক্লিষ্ট, শত-সহস্র ধর্ষিতা ও অপহৃতা নারীর শোচনীয় অবস্থার চিন্তায় জনমত বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ। ইহা ছাড়া আছে দুষ্ট স্বার্থান্বেষী চক্রান্তকারীর প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিপ্লব-প্রচেষ্টা। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রের চালকদিগের যোগ্যতার অগ্নিপরীক্ষার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।

বাংলায় জনবিক্ষোভ ও তাহার কারণ

বাংলার পরিস্থিতি বিচার ইতিপূর্ব্বেই কয়েক সংখ্যায় আমরা করিয়াছি। এই সংখ্যায় আরও বিস্তারিত বিচার করিবার ইচ্ছা আমাদের ছিল কিন্তু সম্প্রতি 'নিরাপত্তা বিল' লইয়া যে জনবিক্ষোভ ও আন্দোলন হইয়া গিয়াছে তাহাতে আমাদের সেরূপ বিচার সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখিতে হইতেছে। নিজের বুদ্ধিবিচারের উপর অপরিসীম বিশ্বাসের ফলে প্রফুল্লবাবু পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহ তাঁহার গদী-দখলের চেষ্টায় এইরূপ জনবিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। এই চক্রান্তে বাংলার অপরিণত মস্তিষ্ক যুবশক্তি ও পেশাদার বিক্ষোভ ও আন্দোলনকারীদিগের নিয়োগ করিয়া যাঁহারা এই গোলমাল বাড়াইয়া তুলিয়াছেন সেই মহাশয় ব্যক্তিগণের হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাওয়ার অর্থ দেশের সর্ব্বনাশের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা। সেরূপ অবস্থায় আমরা প্রথমেই বলিতে বাধ্য যে এই ব্যাপারে দেশের লোক ভুল পথে চলিয়াছে।

রাষ্ট্র এখন আমাদের হাতে। রাষ্ট্রচালক যদি ভুল বা অন্যায় করে তবে তাঁহাকে সে ভুল সংশোধনে বা পদত্যাগে বাধ্য করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে শাস্তিবিধান করিবার অছিলাতে রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া দেশে বিশৃঙ্খলার স্রোত বহাইতে যে চাহে সে দুরাচার রাষ্ট্রের আরও বিষম শত্রু। বাংলার যুবক ও তরুণ দলের এখন বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের এইরূপ উদ্দাম উচ্ছ্বাসের ফলে কিছুকাল যাবৎ দেশের অবনতিই হইতেছে এবং তাহাদের নিজেদের ভবিষ্যৎও ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইতেছে। বাংলার ছাত্রমণ্ডলী কুটিল চক্রান্তকারী মাত্রেরই হাতে কলের পুতুল হইয়া দাঁড়াইতেছে ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়।

কিন্তু অন্য দিকে ইহাও ঠিক কথা যে প্রফুল্লবাবু দেশের লোককে সন্দেহের অবকাশ না দিলে তাহাদিগের বিশ্বাস ও আস্থা পূর্ব্বেকার মতই তাঁহার প্রতি থাকিত এবং সে অবস্থায় ঐরূপ জনবিক্ষোভ সৃষ্টি করিতেও কেহ সাহস পাইত না।

ঘোষ মন্ত্রীসভার চার মাস

ডাঃ ঘোষের মন্ত্রীসভা আজ চার মাস যাবৎ পশ্চিম বঙ্গের পরিচালক। ইহার মধ্যে বক্তৃতা ও বিবৃতির তুবড়ীবাজী অনেক ছুটিয়াছে কিন্তু জাতির কল্যাণকর একটি কাজও হইয়াছে বলিয়াও আমরা দেখিতে পাইতেছি না। দেশের চতুর্দ্দিকে যে সব বিপদ ঘনাইয়া উঠিতেছে তার অন্ন প্রভৃতি, ঘরের পাশে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে সাহস ও বিশ্বাস সঞ্চারিত করিবার আয়োজন, উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রভৃতি কোন গঠনমূলক কাজ আরম্ভ হইবার নিদর্শনটুকুও এই চার মাসে পাওয়া গেল না। শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে কয়েক জন মামুলী লোক লইয়া একটি মামুলি কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং তাঁহারাও যথারীতি "অভিমত" সংগ্রহের সদভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে সার্জ্জেন্ট স্কীম অনুসারে কয়েক জনকে বিলাতে ও ভারতে ট্রেনিং দিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের যেটুকু আয়োজন লীগ আমলে হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া দিয়া অভ্রাশ্রমের ত্রিকালজ্ঞ মহাজ্ঞানীদের সুপারিশক্রমে তাঁহাদের মধ্য হইতে জন ছয়েককে আবার নূতন করিয়া শিক্ষা লাভের জন্য ওয়ার্দ্ধা পাঠানো হইয়াছে। সার্জ্জেন্ট স্কীম অনুসারে যতটা কাজ অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে এই ভাবে বাধা না পড়িলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এত দিনে অনেকটা আগাইয়া যাইতে পারিত। প্রাথমিক শিক্ষার মূল কথা উপযুক্ত 'শিক্ষিত' শিক্ষক, তাহার জন্য সর্বাগ্রে দরকার টীচার্স ট্রেনিং কলেজ। ভারত-সরকারের চাপে পড়িয়া লীগ গবর্মেণ্ট এইরূপ দুইটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ডাঃ ঘোষ সর্ব্বপ্রথমে উহার মূলোচ্ছেদ করিয়া উহার শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের কয়েক জনকে ওয়ার্দ্ধা পাঠাইয়াছেন। শোনা যাইতেছে ইঁহাদিগকে বিশেষভাবে হিন্দীর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের কায়দা আয়ত্ত করিতে হইবে। বাঙালী ছাত্রদের তাহাতে লাভ-লোকসান কি হইবে তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন, অবশ্য প্রফুল্ল বাবুর "উপরওয়ালা"রা খুশী হইতে পারেন।

প্রদেশের দ্বিতীয় সমস্যা শান্তিরক্ষা এবং পশ্চিম বঙ্গ হইতে পাকিস্থানে চাউল চিনি কয়লা কাপড় অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির বে-আইনী চালান নিবারণ। শান্তিরক্ষায় কলিকাতার তরুণ-তরুণীদের আন্তরিক পরিশ্রম, বিপদ বরণ ও আত্মবলিদানের কৃতিত্ব লইতেছে পুলিস এবং পুলিসের মধ্যে যাহারা ডাঃ ঘোষের প্রিয়পাত্র—তাহাদিগকে বেশী সংখ্যায় উচ্চতম ও ক্ষমতাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পুলিসে যে কয়েক জন দক্ষ ও সৎ কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহাদিগকে এমন সব কাজে দেওয়া হইতেছে যাহাতে কোনরূপ দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ তাঁহারা না পান। কিন্তু যোগ্যতা চাপা থাকে না বলিয়া বর্ত্তমান অবস্থাতেও ইঁহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শন করিতেছেন। ডাঃ ঘোষ এবার বেঙ্গল পুলিস ও কলিকাতা পুলিস একত্র করিয়া কলিকাতা পুলিসের কর্ম্মনিপুণতার দফা নিকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। লীগ আমলে কলিকাতার ২৪টি

থানার মধ্যে ১৪টি অযোগ্য মুসলমান কর্ম্মচারীদের হাতে পড়ায় শহরবাসীর লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছিল। এবারও ১৪টি থানায় বেঙ্গল পুলিসের অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য লোক আমদানী হওয়ায় শহরে দুর্বৃত্তের উপদ্রব খুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। মুসলিম লীগের যে সব কর্ম্মচারী ভারতে থাকিয়া ইসলামের সেবা করিবার আগ্রহে পশ্চিমবঙ্গে রহিয়া গিয়াছে, পুলিসের উচ্চতম পদগুলিতে তাহাদিগকে অধিষ্ঠিত রাখা হইয়াছে। পোর্ট এলাকা অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য বে-আইনী দ্রব্যাদির আমদানী-রপ্তানীর কেন্দ্র। সেখানে সবচেয়ে দুর্ব্বল ও লীগের প্রাক্তন থানাধ্যক্ষ এক জন হিন্দু ডেপুটী কমিশনার দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার পাশে দক্ষিণ কলিকাতার ওয়াটগঞ্জ বিভাগে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগওয়ালা একজন মুসলমান এ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছে। পোর্ট এলাকার ইনি সুপরিচিত এবং উহার অতি নিকটেই তিনি বাস করেন। জোড়াসাঁকো জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট প্রভৃতি লীগ ঘাঁটি যে এলাকায় অবস্থিত সেখানেও এক জন মুসলমান এ্যাসিষ্ট্যান্ট কমিশনার দেওয়া হইয়াছে।

এক সাংবাদিক সম্মিলনে ডাঃ ঘোষ বলিয়াছেন যে কলিকাতায় পাকিস্থানী গুপ্তচরবৃত্তি চলিতেছে এবং তাহা ধরিবার জন্য নাকি চেষ্টাও হইতেছে। চেষ্টার কিছু নমুনা তো উপরে দেখা গেল। ব্যবস্থার নিদর্শন আরও চমকপ্রদ। শহরের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের। এই ব্রাঞ্চে আগে দুই জন ডেপুটী কমিশনার ছিলেন, এখন আছেন তিন জন। তন্মধ্যে আছেন লীগওয়ালা ডেপুটী কমিশনার স্বনামধন্য রেজা সাহেব, এক জন ইংরেজ আসিয়াছেন, উপরন্তু ইংরেজ ও লীগ উভয় শাসককেই যিনি তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন তেমনি এক জন হিন্দুও আমদানী হইয়াছেন। স্পেশাল ব্রাঞ্চের নীচের পদগুলিতেও বেঙ্গল পুলিস হইতে লোক আনিয়া ভর্ত্তি করা হইয়াছে। ইহারা বেঙ্গল পুলিসের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী পুরুষ নলিনী মজুমদারের ট্রাডিশন বজায় রাখিবেন। যে পাকিস্থানী গুপ্তচরবৃত্তি বন্ধ করা এবং উহার সংবাদ সংগ্রহ করা স্পেশাল ব্রাঞ্চের এখন সর্ব্বপ্রধান কাজ হওয়া উচিত বিধিব্যবস্থার তাহার বিপরীতই হইতেছে মনে হয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গত আগষ্ট মাসে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে এক জন মুসলমান নাবিক বহু অস্ত্রশস্ত্রসমেত ধরা পড়ে। উহার নিকট ডিনামাইট এবং তদপেক্ষা ভয়ানক বিস্ফোরকও পাওয়া যায়। লোকটি ধরা পড়ে তালতলা থানার এলাকায়। তালতলায় তখন বেঙ্গল পুলিসের এক জন সাব-ইনসপেক্টরকে অফিসার-ইন-চার্জ্জের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি ঐ মামলাটি বেমালুম চাপিয়া যান। ম্যাজিষ্ট্রেট বার বার তাঁহাকে তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি উহাকে হাজতে রাখিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন না এবং ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। পুলিসে যাঁহারা ডাঃ ঘোষের বিশেষ প্রিয়পাত্র আছেন উক্ত অফিসারটি তাঁহাদের বিশেষ অনুগ্রহভাজন, কাজেই ইহার পর তাঁহার শাস্তি না হইয়া প্রমোশনের বন্দোবস্ত হইতেছে। এত বড় অস্ত্র আবিষ্কারের পর উহা অবলম্বন করিয়া স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিস আরও কোন বাড়ী তল্লাসী বা কাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। কলিকাতা করপোরেশন নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও যথাপূর্ব্বং লীগতোষণ চলিতেছে। নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও প্রার্থী আসনের প্রথম যে তালিকা প্রকাশিত হয় তাহাতে একটি ওয়ার্ডে ৮০০ মুসলমানের জন্য একটি আসন ও এক লক্ষ হিন্দুর জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট হয়। ইহা লইয়া আন্দোলন হইলে তালিকা পরিবর্ত্তিত হয় এবং উহাতে সমস্ত ত্রুটি সংশোধিত হয়। দ্বিতীয় তালিকা অনুসারে নির্ব্বাচন হইলে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সুবিধা হইত। লীগ ইহার প্রতিবাদ করে এবং তলে তলে তদ্বিরাদিও চলিতে থাকে। ইহার ফল ফলিতেও বিলম্ব হয় নাই। সৈয়দ নৌশের আলি, ডাঃ আর আহমদ প্রমুখ কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের অভিমত অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং মুসলিম লীগের আবদার ষোল আনা বজায় রাখিয়া ডাঃ ঘোষের তৃতীয় পরিবর্ত্তিত তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

শাসন বিভাগের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও শৈথিল্য এবং বে-বন্দোবস্তের জন্য বিশৃঙ্খলা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে। বাড়তি কর্ম্মচারীদের তিন মাসের মধ্যেও কাজ দেওয়া যায় নাই এবং যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কাজের চেয়ে অকাজ এবং ক্ষতি বেশী হইবে। সেলস ট্যাক্স আপিসে নয়বার বিভাগের উচ্চ ও অডিটার ও একাউণ্ট্যাণ্টদের দেওয়া উচিত ছিল; তৎস্থলে দেওয়া হইয়াছে এক দল সাব-রেজিষ্ট্রার। ইঁহারা ভূমি-আইন কতকটা জানেন এবং হাকিমী করিতে অভ্যস্ত। হিসাব পরীক্ষার কঠিন কাজ ইঁহাদের নিকট আশা করাই বৃথা। ইহার ফল হইয়াছে এই যে জনসাধারণ প্রত্যেকটি জিনিষ চার গুণ দামে কিনিয়া তার উপর টাকায় তিন পয়সা হারে ট্যাক্স দিতেছে কিন্তু উহার অধিকাংশই সরকারী তহবিলে জমা পড়িতেছে না। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ব্যবস্থা-পরিষদের প্রভাবশালী সদস্য অথবা বড় চাকুরীয়াদের আত্মীয়স্বজনেরাই অধিক পরিমাণে সাব-রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সেদিক দিয়া ইঁহাদের অনেকেরই মুরুব্বীর জোর এত বেশী যে তাঁহাদিগকে মফঃস্বলে পাঠাইতে চাহিলে সেক্রেটারিয়েটের উচ্চতম পদাধিকারীদের টেলিফোন পাইয়া সেল্‌স কমিশনারকে কাহারও কাহারও বদলীর আদেশ নাকচ করিতে হইয়াছে। এই অবস্থায় আপিসের শৃঙ্খলা থাকে না এবং বিক্রয়-কর আপিসের শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার অর্থ অসাধু ব্যবসায়ী ও দুর্নীতি-পরায়ণ অফিসারদের পৌষ মাস এবং জনসাধারণের সমূহ ক্ষতি ঘটিতেছে।

সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দ্বারা দেশের যুব-সমাজকে ডাঃ ঘোষ কাজ দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন

নাই। পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের বাস সম্ভব করিতে হইলে পশ্চিম-বঙ্গকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে ও শক্তির বাহিক প্রকাশ দেখাইতে হইবে—ইহা আমরা বহু বার বলিয়াছি। পশ্চিম-বঙ্গের শক্তির উপর পূর্ববঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর মর্য্যাদা ও স্বার্থ বজায় থাকা নির্ভর করে। ত্রিপুরার ব্যাপারে দেখা গিয়াছে পাকিস্থানী কর্তারা একমাত্র শক্তির কথাই মানেন।

বিশেষ ক্ষমতা আইন

পশ্চিমবঙ্গের সম্মুখে যখন সহস্র সমস্যা বিদ্যমান, সেই সময়েও ডাঃ ঘোষ বিশেষ ক্ষমতা বিল ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থিত করিয়া আর এক নূতন অশান্তি সৃষ্টি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই বিল আইনে পরিণত হইলে পুলিসের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা আসিবে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে হাইকোর্টের ক্ষমতা একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, আটক, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ প্রভৃতি ব্যক্তি-স্বাধীনতার হানিকর সর্ব্ববিধ ক্ষমতা ডাঃ ঘোষ এই আইনের বলে নিজের হাতে আনিতে চাহিতেছেন। শাসনযন্ত্রের গঠন, শাসক ও পুলিস নিয়োগ ও ব্যবহার যে সব নিদর্শন প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে সাধারণের এই সন্দেহ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে ডাঃ ঘোষ নিজ দলের বিরুদ্ধবাদীরা যাহাতে প্রকাশ্য আন্দোলনের দ্বারা মাথা তুলিতে না পারে তার জন্যই এই আইনটি পাস করাইয়া লইতে চাহিতেছেন।

বীরভূম নির্ব্বাচনে ডাঃ ঘোষ ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নৈতিক দিক হইতে দেখিতে গেলে তাঁহারই সম্পূর্ণ পরাজয় হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সপ্তাহখানেকের বেশী প্রচারকার্য্যের সুযোগ দেন নাই। তাহা সত্ত্বেও বিপদের আশঙ্কায় কংগ্রেস-সভাপতি আচার্য্য কৃপালনীর নিকট হইতে এই মর্ম্মে ফতোয়া আনাইতে হয় যে তাঁহার বিরোধিতা করার অর্থ দেশের বিরুদ্ধাচরণ। কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্র কংগ্রেসের নামইজ্জৎ রক্ষার জন্য তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছে। মন্ত্রীরাও কেহ কেহ সদলে বীরভূম যাত্রা করেন। ইহাতেও অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া তিনি হুগলী ও বর্দ্ধমানের যে সব নেতাকে অতিশয় অন্যায় ও অসঙ্গত ভাবে স্থানীয় মন্ত্রীসভা গঠনের সময় বাদ দিয়াছিলেন তাঁহাদের শরণাপন্ন হন। সপ্ততিপর বৃদ্ধ শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার প্রতি ডাঃ ঘোষ সবচেয়ে বেশী অন্যায় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মনে না রাখিয়া পাঁজা মহাশয়কে লইয়া যাওয়া হয় নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে এবং তাঁহার যাওয়ার পর ঐ ভোটদাতাদের মন ফিরিতে আরম্ভ করে। হুগলীর শ্রীপ্রফুল্ল সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অকুণ্ঠভাবে ডাঃ ঘোষকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন প্রকাশ করেন। কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী, সুভাষব্রিগেড দল প্রভৃতি এবং অনেক ছাত্রকেও বীরভূমে পাঠানো হয়। এইরূপ প্রবল চেষ্টার পর প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ঘোষ তাঁহার প্রতি-দ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁহার হিন্দু মহাসভা নির্ব্বাচিত অজ্ঞাতনামা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় এগার হাজার ভোট পান। এত দিন দেশের নিয়ম এই ছিল যে কংগ্রেস-প্রার্থীর বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়াইতেন তাঁহার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইত। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের গত নির্ব্বাচনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার একজন অল্প পরিচিত কর্ম্মীর নিকট অনুরূপ ভাবেই পরাজিত হন আমাদের যত দূর মনে পড়িতেছে, বীরভূমে যে আসনে ডাঃ ঘোষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন উহাতে শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায় বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায়কে অযথা গণ-পরিষদে উন্নীত করিয়া ঐ আসনটি খালি করা হয় এবং উহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ মনে করিয়া ডাঃ ঘোষ সেখানে গিয়াছিলেন। সেখানে ঐরূপ নাস্তানাবুদ হইয়াও যদি প্রফুল্লবাবু জনমতের গতি না বুঝিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে কে বুঝাইবে ?

সৌমোন ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বিশেষ ক্ষমতা বলে, অস্ত্রবলে গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ সাধন চেষ্টার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে, কিন্তু প্রথমেই জিজ্ঞাস্য সৌমেনের শক্তি কতটুকু ? কয়জন লোক এবং কয়টা অস্ত্র তাঁহার দলে আছে বা সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ? উহার দ্বারা একটা কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট ধ্বংস করিয়া রাষ্ট্র দখল করা কি চূড়ান্ত পাগলামির কথা নহে ? ব্রহ্ম-দেশে উ স সৌমোন ঠাকুরের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, অনেক বেশী অস্ত্রশস্ত্র লোকজন তাঁহার আছে, দেশের একটা বড় দলও তাঁহার সমর্থক। তৎসত্ত্বেও তিনি আউঙসান ও অপর কয়েক জন মন্ত্রীকে হত্যা করিতে পারিয়াছেন মাত্র, গবর্ণমেণ্ট দখল ত করিতে পারেনই নাই ; বরঞ্চ খুনের দায়ে তাঁহাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইয়াছে। আউঙসানের কথা মনে করিয়া অস্ত্রের কথা শুনিলেই ডাঃ ঘোষ যদি প্রাণের ভয়ে বিচলিত হন তবে অবশ্য আলাদা কথা, কিন্তু তিনি যদি সাহসের ও নিষ্ঠার সহিত প্রধানমন্ত্রী থাকিয়া দেশ শাসন করিতে চাহেন তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে আধুনিক যে কোন গবর্ণমেণ্টের শক্তি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে জন-প্রিয়তার উপর, অস্ত্রের বা পুলিসী সহচরের উপর নয়। আজ যদি ডাঃ ঘোষ গঠনমূলক কাজে প্রবৃত্ত হইতেন, দেশের সজ্জন বিচক্ষণ লোকের সৎপরামর্শ লইয়া কাজ করিতেন, কর্ম্মঠ লোকদের উৎসাহ ও কাজ দিতেন, শিক্ষা বিস্তার ও উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য আত্মনিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে দেখিতেন সৌমোন ঠাকুর বা ঐরূপ কাহারও দ্বারা তাঁহার গবর্ণমেণ্ট ভাঙিবার চেষ্টা হইতেছে ইহা জানিবামাত্র দেশের জনশক্তিই তাহাদের সংযত করিবার বা শাস্তিদানের ভার লইত। অথবা বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত হইয়াছে ইহা বুঝিলে দেশের লোক বিনা বাধায় সে ক্ষমতা মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে তুলিয়া দিত।

পশ্চিম বাংলার সীমান্ত রক্ষা

বাংলাদেশ দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বাংলার সঙ্গে পশ্চিম বাংলার সম্বন্ধ আজ বন্ধুত্বের নয়। যে ভাবের প্রেরণায় বাংলাদেশে এই নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তার মধ্যে সদ্ভাব বন্ধু ভাব ছিল না, এখনও নাই। সুতরাং আজ যদি পূর্ব্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন চীৎকার করিতে থাকেন যে তাদের নূতন রাষ্ট্র শত্রুপরিবেষ্টিত এবং টাকার জোরে শত্রুপক্ষ তার গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু চিন্তিত হইবার আমাদের কারণ আছে, যখন দেখি যে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এই পট-পরিবর্ত্তনের অবস্থা সম্বন্ধে এক প্রকার নির্বিকার। ব্রিটিশ শাসনের সময়ে বাংলাদেশের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের কোন দায়িত্ব ছিল না। বাংলাদেশের লোকে পায়ের উপর পা তুলিয়া নিজের দেশের রক্ষা সম্বন্ধে নির্ব্বিকার থাকিবার শিক্ষা পাইয়াছিল গুর্খা, শিখ, পাঠানের উপর নির্ভর করিয়া। সেইরূপ ১৫ই আগষ্টের পরেও দেখিতেছি, সর্দার বলদেব সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছেন। স্থানীয় লোক পূর্ব্বে—ব্রিটিশ যুগে—যেমন দেশের সীমান্ত-রক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞ ও নিরুৎসাহ ছিল, আজও সেই তুরীয় অবস্থায় আছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী তাঁর রাষ্ট্রের মুসলিম গণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন দেশরক্ষার জন্য কিন্তু ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এরূপ কোন কিছুই করিতে পারিতেছেন না। পূর্ব্ববঙ্গে খাদ্যাভাব আছে, তার তুলনায় পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা ভাল। পূর্ব্ববঙ্গের বস্ত্র-সঙ্কট আরও কঠিন। মুসলিম জনতার মনে এই বিষয়ে কোন ক্ষোভ যে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহারা রাষ্ট্রের রক্ষা সম্বন্ধে সচেতন; তাহাদের ন্যাশনাল গার্ড অনেক ক্ষেত্রে পুলিসের কাজ করিতেছে, তাহাদের উৎসাহের আতিশয্যে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিমণ্ডলীকে অনেক সময় লজ্জা পাইতে হয়; কিন্তু এই উৎসাহ তাঁহারা দমন করেন না। এই উৎসাহ সহস্র হস্ত হইয়া রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম্য করে; সহস্র চক্ষু সজাগ রাখিয়া রাষ্ট্রের শত্রুর গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখে। পশ্চিম বাংলায় ঐরূপ গণ-জাগরণ নাই; ১৫ই আগষ্টে যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অবহেলায় শুকাইয়া গিয়াছে। গণশক্তি আজ পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্রের পরিচালকদের নিকট বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে নিরাপত্তা বিল প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাই ইহার প্রমাণ। অথচ এই গণশক্তির উৎসাহ-উদ্দীপনা কত সহজে রাষ্ট্রের সেবায় লাগান যাইত। দেশবাসীকে সংযত হইয়া হুকুম তামিল করিয়া যাইতে বলা হইতেছে। কিন্তু কোন কর্ম্মের নির্দেশ নাই। বাঙালী যুবক আজ দেড় শত বৎসরের অসামরিক জাতি বলিয়া তাহার কপালে যে কলঙ্কের টীকা টিপিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার অপমান মুছিয়া, দেশ-রক্ষায় গৌরবের পদ অধিকার করিবার সুযোগ পাইতে চায়। সে যে অধৈর্য্য হইয়া, ডাক শুনিতে না পাইয়া, কাজে-অকাজে মাতিয়া উঠিয়াছে তাহার জন্য রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ দায়ী। তাঁহারা এই যুব-শক্তির সম্মুখে কোন আদর্শ ধরিতে পারিতেছেন না যাহার মধ্যে বাঙালী যুবক শুনিতে পাইবে রণদেবতার দুর্জ্জয় আহ্বান। এতদিন সে গোপনে এই আদর্শের সেবা করিতে গিয়া প্রাণ দিয়াছে। আজ সে চায় গৌরবে মাতৃভূমির সীমান্ত রক্ষায় প্রাণ দিতে। চারি শত মাইল বিস্তৃত সর্পিল সীমান্ত রেখায় গ্রামে গ্রামে সংগঠনের ব্যবস্থা হইলে বাংলার যুবশক্তি একটা কর্ত্তব্যের সন্ধান পাইত; কলিকাতা মহানগরীর রাস্তায় রাস্তায় শ্লোগান তুলিয়া নিজের শক্তিক্ষয় করিত না। পশ্চিম পঞ্জাবের শাসক-সম্প্রদায় স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব সীমান্তে নূতন নূতন গ্রামের পত্তন করিতে হইবে; দৈর্ঘ্যে তাহা হইবে প্রায় তিন শত মাইল ভাওয়ালপুর রাজ্য পর্য্যন্ত; প্রস্থে হইবে দশ হইতে পনর মাইল। এই গ্রামে জমায়েত করা হইবে সৈনিক পরিবার। পশ্চিম বঙ্গের পূর্ব্ব সীমান্তের গ্রামে গ্রামে এরূপ একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং এই অঞ্চলের গ্রামবাসীকে নূতন রক্ষীদল গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ভারত-রাষ্ট্রের প্রকৃতি

ধর্ম্মের নামে পাকিস্থানীরা আমাদের দেশকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়াছে। এই ভাবে তাহারা মুসলিম নেশনের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়া বড়াই করে। তাহার জন্য তাহাদের ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করিতে হয় নাই; ইংরেজ সাহায্য করিয়া তাহাদের এই স্বাধীনতা দিয়া দিয়াছে। তাহারা হিন্দু নামে অন্য একটি নেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছে, তাহাদের রক্তপাত করিয়াছে, তাহাদের ধন-সম্পদ লুটিয়াছে, তাহাদের অপমান করিয়াছে। এই অপকর্ম্মে উৎসাহী ছিল সেখানকার মুসলমানেরা যেখানে তাহারা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ; যেখানে কোন ন্যায়ের যুক্তিতে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আজ সেই স্থানের মুসলমানদের অবস্থা হইয়াছে শোচনীয়। যে হিন্দু প্রাধান্যের ধুয়া তুলিয়া তাহারা দেশের বুকের উপর বিভাগের ক্ষাদ কাটিয়া দিয়াছে, সেই হিন্দু প্রাধান্য অটুট, অনড় হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের উপর। ভারতবর্ষের বুক হইতে তাহারা কয়েক টুকরা প্রদেশ ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে এই যুক্তিতে যে তাহারা সেই সব অঞ্চলে সংখ্যা-গরিষ্ঠ, এবং এই সংখ্যা-গরিষ্ঠতাই তাদের নেশনত্বের পরিচয় ও প্রমাণ। আজ তাহারা সেইজন্য শরিয়ত মতে তাহাদের পাকিস্থানে রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থা প্রচলন করিতে পারে। প্রায় দুই কোটি অ-মুসলমান তাহাদের প্রদেশে আছে। তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। শরিয়ত মতে অমুসলমানদের অধিকার কি হইতে পারে তৎসম্বন্ধে পাকিস্থানের শাসকসম্প্রদায় নীরব। পশ্চিম পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত

প্রদেশের অভিজ্ঞতার আলোকে ইহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলে বলিতে হয় যে পাকিস্থানে মুসলমান ছাড়া কাহারও ধন-জন-মান রক্ষা পাইতে পারে না। বর্ত্তমান জগতে নাগরিক বলিতে যাহা বুঝায় সেই অধিকার সেখানে মুসলমান ছাড়া অপর কাহারও প্রাপ্য নয়। এই অবস্থায় এই সমস্যা স্বভাবতই দেখা দিয়াছে—ভারতবর্ষে যে পাকিস্থানীরা রহিয়া গিয়াছে তাহাদের অধিকার ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা এখনই হওয়া দরকার। ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু অকুণ্ঠ ভাষায় বলিতেছেন যে ভারত-রাষ্ট্রে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার থাকিবে না। ভারত-রাষ্ট্রের প্রকৃতি হইবে ধর্ম্ম-প্রভাব মুক্ত (secular)। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষে তিনি সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন।

গান্ধীজী দুই বিরুদ্ধ দেশের নীতি-কথা স্বীকার করেন না। তিনি ভারত রাষ্ট্রে পাকিস্থানীদের অধিকার সম্বন্ধে সাম্যের কথা বলেন; ভারত-রাষ্ট্রে তাহাদের অধিকার অন্য কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে, এই কল্পনা সহ্য করিতে পারেন না। এই বিষয়ে পাকিস্থানীদের মনোভাব অনিশ্চিত দ্বিধা-বিভক্ত। এই বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত করিবার জন্য করাচী নগরীতে সর্ব্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় পরিচালক সভার অধিবেশন হয়। এই মন্তব্য লিখিবার সময় ইহা প্রকাশিত হয় নাই। পণ্ডিত নেহরু ও গান্ধীজী যে নীতি প্রচার করিতেছেন তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না। পাকিস্থানীরা অ-মুসলমানের মুণ্ডপাত করিবে এবং সুযোগ পাইলে ভারত-রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, এই আচরণ সহ্য করিয়া চলিলে আমাদের রাষ্ট্র বিপন্ন হইবে, কখনও সবল হইয়া উঠিতে পারিবে না।

পাকিস্থানীদের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে কাশ্মীরের উপর তাহাদের আক্রমণ উপলক্ষে। আজ পর্য্যন্ত কোন মুসলিম লীগ নেতা অকুণ্ঠ ভাষায় ইহার নিন্দা করেন নাই। ভারতবর্ষের মুসলমানদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে অনেকেই দু-নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইবার কৌশল আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মুসলিম লীগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকির বিবৃতি এই মনোভাবের পরিচায়ক। সিদ্দিকি সাহেব সিন্ধু দেশবাসী; গত পঁচিশ বৎসর কলিকাতায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের দৌলতে গণমান্য হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি একজন নামজাদা পাকিস্থানী। ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৪৭) এক বিবৃতি-প্রসঙ্গে তিনি আমাদের ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং ভারত ডোমিনিয়নের মুসলমানদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে অংশে নির্দ্দেশ আছে বিবৃতির সেই অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল:

> ভারত ডোমিনিয়নের মুসলমানগণ বিভাগ ব্যবস্থার ফলোদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করিবেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁহাদের অবলম্বনীয় ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবেন।
>
> সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ক্রমবর্দ্ধিত আতঙ্ক ও উদ্বেগ-গ্রস্তরাই বর্ত্তমান শাসকদের সামান্য করুণা লাভের জন্য আত্ম-অস্বীকৃতিমূলক ও সম্পূর্ণ আত্ম-বিধ্বংসী নীতি সমর্থন করিতে পারেন। আমার মনে হয়, এই মনোভাব হতাশার ফলোদ্ভূত। বর্ত্তমান জটিল পরিস্থিতি সহজ হইয়া আসিবেই। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই অবস্থা চলিতে পারে না। সংখ্যায় আমরা চারি কোটি এবং আমাদের শাসকগণ যদি দেশের শাসনকার্য্যে আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে সম্মত নাও হন, তাহা হইলেও শীঘ্র হউক অথবা বিলম্বে হউক, তাঁহারা দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাহিরের সমস্যায় আমাদের প্রয়োজন উপলব্ধি করিবেন। সুতরাং আমাদের মুসলিম বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় কোন লজ্জার কারণ নাই, বিশেষ ভাবে যখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, কংগ্রেস যত দিন ভারত ডোমিনিয়নের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিবেন, তত দিন উহা হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হইবে না।

মিঃ সিদ্দিকি "দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাহিরের সমস্যা" সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ সুস্পষ্ট। এই সমস্যা সমাধানের সম্মুখীন হইয়া ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গ চারি কোটি মুসলমানের "প্রয়োজন উপলব্ধি করিবেন।" এই ভরসার মধ্যে একটা ভীতি-প্রদর্শনের ইঙ্গিত আছে, প্যাঁচ খেলিয়া কিছু আদায়ের ভাব আছে। এই ইঙ্গিতের প্রকৃত উদ্দেশ্য, আশা করি, আমরা সকলে বুঝিব। পাকিস্থানে সেইরূপ "প্রয়োজন" উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হইবে না। কারণ পাকিস্থান হইতে সকল অ-মুসলমানকে ভিটে-মাটি-ছাড়া করিবার ব্যবস্থা ত ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। এই নীতি ভারত-রাষ্ট্রে চলিতে পারে না। এক শত বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন যে হিন্দুরা "অতি ভদ্র" হইয়া তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছিল; "excess of civilization"-এর কল্যাণে হিন্দুর শক্তি-ক্ষয় হইয়াছিল। আজ হিন্দুর অনিচ্ছায় ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছে; হিন্দু প্রধানগণ মুসলমান-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নিজেই বাধা দিতেছেন। এই চেষ্টার পরিণতি কোথায় এখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে না। এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অনেকটা নির্ভর করে পাকিস্থানের কার্য্য-কলাপের উপর; ততোধিক নির্ভর করিবে ভারত-রাষ্ট্রে পাকিস্থানী মনোভাবাপন্ন মুসলমানদের কর্ম্ম-অকর্ম্মের উপর। সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি দিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক জীবনের সকল দায়িত্ব আমাদের পালন করিয়া যাইতে হইবে। অনবধান হইবার দুর্ব্বলতা যেন আমাদের জীবনে না আসে; স্বপ্ন চিন্তা আমাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে যেন ক্ষুণ্ণ না করে।

মুসলীম লীগের ভবিষ্যৎ

নিখিল-ভারত মুসলীম লীগ দুই ভাগ হইল। পাকিস্থানে যে লীগ কার্য্য করিবে তার নাম হইবে পাকিস্থান ন্যাশনাল লীগ; ভারতবর্ষে যে লীগ কার্য্য করিবে, তাহার পূর্ব্ব নামই বহাল থাকিবে। পাকিস্থানে লীগের নাম ন্যাশনাল হইলেও তাহাতে সকল লোকের অধিকার থাকিবে না, কারণ পাকিস্থানে মুসলমান ছাড়া আর কেহই সেরূপ মর্য্যাদার দাবি করিতে পারে না। এই পরিবর্ত্তন গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখের লীগ কাউন্সিলের ৩য় প্রস্তাব অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের কার্য্যকরী অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

নিখিল ভারত-মোসলেম লীগের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় এবং ভারত দুইটি স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ায় নিখিল ভারত মোসলেম লীগের সংগঠন, উদ্দেশ্য এবং নীতি পরিবর্ত্তন করা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, পাকিস্থান ও ভারতের মুসলমানগণ একই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকিতে পারে না।

সুতরাং লীগ কাউন্সিল সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে—

১। (ক) নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের পরিবর্ত্তে পাকিস্থান ও ভারতীয় ইউনিয়নের জন্য পৃথক পৃথক লীগ সংগঠন থাকিবে।

(খ) নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের যে সমস্ত বর্ত্তমান সদস্য সাধারণভাবে পাকিস্থানের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন অথবা তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন এবং পাকিস্থান গণপরিষদের যে সব মুসলমান সদস্য মোসলেম লীগের প্রাথমিক সদস্য রহিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে লইয়া পাকিস্থান মোসলেম লীগ কাউন্সিল গঠন করা হইল।

(গ) নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের যে সমস্ত বর্ত্তমান সদস্য সাধারণভাবে ভারতীয় ইউনিয়নের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন অথবা তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন এবং ভারতীয় গণপরিষদের যে সব মুসলমান সদস্য মোসলেম লীগের প্রাথমিক সদস্য রহিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে লইয়া ভারতীয় ইউনিয়ন মোসলেম লীগ কাউন্সিল গঠন করা হইল।

(ঘ) পাকিস্থান মোসলেম লীগ ও ভারতীয় ইউনিয়ন মোসলেম লীগ প্রত্যেকের জন্য এক জন করিয়া আহ্বায়ক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল যে, তাঁহারা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাসম্ভব শীঘ্র নিজ নিজ লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান করিবেন। এই সভায় কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন, গঠনতন্ত্র রচনা ও অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসা করা হইবে।

(ঙ) পাকিস্থান মোসলেম লীগের জন্য মিঃ লিয়াকৎ আলী খান এবং ভারতীয় ইউনিয়ন মোসলেম লীগের জন্য মাদ্রাজ প্রাদেশিক মোসলেম লীগের প্রেসিডেন্ট মিঃ মোহাম্মদ এসমাইল আহ্বায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন।

(চ) করাচীতে পাকিস্থান মোসলেম লীগ কাউন্সিল ও মাদ্রাজে ভারতীয় ইউনিয়ন মোসলেম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন হইবে।

২। নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের যে সব প্রাথমিক সদস্য পাকিস্থানের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন অথবা তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বাস্তবিক পক্ষে পাকিস্থান মোসলেম লীগের প্রাথমিক সদস্য হইয়াছেন বলিয়া মনে করা হইবে এবং নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের যে সব সদস্য ভারতীয় ইউনিয়নের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন অথবা তথায় বসতি-স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বাস্তব পক্ষে ভারতীয় ইউনিয়ন মোসলেম লীগের প্রাথমিক সদস্য হইয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

পাকিস্থান লীগ 'ন্যাশনাল' নাম গ্রহণ করিলেও, লোকে এই ধোঁকায় ভুলিবে না। কারণ সাড়ে পাঁচ কোটি মুসলমান ছাড়া দেড় কোটি অমুসলমান সেখানে এখনও বোধ হয় আছে, যদিও পঞ্চাশ লক্ষ অমুসলমানকে পাকিস্থানীরা তাহাদের পিতৃ-পিতামহের দেশে থাকিতে দেয় নাই। এই নিষ্ঠুরতার প্রতিফল দেখা দিয়াছে সম-সংখ্যক মুসলমানদের জীবনে যাহারা পূর্ব্ব পঞ্জাব, দিল্লী ও যুক্তপ্রদেশ হইতে তাড়িত হইয়াছে পাকিস্থানে বা ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে রামপুর, ভুপাল, হায়দ্রাবাদ সামন্ত রাজ্যে। ভারতবর্ষ বিভাগের এই ফলাফল গ্রহণ করিয়াই আমাদের চলিতে হইতেছে, যদিও অনেক কংগ্রেস-নেতা বিভক্ত ভারত আবার জোড়া লাগিবে বলিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাদের ভাব-প্রবণতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। সাধারণ বুদ্ধি বক্তৃতার মুহূর্ত্তে সুস্থ না থাকিলে তাঁহারা এরূপ ধ্বনি তুলিতেন না। ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় যে দুই ভাই সম্পত্তি পৃথক করিলে আর জোড়া লাগে না। এক ভাই যদি চীৎকার করিতে থাকেন যে অপর ভাইকে ঠেকায় পড়িয়া আবার একান্নভুক্ত পরিবারে ফিরিয়া আসিতে হইবে, তবে অপর ভাইয়ের জেদ চড়িয়া যায় পৃথক ব্যবস্থাটাকে কায়েমি করিবার। তার পর সাধারণতঃ দেখা যায় দুই ভাই একে অন্যকে চিমটি কাটিতেছেন, মামলা-মোকদ্দমা করিয়া দুই জনেই সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন আর পেট ভরাইতেছেন উকীল-ব্যারিষ্টারের। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের মধ্যে যে বাঁটোয়ারা হইল, ইহার ফলাফল জাগতিক নিয়ম মানিবে না; দুই জনে সুখে-শান্তিতে থাকিবে, এরূপ আশা অনেকেই হয়ত করেন। আমরা এতটা আশাবাদী নহি।

সেইজন্য মনে করি যে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাবে

কিছুই মীমাংসা হয় নাই। পৃথগন্ন ত হওয়া গেল ঘটা করিয়া। এই উৎসবের জের আরও অনেক দিন চলিবে। কারণ দেড় কোটি হিন্দু-শিখ পাকিস্থান হইতে চলিয়া আসিতে পারে এবং ভারতবর্ষে নূতন জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে। কিন্তু সাড়ে তিন কোটি মুসলমান ভারতবর্ষে বর্তমানে আছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু-মুসলমান "দুই-নেশ্যন" এই বুলি লইয়া মাতামাতি করিয়াছে; এখনও মনে মনে হয়ত এই বুলি জপ করে। কিন্তু মুসলিম লীগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহারা ত ভারতবর্ষের নেশনের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না, নাগরিকের মর্য্যাদার দাবি করিতে পারে না যখন পাকিস্থান ন্যাশনাল লীগে অমুসলমানদের কোন স্থান নাই। হয়ত বা ভারতবর্ষের মুসলমানগণ এই নীতিতে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন কিন্তু বিশ্বাস পরিবর্তন লোকে সহজে ও অল্প সময়ে করিতে পারে না, পরিবর্তনের ভান করিতে পারে। মিঃ হুসেন শহীদ সুরাবর্দীও হয় ত কোন দিন হিন্দু মুসলমান "এক-নেশ্যন", এই মন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া উঠিবেন; কিন্তু এই সাধনা সময়-সাপেক্ষ। তত দিন ভারতবর্ষের মুসলমান কি করিবে, তাহার নির্দেশ মুসলিম লীগ কাউন্সিল দিতে পারে নাই।

পূর্ব্ব বাংলার একটি চিত্র

কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে প্রায় দুই লক্ষ লোক পূর্ব্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এই হিসাব দেখিয়া মনে হয় যে সরকার বিচ্ছেদের প্রথম কয় মাসের কথাই বলিতেছেন। একটা ব্যাপার দেখিতেছি যে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাই এই ব্যাপারে পথ দেখাইয়া যাইতেছেন। গান্ধীজীর কথায় এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে—"যদি পূর্ব্ব বাংলা হইতে চলিয়া আসাই ঠিক হয়; তবে ডাক্তার, উকীল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ইহা দেখা কর্তব্য যে গরিব হরিজনেরা ও অন্যান্য সকলে যেন আগে আসিতে পারে। উচ্চ শ্রেণীরা যেন আগে না আসিয়া সকলের শেষে স্থান ত্যাগ করে।" বর্তমানে যে ভাবে স্থানত্যাগ চলিতেছে তাহার ফল হিন্দু সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। এই কথাটিই 'দেশপ্রিয়' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত দুইখানি পত্রে বলা হইয়াছে। একখানি পত্র আসিয়াছে চট্টগ্রাম হইতে আর একখানি নারায়ণগঞ্জ হইতে।

> "...বিশেষতঃ হিন্দুরা নিজেদের অসহায় মনে করছে। গ্রামকে গ্রাম ছেড়ে হিন্দুরা চলে যাচ্ছে—কোন প্রকার ভয়ে নয় শুধু বাঁচবার আশায়। মুসলমানের মধ্যে 'পাকিস্থানে'র কোন উৎসাহ নাই—তারা কিছুই অনুভব করতে পারছে না। সকলের শুধু 'হায় খোদা, কি হলো' এই ভাব।...

> "...সংখ্যাগরিষ্ঠ-মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে সংখ্যালঘিষ্ঠদের দু' দিন আগে হউক বা পরে হউক চলে যেতে হবেই বা ধর্মান্তর গ্রহণ করতে হবে।..."

দামোদর উপত্যকা

ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া দামোদর নদীর স্রোত নিয়ন্ত্রিত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় আইন সভায় এই পরিকল্পনা ও তৎসম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা বিহারের হাজারীবাগ অঞ্চলের প্রায় লক্ষ লোককে ভিটে-ছাড়া করিবে। কিন্তু এই পরিকল্পনার ফলে যে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির আশা করা যাইতেছে, তাহা হইলে এই এক লক্ষ লোকের ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইবে, কিন্তু এই পরিকল্পনায় বিশেষ উপকার হইবে পশ্চিম বঙ্গের বর্দ্ধমান জেলা ও তৎসংলগ্ন স্থানের। বাঁকুড়া, মেদিনীপুরে এই ব্যবস্থার প্রভাব কতটা কার্য্যকরী হইবে, তাহা এখন বলা কঠিন। কারণ দামোদরের বন্যার জলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে পার্শ্ববর্ত্তী নদী-নালার উন্নতি হইবে, এবং অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর স্থানে দামোদরের পলিমাটি কিছু কিছু বিস্তার লাভ করিবে, এই ভরসা করা যাইতেছে। এই কাজের সম্ভাবনা সম্পর্কে "সংগঠন" পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় অধ্যাপক কাননগোপাল বাগচি কিছু লেখা-পাত করিয়াছেন,—

> "বিভিন্ন খাল ও খাউনের (বর্দ্ধমান জেলায় জল নিয়ে যাওয়ার ছোট নালাকে 'খাউন' বলে) মারফত, এবং বাঁকা, বেহুলা ও মুণ্ডেশ্বরী প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় শাখা-নদীর সাহায্যে দামোদরের জল চালিয়ে বর্দ্ধমান ও পার্শ্বস্থ জেলাগুলিতে কিছু কিছু সেচের কার্য্য এখনই হইয়া থাকে। তাহা প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার একর বা তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বিঘা জমিতে এই ভাবে চাষের ব্যবস্থা আছে বলে সরকারের দপ্তরে প্রকাশ। দামোদর পরিকল্পনানুযায়ী এ জমিগুলিতে ত বটেই। আরও পাঁচ-ছয় গুণ জমিতে সেচের প্রবর্তন হবে। সর্ব্বসমেত তার পরিমাণ দাঁড়াবে ৭,৬৩,৮০০ একর (২২,৯১,৪০০ বিঘা)।...
>
> আর একটি কথা হয় ত বলা বাহুল্যই হবে। বর্ষার অবসানেও, শীত ও গ্রীষ্মব্যাপী সেচের জল পাইয়া জমিতে সারা বছর ধরে আলুটা, তরকারিটা অথবা রবি-শস্য হতে থাকবে।..."

ইহার উপর আছে, বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের কথা। পল্লী-গ্রামের গৃহাদি বিদ্যুতের আলোকে উদ্ভাসিত হইবে, এ কল্পনা উদ্ভট নয়। বিদ্যুতের শক্তিতে নানা কলকারখানা চালিত হইবে; নানা শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে; লোকের বেকার সমস্যা মিটিবার সম্ভাবনা দেখা দিবে, পশ্চিম বঙ্গ আবার শস্য-শ্যামল, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। এ কল্পনা করিতেও সুখ।

"কম্‌লি নেহি ছোড়্‌তা"—

আমাদের অনেক সময় ইচ্ছা হয় ব্রিটিশ রাজনীতিকদের লীলাখেলা ভুলিয়া যাইতে, কিন্তু কাশ্মীর ব্যাপারে বিলাতের পত্রিকাগুলি যেরূপ "পাকিস্থানী" মনোভাব দেখাইয়াছে তাহাতে আমাদের সাবধান হইতে হইবে। "টাইমস্‌" ও "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডেন" পত্রিকা দুইখানি উৎকট সাম্রাজ্যবাদী নয়। তাহারাও যখন প্রস্তাব করিয়াছে যে কাশ্মীর ও জম্মুকে দুই ভাগ করিয়া দিলে আমাদের পক্ষে মঙ্গল, তখন বুঝিতে হইবে যে পণ্ডিত জবাহরলালের গবর্ণমেণ্টের নিকট এইরূপ প্রস্তাব আসিয়াছে। কাশ্মীর পড়িবে পাকিস্থানের ভাগে, জম্মু পড়িবে ভারতবর্ষের। এই ব্যবস্থায় ব্রিটিশের স্বার্থ কি ঠিক বুঝা যাইতেছে না। যে রাশিয়াকে ব্রিটেন এত ভয় করিয়া আসিতেছে তাহার দাপটে পাকিস্থানকে ফেলিয়া দিবার সার্থকতা কি? এক হইতে পারে যে কাশ্মীর "পাকিস্থানে"র হাতে গেলে শত্রুরাজ্য দ্বারা ভারতবর্ষ আর একটু বেশী বেষ্টিত হইয়া পড়িবে। সে যাহাই হউক, মিঃ ক্লেমেণ্ট এটলি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; তাহার কারণের অনুসন্ধান আমাদের করিতে হইবে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া মিঃ এটলি কি খেলা খেলিয়াছিলেন তাহা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। কাশ্মীর সম্পর্কে সেরূপ কোন চালাকীর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে না এবং উচিত হইবে না ব্রিটেনের সঙ্গে কোন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে, যাহার আকর্ষণে আমরা আন্তর্জাতিক ঘূর্ণপাকের মধ্যে পড়িতে পারি। একটা কথা শোনা যাইতেছে যে পাকিস্থান, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিংহল লইয়া ইংরেজ একটা মণ্ডল সৃষ্টি করিতে চায়। কালে তাহা ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়ায় ব্যাপ্ত হইবে। এই ব্যবস্থা ব্রিটেন এখন হইতেই করিয়া ফেলিতেছে। মিশর ও প্যালেষ্টাইন হইতে তাহার রণসম্ভার সে আফ্রিকার পূর্ব্বাঞ্চলে সরাইয়া আনিতেছে। ভূমধ্যসাগরের উপর প্রভুত্ব সে ছাড়িয়া দিতেছে, পশ্চিম এশিয়া হইতে সে সরিয়া আসিতেছে। মিশর হইতে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে যে প্রভাব-প্রতিপত্তি সে ভোগ করিতেছিল তাহা স্ব-ইচ্ছায় সে ছাড়ে নাই। এই মুসলিম দেশসমূহকে এখন সোভিয়েট রাশিয়ার মন জোগাইয়া চলিতে হইবে। তবুও ব্রিটেন পাকিস্থানের মায়া ছাড়িতে পারিতেছে না এবং ভারত মহাসাগরের উপকূলে সে তাহার ঘাঁটি দৃঢ়তর করিতেছে। আফ্রিকার পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সিংহলে ত্রিনকমেলি বন্দর পর্য্যন্ত তাহার নৌবহর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপ ভারতবর্ষের হাতে ছাড়িয়া দিলেও সে সিঙ্গাপুর বন্দরের ঘাঁটি সুদৃঢ় রাখিতেছে। এই উদ্যোগ কার ভোগে লাগিবে জানি না।

স্বাধীন ভারতে কারা-সংস্কার

মহাত্মা গান্ধী দিল্লী সেণ্ট্রাল জেলে বন্দীদের জন্ত একদিন তাঁহার প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। স্বাধীন ভারতের কারাগার কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন—

"দীর্ঘদিন ধরিয়া তিনি এই অভিমত পোষণ করিয়া আসিতেছেন যে, সমস্ত দাগী অপরাধীকে রোগী বলিয়া এবং কারাগারসমূহকে তাহাদের চিকিৎসাগার ও আরোগ্য নিকেতন বলিয়া ধরিতে হইবে। সখ করিয়া কেহই অপরাধ করে না। অপরাধ অসুস্থ মনের লক্ষণ। বিশেষ কোন রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করিতে হইবে। এই অপরাধীদের কারাগারকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করিতে গিয়া রাজপ্রাসাদের প্রয়োজন হইবে না। কোন দেশই এই ব্যবস্থা করিতে পারে না, ভারতের মত দরিদ্র দেশের কথা ত উঠেই না। কিন্তু জেলের কর্ম্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইবে হাসপাতালের চিকিৎসকের মত। লোকায়ত্ত সরকারগুলিকে প্রয়োজনীয় আদেশজারী করিতে হইবে। কিন্তু নিজেদের শাসন-ব্যবস্থাকে পরিবর্ত্তন করিতে জেল কর্ত্তৃপক্ষকেও যথেষ্ট উদ্যোগী হইতে হইবে। এখন বন্দীদের কর্ত্তব্য কি? প্রাক্তন বন্দী হিসাবে তিনি এই উপদেশ দিতে পারেন যে, তাহাদের উচিত আদর্শ বন্দীর মত ব্যবহার করা। বন্দীদের যে অভিযোগই থাকুক না কেন, যথোপযুক্ত ধরণে তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিতে হইবে। বন্দীদের মধ্যে তাহাদিগকে আদর্শ নাগরিকের মত চলাফেরা করিতে হইবে। তাহা হইলেই মুক্ত হওয়ার সময় তাহারা অনেক ভাল হইয়া সাধারণের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।"

ভারতবর্ষের আরও বহু সমস্তার ন্যায় কারা-সমস্যাও লোকলোচনের অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে। অনশনে যতীন দাসের আত্মদানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জেলের নিয়মকানুন ছিল ভয়ানক কড়া। রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ দাগী আসামীদের সঙ্গে রাখা হইত এবং একই প্রকার দুর্ব্যবহার তাঁহাদের সহিতও করা হইত। সাধারণ কয়েদী এবং রাজবন্দীদের মধ্যে কোন বৈষম্য রাখা হইত না। কারাগারে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি এইরূপ ব্যবহারের জন্য ভারতবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া উহাকে আন্দোলনের বস্তু করিয়া তুলেন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ভগৎ সিং, রাজগুরু শুকদেব এবং যতীন দাস। যতীন দাস শেষ পর্য্যন্ত অনশনে আত্মদান করিয়া এ বিষয়ে ভারতব্যাপী এমন আলোড়ন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন যে শেষ পর্য্যন্ত ভারত-সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের জন্ত কতকটা সুবিধা করিয়া দিতে বাধ্য হন।

পশ্চিম বাংলার উন্নয়ন ব্যবস্থা

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলী সংবাদপত্র মারফত প্রচার করিয়াছেন যে তাঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া এই প্রদেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকর কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিভাগে নানাপ্রকার পরিকল্পনা (scheme)

বিবেচনা করা হইতেছে এবং একবিকবার ডাঃ ঘোষ ও তাঁহার সহকর্মিগণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের অন্নবস্ত্রের অভাব দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। আমাদের জানিতে ইচ্ছা করে যে, যে সকল উন্নতিকর ব্যবস্থার পরিকল্পনা বাংলার মন্ত্রিগণ বিবেচনা করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহাদের কি প্রকারে উদ্ভব হইল। উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী এই প্রদেশে নিযুক্ত আমলাতন্ত্রের অংশ এবং কিছু নথীপত্র লীগ সরকারের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলিও সেই সঙ্গে পাইয়াছেন, না তাঁহাদের নিজের আমলে প্রস্তুত হইয়াছে, জানিবার কোন উপায় নাই।

লীগমন্ত্রীমণ্ডলীর ও তৎকালীন কর্মচারিগণের কার্য্য-তৎপরতার যে নমুনা আমরা দেখিয়াছি তাহার ফলে তাঁহাদের পরিকল্পিত কোন ব্যবস্থার উপরে আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জনহিতকর কার্যে তাঁহাদের কোন উৎসাহের পরিচয় পাই নাই। সেই আমলে "অধিক শস্য ফলাও" আন্দোলন ব্যর্থতার সীমা অতিক্রম করিয়া প্রহসনে পরিণত হইয়াছিল। সরকারী ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণের অভাব মোচন হইবে কিনা এই চিন্তা তাঁহাদের ছিল না, কেবল কি শ্রেণীর পরিকল্পনায় অধিক সংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত করা এবং কণ্ট্রাক্ট বিলি করিয়া আত্মীয় ও আশ্রিতবর্গ প্রতিপালিত করা হইবে তাহাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

এই বিষয়ে অধিক আলোচনা করিয়া লাভ নাই। কিন্তু বর্তমানে যে মন্ত্রীমণ্ডলীর উপরে বাংলার রাষ্ট্র পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহাদের নিকট আমরা নিশ্চিত প্রত্যাশা করিব যে, প্রত্যেক জেলার প্রতিনিধিস্থানীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জনসাধারণের প্রয়োজন ও কল্যাণের কষ্টিপাথরে বিচার করিয়া যেন তাঁহারা কার্য্যপদ্ধতি স্থির করেন।

লীগ আমলে ১৯৪৪-৪৫ সালে 'উন্নয়ন বিভাগ' (Development Department) নাম দিয়া অকস্মাৎ একটি ভুঁইফোঁড় বিভাগ গজাইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই বিভাগের ছোট বড় কর্মচারী পঙ্গপালের মত সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার দ্বারা বাংলার কোনও অঞ্চলে যে কোনও উন্নতিকর কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। পরে রোল্যাণ্ড্‌স্‌ কমিটির পরামর্শ অনুসারে এই বিভাগের বিলোপ সাধন হয় এবং প্রধান মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সরকারী দপ্তরখানায় একটি উন্নয়ন বিভাগ গঠিত হইল। রোল্যাণ্ড্‌স্‌ কমিটির নির্দেশ অনুসারে জেলার যাবতীয় উন্নয়ন কার্য্যের ভার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর অর্পিত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে স্থানীয় অবস্থা বিষয়ে অবহিত করিবার জন্য জেলায় জেলায় পরামর্শ-সভাও গঠিত হইয়াছিল।

জেলার সমস্যাসমূহ কি প্রকারে মীমাংসা করা যাইতে পারে তদ্‌বিষয়ে অধিবাসিগণের মতামত কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিবার জন্য বাঁকুড়া জেলায় একটি বে-সরকারী 'জেলা উন্নয়ন সমিতি' গঠিত হইয়াছে। বাংলার মন্ত্রী বাঁকুড়াবাসী শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় মহাশয় ইহার পৃষ্ঠপোষক এবং শ্রীনিকেতনের প্রাক্তন কর্মী শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহার সভাপতি। জেলায় যে সকল লোক বহুকাল ধরিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং জেলার অবস্থার সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁহাদের অনেকেই ইহার সভ্য। কৃষি, সমবায় ইত্যাদি বিভাগের সরকারী কর্মচারিগণকেও সমিতির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

আলোচনা ও পরিকল্পনার সৌকর্যার্থ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের জন্য সাতটি উপশাখা গঠিত হইয়াছে—

(ক) কৃষি, (খ) সেচ, (গ) বনরক্ষণ ও ভূমিসংরক্ষণ (anti-erosion), (ঘ) কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়, (ঙ) গৃহশিল্প, (চ) স্বাস্থ্য, (ছ) সমবায়।

দেশের গুরুতর সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে সাহায্য করিবার এবং স্থানীয় অবস্থার উপযোগী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া জেলাবাসিগণ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থন করি এবং উন্নয়ন সমিতির প্রচেষ্টার সফলতা কামনা করি। কিন্তু কেবল উপর হইতে সরকারী চেষ্টায় কোনও স্থায়ী ও ফলপ্রদ উন্নতি সাধিত হইতে পারে না—সে সরকার স্বদেশীই হউক বা বিদেশীই হউক। সেইজন্য বাঁকুড়া উন্নয়ন সমিতি জেলার মধ্যে এই সকল বিষয়ে প্রচার কার্য্য ও জনমত গঠনের জন্যও ব্যবস্থা করিবেন। জনসাধারণের মধ্যে এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে কর্ম্ম প্রসারের জন্য সমিতি একটি সাপ্তাহিক প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

বাংলা ও আসাম ব্রাহ্ম-সম্মিলনী

বাংলা ও আসাম ব্রাহ্ম সম্মিলনীর ৫৬তম বার্ষিক অধিবেশন বিগত ২৫শে হইতে ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি সহরে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

২০শে অক্টোবর সন্ধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্র প্রারম্ভিক উপাসনা করেন। তৎপরে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ধরণীধর দিন্দা তাঁহার সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করিয়া অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সম্মিলনীর সভাপতি ডাঃ সরোজকুমার দাস তাঁহার তথ্যপূর্ণ অভিভাষণটি পাঠ করেন। ডাঃ দাস বলেন :

এই কাঁথি সহরটি—যথার্থপক্ষে পল্লীসহরটি—আয়তন হিসাবে ক্ষুদ্র হইলেও অধ্যাত্মসম্পদে ও ঐতিহ্যগৌরবে মেদিনী-

পুর জেলার হৃৎপদ্মস্বরূপ। কাঁথির পথ যে কঠোপনিষদ প্রোক্ত ধর্ম্মের পথ, সে বিষয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষাপূর্ব প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করিয়া আমরা এখানে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু পথের শেষে প্রবেশদ্বারেই শহরের গোষ্পদ, আমাদের উপবাসক্লিষ্ট মন ও আত্মা, পল্লীমাতার স্নেহ সুনিবিড় শ্যামলাঞ্চল স্পর্শে যেন নবজীবন লাভ করিল। যে উদার, উন্মুক্ত আকাশে সূর্য্যোদয় ভক্তির পুষ্পাঞ্জলির মত নিত্যই প্রতিভাত হয় এবং যে নীরব সৌম্য গভীর আকাশে সূর্য্যাস্ত ভক্তের প্রণামের মতই অবনমিত হয়, যেখানে দিগন্ত প্রসারিতা ধরিত্রী অখণ্ড আকাশের সহিত মিলিত হইয়া 'দ্যাবা পৃথিবী'—'দ্যৌঃ পিতা, মহী মাতা' আদি জনকজননীকে আভাস দেয়, সেখানে ধর্ম্মজীবনের উৎসীভূত অনন্তের বোধ এত সহজ, সরল ও সুগম, তাহা যেন এই প্রথম প্রত্যক্ষজ্ঞানে পাইলাম। ঐতিহাসিক পরিবেশও এই প্রাকৃতিক পরিস্থিতির অনুরূপ। ইতিহাসপ্রসিদ্ধি আছে যে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পশ্চিম বঙ্গের এই বিভাগে বৌদ্ধধর্ম্মের একাংশ "ধর্ম্মপূজা" নামে প্রচলিত ছিল। ময়নাগড় ও তন্নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে এখনও এই "ধর্ম্মপূজার" প্রচলন আছে এবং তজ্জন্যই বঙ্গ-সাহিত্যে "ধর্ম্ম মঙ্গল" নামক গ্রন্থের আবির্ভাব। বস্তুতঃ বৌদ্ধমতের এই রূপান্তর ব্যতীত মেদিনীপুর জেলায় যোগপন্থ নিরঞ্জন মত প্রভৃতি বিবিধ মতবাদ ও পূজাপদ্ধতি এবং সহজিয়া আউল, বাউল, দরবেশ সম্প্রদায়ের পূজার্চ্চনা ও মতবাদ প্রচলিত দেখা যায়। বিশেষতঃ উত্তরের আর্য্য সভ্যতা ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সভ্যতা মিলিত হইয়া মেদিনীপুর জেলায় দ্বিতীয় প্রয়াগ তীর্থ রচনা করিয়াছে এবং মেদিনীপুর জেলা বহু দিন পর্য্যন্ত জগন্নাথধামের দ্বারপথ থাকায় আর্য্যশঙ্কর, রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের চরণস্পর্শে মহীয়ান্ হইয়াছে। সর্ব্বশেষে উল্লেখ করি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহকর্ম্মী ও সহধর্ম্মী সভা, শিব ও সুন্দরের পূজারী শিবচন্দ্র দেব ও রাজনারায়ণ বসুর ধর্ম্মসাধনা ও ব্রহ্মোপাসনার। শিবচন্দ্রদেবের 'আত্ম-শিক্ষা' ও 'ঐকতানবিশিষ্ট মন' সম্পর্কিত সাধনা এবং ভাবভক্তিপ্রবণচিত্ত রাজনারায়ণ বসুর 'বসন্ত-কুজন' ও গোপগিরিতে বসন্তকালে ব্রহ্মোপাসনা (খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬০-১৮৬৫ পর্য্যন্ত) মেদিনীপুরের আধ্যাত্মিক সম্পদের অন্যতম নিদর্শন। ধর্ম্ম সাধনার দিক হইতে এই জেলাটি যেমন মহাপুরুষদিগের পুণ্যস্পর্শ লাভে সৌভাগ্যবান্ ছিল, তেমনই ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য ইহাকে নানাবিধ দুঃসহ দুঃখ দুর্গতি লাঞ্ছনা নিপীড়ন সহিতে হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম দশকে ইতিহাসবিক্রান্ত কালাপাহাড়ের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্য্যন্ত দুঃখ দুর্গতি পৌনঃপুনিক দশমিকের মত বারংবার এই মেদিনীপুর জেলার উপর আঘাত করিয়াছে। "মেদিনী"র একটি প্রতিশব্দ "সর্ব্বংসহা" কেন হইয়াছে ইহাই বোধ হয় একটি ইঙ্গিত। দুঃখের হোমাগ্নিপূত এই প্রদেশ বিশেষতঃ কাঁথি, ধন্য হইয়াছে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের চরণরেণু স্পর্শে, যিনি এই দুঃখের তপস্যায় জয় লাভ করিয়া বিধাতার সাধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন।

জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ

যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিগণ লণ্ডন নগরীতে আজ বিশ দিন হইল আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ স্থির করিবার জন্য। আড়াই বৎসর—১৯৪৫ সালের মে মাস হইতে আজ পর্য্যন্ত—এই বিষয় লইয়া অনেক টানা-হেঁচড়া হইল, কিন্তু কোন মীমাংসা হইতেছে না। গত এপ্রিল মাসে মস্কো নগরীতে চতুঃশক্তির পরামর্শ সভায় তর্ক করিয়া মিঃ মার্শাল, মলোটভ, বেভিন ও বিদোলত সময় কাটাইলেন কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিলেন না। কেন পারিলেন না তাহার কারণ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গোড়ার কথা এক - যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যে ভাবে জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিতে চান, সোভিয়েট রাষ্ট্রের তাহাতে গুরুতর আপত্তি আছে, যদিও উভয় পক্ষই জার্ম্মানীর উন্নতির জন্য উদ্গ্রীব বলিয়া প্রচার করেন। জার্ম্মানী ছয় বৎসর যুদ্ধ করিয়া প্রমাণ করিয়াছে তাহার শক্তি কত বড়। একা সে যুদ্ধ করিয়াছে ইউরোপ-আমেরিকার সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে। এই শক্তিধরকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিতে হইবে—এ বিষয়ে মতভেদ নাই। জার্ম্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে—এই বিষয়েও মতভেদ নাই, যদিও ক্ষতিপূরণের ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া তর্কের অন্ত নাই। ক্ষতিপূরণ দিতে হইলে জার্ম্মানীর শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার প্রয়োজন। জার্ম্মানী যাহা উৎপাদন করিবে তাহা হইতে দেশের প্রয়োজন মিটাইয়া উদ্বৃত্ত থাকিলে তবেই তাহা সম্ভব। ক্ষতিপূরণের জন্য উদ্বৃত্ত উৎপাদন করিতে গেলে যে শিল্প-কৌশলের প্রয়োজন তাহাতে উৎসাহ দিতে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রভৃতি অনিচ্ছুক। কারণ জার্ম্মানীর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় তাঁহারা পাইয়াছেন এবং সেই শক্তির পুনরভ্যুত্থানে তাঁহাদের এমন একটা ভীতি দেখা দিয়াছে যে জার্ম্মানীতে সমস্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ব্যাহত হইয়া আছে। জার্ম্মানীর কলকারখানা তাঁহারা ভাঙিয়া ফেলিতেছে বা ক্ষতিপূরণের দায়ে বিদেশে চালান দিতেছে; জার্ম্মানীর শিল্পীকুল ও বৈজ্ঞানিকদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় জার্ম্মানীর উৎপাদন বাড়াইয়া, উদ্বৃত্ত শিল্পসম্ভার ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া, ক্ষতিপূরণ আদায় যে কি করিয়া তাঁহারা করিবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

আবার বর্ত্তমান যুগে শিল্প-বাণিজ্য ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যে কেন্দ্রীয় শক্তির প্রয়োজন জার্ম্মানীতে তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে কেহই ইচ্ছুক নয়। কাইজার উইলিয়ম

ও হিটলারের সময়ে এরূপ শক্তির পরিচয় তাহারা পাইয়াছে; সাত কোটি জার্মানকে এক উদ্দেশ্যে, এক লক্ষ্যে প্রণোদিত করিয়া কি ভাবে তাহা ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুইটি বিশ্ব-সংগ্রামের আয়োজন করিয়াছিল, তাহার ধ্বংসলীলার চিহ্ন আজিও ইউরোপের বুকে, দেশে দেশে প্রকট হইয়া রহিয়াছে। ১৯৪৫ সালের মে মাসে বার্লিনের পটসডাম পল্লীতে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাষ্ট্র ও ব্রিটেনের প্রধানদের মধ্যে যে চুক্তি হয়, তাহাতে এই স্বীকৃতিটা ছিল যে জার্মানীর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা কাঠামো বজায় রাখিতে হইবে। বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি ইহা করিতে পারে নাই। সোভিয়েট চলিয়াছে তাহার সমাজতান্ত্রিক প্রেরণা লইয়া; জার্মানীর পূর্ব্বাঞ্চলে সে সমস্ত ব্যবস্থাকে ওলটপালট করিয়া নিজেদের সুবিধামত গড়িয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাহাদের বিশ্বাস-মতে ব্যক্তি-তান্ত্রিক ব্যবস্থার ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এইখানেই বিরোধ এবং এই বিরোধ লণ্ডন কনফারেন্সে সমাধান হইতেছে না, যেমন গত এপ্রিল মাসে, মস্কো কনফারেন্সে হয় নাই এবং যত দিন এই বিরোধের শান্তি না হইবে, তত দিন ইউরোপে কোন গঠনমূলক উদ্দেশ্য সফল হইবে না; মার্শাল কল্পনানুযায়ী মার্কিন দেশের টাকা ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য নানাভাবে আসিতে পারে। কিন্তু ইউরোপ ত আজ এক ভাবের ভাবুক নয়। ব্যক্তি-তন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্র এই দুই মতের বিরোধের মধ্যে পড়িয়া কেহই মার্কিনের এই সাহায্য স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ইহাই গোড়ার কথা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল। জার্মানী তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া পরাজয়ের গ্লানির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল হিটলারের নেতৃত্বে। আজ সেই ইতিহাসের পুনরভিনয় যে হইবে না তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। প্রতিপক্ষ দুই দেশের নাম বদলাইয়াছে মাত্র। আজ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে।

ফিলিস্তিন

ইউরোপের এই তোলপাড়ের মধ্যে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ফিলিস্তিন লইয়া একটা জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে। গত পঁচিশ বৎসর ব্রিটেন এই দেশের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিল জাতি সঙ্ঘের (League of Nations) পক্ষ হইতে ম্যাণ্ডেট নামে এক অদ্ভুত ব্যবস্থার কল্যাণে। এই ব্যবস্থায় ফিলিস্তিনবাসী আরবেরা সুখী হইতে পারে নাই। তাহারা অধিকাংশই মুসলমান; তাহাদের দেশের উপর ব্রিটেন একটা নূতন রাষ্ট্রের গোড়া-পত্তন করিল "ইহুদিস্থান" নাম দিয়া—জগতে "Jewish Home" নামে এই প্রচেষ্টা পরিচয় লাভ করিল। আরব মুসলমানেরা এই "উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসা" ব্যবস্থাকে সহ্য করিতে পারিল না, যদিও দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহুদিদের পূর্ব্বপুরুষেরাই এই ভূমিখণ্ডের অধিবাসী ও অধিপতি ছিল। ভাগ্যের তাড়নায় তাহারা নানাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অকথ্য অত্যাচার সহ্য করিয়াও তাহারা তাহাদের প্রাচীন জন্মভূমির স্মৃতি আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিল; এই জন্মভূমিতে তাহারা ফিরিয়া আসিবে এই আশা দুই হাজার বৎসরের মধ্যে একদিনও তাহারা ছাড়িতে পারে নাই। প্রথম বিশ্বসংগ্রামের সময় তাহারা ব্রিটেনকে সাহায্য করিয়াছিল। উইজম্যান নামক একজন বৈজ্ঞানিক এই সময়ে একটি আবিষ্কার দ্বারা ব্রিটেনের একটা আসন্ন অভাব মিটাইতে সাহায্য করেন। কৃতজ্ঞতার মূল্যস্বরূপ তিনি ফিলিস্তিনে "ইহুদিস্থান" গঠন করিবার অধিকার দাবি করেন। ১৯১৭ সালে ব্রিটেন এই অধিকার স্বীকার করিয়া লয়। তখন ফিলিস্তিনে ইহুদির সংখ্যা ছিল আশী-নব্বই হাজার মাত্র; গত পঁচিশ বৎসরে তাহা বাড়িয়াছে ছয় লক্ষে। ফিলিস্তিনের মরুভূমিতে তাহারা বহু শস্য-শ্যামল কৃষি-কেন্দ্র স্থাপিত করিয়াছে, দুই হাজার বৎসরের মধ্যে আরবেরা যাহা করিতে পারে নাই। এই কার্য্যের দ্বারা তাহারা নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে নিজেদের অধিকার তাহাদের ধর্ম্মের পুণ্যভূমিতে। আরব মুসলমানেরা এই অধিকার মানিয়া লইতে চায় না। তাহারা এই অধিকার ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছে। চতুর্দ্দিকের আরব রাষ্ট্র হইতে তাহারা সাহায্য পাইবার দাবি রাখে, সেই সাহায্যের আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মুসলমান ইহুদি উভয়েই রণসজ্জায় মাতিয়া গিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের (United Nations Organization) হাতে তাহার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া ব্রিটেন তাহার শাসন-ব্যবস্থা গুটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে একটা যুগ পরিবর্ত্তনের সূচনা হইতেছে। "খেলাফৎ" আন্দোলনের পরিণতির কথা স্মরণ থাকিলে আমরা এই আহ্বানে সাড়া দিতে পারি না।

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়ের উননবতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এক সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করেন। বাঁকুড়া শহরে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। আচার্য্য যদুনাথ সরকার এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। মানপত্রে বলা হয়—

"আপনার সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনের অধিকাংশকাল কঠোর জ্ঞান-সাধনায় অতিবাহিত করিয়া আপনি যে গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা চিরদিন আমাদের অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে; আশীর্ব্বাদ করুন, সে আদর্শে আমরা যেন অনুপ্রাণিত হইতে পারি।

"আপনার ঋষিতুল্য সরল জীবনযাত্রা, শিক্ষাদানে একনিষ্ঠ তৎপরতা, স্থানীয় সর্ব্ববিধ জনহিতকর কার্য্যে পথ প্রদর্শন আপনার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র উড়িষ্যা প্রদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছে; আপনি সেখানে বহু হৃদয়ের ভক্তির

বেদীতে আজ প্রতিষ্ঠিত। আপনার স্বদেশবাসী বাঙালীকে মাতৃভাষায় দুরূহ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্ত আপনার প্রথম জীবনের একক সাধনার কথা আজ আমরা কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করিতেছি। আপনার অক্লান্ত লেখনী দীর্ঘকাল ধরিয়া কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশবাসীদের শিক্ষিত, উদ্বুদ্ধ ও সতর্ক করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবে। বিজ্ঞানকে সাহিত্যের আধারে পরিবেশন করিয়া আপনি ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতিকে নূতন পথে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে বহুবিধ গবেষণা করিয়া আপনি মাতৃভাষায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের নিখুঁত সত্যগুলি আপনার অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে বঙ্গ সাহিত্যের সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে। আপনি বঙ্গ-ভাষার মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে জাহ্নবীধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। আপনার এই অমরকীর্তি স্মরণ করিয়া আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়াছি।"

এই মানপত্রের উত্তরে আচার্য্য যোগেশচন্দ্র তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনার কথা বর্ণনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে তাহা সংযুক্ত। ১৯০১ সালে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়; ১৯০২ সালে যোগেশচন্দ্র তাহার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদ সংগ্রহ আরম্ভ করেন; পরিষদের সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী যোগেশচন্দ্রকে অনুরোধ করেন "বাকী বাদ যে সব শব্দ আছে তাহা যোগ করে দিতে।" এইভাবে আরম্ভ হইল ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সাধনা। বাংলার বর্ণমালার যুক্তাক্ষর সমস্যা সহজ করিতে না পারিলে অন্য ভাষাভাষী লোকের পক্ষে বাংলা ভাষা শিক্ষা কঠিন হইতেছে। এই বাধা দূর করিতে হইবে। "অক্ষর-সংস্কার" আরম্ভ হইল। তাঁহার নিজের কথায় এই অবস্থার বর্ণনা দিতেছি,—

বাংলা কঠিন করেছে এর যুক্তাক্ষর। যুক্তাক্ষর শিখতে শিখতে শিশুর প্রাণ বেরিয়ে যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ দেখলে ভয় হ'ত। অক্ষর পরিবর্ত্তন করতে না পারলে এক সহজ ভাষা বলা যায় না। ভাবলাম, অন্ত প্রদেশের লোক যাতে বাংলা ভাষা সহজে শিখতে পারে এজন্তে অক্ষর ও বানান সহজ করতে হবে। "অক্ষর-সংস্কার" লিখতে লাগলাম। অনেক লোক আমার উপর বিরক্ত হলেন। বললেন কোথাকার কে এক উড়িয়া এসেছে। ভাগলপুর সাহিত্য সম্মেলনে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "বর্ণমালার অভিযোগ" নামে এক প্রবন্ধে আমার খুব সমালোচনা করেন। সম্মেলনে বহু শ্রোতার সমাগম হয়। তারা শুনে হাসতে লাগল। জগদীশ বসুর কথা স্বতন্ত্র। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি বাংলা বানান বদলাতে চান?' আমি বললাম, না, 'বানান নয়, অক্ষর।' এ কথাটা বোঝাতে আমার ২৪ বৎসর লেগেছে।

তারপর আরম্ভ হইল বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর প্রচার। নিজের কর্ম্ম-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিয়াছেন ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ইহা সম্ভব। সেই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন তিনি কটক মেডিক্যাল স্কুলে।

যোগেশচন্দ্রের বক্তৃতার যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের পরিচয় সম্বন্ধে তিনি আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নানা পত্রিকার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। "প্রদীপ", "প্রবাসী"র পৃষ্ঠায় তাহার নিদর্শন আছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়, আজও তাহা অটুট আছে। তাঁহার নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধনীয়; বাঙালী জাতি এই জ্ঞান-যোগীর নিকট যে কত ঋণী তাহার সম্যক ধারণা আজ আমরা হয়ত করিতে পারিব না। কিন্তু বাংলা ভাষা আজ যে নূতন জীবনের বিজয়-ভেরী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শব্দ-সম্পদ যোগেশচন্দ্রের সাধনালব্ধ।

৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আজ একুশ বৎসর তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর কীর্ত্তি-কথা দেশের লোকে ভুলিয়া যাইতেছে। শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে যদি তাহা আমাদের স্মৃতিপটে ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায়, তবে দেশের কল্যাণ হইবে। পিতৃমাতৃ ঋণের মত সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। শতবার্ষিকী উৎসব সভার সভাপতিরূপে শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজা-গোপালাচারিয়ার গত ১০ই ডিসেম্বর এই ঋণের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন :

ভারতে জাতীয়তার প্রথম প্রভাত সুরেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া মূর্ত্ত ও প্রতিফলিত হইয়াছিল। কি ধর্ম্ম, কি সমাজ-নীতি, কি রাজনীতি, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাংলা বহু বিরাট পুরুষের জন্ম দিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের জীবনেতিহাস বাংলার গৌরবশ্রেষ্ঠ অধ্যায়সমূহের অন্যতম। কংগ্রেসের জন্ম হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেস বলিতে তাঁহাকেই বুঝাইত। কংগ্রেসের যাহারা জনক, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।"

এই কয়টি পংক্তির মধ্যে ভারতের প্রায় এক শত বৎসরের ইতিহাস উহ্য আছে। সে ইতিহাসকে জানিলেই ভারতের নব-জাগরণের সম্যক্ মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যাইবে। এই ইতিহাসের পুরোভাগে দেখিতে পাই রাজা রামমোহন রায়ের বিরাট মূর্ত্তি। এক হাতে তিনি দেশের সামাজিক জঞ্জাল সব সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন, অন্য হাতে করিতে-

যেন দুর্নীতির বেষ্টনী হইতে দেশের মন-বুদ্ধিকে মুক্তিদান। ১৮২০ সাল হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত মুক্ত-আত্মা ভারতের একটা রূপ দেখিতে পাই। এই সময়ের মধ্যে "ইয়ং বেঙ্গল", "ইয়ং বোম্বাই" দেশের অনেক সংস্কারের উপর আঘাত করিয়াছে, অনেক সংস্কারের বন্ধন হইতে দেশের মনকে মুক্ত করিয়াছে। এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল দেশের মনকে মোহ-মুক্ত করিয়া সুষুপ্ত অবস্থা হইতে জাগাইবার জন্য। এই জাগরণের শেষে আমরা দেখিতে পাই বাংলাদেশে "হিন্দুমেলা", উত্তর-ভারতে মুসলমান সমাজে নূতন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ। এই কথাই বলিয়াছিলেন হেনরী কটন সাহেব তাঁর "নিউ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে—"The Bengalee Baboos new rule public opinion from Peshawar to Chittagong."—বাঙালী বাবু পেশোয়ার হইতে চাটগাঁ পর্য্যন্ত ভূ-খণ্ডে জনমত গঠন করে, গতিশীল করে। এই বাঙালী বাবু নানা মূর্ত্তিতে হিমালয় হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত ভূ-ভাগে নব-ভারতের নানা উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে—শিক্ষকরূপে, আইনজ্ঞরূপে, চিকিৎসকরূপে, সাংবাদিকরূপে, ধর্ম্মপ্রচারকরূপে, সমাজ-সেবকরূপে। এই সংগঠনের ইতিহাস ভারতবর্ষের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস।

এই বাঙালী বাবুর মধ্যে প্রধান ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। বাংলাদেশে তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ। ভারত-সভা (Indian Association) প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি দেখাইয়া দেন আমাদের সমগ্র রাজনীতির কর্ম্ম-প্রচেষ্টার আদর্শ ও লক্ষ্য। কংগ্রেসের জন্মের দুই বৎসর পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের উদ্যোগ করিয়া সর্ব্বভারতীয় রাজনীতিক কর্ম্মের তিনি নির্দ্দেশ দেন। তারপর ১৮৮৬ সাল হইতে কংগ্রেস ও সুরেন্দ্রনাথ হইয়া পড়িলেন অভিন্ন; সুরেন্দ্রনাথ হইলেন কংগ্রেসের বাণীমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি ছাড়া আর এক মূর্ত্তি ছিল তাঁহার। সেই মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল কংগ্রেসনেতৃত্ব লাভের পূর্ব্বে শিক্ষকরূপে, ছাত্রসমাজের নেতারূপে। কলিকাতা ও বাংলার ছাত্রসমাজ, দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তানায়ক ও কর্ম্ম-নায়কবর্গ, ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে গড়িয়া উঠে কেশবচন্দ্র সেন ও সুরেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়। নব্য ইটালীর স্রষ্টা ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি, শিখ খালসার স্রষ্টা গুরু গোবিন্দ-সিংহ, শ্রীচৈতন্যের আশাময় প্রেমদান এই নরশ্রেষ্ঠদের জীবন-কথা বলিয়া আমাদের পূর্ব্বজগণের জীবনে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেন সুরেন্দ্রনাথ। সেই যুগের যুবকদের স্মৃতিকথায় পড়িয়াছি যে রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা সুরেন্দ্রনাথের অনুপ্রাণনায়ই সম্ভব হইয়াছিল। ত্রিশ বৎসর পরে বারীন-উপেন্দ্র-উল্লাসকর ইহাকে রূপদান করেন। তখন সুরেন্দ্রনাথ হইয়া উঠিয়াছেন কংগ্রেস-নেতা। কিন্তু তিনি বিপ্লবীদের নিরুৎসাহ করেন নাই; নীরব উপদেশ জানাইয়া কখনও তাহাদের বিদায় দেন নাই। এই বৈশিষ্ট্য সুরেন্দ্রনাথের ছিল।

সুরেন্দ্রনাথের যুগে যে সম্প্রদায় দেশের রাজনীতিক মান-অপমানের ব্যথায় ক্ষুব্ধ হইতেন, দেশের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার চেষ্টা করিতেন, সে সম্প্রদায় শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী-সংগ্রামের কথা জানিতেন না। একটা সহজ, সরল সম্ভ্রমবোধ ছিল তাঁহাদের। সেই ভাব বিদেশী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পদে পদে অপমানিত হইত। সেই অপমান তাঁহাদের রাজনীতিক প্রচেষ্টায় প্রেরণা যোগাইত। সেই যুগে জাতীয় আত্মসম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য রাজনীতিক আন্দোলন ছিল একমাত্র অস্ত্র। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রমাণ করিয়াছিলেন যে রাজনীতিক সংঘর্ষ তিনি ভয় করেন না। তাঁহার যুগে রাজনীতি সাম্প্রদায়িক আশা-আকাঙ্ক্ষার বাহন হইয়া উঠে নাই। সেইজন্য তাঁহারা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের সেবা করিতে পারিয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রভেদ, অবস্থার ভেদাভেদ তাঁহাদের কর্ম্মপথে কোন বাধার সৃষ্টি করে নাই। আজ বিভক্ত ভারতবর্ষে সেই সরল, সহজ রাজনীতির অভাব আমরা অনুভব করি।

পরলোকে অধ্যাপক লাড্‌লিমোহন মিত্র

বঙ্গবাসী কলেজের রসায়নশাস্ত্রের খ্যাতনামা অধ্যাপক লাড্‌লিমোহন মিত্র মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। আধুনিক কালে শিক্ষাব্রতী হিসাবে যাঁহারা সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক লাড্‌লিমোহন অন্যতম। যৌবনে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করিয়া তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার সঙ্কল্প করেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আপনার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেন। কলেজ ছিল তাঁর প্রাণ, অপর অধ্যাপকদের ছুটি ছিল কিন্তু তাঁর ছিল না। ছুটিতে কলেজে আসিয়া তিনি ল্যাবরেটরির সমস্ত দোষত্রুটি সংশোধন করিতেন। পূর্ব্ব-বঙ্গের সমস্ত স্কুল-কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বাঙালী ছাত্রদের সম্মুখে যে সমস্যা দেখা দেয় তিনি তাহাতে বিচলিত হন। যে সব ছাত্রকে হঠাৎ এই ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইল, মূলতঃ তাহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র; কলিকাতার কলেজে তাহাদের স্থান যাহাতে হয় তাহার জন্য তিনি একান্ত আগ্রহান্বিত হন। বঙ্গবাসী কলেজে সকালে ও সন্ধ্যায় ক্লাস খুলিয়া তিনি আগত ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ করিয়া দেন। নিজে তিনি সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত বিভাগের কাজ করিতেন।

অধ্যাপক মিত্রের ন্যায় নির্লোভ মানুষ এ যুগে নিতান্ত বিরল। তাঁহার লিখিত ইণ্টারমিডিয়েট কেমিষ্ট্রি বইখানি ভারতবর্ষের ও ভারতের বাহিরে দক্ষিণ-আফ্রিকা, সিংহল, সুমাত্রা, জাভা, শ্যাম প্রভৃতির বহু কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হইয়াছে। প্রায় ছয় শত রেখাচিত্র সমেত প্রায় সাত

শত পৃষ্ঠার পুস্তকের দাম তিনি যুদ্ধের বাজারেও তিন টাকার বেশী করেন নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে দরিদ্র ছাত্র হিসাবে পাঠ্যাবস্থায় যে অসুবিধা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। অথচ এই একখানি পুস্তকের দ্বারা তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। একটি ইংরেজ পুস্তক প্রকাশক কোম্পানীর প্রাক্তন ম্যানেজারের নিকট শুনিয়াছি পুস্তক-প্রকাশের ঝঞ্ঝাট এড়াইবার জন্য একবার তিনি উহার প্রকাশের দায়িত্ব ঐ কোম্পানীকে দিতে চান এবং সেই মর্ম্মে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় তিনি বলেন যে একটা বিষয় ভুল হইয়া গিয়াছে, পুস্তকের দাম বাড়ানো যাইবে না এবং প্রতি বৎসর এক শত ছাত্রকে তিনি যে পুস্তক বিতরণ করিয়া থাকেন তাহা তাঁহাকে দিতে হইবে ইহা চুক্তিনামায় লেখা হয় নাই। ইংরেজ কোম্পানী ইহাতে অসম্মত হয়।

ভাই পরমানন্দ

পঞ্জাবের উপর দুর্দ্দিনের ঘনঘটা বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং সেই সময়ে এই আর্য্যসমাজী নেতার তিরোধান এক যুগ-পরিবর্ত্তনের পরিচয় দিতেছে। যে আদর্শ ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় ভাই পরমানন্দ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন পঞ্জাব বিভাগে তাহার সাফল্য ব্যাহত হইয়াছে। শতদ্রু তীরে আর্য্যসমাজ এক নূতন প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া পঞ্জাবের হিন্দু সমাজকে নবরূপ দান করে। মুঘল সম্রাটের অত্যাচারে গুরু নানকের শিষ্যগণ "খালসায়" পরিণত হয়। ইংরেজ শাসনের সময় পঞ্জাবের হিন্দুগণ আর্য্যসমাজের প্রেরণায় এক নূতন দৃঢ়তা লাভ করে। ইহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ পায় লালা লাজপৎ রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও লালা হংসরাজের জীবনে। ভাই পরমানন্দ ইঁহাদের মন্ত্র-শিষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য দেখিতে পাই প্রথম জীবনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষায় উচ্চ সম্মান-লাভ করিয়া তিনি আর্য্যসমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। ত্যাগের পথে চলিতে চলিতে যাইতে হয় তাঁহাকে দক্ষিণ-আফ্রিকায়, দক্ষিণ-আমেরিকায়, যুক্তরাষ্ট্রে। শেষোক্ত দেশে শ্রমজীবী পঞ্জাবীরা একটা ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহাদের সংগঠনে ভাই পরমানন্দ ১৯১২ সাল হইতে প্রবৃত্ত ছিলেন। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পঞ্জাবীরা তখন রণোন্মাদনায় মাতিয়া উঠে। গদর পার্টি নামে এক বিদ্রোহী দল গড়িয়া উঠে লালা হরদয়াল ও ভাই পরমানন্দের নেতৃত্বে। এইজন্য যখন ভাই পরমানন্দ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন তখন রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। এই আদেশ রূপান্তরিত হয় যাবজ্জীবন দীপান্তরে। ১৯২০ সালে অনেক বিপ্লবীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; ভাই পরমানন্দ তাঁহাদের একজন। মুক্তিলাভ করিয়া তিনি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই আন্দোলন যখন দুর্ব্বল হইল এবং গান্ধীজী সৃষ্ট হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্দ্য বুদ্বুদের ন্যায় উড়িয়া গেল, তখন ভাই পরমানন্দ সাম্প্রদায়িক মেল-বন্ধনে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলেন, ভারতীয় মুসলমানের রাজনীতিক বিশ্বস্ততায় ও সাহচর্য্যে আস্থা হারাইয়া ফেলিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়ারূপে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম হিন্দু মহাসভার নেতৃরূপে। বিগত পঁচিশ বৎসর হিন্দু সমাজকে স্বয়ংসিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না।

সুধীরকুমার লাহিড়া

সুধীরকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের দেহত্যাগে "প্রবাসী", "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকা মণ্ডলীর একজন পরম সুহৃদ হারাইয়া আমরা আত্মীয় বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিতেছি। প্রথম যৌবনে তিনি সংবাদপত্র সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পরিণত বয়সে সাধনোচিত লোকে গমন করিয়াছেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় ডাঃ নীলরতন সরকারের মধ্যস্থতায়। এই মহারাষ্ট্র নেতা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া লক্ষ্ণৌয়ের গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মার সঙ্গে তাঁহার সংযোগ ঘটাইয়া দেন এবং সুধীরকুমার এডভোকেট পত্রিকার সম্পাদকরূপে লক্ষ্ণৌ গমন করেন। তারপর "পাঞ্জাবী" দৈনিক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হইয়া লাহোরে গমন করেন। চার-পাঁচ বৎসর পরে তিনি লাহোরের "ট্রিবিউন" দৈনিকের সহযোগী সম্পাদক পদে বৃত হন, কালীনাথ রায় মহাশয় তখন ঐ পত্রিকার সম্পাদক। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর পঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হয়; ট্রিবিউন পত্রিকা সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যায়, এবং সুধীর-কুমার কলিকাতা চলিয়া আসেন। তখন বাংলাদেশের পাট-ব্যবসায়ে শ্বেতাঙ্গ বণিকের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। বিড়লা প্রমুখ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ এই চক্র ভাঙিতে চেষ্টা করেন। সুধীরকুমার এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং পাট-ব্যবসায়ে কি করিয়া পাট-চাষীদের বঞ্চিত করা হয় তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করেন। গবর্ণমেণ্টও এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন, এবং যামিনীমোহন মিত্র সমবায় প্রথায় পাটের বেচা-কেনায় ব্যবস্থা করেন। সুধীরকুমার দরিদ্রের সেবার এই সুযোগ পাইয়া দুইখানি সমবায় পত্রিকার (বাংলা ও ইংরেজী) সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এত দিন সমবায় প্রথার প্রকৃত পরীক্ষা বাংলাদেশে হইতে পারে নাই। আজ স্বাধীন রাষ্ট্রে সুধীরকুমারের নানা স্বপ্ন সফল হইতে পারে।

নরসিংহ চিন্তামন কেলকার

বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক আমাদের জাতীয় জীবনে যে যুগ-পরিবর্ত্তন সূচনা করেন তাহার শেষ সাক্ষী পৃথিবী হইতে চলিয়া

গেলেন। বলবন্তরাওএর মন্ত্রশিষ্যদের মধ্যে নরসিংহ চিন্তামন কেলকার এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দেশের চিন্তাজগতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভাব সহস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তার ধারক ছিলেন বহু জনের মধ্যে এক জন—বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক। ইহার পূর্ব্বে প্রায় তিন-পুরুষ আমরা ইংরেজী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছি, এবং ইংরেজের অনুকরণকে চতুর্বর্গ লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে আমরা প্রথম দেখিতে পাই ইহার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহচেষ্টা। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে তার প্রকাশ পাই ভাবজগতে আর্য্যসমাজে, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে; বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনে", পুণার বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুকারের "নিবন্ধ-মালায়"। বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক মহারাষ্ট্রদেশে ছিলেন এই বিদ্রোহের চিন্তানায়ক। "কেশরী" পত্রিকার জনপ্রিয়তা ইহার সাক্ষী। আবেদন-নিবেদনের ডালা বহিয়া লইবার যে অপমান আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রে সহজ হইয়া উঠিয়াছিল, এই পত্রিকা মহারাষ্ট্রে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে শিক্ষা দেয়। প্রথম যৌবনে নরসিং চিন্তামন কেলকার এই বিদ্রোহের আলোড়নের মধ্যে পড়েন; এবং আজীবন এই মনোভাবের পতাকাবাহক ছিলেন। গান্ধীযুগে যে নূতন চিন্তাজগতের সৃষ্টি হইল তাহা পূর্ব্বের উত্তরাধিকারী হইলেও, টিলকের শিষ্যবৃন্দ ইহা অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অসহযোগ আন্দোলনে, আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের মন ও বুদ্ধি ইহাতে সায় ও সাড়া দেয় নাই। নরসিংহ চিন্তামন কেলকার তাঁহার গুরুর দেহত্যাগের পর অতীত যুগের চিন্তাধারার সহিত বর্ত্তমান যুগের সঙ্গতিসাধন করিবার একটা চেষ্টা করেন "কেশরী" পত্রিকার সম্পাদকরূপে, সাহিত্যস্রষ্টারূপে কাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধে। এই ভাবে তিনি মহারাষ্ট্র দেশের চিন্তানায়কদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সূর্য্যোদয় দেখিয়া গিয়াছেন, ইহাই আমাদের সান্ত্বনা।

চিমনলাল শিতলবাদ

বর্ত্তমান ভারতের রাজনীতিকগণের নিকট চিমনলাল শিতলবাদ অন্ত কোন নক্ষত্রলোকের অধিবাসী; কারণ তাঁহারা শিখিয়াছেন যে বর্ত্তমান যুগে যে ফলে ও ফুলে আমাদের রাজনীতিক জীবন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য কাহাকেও জমি চাষ করিতে হয় নাই; আপনা হইতে ইহারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, কোন জগতেই এরূপ অঘটন ঘটে না; আমাদের দৃষ্টির অলক্ষিতে প্রকৃতির সৃজন-চেষ্টা থামে না। সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশের মানব-মন কখনও অকর্ষিত থাকে না। আজিকার শতদলের পশ্চাতে আছে বহু জনের অশ্রান্ত চেষ্টা; সেই বহু জনের অনেকেই অজ্ঞাত থাকিয়া যান। চিমনলাল শিতলবাদ এরূপ ইতিহাসের অঙ্গ, এরূপ ইতিহাসের সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তখন দেশের চিন্তাজগতে ও কর্ম্মজগতে পশ্চিম ভারতে দিক্‌পালরূপে বিরাজিত ছিলেন দাদাভাই নৌরোজি, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। ফিরোজ শাহ মেহ্‌তা, নারায়ণ গণেশ চন্দ্রভরকর, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ইঁহাদের শিষ্য। চিমনলাল শিতলবাদ ইঁহাদের বয়ঃকনিষ্ঠ। রাজনীতিক জীবনে ইহারা ব্রিটিশ শাসনকে ভগবানের মঙ্গলবিধান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং এই বিধানের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনে সাহায্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। নানা কুব্যবস্থা, অব্যবস্থা আমাদের সমাজের জীবনকে দুর্ব্বল ও অপটু করিয়াছে। এই কুব্যবস্থা ও অব্যবস্থার সংস্কার সাধন না করিলে আমরা রাজনীতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব না। এই বিশ্বাসের বশে আমাদের এই পূর্ব্বজগণ চিন্তা করিতেন, কর্ম্ম করিতেন। যত দিন আমাদের সমাজ জীবন সংস্কৃত ও শোধিত না হইয়া সুগঠিত ও সুসম্বদ্ধ হইয়াছে, তত দিন বৃটিশ-শাসনের শৃঙ্খল আমাদের মানিয়া লইতে হইবে; না হইলে দেশে আসিবে অরাজকতা; উহার জনগণ সভ্য জীবনের সকল আয়োজন ভাঙিয়া ফেলিবে। এবং এই কারণেই যখন বাংলাদেশে ১৯০৫ সনে আত্মবিশ্বাসের বিকাশ দেখা দিল তখন এক দাদাভাই নৌরোজী ছাড়া কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই ইহাকে অভিনন্দিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু দাদাভাইয়ের স্বীকৃতি প্রমাণ করে যে আমাদের পূর্ব্বজগণের মন নবভাবের বিরোধী ছিল না, যদিও কর্ম্মক্ষেত্রে তার প্রমাণ দিতে তাহা পরাঙ্মুখ ছিল। এই দুর্ব্বলতার মূল্য দিতে হইয়াছে তাঁহাদের বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত স্বভাব-বিপ্লবী গান্ধী-যুগের পয়োধি জলে ভাসিয়া গেলেন। এইরূপ একটা বিরাট পরিবর্ত্তন মানুষের মন সহজে স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। চিমনলাল শিতলবাদ ছিলেন প্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী, রাজনীতিক নেতৃত্ব গান্ধী-পূর্ব্ব-যুগে যাঁহাদের হাতে সহজে চলিয়া আসিত। তিনি অনেক বৎসর ছিলেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্সেলর, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠীর নবাবীর বিরোধী। তাঁহার রাজনীতিক জীবনযাত্রা সুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে; সেই যুগের রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে ইংরেজের সঙ্গে বিরোধ যেখানে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িত সেখানে ফিরোজ শাহ মেহ্‌তা প্রভৃতি নেতৃবর্গ পশ্চাৎপদ হইতেন না। চিমনলাল শিতলবাদ এই কর্ম্মপন্থার বিশ্বাসী ছিলেন; যুগধর্ম্মানুযায়ী কোন কর্ত্তব্য তিনি অবহেলা করেন নাই। গান্ধীজীর জীবনে সে যুগের কোন প্রভাব নাই, এমন কথাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

বাঙালী ছাত্রদের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাঙালী ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধির দিক দিয়া অধঃপতন হইয়াছে, কেননা সর্ব্ব-ভারতীয় পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রেরা আগেকার মত কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণ নিশ্চয়ই বলিবেন যে, গত আট-দশ বৎসর হইতে বাঙালী সাধারণ ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাণ মোটের উপর বেশ কমিয়াছে। যত দিন যাইতেছে পরীক্ষায় ছাত্রদের অযোগ্যতা ততই তীব্রতর ভাবে প্রকট হইতেছে। গড়ে ছাত্রদের বুদ্ধি যে কমিয়াছে তাহা পরীক্ষক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ছাত্রদের বুদ্ধি কমিবার নানা কারণ বর্ত্তমান; তাহার মধ্যে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, দুঃখ-কষ্ট, উপস্থিত শাসন-ব্যবস্থার উপর তীব্র অসন্তোষ ও নানা ঘটনা উপলক্ষে তাহার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক প্রকাশ, ছাত্রদের নিজস্ব রাজনীতিক মতামত, দলাদলি, অছাত্রীয় ব্যাপারে তাহাদের উৎকট আগ্রহ ও খেলাধূলা, সিনেমা, থিয়েটার এবং সভা-সমিতিতে তাহাদের অত্যধিক সময়ক্ষেপ প্রভৃতি কারণ উল্লেখযোগ্য।

ছাত্র-আন্দোলন যে পথে গত কয়েক বৎসর হইতে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আমরা শিক্ষক-সম্প্রদায় কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হইয়াছি। ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ বা উচ্ছ্বাসের আধিক্য হেতু তাহাদের সত্যকার মনের চিত্র খানিকটা বিকৃত হইয়া আমাদের চক্ষে পড়া স্বাভাবিক। তাহাদের আন্দোলন সম্বন্ধে বিকৃত ধারণাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যদি বলা যায়, ছাত্রেরা ঠিক পথে চলিতেছে না তাহা হইলে তাহাদের দিক হইতে তীব্রভাবে আপত্তি উঠিবে; অবশ্য আপত্তিটা যুক্তি নয় তাহা ছাত্রেরা স্বীকার না করিলেও তাহাদের শিক্ষকগণ আশা করি স্বীকার করিবেন। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক উৎসাহিত হইয়াছে। তাহাদের অধিকার স্বীকার করা যে সঙ্গত ও কলেজ কর্তৃপক্ষের উচিত তাহাদের সহিত আলোচনা করিয়া কাজ করা, এই ধরণের কথা অধ্যাপক সম্মেলনে মিঃ কেলাস একবার বলিয়াছেন। অন্যান্য দেশে ছাত্রদের এই অধিকার স্বীকার করা হয় কি না তাহার প্রশ্ন আজ তুলিব না। ছাত্রদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও কর্ম্মপন্থার সমালোচনাও করিতে চাহি না। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মত বলিতেও চাহি না যে ছাত্রদের রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ছাত্রেরা যে ছাত্রত্বের দিক দিয়া ব্যর্থ ও পঙ্গু হইয়া যাইতেছে এবং বুদ্ধি ও মনোবৃত্তির দিক দিয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গলকে তাহাদের চাপল্য ও অশুভ বুদ্ধি দিয়া ক্ষুণ্ণ করিতেছে তাহা তাহাদের শিক্ষক হইয়া আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি। ছাত্রেরা রাজনীতি, আন্দোলন, দলাদলি, ষ্ট্রাইক প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহ দেখাইলেও বা ভারতীয় বিশ্বরাজনীতি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞদের সমতুল্যভাবে সমালোচনা করিলেও ছাত্রদের উন্নতি, বিদ্যালাভের আগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা সম্মিলিত ভাবে কতটুকু কাজ করিয়াছে তাহাই আমরা জানিতে চাই। সম্ভবতঃ দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্যহেতু ছাত্রদের চক্ষু ও মন লইয়া আমরা তাহাদের বিচার করিতে পারি না। সেইজন্য ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে ছাত্রদের মতামত উল্লেখ করিলে আশা করি অনেকটা নিরপেক্ষ ভাবে এদেশীয় ছাত্রদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বা ভয়ের কথা স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিব।

একটি পরীক্ষায় কলেজ-জীবন সম্বন্ধে কলেজের ছাত্রদের লেখা প্রায় দুই শত হইতে আড়াই শত প্রবন্ধ পরীক্ষা করিবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বর্ত্তমান লেখকের হইয়াছে। ছাত্রদের খাতা হইতে আমি অনেক অংশ লিখিয়া লইয়াছি, তাহা দ্বারা ছাত্রজীবনের আদর্শ, দোষ-গুণ প্রভৃতির একটি বেশ সুন্দর চিত্র আঁকিতে পারা যায়। এই ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিমান্ ও নির্ব্বোধ, কংগ্রেসপন্থী কম্যুনিষ্ট ও সোস্যালিষ্ট, দলীয় ও অদলীয়, সকল প্রকারের ছাত্র আছে। কেহ বা নিষ্ঠুর ভাবে ছাত্রদের রাজনীতি ও ষ্ট্রাইক-প্রীতিকে আক্রমণ করিয়াছে, কেহ বা ছাত্রজীবনের দলাদলি, চুরি, অসাধুতা প্রভৃতির কঠোর সমালোচনা করিয়াছে। কেহ বা অনুতপ্ত; একটিমাত্র ছাত্র জাতীয় জীবনে উচ্চ আদর্শের কথা অবতারণা করিয়াছে; কাহারও বা ছাত্রদের রাজনীতিতে বিরাট দানের প্রসঙ্গে বেশ একটু গর্ব্ববোধ আছে। মোটের উপর যে চিত্র পাইয়াছি তাহাতে মনে আশা জাগে না।

স্কুল হইতে কলেজে আসিয়া ছাত্রেরা বৃহত্তর জগতেরও স্বাধীনতার স্বাদ পায়। তাহাদের দায়িত্বও যে বাড়িয়া যায় তাহা অধিকাংশ ছাত্রই ভুলিয়া যায়। ছাত্রেরা নানা সঙ্গ ও দলে পড়িয়া তাহাদের পূর্ব্বার্জ্জিত ধারণা ত্যাগ করিতে থাকে। নানা মতবাদের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া অনেকেরই মাথা ঘুরিয়া যায়। স্কুলে শিক্ষকদের সাহচর্য্য ও সতর্ক দৃষ্টি কলেজের অধ্যাপকদের নিকট পাওয়া যায় না। অধ্যাপকেরা

ছাত্রদের অন্তরে প্রবেশ করিতে চাহেন না। তাঁহাদের কাজ বক্তৃতা দেওয়া, ছাত্রদের কাজ শুনিয়া যাওয়া। সুতরাং ছাত্রেরা অনেকটা স্বাধীনতা পায় ও অবাঞ্ছিত সংসর্গে পড়িয়া তাহার অপব্যবহার করে। ক্লাস পলায়ন একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। অধ্যাপকদের সহিত ব্যবহার ঈষৎ অশিষ্ট। একটি ছাত্র বলিতেছে—

Now-a-days it is often seen that students do not talk politely with their professors. They try to oppose the very teaching of the professors.

অপর একটি ছাত্র বলিতেছে—

What struck me much was the behaviour of the students towards our Venerable teachers. Most of them are so rough in manners that it is shameful for the student community.

আর একটি ছাত্র বলিয়াছে—

College students cannot show unquestioned reverence to their professors and the principal and argue on points they do not know well.

সকল ছাত্রই অশিষ্টাচারী নহে। অধ্যাপকেরাও দোষশূন্য নহেন। একটি ছাত্র লিখিতেছে—

The professors do not mix with the students. They have superiority complex.

আবার সকল অধ্যাপকই ভাল শিক্ষক নহেন, একটি ছাত্রের ভাষায়—there are good scholars but bad teachers. এই কারণেই ছাত্রদের জীবন সম্পূর্ণ হইতে পায় না ও পাণ্ডিত্যের উপর প্রীতি গভীর হইতে পারে না। ছাত্র ও অধ্যাপকের মন রুচি আদর্শ একমুখী না হইলে শিক্ষা সার্থক হইতে পারে না। কলেজ, অধ্যাপক ও তাঁহাদের আবেষ্টনের উপর একটা মমত্ববোধ বা গর্ব্ববোধ অতি অল্প ছাত্রেরই আছে। প্রতি কলেজের একটা ঐতিহ্য আছে, প্রতিবার যাহারা কলেজে ভর্ত্তি হইতেছে তাহাদের সেই ঐতিহ্যের উপর অনুরাগ থাকা দর কার। বোধ হয় একটি মাত্র ছাত্র কলেজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছে। ইহা যে ছাত্রদের একটা ধর্ম্ম এ বোধ অন্য কোন ছাত্রের মধ্যে দেখিলাম না। একটি ছাত্র ভাল ছেলেদের সম্বন্ধে লিখিয়াছে—I find in the scholars deep curiosity and hankering for knowledge. তাহারা অধ্যাপকদের সহিত মিশিতে চায়, নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে ও নূতন নূতন বই পড়িতে চায়।

অল্প ছাত্রই কলেজকে শিক্ষার স্থান হিসাবে গণ্য করে।* তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি যে এস্থানে স্থাপিত হয় তাহার উল্লেখমাত্র পাই নাই। একটি ছাত্র বলিয়াছে, কলেজে—Thoughts and visions have been widened." ছাত্রদের মন জুড়িয়া বসিয়াছে রাজনীতি ও তাহাকে অবলম্বন করিয়া দলাদলি। পরাধীন দেশের হৃদয়বান তরুণরা যে দাসত্ব ও দারিদ্র্যের কথাকে সকলের উর্দ্ধে স্থান দিবে তাহা অবশ্যই স্বাভাবিক। কিন্তু কলেজে 'ইউনিয়ন' লইয়া ছাত্রদের যে দলাদলি সে সম্বন্ধে তাহাদের মত প্রণিধানযোগ্য। ইউনিয়নের মধ্য দিয়া ছাত্রদের ঐক্য থাকে, তাহাদের চিন্তা দানা বাঁধিতে পায়, চিন্তা কার্য্যে রূপান্তরিত হইতে চায়। বক্তা, গায়ক, রসিক ও কবি যাহারা তাহারা এই ইউনিয়নের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে ও ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ইহার মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রচালনার প্রথম পাঠ শিখিতে পারে। একটি ছাত্র লিখিতেছে—

There was a union of our college. I am ashamed of writing that it did nothing. Students can do many things. They have a fresh mind and a wide outlook. But all the energies of the young students, all their potentialities are frittered away without guidance . . . We criticised political matters and the leaders foolishly. We did little to understand the things of the world. We did not study much. We only idled away time. I saw the students are divided into political and fanatical groups with no perfect idea of the situation. We are politically a dependent country hopelessly wasting our energy. . . . There are none to look after us. Those who look cannot either impress us or do only nominal duties.

আত্মস্বীকৃতি হিসাবে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। সাধারণ ছাত্রেরা এতখানি বিনয় সহকারে আপনাদের ত্রুটি স্বীকার করিতে চাহে না। নিজেদের সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা বিশেষ উচ্চ। তাহারা নিজেদের কেবল দেশের আশাভরসাস্থল হিসাবে গণ্য করে না, তাহারাও রাজনীতিতে পাকা রাজনীতিজ্ঞদের অপেক্ষা কম নহে এ ধারণাও কাহারও কাহারও আছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া একটি ছাত্র লিখিয়াছে—

In the practical life of a country students play *the most important part.*

অপর একটি ছাত্র ছাত্রদের রাজনীতি সম্বন্ধে লিখিয়াছে—

I see that student politics is nothing but fanaticism. They are excited by some emotional speeches, face the *lathi* charges and firings and waste their lives.

অবশ্য এই ফ্যানাটিসিজমেই জাতি বড় হয়। যাহারা হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিতে পারে জাতির যৌবনকে গৌরবের মাল্যে তাঁহারাই ভূষিত করিতে পারিয়াছে। উপরে উক্ত ছাত্রটির কথাই ঠিক—There are none to look after us. এমন হীরার টুকরা ছাত্রদের ভাল নেতা নাই, তাই বেঘোরে তাহাদের প্রাণ যাইতেছে। তাহারা ঠিক পথে চলিতেছে না; উদার হৃদয়বৃত্তি তাহাদের দেশের

* ইহাই বর্ত্তমানে ছাত্রজীবনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ।—প্রঃ সঃ

† যদি সে fanaticism ঠিক পথে ও ঠিক ভাবে চালিত হয়। নহিলে ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে। ক্রুসেডের ইতিহাসে, চীনদেশের প্রথম ছাত্র-আন্দোলনে, এবং অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে তাহা দেখা গিয়াছে।—প্রঃ সঃ

মুক্তির জন্য ব্যাকুল করিলেও,মোটের উপর তাহারা অছাত্র-সুলভ ব্যাপারে এতই মত্ত যে ছাত্রজীবনের দায়িত্ব বহন তাহারা করিতে পারে না। হুজুগে পড়িয়া অনেকে মাতিয়া উঠে; ইহারাই অধিকাংশ স্থলে আদর্শভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের ও দলের ক্ষতি করিয়া বসে।

দুঃখের কথা ছাত্রেরা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় না; অনেকস্থলেই হৃদয়াবেগ তাহাদের রাজনীতিক্ষেত্রে টানিয়া আনে। যাহারা রাজনীতি করিতে চাহে তাহাদের বাধা দিবার অধিকার আমার নাই কিন্তু তাহারা কেন নামমাত্র ছাত্র থাকিয়া যাইতে চায়? পড়াশুনার দায়িত্ব তাহারা বহিবে না, অপরাপর ছাত্রকে নিজেদের দলভুক্ত করিতে চায়। মনে হয় ছাত্রজীবনের দায়িত্বের উপর ইহাদের কোন মায়া মমতা বা অনুরাগ নাই। ছাত্র আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি এইখানে। খাওয়া-পরার ভাবনা পিতামাতার উপর ছাড়িয়া দিয়া বিশুদ্ধ দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনীতি চর্চা, ইহাই যদি ছাত্রেরা করিতে চায় তাহা হইলে স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। পড়াশুনা না করায় অধিকাংশ ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়, কলেজের পাঠ অল্পেতেই শেষ হয়, অনেকে নন-কলেজিয়েট হইয়া যায় ও শতকরা ২৫।৩০টি ছাত্র পরীক্ষায় পাস করিতে পারে। অপরাপর ছাত্রদের দয়া-দাক্ষিণ্যের সুযোগে পাস করা সম্ভব হয়।

কলেজ ইউনিয়ন সম্পর্কে একটি ছাত্র লিখিয়াছে—

It is the greatest place of party politics. There are different political parties It is natural that it would create chaos and quarrel among the students. In my opinion, the Students' Union should be rectified (?) by selecting proper representatives who are free from fanatic and blind view about politics and free from communal passion . . . Party politics creates a bitter feeling. There are many leaders of different political parties who do not deserve to be called leaders. They do not lead the students but they take them astray. They rather disorganise the students. There should be one party.

এই ইউনিয়নের কাজ পর্য্যবসিত হইয়াছে ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ করায় এবং দলাদলি ও ধর্ম্মঘট চালানোতে। একটি ছাত্র লিখিতেছে—

The students seem to be well-disciplined, but mostly in the case of holding strikes only.

ষ্ট্রাইক বস্তুটি ছাত্রদের ব্রহ্মাস্ত্র। সকল দলই ষ্ট্রাইকের নামে এক হয় এবং কারণে ও অকারণে এই অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। পড়াশুনা বন্ধ হয়, পথে পথে বিক্ষোভপ্রদর্শন চলে, কেহ কেহ সিনেমায় যায়। অবশ্য ছাত্র-সম্প্রদায় সময়-বিশেষে যে দৃঢ়তা ও চরিত্রবল দেখাইয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। যাহারা সত্যই চরিত্রহীন ও অপদার্থ তাহারা পুলিস ও মিলিটারীর আগ্নেয়াস্ত্রকে তুচ্ছ করিয়া স্বাধীনতার দাবি এমন অকুণ্ঠ ভাবে ও দলাদলি বিসর্জ্জন দিয়া প্রকাশ করিতে পারিত না। যাহাদের মনোবল এত দৃঢ় তাহারা কেমন করিয়া নির্ব্বোধের মত আত্মশক্তির অপব্যয় করে, দেশের মননশক্তিকে ক্ষুণ্ণ করে বা বুদ্ধিবৃত্তির অসম্মান করে তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না। কিন্তু তাহাদের মানসিক অধঃপতন হইয়াছেই—তাহা না হইলে অসংযম, দলাদলি, মারামারি, ইতরতা কখনই প্রবল হইত না। ছাত্র-আন্দোলনের রন্ধ্রে শনি ঢুকিয়াছে। ছাত্রেরা দলগত রাজনীতিকদের আওতা কাটাইয়া উঠুক ইহাই আমরা চাই। তাহাদের মধ্যে কেহ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছাত্রদের অকাজে লাগাইতে পারিবে না। ছাত্রদের পড়াশুনা, চিন্তাশক্তি, সহনশীলতা অসম্ভব রকমে কমিয়াছে। বৎসরের মধ্যে কারণে-অকারণে মাসাধিককাল ধর্ম্মঘট করিলে ইহা হইতে বাধ্য। ছাত্র হইয়া এ কার্য্য করা অবশ্যই গর্হিত। একটি ছাত্র ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে লিখিতেছে—

But the first thing that I consider to be the most hard obstacle in the path of attending lectures is the continual strikes. The students may strike for their grievances against the educational authorities. But such cause is one in a thousand, students' strikes are often political strikes, in sympathy for the labour movement. But these were so continual that the same thing happened day after day, for which every student's study was obstructed. It is not a surprise that 30 per cent. of the students come out successful in a university examination when we consider these things as strikes.

এই ষ্ট্রাইক কি কাজে লাগানো হয়? একটি ছাত্র লিখিতেছে—

Whenever a professor went against us we all united together and urged the professor to give (?) our demand.

অপর একটি ছাত্র লিখিতেছে—

The notice for the examination was served. The students were quite unprepared for it. They *made* an application to the Principal requesting him to stop the examination. The Principal paid no heed to them. They made an arrangement for a strike and said that they would not appear in the examination. In this way they stopped the examination.

যাহারা ডালহৌসী অভিযান করে, ভিয়েৎনাম দিবস প্রতিপালন করিতে গিয়া গুলি খায় তাহারা দল পাকাইয়া কত লজ্জাজনক ব্যাপার ঘটাইতে পারে ইহাই হইতেছে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ছাত্রদের শুভবুদ্ধি কে হরণ করিয়াছে?

পড়াশুনার ব্যাপারে যাহাদের আগ্রহ এইরূপ তাহারা পরীক্ষায় পাস করে কেমন করিয়া? একটি ছাত্র ইহার উত্তর দিয়াছে—

In the examination most of the students pass. It is because though they read nothing they are very apt to copy from their friends.

এই ব্যাপার এত পরিচিত যে ইহার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। প্রশ্নপত্র দুরূহ হইলেও ছাত্রেরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আদ্যশ্রাদ্ধ পাকাইয়া তুলে। তাহাদের সম্মিলিত ঔদ্ধত্যের কাছে শুধু কলিকাতা নহে, মফঃস্বলেও শিক্ষকগণ তটস্থ হইয়া থাকেন। তাহাদের আচরণ দেখিলে মনে হয় তাহাদিগকে উন্মার্গগামী করিবার জন্য যেন ইংরেজ গবর্ণমেন্ট বহু অর্থব্যয়ে প্ল্যান করিয়া দক্ষ এজেন্টদের ছাত্রদলে ছাড়িয়া দিয়াছে। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন; ছাত্রেরা তো আর বলিতে পারিবে না—Education can wait, Swaraj cannot ও সেই অজুহাতে দিনের পর দিন স্কুল বা কলেজ কামাই করিতে পারিবে না। অন্য সভ্যদেশের ছাত্রদের সমকক্ষ হইতে হইলে, ভারতের স্বাধীনতাকে সার্থক করিতে হইলে তাহাদের ভাল ছাত্র হইতে হইবে; রাজনীতিতে মাতিয়া আপনাদের ক্ষতি করিলে চলিবে না। একটি বিষয় বড় আশ্চর্য্য লাগে যে এতগুলি ছাত্রসঙ্ঘ থাকিতেও অন্যায় আচরণকারী ছাত্রদের শাস্তি দিতে বা তাহাদের অসঙ্গত কার্য্যাবলী ব্যর্থ করিতে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে প্রস্তাব পাস ছাড়া বড় একটা কিছু তাহারা আজও করিতে পারে নাই। এইজন্যই মনে হয় ছাত্রদের শুভবুদ্ধির মূলে শনি লাগিয়াছে তাহা না হইলে কেমন করিয়া ছাত্রনেতাদের সম্বন্ধে এমন কথা একটি ছাত্র লিখিতে পারে?—

The representatives of the Union are very selfish and they try to *take* money from the College Students' Funds.

একটি বিষয় অবান্তর হইলেও দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি। ছাত্রদের হৃদয় উদার, তাহারা ইন্দোনেশিয়া বা ভিয়েৎনামের জন্য কাঁদিয়া ভাসায়; ইহাতে আমাদের বলিবার কিছু নাই। কিন্তু মুসলিম লীগ গবর্ণমেন্ট কলিকাতা ও নোয়াখালিতে যে অত্যাচারের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল, ১০০ নং হ্যারিসন রোডের মত কত শত ঘটনা তাহাদের আমলে ঘটিয়াছিল কিন্তু এক সম্প্রদায়ের ছাত্রেরা ইহা লইয়া মাথা ঘামায় নাই। মিথ্যা উদারতার মোহে বাংলার ছাত্রসমাজ অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে। মুসলিম লীগের অনুষ্ঠিত অত্যাচার সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ নয়; ইহার মূলে আছে ইংরেজ কূটনীতির চক্রান্ত। সুতরাং ছাত্রদের প্রথম হইতেই লীগের দুষ্টবুদ্ধিকে আঘাত দেওয়া উচিত ছিল বলিয়া মনে করি। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রসঙ্ঘ ভাঙিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া ছাত্র-আন্দোলনকে দুর্ব্বল করিত একথা মনে করা দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে। আমাদের দেশের দুঃখ বা সমস্যার সমাধান করিব আমরাই। দেশ ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাদের মনকে বিদেশীভাবাপন্ন ও বেদরদী করিল কে?

ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে সকলে ক্ষমার চক্ষে দেখেন। তাহাদের শাস্তি দিবার কথা কেহ তুলেন না। ইহার পশ্চাতেও একটি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। নেতারা তাহাদের কিছু না বলার কারণ দর্শাইয়াছে একটি ছাত্র তাহার অশুদ্ধ ইংরেজীতে—Because of getting liberty no one tells them nothing. অসাধু উপায় দ্বারা সৎ উদ্দেশ্য লাভ করিতে গেলে যে মার খাইতে হয় নেতারা তাহা কেমন করিয়া যে ভুলিতে পারেন তাহা ভাবিয়া পাই না। ছাত্রদের হাতে অসম্মান নেতারা পাইতেছেন ও বোধ হয় আরও পাইবেন। একটি ছাত্র বলিয়াছে—They are misled by political parties. ইহা ছাত্রেরা যদি বুঝিয়া থাকে তবে আশার কথা। কিন্তু রাজনীতির স্বাদ ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গী বিকৃত করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। পেশাদার রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাহারা যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চায়। একটি ছাত্র স্পষ্টই বলিয়াছে—In practical life the students play the most important part. তাহারা কলেজে অধ্যাপক, অধ্যক্ষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিয়া যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে দেশের নানা সমস্যায় তাহারই প্রয়োগ করিয়া বসে। অনেকে গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করিয়াছে যে তাহারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে, মরিয়াছে তবু পুলিসকে ডরায় নাই। তাহাদের কৃতিত্ব দেখিয়া ট্রাম কোম্পানীর ধর্ম্মঘটীরা, অমৃতবাজার পত্রিকার ধর্ম্মঘটীরা তাহাদের সহানুভূতি কামনা করিয়াছে। ছাত্রদের দেশ-বিদেশের অবস্থার সঙ্গে ওয়াকিবহাল হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাই বলিয়া কারণে-অকারণে স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া যত্রতত্র সহানুভূতি দেখাইতে যাওয়া সমীচীন নহে।

দোষের কথা অনেক বলিয়াছি। গুণের কথাও কিছু বলিতে হইবে। আজকালকার ছাত্রেরা ক্লাসের পড়াশুনায় ভাল না হইলেও দেশ-বিদেশের খবর রাখে; বিশেষ করিয়া কম্যুনিষ্ট ছাত্রেরা এ বিষয়ে বিশেষ পরিপক্ক। তবে তাহাদের চিন্তা রেজিমেণ্টাল ও একদেশদর্শী। ইংরেজীতে যাহাকে বলে ইণ্টেলেকচুয়্যাল কিউরিয়সিটি অর্থাৎ জানিবার আগ্রহ—তাহাদের যথেষ্ট আছে। অনেকে আবার দলের কর্ম্মী; দেশের অনেক কথাই তাহারা হাতে-নাতে জানে। পড়াশুনায় ভাল ছাত্রও আছে, তাহারা কখনও রাজনীতির ধার দিয়াও যায় না। কলেজে অনেকে ভাল বক্তা ও তার্কিক। বাংলা-সাহিত্য সমিতির কথা একটি ছাত্র উল্লেখ করিয়াছে। অনেকে সেণ্ট জন্স এম্বুলেন্স কোরের সদস্য। তাহারা কলিকাতার গত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সেবাকার্য্য করিয়াছে। দেশের দাবি গবর্ণমেণ্টের গোচর করিয়াছে, লাঠি ও গুলি খাইয়াছে; ভাল খেলোয়াড়ও

হইয়াছে। একটি মাত্র ছাত্র বিবেকানন্দের কথা উদ্ধৃত করিয়া ছাত্রদের উচ্চতর আদর্শের কথা তুলিয়াছে—

The duties of our boys are among the lowliest and the lost. What they need are muscles of iron and nerves of steel.

দেখিয়া আনন্দ হইল কয়েকটি ছাত্র কলেজের পড়াশুনা বিষয়ে সন্তুষ্ট নহে, তাহারা প্রচলিত রীতির পরিবর্ত্তন চায়। একটি ছাত্র বলিয়াছে, প্রতি ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা অত্যধিক। ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে কোন সম্পর্ক এই কারণেই গড়িয়া উঠিতে পায় না। এইজন্য ছাত্রের সংখ্যা কমাইতে হইবে; কলেজে পড়াশুনার ধারাও বদলাইতে হইবে। অধ্যাপকরা দেন কেবল বক্তৃতা, ছাত্রদের কাজ শোনা। ইহাতে পড়াশুনা ভাল হয় না। একটি ছাত্র বলিয়াছে—

The college is only for show, only to make oneself a bonafide student of the university and to make oneself able to appear in the university examination. But if anyone wants to learn he must not depend upon the college.

অনেকে কলেজ-পুস্তকাগারের দৈন্যের কথা বলিয়াছে।

মোটের উপর যাহা দেখিলাম তাহাতে বলা চলে যে বাঙালী ছাত্রদের ভাল অপেক্ষা মন্দই অধিকতর প্রকট। পরীক্ষার ফলাফলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতা যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে দলাদলি ততই প্রবল হইতেছে ও ছাত্রদের মন পড়াশুনা হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া দলগত রাজনীতি, কলেজের বাহিরের আন্দোলন, সিনেমা, সভা প্রভৃতিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। জাতি ও জগৎ বুদ্ধির দিক দিয়া অধঃপতন ক্ষমা করিবে না। স্বাধীন ভারতে শরীর ও মনে সুস্থ সবল যুবক দরকার। ছাত্রেরা যাহাই করুক জাতির সেবায় যেন এই রূপ সুস্থ সবল বুদ্ধিমান্, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কর্ম্মী, কবি, ভাবুক, রাজনীতিক, সেবক অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। তরুণ সময় সময় উন্মার্গগামী হয়, কিন্তু তাহার প্রাণের প্রাচুর্য্য, আদর্শের উপর শ্রদ্ধাই তাহাকে বাঁচায়। প্রাণের দিক দিয়া, শ্রদ্ধার দিক দিয়া, আদর্শনিষ্ঠার দিক দিয়া আমাদের তরুণরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াক ইহাই আমাদের কাম্য। দলাদলি, নির্ব্বোধ আত্ম-সর্ব্বস্বতা, অহমিকা, আদর্শভ্রষ্টতা অনেক স্থলেই তাহাদের বিভ্রান্ত করে। দিগভ্রান্তরা দিশা খুঁজিয়া পাক, জাতির আশাকে পূর্ণ করিয়া তুলুক ইহাই কাম্য।*

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, সমগ্র ছাত্র সমাজের কল্যাণ এবং জাতি-গঠন প্রচেষ্টার সাফল্যের দিক হইতে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শৃঙ্খলা, সংযম এবং শিক্ষার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ছাত্রদের উন্নতির মূলে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছাত্র সমাজে ইদানীং ইহার বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ছাত্রদের অভিভাবক, শিক্ষাব্রতী, শিক্ষক সম্মেলন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার-গণের এ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। আমরা এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।—প্রবাসীর সম্পাদক।

বিদায়ী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

বিদায় জন্মভূমি !
আমি চাহি নাই—কোল থেকে ঠেলে
ফেলে দিলে মোরে তুমি।
ছিল বড় সাধ তব মাঠে ঘাটে,
বকুল-বিছানো পল্লীর বাটে
যাপিব প্রবাস-ক্লান্ত জীবন
তব পদরেণু চুমি' !

ভাবি নাই কোনো দিন—
তোমার কুটীরে পড়িবে না আর
আমার পায়ের চিন্।
ভাবি নাই কভু—হয়ে গৃহহারা
সম্বলহীন যাযাবর-পারা
বেড়াইব ঘুরে—স্বপন-সৌধ
ধূলিতলে হবে লীন !

আজি চোখে আসে জল,
দূর—বহুদূর হ'তে ডাকে মোরে
তোমার কুঞ্জতল।
তোমার স্নিগ্ধ ঘন বটছায়া
আর কোনো দিন জুড়াবে না কায়া,
তব নদীজলে দগ্ধ জীবন
করিব না সুশীতল !

ফিরে ফিরে শুধু চাই,—
তাড়াইয়া দিলে তবু মায়াবিনী,—
তব লাগি' ব্যথা পাই !
স্নিগ্ধ শীতল কুলায়ে তোমার
নীড়-হারা পাখী ফিরিবে কি আর ?
সন্ধ্যা-আঁধারে নিভৃতে নীরবে
ভাবি আজ ব'সে তাই !

শহীদ

শ্রীসাবিত্রী ঘোষাল

মিসেস্ ওয়াণ্ডাকে সব সময়েই ভয়ে ভয়ে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির ভিতর দিন কাটাতে হ'ত।

ইয়ানেক যখনই বাইরে যেত, তিনি তাকে সময় মত ঘরে ফেরার কথা মনে করিয়ে দিতে কখনই ভুলতেন না। ছেলেকে নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না, তাই সব সময় ঘ্যান ঘ্যান করতেন, জোর করতেন, এমন কি কোন সময় অভিমানও করে থাকতেন।

কোন দিন হয়ত রাত হয়ে যাচ্ছে, ইয়ানেক ফিরছে না, বিলম্বিত মুহূর্তগুলো অসহ্য অত্যাচারের মত মায়ের বুকে বিঁধছে। প্রতিটা মুহূর্ত একটা নতুন বিভীষিকার স্বপ্ন বয়ে আনছে। কি রকম যেন একটা অদ্ভুত ভয়ে মার মন অবশ হয়ে আসে, আকুল মাতৃহৃদয় সন্তানের কল্যাণ-কামনায় অদৃষ্ট দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়তে থাকে।

কিন্তু মায়ের এই যে দুশ্চিন্তা, এই যে ভয়, এটা মোটেই অসঙ্গত ছিল না। বাস্তবিক ওয়ারস'র অবস্থা তখন এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে যে রাস্তায় দু'জন পরিচিত লোকের দেখা হলে প্রথমেই মুখ দিয়ে বেরোয়, 'কিহে এখনও টিকে আছ?' আর সাঁঝ-বাতির সময় পার হয়ে গেলেও যদি কেউ ঘরে ফিরে না আসে, তবে সে আর ফিরবে না, সকলেই নিশ্চিত ধরে নেয়।

মিসেস্ ওয়াণ্ডার স্বামী ছিলেন একজন আইনব্যবসায়ী। লড়াই সুরু হওয়ার পরই তিনি একজন অফিসার হন আর দিন গুনতে থাকেন কবে তাঁর ডাক পড়বে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে অবশেষে ডাক এসে পড়ল। খবর পেয়ে সোজা আপিস থেকেই তাঁকে চলে যেতে হয়েছে, স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে বিদায় নেবার অবসরটুকুও তিনি পান নি।

যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর এক মাস পেরুতে না পেরুতেই পোল্যাণ্ড হয়েছে ঠিক যেন নরককুণ্ড! এই কুৎসিত অবস্থাটাকে কেউ মেনে নিতে পারছে না, সকলেই মনে মনে ভাবছে একটা দুঃস্বপ্নই কেটে গেল বলে। কিন্তু দুঃখের দিনগুলো একঘেয়ে ভাবেই চলেছে, এর যেন আর শেষ নেই। অন্ধকারে দিক্-দিগন্ত ছেয়ে গেল, নতুন সূর্য্যের রশ্মি-সম্পাতে কবে যে আবার দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে! মিসেস্ ওয়াণ্ডা বহু চেষ্টা করেও স্বামীর কোন খোঁজ পেলেন না।

সাবেক বাড়ীর রাস্তাটা আক্রমণের প্রথম চোটেই ভেঙে গেছে। মিসেস্ ওয়াণ্ডাকে উঠে আসতে হয়েছে ছোট একটা ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটটাতে একটা মাত্র ঘর, তবে বেশ বড়—মা আর ছেলের পক্ষে যথেষ্টই। ঘরের দামী জিনিষপত্র একে একে সবই বিকিয়ে গেছে, একমাত্র লক্ষ্য কোনমতে বাঁচার মত সংস্থান রাখা। মাঝে মাঝে গ্রামে কোন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে মা বেড়াতে যেতেন আর ফেরার সময় বেশ কিছুদিনের মত খাবার-দাবার জোগাড় করে আনতেন। হঠাৎ এক এক সময় এই উঞ্ছবৃত্তিতে তাঁর মনে প্রচণ্ড ধিক্কার আসত, মনে মনে ঠিক করতেন এই শেষ, আর নয়।

ক্রমে ক্রমে তিনি নিজেকে নানাভাবে বঞ্চিত করতে সুরু করলেন। কম করে খেতেন যাতে সঞ্চয় বেশ কিছু দিন স্থায়ী হয়, ছেলেটির খাবার অভাব না ঘটে। এই ছেলেটিই তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন—কেবল এর জন্যেই তিনি কোন মতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন।

ক্রমে ইয়ানেকও নিজেদের অবস্থাটা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারলে। সঙ্গে সঙ্গে সে এমন ব্যবহার করতে লাগল যেন সে-ই বাড়ীর অভিভাবক। বয়সে যদিও সে নিতান্তই ছোট, সবে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ছে, কিন্তু তার আচরণে মনে হতে লাগল যেন সে একজন বৃদ্ধ, কত দায়িত্ব তার মাথায়। কিন্তু এই আঠার বছরের ছেলেটির মাথায় যত প্ল্যান ছিল, সেগুলো কাজে লাগাবার আর কোন পথই রইল না। এমন কি পড়াশুনাটাও বন্ধ হয়ে গেল, চালাবার মত অর্থও ছিল না, আর তা ছাড়া জার্মানরা শহরের স্কুলগুলো সব বন্ধও করে দিয়েছিল।

সেই সেপ্টেম্বর আক্রমণের পর থেকে সমস্ত ওয়ারস শহরটাই ব্যবসায়ে লেগে গেল—সঙ্গে সঙ্গে ইয়ানেকও তাতে যোগ দিলে। সিগারেট দিয়েই তার হাতে খড়ি হ'ল। নতুন জীবন প্রথম প্রথম বেশ ভালই লাগতে লাগল, আর লাভটাও মন্দ হচ্ছিল না। খরচ-খরচা বাদ দিয়েও দিনে বেশ কিছু আয় হ'ত।

ইয়ানেকের মন এই দিকে গেছে, তা মা জানতেন না। এক দিন তিনি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একদিকে চোখ পড়াতে পা যেন তাঁর মাটির সঙ্গে গেঁথে গেল! নিজের চোখকেও যেন তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না! একটা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ইয়ানেক চীৎকার করে সিগারেট ফেরি করছে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ছেলে ঘরে ফিরতে, দুঃখে অভিমানে মা একেবারে ভেঙে পড়লেন; কেঁদে-কেটে তার মন গলাতে চাইলেন, কিন্তু ছেলে নাছোড়বান্দা। সে মাকে বার বার করে বোঝাতে লাগল, কেন এতে দোষের কি আছে, তার পরিচিত কত ছেলেই ত এ রকম কোন না কোন একটা কাজ করছে। তার মধ্যে কয়েক জন ত বেশ ভাল বংশের ছেলে। সবাই করতে পারে আর সেই বুঝি কেবল বসে বসে খাবে, সংসারের দায় বুড়ো মায়ের ঘাড়ে ফেলে? তার পরে আবার

সে কাজের সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনাও করছে। প্রমাণ করার জন্য শুধুমি খুলে একটা বই থেকে খানিকটা আওড়ে দিলে। যুদ্ধ শেষ হ'তে বেশী দেরি নেই, শীগ্‌গির ফিরে আসবে পোলেরা আর তাদের সঙ্গে মিত্রপক্ষ। আর—আর তারপরে মা দেখবেন ইয়ানেক কেমন করে চলে যায় ক্র্যাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর সেখান থেকে অক্সফোর্ডে। ইয়ানেক হেসে মাকে আদর করে বললে, "কিন্তু এখন আনন্দ করবার সময় নেই। এখন খালি কাজ আর কাজ।"

ইয়ানেক ক্রমেই একজন পাকা ব্যবসায়ী হয়ে উঠছে।

ওয়ারস'র শ্রমিক ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশে ইতিমধ্যেই আইনকে বেশ ফাঁকি দিতে সুরু করেছে। সে আজকাল ক্র্যাকাও যাচ্ছে তড্‌কার জন্য, লুবলিনে তামাক-পাতার খোঁজে; এর মধ্যেই জিনিষপত্র বাছাই ব্যাপারে বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। মাল কিনবার ফাঁকে সে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে মাল চালান নিয়ে আসে। সে জানে একবার কোন রকমে ডেবলিন পার হতে পারলেই, তার মাল দুনো লাভে বিক্রী হবে। জার্মানগুলোর ঐখানেই খানাতল্লাসীর যত কড়াকড়ি। ট্রেনের কামরাগুলোতে ত বটেই, মায় যাত্রীদের কাপড়-জামা খুলে দেখতেও কসুর করে না।

কখনো কখনো ইয়ানেকেরও দুর্দিন আসে। সেদিন যখন সে ঘরে ফেরে, তার চোখের কোণে কালি, ভারি মুখ, সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন—রুক্ষ মেজাজ থাকে ঠিক রাত্রির মত থমথমে। তবে এ রকম ঘটে কদাচিৎ।

কিছু দিনের মধ্যেই মিসেস ওয়াণ্ডা, তাঁর ছেলের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সন্দেহাকুল হয়ে উঠলেন। কেন না ছেলেরা এ বয়সে করতে পারে না এমন কাজ নেই। বিশেষ করে তাঁর ছেলে নানা ধরণের লোকের সঙ্গে মিশছে, আইনকে ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করছে, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে; মার কেবলই আশঙ্কা পাছে ছেলে কুসঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে যায়।

বহু দিন ধরেই ইয়ানেক্ সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সময়মত বাড়ীতে ফিরছিল, কিন্তু মা লক্ষ্য করতে লাগলেন গত কয়েক দিন যাবৎ আবার সে গোলমাল করছে—প্রায়ই আটটায় কারফিউর ঘণ্টা পড়ে গেলে তবে সে বাড়ী ফেরে। গ্রীষ্মকালে কারফিউর সময় যখন ছিল এগারটা তখন সে ফিরত এগারটার পরে। কোন কোন রাতে হয়তো ফিরলই না। মা জানতেন কাজ উপলক্ষে শহরের বাইরে যাবার প্রয়োজন তার নেই। আর যখন সত্যি সত্যি প্রয়োজন হ'ত তখন প্রতিবারেই সে মাকে জানিয়ে যেত, সাবধান করে যেত যে রাতে সে বাড়ী ফিরবে না; কিন্তু কি যে করবে সে সম্বন্ধে কোন রকম উচ্চবাচ্য করত না।

এক দিন সন্ধ্যায় হঠাৎ ইয়ানেক্ ফিরে এল কি রকম একটা মানসিক বিপর্য্যস্ত অবস্থায়। আড়চোখে একবার মায়ের দিকে চেয়ে সে আনমনে সারা ঘরে পায়চারি করতে সুরু করলে। হাঁটছে, আর মাঝে মাঝে স্পোর্টস্ জ্যাকেটের পকেটটা হাঁটকাচ্ছে। শুতে যাবার আগে জামা কাপড়গুলো যথারীতি একটা চেয়ারের উপর খুলে রাখলে, কিন্তু চেয়ারটা টেনে একেবারে বিছানার পাশে নিয়ে এল। তার পর মা কাগজপত্র নাড়াচাড়ার খসখসানি শব্দ শুনতে পেলেন।

আমার কাছ থেকে ও কি যেন লুকোচ্ছে—তিনি ভাবলেন। মায়ের মন স্বভাবতই ব্যথাতুর হয়ে উঠল। প্রথমে সন্দেহ, তার পরেই সেটা অভিমানে রূপান্তরিত হয়ে অশ্রুরূপে ঝরে পড়তে লাগল।

সন্তানের অশুভ আশঙ্কায় মায়ের মন সর্ব্বদাই ক্লিষ্ট থাকে, কিন্তু মিসেস ওয়াণ্ডা তো কেবল অলীক কল্পনা নিয়েই থাকেন নি। এ কথা একান্ত সত্য যে জার্ম্মানরা ঢোকবার পর থেকেই ওয়ারস'র স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ধ্বংস হয়ে গেছে। সংসার ভেঙে গেছে, অগণিত গৃহহারা নরনারী পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তরুণেরা অভিভাবকহীন, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে ছিটকে পড়েছে। স্কুল-কলেজ নেই—পথে ঘাটে জিনিষপত্র কেনা-বেচা চলে, তার ওপরে নানা রকম দলবলের কথাও লোকের মুখে শোনা যায়। মিসেস ওয়াণ্ডার কানেও ত কত কথাই এসেছে, তাই একমাত্র সন্তানের জন্য তাঁর এত ভয়।

ইয়ানেক্ ঘুমিয়ে পড়লে মা টেবিলের পাশের আলোটার এক দিক আড়াল করে সেলাই নিয়ে বসলেন। ঘুম কিছুতেই আসছে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল, মা স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। মনের মধ্যে কে যেন অবিরাম ফিস্ ফিস্ ক'রে বল্‌তে লাগল, তোমার ছেলে কি করতে চায় খুঁজে বার করো, তুমি মা, তোমার ছেলে কি করছে তোমার জানবার অধিকার আছে।

মা প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন নিজেকে দমন করতে। এত কাল স্বামী বা ছেলের কোন কাজের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা বা সে সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর নেওয়াকে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল মনে করতেন। পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও নির্ভরতাকেই তিনি স্বামী-স্ত্রী, মা-ছেলের মধ্যে একমাত্র সম্বন্ধ বলে জানতেন। কিন্তু এখন পরম দুঃসময়, হয় ত তাঁর সন্তানের সামনে সমূহ বিপদ, তিনি মা—তাঁকে একটা কিছু প্রতিকার করতেই হবে।

ধীরে ধীরে তিনি উঠলেন, অনিচ্ছুক পদক্ষেপে সন্তানের শিয়রে গিয়ে দাঁড়ালেন। কম্বল মুড়ি দিয়ে ছেলে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। মা নিঃশব্দে ইয়ানেকের কোটের পকেটে হাত দিলেন, কম্পমান আঙুল দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে ঠাণ্ডা বাঁকা একটা কাঠের হাতল হাতে ঠেকল। হাতলটার মাথায় একটা ছোট্ট স্প্রিং। অজানা আশঙ্কায় তাঁর সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। তার পর কাগজের গোছাটা ধরলেন।

মনের মধ্যে কে যেন চুপি চুপি বলে চলেছে—যাই ঘটুক না কেন তোমাকে জান্‌তেই হবে ব্যাপারটা কি? কাঠের হাতলটা তিনি শক্ত করে চেপে ধরলেন…। কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে টেবিলের কাছে এসে জিনিষটা খুলে দেখলেন। প্রদীপের আলোয় ঝক্ ঝক্ ক'রে উঠল একটা কোল্ট রিভলবার আর এক তাড়া কাগজ। আতঙ্কে মায়ের শরীরের সমস্ত শক্তি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্ত তিনি আচ্ছন্নের মত বসে রইলেন। অবসাদগ্রস্ত মন কোন রকম চিন্তা করতেও চাইলে না। টেবিলের ওপর হলুদ রঙের কাগজের তাড়াটার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল আর কম্পিত আঙুলগুলো দড়ির বাঁধন খুলতে চেষ্টা করে চলল। অতি ধীরে ধীরে তাঁর মানসিক জড়তা একটু একটু করে কমে আসতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে ময়লা শক্ত কাগজের ওপরকার লেখাগুলো ফুটে উঠতে লাগল :—

"পোল্যাণ্ড মরে নি!"—পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকামীদের মুখপত্র (সাপ্তাহিক)।

ভোরের আলো না ফোটা পর্য্যন্ত মা সেই ছাপা লাইনগুলোর সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন—কালো কালো অক্ষরগুলো যেন তাঁর চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে। বার বার করে লেখাটা পড়ছেন, কিন্তু তার অর্থের কোন পরিবর্ত্তন ঘটছে না। ঠোঁট দুটি চুপিচুপি অস্পষ্টস্বরে উচ্চারণ করছে, প্রথম লাইনক'টাতেই দৃষ্টিটা আটকে রয়েছে।…সেদিন সকালে ইয়ানেকের যখন ঘুম ভাঙল তখন সে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে না মায়ের বুকের মাঝে কতবড় গোপন কথা চাপা রয়েছে।

…ইয়ানেককে আমি বহুদিন ধরেই জানতাম, সে ছিল আমার ছাত্র। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরের পরে তার সঙ্গে বহুবার আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, নানা কারণে নানা পারিপার্শ্বিকে। তাকে আমার ভারি ভাল লাগত। আমাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল।

বেআইনী খবরের কাগজ বিতরণকারী বলে তার মনে বেশ একটা গর্ব্ব ছিল—বিশেষ করে যখন একটা কোল্ট রিভলবার সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করত। আমার সাবধানবাণী শুনে সামান্ত একটু হাসত মাত্র। আমি যখন বলতাম যে সৈনিক-জীবনে সাবধানতাই হচ্ছে সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা, তখন সে কোল্টটাকে নিয়ে স্নেহভরে একটু নাড়াচাড়া করে বলত সে ভীতু নয় আর এটা সঙ্গে থাকতে ধরা সে কিছুতেই পড়বে না। সে নেহাত শিশু নয়।

তবুও এই নীলচোখ লম্বা সুশ্রী ছেলেটিকে দেখলে নিতান্ত শিশু বলেই মনে হ'ত। শিশুর মতই সরল অকপট বিশ্বাসে সে সবকিছুকে গ্রহণ করত। তার দেশবাসী যে আসন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়যুক্ত হবেই তাতে তার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। তার দৃঢ় বিশ্বাসের কাছে আমি নিজেও কত সময় হেরে গিয়েছি। ওর সঙ্গে এসব কথা নিয়ে আলোচনা করার পর ওর বিশ্বাসের শক্তি যেন আমার প্রাণেও সঞ্চারিত হয়ে যেত, নববলে নূতন উদ্যমে আমি সঞ্জীবিত হয়ে উঠতাম।

সবকিছুর ভেতরেই সে আশার আলো দেখতে পেত; যেখানে মিত্রপক্ষ চরম পরাজয়কে বরণ করে নিত সেখানে ভাবত মিত্রপক্ষ শত্রুদের জন্তে জাল পাতছে মাত্র। ওর নিকট খারাপ কিছু নেই। ক্ষমতা থাকলে সিকরেস্কির নামের আগে ও নিশ্চয়ই 'সেণ্ট' বসাত। পোলিশ কমাণ্ডার-ইন-চীফের মতলবের খুঁটিনাটি সব ওর জানা, যেন ও তাঁর সহকারী। পোল্যাণ্ডের সৈন্তরা কোথায় কোথায় যুদ্ধ করছে, রেজিমেণ্ট সংখ্যা কত, তাদের জয় আর বিশেষ করে পোলিশ নৌসেনা ও বিমানবহরের কথা সব ওর কণ্ঠস্থ।

আমি যদি কখনো ওর সংবাদের সত্যতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেছি ত, ও তখুনি একজন কড়া ভূগোলের মাষ্টারের মত বলত—একখানা মানচিত্র কিনুন, কিন্তু পৃথিবীর মানচিত্র হওয়া চাই বুঝলেন। একখানা পৃথিবীর মানচিত্র—তা হলেই বুঝতে পারবেন আমাদের সৈন্তরা কোথায় কি করছে। ব্যস্, একদিন চা খেতে খেতে ইয়ানেক ফিস্ ফিস্ করে আমাকে বললে, আমার মনে হয় আপনি আমাদের মিত্রপক্ষীয় কাউকে কখনও দেখেন নি, না? যেন ও নিজে কত জনকে দেখেছে!

বসন্তের প্রথম দিকে এক দিন যে ব্যাপারটা ঘটল, তার স্মৃতি আজও আমার মনে জ্বলজ্বল করছে। মনে হচ্ছে এই তো সবে সেদিনের কথা। সূর্য্য উঠেছে, ভাঙা বাড়ীগুলোর জানালার সার্শিতে ধাক্কা খেয়ে সূর্য্যের আলো চারদিকে ঠিকরে পড়ছে, বরফ গলতে সুরু করেছে। রাস্তার দু'পাশে গাছগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে, রুক্ষ নিষ্পত্র ডালপালায় ঠিক ভিক্ষুকের মত রিক্ত। এক ঝাঁক চড়ুই পাখী ডালে ডালে কিচিরমিচির করে বেড়াচ্ছে। কুয়াশা কেটে গেছে, মানুষগুলোকেও অনেকটা সজীব দেখাচ্ছে, তাদের চলাফেরায় যেন একটু প্রাণসঞ্চার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। শীতের চেয়ে খারাপ সময় আর কি আছে!

আমি তখন পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম ইয়ানেকের সঙ্গে দেখা করতে, রেল-ষ্টেশনের কাছে একটা নির্জ্জন কফিখানায় আমাদের দেখা হবার কথা। কতকগুলো বেআইনী খবরের কাগজ নিয়ে আমাকে প্রদেশের বাইরে চলে যেতে হবে। সব বন্দোবস্ত করা ছিল, কেবলমাত্র ইয়ানেকের কাছ থেকে আমাকে জিনিষগুলো সংগ্রহ করে নিতে হবে।

হঠাৎ রাস্তায় গুলির শব্দ শোনা গেল। পথচারীরা সকলে ছুটল দোকান বা অন্ত কোথাও আশ্রয় নিতে। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তা একেবারে ফাঁকা। নিশ্চয় কোন অঞ্চল ঘেরাও করে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, অথবা আমাদের শহরের নব আগন্তুকদের রঙীন নেশায় কোন একটা খেয়াল।

গভীর দুশ্চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলে। আমার অন্তর বলে দিলে কোন মানুষকে গুলি করা হ'ল। আমি জোরে পা চালালাম, অবশেষে প্রায় এক রকম ছুটতে ছুটতেই কফিখানার কাছে পৌঁছলাম। সেখানে ইতিমধ্যেই বেশ ভিড় জমে গেছে। ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে চিৎকার, আদেশ—জার্মান পুলিশও চোখে পড়ল।

আমি সোজা ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। জার্মান পুলিসকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি এখানে? গোলমাল কিসের?' বর্ব্বরটা একটা হাত দিয়ে মাটির দিকে ইঙ্গিত করে জার্মান ভাষায় জবাব দিলে, 'দেখ, এই হতভাগাটাকে দেখ।'

সিঁড়ির উপরে লম্বা হয়ে পড়ে আছে ইয়ানেকের দেহ। কাগজপত্রগুলো কাদায় মাখামাখি, এক হাতে শক্ত করে ধরা রয়েছে কোল্ট রিভলবারটা। পা দুটো থর থর করে কাঁপছে, মাথা থেকে রক্তের ধারায় মুখচোখ ভেসে যাচ্ছে। খুব অস্পষ্ট স্বরে ঠোঁট দুটো যেন কি উচ্চারণ করছে, মুখের দু'পাশে ফেনা, চোখের তারা স্থির।

মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মাথার লাল দাগটার ওপর আস্তে আস্তে হাত রেখে ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগলাম, ইয়ানেক বল, কি করে এ ঘটল, বল ইয়ানেক,...ইয়ানেক।

উঠে এস—একটা জার্মান সান্ত্রী চিৎকার করে উঠল।

আমি লাফিয়ে উঠলাম, ঠিক যেন একটা কুকুরকে কেউ লাঠি দিয়ে খোঁচা মেরেছে। তীক্ষ্ণ চিৎকারটা যেন আমার কান কেটে কেটে বসে যাচ্ছে। উঠে আস্তে আস্তে জনতার ভিড়ে মিশে গেলাম। আমি যেন আর সে মানুষ নই। কিছু ভাবতে পারছি না, কিছু বুঝতেও পারছি না। দেহটাকে কোনমতে টানতে টানতে লক্ষ্যহীন ভাবে পথ চলতে লাগলাম—চলৎ-শক্তিহীন একজন বধিরের মত। আমার আর কোন প্রয়োজন নেই, কারুর সঙ্গে দেখা করতে হবে না।

মিসেস ওয়াণ্ডা হয়তো তাঁর ছেলের অপেক্ষায় রাত জেগে বসে আছেন।*

* Majewski-র *Yanek the Distributor*-এর অনুবাদ

সত্য চেয়ে বড়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

কাঠবেড়ালেতে সাগর বেঁধেছে রামায়ণে লেখা নাই
তাতে কিবা আসে যায়?
কে বা তা দেখিতে চায়?
চিরদিন ধরে আমরা সবাই বিশ্বাস করি তাই।

২

রামের হাতের ছাপ গায়ে তার—আদরের ছাপ আহা,
এখনো মুছেনি কই?
হাসি—বিস্মিত হই
রামচন্দ্রের সোহাগের বিনা কেমনে মুছিবে তাহা?

৩

হয় ত অজানা সদয় হৃদয় ভক্ত বা কোনো কবি
রয়েছে এ কথা তাই,
সন্দেহ তাতে নাই
ক্ষুদ্র মহতে এক করে—এক এঁকেছে মধুর ছবি।

৪

বিরাট সাগরবন্ধন কোথা? কোথা দুর্ব্বল প্রাণী?
আকাঙ্ক্ষা তার কত—
আপন সাধ্যমত,
পুষ্ট করেছে পরিকল্পনা ক্ষীণ সাহায্য দানি।

৫

ক্ষুদ্র হ'লেও মহাপুরুষের লভেছে আশীর্ব্বাদ,
পেয়েছে আদর তার,
বাকি পেতে কিবা আর?
অমৃতোৎসবে পংক্তিভোজনে সেও পড়ে নাই বাদ।

৬

যুগের যুগের বালক-বালিকা ওই কাহিনীর লাগি
কাঠবিড়ালের প্রতি
সদয় সকলে অতি,
রামের হাতের ছাপ খুঁজে দেখে শিশু হিয়া অনুরাগী।

৭

হয় ত নেহাত কল্পনা উহা—সত্য নাহিক কিছু,
তবু বিশ্বাস করি,
তবু সুখ পাই স্মরি
জীবে দয়া নামে রুচিবান তাঁর—পদে মাথা করি নীচু।

৮

মানুষকে যাহা মহত্বে লয়—ভগবানে করে প্রিয়,
সে কাহিনী রচে যারা
কবি ও সাধক তারা
তাঁরা যা বলেন সত্যের চেয়ে বড় বেশী বরণীয়।

বাল্য-প্রতিভা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জগতের বিস্ময়জনক সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্যে মানবজাতি বুদ্ধিবলে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু মানুষে মানুষেও বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য পরিগ্রহ করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। পৃথিবীর নানাদেশীয় সভ্যসমাজে যুগে যুগে এক একজন অসাধারণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্ভুত প্রতিভাদ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষেও অতি প্রাচীনকাল হইতে বহু মহাপুরুষের উদ্ভব হইয়াছে যাঁহাদের প্রতিভার বিচিত্র স্ফূর্ত্তি অতিশৈশবেই ঘটিয়াছিল। পৌরাণিক যুগে অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি "শিশু" কালেই অধ্যাপনা আরম্ভ করেন—ছাত্রদের মধ্যে পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র প্রভৃতি বয়স্ক আত্মীয়গণকেও "পুত্রকাঃ" বলিয়া সম্বোধন করায় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদের নিকট অনুযোগ করেন; দেবতারা একবাক্যে বলিলেন, "শিশু ঠিকই সম্বোধন করিয়াছে" (মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ১৫১-২ শ্লোক)। শিশু-প্রতিভার চূড়ান্ত উদাহরণ সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাবক্র মুনি। তিনি মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই সামবেদ ও সমস্ত শাস্ত্র পিতার পাঠ শুনিয়া শিখিয়া ফেলেন এবং এক দিন মাতৃগর্ভ হইতেই অধ্যয়নরত পিতাকে মাতার প্রতি উপেক্ষাভাবের জন্য ভর্ৎসনা করিতে যাওয়ায় পিতার অভিসম্পাতে অষ্টবক্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হন। দশ বৎসর বয়সে জনক রাজার যজ্ঞসভায় অষ্টাবক্রের বিস্ময়জনক বাগ্বিজয় বৃত্তান্ত মহাভারতে পাওয়া যায় (বনপর্ব্ব, ১৩২-৪ অধ্যায়)। রাজা এক স্থানে তাঁহাকে "দেবসত্ব" বলিয়া সম্বোধন করেন।

ঐতিহাসিক যুগে শিশু-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ শঙ্করাচার্য্য। আনন্দলহরীর ৭৬ শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, ভগবতীর স্তন্যপান করিয়া "দ্রবিড়শিশু" অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি লাভ করেন। টীকাকারদের মতে এই দ্রবিড়শিশু স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য। কৈবল্যাশ্রমযতি-রচিত "সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী" টীকা হইতে এই "চিরন্তনাখ্যানে"র সারাংশ উদ্ধৃত হইল। শঙ্করাচার্য্যের পরমেশ্বরীভক্ত পিতা প্রতিদিন গ্রামের বাহিরে এক মন্দিরে যাইয়া দুগ্ধদ্বারা দেবীকে স্নান করাইয়া পূজা সারিয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সহচর পুত্রকে খাইতে দিতেন। পুত্রের মনে হইত, দেবী স্বয়ংই দুগ্ধ পান করেন, পীতাবশিষ্ট দুগ্ধ পিতা তাঁহাকে দেন। এক দিন পিতার অনুপস্থিতিতে অশক্ত মাতার নির্দ্দেশে বালক শঙ্করই দুগ্ধ লইয়া মন্দিরে যান এবং ভগবতীর সম্মুখে রাখিয়া বলেন, "খাও।" বিলম্ব দেখিয়া বালক কাঁদিয়া উঠিলে ভগবতী দয়াবশতঃ আবির্ভূত হইয়া দুগ্ধ সবটা পান করেন। পরে পাত্র শূন্য দেখিয়া বালক আবার কাঁদিয়া উঠিলে ভগবতী স্বয়ং কোলে লইয়া তাঁহাকে স্তন্যদান করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাতে সর্ব্ববিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয় ("ততো জগদম্বিকায়াঃ স্তন্যপানেন সর্ব্ববিদ্যা তদানীমেব স্ফূর্ত্তিকাং জাতা"—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৪০৭ সংখ্যক সংস্কৃত পুথির ৭৪-৫ পত্র দ্রষ্টব্য)।

বাংলাদেশেও যুগে যুগে এইরূপ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন "দেবাংশ" মহাপুরুষ (prodigy) আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতেছে। জাতীয় জীবনে অসামান্য প্রতিভার সমুচিত স্মৃতিরক্ষা হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ৭ জন বাঙ্গালী দেবাংশের বিবরণ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিতেছি। আশা করি অভিজ্ঞ মনীষিগণ এই জাতীয় বহুতর প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির নামোদ্ধার করিয়া বাঙ্গালীর পূর্ব্বতন গৌরবোজ্জ্বল চিত্র আবার নূতন করিয়া প্রকাশ করিবেন।

১। রঘুনাথ শিরোমণি (খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দী)

রঘুনাথের কিম্বদন্তীমূলক জীবনীর ঘটনা বাংলা-সাহিত্যে অনেকটা প্রচারলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তাঁহার কথা এখনও গবেষিত হয় নাই। অথচ বিগত সহস্র বৎসর মধ্যে বাংলাদেশে রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় ভাগ্যবান্ মহাপণ্ডিত আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই; কারণ, তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "অনুমানদীধিতি" অদ্য ৪০০ বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র—আসাম হইতে গুজরাট এবং কাশ্মীর হইতে কোচীন পর্য্যন্ত—ভারতীয় দর্শনের উচ্চতম বিদ্যায়তন-সমূহে দুরূহতম আকরগ্রন্থরূপে প্রতিভাশালী ছাত্রের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা পরিমাপ করিয়া আসিতেছে। ইংরেজ-অধিকারের প্রারম্ভকালেও ক্ষুরধার বুদ্ধির এই বিচিত্র বিলাসের মূল উৎস নবদ্বীপে অধিষ্ঠিত ছিল—কবি ভারতচন্দ্রের ভাষায় নবদ্বীপ তখন "ভারতীর রাজধানী, ক্ষিতির প্রদীপ"। শিরোমণির "দিক্-দীপিকা" দীধিতিগ্রন্থই এই সারস্বত উৎসের পরম উপাদান। শিরোমণির বিষয়ে বহুতথ্য অন্যত্র লিখিয়াছি (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৯, পৃ. ১১৭-২৬; ১৩৫০, পৃ. ৬-১৬; ১৩৫৩, পৃ. ১-৩)। তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শূলপাণির দৌহিত্র ছিলেন, মহাপ্রভুর এক পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এবং একমাত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। তিনি অধ্যয়নার্থ মিথিলায় যান নাই এবং মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী ছিলেন না। তাঁহার এক চক্ষু নষ্ট ছিল।

তাঁহার বাল্যপ্রতিভার নিদর্শন তিনটি উপাখ্যানে চির-প্রসিদ্ধ আছে। (১) নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলের নিকটে (শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়ের) বিধবা কন্যা ভগবতী পাঁচ বৎসরের শিশু লইয়া বাস করিত—সার্ব্বভৌম তাঁহাকে "ভগ্নী" বলিয়া ডাকিতেন। এক দিন ভাত সিদ্ধ করিবার জন্য

শিশুকে চৌলে আগুন আনিতে পাঠাইল। সার্ব্বভৌমের এক ছাত্র এক হাতা আগুন লইয়া বলিলেন—"ধর্, ধর্, হাত পেতে আগুন নে।" শিশু ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া এক অঞ্জলি ধুলা লইয়া আগুন লইল। বালকের বুদ্ধিমত্তা দূর হইতে সার্ব্বভৌম দেখিয়াছিলেন এবং সত্বর ভগবতীর নিকট আসিয়া বলিলেন—"ভগী, ভগী, তোর এই ছেলেটি আমায় দে।" বালকের মাতা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

(২) ভারতপ্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম বালকের বিদ্যারম্ভ করিতে গিয়া মহাবিপদে পড়িলেন। 'ক' আগে না বলিয়া 'খ' আগে বলিলে কি দোষ হয়, দুইটি 'ন' কেন, তিনটি 'স' কেন প্রভৃতি প্রশ্নদ্বারা বালক তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অর্থাৎ বালককে ক, খ শিখাইতে গিয়া সমগ্র ব্যাকরণই সংক্ষেপে শিখাইতে হইয়াছিল। এই বালকই রঘুনাথ শিরোমণি।

(৩) অতি অল্প বয়সেই রঘুনাথ পাঠ সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং অবিলম্বে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক বলিয়া পরিচিত হন। এই সময়ে মিথিলার সুবিখ্যাত পক্ষধর মিশ্র দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া নানাদেশ জয় করিয়া দিগ্বিজয়ী রাজার মত হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি পরিজনবর্গসহ নবদ্বীপে আবির্ভূত হন এবং বাংলার প্রধান পণ্ডিতের সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ কাণা রঘুনাথকেই প্রধান বলিয়া উপস্থিত করিলে পক্ষধর মিশ্র বলিয়া উঠেন—"অক্ষ্ণাং গৌড়দেশস্থ অত্র কাণঃ শিরোমণিঃ।" বিচারের বিষয় ছিল "সামান্যলক্ষণা" নামক ন্যায়শাস্ত্রসম্মত অলৌকিক সন্নিকর্ষ। রঘুনাথ চিরন্তন পক্ষ বর্জন পূর্ব্বক "সামান্যলক্ষণা" অস্বীকার করিয়াই তত্তৎস্থলের উপপত্তি দেখাইয়া পক্ষধর মিশ্রকে নিরুত্তর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বিচারকালে উভয়ের মধ্যে যে কথা-কাটাকাটি হইয়াছিল তন্মধ্যে পরাজিত পক্ষধরের একটি ক্রোধব্যঞ্জক শ্লোক বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে :—

বক্ষোজপানকৃৎ কাণ ! সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটং ।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে ॥

(পক্ষেপের মতে সামান্যলক্ষণা ছাড়া ধূমাদিতে ব্যভিচার সংশয় হয় না। সামান্যলক্ষণা প্রকরণের দীধিতি গ্রন্থে "অত্র বদন্তি" কল্পে বস্তুতই শিরোমণি মৌলিকভাবে সামান্যলক্ষণা ছাড়াও সংশয়ের উপপত্তি করিয়াছেন। বুঝা যায়, এই বিচারের সারাংশ পরে দীধিতিগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।) শ্লোকে শিরোমণিকে 'কাণ' ও 'বক্ষোজপানকৃৎ' (অর্থাৎ দুগ্ধপোষ্য শিশু) বলিয়া আঘাত করা হয়। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিচারের ফলে মিথিলার প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া নবদ্বীপই নব্যন্যায়চর্চ্চার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হইয়া পড়ে। ইহা প্রায় ১৪৮০-৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা—তৎকালে পক্ষধর মিশ্র প্রবীণ ও ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। মতান্তরে, এই বিচার মিথিলাতেই ঘটিয়াছিল, শিরোমণি গৌড় হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে শিরোমণির কৃতিত্বপূর্ণ মিথিলাজয় প্রায় সহস্র বৎসর মধ্যে এক অসামান্য ঘটনা। দুঃখের বিষয় এই মহাপুরুষের জীবনকথা ও স্মৃতি অদ্যাবধি সমুচিত আদরসহকারে আলোচিত হয় নাই।

২। কবিকর্ণপুর (১৫২৬-৭৬+খ্রীঃ)

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্যের বহু অকাট্য নিদর্শন বিদ্যমান আছে। কবিকর্ণপুরের শৈশবকালে অদ্ভুত কবিত্বশক্তির সঞ্চার এইরূপ একটি বিস্ময়কর অথচ প্রমাণসিদ্ধ ঘটনা। দুঃখের বিষয়, মহাপ্রভুর ভক্তগণ এইরূপ প্রামাণিক ঘটনার যথোচিত চর্চ্চা না করিয়া শিরোমণির সহাধ্যয়নাদি অবাস্তব এবং কল্পিত বস্তু অবলম্বন করিয়া তাঁহার পবিত্র চরিত-কথা কলঙ্কিত করিয়া তুলিতেছেন। পরমানন্দদাস কবিকর্ণপুর কাঞ্চনপল্লী নিবাসী সুবিখ্যাত চৈতন্যপার্ষদ সেন বংশীয় শিবানন্দের তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র। সাত বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি পিতার সহিত পুরীধামে গিয়া মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের পরেই তৎকালে বালকের মুখ হইতে মধুর রসাত্মক আর্য্যাচ্ছন্দের শ্লোক নির্গত হয়। চরিতকারগণ একটি শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম ।
বৃন্দাবন-রমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

সাত বৎসরের শিশু, নাহিক অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে, লোক চমৎকার মন ॥
চৈতন্য প্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মাদিদেব যার নাহি পায় সীমা ॥ (চৈতন্যচরিতামৃত,
অন্ত্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া এই বৈজ্ঞানিক যুগে উপেক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা যে অতিরঞ্জিত নহে এবং অনধিক সাত বৎসর বয়সেই যে মহাপ্রভুর কৃপায় কবিকর্ণপুর কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহার বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ বিদ্যমান আছে। কবিকর্ণপুর স্বয়ং "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকের শেষে লিখিয়াছেন :—

যস্যোচ্ছিষ্টপ্রসাদাদয়মজনি মম প্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী, ইত্যাদি।

সুতরাং নিজের উক্তি অনুসারেই কবিকর্ণপুরের কবিত্বশক্তি বিনা অধ্যয়নে স্ফুরিত হইয়াছিল। এই ঘটনা ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধেই সংঘটিত হইয়াছিল। উল্লিখিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের দশমাঙ্কের ঘটনাবলীর মধ্যে শিবানন্দের ছোট ছেলের সম্বন্ধে মহাপ্রভুর প্রতি শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্তের উক্তিতে পাওয়া যায়—"কনীয়াংস্তু যঃ সোঽদৃষ্টশ্রীচরণঃ"। অর্থাৎ শিবানন্দের প্রথম দুই পুত্রকে তিনি পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলেন ("তৌ দৃষ্টপূর্ব্বৌ"), কিন্তু ছোট ছেলেকে এই

প্রথম দেখিলেন। দশমাঙ্কে যে বৎসরের ঘটনাবলী চিত্রিত হইয়াছে রাজা প্রতাপরুদ্রের একটি শ্লোক হইতে জানা যায় সে বৎসর "মহাজ্যৈষ্ঠী" নামক অতি দুর্লভ এক পুণ্যযোগ সংঘটিত হইয়াছিল :—

"রাজা—পশ্য, পশ্য, মহদিদমাশ্চর্য্যং,
মহাজ্যৈষ্ঠীযোগে ভবতি ভগবদ্দেবকুলজা,
পতাকোদঞ্চদ্দীপ্ত্যাতিসুবিদিতোয়ং জনরবঃ।"

অর্থাৎ ঐ যোগে পুরীর মন্দিরে পতাকা উড্ডীয়মান হয়। কারণ স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে এই পুণ্যতিথি পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই বিশেষভাবে পালনীয়। মৈথিল বাচস্পতিমিশ্রের "কৃত্যচিন্তামণি" গ্রন্থে পাওয়া যায় :—(কাশী সং, ১৮১৪ শক, পৃ. ৮)

মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং নরো দৃষ্ট্বা প্রযতঃ পুরুষোত্তমং।
"উর্দ্ধ্বধ্বজাংশুকং" সর্ব্বান্ পিতৃংস্তারয়তে ধ্রুবম্॥

বুঝা যায় শিবানন্দ সেন এই মহাযোগ উপলক্ষেই তিন পুত্রকে সঙ্গে করিয়া পুরী গিয়াছিলেন। মহাজ্যৈষ্ঠী-পদের নানারকম ব্যাখ্যা আছে। অন্যতর ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর পুরী-অবস্থানকালে দুই বার মাত্র মহাজ্যৈষ্ঠীযোগ গণনা দ্বারা পাওয়া যায়—২১ মে ১৫২১ (২৪ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, পূর্ণিমাতিথি, জ্যেষ্ঠানক্ষত্র, রবি রোহিণী নক্ষত্রে এবং বৃহস্পতি মূলানক্ষত্রে) এবং ১৮ মে ১৫৩২ খ্রীঃ (২১ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, পূর্ণিমা, অনুরাধা নক্ষত্র, রবি রোহিণীতে এবং বৃহস্পতি অনুরাধায়)। তন্মধ্যে ১৫২১ সন বর্ত্তমানস্থলে গ্রহণীয় নহে। কারণ, উক্ত নাটকের দশমাঙ্কে মহাপ্রভুর তিরোধানের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা চিত্রিত হইয়াছে। ১৫৩২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে কবিকর্ণপূরের ৭ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার জন্মাব্দ হয় ঠিক ১৫২৬ সন। ইহার সমর্থক প্রমাণান্তর পরে লিখিত হইতেছে।

সম্প্রতি নবদ্বীপের হরিবোলকুটীর হইতে "শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরবগ্রন্থগুচ্ছে" কবিকর্ণপূরের "আর্য্যাশতক" খণ্ডিত পুথিদৃষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে (৪৬১ গৌরাব্দ, ১০-১১৯ শ্লোক)। এই বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের লুপ্তাংশ হইতেই পূর্ব্বোদ্ধৃত মনোহর শ্লোকটি উদ্ধৃত বলিয়া অনুমিত হয়। সাত বৎসরের শিশুর রচনা বলিয়া এই গ্রন্থের প্রচারে জগতের যে কোন সভ্যসমাজে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিত। মহাপ্রভুর জন্মভূমিতে মহাপ্রভুর অলৌকিক মহিমার এই অভিনব নিদর্শন কয়জনের চিত্ত আলোড়িত করিয়াছে, আজ বন্ধনমুক্ত দেশের সাহিত্যিকগণ গণনা করিয়া বিশ্লেষণ করুন।

কবিকর্ণপূর "চৈতন্যচরিতামৃত" নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিংশ-সর্গাত্মক সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেন। ইহার রচনাকাল, "বেদা রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে, শাকে…" অর্থাৎ ১৪৬৪ শক (১৫৪২ খ্রীঃ) গ্রন্থশেষে লিখিত আছে। ইহা বহু পূর্ব্বেই মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে কবিকর্ণপূর রচনা করেন, এরূপ প্রমাণ আছে এবং গ্রন্থরচনার মাত্র ৩ বৎসর পরে রূপ গোস্বামী স্বহস্তে ইহার অনুলিপি করিয়াছিলেন। এই মূল্যবান তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংগৃহীত একটি প্রতিলিপির শেষে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার সমাপ্তি বাক্য—"সমাপ্তমিদং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতং কাব্যমিতি। শকাব্দা ১৪৬৪। আষাঢ়কৃষ্ণদ্বিতীয়া সোমবারে।" তৎপর রূপগোস্বামীর শিষ্য বিষ্ণুদাস গোস্বামী-বিরচিত ৪টি শ্লোক আছে। তৃতীয় শ্লোকটি এই :—

চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমদ্ভুতাভৈ"র্ব্যষ্টাব্দিকৈ"-র্বিরচিতং
কবিকর্ণপূরৈঃ।
রূপাখ্যমৎপ্রভুবরৈঃ স্বকরাম্বুজাতৈঃ শাকে হরর্ত্তুভুবনে
লিখিতং পুরা যৎ॥

(অর্থাৎ চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য অদ্ভুতচরিত্র ষোড়শবয়স্ক কবি-কর্ণপূরকর্ত্তৃক রচিত। মৎ-প্রভু রূপগোস্বামী ১৪৬৭ শকে ইহা পূর্ব্বে স্বকীয় করকমলাগ্রে লিখিয়া লইয়াছিলেন)। 'ব্যষ্টাব্দিক'-শব্দে বহুব্রীহি সমাস দ্বারা ১০ কিম্বা ১৬ বুঝায়, ২৮ নহে। ২৮ হইলে "অদ্ভুতাভ" পদের সার্থকতা থাকে না। গ্রন্থ মধ্যেও এক স্থলে ব্যষ্টাব্দিক শব্দ ১৬ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদনুসারেও কর্ণপূরের জন্মসন হয় ১৫২৬ খ্রীঃ। ১৬ বৎসরের বালক-রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য বিশ্বসাহিত্যের এক আশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত এবং তন্নিমিত্ত রূপগোস্বামী বার্দ্ধক্যে স্বয়ং অনুলিপি করিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কর্ণ-পূরের অন্যান্য গ্রন্থ প্রবন্ধে আলোচিত হইল না।

৩। রাঘবেন্দ্র শতাবধান ভট্টাচার্য্য—(খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দী)

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য রচিত "বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী" সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য ৮ তরঙ্গে সমাপ্ত। ইহার প্রথম তরঙ্গে গ্রন্থকার স্ববংশের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পিতা "মহাপুরুষ" রাঘবেন্দ্রের কীর্ত্তিকথার সারাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। রাঘবেন্দ্র তিন ভাইয়ের মধ্যে গুণোত্তর ও লক্ষণযুত ছিলেন। তিনি বিদ্বৎসমাজের প্রভূত আনন্দবিধানপূর্ব্বক মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে বিদ্যাসমুদ্র পার হইয়া "ভট্টাচার্য্যশতাবধান" উপাধি পাইয়াছিলেন ("লেভে ষোড়শবার্ষিকঃ কৃতিমতামানন্দমুন্মীলয়ন্, ভট্টাচার্য্যশতাবধানপদবীং যস্তীর্ণ-বিদ্যার্ণবঃ।") তিনি বাল্য-কালেই নবদ্বীপনিবাসী মহানৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বৃহস্পতিতুল্য বাদিবিজয়ী এবং মহাকবি হইয়াছিলেন। তাঁহার বিচিত্র উপাধির মধ্যে যে অসামান্য কাব্যরচনা শক্তি অন্তর্নিহিত আছে চিরঞ্জীব তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। একজন কবি একটি শ্লোক রচনা করিলে সেই শ্লোকে এক একটি অক্ষর যে কয়বার প্রয়োগ হইয়াছে, রাঘবেন্দ্র শুনিয়া ঐ অক্ষর ঠিক ততবারই প্রয়োগ করিয়া ১০০ শ্লোক রচনা করিতেন। এই রীতিতে ১০০ কবির ১০০ শ্লোক শুনিয়া স্বয়ং ১০০ শ্লোকে সমস্যা পূরণ করিতেন—এই অসাধারণ শক্তির জন্য তাঁহার "শতাবধান" উপাধি হইয়াছিল। তাঁহার শক্তিদর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার অধ্যাপক ভবানন্দ দেবতাবিশেষ বলিয়া তাঁহাকে খ্যাপন করিয়াছিলেন :—

অধীরামনৃদিত চাবাণকোবং ভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশ উচে।৬
অয়ং কোপি দেবোঽনবদ্যাভিবিদ্যা-চমৎকার-রামাগণারাং
বিভর্তি।

চিরঞ্জীব তাঁহার পিতৃকৃত দুইটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন "মন্ত্রার্থদীপ" ও "রামপ্রকাশ"। প্রথমটি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। "রামপ্রকাশে"র দুইটি প্রতিলিপি লণ্ডনে রক্ষিত আছে। আমরা ৯ বৎসর পূর্ব্বে "রামপ্রকাশে"র একটি অতি মূল্যবান্ প্রতিলিপি নবদ্বীপস্থ সাধারণ পাঠাগারে আবিষ্কার করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। নাগরাক্ষরে লিখিত এই বিরাট স্মৃতি গ্রন্থের বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য (*Indian Hist. Quarterly*, XVII, pp. 6-10)। সম্রাট্ শাহজাহানের রাজত্বকালে ১৭০৪ সম্বতে (১৬৪৭ সনে) ইহা রচিত হয়। গ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষক রাজা পারামের নামে ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। এই কৃপারামের পৌত্রই চিরঞ্জীবের পোষ্টা "রাজা যশবন্তসিংহ"। এই "গৌড়"-ক্ষত্রিয় রাজবংশের রাজধানীর নাম গ্রন্থমধ্যে আবিষ্কৃত হওয়ায় বহু কাল সঞ্চিত একটি ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে। "অগস্ত্যোদয়" প্রকরণে লিখিত আছে :—(৪৩১-২ পত্রে) "এবঞ্চ অর্গলায়াং মহারাজচক্রবর্ত্তিনগরে ষড়ঙ্গুলপরিমিতা···সিংহস্থর্ক্ষস্য ২০-তমাংশোদয়ে নিশান্তে অর্গলাপুরে অগস্ত্যোদয়ঃ। "'লাহাপ্তির'-মধ্যেপি ভূপতি-কৃপারামরাজধানীং প্রাপ্তবৈবেতি।" অর্থাৎ কৃপারামের রাজধানী 'লাকাপ্তির' অর্গলাপুরের (তৎকালীন মোগল রাজধানী আগ্রানগরীর) সন্নিহিত ছিল। বর্ত্তমানে লাহাইর ও তন্নিকটবর্ত্তী 'ইঁন্দুরখী' নগর (নবদ্বীপের প্রতিলিপিতে শেষোক্তস্থলে গ্রন্থরচনার উল্লেখ আছে) গোয়ালিয়র রাজ্যের এক প্রান্তে দৃষ্ট হয়। সেখানেই রাজা কৃপারামের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, গৌড় দেশের কোন অংশে নহে এবং তিনি অদ্ভুতকর্ম্মা শতাবধান ভট্টাচার্য্যকে সভাপণ্ডিত করিয়া আনয়ন করেন। তাঁহার পৌত্র রাজা যশবন্তের সময়ে শতাবধানের যোগ্যপুত্র চিরঞ্জীব সভাপণ্ডিত ছিলেন। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায়, শতাবধান কাশীতে স্বর্গী হইয়াছিলেন এবং চিরঞ্জীবও তৎকালে কাশীতেই অধ্যাপনা করিতেন। কিন্তু চিরঞ্জীবের মাধবচম্পূর শেষে পাওয়া যায় তাঁহার জন্ম হইয়াছিল নবদ্বীপে। অর্থাৎ শতাবধান প্রথম জীবনে নবদ্বীপেই অধ্যাপক ছিলেন। পরে পিতা-পুত্র ২ পুরুষ বাংলার বাহিরে গিয়া অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শতাবধানের নিবাস গ্রাম হুগলির অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া। আমরা কুলপঞ্জীতে তাঁহার বংশপরিচয় আবিষ্কার করিয়াছি। তিনি অবসথী চট্টবংশীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার শেষ বংশধর হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ১৮৯৮ সনে পরলোকপ্রাপ্তি হইলে বংশলোপ হইয়াছে। তাঁহার অসামান্য প্রতিভার কথা বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত।

৪। অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার (মৃত্যু ১৮২২ খ্রীঃ)

নব্যন্যায়ের চর্চ্চা বাংলাদেশে যখন চরমসীমায় পৌঁছিয়াছে সেই সময়ে এই অসামান্য প্রতিভাশালী নৈয়ায়িক অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিচারমল্লরূপে সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন এবং বিদ্যার উপাধি ব্যতীত তাঁহার একটি বিস্ময়জনক লৌকিক উপাধি 'চমৎকার' জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। ফরিদপুর জিলার অধুনা নদীগর্ভে সুপ্রসিদ্ধ 'জপসা' গ্রামে এক পাশ্চাত্য বৈদিক বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহারা ৫ ভাই ছিলেন, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামানন্দ ন্যায়বাগীশ বিক্রমপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাঠক ছিলেন। এই পাঠক বংশ এখনও বিদ্যমান আছে। ইঁহাদের বাড়ীতে দালান ও দীঘি পুষ্করিণী প্রভৃতি ছিল। কোনও ঘটনায় ইঁহারা জপসা পরিত্যাগ করিয়া যান। পরে ইঁহাদের বাড়ীতে উত্তরশাহাবাজপুর নিবাসী হরচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ আসিয়া টোল করিয়া বহু ছাত্র পড়াইয়াছিলেন। তৎকালে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ পূর্ব্ববঙ্গে যাতায়াত কালে জপসার বাবুদের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন এবং সন্ধান লইয়া অভয়ানন্দের পবিত্র জন্মগৃহ পরিদর্শন করিতেন।

অভয়ানন্দ জপসার পণ্ডিতবংশীয় কালিকাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর নিকট সামান্য ব্যাকরণ পড়িয়া নবদ্বীপে আসেন। তখন শঙ্কর তর্কবাগীশ অতি প্রাচীন, তথাকথিত একটি 'অশুদ্ধ পুস্তক' সমালোচনা করিতে দিয়া নবাগত পণ্ডিত কিম্বা ছাত্রের পরীক্ষা করিতেন। অভয়ানন্দ ঐ পুস্তকের সমন্বয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাত্র ২০ বৎসর বয়সে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্কর তর্কবাগীশের পরলোকগমনের সহিত তাঁহার পাঠ সমাপ্তি হয়। তিনি নবদ্বীপের তৎকালীন সমস্ত পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা দেখিয়া নবদ্বীপবাসিগণ নবদ্বীপেই তাঁহাকে চতুষ্পাঠী করিতে বলায় তিনি আর দেশে ফিরেন নাই। ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থে ১৮১৭ সনে নবদ্বীপের প্রধান চতুষ্পাঠীসমূহের তালিকামধ্যে অভয়ানন্দের নাম চতুর্থ, ছাত্রসংখ্যা ২০ (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃ. ৪২৩ দ্রষ্টব্য)। তিনি পরে ভট্টপল্লীতে বাড়ী করেন এবং ১২২৯ সনের ১১ বৈশাখ পথিমধ্যে স্বর্গত হইলে ভট্টপল্লী হইতে যাইয়া তাঁহার পত্নী সহগমন করিয়াছিলেন (ঐ, ঐ, পৃ-৪৬-৭)। আমরা স্বর্গত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের শ্রীমুখাৎ শুনিয়াছি অভয়ানন্দ বেশ বলিষ্ঠ ছিলেন এবং ছুটির দিনে নবদ্বীপ হইতে (প্রায় ৪০ মাইল) হাঁটিয়া ভট্টপল্লীর বাড়ীতে আসিতেন। তিনি মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে স্বর্গী হন এবং স্বকীয় ছাত্রদের পাঠ পরিসমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। অম্বিকাচরণ ঘোষ-রচিত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' (১২৭৫, পৃ. ৫৪-৫) হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—"অনেক দিন অতীত হইল বিক্রমপুর অপর একটি পণ্ডিতরত্নে বঞ্চিত হইয়াছেন, ইহার নাম অভয়াচরণ (?) চমৎকার। ইনি এত অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ও বিচক্ষণতা লাভ করেন যে, শুনিলে যারপর নাই চমৎকৃত

হইতে হয়। ইনি এই নিমিত্তই 'চমৎকার' এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি এই মহাত্মা অভয় চমৎকার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।'

রামগতি ন্যায়রত্নের "গোষ্ঠিকথা" হইতে তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট গল্প ("পাঁঠা ভাঁড়াইয়া মহিষ") উদ্ধৃত হইল। "অভয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য বড় নৈয়ায়িক ছিলেন। একদা তিনি কোনও সভায় গর্ব্ব করিয়া বলিলেন যে, আমার নিকটে যে কেহ পূর্ব্বপক্ষ করুক, একেবারেই তাহার উত্তর করিব। যাঁহার বাটীতে সভা, তিনি ঠকাইবার জন্য একজন ভাল অধ্যাপককে ছাত্ররূপে উপস্থিত করিয়া তাঁহার দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ করাইলেন। অভয়ানন্দ পূর্ব্বপক্ষকারীকে সামান্য ছাত্র জ্ঞান করিয়া যেমন তাহার উত্তর করিলেন, পূর্ব্বপক্ষকারী অমনি সে উত্তরে দোষ দিলেন। তখন অভয়ানন্দ চকিত হইলেন এবং বুঝিলেন ইনি ছাত্র নহেন—একজন ভাল অধ্যাপক। তখন তিনি সে দোষের খণ্ডন করিয়া পুনর্ব্বার উত্তর প্রদান করিলেন; সেবারে আর পূর্ব্বপক্ষকারী কোনও দোষ দিতে পারিলেন না। তখন বাটীর কর্ত্তা হাসিয়া কহিলেন কৈ ভট্টাচার্য্য মহাশয়! এ পূর্ব্বপক্ষে আপনকার উত্তর একেবারে ত হইল না? অভয়ানন্দ কহিলেন বাবু! তুমি যে অন্যায় করিয়াছিলে; তুমি পাঁঠা ভাঁড়াইয়া মহিষ দিয়াছিলে কেন? আমি প্রথমে পাঁঠা মনে করিয়া পাঁঠাকাটা কোপ মারিয়াছিলাম; কিন্তু পরে বুঝিলাম এ পাঁঠা নহে মহিষ; এখন মহিষকাটা কোপ মারিলাম—কাটিয়া গেল।" (পৃ. ৬৫, ৬৬ সংখ্যক গল্প)

তিনি জীবনে দুই বার এ বিচারে পরাস্ত হইয়াছিলেন। কাশী সংস্কৃত কলেজে বিক্রমপুর পাইকপাড়া-নিবাসী বঙ্গের তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়-পঞ্চানন দীর্ঘকাল (১৮১০-৩৩ খ্রীঃ) অধ্যাপক ছিলেন। অভয়ানন্দ পঠদ্দশায় গর্ব্ব করিয়া বলিতেন, 'চাঁদা আমার ভয়ে কাশীতে গিয়াছে!' পরে পাঠ সমাপন করিয়া কাশীতে গিয়া তাঁহার সহিত বিচার করেন, কিন্তু কিছুতেই পরাস্ত করিতে পারেন নাই (অর্চ্চনা, ভাদ্র ১৩২৭, পৃ. ২৬২; প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, পৃ. ৭৬৯ দ্রষ্টব্য)। চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, 'তুমি শিশু—এত অল্প বয়সে পাঠ সমাপ্ত করিলে কেন? তোমার যেরূপ বুদ্ধি ও বিচারশক্তি, আরও কিছুদিন পড়িলে তুমি বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে।' অপর এক 'দেবাংশ' পণ্ডিতের সহিত তাঁহার দ্বিতীয় বিস্ময়াবহ বিচার পরে লিখিত হইল। অভয়ানন্দ বিচারমল্ল হইলেও অধ্যয়নশীল ছিলেন এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া পড়িতেন। নদীয়া বহিরগাছীর সুপ্রসিদ্ধ রঘুমণি বিদ্যাভূষণের গৃহে একটি পুঁথির পত্রে আমরা নিম্নলিখিত স্মারকলিপি দেখিয়াছি:—"সন ১২২৭ সাল ১০ কার্ত্তিক নবদ্বীপের শ্রীযুত অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য অনুমানখণ্ডের আলোকগ্রন্থ মিশ্রকৃত লইয়া যান লিখিয়া আনিয়া দিবেন ইতি।" নব্যন্যায় চর্চ্চার এই সুবর্ণ যুগ অচিরেই অবসান প্রাপ্ত হয়। পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকগণ আলোকগ্রন্থের নামও অবগত ছিলেন কি না সন্দেহ, সংগ্রহ করা ত দূরের কথা। অভয়ানন্দের বহু কথা আমরা জগসার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৺আনন্দনাথ রায় (১২৬২-১৩৪০ সন) মহাশয়ের নিকট জ্ঞাত হইয়াছিলাম।

৫। ভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন (মৃত্যু ১৮১৮)

ঢাকা জিলায় সোনারগাঁ পরগণার "কুকপুরা" গ্রামে রাঢ়ীয় বাৎস্যগোত্রীয় (শিমলাল) ভট্টাচার্য্যবংশ পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই বংশে দৈবশক্তিসম্পন্ন ভৈরবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২২৫ সনে ২৬ বৎসর বয়সে মাত্র ৫ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া (প্রবাদ অনুসারে এক ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে) পরলোক গমন করেন। তিনি কাহারও নিকট বিচারে পরাস্ত হন নাই এবং নব্যন্যায়ের যে কোন কূটপ্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ ছিলেন। তাঁহার ললাটে একটি "রাজদণ্ড" রেখা ছিল এবং শাস্ত্রীয় বিচারকালে তাহা ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া তাঁহার অপরাজেয় শক্তির লাঞ্ছন রূপে সকলকে অভিভূত করিত। তাঁহার বহু কীর্ত্তি কথার মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য। বিক্রমপুরের তদানীন্তন প্রধান নৈয়ায়িক বিখ্যাত "পত্রিকা"কার কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ (১৭৮১-১৮৩০ খ্রীঃ) দ্বিতীয়পক্ষে ভৈরবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রী হরমোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন। কালীশঙ্কর বিচারমল্ল ছিলেন না; ভৈরবচন্দ্র পরিহাসচ্ছলে দাদাকে বলেন, "মেয়ের সঙ্গে মেয়ে বিবাহ দিয়াছেন"!! কথাটি কালীশঙ্করের কর্ণগোচর হইলে তিনি অবিলম্বে আসিয়া ভৈরবচন্দ্রের সহিত শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং প্রত্যেক স্থলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া লজ্জিত হন।

কালীশঙ্কর মৈমনসিংহ সুসঙ্গের বিদ্যোৎসাহী রাজা রাজসিংহের (১৭৮৪-১৮২২ খ্রীঃ) সভাপণ্ডিত ছিলেন, কেবল শ্রাদ্ধাদি রক্ষার জন্য বৎসরে ২।৩ মাস দেশে আসিয়া থাকিতেন। কালীশঙ্করের চেষ্টায় কোন উৎসব উপলক্ষে সুসঙ্গ রাজবাটীতে অভয়ানন্দ ও ভৈরবচন্দ্রের মধ্যে এক বিস্ময়াবহ শাস্ত্রীয় বিচার সংঘটিত হয়—উভয়েই দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। ভৈরবচন্দ্র বিচারে জয়ী হইয়া রাজপ্রদত্ত হাতীর পৃষ্ঠে দেশে ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই স্বর্গী হন। সোনারগাঁর তদানীন্তন একজন "কবি" কুশাই দাস গান বাঁধিয়াছিলেন:—

সুসঙ্গ রাজার বাড়ী বিচার করি দ্বারে বাঁধল হাতী।
তার মধ্যে পড়ে কত পণ্ডার রক্ষা পেল জাতি।
সে যে ভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন,
সশরীরে স্বর্গে গেল করে রথে আরোহণ,
কাঁদলে কি আর পাবে রে সে জন।

৬। ধনেশ্বর ভট্টাচার্য্য

উদীচ্য রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ) রঘুনন্দনের স্মার্ত্তমত সংশোধন করিয়া "কৌমুদী" নামক বহু স্মৃতির গ্রন্থ রচনা করেন। উত্তরবঙ্গে তাঁহার মতই বহুল

পরিমাণে প্রচলিত ছিল। রঙ্গপুর ইটাকুমারীর ভট্টাচার্য্যবংশে তাঁহার জন্ম (বারেন্দ্রশ্রেণী, বাৎস্যগোত্র)। তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ১৩১৮ সনে সম্বন্ধনির্ণয়ের তৃতীয় পরিশিষ্টে তাঁহাদের বংশবৃত্তান্ত মুদ্রিত করেন (পৃ. ১৬২-৮৩)। তন্মধ্যে বালক কবি ধনেশ্বর-রচিত "বাৎস্যবংশচরিতম্" (পৃ. ১৬২-৭৭) নামে "শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত" ছন্দের ৮৭ শ্লোকাত্মক এক অতি বিস্ময়কর ক্ষুদ্রকাব্য আছে। দুঃখের বিষয় এই অসামান্য বস্তুটি কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা বাংলার সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণকে দৈবশক্তিসম্পন্ন ধনেশ্বরের রচনাটি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ধনেশ্বরের ভ্রাতা রামেশ্বর ৮ শ্লোকে "ধনেশ্বর-চরিত" লিখিয়াছেন (ঐ, পৃ. ১৭৮-৯)। তাঁহার সারাংশ এই—উদীচোর এক প্রপৌত্র ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণি; ধনেশ্বর ৮ শ্লোকে (৭৯-৮৬) তাঁহার পাণ্ডিত্যকীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ধনেশ্বর শৈশবে কাতন্ত্রের সন্ধিবৃত্তি মাত্র পড়িয়াছিলেন, এক রাত্রিতে নিদ্রিত পিতার মুখনির্গত এক মন্ত্র শুনিয়া এবং পরদিন পিতার নিকট ঐ মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়া হঠাৎ তাঁহার সমস্ত শাস্ত্রে জ্ঞান জন্মে। এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তিনি অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া অপমান করিয়াছিলেন—তাঁহার অভিসম্পাতে তৃতীয় দিন মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে ধনেশ্বর মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনধিক ১৫ বৎসরে তিনি কি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন ৮৭ শ্লোকের প্রত্যেকটি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ। উদীচো রামকৃষ্ণ সরস্বতীর দর্শন লাভ করিয়া বর পাইয়াছিলেন। ধনেশ্বর ১১ শ্লোকে (২৩-৩৩) উদীচোর বৃত্তান্ত দিয়াছেন। ধনেশ্বরের ভাগিনেয় রুদ্রমঙ্গল কাব্যালঙ্কার (মৃত্যু ১২৬০ সন) নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণির এক প্রধান ছাত্র ছিলেন। ধনেশ্বরের কীর্ত্তি সুতরাং ১৮২৫-৪০ খ্রীঃ মধ্যে স্থাপন করা যায়।

১। নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু (১৮৩৪-৬২ খ্রীঃ)

বাঙ্গালাদেশে নব্যন্যায়ে প্রতিভার শেষ অবতার নন্দকুমার স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। "নৈহাটির ভট্টাচার্য্যবংশ" নামক পারিবারিক গ্রন্থে তাঁহার অসামান্য কীর্ত্তির বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ১৮-২৬)। মাত্র ১১।১২ বৎসর বয়সে তিনি মাতামহ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের (সংস্কৃত কলেজের এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী, মৃত্যু ১৮৪৬ খ্রীঃ) নিকট নব্যন্যায়ের কূটবিচার-প্রণালী শিখিয়াছিলেন। রামমাণিক্য স্বয়ং নবদ্বীপের শঙ্কর তর্কবাগীশ, নৈহাটির মাণিক্য তর্কভূষণ এবং মুরসিদাবাদের কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিকট পাঠ স্বীকার করিয়া তিন সম্প্রদায়ের পদ্ধতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত দৌহিত্রকে প্রাণ খুলিয়া তাহা শিখাইয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর নন্দকুমার পিতার নিকট পড়িয়া মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপ্ত করেন। তাঁহার এই "অসাধারণ" (extraordinary) কৃতিত্ব নড়াইলের রতন রায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজা রাধাকান্তদেব, রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি বহু প্রধান ব্যক্তি লক্ষ্য করিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তিনি প্রায় ৪ বৎসর (১৮৫৬-৬০ খ্রীঃ) সংস্কৃত কলেজে ছিলেন, পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় অধিক বেতনে কাশী স্কুলের হেড্ পণ্ডিত হইয়া যান, কিন্তু ১২৬৯ সনের কার্ত্তিক মাসে (১৮৬২ খ্রীঃ) মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে ক্ষয় রোগে নিঃসন্তান পরলোকগত হন। "সংস্কৃত প্রস্তাব" নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক (১৯১৬ সম্বৎ, পৃ. ২৮) তিনি মুদ্রিত করিয়াছিলেন—আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বঙ্গভাষার উন্নতি বিধানের প্রয়োজন ইহাতে যেভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা বস্তুতই আশ্চর্য্যজনক।

নন্দকুমার ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে অতি অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণি ও তদীয় সর্ব্বপ্রধান ছাত্র গোলোকনাথ ন্যায়রত্নকে তিনি মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে যেভাবে বিচারে পরাস্ত করেন তাহার বিবরণ "সংবাদভাস্কর" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃ. ৪২৭, ৪৭৭-৮)। প্রথম বিচারে বিষয় ছিল "কেবলান্বয়ী গাদাধরী"র একটি পঙ্‌ক্তি এবং দ্বিতীয় বিচারে ছিল গদাধরের "শক্তিবাদে"র একটি পঙ্‌ক্তি। নন্দকুমার জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকেও বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রবীণ পক্ষধর মিশ্রের সহিত বালক রঘুনাথের বিচারকাহিনী এখানে তুলনাচ্ছলে স্মরণীয়। বাংলার নব্যন্যায়ের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা ও নব্যন্যায়ের শোচনীয় অবসান রঘুনাথ ও নন্দকুমারের জীবনে যথাযথ প্রতিফলিত হইয়াছিল। রঘুনাথের খ্যাতি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া যায়, আর নন্দকুমার নিঃস্ব অবস্থায় গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পণ্ডিতী করিয়া মারা যান।

অতি-আদিম যুগের শিল্পের ধারা

শ্রীকানাইলাল সাহা

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন : প্রস্তর-যুগে ইউরোপে তিনটি সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। প্রথমটিকে বলা হয় অ্যরগ্নেশীয় (Aurignasian), দ্বিতীয়টি সল্যুট্রিয় (Solutrian), আর তৃতীয়টি হ'ল ম্যাগ্ডালেনীয় (Magdalenian)।

প্রস্তর-যুগের প্রথম দিকের আধিবাসীদের ব্যবহৃত কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে আরিগ্নাক (Aurignac) নামে একটি পাহাড়ের গুহায়। তাই এই যুগের সভ্যতাকে বলা হয় অ্যরগ্নেশীয় সভ্যতা। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, স্পেনের উত্তর ভাগ, পোল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি স্থানে এই সভ্যতার কিছু আভাস পাওয়া গেছে। তাই অনেকে অনুমান করেন, ইউরোপের সর্ব্বত্রই এই সভ্যতার ধারা ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই যুগের অধিবাসীদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন ছিল শিকার। তাই তারা পাহাড়ের ধারে বসে পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করত, আর শিকারে যাবার পূর্ব্বে পাহাড়ের গায়ে বা গুহার ভেতর জীব-জন্তুর ছবি এঁকে পূজো করত। তখন ওরা যেসব ছবি এঁকেছে সেগুলো ছোট ছেলেদের আঁকা ছবির মতই। রেখা-চিত্রের আঙ্গিকের সঙ্গে তখনও ওদের ভাল করে পরিচয় হয় নি বলেই বোধ হয় তারা শুধু বেষ্টনী-রেখা (outline) দিয়ে কোন রকমে বস্তুটিকে বোঝাতে চেষ্টা করত। এই প্রাথমিক চিত্রগুলির শিল্পগত সৌন্দর্য্য বা মূল্য কিছু থাক বা না থাক ঐতিহাসিক মূল্য একটা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বহুকাল ধরে ছবি আঁকতে আঁকতে ক্রমে ওরা অভ্যস্ত হয়ে উঠল রেখা-চিত্রের আঙ্গিকে এবং ওদের মনেও ধীরে ধীরে জাগল শিল্পবোধ। আর সেই সঙ্গে বেড়ে যেতে লাগল ওদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বা শিল্পের অভিব্যক্তির অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির জন্তেই কালক্রমে ওদের শিল্প হয়ে উঠল পূর্ণাঙ্গ।

পরবর্ত্তী যুগের শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করলে আরও স্পষ্টভাবেই আমরা এ বিষয়টা বুঝতে পারব।

অ্যরগ্নেশীয় যুগের অবসানের পর নূতন এক ধরণের সভ্যতার আলো প্রস্তর-যুগের অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সের সল্যুটার (Solutre) নামে একটি জায়গায় এই যুগের শিল্পের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া গেছে। গবেষকেরা তাই এই স্থানটির নাম অনুযায়ী এই যুগের সভ্যতার নাম দিয়েছেন সল্যুট্রিয় সভ্যতা। তাঁরা অনুমান করেন এই যুগের সভ্যতার অগ্রদূত পশ্চিম এশিয়ার ষ্টেপ্ প্রদেশের এক অভিযাত্রী দল। খুব সম্ভব ওরা তুর্কীস্থান বা তার কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে পশ্চিম ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয়। ক্রমে ওরা ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উপস্থিত হয়ে আরগ্নাকের অধিবাসীদের সঙ্গে বসবাস সুরু করে। ওরা কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করতে তত দক্ষ ছিল না। পরে আর একদল অভিযাত্রী ওখানে উপস্থিত হয়। এরা অ্যরগ্নেশীয়দের অস্ত্র তৈরী করবার কায়দাটুকু আয়ত্ত করে নিয়ে শেষে ওদের চেয়েও সুন্দর সুন্দর অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করতে সুরু করে দিলে।

অ্যরগনেশীয়দের মত এরাও ছবি আঁকত পাহাড়ের গায়ে ও গুহায়। তবে পূর্ব্বপ্রচলিত আঙ্গিকের একটু-আধটু অদল-বদল করায় এদের ছবিগুলো হয়েছিল কিছু উন্নত ধরণের। এরাও বেষ্টনী-রেখা দিয়ে জীব-জন্তুর ছবি আঁকত বটে, তবে সেগুলোর চোখ আঁকত ফুট্‌কি দিয়ে। ছোট বড় রেখা দিয়ে ওরা ক্রমে পশুর গায়ের লোম আঁকাও সুরু করে দিলে। এই দুই যুগের ছবি তুলনা করলে দেখা যায়, আরগনেশীয়দের চেয়ে সল্যুট্রিয়দের শিল্প-বোধ ছিল একটু উন্নত।

সল্যুট্রিয় যুগের অবসানের পর সুরু হয় ম্যাগডালেনীয় যুগ। প্রস্তর-যুগের রেখা-চিত্র ও চিত্রকলার চরম উন্নতি হয়েছিল এই সময়। ১৮৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লার্তেঅ্ (Lartet) ও ক্রিস্টি নামে দুজন গবেষক লা মডেলা (La Madeleine) গুহায় এই যুগের শিল্পের কিছু নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন : এই যুগের শিল্প শুধু ফ্রান্সের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। দক্ষিণে ইটালীর গ্রিম্যাল্ডি নামক স্থানে আর একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে ওঠে। একে বলা হয় গ্রাভিটিয় সভ্যতা। মধ্য ইউরোপে কিন্তু গ্রাভিটিয় ও ম্যাগডালেনীয় সভ্যতার সংমিশ্রণে আর একটি নতুন ধরণের সভ্যতা গড়ে ওঠে। ওদিকে দক্ষিণ রাশিয়ায় তখন গ্রিম্যাল্ডি সভ্যতার চেয়ে কিছু নিকৃষ্ট ধরণের অন্য এক সভ্যতা প্রচলিত ছিল।

অন্ত্যযুগের শিল্পের সঙ্গে মধ্যযুগের শিল্পের বিশেষ কিছু মিল দেখা যায় না। এর প্রধান কারণ, এই সময়ের শিল্পের আঙ্গিকের আমূল পরিবর্ত্তন হয়েছিল। এই যুগের অধিবাসীরা যে মধ্যযুগের শিল্পের সঙ্গে পরিচিত ছিল তার প্রমাণ আছে। উভয় যুগের শিল্পের নমুনা একই জায়গায় পাশাপাশি পাওয়া যায়। এই যুগের শিল্পীরা কিন্তু সব সময়ই নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার চেষ্টা করত।

শিল্পীরা এই সময় শিল্পকর্ম্মের অন্যতম উপাদানস্বরূপ পশুর হাড় ব্যবহার করা সুরু করে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লোকদের অস্ত্রশস্ত্রের অনুকরণে তারা হাড়ের বর্শা তৈরি করত। এই সব বর্শাকে আবার সুদৃশ্য করবার জন্তে বাঁটগুলি চিহ্নিত করত জীব-জন্তুর মূর্ত্তি খোদাই করে। এই খোদাই-শিল্পের

আদিক পরীক্ষা করে গবেষকরা বলেছেন, এগুলি প্রস্তর-যুগের শেষ সময়কারই জিনিষ।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন : ম্যাগডালেনীয় যুগের অধিবাসীরা শিকারে তত অভ্যস্ত ছিল না। কাজেই জীবনধারণের জন্যে তাদের বনের পশুর ওপর আদৌ নির্ভর করতে হ'ত না। তারা জীবনধারণ করত নদীর মাছ ধরে। তাই ওরা কয়েকটি অস্ত্র তৈরি করেছিল মাছ ধরবার জন্যে। এইসব অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কার হবার পর গবেষকদের ধারণা হয়েছে যে, পশু-শিকারের চেয়ে মৎস্যশিকারেই বোধ হয় ওদের আনন্দ ছিল বেশী।

পুরুষরা তো সারা দিন ঘুরে বেড়াত নদীর ধারে ধারে, আর মহিলারা সময় কাটাত গুহার ধারে বসে পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করে। চকমকি পাথরের ধারালো ছুরি দিয়ে পশুর চামড়া কেটে ওরা সুন্দর সুন্দর পোশাক তৈরি করত। অনেক সময় সেগুলিকে আবার চিত্রিত করত ছোট ছোট ছেঁদা-করা ঝিনুক বসিয়ে। এই থেকে এ যুগের মেয়েদেরও শিল্পমনোবৃত্তির আভাস পাওয়া যায় এবং শিল্প সম্বন্ধে ওরা যে কতটা সজাগ ছিল তাও বেশ বোঝা যায়।

মেয়েদের সেলাইয়ের ছুঁচগুলি প্রায়ই হারিয়ে যেত, তাই ওরা সেগুলি অতি যত্নে পাখীর ফাঁপা হাড়ের ভেতর পুরে রাখত। জামায় ওরা হাড়ের বোতামও ব্যবহার করত কখনও কখনও হাতীর দাঁতের তৈরি আলপিনের মত এক প্রকার সূক্ষ্ম জিনিষ ও জামা আটকাবার জন্যে ব্যবহার করত। এই সব জিনিষের নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অতি যত্নে রক্ষিত আছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন, প্রস্তর-যুগের অধিবাসীদের মধ্যে ম্যাগ্‌ডালেনীয়দের শিল্প-বোধ ছিল অত্যন্ত উন্নত। অপরাপর শিল্পের চেয়ে ওদের চিত্র-কলাই আমাদের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করে। পাহাড়ের গায়ে ও গুহায় আঁকা ছবিগুলি ওদের সহজাত শিল্প-প্রবৃত্তির স্পষ্ট পরিচয় দেয়। ইতিহাস ওদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বললেও ওদের আঁকা ছবিগুলি, আঁকবার সরঞ্জাম, ওদের ব্যবহার করা অস্ত্র-শস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ ওদের জীবনযাপন প্রণালী ও মানসিক প্রবণতা সম্বন্ধে অনেক তথ্যই আমাদের জানিয়ে দেয়।

চকমকি পাথরের যন্ত্রপাতি ও ব্যবহারযোগ্য জিনিষের উপর খোদাই করা ছবিগুলি দেখলে বেশ বোঝা যায়, কত গভীর ছিল ওদের শিল্পানুরাগ। এগুলো থেকে বুঝতে পারা যায়, ওরা শুধু চিত্র-কলার অনুরাগী ছিল না, ভাস্কর্যেও ছিল এদের দক্ষতা। ক্রমে ওরা ভাস্কর্যে এত নিপুণ হয়ে উঠেছিল যে, ওদের খোদাই করা চিত্রগুলির সঙ্গে জীবন্ত প্রাণীদেহের কোন বৈসাদৃশ্য নজরে পড়ে না। সরু-মোটা আঁচড়ে খোদাই করা ছবিকে নিখুঁত করবার জন্যে ছিল ওদের অক্লান্ত চেষ্টা।

নীচের বুনো-মহিষের ছবিটি (নং ১) ভাল করে লক্ষ্য করলে ওদের ভাস্কর্যের আঙ্গিকটুকু সম্বন্ধে কিছু ধারণা জন্মাতে পারে। এর গায়ের লোমগুলি আঁকা হয়েছে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খাড়া খাড়া আঁচড় দিয়ে। লোমগুলি এই ভাবে আঁকায় জীবটির

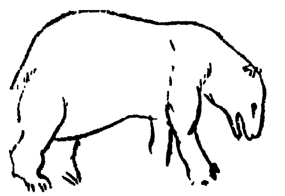


১ নং চিত্র

দৈহিক বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট কাজগুলিকে নিখুঁত করবার জন্যে ওরা সময়ে সময়ে এত সূক্ষ্ম আঁচড় দিয়েছে যে, আজকালকার খুব জোরাল বিজলী বাতির আলোতেও সেগুলি স্পষ্ট দেখা যায় না।

কোন জীবন্ত প্রাণী দেখলে আমাদের মনে তার আকৃতির যে রেখাপাত হয়, সুসমঞ্জস রেখা দিয়ে ছবিগুলি তেমনি সুষ্ঠু ও জীবন্ত করবার জন্যে ওরা যথেষ্ট চেষ্টা করত। নিখুঁত রেখার টানে স্পষ্ট হয়ে উঠত প্রত্যেকটি পশুর গতি-ভঙ্গী ও প্রকৃতির বিশেষত্ব।

লা ম্যাদেলা (La Madeleine) গুহার গুহা-ভল্লুক ও ম্যামথের ছবি দুটিকে ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, ভালুকটি উগ্র প্রকৃতির, আর ম্যামথটি আক্রমণোদ্যত (নং ২ ও ৩)। এই ধরণের ছবি এর চেয়ে নিখুঁত করে আঁকা খুব



২ নং চিত্র

কঠিন বলে মনে হয়। এই ছবিগুলি দেখলে ওদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও নিপুণ রেখা-সংযোজনা-শক্তির প্রশংসা করতে হয়।

চকমকি পাথরের ছুরি দিয়ে পাথর বা হাড়ের ওপর নিখুঁত ছবি আঁকা বেশ একটু শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তাই ওরা



৩ নং চিত্র

অত্যন্ত সতর্ক হয়ে থাকত ছবি আঁকবার সময়। ওরা জানত, অসতর্কতায় কোন অপ্রয়োজনীয় রেখাপাত হলে তা মুছে ফেলা কত কষ্টসাধ্য। এই সতর্কতার ফলেই এদের ছবিতে অপ্রয়োজনীয় রেখা বড় একটা দেখা যায় না।

এর আরও একটি কারণ আছে। কোন আদর্শ বা মডেল থেকে ওরা ছবি আঁকত না। শিল্পী যে জীবটির ছবি আঁকবার ইচ্ছা করত সেই জীবটিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনও বা দিনের পর দিন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখত। দেখবার সময় গভীরভাবে চিন্তা করত রেখার ধরণ ও ভঙ্গী সম্বন্ধে। দেখতে দেখতে জীবটির সম্পূর্ণ ছবিটি যখন মনে গভীর রেখাপাত করত তখনই ওরা সেই জীবটির ছবি আঁকতে বসত।

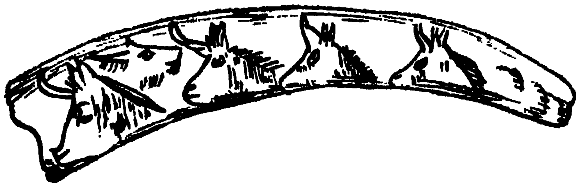
সুইজারল্যাণ্ডের কেসলারলকে শম্প-ভক্ষণরত বলগা হরিণটি প্রস্তর-যুগের ভাস্কর্য্যের একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন (নং ৪)।



৪ নং চিত্র

এই ছবিটিতে একটি নূতন আঙ্গিকের সন্ধান পাওয়া যায়। ছোট বড় সরল-রেখার বদলে আঁকা-বাঁকা রেখা দিয়ে মূর্ত্তিটির গায়ের লোম দেখানো হয়েছে। পায়ের অবস্থান দেখে বোঝা যায়, জীবটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। যে-কোন শিল্পরসিক এই মূর্ত্তিটি দেখে স্বীকার করবেন, এর চেয়ে নিখুঁত ও প্রাণবন্ত মূর্ত্তি খোদাই করা সুকঠিন।

নীচের ছবিটিতে বলগা হরিণের শিঙের উপর হরিণের যে মুখগুলি খোদাই করা হয়েছে জীবন্ত প্রাণীর মুখের সঙ্গে সেগুলির তফাৎ আছে বলে মনে হয় না (নং ৫)। একটি জিনিষ কিন্তু এতে লক্ষ্য করবার আছে। পাঁচটি মুখের



৫ নং চিত্র

কোনটির সঙ্গে কোনটির মিল নেই অথচ প্রত্যেকটি মুখেরই একটি বিশেষত্ব আছে।

বড় বড় ছবি আঁকবার সময় ওরা যে পরিশ্রম ও সতর্কতা অবলম্বন করত ছোট ছোট ছবি আঁকবার সময়ও তার এতটুকু শৈথিল্য দেখা যায় নি। শিল্পানুরাগ যে ছিল এদের রক্তমজ্জাগত তার প্রমাণ এই ছবিগুলি। এই অনুরাগের ফলেই ওরা কিছু আঁকবার সময় এতটুকু অবহেলা বা অসতর্কতা দেখাত না।

নীচের ছবিটি লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায়, এটি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি মাত্র কয়েকটি রেখার সমাবেশে আঁকা হয়েছে। এতে কোন আড়ম্বর না থাকলেও স্টেপ প্রদেশের ঘোড়ার দেহগত বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় আছে (নং ৬)।



৬ নং চিত্র

দিন যতই যেতে লাগল শিল্পীরা ততই নিপুণ হয়ে উঠতে লাগল রেখাঙ্কনে। ক্রমে রেখার সাহায্যেই ওরা দেখাতে সুরু করে দিলে আলো-ছায়ার (light and shade) খেলা। আজে-বাজে রেখা না টেনে সামান্য একটু ছোঁয়া (touch) দিয়েই এই আলো-ছায়ার খেলা দেখিয়ে ওরা ছবিগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলত।

গভীর রেখাবিন্যাসে ছবি আঁকা ছিল অ্যারগ্নেশীয় শিল্পীদের রেখা-চিত্রের প্রধান আঙ্গিক। ক্রমে ক্রমে ওদের শিল্প-বোধ যতই গভীর হতে লাগল ততই ছবিগুলিকে আকর্ষণযোগ্য করবার দিকে ওদের ঝোঁক বাড়তে লাগল। সূক্ষ্মশিল্পবোধ তখনও কিন্তু ওদের মনে জাগে নি। তাই সৌন্দর্য্যপ্রীতি ও শিল্পীমনের অতৃপ্তির তাড়নায় কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে ওরা রেখা-চিত্রের বেষ্টনী-রেখায় ভেতর রং-লেপা সুরু করে দিলে।

ম্যাগ্ডালেনীয় যুগে কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয়েছিল এই

আঙ্গিকের। রং-লেপা (Silhouette) ছবিগুলি ওরা কিন্তু আঁকত রঙের কুচি দিয়ে। কোন কোন ছবিতে আবার সরু-মোটা কুচি দিয়ে আলো-ছায়ার খেলা দেখাতে চেষ্টা করেছে। এই ক্রমোন্নতি দেখে মনে হয়, রঙের তুলি ধরার পর রঙের যাদু দেখাতে ওরা যেন সুরু করে দিয়েছিল।

যে-কোন আঙ্গিকের ছবি ওরা আঁকুক না কেন, সব সময়ই ওদের লক্ষ্য থাকতো ছবিটিকে নিখুঁত করার দিকে। কোন কোন ছবিতে হাল্‌কা রঙের স্পর্শে বেষ্টনী-রেখাটি এঁকে ভেতরেও লেপে দিত হাল্‌কা রং। এই সব ছবির জায়গায় জায়গায় আবার গভীর রঙের স্পর্শ দিয়ে আলো-ছায়ার খেলা দেখিয়েছে।

কোন কোন ছবির বহিঃবেষ্টনীটুকু কালো রংদিয়ে এঁকে ভেতরে দিয়েছে অন্য রঙের স্পর্শ। এই আঙ্গিকের ছবিগুলি এত আকর্ষণযোগ্য যে সম্পূর্ণ ছবিটির ওপর দর্শকের দৃষ্টি পুরোপুরি আটকে যায়।

এক-রঙা ছবিগুলিতেও ক্রমে ওরা আলো-ছায়ার খেলা দেখাতে সুরু করে দিলে। এই ধরণের ছবিগুলিতে রঙ দেওয়ার পর চকমকি পাথরের ছুঁচ দিয়ে জায়গায় জায়গায় চেঁচে হাল্‌কা করে রঙের পরশ দিয়েছে। ফলে সমগ্র ছবিটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আলো-ছায়ার খেলা।

রঙের-নেশা ওদের এমন করে পেয়ে বসল যে, খোদাই-করা মূর্তিগুলিতেও রঙ দেওয়ার একটা ঝোঁক এদের চেপে গেল। এতে মূর্তিগুলি বেশ সুন্দরই দেখাত। রঙের স্পর্শে ছবি ও খোদাই করা মূর্তিগুলি যত সুদৃশ্য হতে লাগল ততই ওদের নানা রং ব্যবহার করবার আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠল।

সে যুগের যে-ক'টি বহু-রঙা ছবি ও ভাস্কর্যের সন্ধান আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে তার সব কয়টিই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও শিল্প চাতুর্য্যপূর্ণ। এই সব ছবিতে ওরা ব্যবহার করেছে মাত্র চার-পাঁচটি রং—লাল, কালো, পাটকিলে, আর হলদে।

রং ব্যবহার করতে করতে ওরা হঠাৎ আবিষ্কার করলে—কোন একটি বিশেষ রঙের ওপর অন্য রঙের ছায়া দেওয়াও সম্ভবপর এবং এতে ছবিগুলির রূপান্তর সাধন হয়। এই আঙ্গিক আবিষ্কৃত হবার পর শিল্পীরা পুরোনো পন্থা ছেড়ে দিয়ে নতুন আঙ্গিকের ওপরই মনোযোগ দিলে। এই ধরণের কতকগুলি ছবির অস্তিত্ব এখনও আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, আঁকবার সময় ওরা যেছায়ার রং ব্যবহার করেছিল সেই রং এখনও কিছুমাত্র ফ্যাকাশে হয় নি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগেই মিশরবাসীদের শিল্প খুব উন্নতিলাভ করেছিল। ওদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল অলঙ্করণের (Decoration) দিকে। বহু-রঙা ছবিগুলির শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে ম্যাগ্‌ডালেনীয় শিল্পীদের ছবিগুলি অত্যন্ত সাদাসিদে হলেও মিশরীয় শিল্পীদের ছবির চেয়ে অধিকতর আকর্ষণীয়।

স্পেনের আল্‌টামিরা গুহার ভেতর কয়েকটি বুনোমহিষের ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। এখনও এগুলি প্রায় অক্ষত অবস্থাতেই আছে। কোনটির রং এতটুকু ঝরে পড়ে নি বা ফ্যাকাশে হয় নি।

ফঁ-দ্য-গিয় গুহার গায়ে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর জীব-জন্তুর ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির প্রায় সব কয়টিই বহু-রঙা।

এই যুগের শিল্পীরা মাটির মূর্তি তৈরি করতেও অভ্যস্ত ছিল। ত্যুক্ দো'দুবেয়র (Tuc d'Audoubert) গুহায় কাদার তৈরি দুটি বুনোমহিষের মূর্তি পাওয়া গেছে। এ দুটি দেখতে অনেকটা জীবন্ত মহিষেরই মত। এমন নিপুণ হস্তে এ দুটি তৈরি করা হয়েছে যে হঠাৎ দেখলে জীবন্ত মহিষ বলেই ভ্রম হয়। বর্ত্তমান যুগের শিল্পীরা তাই এগুলিকে মৃৎশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে স্বীকার করেন। এই মূর্তি দুটির কাছে আরও একটি অসম্পূর্ণ মূর্তি দেখা যায়। এখনও এর গায়ে শিল্পীর আঙুলের ছাপ বিদ্যমান। এ যুগের শিল্পীদের যে শিল্পের সব দিকেই সজাগ দৃষ্টি ছিল তা বেশ বোঝা যায়।

ক্যাপ-ব্লাঁ গুহায় প্রায় সাত ফুট লম্বা কয়েকটি চুনে-পাথরের খোদাই-করা ঘোড়ার মূর্তি পাওয়া গেছে। অধ্যাপক অস্‌বর্ণ বলেন, এ গুলি ম্যাগ্‌ডালেনীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই যুগের শিল্পীদের শিল্প-বোধ এত উন্নত ছিল যে কেবল গুহা-চিত্র বা ভাস্কর্য্যে ওরা সন্তুষ্ট হতে পারে নি। ব্যবহারযোগ্য জিনিষের ওপরও শিল্প-চাতুর্য্য দেখাতে চেষ্টা করেছে। অস্ত্র-শস্ত্রের বাঁটের ওপর খোদাই করেছে নানা জীব-জন্তুর মূর্তি। এই ধরণের শিল্পকে বাংলায় বলা যেতে পারে চলমান শিল্প। ইংরেজীতে বলে মোবাইল (mobile) বা চ্যাটেল (chattel) আর্ট।

এই যুগের শিল্পীরা পশু-মূর্তি আঁকতে সিদ্ধ-হস্ত ছিল। কখনও কখনও ওরা মাছ, হাঁস, বক, বন-মোরগ প্রভৃতির ছবিও এঁকেছে। এগুলি কিন্তু মোটেই শিল্প-পদবাচ্য নয়।

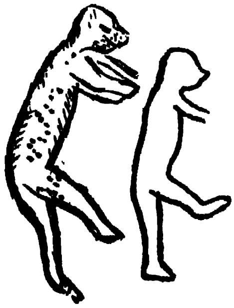
এই সম্পর্কে একটি জিনিষ কিন্তু লক্ষ্য করবার আছে। এই সব শিকারী-শিল্পীরা কোন গাছের ছবি আঁকে নি বা খোদাইও করে নি। মানুষের মূর্তিও ওরা এঁকেছে খুব কম। যে কয়টির সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলি আবার শিল্পসৃষ্টি হিসাবে খুব উঁচু দরের (নং ৭)। মানুষের মূর্তি আঁকবার কায়দাটুকু বোধ হয়



৭ নং চিত্র

ওরা ভাল করে আয়ত্ত করতে পারে নি, অনেক গবেষকের এইরূপ অনুমান। যে সব মানুষের ছবি ওরা এঁকেছে সেগুলির

দৈহিক গঠন মানুষের মত হলেও মুখে পশুর মুখোস পরানো। এগুলির প্রায় সব ক'টিতেই আবার নাচের ভঙ্গী বিদ্যমান। তাই এগুলিকে ব্যঙ্গ-চিত্রের নমুনা হিসাবে ধরে নেওয়াই ভাল (নং ৮)।

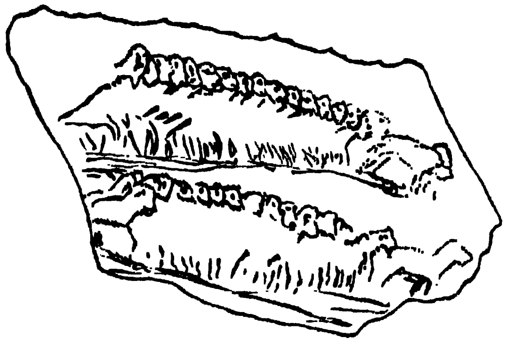


৮ নং চিত্র

সাধারণতঃ দেখা যায়, ম্যাগ্‌ডালেনীয় শিল্পীদের আঁকা যে সব ছবির সন্ধান আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই জীব-জন্তুর ছবি। এর প্রধান কারণ, ওদের মধ্যে প্রচলিত ডাকিনী-বিদ্যা বা যাদু-বিদ্যার অঙ্গ হিসেবে প্রায় সমস্ত শিকারী-শিল্পীকেই পশুর ছবি আঁকায় অভ্যস্ত হতে হ'ত। জীব-জন্তুর মূর্ত্তি ছাড়া আর যা কিছু ওরা এঁকেছে তা খেয়ালী শিল্পীর অবসর বিনোদনের খেলা মাত্র। তাই এই সব ছবি আঁকবার সময় তারা খুব বেশী যত্ন নিত না।

এই যুগের কোন কোন শিল্পী দৃশ্যচিত্রও (landscape) আঁকতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেগুলি ওরা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে আঁকে নি। যে কয়টি আবিষ্কৃত হয়েছে, মনে হয় সেগুলি শিল্পীর এই ধরণের ছবির প্রাথমিক ছবির নমুনা (নং ৯)।

এই যুগের শিল্পের সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়—প্রায় সব ক'টি জীব-জন্তুর ছবির একদিকেরই প্রতিকৃতি (profile) দেখান হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায়, ওরা ছবি আঁকবার সময় জীবগুলিকে লক্ষ্য করত এক পাশ থেকে। এইভাবে



৯ নং চিত্র

দেখতে দেখতে ওরা শুধু এক পাশের প্রতিকৃতি আঁকতেই অভ্যস্ত হয়েছিল। সামনে থেকে দেখে চিত্রে রেখাঙ্কিত করবার আঙ্গিকটুকু হয়ত ওদের একেবারে অজানা ছিল।

হাড়ের ওপর মূর্ত্তি খোদাই করার ঝোঁক কেন যে ওদের চেপেছিল তা আল্‌টামিরা গুহার ছবিটি দেখলে কতকটা হয়ত অনুমান করা যেতে পারে। এই গুহার ভিতর হাড়ের ওপর খোদাই করা একটি হরিণের মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। গুহার গায়েও কিন্তু ঠিক সেই রকমের একটি মূর্ত্তি আঁকা আছে। গবেষকরা তাই অনুমান করেন, গুহার বাইরে বসে জীবটিকে লক্ষ্য করবার সময় শিল্পীরা বোধ হয় হাড়ের ওপর তার একটি খসড়া (sketch) করে নিত। পরে গুহার গায়ে আঁকত সেই ছবিরই অনুলিপি। হাড়ের ওপর খোদাই-করা মূর্ত্তিটিকে তখন ব্যবহার করত মডেল হিসেবে।

ম্যাগ্‌ডালেনীয় যুগের অবসানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এই যুগের শিল্পের অবসান ঘটে। কালক্রমে শিল্পীদের স্বচ্ছ শিল্প-বোধে ভাটা পড়তে থাকে, ওদের শিল্পের সজীবতাও ম্লান হতে থাকে। তবে এই যুগের যে সব গুহাচিত্র ও ভাস্কর্য্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই যে পৃথিবীর শিল্পকলার ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ হিসেবেই গণ্য হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঘুম

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

ঐ চেয়ে দেখ তারায় তারায়
তোমার আকাশে স্বপ্ন ছড়ায়,
মেল গো নয়ন তন্দ্রাতুর।
নিশার ঘণ্টা দূরে বেজে যায়
শোন কান পেতে রাতের গান।

চেয়ে দেখ রাত কি যে মোহময়,
জ্যোৎস্না ঝরিছে দূর বনময়।
উধাও সময়—স্বপ্ন মিলায়,
ঘুমের গহনে রজনী যায়,
মোহময় মধু রজনী যায়।

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১০

ফিরে এল শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহে। বাড়িটা শ্রান্তি দূর করবার মত নয়—তবু এই হ'ল তার আশ্রয়।...

দোতলায় উঠবার মুখে একটি উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে আরও কয়েকটি গলা শোনা গেল। বাইরের কেউ এসেছেন।

একটি বড় মোমবাতি জ্বলছে ঘরে—ঘরটা বেশ আলোকিত হয়েছে। মাদুরের ওপর বসে দু' তিন জন যুবক আর শুভা একটা বড় কলাইকরা প্লেট থেকে খাবার তুলে নিয়ে খাচ্ছে—পাশের প্রকাণ্ড শালপাতার ঠোঙাতেও রয়েছে খাবার। খাবার নিয়ে চলছে ছেলেমানুষি—কাড়াকাড়ি—আর চলেছে গল্প আর হাসি। অন্তরঙ্গতার পরিমণ্ডলে বাতিটাকে বেশী উজ্জ্বল মনে হচ্ছে আর ঘরের শোকস্তব্ধ নির্জনতাটা উপলব্ধি হচ্ছে না।

প্রশান্তকে দেখে শুভা কোলাহল করে উঠল, এস কমরেড বসে পড়। তার পর যুবক তিনটির পানে ফিরে ওর পরিচয় সাধন করিয়ে দিলে।

প্রশান্ত আসন গ্রহণ করলে। বাতির আলোয় অত্যন্ত রুক্ষ চেহারার মানুষকেও কিছু কোমল বোধ হয়—একজনকে ওরই মধ্যে সমগোত্রীয় মনে হ'ল প্রশান্তর। আর দু'জন নিতান্ত পথে-বেড়ানো পোষের চেহারা। যেমন উস্কখুস্ক চুল—তেমনি আধ ময়লা পাঞ্জাবী গায়ে—মুখ রুক্ষ—আর খাবার খাওয়ার মুহূর্তে চোখ দুটিতে খাদ্য-লালসার চিহ্ন ফুটে রয়েছে। অতীন আর চারু ওদের নাম। কমরেড অতীন—কমরেড চারু—পদবীপুচ্ছ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কমরেড অবন্তীকে মোটের ওপর মন্দ লাগল না। বেশবাসে রুচি আছে—আর মুখে আছে লালিত্য। মাথার একপাশে টেরি কাটা—তেল কিংবা লাইমজুসের কল্যাণে চুলগুলি চকচক করছে।...সে-ই বললে, আরম্ভ কর কমরেড—নইলে হ্যাভ-নটদের দলে পড়বে।

শুভা বললে, এটাকে ভোজও বলতে পার। অবন্তী মীরাট যাচ্ছে কাল চাকরি নিয়ে—তারই খাওয়া।

কোন্ আপিস? জিজ্ঞাসা করলে প্রশান্ত।

মিলিটারি একাউণ্টস্। মাইনেটা মন্দ নয়—আর শুনেছি—অনেক বাঙালীও আছে ওখানে।

অতীন বললে, বাঙালী না থাকলেই বা কি? দিস ওয়ার্লড ইজ আওয়ার হোম।

চারু বললে, পার তো আমাদেরও টেনে নিও। যুদ্ধের পর পৃথিবীটা বেশী অশান্ত হয়ে উঠেছে।

শুভা বললে, হোক অশান্ত—নব বিধান রচনার পক্ষে এই তো সুযোগ। আরে—হাত গুটিয়ে বসে রইলে কেন—নাও। দুখানা সিঙাড়া ও প্রশান্তর হাতে তুলে দিলে।

চারু বললে, সন্ধ্যে বেলায় এই জলখাবার খেয়ে আমি কিন্তু রাত কাটাতে রাজী নই।

শুভা বললে, আজ রান্নাঘর থেকে ছুটি নিয়েছি কমরেড—উনুন জ্বলবে না।

চারু বললে, বেশ তো—তোমাকে ছুটি দেওয়া গেল। কি হে অতীন খিচুড়িটা নামাতে পারবে?

অতীন বললে, কেন পারব না—কিন্তু কমরেড-খিচুড়ি নয়—রীতি মত ঘি চাই।

অবন্তী বললে, জগা-খিচুড়ি বল। তার চেয়ে ব্যবস্থা যখন করবেই—আর একটু ওঠ। ঘি ভাত—খাঁটি বুর্জোয়া রীতিতে।

একটা হর্ষধ্বনি উঠল। অতীন দু'হাতে চাপড়ালে মেঝে—চারু দিলে করতালি—শুভা চাপড়ালে অবন্তীর পিঠ। প্রশান্তর মুখ ঈষৎ গম্ভীর হ'ল। মনে হ'ল ওরা অত্যন্ত ছেলেমানুষ।

শুভা বক্র দৃষ্টিতে প্রশান্তর পানে চেয়ে বললে,—ঘি ভাত তোমার মনঃপূত নয়—প্রশান্ত?

অসুখে আর তার অরুচি।

ব্যস—ব্যস—। অতীন আর একটা চাপড় মারলে মেঝেতে।

প্রশান্ত বললে, কিন্তু...রসনাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে কি? যে কোন ছিদ্রপথে—একটু আরাম প্রবেশ করলে—

অবন্তী বললে, পিউরিটানদের মত কথা বলছ কমরেড।

অতীন বললে, যা হাতে আসছে—তাকে না নিয়ে ফাঁক করব এত বড় বোকা আমরা নই। কাল হয়ত পান্তা ভাত জুটবে না—তা বলে আজকের ভোজ ছেড়ে দেব। একটু থেমে বললে—আমরা হচ্ছি জ্ঞানী লোক—বোকাদের টাকায় ভোজ বাগিয়ে বুদ্ধি প্রকাশ করতে ভালবাসি।

শুভা অবন্তীর কাঁধে মৃদু চাপড় মেরে বললে, শুনলে তো—প্রকারান্তরে ও তোমাকে বোকা বলছে।

চারু বললে—কাজের কথা কও। একটা কাগজ আর পেন্সিল দাও—ফর্দটা করে ফেলি চটপট।

অবন্তী বুকপকেট থেকে ছোট নোটবই আর ফাউন্টেন বার করে বললে, বল। কলম উদ্যত করে সে বললে, কিন্তু ভাল চাল জোগাড় করবে কোথায়?

চারু বললে, সে ভার আমার। র‍্যাশন হয়েছে বলে কলকাতায় পোলাওয়ের চাল মেলে না—এ কথা ভুলে যাও।

ব্ল্যাকমার্কেট তো! তাতে আমি রাজী নই। অবন্তী নোটবই বন্ধ করলে।

অতীন বললে, আরে—চালের অভাবে পোলাও বন্ধ হবে—নাই নো মীন্‌স্‌। এক জায়গায় আছে চাল—ন্যায্য দামে পাওয়া যাবে। আলো চাল—গন্ধটা নেই।

চারু বললে, ওতেই হবে।

অবন্তী বললে, যা ব্যাপার তাতে রাত্রিতে বাড়ি ফেরা সম্ভব বলে বোধ হয় না।

শুভা বললে, নাই বা ফিরলে।

অতীন বললে, এর আগে যেন কোনদিন এখানে রাত কাটাও নি? তুমিও কম পিউরিটান নও কমরেড। হাসতে হাসতে সে প্রশান্তর পানে ফিরে চাইলে।

ভাবটা তোমার হয়ে—প্রত্যুত্তরটা আমিই দিলাম।

একটু থেমে বললে, চাকরি করেন তো?

প্রশান্ত বললে, না।

ও—। মাথা চুলকে সে একবার কাসলে।

চারু বললে, আর একটা খাঁটি পাওনা রইল অতীন, নোটবইয়ে টুকে রাখ।

প্রশান্ত বললে, চাকরি পাই যদি—

পাবেই চাকরি, বাংলাদেশের পাস করা ছেলে চাকরি পাবে না ত পাবে কে শুনি! চাকরি তুমি পাবেই।

চারুর অদ্ভুত যুক্তিতে প্রশান্ত হেসে ফেললে। বললে, শুধু বাংলার দোষ দিও না। কিন্তু তুমিও ত চাকরি করছ না।

করব বৈকি—কলেজ থেকে বার হই আগে।

কলেজ!—প্রশান্ত একটু অবাক হ'ল। এই ছন্নছাড়া চেহারার ছেলেটি কলেজে পড়ে?—বিত্তহীন পথে-ঘোরা ছেলে বলেই সে প্রথম দর্শনে একে অবহেলা করেছিল!

কিন্তু কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরিই বা করবে কেন তুমি? বিস্ময়কে সে এইভাবে প্রকাশ করলে।

চারু বললে, মহাজনদের পন্থাই জানি—তাই বলেছি। হাঁ সুবিধা হলে অন্ত কিছুও করতে পারি। তবে সেই অন্ত কিছুটা যেহেতু জানি না কি—

ওঠ—ওঠ—যথেষ্ট বখামো হয়েছে—। অতীন তাকে একটি ঠেলা দিলে।

কর্দ্দটা কিন্তু পাই নি। আর—

অবন্তী পকেট থেকে একখানি দশ টাকার নোট বার করে তার হাতে দিলে।

শুভা বললে, সেরখানেক ঘি আর এলাচ লবঙ্গ কিসমিস সামান্য আনবে। অতীন বাজারটা তুমি করবে আর চাল।

টাকা নিয়ে দু'জনে বার হয়ে গেল।

মিষ্টির ঠোঙাটা হাতে নিয়ে শুভাও দাঁড়ালে। বললে, বুড়িকে মিষ্টি খাইয়ে আসি—বোস কমরেড।

বাতিটা আধাআধি পুড়ে গেছে—আলোর জোর বেড়েছে। দু'জনকে দু'জনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। চুপ করে থাকা অশোভন। দু'জনের চিন্তায় যারা ভিন্নমুখী বলে কয়েকটি মিনিট নীরবে কেটে গেল।

প্রশান্ত ভাবছে—অবন্তী ভাগ্যবান। আজকের রাত্রিটা ওরই নিজস্ব বলতে পারা যায়।—এই নিরানন্দ পুরীতে আনন্দ-সৃষ্টি করেছে সে।

অবন্তী ভাবছে, কালকের কথা। নির্ব্বান্ধব দূরদেশ—একা—অজানা আপিস। চাকরির জগতে এই তার প্রথম প্রবেশ—সহ্য হবে ত!

হঠাৎ সে প্রশান্তকে প্রশ্ন করলে, আপনি চাকরি করেছেন কখনও?

প্রশান্ত একটু অবাক হ'ল তার প্রশ্নের ধরণে। দু'জনে মুখোমুখি বসেই—কথায় সুর পালটে গেল। আপনি সম্বোধন এই প্রথম অবন্তীর মুখ থেকে বেরুল। এটা কি চাকরি পাওয়ার সুর—ভদ্রতার সুরু? বললে, হাঁ—তবে বেশী দিন নয়।

অবন্তী বললে, চাকরি করা শক্ত—না চাকরি রাখা শক্ত?

এ প্রশ্নও অদ্ভুত। প্রশান্ত বললে, আমি দশ-বার দিনের বেশী চাকরি রাখতে পারি নি। তবে সকলের হাত ত সমান নয়।

অবন্তী মাথা নাড়লে। ঠিক বলেছেন আপনি। চাকরিটা বলতে গেলে আমি নিচ্ছি না—সংসারই নেওয়াচ্ছে।

তাই নেওয়ায়। সংসার মানুষের কাছে দাবি করে—পাওনার বেশী—অনেক বেশী। অভিজ্ঞজনের মত প্রশান্ত জবাব দিলে।

আপনার সঙ্গে আমার মিলছে। আপনার ভাইরা নিশ্চয় ইস্কুল কলেজে পড়ে—বোনেরা বিবাহযোগ্যা। বাবা ইন্‌ভ্যালিড—আর মা নেই। ঘরেআছেন বিধবা পিসি আর নিষ্কর্ম্মা কাকা।

প্রশান্ত হেসে বললে, সব না মিলুক কতক মেলে।

তা হলে আমিই বা চাকরি রাখব কি করে? চিন্তায় ওর ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

তা জানি না। যে চাকরির মাইনে হাতে না পেয়েও ভোজের ব্যবস্থা করতে পারেন যখন—কথাটা খোঁচার মত নিজের কানেই বেসুরো বাজতে ও সহসা থেমে গেল।

অবন্তী বললে, পয়সার চেয়ে বন্ধুবান্ধবদের দাবি অগ্রগণ্য নয় কি? ওদের সঙ্গ থেকে যে আনন্দ আমি পেয়েছি তার মূল্যও অন্তত দেব না!

প্রশান্ত চুপ করে রইল। মনে মনে বললে, পৃথিবীতে সব জিনিসেরই দাম দিতে হয়। সে মূল্য ন্যায্য কিংবা অন্যায্য সে ত আর সাম্যবাদ ঠিক করে দিচ্ছে না। বিশেষ করে এই প্রীতিভোজনের ব্যাপারটায়।

শুভা ফিরে এল। বললে, অবন্তী, মা তোমাকে ডাকছেন।

অবন্তী শুভার সাহায্য না নিয়ে ভিতরে চলে গেল। অন্দর-

মহল তার অপরিচিত নয়—শুভার মায়ের সঙ্গেও স্নেহমধুর একটি সম্বন্ধ যে বিদ্যমান সে অনুমান করা বিচিত্র নয়।

প্রশান্ত বললে, আজ আমি আসি শুভা?

আসবে? কোথায় আসবে? ইস্ তোমার মুখ এত শুকিয়ে গেছে! শরীর খারাপ হ'ল নাকি? শুভা এগিয়ে এসে ওর ডান হাতখানি তুলে নিলে।

তুমি নাড়ী দেখতেও জান?

জানি—অত্যন্ত চঞ্চল তোমার নাড়ি—বায়ুটা বেড়েছে। গম্ভীরভাবে শুভা বললে।

আর কিছু বুঝতে পারছ না? কোমল স্বরে প্রশান্ত প্রশ্ন করলে।

আরও কিছু? হঁ—তাও আছে, কিন্তু সে রোগের নিদান যে শাস্ত্রে আছে—তার ব্যবস্থা আপাতত চলবে না। শুভা অতি কষ্টে হাসি চেপে গম্ভীর ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

প্রশান্তর বুকে প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস নেমে এল—সহসা ও শুভার হাতখানা চেপে ধরে ভীষণ বেগে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে করতে বলে উঠল, তুমি জান শুভা—তুমি জান।

শুভা সে বেগের টান সহ্য করতে না পেরে তার বক্ষোলগ্ন হ'ল। কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করলে না—বা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য অযথা বলপ্রকাশের অভিনয় করলে না।

কয়েকটি মুহূর্ত। শুভার কপোলের উপর উষ্ণ নিশ্বাস অনুভূত হতেই সে অত্যন্ত সহজ ভাবে প্রশান্তর হাত ছাড়িয়ে সোজা হয়ে বসলে—বিস্রস্ত কাপড়খানা গুছিয়ে নিয়ে বললে, আমি জানি। দেহের দাবিটা অস্বীকার করে লাভ নেই কমরেড কিন্তু মনকে ওর থেকে আলাদা করে রাখাই ভাল।

ওর এই নিরুত্তাপ উত্তরে প্রশান্তর রক্ত কয়েক ডিগ্রি নেমে এল। এত বড় কথা বললে শুভা! শুভান্তঃপুরের কোন বাঙালী মেয়েই এ ধরণের কথা উচ্চারণ করতে পারে না। ও স্তম্ভিত হয়ে হাতখানি গুটিয়ে নিলে।

শুভা বুঝলে এই উত্তর প্রশান্তর মনে কি প্রতিক্রিয়া এনেছে। গৃহধর্ম বলতে যা বোঝায়—ও জিনিস তার অন্তর্ভুক্ত নয়।...মন যুক্ত হোক আর নাই হোক, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ দিয়ে সপ্তপদীর মন্ত্র উচ্চারণ—এ সবের মারফৎ যে বাঁধন দেহগত দাবির প্রতিষ্ঠা করে—তারই আবহাওয়ায় প্রশান্ত মানুষ হয়ে উঠেছে। এই সমাজ-বিদ্রোহমূলক কথা ওদের কানে বেসুরো লাগবেই।

কি প্রশান্ত, আমার কথায় দুঃখ পেলে?

প্রশান্ত ম্লান হাসি হেসে বললে, এ ছাড়া তুমি কি-ই বা বলতে পারতে শুভা।

অভিমানের অন্তর্নিহিত সুরটা শুভা বুঝলে। কিন্তু এ নিয়ে আপাতত তর্ক করে লাভ নেই। অবন্তী ফিরে আসছে।

অবন্তী এসে ওদের বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করলে না; বললে, তোমার মার অদ্ভুত স্নেহ শুভা—বলেন—দূর দেশে নাই বা গেলে।

শুভা মাথা নেড়ে বললে, ঠাকুরমা কি বললেন?

বললেন—পশ্চিমে নাকি অনেক তীর্থ আছে সেগুলি দেখতে ভুল না করি।

শুভা বললে, তুমি বুঝি বললে—তীর্থ দেখবার বয়স আগে হোক—

প্রশান্ত বললে, যাই বল তোমার তীর্থস্থান নিয়ে এমন উপহাস করা ভাল নয়।

ওর স্বরে চমকে উঠল দু'জনে। অবন্তী বললে, দেবদেবীর ওকালতনামা নিশ্চয়ই নেন নি!

না, দেবদেবী না মেনেও এটা মানতে বোধ হয় আপত্তি করবে না যে—দেশভ্রমণে অভিজ্ঞতা বাড়ে—মনের প্রসার হয়।

তেমনি করে দেশভ্রমণ করি আমরা? কোন তীর্থে কখনও কি যান নি, না মা ঠাকুরমার মুখে সেখানকার গল্প শোনেন নি? দেবতার নামে এই যে বিরাট ব্যবসা—

শুভা বললে, প্রশান্ত জানে বৈকি—শুধু তর্কের খাতিরে—

প্রশান্ত বেগের সঙ্গে বললে, শুধু তর্কের খাতিরে নয়—তুমি বয়সের কথাটা তুললে—

বয়সের কথাটাই তো আসল। শরীরের সামর্থ্য গেলে তীর্থ করা দুষ্কর হয়ে ওঠে—এটা তোমরা বলে থাক কিন্তু আমি জানি দেহের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে না এলে যথার্থ ধর্ম—অবশ্য ধর্ম বলতে সাধারণে যা বোঝে তারই কথা বলছি—যথার্থ ধর্ম সাধন হয় না। কেন?—শক্তি প্রবল থাকলে—মন ভক্তির চেয়ে যুক্তিকে মেনে নিতে ভালবাসে—কিন্তু শক্তিহীনের অবলম্বন যে অদৃশ্য শক্তি সে অস্বীকার করি কি ক'রে। সুতরাং পলিত কেশ, গলিত দন্ত, পরনির্ভরশীল বুড়োবুড়ীদের ওই তো হ'ল একমাত্র আশ্রয়।

অবন্তী হেসে উঠে বললে, তোমার তর্কে যুক্তি আছে—কিন্তু যুক্তির চেয়েও বেশী আছে ঝাঁজ।

প্রশান্ত বললে, ধর্মকে অস্বীকার কর—

অস্বীকার করলাম কোথায়! শুভা হাসিমুখে বললে, ধর্ম—আর ধর্মের আচার আচরণ দুটিকে মিশিয়ে গোল পাকাই নি। সব মানুষের সমান অধিকার—এও কি বিশেষ একটা ধর্ম নয়! আমরা ধর্মের বিচার করি তার pragmatic value দিয়ে।

অবন্তী বললে, ব্যস—ব্যস আর নয়। উনুনটায় এই বেলা কিছু কয়লা দিয়ে দাও—

শুভা বললে, আজ আমার ছুটি বলি নি!

বলেছ—কিন্তু রান্নার উদ্যোগ করে দেবে না—এ ত বল নি!

অতীন ও চারু শুধু ঘি-ভাতের জিনিষপত্র নিয়ে ফিরে এল না—তার সঙ্গে এল দু'জন মহিলা আর তিন জন পুরুষ বন্ধু।

হৈ-চৈ রীতিমত হ'ল—রান্নাও করলে সবাই মিলে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে রাত্রি দুটো বেজে গেল। তারপর সেই ঘরেই মাদুর, চট, সতরঞ্চি বিছিয়ে ঢালা বিছানা হ'ল। স্ত্রী-পুরুষ শুয়ে পড়ল পাশাপাশি। শুয়ে শুয়ে খানিক চলল গল্প—তর্ক—পুঁজিবাদীদের নিয়ে—আচার প্রথা নিয়ে হাসিঠাট্টা—তারপর একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রশান্তর চোখে ঘুম এল না। এক ঘর লোকের নিশ্বাস পতনের দরুন ঘরের বায়ুস্তর উষ্ণ হয়ে উঠেছে। এ রকম অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম। যদিও ঘরে আলো নেই তবু সে কল্পনায় অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করছে। নিদ্রার অসতর্ক মুহূর্তে—মানুষ কত অসহায়—। আলোর শাসন কোন কোন বৃত্তির পক্ষে পরম কল্যাণকর—অন্ধকারের আশ্রয়ে তারা নিরঙ্কুশ। ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো মস্তিষ্কের রক্ত চালনা স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে—কিন্তু মাথার রক্তে যদি কামনার আগুন জ্বলে ঘুম আসবে কোথা থেকে! শুভার সব কথা তখন মুছে গেছে—শুধু জাগছে ওই কথাটি :

দেহের দাবিটা অস্বীকার করে লাভ নেই কমরেড। দেহের দাবি—শুভাকে সে ভালবেসেছে? এ ভালবাসার কি অর্থ? সে অর্থ কি ওর কথায় পরিস্ফুট হয় নি? তবু প্রশ্ন জাগে—মানুষের মন কিছু জলে-ডোবা পদ্মপাতা নয়—কিংবা হাঁসের পালকও নয়। আগুন নিয়ে খেলতে গেলে হাত পুড়বেই—অথচ আগুন নিয়ে খেলতে না গেলেও মনের অতৃপ্তি ঘোচে না। মন না জড়িয়ে পড়লে সে এতদূরে এল কেন? আর কোন মেয়েকে না চেয়ে শুভাকেই বা কামনা করে কেন? অথচ শুভা—ব্যক্তিগত সম্পত্তি সঞ্চয়ের বিরোধী। মানুষ কি সম্পত্তি? হাঁ—ওরা বলবে ভালবেসে যাকে আপন করে নিতে চাও তার স্বাধীনতা হরণ করবার জন্যই তোমার আবেগ-উচ্ছ্বাস—ত্যাগ এ সবের কলকৌশল। দুটি স্বাধীন মানুষ—তাদের স্বাধীন মত নিয়ে মিলতে পারে শুধু সাময়িক ভাবে কতকগুলি সুবিধা—সুবিধা বলতে আপত্তি হয়—সহযোগিতা বলতে পার—এই নিয়ে তারা পরস্পরের সহযোগিতা করবে—একটি মহৎ প্রচেষ্টা অর্থাৎ ভালবাসা থাকবে এই মিলনের মূলে। কিন্তু কায়ার সামীপ্য থেকে মনের গভীরে যদি প্রসারিত হয় সেই মহৎ প্রচেষ্টা অর্থাৎ ভালবাসা—তা হলেই কি বলতে পারবে তোমার স্বাধীন সত্তাকে অপহরণ করবার কৌশল! মানুষকে সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করে পেতে গেলেই যত আপত্তি, অথচ—মানুষের মুখ্য বৃত্তি এই একান্ত করে পাওয়ার সাধনাতেই সারা জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে ধন্য হচ্ছে! পুঁজি-পতিরা নিজেদের সুযোগসুবিধা কায়েমি করবার জন্য যেমন সৃষ্টি করেছে অভিমানবীয় সত্তা—কিনা ঈশ্বর—তেমনি দেহকে আর মনকে এক সঙ্গে কিনে নেবার জন্য সঞ্চারিত করেছে এই আবেগ অর্থাৎ ভালবাসা। ঈশ্বরের সঙ্গে স্বর্গের যোগাযোগে এই বৃত্তিকেও সে আখ্যা দিয়েছে স্বর্গীয় সম্পদ। সমাজ সম-ঘরের মূলে ঈশ্বরকে অস্বীকার করতেই হবে, কেননা ধনিকতা-বাদের যে ক'টি দৃঢ় স্তম্ভ ভূমিসাৎ না করলে সমভূমিতে দাঁড়িয়ে হাতে হাত মেলানো যাবে না—এটি তার অন্যতম। প্রধানতমও বলা যায়। কিন্তু ধনিকতাবাদ থাক—আজ রাত্রিতে কিছুতেই কি ঘুম আসবে না! কিসের উত্তাপে মস্তিষ্কের রক্ত প্রবাহ নিদ্রার আলস্যে শীতল হচ্ছে না? কেন এ উত্তেজনা?

টং টং করে তিনটে বাজল—সাড়ে তিনটে—চারটে। প্রশান্ত বিছানায় উঠে বসল। নিষুপ্ত নরনারীর নিশ্বাসে কেমন একটা গন্ধ ঘরের বাতাসকে করেছে ভারি। অত্যন্ত গাঢ় হয়ে উঠছে চিন্তা—একমুখীন চিন্তা, উগ্র—কামনা-কলুষিত চিন্তা। দেহলগ্ন শুভার দেহ-আস্বাদ-লোলুপ চঞ্চল রক্ত কণিকায় তরল আগুন জ্বেলে দিয়েছিল যে মুহূর্ত—তা যেন নতুন আবেগে ফিরে এল এই নিদ্রাহীন প্রহরে। নিজেকে সম্বরণ করা অত্যন্ত কঠিন।

গলা শুকিয়ে গেছে, জল তৃষ্ণায় ছাতি ফাটছে। একটু জল চাই—আলোটা জ্বালবে কি? না শুভাকে ডাকবে?

তখনই মনে হ'ল এসবের দরকার হবে না। জলের কুঁজোটা কোণের দিকেই আছে—যেদিকে সে শুয়ে আছে সেই কোণের দিকে। একটু হাত বাড়ালেই কুঁজোটা হাতে ঠেকবে। কিন্তু শুভাও বেশী দূরে নেই। এক, দুই, তিন। ঠিক দোরের সামনে। শিয়রের দিকে বালিশের নিশানা ধরে অনায়াসে সে ওখানেও পৌঁছতে পারে। এক, দুই, তিন। ওরা ঘুমুচ্ছে নিশ্চিন্তে—নির্ভয়ে। গভীর রাত্রি ওদের মস্তিষ্ক-কোষে ঘুমের স্নিগ্ধতা ভরে দিয়েছে।

বিছানা থেকে এগিয়ে গেল প্রশান্ত। এক, দুই, না—কুঁজোটাই ঠেকল হাতে। গ্লাসটাও রয়েছে কুঁজোর মুখে। গ্লাস ভরে সে জল নিলে—ঢক্ ঢক্ করে পান করলে আকণ্ঠ। সেই জলে হাত ডুবিয়ে কপালে, গালে, বুকে, ঘাড়ে, পায়ের পাতায় ও হাতের চেটোয় ভাল করে লেপে লেপে দিলে। তারপর বিছানায় শুয়ে কল্পনায় টেনে আনলে নিজের গ্রাম-খানিকে। সেই সঙ্গে ভেসে এল অশ্রুসজল একখানি মুখ—সেই করুণাস্নিগ্ধ মুখখানি আর কারও নয়—তার মায়ের।

এতক্ষণে প্রশান্ত সত্য সত্যই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল পরিপূর্ণ নিদ্রার শেষে। এ ঘরে সময়ের পরি-মাণ করা যায় না—অন্ধকার অনেকখানি তরল হয়েছে এই মাত্র। রাত্রি নেই বেশ বোঝা যায়। প্রশান্ত উঠে বসল। চারদিকে চেয়ে দেখলে—ঘরে কেউ নেই। তবে কি বেলা অনেকখানি হয়েছে? অতঃপর সে কি করবে? এ বাড়িতে এই তার প্রথম রাত্রি যাপন। কোথায় কলতলা—কোথায় শৌচাগার কিছুই তার জানা নেই। আশ্চর্য্য—তাকে কিছু না জানিয়েই ওরা চলে গেল।

শরীরে আলস্য লেগে রয়েছে—আরও খানিকটা ঘুম দি.. মন্দ হয় না। কিন্তু এ বাড়ি থেকে আজই বিদায় নিতে হবে। এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। মনুষ্যত্বের দাবি জানাতে গিয়ে মানুষ হারিয়ে যায় এর অন্ধকারে। অন্ধকারে বসে আলোকের সাধনা!

নড়বড়ে দরজায় শব্দ হ'ল—কে এল বুঝি? চোখ চাইবার আগেই সে ডাকলে, ঘুম ভাঙল প্রশান্ত?

তড়াক করে সে বিছানায় সোজা হয়ে বসল। বললে, কোথায় গেছলে সব?

অবন্তীকে তুলে দিতে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়েছিলাম প্রথমে—তারপর—

হাওড়া ষ্টেশনে? কিন্তু ক্যালকাটা-দিল্লী মেল তো—

ও পাটনায় হল্ট করবে—পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে গেল। একটু হেসে বললে, সারারাত জাগলে বেলার পরিমাণ ঠিক রাখা যায় কি কমরেড?

কে তোমায় বলছে আমি সারারাত জেগেছি?

কথাটা ভুল বলেছি কি?

ভাগ্যে ঘরটা সব সময়েই আলো-আঁধারি! মুখের ভাব গোপন করতে মুখ ফিরিয়ে নেবার দরকার হয় না। প্রশান্ত বললে, তা হলে তুমিও ঘুমোও নি শুভা?

কেন ঘুমোব না—যথেষ্ট ঘুমিয়েছি।

তবে কি করে বুঝলে আর একজন জেগে রয়েছে?

অত্যন্ত সোজা জিনিস। ঠাইনাড়া হলে শীগ্‌গির ঘুম আসে না।

আর সকলের এল কি করে!

ওদের অভ্যাস আছে। তা ছাড়া কালই প্রথম রাত কাটিয়ে গেল না এ বাড়িতে।

প্রশান্ত বললে, এ রকম করে হল্লোড় করে লাভ কি! এতে আসল কাজের ক্ষতি হয় না?

কিছুমাত্র না। যে কাজ আমরা হাতে নিয়েছি—তাতে মানুষে মানুষে যত হৃদ্যতা বাড়ে ততই কাজটা সহজ হয়ে আসে। নিজস্ব একটা বাড়ি—নিজস্ব একখানি ঘর—নিজের রুচিমত শয্যা—এর মোহ না কাটলে জগৎকে টেনে নিতে পারব কেন নিজের মধ্যে!

জগৎকে কোন দিনই এ ভাবে টেনে নেওয়া যাবে না। মানুষের প্রবৃত্তির ওপর জুলুম খাটাতে গেলে—

শুভা বললে, জুলুম এর কোন্‌খানে দেখলে? একটি ছেলেকে জন্মাবধি বিলেতে রাখলে সে যদি কথায় আচারে ব্যবহারে সায়েব হয়ে ওঠে—তার ভারতীয় রক্ত ধারা বিজাতীয় প্রভাবে ভারতীয় সংস্কারমুক্ত হয়, তবে—ঘর বাড়িয়ে নেবার মন্ত্রটি সহজাত প্রবৃত্তির মত করে কেন গড়ে তোলা যাবে না! মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বলছ যাকে—সে প্রতিবেশ-অর্জ্জিত কতকগুলি সংস্কার মাত্র। বুনিয়াদি শিক্ষার দ্বারা এ সংস্কার দূর করা অত্যন্ত সহজ।

প্রশান্ত বললে, তেমনি যাদের এই রকম বুনিয়াদি শিক্ষার অভাব তাদের পক্ষে তা অর্জ্জন করা শক্ত নয় কি?

কেন শক্ত! অভ্যাস—চেষ্টা—বলতে পার সাধনা—এগুলি আছে কি করতে! আমাদের ত্যাগের দ্বারা—সঙ্ঘের দ্বারা গড়ে তুলব এই রকম জগৎ। প্রথমটা সাম্য আনতে অনেক বাধা বাইরে থেকে আর ভেতর থেকে আসবে বইকি—তবু সব বাধার শেষ আছে এ-ও আমরা জানি।

প্রশান্ত কথা কইলে না। সে ভাবতে লাগল। এখনও সময় আছে। ঘরকে সে ভুলতে পারছে না। নীতিকলুষিত আবহাওয়া- হাঁ বার বার তার মনে হচ্ছে এ আবহাওয়ায় নৈতিক পবিত্রতা নেই। কাল রাত্রিতে নিজেকে সে স্পষ্ট চিনতে পেরেছে— সর্ব্বমানবীয় কল্যাণবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নয় নিজেরই কামনাকে পরিতৃপ্ত করতে সে এই পথে পা দিয়েছে। বাইরে স্বার্থত্যাগের বড়াই করে লাভ কি—মনের অসামঞ্জস্য বার বার তাকে পীড়ন করছে।

শুভা বললে, ওঠ শিশু মুখ ধোও—

রহস্যচ্ছলে বললেও সে স্বীকার করলে, সে শিশু। ছেলেরা চাঁদের লোভে আকাশে আঙুল তুলে বায়না ধরে—আর যৌবনের বর্ব্বরবশত সে এসেছে এই পরিমণ্ডলে। শুভাকে সরিয়ে নিলে তার ত্যাগের কোন মূল্যই থাকবে না।

সত্যিই সে কি অর্দ্ধেক পথ এগিয়েছে? পিছু হটে যাত্রা আরম্ভ করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়!

১১

বিরাজমোহিনী মলয়কে একান্তে ডেকে বললেন, তুমি আমার ঘরের ছেলের মত- হাঁ বাবা, সত্যি করে বল ত—প্রশান্ত কি সত্যিই বয়ে গেছে?

তাঁর অশ্রু-গদগদ কণ্ঠস্বরে মলয় বেদনা বোধ করলে। মিথ্যা করে সান্ত্বনা দিতে তার মন সরল না। বললে, কাকিমা, সত্যি কথা বলব রাগ করবেন না। কাকে আপনারা বয়ে যাওয়া বলেন? যে ছেলে চাকরি করতে চায় না—দেশের কাজে জেলখানায় যায়—যন্ত্রণায় ভোগে—

বিরাজমোহিনী বললেন, লেখাপড়া জানি না বলে কি ভালমন্দও বুঝতে পারি না বাবা! ও সব কাজ করে অখ্যাতি পেয়েছে কেউ সে কথা তো জানি না। অবশ্য—যে ছেলে সংসার-ধর্ম্ম কি উপার্জ্জন করে না তাকে দুনিয়ার বার বলে থাকি আর সেই ছেলের জন্যই মায়ের মন পোড়ে বেশি।

মলয় বললে, তবে কি ভেবে আপনি বললেন ও কথা?

বিরাজমোহিনী মনে মনে কি যেন হিসাব করলেন। কথাটা বলা যুক্তিযুক্ত কিনা হয়তো ভাবলেন মুহূর্ত্তকাল—কিন্তু মনের সন্দেহ ও বেদনাকে মুক্ত করে না দিলেও তো

নিস্তার নাই। অবশেষে বললেন, মায়ের মনের সাধ-আহ্লাদের কথা তো বুঝতে পার বাবা, একটি মনের মত টুকটুকে বউ পেলে সংসারটা তাদের ভরে ওঠে—

মলয় বললে, টুকটুকে বউ হলেই তো মনের মত হয় না কাকিমা।

তা না হোক—ছেলে সুখী হলেই আর সমাজে নিন্দে না হলেই আমাদের শান্তি। একটু থেমে বললেন, শুনলাম একটি মেয়ের সঙ্গে প্রশান্তর ভাব হয়েছে। আর মেয়েটি নাকি আমাদের স্বজাতি নয়।

ওঁর প্রকৃত ব্যথা বুঝতে পেরেও মলয় বললে, নাইবা হ'ল স্বজাতি কাকীমা—প্রশান্ত যদি এতে সুখী হয়—

সমাজ সে মেয়ের মর্য্যাদা দেবে কেন বাবা। এখনও তো খ্রীষ্টান হই নি আমরা।

মলয় বললে, আপনি ভাববেন না কাকীমা—হয়ত—এমনটা না-ও ঘটতে পারে। কিন্তু যদি ঘটেই-- তো একটি ছেলে আপনার—তার জন্ত সমাজ ছাড়তে পারবেন না ?

না বাবা—আমাকেও পাঁচ জন আত্মীয়-কুটুম্ব নিয়ে ঘর করতে হয়। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে—ছোট মেয়েটিকেও পার করতে হবে। আমি সমাজে চিরকাল মাথা উঁচু করে এসে কিসের জন্ত হেনস্থা সইব সকলের বল তো। শেষের দিকে স্বরে তাঁর দৃঢ়তা ফুটে উঠল।

মলয় বুঝলে উনি মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। মায়ের মনে অত যুক্তির ঠাঁই নেই—পুরুষরা কালধর্ম্মের স্রোতে পা রেখেও যখন পরিবর্ত্তনকে সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়ে মানতে পারেন না—যুক্তির সারবত্তা করেন না স্বীকার--আচার-পদ্ধতিকে প্রকৃত ধর্ম্ম বলে সামাজিক বিদ্রোহকে বলেন অনাচার—সে অনাচারের অনুষ্ঠাতাদের গালিগালাজ করেন নির্ম্মমভাবে ভদ্রতালেশহীন হয়ে—তখন অন্তঃপুরের বিধিতে ও সমাজের বিধানে অভ্যস্ত মেয়েদের কাছ থেকে কি বা প্রত্যাশা করতে পারা যায়।

বিরাজমোহিনী পুনরায় অশ্রুসজল কণ্ঠে বলিলেন, সত্যি করে বল তো বাবা—সে কি সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করবে ?

মলয় বললে, আমি বিশেষ কিছু জানি না কাকীমা, খোঁজ নেব।

শুধু খোঁজ নিলে হবে না, এগিয়ে এসে তিনি মলয়ের দুটি হাত চেপে ধরলেন, এর উপায় তোমায় করতে হবে।

উপায়! কি উপায় করব আমি ? মূঢ়ের মত প্রশ্ন করলে মলয়।

যাতে এ বিয়ে না হয়—

মাপ করবেন কাকীমা, তাদের মধ্যে যদি ভালবাসা হয়ে থাকে···না, না, আমায় মাপ করবেন।

বিরাজমোহিনী খানিকটা অভিভূতের মত চেয়ে রইলেন মলয়ের পানে। তারপর মনে হ'ল—ও তো হেমন্তরই ছেলে। নিকট প্রতিবেশিনী—যারা সর্ব্বদাই অন্বেষণ করছে প্রতিবেশীর ছিদ্র তাদের সততায় বিশ্বাস রাখা কঠিন—অত্যন্ত কঠিন। প্রতিবেশীরা ভাল—একথা পাঁচীলের পিঠে ঘর তুলে স্বীকার করা কঠিনই তো।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, তা চলবে কেন বাবা, তুমি তো অজাতের মেয়ে ঘরে আন নি—সমাজে কোন নিন্দেও হয় নি তোমাদের—

মলয় দুয়োরের কাছ থেকে ফিরে এল। নীচু গলায় বললে, আপনি দুঃখু পাবেন জানলে একথা কখনই বলতাম না কাকীমা। কিন্তু এ-ও জেনে রাখবেন—প্রশান্তকে যদি আমাদের সমাজ ঠাঁই না দেয়—আমার ঘরে ওদের জায়গা আমি রেখে দেব।

বিরাজমোহিনী এ কথায় সান্ত্বনা লাভ দূরে থাক—রীতিমত রুষ্ট হয়ে উঠলেন। মলয় ভাগ্যিস তাঁর সামনে নেই--না হলে ক্রোধের বশে তাকে কটু-কাটব্য করা তাঁর পক্ষে একটুও অসম্ভব ছিল না। দ্রুতপদে তিনি দুর্গামোহনের শোবার ঘরে এলেন।

কিন্তু ওই বার্দ্ধক্য-পীড়িত শয্যাশায়ী মানুষটিকে তিনি কি বলতে পারেন। তাঁর মনে যে বেদনা—সে কি ওঁর মনেও গুরুভার হয়ে নেই। উনি বার বার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, প্রশান্ত তাঁর ছেলে নয়—সে যদি অসবর্ণের মেয়ের পাণিগ্রহণ করে—ও ঘরে তার স্থান হবে না—এক কাণাকড়িও তাকে দেবেন না উনি। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য-উদাসীন ছেলের প্রতি কিসের বা মমতা।

দুর্গামোহন মাথা তুলে বললেন···এখন তো ওষুধ খাবার সময় হয় নি—

না—এমনি দেখতে এলাম ঘুমিয়েছ কি না ?

দুর্গামোহন একদৃষ্টে তাঁর পানে চেয়ে বললেন, কাঁদছিলে বুঝি ?

বিরাজমোহিনী ত্রস্তে চোখের কোলে তর্জ্জনীটা বুলিয়ে নিয়ে হাসলেন। বললেন, তুমি শীগ্‌গির করে সেরে ওঠ দেখি—

আমি সেরে উঠলেও তোমার চোখের জল শুকোবে না—শুকোবে না—শুকোবে না। ছেলেমানুষের মত তিনি হেসে উঠলেন।

বিরাজমোহিনীর বুকখানা কেঁপে উঠল। দুর্গামোহনের মাথার গোলমাল হয় নি তো! সত্যিই তাঁর চোখের জল শুকিয়ে গেল। বেদনাকে ঢাকা দিতে দুশ্চিন্তার মত বস্তু আর নেই।

শিয়রের টুলের ওপর বসে বললেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দেব ?

তা দাও। তবে কিছুতেই কিছু হবার নয়। বলে একটু হেসে বিরাজমোহিনীর হাতখানি টেনে এনে বুকের ওপর রাখলেন।

বিরাজমোহিনী বললেন, আজও কি বুকে তেল মালিশ করে দেব ?

না—হাতখানা রাখ। তাঁর হাতখানি চেপে ধরলেন।

আর কোন কথা হ'ল না—ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে ছুটি অন্তরের মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করতে লাগল।

১২

মলয় বাড়ি এসে দেখল—হুলস্থুল ব্যাপার লেগে গেছে। মা পা জড়িয়ে বসে কাঁদছেন, দোতলায় ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি চলছে। বড় বউয়ের ফিট্ হয়েছে। খবরটা কাঁদতে কাঁদতে মা-ই দিলেন।

এর বেশী কিছু জানতে হলে সুচিত্রা ছাড়া গতি নেই। ও এতক্ষণ বড় বউয়ের শুশ্রূষায় লেগে রয়েছে। ছেলেরা গোলমাল করছে—হয়ত বা ভিড়ও জমিয়েছে।

উপরে উঠে দেখে—সত্যিই ব্যাপারটি কিছু গুরুতর। একটি ঘটি কাত হয়ে বারান্দার রেলিঙে ঠেকেছে—জল গড়াচ্ছে সারা মেঝেয়। পাখা খান দুই এসেছে—আর জলে ভিজে সপ সপ করছে। রোগীর সারা দেহে আক্ষেপ তো আছেই—মাথার চুল আর বিশৃঙ্খল পরিবেশ থেকে জল পড়ছে গড়িয়ে। দশ বছরের ভাইপোটা শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে পাখা নাড়ছে। হাওয়াটা রোগীর মাথায় লাগছে না—মেঝেয় লাগছে। দাঁতে দাঁত লেগেছে রোগীর। একটি মাঝারি গোছের চাবি অতি কষ্টে সুচিত্রা দাঁতের মাঝখানে বসাতে পেরেছে। এখন সে হাঁটু গেড়ে বসে রোগীর হাতের মুঠো খুলে দিচ্ছে—আর চাবিটা যাতে দাঁতের চাপ থেকে আলগা হয়ে না পড়ে সেই চেষ্টা করছে।

মলয় বললে, হঠাৎ এ রকম হ'ল কেন ?

বলছি। তুমি ভাল করে হাওয়া লাগাও তো মাথায়।

কেন...স্মেলিং সল্টের শিশিটা কোথায় গেল ?

বড়দির হার্ট খুব উইক—এ্যামোনিয়া চলবে না। ব্লটিং পুড়িয়ে ধোঁয়া দিতেও পারতাম—সাহস হ'ল না।

মেয়েটির হাত থেকে পাখাখানি নিয়ে মলয় বাতাস করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আঁ-আঁ—করে রোগী পাশ ফিরল। হাতের মুঠি নরম বোধ হ'ল।

সুচিত্রা বললে- তুমি ঘরে গিয়ে বোস—এখনি জ্ঞান হবে বড়দির।

...বাড়ির এই আবহাওয়া কোন কালেই ভাল লাগে না মলয়ের। বহু পুরাতন জটিল রোগের তীব্রতা না থাকলেও —নিত্য নূতন উপসর্গে যেমন বিরক্তি জন্মায়—তেমনি মনে হয় বাড়িটাকে। কয়েক বিঘা জমির মালিক হয়ে—নানা প্রকারের অশান্তি বাসা বেঁধেছে এখানে। বাপ ঠাকুরদাদারা চেয়েছিলেন—উপার্জ্জনের অর্থে ভাবী বংশধরদের খাওয়া-পরার সুব্যবস্থা করতে। লক্ষ্মী যে চঞ্চলা—যাঁদের জমি আছে—তাঁরা এ প্রবাদবাক্যের মর্ম্ম বোঝেন। আজ জমির স্বত্ব থেকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না—জমির হাঙ্গামা পোহাতে হয় শুধু।... চাষার হাল বলদ দিয়ে জমি চাষ দেয়—ভাগ আধাআধি। কিন্তু সেই আধাআধি ভাগের সিকিও ঘরে ওঠে না যথাসময়ে তদারক না করলে। খাজনা মিটাবার দায় তাদের—জমিতে সার দেবার খরচ সেও তাদের—আবার কোন্ জমিতে কি ফসল দেওয়া কর্ত্তব্য এ নির্দ্দেশ দিতে পারলেও ভাল হয়। শ্রাবণে বা ভাদ্রে ধান রোয়া শেষ হলেই চাষের কর্ত্তব্য শেষ হবে না। কার্ত্তিকে একবার জমি দেখা দরকার—কি ফসল হ'ল। তার পর পৌষে দিন পনর ধরে সেই ফসল কাটা—ভাগ বুঝে নেওয়া—খড় বিক্রী করা—ধান গোলাজাত করা—গেল বার যাদের ধান ধার দেওয়া হয়েছে—তাদের কাছ থেকে বুঝে নেওয়া—এ সব বহু জটিল ব্যাপারের অন্তর্গত। বার দুই মলয়কে এই সব তদারক করবার জন্য যেতে হয়েছিল। বড়দা থাকতে তিনি পোয়াতেন এসব হাঙ্গামা। তাঁর অবর্ত্তমানে মেজদা প্রতি বছরে এই সময়টি এক মাস করে ছুটি নিতেন। কিন্তু একবার বিশেষ জরুরি কাজ পড়াতে অফিসার মেজদাদাকে ছুটি দেয় নি—আর একবার উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেই দু'বারের অভিজ্ঞতা—সারাজীবনে ভুলতে পারবে না মলয়। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা—বা মাঠে মাঠে ভরা সোনার ধান—মনে হয়েছিল কবিদের অত্যুক্তি। যে কবির জমি ছিল না—পাকা ধান ভরা মাঠের শোভা দেখে মুগ্ধ হওয়া তাঁরই মানাতো। কিন্তু সরল চাষীদের কাছে ভাগ বুঝে নেওয়া ও হিসাব মিল করা—ধান কাটা—আছড়ানো—কড়তা বাদ—সুদের হিসাব—পায়ে ধরাধরি...ফাঁকি দেবার কচকচি...এ সব বাস্তব ব্যাপারকে লক্ষ্মীর আবাহন বলে ভুল করবেন না কেউ। চাষারা সরল দুঃখী আর নির্ব্বোধও বটে—তবে পয়সার দিক দিয়ে তারা শক্ত। একটি পয়সার জন্য তারা অজস্র কথা বানিয়ে বলবে—রাতারাতি মাঠের মাড়াই ধান সরিয়ে ফেলবে—না দেখলে ত কথাই নেই। সব চাষার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না—তবে মলয় যাদের সংস্পর্শে এসেছে তাদের কথা তোলা শক্ত। হয়তো অনেক দিনের অত্যাচার সয়ে—এই সংস্কার তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে যে যারা হিসেব বুঝে নিতে আসে তাদের সঙ্গে শঠতা না করলে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবেই। হয়তো পাইকদের হাতে লাঞ্ছনা সয়ে—নায়েবের ধমক ও চোখ রাঙানী পেয়ে স্বভাবটা ওদের অমনিই দাঁড়িয়েছে। পীড়ন শুধু দেহকেই পঙ্গু করে না—মনকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে—নীতি থেকে করে ভ্রষ্ট। ওরা যা হতে পারত তা হতে পারে নি—লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা রয়েছে এর মূলে। সেইজন্য প্রভু জাতীয় যে কোন লোককে ঠকাতে ওরা সিদ্ধহস্ত। এই বঞ্চনা যে ঘৃণার নামান্তর নয় তাই বা কে বলবে ?

বহুদিন থেকে একটা কথা কাণাকাণি হচ্ছে। চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত বাকি থাকবে না। মধ্যস্বত্বভোগীদের সুবিধাটুকুও আইন করে কেড়ে নেওয়া হবে। যে নিজের হাতে হাল বলদ দিয়ে যতটুকু জমি চষতে পারবে—তারই স্বত্বে সে হবে স্বত্ববান। এতে করে প্রত্যেক রায়তের হাতে জমি আসবে—ঋণের দায়ে মহাজনের কাছে তাদের মাথা বিকিয়ে থাকবে না। সরকার বাহাদুর আর প্রজা—মাঝখানে হিস্যাদার কেউ থাকবে না। হোক না আইন—মলয় এতে অমঙ্গল কিছু দেখতে পায় না। লোকে বলে বটে—লক্ষ্মী বসতি করেন তারই ঘরে—যার দু'বিঘে আছে। গত মহা দুর্ভিক্ষে সে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যাদের জমি ছিল—তারা পেট ভরে খেয়েছে আর সিন্দুক ভরে জমিয়েছে টাকা। সম্পন্ন চাষা দশ টাকা দামের শাড়ি কিনে গৃহিণীকে উপহার দিয়েছে, নিজের জন্ত কিনেছে সাইকেল। যারা জনমজুরি করে খায় দু' এক বিঘে জমিতে ভাঙা লাঙল ও রুগ্ন বলদ খেদিয়ে চাষ দেয়—তারাই মরেছে দুর্ভিক্ষে। এই ব্যবস্থা হলে—সামান্ত জমির মালিকরা কিংবা যাদের জমি নেই তারা অন্তত খেয়ে পরে বাঁচবে। মধ্যস্বত্বধারেরা যাবে কোথায়? জমির উপস্বত্ব যাদের উপরি আয়ের সামিল—তারা করুক না যা খুশী। নিজের হাতে লাঙল ধরতে পারে জমি থাকবে হাতে—না পারে যার শ্রম—তারই ঘরে বিতরিত হোক কমলার কৃপা। এতে দুঃখ করবার কি আছে!

সুচিত্রা ঘরে এসে বললে, একবার নন্দ-দাদুর কাছে যাও তো। তিনি নাকি বট্ঠাকুরের কি খবর এনেছেন।

দাদার খবর! কে বললে তোমাদের?

কেন—পটার মা এই মাত্র বলে গেলেন মাকে। তা তিনি যদি খবরটা চুপি চুপি বলেন তো বড়দির কিছু হয় না।

কি বললে পটার মা?

নাকি—মথুরা না বৃন্দাবন কোথায় ট্রেনে এক সাধুর সঙ্গে ওঁদের দেখা হয়। সাধু ওঁদের গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করে—আরও অনেক কথা শুধায়। এক সময়ে নাকি বলেও ফেলেছিলেন—তে-মাথা রাস্তায় যে বড় বটগাছটা আছে সেটা এখনও আছে—না কেটে ফেলা হয়েছে? যেমন বলা নন্দ-দাদু চেপে ধরেন—তিনি জানলেন কি করে তে-মাথা রাস্তায় বটগাছ আছে। সাধু একটু হেসে বলেন, ও গ্রামে আমি একবার গিয়েছি। কবে? কেন? কত দিন ছিলেন সেখানে? এই সব জিজ্ঞাসায় সাধুকে জেরবার করে ফেলবার পর নন্দ দাদু বুঝতে পারলেন—এক বার নয়—হয়তো অনেক বার উনি ওখানে গেছেন আর অনেক দিন ছিলেনও ওখানে। কোন জংশনে গাড়ী বদল হতেই সাধুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়—কিন্তু তাঁর আশ্রমের ঠিকানা ওঁরা নিয়ে এসেছেন।

ও—ওঁদের বিশ্বাস হয়েছে দাদাই সেই সাধু?

সুচিত্রা বললে, বিশ্বাস কি সাধে হয়েছে। নামবার সময় সাধু আমাদের বাড়ির কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছেন যে।

তারপর?

তারপর—তোমার তো অনেক বন্ধুবান্ধব আছে বহু জায়গায়—খোঁজ নাও।

আর খোঁজ না পেলে নিজেকে সেই আশ্রমের ঠিকানা খুঁজে বার করতে হবে?

কেন—সে কি তোমার কর্তব্য নয়?

কিন্তু দাদার বিরুদ্ধে খুনের চার্জ উইথড্র হয় নি। এ্যাবস্কণ্ডারকে খুঁজে বার করার মানে বোঝ তো?

সুচিত্রা শুষ্ক স্বরে বললে, এত দিন পরেও কি—

রাজার আইন কাউকে ক্ষমা করে না।

কিন্তু মা যে কাঁদছেন।

কাঁদুন।

বড়দির জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়, সে কথা ভাবছ কি!

মলয় মাথা নেড়ে বললে, যদি কোন দিন আইন হয় নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে হিন্দু-স্ত্রী অনায়াসে বর্জন করতে পারবে—আমি সে আইন সমর্থন করব।

তুমি তো আইন সভার কেউকেটা নও—তোমার সমর্থনের মূল্য কি! সুচিত্রা হাসলে।

কিন্তু এ নিয়ে প্রোপাগাণ্ডা করতেও তো পারি।

ক'রো—উপস্থিত খবরটা নেবে কিনা তাই বল?

চটি পায়ে দিয়ে মলয় বললে, এইজন্ত বাড়িতে আসতে চাই না—একটা-না-একটা হাঙ্গামা তোমরা বাধাবেই।

হাঙ্গামা! তোমরা যে স্বদেশী কর—সেকি বিনা হাঙ্গামায়?

মলয় উত্তর না দিয়ে বার হয়ে গেল।

নন্দ-দাদুর পুরো নাম নারায়ণ রায়। বয়স সত্তর ছাড়িয়েছে—তবু দেহের প্রান্তে যৌবনের পড়ন্ত রোদটুকু লেগে রয়েছে। এ বয়সে মাথার চুল ক'গাছি পেকেছে গুণে বলে দেওয়া যায়। চাল, ছোলা ভাজা চিবোবার মত মজবুত দাঁতের অভাব নেই। যৌবনকালে তিনি নাকি দুঃসাহসিক ছিলেন। লোকে বলত উচ্ছৃঙ্খল। এখন বছরের তিন-চার মাস ঘুরে বেড়ান তীর্থে তীর্থে। একই তীর্থে বহু বার গেছেন—তীর্থকৃত্য তাও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে থাকেন। সকালে আর সন্ধ্যায় পুরো দুই ঘণ্টা কাটে তাঁর রুদ্ধ-দ্বার ঠাকুরঘরে। যৌবনে যে উদ্যমে একটিও দেবতাকে মাথা নুইয়ে স্বীকার করেন নি—জরার অধিকারে এসে তেমনি উদ্যমে তাদের তেত্রিশ কোটিকে জীবনের জপমালায় গেঁথে নিয়েছেন। সংসার তাঁকে সৌভাগ্য দিয়েছে—আঘাত দিয়েছে। নারায়ণ রায় আর এক দিক দিয়ে গ্রামের অগ্রণী হয়েছেন বলা যায়। তাঁকে সেথো করে প্রতি বছর বহু নরনারী ভারতের বিভিন্ন তীর্থে পুণ্য সঞ্চয় করে বেড়ায়। তাঁর আহার, গাড়ী-ভাড়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুর দায়িত্ব বহন করে—এই পুণ্যকামীরা।

তা ছাড়া দেশ বিদেশের গল্প বলায়—পুরাণ-ইতিহাস মিলিয়ে সে গল্পকে মিষ্ট করার কৌশল তিনি জানেন। তাঁর বাইরের ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়াও সব রকম বয়সের মেয়েপুরুষের ভিড় প্রায় সর্ব্বক্ষণ লেগেই থাকে।

মলয় ঘরে ঢুকে দেখলে ক'টি শিশুকে নিয়ে তিনি আসর জমিয়েছেন। ছেলেরা সব গল্পের চেয়ে ভূত পেত্নী রাক্ষস ব্রহ্মদৈত্য বা যুদ্ধের গল্প শুনতে ভালবাসে। নন্দ-দাদু রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণ থেকে গল্প বলেন—দৈত্য রাক্ষস আর যুদ্ধ এ সব প্রচুর থাকে তাঁর গল্পে।

তিনি বলছিলেন, জানিস দাদু—ব্রহ্মার বরে কুম্ভকর্ণ দিচ্ছিলেন ঘুম। ছ' মাস ঘুমের পর এক দিন তিনি জাগেন—সেই এক দিনই সারা পৃথিবীতে স্বর্গে আর পাতালে হুলস্থুল কাণ্ড। যেমন তেমন রাক্ষস ত নয়। যে ঘরে তিনি ঘুমোতেন—সেই ঘরটা লম্বায় হ'ল ত্রিশ যোজন আর চওড়ায় দশ যোজন। দুয়োরের কাঁদ হ'ল চার কোশ—সে দুয়োর উঁচু হ'ল আট যোজন—এই থেকে বোঝ কত বড় রাক্ষস তিনি।

মলয় ঘরে ঢুকে বললে, থাক দাদু—বেচারী কুম্ভকর্ণকে আর অকাল নিদ্রা ভাঙিয়ে তুলবেন না—

তিনি হেসে বললেন, বোস রে ভাই—বোস। ছেলে-গুলোর এই ত চেহারা কিন্তু ভীষণ ভীষণ রাক্ষস দৈত্য এ সবের গল্প না শুনলে ওরা ঘুমোতেই পারবে না।

ছেলেরা গল্পে বাধা পড়াতে বিরক্ত হ'ল। বললে, গল্পটা শেষ কর দাদু নইলে- -

নন্দ-দাদু হেসে বললেন, না করলে কি যে হবে তা জানি। গাছের পেয়ারা কুল কি বাগানের আম একটিও থাকবে না।

বাঃ রে, আমরা বুঝি আপনার গাছে হাত দিই?

কেন দিবি নে ভাই—ফল ত তোদেরই জন্যে। কুল পেয়ারা ওসব বুড়ো বয়সের জন্য নয়—তবে আমটা যদি ভাল হয়—

আচ্ছা দাদু—আম আপনার একটিও নষ্ট হবে না। দেখবেন পাকা আম পেড়ে কেমন মা দিদিমাকে দিয়ে যাই।

পাকা আম খাওয়াবি এ মস্ত প্রলোভন বটে। মলয়ের পানে চেয়ে হাসলেন, কিন্তু কাঁচা আমগুলো যদি তোদের লোভ থেকে বাঁচে…আহা হা—রাগ করিস কেন ভাই—বুড়ো হয়েছি বলেই কি চিরকেলে বুড়ো আমি। আমাদেরও ছেলে বয়স ছিল।

মলয় বললে, গল্পটা সেরে নিন—কিছু কথা আছে দাদু।

খানিকক্ষণ মলয়ও সে গল্প শুনলে। দাদু বলেন ভারি মিষ্ট করে—রসিয়ে রসিয়ে—কৌতূহলকে জাগ্রত করে। মন্দ লাগছে না গল্প।

ছেলেরা চলে যেতেই ও প্রশ্ন করলে, আচ্ছা দাদু, এমন আজগুবি গল্প শুনিয়ে কি লাভ। চার কোশ ধরে কপাটের পাল্লায় যে রাক্ষস থাকত—তাকে আঁটতে গোটা লঙ্কা শহরটাই যে লাগে। আর প্রত্যেক রাক্ষসের সঙ্গে দশ কোটি বিশ কোটি—বীর চলতো যুদ্ধ করতে—বানরদের এক এক জনের সঙ্গে আশি কোটি নব্বুই কোটি সৈন্য—এ সব সারা ভারতবর্ষে ধরে না—লঙ্কায় ধরল কি করে!

দাদু বললেন, যুদ্ধের বর্ণনা অনেক বাড়ানো—নাতি! তোদের কালটারই কথা ধর। এই যে দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশে লোক মরলে—কেউ বলছে দশ লক্ষ—কেউ বলছে পনেরো—কেউ বা বলেন—ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ। এ মহাযুদ্ধের হিসাব-নিকাশ এখনো হয় নি—গেল মহাযুদ্ধে সবশুদ্ধ আশি লক্ষ লোক মরেছিল—এটাও ঠিক বলে মেনে নেওয়া যায়। যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু উনিশ-বিশ হয়ই।

কিছু নয়—আকাশ-পাতাল তফাৎ। আর এই আজগুবি গল্প—!

দাদু বললেন, পৃথিবীতে কোন্‌টা আজগুবি আর কোন্‌টা সত্যি কে বলবে ভাই। দুটো বোমা খেয়ে দুর্দ্ধর্ষ জাপান কাত হ'ল- -একথা তোমরাই কোন দিন বিশ্বাস করতে কি? অথচ তাই হ'ল। যখন তর্ক করার প্রবৃত্তি থাকে মানুষের তখন বয়সটা থাকে তোদের কোঠায়—আমাদের কোঠায় বয়স পড়লে বিশ্বাসই হ'ল আসল বস্তু। দাদুর কথার সুর ঈষৎ গম্ভীর হ'ল।

বেশি দিনের কথা নয়—সেকেণ্ড ইয়ারের গ্রীষ্মের ছুটিতে মলয় তখন দেশেই রয়েছে। দাদুর ছোট ছেলে মলয়ের বন্ধুই ছিল সে—নিশীথ তার নাম—কাজ করত একটি মার্চ্চেণ্ট আপিসে, এক শনিবারে জ্বর নিয়ে বাড়ি এল। দারুণ জ্বর, বেহুঁস অবস্থা। ডাক্তাররা কেউ বললেন, পক্স- -কেউ বললেন ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া—কেউ বা বললেন মেনিন-জাইটিস্‌। মোট কথা তিন জনের মতভেদ হওয়াতে সে রাত্রিতে কিভার মিকশ্চার ছাড়া বিশেষ কিছু পড়ল না—তার পর দিন আসল রোগ ঠিক হ'ল বটে- -রোগীকে ফেরানো গেল না। সেইটি দাদুর শেষ ছেলে। তার পরই দাদু মন্ত্র নিলেন—নিয়ম করে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত পড়তে লাগলেন। কেউ তর্ক করতে এলে বলেন, ও সব পাট মিটিয়ে দিয়েছি ভাই—আর কেন!

আপনার মনের বল কমে গেছে দাদু।

দেহের বলও কমছে যে ভাই। কিন্তু সে কথা নয়। আমরা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারি একটি অবলম্বন পেলে। সে মানুষই হোক আর ঈশ্বরই হোক। তুমি তো বলবে ঈশ্বর নেই! তোমাদের কাজ যথেষ্ট—নতুন পৃথিবী না হোক—পৃথিবীতে নতুন বিধান তৈরি করবে এই আশ্বাসে আর উৎসাহে মানুষের বেশী কিছু স্বীকার করতে চাও না। কিন্তু আমরা জানি পৃথিবী পুরাতন। নতুন মানুষের মনে বার বার নতুন হয়ে সে ফিরে আসে—এই মাত্র।

কিন্তু দাদু আপনাদের ছেলেবেলাকার পৃথিবীর সঙ্গে আজকের পৃথিবীর কত তফাৎ দেখুন তো।

হাঁ—বিজ্ঞান পৃথিবীকে নতুন করে তৈরি করছে। আমাদের কালে যে পৃথিবী প্রকাণ্ড ছিল—আজ সে ছোট হয়ে গেছে। তবু এ তার বাইরের সাজসজ্জা। আমার এই ময়লা কাপড়টার সঙ্গে তোমার ধবধবে খদ্দরের পোষাকটার যেমন তফাৎ—তোমার দেহের সঙ্গে আমার দেহের গঠন মিলবে না—তবু তুমি মানুষ—আর আমি মানুষ ছাড়া আর কিছু এও তো ঠিক নয়। বুড়ো হলেই মানুষের লাঠির দরকার হয় ভর দিয়ে চলবার জন্য। ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার সেই লাঠি দাদু।

এ সব তর্ক বহু বার হয়ে গেছে। যুক্তির শক্ত পথ থেকে দাদু বিশ্বাসের নরম ভূমিতে নেমেছেন; এ পরিবর্ত্তনের গভীরে রয়েছে যে হেতু—তা বিয়োগ-বেদনায় বাষ্পাকুল। বেশী তর্ক করে তাকে উদঘাটন করা চলে না। শোকে সান্ত্বনা দেওয়া মামুলি প্রথা—তাতে আশ্রয় পাওয়াও দুর্ঘট। নিজের মন থেকে সহজাত প্রবোধ-আশ্বাস না দিলে—কোন্ যুক্তিতে সে চিত্ত স্থির করতে পারে!

মলয় এক মুহূর্ত্তে অনেক কিছু ভেবে নিয়ে বললে, দাদার খবর জানতে এলাম দাদু— সত্যিই কি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

দাদু বললেন, এরই মধ্যে খবরটা পাড়ায় রটে গেছে! ভাল হয় নি দাদু। তোমার মাকে সামলানো কঠিন।

মার চেয়ে বৌদিদির অবস্থা খারাপ—তাঁর ফিট হচ্ছে।

দাদু বললেন, আমার কথা যদি শোন তো তাঁর খোঁজ করো না ভাই।

কেন দাদু?

মানুষ এক বারই জন্মায় না ভাই—মৃত্যুও তার বহু বার ঘটে।

যদি বলি জন্মান্তর মানি না।

দাদু হেসে বললেন—দেহ বদলে যে জন্ম তার কথা তো বলি নি ভাই। তোমার মন—বুদ্ধি—রুচি—প্রবৃত্তি বা সংস্কার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত বহু বার বদলাবে। তারই জন্যে ছেলেবেলায় নাস্তিক—দাদু তোদের আস্তিক হয়েছে রে। একটু থেমে হেসে বললেন, বৃন্দাবনে যাবার পথে যে সন্ন্যাসীকে দেখে আমার সন্দেহ হয়—তাকেই আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আচ্ছা আপনি তো সংস্কারমুক্ত পুরুষ—বিশেষ করে ওই গ্রামখানির কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? সন্ন্যাসী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার হতেও পারে।

জিজ্ঞাসা করলাম—জাতিস্মররা শুনেছি পূর্ব্বজন্মের কথা ঠিকমত বলতে পারেন।

সন্ন্যাসী বললেন—জাতিস্মর না হয়েও কি মানুষের জন্মান্তর হয় না? দ্বিজত্বে ওঠে কি করে মানুষ? আপনার দশ বছরের দেহে আর বিশ বছরের দেহ কি এক? সেই সঙ্গে মনও খোলস বদল করছে বার বার।

হেসে বললাম—তবু হারানো জনকে ফিরে পেলে আত্মীয়বন্ধুরা কম সুখী হয় না। তাদের মধ্যে বাস করার যে শান্তি—

সন্ন্যাসী হেসে বললেন—শান্তির স্তরভেদ আছে জানেন কি? যে মধুর স্বাদ পেয়েছে—চিনিতে স্বভাবতই তার স্পৃহা থাকবে না—পরম সঙ্গ পেলে আসঙ্গলিপ্সা তেমনি ফিকে বোধ হয়। আপনি জ্ঞানী—সংসারের স্বাদ আর পরব্রহ্মের স্পর্শ—একের সঙ্গে অন্যের তুলনা—এ তো চলে না জানেন।

মলয় জিজ্ঞাসা করলে—তা হলে তিনিই যে আমার দাদা—এ সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ নেই।

কিন্তু তিনি নবজন্ম লাভ করেছেন—তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক টানতে গেলে তোমরা হয়ত দুঃখই পাবে ভাই। অন্তত বড় বৌমাকে এ সব না শোনানই ভাল।

কিন্তু দাদু, মন্দ যা তা ঘটে গেছে।

তারা তারা! দাদু একটি গভীর নিশ্বাস ফেললেন। যা ভাল বোধ কর ভাই—না হয় তাঁর আশ্রমের ঠিকানাটি দিচ্ছি, কিন্তু মেয়েদের নিয়ে সেখানে যেও না। মানুষের ইচ্ছা ব'লে যে জিনিসটি আছে তার প্রতিকূলে কিছু করা যুক্তিসঙ্গত নয় ভাই।

মলয় বললে, তা কি সম্ভব দাদু! তবে আমাদের কর্ত্তব্যে যেটুকু না করলে নয়—আচ্ছা আসি—দাদু।

দাদু তার কাঁধে হাত রেখে সস্নেহ হাসি হেসে বললেন, হাঁ রে—তুই নাকি একবার জেল খেটেছিলি?

মলয় মাথা নীচু করে হাসলে, সে আর বেশী কি দাদু।

কবে?—আমি তো শুনি নি—

সে এমন কিছু নয় শোনাবার মত। ওই যে আগষ্ট মাসে 'কুইট ইণ্ডিয়া'-রেজল্যুশন হ'ল না—তারই ফলে ভারতবর্ষে একটা ঢেউ বয়ে গিয়েছিল তো—

বলিস কি—আগষ্ট মুভমেণ্ট! সিপাহী বিদ্রোহের পর ও রকমের বিক্ষোভ ভারতবর্ষে আর দেখা দেয় নি। শুনি তো বহুলোক রক্ত দিয়ে তাদের ভুল কাজের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

মলয় মাথা উঁচু করে স্থির দৃষ্টিতে চাইলে তাঁর দিকে। অসহায় ক্রোধ কিংবা বেদনা—কয়েকটি রেখার কুঞ্চনে মুখে ফুটিয়ে তুলল মৌন প্রতিবাদ। ভঙ্গিটা তার উদ্ধত নয়—উদ্দীপ্ত। মৃদু—অথচ স্পষ্ট স্বরে বললে, ভুল কাজের নয় দাদু—সময়ের। নেতাজীও তা হলে ভুল করেছিলেন বলতে চান?

ভুল যারই হোক ভাই—রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত—

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যায়—ভুলেরও দণ্ড নিতে হয়, বারে বারে যত রক্ত দিয়েছে ভারতবর্ষ তা প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড নয়। জন্মগত অধিকার ফিরে পাবার জন্যে বার বার এগিয়ে আসে মানুষ—প্রাণ দেয়, নির্যাতন সয়—তার জন্য দুঃখ কিসের!

দাদু বললেন, তোমাদের বিশ্বাস—

আপনিই একটু আগে বললেন না—একটি জিনিসে নির্ভরতা না থাকলে—মানুষের জীবনের অর্থও থাকে না।

আমাদের বয়সে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আমরা মেতে উঠেছি এ কথার চেয়ে—নতুন পৃথিবীতে আমাদের সম্মান আর গৌরব যাতে সবাই স্বীকার করে নেয়—সেই মহৎ চেষ্টায় জীবনপাত হ'ল সবচেয়ে বড় সত্য। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা একটু ঠাঁই পেতে চাই—এ কি আমাদের অন্যায় ইচ্ছা? না রক্ত দিয়ে দু' এক বার প্রায়শ্চিত্ত করলেই এই ভুল শুধরে যাবে?

দাদু অবাক হয়ে মলয়ের জ্বলন্ত চোখ দুটির পানে চেয়ে রইলেন। তরুণ বয়স—সংসারের বন্ধন স্বেচ্ছায় গলায় পরেছে। মায়ের স্নেহ -প্রিয়ার ভালবাসা- জীবিকার সংস্থানে নিরবিঘ্ন সংসারে লেখাপড়া শিখে জগৎকে জেনেছে মোহমুক্ত বুদ্ধির দ্বারা—পরিণাম-অনভিজ্ঞ উচ্ছ্বাস-প্রবণ যুবক মাত্র নয়—একে পথের নির্দেশ দেবার ছলে কি উপদেশ দেবেন তিনি? নির্দেশ দিতে যাবার ধৃষ্টতাও তাঁর নেই। তীর্থে তীর্থে সংসারমুক্ত বহু সন্ন্যাসীকে দেখেছেন দাদু—আর স্বাধীনতাকামী এদের কয়েকজনকেও দেখেছেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন-মুখী দুই জাতের সাধনাতে আশ্চর্য্য রকমের মিল তাঁর দৃষ্টিতে পড়ল আজ। দুই সাধকই তো মৃত্যুকে ভয় করেন না—দুই যোগীই ধ্যাননিবদ্ধ দৃষ্টিতে দেবভূমির মহিমা নিরীক্ষণ করছেন। এক জন দেবতার জ্যোতিকে আর এক জন তাঁর মহিমাকে আয়ত্ত করতে চায়। এদের মধ্যে বড় ছোট কেউ নেই।

দাদু প্রসন্ন স্বরে বললেন, আমার ভুলটাই মেনে নিলাম ভাই—

মলয় হেসে বললে, ছি দাদু বুড়ো হয়ে আপনি সত্যিই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। মনের আনন্দে পাক খেয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ক্রমশঃ

বাস্তব ও কল্পনা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

গেঁথেছি অনেক মালা আকাশ-কুসুমে,
সে ফুল যে ফোটে শুধু মনের আকাশে।
শিহরি কাহার স্পর্শে পেলে কি পাখা সে?
ফুল-বিহঙ্গেরা দূর নীল নভ চুমে!
কি ক'রে প্রভেদ করি জাগরণে ঘুমে?
জীবন জাগিয়া থাকে সে স্বপ্নের পাশে,
অপূর্ব্বের পরিচয় পাই যে আভাসে,
একাকার হয়ে যায় স্বর্গ মর্ত্ত্যভূমে।

কল্পনা সে পায় রূপ। সেথা যায় দেখা,
অসীমের সীমা রচে দিগন্তের রেখা।
সম্ভব ও অসম্ভব কে ক'রেছে ঠিক,
মনের মায়ার সঙ্গে পারি না আঁটিতে।
আকাশে কুসুম ফোটে, নহে তা অলীক,
সে পুষ্পতরুর মূল মর্ত্ত্যের মাটিতে।

শাশ্বত বর্ত্তমান

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

"আরো দূরে যেতে হবে।" কোথায়— কে জানে
দূরান্তরে লি লি করে পথের নিশানা,
সে পথের শেষ নাই, সে পথ অজানা,
ডাকিছে সে অনাগত সমুখের পানে।
"ফিরে চাও, চলিয়াছ কিসের সন্ধানে?"
"আমারে চিনিতে পার?" "শোন বন্ধু মানা,
কেন যাবে যে-পথের নাই কো সীমানা?"
কেবলি পশ্চাতে মোরে গত-কলা টানে।

অতীতে জড়ানো কত আনন্দ ও ব্যথা,
আমার স্মৃতির মাঝে তার অমরতা,
ও যে সত্য। সত্যতর সে আগামী কাল
স্বপ্নে যে সার্থক করে জগতের মাঝ।
স্মৃতি ও স্বপ্নের তবে ছিন্ন কর জাল,
সকলের চেয়ে সত্য জীবনের 'আজ'।

ওহাবী আন্দোলন ও মুসলমান সমাজের রাজনীতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আমরা ছেলেবেলায় কোন কোন মুসলমানকে 'করাজী' বা 'ফেরাজী' বলিতে শুনিয়াছি। তখন করাজী বলিতে বুঝিতাম—আচারনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমান। বঙ্গদেশে কিন্তু এই করাজীরাই সত্যিকার ওহাবী। বাংলার জল মাটির গুণে ওহাবী আদর্শ যেমন খানিকটা বদলাইয়া যায়, উহাদের নামেও তেমনি এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে।

ওহাবী আমাদের দেশী কথা নয়। আরব দেশে ওহাবী আন্দোলনের উদ্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সেখানে আবদুল ওহাব নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। তিনিই ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। তুর্কীর অধীনে অবস্থান কালে নানাদিক দিয়াই আরব জাতির বিশেষ অবনতি ঘটে। মুসলমানগণ ইস্‌লাম ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের বশীভূত হয়। ওহাব এই সকল আবর্জ্জনা দূর করিয়া মহম্মদ-প্রতিষ্ঠিত আচার-অনুষ্ঠান বর্জ্জিত খাঁটি ইস্‌লাম ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্ত্তনে সবিশেষ তৎপর হইলেন। আরব সমাজের বিস্তর লোক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। ওহাব দেখিলেন তাঁহার এই সংস্কার-কার্য্যের প্রধান বাধা তুর্কী-রাজ। তাই তিনি স্বদল পুষ্ট করিয়া আরবের মক্কা-মদিনা প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি হইতে তুরস্ক-প্রভুত্ব উচ্ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সমগ্র আরবে আবদুল ওহাবের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইল। ইস্‌লাম ধর্ম্মও সংস্কৃত হইল। কিন্তু ওহাবের কর্ত্তৃত্ব বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারিল না। তাঁহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে তুর্কী-রাজ পুনরায় আরবের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু ওহাবের আদর্শ আরব জাতির মনে স্থায়ী আসন লাভ করে। বহিরাগত তীর্থযাত্রীরাও অনেকে এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। ওহাবী আদর্শে অনুপ্রাণিত এইরূপ এক জন তীর্থযাত্রী ছিলেন সৈয়দ আহ্‌মেদ।

রায় বেরিলীতে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মহরম মাসে সৈয়দ আহ্‌মেদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৈশোরে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পিণ্ডারীদের অধীনে অশ্বারোহী সৈনিকের কার্য্য করেন। তখন উত্তর-ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ওয়ারেন হেষ্টিংস সর্ব্বপ্রথম পিণ্ডারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং উহাদের কঠোর হস্তে দমন করেন। পিণ্ডারীরা অতঃপর বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং লুঠ-তরাজ করিতে থাকে। সৈয়দ আহ্‌মেদও প্রথম জীবনে এইরূপ কুক্রিয়াসক্ত হইয়া পড়েন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে শিখশক্তি প্রবল হইয়া উঠে এবং পঞ্জাবে শিখরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তখন লুঠ-তরাজ, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্য্যের তেমন সুযোগ আর রহিল না। পঞ্জাবে শিখরাজ্য তথা হিন্দু প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় সৈয়দ আহ্‌মেদের জীবনে এক পরিবর্ত্তন দেখা দিল। হিন্দুদের সংস্পর্শে আসিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মে যে সব আচার-অনুষ্ঠান ও পৌত্তলিক প্রভাব প্রবেশ করে তৎসমুদয় বিদূরিত করিয়া ইহাকে সুসংস্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহ্‌মেদ বিশেষ ভাবে তৎপর হইলেন। তিনি ইস্‌লামের সারমর্ম্ম উপলব্ধির জন্য কিছুকাল দিল্লীতে থাকিয়া মৌলানাদের নিকট মুসলমান শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সুসংস্কৃত ও সংশোধিত ইস্‌লাম ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তিনি একদিকে যেমন মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিলেন অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মুসলমানগণও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে লাগিল। সৈয়দ আহ্‌মেদ যখন যেখানে গমন করিতেন বিখ্যাত মৌলানাগণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার সেবা-যত্ন করিতেন। ইহাতেও সাধারণ মুসলমান সমাজ তাঁহার দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ঈশ্বর এক এবং মুসলমানমাত্রেই সমান—আহ্‌মেদের এই দুইটি কথা সহজেই সকলের চিত্ত জয় করিল।

সৈয়দ আহ্‌মেদ ১৮২০-২২ সনে সমগ্র উত্তর-ভারত পরিক্রমা করেন। তিনি যে যে স্থলে গমন করেন সেই সেই স্থলেই বিস্তর লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তিনি সর্ব্বত্র উপযুক্ত ও বিশ্বাসী লোকদের প্রতিনিধি বা এজেণ্ট নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার অন্যতম কার্য্য শিষ্যদের নিকট হইতে 'ধর্ম্ম-কর' সংগ্রহ। পাটনায় তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইল। এখানে তিনি চারি জন খলিফা নিযুক্ত করিলেন। এই চারি জনের মধ্যে ইনায়েত আলি ও বিলায়েত আলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা পূর্ব্ব-ভারতে সৈয়দ আহ্‌মেদের মতবাদ প্রচারে প্রধান সহায়ক হইলেন। পাটনায় প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনান্তর আহ্‌মেদ নৌকাযোগে কলিকাতায় আগমন করেন। পথিমধ্যেও তাঁহার বিস্তর শিষ্য জোটে। কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহার মতবাদ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যেও প্রচারিত হইবার সুযোগ ঘটিল।

ইহার পর সৈয়দ আহ্‌মেদ মক্কাতীর্থে গমন করিলেন। এই সময় তিনি ওহাবীদের সংস্পর্শে আসেন। সৈয়দ এত দিন ধর্ম্ম-সংস্কারে মন দিয়াছিলেন, এবার ওহাবীদের মতবাদে ও কার্য্য-কলাপের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়া বুঝিলেন, ধর্ম্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিশুদ্ধ ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব। তিনি স্বয়ং ওহাবী দলভুক্ত হইলেন। ওহাবী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া খাঁটি ওহাবীরূপে তিনি বোম্বাইয়ের পথে স্বদেশে ফিরিলেন।

ওহাবী মতবাদ প্রচারোদ্দেশ্যে সৈয়দ আহ্‌মেদ ১৮২৪ সনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্ব্বত্য উপজাতিদের মধ্যে কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে সমতল ভূমিতে আসিয়া মুসলমান প্রভুত্ব বা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা। তিনি ইতিপূর্ব্বে সমগ্র উত্তর-ভারতে যে কর্ম্মীসঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন এইবারে তাহাদ্বারা তাঁহার কাজ হাসিল করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার নির্দ্দেশে ধনবল ও জনবল সংগৃহীত হইতে লাগিল। উদ্দেশ্য, নিকটবর্ত্তী শিখ (বা হিন্দু) রাজ্যের উচ্ছেদ। ১৮২৭ সন হইতে শিখ রাজ্যে উৎপাত-উপদ্রব আরম্ভ হইল। ডাকাতি, নরহত্যা, নারী-ধর্ষণ, রাহাজানি, লুঠতরাজ প্রভৃতি অবাধে চলিতে থাকে। ওহাবী দল ক্রমশঃ এত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে যে, ১৮৩০ সন নাগাদ পশ্চিম-পঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার নগরী ইহারা অধিকার করিয়া ফেলিল। তখন পঞ্জাবের অধিপতি রণজিৎ সিংহ উঁহাদের উপেক্ষা না করিয়া দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। সৈয়দের শিষ্যগণ ও শিখসৈন্য সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সৈয়দ-শিষ্যগণকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়। ১৮৩১ সনে এক শিখ সেনার গুলিতে সৈয়দ আহ্‌মেদ ইহলীলা সংবরণ করিলেন।

তদবধি তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ সাধারণের মধ্যে এই সংবাদ প্রচার করিতে থাকে যে, সৈয়দ আহ্‌মেদের মৃত্যু হয় নাই। তিনি গুপ্তভাবে বিচরণ করিতেছেন, এবং শিষ্যবর্গ তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করিয়া সফলকাম হইলে তিনি আবার সশরীরে আবির্ভূত হইবেন। নিরীহ মুসলমান জন-সাধারণ এ কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর ধনজন দিয়া ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় কর্ম্মীসংঘকে সহায়তা করিতে লাগিল। পর্ব্বতের নিভৃত প্রদেশে সিতানায় ওহাবী-দের দুর্গ স্থাপিত হইল। পঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রসদ সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইল। ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল হইতেও নানারূপ সাহায্য সেখানে পৌঁছিতে লাগিল। অতঃপর বড় রকম কোন অভিযান বা আক্রমণ না চালাইলেও ওহাবীরা শিখরাজ্যে নানারূপ উপদ্রব করিতে থাকে।

বঙ্গে ফরাজী বা ওহাবী আদর্শ যে ভাবে শিকড় গাড়িয়া বসে সে এক বিচিত্র কাহিনী। তিতুমিঞা বা তিতুমিরের নাম মধ্য-বাংলায় প্রায় সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। তিতুমির চাষী গৃহস্থের পুত্র; ছোটখাট এক জমিদারের কন্যার পাণিগ্রহণ করায় তাঁহার অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। কিন্তু আরামের জীবন তিনি পছন্দ করিলেন না। কুস্তি, লাঠি ও অসি খেলা, তীর ছোড়া প্রভৃতি শিখিয়া তিনি নদীয়ার এক জমীদারের বরকন্দাজ হইলেন। মারপিটে সংশ্লিষ্ট হওয়ার অপরাধে তাঁহার একবার কারাদণ্ড হয়। কারামুক্তির পর তিতুমির দিল্লী গমন করেন এবং সেখান হইতে বাদশা পরিবারের সঙ্গে মক্কা যান। এখানে আসিয়া বিখ্যাত ধর্ম্মসংস্কারক ও পরবর্ত্তীকালের ওহাবী নেতা সৈয়দ আহ্‌মেদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল। সৈয়দ আহ্‌মেদের সংস্পর্শে আসিয়া তিতুমিরের জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে। বাংলাদেশে ফিরিয়া তিনি একান্ত মনে ওহাবী মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বঙ্গে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিতুমির প্রথমেই ইংরেজের বিরুদ্ধে যাওয়া সমীচীন বোধ করেন নাই। ওহাবী মতবাদ তখনকার প্রচলিত ইস্‌লাম ধর্ম্মেরও বিরোধী ছিল, এ কারণ মুসলমান জমিদার বা প্রতিপত্তিশালী মুসলমানগণ ইহা সমর্থন করিতে পারিলেন না। তিতুমির ইঁহাদিগকে স্বমতে আনিবার জন্য ইঁহাদের উপরও অত্যাচার চালাইতে দ্বিধা করেন নাই। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও ওহাবীদের হস্তে প্রাচীনপন্থী প্রতিপত্তিশালী মুসলমানগণ কম নির্য্যাতিত হন নাই। কিন্তু ওহাবীরা সর্ব্বদা মূল লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া চলিত। তাহারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিত, মুসলমান ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় হিন্দুরাই তাহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। বঙ্গে তিতুমির দলবল সহ আঁচরে হিন্দুদের উপর চড়াও হইলেন। হিন্দু গ্রাম লুঠ করিয়া, ঘর বাড়ী পুড়াইয়া দিয়া, দেবমন্দির কলুষিত করিয়া তিতুমিরের দলের লোকেরা নিজেদের বিধর্ম্মী দলনস্পৃহা চরিতার্থ করিতে লাগিল। গোবর-ডাঙ্গা-নিবাসী জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য হিন্দুগণ বিশেষ ভাবে এই দলের হস্তে নিপীড়িত হইলেন।*

হিন্দু সমাজেও সত্বর ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। হিন্দু জমিদারগণ ওহাবীদের দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে ওহাবীদের উৎপাত এত বাড়িয়া যায় যে, হিন্দুদের তরফেও তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের নানারূপ ব্যবস্থা হয়। ওহাবীরা দাড়ি রাখিত। বারাসতের অধীন পুড়াগাছির জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রতি ওহাবী প্রজার দাড়ির উপর আড়াই টাকা কর বসান। এই ব্যাপারে জমিদারের লোকজন এবং ওহাবীদের মধ্যে একটি দাঙ্গা হয় এবং বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ইহা লইয়া মামলাও উপস্থিত হয়। ইহার পর তিতুমির শিষ্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করণান্তর হিন্দুদের গ্রামগুলি পুনরায় আক্রমণ করিয়া লুঠতরাজ করিতে সুরু করেন। ওহাবী-দের অত্যাচারে শাসকবর্গেরও ক্রমে কতকটা চৈতন্যোদয় হইল। তিতুমির ও সরকারের মধ্যে শীঘ্রই সংঘর্ষ বাধিল। এই সম্পর্কে ১৮৭০ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই বিবরণটি পাওয়া যাইতেছে,—

"১৮৩১ সালে একটি খাওয়া দাওয়া উপলক্ষে তিতু তাহার সমুদয় শিষ্য একত্রিত করিয়া বাঁশ দিয়া কেল্লা প্রস্তুত করে এবং ৫০০ লোক সমভিব্যাহারে পূর্ণ গ্রাম লুঠ করে। তাহার পর তাহারা কৃষ্ণনগর জেলার লাউঘাটা গ্রাম লুঠ করে। তাহারা শেষে ক্রমেই অত্যাচারের বাড়াবাড়ি করিতে আরম্ভ করে। তাহার পর গবর্ণমেণ্ট ২০ জন সিপাহী, এক জন জমাদার ও এক জন হাবিলদার তাহাদিগকে দমন করিতে পাঠান। এলেকজাণ্ডার নামক এক জন সাহেব সিপাহীদিগের ক্যাপ্টেন

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৯।

হইয়া যান। তিনি দারগা এবং তাহাদের সঙ্গে বরকন্দাজ প্রভৃতি ১২০ জন যোদ্ধা সহ এবং এলেকজাণ্ডার তিতুমীরের হস্তে পরাস্ত হন। তাহারা দারগাকে মারিয়া ফেলে, সিপাহী বরকন্দাজও বিস্তর মারা পড়ে। নদীয়ার মাজিষ্ট্রেটও তাহাদের নিকট পরাস্ত হন। ১৮৩২ খ্রীঃ অঃ এলেকজাণ্ডার আবার অধিক সৈন্য সামন্ত লইয়া তিতুকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে তিতু এবং তাহার দল ধ্বংস হয় এবং তাহার সেনাপতি গোলাম মসুম ধৃত হইয়া আলীপুরে তাহার ফাঁসী হয়।" *

তিতুমিরের পরাজয় ও মৃত্যু ওহাবী বা ফরাজীদের বিশেষ আতঙ্কের কারণ হইল। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' (৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮) এই প্রসঙ্গে দেশ-প্রচলিত প্রবাদের উল্লেখ করিয়া লেখেন—

"কিরূপে তিতুমির কামানের গোলা 'খাডলা' বলিয়া উন্মত্ত সহচরগণের উৎসাহের বৃদ্ধি করিয়া দেয়—কিরূপে ফুকির কেল্লার মধ্যে থাকিয়া তাহার সহচরগণ সেই সময়ে 'গুলি খাডলা' বলিয়া হুহুঙ্কার করে, কিরূপে তিতুমির প্রথম গুলিতে হত হয় ও তাহার সহচরগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে, ও পরিশেষে কিরূপে নাপিতকে ৫ টাকা পর্য্যন্ত দিয়া ফরাজীরা শ্মশ্রু মুণ্ডন করে, এ সমুদয় দেশময় প্রবাদ আছে। তখনকার গোটা দুই গান,—

"হায় কি বুজুরুগী বেড়েছে
উত্তরে এক গ্রাম আছে নাম নারিকেল বেড়ে।
ছুটল এসে ঘাট হাজার নেড়ে॥
নেড়ের নামে সুর।
বলে জলদি আন খুর॥
তারা সব গোলার চোটে কাছা খুলে
সিটকে মরে রয়েছে॥
ফকিরানি বলে ফকির রাত পোহালি হাট,
দাড়ি কাইচি দিয়ে ছাট॥ ইত্যাদি"†

এইরূপে ফরাজী বা ওহাবীদের নিপীড়ন ব্যাহত হইল বটে, কিন্তু তাহা নিতান্তই সাময়িক। ইহারা পুনরায় হিন্দু দলন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল। ১৮৩৭ সন নাগাদ দেখা যাইতেছে, ফরিদপুর ও ঢাকায় সরিতুল্লার নেতৃত্বে ফরাজীগণ ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে। এই সম্পর্কে 'জিলা ঢাকা নিবাসী দুঃখী তাপিগণস্য' একখানি পত্র ২২শে এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয়। ইহার কিয়দংশ এখানে প্রদত্ত হইল,—

"ইদানীং জিলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুর গ্রামে সরিতুল্লা নামক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক ১২০০০ জোলা ও মোসলমান দলবদ্ধ করিয়া নূতন এক সরা জারী করিয়া নিজ মতাবলম্বী লোকদিগের মুখে দাড়ি কাছাখোলা কটিদেশে চর্ম্মের রজ্জু তৈল করিয়া তৎচতুর্দ্দিগস্থ হিন্দুদিগের বাটী চড়াও হইয়া দেব দেবীর পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে এবং এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মলকৎগঞ্জ থানার সরহদ্দে রাজনগর নিবাসী দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ-শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জ্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটীতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহারা গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভস্ম রাশ করিলে একজন জবন ধৃত হইয়া ঢাকার দওরায় অর্পিত হইয়াছিল...আর শ্রুত হওয়া গেল তাহার জজ রায় অর্পিত হইয়াছে। আর শ্রুত হওয়া গেল সরিতুল্লার দলভুক্ত দুষ্ট জবনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের তারিণীচরণ মজুমদারের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাঁহার বাটীতে দেবদেবী পূজার আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু জবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্ব্বক কএক জন জবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয় দুষ্ট জবনেরা মফঃসলে এ সকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচার গৃহে আক্রমণ করিতে প্রবর্ত্ত হইল। শ্রুত হওয়া গেল ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে যে সকল আমলা ও মোক্তারকারেরা নিযুক্ত আছে তাহারা সকলেই সরিতুল্লা জবনের মতাবলম্বি তাহারদিগের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয় তবে কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে সুতরাং ১২০০০ হাজার লোক দলবদ্ধ ইহাতে ফরিয়াদীর সাক্ষীর ত্রুটি কি আছে।...আমি বোধ করি সরিতুল্লা জবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর২ প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম লোপ পাইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার জোট পাটের শত অংশের এক অংশ তীতুমির করিয়া ছিল না।...ইতি সন ১২৪৩ সাল তারিখ ২৪ চৈত্র।"*

সরিতুল্লার ন্যায় ফরিদপুরে দুদুমিয়া নামে আর এক জন ওহাবী-নেতা আবির্ভূত হন। তাঁহার সম্বন্ধে এখনও ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল অঞ্চলে নানারূপ জনশ্রুতি আছে। দুদুমিয়ার আমলে বঙ্গের ওহাবী আন্দোলন কতকটা অর্থনৈতিক রূপ ধারণ করে। ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ দিবসীয় 'অমৃত বাজার পত্রিকা' দুদুমিয়া সম্পর্কে লেখেন,—

"ফরিদপুরের দুদুমিয়া ফরাজীদিগের গুরু ছিলেন। কালে তাঁহার প্রভাব এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনি মনে করিলে ৫০ সহস্র লোক সংগ্রহ করিতে পারিতেন। ইহারা সমুদয় ষড়যন্ত্র করিয়া জমিদার ও কুঠিয়ালগণকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া

* প্রবন্ধ-লেখকের "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ," পৃ. ১৮১-২ দ্রষ্টব্য।

† ঐ, পৃ. ১৭৭-৮।

*"সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা", ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৯-৮০।

জেলে। গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তিনি কখন কিছু করেন নাই বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ভয় করিতেন।

"পরে ১৮৪৬ সালে জমিদারে ও কুঠিয়ালে জুটিয়া তাঁহার বাড়ী লুঠ করেন, ও ১৮৪৭ সালে তাঁহাকে সেসন আদালতে দণ্ড দেন। ১৮৫৭ সালে যখন সিপাহী যুদ্ধ বড় জাঁকিয়া উঠে, তখন দুদুমিয়াকে গবর্ণমেণ্ট আশঙ্কাক্রমে কয়েদ করিয়া কিছুকালের নিমিত্ত আলিপুরের জেলে রাখেন।"*

বঙ্গদেশে ওহাবী আন্দোলন ক্রমে নূতন রূপ ধারণ করিল এবং বারাসত, সাতক্ষীরা, যশোহর, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, নদীয়া, পাবনা, রাজসাহী, রংপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু সিত্তানা কেন্দ্রে মূল উদ্দেশ্য অনুযায়ীই কার্য্য হইতে লাগিল। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতেও ধন-জন ও অন্যান্য রসদপত্র বিস্তর প্রেরিত হইতে থাকে। ১৮৪৮ সন নাগাদ পঞ্জাবে শিখশক্তির পতন হয় এবং '৫০ সনে সমগ্র পঞ্জাবই ইংরেজের অধিকারে আসে। ওহাবীদের নিকট হিন্দু, শিখ বা খ্রীষ্টান ইংরেজ সকলেই বিধর্ম্মী, ম্লেচ্ছ; খাঁটি ইসলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় সকলেই প্রতিবাদী। এক জন ইংরেজ লেখক সত্যই বলিয়াছেন, ওহাবী বিরোধিতা উত্তরাধিকার সূত্রে শিখদের নিকট হইতে ইংরেজেরা লাভ করে। ইংরেজ ঐতিহাসিকের এই কথা কয়টি যে কত দূর সত্য তাহা ওহাবীদের পরবর্ত্তী কার্য্যক্রম আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

সৈয়দ আহমেদের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান শিষ্যবর্গ ওহাবী মতবাদ সুষ্ঠুরূপে প্রচারোদ্দেশ্যে নানা উপায় অবলম্বন করিলেন। সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে পূর্ব্ব-প্রান্তিক বাংলা—এই দুই হাজার মাইলের মধ্যে ওহাবীদের বিভিন্ন আড্ডা বা শাখা কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত হইল। এই সকল কর্ম্মকেন্দ্রে ভাবী প্রচারকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ অজ্ঞ মুসলমানদের স্বমতে আনয়নের জন্য এই প্রচারকগণ অনেকে তাহাদের মধ্যে গিয়া বসবাস করিত, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহাদি পর্য্যন্ত করিয়া তাহাদের সঙ্গে একাত্ম হইয়া যাইত। ফার্সী, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় ওহাবী মতবাদ বিশ্লেষণ ও ওহাবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া প্রচার-পত্রী রচিত হইত এবং সাধারণের মধ্যে তাহা বিলি করিবারও ব্যবস্থা ছিল। বহু পুস্তক ও পুস্তিকা এই সম্পর্কে লিখিত হয়।

---

* "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ", পৃ. ১৭৮ দ্রষ্টব্য।

ফরাজী-নেতা দুদুমিয়া সম্পর্কে ২৩ এপ্রিল ১৮৭০ তারিখের "হিন্দু-হিতৈষিণী" সাপ্তাহিকেও অনেক তথ্য বাহির হয়। ইহার কিয়দংশ এই—

"আজি প্রায় ২০/২৫ বৎসর হইল দুদুমিয়া নামে একজন মোসলমান পূর্ব্ব বাংলায় প্রাদুর্ভূত হইয়া ফরিদপুর ও ঢাকার মুসলমান সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন, ইতর শ্রেণীর মোসলমান মাত্রেই কাছা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অধীনতা বা দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল। দুদুমিয়ার মত মোসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং প্রাচীন ও ধার্ম্মিক মোসলমানদিগের মতের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইত না, তজ্জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত মোসলমান তাঁহার মত অনুমোদন করিতেন না। শুনা আছে, দুদুমিয়ার সোয়াহস্ত পরিমিত একখানি বিনামার নাম 'সামাদার' ছিল, কোন শিষ্যাদির ত্রুটি লক্ষিত অথবা কাহাকে স্বমতে আনয়ন করিতে হইলে উক্ত সামাদার দ্বারা শাসন এবং সাহসের সহিত অর্থদণ্ড করা হইত। ইঁহার অধীনে কয়েকজন খলিফা নিযুক্ত হয়, ইহারা তাঁহার মতের উপদেশক। ইহাদের সর্ব্বিষয় ক্ষমতা ছিল। ঐ সময়ে প্রায় স্থলের বদমায়েস মোসলমান লোকই কাছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া স্বার্থ সাধনের বিলক্ষণ সুযোগ পায়। তখন কত স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট, কত স্ত্রী-পুরুষের পতি-পত্নী বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কত নিরীহ লোকের প্রাণদণ্ড, সম্পত্তি অপহরণ, গৃহদাহ এবং অন্যান্য প্রকারের যন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ এবং দুঃখে আপ্লুত হইতে হয়। লোক প্রবৃত্তির অনুরোধে দুদুমিয়াও সে সকল কার্য্যকে ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করাতে শিষ্যেরা সর্ব্বত্রই তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত মনে করিয়া তাঁহার যশোগান ও মত প্রচার করিত। সেই সময়ে এদেশে নীলকরদিগেরও ভয়ানক অত্যাচার ছিল, কিন্তু দুদুমিয়ার অত্যাচারে নীলকরের প্রভা এককালীন মলিন হইয়া পড়ে; দুদুমিয়া সম্পত্তিহীন হইয়াও এভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়া জমিদারী স্থাপন ও অনেক ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তখন লোক এরূপ অত্যাচার পীড়িত হইয়াছিল যে অনেকে দেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। অত্যাচারের প্রতিবিধান জন্য কোন মোকদ্দমা করিলে তাহা নিষ্ফল এবং অত্যাচারের বৃদ্ধি হইত। কিন্তু কেহই প্রাণপণে প্রতিপক্ষ হইত না বরং শরীর পাতিয়া তাঁহার অত্যাচার সহ্য করিত।

* "সামাদার দ্বারা শাসিত হইয়া অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক কাছা ছাড়িয়া যাহারা দুদুমিয়ার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা 'ফেরাজী'। পূর্ব্বে যে খলিফার কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের এক এক জনের অধীনে বহু ফেরাজী থাকিত, ফেরাজীদের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ছিল, তজ্জন্য খলিফারা দুদুমিয়ার প্রসাদে এক এক জন বড় মানুষ মধ্যে গণ্য হইয়া উঠে। দুদুমিয়া শিষ্যদিগের প্রবৃত্তির প্রতিকূলে চলিতেন না; লোক প্রবৃত্তি যে দিকে যাইত সবার মতকেও সেই দিকে চালাইতেন। তিনি এইভাবে অনেক কাল অত্যাচার চালাইয়া শেষ ধর্ম্মের প্রভাবেই হউক অথবা লোকের অভিশাপেই হউক ভয়ানকরূপে আক্রান্ত হন। অবশেষে পদ পচিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। পরক্ষণে তাঁহার অনেক সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়। ফলকথা, দুদুমিয়া মরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অত্যাচার জনিত অনেক পরিবারের হৃদয়ে চিরদুঃখ সঞ্চিত রহিয়াছে, অনেক পরিবার উৎসন্ন গিয়াছে। অদ্যাপিও সেই দুদুমিয়ার খলিফা ও শিষ্য ফেরাজীরা চর অঞ্চলে থাকিয়া অবসরক্রমে লোকের প্রতি অত্যাচার ও চুরি ডাকাইতি করিয়া থাকে। এই অত্যাচার নিবন্ধন অদ্যাপিও এদেশ ঠাণ্ডা হয় নাই।..."

বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সমর-উত্তেজক অনেক গান রচনা করা হয়। ওহাবী দলভুক্ত নূতন নূতন লোকদের সম্মুখে এবং ওহাবী সেনাদলের কুচ্‌কাওয়াজের সময় এই সকল গান গীত হইত। ইহার মধ্যে যে গানটি একটি বিশেষ সমর-সঙ্গীত রূপে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—

"First I glorify God, who is beyond all praise;
I laud his prophet, and write a song on Holy War:
Holy war is a war carried on for religion, without any lust of Power. In the Sacred Scriptures its glories are related: I mention a few.
War against the infidel is incumbent on all Musalmans; make provision for it before all things.
He who from his heart gives one farthing to the cause, shall rearafter receive seven hundredfold;
And he who both gives and joins in the fight, shall receive seven thousand fold from God.
He who shall equip a warrior in the cause of God shall obtain a martyr's reward.
His children dread not the trouble of the grave; nor the last trump; nor the day of judgment.
Cease to be cowards; join the divine leader, and smite the infidel.
I give thanks to God that a great leader has been born in the thirteenth century of Hijra.
Oh friend, since you must sometime die, is it not better to offer up your life in the service of the Lord?
Thousands go to war and come back unhurt! thousands remain at home and die.
You are filled with worldly care, and have forgotten your Maker in thinking of your wives and children.
How long will you be able to remain with your wives and children? How long to escape death?
If you give up this world for the sake of God, you enjoy the pleasures of Heaven for ever.
Fill the uttermost ends of India with Islam, so that no sounds may be heard but "Allah! Allah!"*

ওহাবীরা সাধারণ মুসলমানদিগকে এই বলিয়া উত্তেজিত করে যে, বিধর্ম্মীর রাজ্য দার-উল্‌-হারব। এখানে বসবাস করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য। হয় এই রাজ্যকে একটি পুরাপুরি মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত কর, নতুবা এদেশ হইতে স্বাধীন মুসলমান রাজ্যে (দার্‌-উল্‌-ইস্‌লাম) চলিয়া যাও। ইহাতেও অপরিণামদর্শী মুসলমান সমাজ ভারতবর্ষে একটি মুসলমান ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে মাতিয়া উঠে। পূর্ব্বেই মূল কেন্দ্র সীতানার উল্লেখ করা হইয়াছে। পঞ্জাব অধিকারের পর ভারত-গবর্ণমেণ্ট ১৮৫০-৫৮ সনের মধ্যে ওহাবীদের বিরুদ্ধে ষোলটি এবং '৬৩ সনের মধ্যে অন্যূন কুড়িটি অভিযান চালান। সিপাহী যুদ্ধ-কালেও ওহাবীরা বেশ সক্রিয় ছিল। তবে ১৮৫৮ সনের শেষভাগেই—তখন সিপাহী যুদ্ধ একেবারে শেষ হয় নাই— ওহাবীগণ পশ্চিমাঞ্চলের ইংরেজ অধিকারের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হইয়া উঠে। এই সময় সুদূর সিতানা কেন্দ্রে "বেহারের ও বাঙ্গালার মধ্যে বারাসত, সাতক্ষীরা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের কয়াজীরা ধন ও জন দিয়া বিস্তর সাহায্য করে।"*

ইংরেজরা প্রথমে ওহাবীদের শক্তি পরিমাপ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইংরেজাধিকার যখন সত্য সত্যই আক্রান্ত হইল তখন তাহারা স্যর সিডনি কটনের নেতৃত্বে উপযুক্ত সংখ্যক সেনা প্রেরণ করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে ওহাবীদের পরাজিত করে। সীতানার ওহাবী দুর্গও ধ্বংস করিয়া ফেলা হইল। কিন্তু তবু ওহাবীরা দমিয়া গেল না। সীতানা হইতে কিয়দ্দূরে মহবান নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে মল্‌কায় গিয়া তাহারা আশ্রয় লইল।

ইহার পর কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ওহাবীরা প্রকাশ্যে তেমন কিছু উৎপাতাদি করে নাই। তবে লোকজন ও রসদপত্র সংগ্রহ পূর্ব্ববৎই চলিতে থাকে। পার্ব্বত্য-উপজাতিদের মধ্যে কখন কখন 'ধর্ম্ম-কর' আদায় লইয়া ও কোন কোন আর্থিক প্রয়োজন সম্পর্কে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইত বটে, কিন্তু 'ধর্ম্ম-রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করিতে তাহারা সকলেই সমান তৎপর ছিল এবং যথাসময়ে এই সকল উপজাতীয়েরা ওহাবীদের সহায় হইত। কয়েক বৎসর চুপচাপ থাকিয়া ওহাবীরা ১৮৬৩ সনে পুনরায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। ১৮২৭-৩০ সনে তাহারা রণজিৎ সিংহের রাজ্যে যেরূপ উপদ্রব সুরু করিয়া দিয়াছিল এবারেও প্রায় তাহারই পুনরাবৃত্তি হইল। ১৮৬৩ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ওহাবী ও ব্রিটিশ সেনার মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। এবারকার সেনাধ্যক্ষ ছিলেন স্যর নেভিল চেম্বারলেন। আম্বেলা গিরিসঙ্কটে যে শেষ সংগ্রাম হইল তাহাতে ব্রিটিশ বাহিনী জয়লাভ করে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিস্তর সৈন্য হতাহত হয়। শেষ পর্য্যন্ত উপজাতীয় দলসমূহের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হওয়াতেও ব্রিটিশের অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। কূটনীতি এ ক্ষেত্রে তাহাদের বিশেষ সহায় হয়।

দ্বিতীয় বার সম্মুখ সমরে পরাজিত হইয়াও কিন্তু ওহাবীরা আদৌ নিরস্ত হয় নাই। এই দলটি কতকটা গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক জন নেতার মৃত্যুতে বা প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ধ্বংস হইলেই তাহাদের কার্য্য বন্ধ হইত না। আসল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র হইতে প্রচারকার্য্য এবং ধন ও জনবল সংগ্রহ আগের মতই চলিতেছিল। ১৮৬৮ সনে পুনরায় ব্রিটিশ ও ওহাবীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পার্ব্বত্য উপ-জাতীয়েরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারেও ওহাবীদের বিশেষ সাহায্য করিল। এবার খাস জঙ্গীলাট ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অভিযান পরিচালনা করেন। এবারকার যুদ্ধেও বিস্তর ব্রিটিশ সেনা হতাহত হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাদেরই জয় হইল। প্রাণপণ করিয়া লড়িয়াও উন্নত বৈজ্ঞানিক রণাস্ত্র ও

* *The Indian Musalmans*. By W. W. Hunter. 1871. Pp. 65-6.

* 'অমৃত বাজার পত্রিকা', ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। "ভারতের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ", পৃঃ ১৭৮ দ্রষ্টব্য।

সমরকৌশলের নিকটে দুর্ধর্ষ ওহাবী সেনা হার মানিতে বাধ্য হয়।

সরকার ওহাবীদের কার্য্যকলাপের প্রতি প্রথমে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, কিন্তু দ্বিতীয় বারের সংঘর্ষের পর হইতেই তাঁহারা এ সম্বন্ধে নিয়মিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে ওহাবীদের শক্তিসামর্থ্য, প্রচার-কৌশল, পুস্তক-পুস্তিকা, রসদ সংগ্রহ এবং মুসলমান জনসাধারণের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ প্রভৃতির বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। এ সকলের কতকটা আভাস আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। ১৮৬৪ সনে পঞ্জাবের আম্বালা শহরে ব্রিটিশ বিচারাদালতে রাজদ্রোহাত্মক কার্য্যের অপরাধে ওহাবীদের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে মোকদ্দমা রুজু হইল। এই মোকদ্দমায় এগার জনের বিচার হয় এবং প্রত্যেকেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই আসামীদের মধ্যে একজন ছিল নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রাম-নিবাসী মুসলমান। বহু সরকারী মুসলমান কর্ম্মচারীও যে ওহাবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাহাও এই সময় বিশেষ করিয়া জানা গেল।

ইহার পর বৎসর ১৮৬৫ সনে পাটনায় ওহাবীদের দ্বিতীয় মোকদ্দমা হয়। ১৮৬৯-৭০ সনে মালদহ, রাজমহল, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানেও বিচার আরম্ভ হইল। এবারে ছাব্বিশ জন ওহাবীর বিচার হয়। ইহাদের মধ্যে পাঁচ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। এই দলের মধ্যে কলুটোলার বিখ্যাত ব্যবসায়ী আমীর খাঁ ছিলেন প্রধান। আমীর খাঁ কলিকাতা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত লড়িয়াছিলেন। হাইকোর্টের আপীলে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন বোম্বাই হাইকোর্টের বিখ্যাত এডভোকেট এনেষ্টি সাহেব। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে, এই মামলায় আমীর খাঁর পক্ষে এনেষ্টি সাহেব যে সওয়াল করেন তাহা পাঠ করিয়া তরুণ বয়সেই তাঁহারা স্বাধীনতার পূজারী হইয়া উঠেন।

আমীর খাঁর মোকদ্দমার বিচার করেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নর্ম্যান। ১৮৭১ সনে এই মামলার চূড়ান্ত বিচার হইয়া যায়। বিচারে আমীর খাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ইহার অল্পকাল পরেই, ১৮৭১ সনের ২০শে অক্টোবর তারিখে উক্ত বিচারপতি নর্ম্যান সাহেব এক মুসলমান আততায়ীর নির্ম্মম আঘাতে প্রাণ হারাইলেন। ইহার মাত্র তিন মাস পরে ১৮৭২ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী তৎকালীন বড়লাট লর্ড মেও আন্দামান পরিভ্রমণ কালে পোর্ট ব্লেয়ারে সন্ধ্যার অন্ধকারে শের আলি নামক এক মুসলমান কয়েদীর হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। উভয় আততায়ীই ওহাবী দলভুক্ত বলিয়া সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। ওহাবীদের দমনের জন্য সরকার তিন বার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হন, বিভিন্ন স্থানে ওহাবী-নেতাদের আটক করিয়া বিচারান্তর তাহাদের কারাদণ্ডেও দণ্ডিত করা হয়, রাজ-দ্রোহাত্মক প্রচারকার্য্য বন্ধ করিবার জন্য ফৌজদারী আইনও সংশোধন করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু এত করিয়াও ওহাবীদের দমন করা গেল না। মাঝখান হইতে উহাদেরই দুই জনের হস্তে দুই জন ইংরেজ রাজপুরুষের প্রাণ দিতে হইল। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা কল্পে ওহাবীরা কিরূপ ত্যাগস্বীকারপূর্ব্বক মন্ত্রগুপ্তি সহকারে কার্য্যে ব্রতী হয়, সে সম্বন্ধে অমৃত বাজার পত্রিকা ১৮৭২ সনের ২৫ এপ্রিল তারিখে একটি সুচিন্তিত প্রস্তাব লেখেন। ইহা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল,—

"পৃথিবীর মধ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র যখন যেখানে হইয়াছে, এক সূত্রে না এক সূত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ওহাবী ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা পদে পদে পাইতেছি অথচ উহা ধরিবার যো নাই। এই ষড়যন্ত্রের একটি বিষয় দেখিয়া আমরা অবাক হই। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সবল সাহসী ধর্ম্মোন্মত্ত, অকাতরে প্রাণ দিতে পারে অথচ কিছু প্রকাশ করিবে না এরূপ লোক এক কোটির মধ্যে একজন পাওয়া সুকঠিন। এরূপ লোক অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা কেবল অসাধ্য নহে, কিন্তু অনুসন্ধানে প্রবর্ত্ত হইলে তাহা প্রকাশ না হইয়া যায় না। আমাদের রাজ-পুরুষদিগের ক্ষমতা বিস্তর সত্ত্বেও ইহার নিগূঢ় কারণ তাঁহারা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। যে ষড়যন্ত্র এরূপ লোক দ্বারা সৃষ্ট যাহা কল্পনা চক্ষেও অদৃশ্য, যাহার প্রকৃতি এরূপ অভেদ্য, এবং যাহা সম্ভবত: ভারতবর্ষের প্রতি লোমকূপে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা শাসন দ্বারা দমন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।...মুসলমানেরা ভারি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, স্বর্গসুখ তাহাদের ইন্দ্রিয়সুখের পরাকাষ্ঠা, তাহারা ইংরেজী অভ্যাস করে না। কোরাণে তাহাদের অবিচলিত বিশ্বাস এবং যত কাফের হত্যা করিলে তাহারা স্বর্গসুখ তত অধিক ভোগ করিবে এই তাহাদের বিশ্বাস। তাহারা এক একটি হত্যাকে অনন্ত-সুখের দ্বার বিবেচনা করে সুতরাং কোনরূপ শাসন তাহারা লক্ষ্য করে না। প্রত্যুত অনুগ্রহের ন্যায় শাসনেও তাহাদিগকে আরও অধিক প্রতিজ্ঞারূঢ় ও উৎসাহী করিতে পারে।"*

ওহাবীদের মন্ত্রগুপ্তি এবং ওহাবী মতবাদের ব্যাপক প্রচারের জন্য কর্তৃপক্ষ ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সহসা পারগ হন নাই। পরে তাঁহারা ওহাবীদের নির্মূল করিবার জন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ বিষয় এখন বলিব না। বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে ওহাবী বা ফরাজীদের উৎপীড়নে ১৮৭০ সন নাগাদ জনসাধারণ কিরূপ উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ ঢাকা হইতে প্রকাশিত ২৮ মে ১৮৭০ তারিখের 'হিন্দু হিতৈষিণী'তে প্রদত্ত হয়। 'হিন্দু হিতৈষিণী' লেখেন—

"যখন দুদুমিয়া এদেশে প্রাদুর্ভূত হন, তখন হইতেই মোসলমান ধর্ম্মে...ফেরাজী মত প্রচলিত হয়। দুদুমিয়ার এমনই প্রতাপ ছিল যে একমাত্র সাধারণ অনুবলে ঢাকা, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, ত্রিপুরা এবং নোয়াখালী জেলার প্রায় ইতর শ্রেণীর মোসলমানই তাহার বক্তৃতা ও মত স্বীকার করে। যাহারা প্রথম

*"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ," পৃ. ২২৬-৭।

আপত্য করিয়াছে তাহারা সাধারণের সুশাসনে তৎপরক্ষণেই অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। ইতর লোকেরা কোন উচ্চ লোকের সাহায্য পাইলে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে; দুদুমিয়ার যত প্রতাপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই লোকের প্রতি বিষম অত্যাচার হয়। দুদুমিয়ার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা বলা সুকঠিন। তাঁহার মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর লোকে এক প্রকার শান্তি ভোগ করে। প্রায় ৬।৭ মাস যাবৎ পুনরায় সেই সকল দুর্বৃত্ত ফরাজীরা মাদারিপুর সব ডিভিসনের অন্তর্গত স্থানসমূহে ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেও এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, অদ্য তৎসম্বন্ধে দুইখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার একখানি যথাস্থানে প্রকাশ করা গেল।

"মাদারিপুর সব ডিভিসনের লোকেরা গত ২২শে এপ্রিল বঙ্গদেশের লেপ টেনেণ্ট গবর্ণর উইলিয়ম গ্রে মহোদয়ের নিকট দুদুমিয়ার পুত্রদ্বয়ের অত্যাচার উল্লেখ করিয়া এক আবেদন করে; আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন সুফল হইল কি না জানা যায় না। কেহ২ বলেন, মাদারিপুর সব ডিভিসনে যখন সুযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু দীনবন্ধু মৌলিক ছিলেন, তখন তাঁহার সুশাসনে ফেরাজীরা নিবৃত্ত ছিল, তৎপর যখন তথায় একজন মুসলমান ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট যান তখন হইতেই পুনরায় ফেরাজীর প্রশ্রয় পাইয়া অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা আদালতের আদেশও অবজ্ঞা করে, ২।৩ মাস হইল ছোট আদালতের ডিক্রী ক্রমে একজন গোমস্তাকে ধৃত করে, ফেরাজীরা প্যাদাকে প্রহার করিয়া দায়িককে কাড়িয়া রাখে। আর এক ফৌজদারী মোকদ্দমায় ২ জন কনেষ্টবল প্রহারিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে অবর্ণ ঘটাইয়া ভূমির কর আদায়ের নানা বিঘ্ন জন্মাইতেছে; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আজি উনবিংশ শতাব্দীতে চতুর্দ্দিকের কোলাহল শুনিয়াও এরূপ অত্যাচার অধিক দিন বর্ত্তমান রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই এ সকল অত্যাচার অবগত হইতেছেন, যদি এ অত্যাচারের কোন প্রতিবিধান না হয় তবে বৃটিশ সুশাসন আমাদের কি উপকারে আসিল? অন্যান্য স্থানের কথা বলিতে পারি না, মাদারিপুর সবডিবিসনের এলাকার লোকেরা এ সকল অত্যাচারে পরিবার ও সম্পত্তি আপনাদিগের গলগ্রহ মনে করিতেছে। কোথায় রাখিলে নির্ব্বিঘ্নে থাকিবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না। ফেরাজীদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা দূরে থাকুক, কথা বলিলেই তাহার বিপদ ঘটে; অভিযোগ করিয়াও সুফল লাভ হয় না। যত ইতর শ্রেণীর মোসলমান সমুদয়ই ফেরাজী, তন্মধ্যে ৫।৭ জন উহাদের ধর্ম্মোপদেশক (খলিফা) আছে। মোকদ্দমা উপস্থিত হইলেই উহারা সাক্ষী প্রভৃতির প্রতি অত্যাচারের ভয় প্রদর্শন করে, বোধ হয় সেইজন্যই পার্য্যমানে কেহ প্রকৃত সাক্ষ্য প্রদান করিতে সাহস পায় না।…"

ওহাবী তথা ফরাজীদের মূল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র একটি মুসলমান ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে ব্রিটিশরা ছিল প্রবল প্রতিবাদী। তাই তাহাদের বিরুদ্ধে ছিল এই সকল ষড়যন্ত্র ও সশস্ত্র অভিযান। কিন্তু ইংরেজ লক্ষ্য হইলেও ওহাবীদের অত্যাচার-উৎপীড়ন প্রতিবেশী হিন্দুদেরই বিশেষ করিয়া সহ্য করিতে হয়। হিন্দু (আজকালকার ভাষায় অ-মুসলমান) সমাজ যে নিছক মুসলমান রাজ্য স্থাপনে ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধক হইবে তাহা তাহারা জানিত, এবং জানিত বলিয়াই ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাইলেও হিন্দুদেরই সম্পত্তি লুণ্ঠন, ঘরবাড়ী পোড়ান, নারীর উপর অত্যাচার, মারপিট, নরহত্যা প্রভৃতিতে লিপ্ত হইত। ওহাবীদের কার্য্যকলাপ ঠিক ১৬ই আগষ্টের (১৯৪৬) মুসলিম লীগ পরিচালিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ব্রিটিশগণ ওহাবীদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বিদূরিত করিয়া কিরূপে তাহাদের হিন্দু বিদ্বেষ সমগ্র মুসলমান সমাজে ছড়াইয়া দিতে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে প্রবৃত্ত হয় সে এক অভিনব ব্যাপার। এই প্রচেষ্টার পরিণতি আজ খণ্ডিত-ভারতে লক্ষ্য করি।

সমর্পণ

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

বিপুল উচ্ছ্বাস জাগে হৃদয়ের গোপন কোঠায় :
ওই মসীমাখা নভ— তারি মাঝে অজস্র তারকা—
মোর চিত্তাকাশে তারা কত শত মুকুল ফোটায়।
ওই দীর্ঘ শুভ্রোজ্জ্বল ছায়াপথ—দিগন্তবিসারী রেখা
অপূর্ব্ব আবেগ তোলে। আলো-ছায়া সুন্দর-ভীষণ
মিলিয়া আমার চোখে ধরা দেয় অপরূপ রূপে।
পুঞ্জীভূত ঘন মেঘ ধীরে ধীরে ত্যজি জড়াসন
দূরান্তরে চলে যায় জমেছে যা' মর্ম্মমাঝে চুপে।

কল্পনা-প্রবাহ মোরে নিয়ে চলে ধরা হতে দূরে
হৃদয়-মুকুল যেথা ফুটে রয় ঝরে না কখন,
বাস্তব-সীমার শেষে বিচরণ করি কল্পপুরে।
চিরসুন্দরের ধ্যানে মধু রাতে হই নিমগন।

আপনারে ফিরে পাই, জন্মান্তর-স্মৃতি জাগে মনে
নিঃশেষে সঁপিয়া দিনু যেইমন সুন্দর-চরণে।

রসরাজ অমৃতলাল বসু

১৮৫৩ - ১৯২৯

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ; শৈশব-শিক্ষা

১৮৫৩ সনের ১৭ই এপ্রিল (১২৬০, ৬ই বৈশাখ) শ্রীরাম নবমীর দিন কলিকাতায় অমৃতলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—কৈলাসচন্দ্র বসু ; তিনি এক সময়ে যথাক্রমে ওরিয়েণ্টাল সেমিনরীর সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

অমৃতলালের শৈশব-শিক্ষা শুরু হয়—পিতৃপ্রতিষ্ঠিত কম্বুলিয়াটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ে (বর্ত্তমানে 'শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল') ; এই সময়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী তাঁহার সতীর্থ বন্ধু ছিলেন। এখানকার পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি দুই বৎসর হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৯ সনে জেনারেল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশন হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া অমৃতলাল দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

বিবাহ

এনট্রান্স পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, ১৫ বৎসর বয়সে, অমৃতলালের বিবাহ হইয়াছিল। পাত্রী—শালিখার ভূম্যধিকারী জয়নারায়ণ ঘোষের পৌত্রী, বয়স ৯ বৎসর। কৈলাসচন্দ্র পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই ; এই ঘটনার তিন বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

ডাক্তারি

ছেলেবেলা হইতেই চিকিৎসা-বিদ্যার দিকে অমৃতলালের ঝোঁক ছিল। তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন ; এখানে রাধাগোবিন্দ কর (আর. জি. কর) তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। অমৃতলাল মাঝে মাঝে কাশী গিয়া পিতৃবন্ধু প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ লোকনাথ মৈত্রের নিকট অবস্থান করিতেন। মোটের উপর দুই বৎসর মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নের পর, এলোপ্যাথির পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথি চর্চ্চার জন্ত কাশীতে রহিয়া গেলেন।

কাশীতে অবস্থানকালে অমৃতলালের ইংরেজী পড়ার নেশা জমিয়া উঠিয়াছিল। কুইন্স কলেজের প্রধানাধ্যক্ষ রাজচন্দ্র সান্ডাল তাঁহাকে লাইব্রেরী হইতে ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের ইতিহাস, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি অনেক বিষয় পড়িবার সুযোগ দান করিয়াছিলেন। অমৃতলাল বলিয়াছেন, "জীবনে যদি আমি কিছুমাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকি, তজ্জন্ত সান্ডাল মহাশয়ের নিকটে আমি অনেক অংশে ঋণী।"

১৮৭২ সনের মাঝামাঝি, লোকনাথবাবুর পত্র লইয়া, অমৃতলাল বাঁকিপুরে ডাক্তারি করিতে যান। কিন্তু মাস-কয়েক পরেই তাঁহার জীবনের গতি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

"কাশী হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতাম। এখানে অবস্থানকালে আমাদের কম্বুলিয়াটোলার স্কুলে শিক্ষকতা করিতাম ; বেতন লইতাম না। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, চুনীলাল বসু, প্রিয়নাথ সেন আমার ছাত্র। অর্দ্ধেন্দুশেখর ও ধর্ম্মদাস সুর তখন এই স্কুলে মাষ্টারি করিত। আমার বাবা, কাকা, মামা, সকলেই ইস্কুল-মাষ্টারি করিয়াছিলেন ; আমিও মাষ্টারি করিতাম। অর্দ্ধেন্দু বলিলেন—'তুমি এসেছ ভালই হয়েছে ; লীলাবতীর অভিনয় করতে হবে।' নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত ব্যবস্থা করিবার ভার লইলেন।...লীলাবতীর রিহার্স্যাল চলিতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু আমাকে জোর করিয়া যোগজীবনের ভূমিকা লওয়াইলেন।...আমাদের রিহার্স্যাল হইত গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে ; গাঙ্গুলী হাইকোর্টের কর্ম্মচারী ছিলেন।...এক দিন আমাদের পুরা মজলিস বসিয়াছে, গোবিন্দ হাইকোর্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে আমাদিগকে বলিলেন—'দেখ, হাইকোর্টে শুনে এলাম, সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না, লর্ড মেয়োকে না কি আণ্ডামান দ্বীপে খুন করেছে [৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২]।' সেদিন মজলিস বন্ধ হইয়া গেল।...তালিম দেওয়া যখন শেষ হইয়া আসিল, কাশী হইতে লোকনাথ বাবু কলিকাতায় আসিয়া আমাকে কাশীতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। বন্ধুরা কত কাকুতি মিনতি করিলেন ; তিনি কাহারও কথায় বিচলিত হইলেন না। আমার আর ষ্টেজে দাঁড়ান হইল না।

"১৮৭২ সালের গোড়ায় কাশী পরিত্যাগ করিয়া বাঁকিপুরে আসিলাম। ঐ বৎসরের নবেম্বর মাসে বাঁকিপুর হইতে কলিকাতায় আসিলাম ; বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার উপলক্ষে। এই যে বাঁকিপুর ছাড়িলাম, আর সেখানে ডাক্তারি করিবার জন্ত ফিরিয়া যাইতে হইল না।

"কলিকাতায় আসিয়া যেদিন প্রথম আমি আমাদের স্কুল দর্শন করিতে যাই, অর্দ্ধেন্দু আমাকে দেখিয়া ক্লাস হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখনই হেড মাষ্টারের নিকট হইতে ছুটি লইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া ভুবন নিয়োগীর বাগবাজারের গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকখানায় গেল। গঙ্গাতীরে সেই সুন্দর অট্টালিকার কোনও চিহ্ন এখন নাই ; পোর্ট-ট্রষ্টের কল্যাণে সেটি লুপ্ত হইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে অর্দ্ধেন্দু আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। গিরিশবাবুর সঙ্গে মনোমালিন্য হইয়াছে।... গিরিশবাবু বলিয়াছিলেন, 'থিয়েটরের জন্ত একখানা ভাল

বাড়ী না করিয়া টিকিট বেচিবার ব্যবস্থা করিলে কিছুই হইবে না ; আগে ভাল বাড়ী, ভাল ষ্টেজ কর, তারপরে টিকিট বিক্রয় কর ; নইলে লোকে টিকিট কিনিবে কেন ?' অর্দ্ধেন্দু ও নগেন্দ্র বন্দ্যো বলিলেন—'আমরা ছোট বাড়ীতেই আরম্ভ করি, ছোটখাটো ষ্টেজ করি ; একেবারে বড় বাড়ী বড় ষ্টেজ কোথায় পাওয়া যাবে ?' এই কথা লইয়া দলাদলির সূত্রপাত হইয়াছিল। এ সকল বিষয় আমি কিছুই জানিতাম না ; আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম না। যখন গঙ্গার তীরে ভুবন নিয়োগীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখন বুঝিলাম গিরিশ বাবুকে বাদ দিয়াই থিয়েটর করিতে হইবে।...দ্বিতলের প্রকাণ্ড হলে আমরা নীলদর্পণের অভিনয় চালাইতাম। আমার কোনও পার্ট লইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু সকলে মিলিয়া চাপাচাপি করিয়া ধরিল ; বলিল—'তুমি সৈরিন্ধ্রীর পার্টটা নাও ; বেশী নয়, দু-এক রাত্রি তুমি প্লে কর ; তার পর না হয় আমরা অন্য ব্যবস্থা করে নেবো।' সেই দু-এক রাত্রি করিতে করিতে আজ চুয়াল্লিশ বছর কাটিয়া গেল।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ২য় পর্য্যায়, পৃ, ১৪-৯৭)

রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপে

১৮৭২ সনের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই দিন কলিকাতায় সাধারণ-রঙ্গালয়ের ('ন্যাশনাল থিয়েটারে'র) প্রতিষ্ঠা হয়। এই তারিখে অভিনীত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে ১৯ বৎসর বয়স্ক অমৃতলাল সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় সর্ব্বপ্রথম পাদপ্রদীপের সম্মুখীন হন। তিনি বলিয়াছেন :—

"যথাসময়ে তৃতীয় দৃশ্যে সীন উঠিল ; আমি সৈরিন্ধ্রী বেশে ষ্টেজের উপর উপবিষ্ট। চাহিয়া দেখি, আমার গুরুস্থানীয় কয়েক জন ভদ্রলোক সম্মুখে বসিয়া আছেন। মুহূর্ত্তের জন্য আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল ; আমি যেন তখন সমাজচ্যুত, জাতিচ্যুত, ধর্ম্মচ্যুত হইয়া আমার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত লজ্জার ভার শিরে বহন করিয়া আমার গুরুজনদিগের সম্মুখে নারী-বেশে উপবিষ্ট হইয়াছি ; যেন মনে হইল, টিকিট বেচিয়া পাবলিক ষ্টেজে অভিনয় করিয়া আমি আমার সমাজকে, স্বদেশকে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে আজ যে লজ্জা দিতেছি তাহার একমাত্র শাস্তি—বহিষ্করণ। আমার তখনকার মনের ভাব আজ আপনারা বুঝিতে পারিবেন না। তখন সমাজ ছিল, সমাজ বন্ধন ছিল, সমাজদ্রোহিতার শাস্তি ছিল। মুহূর্ত্তের জন্য আমার মাথা ঘুরিয়া গেল ; পরক্ষণেই ভাবিলাম এ যা হবার তা ত হ'ল ; এখন যদি ভাল করিয়া প্লে করিতে না পারি, তাহা হইলে গঞ্জনা লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। কায়মনোবাক্যে নীলদর্পণের সৈরিন্ধ্রী হইলাম। বাহবা ধ্বনির তালে তালে 'সীন' পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।...পর সপ্তাহে অমৃত বাজার পত্রিকা সৈরিন্ধ্রীর সমালোচনা করিয়া লিখিলেন —'তাহার রোদনস্বর অপূর্ব্ব বলিতে হইবে।"

অমৃতলালের অবশিষ্ট জীবন কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয় —ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী, বেঙ্গল, ষ্টার, মিনার্ভা প্রভৃতির সহিত ওতপ্রোত হইয়া আছে। নাট্যজীবনে অমৃতলালের প্রথম গুরু—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "কবিবর গিরিশচন্দ্র সাধারণ-নাট্যশালা-স্থাপনের কতকটা বিরোধীই ছিলেন, সুতরাং এক-মাত্র এই অর্দ্ধেন্দুই ন্যাশানাল থিয়েটারের তৎকালীন সুদক্ষ অভিনেতাদিগকে শিক্ষা-পরামর্শদানে প্রস্তুত করিয়া তুলেন। নীলদর্পণের সৈরিন্ধ্রী, নবীন তপস্বিনীর বিজয় ও নব-নাটকের সুবোধ প্রভৃতি প্রথম নাট্যজীবনের কয়েকটি ভূমিকা গ্রহকার ইঁহারই নিকটে শিক্ষা করেন" ('অমৃত-মদিরা')। গুরুর ন্যায় অমৃতলালও প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের ভাষায়—"হাস্য-রসাভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু, বেল বাবু এবং ভুনিবাবু (নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু) এই তিন জনেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।...যে চরিত্রে শ্লেষ আছে—তাহার অভিনয়ে ভুনিবাবু অতুলনীয়।"

যৌবনে অমৃতলাল যাঁহাদের সহিত নাট্যক্রীড়ায় যোগদান করিয়াছিলেন, কালসহকারে তাঁহাদের অনেকে প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গালয়ের সহিত যুক্ত হইলেও পরস্পরের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব প্রীতির আকর্ষণ ছিল। মহেন্দ্রলাল বসুর মৃত্যু হইলে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধার-যোগ্য ; পত্রখানি এইরূপ :—

"মহেন্দ্র সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আমার প্রাণে কি ব্যথা লাগিয়াছে, তাহা আপনিই বুঝিবেন। আমাদের সেই সুদূরগত প্রথম নাট্যজীবনের স্বার্থশূন্য Romantic প্রেমের দৃষ্টান্ত জগতে যে অধিক মিলিতে পারে, এমন বোধ হয় না। গত বৃহস্পতিবারে আমার একটি প্রায় তিন বৎসরের মধুরভাষী দৌহিত্রী আমাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কন্যা আমার সূতিকাগারে পড়িয়া কাঁদিতেছে, আমার বড় কষ্ট, তবু বুঝিতেছি যে, এ শোক সোডা ওয়াটারের তুল্য ; কিন্তু বেল, মতি, মহেন্দ্রের শোক সীতাকুণ্ডের ন্যায় চিরদিন তপ্তভাবে ফুটিতে থাকিবে। কতবার ঝগড়া করিয়াছি—সেই ঝগড়ার মধ্যেও কি মধুর মিলনাকাঙ্ক্ষা ছিল !

"তথাপি আপনার লিখিত মহেন্দ্রের স্মৃতি-উপহারস্বরূপ সরল সত্য বিষাদ-গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হৃদয়ের কথা কয়টি পড়িয়া ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি যেন আগে মরি, আপনি আমায় মনে করিয়া দু-ফোঁটা চক্ষের জল ফেলুন। অতি চমৎকার লেখা—সূর্য্যদেব আপনি সাবধানে অন্তরে রহিয়া চন্দ্রকে ফুটিতে দিয়াছেন ; কিন্তু যে জানে, সে বুঝিতেছে যে—সূর্য্যের কিরণই চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া এত মনোহর হইয়াছে। প্রায় অন্ধতায়ই এই আঁকা-বাঁকা লেখা। ১৭-৩-১৯০১।—স্নেহের অমৃত।"

প্রাথমিক রচনা

অমৃতলাল শৈশবাবধি বাংলা-সাহিত্যে অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার বাংলা রচনার—বিশেষতঃ 'প্যারডি' রচনার গোড়ার কথাটি তিনি স্মৃতিকথায় এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন :—

"আমার একজন দূরসম্পর্কীয় কাকা ছিলেন ; তাঁহার নাম প্যারিমোহন বসু।...তখনকার খৃষ্টান পাদরীর স্কুলে বিদ্যালাভ



রসরাজ অমৃতলাল বসু

করিয়া তাঁহারা পঠদ্দশায় বাংলা ভাষার চর্চা করিবার বড় একটা অবসর পান নাই, কিন্তু ল্যাটিন গ্রীক পড়িয়াছিলেন।... তিনি আমাকে একটু একটু ল্যাটিন গ্রীক পড়াইতেন, আমি তাঁহাকে বাংলা বই পড়িয়া শুনাইতাম ; 'ভাস্কর' কাগজখানা প্রায়ই তাঁহাকে শুনাইতে হইত। ক্রমশঃ তাঁহার বাংলা রচনার দিকে একটা প্রবল ঝোঁক হইল ; তিনি শ্লেষ-রচনায় সিদ্ধহস্ত হইলেন ; 'ভাস্করে' তাঁহার সেই সকল parody প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। মাইকেলকে লইয়া তিনি parody করিতেন। মাইকেল লিখিয়াছেন—

আহা, শৈবালের দলে শোভে যেই রত্নরাজি,

প্যারিকাকা লিখিলেন—

আহা, মুষকের ল্যাজে শোভে যেই পুচ্ছরাজি,...

পুনশ্চ, মাইকেলকে অনুকরণ করিয়া তিনি লিখিলেন—

আমি হনু, এ বিপুল বিশ্বে কে না ডরে
দেখি মোর লাফ!

তাঁহার এই সকল শ্লেষ-রচনার ক্রমে আমি তাঁহার শাকরেদ হইয়া উঠিলাম ; অনেক সময়ে তিনি আমাকে পাদপূরণের জন্য আহ্বান করিতেন। আমার রচনায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলে আমি কৃতার্থ হইতাম। ইহার পূর্ব্বে কবিতা রচনায় আমার হাতে খড়ি দিয়াছিলেন আমাদের এই শ্যামবাজার স্কুলের পণ্ডিত ব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।...আমরা বিদ্যালয়ে নানা ছন্দে কবিতা রচনা করিতে অভ্যাস করিলাম। পরে প্যারিকাকার নিকটে অভয় পাইয়া ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে আমার প্রথম চিত্রকাব্য রচিত হয়। আমার সেই প্রথম রচনাটি মোটেই রসাত্মক নহে, কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ শব্দ মাত্র। আদ্য-ক্ষরগুলি একত্র জুড়িলে আমার নামটি বানান করা হয়। এখনও আমার সেটি মুখস্থ আছে—

শ্রীশ্রীহরিপদে যে বা করয়ে স্মরণ।
অবনী ভিতরে সেই আদরের ধন॥
মৃত্যুভয় নাহি থাকে সদা আনন্দিত।
তপ জপ করে সদা মনের সহিত॥
লালসা নাহিক ধনে মোক্ষ প্রয়োজন।
লভিতে লালসা মাত্র ঈশ্বর চরণ॥
বন্দি ঈশ্বর চরণ খোঁজে মোক্ষপথ।
সুজন স্বজন তার শত্রু হয় হত॥

এ কবিতাটি লিখিয়া আমার মোটেই আনন্দ হয় নাই। কোনও রকম করিয়া মিল চাই ; এ ত হইল শব্দের গোঁজামিল মাত্র। প্যারীকাকা বলিলেন—'একটা ভাল ক'রে পদ্য লেখ না!' তখন সবেমাত্র স্যর রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু [১৯ এপ্রিল ১৮৬৭] হইয়াছে। তিনি বলিলেন 'স্যর রাধাকান্ত দেবের উদ্দেশে একটা ক'বতা লেখ না!' আমি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মাইকেলের 'রেখো মা দাসেরে মনে' কবিতাটির ছন্দে একটা পদ্য রচনা করিলাম। প্যারীকাকার তাহা এত ভাল লাগিল যে তিনি তাহা 'ভাস্করে' প্রকাশিত করিয়া দিলেন ; এই আমি প্রথম আমার লেখা ছাপার অক্ষরে দেখি। কবিতাটি আমার নিজেরও বেশ পছন্দসই হইয়াছিল। কিন্তু শ্লেষ-রচনার দিকেই আমার প্রবণতা বেশী রহিয়া গেল। আমার মধ্যে কিছু সহজ সরসতা, native wit, ছিল ; তিনি তাহা ফুটাইয়া তুলিলেন।...

প্যারীকাকার মৃত্যুর পরে আমার বাংলা রচনা দিন কতক বন্ধ ছিল। ঘটনাচক্রে আমি একখানা প্রহসন নাটক লিখিয়া ফেলিলাম ; আমাদের পাড়ায় একটা সখের যাত্রার দল ছিল—এক দিন তাহারা আমাকে ধরিয়া বসিল—'আপনি একটা আমাদের পালা লিখে দিন।' আমি বলিলাম, 'আমি কি লিখে দেব ?' তাহারা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল ; একখণ্ড দাশুরায়ের পাঁচালি আমার কাছে রাখিয়া গেল। আমি তখন সবেমাত্র পড়িয়াছি 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' তাহারই অনুকরণে আমি একখানা Farce রচনা করিলাম ; নামটা বড় ছোটখাট হইল না—'একেই কি বলে তোদের বাংলা সাহিত্যের উন্নতি করা ?' এই রচনাটি এখন একেবারে লুপ্ত।...

রস-সাহিত্য-রচনার জন্য আমি আর একজনের নিকট অত্যন্ত ঋণী। তিনি 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশির ঘোষ। কাশীতে যখন লোকনাথ বাবুর বাসায় ছিলাম,

'অমৃত বাজার পত্রিকা' পাঠ করিতাম। তখন কাগজখানি বাংলা ভাষায় পরিচালিত হইত; যশোর হইতে নিয়মিতভাবে কাগজ বাহির হইত; কলিকাতা সহরে তখনও বড় একটা জাহির হয় নাই। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র হাস্যোদ্দীপক প্রসঙ্গ 'বিবিধ' নামে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। তেমন সরস Comic titbits আমাদের সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। পঞ্চানন্দের প্রথম আমলে অনেকটা ইন্দ্রনাথে সেই খাঁটি রস উপভোগ করা যাইত। আমি পত্রিকার সেই অংশটার রসপ্রাচুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' দ্বিতীয় পর্য্যায়, পৃ. ৮২-৬)

অমৃতলালের ষ্টেজে লেখার প্রথম হাতে খড়ি 'মডেল স্কুল' নামে একটি নক্‌শা; ইহা ১৫ জানুয়ারি ১৮৭৩ তারিখে ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন:—

"লেফটেনান্ট গবর্ণর সার জন ক্যাম্বেলের মাথায় ঢুকলো যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর জন্ত এমন একটা সার্ভিস তৈরি করতে হবে, যাতে এক-একজন এক-একটা বিদ্যাকল্পদ্রুম হ'তে পারে। সাধারণ কেতাবি বিদ্যে ত থাকবেই, তার ওপর একটু কেমিষ্ট্রি, একটু বোট্যানি, সার্ভেয়িং, জিম্‌ন্যাষ্টিক, সাঁতার ইত্যাদি ইত্যাদি। সুরসিক শিশিরবাবু ক্যাম্বেলি সঙ্কল্পকে রহস্ত কোরে তাঁর 'অমৃত বাজারে' [২ মে ১৮৭২] একটি কার্টুন ছাপান, জিম্‌ন্যাষ্টিকের পোষাক-পরা, কোমরে একটি পেছন দিকে ঝোলান শিকলি আর কানে একটি চিম্‌টে (চিম্‌টেটা হচ্ছে কম্পাস)......



ক্যাম্বেলের মডেল ডেপুটি (ব্যঙ্গচিত্র)

ঐ কার্টুন দেখে-ই ও শিশিরবাবুর ইঙ্গিতে আমি এক নক্সা লিখি, জোড়াসাঁকোর সান্ন্যাল-বাড়ীতে তার অভিনয় হয়; শ্মশ্রুবিহীন ছোকরা আমি, তাতে প্রফেসর আর বড় বড় দাড়ী গোঁফ-পরা হিন্দু-মুসলমান ছাত্র, পরিচ্ছদ শিশিরবাবুর কার্টুনের অনুরূপে কানে চিম্‌টে কোমরে শিকলি, খালি প্রফেসরের পেণ্টুলেন চাপকান। কচুপাতা কেটে খণ্ড খণ্ড ক'রে বুঝিয়ে দিতুম, যত-ই খণ্ড খণ্ড করিয়াছি, তত-ই কচুপাতা হচ্ছে, একখানাও কলাপাতা হচ্ছে না, দেখ বোট্যানির কি আশ্চর্য্য মহিমা! দেশলাই জ্বেলে কেমিষ্ট্রির আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়ে বলতুম যে, দেখ, দেশী আগুনের চেয়ে বিলিতী আগুনের ভিতর কি গুপ্ত তেজ, তোমরা হাকিম হয়ে মফঃস্বলে গিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দেবে, যেন সকলে বিলিতী আগুন ঘরে ঘরে রাখে; জমীতেই সাঁতার শেখবার কসরত হ'ত, আর আমি নানা রকম সেলামের উপর এক লম্বা লেক্‌চার ঝাড়তুম। ঐ মডেল স্কুলের "নক্সাই" বোধ হয় আমার ষ্টেজে লেখার প্রথম হাতে খড়ি; আর-ও নানা বিষয়ে ও রকম ৮।১০ খানা নক্সা নিজে একা বা গিরিশবাবুর সাহায্যে সে সময়ে বা তার কিছু পরে লেখা হয়েছিল; ২।১ খানা বোধ হয় গিরিশ-গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে, আর সব কোথায় গিয়েছে।" ("পুরাতন পঞ্জিকা": 'মাসিক বসুমতী,' বৈশাখ ১৩৩১)

অমৃতলালের রচিত প্রথম নাটক—'হীরকচূর্ণ' ১৮৭৫ সনের জুন মাসে প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর। "তখন মল্‌হার রাও গাইকবাড় ও কর্ণেল ফেয়ার ঘটিত ব্যাপার লইয়া দেশময় জল্পনা কল্পনা হইতেছিল; রেসিডেণ্ট সাহেবকে হীরকচূর্ণের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান হইয়াছিল; এই অপরাধে গাইকবাড় অভিযুক্ত। কৃষ্ণদাস পাল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় লিখিলেন—'আমরা এক শত গাইকবাড়কে হারাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু একজন নর্থব্রুককে হারাইতে প্রস্তুত নহি।'—আমি এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া 'হীরকচূর্ণ' নামে একখানি নাটক লিখিলাম; দুষ্টুমি করিয়া কিছু হাসি ঠাট্টা করিলাম। নাট্য-সাহিত্যে এই নাটকখানি আমার প্রথম রচনা।" প্রকৃতপক্ষে, নাট্যকার-হিসাবে অমৃতলাল প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ইহারও ৯ বৎসর পরে—'বিবাহ বিভ্রাট' রচনা করিয়া।

রঙ্গালয়ে অধ্যক্ষতা

গ্রেট ন্যাশনাল।—১৮৭৫ সনের শেষ ভাগে অমৃতলাল ২২ বৎসর বয়সে সর্ব্বপ্রথম রঙ্গালয়ের ম্যানেজার বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন; তখন তিনি ভুবনমোহন নিয়োগী-প্রতিষ্ঠিত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। এই সময়ে তাঁহার রচিত প্রথম নাটক—'হীরকচূর্ণ' অভিনীত হয় (২৫ ডিসেম্বর); ইহাতে তিনি নিজেও একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় দুই মাস পরে—১৮৭৬, ১৯এ ফেব্রুয়ারি গ্রেট ন্যাশনালে যে অভিনয় হয় উহা বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা; কারণ, এই অভিনয়ের ফলেই গবর্মেণ্ট নাট্যশালাকে দমন করিবার জন্ত আইন

করেন। ঘটনাটি এই :—সম্রাট্ সপ্তম-এডওয়ার্ড প্রিন্স-অব-ওয়েলসরূপে কলিকাতায় আসিলে ১৮৭৬ সনের জানুয়ারি মাসের গোড়ায় হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে আহ্বান করেন। যুবরাজ তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ করিলে মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী ও অন্যান্য মহিলারা তাঁহাকে শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি করিয়া ভারতীয় প্রথায় বরণ করেন। এই ব্যাপারে কলিকাতার বাঙালী সমাজে অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাজীমাৎ" শীর্ষক কবিতা এই উপলক্ষেই লেখা। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারও এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়া একখানি প্রহসন অভিনয় করেন। প্রহসনখানির নাম —'গজদানন্দ ও যুবরাজ'। একজন সম্ভ্রান্ত ও রাজভক্ত প্রজাকে ব্যঙ্গ করিয়া হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য পুলিস হইতে এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ২৬এ ফেব্রুয়ারি 'কর্ণাটকুমার নাটক' এবং 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসনটিকে 'হনুমান চরিত্র' নাম দিয়া আবার উহার অভিনয় করা হইল — ইহাও পুলিসের আদেশে বন্ধ হইয়া গেল। ১লা মার্চ তারিখে পুলিসকে ব্যঙ্গ করিয়া 'The Police of Pig and Sheep' নামে প্রহসন ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অভিনীত হইল। গবর্মেণ্ট এক দিকে যেমন নাট্যশালাকে সংযত করিবার জন্য আইন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অপর দিকে তেমনই গ্রেট-ন্যাশনালের কর্ম্মকর্তাদিগকে অন্য উপায়ে শাস্তি দিবার উদ্যোগ করা হইল। ৪ঠা মার্চ যখন অভিনয় চলিতেছিল, তখন পুলিসের ডেপুটি কমিশনার সদলবলে গিয়া গ্রেট ন্যাশনালের ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু, এবং মতিলাল সুর, বেলবাবু-প্রমুখ আট জন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিলেন। অপরাধ—পূর্ব্বে অভিনীত 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অশ্লীল। ৮ই মার্চ ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ডিরেক্টর উপেন্দ্রবাবু ও ম্যানেজার অমৃতলালের এক মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল; অন্য সকলে মুক্তিলাভ করিলেন। এই বিচারের পর দিন ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইল। আপীলে উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল উভয়েই মুক্তি পাইলেন।

এই ঘটনার অল্প দিন পরেই—অমৃতলাল পুলিসের চাকুরী লইয়া পোর্ট ব্লেয়ারে গমন করেন (এপ্রিল ১৮৭৭)। তথায় এক বৎসর কাটাইবার পর তিনি কলিকাতা ফিরিয়া আবার রঙ্গালয়ে যোগদান করিয়াছিলেন।

ষ্টার।—পূর্ব্বে যেখানে মনোমোহন থিয়েটার অবস্থিত ছিল, সেই জমি ভাড়া লইয়া, গুর্মুখ রায় নামে জনৈক মাড়োয়ারী ষ্টার থিয়েটারের পত্তন করেন। ২১ জুলাই ১৮৮৩ (৬ শ্রাবণ ১২৯০) তারিখে গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' লইয়া এই রঙ্গমঞ্চের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। অমৃতলালও এই দলে ছিলেন। বৎসরাবধি থিয়েটার চালাইয়া গুর্মুখ অবসর গ্রহণ করেন। ইহার তিন বৎসর পরে, যে জমির উপর ষ্টার রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত ছিল তথায় 'এমারেল্ড থিয়েটার' স্থাপনের মানসে গোপাললাল শীল উহা ক্রয় করেন। ষ্টার-সম্প্রদায় ১৮৮৭ সনের মধ্য ভাগে, ইঞ্জিনীয়ার যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের পরিকল্পনা অনুসারে, হাতী-বাগানে নূতন রঙ্গালয় নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করেন; গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' নাটক লইয়া নবনির্ম্মিত ষ্টার রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় হয়—১৮৮৮, ২৫এ মে (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫) ফুলদোলের দিন। অমৃতলালই ষ্টারের অধ্যক্ষ (অন্যতম স্বত্বাধিকারীও বটে) নিযুক্ত হন। এই পদ তিনি ২৫ বৎসর অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে অমৃতলাল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত নাট্যগ্রন্থের অভাবে কোন রঙ্গালয়ই সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। তাই তিনি নব নব নাট্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ষ্টার থিয়েটারের সে অভাব বহুলাংশে পূরণ করিয়াছিলেন। 'নসীরাম' অভিনয়ের অল্প দিন পরেই ষ্টারে 'সরলা' অভিনীত হয়। 'সরলা' তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-রচিত 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের অমৃতলাল-কৃত নাট্য-রূপ। ইহার অভিনয় কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, সেকালের পাক্ষিক 'অনুসন্ধানে'র নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে :—

"ষ্টার কোম্পানী সময় বুঝিয়া—লোকের রুচির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নাটক-চিত্রের উৎকর্ষ দেখাইতে অগ্রসর হইলেন। কোম্পানীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয়কেও ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না; সুপ্রসিদ্ধ 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস হইতে তিনি বেশ দক্ষতার সহিত "সরলা"-চরিত্র নাটকাকারে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ধর্ম্মের ঢেউ, হরিবোলের ধুম এখন কিছু মন্দীভূত হইতে চলিল। যে অভিনয় দর্শনে আত্মহারা হইয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও মন তন্ময়ত্ব ভাবে বিভোর হয়, যাহা দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময়, হর্ষ, শোক, ক্রোধ, বীভৎস প্রভৃতি রসের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেই ত অভিনয়, সেই ত নাট্য-চিত্র। উপস্থিত 'সরলা' নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরা সে আশার সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিয়াছি। ইহার কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে সুখ্যাতি করিব?...এ অভিনয়ে, সমাজের যথেষ্ট উপকার হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই অভিনয়ে আমরা কায়মনবাক্যে কোম্পানীর মঙ্গল প্রার্থনা করি।" (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮)

রঙ্গালয়ের উপযোগী নাটক রচনা সম্বন্ধে অমৃতলাল কিরূপ সজাগ ছিলেন, ১৮৯৫ সনে ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রখানি এইরূপ :—

"পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্বরেষু,— ...একখানি নূতন নাটক শীঘ্র লিখিতে হইবে এজন্য অত্যন্ত চিন্তিত আছি। শেষ নূতন নাটক 'চন্দ্রশেখর' ও শেষ নূতন প্রহসন 'একাকার' সাধারণের

বিশেষ সন্তোষ বিধান করিয়াছে। এবার যাহা অভিনীত হইবে তাহা উক্ত পুস্তকদ্বয় অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী হওয়া চাই। কলিকাতায় দর্শকের নিকট নাটকের গুণাগুণ এইরূপে বিচার হইয়া থাকে—কচুরি কচুরির মত ও রসগোল্লা রসগোল্লার মত সুস্বাদু হইলে হইবে না। কচুরির পর রসগোল্লা আহার করিলে রসগোল্লার লবণত্বের অভাবের অভিযোগ হইবে এবং ঐরূপ রসগোল্লার পর কচুরি দিলে কচুরির ভিতর শার্কর রস নাই বলিয়া ভোক্তা মুখ বিকৃত করিবেন। অনন্যগতি হইয়া চির-অভ্যস্ত প্রথায় দয়াময়কে বলিতেছি "হরি —লেখনীতে আসিয়া অবতীর্ণ হও —নান্যির্গতিরণ্যথা।... ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ ('ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন,' কার্ত্তিক ১৩২৮)

অধ্যক্ষরূপে অমৃতলাল ষ্টার রঙ্গমঞ্চে কিরূপ নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংযমের উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় তাহার বর্ণনা করিতেছি :—

"রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে অমৃতলালের তুলনা নাই। তিনি নিয়ম ও নিষ্ঠার বলে থিয়েটারে সর্ব্বরকমের উচ্ছৃঙ্খলতাকে নিবারণ করিয়া তাঁহার পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারকে এক সময়ে আদর্শ থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, কি ভাবে থিয়েটার চালাইতে হয়, অতীত ষ্টার থিয়েটার তাহার সাক্ষ্য। আমি নিজে তাঁহার সময়ে ষ্টারে কায করিয়া দেখিয়াছি, এমন অপূর্ব্ব নিয়মানুবর্ত্তিতা, এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী, খুঁটিনাটি প্রত্যেক জিনিষটির প্রতি এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি, এমন ব্যবহার-কৌশল আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।...একাদিক্রমে প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল এই ভাবে থিয়েটার চালাইয়া অমৃতলাল থিয়েটারের কর্ণধারত্ব পরিত্যাগ করেন।" ("অমৃতলাল" : 'মাসিক বসুমতী,' শ্রাবণ ১৩৩৬)

এই প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত অমৃতলালের একখানি পত্রও উদ্ধারযোগ্য। তিনি লেখেন :—

"পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,—...একণে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি যে আমি যদি আমার ব্যবসায়কে—সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিব, তবে অপরে কেন সম্মান করিবে? জগদীশ্বরের অপার করুণায় আমার অটল বিশ্বাস আছে, তাঁহারি কৃপায় আপনার ন্যায় সাহিত্যগগনের প্রভাকরকে সুহৃদরূপে আমার জীবনে আলোকপ্রদানের জন্য লাভ করিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি বিশুদ্ধ থাকিয়া ষ্টার থিয়েটারের নাম হইতে থিয়েটারী কলঙ্ক মোচন করিতে সমর্থ হই। গোঁড়ার দল বা থিয়েটারকে ঘৃণা দেখান যাঁহাদের স্বার্থের সহিত জড়িত, তাঁহারা ভিন্ন অপর সমস্ত উচ্চ সম্প্রদায়ের নিকট ষ্টার থিয়েটার একণে সাধারণ থিয়েটার অপেক্ষা সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত নাট্যশালা বলিয়া সাদরে পরিচিত হইয়াছে।... স্নেহাভিলাষী—অমৃত।" ('ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন,' মাঘ ১৩২৭)

সার্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া অমৃতলাল নানা ভাবে ইহার কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগে অভিনেতা ও রঙ্গালয়ের নামে লোকে নাসিকা কুঞ্চন করিত। অমৃতলাল 'অমৃত-মদিরা'য় লিখিয়াছেন :—

নিজ-পরিবার-মাঝে বিরক্তিকারণ।
কুটুম্বসমাজে লজ্জা নিন্দার ভাজন॥
দেশের দশের পাশে শ্লেষ ব্যঙ্গ হাঁসি।
স'রে গেছে বাল্যসখা তাচ্ছিল্য প্রকাশি॥

অভিনেতা ও জনসাধারণের মধ্যে সেই অবাঞ্ছিত ব্যবধান দূরীভূত হইয়াছে। এই সংযোগ-সেতু সংগঠনের মূলে অমৃতলালের প্রভাব বড় কম ছিল না।

স্বদেশী আন্দোলন

অমৃতলাল স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন; বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় আমরা তাঁহাকে সুরেন্দ্রনাথের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখি। তিনি বক্তৃতাদিও করিয়াছেন; তাঁহার বাগ্মিতা-শক্তি ছিল। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন উপলক্ষে (ইং ১৯০৫) তাঁহার রচিত একটি সুপরিচিত গান উদ্ধৃত করিতেছি :—

(বাউলের সুর)

ওরা জোর ক'রে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান।
আমরা রব অভ্যরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ।
আমরা জাত বাঙালী প্রেম-কাঙালী—
ভাবচিস্ তোরা মন ভাঙালি,
তা নয়, জ্বালিয়ে আগুন ক'রে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলি
প্রাণের টান।
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের গুড়েতে,
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে,
আবার কর্কচেতে হয়েছে রুচি, চাই নে তোদের লবণ দান।
আমাদের তাতের সঙ্গে তাঁত বজায় থাক্,
নাই বা দেখাই সাজের জাঁক,
তোদের, ওই চকচকান মধুর চাকে করবো না আর
বিষ পান।
তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি,
ফেল্‌বো ভেঙে মেরে তুড়ি,
ক'রে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী শাঁখায় আবার রাখবে মান।
তোদের শাপে হ'ল আশীর্ব্বাদ
দৃঢ় হ'ল মনের বাঁধ,
এই, বিসংবাদে বঙ্গভেদে, আমরা হলুম আবার তেজীয়ান্।
পেয়ে মর্ম্মে আঘাত, কর্ম্মে হাত বাকি্য ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান্।

শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল

"অমৃতলাল ছিলেন শিক্ষকের পুত্র এবং তিনি নিজেও ছিলেন আজীবন শিক্ষক—কি সমাজে, কি রঙ্গালয়ে, কি

বিদ্যালয়ে। সেইজন্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অসীম—বিশেষতঃ পিতৃপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার বাল্যশিক্ষাস্থান শ্যামবাজার এ. ভি স্কুলটির প্রতি তাঁহার স্নেহভালবাসার অন্ত ছিল না। তিনি দীর্ঘ বাইশ বৎসরেরও অধিক কাল এই বিদ্যালয়টির প্রথমে সহকারী সম্পাদক এবং পরে সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারই যত্নে এবং চেষ্টায় এই পুরাতন মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়টি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং নিজস্ব গৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই বিদ্যালয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা অমৃতলালের শেষ জীবনের কীর্ত্তি এবং ইহার জমীক্রয় এবং বাটীনির্ম্মাণ উপলক্ষে তিনি তাঁহার অন্যান্য সহকর্ম্মিগণের সহিত জনসাধারণ এবং গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে লক্ষাধিক টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন। ("অমৃতলাল বসু": ক্ষেত্রভূষণ বসু—'বিশ্বকোষ,' ২য় সং.)

প্রতিভার সম্মান

অমৃতলাল দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন। দেশের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলিও তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি প্রদর্শন করে নাই। ১৩৩০ সালে (ইং ১৯২৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচন, এবং ১৯২৫ সনে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দান করিয়া গুণেরই সমাদর করিয়াছেন। তিনি ১৯২৩ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ১৪শ অধিবেশনে (নৈহাটী, ৮-৯ আষাঢ় ১৩৩০) সাহিত্য-শাখার সভাপতি, ও ১৯২৬ সনে ১৭শ অধিবেশনে (সিউড়ি, বীরভূম, ২০-২১ চৈত্র ১৩৩২) মূল সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। রসরচনার গুণে তিনি স্বদেশবাসীর নিকট "রসরাজ" নামে পরিচিত ছিলেন।

মৃত্যু

৭৭ বৎসর বয়সে, ২ জুলাই ১৯২৯ (১৮ আষাঢ় ১৩৩৬) তারিখে অমৃতলাল পরলোকগমন করিয়াছেন

রচনাপঞ্জী

রচিত গ্রন্থ।—অমৃতলালের গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। হীরকচূর্ণ নাটক। ১২৮২ সাল (১ জুন ১৮৭৫)। পৃ. ৬৮।…গ্রেট ন্যাশনাল ২৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫। প্রথম সংস্করণের পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নামের স্থলে "By an Actor" মুদ্রিত ছিল।

২। চোরের উপর বাটপাড়ি (প্রহসন)। ১২৮৩ সাল (১১ নবেম্বর ১৮৭৬)। পৃ. ৩৪।…গ্রেট ন্যাশনাল ১৮৭৫।

৩। ডিলতর্পণ। (৪ জানুয়ারি ১৮৮১)। পৃ. ৪৩।

৪। ব্রজলীলা (নাট্যরাসক)। ১২৮৯ সাল (৩০ নবেম্বর ১৮৮২)। পৃ. ২৩।

৫। ডিস্‌মিশ (প্রহসন)। ১২৮৯ সাল (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩)। পৃ. ৩১।…বেঙ্গল ১২৮৯।

৬। চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে। ইং ১৮৮৪ (?)।…ষ্টার ১৬ এপ্রিল ১৮৮৪। ১৩০৪ সালে 'ব্রজলীলা' ও 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' একত্রে প্রকাশিত হয়।

৭। বিবাহ বিভ্রাট ১২৯১ সাল (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৪)। পৃ. ৬৯।…ষ্টার ১২৯১।

৮। নিমাইচাঁদ (গল্প)। (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯)। পৃ.২৪।

৯। তাজ্জব ব্যাপার (গীতিরঙ্গ)। ১২৯৭ সাল (২ আগষ্ট ১৮৯০)। পৃ. ৩০।

১০। তরুবালা (সামাজিক নাটক)। ১২৯৭ সাল (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১)। পৃ. ১৪৭।…ষ্টার।

১১। বিলাপ। বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন। ১২৯৮ সাল (২২ আগষ্ট ১৮৯১)। পৃ. ২৬।…ষ্টার ৬ ভাদ্র ১২৯৮।

১২। রাজা বাহাদুর (সং—রং)। ১২৯৮ সাল (ইং ১৮৯২)। পৃ. ৪৮।…ষ্টার বড়দিন ১৮৯১।

১৩। কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা। ১২৯৯ সাল (ইং ১৮৯৩)। পৃ. ৫১।…ষ্টার ১১ পৌষ ১২৯৯।

১৪। বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত (পারিবারিক নাটক)। ১৩০০ সাল (ইং ১৮৯৩)। পৃ. ১৫১।…ষ্টার ১১ ভাদ্র ১৩০০।

১৫। বাবু (সামাজিক নক্সা)। ১৩০০ সাল (২৭ জানুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ. ৯১।…ষ্টার ১৮ পৌষ ১৩০০।

১৬। একাকার। ১৩০১ সাল (১৯ জানুয়ারি ১৮৯৫)। পৃ. ৯৫।…ষ্টার ১১ পৌষ ১৩০১।

১৭। বৌ-মা (সামাজিক নক্সা)। ২৫ পৌষ ১৩০৩ (১১ জানুয়ারি ১৮৯৭)। পৃ. ১০০।…ষ্টার ১১ পৌষ ১৩০৩।

১৮। অবলা বল (উপন্যাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮৯৭)। পৃ. ১২৫।

১৯। চকলা (উপন্যাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮৯৭) পৃ. ১৬২।

২০। গ্রাম্য-বিভ্রাট (সামাজিক নক্সা)। মাঘ ১৩০৪ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮)। পৃ. ১১৫।…ষ্টার ১৮ পৌষ ১৩০৪।

২১। সাবাস আটাশ (নক্সা)। আশ্বিন ১৩০৬ (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০০)। পৃ. ৬৫।…ষ্টার ৭ আশ্বিন ১৩০৬।

২২। কৃপণের ধন (প্রমোদ-প্রহসন)। ১৩০৭ সাল (৯ জুন ১৯০০)। পৃ. ৮০।…ষ্টার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭।

২৩। আদর্শ-বন্ধু (নাটক)। বৈশাখ ১৩০৭ (৫ আগষ্ট ১৯০০)। পৃ. ২১৪।…ষ্টার ১৬ বৈশাখ ১৩০৭।

২৪। যাদুকরী (পঞ্চরং)। ১৫ পৌষ ১৩০৭ (৩০ জানুয়ারি ১৯০১)। পৃ. ৭৮।…ষ্টার ১০ পৌষ ১৩০৭।

২৫। বৈজয়ন্ত-বাস। মাঘ ১৩০৭ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯০১)। পৃ. ১৭।…ষ্টার। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গ-গমন উপলক্ষে লিখিত।

২৬। নবজীবন (মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ একাঙ্ক

নাট্যলীলা)। ১৩০৮ সাল (২৫ মার্চ ১৯০২)। পৃ. ৩৫। ...ষ্টার ১ জানুয়ারি ১৯০২।

২৭। অবতার (প্র-পরা-অপ-সং-হসন্)। মাঘ ১৩০৮ (২ এপ্রিল ১৯০১)। পৃ. ৯০+১।...ষ্টার ২৫ ডিসেম্বর ১৯০১।

২৮। অমৃত-মদিরা (কবিতা)। কার্ত্তিক ১৩১০ (২০ অক্টোবর ১৯০৩)। পৃ. ২৯০।

২৯। সাবাস বাঙ্গালী (সামাজিক নক্সা)। ১৩১২ সাল (২৮ জানুয়ারি ১৯০৬)। পৃ. ৬২।...ষ্টার ১০ পৌষ ১৩১২।

৩০। অমৃত-গ্রন্থাবলী, ১—৪ ভাগ। ইং ১৯০৬-৭, ১৯১১ (বসুমতী)। গ্রন্থাবলীর ১ম ভাগে মুদ্রিত 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক (ভাদ্র ১৩০৬, পৃ. ১২৪) প্রকৃতপক্ষে নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্নের রচনা; উহা "শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত"। গ্রন্থাবলীর ২য় ভাগে মুদ্রিত নাট্যরাসক 'সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্ক-ভঞ্জন' নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। এই দুইটি নাট্যগ্রন্থ অমৃত-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হয় নাই। এই প্রসঙ্গে 'শনিবারের চিঠি' আশ্বিন ১৩৫২ ও কার্ত্তিক ১৩৫৪ দ্রষ্টব্য। চতুর্থ ভাগে মুদ্রিত 'সম্মতি-সঙ্কট', বিরাট বৃহস্পতি, বাহবা বাতিক ও আরও কয়েকটি রচনা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠা হইতে পুনর্মুদ্রিত। সম্মতি-সঙ্কট দুর্গাদাস দে-সম্পাদিত 'মজলিস' পত্রের ১ম বর্ষে (মাঘ ও ফাল্গুন ১২৯৭) প্রকাশিত হয়।

৩২। খাস-দখল (নাট্যলীলা)। ? (২৮ এপ্রিল ১৯১২)। পৃ. ১৪৩।...ষ্টার ১৭ চৈত্র ১৩১৮।

৩৩। নব-যৌবন (নাটিকা)। ? (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪)। পৃ. ২১১।...মিনার্ভা ২০ ডিসেম্বর ১৯১৩।

৩৪। পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়। ১৩৩০ সাল (১ ডিসেম্বর ১৯২৩)।

বিপিনবিহারী গুপ্ত এই পুস্তকের ৬৩-১৩৬ পৃষ্ঠায় ১৩২২-২৩ সালে অমৃতলাল কর্ত্তৃক বিবৃত স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৩৫। বিষবৃক্ষ (নাট্য-রূপ)। ? (২৩ মার্চ ১৯২৫)। পৃ. ১৯১।

৩৬। চন্দ্রশেখর (নাট্য-রূপ)। ? (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৫)। পৃ. ১৭২।

৩৭। রাজসিংহ (নাট্য-রূপ)। ? (১৮ মে ১৯২৬)। পৃ. ১৮৮।

৩৮। কৌতুক-যৌতুক (নক্সা ও গল্প)। ১৩৩৩ সাল (১২ জুন ১৯২৬)। পৃ. ২৫৬।

সূচী:—আমের ধুমধাম, পণ্ডিত ডাক্তার, কৌলিক দুর্গোৎসব, শারদা-মঙ্গল, বোদ্-দা, বিদ্যা "অমূল্য ধন," বুদ্ধার আনন্দ, মাতৃভক্তি, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, বিশ্বকর্ম্মা পুজা, কবির ভাব এসেছে, হিন্দুর নব নামকরণ, ষষ্ঠীর প্রভাত, প্রতাপের গল্প, উমাকান্তের গল্প, গো-গোলযোগ, ইলিশ, মলের নব কলেবর, বিষম সমস্যা, আগমনী, থিয়েটারের শিশু, প্রেমের আবেগ।

৩৯। ব্যাপিকা-বিদায় (প্রমোদ-প্রহসন)। ? (ইং ১৯২৬)। পৃ. ৮২।...মিনার্ভা ২৫ আষাঢ় ১৩৩৩।

৪০। দ্বন্দ্বে মাতনম্ (হাস্যোৎসব)। কার্ত্তিক ১৩৩৩ (১৭ নবেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ৫০।...ষ্টার ২৪ কার্ত্তিক ১৩৩৩।

৪১। যাজ্ঞসেনী (নাটক)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ (ইং ১৯২৮)। পৃ. ১৭৬।...মিনার্ভা ২২ বৈশাখ ১৩৩৫।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

৪২। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা (কাব্য)। ১৩৩৬ সাল। পৃ. ৪১।

সম্পাদিত গ্রন্থ।—অমৃতলাল বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে ১৩১৯ (শ্রীপঞ্চমী) সালে প্রকাশিত সচিত্র 'বীণার ঝঙ্কার' (নির্ব্বাচিত গীত, রঙ্গরস প্রভৃতি) সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক উদীয়মান লেখককে উৎসাহিত করিবার জন্য সানন্দে তাঁহাদের পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—সুরেন্দ্রনাথ রায়ের 'শৈব্যা', আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের 'রাণীর কবর', নন্দলাল দাসের 'যুগাবর্ত্ত' ও পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গালীর গল্প' পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা।—পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অমৃতলালের বহু রচনা আত্মগোপন করিয়া আছে। এই শ্রেণীর রচনার নির্ভরযোগ্য তালিকা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র (৫৪শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

অমৃতলাল ও বাংলা-সাহিত্য

নাট্যালয় ও রঙ্গমঞ্চের সহিত অভিনেতা হিসাবে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়া যে দুই জন সাধক বাংলাদেশে সাহিত্য-খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, অমৃতলাল তাঁহাদের অন্যতর। অপর জন নাট্যসম্রাট্ গিরিশচন্দ্র—গুরু-গৌরবে নাট্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাধারণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি অমৃতলালের মত যশস্বী হইতে পারেন নাই। যাহাকে চৌকস বলা যায়, অমৃতলাল তাহাই ছিলেন। কি প্রবন্ধে কি কবিতায় অনাবিল হাস্যে ও ব্যঙ্গে ও সরস রসিকতায় তিনি একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছিলেন—নাটক-প্রহসনের খ্যাতি ত ছিলই। 'অমৃত-মদিরা' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি যে-জাতীয় রস পরিবেশন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। তাঁহার এই রসের বহু রচনা এখনও সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া আছে; সংগৃহীত হইয়া একত্র প্রকাশিত হইলে আমরা অমৃত-সাহিত্যের যথাযথ মূল্য নিরূপণ করিতে পারিব। 'বিবাহ-বিভ্রাট' ও 'বাবু'র অমৃতলাল এককালে যেমন বঙ্গীয় জনসাধারণের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসিক অমৃতলাল তেমনই সুপ্রকাশিত হইলে বর্ত্তমান ও অনাগত বাঙালী রসিক সমাজে মর্য্যাদা লাভ করিবেন। রঙ্গমঞ্চের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়াও তিনি সুধী সাহিত্যিক সমাজের একজন দিক্‌পাল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন শুধু তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার বলে। 'যৌতুক-কৌতুক', 'অমৃত-মদিরা' প্রভৃতি হইতে চিরজীবী অমৃতলালের প্রতিভার বহু নিদর্শন মিলিবে।

শরণাগতা

শ্রীসুধীর সেনগুপ্ত

আয়নামতি কাপড়খানা পেয়েই ঠোঁটখানা একটু বেঁকিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলল। বিজয়ের গর্ব্বে ও নূতন পুরস্কার লাভের আনন্দে গদগদ রূপাই বলে—নাচের শেষের দিকটায় সাঁওতালী ঢঙে পা-টা এগিয়ে ধুনুচিটা মাথার চারদিকে ঘুরিয়ে এনে যেমনি সামনে রাখলুম অমনি ঢাক-ঢোলের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল হৈ হৈ রব। সেজবাবু বসেছিলেন পাশেই একটা ইজি-চেয়ারে, কাপড়খানা ছুড়ে দিলেন আমার গায়ে।

আয়নামতির বহু দিনের সাধ টকটকে লাল শাড়ীর একটা ঘোমটা মাথায় টেনে পাড়ায় বিজয়ার দিন ঠাকুর দেখতে যাবে। তাই স্বামীর লব্ধ পুরস্কার একবার বুকে চেপে ধরে, আবার দূরে রেখে চেয়ে থাকে, আবার নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকতে থাকে। স্বামীর প্রতিযোগিতার সাফল্য ও নূতনের গন্ধ ভরে দিয়েছে তার অন্তর। আয়নামতি রূপাইর বাঁ কাঁধ থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে ক্লান্ত স্বামীর মিশমিশে কাল গায়ের ওপরের শিশিরবিন্দুর মত ঘামগুলো পুঁছে দেয়, এগিয়ে দেয় হুঁকোটা, আর কল্‌কেটাতে নিয়ে আসে কয়েক খণ্ড টকটকে লাল কাঠকয়লার আগুন। কলকের আগুন ফুঁয়োতে ফুঁয়োতে আয়নামতির নিটোল গালের উপর পড়ে তার তপ্ত আভা, সেই ফিন্‌কি হাসির রেশটুকু তখনও তার রক্তিম অধরে লেগেই আছে।

রূপাই হুঁকোটাতে টান দেয়, আর বলে, আসছে বছর দেবীর কৃপা হলে নতুন নাচের ঢঙ দেখাব, বুঝলি।

নবমীর শেষ আরতির সঙ্গে সঙ্গে অবিরত ঢাক-ঢোলের ধ্বনিও একটা নিস্তব্ধতার যবনিকা ফেলেছে। এই গভীর রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করছে শুধু তারই একটা প্রতি-ধ্বনি। আশ্বিনের শেষ। আয়নামতি শত ছিন্ন মাদুরটার উপর আড়াই ইঞ্চি মোটা কাঁথাখানা বিছিয়ে দিলে। এক যুগের পুঞ্জীভূত ময়লা যেন তাকে বেশ গরম করে রেখেছে। শিয়রে চটের লম্বা বালিশটায় তৈলাক্ত ময়লা জমে ভেলভেটের মতই চিক্‌চিক্ করছে। তারই উপর আয়নামতি ও রূপাই ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলে। কি এক আনন্দ-প্রবাহ তাদের ঘুম আজ কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। জেগেই আজ দেখছে তারা সুখের স্বপ্ন। সুখের রাজপুরী গড়ে, ভাঙে, আবার গড়ে, যে সুখের ইমারত গড়ে উঠে সমান ভাবেই ধনীর পালঙ্কে আর দরিদ্রের জীর্ণ কন্থায়। বিগত বাদলের শেষ বর্ষণ ঘরের ছাউনির মাঝে মাঝে কতকটা অংশ উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তাই এই সুখ-স্বপ্নে বিভোর দুইটি প্রাণীর স্বপ্নকথা শুনবার জন্যে শরতের খণ্ডমেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ এসে উঁকি দেবার সুযোগ পায়। খানিক পরে আকাশের খণ্ডমেঘ যখন সরে চলে যায়, ফুটফুটে জ্যোৎস্না এসে বিছিয়ে দিয়ে যায় শতজীর্ণ মলিন বিছানাখানা ঢেকে একখানা রূপালি বেনারসী। আয়নামতি ও রূপাই প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদের অজ্ঞাত স্পর্শে ঘুমিয়ে পড়ে।

সুগন্ধানদীর চর। নদী থেকে বহু দূরে ছোট ঘরখানি। চরের উপর সুদূরপ্রসারী ধানের ক্ষেত। নদী সেখানে পূর্ব্ব থেকে দক্ষিণে বেঁকে গিয়েছে। ওপারের অনেকখানি বালুতট যখন অপরাহ্নের আভায় রঙীন হয়ে উঠে সুগন্ধানদীর তরঙ্গের উপর লক্ষ মাণিক ছড়িয়ে দেয়, এপারের ছোট কুটির-প্রাঙ্গণের তুলসীতলায় ভক্তি-প্রদীপটি তখন তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে। প্রতি বছর মা-লক্ষ্মী এই সুবিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতে সোনা ফলিয়ে দিয়ে যান।

জমির মালিক চৌধুরীরাই। রূপাই তার কতক অংশে চাষবাস করে। রূপাইর ঘরের ভেতর থেকে ঠিকরে পড়া আলো নৌকারোহীদের দিক্ নির্ণয়ে সাহায্য করে। গরীব রূপাইর চালাঘরখানি চাষীদের বিশ্রামস্থল, শ্রান্ত কিষাণদের তামাক খাবার আড্ডা। ঘরের অনুচ্চ মাটির দেয়াল থেকে মাটি পড়ে গিয়ে বাঁশের কঞ্চি বেরিয়ে পড়েছে। ছাউনি খানিকটা খড়কুটোর, খানিকটা শুকনো গলাপাতায় ঢাকা। ঘরের বাইরে অদূরেই তুলসীমঞ্চ। প্রতিদিন সকালে আয়নামতি একটা বা দুটো করবী নিয়ে তুলসীমঞ্চে প্রণাম করে। বাড়ীতে জবা ও করবীর গাছ অনেক। কোনো বিশিষ্ট সুগন্ধ ফুলের কৌলিন্য সেখানে অসমতার সৃষ্টি করে নি। পাশের বাড়ীর সুবলা পিসি রোজ ডালা ভরে জবা ও করবী নিয়ে যায়, বলে, তোর শাঁখা-সিন্দুর অক্ষয় হোক কয়াতি-বৌ, আমার ঠাকুরের পূজার ফুল যে তোর এখান থেকেই হচ্ছে।

ভোরে উঠে রূপাই পান্তাভাত খেয়ে এক ছিলিম তামাক টেনে মাঠে যায়, আয়নামতি বাঁ হাতে তার লাল শাড়ীর ঘোমটাটি ঈষৎ টেনে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রূপাইর দিকে যতক্ষণ না লম্বা লম্বা ধানের শীষগুলো তার সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে দেয়। রূপাই দুপুরে ঘর্ম্মাক্ত হয়ে কাস্তে হাতে ফিরে আসে, আয়নামতি ভাঙা তক্তাখানা এগিয়ে দেয় বসবার জন্য, তামাক সেজে আনে, হাতে বাড়িয়ে দেয় মুখে নল-লাগান দড়ি বাঁধা ছোট তেলের শিশিটা। কখনও বা রূপাইর পায়ের ও পরের ফুলে-ওঠা শিরাগুলোয় তেল রগড়ে দেয়। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে রূপাইর পাশেই ছেঁড়া মাদুরটার একটা

অংশ বিছিয়ে আয়নামতিও শুয়ে পড়ে, নদীর ওপার থেকে হাওয়া এসে চামর বুলিয়ে দিয়ে যায়।

রূপাই বিকেলে আর মাঠের কাজে যায় না। চৌধুরী বাড়ীর ছেলে মহলে তার আসর জমে। পিপলিতার লাঠিয়ালদের গল্প, বাঘমারার মগনৃত্য, রামনগরের হাসনুবাইজীর নাচ, এই তার গল্পের উপকরণ। ছেলেদেরও স্ফূর্তি উচ্ছল হয়ে ওঠে তখন যখন রূপাই-করাতি তাদের সান্ধ্য আসরে নায়কের পদ নিয়ে বসে। গল্পে রূপাই কল্পতরু। চাহিদা মাফিক গল্প তার মুখে লেগেই আছে।

পূজা এলে সবচেয়ে বেশী সাড়া পড়ে চৌধুরী-বাড়ীর ছেলেমহলে। প্রায় তিন মাস হ'ল মিলিটারী এসে মাঠের অর্দ্ধেক ইজারা নিয়েছে। রূপাইর মাঠের কাজ আর নেই। তাই এখন থেকে দু'বেলাই রূপাইর আড্ডা ঐ ছেলেদের ভেতরে। গেল বছরে আরতির নাচে সে পেয়েছে লাল টুক্‌টুকে শাড়ী। তার রং তার গন্ধ সে আজও ভোলে নি। এবারের পূজায় সে দেখাবে নূতন ঢঙের নাচ। তাই ছেলেদের আসরে তার গল্পের প্রধান বিষয় বিভিন্ন পাড়ার নৃত্যভঙ্গী ও তার দোষত্রুটি।

ওপাড়ার কালু নন্দীর দশ বছরের ছেলে নেচে নেচে বাজায় বেশ—কিন্তু সে একটু তালকানা, ছোট্টু দাস্‌-দাসের সানাই—শুনলেই যেন আপনা থেকে পা নাচতে নাচতে চলতে থাকে, কিন্তু সে যখন ফের দম নেবার জন্যে হাঁপ ছাড়ে তখন তাকে বেহদ্দ বেরসিক বলেই মনে হয়। হারাণ ঢাকি ওস্তাদ বটে, কিন্তু এই রূপাই-করাতির নাচের সঙ্গে দ্রুত চলতে পারে না—বুড়ো কিনা,—তাই তার হাত কাঁপে। সবচেয়ে জমিয়ে রাখে অমরী নটের কাঁসর বাজনা। বুকের উপর কাঁসরখানা রেখে যখন দাঁতের এক পাটি বার করে ডাইনে বামে মাথাটা হেলিয়ে দুলিয়ে ঢং ঢং করতে থাকে, তখন একেবারে বেতালা বুড়ো হরু ঠাকুরও তাঁর চুণকাম-করা পাকা দাড়িতে তাল ধরতে থাকে।

রূপাই এই সব গল্প করে। আর মাঝে মাঝে তার প্রশস্ত বুকখানার গভীর গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসে জমে-পড়া এক একটা দীর্ঘশ্বাস, তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আয়নামতির কঙ্কালসার দেহ। আয়নামতি ম্যালেরিয়ায় ভুগছে আড়াই মাসের বেশী। যখন তার জ্বর আসে, সে মোটা কাঁথাখানা গায়ের 'পর ফেলে দিয়ে রূপাইকে বলে তার পরে চেপে বসতে। ঐ কাঁথাখানা যেমন লজ্জা নিবারণের সম্বল তেমনই জ্বরেরও মহৌষধ।

গেল বছরের চৌধুরী-বাড়ীর পুরস্কারের শাড়ীখানা এক বছরে এসে ছিন্নভিন্ন হয়ে মাত্র আড়াই হাতে দাঁড়িয়েছে। রূপাই যখন সেই ফাকড়াটুকু পরে চৌধুরীদের বাড়ী যায়, আয়নামতি পরে থাকে ঘরের ভিতর কাঁথাখানা জড়িয়ে। ফিরে এসে, রূপাইকে কাঁথাখানা দিয়ে ঐ ফাকড়ায় লজ্জা নিবারণ করে বাইরে চলে আসে। আয়নামতি নিজেকে দিনের আলো থেকে দূরে গোপনতায় ঢাকা দিয়ে রাখতে চায়। চাঁদিনী রাত জাগা বেড়ায় ফাঁকে ফাঁকে তাকে খুঁজে বেড়ায়, আয়নামতি বেড়ার ফাঁকে মুখ রেখে নীরব ভাষায় তাকে মনের কত বেদনা জানায়। কিন্তু সে যেন তার প্রতিদানে পায় শুধু ব্যঙ্গ, শুধু পরিহাস। তাই তার ভাল লাগে অমানিশার জমাট আঁধার। অন্ধকার যেন তার কত আপনার। স্নেহময়ী মায়ের মতই সে নিজের আঁচল দিয়ে সন্তানকে ঢেকে রাখতে চায়। তাই গভীরতর রাত্রে আঁধার যখন ঘনিয়ে আসে তখন ফাকড়াখানা জড়িয়ে ছায়ামূর্ত্তির মতই সে বাইরে চলে আসে, প্রত্যহের কাজটি শেষ করে আবার ভোরের আলোর আগেই ঘরে চলে যায়। যে বিশ্বদেবতা এই ঘনান্ধকার সৃষ্টি করেছেন তাঁকেই নিবেদন করে মনে মনে প্রাণের ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা। সে দিন রাত্রে ছায়ামূর্ত্তি দেখে সনাতন মিস্ত্রী নামে এক পথিক ভয় পেয়েছিল, সেই লজ্জা সেই ক্ষোভ সে আজও ভুলতে পারে নি।

পূজা যতই কাছে আসে আয়নামতি ও রূপাইর প্রাণে আশার মৃদু হাওয়া বইতে থাকে। এ বছরের আরতি-প্রতিযোগিতার শাড়ী যে তাদেরই প্রাপ্য। এই আশায় আয়নামতির শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ রক্তাভ হয়ে ওঠে। তাই রূপাইও চৌধুরী-বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গ ছাড়তে চায় না।

সেজবাবু বাড়ী এসেছেন। পূজার আর চার দিন বাকী: কলকাতা থেকে তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কার ত এসেই গেছে। রূপাই বাড়ীতে বসে শুধু একটা ধুনুচি নিয়ে হাত-পা ঘুরায়। আয়নামতির মলিন মুখে কাশফুলের মতই হাসি ফোটে। নবমীর দিন রূপাই তার এক বছরের সঞ্চিত নৃত্যকলার ভাণ্ডার উজাড় করতে কার্পণ্য করবে না। আয়নামতির শীর্ণ দেহে জড়িয়ে দেবে লাল শাড়ী। হয় ত তার জীবনে এই শেষ পুরস্কার। আহ্লাদ ও বিষাদে তার চোখের কোণে জলভরা হাসির ক্ষীণ রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আজ নবমী। সকাল সকাল রূপাই তার ফাকড়াখানা পরিষ্কার করে নিয়েছে। আয়নামতির আজ দু'দিন জ্বর নেই। কাঁথাখানা থেকে মুখ বার করে দেখে রূপাইর নৃত্যভঙ্গী। আর ভাবে তার স্বামী আজ রাত্রে ফিরে এলেই সে তার হাড় ক'খানা নূতন কাপড়ে ঢেকে একবার টেনে নিয়ে যাবে চৌধুরীদের ঠাকুর প্রণাম করতে।

দেখতে দেখতে রাত ন'টা হ'ল। ঢাকি ঢুলি সানাইদার সব হাজির। প্রথমে ছেলের দল ছোট ছোট ধুনুচি হাতে ঘুরে ঘুরে দেবীর আরতি করে। পরে আসে পাড়ার অন্যান্য প্রতিযোগীরা। এইবার রূপাইর পালা।

ধুনুচি হাতে রূপাই আসরে পা দিতেই চারদিক থেকে উঠল হৈ হৈ রব। রূপাই প্রথমে ধীর তালে পা ফেলতে

থাকে। ঢাক ঢোল কাঁসর দ্রুতগতির সঙ্গে ক্রমে সে চঞ্চল হয়। রূপাই ঘুরে ফিরে দুই হাতে ধুনুচি নিয়ে নৃত্য করে, বালকেরা তাকে ঘিরে চারদিক থেকে মুহুর্মুহু ধুনো চন্দন গুগ্‌গুল নিক্ষেপ করে। রূপাইর হাতের ধুনুচি থেকে তালে তালে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঊর্দ্ধে উঠে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টার শব্দে ও জয় জয়কার উলুধ্বনিতে মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ মুখর। মধ্যে মধ্যে রূপাই অর্দ্ধনিমীলিত চোখে নৃত্যভঙ্গীতে মাথা নীচু করে ভক্তিভরে প্রণাম জানায় আবার দুই চোখ বিস্ফারিত করে রক্তাম্বরভূষিতা প্রতিমার দিকে অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকে। হাস্যময়ী দেবীপ্রতিমা লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ পরিবৃত হয়ে যেন সকলের শিরে আশিস্ বর্ষণ করছেন। পার্শ্বে কলা'-বধূ তার চওড়া লালপাড় শাড়ীতে দেহ আবৃত করে দেড়হাত ঘোমটা টেনে সলজ্জ দাঁড়িয়ে। আরতির কুণ্ডলাকৃতি ধূমে ও মৃদুমন্দ হাওয়ায় তার ঘোমটার মৃদু কম্পন নৃত্যরত রূপাইর বুকে এক অপূর্ব্ব পুলকের শিহরণ তুলছে। ঢাকি ঢুলির ক্লান্তি আসে, রূপাইর ক্লান্তি নেই। তার এক বছরের কসরত সব কটাই দেখান হয়েছে। এখন সে এক একবার নৃত্যের বেগ সংযত করে আর সেজবাবুর দিকে চায়।

কিছুক্ষণ পরে বাজনা গেল থেমে। রূপাই ধুনুচিটা সামনে রেখে সেজবাবুকে প্রণাম করলে। সেজবাবু বললেন— সুন্দর তোর নাচ, রূপাই। মা যেন তোর নাচ দেখে হাসছেন। মা তোর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করবেন। এই নে তোর বকশিস। বলে রূপাইর দিকে একটা টাকা ছুঁড়ে দিলেন, আর বললেন, আসছে বছর তোর মনের আশা মিটিয়ে দেব।

রূপাইর মুখে রা-টি নেই। নীরবে টাকাটা কুড়িয়ে প্রণাম করে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে পা ফেলতে লাগল।

আয়নামতি এতক্ষণ কাঁথাখানা জড়িয়ে দুয়ার ধরে বসেছিল স্বামীর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায়।

রূপাইর বুকখানা ফেটে বেড়িয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। বললে—এই নে তোর বকশিস—বলে, টাকাটা ফেলে দিল আয়নামতির গায়ে।

এক ছিলিম তামাক টানতে টানতে রূপাই ঝিমিয়ে পড়ল দেয়ালের 'পরে। আয়নামতি দুয়ারের অপর দিকে ঠেস্ দিয়ে বসে আকাশের খণ্ডমেঘের দ্রুত গতি নিরীক্ষণ করছে, আর অলক্ষ্যে ক্ষীণ হাত দু'খানি তুলে ঊর্দ্ধে প্রণাম জানাচ্ছে।

রাত্রি গভীর। চাঁদ হেলে পড়েছে অনেকক্ষণ। পূজার তিন দিনের ক্লান্তি নিয়ে সমস্ত পাড়াটা পড়েছে ঘুমিয়ে। চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপের বড় আলোটা নিবিয়ে দিয়ে পুরোহিত এক কোণে নাক ডাকাচ্ছেন। ক্রমে অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে আসে। হঠাৎ কিসের শব্দে পুরোহিতের ঘুম যায় ভেঙে। চেয়ে দেখেন সম্মুখে এক ছায়ামূর্ত্তি নরকঙ্কাল।

পুরোহিতের বিহ্বল চীৎকারে বড়গিন্নী রাজ্যেশ্বরী বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে আসেন, প্রদীপের পল্‌তেটা বাড়িয়ে দিতেই দেখেন, এক কঙ্কালসার নিরাবরণ স্ত্রী-মূর্ত্তি কলা-বৌয়ের বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করছে।

ভোর হয়ে এল প্রায়। বাড়ীসুদ্ধ লোক ভেঙে পড়েছে চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে। প্রভাতের বালসূর্য্য তার রক্তিম আবরণ-খানি বিছিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল রমণীর দেহ দেবীর পদতলে মূর্চ্ছিত, শাড়ীর আঁচলখানা তখনও তার মুষ্টিবদ্ধ।

"রামানন্দ-জীবনী"

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীশান্তা দেবীকে লিখিত]

গুপ্ত নিবাস
বারাকপুর ট্রাংক রোড,
পোঃ, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।
২৭. ১০. ৪৭.

কল্যাণীয়া শান্তা—

রামানন্দ বাবুর জীবনী আর তোমার চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছি, চোখের তেজ কমে গেছে তাই আগাগোড়া পড়ে জবাব দিতে দেরী হয়ে গেছে। বইখানি পড়ে মনে হ'ল— এ যেন সুপাঠ সুখপাঠ্য গল্পের বই অনেক দিন পরে হাতে এলো।

তোমার লেখা এমন সুন্দর করে ফুটিয়েছে—পূর্ব্বাপর ঘটনা— সমস্ত সহজ আর সরলভাবে যে আরম্ভ করলে ছাড়া যায় না শেষ পর্য্যন্ত না পৌঁছে।

গল্পকথার মতো বড় সুন্দর ও সহজ করে তুমি বলেছ বন্ধুবরের জীবনের ঘটনাবলী,—সেকালের সব দিনগুলি একটি অপূর্ব্ব দীপ্তি পেয়ে ফুটেছে এই গ্রন্থে—সেই ভরদ্বাজ আশ্রম চিন্তামণি বাবু বামনদাস বাবু সবাইকে মনে পড়ে, যেন সেই সময়েই আছি মনে করি। আমার খুব ভাল লেগেছে বই-খানি। তোমার শিক্ষা-দীক্ষা সার্থক হয়েছে, এই বই গেঁথে যে তুমি দিয়েছো দেশের মানুষদের, এতে তোমার পুণ্য করা এবং তীর্থ করার কাজ হ'ল। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ নিও।

তোমাদেরই
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ—একটা কথা ভুলেছি; 'প্রবাসী' আর 'মডার্ণ রিভিউ'র প্রথম বছরের দু'খানা মলাটের ছবি বইখানিতে দিলে হতো, এখন আর উপায় নাই।

কোতুলপুর থানার স্বাস্থ্য

শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ

বাঁকুড়া জেলার পূর্ব্বপ্রান্তে কোতুলপুর থানা অবস্থিত। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থান বলিয়া ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে কোতুলপুর থানার জনস্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিলে হৃদয় আতঙ্কে পূর্ণ হইয়া উঠে। সম্প্রতি দেশে নবযুগ আসিয়াছে, কংগ্রেসের মনোনীত মন্ত্রীমণ্ডলী আজ পশ্চিম বাংলার কর্ণধার। এখন তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলে কোতুলপুর থানার জনসাধারণ হয়ত সুস্থদেহে বাঁচিতে পারে।

কোতুলপুর থানার কয়েক বৎসরের জন্ম মৃত্যুর-হিসাব :

বৎসর	জন্ম	মৃত্যু
১৯৩৯	১২৭৪	১৭৮১
১৯৪০	১৩৮১	১৩৮৭
১৯৪১	১৩৫১	১৪৫৯
১৯৪২	১৪৮৭	১৪৫৩
১৯৪৩	১৪৪৪	১৯৩৭
১৯৪৪	১০৩২	১৮৬৫
১৯৪৫	১২১৩	১৫২০
১৯৪৬	১৫৫৬	১৪০৩
মোট সংখ্যা—	১০৭৩৮	১২৮০৫

এই আট বৎসরে জন্মের অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা বেশী হওয়ায় কোতুলপুর থানার ৫৪৭২২ জন অধিবাসীর মধ্যে ২০৬৭ জন কমিয়া গিয়াছে। ১৯০২ হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত ৭ বৎসরের হিসাবে কোতুলপুর থানার মধ্যে জন্ম ১০৮২২ ও মৃত্যু ১১৪৪৬। ইহাতে দেখা যায় এই ৭ বৎসরের মধ্যে মোট জনসংখ্যা হইতে ৫৬৪ জন কমিয়াছে। গত ৭ বৎসরের জনসংখ্যা হ্রাসের অনুপাত দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে বর্ত্তমান বৎসরের হিসাবে জনসংখ্যা প্রায় চতুর্গুণ হ্রাস পাইয়াছে। এই ভাবে যদি কোতুলপুর থানার জনসংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে থাকে তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই কোতুলপুর থানার তিন শত পল্লী শ্মশানে পরিণত হইবে।

ম্যালেরিয়া এখানকার সর্ব্বপ্রধান ব্যাধি। আর এই ম্যালেরিয়া হইতে কত রোগ যে হইতে পারে তাহার অন্ত নাই।

কোতুলপুর থানায় গত ৮ বৎসরে ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যু :

বৎসর	ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু
১৯৩৯	৮৯৬
১৯৪০	৬৬৬
১৯৪১	৬৩১
১৯৪২	৭০৭
১৯৪৩	১১১৭
১৯৪৪	৯৯৯
১৯৪৫	৬২৯
১৯৪৬	৪৪৪
মোট—	৬০৮৯

বর্ত্তমান আট বৎসরের হিসাব ও তাহার পূর্ব্বেকার সাত বৎসর পর্য্যন্ত হিসাবে দেখা যায়, ১৯৩২ হইতে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত ৫১৬৭ জন ম্যালেরিয়া রোগে মরিয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যুসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। যে থানার জনসংখ্যা ৫৪৭২২ সেই থানা হইতে ৮ বৎসরে যদি ৬০৮৯ জন লোক ম্যালেরিয়ার প্রকোপে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা হইলে কোতুলপুর থানার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়াই মনে হয়। জাতীয় সরকারের সহযোগিতায় যদি এই সমস্ত দরিদ্র পল্লীকে বাঁচাইবার জন্য জনসাধারণ এখনো সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা না করে তাহা হইলে এই পল্লীগুলিকে কিছুতেই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে না।

শুধু ম্যালেরিয়ায়ই যে কোতুলপুর উৎসন্ন যাইতেছে তাহা নহে, অন্যান্য ব্যাধির প্রকোপও এ অঞ্চলে কম নয়। এখানকার শিশুমৃত্যুর হারও ভয়াবহ। এক বৎসরের কমবয়স্ক শিশু-মৃত্যুর হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

বৎসর	এক বৎসরবয়স্ক শিশুর মৃত্যুসংখ্যা
১৯৩৯	৩৪০
১৯৪০	২৮৯
১৯৪১	২৬৩
১৯৪২	৩০২
১৯৪৩	৩২৫
১৯৪৪	২৭৬
১৯৪৫	২৫৫
১৯৪৬	২৯৯
মোট—	২৩৪৯

এই আট বৎসরে এক বৎসরের কমবয়স্ক শিশু-মৃত্যুসংখ্যাও কম নয়—২৩৪৯টি। মানুষ জন্মিবার আগে করুণাময় পরমেশ্বর মাতৃস্তনে যে ক্ষীরধারা সঞ্চিত করিয়া রাখেন দারিদ্র্য-নিবন্ধন আজ মাতা উদরপূর্ণ করিয়া খাইতে না পাওয়ায় হতভাগ্য সন্তান সেই অমিয়ধারা হইতে বঞ্চিত। গো-দুগ্ধ দ্বারা শিশুসন্তানকে বাঁচাইবার উপায়ও আজ আর নাই। বাংলায় গো-দুগ্ধের অভাব আজ চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। এক টাকায় ষোল সের খাঁটি দুধ যেখানে পাওয়া যাইত আজ সে স্থলে টাকায় দুই সেরও দুধ পাওয়া যায় না। স্বাধীনতা লাভ হইলে কি হইবে, দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল এই সকল শিশুকে বাঁচাইতে না পারিলে সবই ব্যর্থ হইবে। কোতুলপুর থানায়, যেখানে ৫৪৭২২ জন লোকের বাস সেখানে এক জনও শিক্ষিতা ধাত্রী নাই। অশিক্ষিতা ধাত্রীর হস্তে পড়িয়া কত শিশু যে অকালে মারা যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, খাদ্য না পাওয়ায় ও শিশু-পালনে অজ্ঞতাবশতঃ অনেক শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার দিন কয়েক পরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। অনেক শিশুর জননীও যত্নের অভাবে এবং ধাত্রীর অজ্ঞতাবশতঃ মারা যান।

কোতুলপুর থানায় সন্তানজন্মের ১৪ দিন মধ্যে প্রসূতির মৃত্যুর হিসাব নিম্নলিখিত রূপ :

বৎসর	প্রসূতির মৃত্যু-সংখ্যা
১৯৩৯	২৬
১৯৪০	১৮
১৯৪১	২৭
১৯৪২	৩২
১৯৪৩	৩০
১৯৪৪	১৭
১৯৪৫	৩২
১৯৪৬	২৪
মোট	২০৬

১৯৩৩ হইতে ১৯৩৮ সন পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে ১৯৮টি প্রসূতি এই ভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। ১৯৩৯-৪৬ এই ৮ বৎসরে ২০৬টি জননীর অকালমৃত্যু হইল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী কর্ত্তৃক সংগৃহীত একটি চার্টে দেখিয়াছি, প্রতি ৮ মিনিটে এই সোনার বাংলা হইতে একটি করিয়া মাতা প্রসবকালে বা প্রসবের অব্যবহিত পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সব পল্লীগ্রামের সূতিকাগারের অবস্থা দেখিলে হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার হয়---যে দেশে সন্তানজন্মের পর তাহাকে মনুষ্য-বাসের অযোগ্য গৃহে রাখা হয়, সে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, পূর্ব্বকালে কখনই এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। সে যুগে ত্রিকাল-দর্শী আর্য্যঋষিগণের নির্দ্দেশানুযায়ী প্রসবের বহুপূর্ব্বে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করা হইত। কিন্তু গৃহস্থ আজ চরম দারিদ্র্যপীড়িত। ইচ্ছা থাকিলেও পল্লীবাসীরা অভাবের তাড়নায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাযুক্ত সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। প্রসূতি-পরিচর্য্যা-শিক্ষাও এদেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে।

ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া যে সমস্ত লোক জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে যক্ষ্মারোগ দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে। কোতুলপুর থানার অধিবাসিগণের মধ্যে যক্ষ্মা-রোগে মৃত্যুর হারও ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

কোতুলপুর থানায় যক্ষ্মারোগে মৃত্যু—

বৎসর	মৃত্যু-সংখ্যা
১৯৩৯	১৩
১৯৪০	২১
১৯৪১	২০
১৪৪২	১১
১৯৪৩	৭
১৯৪৪	১৯
১৯৪৫	১৬
১৯৪৬	২৪
মোট	১২১

১৯৩৩ হইতে ১৯৩৮ সন পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসরে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১৭৫ জন। এর পরবর্ত্তী ৮ বৎসরে ১২১ জন যক্ষ্মারোগে মারা গিয়াছে। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান সূর্য্যকিরণ ও বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব যেখানে নাই সেই পল্লীতেও এই ভীষণ ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে।

বর্ত্তমান কালে যথেচ্ছ আহার, যক্ষ্মারোগীর সহিত মেলা-মেশা ইত্যাদি যক্ষ্মা বিস্তারে সহায়তা করিতেছে। যক্ষ্মা ছাড়া দন্তপীড়া ও অন্যান্য নানা ব্যাধিও শহর হইতে মফঃস্বলে আসিতেছে। যক্ষ্মারোগ সংক্রামক হইলে পল্লীগ্রামে অধিকাংশ রোগী বিনা চিকিৎসাতেই মারা যায়। সংক্রামক রোগের মধ্যে কলেরা এবং বসন্ত রোগ মধ্যে মধ্যে এখানে দেখা দেয়, তবে সহরের তুলনায় অনেক কম।

গত ৮ বৎসরের কলেরা ও বসন্ত রোগে মৃত্যুসংখ্যা :

বৎসর	কলেরা	বসন্ত
১৯৩৯	১৪	১
১৯৪০	৯	১
১৯৪১	২৭	৪
১৯৪২	১২	০
১৯৪৩	১১৫	০
১৯৪৪	৩	৩
১৯৪৫	৮	২২
১৯৪৬	১৮	১
মোট	২০৬	৩২

এই ৮ বৎসরে কলেরা বা ওলাউঠা রোগে মৃত্যুসংখ্যা ২০৬। তন্মধ্যে ১৯৪৩ সালে ইহার আক্রমণ ব্যাপক আকার ধারণ করে, ফলে উক্ত বৎসরে কোতুলপুর থানার ১১৫ জন লোক কলেরা রোগে মারা যায়। গত ১৯৩৩-৩৮ পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসরে কলেরা রোগে মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৯১, পল্লীগ্রামে অজ্ঞতাবশতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগ ব্যাপক ভাবে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। ১৯৪৪ সাল হইতে কলেরার টিকা দিবার প্রচলন বেশী হওয়ায় মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়াছে। গরীব রোগীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। অবশ্য কোতুলপুর থানায় ডেঙ্গুয়া পাড়ায় একটি এমার্জেন্সী হাসপাতাল আছে ও তাহাতে কলেরা রোগীকে রাখা যায়, কিন্তু বিশেষ কোন সুবন্দোবস্ত সেখানে নাই। এখানকার অব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একবার একটি রোগীকে সেখানে পাঠাইয়াছিলাম, শুশ্রূষা-কারিগণের লক্ষ্য না থাকায় ইউরিমিয়া অবস্থায়—সে হাসপাতালের বাহিরে চলিয়া যায়। এ ধরণের ব্যাপার যাহাতে না ঘটে সেজন্য প্রত্যেক ইউনিয়নের তরফ হইতে বিহিত ব্যবস্থা করা দরকার। আর একটি মাত্র হাঁসপাতাল দ্বারা বিশেষ কিছুই হইবারও নয়।

কলেরার ন্যায় বসন্ত রোগের বীজও শহর হইতে এখানে আমদানী হয়। বসন্ত রোগে মৃত্যুসংখ্যা গত ৮ বৎসরে ৩২ ও

পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯৩৩-১৯৩৮ পর্য্যন্ত এই ৭ বৎসরে ৫৭। এই হিসাবে হইতে দেখা যায় যে, বসন্ত রোগের প্রকোপ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। অবশ্য সময়মত টিকা লওয়াই ইহার কারণ। রোগ-প্রতিষেধ ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা কোতুলপুর থানায় আশানুরূপ নহে। সারা গ্রাম বন-জঙ্গল, পচা ডোবায় ভরিয়া গিয়াছে, দেশবাসী অন্নবস্ত্রের চিন্তায় বিব্রত হইয়া এমন অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে যে তাহাদের পক্ষে গ্রামের উন্নতির কথা চিন্তা করাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মধ্যে মধ্যে পল্লী-সংস্কার কার্য্যের জন্য যা একটু আধটু সরকারী ব্যবস্থা হয় তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নথিপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। ডাঃ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় স্থানে স্থানে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, কিন্তু সরকারী সাহায্য ও বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের দান বন্ধ হওয়ায় ঐ সমস্ত পল্লী সমিতি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। কোতুলপুর জেলা বোর্ডের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। বহুদিন আগে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জেলাবোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় ও ক্ষুদ্র হাসপাতাল থাকা একান্ত আবশ্যক। মেদিনীপুর জেলায় খিরপাই পল্লীবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় তত্রত্য পল্লীবাসীদের প্রাণে আশার সঞ্চার হইতেছে। চন্দ্রকোণা থানা ম্যালেরিয়ার পীড়নে ধ্বংস হইতেছে। খিরপাই পল্লীতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কোতুলপুর অপেক্ষা কম নয়। পল্লীস্বাস্থ্য সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের পরিকল্পনা যত শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হয় ততই মঙ্গল। নূতন কর স্থাপন করিয়া ইহা করা খুবই কষ্টকর হইবে। একে তো পল্লীর অধিবাসীরা নানাবিধ করভারে প্রপীড়িত, তদুপরি শিক্ষা-করের বোঝাও তাহাদের উপর চাপানো হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলা বোর্ড এখানে শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিলেও তদানীন্তন সরকার তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

আমি পশ্চিম বাংলার ধ্বংসোন্মুখ একটি থানার চিত্র আঁকিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, এদেশের বহু অঞ্চল এইভাবে আধিব্যাধির প্রকোপে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিকর্ম্মে বিমানের কার্য্যকারিতা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ধান্য-উৎপাদকগণ ধানের চাষের এক অভিনব এবং পুরাপুরি যান্ত্রিক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। তাহাদের উদ্ভাবনীশক্তির দরুন বিমানদ্বারা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের বহু প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। এমন কি আধুনিক আমেরিকায় অন্যতম কৃষিযন্ত্ররূপেও বিমানের ব্যবহার চালু হইয়াছে এবং ইহার কার্য্যকারিতা অপরিসীম বলিয়া দক্ষিণ-আমেরিকায় ধানের আবাদে ব্যাপকভাবে ইহার প্রচলন হইতেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার ধান্যক্ষেত্রসমূহের কতকগুলি বিশেষ অবস্থার জন্যই এই নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হয়। প্রচুর গবেষণাদির পর কৃষিবিদ্‌গণ বুঝিতে পারেন যে, উক্ত ষ্টেটের বিরাট কৃষিক্ষেত্রসমূহে যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন আবশ্যক, উপরন্তু ধানগাছগুলিকে আগাছার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এমন কোন উপায় অবলম্বন করা দরকার যাহাতে সময় ও শ্রম দুই-ই বাঁচিতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে, আগাছাগুলির অবাধবৃদ্ধি নিবারণ করিয়া ধানের আবাদ বাড়াইবার সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী পন্থা হইতেছে বীজ বপনের পূর্ব্বে ক্ষেত্রসমূহকে জলপ্লাবিত করিয়া দেওয়া। এখন সমস্যা দাঁড়াইল জলমগ্ন ক্ষেত্রসমূহে বীজবপনের প্রকৃষ্ট উপায় কি? ইহারও সমাধান হইতে দেরি হইল না। বিশেষজ্ঞগণ বলিলেন যে, একমাত্র বিমানের সাহায্যেই এই কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে। নিম্নে আমেরিকার ধান্য-উৎপাদনের সাম্প্রতিক পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

প্রথমে কলের লাঙ্গল এবং মই দিয়া জমি চাষ করিবার পর বাহির হইতে জল আনিয়া ক্ষেত প্লাবিত করিয়া দেওয়া হয়। এই জলধারার উচ্চতা হয় সাধারণতঃ আন্দাজ ছয় ফুট (১৫ সেণ্টিমিটার) পর্য্যন্ত। তারপর খুব নীচু দিয়া উড্ডীয়মান বিমান হইতে জলে-ভিজানো, দিনেকের অঙ্কুর বাহির হওয়া ধানের বীজসমূহ নিক্ষেপ করা হয়। সেগুলি জলে ডুবিয়া যায় এবং নীচেকার জমিতে শিকড় গাড়ে। আগাছাগুলি জলে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে, মাটিতে শিকড় মেলিতে পারে না। কাজেই তাহারা জমি হইতে সার শুষিয়া লইতে পারে না। ওদিকে যথাসময়ে ধানগাছগুলির মাথা জলের উপর জাগিয়া উঠে। তারপর তাহারা মানুষ অথবা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই পরিপুষ্ট এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শস্যকর্ত্তনের ঋতুতে ধান কাটিবার মাসখানেক আগে ক্ষেত্রগুলিকে শুকাইবার জন্য নালা কাটিয়া জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে গিয়া শস্যকর্ত্তনকারীরা যাহাতে



ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ক্ষেতে ধানের বীজ বপনরত একটি বিমান। ডান'দকের লোকটি ক্ষেতের সীমানা নির্দ্দেশক পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান

স্বচ্ছন্দে এবং অনায়াসে ধানকাটা, তুষঝাড়া ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করিতে পারে সেইজন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

ধান্য উৎপাদনে এই যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে ধানের ফলন যে কম হইতেছে তাহা নহে। আমেরিকায় গড়পড়তা একর-প্রতি ২০০০ পাউণ্ড ধান্য উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ অঞ্চলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে শুকনো জমিতে বীজবপন করিয়া যে পরিমাণ ধান ফলানো হয় তাহাও এই হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় বিমানযোগে বীজবপন-পদ্ধতি দ্বারা কিন্তু একর-প্রতি গড়পড়তা অন্ততঃ তিন হাজার পাউণ্ড ধান জন্মে। এই কারণে আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের চাষীরা বিমানের সাহায্যে বীজ বপনের অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছে এবং এই পদ্ধতি তাহাদের মধ্যে দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে।

প্রতি বৎসর যে মাসে ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত সেক্রামেণ্টোর উত্তর দিকস্থ উপত্যকা-অঞ্চলের রাস্তাঘাটে সৈনিক-প্রহরীরা মোটর আরোহীদের অভিযোগ শুনিতে শুনিতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। তাহাদের মাথার মাত্র কয়েক হাত উপর দিয়া উড্ডীয়মান যে-সকল বিমানের বিরামহীন গর্জ্জন তাহাদের কানে তালা লাগাইয়া দেয় সেগুলির বিরুদ্ধেই তাহাদের নালিশ। তাহাদের অভিযোগ যতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হোক্ না কেন, পুলিস বিমানচালক অথবা স্থানীয় লোকেরা কেহই তাহাতে কর্ণপাত করে না। কেননা এই সমস্ত শস্যসমৃদ্ধ অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট এই সকল বিমান—(তন্মধ্যে অধিকাংশই দ্বি-পক্ষবিশিষ্ট এবং তাহাদের ও চালকদের বয়স ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে)—জলসেচের খালের কীলক (irrigation lock), কলের লাঙ্গল বা শস্য-সংগ্রাহক-যন্ত্রের মতই অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এই অভিনব কৃষিযন্ত্রের দৌলতে বিগত পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে সেক্রামেণ্টো এবং ফিদার নদীর মধ্যবর্ত্তী বিরাট ক্ষেত্রসমূহে এত বেশী ধান্য উৎপন্ন হইতেছে যে, ইহা আমেরিকার একটি শ্রেষ্ঠ ধান্যাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় ধান্য উৎপাদনের পরিমাণ যে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সরকারী কৃষি-বিভাগের ১৯৪৬-এর হিসাব পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একর-প্রতি যে ২০০০ পাউণ্ড ধান্য উৎপাদনের কথা বলা হইয়াছে তাহা গত বৎসরেরই হিসাব। উক্ত বৎসরে 'ক্যালিফোর্নিয়ার কোন কোন উৎকৃষ্ট ধান্যক্ষেত্রে কিন্তু একর-প্রতি ছয় হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত ধান জন্মিয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে উত্তম সার প্রয়োগ দ্বারা জমির উর্ব্বরতা বিধান এই উচ্চহারে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আংশিকভাবে দায়ী, কিন্তু বিমানে বীজবপন-ব্যবস্থা যে এই ফলনবৃদ্ধির মুখ্য কারণ সে বিষয়ে কৃষি-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। হাত দিয়া চারা রোপণ করিবার যে পুরনো পচা পদ্ধতি মান্ধাতার আমল হইতে প্রচলিত ছিল যন্ত্রের কল্যাণে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ইহা চাষবাসের কার্য্যকে যে কতদূর সহজসাধ্য করিয়া তুলিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অথচ ইহার দরুন ক্ষেতের উৎপাদিকাশক্তি কিন্তু তিল পরিমাণও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

রিচভেইলের গ্লেন হ্যারিস ক্যালিফোর্নিয়ার এই অভিনব কৃষিপদ্ধতি প্রবর্ত্তকদের অন্যতম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন —"ক্যালিফোর্নিয়ায় আমাদের কৃষি-সমস্যা ছিল অন্যান্য অঞ্চল হইতে আলাদা ধরণের ও বিশেষ জটিল। কি ভাবে ধানগাছের উপর জলজ তৃণ এবং অন্যান্য আগাছার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহা লইয়া আমরা অনেক মাথা ঘামাইয়াছি। শেষ পর্য্যন্ত আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলাম যে, বীজ বপন হইতে শস্যকর্ত্তনের সময় পর্য্যন্ত—এই কয়েক মাস যদি ক্ষেতগুলিকে জলমগ্ন রাখিবার ব্যবস্থা করা যায়, কেবলমাত্র তাহা হইলেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এর পরে জলপ্লাবিত ক্ষেত্রে কি করিয়া বীজ বপন করা যায় তাহা আর এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। হাত দিয়া তো কিছুতেই এগুলোতে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা সম্ভবপর নয়। এখন কি করা যায়? শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা দেখিলাম একমাত্র কার্য্যকরী পন্থা হইতেছে বিমান হইতে জলপ্লাবিত ক্ষেতে বীজ নিক্ষেপ করা। এমনি ভাবেই আবিষ্কৃত হইল আমাদের অভিনব বৈজ্ঞানিক বীজ বপন পদ্ধতি এবং গোটা যে মাঠ জুড়িয়া ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া যে সকল গর্জ্জনশীল বিমা

উড়িয়া বেড়ায় সেগুলি দ্বারা আমাদের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতেছে।

বিমানে বীজ বপন চালু হওয়ায় ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষি-কর্ম্মের ধারাই বদলাইয়া গিয়াছে। পুরনো আমলের সঙ্গে আজকের ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষির সাদৃশ্য কেবল এইটুকু যে তখনকার ন্যায় এখনো জলময় ক্ষেত্রেই ধানগাছগুলি বাড়িয়া থাকে—অবশ্য পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র গম এবং অন্যান্য শস্য উৎপাদনে বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা যেমন আমেরিকার কৃষিকর্ম্মের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তেমনি এই সাম্প্রতিক পদ্ধতিটিও সম্পূর্ণ তাহার নিজস্ব। ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষির কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। প্রথমত এখানে যে ধান গাছ উৎপন্ন হয় তাহা বেশ বড় আকারের; দ্বিতীয়তঃ, ক্ষেত্রসমূহে জলসেচের যে বিরাট ও ব্যাপক ব্যবস্থা এখানকার রাষ্ট্র করিয়াছে তাহার দরুন একদা যে সকল জমি ছিল ঊষর আজ তাহা উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, এবং ইহার সঙ্গে বিমানে বীজ বপন প্রণালীর সংমিশ্রণ হওয়ায় এখানে কৃষির চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

এই নূতন ধরণের কৃষিকার্য্যের জন্য ক্ষেত্রে প্রচুর জল সরবরাহের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই বিষয়ে গ্রেম হ্যারিসের কথাই আবার উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলেন—"আমাদের এই নূতন প্রণালীর কৃষির জন্য জলের আবশ্যকতা অত্যধিক। আগাছার অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে একটি মাত্র উপায়ে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ক্ষেতের জল যদি গভীর হয় তাহা হইলে আগাছাগুলা বাড়িতে পারে না, ধানগাছগুলি কিন্তু সেই গভীর জল ভেদ করিয়া সুষ্ঠুভাবেই বাড়িয়া উঠে।"

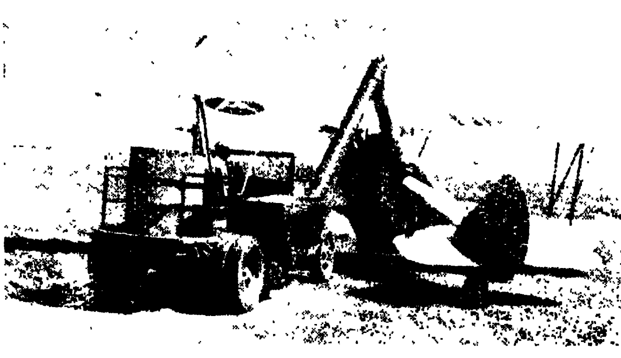
বৎসরের প্রথম ভাগে সিয়েরা নেভাদা পর্ব্বতমালার তুষার গলিতে সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষেত্রকর্ম্মাদির তোড়জোড় আরম্ভ হয়। এই ঋতুতে যখন মাউণ্ট লেসেন নামক আগ্নেয়গিরির নিকটবর্ত্তী সাষ্টা বাঁধের এবং অনেকগুলি উন্নত উপত্যকার বিরাট জলাধারসমূহ গলিত তুষারের জলধারায় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া যায়, তখন নীচেকার বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রসমূহ শুষ্কই থাকে। উচ্চস্থান হইতে এগুলিতে যে বারি পতিত হয় তাহার পরিমাণ বার্ষিক ১৫ হইতে ২০ ইঞ্চি মাত্র। এ গুলিতে তুষারপতন এবং বৃষ্টিপাত এত কম হয় যে তাহা জমিকে আর্দ্র করিতে পারে না। জমি এত খটখটে শুকনো ও শক্ত থাকে যে তাহার উপর দিয়া অনায়াসে ভারী যন্ত্র চালাইয়া লওয়া যায়। ট্রাকটার টানা লাঙল, মই এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি দ্বারা জমি চাষ, মাটির ঢেলা ভাঙা ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। চলমান যন্ত্রগুলির পিছনে ধূলির ঝড় ওঠে, কখনো কখনো সংহত ধূলিকণা স্তম্ভাকৃতি মেঘের মত দৃশ্যমান হয়। পার্ব্বত্য ঝটিকার গতিকে প্রতিহত করিবার জন্য ধানক্ষেতের প্রান্তে রোপিত ইউকেলিপটাস বৃক্ষে আসিয়া অবশেষে সেই ধূলিরাশি আশ্রয় গ্রহণ করে। এপ্রিলের শেষ ভাগে অথবা মে মাসের গোড়ার দিকে বাঁধের কীলকসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়, আর শত শত খাল নালা ইত্যাদির ভিতর দিয়া সেই সঞ্চিত জলধারা ধান্যক্ষেত্রে গিয়া পতিত হয়।

আজকাল কখনো ক্ষেত্র জলপ্লাবিত করিবার পূর্ব্বে বীজ বপন করা হয় না। আগে কিন্তু প্রথমে শুকনো জমির উপর বীজ ছড়ানো হইত এবং তার পরে জমিকে জলপূর্ণ করা হইত। কিন্তু ইহার অসুবিধা ছিল বিস্তর এবং ইহা ছিল ক্ষতিকর। বহু বীজ মাটির ঢেলার ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত, অথবা বীজের গায়ে ইঞ্চিখানেক মাটির প্রলেপ লাগায় তাহা অঙ্কুরিত এবং জলগর্ভ হইতে বহির্গত হইতে পারিত না। আজকের দিনে কিন্তু একটি মাত্র ধানের বীজ বপন করিবার আগেই ক্ষেতটিকে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণতঃ যে জল দেওয়া হয় তাহার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ হইতেছে প্রায় ছয় ইঞ্চি। মোটামুটি সাধারণ আকারের ৩০০ একর একটি ক্ষেত্রের বাঁধের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জলপ্লাবিত করিতে প্রায় দুই সপ্তাহ লাগে। এই কয় দিন অন্য ক্ষেত্রকর্ম্মাদি বিশেষ কিছু করা যায় না—বেশী কিছু করিবার দরকারও হয় না; কেননা এই ব্যবস্থার দরুন আগাছা বাড়িতে পারে না, জমির উৎপাদিকাশক্তিও সংরক্ষিত হয়। যুদ্ধের সময় এই ব্যবস্থার দরুন একই ক্ষেত্রে বৎসরের এ মাথায় এক বার এবং ও মাথায় আর এক বার ফসল ফলানো সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহা দ্বারা আগাছা ধ্বংস এবং জমির সার সংরক্ষণ তো হয়ই, উপরন্তু এরোপ্লেন হইতে অঙ্কুরিত বীজ বপন করিলে যাহাতে তাহা নষ্ট না হইয়া অচিরেই চারাগাছে পরিণত হইতে পারে জমিকে তাহার উপযোগী করিয়া তৈরি করিয়া রাখে।

এই কৃষি-বিমান চালানোর জন্য পাকা বৈমানিকের প্রয়োজন। এগুলি খুব নীচু দিয়া—কতকগুলি মাটি হইতে মাত্র পঞ্চাশ ফুট উপরে—ঘণ্টায় পঞ্চাশ এবং একশ মাইল বেগে উড়ে। এগুলি চালাইতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। চালকদের মধ্যে অধিকাংশেরই বয়স কুড়ির নীচে—তাহারা সকলেই যুদ্ধের সময় বিমান-চালনা-বিদ্যায় গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। এখন তাহারা সকলেই উৎসাহী বৈমানিক। বিমান চালানোর যাবতীয় কৌশল, এর অন্ধিসন্ধি সব কিছু তাদের নখদর্পণে। যাহাতে এক ইঞ্চি পরিমাণ জমিতেও বীজ বপন বাদ না পড়ে সে জন্য ইলেকট্রিক পাওয়ার লাইনের উপর দিয়া কেমন করিয়া বিমান চালাইতে হয়, ঝটিকা-প্রতিরোধক ইলেকট্রিক বৃক্ষের উপর দিয়া কিরূপ কৌশলে বিমানকে লইয়া যাইতে হয়, এ সবই তাদের জানা। সকল সময় গতিবেগের একই মাত্রা রক্ষা করাও তাদের আর একটি বিশেষ গুণ।

বায়ু-প্রবাহের মাত্রায় যতই তারতম্য হোক না কেন, এই সকল বিমান-চালককে সর্ব্বাবস্থায়ই একই গতিতে বিমান চালাইতে হইবে। প্রত্যেকটি বিমান অন্ততঃ পক্ষে ১,০০০ পাউণ্ড (৪৫০ কিলোগ্রাম) বীজ বহন করে। মাঝে মাঝে বোঝা খালাস করা, উচ্চ স্থানে আরোহণ, মোড় ফেরা, প্রত্যেক পাঁচ মিনিট পরে এক বার মাটিতে নামিয়া বীজ দিয়া বিমান বোঝাই করিয়া লওয়া ইত্যাদির দরুন এই সকল বিমান চালানো অত্যন্ত দুরূহ ও বিরক্তিকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।



একটি ট্রাক হইতে বিমানে ধানের বীজ বোঝাই করা হইতেছে

সমগ্র সেক্রামেন্টো উপত্যকায় পনর হইতে কুড়ি জন বৈমানিক কার্য্যের মালিকদের কৃষিকর্ম্মে সাহায্য করিয়া থাকে। তাহারা শুধু যে কায়িক পরিশ্রম দ্বারাই তাহাদের সহায়তা করে তাহা নয়, তাহারা নিজেদের বিমান পর্য্যন্ত দিয়া কৃষিকর্ম্মকারীদের উপকার করিয়া থাকে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের মধ্যে দুই জন পাওয়ার লাইন পরিষ্কার করিতে না পারায় এক সাংঘাতিক বিমান-দুর্ঘটনায় বিপন্ন হয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে হেলিকপ্টারগুলো অধিকতর নিরাপদ, কিন্তু এগুলিতে এরোপ্লেনের প্রপেলারের মত কোনো যন্ত্র না থাকায় বিশেষ অসুবিধা হয়।

যদিও আজকালকার বীজাধারগুলি বিরাট আকারের নয় বলিয়া এগুলির বীজ বহন করিবার ক্ষমতা বিশেষ সীমাবদ্ধ, তথাপি বিমানে বীজ বপন করিলে সময় এবং শ্রমমূল্য দুই-ই বাঁচে। শুকনো জমির উপর সাধারণ ভাবে যন্ত্র-সাহায্যে বীজ বপন করার শ্রমমূল্য পড়িত একর-প্রতি ৪ শিলিং হইতে ছয় শিলিং পর্য্যন্ত। কিন্তু আজকের দিনে বিমানযোগে বীজ বপনের খরচ পড়ে একর-প্রতি ১ শিলিং হইতে দেড় শিলিং। বিমানদ্বারা যে কৃষির পথ সুগম ও অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে কৃষিযন্ত্র রূপে বিমানের ব্যবহার অল্পকালের পরিকল্পনা বলিয়া ইহাতে কতকগুলি অসুবিধাও আছে এবং সেগুলির আশু প্রতিকার প্রয়োজন। প্রত্যেক কৃষি-বিমানকে প্রতিদিন ৬০০ একর পরিক্রমণ করিতে হয়। কাজেই ক্রমাগত বীজ বোঝাই এবং খালাস করিবার জন্য এক জায়গায় বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা বিমানগুলির পক্ষে মুশকিল হইয়া দাঁড়ায়। অথচ অপেক্ষা না করিলে উপযুক্ত পরিমাণ বীজ বোঝাই করাও সম্ভবপর হয় না।

এই সকল কারণে, কৃষিকর্ম্মে ব্যবহারের জন্য বিশেষ ধরণের বিমানের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া ক্যালিফোর্নিয়ার বিমান প্রস্তুতকারীগণ নানা পরিকল্পনা করিতেছেন। সানডিগোর 'কনসোলিডেটেড ভালটি এয়ারক্র্যাফট করপোরেশন' তাহাদের এঞ্জিনিয়র-কার্য্যের বিশেষজ্ঞদের একটি দলকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ধান্যাঞ্চলসমূহে পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহারা খুবই আশা করেন যে, এই এঞ্জিনিয়ারগণ অচিরাৎ এমন এক ধরণের হেলিকপ্টার নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন যাহাতে বীজ ছড়ানোর জন্য একটি বিশিষ্ট স্লাট প্রোপেলার থাকিবে। বীজাধারের মালবহন-ক্ষমতা বাড়াইবার জন্যও তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন।

বিমানবাহিত বীজগুলা কিন্তু শুকনো বীজ নয়, এগুলিকে বলা যাইতে পারে ধানের চারার ভ্রূণাবস্থা। বিমান হইতে ক্ষেতে বীজ ছড়াইবার আগে সেগুলিকে কতকগুলো থলের ভিতরে পুরিয়া, জলসেচের খাতে ভিজাইয়া রাখা হয়। চব্বিশ ঘণ্টা পরে বীজগুলি অঙ্কুরিত হয় এবং সে অবস্থায় এগুলিকে আরো একটি দিন খাতের মধ্যে রাখা হয়। বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত হইবার পর এই জলসিক্ত বীজ ক্ষেতের জলে ডুবিয়া যায় এবং ছোট ছোট অঙ্কুরসমূহ শীঘ্রই জলের নীচেকার ভিজা মাটিতে শিকড় গাড়িয়া বসে।

এর পর হইতে প্রকৃতির সাহায্যেই চারাগাছগুলি জল-তলে ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে—মানুষ বা যন্ত্রের সহায়তার আবশ্যক হয় না। এমনিভাবে প্রায় অর্দ্ধ বৎসরকাল ক্ষেতগুলি যন্ত্রাদি-স্পৃষ্ট না হইয়া ক্যালিফোর্নিয়ার রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশের নীচে পড়িয়া থাকে, চারাগাছগুলি প্রকৃতির তত্ত্বাবধানেই প্রতিপালিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে শস্যকর্ত্তনের প্রায় মাসখানেক আগে কৃষকেরা ক্ষেতে গিয়া সেখানকার জল বহিষ্করণার্থ জলসেচের খাতের কীলক খুলিয়া দেয়। এমনিভাবে ধীরে ধীরে সবটুকু জল বাহির হইয়া যায়। অক্টোবরের শেষে কিম্বা নবেম্বরের গোড়ার দিকে জমি এত শুকনো হয় যে তাহার উপর দিয়া অনায়াসে শস্যসংগ্রাহক-যন্ত্র চালানো যাইতে পারে। প্রথমে ক্ষেত্রকর্ম্মের জন্যই বিশেষ ভাবে তৈরি এক প্রকার যন্ত্র দ্বারা চতুষ্পার্শ্বের ঘাস কাটিয়া ক্ষেতের মুখ খুলিয়া দেওয়া হয়। এমনিভাবে শস্য-সংগ্রাহক যন্ত্রের এক পার্শ্বে একটি ঘাসকাটা কল জুড়িয়া দিয়া ক্ষেত্রকর্ম্ম সুরু হয়। এই যন্ত্র দুটিকে কিন্তু কেবলমাত্র সমতল জমির উপর দিয়াই চালানো যায়, ধানক্ষেতে চতুষ্পার্শ্বস্থ উঁচু বাঁধের উপর

এগুলি দিয়া কোনও কাজ হয় না। শস্য-সংগ্রাহক-যন্ত্র সংলগ্ন ছেদক যন্ত্রটি (cutting rig) ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে ১২ হইতে ১৫ ফুট জায়গার ঘাস কাটিয়া সাফ করিয়া উহার চলাচলের পথকে সুগম করিয়া দেয়।

শস্যসংগ্রহকারীদের পশ্চাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত শস্য আহরণ করিতে হয়। কেননা, জল ছাঁটা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই নানা প্রকার ঘাস এবং আগাছা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে। কাজেই তাহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শস্যসংগ্রাহক যন্ত্রের ছাঁটাইয়ের নাগালের মধ্যে আসিবার আগেই যাহাতে ধান কাটা সারা হইয়া যায় সেদিকে বিশেষ অবহিত হইতে হয়। এই সমস্ত তৃণরাজির মধ্যে একমাত্র বার্ণইয়ার্ড ঘাসই এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যে তাহা শস্যসংগ্রাহক যন্ত্রের নাগালের মধ্যে আসিয়া পৌছে। শুধু এই ত্রুটিটুকু ছাড়া এই অভিনব ধান্যোৎপাদন-পদ্ধতি আর সকল দিক দিয়াই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

এই প্রণালীতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় আগেকার দিনে হস্ত সাহায্যে আগাছা বাছিতে যে খরচ পড়িত তাহার হাত হইতে কৃষিকর্ম্মকারীগণ রেহাই পাইয়াছেন। আর খরচও তখন নেহাত কম ছিল না—একর-প্রতি ৩ শিলিং হইতে ৫ শিলিং পর্য্যন্ত। যন্ত্র দ্বারা ধান কাটার পর ক্ষেতেই তুষ ঝাড়া সম্পন্ন হয় বলিয়া চাল শুকাইয়া লইতেও বিশেষ বেগ পাইতে বা খরচ করিতে হয় না। এ ছাড়া, আরও এমন কতকগুলি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে যেগুলির সাহায্যে বস্তায় পুরিবার আগেই ধানের গাত্রসংলগ্ন আজে-বাজে জিনিষ, পোকা ইত্যাদি দূর করা যাইতে পারে। সাম্প্রতিক ব্যবস্থায় ধান্যোৎপাদনের শ্রমমূল্যই যে শুধু কমিয়াছে তাহা নয়, ধানের পরিমাণ এবং গুণও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এমনি ভাবে এই নূতন প্রচেষ্টা অসামান্য সাফল্যলাভ করাতে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে ধান্যোৎপাদনের এই পুরোপুরি যান্ত্রিক পদ্ধতিই আদর্শ পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইবে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে ধান্যক্ষেত্রে হস্ত দ্বারা বীজ বপনরত লোকদের অবনমিত মূর্ত্তিগুলি আর দৃশ্যমান হইবে না। দক্ষিণ অঞ্চলের টেক্সাস, লুইশিয়ানা, আর্কানসাস এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য প্রধান প্রধান ধান্যাঞ্চলসমূহে ব্যাপকভাবে এই ক্যালিফোর্নিয়া-পদ্ধতিই গ্রহণ করা হইতেছে।

এখন গ্রেন হ্যারিসের কথা উদ্ধৃত করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—"১৯৩০ সনে আমি প্রথম বিমানে ধানের বীজ বপন করি এবং তারপর হইতে প্রতি বৎসরই এই উপায়ে অন্ততঃ আংশিকভাবে হইলেও আমার নিজের ক্ষেত্রে ধান জন্মাইতেছি। ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষক—যে নিজের কর্ম্মক্ষমতায় দুর্বৎসরেও একর-প্রতি অন্ততঃ ১৮০০ পাউণ্ড শস্য উৎপাদন করে, তাহার পক্ষে কৃষি-বিমান যে কত উপযোগী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহা দ্বারা তাহার সময় ও শ্রম দুই-ই বাঁচিবে—ট্রাক্টর এবং কলের মইয়ের মত ইহাও এক দিন তাহার নিকট স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য কৃষিযন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে অপর্য্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনপূর্ব্বক দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া আমরা ধন্য হইতে পারিব।"

আবেদন

শ্রীপ্রশান্তকুমার মিত্র

স্বাধীনতা-সূর্য্য বুঝি দেখা দিল পূর্ব্বাশার পারে,
ভারতের দিগঙ্গনে, আরক্তিম স্বর্ণ-রশ্মি-ধারে।
উৎসুক নয়নে সবে নেহারিছে সুষুপ্তির শেষ—
প্রাচ্যের এ জাগরণে চেতনার নবীন উন্মেষ।
মুকুলিত আশা কত আজ বুঝি স্ফুটন উন্মুখ;
আনন্দ উদ্বেগ ভরা শত ভগ্ন নিপীড়িত বুক।
এর মাঝে কোথা হতে অর্দ্ধনগ্ন বুভুক্ষুর দল
ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে দাঁড়াইয়া করে কোলাহল।
লক্ষ লক্ষ নর-নারী কার পানে বাড়াইয়া হাত
জানাইছে আবেদন, "দাও শুধু এক মুঠা ভাত।"

'স্বাধীনতা' নাম শুনি চাহে তারা বিস্মিত নয়নে;—
'কি ফল মিলিবে এতে, তাই বুঝি ভাবে মনে মনে।
'মিলিবে কি অন্ন মুঠি' বস্ত্রখণ্ড লজ্জা নিবারণী;
ঘুচিবে কি ব্যাধি জ্বালা, শুদ্ধ রক্ত বহিবে ধমনী?
ঢালিয়া বুকের রক্ত বিনিময়ে কেন নাহি পাই?
কোন পথে চলে যায়—মোরা শুধু শূন্য চোখে চাই।
স্বাধীনতা দিবে মুক্তি এই ক্রূর নাগপাশ হতে;
যুগান্তসঞ্চিত ক্ষুধা মিটিবে কি স্বাধীন ভারতে?'
তাই যবে আর সবে নিরখিছে নবীন প্রভাত,
লক্ষ নরনারী কাঁদে, "দাও শুধু এক মুঠা ভাত।"

সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রচার

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

এই প্রবন্ধে আমরা প্রথমে (১) বর্তমান ভারতে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনের কারণ নির্ণয় করব, এবং তারপর (২) সংস্কৃতসাহিত্যের উন্নতিকল্পে পরিকল্পনাদি বিষয়ে আলোচনা করব।

(১) বর্তমান ভারতে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শনের কারণ-নির্ণয়

অতীব দুঃখের বিষয়, সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শনে আমাদের দেশের কয়েক শ্রেণীর লোক সর্বদা তৎপর। (ক) প্রথমতঃ ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজ। এ শ্রেণীর লোকেরা ভারতীয় সভ্যতায় সুশোভন কিছুরই সন্ধান পান না, এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় অনুরাগবশতঃ পাশ্চাত্ত্য ধরণের জীবন-যাপনে আনন্দ পান। সুতরাং এঁরা যে সংস্কৃতশিক্ষার পক্ষপাতী নন, সংস্কৃতসাহিত্যে কোনও আনন্দ পান না, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। তবে আনন্দের কথা, এ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা জাতীয় ভাবোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা কম হয়ে আসছে। (খ) দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক ও বণিক সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের অনেকেই ভাবেন, অন্ততঃ বাইরে প্রকাশ করেন যে, কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানার শ্রীবৃদ্ধিসাধনেই ভারতের মুক্তি, অন্যথা নয়, অতীত ভারতের মৃত অস্থি টেনে খাড়া করার প্রয়োজন আজ আর কিছুই নাই। ফলতঃ যান্ত্রিক সভ্যতার মোহে এঁরা আরণ্য সভ্যতার ভিতরে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পান না। তাঁরা মনে করেন যে, সংস্কৃতবিদেরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং প্রগতিবিরোধী কূপমণ্ডুক। প্রাচীন ভারতের অত্যুচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের অদ্ভুত ধারণা; তাঁদের কাছে উপনিষদ্ গাঁজাখুরি, সংস্কৃত কাব্য অশ্লীল; সংস্কৃত জটিল, সংস্কৃত কামশাস্ত্র কদর্য, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র জঙ্গলের নামমাত্র। যদি বলি হস্ত্যায়ুর্বেদ, অশ্বায়ুর্বেদ, বৃক্ষায়ুর্বেদ, এমন কি, কত আয়ুর্বেদ, কত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আমাদের সংস্কৃত-সাহিত্য পুষ্ট করেছে—যার তুলনায় বর্তমান পাশ্চাত্ত্য জগৎও অনেক পেছনে পড়ে আছে, তাঁরা তাতে নিজেদের অপমান বলে মনে করেন। কাজেই তাঁরা সংস্কৃতের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করেন। তাঁরা ভারতের অদৃষ্টবাদ, নৈরাশ্যবাদ ভারতীয় দর্শনেরই শিক্ষা বলে মনে করেন এবং ভারতীয়দের যাবতীয় চৈতন্যলুপ্তির জন্য ভারতীয় দর্শনকেই দোষারোপ করেন। (গ) তৃতীয়তঃ, হরিজন সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের অনেকেই আজকাল ভাবেন যে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ এবং ন্যূনাধিক—সংস্কৃতশাস্ত্রকার মাত্রেই তাঁদের সামাজিক অবমাননার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের তাই ধারণা যে সংস্কৃতশাস্ত্র গঙ্গার জলে যত দিন না নিমজ্জিত হয়, তত দিন তাঁদের আর এ কলঙ্কলেপ থেকে মুক্ত হবার আশা সুদূর-পরাহত। (ঘ) চতুর্থতঃ, প্রাদেশিক ভাষার সমৃদ্ধিবিধায়ক দল। প্রাদেশিক ভাষার উগ্র হিতকামীগণ বলেন—সহস্র সহস্র বর্ষ ধরে সংস্কৃতশিক্ষার ধারা এ দেশে চলে এসেছে; তাতে তার প্রাণবেগ গেছে থেমে। তদুপরি এর কাঠিন্য হেতু অতি কঠোর পরিশ্রমে এ ভাষাজ্ঞান অর্জন করতে হয়, তার প্রয়োজনীয়তা স্বল্প।

অল্প সময়ের মধ্যে এঁদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যুক্তির যথাযথ বিস্তৃত প্রত্যুত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। তা হলেও আজকে ভারতের জাতীয় দুর্দিনে ঐক্যের মূল্য এত সমধিক যে এ সব বিষয়ে আলোচনা অতীব প্রয়োজন এবং এঁদের কাছে সংস্কৃতসাহিত্যের উৎকর্ষ, সংস্কৃতশিক্ষার আদর্শ এবং জাতীয় সমুন্নতির দিক থেকে সংস্কৃত-সাহিত্য পঠন-পাঠনের একান্ত প্রয়োজনীয়ত্ব সম্যক্ বিশ্লেষণ নিতান্ত প্রয়োজন। তাই সংক্ষেপে দু'একটা কথা বলছি।

ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে লক্ষ্য করে বলা যেতে পারে যে পরের মাকে মা বলে হৃদয়ে তৃপ্তি ও গর্ব অনুভব করায় যে মিথ্যা আড়ম্বরের অবতারণা, এতে কেবল নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করা হয়, সত্যিকার শান্তি এতে পাওয়া যায় না। নিজের যা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সম্পদ্, তা আজ নিজস্ব, পরম আদরের সামগ্রী, তাকে উপেক্ষা করা নিছক বাতুলতা। অন্য দিকে সংস্কৃত-সাহিত্য জগতে সর্বথা অতুলনীয়, সুতরাং ঈদৃশ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া নিতান্তই দুরদৃষ্টের পরিচায়ক মাত্র।

ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞানিকদের সম্বোধনে   এ কথা সুস্পষ্ট বলতে চাই—তাঁদের বিষয়ের বহুলাংশ সংস্কৃত সাহিত্যে সুবিন্যস্ত আছে; নূতনত্বের গর্বে সংস্কৃতের প্রতি রক্তচক্ষু বা অনাদর প্রদর্শন নিতান্ত অশোভন ও অযৌক্তিক। দ্বিতীয়তঃ, তাঁদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে স্থূল বহির্জগৎই জগতের সব নয়, অন্তর্জগৎ ও তার সমস্যা বহির্জগতের থেকেও কঠিনতর। বাইরের সমস্যা আকুল করে, অন্তরের সমস্যা মানুষকে পাগল করে দেয়। দেহ ও আত্মা উভয়ের সুসমঞ্জস বিনোদন অতীব প্রয়োজন। কেবল উদরপূর্তিতে আত্মার পরিপূর্তি সাধিত হয় না; তজ্জন্য সংস্কৃতে সুরক্ষিত ধর্মোপদেশ ও দর্শনবাদেরও প্রয়োজন সমধিক। শূদ্রেরা বেদ-পাঠে অধিকারী ছিল না, ইত্যাদি ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। একটি মাত্র উদাহরণ দিই। রামায়ণে দশরথ-কর্তৃক নিহত সিন্ধুক-মুনির পুত্র করণের সন্তান হয়েও নিত্য বেদ পাঠ করে বেড়াত

—ইহা স্পষ্টই রামায়ণে বলা আছে। প্রয়োজনানুসারে দেশ-বিপ্লবাদিতে শূদ্রেরাও যুদ্ধ করবে, এবং ফলতঃ যুদ্ধবিদ্যায় তাদেরও পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন—ইহা শাস্ত্রের বিধান। আমাদের বর্তমান যে দৃষ্টিভঙ্গী, ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক ভারতের; স্বাধীন সবল আত্মনিষ্ঠ গরিষ্ঠ অতীত ভারতের নয়। একই মাতৃরক্তে পুষ্ট সন্তানকে ভারতজননীর জ্ঞানদীপ্ত জগদ্বরেণ্য সন্তানবৃন্দ উপেক্ষার গ্লানিতে জর্জরিত করার অশুভ বিধান কখনও দেন নি। ফলতঃ "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্মবিভাগশঃ"—এই উক্তির সার্থকতা হচ্ছে এই যে, গুণ ও কর্ম হিসাবে চতুর্বর্ণ বিভাগের উৎপত্তি, ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সন্তানই কেবল ক্ষত্রিয় হত না, গুণ ও কর্ম অনুসারেই হ'ত। তা না হলে ব্রাহ্মণ দ্রোণ—ক্ষত্রিয় অর্জুনাদির অস্ত্রগুরু এবং শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারূপে মহাভারতের জগজ্জোড়া সিংহাসন জুড়ে বসে থাকতে পারত না। সত্যি, আমাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন; বিদেশী কাঁচের ভেতর দিয়ে না দেখে স্বদেশী স্বচ্ছ চশমার ভেতর দিয়ে দেশমাতৃকার দিব্য মূর্তি দর্শনই আজ সমধিক প্রয়োজন।

বঙ্গভাষার হিতসাধকবৃন্দের অবহিত হওয়া প্রয়োজন যে বৃক্ষের শিকড় ও কাণ্ড ব্যতীত বৃক্ষ বাঁচতে পারে না; মাইকেল, হেম, নবীন, বঙ্কিম, রবি—এঁরা সকলেই সংস্কৃত-বৃক্ষেরই সুপক্ব ফল। সমগ্র ভারতব্যাপী সংস্কৃতই মহা-মহীরুহ; মহারাষ্ট্র, গুজরাত, গান্ধার, মদ্র, চোল, কর্ণাট, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, অযোধ্যা, অবন্তী প্রভৃতির ভাষা তারই ফলমাত্র। ঐ বৃক্ষের সরসতা ব্যতীত সবই শুষ্ক হয়ে যাবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

সমালোচকদের উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কয়টি কথা আমাদের মনে জাগে—সত্যি, সংস্কৃতশিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বা অন্য কোথাও কি কোনও গ্লানি নাই? সে সব গ্লানি কি এবং কিসে তার প্রতীকার?

পূর্বোক্ত সম্প্রদায়-বিশেষের সংস্কৃতশিক্ষার বিরুদ্ধে যুক্তি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, উৎকর্ষ, সত্যনির্দেশ প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণ কেন, ভারতের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও একেবারে অজ্ঞ। তাঁদের অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য আমাদের প্রাদেশিক ভাষায় কৃষ্টি বিষয়ক গ্রন্থাদি বিরচন, অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃতবিষয়ক জ্ঞান বিতরণ নিতান্ত প্রয়োজন। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রচারক প্রেরণ পূর্বক বক্তৃতাদির ব্যবস্থাও অত্যাবশ্যক।

বলা বাহুল্য, বর্তমান সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতিও নির্দোষ নয়। এমন কি, বি-এ শ্রেণী পর্যন্ত ধাতুরূপ, শব্দরূপ, কারক-বিভক্তি ও ব্যাকরণের অন্যান্য বিষয় নিয়ে এমন এক অদ্ভুত বিভীষিকার সৃষ্টি করা হয়—যাতে ছাত্র ও বাইরের লোকেরা সকলে সংস্কৃত বলতে একটা ব্যাকরণের বিভীষিকাই বোঝে। এ বিভীষিকার হাত থেকে ছাত্রদের অব্যাহতি দেওয়া সত্যি দরকার। তার পর উচ্চ শ্রেণীতে বিষয়বৈচিত্র্য এবং ভাবগাম্ভীর্য সুপ্রকট করার নিমিত্ত ভিন্ন বিষয়াত্মক গ্রন্থ পাঠ্য করাও প্রয়োজন। এ সব বিষয় পরে আলোচনা করছি। কিন্তু যে জিনিষটা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে শিক্ষা-প্রণালীর ধারার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন। আমাদের স্কুলে-কলেজে সংস্কৃতশিক্ষা দেবার সময় ব্যাকরণের উপর এমন একটা অসম্ভব জোর দেওয়া হয়, যার ফলে কাব্যরস সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়, তৎ-সম্ভোগ থেকে ছাত্রবৃন্দ সর্বথা বঞ্চিত হয়। ফলতঃ পাশাপাশি ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠের এ অসামঞ্জস্যে তারা নিজেরাও যেন ক্ষুব্ধ হতে থাকে। এর বিহিত বিধান নিতান্ত প্রয়োজন। অন্যান্য প্রতিকারও নিয়ে বিবেচিত হবে।

(২) সংস্কৃত-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা

কার্যব্যপদেশে মাদ্রাজ, বোম্বে, রাজপুতানা প্রভৃতি প্রদেশে যখন গিয়েছি, তখন অনেক স্থলে দেখেছি—ইংরেজী ভাষার মাধ্যামিকতায় কোনও কাজ হয় না। আমা-দের দেশী ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য দেশীয় একটি ভাষার মাধ্যমিকতা খুঁজে বের করতেই হয়। বলা বাহুল্য, ভারতের সর্বত্র অগণিত লোক আছেন, যাঁদের সঙ্গে সংস্কৃতভাষার মাধ্যমিকতায় এ কার্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। ভারতের সর্বত্র সকলেই আমাকে বলেছেন যে, মালয়ালম, ক্যানারিস, তেলুগু, গুরুমুখী, উড়িয়া, বাংলা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার আকৃতি বিশেষ থেকে ভাষা-জননীকে উদ্ধার করে নিলেই ভারতের বেশীর ভাগ ভাষাই ভারতীয়মাত্রেরই সহজে বোধগম্য হয়। বিভিন্ন রকমের হরফের জন্যই আমরা সর্বাধিক বিপদ্গ্রস্ত হই। এ কথাটা যে কত বড় সত্য, তা আমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচ্যগ্রন্থাগার লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীর সংস্কৃতবিভাগের কর্মসচিব হিসাবে বিভিন্ন প্রাদেশিক অক্ষরে প্রকাশিত সংস্কৃত-গ্রন্থাদি পর্যালোচনা কালে বিশেষ করে ব্যক্তিগত ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি। আজ সেদিন এসেছে যখন জাতীয়ভাবের ও কার্য-কলাপের পরিতুষ্টি ও সুসম্পাদনার নিমিত্ত আমাদের স্বকীয় সাময়িক অসুবিধা সহ্য করা শুধু প্রয়োজন নয়, একান্ত কর্তব্য। এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নাই যে, সংস্কৃত-ভাষাই প্রকারান্তরে ভারতের একমাত্র সার্বজনীন ভাষা। "প্রকারান্তরে" এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য এই যে, সংস্কৃত-ভাষাবিদ্‌দের সংখ্যা ভারতে অত্যধিক না হলেও এক তামিল ব্যতীত আধুনিক প্রত্যেক ভাষার ভেতরে সংস্কৃত শব্দসংখ্যা এবং সাহিত্যাঙ্গ রচনা এত সমধিক যে, এ সবের মাধ্যমিক-তায় ভারতের এক প্রদেশের লোকের অন্য প্রদেশের ভাষা বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না। আসমুদ্রহিমাচল কল্লোপসাগর

থেকে মণিপুর পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র একটা সভ্যতা ও কৃষ্টির সামঞ্জস্য আছে, চিন্তার ধারায় ঐক্য আছে, বাক্যবিন্যাসের পদ্ধতি আছে। সংস্কৃতানুগ সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট ছাপ আছে—যার অবলম্বনে ভারতীয় মাত্রেই ভারতের বিভিন্ন স্থলের ভাষা ও ভাবধারার সঙ্গে মিলেমিশে যেতে পারে, এবং এটা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমিকতা হেতু সম্ভবপর হয়েছে। এমন কে আছেন যিনি উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, চরকসুশ্রুত প্রভৃতির জন্য গর্বানুভব না করেন? ভারতের এমন কোন নামোল্লেখ যোগ্য ভাষা আছে, যাতে এসব গ্রন্থাদির অনুবাদ, এবং এই সব গ্রন্থাবলম্বনে বহুল গবেষণা হয় নি? সুতরাং বাইরের কিছু বিসংবাদ সত্ত্বেও স্থিরচিত্তে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যই প্রকৃতরূপে ভারতীয়-মাত্রেরই মিলনের একমাত্র সূত্র এবং এজন্যই একে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকার করা যেতে পারে। তা হলে সর্ব-প্রথমেই কথা উঠে,—এ যে অখণ্ড ভারতভূমির রাষ্ট্রীয় ভাষা সংস্কৃত এর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের নিমিত্ত বর্তমান যুগে কি কি করণীয়, কি কি বিষয়ে সর্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা নিতান্ত কর্তব্য মনে করি।

বহির্দৃষ্টিতে কেন, বস্তুত, কার্যতও এটা ঠিক যে বর্তমান যুগে সংস্কৃতশিক্ষা যেন কালোপযোগী হয়ে উঠ্‌ছে না। এ জন্য বাহিরের ও ভেতরের দিক থেকে এর বহুল সংশোধন অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বারাণসী, কলিকাতা ও অন্যান্য সর্বস্থলের সংস্কৃতপরীক্ষাও এক এক বিষয় অবলম্বনে নেওয়া হয়। তাতে যেমন এক দিকে বিষয়-বিশেষের প্রতি মনোযোগ-নিবন্ধন সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি পাঠ্য-তালিকা থেকে আধুনিক বিষয়গুলি সম্পূর্ণ বিবর্জিত হয়েছে বলে আমরা সংস্কৃতবিদ্যার্থীরা যেন বর্তমান কালোপযোগী হয়ে উঠ্‌তে পারছি না। দৈনন্দিন কার্যকলাপের সুযোগ-সুবিধা সংঘটনের নিমিত্ত কিছু আধুনিক ভাষা, কিছু গণিত ও বিজ্ঞান সংস্কৃত প্রত্যেক বিষয়েরই প্রথম দু' পরীক্ষায় অন্ততঃ সংযোজিত করে দেওয়া একান্ত কর্তব্য। অন্ততঃ ইংরেজী একটি পত্র বোঝার, বা একটি টেলিগ্রাম বুঝতে পারার মত বিদ্যার্জন করা সংস্কৃতবিদ্‌দেরও কর্তব্য। এক কথায় সংস্কৃত-বিদ্যাকে বর্তমান কালোপযোগী করার নিমিত্ত যা যা করা প্রয়োজন, তদনুরূপ পাঠ্য-তালিকা তৈরী হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে আমাদের সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির (স্কুল-কলেজ প্রভৃতির) সঙ্গে সংস্কৃতের জন্য বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-গুলির (টোলগুলির) বিশেষ কোনও সম্পর্ক নেই। আমার মনে হয়, এ দু'প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-বিধান একান্ত প্রয়োজন। এদের দুটিকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটি বিভাগরূপে পরিগণিত না করে কিছু দূর পর্যন্ত একটি সাধারণ বিভাগে পরিণত করা বিধেয়—যাতে পণ্ডিতেরাও অন্যান্য বিষয়-বিশেষে কিছু অধিকার লাভ করেন এবং সাধারণ ছাত্রেরাও সংস্কৃত বিষয়ে অধিকতর শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরে অবশ্য ছাত্রমণ্ডলী স্বকীয় অভীষ্ট পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হতে পারেন, এরূপ ব্যবস্থারও প্রয়োজন। নূতন শিক্ষা-প্রণালীর প্রণয়নকালে দেশের শিক্ষা-বিদেরা যেন এদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন, তজ্জন্য আমি তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের সংস্কৃত-শাস্ত্রের যে যে বিষয়ের অনু-ধাবনে আর্থিক সংস্থানের সুযোগ-সুবিধা ঘটতে পারে, যেমন আয়ুর্বেদ, ফলিত জ্যোতিষ প্রভৃতি, সে সব বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান অবশ্য কর্তব্য। সংস্কৃতবিদ্যার্থীদের আর্থিক দুর্গতিই চরম সমস্যা এবং এর থেকে এর কথঞ্চিৎ সমাধান সম্ভবপর হবে নিশ্চয়ই। এটা অত্যন্ত ঠিক যে, এখনও পর্যন্ত আয়ুর্বেদ জগতের চিকিৎসা-পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ-রূপে সর্বত্র স্বীকৃত হয়; এর প্রমাণের প্রয়োজন নেই, এ একে-বারে প্রত্যক্ষ সত্য। ফলিত জ্যোতিষের অনুশীলনকারীদের অর্থাগমও প্রত্যক্ষ সত্য।

ধর্মকে ব্যবসায়ে রূপান্তরিত বা পরিগণিত করার কোনও চেষ্টা না করেও ধর্মসংরক্ষণের নিমিত্তই সুকঠোর আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির প্রবর্তন ও অনুবর্তনে ধর্মযাজী সংস্কৃতবিদ্‌দের জীবিকানির্বাহ সুচারুরূপে চলতে পারে।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে বাস্তুবিদ্যা, স্থাপত্য, তক্ষণ, রত্ন-পরীক্ষা, কৃষি প্রভৃতি বহু বহু শিল্প শাস্ত্রাদি আমাদের অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ঐ সব গ্রন্থে অমূল্য সারতত্ত্ব নিহিত আছে। সে সব তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম ক'রে তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট অনুশীলন একান্ত কর্তব্য। ঐ সব অর্থকরী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করতে পারলে অর্থাগম অনিবার্য। সমগ্র জগতের ধনার্জন নির্ভর করে এর উপরেই। অথচ এ সবের প্রকৃষ্ট বিকাশ আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থনিচয়ে নিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও অতীব পরি-তাপের বিষয় যে এ সব বিষয়ের আমরা সম্পূর্ণ অনাদর করেছি—যার ফলে আমাদের সংস্কৃত বিদ্যা একান্তই তাত্ত্বিক বিদ্যা হয়ে পড়েছে; ব্যবহারিক দিক আমরা ছেড়েই দিয়েছি। আমাদের এ সব দিকে অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ দৃষ্টিপাত একান্ত প্রয়োজন। এ সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্রণ, নৃত্য-গীতাদি, অভিনয় প্রভৃতি ললিতকলার যথোপযুক্ত অনুশীলনেও মানসিক আনন্দ ও আর্থিক সাচ্ছল্য—উভয় দিক থেকে আমাদের যথেষ্ট সহায়তা হতে পারে। তজ্জন্য তদ্বিষয়েও অবহিত হওয়া কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষীয়দের স্ব-হস্তে দেশের শাসনক্ষমতা এসে পড়ায় আজ স্বতঃই আমাদের দণ্ডনীতি প্রভৃতির প্রতি নজর দেওয়া অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে। মহাভারতোক্ত

রাজনীতি, দণ্ডনীতি প্রভৃতি, অর্থ-শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতির সম্যক্ পর্যালোচনা আজ একান্ত কর্তব্য। কালক্রমে আমাদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নারী-চরিত্রের উন্নতিবিধান এবং শূদ্র ও নারীকে সমপর্যায়ভুক্ত করে উভয়কে হীন প্রতিপন্ন করার উপায় উদ্ভাবন করাকেই শাস্ত্রীয় কাজ মনে করেছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আজ সেকালের অবসান হয়েছে এবং আবার দেশের সকলের সমভাবে সর্ব কার্যে শ্রেষ্ঠ অবদানের সুযোগ-সুবিধা ফিরে এসেছে, আইনের বলে সম্প্রদায়-বিশেষকে সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষমতাচ্যুত করার দিন একেবারে তিরোহিত হয়ে গেছে। দেশবাসীই আমাদের একমাত্র উপাস্য ; ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে দৃক্‌পাত করার সময় আমাদের আজ নাই। পরের হাতে রাজনীতির ভার চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা গৃহকোণে বসে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাপনের সময় আজ চলে গেছে। প্রাণমন সম্পূর্ণ সমর্পণ করে "রাজনীতি"র অনুশীলনে—অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ ও সামঞ্জস্য বিধানে আমাদের বদ্ধপরিকর হতে হবে।

চতুর্থতঃ, সংস্কৃত-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক, শিল্পকলাবিদ্ প্রভৃতি অনেকেরই অনুরাগ আছে। এঁদের সহযোগিতায় আমাদের প্রাচীন ভারতের তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানরাশির প্রকৃষ্ট আলোচনা এবং বিশ্বসমক্ষে প্রচার আজ অতি প্রয়োজন। এতদিন পর্যন্ত সংস্কৃতবিদেরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশেষ কাজ কিছুই করেন নি। স্বল্প পরিমাণ কাজ হয়েছে মাত্র, তাই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে সংস্কৃতপণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষ সংযোগ স্থাপন অত্যাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে এও বলা দরকার যে, পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য ভাষাবিদ্ ভারতীয় বা অভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞদের সঙ্গে আরও নিবিড়তর সম্পর্ক গড়ে তোলা আজ অত্যধিক প্রয়োজন। কেবল সংস্কৃত-ভাষাবিদ্ যাঁরা, তাঁরা অন্য ভাষায় লিখিত জ্ঞান আহরণে সমর্থ হন না—জগতের বিভিন্ন ভাষাবিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহযোগিতায় তাঁরা সে জ্ঞানের সন্ধান পান ; অন্য দিকে পণ্ডিতমণ্ডলী পাশ্চাত্ত্য ভাষাবিদ্ পণ্ডিতকে সংস্কৃতের গোপন মণিরাশির সন্ধান দিতে পারেন। এ উভয় প্রকারের সংস্কৃতবিদের মিলন—কর্মক্ষেত্রে মিলন—সর্বথা বাঞ্ছনীয়। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতে ডিগ্রীধারীরা অর্থার্জনে কষ্ট-ভোগ করেন বলে আমরা সংস্কৃতে তেমন উৎকৃষ্ট ছাত্র পাই না ; অন্য দিকে সংস্কৃতবিষয়ক পাণ্ডিত্যের প্রতি জনসাধারণের অনাদর হেতু আর তেমন বড় বড় পণ্ডিতও নূতন করে দেখা দিচ্ছেন না। এর থেকে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে? এখনও যে সব পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁদের বিশাল পক্ষপুটে সংস্কৃত শাস্ত্রকে আশ্রয় দান করে রেখেছেন, তাঁদের সংখ্যা একেবারে কমে এসেছে। এঁদের তিরোধানের পরে তাদৃশ সংস্কৃতবিদ্ মনীষী যে ভারতধাম পূর্ববৎ সমলঙ্কৃত করতে পারবেন, আজ আর তেমন মনে হয় না।

বর্তমানে আমাদের অভাব-অভিযোগ কোথায় তা বিশেষ চিন্তনীয়।

১। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর মত একটি বিশিষ্ট পাঠাগার আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন—যাতে এক জায়গায় বসে সকল প্রকারের গ্রন্থ আলোচনা করা যায়, সব প্রকারের পুঁথি যথাসম্ভব দেখা যায়। আমাদের কলিকাতা নগরী ভারতীয় কৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সংরক্ষণ-স্থল ; ঈদৃশ স্থানেও এমন কোনও পুস্তকাগার নাই যাতে কোনও গ্রন্থ-বিশেষের দু-তিন খানার বেশী সংস্করণ পাওয়া যায় ; এবং সহস্র সহস্র বিশেষ উপযোগী সংস্কৃত গ্রন্থ আছে—যা কলিকাতার কোনও লাইব্রেরীতে কোনও দিন রক্ষিত হয় নি। একটি উদাহরণ দিয়ে এ কথাটি পরিষ্কার করা দরকার। ধরুন শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার কোনও বিষয়বিশেষে আমার হৃদয়ে কোনও এক নূতন চিন্তা যদি জাগে, আমার সর্বপ্রথম জানা দরকার—জগতের কোন্ বরেণ্য সুধী এ বিষয়ে কি বলেছেন, কে কি ভাবে এ জিনিষটাকে দেখেছেন, তা না হলে গবেষণা হয় না, নূতন জিনিষ আবিষ্কার করা হতে পারে না। এ যদি জানতে হয়, তা হলে যত যত পণ্ডিত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা নিয়ে যা যা কাজ করেছেন, আমার দেখে নেওয়া দরকার। তা যদি হয়—আমার একটি পাঠাগারের দরকার যাতে সং কটি ভগবদ্‌গীতার সংস্করণ, অনুবাদ, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি এবং বিশেষতঃ ভগবদ্‌গীতার উপরে লিখিত সমস্ত গ্রন্থের বিবরণ-সংবলিত গ্রন্থপঞ্জী প্রভৃতি রয়েছে। আজ আমাদের দেশে এমন কোনও পাঠাগার নাই যাতে এর কিছুই পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে ভগবদ্‌গীতার ৪১৮টি অনুবাদ-সংবলিত বিভিন্ন সংস্করণ, ১৬৪টি বিভিন্ন টীকা এবং দু'শতাধিক অংশবিশেষের মুদ্রিত সংস্করণ আছে। তদুপরি ৬০০ বিভিন্ন অনুবাদ এবং নয়টি বিভিন্ন প্রকারের সূচী আছে। সুতরাং চাওয়া মাত্রই ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী যে কোন পাঠককে ১৫০০ পনর শতের অধিক শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থ দিতে পারে, এবং তদুপরি অজস্র গবেষণামূলক গ্রন্থ নাম বলার সঙ্গে সঙ্গেই এনে দিতে পারে। তাঁদের তদনুযায়ী ক্যাটালগ, গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ, গ্রন্থাগারের জনসম্পদ প্রভৃতি সব কিছুই আছে। সুতরাং তাদৃশ একটি গ্রন্থাগারে গেলে যে কাজ তিন-চার মাসে হয়ে যায়, আমাদের তাদৃশ কাজ যাবজ্জীবনেও হয় না। তদুপরি সেখানে ব্যক্তিগত হিংসা-দ্বেষাদি আমাদের তুলনায় নিতান্ত কম, স্বীকার করতেই হয়—অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য ব্যক্তিগত সাহায্য সব কিছু বন্যারধারে যেন ছুটে চলে আসে। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে আমাদের যদি কেউ কিছু জানেনও, অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা বিদ্যার্থিকে তদ্বিষয়ক সন্ধান দিতে অনিচ্ছুক থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে দেখেছি যে প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুকে সাহায্য করতে সেখানকার পণ্ডিতমণ্ডলী অতীব উদ্‌গ্রীব। আজ

আমরা শুধু কল্পনা করতে পারি যে আমাদের দেশেও এমনি এক দিন ছিল; তা না হইলে এ বিশ্ববিজয়ী দর্শনশাস্ত্র এদেশে তৈরী হতে পারত না। যা হোক, ঈদৃশ গ্রন্থাগার আমাদের আজ এ যুদ্ধোত্তর যুগে সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

দেশের সর্বত্র যে সব গ্রন্থ লুক্কায়িত আছে, রাজা, মহারাজ, জমিদার বা বিশিষ্ট পণ্ডিতের গ্রন্থাগারে যে সব গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তার যথাযথ ব্যবহারের নিমিত্ত ঐ সব গ্রন্থ ও পুঁথির সঠিক বিবরণ, প্রাপ্তিস্থান প্রভৃতি জানা থাকা দরকার। ইংলণ্ডের ন্যাশনাল লাইব্রেরী এ কাজ করে। এটি অত্যন্ত প্রয়োজন।

তারপর যত বিষয়ে যত কাজ হচ্ছে, তার একটি সূচী—ধারাবাহিক সূচী, অত্যন্ত প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, তা না হলে উচ্চদরের অভিনব গবেষণা অতি কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে, অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপরও হয় না।

ভারতবর্ষের সর্বত্র এক শতাধিক প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদিত হচ্ছে বর্তমানে। এ সব মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক পত্রিকায় অজস্র নূতন নূতন বিষয় নিরন্তর প্রকাশিত হচ্ছে। এ সব জ্ঞানেরও সংহতি প্রয়োজন এবং তজ্জন্য একটি বিষয়সূচী অত্যাবশ্যক। বোম্বে থেকে এজাতীয় কাজ কিছু কিছু হচ্ছে; আরও পূর্ণাঙ্গ কাজ আমাদের প্রয়োজন।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এমন কি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির শব্দসূচী, বিষয়সূচী বা তাঁদের উপরে লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর নির্ণায়ক কোনও গ্রন্থ অদ্যাপি আমরা রচনা করি নি। এ অপরাধ নিশ্চয়ই অমার্জনীয়।

জগতের বিশাল সাহিত্যের সঙ্গে আমরা বিশেষ করে করে ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমিকতায় সুপরিচিত। ঐ সব সাহিত্যের বিশিষ্ট বিশিষ্ট গ্রন্থ থেকে আহৃত জ্ঞান আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করার দিন আজ এসেছে। দারুণ একদা বহু সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদের দ্বারা ফার্সী সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছিলেন। ভারতের মধ্যযুগে অগণিত সংস্কৃতগ্রন্থের অনুবাদাদির দ্বারা মহামতি সম্রাট্ আকবর ফার্সী সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন। অন্য দিকে বহু ফার্সী গ্রন্থের সংস্কৃতানুবাদ দ্বারা তৎকালীন পণ্ডিতসমাজ সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন। আজও এ জিনিষের নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পরিশেষে আমাদের কর্তব্য এই যে, একার্য সুসংহত করার নিমিত্ত সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন অতীব প্রয়োজন। কিছু দিন পূর্বে আলোয়ারের মহারাজা একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড এবং দশ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ থেকেও একটি বিরাট পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছে। দাক্ষিণাত্য এবং পশ্চিমভারতের লোকেরাও এ বিষয়ে তৎপর হয়েছেন। কেবল দিবালোকের প্রথমোন্মেষ স্থলেই অর্থাৎ আমাদের এ পূর্বভারতেই আমরা যেন অন্ধালোকে নিমজ্জিত হয়ে আছি, নির্জীব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হবে পরমুখাপেক্ষী হয়ে অপেক্ষা করছি। আজ সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই সর্বস্ব পণ করেও সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক্ উন্নতি সাধন করতেই হবে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পূর্বভারত একদা সংস্কৃত সাহিত্যে বিশিষ্টতম দান করেছে। আজও পুনরায় তার জন্য আহ্বান এসেছে। আমরা যদি দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করতে চাই, আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন— সংস্কৃত-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হওয়া, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ বিস্মৃত হয়ে কেবল লক্ষ্যের পশ্চাদ্ধাবন করা। এতেই আমাদের অপবর্গ নিহিত আছে।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিদ্যালয় ও প্রাদেশিক সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থাপনের এবং বর্তমান সময়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় আমাদের অবশ্য কর্তব্য— বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি যা অবিচার চলেছে, তার প্রতিবিধান করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের যথাযথ মানমর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখা। অন্যান্য ছাত্রদের সমান সমান সুযোগ-সুবিধা, বৃত্তিনির্ধারণ প্রভৃতি আমাদের সংস্কৃতের ছাত্রদের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতের পূর্বাবস্থার পুনর্ব্যবস্থাপন প্রয়োজন, এবং অঙ্ক বিষয়ের পরিবর্তে যে অপশনাল সংস্কৃত ছিল, তজ্জন্যও প্রচেষ্টা অবশ্য কর্তব্য। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঠ্যসূচীতে সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলক না রেখে ইচ্ছামূলক বিষয়ে পর্যবসিত করার যে প্রচেষ্টা অধুনা দৃষ্ট হচ্ছে, তার বিরুদ্ধেও আমাদের অভিযান নাতিবিলম্বে অবশ্য কর্তব্য।

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়াশিংটন

পটোম্যাক নদীতীরে উত্তুঙ্গ ওয়াশিংটন-স্মৃতি-স্তম্ভ-চিহ্নিত সুসজ্জিত ওয়াশিংটন শহর। আকাশ হইতে শহরের মনোরম শোভা দেখিতে দেখিতে বিমান-ঘাঁটিতে অবতরণ করিলাম। তখন বৈকাল পাঁচটা। অনুসন্ধান-টেবিলে খোঁজ লইয়া জানিলাম যে, ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় দূতাবাসের জনৈক আমেরিকান কর্ম্মচারী আমার জন্য ঘাঁটিতে অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। মাল খালাস করিতে গিয়া দেখি মাল আসে নাই। ঘাঁটির ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট এ বিষয় বলিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোন-যোগে নিউইয়র্ক এবং অন্যান্য স্থানে কথা বলিয়া দশ মিনিটের মধ্যে মালের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। সবিনয়ে বলিলেন, 'আপনার মাল ভুলক্রমে নিউইয়র্ক হইতে বোষ্টন চলিয়া গিয়াছে। আমরা পরবর্ত্তী বিমানে বোষ্টন হইতে মাল আনাইয়া রাত্রি দশটার মধ্যে আপানার হোটেলে পৌঁছাইয়া দিব। আপনার খুবই অসুবিধা হইবে। আমাদের বহু যত্নসত্ত্বেও কচিৎ এরূপ ভুল ঘটিয়া যায়। আশা করি আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।' আমার মালের মধ্যে ছিল দুইটি থলি। একটি ছোট ও একটি বড়। ক্ষুর, দাঁতের মাজন প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুগুলি একটি ক্ষুদ্র হাত-ব্যাগের মধ্যে ছিল। সেটিকে বড় থলির মধ্যে রাখিয়াছিলাম। কাজেই এত লম্বা ভ্রমণের পর দন্তধাবন, বস্ত্রপরিবর্ত্তন প্রভৃতি কিছুই করিতে পারিব না মনে করিয়া বড়ই অস্বস্তি বোধ করিলাম। যদিও ইহারা বলিল, রাত্রি দশটা অর্থাৎ মাত্র সাড়ে চারি ঘণ্টার মধ্যে ইহারা আমার মাল পাঁচ শত মাইল দূরবর্ত্তী বোষ্টন হইতে আনাইয়া নিজেরাই হোটেলে পৌঁছাইয়া দিবে তথাপি ভারতবর্ষীয় অভিজ্ঞতা-পুষ্ট আমার মন এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছিল না। অনন্যোপায় হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে দূতাবাসের বন্ধুটির সঙ্গে তাঁহারই গাড়ীতে হোটেলের দিকে চলিলাম। এখানে কোন ভারতীয়ের সাক্ষাৎ বিরল হইবে এ চিন্তাও মনে উদিত হইল। দূতাবাসের বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে শহরের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। তখন দিবালোক নির্ব্বাপিতপ্রায়। রাস্তার প্রশস্ততা, মসৃণতা ও পরিচ্ছন্নতা চোখের তৃপ্তি উৎপাদন করিল। লিঙ্কন-স্মৃতি-মন্দিরে আলোকোদ্ভাসিত লিঙ্কনের মুখ-খানি ছবির মত চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। এক সুরম্য উদ্যান-মধ্যবর্ত্তী রাস্তা অতিক্রম করিয়া এক বিরাট হোটেলে উঠিলাম। ভিতরে ঢুকিয়াই দেখি অভ্যর্থনা-কক্ষে শ্রীযুত রাধাকুমুদ ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় আমার সম্মুখে। ইঁহাদের অপ্রত্যাশিত দর্শনে মনের গ্লানি অনেকটা দূর হইল। সাড়ে দশটা বাজিতে ঘরে বসিয়া হোটেলের আপিস হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাইলাম যে বিমান-ঘাঁটি হইতে আমার জড় দুইটা থলি আসিয়াছে। দুই মিনিটের মধ্যে স্বগৃহে আমার বোষ্টন-ফেরত থলিদ্বয়-দর্শনে প্রিয়-মিলনের আনন্দ অনুভব করিলাম।

পরদিন শনিবার, ১৬ই নভেম্বর ৩০শে কার্ত্তিক। আমেরিকার সমস্ত সরকারী আপিস ও ব্যাঙ্ক বন্ধ। কিন্তু ভারতীয় দূতাবাস খোলা। সকালে দূতাবাসে গিয়া শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী ও অন্যান্য কর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের খোঁজ লইতেছি, এমন সময় তিনি তদীয় সহকর্ম্মী ছাত্র শ্রীযুত পীতাম্বর পন্থের সহিত দূতাবাসে আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম তাঁহারা শহরের কেন্দ্রস্থলে "মেফ্লাওয়ার" নামক একটি হোটেলে আছেন। দূতাবাসের কর্ম্ম সমাপনান্তে তাঁহাদের সহিত নিকটবর্ত্তী একটি "কেফিটেরিয়া"য় মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিয়া তাঁহাদের হোটেলে গেলাম। মহলানবীশ মহাশয় তিন-চারি দিনের মধ্যেই ওয়াশিংটন ত্যাগ করিবেন এবং শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরিবেন। এ কয়েক দিন তাঁহার সঙ্গে ওয়াশিংটনস্থ সরকারী কর্ম্মচারিসমাজে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিলাম।

শ্রীযুত মহলানবীশ-গৃহিণী তখন ওয়াশিংটনে। সেদিন তিনি ডাক্তার ডেমিং-এর গৃহে আতিথ্যস্বীকার করিয়া বাস করিতেছিলেন। ঐ দিন রাত্রে এতদুপলক্ষে ডেমিং এক ভোজের ব্যবস্থা করিলেন। আমিও সেই ভোজে নিমন্ত্রিত হইলাম। ডেমিং "বাজেট-ব্যুরোর" সংখ্যাবিজ্ঞান বিভাগে একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ। ঐ দিন ভোজে স্ত্রী-পুরুষে প্রায় কুড়ি জন অতিথি ছিলেন। পুরুষগণ সকলেই প্রতিষ্ঠাবান সরকারী কর্ম্মচারী। কেহ আণবিক গবেষণায়, কেহ গণিতে, কেহ সংখ্যাবিজ্ঞানে, কেহ অর্থনীতিতে, কেহ বা বাণিজ্য-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। সকলেরই মন সজীব ও সতেজ; সকলেই বলিষ্ঠ আশাবাদী। ইঁহাদের ও ইঁহাদের পত্নীগণের সঙ্গে পরিচিত হইয়া ও আলাপ করিয়া পরম আপ্যায়িত বোধ করিলাম।

সেদিন অতিথিগণের মধ্যে নানা বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। গত নির্ব্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি চৌদ্দ বৎসরের পর—কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। প্রেসিডেন্ট ডিমোক্রেটিক পার্টিরই রহিয়া গিয়াছেন। এ অবস্থায় শাসন-ব্যবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে—সে বিষয়ে সকলেরই বিশেষ

উৎকণ্ঠা। এদেশে প্রেসিডেন্ট চারি বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু কংগ্রেস নির্ব্বাচিত হয় দুই বৎসরের জন্য। কংগ্রেসে প্রেসিডেন্টের দলগত সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলে শাসনকার্য্যে বিভ্রাট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বিলাতী প্রথায় হাউস অব্ কমন্সে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তাহারই নেতা প্রধানমন্ত্রী-রূপে শাসন-তরণীর কর্ণধার হন। কাজেই তিনি যেভাবে শাসন-তরণী চালাইতে চাহেন, কমন্সগণ তাহা অনুমোদন করেন। আর যদি কখনও মন্ত্রিগণ কমন্সগণের অনুমোদন লাভে অসমর্থ হন তাহা হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করেন। যাঁহারা কমন্সগণের অনুমোদন লাভ করিতে পারিবেন তাহারা তখন মন্ত্রী হন। কাজেই বিলাতে মন্ত্রিগণ ও কমন্সগণের মধ্যে কখনও দলগত বা নীতিগত অসামঞ্জস্য বা বিরোধ উপস্থিত হয় না। কিন্তু আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেস স্বতন্ত্রভাবে দেশবাসীর ভোটে নির্ব্বাচিত হন। ফলে প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সমদলীয় নাও হইতে পারেন। কিন্তু দল দুইটি এখানে এরূপ শক্তিশালী যে যখন প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের যুগপৎ নির্ব্বাচন হইয়াছে তখন কদাপি তাঁহাদের দলগত বৈষম্য হয় নাই। কিন্তু যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের কার্য্যকালের মধ্যভাগে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তখন কখন কখন দলগত বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে, এবং যখনই এইরূপ হইয়াছে তখনই প্রেসিডেন্টের শাসন-তরণী চালনায় বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট উইলসন ও প্রেসিডেন্ট হুভারের শেষের দুই বৎসর এইরূপ ঘটিয়াছিল। প্রেসিডেন্ট উইলসন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লীগ অব্ নেশন্‌স্ সংগঠন করিয়া আসিলে কংগ্রেস তাহার মেম্বর হইতে অস্বীকার করে, ইহা সুবিদিত ঘটনা। এবার সেরূপ বিভ্রাট হইবে কিনা এবং হইলে কি পরিমাণে হইবে ইহা বর্ত্তমানে সকলের আলোচ্য বিষয়। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে এরূপ অবস্থায় পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে প্রেসিডেন্টের দল আর প্রেসিডেন্ট পদটি রাখিতে পারেন নাই। এবারে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে রিপাব্লিকান দল প্রেসিডেন্ট পদটিও অধিকার করিবে কিনা ইহা দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। ইহা হইতে তর্কস্থলে আরও দুইটি প্রশ্ন স্বতঃই উপস্থিত হয়। প্রেসিডেন্টের কার্য্যকালের মধ্যবর্ত্তী কংগ্রেস নির্ব্বাচন উঠাইয়া দেওয়া উচিত কিনা? প্রেসিডেন্ট ও কংগ্রেসের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনই ভাল, না বিলাতী প্রথামত আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতেই প্রেসিডেন্ট বা মন্ত্রিসভা নির্ব্বাচন ভাল? দ্বিতীয় প্রশ্নটি অবশ্য খুব কমই আলোচিত হয়। কারণ এদেশের লোক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনে এত অভ্যস্ত যে বিলাতী প্রথামত অ-স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের কথা সহসা ভাবিতে পারে না।

আমেরিকার তথা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে আলোচনা উঠিল: ঊর্দ্ধগতি বাণিজ্য-চক্র আর কত দিন ঊর্দ্ধমুখী থাকিবে? কত দিনে ইহার অধোগতি সুরু হইবে? আমেরিকার রিপাব্লিকান দলের নীতি এই চক্রগতি রোধ করিতে পারিবে কিনা? এই সব বিষয়ে আলোচনা চলিল। তখন মূল্যশাসন সবে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। উঠাইয়া লইবার অব্যবহিত পরে মূল্য খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু যে সব দ্রব্য মূল্যশাসনের ফলে বাজার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল সে সব দ্রব্য আবার দেখা দিল, উৎপাদন বাড়িয়া গেল; ফলে দাম আবার কমিয়া গেল। রিপাব্লিকান্ দল বৃহৎ বাণিজ্য-স্বার্থের প্রতিনিধি। তাহারা মূল্যশাসন, বা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের "নিউডিল" বা 'নতুন কারবার' পছন্দ করেন না। তাঁহারা অবাধ উৎপাদনের পক্ষপাতী। মূল্যশাসন উঠাইয়া লওয়াতে মূল্য হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণ ইহা পছন্দ করিতেছে। তবে এ মূল্য-হ্রাস কি বাণিজ্য-চক্রের নিম্ন আবর্ত্তন সূচনা করিতেছে? অনেকে মনে করেন যে জিনিষপত্রের এত চড়া দাম থাকিতে পারে না। কারণ এত দামে যথেষ্ট ক্রেতা জুটিবে না। কাজেই মূল্য-হ্রাস অনিবার্য্য। তবে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হইলে মূল্য-হ্রাসও দ্রুত হইবে। ফলে বহু ব্যবসা গুটাইতে হইবে। তাহার ফল সুদূরপ্রসারী হইতে পারে। কিন্তু ১৯২৯ সালে যেরূপ প্রত্যেকেই দায়িক ছিল, এবার সেরূপ নাই। কেহ কাহারও কাছে বিশেষ ধারে না। কিস্তিবন্দীতে কারবারও বিশেষ নাই। দেশের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যেও অধিকতর সহযোগিতা ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান। কাজেই একজনের বিফলতা বা বিপদ অন্য লোকের উপর সংক্রমিত হইবার সুযোগ কম। শৃঙ্খলার সহিত মূল্য স্তরে স্তরে নামাইয়া আনিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা অনেক বেশী। আর এই মূল্যাবতরণের সঙ্গে সঙ্গে যদি যথেষ্ট পরিমাণে যন্ত্রশক্তির উন্নতির দ্বারা উৎপাদন-ব্যয় কমাইতে পারা যায় তবে তো মূল্য-হ্রাস সত্ত্বেও ব্যবসায়ে বিফলতার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা আমেরিকার বাহিরের লোক কিন্তু ভীত হইয়া পড়িতেছি। এখন পৃথিবীর বাণিজ্যের উপর আমেরিকার বিশেষ প্রভাব। আমেরিকার বাণিজ্যচক্র যখন নিম্নমুখে আবর্ত্তিত হইবে, তাহার বেগ ধনী আমেরিকা সামলাইতে পারিলেও আমরা পারিব না। ইংলণ্ডের মুদ্রানীতি ও বাণিজ্য-নীতিতে এই ভয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

ইংলণ্ডের কথা উঠিতেই দেখিলাম যে ইহাদের প্রায় সকলেরই মতে ইংলণ্ডের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় তাহার আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব। যন্ত্রশক্তিতে পিছাইয়া পড়িলে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ে না, তখন সকলের ভাগই কমিয়া যায়। ভাগ লইয়া টানাটানি আরম্ভ হয়। সমস্ত সমস্যার সমাধানই দুরূহ হইয়া পড়ে। বহু বিষয়ে আলোচনা চলিল। সমস্ত বিতর্কে সোৎসাহে যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম।

আমেরিকান অতিথিগণকে ভারতীয় খাদ্যে পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে ঐ দিন শ্রীযুক্তা মহলানবীশ-গৃহিণী স্বয়ং রান্না করিয়াছিলেন। পোলাও, ডাল, কপির ডালনা, মাংস, চাটনী ও ছানার পায়স আমেরিকান ভদ্রলোকগণ পরম পরিতোষের

সহিত আহার করিলেন। বহুদিন পরে সুপক্ব স্বদেশী খাদ্য পাইয়া প্রচুর আহার করিয়া ফেলিলাম। আহারান্তে ডেমিং ও তাহার বালিকা-কন্যা গান গাহিয়া অতিথিগণকে আপ্যায়িত করিলেন। পিয়ানো বাজাইলেন অতিথিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ যুবকটি। ইনি গণিতে পারদর্শী। যুদ্ধের সময় যুদ্ধ-জাহাজের নব-নব ডিজাইন সৃষ্টির জন্য বহু দুরূহ অঙ্ক দ্রুত কষিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। রাত্রি প্রায় বারটায় হোটেলে ফিরিলাম।

পরদিন রবিবার। দিনটা ভাল না। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমি যে হোটেলে ছিলাম তাহার নাম শোরহাম্ হোটেল। তখন ঐ হোটেলে দশ-বার জন ভারতীয় ছিলেন। তাহার মধ্যে প্রায় সকলেই ফুড ও এগ্রিকালচারাল্ অরগানাইজেশনে ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর সভ্য। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অংশীভূত এই প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীর খাদ্য-সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট। সমস্ত জাতির প্রতিনিধিগণ ওয়াশিংটনে মিলিত হইয়াছেন। প্রায়ই ইঁহাদের সভা হইতেছে। ভারতীয় দলের নেতা সু-প্রসিদ্ধ আইনজীবী ও কংগ্রেস-নেতা ডাক্তার কাট্‌জু। ইঁহাদের সেক্রেটারী আজিজ আমেদ। অন্যান্য মেম্বর—রামমূর্ত্তি (মাদ্রাজের চীফ্ সেক্রেটারী), সোরওয়ালা (বম্বের ফাইনান্স সেক্রেটারী), ভকিল, রাও (যথাক্রমে বোম্বাই ও দিল্লীর ইকনমিক্‌সের অধ্যাপক), রাধাকমল মুখার্জ্জি ও রাধাকুমুদ মুখার্জ্জি। ভাবিয়াছিলাম ছুটির দিনটা ইঁহাদের কাহারও সঙ্গে ঘুরিব। কিন্তু এরূপ দুর্দ্দিনে তাহা সম্ভব হইল না। সকালটা হোটেলেই কাটাইলাম।

বিরাট সুসজ্জিত হোটেল। কোথাও কোন বিষয়ে ত্রুটি নাই। সর্ব্বত্রই প্রাচুর্য্য, শোভা ও সুবন্দোবস্ত। শয়নকক্ষ ও স্নানাগার পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত। নীচে প্রশস্ত ও সুসজ্জিত লাউঞ্জটি প্রফুল্ল নরনারী সমাগমে সর্ব্বদা আনন্দময়। পিছনে নাতিবৃহৎ উদ্যান। তাহাতে পায়চারি করার ও বসিবার বন্দোবস্ত আছে। সমস্ত হোটেলটিকে ইচ্ছানুরূপ উত্তপ্ত রাখিবার জন্য কেন্দ্রীয় উত্তাপ-ব্যবস্থা আছে। বাহিরে যত শীতই হউক না কেন ভিতরে সর্ব্বদা ৭০° হইতে ৭৫° ডিগ্রি তাপ রাখা হয়। ফলে নিদারুণ শীতেও হোটেলের মধ্যে সামান্য একটা কম্বল গায়ে . ঘুমান যায় খাবার ঘর তিনটি। প্রত্যেকটির মূল্য-তালিকা পৃথক। খাদ্য যেরূপ রকমারি সেইরূপ প্রচুর। কোন জিনিষেরই অভাব বা অপ্রচুরতা নাই। ফল ও দুধের বাহুল্য ও প্রাচুর্য্য অতুলনীয়। প্রাতরাশে ইহারা প্রথমেই ফল খায়। আট আউন্স এক গ্লাস সুস্বাদু ও স্বচ্ছ আনারসের রস পান করিলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। এরূপ কমলা, পেঁপে, বাতাবি লেবু, সরবতী লেবু ও অন্যান্য ফলের রসও প্রচুর। কেহ কেহ নির্গলিত রস পান না করিয়া ফল চিবাইয়া খান। বাতাবিটাই ইঁহাদের বেশী প্রিয় দেখিতেছি। কেহ সুমিষ্ট কদলী চাক্ চাক্ করিয়া কাটিয়া ঘন দুধ ও চিনি সংযোগে খাইতেছেন। মধ্যাহ্ন ভোজনে বা নৈশ ভোজনেও অনেকে ফল খান। সে সময় দেখিতেছি খরমুজটাই বেশী চলিতেছে। ডিম, মাছ, মাংস, তরকারি সবই যথেচ্ছ খাওয়ার কোন বাধা নাই। আমার সুপরিচিত মাছের মধ্যে এদেশে শুধু চিংড়ি মাছই দেখিতেছি। গলদা চিংড়ি ইহারা অনেকটা মালাইকারীর মতই রান্না করে। তবে মাথাটা কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। ছোট চিংড়ি সিদ্ধ না করিয়া বরফের মধ্যে ভিনিগার-সংযোগে ফেলিয়া দেয়। খাইতে মন্দ লাগে না। স্যামন্ মাছের সালাদও ভাল খাইয়াছি। আইসক্রীম খুব সুস্বাদু। কাঁচা ছানাও দেখিতেছি এদের বেশ প্রিয়। এক প্লেট কাঁচা ছানা, আনারস, আপেল, কমলা, চেরী প্রভৃতি নানাবিধ সুমিষ্ট ফল সহযোগে খাইতে বেশ লাগে। প্রাতরাশে ফলের পর চাউল বা গমের একটি খাদ্য চলে। এ খাদ্যেও বহু রকমারি। কেহ মুড়ি, কেহ কর্ণফ্লেক, কেহ বা পরিজ ইত্যাদি দুধ ও চিনি সংযোগে খাইতেছে। বড় বড় হোটেলে যখন এক ঠোঙ্গা মুড়ি দিয়াছে তখন প্রথম আশ্চর্য্যই হইয়াছি। ভুট্টার খইও এদেশে খুব প্রিয়। শিকাগোর রাস্তায় দুই ধারে খই ভাজিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এখানে খুব বেশী। একটি গলদা চিংড়ি তিন ডলার বা দশ টাকা। এক প্লেট হরিণের মাংস চার ডলার বা তের টাকা সওয়া পাঁচ আনা। ফল বরং সস্তা। এক গ্লাস আনারস বা আপেলের রস কুড়ি-পঁচিশ সেণ্ট বা দশ বার আনা। ঐরূপ এক গ্লাস ফলের রস আমাদের দেশে ঐ দামে এখন পাওয়া যায় না। পঁচিশ সেণ্টে চারিটি বড় বড় সুস্বাদু কলা এবং দশ বার সেণ্টে একটি আপেল কিনিয়াছি। আপেলগুলি খুব বড় এবং সুমিষ্ট, মুখে দিলে গলিয়া যায়। ক্যালিফোর্ণিয়ার খেজুরও খুব সুস্বাদু এবং দামও খুব বেশী নয়। ওয়াশিংটনে দৈনিক ছয় ডলার বা কুড়ি টাকা ঘর-ভাড়া দিয়াছি। শিকাগোতে ঘর-ভাড়া ছিল আরও বেশী। খাবার খরচ দৈনিক প্রায় আট ডলার বা প্রায় সাতাইশ টাকা পড়িয়াছে। লণ্ডনের প্রায় তিনগুণ খরচ আমেরিকায়। ওয়াশিংটন হইতে শিকাগো বা নিউ ইয়র্কে খরচ আরও বেশী।

এদেশে হোটেল ভিন্ন আরও দুই প্রকারের ভোজনালয় আছে। কেফিটেরিয়া ও ড্রাগ ষ্টোর বা ঔষধ-ভাণ্ডার। কেফিটেরিয়ার গৃহপ্রান্তে লম্বা মঞ্চের উপর সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সাজান থাকে। প্রথমেই থাকে বারকোষ, কাঁটা চামচ প্রভৃতি ও কাগজের ন্যাপ্‌কিন্ বা কাপড়-ঢাকুনী। ঢুকিয়া একটি বারকোষ ও প্রয়োজনমত কাঁটা-চামচ ও ন্যাপ্‌কিন্ লইয়া মঞ্চের পাশ ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। যাইতে যাইতে আমার ইচ্ছামত খাদ্য বাছিয়া বারকোষে রাখিলাম। মঞ্চের শেষে একটি লোক বাক্স লইয়া বসিয়া আছে। সে বারকোষ দেখিয়া মূল্য বলিয়া দিল। তাহাকে মূল্য দিয়া বারকোষ লইয়া সামনে চলিয়া আসিলাম। সেখানে টেবিল চেয়ার পাতা



মাঞ্চুরিয়ার চাষী-গৃহস্থ   বর্তমান চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং জাতীয় সরকারের সংগ্রামের পরিণাম-ফলে ইহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের কংগ্রেস-ভবন



মহীশূরের পল্লীপথে



কাশ্মীরের উত্তর দিকস্থ হুমজা অঞ্চলের চাষীদের কুটীর-সংলগ্ন শস্যক্ষেত্র

রহিয়াছে। ইচ্ছামত সেখানে বসিয়া খাইয়া চলিয়া গেলাম। এখানে বেশ দ্রুত খাওয়া শেষ করা যায় এবং দামও হোটেল অপেক্ষা কম। নিউ ইয়র্কে কেফিটেরিয়ার এক প্রকার যান্ত্রিক সংস্করণ আছে। নাম "অটোমেটন" বা "স্বয়ংক্রিয়"। সেখানে অধিকাংশ খাদ্যই যন্ত্রের মধ্যে থাকে। সামনে নাম ও দাম লেখা আছে। কোনটা পাঁচ সেন্ট, কোনটা দশ সেন্ট, কোনটা পঁচিশ সেন্ট। যন্ত্রটির সামনে গিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিদ্রে দামটি ফেলিয়া দিলেই এক প্লেট খাবার আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসে। চা বা কফির যন্ত্রের সামনে বাটি সাজান থাকে।

দাম ফেলিয়া দিলেই যন্ত্রের সম্মুখের মুখ দিয়া চা বা কফি পড়িতে সুরু করে। বাটি পাতিয়া ধরিয়া নিতে হয়। বাটি ভরিলেই আবার মুখ বন্ধ হইয়া যায়।

ড্রাগ ষ্টোরগুলিতে খাদ্য আরও সস্তা, সেখানে একটি মঞ্চের উপর বসিয়া লম্বা টেবিলে খাইতে হয়। অল্প দামে মোটামুটি খাইবার পক্ষে এগুলি বেশ।

হোটেলে বকশিশ দিবার প্রথা আছে। খাদ্যমূল্যের অন্ততঃ দশমাংশ বকশিশ দেওয়া রীতিসম্মত। কেফিটেরিয়া বা ড্রাগ ষ্টোরে এ প্রথা নাই।

সারাদিন হোটেলে থাকিয়া বৈকালে শ্রীযুত রামমূর্ত্তি ও ভকিল মহাশয়ের সঙ্গে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী দেখিতে গেলাম। সুবিশাল সুরম্য প্রাসাদে সুসজ্জিত ছবির মালা। প্রাসাদটি আর্ট গ্যালারীরই উপযুক্ত। গঠনভঙ্গীতে দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য্য যুগপৎ অভিব্যক্ত। দোতলার মধ্যস্থলে কৃষ্ণমর্ম্মরের বিরাট স্তম্ভমালা পরিবেষ্টিত জলের ফোয়ারা। দুদিকে ঘরের পর ঘর ছবিতে সাজান। য়ুরোপীয় শিল্পীগণের ছবিই বেশী। যে সব জগদ্বিখ্যাত ছবি লণ্ডনে দেখিয়াছি তাহাদের অনেকগুলি এখানেও দেখিলাম। কোনটি আসল কোনটি নকল জানি না। আমেরিকান শিল্পীগণের অঙ্কিত জর্জ ওয়াশিংটন ও তাঁহার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনেক ছবি দেখিলাম।

পরদিন ১৮ই নভেম্বর সোমবার। ব্যুরো অব্ দি সেন্সাসে গেলাম। আপিসটি মেরিল্যাণ্ড রাষ্ট্রের অন্তর্গত সুটল্যাণ্ড নামক স্থানে, ওয়াশিংটন হইতে দশ-বার মাইল দূরে। যাইবার রাস্তা যেমন সুনির্ম্মিত তেমনি সুশোভন। পথে নগরপ্রান্তে বস্তি অঞ্চল দেখিলাম। বস্তির বাড়ীগুলি সুন্দর পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জিত। আমাদের দেশের অবস্থাপন্ন লোকদের ফ্লাট অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে হইল না। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়া রাস্তা চলিয়াছে। লোকের ভিড় বেশী নাই।

সেন্সাস আপিসে সেদিন শ্রীযুত মহলানবীশ মহাশয়ের বক্তৃতা হইতেছিল। আপিসের ডিরেক্টর হইতে প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারী আগ্রহ সহকারে বক্তৃতা শুনিলেন। পরে তাঁহারা নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন এবং মহলানবীশ মহাশয় তাহার জবাব দিলেন। আপিস-সংলগ্ন একটি কেফিটেরিয়া আছে। এখানে আপিসের প্রধানগণের সহিত মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিলাম। প্রধানগণ হইতে কেরাণী ও বেহারাগণ পর্য্যন্ত সকলেই একই লাইনে দাঁড়াইয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া একই ঘরে পাশাপাশি বসিয়া খায়। তাহাতে কোন মর্য্যাদা অমর্য্যাদার প্রশ্নই উঠে না। এ যেন খুব সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। বৈকালে মহলানবীশ মহাশয়ের সঙ্গে থাকিয়া এদের সমস্ত কার্য্য দেখিলাম। এরা আপিসের কাজে বহু প্রকারের যন্ত্র ব্যবহার করে। একটি প্রকাণ্ড লম্বা ঘরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত শত শত যন্ত্র দেখিয়া মহলানবীশ মহাশয়ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

পর দিন মহলানবীশ মহাশয়ের সঙ্গে ব্যুরো অব্ এগ্রিকালচারে গেলাম। সেখানেও তিনি বক্তৃতা করিলেন এবং বক্তৃতান্তে সকলের প্রশ্নের জবাব দিলেন। বৈকালে "আরকাইভ হলে" শ্রীযুত মহলানবীশের সংখ্যাতত্ত্ব-বিষয়ক একটি বক্তৃতা হইল। এটি তাঁহার ঐ বিষয়ের তৃতীয় বক্তৃতা। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিতে ঘরটি পূর্ণ।

মহলানবীশ মহাশয় "নমুনা জরীপ" বিষয়ে গবেষণা করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। বহু বস্তুর পরিমাণ বা গুণ নির্ণয় করিতে হইলে সমস্ত জিনিষ পরীক্ষা না করিয়া বিশেষ রূপে নির্ব্বাচিত কয়েকটি নমুনার পরীক্ষা দ্বারাই কাজ চলিতে পারে। দেশে এবার কত জমিতে পাট বোনা হইয়াছে ইহা নির্ণয়ের জন্য সমস্ত পাটের জমি না মাপিয়া কয়েকটি জমি নমুনাস্বরূপ দেখিলেই চলিবে। সম্পূর্ণ জরীপ ব্যয়সাধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে নমুনা জরীপ সুলভ ও সুকর। অধ্যাপক-মহাশয়ের মতে নমুনা জরীপ অপেক্ষা সম্পূর্ণ জরীপ অধিকতর ভ্রমাত্মকও বটে; কারণ সম্পূর্ণ জরীপে বহু-সংখ্যক এবং বহু রকমের লোকের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিতে হয়, অথচ তাহাদের রিপোর্টের সত্যতা নির্ণয়ের কোন বৈজ্ঞানিক উপায় নাই। নমুনা জরীপে অল্প লোকের প্রয়োজন, সুতরাং তাহাদের পটুতা ও সাধুতা সাধারণতঃ উচ্চতর হয় এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহাদের রিপোর্টের সত্যতা নির্ণয়ও সম্ভব। নমুনা জরীপের দ্বারা সরকারের বহু কার্য্য সুগম হইতেছে। আমেরিকায় ইহার ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; নমুনা জরীপে ইহারা বৎসরে কোটি কোটি ডলার খরচ করিতেছে। যদিও ইহারা সম্পূর্ণ জরীপের দ্বারা দশ বৎসর অন্তর সেন্সাস বা লোকগণনা করে, তথাপি প্রতি বৎসর নমুনা জরীপের দ্বারা নূতন করিয়া লোকসংখ্যা নির্ণয় করে। ফসলের পরিমাণ নির্ণয়েও ইহারা নমুনা জরীপের বহুল ব্যবহার করে। স্বতঃই ইহারা নমুনা জরীপের অন্যতম প্রবর্ত্তক মহলানবীশ মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে বিশেষ উৎসুক। অধ্যাপকবরের প্রতিষ্ঠা এবং ইহাদের জানিবার ও আরও ভাল করিয়া কাজ করিবার আগ্রহ দেখিয়া বিশেষ আনন্দবোধ করিলাম। ঐ সময় মহলানবীশ মহাশয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের "ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল কমিশনের" নমুনা জরীপ

সাব্ কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯শে নবেম্বর মঙ্গলবারের পর তিনি ওয়াশিংটন ত্যাগ করেন।

২০শে নবেম্বর বুধবার বাজেট ব্যুরোতে গিয়া তত্রত্য কর্ম্মচারিগণের সহিত পরিচিত হইলাম। এখানে সি, আর, রোজেন নামক বাজেট ব্যুরোর জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আমার কাজের সর্ব্ব বিষয়ে সহায়তা করেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং সাহায্যপরায়ণতার জন্য আমার আমেরিকার কাজ সুসম্পন্ন হয়। বাজেট ব্যুরোতেই আমি আমার মূল কর্ম্মস্থল স্থাপন করিলাম।

দক্ষিণ আমেরিকা ও চীনের কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারী আমেরিকার বাজেট নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য তখন বাজেট ব্যুরোতে কাজ করিতেছিলেন। এই শিক্ষা সমাপ্ত করিতে তাঁহাদের দুই বৎসর লাগিবে। কেহ বৎসরাধিক এখানে আছেন। তাঁহারা সকলেই সরলচিত্ত যুবক। উরুগয়ার আর. জে, বারু, পরাগয়ার ফ্রেরেন্টিন, কিউবার রোডল্‌ফো ভিয়েগাস্, পানামার এডুয়ার্ড ম্যাক্‌কালা, মেক্সিকোর এডুয়ার্দো বোটাস্ এবং চীনের লিয়েন ইহো—ইঁহারা সকলেই সদালাপী। দক্ষিণ-আমেরিকার ভদ্রলোকগণের মাতৃভাষা স্প্যানিশ অথবা পর্ত্তুগীজ। সকলেই ইংরেজি জানেন, তবে কথা খুব স্পষ্ট বা দ্রুত নয়। চীনা যুবকটি সর্ব্বদা কর্ম্মগতচিত্ত। ট্রেজারীর কর্ম্মচারিগণ পরে এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে এই চীনা যুবকটি তাঁহাদের একাউন্টের নিয়মগুলি তাঁহাদের অপেক্ষাও ভাল আয়ত্ত করিয়াছেন। এক দিন ইঁহাদের সহিত একটি কিউবান ভোজনালয়ে সমাংস পোলাও-সংযোগে মধ্যাহ্নভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। ভিয়েগাসের সঙ্গে আরও দু-একদিন মধ্যাহ্নভোজন করিয়াছি। দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলির রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও শিল্পাদি বিষয়ে অসহায়তার কথা ইঁহারা দুঃখের সহিত বিবৃত করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রতি ইঁহাদের সহজ সমবেদনা আছে এবং ভারতবর্ষের কথা শুনিতে ইঁহাদের খুব আগ্রহ। আমার ওয়াশিংটন অবস্থান কালে নিউইয়র্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভায় দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় দলনের বিরুদ্ধে ভারত-সরকারের অভিযোগ আলোচনার্থ উপস্থিত হয়। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এই অভিযোগ সভায় উত্থাপিত করেন। জেনারেল স্মাট্‌স্ স্বয়ং এই অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য উপস্থিত হন। ইংরেজ সরকার ও মার্কিন সরকার দক্ষিণ-আফ্রিকার পক্ষে ভোট দেন। তৎসত্ত্বেও দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে ভারতবর্ষের জয়লাভে বিশ্ব বিস্মিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-আমেরিকার সমস্ত রাষ্ট্র তখন ভারত-সরকারের অনুকূলে ভোট দেন। খবরের কাগজওয়ালারা লিখিল, বর্ত্তমানে জাতিপুঞ্জের সভায় অশ্বেত জাতিগণের একটি জোট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পরে শিকাগোতে ব্রেজিলের একটি সরকারী কর্ম্মচারীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। ইনিও যুবক এবং এ দেশের বাজেট তৈরির কাজ শিখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষ, চীন এবং ব্রেজিলের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। ভবিষ্যতের পৃথিবী ইহাদেরই।

এদেশের দৈনিক খবরের কাগজ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। সব শহরেই খবরের কাগজ আছে। বড় শহরে একাধিক কাগজ প্রকাশিত হয়। নিউইয়র্ক টাইম্‌সই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নহে। যেদিন যেরূপ ছাপাইবার উপযুক্ত খবর থাকে সেই অনুসারে পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়ে বা কমে। আমি ৪৮ পৃষ্ঠার কম কখনও দেখি নাই। বহুদিনই ৬৪ পৃষ্ঠা দেখিয়াছি। রবিবারে ২৫০ পৃষ্ঠা দেখিয়াছি। একখানা ২৫০ পৃষ্ঠার খবরের কাগজ আমাদের বিস্ময়কর ত বটেই, নাড়াচাড়া করাও কষ্টকর। আমাদের দেশের ষ্টেটস্‌ম্যান বা আনন্দবাজার পত্রিকা সাধারণতঃ আট-দশ পৃষ্ঠা মাত্র থাকে। বিলাতের কাগজেও তাহার বেশী থাকে না। লণ্ডন টাইম্‌স ব্যতীত অন্যান্য কাগজের আয়তন তো আরও কম। আমেরিকার খবরের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় খবর থাকে, লণ্ডন টাইমসে প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন থাকে।

এ বিষয়ে আমাদের দেশের কাগজগুলি পূর্ব্বে বিলিতি প্রথা অনুসরণ করিত, এখন আমেরিকান প্রথা অনুসরণ করে। পৃথিবীর সব দেশের খবরই নিউইয়র্ক টাইম্‌সে থাকে। ভারতবর্ষের খবর যথেষ্ট থাকে। ডিসেম্বরের প্রথম একটি রবিবাসরীয় সংখ্যায় নেহেরু ও জিন্নার বড় বড় ছবি দিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। প্রবন্ধকারের মতে জিন্না নিপুণ উকিলের ন্যায় স্ব-মতে অটল, আর নেহেরু সর্ব্বদাই পরমতের সহিত নিজমতের সামঞ্জস্য বিধানে প্রস্তুত, সর্ব্বদা নূতন সত্যে উপনীত হইবার জন্য উৎসুক। প্রবন্ধটিতে নেতৃদ্বয়ের বিপরীত-গুণ-মূলক মহত্ত্ব বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহাদের প্রকাশিত ভারতবর্ষের খবরে কোন ভুল দোষ নাই। সাগ্রহে স্বদেশের খবর পাঠ করিতাম। হিন্দু-মুসলমানে থাকিয়া থাকিয়া দাঙ্গা চলিতেছে। কন্‌ষ্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেম্‌ব্লি আরম্ভ হইল। আমেরিকা-সরকার সরকারী ভাবে ইহার কার্য্যের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করিলেন। নেহেরু জিন্না ও বলদেব সিং সহ লর্ড ওয়াভেল লণ্ডন যাত্রা করিলেন। সেখানে বিলাতি মন্ত্রিসভার সহিত তাঁহাদের আলোচনা ব্যর্থ হইল। মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবের যে অংশের অর্থ লইয়া মতবিরোধ চলিতেছিল, বিলাতি মন্ত্রিসভা ৬ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার নিজস্ব ভাষ্য প্রচার করিলেন। পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সে ভাষ্য স্বীকার করিয়া লইলেন। শরৎ বসু ও জয়প্রকাশনারায়ণ ব্রিটিশের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ করিলেন। ভারত-সরকার ও আমেরিকা-সরকার দূতবিনিময়ে স্বীকৃত হইলেন।

আসফ আলি ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূত নিযুক্ত হইলেন। মেহের বড়লাটের বদলে এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের কলিকাতায় বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা করিয়া স্বাধীন ভারতে ইংরেজ ব্যবসাদারগণকে অভয় দিলেন। তাঁহাদিগকে সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতে গিয়া বলিলেন যে, এমন যে খ্রীষ্টধর্ম তাহাও সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সম্পর্কে আসিয়া এক সময়ে লোকের আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। মন্ত্রিমিশনের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাব কি সত্যই সাধুতা-প্রসূত, না উহা ইংরেজের পুরাতন কপট-লীলার একটি নূতন প্রকাশ মাত্র ইহা তখন ভারতবর্ষে খুব আলোচিত হইতেছে। এই সব খবর সাগ্রহে খুঁজিয়া দেখিতাম।

এখানকার বাসে কণ্ডাক্টর নাই, টিকিট নাই, ভাড়ার তারতম্য নাই। এক দিকে যত দূরই যাই না কেন ভাড়া পাঁচ সেণ্ট। ঐ ভাড়ায় একবার বাস বদলানও চলে। প্রবেশ-দ্বারের পাশে একটি বাক্স আছে। তার উপরে একটি ছোট ছিদ্র। যাত্রীগণ বাসে উঠিয়াই ঐ বাক্সের মধ্যে একটি পাঁচ সেণ্ট মুদ্রা ফেলিয়া দেয়। আমি প্রথম দিন বাসে উঠিয়া নিয়ম না জানায় বাক্সে মুদ্রা না ফেলিয়াই বসিয়া পড়িলাম। কোন কণ্ডাক্টর দেখি না। কেহ ভাড়া চায় না। নামিবার সময় ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাক্সে পয়সা ফেলিয়া নামিলাম। সাধারণ লোকের এই সাধুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম আমাদের দেশে এইরূপ হইলে বাস কোম্পানী দুদিনেই ফেল পড়িত। যাহাদের বাস বদলাইবার দরকার তাহারা ড্রাইভারের নিকট হইতে একখানি টিকিট চাহিয়া লয়। উহা পরবর্তী বাসের ড্রাইভারকে দিয়া দিতে হয়। এই ব্যবস্থায় ইহাদের বাস চালাইবার খরচ কম পড়ে।

যে টাকাটা বাঁচিল তাহা দ্বারা ড্রাইভারকে বেশী মাহিনা দিতে পারে অথবা বাসের ভাড়া হ্রাস করিতে পারে। সামান্য সাধুতার দ্বারা কিরূপে কম শ্রমে কাজ হয়, লোকের আয় বাড়ে ও খরচ কমে ইহা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সেদিন রাত্রে ডাক্তার কাট্‌জুর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হইল। তাঁহার ছেলে এদেশে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। পুত্রের অনুরোধে পিতা তাঁহার বাল্যকালের একটি সহপাঠিনীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি এখন বিবাহিতা। স্বামী লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কাট্‌জু মহাশয় তাঁহাদের সঙ্গে দু-এক দিন বাস করিয়া তাঁহাদের যত্নে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন। কাট্‌জু মহাশয় উৎসাহের সহিত ইঁহাদের সুখ্যাতি করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমরা দূর হইতে শুনি আমেরিকানরা শুধু ডলার এবং যন্ত্রের পূজারী এবং ইঁহাদের পারিবারিক জীবন মোটেই সুখের নয়। কিন্তু একথা মিথ্যা। ইহাদের সুমধুর পারিবারিক জীবন এবং আতিথেয়তা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। ইঁহাদের জ্ঞানস্পৃহাও অসাধারণ। ইহাদের লাইব্রেরিতে ভারতীয় আইনের যত বই দেখিয়াছি তত বই ভারতবর্ষের কোন লাইব্রেরিতেও দেখি নাই।"

এক প্রান্তে

এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

অসহায় পথপ্রান্তে যারা পড়ে আছে,
যাদের প্রাণের শোভা ধূলি-ধূসরিত
যাদের আকাশভরা অন্ধকার প্রেতায়িত রাত,
ধূমায়িত সকল বাসনা,
কে তাদের ভাষা দেবে,
অন্ন দেবে—পথের সঞ্চয়,
সূর্যের আলোক মুঠি মুঠি,
সবুজের শ্যামল বিলাস ?
যুগে যুগে বঞ্চিত প্রাণের
জমেছে অনেক ধুলা,
বহু অভিযোগ,
কঙ্কালের শত হিমালয়
পৃথিবীর পথ ঢাকিয়াছে—
মুক্তির আস্বাদ কোথা ?
কে আনিবে মন্থনের শেষে
প্রাণের অমৃত-মধু
বিপুল বিশ্বাস
উন্মুক্ত-প্রসার বৃষ্টি ?
আজি তার অবজ্ঞাত নাম—
অজানা সে পান্থ লাগি
এ কবির রহিল প্রণাম।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পিএইচ. ডি; ডি. লিট্

পুরাকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষের অপর একটি নাম ছিল কামরূপ। প্রাগ্‌জ্যোতিষ কামরূপ অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। ইহা পূর্ব্ব-জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটি কেন্দ্র। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণেরা কামরূপে আসিয়াছিল। বঙ্গদেশে ইহারা আচার্য্য বলিয়া বিদিত এবং আসামে দৈবজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। প্রত্যেক রাজার একটি করিয়া জ্যোতিষি ছিল। জ্যোতিষির প্রধান কার্য্য ছিল গ্রহদিগকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট রাখা। রামায়ণ এবং মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষের উল্লেখ আছে। এই দুইটি গ্রন্থের মতে ইহারা সুবিখ্যাত জাতি। মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ একটি শ্রেষ্ঠ রাজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রাজা ছিল ভগদত্ত। মহাভারত হইতে আরও আমরা জানিতে পারি যে প্রাগজ্যোতিষ নামে একটি অসুর রাজ্যে নরক ও মুরু নামে দুইটি অসুর রাজত্ব করিত। কিরাত এবং চীনদিগের রাজ্যের সীমান্তে প্রাগজ্যোতিষ অবস্থিত। ভারতযুদ্ধে প্রাগজ্যোতিষের রাজা ভগদত্ত কুরুদিগের মিত্র ছিল। ভারতযুদ্ধে ভগদত্ত চীন-দিগের সৈন্ত লইয়া যুদ্ধ করেন। সমগ্র উত্তর এবং পূর্ব্ব বঙ্গদেশ প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের অধীনে ছিল। বরাহমিহির পূর্ব্ব দিকস্থ যে সকল দেশের উল্লেখ করেন তাহাদের মধ্যে প্রাগজ্যোতিষ একটি। রঘুবংশের মতে ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর দিকে প্রাগজ্যোতিষ দেশ অবস্থিত; সেইজন্ত আমাদের মনে হয় কেবল কামরূপ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা নয়। উত্তর বঙ্গ এবং উত্তর বিহারের অনেক অংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। যোগিনীতন্ত্র হইতে জানা যায় যে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, রংপুর এবং কুচবিহার সমেত কামরূপের অন্তর্ভুক্ত। হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে প্রাগজ্যোতিষ কামরূপের উল্লেখ আছে। রঘুবংশে ইহারা দুইটি বিভিন্ন জাতি বলিয়া বর্ণিত। মহাভারতে গৌহাটির নিকটস্থ কামাখ্যার উল্লেখ আছে। কামাখ্যার মন্দির শাক্ত হিন্দুদিগের একটি পবিত্র স্থান। পুরাকালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা তিন ভাগে বিভক্ত:

(১) সাদিয় (পূর্ব্ব জিলা),

(২) আসাম (মধ্য জিলা),

এবং (৩) কামরূপ (পশ্চিম জিলা)

কামরূপের পশ্চিম বিভাগের অপর একটি নাম ছিল কুশ-বিহার। এখানে রাজাদিগের প্রাসাদ ছিল এবং ইহার রাজধানী কামাতিপুর হইতে সমগ্র দেশের নামকরণ করা হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত গৌহাটি কাম-রূপের প্রাচীন রাজধানী। কুশবিহারের রাজধানী কামাতি-পুর পাবনা হইতে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। গৌহাটি পাবনা হইতে ইহার দ্বিগুণ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্ব দিকে চীনদিগের স্ব নামে একটি দেশের দক্ষিণ পশ্চিম বর্ব্বর জাতির সীমান্ত দেশ-গুলি পর্য্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের জঙ্গলগুলিতে হাতীর বাস ছিল। কামরূপে একটি ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। যদিও তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, অন্তরে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রগাঢ় ভক্ত ছিলেন। কনৌজের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার ধর্ম্মযাত্রায় তিনি মিলিত হন। পুরাকালে কামরূপ পশ্চিমদিকে করতোয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভ শিলালিপিতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বাহিরে একটি সীমান্ত দেশ বলিয়া কামরূপের উল্লেখ আছে। পুরাণের মতে রংপুরের অন্তর্ভুক্ত করতোয়া নদী হইতে পূর্ব্বদিকে প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজধানী কামরূপ বিস্তৃত। মণিপুর, জয়ন্তিয়া, কাছার, পশ্চিম আসাম, ময়মনসিংহ এবং শ্রীহট্টের কতকগুলি অংশ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত। বর্ত্তমান যুগে গোয়ালপাড়া হইতে গৌহাটি পর্য্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত। পুরাকালে কামরূপ দেশ প্রায় দশ হাজার লি বিস্তৃত ছিল। ইহার জমিগুলি উর্ব্বর এবং চাষের সুবিধার জন্ত প্রচুর জল পাওয়া যাইত। উত্তরে ভূটান কামরূপের অন্তর্গত। দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র এবং লখ্যার সঙ্গম পর্য্যন্ত কামরূপ-দেশের সীমা ছিল। কালিকাপুরাণের মতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ এবং কামাখ্যা কিংবা গৌহাটি অভিন্ন। কামাখ্যার নীলকূট পর্ব্বতে কামাখ্যা দেবীর মন্দির আছে। তাম্রেশ্বরী দেবীর মন্দির প্রাচীন কামরূপের উত্তর-পূর্ব্ব সীমার নিকটে অবস্থিত। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় প্রাগ্‌জ্যোতিষের স্থান পূর্ব্বদিকে দেখা যায়।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে আম্র, বেল, বট প্রভৃতি অনেক ফল এবং বৃক্ষ ছিল। প্রজাদের নিকট হইতে কর আদায় করা হইত না। দোষের জন্ত দণ্ডপ্রদানও বিরল ছিল। কামরূপে অনেক প্রকার চন্দন, ধূপ ও ধুনা পাওয়া যাইত। যখন চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং কামরূপে আসেন তখন এখানে তিনি দেখেন যে জাম এবং নারিকেল প্রচুর। এখানকার জল-হাওয়া ভাল ছিল। লোকেরা সৎ, ধর্ম্মভীরু এবং ধৈর্য্যশীল ছিল; তাহারা দেবতার পূজা করিত কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে তাহাদের আস্থা ছিল না। চৈনিক পরিব্রাজক এখানে কোনও বৌদ্ধ-বিহার দেখেন নাই। এখানে অনেক দেবমন্দির ছিল; রাজা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন; বহুদূর হইতে ভাল ছাত্ররা এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত। যদিও রাজা বৌদ্ধ ছিলেন না, তিনি শীলজ্ঞসম্পন্ন বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

কামরূপের পূর্ব্ব দিকে অনেক পর্ব্বত ছিল। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে বন্যহস্তী পাওয়া যাইত এবং যুদ্ধের জন্ত হস্তী পাঠান

হইত। চৈনিক পরিব্রাজকের মতে বর্ত্তমান কামরূপ এবং ক-মো-লু-পো অভিন্ন। বর্ত্তমান কামরূপের রাজধানী গৌহাটী। উচ্চ ব্রহ্মদেশের পশ্চিম দিকে কামরূপ ১৬০০ লি বিস্তৃত। আলবেরুণির মতে কামরূপ কনৌজ রাজ্যের পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর-পূর্ব্বদিকে কামরূপ রাজ্য স্বাধীন বলিয়া মনে হয়। কামরূপের রাজা গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তকে কর দিতেন। বহুদিন ধরিয়া কামরূপে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল। যদিও এই রাজ্য গুপ্ত রাজাদিগকে কর দিত, আভ্যন্তরীণ শাসনে ইহা স্বাধীন ছিল। হর্ষবর্দ্ধন কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মণের সহিত একটি সন্ধি করেন। ভাস্করবর্ম্মণের পিতা সুস্থিতবর্ম্মণ মৃগাঙ্ক মহাসেনগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই সন্ধিতে গৌড়দিগের ক্ষতি হইয়াছিল। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ভাস্করবর্ম্মণের আয়ত্তাধীনে আসে।

হর্ষচরিত হইতে জানা যায় যে, প্রাগ্ জ্যোতিষের যুবরাজ ভাস্করদ্যুতি নামে একজন দূতকে হর্ষের নিকটে পাঠান। যখন হর্ষবর্দ্ধন শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধ করিতে চান, কামরূপের যুবরাজ ভাস্করবর্ম্মণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হংসবেগ নামে একজন দূতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভাস্করবর্ম্মণ হর্ষের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য অনেক উপঢৌকন পাঠান। হর্ষ এবং ভাস্করবর্ম্মণ কর্ত্তৃক শশাঙ্ক পরাজিত হন। কামরূপের রাজা হর্ষের আদেশ মানিতেন। কামরূপের রাজা কুমার হর্ষের মিত্র ছিলেন। শ্রীহর্ষের উৎসবে ভাস্করবর্ম্মণ যোগদান করেন। কামরূপ পরে হর্ষের হস্তগত হয়। কামরূপের রাজা সুস্থিতবর্ম্মণকে পরাজিত করিয়া মহাসেনগুপ্ত সুযশ অর্জ্জন করেন। সুস্থিতবর্ম্মণ বাস্তবিক একজন মৌখরি ছিলেন এবং তিনি কনৌজের গ্রহবর্ম্মণ এবং অবন্তিবর্ম্মণের পূর্ব্বপুরুষ।

যখন চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং নালন্দায় ছিলেন কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। সর্ব্বপ্রথমে এই নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেন নাই কিন্তু তাঁহার শিক্ষক শীলভদ্রের অনুরোধে তিনি কামরূপে আসেন এবং ইহার রাজা ভাস্করবর্ম্মণ তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করেন। যখন ভাস্করবর্ম্মণ তাঁহার জন্মভূমি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তিনি উত্তরে বলেন যে তিনি তাঙ্ দেশের লোক।

যদিও ভাস্কর বর্ম্মণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি নিজেকে ক্ষত্রিয় কিংবা রাজপুত বলিয়া মনে করিতেন। যখন ভাস্কর বর্ম্মণ বর্ব্বর শালস্তম্ভ কর্ত্তৃক পরাজিত হন, কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য কামরূপ জয় করেন।

নরক কামরূপদেশ জয় করিয়া প্রাগ্ জ্যোতিষে বাস করেন। এখানে তিনি বিচারালয় স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র ভগদত্ত পিতার সকল সদ্গুণ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বজ্রদত্ত কোত্রবংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাঁহার পুত্র রত্নপাল অত্যন্ত বলশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র পুরন্দরপাল ধার্ম্মিক ও কবি ছিলেন। পুরন্দরপালের পুত্র ইন্দ্রপাল ধার্ম্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ইন্দ্রপালের মোহর হইতে জানা যায় যে তিনি প্রাগ্ জ্যোতিষের রাজা এবং মহারাজাধিরাজ উপাধিধারী ছিলেন। কামরূপের রাজা বজ্রদত্ত শিবের উপাসক। রাজা বনমালদেবও শিবপূজা করিতেন। রাজা বীরবাহু যুদ্ধে সুযশ অর্জ্জন করেন এবং অম্বা নামে একটি স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করেন। নেপালের লিচ্ছবী বংশজাত বৎসদেবী এবং শিবদেবের পুত্র জয়দেব কামরূপের রাজা শ্রীহর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহ করেন। রাজ্যমতী ভগদত্তরাজকুলজা নামে খ্যাত ছিলেন। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মণের নিধনপুরে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি হইতে কামরূপ রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুষ্যবর্ম্মা
|
সমুদ্রবর্ম্মা
|
বলবর্ম্মা
|
কল্যাণবর্ম্মা
|
গণপতিবর্ম্মা
|
মহেন্দ্রবর্ম্মা
|
নারায়ণবর্ম্মা
|
মহাভূতবর্ম্মা
|
চন্দ্রমুখবর্ম্মা
|
স্থিতবর্ম্মা
|
সুস্থিতবর্ম্মা (অপর নাম মৃগাঙ্ক)
|
সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মা — ভাস্করবর্ম্মা

পালবংশীয় রাজা ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল কামরূপ জয় করেন। রামচরিতের মতে রামপাল নামে এক জন সীমান্ত নৃপতি কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। গৌড়ের রাজারা উপর্য্যুপরি এদেশ জয় করেন। কামরূপ রাজ্য বাংলার পালরাজাদিগের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে কামরূপ শাসনের জন্য কুমারপাল তাঁহার মন্ত্রী বৈদ্যদেবকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেন। বাংলার পালরাজারা আসামের অন্তর্গত প্রাগ্ জ্যোতিষভুক্তিকে শাসন করিত। রামপালের পুত্র ধর্ম্মপাল কামরূপ জয় করেন। কামরূপের রাজা জয়পাল বরেন্দ্রির এক জন ব্রাহ্মণকে নয় শত সুবর্ণ মুদ্রা দান করেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি দানপত্র হইতে জানা যায় যে প্রদত্ত গ্রামটি কামরূপমণ্ডল এবং প্রাগজ্যোতিষভুক্তিতে অবস্থিত। প্রাগজ্যোতিষের রাজা দেবপালের বশ্যতা স্বীকার করেন। লক্ষ্মণসেন কামরূপ জয় করেন। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি

উমাপতিধর প্রাগজ্যোতিষ-জয় সম্বন্ধে একটি কবিতা লেখেন। শরণ নামে লক্ষ্মণ সেনের আর একজন সভাকবি কামরূপ জয় বর্ণনা করেন। চন্দ্ররাজা বলচন্দ্রের পুত্র বিমলচন্দ্র কামরূপ শাসন করেন। তিনি মালব রাজবংশীয় রাজা ভর্তৃহরির ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র এবং তাঁহার পরে ললিতচন্দ্র কামরূপ শাসন করেন।

খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলা এবং বিহারের বিজেতা বখতিয়ারের পুত্র মহম্মদ কামরূপ আক্রমণ করেন। করতোয়া নদীর তীর দিয়া তিনি উত্তর দিকে ধাবিত হন কিন্তু পরে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮১৬ সাল পর্য্যন্ত কামরূপ নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

রেখাগণিতে পণ্ডিত জগন্নাথ

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

কথিত আছে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা প্রজাদের সুবিধার জন্য রেখাগণিত আবিষ্কার করেন। তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বকর্ম্মা ইহা প্রাপ্ত হন এবং কালক্রমে বিশ্বকর্ম্মার এই শাস্ত্র ধরণীতলে প্রচার করেন।

রেখাগণিতের আধুনিক বাংলা নাম জ্যামিতি। এক সময় শুল্বসূত্র নামেও ইহা পরিচিত ছিল। Geometry ইহার বৈদেশিক সংজ্ঞা। তিনটি শব্দের বিশ্লেষণে একই অর্থ পাওয়া যায়।

শুল্ব— ক শুল্বয়তি বেধা পৃথিবীং পরিমাতি সৃজতি বা ইত্যর্থঃ।

জ্যামিতি—জ্যা (বসুধা)+মিতি (মানম্ পরিমাণম্।) জিওমেট্রি (geometry)—জি (ge=earth—পৃথিবী)+ মেট্রন (Metron=Measure—পরিমাপ)।

বৈদেশিক সংঘাতের ফলে ভারতবর্ষ হইতে এক সময় এই গণিতবিজ্ঞান বিলুপ্ত হয়।

মুসলমান আধিপত্য কালে পাশ্চাত্য দেশ হইতে রেখাগণিত পুনরায় ভারতে আনীত হয়। ইউক্লিডের গ্রন্থাবলম্বনে আরবী ভাষায় "মিজাস্তি" গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ ভারতবর্ষেও প্রচারিত হয়। ইহা অধ্যয়ন করিয়া সে যুগে কেহ কেহ জমি-জরীপ ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনায় পর্য্যন্ত সহায়তা করিয়াছিলেন। আকবরের রাজসভার অন্যতম রত্ন মহারাজ টোডরমল ক্ষেত্রতত্ত্ব-বিদ্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে যিনি বঙ্গাধিপ মুর্শিদকুলি খাঁকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে সাহসী হইয়াছিলেন সেই দর্পনারায়ণ কানুনগো ছিলেন ক্ষেত্রতত্ত্ব-বিদ্যার বিশেষ ব্যুৎপন্ন। এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যের জায়গা-জমির সকল তথ্য তাঁর নখদর্পণে ছিল।

তৈলঙ্গ দেশীয় সুপণ্ডিত জগন্নাথ ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সভার অন্যতম রত্ন। জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ এই গুণী ব্যক্তিকে নিজ রাজ্যে আনয়ন করেন। মহারাজের উৎসাহে এবং প্রেরণায় জগন্নাথ ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় রেখাগণিত প্রণয়ন করেন। মুখবন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

অপূর্ব্ব বিহিতং শাস্ত্রং যত কোণাব বোধনাৎ।
ক্ষেত্রেষু জায়তে সম্যক্ ব্যুৎপত্তির্গণিতে তথা॥
শিল্পশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণে।
পারম্পর্য্য বশাদেতদাগতং ধরণীতলে॥
তচ্ছিন্নং মহারাজ জয় সিংহাজ্ঞয়া পুনঃ।
প্রকাশিতং ময়া সম্যক্ গণকানন্দ হেতবে।

বিন্দু, রেখা, ক্ষেত্র প্রভৃতির সূত্র তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ দৃষ্ট হয়:—

যঃ পদার্থ দর্শনযোগ্যঃ বিভাগানর্হঃ স বিন্দুর্বাচ্যঃ। যঃ পদার্থঃ দীর্ঘঃ বিস্তাররহিতঃ বিভাগার্হঃ স রেখাপদবাচ্যঃ। বিস্তার দৈর্ঘ্যয়ো যদ্ ভিদ্যতে তদ্ধরাতলং দেবক্ষেত্রং। ইত্যাদি।

রেখাগণিতের অপর একটি সূত্রে গ্রন্থকারের রচনা-মাধুর্য্যের এবং নীরস বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করিয়া বলিবার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

যত্র ত্রিভুজস্য ভুজত্রয়ং অন্য ত্রিভুজস্য ভুজৈঃ সমানং ভবতি তদা তস্য কোণত্রয়মপি অন্য ত্রিভুজস্য কোণৈরবশ্যং সমানং ভবিষ্যতি।

এই প্রকার সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় সম্পূর্ণ রেখা-গণিত-শাস্ত্রের জটিল সূত্রগুলি বিবৃত করিয়া পণ্ডিত জগন্নাথ ক্ষেত্রতত্ত্বকে সহজ ও সুখবোধ্য করিয়া গিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষায় যে জ্যামিতি-শাস্ত্র অধীত হইতেছে, তাহা অনুবিত্তম জগন্নাথেরই রেখাগণিতের রূপান্তর।

কুষ্ঠীদের সেবায় আত্মবলিদান

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত বি-এল্

যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "He that findeth his life shall lose it; and he that loseth his life for my sake shall find it. He that taketh not his cross and followeth not after me, is not worthy of me. Heal the sick, cleanse the lepers; freely you have received, freely give." অর্থাৎ—'যে ব্যক্তি নিজের জীবনের সুখের দিকে তাকাইবে সে জীবন হারাইবে, আর যে আমার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিবে সে প্রকৃত জীবন লাভ করিবে। যে ব্যক্তি ক্রুশ গ্রহণ করিয়া আমার অনুসরণ না করে সে আমার উপযুক্ত শিষ্য নয়। পীড়িতের রোগ দূর কর, কুষ্ঠীদিগের সেবা কর। অযাচিতভাবে তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা মুক্তহস্তে দান কর।' যীশুর সমসাময়িক শিষ্যমণ্ডলী এবং পরবর্ত্তী অনুগামিগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার এই বাণী অনুসরণ করিয়া বহুজনের হিত ও সুখের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সেবাধর্ম্মের মূর্ত্ত প্রতীক ফাদার ড্যামিয়েনের নাম খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। পরহিতের জন্য এরূপ একজন মহান সেবাব্রতীর আত্মবলিদানের আদর্শ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে অনুকরণীয়। 'কুষ্ঠীদিগের সেবা কর'—যীশুর এই উপদেশটি জীবনের মূলমন্ত্র-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তদুদ্দেশ্যে জীবনপাত করিবার জন্যই যেন মহাত্মা ড্যামিয়েন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে বেলজিয়মের অন্তর্গত এক গণ্ডগ্রামে যোশেফ ডি ভিয়াষ্টার নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যজীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা পাওয়া যায় না। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন এবং স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি একই সময়ে চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারী, সূত্রধর, গৃহনির্ম্মাতা, শিক্ষক, পাচক, উদ্যানরক্ষক ও চিত্রকররূপে বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দিয়াছিলেন—ইহা হইতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে যোশেফ বাল্যকাল হইতেই এই সকল বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

তিনি বাল্যকালেই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পেম্পিলাস প্রসিদ্ধ লুভেইন নগরের মঠের ধর্ম্মযাজক ছিলেন। বালক ভিয়াষ্টার লুভেইন মঠে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য পিতার অনুমতি চাহিলেন। পিতা পুত্রের দৃঢ় সংকল্প দেখিয়া সম্মতি দিলেন। এই মঠে ধর্ম্মপ্রচারের শিক্ষা লাভ করিয়া ভিয়াষ্টার ড্যামিয়েন নামে অভিহিত হইলেন।

এই সময়ে ড্যামিয়েনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পেম্পিলাসের বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যাইবার কথা স্থিরীকৃত হয়। যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইলে পেম্পিলাস গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। দুই দিবস পর যে জাহাজ ছাড়িবার কথা সে জাহাজে যাত্রা করিবার তাঁহার কোন সম্ভাবনাই রহিল না, কারণ তিনি যথাসময়ে আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই। এই শুভকার্য্যে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পেম্পিলাস অতীব মর্ম্মাহত হইলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিষণ্ণ দেখিয়া ড্যামিয়েন বলিলেন, "ভ্রাতঃ, আপনার পরিবর্ত্তে আমি যাইব—ইহাতে কি আপনার মনে শান্তি ও আনন্দ হইবে?" পীড়িত ভ্রাতা সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "আমি নিশ্চিতই সুখী হইব; তুমি যদি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্যে বিদেশে গমন কর, তাহা হইলে আমি মনে করিব যে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।"

ড্যামিয়েন অনতিবিলম্বে ভ্রাতার প্রতিনিধিরূপে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বিদেশে গমন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া সঙ্ঘনায়ককে (Head of the Order) লিখিলেন। অনুমতি প্রদত্ত হইল। ড্যামিয়েন পরিবারবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া চিরদিনের জন্য দাক্ষিণসমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপ ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন কুক আবিষ্কার করেন। এই দ্বীপশ্রেণী অতি মনোরম এবং বিচিত্র কুসুমাদি দ্বারা সুশোভিত। অসংখ্য নারিকেল-বৃক্ষ তীরভূমিতে সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান আছে। এই স্থানেই ফাদার ড্যামিয়েন ধর্ম্মপ্রচারের জন্য গমন করিয়া তথায় সুদীর্ঘ নয় বৎসর কাল হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সকল দ্বীপের অধিবাসিগণ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। এক শত বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় খ্রীষ্টান মিশনরী এই স্থানে গমন করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যভাগে অবস্থিত হাওয়াই নামক বৃহত্তম দ্বীপে একটি আগ্নেয়গিরি আছে। এই আগ্নেয়গিরি বিদ্যমান থাকায় দ্বীপের অধিবাসিকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে খ্রীষ্টান মিশনরীদের অতিশয় বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে মাঝে মাঝে নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির প্রভূত অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে। দ্বীপবাসিগণ এই ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরিকে দেবী পিলির (Pele) আবাসস্থান বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যদি তাহারা দেবীর পূজা পরিত্যাগ করে, তবে দেবী কোপান্বিতা হইয়া আগ্নেয়গিরি হইতে উষ্ণ গলিত পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের বিনাশ করিবেন। তাহারা অনেক

বার জনবহুল গ্রামগুলিকে এই আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইতে দেখিয়াছে। সুতরাং তাহারা সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিত এবং কেহই দেবী পিলির পূজা পরিত্যাগ করিয়া মিশনরীদের প্রচারিত খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সাহসী হইত না।

হাওয়াই দ্বীপের রাণী দ্বীপবাসিগণের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এক দিন রাণী একাকিনী আগ্নেয়গিরির চতুর্দ্দিকস্থ বিস্তীর্ণ সমতলভূমি অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতপার্শ্বে আরোহণ করিলেন। তিনি বহ্নিময়ে পুঞ্জীভূত আগ্নেয় পদার্থ দেখিতে পাইলেন। দেবী পিলির নিকট পবিত্র বলিয়া পরিগণিত এক বৃক্ষের শাখা রাণী আগ্নেয়গিরির মুখে নিক্ষেপ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"পিলি, যদি তুমি প্রকৃতপক্ষেই জাগ্রতা দেবী হইয়া থাক, তাহা হইলে এই অপমানের প্রতিশোধ লও।" দেবীর কোপের কোন পরিচয় পাওয়া গেল না; ভূগর্ভ হইতে কোন গর্জ্জন শ্রুত হইল না, বীরাঙ্গনা রাণীকে বিনাশ করিবার জন্য কোন গলিত স্রাবও নির্গত হইল না। বীরাঙ্গনা রাণী বিজয়গর্ব্বে প্রমত্তা হইয়া অক্ষতদেহে আগ্নেয়গিরি হইতে অবতরণ করিলেন এবং দ্বীপবাসিগণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"তোমরা সকলেই দেখিলে দেবী পিলি শক্তিহীনা। এই খ্রীষ্টান মিশনরীগণ যে পরমেশ্বরের বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন সেই পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতা নাই এবং খ্রীষ্ট ব্যতীত মানবজাতির অন্য ত্রাণকর্ত্তা নাই।" দ্বীপবাসিগণ এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া এবং রাণীর আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া খ্রীষ্টান প্রচারকগণের নিকট পরমেশ্বরের কথা শুনিতে আরম্ভ করিল এবং কালক্রমে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপগুলি দেখিতে মনোরম হইলেও একটি দোষে এগুলি কলঙ্কিত এবং ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল দ্বীপের অধিবাসিগণ ভীষণ কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। দক্ষিণ-সমুদ্রস্থ এই দ্বীপগুলিতে কুষ্ঠব্যাধি এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে গবর্ণমেন্ট ইহার সংক্রমণ প্রতিরোধ-মানসে কুষ্ঠীদিগের বাসের জন্য একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ পৃথকরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। অন্যান্য দ্বীপগুলি হইতে ঘনকৃষ্ণ অত্যুচ্চ গিরিশ্রেণীর দ্বারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের দুইটি পল্লীতে এই হতভাগ্য কুষ্ঠীগণ নিঃসহায় অবস্থায় নিরানন্দ জীবন যাপন করিত। তাহাদিগের সঙ্গে কোন চিকিৎসক এবং ধর্ম্মযাজক বাস করিতেন না। অন্যান্যের নিরাপত্তার জন্য এই কুষ্ঠীদিগকে নির্জ্জন দ্বীপে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করা হইত।

দ্বীপগুলির প্রধান ধর্ম্মযাজক যখনই পারিতেন তখনই কুষ্ঠীদিগকে দেখিতে যাইতেন। হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগকে নিঃসহায় অবস্থায় দ্বীপে ফেলিয়া যাইতে প্রধান ধর্ম্মযাজকের প্রাণে দুঃখ হইত। অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য চালাইবার লোক বিশপের হস্তে অতি অল্পই ছিল; ইহা ছাড়া কুষ্ঠীদিগের সহিত বাস করিবার জন্য কাহাকেও পাঠাইলেই সে নিশ্চিতরূপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া পরিণামে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে—এই আশঙ্কাও ছিল। কাজেই প্রধান ধর্ম্মযাজক বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কিন্তু হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগের জন্য ড্যামিয়েনের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল। এক দিন ইউরোপ হইতে কতিপয় ধর্ম্মপ্রচারক আসিয়া উপস্থিত হইলে ড্যামিয়েন তৎক্ষণাৎ প্রধান ধর্ম্মযাজকের নিকট গিয়া বলিলেন, "এই ধর্ম্মপ্রচারকগণই এক্ষণে আমার কাজ করিতে পারিবেন। আমাকেই মোলাকাই যাইতে অনুমতি দিন।" ড্যামিয়েনের অসাধারণ আত্মত্যাগের ভাব দেখিয়া বিশপ বিস্মিত হইলেন এবং মোলাকাই দ্বীপে যাইতে তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। ড্যামিয়েন তখন তেত্রিশ বৎসরবয়স্ক বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিৎকর্ম্মা যুবক। তিনি তৎক্ষণাৎ পিতামাতা, গৃহ ও আত্মীয়স্বজনদিগকে পুনরায় দেখিবার আশা চিরতরে বিসর্জ্জন দিলেন। এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার ভাবনাও তাঁহার মনে উপস্থিত হইল না। কুষ্ঠ যে কি ভীষণ ব্যাধি এবং মোলাকাইয়ে গমন করিলেই যে তিনি এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারেন তিনি ইহা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন। মোলাকাইয়ে যাইবার জন্য ড্যামিয়েন এত দূর ব্যস্ত হইলেন যে তিনি কাহারও নিকট হইতে যথোচিত বিদায় গ্রহণ না করিয়া এবং কোনও নূতন পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহ না করিয়াই সেই দিবসই রওনা হইলেন।

একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ড্যামিয়েনকে জাহাজ হইতে সমুদ্রতীরে লইয়া গেলে তিনি অসংখ্য নিঃসহায় কুষ্ঠীকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। ড্যামিয়েন ইহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি মনে মনে নিজকে বলিতে লাগিলেন, "যোশেফ, এই তোমার জীবনের প্রধান ব্রত, এই কুষ্ঠীদিগের সেবায়ই তোমার জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে।" মোলাকাই দ্বীপে ড্যামিয়েন যখন প্রথম উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার বাসস্থানের কোন বন্দোবস্ত ছিল না; তিনি এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের নীচে উন্মুক্ত স্থানে নিদ্রা যাইতেন। প্রায় আট শত কুষ্ঠী নিজেদের তৈরি জীর্ণ কুটীরে নিরানন্দ জীবন যাপন করিত। ড্যামিয়েন কালবিলম্ব না করিয়া কুষ্ঠীদিগের জন্য স্বাস্থ্যকর কুটীর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কাঠাদি প্রেরণ করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি যে কেবল গৃহনির্ম্মাণের পরিকল্পনাই করিয়াছিলেন তাহা নহে। পূর্ব্বে কুষ্ঠীগণ সাময়িকভাবে কতকটা দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিবার জন্য সুরাপান করিয়া সময় অতিবাহিত করিত। এক্ষণে ড্যামিয়েনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কুষ্ঠীদিগের মধ্যে অনেকেই কুঠার, করাত প্রভৃতি যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিজেদের বাসোপযোগী কুটীর নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সারি সারি সুন্দর স্বাস্থ্যকর কুটীর নির্ম্মিত হইয়া গেল।

কুষ্ঠীদের পল্লীতে প্রচুর জল সরবরাহের বন্দোবস্ত ছিল না। জলের অভাবে পল্লীগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারা যাইত না। ফাদার ড্যামিয়েন পাহাড়ে একটি ঝরণার কথা শুনিয়া কতিপয় বালকের সহিত উহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। এক উপত্যকার উপরিভাগে বৃহৎ একটি ঝরণা দেখিতে পাইলেন। ঝরণাটি গ্রীষ্মকালের প্রখর উত্তাপেও শুষ্ক হইয়া যাইত না; উহাতে সর্ব্বদাই অফুরন্ত জল পাওয়া যাইত। ড্যামিয়েন নলসংযোগে ঝরণা হইতে কুষ্ঠীদের পল্লীতে জল আনয়ন করিলেন। তদবধি কুষ্ঠীদিগের জলের আর কোন অভাব রহিল না।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। ড্যামিয়েন প্রতিদিন প্রাতে গির্জ্জায় উপাসনা সমাপন করিয়া দৈনন্দিন কাজে নিযুক্ত হইতেন। এই দৈনিক উপাসনাই তাঁহাকে প্রতিকার্য্যে অপূর্ব্ব প্রেরণা ও শক্তি প্রদান করিত। প্রথমতঃ, তিনি মোলোকাই দ্বীপের পিতৃমাতৃহীন শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত অনাথ-ভবনে যাইতেন, পরে বালকবালিকাদের বিদ্যালয়ে যাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন; তৎপর গৃহে ও হাসপাতালে রোগীদিগকে দেখিতেন। এই সকল নির্দ্দিষ্ট কাজ সমাপন করিয়া ড্যামিয়েন মিস্ত্রীর কাজও কিছু কিছু করিতেন। শক্ত-সমর্থ কুষ্ঠীদিগের সহায়তায় তিনি ক্ষুদ্র গির্জ্জাটির পরিসর আরও বাড়াইলেন। দুইটি নূতন গির্জ্জাও নির্ম্মিত হইল। ধর্ম্মযাজক রূপে ড্যামিয়েনকে দীক্ষা, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও যোগদান করিতে হইত। প্রকৃতপক্ষে ফাদার ড্যামিয়েন মোলোকাই দ্বীপে কুষ্ঠীদিগের বিচারক, পিতা, শাসক ও ত্রাণকর্ত্তা ছিলেন। "Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest" অর্থাৎ তোমরা যাহারা দুঃখকষ্টে জর্জ্জরিত আছ, আমার নিকট এস; আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব"—যীশুখ্রীষ্টের এই আশ্বাসবাণী লইয়াই ফাদার ড্যামিয়েন কুষ্ঠীদিগের নিকট যাইতেন, হতভাগ্যদের শারীরিক ক্লেশ দূর করিতেন এবং ভগবানের কথা শুনাইয়া তাহাদের নিরানন্দ জীবনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার করিতেন। বহু বৎসর কুষ্ঠীপল্লীতে বাস করিয়া কুষ্ঠীদিগের সেবায় তিনি দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অলোকসামান্য নিঃস্বার্থ সেবার ফলে মোলোকাই দ্বীপের কুষ্ঠীদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একাদশ বৎসর একনিষ্ঠ সেবার পরও কুষ্ঠব্যাধি তাঁহার শরীরে সংক্রমিত হয় নাই। কিন্তু তিনি বেশী দিন এই সংক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি পীড়িত ও মৃত কুষ্ঠীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিজ শরীরে এই ব্যাধির সংক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। অবশেষে জনৈক ডাক্তার চিকিৎসা ব্যপদেশে মোলোকাইয়ে আসিয়া ড্যামিয়েনের শরীরে কুষ্ঠব্যাধির লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। ব্যাধির আক্রমণ দেখিতে পাইয়া ডাক্তার ড্যামিয়েনকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।

ড্যামিয়েন হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমি অনেক পূর্ব্বেই ইহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম। তুমি যদি বলিতে এখানকার কাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে আমার এই ব্যাধি সারিয়া যাইবে, তাহা হইলেও আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিতাম না। আমি এই হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগের সেবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি—ইহাদের সেবায়ই আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।" আর প্রকৃতপক্ষে তিনি কুষ্ঠীদের সেবায়ই প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; 'কুষ্ঠীদিগের সেবা কর'—শিষ্যগণের নিকট প্রভু যীশুর এই উপদেশ ভক্ত ফাদার ড্যামিয়েন তাঁহার নিজ জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। এই কাল ব্যাধিতেই ড্যামিয়েনের অমূল্য জীবন তিলে তিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। তাঁহার জীবনের ব্রত শেষ হইল। তিনি যে কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা উহা গ্রহণ করিলে অন্যান্য ধর্ম্মযাজকগণ স্বেচ্ছায় এই কার্য্যে যোগদান করিলেন। আজকাল চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণীগণ হাসপাতালে কুষ্ঠীদিগকে দেখিতেছেন, শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে কুষ্ঠী বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু ফাদার ড্যামিয়েন যখন প্রথম এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন তখন কেহই তাঁহাকে উৎসাহ দেন নাই, কোন সহানুভূতি দেখান নাই। সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে বেলজিয়মবাসী জনৈক ধর্ম্মযাজক হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, বহির্জ্জগৎ এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপ এই মহাপুরুষের অলৌকিক আত্মবলিদানের কথা জানিতে পারিল। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলিতে মোলোকাই দ্বীপের কুষ্ঠী-পল্লীর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহার জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। ইউরোপবাসিগণ ড্যামিয়েনের অলোকসামান্য সেবাপরায়ণতা ও স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা ড্যামিয়েনের অপূর্ব্ব সেবাকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া প্রভূত অর্থ সাহায্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ড্যামিয়েন তাঁহার জীবদ্দশায়ই ইউরোপীয়গণের সহানুভূতি ও অর্থানুকূল্যের কথা জানিতে পারিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ম্যাজিক ল্যাণ্ঠার্ণ, মানচিত্র, কলের গান, চিত্র প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য উপহার-স্বরূপ ড্যামিয়েনের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে একটি মূল্যবান্ উপহার ড্যামিয়েন সযত্নে ও পরম আদরে নিজ কুটীরে রক্ষা করিয়াছিলেন—এই উপহার সাধু ফ্রান্সিসের নিকট প্রভুর আবির্ভাবের ক্ষুদ্র চিত্রখানি। ইহা ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত চিত্রকর কর্ত্তৃক অঙ্কিত। ভক্ত ড্যামিয়েন নিজ প্রকোষ্ঠে শয্যার পাদদেশে প্রাচীরগাত্রে এই চিত্রখানি প্রলম্বিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আজকাল মোলোকাই কুষ্ঠী-পল্লীর প্রভূত উন্নতি সাধিত

হইয়াছে। কুষ্ঠীদিগের সেবা ও তত্ত্বাবধানের জন্য ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে। ফাদার ড্যামিয়েনের জীবনব্যাপী তপস্যা, নিষ্কাম সেবা ও আত্মত্যাগের ফলেই কুষ্ঠী-পল্লীর এরূপ অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। পৃথিবীতে যত দিন সেবাধর্মের মহিমা থাকিবে তত দিন ফাদার ড্যামিয়েনের নিষ্কাম সেবা ও আত্মবলিদানের কাহিনী পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

আর্টের ত্রিধারা

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

ভারতবর্ষের চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও অন্যান্য সুকুমার কলা-শিল্প একদা সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হয়েছিল, কিন্তু আজ তার শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার করে।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকের একটা ধারণা জন্মেছে যে, আর্ট বা শিল্প-কলা তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে উন্মার্গগামী হয়েছে। আধুনিক সভ্যতা বহুক্ষেত্রে কলা-বিদ্যাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছে। আধুনিক আর্টও তাই স্বধর্ম ভুলে গিয়ে মিথ্যা আড়ম্বর ও সৌখীনতার আশ্রয় নিয়ে আপনার দৈন্যকে ঢাকবার প্রয়াস পাচ্ছে।

মনে প্রশ্ন জাগে, আর্ট বর্ত্তমান অবস্থা থেকে কবে মুক্তি পাবে? আর কলা-বিদ্যার অনুশীলনে মানবজাতির পার্থিব উন্নতির অন্তরায়-স্বরূপ বলে যে একটা কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় তারও কোন ভিত্তি আছে কিনা সে কথাটাও ভেবে দেখতে হবে।

ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই কলা-বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং তার ফলে তদ্দেশবাসীর জীবন হয়ে উঠেছে আনন্দময়, আর তাদের দেশের সর্ব্বত্র কলা-বিদ্যার প্রচার ও প্রসার হয়েছে। অবশ্য প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে ওদেশে শিল্পকলার যে অপার ক্ষতি হয়েছে, সহজে তা পূরণ হওয়া সম্ভবপর নয়। সাম্প্রতিক রাশিয়ার শিল্প ও কলা-বিদ্যার প্রকৃত স্বরূপ আজও আমাদের নিকটে পূর্ণতর পরিচয়ের অপেক্ষায় আছে।

সভ্যতা ও কলা-বিদ্যার সম্বন্ধ গভীর। তার কারণ সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বড় বড় নগরী, আর সেগুলোকে কেন্দ্র করেই কলা-বিদ্যা ক্রমবিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। শিল্পকলা হচ্ছে সভ্যতার অলঙ্কার-স্বরূপ। দেশ সমৃদ্ধ হলে কলা-বিদ্যা জনগণের নিকটে সমাদৃত হয়।

শিল্প-কলার মূল আদর্শ হ'ল সত্যম্, শিবম্, সুন্দরের সাধনা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই উন্নত আদর্শকে উপলব্ধি করাই ছিল ভারতীয় শিল্প-সাধনার মর্ম্মকথা। শুধু ভারতের নয়, জগতের সকল দেশেরই শ্রেষ্ঠ সুকুমার কলা এই আদর্শকেই সৃষ্টির ক্ষেত্রে রূপায়িত করবার চেষ্টা করে আসছে। প্রথমে চিত্রকলার বিষয় আলোচনা করা যাক্। চিত্রকলার প্রধান তিনটি ধারা দেখা যায়। তার মধ্যে একটি হ'ল চীন ও জাপান দেশে প্রচলিত পদ্ধতি। দ্বিতীয়টি হ'ল ইউরোপ ও ইউনানের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি; আর তৃতীয়টি হচ্ছে ভারতীয় চিত্রকলা। এর মধ্যে কোনটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে গবেষণাত্মক বা তুলনামূলক আলোচনা এখানে আমরা করতে যাচ্ছি না।

চীনা ও জাপানী চিত্র বহু বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে খুব সমাদৃত। এগুলো শুধু যে আমাদের দেশে ধনী লোকদের বৈঠকখানার শোভাবৃদ্ধি করে তা নয়, এদেশের শিল্পী ও শিল্পরসিকদের মধ্যেও এগুলোর আদর ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ সব চিত্রে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা রয়েছে যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চিত্রে পাওয়া যায় না।

জাপানী চিত্রকলা চীনা চিত্রকলার আদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত। এই হিসাবে চিত্রকলার ক্ষেত্রে জাপানকে চীনের শিষ্যস্থানীয় বলা যেতে পারে। চীনা ও জাপানী চিত্রকলাকে একই বৃক্ষের দুটি শাখা বললে অসঙ্গত হয় না। জাপানী চিত্রকলার ওপর চীনা অঙ্কন-পদ্ধতির ছাপ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। চীন জাতি পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিদের মধ্যে একটি। নবীন জাপান তার চিত্রকলার জন্য চীনের নিকট ঋণী বটে, কিন্তু সে শুধু ব্যর্থ অনুকরণই করে নি, তার চিত্রকলা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ইউনানের ভাস্কর্য্য অতি উঁচুদরের, কিন্তু তার চিত্রকলা ভারতবর্ষ বা ইউরোপের ন্যায় উন্নত নয়। ভারতবর্ষের ও ইউরোপের চিত্রকলা উঁচুদরের হলেও তার প্রামাণিক ধারাবাহিক ইতিহাস বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় না। চার্লস হোম তাঁর বিশ্বকোষ গ্রন্থে বলেছেন যে, চীনের চিত্রাঙ্কন-প্রথা বহু পুরাতন ও শ্রেষ্ঠ। চীনের চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার বার শত বৎসরের প্রামাণিক ইতিহাস আছে। পৃথিবীতে আর কোন দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। বাস্তবিক চীনা সুকুমার শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হ'ল তার চিত্রকলা।

হোম সাহেব আরও বলেছেন যে, চীনের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির উদ্দেশ্য হ'ল বস্তুর আভ্যন্তনিহিত পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা, ঘটনা চিত্রিত করা নয়। তাই চীনদেশে চিত্রকে শব্দহীন কবিতা বলা হয়ে থাকে। তাই সে দেশে চিত্রকর ও কবি উভয়েই সমধর্ম্মী।

চীনা শিল্পীরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রাবলী খুব বেশী করে আঁকেন। চিত্রাঙ্কন ও কবিতা-রচনা এই উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পী ও কবিরা প্রকৃতি থেকে প্রচুর উপকরণ আহরণ করেন।

এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রাবলীতে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এই চিত্রগুলিতে মানুষ, পশু, পাখী ইত্যাদিও স্থান পেয়েছে, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যই তাতে মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। যেমন শিল্পী নীলাকাশের পটে শ্বেতবলাকা আঁকে পটভূমিকার দৃশ্য-সৌন্দর্য্যকেই বাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে—বস্তুত: চীনা চিত্রকর পাখী আঁকে তার আকাশের চিত্রকে আরও সুসমঞ্জস করতে। অনন্ত আকাশের সৌন্দর্য্য তাতে অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

জাপানের চিত্রকলাও অনেকটা এইরূপ। এই কারণে চীনা ও জাপানী চিত্রকলা, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র ধরণের। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের চিত্রকলা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনার সহিত সংস্পর্শ-বিহীন হওয়ায় যথোচিত আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি। প্রাকৃতিক দৃশ্য-চিত্রাঙ্কনের যে সমস্ত নমুনা পাওয়া যায় চীনা বা জাপানী চিত্রের সহিত সেগুলোর তুলনা করা চলে না।

ইউরোপের চিত্রেও প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য দেখান হয়, কিন্তু তাতে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত আনন্দের আভাস খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়ে পড়ে। সে ছবি নয়নানন্দকর বটে, কিন্তু তাতে দর্শকের শুধু চোখই ভোলে, মন ভরে ওঠে না।

প্রকৃতির অন্তস্তলে যে অনন্ত প্রাণ-লীলা আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল তার স্বরূপ ইউরোপীয় চিত্রকর উপলব্ধি করতে পারেন নি। একমাত্র রেম্ব্রাঁকে বাদ দিলে আর সকলের সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। এ বিষয় স্টক হোল্‌ম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শাইরেন সাহেব বলেছেন—

প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র যা চীনা শিল্পীরা এঁকেছে তত সুন্দর চিত্র ইউরোপের চিত্রকরগণ আঁকতে পারে নি। চীনা চিত্রকর প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে গিয়ে তুলির টানে এমন এক সৌন্দর্য্যলোকের আভাস ফুটিয়ে তোলে, যা ইউরোপের চিত্র-শিল্পীদের চোখে পড়ে না। প্রকৃতি-নিরীক্ষণ-ক্ষমতা চীনা শিল্পীদের অসাধারণ—তা মানতেই হবে। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ, আত্মার নীরব সঙ্গীত তার চিত্রে ধরা পড়েছে।

জাপানীদের চিত্রেও প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য বিশেষ ভাবেই চোখে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই উভয় শিল্পে বৈষম্য আছে।

এটা সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, জাপানী চিত্রকর চীনা চিত্রশিল্পীর ন্যায় ততটা ভাবনা-প্রবণ ও কল্পনাপ্রিয় নয়। জাপানী শিল্পীর প্রধানতঃ সৌন্দর্য্যপ্রিয় এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই তাদের আদর্শ সৌন্দর্য্য বা সৌন্দর্য্যের আদর্শ। চীনারা ভাবুক তাই আকাশ তাদের খুব প্রিয়। জাপানীরাও নীলাকাশ ভালবাসে, কিন্তু চীনাদের ন্যায় তাকে দিগন্ত-প্রসারী রূপ দিয়ে মহিমান্বিত করে না। জাপানীদের অঙ্কিত আকাশ সাদা খণ্ড-মেঘশোভিত ও সূর্য্যের কিরণসম্পাতে সমুজ্জ্বল—এমনি নয়নাভিরাম ছবিই তারা প্রধানতঃ আঁকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জাপানীদের মণ্ডন-শিল্পের (decorative art) দিকেই আকর্ষণ বেশী। জাপানীদের ছবিতে বর্ণবিন্যাসের বৈচিত্র্য চীনাচিত্রের চেয়ে বেশী লক্ষণীয়।

প্রসিদ্ধ কলা-সমালোচক উইলিয়াম এণ্ডার্স্‌ন লিখেছেন যে, চীনাদের রেখা-চিত্র আর জাপানীদের রঙীন চিত্র তাদের স্বকীয়তার জন্যে সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

মানব-জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী ও ঐতিহাসিক আখ্যানকে বিষয়বস্তু করে চীনারা বহু চিত্র এঁকেছে। পুরনো চিত্রগুলির মধ্যে য়ু য়াবতজী (Wu Yotzi) অঙ্কিত বুদ্ধের মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই চিত্রের অঙ্কন-পদ্ধতি সিংহলের 'ধ্যানী বুদ্ধের চিত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। ঐ মূর্ত্তি বর্ত্তমান সময়ে মাদ্রাজের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এক সময় বৌদ্ধ প্রভাব সমগ্র এশিয়ার শিল্পকলাকে প্রভাবিত করে-ছিল—এই চিত্র তারই সাক্ষ্য প্রদান করছে। চীনে ও জাপানে সেই সুদূর কাল থেকেই বুদ্ধ ও তাঁর জীবনের ঘটনা-গুলিকে বিষয়বস্তু করে ছবি আঁকার রেওয়াজ চলে আসছে।

চীন ও জাপানের চিত্র-জগৎ ছেড়ে যখন ইউরোপের চিত্রশালায় প্রবেশ করি তখন মনে হয় যেন আমরা এক নূতন রাজ্যে, নূতন পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত হয়েছি।

ইউরোপের চিত্রকলার আলোচনা করতে গেলে প্রথমে ইউরোপীয় সভ্যতার আদি জননী গ্রীস দেশ ও তৎপরে ইটালীর সুবিখ্যাত চিত্রকলার অভ্যুদয়ের ইতিহাস অনুধাবন আবশ্যক।

ইউরোপের চিত্রাবলী অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত, কিন্তু তাতে একটা অভাব বিশেষ করে চোখে পড়ে। শিল্পী তার ছবিতে নরনারীর দেহসৌষ্ঠবকে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়েছেন সত্য, কিন্তু তার আত্মার স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করতে পারেন নি। তাদের ছবিতে পাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগতের হুবহু অনুকরণ কিন্তু তাতে ইন্দ্রিয়াতীতের আভাস নাই, ইঙ্গিত নাই, ব্যঞ্জনা নাই। 'মিনার্ভা' ও 'এপলো' নারী ও নরের শ্রেষ্ঠ নিখুঁত ও সুন্দরতম প্রতিকৃতি সন্দেহ নেই—তাদের অঙ্গসৌষ্ঠব, দেহ-লাবণ্য অতুলনীয়, কিন্তু তাদের যে সৌন্দর্য্য তা অবিনশ্বর নয়। ইটালীর চিত্রকরগণ চিত্রাঙ্কনে এই বাস্তবতার প্রভাব এড়াতে পারে নি—যদিও তারা তাদের ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত দেব-দেবীর ছবিই এঁকেছে খুব বেশী সংখ্যায়।

রাফেলের 'মেডোনা', মাইকেল এঞ্জেলোর 'সেণ্ট পল্,' প্রভৃতি চিত্র স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠতায় কালজয়ী হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহ।

কিন্তু এ তো গেল চিত্রকলার এক দিক মাত্র, এর আর

এক দিকের বিকাশ হয়েছে ভারতে। ভারতের শিল্পী এঁকেছে আরও সুন্দর, আরও প্রাণবান্, আধ্যাত্মিক ভাবধারায় সঞ্জীবিত চিত্রাবলী। প্রাচীন ভারতে কলাশিল্পের উন্নয়নের জন্যে, বিশেষ করে চিত্রশিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যাঁরা প্রকৃত পন্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন তন্মধ্যে কামসূত্রপ্রণেতা বাৎস্যায়নের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিল্পীদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন : প্রকৃতির নয়নাভিরাম রূপ ক্ষণে ক্ষণে বদ্‌লাচ্ছে—নব নব পরিবর্তিত মূর্তিতে তা আমাদের আনন্দ দিচ্ছে। শিল্পী যারা তারা প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য্যের বিবর্তন অনুসরণ করে চিত্র আঁকবে। যে মূর্তি গড়তে হবে, যে চিত্র আঁকতে হবে, তার রূপ চর্ম্মচক্ষে দেখে ও মানসপটে কল্পনা করে, তুলির টানে বা ভাস্করের হাতুড়ি দিয়ে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

ইউরোপের কুশলী শিল্পীগণও গৌরব অর্জ্জন করেছেন প্রকৃতি ও মানুষের বাহ্যিক রূপের ব্যঞ্জনা তাঁদের চিত্রে ফুটিয়ে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অন্তরালে যে রহস্যময় শব্দাতীত স্পর্শাতীত রূপলোক বিদ্যমান, তাঁকে তাঁরা তাদের চিত্রে রূপায়িত করতে পারেন নি—সুতরাং তাঁদের চিত্রাবলী অতি উঁচুদরের হলেও মানুষের আত্মার ক্ষুধা মেটাবার উপযোগী নহে।

বাঘগুহা, অজন্তা ও ইলোরার পরম রমণীয় চিত্রাবলী সমগ্র জগতে অতুলনীয়। তাতে অন্যান্য দেশের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির ন্যায় রঙের সমাবেশ, অলঙ্করণ ও রেখাঙ্কননৈপুণ্য সব কিছুই চোখে পড়ে, কিন্তু অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব-ব্যঞ্জনা এই চিত্রসমূহে এমনি সুন্দর ভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে যে সেগুলো সমগ্র পৃথিবীর শিল্পী-গোষ্ঠীকে এবং শিল্পরসিকদের শুধু আনন্দই দেয় নি, তাদের বিস্মিতও করেছে। একাধারে বাহ্যিক ও আন্তরিক, দৈহিক ও মানসিক এই উভয়বিধ সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ এই চিত্রাবলীকে একটা অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ভারতীয় ও বিদেশীয় চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির এই পার্থক্যের কথা ডাক্তার কুমারস্বামী এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন—

অন্তর্জ্জগতের সহিত ইউরোপীয় শিল্পকলার সম্পর্ক অতি অল্পই চোখে পড়ে। ওখানকার চিত্রশিল্পীদের কল্পনাশক্তি বহির্জ্জগতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ভারতীয় চিত্র ও অন্যান্য কলা-শিল্পের দৃষ্টি ও রূপভাবনা চিরদিনই অসীমের ও মানসিক সৌন্দর্য্যের অনুসরণে ব্যগ্র। ভারতের পুরুষ ও স্ত্রীর চিত্র শুধু শারীরিক সৌন্দর্য্য ও দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনের জন্যে অঙ্কিত হয় নি—তার ভেতরের, অন্তর্জ্জগতের উচ্চভাবের আদর্শকে তাতে রূপায়িত করা হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে—যেমন সরস্বতী, প্রজ্ঞাপারমিতা ও তারার মূর্তি আর নটরাজ শিব ও ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি।

বিশ্ববিখ্যাত কলাবিদ্ হাওয়েল সাহেব বলেছেন যে ধ্যানী বুদ্ধের চিত্র বা মূর্তিনির্ম্মাণের পরিকল্পনাও ইউরোপে হওয়া অসম্ভব।

অনেক বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক বলেছেন যে, মুভমেণ্ট পিকচার বা গতিব্যঞ্জক ছবির মধ্যে ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা শিবের তাণ্ডব-নৃত্যের ছবির ন্যায় দ্বিতীয় ছবি আর পৃথিবীতে নেই।

ভারতীয় দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও অনুভূতি রূপ পরিগ্রহ করেছে শিবের বিভিন্ন মূর্তিতে চিত্রে। শিব সংহারকর্ত্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা দুই-ই। নটরাজ শিবের মূর্তিতে যে ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে তা অতুলনীয়।

ভারতের চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে আরো অনেক বলবার আছে, কিন্তু এখানে তার স্থানাভাব। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা একান্ত প্রয়োজন যে আমাদের এ অতুলনীয় জাতীয় সম্পদ সম্বন্ধে আমরা বেশীরভাগই অজ্ঞ ও উদাসীন। বহু শতাব্দীর পরাধীনতা আমাদের সৌন্দর্য্যবোধকে ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। তারই ফলে আমরা আমাদের অনেক গৌরবের জিনিষ, বিশেষ করে ভারতীয় চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সম্যক্ সচেতন নই।

কিন্তু আশার কথা এই যে অবনীন্দ্রনাথ, কুমারস্বামী প্রভৃতি গুণী জ্ঞানীদের প্রাণপণ চেষ্টায় ভারতীয় চিত্রকলা আজ সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ভারতবর্ষ আজ পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পকলা অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব্ব গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভারতীয় শিল্পের এই সব অভ্যুদয় এ দেশবাসীর জন্যে অশেষ কল্যাণ বহন করে আনবে।

সরলা রায়

[জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ—২৬শে নবেম্বর ১৯৪৭]

শ্রীপ্রভাবতী রায়

মাতৃসমা যে পূজ্যনীয়া মহিলার আজ জন্মতিথি তাঁহার বিষয় কিছুই বলিবার যোগ্যতা আমার নাই। কিন্তু তাঁহার নিকট আমি মায়ের স্নেহযত্ন পাইয়াছি, অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি। তাঁহার প্রভাবে আসিয়া তাঁহারই শিক্ষার গুণে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছি—তাঁহার প্রতি আমার হৃদয় চিরদিনই শ্রদ্ধাভক্তিতে পূর্ণ। সেই শ্রদ্ধাভক্তির অঞ্জলি নিবেদন করিবার জন্যই আজ দুই-চারিটি কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি।

বি-এ পাস করিবার পরই আমি তাঁহার সংস্পর্শে আসি। এক দিন মায়ের সঙ্গে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সেই দিনই তিনি মায়ের নিকট আমাকে তাঁহার কোনও কাজে লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং বাবাকেও অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিলেন। তখন আমার বয়স অল্প, বাবা আমাকে চাকরী করিতে দিতে ইচ্ছুক নন; নিজেও তেমন সাহস পাই না, কিন্তু মিসেস্ রায় এমন করিয়া বাবাকে লিখিলেন যে, বাবা আর আপত্তি করিতে পারিলেন না।

যে কারণেই হোক, ব্রাহ্ম স্কুলের তখন অতি বিশৃঙ্খল অবস্থা। গবর্ণমেণ্টের হাতে দিবার কথা চলিতেছে, নতুবা স্কুল উঠিয়া যাইবে। এমন সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কাহারও কাহারও মনে হইল মিসেস্ রায়ের হাতে স্কুলের ভার অর্পণ করিলে, গবর্ণমেণ্টকে না দিলেও স্কুলটি পুনর্ব্বার সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষ মিসেস্ রায়ের নিকট এই প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি স্কুলের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। সেই দিন হইতেই তিনি স্কুলের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমাকে ব্রাহ্ম স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে দিলেন। আমি তখন সবে কলেজ হইতে বাহির হইয়াছি, কাজের কিছুই জানি না—মিসেস্ রায় নিজ হাতে আমাকে কাজ শিখাইতে লাগিলেন। শিক্ষয়িত্রীদের ন্যায় তিনিও ঠিক সাড়ে দশটায় স্কুলে উপস্থিত হইতেন; স্কুল ও হোষ্টেলের সব বিষয়ের খুঁটিনাটি যাবতীয় সংবাদ লইতেন এবং যেখানে যে ভাবে কাজ করিতে হইবে, সে বিষয়ে সকলকে যথাযথ উপদেশ দান করিতেন। রূঢ়তা কাহাকে বলে, মিসেস্ রায় জানিতেন না। সকলের সঙ্গেই সর্ব্বদা হাসিমুখে মিষ্ট ভাষায় কথা কহিতেন, কাজেই কেহ কখনও তাঁহার কথায় রুষ্ট হইত না। কেহ আপত্তিকর আচরণ করিলে ক্রোধপ্রকাশ না করিয়া এমন দৃঢ়ভাবে তাহাকে নিষেধ করিতেন যে, সে ঐ কাজ আর কখনও করিতে সাহস পাইত না। শিক্ষয়িত্রীরা সকলে স্কুলের কাজ শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতেন, মিসেস্ রায়ের কাজ কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে কখনও শেষ হইত না। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতেন। এক এক দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন, রাত্রি ১২টা ১টা পর্য্যন্ত আমাকে লইয়া কাজ করিতেন।

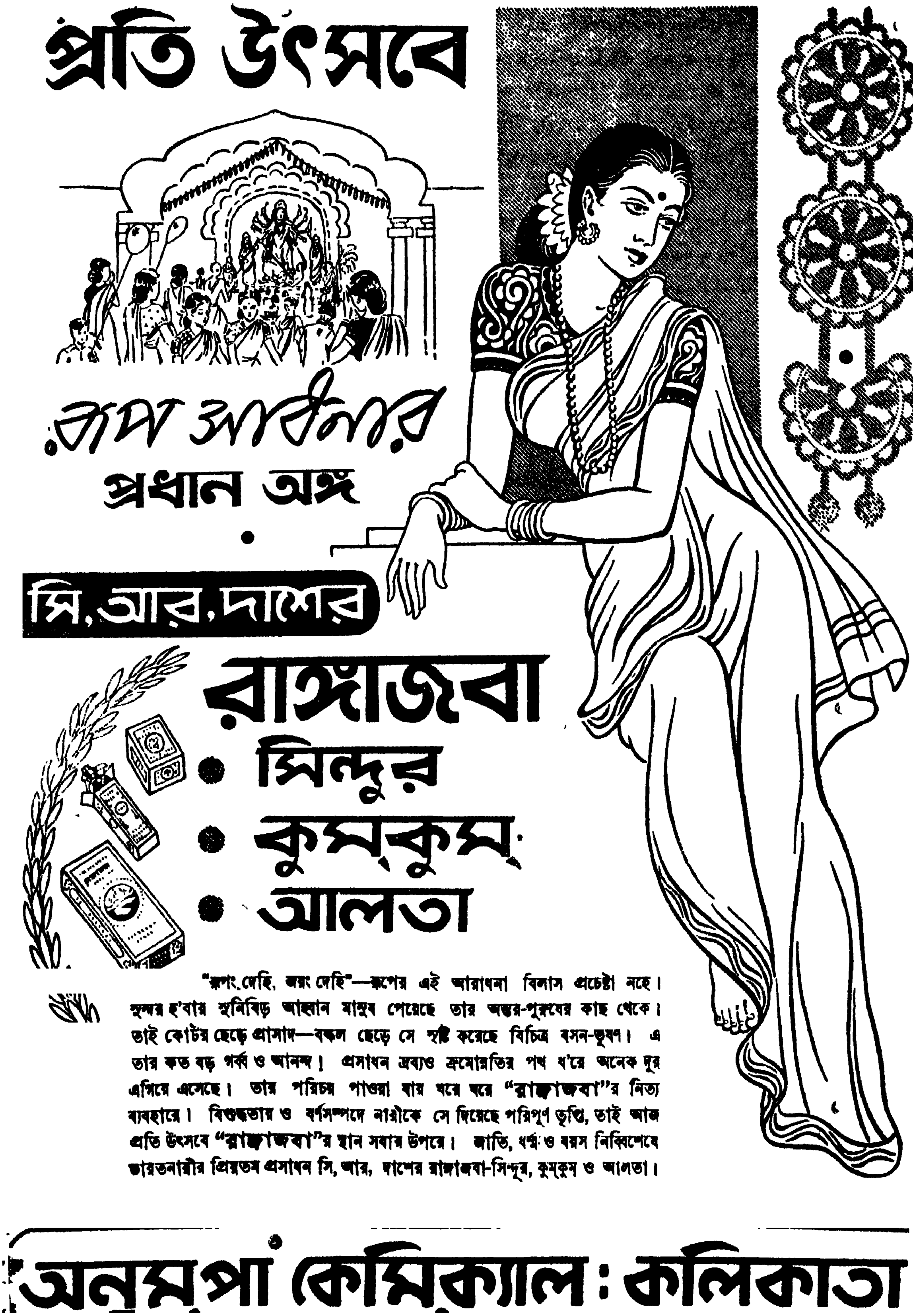
স্কুলের বিশৃঙ্খল অবস্থাকে সুশৃঙ্খলায় আনিতে অনেক সময় অধ্যবসায়, ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের আবশ্যক হইয়াছিল। মিসেস্ রায় দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল। স্কুলে সর্ব্ববিষয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলাকে বাধ্যতামূলক করাতেই এ ধরণের বিরূপ সমালোচনা সুরু হইয়াছিল। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের দেশে নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং শৃঙ্খলার বড়ই অভাব। ইহা আমরা আজও ছোট বড় সকল কাজেই দেখিতে পাই এবং এ দুটির অভাবের জন্যই আমরা অনেক কাজে অকৃতকার্য্য হই। তথাপি নিয়মানুবর্ত্তিতার মূল্য আমরা আজও বুঝিলাম না, জীবনে কৃতকার্য্য হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথম যে আমাদের সময়ানুবর্ত্তিতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে শিখিতে হইবে, ইহা আমরা আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। উপরন্তু এইগুলি সম্বন্ধে কেহ পীড়াপীড়ি করিতে গেলেই কি গৃহে, কি বাহিরে—সর্ব্বত্র গোলযোগ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

ব্রাহ্ম স্কুলে ঠিক এরূপই হইয়াছিল। মিসেস্ রায় ছিলেন বিলিতী ধরণে শিক্ষিতা, বিদেশী আবহাওয়ায় প্রতিপালিতা। বিলিতী সমাজের ভাল জিনিষগুলি তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়স হইতেই উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং জানিতেন যে স্কুলে সময়ানুবর্ত্তিতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং শৃঙ্খলার রক্ষা না হইলে ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষালাভ হইবে না—শিক্ষার প্রধান অঙ্গই বাদ পড়িয়া যাইবে এবং স্কুল পরিচালনা করাও অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তাই

তিনি সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা ও অপবাদ অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। কত সময়ে কত মিথ্যা অপবাদ ও নিন্দা ব্যক্তিগতভাবেও আমাদেরই কানে আসিত, কত তীব্র সমালোচনা কাগজে বাহির হইত, আমরা সবই তাঁহাকে বলিতাম ; তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। ঐ সকল নিন্দাবাদ যে তাঁহার মনে কোনও রেখাপাতই করিত না, তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম। তিনি যেমন কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপন কর্ত্তব্য দৃঢ়ভাবে পালন করিয়া যাইতেন, আমাদেরও তেমনি উপদেশ দিতেন। এই শিক্ষাটুকু তাঁহার প্রভাবে আমরা বিশেষভাবে পাইয়াছিলাম এবং তাঁহার সেই উপদেশই এ যাবৎ পালন করিয়া আসিতেছি—তাহার জন্য আজ পর্য্যন্ত অনুতাপ করিতে হয় নাই। তাঁহার হৃদয় ছিল আকাশের ন্যায় উদার,ধরিত্রীর ন্যায় সহিষ্ণু এবং সমুদ্রের ন্যায় গভীর। তাই তিনি অনাত্মীয়কেও সহজেই আত্মীয় মনে করিতে পারিতেন, মানুষের দোষত্রুটী সহজেই ক্ষমা করিতে পারিতেন এবং নিন্দা, প্রশংসা বা অন্য কোনও কারণেই সহজে বিচলিত হইতেন না। এই সকল গুণ না থাকিলে কোনও বৃহৎ কার্য্যে কি কেহ সফলতা লাভ করিতে পারে ?

অভিভাবকেরা কোনও অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেই তিনি তাঁহাদের দেখা করিতে আসিতে বলিতেন। অনেক সময়ে দেখিয়াছি কেহ হয়ত অভিযোগ জানাইবার উদ্দেশ্যে বিরূপ মনোভাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু মিসেস্ রায়ের সঙ্গে আলোচনা করিয়া নিজের ভুল ত বুঝিয়াছেনই, উপরন্তু তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া প্রসন্ন চিত্তে বাড়ী ফিরিয়াছেন।

স্কুলের কর্তৃপক্ষের কোনও ভুল বা ত্রুটি হইয়া থাকিলে মিসেস্ রায় তাহা সরল ভাবে জানিয়া লইয়া তাহার প্রতি-বিধান করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করি-তেন। যাহার কাছে যে প্রকার সাহায্য পাইবেন বলিয়া বুঝি-তেন, তাহার নিকটে সেইরূপ সাহায্যই চাহিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার কোনও অভিমান বা অহঙ্কার ছিল না। স্কুলটি ব্রাহ্মসমাজের, প্রত্যেক শিক্ষাস্থলই জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য, তাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়, ইহা মনে করিয়াই তিনি কাহারও নিকট সাহায্য চাহিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল অসাধারণ। সেই প্রভাবের জন্য তিনি সাহায্য চাহিয়া কখনও বিমুখ হন নাই। ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের আর্থিক অবস্থাও তখন শোচনীয়। সরকারী সাহায্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্কুলের উন্নতি দেখাইতে না পারিলে আর পাওয়া যাইবে না। অর্থ বিনা উন্নতি সম্ভবপর নয়, তাই মিসেস্ রায় অর্থসংগ্রহ করিতে বাহির হইলেন। কোনও স্থান হইতেই তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হয় নাই। তাঁহার অদম্য উৎসাহ, উদ্যম ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া সকলেই তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্য মুক্তহস্তে দান


প্রতি উৎসবে
রূপ সজ্জার
প্রধান অঙ্গ
সি. আর. দাশের
রাঙ্গাজবা
সিন্দুর
কুমকুম
আলতা
"রূপং দেহি, জয়ং দেহি"—রূপের এই আরাধনা বিলাস প্রচেষ্টা নহে। সুন্দর হ'বার সুনিবিড় আহ্বান মানুষ পেয়েছে তার অন্তর-পুরুষের কাছ থেকে। তাই কোটর ছেড়ে প্রাসাদ—বল্কল ছেড়ে সে সৃষ্টি করেছে বিচিত্র বসন-ভূষণ। এ তার কত বড় গর্ব্ব ও আনন্দ। প্রসাধন দ্রব্যও ক্রমোন্নতির পথ ধ'রে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। তার পরিচয় পাওয়া যায় ঘরে ঘরে "রাঙ্গাজবা"র নিত্য ব্যবহারে। বিশুদ্ধতায় ও বর্ণসম্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি, তাই আজ প্রতি উৎসবে "রাঙ্গাজবা"র স্থান সবার উপরে। জাতি, ধর্ম্ম ও বয়স নির্ব্বিশেষে ভারতনারীর প্রিয়তম প্রসাধন সি, আর, দাশের রাঙ্গাজবা-সিন্দুর, কুমকুম ও আলতা।
অনুপমা কেমিক্যাল : কলিকাতা

করিতে লাগিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই স্কুলের চেহারা বদলাইয়া গেল। সেই ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়কে তিনি যে রূপ দিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে যে আদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই রূপ, সেই আদর্শ লইয়াই উক্ত বিদ্যালয়টি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ত্রিশ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে শিক্ষাদান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কিছু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি, সেই জন্য দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, ব্রাহ্ম স্কুলের মত মেয়েদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিরল। এই স্কুলের মত নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা বাঙালা মেয়েদের আর কয়টি স্কুলে আছে জানি না। ইহার নৈতিক আদর্শ অতি উচ্চ স্তরের।

বৎসর দেড়েকের মধ্যেই মিসেস্ রায় ঐ স্কুলের ভার তাঁহার সুযোগ্যা জ্যেষ্ঠা কন্যার হস্তে সমর্পণ করিয়া বিলাত গেলেন। সেখানে বহু স্থান পর্য্যটন করিয়া বিস্তৃত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু, ব্রাহ্ম স্কুলের ভার আর গ্রহণ করিলেন না। তখন তিনি একটি নূতন স্কুল অন্য আদর্শে গঠন করিবার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। লরেটো স্কুলে বাঙালী মেয়েদের স্থান পাওয়া চিরদিনই কষ্টকর। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অনুরাগী ধনীরা তাঁহাদের কন্যা বা আত্মীয়াদিগকে লরেটোতে শিক্ষা দিতে চাহিলেও ভর্তি করিবার সময় তাহাদের অনেককে নানা কারণে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইত। তাই মিসেস্ রায় লরেটোর আদর্শে বাঙালী মেয়েদের একটি নূতন স্কুল স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়া আত্মীয়বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

স্ত্রী-শিক্ষা তখন দেশের সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। আদর্শ বিভিন্ন হইলেও, মেয়েদের শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে গৃহ ও সমাজের কাজের উপযোগী করা, তাহাদিগকে পরিবারে ও সমাজে সম্মানের অধিকারী করা যে প্রত্যেক অভিভাবকেরই অবশ্যকর্ত্তব্য, এ কথা তখন আর কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। মিসেস্ রায়ের নূতন স্কুলের আদর্শের সহিত সকলের সহানুভূতি না থাকিলেও তাঁহাকে সমর্থন ও সাহায্য করিবার লোকও একেবারে অভাব হয় নাই। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, উৎসাহ ও অসাধারণ কর্ম্মক্ষমতা লোককে এমনই আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, এ ক্ষেত্রে ক্রমে সবই তাঁহার জুটিয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বহু অর্থসংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন, ছাত্রীরও অভাব হইল না, শিক্ষয়িত্রীরও অপ্রতুল হইল না। এই স্কুলটি তিনি তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্বর্গীয় গোপালকৃষ্ণ গোখলের নামে উৎসর্গ করিয়া ইহার নাম রাখিলেন গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল। এই স্কুলেই পরে কলেজও খোলা হয়। মিসেস্ রায়ের উদার হৃদয়ে প্রাদেশিকতার স্থান ছিল না। তাই তাঁহার স্কুল ও কলেজে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল প্রদেশের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের সাদরে

গ্রহণ করা হইয়া থাকে। মেয়েদের স্কুলগুলি মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত, এই ধারণা লইয়া মিসেস্ রায় প্রথমে ব্রাহ্ম স্কুলে ও পরে গোখ্‌লে মেমোরিয়াল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র মহিলাদের দ্বারাই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা যে ভ্রান্ত ছিল না, তাহা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এখন মেয়েদের প্রায় সব স্কুল-কলেজে মেয়েরাই শিক্ষাদান করিয়া থাকেন এবং তাহার ফলাফলও আজ কাহারও অবিদিত নাই। এই প্রথা প্রচলিত করিয়া মিসেস্ রায় যে স্ত্রীজাতির কি উপকার সাধন করিয়াছেন সে বিষয়ে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি শিক্ষিতা মহিলাদের একটি কর্মক্ষেত্র খুলিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে সমাজের নিকট সম্মানিতা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার চিন্তা সর্ববিষয়েই স্বাধীন ছিল। ইন্‌স্পেক্‌ট্রেস্ বা ডিরেক্টর কর্তৃক অনুমোদিত পুস্তক তিনি সকল শ্রেণীর জন্য উপযোগী মনে করিতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র, রজনীকান্ত, প্রভৃতি পুরাতন লেখকদিগের ভাব ও ভাষা তিনি বড় পছন্দ করিতেন এবং শিশু ও অল্পবয়স্ক বালিকাদের পক্ষে উক্ত লেখকদিগের পুস্তকই উপযোগী মনে করিয়া যথাসম্ভব ঐ সকল পুস্তকই নিজের স্কুলের জন্য নির্ব্বাচন করিতেন। ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধেও তাই। তিনি নিজের পছন্দমত পুস্তক নির্ব্বাচন ও পাঠ্য নির্দ্দেশ করিতেন। শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ তাঁহার এই সকল কাজে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতেন না—মিসেস্ রায়ের উপর তাঁহাদের প্রগাঢ় আস্থা ছিল।

এইরূপে নানাভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার দান যে কত বড়, তাহা বিচার করিবার সময় বোধ হয় আজও উপস্থিত হয় নাই। সবে মাত্র তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। এখনও তাঁহার অভাব আমরা যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন বঙ্গবাসী স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এই মহীয়সী মহিলার মহান্ অবদানের কথা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তঃকরণে স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম জানাইবে।

ধ্বনিধ্বংসে ধ্বনির জন্ম

শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী

প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় ধ্বনির ধ্বংসে ধ্বনির জন্মের কথা এখানে কিছু বলব। বিষয়বস্তুটি কঠিন হলেও সহজবোধ্য করে বলবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করব।

সংস্কৃতে "প্রাচীন" আর "অর্ব্বাচীন" বলে দুটি শব্দ আছে। তাদের অর্থ যথাক্রমে, পুরানো ও নূতন। "প্রাক্" অর্থাৎ পূর্ব্ব, আবার তা থেকে "প্রাচী," অর্থাৎ পুবদিক। আর্য্যদের দৃষ্টিতে পুবদিক সবচেয়ে আগের বা প্রাথমিক সেই অর্থই "প্রাচীন" শব্দে চলে গিয়ে তাকে—আগের বা পুরানো—এই অর্থযুক্ত করল। আবার, নূতন কি পরবর্ত্তী—বোঝাতে এই প্রাচীন শব্দের পূর্ব্বে নঞর্থক অ যোগ করে "অপ্রাচীন" শব্দের সৃষ্টি হ'ল এবং প্রয়োগ হতে লাগল। প্রাকৃত-প্রভাবের যুগে 'প্রাচীন' ঠিক প্রাচীনই রয়ে গেল, যা খেল অপ্রাচীন। 'মেটাথিসিসে'র বশে শব্দটির মধ্যেকার র-ফলা রেফ্ হয়ে এল এগিয়ে, আর, "প"-টা মোটা হয়ে "ব" বনে গেল। ফলে রূপ বেরুল "অর্ব্বাচীন"। পঞ্চতন্ত্রের নীলবর্ণ শৃগালের মত এই শব্দটিরও বাহ্যিক ছদ্ম আবরণের মধ্যে তার আসল রূপটি লুকিয়ে আছে। আরও এই রকমের নীলবর্ণ শৃগাল-জাতীয় শব্দ ভারতীয় আর্য্য-ভাষাগুলিতে অনেক রয়ে গেছে। উদাহরণ-স্বরূপ, বৌদ্ধ-মত "হীনযান" আর "মহাযানে"র ইতিহাসটাই বলি। কথা দুটি আসলে ছিল "হীনজ্ঞান", "মহাজ্ঞান"—কিনা, সামান্য উপলব্ধি আর মহান্ উপলব্ধি। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষায় "জ্ঞান" শব্দের উচ্চারণ ছিল "জ-ঞান"। "হীন" আর "মহা" ঠিকই রইল, কিন্তু বিপর্য্যয় ঘটল 'জ্ঞানের' বেলায় অর্থাৎ—"জ-ঞান"-এর ঞ-ধ্বনি গেল হারিয়ে, পড়ে রইল "জ্-ন"। কিংবা এও বলা চলে যে "ঞ"-র প্রভাবে "জ", তার বর্গীয়ত্ব হারিয়ে "য" হয়ে পড়ল। অবশ্য "ঞ"-র অনুনাসিকত্বও ঘুচে গেল। ফলে বেরিয়ে এল "যান" শব্দ। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় গাড়ী অর্থে "যান" শব্দের প্রচলন আগে থেকেই ছিল। সুতরাং কোনও অসুবিধা হ'ল না। লোকে "হীনযান" ও "মহাযান" শব্দের অর্থ করে নিলে—ছোট গাড়ী আর বড় গাড়ী।

"বরাহমিহির" নামেও জনসাধারণের ভুল বোঝার বেশ একটু ছিটেফোঁটা রয়ে গেছে। পুরাকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অনেকের "মিশ্র" উপাধি থাকত, তদনুযায়ী নামটা আসলে ছিল "বরাহমিশ্র"। খুব সম্ভব তিনি সিংহলে ফলিত-জ্যোতিষ, কি সামুদ্রিক বিদ্যা শিখতে গিয়েছিলেন,—কেননা তখনকার দিনে সিংহলে ঐ সকল বিদ্যার খুবই চর্চ্চা হ'ত। ফলে, সিংহলী বা এলু ভাষায় ও সিংহলবাসীদের মুখে মুখে তাঁর "মিশ্র" উপাধি "মিহ্-র" হয়ে দাঁড়াল। তারপর তিনি যখন জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিখে নিজের দেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে যৌগিক শব্দটির "মিহ্-র" অংশটা নেহাত নিরর্থক মালুম হওয়ায়, তারা সেটাকে "মিহির" করে নিলে। মিহির কথাটা আগে থেকেই এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। "মিত্র" বা "মিথ্-র" শব্দের ধ্বনি-ধ্বংসের ফলে শব্দটি উৎপন্ন হয়েছিল,যার অর্থ করা হ'ত সূর্য্য। বরাহ-পণ্ডিত জ্যোতির্ব্বিদ বলে লোকে সেই ছাপটা ওই উপাধির মধ্যে জড়িয়ে দিলে। ফলে তিনি সমাজে বরাহমিহির বলেই পরিচিত হতে লাগলেন। বরাহমিহিরের সময়ের বহু আগের যুগে বৈদিক সংস্কৃত-ভাষী আর্য্যেরা এতদ্দেশের আদিম অধিবাসীদের "ক্ষুদ্র" অর্থাৎ হীন বা ছোট লোক আখ্যা দিয়েছিল। "ক্ষুদ্র" শব্দের উচ্চারণ তখন ছিল "ক্ষুদ্র।" পরে আর্য্য অনার্য্য-মিশ্র হিন্দু জাতির মুখে তাই "শূদ্র" হয়ে দাঁড়াল। তাতে ব্যাপারটা হ'ল এই—অজ্ঞাতসারে তারা নিজেরাই নিজেদের ছোটলোক আখ্যায় অভিহিত করতে লাগল। "অজস্র" শব্দের উৎপত্তিও ভারি মজার। প্রাকৃত যুগের মাঝামাঝি কোন সময়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসী আর্য্যভাষী দলবিশেষের মুখে মধ্য-ভারতীয় আর্য্যভাষার "সহস্র" শব্দটি—যার অর্থ হাজার, উষ্মত্ব হারিয়ে "হজ্স্-র" হয়ে দাঁড়ায়। তা থেকে কালক্রমে "অজস্র" রূপের অবতরণ ঘটল। আবার পারস্য থেকে "হজ্র্হর" থেকে উদ্ভূত 'হাজার' রূপ এসে জুটে ঐ একই সংখ্যাবাচক শব্দটিকে বেশ তারিফ করে তুলল। ফলে আমাদের হ'ল বিপদ,—কাকে রাখি আর কাকে ফেলি।

পুস্তক-পরিচয়

প্রেমরাগ—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

কাব্য-সম্পর্কে চিরকালীন ধারণার পরিবর্ত্তনের একটি বিশেষ প্রয়াস কিছু দিন হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে। সাহিত্যে তখনই নূতন যুগ আসে, বিশিষ্ট সৃষ্টি-প্রতিভা যখন স্বতঃই ভিন্ন পথ বাছিয়া লয়। পরিবর্ত্তনের জন্যই পরিবর্ত্তন প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ নয়। অত্যন্ত সজ্ঞান প্রয়াস সাহিত্যকে বিকৃত করে। 'প্রেমরাগে'র কবি নব যুগ আনিবার চেষ্টায় নিজের শক্তিকে বৃথা ব্যয়িত করেন নাই। যুগধর্ম্মের প্রভাব মানিয়া লইয়া তিনি কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস পাঠকের নিকট সুপরিচিত। 'ইয়োরোপা' লিখিয়া তিনি সাহিত্য-খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। 'প্রেমরাগ' তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থখানি অনেকগুলি গীতি-কবিতার সমষ্টি। কবির অনুভূতি যখন পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, কাব্য তখনই সার্থক হইয়া উঠে। প্রেম মানুষের মনের একটি মৌলিক বৃত্তি। ইহা সকল দেশ এবং সকল কালের মানব-মনকে আলোড়িত করে। এই প্রেমের অনুভূতিকে দেবেশচন্দ্র নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 'কবিপরিচিতি'তে শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বলিতেছেন, "কবিতাগুলির অধিকাংশই ব্যক্তিগত বা আদর্শগত প্রণয়ধর্ম্মী, কিন্তু সচরাচর দৃষ্ট প্রেমের কবিতার সুলভ রূপ হইতে এগুলি স্বতন্ত্র ও ভিন্নগোত্রীয়। মাত্র দুঃখবিলাস নয়, সুষ্ঠু বলিষ্ঠতায় ইহাদের জন্ম।" 'বন্ধু' কবিতায় কবি বলিতেছেন,

"আমার জীবনে বিলায়ে জীবন তব
দিয়েছ আমারে তোমার অমৃত আনি।"

অন্যত্র বলিতেছেন,

"স্পর্শ-দাও, আলো দাও, সুখসুধাধারা—
তুমি বঁধু মম, তুমি মোর ধ্রুবতারা।"

'ভূমিকা'য় শ্রীকালিদাস রায় লিখিতেছেন,—"কবি আত্মহৃদয় বিগলিত প্রেমরাগকে নিজে তন্ময় হইয়া উপভোগ করিয়াছেন এবং সেই উপভোগের আনন্দকে এই কবিতাগুলিতে বাণীরূপ দিয়াছেন।"

'ভালবাসি' কবিতায় পাই,

"আপন অন্তর হতে মধুরে উচ্ছ্বাসি
পুষ্প-সম বাণী ফুটে।"

'স্বপ্নরাত্রি'তে পাই

"শুধু দুটি কথা,
বাণীতে ধরিবে রূপ রাত্রি-নীরবতা।"

কাব্য প্রাত্যহিক জীবনের আলোচনা নয়। ইহা মানস-জীবনকে প্রতিফলিত করে। প্রেম মনের ধর্ম্ম।

"জীবনে আলোক রেখা অন্ধকারে করেছিনু ধ্যান,
নয়নে অমৃতবর্ত্তি জ্বালি' তুমি দিয়েছ সন্ধান।"

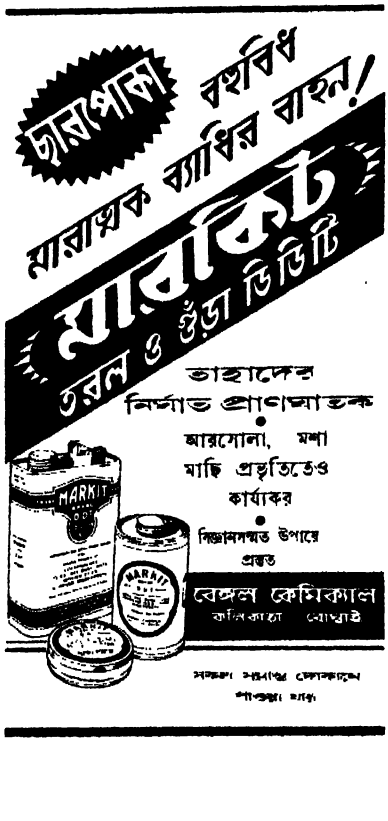
'ব্যথা'য় আছে, "ছিল মরু মালঞ্চ করেছি হিয়া।"

"অশ্রুর কালিমা হতে বহু ঊর্দ্ধলোকে" কবি বাঞ্ছিতার দেখা পাইয়াছেন।

"এ হৃদয়ে চিরকাল থেকো—
মিশেছে তোমার মাঝে শেষ কথা মোরে মনে রেখো।"

অন্তরের সাড়া পাই বলিয়া "প্রেমরাগ" সার্থক হইয়াছে। কবিতাগুলি পাঠকের-চিত্তকেও নন্দিত করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা



কষ্মৈ দেবায়—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি১৩, গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা। দাম তিন টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ।

উপন্যাসখানির পটভূমি—স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষ, ঘটনাস্থল—বাংলাদেশ, পাত্রপাত্রী—বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদী কয়েকটি চরিত্র। বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষে বিপ্লবী বাংলার তরুণ মনে যে বিক্ষোভ জাগিয়াছে—তাহার সঙ্গে সখ্য ভালবাসা আশা-অভিমান প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মিলিয়া এই কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। দুটি নারী-চরিত্র এক কেন্দ্রে সংলগ্ন হইয়াও মিলিতে পারে নাই; আত্মকেন্দ্রিকতার প্রাচীরে বাধা পাইয়া ভিন্নমুখী হইয়াছে। এই কেন্দ্রাতিগ নারী-মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লেখকের তুলিকায় সুন্দর হইয়াই ফুটিয়াছে। দীপালী ও চিত্রা চরিত্র দুটিকে আপাত-বিচ্ছিন্ন মনে হইলেও—পরস্পরের পরিপূরক। কোন কোন স্থলে বিতর্ক দীর্ঘ হওয়ায় গল্পের বাঁধুনি কিছু শিথিল হইয়াছে—কিন্তু প্রধান চরিত্রগুলি অস্পষ্ট হয় নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

হে বিহঙ্গ মোর—শ্রীনরেন্দ্র দে। দি বুক হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য নয় সিকা।

১৯৪২ হইতে ১৯৪৫-এর মধ্যে বাংলার সমস্যা সবচেয়ে ঘনীভূত হইয়া ওঠে। যুদ্ধ, বিপ্লব, দমননীতি, দুর্ভিক্ষ—এই চারের সমন্বয়ে সমাজ-জীবন একেবারে ওলট-পালট হইয়া যায়। এই চরম দুর্বিপাকের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনাই জাতিকে মাথা সিধা করিয়া দাঁড়াইতে সচেষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু সে পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। সম্ভবও ছিল না। সমাজের নৈতিক জীবনে দুই দিক দিয়া ভাঙন ধরিয়েছিল, এক দিকে নিদারুণ বুভুক্ষা, এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়ন, অন্য দিকে চোরাবাজারের অমোঘ আকর্ষণ, রাতারাতি লক্ষপতি হইয়া উঠিবার লোভ এবং সুযোগ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসখানি রচিত। লেখক যে বেশ দরদ দিয়াই দেশের এই বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন তাঁহার লেখার মধ্যে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনার বর্ণনা তথা বিন্যাসের মধ্যে কুশলী শিল্পীর হাতের ছাপ আছে, যদিও জায়গায় জায়গায় একটু কাঁচা।

লেখক আদর্শবাদী তো বটেই, সেই সঙ্গে বেশ সবলভাবে আশাবাদীও, যদিও সেজন্য কম রিয়ালিষ্ট নহেন। তাঁহার কাছে বিপর্যয় খুবই সত্য, তবু মানুষের সর্ব্বজয়ী আত্মা তাহার অনেক ঊর্ধ্বে; তাহার আশা অনেক, শক্তি অফুরন্ত, শত পরাজয়ের মধ্যেও সে অন্তিম বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়া চলে। গল্পের নায়ক সুধানের মধ্যে এই সত্যটি বেশ ভালো ভাবে ফুটিয়াছে।

বাংলার চরম দুঃখের দিনের এই আলেখ্যটুকুর পাঠকসমাজে কদর হওয়া উচিত।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মহাত্মা গান্ধী—রোমাঁ রোলাঁ। অনুবাদক ঋষি দাস। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বঙ্গানুবাদ ১৯৪৭। দাম আড়াই টাকা। পৃ. ১৩৩।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পরে রোলাঁ গান্ধীজীর সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এতদিনে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত [illegible] পরে রোলাঁর মতের পরিণতি ঘটিয়াছিল এবং

বর্তমান বইখানি লিখিবার সময়েও তিনি গান্ধীজীর নেতিমূলক কর্ম-প্রচেষ্টাকে যেমন ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, গঠনকর্মের ভিতর দিয়া গান্ধীজী যে নূতন জীবন রচনার প্রচেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি তত দূর আকৃষ্ট হয় নাই। তৎসত্ত্বেও রোলাঁর মত একজন মনীষী ও প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর দৃষ্টিতে গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের সকলের পক্ষে শিক্ষণীয়।

অনুবাদকের দায়িত্ব অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে বিষয়বস্তুই অত্যন্ত গূঢ় বা জটিল, সেখানে ব্যাখ্যা না করিয়া পুরাপুরি লেখকের ভাব জ্ঞাপন করা কঠিন। অথচ অনুবাদকের পক্ষে সেরূপ অধিকার গ্রহণ করা উচিত নয়। এইরূপ নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত ঋষি দাসের অনুবাদ সার্থক হইয়াছে। ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পাঠকের মনে কোন পীড়া জন্মায় না।

গীতা-বোধ—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। অনুবাদক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমারচন্দ্র জানা। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। গুজরাতী সংস্করণ ১৯৩০, বঙ্গানুবাদ ১৯৪৭। পৃ. ।৷৴০—১১০। দাম বার আনা, বিশেষ সংস্করণ, এক টাকা।

গান্ধীজী লবণ-সত্যাগ্রহের পর যখন যরোড়া জেলে বন্দী ছিলেন তখন অল্পে অল্পে গীতার একটি সরল উপক্রমণিকা লেখেন। প্রতি অধ্যায়ের তাৎপর্য অত্যন্ত সরল গুজরাতী ভাষায় জনসাধারণের বোধের জন্যই লেখা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ডক্টর ঘোষ এবং কুমার বাবু উভয়ে সেই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। ভাষা সরল হইয়াছে, এবং পড়িতে কোথাও বাধে না।

গান্ধীজীর ধর্ম্মমতের সম্যক্ পরিচয় যাঁহারা লাভ করিতে চান, অথবা গীতার শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া সরলভাবে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে বইখানি পড়া বিশেষ দরকার।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

গান্ধীজী কি চান—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বসু। সাহিত্যিকা, ১২৩, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৮০। মূল্য ১৲ টাকা।

এই পুস্তকে প্রকাশিত ছয়টি প্রবন্ধ ধারাবাহিক রূপে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। মহাত্মাজীর কর্ম্মপন্থা ও আদর্শ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক এমন কি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও ভ্রান্ত ধারণা আছে। লেখক গান্ধীবাদের নানা দিক বিশ্লেষণ করিয়া এই ভ্রমাত্মক ধারণাগুলি দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কার্য্যকেও অনেকে পুরাতনের প্রতি অস্বাভাবিক আগ্রহপ্রসূত বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহার কুটীর-শিল্প-উন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রগতিবিরোধী বলিয়া ভয় পান। অধ্যাপক বসু মহাশয় অতি সুষ্ঠু আলোচনাদ্বারা বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছেন যে, বর্ত্তমান হুজুগের সময় যাহা ভাল ও মানবকল্যাণকর বলিয়া চলিতেছে এবং আরও ব্যাপকভাবে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহার মধ্যে অনেক গলদ আছে। এই গলদ এড়াইয়া চলিতে পারিলেই তবে ভারতের প্রকৃত মঙ্গল হইবে, অন্যথা নহে।

দেশের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন এবং প্রকৃত গান্ধী-দর্শনের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বিজ্ঞানী ও বীজাণু—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা, ঢাকা। পৃ. ৭৪; মূল্য দশ আনা।

অনেকেরই ধারণা—যথেষ্ট অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুসজ্জিত পরীক্ষাগার ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে সাফল্য লাভ করা দুরূহ; কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রেই একথা সত্য নহে। আসল কথা হইতেছে—একান্ত অনুসন্ধিৎসাপ্রবৃত্তি এবং অদম্য অধ্যবসায়। ইহারই বলে জ্ঞানান্বেষী প্রবল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও সত্যের সন্ধান পাইয়া থাকেন। বিজ্ঞানের বহুবিধ ক্ষেত্রেই এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। গোড়ায় যাঁহারা জীবাণু-জগতের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাহাদের রহস্যসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন তাঁহাদের সকলেরই কাহিনী গভীর কৌতূহলোদ্দীপক। "মাইক্রোব্ হাণ্টারস্" নামক বইখানিতে তাঁহাদের অভিনব আবিষ্কার সম্পর্কিত ঘটনাবলী বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার বাংলা ভাষায় তাঁহাদেরই কথা বেশ প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করিয়াছেন। লেখার ভঙ্গী সহজ ও সুন্দর। বইখানি পড়িয়া প্রত্যেকেই তৃপ্তি লাভ করিবেন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দেশ যাদের ডাকে—শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত। মুখার্জ্জী গুপ্ত এণ্ড কোং। ৪৫, ধর্ম্মতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া। দাম ১৷৵০।

ছেলেদের উপন্যাস। যদিও প্লটের মধ্যে বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই তথাপি সহজ ভঙ্গীতে বলিবার কৌশল লেখকের আয়ত্ত থাকায় উপন্যাসখানি ভাল লাগিল।

বিশ্বরূপা—সম্পাদক: শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১০।

সঙ্কলন-গ্রন্থ। খ্যাত এবং অখ্যাত বহু লেখকের লেখা গ্রন্থখানিতে স্থান লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক সুকুমার সেনের প্রবন্ধ দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানি শুধু প্রবন্ধসঙ্কলন হইলে সম্পাদনার বিরুদ্ধে বলিবার তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু গল্প এবং কবিতাও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে অথচ সেদিকে সম্পাদক মহাশয় বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। অজস্র ছাপার ভুল বিরক্তিকর।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী—শ্রী গোপাল ভৌমিক। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, মূল্য এক টাকা।

ভারতবর্ষ আজ পূর্ণ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়াছে। আজকের দিনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার অবদানের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করা উচিত। মুক্তিপাগল বাঙালী একদিন ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিবার জন্য গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছিল। এই বিপ্লব-আন্দোলনে বাংলার যে সমস্ত তরুণকে আত্মাহুতি দিতে হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। মুক্তি-সংগ্রামে বাংলার প্রথম শহীদ হওয়ার গৌরব প্রফুল্ল চাকীরই প্রাপ্য—ক্ষুদিরাম ছিলেন বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতির মেদিনীপুর শাখার কর্ম্মী। লেখক সরকারী রিপোর্ট এবং ক্ষুদিরামের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী অপরূপা দেবীর রচনাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গুপ্ত সমিতির কার্য্যক্রম ও স্বরূপ বিশ্লেষণে লেখক বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের মর্ম্মকথাটি অনুধাবন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৪৬ সনের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বারেও বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কেন্দ্রে সেবা পূজা ধর্মালোচনা সভা ও বৈঠকাদি নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে সর্ব্বসাধারণের জন্য কয়েকটি ধর্ম্মসভার এবং মঠ ও মিশনের অন্তেবাসিগণের মধ্যে ২৯৪টি ধর্ম্মালোচনা বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছে। মিশনের বিভিন্ন বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইতেছে। ইহার পুস্তকাগারে মোট পুস্তকসংখ্যা ১৩৪১। মোট চব্বিশখানা মাসিক পত্রিকা ও দু'খানা দৈনিক সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে পাঠাগারে গৃহীত হয়।

মিশন কর্ত্তৃক তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে মোট ৬৫৬২৭ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মিশনের হাসপাতালে সর্ব্বসমেত ২১১৫ জন রোগীকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এবার মোট ১০ জন ছাত্র বিবেকানন্দ হোমিও বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে।

রামহরিপুর অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্য্য নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উহাকে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। মোট ছাত্র সংখ্যা ১২৩ জন।

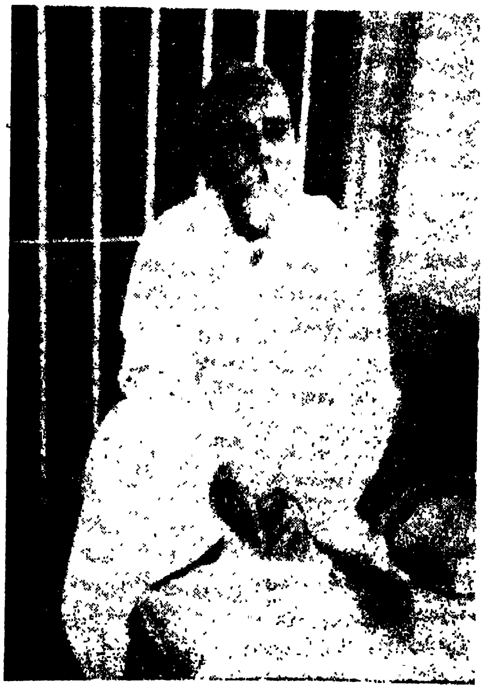
কাল পাথর, আন্দার থোল ও গঙ্গাজলঘাটী থানার ১২টি গ্রামের ৭২০টি পরিবারের ১৪০০ লোকের মধ্যে মোট ২৯।৯ সের চাউল, ৪৩৮খানা কাপড় ও ৫৫টি কোট বিতরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ব্যাপকভাবে আরো নানা জনহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

চাংড়ীপোতা গ্রামে প্রসূতি-সদনের ভিত্তি স্থাপন

গত ১৬ই নবেম্বর চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত চাংড়ীপোতা গ্রামে "রাজলক্ষ্মী প্রসূতি ও শিশুসদনে"র ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মেজর জেনারেল এ. সি. চাটার্জ্জির পৌরোহিত্যে এক সভা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক, 'ডাক্তার বসুর লেবরেটরী'র স্বত্বাধিকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য ও অর্থসচিব শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী এই নব-পরিকল্পিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া ডাঃ বসুকে তাঁহার জনহিতৈষণার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া গ্রামবাসীদেরও দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন। ঐ অনুষ্ঠানেরই অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে ডাঃ বসুকে তাঁহার ৭৪ বৎসর পূর্ণ হওয়ার জন্য অভিনন্দিত করা হয়। ইতিপূর্ব্বে পল্লী উন্নয়নের জন্য তিনি যে অর্দ্ধলক্ষাধিক মুদ্রা দান করিয়াছেন সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সে কথার উল্লেখ করেন। স্বাস্থ্যধর্ম্মসঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু সভায় উপস্থিত ছিলেন।



প্রসূতিসদনের ভিত্তিস্থাপন। দণ্ডায়মান দক্ষিণ দিক হইতে দ্বিতীয় ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু



সুধীরচন্দ্র লাহিড়ী
('বিবিধ প্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য)



সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের সংবর্দ্ধনা। দ্বিতীয় সারিতে উপবিষ্ট বাম দিক হইতে পঞ্চম শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনা

সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনার্থ খ্যাতনামা ব্যায়ামকুশলী প্রফেসর শ্রীবিজয় মল্লিকের উদ্যোগে বিগত ২৩শে নবেম্বর "মল্লিকস হেল্‌থ হোম" নামক ক্লাবে এক চায়ের আসরের আয়োজন হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রফেসর মল্লিকের শিষ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক বিবিধ ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শিত হয়। এ সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হইলে অশোকবাবু শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বাঙালী যুবকদের সর্ব্বাগ্রে শরীর সামলাইবার জন্য অবহিত হইতে অনুরোধ করেন। অশোকবাবু নিজে বিবিধ ব্যায়াম ও ক্রীড়াদিতে সুনিপুণ। বাঙালী যুবকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা ও নানা ব্যায়াম-কৌশল প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি এক সময় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেহানুশীলন সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামূলক বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ, ডাঃ অমর মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আদিত্য গুপ্ত, শ্রীশিশির কুমার কর, শ্রীসন্তোষকুমার দে, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণ উক্ত আসরে যোগদান করিয়াছিলেন।

রাঁচিতে স্কাউট ক্যাম্প

দ্বিতীয় কলিকাতা বয়স্কাউট এসোসিয়েশনের উনবিংশতি দল শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে বিগত অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে রাঁচিতে ক্যাম্পের অনুষ্ঠান করে। ব্যারিষ্টার শ্রীসীতানাথ পালের রাঁচিস্থ ভবনে স্কাউটদের শিবির সংস্থাপিত হয়। হুড্রু ও জোনা জলপ্রপাত এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে ব্রতীবৃন্দ প্রভূত আনন্দ লাভ করে। সম্ভ্রান্ত নাগরিক শ্রীঅর্জ্জুন আগরওয়ালা ইহাদিগকে তাঁহার সুবিস্তৃত ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া চা-পানে আপ্যায়িত করেন। বিহারের লাট-প্রাসাদেও অতিথিগণ সহ ব্রতীবৃন্দ নিমন্ত্রিত হন। অবিলম্বে পাটনা যাওয়ার প্রয়োজন সত্ত্বেও বিহারের গভর্ণর শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম সপরিবারে প্রায় ত্রিশ মিনিট কাল ইহাদের মধ্যে থাকিয়া স্কাউট, কাব ও রোভারদের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করেন। উনবিংশ গ্রুপের ব্রতীবৃন্দ ছাড়াও লাটপ্রাসাদের অতিথিগণের মধ্যে সেখানকার পুলিস কমিশনর, গবর্ণরের এ. ডি. সি., কবি শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কৌন্সিলর শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণরের একটি নাতিদীর্ঘ সুন্দর অভিভাষণের পর সেখানকার আধ ঘণ্টার চিত্তাকর্ষক কার্য্যসূচী সমাপ্ত হয়।

পরলোকে হরেন্দ্রনাথ বসু

গত ১লা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর) বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানের অন্যতম জনপ্রিয় উৎসাহী কর্ম্মী হরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯০২ সনে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী কর্ম্মে লিপ্ত হন। জীবনের শেষ আঠার বৎসর কাল তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হরেন্দ্রনাথ খেলাধুলায় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। যৌবনে তিনি একজন ফুটবল খেলোয়াড় রূপে খ্যাতিলাভ করেন। সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অসামান্য প্রীতি ছিল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও সৌজন্যগুণে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। কলিকাতার সন্নিকটস্থ সোদপুরে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। তিনি তথাকার বিভিন্ন ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা





ভাস্কর ও শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী কৃত মালাবার-কবি কুমার আসানের প্রস্তরমূর্তি

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৭শ ভাগ, ২য় খণ্ড | পৌষ, ১৩৫৪ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে নেতৃত্ব সমস্যা

পশ্চিম-পঞ্জাবে, কাশ্মীরে, হায়দরাবাদে ও অন্যান্য পাকিস্থান সংযুক্ত বা প্রভাবিত প্রদেশে যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুদিগের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং তাহাদের মনোবৃত্তি এবং কার্য্যক্রমের অভ্রান্ত ও সুস্পষ্ট নির্দ্দেশও পাওয়া গিয়াছে। সেই সঙ্গে আমাদের বুঝিবার ও বিচার করিবার সময় আসিয়াছে যে কংগ্রেসের মনোনীত নেতৃবর্গের ঐ শত্রুদিগের মুক্ত ও গুপ্ত অভিযান ব্যর্থ করিয়া এই রাষ্ট্রের গঠন ও পরিচালনার জন্য সম্যক্ ও যথার্থ বুদ্ধিবিবেচনা ও ক্ষমতা আছে কিনা। আচার্য্য কৃপালনী তাঁহার ইস্তফাপত্র দাখিল করার সময় যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে স্বয়ং রাষ্ট্রপতিই সে বিষয়ে বিশেষ সন্দিগ্ধ। যে বিশেষ উদ্দেশ্য ও সংকল্প লইয়া বর্ত্তমান কংগ্রেস গঠিত, চালিত ও উদ্দীপিত হইয়াছিল তাহা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া ভারতে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করা। আজ সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে। কেননা ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে এ দেশের ব্রিটিশ শাসক ও শোষকবর্গ দেশ বিভাগ করিয়া, অশেষ নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়া এমন এক পরিস্থিতির সূচনা করিয়া গিয়াছে যাহা অতি বিচক্ষণ, অতি নিপুণ রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ রাষ্ট্রপরিচালকবর্গের পক্ষেও বিষম জটিল। উপরন্তু এখন বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতিও ক্রমেই অত্যন্ত শঙ্কাজনক ও সমস্যাবহুল হইয়া পড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় ভারত-রাষ্ট্রের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের ভার বহন করিবার যোগ্যতা ও ক্ষমতা আমাদের নেতৃবর্গের কাহার কতটা আছে তাহার বিচার এখনই প্রয়োজন, কেননা বিলম্বে এইরূপ কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বিপাকে পড়িয়া নষ্টপ্রায় হইতে পারে।

অনেকের ধারণা, সময় পাইলে এই নেতৃবর্গ সমস্ত সামলাইয়া অনেক অসাধ্য সাধনে দেশকে ঠিকপথে চালাইয়া লইয়া গন্তব্য স্থলে পৌঁছাইয়া দিতে পারিবেন। এইরূপ ধারণা যে শুধু ভ্রান্ত তাহা নহে, বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে উহা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমাদের বুঝা উচিত যে আমরা সময় দিতে প্রস্তুত থাকিলেও বিপক্ষ তাহাতে রাজী হইতে পারে না। পাকিস্থান ও কাশ্মীরের ঘটনাবলী তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আমাদের জানা উচিত যে বিদেশী শোষকবর্গের বিচারে আমাদের ধ্বংস ও পরাজয় যত শীঘ্র হয় তত শীঘ্রই তাহাদের মঙ্গল, এবং ইহাও জানা উচিত যে আমাদের অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টির অভাব, দীর্ঘসূত্রিতা ও অন্যান্য দুর্ব্বলতা যত দিন আছে তত দিনই আমাদের শত্রুপক্ষের সুবর্ণ সুযোগ। তাহারা যে সে সুযোগ ত্যাগ করিয়া, আমাদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য দেখাইয়া আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি-বিবেচনা উদ্রেকের অপেক্ষায় অস্ত্রসংবরণ করিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে একথা মনে স্থান দেওয়াই বাতুলতার পরিচায়ক। অন্য দিকে তাঁহারা সেই সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়া আমাদের দুর্ব্বলতার অবকাশে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবে যদি আমরা অহিংসা, আদর্শবাদ বা অন্য অজুহাতে কেবলমাত্র আক্ষেপ ও নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া তোষণনীতির পথেই চলিতে থাকি, তবে সময় যতই বহিয়া যাইবে বিপক্ষ ততই সবল সক্ষম হইবে এবং আমরা ততই দুর্ব্বল ও অক্ষম হইতে থাকিব। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সময় অক্ষমের সহায়ক নহে, সংহারক।

বস্তুতঃপক্ষে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র এখন যে পরিবেশের মধ্যে রহিয়াছে, তাহাতে রাষ্ট্রনেতৃত্বে দৃঢ়চেতা, অভিজ্ঞ বাস্তববাদীর প্রয়োজন চতুর্দ্দিকে, কেবলমাত্র আদর্শবাদ সম্বল করিয়া কল্পনাক্ষেত্রে বিচরণ করার অবকাশ আর নাই। দেশের বাহিরে শত্রু ও দেশের ভিতরেও নানাপ্রকারের অসংখ্য প্রচ্ছন্ন শত্রু রাষ্ট্রের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় ফিরিতেছে। এখন বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও অতি দ্রুত গতিতে রাষ্ট্রকে সবল ও সক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে। নচেৎ দেশের উন্নতির আশা ত সুদূরপরাহত হইবেই, দেশকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করাই অসম্ভব হইয়া উঠিবে। দেশের লোক যাঁহাদিগকে রাষ্ট্রনেতৃত্বে বরণ করিয়াছে তাঁহাদের বুঝিতে হইবে যে দেশ এখন প্রতি পদে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহাদের নিকট হইতে কার্য্যতঃ যোগ্যতার পরিচয় ও সবল সক্ষমতার নিদর্শন চাহিতেছে। স্তোকবাক্যে জনসাধারণ আর ভুলিবে না। দেশ এখন চাহিতেছে প্রতিশ্রুতির পূরণ।

বর্ত্তমান গণতন্ত্রের যুগে দেশের জনসাধারণের সমষ্টিগত সম্মতিই (sanction) রাষ্ট্রের প্রবলতম শক্তি। এই শক্তিকে

সংযত ও নিয়মানুবর্ত্তী করিয়া চালনা করিতে পারিলেই রাষ্ট্রের মঙ্গল, না হইলে বিপদ। জনমতকে উপেক্ষা বা অবহেলা করিয়া চলিলে হয় সে শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া রাষ্ট্রকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে নচেৎ সে শক্তি বিপরীতগামী হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লবে দেশকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে। চীনদেশে আজ এই দুর্ব্বিপাকের পূর্ণ নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। আমাদেরও বিচারের সময় আসিয়াছে যে আমাদের নেতৃবর্গই বা রাষ্ট্রকে কোন্ পথে লইয়া যাইতেছেন। তাঁহারা দেশের জনসাধারণের যে গরিষ্ঠ অংশের সম্মতি, সহায়তা ও সমর্থনের ফলে আজ রাষ্ট্র-পরিচালনার অধিকার লাভ করিয়াছেন, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সেই সমর্থকদিগের পূর্ণ বিশ্বাস ও অবিমিশ্র সম্মতি তাঁহারা রাখিতে পারিতেছেন কিনা। রাষ্ট্রে এখন চতুর্দ্দিকে অভাব-অভিযোগের স্রোত বহিতেছে। লক্ষ লক্ষ সর্ব্বহারার হা-হুতাশ ও অভিশাপে লোকের মন ক্লিষ্ট, শত-সহস্র ধর্ষিতা ও অপহৃতা নারীর শোচনীয় অবস্থার চিন্তায় জনমত বিচলিত ও বিক্ষুব্ধ। ইহা ছাড়া আছে দুষ্ট স্বার্থান্বেষী চক্রান্তকারীর প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিপ্লব-প্রচেষ্টা। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রের চালক-দিগের যোগ্যতার অগ্নিপরীক্ষার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে।

বাংলায় জনবিক্ষোভ ও তাহার কারণ

বাংলার পরিস্থিতি বিচার ইতিপূর্ব্বেই কয়েক সংখ্যায় আমরা করিয়াছি। এই সংখ্যায় আরও বিস্তারিত বিচার করিবার ইচ্ছা আমাদের ছিল কিন্তু সম্প্রতি 'নিরাপত্তা বিল' লইয়া যে জনবিক্ষোভ ও আন্দোলন হইয়া গিয়াছে তাহাতে আমাদের সেরূপ বিচার সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখিতে হই-তেছে। নিজের বুদ্ধিবিচারের উপর অপরিসীম বিশ্বাসের ফলে প্রফুল্লবাবু পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দলসমূহ তাঁহার গদী-দখলের চেষ্টায় এইরূপ জনবিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছে। এই চক্রান্তে বাংলার অপরিণত মস্তিষ্ক যুবশক্তি ও পেশাদার বিক্ষোভ ও আন্দোলনকারীদিগের নিয়োগ করিয়া যাঁহারা এই গোলমাল বাড়াইয়া তুলিয়াছেন সেই মহাশয় ব্যক্তিগণের হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা যাওয়ার অর্থ দেশের সর্ব্বনাশের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করা। সেরূপ অবস্থায় আমরা প্রথমেই বলিতে বাধ্য যে এই ব্যাপারে দেশের লোক ভুল পথে চলিয়াছে।

রাষ্ট্র এখন আমাদের হাতে। রাষ্ট্রচালক যদি ভুল বা অন্যায় করে তবে তাঁহাকে সে ভুল সংশোধনে বা পদত্যাগে বাধ্য করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাকে শাস্তিবিধান করিবার অজুহাতে রাষ্ট্রের নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া দেশে বিশৃঙ্খলার স্রোত বহাইতে যে চাহে সে দুরাচার রাষ্ট্রের আরও বিষম শত্রু। বাংলার যুবক ও তরুণ দলের এখন বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের এইরূপ উদ্দাম উচ্ছ্বাসের ফলে কিছুকাল যাবৎ দেশের অবনতিই হইতেছে এবং তাহাদের নিজেদের ভবিষ্যৎও ঘোরতর অন্ধ-কারাচ্ছন্ন হইতেছে। বাংলার ছাত্রমণ্ডলী কুটিল চক্রান্তকারী মাত্রেরই হাতে কলের পুতুল হইয়া দাঁড়াইতেছে ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয়।

কিন্তু অন্য দিকে ইহাও ঠিক কথা যে প্রফুল্লবাবু দেশের লোককে সন্দেহের অবকাশ না দিলে তাহাদিগের বিশ্বাস ও আস্থা পূর্ব্বেকার মতই তাঁহার প্রতি থাকিত এবং সে অবস্থায় ঐরূপ জনবিক্ষোভ সৃষ্টি করিতেও কেহ সাহস পাইত না।

ঘোষ মন্ত্রীসভার চার মাস

ডাঃ ঘোষের মন্ত্রীসভা আজ চার মাস যাবৎ পশ্চিম বঙ্গের পরিচালক। ইহার মধ্যে বক্তৃতা ও বিবৃতির তুবড়ীবাজী অনেক ছুটিয়াছে কিন্তু জাতির কল্যাণকর একটি কাজও হইয়াছে বলিয়াও আমরা দেখিতে পাইতেছি না। দেশের চতুর্দ্দিকে যে সব বিপদ ঘনাইয়া উঠিতেছে তার অন্ন প্রভৃতি, ঘরের পাশে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে সাহস ও বিশ্বাস সঞ্চারিত করিবার আয়োজন, উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রভৃতি কোন গঠনমূলক কাজ আরম্ভ হইবার নিদর্শনটুকুও এই চার মাসে পাওয়া গেল না। শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে কয়েক জন মামুলী লোক লইয়া একটি মামুলি কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং তাঁহারাও যথারীতি "অভিমত" সংগ্রহের সদভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়া-ছেন। ইতিমধ্যে সার্জ্জেন্ট স্কীম অনুসারে কয়েক জনকে বিলাতে ও ভারতে ট্রেনিং দিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের যেটুকু আয়োজন লীগ আমলে হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া দিয়া অন্তরাশ্রমের ত্রিকালজ্ঞ মহাজ্ঞানীদের সুপারিশক্রমে তাঁহাদের মধ্য হইতে জন ছয়েককে আবার নূতন করিয়া শিক্ষা লাভের জন্য ওয়ার্দ্ধা পাঠানো হইয়াছে। সার্জ্জেন্ট স্কীম অনুসারে যতটা কাজ অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে এই ভাবে বাধা না পড়িলে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এত দিনে অনেকটা আগাইয়া যাইতে পারিত। প্রাথমিক শিক্ষার মূল কথা উপযুক্ত 'শিক্ষিত' শিক্ষক, তাহার জন্য সর্বাগ্রে দরকার টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। ভারত-সরকারের চাপে পড়িয়া লীগ গবর্মেণ্ট এইরূপ দুইটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ডাঃ ঘোষ সর্ব্বপ্রথমে উহার মূলোচ্ছেদ করিয়া উহার শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের কয়েক জনকে ওয়ার্দ্ধা পাঠাইয়াছেন। শোনা যাইতেছে ইঁহাদিগকে বিশেষভাবে হিন্দীর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদানের কায়দা আয়ত্ত করিতে হইবে। বাঙালী ছাত্রদের তাহাতে লাভ-লোকসান কি হইবে তাহার বিচার নিষ্প্রয়োজন, অবশ্য প্রফুল্ল বাবুর "উপরওয়ালা"রা খুশী হইতে পারেন।

প্রদেশের দ্বিতীয় সমস্যা শান্তিরক্ষা এবং পশ্চিম বঙ্গ হইতে পাকিস্থানে চাউল চিনি কয়লা কাপড় অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির বে-আইনী চালান নিবারণ। শান্তিরক্ষায় কলিকাতার তরুণ-তরুণীদের আন্তরিক পরিশ্রম, বিপদ বরণ ও আত্মবলি-দানের কৃতিত্ব লইতেছে পুলিস এবং পুলিসের মধ্যে যাহারা ডাঃ ঘোষের প্রিয়পাত্র—তাহাদিগকে বেশী সংখ্যায় উচ্চতম ও ক্ষমতাপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। পুলিসে যে কয়েক জন দক্ষ ও সৎ কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁহাদিগকে এমন সব কাজে দেওয়া হইতেছে যাহাতে কোনরূপ দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ তাঁহারা না পান। কিন্তু যোগ্যতা চাপা থাকে না বলিয়া বর্ত্তমান অবস্থাতেও ইঁহারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শন করিতে-ছেন। ডাঃ ঘোষ এবার বেঙ্গল পুলিস ও কলিকাতা পুলিস একত্র করিয়া কলিকাতা পুলিসের কর্ম্মনিপুণতার দফা নিকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। লীগ আমলে কলিকাতায় ২৪টি

থানার মধ্যে ১৪টি অযোগ্য মুসলমান কর্ম্মচারীদের হাতে পড়ায় শহরবাসীর লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছিল। এবারও ১৪টি থানায় বেঙ্গল পুলিসের অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য লোক আমদানী হওয়ায় শহরে দুর্বৃত্তের উপদ্রব খুব বেশী বাড়িয়া গিয়াছে। মুসলিম লীগের যে সব কর্ম্মচারী ভারতে থাকিয়া ইসলামের সেবা করিবার আগ্রহে পশ্চিমবঙ্গে রহিয়া গিয়াছে, পুলিসের উচ্চতম পদগুলিতে তাহাদিগকে অধিষ্ঠিত রাখা হইয়াছে। পোর্ট এলাকা অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য বে-আইনী দ্রব্যাদির আমদানী-রপ্তানীর কেন্দ্র। সেখানে সবচেয়ে দুর্ব্বল ও লীগের প্রাক্তন থানাধরা এক জন হিন্দু ডেপুটি কমিশনার দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার পাশে দক্ষিণ কলিকাতার ওয়াটগঞ্জ বিভাগে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী লীগওয়ালা একজন মুসলমান এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার নিযুক্ত করা হইয়াছে। পোর্ট এলাকায় ইনি সুপরিচিত এবং উহার অতি নিকটেই তিনি বাস করেন। জোড়াসাঁকো জ্যাকেরিয়া ষ্ট্রীট প্রভৃতি লীগ ঘাঁটি যে এলাকায় অবস্থিত সেখানেও এক জন মুসলমান এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার দেওয়া হইয়াছে।

এক সাংবাদিক সম্মিলনে ডাঃ ঘোষ বলিয়াছেন যে কলিকাতায় পাকিস্থানী গুপ্তচরবৃত্তি চলিতেছে এবং তাহা ধরিবার জন্য নাকি চেষ্টাও হইতেছে। চেষ্টার কিছু নমুনা তো উপরে দেখা গেল। ব্যবস্থার নিদর্শন আরও চমকপ্রদ। শহরের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিসের। এই ব্রাঞ্চে আগে দুই জন ডেপুটি কমিশনার ছিলেন, এখন আছেন তিন জন। তন্মধ্যে আছেন লীগওয়ালা ডেপুটি কমিশনার স্বনামধন্য রেজা সাহেব, এক জন ইংরেজ আসিয়াছেন, উপরন্তু ইংরেজ ও লীগ উভয় শাসককেই যিনি তুষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন তেমনি এক জন হিন্দুও আমদানী হইয়াছেন। স্পেশাল ব্রাঞ্চের নীচের পদগুলিতেও বেঙ্গল পুলিস হইতে লোক আনিয়া ভর্ত্তি করা হইয়াছে। ইহারা বেঙ্গল পুলিসের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী পুরুষ নলিনী মজুমদারের ট্রাডিশন বজায় রাখিবেন। যে পাকিস্থানী গুপ্তচরবৃত্তি বন্ধ করা এবং উহার সংবাদ সংগ্রহ করা স্পেশাল ব্রাঞ্চের এখন সর্ব্বপ্রধান কাজ হওয়া উচিত বিধিব্যবস্থায় তাহার বিপরীতই হইতেছে মনে হয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। গত আগষ্ট মাসে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে এক জন মুসলমান নাবিক বহু অস্ত্রশস্ত্রসমেত ধরা পড়ে। উহার নিকট ডিনামাইট এবং তদপেক্ষা ভয়ানক বিস্ফোরকও পাওয়া যায়। লোকটি ধরা পড়ে তালতলা থানার এলাকায়। তালতলায় তখন বেঙ্গল পুলিসের এক জন সাব-ইনসপেক্টরকে অফিসার-ইন-চার্জ্জের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি ঐ মামলাটি বেমালুম চাপিয়া যান। ম্যাজিষ্ট্রেট বার বার তাঁহাকে তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও তিনি উহাকে হাজতে রাখিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন না এবং ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। পুলিসে যাঁহারা ডাঃ ঘোষের বিশেষ প্রিয়পাত্র আছেন উক্ত অফিসারটি তাঁহাদের বিশেষ অনুগ্রহভাজন, কাজেই ইহার পর তাঁহার শাস্তি না হইয়া প্রমোশনের বন্দোবস্ত হইতেছে। এত বড় অস্ত্র আবিষ্কারের পর উহা অবলম্বন করিয়া স্পেশাল ব্রাঞ্চ পুলিস আরও কোন বাড়ী তল্লাসী বা কাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। কলিকাতা করপোরেশন নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও যথাপূর্ব্বং লীগতোষণ চলিতেছে। নির্ব্বাচকমণ্ডলী ও প্রার্থী আসনের প্রথম যে তালিকা প্রকাশিত হয় তাহাতে একটি ওয়ার্ডে ৮০০ মুসলমানের জন্য একটি আসন ও এক লক্ষ হিন্দুর জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট হয়। ইহা লইয়া আন্দোলন হইলে তালিকা পরিবর্ত্তিত হয় এবং উহাতে সমস্ত ত্রুটি সংশোধিত হয়। দ্বিতীয় তালিকা অনুসারে নির্ব্বাচন হইলে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সুবিধা হইত। লীগ ইহার প্রতিবাদ করে এবং তলে তলে তদ্বিরাদিও চলিতে থাকে। ইহার ফল ফলিতেও বিলম্ব হয় নাই। সৈয়দ নৌশের আলি, ডাঃ আর আহমদ প্রমুখ কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের অভিমত অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং মুসলিম লীগের আবদার ষোল আনা বজায় রাখিয়া ডাঃ ঘোষের তৃতীয় পরিবর্ত্তিত তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

শাসন বিভাগের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও শৈথিল্য এবং বে-বন্দোবস্তের জন্য বিশৃঙ্খলা ক্রমশঃই বাড়িয়া উঠিতেছে। বাড়তি কর্ম্মচারীদের তিন মাসের মধ্যেও কাজ দেওয়া যায় নাই এবং যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে কাজের চেয়ে অকাজ এবং ক্ষতি বেশী হইবে। সেলস ট্যাক্স আপিসে লম্বার বিভাগের উচ্চ ও অডিটার ও একাউণ্ট্যাণ্টদের দেওয়া উচিত ছিল; তৎস্থলে দেওয়া হইয়াছে এক দল সাব-রেজিষ্ট্রার। ইঁহারা ভূমি-আইন কতকটা জানেন এবং হাকিমী করিতে অভ্যস্ত। হিসাব পরীক্ষার কঠিন কাজ ইঁহাদের নিকট আশা করাই বৃথা। ইহার ফল হইয়াছে এই যে জনসাধারণ প্রত্যেকটি জিনিষ চার গুণ দামে কিনিয়া তার উপর টাকায় তিন পয়সা হারে ট্যাক্স দিতেছে কিন্তু উহার অধিকাংশই সরকারী তহবিলে জমা পড়িতেছে না। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ব্যবস্থা-পরিষদের প্রভাবশালী সদস্য অথবা বড় চাকুরীয়াদের আত্মীয়স্বজনেরাই অধিক পরিমাণে সাব-রেজিষ্ট্রার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সেদিক দিয়া ইঁহাদের অনেকেরই মুরুব্বীর জোর এত বেশী যে তাঁহাদিগকে মফঃস্বলে পাঠাইতে চাহিলে সেক্রেটারিয়েটের উচ্চতম পদাধিকারীদের টেলিফোন পাইয়া সেল্‌স কমিশনারকে কাহারও কাহারও বদলীর আদেশ নাকচ করিতে হইয়াছে। এই অবস্থায় আপিসের শৃঙ্খলা থাকে না এবং বিক্রয়-কর আপিসের শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার অর্থ অসাধু ব্যবসায়ী ও দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের পৌষ মাস এবং জনসাধারণের সমূহ ক্ষতি ঘটিতেছে।

সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দ্বারা দেশের যুব-সমাজকে ডাঃ ঘোষ কাজ দিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন

নাই। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের বাস সম্ভব করিতে হইলে পশ্চিমবঙ্গকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে ও শক্তির বাহ্যিক প্রকাশ দেখাইতে হইবে—ইহা আমরা বহু বার বলিয়াছি। পশ্চিমবঙ্গের শক্তির উপর পূর্ব্ববঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে বাঙালীর মর্য্যাদা ও স্বার্থ বজায় থাকা নির্ভর করে। ত্রিপুরার ব্যাপারে দেখা গিয়াছে পাকিস্থানী কর্ত্তারা একমাত্র শক্তির কথাই মানেন।

বিশেষ ক্ষমতা আইন

পশ্চিমবঙ্গের সম্মুখে যখন সহস্র সমস্যা বিদ্যমান, সেই সময়েও ডাঃ ঘোষ বিশেষ ক্ষমতা বিল ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থিত করিয়া আর এক নূতন অশান্তি সৃষ্টি করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই বিল আইনে পরিণত হইলে পুলিসের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা আসিবে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কে হাইকোর্টের ক্ষমতা একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে। বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, আটক, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ প্রভৃতি ব্যক্তিস্বাধীনতার হানিকর সর্ব্ববিধ ক্ষমতা ডাঃ ঘোষ এই আইনের বলে নিজের হাতে আনিতে চাহিতেছেন। শাসনযন্ত্রের গঠন, শাসক ও পুলিস নিয়োগ ও ব্যবহার যে সব নিদর্শন প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে সাধারণের এই সন্দেহ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে ডাঃ ঘোষ নিজ দলের বিরুদ্ধবাদীরা যাহাতে প্রকাশ্য আন্দোলনের দ্বারা মাথা তুলিতে না পারে তার জন্যই এই আইনটি পাস করাইয়া লইতে চাহিতেছেন।

বীরভূম নির্ব্বাচনে ডাঃ ঘোষ ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নৈতিক দিক হইতে দেখিতে গেলে তাঁহারই সম্পূর্ণ পরাজয় হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সপ্তাহখানেকের বেশী প্রচারকার্য্যের সুযোগ দেন নাই। তাহা সত্ত্বেও বিপদের আশঙ্কায় কংগ্রেস-সভাপতি আচার্য্য কৃপালনীর নিকট হইতে এই মর্ম্মে ফতোয়া আনাইতে হয় যে তাঁহার বিরোধিতা করার অর্থ দেশের বিরুদ্ধাচরণ। কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্র কংগ্রেসের মানইজ্জৎ রক্ষার জন্য তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছে। মন্ত্রীরাও কেহ কেহ সদলে বীরভূম যাত্রা করেন। ইহাতেও অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া তিনি হুগলী ও বর্দ্ধমানের যে সব নেতাকে অতিশয় অন্যায় ও অসঙ্গত ভাবে স্থানীয় মন্ত্রীসভা গঠনের সময় বাদ দিয়াছিলেন তাঁহাদের শরণাপন্ন হন। সপ্ততিপর বৃদ্ধ শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজার প্রতি ডাঃ ঘোষ সবচেয়ে বেশী অন্যায় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা মনে না রাখিয়া পাঁজা মহাশয়কে লইয়া যাওয়া হয় নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে এবং তাঁহার যাওয়ার পর ঐ ভোটদাতাদের মন ফিরিতে আরম্ভ করে। হুগলীর শ্রীপ্রফুল্ল সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অকুণ্ঠভাবে ডাঃ ঘোষকে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন প্রকাশ করেন। কম্যুনিষ্ট কর্ম্মী, সুভাষব্রিগেড দল প্রভৃতি এবং অনেক ছাত্রকেও বীরভূমে পাঠানো হয়। এইরূপ প্রবল চেষ্টার পর প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ঘোষ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু তাঁহার হিন্দু মহাসভা নির্ব্বাচিত অজ্ঞাতনামা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় এগার হাজার ভোট পান। এত দিন দেশের নিয়ম এই ছিল যে কংগ্রেস-প্রার্থীর বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়াইতেন তাঁহার জামানতের টাকা বাজেয়াপ্ত হইত। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের গত নির্ব্বাচনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হুগলী জেলার একজন অল্প পরিচিত কর্ম্মীর নিকট অনুরূপ ভাবেই পরাজিত হন আমাদের যত দূর মনে পড়িতেছে, বীরভূমে যে আসনে ডাঃ ঘোষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন উহাতে শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায় বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। শ্রীমিহির চট্টোপাধ্যায়কে অযথা গণ-পরিষদে উন্নীত করিয়া ঐ আসনটি খালি করা হয় এবং উহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ মনে করিয়া ডাঃ ঘোষ সেখানে গিয়াছিলেন। সেখানে ঐরূপ নাস্তানাবুদ হইয়াও যদি প্রফুল্লবাবু জনমতের গতি না বুঝিয়া থাকেন তবে তাঁহাকে কে বুঝাইবে?

সৌমেন ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বিশেষ ক্ষমতা বলে, অস্ত্রবলে গবর্ন্মেন্টের উচ্ছেদ সাধন চেষ্টার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে, কিন্তু প্রথমেই জিজ্ঞাসা সৌমেনের শক্তি কতটুকু? কয়জন লোক এবং কয়টা অস্ত্র তাঁহার দলে আছে বা সন্ধান পাওয়া গিয়াছে? উহার দ্বারা একটা কংগ্রেস গবর্ন্মেন্ট ধ্বংস করিয়া রাষ্ট্র দখল করা কি চূড়ান্ত পাগলামির কথা নহে? ব্রহ্মদেশে উ স সৌমেন ঠাকুরের চেয়ে অনেক শক্তিশালী, অনেক বেশী অস্ত্রশস্ত্র লোকজন তাঁহার আছে, দেশের একটা বড় দলও তাঁহার সমর্থক। তৎসত্ত্বেও তিনি আউঙসান ও অপর কয়েক জন মন্ত্রীকে হত্যা করিতে পারিয়াছেন মাত্র, গবর্ন্মেন্ট দখল ত করিতে পারেনই নাই; বরং খুনের দায়ে তাঁহাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইয়াছে। আউঙসানের কথা মনে করিয়া অস্ত্রের কথা শুনিলেই ডাঃ ঘোষ যদি প্রাণের ভয়ে বিচলিত হন তবে অবশ্য আলাদা কথা, কিন্তু তিনি যদি সাহসের ও নিষ্ঠার সহিত প্রধানমন্ত্রী থাকিয়া দেশ শাসন করিতে চাহেন তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে আধুনিক যে কোন গবর্ন্মেন্টের শক্তি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে জনপ্রিয়তার উপর, অস্ত্রের বা পুলিসী সহচরের উপর নয়। আজ যদি ডাঃ ঘোষ গঠনমূলক কাজে প্রবৃত্ত হইতেন, দেশের সজ্জন বিচক্ষণ লোকের সৎপরামর্শ লইয়া কাজ করিতেন, কর্ম্মঠ লোকদের উৎসাহ ও কাজ দিতেন, শিক্ষা বিস্তার ও উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য আত্মনিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে দেখিতেন সৌমেন ঠাকুর বা ঐরূপ কাহারও দ্বারা তাঁহার গবর্ন্মেন্ট ভাঙিবার চেষ্টা হইতেছে ইহা জানিবামাত্র দেশের জনশক্তিই তাহাদের সংযত করিবার বা শাস্তিদানের ভার লইত। অথবা বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে এবং সেই ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত হইয়াছে ইহা বুঝিলে দেশের লোক বিনা বাধায় সে ক্ষমতা মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে তুলিয়া দিত।

পশ্চিম বাংলার সীমান্ত রক্ষা

বাংলাদেশ দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বাংলার সঙ্গে পশ্চিম বাংলার সম্বন্ধ আজ বন্ধুত্বের নয়। যে ভাবের প্রেরণায় বাংলাদেশে এই নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তার মধ্যে সদ্ভাব বন্ধুভাব ছিল না, এখনও নাই। সুতরাং আজ যদি পূর্ব্ব বাংলার প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন চীৎকার করিতে থাকেন যে তাদের নূতন রাষ্ট্র শত্রুপরিবেষ্টিত এবং টাকার জোরে শত্রুপক্ষ তার গলা টিপিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা হইলে আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু চিন্তিত হইবার আমাদের কারণ আছে, যখন দেখি যে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রিমণ্ডলী এই পট-পরিবর্ত্তনের অবস্থা সম্বন্ধে এক প্রকার নির্বিকার। ব্রিটিশ শাসনের সময়ে বাংলাদেশের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের কোন দায়িত্ব ছিল না। বাংলাদেশের লোকে পায়ের উপর পা তুলিয়া নিজের দেশের রক্ষা সম্বন্ধে নির্ব্বিকার থাকিবার শিক্ষা পাইয়াছিল গুর্খা, শিখ, পাঠানের উপর নির্ভর করিয়া। সেইরূপ ১৫ই আগষ্টের পরেও দেখিতেছি, সর্দার বলদেব সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ আপনার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছেন। স্থানীয় লোক পূর্ব্বে---ব্রিটিশ যুগে---যেমন দেশের সীমান্ত-রক্ষা সম্বন্ধে অজ্ঞ ও নিরুৎসাহ ছিল, আজও সেই তুরীয় অবস্থায় আছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী তাঁর রাষ্ট্রের মুসলিম গণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন দেশরক্ষার জন্য কিন্তু ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এরূপ কোন কিছুই করিতে পারিতেছেন না। পূর্ব্ববঙ্গে খাদ্যাভাব আছে, তার তুলনায় পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা ভাল। পূর্ব্ববঙ্গের বস্ত্র-সঙ্কট আরও কঠিন। মুসলিম জনতার মনে এই বিষয়ে কোন ক্ষোভ যে নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহারা রাষ্ট্রের রক্ষা সম্বন্ধে সচেতন; তাহাদের ন্যাশনাল গার্ড অনেক ক্ষেত্রে পুলিসের কাজ করিতেছে, তাহাদের উৎসাহের আতিশয্যে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিমণ্ডলীকে অনেক সময় লজ্জা পাইতে হয়; কিন্তু এই উৎসাহ তাঁহারা দমন করেন না। এই উৎসাহ সহস্র হস্ত হইয়া রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষা করে; সহস্র চক্ষু সজাগ রাখিয়া রাষ্ট্রের শত্রুর গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখে। পশ্চিম বাংলায় ঐরূপ গণ-জাগরণ নাই; ১৫ই আগষ্টে যাহা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের অবহেলায় শুকাইয়া গিয়াছে। গণশক্তি আজ পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্রের পরিচালকদের নিকট বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে নিরাপত্তা বিল প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাই ইহার প্রমাণ। অথচ এই গণশক্তির উৎসাহ-উদ্দীপনা কত সহজে রাষ্ট্রের সেবায় লাগান যাইত। দেশবাসীকে সংযত হইয়া হুকুম তামিল করিয়া যাইতে বলা হইতেছে। কিন্তু কোন কর্ম্মের নির্দ্দেশ নাই। বাঙালী যুবক আজ দেড় শত বৎসরের অসামরিক জাতি বলিয়া তাহার কপালে যে কলঙ্কের টীকা টিপিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার অপমান মুছিয়া, দেশ-রক্ষায় গৌরবের পথ অধিকার করিবার সুযোগ পাইতে চায়। সে যে অধৈর্য্য হইয়া, ডাক শুনিতে না পাইয়া, কাজে-অকাজে মাতিয়া উঠিয়াছে তাহার জন্য রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ দায়ী। তাঁহারা এই যুব-শক্তির সম্মুখে কোন আদর্শ ধরিতে পারিতেছেন না যাহার মধ্যে বাঙালী যুবক শুনিতে পাইবে রণদেবতার দুর্জ্জয় আহ্বান। এতদিন সে গোপনে এই আদর্শের সেবা করিতে গিয়া প্রাণ দিয়াছে। আজ সে চায় গৌরবে মাতৃভূমির সীমান্ত রক্ষায় প্রাণ দিতে। চারি শত মাইল বিস্তৃত সর্পিল সীমান্ত রেখায় গ্রামে গ্রামে সংগঠনের ব্যবস্থা হইলে বাংলার যুবশক্তি একটা কর্ত্তব্যের সন্ধান পাইত; কলিকাতা মহানগরীর রাস্তায় রাস্তায় স্লোগান তুলিয়া নিজের শক্তিক্ষয় করিত না। পশ্চিম পঞ্জাবের শাসক-সম্প্রদায় স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব সীমান্তে নূতন নূতন গ্রামের পত্তন করিতে হইবে; দৈর্ঘ্যে তাহা হইবে প্রায় তিন শত মাইল ভাওয়ালপুর রাজ্য পর্য্যন্ত; প্রস্থে হইবে দশ হইতে পনর মাইল। এই গ্রামে জমায়েত করা হইবে সৈনিক পরিবার। পশ্চিম বঙ্গের পূর্ব্ব সীমান্তের গ্রামে গ্রামে এরূপ একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং এই অঞ্চলের গ্রামবাসীকে নূতন রক্ষীদল গড়িয়া তুলিতে হইবে।

ভারত-রাষ্ট্রের প্রকৃতি

ধর্ম্মের নামে পাকিস্থানীরা আমাদের দেশকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়াছে। এই ভাবে তাহারা মুসলিম নেশনের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়া বড়াই করে। তাহার জন্য তাহাদের ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করিতে হয় নাই; ইংরেজ সাহায্য করিয়া তাহাদের এই স্বাধীনতা দিয়া দিয়াছে। তাহারা হিন্দু নামে অন্য একটি নেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছে, তাহাদের রক্তপাত করিয়াছে, তাহাদের ধন-সম্পদ লুটিয়াছে, তাহাদের অপমান করিয়াছে। এই অপকর্ম্মে উৎসাহী ছিল সেখানকার মুসলমানেরা যেখানে তাহারা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ; যেখানে কোন ন্যায়ের যুক্তিতে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। আজ সেই স্থানের মুসলমানদের অবস্থা হইয়াছে শোচনীয়। যে হিন্দু প্রাধান্যের ধুয়া তুলিয়া তাহারা দেশের বুকের উপর বিভাগের কালি কাটিয়া দিয়াছে, সেই হিন্দু প্রাধান্য অটুট, অনড় হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের উপর। ভারতবর্ষের বুক হইতে তাহারা কয়েক টুকরা প্রদেশ ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে এই যুক্তিতে যে তাহারা সেই সব অঞ্চলে সংখ্যা-গরিষ্ঠ, এবং এই সংখ্যা-গরিষ্ঠতাই তাদের নেশনত্বের পরিচয় ও প্রমাণ। আজ তাহারা সেইজন্য শরিয়ত মতে তাহাদের পাকিস্থানে রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থা প্রচলন করিতে পারে। প্রায় দুই কোটি অ-মুসলমান তাহাদের প্রদেশে আছে। তাহাদের অধিকার সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। শরিয়ত মতে অমুসলমানদের অধিকার কি হইতে পারে তৎসম্বন্ধে পাকিস্থানের শাসকসম্প্রদায় নীরব। পশ্চিম পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত

প্রদেশের অভিজ্ঞতার আলোকে ইহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিলে বলিতে হয় যে পাকিস্থানে মুসলমান ছাড়া কাহারও ধন-জন-মান রক্ষা পাইতে পারে না। বর্ত্তমান জগতে নাগরিক বলিতে যাহা বুঝায় সেই অধিকার সেখানে মুসলমান ছাড়া অপর কাহারও প্রাপ্য নয়। এই অবস্থায় এই সমস্যা স্বভাবতই দেখা দিয়াছে—ভারতবর্ষে যে পাকিস্থানীরা রহিয়া গিয়াছে তাহাদের অধিকার ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা এখনই হওয়া দরকার। ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু অকুণ্ঠ ভাষায় বলিতেছেন যে ভারত-রাষ্ট্রে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের একচেটিয়া অধিকার থাকিবে না। ভারত-রাষ্ট্রের প্রকৃতি হইবে ধর্ম্ম-প্রভাব মুক্ত (secular)। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষে তিনি সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন।

গান্ধীজী দুই বিরুদ্ধ দেশের নীতি-কথা স্বীকার করেন না। তিনি ভারত রাষ্ট্রে পাকিস্থানীদের অধিকার সম্বন্ধে সাম্যের কথা বলেন ; ভারত-রাষ্ট্রে তাহাদের অধিকার অন্য কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে, এই কল্পনা সহ্য করিতে পারেন না। এই বিষয়ে পাকিস্থানীদের মনোভাব অনিশ্চিত দ্বিধা-বিভক্ত। এই বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত করিবার জন্য করাচী নগরীতে সর্ব্ব-ভারতীয় মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় পরিচালক সভার অধিবেশন হয়। এই মন্তব্য লিখিবার সময় ইহা প্রকাশিত হয় নাই। পণ্ডিত নেহরু ও গান্ধীজী যে নীতি প্রচার করিতেছেন তাহার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না। পাকিস্থানীরা অ-মুসলমানের মুণ্ডপাত করিবে এবং সুযোগ পাইলে ভারত-রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, এই আচরণ সহ্য করিয়া চলিলে আমাদের রাষ্ট্র বিপন্ন হইবে, কখনও সবল হইয়া উঠিতে পারিবে না।

পাকিস্থানীদের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে কাশ্মীরের উপর তাহাদের আক্রমণ উপলক্ষে। আজ পর্য্যন্ত কোন মুসলিম লীগ নেতা অকুণ্ঠ ভাষায় ইহার নিন্দা করেন নাই। ভারতবর্ষের মুসলমানদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে অনেকেই দু-নৌকায় পা দিয়া দাঁড়াইবার কৌশল আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মুসলিম লীগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মিঃ আবদুর রহমান সিদ্দিকির বিবৃতি এই মনোভাবের পরিচায়ক। সিদ্দিকি সাহেব সিন্ধু দেশবাসী ; গত পঁচিশ বৎসর কলিকাতায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের দৌলতে গণমান্য হইয়াছেন। তিনি কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি একজন নামজাদা পাকিস্থানী। ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৪৭) এক বিবৃতি-প্রসঙ্গে তিনি আমাদের ভয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং ভারত ডোমিনিয়নের মুসলমানদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে অংশে নির্দ্দেশ আছে বিবৃতির সেই অংশটি নিয়ে উদ্ধৃত হইল :

> ভারত ডোমিনিয়নের মুসলমানগণ বিভাগ ব্যবস্থার-ফলোদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনা করিবেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁহাদের অবলম্বনীয় ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিবেন।
>
> সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ক্রমবর্দ্ধিত আতঙ্ক ও উদ্বেগ-প্রভয়াই বর্ত্তমান শাসকদের সামান্য করুণা লাভের জন্য আত্ম-অঙ্গীকৃতিমূলক ও সম্পূর্ণ আত্ম-বিধ্বংসী নীতি সমর্থন করিতে পারেন। আমার মনে হয়, এই মনোভাব হতাশায় ফলোদ্ভূত। বর্ত্তমান জটিল পরিস্থিতি সহজ হইয়া আসিবেই। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য এই অবস্থা চলিতে পারে না। সংখ্যায় আমরা চারি কোটি এবং আমাদের শাসকগণ যদি দেশের শাসনকার্য্যে আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার দিতে সম্মত নাও হন, তাহা হইলেও শীঘ্র হউক অথবা বিলম্বে হউক, তাঁহারা দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাহিরের সমস্যায় আমাদের প্রয়োজন উপলব্ধি করিবেন। সুতরাং আমাদের মুসলিম বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় কোন লজ্জার কারণ নাই, বিশেষ ভাবে যখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আমাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, কংগ্রেস যত দিন ভারত ডোমিনিয়নের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিবেন, তত দিন উহা হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত হইবে না।

মিঃ সিদ্দিকি "দেশের আভ্যন্তরীণ ও বাহিরের সমস্যা" সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার অর্থ সুস্পষ্ট। এই সমস্যা সমাধানের সম্মুখীন হইয়া ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধারবর্গ চারি কোটি মুসলমানের "প্রয়োজন উপলব্ধি করিবেন।" এই ভরসার মধ্যে একটা ভীতি-প্রদর্শনের ইঙ্গিত আছে, প্যাঁচ খেলিয়া কিছু আদায়ের ভাব আছে। এই ইঙ্গিতের প্রকৃত উদ্দেশ্য, আশা করি, আমরা সকলে বুঝিব। পাকিস্থানে সেইরূপ "প্রয়োজন" উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হইবে না। কারণ পাকিস্থান হইতে সকল অ-মুসলমানকে ভিটে-মাটি-ছাড়া করিবার ব্যবস্থা ত ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। এই নীতি ভারত-রাষ্ট্রে চলিতে পারে না। এক শত বৎসর পূর্ব্বে রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন যে হিন্দুরা "অতি ভদ্র" হইয়া তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছিল ; "excess of civilization"-এর কল্যাণে হিন্দুর শক্তি-ক্ষয় হইয়াছিল। আজ হিন্দুর অনিচ্ছায় ভারতবর্ষ বিভক্ত হইয়াছে ; হিন্দু প্রধানগণ মুসলমান-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নিজেই বাধা দিতেছেন। এই চেষ্টার পরিণতি কোথায় এখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে না। এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা অনেকটা নির্ভর করে পাকিস্থানের কার্য্য-কলাপের উপর ; ততোধিক নির্ভর করিবে ভারত-রাষ্ট্রে পাকিস্থানী মনোভাবাপন্ন মুসলমানদের কর্ম্ম-অকর্ম্মের উপর। সজাগ, সতর্ক দৃষ্টি দিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক জীবনের সকল দায়িত্ব আমাদের পালন করিয়া যাইতে হইবে। অসাবধান হইবার দুর্ব্বলতা যেন আমাদের জীবনে না আসে ; ভ্রান্ত চিন্তা আমাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে যেন ক্ষুণ্ণ না করে।

মুসলীম লীগের ভবিষ্যৎ

নিখিল-ভারত মুসলীম লীগ দুই ভাগ হইল। পাকিস্থানে যে লীগ কার্য্য করিবে তার নাম হইবে পাকিস্থান ন্যাশনাল লীগ; ভারতবর্ষে যে লীগ কার্য্য করিবে, তাহার পূর্ব্ব নামই বহাল থাকিবে। পাকিস্থানে লীগের নাম ন্যাশনাল হইলেও তাহাতে সকল লোকের অধিকার থাকিবে না, কারণ পাকিস্থানে মুসলমান ছাড়া আর কেহই সেরূপ মর্য্যাদার দাবি করিতে পারে না। এই পরিবর্ত্তন গত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখের লীগ কাউন্সিলের ৩য় প্রস্তাব অনুসারে সম্পাদিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের কার্য্যকরী অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল,—

> নিখিল ভারত-মোসলেম লীগের প্রধান উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় এবং ভারত দুইটি স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ায় নিখিল ভারত মোসলেম লীগের সংগঠন, উদ্দেশ্য এবং নীতি পরিবর্ত্তন করা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সুস্পষ্ট যে, পাকিস্থান ও ভারতের মুসলমানগণ একই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকিতে পারে না।
>
> সুতরাং লীগ কাউন্সিল সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে—
>
> ১। (ক) নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের পরিবর্ত্তে পাকিস্থান ও ভারতীয় ইউনিয়নের জন্য পৃথক পৃথক লীগ সংগঠন থাকিবে।
>
> (খ) নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের যে সমস্ত বর্ত্তমান সদস্য সাধারণভাবে পাকিস্থানের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন অথবা তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন এবং পাকিস্থান গণপরিষদের যে সব মুসলমান সদস্য মোসলেম লীগের প্রাথমিক সদস্য রহিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে লইয়া পাকিস্থান মোসলেম লীগ কাউন্সিল গঠন করা হইল।
>
> (গ) নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের যে সমস্ত বর্ত্তমান সদস্য সাধারণভাবে ভারতীয় ইউনিয়নের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন অথবা তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন এবং ভারতীয় গণপরিষদের যে সব মুসলমান সদস্য মোসলেম লীগের প্রাথমিক সদস্য রহিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে লইয়া ভারতীয় ইউনিয়ন মোসলেম লীগ কাউন্সিল গঠন করা হইল।
>
> (ঘ) পাকিস্থান মোসলেম লীগ ও ভারতীয় ইউনিয়ন মোসলেম লীগ প্রত্যেকের জন্য এক জন করিয়া আহ্বায়ক নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দেওয়া হইল যে, তাঁহারা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যথাসম্ভব শীঘ্র নিজ নিজ লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান করিবেন। এই সভায় কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন, গঠনতন্ত্র রচনা ও অন্যান্য বিষয়ের মীমাংসা করা হইবে।
>
> (ঙ) পাকিস্থান মোসলেম লীগের জন্য মিঃ লিয়াকৎ আলী খান এবং ভারতীয় ইউনিয়ন মোসলেম লীগের জন্য মাদ্রাজ প্রাদেশিক মোসলেম লীগের প্রেসিডেন্ট মিঃ মোহাম্মদ এসমাইল আহ্বায়ক নির্ব্বাচিত হইলেন।
>
> (চ) করাচীতে পাকিস্থান মোসলেম লীগ কাউন্সিল ও মাদ্রাজে ভারতীয় ইউনিয়ন মোসলেম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন হইবে।
>
> ২। নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের যে সব প্রাথমিক সদস্য পাকিস্থানের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন অথবা তথায় বসতি স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বাস্তবিক পক্ষে পাকিস্থান মোসলেম লীগের প্রাথমিক সদস্য হইয়াছেন বলিয়া মনে করা হইবে এবং নিখিল-ভারত মোসলেম লীগের যে সব সদস্য ভারতীয় ইউনিয়নের বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছেন অথবা তথায় বসতি-স্থাপন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বাস্তব পক্ষে ভারতীয় ইউনিয়ন মোসলেম লীগের প্রাথমিক সদস্য হইয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে।

পাকিস্থান লীগ 'ন্যাশনাল' নাম গ্রহণ করিলেও, লোকে এই ধোঁকায় ভুলিবে না। কারণ সাড়ে পাঁচ কোটি মুসলমান ছাড়া দেড় কোটি অমুসলমান সেখানে এখনও বোধ হয় আছে, যদিও পঞ্চাশ লক্ষ অমুসলমানকে পাকিস্থানীরা তাহাদের পিতৃ-পিতামহের দেশে থাকিতে দেয় নাই। এই নিষ্ঠুরতার প্রতিফল দেখা দিয়াছে সম-সংখ্যক মুসলমানদের জীবনে যাহারা পূর্ব্ব পঞ্জাব, দিল্লী ও যুক্তপ্রদেশ হইতে তাড়িত হইয়াছে পাকিস্থানে বা ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে রামপুর, ভূপাল, হায়দ্রাবাদ সামন্ত রাজ্যে। ভারতবর্ষ বিভাগের এই ফলাফল গ্রহণ করিয়াই আমাদের চলিতে হইতেছে, যদিও অনেক কংগ্রেস-নেতা বিভক্ত ভারত আবার জোড়া লাগিবে বলিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাদের ভাব-প্রবণতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। সাধারণ বুদ্ধি বক্তৃতার মুহূর্ত্তে যুক্ত না থাকিলে তাঁহারা এরূপ ধ্বনি তুলিতেন না। ব্যবহারিক জীবনে দেখা যায় যে দুই ভাই সম্পত্তি পৃথক করিলে আর জোড়া লাগে না। এক ভাই যদি চীৎকার করিতে থাকেন যে অপর ভাইকে ঠেকায় পড়িয়া আবার একান্নভুক্ত পরিবারে ফিরিয়া আসিতে হইবে, তবে অপর ভাইয়ের জেদ চড়িয়া যায় পৃথক ব্যবস্থাটাকে কায়েমি করিবার। তার পর সাধারণতঃ দেখা যায় দুই ভাই একে অন্যকে চিমটি কাটিতেছেন, মামলা-মোকদ্দমা করিয়া দুই জনেই সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন আর পেট ভরাইতেছেন উকীল-ব্যারিষ্টারের। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের মধ্যে যে বাঁটোয়ারা হইল, ইহার ফলাফল জাগতিক নিয়ম মানিবে না; দুই দেশে সুখে-শান্তিতে থাকিবে, এরূপ আশা অনেকেই হয়ত করেন। আমরা এতটা আশাবাদী নহি।

সেইজন্য মনে করি যে মুসলিম লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাবে

কিছুই মীমাংসা হয় নাই। পৃথগন্ন ত হওয়া গেল ঘটা করিয়া। এই উৎসবের জের আরও অনেক দিন চলিবে। কারণ দেড় কোটি হিন্দু-শিখ পাকিস্থান হইতে চলিয়া আসিতে পারে এবং ভারতবর্ষে নূতন জীবন গড়িয়া তুলিতে পারে। কিন্তু সাড়ে তিন কোটি মুসলমান ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে আছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু-মুসলমান "দুই-নেশ্যন" এই বুলি লইয়া মাতামাতি করিয়াছে; এখনও মনে মনে হয়ত এই বুলি জপ করে। কিন্তু মুসলিম লীগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহারা ত ভারতবর্ষের নেশনের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না, নাগরিকের মর্য্যাদার দাবি করিতে পারে না যখন পাকিস্থান ন্যাশনাল লীগে অমুসলমানদের কোন স্থান নাই। হয়ত বা ভারতবর্ষের মুসলমানগণ এই নীতিতে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন কিন্তু বিশ্বাস পরিবর্ত্তন লোকে সহজে ও অল্প সময়ে করিতে পারে না, পরিবর্ত্তনের ভান করিতে পারে। মিঃ হুসেন শহীদ সুরাবর্দ্দীও হয় ত কোন দিন হিন্দু মুসলমান "এক-নেশ্যন", এই মন্ত্রে বিশ্বাসী হইয়া উঠিবেন; কিন্তু এই সাধনা সময়-সাপেক্ষ। তত দিন ভারতবর্ষের মুসলমান কি করিবে, তাহার নির্দ্দেশ মুসলিম লীগ কাউন্সিল দিতে পারে নাই।

পূর্ব্ব বাংলার একটি চিত্র

কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে প্রায় দুই লক্ষ লোক পূর্ব্ববঙ্গ হইতে চলিয়া আসিয়াছে। এই হিসাব দেখিয়া মনে হয় যে সরকার বিচ্ছেদের প্রথম কয় মাসের কথাই বলিতেছেন। একটা ব্যাপার দেখিতেছি যে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাই এই ব্যাপারে পথ দেখাইয়া যাইতেছেন। গান্ধীজীর কথায় এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে—"যদি পূর্ব্ব বাংলা হইতে চলিয়া আসাই ঠিক হয়; তবে ডাক্তার, উকীল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের ইহা দেখা কর্ত্তব্য যে গরিব হরিজনেরা ও অন্যান্য সকলে যেন আগে আসিতে পারে। উচ্চ শ্রেণীরা যেন আগে না আসিয়া সকলের শেষে স্থান ত্যাগ করে।" বর্ত্তমানে যে ভাবে স্থানত্যাগ চলিতেছে তাহার ফল হিন্দু সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। এই কথাটিই 'দেশপ্রিয়' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত দুইখানি পত্রে বলা হইয়াছে। একখানি পত্র আসিয়াছে চট্টগ্রাম হইতে আর একখানি নারায়ণগঞ্জ হইতে।

> "...বিশেষতঃ হিন্দুরা নিজেদের অসহায় মনে করছে। গ্রামকে গ্রাম ছেড়ে হিন্দুরা চলে যাচ্ছে—কোন প্রকার ভয়ে নয় শুধু বাঁচবার আশায়। মুসলমানের মধ্যে 'পাকিস্থানে'র কোন উৎসাহ নাই—তারা কিছুই অনুভব করতে পারছে না। সকলের শুধু 'হায় খোদা, কি হলো' এই ভাব।...

> "...সংখ্যাগরিষ্ঠ-মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে যে সংখ্যালঘিষ্ঠদের দু' দিন আগে হউক বা পরে হউক চলে যেতে হবেই বা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করতে হবে।..."

দামোদর উপত্যকা

ভারত গবর্মেণ্ট প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া দামোদর নদীর স্রোত নিয়ন্ত্রিত করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতীয় আইন সভায় এই পরিকল্পনা ও তৎসম্বন্ধে সমস্ত ব্যবস্থা স্বীকৃত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা বিহারের হাজারীবাগ অঞ্চলের প্রায় লক্ষ লোককে ভিটে-ছাড়া করিবে। কিন্তু এই পরিকল্পনার ফলে যে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির আশা করা যাইতেছে, তাহা হইলে এই এক লক্ষ লোকের ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইবে, কিন্তু এই পরিকল্পনায় বিশেষ উপকার হইবে পশ্চিম বঙ্গের বর্দ্ধমান জেলা ও তৎসংলগ্ন স্থানের। বাঁকুড়া, মেদিনীপুরে এই ব্যবস্থার প্রভাব কতটা কার্য্যকরী হইবে, তাহা এখন বলা কঠিন। কারণ দামোদরের বন্যার জলকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে পার্শ্ববর্ত্তী নদী-নালার উন্নতি হইবে, এবং অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর স্থানে দামোদরের পলিমাটি কিছু কিছু বিস্তার লাভ করিবে, এই ভরসা করা যাইতেছে। এই কাজের সম্ভাবনা সম্পর্কে "সংগঠন" পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় অধ্যাপক কাননগোপাল বাগচি কিছু লেখা-পাত করিয়াছেন,—

> "বিভিন্ন খাল ও খাউনের (বর্দ্ধমান জেলায় জল নিয়ে যাওয়ার ছোট নালাকে 'খাউন' বলে) মারফত, এবং বাঁকা, বেহুলা ও খুড়েশ্বরী প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় শাখা-নদীর সাহায্যে দামোদরের জল চালিয়ে বর্দ্ধমান ও পার্শ্বস্থ জেলাগুলিতে কিছু কিছু সেচের কার্য্য এখনই হইয়া থাকে। তাহা প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার একর বা তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার বিঘা জমিতে এই ভাবে চাষের ব্যবস্থা আছে বলে সরকারের দপ্তরে প্রকাশ। দামোদর পরিকল্পনানুযায়ী এ জমিগুলিতে ত বটেই। আরও পাঁচ-ছয় গুণ জমিতে সেচের প্রবর্ত্তন হবে। সর্ব্বসমেত তার পরিমাণ দাঁড়াবে ৭,৬৩,৮০০ একর (২২,৯১,৪০০ বিঘা)।...
>
> আর একটি কথা হয় ত বলা বাহুল্যই হবে। বর্ষার অবসানেও, শীত ও গ্রীষ্মব্যাপী সেচের জল পাইয়া জমিতে সারা বছর ধরে আলুটা, তরকারিটা অথবা রবি-শস্য হতে থাকবে।..."

ইহার উপর আছে, বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের কথা। পল্লী-গ্রামের গৃহাদি বিদ্যুতের আলোকে উদ্ভাসিত হইবে, এ কল্পনা উদ্ভট নয়। বিদ্যুতের শক্তিতে নানা কলকারখানা চালিত হইবে; নানা শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইবে; লোকের বেকার সমস্যা মিটিবার সম্ভাবনা দেখা দিবে, পশ্চিম বঙ্গ আবার শস্য-শ্যামল, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। এ কল্পনা করিতেও সুখ।

"কম্‌লি নেহি ছোড়্‌তা"—

আমাদের অনেক সময় ইচ্ছা হয় ব্রিটিশ রাজনীতিকদের লীলাখেলা ভুলিয়া যাইতে, কিন্তু কাশ্মীর ব্যাপারে বিলাতের পত্রিকাগুলি যেরূপ "পাকিস্থানী" মনোভাব দেখাইয়াছে তাহাতে আমাদের সাবধান হইতে হইবে। "টাইমস্" ও "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডেন" পত্রিকা দুইখানি উৎকট সাম্রাজ্যবাদী নয়। তাহারাও যখন প্রস্তাব করিয়াছে যে কাশ্মীর ও জম্মুকে দুই ভাগ করিয়া দিলে আমাদের পক্ষে মঙ্গল, তখন বুঝিতে হইবে যে পণ্ডিত জবাহরলালের গবর্ণমেণ্টের নিকট এইরূপ প্রস্তাব আসিয়াছে। কাশ্মীর পড়িবে পাকিস্থানের ভাগে, জম্মু পড়িবে ভারতবর্ষের। এই ব্যবস্থায় ব্রিটিশের স্বার্থ কি ঠিক বুঝা যাইতেছে না। যে রাশিয়াকে ব্রিটেন এত ভয় করিয়া আসিতেছে তাহার দাপটে পাকিস্থানকে ফেলিয়া দিবার সার্থকতা কি? এক হইতে পারে যে কাশ্মীর "পাকিস্থানে"র হাতে গেলে শত্রুরাজ্য দ্বারা ভারতবর্ষ আর একটু বেশী বেষ্টিত হইয়া পড়িবে। সে যাহাই হউক, মিঃ ক্লেমেণ্ট এটলি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; তাহার কারণের অনুসন্ধান আমাদের করিতে হইবে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডনে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া মিঃ এটলি কি খেলা খেলিয়াছিলেন তাহা আমাদের ভুলিলে চলিবে না। কাশ্মীর সম্পর্কে সেরূপ কোন চালাকীর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে না এবং উচিত হইবে না ব্রিটেনের সঙ্গে কোন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে, যাহার আকর্ষণে আমরা আন্তর্জাতিক ঘূর্ণপাকের মধ্যে পড়িতে পারি। একটা কথা শোনা যাইতেছে যে পাকিস্থান, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিংহল লইয়া ইংরেজ একটা মণ্ডল সৃষ্টি করিতে চায়। কালে তাহা ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়ায় ব্যাপ্ত হইবে। এই ব্যবস্থা ব্রিটেন এখন হইতেই করিয়া ফেলিতেছে। মিশর ও প্যালেষ্টাইন হইতে তাহার রণসম্ভার সে আফ্রিকার পূর্ব্বাঞ্চলে সরাইয়া আনিতেছে। ভূমধ্যসাগরের উপর প্রভুত্ব সে ছাড়িয়া দিতেছে, পশ্চিম এশিয়া হইতে সে সরিয়া আসিতেছে। মিশর হইতে আফগানিস্থান পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে যে প্রভাব-প্রতিপত্তি সে ভোগ করিতেছিল তাহা স্ব-ইচ্ছায় সে ছাড়ে নাই। এই মুসলিম দেশসমূহকে এখন সোভিয়েট রাশিয়ার মন জোগাইয়া চলিতে হইবে। তবুও ব্রিটেন পাকিস্থানের মায়া ছাড়িতে পারিতেছে না এবং ভারত মহাসাগরের উপকূলে সে তাহার ঘাঁটি দৃঢ়তর করিতেছে। আফ্রিকার পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সিংহলে ত্রিনকমেলি বন্দর পর্য্যন্ত তাহার নৌবহর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপ ভারতবর্ষের হাতে ছাড়িয়া দিলেও সে সিঙ্গাপুর বন্দরের ঘাঁটি সুদৃঢ় রাখিতেছে। এই উদ্যোগ কার ভোগে লাগিবে জানি না।

স্বাধীন ভারতে কারা-সংস্কার

মহাত্মা গান্ধী দিল্লী সেণ্ট্রাল জেলে বন্দীদের জন্ত একদিন

তাঁহার প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। স্বাধীন ভারতের কারাগার কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে গান্ধীজী বলেন—

"দীর্ঘদিন ধরিয়া তিনি এই অভিমত পোষণ করিয়া আসিতেছেন যে, সমস্ত দাগী অপরাধীকে রোগী বলিয়া এবং কারাগারসমূহকে তাহাদের চিকিৎসাগার ও আরোগ্য নিকেতন বলিয়া ধরিতে হইবে। সখ করিয়া কেহই অপরাধ করে না। অপরাধ অসুস্থ মনের লক্ষণ। বিশেষ কোন রোগের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করিতে হইবে। এই অপরাধীদের কারাগারকে হাসপাতালে রূপান্তরিত করিতে গিয়া রাজপ্রাসাদের প্রয়োজন হইবে না। কোন দেশই এই ব্যবস্থা করিতে পারে না, ভারতের মত দরিদ্র দেশের কথা ত উঠেই না। কিন্তু জেলের কর্ম্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইবে হাসপাতালের চিকিৎসকের মত। লোকায়ত্ত সরকারগুলিকে প্রয়োজনীয় আদেশজারী করিতে হইবে। কিন্তু নিজেদের শাসন-ব্যবস্থাকে পরিবর্ত্তন করিতে জেল কর্ত্তৃপক্ষকেও যথেষ্ট উদ্যোগী হইতে হইবে। এখন বন্দীদের কর্ত্তব্য কি? প্রাক্তন বন্দী হিসাবে তিনি এই উপদেশ দিতে পারেন যে, তাহাদের উচিত আদর্শ বন্দীর মত ব্যবহার করা। বন্দীদের যে অভিযোগই থাকুক না কেন, যথোপযুক্ত ধরণে তাহা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিতে হইবে। বন্দীদের মধ্যে তাহাদিগকে আদর্শ নাগরিকের মত চলাফেরা করিতে হইবে। তাহা হইলেই মুক্ত হওয়ার সময় তাহারা অনেক ভাল হইয়া সাধারণের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে পারিবে।"

ভারতবর্ষের আরও বহু সমস্যার ন্যায় কারা-সমস্যাও লোকলোচনের অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে। অনশনে যতীন দাসের আত্মদানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জেলের নিয়মকানুন ছিল ভয়ানক কড়া। রাজনৈতিক বন্দীদের সাধারণ দাগী আসামী-দের সঙ্গে রাখা হইত এবং একই প্রকার দুর্ব্যবহার তাঁহাদের সহিতও করা হইত। সাধারণ কয়েদী এবং রাজবন্দীদের মধ্যে কোন বৈষম্য রাখা হইত না। কারাগারে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি এইরূপ ব্যবহারের জন্য ভারতবাসীর মনো-যোগ আকর্ষণ করিয়া উহাকে আন্দোলনের বস্তু করিয়া তুলেন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ভগৎ সিং, রাজগুরু শুকদেব এবং যতীন দাস। যতীন দাস শেষ পর্য্যন্ত অনশনে আত্মদান করিয়া এ বিষয়ে ভারতব্যাপী এমন আলোড়ন সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন যে শেষ পর্য্যন্ত ভারত-সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের জন্ত কতকটা সুবিধা করিয়া দিতে বাধ্য হন।

পশ্চিম বাংলার উন্নয়ন ব্যবস্থা

পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রীমণ্ডলী সংবাদপত্র মারফত প্রচার করিয়াছেন যে তাঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া এই প্রদেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকর কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিভাগে নানাপ্রকার পরিকল্পনা (scheme)

বিবেচনা করা হইতেছে এবং একাধিকবার ডাঃ ঘোষ ও তাঁহার সহকর্মিগণ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের অন্নবস্ত্রের অভাব দূরীকরণ এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। আমাদের জানিতে ইচ্ছা করে যে, যে সকল উন্নতিকর ব্যবস্থার পরিকল্পনা বাংলার মন্ত্রিগণ বিবেচনা করিয়াছেন বা করিতেছেন তাহাদের কি প্রকারে উদ্ভব হইল। উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী এই প্রদেশে নিযুক্ত আমলাতন্ত্রের অংশ এবং কিছু নথীপত্র লীগ সরকারের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলিও সেই সঙ্গে পাইয়াছেন, না তাঁহাদের নিজের আমলে প্রস্তুত হইয়াছে, জানিবার কোন উপায় নাই।

লীগমন্ত্রীমণ্ডলীর ও তৎকালীন কর্মচারিগণের কার্য্যতৎপরতার যে নমুনা আমরা দেখিয়াছি তাহার ফলে তাঁহাদের পরিকল্পিত কোন ব্যবস্থার উপরে আমরা আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য ইত্যাদি জনহিতকর কার্যে তাঁহাদের কোন উৎসাহের পরিচয় পাই নাই। সেই আমলে "অধিক শস্য ফলাও" আন্দোলন ব্যর্থতার সীমা অতিক্রম করিয়া প্রহসনে পরিণত হইয়াছিল। সরকারী ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণের অভাব মোচন হইবে কিনা এই চিন্তা তাঁহাদের ছিল না, কেবল কি শ্রেণীর পরিকল্পনায় অধিক সংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত করা এবং কণ্ট্রাক্ট বিলি করিয়া আত্মীয় ও আশ্রিতবর্গ প্রতিপালিত করা হইবে তাহাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

এই বিষয়ে অধিক আলোচনা করিয়া লাভ নাই। কিন্তু বর্তমানে যে মন্ত্রীমণ্ডলীর উপরে বাংলার রাষ্ট্র পরিচালনার ভার ন্যস্ত আছে, তাঁহাদের নিকট আমরা নিশ্চিত প্রত্যাশা করিব যে, প্রত্যেক জেলার প্রতিনিধিস্থানীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জনসাধারণের প্রয়োজন ও কল্যাণের কষ্টিপাথরে বিচার করিয়া যেন তাঁহারা কার্য্যপদ্ধতি স্থির করেন।

লীগ আমলে ১৯৪৪-৪৫ সালে 'উন্নয়ন বিভাগ' (Development Department) নাম দিয়া অকস্মাৎ একটি ভুঁইফোঁড় বিভাগ গজাইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই বিভাগের ছোট বড় কর্মচারী পঙ্গপালের মত সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। তাহার দ্বারা বাংলার কোনও অঞ্চলে যে কোনও উন্নতিকর কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। পরে রোল্যাণ্ড্‌স্ কমিটির পরামর্শ অনুসারে এই বিভাগের বিলোপ সাধন হয় এবং প্রধান মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সরকারী দপ্তরখানায় একটি উন্নয়ন বিভাগ গঠিত হইল। রোল্যাণ্ড্‌স্ কমিটির নির্দেশ অনুসারে জেলার যাবতীয় উন্নয়ন কার্য্যের ভার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর অর্পিত হইয়াছিল এবং তাঁহাকে স্থানীয় অবস্থা বিষয়ে অবহিত করিবার জন্য জেলায় জেলায় পরামর্শ-সভাও গঠিত হইয়াছিল।

জেলার সমস্যাসমূহ কি প্রকারে মীমাংসা করা যাইতে পারে তদ্‌বিষয়ে অধিবাসিগণের মতামত কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিবার জন্য বাঁকুড়া জেলায় একটি বে-সরকারী 'জেলা উন্নয়ন সমিতি' গঠিত হইয়াছে। বাংলার মন্ত্রী বাঁকুড়াবাসী শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ রায় মহাশয় ইহার পৃষ্ঠপোষক এবং শ্রীনিকেতনের প্রাক্তন কর্মী শ্রীসুকুমার চট্টোপাধ্যায় ইহার সভাপতি। জেলায় যে সকল লোক বহুকাল ধরিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং জেলার অবস্থার সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে তাঁহাদের অনেকেই ইহার সভ্য। কৃষি, সমবায় ইত্যাদি বিভাগের সরকারী কর্মচারিগণকেও সমিতির অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

আলোচনা ও পরিকল্পনার সৌকর্যার্থ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের জন্য সাতটি উপশাখা গঠিত হইয়াছে—

(ক) কৃষি, (খ) সেচ, (গ) বনরক্ষণ ও ভূমিসংরক্ষণ (anti-erosion), (ঘ) কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়, (ঙ) গৃহশিল্প, (চ) স্বাস্থ্য, (ছ) সমবায়।

দেশের গুরুতর সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে সাহায্য করিবার এবং স্থানীয় অবস্থার উপযোগী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া জেলাবাসিগণ যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা আমরা সমর্থন করি এবং উন্নয়ন সমিতির প্রচেষ্টার সফলতা কামনা করি। কিন্তু কেবল উপর হইতে সরকারী চেষ্টায় কোনও স্থায়ী ও ফলপ্রদ উন্নতি সাধিত হইতে পারে না—সে সরকার স্বদেশীই হউক বা বিদেশীই হউক। সেইজন্য বাঁকুড়া উন্নয়ন সমিতি জেলার মধ্যে এই সকল বিষয়ে প্রচার কার্য্য ও জনমত গঠনের জন্যও ব্যবস্থা করিবেন। জনসাধারণের মধ্যে এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে কর্ম প্রসারের জন্য সমিতি একটি সাপ্তাহিক প্রচারপত্র প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

বাংলা ও আসাম ব্রাহ্ম-সম্মিলনী

বাংলা ও আসাম ব্রাহ্ম সম্মিলনীর ৫৬তম বার্ষিক অধিবেশন বিগত ২৫শে হইতে ২৮শে অক্টোবর পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি সহরে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

২৫শে অক্টোবর সন্ধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক ডাঃ দেবপ্রসাদ মিত্র প্রারম্ভিক উপাসনা করেন। তৎপরে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত ধরণীধর দিন্দা তাঁহার সুলিখিত অভিভাষণ পাঠ করিয়া অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সম্মিলনীর সভাপতি ডাঃ সরোজকুমার দাস তাঁহার তথ্যপূর্ণ অভিভাষণটি পাঠ করেন। ডাঃ দাস বলেন :

এই কাঁথি সহরটি—যথার্থপক্ষে পল্লীসহরটি—আয়তন হিসাবে ক্ষুদ্র হইলেও অধ্যাত্মসম্পদে ও ঐতিহ্যগৌরবে মেদিনী-

পুর জেলার হৃৎপদ্মস্বরূপ। কাঁথির পথ যে কঠোপনিষদ প্রোক্ত ধর্ম্মের পথ, সে বিষয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষাপূর্ব প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করিয়া আমরা এখানে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু পথের শেষে প্রবেশদ্বারেই শহরের পোস্তপুল, আমাদের উপবাসক্লিষ্ট মন ও আত্মা, পল্লীমাতার স্নেহ সুনিবিড় শ্যামলাঞ্চল স্পর্শে যেন নবজীবন লাভ করিল। যে উদার, উন্মুক্ত আকাশে সূর্য্যোদয় ভক্তির পুষ্পাঞ্জলির মত নিত্যই প্রতিভাত হয় এবং যে নীরব সৌম্য গভীর আকাশে সূর্য্যাস্ত ভক্তের প্রণামের মতই অবনমিত হয়, যেখানে দিগন্ত প্রসারিতা ধরিত্রী অখণ্ড আকাশের সহিত মিলিত হইয়া 'দ্যাবা পৃথিবী'—'দ্যৌঃ পিতা, মহী মাতা' আদি জনকজননীকে আভাস দেয়, সেখানে ধর্ম্মজীবনের উৎসীভূত অনন্তের বোধ এত সহজ, সরল ও সুগম, তাহা যেন এই প্রথম প্রত্যক্ষজ্ঞানে পাইলাম। ঐতিহাসিক পরিবেশও এই প্রাকৃতিক পরিস্থিতির অনুরূপ। ইতিহাসপ্রসিদ্ধি আছে যে, খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পশ্চিম বঙ্গের এই বিভাগে বৌদ্ধধর্ম্মের একাঙ্গ "ধর্ম্মপূজা" নামে প্রচলিত ছিল। ময়নাগড় ও তন্নিকটবর্ত্তী অনেক স্থানে এখনও এই "ধর্ম্মপূজার" প্রচলন আছে এবং তজ্জন্যই বঙ্গ-সাহিত্যে "ধর্ম্ম মঙ্গল" নামক গ্রন্থের আবির্ভাব। বস্তুতঃ বৌদ্ধমতের এই রূপান্তর ব্যতীত মেদিনীপুর জেলায় যোগপন্থ নিরঞ্জন মত প্রভৃতি বিবিধ মতবাদ ও পূজাপদ্ধতি এবং সহজিয়া আউল, বাউল, দরবেশ সম্প্রদায়ের পূজার্চ্চনা ও মতবাদ প্রচলিত দেখা যায়। বিশেষতঃ উত্তরের আর্য্য সভ্যতা ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সভ্যতা মিলিত হইয়া মেদিনীপুর জেলায় দ্বিতীয় প্রয়াগ তীর্থ রচনা করিয়াছে এবং মেদিনীপুর জেলা বহু দিন পর্য্যন্ত জগন্নাথধামের দ্বারপথ থাকায় আর্য্যশঙ্কর, রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদিগের চরণস্পর্শে মহীয়ান্ হইয়াছে। সর্ব্বশেষে উল্লেখ করি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহকর্ম্মী ও সহধর্ম্মী সভা, শিব ও সুন্দরের পূজারী শিবচন্দ্র দেব ও রাজনারায়ণ বসুর ধর্ম্মসাধনা ও ব্রহ্মোপাসনার। শিবচন্দ্রদেবের 'আত্ম-শিক্ষা' ও 'ঐকতানবিশিষ্ট মন' সম্পর্কিত সাধনা এবং ভাবভক্তিপ্রবণচিত্ত রাজনারায়ণ বসুর 'বসন্ত-কুঞ্জ' ও গোপগিরিতে বসন্তকালে ব্রহ্মোপাসনা (খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬০-১৮৬৫ পর্য্যন্ত) মেদিনীপুরের আধ্যাত্মিক সম্পদের অন্যতম নিদর্শন। ধর্ম্ম সাধনার দিক হইতে এই জেলাটি যেমন মহাপুরুষদিগের পুণ্যস্পর্শ লাভে সৌভাগ্যবান্ ছিল, তেমনই ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য ইহাকে নানাবিধ দুঃসহ দুঃখ দুর্গতি লাঞ্ছনা নিপীড়ন সহিতে হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম দশকে ইতিহাসবিশ্রুত কালাপাহাড়ের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্য্যন্ত দুঃখ দুর্গতি পৌনঃপুনিক দশমিকের মত বারংবার এই মেদিনীপুর জেলার উপর আঘাত করিয়াছে। "মেদিনী"র একটি প্রতিশব্দ "সর্ব্বংসহা" কেন হইয়াছে ইহাই বোধ হয় একটি ইঙ্গিত। দুঃখের হোমাগ্নিপূত এই প্রদেশ বিশেষতঃ কাঁথি, ধন্য হইয়াছে বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবের চরণরেণু স্পর্শে, যিনি এই দুঃখের তপস্যায় জয় লাভ করিয়া বিধাতার সাধর্ম্ম্য লাভ করিয়াছেন।

জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ

যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রিগণ লণ্ডন নগরীতে আজ বিশ দিন হইল আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ স্থির করিবার জন্য। আড়াই বৎসর—১৯৪৫ সালের মে মাস হইতে আজ পর্য্যন্ত—এই বিষয় লইয়া অনেক টানা-হেঁচড়া হইল, কিন্তু কোন মীমাংসা হইতেছে না। গত এপ্রিল মাসে মস্কো নগরীতে চতুঃশক্তির পরামর্শ সভায় তর্ক করিয়া মিঃ মার্শাল, মলোটভ, বেভিন ও বিদোলত সময় কাটাইলেন কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিলেন না। কেন পারিলেন না তাহার কারণ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গোড়ার কথা এক - যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যে ভাবে জার্ম্মানীর ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিতে চান, সোভিয়েট রাষ্ট্রের তাহাতে গুরুতর আপত্তি আছে, যদিও উভয় পক্ষই জার্ম্মানীর উন্নতির জন্য উদ্গ্রীব বলিয়া প্রচার করেন। জার্ম্মানী ছয় বৎসর যুদ্ধ করিয়া প্রমাণ করিয়াছে তাহার শক্তি কত বড়। একা সে যুদ্ধ করিয়াছে ইউরোপ-আমেরিকার সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে। এই শক্তিধরকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিতে হইবে—এ বিষয়ে মতভেদ নাই। জার্ম্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে—এই বিষয়েও মতভেদ নাই, যদিও ক্ষতিপূরণের ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া তর্কের অন্ত নাই। ক্ষতিপূরণ দিতে হইলে জার্ম্মানীর শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার প্রয়োজন। জার্ম্মানী যাহা উৎপাদন করিবে তাহা হইতে দেশের প্রয়োজন মিটাইয়া উদ্বৃত্ত থাকিলে তবেই তাহা সম্ভব। ক্ষতিপূরণের জন্য উদ্বৃত্ত উৎপাদন করিতে গেলে যে শিল্প-কৌশলের প্রয়োজন তাহাতে উৎসাহ দিতে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রভৃতি অনিচ্ছুক। কারণ জার্ম্মানীর উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় তাঁহারা পাইয়াছেন এবং সেই শক্তির পুনরভ্যুত্থানে তাঁহাদের এমন একটা ভীতি দেখা দিয়াছে যে জার্ম্মানীতে সমস্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টা ব্যাহত হইয়া আছে। জার্ম্মানীর কলকারখানা তাঁহারা ভাঙিয়া ফেলিতেছে বা ক্ষতিপূরণের দায়ে বিদেশে চালান দিতেছে; জার্ম্মানীর শিল্পীকুল ও বৈজ্ঞানিকদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় জার্ম্মানীর উৎপাদন বাড়াইয়া, উদ্বৃত্ত শিল্পসম্ভার ও কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া, ক্ষতিপূরণ আদায় যে কি করিয়া তাহারা করিবে তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

আবার বর্ত্তমান যুগে শিল্প-বাণিজ্য ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যে কেন্দ্রীয় শক্তির প্রয়োজন জার্ম্মানীতে তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে কেহই ইচ্ছুক নয়। কাইজার উইলিয়ম

ও হিটলারের সময়ে এরূপ শক্তির পরিচয় তাহারা পাইয়াছে; সাত কোটি জার্মানকে এক উদ্দেশ্যে, এক লক্ষ্যে প্রণোদিত করিয়া কি ভাবে তাহা ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুইটি বিশ্ব-সংগ্রামের আয়োজন করিয়াছিল, তাহার ধ্বংসলীলার চিহ্ন আজিও ইউরোপের বুকে, দেশে দেশে প্রকট হইয়া রহিয়াছে। ১৯৪৫ সালের মে মাসে বার্লিনের পটস্‌ডাম পল্লীতে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাষ্ট্র ও ব্রিটেনের প্রধানদের মধ্যে যে চুক্তি হয়, তাহাতে এই স্বীকৃতিটা ছিল যে জার্মানীর অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা কাঠামো বজায় রাখিতে হইবে। বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি ইহা করিতে পারে নাই। সোভিয়েট চলিয়াছে তাহার সমাজতান্ত্রিক প্রেরণা লইয়া; জার্মানীর পূর্ব্বাঞ্চলে সে সমস্ত ব্যবস্থাকে ওলটপালট করিয়া নিজেদের সুবিধামত গড়িয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাহাদের বিশ্বাস-মতে ব্যক্তি-তান্ত্রিক ব্যবস্থার ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এইখানেই বিরোধ এবং এই বিরোধ লণ্ডন কনফারেন্সে সমাধান হইতেছে না, যেমন গত এপ্রিল মাসে, মস্কো কনফারেন্সে হয় নাই এবং যত দিন এই বিরোধের শান্তি না হইবে, তত দিন ইউরোপে কোন গঠনমূলক উদ্দেশ্য সফল হইবে না; মার্শাল কল্পনানুযায়ী মার্কিন দেশের টাকা ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য নানাভাবে আসিতে পারে। কিন্তু ইউরোপ ও আজ এক ভাবের ভাবুক নয়। ব্যক্তি-তন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্র এই দুই মতের বিরোধের মধ্যে পড়িয়া কেহই মার্কিনের এই সাহায্য স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। ইহাই গোড়ার কথা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল। জার্মানী তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া পরাজয়ের গ্লানির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল হিটলারের নেতৃত্বে। আজ সেই ইতিহাসের পুনরভিনয় যে হইবে না তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। প্রতিপক্ষ দুই দেশের নাম বদলাইয়াছে মাত্র। আজ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে।

ফিলিস্তিন

ইউরোপের এই ডামাডোলের মধ্যে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ফিলিস্তিন লইয়া একটা জটিলতার সৃষ্টি হইতেছে। গত পঁচিশ বৎসর ব্রিটেন এই দেশের উপর কর্তৃত্ব করিতেছিল জাতি সঙ্ঘের (League of Nations) পক্ষ হইতে ম্যাণ্ডেট নামে এক অদ্ভুত ব্যবস্থার কল্যাণে। এই ব্যবস্থায় ফিলিস্তিনবাসী আরবেরা সুখী হইতে পারে নাই। তাহারা অধিকাংশই মুসলমান; তাহাদের দেশের উপর ব্রিটেন একটা নূতন রাষ্ট্রের গোড়া-পত্তন করিল "ইহুদিস্থান" নাম দিয়া—জগতে "Jewish Home" নামে এই প্রচেষ্টা পরিচয় লাভ করিল। আরব মুসলমানেরা এই "উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসা" ব্যবস্থাকে সহ্য করিতে পারিল না, যদিও দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহুদিদের পূর্ব্বপুরুষেরাই এই ভূমিখণ্ডের অধিবাসী ও অধিপতি ছিল। ভাগ্যের তাড়নায় তাহারা নানাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অকথ্য অত্যাচার সহ্য করিয়াও তাহারা তাহাদের প্রাচীন জন্মভূমির স্মৃতি আঁকড়াইয়া ধরিয়া ছিল; এই জন্মভূমিতে তাহারা ফিরিয়া আসিবে এই আশা দুই হাজার বৎসরের মধ্যে একদিনও তাহারা ছাড়িতে পারে নাই। প্রথম বিশ্বসংগ্রামের সময় তাহারা ব্রিটেনকে সাহায্য করিয়াছিল। উইজম্যান নামক একজন বৈজ্ঞানিক এই সময়ে একটি আবিষ্কার দ্বারা ব্রিটেনের একটা আসন্ন অভাব মিটাইতে সাহায্য করেন। কৃতজ্ঞতার মূল্যস্বরূপ তিনি ফিলিস্তিনে "ইহুদিস্থান" গঠন করিবার অধিকার দাবি করেন। ১৯১৭ সালে ব্রিটেন এই অধিকার স্বীকার করিয়া লয়। তখন ফিলিস্তিনে ইহুদির সংখ্যা ছিল আশী-নব্বই হাজার মাত্র; গত পঁচিশ বৎসরে তাহা বাড়িয়াছে ছয় লক্ষে। ফিলিস্তিনের মরুভূমিতে তাহারা বহু শস্য-শ্যামল কৃষি-কেন্দ্র স্থাপিত করিয়াছে, দুই হাজার বৎসরের মধ্যে আরবেরা যাহা করিতে পারে নাই। এই কার্য্যের দ্বারা তাহারা নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে নিজেদের অধিকার তাহাদের ধর্ম্মের পুণ্যভূমিতে। আরব মুসলমানেরা এই অধিকার মানিয়া লইতে চায় না। তাহারা এই অধিকার ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেছে। চতুর্দ্দিকের আরব রাষ্ট্র হইতে তাহারা সাহায্য পাইবার দাবি রাখে, সেই সাহায্যের আয়োজন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মুসলমান ইহুদি উভয়েই রণসজ্জায় মাতিয়া গিয়াছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের (United Nations Organization) হাতে তাহার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া ব্রিটেন তাহার শাসন-ব্যবস্থা গুটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলে একটা যুগ পরিবর্ত্তনের সূচনা হইতেছে। "খেলাফৎ" আন্দোলনের পরিণতির কথা স্মরণ থাকিলে আমরা এই আহ্বানে সাড়া দিতে পারি না।

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায়ের উননবতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এক সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করেন। বাঁকুড়া শহরে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। আচার্য্য যদুনাথ সরকার এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। মানপত্রে বলা হয়—

"আপনার সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনের অধিকাংশকাল কঠোর জ্ঞান-সাধনায় অতিবাহিত করিয়া আপনি যে গৌরবময় আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহা চিরদিন আমাদের অনুকরণীয় হইয়া থাকিবে; আশীর্ব্বাদ করুন, সে আদর্শে আমরা যেন অনুপ্রাণিত হইতে পারি।

"আপনার ঋষিতুল্য সরল জীবনযাত্রা, শিক্ষাদানে একনিষ্ঠ তৎপরতা, স্বদেশীর সর্ব্ববিধ জনহিতকর কার্য্যে পথ প্রদর্শন আপনার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র উড়িষ্যা প্রদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছে; আপনি সেখানে বহু হৃদয়ের ভক্তির

বেদীতে আজ প্রতিষ্ঠিত। আপনার স্বদেশবাসী বাঙালীকে মাতৃভাষায় দুরূহ বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্ত আপনার প্রথম জীবনের একক সাধনার কথা আজ আমরা কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করিতেছি। আপনার অক্লান্ত লেখনী দীর্ঘকাল ধরিয়া কত বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশবাসীদের শিক্ষিত, উদ্বুদ্ধ ও সতর্ক করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে থাকিবে। বিজ্ঞানকে সাহিত্যের আধারে পরিবেশন করিয়া আপনি ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতিকে নূতন পথে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে বহুবিধ গবেষণা করিয়া আপনি মাতৃভাষায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ব ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বের নিখুঁত সত্যগুলি আপনার অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে বঙ্গ সাহিত্যের সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে। আপনি বঙ্গ-ভাষার মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে জাহ্নবীধারা প্রবাহিত করিয়াছেন। আপনার এই অমরকীর্তি স্মরণ করিয়া আমরা আপনাকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়াছি।"

এই মানপত্রের উত্তরে আচার্য্য যোগেশচন্দ্র তাঁহার জীবন-ব্যাপী সাধনার কথা বর্ণনা করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে তাহা সংযুক্ত। ১৯০১ সালে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়; ১৯০২ সালে যোগেশচন্দ্র তাহার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদ সংগ্রহ আরম্ভ করেন; পরিষদের সহকারী সম্পাদক ব্যোমকেশ মুস্তফী যোগেশচন্দ্রকে অনুরোধ করেন "বাকী বাদ যে সব শব্দ আছে তাহা যোগ করে দিতে।" এইভাবে আরম্ভ হইল ভাষাতত্ত্বের আলোচনার সাধনা। বাংলার বর্ণমালার যুক্তাক্ষর সমস্যা সহজ করিতে না পারিলে অন্য ভাষাভাষী লোকের পক্ষে বাংলা ভাষা শিক্ষা কঠিন হইতেছে। এই বাধা দূর করিতে হইবে। "অক্ষর-সংস্কার" আরম্ভ হইল। তাঁহার নিজের কথায় এই অবস্থার বর্ণনা দিতেছি,—

> বাংলা কঠিন করেছে এর যুক্তাক্ষর। যুক্তাক্ষর শিখতে শিখতে শিশুর প্রাণ বেরিয়ে যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ দেখলে ভয় হ'ত। অক্ষর পরিবর্তন করতে না পারলে এক সহজ ভাষা বলা যায় না। ভাবলাম, অন্ত প্রদেশের লোক যাতে বাংলা ভাষা সহজে শিখতে পারে এজন্তে অক্ষর ও বানান সহজ করতে হবে। "অক্ষর-সংস্কার" লিখতে লাগলাম। অনেক লোক আমার উপর বিরক্ত হলেন। বললেন কোথাকার কে এক উড়িয়া এসেছে। ভাগলপুর সাহিত্য সম্মেলনে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "বর্ণমালার অভিযোগ" নামে এক প্রবন্ধে আমার খুব সমালোচনা করেন। সম্মেলনে বহু শ্রোতার সমাগম হয়। তারা শুনে হাসতে লাগল। জগদীশ বসুর কথা স্বতন্ত্র। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি বাংলা বানান বদলাতে চান?' আমি বললাম, না, 'বানান নয়, অক্ষর।' এ কথাটা বোঝাতে আমার ২৪ বৎসর লেগেছে।

তারপর আরম্ভ হইল বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর প্রচার। নিজের কর্ম্ম-জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি বুঝিয়াছেন ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ইহা সম্ভব। সেই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন তিনি কটক মেডিক্যাল স্কুলে।

যোগেশচন্দ্রের বক্তৃতার যে বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ। তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের পরিচয় সম্বন্ধে তিনি আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নানা পত্রিকার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। "প্রদীপ", "প্রবাসী"র পৃষ্ঠায় তাহার নিদর্শন আছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে যে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়, আজও তাহা অটুট আছে। তাঁহার নিকট আমাদের ঋণ অপরিশোধনীয়। বাঙালী জাতি এই জ্ঞান-যোগীর নিকট যে কত ঋণী তাহার সম্যক ধারণা আজ আমরা হয়ত করিতে পারিব না। কিন্তু বাংলা ভাষা আজ যে নূতন জীবনের বিজয়-ভেরী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার শব্দ-সম্পদ যোগেশচন্দ্রের সাধনালব্ধ।

৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আজ একুশ বৎসর তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁর কীর্ত্তি-কথা দেশের লোকে ভুলিয়া যাইতেছে। শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে যদি তাহা আমাদের স্মৃতিপটে ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায়, তবে দেশের কল্যাণ হইবে। পিতৃমাতৃ ঋণের মত সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। শতবার্ষিকী উৎসব সভার সভাপতিরূপে শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজা-গোপালাচারিয়ার গত ১০ই ডিসেম্বর এই ঋণের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন:

> ভারতে জাতীয়তার প্রথম প্রভাত সুরেন্দ্রনাথের মধ্য দিয়া মূর্ত্ত ও প্রতিফলিত হইয়াছিল। কি ধর্ম্ম, কি সমাজ-নীতি, কি রাজনীতি, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাংলা বহু বিরাট পুরুষের জন্ম দিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের জীবনেতিহাস বাংলার গৌরবশ্রেষ্ঠ অধ্যায়সমূহের অন্যতম। কংগ্রেসের জন্ম হইতে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত কংগ্রেস বলিতে তাঁহাকেই বুঝাইত। কংগ্রেসের যাহারা জনক, তিনি তাঁহাদের অন্যতম।"

এই কয়টি পংক্তির মধ্যে ভারতের প্রায় এক শত বৎসরের ইতিহাস উহ্য আছে। সে ইতিহাসকে জানিলেই ভারতের নব-জাগরণের সম্যক মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যাইবে। এই ইতিহাসের পুরোভাগে দেখিতে পাই রাজা রামমোহন রায়ের বিরাট মূর্ত্তি। এক হাতে তিনি দেশের সামাজিক জঞ্জাল সব সরাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন, অন্ত হাতে করিতে-

দেন কূটনীতির বেষ্টনী হইতে দেশের মন-বুদ্ধিকে মুক্তিদান। ১৮২০ সাল হইতে ১৮৭০ সাল পর্য্যন্ত মুক্ত-আত্মা ভারতের একটা রূপ দেখিতে পাই। এই সময়ের মধ্যে "ইয়ং বেঙ্গল", "ইয়ং বোম্বাই" দেশের অনেক সংস্কারের উপর আঘাত করিয়াছে, অনেক সংস্কারের বন্ধন হইতে দেশের মনকে মুক্ত করিয়াছে। এই আঘাতের প্রয়োজন ছিল দেশের মনকে মোহ-মুক্ত করিয়া সুষুপ্ত অবস্থা হইতে জাগাইবার জন্য। এই জাগরণের শেষে আমরা দেখিতে পাই বাংলাদেশে "হিন্দুমেলা", উত্তর-ভারতে মুসলমান সমাজে নূতন শিক্ষার প্রতি আগ্রহ। এই কথাই বলিয়াছিলেন হেনরী কটন সাহেব তাঁর "নিউ ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তকে—"The Bengalee Baboos new rule public opinion from Peshawar to Chittagong."—বাঙালী বাবু পেশোয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যান্ত ভূ-খণ্ডে জনমত গঠন করে, গতিশীল করে। এই বাঙালী বাবু নানা মূর্ত্তিতে হিমালয় হইতে বিন্ধ্যাচল পর্যান্ত ভূ-ভাগে নব-ভারতের নানা উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে—শিক্ষকরূপে, আইনজ্ঞরূপে, চিকিৎসকরূপে, সাংবাদিকরূপে, ধর্ম্মপ্রচারকরূপে, সমাজ-সেবকরূপে। এই সংগঠনের ইতিহাস ভারতবর্ষের ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস।

এই বাঙালী বাবুর মধ্যে প্রধান ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। বাংলা-দেশে তাঁহার সহকর্ম্মী ছিলেন আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ। ভারত-সভা (Indian Association) প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি দেখাইয়া দেন আমাদের সমগ্র রাজনীতির কর্ম্ম-প্রচেষ্টার আদর্শ ও লক্ষ্য। কংগ্রেসের জন্মের দুই বৎসর পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্সের উদ্যোগ করিয়া সর্ব্বভারতীয় রাজনীতিক কর্ম্মের তিনি নির্দ্দেশ দেন। তারপর ১৮৮৬ সাল হইতে কংগ্রেস ও সুরেন্দ্রনাথ হইয়া পড়িলেন অভিন্ন, সুরেন্দ্রনাথ হইলেন কংগ্রেসের বাণীমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি ছাড়া আর এক মূর্ত্তি ছিল তাঁহার। সেই মূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল কংগ্রেসনেতৃত্ব লাভের পূর্ব্বে শিক্ষকরূপে, ছাত্রসমাজের নেতারূপে। কলিকাতা ও বাংলার ছাত্রসমাজ, দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তানায়ক ও কর্ম্ম-নায়কবর্গ, ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে গড়িয়া উঠে কেশবচন্দ্র সেন ও সুরেন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়। নব্য ইটালীর স্রষ্টা ম্যাটসিনি, গারিবল্ডি, শিখ খালসার স্রষ্টা গুরু গোবিন্দ-সিংহ, শ্রীচৈতন্যের আপামর প্রেমদান এই নরশ্রেষ্ঠদের জীবন-কথা বলিয়া আমাদের পূর্ব্বগণের জীবনে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেন সুরেন্দ্রনাথ। সেই যুগের যুবকদের স্মৃতিকথায় পাড়িয়াছি যে রাজনীতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা সুরেন্দ্রনাথের অনুপ্রাণনায়ই সম্ভব হইয়াছিল। ত্রিশ বৎসর পরে বারীন-উপেন্দ্র-উল্লাসকর ইহাকে রূপদান করেন। তখন সুরেন্দ্রনাথ হইয়া উঠিয়াছেন কংগ্রেস-নেতা। কিন্তু তিনি বিপ্লবীদের নিরুৎসাহ করেন নাই, নীরস উপদেশ শুনাইয়া কখনও তাহাদের বিদায় দেন নাই। এই বৈশিষ্ট্য সুরেন্দ্রনাথের ছিল।

সুরেন্দ্রনাথের যুগে যে সম্প্রদায় দেশের রাজনীতিক মান-অপমানের বাধায় ক্ষুব্ধ হইতেন, দেশের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার চেষ্টা করিতেন, সে সম্প্রদায় শ্রেণীস্বার্থ ও শ্রেণী-সংগ্রামের কথা জানিতেন না। একটা সহজ, সরল সম্ভ্রমবোধ ছিল তাঁহাদের। সেই ভাব বিদেশী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পদে পদে অপমানিত হইত। সেই অপমান তাঁহাদের রাজনীতিক প্রচেষ্টায় প্রেরণা যোগাইত। সেই যুগে জাতীয় আত্মসম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য রাজনীতিক আন্দোলন ছিল একমাত্র অস্ত্র। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়া সুরেন্দ্রনাথ প্রমাণ করিয়া-ছিলেন যে রাজনীতিক সংঘর্ষ তিনি ভয় করেন না। তাঁহার যুগে রাজনীতি সাম্প্রদায়িক আশা-আকাঙ্ক্ষার বাহন হইয়া উঠে নাই। সেইজন্য তাঁহারা জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের সেবা করিতে পারিয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রভেদ, অবস্থার ভেদাভেদ তাঁহাদের কর্ম্মপথে কোন বাধার সৃষ্টি করে নাই। আজ বিভক্ত ভারতবর্ষে সেই সরল, সহজ রাজনীতির অভাব আমরা অনুভব করি।

পরলোকে অধ্যাপক লাড্‌লিমোহন মিত্র

বঙ্গবাসী কলেজের রসায়নশাস্ত্রের খ্যাতনামা অধ্যাপক লাড্‌লিমোহন মিত্র মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। আধুনিক কালে শিক্ষাব্রতী হিসাবে যাঁহারা সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অধ্যাপক লাড্‌লিমোহন অন্যতম। যৌবনে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করিয়া তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার সঙ্কল্প করেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে আপনার সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করেন। কলেজ ছিল তাঁর প্রাণ, অপর অধ্যাপকদের ছুটি ছিল কিন্তু তাঁর ছিল না। ছুটিতে কলেজে আসিয়া তিনি ল্যাবরেটরির সমস্ত দোষত্রুটি সংশোধন করিতেন। পূর্ব্ব-বঙ্গের সমস্ত স্কুল-কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বাঙালী ছাত্রদের সম্মুখে যে সমস্যা দেখা দেয় তিনি তাহাতে বিচলিত হন। যে সব ছাত্রকে হঠাৎ এই ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইল, মূলতঃ তাহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র; কলিকাতার কলেজে তাহা-দের স্থান যাহাতে হয় তাহার জন্য তিনি একান্ত আগ্রহান্বিত হন। বঙ্গবাসী কলেজে সকালে ও সন্ধ্যায় ক্লাস খুলিয়া তিনি আগত ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ করিয়া দেন। নিজে তিনি সকাল হইতে রাত্রি পর্যান্ত সমস্ত বিভাগের কাজ করিতেন।

অধ্যাপক মিত্রের ন্যায় নির্লোভ মানুষ এ যুগে নিতান্ত বিরল। তাঁহার লিখিত ইণ্টারমিডিয়েট কেমিষ্ট্রি বইখানি ভারতবর্ষের ও ভারতের বাহিরে দক্ষিণ-আফ্রিকা, সিংহল, সুমাত্রা, জাভা, জাপান প্রভৃতির বহু কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হইয়াছে। প্রায় ছয় শত রেখাচিত্র সমেত প্রায় সাত

শত পৃষ্ঠার পুস্তকের দাম তিনি যুদ্ধের বাজারেও তিন টাকার বেশী করেন নাই। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে দরিদ্র ছাত্র হিসাবে পাঠ্যাবস্থায় যে অসুবিধা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। অথচ এই একখানি পুস্তকের দ্বারা তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। একটি ইংরেজ পুস্তক প্রকাশক কোম্পানীর প্রাক্তন ম্যানেজারের নিকট শুনিয়াছি পুস্তক-প্রকাশের ঝঞ্ঝাট এড়াইবার জন্য একবার তিনি উহার প্রকাশের দায়িত্ব ঐ কোম্পানীকে দিতে চান এবং সেই মর্ম্মে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের সময় তিনি বলেন যে একটা বিষয় ভুল হইয়া গিয়াছে, পুস্তকের দাম বাড়ানো যাইবে না এবং প্রতি বৎসর এক শত ছাত্রকে তিনি যে পুস্তক বিতরণ করিয়া থাকেন তাহা তাঁহাকে দিতে হইবে ইহা চুক্তিনামায় লেখা হয় নাই। ইংরেজ কোম্পানী ইহাতে অসম্মত হয়।

ভাই পরমানন্দ

পঞ্জাবের উপর দুর্দ্দিনের ঘনঘটা বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং সেই সময়ে এই আর্য্যসমাজী নেতার তিরোধান এক যুগ-পরিবর্ত্তনের পরিচয় দিতেছে। যে আদর্শ ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় ভাই পরমানন্দ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন পঞ্জাব বিভাগে তাহার সাফল্য ব্যাহত হইয়াছে। পঞ্চনদ তীরে আর্য্যসমাজ এক নূতন প্রবাহের সৃষ্টি করিয়া পঞ্জাবের হিন্দু সমাজকে নবরূপ দান করে। মুঘল সম্রাটের অত্যাচারে গুরু নানকের শিষ্যগণ "খালসায়" পরিণত হয়। ইংরেজ শাসনের সময় পঞ্জাবের হিন্দুগণ আর্য্যসমাজের প্রেরণায় এক নূতন দৃঢ়তা লাভ করে। ইহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ পায় লালা লাজপৎ রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও লালা হংসরাজের জীবনে। ভাই পরমানন্দ ইঁহাদের মন্ত্র-শিষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেইজন্য দেখিতে পাই প্রথম জীবনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষায় উচ্চ সম্মান লাভ করিয়া তিনি আর্য্যসমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। ত্যাগের পথে চলিতে চলিতে যাইতে হয় তাঁহাকে দক্ষিণ-আফ্রিকায়, দক্ষিণ-আমেরিকায়, যুক্তরাষ্ট্রে। শেষোক্ত দেশে শ্রমজীবী পঞ্জাবীরা একটা ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাঁহাদের সংগঠনে ভাই পরমানন্দ ১৯১২ সাল হইতে প্রবৃত্ত ছিলেন। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয় যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার পঞ্জাবীরা তখন রণোন্মাদনায় মাতিয়া উঠে। গদর পার্টি নামে এক বিদ্রোহী দল গড়িয়া উঠে লালা হরদয়াল ও ভাই পরমানন্দের নেতৃত্বে। এইজন্য যখন ভাই পরমানন্দ ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসেন তখন রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। এই আদেশ রূপান্তরিত হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে। ১৯২০ সালে অনেক বিপ্লবীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়; ভাই পরমানন্দ তাঁহাদের একজন। মুক্তিলাভ করিয়া তিনি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এই আন্দোলন যখন দুর্ব্বল হইল এবং গান্ধীজী সৃষ্ট হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্দ্য বুদ্বুদের ন্যায় উড়িয়া গেল, তখন ভাই পরমানন্দ সাম্প্রদায়িক মেল-বন্ধনে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিলেন, ভারতীয় মুসলমানের রাজনীতিক বিশ্বস্ততায় ও সাহচর্য্যে আস্থা হারাইয়া ফেলিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়ারূপে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম হিন্দু মহাসভার নেতৃরূপে। বিগত পঁচিশ বৎসর হিন্দু সমাজকে স্বয়ংসিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না।

সুধীরকুমার লাহিড়ী

সুধীরকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের দেহত্যাগে "প্রবাসী", "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকা মণ্ডলীর একজন পরম সুহৃদ হারাইয়া আমরা আত্মীয় বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিতেছি। প্রথম যৌবনে তিনি সংবাদপত্র সেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পরিণত বয়সে সাধনোচিত লোকে গমন করিয়াছেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় ডাঃ নীলরতন সরকারের মধ্যস্থতায়। এই মহারাষ্ট্র নেতা তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া লক্ষ্ণৌয়ের গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মার সঙ্গে তাঁহার সংযোগ ঘটাইয়া দেন এবং সুধীরকুমার এডভোকেট পত্রিকার সম্পাদকরূপে লক্ষ্ণৌ গমন করেন। তারপর "পাঞ্জাবী" দৈনিক পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হইয়া লাহোরে গমন করেন। চার-পাঁচ বৎসর পরে তিনি লাহোরের "ট্রিবিউন" দৈনিকের সহযোগী সম্পাদক পদে বৃত হন, কালীনাথ রায় মহাশয় তখন ঐ পত্রিকার সম্পাদক। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর পঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হয়; ট্রিবিউন পত্রিকা সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া যায়, এবং সুধীরকুমার কলিকাতা চলিয়া আসেন। তখন বাংলাদেশের পাট-ব্যবসায়ে শ্বেতাঙ্গ বণিকের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। বিড়লা প্রমুখ মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীগণ এই চক্র ভাঙিতে চেষ্টা করেন। সুধীরকুমার এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং পাট-ব্যবসায়ে কি করিয়া পাট-চাষীদের বঞ্চিত করা হয় তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করেন। সবরেন্টও এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন, এবং যামিনীমোহন মিত্র সমবায় প্রথায় পাটের বেচা-কেনায় ব্যবস্থা করেন। সুধীরকুমার দরিদ্রের সেবার এই সুযোগ পাইয়া দুইখানি সমবায় পত্রিকার (বাংলা ও ইংরেজী) সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এত দিন সমবায় প্রথার প্রকৃত পরীক্ষা বাংলাদেশে হইতে পারে নাই। আজ স্বাধীন রাষ্ট্রে সুধীরকুমারের নানা স্বপ্ন সফল হইতে পারে।

নরসিংহ চিন্তামন কেলকার

বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক আমাদের জাতীয় জীবনে যে যুগ-পরিবর্ত্তন সূচনা করেন তাহার শেষ সাক্ষী পৃথিবী হইতে চলিয়া

গেলেন। বলবন্তরাওএর মন্ত্রশিষ্যদের মধ্যে নরসিংহ চিন্তামন কেলকার এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দেশের চিন্তাজগতে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভাব সহস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তার ধারক ছিলেন বহু জনের মধ্যে এক জন—বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক। ইহার পূর্ব্বে প্রায় তিন-পুরুষ আমরা ইংরেজী সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছি, এবং ইংরেজের অনুকরণকে চতুর্বর্গ লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে আমরা প্রথম দেখিতে পাই ইহার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহচেষ্টা। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে তার প্রকাশ পাই ভাবজগতে আর্য্যসমাজে, থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে; বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শনে", পুণার বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপলুণকারের "নিবন্ধ-মালায়"। বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক মহারাষ্ট্রদেশে ছিলেন এই বিদ্রোহের চিন্তানায়ক। "কেশরী" পত্রিকার জনপ্রিয়তা ইহার সাক্ষী। আবেদন-নিবেদনের ডালা বহিয়া লইবার যে অপমান আমাদের রাজনীতি ক্ষেত্রে সহজ হইয়া উঠিয়াছিল, এই পত্রিকা মহারাষ্ট্রে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে শিক্ষা দেয়। প্রথম যৌবনে নরসিং চিন্তামন কেলকার এই বিদ্রোহের আলোড়নের মধ্যে পড়েন; এবং আজীবন এই মনোভাবের পতাকাবাহক ছিলেন। গান্ধীযুগে যে নূতন চিন্তাজগতের সৃষ্টি হইল তাহা পূর্ব্বের উত্তরাধিকারী হইলেও, টিলকের শিষ্যবৃন্দ ইহা অকুণ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অসহযোগ আন্দোলনে, আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের মন ও বুদ্ধি ইহাতে সায় ও সাড়া দেয় নাই। নরসিংহ চিন্তামন কেলকার তাঁহার গুরুর দেহত্যাগের পর অতীত যুগের চিন্তাধারার সহিত বর্ত্তমান যুগের সঙ্গতিসাধন করিবার একটা চেষ্টা করেন "কেশরী" পত্রিকার সম্পাদকরূপে, সাহিত্যস্রষ্টারূপে কাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধে। এই ভাবে তিনি মহারাষ্ট্র দেশের চিন্তানায়কদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সূর্য্যোদয় দেখিয়া গিয়াছেন, ইহাই আমাদের সান্ত্বনা।

চিমনলাল শিতলবাদ

বর্ত্তমান ভারতের রাজনীতিকগণের নিকট চিমনলাল শিতলবাদ অন্ত কোন নক্ষত্রলোকের অধিবাসী। কারণ তাঁহারা শিখিয়াছেন যে বর্ত্তমান যুগে যে ফলে ও ফুলে আমাদের রাজনীতিক জীবন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্ম কাহাকেও জমি চাষ করিতে হয় নাই; আপনা হইতে ইহারা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, কোন জগতেই এরূপ অঘটন ঘটে না; আমাদের দৃষ্টির অলক্ষিতে প্রকৃতির সৃজন-চেষ্টা থামে না। সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দেশের মানব-মন কখনও অকর্ষিত থাকে না। আজিকার শতদলের পশ্চাতে আছে বহু জনের অক্লান্ত চেষ্টা; সেই বহু জনের অনেকেই অজ্ঞাত থাকিয়া যান। চিমনলাল শিতলবাদ এরূপ ইতিহাসের অঙ্গ, এরূপ ইতিহাসের সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করিয়া-ছেন। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তখন দেশের চিন্তা-জগতে ও কর্ম্মজগতে পশ্চিম ভারতে দিক্‌পালরূপে বিরাজিত ছিলেন দাদাভাই নৌরোজি, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে। ফিরোজ শাহ মেহ্‌তা, নারায়ণ গণেশ চন্দ্রভরকর, গোপাল-কৃষ্ণ গোখলে ইঁহাদের শিষ্য। চিমনলাল শিতলবাদ ইঁহাদের বয়ঃকনিষ্ঠ। রাজনীতিক জীবনে ইঁহারা ব্রিটিশ শাসনকে ভগবানের মঙ্গলবিধান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং এই বিধানের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনে সাহায্য করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি-তেন। নানা কুব্যবস্থা, অব্যবস্থা আমাদের সমাজের জীবনকে দুর্ব্বল ও অপটু করিয়াছে। এই কুব্যবস্থা ও অব্যবস্থার সংস্কার সাধন না করিলে আমরা রাজনীতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব না। এই বিশ্বাসের বশে আমাদের এই পূর্ব্বজগণ চিন্তা করিতেন, কর্ম্ম করিতেন। যত দিন আমা-দের সমাজ জীবন সংস্কৃত ও শোধিত না হইয়া সুগঠিত ও সুসম্বদ্ধ হইয়াছে, তত দিন বৃটিশ-শাসনের শৃঙ্খল আমাদের মানিয়া লইতে হইবে; না হইলে দেশে আসিবে অরাজকতা; উচ্ছৃঙ্খল জনগণ সভ্য জীবনের সকল আয়োজন ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। এবং এই কারণেই যখন বাংলাদেশে ১৯০৫ সনে আত্মবিশ্বাসের বিকাশ দেখা দিল তখন এক দাদাভাই নৌরোজী ছাড়া কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই ইহাকে অভিনন্দিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু দাদাভাইয়ের স্বীকৃতি প্রমাণ করে যে আমাদের পূর্ব্বজ-গণের মন নবভাবের বিরোধী ছিল না, যদিও কর্ম্মক্ষেত্রে তার প্রমাণ দিতে তাহা পরাঙ্মুখ ছিল। এই দুর্ব্বলতার মূল্য দিতে হইয়াছে তাঁহাদের বিগত চল্লিশ বৎসর ধরিয়া। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত স্বভাব-বিপ্লবী গান্ধী-যুগের পয়োধি জলে ভাসিয়া গেলেন। এইরূপ একটা বিরাট পরিবর্ত্তন মানুষের মন সহজে স্বীকার করিয়া লইতে পারে না। চিমনলাল শিতলবাদ ছিলেন প্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী, রাজনীতিক নেতৃত্ব গান্ধী-পূর্ব্ব-যুগে যাঁহাদের হাতে সহজে চলিয়া আসিত। তিনি অনেক বৎসর ছিলেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর; শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ শাসক-গোষ্ঠীর নবাবীর বিরোধী। তাঁহার রাজনীতিক জীবনযাত্রা সুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে; সেই যুগের রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে ইংরেজের সঙ্গে বিরোধ যেখানে অপরিহার্য্য হইয়া পড়িত সেখানে ফিরোজ শাহ মেহ্‌তা প্রভৃতি নেতৃবর্গ পশ্চাৎপদ হইতেন না। চিমনলাল শিতলবাদ এই কর্ম্মপন্থার বিশ্বাসী ছিলেন; যুগধর্ম্মানুযায়ী কোন কর্ত্তব্য তিনি অবহেলা করেন নাই। গান্ধীজীর জীবনে সে যুগের কোন প্রভাব নাই, এমন কথাও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

বাঙালী ছাত্রদের কথা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আজকাল প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাঙালী ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধির দিক দিয়া অধঃপতন হইয়াছে, কেননা সর্ব্ব-ভারতীয় পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রেরা আগেকার মত কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকগণ নিশ্চয়ই বলিবেন যে, গত আট-দশ বৎসর হইতে বাঙালী সাধারণ ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধির পরিমাণ মোটের উপর বেশ কমিয়াছে। যত দিন যাইতেছে পরীক্ষায় ছাত্রদের অযোগ্যতা ততই তীব্রতর ভাবে প্রকট হইতেছে। গড়ে ছাত্রদের বুদ্ধি যে কমিয়াছে তাহা পরীক্ষক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ছাত্রদের বুদ্ধি কমিবার নানা কারণ বর্ত্তমান; তাহার মধ্যে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, দুঃখ-কষ্ট, উপস্থিত শাসন-ব্যবস্থার উপর তীব্র অসন্তোষ ও নানা ঘটনা উপলক্ষে তাহার স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক প্রকাশ, ছাত্রদের নিজস্ব রাজনীতিক মতামত, দলাদলি, অছাত্রীয় ব্যাপারে তাহাদের উৎকট আগ্রহ ও খেলাধুলা, সিনেমা, থিয়েটার এবং সভা-সমিতিতে তাহাদের অত্যধিক সময়ক্ষেপ প্রভৃতি কারণ উল্লেখযোগ্য।

ছাত্র-আন্দোলন যে পথে গত কয়েক বৎসর হইতে চলিতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আমরা শিক্ষক-সম্প্রদায় কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হইয়াছি। ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ বা উচ্ছ্বাসের আধিক্য হেতু তাহাদের সত্যকার মনের চিত্র খানিকটা বিকৃত হইয়া আমাদের চক্ষে পড়া স্বাভাবিক। তাহাদের আন্দোলন সম্বন্ধে বিকৃত ধারণাও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু যদি বলা যায়, ছাত্রেরা ঠিক পথে চলিতেছে না তাহা হইলে তাহাদের দিক হইতে তীব্রভাবে আপত্তি উঠিবে; অবশ্য আপত্তিটা যুক্তি নয় তাহা ছাত্রেরা স্বীকার না করিলেও তাহাদের শিক্ষকগণ আশা করি স্বীকার করিবেন। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ভাইস-চ্যান্সেলর কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়াছে। তাহাদের অধিকার স্বীকার করা যে সঙ্গত ও কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের উচিত তাহাদের সহিত আলোচনা করিয়া কাজ করা, এই ধরণের কথা অধ্যাপক সম্মেলনে মিঃ কেলাস একবার বলিয়াছেন। অন্যান্য দেশে ছাত্রদের এই অধিকার স্বীকার করা হয় কি না তাহার প্রশ্ন আজ তুলিব না। ছাত্রদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও কর্ম্মপন্থার সমালোচনাও করিতে চাহি না। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর মত বলিতেও চাহি না যে ছাত্রদের রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ছাত্রেরা যে ছাত্রত্বের দিক দিয়া ব্যর্থ ও পঙ্গু হইয়া যাইতেছে এবং বুদ্ধি ও মনোবৃত্তির দিক দিয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গলকে তাহাদের চাপল্য ও অশুভ বুদ্ধি দিয়া ক্ষুণ্ণ করিতেছে তাহা তাহাদের শিক্ষক হইয়া আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি। ছাত্রেরা রাজনীতি, আন্দোলন, দলাদলি, ষ্ট্রাইক প্রভৃতি বিষয়ে উৎসাহ দেখাইলেও বা ভারতীয় বিশ্বরাজনীতি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞদের সমতুল্যভাবে সমালোচনা করিলেও ছাত্রদের উন্নতি, বিদ্যালাভের আগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে তাহারা সম্মিলিত ভাবে কতটুকু কাজ করিয়াছে তাহাই আমরা জানিতে চাই। সম্ভবতঃ দৃষ্টি-ভঙ্গীর পার্থক্যহেতু ছাত্রদের চক্ষু ও মন লইয়া আমরা তাহাদের বিচার করিতে পারি না। সেইজন্য ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে ছাত্রদের মতামত উল্লেখ করিলে আশা করি অনেকটা নিরপেক্ষ ভাবে এদেশীয় ছাত্রদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বা ভয়ের কথা স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিব।

একটি পরীক্ষায় কলেজ-জীবন সম্বন্ধে কলেজের ছাত্রদের লেখা প্রায় দুই শত হইতে আড়াই শত প্রবন্ধ পরীক্ষা করিবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য বর্ত্তমান লেখকের হইয়াছে। ছাত্রদের খাতা হইতে আমি অনেক অংশ লিখিয়া লইয়াছি, তাহা দ্বারা ছাত্রজীবনের আদর্শ, দোষ-গুণ প্রভৃতির একটি বেশ সুন্দর চিত্র আঁকিতে পারা যায়। এই ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিমান্ ও নির্ব্বোধ, কংগ্রেসপন্থী কম্যুনিষ্ট ও সোস্যালিষ্ট, দলীয় ও অদলীয়, সকল প্রকারের ছাত্র আছে। কেহ বা নিষ্ঠুর ভাবে ছাত্রদের রাজনীতি ও ষ্ট্রাইক-প্রীতিকে আক্রমণ করিয়াছে, কেহ বা ছাত্রজীবনের দলাদলি, চুরি, অসাধুতা প্রভৃতির কঠোর সমালোচনা করিয়াছে। কেহ বা অনুতপ্ত; একটিমাত্র ছাত্র জাতীয় জীবনে উচ্চ আদর্শের কথা অবতারণা করিয়াছে; কাহারও বা ছাত্রদের রাজনীতিতে বিরাট দানের প্রসঙ্গে বেশ একটু গর্ব্ববোধ আছে। মোটের উপর যে চিত্র পাইয়াছি তাহাতে মনে আশা জাগে না।

স্কুল হইতে কলেজে আসিয়া ছাত্রেরা বৃহত্তর জগতেরও স্বাধীনতার স্বাদ পায়। তাহাদের দায়িত্বও যে বাড়িয়া যায় তাহা অধিকাংশ ছাত্রই ভুলিয়া যায়। ছাত্রেরা নানা সঙ্ঘ ও দলে পড়িয়া তাহাদের পূর্ব্বার্জ্জিত ধারণা ত্যাগ করিতে থাকে। নানা মতবাদের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া অনেকেরই মাথা ঘুরিয়া যায়। স্কুলে শিক্ষকদের সাহচর্য্য ও সতর্ক দৃষ্টি কলেজের অধ্যাপকদের নিকট পাওয়া যায় না। অধ্যাপকেরা

ছাত্রদের অন্তরে প্রবেশ করিতে চাহেন না। তাঁহাদের কাজ বক্তৃতা দেওয়া, ছাত্রদের কাজ শুনিয়া যাওয়া। সুতরাং ছাত্রেরা অনেকটা স্বাধীনতা পায় ও অবাঞ্ছিত সংসর্গে পড়িয়া তাহার অপব্যবহার করে। ক্লাস পলায়ন একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। অধ্যাপকদের সহিত ব্যবহার ঈষৎ অশিষ্ট। একটি ছাত্র বলিতেছে—

Now-a-days it is often seen that students do not talk politely with their professors. They try to oppose the very teaching of the professors.

অপর একটি ছাত্র বলিতেছে—

What struck me much was the behaviour of the students towards our Venerable teachers. Most of them are so rough in manners that it is shameful for the student community.

আর একটি ছাত্র বলিয়াছে—

College students cannot show unquestioned reverence to their professors and the principal and argue on points they do not know well.

সকল ছাত্রই অশিষ্টাচারী নহে। অধ্যাপকেরাও দোষ-শূন্য নহেন। একটি ছাত্র লিখিতেছে—

The professors do not mix with the students. They have superiority complex.

আবার সকল অধ্যাপকই ভাল শিক্ষক নহেন, একটি ছাত্রের ভাষায়—there are good scholars but bad teachers. এই কারণেই ছাত্রদের জীবন সম্পূর্ণ হইতে পায় না ও পাণ্ডিত্যের উপর প্রীতি গভীর হইতে পারে না। ছাত্র ও অধ্যাপকের মন রুচি আদর্শ একমুখী না হইলে শিক্ষা সার্থক হইতে পারে না। কলেজ, অধ্যাপক ও তাঁহাদের আবেষ্টনের উপর একটা মমত্ববোধ বা গর্ব্ববোধ অতি অল্প ছাত্রেরই আছে। প্রতি কলেজের একটা ঐতিহ্য আছে, প্রতিবার যাহারা কলেজে ভর্ত্তি হইতেছে তাহাদের সেই ঐতিহ্যের উপর অনুরাগ থাকা দর কার। বোধ হয় একটি মাত্র ছাত্র কলেজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছে। ইহা যে ছাত্রদের একটা ধর্ম্ম এ বোধ অন্য কোন ছাত্রের মধ্যে দেখিলাম না। একটি ছাত্র ভাল ছেলেদের সম্বন্ধে লিখিয়াছে—I find in the scholars deep curiosity and hankering for knowledge. তাহারা অধ্যাপকদের সহিত মিশিতে চায়, নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে ও নূতন নূতন বই পড়িতে চায়।

অল্প ছাত্রই কলেজকে শিক্ষার স্থান হিসাবে গণ্য করে।* তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত্তি যে এস্থানে স্থাপিত হয় তাহার উল্লেখমাত্র পাই নাই। একটি ছাত্র বলিয়াছে, কলেজে—Thoughts and visions have been widened." ছাত্রদের মন জুড়িয়া বসিয়াছে রাজনীতি ও তাহাকে অবলম্বন করিয়া দলাদলি। পরাধীন দেশের হৃদয়বান তরুণরা যে দাসত্ব ও দারিদ্র্যের কথাকে সকলের ঊর্দ্ধে স্থান দিবে তাহা অবশ্যই স্বাভাবিক। কিন্তু কলেজে 'ইউনিয়ন' লইয়া ছাত্রদের যে দলাদলি সে সম্বন্ধে তাহাদের মত প্রণিধানযোগ্য। ইউনিয়নের মধ্য দিয়া ছাত্রদের ঐক্য থাকে, তাহাদের চিন্তা দানা বাঁধিতে পায়, চিন্তা কার্য্যে রূপান্তরিত হইতে চায়। বক্তা, গায়ক, রসিক ও কবি যাহারা তাহারা এই ইউনিয়নের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে ও ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ইহার মধ্য দিয়াই রাষ্ট্রচালনার প্রথম পাঠ শিখিতে পারে। একটি ছাত্র লিখিতেছে—

There was a union of our college. I am ashamed of writing that it did nothing. Students can do many things. They have a fresh mind and a wide outlook. But all the energies of the young students, all their potentialities are frittered away without guidance . . . We criticised political matters and the leaders foolishly. We did little to understand the things of the world. We did not study much. We only idled away time. I saw the students are divided into political and fanatical groups with no perfect idea of the situation. We are politically a dependent country hopelessly wasting our energy. . . . There are none to look after us. Those who look cannot either impress us or do only nominal duties.

আত্মস্বীকৃতি হিসাবে ইহার যথেষ্ট মূল্য আছে। সাধারণ ছাত্রেরা এতখানি বিনয় সহকারে আপনাদের ত্রুটি স্বীকার করিতে চাহে না। নিজেদের সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা বিশেষ উচ্চ। তাহারা নিজেদের কেবল দেশের আশাভরসা-স্থল হিসাবে গণ্য করে না, তাহারাও রাজনীতিতে পাকা রাজনীতিজ্ঞদের অপেক্ষা কম নহে এ ধারণাও কাহারও কাহারও আছে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া একটি ছাত্র লিখিয়াছে—

In the practical life of a country students play *the most important part.*

অপর একটি ছাত্র ছাত্রদের রাজনীতি সম্বন্ধে লিখিয়াছে—

I see that student politics is nothing but fanaticism. They are excited by some emotional speeches, face the *lathi* charges and firings and waste their lives.

অবশ্য এই ফ্যানাটিসিজমেই† জাতি বড় হয়। যাহারা হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিতে পারে জাতির যৌবনকে গৌরবের মাল্যে তাঁহারাই ভূষিত করিতে পারিয়াছে। উপরে উক্ত ছাত্রটির কথাই ঠিক—There are none to look after us. এমন হীরার টুকরা ছাত্রদের ভাল নেতা নাই, তাই বেঘোরে তাহাদের প্রাণ যাইতেছে। তাহারা ঠিক পথে চলিতেছে না; উদার হৃদয়বৃত্তি তাহাদের দেশের

* ইহাই বর্ত্তমানে ছাত্রজীবনের ব্যর্থতার প্রধান কারণ।—প্রঃ সঃ

† যদি সে fanaticism ঠিক পথে ও ঠিক ভাবে চালিত হয়। নহিলে ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে। ক্রুসেডের ইতিহাসে, চীনদেশের প্রথম ছাত্র-আন্দোলনে, এবং অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে তাহা দেখা গিয়াছে।—প্রঃ সঃ

মুক্তির জন্য ব্যাকুল করিলেও,মোটের উপর তাহারা অছাত্র-সুলভ ব্যাপারে এতই মত্ত যে ছাত্রজীবনের দায়িত্ব বহন তাহারা করিতে পারে না। হুজুগে পড়িয়া অনেকে মাতিয়া উঠে; ইহারাই অধিকাংশ স্থলে আদর্শভ্রষ্ট হইয়া আপনাদের ও দলের ক্ষতি করিয়া বসে।

দুঃখের কথা ছাত্রেরা বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা চালিত হয় না; অনেকস্থলেই হৃদয়াবেগ তাহাদের রাজনীতিক্ষেত্রে টানিয়া আনে। যাহারা রাজনীতি করিতে চাহে তাহাদের বাধা দিবার অধিকার আমার নাই কিন্তু তাহারা কেন নামমাত্র ছাত্র থাকিয়া যাইতে চায়? পড়াশুনার দায়িত্ব তাহারা বহিবে না, অপরাপর ছাত্রকে নিজেদের দলভুক্ত করিতে চায়। মনে হয় ছাত্রজীবনের দায়িত্বের উপর ইহাদের কোন মায়া মমতা বা অনুরাগ নাই। ছাত্র আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি এইখানে। খাওয়া-পরার ভাবনা পিতামাতার উপর ছাড়িয়া দিয়া বিশুদ্ধ দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনীতি চর্চা, ইহাই যদি ছাত্রেরা করিতে চায় তাহা হইলে স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া দেওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। পড়াশুনা না করায় অধিকাংশ ছাত্র পরীক্ষায় অকৃত-কার্য্য হয়, কলেজের পাঠ অল্পেতেই শেষ হয়, অনেকে নন-কলেজিয়েট হইয়া যায় ও শতকরা ২৫।৩০টি ছাত্র পরীক্ষায় পাস করিতে পারে। অপরাপর ছাত্রদের দয়া-দাক্ষিণ্যের সুযোগে পাস করা সম্ভব হয়।

কলেজ ইউনিয়ন সম্পর্কে একটি ছাত্র লিখিয়াছে—

It is the greatest place of party politics. There are different political parties It is natural that it would create chaos and quarrel among the students. In my opinion, the Students' Union should be rectified (?) by selecting proper representatives who are free from fanatic and blind view about politics and free from communal passion . . . Party politics creates a bitter feeling. There are many leaders of different political parties who do not deserve to be called leaders. They do not lead the students but they take them astray. They rather disorganise the students. There should be one party.

এই ইউনিয়নের কাজ পর্য্যবসিত হইয়াছে ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ করায় এবং দলাদলি ও ধর্ম্মঘট চালানোতে। একটি ছাত্র লিখিতেছে—

The students seem to be well-disciplined, but mostly in the case of holding strikes only.

ষ্ট্রাইক বস্তুটি ছাত্রদের ব্রহ্মাস্ত্র। সকল দলই ষ্ট্রাইকের নামে এক হয় এবং কারণে ও অকারণে এই অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। পড়াশুনা বন্ধ হয়, পথে পথে বিক্ষোভপ্রদর্শন চলে, কেহ কেহ সিনেমায় যায়। অবশ্য ছাত্র-সম্প্রদায় সময়-বিশেষে যে দৃঢ়তা ও চরিত্রবল দেখাইয়াছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। যাহারা সত্যই চরিত্রহীন ও অপদার্থ তাহারা পুলিস ও মিলিটারীর আগ্নেয়াস্ত্রকে তুচ্ছ করিয়া স্বাধীনতার দাবি এমন অকুণ্ঠ ভাবে ও দলাদলি বিসর্জ্জন দিয়া প্রকাশ করিতে পারিত না। যাহাদের মনোবল এত দৃঢ় তাহারা কেমন করিয়া নির্ব্বোধের মত আত্ম-শক্তির অপব্যয় করে, দেশের মননশক্তিকে ক্ষুণ্ণ করে বা বুদ্ধিবৃত্তির অসম্মান করে তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না। কিন্তু তাহাদের মানসিক অধঃপতন হইয়াছেই—তাহা না হইলে অসংযম, দলাদলি, মারামারি, ইতরতা কখনই প্রবল হইত না। ছাত্র-আন্দোলনের রন্ধ্রে শনি ঢুকিয়াছে। ছাত্রেরা দলগত রাজনীতিকদের আওতা কাটাইয়া উঠুক ইহাই আমরা চাই। তাহাদের মধ্যে কেহ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছাত্রদের অকাজে লাগাইতে পারিবে না। ছাত্রদের পড়াশুনা, চিন্তাশক্তি, সহনশীলতা অসম্ভব রকমে কমিয়াছে। বৎসরের মধ্যে কারণে-অকারণে মাসাধিককাল ধর্ম্মঘট করিলে ইহা হইতে বাধ্য। ছাত্র হইয়া এ কার্য্য করা অবশ্যই গর্হিত। একটি ছাত্র ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে লিখিতেছে—

But the first thing that I consider to be the most hard obstacle in the path of attending lectures is the continual strikes. The students may strike for their grievances against the educational authorities. But such cause is one in a thousand, students' strikes are often political strikes, in sympathy for the labour movement. But these were so continual that the same thing happened day after day, for which every student's study was obstructed. It is not a surprise that 30 per cent. of the students come out successful in a university examination when we consider these things as strikes.

এই ষ্ট্রাইক কি কাজে লাগানো হয়? একটি ছাত্র লিখিতেছে—

Whenever a professor went against us we all united together and urged the professor to give (?) our demand.

অপর একটি ছাত্র লিখিতেছে—

The notice for the examination was served. The students were quite unprepared for it. They *made* an application to the Principal requesting him to stop the examination. The Principal paid no heed to them. They made an arrangement for a strike and said that they would not appear in the examination. In this way they stopped the examination.

যাহারা ডালহৌসী অভিযান করে, ভিয়েৎনাম দিবস প্রতিপালন করিতে গিয়া গুলি খায় তাহারা দল পাকাইয়া কত লজ্জাজনক ব্যাপার ঘটাইতে পারে ইহাই হইতেছে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ছাত্রদের শুভবুদ্ধি কে হরণ করিয়াছে?

পড়াশুনার ব্যাপারে যাহাদের আগ্রহ এইরূপ তাহারা পরীক্ষায় পাস করে কেমন করিয়া? একটি ছাত্র ইহার উত্তর দিয়াছে—

In the examination most of the students pass. It is because though they read nothing they are very apt to copy from their friends.

এই ব্যাপার এত পরিচিত যে ইহার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন। প্রশ্নপত্র দুরূহ হইলেও ছাত্রেরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আদ্যশ্রাদ্ধ পাকাইয়া তুলে। তাহাদের সম্মিলিত ঔদ্ধত্যের কাছে শুধু কলিকাতা নহে, মফঃস্বলেও শিক্ষকগণ তটস্থ হইয়া থাকেন। তাহাদের আচরণ দেখিলে মনে হয় তাহাদিগকে উন্মার্গগামী করিবার জন্য যেন ইংরেজ গবর্ণমেন্ট বহু অর্থব্যয়ে প্ল্যান করিয়া দক্ষ এজেণ্টদের ছাত্রদলে ছাড়িয়া দিয়াছে। আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন; ছাত্রেরা তো আর বলিতে পারিবে না—Education can wait, Swaraj cannot ও সেই অজুহাতে দিনের পর দিন স্কুল বা কলেজ কামাই করিতে পারিবে না। অন্য সভ্যদেশের ছাত্রদের সমকক্ষ হইতে হইলে, ভারতের স্বাধীনতাকে সার্থক করিতে হইলে তাহাদের ভাল ছাত্র হইতে হইবে; রাজনীতিতে মাতিয়া আপনাদের ক্ষতি করিলে চলিবে না। একটি বিষয় বড় আশ্চর্য্য লাগে যে এতগুলি ছাত্রসঙ্ঘ থাকিতেও অন্যায় আচরণকারী ছাত্রদের শাস্তি দিতে বা তাহাদের অসঙ্গত কার্য্যাবলী ব্যর্থ করিতে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে প্রস্তাব পাস ছাড়া বড় একটা কিছু তাহারা আজও করিতে পারে নাই। এইজন্যই মনে হয় ছাত্রদের শুভবুদ্ধির মূলে শনি লাগিয়াছে তাহা না হইলে কেমন করিয়া ছাত্রনেতাদের সম্বন্ধে এমন কথা একটি ছাত্র লিখিতে পারে?—

The representatives of the Union are very selfish and they try to *take* money from the College Students' Funds.

একটি বিষয় অবান্তর হইলেও দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি। ছাত্রদের হৃদয় উদার, তাহারা ইন্দোনেশিয়া বা ভিয়েৎনামের জন্য কাঁদিয়া ভাসায়; ইহাতে আমাদের বলিবার কিছু নাই। কিন্তু মুসলিম লীগ গবর্ণমেন্ট কলিকাতা ও নোয়াখালিতে যে অত্যাচারের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল, ১০০ নং হ্যারিসন রোডের মত কত শত ঘটনা তাহাদের আমলে ঘটিয়াছিল কিন্তু এক সম্প্রদায়ের ছাত্রেরা ইহা লইয়া মাথা ঘামায় নাই। মিথ্যা উদারতার মোহে বাংলার ছাত্রসমাজ অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে। মুসলিম লীগের অনুষ্ঠিত অত্যাচার সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ নয়; ইহার মূলে আছে ইংরেজ কূটনীতির চক্রান্ত। সুতরাং ছাত্রদের প্রথম হইতেই লীগের দুষ্টবুদ্ধিকে আঘাত দেওয়া উচিত ছিল বলিয়া মনে করি। ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রসঙ্ঘ ভাঙিয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া ছাত্র-আন্দোলনকে দুর্ব্বল করিত একথা মনে করা দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে। আমাদের দেশের দুঃখ বা সমস্যার সমাধান করিব আমরাই। দেশ ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাদের মনকে বিদেশীভাবাপন্ন ও বেদরদী করিল কে?

ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে সকলে ক্ষমার চক্ষে দেখেন। তাহাদের শাস্তি দিবার কথা কেহ তুলেন না। ইহার পশ্চাতেও একটি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। নেতারা তাহাদের কিছু না বলার কারণ দর্শাইয়াছে একটি ছাত্র তাহার অশুদ্ধ ইংরেজীতে—Because of getting liberty no one tells them nothing. অসাধু উপায় দ্বারা সৎ উদ্দেশ্য লাভ করিতে গেলে যে মার খাইতে হয় নেতারা তাহা কেমন করিয়া যে ভুলিতে পারেন তাহা ভাবিয়া পাই না। ছাত্রদের হাতে অসম্মান নেতারা পাইতেছেন ও বোধ হয় আরও পাইবেন। একটি ছাত্র বলিয়াছে—They are misled by political parties. ইহা ছাত্রেরা যদি বুঝিয়া থাকে তবে আশার কথা। কিন্তু রাজনীতির স্বাদ ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গী বিকৃত করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। পেশাদার রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে তাহারা যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চায়। একটি ছাত্র স্পষ্টই বলিয়াছে—In practical life the students play the most important part. তাহারা কলেজে অধ্যাপক, অধ্যক্ষ প্রভৃতির বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিয়া যে শক্তি অর্জ্জন করিয়াছে দেশের নানা সমস্যায় তাহারই প্রয়োগ করিয়া বসে। অনেকে গর্ব্বের সহিত উল্লেখ করিয়াছে যে তাহারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়িয়াছে, মরিয়াছে তবু পুলিসকে ডরায় নাই। তাহাদের কৃতিত্ব দেখিয়া ট্রাম কোম্পানীর ধর্ম্মঘটীরা, অমৃতবাজার পত্রিকার ধর্ম্মঘটীরা তাহাদের সহানুভূতি কামনা করিয়াছে। ছাত্রদের দেশ-বিদেশের অবস্থার সঙ্গে ওয়াকিবহাল হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাই বলিয়া কারণে-অকারণে স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া যত্রতত্র সহানুভূতি দেখাইতে যাওয়া সমীচীন নহে।

দোষের কথা অনেক বলিয়াছি। গুণের কথাও কিছু বলিতে হইবে। আজকালকার ছাত্রেরা ক্লাসের পড়াশুনায় ভাল না হইলেও দেশ-বিদেশের খবর রাখে; বিশেষ করিয়া কম্যুনিষ্ট ছাত্রেরা এ বিষয়ে বিশেষ পরিপক্ব। তবে তাহাদের চিন্তা রেজিমেণ্টাল ও একদেশদর্শী। ইংরেজীতে যাহাকে বলে ইণ্টেলেকচুয়্যাল কিউরিয়সিটি অর্থাৎ জানিবার আগ্রহ—তাহাদের যথেষ্ট আছে। অনেকে আবার দলের কর্ম্মী; দেশের অনেক কথাই তাহারা হাতে-নাতে জানে। পড়াশুনায় ভাল ছাত্রও আছে, তাহারা কখনও রাজনীতির ধার দিয়াও যায় না। কলেজে অনেকে ভাল বক্তা ও তার্কিক। বাংলা-সাহিত্য সমিতির কথা একটি ছাত্র উল্লেখ করিয়াছে। অনেকে সেণ্ট জন্স এম্বুলেন্স কোরের সদস্য। তাহারা কলিকাতার গত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সেবাকার্য্য করিয়াছে। দেশের দাবি গবর্ণমেন্টের গোচর করিয়াছে, লাঠি ও গুলি খাইয়াছে; ভাল খেলোয়াড়ও

হইয়াছে। একটি মাত্র ছাত্র বিবেকানন্দের কথা উদ্ধৃত করিয়া ছাত্রদের উচ্চতর আদর্শের কথা তুলিয়াছে—

The duties of our boys are among the lowliest and the lost. What they need are muscles of iron and nerves of steel.

দেখিয়া আনন্দ হইল কয়েকটি ছাত্র কলেজের পড়াশুনা বিষয়ে সন্তুষ্ট নহে, তাহারা প্রচলিত রীতির পরিবর্তন চায়। একটি ছাত্র বলিয়াছে, প্রতি ক্লাসে ছাত্রের সংখ্যা অত্যধিক। ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে কোন সম্পর্ক এই কারণেই গড়িয়া উঠিতে পায় না। এইজন্য ছাত্রের সংখ্যা কমাইতে হইবে; কলেজে পড়াশুনার ধারাও বদলাইতে হইবে। অধ্যাপকরা দেন কেবল বক্তৃতা, ছাত্রদের কাজ শোনা। ইহাতে পড়াশুনা ভাল হয় না। একটি ছাত্র বলিয়াছে—

The college is only for show, only to make oneself a bonafide student of the university and to make oneself able to appear in the university examination. But if anyone wants to learn he must not depend upon the college.

অনেকে কলেজ-পুস্তকাগারের দৈন্যের কথা বলিয়াছে।

মোটের উপর যাহা দেখিলাম তাহাতে বলা চলে যে বাঙালী ছাত্রদের ভাল অপেক্ষা মন্দই অধিকতর প্রকট। পরীক্ষার ফলাফলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতা যতই নিকটবর্তী হইতেছে দলাদলি ততই প্রবল হইতেছে ও ছাত্রদের মন পড়াশুনা হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া দলগত রাজনীতি, কলেজের বাহিরের আন্দোলন, সিনেমা, সভা প্রভৃতিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে। জাতি ও জগৎ বুদ্ধির দিক দিয়া অধঃপতন ক্ষমা করিবে না। স্বাধীন ভারতে শরীর ও মনে সুস্থ সবল যুবক দরকার। ছাত্রেরা যাহাই করুক জাতির সেবায় যেন এই রূপ সুস্থ সবল বুদ্ধিমান্, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কর্মী, কবি, ভাবুক, রাজনীতিক, সেবক অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। তরুণ সময় সময় উন্মার্গগামী হয়, কিন্তু তাহার প্রাণের প্রাচুর্য্য, আদর্শের উপর শ্রদ্ধাই তাহাকে বাঁচায়। প্রাণের দিক দিয়া, শ্রদ্ধার দিক দিয়া, আদর্শনিষ্ঠার দিক দিয়া আমাদের তরুণরা মাথা তুলিয়া দাঁড়াক ইহাই আমাদের কাম্য। দলাদলি, নির্ব্বোধ আত্ম-সর্ব্বস্বতা, অহমিকা, আদর্শভ্রষ্টতা অনেক স্থলেই তাহাদের বিভ্রান্ত করে। দিগভ্রান্তরা দিশা খুঁজিয়া পাক, জাতির আশাকে পূর্ণ করিয়া তুলুক ইহাই কাম্য।*

* বর্তমান প্রবন্ধে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, সমগ্র ছাত্র সমাজের কল্যাণ এবং জাতি-গঠন প্রচেষ্টার সাফল্যের দিক হইতে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শৃঙ্খলা, সংযম এবং শিক্ষার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা ছাত্রদের উন্নতির মূলে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ছাত্র সমাজে ইদানীং ইহার বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ছাত্রদের অভিভাবক, শিক্ষাব্রতী, শিক্ষক সম্মেলন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগণের এ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। আমরা এদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।—প্রবাসীর সম্পাদক।

বিদায়ী

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

বিদায় জন্মভূমি!
আমি চাহি নাই—কোল থেকে ঠেলে
ফেলে দিলে মোরে তুমি।
ছিল বড় সাধ তব মাঠে ঘাটে,
বকুল-বিছানো পল্লীর বাটে
যাপিব প্রবাস-ক্লান্ত জীবন
তব পদরেণু চুমি'!

ভাবি নাই কোনো দিন—
তোমার কুটীরে পড়িবে না আর
আমার পায়ের চিন্।
ভাবি নাই কভু—হয়ে গৃহহারা
সম্বলহীন যাযাবর-পারা
বেড়াইব ঘুরে—স্বপন-সৌধ
ধূলিতলে হবে লীন!

আজি চোখে আসে জল,
দূর—বহুদূর হ'তে ডাকে মোরে
তোমার কুঞ্জতল।
তোমার স্নিগ্ধ ঘন বটছায়া
আর কোনো দিন জুড়াবে না কায়া,
তব নদীজলে দগ্ধ জীবন
করিব না সুশীতল!

ফিরে ফিরে তবু চাই,—
তাড়াইয়া দিলে তবু মায়াবিনী,—
তব লাগি' ব্যথা পাই!
স্নিগ্ধ শীতল কুলায়ে তোমার
নীড়-হারা পাখী ফিরিবে কি আর?
সন্ধ্যা-আঁধারে নিভৃতে নীরবে
ভাবি আজ ব'সে তাই!

শহীদ

শ্রীসাবিত্রী ঘোষাল

মিসেস্ ওয়াণ্ডাকে সব সময়েই ভয়ে ভয়ে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির ভিতর দিন কাটাতে হ'ত।

ইয়ানেক যখনই বাইরে যেত, তিনি তাকে সময় মত ঘরে ফেরার কথা মনে করিয়ে দিতে কখনই ভুলতেন না। ছেলেকে নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না, তাই সব সময় ঘ্যান ঘ্যান করতেন, জোর করতেন, এমন কি কোন সময় অভিমানও করে থাকতেন।

কোন দিন হয়ত রাত হয়ে যাচ্ছে, ইয়ানেক ফিরছে না, বিলম্বিত মুহূর্তগুলো অসহ্য অত্যাচারের মত মায়ের বুকে বিঁধছে। প্রতিটা মুহূর্ত একটা নতুন বিভীষিকার স্বপ্ন বয়ে আনছে। কি রকম যেন একটা অদ্ভুত ভয়ে মার মন অবশ হয়ে আসে, আকুল মাতৃহৃদয় সন্তানের কল্যাণ-কামনায় অদৃষ্ট দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়তে থাকে।

কিন্তু মায়ের এই যে দুশ্চিন্তা, এই যে ভয়, এটা মোটেই অসঙ্গত ছিল না। বাস্তবিক ওয়ারস'র অবস্থা তখন এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে যে রাস্তায় দু'জন পরিচিত লোকের দেখা হলে প্রথমেই মুখ দিয়ে বেরোয়, 'কিহে এখনও টিকে আছ?' আর সাঁঝ-বাতির সময় পার হয়ে গেলেও যদি কেউ ঘরে ফিরে না আসে, তবে সে আর ফিরবে না, সকলেই নিশ্চিত ধরে নেয়।

মিসেস্ ওয়াণ্ডার স্বামী ছিলেন একজন আইনব্যবসায়ী। লড়াই সুরু হওয়ার পরই তিনি একজন অফিসার হন আর দিন গুনতে থাকেন কবে তাঁর ডাক পড়বে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে অবশেষে ডাক এসে পড়ল। খবর পেয়ে সোজা আপিস থেকেই তাঁকে চলে যেতে হয়েছে, স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে বিদায় নেবার অবসরটুকুও তিনি পান নি।

যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর এক মাস পেরুতে না পেরুতেই পোল্যাণ্ড হয়েছে ঠিক যেন নরককুণ্ড! এই কুৎসিত অবস্থাটাকে কেউ মেনে নিতে পারছে না, সকলেই মনে মনে ভাবছে একটা দুঃস্বপ্নই কেটে গেল বলে। কিন্তু দুঃখের দিনগুলো একঘেয়ে ভাবেই চলেছে, এর যেন আর শেষ নেই। অন্ধকারে দিক্-দিগন্ত ছেয়ে গেল, নতুন সূর্য্যের রশ্মি-সম্পাতে কবে যে আবার দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে! মিসেস্ ওয়াণ্ডা বহু চেষ্টা করেও স্বামীর কোন খোঁজ পেলেন না।

সাবেক বাড়ীর রাস্তাটা আক্রমণের প্রথম চোটেই ভেঙে গেছে। মিসেস্ ওয়াণ্ডাকে উঠে আসতে হয়েছে ছোট একটা ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটটাতে একটা মাত্র ঘর, তবে বেশ বড়—মা আর ছেলের পক্ষে যথেষ্টই। ঘরের দামী জিনিষপত্র একে একে সবই বিকিয়ে গেছে, একমাত্র লক্ষ্য কোনমতে বাঁচার মত সংস্থান রাখা। মাঝে মাঝে গ্রামে কোন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের বাড়ীতে মা বেড়াতে যেতেন আর ফেরার সময় বেশ কিছুদিনের মত খাবার-দাবার জোগাড় করে আনতেন। হঠাৎ এক এক সময় এই উঞ্ছবৃত্তিতে তাঁর মনে প্রচণ্ড ধিক্কার আসত, মনে মনে ঠিক করতেন এই শেষ, আর নয়।

ক্রমে ক্রমে তিনি নিজেকে নানাভাবে বঞ্চিত করতে সুরু করলেন। কম করে খেতেন যাতে সঞ্চয় বেশ কিছু দিন স্থায়ী হয়, ছেলেটির খাবার অভাব না ঘটে। এই ছেলেটিই তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন—কেবল এর জন্যেই তিনি কোন মতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করছেন।

ক্রমে ইয়ানেকও নিজেদের অবস্থাটা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারলে। সঙ্গে সঙ্গে সে এমন ব্যবহার করতে লাগল যেন সে-ই বাড়ীর অভিভাবক। বয়সে যদিও সে নিতান্তই ছোট, সবে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ছে, কিন্তু তার আচরণে মনে হতে লাগল যেন সে একজন বৃদ্ধ, কত দায়িত্ব তার মাথায়। কিন্তু এই আঠার বছরের ছেলেটির মাথায় যত প্ল্যান ছিল, সেগুলো কাজে লাগাবার আর কোন পথই রইল না। এমন কি পড়াশুনাটাও বন্ধ হয়ে গেল, চালাবার মত অর্থও ছিল না, আর তা ছাড়া জার্মানরা শহরের স্কুলগুলো সব বন্ধও করে দিয়েছিল।

সেই সেপ্টেম্বর আক্রমণের পর থেকে সমস্ত ওয়ারস শহরটাই ব্যবসায়ে লেগে গেল—সঙ্গে সঙ্গে ইয়ানেকও তাতে যোগ দিলে। সিগারেট দিয়েই তার হাতে খড়ি হ'ল। নতুন জীবন প্রথম প্রথম বেশ ভালই লাগতে লাগল, আর লাভটাও মন্দ হচ্ছিল না। খরচ-খরচা বাদ দিয়েও দিনে বেশ কিছু আয় হ'ত।

ইয়ানেকের মন এই দিকে গেছে, তা মা জানতেন না। এক দিন তিনি পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একদিকে চোখ পড়াতে পা যেন তাঁর মাটির সঙ্গে গেঁথে গেল! নিজের চোখকেও যেন তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না! একটা গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ইয়ানেক চীৎকার করে সিগারেট ফেরি করছে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ছেলে ঘরে ফিরতে, দুঃখে অভিমানে মা একেবারে ভেঙে পড়লেন; কেঁদে-কেটে তার মন গলাতে চাইলেন, কিন্তু ছেলে নাছোড়বান্দা। সে মাকে বার বার করে বোঝাতে লাগল, কেন এতে দোষের কি আছে, তার পরিচিত কত ছেলেই ত এ রকম কোন না কোন একটা কাজ করছে। তার মধ্যে কয়েক জন ত বেশ ভাল বংশের ছেলে। সবাই করতে পারে আর সেই বুঝি কেবল বসে বসে খাবে, সংসারের দায় বুড়ো মায়ের ঘাড়ে ফেলে? তার পরে আবার

সে কাজের সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনাও করছে। প্রমাণ করার জন্য শুধুমি খুলে একটা বই থেকে খানিকটা আওড়ে দিলে। যুদ্ধ শেষ হ'তে বেশী দেরি নেই, শীগ্গির ফিরে আসবে পোলেরা আর তাদের সঙ্গে মিত্রপক্ষ। আর—আর তারপরে মা দেখবেন ইয়ানেক কেমন করে চলে যায় ক্র্যাকাও বিশ্ববিদ্যালয়ে, আর সেখান থেকে অক্সফোর্ডে। ইয়ানেক হেসে মাকে আদর করে বললে, "কিন্তু এখন আনন্দ করবার সময় নেই। এখন খালি কাজ আর কাজ।"

ইয়ানেক ক্রমেই একজন পাকা ব্যবসায়ী হয়ে উঠছে।

ওয়ারস'র শ্রমিক ছেলেগুলোর সঙ্গে মিশে ইতিমধ্যেই আইনকে বেশ ফাঁকি দিতে সুরু করেছে। সে আজকাল ক্র্যাকাও যাচ্ছে তড্কার জন্য, লুবলিনে তামাক-পাতার খোঁজে; এর মধ্যেই জিনিষপত্র বাছাই ব্যাপারে বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। মাল কিনবার ফাঁকে সে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে মাল চালান নিয়ে আসে। সে জানে একবার কোন রকমে ডেবলিন পার হতে পারলেই, তার মাল দুনো লাভে বিক্রী হবে। জার্মানগুলোর ঐখানেই খানাতল্লাশীর যত কড়াকড়ি। ট্রেনের কামরাগুলোতে ত বটেই, মায় যাত্রীদের কাপড়-জামা খুলে দেখতেও কসুর করে না।

কখনো কখনো ইয়ানেকেরও দুর্দিন আসে। সেদিন যখন সে ঘরে ফেরে, তার চোখের কোণে কালি, ভারি মুখ, সর্ব্বাঙ্গে আঘাতের চিহ্ন—রুক্ষ মেজাজ থাকে ঠিক রাত্রির মত থমথমে। তবে এ রকম ঘটে কদাচিৎ।

কিছু দিনের মধ্যেই মিসেস ওয়াণ্ডা, তাঁর ছেলের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সন্দেহাকুল হয়ে উঠলেন। কেন না ছেলেরা এ বয়সে করতে পারে না এমন কাজ নেই। বিশেষ করে তাঁর ছেলে নানা ধরণের লোকের সঙ্গে মিশছে, আইনকে ফাঁকি দিয়ে ব্যবসা করছে, যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে; মায় কেবলই আশঙ্কা পাছে ছেলে কুসঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে যায়।

বহু দিন ধরেই ইয়ানেক্ সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সময়মত বাড়ীতে ফিরছিল, কিন্তু মা লক্ষ্য করতে লাগলেন গত কয়েক দিন যাবৎ আবার সে গোলমাল করছে—প্রায়ই আটটায় কারফিউর ঘণ্টা পড়ে গেলে তবে সে বাড়ী ফেরে। গ্রীষ্মকালে কারফিউর সময় যখন ছিল এগারটা তখন সে ফিরত এগারটার পরে। কোন কোন রাতে হয়তো ফিরলই না। মা জানতেন কাজ উপলক্ষে শহরের বাইরে যাবার প্রয়োজন তার নেই। আর যখন সত্যি সত্যি প্রয়োজন হ'ত তখন প্রতিবারেই সে মাকে জানিয়ে যেত, সাবধান করে যেত যে রাতে সে বাড়ী ফিরবে না; কিন্তু কি যে করবে সে সম্বন্ধে কোন রকম উচ্চবাচ্য করত না।

এক দিন সন্ধ্যায় হঠাৎ ইয়ানেক্ ফিরে এল কি রকম একটা মানসিক বিপর্য্যস্ত অবস্থায়। আড়চোখে একবার মায়ের দিকে চেয়ে সে আনমনে সারা ঘরে পায়চারি করতে সুরু করলে। হাঁটছে, আর মাঝে মাঝে স্পোর্টস্ জ্যাকেটের পকেটটা হাঁটকাচ্ছে। শুতে যাবার আগে জামা কাপড়গুলো যথারীতি একটা চেয়ারের উপর খুলে রাখলে, কিন্তু চেয়ারটা টেনে একেবারে বিছানার পাশে নিয়ে এল। তার পর মা কাগজপত্র নাড়াচাড়ার খসখসানি শব্দ শুনতে পেলেন।

আমার কাছ থেকে ও কি যেন লুকোচ্ছে—তিনি ভাবলেন। মায়ের মন স্বভাবতই ব্যথাতুর হয়ে উঠল। প্রথমে সন্দেহ, তার পরেই সেটা অভিমানে রূপান্তরিত হয়ে অশ্রু রূপে ঝরে পড়তে লাগল।

সন্তানের অশুভ আশঙ্কায় মায়ের মন সর্ব্বদাই ক্লিষ্ট থাকে, কিন্তু মিসেস ওয়াণ্ডা তো কেবল অলীক কল্পনা নিয়েই থাকেন নি। এ কথা একান্ত সত্য যে জার্মানরা ঢোকবার পর থেকেই ওয়ারস'র স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ধ্বংস হয়ে গেছে। সংসার ভেঙে গেছে, অগণিত গৃহহারা নরনারী পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তরুণেরা অভিভাবকহীন, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা থেকে ছিটকে পড়েছে। স্কুল-কলেজ নেই—পথে ঘাটে জিনিষপত্র কেনা-বেচা চলে, তার ওপরে নানা রকম দলবলের কথাও লোকের মুখে শোনা যায়। মিসেস ওয়াণ্ডার কানেও ত কত কথাই এসেছে, তাই একমাত্র সন্তানের জন্য তাঁর এত ভয়।

ইয়ানেক্ ঘুমিয়ে পড়লে মা টেবিলের পাশের আলোটার এক দিক আড়াল করে সেলাই নিয়ে বসলেন। ঘুম কিছুতেই আসছে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল, মা স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। মনের মধ্যে কে যেন অবিরাম ফিস্ফিস্ ক'রে বল্‌তে লাগল, তোমার ছেলে কি করতে চায় খুঁজে বার করো, তুমি মা, তোমার ছেলে কি করছে তোমার জানবার অধিকার আছে।

মা প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন নিজেকে দমন করতে। এত কাল স্বামী বা ছেলের কোন কাজের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা বা সে সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর নেওয়াকে তিনি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল মনে করতেন। পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও নির্ভরতাকেই তিনি স্বামী-স্ত্রী, মা-ছেলের মধ্যে একমাত্র সম্বন্ধ বলে জানতেন। কিন্তু এখন পরম দুঃসময়, হয় ত তাঁর সন্তানের সামনে সমূহ বিপদ, তিনি মা—তাঁকে একটা কিছু প্রতিকার করতেই হবে।

ধীরে ধীরে তিনি উঠলেন, অনিচ্ছুক পদক্ষেপে সন্তানের শিয়রে গিয়ে দাঁড়ালেন। কম্বল মুড়ি দিয়ে ছেলে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। মা নিঃশব্দে ইয়ানেকের কোটের পকেটে হাত দিলেন, কম্পমান আঙুল দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে ঠাণ্ডা বাঁকা একটা কাঠের হাতল হাতে ঠেকল। হাতলটার মাথায় একটা ছোট্ট স্প্রিং। অজানা আশঙ্কায় তাঁর সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। তার পর কাগজের গোছাটা ধরলেন।

মনের মধ্যে কে যেন চুপি চুপি বলে চলেছে—যাই ঘটুক না কেন তোমাকে জানতেই হবে ব্যাপারটা কি ? কাঠের হাতলটা তিনি শক্ত করে চেপে ধরলেন…। কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে টেবিলের কাছে এসে জিনিষটা খুলে দেখলেন। প্রদীপের আলোয় ঝক্‌ ঝক্‌ ক'রে উঠল একটা কোল্ট রিভলবার আর এক তাড়া কাগজ। আতঙ্কে মায়ের শরীরের সমস্ত শক্তি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্তের জন্ত তিনি আচ্ছন্নের মত বসে রইলেন। অবসাদগ্রস্ত মন কোন রকম চিন্তা করতেও চাইলে না। টেবিলের ওপর হলুদ রঙের কাগজের তাড়াটার দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে রইল আর কম্পিত আঙুলগুলো দড়ির বাঁধন খুলতে চেষ্টা করে চলল। অতি ধীরে ধীরে তাঁর মানসিক জড়তা একটু একটু করে কমে আসতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে ময়লা শক্ত কাগজের ওপরকার লেখাগুলো ফুটে উঠতে লাগল :—

"পোল্যাণ্ড মরে নি !"—পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতাকামীদের মুখপত্র (সাপ্তাহিক)।

ভোরের আলো না ফোটা পর্য্যন্ত মা সেই ছাপা লাইনগুলোর সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন—কালো কালো অক্ষরগুলো যেন তাঁর চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে। বার বার করে লেখাটা পড়ছেন,কিন্তু তার অর্থের কোন পরিবর্ত্তন ঘটছে না। ঠোঁট দুটি চুপিচুপি অস্পষ্টস্বরে উচ্চারণ করছে, প্রথম লাইন ক'টাতেই দৃষ্টিটা আটকে রয়েছে।…সেদিন সকালে ইয়ানেকের যখন ঘুম ভাঙল তখন সে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে না মায়ের বুকের মাঝে কতবড় গোপন কথা চাপা রয়েছে।

…ইয়ানেককে আমি বহুদিন ধরেই জানতাম, সে ছিল আমার ছাত্র। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরের পরে তার সঙ্গে বহুবার আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে,নানা কারণে নানা পারিপার্শ্বিকে। তাকে আমার ভারি ভাল লাগত। আমাদের মধ্যে একটা বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের বন্ধন ছিল।

বেআইনী খবরের কাগজ বিতরণকারী বলে তার মনে বেশ একটা গর্ব্ব ছিল—বিশেষ করে যখন একটা কোল্ট রিভলবার সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করত। আমার সাবধানবাণী শুনে সামান্ত একটু হাসত মাত্র। আমি যখন বলতাম যে সৈনিক-জীবনে সাবধানতাই হচ্ছে সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা, তখন সে কোল্টটাকে নিয়ে স্নেহভরে একটু নাড়াচাড়া করে বলত সে ভীতু নয় আর এটা সঙ্গে থাকতে ধরা সে কিছুতেই পড়বে না। সে নেহাত শিশু নয়।

তবুও এই নীলচোখ লম্বা সুশ্রী ছেলেটিকে দেখলে নিতান্ত শিশু বলেই মনে হ'ত। শিশুর মতই সরল অকপট বিশ্বাসে সে সবকিছুকে গ্রহণ করত। তার দেশবাসী যে আসন্ন স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয়যুক্ত হবেই তাতে তার বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। তার দৃঢ় বিশ্বাসের কাছে আমি নিজেও কত সময় হেরে গিয়েছি। ওর সঙ্গে এসব কথা নিয়ে আলোচনা করার পর ওর বিশ্বাসের শক্তি যেন আমার প্রাণেও সঞ্চারিত হয়ে যেত, নববলে নূতন উদ্যমে আমি সঞ্জীবিত হয়ে উঠতাম।

সবকিছুর ভেতরেই সে আশার আলো দেখতে পেত ; যেখানে মিত্রপক্ষ চরম পরাজয়কে বরণ করে নিত সেখানে ভাবত মিত্রপক্ষ শত্রুদের জন্তে জাল পাতছে মাত্র। ওর নিকট খারাপ কিছু নেই। ক্ষমতা থাকলে সিকোরেস্কির নামের আগে ও নিশ্চয়ই 'সেন্ট' বসাত। পোলিশ কমাণ্ডার-ইন-চীফের মতলবের খুঁটিনাটি সব ওর জানা, যেন ও তাঁর সহকারী। পোল্যাণ্ডের সৈন্তরা কোথায় কোথায় যুদ্ধ করছে, রেজিমেণ্ট সংখ্যা কত, তাদের জয় আর বিশেষ করে পোলিশ নৌসেনা ও বিমানবহরের কথা সব ওর কণ্ঠস্থ।

আমি যদি কখনো ওর সংবাদের সত্যতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেছি ত, ও তখুনি একজন কড়া ভূগোলের মাষ্টারের মত বলত—একখানা মানচিত্র কিনুন, কিন্তু পৃথিবীর মানচিত্র হওয়া চাই বুঝলেন। একখানা পৃথিবীর মানচিত্র—তা হলেই বুঝতে পারবেন আমাদের সৈন্তরা কোথায় কি করছে। ব্যস্‌, একদিন চা খেতে খেতে ইয়ানেক ফিস্‌ ফিস্‌ করে আমাকে বললে, আমার মনে হয় আপনি আমাদের মিত্রপক্ষীয় কাউকে কখনও দেখেন নি, না ? যেন ও নিজে কত জনকে দেখেছে !

বসন্তের প্রথম দিকে এক দিন যে ব্যাপারটা ঘটল, তার স্মৃতি আজও আমার মনে জ্বলজ্বল করছে। মনে হচ্ছে এই তো সবে সেদিনের কথা। সূর্য্য উঠেছে, ভাঙা বাড়ীগুলোর জানালার সার্শিতে ধাক্কা খেয়ে সূর্য্যের আলো চারদিকে ঠিকরে পড়ছে, বরফ গলতে সুরু করেছে। রাস্তার দু'পাশে গাছগুলো সারি সারি দাঁড়িয়ে, রুক্ষ নিষ্পত্র ডালপালায় ঠিক ভিক্ষুকের মত রিক্ত। এক ঝাঁক চড়ুই পাখী ডালে ডালে কিচিরমিচির করে বেড়াচ্ছে। কুয়াশা কেটে গেছে, মানুষগুলোকেও অনেকটা সজীব দেখাচ্ছে, তাদের চলাফেরায় যেন একটু প্রাণসঞ্চার হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। শীতের চেয়ে খারাপ সময় আর কি আছে !

আমি তখন পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম ইয়ানেকের সঙ্গে দেখা করতে, রেল-ষ্টেশনের কাছে একটা নির্জ্জন কফিখানায় আমাদের দেখা হবার কথা। কতকগুলো বেআইনী খবরের কাগজ নিয়ে আমাকে প্রদেশের বাইরে চলে যেতে হবে। সব বন্দোবস্ত করা ছিল, কেবলমাত্র ইয়ানেকের কাছ থেকে আমাকে জিনিষগুলো সংগ্রহ করে নিতে হবে।

হঠাৎ রাস্তায় গুলির শব্দ শোনা গেল। পথচারীরা সকলে ছুটল দোকান বা অন্ত কোথাও আশ্রয় নিতে। মুহূর্ত্তের মধ্যে রাস্তা একেবারে ফাঁকা। নিশ্চয় কোন অঞ্চল ঘেরাও করে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, অথবা আমাদের শহরের নব আগন্তুকদের রঙীন নেশার কোন একটা খেয়াল।

গভীর দুশ্চিন্তা আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলে। আমার অন্তর বলে দিলে কোন মানুষকে গুলি করা হ'ল। আমি জোরে পা চালালাম, অবশেষে প্রায় এক রকম ছুটতে ছুটতেই কফিখানার কাছে পৌঁছলাম। সেখানে ইতিমধ্যেই বেশ ভিড় জমে গেছে। ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে চিৎকার, আদেশ—জার্মান পুলিশও চোখে পড়ল।

আমি সোজা ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম। জার্মান পুলিসকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপার কি এখানে? গোলমাল কিসের?' বর্ব্বরটা একটা হাত দিয়ে মাটির দিকে ইঙ্গিত করে জার্মান ভাষায় জবাব দিলে, 'দেখ, এই হতভাগাটাকে দেখ।'

সিঁড়ির উপরে লম্বা হয়ে পড়ে আছে ইয়ানেকের দেহ। কাগজপত্রগুলো কাদায় মাখামাখি, এক হাতে শক্ত করে ধরা রয়েছে কোল্ট রিভলবারটা। পা দুটো থর থর করে কাঁপছে, মাথা থেকে রক্তের ধারায় মুখচোখ ভেসে যাচ্ছে। খুব অস্পষ্ট স্বরে ঠোঁট দুটো যেন কি উচ্চারণ করছে, মুখের দু'পাশে ফেনা, চোখের তারা স্থির।

মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে মাথার লাল দাগটার ওপর আস্তে আস্তে হাত রেখে ফিস্ ফিস্ করে বলতে লাগলাম, ইয়ানেক বল, কি করে এ ঘটল, বল ইয়ানেক,...ইয়ানেক।

উঠে এস—একটা জার্ম্মান সান্ত্রী চিৎকার করে উঠল।

আমি লাফিয়ে উঠলাম, ঠিক যেন একটা কুকুরকে কেউ লাঠি দিয়ে খোঁচা মেরেছে। তীক্ষ্ণ চিৎকারটা যেন আমার কান কেটে কেটে বসে যাচ্ছে। উঠে আস্তে আস্তে জনতার ভিড়ে মিশে গেলাম। আমি যেন আর সে মানুষ নই। কিছু ভাবতে পারছি না, কিছু বুঝতেও পারছি না। দেহটাকে কোনমতে টানতে টানতে লক্ষ্যহীন ভাবে পথ চলতে লাগলাম—চলৎ-শক্তিহীন একজন দুবিরের মত। আমার আর কোন প্রয়োজন নেই, কারুর সঙ্গে দেখা করতে হবে না।

মিসেস ওয়াণ্ডা হয়তো তাঁর ছেলের অপেক্ষায় রাত জেগে বসে আছেন।*

* Majewski-র *Yanek the Distributor*-এর অনুবাদ

সত্য চেয়ে বড়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

কাঠবেড়ালেতে সাগর বেঁধেছে রামায়ণে লেখা নাই
তাতে কিবা আসে যায়?
কে বা তা দেখিতে চায়?
চিরদিন ধরে আমরা সবাই বিশ্বাস করি তাই।

২

রামের হাতের ছাপ গায়ে তার—আদরের ছাপ আহা,
এখনো মুছেনি কই?
হাসি—বিস্মিত হই
রামচন্দ্রের সোহাগের বিনা কেমনে মুছিবে তাহা?

৩

হয় ত অজানা সদয় হৃদয় ভক্ত বা কোনো কবি
রয়েছে এ কথা তাই,
সন্দেহ তাতে নাই
ক্ষুদ্র মহতে এক করে—এক এঁকেছে মধুর ছবি।

৪

বিরাট সাগরবন্ধন কোথা? কোথা দুর্ব্বল প্রাণী?
আকাঙ্ক্ষা তার কত—
আপন সাধ্যমত,
পুষ্ট করেছে পরিকল্পনা ক্ষীণ সাহায্য দানি।

৫

ক্ষুদ্র হ'লেও মহাপুরুষের লভেছে আশীর্ব্বাদ,
পেয়েছে আদর তার,
বাকি পেতে কিবা আর?
অমৃতোৎসবে পংক্তিভোজনে সেও পড়ে নাই বাদ।

৬

যুগের যুগের বালক-বালিকা ওই কাহিনীর লাগি
কাঠবিড়ালের প্রতি
সদয় সকলে অতি,
রামের হাতের ছাপ খুঁজে দেখে শিশু হিয়া অনুরাগী।

৭

হয় ত নেহাত কল্পনা উহা—সত্য নাহিক কিছু,
তবু বিশ্বাস করি,
তবু সুখ পাই স্মরি
জীবে দয়া নামে রুচিবান তাঁর—পদে মাথা করি নীচু।

৮

মানুষকে যাহা মহতের লয়—ভগবানে করে প্রিয়,
সে কাহিনী রচে যারা
কবি ও সাধক তারা
তাঁরা যা বলেন সত্যের চেয়ে বড় বেশী বরণীয়।

বাল্য-প্রতিভা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

জগতের বিস্ময়জনক সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্যে মানবজাতি বুদ্ধিবলে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু মানুষে মানুষেও বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য পরিগ্রহ করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। পৃথিবীর নানাদেশীয় সভ্যসমাজে যুগে যুগে এক একজন অসাধারণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্ভুত প্রতিভাদ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষেও অতি প্রাচীনকাল হইতে বহু মহাপুরুষের উদ্ভব হইয়াছে যাঁহাদের প্রতিভার বিচিত্র স্ফূর্ত্তি অতিশৈশবেই ঘটিয়াছিল। পৌরাণিক যুগে অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি "শিশু" কালেই অধ্যাপনা আরম্ভ করেন—ছাত্রদের মধ্যে পিতৃব্য, পিতৃব্যপুত্র প্রভৃতি বয়স্ক আত্মীয়গণকেও "পুত্রকাঃ" বলিয়া সম্বোধন করায় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া দেবতাদের নিকট অনুযোগ করেন; দেবতারা একবাক্যে বলিলেন, "শিশু ঠিকই সম্বোধন করিয়াছে" (মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ১৫১-২ শ্লোক)। শিশু-প্রতিভার চূড়ান্ত উদাহরণ সুপ্রসিদ্ধ অষ্টাবক্র মুনি। তিনি মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই সাঙ্গবেদ ও সমস্ত শাস্ত্র পিতার পাঠ শুনিয়া শিখিয়া ফেলেন এবং এক দিন মাতৃগর্ভ হইতেই অধ্যয়নরত পিতাকে মাতার প্রতি উপেক্ষাভাবের জন্য ভর্ৎসনা করিতে যাওয়ায় পিতার অভিসম্পাতে অষ্টবক্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হন। দশ বৎসর বয়সে জনক রাজার যজ্ঞসভায় অষ্টাবক্রের বিস্ময়জনক বাগ্বিজয় বৃত্তান্ত মহাভারতে পাওয়া যায় (বনপর্ব্ব, ১৩২-৪ অধ্যায়)। রাজা এক স্থানে তাঁহাকে "দেবসত্ত্ব" বলিয়া সম্বোধন করেন।

ঐতিহাসিক যুগে শিশু-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ শঙ্করাচার্য্য। আনন্দলহরীর ৭৬ শ্লোকে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, ভগবতীর স্তন্যপান করিয়া "দ্রবিড়শিশু" অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি লাভ করেন। টীকাকারদের মতে এই দ্রবিড়শিশু স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য। কৈবল্যাশ্রমযতি-রচিত "সৌভাগ্যবর্দ্ধিনী" টীকা হইতে এই "চিরন্তনাখ্যানে"র সারাংশ উদ্ধৃত হইল। শঙ্করাচার্য্যের পরমেশ্বরীভক্ত পিতা প্রতিদিন গ্রামের বাহিরে এক মন্দিরে যাইয়া দুগ্ধদ্বারা দেবীকে স্নান করাইয়া পূজা সারিয়া অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ দুগ্ধ সহচর পুত্রকে খাইতে দিতেন। পুত্রের মনে হইত, দেবী স্বয়ংই দুগ্ধ পান করেন, পীতাবশিষ্ট দুগ্ধ পিতা তাঁহাকে দেন। এক দিন পিতার অনুপস্থিতিতে অশক্ত মাতার নির্দ্দেশে বালক শঙ্করই দুগ্ধ লইয়া মন্দিরে যান এবং ভগবতীর সম্মুখে রাখিয়া বলেন, "খাও।" বিলম্ব দেখিয়া বালক কাঁদিয়া উঠিলে ভগবতী দয়াবশতঃ আবির্ভূত হইয়া দুগ্ধ সবটা পান করেন। পরে পাত্র শূন্য দেখিয়া বালক আবার কাঁদিয়া উঠিলে ভগবতী স্বয়ং কোলে লইয়া তাঁহাকে স্তন্যদান করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাতে সর্ব্ববিদ্যার স্ফূর্ত্তি হয় ("ততো জগদম্বিকায়াঃ স্তন্যপানেন সর্ব্ববিদ্যা তদানীমেব স্ফূর্ত্তিকাং জাতা"—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৪০৭ সংখ্যক সংস্কৃত পুথির ৭৪-৫ পত্র দ্রষ্টব্য)।

বাংলাদেশেও যুগে যুগে এইরূপ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন "দেবাংশ" মহাপুরুষ (prodigy) আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতেছে। জাতীয় জীবনে অসামান্য প্রতিভার সমুচিত স্মৃতিরক্ষা হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ৭ জন বাঙ্গালী দেবাংশের বিবরণ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করিতেছি। আশা করি অভিজ্ঞ মনীষিগণ এই জাতীয় বহুতর প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তির নামোদ্ধার করিয়া বাঙ্গালীর পূর্ব্বতন গৌরবোজ্জ্বল চিত্র আবার নূতন করিয়া প্রকাশ করিবেন।

১। রঘুনাথ শিরোমণি (খ্রী: ১৫শ শতাব্দী)

রঘুনাথের কিম্বদন্তীমূলক জীবনীর ঘটনা বাংলা-সাহিত্যে অনেকটা প্রচারলাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তাঁহার কথা এখনও গবেষিত হয় নাই। অথচ বিগত সহস্র বৎসর মধ্যে বাংলাদেশে রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় ভাগ্যবান্ মহাপণ্ডিত আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই; কারণ, তাঁহার প্রধান গ্রন্থ "অনুমানদীধিতি" অদ্য ৪০০ বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র—আসাম হইতে গুজরাট এবং কাশ্মীর হইতে কোচীন পর্য্যন্ত—ভারতীয় দর্শনের উচ্চতম বিদ্যায়তনসমূহে দুরূহতম আকরগ্রন্থরূপে প্রতিভাশালী ছাত্রের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা পরিমাপ করিয়া আসিতেছে। ইংরেজ-অধিকারের প্রারম্ভকালেও ক্ষুরধার বুদ্ধির এই বিচিত্র বিলাসের মূল উৎস নবদ্বীপে অধিষ্ঠিত ছিল—কবি ভারতচন্দ্রের ভাষায় নবদ্বীপ তখন "ভারতীর রাজধানী, ক্ষিতির প্রদীপ"। শিরোমণির "দিক্-দীপিকা" দীধিতিগ্রন্থই এই সারস্বত উৎসের পরম উপাদান। শিরোমণির বিষয়ে বহুতথ্য অন্যত্র লিখিয়াছি (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৯, পৃ. ১১৭-২৬; ১৩৫০, পৃ. ৬-১৬; ১৩৫৩, পৃ. ১-৩)। তিনি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শূলপাণির দৌহিত্র ছিলেন, মহাপ্রভুর এক পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এবং একমাত্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। তিনি অধ্যয়নার্থ মিথিলায় যান নাই এবং মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী ছিলেন না। তাঁহার এক চক্ষু নষ্ট ছিল।

তাঁহার বাল্যপ্রতিভার নিদর্শন তিনটি উপাখ্যানে চির-প্রসিদ্ধ আছে। (১) নবদ্বীপে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের টোলের নিকটে (শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়ের) বিধবা কন্যা ভগবতী পাঁচ বৎসরের শিশু লইয়া বাস করিত—সার্ব্বভৌম তাঁহাকে "ভগী" বলিয়া ডাকিতেন। এক দিন ভাত সিদ্ধ করিবার জন্য

শিশুকে চৌলে আগুন আনিতে পাঠাইল। সার্ব্বভৌমের এক ছাত্র এক হাতা আগুন লইয়া বলিলেন—"বস্, বস্, হাত পেতে আগুন নে।" শিশু ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া এক অঞ্জলি ধুলা লইয়া আগুন লইল। বালকের বুদ্ধিমত্তা দূর হইতে সার্ব্বভৌম দেখিয়াছিলেন এবং সত্বর ভগবতীর নিকট আসিয়া বলিলেন—"ভগ্নী, ভগ্নী, তোর এই ছেলেটি আমায় দে।" বালকের মাতা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

(২) ভারতপ্রসিদ্ধ মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম বালকের বিদ্যারম্ভ করিতে গিয়া মহাবিপদে পড়িলেন। 'ক' আগে না বলিয়া 'খ' আগে বলিলে কি দোষ হয়, দুইটি 'ন' কেন, তিনটি 'স' কেন প্রভৃতি প্রশ্নদ্বারা বালক তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অর্থাৎ বালককে ক, খ শিখাইতে গিয়া সমস্ত ব্যাকরণই সংক্ষেপে শিখাইতে হইয়াছিল। এই বালকই রঘুনাথ শিরোমণি।

(৩) অতি অল্প বয়সেই রঘুনাথ পাঠ সমাপ্ত করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন এবং অবিলম্বে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক বলিয়া পরিগণিত হন। এই সময়ে মিথিলার সুবিখ্যাত পক্ষধর মিশ্র দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া নানাদেশ জয় করিয়া দিগ্বিজয়ী রাজার মত হাতী, ঘোড়া প্রভৃতি পরিজনবর্গসহ নবদ্বীপে আবির্ভূত হন এবং বাংলার প্রধান পণ্ডিতের সহিত বিচার প্রার্থনা করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ কাণা রঘুনাথকেই প্রধান বলিয়া উপস্থিত করিলে পক্ষধর মিশ্র বলিয়া উঠেন—"অকস্মাৎ গৌড়দেশস্থ অত্র কাণঃ শিরোমণিঃ।" বিচারের বিষয় ছিল "সামান্যলক্ষণা" নামক ন্যায়শাস্ত্রসম্মত অলৌকিক সন্নিকর্ষ। রঘুনাথ চিরন্তন পক্ষ খণ্ডন পূর্ব্বক "সামান্যলক্ষণা" অস্বীকার করিয়াই তত্ত্বস্থলের উপপত্তি দেখাইয়া পক্ষধর মিশ্রকে নিরুত্তর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বিচারকালে উভয়ের মধ্যে যে কথা-কাটাকাটি হইয়াছিল তন্মধ্যে পরাজিত পক্ষধরের একটি ক্রোধব্যঞ্জক শ্লোক বহুল প্রচার লাভ করিয়াছে :—

বক্ষোজপানকৃৎ কাণ! সংশয়ে জাগ্রতি স্ফুটং।
সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে॥

(পক্ষের মতে সামান্যলক্ষণা ছাড়া ধূমাদিতে ব্যভিচার সংশয় হয় না। সামান্যলক্ষণা প্রকরণের দীধিতি গ্রন্থে "অত্র বদন্তি" করে বস্তুতই শিরোমণি মৌলিকভাবে সামান্য-লক্ষণা ছাড়াও সংশয়ের উপপত্তি করিয়াছেন। বুঝা যায়, এই বিচারের সারাংশ পরে দীধিতিগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।) শ্লোকে শিরোমণিকে 'কাণ' ও 'বক্ষোজপানকৃৎ' (অর্থাৎ দুগ্ধপোষ্য শিশু) বলিয়া আঘাত করা হয়। এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিচারের ফলে মিথিলার প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া নবদ্বীপই নব্যন্যায়চর্চ্চার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হইয়া পড়ে। ইহা প্রায় ১৪৮০-৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা—তৎকালে পক্ষধর মিশ্র প্রবীণ ও ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ছিলেন। মতান্তরে, এই বিচার মিথিলাতেই ঘটিয়াছিল, শিরোমণি গৌড় হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে শিরোমণির কৃতিত্বপূর্ণ মিথিলাজয় প্রায় সহস্র বৎসর মধ্যে এক অসামান্য ঘটনা। দুঃখের বিষয় এই মহাপুরুষের জীবনকথা ও স্মৃতি অদ্যাবধি সমুচিত আদরসহকারে আলোচিত হয় নাই।

২। কবিকর্ণপুর (১৫২৬-৭৬+খ্রীঃ)

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অলৌকিক যোগৈশ্বর্য্যের বহু অকাট্য নিদর্শন বিদ্যমান আছে। কবিকর্ণপুরের শৈশবকালে অদ্ভুত কবিত্বশক্তির সঞ্চার এইরূপ একটি বিস্ময়কর অথচ প্রমাণসিদ্ধ ঘটনা। দুঃখের বিষয়, মহাপ্রভুর ভক্তগণ এইরূপ প্রামাণিক ঘটনার যথোচিত চর্চ্চা না করিয়া শিরোমণির সহাধ্যায়নাদি অবাস্তব এবং কল্পিত বস্তু অবলম্বন করিয়া তাঁহার পবিত্র চরিত-কথা কলঙ্কিত করিয়া তুলিতেছেন। পরমানন্দদাস কবিকর্ণপুর কাঞ্চনপল্লী নিবাসী সুবিখ্যাত চৈতন্যপার্ষদ সেন বংশীয় শিবানন্দের তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র। সাত বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি পিতার সহিত পুরীধামে গিয়া মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের পরেই তৎকালে বালকের মুখ হইতে মধুর রসাত্মক আর্য্যাচ্ছন্দের শ্লোক নির্গত হয়। চরিতকারগণ একটি শ্লোক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবন-রমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

সাত বৎসরের শিশু, নাহিক অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে, লোক চমৎকার মন॥
চৈতন্য প্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মাদিদেব যার নাহি পায় সীমা॥ (চৈতন্যচরিতামৃত,
অন্ত্যলীলা, ১৬ পরিচ্ছেদ)

কৃষ্ণদাস কবিরাজের এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া এই বৈজ্ঞানিক যুগে উপেক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা যে অতিরঞ্জিত নহে এবং অনধিক সাত বৎসর বয়সেই যে মহাপ্রভুর কৃপায় কবিকর্ণপুর কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহার বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ বিদ্যমান আছে। কবিকর্ণপুর স্বয়ং "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নাটকের শেষে লিখিয়াছেন :—

যস্যোচ্ছিষ্টপ্রসাদাদয়মজনি মম প্রৌঢ়িমা কাব্যরূপী, ইত্যাদি।

সুতরাং নিজের উক্তি অনুসারেই কবিকর্ণপুরের কবিত্ব-শক্তি বিনা অধ্যয়নে স্ফুরিত হইয়াছিল। এই ঘটনা ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধেই সংঘটিত হইয়াছিল। উল্লিখিত চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের দশমাঙ্কের ঘটনাবলীর মধ্যে শিবানন্দের ছোট ছেলের সম্বন্ধে মহাপ্রভুর প্রতি শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্তের উক্তিতে পাওয়া যায়—"কনীয়াংস্তু যঃ নোদৃষ্ট-শ্রীচরণঃ"। অর্থাৎ শিবানন্দের প্রথম দুই পুত্রকে তিনি পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলেন ("তৌ দৃষ্টপূর্ব্বৌ"), কিন্তু ছোট ছেলেকে এই

প্রথম দেখিলেন। দশমাঙ্কে যে বৎসরের ঘটনাবলী চিত্রিত হইয়াছে রাজা প্রতাপরুদ্রের একটি শ্লোক হইতে জানা যায় সে বৎসর "মহাজ্যৈষ্ঠী" নামক অতি দুর্লভ এক পুণ্যযোগ সংঘটিত হইয়াছিল :—

"রাজা—পশ্য, পশ্য, মহদিদমাশ্চর্য্যং,
মহাজ্যৈষ্ঠীযোগে ভবতি ভগবদ্দেবকুলজা,
পতাকোদঞ্চদ্‌বীত্যতিসুবিদিতোঽয়ং জনরবঃ।"

অর্থাৎ ঐ যোগে পুরীর মন্দিরে পতাকা উড্ডীয়মান হয়। কারণ স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে এই পুণ্যতিথি পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই বিশেষভাবে পালনীয়। মৈথিল বাচস্পতিমিশ্রের "কৃত্যচিন্তামণি" গ্রন্থে পাওয়া যায় :—(কাশী সং, ১৮১৪ শক, পৃ. ৮)

মহাজ্যৈষ্ঠ্যাং নরো দৃষ্ট্বা প্রযতঃ পুরুষোত্তমং।
"উর্দ্ধধ্বজাংশুকং" সর্ব্বান্ পিতৄংস্তারয়তে ধ্রুবম্॥

বুঝা যায় শিবানন্দ সেন এই মহাযোগ উপলক্ষেই তিন পুত্রকে সঙ্গে করিয়া পুরী গিয়াছিলেন। মহাজ্যৈষ্ঠী-পদের নানারকম ব্যাখ্যা আছে। অন্যতর ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর পুরী-অবস্থানকালে দুই বার মাত্র মহাজ্যৈষ্ঠীযোগ গণনা দ্বারা পাওয়া যায়—২১ মে ১৫২১ (২৪ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, পূর্ণিমাতিথি, জ্যেষ্ঠানক্ষত্র, রবি রোহিণী নক্ষত্রে এবং বৃহস্পতি মূলানক্ষত্রে) এবং ১৮ মে ১৫৩২ খ্রীঃ (২১ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার, পূর্ণিমা, অনুরাধা নক্ষত্র, রবি রোহিণীতে এবং বৃহস্পতি অনুরাধায়)। তন্মধ্যে ১৫২১ সন বর্ত্তমানস্থলে গ্রহণীয় নহে। কারণ, উক্ত নাটকের দশমাঙ্কে মহাপ্রভুর তিরোধানের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা চিত্রিত হইয়াছে। ১৫৩২ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে কবিকর্ণপূরের ৭ বৎসর বয়স হইলে তাঁহার জন্মাব্দ হয় ঠিক ১৫২৬ সন। ইহার সমর্থক প্রমাণান্তর পরে লিখিত হইতেছে।

সম্প্রতি নবদ্বীপের হরিবোলকুটির হইতে "শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরবগ্রন্থগুচ্ছে" কবিকর্ণপূরের "আর্য্যাশতক" খণ্ডিত পুথিদৃষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে (৪৬১ গৌরাব্দ, ১০-১১৯ শ্লোক)। এই বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থের লুপ্তাংশ হইতেই পূর্ব্বোদ্ধৃত মনোহর শ্লোকটি উদ্ধৃত বলিয়া অনুমিত হয়। সাত বৎসরের শিশুর রচনা বলিয়া এই গ্রন্থের প্রচারে জগতের যে কোন সভ্যসমাজে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিত। মহাপ্রভুর জন্মভূমিতে মহাপ্রভুর অলৌকিক মহিমার এই অভিনব নিদর্শন কয়জনের চিত্ত আলোড়িত করিয়াছে, আজ বন্ধনমুক্ত দেশের সাহিত্যিকগণ গণনা করিয়া বিশ্লেষণ করুন।

কবিকর্ণপূর "চৈতন্যচরিতামৃত" নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিংশ-সর্গাত্মক সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেন। ইহার রচনাকাল, "বেদা রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে, শাকে..." অর্থাৎ ১৪৬৪ শক (১৫৪২ খ্রীঃ) গ্রন্থশেষে লিখিত আছে। ইহা বহু পূর্ব্বেই মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে কবিকর্ণপূর রচনা করেন, এরূপ প্রমাণ আছে এবং গ্রন্থরচনার মাত্র ৩ বৎসর পরে রূপ গোস্বামী স্বহস্তে ইহার অনুলিপি করিয়াছিলেন। এই মূল্যবান্ তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় সংগৃহীত একটি প্রতিলিপির শেষে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার সমাপ্তি বাক্য—"সমাপ্তমিদং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতং কাব্য-মিতি॥ শকাব্দা ১৪৬৪। আষাঢ়কৃষ্ণদ্বিতীয়া সোমবারে॥" তৎপর রূপগোস্বামীর শিষ্য বিষ্ণুদাস গোস্বামী-বিরচিত ৪টি শ্লোক আছে। তৃতীয় শ্লোকটি এই :—

চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমদ্ভুতার্থৈর্ব্যষ্টাব্দিকৈঃ-বিরচিতং
কবিকর্ণপূরৈঃ।
রূপাখ্যমৎপ্রভুবরৈঃ স্বকরাম্বুজাগ্রৈঃ শাকে হয়র্ত্তুভুবনে
লিখিতং পুরা যৎ॥

(অর্থাৎ চৈতন্যচরিতামৃত কাব্য অদ্ভুতচরিত্র ষোড়শবয়স্ক কবি-কর্ণপূরকর্ত্তৃক রচিত। মৎ-প্রভু রূপগোস্বামী ১৪৬৭ শকে ইহা পূর্ব্বে স্বকীয় করকমলাগ্রে লিখিয়া লইয়াছিলেন)। 'ব্যষ্টাব্দিক'-শব্দে বহুব্রীহি সমাস দ্বারা ১০ কিম্বা ১৬ বুঝায়, ২৮ নহে। ২৮ হইলে "অদ্ভুতার্থ" পদের সার্থকতা থাকে না। গ্রন্থ মধ্যেও এক স্থলে ব্যষ্টাব্দিক শব্দ ১৬ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এতদনু-সারেও কর্ণপূরের জন্মসন হয় ১৫২৬ খ্রীঃ। ১৬ বৎসরের বালক-রচিত সংস্কৃত মহাকাব্য বিশ্বসাহিত্যের এক আশ্চর্য্য বস্তু বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত এবং তন্নিমিত্ত রূপগোস্বামী বার্দ্ধক্যে স্বয়ং অনুলিপি করিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কর্ণ-পূরের অন্যান্য গ্রন্থ প্রবন্ধে আলোচিত হইল না।

৩। রাঘবেন্দ্র শতাবধান ভট্টাচার্য্য—(খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দী)

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য রচিত "বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী" সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য ৮ তরঙ্গে সমাপ্ত। ইহার প্রথম তরঙ্গে গ্রন্থকার স্ববংশের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পিতা "মহাপুরুষ" রাঘবেন্দ্রের কীর্ত্তিকথার সারাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল। রাঘবেন্দ্র তিন ভাইয়ের মধ্যে গুণোত্তর ও লক্ষণযুত ছিলেন। তিনি বিদ্বৎসমাজের প্রভূত আনন্দবিধানপূর্ব্বক মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে বিদ্যাসমুদ্র পার হইয়া "ভট্টাচার্য্যশতাবধান" উপাধি পাইয়া-ছিলেন ("লেভে ষোড়শবার্ষিকঃ কৃতিসভামানন্দয়ন্ভূয়সো, ভট্টাচার্য্যশতাবধানপদবীং যস্তীর্ণ-বিদ্যার্ণবঃ।") তিনি বাল্য-কালেই নবদ্বীপনিবাসী মহানৈয়ায়িক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বৃহস্পতিতুল্য বাদিবিজয়ী এবং মহাকবি হইয়াছিলেন। তাঁহার বিচিত্র উপাধির মধ্যে যে অসামান্য কাব্যরচনা শক্তি অন্তর্নিহিত আছে চিরঞ্জীব তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়াছেন। একজন কবি একটি শ্লোক রচনা করিলে সেই শ্লোকে এক একটি অক্ষর যে কয়বার প্রয়োগ হইয়াছে, রাঘবেন্দ্র শুনিয়া ঐ অক্ষর ঠিক ততবারই প্রয়োগ করিয়া ১০০ শ্লোক রচনা করিতেন। এই রীতিতে ১০০ কবির ১৮০ শ্লোক শুনিয়া স্বয়ং ১০০ শ্লোকে সমস্যা পূরণ করিতেন—এই অসাধারণ শক্তির জন্য তাঁহার "শতাবধান" উপাধি হইয়াছিল। তাঁহার শক্তিদর্শনে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার অধ্যাপক ভবানন্দ দেবতাবিশেষ বলিয়া তাঁহাকে খ্যাপন করিয়াছিলেন :—

অধীরামমুদ্রিত চাধাপকোয়ং ভবানন্দসিদ্ধান্তবাগীশ উচে।৬
অয়ং কোপি দেবোঽনবদ্যাভিবিদ্যা-চমৎকার-বারাবণারাং
বিভর্তি।

চিরঞ্জীব তাঁহার পিতৃকৃত দুইটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন "মন্ত্রার্থদীপ" ও "রামপ্রকাশ"। প্রথমটি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। "রামপ্রকাশে"র দুইটি প্রতিলিপি লণ্ডনে রক্ষিত আছে। আমরা ৯ বৎসর পূর্ব্বে "রামপ্রকাশে"র একটি অতি মূল্যবান্ প্রতিলিপি নবদ্বীপস্থ সাধারণ পাঠাগারে আবিষ্কার করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। নাগরাক্ষরে লিখিত এই বিরাট স্মৃতি গ্রন্থের বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য (*Indian Hist. Quarterly*, XVII, pp. 6-10)। সম্রাট্ শাহজাহানের রাজত্বকালে ১৭০৪ সম্বতে (১৬৪৭ সনে) ইহা রচিত হয়। গ্রন্থকারের পৃষ্ঠপোষক রাজা পারামের নামে ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। এই কৃপারামের পৌত্রই চিরঞ্জীবের পোষ্টা "রাজা যশবন্তসিংহ"। এই "গৌড়"-ক্ষত্রিয় রাজবংশের রাজধানীর নাম গ্রন্থমধ্যে আবিষ্কৃত হওয়ায় বহু কাল সঞ্চিত একটি ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে। "জগজ্জ্যোদয়" প্রকরণে লিখিত আছে:—(৪৩১-২ পত্রে) "এবক অর্গলায়াং মহারাজচক্রবর্ত্তিনগরে মণ্ডলপরিমিতা···সিংহস্বর্ণস্য ২০-ভমাংশোনশুরে নিশান্তে অর্গলাপুরে জগজ্জ্যোদয়ঃ। "'লাহারির'-মধ্যেপি ভূপতি-কৃপারামরাজধানীং প্রায়শুবৈবেতি।" অর্থাৎ কৃপারামের রাজধানী 'লাহারির' অর্গলাপুরের (তৎকালীন মোগল রাজধানী আগ্রানগরীর) সন্নিহিত ছিল। বর্ত্তমানে লাহাইর ও তন্নিকটবর্ত্তী 'ইঁদুরখী' নগর (নবদ্বীপের প্রতিলিপিতে শেষোক্তস্থলে গ্রন্থরচনার উল্লেখ আছে) গোয়ালিয়র রাজ্যের এক প্রান্তে দৃষ্ট হয়। সেখানেই রাজা কৃপারামের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, গৌড় দেশের কোন অংশে নহে এবং তিনি অদ্ভুতকর্ম্মা শতাবধান ভট্টাচার্য্যকে সভাপণ্ডিত করিয়া আনয়ন করেন। তাঁহার পৌত্র রাজা যশবন্তের সময়ে শতাবধানের যোগ্যপুত্র চিরঞ্জীব সভাপণ্ডিত ছিলেন। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীতে পাওয়া যায়, শতাবধান কাশীতে স্বর্গী হইয়াছিলেন এবং চিরঞ্জীবও তৎকালে কাশীতেই অধ্যাপনা করিতেন। কিন্তু চিরঞ্জীবের মাধবচম্পূর শেষে পাওয়া যায় তাঁহার জন্ম হইয়াছিল নবদ্বীপে। অর্থাৎ শতাবধান প্রথম জীবনে নবদ্বীপেই অধ্যাপক ছিলেন। পরে পিতা-পুত্র ২ পুরুষ বাংলার বাহিরে গিয়া অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শতাবধানের নিবাস গ্রাম হুগলির অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া। আমরা কুলপঞ্জীতে তাঁহার বংশপরিচয় আবিষ্কার করিয়াছি। তিনি অবসথী চট্টবংশীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার শেষ বংশধর হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ১৮৯৮ সনে পরলোকপ্রাপ্তি হইলে বংশলোপ হইয়াছে। তাঁহার অসামান্য প্রতিভার কথা বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হওয়া উচিত।

৪। অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার (মৃত্যু ১৮২২ খ্রীঃ)

নব্যন্যায়ের চর্চ্চা বাংলাদেশে যখন চরমসীমায় পৌঁছিয়াছে সেই সময়ে এই অসামান্য প্রতিভাশালী নৈয়ায়িক অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিচারমল্লরূপে সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন এবং বিদ্যার উপাধি ব্যতীত তাঁহার একটি বিস্ময়জনক লৌকিক উপাধি 'চমৎকার' জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। ফরিদপুর জিলার অধুনা নদীগর্ভে সুপ্রসিদ্ধ 'জপসা' গ্রামে এক পাশ্চাত্য বৈদিক বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহারা ৫ ভাই ছিলেন, সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ রামানন্দ ন্যায়বাগীশ বিক্রমপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাঠক ছিলেন। এই পাঠক বংশ এখনও বিদ্যমান আছে। ইঁহাদের বাড়ীতে দালান ও দীর্ঘি পুষ্করিণী প্রভৃতি ছিল। কোনও ঘটনায় ইঁহারা জপসা পরিত্যাগ করিয়া যান। পরে ইঁহাদের বাড়ীতে উত্তরশাহাবাজপুর নিবাসী হরচরণ সিদ্ধান্তবাগীশ আসিয়া টোল করিয়া বহু ছাত্র পড়াইয়াছিলেন। তৎকালে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ পূর্ব্ববঙ্গে যাতায়াত কালে জপসায় বাবুদের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন এবং সন্ধান লইয়া অভয়ানন্দের পবিত্র জন্মগৃহ পরিদর্শন করিতেন।

অভয়ানন্দ জপসায় পণ্ডিতবংশীয় কালিকাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর নিকট সামান্য ব্যাকরণ পড়িয়া নবদ্বীপে আসেন। তখন শঙ্কর তর্কবাগীশ অতি প্রাচীন, তথাকথিত একটি 'অশুদ্ধ পুস্তক' সমালোচনা করিতে দিয়া নবাগত পণ্ডিত কিম্বা ছাত্রের পরীক্ষা করিতেন। অভয়ানন্দ ঐ পুস্তকের সমন্বয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাত্র ২০ বৎসর বয়সে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্কর তর্কবাগীশের পরলোকগমনের সহিত তাঁহার পাঠ সমাপ্তি হয়। তিনি নবদ্বীপের তৎকালীন সমস্ত পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অসামান্য প্রতিভা দেখিয়া নবদ্বীপবাসিগণ নবদ্বীপেই তাঁহাকে চতুষ্পাঠী করিতে বলায় তিনি আর দেশে ফিরেন নাই। ওয়ার্ড সাহেবের গ্রন্থে ১৮১৭ সনে নবদ্বীপের প্রধান চতুষ্পাঠীসমূহের তালিকামধ্যে অভয়ানন্দের নাম চতুর্থ, ছাত্রসংখ্যা ২০ (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃ. ৪২৩ দ্রষ্টব্য)। তিনি পরে ভট্টপল্লীতে বাড়ী করেন এবং ১২২৯ সনের ১১ বৈশাখ পথিমধ্যে স্বর্গত হইলে ভট্টপল্লী হইতে যাইয়া তাঁহার পত্নী সহগমন করিয়াছিলেন (ঐ, ঐ, পৃ-৪৬-৭)। আমরা স্বর্গত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি অভয়ানন্দ বেশ বলিষ্ঠ ছিলেন এবং ছুটির দিনে নবদ্বীপ হইতে (প্রায় ৪০ মাইল) হাঁটিয়া ভট্টপল্লীর বাড়ীতে আসিতেন। তিনি মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে স্বর্গী হন এবং স্বকীয় ছাত্রদের পাঠ পরিসমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। অম্বিকাচরণ ঘোষ-রচিত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' (১২৭৫, পৃ. ৫৪-৫) হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—"অনেক দিন অতীত হইল বিক্রমপুর অপর একটি পণ্ডিতরত্নে বঞ্চিত হইয়াছেন, ইহার নাম অভয়াচরণ (?) চমৎকার। ইনি এত অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ও বিচক্ষণতা লাভ করেন যে, শুনিলে যারপর নাই চমৎকৃত

হইতে হয়। ইনি এই নিমিত্তই 'চমৎকার' এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি এই মহাত্মা অভয় চমৎকার নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।'

রামগতি ন্যায়রত্নের "গোষ্ঠীকথা" হইতে তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট গল্প ("পাঁঠা ভাঁড়াইয়া মহিষ)" উদ্ধৃত হইল। "অভয়ানন্দ ভট্টাচার্য্য বড় নৈয়ায়িক ছিলেন। একদা তিনি কোনও সভায় গর্ব্ব করিয়া বলিলেন যে, আমার নিকটে যে কেহ পূর্ব্বপক্ষ করুক, একেবারেই তাহার উত্তর করিব। যাঁহার বাটীতে সভা, তিনি ঠকাইবার জন্য একজন ভাল অধ্যাপককে ছাত্ররূপে উপস্থিত করিয়া তাঁহার দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ করাইলেন। অভয়ানন্দ পূর্ব্বপক্ষকারীকে সামান্য ছাত্র জ্ঞান করিয়া যেমন তাহার উত্তর করিলেন, পূর্ব্বপক্ষকারী অমনি সে উত্তরে দোষ দিলেন। তখন অভয়ানন্দ চকিত হইলেন এবং বুঝিলেন ইনি ছাত্র নহেন—একজন ভাল অধ্যাপক। তখন তিনি সে দোষের খণ্ডন করিয়া পুনর্ব্বার উত্তর প্রদান করিলেন; সেবারে আর পূর্ব্বপক্ষকারী কোনও দোষ দিতে পারিলেন না। তখন বাটীর কর্ত্তা হাসিয়া কহিলেন কৈ ভট্টাচার্য্য মহাশয়! এ পূর্ব্বপক্ষে আপনকার উত্তর একেবারে ত হইল না? অভয়ানন্দ কহিলেন বাবু! তুমি যে অন্যায় করিয়াছিলে; তুমি পাঁঠা ভাঁড়াইয়া মহিষ দিয়াছিলে কেন? আমি প্রথমে পাঁঠা মনে করিয়া পাঁঠাকাটা কোপ মারিয়াছিলাম; কিন্তু পরে বুঝিলাম এ পাঁঠা নহে মহিষ; এখন মহিষকাটা কোপ মারিলাম—কাটিয়া গেল।" (পৃ. ৬০, ৬৬ সংখ্যক গল্প)

তিনি জীবনে দুই বার এ বিচারে পরাস্ত হইয়াছিলেন। কাশী সংস্কৃত কলেজে বিক্রমপুর পাইকপাড়া-নিবাসী বঙ্গের তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক চন্দ্রনারায়ণ ন্যায়-পঞ্চানন দীর্ঘকাল (১৮১৩-৩৩ খ্রীঃ) অধ্যাপক ছিলেন। অভয়ানন্দ পাঠদশায় গর্ব্ব করিয়া বলিতেন, 'চাঁদা আমার ভয়ে কাশীতে গিয়াছে!" পরে পাঠ সমাপন করিয়া কাশীতে গিয়া তাঁহার সহিত বিচার করেন, কিন্তু কিছুতেই পরাস্ত করিতে পারেন নাই (অর্চ্চনা, ভাদ্র ১৩২৭, পৃ. ২৮২; প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩২, পৃ. ৭৬৯ দ্রষ্টব্য)। চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, 'তুমি শিশু—এত অল্প বয়সে পাঠ সমাপ্ত করিলে কেন? তোমার যেরূপ বুদ্ধি ও বিচারশক্তি, আরও কিছুদিন পড়িলে তুমি বঙ্গের অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইবে।' অপর এক 'দেবাংশ' পণ্ডিতের সহিত তাঁহার দ্বিতীয় বিস্ময়াবহ বিচার পরে লিখিত হইল। অভয়ানন্দ বিচারমল্ল হইলেও অধ্যয়নশীল ছিলেন এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া পড়িতেন। নদীয়া বহিরগাছীর সুপ্রসিদ্ধ রঘুমণি বিদ্যাভূষণের গৃহে একটি পুঁথির পত্রে আমরা নিম্নলিখিত স্মারকলিপি দেখিয়াছি:—"সন ১২২৭ সাল ১০ কার্ত্তিক নবদ্বীপের শ্রীযুত অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য অনুমানখণ্ডের আলোকগ্রন্থ মিশ্রকৃত লইয়া যান লিখিয়া আনিয়া দিবেন ইতি।" নব্যন্যায় চর্চ্চার এই স্বর্ণ যুগ অচিরেই অবসান প্রাপ্ত হয়। পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকগণ আলোকগ্রন্থের নামও অবগত ছিলেন কি না সন্দেহ, সংগ্রহ করা ত দূরের কথা। অভয়ানন্দের বহু কথা আমরা জপসার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৺আনন্দনাথ রায় (১২৬২-১৩৪০ সন) মহাশয়ের নিকট জ্ঞাত হইয়াছিলাম।

৫। ভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন (মৃত্যু ১৮১৮)

ঢাকা জিলায় সোনারগাঁ পরগণার "কুকপুরা" গ্রামে রাঢ়ীয় বাৎস্যগোত্রীয় (শিমলাল) ভট্টাচার্য্যবংশ পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই বংশে দৈবশক্তিসম্পন্ন ভৈরবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২২৫ সনে ২৬ বৎসর বয়সে মাত্র ৫ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া (প্রবাদ অনুসারে এক ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে) পরলোক গমন করেন। তিনি কাহারও নিকট বিচারে পরাস্ত হন নাই এবং নব্যন্যায়ের যে কোন কূটপ্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ ছিলেন। তাঁহার ললাটে একটি "রাজদণ্ড" রেখা ছিল এবং শাস্ত্রীয় বিচারকালে তাহা ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া তাঁহার অপরাজেয় শক্তির লাঞ্ছন রূপে সকলকে অভিভূত করিত। তাঁহার বহু কীর্ত্তি কথার মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য। বিক্রমপুরের তদানীন্তন প্রধান নৈয়ায়িক বিখ্যাত "পত্রিকা"কার কালীশঙ্কর সিদ্ধান্তবাগীশ (১৭৮১-১৮৩০ খ্রীঃ) দ্বিতীয়পক্ষে ভৈরবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রী হরমোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন। কালীশঙ্কর বিচারমল্ল ছিলেন না; ভৈরবচন্দ্র পরিহাসচ্ছলে দাদাকে বলেন, "মেয়ের সঙ্গে মেয়ে বিবাহ দিয়াছেন"!! কথাটি কালীশঙ্করের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি অবিলম্বে আসিয়া ভৈরবচন্দ্রের সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হন এবং প্রত্যেক স্থলে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া লজ্জিত হন।

কালীশঙ্কর ময়মনসিংহ সুসঙ্গের বিদ্যোৎসাহী রাজা রাজসিংহের (১৭৮৪-১৮২২ খ্রীঃ) সভাপণ্ডিত ছিলেন, কেবল প্রাণরক্ষার জন্য বৎসরে ৮।৯ মাস দেশে আসিয়া থাকিতেন। কালীশঙ্করের চেষ্টায় কোন উৎসব উপলক্ষে সুসঙ্গ রাজবাড়ীতে অভয়ানন্দ ও ভৈরবচন্দ্রের মধ্যে এক বিস্ময়াবহ শাস্ত্রীয়বিচার সংঘটিত হয়—উভয়েই দৈবশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। ভৈরবচন্দ্র বিচারে জয়ী হইয়া রাজপ্রদত্ত হাতীর পৃষ্ঠে দেশে ফিরিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই স্বর্গী হন। সোনারগাঁর তদানীন্তন একজন "কবি" কুশাই দাস গান বাঁধিয়াছিলেন:—

সুসঙ্গ রাজার বাড়ী বিচার করি দ্বারে বাঁধল হাতী।
তার মধ্যে পড়ে কত পণ্ডার রক্ষা পেল জাতি।
সে যে ভৈরবচন্দ্র তর্কপঞ্চানন,
সশরীরে স্বর্গে গেল করে রথে আরোহণ,
কাঁদলে কি আর পাবে রে সে জন।

৬। ধনেশ্বর ভট্টাচার্য্য

উদীচ্য রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য (খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ) রঘুনন্দনের স্মার্ত্তমত সংশোধন করিয়া "কৌমুদী" নামক বহু স্মৃতির গ্রন্থ রচনা করেন। উত্তরবঙ্গে তাঁহার মতই বহুল

পরিমাণে প্রচলিত ছিল। রঙ্গপুর ইটাকুমারীর ভট্টাচার্য্যবংশে তাঁহার জন্ম (বারেন্দ্রশ্রেণী, বাৎস্যগোত্র)। তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ১৩১৮ সনে সম্বন্ধনির্ণয়ের তৃতীয় পরিশিষ্টে তাঁহাদের বংশবৃত্তান্ত মুদ্রিত করেন (পৃ. ১৬২-৮৩)। তন্মধ্যে বালক কবি ধনেশ্বর-রচিত "বাৎস্যবংশচরিতম্" (পৃ. ১৬২-৭৭) নামে "শার্দ্দুল-বিক্রীড়িত" ছন্দের ৮৭ শ্লোকাত্মক এক অতি বিস্ময়কর ক্ষুদ্রকাব্য আছে। দুঃখের বিষয় এই অসামান্য বস্তুটি কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আমরা বাংলার সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণকে দৈবশক্তিসম্পন্ন ধনেশ্বরের রচনাটি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ধনেশ্বরের ভ্রাতা রামেশ্বর ৮ শ্লোকে "ধনেশ্বর-চরিত" লিখিয়াছেন (ঐ, পৃ. ১৭৮-৯)। তাঁহার সারাংশ এই—উদীচোর এক প্রপৌত্র ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণি; ধনেশ্বর ৮ শ্লোকে (৭৯-৮৬) তাঁহার পাণ্ডিত্যকীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ধনেশ্বর শৈশবে কাতন্ত্রের সন্ধিবৃত্তি মাত্র পড়িয়াছিলেন, এক রাত্রিতে নিদ্রিত পিতার মুখনির্গত এক মন্ত্র শুনিয়া এবং পরদিন পিতার নিকট ঐ মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়া হঠাৎ তাঁহার সমস্ত শাস্ত্রে জ্ঞান জন্মে। এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তিনি অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া অপমান করিয়াছিলেন—তাঁহার অভিসম্পাতে তৃতীয় দিন মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে ধনেশ্বর মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনধিক ১৫ বৎসরে তিনি কি অদ্ভুত কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন ৮৭ শ্লোকের প্রত্যেকটি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ। উদীচা রামকৃষ্ণ সরস্বতীর দর্শন লাভ করিয়া বর পাইয়াছিলেন। ধনেশ্বর ১১ শ্লোকে (২৩-৩৩) উদীচোর বৃত্তান্ত দিয়াছেন: ধনেশ্বরের ভাগিনেয় রুদ্রমঙ্গল কাব্যালঙ্কার (মৃত্যু ১২৬০ সন) নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণির এক প্রধান ছাত্র ছিলেন। ধনেশ্বরের কীর্ত্তি সুতরাং ১৮২৫-৪০ খ্রীঃ মধ্যে স্থাপন করা যায়।

৭। নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু (১৮৩৪-৬২ খ্রীঃ)

বাঙ্গলাদেশে নব্যন্যায়ে প্রতিভার শেষ অবতার নন্দকুমার স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। "নৈহাটির ভট্টাচার্য্যবংশ" নামক পারিবারিক গ্রন্থে তাঁহার অসামান্য কীর্ত্তির বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে (পৃ. ১৮-২৬)। মাত্র ১১।১২ বৎসর বয়সে তিনি মাতামহ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের (সংস্কৃত কলেজের এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী, মৃত্যু ১৮৪৬ খ্রীঃ) নিকট নব্যন্যায়ের কূটবিচার-প্রণালী শিখিয়াছিলেন। রামমাণিক্য স্বয়ং নবদ্বীপের শঙ্কর তর্কবাগীশ, নৈহাটির মাণিক্য তর্কভূষণ এবং মুরসিদাবাদের কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিকট পাঠ স্বীকার করিয়া তিন সম্প্রদায়ের পদ্ধতি আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং উপযুক্ত দৌহিত্রকে প্রাণ খুলিয়া তাহা শিখাইয়া যান। তাঁহার মৃত্যুর পর নন্দকুমার পিতার নিকট পড়িয়া মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপ্ত করেন। তাঁহার এই "অসাধারণ" (extraordinary) কৃতিত্ব নভাইলের রতন রায়, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রাজা রাধাকান্তদেব, রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি বহু প্রধান ব্যক্তি প্রশংসা করিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তিনি প্রায় ৪ বৎসর (১৮৫৬-৬০ খ্রীঃ) সংস্কৃত কলেজে ছিলেন, পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় অধিক বেতনে কাশী স্কুলের হেড্ পণ্ডিত হইয়া যান, কিন্তু ১২৬৯ সনের কার্ত্তিক মাসে (১৮৬২ খ্রীঃ) মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে ক্ষয় রোগে নিঃসন্তান পরলোকগত হন। "সংস্কৃত প্রস্তাব" নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক (১৯১৬ সম্বৎ, পৃ. ২৮) তিনি মুদ্রিত করিয়াছিলেন—আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বঙ্গভাষার উন্নতি বিধানের প্রয়োজন ইহাতে যেভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহা বস্তুতই আশ্চর্য্যজনক।

নন্দকুমার ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে অতি অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণি ও তদীয় সর্ব্বপ্রধান ছাত্র গোলোকনাথ ন্যায়রত্নকে তিনি মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে যেভাবে বিচারে পরাস্ত করেন তাহার বিবরণ "সংবাদভাস্কর" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম ভাগ, ২য় সং, পৃ. ৪২৭, ৪৭৭-৮)। প্রথম বিচারে বিষয় ছিল "কেবলান্বয়ী গাদাধরী"র একটি পঙ্ক্তি এবং দ্বিতীয় বিচারে ছিল গদাধরের "শক্তিবাদে"র একটি পঙ্ক্তি। নন্দকুমার জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননকেও বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রবীণ পক্ষধর মিশ্রের সহিত বালক রঘুনাথের বিচারকাহিনী এখানে তুলনাচ্ছলে স্মরণীয়। বাংলায় নব্যন্যায়ের গৌরবোজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা ও নব্যন্যায়ের শোচনীয় অবসান রঘুনাথ ও নন্দকুমারের জীবনে যথাযথ প্রতিফলিত হইয়াছিল। রঘুনাথের খ্যাতি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া যায়, আর নন্দকুমার নিঃস্ব অবস্থায় গ্রাম্য বিদ্যালয়ে পণ্ডিতী করিয়া মারা যান।

অতি-আদিম যুগের শিল্পের ধারা

শ্রীকানাইলাল সাহা

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন : প্রস্তর-যুগে ইউরোপে তিনটি সভ্যতা বিস্তার লাভ করে। প্রথমটিকে বলা হয় অ্যারগ্‌নেসীয় (Aurignasian), দ্বিতীয়টি সলুট্রিয় (Solutrian), আর তৃতীয়টি হ'ল ম্যাগ্‌ডালেনীয় (Magdalenian)।

প্রস্তর-যুগের প্রথম দিকের আধবাসীদের ব্যবহৃত কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে আরিগ্‌নাক (Aurignac) নামে একটি পাহাড়ের গুহায়। তাই এই যুগের সভ্যতাকে বলা হয় অ্যারগ্‌নেসীয় সভ্যতা। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, স্পেনের উত্তর ভাগ, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি স্থানে এই সভ্যতার কিছু আভাস পাওয়া গেছে। তাই অনেকে অনুমান করেন, ইউরোপের সর্ব্বত্রই এই সভ্যতার ধারা ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই যুগের অধিবাসীদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন ছিল শিকার। তাই তারা পাহাড়ের ধারে বসে পাথরের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করত, আর শিকারে যাবার পূর্ব্বে পাহাড়ের গায়ে বা গুহার ভেতর জীব-জন্তুর ছবি এঁকে পূজো করত। তখন ওরা যেসব ছবি এঁকেছে সেগুলো ছোট ছেলেদের আঁকা ছবির মতই। রেখা-চিত্রের আঙ্গিকের সঙ্গে তখনও ওদের ভাল করে পরিচয় হয় নি বলেই বোধ হয় তারা শুধু বেষ্টনী-রেখা (outline) দিয়ে কোন রকমে বস্তুটিকে বোঝাতে চেষ্টা করত। এই প্রাথমিক চিত্রগুলির শিল্পগত সৌন্দর্য্য বা মূল্য কিছু থাক বা না থাক ঐতিহাসিক মূল্য একটা আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বহুকাল ধরে ছবি আঁকতে আঁকতে ক্রমে ওরা অভ্যস্ত হয়ে উঠল রেখা-চিত্রের আঙ্গিকে এবং ওদের মনেও ধীরে ধীরে জাগল শিল্পবোধ। আর সেই সঙ্গে বেড়ে যেতে লাগল ওদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বা শিল্পের অভিব্যক্তির অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির জন্যেই কালক্রমে ওদের শিল্প হয়ে উঠল পূর্ণাঙ্গ।

পরবর্ত্তী যুগের শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করলে আরও স্পষ্টভাবেই আমরা এ বিষয়টা বুঝতে পারব।

অ্যারগ্‌নেসীয় যুগের অবসানের পর নূতন এক ধরণের সভ্যতার আলো প্রস্তর-যুগের অধিবাসীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্সের সলুট্রার (Solutro) নামে একটি জায়গায় এই যুগের শিল্পের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া গেছে। গবেষকেরা তাই এই স্থানটির নাম অনুযায়ী এই যুগের সভ্যতার নাম দিয়েছেন সলুট্রিয় সভ্যতা। তাঁরা অনুমান করেন এই যুগের সভ্যতার অগ্রদূত পশ্চিম এশিয়ার স্টেপ্‌ প্রদেশের এক অভিযাত্রী দল। খুব সম্ভব ওরা তুর্কীস্থান বা তার কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে পশ্চিম ইউরোপের দিকে অগ্রসর হয়। ক্রমে ওরা ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উপস্থিত হয়ে আরগ্‌নাকের অধিবাসীদের সঙ্গে বসবাস সুরু করে। ওরা কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করতে তত দক্ষ ছিল না। পরে আর একদল অভিযাত্রী ওখানে উপস্থিত হয়। এরা অ্যারগ্‌নেসীয়দের অস্ত্র তৈরী করবার কায়দাটুকু আয়ত্ত করে নিয়ে শেষে ওদের চেয়েও সুন্দর সুন্দর অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করতে সুরু করে দিলে।

অ্যারগনেশীয়দের মত এরাও ছবি আঁকত পাহাড়ের গায়ে ও গুহায়। তবে পূর্ব্বপ্রচলিত আঙ্গিকের একটু-আধটু অদল-বদল করায় এদের ছবিগুলো হয়েছিল কিছু উন্নত ধরণের। এরাও বেষ্টনী-রেখা দিয়ে জীব-জন্তুর ছবি আঁকত বটে, তবে সেগুলোর চোখ আঁকত ফুটকি দিয়ে। ছোট বড় রেখা দিয়ে ওরা ক্রমে পশুর গায়ের লোম আঁকাও সুরু করে দিলে। এই দুই যুগের ছবি তুলনা করলে দেখা যায়, আরগনেশীয়দের চেয়ে সলুট্রিয়দের শিল্প-বোধ ছিল একটু উন্নত।

সলুট্রিয় যুগের অবসানের পর সুরু হয় ম্যাগডালেনীয় যুগ। প্রস্তর-যুগের রেখা-চিত্র ও চিত্রকলার চরম উন্নতি হয়েছিল এই সময়। ১৮৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে লার্তেঅ্যাঁ (Lartet) ও ক্রিস্টি নামে দুজন গবেষক লা মডেলা (La Madeleine) গুহায় এই যুগের শিল্পের কিছু নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন : এই যুগের শিল্প শুধু ফ্রান্সের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। দক্ষিণে ইটালীয় গ্রিম্যাল্‌ডি নামক স্থানে আর একটি স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে ওঠে। একে বলা হয় গ্রাভিটিয় সভ্যতা। মধ্য ইউরোপে কিন্তু গ্রাভিটিয় ও ম্যাগ-ডালেনীয় সভ্যতার সংমিশ্রণে আর একটি নতুন ধরণের সভ্যতা গড়ে ওঠে। ওদিকে দক্ষিণ রাশিয়ায় তখন গ্রিম্যাল্‌ডি সভ্যতার চেয়ে কিছু নিকৃষ্ট ধরণের অন্য এক সভ্যতা প্রচলিত ছিল।

অন্ত্যযুগের শিল্পের সঙ্গে মধ্যযুগের শিল্পের বিশেষ কিছু মিল দেখা যায় না। এর প্রধান কারণ, এই সময়ের শিল্পের আঙ্গিকের আমূল পরিবর্ত্তন হয়েছিল। এই যুগের অধিবাসীরা যে মধ্যযুগের শিল্পের সঙ্গে পরিচিত ছিল তার প্রমাণ আছে। উভয় যুগের শিল্পের নমুনা একই জায়গায় পাশাপাশি পাওয়া যায়। এই যুগের শিল্পীরা কিন্তু সব সময়ই নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার চেষ্টা করত।

শিল্পীরা এই সময় শিল্পকর্ম্মের অন্যতম উপাদানস্বরূপ পশুর হাড় ব্যবহার করা সুরু করে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লোকদের অস্ত্রশস্ত্রের অনুকরণে তারা হাড়ের বর্শা তৈরি করত। এই সব বর্শাকে আবার সুদৃঢ় করবার জন্যে বাঁটগুলি চিত্রিত করত জীব-জন্তুর মূর্ত্তি খোদাই করে। এই খোদাই-শিল্পের

আদিক পরীক্ষা করে গবেষকরা বলেছেন, এগুলি প্রস্তর-যুগের শেষ সময়কারই জিনিষ।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন : ম্যাগডালেনীয় যুগের অধিবাসীরা শিকারে তত অভ্যস্ত ছিল না। কাজেই জীবনধারণের জন্যে তাদের বনের পশুর ওপর আদৌ নির্ভর করতে হ'ত না। তারা জীবনধারণ করত নদীর মাছ ধরে। তাই ওরা কয়েকটি অস্ত্র তৈরি করেছিল মাছ ধরবার জন্যে। এইসব অস্ত্র-শস্ত্র আবিষ্কার হবার পর গবেষকদের ধারণা হয়েছে যে, পশু-শিকারের চেয়ে মৎস্যশিকারেই বোধ হয় ওদের আনন্দ ছিল বেশী।

পুরুষরা তো সারা দিন ঘুরে বেড়াত নদীর ধারে ধারে, আর মহিলারা সময় কাটাত গুহার ধারে বসে পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরি করে। চকমকি পাথরের ধারালো ছুরি দিয়ে পশুর চামড়া কেটে ওরা সুন্দর সুন্দর পোশাক তৈরি করত: অনেক সময় সেগুলিকে আবার চিত্রিত করত ছোট ছোট ছেঁদা-করা ঝিনুক বসিয়ে। এই থেকে এ যুগের মেয়েদেরও শিল্পমনোবৃত্তির আভাস পাওয়া যায় এবং শিল্প সম্বন্ধে ওরা যে কতটা সজাগ ছিল তাও বেশ বোঝা যায়।

মেয়েদের সেলাইয়ের ছুঁচগুলি প্রায়ই হারিয়ে যেত, তাই ওরা সেগুলি অতি যত্নে পাখীর ফাঁপা হাড়ের ভেতর পুরে রাখত। জামায় ওরা হাড়ের বোতামও ব্যবহার করত কখনও কখনও হাতীর দাঁতের তৈরি আলপিনের মত এক প্রকার সূক্ষ্ম জিনিষ ও জামা আটকাবার জন্যে ব্যবহার করত। এই সব জিনিষের নমুনা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে অতি যত্নে রক্ষিত আছে।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন, প্রস্তর-যুগের অধিবাসীদের মধ্যে ম্যাগ্‌ডালেনীয়দের শিল্প-বোধ ছিল অত্যন্ত উন্নত। অপরাপর শিল্পের চেয়ে ওদের চিত্র-কলাই আমাদের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করে। পাহাড়ের গায়ে ও গুহায় আঁকা ছবিগুলি ওদের সহজাত শিল্প-প্রবৃত্তির স্পষ্ট পরিচয় দেয়। ইতিহাস ওদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বললেও ওদের আঁকা ছবিগুলি, আঁকবার সরঞ্জাম, ওদের ব্যবহার করা অস্ত্র-শস্ত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ ওদের জীবনযাপন প্রণালী ও মানসিক প্রবণতা সম্বন্ধে অনেক তথ্যই আমাদের জানিয়ে দেয়।

চকমকি পাথরের যন্ত্রপাতি ও ব্যবহারযোগ্য জিনিষের উপর খোদাই করা ছবিগুলি দেখলে বেশ বোঝা যায়, কত গভীর ছিল ওদের শিল্পানুরাগ। এগুলো থেকে বুঝতে পারা যায়, ওরা শুধু চিত্র-কলার অনুরাগী ছিল না, ভাস্কর্য্যেও ছিল এদের দক্ষতা। ক্রমে ওরা ভাস্কর্য্যে এত নিপুণ হয়ে উঠেছিল যে, ওদের খোদাই করা চিত্রগুলির সঙ্গে জীবন্ত প্রাণীদেহের কোন বৈসাদৃশ্য নজরে পড়ে না। সরু-মোটা আঁচড়ে খোদাই করা ছবিকে নিখুঁত করবার জন্যে ছিল ওদের অক্লান্ত চেষ্টা।

নীচের বুনো-মহিষের ছবিটি (নং ১) ভাল করে লক্ষ্য করলে ওদের ভাস্কর্য্যের আঙ্গিকটুকু সম্বন্ধে কিছু ধারণা জন্মাতে পারে। এর গায়ের লোমগুলি আঁকা হয়েছে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খাড়া খাড়া আঁচড় দিয়ে। লোমগুলি এই ভাবে আঁকায় জীবটির

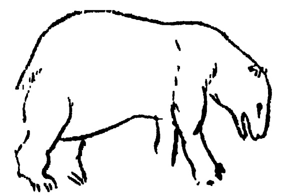


১ নং চিত্র

দৈহিক বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট কাজগুলিকে নিখুঁত করবার জন্যে ওরা সময়ে সময়ে এত সূক্ষ্ম আঁচড় দিয়েছে যে, আজকালকার খুব জোরাল বিজলী বাতির আলোতেও সেগুলি স্পষ্ট দেখা যায় না।

কোন জীবন্ত প্রাণী দেখলে আমাদের মনে তার আকৃতির যে রেখাপাত হয়, সুসমঞ্জস রেখা দিয়ে ছবিগুলি তেমনি সুষ্ঠু ও জীবন্ত করবার জন্যে ওরা যথেষ্ট চেষ্টা করত। নিখুঁত রেখার টানে স্পষ্ট হয়ে উঠত প্রত্যেকটি পশুর গতি-ভঙ্গী ও প্রকৃতির বিশেষত্ব।

লা ম্যাদেলা (La Madeleine) গুহার গুহা-ভল্লুক ও ম্যামথের ছবি দুটিকে ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, ভালুকটি উগ্র প্রকৃতির, আর ম্যামথটি আক্রমণোদ্যত (নং ২ ও ৩)। এই ধরণের ছবি এর চেয়ে নিখুঁত করে আঁকা খুব



২ নং চিত্র

কঠিন বলে মনে হয়। এই ছবিগুলি দেখলে ওদের পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও নিপুণ রেখা-সংযোজনা-শক্তির প্রশংসা করতে হয়।

চকমকি পাথরের ছুরি দিয়ে পাথর বা হাড়ের ওপর নিখুঁত ছবি আঁকা বেশ একটু শ্রমসাধ্য ব্যাপার। তাই ওরা



৩ নং চিত্র

অত্যন্ত সতর্ক হয়ে থাকত ছবি আঁকবার সময়। ওরা জানত, অসতর্কতার কোন অপ্রয়োজনীয় রেখাপাত হলে তা মুছে ফেলা কত কষ্টসাধ্য। এই সতর্কতার ফলেই এদের ছবিতে অপ্রয়োজনীয় রেখা বড় একটা দেখা যায় না।

এর আরও একটি কারণ আছে। কোন আদর্শ বা মডেল থেকে ওরা ছবি আঁকত না। শিল্পী যে জীবটির ছবি আঁকবার ইচ্ছা করত সেই জীবটিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনও বা দিনের পর দিন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখত। দেখবার সময় গভীরভাবে চিন্তা করত রেখার ধরণ ও ভঙ্গী সম্বন্ধে। দেখতে দেখতে জীবটির সম্পূর্ণ ছবিটি যখন মনে গভীর রেখাপাত করত তখনই ওরা সেই জীবটির ছবি আঁকতে বসত।

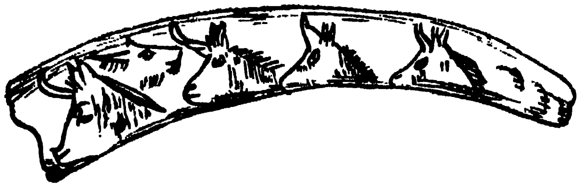
সুইজারল্যাণ্ডের কেস্‌লারলকে শম্প-ভক্ষণরত বল্গা হরিণটি প্রস্তর-যুগের ভাস্কর্য্যের একটি অপূর্ব্ব নিদর্শন (নং ৪)।



৪ নং চিত্র

এই ছবিটিতে একটি নূতন আঙ্গিকের সন্ধান পাওয়া যায়। ছোট বড় সরল-রেখার বদলে আঁকা-বাঁকা রেখা দিয়ে মূর্ত্তিটির গায়ের লোম দেখানো হয়েছে। পায়ের অবস্থান দেখে বোঝা যায়, জীবটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। যে-কোন শিল্পরসিক এই মূর্ত্তিটি দেখে স্বীকার করবেন, এর চেয়ে নিখুঁত ও প্রাণবন্ত মূর্ত্তি খোদাই করা সুকঠিন।

নীচের ছবিটিতে বল্গা হরিণের শিঙের উপর হরিণের যে মুখগুলি খোদাই করা হয়েছে জীবন্ত প্রাণীর মুখের সঙ্গে সেগুলির তফাৎ আছে বলে মনে হয় না (নং ৫)। একটি জিনিষ কিন্তু এতে লক্ষ্য করবার আছে। পাঁচটি মুখের



৫ নং চিত্র

কোনটির সঙ্গে কোনটির মিল নেই অথচ প্রত্যেকটি মুখেরই একটি বিশেষত্ব আছে।

বড় বড় ছবি আঁকবার সময় ওরা যে পরিশ্রম ও সতর্কতা অবলম্বন করত ছোট ছোট ছবি আঁকবার সময়ও তার এতটুকু শৈথিল্য দেখা যায় নি। শিল্পানুরাগ যে ছিল এদের রক্তমজ্জাগত তার প্রমাণ এই ছবিগুলি। এই অনুরাগের ফলেই ওরা কিছু আঁকবার সময় এতটুকু অবহেলা বা অসতর্কতা দেখাত না।

নীচের ছবিটি লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায়, এটি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি মাত্র কয়েকটি রেখার সমাবেশে আঁকা হয়েছে। এতে কোন আড়ম্বর না থাকলেও স্টেপ প্রদেশের ঘোড়ার দেহগত বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় আছে (নং ৬)।



৬ নং চিত্র

দিন যতই যেতে লাগল শিল্পীরা ততই নিপুণ হয়ে উঠতে লাগল রেখাঙ্কনে। ক্রমে রেখার সাহায্যেই ওরা দেখাতে সুরু করে দিলে আলো-ছায়ার (light and shade) খেলা। আজে-বাজে রেখা না টেনে সামান্ত একটু ছোঁয়া (touch) দিয়েই এই আলো-ছায়ার খেলা দেখিয়ে ওরা ছবিগুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলত।

গভীর রেখাবিন্যাসে ছবি আঁকা ছিল অ্যারগ্‌নেশীয় শিল্পীদের রেখা-চিত্রের প্রধান আঙ্গিক। ক্রমে ক্রমে ওদের শিল্প-বোধ যতই গভীর হতে লাগল ততই ছবিগুলিকে আকর্ষণযোগ্য করবার দিকে ওদের ঝোঁক বাড়তে লাগল। সূক্ষ্মশিল্পবোধ তখনও কিন্তু ওদের মনে জাগে নি। তাই সৌন্দর্য্যপ্রীতি ও শিল্পীমনের অতৃপ্তির তাড়নায় কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে ওরা রেখা-চিত্রের বেষ্টনী-রেখার ভেতর রং-লেপা সুরু করে দিলে।

ম্যাগ্‌ডালেনীয় যুগে কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল এই

আঙ্গিকের। রং-লেপা (Silhouette) ছবিগুলি ওরা কিন্তু আঁকত রঙের ফুটকি দিয়ে। কোন কোন ছবিতে আবার সরু-মোটা ফুটকি দিয়ে আলো-ছায়ার খেলা দেখাতে চেষ্টা করেছে। এই ক্রমোন্নতি দেখে মনে হয়, রঙের তুলি ধরার পর রঙের যাদু দেখাতে ওরা যেন সুরু করে দিয়েছিল।

যে-কোন আঙ্গিকের ছবি ওরা আঁকুক না কেন, সব সময়ই ওদের লক্ষ্য থাকতো ছবিটিকে নিখুঁত করার দিকে। কোন কোন ছবিতে হাল্কা রঙের স্পর্শে বেষ্টনী-রেখাটি এঁকে ভেতরেও লেপে দিত হাল্কা রং। এই সব ছবির জায়গায় জায়গায় আবার গভীর রঙের স্পর্শ দিয়ে আলো-ছায়ার খেলা দেখিয়েছে।

কোন কোন ছবির বহির্বেষ্টনীটুকু কালো রংদিয়ে এঁকে ভেতরে দিয়েছে অন্য রঙের স্পর্শ। এই আঙ্গিকের ছবিগুলি এত আকর্ষণযোগ্য যে সম্পূর্ণ ছবিটির ওপর দর্শকের দৃষ্টি পুরোপুরি আটকে যায়।

এক-রঙা ছবিগুলিতেও ক্রমে ওরা আলো-ছায়ার খেলা দেখাতে সুরু করে দিলে। এই ধরণের ছবিগুলিতে রঙ দেওয়ার পর চকমকি পাথরের ছুঁচ দিয়ে জায়গায় জায়গায় চেঁচে হাল্কা করে রঙের পরশ দিয়েছে। ফলে সমগ্র ছবিটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আলো-ছায়ার খেলা।

রঙের-নেশা ওদের এমন করে পেয়ে বসল যে, খোদাই-করা মূর্তিগুলিতেও রঙ দেওয়ার একটা ঝোঁক এদের চেপে গেল। এতে মূর্তিগুলি বেশ সুন্দরই দেখাত। রঙের স্পর্শে ছবি ও খোদাই করা মূর্তিগুলি যত সুদৃশ্য হতে লাগল ততই ওদের নানা রং ব্যবহার করবার আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠল।

সে যুগের যে-ক'টি বহু-রঙা ছবি ও ভাস্কর্যের সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া গেছে তার সব কয়টিই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও শিল্প চাতুর্যপূর্ণ। এই সব ছবিতে ওরা ব্যবহার করেছে মাত্র চার-পাঁচটি রং—লাল, কালো, পাটকিলে, আর হলদে।

রং ব্যবহার করতে করতে ওরা হঠাৎ আবিষ্কার করলে—কোন একটি বিশেষ রঙের ওপর অন্য রঙের ছায়া দেওয়াও সম্ভবপর এবং এতে ছবিগুলির রূপান্তর সাধন হয়। এই আঙ্গিক আবিষ্কৃত হবার পর শিল্পীরা পুরোনো পন্থা ছেড়ে দিয়ে নতুন আঙ্গিকের ওপরই মনোযোগ দিলে। এই ধরণের কতকগুলি ছবির অস্তিত্ব এখনও আছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, আঁকবার সময় ওরা যেছায়ার রং ব্যবহার করেছিল সেই রং এখনও কিছুমাত্র ফ্যাকাশে হয় নি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগেই মিশরবাসীদের শিল্প খুব উন্নতিলাভ করেছিল। ওদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল অলকরণের (Decoration) দিকে। বহু-রঙা ছবিগুলির শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে ম্যাগ্‌ডালেনীয় শিল্পীদের ছবিগুলি অত্যন্ত সাদাসিদে হলেও মিশরীয় শিল্পীদের ছবির চেয়ে অধিকতর আকর্ষণীয়।

স্পেনের আল্‌টামিরা গুহার ভেতর কয়েকটি বুনোমহিষের ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। এখনও এগুলি প্রায় অক্ষত অবস্থাতেই আছে। কোনটির রং এতটুকু ঝরে পড়ে নি বা ফ্যাকাশে হয় নি।

কঁ-দ-গিয় গুহার গায়ে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর জীব-জন্তুর ছবির সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির প্রায় সব কয়টিই বহু-রঙা।

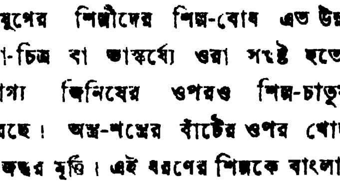
এই যুগের শিল্পীরা মাটির মূর্তি তৈরি করতেও অভ্যস্ত ছিল। ত্যুক্ দো'দ্যুবেয়র (Tuc d'Audoubert) গুহায় কাদার তৈরি দুটি বুনোমহিষের মূর্তি পাওয়া গেছে। এ দুটি দেখতে অনেকটা জীবন্ত মহিষেরই মত। এমন নিপুণ হস্তে এ দুটি তৈরি করা হয়েছে যে হঠাৎ দেখলে জীবন্ত মহিষ বলেই ভ্রম হয়। বর্তমান যুগের শিল্পীরা তাই এগুলিকে মৃৎশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে স্বীকার করেন। এই মূর্তি দুটির কাছে আরও একটি অসম্পূর্ণ মূর্তি দেখা যায়। এখনও এর গায়ে শিল্পীর আঙুলের ছাপ বিদ্যমান। এ যুগের শিল্পীদের যে শিল্পের সব দিকেই সজাগ দৃষ্টি ছিল তা বেশ বোঝা যায়।

ক্যাপ-ব্লাঁ গুহায় প্রায় সাত ফুট লম্বা কয়েকটি চুনে-পাথরের খোদাই-করা ঘোড়ার মূর্তি পাওয়া গেছে। অধ্যাপক অসবর্ণ বলেন, এ গুলি ম্যাগ্‌ডালেনীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এই যুগের শিল্পীদের শিল্প-বোধ এত উন্নত ছিল যে কেবল গুহা-চিত্র বা ভাস্কর্যে ওরা সন্তুষ্ট হতে পারে নি। ব্যবহারযোগ্য জিনিষের ওপরও শিল্প-চাতুর্য্য দেখাতে চেষ্টা করেছে। অস্ত্র-শস্ত্রের বাঁটের ওপর খোদাই করেছে নানা জীব-জন্তুর মূর্তি। এই ধরণের শিল্পকে বাংলায় বলা যেতে পারে চলমান শিল্প। ইংরেজীতে বলে মোবাইল (mobile) বা চ্যাটেল (chattel) আর্ট।

এই যুগের শিল্পীরা পশু-মূর্তি আঁকতে সিদ্ধ-হস্ত ছিল। কখনও কখনও ওরা মাছ, হাঁস, বক, বন-মোরগ প্রভৃতির ছবিও এঁকেছে। এগুলি কিন্তু মোটেই শিল্প-পদবাচ্য নয়।

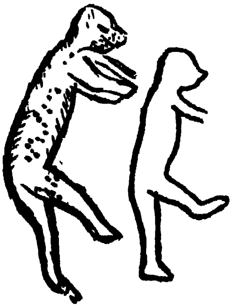
এই সম্পর্কে একটি জিনিষ কিন্তু লক্ষ্য করবার আছে। এই সব শিকারী-শিল্পীরা কোন গাছের ছবি আঁকে নি বা খোদাইও করে নি। মানুষের মূর্তিও ওরা এঁকেছে খুব কম। যে কয়টির সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলি আবার শিল্পসৃষ্টি হিসাবে খুব উঁচু দরের (নং ৭)। মানুষের মূর্তি আঁকবার কায়দাটুকু বোধ হয়



৭ নং চিত্র

ওরা ভাল করে আয়ত্ত করতে পারে নি, অনেক গবেষকের এইরূপ অনুমান। যে সব মানুষের ছবি ওরা এঁকেছে সেগুলির

দৈহিক গঠন মানুষের মত হলেও মুখে পশুর মুখোস পরানো। এগুলির প্রায় সব কয়টিতেই আবার নাচের ভঙ্গী বিদ্যমান। তাই এগুলিকে ব্যঙ্গ-চিত্রের নমুনা হিসাবে ধরে নেওয়াই ভাল (নং ৮)।

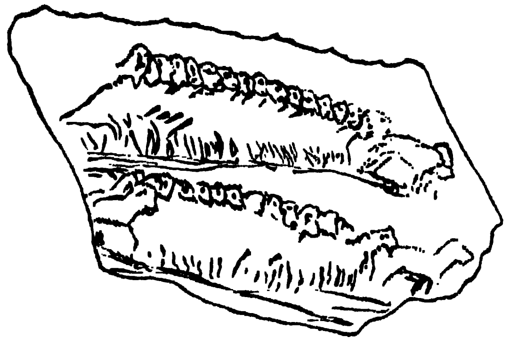


৮ নং চিত্র

সাধারণতঃ দেখা যায়, ম্যাগ্‌ডালেনীয় শিল্পীদের আঁকা যে সব ছবির সন্ধান আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই জীব-জন্তুর ছবি। এর প্রধান কারণ, ওদের মধ্যে প্রচলিত ডাকিনী-বিদ্যা বা যাদু-বিদ্যার অঙ্গ হিসেবে প্রায় সমস্ত শিকারী-শিল্পীকেই পশুর ছবি আঁকায় অভ্যস্ত হতে হ'ত। জীব-জন্তুর মূর্ত্তি ছাড়া আর যা কিছু ওরা এঁকেছে তা খেয়ালী শিল্পীর অবসর বিনোদনের খেলা মাত্র। তাই এই সব ছবি আঁকবার সময় তারা খুব বেশী যত্ন নিত না।

এই যুগের কোন কোন শিল্পী দৃশ্যচিত্রও (landscape) আঁকতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সেগুলি ওরা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে আঁকে নি। যে কয়টি আবিষ্কৃত হয়েছে, মনে হয় সেগুলি শিল্পীর এই ধরণের ছবির প্রাথমিক ছবির নমুনা (নং ৯)।

এই যুগের শিল্পের সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়—প্রায় সব ক'টি জীব-জন্তুর ছবির একদিকেরই প্রতিকৃতি (profile) দেখান হয়েছে। এর থেকে অনুমান করা যায়, ওরা ছবি আঁকবার সময় জীবগুলিকে লক্ষ্য করত এক পাশ থেকে। এইভাবে



৯ নং চিত্র

দেখতে দেখতে ওরা শুধু এক পাশের প্রতিকৃতি আঁকতেই অভ্যস্ত হয়েছিল। সামনে থেকে দেখে চিত্রে রেখাঙ্কিত করবার আঙ্গিকটুকু হয়ত ওদের একেবারে অজানা ছিল।

হাড়ের ওপর মূর্ত্তি খোদাই করার ঝোঁক কেন যে ওদের চেপেছিল তা আলটামিরা গুহার ছবিটি দেখলে কতকটা হয়ত অনুমান করা যেতে পারে। এই গুহার ভিতর হাড়ের ওপর খোদাই করা একটি হরিণের মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। গুহার গায়েও কিন্তু ঠিক সেই রকমের একটি মূর্ত্তি আঁকা আছে। গবেষকরা তাই অনুমান করেন, গুহার বাইরে বসে জীবটিকে লক্ষ্য করবার সময় শিল্পীরা বোধ হয় হাড়ের ওপর তার একটি খসড়া (sketch) করে নিত। পরে গুহার গায়ে আঁকত সেই ছবিরই অনুলিপি। হাড়ের ওপর খোদাই-করা মূর্ত্তিটিকে তখন ব্যবহার করত মডেল হিসেবে।

ম্যাগ্‌ডালেনীয় যুগের অবসানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু এই যুগের শিল্পের অবসান ঘটে। কালক্রমে শিল্পীদের সুক্ষ্ম শিল্প-বোধে ভাটা পড়তে থাকে, ওদের শিল্পের সজীবতাও ম্লান হতে থাকে। তবে এই যুগের যে সব গুহাচিত্র ও ভাস্কর্য্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই যে পৃথিবীর শিল্পকলার ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ হিসেবেই গণ্য হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ঘুম

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

ঐ চেয়ে দেখ তারায় তারায়
তোমার আকাশে স্বপ্ন ছড়ায়,
মেল গো নয়ন তন্দ্রাতুর।
নিশার ঘণ্টা দূরে বেজে যায়
শোন কান পেতে রাতের গান।

চেয়ে দেখ রাত কি যে মোহময়,
জ্যোৎস্না ঝরিছে দূর বনময়।
উধাও সময়—স্বপ্ন মিলায়,
ঘুমের গহনে রজনী যায়,
মোহময় মধু রজনী যায়।

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১০

ফিরে এল শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহে। বাড়িটা শ্রান্তি দূর করবার মত নয়—তবু এই হ'ল তার আশ্রয়।...

দোতলায় উঠবার মুখে একটি উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে আরও কয়েকটি গলা শোনা গেল। বাইরের কেউ এসেছেন।

একটি বড় মোমবাতি জ্বলছে ঘরে—ঘরটা বেশ আলোকিত হয়েছে। মাদুরের ওপর বসে দু' তিন জন যুবক আর শুভা একটা বড় কলাইকরা প্লেট থেকে খাবার তুলে নিয়ে খাচ্ছে—পাশের প্রকাণ্ড শালপাতার ঠোঙাতেও রয়েছে খাবার। খাবার নিয়ে চলছে ছেলেমানুষি—কাড়াকাড়ি—আর চলেছে গল্প আর হাসি। অন্তরঙ্গতার পরিমণ্ডলে বাতিটাকে বেশী উজ্জ্বল মনে হচ্ছে আর ঘরের শোকস্তব্ধ নির্জনতাটা উপলব্ধি হচ্ছে না।

প্রশান্তকে দেখে শুভা কোলাহল করে উঠল, এস কমরেড বসে পড়। তার পর যুবক তিনটির পানে ফিরে ওর পরিচয় সাধন করিয়ে দিলে।

প্রশান্ত আসন গ্রহণ করলে। বাতির আলোয় অত্যন্ত রুক্ষ চেহারার মানুষকেও কিছু কোমল বোধ হয়—একজনকে ওরই মধ্যে সমগোত্রীয় মনে হ'ল প্রশান্তর। আর দু'জন নিতান্ত পথে-বেড়ানো গোছের চেহারা। যেমন উস্কখুস্ক চুল তেমনি আধ ময়লা পাঞ্জাবী গায়ে—মুখ রুক্ষ—আর খাবার খাওয়ার মুহূর্তে চোখ দুটিতে খাদ্য-লালসার চিহ্ন ফুটে রয়েছে। অতীন আর চারু ওদের নাম। কমরেড অতীন—কমরেড চারু—পদবীপুচ্ছ উল্লেখের প্রয়োজন নাই। কমরেড অবন্তীকে মোটের ওপর মন্দ লাগল না। বেশবাসে রুচি আছে—আর মুখে আছে লালিত্য। মাথার একপাশে টেরি কাটা—তেল কিংবা লাইমজুসের কল্যাণে চুলগুলি চকচক করছে।...সে-ই বললে, আরম্ভ কর কমরেড—নইলে হ্যাভ-নটদের দলে পড়বে।

শুভা বললে, এটাকে ভোজও বলতে পার। অবন্তী মীরাট যাচ্ছে কাল চাকরি নিয়ে—তারই খাওয়া।

কোন্ আপিস? জিজ্ঞাসা করলে প্রশান্ত।

মিলিটারি একাউণ্টস্। মাইনেটা মন্দ নয়—আর শুনেছি—অনেক বাঙালীও আছে ওখানে।

অতীন বললে, বাঙালী না থাকলেই বা কি? দিস ওয়ার্লড ইজ আওয়ার হোম।

চারু বললে, পার তো আমাদেরও টেনে নিও। যুদ্ধের পর পৃথিবীটা বেশী অশান্ত হয়ে উঠেছে।

শুভা বললে, হোক অশান্ত—নব বিধান রচনার পক্ষে এই তো সুযোগ। আরে—হাত গুটিয়ে বসে রইলে কেন—নাও। দুখানা সিঙাড়া ও প্রশান্তর হাতে তুলে দিলে।

চারু বললে, সন্ধ্যে বেলায় এই জলখাবার খেয়ে আমি কিন্তু রাত কাটাতে রাজী নই।

শুভা বললে, আজ রান্নাঘর থেকে ছুটি নিয়েছি কমরেড—উনুন জ্বলবে না।

চারু বললে, বেশ তো—তোমাকে ছুটি দেওয়া গেল। কি হে অতীন খিচুড়িটা নামাতে পারবে?

অতীন বললে, কেন পারব না—কিন্তু কমরেড-খিচুড়ি নয়—রীতি মত ঘি চাই।

অবন্তী বললে, জনখিচুড়ি বল। তার চেয়ে ব্যবস্থা যখন করবেই—আর একটু ওঠ। ঘি ভাত—খাঁটি বুর্জোয়া রীতিতে।

একটা হর্ষধ্বনি উঠল। অতীন দু'হাতে চাপড়ালে মেঝে—চারু দিলে করতালি—শুভা চাপড়ালে অবন্তীর পিঠ। প্রশান্তর মুখ ঈষৎ গম্ভীর হ'ল। মনে হ'ল ওরা অত্যন্ত ছেলেমানুষ।

শুভা বক্র দৃষ্টিতে প্রশান্তর পানে চেয়ে বললে,—ঘি ভাত তোমার মনঃপূত নয়—প্রশান্ত?

অঙ্গুতে আর তার অরুচি।

ব্যস—ব্যস—। অতীন আর একটা চাপড় মারলে মেঝেতে।

প্রশান্ত বললে, কিন্তু...রসনাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে কি? যে কোন ছিদ্রপথে—একটু আরাম প্রবেশ করলে—

অবন্তী বললে, পিউরিটানদের মত কথা বলছ কমরেড।

অতীন বললে, যা হাতে আসছে—তাকে না নিয়ে ফাঁক করব এত বড় বোকা আমরা নই। কাল হয়ত পান্তা ভাত জুটবে না—তা বলে আজকের ভোজ ছেড়ে দেব। একটু থেমে বললে—আমরা হচ্ছি জ্ঞানী লোক—বোকাদের টাকায় ভোজ বাগিয়ে বুদ্ধি প্রকাশ করতে ভালবাসি।

শুভা অবন্তীর কাঁধে মৃদু চাপড় মেরে বললে, শুনলে তো—প্রকারান্তরে ও তোমাকে বোকা বলছে।

চারু বললে—কাজের কথা কও। একটা কাগজ আর পেন্সিল দাও—ফর্দটা করে ফেলি চটপট।

অবন্তী বুকপকেট থেকে ছোট নোটবই আর কাউন্টেন বার করে বললে, বল। কলম উদ্যত করে সে বললে, কিন্তু ভাল চাল জোগাড় করবে কোথায়?

চারু বললে, সে ভার আমার। র‍্যাশন হয়েছে বলে কলকাতায় পোলাওয়ের চাল মেলে না—এ কথা ভুলে যাও।

ব্ল্যাকমার্কেট তো! তাতে আমি রাজী নই। অবন্তী নোটবই বন্ধ করলে।

অতীন বললে, আরে—চালের অভাবে পোলাও বন্ধ হবে—বাই নো মীন্‌স্‌। এক জায়গায় আছে চাল—ন্যায্য দামে পাওয়া যাবে। আলো চাল—গন্ধটা নেই।

চারু বললে, ওতেই হবে।

অবন্তী বললে, যা ব্যাপার তাতে রাত্রিতে বাড়ি ফেরা সম্ভব বলে বোধ হয় না।

শুভা বললে, নাই বা ফিরলে।

অতীন বললে, এর আগে যেন কোনদিন এখানে রাত কাটাও নি ? তুমিও কম পিউরিটান নও কমরেড। হাসতে হাসতে সে প্রশান্তর পানে ফিরে চাইলে।

ভাবটা তোমার হয়ে—প্রত্যুত্তরটা আমিই দিলাম।

একটু থেমে বললে, চাকরি করেন তো ?

প্রশান্ত বললে, না।

ও—। মাথা চুলকে সে একবার কাসলে।

চারু বললে, আর একটা খাঁটি পাওনা রইল অতীন, নোটবইয়ে টুকে রাখ।

প্রশান্ত বললে, চাকরি পাই যদি—

পাবেই চাকরি, বাংলাদেশের পাস করা ছেলে চাকরি পাবে না ত পাবে কে শুনি ! চাকরি তুমি পাবেই।

চারুর অদ্ভুত যুক্তিতে প্রশান্ত হেসে ফেললে। বললে, শুধু বাংলার দোষ দিও না। কিন্তু তুমিও ত চাকরি করছ না।

করব বৈকি—কলেজ থেকে বার হই আগে।

কলেজ !—প্রশান্ত একটু অবাক হ'ল। এই ছন্নছাড়া চেহারার ছেলেটি কলেজে পড়ে ?—বিত্তহীন পথে-ঘোরা ছেলে বলেই সে প্রথম দর্শনে একে অবহেলা করেছিল !

কিন্তু কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরিই বা করবে কেন তুমি ? বিস্ময়কে সে এইভাবে প্রকাশ করলে।

চারু বললে, মহাজনদের পন্থাই জানি—তাই বলেছি। হাঁ সুবিধা হলে অন্য কিছুও করতে পারি। তবে সেই অন্য কিছুটা যেহেতু জানি না কি—

ওঠ—ওঠ—যথেষ্ট বথামো হয়েছে—। অতীন তাকে একটি ঠেলা দিলে।

কর্ডটা কিন্তু পাই নি। আর—

অবন্তী পকেট থেকে একখানি দশ টাকার নোট বার করে তার হাতে দিলে।

শুভা বললে, সেরখানেক ঘি আর এলাচ লবঙ্গ কিসমিস সামান্য আনবে। অতীন বাজারটা তুমি করবে আর চাল।

টাকা নিয়ে দু'জনে বার হয়ে গেল।

মিষ্টির ঠোঙাটা হাতে নিয়ে শুভাও দাঁড়ালে। বললে, বুড়িকে মিষ্টি খাইয়ে আসি—বোস কমরেড।

বাতিটা আধাআধি পুড়ে গেছে—আলোর জোর বেড়েছে। দু'জনকে দু'জনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। চুপ করে থাকা অশোভন। দু'জনের চিন্তায় যারা ভিন্নমুখী বলে কয়েকটি মিনিট নীরবে কেটে গেল।

প্রশান্ত ভাবছে—অবন্তী ভাগ্যবান। আজকের রাত্রিটা ওরই নিজস্ব বলতে পারা যায়।—এই নিরানন্দ পুরীতে আনন্দ-সৃষ্টি করেছে সে।

অবন্তী ভাবছে, কালকের কথা। নির্বান্ধব দূরদেশ—একা—অজানা আপিস। চাকরির জগতে এই তার প্রথম প্রবেশ—সহ্য হবে ত !

হঠাৎ সে প্রশান্তকে প্রশ্ন করলে, আপনি চাকরি করেছেন কখনও ?

প্রশান্ত একটু অবাক হ'ল তার প্রশ্নের ধরণে। দু'জনে মুখোমুখি বসেই—কথায় সুর পালটে গেল। আপনি সম্বোধন এই প্রথম অবন্তীর মুখ থেকে বেরুল। এটা কি চাকরি পাওয়ার সুর—ভদ্রতার সুরু ? বললে, হাঁ—তবে বেশী দিন নয়।

অবন্তী বললে, চাকরি করা শক্ত—না চাকরি রাখা শক্ত ?

এ প্রশ্নও অদ্ভুত। প্রশান্ত বললে, আমি দশ-বার দিনের বেশী চাকরি রাখতে পারি নি। তবে সকলের হাত ত সমান নয়।

অবন্তী মাথা নাড়লে। ঠিক বলেছেন আপনি। চাকরিটা বলতে গেলে আমি নিচ্ছি না—সংসারই নেওয়াচ্ছে।

তাই নেওয়ায়। সংসার মানুষের কাছে দাবি করে—পাওনার বেশী—অনেক বেশী। অভিজ্ঞজনের মত প্রশান্ত জবাব দিলে।

আপনার সঙ্গে আমার মিলছে। আপনার ভাইরা নিশ্চয় ইস্কুল কলেজে পড়ে—বোনেরা বিবাহযোগ্যা। বাবা ইন্‌ভ্যালিড—আর মা নেই। ঘরেআছেন বিধবা পিসি আর নিষ্কর্মা কাকা।

প্রশান্ত হেসে বললে, সব না মিলুক কতক মেলে।

তা হলে আমিই বা চাকরি রাখব কি করে ? চিন্তায় ওর ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

তা জানি না। অনেক চাকরির মাইনে হাতে না পেয়েও ভোজের ব্যবস্থা করতে পারেন যখন—কথাটা খোঁচার মত নিজের কানেই বেসুরো বাজতে ও সহসা থেমে গেল।

অবন্তী বললে, পয়সার চেয়ে বন্ধুবান্ধবদের দাবি অগ্রগণ্য নয় কি ? ওদের সঙ্গ থেকে যে আনন্দ আমি পেয়েছি তার মূল্যও অন্তত দেব না !

প্রশান্ত চুপ করে রইল। মনে মনে বললে, পৃথিবীতে সব জিনিসেরই দাম দিতে হয়। সে মূল্য ন্যায্য কিংবা অন্যায্য সে ত আর সাম্যবাদ ঠিক করে দিচ্ছে না। বিশেষ করে এই প্রীতিভোজনের ব্যাপারটায়।

শুভা ফিরে এল। বললে, অবন্তী, মা তোমাকে ডাকছেন।

অবন্তী শুভার সাহায্য না নিয়ে ভিতরে চলে গেল। অন্দর-

মহল তার অপরিচিত নয়—শুভার মায়ের সঙ্গেও স্নেহমধুর একটি সম্বন্ধ যে বিদ্যমান সে অনুমান করা বিচিত্র নয়।

প্রশান্ত বললে, আজ আমি আসি শুভা ?

আসবে ? কোথায় আসবে ? ইস্ তোমার মুখ এত শুকিয়ে গেছে ! শরীর খারাপ হ'ল নাকি ? শুভা এগিয়ে এসে ওর ডান হাতখানি তুলে নিলে।

তুমি নাড়ী দেখতেও জান ?

জানি—অত্যন্ত চঞ্চল তোমার নাড়ি—বায়ুটা বেড়েছে। গম্ভীরভাবে শুভা বললে।

আর কিছু বুঝতে পারছ না ? কোমল স্বরে প্রশান্ত প্রশ্ন করলে।

আরও কিছু ? হুঁ—তাও আছে, কিন্তু সে রোগের নিদান যে শাস্ত্রে আছে—তার ব্যবস্থা আপাতত চলবে না। শুভা অতি কষ্টে হাসি চেপে গম্ভীর ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

প্রশান্তর বুকে প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস নেমে এল—সহসা ও শুভার হাতখানা চেপে ধরে ভীষণ বেগে নিজের দিকে আকর্ষণ করতে করতে বলে উঠল, তুমি জান শুভা—তুমি জান।

শুভা সে বেগের টান সহ্য করতে না পেরে তার বক্ষোলগ্ন হ'ল। কিন্তু সে ক্রোধ প্রকাশ করলে না—বা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য অযথা বলপ্রকাশের অভিনয় করলে না।

কয়েকটি মুহূর্ত। শুভার কপোলের উপর উষ্ণ নিশ্বাস অনুভূত হতেই সে অত্যন্ত সহজ ভাবে প্রশান্তর হাত ছাড়িয়ে সোজা হয়ে বসলে—বিস্রস্ত কাপড়খানা গুছিয়ে নিয়ে বললে, আমি জানি। দেহের দাবিটা অস্বীকার করে লাভ নেই কমরেড কিন্তু মনকে ওর থেকে আলাদা করে রাখাই ভাল।

ওর এই নিরুত্তাপ উত্তরে প্রশান্তর রক্ত কয়েক ডিগ্রি নেমে এল। এত বড় কথা বললে শুভা ! শুদ্ধান্তঃপুরের কোন বাঙালী মেয়েই এ ধরণের কথা উচ্চারণ করতে পারে না। ও স্তম্ভিত হয়ে হাতখানি গুটিয়ে নিলে।

শুভা বুঝলে এই উত্তর প্রশান্তর মনে কি প্রতিক্রিয়া এনেছে। গৃহধর্ম বলতে যা বোঝায়—ও জিনিস তার অভুক্ত নয়।...মন যুক্ত হোক আর নাই হোক, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ দিয়ে সপ্তপদীর মন্ত্র উচ্চারণ—এ সবের মারফৎ যে বাঁধন দেহগত দাবির প্রতিষ্ঠা করে—তারই আবহাওয়ায় প্রশান্ত মানুষ হয়ে উঠেছে। এই সমাজ-বিদ্রোহমূলক কথা ওদের কানে বেসুরো লাগবেই।

কি প্রশান্ত, আমার কথায় দুঃখ পেলে ?

প্রশান্ত ম্লান হাসি হেসে বললে, এ ছাড়া তুমি কি-ই বা বলতে পারতে শুভা।

অভিমানের অন্তর্নিহিত সুরটা শুভা বুঝলে। কিন্তু এ নিয়ে আপাতত তর্ক করে লাভ নেই। অবন্তী ফিরে আসছে।

অবন্তী এসে ওদের বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করলে না; বললে, তোমার মার অদ্ভুত স্নেহ শুভা—বলেন—দূর দেশে নাই বা গেলে।

শুভা মাথা নেড়ে বললে, ঠাকুরমা কি বললেন ?

বললেন—পশ্চিমে নাকি অনেক তীর্থ আছে সেগুলি দেখতে ভুল না ক'র।

শুভা বললে, তুমি বুঝি বললে—তীর্থ দেখবার বয়স আগে হোক—

প্রশান্ত বললে, যাই বল তোমার তীর্থস্থান নিয়ে এমন উপহাস করা ভাল নয়।

ওর স্বরে চমকে উঠল দু'জনে। অবন্তী বললে, দেবদেবীর ওকালতনামা নিশ্চয়ই নেন নি !

না, দেবদেবী না মেনেও এটা মানতে বোধ হয় আপত্তি করবে না যে—দেশভ্রমণে অভিজ্ঞতা বাড়ে—মনের প্রসার হয়।

তেমনি করে দেশভ্রমণ করি আমরা ? কোন তীর্থে কখনও কি যান নি, না মা ঠাকুরমার মুখে সেখানকার গল্প শোনেন নি ? দেবতার নামে এই যে বিরাট ব্যবসা—

শুভা বললে, প্রশান্ত জানে বৈকি—শুধু তর্কের খাতিরে—

প্রশান্ত বেগের সঙ্গে বললে, শুধু তর্কের খাতিরে নয়—তুমি বয়সের কথাটা তুললে—

বয়সের কথাটাই তো আসল। শরীরের সামর্থ্য গেলে তীর্থ করা দুষ্কর হয়ে ওঠে—এটা তোমরা বলে থাক কিন্তু আমি জানি দেহের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে না এলে যথার্থ ধর্ম—অবশ্য ধর্ম বলতে সাধারণে যা বোঝে তারই কথা বলছি—যথার্থ ধর্ম সাধন হয় না। কেন ?—শক্তি প্রবল থাকলে—মন ভক্তির চেয়ে যুক্তিকে মেনে নিতে ভালবাসে—কিন্তু শক্তিহীনের অবলম্বন যে অদৃশ্য শক্তি সে অস্বীকার করি কি ক'রে। সুতরাং পলিত কেশ, গলিত দন্ত, পরনির্ভরশীল বুড়োবুড়ীদের ওই তো হ'ল একমাত্র আশ্রয়।

অবন্তী হেসে উঠে বললে, তোমার তর্কে যুক্তি আছে—কিন্তু যুক্তির চেয়েও বেশী আছে ঝাঁজ।

প্রশান্ত বললে, ধর্মকে অস্বীকার কর—

অস্বীকার করলাম কোথায় ! শুভা হাসিমুখে বললে, ধর্ম—আর ধর্মের আচার আচরণ দুটিকে মিশিয়ে গোল পাকাই নি। সব মানুষের সমান অধিকার—এও কি বিশেষ একটা ধর্ম নয় ! আমরা ধর্মের বিচার করি তার pragmatic value দিয়ে।

অবন্তী বললে, বাস—ব্যস আর নয়। উনুনটায় এই বেলা কিছু কয়লা দিয়ে দাও—

শুভা বললে, আজ আমার ছুটি বলি নি !

বলেছ—কিন্তু রান্নার উদ্যোগ করে দেবে না—এ ত বল নি !

অতীন ও চারু শুধু ঘি-ভাতের জিনিষপত্র নিয়ে ফিরে এল না—তার সঙ্গে এল দু'জন মহিলা আর তিন জন পুরুষ বন্ধু।

হৈ-চৈ রীতিমত হ'ল—রান্নাও করলে সবাই মিলে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে রাত্রি দুটো বেজে গেল। তারপর সেই ঘরেই মাদুর, চট, সতরঞ্চি বিছিয়ে ঢালা বিছানা হ'ল। স্ত্রী-পুরুষ শুয়ে পড়ল পাশাপাশি। শুয়ে শুয়ে খানিক চলল গল্প—তর্ক—পুঁজিবাদীদের নিয়ে—আচার প্রথা নিয়ে হাসিঠাট্টা—তারপর একে একে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

প্রশান্তর চোখে ঘুম এল না। এক ঘর লোকের নিশ্বাস পতনের দরুন ঘরের বায়ুস্তর উষ্ণ হয়ে উঠেছে। এ রকম অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম। যদিও ঘরে আলো নেই তবু সে কল্পনায় অনেক কিছু প্রত্যক্ষ করছে। নিদ্রার অসতর্ক মুহূর্তে—মানুষ কত অসহায়—। আলোর শাসন কোন কোন বৃত্তির পক্ষে পরম কল্যাণকর—অন্ধকারের আশ্রয়ে তারা নিরঙ্কুশ। ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো মস্তিষ্কের রক্ত চালনা স্বাভাবিক নিয়মে ঘটে—কিন্তু মাথার রক্তে যদি কামনার আগুন জ্বলে ঘুম আসবে কোথা থেকে। শুভার সব কথা তখন মুছে গেছে—শুধু জাগছে ওই কথাটি :

দেহের দাবিটা অস্বীকার করে লাভ নেই কমরেড। দেহের দাবি—শুভাকে সে ভালবেসেছে? এ ভালবাসার কি অর্থ? সে অর্থ কি ওর কথায় পরিস্ফুট হয় নি? তবু প্রশ্ন জাগে—মানুষের মন কিছু জলে-ডোবা পদ্মপাতা নয়—কিংবা হাঁসের পালকও নয়। আগুন নিয়ে খেলতে গেলে হাত পুড়বেই—অথচ আগুন নিয়ে খেলতে না গেলেও মনের অতৃপ্তি ঘোচে না। মন না জড়িয়ে পড়লে সে এতদূরে এল কেন? আর কোন মেয়েকে না চেয়ে শুভাকেই বা কামনা করে কেন? অথচ শুভা—ব্যক্তিগত সম্পত্তি সঞ্চয়ের বিরোধী। মানুষ কি সম্পত্তি? হাঁ—ওরা বলবে ভালবেসে যাকে আপন করে নিতে চাও তার স্বাধীনতা হরণ করবার জন্যই তোমার আবেগ—উচ্ছ্বাস—ত্যাগ এ সবের কলকৌশল। দুটি স্বাধীন মানুষ—তাদের স্বাধীন মত নিয়ে মিলতে পারে শুধু সাময়িক ভাবে কতকগুলি সুবিধা—সুবিধা বলতে আপত্তি হয়—সহযোগিতা বলতে পার—এই নিয়ে তারা পরস্পরের সহযোগিতা করবে—একটি মহৎ প্রচেষ্টা অর্থাৎ ভালবাসা থাকবে এই মিলনের মূলে। কিন্তু কায়ার সামীপ্য থেকে মনের গভীরে যদি প্রসারিত হয় সেই মহৎ প্রচেষ্টা অর্থাৎ ভালবাসা—তা হলেই কি বলতে পারবে তোমার স্বাধীন সত্তাকে অপহরণ করবার কৌশল। মানুষকে সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করে পেতে গেলেই যত আপত্তি, অথচ—মানুষের মুখ্য বৃত্তি এই একান্ত করে পাওয়ার সাধনাতেই সারা জীবন উৎসর্গ করে দিয়ে ধন্য হচ্ছে। পুঁজি-পতিরা নিজেদের সুযোগসুবিধা কায়েমি করবার জন্য যেমন সৃষ্টি করেছে অভিমানবীয় সত্তা—কিনা ঈশ্বর—তেমনি দেহকে আর মনকে এক সঙ্গে কিনে নেবার জন্য সঞ্চারিত করেছে এই আবেগ অর্থাৎ ভালবাসা। ঈশ্বরের সঙ্গে স্বর্গের যোগাযোগে এই বৃত্তিকেও সে আখ্যা দিয়েছে স্বর্গীয় সম্পদ। সমাজ সম-ম্বয়ের মূলে ঈশ্বরকে অস্বীকার করতেই হবে, কেননা ধনিকতা-বাদের যে ক'টি দৃঢ় স্তম্ভ ভূমিসাৎ না করলে সমভূমিতে দাঁড়িয়ে হাতে হাত মেলানো যাবে না—এটি তার অন্যতম। প্রধানতমও বলা যায়। কিন্তু ধনিকতাবাদ থাক—আজ রাত্রিতে কিছুতেই কি ঘুম আসবে না। কিসের উত্তাপে মস্তিষ্কের রক্ত প্রবাহ নিদ্রার আলস্যে শীতল হচ্ছে না? কেন এ উত্তেজনা?

টং টং করে তিনটে বাজল—সাড়ে তিনটে—চারটে। প্রশান্ত বিছানায় উঠে বসল। নিদ্রিত নরনারীর নিশ্বাসে কেমন একটা গন্ধ ঘরের বাতাসকে করেছে ভারি। অত্যন্ত গাঢ় হয়ে উঠছে চিন্তা—একমুখীন চিন্তা, উগ্র—কামনা-কলুষিত চিন্তা। দেহলগ্ন শুভার দেহ-আস্বাদ-লোলুপ চঞ্চল রক্ত কণিকায় তরল আগুন জ্বেলে দিয়েছিল যে মুহূর্ত—তা যেন নতুন আবেগে ফিরে এল এই নিদ্রাহীন প্রহরে। নিজেকে সম্বরণ করা অত্যন্ত কঠিন।

গলা শুকিয়ে গেছে, জল তৃষ্ণায় ছাতি ফাটছে। একটু জল চাই—আলোটা জ্বালবে কি? না শুভাকে ডাকবে?

তখনই মনে হ'ল এসবের দরকার হবে না। জলের কুঁজোটা কোণের দিকেই আছে—যেদিকে সে শুয়ে আছে সেই কোণের দিকে। একটু হাত বাড়ালেই কুঁজোটা হাতে ঠেকবে। কিন্তু শুভাও বেশী দূরে নেই। এক, দুই, তিন। ঠিক দোরের সামনে। শিয়রের দিকে বালিশের নিশানা ধরে অনায়াসে সে ওখানেও পৌঁছতে পারে। এক, দুই, তিন। ওরা ঘুমুচ্ছে নিশ্চিন্তে—নির্ভয়ে। গভীর রাত্রি ওদের মস্তিষ্ক-কোষে ঘুমের স্নিগ্ধতা ভরে দিয়েছে।

বিছানা থেকে এগিয়ে গেল প্রশান্ত। এক, দুই, না কুঁজোটাই ঠেকল হাতে। গ্লাসটাও রয়েছে কুঁজোর মুখে। গ্লাস ভরে সে জল নিলে—ঢক্ ঢক্ করে পান করলে আকণ্ঠ। সেই জলে হাত ডুবিয়ে কপালে, গালে, বুকে, ঘাড়ে, পায়ের পাতায় ও হাতের চেটোয় ভাল করে লেপে লেপে দিলে। তারপর বিছানায় শুয়ে কল্পনায় টেনে আনলে নিজের গ্রাম-খানিকে। সেই সঙ্গে ভেসে এল অশ্রুসজল একখানি মুখ—সেই করুণাস্নিগ্ধ মুখখানি আর কারও নয়—তার মায়ের।

এতক্ষণে প্রশান্ত সত্য সত্যই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল পরিপূর্ণ নিদ্রার শেষে। এ ঘরে সময়ের পরি-মাণ করা যায় না—অন্ধকার অনেকখানি তরল হয়েছে এই মাত্র। রাত্রি নেই বেশ বোঝা যায়। প্রশান্ত উঠে বসল। চারদিকে চেয়ে দেখলে—ঘরে কেউ নেই। তবে কি বেলা অনেকখানি হয়েছে? অতঃপর সে কি করবে? এ বাড়িতে এই তার প্রথম রাত্রি যাপন। কোথায় কলতলা—কোথায় শৌচাগার কিছুই তার জানা নেই। আশ্চর্য—তাকে কিছু না জানিয়েই ওরা চলে গেল।

শরীরে আলস্য লেগে রয়েছে—আরও খানিকটা ঘুম দি.. মন্দ হয় না। কিন্তু এ বাড়ি থেকে আজই বিদায় নিতে হবে। এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর নয়। মনুষ্যত্বের দাবি জানাতে গিয়ে মানুষ হারিয়ে যায় এর অন্ধকারে। অন্ধকারে বসে আলোকের সাধনা!

নড়বড়ে দরজায় শব্দ হ'ল—কে এল বুঝি? চোখ চাইবার আগেই সে ডাকলে, ঘুম ভাঙল প্রশান্ত?

তড়াক করে সে বিছানায় সোজা হয়ে বসল। বললে, কোথায় গেছলে সব?

অবন্তীকে তুলে দিতে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়েছিলাম প্রথমে—তারপর—

হাওড়া ষ্টেশনে? কিন্তু ক্যালকাটা-দিল্লী মেল তো—

ও পাটনায় হল্ট করবে—পাঞ্জাব এক্সপ্রেসে গেল। একটু হেসে বললে, সারারাত জাগলে বেলার পরিমাণ ঠিক রাখা যায় কি কমরেড?

কে তোমায় বলছে আমি সারারাত জেগেছি?

কথাটা ভুল বলেছি কি?

ভাগ্যে ঘরটা সব সময়েই আলো-আঁধারি! মুখের ভাব গোপন করতে মুখ ফিরিয়ে নেবার দরকার হয় না। প্রশান্ত বললে, তা হলে তুমিও ঘুমোও নি শুভা?

কেন ঘুমোব না—যথেষ্ট ঘুমিয়েছি।

তবে কি করে বুঝলে আর একজন জেগে রয়েছে?

অত্যন্ত সোজা জিনিস। ট্রাইনাড়া হলে শীগ্‌গির ঘুম আসে না।

আর সকলের এল কি করে!

ওদের অভ্যাস আছে। তা ছাড়া কালই প্রথম রাত কাটিয়ে গেল না এ বাড়িতে।

প্রশান্ত বললে, এ রকম করে হল্লোড় করে লাভ কি! এতে আসল কাজের ক্ষতি হয় না?

কিছুমাত্র না। যে কাজ আমরা হাতে নিয়েছি—তাতে মানুষে মানুষে যত হৃদ্যতা বাড়ে ততই কাজটা সহজ হয়ে আসে। নিজস্ব একটা বাড়ি—নিজস্ব একখানি ঘর—নিজের রুচিমত শয্যা—এর মোহ না কাটলে জগৎকে টেনে নিতে পারব কেন নিজের মধ্যে!

জগৎকে কোন দিনই এ ভাবে টেনে নেওয়া যাবে না। মানুষের প্রবৃত্তির ওপর জুলুম খাটাতে গেলে—

শুভা বললে, জুলুম এর কোন্‌খানে দেখলে? একটি ছেলেকে জন্মাবধি বিলেতে রাখলে সে যদি কথায় আচারে ব্যবহারে সায়েব হয়ে ওঠে—তার ভারতীয় রক্ত ধারা বিজাতীয় প্রভাবে ভারতীয় সংস্কারমুক্ত হয়, তবে—ঘর বাড়িয়ে নেবার মন্ত্রটি সহজাত প্রবৃত্তির মত করে কেন গড়ে তোলা যাবে না! মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বলছ যাকে—সে প্রতিবেশ-অর্জিত কতকগুলি সংস্কার মাত্র। বুনিয়াদি শিক্ষার দ্বারা এ সংস্কার দূর করা অত্যন্ত সহজ।

প্রশান্ত বললে, তেমনি যাদের এই রকম বুনিয়াদি শিক্ষার অভাব তাদের পক্ষে তা অর্জন করা শক্ত নয় কি?

কেন শক্ত! অভ্যাস—চেষ্টা—বলতে পার সাধনা—এগুলি আছে কি করতে! আমাদের ত্যাগের দ্বারা—সঙ্ঘের দ্বারা গড়ে তুলব এই রকম জগৎ। প্রথমটা সাম্য আনতে অনেক বাধা বাইরে থেকে আর ভেতর থেকে আসবে বইকি—তবু সব বাধার শেষ আছে এ-ও আমরা জানি।

প্রশান্ত কথা কইলে না। সে ভাবতে লাগল। এখনও সময় আছে। ঘরকে সে ভুলতে পারছে না। নীতিকলুষিত আবহাওয়া- হাঁ বার বার তার মনে হচ্ছে এ আবহাওয়ায় নৈতিক পবিত্রতা নেই। কাল রাত্রিতে নিজেকে সে স্পষ্ট চিনতে পেরেছে—সর্বমানবীয় কল্যাণবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নয় নিজেরই কামনাকে পরিতৃপ্ত করতে সে এই পথে পা দিয়েছে। বাইরে স্বার্থত্যাগের বড়াই করে লাভ কি—মনের অসামঞ্জস্য বার বার তাকে পীড়ন করছে।

শুভা বললে, ওঠ শিশু মুখ ধোও—

রহস্যচ্ছলে বললেও সে স্বীকার করলে, সে শিশু। ছেলেরা চাঁদের লোভে আকাশে আঙুল তুলে বায়না ধরে—আর যৌবনের ধর্মবশত সে এসেছে এই পরিমণ্ডলে। শুভাকে সরিয়ে নিলে তার ত্যাগের কোন মূল্যই থাকবে না।

সত্যিই সে কি অর্দ্ধেক পথ এগিয়েছে? পিছু হটে যাত্রা আরম্ভ করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়!

১১

বিরাজমোহিনী মলয়কে একান্তে ডেকে বললেন, তুমি আমার ঘরের ছেলের মত- হাঁ বাবা, সত্যি করে বল ত—প্রশান্ত কি সত্যিই বয়ে গেছে?

তাঁর অশ্রু-গদগদ কণ্ঠস্বরে মলয় বেদনা বোধ করলে। মিথ্যা করে সান্ত্বনা দিতে তার মন সরল না। বললে, কাকিমা, সত্যি কথা বলব রাগ করবেন না। কাকে আপনারা বয়ে যাওয়া বলেন? যে ছেলে চাকরি করতে চায় না—দেশের কাজে জেলখানায় যায়—যন্ত্রণায় ভোগে—

বিরাজমোহিনী বললেন, লেখাপড়া জানি না বলে কি ভালমন্দও বুঝতে পারি না বাবা! ও সব কাজ করে অখ্যাতি পেয়েছে কেউ সে কথা তো জানি না। অবশ্য—যে ছেলে সংসার-ধর্ম কি উপার্জন করে না তাকে দুনিয়ার বার বলে থাকি আর সেই ছেলের জন্যই মায়ের মন পোড়ে বেশি।

মলয় বললে, তবে কি ভেবে আপনি বললেন ও কথা?

বিরাজমোহিনী মনে মনে কি যেন হিসাব করলেন। কথাটা বলা যুক্তিযুক্ত কিনা হয়তো ভাবলেন মুহূর্তকাল—কিন্তু মনের সন্দেহ ও বেদনাকে মুক্ত করে না দিলেও তো

নিস্তার নাই। অবশেষে বললেন, মায়ের মনের সাধ-আহ্লাদের কথা তো বুঝতে পার বাবা, একটি মনের মত টুকটুকে বউ পেলে সংসারটা তাদের ভরে ওঠে—

মলয় বললে, টুকটুকে বউ হলেই তো মনের মত হয় না কাকিমা।

তা না হোক—ছেলে সুখী হলেই আর সমাজে নিন্দে না হলেই আমাদের শান্তি। একটু থেমে বললেন, শুনলাম একটি মেয়ের সঙ্গে প্রশান্তর ভাব হয়েছে। আর মেয়েটি নাকি আমাদের স্বজাতি নয়।

ওঁর প্রকৃত ব্যথা বুঝতে পেরেও মলয় বললে, নাইবা হ'ল স্বজাতি কাকীমা—প্রশান্ত যদি এতে সুখী হয়—

সমাজ সে মেয়ের মর্য্যাদা দেবে কেন বাবা। এখনও তো খ্রীষ্টান হই নি আমরা।

মলয় বললে, আপনি ভাববেন না কাকীমা—হয়ত—এমনটা না-ও ঘটতে পারে। কিন্তু যদি ঘটেই—তো একটি ছেলে আপনার—তার জন্ত সমাজ ছাড়তে পারবেন না?

না বাবা—আমাকেও পাঁচ জন আত্মীয়-কুটুম্ব নিয়ে ঘর করতে হয়। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে—ছোট মেয়েটিকেও পার করতে হবে। আমি সমাজে চিরকাল মাথা উঁচু করে এসে কিসের জন্ত হেনস্থা সইব সকলের বল তো! শেষের দিকে স্বরে তাঁর দৃঢ়তা ফুটে উঠল।

মলয় বুঝলে উনি মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। মায়ের মনে অত যুক্তির ঠাঁই নেই—পুরুষরা কালধর্ম্মের স্রোতে পা রেখেও যখন পরিবর্ত্তনকে সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়ে মানতে পারেন না—যুক্তির সারবত্তা করেন না স্বীকার—আচার-পদ্ধতিকে প্রকৃত ধর্ম্ম বলে সামাজিক বিদ্রোহকে বলেন অনাচার—সে অনাচারের অনুষ্ঠাতাদের গালিগালাজ করেন নির্ম্মমভাবে ভদ্রতালেশহীন হয়ে—তখন অন্তঃপুরের বিধিতে ও সমাজের বিধানে অভ্যস্ত মেয়েদের কাছ থেকে কি বা প্রত্যাশা করতে পারা যায়!

বিরাজমোহিনী পুনরায় অনুনয়ভরা কণ্ঠে বলিলেন, সত্যি করে বল তো বাবা—সে কি সেই মেয়েটিকেই বিয়ে করবে?

মলয় বললে, আমি বিশেষ কিছু জানি না কাকীমা, খোঁজ নেব।

শুধু খোঁজ নিলে হবে না, এগিয়ে এসে তিনি মলয়ের দুটি হাত চেপে ধরলেন, এর উপায় তোমায় করতে হবে।

উপায়! কি উপায় করব আমি? মূঢ়ের মত প্রশ্ন করলে মলয়।

যাতে এ বিয়ে না হয়—

মাপ করবেন কাকীমা, তাদের মধ্যে যদি ভালবাসা হয়ে থাকে…না, না, আমায় মাপ করবেন।

বিরাজমোহিনী খানিকটা অভিভূতের মত চেয়ে রইলেন মলয়ের পানে। তারপর মনে হ'ল—ও তো হেমলতারই ছেলে। নিকট প্রতিবেশিনী—যারা সর্ব্বদাই অন্বেষণ করছে প্রতিবেশীর ছিদ্র তাদের সততায় বিশ্বাস রাখা কঠিন—অত্যন্ত কঠিন। প্রতিবেশীরা ভাল—একথা পাঁচীলের পিঠে ঘর তুলে স্বীকার করা কঠিনই তো।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, তা চলবে কেন বাবা, তুমি তো অজাতের মেয়ে ঘরে আন নি—সমাজে কোন নিন্দেও হয় নি তোমাদের—

মলয় দুয়োরের কাছ থেকে ফিরে এল। নীচু গলায় বললে, আপনি দুঃখু পাবেন জানলে একথা কখনই বলতাম না কাকীমা। কিন্তু এ-ও জেনে রাখবেন—প্রশান্তকে যদি আমাদের সমাজ ঠাঁই না দেয়—আমার ঘরে ওদের জায়গা আমি রেখে দেব।

বিরাজমোহিনী এ কথায় সান্ত্বনা লাভ দূরে থাক—রীতিমত রুষ্ট হয়ে উঠলেন। মলয় তাড়াতাড়ি তাঁর সামনে থেকে সরে না গেলে ক্রোধের বশে তাকে কটু-কাটব্য করা তাঁর পক্ষে একটুও অসম্ভব ছিল না। দ্রুতপদে তিনি দুর্গামোহনের শোবার ঘরে এলেন।

কিন্তু ওই বার্দ্ধক্য-পীড়িত শয্যাশায়ী মানুষটিকে তিনি কি বলতে পারেন। তাঁর মনে যে বেদনা—সে কি ওঁর মনেও গুরুভার হয়ে নেই। উনি বার বার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ঘোষণা করে-ছেন, প্রশান্ত তাঁর ছেলে নয়—সে যদি অসবর্ণের মেয়ের পাণি-গ্রহণ করে—ও ঘরে তার স্থান হবে না—এক কাণাকড়িও তাকে দেবেন না উনি। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য-উদাসীন ছেলের প্রতি কিসের বা মমতা!

দুর্গামোহন মাথা তুলে বললেন…এখন তো ওষুধ খাবার সময় হয় নি—

না—এমনি দেখতে এলাম ঘুমিয়েছ কি না?

দুর্গামোহন একদৃষ্টে তাঁর পানে চেয়ে বললেন, কাঁদছিলে বুঝি?

বিরাজমোহিনী ত্রস্তে চোখের কোলে তর্জ্জনীটা বুলিয়ে নিয়ে হাসলেন। বললেন, তুমি শীগ্‌গির করে সেরে ওঠ দেখি—

আমি সেরে উঠলেও তোমার চোখের জল শুকোবে না—শুকোবে না—শুকোবে না। ছেলেমানুষের মত তিনি হেসে উঠলেন।

বিরাজমোহিনীর বুকখানা কেঁপে উঠল। দুর্গামোহনের মাথার গোলমাল হয় নি তো! সত্যিই তাঁর চোখের জল শুকিয়ে গেল। বেদনাকে ঢাকা দিতে দুশ্চিন্তার মত বস্তু আর নেই।

শিয়রের টুলের ওপর বসে বললেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?

তা দাও। তবে কিছুতেই কিছু হবার নয়। বলে একটু হেসে বিরাজমোহিনীর হাতখানি টেনে এনে বুকের ওপর রাখলেন।

বিরাজমোহিনী বললেন, আজও কি বুকে তেল মালিশ করে দেব ?

না—হাতখানা রাখ। তাঁর হাতখানি চেপে ধরলেন।

আর কোন কথা হ'ল না—ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে দুটি অন্তরের মর্মব্যথা প্রকাশ করতে লাগল।

১২

মলয় বাড়ি এসে দেখল—হুলস্থূল ব্যাপার লেগে গেছে। মা পা ছড়িয়ে বসে কাঁদছেন, দোতলায় ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি চলছে। বড় বউয়ের ফিট্ হয়েছে। খবরটা কাঁদতে কাঁদতে মা-ই দিলেন।

এর বেশী কিছু জানতে হলে সুচিত্রা ছাড়া গতি নেই। ও এতক্ষণ বড় বউয়ের শুশ্রূষায় লেগে রয়েছে। ছেলেরা গোলমাল করছে—হয়ত বা ভিড়ও জমিয়েছে।

উপরে উঠে দেখে—সত্যিই ব্যাপারটি কিছু গুরুতর। একটি ঘটি কাত হয়ে বারান্দার রেলিঙে ঠেকেছে—জল গড়াচ্ছে সারা মেঝেয়। পাখা খান দুই এসেছে—আর জলে ভিজে সপ সপ করছে। রোগীর সারা দেহে আক্ষেপ তো আছেই—মাথার চুল আর বিশৃঙ্খল পরিবেশ থেকে জল পড়ছে গড়িয়ে। দশ বছরের ভাইপোটা শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে পাখা নাড়ছে। হাওয়াটা রোগীর মাথায় লাগছে না—মেঝেয় লাগছে। দাঁতে দাঁত লেগেছে রোগীর। একটি মাঝারি গোছের চাবি অতি কষ্টে সুচিত্রা দাঁতের মাঝখানে বসাতে পেরেছে। এখন সে হাঁটু গেড়ে বসে রোগীর হাতের মুঠো খুলে দিচ্ছে—আর চাবিটা যাতে দাঁতের চাপ থেকে আলগা হয়ে না পড়ে সেই চেষ্টা করছে।

মলয় বললে, হঠাৎ এ রকম হ'ল কেন ?

বলছি। তুমি ভাল করে হাওয়া লাগাও তো মাথায়।

কেন···স্মেলিং সল্টের শিশিটা কোথায় গেল ?

বড়দির হার্ট খুব উইক—এ্যামোনিয়া চলবে না। ব্লটিং পুড়িয়ে ধোঁয়া দিতেও পারতাম—সাহস হ'ল না।

মেয়েটির হাত থেকে পাখাখানি নিয়ে মলয় বাতাস করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আঁ-আঁ—করে রোগী পাশ ফিরল। হাতের মুঠি নরম বোধ হ'ল।

সুচিত্রা বললে- তুমি ঘরে গিয়ে বোস—এখনি জ্ঞান হবে বড়দির।

···বাড়ির এই আবহাওয়া কোন কালেই ভাল লাগে না মলয়ের। বহু পুরাতন জটিল রোগের তীব্রতা না থাকলেও —নিত্য নূতন উপসর্গে যেমন বিরক্তি জন্মায়—তেমনি মনে হয় বাড়িটাকে। কয়েক বিঘা জমির মালিক হয়ে—নানা প্রকারের অশান্তি বাসা বেঁধেছে এখানে। বাপ ঠাকুরদাদারা চেয়েছিলেন—উপার্জ্জনের অর্থে ভাবী বংশধরদের খাওয়া-পরার সুব্যবস্থা করতে। লক্ষ্মী যে চঞ্চলা—যাঁদের জমি আছে—তাঁরা এ প্রবাদবাক্যের মর্ম্ম বোঝেন। আজ জমির স্বত্ব থেকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না—জমির হাঙ্গামা পোহাতে হয় শুধু।··· চাষার হাল বলদ দিয়ে জমি চাষ দেয়—ভাগ আধাআধি। কিন্তু সেই আধাআধি ভাগের সিকিও ঘরে ওঠে না যথাসময়ে তদারক না করলে। খাজনা মিটাবার দায় তাদের—জমিতে সার দেবার খরচ সেও তাদের—আবার কোন্ জমিতে কি ফসল দেওয়া কর্ত্তব্য এ নির্দেশ দিতে পারলেও ভাল হয়। শ্রাবণে বা ভাদ্রে ধান রোয়া শেষ হলেই চাষের কর্ত্তব্য শেষ হবে না। কার্ত্তিকে একবার জমি দেখা দরকার—কি ফসল হ'ল। তার পর পৌষে দিন পনর ধরে সেই ফসল কাটা—ভাগ বুঝে নেওয়া—খড় বিক্রী করা—ধান গোলাজাত করা—গেল বার যাদের ধান ধার দেওয়া হয়েছে—তাদের কাছ থেকে বুঝে নেওয়া—এ সব বহু জটিল ব্যাপারের অন্তর্গত। বার দুই মলয়কে এই সব তদারক করবার জন্য যেতে হয়েছিল। বড়দা থাকতে তিনি পোয়াতেন এসব হাঙ্গামা। তাঁর অবর্ত্তমানে মেজদা প্রতি বছরে এই সময়টি এক মাস করে ছুটি নিতেন। কিন্তু একবার বিশেষ জরুরি কাজ পড়াতে অফিসার মেজদাদাকে ছুটি দেয় নি—আর একবার উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেই দু'বারের অভিজ্ঞতা—সারাজীবনে ভুলতে পারবে না মলয়। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা—বা মাঠে মাঠে ভরা সোনার ধান—মনে হয়েছিল কবিদের অত্যুক্তি। যে কবির জমি ছিল না—পাকা ধান ভরা মাঠের শোভা দেখে মুগ্ধ হওয়া তাঁরই মানাতো। কিন্তু সরল চাষীদের কাছে ভাগ বুঝে নেওয়া ও হিসাব মিল করা—ধান কাটা—আছড়ানো—কড়তা বাদ—সুদের হিসাব—পায়ে ধরাধরি···ফাঁকি দেবার কচকচি···এ সব বাস্তব ব্যাপারকে লক্ষ্মীর আবাহন বলে ভুল করবেন না কেউ। চাষারা সরল দুঃখী আর নির্ব্বোধও বটে—তবে পয়সার দিক দিয়ে তারা শক্ত। একটি পয়সার জন্য তারা অজস্র কথা বানিয়ে বলবে—রাতারাতি মাঠের মাড়াই ধান সরিয়ে ফেলবে—না দেখলে ত কথাই নেই। সব চাষার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না—তবে মলয় যাদের সংস্পর্শে এসেছে তাদের কথা তোলা শক্ত। হয়তো অনেক দিনের অত্যাচার সয়ে—এই সংস্কার তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে যে যারা হিসেব বুঝে নিতে আসে তাদের সঙ্গে শঠতা না করলে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবেই। হয়তো পাইকদের হাতে লাঞ্ছনা সয়ে—নায়েবের ধমক ও চোখ রাঙানী পেয়ে স্বভাবটা ওদের অমনিই দাঁড়িয়েছে। পীড়ন শুধু দেহকেই পঙ্গু করে না—মনকে সত্য থেকে বিচ্যুত করে—নীতি থেকে করে ভ্রষ্ট। ওরা যা হতে পারত তা হতে পারে নি—লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা রয়েছে এর মূলে। সেইজন্য প্রভু জাতীয় যে কোন লোককে ঠকাতে ওরা সিদ্ধহস্ত। এই বঞ্চনা যে ঘৃণার নামান্তর নয় তাই বা কে বলবে ?

বহুদিন থেকে একটা কথা কাণাকাণি হচ্ছে। চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত বাকি থাকবে না। মধ্যস্বত্বভোগীদের সুবিধাটুকুও আইন করে কেড়ে নেওয়া হবে। যে নিজের হাতে হাল বলদ দিয়ে যতটুকু জমি চষতে পারবে—তারই স্বত্বে সে হবে স্বত্ববান। এতে করে প্রত্যেক রায়তের হাতে জমি আসলে—ঋণের দায়ে মহাজনের কাছে তাদের মাথা বিকিয়ে থাকবে না। সরকার বাহাদুর আর প্রজা—মাঝখানে হিস্যাদার কেউ থাকবে না। হোক না আইন—মলয় এতে অমঙ্গল কিছু দেখতে পায় না। লোকে বলে বটে—লক্ষ্মী বসতি করেন তারই ঘরে—যার দু'বিঘে আছে। গত মহা দুর্ভিক্ষে সে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। যাদের জমি ছিল—তারা পেট ভরে খেয়েছে আর সিন্দুক ভরে জমিয়েছে টাকা। সম্পন্ন চাষা দশ টাকা দামের শাড়ি কিনে গৃহিণীকে উপহার দিয়েছে, নিজের জন্য কিনেছে সাইকেল। যারা জনমজুরি করে খায় দু' এক বিঘে জমিতে ভাঙা লাঙল ও রুগ্ন বলদ খেদিয়ে চাষ দেয়—তারাই মরেছে দুর্ভিক্ষে। এই ব্যবস্থা হলে—সামান্য জমির মালিকরা কিংবা যাদের জমি নেই তারা অন্তত খেয়ে পরে বাঁচবে। মধ্যস্বত্বধারেরা যাবে কোথায়? জমির উপস্বত্ব যাদের উপরি আয়ের সামিল—তারা করুক না যা খুশী। নিজের হাতে লাঙল ধরতে পারে জমি থাকবে হাতে—না পারে যার শ্রম—তারই ঘরে বিতরিত হোক কমলার কৃপা। এতে দুঃখ করবার কি আছে!

সুচিত্রা ঘরে এসে বললে, একবার নন্ত-দাদুর কাছে যাও তো। তিনি নাকি বটু ঠাকুরের কি খবর এনেছেন।

দাদার খবর! কে বললে তোমাদের?

কেন—পটার মা এই মাত্র বলে গেলেন মাকে। তা তিনি যদি খবরটা চুপি চুপি বলেন তো বড়দির কিছু হয় না।

কি বললে পটার মা?

নাকি—মথুরা না বৃন্দাবন কোথায় ট্রেনে এক সাধুর সঙ্গে ওঁদের দেখা হয়। সাধু ওঁদের গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করে—আরও অনেক কথা শুধায়। এক সময়ে নাকি বলেও ফেলে-ছিলেন—তে-মাথা রাস্তায় যে বড় বটগাছটা আছে সেটা এখনও আছে—না কেটে ফেলা হয়েছে? যেমন বলা নন্ত-দাদু চেপে ধরেন—তিনি জানলেন কি করে তে-মাথা রাস্তায় বটগাছ আছে। সাধু একটু হেসে বলেন, ও গ্রামে আমি একবার গিয়েছি। কবে? কেন? কত দিন ছিলেন সেখানে? এই সব জিজ্ঞাসায় সাধুকে জেরবার করে ফেলবার পর নন্ত দাদু বুঝতে পারলেন—এক বার নয়—হয়তো অনেক বার উনি ওখানে গেছেন আর অনেক দিন ছিলেনও ওখানে। কোন জংশনে গাড়ী বদল হতেই সাধুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়—কিন্তু তাঁর আশ্রমের ঠিকানা ওঁরা নিয়ে এসেছেন।

ও—ওঁদের বিশ্বাস হয়েছে দাদাই সেই সাধু?

সুচিত্রা বললে, বিশ্বাস কি সাধে হয়েছে। নামবার সময় সাধু আমাদের বাড়ির কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছেন যে।

তারপর?

তারপর—তোমার তো অনেক বন্ধুবান্ধব আছে বহু জায়গায়—খোঁজ নাও।

আর খোঁজ না পেলে নিজেকে সেই আশ্রমের ঠিকানা খুঁজে বার করতে হবে?

কেন—সে কি তোমার কর্ত্তব্য নয়?

কিন্তু দাদার বিরুদ্ধে খুনের চার্জ উইথড্র হয় নি। এ্যাবস্‌কণ্ডারকে খুঁজে বার করার মানে বোঝ তো?

সুচিত্রা শুষ্ক স্বরে বললে, এত দিন পরেও কি--

রাজার আইন কাউকে ক্ষমা করে না।

কিন্তু মা যে কাঁদছেন।

কাঁদুন।

বড়দির জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়, সে কথা ভাবছ কি!

মলয় মাথা নেড়ে বললে, যদি কোন দিন আইন হয় দুষ্কৃতিবান স্বামীকে হিন্দু-স্ত্রী অনায়াসে বর্জ্জন করতে পারবে—আমি সে আইন সমর্থন করব।

তুমি তো আইন সভার কেউকেটা নও—তোমার সমর্থনের মূল্য কি! সুচিত্রা হাসলে।

কিন্তু এ নিয়ে প্রোপাগাণ্ডা করতেও তো পারি।

ক'রো—উপস্থিত খবরটা নেবে কিনা ভাল করে?

চটি পায়ে দিয়ে মলয় বললে, এইজন্য বাড়িতে আসতে চাই না—একটা-না-একটা হাঙ্গামা তোমরা বাধাবেই।

হাঙ্গামা! তোমরা যে স্বদেশী কর—সেকি বিনা হাঙ্গামায়?

মলয় উত্তর না দিয়ে বার হয়ে গেল।

নন্ত-দাদুর পুরো নাম নারায়ণ রায়। বয়স সত্তর দাঁড়িয়েছে—তবু দেহের প্রান্তে যৌবনের পড়ন্ত রোদটুকু লেগে রয়েছে। এ বয়সে মাথার চুল ক'গাছি পেকেছে গুণে বলে দেওয়া যায়। চাল, ছোলা ভাজা চিবোবার মত মজবুত দাঁতের অভাব নেই। যৌবনকালে তিনি নাকি দুঃসাহসিক ছিলেন। লোকে বলত উচ্ছৃঙ্খল। এখন বছরের তিন-চার মাস ঘুরে বেড়ান তীর্থে তীর্থে। একই তীর্থে বহু বার গেছেন—তীর্থকৃত্য তাও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে থাকেন। সকালে আর সন্ধ্যায় পুরো দুটি ঘণ্টা কাটে তাঁর রুদ্ধ-দ্বার ঠাকুরঘরে। যৌবনে যে উদ্যমে একটিও দেবতাকে মাথা নুইয়ে স্বীকার করেন নি—জরার অধিকারে এসে তেমনি উদ্যমে তাদের তেত্রিশ কোটিকে জীবনের জপমালায় গেঁথে নিয়েছেন। সংসার তাঁকে সৌভাগ্য দিয়েছে—আঘাত দিয়েছে। নারায়ণ রায় আর এক দিক দিয়ে গ্রামের অগ্রণী হয়েছেন বলা যায়। তাঁকে সেথো করে প্রতি বছর বহু নরনারী ভারতের বিভিন্ন তীর্থে পুণ্য সঞ্চয় করে বেড়ায়। তাঁর আহার, গাড়ী-ভাড়া, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুর দায়িত্ব বহন করে—এই পুণ্যকামীরা।

তা ছাড়া দেশ বিদেশের গল্প বলায়—পুরাণ-ইতিহাস মিলিয়ে সে গল্পকে মিষ্ট করার কৌশল তিনি জানেন। তাঁর বাইরের ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়াও সব রকম বয়সের মেয়েপুরুষের ভিড় প্রায় সর্বক্ষণ লেগেই থাকে।

মলয় ঘরে ঢুকে দেখলে ক'টি শিশুকে নিয়ে তিনি আসর জমিয়েছেন। ছেলেরা সব গল্পের চেয়ে ভূত পেত্নী রাক্ষস ব্রহ্মদৈত্য বা যুদ্ধের গল্প শুনতে ভালবাসে। নন্দ-দাদু রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণ থেকে গল্প বলেন—দৈত্য রাক্ষস আর যুদ্ধ এ সব প্রচুর থাকে তাঁর গল্পে।

তিনি বলছিলেন, জানিস দাদু—ব্রহ্মার বরে কুম্ভকর্ণ দিচ্ছিলেন ঘুম। ছ' মাস ঘুমের পর এক দিন তিনি জাগেন—সেই এক দিনই সারা পৃথিবীতে স্বর্গে আর পাতালে হুলস্থুল কাণ্ড। যেমন তেমন রাক্ষস ত নয়। যে ঘরে তিনি ঘুমোতেন—সেই ঘরটা লম্বায় হ'ল ত্রিশ যোজন আর চওড়ায় দশ যোজন। দুয়োরের কাঁদ হ'ল চার কোশ—সে দুয়োর উঁচু হ'ল আট যোজন—এই থেকে বোঝ কত বড় রাক্ষস তিনি।

মলয় ঘরে ঢুকে বললে, থাক দাদু—বেচারী কুম্ভকর্ণকে আর অকাল নিদ্রা ভাঙিয়ে তুলবেন না—

তিনি হেসে বললেন, বোস রে ভাই—বোস। ছেলেগুলোর এই ত চেহারা কিন্তু ভীষণ ভীষণ রাক্ষস দৈত্য এ সবের গল্প না শুনলে ওরা ঘুমোতেই পারবে না।

ছেলেরা গল্পে বাধা পড়াতে বিরক্ত হ'ল। বললে, গল্পটা শেষ কর দাদু নইলে—

নন্দ-দাদু হেসে বললেন, না করলে কি যে হবে তা জানি। গাছের পেয়ারা কুল কি বাগানের আম একটিও থাকবে না।

বাঃ রে, আমরা বুঝি আপনার গাছে হাত দিই?

কেন দিবি নে ভাই—কল ত তোদেরই জন্তে। কুল পেয়ারা ওসব বুড়ো বয়সের জন্ত নয়—তবে আমটা যদি ভাল হয়—

আচ্ছা দাদু—আম আপনার একটিও নষ্ট হবে না। দেখবেন পাকা আম পেড়ে কেমন মা দিদিমাকে দিয়ে যাই।

পাকা আম খাওয়াবি এ মস্ত প্রলোভন বটে। মলয়ের পানে চেয়ে হাসলেন, কিন্তু কাঁচা আমগুলো যদি তোদের লোভ থেকে বাঁচে···আহা হা—রাগ করিস কেন ভাই—বুড়ো হয়েছি বলেই কি চিরকেলে বুড়ো আমি। আমাদেরও ছেলে বয়স ছিল।

মলয় বললে, গল্পটা সেরে নিন—কিছু কথা আছে দাদু।

খানিকক্ষণ মলয়ও সে গল্প শুনলে। দাদু বলেন ভারি মিষ্ট করে—রসিয়ে রসিয়ে—কৌতূহলকে জাগ্রত করে। মন্দ লাগছে না গল্প।

ছেলেরা চলে যেতেই ও প্রশ্ন করলে, আচ্ছা দাদু, এমন আজগুবি গল্প শুনিয়ে কি লাভ। চার কোশ ধরে কপাটের পাল্লায় যে রাক্ষস থাকত—তাকে আঁটতে গোটা লঙ্কা শহরটাই যে লাগে। আর প্রত্যেক রাক্ষসের সঙ্গে দশ কোটি বিশ কোটি—বীর চলতো যুদ্ধ করতে—বানরদের এক এক জনের সঙ্গে আশি কোটি নব্বুই কোটি সৈন্ত—এ সব সারা ভারতবর্ষে ধরে না—লঙ্কায় ধরল কি করে!

দাদু বললেন, যুদ্ধের বর্ণনা অনেক বাড়ানো—মানি। তোদের কালটারই কথা ধর। এই যে দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশে লোক মরলে—কেউ বলছে দশ লক্ষ—কেউ বলছে পনেরো—কেউ বা বলেন—ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ। এ মহাযুদ্ধের হিসাব-নিকাশ এখনো হয় নি—গেল মহাযুদ্ধে সবশুদ্ধ আশি লক্ষ লোক মরেছিল—এটাও ঠিক বলে মেনে নেওয়া যায়। যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু উনিশ-বিশ হয়ই।

কিছু নয়—আকাশ-পাতাল তফাৎ। আর এই আজগুবি গল্প—!

দাদু বললেন, পৃথিবীতে কোন্‌টা আজগুবি আর কোন্‌টা সত্যি কে বলবে ভাই। দুটো বোমা খেয়ে দুর্দ্ধর্ষ জাপান কাত হ'ল—একথা তোমরাই কোন দিন বিশ্বাস করতে কি? অথচ তাই হ'ল। যখন তর্ক করার প্রবৃত্তি থাকে মানুষের তখন বয়সটা থাকে তোদের কোঠায়—আমাদের কোঠায় বয়স গড়ালে বিশ্বাসই হ'ল আসল বস্তু। দাদুর কথার সুর ঈষৎ গম্ভীর হ'ল।

বেশি দিনের কথা নয়—সেকেণ্ড ইয়ারের গ্রীষ্মের ছুটিতে মলয় তখন দেশেই রয়েছে। দাদুর ছোট ছেলে মলয়ের বন্ধুই ছিল সে—নিশীথ তার নাম—কাজ করত একটি মার্চেন্ট আপিসে, এক শনিবারে জ্বর নিয়ে বাড়ি এল। দারুণ জ্বর, বেহুঁস অবস্থা। ডাক্তাররা কেউ বললেন, পক্স—কেউ বললেন ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়া—কেউ বা বললেন মেনিনজাইটিস্‌। মোট কথা তিন জনের মতভেদ হওয়াতে সে রাত্রিতে ভিজার মিকশ্চার ছাড়া বিশেষ কিছু পড়ল না—তার পর দিন আসল রোগ ঠিক হ'ল বটে—রোগীকে ফেরানো গেল না। সেইটি দাদুর শেষ ছেলে। তার পরই দাদু মন্ত্র নিলেন—নিয়ম করে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত পড়তে লাগলেন। কেউ তর্ক করতে এলে বলেন, ও সব পাট মিটিয়ে দিয়েছি ভাই—আর কেন!

আপনার মনের বল কমে গেছে দাদু।

দেহের বলও কমছে যে ভাই। কিন্তু সে কথা নয়। আমরা খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারি একটা অবলম্বন পেলে। সে মানুষই হোক আর ঈশ্বরই হোক। তুমি তো বলবে ঈশ্বর নেই! তোমাদের কাজ যথেষ্ট—নতুন পৃথিবী না হোক—পৃথিবীতে নতুন বিধান তৈরি করবে এই আশ্বাসে আর উৎসাহে মানুষের বেশী কিছু স্বীকার করতে চাও না। কিন্তু আমরা জানি পৃথিবী পুরাতন। নতুন মানুষের মনে বার বার নতুন হয়ে সে ফিরে আসে—এই মাত্র।

কিন্তু দাদু আপনাদের ছেলেবেলাকার পৃথিবীর সঙ্গে আজকের পৃথিবীর কত তফাৎ দেখুন তো।

হাঁ—বিজ্ঞান পৃথিবীকে নতুন করে তৈরি করছে। আমাদের কালে যে পৃথিবী প্রকাণ্ড ছিল—আজ সে ছোট হয়ে গেছে। তবু এ তার বাইরের সাজসজ্জা। আমার এই ময়লা কাপড়টার সঙ্গে তোমার ধবধবে খদ্দরের পোষাকটার যেমন তফাৎ—তোমার দেহের সঙ্গে আমার দেহের গঠন মিলবে না—তবু তুমি মানুষ—আর আমি মানুষ ছাড়া আর কিছু এও তো ঠিক নয়। বুড়ো হলেই মানুষের লাঠির দরকার হয় ভর দিয়ে চলবার জন্য। ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার সেই লাঠি দাদু।

এ সব তর্ক বহু বার হয়ে গেছে। যুক্তির শক্ত পথ থেকে দাদু বিশ্বাসের নরম ভূমিতে নেমেছেন; এ পরিবর্তনের গভীরে রয়েছে যে হেতু—তা বিয়োগ-বেদনায় বাষ্পাকুল। বেশী তর্ক করে তাকে উদঘাটন করা চলে না। শোকে সান্ত্বনা দেওয়া মামুলি প্রথা—তাতে আশ্রয় পাওয়াও দুর্ঘট। নিজের মন থেকে সহজাত প্রবোধ-আশ্বাস না দিলে—কোন্ যুক্তিতে সে চিত্ত স্থির করতে পারে!

মলয় এক মুহূর্তে অনেক কিছু ভেবে নিয়ে বললে, দাদার খবর জানতে এলাম দাদু— সত্যিই কি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

দাদু বললেন, এরই মধ্যে খবরটা পাড়ায় রটে গেছে। ভাল হয় নি দাদু। তোমার মাকে সামলানো কঠিন।

মার চেয়ে বৌদিদির অবস্থা খারাপ—তাঁর ফিট হচ্ছে।

দাদু বললেন, আমার কথা যদি শোন তো তাঁর খোঁজ করো না ভাই।

কেন দাদু?

মানুষ এক বারই জন্মায় না ভাই—মৃত্যুও তার বহু বার ঘটে।

যদি বলি জন্মান্তর মানি না।

দাদু হেসে বললেন—দেহ বদলে যে জন্ম তার কথা তো বলি নি ভাই। তোমার মন—বুদ্ধি—রুচি—প্রবৃত্তি বা সংস্কার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বহু বার বদলাবে। তারই জন্যে ছেলেবেলায় নাস্তিক—দাদু তোদের আস্তিক হয়েছে রে। একটু থেমে হেসে বললেন, বৃন্দাবনে যাবার পথে যে সন্ন্যাসীকে দেখে আমার সন্দেহ হয়—তাকেই আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আচ্ছা আপনি তো সংস্কারমুক্ত পুরুষ—বিশেষ করে ওই গ্রামখানির কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? সন্ন্যাসী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার হতেও পারে।

জিজ্ঞাসা করলাম—জাতিস্মররা শুনেছি পূর্ব্বজন্মের কথা ঠিকমত বলতে পারেন।

সন্ন্যাসী বললেন—জাতিস্মর না হয়েও কি মানুষের জন্মান্তর হয় না? দ্বিজত্বে ওঠে কি করে মানুষ? আপনার দশ বছরের দেহে আর বিশ বছরের দেহ কি এক? সেই সঙ্গে মনও খোলস বদল করছে বার বার।

সাহস করে বললাম—তবু হারানো জনকে ফিরে পেলে আত্মীয়বন্ধুরা কম সুখী হয় না। তাদের মধ্যে বাস করার যে শান্তি—

সন্ন্যাসী হেসে বললেন—শান্তির স্তরভেদ আছে জানেন কি? যে মধুর স্বাদ পেয়েছে—চিনিতে স্বভাবতই তার স্পৃহা থাকবে না—পরম সঙ্গ পেলে আসঙ্গলিপ্সা তেমনি ফিকে বোধ হয়। আপনি জ্ঞানী—সংসারের স্বাদ আর পরব্রহ্মের স্পর্শ—একের সঙ্গে অন্যের তুলনা—এ তো চলে না জানেন।

মলয় জিজ্ঞাসা করলে—তা হলে তিনিই যে আমার দাদা—এ সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ নেই।

কিন্তু তিনি নবজন্ম লাভ করেছেন—তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক টানতে গেলে তোমরা হয়ত দুঃখই পাবে ভাই। অন্তত বড় বৌমাকে এ সব না শোনানই ভাল।

কিন্তু দাদু, মন্দ যা তা ঘটে গেছে।

তারা তারা! দাদু একটি গভীর নিশ্বাস ফেললেন। যা ভাল বোধ কর ভাই—না হয় তাঁর আশ্রমের ঠিকানাটি দিচ্ছি, কিন্তু মেয়েদের নিয়ে সেখানে যেও না। মানুষের ইচ্ছা ব'লে যে জিনিসটি আছে তার প্রতিকূলে কিছু করা যুক্তিসঙ্গত নয় ভাই।

মলয় বললে, তা কি সম্ভব দাদু! তবে আমাদের কর্ত্তব্যে যেটুকু না করলে নয়—আচ্ছা আসি—দাদু।

দাদু তার কাঁধে হাত রেখে সস্নেহ হাসি হেসে বললেন, হাঁ রে—তুই নাকি একবার জেল খেটেছিলি?

মলয় মাথা নীচু করে হাসলে, সে আর বেশী কি দাদু।

কবে?—আমি তো শুনি নি—

সে এমন কিছু নয় শোনাবার মত। ওই যে আগষ্ট মাসে 'কুইট ইণ্ডিয়া'-রেজল্যুশন হ'ল না—তারই ফলে ভারতবর্ষে একটা ঢেউ বয়ে গিয়েছিল তো—

বলিস কি—আগষ্ট মুভমেণ্ট! সিপাহী বিদ্রোহের পর ও ধরণের বিক্ষোভ ভারতবর্ষে আর দেখা দেয় নি। শুনি তো বহুলোক রক্ত দিয়ে তাদের ভুল কাজের প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

মলয় মাথা উঁচু করে স্থির দৃষ্টিতে চাইলে তাঁর দিকে। অসহায় ক্রোধ কিংবা বেদনা—কয়েকটি রেখার কুঞ্চনে মুখে ফুটিয়ে তুলল মৌন প্রতিবাদ। ভঙ্গিটা তার উদ্ধত নয়—উদ্দীপ্ত। মৃদু—অথচ স্পষ্ট স্বরে বললে, ভুল কাজের নয় দাদু—সময়ের। নেতাজীও তা হলে ভুল করেছিলেন বলতে চান?

ভুল যারই হোক ভাই—রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত—

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা যায়—ভুলেরও দণ্ড নিতে হয়, বারে বারে যত রক্ত দিয়েছে ভারতবর্ষ তা প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড নয়। জন্মগত অধিকার ফিরে পাবার জন্যে বার বার এগিয়ে আসে মানুষ—প্রাণ দেয়, নির্যাতন সয়—তার জন্য দুঃখ কিসের!

দাদু বললেন, তোমাদের বিশ্বাস—

আপনিই একটু আগে বললেন না—একটি জিনিসে নির্ভরতা না থাকলে—মানুষের জীবনের অর্থও থাকে না।

আমাদের বয়সে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে আমরা মেতে উঠেছি এ কথার চেয়ে—নতুন পৃথিবীতে আমাদের সম্মান আর গৌরব যাতে সবাই স্বীকার করে নেয়—সেই মহৎ চেষ্টায় জীবনপাত হ'ল সবচেয়ে বড় সত্য। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা একটু ঠাঁই পেতে চাই—এ কি আমাদের অন্যায় ইচ্ছা? না রক্ত দিয়ে দু' এক বার প্রায়শ্চিত্ত করলেই এই ভুল শুধরে যাবে?

দাদু অবাক হয়ে মলয়ের জ্বলন্ত চোখ দুটির পানে চেয়ে রইলেন। তরুণ বয়স—সংসারের বন্ধন স্বেচ্ছায় গলায় পরেছে। মায়ের স্নেহ -প্রিয়ার ভালবাসা- জীবিকার সংস্থানে নির্বিঘ্ন সংসারে লেখাপড়া শিখে জগৎকে জেনেছে মোহমুক্ত বুদ্ধির দ্বারা—পরিণাম-অনভিজ্ঞ উচ্ছ্বাস-প্রবণ যুবক মাত্র নয়—একে পথের নির্দ্দেশ দেবার ছলে কি উপদেশ দেবেন তিনি? নির্দ্দেশ দিতে যাবার ধৃষ্টতাও তাঁর নেই। তীর্থে তীর্থে সংসারমুক্ত বহু সন্ন্যাসীকে দেখেছেন দাদু—আর স্বাধীনতাকামী এদের কয়েকজনকেও দেখেছেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন-মুখী দুই জাতের সাধনাতে আশ্চর্য্য রকমের মিল তাঁর দৃষ্টিতে পড়ল আজ। দুই সাধকই তো মৃত্যুকে ভয় করেন না—দুই যোগীই ধ্যাননিবদ্ধ দৃষ্টিতে দেবভূমির মহিমা নিরীক্ষণ করছেন। এক জন দেবতার জ্যোতিকে আর এক জন তাঁর মহিমাকে আয়ত্ত করতে চায়। এদের মধ্যে বড় ছোট কেউ নেই।

দাদু প্রসন্ন স্বরে বললেন, আমার ভুলটাই মেনে নিলাম ভাই—

মলয় হেসে বললে, ছি দাদু বুড়ো হয়ে আপনি সত্যিই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। মনের আনন্দে পাক খেয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ক্রমশঃ

বাস্তব ও কল্পনা

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

গেঁথেছি অনেক মালা আকাশ-কুসুমে,
সে ফুল যে ফোটে শুধু মনের আকাশে।
শিহরি কাহার স্পর্শে পেলে কি পাখা সে?
ফুল-বিহঙ্গেরা দূর নীল নভ চুমে!
কি ক'রে প্রভেদ করি জাগরণে ঘুমে?
জীবন জাগিয়া থাকে সে স্বপ্নের পাশে,
অপূর্ব্বের পরিচয় পাই যে আভাসে,
একাকার হয়ে যায় স্বর্গ মর্ত্ত্যভূমে।

কল্পনা সে পায় রূপ। সেথা যায় দেখা,
অসীমের সীমা রচে দিগন্তের রেখা।
সম্ভব ও অসম্ভব কে ক'রেছে ঠিক,
মনের মায়ার সঙ্গে পারি না আঁটিতে।
আকাশে কুসুম ফোটে, নহে তা অলীক,
সে পুষ্পতরুর মূল মর্ত্ত্যের মাটিতে।

শাশ্বত বর্ত্তমান

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

"আরো দূরে যেতে হবে।" কোথায়—কে জানে
দূরান্তরে লিখি করে পথের নিশানা,
সে পথের শেষ নাই, সে পথ অজানা,
ডাকিছে সে অনাগত সমুখের পানে।
"ফিরে চাও, চলিয়াছ কিসের সন্ধানে?"
"আমারে চিনিতে পার?" "শোন বন্ধু মানা,
কেন যাবে যে-পথের নাই কো সীমানা?"
কেবলি পশ্চাতে মোরে গত-কাল্য টানে।

অতীতে জড়ানো কত আনন্দ ও ব্যথা,
আমার স্মৃতির মাঝে তার অমরতা,
ও যে সত্য। সত্যতর সে আগামী কাল
স্বপ্নে যে সার্থক করে জগতের মাঝ।
স্মৃতি ও স্বপ্নের তবে ছিন্ন কর জাল,
সকলের চেয়ে সত্য জীবনের 'আজ'।

ওহাবী আন্দোলন ও মুসলমান সমাজের রাজনীতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

আমরা ছেলেবেলায় কোন কোন মুসলমানকে 'করাজী' বা 'ফেরাজী' বলিতে শুনিয়াছি। তখন করাজী বলিতে বুঝিতাম—আচারনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমান। বঙ্গদেশে কিন্তু এই করাজীরাই সত্যিকার ওহাবী। বাংলার জল মাটির গুণে ওহাবী আদর্শ যেমন খানিকটা বদলাইয়া যায়, উহাদের নামেও তেমনি এইরূপ পরিবর্তন ঘটে।

ওহাবী আমাদের দেশী কথা নয়। আরব দেশে ওহাবী আন্দোলনের উদ্ভব। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সেখানে আবহুল ওহাব নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। তিনিই ওহাবী আন্দোলনের প্রবর্তক। তুর্কীর অধীনে অবস্থান কালে নানাদিক দিয়াই আরব জাতির বিশেষ অবনতি ঘটে। মুসলমানগণ ইস্লাম ধর্ম্মের মূল তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের বশীভূত হয়। ওহাব এই সকল আবর্জ্জনা দূর করিয়া মহম্মদ-প্রতিষ্ঠিত আচার-অনুষ্ঠান বর্জ্জিত খাঁটি ইস্লাম ধর্ম্মের পুনঃপ্রবর্তনে সবিশেষ তৎপর হইলেন। আরব সমাজের বিস্তর লোক তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। ওহাব দেখিলেন তাঁহার এই সংস্কার-কার্য্যের প্রধান বাধা তুর্কী-রাজ। তাই তিনি স্বদল পুষ্ট করিয়া আরবের মক্কা-মদিনা প্রভৃতি তীর্থস্থানগুলি হইতে তুরস্ক-প্রভুত্ব উচ্ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সমগ্র আরবে আবহুল ওহাবের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইল। ইস্লাম ধর্ম্মও সংস্কৃত হইল। কিন্তু ওহাবের কর্তৃত্ব বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারিল না। তাঁহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরে তুর্কী-রাজ পুনরায় আরবের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু ওহাবের আদর্শ আরব জাতির মনে স্থায়ী আসন লাভ করে। বহিরাগত তীর্থযাত্রীরাও অনেকে এই আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়। ওহাবী আদর্শে অনুপ্রাণিত এইরূপ এক জন তীর্থযাত্রী ছিলেন সৈয়দ আহ্‌মেদ।

রায় বেরিলীতে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মহরম মাসে সৈয়দ আহ্‌মেদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৈশোরে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পিণ্ডারীদের অধীনে অশ্বারোহী সৈনিকের কার্য্য করেন। তখন উত্তর-ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ওয়ারেন হেষ্টিংস সর্ব্বপ্রথম পিণ্ডারীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং উহাদের কঠোর হস্তে দমন করেন। পিণ্ডারীরা অতঃপর বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং লুঠ-তরাজ করিতে থাকে। সৈয়দ আহ্‌মেদও প্রথম জীবনে এইরূপ কুক্রিয়াসক্ত হইয়া পড়েন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে শিখশক্তি প্রবল হইয়া উঠে এবং পঞ্জাবে শিখরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তখন লুঠ-তরাজ, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্য্যের তেমন সুযোগ আর রহিল না। পঞ্জাবে শিখরাজ্য তথা হিন্দু প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় সৈয়দ আহ্‌মেদের জীবনে এক পরিবর্তন দেখা দিল। হিন্দুদের সংস্পর্শে আসিয়া ইস্লাম ধর্ম্মে যে সব আচার-অনুষ্ঠান ও পৌত্তলিক প্রভাব প্রবেশ করে তৎসমুদয় বিদূরিত করিয়া ইহাকে সুসংস্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে সৈয়দ আহ্‌মেদ বিশেষ ভাবে তৎপর হইলেন। তিনি ইস্লামের সারমর্ম্ম উপলব্ধির জন্য কিছুকাল দিল্লীতে থাকিয়া মৌলানাদের নিকট মুসলমান শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সুসংস্কৃত ও সংশোধিত ইস্লাম ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তিনি একদিকে যেমন মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিলেন অন্যদিকে তেমনি সাধারণ মুসলমানগণও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে লাগিল। সৈয়দ আহ্‌মেদ যখন যেখানে গমন করিতেন বিখ্যাত মৌলানাগণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার সেবা-যত্ন করিতেন। ইহাতেও সাধারণ মুসলমান সমাজ তাঁহার দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ঈশ্বর এক এবং মুসলমানমাত্রেই সমান—আহ্‌মেদের এই দুইটি কথা সহজেই সকলের চিত্ত জয় করিল।

সৈয়দ আহ্‌মেদ ১৮২০-২২ সনে সমগ্র উত্তর-ভারত পরিক্রমা করেন। তিনি যে যে স্থলে গমন করেন সেই সেই স্থলেই বিস্তর লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। তিনি সর্ব্বত্র উপযুক্ত ও বিশ্বাসী লোকদের প্রতিনিধি বা এজেণ্ট নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার অন্যতম কার্য্য শিষ্যদের নিকট হইতে 'ধর্ম্ম-কর' সংগ্রহ। পাটনায় তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইল। এখানে তিনি চারি জন খলিফা নিযুক্ত করিলেন। এই চারি জনের মধ্যে ইনায়েত আলি ও বিলায়েত আলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা পূর্ব্ব-ভারতে সৈয়দ আহ্‌মেদের মতবাদ প্রচারে প্রধান সহায়ক হইলেন। পাটনায় প্রচার-কেন্দ্র স্থাপনান্তর আহ্‌মেদ নৌকাযোগে কলিকাতায় আগমন করেন। পথিমধ্যেও তাঁহার বিস্তর শিষ্য জোটে। কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহার মতবাদ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যেও প্রচারিত হইবার সুযোগ ঘটিল।

ইহার পর সৈয়দ আহ্‌মেদ মক্কাতীর্থে গমন করিলেন। এই সময় তিনি ওহাবীদের সংস্পর্শে আসেন। সৈয়দ এত দিন ধর্ম্ম-সংস্কারে মন দিয়াছিলেন, এবার ওহাবীদের মতবাদে ও কার্য্যকলাপের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইয়া বুঝিলেন, ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে বিশুদ্ধ ইস্লাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব। তিনি স্বয়ং ওহাবী দলভুক্ত হইলেন। ওহাবী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া খাঁটি ওহাবীরূপে তিনি বোম্বাইয়ের পথে স্বদেশে ফিরিলেন।

ওহাবী মতবাদ প্রচারোদ্দেশ্যে সৈয়দ আহ্মেদ ১৮২৪ সনে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্ব্বত্য উপজাতিদের মধ্যে কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। ইহার পর হইতে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে সমতল ভূমিতে আসিয়া মুসলমান প্রভুত্ব বা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা। তিনি ইতিপূর্ব্বে সমগ্র উত্তর-ভারতে যে কর্ম্মীসঙ্ঘ গঠন করিয়াছিলেন এইবারে তাহাদ্বারা তাঁহার কাজ হাসিল করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার নির্দ্দেশে ধনবল ও জনবল সংগৃহীত হইতে লাগিল। উদ্দেশ্য, নিকটবর্ত্তী শিখ (বা হিন্দু) রাজ্যের উচ্ছেদ। ১৮২৭ সন হইতে শিখ রাজ্যে উৎপাত-উপদ্রব আরম্ভ হইল। ডাকাতি, নরহত্যা, নারী-ধর্ষণ, রাহাজানি, লুঠতরাজ প্রভৃতি অবাধে চলিতে থাকে। ওহাবী দল ক্রমশঃ এত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে যে, ১৮৩০ সন নাগাদ পশ্চিম-পঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার নগরী ইহারা অধিকার করিয়া ফেলিল। তখন পঞ্জাবের অধিপতি রণজিৎ সিংহ ইঁহাদের উপেক্ষা না করিয়া দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। সৈয়দের শিষ্যগণ ও শিখসৈন্য সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সৈয়দ-শিষ্যগণকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়। ১৮৩১ সনে এক শিখ সেনার গুলিতে সৈয়দ আহ্মেদ ইহলীলা সংবরণ করিলেন।

তদবধি তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ সাধারণের মধ্যে এই সংবাদ প্রচার করিতে থাকে যে, সৈয়দ আহ্মেদের মৃত্যু হয় নাই। তিনি গুপ্তভাবে বিচরণ করিতেছেন, এবং শিষ্যবর্গ তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করিয়া সফলকাম হইলে তিনি আবার সশরীরে আবির্ভূত হইবেন। নিরীহ মুসলমান জন-সাধারণ এ কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর ধনজন দিয়া ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় কর্ম্মীসংঘকে সহায়তা করিতে লাগিল। পর্ব্বতের নিভৃত প্রদেশে সিত্তানায় ওহাবী-দের দুর্গ স্থাপিত হইল। পঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রসদ সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইল। ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল হইতেও নানারূপ সাহায্য সেখানে পৌঁছিতে লাগিল। অতঃপর বড় রকম কোন অভিযান বা আক্রমণ না চালাইলেও ওহাবীরা শিখরাজ্যে নানারূপ উপদ্রব করিতে থাকে।

বঙ্গে ফরাজী বা ওহাবী আদর্শ যে ভাবে শিকড় গাড়িয়া বসে সে এক বিচিত্র কাহিনী। তিতুমিঞা বা তিতুমিরের নাম মধ্য-বাংলায় প্রায় সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। তিতুমির চাষী গৃহস্থের পুত্র; ছোটখাট এক জমিদারের কন্যার পাণিগ্রহণ করায় তাঁহার অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়। কিন্তু আরামের জীবন তিনি পছন্দ করিলেন না। কুস্তি, লাঠি ও অসি খেলা, তীর ছোড়া প্রভৃতি শিখিয়া তিনি নদীয়ার এক জমীদারের বরকন্দাজ হইলেন। মারপিটে সংশ্লিষ্ট হওয়ার অপরাধে তাঁহার একবার কারাদণ্ড হয়। কারামুক্তির পর তিতুমির দিল্লী গমন করেন এবং সেখান হইতে বাদশা পরিবারের সঙ্গে মক্কা যান। এখানে আসিয়া বিখ্যাত ধর্ম্মসংস্কারক ও পরবর্ত্তীকালের ওহাবী নেতা সৈয়দ আহ্মেদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল। সৈয়দ আহ্মেদের সংস্পর্শে আসিয়া তিতুমিরের জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে। বাংলাদেশে ফিরিয়া তিনি একান্ত মনে ওহাবী মতবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বঙ্গে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিতুমির প্রথমেই ইংরেজের বিরুদ্ধে যাওয়া সমীচীন বোধ করেন নাই। ওহাবী মতবাদ তখনকার প্রচলিত ইস্লাম ধর্ম্মেরও বিরোধী ছিল, এ কারণ মুসলমান জমিদার বা প্রতিপত্তিশালী মুসলমানগণ ইহা সমর্থন করিতে পারিলেন না। তিতুমির ইঁহাদিগকে স্বমতে আনিবার জন্য ইঁহাদের উপরও অত্যাচার চালাইতে দ্বিধা করেন নাই। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও ওহাবীদের হস্তে প্রাচীনপন্থী প্রতিপত্তিশালী মুসলমানগণ কম নির্য্যাতিত হন নাই। কিন্তু ওহাবীরা সর্ব্বদা মূল লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া চলিত। তাহারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিত, মুসলমান ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় হিন্দুরাই তাহাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। বঙ্গে তিতুমির দলবল সহ অচিরে হিন্দুদের উপর চড়াও হইলেন। হিন্দু গ্রাম লুঠ করিয়া, ঘর বাড়ী পুড়াইয়া দিয়া, দেবমন্দির কলুষিত করিয়া তিতুমিরের দলের লোকেরা নিজেদের বিধর্ম্মী দলনস্পৃহা চরিতার্থ করিতে লাগিল। গোবর-ডাঙ্গা-নিবাসী জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য হিন্দুগণ বিশেষ ভাবে এই দলের হস্তে নিপীড়িত হইলেন।*

হিন্দু সমাজেও সত্বর ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। হিন্দু জমিদারগণ ওহাবীদের দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে ওহাবীদের উৎপাত এত বাড়িয়া যায় যে, হিন্দুদের তরফেও তাহাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের নানারূপ ব্যবস্থা হয়। ওহাবীরা দাড়ি রাখিত। বারাসতের অধীন মুড়াগাছাছির জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রতি ওহাবী প্রজার দাড়ির উপর আড়াই টাকা কর বসান। এই ব্যাপারে জমিদারের লোকজন এবং ওহাবীদের মধ্যে একটি দাঙ্গা হয় এবং বারাসতের ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ইহা লইয়া মামলাও উপস্থিত হয়। ইহার পর তিতুমির শিষ্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করণান্তর হিন্দুদের গ্রামগুলি পুনরায় আক্রমণ করিয়া লুঠতরাজ করিতে সুরু করেন। ওহাবী-দের অত্যাচারে শাসকবর্গেরও ক্রমে কতকটা চৈতন্যোদয় হইল। তিতুমির ও সরকারের মধ্যে শীঘ্রই সংঘর্ষ বাধিল। এই সম্পর্কে ১৮৭০ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় এই বিবরণটি পাওয়া যাইতেছে,—

"১৮৩১ সালে একটি খাওয়া দাওয়া উপলক্ষে তিতু তাহার সমুদয় শিষ্য একত্রিত করিয়া বাঁশ দিয়া কেল্লা প্রস্তুত করে এবং ৫০০ লোক সমভিব্যাহারে পূর্ণ গ্রাম লুঠ করে। তাহার পর তাহারা কৃষ্ণনগর জেলার লাউঘাটা গ্রাম লুঠ করে। তাহারা শেষে ক্রমেই অত্যাচারের বাড়াবাড়ি করিতে আরম্ভ করে। তাহার পর গবর্ণমেণ্ট ২০ জন সিপাহী, এক জন জমাদার ও এক জন হাবিলদার তাহাদিগকে দমন করিতে পাঠান। এলেকজাণ্ডার নামক এক জন সাহেব সিপাহীদিগের ক্যাপ্টেন

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৯।

হইয়া যান। তিনি দারগা এবং তাহাদের সঙ্গে বরকন্দাজ প্রভৃতি ১২০ জন যোদ্ধা লন এবং এলেকজাণ্ডার তিতুমীরের হস্তে পরাস্ত হন। তাহারা দারগাকে মারিয়া ফেলে, সিপাহী বরকন্দাজও বিস্তর মারা পড়ে। নদীয়ার মাজিষ্ট্রেটও তাহাদের নিকট পরাস্ত হন। ১৮৩২ খ্রীঃ অঃ এলেকজাণ্ডার আবার অধিক সৈন্য সামন্ত লইয়া তিতুকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে তিতু এবং তাহার দল ধ্বংস হয় এবং তাহার সেনাপতি গোলাম মসুম ধৃত হইয়া আলীপুরে তাহার ফাঁসী হয়।" *

তিতুমিরের পরাজয় ও মৃত্যু ওহাবী বা ফরাজীদের বিশেষ আতঙ্কের কারণ হইল। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' (৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮) এই প্রসঙ্গে দেশ-প্রচলিত প্রবাদের উল্লেখ করিয়া লেখেন—

"কিরূপে তিতুমির কামানের গোলা 'খাডলা' বলিয়া উন্মত্ত সহচরগণের উৎসাহের বৃদ্ধি করিয়া দেয়—কিরূপে ফকির কেল্লার মধ্যে থাকিয়া তাহার সহচরগণ সেই সময়ে 'গুলি খাডলা' বলিয়া হুহুঙ্কার করে, কিরূপে তিতুমির প্রথম গুলিতে হত হয় ও তাহার সহচরগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে, ও পরিশেষে কিরূপে নাপিতকে ৫ টাকা পর্য্যন্ত দিয়া ফরাজীরা শ্মশ্রু মুণ্ডন করে, এ সমুদয় দেশময় প্রবাদ আছে। তখনকার গোটা দুই গান,—

"হায় কি বুজুরুগী বেড়েছে
উত্তরে এক গ্রাম আছে নাম নারিকেল বেড়ে।
জুটল এসে ষাট হাজার দেড়ে ॥
দেড়ের নামে দুর।
বলে জলদি আন খুর ॥
তারা সব গোলার চোটে কাছা খুলে
সিটকে মরে রয়েছে ॥
ফকিরানি বলে ফকির রাত পোহালি হাট,
দাড়ি কাইচি দিয়ে ছাট ॥ ইত্যাদি"†

এইরূপে ফরাজী বা ওহাবীদের নিপীড়ন ব্যাহত হইল বটে, কিন্তু তাহা নিতান্তই সাময়িক। ইহারা পুনরায় হিন্দু দলন কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল। ১৮৩৭ সন নাগাদ দেখা যাইতেছে, ফরিদপুর ও ঢাকায় সরিতুল্লার নেতৃত্বে ফরাজীগণ ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি করিতেছে। এই সম্পর্কে 'জিলা ঢাকা নিবাসী দুঃখী তাপিগণস্য' একখানি পত্র ২২শে এপ্রিল তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত হয়। ইহার কিয়দংশ এখানে প্রদত্ত হইল,—

"ইদানীং জিলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুর গ্রামে সরিতুল্লা নামক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক ১২০০০ জোলা ও মোসলমান দলবদ্ধ করিয়া নূতন এক সরা জারী করিয়া নিজ মতাবলম্বী লোকদিগের মুখে দাড়ি কাছাখোলা কটিদেশে চর্ম্মের রজ্জু বৈন্ধ করিয়া তৎচতুর্দ্দিগস্থ হিন্দুদিগের বাটী চড়াও হইয়া দেব দেবীর পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাইতেছে এবং এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মলকৎগঞ্জ থানার সরহদ্দে রাজনগর নিবাসী দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ-শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জ্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটীতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহারা গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভস্ম রাশ করিলে একজন জবন ধৃত হইয়া ঢাকার দওরায় অর্পিত হইয়াছিল...আর শ্রুত হওয়া গেল তাহার জজ রায় অর্পিত হইয়াছে। আর শ্রুত হওয়া গেল সরিতুল্লার দলভুক্ত দুষ্ট জবনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের তারিণীচরণ মজুমদারের প্রতি নানা প্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাঁহার বাটীতে দেবদেবী পূজার আঘাত জন্মাইয়া গোহত্যা ইত্যাদি কুকর্ম্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু জবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে জ্ঞাপন করিলে ঐ সাহেব বিচারপূর্ব্বক কএক জন জবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয় দুষ্ট জবনেরা মফঃসলে এ সকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচার গৃহে আক্রমণ করিতে প্রবর্ত্ত হইল। শ্রুত হওয়া গেল ফরিদপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুজুরে যে সকল আমলা ও মোক্তারকারেরা নিযুক্ত আছে তাহারা সকলেই সরিতুল্লা জবনের মতাবলম্বি তাহারদিগের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয় তবে কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে সুতরাং ১২০০০ হাজার লোক দলবদ্ধ ইহাতে ফরিয়াদীর সাক্ষীর ত্রুটি কি আছে।...আমি বোধ করি সরিতুল্লা জবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর২ প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম লোপ পাইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার জোট পাটের শত অংশের এক অংশ তীতুমির করিয়া ছিল না।...ইতি সন ১২৪৩ সাল তারিখ ২৪ চৈত্র।"*

সরিতুল্লার ন্যায় ফরিদপুরে দুদুমিয়া নামে আর এক জন ওহাবী-নেতা আবির্ভূত হন। তাঁহার সম্বন্ধে এখনও ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল অঞ্চলে নানারূপ জনশ্রুতি আছে। দুদুমিয়ার আমলে বঙ্গের ওহাবী আন্দোলন কতকটা অর্থনৈতিক রূপ ধারণ করে। ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ দিবসীয় 'অমৃত বাজার পত্রিকা' দুদুমিয়া সম্পর্কে লেখেন,—

"ফরিদপুরের দুদুমিয়া ফরাজীদিগের গুরু ছিলেন। কালে তাঁহার প্রভাব এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, তিনি মনে করিলে ৫০ সহস্র লোক সংগ্রহ করিতে পারিতেন। ইহারা সমুদয় ষড়যন্ত্র করিয়া জমিদার ও কুঠিয়ালগণকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া

* প্রবন্ধ-লেখকের "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ," পৃ. ১৮১-২ দ্রষ্টব্য।

† ঐ, পৃ. ১৭৭-৮।

*"সংবাদ-পত্রে সেকালের কথা", ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৯-৮০।

জেলে। গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে তিনি কখন কিছু করেন নাই বটে, কিন্তু গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ভয় করিতেন।

"পরে ১৮৪৬ সালে জমিদারে ও কুঠিয়ালে জুটিয়া তাঁহার বাড়ী লুঠ করেন, ও ১৮৪৭ সালে তাঁহাকে সেসন আদালতে দণ্ড দেন। ১৮৫৭ সালে যখন সিপাহী যুদ্ধ বড় ঝাঁকিয়া উঠে, তখন দুদুমিয়াকে গবর্ণমেণ্ট আশঙ্কাক্রমে কয়েদ করিয়া কিছুকালের নিমিত্ত আলিপুরের জেলে রাখেন।"*

বঙ্গদেশে ওহাবী আন্দোলন ক্রমে নূতন রূপ ধারণ করিল এবং বারাসত, সাতক্ষীরা, যশোহর, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, নদীয়া, পাবনা, রাজসাহী, রংপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু সিত্তানা কেন্দ্রে মূল উদ্দেশ্য অনুযায়ীই কার্য্য হইতে লাগিল। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতেও ধন-জন ও অন্যান্য রসদপত্র বিস্তর প্রেরিত হইতে থাকে। ১৮৪৮ সন নাগাদ পঞ্জাবে শিখশক্তির পতন হয় এবং '৫০ সনে সমগ্র পঞ্জাবই ইংরেজের অধিকারে আসে। ওহাবীদের নিকট হিন্দু, শিখ বা খ্রীষ্টান ইংরেজ সকলেই বিধর্ম্মী, ম্লেচ্ছ; খাঁটি ইসলাম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠায় সকলেই প্রতিবাদী। এক জন ইংরেজ লেখক সত্যই বলিয়াছেন, ওহাবী বিরোধিতা উত্তরাধিকার সূত্রে শিখদের নিকট হইতে ইংরেজেরা লাভ করে। ইংরেজ ঐতিহাসিকের এই কথা কয়টি যে কত দূর সত্য তাহা ওহাবীদের পরবর্তী কার্য্যক্রম আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়।

সৈয়দ আহমেদের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান শিষ্যবর্গ ওহাবী মতবাদ সুষ্ঠুরূপে প্রচারোদ্দেশ্যে নানা উপায় অবলম্বন করিলেন। সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে পূর্ব্ব-প্রান্তিক বাংলা—এই দুই হাজার মাইলের মধ্যে ওহাবীদের বিভিন্ন আড্ডা বা শাখা কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত হইল। এই সকল কর্ম্মকেন্দ্রে ভাবী প্রচারকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ অজ্ঞ মুসলমানদের স্বমতে আনয়নের জন্য এই প্রচারকগণ অনেকে তাহাদের মধ্যে গিয়া বসবাস করিত, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বিবাহাদি পর্য্যন্ত করিয়া তাহাদের সঙ্গে একাত্ম হইয়া যাইত। ফার্সী, উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষায় ওহাবী মতবাদ বিশ্লেষণ ও ওহাবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া প্রচার-পত্রী রচিত হইত এবং সাধারণের মধ্যে তাহা বিলি করিবারও ব্যবস্থা ছিল। বহু পুস্তক ও পুস্তিকা এই সম্পর্কে লিখিত হয়।

---

* "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ", পৃ. ১৭৮ দ্রষ্টব্য।

ফরায়জী-নেতা দুদুমিয়া সম্পর্কে ২৩ এপ্রিল ১৮৭০ তারিখের "হিন্দু-হিতৈষিণী" সাপ্তাহিকেও অনেক তথ্য বাহির হয়। ইহার কিয়দংশ এই—

"আজি প্রায় ২০।২৫ বৎসর হইল দুদুমিয়া নামে একজন মোসলমান পূর্ব্ব বাংলায় প্রাদুর্ভূত হইয়া ফরিদপুর ও ঢাকার মুসলমান সমাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন, ইতর শ্রেণীর মোসলমান মাত্রই কাছা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অধীনতা বা দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল। দুদুমিয়ার মত মোসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং প্রাচীন ও ধার্ম্মিক মোসলমানদিগের মতের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইত না, তজ্জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত মোসলমান তাঁহার মত অনুমোদন করিতেন না। শুনা আছে, দুদুমিয়ার সোয়াহস্ত পরিমিত একখানি বিনামার নাম 'সামাদার' ছিল, কোন শিষ্যাদির ত্রুটি লক্ষিত অথবা কাহাকে স্বমতে আনয়ন করিতে হইলে উক্ত সামাদার দ্বারা শাসন এবং সাহসের সহিত অর্থদণ্ড করা হইত। ইঁহার অধীনে কয়েকজন খলিফা নিযুক্ত হয়, ইহারা তাঁহার মতের উপদেশক। ইহাদের সর্ব্বময় ক্ষমতা ছিল। ঐ সময়ে প্রায় স্থলের বদমায়েস মোসলমান লোকই কাছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া স্বার্থ সাধনের বিলক্ষণ সুযোগ পায়। তখন কত স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট, কত স্ত্রী-পুরুষের পতি-পত্নী বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। কত নিরীহ লোকের প্রাণদণ্ড, সম্পত্তি অপহরণ, গৃহদাহ এবং অন্যান্য প্রকারের যন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ এবং দুঃখে আপ্লুত হইতে হয়। লোক প্রবৃত্তির অনুরোধে দুদুমিয়াও সে সকল কার্য্যকে ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করাতে শিষ্যেরা সর্ব্বত্রই তাঁহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত মনে করিয়া তাঁহার যশোগান ও মত প্রচার করিত। সেই সময়ে এদেশে নীলকরদিগেরও ভয়ানক অত্যাচার ছিল, কিন্তু দুদুমিয়ার অত্যাচারে নীলকরের প্রভা এককালীন মলিন হইয়া পড়ে; দুদুমিয়া সম্পত্তিহীন হইয়াও এভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়া জমিদারী স্থাপন ও অনেক ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তখন লোক এরূপ অত্যাচার পীড়িত হইয়াছিল যে অনেকে দেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন। অত্যাচারের প্রতিবিধান জন্য কোন মোকদ্দমা করিলে তাহা নিষ্ফল এবং অত্যাচারের বৃদ্ধি হইত। কিন্তু কেহই সাধ্যমানে প্রতিপক্ষ হইত না বরং শরীর পাতিয়া তাঁহার অত্যাচার সহ্য করিত।

* "সামাদার দ্বারা শাসিত হইয়া অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বক কাছা ছাড়িয়া যাহারা দুদুমিয়ার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল, তাহারা 'ফেরাজী'। পূর্ব্বে যে খলিফার কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের এক এক জনের অধীনে বহু ফেরাজী থাকিত, ফেরাজীদের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ছিল, তজ্জন্য খলিফারা দুদুমিয়ার প্রসাদে এক এক জন বড় মানুষ মধ্যে গণ্য হইয়া উঠে। দুদুমিয়া শিষ্যদিগের প্রবৃত্তির প্রতিকূলে চলিতেন না; লোক প্রবৃত্তি যে দিকে যাইত সবার মতকেও সেই দিকে চালাইতেন। তিনি এইভাবে অনেক কাল অত্যাচার চালাইয়া শেষ ধর্ম্মের প্রভাবেই হউক অথবা লোকের অভিশাপেই হউক ভয়ানকরূপে আক্রান্ত হন। অবশেষে পদ পচিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। পরক্ষণে তাঁহার অনেক সম্পত্তি নীলাম হইয়া যায়। ফলকথা, দুদুমিয়া মরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অত্যাচার জনিত অনেক পরিবারের হৃদয়ে চিরদুঃখ লক্ষিত রহিয়াছে, অনেক পরিবার উৎসন্ন গিয়াছে। অদ্যাপিও সেই দুদুমিয়ার খলিফা ও শিষ্য ফেরাজীরা চর অঞ্চলে থাকিয়া অবসরক্রমে লোকের প্রতি অত্যাচার ও চুরি ডাকাইতি করিয়া থাকে। এই অত্যাচার নিবন্ধন অদ্যাপিও এদেশ ঠাণ্ডা হয় নাই।..."

বিধর্ম্মীদের বিরুদ্ধে সমর-উত্তেজক অনেক গান রচনা করা হয়। ওহাবী দলভুক্ত নূতন নূতন লোকদের সম্মুখে এবং ওহাবী সেনাদলের কুচ্‌কাওয়াজের সময় এই সকল গান গীত হইত। ইহার মধ্যে যে গানটি একটি বিশেষ সমর-সঙ্গীত রূপে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—

"First I glorify God, who is beyond all praise;
I laud his prophet, and write a song on Holy War:
Holy war is a war carried on for religion, without any lust of Power. In the Sacred Scriptures its glories are related: I mention a few.
War against the infidel is incumbent on all Musalmans; make provision for it before all things.
He who from his heart gives one farthing to the cause, shall rearafter receive seven hundredfold;
And he who both gives and joins in the fight, shall receive seven thousand fold from God.
He who shall equip a warrior in the cause of God shall obtain a martyr's reward.
His children dread not the trouble of the grave; nor the last trump; nor the day of judgment.
Cease to be cowards; join the divine leader, and smite the infidel.
I give thanks to God that a great leader has been born in the thirteenth century of Hijra.
Oh friend, since you must sometime die, is it not better to offer up your life in the service of the Lord?
Thousands go to war and come back unhurt! thousands remain at home and die.
You are filled with worldly care, and have forgotten your Maker in thinking of your wives and children.
How long will you be able to remain with your wives and children? How long to escape death?
If you give up this world for the sake of God, you enjoy the pleasures of Heaven for ever.
Fill the uttermost ends of India with Islam, so that no sounds may be heard but "Allah! Allah!"*

ওহাবীরা সাধারণ মুসলমানদিগকে এই বলিয়া উত্তেজিত করে যে, বিধর্ম্মীর রাজ্য দার-উল্‌-হার্‌ব। এখানে বসবাস করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য। হয় এই রাজ্যকে একটি পুরাপুরি মুসলমান রাষ্ট্রে পরিণত কর, নতুবা এদেশ হইতে স্বাধীন মুসলমান রাজ্যে (দার্‌-উল্‌-ইস্‌লাম) চলিয়া যাও। ইহাতেও অপরিণামদর্শী মুসলমান সমাজ ভারতবর্ষে একটি মুসলমান ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পে মাতিয়া উঠে। পূর্ব্বেই মূল কেন্দ্র সীতানার উল্লেখ করা হইয়াছে। পঞ্জাব অধিকারের পর ভারত-গবর্ণমেণ্ট ১৮৫০-৫৮ সনের মধ্যে ওহাবীদের বিরুদ্ধে ষোলটি এবং '৬৩ সনের মধ্যে অন্যূন কুড়িটি অভিযান চালান। সিপাহী যুদ্ধ-কালেও ওহাবীরা বেশ সক্রিয় ছিল। তবে ১৮৫৮ সনের শেষভাগেই—তখন সিপাহী যুদ্ধ একেবারে শেষ হয় নাই—ওহাবীগণ পশ্চিমাঞ্চলের ইংরেজ অধিকারের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হইয়া উঠে। এই সময় সুদূর সিতানা কেন্দ্রে "বেহারের ও বাঙ্গালার মধ্যে বারাসত, সাতক্ষীরা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানের কর্ম্মীরা ধন ও জন দিয়া বিস্তর সাহায্য করে।"*

ইংরেজরা প্রথমে ওহাবীদের শক্তি পরিমাপ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইংরেজাধিকার যখন সত্য সত্যই আক্রান্ত হইল তখন তাহারা সর সিডনি কটনের নেতৃত্বে উপযুক্ত সংখ্যক সেনা প্রেরণ করিয়া সম্মুখ যুদ্ধে ওহাবীদের পরাজিত করে। সীতানার ওহাবী দুর্গও ধ্বংস করিয়া ফেলা হইল। কিন্তু তবু ওহাবীরা দমিয়া গেল না। সীতানা হইতে কিয়দ্দূরে মহবান নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে মল্‌কায় গিয়া তাহারা আশ্রয় লইল।

ইহার পর কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ওহাবীরা প্রকাশ্যে তেমন কিছু উৎপাতাদি করে নাই। তবে লোকজন ও রসদপত্র সংগ্রহ পূর্ব্ববৎই চলিতে থাকে। পার্ব্বত্য-উপজাতিদের মধ্যে কখন কখন 'ধর্ম্ম-কর' আদায় লইয়া ও কোন কোন আর্থিক প্রয়োজন সম্পর্কে মতদ্বৈধ উপস্থিত হইত বটে, কিন্তু 'ধর্ম্ম-রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করিতে তাহারা সকলেই সমান তৎপর ছিল এবং যথাসময়ে এই সকল উপজাতীয়েরা ওহাবীদের সহায় হইত। কয়েক বৎসর চুপচাপ থাকিয়া ওহাবীরা ১৮৬৩ সনে পুনরায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। ১৮২৭-৩০ সনে তাহারা রণজিৎ সিংহের রাজ্যে যেরূপ উপদ্রব সুরু করিয়া দিয়াছিল এবারেও প্রায় তাহারই পুনরাবৃত্তি হইল। ১৮৬৩ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ওহাবী ও ব্রিটিশ সেনার মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। এবারকার সেনাধ্যক্ষ ছিলেন সর নেভিল চেম্বারলেন। আম্বেলা গিরিসঙ্কটে যে শেষ সংগ্রাম হইল তাহাতে ব্রিটিশ বাহিনী জয়লাভ করে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের বিস্তর সৈন্য হতাহত হয়। শেষ পর্য্যন্ত উপজাতীয় দলসমূহের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হওয়াতেও ব্রিটিশের অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল। কূটনীতি এ ক্ষেত্রে তাহাদের বিশেষ সহায় হয়।

দ্বিতীয় বার সম্মুখ সমরে পরাজিত হইয়াও কিন্তু ওহাবীরা আদৌ নিরস্ত হয় নাই। এই দলটি কতকটা গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক জন নেতার মৃত্যুতে বা প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ধ্বংস হইলেই তাহাদের কার্য্য বন্ধ হইত না। আসল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র হইতে প্রচারকার্য্য এবং ধন ও জনবল সংগ্রহ আগের মতই চলিতেছিল। ১৮৬৮ সনে পুনরায় ব্রিটিশ ও ওহাবীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। পার্ব্বত্য উপজাতীয়েরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারেও ওহাবীদের বিশেষ সাহায্য করিল। এবার খাস জঙ্গীলাট ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অভিযান পরিচালনা করেন। এবারকার যুদ্ধেও বিস্তর ব্রিটিশ সেনা হতাহত হয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাদেরই জয় হইল। প্রাণপণ করিয়া লড়িয়াও উন্নত বৈজ্ঞানিক রণাস্ত্র ও

* *The Indian Musalmans.* By W. W. Hunter. 1871. Pp. 65-6.

* 'অমৃত বাজার পত্রিকা', ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। "ভারতের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ", পৃঃ ১৭৮ দ্রষ্টব্য।

সমরকৌশলের নিকটে দুর্দ্ধর্ষ ওহাবী সেনা হার মানিতে বাধ্য হয়।

সরকার ওহাবীদের কার্য্যকলাপের প্রতি প্রথমে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, কিন্তু দ্বিতীয় বারের সংঘর্ষের পর হইতেই তাঁহারা এ সম্বন্ধে নিয়মিত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে ওহাবীদের শক্তিসামর্থ্য, প্রচার-কৌশল, পুস্তক-পুস্তিকা, রসদ সংগ্রহ এবং মুসলমান জন-সাধারণের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ প্রভৃতির বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে। এ সকলের কতকটা আভাস আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি। ১৮৬৪ সনে পঞ্জাবের আম্বালা শহরে ব্রিটিশ বিচারাদালতে রাজদ্রোহাত্মক কার্য্যের অপরাধে ওহাবীদের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষে মোকদ্দমা রুজু হইল। এই মোকদ্দমায় এগার জনের বিচার হয় এবং প্রত্যেকেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই আসামীদের মধ্যে একজন ছিল নদীয়া জেলার কুমারখালি গ্রাম-নিবাসী মুসলমান। বহু সরকারী মুসলমান কর্ম্মচারীও যে ওহাবী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাহাও এই সময় বিশেষ করিয়া জানা গেল।

ইহার পর বৎসর ১৮৬৫ সনে পাটনায় ওহাবীদের দ্বিতীয় মোকদ্দমা হয়। ১৮৬৯-৭০ সনে মালদহ, রাজমহল, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানেও বিচার আরম্ভ হইল। এবারে ছাব্বিশ জন ওহাবীর বিচার হয়। ইহাদের মধ্যে পাঁচ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। এই দলের মধ্যে কলুটোলার বিখ্যাত ব্যবসায়ী আমীর খাঁ ছিলেন প্রধান। আমীর খাঁ কলিকাতা হাইকোর্ট পর্য্যন্ত লড়িয়াছিলেন। হাইকোর্টের আপীলে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন বোম্বাই হাইকোর্টের বিখ্যাত এডভোকেট এনেষ্টি সাহেব। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন যে, এই মামলায় আমীর খাঁর পক্ষে এনেষ্টি সাহেব যে সওয়াল করেন তাহা পাঠ করিয়া তরুণ বয়সেই তাঁহারা স্বাধীনতার পূজারী হইয়া উঠেন।

আমীর খাঁর মোকদ্দমার বিচার করেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নর্ম্যান। ১৮৭১ সনে এই মামলার চূড়ান্ত বিচার হইয়া যায়। বিচারে আমীর খাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। ইহার অল্পকাল পরেই, ১৮৭১ সনের ২০শে অক্টোবর তারিখে উক্ত বিচারপতি নর্ম্যান সাহেব এক মুসলমান আততায়ীর নির্ম্মম আঘাতে প্রাণ হারাইলেন। ইহার মাত্র তিন মাস পরে ১৮৭২ সনের ৮ই ফেব্রুয়ারী তৎকালীন বড়লাট লর্ড মেও আন্দামান পরিভ্রমণ কালে পোর্ট ব্লেয়ারে সন্ধ্যার অন্ধকারে শের আলি নামক এক মুসলমান কয়েদীর হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন। উভয় আততায়ীই ওহাবী দলভুক্ত বলিয়া সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হইল। ওহাবীদের দমনের জন্ত সরকার তিন বার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হন, বিভিন্ন স্থানে ওহাবী-নেতাদের আটক করিয়া বিচারান্তর তাহাদের কারাদণ্ডেও দণ্ডিত করা হয়, রাজ-দ্রোহাত্মক প্রচারকার্য্য বন্ধ করিবার জন্ত ফৌজদারী আইনও সংশোধন করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু এত করিয়াও ওহাবীদের দমন করা গেল না। মাঝখান হইতে উহাদেরই দুই জনের হস্তে দুই জন ইংরেজ রাজপুরুষের প্রাণ দিতে হইল। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা কল্পে ওহাবীরা কিরূপ ত্যাগস্বীকারপূর্ব্বক মন্ত্রগুপ্তি সহকারে কার্য্যে ব্রতী হয়, সে সম্বন্ধে অমৃত বাজার পত্রিকা ১৮৭২ সনের ২৫ এপ্রিল তারিখে একটি সুচিন্তিত প্রস্তাব লেখেন। ইহা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল,—

"পৃথিবীর মধ্যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র যখন যেখানে হইয়াছে, এক সূত্রে না এক সূত্রে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ওহাবী ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা পদে পদে পাইতেছি অথচ উহা ধরিবার যো নাই। এই ষড়যন্ত্রের একটি বিষয় দেখিয়া আমরা অবাক হই। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সবল সাহসী ধর্ম্মোন্মত্ত, অকাতরে প্রাণ দিতে পারে অথচ কিছু প্রকাশ করিবে না এরূপ লোক এক কোটির মধ্যে একজন পাওয়া সুকঠিন। এরূপ লোক অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা কেবল অসাধ্য নহে, কিন্তু অনুসন্ধানে প্রবর্ত্ত হইলে তাহা প্রকাশ না হইয়া যায় না। আমাদের রাজ-পুরুষদিগের ক্ষমতা বিস্তর সত্ত্বেও ইহার নিগূঢ় কারণ তাঁহারা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। যে ষড়যন্ত্র এরূপ লোক দ্বারা সৃষ্ট যাহা কল্পনা চক্ষেও অদৃশ্য, যাহার প্রকৃতি এরূপ অভেদ্য, এবং যাহা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের প্রতি লোমকূপে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা শাসন দ্বারা দমন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।...মুসলমানেরা ভারি ইন্দ্রিয়পরায়ণ, স্বর্গসুখ তাহাদের ইন্দ্রিয়সুখের পরাকাষ্ঠা, তাহারা ইংরেজী অভ্যাস করে না। কোরাণে তাহাদের অবিচলিত বিশ্বাস এবং শুদ্ধ কাফের হত্যা করিলে তাহারা স্বর্গসুখ তত অধিক ভোগ করিবে এই তাহাদের বিশ্বাস। তাহারা এক একটি হত্যাকে অনন্ত-সুখের দ্বার বিবেচনা করে সুতরাং কোনরূপ শাসন তাহারা লক্ষ্য করে না। প্রত্যুত অনুগ্রহের ন্যায় শাসনেও তাহাদিগকে আরও অধিক প্রতিজ্ঞারূঢ় ও উৎসাহী করিতে পারে।"*

ওহাবীদের মন্ত্রগুপ্তি এবং ওহাবী মতবাদের ব্যাপক প্রচারের জন্ত কর্ত্তৃপক্ষ ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সহসা পারগ হন নাই। পরে তাঁহারা ওহাবীদের নির্ম্মূল করিবার জন্ত উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ বিষয় এখন বলিব না। বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে ওহাবী বা ফরাজীদের উৎপীড়নে ১৮৭০ সন নাগাদ জনসাধারণ কিরূপ উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ ঢাকা হইতে প্রকাশিত ২৮ মে ১৮৭০ তারিখের 'হিন্দু হিতৈষিণী'তে প্রদত্ত হয়। 'হিন্দু হিতৈষিণী' লেখেন—

"যখন দুদুমিয়া এদেশে প্রাদুর্ভূত হন, তখন হইতেই মোসলমান ধর্ম্মে...ফেরাজী মত প্রচলিত হয়। দুদুমিয়ার এমনই প্রতাপ ছিল যে একমাত্র সাধারণের অনুবলে ঢাকা, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, ত্রিপুরা এবং নোয়াখালী জেলার প্রায় ইতর শ্রেণীর মোসলমানই তাহার বক্তৃতা ও মত স্বীকার করে। যাহারা প্রথম

*"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ," পৃ. ২২৬-৭।

আপত্য করিয়াছে তাহারা সাধারণের সুশাসনে তৎপরক্ষণেই অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। ইতর লোকেরা কোন উচ্চ লোকের সাহায্য পাইলে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে; দুদুমিয়ার যত প্রতাপ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই লোকের প্রতি বিষম অত্যাচার হয়। দুদুমিয়ার মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা বলা সুকঠিন। তাঁহার মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর লোকে এক প্রকার শান্তি ভোগ করে। প্রায় ৬।৭ মাস যাবৎ পুনরায় সেই সকল দুর্বৃত্ত ফরাজীরা মাদারিপুর সব ডিভিসনের অন্তর্গত স্থানসমূহে ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেও এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলাম, অদ্য তৎসম্বন্ধে দুইখানি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার একখানি যথাস্থানে প্রকাশ করা গেল।

"মাদারিপুর সব ডিভিসনের লোকেরা গত ২২শে এপ্রিল বঙ্গদেশের লেপ্ টেনেণ্ট গবর্ণর উইলিয়ম গ্রে মহোদয়ের নিকট দুদুমিয়ার পুত্রদ্বয়ের অত্যাচার উল্লেখ করিয়া এক আবেদন করে; আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন সুফল হইল কি না জানা যায় না। কেহ২ বলেন, মাদারিপুর সব ডিভিসনে যখন সুযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু দীনবন্ধু মৌলিক ছিলেন, তখন তাঁহার সুশাসনে ফেরাজীরা নিবৃত্ত ছিল, তৎপর যখন তথায় একজন মুসলমান ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট যান তখন হইতেই পুনরায় ফেরাজীর প্রশ্রয় পাইয়া অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা আদালতের আদেশও অবজ্ঞা করে, ২।৩ মাস হইল ছোট আদালতের ডিক্রী ক্রমে একজন গোমস্তাকে ধৃত করে, ফেরাজীরা প্যাদাকে প্রহার করিয়া দায়িককে কাড়িয়া রাখে। আর এক ফৌজদারী মোকদ্দমায় ২ জন কনেষ্টবল প্রহারিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে অবর্ণ ঘটাইয়া ভূমির কর আদায়ের নানা বিঘ্ন জন্মাইতেছে; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আজি ঊনবিংশ শতাব্দীতে চতুর্দ্দিকের কোলাহল শুনিয়াও এরূপ অত্যাচার অধিক দিন বর্ত্তমান রহিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই এ সকল অত্যাচার অবগত হইতেছেন, যদি এ অত্যাচারের কোন প্রতিবিধান না হয় তবে বৃটিশ সুশাসন আমাদের কি উপকারে আসিল? অন্যান্য স্থানের কথা বলিতে পারি না, মাদারিপুর সবডিবিসনের এলাকার লোকেরা এ সকল অত্যাচারে পরিবার ও সম্পত্তি আপনাদিগের গলগ্রহ মনে করিতেছে। কোথায় রাখিলে নির্ব্বিঘ্নে থাকিবে তাহা স্থির করিতে পারিতেছে না। ফেরাজীদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করা দূরে থাকুক, কথা বলিলেই তাহার বিপদ ঘটে; অভিযোগ করিয়াও সুফল লাভ হয় না। যত ইতর শ্রেণীর মোসলমান সমুদয়ই ফেরাজী, তন্মধ্যে ৫।৭ জন উহাদের ধর্ম্মোপদেশক (খলিফা) আছে। মোকদ্দমা উপস্থিত হইলেই উহারা সাক্ষী প্রভৃতির প্রতি অত্যাচারের ভয় প্রদর্শন করে, বোধ হয় সেইজন্যই পার্য্যমানে কেহ প্রকৃত সাক্ষ্য প্রদান করিতে সাহস পায় না।..."

ওহাবী তথা ফরাজীদের মূল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র একটি মুসলমান ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিবার পক্ষে ব্রিটিশরা ছিল প্রবল প্রতিবাদী। তাই তাহাদের বিরুদ্ধে ছিল এই সকল ষড়যন্ত্র ও সশস্ত্র অভিযান। কিন্তু ইংরেজ লক্ষ্য হইলেও ওহাবীদের অত্যাচার-উৎপীড়ন প্রতিবেশী হিন্দুদেরই বিশেষ করিয়া সহ্য করিতে হয়। হিন্দু (আজকালকার ভাষায় অ-মুসলমান) সমাজ যে নিছক মুসলমান রাজ্য স্থাপনে ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধক হইবে তাহা তাহারা জানিত, এবং জানিত বলিয়াই ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাইলেও হিন্দুদেরই সম্পত্তি লুণ্ঠন, ঘরবাড়ী পোড়ান, নারীর উপর অত্যাচার, মারপিট, নরহত্যা প্রভৃতিতে লিপ্ত হইত। ওহাবীদের কার্য্যকলাপ ঠিক ১৬ই আগষ্টের (১৯৪৬) মুসলিম লীগ পরিচালিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ব্রিটিশগণ ওহাবীদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বিদূরিত করিয়া কিরূপে তাহাদের হিন্দু বিদ্বেষ সমগ্র মুসলমান সমাজে ছড়াইয়া দিতে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে প্রবৃত্ত হয় সে এক অভিনব ব্যাপার। এই প্রচেষ্টার পরিণতি আজ খণ্ডিত-ভারতে লক্ষ্য করি।

সমর্পণ

শ্রীঅমলেন্দু দত্ত

বিপুল উচ্ছ্বাস জাগে হৃদয়ের গোপন কোঠায়:
ওই মসীমাখা নভ—তারি মাঝে অজস্র তারকা—
মোর চিত্তাকাশে তারা কত শত মুকুল ফোটায়।
ওই দীর্ঘ শুভ্রোজ্জ্বল ছায়াপথ—দিগন্তবিসারী রেখা
অপূর্ব্ব আবেগ তোলে। আলো-ছায়া সুন্দর-ভীষণ
মিলিয়া আমার চোখে ধরা দেয় অপরূপ রূপে।
পুঞ্জীভূত ঘন মেঘ ধীরে ধীরে ত্যজি জন্মাসন
দূরান্তরে চলে যায় জমেছে যা' মর্ম্মমাঝে চুপে।

কল্পনা-প্রবাহ মোরে নিয়ে চলে ধরা হতে দূরে
হৃদয়-মুকুল যেথা ফুটে রয় ঝরে না কখন,
বাস্তব-সীমার শেষে বিচরণ করি কল্পপুরে।
চিরসুন্দরের ধ্যানে মধু রাতে হই নিমগন।

আপনারে ফিরে পাই, জন্মান্তর-স্মৃতি জাগে মনে
নিঃশেষে সঁপিয়া দিনু যেহেমন সুন্দর-চরণে।

রসরাজ অমৃতলাল বসু

১৮৫৩ - ১৯২৯

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ; শৈশব-শিক্ষা

১৮৫৩ সনের ১৭ই এপ্রিল (১২৬০, ৬ই বৈশাখ) শ্রীরাম নবমীর দিন কলিকাতায় অমৃতলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—কৈলাসচন্দ্র বসু ; তিনি এক সময়ে যথাক্রমে ওরিয়েণ্টাল সেমিনরীর সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

অমৃতলালের শৈশব-শিক্ষা শুরু হয়—পিতৃপ্রতিষ্ঠিত কম্বুলিয়াটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ে (বর্ত্তমানে 'শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল') ; এই সময়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী তাঁহার সতীর্থ বন্ধু ছিলেন। এখানকার পাঠ সাঙ্গ করিয়া তিনি দুই বৎসর হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৯ সনে জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউশন হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া অমৃতলাল দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

বিবাহ

এনট্রান্স পরীক্ষা দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, ১৫ বৎসর বয়সে, অমৃতলালের বিবাহ হইয়াছিল। পাত্রী—শালিখার ভূম্যধিকারী জয়নারায়ণ ঘোষের পৌত্রী, বয়স ৯ বৎসর। কৈলাসচন্দ্র পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই ; এই ঘটনার তিন বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

ডাক্তারি

ছেলেবেলা হইতেই চিকিৎসা-বিদ্যার দিকে অমৃতলালের ঝোঁক ছিল। তিনি এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন ; এখানে রাধাগোবিন্দ কর (আর. জি. কর) তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। অমৃতলাল মাঝে মাঝে কাশী গিয়া পিতৃবন্ধু প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ লোকনাথ মৈত্রের নিকট অবস্থান করিতেন। মোটের উপর দুই বৎসর মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নের পর, এলোপ্যাথির পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তিনি হোমিওপ্যাথি চর্চ্চার জন্য কাশীতে রহিয়া গেলেন।

কাশীতে অবস্থানকালে অমৃতলালের ইংরেজী পড়ার নেশা জমিয়া উঠিয়াছিল। কুইন্স কলেজের অধ্যক্ষ রাজচন্দ্র সান্যাল তাঁহাকে লাইব্রেরী হইতে ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের ইতিহাস, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি অনেক বিষয় পড়িবার সুযোগ দান করিয়াছিলেন। অমৃতলাল বলিয়াছেন, "জীবনে যদি আমি কিছুমাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকি, তজ্জন্য সান্যাল মহাশয়ের নিকটে আমি অনেক অংশে ঋণী।"

১৮৭২ সনের মাঝামাঝি, লোকনাথবাবুর পত্র লইয়া, অমৃতলাল বাঁকিপুরে ডাক্তারি করিতে যান। কিন্তু মাস-কয়েক পরেই তাঁহার জীবনের গতি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

"কাশী হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতাম। এখানে অবস্থানকালে আমাদের কম্বুলিয়াটোলার স্কুলে শিক্ষকতা করিতাম ; বেতন লইতাম না। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, চুনীলাল বসু, প্রিয়নাথ সেন আমার ছাত্র। অর্দ্ধেন্দুশেখর ও ধর্ম্মদাস সুর তখন এই স্কুলে মাষ্টারি করিত। আমার বাবা, কাকা, মামা, সকলেই ইস্কুল-মাষ্টারি করিয়াছিলেন ; আমিও মাষ্টারি করিতাম। অর্দ্ধেন্দু বলিলেন—'তুমি এসেছ ভালই হয়েছে ; লীলাবতীর অভিনয় করতে হবে।' নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত ব্যবস্থা করিবার ভার লইলেন।...লীলাবতীর রিহার্সাল চলিতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু আমাকে জোর করিয়া যোগজীবনের ভূমিকা লওয়াইলেন।...আমাদের রিহার্সাল হইত গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে ; গাঙ্গুলী হাই-কোর্টের কর্ম্মচারী ছিলেন।...এক দিন আমাদের পুরা মজলিস বসিয়াছে, গোবিন্দ হাইকোর্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে আমাদিগকে বলিলেন—'দেখ, হাইকোর্টে শুনে এলাম, সত্য মিথ্যা বলিতে পারি না, লর্ড মেয়োকে না কি আণ্ডামান দ্বীপে খুন করেছে [৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২]।' সেদিন মজলিস বন্ধ হইয়া গেল।...তালিম দেওয়া যখন শেষ হইয়া আসিল, কাশী হইতে লোকনাথ বাবু কলিকাতায় আসিয়া আমাকে কাশীতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। বন্ধুরা কত কাকুতি মিনতি করিলেন ; তিনি কাহারও কথায় বিচলিত হইলেন না। আমার আর ষ্টেজে দাঁড়ান হইল না।

"১৮৭২ সালের গোড়ায় কাশী পরিত্যাগ করিয়া বাঁকিপুরে আসিলাম। ঐ বৎসরের নবেম্বর মাসে বাঁকিপুর হইতে কলিকাতায় আসিলাম। বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার উপলক্ষে এই যে বাঁকিপুর ছাড়িলাম, আর সেখানে ডাক্তারি করিবার জন্য ফিরিয়া যাইতে হইল না।

"কলিকাতায় আসিয়া যেদিন প্রথম আমি আমাদের স্কুল দর্শন করিতে যাই, অর্দ্ধেন্দু আমাকে দেখিয়া ক্লাস হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখনই হেড মাষ্টারের নিকট হইতে ছুটি লইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া ভুবন নিয়োগীর বাগবাজারের গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকখানায় গেল। গঙ্গাতীরে সেই সুন্দর অট্টালিকার কোনও চিহ্ন এখন নাই ; পোর্ট-ট্রষ্টের কল্যাণে সেটি লুপ্ত হইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে অর্দ্ধেন্দু আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। গিরিশবাবুর সঙ্গে মনোমালিন্য হইয়াছে।... গিরিশবাবু বলিয়াছিলেন, 'থিয়েটারের জন্য একখানা ভাল

বাড়ী না করিয়া টিকিট বেচিবার ব্যবস্থা করিলে কিছুই হইবে না ; আগে ভাল বাড়ী, ভাল ষ্টেজ কর, তারপরে টিকিট বিক্রয় কর ; নইলে লোকে টিকিট কিনিবে কেন ?' অর্দ্ধেন্দু ও নগেন্দ্র বন্দ্যো বলিলেন—'আমরা ছোট বাড়ীতেই আরম্ভ করি, ছোটখাটো ষ্টেজ করি ; একেবারে বড় বাড়ী বড় ষ্টেজ কোথায় পাওয়া যাবে ?' এই কথা লইয়া দলাদলির সূত্রপাত হইয়াছিল। এ সকল বিষয় আমি কিছুই জানিতাম না ; আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম না। যখন গঙ্গার তীরে ভুবন নিয়োগীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখন বুঝিলাম গিরিশ বাবুকে বাদ দিয়াই থিয়েটর করিতে হইবে।...দ্বিতলের প্রকাণ্ড হলে আমরা নীলদর্পণের অভিনয় চালাইতাম। আমার কোনও পার্ট লইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু সকলে মিলিয়া চাপাচাপি করিয়া ধরিল, বলিল—'তুমি সৈরিন্ধ্রীর পার্টটা নাও ; বেশী নয়, দু-এক রাত্রি তুমি প্লে কর ; তার পর না হয় আমরা অন্য ব্যবস্থা করে নেবো।' সেই দু-এক রাত্রি করিতে করিতে আজ চুয়াল্লিশ বছর কাটিয়া গেল।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ২য় পর্য্যায়, পৃ, ৯৪-৯৭)

রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপে

১৮৭২ সনের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই দিন কলিকাতায় সাধারণ-রঙ্গালয়ের ('ন্যাশনাল থিয়েটারে'র) প্রতিষ্ঠা হয়। এই তারিখে অভিনীত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে ১৯ বৎসর বয়স্ক অমৃতলাল সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় সর্ব্বপ্রথম পাদপ্রদীপের সম্মুখীন হন। তিনি বলিয়াছেন :—

"যথাসময়ে তৃতীয় দৃশ্যে সীন উঠিল ; আমি সৈরিন্ধ্রী বেশে ষ্টেজের উপর উপবিষ্ট। চাহিয়া দেখি, আমার গুরুস্থানীয় কয়েক জন ভদ্রলোক সম্মুখে বসিয়া আছেন। মুহূর্ত্তের জন্য আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল ; আমি যেন তখন সমাজচ্যুত, জাতিচ্যুত, ধর্ম্মচ্যুত হইয়া আমার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত লজ্জার ভার শিরে বহন করিয়া আমার গুরুজনদিগের সম্মুখে নারী-বেশে উপবিষ্ট হইয়াছি ; যেন মনে হইল, টিকিট বেচিয়া পাবলিক ষ্টেজে অভিনয় করিয়া আমি আমার সমাজকে, স্বদেশকে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে আজ যে লজ্জা দিতেছি তাহার একমাত্র শাস্তি—বহিষ্করণ। আমার তখনকার মনের ভাব আজ আপনারা বুঝিতে পারিবেন না। তখন সমাজ ছিল, সমাজ বন্ধন ছিল, সমাজদ্রোহিতার শাস্তি ছিল। মুহূর্ত্তের জন্য আমার মাথা ঘুরিয়া গেল ; পরক্ষণেই ভাবিলাম এ যা হবার তা ত হ'ল ; এখন যদি ভাল করিয়া প্লে করিতে না পারি, তাহা হইলে গঞ্জনা লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। কায়-মনোবাক্যে নীলদর্পণের সৈরিন্ধ্রী হইলাম। বাহবা ধ্বনির তালে তালে 'সীন' পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।...পর সপ্তাহে অমৃত বাজার পত্রিকা সৈরিন্ধ্রীর সমালোচনা করিয়া লিখিলেন—'তাহার রোদনস্বর অপূর্ব্ব বলিতে হইবে।"

অমৃতলালের অবশিষ্ট জীবন কলিকাতার সাধারণ রঙ্গালয়—ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল অপেরা কোম্পানী, বেঙ্গল, ষ্টার, মিনার্ভা প্রভৃতির সহিত ওতপ্রোত হইয়া আছে। নাট্যজীবনে অমৃতলালের প্রথম গুরু—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "কবিবর গিরিশচন্দ্র সাধারণ-নাট্যশালা-স্থাপনের কতকটা বিরোধীই ছিলেন, সুতরাং একমাত্র এই অর্দ্ধেন্দুই ন্যাশানাল থিয়েটারের তৎকালীন সুদক্ষ অভিনেতাদিগকে শিক্ষা-পরামর্শদানে প্রস্তুত করিয়া তুলেন। নীলদর্পণের সৈরিন্ধ্রী, নবীন তপস্বিনীর বিজয় ও নব-নাটকের সুবোধ প্রভৃতি প্রথম নাট্যজীবনের কয়েকটি ভূমিকা গ্রহকার ইঁহারই নিকটে শিক্ষা করেন" ('অমৃত-মদিরা')। গুরুর ন্যায় অমৃতলালও প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার গৌরব অর্জন করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের ভাষায়—"হাস্য-রসাভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু, বেল বাবু এবং ভুনিবাবু (নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু) এই তিন জনেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।...যে চরিত্রে শ্লেষ আছে—তাহার অভিনয়ে ভুনিবাবু অতুলনীয়।"

যৌবনে অমৃতলাল যাঁহাদের সহিত নাট্যক্রীড়ায় যোগদান করিয়াছিলেন, কালসহকারে তাঁহাদের অনেকে প্রতিদ্বন্দ্বী রঙ্গালয়ের সহিত যুক্ত হইলেও পরস্পরের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব প্রীতির আকর্ষণ ছিল। মহেন্দ্রলাল বসুর মৃত্যু হইলে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধারযোগ্য ; পত্রখানি এইরূপ :—

"মহেন্দ্র সকলকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, আমার প্রাণে কি ব্যথা লাগিয়াছে, তাহা আপনিই বুঝিবেন। আমাদের সেই সুদূরগত প্রথম নাট্যজীবনের স্বার্থশূন্য Romantic প্রেমের দৃষ্টান্ত জগতে যে অধিক মিলিতে পারে, এমন বোধ হয় না। গত বৃহস্পতিবারে আমার একটি প্রায় তিন বৎসরের মধুরভাষী দৌহিত্রী আমাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, কন্যা আমার সূতিকাগারে পড়িয়া কাঁদিতেছে, আমার বড় কষ্ট, তবু বুঝিতেছি যে, এ শোক সোডা ওয়াটারের তুল্য ; কিন্তু বেল, মতি, মহেন্দ্রের শোক সীতাকুণ্ডের ন্যায় চিরদিন গুপ্তভাবে ফুটিতে থাকিবে। কতবার ঝগড়া করিয়াছি—সেই ঝগড়ার মধ্যেও কি মধুর মিলনাকাঙ্ক্ষা ছিল!

"তথাপি আপনার লিখিত মহেন্দ্রের স্মৃতি-উপহারস্বরূপ সরল সত্য বিষাদ-গাম্ভীর্য্যপূর্ণ হৃদয়ের কথা কয়টি পড়িয়া ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি যেন আগে মরি, আপনি আমায় মনে করিয়া দু-ফোঁটা চক্ষের জল ফেলুন। অতি চমৎকার লেখা—সূর্য্যদেব আপনি সাবধানে অন্তরে রহিয়া চন্দ্রকে ফুটিতে দিয়াছেন ; কিন্তু যে জানে, সে বুঝিতেছে যে—সূর্য্যের কিরণই চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া এত মনোহর হইয়াছে। প্রায় অন্ততায়ই এই আঁকা-বাঁকা লেখা। ১৭-৩-১৯০১।—স্নেহের অমৃত।"

প্রাথমিক রচনা

অমৃতলাল শৈশবাবধি বাংলা-সাহিত্যে অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার বাংলা রচনার—বিশেষতঃ 'প্যারডি' রচনার গোড়ার সূত্রটি তিনি স্মৃতিকথায় এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন:—

"আমার একজন দূরসম্পর্কীয় কাকা ছিলেন; তাঁহার নাম প্যারিমোহন বসু।…তখনকার খৃষ্টান পাদরীর স্কুলে বিদ্যালাভ



রসরাজ অমৃতলাল বসু

করিয়া তাঁহারা পঠদ্দশায় বাংলা ভাষার চর্চা করিবার বড় একটা অবসর পান নাই, কিন্তু ল্যাটিন গ্রীক পড়িয়াছিলেন।… তিনি আমাকে একটু একটু ল্যাটিন গ্রীক পড়াইতেন, আমি তাঁহাকে বাংলা বই পড়িয়া শুনাইতাম; 'ভাস্কর' কাগজখানা প্রায়ই তাঁহাকে শুনাইতে হইত। ক্রমশঃ তাঁহার বাংলা রচনার দিকে একটা প্রবল ঝোঁক হইল। তিনি শ্লেষ-রচনায় সিদ্ধহস্ত হইলেন; 'ভাস্করে' তাঁহার সেই সকল parody প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। মাইকেলকে লইয়া তিনি parody করিতেন। মাইকেল লিখিয়াছেন—

আহা, শৈবালের দলে শোভে যেই রত্নরাজি,

প্যারিকাকা লিখিলেন—

আহা, বৃষভের ল্যাজে শোভে যেই পুচ্ছরাজি,…

পুনশ্চ, মাইকেলকে অনুকরণ করিয়া তিনি লিখিলেন—

আমি হনু, এ বিপুল বিশ্বে কে না ডরে
দেখি মোর লাক!

তাঁহার এই সকল শ্লেষ-রচনার ক্রমে আমি তাঁহার শাক্রেদ হইয়া উঠিলাম; অনেক সময়ে তিনি আমাকে পাদপূরণের জন্য আহ্বান করিতেন। আমার রচনায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলে আমি কৃতার্থ হইতাম। ইহার পূর্ব্বে কবিতা রচনায় আমার হাতে খড়ি দিয়াছিলেন আমাদের এই শ্যামবাজার স্কুলের পণ্ডিত ব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।…আমরা বিদ্যালয়ে নানা ছন্দে কবিতা রচনা করিতে অভ্যাস করিলাম। পরে প্যারিকাকার নিকটে অভয় পাইয়া ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে আমার প্রথম চিত্রকাব্য রচিত হয়। আমার সেই প্রথম রচনাটি মোটেই রসাত্মক নহে, কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ শব্দ মাত্র। আদ্য-ক্ষরগুলি একত্র জুড়িলে আমার নামটি বানান করা হয়। এখনও আমার সেটি মুখস্থ আছে—

শ্রীশ্রীহরিপদে যে বা করয়ে স্মরণ।
অবনী ভিতরে সেই আদরের ধন॥
মৃত্যুভয় নাহি থাকে সদা আনন্দিত।
তপ জপ করে সদা মনের সহিত॥
লালসা নাহিক ধনে মোক্ষ প্রয়োজন।
লভিতে লালসা মাত্র ঈশ্বর চরণ॥
বলি ঈশ্বর চরণ খোঁজে মোক্ষপথ।
সুজন স্বজন তার শত্রু হয় হত॥

এ কবিতাটি লিখিয়া আমার মোটেই আনন্দ হয় নাই। কোনও রকম করিয়া মিল চাই; এ ত হইল শব্দের গোঁজামিল মাত্র। প্যারীকাকা বলিলেন—'একটা ভাল ক'রে পদ্য লেখ না!' তখন সবেমাত্র স্যর রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু [১৯ এপ্রিল ১৮৬৭] হইয়াছে। তিনি বলিলেন 'স্যর রাধাকান্ত দেবের উদ্দেশে একটা ক'বতা লেখ না!' আমি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মাইকেলের 'রেখো মা দাসেরে মনে' কবিতাটির ছন্দে একটা পদ্য রচনা করিলাম। প্যারীকাকার তাহা এত ভাল লাগিল যে তিনি তাহা 'ভাস্করে' প্রকাশিত করিয়া দিলেন। এই আমি প্রথম আমার লেখা ছাপার অক্ষরে দেখি। কবিতাটি আমার নিজেরও বেশ পছন্দসই হইয়াছিল। কিন্তু শ্লেষ-রচনার দিকেই আমার প্রবণতা বেশী রহিয়া গেল। আমার মধ্যে কিছু সহজ সরসতা, native wit, ছিল; তিনি তাহা ফুটাইয়া তুলিলেন।…

প্যারীকাকার মৃত্যুর পরে আমার বাংলা রচনা দিন কতক বন্ধ ছিল। ঘটনাচক্রে আমি একখানা প্রহসন নাটক লিখিয়া ফেলিলাম; আমাদের পাড়ায় একটা সখের যাত্রার দল ছিল—এক দিন তাহারা আমাকে ধরিয়া বসিল—'আপনি একটা আমাদের পালা লিখে দিন।' আমি বলিলাম, 'আমি কি লিখে দেব?' তাহারা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল; একখণ্ড দাশুরায়ের পাঁচালি আমার কাছে রাখিয়া গেল। আমি তখন সবেমাত্র পড়িয়াছি 'একেই কি বলে সভ্যতা?' তাহারই অনুকরণে আমি একখানা Farce রচনা করিলাম; নামটা বড় ছোটখাট হইল না—'একেই কি বলে তোদের বাংলা সাহিত্যের উন্নতি করা?' এই রচনাটি এখন একেবারে লুপ্ত।…

রস-সাহিত্য-রচনার জন্য আমি আর একজনের নিকট অত্যন্ত ঋণী। তিনি 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশির ঘোষ। কাশীতে যখন লোকনাথ বাবুর বাসায় ছিলাম,

'অমৃত বাজার পত্রিকা' পাঠ করিতাম। তখন কাগজখানি বাংলা ভাষায় পরিচালিত হইত ; যশোর হইতে নিয়মিতভাবে কাগজ বাহির হইত ; কলিকাতা সহরে তখনও বড় একটা জাহির হয় নাই। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র হাস্যোদ্দীপক প্রসঙ্গ 'বিবিধ' নামে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। তেমন সরস Comic titbits আমাদের সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। পঞ্চানন্দের প্রথম আমলে অনেকটা ইন্দ্রনাথে সেই খাঁটি রস উপভোগ করা যাইত। আমি পত্রিকার সেই অংশটার রসপ্রাচুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম।" ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' দ্বিতীয় পর্য্যায়, পৃ. ৮২-৬)

অমৃতলালের ষ্টেজে লেখার প্রথম হাতে খড়ি 'মডেল স্কুল' নামে একটি নক্‌শা ; ইহা ১৫ জানুয়ারি ১৮৭৩ তারিখে ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন :—

"লেফটেনান্ট গবর্নর সার জন ক্যাম্বেলের মাথায় ঢুকলো যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর জন্য এমন একটা সার্ভিস তৈরি করতে হবে, যাতে এক-একজন এক-একটা বিদ্যাকল্পদ্রুম হ'তে পারে। সাধারণ কেতাবি বিদ্যে ত থাকবেই, তার ওপর একটু কেমিষ্ট্রি, একটু বোট্যানি, সারভেয়িং, জিম্‌ন্যাষ্টিক, সাঁতার ইত্যাদি ইত্যাদি। সুরসিক শিশিরবাবু ক্যাম্বেলি সম্বন্ধে রহস্য কোরে তাঁর 'অমৃত বাজারে' [২ মে ১৮৭২] একটি কার্টুন ছাপান, জিম্‌ন্যাষ্টিকের পোষাক-পরা, কোমরে একটি পেছন দিকে ঝোলান শিকলি আর কানে একটি চিম্‌টে (চিম্‌টেটা হচ্ছে কম্পাস)......



ক্যাম্বেলের মডেল ডেপুটি (ব্যঙ্গচিত্র)

ঐ কার্টুন দেখে-ই ও শিশিরবাবুর ইঙ্গিতে আমি এক নক্সা লিখি, জোড়াসাঁকোর সান্ন্যাল-বাড়ীতে তার অভিনয় হয় ; শ্মশ্রুবিহীন ছোকরা আমি, তাতে প্রফেসর আর বড় বড় দাড়ী গোঁফ-পরা হিঁদু-মুসলমান ছাত্র, পরিচ্ছদ শিশিরবাবুর কার্টুনের অনুরূপে কানে চিম্‌টে কোমরে শিকলি, খালি প্রফেসরের পেণ্টুলেন চাপকান। কচুপাতা কেটে খণ্ড খণ্ড ক'রে বুঝিয়ে দিতুম, যত-ই খণ্ড খণ্ড করিয়াছি, তত-ই কচুপাতা হচ্ছে, একখানাও কলাপাতা হচ্ছে না, দেখ বোট্যানির কি আশ্চর্য্য মহিমা। দেশলাই জ্বেলে কেমিষ্ট্রির আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়ে বলতুম যে, দেখ, দেশী আগুনের চেয়ে বিলিতী আগুনের ভিতর কি গুপ্ত তেজ, তোমরা হাকিম হয়ে মফঃস্বলে গিয়ে সবাইকে বুঝিয়ে দেবে, যেন সকলে বিলিতী আগুন ঘরে ঘরে রাখে ; জমীতেই সাঁতার শেখবার কসরত হ'ত, আর আমি নানা রকম সেলামের উপর এক লম্বা লেক্‌চার ঝাড়তুম। ঐ মডেল স্কুলের "নক্সাই" বোধ হয় আমার ষ্টেজে লেখার প্রথম হাতে খড়ি ; আর-ও নানা বিষয়ে ও রকম ৮।১০ খানা নক্সা নিজে একা বা গিরিশবাবুর সাহায্যে সে সময়ে বা তার কিছু পরে লেখা হয়েছিল ; ২।১ খানা বোধ হয় গিরিশ-গ্রন্থাবলীতে স্থান পেয়েছে, আর সব কোথায় গিয়েছে।" ("পুরাতন পঞ্জিকা" : 'মাসিক বসুমতী,' বৈশাখ ১৩৩১)

অমৃতলালের রচিত প্রথম নাটক—'হীরকচূর্ণ' ১৮৭৫ সনের জুন মাসে প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার বয়স ২২ বৎসর। "তখন মল্‌হার রাও গাইকবাড় ও কর্ণেল ফেয়ার ঘটিত ব্যাপার লইয়া দেশময় জল্পনা কল্পনা হইতেছিল ; রেসিডেণ্ট সাহেবকে হীরকচূর্ণের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান হইয়াছিল ; এই অপরাধে গাইকবাড় অভিযুক্ত। কৃষ্ণদাস পাল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় লিখিলেন—'আমরা এক শত গাইকবাড়কে হারাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু একজন নর্থব্রুককে হারাইতে প্রস্তুত নহি।'—আমি এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া 'হীরকচূর্ণ' নামে একখানি নাটক লিখিলাম ; দুষ্টুমি করিয়া কিছু হাসি ঠাটা করিলাম। নাট্য-সাহিত্যে এই নাটকখানি আমার প্রথম রচনা।" প্রকৃতপক্ষে, নাট্যকার-হিসাবে অমৃতলাল প্রতিষ্ঠা লাভ করেন ইহারও ৯ বৎসর পরে—'বিবাহ বিভ্রাট' রচনা করিয়া।

রঙ্গালয়ে অধ্যক্ষতা

গ্রেট ন্যাশনাল।—১৮৭৫ সনের শেষ ভাগে অমৃতলাল ২২ বৎসর বয়সে সর্ব্বপ্রথম রঙ্গালয়ের ম্যানেজার বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন ; তখন তিনি ভুবনমোহন নিয়োগী-প্রতিষ্ঠিত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে। এই সময়ে তাঁহার রচিত প্রথম নাটক—'হীরকচূর্ণ' অভিনীত হয় (২৫ ডিসেম্বর) ; ইহাতে তিনি নিজেও একটি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় দুই মাস পরে—১৮৭৬, ১৯এ ফেব্রুয়ারি গ্রেট ন্যাশনালে যে অভিনয় হয় উহা বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা ; কারণ, এই অভিনয়ের ফলেই গবর্মেণ্ট নাট্যশালাকে দমন করিবার জন্য আইন

করেন। ঘটনাটি এই :—সম্রাট্‌ সপ্তম-এডওয়ার্ড প্রিন্স-অব-ওয়েলসরূপে কলিকাতায় আসিলে ১৮৭৬ সনের জানুয়ারি মাসের গোড়ায় হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে আহ্বান করেন। যুবরাজ তাঁহার বাড়ীতে পদার্পণ করিলে মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী ও অন্যান্য মহিলারা তাঁহাকে শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি করিয়া ভারতীয় প্রথায় বরণ করেন। এই ব্যাপারে কলিকাতার বাঙালী সমাজে অত্যন্ত আন্দোলন উপস্থিত হয়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাজীমাৎ" শীর্ষক কবিতা এই উপলক্ষেই লেখা। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারও এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়া একখানি প্রহসন অভিনয় করেন। প্রহসনখানির নাম—'গজদানন্দ ও যুবরাজ'। একজন সম্ভ্রান্ত ও রাজভক্ত প্রজাকে ব্যঙ্গ করিয়া হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য পুলিস হইতে এই প্রহসনের অভিনয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ২৬এ ফেব্রুয়ারি 'কর্ণাটকুমার নাটক' এবং 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' প্রহসনটিকে 'হনুমান চরিত্র' নাম দিয়া আবার উহার অভিনয় করা হইল—ইহাও পুলিসের আদেশে বন্ধ হইয়া গেল। ১লা মার্চ তারিখে পুলিসকে ব্যঙ্গ করিয়া 'The Police of Pig and Sheep' নামে প্রহসন ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অভিনীত হইল। গবর্মেণ্ট এক দিকে যেমন নাট্যশালাকে সংযত করিবার জন্য আইন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অপর দিকে তেমনই গ্রেট-ন্যাশনালের কর্মকর্তাদিগকে অন্য উপায়ে শাস্তি দিবার উদ্যোগ করা হইল। ৪ঠা মার্চ যখন অভিনয় চলিতেছিল, তখন পুলিসের ডেপুটি কমিশনার সদলবলে গিয়া গ্রেট ন্যাশনালের ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু, এবং মতিলাল সুর, বেলবাবু-প্রমুখ আট জন অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিলেন। অপরাধ—পূর্ব্বে অভিনীত 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অশ্লীল। ৮ই মার্চ ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে ডিরেক্টর উপেন্দ্রবাবু ও ম্যানেজার অমৃতলালের এক মাস করিয়া বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল; অন্য সকলে মুক্তিলাভ করিলেন। এই বিচারের পর দিন ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইল। আপীলে উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল উভয়েই মুক্তি পাইলেন।

এই ঘটনার অল্প দিন পরেই—অমৃতলাল পুলিসের চাকুরী লইয়া পোর্ট ব্লেয়ারে গমন করেন (এপ্রিল ১৮৭৭)। তথায় এক বৎসর কাটাইবার পর তিনি কলিকাতা ফিরিয়া আবার রঙ্গালয়ে যোগদান করিয়াছিলেন।

ষ্টার।—পূর্ব্বে যেখানে মনোমোহন থিয়েটার অবস্থিত ছিল, সেই জমি ভাড়া লইয়া, গুর্ম্মুখ রায় নামে জনৈক মাড়োয়ারী ষ্টার থিয়েটারের পত্তন করেন। ২১ জুলাই ১৮৮৩ (৬ শ্রাবণ ১২৯০) তারিখে গিরিশচন্দ্রের 'দক্ষযজ্ঞ' লইয়া এই রঙ্গমঞ্চের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। অমৃতলালও এই দলে ছিলেন। বৎসরাবধি থিয়েটার চালাইয়া গুর্ম্মুখ অবসর গ্রহণ করেন। ইহার তিন বৎসর পরে, যে জমির উপর ষ্টার রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত ছিল তথায় 'এমারেল্ড থিয়েটার' স্থাপনের মানসে গোপাললাল শীল উহা ক্রয় করেন। ষ্টার-সম্প্রদায় ১৮৮৭ সনের মধ্য ভাগে, ইঞ্জিনীয়ার যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের পরিকল্পনা অনুসারে, হাতী-বাগানে নূতন রঙ্গালয় নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করেন; গিরিশচন্দ্রের 'নসীরাম' নাটক লইয়া নবনির্ম্মিত ষ্টার রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনয় হয়—১৮৮৮, ২৫এ মে (১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫) ফুলদোলের দিন। অমৃতলালই ষ্টারের অধ্যক্ষ (অন্যতম স্বত্বাধিকারীও বটে) নিযুক্ত হন। এই পদ তিনি ২৫ বৎসর অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে অমৃতলাল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত নাট্যগ্রন্থের অভাবে কোন রঙ্গালয়ই সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে না। তাই তিনি নব নব নাট্যগ্রন্থ রচনা করিয়া ষ্টার থিয়েটারের সে অভাব বহুলাংশে পূরণ করিয়াছিলেন। 'নসীরাম' অভিনয়ের অল্প দিন পরেই ষ্টারে 'সরলা' অভিনীত হয়। 'সরলা' তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-রচিত 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের অমৃতলাল-কৃত নাট্য-রূপ। ইহার অভিনয় কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, সেকালের পাক্ষিক 'অনুসন্ধানে'র নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে :—

"ষ্টার কোম্পানী সময় বুঝিয়া—লোকের রুচির প্রতি লক্ষ্য করিয়া নাটক-চিত্রের উৎকর্ষ দেখাইতে অগ্রসর হইলেন। কোম্পানীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয়কেও ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না; সুপ্রসিদ্ধ 'স্বর্ণলতা' উপন্যাস হইতে তিনি বেশ দক্ষতার সহিত "সরলা"-চরিত্র নাটকাকারে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ধর্ম্মের ঢেউ, হরিবোলের ধুম এখন কিছু মন্দীভূত হইতে চলিল। যে অভিনয় দর্শনে আত্মহারা হইয়া অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও মন তন্ময়ত্ব ভাবে বিভোর হয়, যাহা দেখিয়া যুগপৎ বিস্ময়, হর্ষ, শোক, ক্রোধ, বীভৎস প্রভৃতি রসের আবির্ভাব হইয়া থাকে, সেই ত অভিনয়, সেই ত নাট্য-চিত্র। উপস্থিত 'সরলা' নাটকের অভিনয় দেখিয়া আমরা সে আশার সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিয়াছি। ইহার কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে সুখ্যাতি করিব?...এ অভিনয়ে, সমাজের যথেষ্ট উপকার হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই অভিনয়ে আমরা কায়মনবাক্যে কোম্পানীর মঙ্গল প্রার্থনা করি।" (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮)

রঙ্গালয়ের উপযোগী নাটক রচনা সম্বন্ধে অমৃতলাল কিরূপ সজাগ ছিলেন, ১৮৯৫ সনে ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রখানি এইরূপ :—

"পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদবরেষু,— ...একখানি নূতন নাটক শীঘ্র লিখিতে হইবে এজন্ত অত্যন্ত চিন্তিত আছি। শেষ নূতন নাটক 'চন্দ্রশেখর' ও শেষ নূতন প্রহসন 'একাকার' সাধারণের

বিশেষ সন্তোষ বিধান করিয়াছে। এবার যাহা অভিনীত হইবে তাহা উক্ত পুস্তকদ্বয় অপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী হওয়া চাই। কলিকাতায় দর্শকের নিকট নাটকের গুণাগুণ এইরূপে বিচার হইয়া থাকে—কচুরি কচুরির মত ও রসগোল্লা রসগোল্লার মত সুস্বাদু হইলে হইবে না। কচুরির পর রসগোল্লা আহার করিলে রসগোল্লার লবণত্বের অভাবের অভিযোগ হইবে এবং ঐরূপ রসগোল্লার পর কচুরি দিলে কচুরির ভিতর শার্কর রস নাই বলিয়া ভোক্তা মুখ বিকৃত করিবেন। অনন্যগতি হইয়া চির-অভ্যস্ত প্রথায় দয়াময়কে বলিতেছি "হরি —লেখনীতে আসিয়া অবতীর্ণ হও —নান্যির্গতিরণ্যথা।... ২ জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ ('ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন,' কার্ত্তিক ১৩২৮)

অধ্যক্ষরূপে অমৃতলাল ষ্টার রঙ্গমঞ্চে কিরূপ নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সংযমের উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় তাহার বর্ণনা করিতেছি :—

"রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে অমৃতলালের তুলনা নাই। তিনি নিয়ম ও নিষ্ঠার বলে থিয়েটারে সর্ব্বরকমের উচ্ছৃঙ্খলতাকে নিবারণ করিয়া তাঁহার পরিচালিত ষ্টার থিয়েটারকে এক সময়ে আদর্শ থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, কি ভাবে থিয়েটার চালাইতে হয়, অতীত ষ্টার থিয়েটার তাহার সাক্ষ্য। আমি নিজে তাঁহার সময়ে ষ্টারে কায করিয়া দেখিয়াছি, এমন অপূর্ব্ব নিয়মানুবর্ত্তিতা, এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী, খুঁটিনাটি প্রত্যেক জিনিষটির প্রতি এমন সূক্ষ্ম দৃষ্টি, এমন ব্যবহার-কৌশল আর কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।...একাদিক্রমে প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল এই ভাবে থিয়েটার চালাইয়া অমৃতলাল থিয়েটারের কর্ণধারত্ব পরিত্যাগ করেন।" ("অমৃতলাল": 'মাসিক বসুমতী,' শ্রাবণ ১৩৩৬)

এই প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত অমৃতলালের একখানি পত্রও উদ্ধারযোগ্য। তিনি লেখেন :—

"পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,—....একণে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতেছি যে আমি যদি আমার ব্যবসায়কে—সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিব, তবে অপরে কেন সম্মান করিবে? জগদীশ্বরের অপার করুণায় আমার অটল বিশ্বাস আছে, তাঁহারি কৃপায় আপনার ন্যায় সাহিত্যগগনের প্রভাকরকে সুহৃদরূপে আমার জীবনে আলোকপ্রদানের জন্য লাভ করিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি বিশুদ্ধ থাকিয়া ষ্টার থিয়েটারের নাম হইতে থিয়েটারী কলঙ্ক মোচন করিতে সমর্থ হই। গোঁড়ার দল বা থিয়েটারকে ঘৃণা দেখান যাঁহাদের স্বার্থের সহিত জড়িত, তাঁহারা ভিন্ন অপর সমস্ত উচ্চ সম্প্রদায়ের নিকট ষ্টার থিয়েটার একণে সাধারণ থিয়েটার অপেক্ষা সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত নাট্যশালা বলিয়া সাদরে পরিচিত হইয়াছে।... স্নেহাভিলাষী—অমৃত।" ('ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন,' মাঘ ১৩২৭)

সার্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল রঙ্গালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া অমৃতলাল নানা ভাবে ইহার কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম যুগে অভিনেতা ও রঙ্গালয়ের নামে লোকে নাসিকা কুঞ্চন করিত। অমৃতলাল 'অমৃত-মদিরা'য় লিখিয়াছেন :—

নিজ-পরিবার-মাঝে বিরক্তিকারণ।
কুটুম্বসমাজে লজ্জা নিন্দার ভাজন।
দেশের দশের পাশে শ্লেষ ব্যঙ্গ হাঁসি।
স'রে গেছে বাল্যসখা তাচ্ছিল্য প্রকাশি।

অভিনেতা ও জনসাধারণের মধ্যে সেই অবাঞ্ছিত ব্যবধান দূরীভূত হইয়াছে। এই সংযোগ-সেতু সংগঠনের মূলে অমৃতলালের প্রভাব বড় কম ছিল না।

স্বদেশী আন্দোলন

অমৃতলাল স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন; বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় আমরা তাঁহাকে সুরেন্দ্রনাথের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখি। তিনি বক্তৃতাদিও করিয়াছেন; তাঁহার বাগ্মিতা-শক্তি ছিল। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন উপলক্ষে (ইং ১৯০৫) তাঁহার রচিত একটি সুপরিচিত গান উদ্ধৃত করিতেছি :—

(বাউলের সুর)

ওরা জোর ক'রে দেয় দিক না বঙ্গ বলিদান।
আমরা সব অন্তরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ।
আমরা জাত বাঙালী প্রেম-কাঙালী—
ভাবছিস্ তোরা মন ভাঙালি,
তা নয়, জ্বালিয়ে আগুন ক'রে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলি
প্রাণের টান।
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের মুখেতে,
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে,
আবার কর্কচেতে হয়েছে রুচি, চাই নে তোদের লবণ দান।
আমাদের তাতের সঙ্গে তাঁত বজায় থাক্,
নাই বা দেখাই সাজের জাঁক,
তোদের, ওই চকচকান মধুর চাকে করবো না আর
বিষ পান।
তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি,
ফেলবো ভেঙে মেরে তুড়ি,
ক'রে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী শাঁখায় আবার রাখবে মান।
তোদের শাপে হ'ল আশীর্ব্বাদ
দৃঢ় হ'ল মনের বাঁধ,
এই, বিসংবাদে বঙ্গভেদে, আমরা হলুম আবার তেজীয়ান্।
পেয়ে মর্ম্মে আঘাত, কর্ম্মে হাত বাকি্য ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান্।

শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল

"অমৃতলাল ছিলেন শিক্ষকের পুত্র এবং তিনি নিজেও ছিলেন আজীবন শিক্ষক—কি সমাজে, কি রঙ্গালয়ে, কি

বিদ্যালয়ে। সেইজন্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল অসীম—বিশেষতঃ পিতৃপ্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার বাল্যশিক্ষাস্থান শ্যামবাজার এ. ভি স্কুলটির প্রতি তাঁহার স্নেহভালবাসার অন্ত ছিল না। তিনি দীর্ঘ বাইশ বৎসরেরও অধিক কাল এই বিদ্যালয়টির প্রথমে সহকারী সম্পাদক এবং পরে সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বস্তুতঃ তাঁহারই যত্নে এবং চেষ্টায় এই পুরাতন মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়টি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং নিজস্ব গৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই বিদ্যালয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা অমৃতলালের শেষ জীবনের কীর্ত্তি এবং ইহার জমীক্রয় এবং বাটীনির্ম্মাণ উপলক্ষে তিনি তাঁহার অন্যান্য সহকর্ম্মিগণের সহিত জনসাধারণ এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লক্ষাধিক টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেন। ("অমৃতলাল বসু" : ক্ষেত্রভূষণ বসু—'বিশ্বকোষ,' ২য় সং.)

প্রতিভার সম্মান

অমৃতলাল দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জন করিয়াছিলেন। দেশের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলিও তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি প্রদর্শন করে নাই। ১৩৩০ সালে (ইং ১৯২৩) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচন, এবং ১৯২৫ সনে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'জগত্তারিণী সুবর্ণপদক' দান করিয়া গুণেরই সমাদর করিয়াছেন। তিনি ১৯২৩ সনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ১৪শ অধিবেশনে (নৈহাটী, ৮-৯ আষাঢ় ১৩৩০) সাহিত্য-শাখার সভাপতি, ও ১৯২৬ সনে ১৭শ অধিবেশনে (সিউড়ি, বীরভূম, ২০-২১ চৈত্র ১৩৩২) মূল সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। রসরচনার গুণে তিনি স্বদেশবাসীর নিকট "রসরাজ" নামে পরিচিত ছিলেন।

মৃত্যু

৭৭ বৎসর বয়সে, ২ জুলাই ১৯২৯ (১৮ আষাঢ় ১৩৩৬) তারিখে অমৃতলাল পরলোকগমন করিয়াছেন

রচনাপঞ্জী

রচিত গ্রন্থ।—অমৃতলালের গ্রন্থাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়া হইয়াছে তাহা বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। হীরকচূর্ণ নাটক। ১২৮২ সাল (১ জুন ১৮৭৫)। পৃ. ৬৮।…গ্রেট ন্যাশনাল ২৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫। প্রথম সংস্করণের পুস্তকের আখ্যাপত্রে গ্রন্থকারের নামের স্থলে "By an Actor" মুদ্রিত ছিল।

২। চোরের উপর বাটপাড়ি (প্রহসন)। ১২৮৩ সাল (১১ নবেম্বর ১৮৭৬)। পৃ. ৩৪।…গ্রেট ন্যাশনাল ১৮৭৫।

৩। তিলতর্পণ। (৪ জানুয়ারি ১৮৮১)। পৃ. ৪৩।

৪। ব্রজলীলা (নাট্যরাসক)। ১২৮৯ সাল (৩০ নবেম্বর ১৮৮২)। পৃ. ২৩।

৫। ডিস্‌মিশ (প্রহসন)। ১২৮৯ সাল (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩)। পৃ. ৩১।…বেঙ্গল ১২৮৯।

৬। চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে। ইং ১৮৮৪ (?)।…ষ্টার ১৬ এপ্রিল ১৮৮৪। ১৩০৪ সালে 'ব্রজলীলা' ও 'চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে' একত্রে প্রকাশিত হয়।

৭। বিবাহ বিভ্রাট ১২৯১ সাল (৯ ডিসেম্বর ১৮৮৪)। পৃ. ৬৯।…ষ্টার ১২৯১।

৮। নিমাইচাঁদ (গল্প)। (২২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯)। পৃ.২৪।

৯। তাজ্জব ব্যাপার (গীতিরঙ্গ)। ১২৯৭ সাল (২ আগষ্ট ১৮৯০)। পৃ. ৩০।

১০। তরুবালা (সামাজিক নাটক)। ১২৯৭ সাল (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১)। পৃ. ১৪৭।…ষ্টার।

১১। বিলাপ ; বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন। ১২৯৮ সাল (২২ আগষ্ট ১৮৯১)। পৃ. ২৬।…ষ্টার ৬ ভাদ্র ১২৯৮।

১২। রাজা বাহাদুর (সং—রং)। ১২৯৮ সাল (ইং ১৮৯২)। পৃ. ৪৮।…ষ্টার বড়দিন ১৮৯১।

১৩। কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা। ১২৯৯ সাল (ইং ১৮৯৩)। পৃ. ৫১।…ষ্টার ১১ পৌষ ১২৯৯।

১৪। বিমাতা বা বিজয়-বসন্ত (পারিবারিক নাটক)। ১৩০০ সাল (ইং ১৮৯৩)। পৃ. ১৫১।…ষ্টার ১১ ভাদ্র ১৩০০।

১৫। বাবু (সামাজিক নক্সা)। ১৩০০ সাল (২৭ জানুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ. ৯১।…ষ্টার ১৮ পৌষ ১৩০০।

১৬। একাকার। ১৩০১ সাল (১৯ জানুয়ারি ১৮৯৫)। পৃ. ৯৫।…ষ্টার ১১ পৌষ ১৩০১।

১৭। বৌ-মা (সামাজিক নক্সা)। ২৫ পৌষ ১৩০৩ (১১ জানুয়ারি ১৮৯৭)। পৃ. ১০০।…ষ্টার ১১ পৌষ ১৩০৩।

১৮। অবলা বল (উপন্যাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮৯৭)। পৃ. ১২৫।

১৯। চপলা (উপন্যাস)। (২৭ আগষ্ট ১৮৯৭) পৃ. ১৬২।

২০। গ্রাম্য-বিভ্রাট (সামাজিক নক্সা)। মাঘ ১৩০৪ (২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮)। পৃ. ১১৫।…ষ্টার ১৮ পৌষ ১৩০৪।

২১। সাবাস আটাশ (নক্সা)। আশ্বিন ১৩০৬ ([illegible] ফেব্রুয়ারি ১৯০০)। পৃ. ৬৫।…ষ্টার ৭ আশ্বিন ১৩০৬।

২২। কৃপণের ধন (প্রমোদ-প্রহসন)। ১৩০৭ সাল (৯ জুন ১৯০০)। পৃ. ৮০।…ষ্টার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭।

২৩। আদর্শ-বন্ধু (নাটক)। বৈশাখ ১৩০৭ (৫ আগষ্ট ১৯০০)। পৃ. ২১৪।…ষ্টার ১৬ বৈশাখ ১৩০৭।

২৪। যাদুকরী (পঞ্চরং)। ১৫ পৌষ ১৩০৭ (৩০ জানুয়ারি ১৯০১)। পৃ. ৭৮।…ষ্টার ১০ পৌষ ১৩০৭।

২৫। বৈজয়ন্ত-বাস।* মাঘ ১৩০৭ (২ ফেব্রুয়ারি ১৯০১)। পৃ. ১৭।…ষ্টার। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্গ-গমন উপলক্ষে লিখিত।

২৬। নবজীবন (মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ একাঙ্ক

নাট্যলীলা)। ১৩০৮ সাল (২৫ মার্চ ১৯০২)। পৃ. ৩৫। ...ষ্টার ১ জানুয়ারি ১৯০২।

২৭। অবতার (প্র-পরা-অপ-সং-হসন্)। মাঘ ১৩০৮ (২ এপ্রিল ১৯০১)। পৃ. ৯০+১।...ষ্টার ২৫ ডিসেম্বর ১৯০১।

২৮। অমৃত-মদিরা (কবিতা)। কার্ত্তিক ১৩১০ (২০ অক্টোবর ১৯০৩)। পৃ. ২৯০।

২৯। সাবাস বাঙ্গালী (সামাজিক নক্সা)। ১৩১২ সাল (২৮ জানুয়ারি ১৯০৬)। পৃ. ৬২।...ষ্টার ১০ পৌষ ১৩১২।

৩০। অমৃত-গ্রন্থাবলী, ১—৪ ভাগ। ইং ১৯০৬-৭, ১৯১১ (বসুমতী)। গ্রন্থাবলীর ১ম ভাগে মুদ্রিত 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক (ভাদ্র ১৩০৬, পৃ. ১২৪) প্রকৃতপক্ষে নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্নের রচনা; উহা "শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত"। গ্রন্থাবলীর ২য় ভাগে মুদ্রিত নাট্যরাসক 'সতী কি কলঙ্কিনী বা কলঙ্ক-ভঞ্জন' নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। এই দুইটি নাট্যগ্রন্থ অমৃত-গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হয় নাই। এই প্রসঙ্গে 'শনিবারের চিঠি' আশ্বিন ১৩৫২ ও কার্ত্তিক ১৩৫৪ দ্রষ্টব্য। চতুর্থ ভাগে মুদ্রিত 'সম্মতি-সঙ্কট', বিরাট বৃহস্পতি, বাহবা বাতিক ও আরও কয়েকটি রচনা সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠা হইতে পুনর্মুদ্রিত। সম্মতি-সঙ্কট দুর্গাদাস দে-সম্পাদিত 'মজলিস' পত্রের ১ম বর্ষে (মাঘ ও ফাল্গুন ১২৯৭) প্রকাশিত হয়।

৩২। খাস-দখল (নাট্যলীলা)। ? (২৮ এপ্রিল ১৯১২)। পৃ. ১৪৩।...ষ্টার ১৭ চৈত্র ১৩১৮।

৩৩। নব-যৌবন (নাটিকা)। ? (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪)। পৃ. ২১১।...মিনার্ভা ২০ ডিসেম্বর ১৯১৩।

৩৪। পুরাতন প্রসঙ্গ, ২য় পর্য্যায়। ১৩৩০ সাল (১ ডিসেম্বর ১৯২৩)।

বিপিনবিহারী গুপ্ত এই পুস্তকের ৬৩-১৩৬ পৃষ্ঠায় ১৩২২-২৩ সালে অমৃতলাল কর্ত্তৃক বিবৃত স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

৩৫। বিষবৃক্ষ (নাট্য-রূপ)। ? (২৩ মার্চ ১৯২৫)। পৃ. ১৯১।

৩৬। চন্দ্রশেখর (নাট্য-রূপ)। ? (১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৫)। পৃ. ১৭২।

৩৭। রাজসিংহ (নাট্য-রূপ)। ? (১৮ মে ১৯২৬)। পৃ. ১৮৮।

৩৮। কৌতুক-যৌতুক (নক্সা ও গল্প)। ১৩৩৩ সাল (১২ জুন ১৯২৬)। পৃ. ২৫৬।

সূচী :—আমের ধুমধাম, পণ্ডিত ডাক্তার, কৌলিক দুর্গোৎসব, শারদা-মঙ্গল, মোদ্-দা, বিদ্যা "অমূল্য ধন," বৃন্দার আনন্দ, মাতৃভক্তি, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে, বিশ্বকর্ম্মা পূজা, কবির ভাব এসেছে, হিন্দুর নব নামকরণ, ষষ্ঠীর প্রভাত, প্রতাপের গল্প, উমাকান্তের গল্প, গো-গোলযোগ, ইলিশ, মলের নব কলেবর, বিষম সমস্যা, আগমনী, থিয়েটারের শিশু, প্রেমের আবেগ।

৩৯। ব্যাপিকা-বিদায় (প্রমোদ-প্রহসন)। ? (ইং ১৯২৬)। পৃ. ৮২।...মিনার্ভা ২৫ আষাঢ় ১৩৩৩।

৪০। যদুবংশে মাতনম (হাস্যোৎসব)। কার্ত্তিক ১৩৩৩ (১৭ নবেম্বর ১৯২৬)। পৃ. ৫০।...ষ্টার ২৪ কার্ত্তিক ১৩৩৩।

৪১। যাজ্ঞসেনী (নাটক)। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ (ইং ১৯২৮)। পৃ. ১৭৬।...মিনার্ভা ২২ বৈশাখ ১৩৩৫।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

৪২। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলা (কাব্য)। ১৩৩৬ সাল। পৃ. ৪১।

সম্পাদিত গ্রন্থ।—অমৃতলাল বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে ১৩১৯ (শ্রীপঞ্চমী) সালে প্রকাশিত সচিত্র 'বীণার ঝঙ্কার' (নির্ব্বাচিত গীত, রঙ্গরস প্রভৃতি) সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি অনেক উদীয়মান লেখককে উৎসাহিত করিবার জন্য সানন্দে তাঁহাদের পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ—সুরেন্দ্রনাথ রায়ের 'শৈব্যা', আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের 'রাণীর কবর', নন্দলাল দাসের 'যুগাবর্ত্ত' ও পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গালীর গল্প' পুস্তকের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা।—পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অমৃতলালের বহু রচনা আত্মগোপন করিয়া আছে। এই শ্রেণীর রচনার নির্ভরযোগ্য তালিকা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় (৫৪শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

অমৃতলাল ও বাংলা-সাহিত্য

নাট্যালয় ও রঙ্গমঞ্চের সহিত অভিনেতা হিসাবে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকিয়া যে দুই জন সাধক বাংলাদেশে সাহিত্য-খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, অমৃতলাল তাঁহাদের অন্যতর। অপর জন নাট্যসম্রাট্ গিরিশচন্দ্র—গুরু-গৌরবে নাট্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সাধারণ সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি অমৃতলালের মত যশস্বী হইতে পারেন নাই। যাহাকে চৌকস বলা যায়, অমৃতলাল তাহাই ছিলেন। কি প্রবন্ধে কি কবিতায় অনাবিল হাস্যে ও ব্যঙ্গে ও সরস রসিকতায় তিনি একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়াছিলেন—নাটক-প্রহসনের খ্যাতি ত ছিলই। 'অমৃত-মদিরা' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি যে-জাতীয় রস পরিবেশন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। তাঁহার এই রসের বহু রচনা এখনও সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া আছে; সংগৃহীত হইয়া একত্র প্রকাশিত হইলে আমরা অমৃত-সাহিত্যের যথাযথ মূল্য নিরূপণ করিতে পারিব। 'বিবাহ-বিভ্রাট' ও 'বাবু'র অমৃতলাল এককালে যেমন বঙ্গীয় জনসাধারণের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন, ব্যঙ্গ ও হাস্যরসিক অমৃতলাল তেমনই সুপ্রকাশিত হইলে বর্ত্তমান ও অনাগত বাঙালী রসিক সমাজে মর্য্যাদা লাভ করিবেন। রঙ্গমঞ্চের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়াও তিনি সুধী সাহিত্যিক সমাজের একজন দিক্‌পাল হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন শুধু তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার বলে। 'যৌতুক-কৌতুক', 'অমৃত-মদিরা' প্রভৃতি হইতে চিরজীবী অমৃতলালের প্রতিভার বহু নিদর্শন মিলিবে।

শরণাগতা

শ্রীসুধীর সেনগুপ্ত

আয়নামতি কাপড়খানা পেয়েই ঠোঁটখানা একটু বেঁকিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলল। বিজয়ের গর্ব্বে ও নূতন পুরস্কার লাভের আনন্দে গদগদ রূপাই বলে—নাচের শেষের দিকটায় সাঁওতালী ঢঙে পা-টা এগিয়ে ঝুমঝুমিটা মাথার চারদিকে ঘুরিয়ে এনে যেমনি সামনে রাখলুম অমনি ঢাক-ঢোলের বাজনার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল হৈ হৈ রব। মেজবাবু বসেছিলেন পাশেই একটা ইজি-চেয়ারে, কাপড়খানা ছুড়ে দিলেন আমার গায়ে।

আয়নামতির বহু দিনের সাধ টকটকে লাল শাড়ীর একটা ঘোমটা মাথায় টেনে পাড়ায় বিজয়ার দিন ঠাকুর দেখতে যাবে। তাই স্বামীর লব্ধ পুরস্কার একবার বুকে চেপে ধরে, আবার দূরে রেখে চেয়ে থাকে, আবার নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকতে থাকে। স্বামীর প্রতিযোগিতার সাফল্য ও নূতনের গন্ধ ভরে দিয়েছে তার অন্তর। আয়নামতি রূপাইর বাঁ কাঁধ থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে ক্লান্ত স্বামীর মিশমিশে কাল গায়ের ওপরের শিশিরবিন্দুর মত ঘামগুলো পুঁছে দেয়, এগিয়ে দেয় হুঁকোটা, আর কল্কেটাতে নিয়ে আসে কয়েক খণ্ড টকটকে লাল কাঠকয়লার আগুন। কলকের আগুন ফুঁয়োতে ফুঁয়োতে আয়নামতির নিটোল গালের উপর পড়ে তার তপ্ত আভা, সেই ফিন্‌কি হাসির রেশটুকু তখনও তার রক্তিম অধরে লেগেই আছে।

রূপাই হুঁকোটাতে টান দেয়, আর বলে, আসছে বছর দেবীর কৃপা হলে নতুন নাচের ঢঙ দেখাব, বুঝলি।

নবমীর শেষ আরতির সঙ্গে সঙ্গে অবিরত ঢাক-ঢোলের ধ্বনিও একটা নিস্তব্ধতার যবনিকা ফেলেছে। এই গভীর রাত্রির নীরবতা ভঙ্গ করছে শুধু তারই একটা প্রতি-ধ্বনি। আশ্বিনের শেষ। আয়নামতি শত ছিন্ন মাদুরটার উপর আভাই ইঞ্চি মোটা কাঁথাখানা বিছিয়ে দিলে। এক যুগের পুঞ্জীভূত ময়লা যেন তাকে বেশ গরম করে রেখেছে। শিয়রে চটের লম্বা বালিশটায় তৈলাক্ত ময়লা জমে ভেলভেটের মতই চিক্‌চিক্ করছে। তারই উপর আয়নামতি ও রূপাই ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলে। কি এক আনন্দ-প্রবাহ তাদের ঘুম আজ কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। জেগেই আজ দেখছে তারা সুখের স্বপ্ন। সুখের রাজপুরী গড়ে, ভাঙে, আবার গড়ে, যে সুখের ইমারত গড়ে উঠে সমান ভাবেই ধনীর পালঙ্কে আর দরিদ্রের জীর্ণ কন্থায়। বিগত বাদলের শেষ বর্ষণ ঘরের ছাউনির মাঝে মাঝে কতকটা অংশ উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তাই এই সুখ-স্বপ্নে বিভোর দুইটি প্রাণীর স্বপ্নকথা শুনবার জন্যে শরতের খণ্ডমেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ এসে উঁকি দেবার সুযোগ পায়। খানিক পরে আকাশের খণ্ডমেঘ যখন সরে চলে যায়, ফুটফুটে জ্যোৎস্না এসে বিছিয়ে দিয়ে যায় শতজীর্ণ মলিন বিছানাখানা ঢেকে একখানা রূপালি বেনারসী। আয়নামতি ও রূপাই প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদের অজ্ঞাত স্পর্শে ঘুমিয়ে পড়ে।

সুগন্ধানদীর চর। নদী থেকে বহু দূরে ছোট ঘরখানি। চরের উপর সুদূরপ্রসারী ধানের ক্ষেত। নদী সেখানে পূর্ব্ব থেকে দক্ষিণে বেঁকে গিয়েছে। ওপারের অনেকখানি বালুতট যখন অপরাহ্নের আভায় রঙীন হয়ে উঠে সুগন্ধানদীর তরঙ্গের উপর লক্ষ মাণিক ছড়িয়ে দেয়, এপারের ছোট কুটীর-প্রাঙ্গণের তুলসীতলায় ভক্তি-প্রদীপটি তখন তার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে। প্রতি বছর মা-লক্ষ্মী এই সুবিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতে সোনা ফলিয়ে দিয়ে যান।

জমির মালিক চৌধুরীরাই। রূপাই তার কতক অংশে চাষবাস করে। রূপাইর ঘরের ভেতর থেকে ঠিকরে পড়া আলো নৌকারোহীদের দিক্ নির্ণয়ে সাহায্য করে। গরীব রূপাইর চালাঘরখানি চাষীদের বিশ্রামস্থল, শ্রান্ত কিষাণদের তামাক খাবার আড্ডা। ঘরের অনুচ্চ মাটির দেয়াল থেকে মাটি পড়ে গিয়ে বাঁশের কঞ্চি বেরিয়ে পড়েছে। ছাউনি খানিকটা খড়কুটার, খানিকটা শুকনো গলাপাতায় ঢাকা। ঘরের বাইরে অদূরেই তুলসীমঞ্চ। প্রতিদিন সকালে আয়নামতি একটা বা দুটো করবী দিয়ে তুলসীমঞ্চে প্রণাম করে। বাড়ীতে জবা ও করবীর গাছ অনেক। কোনো বিশিষ্ট সুগন্ধ ফুলের কৌলিন্য সেখানে অসমতার সৃষ্টি করে নি। পাশের বাড়ীর মুরলা পিসি রোজ ডালা ভরে জবা ও করবী নিয়ে যায়, বলে, তোর শাঁখা-সিন্দূর অক্ষয় হোক রূপাতি-বৌ, আমার ঠাকুরের পূজার ফুল যে তোর এখান থেকেই হচ্ছে।

ভোরে উঠে রূপাই পান্তাভাত খেয়ে এক ছিলিম তামাক টেনে মাঠে যায়, আয়নামতি বাঁ হাতে তার লাল শাড়ীর ঘোমটাটি ঈষৎ টেনে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রূপাইর দিকে যতক্ষণ না লম্বা লম্বা ধানের শীষগুলো তার সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে দেয়। রূপাই দুপুরে ঘর্ম্মাক্ত হয়ে কাস্তে হাতে ফিরে আসে, আয়নামতি ভাঙা তক্তাখানা এগিয়ে দেয় বসবার জন্য, তামাক সেজে আনে, হাতে বাড়িয়ে দেয় মুখে নল-লাগান দড়ি বাঁধা ছোট তেলের শিশিটা। কখনও বা রূপাইর পায়ের ও পরের ফুলে-ওঠা শিরাগুলোয় তেল রগড়ে দেয়। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে রূপাইর পাশেই ছেঁড়া মাদুরটার একটা

অংশ বিছিয়ে আয়নামতিও শুয়ে পড়ে, নদীর ওপার থেকে হাওয়া এসে চামর বুলিয়ে দিয়ে যায়।

রূপাই বিকেলে আর মাঠের কাজে যায় না। চৌধুরী বাড়ীর ছেলে মহলে তার আসর জমে। পিপলিতার লাঠিয়ালদের গল্প, বাঘমারার যশনৃত্য, রামনগরের হাসনুবাইজীর নাচ, এই তার গল্পের উপকরণ। ছেলেদেরও স্ফূর্তি উচ্ছল হয়ে ওঠে তখন যখন রূপাই-করাতি তাদের সান্ধ্য আসরে নায়কের পদ নিয়ে বসে। গল্পে রূপাই কল্পতরু। চাহিদা মাফিক গল্প তার মুখে লেগেই আছে।

পূজা এলে সবচেয়ে বেশী সাড়া পড়ে চৌধুরী-বাড়ীর ছেলেমহলে। প্রায় তিন মাস হ'ল মিলিটারী এসে মাঠের অর্দ্ধেক ইজারা নিয়েছে। রূপাইর মাঠের কাজ আর নেই। তাই এখন থেকে দু'বেলাই রূপাইর আড্ডা ঐ ছেলেদের ভেতরে। গেল বছরে আরতির নাচে সে পেয়েছে লাল টুক্‌টুকে শাড়ী। তার রং তার গন্ধ সে আজও ভোলে নি। এবারের পূজায় সে দেখাবে নূতন ঢঙের নাচ। তাই ছেলেদের আসরে তার গল্পের প্রধান বিষয় বিভিন্ন পাড়ার নৃত্যভঙ্গী ও তার দোষত্রুটি।

ওপাড়ার কালু নন্দীর দশ বছরের ছেলে নেচে নেচে বাজায় বেশ—কিন্তু সে একটু তালকানা, ঝোড়ু সান্‌-দাসের সানাই—শুনলেই যেন আপনা থেকে পা নাচতে নাচতে চলতে থাকে, কিন্তু সে যখন ফের দম নেবার জন্যে হাঁপ ছাড়ে তখন তাকে বেহদ্দ বেরসিক বলেই মনে হয়। হারাণ ঢাকি ওস্তাদ বটে, কিন্তু এই রূপাই-করাতির নাচের সঙ্গে দ্রুত চলতে পারে না —বুড়ো কিনা,—তাই তার হাত কাঁপে। সবচেয়ে জমিয়ে রাখে অমরী নটের কাঁসর বাজনা। বুকের উপর কাঁসরখানা রেখে যখন দাঁতের এক পাটি বার করে ডাইনে বামে মাথাটা হেলিয়ে দুলিয়ে ঢং ঢং করতে থাকে, তখন একেবারে বেতালা বুড়ো হরু ঠাকুরও তাঁর চুণকাম-করা পাকা দাড়িতে তাল ধরতে থাকে।

রূপাই এই সব গল্প করে। আর মাঝে মাঝে তার প্রশস্ত বুকখানার গভীর গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসে অযত্নে-পড়া এক একটা দীর্ঘশ্বাস, তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আয়নামতির কঙ্কালসার দেহ। আয়নামতি ম্যালেরিয়ায় ভুগছে আড়াই মাসের বেশী। যখন তার জ্বর আসে, সে মোটা কাঁথাখানা গায়ের 'পর ফেলে দিয়ে রূপাইকে বলে তার পরে চেপে বসতে। ঐ কাঁথাখানা যেমন লজ্জা নিবারণের সম্বল তেমনই জ্বরেরও মহৌষধ।

গেল বছরের চৌধুরী-বাড়ীর পুরস্কারের শাড়ীখানা এক বছরে এসে ছিন্নভিন্ন হয়ে মাত্র আড়াই হাতে দাঁড়িয়েছে। রূপাই যখন সেই ন্যাকড়াটুকু পরে চৌধুরীদের বাড়ী যায়, আয়নামতি পরে থাকে ঘরের ভিতর কাঁথাখানা জড়িয়ে। ফিরে এসে, রূপাইকে কাঁথাখানা দিয়ে ঐ ন্যাকড়ায় লজ্জা নিবারণ করে বাইরে চলে আসে। আয়নামতি নিজেকে দিনের আলো থেকে দূরে গোপনতায় ঢাকা দিয়ে রাখতে চায়। চাঁদিনী রাত ভাঙা বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে তাকে খুঁজে বেড়ায়, আয়নামতি বেড়ার ফাঁকে মুখ রেখে নীরব ভাষায় তাকে মনের কত বেদনা জানায়। কিন্তু সে যেন তার প্রতিদানে পায় শুধু ব্যঙ্গ, শুধু পরিহাস। তাই তার ভাল লাগে অমানিশার জমাট আঁধার। অন্ধকার যেন তার কত আপনার। স্নেহময়ী মায়ের মতই সে নিজের আঁচল দিয়ে সন্তানকে ঢেকে রাখতে চায়। তাই গভীরতর রাত্রে আঁধার যখন ঘনিয়ে আসে তখন ন্যাকড়াখানা জড়িয়ে ছায়ামূর্ত্তির মতই সে বাইরে চলে আসে, প্রত্যহের কাজটি শেষ করে আবার ভোরের আলোর আগেই ঘরে চলে যায়। যে বিশ্বদেবতা এই ঘনান্ধকার সৃষ্টি করেছেন তাঁকেই নিবেদন করে মনে মনে প্রাণের ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা। সে দিন রাত্রে ছায়ামূর্ত্তি দেখে সনাতন মিস্ত্রী নামে এক পথিক ভয় পেয়েছিল, সেই লজ্জা সেই ক্ষোভ সে আজও ভুলতে পারে নি।

পূজা যতই কাছে আসে আয়নামতি ও রূপাইর প্রাণে আশার মৃদু হাওয়া বইতে থাকে। এ বছরের আরতি-প্রতিযোগিতার শাড়ী যে তাদেরই প্রাপ্য। এই আশায় আয়নামতির শুষ্ক পাণ্ডুর মুখ রক্তাভ হয়ে ওঠে। তাই রূপাইও চৌধুরী-বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গ ছাড়তে চায় না।

সেজবাবু বাড়ী এসেছেন। পূজার আর চার দিন বাকী: কলকাতা থেকে তাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত পুরস্কার ত এসেই গেছে। রূপাই বাড়ীতে বসে শুধু একটা ধুনুচি নিয়ে হাত-পা ঘুরায়। আয়নামতির মলিন মুখে ঝরাফুলের মতই হাসি ফোটে। নবমীর দিন রূপাই তার এক বছরের সঞ্চিত নৃত্যকলার ভাণ্ডার উজাড় করতে কার্পণ্য করবে না। আয়নামতির শীর্ণ দেহে জড়িয়ে দেবে লাল শাড়ী। হয় ত তার জীবনে এই শেষ পুরস্কার। আহ্লাদ ও বিষাদে তার চোখের কোণে জলভরা হাসির ক্ষীণ রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আজ নবমী। সকাল সকাল রূপাই তার ন্যাকড়াখানা পরিষ্কার করে নিয়েছে। আয়নামতির আজ দু'দিন জ্বর নেই। কাঁথাখানা থেকে মুখ বার করে দেখে রূপাইর নৃত্যভঙ্গী। আর ভাবে তার স্বামী আজ রাত্রে ফিরে এলেই সে তার হাড় ক'খানা নূতন কাপড়ে ঢেকে একবার টেনে নিয়ে যাবে চৌধুরীদের ঠাকুর প্রণাম করতে।

দেখতে দেখতে রাত ন'টা হ'ল। ঢাকি ঢুলি সানাইদার সব হাজির। প্রথমে ছেলের দল ছোট ছোট ধুনুচি হাতে ঘুরে ঘুরে দেবীর আরতি করে। পরে আসে পাড়ার অন্যান্য প্রতিযোগীরা। এইবার রূপাইর পালা।

ধুনুচি হাতে রূপাই আসরে পা দিতেই চারদিক থেকে উঠল হৈ হৈ রব। রূপাই প্রথমে ধীর তালে পা ফেলতে

থাকে। ঢাক ঢোল কাঁসার দ্রুতগতির সঙ্গে ক্রমে সে চঞ্চল হয়। রূপাই ঘুরে ফিরে দুই হাতে ধুনুচি নিয়ে নৃত্য করে, বালকেরা তাকে ঘিরে চারদিক্ থেকে মুহুর্মুহু ধুনো চন্দন গুগ্‌গুল নিক্ষেপ করে। রূপাইর হাতের ধুনুচি থেকে তালে তালে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ঊর্দ্ধে উঠে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টার শব্দে ও জয় জয়কার উলুধ্বনিতে মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ মুখর। মধ্যে মধ্যে রূপাই অর্দ্ধনিমীলিত চোখে নৃত্যভঙ্গীতে মাথা নীচু করে ভক্তিভরে প্রণাম জানায় আবার দুই চোখ বিস্ফারিত করে রক্তাম্বরভূষিতা প্রতিমার দিকে অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকে। হাস্যময়ী দেবীপ্রতিমা লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ পরিবৃত হয়ে যেন সকলের শিরে আশিস্ বর্ষণ করছেন। পার্শ্বে কলা'-বধূ তার চওড়া লালপাড় শাড়ীতে দেহ আবৃত করে দেড়হাত ঘোমটা টেনে সলজ্জ দাঁড়িয়ে। আরতির কুণ্ডলাকৃতি ধূমে ও মৃদুমন্দ হাওয়ায় তার ঘোমটার মৃদু কম্পন নৃত্যরত রূপাইর বুকে এক অপূর্ব্ব পুলকের শিহরণ তুলছে। ঢাকি ঢুলির ক্লান্তি আসে, রূপাইর ক্লান্তি নেই। তার এক বছরের কসরত সব কটাই দেখান হয়েছে। এখন সে এক একবার নৃত্যের বেগ সংযত করে আর সেজবাবুর দিকে চায়।

কিছুক্ষণ পরে বাজনা গেল থেমে। রূপাই ধুনুচিটা সামনে রেখে সেজবাবুকে প্রণাম করলে। সেজবাবু বললেন—সুন্দর তোর নাচ, রূপাই। মা যেন তোর নাচ দেখে হাসছেন। মা তোর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করবেন। এই যে তোর বকশিস। বলে রূপাইর দিকে একটা টাকা ছুঁড়ে দিলেন, আর বললেন, আসছে বছর তোর মনের আশা মিটিয়ে দেব।

রূপাইর মুখে রা-টি নেই। নীরবে টাকাটা কুড়িয়ে প্রণাম করে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে পা ফেলতে লাগল।

আয়নামতি এতক্ষণ কাঁথাখানা জড়িয়ে দুয়ার ধরে বসেছিল স্বামীর প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায়।

রূপাইর বুকখানা ফেটে বেড়িয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। বললে—এই যে তোর বকশিস—বলে, টাকাটা ফেলে দিল আয়নামতির গায়ে।

এক ছিলিম তামাক টানতে টানতে রূপাই ঝিমিয়ে পড়ল দেয়ালের 'পরে। আয়নামতি দুয়ারের অপর দিকে ঠেস্ দিয়ে বসে আকাশের খণ্ডমেঘের দ্রুত গতি নিরীক্ষণ করছে, আর অলক্ষ্যে ক্ষীণ হাত দু'খানি তুলে ঊর্দ্ধে প্রণাম জানাচ্ছে।

রাত্রি গভীর। চাঁদ হেলে পড়েছে অনেকক্ষণ। পূজার তিন দিনের ক্লান্তি নিয়ে সমস্ত পাড়াটা পড়েছে ঘুমিয়ে। চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপের বড় আলোটা নিবিয়ে দিয়ে পুরোহিত এক কোণে নাক ডাকাচ্ছেন। ক্রমে অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে আসে। হঠাৎ কিসের শব্দে পুরোহিতের ঘুম যায় ভেঙে। চেয়ে দেখেন সম্মুখে এক ছায়ামূর্ত্তি নরকঙ্কাল।

পুরোহিতের বিহ্বল চীৎকারে বড়গিন্নী রাজ্যেশ্বরী বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে আসেন, প্রদীপের পল্‌তেটা বাড়িয়ে দিতেই দেখেন, এক কঙ্কালসার নিরাবরণ স্ত্রী-মূর্ত্তি কলা-বৌয়ের বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করছে।

ভোর হয়ে এল প্রায়। বাড়ীসুদ্ধ লোক ভেঙে পড়েছে চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে। প্রভাতের বালসূর্য্য তার রক্তিম আবরণ-খানি বিছিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল রমণীর দেহ দেবীর পদতলে মূর্চ্ছিত, শাড়ীর আঁচলখানা তখনও তার মুষ্টিবদ্ধ।

"রামানন্দ-জীবনী"

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[শ্রীশান্তা দেবীকে লিখিত]

গুপ্ত নিবাস
বারাকপুর ট্রাংক রোড,
পোঃ, বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা।
২৭. ১০. ৪৭.

কল্যাণীয়া শান্তা—

রামানন্দ বাবুর জীবনী আর তোমার চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছি, চোখের তেজ কমে গেছে তাই আগাগোড়া পড়ে জবাব দিতে দেরী হয়ে গেছে। বইখানি পড়ে মনে হ'ল—এ যেন সুপাঠ সুখপাঠ্য গল্পের বই অনেক দিন পরে হাতে এলো।

তোমার লেখা এমন সুন্দর করে ফুটিয়েছে—পূর্ব্বাপর ঘটনা—সমস্ত সহজ আর সরলভাবে যে আরম্ভ করলে ছাড়া যায় না শেষ পর্য্যন্ত না পৌঁছে।

গল্পকথার মতো বড় সুন্দর ও সহজ করে তুমি বলেছো বন্ধুবরের জীবনের ঘটনাবলী,—সেকালের সব দিনগুলি একটি অপূর্ব্ব দীপ্তি পেয়ে ফুটেছে এই গ্রন্থে—সেই ভরদ্বাজ আশ্রম চিন্তামণি বাবু বামনদাস বাবু সবাইকে মনে পড়ে, যেন সেই সময়েই আছি মনে করি। আমার খুব ভাল লেগেছে বই-খানি। তোমার শিক্ষা-দীক্ষা সার্থক হয়েছে, এই বই গেঁথে যে তুমি দিয়েছো দেশের মানুষদের, এতে তোমার পুণ্য করা এবং তীর্থ করার কাজ হ'ল। আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ নিও।

তোমাদেরই
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ—একটা কথা ভুলেছি, 'প্রবাসী' আর 'মডার্ণ রিভিউ'র প্রথম বছরের দু'খানা মলাটের ছবি বইখানিতে দিলে হতো, এখন আর উপায় নাই।

কোতুলপুর থানার স্বাস্থ্য

শ্রীরাখালচন্দ্র নাগ

বাঁকুড়া জেলার পূর্ব্বপ্রান্তে কোতুলপুর থানা অবস্থিত। ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত স্থান বলিয়া ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে কোতুলপুর থানার জনস্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিলে হৃদয় আতঙ্কে পূর্ণ হইয়া উঠে। সম্প্রতি দেশে নবযুগ আসিয়াছে, কংগ্রেসের মনোনীত মন্ত্রীমণ্ডলী আজ পশ্চিম বাংলার কর্ণধার। এখন তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলে কোতুলপুর থানার জনসাধারণ হয়ত সুস্থদেহে বাঁচিতে পারে।

কোতুলপুর থানার কয়েক বৎসরের জন্ম মৃত্যুর-হিসাব :

বৎসর	জন্ম	মৃত্যু
১৯৩৯	১২৭৪	১৭৮১
১৯৪০	১৩৮১	১৬৮৭
১৯৪১	১৩৫১	১৪৫৯
১৯৪২	১৪৮৭	১৪৫৩
১৯৪৩	১৪৪৪	১৯৩৭
১৯৪৪	১০৩২	১৮৬৫
১৯৪৫	১২১৩	১৫২০
১৯৪৬	১৫৫৬	১৪২৩
মোট সংখ্যা—	১০৭৩৮	১২৮০৫

এই আট বৎসরে জন্মের অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা বেশী হওয়ায় কোতুলপুর থানার ৫৪৭২২ জন অধিবাসীর মধ্যে ২০৬৭ জন কমিয়া গিয়াছে। ১৯০২ হইতে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত ৭ বৎসরের হিসাবে কোতুলপুর থানার মধ্যে জন্ম ১০৮২২ ও মৃত্যু ১১৪৪৬। ইহাতে দেখা যায় এই ৭ বৎসরের মধ্যে মোট জনসংখ্যা হইতে ৫৬৪ জন কমিয়াছে। গত ৭ বৎসরের জনসংখ্যা হ্রাসের অনুপাত দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে বর্ত্তমান বৎসরের হিসাবে জনসংখ্যা প্রায় চতুর্গুণ হ্রাস পাইয়াছে। এই ভাবে যদি কোতুলপুর থানার জনসংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে থাকে তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই কোতুলপুর থানার তিন শত পল্লী শ্মশানে পরিণত হইবে।

ম্যালেরিয়া এখানকার সর্ব্বপ্রধান ব্যাধি। আর এই ম্যালেরিয়া হইতে কত রোগ যে হইতে পারে তাহার অন্ত নাই।

কোতুলপুর থানায় গত ৮ বৎসরে ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যু :

বৎসর	ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু
১৯৩৯	৮৯৬
১৯৪০	৬৬৬
১৯৪১	৬৩১
১৯৪২	৭০৭
১৯৪৩	১১১৭
১৯৪৪	৯৯৯
১৯৪৫	৬২৯
১৯৪৬	৪৪৪
মোট—	৬০৮৯

বর্ত্তমান আট বৎসরের হিসাব ও তাহার পূর্ব্বেকার সাত বৎসর পর্য্যন্ত হিসাবে দেখা যায়, ১৯০২ হইতে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত ৫১৬৭ জন ম্যালেরিয়া রোগে মরিয়াছে। ম্যালেরিয়া জ্বরে মৃত্যুসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। যে থানার জনসংখ্যা ৫৪৭২২ সেই থানা হইতে ৮ বৎসরে যদি ৬০৮৯ জন লোক ম্যালেরিয়ার প্রকোপে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহা হইলে কোতুলপুর থানার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়াই মনে হয়। জাতীয় সরকারের সহযোগিতায় যদি এই সমস্ত দরিদ্র পল্লীকে বাঁচাইবার জন্ত জনসাধারণ এখনো সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা না করে তাহা হইলে এই পল্লীগুলিকে কিছুতেই ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা যাইবে না।

শুধু ম্যালেরিয়ায়ই যে কোতুলপুর উৎসন্ন যাইতেছে তাহা নহে, অন্যান্য ব্যাধির প্রকোপও এ অঞ্চলে কম নয়। এখানকার শিশুমৃত্যুর হারও ভয়াবহ। এক বৎসরের কমবয়স্ক শিশু-মৃত্যুর হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :—

বৎসর	এক বৎসরবয়স্ক শিশুর মৃত্যুসংখ্যা
১৯৩৯	৩৪০
১৯৪০	২৮৯
১৯৪১	২৬৩
১৯৪২	৩০২
১৯৪৩	৩২৫
১৯৪৪	২৭৬
১৯৪৫	২৫৫
১৯৪৬	২৯৯
মোট—	২৩৪৯

এই আট বৎসরে এক বৎসরের কমবয়স্ক শিশু-মৃত্যুসংখ্যাও কম নয়—২৩৪৯টি। মানুষ জন্মিবার আগে করুণাময় পরমেশ্বর মাতৃস্তনে যে ক্ষীরধারা সঞ্চিত করিয়া রাখেন দারিদ্র্য-নিবন্ধন আজ মাতা উদরপূর্ণ করিয়া খাইতে না পাওয়ায় হতভাগ্য সন্তান সেই অমিয়ধারা হইতে বঞ্চিত। গো-দুগ্ধ দ্বারা শিশুসন্তানকে বাঁচাইবার উপায়ও আজ আর নাই। বাংলায় গো-দুগ্ধের অভাব আজ চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। এক টাকায় ষোল সের খাঁটি দুধ যেখানে পাওয়া যাইত আজ সে স্থলে টাকায় দুই সেরও দুধ পাওয়া যায় না। স্বাধীনতা লাভ হইলে কি হইবে, দেশের ভবিষ্যৎ আশাভরসার স্থল এই সকল শিশুকে বাঁচাইতে না পারিলে সবই ব্যর্থ হইবে। কোতুলপুর থানায়, যেখানে ৫৪৭২২ জন লোকের বাস সেখানে এক জনও শিক্ষিতা ধাত্রী নাই। অশিক্ষিতা ধাত্রীর হস্তে পড়িয়া কত শিশু যে অকালে মারা যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, খাদ্য না পাওয়ায় ও শিশু-পালনে অজ্ঞতাবশতঃ অনেক শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার দিন কয়েক পরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। অনেক শিশুর জননীও যত্নের অভাবে এবং ধাত্রীর অজ্ঞতাবশতঃ মারা যান।

কোতুলপুর থানায় সন্তানজন্মের ১৪ দিন মধ্যে প্রসূতির মৃত্যুর হিসাব নিম্নলিখিত রূপ :

বৎসর	প্রসূতির মৃত্যু-সংখ্যা
১৯৩৯	২৬
১৯৪০	১৮
১৯৪১	২৭
১৯৪২	৩২
১৯৪৩	৩০
১৯৪৪	১৭
১৯৪৫	৩২
১৯৪৬	২৪
মোট	২০৬

১৯৩৩ হইতে ১৯৩৮ সন পর্য্যন্ত ছয় বৎসরে ১৯৮টি প্রসূতি এই ভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। ১৯৩৯-৪৬ এই ৮ বৎসরে ২০৬টি জননীর অকালমৃত্যু হইল। শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী কর্ত্তৃক সংগৃহীত একটি চার্টে দেখিয়াছি, প্রতি ৮ মিনিটে এই সোনার বাংলা হইতে একটি করিয়া মাতা প্রসবকালে বা প্রসবের অব্যবহিত পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সব পল্লীগ্রামের সূতিকাগারের অবস্থা দেখিলে হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার হয়---যে দেশে সন্তানজন্মের পর তাঁহাকে মনুষ্য-বাসের অযোগ্য গৃহে রাখা হয়, সে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, পূর্ব্বকালে কখনই এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। সে যুগে ত্রিকাল-দর্শী আর্য্যঋষিগণের নির্দ্দেশানুযায়ী প্রসবের বহুপূর্ব্বে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করা হইত। কিন্তু গৃহস্থ আজ চরম দারিদ্র্যপীড়িত। ইচ্ছা থাকিলেও পল্লীবাসীরা অভাবের তাড়নায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থাযুক্ত সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছে না। প্রসূতি-পরিচর্য্যা-শিক্ষাও এদেশ হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে।

ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া যে সমস্ত লোক জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে যক্ষ্মারোগ দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে। কোতুলপুর থানার অধিবাসিগণের মধ্যে যক্ষ্মা-রোগে মৃত্যুর হারও ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

কোতুলপুর থানায় যক্ষ্মারোগে মৃত্যু—

বৎসর	মৃত্যু-সংখ্যা
১৯৩৯	১৩
১৯৪০	২১
১৯৪১	২০
১৪৪২	১১
১৯৪৩	৭
১৯৪৪	১৯
১৯৪৫	১৬
১৯৪৬	২৪
মোট	১২১

১৯৩৩ হইতে ১৯৩৮ সন পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসরে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুসংখ্যা ছিল ১৭৫ জন। এর পরবর্ত্তী ৮ বৎসরে ১২১ জন যক্ষ্মারোগে মারা গিয়াছে। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান সূর্য্যকিরণ ও বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব যেখানে নাই সেই পল্লীতেও এই ভীষণ ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে।

বর্ত্তমান কালে যথেচ্ছ আহার, যক্ষ্মারোগীর সহিত মেলা-মেশা ইত্যাদি যক্ষ্মা বিস্তারে সহায়তা করিতেছে। যক্ষ্মা ছাড়া দন্তপীড়া ও অন্যান্য নানা ব্যাধিও শহর হইতে মফঃস্বলে আসিতেছে। যক্ষ্মারোগ সংক্রামক হইলে পল্লীগ্রামে অধিকাংশ রোগী বিনা চিকিৎসাতেই মারা যায়। সংক্রামক রোগের মধ্যে কলেরা এবং বসন্ত রোগ মধ্যে মধ্যে এখানে দেখা দেয়, তবে সহরের তুলনায় অনেক কম।

গত ৮ বৎসরের কলেরা ও বসন্ত রোগে মৃত্যুসংখ্যা :

বৎসর	কলেরা	বসন্ত
১৯৩৯	১৪	১
১৯৪০	৯	১
১৯৪১	২৭	৪
১৯৪২	১২	০
১৯৪৩	১১৫	০
১৯৪৪	৩	৩
১৯৪৫	৮	২২
১৯৪৬	১৮	১
মোট	২০৬	৩২

এই ৮ বৎসরে কলেরা বা ওলাউঠা রোগে মৃত্যুসংখ্যা ২০৬। তন্মধ্যে ১৯৪৩ সালে ইহার আক্রমণ ব্যাপক আকার ধারণ করে, ফলে উক্ত বৎসরে কোতুলপুর থানায় ১১৫ জন লোক কলেরা রোগে মারা যায়। গত ১৯৩৩-৩৮ পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসরে কলেরা রোগে মৃত্যুসংখ্যা ছিল ৯১, পল্লীগ্রামে অজ্ঞতাবশতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগ ব্যাপক ভাবে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। ১৯৪৪ সাল হইতে কলেরার টিকা দিবার প্রচলন বেশী হওয়ায় মৃত্যুসংখ্যা অনেক কমিয়াছে। গরীব রোগীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। অবশ্য কোতুলপুর থানায় ডেহুয়া পাড়ায় একটি এমার্জ্জেন্সী হাসপাতাল আছে ও তাহাতে কলেরা রোগীকে রাখা যায়, কিন্তু বিশেষ কোন সুবন্দোবস্ত সেখানে নাই। এখানকার অব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একবার একটি রোগীকে সেখানে পাঠাইয়াছিলাম, শুশ্রূষা-কারিগণের লক্ষ্য না থাকায় ইউরিমিয়া অবস্থায়—সে হাসপাতালের বাহিরে চলিয়া যায়। এ ধরণের ব্যাপার যাহাতে না ঘটে সেজন্য প্রত্যেক ইউনিয়নের তরফ হইতে বিহিত ব্যবস্থা করা দরকার। আর একটি মাত্র হাঁসপাতাল দ্বারা বিশেষ কিছুই হইবারও নয়।

কলেরার ন্যায় বসন্ত রোগের বীজও শহর হইতে এখানে আমদানী হয়। বসন্ত রোগে মৃত্যুসংখ্যা গত ৮ বৎসরে ৩২ ও

পূর্ব্ববর্তী ১৯৩৩-১৯৩৮ পর্য্যন্ত এই ৭ বৎসরে ৫৭। এই হিসাবে হইতে দেখা যায় যে, বসন্ত রোগের প্রকোপ ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। অবশ্য সময়মত টিকা লওয়াই ইহার কারণ। রোগ-প্রতিষেধ ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা কোতুলপুর থানায় আশানুরূপ নহে। সারা গ্রাম বন-জঙ্গল, পচা ডোবায় ভরিয়া গিয়াছে, দেশবাসী অন্নবস্ত্রের চিন্তায় বিব্রত হইয়া এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে তাহাদের পক্ষে গ্রামের উন্নতির কথা চিন্তা করাই অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মধ্যে মধ্যে পল্লী-সংস্কার কার্য্যের জন্য যা একটু আধটু সরকারী ব্যবস্থা হয় তাহা উল্লেখযোগ্য নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নথিপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়। ডাঃ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় স্থানে স্থানে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, কিন্তু সরকারী সাহায্য ও বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের দান বন্ধ হওয়ায় ঐ সমস্ত পল্লী সমিতি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছে। কোতুলপুর জেলা বোর্ডের একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। বহুদিন আগে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জেলাবোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা কার্য্যকরী হয় নাই। প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় ও ক্ষুদ্র হাসপাতাল থাকা একান্ত আবশ্যক। মেদিনীপুর জেলায় খিরপাই পল্লীবাসী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় তত্রত্য পল্লীবাসীদের প্রাণে আশার সঞ্চার হইতেছে। চন্দ্রকোণা থানা ম্যালেরিয়ার পীড়নে ধ্বংস হইতেছে। খিরপাই পল্লীতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কোতুলপুর অপেক্ষা কম নয়। পল্লীস্বাস্থ্য সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের পরিকল্পনা যত শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হয় ততই মঙ্গল। নূতন কর স্থাপন করিয়া ইহা করা খুবই কষ্টকর হইবে। একে তো পল্লীর অধিবাসীরা নানাবিধ করভারে প্রপীড়িত, তদুপরি শিক্ষা-করের বোঝাও তাহাদের উপর চাপানো হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলা বোর্ড এখানে শিক্ষা বোর্ড স্থাপনের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিলেও তদানীন্তন সরকার তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

আমি পশ্চিম বাংলার ধ্বংসোন্মুখ একটি থানার চিত্র আঁকিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, এদেশের বহু অঞ্চল এইভাবে আধিব্যাধির প্রকোপে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিকর্ম্মে বিমানের কার্য্যকারিতা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ধান্য-উৎপাদকগণ ধানের চাষের এক অভিনব এবং পুরাপুরি যান্ত্রিক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। তাহাদের উদ্ভাবনীশক্তির দরুন বিমানদ্বারা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের বহু প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। এমন কি আধুনিক আমেরিকায় অন্যতম কৃষিযন্ত্ররূপেও বিমানের ব্যবহার চালু হইয়াছে এবং ইহার কার্য্যকারিতা অপরিসীম বলিয়া দক্ষিণ-আমেরিকায় ধানের আবাদে ব্যাপকভাবে ইহার প্রচলন হইতেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার ধান্যক্ষেত্রসমূহের কতকগুলি বিশেষ অবস্থার জন্যই এই নূতন পন্থা উদ্ভাবিত হয়। প্রচুর গবেষণাদির পর কৃষিবিদ্‌গণ বুঝিতে পারেন যে, উক্ত ষ্টেটের বিরাট কৃষিক্ষেত্রসমূহে যান্ত্রিক কৃষি-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন আবশ্যক, উপরন্তু ধানগাছগুলিকে আগাছার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এমন কোন উপায় অবলম্বন করা দরকার যাহাতে সময় ও শ্রম দুই-ই বাঁচিতে পারে। শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল যে, আগাছাগুলির অবাধবৃদ্ধি নিবারণ করিয়া ধানের আবাদ বাড়াইবার সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী পন্থা হইতেছে বীজ বপনের পূর্ব্বে ক্ষেত্রসমূহকে জলপ্লাবিত করিয়া দেওয়া। এখন সমস্যা দাঁড়াইল জলমগ্ন ক্ষেত্রসমূহে বীজবপনের প্রকৃষ্ট উপায় কি? ইহারও সমাধান হইতে দেরি হইল না। বিশেষজ্ঞগণ বলিলেন যে, একমাত্র বিমানের সাহায্যেই এই কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে। নিম্নে আমেরিকার ধান্য-উৎপাদনের সাম্প্রতিক পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

প্রথমে কলের লাঙ্গল এবং মই দিয়া জমি চাষ করিবার পর বাহির হইতে জল আনিয়া ক্ষেত প্লাবিত করিয়া দেওয়া হয়। এই জলধারার উচ্চতা হয় সাধারণতঃ আন্দাজ ছয় ফুট (১৫ সেন্টিমিটার) পর্য্যন্ত। তারপর খুব নীচু দিয়া উড্ডীয়মান বিমান হইতে জলে-ভিজানো, দিনেকের অঙ্কুর বাহির হওয়া ধানের বীজসমূহ নিক্ষেপ করা হয়। সেগুলি জলে ডুবিয়া যায় এবং নীচেকার জমিতে শিকড় গাড়ে। আগাছাগুলি জলে ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে, মাটিতে শিকড় মেলিতে পারে না। কাজেই তাহারা জমি হইতে সার শুষিয়া লইতে পারে না। ওদিকে যথাসময়ে ধানগাছগুলির মাথা জলের উপর জাগিয়া উঠে। তারপর তাহারা মানুষ অথবা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই পরিপুষ্ট এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শস্যকর্ত্তনের ঋতুতে ধান কাটিবার মাসখানেক আগে ক্ষেত্রগুলিকে শুকাইবার জন্য নালা কাটিয়া জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা হয়। কৃষিক্ষেত্রে গিয়া শস্যকর্ত্তনকারীরা যাহাতে

স্বচ্ছন্দে এবং অনায়াসে ধানকাটা, তুষঝাড়া ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করিতে পারে সেইজন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

ধান্য উৎপাদনে এই যান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে ধানের ফলন যে কম হইতেছে তাহা নহে। আমেরিকায় গড়পড়তা একর-প্রতি ২০০০ পাউণ্ড ধান্য উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ অঞ্চলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে শুকনো জমিতে বীজবপন করিয়া যে পরিমাণ ধান ফলানো হয় তাহাও এই হিসাবের মধ্যে ধরা হইয়াছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় বিমানযোগে বীজবপন-পদ্ধতি দ্বারা কিন্তু একর-প্রতি গড়পড়তা অন্ততঃ তিন হাজার পাউণ্ড ধান জন্মে। এই কারণে আমেরিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের চাষীরা বিমানের সাহায্যে বীজ বপনের অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছে এবং এই পদ্ধতি তাহাদের মধ্যে দ্রুত প্রসারলাভ করিতেছে।



ক্যালিফোর্নিয়ার একটি ক্ষেতে ধানের বীজ বপনরত একটি বিমান। ডান'দকের লোকটি ক্ষেতের সীমানা নির্দ্দেশক পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান

প্রতি বৎসর যে মাসে ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত সেক্রামেণ্টোর উত্তর দিকস্থ উপত্যকা-অঞ্চলের রাস্তাঘাটে সৈনিক-প্রহরীরা মোটর আরোহীদের অভিযোগ শুনিতে শুনিতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। তাহাদের মাথার মাত্র কয়েক হাত উপর দিয়া উড্ডীয়মান যে-সকল বিমানের বিরামহীন গর্জ্জন তাহাদের কানে তালা লাগাইয়া দেয় সেগুলির বিরুদ্ধেই তাহাদের নালিশ। তাহাদের অভিযোগ যতই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হোক্ না কেন, পুলিস বিমানচালক অথবা স্থানীয় লোকেরা কেহই তাহাতে কর্ণপাত করে না। কেননা এই সমস্ত শস্যসমৃদ্ধ অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট এই সকল বিমান—(তন্মধ্যে অধিকাংশই দ্বি-পক্ষবিশিষ্ট এবং তাহাদের ও চালকদের বয়স ১৫ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে)—জলসেচের খালের কীলক (irrigation lock), কলের লাঙল বা শস্য-সংগ্রাহক-যন্ত্রের মতই অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এই অভিনব কৃষিযন্ত্রের দৌলতে বিগত পাঁচ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে সেক্রামেণ্টো এবং ফিদার নদীর মধ্যবর্ত্তী বিরাট ক্ষেত্রসমূহে এত বেশী ধান্য উৎপন্ন হইতেছে যে, ইহা আমেরিকার একটি শ্রেষ্ঠ ধান্যাঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় ধান্য উৎপাদনের পরিমাণ যে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা সরকারী কৃষি-বিভাগের ১৯৪৬-এর হিসাব পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একর-প্রতি যে ২০০০ পাউণ্ড ধান্য উৎপাদনের কথা বলা হইয়াছে তাহা গত বৎসরেরই হিসাব। উক্ত বৎসরে 'ক্যালিফোর্নিয়ার কোন কোন উৎকৃষ্ট ধান্যক্ষেত্রে কিন্তু একর-প্রতি ছয় হাজার পাউণ্ড পর্য্যন্ত ধান জন্মিয়াছে। অবশ্য একথা সত্য যে উত্তম সার প্রয়োগ দ্বারা জমির উর্ব্বরতা বিধান এই উচ্চহারে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আংশিকভাবে দায়ী, কিন্তু বিমানে বীজবপন-ব্যবস্থা যে এই ফলনবৃদ্ধির মুখ্য কারণ সে বিষয়ে কৃষি-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। হাত দিয়া চারা রোপণ করিবার যে পুরনো পচা পদ্ধতি মান্ধাতার আমল হইতে প্রচলিত ছিল যন্ত্রের কল্যাণে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ইহা চাষবাসের কার্য্যকে যে কতদূর সহজসাধ্য করিয়া তুলিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অথচ ইহার দরুণ ক্ষেতের উৎপাদিকাশক্তি কিন্তু তিল পরিমাণও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

রিচভেইলের গ্রেন হ্যারিস ক্যালিফোর্নিয়ার এই অভিনব কৃষিপদ্ধতি প্রবর্ত্তকদের অন্যতম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন —"ক্যালিফোর্নিয়ায় আমাদের কৃষি-সমস্যা ছিল অন্যান্য অঞ্চল হইতে আলাদা ধরণের ও বিশেষ জটিল। কি ভাবে ধানগাছের উপর জলজ তৃণ এবং অন্যান্য আগাছার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহা লইয়া আমরা অনেক মাথা ঘামাইয়াছি। শেষ পর্য্যন্ত আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলাম যে, বীজ বপন হইতে শস্য-কর্ত্তনের সময় পর্য্যন্ত—এই কয়েক মাস যদি ক্ষেতগুলিকে জলমগ্ন রাখিবার ব্যবস্থা করা যায়, কেবলমাত্র তাহা হইলেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। এর পরে জলপ্লাবিত ক্ষেত্রে কি করিয়া বীজ বপন করা যায় তাহা আর এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। হাত দিয়া তো কিছুতেই এগুলোতে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা সম্ভবপর নয়। এখন কি করা যায়? শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা দেখিলাম একমাত্র কার্য্যকরী পন্থা হইতেছে বিমান হইতে জলপ্লাবিত ক্ষেতে বীজ নিক্ষেপ করা। এমনি ভাবেই আবিষ্কৃত হইল আমাদের অভিনব বৈজ্ঞানিক বীজ বপন পদ্ধতি এবং গোটা যে মা জুড়িয়া ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া যে সকল গর্জ্জনশীল বিমা

উড়িয়া বেড়ায় সেগুলি দ্বারা আমাদের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইতেছে।

বিমানে বীজ বপন চালু হওয়ায় ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষি-কর্ম্মের ধারাই বদলাইয়া গিয়াছে। পুরনো আমলের সঙ্গে আজকের ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষির সাদৃশ্য কেবল এইটুকু যে তখনকার ন্যায় এখনো জলমগ্ন ক্ষেত্রেই ধানগাছগুলি বাড়িয়া থাকে—অবশ্য পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বত্র গম এবং অন্যান্য শস্য উৎপাদনে বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতির ব্যবহার যেমন আমেরিকার কৃষিকর্ম্মের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তেমনি এই সাম্প্রতিক পদ্ধতিটিও সম্পূর্ণ তাহার নিজস্ব। ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষির কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। প্রথমত এখানে যে ধান গাছ উৎপন্ন হয় তাহা বেশ বড় আকারের; দ্বিতীয়তঃ, ক্ষেত্রসমূহে জলসেচের যে বিরাট ও ব্যাপক ব্যবস্থা এখানকার রাষ্ট্র করিয়াছে তাহার দরুন একদা যে সকল জমি ছিল ঊষর আজ তাহা উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, এবং ইহার সঙ্গে বিমানে বীজ বপন প্রণালীর সংমিশ্রণ হওয়ায় এখানে কৃষির চরম উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

এই নূতন ধরণের কৃষিকার্য্যের জন্য ক্ষেত্রে প্রচুর জল সরবরাহের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই বিষয়ে গ্রেন হ্যারিসের কথাই আবার উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলেন—"আমাদের এই নূতন প্রণালীর কৃষির জন্য জলের আবশ্যকতা অত্যধিক। আগাছার অবাঞ্ছিত বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে একটি মাত্র উপায়ে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে ক্ষেতের জল যদি গভীর হয় তাহা হইলে আগাছাগুলা বাড়িতে পারে না, ধানগাছগুলি কিন্তু সেই গভীর জল ভেদ করিয়া সুষ্ঠুভাবেই বাড়িয়া উঠে।"

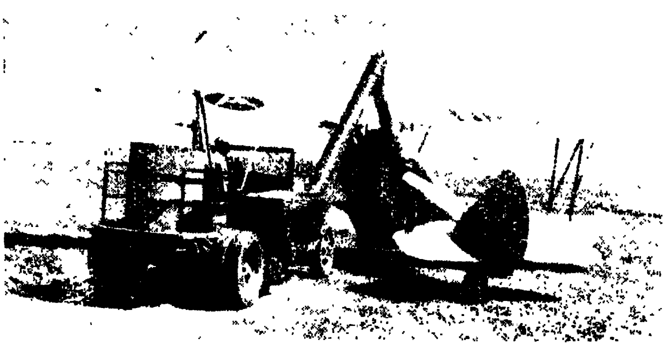
বৎসরের প্রথম ভাগে সিয়েরা নেভাদা পর্ব্বতমালায় তুষার গলিতে সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষেত্র-কর্ম্মাদির তোড়জোড় আরম্ভ হয়। এই ঋতুতে যখন মাউণ্ট লেসেন নামক আগ্নেয়গিরির নিকটবর্ত্তী সাষ্টা বাঁধের এবং অনেকগুলি উন্নত উপত্যকার বিরাট জলাধারসমূহ গলিত তুষারের জলধারায় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া যায়, তখন নীচেকার বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রসমূহ শুষ্কই থাকে। উচ্চস্থান হইতে এগুলিতে যে বারি পতিত হয় তাহার পরিমাণ বার্ষিক ১৫ হইতে ২০ ইঞ্চি মাত্র। এ গুলিতে তুষারপতন এবং বৃষ্টিপাত এত কম হয় যে তাহা জমিকে আর্দ্র করিতে পারে না। জমি এত খটখটে শুকনো ও শক্ত থাকে যে তাহার উপর দিয়া অনায়াসে ভারী যন্ত্র চালাইয়া লওয়া যায়। ট্রাকটার টানা লাঙল, মই এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি দ্বারা জমি চাষ, মাটির ঢেলা ভাঙা ইত্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। চলমান যন্ত্রগুলির পিছনে ধূলির ঝড় ওঠে, কখনো কখনো সংহত ধূলিকণা স্তম্ভাকৃতি মেঘের মত দৃশ্যমান হয়। পার্ব্বত্য ঝটিকার গতিকে প্রতিহত করিবার জন্য ধানক্ষেতের প্রান্তে রোপিত ইউকেলিপটাস বৃক্ষে আসিয়া অবশেষে সেই ধূলিরাশি আশ্রয় গ্রহণ করে। এপ্রিলের শেষ ভাগে অথবা মে মাসের গোড়ার দিকে বাঁধের কীলকসমূহ খুলিয়া দেওয়া হয়, আর শত শত খাল নালা ইত্যাদির ভিতর দিয়া সেই সঞ্চিত জলধারা ধান্যক্ষেত্রে গিয়া পতিত হয়।

আজকাল কখনো ক্ষেত্র জলপ্লাবিত করিবার পূর্ব্বে বীজ বপন করা হয় না। আগে কিন্তু প্রথমে শুকনো জমির উপর বীজ ছড়ানো হইত এবং তার পরে জমিকে জলপূর্ণ করা হইত। কিন্তু ইহার অসুবিধা ছিল বিস্তর এবং ইহা ছিল ক্ষতিকর। বহু বীজ মাটির ঢেলায় কাটলের মধ্যে ঢুকিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত, অথবা বীজের গায়ে ইঞ্চিখানেক মাটির প্রলেপ লাগায় তাহা অঙ্কুরিত এবং জলগর্ভ হইতে বহির্গত হইতে পারিত না। আজকের দিনে কিন্তু একটি মাত্র ধানের বীজ বপন করিবার আগেই ক্ষেতটিকে জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়।

সাধারণতঃ যে জল দেওয়া হয় তাহার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ হইতেছে প্রায় ছয় ইঞ্চি। মোটামুটি সাধারণ আকারের ৩০০ একর একটি ক্ষেত্রের বাঁধের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জলপ্লাবিত করিতে প্রায় দুই সপ্তাহ লাগে। এই কয় দিন অন্য ক্ষেত্রকর্ম্মাদি বিশেষ কিছু করা যায় না—বেশী কিছু করিবার দরকারও হয় না; কেননা এই ব্যবস্থার দরুন আগাছা বাড়িতে পারে না, জমির উৎপাদিকাশক্তিও সংরক্ষিত হয়। যুদ্ধের সময় এই ব্যবস্থার দরুন একই ক্ষেত্রে বৎসরের এ মাথায় এক বার এবং ও মাথায় আর এক বার ফসল ফলানো সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহা দ্বারা আগাছা ধ্বংস এবং জমির সার সংরক্ষণ তো হয়ই, উপরন্তু এরোপ্লেন হইতে অঙ্কুরিত বীজ বপন করিলে যাহাতে তাহা নষ্ট না হইয়া অচিরেই চারাগাছে পরিণত হইতে পারে জমিকে তাহার উপযোগী করিয়া তৈরি করিয়া রাখে।

এই কৃষি-বিমান চালানোর জন্য পাকা বৈমানিকের প্রয়োজন। এগুলি খুব নীচু দিয়া—কতকগুলি মাটি হইতে মাত্র পঞ্চাশ ফুট উপরে—ঘণ্টায় পঞ্চাশ এবং একশ মাইল বেগে উড়ে। এগুলি চালাইতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। চালকদের মধ্যে অধিকাংশেরই বয়স কুড়ির নীচে—তাহারা সকলেই যুদ্ধের সময় বিমান-চালনা-বিদ্যায় গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে। এখন তাহারা সকলেই উৎসাহী বৈমানিক। বিমান চালানোর যাবতীয় কৌশল, এর অন্ধিসন্ধি সব কিছু তাদের নখদর্পণে। যাহাতে এক ইঞ্চি পরিমাণ জমিতেও বীজ বপন বাদ না পড়ে সে জন্য ইলেকট্রিক পাওয়ার লাইনের উপর দিয়া কেমন করিয়া বিমান চালাইতে হয়, ঝটিকা-প্রতিরোধক ইলেকট্রিক বৃক্ষের উপর দিয়া কিরূপ কৌশলে বিমানকে লইয়া যাইতে হয়, এ সবই তাদের জানা। সকল সময় গতিবেগের একই মাত্রা রক্ষা করাও তাদের আর একটি বিশেষ গুণ।

বায়ু-প্রবাহের মাত্রার যতই তারতম্য হোক না কেন, এই সকল বিমান-চালককে সর্ব্বাবস্থায়ই একই গতিতে বিমান চালাইতে হইবে। প্রত্যেকটি বিমান অন্ততঃ পক্ষে ১,০০০ পাউণ্ড (৪৫০ কিলোগ্রাম) বীজ বহন করে। মাঝে মাঝে বোঝা খালাস করা, উচ্চ স্থানে আরোহণ, মোড় ফেরা, প্রত্যেক পাঁচ মিনিট পরে এক বার মাটিতে নামিয়া বীজ দিয়া বিমান বোঝাই করিয়া লওয়া ইত্যাদির দরুন এই সকল বিমান চালানো অত্যন্ত দুরূহ ও বিরক্তিকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।



একটি ট্রাক হইতে বিমানে ধানের বীজ বোঝাই করা হইতেছে

সমগ্র সেক্রামেন্টো উপত্যকায় পনর হইতে কুড়ি জন বৈমানিক কার্য্যের মালিকদের কৃষিকর্ম্মে সাহায্য করিয়া থাকে। তাহারা শুধু যে কায়িক পরিশ্রম দ্বারাই তাহাদের সহায়তা করে তাহা নয়, তাহারা নিজেদের বিমান পর্য্যন্ত দিয়া কৃষিকর্ম্মকারীদের উপকার করিয়া থাকে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের মধ্যে দুই জন পাওয়ার লাইন পরিষ্কার করিতে না পারায় এক সাংঘাতিক বিমান-দুর্ঘটনায় বিপন্ন হয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে হেলিকপ্টারগুলো অধিকতর নিরাপদ, কিন্তু এগুলিতে এরোপ্লেনের প্রপেলারের মত কোনো যন্ত্র না থাকায় বিশেষ অসুবিধা হয়।

যদিও আজকালকার বীজাধারগুলি বিরাট আকারের নয় বলিয়া এগুলির বীজ বহন করিবার ক্ষমতা বিশেষ সীমাবদ্ধ, তথাপি বিমানে বীজ বপন করিলে সময় এবং শ্রমমূল্য দুই-ই বাঁচে। শুকনো জমির উপর সাধারণ ভাবে যন্ত্র-সাহায্যে বীজ বপন করার শ্রমমূল্য পড়িত একর-প্রতি ৪ শিলিং হইতে ছয় শিলিং পর্য্যন্ত। কিন্তু আজকের দিনে বিমানযোগে বীজ বপনের খরচ পড়ে একর-প্রতি ১ শিলিং হইতে দেড় শিলিং। বিমানদ্বারা যে কৃষির পথ সুগম ও অপেক্ষাকৃত স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে কৃষিযন্ত্র রূপে বিমানের ব্যবহার অল্পকালের পরিকল্পনা বলিয়া ইহাতে কতকগুলি অসুবিধাও আছে এবং সেগুলির আশু প্রতিকার প্রয়োজন। প্রত্যেক কৃষি-বিমানকে প্রতিদিন ৬০০ একর পরিক্রমণ করিতে হয়! কাজেই ক্রমাগত বীজ বোঝাই এবং খালাস করিবার জন্য এক জায়গায় বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা বিমানগুলির পক্ষে মুশকিল হইয়া দাঁড়ায়। অথচ অপেক্ষা না করিলে উপযুক্ত পরিমাণ বীজ বোঝাই করাও সম্ভবপর হয় না।

এই সকল কারণে, কৃষিকর্ম্মে ব্যবহারের জন্য বিশেষ ধরণের বিমানের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া ক্যালিফোর্নিয়ার বিমান প্রস্তুতকারীগণ নানা পরিকল্পনা করিতেছেন। সানডিগোর 'কনসোলিডেটেড ভালটি এয়ারক্র্যাফট করপোরেশন' তাহাদের এঞ্জিনিয়র-কার্য্যের বিশেষজ্ঞদের একটি দলকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য ধান্যাঞ্চলসমূহে পাঠাইয়াছেন এবং তাঁহারা খুবই আশা করেন যে, এই এঞ্জিনিয়ারগণ অচিরাৎ এমন এক ধরণের হেলিকপ্টার নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন যাহাতে বীজ ছড়ানোর জন্য একটি বিশিষ্ট স্লাষ্ট প্রোপেলার থাকিবে। বীজাধারের মালবহন-ক্ষমতা বাড়াইবার জন্যও তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন।

বিমানবাহিত বীজগুলা কিন্তু শুকনো বীজ নয়, এগুলিকে বলা যাইতে পারে ধানের চারার ভ্রূণাবস্থা। বিমান হইতে ক্ষেতে বীজ ছড়াইবার আগে সেগুলিকে কতকগুলো থলের ভিতরে পুরিয়া, জলসেচের খাতে ভিজাইয়া রাখা হয়। চব্বিশ ঘণ্টা পরে বীজগুলি অঙ্কুরিত হয় এবং সে অবস্থায় এগুলিকে আরো একটি দিন খাতের মধ্যে রাখা হয়। বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত হইবার পর এই জলসিক্ত বীজ ক্ষেতের জলে ডুবিয়া যায় এবং ছোট ছোট অঙ্কুরসমূহ শীঘ্রই জলের নীচেকার ভিজা মাটিতে শিকড় গাড়িয়া বসে।

এর পর হইতে প্রকৃতির সাহায্যেই চারাগাছগুলি জল-তলে ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে—মানুষ বা যন্ত্রের সহায়তার আবশ্যক হয় না। এমনিভাবে প্রায় অর্দ্ধ বৎসরকাল ক্ষেতগুলি যন্ত্রাদি-স্পৃষ্ট না হইয়া ক্যালিফোর্নিয়ার রৌদ্রকরোজ্জ্বল আকাশের নীচে পড়িয়া থাকে, চারাগাছগুলি প্রকৃতির তত্ত্বাবধানেই প্রতিপালিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে শস্যকর্ত্তনের প্রায় মাসখানেক আগে কৃষকেরা ক্ষেতে গিয়া সেখানকার জল বহিষ্করণার্থ জলসেচের খাতের কীলক খুলিয়া দেয়। এমনিভাবে ধীরে ধীরে সবটুকু জল বাহির হইয়া যায়। অক্টোবরের শেষে কিম্বা নবেম্বরের গোড়ার দিকে জমি এত শুকনো হয় যে তাহার উপর দিয়া অনায়াসে শস্যসংগ্রাহক-যন্ত্র চালানো যাইতে পারে। প্রথমে ক্ষেত্রকর্ম্মের জন্যই বিশেষ ভাবে তৈরি এক প্রকার যন্ত্র দ্বারা চতুষ্পার্শ্বের ঘাস কাটিয়া ক্ষেতের মুখ খুলিয়া দেওয়া হয়। এমনিভাবে শস্য-সংগ্রাহক যন্ত্রের এক পার্শ্বে একটি ঘাসকাটা কল জুড়িয়া দিয়া ক্ষেত্রকর্ম্ম শুরু হয়। এই যন্ত্র দুটিকে কিন্তু কেবলমাত্র সমতল জমির উপর দিয়াই চালানো যায়, ধানক্ষেতে চতুষ্পার্শ্বস্থ উঁচু বাঁধের উপর

এগুলি দিয়া কোনও কাজ হয় না। শস্য-সংগ্রাহক-যন্ত্র সংলগ্ন ছেদক যন্ত্রটি (cutting rig) ক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে ১২ হইতে ১৫ ফুট জায়গার ঘাস কাটিয়া সাফ করিয়া উহার চলাচলের পথকে সুগম করিয়া দেয়।

শস্যসংগ্রহকারীদের সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত শস্য আহরণ করিতে হয়। কেননা, জল শুকাইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই নানা প্রকার ঘাস এবং আগাছা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে। কাজেই তাহারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শস্যসংগ্রাহক যন্ত্রের ম্যাটাইয়ের নাগালের মধ্যে আসিবার আগেই যাহাতে ধান কাটা সারা হইয়া যায় সেদিকে বিশেষ অবহিত হইতে হয়। এই সমস্ত তৃণরাজির মধ্যে একমাত্র বার্ণইয়ার্ড ঘাসই এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যে তাহা শস্যসংগ্রাহক যন্ত্রের নাগালের মধ্যে আসিয়া পৌঁছে। শুধু এই ত্রুটিটুকু ছাড়া এই অভিনব ধান্যোৎপাদন-পদ্ধতি আর সকল দিক দিয়াই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

এই প্রণালীতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তিত হওয়ায় আগেকার দিনে হস্ত সাহায্যে আগাছা বাছিতে যে খরচ পড়িত তাহার হাত হইতে কৃষিকর্মকারীগণ রেহাই পাইয়াছেন। আর খরচও তখন নেহাত কম ছিল না—একর-প্রতি ৩ শিলিং হইতে ৫ শিলিং পর্যন্ত। যন্ত্র দ্বারা ধান কাটার পর ক্ষেতেই তুষ বাড়া সম্পন্ন হয় বলিয়া চাল শুকাইয়া লইতেও বিশেষ বেগ পাইতে বা খরচ করিতে হয় না। এ ছাড়া, আরও এমন কতকগুলি যন্ত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে যেগুলির সাহায্যে বন্তায় পুরিবার আগেই ধানের সাথসংলগ্ন আজে-বাজে জিনিষ, পোকা ইত্যাদি দূর করা যাইতে পারে। সাম্প্রতিক ব্যবস্থায় ধান্যোৎপাদনের শ্রমমূল্যই যে শুধু কমিয়াছে তাহা নয়, ধানের পরিমাণ এবং গুণও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এমনি ভাবে এই নূতন প্রচেষ্টা অসামান্য সাফল্যলাভ করাতে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে ধান্যোৎপাদনের এই পুরোপুরি যান্ত্রিক পদ্ধতিই আদর্শ পদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইবে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে ধান্যক্ষেত্রে হস্ত দ্বারা বীজ বপনরত লোকদের অবনমিত মূর্তিগুলি আর দৃশ্যমান হইবে না। দক্ষিণ অঞ্চলের টেক্সাস, লুইশিয়ানা, আর্কানসাস এবং যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য প্রধান প্রধান ধান্যাঞ্চলসমূহে ব্যাপকভাবে এই ক্যালিফোর্নিয়া-পদ্ধতিই গ্রহণ করা হইতেছে।

এখন গ্রেন হ্যারিসের কথা উদ্ধৃত করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—"১৯৩০ সনে আমি প্রথম বিমানে ধানের বীজ বপন করি এবং তারপর হইতে প্রতি বৎসরই এই উপায়ে অন্ততঃ আংশিকভাবে হইলেও আমার নিজের ক্ষেত্রে ধান জন্মাইতেছি। ক্যালিফোর্নিয়ার কৃষক—যে নিজের কর্মক্ষমতায় দুর্বৎসরেও একর-প্রতি অন্ততঃ ১৮০০ পাউণ্ড শস্য উৎপাদন করে, তাহার পক্ষে কৃষি-বিমান যে কত উপযোগী তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহা দ্বারা তাহার সময় ও শ্রম দুই-ই বাঁচিবে—ট্রাক্টার এবং কলের মইয়ের মত ইহাও এক দিন তাহার নিকট স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য কৃষিযন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে অপর্য্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদনপূর্ব্বক দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া আমরা ধন্য হইতে পারিব।"

আবেদন

শ্রীপ্রশান্তকুমার মিত্র

স্বাধীনতা-সূর্য্য বুঝি দেখা দিল পূর্ব্বাশার পারে,
ভারতের দিগঙ্গনে, আরক্তিম স্বর্ণ-রশ্মি-ধারে।
উৎসুক নয়নে সবে নেহারিছে সুষুপ্তির শেষ—
প্রাচ্যের এ জাগরণে চেতনার নবীন উন্মেষ!
মুকুলিত আশা কত আজ বুঝি স্ফুটন উন্মুখ;
আনন্দ উদ্বেগ ভরা শত ভগ্ন নিপীড়িত বুক।
এর মাঝে কোথা হতে অর্দ্ধনগ্ন বুভুক্ষুর দল
ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে দাঁড়াইয়া করে কোলাহল।
লক্ষ লক্ষ নর-নারী কার পানে বাড়াইয়া হাত
জানাইছে আবেদন, "দাও শুধু এক মুঠা ভাত।"

'স্বাধীনতা' নাম শুনি চাহে তারা বিস্মিত নয়নে;—
'কি ফল মিলিবে এতে, তাই বুঝি ভাবে মনে মনে।
'মিলিবে কি অন্ন মুষ্টি' বস্ত্রখণ্ড লজ্জা নিবারণী;
ঘুচিবে কি ব্যাধি জ্বালা, শুদ্ধ রক্ত বহিবে ধমনী?
ঢালিয়া বুকের রক্ত বিনিময়ে কেন নাহি পাই?
কোন পথে চলে যায়—মোরা শুধু শূন্য চোখে চাই।
স্বাধীনতা দিবে মুক্তি এই ক্রুর নাগপাশ হতে;
যুগান্তসঞ্চিত ক্ষুধা মিটিবে কি স্বাধীন ভারতে?'
তাই যবে আর সবে নিরখিছে নবীন প্রভাত,
লক্ষ নরনারী কাঁদে, "দাও শুধু এক মুঠা ভাত।"

সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রচার

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

এই প্রবন্ধে আমরা প্রথমে (১) বর্তমান ভারতে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনের কারণ নির্ণয় করব, এবং তারপর (২) সংস্কৃতসাহিত্যের উন্নতিকল্পে পরিকল্পনাদি বিষয়ে আলোচনা করব।

(১) বর্তমান ভারতে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শনের কারণ-নির্ণয়

অতীব দুঃখের বিষয়, সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা-প্রদর্শনে আমাদের দেশের কয়েক শ্রেণীর লোক সর্বদা তৎপর। (ক) প্রথমতঃ ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজ। এ শ্রেণীর লোকেরা ভারতীয় সভ্যতায় সুশোভন কিছুরই সন্ধান পান না, এবং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় অনুরাগবশতঃ পাশ্চাত্ত্য ধরণের জীবন-যাপনে আনন্দ পান। সুতরাং এঁরা যে সংস্কৃতশিক্ষার পক্ষপাতী নন, সংস্কৃতসাহিত্যে কোনও আনন্দ পান না, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নাই। তবে আনন্দের কথা, এ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা জাতীয় ভাবোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা কম হয়ে আসছে। (খ) দ্বিতীয়তঃ বৈজ্ঞানিক ও বণিক সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের অনেকেই ভাবেন, অন্ততঃ বাইরে প্রকাশ করেন যে, কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানার শ্রীবৃদ্ধিসাধনেই ভারতের মুক্তি, অন্যথা নয়, অতীত ভারতের মৃত অস্থি টেনে খাড়া করার প্রয়োজন আজ আর কিছুই নাই। ফলতঃ যান্ত্রিক সভ্যতার মোহে এঁরা আরণ্য সভ্যতার ভেতরে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখতে পান না। তাঁরা মনে করেন যে, সংস্কৃতবিদেরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং প্রগতিবিরোধী কূপমণ্ডুক। প্রাচীন ভারতের অত্যুচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের অদ্ভুত ধারণা; তাঁদের কাছে উপনিষদ্ গাঁজাখুরি, সংস্কৃত কাব্য অশ্লীল; সংস্কৃত জটিল, সংস্কৃত কামশাস্ত্র কদর্য, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র জঙ্গলের নামমাত্র। যদি বলি হস্ত্যায়ুর্বেদ, অশ্বায়ুর্বেদ, বৃক্ষায়ুর্বেদ, এমন কি, কত আয়ুর্বেদ, কত পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা আমাদের সংস্কৃত-সাহিত্য পুষ্ট করেছে—যার তুলনায় বর্তমান পাশ্চাত্ত্য জগৎও অনেক পেছনে পড়ে আছে, তাঁরা তাতে নিজেদের অপমান বলে মনে করেন। কাজেই তাঁরা সংস্কৃতের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করেন। তাঁরা ভারতের অদৃষ্টবাদ, নৈরাশ্যবাদ ভারতীয় দর্শনেরই শিক্ষা বলে মনে করেন এবং ভারতীয়দের যাবতীয় চৈতন্যলুপ্তির জন্য ভারতীয় দর্শনকেই দোষারোপ করেন। (গ) তৃতীয়তঃ, হরিজন সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের অনেকেই আজকাল ভাবেন যে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ এবং ন্যূনাধিক—সংস্কৃতশাস্ত্রকার মাত্রেই তাঁদের সামাজিক অবমাননার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের তাই ধারণা যে সংস্কৃতশাস্ত্র গঙ্গার জলে যত দিন না নিমজ্জিত হয়, তত দিন তাঁদের আর এ কলঙ্কলেপ থেকে মুক্ত হবার আশা সুদূর-পরাহত। (ঘ) চতুর্থতঃ, প্রাদেশিক ভাষার সমৃদ্ধাভিলাষক দল। প্রাদেশিক ভাষার উগ্র হিতকামিগণ বলেন— সহস্র সহস্র বর্ষ ধরে সংস্কৃতশিক্ষার ধারা এ দেশে চলে এসেছে; তাতে তার প্রাণশেষ গেছে থেমে। তদুপরি এর কাঠিন্য হেতু অতি কঠোর পরিশ্রমে এ ভাষাজ্ঞান অর্জন করতে হয়, তার প্রয়োজনীয়তা স্বল্প।

অল্প সময়ের মধ্যে এঁদের প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যুক্তির যথাযথ বিস্তৃত প্রত্যুত্তর দেওয়া সম্ভবপর নয়। তা হলেও আজকে ভারতের জাতীয় দুর্দিনে ঐক্যের মূল্য এত সমধিক যে এ সব বিষয়ে আলোচনা অতীব প্রয়োজন এবং এঁদের কাছে সংস্কৃতসাহিত্যের উৎকর্ষ, সংস্কৃতশিক্ষার আদর্শ এবং জাতীয় সমুন্নতির দিক থেকে সংস্কৃত-সাহিত্য পঠন-পাঠনের একান্ত প্রয়োজনীয়ত্ব সম্যক্ বিশ্লেষণ নিতান্ত প্রয়োজন। তাই সংক্ষেপে দু'একটা কথা বলছি।

ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে লক্ষ্য করে বলা যেতে পারে যে পরের মাকে মা বলে হৃদয়ে তৃপ্তি ও গর্ব অনুভব করায় যে মিথ্যা আড়ম্বরের অবতারণা, এতে কেবল নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করা হয়, সত্যিকার শান্তি এতে পাওয়া যায় না। নিজের যা পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত সম্পদ্, তা অতি নিজস্ব, পরম আদরের সামগ্রী, তাকে উপেক্ষা করা নিছক বাতুলতা। অন্য দিকে সংস্কৃত-সাহিত্য জগতে সর্বথা অতুলনীয়, সুতরাং ঈদৃশ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া নিতান্তই দুরদৃষ্টের পরিচায়ক মাত্র।

ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞানিকদের সম্বোধন এ কথা সুস্পষ্ট বলতে চাই—তাঁদের বিষয়ের বহুলাংশ সংস্কৃত সাহিত্যে সুবিন্যস্ত আছে; সুতরাং গর্বে সংস্কৃতের প্রতি রক্তচক্ষু বা অনাদর প্রদর্শন নিতান্ত অশোভন ও অযৌক্তিক। দ্বিতীয়তঃ, তাঁদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে স্থূল বহির্জগৎই জগতের সব নয়, অন্তর্জগৎ ও তার সমস্যা বহির্জগতের থেকেও কঠিনতর। বাইরের সমস্যা আকুল করে, অন্তরের সমস্যা মানুষকে পাগল করে দেয়। দেহ ও আত্মা উভয়ের সুসমঞ্জস বিনোদন অতীব প্রয়োজন। কেবল উদরপূর্তিতে আত্মার পরিপূর্তি সাধিত হয় না; তজ্জন্য সংস্কৃতে সুরক্ষিত ধর্মোপদেশ ও দর্শনবাদেরও প্রয়োজন সমধিক। শূদ্রেরা বেদ-পাঠে অধিকারী ছিল না, ইত্যাদি ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। একটি মাত্র উদাহরণ দিই। রামায়ণে দশরথ-কর্তৃক নিহত সিন্ধুক-মুনির পুত্র করণের সন্তান হয়েও নিত্য বেদ পাঠ করে বেদান্ত

—ইহা স্পষ্টই রামায়ণে বলা আছে। প্রয়োজনানুসারে দেশ-বিপ্লবাদিতে শূদ্রেরাও যুদ্ধ করবে, এবং ফলতঃ যুদ্ধবিদ্যায় তাদেরও পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন—ইহা শাস্ত্রের বিধান। আমাদের বর্তমান যে দৃষ্টিভঙ্গী, ইহা সম্পূর্ণ আধুনিক ভারতের; স্বাধীন সবল আত্মনিষ্ঠ গরিষ্ঠ অতীত ভারতের নয়। একই মাতৃরক্তে পুষ্ট সন্তানকে ভারতজননীর জ্ঞানদীপ্ত জগদ্বরেণ্য সন্তানবৃন্দ উপেক্ষার গ্লানিতে জর্জরিত করার অশুভ বিধান কখনও দেন নি। ফলতঃ "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্মবিভাগশঃ"—এই উক্তির সার্থকতা হচ্ছে এই যে, গুণ ও কর্ম হিসাবে চতুর্বর্ণ বিভাগের উৎপত্তি, ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সন্তানই কেবল ক্ষত্রিয় হত না, গুণ ও কর্ম অনুসারেই হ'ত। তা না হলে ব্রাহ্মণ দ্রোণ—ক্ষত্রিয় অর্জুনাদির অস্ত্রগুরু এবং শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারূপে মহাভারতের জগজ্জোড়া সিংহাসন জুড়ে বসে থাকতে পারত না। সত্যি, আমাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন; বিদেশী কাঁচের ভেতর দিয়ে না দেখে স্বদেশী স্বচ্ছ চশমার ভেতর দিয়ে দেশমাতৃকার দিব্য মূর্তি দর্শনই আজ সমধিক প্রয়োজন।

বঙ্গভাষার হিতসাধকবৃন্দের অবহিত হওয়া প্রয়োজন যে বৃক্ষের শিকড় ও কাণ্ড ব্যতীত বৃক্ষ বাঁচতে পারে না; মাইকেল, হেম, নবীন, বঙ্কিম, রবি—এঁরা সকলেই সংস্কৃত-বৃক্ষেরই সুপক্ব ফল। সমগ্র ভারতব্যাপী সংস্কৃতই মহা-মহীরুহ; মহারাষ্ট্র, গুজরাত, গান্ধার, মগধ, চোল, কর্ণাট, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, অযোধ্যা, অবন্তী প্রভৃতির ভাষা তারই ফলমাত্র। ঐ বৃক্ষের সরসতা ব্যতীত সবই শুষ্ক হয়ে যাবে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

সমালোচকদের উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কয়টি কথা আমাদের মনে জাগে—সত্যি, সংস্কৃতশিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বা অন্য কোথাও কি কোনও গ্লানি নাই? সে সব গ্লানি কি এবং কিসে তার প্রতীকার?

পূর্বোক্ত সম্প্রদায়-বিশেষের সংস্কৃতশিক্ষার বিরুদ্ধে যুক্তি থেকে এটা সুস্পষ্ট যে সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, উৎকর্ষ, সত্যনির্দেশ প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণ কেন, ভারতের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও একেবারে অজ্ঞ। তাঁদের অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য আমাদের প্রাদেশিক ভাষায় কৃষ্টি বিষয়ক গ্রন্থাদি বিরচন, অনুবাদের সাহায্যে সংস্কৃতবিষয়ক জ্ঞান বিতরণ নিতান্ত প্রয়োজন। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রচারক প্রেরণ পূর্বক বক্তৃতাদির ব্যবস্থাও অত্যাবশ্যক।

বলা বাহুল্য, বর্তমান সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতিও নির্দোষ নয়। এমন কি, বি-এ শ্রেণী পর্যন্ত ধাতুরূপ, শব্দরূপ, কারক-বিভক্তি ও ব্যাকরণের অন্যান্য বিষয় নিয়ে এমন এক অদ্ভুত বিভীষিকার সৃষ্টি করা হয়—যাতে ছাত্র ও বাইরের লোকেরা সকলে সংস্কৃত বলতে একটা ব্যাকরণের বিভীষিকাই বোঝে। এ বিভীষিকার হাত থেকে ছাত্রদের অব্যাহতি দেওয়া সত্যি দরকার। তার পর উচ্চ শ্রেণীতে বিষয়বৈচিত্র্য এবং ভাবগাম্ভীর্য সুপ্রকট করার নিমিত্ত ভিন্ন বিষয়াত্মক গ্রন্থ পাঠ্য করাও প্রয়োজন। এ সব বিষয় পরে আলোচনা করছি। কিন্তু যে জিনিষটা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে শিক্ষা-প্রণালীর ধারার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন। আমাদের স্কুল-কলেজে সংস্কৃতশিক্ষা দেবার সময় ব্যাকরণের উপর এমন একটা অসম্ভব জোর দেওয়া হয়, যার ফলে কাব্যরস সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়, তৎ-সম্ভোগ থেকে ছাত্রবৃন্দ সর্বথা বঞ্চিত হয়। ফলতঃ পাশাপাশি ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠের এ অসামঞ্জস্যে তারা নিজেরাও যেন ক্ষুব্ধ হতে থাকে। এর বিহিত বিধান নিতান্ত প্রয়োজন।

অন্যান্য প্রতিকারও নিয়ে বিবেচিত হবে।

(২) সংস্কৃত-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা

কার্যব্যপদেশে মাদ্রাজ, বোম্বে, রাজপুতানা প্রভৃতি প্রদেশে যখন গিয়েছি, তখন অনেক স্থলে দেখেছি—ইংরেজী ভাষার মাধ্যমিকতায় কোনও কাজ হয় না। আমা-দের দেশী ভ্রাতৃবৃন্দের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য দেশীয় একটি ভাষার মাধ্যমিকতা খুঁজে বের করতেই হয়। বলা বাহুল্য, ভারতের সর্বত্র অগণিত লোক আছেন, যাঁদের সঙ্গে সংস্কৃতভাষার মাধ্যমিকতায় এ কার্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়। ভারতের সর্বত্র সকলেই আমাকে বলেছেন যে, মালয়ালম, ক্যানারিস, তেলুগু, গুরুমুখী, উড়িয়া, বাংলা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার আকৃতি বিশেষ থেকে ভাষা-জননীকে উদ্ধার করে নিলেই ভারতের বেশীর ভাগ ভাষাই ভারতীয়মাত্রেরই সহজে বোধগম্য হয়। বিভিন্ন রকমের হরফের জন্যই আমরা সর্বাধিক বিপদগ্রস্ত হই। এ কথাটা যে কত বড় সত্য, তা আমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচ্যগ্রন্থাগার লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীর সংস্কৃতবিভাগের কর্মসচিব হিসাবে বিভিন্ন প্রাদেশিক অক্ষরে প্রকাশিত সংস্কৃত-গ্রন্থাদি পর্যালোচনা কালে বিশেষ করে ব্যক্তিগত ভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছি। আজ সেদিন এসেছে যখন জাতীয়ভাবের ও কার্য-কলাপের পরিতুষ্টি ও সুসম্পাদনার নিমিত্ত আমাদের স্বকীয় সাময়িক অসুবিধা সহ্য করা শুধু প্রয়োজন নয়, একান্ত কর্তব্য। এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নাই যে, সংস্কৃত-ভাষাই প্রকারান্তরে ভারতের একমাত্র সার্বজনীন ভাষা। "প্রকারান্তরে" এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য এই যে, সংস্কৃত-ভাষাবিদ্দের সংখ্যা ভারতে অত্যধিক না হলেও এক তামিল ব্যতীত আধুনিক প্রত্যেক ভাষার ভেতরে সংস্কৃত শব্দসংখ্যা এবং সাহিত্যাঙ্গ রচনা এত সমধিক যে, এ সবের মাধ্যমিক-তায় ভারতের এক প্রদেশের লোকের অন্য প্রদেশের ভাষা বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না। আসমুদ্রহিমাচল কচ্ছোপসাগর

থেকে মণিপুর পর্যন্ত ভারতের সর্বত্র একটা সভ্যতা ও কৃষ্টির সামঞ্জস্য আছে, চিন্তার ধারায় ঐক্য আছে, বাক্যবিন্যাসের পদ্ধতি আছে। সংস্কৃতানুগ সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট ছাপ আছে—যার অবলম্বনে ভারতীয় মাত্রেই ভারতের বিভিন্ন স্থলের ভাষা ও ভাবধারার সঙ্গে মিলেমিশে যেতে পারে, এবং এটা সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমিকতা হেতু সম্ভবপর হয়েছে। এমন কে আছেন যিনি উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, চরকসুশ্রুত প্রভৃতির জন্য গর্বানুভব না করেন? ভারতের এমন কোন নামোল্লেখ যোগ্য ভাষা আছে, যাতে এসব গ্রন্থাদির অনুবাদ, এবং এই সব গ্রন্থাবলম্বনে বহুল গবেষণা হয় নি? সুতরাং বাইরের কিছু বিসংবাদ সত্ত্বেও স্থিরচিত্তে ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যই প্রকৃতরূপে ভারতীয়-মাত্রেরই মিলনের একমাত্র সূত্র এবং এজন্যই একে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকার করা যেতে পারে। তা হলে সর্ব-প্রথমেই কথা উঠে,—এ যে অখণ্ড ভারতভূমির রাষ্ট্রীয় ভাষা সংস্কৃত এর সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধানের নিমিত্ত বর্তমান যুগে কি কি করণীয়, কি কি বিষয়ে সর্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা নিতান্ত কর্তব্য মনে করি।

বহির্দৃষ্টিতে কেন, বস্তুত, কার্যতও এটা ঠিক যে বর্তমান যুগে সংস্কৃতশিক্ষা যেন কালোপযোগী হয়ে উঠ্‌ছে না। এ জন্য বাহিরের ও ভেতরের দিক থেকে এর বহুল সংশোধন অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বারাণসী, কলিকাতা ও অন্যান্য সর্বস্থলের সংস্কৃতপরীক্ষাও এক এক বিষয় অবলম্বনে নেওয়া হয়। তাতে যেমন এক দিকে বিষয়-বিশেষের প্রতি মনোযোগ-নিবন্ধন সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রকৃষ্ট রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি পাঠ্য-তালিকা থেকে আধুনিক বিষয়গুলি সম্পূর্ণ বিবর্জিত হয়েছে বলে আমরা সংস্কৃতবিদ্যার্থীরা যেন বর্তমান কালোপযোগী হয়ে উঠ্‌তে পারছি না। দৈনন্দিন কার্যকলাপের সুযোগ-সুবিধা সংঘটনের নিমিত্ত কিছু আধুনিক ভাষা, কিছু গণিত ও বিজ্ঞান সংস্কৃত প্রত্যেক বিষয়েরই প্রথম দু' পরীক্ষায় অন্ততঃ সংযোজিত করে দেওয়া একান্ত কর্তব্য। অন্ততঃ ইংরেজী একটি পত্র বোঝার, বা একটি টেলিগ্রাম বুঝতে পারার মত বিদ্যার্জন করা সংস্কৃতবিদ্‌দেরও কর্তব্য। এক কথায় সংস্কৃত-বিদ্যাকে বর্তমান কালোপযোগী করার নিমিত্ত যা যা করা প্রয়োজন, তদনুরূপ পাঠ্য-তালিকা তৈরী হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে আমাদের সাধারণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির (স্কুল-কলেজ প্রভৃতির) সঙ্গে সংস্কৃতের জন্য বিশেষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-গুলির (টোলগুলির) বিশেষ কোনও সম্পর্ক নেই। আমার মনে হয়, এ দু'প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-বিধান একান্ত প্রয়োজন। এদের দুটিকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দুটি বিভাগরূপে পরিগণিত না করে কিছু দূর পর্যন্ত একটি সাধারণ বিভাগে পরিণত করা বিধেয়—যাতে পণ্ডিতেরাও অন্যান্য বিষয়-বিশেষে কিছু অধিকার লাভ করেন এবং সাধারণ ছাত্রেরাও সংস্কৃত বিষয়ে অধিকতর শিক্ষা লাভ করতে পারেন।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরে অবশ্য ছাত্রমণ্ডলী স্বকীয় অভীষ্ট পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হতে পারেন, এরূপ ব্যবহারও প্রয়োজন। নূতন শিক্ষা-প্রণালীর প্রণয়নকালে দেশের শিক্ষা-বিদেরা যেন এদিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন, তজ্জন্য আমি তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের সংস্কৃত-শাস্ত্রের যে যে বিষয়ের অনু-ধাবনে আর্থিক সংস্থানের সুযোগ-সুবিধা ঘটতে পারে, যেমন আয়ুর্বেদ, ফলিত জ্যোতিষ প্রভৃতি, সে সব বিষয়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান অবশ্য কর্তব্য। সংস্কৃতবিদ্যার্থীদের আর্থিক দুর্গতিই চরম সমস্যা এবং এর থেকে এর কথঞ্চিৎ সমাধান সম্ভবপর হবে নিশ্চয়ই। এটা অত্যন্ত ঠিক যে, এখনও পর্যন্ত আয়ুর্বেদ জগতের চিকিৎসা-পদ্ধতির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ-রূপে সর্বত্র স্বীকৃত হয়; এর প্রমাণের প্রয়োজন নেই, এ একে-বারে প্রত্যক্ষ সত্য। ফলিত জ্যোতিষের অনুশীলনকারীদের অর্থাগমও প্রত্যক্ষ সত্য।

ধর্মকে ব্যবসায়ে রূপান্তরিত বা পরিগণিত করার কোনও চেষ্টা না করেও ধর্মসংরক্ষণের নিমিত্তই সুকঠোর আচার-ব্যবহার ও রীতি-নীতির প্রবর্তন ও অনুবর্তনে ধর্মযাজী সংস্কৃতবিদ্‌দের জীবিকানির্বাহ সুচারুরূপে চলতে পারে।

আমরা পূর্বেই বলেছি যে বাস্তুবিদ্যা, স্থাপত্য, তক্ষণ, রত্ন-পরীক্ষা, কৃষি প্রভৃতি বহু বহু শিল্প শাস্ত্রাদি আমাদের অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে। ঐ সব গ্রন্থে অমূল্য সারতত্ত্ব নিহিত আছে। সে সব তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম ক'রে তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট অনুশীলন একান্ত কর্তব্য। ঐ সব অর্থকরী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করতে পারলে অর্থাগম অনিবার্য। সমগ্র জগতের ধনার্জন নির্ভর করে এর উপরেই। অথচ এ সবের প্রকৃষ্ট বিকাশ আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থনিচয়ে নিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও অতীব পরি-তাপের বিষয় যে এ সব বিষয়ের আমরা সম্পূর্ণ অনাদর করেছি—যার ফলে আমাদের সংস্কৃত বিদ্যা একান্তই তাত্ত্বিক বিদ্যা হয়ে পড়েছে; ব্যবহারিক দিক আমরা ছেড়েই দিয়েছি। আমাদের এ সব দিকে অদূর ভবিষ্যতে বিশেষ দৃষ্টিপাত একান্ত প্রয়োজন। এ সঙ্গে সঙ্গীত, চিত্রণ, নৃত্য-গীতাদি, অভিনয় প্রভৃতি ললিতকলার যথোপযুক্ত অনুশীলনেও মানসিক আনন্দ ও আর্থিক সাচ্ছল্য—উভয় দিক থেকে আমাদের যথেষ্ট সহায়তা হতে পারে। তজ্জন্য তদ্বিষয়েও অবহিত হওয়া কর্তব্য।

তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষীয়দের স্ব-হস্তে দেশের শাসনক্ষমতা এসে পড়ায় আজ স্বতঃই আমাদের দণ্ডনীতি প্রভৃতির প্রতি নজর দেওয়া অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে। মহাভারতোক্ত

রাজনীতি, দণ্ডনীতি প্রভৃতি, অর্থ-শাস্ত্রোক্ত পদ্ধতির সম্যক্ পর্যালোচনা আজ একান্ত কর্তব্য। কালক্রমে আমাদের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নারী-চরিত্রের উন্নতিবিধান এবং শূদ্র ও নারীকে সমপর্যায়ভুক্ত করে উভয়কে হীন প্রতিপন্ন করার উপায় উদ্ভাবন করাকেই শাস্ত্রীয় কাজ মনে করেছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে আজ সেকালের অবসান হয়েছে এবং আবার দেশের সকলের সমভাবে সর্ব কার্যে শ্রেষ্ঠ অবদানের সুযোগ-সুবিধা ফিরে এসেছে, আইনের বলে সম্প্রদায়-বিশেষকে সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষমতাচ্যুত করার দিন একেবারে তিরোহিত হয়ে গেছে। দেশবাসীই আমাদের একমাত্র উপাস্য ; ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে দৃকপাত করার সময় আমাদের আজ নাই। পরের হাতে রাজনীতির ভার চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা গৃহকোণে বসে নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনযাপনের সময় আজ চলে গেছে। প্রাণমন সম্পূর্ণ সমর্পণ করে "রাজনীতি"র অনুশীলনে—অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ ও সামঞ্জস্য বিধানে আমাদের বদ্ধপরিকর হতে হবে।

চতুর্থতঃ, সংস্কৃত-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক, শিল্পকলাবিদ্ প্রভৃতি অনেকেরই অনুরাগ আছে। এঁদের সহযোগিতায় আমাদের প্রাচীন ভারতের তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানরাশির প্রকৃষ্ট আলোচনা এবং বিশ্বসমক্ষে প্রচার আজ অতি প্রয়োজন। এতদিন পর্যন্ত সংস্কৃতবিদেরা বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিশেষ কাজ কিছুই করেন নি। স্বল্প পরিমাণ কাজ হয়েছে মাত্র, তাই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে সংস্কৃতপণ্ডিতমণ্ডলীর বিশেষ সংযোগ স্থাপন অত্যাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে এও বলা দরকার যে, পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য ভাষাবিদ্ ভারতীয় বা অভারতীয় সংস্কৃতজ্ঞদের সঙ্গে আরও নিবিড়তর সম্পর্ক গড়ে তোলা আজ অত্যধিক প্রয়োজন। কেবল সংস্কৃত-ভাষাবিদ্ যাঁরা, তাঁরা অন্য ভাষায় লিখিত জ্ঞান আহরণে সমর্থ হন না—জগতের বিভিন্ন ভাষাবিদ্ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহযোগিতায় তাঁরা সে জ্ঞানের সন্ধান পান ; অন্য দিকে পণ্ডিতমণ্ডলী পাশ্চাত্ত্য ভাষাবিদ্ পণ্ডিতকে সংস্কৃতের গোপন মণিরাশির সন্ধান দিতে পারেন। এ উভয় প্রকারের সংস্কৃতবিদের মিলন —কর্মক্ষেত্রে মিলন—সর্বথা বাঞ্ছনীয়। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতে ডিগ্রীধারীরা অর্থার্জনে কষ্ট-ভোগ করেন বলে আমরা সংস্কৃতে তেমন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্র পাই না ; অন্য দিকে সংস্কৃতবিষয়ক পাণ্ডিত্যের প্রতি জনসাধারণের অনাদর হেতু আর তেমন বড় বড় পণ্ডিতও নূতন করে দেখা দিচ্ছেন না। এর থেকে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে ? এখনও যে সব পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁদের বিশাল পক্ষপুটে সংস্কৃত শাস্ত্রকে আশ্রয় দান করে রেখেছেন, তাঁদের সংখ্যা একেবারে কমে এসেছে। এঁদের তিরোধানের পরে তাদৃশ সংস্কৃতবিদ্ মনীষী যে ভারতধাম পূর্ববৎ সমলঙ্কৃত করতে পারবেন, আজ আর তেমন মনে হয় না।

বর্তমানে আমাদের অভাব-অভিযোগ কোথায় তা বিশেষ চিন্তনীয়।

১। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর মত একটি বিশিষ্ট পাঠাগার আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন—যাতে এক জায়গায় বসে সকল প্রকারের গ্রন্থ আলোচনা করা যায়, সব প্রকারের পুঁথি যথাসম্ভব দেখা যায়। আমাদের কলিকাতা নগরী ভারতীয় কৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সংরক্ষণ-স্থল ; ঈদৃশ স্থানেও এমন কোনও পুস্তকাগার নাই যাতে কোনও গ্রন্থ-বিশেষের দু-তিন খানার বেশী সংস্করণ পাওয়া যায় ; এবং সহস্র সহস্র বিশেষ উপযোগী সংস্কৃত গ্রন্থ আছে—যা কলিকাতার কোনও লাইব্রেরীতে কোনও দিন রক্ষিত হয় নি। একটি উদাহরণ দিয়ে এ কথাটি পরিষ্কার করা দরকার। ধরুন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কোনও বিষয়বিশেষে আমার হৃদয়ে কোনও এক নূতন চিন্তা যদি জাগে, আমার সর্বপ্রথম জানা দরকার—জগতের কোন্ বরেণ্য সুধী এ বিষয়ে কি বলেছেন, কে কি ভাবে এ জিনিষটাকে দেখেছেন, তা না হলে গবেষণা হয় না, নূতন জিনিষ আবিষ্কার করা হতে পারে না। এ যদি জানতে হয়, তা হলে যত যত পণ্ডিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নিয়ে যা যা কাজ করেছেন, আমার দেখে নেওয়া দরকার। তা যদি হয়—আমার একটি পাঠাগারের দরকার যাতে সং কটি ভগবদ্গীতার সংস্করণ, অনুবাদ, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি এবং বিশেষতঃ ভগবদ্গীতার উপরে লিখিত সমস্ত গ্রন্থের বিবরণ-সংবলিত গ্রন্থপঞ্জী প্রভৃতি রয়েছে। আজ আমাদের দেশে এমন কোনও পাঠাগার নাই যাতে এর কিছুই পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে ভগবদ্গীতার ৪১৮টি অনুবাদ-সংবলিত বিভিন্ন সংস্করণ, ১৬৪টি বিভিন্ন টীকা এবং দু'শতাধিক অংশবিশেষের মুদ্রিত সংস্করণ আছে। তদুপরি ৬০০ বিভিন্ন অনুবাদ এবং নয়টি বিভিন্ন প্রকারের সূচী আছে। সুতরাং চাওয়া মাত্রই ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী যে কোন পাঠককে ১৫০০ পনর শতের অধিক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা গ্রন্থ দিতে পারে, এবং তদুপরি অজস্র গবেষণামূলক গ্রন্থ নাম বলার সঙ্গে সঙ্গেই এনে দিতে পারে। তাঁদের তদনুযায়ী ক্যাটালগ, গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ, গ্রন্থাগারের জনসম্পদ প্রভৃতি সব কিছুই আছে। সুতরাং তাদৃশ একটি গ্রন্থাগার পেলে যে কাজ তিন-চার মাসে হয়ে যায়, আমাদের তাদৃশ কাজ যাবজ্জীবনেও হয় না। তদুপরি সেখানে ব্যক্তিগত হিংসা-দ্বেষাদি আমাদের তুলনায় নিতান্ত কম, স্বীকার করতেই হয়—অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য ব্যক্তিগত সাহায্য সব কিছু বক্তার দ্বারে যেন ছুটে চলে আসে। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে আমাদের যদি কেউ কিছু জানেনও, অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা বিদ্যার্থীকে তদ্বিষয়ক সন্ধান দিতে অনিচ্ছুক থাকেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দেশে দেখেছি যে প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুকে সাহায্য করতে সেখানকার পণ্ডিতমণ্ডলী অতীব উদ্গ্রীব। আজ

আমরা শুধু কল্পনা করতে পারি যে আমাদের দেশেও এমনি এক দিন ছিল, তা না হইলে এ বিশ্ববিজয়ী দর্শনশাস্ত্র এদেশে তৈরী হতে পারত না। যা হোক, ঈদৃশ গ্রন্থাগার আমাদের আজ এ যুদ্ধোত্তর যুগে সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

দেশের সর্বত্র যে সব গ্রন্থ লুকায়িত আছে, রাজা, মহারাজ, জমিদার বা বিশিষ্ট পণ্ডিতের গ্রন্থাগারে যে সব গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তার যথাযথ ব্যবহারের নিমিত্ত ঐ সব গ্রন্থ ও পুঁথির সঠিক বিবরণ, প্রাপ্তিস্থান প্রভৃতি জানা থাকা দরকার। ইংলণ্ডের ন্যাশনাল লাইব্রেরী এ কাজ করে। এটি অত্যন্ত প্রয়োজন।

তারপর যত বিষয়ে যত কাজ হচ্ছে, তার একটি সূচী—ধারাবাহিক সূচী, অত্যন্ত প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, তা না হলে উচ্চদরের অভিনব গবেষণা অতি কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে, অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপরও হয় না।

ভারতবর্ষের সর্বত্র এক শতাধিক প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকা সম্পাদিত হচ্ছে বর্তমানে। এ সব মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক পত্রিকায় অজস্র নূতন নূতন বিষয় নিরন্তর প্রকাশিত হচ্ছে। এ সব জ্ঞানেরও সংহতি প্রয়োজন এবং তজ্জন্য একটি বিষয়সূচী অত্যাবশ্যক। বোম্বে থেকে এজাতীয় কাজ কিছু কিছু হচ্ছে; আরও পূর্ণাঙ্গ কাজ আমাদের প্রয়োজন।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এমন কি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির শব্দসূচী, বিষয়সূচী বা তাঁদের উপরে লিখিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলীর নির্ণায়ক কোনও গ্রন্থ অদ্যাপি আমরা রচনা করি নি। এ অপরাধ নিশ্চয়ই অমার্জনীয়।

জগতের বিশাল সাহিত্যের সঙ্গে আমরা বিশেষ করে করে ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমিকতায় সুপরিচিত। ঐ সব সাহিত্যের বিশিষ্ট বিশিষ্ট গ্রন্থ থেকে আহৃত জ্ঞান আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করার দিন আজ এসেছে। দারুণ এককালে বহু সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদের দ্বারা ফার্সী সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছিলেন। ভারতের মধ্যযুগে অগণিত সংস্কৃতগ্রন্থের অনুবাদাদির দ্বারা মহামতি সম্রাট্ আকবর ফার্সী সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন। অন্য দিকে বহু ফার্সী গ্রন্থের সংস্কৃতানুবাদ দ্বারা তৎকালীন পণ্ডিতসমাজ সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন। আজও এ জিনিষের নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

পরিশেষে আমাদের কর্তব্য এই যে, একার্য সুসংহত করার নিমিত্ত সমগ্র ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন অতীব প্রয়োজন। কিছু দিন পূর্বে আলোয়ারের মহারাজা একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড এবং দশ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ থেকেও একটি বিরাট পরিকল্পনা ঘোষিত হয়েছে। দাক্ষিণাত্য এবং পশ্চিম-ভারতের লোকেরাও এ বিষয়ে তৎপর হয়েছেন। কেবল দিবালোকের প্রথমোন্মেষ স্থলেই অর্থাৎ আমাদের এ পূর্ব-ভারতেই আমরা যেন অন্ধালোকে নিমজ্জিত হয়ে আছি, নির্জীব ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হবে পরমুখাপেক্ষী হয়ে অপেক্ষা করছি। আজ সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই সর্বস্ব পণ করেও সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক্ উন্নতি সাধন করতেই হবে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পূর্বভারত এককালে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশিষ্টতম দান করেছে। আজও পুনরায় তার জন্য আহ্বান এসেছে। আমরা যদি দেশমাতৃকার মুখ উজ্জ্বল করতে চাই, আমাদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন— সংস্কৃত-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হওয়া, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ বিস্মৃত হয়ে কেবল লক্ষ্যের পশ্চাদ্ধাবন করা। এতেই আমাদের অপবর্গ নিহিত আছে।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিদ্যালয় ও প্রাদেশিক সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সংস্থাপনের এবং বর্তমান সময়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় আমাদের অবশ্য কর্তব্য—বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রতি যা অবিচার চলেছে, তার প্রতিবিধান করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের যথাযথ মানমর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রাখা। অন্যান্য ছাত্রদের সমান সমান সুযোগ-সুবিধা, বৃত্তি-নির্ধারণ প্রভৃতি আমাদের সংস্কৃতের ছাত্রদের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতের পূর্বাবস্থার পুনর্ব্যবস্থাপন প্রয়োজন, এবং অন্য বিষয়ের পরিবর্তে যে অপশব্দাল সংস্কৃত ছিল, তজ্জন্যও প্রচেষ্টা অবশ্য কর্তব্য। প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যসূচীতে সংস্কৃতকে বাধ্যতামূলক না রেখে ইচ্ছামূলক বিষয়ে পর্য্যবসিত করার যে প্রচেষ্টা অধুনা দৃষ্ট হচ্ছে, তার বিরুদ্ধেও আমাদের অভিযান নাতিবিলম্বে অবশ্য কর্তব্য।

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

চতুর্থ অধ্যায়

ওয়াশিংটন

পটোম্যাক নদীতীরে উত্তুঙ্গ ওয়াশিংটন-স্মৃতি-স্তম্ভ-চিহ্নিত সুসজ্জিত ওয়াশিংটন শহর। আকাশ হইতে শহরের মনোরম শোভা দেখিতে দেখিতে বিমান-ঘাঁটিতে অবতরণ করিলাম। তখন বৈকাল পাঁচটা। অনুসন্ধান-টেবিলে খোঁজ লইয়া জানিলাম যে, ওয়াশিংটনস্থ ভারতীয় দূতাবাসের জনৈক আমেরিকান কর্ম্মচারী আমার জন্য ঘাঁটিতে অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। মাল খালাস করিতে গিয়া দেখি মাল আসে নাই। ঘাঁটির ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট এ বিষয় বলিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোন-যোগে নিউইয়র্ক এবং অন্যান্য স্থানে কথা বলিয়া দশ মিনিটের মধ্যে মালের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। সবিনয়ে বলিলেন, 'আপনার মাল ভুলক্রমে নিউইয়র্ক হইতে বোষ্টন চলিয়া গিয়াছে। আমরা পরবর্ত্তী বিমানে বোষ্টন হইতে মাল আনাইয়া রাত্রি দশটার মধ্যে আপানার হোটেলে পৌঁছাইয়া দিব। আপনার খুবই অসুবিধা হইবে। আমাদের বহু যত্নসত্ত্বেও কচিৎ এরূপ ভুল ঘটিয়া যায়। আশা করি আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।' আমার মালের মধ্যে ছিল দুইটি থলি। একটি ছোট ও একটি বড়। ক্ষুর, দাঁতের মাজন প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুগুলি একটি ক্ষুদ্র হাত-ব্যাগের মধ্যে ছিল। সেটিকে বড় থলির মধ্যে রাখিয়াছিলাম। কাজেই এত লম্বা ভ্রমণের পর দন্তধাবন, বস্ত্রপরিবর্ত্তন প্রভৃতি কিছুই করিতে পারিব না মনে করিয়া বড়ই অস্বস্তি বোধ করিলাম। যদিও ইহারা বলিল, রাত্রি দশটা অর্থাৎ মাত্র সাড়ে চারি ঘণ্টার মধ্যে ইহারা আমার মাল পাঁচ শত মাইল দূরবর্ত্তী বোষ্টন হইতে আনাইয়া নিজেরাই হোটেলে পৌঁছাইয়া দিবে তথাপি ভারতবর্ষীয় অভিজ্ঞতা-পুষ্ট আমার মন এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছিল না। অনন্যোপায় হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে দূতাবাসের বন্ধুটির সঙ্গে তাঁহারই গাড়ীতে হোটেলের দিকে চলিলাম। এখানে কোন ভারতীয়ের সাক্ষাৎ বিরল হইবে এ চিন্তাও মনে উদিত হইল। দূতাবাসের বন্ধুটির সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে শহরের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। তখন দিবালোক নির্ব্বাপিতপ্রায়। রাস্তার প্রশস্ততা, মসৃণতা ও পরিচ্ছন্নতা চোখের তৃপ্তি উৎপাদন করিল। লিঙ্কন-স্মৃতি-মন্দিরে আলোকোদ্ভাসিত লিঙ্কনের মুখ-খানি ছবির মত চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। এক সুরম্য উদ্যান-মধ্যবর্ত্তী রাস্তা অতিক্রম করিয়া এক বিরাট হোটেলে উঠিলাম। ভিতরে ঢুকিয়াই দেখি অভ্যর্থনা-কক্ষে শ্রীযুত রাধাকুমুদ ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় আমার সম্মুখে। ইঁহাদের অপ্রত্যাশিত দর্শনে মনের গ্লানি অনেকটা দূর হইল। সাড়ে দশটা বাজিতে ঘরে বসিয়া হোটেলের আপিস হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাইলাম যে বিমান-ঘাঁটি হইতে আমার বড় দুইটা থলি আসিয়াছে। দুই মিনিটের মধ্যে স্বগৃহে আমার বোষ্টন-ফেরত থলিদ্বয়-দর্শনে প্রিয়-মিলনের আনন্দ অনুভব করিলাম।

পরদিন শনিবার, ১৬ই নভেম্বর ৩০শে কার্ত্তিক। আমেরিকার সমস্ত সরকারী আপিস ও ব্যাঙ্ক বন্ধ। কিন্তু ভারতীয় দূতাবাস খোলা। সকালে দূতাবাসে গিয়া শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী ও অন্যান্য কর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের খোঁজ লইতেছি, এমন সময় তিনি তদীয় সহকর্ম্মী ছাত্র শ্রীযুত পীতাম্বর পন্থের সহিত দূতাবাসে আসিয়া উপস্থিত। শুনিলাম তাঁহারা শহরের কেন্দ্রস্থলে "মেফ্লাওয়ার" নামক একটি হোটেলে আছেন। দূতাবাসের কর্ম্ম সমাপনান্তে তাঁহাদের সহিত নিকটবর্ত্তী একটি "কেফিটেরিয়া"য় মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিয়া তাঁহাদের হোটেলে গেলাম। মহলানবীশ মহাশয় তিন-চারি দিনের মধ্যেই ওয়াশিংটন ত্যাগ করিবেন এবং শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরিবেন। এ কয়েক দিন তাঁহার সঙ্গে ওয়াশিংটনস্থ সরকারী কর্ম্মচারিসমাজে পরিচিত হইবার চেষ্টা করিলাম।

শ্রীযুত মহলানবীশ-গৃহিণী তখন ওয়াশিংটনে। সেদিন তিনি ডাক্তার ডেমিং-এর গৃহে আতিথ্যস্বীকার করিয়া বাস করিতেছিলেন। ঐ দিন রাত্রে এতদুপলক্ষে ডেমিং এক ভোজের ব্যবস্থা করিলেন। আমিও সেই ভোজে নিমন্ত্রিত হইলাম। ডেমিং "বাজেট-ব্যুরোর" সংখ্যাবিজ্ঞান বিভাগে একজন বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ। ঐ দিন ভোজে স্ত্রী-পুরুষে প্রায় কুড়ি জন অতিথি ছিলেন। পুরুষগণ সকলেই প্রতিষ্ঠাবান সরকারী কর্ম্মচারী। কেহ আণবিক গবেষণায়, কেহ গণিতে, কেহ সংখ্যাবিজ্ঞানে, কেহ অর্থনীতিতে, কেহ বা বাণিজ্য-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। সকলেরই মন সজীব ও সতেজ; সকলেই বলিষ্ঠ আশাবাদী। ইঁহাদের ও ইঁহাদের পত্নীগণের সঙ্গে পরিচিত হইয়া ও আলাপ করিয়া পরম আপ্যায়িত বোধ করিলাম।

সেদিন অতিথিগণের মধ্যে নানা বিষয়ে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। গত নির্ব্বাচনে রিপাবলিকান পার্টি চৌদ্দ বৎসরের পর—কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। প্রেসিডেন্ট ডিমোক্রেটিক পার্টিরই রহিয়া গিয়াছেন। এ অবস্থায় শাসন-ব্যবস্থায় কিরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে—সে বিষয়ে সকলেরই বিশেষ

উৎকণ্ঠা। এদেশে প্রেসিডেণ্ট চারি বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন। কিন্তু কংগ্রেস নির্ব্বাচিত হয় দুই বৎসরের জন্য। কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্টের দলগত সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকিলে শাসনকার্য্যে বিভ্রাট উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। বিলাতী প্রথায় হাউস অব্ কমন্সে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তাহারই নেতা প্রধানমন্ত্রী-রূপে শাসন-তরণীর কর্ণধার হন। কাজেই তিনি যেভাবে শাসন-তরণী চালাইতে চাহেন, কমন্সগণ তাহা অনুমোদন করেন। আর যদি কখনও মন্ত্রিগণ কমন্সগণের অনুমোদন লাভে অসমর্থ হন তাহা হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করেন। যাঁহারা কমন্সগণের অনুমোদন লাভ করিতে পারিবেন তাহারা তখন মন্ত্রী হন। কাজেই বিলাতে মন্ত্রিগণ ও কমন্সগণের মধ্যে কখনও দলগত বা নীতিগত অসামঞ্জস্য বা বিরোধ উপস্থিত হয় না। কিন্তু আমেরিকায় প্রেসিডেণ্ট ও কংগ্রেস স্বতন্ত্রভাবে দেশবাসীর ভোটে নির্ব্বাচিত হন। ফলে প্রেসিডেণ্ট ও কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সমদলীয় নাও হইতে পারেন। কিন্তু দল দুইটি এখানে এরূপ শক্তিশালী যে যখন প্রেসিডেণ্ট ও কংগ্রেসের যুগপৎ নির্ব্বাচন হইয়াছে তখন কদাপি তাঁহাদের দলগত বৈষম্য হয় নাই। কিন্তু যখন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকালের মধ্যভাগে নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তখন কখন কখন দলগত বৈষম্য উপস্থিত হইয়াছে, এবং যখনই এইরূপ হইয়াছে তখনই প্রেসিডেণ্টের শাসন-তরণী চালনায় বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট উইলসন ও প্রেসিডেণ্ট হুভারের শেষের দুই বৎসর এইরূপ ঘটিয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট উইলসন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লীগ অব্ নেশন্‌স্ সংগঠন করিয়া আসিলে কংগ্রেস তাহার মেম্বর হইতে অস্বীকার করে, ইহা সুবিদিত ঘটনা। এবার সেরূপ বিভ্রাট হইবে কিনা এবং হইলে কি পরিমাণে হইবে ইহা বর্ত্তমানে সকলের আলোচ্য বিষয়। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে এরূপ অবস্থায় পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে প্রেসিডেণ্টের দল আর প্রেসিডেণ্ট পদটি রাখিতে পারেন নাই। এবারে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে রিপাব্লিকান দল প্রেসিডেণ্ট পদটিও অধিকার করিবে কিনা ইহা দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়। ইহা হইতে তর্কস্থলে আরও দুইটি প্রশ্ন স্বতঃই উপস্থিত হয়। প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকালের মধ্যবর্ত্তী কংগ্রেস নির্ব্বাচন উঠাইয়া দেওয়া উচিত কিনা? প্রেসিডেণ্ট ও কংগ্রেসের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনই ভাল, না বিলাতী প্রথামত আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতেই প্রেসিডেণ্ট বা মন্ত্রিসভা নির্ব্বাচন ভাল? দ্বিতীয় প্রশ্নটি অবশ্য খুব কমই আলোচিত হয়। কারণ এদেশের লোক স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনে এত অভ্যস্ত যে বিলাতী প্রথামত অ-স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের কথা সহসা ভাবিতে পারে না।

আমেরিকার তথা পৃথিবীর অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে আলোচনা উঠিল: ঊর্দ্ধগতি বাণিজ্য-চক্র আর কত দিন ঊর্দ্ধমুখী থাকিবে? কত দিনে ইহার অধোগতি সুরু হইবে? আমেরিকার রিপাব্লিকান দলের নীতি এই চক্রগতি রোধ করিতে পারিবে কিনা? এই সব বিষয়ে আলোচনা চলিল। তখন মূল্যশাসন সবে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। উঠাইয়া লইবার অব্যবহিত পরে মূল্য খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু যে সব দ্রব্য মূল্যশাসনের ফলে বাজার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল সে সব দ্রব্য আবার দেখা দিল, উৎপাদন বাড়িয়া গেল; ফলে দাম আবার কমিয়া গেল। রিপাব্লিকান্ দল বৃহৎ বাণিজ্য-স্বার্থের প্রতিনিধি। তাহারা মূল্যশাসন, বা প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের "নিউডিল" বা 'নতুন কারবার' পছন্দ করেন না। তাঁহারা অবাধ উৎপাদনের পক্ষপাতী। মূল্যশাসন উঠাইয়া লওয়াতে মূল্য হ্রাস পাওয়ায় জনসাধারণ ইহা পছন্দ করিতেছে। তবে এ মূল্য-হ্রাস কি বাণিজ্য-চক্রের নিম্ন আবর্ত্তন সূচনা করিতেছে? অনেকে মনে করেন যে জিনিষপত্রের এত চড়া দাম থাকিতে পারে না। কারণ এত দামে যথেষ্ট ক্রেতা জুটিবে না। কাজেই মূল্য-হ্রাস অনিবার্য্য। তবে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হইলে মূল্য-হ্রাসও দ্রুত হইবে। ফলে বহু ব্যবসা গুটাইতে হইবে। তাহার ফল সুদূরপ্রসারী হইতে পারে। কিন্তু ১৯২৯ সালে যেরূপ প্রত্যেকেই দায়িক ছিল, এবার সেরূপ নাই। কেহ কাহারও কাছে বিশেষ ধারে না। কিস্তিবন্দীতে কারবারও বিশেষ নাই। দেশের ব্যাঙ্কগুলির মধ্যেও অধিকতর সহযোগিতা ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান। কাজেই একজনের বিফলতা বা বিপদ অন্য লোকের উপর সংক্রমিত হইবার সুযোগ কম। শৃঙ্খলার সহিত মূল্য স্তরে স্তরে নামাইয়া আনিবার সুযোগ ও সম্ভাবনা অনেক বেশী। আর এই মূল্যাবতরণের সঙ্গে সঙ্গে যদি যথেষ্ট পরিমাণে যন্ত্রশক্তির উন্নতির দ্বারা উৎপাদন-ব্যয় কমাইতে পারা যায় তবে তো মূল্য-হ্রাস সত্ত্বেও ব্যবসায়ে বিফলতার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা আমেরিকার বাহিরের লোক কিন্তু ভীত হইয়া পড়িতেছি। এখন পৃথিবীর বাণিজ্যের উপর আমেরিকার বিশেষ প্রভাব। আমেরিকার বাণিজ্যচক্র যখন নিম্নমুখে আবর্ত্তিত হইবে, তাহার বেগ ধনী আমেরিকা সামলাইতে পারিলেও আমরা পারিব না। ইংলণ্ডের মুদ্রানীতি ও বাণিজ্য-নীতিতে এই ভয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছে।

ইংলণ্ডের কথা উঠিতেই দেখিলাম যে ইহাদের প্রায় সকলেরই মতে ইংলণ্ডের অগ্রগতির প্রধান অন্তরায় তাহার আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব। যন্ত্রশক্তিতে পিছাইয়া পড়িলে উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ে না, তখন সকলের ভাগই কমিয়া যায়। ভাগ লইয়া টানাটানি আরম্ভ হয়। সমস্ত সমস্যার সমাধানই দুরূহ হইয়া পড়ে। বহু বিষয়ে আলোচনা চলিল। সমস্ত বিতর্কে সোৎসাহে যোগদান করিয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম।

আমেরিকান অতিথিগণকে ভারতীয় খাদ্যে পরিতৃপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে ঐ দিন শ্রীযুক্তা মহলানবীশ-গৃহিণী স্বয়ং রান্না করিয়াছিলেন। পোলাও, ডাল, কপির ডালনা, মাংস, চাটনী ও ছানার পায়স আমেরিকান ভদ্রলোকগণ পরম পরিতোষের

সহিত আহার করিলেন। বহুদিন পরে সুপক্ব স্বদেশী খাদ্য পাইয়া প্রচুর আহার করিয়া ফেলিলাম। আহারান্তে ডেমিং ও তাঁহার বালিকা-কন্যা গান গাহিয়া অতিথিগণকে আপ্যায়িত করিলেন। পিয়ানো বাজাইলেন অতিথিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ যুবকটি। ইনি গণিতে পারদর্শী। যুদ্ধের সময় যুদ্ধ-জাহাজের নব-নব ডিজাইন সৃষ্টির জন্য বহু দুরূহ অঙ্ক দ্রুত কষিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। রাত্রি প্রায় বারটায় হোটেলে ফিরিলাম।

পরদিন রবিবার। দিনটা ভাল না। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছিল। আমি যে হোটেলে ছিলাম তাহার নাম শোরহাম্ হোটেল। তখন ঐ হোটেলে দশ-বার জন ভারতীয় ছিলেন। তাঁহার মধ্যে প্রায় সকলেই ফুড ও এগ্রিকালচারাল্ অরগানাইজেশানে ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর সভ্য। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অংশীভূত এই প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীর খাদ্য-সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট। সমস্ত জাতির প্রতিনিধিগণ ওয়াশিংটনে মিলিত হইয়াছেন। প্রায়ই ইঁহাদের সভা হইতেছে। ভারতীয় দলের নেতা সু-প্রসিদ্ধ আইনজীবী ও কংগ্রেস-নেতা ডাক্তার কাটজু। ইঁহাদের সেক্রেটারী আজিজ আমেদ। অন্যান্য মেম্বর—রামমূর্ত্তি (মান্দ্রাজের চীফ্ সেক্রেটারী), সোরওয়ালা (বম্বের ফাইনান্স সেক্রেটারী), ভকিল, রাও (যথাক্রমে বোম্বাই ও দিল্লীর ইকনমিক্সের অধ্যাপক), রাধাকমল মুখার্জ্জি ও রাধাকুমুদ মুখার্জ্জি। ভাবিয়াছিলাম ছুটির দিনটা ইঁহাদের কাহারও সঙ্গে ঘুরিব। কিন্তু এরূপ দুর্দ্দিনে তাহা সম্ভব হইল না। সকালটা হোটেলেই কাটাইলাম।

বিরাট সুসজ্জিত হোটেল। কোথাও কোন বিষয়ে ত্রুটি নাই। সর্ব্বত্রই প্রাচুর্য্য, শোভা ও সুবন্দোবস্ত। শয়নকক্ষ ও স্নানাগার পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত। নীচে প্রশস্ত ও সুসজ্জিত লাউঞ্জটি প্রফুল্ল নরনারী সমাগমে সর্ব্বদা আনন্দময়। পিছনে নাতিবৃহৎ উদ্যান। তাহাতে পায়চারি করার ও বসিবার বন্দোবস্ত আছে। সমস্ত হোটেলটিকে ইচ্ছানুরূপ উত্তপ্ত রাখিবার জন্য কেন্দ্রীয় উত্তাপ-ব্যবস্থা আছে। বাহিরে যত শীতই হউক না কেন ভিতরে সর্ব্বদা ৭০° হইতে ৭৫° ডিগ্রি তাপ রাখা হয়। ফলে নিদারুণ শীতেও হোটেলের মধ্যে সামান্য একটা কম্বল গায়ে দিয়া ঘুমান যায়। খাবার ঘর তিনটি। প্রত্যেকটির মূল্য-তালিকা পৃথক। খাদ্য যেরূপ রকমারি সেইরূপ প্রচুর। কোন জিনিষেরই অভাব বা অপ্রচুরতা নাই। ফল ও দুধের বাহুল্য ও প্রাচুর্য্য অতুলনীয়। প্রাতরাশে ইহারা প্রথমেই ফল খায়। আট আউন্স এক গ্লাস সুস্বাদু ও স্বচ্ছ আনারসের রস পান করিলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। এরূপ কমলা, পেঁপে, বাতাবি লেবু, সরবতী লেবু ও অন্যান্য ফলের রসও প্রচুর। কেহ কেহ নিষ্পেষিত রস পান না করিয়া ফল চিবাইয়া খান। বাতাবিটাই ইঁহাদের বেশী প্রিয় দেখিতেছি। কেহ সুমিষ্ট কদলী চাক্ চাক্ করিয়া কাটিয়া ঘন দুধ ও চিনি সংযোগে খাইতেছেন। মধ্যাহ্ন ভোজনে বা নৈশ ভোজনেও অনেকে ফল খান। সে সময় দেখিতেছি খরমুজটাই বেশী চলিতেছে। ডিম, মাছ, মাংস, তরকারি সবই যথেষ্ট খাওয়ার কোন বাধা নাই। আমার সুপরিচিত মাছের মধ্যে এদেশে শুধু চিংড়ি মাছই দেখিতেছি। গলদা চিংড়ি ইহারা অনেকটা মালাইকারীর মতই রান্না করে। তবে মাথাটা কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। ছোট চিংড়ি সিদ্ধ না করিয়া বরফের মধ্যে ভিনিগার-সংযোগে ফেলিয়া দেয়। খাইতে মন্দ লাগে না। স্যামন্ মাছের সালাদও ভাল খাইয়াছি। আইসক্রীম খুব সুস্বাদু। কাঁচা ছানাও দেখিতেছি এদের বেশ প্রিয়। এক প্লেট কাঁচা ছানা, আনারস, আপেল, কমলা, চেরী প্রভৃতি নানাবিধ সুমিষ্ট ফল সহযোগে খাইতে বেশ লাগে। প্রাতরাশে ফলের পর চাউল বা গমের একটি খাদ্য চলে। এ পদেও বহু রকমারি। কেহ মুড়ি, কেহ কর্ণফ্লেক, কেহ বা পরিজ ইত্যাদি দুধ ও চিনি সংযোগে খাইতেছে। বড় বড় হোটেলে যখন এক ঠোঙ্গা মুড়ি দিয়াছে তখন প্রথম আশ্চর্য্যই হইয়াছি। ভুট্টার খইও এদেশে খুব প্রিয়। শিকাগোর রাস্তায় দুই ধারে খই ভাজিতে দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এখানে খুব বেশী। একটি গলদা চিংড়ি তিন ডলার বা দশ টাকা। এক প্লেট হরিণের মাংস চার ডলার বা তের টাকা সওয়া পাঁচ আনা। ফল বরং সস্তা। এক গ্লাস আনারস বা আপেলের রস কুড়ি-পঁচিশ সেণ্ট বা দশ বার আনা। ঐরূপ এক গ্লাস ফলের রস আমাদের দেশে ঐ দামে এখন পাওয়া যায় না। পঁচিশ সেণ্টে চারিটি বড় বড় সুস্বাদু কলা এবং দশ বার সেণ্টে একটি আপেল কিনিয়াছি। আপেলগুলি খুব বড় এবং সুমিষ্ট, মুখে দিলে গলিয়া যায়। ক্যালিফোর্ণিয়ার খেজুরও খুব সুস্বাদু এবং দামও খুব বেশী নয়। ওয়াশিংটনে দৈনিক ছয় ডলার বা কুড়ি টাকা ঘর-ভাড়া দিয়াছি। শিকাগোতে ঘর-ভাড়া ছিল আরও বেশী। খাবার খরচ দৈনিক প্রায় আট ডলার বা প্রায় সাতাইশ টাকা পড়িয়াছে। লণ্ডনের প্রায় তিনগুণ খরচ আমেরিকায়। ওয়াশিংটন হইতে শিকাগো বা নিউ ইয়র্কে খরচ আরও বেশী।

এদেশে হোটেল ভিন্ন আরও দুই প্রকারের ভোজনালয় আছে। কেফিটেরিয়া ও ড্রাগ ষ্টোর বা ঔষধ-ভাণ্ডার। কেফিটেরিয়ার গৃহপ্রান্তে লম্বা মঞ্চের উপর সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সাজান থাকে। প্রথমেই থাকে বারকোষ, কাঁটা চামচ প্রভৃতি ও কাগজের ন্যাপকিন্ বা কাপড়-ঢাকনী। ঢুকিয়া একটি বারকোষ ও প্রয়োজনমত কাঁটা-চামচ ও ন্যাপকিন্ লইয়া মঞ্চের পাশ ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। যাইতে যাইতে আমার ইচ্ছামত খাদ্য বাছিয়া বারকোষে রাখিলাম। মঞ্চের শেষে একটি লোক বাক্স লইয়া বসিয়া আছে। সে বারকোষ দেখিয়া মূল্য বলিয়া দিল। তাহাকে মূল্য দিয়া বারকোষ লইয়া সামনে চলিয়া আসিলাম। সেখানে টেবিল চেয়ার পাতা



মাঞ্চুরিয়ার চাষী-গৃহস্থ   বর্তমান চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং জাতীয় সরকারের সংগ্রামের পরিণাম-ফলে ইহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের কংগ্রেস-ভবন



মহীশূরের পল্লীপথে



কাশ্মীরের উত্তর দিকস্থ হুমজা অঞ্চলের চাষীদের কুটীর-সংলগ্ন শস্যক্ষেত্র

রহিয়াছে। ইচ্ছামত সেখানে বসিয়া খাইয়া চলিয়া গেলাম। এখানে বেশ দ্রুত খাওয়া শেষ করা যায় এবং দামও হোটেল অপেক্ষা কম। নিউ ইয়র্কে কেফিটেরিয়ার এক প্রকার যান্ত্রিক সংস্করণ আছে। নাম "অটোমেটন" বা "স্বয়ংক্রিয়"। সেখানে অধিকাংশ খাদ্যই যন্ত্রের মধ্যে থাকে। সামনে নাম ও দাম লেখা আছে। কোনটা পাঁচ সেণ্ট, কোনটা দশ সেণ্ট, কোনটা পঁচিশ সেণ্ট। যন্ত্রটির সামনে গিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিদ্রে দামটি ফেলিয়া দিলেই এক প্লেট খাবার আপনা হইতেই বাহির হইয়া আসে। চা বা কফির যন্ত্রের সামনে বাটি সাজান থাকে।

দাম ফেলিয়া দিলেই যন্ত্রের সম্মুখের মুখ দিয়া চা বা কফি পড়িতে সুরু করে। বাটি পাতিয়া ধরিয়া নিতে হয়। বাটি ভরিলেই আবার মুখ বন্ধ হইয়া যায়।

ড্রাগ ষ্টোরগুলিতে খাদ্য আরও সস্তা, সেখানে একটি মঞ্চের উপর বসিয়া লম্বা টেবিলে খাইতে হয়। অল্প দামে মোটামুটি খাইবার পক্ষে এগুলি বেশ।

হোটেলে বকশিশ দিবার প্রথা আছে। খাদ্যমূল্যের অন্ততঃ দশমাংশ বকশিশ দেওয়া রীতিসম্মত। কেফিটেরিয়া বা ড্রাগ ষ্টোরে এ প্রথা নাই।

সারাদিন হোটেলে থাকিয়া বৈকালে শ্রীযুত রামমূর্ত্তি ও ভকিল মহাশয়ের সঙ্গে ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারী দেখিতে গেলাম। সুবিশাল সুরম্য প্রাসাদে সুসজ্জিত ছবির মালা। প্রাসাদটি আর্ট গ্যালারীরই উপযুক্ত। গঠনভঙ্গীতে দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য্য যুগপৎ অভিব্যক্ত। দোতলার মধ্যস্থলে কৃষ্ণমর্ম্মরের বিরাট স্তম্ভমালা পরিবেষ্টিত জলের ফোয়ারা। দুদিকে ঘরের পর ঘর ছবিতে সাজান। য়ুরোপীয় শিল্পীগণের ছবিই বেশী। যে সব জগদ্বিখ্যাত ছবি লণ্ডনে দেখিয়াছি তাহাদের অনেকগুলি এখানেও দেখিলাম। কোন্‌টি আসল কোন্‌টি নকল জানি না। আমেরিকান শিল্পীগণের অঙ্কিত জর্জ্জ ওয়াশিংটন ও তাঁহার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অনেক ছবি দেখিলাম।

পরদিন ১৮ই নভেম্বর সোমবার। ব্যুরো অব্ দি সেন্সাসে গেলাম। আপিসটি মেরিল্যাণ্ড রাষ্ট্রের অন্তর্গত সুটল্যাণ্ড নামক স্থানে, ওয়াশিংটন হইতে দশ-বার মাইল দূরে। যাইবার রাস্তা যেমন সুনির্ম্মিত তেমনি সুশোভন। পথে নগরপ্রান্তে বস্তি অঞ্চল দেখিলাম। বস্তির বাড়ীগুলি সুন্দর পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জিত। আমাদের দেশের অবস্থাপন্ন লোকদের ফ্লাট অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে হইল না। বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্য দিয়া রাস্তা চলিয়াছে। লোকের ভিড় বেশী নাই।

সেন্সাস আপিসে সেদিন শ্রীযুত মহলানবীশ মহাশয়ের বক্তৃতা হইতেছিল। আপিসের ডিরেক্টর হইতে প্রায় সমস্ত কর্ম্মচারী আগ্রহ সহকারে বক্তৃতা শুনিলেন। পরে তাঁহারা নানাবিধ প্রশ্ন করিলেন এবং মহলানবীশ মহাশয় তাহার জবাব দিলেন। আপিস-সংলগ্ন একটি কেফিটেরিয়া আছে। এখানে আপিসের প্রধানগণের সহিত মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিলাম। প্রধানগণ হইতে কেরাণী ও বেহারাগণ পর্য্যন্ত সকলেই একই লাইনে দাঁড়াইয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া একই ঘরে পাশাপাশি বসিয়া খায়। তাহাতে কোন মর্য্যাদা অমর্য্যাদার প্রশ্নই উঠে না। এ যেন খুব সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। বৈকালে মহলানবীশ মহাশয়ের সঙ্গে থাকিয়া এদের সমস্ত কার্য্য দেখিলাম। এরা আপিসের কাজে বহু প্রকারের যন্ত্র ব্যবহার করে। একটি প্রকাণ্ড লম্বা ঘরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সজ্জিত শত শত যন্ত্র দেখিয়া মহলানবীশ মহাশয়ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

পর দিন মহলানবীশ মহাশয়ের সঙ্গে ব্যুরো অব্ এগ্রিকালচারে গেলাম। সেখানেও তিনি বক্তৃতা করিলেন এবং বক্তৃতান্তে সকলের প্রশ্নের জবাব দিলেন। বৈকালে "আরকাইভ হলে" শ্রীযুত মহলানবীশের সংখ্যাতত্ত্ব-বিষয়ক একটি বক্তৃতা হইল। এটি তাঁহার ঐ বিষয়ের তৃতীয় বক্তৃতা। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিতে ঘরটি পূর্ণ।

মহলানবীশ মহাশয় "নমুনা জরীপ" বিষয়ে গবেষণা করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন। বহু বস্তুর পরিমাণ বা গুণ নির্ণয় করিতে হইলে সমস্ত জিনিষ পরীক্ষা না করিয়া বিশেষ রূপে নির্ব্বাচিত কয়েকটি নমুনার পরীক্ষা দ্বারাই কাজ চলিতে পারে। দেশে এবার কত জমিতে পাট বোনা হইয়াছে ইহা নির্ণয়ের জন্য সমস্ত পাটের জমি না মাপিয়া কয়েকটি জমি নমুনাস্বরূপ দেখিলেই চলিবে। সম্পূর্ণ জরীপ ব্যয়সাধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে ' নমুনা জরীপ সুলভ ও সুকর। অধ্যাপক-মহাশয়ের মতে নমুনা জরীপ অপেক্ষা সম্পূর্ণ জরীপ অধিকতর ভ্রমাত্মকও বটে; কারণ সম্পূর্ণ জরীপে বহুসংখ্যক এবং বহু রকমের লোকের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিতে হয়, অথচ তাহাদের রিপোর্টের সত্যতা নির্ণয়ের কোন বৈজ্ঞানিক উপায় নাই। নমুনা জরীপে অল্প লোকের প্রয়োজন, সুতরাং তাহাদের পটুতা ও সাধুতা সাধারণতঃ উচ্চতর হয় এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহাদের রিপোর্টের সত্যতা নির্ণয়ও সম্ভব। নমুনা জরীপের দ্বারা সরকারের বহু কার্য্য সুগম হইতেছে। আমেরিকায় ইহার ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী; নমুনা জরীপে ইহারা বৎসরে কোটি কোটি ডলার খরচ করিতেছে। যদিও ইহারা সম্পূর্ণ জরীপের দ্বারা দশ বৎসর অন্তর সেন্সাস বা লোকগণনা করে, তথাপি প্রতি বৎসর নমুনা জরীপের দ্বারা নূতন করিয়া লোকসংখ্যা নির্ণয় করে। ফসলের পরিমাণ নির্ণয়েও ইহারা নমুনা জরীপের বহুল ব্যবহার করে। স্বতঃই ইহারা নমুনা জরীপের অন্যতম প্রবর্ত্তক মহলানবীশ মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিতে বিশেষ উৎসুক। অধ্যাপকবরের প্রতিষ্ঠা এবং ইহাদের জানিবার ও আরও ভাল করিয়া কাজ করিবার আগ্রহ দেখিয়া বিশেষ আনন্দবোধ করিলাম। ঐ সময় মহলানবীশ মহাশয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের "ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল কমিশনের" নমুনা জরীপ

সাব্‌ কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯শে নবেম্বর মঙ্গলবারের পর তিনি ওয়াশিংটন ত্যাগ করেন।

২০শে নবেম্বর বুধবার বাজেট ব্যুরোতে গিয়া তত্রত্য কর্ম্মচারিগণের সহিত পরিচিত হইলাম। এখানে সি, আর, রোজেন নামক বাজেট ব্যুরোর জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আমার কাজের সর্ব্ব বিষয়ে সহায়তা করেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং সাহায্যপরায়ণতার জন্য আমার আমেরিকার কাজ সুসম্পন্ন হয়। বাজেট ব্যুরোতেই আমি আমার মূল কর্ম্মস্থল স্থাপন করিলাম।

দক্ষিণ আমেরিকা ও চীনের কয়েকজন সরকারী কর্ম্মচারী আমেরিকার বাজেট নির্ম্মাণ প্রণালী শিক্ষা করিবার জন্য তখন বাজেট ব্যুরোতে কাজ করিতেছিলেন। এই শিক্ষা সমাপ্ত করিতে তাঁহাদের দুই বৎসর লাগিবে। কেহ বৎসরাধিক এখানে আছেন। তাঁহারা সকলেই সরলচিত্ত যুবক। উরুগয়ার আর. জে, বারু, পরাগয়ার ফ্রেরেটিস, কিউবার রোডল্‌ফো ভিয়েগাস্‌, পানামার এডুয়ার্ড ম্যাক্‌কালা, মেক্সিকোর এডুয়ার্ডো বোর্টাস্‌ এবং চীনের লিয়েন ইহো—ইঁহারা সকলেই সদালাপী। দক্ষিণ-আমেরিকার ভদ্রলোকগণের মাতৃভাষা স্প্যানিশ অথবা পর্ত্তুগীজ। সকলেই ইংরেজি জানেন, তবে কথা খুব স্পষ্ট বা দ্রুত নয়। চীনা যুবকটি সর্ব্বদা কর্ম্মব্যস্তচিত্ত। ট্রেজারীর কর্ম্মচারিগণ পরে এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে এই চীনা যুবকটি তাঁহাদের একাউন্টের নিয়মগুলি তাঁহাদের অপেক্ষাও ভাল আয়ত্ত করিয়াছেন। এক দিন ইঁহাদের সহিত একটি কিউবান ভোজনালয়ে সমাংস পোলাও-সংযোগে মধ্যাহ্নভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম। ভিয়েগাসের সঙ্গে আরও দু-একদিন মধ্যাহ্নভোজন করিয়াছি। দক্ষিণ-আমেরিকার দেশগুলির রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও শিল্পাদি বিষয়ে অসহায়তার কথা ইহারা দুঃখের সহিত বিবৃত করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রতি ইঁহাদের সহজ সমবেদনা আছে এবং ভারতবর্ষের কথা শুনিতে ইঁহাদের খুব আগ্রহ। আমার ওয়াশিংটন অবস্থান কালে নিউইয়র্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভায় দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয় দলনের বিরুদ্ধে ভারত-সরকারের অভিযোগ আলোচনার্থ উপস্থিত হয়। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এই অভিযোগ সভায় উত্থাপিত করেন। জেনারেল স্মাট্‌স্‌ স্বয়ং এই অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য উপস্থিত হন। ইংরেজ সরকার ও মার্কিন সরকার দক্ষিণ-আফ্রিকার পক্ষে ভোট দেন। তৎসত্ত্বেও দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে ভারতবর্ষের জয়লাভে বিশ্ব বিস্মিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-আমেরিকার সমস্ত রাষ্ট্র তখন ভারত-সরকারের অনুকূলে ভোট দেন। খবরের কাগজওয়ালারা লিখিল, বর্ত্তমানে জাতিপুঞ্জের সভায় অশ্বেত জাতিগণের একটি জোট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

পরে শিকাগোতে ব্রেজিলের একটি সরকারী কর্ম্মচারীর সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল। ইনিও যুবক এবং এ দেশের বাজেট তৈরির কাজ শিখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষ, চীন এবং ব্রেজিলের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। ভবিষ্যতের পৃথিবী ইহাদেরই।

এদেশের দৈনিক খবরের কাগজ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। সব শহরেই খবরের কাগজ আছে। বড় শহরে একাধিক কাগজ প্রকাশিত হয়। নিউইয়র্ক টাইম্‌সই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহার পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দিষ্ট নহে। যেদিন যেরূপ ছাপাইবার উপযুক্ত খবর থাকে সেই অনুসারে পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়ে বা কমে। আমি ৪৮ পৃষ্ঠার কম কখনও দেখি নাই। বহুদিনই ৬৪ পৃষ্ঠা দেখিয়াছি। রবিবারে ২৫০ পৃষ্ঠা দেখিয়াছি। একখানা ২৫০ পৃষ্ঠার খবরের কাগজ আমাদের বিস্ময়কর ত বটেই, নাড়াচাড়া করাও কষ্টকর। আমাদের দেশের ষ্টেটস্‌ম্যান বা আনন্দবাজার পত্রিকা সাধারণতঃ আট-দশ পৃষ্ঠা মাত্র থাকে। বিলাতের কাগজেও তাহার বেশী থাকে না। লণ্ডন টাইম্‌স্‌ ব্যতীত অন্যান্য কাগজের আয়তন তো আরও কম। আমেরিকার খবরের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় খবর থাকে, লণ্ডন টাইমসে প্রথম পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন থাকে।

এ বিষয়ে আমাদের দেশের কাগজগুলি পূর্ব্বে বিলিতি প্রথা অনুসরণ করিত, এখন আমেরিকান প্রথা অনুসরণ করে। পৃথিবীর সব দেশের খবরই নিউইয়র্ক টাইম্‌সে থাকে। ভারতবর্ষের খবর যথেষ্ট থাকে। ডিসেম্বরের প্রথম একটি রবিবাসরীয় সংখ্যায় নেহেরু ও জিন্নার বড় বড় ছবি দিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। প্রবন্ধকারের মতে জিন্না নিপুণ উকিলের ন্যায় স্ব-মতে অটল, আর নেহেরু সর্ব্বদাই পরমতের সহিত নিজমতের সামঞ্জস্য বিধানে প্রস্তুত, সর্ব্বদা নূতন সত্যে উপনীত হইবার জন্য উৎসুক। প্রবন্ধটিতে নেতৃদ্বয়ের বিপরীত-গুণ-মূলক মহত্ত্ব বিশদ ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ইহাদের প্রকাশিত ভারতবর্ষের খবরে কোন ভুল দেখি নাই। সাগ্রহে স্বদেশের খবর পাঠ করিতাম। হিন্দু-মুসলমানে থাকিয়া থাকিয়া দাঙ্গা চলিতেছে। কনষ্টিটুয়েণ্ট এ্যাসেম্‌ব্লি আরম্ভ হইল। আমেরিকা-সরকার সরকারী ভাবে ইহার কার্য্যের সাফল্য কামনা করিয়া বাণী প্রেরণ করিলেন। নেহেরু জিন্না ও বলদেব সিং সহ লর্ড ওয়াভেল লণ্ডন যাত্রা করিলেন। সেখানে বিলাতি মন্ত্রিসভার সহিত তাঁহাদের আলোচনা ব্যর্থ হইল। মন্ত্রিমিশনের প্রস্তাবের যে অংশের অর্থ লইয়া মতবিরোধ চলিতেছিল, বিলাতি মন্ত্রিসভা ৬ই ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার নিজস্ব ভাষ্য প্রচার করিলেন। পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সে ভাষ্য স্বীকার করিয়া লইলেন। শরৎ বসু ও জয়প্রকাশনারায়ণ ব্রিটিশের সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ করিলেন। ভারত-সরকার ও আমেরিকা-সরকার দূতবিনিময়ে স্বীকৃত হইলেন।

আসফ আলি ওয়াশিংটনের ভারতীয় দূত নিযুক্ত হইলেন। নেহেরু বড়লাটের বদলে এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্সের কলিকাতায় বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা করিয়া স্বাধীন ভারতে ইংরেজ ব্যবসাদারগণকে অভয় দিলেন। তাঁহাদিগকে সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতে গিয়া বলিলেন যে, এমন যে খ্রীষ্টধর্ম তাহাও সাম্রাজ্য-বাদী সরকারের সম্পর্কে আসিয়া এক সময়ে লোকের আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছিল। মন্ত্রিমিশনের ১৬ই মে তারিখের প্রস্তাব কি সত্যই সাধুতা-প্রসূত, না উহা ইংরেজের পুরাতন কপট-লীলার একটি নূতন প্রকাশ মাত্র ইহা তখন ভারতবর্ষে খুব আলোচিত হইতেছে। এই সব খবর সাগ্রহে খুঁজিয়া দেখিতাম।

এখানকার বাসে কণ্ডাক্টর নাই, টিকিট নাই, ভাড়ার তারতম্য নাই। এক দিকে যত দূরই যাই না কেন ভাড়া পাঁচ সেণ্ট। ঐ ভাড়ায় একবার বাস বদলানও চলে। প্রবেশ-দ্বারের পাশে একটি বাক্স আছে। তার উপরে একটি ছোট ছিদ্র। যাত্রীগণ বাসে উঠিয়াই ঐ বাক্সের মধ্যে একটি পাঁচ সেণ্ট মুদ্রা ফেলিয়া দেয়। আমি প্রথম দিন বাসে উঠিয়া নিয়ম না জানায় বাক্সে মুদ্রা না ফেলিয়াই বসিয়া পড়িলাম। কোন কণ্ডাক্টর দেখি না। কেহ ভাড়া চায় না। নামিবার সময় ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিয়া বাক্সে পয়সা ফেলিয়া নামিলাম। সাধারণ লোকের এই সাধুতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম আমাদের দেশে এইরূপ হইলে বাস কোম্পানী দুদিনেই ফেল পড়িত। যাহাদের বাস বদলাইবার দরকার তাহারা ড্রাইভারের নিকট হইতে একখানি টিকিট চাহিয়া লয়। উহা পরবর্তী বাসের ড্রাইভারকে দিয়া দিতে হয়। এই ব্যবস্থায় ইহাদের বাস চালাইবার খরচ কম পড়ে।

যে টাকাটা বাঁচিল তাহা দ্বারা ড্রাইভারকে বেশী মাহিনা দিতে পারে অথবা বাসের ভাড়া হ্রাস করিতে পারে। সামান্য সাধুতার দ্বারা কিরূপে কম শ্রমে কাজ হয়, লোকের আয় বাড়ে ও খরচ কমে ইহা তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

সেদিন রাত্রে ডাক্তার কাট্‌জুর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ হইল। তাঁহার ছেলে এদেশে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। পুত্রের অনুরোধে পিতা তাঁহার বাল্যকালের একটি সহ-পাঠিনীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি এখন বিবাহিতা। স্বামী লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। তাঁহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া কাট্‌জু মহাশয় তাঁহাদের সঙ্গে দু-এক দিন বাস করিয়া তাঁহাদের যত্নে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছেন। কাট্‌জু মহাশয় উৎসাহের সহিত ইঁহাদের সুখ্যাতি করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমরা দূর হইতে শুনি আমেরিকানরা শুধু ডলার এবং যন্ত্রের পূজারী এবং ইঁহাদের পারিবারিক জীবন মোটেই সুখের নয়। কিন্তু একথা মিথ্যা। ইহাদের সুমধুর পারি-বারিক জীবন এবং আতিথেয়তা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। ইঁহাদের জ্ঞানস্পৃহাও অসাধারণ। ইহাদের লাইব্রেরিতে ভারতীয় আইনের যত বই দেখিয়াছি তত বই ভারতবর্ষের কোন লাইব্রেরিতেও দেখি নাই।"

এক প্রান্তে

এ. এন. এম. বজলুর রশীদ

অসহায় পথপ্রান্তে যারা পড়ে আছে,
যাদের প্রাণের সোনা ধূলি-ধূসরিত
যাদের আকাশভরা অন্ধকার প্রেতায়িত রাত,
ধূমায়িত সকল বাসনা,
কে তাদের ভাষা দেবে,
অন্ন দেবে—পথের সঞ্চয়,
সূর্যের আলোক মুঠি মুঠি,
সবুজের শ্যামল বিলাস ?
যুগে যুগে বঞ্চিত প্রাণের
জমেছে অনেক ধুলা,
বহু অভিযোগ,
কঙ্কালের শত হিমালয়
পৃথিবীর পথ ঢাকিয়াছে—
মুক্তির আস্বাদ কোথা ?
কে আনিবে মন্থনের শেষে
প্রাণের অমৃত-মধু
বিপুল বিশ্বাস
উন্মুক্ত-প্রসার দৃষ্টি ?
আজি তার অবজ্ঞাত নাম—
অজানা সে পান্থ লাগি
এ কবির রহিল প্রণাম।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল , পিএইচ. ডি ; ডি. লিট্

পুরাকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষের অপর একটি নাম ছিল কামরূপ। প্রাগ্‌জ্যোতিষ কামরূপ অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল। ইহা পূর্ব্ব-জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটি কেন্দ্র। শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণেরা কামরূপে আসিয়াছিল। বঙ্গদেশে ইহারা আচার্য্য বলিয়া বিদিত এবং আসামে দৈবজ্ঞ বলিয়া পরিচিত। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। প্রত্যেক রাজার একটি করিয়া জ্যোতিষি ছিল। জ্যোতিষির প্রধান কার্য্য ছিল গ্রহদিগকে পূজা করিয়া সন্তুষ্ট রাখা। রামায়ণ এবং মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষের উল্লেখ আছে। এই দুইটি গ্রন্থের মতে ইহারা সুবিখ্যাত জাতি। মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ একটি ম্লেচ্ছ রাজ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার রাজা ছিল ভগদত্ত। মহাভারত হইতে আরও আমরা জানিতে পারি যে প্রাগজ্যোতিষ নামে একটি অসুর রাজ্যে নরক ও মুরু নামে দুইটি অসুর রাজত্ব করিত। কিরাত এবং চীনদিগের রাজ্যের সীমান্তে প্রাগজ্যোতিষ অবস্থিত। ভারতযুদ্ধে প্রাগজ্যোতিষের রাজা ভগদত্ত কুরুদিগের মিত্র ছিল। ভারতযুদ্ধে ভগদত্ত চীন-দিগের সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করেন। সমগ্র উত্তর এবং পূর্ব্ব বঙ্গ-দেশ প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের অধীনে ছিল। বরাহমিহির পূর্ব্ব দিকস্থ যে সকল দেশের উল্লেখ করেন তাহাদের মধ্যে প্রাগজ্যোতিষ একটি। রঘুবংশের মতে ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর দিকে প্রাগজ্যোতিষ দেশ অবস্থিত ; সেইজন্য আমাদের মনে হয় কেবল কামরূপ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা নয়। উত্তর বঙ্গ এবং উত্তর বিহারের অনেক অংশ ইহার অন্তর্গত ছিল। যোগিনীতন্ত্র হইতে জানা যায় যে সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, রংপুর এবং কুচবিহার সমেত কামরূপের অন্তর্ভুক্ত। হেমচন্দ্রের অভিধানচিন্তামণিতে প্রাগজ্যোতিষ কামরূপের উল্লেখ আছে। রঘুবংশে ইহারা দুইটি বিভিন্ন জাতি বলিয়া বর্ণিত। মহাভারতে গৌহাটির নিকটস্থ কামাখ্যার উল্লেখ আছে। কামাখ্যার মন্দির শাক্ত হিন্দুদিগের একটি পবিত্র স্থান। পুরাকালে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা তিন ভাগে বিভক্ত :

(১) সাদিয় (পূর্ব্ব জিলা),
(২) আসাম (মধ্য জিলা),
এবং (৩) কামরূপ (পশ্চিম জিলা)

কামরূপের পশ্চিম বিভাগের অপর একটি নাম ছিল কুশ-বিহার। এখানে রাজাদিগের প্রাসাদ ছিল এবং ইহার রাজধানী কামাতিপুর হইতে সমগ্র দেশের নামকরণ করা হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত গৌহাটি কাম-রূপের প্রাচীন রাজধানী। কুশবিহারের রাজধানী কামাতি-পুর পাবনা হইতে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। গৌহাটি পাবনা হইতে ইহার দ্বিগুণ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্ব দিকে চীনদিগের স্থ নামে একটি দেশের দক্ষিণ পশ্চিম বর্ব্বর জাতির সীমান্ত দেশ-গুলি পর্য্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের জঙ্গলগুলিতে হাতীর বাস ছিল। কামরূপে একটি ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন। যদিও তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন বটে, অন্তরে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রগাঢ় ভক্ত ছিলেন। কনৌজের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার ধর্ম্মযাত্রায় তিনি মিলিত হন। পুরাকালে কামরূপ পশ্চিমদিকে করতোয়া নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভ শিলালিপিতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের বাহিরে একটি সীমান্ত দেশ বলিয়া কামরূপের উল্লেখ আছে। পুরাণের মতে রংপুরের অন্তর্ভুক্ত করতোয়া নদী হইতে পূর্ব্বদিকে প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজধানী কামরূপ বিস্তৃত। মণিপুর, জয়ন্তিয়া, কাছার, পশ্চিম আসাম, ময়মনসিংহ এবং শ্রীহট্টের কতকগুলি অংশ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত। বর্ত্তমান যুগে গোয়ালপাড়া হইতে গৌহাটি পর্য্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত। পুরাকালে কামরূপ দেশ প্রায় দশ হাজার লি বিস্তৃত ছিল। ইহার জমিগুলি উর্ব্বর এবং চাষের সুবিধার জন্য প্রচুর জল পাওয়া যাইত। উত্তরে ভুটান কামরূপের অন্তর্গত। দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র এবং লখ্যার সঙ্গম পর্য্যন্ত কামরূপ-দেশের সীমা ছিল। কালিকাপুরাণের মতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ এবং কামাখ্যা কিংবা গৌহাটি অভিন্ন। কামাখ্যার নীলকূট পর্ব্বতে কামাখ্যা দেবীর মন্দির আছে। তাম্রেশ্বরী দেবীর মন্দির প্রাচীন কামরূপের উত্তর-পূর্ব্ব সীমার নিকটে অবস্থিত। রাজশেখরের কাব্যমীমাংসায় প্রাগ্‌জ্যোতিষের স্থান পূর্ব্বদিকে দেখা যায়।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে আম্র, বেল, বট প্রভৃতি অনেক ফল এবং বৃক্ষ ছিল। প্রজাদের নিকট হইতে কর আদায় করা হইত না। দোষের জন্য দণ্ডপ্রদানও বিরল ছিল। কামরূপে অনেক প্রকার চন্দন, ধূপ ও ধুনা পাওয়া যাইত। যখন চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং কামরূপে আসেন তখন এখানে তিনি দেখেন যে জাম এবং নারিকেল প্রচুর। এখানকার জল-হাওয়া ভাল ছিল। লোকেরা সৎ, ধর্ম্মভীরু এবং ধৈর্য্যশীল ছিল ; তাহারা দেবতার পূজা করিত কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে তাহাদের আস্থা ছিল না। চৈনিক পরিব্রাজক এখানে কোনও বৌদ্ধ-বিহার দেখেন নাই। এখানে অনেক দেবমন্দির ছিল ; রাজা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ; বহুদূর হইতে ভাল ছাত্ররা এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত। যদিও রাজা বৌদ্ধ ছিলেন না, তিনি দীনভিক্ষসম্পন্ন বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

কামরূপের পূর্ব্ব দিকে অনেক পর্ব্বত ছিল। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে বন্যহস্তী পাওয়া যাইত এবং যুদ্ধের জন্য হস্তী পাঠান

হইত। চৈনিক পরিব্রাজকের মতে বর্ত্তমান কামরূপ এবং ক-মো-লু-পো অভিন্ন। বর্ত্তমান কামরূপের রাজধানী গৌহাটী। উচ্চ ব্রহ্মদেশের পশ্চিম দিকে কামরূপ ১৬০০ লি বিস্তৃত। আলবেরুণির মতে কামরূপ কনৌজ রাজ্যের পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর-পূর্ব্বদিকে কামরূপ রাজ্য স্বাধীন বলিয়া মনে হয়। কামরূপের রাজা গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তকে কর দিতেন। বহুদিন ধরিয়া কামরূপে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল। যদিও এই রাজ্য গুপ্ত রাজাদিগকে কর দিত, আভ্যন্তরীণ শাসনে ইহা স্বাধীন ছিল। হর্ষবর্দ্ধন কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মণের সহিত একটি সন্ধি করেন। ভাস্করবর্ম্মণের পিতা সুস্থিতবর্ম্মণ মৃগাঙ্ক মহাসেনগুপ্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই সন্ধিতে গৌড়দিগের ক্ষতি হইয়াছিল। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ভাস্করবর্ম্মণের আয়ত্তাধীনে আসে।

হর্ষচরিত হইতে জানা যায় যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষের যুবরাজ ভাস্করদ্যুতি নামে একজন দূতকে হর্ষের নিকটে পাঠান। যখন হর্ষবর্দ্ধন শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধ করিতে চান, কামরূপের যুবরাজ ভাস্করবর্ম্মণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হংসবেগ নামে একজন দূতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভাস্করবর্ম্মণ হর্ষের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য অনেক উপঢৌকন পাঠান। হর্ষ এবং ভাস্কর বর্ম্মণ কর্ত্তৃক শশাঙ্ক পরাজিত হন। কামরূপের রাজা হর্ষের আদেশ মানিতেন। কামরূপের রাজা কুমার হর্ষের মিত্র ছিলেন। শ্রীহর্ষের উৎসবে ভাস্করবর্ম্মণ যোগদান করেন। কামরূপ পরে হর্ষের হস্তগত হয়। কামরূপের রাজা সুস্থিত বর্ম্মণকে পরাজিত করিয়া মহাসেনগুপ্ত সুযশ অর্জ্জন করেন। সুস্থিতবর্ম্মণ বাস্তবিক একজন মৌখরি ছিলেন এবং তিনি কনৌজের গ্রহবর্ম্মণ এবং অবন্তিবর্ম্মণের পূর্ব্বপুরুষ।

যখন চৈনিক পরিব্রাজক হয়েন সাং নালন্দায় ছিলেন কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। সর্ব্বপ্রথমে এই নিমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেন নাই কিন্তু তাঁহার শিক্ষক শীলভদ্রের অনুরোধে তিনি কামরূপে আসেন এবং ইহার রাজা ভাস্করবর্ম্মণ তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করেন। যখন ভাস্করবর্ম্মণ তাঁহার জন্মভূমি সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তিনি উত্তরে বলেন যে তিনি তাঙ্‌ দেশের লোক।

যদিও ভাস্কর বর্ম্মণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি নিজেকে ক্ষত্রিয় কিংবা রাজপুত বলিয়া মনে করিতেন। যখন ভাস্কর বর্ম্মণ বর্ম্মর শালস্তম্ভ কর্ত্তৃক পরাজিত হন, কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য কামরূপ জয় করেন।

নরক কামরূপদেশ জয় করিয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষে বাস করেন। এখানে তিনি বিচারালয় স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র ভগদত্ত পিতার সকল সদ্গুণ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বজ্রদত্ত কোত্রবংশের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাঁহার পুত্র রত্নপাল অত্যন্ত বলশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র পুরন্দরপাল ধার্ম্মিক ও কবি ছিলেন। পুরন্দরপালের পুত্র ইন্দ্রপাল ধার্ম্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ইন্দ্রপালের মোহর হইতে জানা যায় যে তিনি প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা এবং মহারাজাধিরাজ উপাধিধারী ছিলেন। কামরূপের রাজা বজ্রদত্ত শিবের উপাসক। রাজা বনমালদেবও শিবপূজা করিতেন। রাজা বীরবাহু যুদ্ধে সুযশ অর্জ্জন করেন এবং অম্বা নামে একটি স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করেন। নেপালের লিচ্ছবী বংশজাত বৎসদেবী এবং শিবদেবের পুত্র জয়দেব কামরূপের রাজা শ্রীহর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহ করেন। রাজ্যমতী ভগদত্তরাজকুলজা নামে খ্যাত ছিলেন। কামরূপের রাজা ভাস্করবর্ম্মণের নিধনপুরে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি হইতে কামরূপ রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পুষ্যবর্ম্মা
|
সমুদ্রবর্ম্মা
|
বলবর্ম্মা
|
কল্যাণবর্ম্মা
|
গণপতিবর্ম্মা
|
মহেন্দ্রবর্ম্মা
|
নারায়ণবর্ম্মা
|
মহাভূতবর্ম্মা
|
চন্দ্রমুখবর্ম্মা
|
স্থিতবর্ম্মা
|
সুস্থিতবর্ম্মা (অপর নাম মৃগাঙ্ক)
|
সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মা — ভাস্করবর্ম্মা

পালবংশীয় রাজা ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল কামরূপ জয় করেন। রামচরিতের মতে রামপাল নামে এক জন সীমান্ত নৃপতি কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। গৌড়ের রাজারা উপর্য্যুপরি এদেশ জয় করেন। কামরূপ রাজ্য বাংলার পালরাজাদিগের রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীতে কামরূপ শাসনের জন্য কুমারপাল তাঁহার মন্ত্রী বৈদ্যদেবকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেন। বাংলার পালরাজারা আসামের অন্তর্গত প্রাগ্‌জ্যোতিষভুক্তিকে শাসন করিত। রত্নপালের পুত্র ধর্ম্মপাল কামরূপ জয় করেন। কামরূপের রাজা জয়পাল বরেন্দ্রির এক জন ব্রাহ্মণকে নয় শত সুবর্ণ মুদ্রা দান করেন। বৈদ্যদেবের কমৌলি দানপত্র হইতে জানা যায় যে প্রদত্ত গ্রামটি কামরূপমণ্ডল এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষভুক্তিতে অবস্থিত। প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা দেবপালের বশ্যতা স্বীকার করেন। লক্ষ্মণসেন কামরূপ জয় করেন। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি

উমাপতিধর প্রাগজ্যোতিষ-জয় সম্বন্ধে একটি কবিতা লেখেন। শরণ নামে লক্ষ্মণ সেনের আর একজন সভাকবি কামরূপ জয় বর্ণনা করেন। চন্দ্ররাজা বলচন্দ্রের পুত্র বিমলচন্দ্র কামরূপ শাসন করেন। তিনি মালব রাজবংশীয় রাজা ভর্তৃহরির ভগ্নীকে বিবাহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র এবং তাঁহার পরে ললিতচন্দ্র কামরূপ শাসন করেন।

খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলা এবং বিহারের বিজেতা বখতিয়ারের পুত্র মহম্মদ কামরূপ আক্রমণ করেন। করতোয়া নদীর তীর দিয়া তিনি উত্তর দিকে ধাবিত হন কিন্তু পরে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮১৬ সাল পর্য্যন্ত কামরূপ নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

রেখাগণিতে পণ্ডিত জগন্নাথ

শ্রীবিজয়গোপাল বসু

কথিত আছে, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা প্রজাদের সুবিধার জন্য রেখাগণিত আবিষ্কার করেন। তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বকর্ম্মা ইহা প্রাপ্ত হন এবং কালক্রমে বিশ্বকর্ম্মার এই শাস্ত্র ধরণীতলে প্রচার করেন।

রেখাগণিতের আধুনিক বাংলা নাম জ্যামিতি। এক সময় শুল্বসূত্র নামেও ইহা পরিচিত ছিল। Geometry ইহার বৈদেশিক সংজ্ঞা। তিনটি শব্দের বিশ্লেষণে একই অর্থ পাওয়া যায়।

শুল্ব— ক শুল্বয়তি বেধা পৃথিবীং পরিমাতি সৃজতি বা ইত্যর্থঃ।

জ্যামিতি—জ্যা (বসুধা)+মিতি (মানম্ পরিমাণম্।) জিওমেট্রি (geometry)—জি (ge=earth—পৃথিবী)+ মেট্রন (Metron=Measure—পরিমাপ)।

বৈদেশিক সংঘাতের ফলে ভারতবর্ষ হইতে এক সময় এই গণিতবিজ্ঞান বিলুপ্ত হয়।

মুসলমান আধিপত্য কালে পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে রেখাগণিত পুনরায় ভারতে আনীত হয়। ইউক্লিডের গ্রন্থাবলম্বনে আরবী ভাষায় "মিজাস্তি" গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ ভারতবর্ষেও প্রচারিত হয়। ইহা অধ্যয়ন করিয়া সে যুগে কেহ কেহ জমি-জরীপ ইত্যাদিতে ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনায় পর্য্যন্ত সহায়তা করিয়াছিলেন। আকবরের রাজসভার অন্যতম রত্ন মহারাজ টোডরমল্ল ক্ষেত্রতত্ত্ব-বিদ্যায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বকালে যিনি বঙ্গাধিপ মুর্শিদকুলি খাঁকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে সাহসী হইয়াছিলেন সেই দর্পনারায়ণ কানুনগো ছিলেন ক্ষেত্রতত্ত্ব-বিদ্যার বিশেষ ব্যুৎপন্ন। এই বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন বলিয়া রাজ্যের জায়গা-জমির সকল তথ্য তাঁর নখদর্পণে ছিল।

তৈলঙ্গ দেশীয় সুপণ্ডিত জগন্নাথ ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সভার অন্যতম রত্ন। জয়পুরাধিপতি মহারাজ জয়সিংহ এই গুণী ব্যক্তিকে নিজ রাজ্যে আনয়ন করেন। মহারাজের উৎসাহে এবং প্রেরণায় জগন্নাথ ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় রেখাগণিত প্রণয়ন করেন। মুখবন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

অপূর্ব্ব বিহিতং শাস্ত্রং যত্ত কোণাব বোধনাৎ।
ক্ষেত্রেষু জায়তে সম্যক্ ব্যুৎপত্তির্গণিতে তথা॥
শিল্পশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণে।
পারম্পর্য্য বশাদেতদাগতং ধরণীতলে॥
তচ্ছিন্নং মহারাজ জয় সিংহাজ্ঞয়া পুনঃ।
প্রকাশিতং ময়া সম্যক্ গণকানন্দ হেতবে।

বিন্দু, রেখা, ক্ষেত্র প্রভৃতির সূত্র তাঁহার গ্রন্থে এইরূপ দৃষ্ট হয়:—

যঃ পদার্থ দর্শনযোগ্যঃ বিভাগানর্হঃ স বিন্দুর্বাচ্যঃ। যঃ পদার্থঃ দীর্ঘঃ বিস্তাররহিতঃ বিভাগার্হঃ স রেখাপদবাচ্যঃ। বিস্তার দৈর্ঘ্যয়ো যদ্ ভিদ্যতে তদ্ধরাতলং দেবক্ষেত্রং। ইত্যাদি।

রেখাগণিতের অপর একটি সূত্রে গ্রন্থকারের রচনা-মাধুর্য্যের এবং নীরস বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করিয়া বলিবার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

যত্র ত্রিভুজস্য ভুজত্রয়ং অন্য ত্রিভুজস্য ভুজৈঃ সমানং ভবতি তদা তস্য কোণত্রয়মপি অন্য ত্রিভুজস্য কোণৈরবশ্যং সমানং ভবিষ্যতি।

এই প্রকার সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় সম্পূর্ণ রেখা-গণিত-শাস্ত্রের জটিল সূত্রগুলি বিবৃত করিয়া পণ্ডিত জগন্নাথ ক্ষেত্রতত্ত্বকে সহজ ও সুখবোধ্য করিয়া গিয়াছেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষায় যে জ্যামিতি-শাস্ত্র অধীত হইতেছে, তাহা অল্পবিস্তর জগন্নাথেরই রেখাগণিতের রূপান্তর।

কুষ্ঠীদের সেবায় আত্মবলিদান

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত বি-এল্

যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার শিষ্যগণকে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "He that findeth his life shall lose it; and he that loseth his life for my sake shall find it. He that taketh not his cross and followeth not after me, is not worthy of me. Heal the sick, cleanse the lepers; freely you have received, freely give." অর্থাৎ—'যে ব্যক্তি নিজের জীবনের সুখের দিকে তাকাইবে সে জীবন হারাইবে, আর যে আমার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিবে সে প্রকৃত জীবন লাভ করিবে। যে ব্যক্তি ক্রুশ গ্রহণ করিয়া আমার অনুসরণ না করে সে আমার উপযুক্ত শিষ্য নয়। পীড়িতের রোগ দূর কর, কুষ্ঠীদিগের সেবা কর। অযাচিতভাবে তুমি যাহা পাইয়াছ তাহা মুক্তহস্তে দান কর।' যীশুর সমসাময়িক শিষ্যমণ্ডলী এবং পরবর্ত্তী অনুগামিগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার এই বাণী অনুসরণ করিয়া বহুজনের হিত ও সুখের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সেবাধর্ম্মের মূর্ত্ত প্রতীক ফাদার ড্যামিয়েনের নাম খ্রীষ্টধর্ম্মের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। পরহিতের জন্য এরূপ একজন মহান্ সেবাব্রতীর আত্মবলিদানের আদর্শ সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে অনুকরণীয়। 'কুষ্ঠীদিগের সেবা কর'—যীশুর এই উপদেশটি জীবনের মূলমন্ত্র-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া তদুদ্দেশ্যে জীবনপাত করিবার জন্যই যেন মহাত্মা ড্যামিয়েন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে বেলজিয়মের অন্তর্গত এক গণ্ডগ্রামে যোশেফ ডি ভিয়াষ্টার নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যজীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা পাওয়া যায় না। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন এবং স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তিনি একই সময়ে চিকিৎসক, শুশ্রূষাকারী, সূত্রধর, গৃহনির্ম্মাতা, শিক্ষক, পাচক, উদ্যানরক্ষক ও চিত্রকররূপে বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দিয়াছিলেন—ইহা হইতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে যোশেফ বাল্যকাল হইতেই এই সকল বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

তিনি বাল্যকালেই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পেম্পিলাস প্রসিদ্ধ লুভেইন নগরের মঠের ধর্ম্মযাজক ছিলেন। বালক ভিয়াষ্টার লুভেইন মঠে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্য শিক্ষা করিবার জন্য পিতার অনুমতি চাহিলেন। পিতা পুত্রের দৃঢ় সংকল্প দেখিয়া সম্মতি দিলেন। এই মঠে ধর্ম্মপ্রচারের শিক্ষা লাভ করিয়া ভিয়াষ্টার ড্যামিয়েন নামে অভিহিত হইলেন।

এই সময়ে ড্যামিয়েনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পেম্পিলাসের বিদেশে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যাইবার কথা স্থিরীকৃত হয়। যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইলে পেম্পিলাস গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। দুই দিবস পর যে জাহাজ ছাড়িবার কথা সে জাহাজে যাত্রা করিবার তাঁহার কোন সম্ভাবনাই রহিল না, কারণ তিনি যথাসময়ে আরোগ্যলাভ করিতে পারেন নাই। এই শুভকার্য্যে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পেম্পিলাস অতীব মর্ম্মাহত হইলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিষণ্ণ দেখিয়া ড্যামিয়েন বলিলেন, "ভ্রাতঃ, আপনার পরিবর্ত্তে আমি যাইব—ইহাতে কি আপনার মনে শান্তি ও আনন্দ হইবে?" পীড়িত ভ্রাতা সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "আমি নিশ্চিতই সুখী হইব। তুমি যদি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্যে বিদেশে গমন কর, তাহা হইলে আমি মনে করিব যে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।"

ড্যামিয়েন অনতিবিলম্বে ভ্রাতার প্রতিনিধিরূপে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বিদেশে গমন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া সঙ্ঘনায়ককে (Head of the Order) লিখিলেন। অনুমতি প্রদত্ত হইল। ড্যামিয়েন পরিবারবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া চিরদিনের জন্য দাক্ষিণসমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপ ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কাপ্তেন কুক আবিষ্কার করেন। এই দ্বীপশ্রেণী অতি মনোরম এবং বিচিত্র কুসুমাদি দ্বারা সুশোভিত। অসংখ্য নারিকেলবৃক্ষ তীরভূমিতে সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান আছে। এই স্থানেই ফাদার ড্যামিয়েন ধর্ম্মপ্রচারের জন্য গমন করিয়া তথায় সুদীর্ঘ নয় বৎসর কাল হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সকল দ্বীপের অধিবাসিগণ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী। এক শত বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় খ্রীষ্টান মিশনরী এই স্থানে গমন করিয়া তত্রত্য অধিবাসিগণকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যভাগে অবস্থিত হাওয়াই নামক বৃহত্তম দ্বীপে একটি আগ্নেয়গিরি আছে। এই আগ্নেয়গিরি বিদ্যমান থাকায় দ্বীপের অধিবাসিকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে খ্রীষ্টান মিশনরীদের অতিশয় বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে মাঝে মাঝে নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির প্রভূত অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে। দ্বীপবাসিগণ এই ভয়ঙ্কর আগ্নেয়গিরিকে দেবী পিলির (Pele) আবাসস্থান বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যদি তাহারা দেবীর পূজা পরিত্যাগ করে, তবে দেবী কোপান্বিতা হইয়া আগ্নেয়গিরি হইতে উষ্ণ গলিত পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের বিনাশ করিবেন। তাহারা অনেক

বার জনবহুল গ্রামগুলিকে এই আগ্নেয়গিরির ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইতে দেখিয়াছে। সুতরাং তাহারা সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত থাকিত এবং কেহই দেবী পিলির পূজা পরিত্যাগ করিয়া মিশনরীদের প্রচারিত খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সাহসী হইত না।

হাওয়াই দ্বীপের রাণী দ্বীপবাসিগণের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। এক দিন রাণী একাকিনী আগ্নেয়গিরির চতুর্দ্দিকস্থ বিস্তীর্ণ সমতলভূমি অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতপার্শ্বে আরোহণ করিলেন। তিনি বহুনিম্নে পুঞ্জীভূত আগ্নেয় পদার্থ দেখিতে পাইলেন। দেবী পিলির নিকট পবিত্র বলিয়া পরিগণিত এক বৃক্ষের শাখা রাণী আগ্নেয়গিরির মুখে নিক্ষেপ করিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"পিলি, যদি তুমি প্রকৃতপক্ষেই জাগ্রতা দেবী হইয়া থাক, তাহা হইলে এই অপমানের প্রতিশোধ লও।" দেবীর কোপের কোন পরিচয় পাওয়া গেল না; ভূগর্ভ হইতে কোন গর্জ্জন শ্রুত হইল না, বীরাঙ্গনা রাণীকে বিনাশ করিবার জন্ত কোন গলিত স্রাবও নির্গত হইল না। বীরাঙ্গনা রাণী বিজয়গর্ব্বে প্রমত্তা হইয়া অক্ষতদেহে আগ্নেয়গিরি হইতে অবতরণ করিলেন এবং দ্বীপবাসিগণকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"তোমরা সকলেই দেখিলে দেবী পিলি শক্তিহীনা। এই খ্রীষ্টান মিশনরীগণ যে পরমেশ্বরের বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন সেই পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতা নাই এবং খ্রীষ্ট ব্যতীত মানবজাতির অন্ত ত্রাণকর্ত্তা নাই।" দ্বীপবাসিগণ এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া এবং রাণীর আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া খ্রীষ্টান প্রচারকগণের নিকট পরমেশ্বরের কথা শুনিতে আরম্ভ করিল এবং কালক্রমে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইল।

প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপগুলি দেখিতে মনোরম হইলেও একটি দোষে এগুলি কলঙ্কিত এবং ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল দ্বীপের অধিবাসিগণ ভীষণ কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। দক্ষিণ-সমুদ্রস্থ এই দ্বীপগুলিতে কুষ্ঠব্যাধি এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে গবর্ণমেণ্ট ইহার সংক্রমণ প্রতিরোধ-মানসে কুষ্ঠীদিগের বাসের জন্ত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ পৃথকরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। অন্যান্ত দ্বীপগুলি হইতে ঘনকৃষ্ণ অত্যুচ্চ গিরিশ্রেণীর দ্বারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের দুইটি পল্লীতে এই হতভাগ্য কুষ্ঠীগণ নিঃসহায় অবস্থায় নিরানন্দ জীবন যাপন করিত। তাহাদিগের সঙ্গে কোন চিকিৎসক এবং ধর্ম্মযাজক বাস করিতেন না। অন্যান্যের নিরাপত্তার জন্য এই কুষ্ঠীদিগকে নির্জ্জন দ্বীপে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করা হইত।

দ্বীপগুলির প্রধান ধর্ম্মযাজক যখনই পারিতেন তখনই কুষ্ঠীদিগকে দেখিতে যাইতেন। হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগকে নিঃসহায় অবস্থায় দ্বীপে ফেলিয়া যাইতে প্রধান ধর্ম্মযাজকের প্রাণে দুঃখ হইত। অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারের কার্য্য চালাইবার লোক বিশপের হস্তে অতি অল্পই ছিল; ইহা ছাড়া কুষ্ঠীদিগের সহিত বাস করিবার জন্য কাহাকেও পাঠাইলেই সে নিশ্চিতরূপে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া পরিণামে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে—এই আশঙ্কাও ছিল। কাজেই প্রধান ধর্ম্মযাজক বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কিন্তু হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগের জন্য ড্যামিয়েনের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল। এক দিন ইউরোপ হইতে কতিপয় ধর্ম্মপ্রচারক আসিয়া উপস্থিত হইলে ড্যামিয়েন তৎক্ষণাৎ প্রধান ধর্ম্মযাজকের নিকট গিয়া বলিলেন, "এই ধর্ম্মপ্রচারকগণই এক্ষণে আমার কাজ করিতে পারিবেন। আমাকেই মোলাকাই যাইতে অনুমতি দিন।" ড্যামিয়েনের অসাধারণ আত্মত্যাগের ভাব দেখিয়া বিশপ বিস্মিত হইলেন এবং মোলাকাই দ্বীপে যাইতে তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। ড্যামিয়েন তখন তেত্রিশ বৎসরবয়স্ক বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিকর্ম্মা যুবক। তিনি তৎক্ষণাৎ পিতামাতা, গৃহ ও আত্মীয়স্বজনদিগকে পুনরায় দেখিবার আশা চিরতরে বিসর্জ্জন দিলেন। এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার ভাবনাও তাঁহার মনে উপস্থিত হইল না। কুষ্ঠ যে কি ভীষণ ব্যাধি এবং মোলাকাইয়ে গমন করিলেই যে তিনি এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারেন তিনি ইহা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন। মোলাকাইয়ে যাইবার জন্ত ড্যামিয়েন এত দূর ব্যস্ত হইলেন যে তিনি কাহারও নিকট হইতে যথোচিত বিদায় গ্রহণ না করিয়া এবং কোনও নূতন পোশাক-পরিচ্ছদ সংগ্রহ না করিয়াই সেই দিবসই রওনা হইলেন।

একখানি ক্ষুদ্র নৌকা ড্যামিয়েনকে জাহাজ হইতে সমুদ্রতীরে লইয়া গেলে তিনি অসংখ্য নিঃসহায় কুষ্ঠীকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। ড্যামিয়েন ইহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি মনে মনে নিজকে বলিতে লাগিলেন, "যোশেফ, এই তোমার জীবনের প্রধান ব্রত, এই কুষ্ঠীদিগের সেবায়ই তোমার জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে।" মোলাকাই দ্বীপে ড্যামিয়েন যখন প্রথম উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার বাসস্থানের কোন বন্দোবস্ত ছিল না; তিনি এক প্রকাণ্ড বৃক্ষের নীচে উন্মুক্ত স্থানে নিদ্রা যাইতেন। প্রায় আট শত কুষ্ঠী নিজেদের তৈরি জীর্ণ কুটীরে নিরানন্দ জীবন যাপন করিত। ড্যামিয়েন কালবিলম্ব না করিয়া কুষ্ঠীদিগের জন্ত স্বাস্থ্যকর কুটীর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কাঠাদি প্রেরণ করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি যে কেবল গৃহনির্ম্মাণের পরিকল্পনাই করিয়াছিলেন তাহা নহে। পূর্ব্বে কুষ্ঠীগণ সাময়িকভাবে কতকটা দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিবার জন্ত সুরাপান করিয়া সময় অতিবাহিত করিত। এক্ষণে ড্যামিয়েনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কুষ্ঠীদিগের মধ্যে অনেকেই কুঠার, করাত প্রভৃতি যন্ত্রপাতির সাহায্যে নিজেদের বাসোপযোগী কুটীর নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সারি সারি সুন্দর স্বাস্থ্যকর কুটীর নির্ম্মিত হইয়া গেল।

কুষ্ঠীদের পল্লীতে প্রচুর জল সরবরাহের বন্দোবস্ত ছিল না। জলের অভাবে পল্লীগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারা যাইত না। কাদার ড্যামিয়েন পাহাড়ে একটি ঝরণার কথা শুনিয়া কতিপয় বালকের সহিত উহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। এক উপত্যকার উপরিভাগে বৃহৎ একটি ঝরণা দেখিতে পাইলেন। ঝরণাটি গ্রীষ্মকালের প্রখর উত্তাপেও শুষ্ক হইয়া যাইত না; উহাতে সর্ব্বদাই অফুরন্ত জল পাওয়া যাইত। ড্যামিয়েন নলসংযোগে ঝরণা হইতে কুষ্ঠীদের পল্লীতে জল আনয়ন করিলেন। তদবধি কুষ্ঠীদিগের জলের আর কোন অভাব রহিল না।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। ড্যামিয়েন প্রতিদিন প্রাতে গির্জ্জায় উপাসনা সমাপন করিয়া দৈনন্দিন কাজে নিযুক্ত হইতেন। এই দৈনিক উপাসনাই তাঁহাকে প্রতিকার্য্যে অপূর্ব্ব প্রেরণা ও শক্তি প্রদান করিত। প্রথমতঃ, তিনি মোলোকাই দ্বীপের পিতৃমাতৃহীন শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত অনাথ-ভবনে যাইতেন, পরে বালকবালিকাদের বিদ্যালয়ে যাইয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন; তৎপর গৃহে ও হাসপাতালে রোগীদিগকে দেখিতেন। এই সকল নির্দ্দিষ্ট কাজ সমাপন করিয়া ড্যামিয়েন মিস্ত্রীর কাজও কিছু কিছু করিতেন। শক্ত-সমর্থ কুষ্ঠীদিগের সহায়তায় তিনি ক্ষুদ্র গির্জ্জাটির পরিসর আরও বাড়াইলেন। দুইটি নূতন গির্জ্জাও নির্ম্মিত হইল। ধর্ম্মযাজক রূপে ড্যামিয়েনকে দীক্ষা, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও যোগদান করিতে হইত। প্রকৃতপক্ষে ফাদার ড্যামিয়েন মোলোকাই দ্বীপে কুষ্ঠীদিগের বিচারক, পিতা, শাসক ও ত্রাণকর্ত্তা ছিলেন। "Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest" অর্থাৎ তোমরা যাহারা দুঃখকষ্টে জর্জ্জরিত আছ, আমার নিকট এস; আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব"—যীশুখ্রীষ্টের এই আশ্বাসবাণী লইয়াই ফাদার ড্যামিয়েন কুষ্ঠীদিগের নিকট যাইতেন, হতভাগ্যদের শারীরিক ক্লেশ দূর করিতেন এবং ভগবানের কথা শুনাইয়া তাহাদের নিরানন্দ জীবনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার করিতেন। বহু বৎসর কুষ্ঠীপল্লীতে বাস করিয়া কুষ্ঠীদিগের সেবায় তিনি দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অলোকসামান্য নিঃস্বার্থ সেবার ফলে মোলোকাই দ্বীপের কুষ্ঠীদিগের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। একাদশ বৎসর একনিষ্ঠ সেবার পরও কুষ্ঠব্যাধি তাঁহার শরীরে সংক্রমিত হয় নাই। কিন্তু তিনি বেশী দিন এই সংক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি পীড়িত ও মৃত কুষ্ঠীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিজ শরীরে এই ব্যাধির সংক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। অবশেষে জনৈক ডাক্তার চিকিৎসা ব্যপদেশে মোলোকাইয়ে আসিয়া ড্যামিয়েনের শরীরে কুষ্ঠব্যাধির লক্ষণ দেখিতে পাইলেন। ব্যাধির আক্রমণ দেখিতে পাইয়া ডাক্তার ড্যামিয়েনকে এ বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন।

ড্যামিয়েন হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আমি অনেক পূর্ব্বেই ইহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম। তুমি যদি বলিতে এখানকার কাজ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলে আমার এই ব্যাধি সারিয়া যাইবে, তাহা হইলেও আমি এ স্থান পরিত্যাগ করিতাম না। আমি এই হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগের সেবার ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছি—ইহাদের সেবায়ই আমি প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।" আর প্রকৃতপক্ষে তিনি কুষ্ঠীদের সেবায়ই প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; 'কুষ্ঠীদিগের সেবা কর'—শিষ্যগণের নিকট প্রভু যীশুর এই উপদেশ ভক্ত ফাদার ড্যামিয়েন তাঁহার নিজ জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। এই কাল ব্যাধিতেই ড্যামিয়েনের অমূল্য জীবন তিলে তিলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল। তাঁহার জীবনের ব্রত শেষ হইল। তিনি যে কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতা উহা গ্রহণ করিলে অন্যান্য ধর্ম্মযাজকগণ স্বেচ্ছায় এই কার্য্যে যোগদান করিলেন। আজকাল চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণীগণ হাসপাতালে কুষ্ঠীদিগকে দেখিতেছেন, শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে কুষ্ঠী বালক-বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু ফাদার ড্যামিয়েন যখন প্রথম এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন তখন কেহই তাঁহাকে উৎসাহ দেন নাই, কোন সহানুভূতি দেখান নাই। সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে বেলজিয়মবাসী জনৈক ধর্ম্মযাজক হতভাগ্য কুষ্ঠীদিগের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, বহির্জ্জগৎ এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপ এই মহাপুরুষের অলৌকিক আত্মবলিদানের কথা জানিতে পারিল। ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলিতে মোলোকাই দ্বীপের কুষ্ঠী-পল্লীর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইতে লাগিল। ইহার জন্য অর্থ সংগৃহীত হইতে লাগিল। ইউরোপবাসিগণ ড্যামিয়েনের অলোকসামান্য সেবাপরায়ণতা ও স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা ড্যামিয়েনের অপূর্ব্ব সেবাকার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া প্রভূত অর্থ সাহায্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ড্যামিয়েন তাঁহার জীবদ্দশায়ই ইউরোপীয়গণের সহানুভূতি ও অর্থানুকূল্যের কথা জানিতে পারিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড হইতে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ, মানচিত্র, কলের গান, চিত্র প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য উপহার-স্বরূপ ড্যামিয়েনের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে একটি মূল্যবান্ উপহার ড্যামিয়েন সযত্নে ও পরম আদরে নিজ কুটীরে রক্ষা করিয়াছিলেন—এই উপহার সাধু ফ্রান্সিসের নিকট প্রভুর আবির্ভাবের ক্ষুদ্র চিত্রখানি। ইহা ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত চিত্রকর কর্ত্তৃক অঙ্কিত। ভক্ত ড্যামিয়েন নিজ প্রকোষ্ঠে শয্যার পাদদেশে প্রাচীরগাত্রে এই চিত্রখানি প্রলম্বিত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আজকাল মোলোকাই কুষ্ঠী-পল্লীর প্রভূত উন্নতি সাধিত

হইয়াছে। কুষ্ঠীদিগের সেবা ও তত্ত্বাবধানের জন্য ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে। ভক্ত ড্যামিয়েনের জীবনব্যাপী তপস্যা, নিষ্কাম সেবা ও আত্মত্যাগের ফলেই কুষ্ঠ-পল্লীর এরূপ অভাবনীয় পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। পৃথিবীতে যত দিন সেবাধর্ম্মের মহিমা থাকিবে তত দিন ভক্ত ড্যামিয়েনের নিষ্কাম সেবা ও আত্মবলিদানের কাহিনী পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

আর্টের ত্রিধারা

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

ভারতবর্ষের চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও অন্যান্য সুকুমার কলা-শিল্প একদা সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হয়েছিল, কিন্তু আজ তার শোচনীয় অবস্থা হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার করে।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকের একটা ধারণা জন্মেছে যে, আর্ট বা শিল্প-কলা তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে উন্মার্গগামী হয়েছে। আধুনিক সভ্যতা বহুক্ষেত্রে কলা-বিদ্যাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছে। আধুনিক আর্টও তাই স্বধর্ম্ম ভুলে গিয়ে মিথ্যা আড়ম্বর ও দৌর্বল্যের আশ্রয় নিয়ে আপনার দৈন্যকে ঢাকবার প্রয়াস পাচ্ছে।

মনে প্রশ্ন জাগে, আর্ট বর্ত্তমান অবস্থা থেকে কবে মুক্তি পাবে? আর কলা-বিদ্যার অনুশীলনে মানবজাতির পার্থিব উন্নতির অন্তরায়-স্বরূপ বলে যে একটা কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় তারও কোন ভিত্তি আছে কিনা সে কথাটাও ভেবে দেখতে হবে।

ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই কলা-বিদ্যার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং তার ফলে তদ্দেশবাসীর জীবন হয়ে উঠেছে আনন্দময়, আর তাদের দেশের সর্ব্বত্র কলা-বিদ্যার প্রচার ও প্রসার হয়েছে। অবশ্য প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে ওদেশে শিল্পকলার যে অপার ক্ষতি হয়েছে, সহজে তা পূরণ হওয়া সম্ভবপর নয়। সাম্প্রতিক রাশিয়ার শিল্প ও কলা-বিদ্যার প্রকৃত স্বরূপ আজও আমাদের নিকটে পূর্ণতর পরিচয়ের অপেক্ষায় আছে।

সভ্যতা ও কলা-বিদ্যার সম্বন্ধ গভীর। তার কারণ সভ্যতার কেন্দ্রস্থল বড় বড় নগরী, আর সেগুলোকে কেন্দ্র করেই কলা-বিদ্যা ক্রমবিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। শিল্পকলা হচ্ছে সভ্যতার অলঙ্কার-স্বরূপ। দেশ সমৃদ্ধ হলে কলা-বিদ্যা জনগণের নিকটে সমাদৃত হয়।

শিল্প-কলার মূল আদর্শ হ'ল সত্যম্, শিবম্, সুন্দরের সাধনা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই উন্নত আদর্শকে উপলব্ধি করাই ছিল ভারতীয় শিল্প-সাধনার মর্ম্মকথা। শুধু ভারতের নয়, জগতের সকল দেশেরই শ্রেষ্ঠ সুকুমার কলা এই আদর্শকেই সৃষ্টির ক্ষেত্রে রূপায়িত করবার চেষ্টা করে আসছে। প্রথমে চিত্রকলার বিষয় আলোচনা করা যাক্। চিত্রকলার প্রধান তিনটি ধারা দেখা যায়। তার মধ্যে একটি হ'ল চীন ও জাপান দেশে প্রচলিত পদ্ধতি। দ্বিতীয়টি হ'ল ইউরোপ ও ইউনানের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি; আর তৃতীয়টি হচ্ছে ভারতীয় চিত্রকলা। এর মধ্যে কোনটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে গবেষণাত্মক বা তুলনামূলক আলোচনা এখানে আমরা করতে যাচ্ছি না।

চীনা ও জাপানী চিত্র বহু বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে খুব সমাদৃত। এগুলো শুধু যে আমাদের দেশে ধনী লোকদের বৈঠকখানার শোভাবৃদ্ধি করে তা নয়, এদেশের শিল্পী ও শিল্পরসিকদের মধ্যেও এগুলোর আদর ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এ সব চিত্রে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা রয়েছে যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চিত্রে পাওয়া যায় না।

জাপানী চিত্রকলা চীনা চিত্রকলার আদর্শে বিশেষভাবে প্রভাবিত। এই হিসাবে চিত্রকলার ক্ষেত্রে জাপানকে চীনের শিষ্যস্থানীয় বলা যেতে পারে। চীনা ও জাপানী চিত্রকলাকে একই বৃক্ষের দুটি শাখা বললে অসঙ্গত হয় না। জাপানী চিত্রকলার ওপর চীনা অঙ্কন-পদ্ধতির ছাপ সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। চীন জাতি পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিদের মধ্যে একটি। নবীন জাপান তার চিত্রকলার জন্য চীনের নিকট ঋণী বটে, কিন্তু সে শুধু ব্যর্থ অনুকরণই করে নি, তার চিত্রকলা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ইউনানের ভাস্কর্য্য অতি উঁচুদরের, কিন্তু তার চিত্রকলা ভারতবর্ষ বা ইউরোপের ন্যায় উন্নত নয়। ভারতবর্ষের ও ইউরোপের চিত্রকলা উঁচুদরের হলেও তার প্রামাণিক ধারাবাহিক ইতিহাস বা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় না। চার্লস হোম তাঁর বিশ্বকোষ গ্রন্থে বলেছেন যে, চীনের চিত্রাঙ্কন-প্রথা বহু পুরাতন ও শ্রেষ্ঠ। চীনের চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার বার শত বৎসরের প্রামাণিক ইতিহাস আছে। পৃথিবীতে আর কোন দেশে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। বাস্তবিক চীনা সুকুমার শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হ'ল তার চিত্রকলা।

হোম সাহেব আরও বলেছেন যে, চীনের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির উদ্দেশ্য হ'ল বস্তুর অন্তর্নিহিত পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা, ঘটনা চিত্রিত করা নয়। তাই চীনদেশে চিত্রকে শব্দহীন কবিতা বলা হয়ে থাকে। তাই সে দেশে চিত্রকর ও কবি উভয়েই সমধর্ম্মী।

চীনা শিল্পীরা প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রাবলী খুব বেশী করে আঁকেন। চিত্রাঙ্কন ও কবিতা-রচনা এই উভয় ক্ষেত্রেই শিল্পী ও কবিরা প্রকৃতি থেকে প্রচুর উপকরণ আহরণ করেন।

এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রাবলীতে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। এই চিত্রগুলিতে মানুষ, পশু, পাখী ইত্যাদিও স্থান পেয়েছে, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যই তাতে মুখ্য স্থান অধিকার করে আছে। যেমন শিল্পী নীলাকাশের পটে শ্বেতবলাকা আঁকে পটভূমিকার দৃশ্য-সৌন্দর্য্যকেই বাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে—বস্তুত: চীনা চিত্রকর পাখী আঁকে তার আকাশের চিত্রকে আরও সুসমঞ্জস করতে। অনন্ত আকাশের সৌন্দর্য্য তাতে অধিকতর পরিস্ফুট হয়।

জাপানের চিত্রকলাও অনেকটা এইরূপ। এই কারণে চীনা ও জাপানী চিত্রকলা, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র ধরণের। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের চিত্রকলা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনার সহিত সংস্পর্শ-বিহীন হওয়ায় যথোচিত আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি। প্রাকৃতিক দৃশ্য-চিত্রাঙ্কনের যে সমস্ত নমুনা পাওয়া যায় চীনা বা জাপানী চিত্রের সহিত সেগুলোর তুলনা করা চলে না।

ইউরোপের চিত্রেও প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য দেখান হয়, কিন্তু তাতে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত আনন্দের আভাস খুঁজে পাওয়া শক্ত হয়ে পড়ে। সে ছবি নয়নানন্দকর বটে, কিন্তু তাতে দর্শকের শুধু চোখই ভোলে, মন ভরে ওঠে না।

প্রকৃতির অন্তস্তলে যে অনন্ত প্রাণ-লীলা আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল তার স্বরূপ ইউরোপীয় চিত্রকর উপলব্ধি করতে পারেন নি। একমাত্র রেম্ব্রাঁকে বাদ দিলে আর সকলের সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। এ বিষয় স্টক হোল্‌ম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক শাইরেন সাহেব বলেছেন—

প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র যা চীনা শিল্পীরা এঁকেছে তত সুন্দর চিত্র ইউরোপের চিত্রকরগণ আঁকতে পারে নি। চীনা চিত্রকর প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকতে গিয়ে তুলির টানে এমন এক সৌন্দর্য্যলোকের আভাস ফুটিয়ে তোলে, যা ইউরোপের চিত্র-শিল্পীদের চোখে পড়ে না। প্রকৃতি-নিরীক্ষণ-ক্ষমতা চীনা শিল্পীদের অসাধারণ—তা মানতেই হবে। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ, আত্মার নীরব সঙ্গীত তার চিত্রে ধরা পড়েছে।

জাপানীদের চিত্রেও প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য বিশেষ ভাবেই চোখে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই উভয় শিল্পে বৈষম্য আছে।

এটা সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, জাপানী চিত্রকর চীনা চিত্রশিল্পীর ন্যায় ততটা ভাবনা-প্রবণ ও কল্পনাপ্রিয় নয়। জাপানী শিল্পীর প্রধানত: সৌন্দর্য্যপ্রিয় এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যই তাদের আদর্শ সৌন্দর্য্য বা সৌন্দর্য্যের আদর্শ। চীনারা ভাবুক তাই আকাশ তাদের খুব প্রিয়। জাপানীরাও নীলাকাশ ভালবাসে, কিন্তু চীনাদের ন্যায় তাকে দিগন্ত-প্রসারী রূপ দিয়ে মহিমান্বিত করে না। জাপানীদের অঙ্কিত আকাশ সাদা খণ্ড-মেঘশোভিত ও সূর্য্যের কিরণসম্পাতে সমুজ্জ্বল—এমনি নয়নাভিরাম ছবিই তারা প্রধানতঃ আঁকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জাপানীদের মণ্ডন-শিল্পের (decorative art) দিকেই আকর্ষণ বেশী। জাপানীদের ছবিতে বর্ণবিন্যাসের বৈচিত্র্য চীনাচিত্রের চেয়ে বেশী লক্ষণীয়।

প্রসিদ্ধ কলা-সমালোচক উইলিয়াম এণ্ডার্সন লিখেছেন যে, চীনাদের রেখা-চিত্র আর জাপানীদের রঙীন চিত্র তাদের স্বকীয়তার জন্যে সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে।

মানব-জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী ও ঐতিহাসিক আখ্যানকে বিষয়বস্তু করে চীনারা বহু চিত্র এঁকেছে। পুরনো চিত্রগুলির মধ্যে য়ু য়াবতসী (Wu Yotzi) অঙ্কিত বুদ্ধের মূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই চিত্রের অঙ্কন-পদ্ধতি সিংহলের 'ধ্যানী বুদ্ধের চিত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। ঐ মূর্ত্তি বর্ত্তমান সময়ে মাদ্রাজের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এক সময় বৌদ্ধ প্রভাব সমগ্র এশিয়ার শিল্পকলাকে প্রভাবিত করে-ছিল—এই চিত্র তারই সাক্ষ্য প্রদান করছে। চীনে ও জাপানে সেই সুদূর কাল থেকেই বুদ্ধ ও তাঁর জীবনের ঘটনা-গুলিকে বিষয়বস্তু করে ছবি আঁকার রেওয়াজ চলে আসছে।

চীন ও জাপানের চিত্র-জগৎ ছেড়ে যখন ইউরোপের চিত্রশালায় প্রবেশ করি তখন মনে হয় যেন আমরা এক নূতন রাজ্যে, নূতন পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত হয়েছি।

ইউরোপের চিত্রকলার আলোচনা করতে গেলে প্রথমে ইউরোপীয় সভ্যতার আদি জননী গ্রীস দেশ ও তৎপরে ইটালীর সুবিখ্যাত চিত্রকলার অভ্যুদয়ের ইতিহাস অনুধাবন আবশ্যক।

ইউরোপের চিত্রাবলী অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত, কিন্তু তাতে একটা অভাব বিশেষ করে চোখে পড়ে। শিল্পী তার ছবিতে নরনারীর দেহসৌষ্ঠবকে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়েছেন সত্য, কিন্তু তার আত্মার স্বরূপকে উদ্ঘাটিত করতে পারেন নি। তাদের ছবিতে পাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগতের হুবহু অনুকরণ কিন্তু তাতে ইন্দ্রিয়াতীতের আভাস নাই, ইঙ্গিত নাই, ব্যঞ্জনা নাই। 'মিনার্ভা' ও 'এপলো' নারী ও নরের শ্রেষ্ঠ নিখুঁত ও সুন্দরতম প্রতিকৃতি সন্দেহ নেই—তাদের অঙ্গসৌষ্ঠব, দেহ-লাবণ্য অতুলনীয়, কিন্তু তাদের যে সৌন্দর্য্য তা অবিনশ্বর নয়। ইটালীর চিত্রকরগণ চিত্রাঙ্কনে এই বাস্তবতার প্রভাব এড়াতে পারে নি—যদিও তারা তাদের ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত দেব-দেবীর ছবিই এঁকেছে খুব বেশী সংখ্যায়।

র‍্যাফেলের 'মেডোনা', মাইকেল এঞ্জেলোর 'সেণ্ট পল,' প্রভৃতি চিত্র স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠতায় কালজয়ী হয়ে থাকবে নিঃসন্দেহ।

কিন্তু এ তো গেল চিত্রকলার এক দিক মাত্র, এর আর

এক দিকের বিকাশ হয়েছে ভারতে। ভারতের শিল্পী এঁকেছে আরও সুন্দর, আরও প্রাণবান্, আধ্যাত্মিক ভাবধারায় সঞ্জীবিত চিত্রাবলী। প্রাচীন ভারতে কলাশিল্পের উন্নয়নের জন্যে, বিশেষ করে চিত্রশিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্ত যাঁরা প্রকৃত পন্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন তন্মধ্যে কামসূত্রপ্রণেতা বাৎস্যায়নের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিল্পীদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন : প্রকৃতির নয়নাভিরাম রূপ ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে—নব নব পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তিতে তা আমাদের আনন্দ দিচ্ছে। শিল্পী যারা তারা প্রকৃতির এই অপার সৌন্দর্য্যের বিবর্ত্তন অনুসরণ করে চিত্র আঁকবে। যে মূর্ত্তি গড়তে হবে, যে চিত্র আঁকতে হবে, তার রূপ চর্ম্মচক্ষে দেখে ও মানসপটে কল্পনা করে, তুলির টানে বা ভাস্করের হাতুড়ি দিয়ে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

ইউরোপের কুশলী শিল্পীগণও গৌরব অর্জ্জন করেছেন প্রকৃতি ও মানুষের বাহ্যিক রূপের ব্যঞ্জনা তাঁদের চিত্রে ফুটিয়ে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অন্তরালে যে রহস্যময় শব্দাতীত স্পর্শাতীত রূপলোক বিদ্যমান, তাঁকে তাঁরা তাদের চিত্রে রূপায়িত করতে পারেন নি—সুতরাং তাঁদের চিত্রাবলী অতি উঁচুদরের হলেও মানুষের আত্মার ক্ষুধা মেটাবার উপযোগী নহে।

বাঘগুহা, অজন্তা ও ইলোরার পরম রমণীয় চিত্রাবলী সমগ্র জগতে অতুলনীয়। তাতে অন্যান্য দেশের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির ন্যায় রঙের সমাবেশ, অলঙ্করণ ও রেখাঙ্কননৈপুণ্য সব কিছুই চোখে পড়ে, কিন্তু অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাব-ব্যঞ্জনা এই চিত্রসমূহে এমনি সুন্দর ভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছে যে সেগুলো সমগ্র পৃথিবীর শিল্পী-গোষ্ঠীকে এবং শিল্পরসিকদের শুধু আনন্দই দেয় নি, তাদের বিস্মিতও করেছে। একাধারে বাহ্যিক ও আন্তরিক, দৈহিক ও মানসিক এই উভয়বিধ সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ এই চিত্রাবলীকে একটা অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ভারতীয় ও বিদেশীয় চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির এই পার্থক্যের কথা ডাক্তার কুমারস্বামী এই ভাবে ব্যক্ত করেছেন—

অন্তর্জ্জগতের সহিত ইউরোপীয় শিল্পকলার সম্পর্ক অতি অল্পই চোখে পড়ে। ওখানকার চিত্রশিল্পীদের কল্পনাশক্তি বহির্জ্জগতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ভারতীয় চিত্র ও অন্যান্য কলা-শিল্পের দৃষ্টি ও রূপভাবনা চিরদিনই অসীমের ও মানসিক সৌন্দর্য্যের অনুসরণে ব্যগ্র। ভারতের পুরুষ ও স্ত্রীর চিত্র শুধু শারীরিক সৌন্দর্য্য ও দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনের জন্যে অঙ্কিত হয় নি—তার ভেতরের, অন্তর্জ্জগতের উচ্চভাবের আদর্শকে তাতে রূপায়িত করা হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে—যেমন সরস্বতী, প্রজ্ঞাপারমিতা ও তারার মূর্ত্তি আর নটরাজ শিব ও ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি।

বিশ্ববিখ্যাত কলাবিদ্ হাওয়েল সাহেব বলেছেন যে ধ্যানী বুদ্ধের চিত্র বা মূর্ত্তিনির্ম্মাণের পরিকল্পনাও ইউরোপে হওয়া অসম্ভব।

অনেক বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক বলেছেন যে, মুভমেণ্ট পিকচার বা গতিব্যঞ্জক ছবির মধ্যে ভারতীয় শিল্পীদের আঁকা শিবের তাণ্ডব-নৃত্যের ছবির ন্যায় দ্বিতীয় ছবি আর পৃথিবীতে নেই।

ভারতীয় দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্ব ও অনুভূতি রূপ পরিগ্রহ করেছে শিবের বিভিন্ন মূর্ত্তিতে চিত্রে। শিব সংহারকর্ত্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা দুই-ই। নটরাজ শিবের মূর্ত্তিতে যে ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়েছে তা অতুলনীয়।

ভারতের চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে আরো অনেক বলবার আছে, কিন্তু এখানে তার স্থানাভাব। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা একান্ত প্রয়োজন যে আমাদের এ অতুলনীয় জাতীয় সম্পদ সম্বন্ধে আমরা বেশীরভাগই অজ্ঞ ও উদাসীন। বহু শতাব্দীর পরাধীনতা আমাদের সৌন্দর্য্যবোধকে ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। তারই ফলে আমরা আমাদের অনেক গৌরবের জিনিষ, বিশেষ করে ভারতীয় চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সম্যক্ সচেতন নই।

কিন্তু আশার কথা এই যে অবনীন্দ্রনাথ, কুমারস্বামী প্রভৃতি গুণী জ্ঞানীদের প্রাণপণ চেষ্টায় ভারতীয় চিত্রকলা আজ সমগ্র জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ভারতবর্ষ আজ পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে পূর্ণ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পকলা অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব্ব গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং ভারতীয় শিল্পের এই নব অভ্যুদয় এ দেশবাসীর জন্যে অশেষ কল্যাণ বহন করে আনবে।

সরলা রায়

[জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ—২৬শে নবেম্বর ১৯৪৭]

শ্রীপ্রভাবতী রায়

মাতৃসমা যে পূজনীয়া মহিলার আজ জন্মতিথি তাঁহার বিষয় কিছুই বলিবার যোগ্যতা আমার নাই। কিন্তু তাঁহার নিকট আমি মায়ের স্নেহযত্ন পাইয়াছি, অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছি। তাঁহার প্রভাবে আসিয়া তাঁহারই শিক্ষার গুণে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিয়াছি—তাঁহার প্রতি আমার হৃদয় চিরদিনই শ্রদ্ধাভক্তিতে পূর্ণ। সেই শ্রদ্ধাভক্তির অঞ্জলি নিবেদন করিবার জন্যই আজ দুই-চারিটি কথা বলিতে সাহসী হইয়াছি।

বি-এ পাস করিবার পরই আমি তাঁহার সংস্পর্শে আসি। এক দিন মায়ের সঙ্গে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সেই দিনই তিনি মায়ের নিকট আমাকে তাঁহার কোনও কাজে লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং বাবাকেও অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিলেন। তখন আমার বয়স অল্প, বাবা আমাকে চাকুরী করিতে দিতে ইচ্ছুক নন; নিজেও তেমন সাহস পাই না, কিন্তু মিসেস্ রায় এমন করিয়া বাবাকে লিখিলেন যে, বাবা আর আপত্তি করিতে পারিলেন না।

যে কারণেই হোক, ব্রাহ্ম স্কুলের তখন অতি বিশৃঙ্খল অবস্থা। গবর্ণমেণ্টের হাতে দিবার কথা চলিতেছে, নতুবা স্কুল উঠিয়া যাইবে। এমন সময়ে ব্রাহ্মসমাজের কাহারও কাহারও মনে হইল মিসেস্ রায়ের হাতে স্কুলের ভার অর্পণ করিলে, গবর্ণমেণ্টকে না দিলেও স্কুলটি পুনর্ব্বার সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ত্তৃপক্ষ মিসেস্ রায়ের নিকট এই প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলে তিনি স্কুলের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। সেই দিন হইতেই তিনি স্কুলের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। আমাকে ব্রাহ্ম স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে দিলেন। আমি তখন সবে কলেজ হইতে বাহির হইয়াছি, কাজের কিছুই জানি না—মিসেস্ রায় নিজ হাতে আমাকে কাজ শিখাইতে লাগিলেন। শিক্ষয়িত্রীদের ন্যায় তিনিও ঠিক সাড়ে দশটায় স্কুলে উপস্থিত হইতেন; স্কুল ও হোষ্টেলের সব বিষয়ের খুঁটিনাটি যাবতীয় সংবাদ লইতেন এবং যেখানে যে ভাবে কাজ করিতে হইবে, সে বিষয়ে সকলকে যথাযথ উপদেশ দান করিতেন। রূঢ়তা কাহাকে বলে, মিসেস্ রায় জানিতেন না। সকলের সঙ্গেই সর্ব্বদা হাসিমুখে মিষ্ট ভাষায় কথা কহিতেন, কাজেই কেহ কখনও তাঁহার কথায় রুষ্ট হইত না। কেহ আপত্তিকর আচরণ করিলে ক্রোধপ্রকাশ না করিয়া এমন দৃঢ়ভাবে তাহাকে নিষেধ করিতেন যে, সে ঐ কাজ আর কখনও করিতে সাহস পাইত না। শিক্ষয়িত্রীরা সকলে স্কুলের কাজ শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতেন, মিসেস্ রায়ের কাজ কিন্তু সন্ধ্যার পূর্ব্বে কখনও শেষ হইত না। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিতেন। এক এক দিন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন, রাত্রি ১২টা ১টা পর্য্যন্ত আমাকে লইয়া কাজ করিতেন।

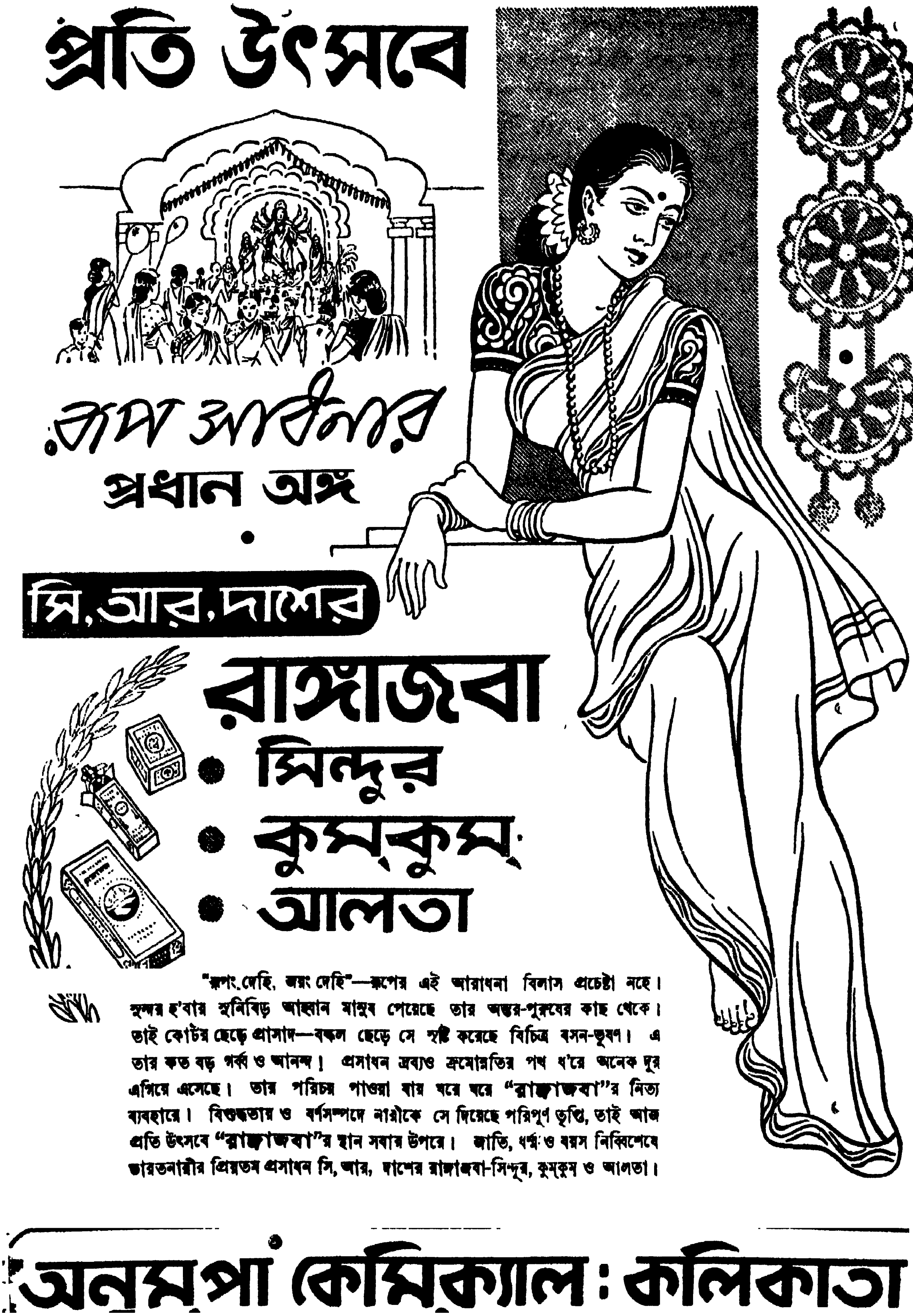
স্কুলের বিশৃঙ্খল অবস্থাকে সুশৃঙ্খলায় আনিতে অনেক সময় অধ্যবসায়, ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের আবশ্যক হইয়াছিল। মিসেস্ রায় দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে তীব্র সমালোচনা চলিতে লাগিল। স্কুলে সর্ব্ববিষয়ে নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলাকে বাধ্যতামূলক করাতেই এ ধরণের বিরূপ সমালোচনা সুরু হইয়াছিল। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমাদের দেশে নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং শৃঙ্খলার বড়ই অভাব। ইহা আমরা আজও ছোট বড় সকল কাজেই দেখিতে পাই এবং এ দুটির অভাবের জন্যই আমরা অনেক কাজে অকৃতকার্য্য হই। তথাপি নিয়মানুবর্ত্তিতার মূল্য আমরা আজও বুঝিলাম না, জীবনে কৃতকার্য্য হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথম যে আমাদের সময়ানুবর্ত্তিতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে শিখিতে হইবে, ইহা আমরা আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। উপরন্তু এইগুলি সম্বন্ধে কেহ পীড়াপীড়ি করিতে গেলেই কি গৃহে, কি বাহিরে—সর্ব্বত্র গোলযোগ ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

ব্রাহ্ম স্কুলে ঠিক এরূপই হইয়াছিল। মিসেস্ রায় ছিলেন বিলিতী ধরণে শিক্ষিতা, বিদেশী আবহাওয়ায় প্রতিপালিতা। বিলিতী সমাজের ভাল জিনিষগুলি তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অল্প বয়স হইতেই উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের মূল্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং জানিতেন যে স্কুলে সময়ানুবর্ত্তিতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং শৃঙ্খলার রক্ষা না হইলে ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষালাভ হইবে না—শিক্ষার প্রধান অঙ্গই বাদ পড়িয়া যাইবে এবং স্কুল পরিচালনা করাও অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তাই

তিনি সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা ও অপবাদ অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। কত সময়ে কত মিথ্যা অপবাদ ও নিন্দা ব্যক্তিগতভাবেও আমাদেরই কানে আসিত, কত তীব্র সমালোচনা কাগজে বাহির হইত, আমরা সবই তাঁহাকে বলিতাম ; তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। ঐ সকল নিন্দাবাদ যে তাঁহার মনে কোনও রেখাপাতই করিত না, তাহা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম। তিনি যেমন কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপন কর্ত্তব্য দৃঢ়ভাবে পালন করিয়া যাইতেন, আমাদেরও তেমনি উপদেশ দিতেন। এই শিক্ষাটুকু তাঁহার প্রভাবে আমরা বিশেষভাবে পাইয়াছিলাম এবং তাঁহার সেই উপদেশই এ যাবৎ পালন করিয়া আসিতেছি—তাহার জন্য আজ পর্য্যন্ত অনুতাপ করিতে হয় নাই। তাঁহার হৃদয় ছিল আকাশের ন্যায় উদার, ধরিত্রীর ন্যায় সহিষ্ণু এবং সমুদ্রের ন্যায় গভীর। তাই তিনি অনাত্মীয়কেও সহজেই আত্মীয় মনে করিতে পারিতেন, মানুষের দোষত্রুটী সহজেই ক্ষমা করিতে পারিতেন এবং নিন্দা, প্রশংসা বা অন্য কোনও কারণেই সহজে বিচলিত হইতেন না। এই সকল গুণ না থাকিলে কোনও বৃহৎ কার্য্যে কি কেহ সফলতা লাভ করিতে পারে?

অভিভাবকেরা কোনও অভিযোগ করিয়া পাঠাইলেই তিনি তাঁহাদের দেখা করিতে আসিতে বলিতেন। অনেক সময়ে দেখিয়াছি কেহ হয়ত অভিযোগ জানাইবার উদ্দেশ্যে বিরূপ মনোভাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু মিসেস্ রায়ের সঙ্গে আলোচনা করিয়া নিজের ভুল ত বুঝিয়াছেনই, উপরন্তু তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া প্রসন্ন চিত্তে বাড়ী ফিরিয়াছেন।

স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের কোনও ভুল বা ত্রুটি হইয়া থাকিলে মিসেস্ রায় তাহা সরল ভাবে জানিয়া লইয়া তাহার প্রতি-বিধান করিবার প্রতিশ্রুতি দিতেন এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন। যাহার কাছে যে প্রকার সাহায্য পাইবেন বলিয়া বুঝিতেন, তাহার নিকটে সেইরূপ সাহায্যই চাহিতেন। এই বিষয়ে তাঁহার কোনও অভিমান বা অহঙ্কার ছিল না। স্কুলটি ব্রাহ্মসমাজের, প্রত্যেক শিক্ষাস্থলই জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য, তাহা কোনও ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়, ইহা মনে করিয়াই তিনি কাহারও নিকট সাহায্য চাহিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল অসাধারণ। সেই প্রভাবের জন্য তিনি সাহায্য চাহিয়া কখনও বিমুখ হন নাই। ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের আর্থিক অবস্থাও তখন শোচনীয়। সরকারী সাহায্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্কুলের উন্নতি দেখাইতে না পারিলে আর পাওয়া যাইবে না। অর্থ বিনা উন্নতি সম্ভবপর নয়, তাই মিসেস্ রায় অর্থসংগ্রহ করিতে বাহির হইলেন। কোনও স্থান হইতেই তাঁহাকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিতে হয় নাই। তাঁহার অদম্য উৎসাহ, উদ্যম ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া সকলেই তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্যকে সফল করিবার জন্য মুক্তহস্তে দান


প্রতি উৎসবে
রূপ সাধনার
প্রধান অঙ্গ
সি. আর. দাশের
রাঙ্গাজবা
সিন্দুর
কুমকুম
আলতা
"রূপং দেহি, জয়ং দেহি"—রূপের এই আরাধনা বিলাস প্রচেষ্টা নহে। সুন্দর হ'বার সুনিবিড় আহ্বান মানুষ পেয়েছে তার অন্তর-পুরুষের কাছ থেকে। তাই কোটর ছেড়ে প্রাসাদ—বল্কল ছেড়ে সে সৃষ্টি করেছে বিচিত্র বসন-ভূষণ। এ তার কত বড় গর্ব্ব ও আনন্দ। প্রসাধন দ্রব্যও ক্রমোন্নতির পথ ধ'রে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। তার পরিচয় পাওয়া যায় ঘরে ঘরে "রাঙ্গাজবা"র নিত্য ব্যবহারে। বিশুদ্ধতায় ও বর্ণসম্পদে নারীকে সে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তি, তাই আজ প্রতি উৎসবে "রাঙ্গাজবা"র স্থান সবার উপরে। জাতি, ধর্ম্ম ও বয়স নির্ব্বিশেষে ভারতনারীর প্রিয়তম প্রসাধন সি, আর, দাশের রাঙ্গাজবা-সিন্দূর, কুমকুম ও আলতা।
অনুরূপা কেমিক্যাল : কলিকাতা

করিতে লাগিলেন। এক বৎসরের মধ্যেই স্কুলের চেহারা বদলাইয়া গেল। সেই ব্রাহ্মবালিকা বিভালয়কে তিনি যে রূপ দিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে যে আদর্শে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই রূপ, সেই আদর্শ লইয়াই উক্ত বিদ্যালয়টি আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ত্রিশ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে শিক্ষা-দান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কিছু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি, সেই জন্য দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, ব্রাহ্ম স্কুলের মত মেয়েদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিরল। এই স্কুলের মত নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলা বাঙালী মেয়েদের আর কয়টি স্কুলে আছে জানি না। ইহার নৈতিক আদর্শ অতি উচ্চ স্তরের।

বৎসর দেড়েকের মধ্যেই মিসেস্ রায় ঐ স্কুলের ভার তাঁহার সুযোগ্যা জ্যেষ্ঠা কন্যার হস্তে সমর্পণ করিয়া বিলাত গেলেন। সেখানে বহু স্থান পর্য্যটন করিয়া বিস্তৃত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন কিন্তু, ব্রাহ্ম স্কুলের ভার আর গ্রহণ করিলেন না। তখন তিনি একটি নূতন স্কুল অন্য আদর্শে গঠন করিবার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন। লরেটো স্কুলে বাঙালী মেয়েদের স্থান পাওয়া চিরদিনই কষ্টকর। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অনুরাগী ধনীরা তাঁহাদের কন্যা বা আত্মীয়াদিগকে লরেটোতে শিক্ষা দিতে চাহিলেও ভর্ত্তি করিবার সময় তাহাদের অনেককে নানা কারণে নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইত। তাই মিসেস্ রায় লরেটোর আদর্শে বাঙালী মেয়েদের একটি নূতন স্কুল স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়া আত্মীয়বন্ধুদের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

স্ত্রী-শিক্ষা তখন দেশের সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। আদর্শ বিভিন্ন হইলেও, মেয়েদের শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে গৃহ ও সমাজের কাজের উপযোগী করা, তাহাদিগকে পরিবারে ও সমাজে সম্মানের অধিকারী করা যে প্রত্যেক অভিভাবকেরই অবশ্যকর্ত্তব্য, এ কথা তখন আর কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। মিসেস্ রায়ের নূতন স্কুলের আদর্শের সহিত সকলের সহানুভূতি না থাকিলেও তাঁহাকে সমর্থন ও সাহায্য করিবার লোকও একেবারে অভাব হয় নাই। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, উৎসাহ ও অসাধারণ কর্ম্মক্ষমতা লোককে এমনই আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, এ ক্ষেত্রে ক্রমে সবই তাঁহার জুটিয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি বহু অর্থসংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন, ছাত্রীরও অভাব হইল না, শিক্ষয়িত্রীরও অপ্রতুল হইল না। এই স্কুলটি তিনি তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্বর্গীয় গোপাল-কৃষ্ণ গোখলের নামে উৎসর্গ করিয়া ইহার নাম রাখিলেন গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল। এই স্কুলেই পরে কলেজও খোলা হয়। মিসেস্ রায়ের উদার হৃদয়ে প্রাদেশিকতার স্থান ছিল না। তাই তাঁহার স্কুল ও কলেজে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল প্রদেশের ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের সাদরে

গ্রহণ করা হইয়া থাকে। মেয়েদের স্কুলগুলি মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত, এই ধারণা লইয়া মিসেস্ রায় প্রথমে ব্রাহ্ম স্কুলে ও পরে গোখ্‌লে মেমোরিয়াল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র মহিলাদের দ্বারাই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা যে ভ্রান্ত ছিল না, তাহা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এখন মেয়েদের প্রায় সব স্কুল-কলেজে মেয়েরাই শিক্ষাদান করিয়া থাকেন এবং তাহার ফলাফলও আজ কাহারও অবিদিত নাই। এই প্রথা প্রচলিত করিয়া মিসেস্ রায় যে স্ত্রীজাতির কি উপকার সাধন করিয়াছেন সে বিষয়ে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি শিক্ষিতা মহিলাদের একটি কর্মক্ষেত্র খুলিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে সমাজের নিকট সম্মানিতা করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার চিন্তা সর্ববিষয়েই স্বাধীন ছিল। ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস্ বা ডিরেক্টর কর্তৃক অনুমোদিত পুস্তক তিনি সকল শ্রেণীর জন্য উপযোগী মনে করিতেন না। ঈশ্বরচন্দ্র, রজনীকান্ত, প্রভৃতি পুরাতন লেখকদিগের ভাব ও ভাষা তিনি বড় পছন্দ করিতেন এবং শিশু ও অল্পবয়স্ক বালিকাদের পক্ষে উক্ত লেখকদিগের পুস্তকই উপযোগী মনে করিয়া যথাসম্ভব ঐ সকল পুস্তকই নিজের স্কুলের জন্য নির্ব্বাচন করিতেন। ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধেও তাই। তিনি নিজের পছন্দমত পুস্তক নির্ব্বাচন ও পাঠ্য নির্দ্দেশ করিতেন। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার এই সকল কাজে বড় একটা হস্তক্ষেপ করিতেন না—মিসেস্ রায়ের উপর তাঁহাদের প্রগাঢ় আস্থা ছিল।

এইরূপে নানাভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহার দান যে কত বড়, তাহা বিচার করিবার সময় বোধ হয় আজও উপস্থিত হয় নাই। সবে মাত্র তাঁহার কর্ম্মময় জীবনের অবসান ঘটিয়াছে। এখনও তাঁহার অভাব আমরা যথাযথ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন বঙ্গবাসী স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এই মহীয়সী মহিলার মহান্ অবদানের কথা কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তঃকরণে স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম জানাইবে।

ধ্বনিধ্বংসে ধ্বনির জন্ম

শ্রীগিরিধারী রায় চৌধুরী

প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় ধ্বনির ধ্বংসে ধ্বনির জন্মের কথা এখানে কিছু বলব। বিষয়বস্তুটি কঠিন হলেও সহজবোধ্য করে বলবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করব।

সংস্কৃতে "প্রাচীন" আর "অর্ব্বাচীন" বলে দুটি শব্দ আছে। তাদের অর্থ যথাক্রমে, পুরানো ও নূতন। "প্রাক্" অর্থাৎ পূর্ব্ব, আবার তা থেকে "প্রাচী," অর্থাৎ পুবদিক। আর্য্যদের দৃষ্টিতে পুবদিক সবচেয়ে আগের বা প্রাথমিক সেই অর্থই "প্রাচীন" শব্দে চলে গিয়ে তাকে—আগের বা পুরানো—এই অর্থযুক্ত করল। আবার, নূতন কি পরবর্ত্তী—বোঝাতে এই প্রাচীন শব্দের পূর্ব্বে নঞর্থক অ যোগ করে "অপ্রাচীন" শব্দের সৃষ্টি হ'ল এবং প্রয়োগ হতে লাগল। প্রাকৃত-প্রভাবের যুগে 'প্রাচীন' ঠিক প্রাচীনই রয়ে গেল, যা খেল অপ্রাচীন। 'মেটাথিসিসে'র বশে শব্দটির মধ্যেকার র-ফলা রেফ্ হয়ে এল এগিয়ে, আর, "প"-টা মোটা হয়ে "ব" বনে গেল। ফলে রূপ বেরুল "অর্ব্বাচীন"। পঞ্চতন্ত্রের নীলবর্ণ শৃগালের মত এই শব্দটিরও বাহ্যিক ছদ্ম আবরণের মধ্যে তার আসল রূপটি লুকিয়ে আছে। আরও এই রকমের নীলবর্ণ শৃগাল-জাতীয় শব্দ ভারতীয় আর্য্য-ভাষাগুলিতে অনেক রয়ে গেছে। উদাহরণ-স্বরূপ, বৌদ্ধ-মত "হীনযান" আর "মহাযানে"র ইতিহাসটাই বলি। কথা দুটি আসলে ছিল "হীনজ্ঞান", "মহাজ্ঞান"—কিনা, সামান্য উপলব্ধি আর মহান্ উপলব্ধি। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য ভাষার "জ্ঞান" শব্দের উচ্চারণ ছিল "জ-ঞান"। "হীন" আর "মহা" ঠিকই রইল, কিন্তু বিপর্য্যয় ঘটল 'জ্ঞানের' বেলায় অর্থাৎ—"জ-ঞান"-এর ঞ-ধ্বনি গেল হারিয়ে, পড়ে রইল "জ্া-ন"। কিংবা এও বলা চলে যে "ঞ"-র প্রভাবে "জ", তার বর্গীয়ত্ব হারিয়ে "য" হয়ে পড়ল। অবশ্য "ঞ"-র অনুনাসিকত্বও ঘুচে গেল। ফলে বেরিয়ে এল "যান" শব্দ। প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যভাষায় গাড়ী অর্থে "যান" শব্দের প্রচলন আগে থেকেই ছিল। সুতরাং কোনও অসুবিধা হ'ল না। লোকে "হীনযান" ও "মহাযান" শব্দের অর্থ করে নিলে—ছোট গাড়ী আর বড় গাড়ী।

"বরাহমিহির" নামেও জনসাধারণের ভুল বোঝার বেশ একটু ছিটেফোঁটা রয়ে গেছে। পুরাকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অনেকের "মিশ্র" উপাধি থাকত, তদনুযায়ী নামটা আসলে ছিল "বরাহমিশ্র"। খুব সম্ভব তিনি সিংহলে ফলিত-জ্যোতিষ, কি সামুদ্রিক বিদ্যা শিখতে গিয়েছিলেন,—কেননা তখনকার দিনে সিংহলে ঐ সকল বিদ্যার খুবই চর্চ্চা হ'ত। ফলে, সিংহলী বা এলু ভাষায় ও সিংহলবাসীদের মুখে মুখে তাঁর "মিশ্র" উপাধি "মিহ্-র" হয়ে দাঁড়াল। তারপর তিনি যখন জ্যোতির্ব্বিদ্যা শিখে নিজের দেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে যৌগিক শব্দটির "মিহ্-র" অংশটা নেহাত নিরর্থক মালুম হওয়ায়, তারা সেটাকে "মিহির" করে নিলে। মিহির কথাটা আগে থেকেই এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। "মিত্র" বা "মিথ্-র" শব্দের ধ্বনি-ধ্বংসের ফলে শব্দটি উৎপন্ন হয়েছিল,যার অর্থ করা হ'ত সূর্য্য। বরাহ-পণ্ডিত জ্যোতির্ব্বিদ বলে লোকে সেই ছাপটা ওই উপাধির মধ্যে জড়িয়ে দিলে। ফলে তিনি সমাজে বরাহমিহির বলেই পরিচিত হতে লাগলেন। বরাহমিহিরের সময়ের বহু আগের যুগে বৈদিক সংস্কৃত-ভাষী আর্য্যেরা এতদ্দেশের আদিম অধিবাসীদের "ক্ষুদ্র" অর্থাৎ হীন বা ছোট লোক আখ্যা দিয়েছিল। "ক্ষুদ্র" শব্দের উচ্চারণ তখন ছিল "ক্সুদ্র।" পরে আর্য্য অনার্য্য-মিশ্র হিন্দু জাতির মুখে তাই "শূদ্র" হয়ে দাঁড়াল। তাতে ব্যাপারটা হ'ল এই—অজ্ঞাতসারে তারা নিজেরাই নিজেদের ছোটলোক আখ্যায় অভিহিত করতে লাগল। "অজস্র" শব্দের উৎপত্তিও ভারি মজার। প্রাকৃত যুগের মাঝামাঝি কোন সময়ে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসী আর্য্যভাষী দলবিশেষের মুখে মধ্য-ভারতীয় আর্য্যভাষার "সহস্র" শব্দটি—যার অর্থ হাজার, উষ্মত্ব হারিয়ে "হজ্স্-র" হয়ে দাঁড়ায়। তা থেকে কালক্রমে "অজস্র" রূপের অবতরণ ঘটল। আবার পারস্য থেকে "হজ্র্হর" থেকে উদ্ভূত 'হাজার' রূপ এসে জুটে ঐ একই সংখ্যাবাচক শব্দটিকে বেশ ভারিক্কি করে তুলল। ফলে আমাদের হ'ল বিপদ,—কাকে রাখি আর কাকে ফেলি।

পুস্তক-পরিচয়

প্রেমরাগ—শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

কাব্য-সম্পর্কে চিরকালীন ধারণার পরিবর্ত্তনের একটি বিশেষ প্রয়াস কিছু দিন হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে। সাহিত্যে তখনই নূতন যুগ আসে, বিশিষ্ট সৃষ্টি-প্রতিভা যখন স্বতঃই ভিন্ন পথ বাছিয়া লয়। পরিবর্ত্তনের জন্যই পরিবর্ত্তন প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ নয়। অত্যন্ত সজ্ঞান প্রয়াস সাহিত্যকে বিকৃত করে। 'প্রেমরাগে'র কবি নব যুগ আনিবার চেষ্টায় নিজের শক্তিকে বৃথা ব্যয়িত করেন নাই। যুগধর্ম্মের প্রভাব মানিয়া লইয়া তিনি কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীদেবেশচন্দ্র দাস পাঠকের নিকট সুপরিচিত। 'ইয়োরোপা' লিখিয়া তিনি সাহিত্য-খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। 'প্রেমরাগ' তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থখানি অনেকগুলি গীতি-কবিতার সমষ্টি। কবির অনুভূতি যখন পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, কাব্য তখনই সার্থক হইয়া উঠে। প্রেম মানুষের মনের একটি মৌলিক বৃত্তি। ইহা সকল দেশ এবং সকল কালের মানব-মনকে আলোড়িত করে। এই প্রেমের অনুভূতিকে দেবেশচন্দ্র নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 'কবিপরিচিতি'তে শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বলিতেছেন, "কবিতাগুলির অধিকাংশই ব্যক্তিগত বা আদর্শগত প্রণয়ধর্ম্মী, কিন্তু সচরাচর দৃষ্ট প্রেমের কবিতার সুলভ রূপ হইতে এগুলি স্বতন্ত্র ও ভিন্ন-গোত্রীয়। মাত্র দুঃখবিলাস নয়, সুষ্ঠু বলিষ্ঠতায় ইহাদের জন্ম।" 'বন্ধু' কবিতায় কবি বলিতেছেন,

"আমার জীবনে বিলায়ে জীবন তব
দিয়েছ আমারে তোমার অমৃত আনি।"

অন্যত্র বলিতেছেন,

"স্পর্শ-দাও, আলো দাও, সুখসুধাধারা—
তুমি বঁধু মম, তুমি মোর ধ্রুবতারা।"

'ভূমিকা'য় শ্রীকালিদাস রায় লিখিতেছেন,—"কবি আত্মহৃদয় বিগলিত প্রেমরাগকে নিজে তন্ময় হইয়া উপভোগ করিয়াছেন এবং সেই উপভোগের আনন্দকে এই কবিতাগুলিতে বাণীরূপ দিয়াছেন।"

'ভালবাসি' কবিতায় পাই,

"আপন অন্তর হতে মধুরে উচ্ছ্বাসি
পুষ্প-সম বাণী ফুটে।"

'স্বপ্নরাত্রি'তে পাই

"শুধু দুটি কথা,
বাণীতে ধরিবে রূপ রাত্রি-নীরবতা।"

কাব্য প্রাত্যহিক জীবনের আলোচনা নয়। ইহা মানস-জীবনকে প্রতিফলিত করে। প্রেম মনের ধর্ম্ম।

"জীবনে আলোক রেখা অন্ধকারে করেছিনু ধ্যান,
নয়নে অমৃতবর্ত্তি জ্বালি' তুমি দিয়েছ সন্ধান।"

'ব্যথা'য় আছে, "ছিল মরু মালঞ্চ করেছি হিয়া;"

"অশান্ত কালিমা হতে বহু ঊর্দ্ধলোকে" কবি বাঞ্ছিতার দেখা পাইয়াছেন।

"এ হৃদয়ে চিরকাল থেকো—
মিশেছে তোমার মাঝে শেষ কথা মোরে মনে রেখো।"

অন্তরের সাড়া পাই বলিয়া "প্রেমরাগ" সার্থক হইয়াছে। কবিতাগুলি পাঠকের-চিত্তকেও নন্দিত করিবে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কস্মৈ দেবায়—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি১৩, গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা। দাম তিন টাকা। দ্বিতীয় সংস্করণ।

উপন্যাসখানির পটভূমি—স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষ, ঘটনাস্থল—বাংলাদেশ, পাত্রপাত্রী—বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদী কয়েকটি চরিত্র। বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষে বিপ্লবী বাংলার তরুণ মনে যে বিক্ষোভ জাগিয়াছে—তাহার সঙ্গে সখ্য ভালবাসা আশা-অভিমান প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মিলিয়া এই কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে। দুটি নারী-চরিত্র এক কেন্দ্রে সংলগ্ন হইয়াও মিলিতে পারে নাই; আত্মকেন্দ্রিকতার প্রাচীরে বাধা পাইয়া ভিন্নমুখী হইয়াছে। এই কেন্দ্রাতিগ নারী-মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ লেখকের তুলিকায় সুন্দর হইয়াই ফুটিয়াছে। দীপালী ও চিত্রা চরিত্র দুটিকে আপাত-বিচ্ছিন্ন মনে হইলেও—পরস্পরের পরিপূরক। কোন কোন স্থলে বিতর্ক দীর্ঘ হওয়ায় গল্পের বাঁধুনি কিছু শিথিল হইয়াছে—কিন্তু প্রধান চরিত্রগুলি অস্পষ্ট হয় নাই।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

হে বিহঙ্গ মোর—শ্রীনরেন্দ্র দে। দি বুক হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য নয় সিকা।

১৯৪২ হইতে ১৯৪৫-এর মধ্যে বাংলার সমস্যা সবচেয়ে ঘনীভূত হইয়া ওঠে। যুদ্ধ, বিপ্লব, দমননীতি, দুর্ভিক্ষ—এই চারের সমন্বয়ে সমাজ-জীবন একেবারে ওলট-পালট হইয়া যায়। এই চরম দুর্বিপাকের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনাই জাতিকে মাথা সিধা করিয়া দাঁড়াইতে সচেষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু সে পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। সম্ভবও ছিল না। সমাজের নৈতিক জীবনে দুই দিক দিয়া ভাঙন ধরিয়েছিল, এক দিকে নিদারুণ বুভুক্ষা, এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়ন, অন্য দিকে চোরাবাজারের অমোঘ আকর্ষণ, রাতারাতি লক্ষপতি হইয়া উঠিবার লোভ এবং সুযোগ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উপন্যাসখানি রচিত। লেখক যে বেশ দরদ দিয়াই দেশের এই বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন তাঁহার লেখার মধ্যে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনার বর্ণনা তথা বিন্যাসের মধ্যে কুশলী শিল্পীর হাতের ছাপ আছে, যদিও জায়গায় জায়গায় একটু কাঁচা।

লেখক আদর্শবাদী তো বটেই, সেই সঙ্গে বেশ সবলভাবে আশাবাদীও, যদিও সেজন্য কম রিয়ালিষ্ট নহেন। তাঁহার কাছে বিপর্যয় খুবই সত্য, তবু মানুষের সর্ব্বজয়ী আত্মা তাহার অনেক ঊর্ধ্বে; তাহার আশা অনেক, গতি অকুণ্ঠ, শত পরাজয়ের মধ্যেও সে অন্তিম বিজয়ের স্বপ্ন দেখিয়া চলে। গল্পের নায়ক সুধানের মধ্যে এই সত্যটি বেশ ভালো ভাবে ফুটিয়াছে।

বাংলার চরম দুঃখের দিনের এই আলেখ্যটুকুর পাঠকসমাজে কদর হওয়া উচিত।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

মহাত্মা গান্ধী—রোমাঁ রোলাঁ। অনুবাদক ঋষি দাস। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। বঙ্গানুবাদ ১৯৪৭। দাম আড়াই টাকা। পৃ. ১৩৩।

১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের পরে রোলাঁ গান্ধীজীর সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এতদিনে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত [illegible]

বর্ত্তমান বইখানি লিখিবার সময়েও তিনি গান্ধীজীর নেতিমূলক কর্ম-প্রচেষ্টাকে যেমন ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, গঠনকর্মের ভিতর দিয়া গান্ধীজী যে নূতন জীবন রচনার প্রচেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি তত দূর আকৃষ্ট হয় নাই। তৎসত্ত্বেও রোলাঁর মত একজন মনীষী ও প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর দৃষ্টিতে গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের সকলের পক্ষে শিক্ষণীয়।

অনুবাদকের দায়িত্ব অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে বিষয়বস্তুই অত্যন্ত গূঢ় বা জটিল, সেখানে ব্যাখ্যা না করিয়া পুরাপুরি লেখকের ভাব জ্ঞাপন করা কঠিন। অথচ অনুবাদকের পক্ষে সেরূপ অধিকার গ্রহণ করা উচিত নয়। এইরূপ নানা বিঘ্ন সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত ঋষি দাসের অনুবাদ সার্থক হইয়াছে। ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পাঠকের মনে কোন পীড়া জন্মায় না।

গীতা-বোধ—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। অনুবাদক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীকুমারচন্দ্র জানা। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। গুজরাতী সংস্করণ ১৯৩০, বঙ্গানুবাদ ১৯৪৭। পৃ. ।৫/০—১১০। দাম বার আনা, বিশেষ সংস্করণ, এক টাকা।

গান্ধীজী লবণ-সত্যাগ্রহের পর যখন যরোড়া জেলে বন্দী ছিলেন তখন অল্পে অল্পে গীতার একটি সরল উপক্রমণিকা লেখেন। প্রতি অধ্যায়ের তাৎপর্য অত্যন্ত সরল গুজরাতী ভাষায় জনসাধারণের বোধের জন্যই লেখা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ডক্টর ঘোষ এবং কুমার বাবু উভয়ে সেই লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। ভাষা সরল হইয়াছে, এবং পড়িতে কোথাও বাধে না।

গান্ধীজীর ধর্ম্মমতের সম্যক্ পরিচয় যাঁহারা লাভ করিতে চান, অথবা গীতার শিক্ষাকে ভিত্তি করিয়া সরলভাবে নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে বইখানি পড়া বিশেষ দরকার।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

গান্ধীজী কি চান—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বসু। সাহিত্যিকা, ১২৩, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৮০। মূল্য ১৲ টাকা।

এই পুস্তকে প্রকাশিত ছয়টি প্রবন্ধ ধারাবাহিক রূপে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। মহাত্মাজীর কর্ম্মপন্থা ও আদর্শ সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক এমন কি অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও ভ্রান্ত ধারণা আছে। লেখক গান্ধীবাদের নানা দিক বিশ্লেষণ করিয়া এই ভ্রমাত্মক ধারণাগুলি দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। মহাত্মাজীর গঠনমূলক কার্য্যকেও অনেকে পুরাতনের প্রতি অস্বাভাবিক আগ্রহপ্রসূত বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহার কুটীর-শিল্প-উন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রগতিবিরোধী বলিয়া ভয় পান। অধ্যাপক বসু মহাশয় অতি সুষ্ঠু আলোচনাদ্বারা বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছেন যে, বর্ত্তমান হুজুগের সময় যাহা ভাল ও মানবকল্যাণকর বলিয়া চলিতেছে এবং আরও ব্যাপকভাবে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহার মধ্যে অনেক গলদ আছে। এই গলদ এড়াইয়া চলিতে পারিলেই তবে ভারতের প্রকৃত মঙ্গল হইবে, অন্যথা নহে।

দেশের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেই এই পুস্তকপাঠে উপকৃত হইবেন এবং প্রকৃত গান্ধী-দর্শনের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

বিজ্ঞানী ও বীজাণু—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা, ঢাকা। পৃ. ৭৪; মূল্য দশ আনা।

অনেকেরই ধারণা—যথেষ্ট অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুসজ্জিত পরীক্ষাগার ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে সাফল্য লাভ করা দুরূহ; কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই একথা সত্য নহে। আসল কথা হইতেছে—একান্ত অনুসন্ধিৎসাপ্রবৃত্তি এবং অদম্য অধ্যবসায়। ইহারই বলে জ্ঞানান্বেষী প্রবল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াও সত্যের সন্ধান পাইয়া থাকেন। বিজ্ঞানের বহুবিধ ক্ষেত্রেই এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। গোড়ায় যাঁহারা জীবাণু-জগতের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাহাদের রহস্যসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন তাঁহাদের সকলেরই কাহিনী গভীর কৌতূহলোদ্দীপক। "মাইক্রোব্ হাণ্টারস্" নামক বইখানিতে তাঁহাদের অভিনব আবিষ্কার সম্পর্কিত ঘটনাবলী বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার বাংলা ভাষায় তাঁহাদেরই কথা বেশ প্রাঞ্জলভাবে আলোচনা করিয়াছেন। লেখার ভঙ্গী সহজ ও সুন্দর। বইখানি পড়িয়া প্রত্যেকেই তৃপ্তি লাভ করিবেন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দেশ যাদের ডাকে—শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত। মুখার্জ্জী গুপ্ত এণ্ড কোং। ৪৫, ধর্ম্মতলা লেন, শিবপুর, হাওড়া। দাম ১।৵০।

ছেলেদের উপন্যাস। যদিও প্লটের মধ্যে বিশেষ কিছু নূতনত্ব নাই তথাপি সহজ ভঙ্গীতে বলিবার কৌশল লেখকের আয়ত্ত থাকায় উপন্যাসখানি ভাল লাগিল।

বিশ্বরূপা—সম্পাদক: শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ। শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১৷০।

সঙ্কলন-গ্রন্থ। খ্যাত এবং অখ্যাত বহু লেখকের লেখা গ্রন্থখানিতে স্থান লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক সুকুমার সেনের প্রবন্ধ দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থখানি শুধু প্রবন্ধসঙ্কলন হইলে সম্পাদনার বিরুদ্ধে বলিবার তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু গল্প এবং কবিতাও ইহাতে স্থান লাভ করিয়াছে অথচ সেদিকে সম্পাদক মহাশয় বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। অজস্র ছাপার ভুল বিরক্তিকর।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী—শ্রী গোপাল ভৌমিক। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, মূল্য এক টাকা।

ভারতবর্ষ আজ পূর্ণ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়াছে। আজকের দিনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার অবদানের কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ করা উচিত। মুক্তিপাগল বাঙ্গালী একদিন ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিবার জন্য গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজন করিয়াছিল। এই বিপ্লব-আন্দোলনে বাংলার যে সমস্ত তরুণকে আত্মাহুতি দিতে হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। মুক্তি-সংগ্রামে বাংলার প্রথম শহীদ হওয়ার গৌরব প্রফুল্ল চাকীরই প্রাপ্য—ক্ষুদিরাম ছিলেন বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতির মেদিনীপুর শাখার কর্ম্মী। লেখক সরকারী রিপোর্ট এবং ক্ষুদিরামের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী অপরূপা দেবীর রচনাদি হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গুপ্ত সমিতির কার্য্যক্রম ও স্বরূপ বিশ্লেষণে লেখক বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের মর্ম্মকথাটি অনুধাবন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ১৯৪৬ সনের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণী

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বারেও বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন কেন্দ্রে সেবা পূজা ধর্ম্মালোচনা সভা ও বৈঠকাদি নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে সর্ব্বসাধারণের জন্য কয়েকটি ধর্ম্মসভার এবং মঠ ও মিশনের অন্তেবাসিগণের মধ্যে ২৯৪টি ধর্ম্মালোচনা বৈঠকের অধিবেশন হইয়াছে। মিশনের বিভিন্ন বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইতেছে। ইহার পুস্তকাগারে মোট পুস্তকসংখ্যা ১৩৪১। মোট চব্বিশখানা মাসিক পত্রিকা ও দু'খানা দৈনিক সংবাদপত্র নিয়মিতভাবে পাঠাগারে গৃহীত হয়।

মিশন কর্ত্তৃক তিনটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে মোট ৬৫৬২৭ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে। তন্মধ্যে মিশনের হাসপাতালে সর্ব্বসমেত ২১১৫ জন রোগীকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এবার মোট ১০ জন ছাত্র বিবেকানন্দ হোমিও বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছে।

রামহরিপুর অবৈতনিক উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্য্য নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উহাকে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। মোট ছাত্র সংখ্যা ১২৩ জন।

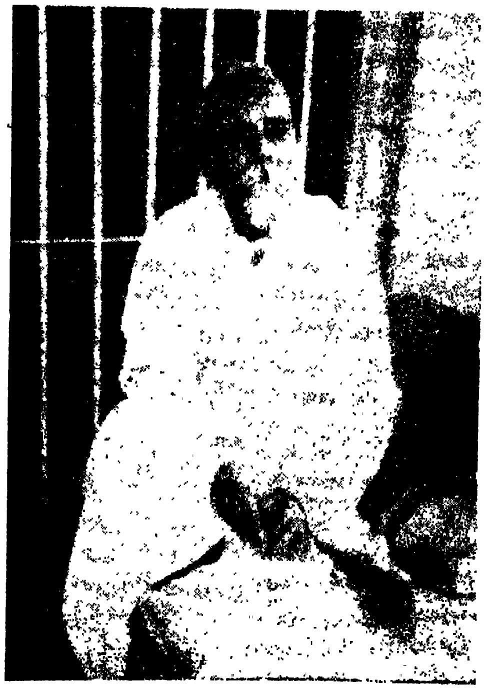
কাল পাথর, আন্দার থোল ও গঙ্গাজলঘাটী থানার ১২টি গ্রামের ৭২০টি পরিবারের ১৪০০ লোকের মধ্যে মোট ২৯১৯ সের চাউল, ৪৩৮খানা কাপড় ও ৫৫টি কোট বিতরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ব্যাপকভাবে আরো নানা জনহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

চাংড়ীপোতা গ্রামে প্রসূতি-সদনের ভিত্তি স্থাপন

গত ১৬ই নবেম্বর চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত চাংড়ীপোতা গ্রামে "রাজলক্ষ্মী প্রসূতি ও শিশুসদনে"র ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে মেজর জেনারেল এ. সি. চাটার্জির পৌরোহিত্যে এক সভা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক, 'ডাক্তার বসুর লেবরেটরী'র স্বত্বাধিকারী ডাক্তার শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার মাতার স্মৃতি রক্ষার্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠান নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। পশ্চিম বঙ্গের স্বাস্থ্য ও অর্থসচিব শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী এই নব-পরিকল্পিত জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া ডাঃ বসুকে তাঁহার জনহিতৈষণার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া গ্রামবাসীদেরও দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন। ঐ অনুষ্ঠানেরই অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে ডাঃ বসুকে তাঁহার ৭৪ বৎসর পূর্ণ হওয়ার জন্য অভিনন্দিত করা হয়। ইতিপূর্ব্বে পল্লী উন্নয়নের জন্য তিনি যে অর্দ্ধলক্ষাধিক মুদ্রা দান করিয়াছেন সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সে কথার উল্লেখ করেন। স্বাস্থ্যধর্ম্মসঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু সভায় উপস্থিত ছিলেন।



প্রসূতিসদনের ভিত্তিস্থাপন। দণ্ডায়মান দক্ষিণ দিক হইতে দ্বিতীয় ডাঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বসু



সুধীরচন্দ্র লাহিড়ী

('বিবিধ প্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য)



সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়ের সংবর্দ্ধনা। দ্বিতীয় সারিতে উপবিষ্ট বাম দিক হইতে পঞ্চম শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনা

সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সম্বর্দ্ধনার্থ খ্যাতনামা ব্যায়ামকুশলী প্রফেসর শ্রীবিজয় মল্লিকের উদ্যোগে বিগত ২৩শে নবেম্বর "মল্লিকস হেল্‌থ হোম" নামক ক্লাবে এক চায়ের আসরের আয়োজন হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রফেসর মল্লিকের শিষ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক বিবিধ ব্যায়াম কৌশল প্রদর্শিত হয়। এ সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ হইলে অশোকবাবু শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বাঙালী যুবকদের সর্ব্বাগ্রে শরীর সামলাইবার জন্য অবহিত হইতে অনুরোধ করেন। অশোকবাবু নিজে বিবিধ ব্যায়াম ও ক্রীড়াদিতে সুনিপুণ। বাঙালী যুবকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষা ও নানা ব্যায়াম-কৌশল প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি এক সময় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেহানুশীলন সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামূলক বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দের পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ, ডাঃ অমর মুখোপাধ্যায়, ডাঃ আদিত্য গুপ্ত, শ্রীশিশির কুমার কর, শ্রীসন্তোষকুমার দে, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রমুখ বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণ উক্ত আসরে যোগদান করিয়াছিলেন।

রাঁচিতে স্কাউট ক্যাম্প

দ্বিতীয় কলিকাতা বয়স্কাউট এসোসিয়েশনের উনবিংশতি দল শ্রীকানাই বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে বিগত অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে রাঁচিতে ক্যাম্পের অনুষ্ঠান করে। ব্যারিষ্টার শ্রীসীতানাথ পালের রাঁচিস্থ ভবনে স্কাউটদের শিবির সংস্থাপিত হয়। হুড্রু ও জোনা জলপ্রপাত এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনে ব্রতীবৃন্দ প্রভূত আনন্দ লাভ করে। সম্ভ্রান্ত নাগরিক শ্রীঅর্জ্জুন আগরওয়ালা ইহাদিগকে তাঁহার সুবিস্তৃত ভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া চা-পানে আপ্যায়িত করেন। বিহারের লাট-প্রাসাদেও অতিথিগণ সহ ব্রতীবৃন্দ নিমন্ত্রিত হন। অবিলম্বে পাটনা যাওয়ার প্রয়োজন সত্ত্বেও বিহারের গভর্ণর শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম সপরিবারে প্রায় ত্রিশ মিনিট কাল ইহাদের মধ্যে থাকিয়া স্কাউট, কাব ও রোভারদের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করেন। উনবিংশ গ্রুপের ব্রতীবৃন্দ ছাড়াও লাটপ্রাসাদের অতিথিগণের মধ্যে সেখানকার পুলিস কমিশনর, গবর্ণরের এ. ডি. সি., কবি শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কৌন্সিলর শ্রীসুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকালীকৃষ্ণ রায় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। গবর্ণরের একটি নাতিদীর্ঘ সুন্দর অভিভাষণের পর সেখানকার আধ ঘণ্টার চিত্তাকর্ষক কার্য্যসূচী সমাপ্ত হয়।

পরলোকে হরেন্দ্রনাথ বসু

গত ১লা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর) বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানের অন্যতম জনপ্রিয় উৎসাহী কর্ম্মী হরেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ১৯০২ সনে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী কর্ম্মে লিপ্ত হন। জীবনের শেষ আঠার বৎসর কাল তিনি বেঙ্গল কেমিক্যালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। হরেন্দ্রনাথ খেলাধুলায় বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। যৌবনে তিনি একজন ফুটবল খেলোয়াড় রূপে খ্যাতিলাভ করেন। সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অসামান্য প্রীতি ছিল। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও সৌজন্যগুণে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। কলিকাতার সন্নিকটস্থ সোদপুরে তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন। তিনি তথাকার বিভিন্ন ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা





ভাস্কর ও শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী কৃত মালাবার-কবি কুমার আসানের প্রস্তরমূর্তি

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

৪৭শ ভাগ ২য় খণ্ড | মাঘ, ১৩৫৪ | ৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মহাত্মাজীর অনশন ব্রতের সমাপ্তি

মহাত্মাজীর সর্ত্ত দিল্লীর অমুসলমান অধিবাসীগণ মানিয়া লওয়ায় তাঁহার অনশন ব্রতের সমাপ্তি হইয়াছে। এই ব্যাপারে সারা জগতে সাড়া পড়ে এবং চতুর্দ্দিক হইতে এই মহামানবের মঙ্গলের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা প্রকাশ হয়। অনশন ভঙ্গে সমস্ত ভারত এবং জগতের সুধীবর্গের এক বিশিষ্ট অংশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। মহাত্মাজী নিজের জীবন যে বিশেষ মঙ্গল কামনা সাধনের জন্য পণ করিয়াছিলেন তাহা সফল হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে দিল্লীর কল্যাণ হইবে ও বিশ্বমানবের চক্ষে গান্ধীজীর মহান্ আদর্শ আরও উচ্চে উঠিবে। কিন্তু এবারকার অনশন ব্রত সম্বন্ধে কেবলমাত্র মহাত্মাজীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিবেদন করিয়া ক্ষান্ত হইলে আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্যের দারুণ অবহেলা করা হইবে, সুতরাং সুবিধাবাদের সহজ পথ ছাড়িয়া উহার ফলাফল সম্বন্ধে কঠোর বাস্তববাদের ন্যায় অনুসারে বিচার করিতে হইবে। আজ আমরা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছি এবং দুইদিন পরে সম্পূর্ণ স্বাধীনতালাভ করিব আশা করিতেছি। সুতরাং ভারতরাষ্ট্রের শুভাশুভ এখন আমাদের নিজের হাতে, সব দোষ ইংরেজের স্কন্ধে চাপাইয়া নিস্তার পাওয়ার উপায় আর আমাদের নাই, সেই কারণে ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধার যাঁহারা তাঁহাদের কার্য্যাবলীর আলোচনা, যতই অপ্রিয় হউক, আমাদের করিতেই হইবে নহিলে এই নূতন রাষ্ট্রের সমূহ বিপদ ও অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। কেবলমাত্র ভাবের উচ্ছ্বাসে গদগদ হইয়া, চক্ষু মুদিয়া, সহজ পথে চলিয়া, আমাদের কতবার কি নিদারুণ দুর্দ্দশায় পড়িয়া দাসত্ববরণ করিতে হইয়াছে তাহার বিবরণে ইতিহাসের শত সহস্র পৃষ্ঠা ভরিয়া গিয়াছে। আবার সেই পথে চলিলে ফল একই হইবে।

মহাত্মাজীর অনশনের উদ্দেশ্য মহান্ ছিল এবং তিনি আমাদের সকলের কল্যাণকামনা করিয়াই এই ব্রত গ্রহণ করেন সে বিষয়ে কাহারও মনে কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু আমরা জানি অনেক ক্ষেত্রে কল্যাণ কামনা করিয়া যে কাজ করা হয় তাহার ফল নিরবচ্ছিন্ন কল্যাণপ্রদ হয় না। যেমন চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক ঔষধ আবিষ্কৃত হয় যাহা রোগ-বিশেষে অমোঘ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে কিন্তু যাহাতে রোগীর দেহে বিষম প্রতিক্রিয়া হওয়ায় অনেক সময় তাহার প্রাণ বিপন্ন হইয়া পড়ে। সে কথা মনে রাখিয়া আমাদের এখন বিচার করা প্রয়োজন যে এই আমরণ অনশন ব্রতরূপ ঔষধ প্রয়োগে সমগ্র রাষ্ট্রের দেহে ফলাফল কি ঘটিয়াছে। কংগ্রেসের আদর্শ যদি সত্য হয় তবে ভারতযুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের অংশ রূপে রাষ্ট্রের মঙ্গল-অমঙ্গল বিচারের অধিকার আমাদের সকলেরই সম্পূর্ণ আছে।

মহাত্মাজীর অনশন ব্রতে উপকার হইয়াছে দিল্লীর মুসলমান ও অমুসলমান অধিবাসীদিগের প্রত্যক্ষ ভাবে এবং পরোক্ষ ভাবে, দিল্লীর উদাহরণ দেখিয়া, সেই সকল অঞ্চলের লোকের যেখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন এখনও জ্বলিতেছে। ভারতযুক্তরাষ্ট্রের পনেরো আনা অংশে ঐ রোগ এখন নাই সুতরাং ঐ ঔষধের দরুন কোনও সুফল সেখানে হওয়া সম্ভব নহে। এক কথায় মহাত্মাজীর এই প্রচণ্ডগুণযুক্ত ঔষধ এবারে ব্যবহৃত হইয়াছে ভারতযুক্তরাষ্ট্রের অতি ক্ষুদ্র অংশের জন্য

কিন্তু ঔষধের বিষম প্রতিক্রিয়া হইয়াছে সমস্ত রাষ্ট্রের উপর, এ বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। এবং সেই প্রতিক্রিয়ার কারণ মহাত্মাজীর ঔষধ তাহাও নিঃসন্দেহ। কেননা এবার তিনি জনসাধারণকে পূর্ব্বাহ্ণে বলেন নাই যে তিনি কি কারণে এইরূপ ব্রত অবলম্বন করিতে যাইতেছেন, এবং কি সর্ত্তে তিনি অনশন ভঙ্গ করিবেন। উপরন্তু ব্রত গ্রহণের সময়ের উপযোগিতা বা ব্রতকালে আন্তর্জ্জাতিক সাময়িক পরিস্থিতির বিচার করা তিনি প্রয়োজন মনে করেন নাই।

অনশনের প্রথম প্রতিক্রিয়া আমরা দেখিলাম পণ্ডিত নেহরুর পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিবার সংকল্পে। আমরা পরে একথাও শুনিয়াছি যে, এই পঞ্চান্ন কোটি টাকা দেওয়া বা না দেওয়ার সহিত মহাত্মাজীর অনশনের কোনও সম্পর্ক ছিল না, উহা পণ্ডিত নেহরুর বিচারের ভুল। কিন্তু যেহেতু মহাত্মাজী অনশনের পূর্ব্বে সবিশেষ সর্ত্ত জ্ঞাপন করেন নাই—এবং পরেও স্পষ্ট কিছু বলেন নাই—সেইজন্য আজ পাকিস্তানির দল সারা জগৎকে বুঝাইতে সমর্থ হইয়াছে যে ঐ টাকা

তাহাদের প্রাপ্য ছিল এবং এতদিন ভারতযুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীসংসদ দুর্নীতির আশ্রয় করিয়া উহাদের বঞ্চিত করিতে চেষ্টিত ছিল। এইভাবে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দেওয়ায় আজ ভারতরাষ্ট্র প্রথমতঃ জগতের চক্ষে হীন প্রতিপন্ন হইল এবং দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও গোপন যুদ্ধের জন্য অর্থবল পাইল। অনশনের দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া হইয়াছে সম্মিলিত জাতি সংসদের (U. N. O.) পরিষদে। ঠিক যে সময়ে সেখানে ভারতযুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাশ্মীর সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করে, সেই সময়েই মহাত্মাজী অনশন ব্রত আরম্ভ করিয়া জগতের কাছে সমগ্র ভারতীয় অমুসলমানদিগের মুসলমানের প্রতি অবিচার, অনাচার ও অত্যাচারের কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করিয়া দিলেন। তিনি অনশনের পূর্ব্বে বলেন নাই যে তিনি কেবল দিল্লীর কথা ভাবিতেছেন, সুতরাং সম্মিলিত জাতি-সংসদে ভারতযুক্তরাষ্ট্রের সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিয়াছে। ইহা ভিন্ন সর্ব্বাপেক্ষা বিষম প্রতিক্রিয়া হইয়াছে ভারতযুক্তরাষ্ট্রের চালনার ব্যবস্থায়। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এবার বুঝিল যে মহাত্মাজী কার্য্যতঃ ভারতযুক্তরাষ্ট্রে একনায়কত্ব (dictatorship) স্থাপন করিয়াছেন।

নূতন মন্ত্রিসভা

নূতন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং তাঁহার মন্ত্রীসভার এগার জন সদস্য ২৩শে জানুয়ারী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন মন্ত্রীদের মধ্যে নিম্নলিখিত ভাবে দপ্তর বণ্টন করা হইয়াছে :

প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।
শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার—অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প।
রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—শিক্ষা।
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন—অসামরিক সরবরাহ।
শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা—কৃষি ও পশু চিকিৎসা।
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতি—সমবায়, দুর্গতত্রাণ ও পুনর্ব্বসতি।
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—পূর্ত্ত ও যোগাযোগ।
শ্রীমোহিনীমোহন বর্ম্মন—ভূমি ও ভূমিরাজস্ব।
শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদার—বিচার ও আইন।
শ্রীভূপতি মজুমদার—সেচ ও জলপথ।
শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়—শ্রমিক।
শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর—বন ও মৎস্য।

কার্য্যভার গ্রহণের পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে দেশের প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টাই তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য হইবে। তিনি বলেন, বর্ত্তমানে তিনটি সমস্যা তাঁহাদের সম্মুখে বিদ্যমান। প্রথমটি হইতেছে খাদ্য, বস্ত্র ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে আবশ্যক দ্রব্যাদির অভাব মিটানো। দ্বিতীয় সমস্যা হইতেছে গৃহ সঙ্কট, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে বহু লোক এই প্রদেশে চলিয়া আসিয়াছে তাহাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা। আসলে কলিকাতা এখনও পঞ্চাশের মন্বন্তরের এবং তাহার পরবর্ত্তী মহামারীর ধাক্কা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। তৃতীয়তঃ তিনি পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের মন হইতে শঙ্কা দূর করিয়া তাহাদের মনে আস্থা ফিরাইয়া আনিতে চাহেন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বহু লোক যে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে তিনি তাহা জানেন। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া তাহারা যে ক্লেশ ভোগ করিতেছে তাহাও তিনি অবগত আছেন। সীমান্ত রক্ষার নিমিত্ত এবং বাঙ্গালীর মনে আস্থা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে একটি বেসরকারী কিম্বা সরকারের উদ্যোগে গঠিত একটি প্রাদেশিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা যত শীঘ্র সম্ভব করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তিনি ইতিমধ্যেই ভারত সরকারের দেশরক্ষা বিভাগের সহিত আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন; শীঘ্রই তিনি এ বিষয়ে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অধিকতর সচেষ্ট হইবেন। খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে ডাঃ রায় বলেন যে কি ভাবে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা দূর করা যায় সে বিষয়ে তিনি এখনও কোন মতামত স্থির করেন নাই। গান্ধীজী কোনরূপ নিয়ন্ত্রণের ঘোর বিরোধী। সেই নীতি পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োগ করা যায় কি না তাহা তিনি বলিতে পারেন না। শ্রমিক সমস্যা সম্বন্ধে ডাঃ রায় বলেন যে সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে নির্দ্ধারিত পথেই তিনি চলিবেন।

মন্ত্রী সভায় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী হিসাবে যোগ দিবেন কিনা তাহা এখনও সঠিক বুঝা যাইতেছে না। কার্য্যভার গ্রহণের পূর্ব্বদিন এক সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ রায় বলিয়াছিলেন যে মন্ত্রী সভায় যোগদান সম্পর্কে ডাঃ ঘোষের মতামত চূড়ান্ত ভাবে জানা যায় নাই, তিনি দিল্লী হইতে ফিরিলে জানা যাইবে। এই কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে ডাঃ ঘোষ নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন—

"আমি ডাঃ রায়ের মন্ত্রী সভায় যোগ দিব কি না সে সম্পর্কে তিনি আমার নিকট হইতে কোন শেষ কথা পান নাই বলিয়া পশ্চিমবঙ্গের নূতন প্রধান মন্ত্রী যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। তিনি যে আমাকে মন্ত্রী সভায় লইতে চাহিয়াছিলেন সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু আমি তাঁহার মন্ত্রী সভায় যোগ দানে অক্ষম এবং ইহাই আমার শেষ কথা বলিয়া আমি সুস্পষ্টভাবে তাঁহাকে টেলিফোনে জানাইয়াছি। সুতরাং দিল্লী হইতে ফিরিয়া তাঁহাকে আর কোন পত্র দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।"

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের এই বিবৃতি দেখানো হইলে তখনও তিনি বলেন যে ডাঃ ঘোষ মন্ত্রী সভায় যোগদানে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন নাই। দিল্লী হইতে ফিরিয়া ডাঃ ঘোষ মন্ত্রী সভায় যোগ দিবেন বলিয়া ডাঃ রায় এখনও আশা রাখেন বলিয়া তিনি জানান।

ঘোষ-মন্ত্রীসভার অপমৃত্যু

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেস দলের অধিকাংশ সদস্য ডাঃ ঘোষের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করিয়া ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে একটি নূতন মন্ত্রীমণ্ডল গঠনের দাবী জানাইলে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সভায় উহা আলোচিত হয় এবং ডাঃ ঘোষ স্বেচ্ছায় প্রধানমন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া ডাঃ রায়কে ঐ দায়িত্ব গ্রহণে আহ্বান করেন।

ডাঃ ঘোষ দেশবাসীর বহুলাংশের যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেন তাঁহকে পাঁচ মাসের মধ্যে সরিতে হইল তাহার আলোচনা আবশ্যক। ঘটনাটিকে কেবলমাত্র অবিমিশ্র দলগত চক্রান্তের পরিণতি ভাবিলে ভুল করা হইবে।

ডাঃ ঘোষের পদত্যাগে অনেক লোক "একটি ভাল মানুষ বিদায় হইলেন" ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। যে ভাবে ঘোষ-মন্ত্রীসভার অপমৃত্যু ঘটিল তাহা অনেক দিক দিয়াই সমর্থন-যোগ্য নহে, তথাপি জনসাধারণের তরফ হইতে সভাসমিতি বা সংবাদপত্রের মারফৎ ঘোষ-মন্ত্রীসভা বজায় রাখিবার জন্য কোন দাবী উঠে নাই ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ডাঃ ঘোষের প্রথম ভুল, জনসাধারণ শাসনযন্ত্র গঠন সম্পর্কে তাঁহার নিকট যাহা আশা করিয়াছিল তাহার কোনটির জন্যই তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার গবর্মেণ্টের উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারীদের নামের তালিকা প্রণয়নের সংবাদে লোকে ইহাই আশা করিয়াছিল যে, যে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী ও পুলিস ইংরেজ এবং লীগ আমলে দেশবাসীকে লাঞ্ছনা করিয়াছে তাহাদের অপমৃত্যু ঘটিবে এবং যে সব কর্ম্মচারী ঐ দুই আমলে বিবেকবুদ্ধি বা স্বদেশপ্রীতি বিসর্জ্জন দেন নাই বলিয়া অবহেলিত হইয়া কাল কাটাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত করা হইবে। কিন্তু তালিকা প্রকাশের পর দেখা গেল ইংরেজ ও লীগ আমলের অখ্যাত-কুখ্যাত কর্ম্ম-চারীদের অনেকেরই পদোন্নতি হইয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই হইল যে, বহু কৃতী কর্ম্মচারী ক্ষুব্ধ হইল এবং স্বাধীনতা লাভের পরেও দক্ষতা ও সততা উপেক্ষিত হওয়ায় শাসনযন্ত্রে ফাটল ধরিল। ডাঃ ঘোষের শাসনকালে অল্প সময়ের মধ্যে শাসনযন্ত্রের দ্রুত অবনতির ইহাই মূল কারণ। আদর্শবাদী বলিয়া বাংলাদেশ যাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিল এই কার্য্যে তাঁহার উপর প্রথম সংশয় জন্মিল।

ডাঃ ঘোষের দ্বিতীয় ভুল, জনমতকে উপেক্ষা করিয়া কেবল-মাত্র ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যদের মধ্যে দলগত সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মন্ত্রীত্ব বজায় রাখার চেষ্টা। ছায়া মন্ত্রীসভাকে যখন তিনি পুনর্গঠন করেন তখন শ্রীযাদবেন্দ্র পাঁজাকে যে ভাবে বাদ দেন তাহা বহুলোকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ডাঃ ঘোষের বিরোধী দল হইতে বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়া যে দুই জন আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করেন সেই দুই জনকে ডাঃ ঘোষ মন্ত্রীসভায় স্থান দেন কিন্তু শ্রীযুক্ত পাঁজার ন্যায় নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র লোকের স্থান সেখানে হয় না। এখানেও ডাঃ ঘোষ তাঁহার আদর্শবাদ অম্লান রাখিতে পারিলেন না। পদত্যাগের পর শ্রীযুক্ত পাঁজা যে বিবৃতি দেন তাহাতে পাঁজা মহাশয়ের উপরেই লোকের শ্রদ্ধা বাড়ে। অভয়াশ্রমের শ্রীঅন্নদা চৌধুরীকে মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়ার জন্য ডাঃ ঘোষ জিদ ধরেন এবং অনেকে ইহাতে আপত্তি করেন। পরিষদ-সদস্যদের লইয়া দল পাকাইয়া ডাঃ ঘোষ তাহার জোরে বর্দ্ধমান বিভাগের প্রতিনিধিদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও চৌধুরী মহাশয়কে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করেন। দল ঠিক রাখিবার জন্য ডাঃ ঘোষকে যুগান্তর দলের সহিত আপোষ করিয়া তাঁহাদের এক জনকে মন্ত্রী এবং অপর এক জনকে চীফ হুইপ পদে নিযুক্ত করিতে হয়। এখানে ডাঃ ঘোষ জনসাধারণকে সঙ্গে রাখার চেয়ে দল পাকানোর উপর বেশী জোর দেন। কংগ্রেসের আদর্শ ইহাতে পুনর্ব্বার ক্ষুণ্ণ হয়।

ডাঃ ঘোষ বাংলায় চোরাকারবার বা অন্যায় লাভ গ্রহণ দমনের ব্যবস্থা বা সবল চেষ্টা করিতে পারেন নাই। দলগত চক্রান্তের চালের উপর নজর রাখিতে তাঁহার সময় গিয়াছে এবং চাটুকার ভিন্ন অন্য সকলের উপদেশ বা প্রস্তাব অবহেলা করায় যোগ্য পরামর্শদাতার অভাব তাঁহার ঘটে। ফলে তাঁহার কার্য্যক্ষমতার উপর লোকে আস্থা হারায়। বাংলাদেশ সকল প্রদেশের মধ্যে দুর্ম্মূল্যতা ও অভাব জনিত ক্লেশে অধিক জর্জ্জরিত। ডাঃ ঘোষের মন্ত্রীত্বের মধ্যে এই ক্লেশ উপশমের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।

ডাঃ ঘোষ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত লোকদের বসবাসের কোন ব্যবস্থা করেন নাই, কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহাকে সম্যক অবস্থা জানাইবার জন্য অনুরোধ করিলে তাহাও জানান নাই, শিক্ষা-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রথম বাধাস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলির সহিত বিরোধ বাধাইয়া তুলিয়াছেন, খাদ্য-সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারেন নাই, বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বাংলায় প্রত্যর্পণের দাবী কেন্দ্রীয় সরকারকে নিজে জানান নাই, পশ্চিমবঙ্গ পরিষদের জনৈক সদস্য এই মর্ম্মে পরিষদে একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিলে তাহা উত্থাপিত হইতে দেন নাই, এই সমুদয়ও তাঁহার বিরুদ্ধে বড় কম অভিযোগ নয়। অভয়াশ্রমের লোকদের অযথা বড় চাকুরি দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাতেও লোকে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সেক্রেটারীর ন্যায় গুরু দায়িত্ব পদে এমন একজনকে নিযুক্ত করা হইয়াছে যিনি মানবেন্দ্র রায়ের দলের অন্যতম নায়করূপে দীর্ঘকাল কংগ্রেস বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহার কি বিশেষ গুণ ডাক্তার ঘোষ দেখিয়াছিলেন আমরা জানি না।

মুসলীম লীগ ও মুসলীম লীগ গবর্মেণ্ট যখন কলিকাতা

অধিকারের অভিযান চালাইতেছিল তখন শহরের যে সকল সাহসী যুবক জীবন বিপন্ন করিয়া লীগ গবর্মেণ্টের এই আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিল, তাহাদের প্রতি ডাঃ ঘোষের আচরণ প্রশংসার যোগ্য নহে। এই যুবকেরা যে সাহস ও সংগ্রামকুশলতা দেখাইয়াছিল তাহাতে ইহাদিগকে পুলিস সার্জেণ্ট, সশস্ত্র পুলিস এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে গ্রহণ করিলে দেশের শক্তিবৃদ্ধি হইত, ইহাদের মধ্যে যে কেহ কেহ বিপথগামী হইয়াছে তাহারও সুযোগ মিলিত না। অনুরুদ্ধ হইয়াও ডাঃ ঘোষ ইহা করেন নাই, অধিকন্তু এই সব যুবকের উপর গোয়েন্দা পুলিস লেলাইয়া দিয়াছেন। নিরাপত্তা বিল সম্পর্কে যে কয়েকটি সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন তাহার প্রত্যেকটিতে তাঁহার এই মনোভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে যে এই যুবকদলকে বিধ্বস্ত করাই তাঁহার উক্ত ক্ষমতা গ্রহণের প্রধান অভিপ্রায়। পাকিস্থান কি করিবে তাহা জানা নাই। বাংলা এখন একটি সীমান্ত প্রদেশ, দেশরক্ষার একটি বড় আয়োজন এখানে থাকা দরকার এবং ইহার জন্য এখন হইতেই যুবকদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া একান্ত আবশ্যক ইহা লইয়া সংবাদপত্রে ও সভা-সমিতিতে বহু আন্দোলন গত কয়েকমাস যাবৎ হইতেছে কিন্তু ডাঃ ঘোষ নির্বিকার ছিলেন। সামরিক শিক্ষার আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের মারফতেও তিনি করিতে রাজী হন নাই। দেশরক্ষায় তাঁহার এই উদাসীনতা লোকে সন্তুষ্ট চিত্তে মানিয়া লইতে পারে নাই।

আদর্শরক্ষা এবং শাসনযন্ত্র পরিচালনে দক্ষতা—এই দুইটির একটিতেও ডাঃ ঘোষ উপযুক্ত দৃঢ়তা, দূরদর্শিতা বা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ

জাতীয় মহাসমিতির ভবিষ্যৎ লইয়া ইতিমধ্যেই নানা আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রের সব প্রদেশেই কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা শাসনকার্য্য চালাইতেছে। ১৯৪৬ সালে যে নির্বাচন-সংগ্রাম চলিয়াছিল, কংগ্রেস তাহাতে জয়লাভ করে। সেই অধিকারে আজ ভারত রাষ্ট্রের শাসনকার্য্যে তাঁহার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ। এইরূপ ক্ষমতার ব্যবহার জাতীয় স্বার্থের পক্ষে উপকারী কিনা তৎসম্বন্ধেই আলোচনা চলিতেছে। কারণ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ব্যবহারে একটা মোহের সৃষ্টি করে, যাহা কোথাও কল্যাণজনক হয় নাই। পশ্চিম বাংলায় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রীত্বের অবদানে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার বিরোধী কংগ্রেসী সভ্যগণ বীরভূম নির্বাচনের সময়ও তাঁহার উপর অকুণ্ঠ আস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক মাস যাইতে না যাইতে তাঁহারা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রীসভার উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিলেন। নির্বাচকমণ্ডলীকে মূর্খ ও অসহায় বোধে তাঁহারা এই পার্শ্বপরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে কিছুই জানাইলেন না। জনমতের প্রতি শ্রদ্ধার কোনও পরিচয় এই গুপ্তচক্রান্তে পাওয়া যায় নাই। মাদ্রাজেও এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহার জন্য শ্রীপ্রকাশমের মন্ত্রীসভার পতন হয়, এবং শ্রীঅমানজ্জুর রেড্ডি প্রধানমন্ত্রী পদে বৃত হন। মাদ্রাজের নির্বাচকমণ্ডলীকে এই পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। মাদ্রাজের একখানি পত্রিকায় দেখিলাম যে একজন বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছে—কংগ্রেসপন্থীরা আজ হয় মন্ত্রী হইয়াছে না হয় হইয়াছে রেশনের দোকানের মালিক। অন্ধ্র দেশের প্রবীণতম নেতা শ্রীকোণ্ডা ভেঙ্কটপ্পিয়া বলিয়াছেন যে ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সভ্যরা জনসাধারণের ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের প্রতিবেশী বিহার প্রদেশের মন্ত্রীবর্গের কীর্ত্তি-কথা অনবদ্য। সেখানে গুড়ের কনট্রাক্ট লইয়া একটা কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি হইয়াছে। মন্ত্রীদলের পোষ্যবর্গ বা বন্ধুবর্গের নামে গুড়ের ব্যবসায়ে প্রায় একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ডাঃ সৈয়দ মামুদ ও জনাব আবদুল কায়ুম আনসারীর নামও এই সম্পর্কে দেখা দিয়াছে। বাংলায় কংগ্রেস-সভ্য সংগ্রহের জুয়াচুরি ব্যাপার এতই নীচ যে তাহা চোরাকারবারীদের হারাইয়া দিয়াছে। সম্প্রতি আমাদের আপিসে তাহার একটি অদ্ভুত প্রমাণ ডাকে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কলিকাতার একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকাকে যে কাগজের মোড়কে জড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা একখানি কংগ্রেস সভ্য-সংগ্রহের রসিদ এবং তাহার উপর আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোষ্ট আপিসের ছাপ দেওয়া। এই রসিদে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকের নাম আছে। শুনিতে পাই, কংগ্রেস-সভ্য সংগ্রহের জন্য রসিদ বই পাওয়া কঠিন। কিন্তু সংবাদপত্র প্যাক করিবার জন্য তাহা সহজপ্রাপ্য বলিয়া মনে হয়। দুই দিন পরে মসলার দোকানেও তাহা দেখা দিবে। তখন জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত পরিচয় মিলিবে।

এই অবস্থায় অনেকেই মনে করেন যে কংগ্রেসের মধ্যেই একটা বিরোধী দল সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই দল ভবিষ্যতের ভয় দেখাইয়া সংযত রাখিবে তাঁহাদের, যাঁহাদের হাতে বর্ত্তমানে সমস্ত ক্ষমতা চলিয়া গিয়াছে। তাহা সহজ বলিয়া মনে করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখন নিতান্তই প্রয়োজন। কংগ্রেস আজ দলগত স্বার্থের প্রতীক, না জাতীয় জীবনের নিয়ামক তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। বর্ত্তমানে যাঁহারা কংগ্রেসে প্রধান হইয়া আছেন, তাঁহারা কোন একটি দলের প্রতিনিধি বলিয়া মনে হয় না। অন্ততঃ দুইটি দল আপনার শক্তি সংহত করিয়া নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে কংগ্রেসের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশের হাত হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া। আজ সেই তথাকথিত একপ্রাণতা রক্ষিত হইতেছে না। এই অবস্থায় কংগ্রেসের মধ্যে নানা দলের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির ভিতরে, মোড়লদিগের চক্রান্তের জোরে, তাহা গঠন সম্ভব না হয় তবে দল ভাঙিয়া বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদের নামে অন্য দল

গড়িতে হইবে। ইংরেজ শাসন যতদিন এদেশে ছিল, ততদিন কংগ্রেসের বিরোধিতা দেশদ্রোহের নামান্তর ছিল। আজ সে কলঙ্কের আশঙ্কা নাই। সুতরাং ভারত রাষ্ট্রে কংগ্রেসের অপ্রতিহত ক্ষমতার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে সে কথা উচ্চারণ করিলেই দেশদ্রোহী নামে পরিচিত হইতে হইবে না। বাংলা দেশ, মাদ্রাজ, বিহার ও অন্যান্য প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে কংগ্রেসের দলভুক্ত কুচক্রীদিগের বিরুদ্ধে একটা বিরোধী দল গঠিত হওয়া প্রয়োজন। এরূপ পরিণতি আপাতত সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু এই পরিণতি অবশ্যম্ভাবী।

পল্লীবাসীর সামরিক শিক্ষা

গত ২৪শে পৌষের "ভারত" (দৈনিক) পত্রিকায় "নাগপুরের চিঠি"তে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

> "মধ্য-প্রদেশের বিভিন্ন কলেজের অস্ত্রপরিচালনা শিক্ষকেরা হায়দরাবাদ-বেরার সীমান্তে সহস্রাধিক পল্লীবাসীকে রাইফেল চালান শিক্ষা দিতেছেন। হায়দরাবাদ-মধ্য প্রদেশ সীমান্তের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে পল্লীবাসীরা বিশেষ আতঙ্কিত হইয়া পড়ায় তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাদের অংশাংশকে পরে জাতীয় রক্ষিবাহিনীতে লওয়া হইবে। আত্মরক্ষার্থে পল্লীবাসীদের অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষাদানের কাজ চলিতে থাকিবে।"

মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রীমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ। হায়দরাবাদ রাষ্ট্রের "পাকিস্তানী" মনোভাবের জন্য তাঁহাকে সর্বদা সাবধানে থাকিতে হয়। উপরোক্ত সংবাদটি তার প্রমাণ। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী পশ্চিম বঙ্গে আজ পাঁচ মাস হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই রাষ্ট্রের পূর্ব্বাঞ্চলে "পাকিস্তানী" দাপটের অন্ত নাই। চর মরনদাজপুর ও চর রায়নগর তার সাক্ষ্য দিতেছে। কয়েক দিন পূর্ব্বে পশ্চিমবাংলার জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্তে পূর্ব্ববঙ্গের তেতুলিয়া থানার হাটে মাঠে "পাকিস্তানী" ন্যাশনাল গার্ডের জমায়েতের বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছিল। পশ্চিম বঙ্গের গবর্মেণ্ট কেবল অভয় দিতেছেন যে পুলিশ ঘাঁটির সংখ্যা পূর্ব্বাঞ্চলে বৃদ্ধি করা হইবে; তাহার মধ্যে অশ্বারোহী পুলিসও থাকিবে। আমরা কেবল দেখিতেছি যে এই সরকারী ব্যবস্থায় দেশের লোকের, সীমান্তবাসীর, কোন কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ নাই। পুলিস ও সৈন্যবাহিনী তাহাদের রক্ষা করিবে, এবং তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে ট্যাক্স দিয়া। ব্যক্তিগত ভাবে বা সমষ্টিগত ভাবে তাহাদের করণীয় কিছু নাই। পশ্চিম বঙ্গের গবর্মেণ্ট তাহাদের কোনরূপ কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ দিতে পারিতেছেন না, যেমন দিয়াছেন মধ্যপ্রদেশের গবর্মেণ্ট। এই পার্থক্যের কারণ কি? পশ্চিম বঙ্গের জনগণকে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। গবর্মেণ্টের নিকট হইতে তাহার জবাব আদায় করিয়া লইতে হইবে।

আজ যখন ইংরেজের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিবার সুযোগ নাই, এবং আমাদের নিজের গবর্মেণ্ট ইংরেজ-কৃত নানা অন্যায় ও অবিচারের শেষ করিতে দৃঢ়সংকল্প, তখন পশ্চিম বঙ্গের নাগরিক জীবনের একটা প্রধান অভাব আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিজ হইতেই অগ্রসর হইয়া দূর করা উচিত ছিল। ইংরেজের কল্যাণে বাঙালী কেরাণীগিরি করিয়াছে তার আপিসে আপিসে; জজ ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া তাহার শাসন দণ্ডের গতিও অব্যাহত রাখিয়াছে। কিন্তু বাঙালী কোনদিন সৈন্যবাহিনীতে ঢুকিতে পারে নাই। দেড় শত বৎসরের মধ্যে বাঙালীর মন হইতে সমস্ত সামরিক ঐতিহ্য মুছিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রের অনাদরে তাহা শুকাইয়া গিয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন "বিপ্লববাদ" বাংলা দেশে দেখা দেয়, তখন তার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া অনেক ব্রিটিশ গবেষক বলিয়াছিলেন যে বাঙালী যুবক বোমা-রিভলবারের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে অপমানের জ্বালায়। ভীরু, অসামরিক জাতি বলিয়া যে অপমানের ছাপ ইংরেজ শাসক তার জাতির কপালে দাগিয়া দিয়াছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে বাঙালী বিপ্লবী বোমা রিভলবার, গোপন হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া। এই নিদানের মধ্যে অনেক অত্যুক্তি আছে, কারণ সামরিক জাতিও গোপন হত্যার পথ অবলম্বন করিয়া পরদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই তর্কের মধ্যে সত্য যেখানেই থাকুক, এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে ইংরেজের আমলে বাঙালী সামরিক বিভাগে স্থান পায় নাই। আজ সেই ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে উল্টাইয়া দিতে হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু

"পাকিস্তানী" প্রতিবেশীদের ভাব ভঙ্গীতে অতিষ্ঠ হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু অনেকেই পিতৃ-পিতামহের স্মৃতিপূত বাসস্থান ত্যাগ করিয়া আসিতেছেন। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে নোয়াখালি-ত্রিপুরা জেলাদ্বয়ের স্থানে স্থানে যে তাণ্ডবের সূচনা হয়, তখন হইতে আজ পর্যন্ত কত হিন্দু চিরকালের জন্য পূর্ব্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহার কোন হিসাব নাই। কেহ বলিতেছেন ২০ লক্ষ; কেহ বলিতেছেন ১০ লক্ষ। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ। সুতরাং বলিতে হয় অতি অল্পসংখ্যক হিন্দু পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া আসিতে পারিয়াছেন। এই হিসাবের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গে আগত হিন্দুর সংখ্যাই ধরা হইয়াছে; যাঁহারা বিহার, আসাম, ত্রিপুরা রাজ্যে যাইতে পারিয়াছেন এই হিসাবে তাঁহাদের ধরা হয় নাই। এবং পশ্চিম বঙ্গ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইতেছে যে তাঁহারা এই বিষয়ে মনোযোগ দিতেছেন না বা অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতেছেন না। ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখে প্রেরিত একটি সংবাদে দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় পরিষদ এই বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ছলে পুনর্ব্বসতি সচিব

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী পশ্চিম বঙ্গ গবর্মেণ্টকে একেবারে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। যুক্তপ্রদেশের অ-কংগ্রেসী নেতা শ্রীহৃদয়নাথ কুঞ্জরু এই প্রশ্নোত্তরে বিশেষ আগ্রহ দেখান। এই উপলক্ষেই আমরা জানিতে পারি যে ১৫ই আগষ্টের পরে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে আগতের সংখ্যা ২ লক্ষ মাত্র, এবং অধিকাংশ আশ্রয়প্রার্থী নিজেদের পুনর্ব্বসতির ব্যবস্থা করিতে সক্ষম। সুতরাং সাহায্য ও পুনর্ব্বসতির কোন ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয় নাই। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে এই প্রশ্নোত্তরের কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম।

পণ্ডিত কুঞ্জরু—পূর্ব্ব-বাংলা হইতে আশ্রয়প্রার্থীদের চলিয়া আসার কারণ কি ?

শ্রীযুত নিয়োগী—উৎপীড়ন করা হইবে এই আতঙ্ক হইতেই আশ্রয়প্রার্থীরা চলিয়া আসিতেছে। কতকগুলি ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অর্থনৈতিক বয়কটের ফলেই আশ্রয়প্রার্থীরা চলিয়া আসিয়াছে।

পণ্ডিত কুঞ্জরু—দুই মাসের অধিককাল ধরিয়া আশ্রয়প্রার্থীরা চলিয়া আসিতেছে। ভারত সরকার এখনও বিষয়টি পাকিস্তান সরকারের সহিত আলোচনা করিবেন কি না, ইহা ভাবিয়া দেখিতেছেন, ইহার অর্থ কি ?

শ্রীযুত নিয়োগী—এই সমস্যার গুরুত্ব নিরূপণ করা সম্পর্কে আমরা বহুলাংশে পশ্চিম-বাংলা সরকারের উপর নির্ভর করি। পশ্চিম-বাংলা সরকারের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত আমরা যে 'রিপোর্ট' পাইয়াছি, তাহাতে কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয় নাই।

পণ্ডিত কুঞ্জরু—ভারত সরকার আশ্রয়প্রার্থীদের সঠিক সংখ্যা অবগত নহেন কেন ?

শ্রীযুত নিয়োগী—আমরা কয়েকদিন পূর্ব্বে এ সম্পর্কে খোঁজ করিয়াছিলাম এবং আমি ইহার ফলাফল জানাইয়াছি।

পণ্ডিত কুঞ্জরু—আপনি কি বলিতে চাহেন যে, ভারত সরকার খোঁজ না করিলে পশ্চিম-বাংলা সরকার পূর্ব্ব-বাংলা হইতে বহুসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থীর আগমনের সংবাদ জানাইতেন না ?

শ্রীযুত নিয়োগী—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, পশ্চিম-বাংলা সরকার ভারত সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু পশ্চিম-বাংলা সরকার এ সম্পর্কে ভারত সরকারকে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন কি না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নহি।

নিয়োগী মহাশয়ের উত্তরে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্যচ্যুতি হইয়াছে। যেমন কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট তেমনি পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট চোখ বুজিয়া চলিয়াছেন। বিপদের জন্য প্রস্তুত না হওয়ায় পঞ্জাবে ঘটিয়াছে বিপর্য্যয় ; সেইরূপে বিপদ ঘটিলে পর পশ্চিমবঙ্গ গবর্মেণ্ট তাড়াহুড়া করিয়া কিছু করিবেন।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেই কেবল পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু ভিড় করিয়া আসেন নাই। আসামেও অনেকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সংখ্যা কত আমরা জানি না। কিন্তু ইহা আমরা জানি যে ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক হিন্দু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়—গোয়ালপাড়া জেলায়, শিলং-গৌহাটি সহরে, আসামের চা বাগিচায়, ডিব্রুগড়ের তেলের খনিতে নানা বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছিলেন। আজ তাঁহারা "পাকিস্তানে"র কল্যাণে হইয়া পড়িয়াছেন "বিদেশী"। ভারতীয় ইউনিয়ন রাষ্ট্রে এখনও তাঁহারা আইনের চক্ষে "বিদেশী" বলিয়া গণ্য হন নাই। কিন্তু বাস্তব জগতে, বিশেষ করিয়া আসাম প্রদেশে তাঁহারা "বিদেশী"র মতনই ব্যবহার পাইতেছেন। আসামের গবর্ণর সার আকবর হায়দরী ত এই বলিয়াই শ্রীহট্টের হিন্দুকে গালি দিয়াছেন—যদিও গবর্ণর বাহাদুরের বাড়ী, বোধ হয়, বোম্বাই প্রদেশে এবং "দুই নেশন" তত্ত্ব মতে তিনি ত তদপেক্ষা "বিদেশী"। আমরা জানি যে আসাম প্রদেশের একটি শ্রেণী চায় যে বাংলাভাষাভাষী কেহই যেন আসামে স্থান পায় না। আসাম প্রদেশে বাঙালীর সংখ্যা প্রায় ২৬ লক্ষ এবং অসমীয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা ২৫ লক্ষের কম। খাসিয়া প্রভৃতি অন্য ভাষাভাষী লোকসংখ্যা ইহাদের মধ্যে ধরিলে অসমীয়া ভাষা আসাম প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে না। এই বিষয়েই বিরোধ বাধিয়াছে আসামে। একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর ভাষা ৪৫ লক্ষ লোকের উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে। এইজন্যই কথা উঠিয়াছে বর্ত্তমান আসামের বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চল লইয়া ভারতীয় ইউনিয়নের অধীনে নূতন একটা প্রদেশ সৃষ্টি করা হউক।

ত্রিপুরা রাজ্য অবরোধ

"পাকিস্তানীদের" কার্য্য-কলাপ আজ কাহারও অবিদিত নাই। কাশ্মীর লইয়া ভাবনার অন্ত নাই। ভারত ইউনিয়নের পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যে কি ঘটিতেছে তাহার সঠিক কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। নিম্নলিখিত সংবাদটি ত্রিপুরা রাজ্যের বিপদের উপর কিছু আলোকপাত করিতেছে,—

"ত্রিপুরা রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল ডিবিসন কৈলাসহর টাউন শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত সমসেরনগর রেল ষ্টেশন হইতে ৯ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ-শ্রীহট্টের মৌলবীবাজার সবডিবিসনের সাপ্লাই ও পুলিস অফিসারগণ সম্প্রতি কৈলাসহর-সমসেরনগর লোকাল বোর্ড রাস্তায় ৩টি ঘাঁটি বসাইয়াছেন। ঐ রাস্তা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত এবং উহাই কৈলাসহর হইতে রেল ষ্টেশনে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা। শত শত পথচারী প্রত্যহ ঐ রাস্তায় চলাফেরা করে। এক্ষণে

প্রত্যেক পথচারীকে সাপ্লাই ও পুলিস ঘাঁটিতে তল্লাসী করে এবং পথিকগণ বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হয়। ব্যবসায়ীগণ রেল বা নৌকাযোগে যে সব মালপত্র ত্রিপুরা রাজ্যে আমদানী করে তাহাও আটক করা হয় এবং সময় সময় কিছু কিছু ঘুষের বিনিময়ে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীগণ এই সম্পর্কে মৌলবীবাজারের এস-ডি-ও ও শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনারের নিকট দরখাস্ত করিয়াও কোন সুফল পায় নাই। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, যে সব জিনিস আটক করা হয় তাহা সবই ভারত ডোমিনিয়ন হইতে আসে। এ বিষয় ত্রিপুরা রাজ্যের কর্তৃপক্ষকেও জানান হইয়াছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে অর্থনৈতিক সঙ্কট ঘটাইবার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র করা হইতেছে।"

এই ব্যাপার হইল ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তর অঞ্চলের সম্বন্ধে। রাজ্যের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের অবস্থাও এইরূপ বিপৎসঙ্কুল। হানাদারগণ আক্রমণ করে নাই বা আক্রমণ করিতে সাহস পাইতেছে না। কিন্তু বিপদ যখন ঘনাইয়া আসিবে তখন দিল্লী ও শিলং হইতে সাহায্য আসিবে, তাহা জানিয়াও নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। মহারাণী ও তাঁহার পরামর্শদাতাগণ যদি পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর অংশবিশেষকে এই রাজ্যে বসতি স্থাপন করিতে আহ্বান করেন, তবে পাকিস্তানী আক্রমণের বিরুদ্ধে একটা বিরাট প্রতিরোধ-ব্যবস্থার আয়োজন করিয়া তুলিতে পারিবেন। এই বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গ ও শ্রীহট্টের হিন্দু সম্প্রদায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

পুনর্ব্বসতির বিরাট আয়োজন

কয়েকদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, "পাকিস্তানী" হিংস্রতায় পীড়িত হইয়া যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ পশ্চিম পঞ্জাব হইতে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছে, এবং তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ভারত গবর্মেণ্টের দৈনিক ব্যয় হইতেছে ত্রিশ লক্ষ টাকা। তখন এই বিতাড়িতদের সংখ্যা জানা যায় নাই। এখন এই সংখ্যার একটা হিসাব পাওয়া গিয়াছে। ৪৫ লক্ষ হিন্দু শিখ আপনাদের পিতৃপুরুষের ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় সাড়ে বার লক্ষ লোক এখনও নানা প্রদেশের আশ্রয়শিবিরে বাস করিতেছে; এখনও সাত লক্ষ লোক পূর্ব্ব-পঞ্জাবের নানাস্থানে তাঁবুর নীচে বাস করিতেছে। ইহাদের বাসের জন্য পূর্ব্ব-পঞ্জাবের প্রায় পঁচিশটি সহরের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে দুই লক্ষ লোকের বাসোপযোগী বাড়ী-ঘর তৈয়ার হইবে। ১লা মাঘের সংবাদে প্রকাশ যে এইজন্য ব্যয় হইবে দুই কোটি টাকা। এই অর্দ্ধ-কোটি লোকের জীবিকা-উপার্জ্জনের সব ব্যবস্থা করিয়া দিবার দায়িত্ব পড়িয়াছে ভারত গবর্মেণ্টের উপরে। গ্রামে বা সহরে যাঁহারা বসতি করিতে চাহেন, সকলকেই সরকার কর্ত্তৃক ঋণ দেওয়া হইবে। পূর্ব্ব-পঞ্জাবের অনেক স্থান হইতে প্রায় সম-সংখ্যক মুসলমান তাড়িত হইয়াছে "পাকিস্তানে"। ইহাদের পরিত্যক্ত জমি বিলি করিয়া দেওয়া হইয়াছে হিন্দু ও শিখ চাষীর মধ্যে। আগামী ফসল কাটার সময় পর্য্যন্ত ইহাদিগকে খাদ্য-সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহ করা হইবে; ইহাদের পশুর খাদ্যও সরকার হইতে দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শিল্পী, ব্যবসায়ী, দোকানদার, চিকিৎসক, আইন-ব্যবসায়ী সকলকেই ঋণ দেওয়া হইবে; চারি বৎসরে তাহা শোধ করিতে হইবে। ঋণের পরিমাণ জনপ্রতি ৫০০৲ টাকার কম হইবে না।

ভারতবর্ষে আগত এই ৪৫ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৩২ লক্ষ গ্রামাঞ্চলের লোক বলিয়া হিসাবে ধরা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ মুসলমান-পরিত্যক্ত পূর্ব্ব-পঞ্জাবে ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার বিঘা জমিতে চাষ-বাস আরম্ভ করিয়াছে। কৃষি-ঋণের জন্য মঞ্জুর করা হইয়াছে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা; ইহার মধ্যে শস্যবীজের জন্য ৩২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা; চাষের বলদের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা; পশু-খাদ্যের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা, এবং গৃহ নির্ম্মাণ বা সংস্কার ও কূপ খনন বা সংস্কারের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। গ্রাম্য শিল্পীদের ও জমিবিহীন মজুরশ্রেণীর গ্রামে বাসস্থান দিয়া রাখিবার জন্য একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। ৫০টি বয়ন-কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার অঙ্গ।

পশ্চিম পঞ্জাবের ৫০ হাজার ও বাহাওয়ালপুর রাজ্য ও সিন্ধু হইতে আগত ৩০ হাজার চাষী পরিবারের পূর্ব্ব-পঞ্জাবের দেশীয় রাজ্যসমূহে বসবাসের ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। পাতিয়ালা রাজ্যে ৬,৩০,০০০ বিঘা জমিতে ১ লক্ষ ২০ হাজার লোকের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে; আরও এই পরিমাণ জমিতে ১২ হাজার পরিবারের ব্যবস্থা হইবে। ঝিন্দে ১ হাজার ১ শত ৬৯টি পরিবারের স্থান হইয়াছে; নাভা রাজ্যে স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছে ১২ হাজার পরিবার। কপূর্থলায় বসতি স্থাপন করিয়াছে ১০ হাজার পরিবার; আরও ৩ হাজার চাষী-পরিবারের ব্যবস্থা হইয়া আছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে ও প্রদেশে এইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে। আলোয়ার রাজ্য ৫০ হাজার লোকের ভার লইতে প্রস্তুত; ভরতপুর—১৫ হাজার, রেওয়া—১০ হাজার; মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—১০ হাজার; উৎকল—২৫০০ শত; বিহার—৩ হাজার। এই ব্যবস্থার পরেও সহরবাসী হিন্দু শিখের ৫ লক্ষ লোক শীঘ্র গৃহ পাইবে না।

এই বিরাট আয়োজনের বিবরণ সংক্ষেপে দিলাম অন্য একটা কারণে: যে হিংসার উন্মত্ততা পঞ্জাব ও দিল্লী প্রদেশকে যেভাবে বিধ্বস্ত করিয়াছে তাহার প্রকৃতি আমাদের বুঝিতে হইবে, এবং পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ভারতবর্ষের মুসলমান

লক্ষ্ণৌ নগরীতে ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি বিরাট সম্মেলন হইয়া গেল। প্রায় ৬০,০০০ লোক নাকি এই

সভায় উপস্থিত ছিলেন। মুসলীম লীগের কল্যাণে ভারতবর্ষের মুসলমান যে ভাবে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে, তার গোলকধাঁধা হইতে বাহির হইবার একটা পথ খুঁজিয়া লইবার জন্য এই সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলিয়াছেন যে ৩রা জুনের পর ভারতবর্ষের নানা স্থানের মুসলীম লীগ এবং অ-লীগ ও অ-দলীয় মুসলমান নায়কগণ এইরূপ একটা সম্মেলন আহ্বান করিবার জন্য নানা ভাবে তাঁহাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন; এবং এই সম্মেলন আহ্বান করিবার কি প্রয়োজন ছিল, তাহা তিনি তাঁহার বক্তৃতায় স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

"একথা সত্য যে, ভারতীয় মুসলমানেরা আমাদের সমাজের কতিপয় নেতার ভ্রান্ত নীতির পশ্চাদনুসরণ করার দরুন আজ আমাদিগকে এই প্রকার ভয়াবহ ধ্বংসলীলার সম্মুখে পড়িয়া দিশাহারা হইতে হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য আমি কাহাকেও তিরস্কার করিব না এবং আপনাদিগকে উহা বর্জন করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। আমরা কাহাকে তিরস্কার করিব? যাহাদিগকে তিরস্কার করিব তাঁহারা যে আমাদের ভ্রাতা। সুতরাং এক ভ্রাতার ভুলের দরুণ যদি অপর ভ্রাতৃমণ্ডলীকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়, তবুও ভাই হইয়া ভাইকে তিরস্কার করা সঙ্গত হইতে পারে না। এইজন্য আমি বলিতে চাহিতেছি যে, কাহারও অথবা কোন দলের সমালোচনা শুনাইবার জন্য আমি আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হই নাই। কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে বিপদের এই ঘনান্ধকারের মধ্য হইতে মুক্তির পথ পাওয়া যাইতে পারে তাহাই আলোচনা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।"

মৌলানা আজাদের বক্তৃতার যে চুম্বক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজকে যে "ভয়াবহ ধ্বংসলীলার" সম্মুখীন হইয়া "দিশাহারা" হইতে হইয়াছে বলিয়া শোনা যায়, তাহার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন নির্দেশ পাই না। পাইলে সুবিধা হইত। আমরা বুঝিতে পারিতাম ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রধানগণ এই ধ্বংসলীলার কারণ সম্বন্ধে কি মনোভাব পোষণ করেন এবং বিপদের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার উপায় সম্বন্ধে তাঁরা কি ভাবে চিন্তা করিতেছেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে যে ধ্বংসের আগুন দেশে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, মিঃ হুসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্ব তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়া দিয়াছিল। এর প্রায় দশ বৎসর পূর্ব হইতে মুসলীম লীগের নেতৃবর্গ প্রকাশ্যে প্রচার করিয়াছে যে হিন্দু কেবল "কাফের" নয়, সে ভারতীয় মুসলমানের বিশেষ শত্রু। জাতীয়তাবাদী মুসলমান এইরূপ প্রচারের বিষ-ক্রিয়া রোধ করিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই, সেই সম্বন্ধে তাঁহাদের সুস্পষ্ট অভিমত আমরা জানি না। তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মনোভাবের মধ্যে এই হিন্দু-বিদ্বেষ এত সহজে কুটিয়া দাবানলের সৃষ্টি করে কেন তৎসম্বন্ধে কোন আলোচনা তাঁহাদের মধ্যে দেখি নাই। আর এই মনোবিকারের মূল খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ দেশে আগুন লাগাইয়াছে, সেই উন্মাদনার কোন চিকিৎসা হইতে পারিবে না। জোড়াতালি করিয়া এই বিরোধের মীমাংসা হয় না, সহৃদয়তার কথা শুনাইয়া এই রোগের মূল চিকিৎসা হয় না।

ভারতীয় মুসলমানের মনে এক নূতন আগাছা জন্মিয়াছে; সেই গাছে যে ফল দেখা দিয়াছে তাহা বিষাক্ত। তাহা খাইয়া কেবল হিন্দু মরে নাই, মুসলমান মরিয়াছে এবং আরও মরিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে বলিয়াই ভারতীয় মুসলিম লীগ নেতাগণ অনেক ধর্মকথা আমাদের শুনাইতেছে। কিন্তু যে চারা গাছ তাহারা রোপণ করিয়াছে সেটি উপড়াইয়া ফেলিয়া নূতন গাছ রোপণ করিবার চেষ্টা ত দেখি না। মুসলমানের মনের জমিতে নূতন ফসল ফলাইতে হইলে, আগাছা সব উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে, পরগাছা অনেক পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে। এই আগাছা পরগাছার মধ্যে অনেক কিছু আছে যা ধর্মসংস্কারের সঙ্গে জড়ানো, যা অহমিকার জলে বর্দ্ধিত। হিন্দু সমাজের মধ্যেও তাহা আছে। আজ এক শত বৎসর পূর্ব হইতে "সমাজ-সংস্কার" প্রচেষ্টার নানারূপের মধ্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান সমাজের মধ্যে তার কোন ব্যাপক চেষ্টা আমরা দেখি নাই। আলিগড়ের সৈয়দ আহম্মদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ মুসলমান সমাজ তার যুক্তি ও নীতি গ্রহণ করিতে পারে নাই। সেইজন্য ভারতীয় মুসলমান নিজের সংস্কারের, সু-ও-কু-সংস্কারের, যুগোপযোগী কোন পরিবর্তন করিতে স্বীকার করে নাই। তার ফল আমরা দেখিয়াছি কলিকাতায়, নোয়াখালি-ত্রিপুরায়, বিহার-যুক্তপ্রদেশে, পঞ্জাব, দিল্লী, কাশ্মীর, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। এই ফল যার জমিতে ফলিয়াছে, সেই মালিককেই তার ধ্বংস করিতে হইবে। সেই সাহস ভারতীয় মুসলমান-সমাজের আছে কিনা তাহার পরীক্ষা আজ তাঁদের দিতে হইবে।

বাংলা বনাম উর্দ্দু

বাংলা বনাম উর্দ্দুর তর্ক রক্তারক্তিতে পরিণত হইয়াছে ঢাকা শহরে। জনাব ফরিদ আহাম্মদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক। তিনি বাংলার—নিজের মাতৃভাষার—পক্ষ লইয়া উৎসাহী ছিলেন বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের অ-বাঙালী কর্ণধারবৃন্দের নিকট তিরস্কৃত হওয়ায় অপমানে পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগের আর একটা কারণ তিনি দিয়াছেন। সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ-প্রার্থীদের নানা ভাষায় পরীক্ষা দিতে হয়। পূর্ব্ববঙ্গের পাবলিক সার্বিস কমিশন এই পরীক্ষার জন্য আটটি ভাষার নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। বাংলা ভাষার নাম এই নির্দ্দেশনামার মধ্যে

নাই। এই সম্বন্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলীম লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রাম খাঁ ঢাকায় গিয়া বলিয়াছিলেন যদি পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হইয়া অন্য কোন ভাষা হয়, তবে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন। পূর্ব্ববঙ্গের অ-বাঙালী প্রধানগণ মৌলানার এই উক্তির উত্তর দিয়াছেন। তার প্রতি-উত্তর কোন্ মূর্ত্তিতে দেখা দিবে, তার অপেক্ষায় রহিলাম। ইতিমধ্যে দেখিতেছি যে পাকিস্তানী সংবাদপত্রে বাংলা বনাম উর্দ্দু, এই দুই ভাষার মামলা লইয়া খুব বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। ১১শে পৌষের "ইত্তেহাদ" দৈনিক পত্রিকায় জনাব মোহাম্মদ ওয়াজিদ আলীর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিশ্লেষণের মধ্যে বাঙালী মুসলীমদের এই বিষয়ে ভাবিবার অনেক কথা আছে। সেইজন্য তাহা এইখানে তুলিয়া দিলাম।

"মুসলীম সাহিত্যিকদের অনেকেরই ধারণা বোধ হয় এরূপ যে, পাকিস্তান-যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হবে করাচী কিংবা লাহোর এবং আমাদের বাংলা দেশটি এই যুক্তরাষ্ট্রের অধীন একটি প্রদেশমাত্রে পর্য্যবসিত হয়ে থাকবে। সুতরাং বৃহত্তর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দ্দু, এবং বাংলা মাত্র একটি তুচ্ছ প্রাদেশিক ভাষা হয়ে থাকবে। মানে, আমাদের সাহিত্যিকরা ধরে নিয়েছেন যে, উর্দ্দু হবে রাজা, আর বাংলা হবে তার প্রজা বা গোলাম বা বাঁদী। ঐতিহাসিক গরজ-বেগরজ সব রকমেরই বোঝা বইতে গোলাম বাধ্য, সুতরাং দাস-বাংলাকে রাজা উর্দ্দু ভার বওয়ার জন্যে এখন থেকেই তৈরি করা দরকার। মুসলীম সাহিত্যিকদের মনে এই দাস-মনোবৃত্তি পূর্ব্বাহ্নেই সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই তাঁরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ও পরিহার্য্য আরবী-ফার্সী-উর্দ্দু শব্দ দেদার বাংলা ভাষায় চালিয়ে দিয়ে তার ললাটে গোলামীর চিহ্ন অনপনেয় করতে চাচ্ছেন।"

"পাকিস্থানি" মনোভাব

১৯৪৬ সনের এপ্রিল মাসে দিল্লী নগরীতে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভার মুসলীম সভ্যগণের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সেই সময় সবে মাত্র মন্ত্রী-মিশন দিল্লী আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সেই সভায় বক্তৃতা উপলক্ষে বাংলা দেশের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী জনাব হুসেন শহিদ সোহরওয়ার্দি বলিয়াছিলেন যে "পাকিস্তান আমাদের শেষ দাবী নয়।" এই কথার অর্থ বুঝিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় নাই; আজিও পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। প্রায় বাইশ মাস পরে কলিকাতায় প্রকাশিত "পাকিস্তানী" পত্রিকা "আজাদ" আবার আমাদের এই কথা মনে করাইয়া দিয়াছেন। মুসলীম লীগের লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪০) মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে "পাকিস্তান" প্রতিষ্ঠার কথাই বলা হইয়াছিল। ১৩ই অগ্রহায়ণের সংখ্যায় "আজাদ" সেই দাবীর নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন এই ভাবে—

"...ভারতবর্ষের মুসলমান নিজেকে হিন্দুদের হইতে পৃথক সত্তা হিসাবে উপলব্ধি করিয়াছে বটে, কিন্তু যেহেতু সে অনুসারে দেশ ভাগ করিতে গেলে তাহাকে দেশের এক-চতুর্থাংশ দাবী করিতে হয় এবং বিভক্ত দেশের উভয় অংশ হইতে লোকবিনিময় প্রভৃতির দরুণ কোটি কোটি জীবনের মূলচ্ছেদ ও বিপর্য্যয় ঘটাইতে হয়, সেহেতু মোছলেম লীগ কার্য্যকালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের অনুসারে দেশ বিভাগ দাবী করিতে ক্ষান্ত রহিয়াছে। সে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ বিভাগেই সম্মত হইয়াছে, এমন কি সেজন্য পাঞ্জাব ও বঙ্গ বিভাগও মানিয়া লইয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুযায়ী দেশ বিভাগে উভয় রাষ্ট্রেই উভয় সম্প্রদায়ের লোক রহিয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে সরাইবার কোনো রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা হয় নাই। পরে সাম্প্রদায়িক অশান্তির দরুণ কিছু লোকের সাময়িক অপসারণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাও স্থায়ী ভাবে নহে। অতএব দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুযায়ী দেশবিভাগ হইয়াছে, এ কথা বলা সম্পূর্ণ বৃথা ও অন্যায়। তবুও যাহারা দ্বি-জাতিতত্ত্বের কথা তুলেন, এমন কি সে অজুহাতে হিন্দুস্থান হইতে মুছলমানদিগকে বিতাড়নের কথা পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁহাদের কথা মতো যদি কাজ করিতে হয়, তবে বর্ত্তমান দেশবিভাগই চরম হইয়া থাকিবে না। পাকিস্তান এলাকাকে তবে বর্ত্তমান পরিধিতেই আবদ্ধ রাখা চলিবে না, দশ কোটি মুছলমানের স্থান দিবার মতো উহার প্রসার করিতে হইবে।"

এই নূতন ব্যাখ্যার জন্য ধন্যবাদ।

নিজের নাক কাটিয়া অপরের যাত্রাভঙ্গ

সম্প্রতি আসামের বড়দলৈ মন্ত্রীসভার দুইখানি নির্দ্দেশ আসাম সরকারের নানা বিভাগে প্রচারিত হইয়াছে। বিগত ১লা ডিসেম্বর মন্ত্রীসভা স্থির করিয়াছেন, যেন শ্রীহট্টবাসী যেসব কর্ম্মচারী বা শ্রীহট্টের সরকারী আপিস বা প্রতিষ্ঠানে যেসব কর্ম্মচারী ভারত রাষ্ট্রে (Rest of India) চাকুরী করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, আসামে তাঁহাদের স্থান হইবে না। স্থির হইয়াছে, যে সব কর্ম্মচারীকে আসামের নানা বিভাগে নিযুক্ত করা সম্ভব নয়, তাঁহাদের পেনসন বা "নগদ বিদায়" দিয়া সরাইয়া ফেলা হইবে। অথচ আমরা জানি যে বর্ত্তমান আসামের অনেক আপিসে, স্কুলে, কলেজে এইরূপ অভিজ্ঞ লোকের স্থান আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ শিলচর গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের নাম করিতে পারি। গৌহাটির কটন কলেজে বোটানি ও জিওলজি বিভাগের অধ্যাপক পদও খালি আছে। এইরূপ অনেক স্কুল-কলেজ আছে যেখানে শ্রীহট্টবাসী বাঙালী ও অন্যান্য

বাঙালীর ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। শ্রীহট্টের বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীদের ছাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে একটা অজুহাতে যার কোন অর্থ হয় না। এই সম্বন্ধে ভুক্তভোগী এক জনের নিকট হইতে একখানি পত্র নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম—

"নূতন রাষ্ট্রে নেতাদের মুখ দিয়া যখন শিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তনের কথা শুনি, নূতন নূতন পরিকল্পনার কথাও তাঁহারা বলেন, ঠিক সেই সময় অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত শিক্ষকদের "বাড়তি" হিসাবে ছাঁটাইয়ের ব্যবস্থা চলছে। অভিনব ব্যবস্থা! তিনি (কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা মন্ত্রী) আরও বলিয়াছেন যে ছয় হইতে এগার বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকারা সংখ্যায় তিন কোটি; ইহাদের জন্ত নয় লক্ষ শিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজন।...শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মঠ, সক্ষম ও অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীদের আজ আর স্বাধীন রাষ্ট্রে প্রয়োজন নাই।..."

এই বৈষম্যের কারণ সুবিদিত। গত ২রা জানুয়ারী তারিখে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নিকট এই সম্বন্ধে বহু স্মারকলিপি উপস্থিত করা হয়। শ্রীহট্ট সম্মেলনের পক্ষ হইতে যাহা বলা হয়, তাহা জনমতের প্রতিভূ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

"পুনর্গঠিত আসামের যে সব অধিবাসীর জন্মস্থান পাকিস্তানে পড়িয়াছে এবং যাহারা লোকবল ও অর্থ দিয়া আসামের যে কোন নাগরিকের মতই আসামকে শিল্প-বাণিজ্যে, আর্থিক সম্পদে, শাসন-ব্যবস্থায় ও অন্তান্ত ক্ষেত্রে উন্নত করায় সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে বিদেশী বলিয়া গণ্য করা হইতেছে, এবং (১) জীবিকা অর্জ্জনের বিভিন্ন পেশা, (২) সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ ও পদোন্নতি; (৩) ছাত্রদের বৃত্তিদান; (৪) স্কুল-কলেজে প্রবেশাধিকার; (৫) ভূসম্পত্তি ক্রয় ও ভোগদখল, ইজারা গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপারে কতকগুলি নিষেধাত্মক ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা আসাম সরকার কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে।"

এই অভিযোগের উত্তরে সর্দ্দার প্যাটেল সান্ত্বনা দিয়াছেন এই বলিয়া যে,

"শ্রীহট্টের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যায় প্রায় ১২ লক্ষ। তাহাদের মধ্যে যে কেহ বিশেষতঃ হিন্দুরা যদি আসামে আসিয়া বসবাস করিতে চাহে, তাহা হইলে সাদরে গ্রহণ করা হইবে। তাহাদের নাগরিক অধিকার লাভেও কোন অসুবিধা হইবে না, কারণ, কেবলমাত্র ঘোষণার দ্বারা পাকিস্তানের প্রত্যেক লোকই ভারতীয় রাষ্ট্রের অধিকার লাভ করিতে পারে।"

এই ঘোষণা একটা বড় নজীর। কিন্তু আসামের প্রধান-মন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বড়দলৈর পশ্চাতে যে শ্রেণীর সমর্থন আছে তাহারা এই প্রার্থিত ব্যবস্থা কি বানচাল করিবার চেষ্টা করিতেছে না? সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল কি এই কথা জানেন না? এবং জানিলে, আপনার নাক কাটিয়া অপরের যাত্রাভঙ্গ করার যে নীতি বড়দলৈ মন্ত্রীসভা গ্রহণ করিয়াছে এবং সহস্র সহস্র লোকের অনিষ্ট করিতেছে, তাহাতে তিনি কি করিয়া বাধা দিবেন? সেই ক্ষমতা তাঁহার হয়ত আছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সব নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া বড়দলৈ মন্ত্রীসভা চলিতেছেন, এবং সর্দ্দার প্যাটেলের নির্দ্দেশ অমান্য করিতেছেন। কি উপায়ে এই মারাত্মক অন্যায় বিদূরিত করা যাইতে পারে, তাহা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

বস্ত্রমূল্য নিয়ন্ত্রণ

গান্ধীজী নিয়ন্ত্রণ প্রথার বিরুদ্ধে। শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরাও ইহার বিরুদ্ধে। কিন্তু এই মতৈক্যের কারণ এক নয়। চিনির নিয়ন্ত্রণ রদের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে আমাদের দেশের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সততার উপর, নির্লোভের উপর নির্ভর করা যায় না। এই কথাটা প্রায় পনের দিন পূর্ব্বে দিল্লীর হার্ডিঞ্জ লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত ব্যবসায়ীদের এক সভায় গান্ধীজী স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

"ব্যবসায়ীদের অসাধুতা বা অতি-লোভের ভয়েই কনট্রোলের উৎপত্তি। একজন মজুর স্বীয় পরিশ্রমের মূল্য যাহা পায় একজন ব্যবসায়ী তাহার চেয়ে বেশী পাইবে কেন?"

দিল্লীর সভায় ব্যবসায়ীরা এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু দেশের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে ইহা বলা যায় যে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিতেছেন না। তাহার ফলে দেশে রাষ্ট্র-বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তুত হইতেছে। গান্ধীজীর প্রাণান্ত চেষ্টায়ও তাহা আটকাইয়া রাখা যাইবে না এই কথা মনে করিয়া আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশের লোকে নানা বিপর্য্যয়ের জন্য আশঙ্কা করিতেছে। আর এক পরীক্ষা আসিতেছে দেশের লোকের সম্মুখে কাপড়ের নিয়ন্ত্রণ প্রথা রদ করার ফলে। পশ্চিম বাংলার কাপড়ের কলওয়ালা ও কাপড়ের বিক্রয় সমিতির নিকট মজুত সকল গাঁট কাপড়ের বিক্রয় বন্ধ করা হইয়াছে; তাহাদের গুদামে তালা লাগাইয়া পুলিসের হেফাজতে রাখা হইয়াছে। চিনির সম্বন্ধেও এরূপ করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে চিনির কলওয়ালার বা মজুতদারের হাতে সমাজের গলা কাটিবার পথে কোন কাঁটা পড়ে নাই। যে চিনি কলিকাতায় সাড়ে দশ আনা সের হিসাবে পাওয়া যাইত, বিজ্ঞাপন দিয়া চিনির মজুতদার তাহা এক টাকা সেরে বিক্রয় করিতেছে। লজ্জা বা ভয় তাহার করিবার নাই। মূল্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ গোরওয়ালা, বলিয়াছেন যে এই মূল্য নিয়ন্ত্রণ রদে চিনির মজুতদারদের

হিসাবে প্রায় বিশ কোটি টাকা অতিরিক্ত লাভ হইবে। কাপড়ের সম্বন্ধেও আমরা একই খেলা দেখিব। ১৯৪৩ সালে বাংলা দেশের এক জন কাপড়ের কলওয়ালা বলিয়াছিলেন যে এক জোড়া কাপড় তাঁহারা চারি টাকা মূল্যে দিতে পারেন। সেই সময় আমাদের সাত আট টাকা দরে সেই কাপড় কিনিতে হইত। এই তিন চার টাকা মুনাফা যাইত কাপড়ের ব্যবসায়ীদের হাতে। আজ যে তাহার ব্যতিক্রম হইবে তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তাই আমরা ভাবিতেছি, ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা এরূপ শোষণ হইতে দেশের লোককে বাঁচাইতে পারিতেছেন না কেন? শুনিয়াছি ও দেখিতেছি যে সরকারী চাকুরিয়ারা প্রলোভনের তাড়নায় কালোবাজার চালাইবার যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই নৈতিক অবনতি রোধ করিতে পারা যাইতেছে না, এবং এই অনাচারকে সামাজিক রীতিনীতির অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে স্বীকার করিয়া লইবার প্রবৃত্তি দেশের লোকের মনে দেখা দিয়াছে। এই দুর্বলতার কারণ কি? যাঁহারা ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এত বৎসর যুঝিয়া সংগ্রাম করিয়া দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিল, তাহারা অনাচারের প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না কেন?

ভারত-ইতিহাসের প্রেরণা

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দেশকে "মহামানবের সাগর তীর" বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছেন। এই দেশে নানা জাতি, নানা লোক মিলিত হইয়াছে। এই দেশের চিন্তানায়কগণ বলিয়াছেন যে এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করাই ভারত ইতিহাসে প্রেরণা দিয়াছে। আজ দ্বি-খণ্ডিত ভারতে এই কথা বলিয়া দাঁড়াইবার লোক খুব কম। ভারতবর্ষের লোকসমষ্টির এক বৃহৎ অংশ, প্রায় দশ কোটি লোক, বিশ্বাস করে যে তারা একটা পৃথক "নেশন", এবং এই নেশনের জন্ম চাই পৃথক একটা রাষ্ট্র। এই আন্দোলন পরিণতি লাভ করে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে, যখন ব্রিটিশের অলক্ষ্য চাপে পড়িয়া কংগ্রেস মুসলীম লীগের দাবী মানিয়া লয়। ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হইয়া পড়ে। এই বিভাগে আলীগড় মুসলিম বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ছিল উৎকট উৎসাহী। লোকের ধারণা ছিল যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ প্রায় সকলেই ঘোর পাকিস্তানী। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে এই ধারণা ভুল। এবং এই ভুল ভাঙিয়াছেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মোহাম্মদ হবিব। ইতিহাস কংগ্রেসের বিগত অধিবেশন বোম্বাই নগরীতে অনুষ্ঠিত হয় এবং অধ্যাপক হবিব তার সভাপতিপদে বৃত হন। এই উপলক্ষে তাঁহার অভিভাষণে তিনি ভারতবর্ষের এই ঐক্যের কথা আমাদের মনে করাইয়া বলেন যে, ভাবের রাজ্যে এই ঐক্যের অনুভূতি ও জ্ঞান আমাদের জীবনের প্রতি স্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছে, রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় তাহা বারে বারে স্বীকৃত হইয়াছে এবং ভারত-ইতিহাসে ধর্ম্মকে রাষ্ট্রের নিয়ামক হইতে কখনও দেওয়া হয় নাই; মুসলমানধর্ম্মী পাঠান মুঘল যখন দিল্লীর রাজতক্তে বসিতেন তখনও নয়। এক ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া ভারতবর্ষজাত মুসলীমগণ রাষ্ট্রে কোন বিশেষ ক্ষমতা বা অধিকার পাইতেন না। পাঠান মুঘল এই দেশের মুসলীমগণকে তাহা হইলে এরূপভাবে হেনস্তা করিতেন না। এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ম অধ্যাপক হবিব ভারত-ইতিহাসের বহু প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার এই অংশ তাঁহার নিজের ভাষায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

> The Unity of India has been one of the fundamental postulates of Indian moral consciousness, and the longing for a centralized administration has been one of the most visible and persistent demands of the political spirit of Indians throughout the ages. The breaking up of India under two separate States or law-making organizations with exclusive citizenship which creates a spirit of hostility not only between the Governments but also between the peoples and the monstrosity of the establishment of state on purely religious and communal basis have never been known to the history of our land.

"নঈ তালিম"—নূতন শিক্ষা

"নঈ তালিম" এই কথাটা কংগ্রেস মন্ত্রিবর্গের অনেকের মুখে শোনা যায়। স্বাধীন দেশ নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে গেলে নূতন মানুষ সৃষ্টি করিতে হইবে; এই কার্য্যে নূতন শিক্ষার প্রয়োজন। আট দশ বৎসর হইতে এই নূতন শিক্ষার একটা কাঠামো প্রস্তুত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। গান্ধীজী তার প্রবর্ত্তক। ১৯৩৭ সালে যখন সাত আটটি প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কয়েকটি স্কুল স্থাপিত হয় এই শিক্ষা পদ্ধতি পরীক্ষা করিবার জন্ম। "Basic Education" এই দুইটি ইংরেজী শব্দের বাংলা করিয়া "বনিয়াদি শিক্ষার" সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইতে পারে নাই। কারণ ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী পদত্যাগ করেন এবং "বনিয়াদি শিক্ষার" পরীক্ষাগারগুলিও একে একে সংকুচিত হয়। আজ কংগ্রেস নেতৃত্বে দেশ সংগঠিত হইতেছে। "বনিয়াদি শিক্ষা" নবরূপ ধারণ করিতেছে "নঈ তালিম"রূপে। এই শিক্ষার ভাব ও রূপ সম্বন্ধে গান্ধীজীর কথাই প্রামাণ্য। দিল্লীর এক ভাষণ হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

> নঈ তালিমের বয়স মাত্র ৮ বৎসর; একটি নিখিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে নূতন ভিত্তিতে একটা জাতির শিক্ষাব্যাপার সম্পর্কে এই অভিজ্ঞতা দীর্ঘ নয়। নঈ তালিমকে হাতের কাজের ভিতর দিয়া শিক্ষা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনা ঠিক, আর লোকে ইহা বুঝিবে। তবে ইহা এই সম্পর্কে সত্যের একটা দিক মাত্র। এই নবশিক্ষার মূল গিয়াছে আরও গভীরে, মানুষের সর্ব্ববিধ

কার্য্যে সত্য ও প্রেমের প্রয়োগের মধ্যে—সে কার্য্য ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যে জীবনেরই হউক না কেন। জীবনের সকল কার্য্যে সত্য ও প্রেম অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, এই ধ্যান হইতেই হস্ত-শিল্পের মধ্য দিয়া শিক্ষার ধারণার উদ্ভব হইয়াছে। প্রেম চায় শিক্ষা সকলেরই সহজলভ্য হউক আর গ্রামের প্রত্যেক লোকের প্রতিদিনের জীবনে তাহা কাজে লাগুক। এই শিক্ষা পুঁথি হইতে আসে না এবং পুঁথির উপর নির্ভর করে না। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সহিতও ইহার কোন সম্পর্ক নাই। এই শিক্ষাকে যদি ধর্ম্মানুগত বলা যায়, তবে সে ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন—খণ্ড ধর্ম্মসমূহ তাহা হইতেই আসিয়াছে। অতএব জীবন-পুঁথি হইতেই এই শিক্ষা গ্রহণ করা হইবে। ইহাতে অর্থব্যয় হইবে না, পৃথিবীতে কেহই জোর করিয়া কাহারও নিকট হইতে এই শিক্ষা কাড়িয়া লইতে পারিবে না।

এই নঈ তালিমের গভীর মূল তত্ত্ব সাধারণে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিনা জানি না। অনেকে না বুঝিয়াই কেবল গান্ধীজীর ব্যবস্থাকে শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত, অন্যেরা এ বিষয়ে খোঁজই করেন নাই। এই নঈ তালিমকে কার্য্যকরী করার জন্য প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ্‌ প্রায় আট বৎসর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সরকার এ পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দানের জন্য প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে পুনরায় আনয়ন করেন। সম্প্রতি মৌলানা আজাদের নিকট কোনও উৎসাহ না পাওয়ায় এবং নানারূপে অবহেলা অপমানের ইঙ্গিত মনে করায় তিনি পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

মৌলানা আজাদের এই মতান্তরের প্রভাব দেশে প্রদেশে প্রদেশে এই শিক্ষা প্রবর্ত্তনের উপর পড়িবে না কি? পশ্চিম বঙ্গে "বনিয়াদি শিক্ষা"-প্রেমিক কয়েকজন বলরামপুর "বনিয়াদি শিক্ষা" কেন্দ্রে মিলিত হইয়াছিলেন বাংলা সংবাদপত্রে একটা বিবরণ দেখিলাম। তদুপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ নাকি বলিয়াছিলেন যে তিনি "সার্জেন্ট পরিকল্পনা বুঝেন না; গান্ধীজীর পরিকল্পনা বুঝিতে পারেন।" এই কথার মধ্যে এই দুই পরিকল্পনার ভিতরে বিরোধ বা পার্থক্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দেশের লোকে তাহাতে বিভ্রান্ত হইতে পারে। এই বিষয়ে কলিকাতার কোন ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় "বনিয়াদি শিক্ষার" একটা বিরাট পরিকল্পনা দিনের পর দিন প্রকাশিত হইতেছে। বলরামপুর সভায় স্থির হইয়াছে বিশ হাজার লোককে "বনিয়াদি শিক্ষা"—দানের জন্য তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। ইঁহারা হইবেন "নঈ তালিমে"র শিক্ষক। দুই হাজার "বনিয়াদি" স্কুল খুলিতে হইবে। এই সব বিরাট পরিকল্পনার কথা শুনিতে ভাল লাগে। কিন্তু আমরা এ কথাও ভুলিতে পারি না যে বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলার পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ে প্রায় এক লক্ষ লোক শিক্ষাদান কার্য্যে রত আছেন। একটা শিক্ষার ব্যবস্থা মানিয়া তাঁহারা কাজ করিয়া যাইতেছেন। "বনিয়াদি শিক্ষা"র যুগে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার স্থান কোথায়, তাঁহাদের বিদ্যালয়গুলির স্থান কোথায়—এই দুইটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। শিক্ষামন্ত্রীর নিকট এই সম্বন্ধে সদুত্তর তাঁহারা পাইয়াছেন কি না জানি না। প্রাথমিক শিক্ষার উপরেও একটা শিক্ষার ব্যবস্থা চলিতেছে। এই শিক্ষার সঙ্গে "বনিয়াদি শিক্ষা" কি করিয়া খাপ খাওয়াইয়া লওয়া হইবে বা এই শিক্ষাকে কি করিয়া "বনিয়াদি শিক্ষা"র সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া যাইবে তৎসম্বন্ধেও প্রশ্ন জাগিয়াছে। শিক্ষাবিদ্‌গণ অনেকেই নীরব হইয়া আছেন দেখিতেছি। হয়ত বা তাঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিতে সভায় তৎসম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু এই বিরাট পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোন উৎসাহের পরিচয় দেশের লোকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। সাধারণ পাঠের পত্রিকায় কোন কোন স্থলে এই বিষয় লইয়া [illegible] দেখা যায়। শিক্ষা জগতে একটা বিপ্লব [illegible], তৎসম্বন্ধে লোকের বুদ্ধি সজাগ নয়। এই [illegible] কেন দেখা দিল, এই নিশ্চেষ্টতা কেন আমাদের দেশের লোকের মধ্যে [illegible] করিল, তৎসম্বন্ধে [illegible] ইহা কিন্তু সুলক্ষণ নয়। [illegible] সরকারী [illegible] উপর শিক্ষা সম্বন্ধে সব চিন্তা ভাবনার ভার দিয়া দেশের লোক যদি নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন তবে নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারা হইবে।

বৃহৎ উৎকল

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মধুসূদন দাশ সমস্ত উড়িয়া ভাষাভাষীকে এক শাসনাধীনে একত্র করিয়া একটি বৃহৎ উৎকল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা লইয়া উৎকল ইউনিয়ন কনফারেন্স নামে একটি সঙ্ঘ গড়িয়া তুলেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা, বর্ত্তমান মহারাজের পিতা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও এই পরিকল্পনার উৎসাহী ছিলেন। ১৯৩৫ সালের ভারত আইন অনুসারে উৎকল পৃথক প্রদেশের মর্য্যাদা লাভ করে; ১৯৩৭ সালের নির্ব্বাচনে জয় লাভ করিয়া কংগ্রেস পার্টি মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করে। উৎকল ইউনিয়ন কনফারেন্সের আশা তাহাতে কথঞ্চিত সার্থক হয়। ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী মাসে ইহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; ২৫টি উড়িয়া ভাষাভাষী অধ্যুষিত দেশীয় রাজ্য উৎকল প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া এক বৃহৎ উৎকলের সৃষ্টি হইয়াছে। কেবল মাত্র ময়ূরভঞ্জ রাজ্য দূরে সরিয়া আছে এবং সেরাইকলা ও খারসোয়ান রাজ্য লইয়া বিবাদ লাগিয়াছে উৎকল ও বিহার গবর্ণমেণ্টের মধ্যে। এই বিবাদ মীমাংসার জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট একটি কমিশন বসাইয়াছেন। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন এই দুই রাজ্যে উড়িয়া না বিহারীর জনসংখ্যা বেশী। অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে পশ্চিম বঙ্গের নির্জীব গবর্ণমেণ্ট এই বিবাদে "দাঁড়িয়ে থাকি তফাতে" এই নীতি—বা নীতির

অভাব—অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন এবং কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট, "দিন গত পাপ ক্ষয়", এই নীতি অনুসরণ করিয়াছেন ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের প্রশ্ন সম্বন্ধে। পণ্ডিত নেহেরু কেন্দ্রীয় পরিষদে এক আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ভাষার ভিত্তির উপর ভারতীয় ইউনিয়নের নানা প্রদেশ পুনর্গঠন করিবার নীতি তাঁরা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু—। গান্ধীজী এই "কিন্তুর" ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মুসলীম লীগের "দুই নেশন" তত্ত্বের মীমাংসা করিতে সকলেই বিব্রত; এই সময়েই ভাষার পার্থক্যের জন্য নানা অঞ্চলে যে বিক্ষোভ জমাট বাঁধিতেছে, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় নাই; অস্থির হইলে চলিবে না। উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশ কংগ্রেস-ভাবাপন্ন হইয়াও বিবাদ এড়াইতে পারে নাই। ইহা লইয়া সর্দার প্যাটেলকে ব্যস্ত হইতে হইতেছে। এই উপলক্ষে পশ্চিম বঙ্গের জনমত উড়িয়া বিহারী সংঘর্ষের মধ্যে কোন একটা ব্যাপার ঘটাইতে পারে নাই বলিয়াই পশ্চিম বঙ্গের সেরাইকেলা ও খারসোয়ান সম্বন্ধে একটা দাবী-দাওয়া যে আছে বা থাকিতে পারে, তাহা লইয়া কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের মাথা ঘামাইবার কোন কারণ দেখা দেয় নাই। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিলসঙ্ঘ এই সম্বন্ধে বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানাইয়াছেন। সেরাইকেলা ও খারসোয়ান রাজ্য সিংহভূম জিলার অন্তর্ভুক্ত। এই জিলার কোন কোন অংশে বাঙালীরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত কমিশন পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে তাহাদের তদন্তের একটা সম্বন্ধ আছে, এই কথা বিবেচনা করিবেন কিনা জানি না; পশ্চিম বঙ্গ গবর্মেণ্ট এই বিষয়ে বলিবার অধিকার দাবী না করিলে অত্যন্ত অন্যায় করিবেন; কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের সঙ্গে এই বিষয়ে বোঝাপড়া করিবার সময় কি আসে নাই? ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের সময় বিহারের শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য প্রায় ১৫-২০ লক্ষ বাঙালীকে তাদের পৈত্রিক ভিটে-মাটি সহ নূতন প্রদেশে চালান দিয়াছিলেন বড়লাট হার্ডিঞ্জ সর আলী ইমামের পরামর্শে। সেই সময় হইতে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের জন্মভূমির প্রধানেরা এই বাঙালীদের সঙ্গে ব্যবহার করিতেছেন বিমাতার মতন। প্রায় পঁচিশ বৎসর বিহারের সঙ্গে উৎকলও এক শাসনাধীনে সংযুক্ত ছিল। এই যৌতুক ভাঙিয়া যখন উৎকল হইল স্বপ্রতিষ্ঠ, তখন সিংহভূম জিলার উড়িয়া অঞ্চল লইয়া একটা রেষারেষি চলিতেছিল বিহারের সঙ্গে, যেমন চলিতেছে মেদিনীপুর জিলার দাঁতন অঞ্চল ইত্যাদি লইয়া পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে। গত বৎসর, বোধ হয়, এই অঞ্চলে উৎকল ইউনিয়ন কনফারেন্সের একটি অধিবেশন বসিয়াছিল, উৎকলের দাবীর একটা সাক্ষ্যপ্রমাণ তৈয়ার করিবার জন্য। তেলেগু ভাষা-ভাষীর সঙ্গে উড়িয়া ভাষাভাষীর একটা বিরোধ চলিতেছে দক্ষিণ অঞ্চল লইয়া। কোন কোন তেলেগু অঞ্চল, মনে হয়, উৎকলে আসিয়া পড়িয়াছে; দাবী-প্রতিদাবী উগ্র হইয়া উঠিয়াছিল ছমছুমার জলপ্রপাত লইয়া। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বৃহৎ উৎকলের স্বয়ং-সম্পূর্ণ রূপ দিতে হইলে আমাদের উড়িয়া প্রতিবেশীদের বোঝাপড়া করিতে হইবে বাঙালী, বিহারী, তেলেগুর সঙ্গে। কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট সজাগ থাকিলে খারসোয়ানে যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিয়াছে সেরূপ ঘটিবে না। বিহারের কংগ্রেস নেতৃবর্গ এই সংঘর্ষের প্রশ্রয় দিয়াছেন বলিয়া নানা দিক হইতে অভিযোগ শোনা যাইতেছে। স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসক-শ্রেণী অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াই বিবাদের এইরূপ উপকরণ সৃষ্টি করেন। রাষ্ট্রনীতিতে এইরূপ বলপ্রয়োগ দোষের নয়।

ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা

বিগত ১৯শে পৌষ (৪ঠা জানুয়ারী) ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ-শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিল। সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র বলিয়া সে ঘোষণা করিল। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এই অধিকার মানিয়া লইয়াছেন। আপাতদৃষ্টে ব্রহ্মদেশের উপর ব্রিটেনের কোন প্রভাব প্রাধান্য রহিল না। কার্য্যতঃ ফলাফল কি দেখা দিবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত আছে।

ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের নিকট প্রতিবেশী; আমাদের দেশ-বিভাগ হওয়ার পরেও আসাম-সীমান্ত ব্রহ্মদেশের সীমান্তের সঙ্গে মিশিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের সীমান্ত ও ব্রহ্মদেশের সীমান্ত প্রায় দুই শত মাইল ব্যাপিয়া পরস্পর সংলগ্ন। প্রকৃতিদত্ত এই নৈকট্যই ব্রহ্মদেশের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের সৃষ্টি করে নাই। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে এই প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে কি সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইতেছে। সে যাহাই হউক, ব্রহ্মদেশ যখন হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করে, তখন হইতে শাক্যমুনির জন্মভূমির সঙ্গে তাহার পরিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে এই প্রাচীন স্মৃতি-কথার উপর বর্ত্তমান যুগের সম্বন্ধের ভিত্তি স্থাপিত হইবে না। ১৮৮৭ হইতে ১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ এক শাসন-ব্যবস্থার অধীনে ছিল। এই সময়ের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ব্রহ্মদেশে নিজেদের জীবন-যাত্রার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রায় ১২ লক্ষ ভারতবাসী ব্রহ্মদেশে ছিলেন। জাপানী আক্রমণের ভয়ে তাঁদের অর্দ্ধেক পলাইয়া আসিয়াছিলেন ভারতবর্ষে। ১৯৪৫ সালের মে মাসে ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ-শাসন আবার প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন অনেক ভারতবাসী ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অবস্থা ত্রিশঙ্কুর অবস্থার সঙ্গে তুলনীয়। তাঁহারা দুই রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারেন না। ব্রহ্মদেশ আজ স্বাধীন, সুতরাং ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতবাসীকে একটা বাছিয়া লইতে হইবে। এই কাজ সহজ নয়। জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া, সমস্ত সম্বন্ধ ছেদন করিয়া ব্রহ্মদেশের নাগরিক জীবনের গৌরব ও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। নতুবা বিদেশীর মতন ব্রহ্মদেশে থাকিয়া কোন

কোন শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে ব্রহ্মীদের সঙ্গে জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় খুঁজিয়া লইতে হয়। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসের পূর্ব্বে মত্র দেশের চেট্টি-সম্প্রদায়ের ব্রহ্মদেশের আর্থিক জীবনে যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, তাহা আজ সম্ভব নয়; ব্রহ্মদেশের হাটে-বাজারে বোম্বাই ও গুরাট বণিক সম্প্রদায়ের যে প্রভাব ছিল, তাহা থাকিতে পারে না; বাঙালী উকিল, ডাক্তার, সরকারী চাকুরীয়ার সংখ্যা কমিবে; বিহারী, উড়িয়া, বাঙালী, তেলেগু শ্রমিক রেঙ্গুন, আকিয়াবের বন্দরে ব্রহ্মদেশে পূর্ব্বের সুবিধা পাইবে না।

এই পরিবর্ত্তন অপরিহার্য্য। আমাদের দেশে আমরা যেমন স্বাধীন রাষ্ট্র গড়িতে চাই, সেইরূপ ব্রহ্মদেশের নাগরিকও এই সংগঠনের কাজে নিজেকে নিয়োগ করিতে চান। গত মহাযুদ্ধে সে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে ইউ আউঙ্-সানের নেতৃত্বে; আবার জাপানীর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করিয়াছে, ব্রিটিশকে সাহায্য করিয়াছে। মনে হইয়াছিল, নিজের দেশকে বুঝি আউঙ্-সান আবার ব্রিটিশ পদানত করিয়া দিলেন। কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতে ব্রহ্মদেশের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব আউঙ্-সানকে অগ্রণী করিয়া ব্রিটিশের অধিকার ছিনাইয়া লইল। সেই ব্রহ্মদেশ যেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করিল, সেই দিন আউঙ্-সান ইহজগতে নাই। আজ ব্রহ্মদেশ এক মহান আদর্শের পথে যাত্রা করিল। ব্রহ্ম-প্রবাসী ভারতবাসীকে ঐ স্বাধীন জাতির সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের মধ্যে এক নূতন সম্বন্ধের সৃষ্টি করিতে হইবে। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা-দিবসে ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যে ভরসা দিয়াছিলেন, তাহা আমাদের সার্থক করিতে হইবে। "বহু যুগ হইতে ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। ভবিষ্যতে উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত হইবে বলিয়া আমি আশা করি।"

খাদ্য-সমস্যা সমাধান

পাটনা নগরীতে ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চত্রিংশৎ অধিবেশন শেষ হইয়াছে। বিহারের গবর্ণর শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম এই অধিবেশন উদ্বোধন করিতে গিয়া "দরিদ্র, নগ্ন, ব্যাধিগ্রস্ত" জনগণের প্রতি বিজ্ঞানীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে নানা কথার উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা অদূরভবিষ্যতে কি করিতে পারেন, এই বিজ্ঞান পরিষদে তাহার অনেক আলোচনা হইয়াছে। এই উপলক্ষে "খাদ্য ও বিশ্বের জনসংখ্যা" সম্পর্কিত আলোচনা বৈঠক বসে। ভারত গবর্ণমেণ্টের খাদ্য-বিশেষজ্ঞ শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁহার বক্তৃতার যে বিবরণ দৈনিক সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় না যে ভারতবাসীর সমাবস্থাপন্ন লোকেদের খাদ্য, বস্ত্র ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উন্নতির আশা অদূর ভবিষ্যতে দেখা দিবে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা ২৫০ কোটি বলিয়া মনে করা হয়, এবং ১৯৬০ সালে তাহা বাড়িয়া যাইবে শতকরা ২০ জন করিয়া। অর্থাৎ ১৯৬০ সালে পৃথিবীর লোক সংখ্যা হইবে ৩০০ কোটি। তাহা হইলে আগামী ১২।১৩ বৎসরের মধ্যে খাদ্য-শস্যের পরিমাণ শতকরা ২৫ ভাগ অন্ততঃ বাড়াইতে হইবে। ডাক্তার বীরেশ গুহ এই বৃদ্ধির নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন: খাদ্য, গম ইত্যাদি শতকরা ২১ ভাগ; মূল ও শিকড়জাত খাদ্যদ্রব্য শতকরা ২৭ ভাগ; শর্করা শতকরা ১২ ভাগ; স্নেহপদার্থ শতকরা ৩৪ ভাগ; ডাল ইত্যাদি শতকরা ৮০ ভাগ; ফল ও শাকসব্জি শতকরা ১৩০ ভাগ; মাংস শতকরা ৪৬ ভাগ ও দুগ্ধ শতকরা ১০০ ভাগ। এই বিরাট কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে জাতীয় বা আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অগ্রসর হইতে হইবে। ডাঃ গুহ আশা করেন যে এই উপায়ে আমাদের দেশে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে প্রতি একর (তিন বিঘা) জমিতে খাদ্যশস্যের হার শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। তৎপূর্ব্বে আমাদের জমি বিলিবন্দোবস্তের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কৃষিজীবীদের সরকারী সাহায্য দিতে হইবে। ব্রিটেন এই খাতে ব্যয় করে ৮০০ কোটি টাকা, আমাদের করিতে হইবে অন্ততঃ ৫০ কোটি টাকা। খাদ্য সম্বন্ধে সনাতন স্বাদ-আস্বাদও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

বোম্বাই নগরীতে গত ১০ই পৌষ তারিখে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চবিংশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করিতে গিয়া বোম্বাই প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী শ্রীবলবন্ত রাও খের বঙ্গভাষায় তাঁহার অভিভাষণ আরম্ভ করেন। তৎপরে অবশ্য ইংরেজী ভাষায় অভিভাষণ শেষ করেন। এই উপলক্ষে তিনি ইংরেজী-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রভাষা শিক্ষার উপর খুবই জোর দেন। "ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এতাবৎ আমাদের কাজ ভাল মতেই চলিয়াছে।" কিন্তু এই ভাষার প্রচলন এত সীমা-বদ্ধ যে স্বাধীন ভারতে, জনগণের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়, ইংরেজী ভাষা দ্বারা কাজ চলিবে বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্যই তিনি বাঙালীকে "হিন্দী" শিক্ষা করিবার জন্য আবেদন করেন। এসব কথার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নাই। কিন্তু "সমসংস্কৃতি-সম্পন্ন অধিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার দাবী" এত উগ্র হইয়া উঠিতেছে যে ভারতের "মূলগত ঐক্যবোধ" বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে। আমরা দেখিতেছি যে "নিজ প্রদেশের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন অন্যান্য প্রদেশের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞায়" পরিণত হইতেছে এবং ভারতবর্ষের ঐক্যবোধ লোকের মন হইতে বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই বিপদের কথা মনে করাইয়া দিয়া বলবন্ত রাও দেশের উপকার করিয়াছেন। ভেদ-বুদ্ধির প্রশ্রয় দিলে আমরা বিনষ্ট হইব, এই কথা জানিয়া ও বুঝিয়াও আমরা এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিতে পারিতেছি না।

সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন শিল্পপতি শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীবলবন্ত রাও খেরের উদ্বোধন অভিভাষণের মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল যে বাঙালী যে প্রদেশে থাকে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিতে পারে না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই "নালিশ" সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন করিয়া তার উত্তর দিয়াছেন—"বাংলা দেশে আজ বিহারী, মাড়োয়ারী, মাদ্রাজী ও গুজরাটি থাকেন, কিন্তু তাঁহারা সাধারণ বাঙালীদের সঙ্গে কতটা মিশেন?" এই বিষয়ে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে আমাদের —বাঙালী, বিহারী, মাদ্রাজী, উড়িয়া, গুজরাটি, মারাঠি, পাঞ্জাবী, আসামীদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এত প্রবল যে আমরা বিদেশেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাংলা, বিহার, মাদ্রাজ, উৎকল, মহারাষ্ট্র, গুর্জ্জর, পাঞ্জাব, আসাম সৃষ্টি করিয়া সাংস্কৃতিক বৈষম্যের নামে নিজ নিজ কূপের ভিতরে থাকিতে ভালবাসি। এই সংকীর্ণতার কারণ একটা আছে নিশ্চয়ই। সেই কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। আমাদের প্রত্যেকের সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণে ছুৎমার্গের মধ্যে তাহা আছে।

এই সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন বোম্বাই হাইকোর্টের জজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন। তিনি বাঙালী জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আবেগ-উত্তেজনা, বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে কি করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে এবং বাঙালী জীবন সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, তাহার পরিচয় দেন। অন্য এক উপলক্ষে বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছিলেন যে দুইজন মহারাষ্ট্রী একত্র হইলে করে ঝগড়া, তাঁহার পর গড়িয়া তুলে মহারাষ্ট্রমণ্ডল একটা। সেইরূপ দুই জন বাঙালী একত্র হইলে "মিলিত হইবার পূর্ব্বে দলাদলি করিয়া লয়। পরে বয়স একটু বাড়িলে তাহারা একটি কালী-বাড়ী স্থাপন করে।" পূর্ব্বতন যুগে এই "কালী-বাড়ীর মধ্যদিয়া প্রবাসী বাঙালী বাঙ্গলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছে।" কিন্তু আজ যদিও সে ঘটা করিয়া দুর্গা পূজা করে, তবুও তাঁহার মন তাতে যেন সন্তুষ্ট নয়। আরও কিছু চায় যাহা অবলম্বন করিয়া মাতৃভূমির সঙ্গে তাহার সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়। প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে বাংলা সাহিত্যই সেই আশ্রয়। সংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে আর কোথাও তাহার অন্তঃপ্রকৃতির সে ক্ষুধা মিটে না। সভাপতি মহাশয় সেই প্রকৃতির এই বর্ণনা দিয়াছেন, এবং সেই প্রকৃতির কল্যাণে সে কি করিয়া নব-ভারত গঠনে সাহায্য করিয়াছে তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

"নানা দেশ গ্রাম ও সহরের জমিপ্রসূত পলিমাটি হইতে যেমন বাংলার মাটির জন্ম, তেমনি নানা ঐতিহ্য, নানা জাতির বিভিন্ন সংস্কার, নানা সংস্কৃতি সংমিশ্রণ আমাদের জাতীয় চিত্তের নানা স্তরে নিহিত আছে। এই কৃষ্টিসকল লজ্জার বিষয় নহে, কারণ ইহা হইতেই আসিয়াছে আমাদের চিত্তের সাবলীল দৃষ্টিপ্রসার, নিঃসঙ্কোচ গ্রহণ সামর্থ্য, সমন্বয়ে কৌশল নৈপুণ্য, সৃষ্টিতে শক্তি ও সৌন্দর্য্যের মিলন। আমরা বাহির হইতে গ্রহণ করিয়াছি অনেক, কিন্তু সমস্তই আমাদের মননশক্তি ও অন্তঃপ্রকৃতির জারক রসে পরিপাক করিয়া নিজের করিয়া লইয়াছি। ইহার দৃষ্টান্ত—রামমোহন রায়, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন। বাংলা ও ভারতের বাহিরের অনেক বস্তু ইঁহারা সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারা বাংলার একান্ত আপনার, বাংলার সরস্বতীর বরপুত্র। বাংলার মাটি লেটারাইট বা গ্রানাইটে তৈরী নয় যে কালের স্রোতের সহিত উহা সংগ্রাম করিবে; কবির ভাষায় উহা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা, অথচ অসীম শক্তির আধার ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য—এক সঙ্গে কোমলতা ও শক্তির আধার হওয়া। এজন্যই যখন পশ্চিম জগতের চিন্তাধারা এদেশে আসিয়া পড়িল তখন বাংলাই প্রথম নিখিল ভারতের পথনির্দ্দেশ করিয়াছিল—শিক্ষায়, সামাজিক প্রগতিতে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে।"

এই বিশ্লেষণের মধ্যে নূতন কথা বেশী নাই। কিন্তু পুরাতন কথা যাহা আছে তাহা মনে করাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে, মনে করিয়া রাখিবার প্রয়োজন আছে আজ যখন নানা বর্ব্বরোচিত আক্রমণে সমগ্র দেশের জীবন বিপন্ন। আজ ইহা মনে করিবার প্রয়োজন আছে যে নানা ভাবের সঙ্ঘাতে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছে, বাঙালী সাহিত্য-সাধকের সেই ক্ষণে নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; তাঁহার বিশেষ সংস্কৃতির আলোকে নব-ভারতের পথে নূতন আলোক রেখা ফেলিয়া দেশের জয়-যাত্রায় যোগদান করিতে হইবে। প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সার্থকতা হইবে তখন যখন প্রবাসী বাঙালী নিজের সংস্কৃতি অন্য-সংস্কৃতি প্রভাবিত অঞ্চলে অনুবাদ করিতে পারিবে এবং অন্য সংস্কৃতির বাণী নিজের লোকের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে। এই যোগ-সূত্র স্থাপন করিয়া দেওয়া হইল প্রবাসী বাঙালীর কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইলে তাহার মন রাখিতে হইবে জাগ্রত, তাহার বুদ্ধি রাখিতে হইবে পর-মত শ্রদ্ধাশীল, তাহার অন্তঃপ্রকৃতি রাখিতে হইবে শতদল পদ্মের মতন সূর্য্যালোক পিয়াসী। বর্ত্তমান শতকের প্রথমে অনেক বাঙালী এই মননশীলতার জন্যই ভারতবর্ষের মানসলোকের অনেক ক্ষেত্রে নব-জীবন-প্রবর্ত্তকরূপে দেখা দিয়াছিলেন। আজও সে মেধা, বুদ্ধি ও কর্ম্ম-শক্তি পরিশ্রান্ত হইয়া যায় নাই।

বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের স্থান

প্রায় এক মাস পূর্ব্বে ভারতীয় বিমানবাহিনীর কর্ম্মীবৃন্দের এক সভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন—

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারত কোনদিনই মধ্যমশ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকিবে না। ভারতবর্ষ হয় একটি সুমহান রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, না হয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে। যদি আমরা যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমস্যার সম্মুখীন হইতে পারি এবং আমাদের মন যদি উদার হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ বিশ্বের রাষ্ট্র-দরবারে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিবে এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

কোন্ গুণের অধিকারী হইলে ভারতবর্ষ বিশ্বের দরবারে সম্মানের পদ অধিকার করিবে, তাহাও পণ্ডিতজী বর্ণনা করেন। "ভারত কখনই একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হইবে না। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ভারতবর্ষের কার্য্য পরিচালিত হইবে; সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক থাকিবে না।" এই আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা আমাদের রাষ্ট্র-চালকবৃন্দ করিতে পারিবেন কিনা জানি না। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের দরবারে ত এই আদর্শের অনুযায়ী কোন কর্ম্ম-প্রচেষ্টার পরিচয় পাই না। পণ্ডিতজী নিজেই কেন্দ্রীয় পরিষদে বলিয়াছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধে কোন পক্ষ অবলম্বন করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় ভারতবর্ষ অনেকটা "একঘরে" হইয়া আছে; "একাই নিজের লাঙ্গল ঠেলিয়া চলিয়াছে।" কিন্তু এরূপ স্বয়ংসিদ্ধ হইয়া বেশী দিন চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দেশ হইতে বহুদূরে, প্রায় তের হাজার মাইল দূরে। এটম বোমার যুগে এই দূরত্ব কিছু নয়। সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই দূরত্বের অজুহাতও টিকে না। কাশ্মীরের মাথার আছে সোভিয়েট রাষ্ট্রের মুসলিম স্বাধীন সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি। সেইজন্য অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সোভিয়েট রাষ্ট্র নিরুদ্বেগ থাকিতে পারে না। কাবুলের ভূতপূর্ব্ব ব্রিটিশ দূত সর কের ফ্রেজার টাইলার এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই সম্ভাবনার কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন:

"অক্সাস নদীর অপর পারে সোভিয়েট রিপাব্লিক-গুলিকে শিল্পসমৃদ্ধ করার পর রাশিয়া যে দক্ষিণে করাচীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নাই, তাহা অবিশ্বাস্য। শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক ককেশাশ হইতে পামীর পর্য্যন্ত দক্ষিণ সীমান্তে উষ্ণজলবিশিষ্ট একটি বন্দরের প্রয়োজন হইবেই। আফগানিস্থানকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া যে হিন্দুকুশ পর্ব্বত-মালা দাঁড়াইয়া আছে, সেই হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার উপর যাহার অধিকার থাকিবে, ভারতে প্রবেশের চাবি-কাঠিও তাহার হাতে পাওয়া যাইবে।"

প্রকৃতি এই ভাবেই বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্বপ্রান্তে যে স্বাধীন ব্রহ্মরাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতেছে তৎসম্বন্ধে আমাদের রাষ্ট্রচালকগণকে সজাগ থাকিতে হইবে। সিঙ্গাপুর ও সিংহলের ত্রিকমেলি বন্দরে ব্রিটিশের নৌ-ঘাঁটি এখনও অব্যাহত আছে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রের সঙ্গে এখনও আমাদের একটা সম্বন্ধ আছে। এ বন্ধন ছিন্ন করিয়া একটা নূতন সম্বন্ধের পরিকল্পনা নাকি লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের মাথায় খেলিতেছে। ব্রিটিশ রাষ্ট্রসঙ্ঘ (British Commonwealth of Nations) ভাঙিয়া দেওয়া হইবে। ব্রিটিশ রাজার নামে এই সঙ্ঘের শাসনকার্য্য আর চলিবে না। ব্রিটেন, আয়ার, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, ভারতবর্ষ, "পাকিস্তান" এই রাষ্ট্রগুলি স্বাধীন হইয়া যাইবে। কিন্তু সব সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যাইবে না। এই পরিকল্পনায় ব্রিটিশ রাজার স্থান কোথায়, তাহা এখনও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। গত মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ রক্ষণ-নীতি (British scheme of Defence) বলিয়া একটা কথা শুনিয়াছিলাম। এই রক্ষণ ও আক্রমণ নীতির কল্যাণে হয়ত একটা সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে পারে, এই আদর্শই বোধ হয় মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনার মূল কথা। সেইজন্যই সিঙ্গাপুর ও ত্রিকমেলি বন্দরের একটা মাহাত্ম্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। ভারতবর্ষের পশ্চিমে সিন্ধু ও পশ্চিম পঞ্জাব হইতে আরম্ভ করিয়া আফ্রিকা মহাদেশের মরক্কো পর্য্যন্ত প্রায় দশটি মুসলিম রাষ্ট্র বিদ্যমান আছে। একক কোনটিই পরাক্রান্ত নয়, অনেকগুলিই মধ্যযুগের চিন্তাধারায় মধ্যে নিমজ্জিত। এদের সম্বন্ধে ভারতবর্ষ নিস্পৃহ হইতে পারে না এইজন্য যে, ভারতবর্ষের মধ্যে চারি কোটি মুসলমান আছে, যাহাদের ভাব ও আবেগ অনেক সময় এই মুসলিম দেশসমূহের ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়াইয়া পড়ে, এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারত-বর্ষকে এই সব দেশের ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হয়। খেলাফৎ আন্দোলনের সময় তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

গুরু নানক মক্কায় গিয়াছিলেন

প্রয়াগের পণ্ডিত সুন্দরলাল ৪ঠা জানুয়ারী তারিখের "হরি-জন" পত্রিকায় শিখ সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পাঞ্জাবী প্রধান প্রবন্ধের স্থানে ইহা ছাপিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন গুরু নানক, এই তথ্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে পণ্ডিতজী বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। গুরু নানকের "জীবনযাত্রা প্রণালী না ছিল হিন্দুধর্ম্মানুসারী, না ছিল ইসলাম অনুসারী। তাহা ছিল উভয় ধর্ম্মের সংমিশ্রণ।" এই কথার প্রমাণ করিতে গিয়া পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, শিখ-ধর্ম্ম-গ্রন্থের নামকরণে "সংস্কৃত 'গ্রন্থ' শব্দের সহিত আরবী 'সাহেব' শব্দ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।" এই সমন্বয় চেষ্টা গুরু নানকের জীবনেই শেষ হয় নাই; তাঁর পরবর্তী শিখ গুরুবৃন্দও এই ভাবের ভাবুক ছিলেন। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, "অমৃতসহরের স্বর্ণমন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা কাহার হাতে করা হইবে, প্রশ্ন উঠিলে গুরু অর্জ্জুন দেব এই পবিত্র অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করিতে মুসলমান ফকির সাইন মিঞা মীরকে আহ্বান করিয়া-ছিলেন।" গুরু নানক সমদর্শী ছিলেন—রামেশ্বর-মক্কা উভয় তীর্থে গিয়াছিলেন এই কিংবদন্তী তাঁহার আত্যন্তিক চেষ্টার পরিচয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আরও অনেক হিন্দু সন্ন্যাসী মক্কা গিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথ জীবিত ছিলেন। তাঁর মক্কা পর্য্যটনের বৃত্তান্ত তাঁর জীবনচরিতে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ব যুগের হিন্দু সন্ন্যাসীরা এই তীর্থ পর্য্যটন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। কেন করিতেন তার উত্তর নিশ্চয়ই একটা ছিল। আজ লোকে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে।

পত্রাবলী

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমার লিখিত ইংরেজি পত্রখানি *Modern Review* পত্রে ছাপাইবার যোগ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন, আশা করি বিচারে ভুল করেন নাই।

প্রুফে দ্বিতীয় গেলির শেষ প্রান্তে একটি প্যারাগ্রাফ যোগ করিয়াছি। ইহার ভাষা, ব্যাকরণ ও পদচ্ছেদ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন আছি—দয়া করিয়া যথেচ্ছা সংশোধন করিয়া দিবেন।

নেপালবাবু[১] কিছু দিনের জন্য এখানকার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সেই কিছুকালের মেয়াদ যদি ক্রমে বাড়িয়া চলিতে থাকে তবে আরও আনন্দের কারণ হইবে।

আশা করি আপনার শরীর এক্ষণে ভাল আছে। ইতি ৯ই শ্রাবণ ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ আজ রবিবার বলিয়া প্রুফ রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠানো গেল না – তাহাতে ক্ষতির আশঙ্কা আছে কি? প্রবাসীর জন্য চারুকে গুটি তিনেক কবিতা পাঠাইয়াছি, এখনো প্রাপ্তিসংবাদ পাই নাই।

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

কুমারস্বামী[২] আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তিনি আমার কতকগুলি কবিতা অনুবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশে আমি তাড়াতাড়ি গোটা তিন-চার কবিতা নিতান্ত নীরস গদ্যে তর্জ্জমা করিয়া দিয়াছিলাম। কুমারস্বামী যদি সেগুলি অবলম্বন করিয়া লিখিয়া দেন তবে *Modern Review* পত্রিকায় ছাপাইবেন। তাঁহার হাত দিয়া বাহির হইয়া আসিলে আমার আপত্তির কারণ থাকিবে না। অজিত[৩] কতকগুলি তর্জ্জমা করিয়াছিল, সেও কুমারস্বামীর হাতে আছে। তিনি যাহা ছাপাইবার যোগ্য বলিয়া আপনার হাতে দিবেন তাহা আপনি প্রকাশ করিবেন। কিন্তু স্বকৃত তর্জ্জমার বিড়ম্বনাগুলিকে কুমারস্বামী মাজিয়া ঘষিয়া দিলে তাহাতে অনুবাদক বলিয়া আমার নাম সংযোগ করা সঙ্গত হইবে না।

ডাক্তার বসু[৪] বলিতেছিলেন, Sister Nivedita আমার দুইটি ছোট গল্প (কাবুলিওয়ালা ও ছুটি) ইংরেজিতে তর্জ্জমা করিয়াছেন—তাহা বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে, শুনিয়াছি সে দুটি আপনার কাগজে ছাপিতে দিতে তাঁহার আপত্তি নাই। ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩১৭

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমার জীবনস্মৃতি প্রবাসীতে বাহির করিবার পক্ষে আপনার অনুরোধ ছাড়া আর একটি কারণ ঘটিয়াছে। আমার বিদ্যালয়ের কোনো অত্যুৎসাহী শিক্ষক আমার ঐ লেখা নকল করিয়া মফস্বলে কোনো সভায় আমার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পাঠ করিতে পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ না করিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু ইহার অযথা ব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা যখন আছে তখন বিকৃতি লাভের পূর্ব্বেই ওটাকে ছাপার অক্ষরে ধ্রুব করিয়া রাখা ভাল। কিন্তু আগে অজিতের লেখাটা বাহির হইয়া গেলে তাহার পরে এটা প্রকাশ হওয়া কি ভাল নয়? ভাবিয়া দেখিবেন। আমি ঐ লেখাটার ফাঁক ভরাইয়া আবার একটু সংশোধন করিয়া লইতেছি। যখন ইচ্ছা করেন পাইবেন।

মাতা শান্তা[৫]র শরীর এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই শুনিয়া দুঃখ বোধ করিতেছি, তাঁহার এই অস্বাস্থ্যের জন্য আমাদের আতিথ্য যদি কোনো অংশে দায়ী হয় তবে সে আমার পক্ষে অত্যন্ত পরিতাপের কথা।

চারু[৬]কে বলিয়া দিবেন, বড়দাদার লেখাটা কম্পোজ হইবামাত্র সেটা ছাপিবার জন্য যেন তত্ত্ববোধিনীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। ইতি ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদা
নদীয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

জীবনস্মৃতি কাপি করিতে দিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় অজিতের লেখার প্রথম কিস্তি অন্তত বাহির

১। নেপালচন্দ্র রায়।
২। আনন্দ কুমারস্বামী।
৩। অজিতকুমার চক্রবর্তী।
৪। জগদীশচন্দ্র বসু।
৫। শ্রীশান্তা দেবী।
৬। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হইয়া গেলে এই প্রবন্ধ প্রকাশ হওয়া উচিত। অজিত আমার জীবনের সঙ্গে কাব্যকে মিলাইয়া সমালোচনা করিয়াছেন—তাঁহার লেখা পড়িয়া যদি পাঠকদের মনে কৌতূহল জাগ্রত হয় তবে এ লেখাটা তাঁহারা ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন। এবং অজিতেরই লেখার অনুবৃত্তিরূপে এই জীবনস্মৃতির উপযোগিতা কতকটা পরিমাণে আছে। ইতিমধ্যে আমি ...কে বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিতেছি তিনি আমার লেখাটাকে যেন প্রচার না করেন।

জীবনস্মৃতি অনেকটা পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হইতেছে—সমস্তটাই আবার নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে। যখন প্রবন্ধটা হাতে পাইবেন একবার ভাল করিয়া আগাগোড়া পড়িয়া দেখিবেন যদি কোনোখানে লেশমাত্র অহমিকা বা অনাবশ্যক প্রগল্‌ভতা প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নির্ম্মমভাবে কাটিয়া দিবেন। নিজের কথা বলিবার সময় কথার ওজন থাকে না। যে সব বৃত্তান্তকে অত্যন্ত ঔৎসুক্যজনক বলিয়া বোধ করি তাহা সাধারণের কাছে তুচ্ছ ও বিরক্তিকর হইতে পারে। ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদা
নদীয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

প্রতীক্ষা নামক লেখাটি অল্প স্বল্প সংশোধন করিয়া দিলাম। গোড়ার দিকে দুই চার লাইন বর্ণনা ছিল যাহা বাহুল্য এবং নিতান্ত দস্তুরমত, সেইগুলি বাদ দিয়াছি। শেষটুকুতেও অল্প একটু হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

সাময়িক পত্র যাহা পান তাহার ব্যবহার শেষ হইয়া গেলে আমাকে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিবার জন্য আজই আপনাকে চিঠি লিখিতে যাইতেছিলাম এমন সময়ে আপনার পত্রে তাহার উল্লেখ পাইলাম। অবশ্য, এখন নিজের সম্পাদকী দফ্‌তরের জন্যই ইহাদের প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। তত্ত্ববোধিনীর রুচি এবং ক্ষুধা দুইই সঙ্কীর্ণ অতএব প্রবাসীর জন্যও কিছু উদ্বৃত্ত থাকিতে পারে এমন আশা করা যায়। আপাততঃ কাগজগুলি এই ঠিকানাতেই পাঠাইবেন। এখানে আমার সঙ্কলনকারী দুই একটি আছে।

কাল জ্ঞানে[১]র হাত দিয়া আমার জীবনস্মৃতির কাপি আপনার কাছে পাঠাইয়াছি, বোধ হয় পাইয়াছেন। আশা করি আমার এই লেখাটিতে আমার শত্রু-মিত্র কোনো পক্ষকেই উত্তেজিত করিয়া তুলিবে না। যে পর্য্যন্ত পাঠাইয়াছি ইহার পরেও আরো খানিকটা লেখা আছে। তাহাতে ক্রমশ অধিক করিয়া আমার রচনার কথা আসিয়া পড়িয়াছে। আর একবার সংশোধন করিয়া লিখিয়া তাহার পরে বিবেচনা করা যাইবে সে অংশটা বাহির করা চলিবে কিনা। ইতি ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদা
নদীয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আজ সেই নিবেদিতা সম্বন্ধীয় লেখাটা শেষ করিয়াছি—যদি সময় থাকে তবে আজই পাঠাইব কিন্তু রেজিষ্ট্রি করিবার অবসর যদি না পাওয়া যায় তবে মঙ্গলবারে পাইবেন। নিতান্ত ছোট হইবে না প্রায় এক ফর্ম্মা হইবে।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। সেই যে পুস্তিকা প্রকাশের প্রস্তাব করিয়াছিলাম সে সম্বন্ধে আমার ইচ্ছার উপর লেশমাত্র নির্ভর করিবেন না। যে সকল প্রবন্ধ জনসমাজের বিচারবুদ্ধিকে আঘাত করিয়া উদ্বোধিত করিবার উদ্দেশে লিখিত সেগুলি এইভাবে প্রচার করিলে যদি কোনো উপকার প্রত্যাশা করেন তবেই চেষ্টা করিবেন। আর একটি কথা মনে রাখিবেন আপনি নিজে যে প্রবন্ধগুলিকে যোগ্য মনে করিবেন সেইগুলিই ছাপিবেন। আমি এ সম্বন্ধে কোনো বিচার করিতে পারিব না। আপনার মনে যেটা ভাল লাগিবে অর্থাৎ যাহাতে কোনো উপকারের সম্ভাবনা বুঝিবেন সেইটেই নিজের দায়িত্বে আপনি এইরূপ ছাপিবেন। আমার সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধেই আপনার এই অধিকার রহিল—যাহা প্রবাসীতে বাহির হইবে বা যাহা অন্যত্র।

কিন্তু আপনি লেশমাত্র সঙ্কোচ মনে রাখিবেন না। আপনি যদি কোনো প্রবন্ধ ত্যাগ করেন তবে আমি তাহাতে কিছুমাত্র রাগ করিব না।

নিবেদিতা আমার "কাবুলিওয়ালা"র যে ইংরেজি তর্জ্জমা করিয়াছেন তাহার পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। আপনি জগদীশের কাছে সন্ধান লইবেন।

Mrs. Shomeকে আপনি বোধ হয় জানেন। তাঁহারই এক কন্যাকে বৌমার শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিবার কথা চলিতেছে—যদি তাঁহাকে না পাওয়া যায় তবে আপনাকে জানাইব। ইতি ১৮ই কার্ত্তিক ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ওঁ

বোলপুর

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বিদ্যালয়ের জন্য একটি অধ্যক্ষসভা স্থাপনের প্রস্তাব আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। আপনি ছাড়া আর কাহারও নাম মনে পড়িতেছে না। আপনার সঙ্গে রথীন্দ্র[৮] ও সুরেন্দ্র[৯]কে স্থান দেওয়া যাইতে পারে—কেননা তাঁহাদের দুই জনের কাছ হইতে বিপদে আপদে অর্থের প্রত্যাশা করা যাইতে পারিবে।

আমি এখানে থাকিতে থাকিতে আপনি কি দুই-এক দিনের জন্য এখানে আসিবার অবসর করিতে পারিবেন? আমি বোধ হয় আগামী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত থাকিতে পারি। একবার যদি আসা সম্ভব হয় তবে আর্থিক ও অন্যান্য অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন। যদি ব্যাঘাত না থাকে তবে কবে আসিতে পারেন জানাইবেন। ইতি ২৬শে মাঘ ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদা
নদীয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

জীবনস্মৃতির প্রুফ্ না হউক ফাইলটা আমার কাছে পাঠাইবেন কেননা কিছু কিছু বাড়ান চলিতেছে। আমার মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল—আর ২০।২২ দিন লিখিতে পাইব ইহার মধ্যে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া দিয়া যাইতে হইবে। অতএব আপনি যদি "জীবনস্মৃতি"র সমস্ত কাপি আমার কাছে রেজিষ্ট্রি করিয়া পাঠান তবে তাহার উপর শেষ তুলির পোঁচ দিয়া সমস্তটা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। সীতা[১০]র ইচ্ছা জীবনস্মৃতি আরো খানিকটা অগ্রসর করিয়া দিই—তাহাও নিতান্ত অসম্ভব নহে অতএব কাপিগুলা একবার শীঘ্র করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ইতি ৮ই ফাল্গুন ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আজ প্রুফ্ পাইলাম। ইহার শেষ প্যারাগ্রাফটায় কিছু যোগ করিয়া দিতে হইবে। আজই তাড়াতাড়ি লেখার সুবিধা হইল না, কারণ হাতে এখন একটা অন্য লেখার উপসর্গ আছে। "ভগ্নহৃদয়" শীর্ষক এই প্যারাগ্রাফটি বৈশাখের কিস্তিতে চালাইয়া দিবেন। সেই হইলেই ঠিক ভাল হয়—চৈত্রের শেষে ওটা ঠিক সঙ্গত হয় নাই—তাই এই প্যারাগ্রাফটা কাটিয়া রাখিলাম।

সেই বইটার নাম "পাঠসঞ্চয়" দিলে কেমন হয়? যে প্রবন্ধগুলি পাঠাইয়াছি তাহার মধ্যে কোনোটা যদি অনুপযুক্ত মনে করেন তবে বাদ দিয়া দিবেন।

"জীবনস্মৃতি"র শেষের কথাগুলা মোটামুটি ভাবে লিখিয়া ফেলিতে ইচ্ছা আছে। কিন্তু মেয়াদ ফুরাইয়া আসিল—ছুটি আর ত বাকি নাই! এই কয় দিনের মধ্যে কতটুকুই বা লিখিতে পারিব? বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে একটা বড় প্রবন্ধ লিখিতে হাত দিয়াছি—এটা লিখিতে সময় যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি। দেখা যাক কতদূর কি হইয়া দাঁড়ায়। ইতি ১৩ই ফাল্গুন ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

পাঠসঞ্চয় লইয়া ত বিপদে পড়া গেল। গ্রন্থাবলী ঘাঁটিয়া ছেলেদের উপযোগী আর একটি প্রবন্ধও পাওয়া গেল না। এক্ষণে আমার প্রস্তাব এই যে, প্রবাসীতে কয়েক বৎসর ধরিয়া যে সকল সঙ্কলন চলিয়াছে তাহার মধ্য হইতে আমার লেখা এবং মীরা[১১]র ও হেমলতা[১২] বৌমার লেখা হইতে বাছিয়া যতগুলা প্রবন্ধ উপযুক্ত বোধ করেন জুড়িয়া দিবেন। সেই প্রবাসীগুলি হাতের কাছে থাকিলে নিজেই দেখিয়া দিতাম। স্মরণশক্তির অবস্থাও এমন যে কখন কি লিখিয়াছি তাহা মনেও নাই। শিক্ষা সম্বন্ধে আমেরিকার দুই একটা ইস্কুল সম্বন্ধে কিছু যেন লিখিয়াছিলাম। এমন আরো কিছু না কিছু পাওয়া যাইবে। ইহাতে যদি না কুলায় তবে আর ত উপায় দেখি না। তাহা হইলে অগত্যা প্রাইভেট পড়ার জন্যই এই পাঠসঞ্চয়টা তৈরি করিতে হইবে।

আমার প্রবন্ধ পাঠ সভায় সভাপতি কে হইবেন সেটা বিচার করিয়া স্থির করিবেন। আশু[১৩]র কথা ত পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—আশু মুখুয্যে মশায়ের কথাও চিন্তা করিয়া

৮। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৯। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১০। শ্রীসীতা দেবী।
১১। কন্যা শ্রীমীরা দেবী।
১২। শ্রীহেমলতা ঠাকুর।
১৩। আশুতোষ চৌধুরী।

দেখিবেন—তিনিও ত বিচারক মানুষ। অবশ্য আমার মতামত তাঁহার কাছে কেমন ঠেকিবে তাহা জানি না। সভাপতির হাতে যেরূপ ক্ষমতা আছে তাহাতে সমস্ত বক্তৃতার মাথায় ঘোল ঢালিয়া দিয়া তিনি অক্ষত শরীরে বাড়ি চলিয়া যাইতে পারেন এইটেই ভাবনার কথা। যাঁহার কথার জবাব চলে তাঁহাকে ভয় করা কাপুরুষতা, কিন্তু সভাপতি যদি বিমুখ হন তবে সভার শেষ মুহূর্ত্তটা রামমোহন রায়ের গানের "শেষের সে দিন" এর মতই ভয়ঙ্কর—কারণ তখন "অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।"

আগামী সোমবার চাটগাঁ মেলে কলিকাতা যাওয়া স্থির করিয়াছি। দেখা হইলে সকল কথা আলোচনা হইবে। ইতি ২৪শে ফাল্গুন ১৩১৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদা

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

কয়েকদিন থেকে আবার অসুস্থ বোধ করচি। জীবনস্মৃতি শ্রাবণের কিস্তিতে শেষ করে দিয়েছি—দেখলুম আর লেখবার সময়ও পাব না—ক্রমে জটিলতার অরণ্য ভেদ করে কলমও চলবে না।

লোকেন[১৪]কে লিখে দেখব। আজকাল সে লেখায় অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছে বলে কি হয় বলা যায় না।

এখান থেকে ৭ই জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় ও বোধ হয় ১০ই বোম্বাই রওনা হব।

শান্তা ও সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবেন। সীতাকে বলবেন শ্রাবণের জীবনস্মৃতির পাণ্ডুলিপিটা তাঁর কাছেই পাঠাব—সেটা আর এক ব্যক্তির দ্বারা কাপি করিয়ে নিয়েছি। ইতি ৩০শে বৈশাখ ১৩১৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আমি ছাত্রদের এই প্রবন্ধটা বাংলা হইতে ইংরেজি করিয়া মুখে মুখে বলিয়া যাইতেছিলাম এণ্ড্রুজ লিখিয়া লইতেছিলেন। তারপরে সেইটেকে দুরস্ত করিয়া তিনি লিখিয়া দিলে আমি আবার তাহার উপর কিছু কারিগরি করিয়া তবে জিনিষটা দাঁড়াইয়াছে।

জীবনস্মৃতির তর্জ্জমাটার প্রুফ কাল সংশোধন করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেটা পাইয়া থাকিবেন। মাঝে মাঝে সুরেন[১৫] দুই-এক জায়গায় ছাড়িয়া দিয়াছিল সেইগুলো পূরণ করিয়াছি দু-এক জায়গায় কিছু বদল করিতেও হইয়াছে।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

এখন হইতে আমার ঠিকানা
C/o Prof. Seymour.
Urbana.
Illinois
U.S.A.

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা আপনার পত্রে বিস্তারিতরূপে জানিতে পারিলাম।

আমার মনে হয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজন জানাইয়া অভিভাবকদের নিকট মাসিক আরো দুই টাকা বেতন দাবি করার সময় আসিয়াছে। ইহাতে সকলেই সম্মত না হইতে পারেন কিন্তু যাহাদের অবস্থা ভাল তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। বর্ত্তমানে যে সকল ছাত্র আছে তাহাদের অভিভাবকেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ২০৲ টাকা বেতন যদি না দেন তবে তাহাদিগকে রাখিতেই হইবে কিন্তু ভবিষ্যতে ২০৲ টাকার কমে ছাত্র লওয়া হইবে না এইরূপ নিয়ম করা অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে।

বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে অধ্যাপকদের বেতন কম করিবার প্রস্তাব করা আমি ঠিক মনে করি না। কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজে হইতে কিছু কি ত্যাগ করিবার কথা বলিতে পারেন না? তাঁহাদের মধ্যে কেহ একজন দৃষ্টান্ত দেখাইলেই পথ সরল হইতে পারে।

আমি জানি না আমাদের বিদ্যালয়ের বেতনের হার অন্যত্র অপেক্ষা বেশি কিনা কিন্তু আমি ইঁহাদের কাহারও কাছে কিছু দাবি করিতে পারি না। ত্যাগ করিবার দাবি একমাত্র আমারই উপর আছে—বিদ্যালয়ের আইডিয়া আমাকেই ডাক দিয়াছিল অতএব যথার্থভাবে আমারই গরজ। যতক্ষণ আমার কিছুমাত্র সামর্থ্য আছে ততক্ষণ আমি অন্যের কাছে হাত পাতিতে পারি না। অতএব বিদ্যালয়ে অনটন যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার মূলে আমারই অপরাধ আছে—সেজন্য আমি অন্যকে দণ্ডনীয় করিব কি করিয়া? অধিক বেতনের অধ্যাপকদিগকে বিদায় করা একটা পন্থা বটে কিন্তু তাহা হইলে প্রাণ নষ্ট করিয়া ব্যয় বাঁচানোর চেষ্টা করা হয়। কারণ তাঁহারাই বিদ্যালয়ের মর্ম্মস্থান অধিকার করিয়া আছেন।

১৪। লোকেন্দ্রনাথ পালিত।

১৫। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যেমন করিয়া হোক একদিন ইহার সমস্ত দায় আমাকেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে একথা মনে মনে ভাবিয়াছি। অবশ্য আমার সামর্থ্যেরও সীমা আছে সে সীমা যে বেশি দূরে তাহা নহে—কারণ, আমি ঋণে মগ্ন। তা ছাড়া আমার আয়ুর চেয়ে বিদ্যালয়ের আয়ু বেশি এই কথাই ধরিয়া লওয়া উচিত—অতএব আমার আয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের আয়কে এক করিয়া দেখিলে এক দিন বিপদ ঘটিবেই।

আসল কথা, যে জিনিষের প্রয়োজনকে সকলে সত্য-ভাবে স্বীকার না করে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচাইয়া রাখা বিড়ম্বনা। যেটুকু আমার শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে বিদ্যালয়ের মধ্যে সেইটুকুই যদি সত্য হয় তবে সেই শক্তির শেষ পর্য্যন্তই চলুক। দেশলাই জলে বাতিকে জ্বালাইবার জন্য, কিন্তু বাতি যদি না জলে তবে দেশলাইয়ের শেষটুকু পর্য্যন্ত জ্বলুক—ততক্ষণ যতটুকু পথ পার হওয়া যায় ততটুকুই ভাল।

বিদ্যালয়ের আর্থিক সঙ্কটের কথা শুনিয়া দেশে ফিরিবার জন্য আমার মন টলিয়াছিল। কিন্তু আমার এখানকার বন্ধুরা বারম্বার আমাকে আশ্বাস দিতেছেন যে আমার বই ছাপার ভালরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিদ্যালয়ের আয় সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে। সেইজন্য আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু বই বিক্রী করিয়া কিছু পাইব এ কথা বিশ্বাস করিবার ভরসা আমার চলিয়া গিয়াছে।...

আমেরিকা যাইবার প্রস্তাব চলিতেছে। সেখানে কিছু সুবিধা হইতে পারে কিনা দেখিব। কিন্তু ভিক্ষা করিবার বিদ্যা আমি একেবারেই জানি না—এবং দেশের কাজের জন্য বিদেশে ভিক্ষার ঝুলি বাহির করিতে আমার অত্যন্ত লজ্জা করে। অতএব আমার বিশ্বাস ঝুলিটা লুকানোই থাকিবে এবং যখন ফিরিয়া আসিব তখন শূন্য হাতেই ফিরিব।

জোর করিয়া বলিতে পারি না তবে আন্দাজে বলিতে পারি হয় ত হাজার খানেক টাকা নূতন বাড়ি তৈরি করিবার জন্য পাঠাইতেও পারি কিন্তু তাহাতেই কি সমস্যা পূরণ হইবে? অন্তর্যামী যিনি অন্তরে বসিয়া বাহিরে ফল দিয়া থাকেন তিনি দেখিতেছেন আমাদের তপস্যা সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। তিনি মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিয়া বাঁচাইয়া রাখিবেন না। যাহার আয়ু নাই তাহাকে মরিতে দিতেই হইবে। বাহিরে যে টানাটানি দেখিতেছেন সেটা অন্তরের টানাটানির বাহ্য লক্ষণ মাত্র। বাহির হইতে জোড়াতাড়া দিয়া একটা ইস্কুলকে খাড়া করিয়া রাখা চলে কারণ তাহা প্রাণের জিনিষ নহে কিন্তু আশ্রমকে বাঁচাইয়া রাখা চলে না। অতএব যদি সামর্থ্য না থাকে তবে লোভ করিব না—আমাকে জবাব দিলেও তাঁহার সেবকের অভাব ঘটিবে না এই কথাই মনকে বুঝাইয়াছি। ইতি ২১শে আশ্বিন, ১৩১৯

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদা

নদীয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু,—

চোখের বালি ইংরেজিতে তর্জ্জমা করা আমার পক্ষে বড় কঠিন। অন্তত এ কাজ করিতে আমার বিস্তর সময় লাগিবে। Anderson[১৬] চোখের বালির বিশেষ ভক্ত—তিনি ঐ বইয়ের সমালোচনা উপলক্ষ্যে উহার একটি অংশ তর্জ্জমা করিয়াছিলেন সেটুকু সুন্দর হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস তাঁহাকে অনুরোধ করিলে তিনি রাজি হইবেন। ইংরেজি করিতে হইলে যে যে অংশ বাদ দেওয়া দরকার তাহা আমি দেখিয়া ঠিক করিয়া দিতে পারি। এবং তাঁহার তর্জ্জমা হইলেও আমি একবার দেখিয়া ঠিক করিয়া দিলে তাঁহার বুঝিবার ভুলের ত্রুটি সংশোধন হইতে পারিবে।

আপনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের জন্য যে তিনটি ছাত্রের কথা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে তৃতীয়টিকে ছাড়া অন্য কাহাকেও লওয়া সঙ্গত হইবে না। স্থানাভাব ঘটিয়াছে, এ স্থলে অধিক বয়সের ছাত্র লইয়া ছোট ছেলে-দের স্থান জুড়িয়া ফেলা আমাদের পক্ষে সকল প্রকারেই ক্ষতিকর। চতুর্থ শ্রেণীতেও বাহিরের ছাত্র লওয়া আমাদের অনভিমত—কারণ তাহাতে আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর অনিষ্ট হয়—অন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের অধ্যাপনার পার্থক্য থাকাতে বাহিরের ছাত্রকে মাঝখানে লইলে আমাদের কাজ বাড়িয়া যায় ও অন্য ছাত্রদের ক্ষতি ঘটে—এই জন্য উমাপদ বাবুর দৌহিত্রটিকে বিদ্যালয়ে লওয়া সম্বন্ধে অধ্যাপকদের সম্মতি পাওয়া কঠিন হইবে। এই সম্বন্ধে তাঁহারা বারবার অনেক দুঃখ পাইয়াছেন বলিয়া বিশেষ সতর্ক হইয়াছেন—বস্তুত বিনা বেতনে ছাত্র লওয়া তেমন গুরুতর বাধা নহে। ইতি ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩২০

ভবদীয়

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬। জে. ডি. এণ্ডার্সন।

বাঙ্গালী-বিহারী বিরোধ

শ্রীনির্ম্মালা দাশগুপ্ত

সাম্প্রদায়িকতার বিষে দেশ আজ এত জর্জ্জরিত আর একটি দুষ্ট ব্যাধি যে ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে সেদিকে লোকের পরিপূর্ণ দৃষ্টি এখনও পড়ে নাই। দেশের নেতৃবর্গও সাম্প্রদায়িকতার ঠেলা সামলাইতে ব্যস্ত। তবু এই নূতন ব্যাধি—প্রাদেশিকতা, এখন এমন পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে প্রতিকারে সচেষ্ট না হইলে দেশ অচিরেই বিপন্ন হইবে। যে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেশবাসী দেখিয়া আসিতেছে, সে স্বপ্ন ধূলায় লুটাইবে

প্রাদেশিকতার মূল কারণ আর্থিক অভাব ; বাঙ্গালী চাকুরী লইয়া নানা প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে সেই সব প্রদেশের অধিবাসীদের মনে এই বলিয়া ক্ষোভ ও ঈর্ষার উদ্রেক হইতেছে যে তাহাদের মুখের গ্রাস বাঙ্গালী কাড়িয়া লইল। প্রাদেশিকতা বাঙ্গালীকে লক্ষ্য করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছে, যেহেতু সে চাকুরীজীবী। বাঙ্গালী নিজের প্রদেশ ছাড়িয়া অন্য প্রদেশের চাকুরীতেও হাত বাড়াইয়াছে। মাড়ওয়ারী, কচ্ছি, বোম্বাইওয়ালা ইহারা প্রতি বৎসর বিভিন্ন প্রদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ,কোটি কোটি টাকা লইয়া যায় তবু তাহাদের লইয়া বিরোধ নাই ; তাহারা যে ব্যবসায়ী। তাহারা ব্যবসা করিয়া টাকা লইতেছে, তেমনি তাহাদের ব্যবসায়ে সেই সেই প্রদেশের লোকেরাও কাজে লাগিতেছে। তাহা ছাড়া ব্যবসা চাকুরীর মত সহজও নয়। সেইজন্য চাকুরীগতপ্রাণ বাঙ্গালীরাই এই বিরোধের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে।

যুদ্ধের সময় বহু নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই জন্য প্রাদেশিকতাও চাপা পড়িয়াছিল। যুদ্ধশেষে বেকার-সমস্যা বাড়িয়াছে, সেই সঙ্গে প্রাদেশিকতার তীব্রতাও দেখা দিয়াছে।

ইহার উপর বিহার ও আসামের লোকদের কতকটা 'ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স' বা হীনমন্যতা আছে। বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তার জন্য তাহারা তাহাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখে। তাহারা মনে করে 'বিহার বিহারীদের জন্য' 'আসাম আসামবাসীর জন্য'—এইরূপ রক্ষা-কবচ না থাকিলে জীবন-যুদ্ধে বাঙ্গালীর নিকট তাহারা হারিয়া যাইবে।

সম্প্রতি জামশেদপুরের ব্যাপার লইয়া তীব্র আলোচনা চলিতেছে এবং নূতন করিয়া আন্দোলন গড়িয়া উঠিতেছে। তবু এ আন্দোলন নূতন নয়। বিহারে বিগত কংগ্রেস মন্ত্রিত্বের সময়ই প্রাদেশিকতা প্রথম সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। মন্ত্রীরা ক্ষমতা হাতে পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে প্রতিকূল আচরণ সুরু করেন। চাকুরী, চাকুরীতে পদোন্নতি, কনট্রাক্ট, স্কুল কলেজে বৃত্তি—সর্ব্ববিষয়েই বাঙ্গালীকে দমন করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়।

এই দমন-নীতির বিরুদ্ধেই ১৯৩৭ সালে বিহারে বাঙ্গালী সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিকতা দূর করিয়া জাতীয়তাবাদ প্রচার করা এবং বিহারে প্রাদেশিকতার প্রকোপে পড়িয়া বাঙ্গালীরা যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য বাঙ্গালীর সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় উন্নতির জন্য চেষ্টা করা। সমিতির কাজ বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই, যদিও সমিতি এখনও বর্ত্তমান আছে। বহু উচ্চ আদর্শ থাকিলেও ইহার কার্য্যক্ষেত্র চাকুরী ও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট লইয়া আন্দোলনেই সীমাবদ্ধ ছিল। বাঙ্গালীদের নিজেদের যে সমস্ত দোষত্রুটি আছে সে বিষয়েও সমিতির লোকেরা বা সাধারণভাবে বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীরা মোটেই সজাগ ছিলেন না।

স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে বিহারে এই বাঙ্গালী বিদ্বেষের জন্য বাঙ্গালীরাও কতক অংশে দায়ী। বিহারীদের তাহারা কখনও সমচক্ষে দেখে নাই ; বরং বরাবরই অবজ্ঞার চোখে দেখিয়াছে। পূজাপার্ব্বণ, উৎসবাদিতে বাঙ্গালীরা সাধারণতঃ বিহারীদের আমন্ত্রণ জানায় না। বিহারীদের সহিত মেলা-মেশায় তাহাদের বিশেষ আগ্রহ নাই। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমও আছে তবে সাধারণতঃ এইরূপই দেখা যায়। বিহারে অনেক শহরেই 'বাঙ্গালী পাড়া' নামে পল্লী আছে। বাঙ্গালীরা শহরের নানাস্থানে থাকিলেও এই বাঙ্গালী পাড়াতেই অধিক সংখ্যায় থাকে। ভাষা ও সংস্কৃতিগত মিল যেখানে আছে সেখানেই ঘনিষ্ঠ হইয়া থাকা মানুষের স্বভাব, সুতরাং বাঙ্গালীদের এই একত্র-বাস-প্রীতিতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু এই ভাবে এক জায়গায় দলবদ্ধ হইয়া থাকিয়া বাঙ্গালীরা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মেলামেশা, সামাজিকতা স্বীয় সমাজেই নিবদ্ধ রহিয়াছে। বিহারী-সমাজ হইতে তাহারা দূরেই রহিয়া গিয়াছে। বিহারীরা বাঙ্গালীর এই আত্মকেন্দ্রিকতা ভুলিতে পারে নাই। তাহারা ভুলিতে পারে না যে, বাঙ্গালীরা তাহাদের মধ্যে থাকিয়াও দূরে রহিয়াছে। বাঙ্গালী সমিতির দৃষ্টি এই দিকে পড়ে নাই। বিহারে থাকিয়া শুধু বাঙ্গালীদের স্বার্থ দেখিলে বিহারীদের সহানুভূতি ও সমর্থন পাওয়া যাইবে না। 'বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী না বাঁচাইলে কে বাঁচাইবে'—এই নীতি বাংলা দেশে চলিতে পারে ; কিন্তু বিহারে থাকিয়া শুধু বাঙ্গালীদের বাঁচাইবার চেষ্টা না করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থই দেখা উচিত। বিহারীদের স্বার্থ দেখিবার জন্য বিহারীরাই আছে সত্য, তবু বাঙ্গালীদেরও এ বিষয়ে সহযোগিতা দেখিলে বিহার বুঝিবে বাঙ্গালী তাহার পর নয়, আপন।

এই যে বাঙ্গালী-বিরোধ কংগ্রেস মন্ত্রীদের আমলে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল. যুদ্ধের সময় ইহা মন্দীভূত হয়। যুদ্ধের মধ্যে বহু নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হইয়া বেকার-সমস্যা কমিয়া গিয়াছিল, সেইজন্য প্রাদেশিকতাও চাপা পড়িয়াছিল। যুদ্ধশেষে বেকার সমস্যা এবং সেই সঙ্গে প্রাদেশিকতাও বাড়িয়াছে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাদেশিকতার জন্য দায়ী আমাদের আর্থিক অবস্থা।

যুদ্ধান্তে বেকার-সমস্যা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বিহার ভয় পাইতেছে যে, ভবিষ্যতে এই সমস্যা আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিবে। সেই জন্য কোন চাকুরীই বাঙ্গালী পাইলে সে ভাবে একটি বিহারী যুবকের বিষম ক্ষতি হইল। এই বেকার-সমস্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিকতা ক্রমেই তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে। জামশেদপুরের ঘটনা ত বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে বিহারীদের সংগ্রাম চালাইবার উপলক্ষ্য মাত্র। যে বিদ্বেষ বহু দিন ধরিয়া সঞ্চিত হইতেছিল তাহা এই সুযোগে ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

জামশেদপুরে বাঙ্গালী সমিতি যে দাবি উত্থাপন করিয়াছিল তাহা অযৌক্তিক নয়। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠন করা কংগ্রেসেরই অভিপ্রায়। সেই নীতি অনুযায়ী বিহারের বাংলাভাষী মানভূম ও সিংভূম অঞ্চল বাংলাদেশে ফিরাইয়া দেওয়া হউক—এই ছিল বাঙ্গালী সমিতির দাবি। বিশেষতঃ এই অঞ্চল পূর্ব্বে বাংলাদেশেরই অন্তর্গত ছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট এইগুলিকে বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিহারের অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং এই সব অঞ্চলে যে সকল বাঙ্গালী আছে তাহারা আপনা হইতেই বিহারবাসী হইয়া পড়িল। তাহারা বাহির হইতে বিহারে আসে নাই। ভৌগোলিক সীমা অনুযায়ীই তাহারা বিহারী। তথাপি ইহাদের জন্যও ডোমিসাইল সার্টিফিকেট চাই এবং চাকুরী, শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারেও বিহারীদের সহিত তাহাদের তারতম্য করা হয়। ইহা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। একদিকে তাহাদের জোর করিয়া 'বিহারী' করা হইয়াছে, কিন্তু অন্যদিকে বিহারীদের প্রাপ্য সুখ-সুবিধা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে।

কিন্তু বাঙ্গালীদের এই দাবি পূর্ণ করা হইলে বিহারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে। সিংভূম, মানভূম খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ। একে ত বিহার খাদ্য-বিষয়ে ঘাটতি-প্রদেশ। ইহার উপর এই খনিজ সম্পদও যদি তাহার চলিয়া যায় তাহা হইলে বিহারের অস্তিত্ব নামমাত্র হইয়া পড়িবে। এইজন্যই বিহার এই আন্দোলনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙালীদের বিরুদ্ধে বিহারীদের এই সংগ্রাম এখনও চলিতেছে। কাগজে-কলমে কঠোরতার কিছু হ্রাস হইলেও আসলে কিছুই হয় নাই। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল ডোমিসাইল সার্টিফিকেট পাইতে হইলে বিহারে জমি বা বাড়ি অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি থাকা চাই। এমন কি ভগিনীর বাংলা দেশে বিবাহ হইয়াছে কি না সে খবরও লওয়া হইত। অথচ ১৯১২ সালে বিহার বাংলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর যে সব বাঙ্গালীকে বিহারে সরকারী কার্য্যব্যপদেশে রাখা হইয়াছিল তাহাদের সকলের বাড়ী তৈরি করিবার সঙ্গতি ছিল না। বর্ত্তমান নিয়ম এই যে, বিহারে জন্ম বা দশ বৎসর বাস হইলেই ডোমিসাইলড্ হইবে। কিন্তু ডোমিসাইলড্ হইলেও বিহারে বাঙ্গালীর চাকরী পাইবার সম্ভাবনা ক্রমেই হ্রাস পাইয়া আসিতেছে।

বাঙ্গালীর প্রতি অবিচারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতেছে। বিহারে পঁচিশ বৎসর আছেন এমন বাঙ্গালী ডাক্তারের এক ছেলে ডোমিসাইলড্ সার্টিফিকেট পান নাই। অথচ এই ছেলেটির বিহারে জন্ম ও বিহারে বিশ বৎসরের উপর কাটিয়াছে এবং বিহারে তাহাদের বাড়ীও তৈরি হইতেছে।

দ্বিতীয়, এই বৎসরই এক বিহারী মহিলা বিহারে সুযোগের অভাবে কাশী হইতে ডোমেষ্টিক সায়েন্স (ঘরকন্না বিদ্যা) পাশ করিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে যে বাঙ্গালী মহিলাটি গত চার-পাঁচ বৎসর ধরিয়া পাটনায় মেয়েদের কলেজে উক্ত বিষয়টি পড়াইতেন তাঁহার চাকুরী গেল। বিহারী মহিলাটি সেই স্থলে নিযুক্ত হইয়াছেন। উপযুক্ত বিহারী পাওয়া গেলেই তাহার জন্য বাঙ্গালীকে স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করা হয়—এইরূপ দৃষ্টান্ত বিহারে বিরল নয়। ছাড়াইবার ওজুহাত একটা দেখানো হয় অবশ্য।

শুধু চাকুরীক্ষেত্রেই নহে, শিক্ষাক্ষেত্রেও যে এইরূপ প্রাদেশিকতা আত্মপ্রকাশ করিতেছে তাহা অত্যন্ত লজ্জাজনক ও শোচনীয়। এ বৎসর বিহারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম দশটি স্থানের মধ্যে আটটিই বাঙ্গালীরা অধিকার করিয়াছিল। মাতৃভাষায় ইতিহাস ভূগোল পরীক্ষা হওয়ায় বাঙ্গালী পরীক্ষকেরা বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে অধিক নম্বর দিয়াছেন এই সন্দেহ করিয়া পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকের স্ক্রুটিনি বোর্ড ইতিহাসের খাতা পরীক্ষকদের কাছে পুনরায় পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দেন। এই সকল খাতা পাঠাইবার আগে বাঙ্গালী প্রধান পরীক্ষককে একবার জানানোও আবশ্যক মনে করে নাই—তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করা ত দূরের কথা। এই যে সন্দেহ ও অপমান তাহা শুধু পরীক্ষকের নয়, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির।

এই বাঙ্গালী-বিহারী বিরোধের অবসান কিসে? ইতিপূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে প্রধান কারণ আর্থিক। দেশের আর্থিক অবস্থা এমন ভাবে ঢালিয়া নূতন করিয়া সাজিতে হইবে যে লোকের অভাব অনটন থাকিবে না। তাহা হইলে এই বিরোধ দূর হইতে পারে। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। লোকের অন্নবস্ত্রের অভাব থাকিলেই তাহারা অন্যের উপর বিরূপ হইয়া উঠে, ভাবে যে অপরেই তাহাদের বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। যেদিন অন্ন, বস্ত্র ও শিক্ষা সকলেরই নিকট সুলভ হইবে সেদিন প্রদেশে প্রদেশে এত রেষারেষি থাকিবে না। তবে সেদিন কবে আসিবে কেহ বলিতে পারে না।

বর্ত্তমানে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি—যদিও আংশিক। এই সন্ধিক্ষণে পরস্পর কলহ করিলেই সকলেরই সর্ব্বনাশ। খাদ্য ও বস্ত্রের অভাবে সকল প্রদেশই দারুণ দুঃখে দিনাতিপাত করিতেছে। প্রাদেশিকতা ভুলিয়া সকল প্রদেশ একযোগে একপ্রাণ হইয়া না চলিলে অখণ্ড স্বাধীন ভারতের আশা স্বপ্নই রহিয়া যাইবে।

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৩

বাড়িতে পা দিতেই হেমলতা একখানা পাঁজি এনে বললেন, এই মাসে কবে ভাল যাত্রার দিন আছে দেখ তো ?

যাত্রার দিন ! কেউ বাপের বাড়ি যাবেন বুঝি ! মার হাত থেকে পাঁজিখান নিয়ে—মলয় উল্টাতে লাগল।

হেমলতা বললেন, আমি তীর্থে যাব। আর তুমি আমাকে নিয়ে যাবে।

ওরে বাপরে—এরই মধ্যে আমার তীর্থে যাবার বয়স হয়েছে !

অতি দুঃখে হেমলতা হেসে ফেললেন।

আমাকে তীর্থে ঘুরিয়ে আনা তোমাদের উচিত নয় ? অথর্ব্ব হয়ে পড়লে ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় ?

মলয় বললে, মেজদাকে চিঠি লেখ—ওসব কাজ সে ভালই পারবে।

হেমলতা গম্ভীর হলেন। বললেন, বলতে গেলে এত বড় সংসারটা তারই ঘাড়ে। সাহেবের আপিসে চাকরী—ছুট বলতে কোথায় নিয়ে যাবে শুনি।

আমিও এবার সাহেবের আপিসে চাকরী নেব মা।

মা হাসলেন না—গম্ভীর স্বরে বললেন, তখন তোমাকে কোন কথা বলব না— এখন তো চল।

রহস্যচ্ছলে কথাটা উড়িয়ে দেওয়া গেল না। মা তীর্থে যাবেনই। শুধু তীর্থ করার আকাঙ্ক্ষা থাকলে নিজেদের অসুবিধাগুলি বড় করে স্নেহাতুর মাকে সে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারত, কিন্তু পুণ্যসঞ্চয় এ ক্ষেত্রে উপলক্ষ মাত্র। মন্ত্র-দাদুর কাছে সন্ন্যাসী-ছেলের বার্ত্তা পেয়ে মার মন ছুটেছে সেই দূর-তম দেশে। যে স্নেহ পুণ্য-সঞ্চয়কে বার বার শ্লেটের লেখার মত মুছে দেয় সেই স্নেহই বাইরে যাবার জন্ত টান দিয়াছে। মা শুনবেন না।

সুচিত্রা বললে, শুধু মা নয় দিদিও কাপড় জামা গোছাচ্ছে।

মলয় বললে, তাহলে আমার সুটকেসটাও আজ রাত্তিরে গুছিয়ে দাও।

তবে যে বললে যাব না ?

না গিয়ে উপায় আছে ? তোমায় তো বলেছি—আলেয়ার পিছনে ছোটা আমার কর্ম্ম নয়। হাঁ করে ভাবছ কি—তীর্থে যাব না—কলকাতায় পালাব।

সুচিত্রা বললে, সব কথা হাল্কা মনে করে উড়িয়ে দাও কেন !—মার ব্যথাটা বোঝ না।

মলয় বললে—বুঝি বলেই ওঁকে তীর্থে নিয়ে যাব না। আশা ভঙ্গ হলে সব মানুষ কি সামলে উঠতে পারে। তখন বিদেশে আমি কি করব বল তো !

সুচিত্রা বললে, সে কথা আমিও ভেবেছি। উপায় ভেবেছ কিছু ?

তারপর দু'জনে উপায় উদ্ভাবন করতে লেগে গেল। একের উপায় অন্যের যুক্তিতে কেটে যেতে লাগল। কোনটা যুক্তিগ্রাহ্য হ'ল না—কোনটা মনে হ'ল ছেলেমানুষি—কোনটা আঘাত দেওয়ার মত পরিত্যক্ত হ'ল।

অবশেষে মলয় বললে, আমার হঠাৎ যদি জ্বর হয় তো ভাল হয়।

সুচিত্রা হেসে বললে, সেটা তো তোমার হাত নয়।

নিশ্চয় আমার হাত। মলয় সোৎসাহে বিছানায় উঠে বসল। জ্বর না হয়ে এমন কোন অসুখও তো হতে পারে যা অন্যের চোখে ধরা পড়ে না অথচ বিছানা ছেড়ে ওঠা নিষেধ। এমন কোন অসুখের নাম কর দিকি ?

সুচিত্রা বললে,—মাকে ঠকানো যেতে পারে কোন অসুখের দোহাই না দিয়েও—কিন্তু সেটা উচিত হবে কি ?

মলয় মাথা নেড়ে বললে, ঠিক বলেছ ; একটু পরে বললে, আজকের রাতটাও বড় কম সময় নয়—

সুচিত্রা বললে, তাহলে আজাদ হিন্দ-ফৌজের গল্প বল।

মলয় বললে, সে তো তুমি কাগজে পড়েছ।

সুচিত্রা বললে, তবু বল।

মলয় বললে, কাবুল থেকে রাশিয়া দিয়ে বার্লিন গেলেন নেতাজী। সেখানে প্রথমে আজাদ হিন্দ দল গড়লেন—সাড়ে তিন হাজারের বেশী লোক পাওয়া গেল না।—পাওয়া যাবে কোথেকে ! বেনগাজী—এল্-আলেমেন নামে লিবিয়া থেকে যুদ্ধ-বন্দী ভারতীয় যে ক'জনকে পাওয়া গেল—তারাই নাম লেখালে দলে। তারপর জাপানী সাবমেরিন করে নেতাজী এলেন সিঙ্গাপুরে। সেখানে জাপানের সঙ্গে সর্ত্ত করে নতুন করে গড়লেন আজাদী দল। হাজারে হাজারে এল মানুষ—লক্ষ লক্ষ উঠল টাকা।

অদ্ভুত জীবন, অদ্ভুত তাঁর কর্ম্মপ্রণালী আর তেমনি বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র। ইংরেজের নজরবন্দী থেকে পলায়নকাহিনী কি কম বৈচিত্র্যবহুল ! কোথায় কাবুল, কোথায় বার্লিন—সিঙ্গাপুর টোকিও—সাইগন—ও রেঙ্গুন। তাঁরই আজাদী দল দুশো বছরের পরাধীন ভারতের মাটিতে নতুন করে বুনলে স্বাধীনতার বীজ। ইম্ফালের মৃত্তিকায় স্বাধীন বীরের দল দিয়ে এল সমুদ্রের জোয়ার—যার আঘাতে আজও কেঁপে উঠছে এর

মাটি—আর আকাশ। যে মানুষ চল্লিশ কোটি মানুষের বুকে জীবন এনে দেয়—তাঁর মৃত্যু ঘোষণা করবে বিশ্বে এমন দুঃসাহসিক কে আছে।

গল্প শেষ হ'ল—নিস্তব্ধ রাত্রির প্রহরগুলি শূন্য পথে চলে যেতে যেতে সুচিত্রার জানালার ধারে নির্ব্বাক বিস্ময়ে খানিক উঁকি দিয়ে গেল। সময়ের স্রোতে তারা ভেসেই চলেছে। তারা ভেসে যেতে যেতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে কোথাও—কোথাও অনুরাগলিপ্ত আরক্ত কপোলের মত সুকুমার—কোথাও বা বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ মেঘের গায়ে অগ্নি-তরবারির আঘাত করছে। কোন হৃদয়ে আনন্দ-উত্তেজনা—কারো কর্ম্মে প্রেরণা—কারো কল্পনায় মহত্ত্ব—কারো জ্ঞানের বর্ত্তিকায় একটি নতুন শিখা জ্বেলে দিতে দিতে চলেছে তারা। বর্ত্তমান বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অতীতকে এক অনাগত কালের সমুদ্রসমীপে।

প্রহর ঘোষণা করে শৃগাল ডেকে উঠল—গ্রামের প্রান্তে।

চমকে উঠে সুচিত্রা বললে, ঘুমোও।

মলয় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললে, ঘুম আসছে না।

জর নয়—এক অভাবিত ঘটনা মলয়কে তীর্থ যাত্রার দায় থেকে উদ্ধার করলে।

সকাল থেকেই গোছগাছ আরম্ভ হয়েছে। যাই বললেই কিছু যাওয়া সম্ভব নয়। সংসারটা শিকড়ে বনস্পতি আঁকড়ে আছে সংসারের মাটি: তার থেকে গুটিয়ে গুছিয়ে নেওয়া দুই-এক দিনের ব্যাপার নয় তো। তবু হেমলতা অনেক কাজ তাড়াতাড়ি সারলেন। রান্না খাওয়ার উপদেশগুলি সংক্ষেপে দিলেন—কাঠ বা কয়লা কোন রীতিতে পোড়ালে অপচয় হয় না—ডাল্‌ তরকারিগুলোর হিসেব করে তেল দিবার প্রণালী কি—গরু দুটিকে ক'বার জাবনা আর ক'বার শুকনো বিচালী দিতে হয়—ছেলেদের সর্দ্দি কাসি ইত্যাদির ওপর নজর রেখে—গরম-ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে স্নান করানো—গৃহদেবতা নারায়ণের জলপানি কাঁচা তসর বা গরদ পরে দেওয়ার বিধান—কোনটাই বাদ গেল না—ভাঁড়ার গুছোতে পুরো একটি দিন যাবে। চাল ডাল মুগ কলাই গুড় চিনি ঘি ময়দা মশলা—এক মাসের মত আলাদা করে- আর ঢেকে চুকে না গেলে খরচ বেশী হবে—ইঁদুরে পোকায় নষ্ট করবে। এসব সেরে ঢেকে রাখা—আন্দাজ মত নেওয়া বাড়া—রোদে দেওয়া···সংসারের ক্ষতি ঠেকানো যে সে গৃহিণীতে পারে না। কথায় বলে না:

আট পিঠে দড়—
তো ঘোড়ার ওপর চড়।

সংসার হচ্ছে তেমনি বড়—চারদিকে চোখ আর হুঁস রেখে চালাতে হয়। এই সব গোছানোর কাজ পুরো দমে চলছে।

বেলা দশটা আন্দাজ মলয় বাজারের দিক থেকে ফিরছিল গাঁয়ের এক ছোকরা বললে, মলয়দা আপনাকে একজন খুঁজছিলেন।

কে?

মনে হ'ল বিদেশী। কুলির মাথায় মোট রয়েছে সঙ্গে একজন স্ত্রীলোকও রয়েছেন দেখলাম — বললেন--বিদেশ থেকে আসছি।

কে এল কোথা থেকে? নিকট বা দূরের বন্ধু অনেকের নাম মনে এল-- কিন্তু তাদের কেউ হঠাৎ খোঁজ করে এই গাঁয়েই বা আসবে কেন।

বাড়ি আসতেই সন্দেহ ভঞ্জন হ'ল। মনীশ—তার কলেজ-বন্ধু; তারপর কর্ম্মক্ষেত্রেও ওরা দু'জনে এক সঙ্গে নেমেছিল। যুদ্ধের মধ্যেই ওদের আলাপ-পরিচয় আবার যুদ্ধের মধ্যেই ছাড়াছাড়ি। এই যুদ্ধে ভারত সম্বন্ধে—ব্রিটিশের নীতি স্পষ্ট রূপ না নেওয়ায় কংগ্রেস যোগ দেয় নি। সুতরাং কংগ্রেস-সেবক হয়ে এদেরও যুদ্ধে যোগ দেবার যুক্তি ছিল না। একদিন মনীশ বললে, যুদ্ধ শেখা আমাদের দরকার।

মলয় বললে, কিন্তু কংগ্রেসের নির্দ্দেশ·

মনীশ হেসে বললে, আত্মানাং সততং রক্ষেৎ---এই নীতিই সবচেয়ে বড়। সে যুদ্ধে নাম লিখিয়ে রেঙ্গুন চলে গেল।

তারপর প্রাচ্যে সুরু হ'ল শ্বেতজাতির ভাগ্যবিপর্য্যয়। ভারতীয় সেনাদলও সেই বিপর্য্যয়ের মুখে পড়ল। কিন্তু তারা ভেসে গেল না। এক শক্তিশালী নেতা তাদের একত্রিত করলেন। এ যুদ্ধের প্রকৃত অর্থ তাঁর কাছ থেকেই তারা জানলে—অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা হয়ে গেল। দিল্লীর লাল কেল্লায় বিচারের সমারোহ করে—কারা প্রচার করলে এই গৌরব কাহিনীকে এক গোলার্দ্ধ থেকে আর এক গোলার্দ্ধে।···এ সব কালেরই বিচিত্র রহস্যে ঘটল। যুদ্ধোত্তর জগতে এশিয়াখণ্ড জেগে উঠল---বিচিত্র জলনাজাল বহুশতাব্দী সঞ্চিত জাড্য তার আর তাকে মোহগ্রস্ত করতে পারছে না। লাল কেল্লায় বিচারপ্রহসন শেষ হ'ল---বন্দীরা অধিকাংশই মুক্তি পেলেন··· মনীশও মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছিল কলকাতায়। এসব মার্চ্চ মাসের কথা। তার পর সে চলে যায়---পশ্চিম বঙ্গের কোন একটি জেলা-শহরে। ঝাঁসীর রাণী দলের অনুকরণে মেয়েদের সামরিক শিক্ষা দেবার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন সেখানকার কংগ্রেসকর্ম্মীরা। তাঁদের নির্দ্দেশ সে মেনে নেয়। জাতীয় সৈনিক হওয়ার সুবিধাটুকু এই যে বিদেশীয় কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শ্রমবিনিময় করার প্রবৃত্তি জাগে না। তাদের দিক থেকে এই সব লোক অবাঞ্ছিত ত বটেই। অথচ জাতীয় সৈনিক বা তার আত্মীয়স্বজনের জীবন রক্ষার দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না। স্বাধীন জাতি হলে---এদের জীবিকা অর্জ্জনের পথ--সসম্মানে খোলা থাকত—কিন্তু স্বাধীনতার দ্বারদেশে পৌঁছলেও---ভারতবর্ষীয়দের সে অধিকার এখনও বর্ত্তায় নি।

সেই জেলা-শহর থেকে হঠাৎ মনীশ কেমই বা এল—আর সঙ্গে নিয়ে এল একটি মেয়েকে—মলয় বুঝতে পারলে না।

সুচিত্রার ব্যবস্থায়—মেয়েটি অন্দর মহলে জায়গা পেয়েছে—মনীশ ইতিমধ্যেই হাত মুখ ধুয়ে এক কাপ চা নিয়ে বসেছে বাইরের ঘরে।

প্রথম পরিচয়সম্বর্দ্ধনা সংক্ষেপেই শেষ হ'ল। মনীশ বললে, আপাতত দুই এক সপ্তাহের জন্য আশ্রয় দিতে হবে।

কেন—এ গাঁয়েও কি ঝাঁসীর রাণী ফৌজ তৈরী হবে?

দরকার হলে হবে বৈকি। আমার কথাটা শোন তবে।

এখন নয়—নাওয়া-খোওয়া আহারাদি কর—

কিন্তু সব না শুনে তুমিও আমাকে আশ্রয় দিতে পারবে কি?

সেটা এমন কিছু গুরুতর কাজ নয়। যিনি আশ্রয় দেবার তিনি ত সব ব্যবস্থা করেছেন।

কিন্তু তিনি জানেন না—

না-ই বা জানলেন--

বাধা দিয়ে মনীশ বললে, যদি কোন গুরুতর অপরাধ করে এখানে এসে থাকি—

গুরুতর অপরাধ করা তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়—যেহেতু তুমি লালকেল্লায় আটক ছিলে।

রাজনৈতিক অপরাধের কথা বলছি না—সামাজিক—

মলয় শব্দ করে হেসে উঠল।

মনীশ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বললে, যদি আমি মেয়েটিকে ইলোপ করে নিয়ে আসি?

মলয় বললে, ইলোপমেণ্ট? মেয়েটি কি সাবালিকা?

আইনকে ভয় করছ ত?

ভয় করছি একটা বিশ্রী ব্যাপার না ঘটে। তোমরা অতিথি—তোমাদের অসম্মান না হয় এটুকু দেখা অন্ততঃ আমার কর্ত্তব্য।

নিজের সামাজিক অসম্মানকে ভয় কর না?

মলয় জবাব না দিয়ে হাসলে। বললে, এক মিনিট—আমি আসছি।

নিজের মনে বিচার সুরু হ'ল, মনে হয় না এরা সামাজিক কোন অপরাধে অপরাধী।

দোতলায় উঠবার মুখে মা ডাকলেন, মলু—শুনে যা তো।

সে এলে বললেন, শুনলাম ছেলেটি তোমার বন্ধু। বউমার সঙ্গে মেয়েটি যখন ওপরে যায় মনে হল সে কাঁদছে। ওর শাশুড়ী কি ওকে খুব যন্ত্রণা দিত?

মলয় বললে, জানি না তো?

মায়ের অনুসন্ধিৎসা পরিতৃপ্ত হ'ল না। বললেন, যাই হোক—ব্যাপারটা ভাল করে জান। একে আমার কপাল মন্দ—অশান্তির ওপর না অশান্তি জোটে।

মলয় বললে, আচ্ছা মা—বউটি শাশুড়ীর অত্যাচারে যদি পালিয়েই আসে—তুমি তাকে জায়গা দেবে না বাড়িতে?

মা বললেন, জায়গা দেব না এমন কথা বলিনি তো—তবে অশান্তি খিটিমিটি এ সব আমি ভালবাসি না। আমার রোগা-ভোগা শরীর—এত হাঙ্গামা পোয়াতে পারব না বাবা।

আচ্ছা জেনে বলব তোমায়। মলয় যাবার উদ্যোগ করতেই তিনি বললেন, জিজ্ঞেস কর বউটির খাওয়া হয়েছে কিনা। আমাদের স্বজাতি তো?

মলয় বললে, বন্ধুটিকে জানি ত স্বজাতি কিন্তু মেয়েটি—

মা বললেন, আর জ্বালাসনে বাপু! একটু চুপ করে থেকে বললেন, তা কথাটা মন্দই বা বলেছি কি! জাত নিয়ে তো তোদের ভারি মাথা ব্যথা! স্বজাতের ঘরে বিয়ে যা হচ্ছে না—এই নিয়েই ত বাপে-ছেলেয়—মায়ে-বৌয়ে এত খেয়োখেয়ি।

মলয় নীরবে সেখান থেকে উঠে গেল। কয়েক বছর আগেকার কথা তার মনে পড়ল। ক্ষুদ্র-স্বার্থের অছিলাতেই—স্বাজাত্যাভিমান যার মনে কি প্রবল হয়ে ওঠে নি? সুচিত্রাকে মানিয়ে নিতে এ সংসারে বেশ বড় রকমের ঢেউ ওঠেনি কি!

সুচিত্রাকে একান্তে পেয়ে সে শুধোলে, ওদের কথা কিছু শুনেছ?

সুচিত্রা বললে, এমন কথা কিছু আছে নাকি?

মনীশ বলছিল কিনা যে আমাদের কথা শুনলে তোমরা হয়ত—

আশ্রয় দেব না! সুচিত্রা সাধারণভাবে কথাটা শেষ করে দিলে।

মলয় অবাক চোখে সুচিত্রার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলে। খানিকক্ষণ পরে বললে, যদি ওরা সামাজিক কোন অন্যায় করে এখানে এসে থাকে---

সে বিচার পরেই করব না হয়।

না না, যদি—মলয় ইতস্ততঃ করলে।

মলয়কে আশ্বস্ত করে সুচিত্রা বলে উঠল, ইলোপমেণ্ট পর্য্যন্ত মেনে নেওয়া যেতে পারে—কি বল?

মলয় ওর হাত চেপে ধরলে, সুচিত্রা তুমি তা হলে সব শুনেছ। আমি ঠাট্টা মনে—

চুপ। ওষ্ঠে তর্জ্জনী চেপে সে চোখের ইঙ্গিত করলে।

মেয়েটি ততক্ষণে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। মলয় ও সুচিত্রাকে একত্রে দেখেও ও থামলে না—অকুণ্ঠিত গতিতে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত্ত কি ভাবলে। তার পর মলয়ের পায়ের কাছে হেঁট হতেই ও বিব্রত ভাবে সরে যাবার চেষ্টা করলে।

মেয়েটি ততক্ষণে ওর পা ছুঁয়ে প্রণাম শেষ করেছে।

সুচিত্রা মুখ টিপে টিপে হাসছিল। বললে, অন্যায় করলে ভাই।

মেয়েটি মুখ তুলে বললে, অন্যায় করলাম দাদা?

এ প্রশ্ন সরাসরি সে মলয়কেই করলে। আর কুণ্ঠা প্রকাশ করলে ওকে অসম্মান করা হবে। কণ্ঠে ওর স্নিগ্ধ করুণ সুর—প্রশ্নের ভঙ্গিতে সুবিচারের প্রত্যাশা। মলয় চোখ তুলে বললে, না—অন্যায় করনি।

দুটি মেয়ে পরস্পরের পানে চেয়ে ইঙ্গিতময় হাসি হাসলে।

মেয়েটি বললে, কোন অন্যায় করে আপনার বাড়িতে ঢুকবার সাহস হ'ত না দাদা। তবুও অনেক কথা বলবার আছে।

আচ্ছা—খাওয়া-দাওয়া হলে সবাই এক সঙ্গে বসে শুনব।

আহারাদি শেষে ওরা চারজনে মলয়ের শোবার ঘরে একত্রিত হ'ল। মলয় আপত্তি করলে, একটু বিশ্রাম কর।

মনীশ বললে, যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে—এবার বস। বউদি আপনাকেও বসতে হবে।

মেয়েটি উঠে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে।

সুচিত্রা বললে, দরজা বন্ধ করার দরকার ছিল না তোমরা রয়েছ, এ ঘরে কেউ আসবেন না।

মেয়েটি বললে, কেউ আমাদের কথা শুনলে কোন ক্ষতি হবে না—তবে ছেলেরা এসে গোল করতে পারে এই ভেবে—। সে অর্গল মুক্ত করবার জন্য এগিয়ে গেল।

সুচিত্রা বললে, থাক—। ঠাকুরপো খুব সংক্ষেপে বলুন। উনি আবার ভাল বা মন্দ কোন কাজেরই ব্যাখ্যা শুনতে ভালবাসেন না।

মলয় বললে, আর তুমি?

হেমলতা ডাকলেন—ছোট বৌমা শোন।

উপর থেকে সন্তর্পণে নেমে এল মন্দাকিনী। বললে—ছোট বউকে এখন ডাকবেন না মা—ওরা চারজনে মিলে দুয়োরে খিল দিয়ে গল্প করছে।

কিসের গল্প?

কি জানি মেয়েটি কেন ওর স্বামীর সঙ্গে চলে এসেছে—সেই গল্পই হবে হয় ত।

হেমলতার মুখখানা চক্ চক্ করে উঠল।

মন্দাকিনী বললে—আপনার দোক্তা দেওয়া পান আর জল—

থাক বাছা—তুমি বরং নীচের ভাঁড়ার গুছিয়ে নাও—আমি একবার ছাদের বিছানাপত্তরগুলো রোদ্দুরে উল্টে দিয়ে আসি।

ছাদে যাবার পথে—সুচিত্রার ঘরের পাশে একবার উঁকি মারলেন। একটু এগিয়ে গেলেন—ওদের ঘরের দিকে। যে কার্নিশ ঢাকা বারান্দাটা ওদের ঘরের উত্তর কোণ ঘেঁসে—সিঁড়ির গোড়ায় মিশেছে—সেইখানে এসে দাঁড়ালেন। দেওয়ালের একটু ওপরে ঘুলঘুলি মত—কিংবা হাওয়া চলাচলের পথও বলা যায়—সেখান দিয়েই ঘরের ভেতরের কথাগুলি অবিচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহে ভেসে আসছে। মনোযোগী শ্রোতার পক্ষে সে ধ্বনির অর্থ উদ্ধার করা কঠিন নয়।

সুতরাং হেমলতা ছাদে যাবার কথা ভুলে গেলেন।

সাধারণত প্রণয়-কাহিনী যেমন হয়ে থাকে, মনীশ-অনিমার গল্পও সেই ধরণের সামাজিক বাধা প্রবল না হোক—অন্ত বাধা ছিল। আই, এন, এ সারা দেশকে দু'শো বছরের ভুলে-যাওয়া অপূর্ব্ব এক বস্তুর আস্বাদ দিয়েছে; অভাবিত জিনিস। এ জিনিস পেয়ে জাতি আত্মসম্মানে প্রতিষ্ঠা লাভ করছে—আশা হচ্ছে তাদের বন্যা মিলিয়ে গেলেও বস্তুর কাঠিন্য লুপ্ত হবে না—হয়ত নতুন জগতের মাঝে—নতুন ভারত নতুন গৌরবে স্থান নেবে—নতুন মানুষরা—নতুন সমাজ বিধিবিধানে অখণ্ড একটি সত্তাকে রূপ দেবেন। কিন্তু আপাততঃ বন্যার বেগ প্রবল। ঢেউ দেখে সবাই উল্লসিত। এ ঢেউ ফিরে গেলেও যে টান গভীরে আকর্ষণ করবে—তার পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন।

মনীশ আই, এন, এর গৌরব নিয়ে ফিরে এলেও—সামাজিক মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সে উপার্জ্জনশীল নয়—পুরাতন সমাজ—তাকে সম্বর্দ্ধনা করলেও—সংসার পরিচালনার দায়িত্ব সে নিতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সংশয়শীল। কাজেই অনিমার সঙ্গে তার মিলনটা জ্ঞাতি গোত্রের দিক দিয়ে না বাধলেও—এই দিক দিয়ে বাধল। ফলে এই ইলোপমেণ্ট। অনাত্মীয় নরনারীর সম্বন্ধ নিয়ে—মানুষের যেমন আলোচনার উৎসাহ নেই—তেমনি সমাজকে সে সন্দেহে শুচিশীল করে। এ শুচিতার অর্থ নিছক পবিত্রতা নয়। যাই হোক এর অর্থ—মনীশ…নিজের প্রবৃত্তির বেগে ভেসে গিয়ে সমাজগর্হিত এমন ধরণের কাজটা করতে পারে—আর এতে আই. এন. এ.-র গৌরব ক্ষুণ্ণ হতে পারে…এটি তার কল্পনাতেই আসে নি। আধখানি মানুষ—আর আধখানি সামাজিক নিষ্ঠা—এমন উপকরণে সে সৃষ্ট নয়। এই ব্যাপারের মূলে যা রয়েছে—সেটি দৈব—আর তাকেই ইলোপমেণ্টের হেতু বলা সঙ্গত।

অনিমাও কম দুঃসাহসী নয়। আগের দিন রাত্রিতে তাদের কথাবার্ত্তায় ঠিক হয়েছিল—দেশসেবাব্রতটিকে মুখ্য করে নিয়ে এই বিচ্ছেদ বেদনা, অনায়াসে না হোক, কর্ত্তব্য ভেবেও গ্রহণ করবে তারা। মনীশ ক্ষেত্রান্তরে গিয়ে—গঠনমূলক কাজ করবে। অনিমা নেবে এখানকার ভার।

তখনও ভোর হয় নি। শুক্লপক্ষের প্রথম দিকের কোন একটি তিথি—শেষ রাত্রের অন্ধকার আকাশ আর গাছের মাথায় জড়িয়ে আছে; সপ্তর্ষি দিকপ্রান্তে হেলে পড়েছে—

ধ্রুবতারার ঠিক নীচের দিকে। নিষুপ্ত গ্রাম। ছ'মাইল গেলে তবে ষ্টেশন পাওয়া যায়। একলা মানুষ—প্রয়োজনীয় বস্তু গুছিয়ে নিতে সময় লাগল না। একটা ব্যাগের মধ্যে সবকিছু নিয়ে পিঠে ঝুলিয়ে দিল ব্যাগটি—তার পর যাত্রা। নিজের পায়ের শব্দ নিষুপ্ত রাজপথে বেজে উঠল। খানিকদূর এসে মনে হ'ল নিজের পায়ের শব্দই। মনে হচ্ছে গম্ভীর রাত্রির বুকে তার মৃদু প্রতিধ্বনি...কখনও দূর থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে—কখনও দূর থেকে এগিয়ে আসছে কাছে। হাঁ—এগিয়েই আসছে—কাছে—আরও কাছে।

অনিমা বললে, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

মনীশ বিস্মিত হ'ল—আনন্দিত হ'ল। মাথার ওপর একটা তারা সহসা খুব জলজ্বল করে কেঁপে উঠল। ওদের মনের খুশী গ্রহের অন্তর স্পর্শ করেছে—তাই দ্যুতিময় হয়ে শিউরে উঠল সে। পুলক শিহরণ।

আত্মবিস্মৃত মুহূর্তে,মনীশ প্রশ্ন করল তবু, এর অর্থ—বোঝ ?

অনিমা মাথা নেড়ে স্বীকার করলে, বাব দা কলঙ্কের কথা। অনিমা এগিয়ে এসে ওর হাত ধরলে। বললে, চল।

তাই চলে এলাম। গল্প শেষ করে মনীশ হাসলে।

সুচিত্রা বললে, ঠাকুরপো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি রাগ করবেন না। লোকাচার রক্ষার দায়টা নিলে কি ভালবাসার অসম্মান হ'ত ?

মনীশ বললে, কোথায় পেলাম সে অবসর। ওতে আপত্তি নেই আমার—না হলেও ক্ষোভ নেই। সমাজের চোখে সমান অপরাধীই থেকে যাব ত।

সুচিত্রা বললে, বিবেকে বাধবে না ?

মনীশ বললে, বাধবে অনিমা ?

অনিমা মুখ ফিরিয়ে নিলে। রাত্রিশেষের তারার আলোয় পথ চলতে চলতে সেই উত্তর কি দেয়নি সে ?

মলয় বললে, যতই দেশপ্রেমের সার্টিফিকেট নিয়ে এস ভাই—সামাজিক লাঞ্ছনা তোমাদের ঘুচবে না।

মনীশ ও অনিমা দু'জনেই মুখ তুলে চাইলে তার দিকে। মলয় বললে, আশা করি সব কিছু সহ্য করবার মনোবল নিয়েই তোমরা—

মনীশ বললে, না ভাই দৈববশে আমরা মিলেছি—দৈবের হাতেই আমাদের দিয়েছি ছেড়ে। অনিমা ট্রেনে আসতে আসতে আমাকে বলছিল যে আকাশের সূর্য্য আর দিঘীর পদ্ম যেমন দৈববশে মেলে—

অনিমা বললে, আপনারা সাহস করেন আমাদের আশ্রয় দিতে ?

মলয় বললে, সুচিত্রা, উত্তর দাও।

সুচিত্রা বললে, সাহস করি। সেই সঙ্গে একটু নিবেদন আছে ভাই। যদি তোমাদের জন্য আমাদের লাঞ্ছনাও ঘটে—তোমরা তোমাদের দোষী মনে করবে না ?

মনীশ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে বললে, আপনার কথায় বড় আনন্দ পেলাম বউদি, সেই সঙ্গে আক্কেলও।

মানে ?

মানে—এতক্ষণ আমাদের লাঞ্ছনার দিকটাই দেখছিলাম—অন্য দিকের কথা ভাবি নি। ঠিকই বলেছেন—অন্যের শান্তি নষ্ট করে নিজের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব না।

আমাদের আপনি আত্মীয় মনে করেন না ?

অনুযোগের উত্তরে মনীশ হাসলে। বললে, মলয়কে জানতাম—আপনার সঙ্গে আজ মাত্র পরিচয় হ'ল। তবু আপনাকে বহুদিনের চেনা বলে মনে হচ্ছে।

মলয় বললে, এই গ্রামেই তোমার প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন কর না।

মনীশ বললে, কিছুদিন যাক। আইন মতে বিয়েটা চুকিয়ে ফেলে—তার পর,—ও কি! চারজনেই চমকে উঠল।

ঘরের বাইরে গুরুভার দ্রব্য পতনের শব্দ হ'ল।

সুচিত্রা বাইরে এল তার পিছনে মলয়। কোথাও কেউ নেই। ওরা সিঁড়ির ধারে এসে দেখল—বহু দিনের পুরনো খাতার একাংশ কোথা থেকে খসিয়ে ঘরের দেওয়ালে কাত হয়ে পড়েছে। বাতাস নেই—ছেলেরাও বারান্দায় খেলা করছে না—অথচ—

সুচিত্রা বললে, ছাদে কেউ নেই ত—দেখে আসি। সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে সে উপরে উঠে গেল।

হেমলতা ভারি তোষকটা দু' হাতে উল্টে দেবার চেষ্টা করছেন দেখে সুচিত্রা তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে এল।

হেমলতা গম্ভীর মুখে বললেন, থাক থাক—আমিই পারব'খন। তোষক উলটে দিয়ে তিনি হাঁপাতে লাগলেন।

সুচিত্রা বললে, আমাদের ভাউকে ডাকলেন না কেন মা ?

তোমাদের ডেকে আমার লাভ! গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন হেমলতা। এই অবেলায় তোষক কাচলে শুকোবে ?

তোষক কাচবেন কেন ?

এত কচি খুকী নও বউমা যে একথা বোঝ না! বলি এটা হিন্দুর বাড়ি এটা মান তো ?

সুচিত্রা স্তম্ভিত হয়ে তাঁর পানে চেয়ে রইল। ক্রোধের আবেগে ঘৃণা প্রকাশটা সহজ হয়ে আসে। হেমলতা শেষ আঘাত হানলেন। আমি তো পা বাড়িয়েই আছি, কিন্তু তোমাদের আক্কেলটা কি ? পরপুরুষের সঙ্গে যে মেয়ে বেরিয়ে আসে—তাকে তোমরা জায়গা দাও কোন্ সাহসে শুনি ?

মলয় ছাদে আসতেই হেমলতা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন, ওদের না তাড়ালে আমি দাঁতে কুটো কাটব না—আত্মহত্যে হব। তোদের এত বড় আসপদ্দা যে—

মাকে প্রবোধ দেওয়া মলয়ের সাধ্যাতীত। মাথা নীচু করে ওরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল।

বারান্দায় পৌঁছে মলয় বললে, ওদের বুঝিয়ে বলো সুচিত্রা, —আমি মুখ দেখাতে পারব না। সে নীচের নেমে গেল।

রাজ্যের লজ্জা মাথায় নিয়ে সুচিত্রা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। থমথমে কয়েকটি মুহূর্তের মাথায় ভর দিয়ে বাতাস হ'ল নিশ্চল।

মনীশ বললে, বউদি আপনাদের দুঃখের জন্ম নিজেদের দায়ী করছি না। এইটেই যে আমরা আশা করেছিলাম। পুরনো সমাজ খোলসের মত জড়িয়ে আছে গায়ে। দেশের গৌরবের আলোয় তার অন্ধকার দূর হবেই—তবে সে দিন আজ নয়।

সুচিত্রা মুখ তুললে না। ওর দু' চোখের কোল সিক্ত হয়ে উঠল।

মণীশ বললে, আমরা কলকাতায় যাব। আজই। আপনার কাছে মাপ চেয়ে আপনার কষ্ট বাড়াব না—তবু একটা কিছু বলা দরকার কেবলই মনে হচ্ছে। আপনাদের কি যে বলব—। দারুণ অস্বস্তিতে ও দু' হাত বুকে চেপে ধরল।

সুচিত্রা এতক্ষণে শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছে। সহজ ভাবে বললে, বেশ ত এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।

মনীশ বললে, যাবেন বইকি—নিশ্চয় যাবেন। আজ নয় বউদি, একটা আশ্রয় ঠিক করি আগে—

ওরা প্রণাম করলে সুচিত্রাকে। মনীশ হাত জোড় ক'রে—অনিমা হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়ে। কাউকে ও নিষেধ করলে না। ক্ষমা চাওয়া—দোষ স্বীকার করা—দু'পক্ষের কাছে ভদ্রতার বাঁধাবুলি আওড়ানো এ সব থাকুক। মানুষ সহজ হলেও আচরণে সরল হতে পারে না। ক্ষমাপ্রার্থনার মধ্যে স্তুতি স্বীকারের ভঙ্গি সব সময়ে শুদ্ধ কি? না, সংসারে স্বাভাবিক নিয়মে যা আসবে—প্রকৃতির বিপর্য্যয়ের মত, তাকেই অক্ষুব্ধ চিত্তে গ্রহণ করতে হবে। তোমার চোখের জল আমার স্নায়ুকেন্দ্রে যদি আঘাত করেই—চোখের জল ফেলেই জানাব সমবেদনা। মুখের ভাষায় বাহুল্য প্রকাশ করে নিজেকে খাটো করব কেন।

সুচিত্রার কাছে বিদায় নিয়ে ওরা নীচেয় নেমে এল এ বাড়িতে আর যেন প্রাণী নেই—আর কারও কাছে বিদায় নিতে গেলে আঘাত না নিয়ে ফিরতে পারবে না

এমন কি মলয় কোথায় এ প্রসঙ্গ মাত্র ওরা উত্থাপন করলে না।

বাইরের দরজার কাছে এসে অনিমা সহসা ফিরে দাঁড়াল। এগিয়ে এসে সুচিত্রার একখানি হাত পরম সমাদরে টেনে নিয়ে বললে, আপনি যাবেন ত দিদি? আমরা চিঠি দেব কিন্তু।

চোখের কোলে অবাধ্য অশ্রুকে আর সামলে রাখা গেল না—সুচিত্রা অশ্রু গোপনের প্রয়াস না করে ধরা গলায় বললে, যাব।

১৪

এই সংসারের মত ভারতের রঙ্গমঞ্চেও ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পালা সুরু হয়েছে। ঠিক স্বাধীনতা নয়—তবে ভারত যাতে সেই পথে দ্রুত অগ্রসর হয়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে তার জন্ম বিলাতের শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রী মিশন পাঠিয়েছেন। তাঁরা একটা কিছু দেবেনই—এই প্রতিজ্ঞা করে ভারতের মাটিতে পা দিয়েছেন। বিভিন্ন দলকে নিয়ে তাঁদের বৈঠক বসল দিল্লীতে। সকাল বিকাল সন্ধ্যায়—বিভিন্ন শ্রেণীর লোক—তা তাঁরা অল্প নামজাদা বা অধিক খ্যাতিসম্পন্ন—নরম, গরম কিংবা মধ্যপন্থী যাই হোন না কেন—সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের সব দলের মাথা-ধরা ব্যক্তিকেও—মহারাজা কিংবা তপশীলী নেতা, সবাইকে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠালেন। লোকে ভাবল ধৈর্য্য বটে এঁদের। সব দলকে এক করে—আলাদা আলাদা তাদের মত নিয়ে সুবিধা-অসুবিধা বুঝে যে শাসনতন্ত্রের খসড়া ছকে দিয়ে যাবেন সর্ব্ব-জাতি-ধর্ম্ম ও মত সমন্বয়ে না জানি সে কি অপূর্ব্ব বস্তুই দাঁড়াবে। বিভিন্ন দলের মত স্বাতন্ত্র্যে বৈঠক টলমল করে উঠল। দিল্লীর গরমে তিষ্ঠুতে না পেরে মন্ত্রীরা গেলেন সিমলায়, সেখানকার ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় মতবিরোধ মিটল না। স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদী শাসনতন্ত্র নিয়ে বাধল গোলমাল। অবশেষে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হ'ল ভারতবর্ষকে—পঞ্জাবের সঙ্গে সীমান্ত আর বেলুচিস্থানের লেজুড় জুড়ে দেওয়া হ'ল—আসামের কাঁধে চাপানো হ'ল বাংলাকে। মন্ত্রী মিশন ঘোষণা করলেন পাকিস্থানের দাবি অযৌক্তিক। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠরা যাতে সংখ্যালঘুদের নস্যাৎ করতে না পারে তার জন্ম যথোচিত রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা রইল। কোন কোন রাজনীতিবিদ বললেন—বাহ্যত পাকিস্থানকে অস্বীকার করে—কার্য্যত গ্রুপের মধ্য দিয়ে তাকে স্বীকার করেই নেয়া হ'ল। ল্যাজা মুড়োয় পাকিস্থানী প্রদেশ সাপটে ধড়টাকে ঢাকের বাদ্যে মোহিত করে দেবার ব্যবস্থা—এ কথাও বললেন কেউ কেউ। স্বল্পমেয়াদী স্কিম বাতিল করলে কংগ্রেস—লীগ দুটোই মেনে নিলে। কিন্তু মন্ত্রীদের জিদ কংগ্রেসকে এর মধ্যে ঢোকাতেই হবে। পনেরই মে-র ঘোষণার ভাষ্য—টীকা ইত্যাদি সুরু হ'ল। কিন্তু ইংরেজী ভাষাটাই এমন যে রবারের মত যতই টেনে দেখা যায়—বিভিন্ন অর্থসম্পদে ততই ওটি প্রসারিত হতে থাকে। প্রদেশসমূহকে এক জোয়ালে জুতলেও—আলাদা হয়ে যাবার ক্ষমতা ওদের থাকবে। তা ছাড়া অনিচ্ছুক কোন প্রদেশের ঘাড়ে বাধ্যতামূলক বিধান চাপানো চলবে না। ইচ্ছে করলে প্রদেশসমূহ গ্রুপিং-এর বাইরে চলে যেতে পারে। কংগ্রেসের মিটিং চলছে ক'দিন ধরে। কি-হয় কি-হয়—এই উত্তেজনাতে বঙ্গদেশের দূর প্রান্তের এক অখ্যাত গ্রামেও তর্ক-আলোচনা চলছে।

কেউ বলছেন, উনিশ শো বিয়াল্লিশের ক্রীপস্ সাহেব

সঙ্গে থাকলেও—এবার হেস্তনেস্ত একটা করবেনই এঁরা। এ, ভি, আলেকজাণ্ডার কাঁদরেল লোক- তাঁর সঙ্গে আছেন ভারত সচিব প্যাথিক লরেন্স। প্যাথিক লরেন্সকে দেখলেই মনে হয়—লোকটা এ দেশেরই একজন—হাসিমুখ—গায়ের রংটাও উগ্র রকমের শাদা নয়, হতে পারে ওটা ফটোগ্রাফির খুঁৎ—কিন্তু ওঁর মুখের হাসিটি যে নিখুঁৎ। ওটি যেন সমবেদনা-জাতীয় হাসি। যাই হোক—ভারতবর্ষ যে পরিবর্ত্তনের মুখে এ বিষয়ে সংশয় নেই।

মলয় ভাবছিল, আজ বাড়ি ফেরা অসম্ভব। মায়ের রোষ কোন্ পথ ধরবে সে জানে না—তবু সে না থাকলে তা হয়ত তেমন উগ্র না-ও হতে পারে। নন্দ-দাদুর ওখানেই রাতটা কাটিয়ে দেয়া যাক না।

বটতলায় খুব হৈ চৈ হচ্ছে। কোন সভা বসেছে—না সভার প্রস্তুতি? জয় হিন্দ — বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শোনা গেল—সেই সঙ্গে বাছা বাছা শ্লোগান।

হঠাৎ কি হ'ল যে ওরা এমন করে আনন্দ প্রকাশ করছে?

কাছে আসতে-না-আসতেই একটি ছেলে লাফিয়ে দল থেকে বেরিয়ে এল, মারদিস্ কেল্লা। মলয়দা—কংগ্রেস লং-টার্ম অ্যাক্সেপ্ট করেছে। এই মাত্র টেলিগ্রাম এল।

মলয় ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। তারপর চলল জল্পনা-কল্পনা তর্ক উচ্ছ্বাস। ভিড়ের মধ্য থেকে যখন বেরিয়ে এল সে—তখন ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের চিন্তায় বাড়ির অপ্রীতি নিঃশেষে মুছে গেছে।

সন্ধ্যার পর সে বাড়িতেই ফিরে এল।

নিস্তব্ধ বাড়ি—নিষ্প্রদীপ। কংগ্রেসের মন্ত্রী-মিশন-প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পর ভারতের বৃহৎ অংশ যেমন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে তেমনি স্তব্ধ হ'ল বাড়িটাকে। মনীশরা গেল কোথায়? সবাই ঘুমিয়েছে কি?

সুচিত্রার ঘরেও আলো নেই—ঘরেও মানুষ নেই—এমনি নিস্তব্ধতা।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ও ঘরের মাঝখান পর্য্যন্ত এসে ডাকলে, ঘুমুলে কি? চিত্রা—

শাড়ির খস্ খস্ শব্দ হ'ল—কে যেন বিছানার ওপর উঠে বসল। দেশলাই খোলার শব্দ—কাঠি ঘষার শব্দ—ফ্যাঁস করে আলো জ্বলে উঠল। শিয়রের কাছে একটা টুলের ওপর মোমবাতি ছিল—সেটা জ্বেলে দিয়ে সুচিত্রা বিছানা থেকে মেঝেয় এসে দাঁড়াল।

অদ্ভুত আলো—এই মোমবাতির। কোমল আধ-আলো আধ-ছায়ায় রহস্যময়। সুচিত্রার ঘুম-ভাঙা চোখে সে আলো পড়ে ওকে গম্ভীর আর বিষণ্ণ বোধ হচ্ছে। মুখখানাও ওর ফুলো ফুলো—অকাল নিদ্রাভঙ্গজনিত কিনা কে জানে।

মনীশ কোথায়?

সুচিত্রা অদ্ভুত চোখে মলয়ের পানে চাইল। মনীশ কোথায় সে কথাটা তার চেয়ে মলয়ই ভাল জানে না? কার পরিচয়ে মনীশ এ বাড়িতে এসেছিলেন?

ও—চলে গেছে বুঝি?

অনেকক্ষণ—তুমি যাবার সঙ্গে সঙ্গেই।

মোমবাতিটা কখনও ম্লান—কখনও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই সুচিত্রাকে। আলোর ম্লান শিখায় কাঁপছে অনিশ্চান। গভীর অস্বস্তিতে স্তব্ধ হয়ে আছে জানালার বাইরে আকাশ—পৃথিবী তমোবসনাবৃতা।

ও কি সুচিত্রার চোখের কোল চকচক্ করছে না? দু' গাল বেয়ে দুটি ধারা নামছে? মোমবাতির কাঁপুনি সুচিত্রার ঠোঁটের কাঁপুনির সঙ্গে মিশে গেল এই মুহূর্তে। মলয় এগিয়ে এল সুচিত্রার দিকে।

সে রাত্রি অন্ধকারেই গভীর হ'ল। বাতাস ভারি নিশ্বাসের মত—আর থেকে থেকে পেঁচার ডাকটা বুকচাপা কান্নার মত। পৃথিবী সমবেদনা জানাচ্ছে।

মনীশরা চলে গেছে—কষ্ট থামে নি। প্রথম বিয়ে হয়ে সুচিত্রা যেদিন এ বাড়িতে আসে সেদিনকার চাপা অসন্তোষ আজ মনে পড়ছে। মানুষের মন থেকে কিছুই কি মুছে যায় না? কতকগুলি প্রবল বৃত্তির প্রতিযোগিতা চলছে মনের মধ্যে। কোনটা সুযোগ পেয়ে কোনটিকে হটিয়ে দেয়—কোনটা বা স্পর্শভীরু। নিঃশেষে লুপ্ত হয় না কোনটিই। মানুষী-প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ বুঝি পূর্ণ হতে পারবে না কোন মুহূর্তে? যে মানদণ্ডের চার পাশে এই বৃত্তিগুলি পাক খাচ্ছে, তাকে নিজ ইষ্ট কি না স্বার্থ বলাই সঙ্গত। এরই মাঝে মানছে সে মানুষকে পৃথিবীকে—নব বিধানকে। যাই হোক—এ বাড়ি আজ মুখ ফিরিয়েছে সুচিত্রার দিক থেকে। এক পক্ষে ত ভালই হ'ল। নিত্য অসম্মানের দায় থেকে সে অন্তত বাঁচল। নিত্য অসম্মানের দায় নয় তো কি? সুচিত্রার তো মনে পড়ে না হেমলতা তার হাতের নিরামিষ রান্না খেয়েছেন কোন দিন। রান্নাঘরেই তার অধিকার সাব্যস্ত হয় নি। মন্দাকিনী বলে—তোমরা ছেলেমানুষ—এখন সেজেগুজে হাসি-আহ্লাদ করে কাটাবে—হাতাবেড়ি খুন্তি ঠন্ ঠন্ এসব কি মানায় ভাই। কথাগুলি স্নেহ-কোমল কিন্তু ওখান থেকে দূরে রাখার প্রচেষ্টা তার মধ্যে নেই কি? খাওয়াটাই জাত-বিচারের কষ্টিপাথর এ কথাটা আজ স্পষ্ট করেই বলেন নি কি হেমলতা? ওরা এ বাড়িতে থাকলে আমি জলস্পর্শ করব না।

অভিমানে বার বার চোখের কোল ভিজে উঠছে।

আজ কারও খাওয়া হয় নি। ছেলেগুলোকে মুড়ি মিষ্টি, ও বেলার ভাত রুটি যা অবশিষ্ট ছিল তাই খাইয়ে ঘুম পাড়ান হয়েছিল। সুচিত্রাকে খাবার জন্ত অনুরোধ করেছিল মন্দাকিনী—ও উত্তর দেয় নি। এ ঘটনার পর এ বাড়িতে থাকা কিংবা এ বাড়ির অন্ন মুখে তোলা ওর পক্ষে অসম্ভব নয় কি?

ভোর বেলা মন্দাকিনী হেমলতার দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলে, মা—মা—শুনছেন ?

হেমলতা জেগেই ছিলেন। খুব ভোরবেলাতেই তাঁর ঘুম ভেঙে গেলেও বিছানা ছেড়ে তিনি ওঠেন না। ঘরের বাইরে থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—অস্পষ্ট সুরময় উচ্চারণে ঠাকুরদেবতার স্তব পাঠ করেন—পঞ্চকন্যাকে স্মরণ করে মহাপাতক ক্ষয় করেন—আর যে দিন আসছে তাকে স্বাগত জানিয়ে তেত্রিশ কোটির কাছে সংসারের কল্যাণ কামনা করেন। আজও জেগেছিলেন—তবে মন ভাল ছিল না বলে বিছানায় বসে ফিস ফিস করে ঠাকুরদেবতাকে স্মরণ করছিলেন।

কে—মেজবউমা···?

হাঁ মা—একবার শুনুন ত।

ওর কণ্ঠস্বরে ভয়ের আভাস পেয়ে মন্দাকিনী ধড়মড় করে উঠে দুয়োর খুলে বারান্দায় বেরুলেন।

কি মেজবউমা—ভয় পেয়েছ নাকি ?

না মা—ছোট বউ আর ঠাকুরপোকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।

সে কি কথা—ওদের ঘরে ঘুমুচ্ছে না ওরা ?

ঘরের দুয়ার খোলা খাঁ খাঁ করছে।

বাইরের দরজাটা দেখেছ কি ?

না মা, একলা যেতে ভয়-ভয় করছে বলে আপনাকে ডাকছিলাম।

আচ্ছা চল দেখে আসি।

হারিকেনের দম বাড়িয়ে হেমলতা সদর দরজা পরীক্ষা করতে চললেন।

সদর দরজায় টানা খিলটি ছাড়া আর একটি ছোট ঘুরনো খিল আছে—যেটা বাইরে থেকেও দেওয়া যায়। সেইটাই দেওয়া রয়েছে।

হেমলতা ফিরে এসে বললেন, কাল সন্ধ্যেবেলায় সদরের খিলটা বুঝি দেয় নি কেউ ?

ওমা—সে কি কথা। অন্ধকারে ঠাকুরপো যখন আসে তখন ত আমি জেগে। খিল দেওয়ার শব্দ স্পষ্ট শুনেছি।

ভাল করে উটকে দেখ ত বাইরের ঘর, ছাদ, বড়বোয়ের ঘর—

ওপর নীচে আলো হাতে করে হেমলতা নিজেই খোঁজাখুঁজি সুরু করলেন। এক-একটি জায়গা খালি দেখেন আর তাঁর বুক ঠেলে ঠেলে কান্না আসে। শেষে তিনি চীৎকার করে ডাকলেন, মলয়—মলয়, ছোটবউমা—ওরে মলু রে—

পূব দিক করসা হতে সুরু হয়েছে, আমগাছে বসে দোয়েল প্রভাতী শিস্ দিয়ে প্রভাতকে স্বাগত জানাচ্ছে।

মলয়ের ঘরের মেঝের ওপর বসে পড়ে পরিশ্রান্ত হেমলতা আর্তকণ্ঠে কেঁদে উঠলেন, ওরা চলে গেছে মেজবউমা—ওরা আর আসবে না।

ক্রমশঃ

বাউলের সাজ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাউল আমি, আমিই রাজা—
আমিই যুবরাজ রে,
আলখাল্লা মোর সখের পোষাক
অভিষেকের সাজ রে।
ওইটি গায়ে, নূপুর পায়ে,
গান গেয়েছি বাদল বায়ে,
আমার সাধের 'গাব গুবাগুব'
সঙ্গে নাহি আজ রে।

নাচের ছিল ভঙ্গী কত,
ময়ূর ছিল চিত্ত,
মন যে তখন দেহের সাথে
করতো সদাই নৃত্য।
হাজার তালির আলখাল্লাতে,
লাগতো হাওয়া সন্ধ্যা প্রাতে,
শুধু গুপীনির উন ঘুনানি—
আর ছিল না কাজ রে।

চংটি নূতন, রংটি ছিল,
গৈরিক এবং খেরী,
যেন যুগের জমাট পুলক
উল্লাসে সে তৈরী।
সে কি অগাধ ফূর্তি তাহার,
যেমন মূর্তি তেমনি বাহার,
অঙ্গে তাহার শান্তিপুরের
সাতটা রাসের ঝাঁক রে।

যাবার সময় বলতে আমার
নাই কো মোটেই লজ্জা।
জীর্ণ আমি, ওইটি আমার
আসল আমির সজ্জা।
ওতেই আমি জড়িয়ে আছি,
ইচ্ছা যে হয় আবার নাচি,
মনের বাউল লুকিয়ে আছে
আজ ও উহার মাঝ রে।

দেবীর বোধন ও বিসর্জ্জন

শ্রীরাজমোহন নাথ, বি-ই, তত্ত্বভূষণ

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় দুর্গাপূজা সম্পর্কে গবেষণামূলক ছয়টি প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে ১০৫৩ সালের প্রবাসী কার্ত্তিক-চৈত্র—ছয় সংখ্যাতে লিখিয়াছেন। প্রবন্ধ লিখিবার সময় প্রাচীন কামরূপের পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে কোন বিষয়ে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সহিত পত্রযোগে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রবন্ধে এই সামান্য বিষয়টির উল্লেখ করিয়া তিনি আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রবীণ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বিদ্যানিধি মহাশয়ের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধগুলিতে দুর্গাপূজার উৎপত্তি সম্পর্কে নানাদিক হইতে আলোচনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে জ্যোতিষিক আলোচনাই অধিক। কিন্তু দেবীর বোধন সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—"আমি নব পত্রিকার উৎপত্তি ও প্রয়োজন বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। নব পত্রিকা নবদুর্গা, ইহার দ্বারা কিছুই বুঝিলাম না।" (ফাল্গুন)।

তিনি আরও লিখিয়াছেন—"নাম নবপত্রিকা, কিন্তু নয়টি বৃক্ষের পত্র না হইয়া নয়টি বৃক্ষ কিম্বা নয়টি বৃক্ষের শাখা রজ্জুর দ্বারা বাঁধিয়া স্থাপিত হয়। সে নয়টি বৃক্ষ এই—রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মান ও ধান্য।" (কার্ত্তিক)। * * * "বোধনের নিমিত্ত এক পৃথক বস্ত্রগৃহ নির্ম্মিত করা হয়। এক বেদীর চারি কোণে শর পুঁতিয়া কয়েকবার সূত্র বেষ্টন পূর্ব্বক বস্ত্রগৃহ নির্ম্মাণ করা হয়। সেই বস্ত্রগৃহে যুগ্ম ফলবিশিষ্ট বিল্বশাখা স্থাপিত হয়। বেদীতে অলক্তক, সূত্র ও ছুরি রাখা হয়। ভাবিয়া দেখিলে এই বস্ত্রগৃহ সূতিকা গৃহ, যুগ্ম ফলের একটি মাতার কুক্ষি, অপরটি ভ্রূণ। নাড়ীচ্ছেদের নিমিত্ত ছুরি। নাড়ীবন্ধনের নিমিত্ত সূত্র। অলক্তক শোণিতের দ্যোতক। ইতিপূর্ব্বে প্রতিপদ হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত ঘটস্থ দেবীর নিমিত্তে কেশ-সংস্কার দ্রব্য, অঙ্গরাগ, দ্রব্য, অলঙ্কার ও মধুপর্ক প্রদত্ত হইয়াছে। গর্ভ সম্ভাবনা না করিলে এই সবের প্রয়োজন থাকে না। অতএব বিল্বশাখা ও ফলে দেবীর বোধন অর্থে বুঝিতে হইতেছে বিল্বশাখায় দুর্গারূপ অগ্নির আবির্ভাব। বিল্বফল দেবীর প্রতিরূপক। * * * সায়ংকালে বোধন অকাল বোধন। সায়ংকাল কেন? কারণ রাত্রি সন্তান প্রসবের কাল।" (ফাল্গুন)

দেবী বিসর্জ্জন সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন—"নদীর স্রোতে প্রতিমা বিসর্জ্জনের পর শবরোৎসব, জল ও কর্দ্দম ক্রীড়া। সে সময় অশ্রাব্য, অকথ্য ভাষায় গান হইত। ইহা দুর্গোৎসবের অঙ্গ, কালিকাপুরাণ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে কেহ রুষ্ট হইত না। * * * আমার মনে হয় লোকের বিশ্বাস ছিল, নব বর্ষের প্রথম দিন অশ্লীল ভাষা শুনিলে দেহ শুচি হয়, যম রাজা সে বৎসর স্পর্শ করেন না।" (ফাল্গুন)

দুর্গাপূজার আনুষঙ্গিক—বিশেষতঃ কামরূপে সমধিক প্রচলিত—কুমারী পূজা সম্পর্কে—বিদ্যানিধি মহাশয় প্রশ্ন করিয়াছেন—"কুমারী পূজার হেতু কি?"

শ্রদ্ধাস্পদ বিদ্যানিধি মহাশয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের যথাসাধ্য মীমাংসা করিতে হইলে প্রথমে প্রাচীন কামরূপের আদি অধিবাসী সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন।

অতি প্রাচীনকালে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ অব্দে বর্ত্তমান চীনদেশের মধ্য অঞ্চল হইতে এক জাতীয় লোক দলবদ্ধ হইয়া চীনদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হইতে সমুখিত এক নদীপথ ধরিয়া বর্ত্তমান আসামের পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া কামরূপ দেশে প্রবেশ করে। চীনদেশস্থিত আবাসভূমিকে উহারা চাও-থিউস্ (Chao-Thieus) বা চোহ্-থিস্ অর্থাৎ দেবতার দেশ বা স্বর্গভূমি বলিত। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে গ্রীক্ নাবিক কর্ত্তৃক লিখিত পেরিপ্লাস গ্রন্থে ঐ দেশকে থিস্ দেশ (Land of This) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পেরিপ্লাসের টীকাকার স্বফ সাহেবও থিস্ দেশ চীনদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। উত্তর ব্রহ্মদেশের লোকেরা এখনও চীনদেশকে থিয়স্ (স উস্থ) বা স্বর্গ বলে।

যে নদীপথ ধরিয়া ঐ লোকগুলি আসিয়াছিল, উহা কামরূপে প্রবেশ করিয়া অন্যান্য জল-স্রোতের সংযোগে বৃহদাকার ধারণ করায়, উহারা ইহাকে লাও-তু (বৃহদায়তন জলরাশি) নাম দিয়াছিল। এই লাও-তুই পরবর্ত্তীকালে লুইত, লোহিত বা লৌহিত্য নামে পরিচিত হইয়াছে। চোহ্-থিস্ পরবর্ত্তীকালে জোহ-থিস্ রূপে উচ্চারিত হয় এবং ঐ দেশাগত লোকেরাও অন্যদেশবাসীর নিকট জোহথিস্ জাতিরূপেই পরিচিত ছিল। এই জোহ-থিস্ শব্দ পরবর্ত্তীকালে সংস্কৃত জ্যোতিষ রূপ ধারণ করিয়াছে। আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্গণ এই জাতীয় লোককে অষ্ট্রীক (অষ্ট্রো+এসিয়াটিক) নাম দিয়াছেন।

জোহ-থিস্রা কামরূপে অনেক শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া বসবাস করিয়াছিল, এবং পরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যভারত ও আফগানিস্থান পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। যুক্তপ্রদেশে মধ্য জ্যোতিষ ও আফগানিস্থানে উত্তর জ্যোতিষ দেশ এইভাবে সৃষ্ট হইয়াছিল। চাও, চোহ বা জোহ শব্দের অর্থ পরবর্ত্তীকালে উচ্চভূমি অর্থে ব্যবহৃত হইত। ঐ জাতীয় লোকেরা পার্ব্বত্যভূমি খুঁড়িয়া গর্ত্ত করিয়া উহাতে হলুদি, কচু, ধান ইত্যাদির বীজ বপন করিয়া শস্য উৎপাদন করিত। ঐরূপ কৃষিকে জোহ-মো (উচ্চভূমি কর্ষণ) বা জুম্

খেণ্ডি বলিত। বর্ত্তমান কালেও মি+জোহ বা মিজু (লুসাই জাতি), মি (বা মেই—মানুষ)+থিয়স্ বা মেইথাই (মণিপুরী জাতি) শব্দ প্রচলিত।

সমতল ভূমিতে আসিয়া জ্যোতিষজাতিরা ধান্যের চাষও করিত। ভারতবর্ষে ইহারাই সর্ব্বপ্রথম ধান্যের চাষ প্রবর্ত্তন করে। সঙ্গে সঙ্গে কচু, হলুদী, পান, সুপারির চাষও করিত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল—পৃথিবী হইতে যে সব শস্য উৎপন্ন হয় তাহা পৃথিবীর গর্ভজাত সন্তান, কেমনা প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় এইগুলি পৃথিবী ভেদ করিয়া জাত হয়। নারীজাতির গর্ভ হইতেও সন্তান উৎপন্ন হয়; সুতরাং নারী ও পৃথিবী সমধর্ম্মা এবং উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। এইজন্য তাহারা নারীদিগকেই কৃষিকার্য্যে নিয়োগ করিত এবং নিজেরা গৃহের অন্য কার্য্য ও পশ্বাদি শিকারে ব্যস্ত থাকিত। বর্ত্তমানেও উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে সাধারণ লোকের মধ্যে একটি প্রবল বিশ্বাস আছে যে একজন মেয়েলোক কোনও শস্যের বীজ বপন করিলে উহাতে ভাল ফসল হয়। অশুচি রজস্বলা অবস্থায় কোন নারী কোন কচি বৃক্ষে জল দিলে বা কোনও বৃক্ষের ফল বা পুষ্প চয়ন করিলে ঐ বৃক্ষ মরিয়া যায়।

এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া উহারা নিজের দেশকে মাতৃ-সদৃশ জ্ঞান করিত। প্রাচীন কামরূপ বা বর্ত্তমান আসামের ভৌগোলিক অবস্থানুযায়ী ইহার মেরুদণ্ড ব্রহ্মপুত্র বা লৌহিত্য নদ; উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চল সদিয়া হইতে দরং জিলার ভরালি নদী পর্য্যন্ত মস্তক, দরং হইতে রূপহি নদী পর্য্যন্ত কণ্ঠ ও বক্ষ; রূপহি নদী হইতে গৌহাটির নিম্নে মানস নদী পর্য্যন্ত পেট ও কোমর এবং ইহার নিম্নদেশ পদ। এই ভাবে দেশকে নারীমূর্ত্তি কল্পনা করা হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে এইসব অঞ্চল যথাক্রমে সৌমার পীঠ, রত্নপীঠ, কামপীঠ ও ভদ্রপীঠ নামে পরিচিত হইয়াছিল।

গৌহাটি বা দেশমাতৃকার কটিদেশে মেরুদণ্ড ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীর সংলগ্ন শিলাময় পর্ব্বত হইতে একটি প্রাকৃতিক উৎস নির্গত হইত। যে স্থানে উহা নির্গত হইত ঐ স্থানে এক বিঘত দীর্ঘ, একুশ অঙ্গুলি প্রস্থ, নাতিগভীর ত্রিকোণাকার একটি গর্ত্ত ছিল। গর্ত্তের ভিতরস্থ শিলাখণ্ডের বর্ণ কিঞ্চিৎ রক্তাভ ছিল। আকৃতি, বর্ণ ও অবস্থিতি বিবেচনায় উহা দেশমাতৃকার যোনিদেশরূপে কল্পিত হইয়াছিল। তাহারা নিজেদের ভাষায় উহার নাম দিয়াছিল—কা-মাই-খা (মাতার প্রসবদ্বার বা মাতার স্বাভাবিক জলনির্গমন দ্বার)। এই শব্দই পরবর্ত্তী-কালে সংস্কৃত কামাখ্যা এবং সতীর যোনিপীঠরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

আসামে বৈশাখের প্রথম হইতেই কৃষিকর্ম্মের আয়োজন আরম্ভ হয়। সুতরাং সেই সময়ই পৃথিবীকে গর্ভধারণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। নারী ও পৃথিবী সমধর্ম্মা বিধায় এই সময় পুরুষ-স্ত্রী, যুবক-যুবতী একত্র মিলিয়া নানাপ্রকার কাম-ভাবোদ্দীপক নৃত্যগীতে রত হইত। ইহা দ্বারা নারীদিগের ভাবোদ্দীপনা হইত এবং কাজে কাজেই পৃথিবীর ও ঐ ভাব উদ্দীপিত হইত। এই প্রথাই আসামের প্রচলিত বিহুগীত ও বিহুনাচ। বর্ত্তমানে অবশ্য ইহাতে অনেকে অশ্লীলতা দেখেন, কিন্তু প্রাচীনকালে ইহা জাতীয় মঙ্গলের জন্যই ধর্ম্মাচরণরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

পৃথিবী কামভাবে উদ্দীপিত হইয়াছেন; এখন তাঁহার গর্ভাশয় সবল ও সুস্থ করিবার জন্য মেরুদণ্ড ব্রহ্মপুত্রে যোনি-পীঠের নিকট অশোক পুষ্প ও পত্র ভাসাইয়া দেওয়া হইত এবং মেয়েরা নদীর জলে স্নান করিত। অশোক গর্ভাশয়ের সর্ব্ববিধ রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। এই আচারটি পরবর্ত্তীকালে অশোকাষ্টমী রূপে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্র ভিন্ন অন্য নদীতে অশোকাষ্টমী স্নান হয় না।

আষাঢ় মাসে আসামে ধান্য বপনের সময়। এই সময়েই পৃথিবীকে প্রকৃতপক্ষে গর্ভধারণ করিতে হইবে। সুতরাং গর্ভধারণের পূর্ব্বলক্ষণ রজঃদর্শন হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। এইজন্য ধান্যবপনের পূর্ব্বকালে দেশমাতৃকার যোনিস্থানে—কা-মাই-খা স্থানে পৃথিবীর রজোদর্শন উৎসব করা হইত। এই উৎসব বর্ত্তমানে অম্বুবাচী নামে পরিচিত। এই সময় চারি দিন পৃথিবীতে কর্ষণ নিষেধ। কা-মাই-খা স্থানের তত্ত্বাবধায়ক ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় খা-চাই, খাচাইয়া বা খাসিয়া (খার সন্তান)। বর্ত্তমানে খাসিয়া যুবতীরা এই উৎসবের সময় নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সাবধানে অতি ধীর পদক্ষেপে এক প্রকার নৃত্য করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। ইহা নংক্রেম (একটি স্থানের নাম) নৃত্য নামে পরিচিত। ধীর পদক্ষেপ দেখিয়া এই নৃত্যকে অনেকে শিল্পবিহীন পিপীলিকা-বৎ নৃত্য বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। কিন্তু রজস্বলা হওয়ার আনন্দ প্রকাশ করার নৃত্যে উদ্দাম পাদক্ষেপ কোনমতেই অভীপ্সিত নয়।

তারপর শস্য বপন করা হইলে, চার মাস অতীত হইল, ধরণী গর্ভধারণ করিয়াছেন; ধানের শীষে ক্ষীর সঞ্চার আরম্ভ হইয়াছে, এখন গর্ভবতীকে সাধ ভক্ষণ করান প্রয়োজন। একটি ছোট কদলী বৃক্ষকে সোজা করিয়া দাঁড় করান হইত, এবং তাহার বক্ষে দুইটি বিল্বফল বাঁধিয়া দিয়া নিম্নভাগে অর্থাৎ উদরদেশে কালকচু, হরিদ্রা, মানকচু, ধান্যগাছ এবং জয়ন্তী, দাড়িম ও অশোকের ডাল ও পাতা শ্বেত অপরাজিতার লতা দ্বারা (বিদ্যানিধি মহাশয় রজ্জুদ্বারা লিখিয়াছেন) বাঁধিয়া দেওয়া হইত, এবং পরে একখানা সাধারণ কাপড় দ্বারা ঘোমটা দিয়া কদলীবৃক্ষকে একটি লজ্জাবতী গর্ভবতী নারীরূপে সাজান হইত। ইহাই আধুনিক নবপত্রিকা বা কলা-বৌ।

লক্ষ্য করিবার বিষয়—কদলী, কালকচু, হরিদ্রা, মানকচু ও ধান্য জ্যোতিষজাতির প্রধান কৃষিজাত বস্তু, তাহারা এই সব শস্যেরই চাষ জানিত।

বিল্বফল কোঁচকাটিদের প্রতিবেদক; জয়ন্তী ঘটিকায়, দাড়িম

ভঙ্গদোষের, অশোক গর্ভদোষের এবং অপরাজিতা মেধা-বিক্যের ঔষধ। সুতরাং গর্ভধারিণী এবং গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গলের জন্য এই সব ওষধি প্রয়োগ করা হইত। তারপর এই গর্ভ-ধারিণীর উদ্দেশ্যে ভাত, কচুর তরকারি ও পোড়া উপল মৎস্য দেওয়া হইত। প্রসাধন-দ্রব্যও দেওয়া হইত।

এই নবপত্রিকা বা কলা-বৌ দুর্গাপূজার প্রধান দেবতা। তাঁহারই বোধন এবং বিসর্জ্জন হয়; বহু স্থলে শুধু নব-পত্রিকারই পূজা হয়। এই নবপত্রিকাকে অনেক স্থানে প্রতিমা বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্যান্য ভোগের সঙ্গে আদিম অধিবাসীদের কচু ও পোড়ামৎস্যের তরকারী আধুনিক কালেও একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ।

সুতরাং গর্ভবতী নারীকে ভূতপ্রেতাদি হইতে রক্ষার জন্য সুতার বেষ্টনী দিয়া, নাড়ীচ্ছেদের ছুরি ও সুতাসহ পৃথক বস্ত্রাবৃত গৃহে ঘোমটা দিয়া রাখা অতি যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা। শস্য-গর্ভা ধরিত্রীদেবী আজ সাধ ভক্ষণ করিয়া আঁতুড় ঘরে বাস করিতেছেন। অন্যেরা আজ আনন্দ উৎসব করিতেছে। যে সব কুমারী এখনও রজস্বলা হয় নাই বা গর্ভধারণ করে নাই, তাহারাও পৃথিবীর সমধর্ম্মা ও অংশস্বরূপা, তাহাদের আনন্দ বিধান করিলে তাহাদেরই অপর অংশ—যিনি গর্ভধারণ করিয়াছেন, তাঁহার মঙ্গল হইবে। এইজন্যই কুমারী-পূজার ব্যবস্থা।

উৎসব শেষ হইবার সময় আশেপাশে যত ভূতপ্রেত বা গর্ভস্থ সন্তান নষ্টকারী অপদেবতা আছে তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া ও কর্দ্দম ছিটাইয়া তাড়ান প্রয়োজন। তাহারা মানুষকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, আকাশে বাতাসেও থাকে। সুতরাং দেশজ গ্রাম্য ভাষায় লোকে পরস্পরে পরস্পরের প্রতি জননেন্দ্রিয়-বাচক শব্দ প্রয়োগ করিয়া অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করিত, অশ্লীল নৃত্যগীত করিত এবং কর্দ্দম ছিটাইত। কালিকা পুরাণ-কার ইহাকে দুর্গাপূজার বিসর্জ্জনের অঙ্গ বলিয়াছেন; কিন্তু ইহাকে শবর জাতির উৎসব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বোধন তথা দুর্গাপূজাও শবর জাতির কৃষি উৎসব।

পার্ব্বত্য নাগারা আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে একটি উৎসব করিয়া গেনা পাথর প্রোথিত করে। ইহা তাহাদের বড় উৎসব। কচু, হলুদ, সীম, ভুট্টা আদি শস্যের বীজ একত্র করিয়া গরু বা মহিষের রক্তে রঞ্জিত করণান্তর গেনা পাথরের নীচে পুঁতিয়া ফেলে।

ধানগাছে পোকা লাগিলে একজন নারী উলঙ্গ হইয়া অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে ধানক্ষেত্র প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলে পোকা ছাড়িয়া যায়, অনাবৃষ্টি হইলে এক-জন নারী উলঙ্গ হইয়া অশ্লীল নৃত্যগীত করিলে বৃষ্টি হয়—এই বিশ্বাস অদ্যাপি অনেক পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে আছে। দেশের ভবিষ্যৎ বিপদাপদ মঙ্গলামঙ্গলের কথা বলিবার জন্য দেবধনীর (দেবতার ধনী বা নারী) উপর দেবতার আবেশ হয়। দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত কুমারীর নৃত্যে দেবতা সন্তুষ্ট হন, সেইজন্যই দেবদাসী-প্রথা।

গর্ভধারিণীকে সাধ ভক্ষণ করান হইয়াছে, তাহার আঁতুড় ঘরের সমস্ত ব্যবস্থাও করা হইয়াছে, বিঘ্নাদিও বিনাশ করা হইয়াছে—সুতরাং গৃহস্বামীর এখন নিশ্চিন্ত মনে পশু শিকারে বা শত্রু নিধনে যাওয়া উচিত। এইজন্যই বিজয়ার পর দিবস যুদ্ধযাত্রার বিধান। কামরূপের কোনও কোনও অঞ্চলে গ্রামবাসীরা দলবদ্ধ হইয়া শৃগাল বা শূকর বধ করিতে যায়। অতঃপর ধরিত্রীদেবীর সন্তানপ্রসব পর্ব্ব। পৌষ মাসে ধান কাটিয়া ঘরে ফসল তোলা হইলেই গর্ভবতী পৃথিবীর সন্তান প্রসব হইল। শেষরাত্রে গৃহস্থ সবত্নে স্নান করিয়া শুচি হইলেন। প্রসূতির গৃহে অগ্নি প্রজ্বালিত রাখিবার জন্য মাঠে স্থানে স্থানে খড়, পাতা, বাঁশ দ্বারা প্রস্তুত মেজি বা ভেড়াঘরে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল। তারপর সন্তানকে কোলে লইয়া পাড়া-প্রতিবেশীর সহিত পরস্পরে আনন্দ-উৎসব করে, অর্থাৎ কৃষিজাত ফসল দ্বারা পিঠাপুলি প্রস্তুত করিয়া একে অপরকে ভোজন করাইয়া পৌষপার্ব্বণ বা পিঠাপার্ব্বণ উৎসব পালন করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মহাবিষুব সংক্রান্তির বিহু উৎসব, আষাঢ়ের অম্বুবাচী, শরৎকালীন নবপত্রিকা, পৌষ-সংক্রান্তির পৌষ-পার্ব্বণ—সমস্তই প্রাচীন অষ্ট্রিক বা জোহবিস্ জাতির কৃষি উৎসব। আধুনিক কালেও আসামের পার্ব্বত্য জাতিরা বিশেষ কোনও নির্দ্দিষ্ট দিবসে ঐ উৎসব পালন করে না। উৎসবের কাল উপস্থিত হইলে গ্রামপতির নির্দ্দেশ অনুসারে সুযোগ-সুবিধামত যে-কোন দিবসে উহা পালিত হয়। প্রাচীন কামরূপে আর্য্যকৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইলে তাহাদের জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী বিষুব দিনে ঐ সব উৎসব প্রতিপালিত হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং আদিম জাতির কৃষি উৎসবের সঙ্গে আর্য্যজাতির জ্যোতিষিক তত্ত্বের সামঞ্জস্য করা সম্ভবপর হইয়া পড়ে।

আসামের সমতল ভূমিতে ধান্যক্ষেত্রের পরম শত্রু বন্য মহিষ, ইঁদুর এবং পক্ষী। সুতরাং এইগুলিকে বধ করা অথবা বশ করিয়া রাখা আদিবাসী কৃষকদের প্রধান কাম্য ছিল। যুবকেরা তীরধনুক দ্বারা পক্ষী তাড়াইত, হাতী দ্বারা ধান-ক্ষেত্রের ইঁদুরের গর্ত্ত মাড়াইয়া ইঁদুর তাড়ান হইত। কিন্তু বন্য মহিষকে বল্লম ও খড়্গ দ্বারা বধ করা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না। সেইজন্য ধরিত্রীদেবী নিজে মহিষকে বধ করেন এবং তাঁহার সন্তানগণ ইঁদুর ও ময়ূরকে বাহনরূপে স্ববশে রাখেন। ইহাই আদি কল্পনা, পরে আর্য্যকৃষ্টি এই কল্পনাকে নানাভাবে রঞ্জিত করিয়া নানারূপ আড়ম্বরে সজ্জিত করিয়া তুলিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে মৈত্রক জাতিরা বসন্তকালে একটি ষাঁড়ের উদর ছুরিকাবিদ্ধ করিয়া, সেই রক্তে নিজেরা স্নাত হইয়া জীবনীশক্তি

অর্জন করিত এবং ঐ রক্ত শস্যক্ষেত্রের উপর ছিটাইয়া দিয়া পৃথিবীর উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিত। বৈদিকগণ পশ্চিম ভারতে আসিয়া বসবাস করার পর ঐ অঞ্চলে বসন্ত ঋতুতে কৃষি আরম্ভ করার পূর্ব্বে ষাঁড় বধের পরিবর্তে, মেষবলির বিধান প্রবর্ত্তিত করিল এবং রক্তের পরিবর্তে রক্তবর্ণ আবীর মাটিতে এবং নারীদের অঙ্গে ছিটাইয়া দিয়া আদিরসাত্মক নৃত্য-গীতের দ্বারা তাহাদিগকে কামভাবোদ্দীপিত করার আয়োজন করিল। ইহাদ্বারা পৃথিবীও উদ্দীপিত হইতেন। এই প্রথাই হোলিখেলা। শ্রীকৃষ্ণ যুবতীদিগকে রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া আদিরসাত্মক নৃত্যগীতসহকারে দোলযাত্রা করেন এবং পৃথিবীকে রজস্বলা করেন। সাত দিন পর শুধু হলুদ রঙে রঞ্জিত করিয়া পৃথিবীকে শুচি করা হয়। ইহাই পূর্ণদোল।

দক্ষিণ-ভারতীয় ভাগবতকার শরৎকালে নিজ দেশের কৃষির সময় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অবতারণা করিয়াছেন। উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের গীতগোবিন্দকার বসন্তকালে ঐ উৎসব করিয়াছেন। গুজরাট অঞ্চলের সাধারণ কৃষির সময় চৈত্র-বৈশাখ মাসে বলরাম গোপিনীগণের সহিত জলবিহার করিয়াছেন। ঐ সময় পয়ঃপ্রণালী দ্বারা জল দিয়াই কৃষি হয়, সুতরাং হলদ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া বলরামকে যুবতীদের সহিত আনন্দোৎসব করিতে হইয়াছিল। কাজেই রাসলীলার মূলেও আদিম জাতির কৃষি-উৎসব বলিয়া অনুমান হয়।

স্বাধীন ত্রিপুরা

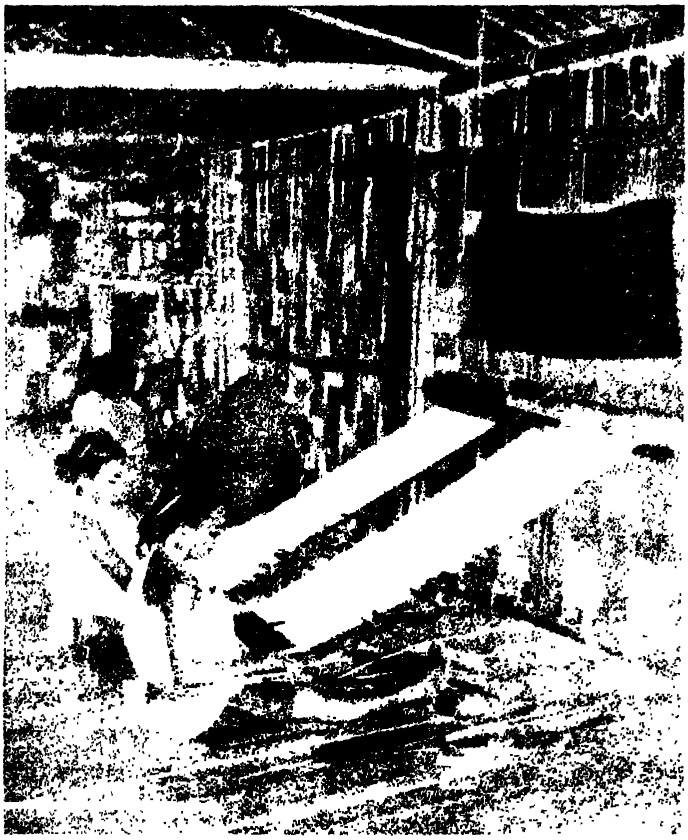
শ্রীসুনীলপ্রকাশ সোম

ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনের অব্যবহিত পরেই ত্রিপুরা-রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে। তাহার পর হইতেই পূর্ব্ব-পাকিস্থান রাষ্ট্রের মুসলমানগণ এ রাজ্যে নানাপ্রকার অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। এই ত্রিপুরা-রাজ্য অতি প্রাচীনকালে 'কিরাদিয়া' বা কিরাতরাজ্য নামে অভিহিত ছিল। ইহা ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। পুরাণ-কারগণ বঙ্গের প্রত্যন্তপ্রদেশস্থ প্রাচীন ত্রিপুরার শৌর্য্যবীর্য্য ও রাজনীতিবিষয়ক বিবিধ তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ জনশ্রুতি ইত্যাদির উপর নির্ভর করিয়া 'রাজমালা' এবং অন্যান্য গ্রন্থনিচয় বাংলা ভাষায় সঙ্কলন করিয়াছেন, কিন্তু অনেক স্থলেই এই সমস্ত উপাদান নির্ভুল হয় নাই। যেমন বঙ্গদেশবাসী সকল জাতিই বাঙালী, উড়িষ্যাবাসীরা উড়িয়া, আসাম প্রদেশের অধিবাসীরা অসমীয়া আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছে—তদ্রূপ ত্রিপুরাবাসী জাতিসকলকে 'ত্রিপুর' বা 'ত্রিপুরী' আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। ত্রিপুররাজ্যের অতীত গৌরবকাহিনী ও কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিয়া ত্রিপুরাবাসিগণ আজও গর্ব্ব অনুভব করে। ত্রিপুরার রাজপরিবার ও ঠাকুর-পরিবারের লোকেরা নিজেদের 'ত্রিপুর ক্ষত্রিয়' নামে আখ্যাত করেন। মহারাজ ত্রিলোচনের পরবর্তী এবং মহারাজ রত্নমাণিক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ভূপতিগণ 'ফা' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। এই 'ফা' শব্দের অর্থ 'পিতা'। খ্রীষ্টান-সমাজে ধর্ম্মযাজককে 'ফাদার' বলা হয়। তাঁহারা ঈশ্বরকেও ফাদার বলিয়া থাকেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজেও এবম্বিধ আখ্যার অভাব নাই। 'ফা' শব্দটির ব্যবহারও এগুলির অনুরূপ—ত্রিপুরার রাজভক্ত প্রজারা প্রজারঞ্জক রাজাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মহারাজ রত্নমাণিক্যের সময় হইতে 'ফা' উপাধির পরিবর্তে 'মাণিক্য' উপাধি-ধারণ এই রাজবংশে প্রচলিত হয়।



চতুর্দ্দশ দেবতার প্রাচীন মন্দির—উদয়পুর

ত্রিপুরারাজ্য পর্ব্বতসঙ্কুল বলিয়া অতীতে উক্ত অঞ্চল বিশেষ দুর্গম ছিল। রাজ্যের পশ্চিম ভাগ জলময় থাকায় দূরবর্ত্তী



বস্ত্রবয়নরতা কুকি বালিকাদ্বয়

স্থানে যাতায়াত নিতান্তই কষ্টসাধ্য ও বিপজ্জনক ছিল বলিয়া জানা যায়। এজন্য তখনকার দিনে পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের সহিত এখানকার রাজাদের এবং রাজপরিবারের লোকেদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। রাজপরিবারে বহুবিবাহ-প্রথা অনেক দিন হইতেই প্রচলিত ছিল। কথিত আছে, মহারাজ ত্রিলোচন শিল্পকলা-নিপুণা ২৪০টি মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ উদয়মাণিক্যও যে ২৪০টি বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। ত্রিপুরার ইতিহাসে ইহাই সর্ব্বোচ্চ বিবাহসংখ্যা। এতদ্ব্যতীত অল্পাধিক পরিমাণে প্রায় সকল রাজাই বহুবিবাহ করিয়াছেন। একাধিক মহিষী গ্রহণ না করার দৃষ্টান্ত ত্রিপুরেশ্বরগণের মধ্যে বিরল।

ত্রিপুরার নৃপতিবৃন্দ প্রাচীন কৌলিক প্রথা বজায় রাখিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট ও যত্নবান। কথিত আছে, মহারাজ ত্রিলোচনের বিবাহকালে রাজবাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে মনোহর বেদিকার উপর উপর্য্যুপরি একুশটি চন্দ্রাতপ খাটাইয়া তাহার চারি কোণে মাঙ্গল্যসূচক কদলীবৃক্ষ, কাষ্ঠনির্ম্মিত কদলী স্থাপন করা হইয়াছিল এবং বেদিকার চতুষ্পার্শ্বে ফল-পুষ্প-পল্লব-সুশোভিত মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। ত্রিপুরা রাজপরিবারে বিবাহ-উৎসবে অদ্যাপি এই সকল নিয়ম যথাবিধি প্রতিপালিত হইতেছে। প্রবাদ আছে, ত্রিলোচনের জন্মকালে তাঁহার ত্রিনেত্র লক্ষিত হইয়াছিল। তদবধি রাজপরিবারস্থ পুরুষগণের বিবাহকালে তাঁহাদের ললাটদেশে চন্দনদ্বারা একটি চক্ষু আঁকিয়া দেওয়ার রেওয়াজ হইয়াছে।

প্রাচীনকাল হইতেই ত্রিপুরার রাজপরিবারে লোকেদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। সেকালে যাতায়াতের সুব্যবস্থার অভাব নিবন্ধন ত্রিপুর-রাজ্যে শিক্ষা আশানুরূপ প্রসারলাভ করে নাই বটে, কিন্তু যেটুকু বিদ্যাচর্চ্চা সেখানে ছিল তাহাও নেহাত উপেক্ষণীয় নহে। আর সেকালে সেখানে শুধু যে পুথিগত বিদ্যার অনুশীলন হইত তেমন নহে। রাজনীতি, সমাজনীতি, আচরণনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, সঙ্গীতশাস্ত্র, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ইত্যাদি সকল বিষয়েরই চর্চ্চা ছিল। শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে মল্ল-বিদ্যারও অভ্যাস করিতে হইত। ত্রিপুর-ভূপতিবৃন্দ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ উদার মতাবলম্বী ছিলেন; তাঁহারা সকলেই যে একই ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুসরণকারী ছিলেন তাহা নহে। কোন কোন রাজা স্বীয় বিশ্বাসানুসারে শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণব



এই কায়দায় খেদায় হাতী ধরা হয়

মতাবলম্বী হইয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত ত্রিপুরার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজবংশ প্রথমতঃ শৈব ছিলেন, পরে মত



'কের' পূজায় ত্রিপুরাবাসীদের নৃত্যোৎসব

পরিবর্তনের দরুন বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁহারা বৈষ্ণব হইলেও শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের প্রতি চিরদিনই সমান আস্থাবান। তাঁহারা পুরুষানুক্রমে পীঠাধিষ্ঠাত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর সেবা করিয়া আসিতেছেন; বিধিমতে ছাগাদি বলিদান দ্বারা এই দেবীর অর্চ্চনা করা হয়। রাজপরিবারে কুলদেবতাদের মধ্যে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবদেবী আছেন। এই সকল দেবতার প্রীত্যর্থে আজিও ছাগাদি পশু বলি দেওয়ার প্রথা আছে। এমন কি রাজার অভিষেক উপলক্ষেও পাঁঠা বলি দেওয়া হইয়া থাকে। এ দেশে রাজাদের প্রতিষ্ঠিত শিব ও শক্তিমূর্ত্তি এবং বিষ্ণু-বিগ্রহ অনেক আছে। চিরাচরিত প্রথানুসারে আজিও শিব দুর্গা ও বিষ্ণু ইত্যাদি বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার সমস্ত আয়োজন পাশাপাশিই হইয়া থাকে। রাজা স্বয়ং এই সকল পূজাপার্ব্বণের পৃষ্ঠপোষক—যদিও ব্যক্তিগতভাবে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী।

শিল্পকলার জন্য ত্রিপুরারাজ্যের প্রসিদ্ধি আছে। এখানকার বস্ত্রশিল্প বিশেষ উন্নত ধরণের। এজন্য বাস্তবিকই ইহারা গর্ব্ব করিতে পারে। প্রাচীনকালেই ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্পকলার বিকাশ হইয়াছিল। বস্ত্রশিল্প প্রথমতঃ ত্রিপুরা রাজপ্রাসাদেই পুষ্ট হয়; পরে উহা রাজ্যময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সুবতা নামে এক রাজার চেষ্টায় ত্রিপুরার শিল্পকলার বিস্তর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কথিত আছে, কার্পাস তন্তুদ্বারা বস্ত্রবয়নের প্রথা তিনিই সর্ব্বপ্রথম ত্রিপুরায় প্রবর্ত্তন করেন। বস্ত্র-শিল্প ছাড়া আরও বিভিন্ন শিল্পকলার চর্চ্চা সুবতা রাজা নিজ রাজ্যমধ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার গভীর অরণ্যবাসী কুকী ও টিপরা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় প্রত্যেক আদিবাসীর গৃহেই বালিকা যুবতী বৃদ্ধা সকলকেই তাঁত বুনিতে দেখা যায়। ইহা-



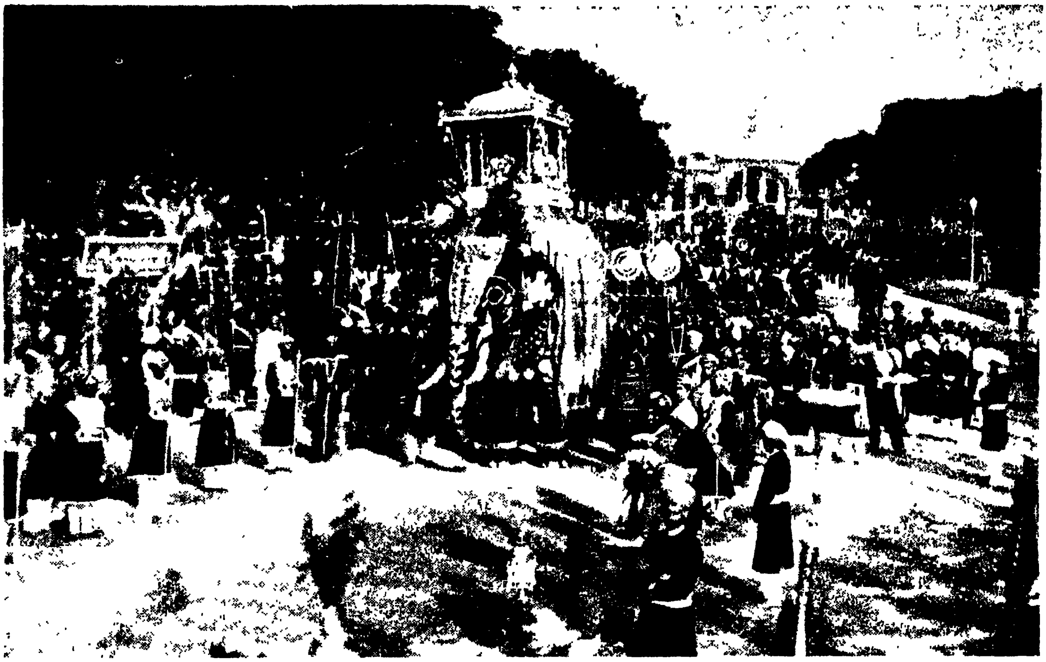
'কয়চা' পূজায় নাচ গান



উদয়পুরের পথে

দের বস্ত্রবয়নবৈপুণ্য প্রশংসনীয়। তাহাদের সমাজে অন্যান্য গৃহকার্য্যের ন্যায় বয়নবিদ্যাও অবশ্যশিক্ষণীয়। ত্রিপুরায় উপনিবিষ্ট মণিপুরী সমাজেও বয়ন-শিল্পের বিশেষ প্রচলন আছে। ত্রিপুরায় বয়নশিল্পের প্রসার কিরূপ, নীচেকার হিসাব হইতে তাহা বুঝা যাইবে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী মতে ত্রিপুরারাজ্যে পার্ব্বত্য পল্লীস্থিত গৃহের সংখ্যা ৩৪৮৫৬। এই সকল গৃহে তাঁতের সংখ্যা সর্ব্বসুদ্ধ ৩১৪৮৫। বয়নশিল্প ছাড়া চিত্র-শিল্প, এবং তক্ষণশিল্পের জন্যও ত্রিপুরার খ্যাতি আছে। এমন কি, বাঁশ, বেত ইত্যাদি দ্বারাও ত্রিপুরাবাসীরা যে সকল দ্রব্য নির্ম্মাণ করে সেগুলিও উঁহাদের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। রাজ-সরকারের সাহায্যে যাহাতে এই সকল শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতি হয় তাহার চেষ্টা করা দরকার। বর্ত্তমান কালে ভারত গবর্ণমেণ্টের সূত্র নিয়ন্ত্রণ বিধির (yarn control order) দরুন অতি অল্প পরিমাণ সূতাই এই রাজ্যে আসে। ইহার ফলে বহুসংখ্যক তাঁতী আজ বেকার এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত। ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখন দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। রাজসরকার অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে পরিণামে ত্রিপুরারাজ্যে তাঁত-শিল্পের সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

ত্রিপুরারাজ্যের পূজা-অর্চ্চনাদি হিন্দুশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ীই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমীতে এখানে বিপুল সমারোহে 'খার্চি' পূজা হয়। ইহা চতুর্দ্দশ দেবতার একটি প্রধান উৎসব। এই পূজার পূর্ব্বদিবস অপরাহ্ণে চতুর্দ্দশ দেবতাকে নদীতে স্নান করান হয়। এই সময় শহরের নরনারী নানা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া দলে দলে দেবতাদের স্নানযাত্রা দর্শন করে। ইহার পরবর্ত্তী শনি কিম্বা মঙ্গলবারে আর একটি বিশেষ পূজা হয়, তাহাকে 'কের' পূজা বলে। এই পূজা চতুর্দ্দশ দেবতার পূজার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। চন্তাই এই পূজার প্রধান কর্ত্তা। পূজা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে পূজাস্থান হিসাবে একটি বিশেষ এলাকা স্থিরীকৃত হয়। ইহাদের বিশ্বাস অর্চ্চনাকালে সেই এলাকার মধ্যে কাহারও জন্ম বা মৃত্যু হইলে পূজা পণ্ড হয়। এই ব্যাপারকে তাহারা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক বলিয়া মনে করে। এজন্য পূজা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া আসন্ন-প্রসবা রমণী বা মৃত্যুশয্যাশায়ী স্ত্রীপুরুষদের এই সীমানার বাহিরে লইয়া যাওয়া হয়। পূজার সময় মানুষ ও গৃহপালিত পশু ইত্যাদি বাড়ীর বাহির হইতে পারে না। এই সময়ে কেহই জামা, জুতা, খড়ম, পাগড়ী ও ছাতা ব্যবহার করিতে পারে না। গীতবাদ্য কোলাহল এমন কি উচ্চস্বরে কথা বলাও 'কের' পূজার সময় নিষিদ্ধ। স্বয়ং মহারাজাকেও এই নিয়ম পুরাপুরি মানিয়া চলিতে হয়। এই সময়ে সকলকে এক দিন দুই রাত্রি নিজ নিজ গৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনার্থে কিয়ৎকালের জন্য নগরবাসীদিগকে গৃহসীমানার বাহিরে যাইবার অধিকার দেওয়া হয়। বহির্গমনের সময়টুকু তোপধ্বনি দ্বারা ঘোষিত হয়। ঐ সময়ে সকলে বাহিরে আসে এবং যে যার কাজে লিপ্ত হয়।



বিজয়া দশমীর মিছিলে হস্তীপৃষ্ঠে ভূতপূর্ব্ব ত্রিপুরার মহারাজা

পুনর্ব্বার তোপধ্বনি হইলে সকলকেই গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবাদ আছে, এই পূজার ফলে দৈবকৃপায় দেশে নিরাপত্তা বিধান হয় এবং এই পূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ার উপর এক বৎসরের জন্য রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করে। প্রথম বারের পূজায় কোনরূপ বাধাবিঘ্ন ঘটিলে, সপ্তাহমধ্যেই শনি কিম্বা মঙ্গলবারে পুনর্ব্বার বিশেষ সতর্কতার সহিত পূজার অনুষ্ঠান করা হয়। রাজধানীর পূজা নিরাপদে সম্পন্ন হইবার পরে প্রত্যেক পার্ব্বত্য পল্লীতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে 'কের' পূজা হয়। তৎকালে এই সব পল্লীতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ।

বর্ত্তমানে স্বাধীন ত্রিপুরা যখন ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছে তখন এই রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে দেশবাসীদের সম্যক্ জ্ঞান থাকা উচিত। বর্ত্তমান কালে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ভারতবর্ষের ও পাকিস্থানের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে ত্রিপুরারাজ্যে তাহার ছিটেফোঁটা প্রবেশ করিয়া সেখানকার বাতাসকেও কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। এ রাজ্যের মুসলমানগণ মুসলিম লীগের পক্ষপাতী—যদিও তাঁহারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার নিন্দা করেন। ত্রিপুরা-রাজ্য ভারতীয় ডোমিনিয়নে যোগদান করায় পূর্ব্ব-পাকিস্থানের মুসলিম লীগ কাউন্সিল অসন্তুষ্ট। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা সত্ত্বেও কিন্তু বহিরাগত মুসলমানগণ চক্রান্ত করিয়া এ রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা



পর্ব্বতগহ্বরে শিকার অন্বেষণে কুকি প্রজা



টিপরাদের নৃত্যগীত

রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইতেছেন মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী। তিনি রিজেন্সি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টরূপে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। তাঁহার পুত্রই রাজ্যের উত্তরাধিকারী—তিনি এখন নাবালক। প্রকাশ, রাজসরকারের কর্ম্মচারীদের বেতন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামান্য বলিয়া অনেকে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া থাকে। সাধারণ কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত প্রজাসাধারণের নিকট হইতে ভেট লইয়া থাকেন। ফলে শাসনব্যবস্থা উত্তরোত্তর শিথিল হইয়া পড়িতেছে। পাহাড়ী প্রজাদের মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত গরীব। তাহাদের মধ্যে অনেকেই পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, পরনের কাপড় জুটাইতে পারে না। ছোট এক টুকরা কাপড় অথবা সূতার গোছা কোমরে জড়াইয়া কোনমতে লজ্জা নিবারণ করে। শহরে অনেক বাঙালীর বাস—তাঁহাদের মধ্যে ব্যবসাদার, উকিল, মোক্তার ইত্যাদির সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। এখানকার বেশীর ভাগ বাঙালীই পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আগত। এ রাজ্যের অধিকাংশ বাড়ীতে বাঁশের ছাউনি, ঘরের বেড়াও বাঁশের তৈরি। ত্রিপুরার অরণ্যে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ জন্মে। এখান হইতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কাগজের কারখানায় প্রচুর বাঁশ চালান দেওয়া হয়। এজন্যই এখানকার নদীবক্ষে ভাসমান বাঁশের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। জঙ্গলে এত অধিক বাঁশ থাকিতেও আজ পর্য্যন্ত এ রাজ্যে কোনও কাগজের কল স্থাপিত হয় নাই। এ বিষয়ে রাজসরকার এক প্রকার উদাসীন বলিলেই চলে।



সোণামুড়ায় কয়েকটি পাহাড়ী ছেলেমেয়ে

ত্রিপুরায় অতি সুস্বাদু আনারস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং দামও বেশ সস্তা। ইহা ছাড়া আম, কাঁঠাল, লেবু ইত্যাদি

অন্যান্য ফলও এখানে বিস্তর উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রজাসাধারণ অতি দরিদ্র বলিয়া এসব তাহাদের ভোগে লাগে না—বেশীর ভাগই রাজ্যের বাহিরে চালান যায়। ব্যবসায়ীরা এই সব জিনিষ অন্যত্র লইয়া গিয়া বেশ দু'পয়সা লাভ করে। ত্রিপুরায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সব ধান হইতে যে চাউল হয় তাহা অতি সুগন্ধযুক্ত ও সুস্বাদু। এখানে চোরা-কারবার পুরাদমে চলিয়াছে। সেজন্য চাউলের মূল্য অত্যধিক। নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বাস্তুত্যাগী প্রায় ত্রিশ হাজার নরনারী এ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেই সময়ে ইহাদের সেবাশুশ্রূষা ও ভরণপোষণের ভার এখানকার সিভিল সাপ্লাইজ ডিপার্টমেন্টের উপর পড়ে। বর্তমান লেখক তখন উক্ত বিভাগের ডিরেক্টর রূপে ত্রিপুরারাজ্যে কাজ করিতেছিলেন। রেশনিং প্রবর্তিত করিয়া রাজ্যের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও চোরা-কারবার সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভবপর হয় নাই। এ রাজ্যের পুলিস কনেষ্টবল হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ-পরিবারেরও কেহ কেহ নাকি কোন না কোন সূত্রে এই নিন্দনীয় ব্যাপারের সহিত জড়িত আছেন বলিয়া ইহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা সম্ভবপর হয় নাই। এখানে যে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হয় সে কথা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু ইহার বেশীর ভাগই আখাউড়া, কুমিল্লা ও আসাম সীমান্ত দিয়া বাহিরে রপ্তানী হইয়া উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। ত্রিপুরার মন্ত্রীমণ্ডলী অনেক চেষ্টা করিয়াও এখন পর্য্যন্ত এই অপচয় নিবারণ করিতে পারেন নাই। এ রাজ্যের শাসন-প্রথা যুগোপযোগী নহে, ইহা এখনো পুরনো পথ ধরিয়া চলিতেছে, সেইজন্য রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনেক বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীন ভারতের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ত্রিপুরায় আশু শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি প্রজাসাধারণের মধ্যে এক অভিনব রাজনৈতিক চেতনার আভাস পরিলক্ষিত হইতেছে। তাহারা রাজসরকারকে জানাইয়াছে যে তাহাদের আস্থাভাজন প্রতিনিধিদের মারফত শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে। ত্রিপুরা রাজসরকারও এ বিষয়ে বাদপ্রতিবাদ না করিয়া একটা সুনির্দিষ্ট নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার সামঞ্জস্য বিধান করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা সত্ত্বেও এ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এখনও মিটে নাই। ঠাকুর-পরিবার ও রাজপরিবারের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে রেষারেষি, বিবাদ-বিসম্বাদ, গোপন ষড়যন্ত্র ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। ফলে সুষ্ঠুভাবে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করা মন্ত্রীদের এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

মুখ

শ্রীমণীন্দ্র গুপ্ত

ধু-ধু-করা পথ রৌদ্র-ছায়ায় জ্বলছে
ঘুমোনো নগর খোলা-চোখ তবু বন্ধ :
পৃথিবীটা শুধু মুখ বুজে পথ চলছে
রাত্রি বুঝিবা অভিমানে কারো অন্ধ।

তবু এখানে আষাঢ় নামলো একদা
আকাশ ঝরানো কি যে তার নীল মিনতি
চোখ ডুবে গেল—মৃত্তিকা হ'ল বরদা
আজকে সে শুধু স্বপ্ন ঝরানি নিয়তি।

তোমারো হয়তো ভুল হয়েছিল কিছুটা
চির বসন্ত পাবেই ভেবেছো তোমাকে ;
সুন্দর চোখে দেখো নি কো তাই পিছুটা—
তা হলে হয়তো দেখতেই তুমি আমাকে।

তবু প্রতীক্ষা গোপনে করেছি—কেন না
মনে মনে জানি একদা মধুর লগ্ন ;
ফুটবে জীবনে ফুল চোখে ভুল যেন না
তাই তো স্বপ্নে নিজেকে করেছি মগ্ন।

কেন যে এল না আকাশ-ঝরা সে গোধূলি—
কত সূর্য্য তো ছাই হয়ে গেল বাতাসে
ধু-ধু করা পথে জ্বলছে যে আজ কি ধূলি ;
জ্যোৎস্নায় মুখ কত দূরে সে কি আকাশে ?

প্রাগৈতিহাসিক বাঙ্লাদেশ

শ্রীগিরিধারী রায়চৌধুরী

জাতিতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব অনুযায়ী প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীনতম বঙ্গ-বিভাগ এই রকম ছিল বলে ধারণা হয়, যেমন—(১) "রাঢ়" [=প্রাচীন উচ্চারণ, "রাঢ়ে ~ রাঢে"]; (২) "সুমেহ"[1] [=প্রাচীন উচ্চারণ বা শব্দ, "সুমেহের {=Sumer}> সুমেহর > সুমেহ"]; (৩) "ডবাক্"[2] [=প্রাচীন * "ডবক"]; (৪) "বঙ্গ" [=প্রাচীন, "ম্যঙ্ {=Muong}> বাঙ > বঙা"]; (৫) "পুণ্ড্র" [=প্রাচীন শব্দ ও উচ্চারণ, "বুণ্ড্র" * ও রূপভেদ "মুণ্ড্র * > মুণ্ড"; (৬) গৌড় [> "গোড্ড, * গোণ্ড < গোণ্ড্র * বা গুণ্ড্র"—ছিল প্রাচীনতমরূপ]। এই রকম বঙ্গ-বিভাগ ঘটে থাকতে পারে এখন থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগে। অষ্ট্রিক জাতির সভ্যতা অনুযায়ী প্রাচীন বাঙ্লার বিশেষ কোন অংশ বা অঞ্চল বিশেষ কোন উপজাতির নামানুযায়ী আখ্যাত হ'ত। অবশ্য আর্য্যমহলেও এরকম নামকরণ প্রথা ছিল, যেমন—ইরাণ <ঐরাণ-হ্ <অর্য্যা/আর্য্যা-নাম্"[3] (="দেশ বাচিত্বাৎ বাহুল্যম্", যেমন, "উত্তর-কোশলা-নাম্"); [4] "*Hellas*=(সং) "হেলয়:" <অর্য্যা: / আর্য্যা:। তখনকার দিনের বাঙ্লার সীমা ও আয়তন কি ছিল ও কি রকম ছিল তা বলা দুষ্কর, তবে এখনকার দিনের অনুরূপ ও অনুযায়ী যে ছিল না—একথা অনেকটা জোর দিয়েই বলা চলে। যুক্তি-তর্কের দ্বারা যতটুকু আন্দাজ করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে এই যে, বাঙ্লার উত্তরে হিমালয় অর্থাৎ প্রাকৃতিক সীমা আজও যেমন আছে, অতীতেও তেমনি ছিল, দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরও চিরদিনই বাঙ্লার দক্ষিণ সীমা। শুধু পূব আর পশ্চিমের সীমা নির্ণয় করাই শক্ত। যুগে যুগে এই দুটো দিকের সীমা পরিবর্ত্তিত হয়েছে। তারপর, পূর্ব্বোক্ত দুটি অংশ বা অঞ্চলের সীমা ও আয়তন কত দূর কি ছিল আজ তার খুঁটিনাটি বর্ণনা করা দুঃসাধ্য; তবু এইটুকু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, "বঙ্গ"[5] (অর্থাৎ—"ম্যঙ্ বা * বাঙ্) বলতে মধ্যের খানিকটা ও দক্ষিণের অনেকটা অঞ্চলই নির্দ্দিষ্ট হ'ত। "রাঢ়" (অর্থাৎ "রাঢ বা রাঢে") বলতে ভাগীরথীর উত্তর-পশ্চিম পারের খানিকটা অংশ বোঝাত। "গৌড়" (অর্থাৎ "* গোড্ড" বা "গোণ্ড" * কি "গোণ্ড্র" *—"গুণ্ড্র") বলতে বর্ত্তমানের গৌড় ও তার আশপাশের অঞ্চল নির্দ্দিষ্ট হ'ত। "পুণ্ড্র" (অর্থাৎ—"বুণ্ড্র * বা মুণ্ড্র—মুণ্ড", অঞ্চল ছিল উত্তর বঙ্গের কতকটা জুড়ে, হয়ত পুরাণ-ইতিহাসে বর্ণিত "পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন" রাজ্য কি "পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন-ভুক্তি"[6]। কিন্তু বিভিন্ন যুগে পৃথক পৃথক ভাবে এই সব অংশ বা অঞ্চলের সীমা ও আয়তন কি পরিমাণ হ্রাস ও বৃদ্ধি পেয়েছিল তা বলা দুষ্কর।

এখন প্রাচীনতম বঙ্গের এই সব অংশ বা অঞ্চলগুলির আখ্যা যে-কোন লোকের কাছে নতুন বলে মনে হবে, সেজন্য এখানে তার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা দরকার। মোটামুটিভাবে ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের সগোত্র জাতিতাত্ত্বিক

---

* তারকা চিহ্ন অনুমান বোঝায়। যে শব্দের আগে এই চিহ্ন থাকবে, বুঝতে হবে যে সেই শব্দটি অনুমিত।

১। হয়ত—"সুমেহ, সুমেহর, সুমেহের" আসলে "সুহ্ম, সুহ্মর, সুহমের" ছিল।

২। "ডবাক" শব্দ থেকেই witch কি sibyl অর্থক বাঙ্লা "ডাক—ডাকিনী" ও "ডাকু—ডাকাত" শব্দের উৎপত্তি। ডাক—ডাকিনী বাঙ্লার নিজস্ব ও বহু প্রাচীন, তাই শব্দটি অষ্ট্রিক বলেই মনে হয়। কিন্তু "ডাক—ডাকা"র সঙ্গে এই শব্দের কোন সম্পর্ক নেই। তার সম্পর্ক মূল * "ঢক—ঢক্কা" শব্দের সঙ্গেই। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমানের "ঢাকা" নাম ও শব্দ ডবাক্ এরই অবশিষ্ট।

৩। "আর্য্যানাম্"—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণার ফল।

৪। "Hellas" সং-প্রভাবিত। হিন্দু বৈয়াকরণেরা শব্দটিকে "হেলয়:" ধরে নিয়েছেন—অর্থাৎ দেশ বা দ্বীপ বাচক শব্দটিকে জাতিবাচক হিসাবে। তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু তাঁরা যে ভাবে শব্দটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখিয়েছেন, যেমন—হে অরয়: = হে অ লয়: > হেলয়:—তা কিন্তু কৌতুককর (দ্রষ্টব্য:—নীলকণ্ঠ-সম্পাদিত মহাভারতম্ গ্রন্থের আদি পর্ব্বের "জতুগৃহদাহ" পর্ব্বাধ্যায় ও পাতঞ্জলকৃত মহাভাষ্যের প্রথম দিক)।

৫। "অঙ্গ"র সঙ্গে আমরা "বঙ্গ"র সম্পর্ক স্বীকার করি—অর্থাৎ যে ধারণাটা প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে ছিল বলেই আমরা এই রকম কথার দ্বারা প্রমাণ পাই যে—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, রাঢ়, সুহ্ম প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র দীর্ঘতমা ঋষি কর্ত্তৃক বলিপত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে উৎপন্ন হয়। তার উৎপত্তি হয়ে থাকতে পারে এ দেশীয় প্রাচীন জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ঐতিহ্য ও কিম্বদন্তী থেকে যার নিহিতার্থ এই হতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত উপজাতিগুলি পরস্পর জাতি সম্পর্কীয়—তা আমরা মানি। এমন কি, নাগা একটি জাতির নাম যার পূর্ব্বরূপ ছিল* "নগণ <নঙ্গ <নঙা <ন্যঙ"—তার ও এই মূল "ম্যঙ-ব্যাঙ্" উপজাতিরই জ্ঞাতি। সম্ভবতঃ* "উঅঙ, বা, অ্যঙ্" মূল শব্দ থেকে ওই "অঙ্গ" শব্দ উদ্ভূত হয়েছিল।

৬। "ভুক্তি" এখনকার "বিভাগের" অনুরূপ, shire বা "জেলার" চেয়ে বড়।

উপাদান থেকে এই আখ্যাগুলি গৃহীত হয়েছে। "রাঢে"[৭] ছিল মূলতঃ বিরাট অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর উপজাতি-বিশেষের ও তাদের ভাষা কি উপভাষার নাম: মূল "রাঢে বা রাঢ" ধ্বনির বিকৃতির ফলে পরবর্তী কালে "রাঢ়" রূপ দাঁড়িয়েছিল। আবার তা থেকে "র-লয়োঃ, ড লয়োরভেদঃ" নিয়মানুযায়ী "লাঢ়> লাঢ়"[৮] রূপের উদ্ভব হয়। ঐ একই মূল শব্দ থেকে আবার লাল (="লাল্হ") শব্দের উৎপত্তি হয়। পঞ্জাবের অঞ্চল-বিশেষ "লাল" নামে কথিত হয় ও গুজরাটে "লাঢ়" নামীয় অঞ্চল আছে। "সুম্হের-সুমহের"-ও একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ উপ-জাতি বিশেষের নাম। সুতরাং তাদের ভাষারও নাম বটে। এই একই শব্দ থেকে "সুম্হ" ও "সুমের" শব্দের উৎপত্তি সম্ভবপর। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে, সুম্হ-রা নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম বা প্রাগৈতিহাসিক বাঙলার উপনিবেশ স্থাপন-কারী একটা উপজাতি, সেই হিসাবে অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দ্রাবিড়দের সঙ্গে এদের এক করে ফেলা চলে না, কারণ তারা আরও পরের যুগের উপনিবেশকারী। কিন্তু সুমের-দের অর্থাৎ Sumerian-দের পণ্ডিতরা অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর উপ-জাতি বলে ঠিক স্বীকার করেন না। অর্থাৎ কতকটা সন্দেহ পোষণ করেন। সুমেরদের সঙ্গে দ্রাবিড়দের বহু বিষয়ে ঐক্য দেখতে পাওয়া যায়। মহেন-জো-দড়োর প্রাগৈতিহাসিক সম্পদরাশিই হচ্ছে মূলতঃ তার প্রমাণ ও নিদর্শন। শব্দের দিক থেকেও যে মিল নেই এমন নয়, যেমন নগর-বাচক সুমেরীয় শব্দ হচ্ছে "উর" (="ur"), "আর দ্রাবিড়ীয় (মোটামুটিভাবে) শব্দ হচ্ছে "কুর"[৯]—যা রূপ করে আর্য-গোষ্ঠীতে "পুর-পুরী" শব্দ বিকাশ পায়। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে কিন্তু এই যে, অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর অনেকগুলি উপ-ভাষাতে ঐ একই "উর" শব্দ নগরার্থে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া এমন আরও অনেক শব্দ আছে যা সুমেরীয় ভাষাতে এবং অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর উপভাষাগুলিতে[১০] (বা তাদের কোন একটির মধ্যেও) সমান ভাবে মেলে, এবং তফাৎ যা দেখা যায় তা নগণ্যই। সম্ভবতঃ বাঙলার এই সুম্হ উপজাতির শাখাই পুরাকালে মধ্য এশিয়া খণ্ডে নাগরিক সভ্যতার পত্তন করেছিল। বলা বাহুল্য, পরবর্তী কালে ঐ মূল "সুম্হের ও সুমহের" শব্দের অন্তর্বর্তী "র"-ধ্বনি অপ্রচলিত হয়ে যাওয়ায় "সুম্হ" শব্দের উদ্ভব হয়, আবার তা থেকে প্রাকৃতে "সুব্ভ" শব্দের উদ্ভব হয়। মৌলিক *"গোণ্ড্-গুণ্ড্" জাতি থেকে বর্তমানে "গোন্দ-" জাতির উদ্ভব। বর্তমানে আমরা তাদের দ্রাবিড় ভাষাভাষী-রূপে দেখতে পাই, সেইজন্য তাদের অনেকে দ্রাবিড় বলে মনে করেন। কিন্তু আসলে তাঁরা কোন অষ্ট্রিক-উপজাতিই—অন্যান্য, যেমন, সুম্হ, রাঢ়, বঙ্গ প্রভৃতির অনুরূপ। গুণ্ড, চণ্ড বা চুণ্ড ("<*চুণ্ড্"), পুণ্ড্ বা *পুণ্ড্, বা *মুণ্ড্ (="মুণ্ডা") প্রভৃতি অষ্ট্রিক উপজাতির সমস্থানীয় ঐ "*গোণ্ড্[১১]-গুণ্ড্" (="গোন্দ") উপজাতি। এ প্রসঙ্গে এটুকু বলে দেওয়া দরকার যে একেবারে সাম্প্রতিক বা সর্বাধুনিক মতানুযায়ী '*দৃমিড়' বা "দ্রমিল্হ-দৃমিল্হ" (=দ্রাবিড়) জাতি মূল অষ্ট্রিক জাতিরই সুদূর উপনিবিষ্ট শাখা[১২] বিশেষ। অন্যান্য অনেক উপজাতির বহুপূর্বকালে এই দলে-ভারী উপজাতিটি মূলতঃ এক সাধারণ বাসকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে পড়ে ভূমধ্যসাগরীয় তীরভূমিতে গিয়ে বসবাস সুরু করেছিল। তার পর আবার তারা এই দ্বিতীয় সাধারণ বাসকেন্দ্র ছেড়ে ক্রমশঃ দক্ষিণ পূর্বের দেশগুলিতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে উপনিবিষ্ট হতে থাকে। হয়ত মধ্য এশিয়ায় নাগরিক সভ্যতার পত্তন এই মূল জাতিরই কোন শাখা করেছিল।

তারপর সেখান থেকে ক্রমশঃ তারা ভারতের সীমার বহির্ভূক্ত কিন্তু ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ দেশগুলিতে উপনিবিষ্ট হয় এবং সেখান থেকে ভারতে প্রবেশ করে। বলা বাহুল্য, এই দুই জাতির মধ্যে অমিলের চেয়ে মিল অনেক বেশী। সেই হিসাবে ভারতবর্ষে এমনও ঘটে থাকতে পারে যে, দ্রাবিড় সান্নিধ্য ও সংস্পর্শে একভাবে বহু যুগ, বহু পুরুষ ধরে বাস করার ফলে "গোন্দ" জাতি নিজস্ব ভাষা ত্যাগ করে দ্রাবিড় ভাষা গ্রহণ করেছিল। ব্যাপারটা নেহাৎ আওতার চাপের ফল আর এরকম ঘটনা জগতে মানব সভ্যতার ইতিহাসে একেবারে যে বিরল তাও নয়। তা ছাড়া এখনও পর্যন্ত ভারতের যে প্রদেশে গোন্দরা সবচেয়ে সংখ্যাধিক বলে দৃষ্ট হয়, সে প্রদেশটি হচ্ছে ছোটনাগপুর সমেত মধ্যপ্রদেশ। এই মধ্যপ্রদেশের পাশেই প্রাচীন কলিঙ্গ প্রদেশ। কলিঙ্গ ছিল দ্রাবিড় অধ্যুষিত ও দ্রাবিড় প্রভাবান্বিত। সংস্কৃত-কলিঙ্গ শব্দ উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে "*কো-[১৩]

৭। দ্রষ্টব্য—

Pre-Aryans and Pre-Dravidians in India—by Jean Przyluski, Jules Bloch and Sylvain Levi—translated into English by Dr. P. C. Bagchi, page 23

৮। বিহারের "বাঢ়াবন বিহারের" "নাঢ়া," বাঙলা "মেড়া নেড়ি"র জাতি সম্পর্কীয় যেহেতু একই মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত।

৯। সংস্কৃত "কুট, কুটির" শব্দ ওই একই 'কুর' শব্দ থেকে উদ্ভূত। উপরন্তু "কুটির কুটজ"ও তাই।

১০। দ্রষ্টব্য—

Pre-Aryans and Pre-Dravidians in India—by Sylvain Levi, Jean Przylusky and Jules Bloch—translated into English by Dr. P. C. Bagchi (C. U. pub.) pages 146 & ff.

১১। ঐ মূল "*গোণ্ড্ বা গুণ্ড্" শব্দ থেকে বাঙলা উপাধিবাচক "গোঁড়" ও "গুণ্ডা" শব্দের উৎপত্তি।

১২। জার্মান-নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণা ও মতানুযায়ী দ্রাবিড় জাতি মূলতঃ অষ্ট্রিকদের সঙ্গে অভিন্ন।

১৩। এই প্রসঙ্গে খাসি (Khasi) শব্দ "Ka-lynkor"-এর উল্লেখ করা যেতে পারে যার অর্থ হয় "লাঙ্গল"। দ্রষ্টব্য—

লক্‌" কি "কো*-১৩ লঙ্‌"—অনার্য্য শব্দ থেকে, এবং তার প্রাচীন উচ্চারণ *"কো-লিঙ্গ" ছিল বলেই মনে হয়। আনামিক "কো-লক্‌-কো-লঙ্‌"—শব্দের অর্থ হয়, রাজ-চিহ্ন। "কোল"+"লক্‌ বা লঙ্‌=“কোল্ল-ক্‌-কোল্লঙ"ও হতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে তা না হওয়াই সম্ভব। রাজচিহ্ন সম্পন্ন জাতির দেশ অর্থই আমাদের কাছে সঙ্গত বলে বোধ হয়। অর্থাৎ দ্রাবিড়রা নিজেদের রাজার জাত বলে মনে করত— অর্থাৎ কিনা উচ্চাহং সম্পন্ন ছিল ; তার প্রমাণ অন্যত্র বহু পাওয়া যায়। যাই হোক, অষ্ট্রিক "গোঙ্‌ড্‌* বা ১৪গুঙ্‌ড্‌"—শব্দ কাল-ক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়ে সংস্কৃত ভাষায় 'গৌড়'রূপ ধারণ করে। কেউ কেউ এই গৌড় শব্দকে সংস্কৃত 'গৌর" শব্দের অপভ্রষ্ট রূপ বলে মনে করেন। এমন মনে করারও যথেষ্ট কারণ আছে—কেন না, জায়গা-বিশেষে তা ঘটেছে, যেমন, (নদীর নাম)="গৌরী" হয়ে দাড়িয়েছিল "গৌড়ী" এবং তা থেকে "গোড়ে" রূপের উদ্ভব হয়। সাম্প্রতিক যুগে এই অকৃত্রিম "গোড়ে"কে অর্থহীন বা কৃত্রিম ধরে নিয়ে পণ্ডিতের দল তার সঙ্গে-"ইয়া"—প্রত্যয় যোগ করে "গোড়িয়া" শব্দ (স্থান-বিশেষের নাম) তৈরি করে নিয়েছেন। এর অর্থ হ'ল "গৌরী" বা "গৌড়ী নদীর তীর" স্থান, কি গ্রাম। সংস্কৃত "গৌরীয়" শব্দ থেকে আধুনিক "গড়িয়া" রূপের উৎপত্তি হয়েছে—এমন যদি কেউ মনে ভাবেন তবে তিনি নির্ঘাত ভুল করবেন বলে আমরা মনে করি। তবু গৌড়ের উৎপত্তি যদি কেউ ভাবেন গো-বাচক (বৈঃ-সং)§ "গৌর" শব্দ থেকেই হয়েছে, কেন না ঐ অঞ্চলটিতে বড় গরু খুব বেশী পাওয়া যেত, তা হলেও ভুল হতে পারে। যে হেতু আমরা অন্যান্য অংশ বা অঞ্চলগুলির আখ্যাহিসাবে ভিন্ন ভিন্ন উপজাতির নামই পাচ্ছি, সেই হেতু আমরা "গুঙ্‌ড্‌* গোঙ্‌ড্‌" শব্দকেই গৌড়-এর প্রকৃতস্থিত বলে ধরে নেওয়া সমীচীন মনে করি। ডবাক শব্দের আধুনিক অবশেষ "ঢাকা" হলেও, ঠিক ঢাকা-অঞ্চলই পূর্ব্বকালে ডবাক নামে কথিত হ'ত কি-না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাই আমরা ডবাক-অঞ্চল নির্ণয় করতে অশক্ত। "পুঙ্‌ড্‌ বা *বুঙ্‌ড্‌ বা মুণ্ডা" অঞ্চল ছিল উত্তর-বঙ্গের খানিকটা, কারণ আর খানিকটা ছিল কামরূপ, অন্ততঃ যে অংশটুকুর পরিচয় মহাভারত থেকে লক্ষ্মণ সেনের অনুশাসন পর্যন্ত পাওয়া যায়, অবশ্য বিভিন্ন যুগে তার হ্রাস-বৃদ্ধি সমেত। "পুঙ্‌ড্‌" শব্দের[১৫] উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যেও আছে, পুনরুক্তির ভয়েও অনেকের জানা আছে বলে এখানে আর তা দিতে চাই না। বোধ হয় "পুঙ্‌ড্‌" শব্দের দ্বারা বৈদিক আর্য্যরা উপজাতিটিকেই বোঝাত এবং "পৌঙ্‌ড্‌" শব্দের দ্বারা জনপদ কি অধিষ্ঠানটিকেই বুঝাত। ঐ মূল অষ্ট্রিক ধ্বনিটি সংস্কৃতে "পুণ্ড্‌ ও পৌণ্ড্‌" রূপে গৃহীত হয়েছিল—তার কারণ বোধ হয় অষ্ট্রিক ঙ-কার ধ্বনি (ঠিক এখনকার মত ঙ-স্বর না হলেও) সংস্কৃতে ণ্ড-কার রূপে গৃহীত হ'ত, তাই "গুঙ* বা গোঙ" ধ্বনির পরিণতি হয়েছিল গৌড়-এ, 'পুঙে"-এর পরিণতি হয়েছিল পৌণ্ড্‌-এ ; "চঙ* বা চুঙ্‌"—শব্দ থেকে উদ্ভূত কোন ঙ-স্বর যুক্ত (হয়ত, "চোঙ কি, চুড়ঙ কি, চোড়)" শব্দের পরিণতি হয়েছিল 'চৌর"-এ। "ম্যঙ* বা ব্যঙ" (Muong) একটি অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর উপজাতির ও ভাষা কি উপভাষার নাম। আসলে ভাষা কি, উপভাষার নাম থেকেই আমরা উপজাতির অস্তিত্ব ধরে নিয়েছি। কালক্রমে "মাং" (মুঅঙ) ও তার রূপভেদ (=বুঅঙ) "ব্যাঙ*" যথাক্রমে 'মঙ্গ ও বঙ্গ"-এ পরিণত হয়, আবার তাদের সঙ্গে "অল কি, আল" প্রত্যয় যোগ করে 'মঙ্গল" (-মোঙ্গল) ও 'বঙ্গল-বঙ্গাল" শব্দের সৃষ্টি হয়। আবার ঐ 'বঙ্গল-বঙ্গাল"-রূপে হিন্দু শাসনের শেষভাগ থেকে মুসলমান আমলের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে -আ ও -ঈ সামান্য-প্রত্যয় (particle) যোগ করে দেশার্থক "বাঙ্গালা" ও "বাঙ্‌লা" এবং জাতি-বাচক "বাঙ্গালী" বা "বাঙালী" শব্দের উৎপত্তি হয়। কিন্তু সবার ওপরে আশ্চর্য্যের কথা হচ্ছে এই যে, "বাঙ্‌লা-বাঙ্গালা" আখ্যার দ্বারা সেহাৎ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলেই রাঢ়-গৌড়-সুহ্ম-ডবাক-বঙ্গ-পুণ্ড্‌-সমেত প্রদেশটি অভিহিত হতে থাকে এবং গোন্দ-মুণ্ডা-সুহ্ম-ডবাক্‌-ডোম্ব-বগধ বা মগধ-বঙ্গ-চণ্ড-কাবাড-বাহ্‌নর বা বাহ্‌নার-বেদ্দা-সমন্বিত অষ্ট্রিক জাতি "বাঙ্গালী" নামে অভিহিত হতে থাকে।

অঞ্চল, স্থান ও নদী পরিচায়ক আরও কতকগুলি অষ্ট্রিক শব্দ পাওয়া যায়, যেমন, "কামরূপ" (<"কাম্‌-রূপ্‌<কম্‌-রূক্‌<কম্‌-লক্‌"=কাম+লিঙ্গ), "তমলুক্‌," যার সংস্কৃতায়িত রূপ দাঁড়িয়েছিল, "দাম-লিপ্তি" ও "তাম্র-লিপ্ত", (তম্ম বা দম্ম+লক্‌—উপজাতি-বিশেষের বা পক্ষ-বিশেষের চিহ্ন বা লিঙ্গ।), "দামোদর"[১৬] (<*"দামুদাক্‌"), "কপোতাক্ষ"[১৭] (<*"কবুদাক্‌"), তিস্তা (<*"দিস্তাং"[১৬]) —যার সংস্কৃতায়িত রূপ হয়েছিল "ত্রি-স্রোতা", "হুগলী"[১৭]

---

* Pre-Aryans and Pre-Dravidians in India—by S. Levi, J. Bloch and Jean Przyluski—translated into English by Dr. P. C. Bagchi, page 8.

১৪। ঐ মূল* "গোঙ্‌ড্‌ বা গুঙ্‌ড্‌" শব্দ থেকেই বাঙ্‌লা উপাধি বাচক "গোঁড়" শব্দের, "গৌড়া" ও "গুণ্ডা" শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

§ বৈঃ-সং=বৈদিক ও সংস্কৃত এবং বৈদিক বা সংস্কৃত।

১৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—"অন্ধ্রা-পুণ্ড্রা-শবরা-পুলিন্দা-মুতিবা ইত্যুদন্তা বহবো ভবন্তি" (৭।১৮) মার্কণ্ডেয় পুরাণ—৫৭, বিষ্ণু-পুরাণ—২।৩ ১৫, মহাভারত—৫২।১৬-১৯ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

১৬। আনুমানিক প্রাচীন রূপগুলি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায় প্রস্তাবিত।

১৭। মৎপ্রস্তাবিত।

ইত্যাদি। পুরান-মাটি ও নতুন মাটি-বোধক "ভাদড়"[১৮] ও "খাদাড়"[১৮]-শব্দ গ্রাম-বিশেষের নাম হিসাবে শুনতে পাওয়া যায়।

এ ছাড়া আরও বহু বাঙলাদেশের গ্রামের নাম হিসাবে আষ্ট্রিক শব্দ প্রচলিত আছে, যেমন :—

(ক) ["অড়া বা আড়া" প্রত্যয়[১৯] দিয়ে,]

১। বোদরা [<বোদড়া <বাদড়া <ব্যাং[২০] + অড়া = পাখীদের বাসস্থান বা আশ্রয়।]

২। যশোর, যশড়, যশড়া [<জস্ + অড়া।]

৩। সোমড়া [<সুম্[২১] + অড়া।]

৪। হোমড়া [<হম্ বা হুম্ + অড়া।]

৫। লাওরা[২২] [<লাওড়া <লাও বা লাব্ + অড়া = লাউয়ের স্থান বা ক্ষেত্র।

৬। সেন্তড়া [<সিদ্ বা শুদ্ + অড়া।]

৭। বাঁশড়া [<বাঁস + অড়া।]

৮। হাওড়া [<হাব + অড়া।]

৯। শাঁকড়া [<বাঁও + অড়া।]

১০। বাকুড়ি [<বাদড়ী[২৩] <বাহ + অড়া + ঈ।]

(খ) [ই-আ-প্রত্যয় দিয়ে।]

১। বাদি [<বাং + ইআ।]

২। হেদে, হেড়ুয়া [<হাং + ইআ, হাং + উআ।]

৩। ভাদা ব ভাদে [<ভাং + ইআ <বাং + ইআ।]

৪। খুঁদে [<খুঁদিআ = খুঁং + ইআ।]

শব্দের দিক থেকে বা ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে যথেষ্টই পর্য্যালোচনা করা গেল। এখন দেখা যাক—জাতিতত্ত্ব বা নৃতত্ত্বের দিক থেকে কতটা সংবাদ পরিবেশন করতে পারি।

একথা সকলেই বুঝবেন যে কতকগুলি ঘর নিয়ে যেমন একটি পাড়া গড়ে ওঠে, কতকগুলি পাড়া নিয়ে আবার যেমন একটি গ্রাম গড়ে ওঠে ঠিক তেমনই ভাবে মানুষের কতকগুলি দল নিয়ে একটা উপজাতি এবং কতকগুলি উপজাতির সমবায়ে একটি জাতি গড়ে ওঠে। আমাদের দেশ প্রাগৈতিহাসিক আমলে কতকগুলি অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর উপজাতিদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। তাদের অনেকগুলির নাম পূর্ব্বেই দিয়েছি।

এই উপজাতিগুলি মুর্গী[২৪] পুষত, কুকুর[২৫] পুষত কিন্তু (কোন কোন উপজাতি বা দল) গো-হত্যা করত, পর-স্ত্রী হরণ করত। বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে এই যে শেষোক্ত অভ্যাসগুলি দেখতে পাওয়া যায় এগুলি কিন্তু তাদের বরাবরের সংস্কার অর্থাৎ বহু প্রাচীন। ময়ূরের[২৪] সঙ্গেও তাদের পরিচয় ছিল। তাদের গণনার ধারায় ছিল "গণ্ডা" (৪টি) "কুড়ি" ও "কড়া" (২০ ও ¼), "পণ" (৮০) প্রভৃতি বিশিষ্ট সংখ্যার নাম ও স্থান। তারা চান্দ্র মাস ও চান্দ্র বৎসর গণনা করত, তাই আমরা তাদের কাছ থেকে পেয়েছি, "কটাল, গণ, জোয়ার, ভাঁটা" প্রভৃতি শব্দ। চণ্ডী[২৬] কালী ছিল তাদের (উপজাতি-বিশেষের) আরাধ্যা দেবী। হলুদ, পান, কলা, সিঁদুর ছিল[২৭] তাদের পণ্য এবং শিল্প-সভ্যতার নিদর্শন। কড়ি ছিল তাদের মুদ্রা। "কার্পাস" বোধ হয় তাদেরই আবিষ্কার। তাদের সভ্যতা ছিল নদীমাতৃক ও মূলতঃ গ্রামীণ। তাদের রাষ্ট্রিক কাঠামো ছিল প্রাচীন আর্য্যদেরই মতন, অর্থাৎ গোষ্ঠীপতি বা গোত্রপতির অধীনে যেমন এক-একটি দল থাকত, তেমনি কোন সর্দ্দারের অধীনে বিশেষ একটি দল থাকত বা কাজ করত। অস্ত্র-শস্ত্র ছিল তাদের হাড়ের ও পাষাণের।

আজ আমরা বাঙালীর মধ্যে যে, "ডোম, কাওরা, গোড়, বাগদী, মালী, মালাকার, পোদ, পুর-কায়স্থ, পৌণ্ড্র[২৮]-ক্ষত্রিয়

১৮। মৎপ্রণীত ও *Prehistoric India* by P. Mitra, page 72-74 দ্রষ্টব্য।

১৯। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে মূল "অড়ক" প্রত্যয় থেকে "অড়া বা আড়া"র উৎপত্তি হয়েছে।

২০। দ্রষ্টব্য "ভারতের ভাষা ও ভাষা-সমস্যা"; ২য় অধ্যায়—১৪ পৃ.। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২১। "সুম্" মূলতঃ "সুম্হ" শব্দও হতে পারে এবং তা যদি হয়, তা হলে অর্থ হয়—সুম্হদের বাসস্থান।

২২। বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের উপাধি "লাহিড়ী" মূলতঃ লাব্ বালাও + অড় + ঈ = "লাওড়ী > লাহড়ী > লাহিড়ী", অর্থাৎ লাওড়া বা লাবড়া গ্রামের অধিবাসী ও "ভাদুড়ী" শব্দ মূলতঃ ব্যাং + অড়া + ঈ = "ব্যাঙড়ী > বাদড়ী > বাদুড়ী > ভাদুড়ী"— কিনা, বাদড়া গ্রামের অধিবাসী।

২৩। অনেকেই ভুল করে "বকদ্বীপ" ও "ব্যাঘ্রতটী"কে এর প্রজন্মস্থিতা বলে মনে করেন।

২৪। অষ্ট্রিক • "ময়ূ-রকু" শব্দই তার প্রমাণ। একথা অন্যত্র প্রমাণ করেছি। ঐ মূল থেকেই "ময়ূর" ও "বর্হ" উৎপন্ন হয়েছে।

২৫। বোধ হয় বৈদিক "কুকুর" শব্দ মূল আর্য্য ভাষার কোন শব্দ নয়। বিপরীতে অষ্ট্রিক হওয়াই সম্ভব।

২৬। "চুণ্ড বা চুণ্ডু" উপজাতির দেবী বলেই নাম "চণ্ডী" ও "চণ্ডিকা"—অবশ্য সংস্কৃতে, এবং "মুণ্ডা বা কোল" জাতির দেবী বলেই নাম 'কালী ও কালিকা'। এই সব দেবীর পূজার মধ্যে রয়ে গেছে মাতৃকাতন্ত্রের (Matriarchate System) স্মৃতি।

২৭। দ্রষ্টব্য—বাঙ্গলা দেশের ইতিহাস—পৃঃ ৮-১১ ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

২৮। দ্রষ্টব্য—"বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত" (বিশেষভাবে প্রথম অধ্যায়) প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও "বাঙালীর পরিচয়" (শেষের দিক) মীননাথ বসু।

চাণ্ডাল, হাড়ি, ডোম, চুড়া, মাল, পোদ"—প্রভৃতি উপাধি-বাচক শব্দ দেখতে পাই আসলে সেগুলি পূর্ব্বোক্ত প্রাগৈতিহাসিক উপজাতিগুলির নামের অপভ্রষ্ট রূপ। সুতরাং বাঙালী অষ্ট্রিক জাতি। আজকের জাতি হিসাবে পরিচিত বাঙালীর করোটির মাপ-যোগ অষ্ট্রিক উপজাতীয়দের করোটির মাপ-যোগের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। রক্ত পরীক্ষার ফলও এক। সুতরাং বাঙালী "হোমো-আল্পিনাস"[২৯] (Homo-Alpinus)ও নয়, "নিগ্রো-নিগ্রোবটু" (Negro-Negrito)ও নয়, "দ্রাবিড়, মোন্, খ্মের"-প্রভৃতি পঞ্চজাতির সংমিশ্রণও নয়। সরকারী প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠ নৃতাত্ত্বিকেরা যে প্রাচীন অষ্ট্রিক-গোষ্ঠীর বিচরণ-পথ সম্প্রতি অনুসন্ধান করেছেন, তার ফলে দেখা গেছে যে তারা আফ্রিকা মহাদেশ থেকে উঠে এসে এশিয়ার নানা দেশ হয়ে ভারতে পঞ্জাবের উপর দিয়ে এসে বাঙলায় হারিয়ে গেছে। অর্থাৎ তাদের স্থলপথ এখানে এসেই শেষ হয়ে গেছে। তারপর থেকে সুরু হয়েছে জলপথে বিচরণ। তাই বাঙলার জাতিরা গিয়ে উঠেছে সুদূর অষ্ট্রেলিয়া মহাদ্বীপে, প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে, লঙ্কা, আন্দামান, লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপে।

শেষ কথা হচ্ছে এই যে, বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাসের প্রধান সম্বল পাথুরে প্রমাণ এখনও পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় নি, তার কারণ খননের কাজ বাঙলা দেশে অত্যল্পই হয়েছে। নেহাৎ যেটুকু পুকুর খুঁড়তে গিয়ে, কি লাঙলের মুখে, কি নদীর সোঁতায় পাওয়া গেছে সেইটুকু বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিত হয়ে আছে। রাখালদাস বাবু তাঁর বাঙ্গলার ইতিহাসে[৩০] যে ক'টি পাথুরে প্রমাণের উল্লেখ করেছেন সে ক'টির মধ্যে হুগলী জেলার কৃনকুনে গ্রামে প্রাপ্ত পাথুরে (Boucher of Celt) প্রমাণটিই একমাত্র বাঙলার জিনিস

২৯। দ্রষ্টব্য—"বাঙালীর পরিচয়"—পৃঃ ৪২-৪৪ দীননাথ বসু ও "বাঙ্গলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা"—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার অন্যান্য প্রবন্ধ।

৩০। বাঙ্গলার ইতিহাস ; ১ম খণ্ড, ১ম অধ্যায় পৃঃ ৬-৭।

"নিউ ইণ্ডিয়ান কাল্চরাল ড্যান্সারস"

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

টিপটিপে বৃষ্টি ও সংশ্লিষ্ট কুয়াশার মধ্যে সমীর লণ্ডন ছাড়িল। দেশে ফিরিবার আগে ভাল করিয়া কন্টিনেণ্ট বেড়াইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কপালগুণে তাহাকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে হইল জেনোয়া মুখে জাহাজ ধরিবার জন্য।

সারা ইউরোপ তখন টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। মিউনিকে ফুয়েরর ও রোমে ডুচের হুঙ্কার ক্রমে চড়িতেছে। ফ্রান্সে মাসে মাসে মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন হইতেছে। ইংলণ্ডে চেম্বারলেনের ছাতার দিকে সকলে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে। যাহারা হাস্যপ্রধান ধাতের লোক তাহাদের মুখেও আসন্ন ঝটিকার বিদ্যুৎ-দন্ত বিকাশ দেখিয়া বক্রহাসির পরিবর্ত্তে কাষ্ঠহাসির উদয় ও বিলয় হইতেছে। ম্যাজিনো লাইন, হিণ্ডেনবুর্গ লাইন, জার্ম্মানীর সমর-প্রস্তুতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণের লম্বা লম্বা প্রবন্ধ বাহির হইতেছে। পোলাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, বেলজিয়মে সমরবিশারদ ও কূটমন্ত্রণাবিশারদগণের ছুটাছুটি চলিতেছে। আকাশে বিমানবাহিনী, পথেঘাটে ট্যাঙ্কবাহিনী, বন্দরে বন্দরে জঙ্গীজাহাজের সারি, জলের তলে সাবমেরিন দিন ও ঘণ্টা গুনিতেছে। ইউরোপের বারুদস্তূপ স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব।

সমীরের ভাগ্য ভাল যে বহু চেষ্টায় সে জাহাজে স্থান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে। উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণস্নাত ইতালীয় উপকূল পিছনে ফেলিয়া জাহাজ যখন দাক্ষিণ সমুদ্রের পথ ধরিল সমীর স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

তাহার বিলাতে প্রবাসজীবনের কথা মনে হইল। কিসের একটা নেশায় সময়টা কাটিয়া গিয়াছে। ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য সে বিলাতে আসিয়াছিল। পড়াশুনা নামমাত্র, মিটিং, ইণ্টারভিউ, রিসেপশন, কাগজে লেখা, এই করিয়া দুইটি বছর কাটিয়া গিয়াছে। ফরাসী, জার্ম্মান, রুশ, পোল, মিশরী, তুর্কী, নিগ্রো কত জাতির লোকের সঙ্গে, বিশেষ করিয়া ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলের মুখে এক প্রশ্ন, তোমাদের দেশ কি করিবে?

ইউরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়ার দিকে চাহিয়া সে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছে যে ভারতবাসীর সম্মুখে এক বড় সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বারট্রাণ্ড রাসেলের একটা কথা তাহার মনে পড়িত। লোকবল ও প্রাকৃতিক সম্পদে আমেরিকা, রুশিয়া, চীন ও ভারতবর্ষ এই চারিটি মাত্র দেশ আছে পৃথিবীতে যাহারা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে। ঠিক কথা, কিন্তু চীন ও ভারত কোথায়? সবাই তাহাকে বলিয়াছে যে—সুযোগ আজ আসিয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হইলে

ভারতবর্ষ শক্তিশালী জাতিসমূহের সভায় নিজের প্রাপ্য আসন অধিকার করিতে পারিবে।

Conte Verde জাহাজে অখণ্ড অবসর, কোন কাজের বালাই নাই। জাহাজের ইতালীয়ান অফিসারদের উদ্ধত ভাব, জার্ম্মান যাত্রীদের নাটকীয় চালচলন, জাপানীদের হ্রস্ব, মাংসল নাসিকার নীচে সুপ্রীতিময় হাসি, ব্রিটিশদের নূতন মৃদুভাব, এ সব লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। নিষ্কর্ম্মা বসিয়া বসিয়া সসীম নানা রঙের তুলি দিয়া নানা দিক হইতে তাহার কল্পনার ভবিষ্যৎ ভারতের চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিত মনে মনে। প্রদেশে প্রদেশে যে অবিশ্বাস ও ঈর্ষার দ্বন্দ্ব দেখিয়া গিয়াছিল সে দ্বন্দ্ব নিশ্চয় মিটিয়া গিয়াছে। প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ব্যক্তি বা দলগত স্বার্থান্বেষণ জাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া সকলের বোধ হইয়াছে, আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া ভারতবাসী ঘরের সমস্যা নিজেরা সমাধান করিয়া লইবার প্রতিজ্ঞায় ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে।

বিদেশ ও বিদেশীদের মধ্যে বাস করিয়া দূর হইতে আর পাঁচটা দেশের সঙ্গে পাশাপাশি নিজের দেশের দিকে চাহিয়া তাহার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। আসন্ন সঙ্কটের মুখে দেশের লোকের যাহা করা উচিত সরল বিশ্বাসে তাহাই তাহারা করিতেছে দেখিবে আশায় সসীম দেশে ফিরিতেছিল।

দেশে ফিরিয়া তাহার কাজ হইবে আগতপ্রায় নবযুগের বাণী প্রচার করা। বিরল অবসর কর্ম্মব্যস্ত জীবনের চিত্র সে আপনার চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।

লোহিত সমুদ্র পার হইয়া এডেনের সাঁড়াশী মুখ হইতে বাহির হইয়া জাহাজ আরব সাগরে পড়িল। পশ্চিম-উপকূলের দিকে জাহাজ আগাইতে থাকিলে দেশের প্রিয়জনদের কথা সসীমের মনে পড়িতে লাগিল। একটি মুখ প্রায়ই তাহার মনে উঁকি দিতে লাগিল। সে মুখ ডেইজীর নহে। ডেইজীর কথা মনে হইতে আজ হঠাৎ সে ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইল যে গত দুই বৎসরের মধ্যে প্রথম দিকে মাত্র দুই-তিনখানা চিঠি সে ডেইজীর কাছ হইতে পাইয়াছে, তার পর তাহাদের দুই জনের মধ্যে চিঠিপত্র লেখা অলক্ষিতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনেক ভাবিয়াও কে আগে চিঠি লেখা বন্ধ করিল, কি জন্য বন্ধ হইল সে মনে করিতে পারিল না। তাহার পিতার চিঠিতে এইমাত্র জানিতে পারিয়াছিল যে দেশে ফিরিলেই বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ করা তাঁহার অভিপ্রায়। ডেইজী পিতার নির্ব্বাচিত তাহার ভাবী পত্নী।

বোম্বাই বন্দরে যেদিন জাহাজ ভিড়িল সেদিন শহরে কি একটা উপলক্ষে হরতাল। ডকে ষ্ট্রাইক, সাধারণ যানবাহন বন্ধ। রাস্তায় রাস্তায় সশস্ত্র পাহারা, দোকানপাট বন্ধ, লোকজনের চলাচল নাই বলিলেই হয়।

এক বন্ধুর গৃহে সসীমের উঠিবার কথা ছিল। তাঁহার সাহায্যে কোন প্রকারে মালপত্র সহ সে তাঁহার বাড়ীতে পৌঁছিল।

বন্ধুটি মারাঠী, এক ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর উচ্চপদস্থ চাকুরীয়া। বিদেশে আলাপ ও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। চমৎকার লোক, খাঁটি স্বদেশীভাবাপন্ন। হরতালের পরদিন বন্ধু বলিলেন বোম্বাইতে এক বাঙালী নাচের দল আসিয়া খুব নাম করিয়াছে। সসীম নাচ দেখিতে ইচ্ছা করিলে তিনি টিকেট সংগ্রহ করিয়া আনিবেন। সসীম নাচের দলের নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেদিনকার বোম্বে ক্রনিকেলের বিজ্ঞাপনের পাতা দেখিয়া বলিলেন, Miss Daisy Sen Sarma's Troupe of New Indian Cultural Dancers. Directed by Pandit J. K. Sen Sarma. লেখনের উপরে কাঁচুলী বাঁধিয়া এক হাত মাথার উপরে অন্য হাত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সম্মুখে প্রসারিত একটি মেয়ের চিত্র।

মিস্ ডেইজী সেন শর্ম্মা নাচ দেখাইতে বোম্বাই আসিয়াছে? সসীম আপনাকে জিজ্ঞাসা করিল, টিকেট করিয়া একবার ভাবী পত্নীর নাচ দেখিয়া আসিবে কি? কথাটা মনে আসিতে তাহার খুব হাসি পাইতে লাগিল। তাহার মা নাই, পিতা শেষ পর্য্যন্ত এই মেয়েকেই তাহার ঘাড়ে চাপাইবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছেন? সাবধান, মারাঠী বন্ধু যেন কিছু না জানিতে পারেন। সে নাচে যাইবে না, চিঠিপত্র লেখার কাজ সারিয়া একটু বেড়াইয়া আসিবে বলিয়া সসীম উঠিয়া গেল।

বিলাতযাত্রার কয়েক দিন আগে সসীম ডেইজীদের বাড়িতে গিয়াছিল।

সসীম ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিলে দোতলা হইতে সুমিত্রা তাহাকে দেখিতে পাইল। ছুটিয়া সে বড় বোন ডেইজীর ঘরে ঢুকিয়া চিৎকার করিয়া বলিল,—এই তোর দত্ত সাহেব এসে গেছেন, তাড়াতাড়ি কর্।

ডেইজী তখন আয়নার সম্মুখে সাগরের দোল নৃত্যের মহড়া দিতেছিল। আগামী শনিবারে ইন্‌ষ্টিটিউটের চ্যারিটি শো-তে প্রথম আইটেম তাহার নৃত্য। সে মহড়া না থামাইয়া বলিল,—যে রকম হুড়দাড় ক'রে খবর দিতে এলি ভাবলেম না জানি কি খবর আছে। তুই বসাগে যা, আমি আসছি একটু পরে।

সুমিত্রা ততক্ষণে দিদির টয়লেট টেবিলের কাছে গিয়া ক্ষিপ্রহস্তে সাজসজ্জার ত্রুটি সারিয়া লইতেছিল আর অনর্গল বকিতেছিল। সাগরের দোল নৃত্যে তরঙ্গ তখন ফুলিয়া-ফাঁপিয়া উঠিতেছে, এই গর্জ্জন করিয়া ভাঙিয়া পড়ে বুঝি। কোন প্রশ্নের উত্তর দিবার অবসর নাই ডেইজীর। সুমিত্রা কাজ সারিয়া নীচে নামিয়া গেল। মৃদু গুঞ্জনে কি একটা গানের কলি গাহিতেছিল সে।

সসীম বসিবার ঘরে ঢুকিয়া একখানি বড় চিত্র মনোযোগ দিয়া দেখিতেছিল। চিত্রের সম্মুখভাগে একটি খড়ের কুঁড়ে ঘর, উহার দাওয়ার নীচে একটি কলাগাছ এবং তাল ও আম্র

পরণে মাথায় মাটির ঘট। মধ্যভাগে দীর্ঘকেশ, দীর্ঘ শ্মশ্রু নামাবলী গায়ে যোগাসনে উপবিষ্ট একজন লোক। তাহার সম্মুখে ত্রিভুজ বেষ্টনে ত্রিশূলধারিণী স্ত্রীমূর্ত্তি। সসীম ভাল করিয়া দেখিল, ত্রিভুজ নহে, ত্রিভুজাকার ভারতবর্ষের রেখা-চিত্র। চিত্রের পশ্চাদ্ভাগে মেঘের গায়ে কয়েকটি মুণ্ড। মুণ্ডগুলির সঙ্গে কয়েকজন বঙ্গসন্তানের মুখের সাদৃশ্য আছে, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ। ইঁহাদের আড়ালে দুইটি মুণ্ডকে একটু উঁকি দিবার মত স্থান দেওয়া হইয়াছে। সে দুইটি বালগঙ্গাধর তিলক ও লজপত রায়ের। চিত্রের নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা, প্রথম লাইনে, ভারতমাতা ও পণ্ডিত জে, কে, সেন শর্ম্মা, দ্বিতীয় লাইনে, আশীর্ব্বাদ।

এই চিত্রের কি অর্থ হইতে পারে সসীম চিন্তা করিতেছিল, হঠাৎ পিছনে হাসির শব্দে ফিরিয়া দেখিল ডেইজীর ছোট বোন সুমিত্রা।

—গুড আফটার নুন সসীমদা, ইউ লুক চার্মিং।

সসীম হাসিল। সুমিত্রার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই বয়স বাড়িলেও। অবিশ্রান্ত কথা বলা, অসংলগ্ন, অনুচিত কথা বলা তাহার অভ্যাস। সসীম তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, বলিল, ওটা আমার বলবার কথা। ইউ লুক চার্মিং সুমিত্রা।

তাহার স্বরটা যেন তাহার নিজের কাছে সম্পূর্ণ পরিহাসের বলিয়া মনে হইল না।

সন্ত্রস্ত হইবার ভঙ্গীতে ঠোঁটে একটা আঙুল চাপিয়া সুমিত্রা বলিল,—চুপ, ডেইজী শুনলে কুরুক্ষেত্তর বেধে যাবে। আপনাকে একটা টিপ দিচ্ছি, যখন এমনতর কথা বলতে ইচ্ছে যাবে আমার কানে কানে বলবেন, বুঝলেন?

সে হাসিয়া ফেলিল।

—ডেইজী কোথায়? তাকে দেখছি না যে?—সসীম জিজ্ঞাসা করিল।

—কি করে দেখতে পাবেন মিঃ দত্ত? বয়স দেখি ভাল ছেলের মত। বিলেত যাবার আনন্দে দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোন খবর রাখেন না। ডেইজীর এখন মস্ত নাম, প্রথম শ্রেণীর গাইয়ে ও নাচিয়ে বলে। সে উপাধি পেয়েছে জলসাশ্রী।

—জলসাশ্রী কি? কে উপাধি দিয়েছে?

—লোকে বাংলাভাষা ভুলে যায় বিদেশ থেকে ফিরে, আপনি দেখছি বিদেশ যাবার আগে মাতৃভাষা ভুলে গেছেন। গীতশ্রী, নৃত্যশ্রী, জলসাশ্রী, একথাগুলো কোনদিন শোনেন নি? জলসাশ্রী মানে যার উপস্থিতে জলসার সর্ব্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি ঘটে সেই তরুণী মহিলা। ইজ ইট ক্লিয়ার? উপাধিটা দিয়েছি আমি। বাবার বক্তৃতা শুনতে যেমন বুড়োরা ভিড় করে, দিদি যে জলসায় যায় সেখানে ছোকরাগুলো তেমনি ভিড় করে। "বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। বাঙালী জাতির যে বৈশিষ্ট্য জগৎ সভায় তাহাকে উচ্চ সম্মানের আসনের দাবীদার করেছে…" বাবা এই ব'লে বক্তৃতা সুরু করলেই শ্রোতারা একসঙ্গে হাততালি দিতে, মাথা নাড়তে সুরু করে, কোন কোন বুড়ো আবার ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদতে থাকে। আর জলসাশ্রী ডেইজী যখন—

সুমিত্রা দাঁড়াইয়া বোধ হয় ডেইজীর নাচের একটু নমুনা দিবার ইচ্ছায় দরজার দিকে মুখ ফিরাইতেই দেখিল পরদা সরাইয়া ডেইজী ঘরে ঢুকিতেছে। ধপ করিয়া আসনে বসিয়া পড়িয়া বলিল,—পারলে আসতে এত সকালে? দত্ত-সাহেবের অবস্থা দেখে তোমাকে ডাকতে উঠছিলেম।

ডেইজী কটমট করিয়া বোনের দিকে চাহিল। নৃত্য-ভঙ্গিমার ইঙ্গিতটুকু তাহার চোখ এড়ায় নাই। সে জানিত সুমিত্রা এতক্ষণ বসিয়া সসীমের সঙ্গে ফ্লার্ট করিতেছিল, যে রকম স্বভাবের মেয়ে সে। ডেইজীর স্তাবক জনতা, জনতার মুগ্ধ দৃষ্টি ও প্রশংসা তাহাকে এত উচ্চ আসনে উঠাইয়াছিল যে সে আসন হইতে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নিগ্রহ বা অনুগ্রহ দৃষ্টিপাত করিবার অবকাশ বা প্রবৃত্তি তাহার হইত না। সুমিত্রার প্রগলভতা তাহার অত্যন্ত ইতর মনে হইত।

ডেইজীর চটিবার বাস্তবিক কারণ ছিল। সে বিশ্বাস করিত নাচ ও গান তাহার জীবনের মিশন। নানা সভায় পিতার বক্তৃতা হইতে তাহার মনে বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মিয়াছিল। পিতার সম্পাদিত কাগজের "আমোদ-প্রমোদ" কলমের ব্যাখ্যা হইতে সে বুঝিতে পারিয়াছিল বাঙালীর এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যের একটা দিক মূর্ত্ত হইয়াছে তাহার সঙ্গীত ও নৃত্যের মধ্যে। তাহার মাধ্যমে বাঙালী-আত্মার সঙ্গীতময় ও নৃত্যময় অভিব্যক্তি হইয়াছে। এজন্য নিজের নাচগান সম্বন্ধে হাল্‌কা আলোচনা সে সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু সুমিত্রাটা—ছোট মেয়ে বলিয়া পিতার শাসন তাহার সম্বন্ধে বরাবর আলগা।

সুমিত্রার প্রতি উদ্‌গত ক্রোধ দমন করিয়া ডেইজী সসীমের পাশে বসিল। রওনা হইবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে দুইচারিটা প্রশ্নের পর একটু হাসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল,—বাবা ও রায়-সাহেব দত্ত মিলে নূতন মাসিক পত্র বের করছেন জান?

সসীম বিস্মিত হইল, তাহার বাবা কাগজ বাহির করিবেন? আণ্ডারসন কোম্পানীর কাজ করিবার সময়ে কি একটা জুট কোরকাষ্ট না কি কাগজের ভার তাঁহার হাতে ছিল জানে। কয়েক বৎসর হইল তিনি অবসর লইয়াছেন। এখন পূজা করেন ও ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়েন। কই কোন কাগজের কথা ত শোনে নাই সে। বোধ হয় টাকা জোগাইবার ভারটা শুধু তাঁহার।

—কি কাগজ? সে জিজ্ঞাসা করিল।

সুমিত্রা এতক্ষণ কোন মতে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। দিদিকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া সে বলিয়া

উঠিল,—হায় যীশুখ্রীষ্ট! কি কাগজ তাও জানেন না? বাঙালীর বৈশিষ্ট্য, বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য, বাঙালীর বীরত্ব, বাঙালীর শক্তি-উপাসনা, বাঙালীর আরও যেন কি কি এই নূতন কাগজের মারফৎ প্রচার করা হবে। নৃত্যে, গীতে, হাস্তে, লাস্তে, বক্তৃতায় বাঙালীর বৈশিষ্ট্য ইণ্টারপ্রেট করবে এই কাগজ, বাঙালী-নিন্দুক ভিন্নপ্রদেশীয়গণের বোঁতা মুখ ভোঁতা করবে—

সুমিত্রা!—ভেইজী প্রায় কাটিয়া পড়িল রাগে।

ভেইজীর ক্রোধ অগ্রাহ্য করিয়া সুমিত্রা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সমীর দেখিল ভেইজী ভয়ানক রাগিয়াছে। তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল,—সুমিত্রা, এসব সীরিয়াস ব্যাপার নিয়ে তামাশা করা কি উচিত? যদি তোমাদের বাবা ও আমার বাবা আপনাদের মত প্রচার করবার জন্ত বাস্তবিক কোন কাগজ বের করা স্থির করে থাকেন এভাবে বিদ্রূপ করা তাঁদের অপমান করা নয় কি?

সুমিত্রা ভ্রূকুটি করিয়া সমীরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিল। তারপর মৃদু হাসিয়া বলিল,—এটাকে বড্ড সীরিয়াস ব্যাপার বলে আপনিও মনে করেন নাকি? না মিস ভেইজীর মন গলাবার জন্ত—

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই জনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল,—এক্সকিউজ মি, বিদেশে যাচ্ছেন, নিরিবিলি আলাপ-আলোচনার একটু সুযোগ আপনাদের দেওয়া উচিত।

সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া সমীর অন্তমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। তাহার এই অন্তমনস্কতা ভেইজীর চোখ এড়াইল না, তাহার মুখে বিরক্তির কুঞ্চিত রেখা দেখা দিল। কিছুক্ষণ পরে সমীর ভেইজীর দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল। বলিল,—সুমিত্রার কথায় তুমি এত চট কেন ভেইজী, ও ত ছেলেবেলা থেকে ঐ রকমের।

—ছেলেবেলায় যা মানিয়ে যেত বড় হলে তা আর মানায় না। তা ছাড়া, বকামি ক'রে ক'রে ভাল জিনিস, বড় জিনিস বুঝবার শক্তিও সে হারিয়েছে। সে কথা যাক। শনিবারে ইনষ্টিটিউটে চ্যারিটি শো-তে আসছ ত? টিকিট বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি কর্ত্তৃপক্ষদের বলে রাখবো তুমি গেলে তোমাকে বসিয়ে দেবেন। টিকিটের বাবদ পঁচিশটা টাকা তাঁদের হাতে দিয়ে দিও।

ভেইজী সমীরের দিকে চাহিয়া মিষ্ট হাসিল। বলিল,—আমার নাচ ও গানের প্রশংসা করে দেশের লোক। তুমি নিজে দেখে শুনে বলবে এই প্রশংসা অতিরঞ্জিত কিনা।

আরও খানিকক্ষণ অন্ত কথাবার্ত্তার পরে সমীর চ্যারিটি শো-তে যাইবে কথা দিয়া উঠিল, ভেইজীর মিষ্ট হাসি পাওয়া একটু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া তাহার মনে হইল কিনা বলা কঠিন।

তাহার পিতার প্রভাব ভেইজীর চরিত্র ও মত গঠনে অনেকখানি কার্য্যকরী হইয়াছিল। ভেইজীর পিতা পণ্ডিত যুগলকিশোর বা জে, কে, সেনশর্ম্মা প্যাট্রিয়ট, সম্পাদক ও লীডার। বিপিনচন্দ্র পালের লজিক ও শ্রীঅরবিন্দের ম্যাজিক বা আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদ গঠিত। হাল আমলের রাজনীতির অভ্যুদয় হইবার পর হইতে তিনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছেন, তবে মাঝে মাঝে আলবার্ট হলের দুই-একটা মিটিঙে সভাপতিত্ব করিবার ডাক পড়িলে না করিতে পারেন না।

রাজনীতি হইতে অবসর লইলেও পণ্ডিত সেনশর্ম্মা তাঁহার অক্ষুণ্ণ উদ্যম ও শক্তি দেশসেবায় নিয়োজিত রাখিয়াছেন। ইউরোপের আসুরিক সভ্যতা ও বস্তুতান্ত্রিকতা, ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্ব অপেক্ষা ভারতবর্ষের বড় শত্রু দেশের অনেকের মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি দৃঢ়-ভাবে এ কথা বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে উত্তর-ভারতে সাত-আট শত বৎসর ব্যাপী তুর্কী, আফগান ও চাঘতাই-মোগল প্রভুত্ব ভারতবর্ষের যে ক্ষতি করিতে পারে নাই মাত্র দুই শত বৎসরের ইউরোপীয় প্রভুত্ব তাহা অপেক্ষা গুরুতর অনিষ্টের সম্ভাবনা ঘটাইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্ত কাড়াকাড়ি মারামারি করা অপেক্ষা ভারতবর্ষের প্রাচীন কৃষ্টি ও আধ্যাত্মিকতার প্রাণধারাকে বাঁচাইয়া রাখা অনেক বড় কাজ। আধ্যাত্মিকতা ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য, ভারতবর্ষ পৃথিবীতে এক মাত্র আধ্যাত্মিক দেশ। এই আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিবার গুরুভার পণ্ডিত সেনশর্ম্মা আপনার প্রবীণ স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন।

ইহা ছাড়া তিনি বাঙালী জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে যাহার কথা লিখিত থাকিবে এমন একটি মহামূল্যবান তথ্য-রত্নের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন বিস্মৃতির অন্ধকার গুহা হইতে। সে তথ্যটি এই যে বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। সভা-সমিতিতে, খবরের কাগজে, পুস্তকে এই তথ্য তিনি অবিশ্রান্ত প্রচার করেন। এই তথ্য হইতে উৎপত্তি হইয়াছে অতি পরিচিত বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যবাদের। বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের গর্ব্ব আজ কোন বাঙালী করে না? স্বভাবদুর্ব্বল বাঙালী চরিত্রকে সবল করিবার এই অব্যর্থ টনিক সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিয়া পণ্ডিত সেনশর্ম্মা দেশের ও দশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পণ্ডিত সেনশর্ম্মার অভিন্নহৃদয় বাল্যবন্ধু কম্বুলীটোলার রায় সাহেব কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সমীরের সঙ্গে ভেইজীর বিবাহের কথাবার্ত্তা অনেক দিন স্থির আছে। বিবাহ হইয়া যাইত কিন্তু রায় সাহেব জিদ ধরেন ছেলে বিলেত ঘুরিয়া না আসিলে বিবাহ হইবে না।

ভেইজী ইতিমধ্যে ডুমিয়র কেম্ব্রিজ পাস করিয়া তাইও-

সিসাম হইতে বাহির হইল। মিশনারী স্কুলে না দিলে ছেলে-মেয়ের শিক্ষার বনিয়াদ পোক্ত হয় না এবং ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজ না পড়িলে রাজনীতির জ্ঞান জন্মায় না—বাংলাদেশের ভাপার লার্কেলের এই সনাতন মত পণ্ডিত সেনশর্ম্মা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ডেইজী ডাইওসিসান হইতে বাহির হইল। এক শুভ মুহূর্ত্তে পূর্ব্ব-ভারতের আকাশে এক এয়ারপকেটে বসিয়া বসিয়া বিশ্রাম করিবার সময়ে ভগবান নটরাজের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল, তিনি মৃদু হাস্য করিলেন। তখন হইতে ডেইজীর জয়যাত্রা সুরু হইল। খবরের কাগজ, স্কুল কলেজের তরুণ-বৃন্দ, দরদী মধ্যবয়স্কদিগের পৃষ্ঠপোষকতায় তাহার বিজয় রথ দুর্ব্বার গতিতে ছুটিয়া চলিল। সসীম বিলাতে তখন বার্ণাড শ, প্রোঃ হ্যারল্ড ল্যাস্কী ও মিঃ ডি ভ্যালেরার সঙ্গে ইণ্টারভিউ, ব্রিটিশের ভারতবর্ষের মঙ্গল করিবার ইচ্ছার মধ্যে কত পারসেণ্ট খাঁটি ও কত পারসেণ্ট মেকী তাহা নির্ণয় ও ইণ্ডিয়ান মজলিশে বক্তৃতা করিতে ব্যস্ত।

ডেইজীর খ্যাতি যত বাড়িতে লাগিল প্রবাসী সসীমের কপাল তত ভাঙিবার আগের মচ্‌মচ্‌ শব্দ করিতে লাগিল। এদিকে নাচুনে ভাবী পুত্রবধূকে লইয়া সসীমদের পরিবারে অবস্তির হাওয়া বহিতে লাগিল।

সসীমের পিতা রায় সাহেব কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত সামান্য বেতনে আণ্ডারসন কোম্পানীর আপিসে চাকুরী আরম্ভ করিয়া সততা ও অধ্যবসায়ের গুণে জুট-সেক্‌সনের বড়বাবু হইয়াছিলেন। তিনি শাক্ত মতে বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার বাটীতে কালী পূজার সময়ে কোম্পানীর ছোট বড় সাহেবগণ নিমন্ত্রিত হইয়া প্রতিমা দর্শন করিয়া প্রণামী দিতেন এবং মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের জন্য বড়বাবু বিলাতী 'কারণে'র ব্যবস্থা করিতেন।

রায় সাহেব সওদাগরী আপিসের চাকুরীয়া এবং সাহেব-ভক্ত হইলেও তাঁহার পারিবারিক আবহাওয়া ছিল শিক্ষিত ও মার্জ্জিত এবং অনেকখানি স্বদেশীয়ানাপূর্ণ। বাল্যবন্ধু পণ্ডিত সেনশর্ম্মার প্রভাব তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বাঙালী জাতি শক্তি উপাসকের জাতি, বাঙালীর বৈশিষ্ট্য শক্তিসাধনা তিনি দৃঢ়ভাবে এই মত ব্যক্ত করিতেন এবং দৃষ্টান্ত দিবার প্রয়োজন হইলে নিজের দৃষ্টান্ত দিতেন।

রায় সাহেব রাশভারী মানুষ, দেহখানি শক্তি-উপাসকের উপযুক্ত। সকলে তাঁহাকে সমীহ করিত, তিনি সমীহ করিতেন একটি বাচাল মেয়েকে। এই মেয়েটি তাঁহার বন্ধুকন্যা সুমিত্রা। হাসি ও কৌতুকপ্রিয় এই মেয়েটির সম্মুখে রাশভারী রায় সাহেব রাশ আলগা করিয়া দিতেন। তাঁহার নিজের কন্যা ছিল না। ডেইজীর দর্শন যত দুর্লভ হইতে লাগিল সুমিত্রাকে তত তিনি কাছে টানিতে লাগিলেন। শক্তিসাধনা বাঙালীর বৈশিষ্ট্য আন্তরিক ভাবে এই মতে বিশ্বাস করিলেও বন্ধুর আধ্যাত্মিকতার বাণী রায় সাহেব বুঝিতেন না, পছন্দও করিতেন না। সম্ভবত এই জায়গায় সুমিত্রার সঙ্গে তাঁহার মিল ছিল।

সুমিত্রা নিজের বাপকে এড়াইয়া চলিত কিন্তু বাপের এই গম্ভীর, কালীভক্ত, বিশালকায় বন্ধুকে চোখা চোখা বাক্যবাণে বিদ্ধ করিবার সুযোগ পাইলে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিত না। কখন কখন সুমিত্রার সন্দেহ হইত রায় সাহেব লেগ-পুলিং করিতেছেন, অর্থাৎ ইচ্ছা করিয়া উস্কাইয়া দিতেছেন। এ সন্দেহ একেবারে মিথ্যা নয়। প্রকৃতই সুমিত্রাকে চটাইয়া, তাহাকে খোঁচা দিয়া তাহার কথা শুনিতে তাঁহার আনন্দ বোধ হইত। সুমিত্রার একটা আলাদা দেখিবার ভঙ্গী ছিল, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেও তাহার বেশ দখল ছিল। ঝোঁকের মাথায় বকিতে বকিতে এই সন্দেহ একবার মনে উঠিলেই সুমিত্রার বাক্যবাণ-গুলি একেবারে নিস্তেজ হইয়া যাইত।

সুমিত্রা আসিয়া তাঁহার কাছে বসিলে তাহার মনের ভাব বুঝিয়া গম্ভীরভাবে দুই-চারিটা কথায় তিনি তাহাকে উস্কাইয়া দিতেন, দিয়া মজা দেখিতেন। স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙালী শক্তিসাধনা করিয়া আসিতেছে এক দিন গম্ভীরভাবে এই মতের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া শুনিবার পর সুমিত্রা উসখুস করিতে লাগিল। পণ্ডিত সেনশর্ম্মার একটি প্রবন্ধের কথা রায় সাহেবের স্মরণ হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, দশপ্রহরণধারিণী মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা বাঙালী জাতির ইষ্টদেবী, বাঙালী শক্তির সন্তান, আজন্ম শক্তির সাধক। সুমিত্রার বাগযন্ত্র আর বাধা মানিল না। ব্যঙ্গ হাস্য করিয়া সে বলিল,—বাঙালীর শক্তিসাধনা আর কোন শক্তির নয় কাকাবাবু, শুধু বাক্‌শক্তির সাধনা। চারদিক থেকে পিটিয়ে, ধনেপ্রাণে ইজ্জতে মেরে যখন একশা করে দিচ্ছে ককিয়ে ককিয়ে বাঙালী তখনো মহিষমর্দ্দিনীর স্তব করছে। পায়ের ধুলো ঝেড়ে তর্জ্জনী তুলে বলছে, একবার দেখে নোব, আর আস্ফালন করছে। আবার দম নিয়ে শক্তিসাধনার ধুকুনী ঝেড়ে গান্ধীজীর অহিংসবাদকে খবরের কাগজে বিদ্রূপ করছে। কবে দু'জন ছেলে বোমা ফাটিয়ে নিজের হাত পা উড়িয়েছিল গোটা বাঙালী জাতি তাই ভাঙিয়ে খাচ্ছে আজও।

ঘন ভ্রূর নীচে রায় সাহেবের বড় বড় দুই চোখ মিটমিট করিতেছিল। সুমিত্রা নিজের ঝোঁকে বলিয়া চলিল,—দেহে শক্তি নেই, চরিত্রে শক্তি নেই, শক্তির পরিচয় কেবল বাক্‌ বিস্তারে। এক জন বাঙালী জীবনে বাজে কথায় যে শক্তি ব্যয় করে পাওয়ারে পরিণত ক'রে তাতে বোধ হয় এক জন সুপার ফোর্টেস হাওড়াই টু ক্যালকাটা ননষ্টপ উড়তে পারে। সাধে কি অন্য প্রদেশের লোকে বলে বাঙালীর আছে শুধু গিফ্‌ট অব দি গ্যাব? বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য। বড় বড় কথা, দলাদলি, পরশ্রীকাতরতা, আত্মম্ভরিতা, এই হ'ল বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য। গোটা ভারতবর্ষের

লোক কেউ নয়, এ খোট্টা, ও মেড়ো, সে উড়ে, মানুষ কেবল আপনার মনিব আণ্ডারসন কোম্পানীর সাহেব গোষ্ঠী আর তাঁহাদের বশম্বদ কেরাণীর জাত বাঙালী। শালুক চিনেছেন গোপালঠাকুর। আর কোন্ জাত আছে ভারতবর্ষে যাকে ভারতবর্ষের সবগুলো জাতে মিলে কায়মনে ঘৃণা করে?

সুমিত্রার রাগ দেখিয়া রায় সাহেব হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—আমার মনিব আণ্ডারসন কোম্পানীকে এর মধ্যে আনছ কেন মা?

—আণ্ডারসন, মরিসন, সোরেনসন সব কোম্পানী এক। বাঙালী সাহেব ভাণ্ডায় মুখে। সাহেবরা গেলে কার মন যুগিয়ে কৃতার্থ হবে বাঙালী? ভারতবর্ষের কোন জাত কি আপনাদের দেখতে পারে? কেন পারে না? কোন্‌গুণে আপনারা তাদের চেয়ে বড়? বুদ্ধি? বুদ্ধির গোড়ায় জল ঢেলে ঢেলে বাঙালী মরছে, সে গাছ বন্ধ্যা, ফল আর ধরছে না। বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বুলি নিছক ভণ্ডামি। বৈশিষ্ট্যের বুলি কপচে আর কত দিন ধোঁকা দেবেন? লোকের চোখ নেই? দিন আসছে যখন চোখের জল ফেলে হাত জোড় করে চেয়ে থাকতে হবে পশ্চিমে বাংলার বাইরে যে ভারতবর্ষ রয়েছে তার দিকে।

রায়সাহেব হাসিয়া বলিলেন,—বক্তৃতার জোর তোমারও ত কম নয় মেয়ে। রা শুনে পাখীর জাত চেনা যায়।

সুমিত্রা কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর অল্প অল্প হাসিতে লাগিল। বলিল,—নাঃ, আপনার মধ্যে এক কোঁটা সীরিয়াসনেস নেই। এত বড় মানুষটা শুধু খোল, শাঁস নেই এক বিন্দু।

রায় সাহেব তিরস্কৃত হইয়া সস্নেহ হাসি হাসিলেন। এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বাক্‌চতুরা মেয়েটি তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্রী হইয়া উঠিতেছিল। বড় বোনের সঙ্গে সুমিত্রার তুলনা করিয়া তিনি মনে মনে একটু আক্ষেপ করিতেন।

এদিকে সসীমের ফিরিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। ভাবী পুত্রবধূর নৃত্য অভিযান সংযত করিবার জন্ত রায় সাহেব বন্ধুকে উপদেশ দিলেন। বন্ধু তখন কন্তার কালচরাল দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্যে ভক্তমণ্ডলীর সহায়তায় অল-ইণ্ডিয়া টুরের পরিকল্পনা করিতে ব্যস্ত। তিনি মুখে আশ্বাস দিলেন ভাবনার কারণ নাই, সসীম ফিরিলে শুভকার্য্য শেষ করা তাঁহার অভিপ্রায়, কন্তার অভিপ্রায়ও তাহাই।

পণ্ডিত সেনশর্ম্মার পার্টি অল-ইণ্ডিয়া টুরে বাহির হইয়া গেল। একটু গোল বাধিয়াছিল সুমিত্রাকে লইয়া। সে বরাবর পিতা ও জ্যেঠা ভগ্নীর নৃত্য ও সঙ্গীতমূলক কালচরাল মিশনের প্রতি উদাসীন। তাহার পড়াশুনার বাতিক ছিল। তাহা ছাড়া তাহার মামার বাড়ীর উগ্র ধরণের দেশপ্রীতির প্রভাব বোধ হয় তাহার মনের উপর পড়িয়াছিল। পিতা ও ভগ্নী টুরে বাহির হইবার আগে সে মামার বাড়ী গিয়া উঠিল।

বেনারস, লক্ষ্নৌ, এলাহাবাদ, দিল্লী হইয়া পণ্ডিত সেন-শর্ম্মার পার্টি ভারতীয় নৃত্যের পৃষ্ঠপোষক এক হিজ হাইনেসের আহ্বানে মধ্যভারতে গেল। সেখান হইতে বোম্বাই। পার্টির দক্ষ পাবলিসিটি অফিসারের দক্ষতায় মিস্ ডেইজী সেন-শর্ম্মা সর্ব্বভারতীয় সেনসেসনের পর্য্যায়ে উঠিল।

বোম্বাইতে সেনশর্ম্মা দলের আবির্ভাবের কথা জানিতে পারিয়া সসীম রত্নেবাণ্ডে মারাঠি বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

গৃহে ফিরিয়া সসীম দেখিল পিতা শয্যাশায়ী, ভাল করিয়া কথা বলিতে পারেন না। মাস কয়েক আগে সন্ন্যাসরোগের আক্রমণ হইয়াছিল, কোনমতে এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন। তাহার মধ্যম ভ্রাতা অসীমকে পাণ্ডি ও শৃঙ্খলার রক্ষকগণ কোথায় লইয়া গিয়াছে জানা যায় নাই। সে নাকি অপরাধজনক হ্যাণ্ডবিল বিলি করিতেছিল।

পিতা দুঃখ করিয়া জানাইলেন যে বড় ছেলের বিবাহ দিয়া যাইবার সাধ ছিল, সে সাধ আর পূর্ণ হইল না। তিনি এইরূপ ইঙ্গিত করিলেন যে সংসারের দিকে চাহিয়া ডেইজীর সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিবার অভিপ্রায় আর তাঁহার নাই, কিন্তু তিনি কথা দিয়াছিলেন অনেক আগে।

পারিবারিক বিপর্যয়ের চাপে ইউরোপের আসন্ন ঝটিকা অতি দূরের, নিঃসম্পর্কিত ব্যাপার বলিয়া সসীমের মনে হইল। মনে হইল যে নবযুগের প্রভাতের আশায় সে বিদেশে দিন গুনিতে ছিল সে প্রভাত উদয়ের পথে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

সসীম একটু গুছাইয়া লইয়া কি ভাবে আপনাকে দেশের কাজে নিয়োজিত করিবে ভাবিতেছে, বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা করিয়া প্রকৃত অবস্থা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। ডেইজীর কথা তুলিয়া পিতাকে ইঙ্গিতে জানাইবার চেষ্টা করিয়াছে যে তাহাকে বিবাহ করা বোধ হয় সম্ভব হইবে না।

কয়েক দিন পরের কথা। রায়সাহেব সসীমকে ডাকিয়া তাহার হাতে একখানা পত্র দিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন,—যুগল লিখেছে, পড়ো।

পত্রে বাল্যবন্ধুর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া পণ্ডিত সেন-শর্ম্মা লিখিয়াছেন যে তিনি অতি দুঃখিত যে বন্ধুর নিকটে বহুদিন পূর্ব্বে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিতে পারিলেন না। ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। শ্রীমতী ডেইজীকে আশ্রমজীবন আকর্ষণ করিয়াছে। আধ্যাত্মিকতার সংস্কার তাহার রক্তে রহিয়াছে, শ্রীমতী যন্ত্রমাত্র। তাঁহারা এক আশ্রমে গিয়াছিলেন মহাপুরুষের পুণ্যদর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায়। আকাঙ্ক্ষা আশার অধিক পূর্ণ হইয়াছে। আশ্রমের আনন্দঘন আধ্যাত্মিক প্রভাব শ্রীমতীকে গভীরভাবে অভিভূত করিয়াছে, সে আশ্রমবাসিনী হইয়াছে। শ্রীমতীকে তুমি অত্যন্ত স্নেহ করিতে, আধ্যাত্মিক জীবনলাভের জন্ত তাহার এই ত্যাগ

খীকার তোমাকে গভীর আনন্দ দান করিবে সন্দেহ নাই।

কন্যার সম্বন্ধে এই সংবাদ দিয়া পণ্ডিত সেনশর্ম্মা ইহার পর লিখিয়াছেন আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতির লুপ্ত স্মৃতি ও গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য জীবনের বাকী কয়টি দিন তিনি যোগ-সাধনায় ব্যয় করিবেন। এই উদ্দেশ্যে মহাবলিপুরমের নিকটে সাধনার পক্ষে অনুকূল মনোরম নৈসর্গিক দৃশ্যের মধ্যে শ্রীহারমিটেজ নামে একটি আশ্রম স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই মহৎ প্রচেষ্টার সাফল্য সাধারণের, বিশেষ করিয়া তোমার মত প্রাচীন আদর্শের অকৃত্রিম অনুরাগী ব্যক্তি-গণের আনুকূল্য ও দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। যৎ-কিঞ্চিৎ সাহায্যও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

পত্র পড়া শেষ করিয়া সসীম পিতার দিকে চাহিয়া হাসিল। পিতার মনে বোধ হয় তখনও একটু আশঙ্কার ভাব ছিল, ছেলের হাসি দেখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন। কিন্তু বাল্যবন্ধুর সহিত এই বিচ্ছেদে তাঁহার মনে একটা ব্যথা রহিয়া গেল। এই ব্যথা সুমিত্রার জন্য। রোগশয্যায় সুমিত্রার কথা তাঁহার পুনঃপুনঃ মনে পড়িয়াছে। তাহার কোন খবর তিনি আজকাল পান না। এবার বোধ হয় খবর পাইবার পথও বন্ধ হইয়া গেল।

ডেইজীর আশ্রমজীবন গ্রহণের ব্যাপার লইয়া দিন কয়েক কাগজে নানা প্রকার আলোচনা হইল। কোন কোন কাগজের উৎসাহী নিজস্ব সংবাদদাতারা আশ্রমিকদিগের মধ্যে খ্যাতনামা ব্যক্তিদিগের সঙ্গে ইণ্টারভিউ করিয়া রিপোর্ট পাঠাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের বর্ণনাভঙ্গী ও মন্তব্যের সরসতার গুণে রিপোর্টগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইত। সাধারণের অবগতির জন্য অবশেষে শ্রীহারমিটেজ হইতে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া পণ্ডিত জে, কে, সেনশর্ম্মা জানাইলেন যে বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক প্রেরণা ব্যতীত শ্রীমতী ডেইজীর আশ্রমজীবন গ্রহণের মূলে আর কোন প্রেরণা নাই। সাধারণে এই বিবৃতিতে সন্তুষ্ট হইয়া ডেইজীকে দ্রুত ভুলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল।

সসীম ডেইজীকে ইহার পূর্ব্বেই ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ডেইজীকে সসীম যত ভুলিতে লাগিল বিদেশে যাইবার আগে ডেইজীদের বাড়ীতে এক জনের কৃত্রিম সম্ভ্রমভঙ্গীর সহিত উচ্চারিত একটা কথা তাহার তত মনে পড়িতে লাগিল। ফিরিয়া আসিয়া আর তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই, তাহার কোন খবরও সে জানিতে পারে নাই। তাহার কথাটা অতি হালকা কৌতুকের ভঙ্গীতে বলা হইয়াছিল কিন্তু কেন যেন স্বপ্নে শোনা একটা সুন্দর গানের কলির মত কথাটা তাহার মনের এক কোণে গুঞ্জরিত হইত। এই গুঞ্জনকে আশ্রয় করিয়া একখানি কৌতুকপ্রিয়, মিষ্ট মুখ তাহার মনের আকাশে উঁকি দিত।

এক দিন পুলিস আপিসে ভ্রাতার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া সসীম জানিতে পারিল শীঘ্র তাহার ছাড়া পাইবার সম্ভাবনা আছে। যে আপত্তিজনক হ্যাণ্ডবিল বিলি করিবার জন্য তাহাকে ধরা হইয়াছিল তাহা নাকি বাস্তবিক আপত্তিজনক নহে। অনেকখানি উৎফুল্ল হইয়া সে বাড়ীতে ফিরিল। পিতা সংবাদটি পাইলে আনন্দিত হইবেন।

এ রকম হাল্কা, উৎফুল্ল মনের অবস্থা অনেক দিন হয় নাই সসীমের। হঠাৎ তাহার জেনোয়া আসিতে ট্রেন হইতে দেখা একটি পল্লীদৃশ্যের কথা মনে পড়িল। সকাল বেলা। রেল-লাইন হইতে অনতিদূরে অলিভ ক্ষেতের মধ্যে একটা লাল বাড়ী লতা-পাতা-ফুলের বেষ্টনীর মধ্যে। পিছনের জমি ক্রমে উঁচু হইয়া পাহাড়ের সঙ্গে মিশিয়াছে। পাহাড়ের মাথায় কুয়াশার জাল। প্রভাতসূর্য্যের আলো পড়িয়া বাড়ী, ক্ষেত, বাগান, ফুল, পাতা ঝিকমিক করিতেছে। বাড়ীর ফটকে হলুদ রঙের কাঁকর বিছানো পথে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে সকৌতূহলে গাড়ীর দিকে চাহিয়া আছে। কালো চুল, অমল রং, অতি সুকুমার মুখের ডৌল। গাড়ী দেখিবার জন্য বোধ হয় বিছানা হইতে উঠিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। প্রভাতের আলোতে সমুজ্জ্বল পটভূমিতে এই বিদেশিনী কিশোরীকে দেখিয়া সসীম মুগ্ধ হইল। তাহার নিদ্রাহীন রাত্রের জড়িমা পলকে দূর হইয়া গেল। সমগ্র দৃশ্যটি ও তাহার নিজের ভাল-লাগা মিশাইয়া একটি অপরূপ চিত্র তাহার মনে অঙ্কিত হইয়া রহিল। সে দেখিয়াছে কোন কারণে মন হাল্কা ও উৎফুল্ল হইলে এই চিত্রটি তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে, মনে ঘন আনন্দের ছোপ লাগাইয়া দেয়।

পিতাকে খবরটি জানাইবার জন্য সে উপরে গেল। সিঁড়িতে উঠিবার সময়ে পিতার হাসির শব্দ কানে আসিয়া তাহাকে বিস্মিত করিল। আসিয়া অবধি সে তাঁহাকে আগের মত হাসিতে দেখে নাই, কথাবার্ত্তাও খুব অল্প ও রূঢ় হইয়া আসিয়া-ছিল। তাঁহার এতখানি পরিবর্ত্তন আনিল এমন কি ঘটিয়াছে ইতিমধ্যে?

ঘরের সম্মুখে আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। দরজার দিকে পিঠ করিয়া একটি মহিলা পিতার শয্যার পাশে চেয়ারে বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন। ঘর অল্প অন্ধকার হইয়াছে।

একটু ইতস্তত করিয়া সসীম ঘরে প্রবেশ করিল। জুতার শব্দে মহিলাটি ঘাড় ফিরাইয়া তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সসীম তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যথিত ও বিস্মিত হইল। সুমিত্রার চেহারা এ কি হইয়াছে? তাহাকে চেনা যায় না। কি অসুখ হইয়াছিল? বাহিরে সে উদ্বেগ প্রকাশ করিল না। একটু হাসিয়া বলিল,—কখন এলে সুমিত্রা? কেমন আছ?

সুমিত্রা হাসিয়া তাহাকে নমস্কার করিল, কোন উত্তর দিল না।

রায় সাহেব বলিলেন, তোমরা বসো দু'জন। সুমিত্রা তার মামার বাড়ীতে ছিল এত দিন। ও নিজেও অসুস্থ।

সুমিত্রাকে তিনি বিছানার উপরে বসিতে বলিলেন। সুমিত্রা বসিলে তাহার মাথায় একখানা হাত রাখিয়া বলিলেন,—সুমিত্রা কিছুদিন আমার কাছে থাকবে। ও আমাকে ভাল ক'রে তুলবে বলছিল।

সসীম সুমিত্রার মুখের ভাব দেখিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মুখ রায় সাহেবের দিকে ফিরানো, কিছু দেখা গেল না। সে বলিল, সুমিত্রা কি থাকবেন, বাবা?

রায় সাহেব হাসিয়া বলিলেন,— বাপ ও বড় বোন দু'জনে দুই আশ্রমে ঢুকেছে। মা নেই। ও কি মামার বাড়ীতেই বারো মাস পড়ে থাকবে? তুমি একবার বলে দেখ না?

পিতা রহস্য করিতেছেন কিনা সসীম বুঝিতে পারিল না। একবার তাহার মনে হইল বোধ হয় দুই জনের মধ্যে ইহার আগে কোন রকম বোঝাপড়া হইয়াছে। কিন্তু সুমিত্রা বাস্তবিক এখানে থাকিবে কেন? পিতা তাহাকে স্নেহ করেন সেইজন্য থাকবার কথা বলিতেছেন। সুমিত্রাকে কাছে পাইয়া পিতার পরিবর্তন সে চোখে দেখিতেছে। কিন্তু তাহাদের আগ্রহে কি আসে যায়? একটু বিব্রতভাবে সে বলিল,—আমি বললে যদি সুমিত্রা থাকেন বাবা, আমি আপনার দিকে চেয়ে তাঁর কাছে এক-শ' বার এ অনুরোধ করব, কিন্তু এ ভাবে—

হঠাৎ তাহার কথা জড়াইয়া গেল, মুখ লাল হইয়া উঠিল।

রায় সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। কি বুঝিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন। তিনি বলিলেন,—সুমিত্রা, একটু মুখখানা তোল ত মা, ছেলে আমার দিকে চেয়ে তোমাকে থাকবার জন্য এক-শ' বার অনুরোধ করতে প্রস্তুত আছে। কথাটা একটু ভাল করে শোন। অনেক গভীর অর্থ আছে বোধ হয় কথাটার মধ্যে। একটু ভেবে দেখ ত মা। ভেবে ওকেই উত্তর দিও। ওর নিজের দিক থেকে কিছু বলবার থাকলে সেটাও শুনে নিও। সসীম, সুমিত্রাকে নিয়ে যাও, হাত-মুখ ধুয়ে ও কিছু খেয়ে নিক। যাও মা।

সুমিত্রা উঠিয়া সসীমের অনুসরণ করিল।

রায় সাহেবের ঘরের পরে একটা প্রশস্ত দালান, তারপর ছেলেদের ঘর। এ বাড়ীর কোন কিছু সুমিত্রার অপরিচিত নহে। দালানে আসিয়া সসীম বলিল,—সুমিত্রা, একটা কথা বলব যদি কিছু মনে না কর।

সুমিত্রা দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—বলুন।

সসীম কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহার দুই চোখ ব্যগ্রভাবে সুমিত্রার মুখে চোখে কি যেন খুঁজিতেছিল।

সুমিত্রা নতমুখে দাঁড়াইয়া। সসীম হঠাৎ বাকশক্তি হারাইয়াছে। তাহার ব্যাকুল, মুখর চোখের ভাষা হইতে সুমিত্রা সম্ভবত কিছু অনুমান করিয়া লইল। ধীরে ধীরে তাহার মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল। সসীমের একটু কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদু কণ্ঠে সে বলিল,—যে কথা বলতে চাও তুমি, সেটা বলতেও কি আমাকে সাহায্য করতে হবে?

এতক্ষণে সসীমের বাকশক্তি ফিরিয়া আসিল। সে অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া হাসিয়া বলিল,—থ্যাংকস সুমিত্রা, একটু সাহায্য কর।

- এবার তোমার নিজের দিক হতে সুমিত্রার কাছে কিছু অনুরোধ করবার আছে কিনা বল। আই নো সি ইজ এ জেনারাস ইয়ং লেডী।

সসীম হাসিল। বলিল,—তুমি টিপ দিয়েছ, সেটা কানে কানে বলব পরে।

তাহার টিপ দিবার কথা শুনিয়া সুমিত্রা প্রথমটা বিস্মিত হইল। তারপর চকিতে প্রায় তিন বৎসরের আগের এক দিনের কথা মনে পড়িল। তাহার সেদিনকার হাল্কা পরিহাস সসীম এইভাবে মনে রাখিয়াছে? তবে কি সসীম তখন হইতে—?

মুখ তুলিয়া সে পূর্ণ দৃষ্টিতে সসীমের দিকে চাহিল। সসীম মৃদু হাসিতেছে। কি জানি কি ভাবিয়া কৌতুকপ্রিয় সুমিত্রার চোখের পাতা একটু ভারী হইয়া আসিল, দুই-একটা ফোঁটা গড়াইয়া পড়িল কিনা বলা যায় না।

সসীম তাহাকে দেখিতেছিল। সে হাসিয়া বলিল,—বাস্ বাস্ সুমিত্রা, আর নয়। হাত মুখ ধুয়ে এস ঝিকি চট্ করে। রাজ্যপাটের ভার নাও, অভাগা প্রজার দল ক্ষুধার্ত।

সুমিত্রার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৬১—১৯৪০

জন্ম ঃ বাল্য-শিক্ষা

আনুমানিক ১৮৬১ সনে বিহারের মোতিহারীতে নগেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—মথুরানাথ গুপ্ত, আদি নিবাস হালিশহর ২৪-পরগণা। মথুরানাথ বিহারে সবজজ ছিলেন। তিনি যখন দ্বিতীয় বার মোতিহারীতে বদলি হন, সেই সময়ে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়; মধ্যম পুত্র নগেন্দ্রনাথের বয়স তখন আট নয় বৎসর। মথুরানাথ দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথের বাল্য ও কৈশোর বিহারের মোতিহারী, ছাপরা, আরা ও ভাগলপুরে অতিবাহিত হইয়াছিল। ছাপরায় অবস্থানকালে, নয়-দশ বৎসর বয়সে, তিনি স্থানীয় ইংরেজী জেলা-স্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ সনের গোড়ায় তিনি কলিকাতায় আসিয়া জেনারেল এসেম্ব্রীজ ইন্‌ষ্টিটিশনে প্রবিষ্ট হন এবং ঐ বৎসর এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পারিবারিক আবহাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভে অন্তরায় হওয়ায় নগেন্দ্রনাথের ভাগ্যে কোন ডিগ্রী লাভ ঘটে নাই। জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত (জে. এন. গুপ্ত, আই সি এস) স্মৃতিকথায় জ্যেষ্ঠতাতপুত্র নগেন্দ্রনাথের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আমার মেজদার কথা দু-একটা বলি, ইনি বিখ্যাত সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। কিন্তু যে সময়ের কথা বলছি তখন সাহিত্য-জগতে বড় কিছু করেছিলেন ব'লে মনে পড়ছে না। জেনারেল এসেম্ব্রী কলেজে পড়তেন। জগৎ-আলোক বিবেকানন্দ হয় তাঁর সহপাঠী নয় সেই কলেজের সহাধ্যায়ী ছিলেন। সে কথা মেজদা নিজেই একটা প্রবন্ধে বলেছেন। বাড়ীতে মেজদা এক রকম ডিক্‌টেটর ছিলেন। আমাদের সকলের অধিনায়ক ত ছিলেনই তাছাড়া যা খুশী তাই করতেন।...আমি মেজদার প্রধান চেলা ছিলাম। লেজুরের মত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম। এই সময়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে দু-এক বার গিয়েছিলাম এবং তাঁদের বাড়ীতে শেক্‌সপিয়রের "Merchant of Venice" এ্যাক্‌টিং এ "সাইলকে"র পার্ট মেজদা নিয়েছিলেন।...মেজদার বিয়ে হবার পর মেজদার শ্বশুরবাড়ী সরগহাটাতে প্রায়ই যেতাম। মেজবৌদি ও তাঁর বোন 'হেবি' দুজনকেই খুব ভালবাসতাম। মেজদার একটা কথা নিয়ে একবার আমার মা খুব ঠাটা করেছিলেন—তা খুব মনে আছে। বিয়ের দু-এক দিন পরে যখন মেজদা বৌ নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন—তখন বল্লেন "কাকি, আজ এখানে কেমন ঝাপসা ঝাপসা লাগছে?" মা বল্লেন "তা তো লাগবেই, বাবা, সেখানে সকলেই সাদা—সকলেই সুন্দর, এখানে আমরা সকলেই কালো।" বোধ হয়, এ কথা শুনে মেজদা একটু খুশীই হয়েছিলেন।

"মেজদার সঙ্গে প্রিয়বাবুর বাড়ী অনেক বার গেছি। মেজদা তাঁর কাছ থেকে কত বই যে এনে পড়তেন তার আর ঠিকানা নাই। মেজদার পড়ার বাইটা অসামান্য ছিল। বিটনস্ ডিক্‌সনারী প্রভৃতি দুই চারিটা মোটা অভিধান আগাগোড়া প'ড়ে প্রায় মুখস্থ করেছিলেন। আর এই সময় অনেক বার জোড়াসাঁকোর রবিবাবুদের বাড়ী যেতেন। আমি প্রায়ই তাঁর সঙ্গে যেতাম। মেজদা ও রবিবাবুর খুব বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু ওঁর কথা রবিবাবু জীবন-স্মৃতিতে কিছু কেন যে বলেন নি—জানি না। মেজদা সাহিত্যচর্চ্চা পরজীবনে অনেক করেছিলেন। তিনি লাহোর, করাচী, বোম্বে প্রভৃতি প্রদেশে বাস করবার সময় ইংরাজী ও বাংলায় অনেক উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মডার্ণ রিভিউতে তাঁর লেখা পড়বার জন্য অনেকে উৎসুক হয়ে থাকতেন।" ('স্মৃতি ও চিন্তা,' পৃ. ৩৪-৩৬)

সংবাদপত্র-সেবা

বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সে, ১৮৮৪ সনে, নগেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভারতের পশ্চিম সীমান্তে করাচি চলিয়া যান। তথায় তিনি 'ফিনিক্স' (Phoenix) নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক-পত্রের সম্পাদক হন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁহার বিবাহ (ইং ১৮৮২?) ও একটি পুত্রসন্তান হইয়াছিল। করাচিতে পৌঁছিয়া তিনি শিশুপুত্র সহ পত্নীকে আনাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে কলিকাতায় যে না আসিয়াছেন তাহা নহে। কর্ম্মস্থল হইতে তিনি বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন; উহা "প্রবাসের চিঠি" ও "করাচির চিঠি" নামে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-সম্পাদিত 'বালকে' (ভাদ্র, মাঘ ১২৯২) প্রকাশিত হয়। "প্রবাসের চিঠি" রবীন্দ্রনাথের "বর্ষার চিঠি"র (শ্রাবণ ১২৯২) উত্তরে লিখিত। চিঠিগুলিতে সিন্ধুদেশের—বিশেষ করিয়া করাচির সুন্দর বর্ণনা আছে।

সাত বৎসর যোগ্যতার সহিত 'ফিনিক্স' পরিচালন করিয়া নগেন্দ্রনাথ লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিবার জন্য ১৮৯১ সনের মে মাসে সিন্ধুদেশ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পূর্ব্বে শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় 'ট্রিবিউনে'র সম্পাদক ছিলেন। নগেন্দ্রনাথের আমলে পত্রিকাখানি জনমত-গঠনের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে 'ট্রিবিউন' সম্পাদন করিয়াই তিনি সাংবাদিকরূপে যশস্বী হইয়াছিলেন।

১৮৯১ সনে তিনি যখন কার্য্যভার ত্যাগ করেন, তখন 'ট্রিবিউন' সপ্তাহে দুই বারের পরিবর্ত্তে তিন বার প্রকাশিত হইত।

লাহোর হইতে ফিরিয়া নগেন্দ্রনাথ পাঁচ বৎসর কলিকাতায় অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহযোগিতায় 'টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি' নামে একখানি ইংরেজী মাসিকপত্র পরিচালন করেন। ১৯০৫ সনে তিনি এলাহাবাদে সচ্চিদানন্দ সিংহ-প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান পীপ্‌ল' (*Indian People*) নামক সাপ্তাহিক-পত্র সম্পাদন করিবার জন্য আহূত হন। 'ইণ্ডিয়ান পীপ্‌ল' চারি বৎসর পরে এলাহাবাদের দৈনিক 'লীডারে'র (*Leader*) সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণির সহিত যুগ্মসম্পাদক-রূপে নগেন্দ্রনাথ সাত মাস 'লীডার'ও পরিচালন করিয়াছিলেন।

১৯১০ সনে নগেন্দ্রনাথ পুনরায় লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রিকায় যোগদান করিয়া ১৯১২ সন পর্য্যন্ত ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯১৩ সনে তিনি অল্প দিনের জন্য লাহোরের 'পঞ্জাবী' পত্রের সম্পাদক হন এবং এই বৎসরের প্রথম ভাগেই সম্পাদক-রূপে সাংবাদিকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সাংবাদিকরূপে নগেন্দ্রনাথের খ্যাতি প্রধানতঃ বঙ্গদেশের বাহিরেই বিস্তৃত ছিল। স্বদেশে তিনি সুসাহিত্যিকরূপেই বিশেষভাবে পরিচিত। মাতৃভাষায় তাঁহার অসাধারণ লিপিকুশলতা ছিল। 'ট্রিবিউন' ছাড়িয়া ১৮৯১ সনে কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি বাংলা সাময়িক-পত্র সম্পাদনে ব্রতী হন।

'প্রদীপ'।—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করিলে, ১৩০৬ সালের ফাল্গুন মাস (ইং ১৯০০), ৩য় ভাগ ৩য় সংখ্যা, হইতে নগেন্দ্রনাথ 'প্রদীপে'র সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। এই সংখ্যায় "সম্পাদকের নিবেদনে" প্রকাশ :—

"এই সংখ্যা হইতে প্রদীপের সম্পাদকীয় ভার আমি গ্রহণ করিলাম। রামানন্দ বাবু প্রদীপের সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহচক্ষে প্রদীপকে দেখিবেন আমরা সে আশা করি এবং সর্ব্বদা তাঁহার পরামর্শ পাইব সে ভরসাও আছে।

বাঙ্গালা মাসিক পত্রের ইতিহাসে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমাদের দেশে মাসিক পত্রের যখন প্রথম সৃষ্টি হয় তখন লেখকের সংখ্যা অল্প, সম্পাদককেই পত্রের অধিকাংশ লিখিতে হইত। এখন শিক্ষিত লোকে অনেকে বাঙ্গালা পড়েন ও লেখেন, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে এখন অনেকে ব্রতী। অন্যান্য দেশে সম্পাদককে যাহা করিতে হয় কতক পরিমাণে এখন এদেশেও তাঁহাকে তাহাই করিতে হয়। প্রধানতঃ প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করাই সম্পাদকের কর্ত্তব্য। তাহার অধিক বিশেষ কিছু করিতে হইবে না এই ভরসা পাইয়াই আমি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। যাঁহারা এত দিন প্রদীপকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, যাঁহাদের রচনায় এই পত্রের এতাদৃশ উন্নতি হইয়াছে তাঁহারা আমাকেও কৃপা করিবেন ইহাই আমার প্রধান ভরসা।"



নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

নগেন্দ্রনাথ মাত্র চারি মাস 'প্রদীপে'র সম্পাদক ছিলেন। ১৩০৭ সালের আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশক বৈকুণ্ঠনাথ দাসের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় :—

"এত কাল ব্যক্তিবিশেষের হস্তে প্রদীপ সম্পাদনভার ন্যস্ত ছিল। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রদীপ সম্পাদন করিয়া গ্রাহকবর্গ ও সাধারণের প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছেন। আমরা সেইজন্য তাঁহাদের নিকট চিরঋণী। কিন্তু দেখিলাম একের অনুরাগ ও যত্নের উপর নির্ভর না করিয়া যদি প্রদীপ দশের সমবেত যত্ন ও পরিচর্য্যা লাভ করিতে পারে, তবে ইহার উন্নতি ক্ষিপ্রতর হইবে। উদ্দেশ্য প্রদীপের উন্নতি, উপায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইবেই হইবে। এই উন্নতির উদ্দেশ্যে কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক লইয়া প্রদীপ পরিষদ গঠিত হইল। এখন হইতে প্রদীপ সম্পাদনভার এই পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইল।"

প্রথম তিন বৎসরের 'প্রদীপে' নগেন্দ্রনাথের বহু রচনা—গল্প, প্রবন্ধ, কবিতাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল রচনার মধ্যে ১৩০৬ সালের পৌষ-সংখ্যায় প্রকাশিত "মায়াবিনী" নামে গল্পটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'প্রভাত'—১৩০৭ সালের বৈশাখ (?) মাসে নগেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'প্রভাত' নামে একখানি উচ্চাদের সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

"তিনি ট্রিবিউনের কাজ ছাড়িয়া [ইং ১৮৯৯] বাংলা দেশে, কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এখানে তাঁহার গ্রে ষ্ট্রীটস্থ পৈতৃক গৃহ হইতে 'সুপ্রভাত'* নাম দিয়া একটি বাংলা সাপ্তাহিক বাহির করেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কিছু লেখা বাহির হইয়াছিল, এইরূপ মনে পড়িতেছে। আমি তখন এলাহাবাদে কাজ করিতাম, নগেন্দ্রবাবুর কাগজটির সেখানকার সংবাদদাতা ছিলাম। তাঁহার কাগজে ছাপা আমার দু-একটা সংবাদ-চিঠি ("news-letter") পড়িয়া তিনি আমাকে ব্যক্তিগত চিঠিতে এই 'সার্টিফিকেট' দিয়াছিলেন যে, আমার জর্ণালিষ্টিক ইন্‌ষ্টিংক্ট (journalistic instinct) আছে। তাহাতে আমি উৎসাহিত হইয়াছিলাম।" ("নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত" : 'প্রবাসী', মাঘ ১৩৪৭)

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সেবা

নগেন্দ্রনাথ পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও আজীবন সভ্য ছিলেন। ১৩০৮ ও ১৩১১-১২ সালে (ইং ১৯০১,-৪-৫) কার্য্যনির্ব্বাহক-সভার সভ্যরূপে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-কার্য্যে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সময়ে পরিষদের মাসিক অধিবেশনগুলিতেও তিনি অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি—

দ্রৌপদী ও সভ্যভাষা সংবাদ…২১ কার্ত্তিক ১৩১০
বিদ্যাপতির প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পদাবলী ৮ ফাল্গুন ১৩১০
বৈষ্ণব কাব্যে মিথিলার স্থান…১১ ভাদ্র ১৩১১
বিদ্যাপতি-প্রসঙ্গ…৩ পৌষ ১৩১১
গোবিন্দ দাস…২৪ পৌষ ১৩১১

শেষ-জীবন ঃ মৃত্যু

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৯১০ সনে নগেন্দ্রনাথ সংবাদপত্র-সম্পাদকের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া প্রায় আড়াই বৎসর কাল (২৯ মাঘ ১৩১৯—১ বৈশাখ ১৩২২) কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটরী-রূপে তাঁহার রাজনীতি-কার্য্যে সহায়তা করেন। তিনি 'বেঙ্গলী'র সম্পাদকীয় বিভাগেও কিছু দিন যুক্ত ছিলেন। ১৯১৭ সনে নগেন্দ্রনাথ টাটার তেল-কলের সেক্রেটরী হইয়া বোম্বাই যাত্রা করেন। ১৯২২ সনে তিনি এই কার্য্যভার ত্যাগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল ঈপ্সিত সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আনুমানিক ৭৮ বৎসর বয়সে, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪০, শনিবার প্রাতে, বোম্বাইয়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবনের শেষ দশ বার বৎসর তিনি বোম্বাইয়ের বান্দোরায় কাটাইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এলাহাবাদের 'লীডার' সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখেন :—

"We deeply regret the death announced in Sunday morning's *Leader*, of Nagendranath Gupta at the age of 78 at a nursing home in Bombay. Mr. Gupta was a distinguished journalist. He first came to be known to the public as editor of the *Phoenix* of Karachi. But he rose to fame later as editor of the *Tribune* of Lahore, whose proprietor, the late Sardar Dyal Singh Majithia, gave him his full confidence. The *Tribune* became so influential under Mr. Gupta's editorship that once the local Anglo-Indian paper, the *Civil and Military Gazette* asked whether the province was being governed by Sir Dennis Fitzpatrick or by the editor of the *Tribune*! . . . In the autumn of 1905, he was brought over to Allahabad by Mr. Sachchidananda Sinha to edit the *Indian People*. He did so for four years, after which that paper was incorporated with the *Leader*. Of this paper he was the first editor with Mr. Chintamani but he severed his connection with it after seven months. . . . Mr. Gupta had command of a fine literary style and wrote still better on literary topics than on political. He was also a story-writer, poet and artist. Altogether he was one of the most cultured of men and always lived a peaceful life."

রচনাবলী

শৈশব হইতেই বাংলা-সাহিত্যের প্রতি নগেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। কলিকাতায় পাঠাবস্থায় তিনি কাব্য-চর্চ্চা শুরু করেন। ১২৮৯-৯০ সালের 'ভারতী'তে তাঁহার অনেকগুলি কবিতা স্থান পাইয়াছিল। কবি বিহারিলালের নিকট তাঁহার যতায়াত ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেনের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। যে স্বল্প-সংখ্যক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বিবাহে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, নগেন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ তাঁহাদের অন্যতম। নগেন্দ্রনাথ কাব্যচর্চ্চা হইতে ক্রমে কথাসাহিত্যে আকৃষ্ট হন। বাংলা-সাহিত্যের আলোচনার জন্য তাঁহাদের একটি সাহিত্য-সমিতিও ছিল; রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

বাংলা-গ্রন্থাবলী—মাতৃভাষায় লিখিত নগেন্দ্রনাথের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।

১। বিসর্জ্জন (খণ্ড-কাব্য)। (ইং ১৮৮১ ?) পৃ. ৩৪।
চৈতন্য লাইব্রেরিতে আখ্যাপত্র-বিহীন একখণ্ড 'বিসর্জ্জন' আছে।

২। স্বপন-সঙ্গীত (গীতিকাব্য)। ? (১৯ জুন ১৮৮২)। পৃ. ৬৫।

---

* প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাখানির নাম—'প্রভাত'। 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত (পৌষ ১৩৪৭) নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদে 'প্রভাত' নামেরই উল্লেখ আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত রমেশচন্দ্র দত্তের কাগজপত্রের মধ্যে ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭ তারিখের 'প্রভাতে' প্রকাশিত তাঁহার একটি প্রবন্ধের প্রতিলিপি দেখিয়াছি; প্রবন্ধটির নাম—"ভারতবর্ষীয়দিগের দরিদ্রতা ও দুর্ভিক্ষের কারণ"।

বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরিতে একখণ্ড 'স্বপন-সঙ্গীত' আছে। 'ভারতী' (বৈশাখ ১২৮৯) সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—"লেখকের হাত পাকে নাই। কিন্তু ইহার অনেক স্থানে যথার্থ কবিতা আছে, অনেক স্থানে লেখকের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।"

৩। পর্ব্বতবাসিনী (উপন্যাস)। ১২৯০ সাল (ইং ১৮৮৩ ?)। পৃ. ১৩৯। ১২৯০ সালের ফাল্গুন-সংখ্যা 'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় সমালোচিত।

৪। অমরসিংহ (সিপাহী-বিদ্রোহমূলক উপন্যাস)। (১০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৯)। পৃ. ১৭৫।

৫। সংগ্রহ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস। ১২৯৯ সাল (২৩ অক্টোবর ১৮৯২)। পৃ. ২১৬।

সূচী :—চুরী না বাহাদুরী (ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৪); ঘরের অলক্ষ্মী (ভারতী ও বালক, আষাঢ় ১২৯৬); দুইবার (ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৬); ভৈরবী (ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৬); মিরিয়ম ও সোরাব (সাহিত্য, ভাদ্র ১২৯৯); নূতন বাড়ী (সাহিত্য, বৈশাখ ১২৯৯); মুক্তি (সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১২৯৮); আমার 'কাহিনী'।

৬। লীলা (উপন্যাস)। লাহোর ভাদ্র ১২৯৯ (১৫ নবেম্বর ১৮৯২)। পৃ ২৪৩। ফাল্গুন ১২৯০—আষাঢ় ১২৯১ সালের 'ভারতী'তে প্রথম প্রকাশিত।

৭। উপন্যাস সংগ্রহ ও রহস্য। ? (সেপ্টেম্বর ১৮৯৯)। পৃ. ২২৫।

সূচী :—হীরার মূল্য (প্রদীপ, আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০৫); বন্ধু (সাহিত্য, শ্রাবণ ১২৯৯); বোম্বেটে (প্রদীপ, পৌষ ১৩০৫); কাহার ভ্রম (সাহিত্য, শ্রাবণ ১৩০০); জাল কুঞ্জলাল (সাহিত্য, বৈশাখ ১৩০০); বন্দী (ভারতী, বৈশাখ ১৩০১); যোগিনীরা (সাহিত্য, মাঘ ১২৯৯); কাঠুরিয়া (সাহিত্য, আষাঢ় ১৩০০); ছায়া (ভারতী, ফাল্গুন ১৩০০) গল্প ও অল্প (ভারতী, কার্ত্তিক ১৩০১)। রহস্য :—চুলের কলপ (সাহিত্য, আষাঢ় ১৩০০); কোঁচার কথা (সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯); হিসাবে ভুল (সাহিত্য, আশ্বিন ১২৯৯)।

৮। তমস্বিনী (উপন্যাস)। ১৩০৭ সাল (৫ মার্চ ১৯০১)। পৃ. ২০৭।*

১৩০১ সালের কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও মাঘ সংখ্যা 'জন্মভূমি'তে ৭ম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত প্রথম প্রকাশিত।

৯। জীবন ও মৃত্যু (সন্দর্ভ)। ১৩০৭ সাল (৫ মার্চ ১৯০১)। পৃ. ২৩০

১৩০০ সালের 'সাহিত্যে' প্রথম প্রকাশিত।†

১০। বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদাবলী (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত)। ১৩১৬ সাল (ইং ১৯০৯)। পৃ. ৪৮০+৫৫২+৫/০

"সাধারণ পাঠকের পক্ষে সুলভ হইবে এবং বিদ্যাপতির কবিতার বহু প্রচার হইবে, এই আশায়" নগেন্দ্রনাথ ১৩৪২ সালে বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে বিদ্যাপতি পদাবলীর আর একটি সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১১। নগেন্দ্র-গ্রন্থাবলী, ১ম-২য় ভাগ। (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯২৫)। পৃ. ৩১২+৩৮৬ (বসুমতী)

সূচী :—লীলা, পর্ব্বতবাসিনী, তমস্বিনী, অমরসিংহ, জীবন ও মৃত্যু, এবং 'উপন্যাস সংগ্রহ' ("হিসাবে ভুল" রচনাটি বাদে) ও 'সংগ্রহ' পুস্তকদ্বয়ের সকল গল্প। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত নগেন্দ্রনাথের এই গল্পগুলিও গ্রন্থাবলীর দুই ভাগে স্থান পাইয়াছে :—লক্ষহীরা (প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩২৯); পূজার পোষাক (বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১৩১১); মিলন; মেহেরজান (বঙ্গভাষা, আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩১৪); মালবিকা (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩২৯); পুঁটেরাম; নির্ম্মলা (মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩২৯); ভৈরব মন্দির; অলকা; শাহ নওয়াজ; ব্রাহ্মণাবাদ (বঙ্গভাষা, অগ্রহায়ণ ১৩১৩); টকিয়া শাহ;

* ১২ আশ্বিন ১৩০৭ তারিখে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ 'তমস্বিনী' প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—"নগেন্দ্র গুপ্তর তমস্বিনী পড়ে দেখলুম। ঠিক হয় নি। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বাঙ্গলা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত Realism এর অবতারণা করতে চাচ্ছেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করি নে। কিন্তু সেটা পারা চাই। যেমন নাচতে ব'সে ঘোমটা সাজে না, তেমনি এ রকম বিষয় লিখতে ব'সে কিছু ঢাকতে রাখা চলে না। সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভাল, কিন্তু স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আব্রু নষ্ট হয়। এ বইয়ে তাই হয়েছে। গ্রন্থকার সাহসপূর্ব্বক সব কথা পরিষ্কারভাবে শেষ পর্য্যন্ত বলতে পারেন নি, সেই জন্য তাঁর self-conscious ভাব প্রকাশিত হয়ে রচনাটাকে লজ্জিত ক'রে তুলেছে। নগেন্দ্রবাবু তাঁর ঘটনা-বিন্যাসের স্বাভাবিক পরিণামের পূর্ব্বেই হঠাৎ থেমে যাওয়াতে বোঝা যাচ্ছে নিঃসঙ্কোচ নিরাবরণ তাঁর লেখনীর পক্ষে সহজ নয়, ওটা তিনি জবরদস্তি ক'রে করেছেন। ফর্ ইন্‌ষ্টান্স, সেই বিধবা মেয়েটার সঙ্গে একজন ছোক্‌রার ঘনিষ্ঠতার কথা যদি উত্থাপন করলেন তবে তার অন্ত্যেষ্টি-সংকার না ক'রে ছাড়লেন কেন? ও রকম স্থলে যা হ'তে পারে সেটাকে সরল ভাবে তার সম্পূর্ণ বীভৎস মূর্ত্তিতে পরিস্ফুট করলেন না কেন? এ সব জিনিষ তিনি ছুঁতে ঘৃণা করেন অথচ নাড়তে প্রবৃত্ত হয়েছেন, সেই জন্যে সব কথা ভাল ক'রে প্রকাশ করতেও পারেন নি, ভাল ক'রে গোপন করতেও পারেন নি।" ("পত্রাবলী" : 'বিশ্বভারতী পত্রিকা,' বৈশাখ ১৩৫০, পৃ. ৫৯৮)

† সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গে' (পৃ. ৩৪৯) লিখিয়াছেন :—"বঙ্কিম বাবু বলিলেন…'নগেন গুপ্তর 'মৃত্যুর পরে' উঁচু দরের লেখা। 'বঙ্গদর্শনে' এ রকম প্রবন্ধ ছাপা হয় নাই।' বঙ্কিমবাবু শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের 'মৃত্যুর পরে'র বড় পক্ষপাতী ছিলেন। তিন চারি বার আমার নিকট উহার প্রশংসা করিয়াছিলেন। নগেনবাবুর styleএরও তিনি প্রশংসা করিতেন। 'মৃত্যুর পরে' গ্রন্থাকারে ছাপা হইয়াছে।"

চক্রণীদের ঐশ্বর্য্য ; ফুটবল ফাইনাল (ভারতবর্ষ, আশ্বিন ১৩২০) ; জমাল-জমিল (বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩২০) ; মায়াবিনী (প্রদীপ, পৌষ ১৩০৬) ; প্রতিশোধ (প্রদীপ, মাঘ ১৩০৬) ; ছোট বৌ (প্রদীপ, বৈশাখ ১৩০৭) ; স্বরজ কওর (ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২০) দেবরাত ও প্রসেন ; নবনগর (নাটিকা) ; খেলাঘরে ; বিস্তারিণীর রাজনীতি ; বিভ্রাট।

১২। জয়ন্তী (উপন্যাস)। ইং ১৯২৯। পৃ. ১৭৫।
১৩২৯-৩০ সালের 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত।

১৩। সত্যপীরের কথা—রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য-বিরচিত (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত)। ১৩৩৬ সাল (ইং ১৯৩০)। পৃ ১॥৶০+৪৭।

১৪। আরাভাষা (উপন্যাস)। ইং ১৯৩০। পৃ. ২১৯।
১৩৩৪-৩৫ সালের 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত।

১৫। ব্রজনাথের বিবাহ (উপন্যাস)। ইং ১৯৩১। পৃ. ১৭৮।

১৩৩৬ সালের 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত।

১৬। রথযাত্রা ও অন্যান্য গল্প। ইং ১৯৩১। পৃ. ১৪৯।

সূচী :—রথযাত্রা (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৬) ; পদ্ম পিসীমা (মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৩৬) ; রাজরোষ (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৪) ; নির্ব্বন্ধ (মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৩৬) ; যে দেশে পাখী নেই (মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৩০) ; পণ্ডিতের পরাজয় (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৪), নিষ্কণ্টক (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬) ; না জলে, না স্থলে (প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৫) ; বন্দী (প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৩৭) ; প্যারীর মাসী (মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৩৬)।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রচনা।—

পুরাতন মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় নগেন্দ্রনাথের বহু সুলিখিত প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প-উপন্যাস বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল রচনার অতি অল্পই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত তাঁহার কতকগুলি গল্প-উপন্যাস ও রস-রচনার নির্দ্দেশ দিতেছি :—

'ভারতী'—১২৯৬ : আষাঢ়—বধিরের বাসনা ; ভাদ্র—চিরকুমারী। ১৩০১ : ভাদ্র-অগ্রহায়ণ—চক্র (উপন্যাস) ; আশ্বিন—সমুদ্রলঙ্ঘন। ১৩০৮ : জ্যৈষ্ঠ—সোনার কাঠি ও রূপার কাঠি।

'প্রদীপ'।—১৩০৬ : চৈত্র—নিষ্ফল অপরাধ, মৃত্যু।

'প্রবাসী'।—১৩০৮ : জ্যৈষ্ঠ—সন্ন্যাসী ; অহঙ্কারমাহাত্ম্য। ১৩১০ : আশ্বিন—রূপালী ; অগ্রহায়ণ—রঘু মাঝি। ১৩১১ : আষাঢ়—ভেজা সিংহ ; আশ্বিন—মাতুকা। ১৩৩৬ : শ্রাবণ—সাচ্চা ও ঝুটা। ১৩৩৯ : আষাঢ়-চৈত্র—বাগদত্তা (উপন্যাস)। ১৩৪০ : আষাঢ়—পুনর্জ্জীবন।

'সাহিত্য'।—১৩২০ : মাঘ—স্বপ্নপথে।

'মানসী'।—১৩২০ : শ্রাবণ—ইংরাজ ও পাঠান।

'মাসিক বসুমতী'।—১৩৩৯ : আশ্বিন—চতুরে চতুরে ; পৌষ-ফাল্গুন ১৩৪০—উইল (উপন্যাস)। ১৩৪০ : বৈশাখ—পীতোন্মাদ ; শ্রাবণ—কেরামৎ। ১৩৪১ : বৈশাখ-চৈত্র—লুলু (উপন্যাস) ; জ্যৈষ্ঠ—হরণ ; ভাদ্র—ভীতা ; কার্ত্তিক—নাগিনী ; অগ্রহায়ণ—টিয়া পাখী ; চৈত্র—বিদেশিনী। ১৩৪২ : বৈশাখ-চৈত্র—পরীস্থান (উপন্যাস) ; বৈশাখ—ব্যর্থ প্রয়াস ; চৈত্র—অনুতাপ। ১৩৪৬ : পৌষ—বিপদ ও বিবাহ।

ইংরেজী রচনা—নগেন্দ্রনাথ ইংরেজী রচনাতেও তুল্য পারদর্শী ছিলেন। 'মডার্ণ রিভিয়ু'র পৃষ্ঠাগুলি অন্বেষণ করিলে তাঁহার বহু ইংরেজী রচনার সন্ধান মিলিবে। এই সকল রচনার মধ্যে তাঁহার নিজের ও সমসাময়িকদের সম্বন্ধে স্মৃতিকথা (ইং ১৯২৭-৩০) ও A Planet and a Star নামে নূতন ধরণের উপন্যাস (ইং ১৯৩২-৩৪) উল্লেখযোগ্য। তিনি 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার তর্জ্জমাও প্রকাশ করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে "উর্ব্বশী"র পদ্যানুবাদটি (জুলাই ১৯২৭) অনেকের নিকট আদৃত হইয়াছিল। ইংরেজীতেও তিনি কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন ; দৃষ্টান্তস্বরূপ কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ পরমহংস ও মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তক-পুস্তিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নগেন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য

নগেন্দ্রনাথ অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল বাংলা-সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন। প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য ছিল। কথা-শিল্পী হিসাবে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অপরিচয়ের ফলে আধুনিক বাঙালী তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছেন। আজকাল প্রাচীন ও নবীন লেখকগণের রচনা-সমবায়ে অনেক গল্প-সংগ্রহ, গল্প-সঞ্চয়ন জন্মলাভ করিতেছে সত্য, কিন্তু তাহাদের কোনটিতেই নগেন্দ্রনাথের নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ তাঁহার লিখিত "মুক্তি," "দুইবার" "মায়াবিনী," "রূপালী," "গ্রামার কাহিনী" প্রভৃতি যে-কোন গল্প-সংগ্রহের গৌরব বৃদ্ধি বই হ্রাস করিত না। ইহা আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই। পদাবলী-সাহিত্যেও নগেন্দ্রনাথের নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস ঝার পদাবলী পাণ্ডিত্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ।

নগেন্দ্রনাথ অক্লান্ত কর্ম্মী ও মাতৃভাষার প্রতি অত্যধিক প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া ইংরেজী সাংবাদিকতার সঙ্গে ওতপ্রোত থাকিয়াও বাংলা-সাহিত্য ব্যাপারে প্রভূত কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রেণীর লোকের মধ্যে বর্ত্তমানে এইরূপ সাহিত্যনিষ্ঠা দুর্লভ। এই অধুনা-বিস্মৃত সাহিত্য-সাধকের দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যিকদের নানা ভাবে অনুকরণীয়।

রবীন্দ্র-চিত্রের ভূমিকা

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথের ছবির সহিত আমাদের যতটুকু পরিচয় আছে তাহাতে তাঁহার শিল্পী-জীবনের ক্রমবিকাশের দ্বারা নির্ণয় করা চলে না। আমরা বলিতে পারি না তাঁহার শিল্পী-জীবনের ইতিহাস কোথায় আরম্ভ হইয়া কোথায় শেষ হইয়াছে এবং কি ভাবেই বা তাহা পরিণতি লাভ করিয়াছে। শেষ জীবনে সামান্য কিছুকাল তিনি ছবি আঁকেন, সে ছবিগুলি তাঁহার নিপুণ হস্তের পরিচয় দেয়। এ নৈপুণ্য পরিণতশক্তি কুশলী চিত্রকরের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু প্রশ্ন এই, বাঙালী দর্শক কি সেই ভাবেই তাঁহার ছবি গ্রহণ করিয়াছে?

আজ পর্য্যন্ত তাঁহার ছবির যে স্বল্প সমালোচনা হইয়াছে তাহা দেখিয়া মনে হয় বাঙালী দর্শকের নিকট তাহা যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে নাই। ইহার কতকগুলি কারণ আছে।

প্রথমতঃ, প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতির ছবি আমাদের সুপরিচিত; এই জাতীয় ছবি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনেকটা গড়িয়া তুলিয়াছে। কাজেই কোন ছবির সহিত প্রাচীন ভারতীয় ছবির সাদৃশ্য না থাকিলে তাহা আমরা সহজে গ্রহণ করিতে পারি না। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত ও তাঁহার শিষ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক অনুসৃত নব্যভারতীয় চিত্রকলার আন্দোলনের মূলে প্রধানতঃ ছিল প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলাকে পুনঃসঞ্জীবিত করিবার আকাঙ্ক্ষা। তাঁহাদের ছবিগুলি আমাদের নিকট সহজেই আদৃত হইয়াছিল। নব্যভারতীয় চিত্রকলার আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও রবীন্দ্রনাথ যে সময় ছবি আঁকা আরম্ভ করেন তখন সে আন্দোলন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তাহার কোন বৈশিষ্ট্যই তাঁহার ছবিতে পরিলক্ষিত হয় না। এদিক দিয়া তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়তঃ, চিত্রকলার ইতিহাসে যে পদ্ধতিগুলি আমাদের পরিচিত সে রকম কোন পদ্ধতি অনুসারেও তিনি ছবি আঁকেন নাই। এদিক দিয়া গগনেন্দ্রনাথও স্বতন্ত্র, এ বিষয়ে সমসাময়িক চিত্রকরদের সহিত তাঁহার কোন মিল দেখা যায় না। কিন্তু গগনেন্দ্রনাথ নানা পদ্ধতিকে একান্ত ভাবে নিজস্ব করিয়া লইয়া ছবি আঁকিয়াছেন এবং এইখানেই তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই, তিনি নিজেই স্বকীয় পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন, কোন প্রচলিত টেকনিকের সহিত তাহার তুলনা করা যায় না।

তৃতীয়তঃ, বিষয়বস্তুর দিক দিয়াও তাঁহার ছবি ভিন্ন ধরণের। তাঁহার অধিকাংশ ছবির বিষয়বস্তুই সাধারণ দর্শকের নিকট খানিকটা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। বাস্তবের সহিত সাদৃশ্য অত্যন্ত কম বলিয়া তাহারা এগুলির প্রতি সহজে আকৃষ্ট হইতে পারে না।

মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে উপরোক্ত কারণগুলিই সাধারণের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ছবির রসোপলব্ধির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু চিত্রকরের কাজ ও ছবির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়া আমরা যদি রবীন্দ্রনাথের ছবির আলোচনা করি তাহা হইলে তাঁহার চিত্রকলার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইতে পারে। এই প্রবন্ধে আমরা সেই কথাই বলিবার চেষ্টা করিব।

চিত্রকরের কাজ প্রধানতঃ তিনটি। প্রথম, তিনি যে বিষয়ের ছবি আঁকেন, কল্পনায় তাহাকে উপলব্ধি করা; দ্বিতীয়, তুলিকার সাহায্যে তাহাকে ফুটাইয়া তোলা। এই দুইটি কাজ প্রায় একই সঙ্গে চলে। আমরা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, এমন কি চিত্রকর নিজেও নয়, কোথায় একটি শেষ হইয়া আর একটি আরম্ভ হয়। ছবির উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে চিত্রকরের এই উপলব্ধি এবং উপলব্ধিগত বিষয়কে রূপ দান করিবার ক্ষমতার উপর। যেখানে অনুভূতি ক্ষীণ সেখানে চিত্রকরের প্রকাশ-ক্ষমতা যতই থাকুক না কেন, তাঁহার ছবি দর্শকের তৃপ্তিবিধান করিতে পারে না। আবার যেখানে প্রকাশ-ক্ষমতা দুর্ব্বল সেখানে বিষয়বস্তুর উপলব্ধি যত গভীরই হোক না কেন, আঁকা ছবি চিত্রকরের ব্যর্থতারই পরিচয় দেয়।

চিত্রকরের তৃতীয় কাজ—উপলব্ধিগত বিষয়কে রূপ দিবার সময় এটা দেখা যে, যে ছবিখানি তিনি আঁকিতেছেন চিত্র হিসাবে তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ কিনা এবং দর্শকের কাছে তাহার নিজস্ব একটি আবেদন আছে কিনা। অর্থাৎ 'কম্পোজিসন' এবং রেখা ও রঙের দিক দিয়া তাঁহার ছবির এমন সামঞ্জস্য ও পূর্ণতা থাকা আবশ্যক যাহা অনায়াসে রসানুসন্ধানী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে।

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ চিত্রকর্ম্মের এই তিনটি দিক সম্বন্ধেই সচেতন। এক কথায় তিনি চিত্রকরের সম্পূর্ণ দায়িত্বই মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহার যে-কোন ছবি লইয়া আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাই, তাহা তাঁহার উপলব্ধিগত বিষয়ের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি— তাহার সামঞ্জস্য ও পূর্ণতা তাহাকে একটি বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। শ্মশ্রু-গুম্ফ সম্বলিত অদ্ভুত আকৃতিবিশিষ্ট মানুষের ছবি কিংবা গোধূলির ছায়াধূসরিত বনানীর ছবি— এককথায় যে ছবিই ধরি না কেন আমরা ইহার প্রমাণ পাই।

এখানে বলা আবশ্যক উপলব্ধিগত বিষয়ের সহিত বাস্তবের যে সম্পূর্ণ মিল থাকিবে এমন কোন কথা নাই; কেননা চিত্র-

করের কাজ ছবি আঁকা, বাস্তবের প্রতিলিপি আঁকা নয়। তাঁহার মনের 'চিত্রশালে' এক এক সময় এক একটি ছবি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, এগুলির অস্তিত্ব তাঁহার মনোজগতে অত্যন্ত সত্য। ইহারাই চিত্রকরের উপলব্ধিগত বিষয় এবং তাঁহার অঙ্কিত ছবির বিষয়বস্তু। বলা বাহুল্য, বাস্তব জগতের নানা দৃশ্য নানা জিনিষ তাঁহার মানসপটে রূপান্তরিত হইয়া এই সমস্ত ছবি সৃষ্টি করে। বহির্জগতের কোন রূপ যদি চিত্রকরের চোখে না পড়ে, তাঁহার অনুভূতিকে সক্রিয় না করে, তাহা হইলে তাঁহার মনের 'চিত্রশালে' কোন ছবিই ভাসিয়া উঠিতে পারে না। চিত্রকরের অনুভূতিলব্ধ বিষয়গুলির সহিত বাস্তবের সম্পূর্ণ মিল নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সেগুলি একান্ত অবাস্তবও নয়। ইহারা বাস্তব-অবাস্তবের মাঝামাঝি জিনিষ, চিত্রকরের তুলিকায় প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। এই কথাটি মনে রাখিলে রবীন্দ্রনাথের ছবির বিষয়বস্তুর বিরুদ্ধে যে অভিযোগের কথা শুনা যায় তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয়। দৃশ্যমান জগৎকে রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে দেখিয়াছেন, তাহার বিচিত্র রূপ তাঁহার মনকে এক এক সময় এক এক ভাবে দোলা দিয়াছে, যাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার অসংখ্য গানে ও কবিতায়। আবার এই সমস্ত রূপ পরিবর্তিত হইয়া তাঁহার মনের 'চিত্রশালে' যে সকল ছবি ফুটাইয়া তুলিয়াছে, তাহাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে রেখায় ও রঙে। বাস্তবের সহিত ইহাদের মিল হয়ত বেশী নাই, কিন্তু ইহারা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবসম্পর্ক বর্জিতও নয়।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রঙের ব্যবহারের উল্লেখ করা প্রয়োজন। রঙ ছবির প্রধান উপাদান; রঙের উপযুক্ত ব্যবহারের উপর ছবির পূর্ণতা অনেকাংশে নির্ভর করে। তাই সকল চিত্রকরই উপযুক্ত রঙের প্রয়োগদ্বারা চিত্রের সৌষ্ঠব সম্পাদনের প্রতি বিশেষ অবহিত থাকেন।

আমাদের দেশে ছবিতে সাধারণত: উগ্র রঙের ব্যবহার দেখা যায় না, এক সঙ্গে বিভিন্ন রঙের ব্যবহারও কম দৃষ্ট হয়। আমাদের চিত্রকরগণ প্রধানত: কোমল রঙই ব্যবহার করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছবিতে তাহার ব্যতিক্রম নজরে পড়ে। তিনি কোমল রঙ খুব কমই ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার ছবির রঙ উগ্র না হইলেও বেশ উজ্জ্বল, এবং তাঁহার ছবিতে রঙের সমারোহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রঙের ঔজ্জ্বল্য এবং সমারোহ তাঁহার উপলব্ধিগত বিষয়কে প্রকাশ করিতে ও তাঁহার ছবির পূর্ণতা সম্পাদন করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

আমরা সাধারণতঃ পূর্ব্বধারণার বশবর্ত্তী হই। ছবি দেখি, নতুবা ছবি হইতে কোন অর্থ খুঁজি। এ ভাবে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখা অসঙ্গত। এই প্রসঙ্গে তাঁহার নিজের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

'People often ask me about the meaning of my pictures. I remain silent even as my pictures are. It is for them to express and not to explain. They have nothing ulterior behind their own appearance for the thoughts to explore and words desirable and if that appearance carries its ultimate worth then they remain, otherwise they are rejected and forgotten even though they may have some scientific truth or ethical justification."

তাৎপর্য্য : আমার ছবির অর্থ সম্পর্কে লোকে প্রায়ই আমাকে প্রশ্ন করে। আমার ছবির মতই আমি চুপ করিয়া থাকি। আমার ছবির কাজ প্রকাশ করা, ব্যাখ্যা করা নয়। চিন্তা দ্বারা আবিষ্কার এবং ভাষা দ্বারা বর্ণনা করিতে হয় এমন কোন গূঢ় অর্থ তাহাদের পিছনে নাই। তাহাদের চরম সার্থকতা যদি তাহাদের মধ্যে নিহিত থাকে তাহা হইলেই তাহারা টিকিবে, নতুবা তাহাদের মধ্যে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য কিম্বা নৈতিক যুক্তি যদিও বা থাকে তাহা হইলেও তাহারা প্রত্যাখ্যাত ও বিস্মৃত হইবে।

একথা সকল চিত্রকরের ছবি সম্বন্ধেই সমান ভাবে প্রযোজ্য। ছবির পিছনে কোন অর্থ থাকে না; চিত্রকর তত্ত্বকথা বলিবার জন্য ছবি আঁকেন না, রূপসৃষ্টি করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। তাঁহার যাহা কিছু প্রকাশ করিবার তাহা ছবির ভিতর দিয়াই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলিয়াছেন :

"আপন প্রকাশ আপনাতে
নিয়ে সাথে নিজে দাও দেখা, বচনের মন্ত্রিনাথে
ভ্রূক্ষেপ কর না কভু।"

বস্তুতঃ ছবির বড় কথাই হইতেছে এই—"আপন প্রকাশ আপনাতে।" রবীন্দ্রনাথের প্রায় সকল ছবিতেই ইহা পরিলক্ষিত হয়।

তাঁহার ছবি হইতে যদি কোন অর্থ খুঁজিতে যাই তাহা হইলে আমরা নিরাশ হইব। আনন্দের প্রেরণায় ছবি আঁকা—এ ছাড়া তাঁহার তুলিকা ধারণের পিছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। ছবি আঁকা তাঁহার বিচিত্র ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ দিক—গান বা কবিতার ভিতর দিয়া যে দিকের কোন প্রকাশ হয় নাই। যাহা গানে অথবা কবিতায় ব্যক্ত করা যায় না, সুর কিংবা ছন্দ যাহার পরিচয় দিতে পারে না, রেখায় ও রঙে তিনি তাহাই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার ছবি সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কথাই মনে রাখা সমীচীন : "চিত্রকর গান করে না, ধর্ম্মকথা বলে না, চিত্রকরের চিত্র বলে—'অয়ম্ অহম্ ভোঃ'—'এই যে আমি এই'।"—এই আপনার অস্তিত্বেই তাঁহার ছবি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

"বলম্ উপাস্স্ব"

শ্রীবিমলাচরণ দেব

"হুজ্জুতে বাংলা" এই কথাটা অনেকেই জানেন। কিন্তু বোধ হয় সকলে জানেন না যে, ঐ দুটি কথা এককালে খুব প্রচলিত একটি প্রবচন-বাক্যের আদ্য অংশের বিকৃত রূপ। আর, বোধ হয়, ঐ প্রবচন-বাক্যের উৎপত্তির কারণও সকলে জানেন না।

পুরাকালের কথা—"বঙ্গান্নুৎখায় তরসা" বা বিজয় সিংহের লঙ্কা জয় প্রভৃতি ছাড়িয়া দিই। অপেক্ষাকৃত অধুনাতন সময়ের কথাই বলি। মুসলমানরা যে সময়ে বাংলায় আধিপত্য স্থাপন করে, তখন ও তাহার পর অনেক কাল পর্য্যন্ত বাংলা প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি অল্পবিস্তর স্বাধীন রাজ্যের সমষ্টি ছিল। অর্থাৎ, সারা বাংলাটা কয়েক জন রাজা ভাগ করিয়া লইয়া যথাশক্তি দখল ও শাসন করিতেন। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই কায়স্থ। আইন-ই-আকবরিতে সুবা বাংলা সম্বন্ধে বলা আছে (Gladwin's translation) the zamindars (who are mostly Koits) furnish also 23,330 cavalry, 801,158 infantry, 170 elephants 4260 cannon and 4400 boats. সীতারাম, প্রতাপাদিত্যের কথা মনে পড়িবে।

এই সব রাজা (যাহাদের আইন-ই-আকবরিতে "জমিদার" বলা হইয়াছে) স্বাধীন ভাবেই চলিতেন। নেহাৎ বাধ্য না হইলে পাঠান বা মোগলের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। তাহাও যতদিন শক্তি অপেক্ষাকৃত কম থাকিত। এই কারণে নিত্য বাংলায় হাঙ্গাম লাগিয়া থাকিত। একটা হাঙ্গাম ভাল করিয়া থামিতে না থামিতে আবার একটা হাঙ্গাম আরম্ভ হইত। এইজন্য উক্ত প্রবচনের উৎপত্তি হয়—"হুজ্জত-এ-বাঙ্গালা, হিকমৎ-এ চীন"। অর্থাৎ যদি হাঙ্গাম হুজ্জুতের কথা বল, তাহা হইলে বাংলাকে হারানো শক্ত, যদি শিল্পীর শিল্পচাতুর্য্যের কথা বল, তাহা হইলে চীনে কারিগরকে হারানো শক্ত।

বাঙালীর এই যুদ্ধোৎসুক্য বহুকাল বজায় ছিল। যে "লাল পল্টন" অবলম্বন করিয়া ক্লাইভ মাতামাতি করিয়াছিলেন, সে "লাল পল্টন" প্রধানতঃ বাঙালীর দ্বারা গঠিত। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে যে দুই জন "নুনের মর্য্যাদা" রক্ষা করিয়াছিল—মীর মদন ও মোহনলাল—তন্মধ্যে মোহন লাল বাঙালী, উত্তর রাঢ়ী ঘোষ কায়স্থ। শান্তিপুরের গোড়গোয়ালাদের যুদ্ধোৎসুক্য বিখ্যাত ছিল। কোনও উৎসব উপলক্ষে একটা "খণ্ডযুদ্ধ" করা তাহাদের প্রথা ছিল, বিশেষ করিয়া চৈত্রসংক্রান্তির দিন। এইরূপে তাহারা যুদ্ধের মনোবৃত্তি জাগাইয়া রাখিত। প্রাচীন লোকেদের কাছে আমার শোনা যে এই যুদ্ধোৎসুক্যের মূলে কুঠারাঘাত করেন Blacquire যাঁর নামে কলিকাতায় Blacquire Square. এই ব্ল্যাকিয়ার, পিতৃমাতৃহীন ইংরেজ সন্তান, শান্তিপুরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় পান ও কিছুকাল তাঁহার গৃহে পোষ্যরূপে বাস করেন। সেই সময়ে গোড়-গোয়ালাদের ভীষণ যুদ্ধ বহু বার দেখেন। পরে তিনি বিলাত গিয়া সেখান হইতে কোম্পানীর চাকুরি লইয়া এদেশে আসেন। তাঁহার সাম্রাজ্যবুদ্ধি ও দূরদর্শিতার প্রশংসা এইজন্য করি যে, তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই যুদ্ধপ্রিয়তা সমূলে উচ্ছেদ না করিলে ইংরেজরাজ্য এদেশে স্থায়ী হইবে না। এই বুঝিয়া তিনি নানা কৌশলে এইরূপ "খণ্ডযুদ্ধ" বন্ধ করিয়া দিয়া গোড়গোয়ালা ও অপর সমস্ত লোককে "শান্তিপ্রিয়" করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিলেন। সারা দেশময় এই নীতি অনুসৃত হইল। কাজেই ক্রমে লোকে "শান্তশিষ্ট" হইয়া পড়িল। বিপদ আসিলে নিজকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল এবং তখন সম্বল হইল রাজশক্তির উদ্দেশ্যে "ত্রাহি ত্রাহি" আর্ত্তনাদ। (বর্ত্তমান সময়েও আমরা এইরূপ উপদেশ পাইতেছি—"আততায়ী তোমাকে আক্রমণ করিলে do not take the law into your own hands") রাজশক্তিও ইহাই চায়। ক্রমে বাঙালীকে non-martial race শ্রেণীভুক্ত করা হইল এবং তাহাকে শুধু সৈন্যবিভাগ নহে, মিলিটারী পুলিস হইতেও বারিত করা হইল।

ইহার পর আসিল সিপাহী যুদ্ধ।—বিদেশীয় আধিপত্য উচ্ছেদের জন্য ভারতীয়দের প্রথম বড় চেষ্টা। ইংরেজ দেখিল যে, তখনও যুদ্ধোদ্যমের ইচ্ছা ভারতীয় মনে বিলুপ্ত হয় নাই। যাহাতে এই ইচ্ছা সমূলে বিনাশ হয়, তাহার জন্য ব্যাপক চেষ্টা আরম্ভ হইল। কূটতম চেষ্টা—স্কুলের সাহায্যে অভিসন্ধিমূলক (propaganda) শিক্ষা। আমাদের দৃষ্টি, আমাদের শ্রোত্র নিরন্তর দেখিতে শুনিতে লাগিল—"তোমাদের দেশে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সভ্যতার, দেখিতেছ, তাহা সমস্তই আমরা আনিয়াছি। তোমরা আমাদের পরম কৃপার পাত্র"। "তোমরা আমাদের অপেক্ষা বহু হীন, আমরা তোমাদের বহু উপরে", "আমরা কখনও কোনও যুদ্ধে হারি নাই এবং কখনও পরাধীন হই নাই। কিন্তু তোমরা বহু বার পরাজিত ও পরাধীন হইয়াছ", "তোমরা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, আমরা

আলোকে উদ্ভাসিত", "যে পরিমাণে তোমরা আমাদিগের অনুকরণ করিবে, সেই পরিমাণে তোমরা সভ্যতার, তথা মনুষ্যত্বের, উচ্চতর স্তরে উঠিবে" ইত্যাদি।

এইরূপে আমাদিগের মনে পরাভূত মনোবৃত্তি আনিবার উদ্দেশ্যে অভিসন্ধিমূলক পুস্তক রচনা হইতে লাগিল, বিশেষ ভাবে স্কুলের জন্য। উদাহরণস্বরূপ দুই-একটি কথা বলিতেছি। ইংরেজ God the Father, God the Son, God the Holy Ghost-এর নাম লইয়া সিরাজউদ্দৌলার সহিত "আলিপুরের সন্ধি" করিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাহা অবলীলাক্রমে ভঙ্গ করিয়াছিল—একথা কোনও স্কুলপাঠ্য বা প্রচলিত ইতিহাসে লেখে বলিয়া জানা নাই। মাহাদজি সিন্ধিয়ার হস্তে যে সময়ে ইংরেজ সৈন্যের বিনাশ নিশ্চিত, সে সময় প্রাণের দায়ে বোম্বাইস্থ Carnac নামক ইংরেজদের প্রধান রাজপুরুষ Holmes নামক এক রাজপুরুষকে "invested with full power to conclude a treaty" প্রেরণ করে এবং তদনুসারে মাহাদজি সিন্ধিয়ার সহিত Convention of Wargaum নামক সন্ধি Holmes স্বাক্ষর করে এবং ইংরেজ সৈন্য নিশ্চিত বিনাশ হইতে মুক্তি পায়। কিন্তু সৈন্য মুক্তি পাইবার পরই ইংরেজ এই সন্ধি অস্বীকার করে এবং Carnac বলে "he granted the powers to Mr. Holmes under a mental reservation that they were of no validity". একথা পুরাতন পুস্তক Grant Duff's "*History of the Mahrattas*"-এ আছে, কিন্তু কোনও স্কুলপাঠ্য বা প্রচলিত ইতিহাসে আছে বলিয়া জানি না। আবার, Cunningham নামে একজন ইংরেজ পল্টনের অফিসার তাঁহার *History of the Sikhs*-এ লিখিলেন যে ইংরেজ শিখদের সহিত কোন যুদ্ধে হারিয়াছে এবং পঞ্জাব সম্বন্ধে ইংরেজের নীতি অন্যায়। ফলে সে পুস্তকের সে সংস্করণ বাজেয়াপ্ত হইল ও "দোষী" অংশ বাদ দিয়া নূতন সংস্করণ ছাপিবার হুকুম হইল। উপরন্তু Cunningham-এর চাকরি গেল এবং তিনি ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। আবার, বরাবর ছেলেরা তাহাদের স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে পড়িয়া আসিতেছে যে, ১৮৫৭ সালে কার্তুজে চর্বি থাকার কথা (যাহা লইয়া সিপাহী যুদ্ধ আরম্ভ হয়) মিথ্যা। কিন্তু Roberts (পরে Lord Roberts)—যিনি সে সময়ে এদেশে ছিলেন—তাঁহার *Forty-one Years in India* নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে ঐ কথা সত্য। ইহা হইল এক রূপ। অপর রূপ, আমাদের জাতির পরাজয় ও কাপুরুষতার গল্প, কতক নিছক মিথ্যা, কতক অতিরঞ্জিত, আমাদের সামনে ধরা হইল।

এই ভাবে বহু স্থলে সত্যগোপন, তথ্যবিকৃতি ও মিথ্যাসৃষ্টি দ্বারা আমাদের মনকে অভিভূত করা স্কুল কলেজের মধ্য দিয়া "পীঢ়ী দর পীঢ়ী" চলিয়া আসিতেছিল।

মিথ্যা বার বার বলিলে তাহা সত্যের আকার ধারণ করে, ইহা সকলেই জানে। এখানেও তাহাই হইল। মিথ্যা প্রচারের পৌনঃপুনিক আঘাতে এদেশের লোকের মন "সম্মোহিত" হইয়া গেল। আমরা যে অতি দীনহীন এবং ইংরেজের একান্ত কৃপাপাত্র, নেহাৎ Man Friday, ইহা আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া গেল। আমাদের অতীত নাই, আমাদের ভবিষ্যৎ ইংরেজের পাদুকাতলে।

এই ভাবে ব্যাপক ও কালব্যাপী চেষ্টার ফলে আমাদের সাহস, আমাদের জাতীয়তাবোধ, ক্রমে অবচেতনে নামিয়া গেল, এবং তাহার পরে অবচেতন হইতেও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া যাইবার মত হইল। আমরা একেবারে ইংরেজের "কায়ার ছায়া" হইয়া পড়িলাম। এমনই "সম্মোহন মন্ত্র" যে, আমরা যেন ইংরাজ ব্যতীত নিজেদের অস্তিত্ব ধারণ করিতে পারিতাম না। ইংরেজের জয় আমাদের জয়, ইংরেজের লাভক্ষতি আমাদের লাভক্ষতি। একেবারে "গর্ভমেন্টবৎ", খিদমদ্গার, খানসামা। "হুজুতে বাংলার" এই পরিণাম—যে দেশে নিত্য জপের মন্ত্র "অদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতম্"!

জাতির জীবনে এই বিপদের সময় এদেশে দুই জনের আবির্ভাব—কতকাংশে সমসাময়িক। আমাদের মৃতপ্রায় জাতীয়তাবোধ পুনর্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ করিতে তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, সে বিষয় মনে করিলে সন্দেহ থাকে না যে, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে তাঁহাদের নাম অক্ষয় হইয়া থাকিবে।

এই দুই জনের এক জন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁহার "আনন্দমঠ", "সীতারাম" আমাদের জীবনে দেশমাতৃকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া দেখাইয়াছে আমাদের শক্তি কোথায়, আমাদের দৌর্বল্য কোথায়; এবং আর কেহ থাক বা না থাক, আমরা এখনও টিকিয়া আছি; এবং থাকিবার মত থাকিতে হইলে, আমাদের কি করিতে হইবে ও কি হইতে সাবধান থাকিতে হইবে। শুধু আত্মপ্রসাদে চলিবে না। তাঁহার পুস্তকগুলি পড়িলে তাঁহার নিজস্ব সংযতভাবে দত্ত দেশাত্মবোধ বাণী ও সাবধান বাণী পাঠকের সমস্ত সত্তাকে নাড়া দেয়।

অপর জন বিবেকানন্দ—যাঁহাকে সে সময়ে *Englishman* কাগজ নিপুণ ভাবে বর্ণনা করিয়াছিল, মাত্র দুইটি ইংরাজী কথায়—"Militant Sanyasi".

তিনি সত্যই "সন্ন্যাসী" ছিলেন। "সন্ন্যাস" অর্থে সম্যক্ ন্যাস, সমস্ত নাবাইয়া দেওয়া, ত্যাগ করা। কিন্তু পৃথিবী কর্মভূমি, যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ আত্যন্তিক সন্ন্যাস

অসম্ভব। তাই "সন্ন্যাস" অর্থে বুঝিতে হইবে—সমস্ত অনুরাগ, আগ্রহ, আকর্ষণ একটি ব্যতীত সমস্ত বিষয় হইতে সরাইয়া লইয়া পুঞ্জীভূত ভাবে সেই একটি বিষয়ের উপর স্থাপন। একাধারে পূর্ণ, গভীর বিরাগ এবং পূর্ণ, গভীর অনুরাগ। তাই সন্ন্যাসীর সাংসারিক সমস্ত বিষয়ে তীব্র বিরাগ এবং "দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মে লীন হইব" এই ভাবনায় তীব্র অনুরাগ। ইহাই ক্রমে "নৈষ্কর্ম্য" ও "নৈষ্কর্ম্য-সিদ্ধি"তে আসিয়া দাঁড়ায়। ইহাই পৃথিবীতে "সম্ভব" ও সর্বজনপরিচিত ব্রাহ্মণসম্মত সন্ন্যাস।

কিন্তু ক্ষত্রিয় রজোগুণপ্রধান। রজোগুণ নৈষ্কর্ম্যের একান্ত পরিপন্থী। এইজন্যই জন্মগত স্ব-ভাব বা বৃত্তি বিবেচনায় ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সন্ন্যাস ও দৈববাদিত্ব নিষিদ্ধ, যেমন যাচ্ঞা নিষিদ্ধ। বিবেকানন্দের মনে যে ব্রাহ্মণ-সম্মত সন্ন্যাসের কথা জাগিত না, তাহা নহে। কারণ তাঁহার পুস্তকাদির মধ্যে একাধিক স্থলে এই ভাবের কথা দেখা যায়।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মূলতঃ ও স্বভাবতঃ তিনি (তাঁহার গুরুদেবের ভাষায়) "খাপখোলা তলওয়ার"। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যে প্রকারের সন্ন্যাস সম্ভব, তাহাই তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং তাহার বিশেষ অনুরাগের বস্তু ছিল তাঁহার দেশ ও জাতি।

নিজ দেশ ও জাতির উপর তাঁহার অনুরাগ কিরূপ গভীর ছিল, তাহা তাঁহার প্রত্যেক লেখনে স্পষ্ট। তাহার মধ্যে বোধ হয় "বর্তমান ভারত"-এর অন্তিম অংশে যাহা পাই, তাহাতে এই ভাব সর্বাপেক্ষা পরিস্ফুট। তাহা এখানে উদ্ধার করি—

হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর, ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই "মায়ের" জন্য বলিপ্রদত্ত, ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামায়ের ছায়া মাত্র, ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল, ভাই; ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ; ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত; "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে; আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর; আমায় মানুষ কর।"

তিনি দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে আমাদের এই জাতী পাঁকে পড়িয়াছে। সমগ্র দেশ ও জাতি ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন। এই তমোগুণের প্রভাবে বিকারের রোগীর মত ভুল দেখিতেছে ও বকিতেছে। আংশিক চিকিৎসা বা স্থানীয় ঔষধ প্রয়োগে কিছুই হইবে না। সমগ্র সত্তা যখন অবসাদগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত, তখন অঙ্গবিশেষের চিকিৎসা করা ভুল। পূর্ণ উদ্যমে সমগ্র দেশ ও জাতিকে সর্বাঙ্গীণভাবে তমোগুণ হইতে টানিয়া তোলা দরকার। ইহা না হইলে দেশ ও জাতি সেই পাঁকে একেবারে ডুবিয়া মরিবে।

তাই তিনি চাহিয়াছিলেন এ জাতিতে রজোগুণ উদ্বুদ্ধ হউক। তাঁহার "ভাববার কথা" (পৃ. ১৭তে) পাই—

চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য্য, সেই কার্য্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা, চাই—সর্বদা পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—মস্তক, শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ."

কাজেই militant-ও বটে!

রজোগুণের আবাহন অর্থে বলের পূর্ণ উদ্বোধন ও স্ফুরণ। তাহা না হইলে ব্যক্তি বা সমাজ কাহারও সর্বাঙ্গীণ কুশল হয় না। যাহারা বলে "একাঙ্গীন কুশল করিলেই কাজ হইল এবং পর পর এক এক অঙ্গ ধরিয়া কাজ করিলেই হইবে" তাহারা হয় মূর্খ নয় ধূর্ত। একটিমাত্র অঙ্গও যদি রোগগ্রস্ত থাকে, তাহা হইলে সমস্ত শরীরই অসুস্থ হয়, কোন অঙ্গই ভাল থাকে না। ব্যক্তিই বল, আর সমাজই বল, যখন সে সুস্থ থাকে, তখন সে যুগপৎ সর্বাঙ্গীণ সুস্থ থাকে। কোনও অঙ্গ অসুস্থ হইলে সর্বাঙ্গের উপর দৃষ্টি রাখিয়া যদি প্রতীকার না করা হয়, তাহা হইলে রোগ সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইয়া সমগ্র শরীরকে নাশ করে।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় বলের প্রয়োজনীয়তা কত। বল না থাকিলে বাকি সমস্তই নিরর্থক, "ছেলের হাতে মোয়া" যে কেহ আসিয়া গালে চড় মারিয়া কাড়িয়া লইবে। বলাধান জন্য আবার সব কিছুকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। গর্ভচেটবৃত্তি যাহার মজ্জাগত অর্থাৎ যাহার অবিচ্ছেদ্য মনোবৃত্তি চাকর, খানসামা, খিদমদ্গারের অর্থাৎ সর্বসময়ে এক জন অর্থদাতা 'মনিব' আবশ্যক; বা অর্থানুসন্ধানবৃত্তি যাহার মজ্জাগত অর্থাৎ যাহার মনোবৃত্তি এই যে এ কাজ করিলে বর্তমান সংসারে আমার যে স্থান আছে বা

অর্থ আছে তাহার হানি হইতে পারে—তাহাদের দ্বারা কাজ ত কিছুই হইবে না, বরং সমূহ অনিষ্ট হইবে। এই রূপ "অর্থকরী রাজনীতিচর্চা"র ন্যায় সর্বনেশে জিনিস আছে বলিয়া ধারণা করিতে পারি না। এইজন্য বলি—সব কিছু পণ রাখিয়া কাজে লাগিতে হইবে। "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্"।

এই ভাবের পরিচয় পাইলাম সে দিন যখন পড়িলাম এক জন কুর্দী সর্দার বলিয়াছেন—In the end we shall appeal to the Brother of Allah. এই Brother of Allah আর কেহই নহেন—তলওয়ার। শ্রেষ্ঠ শাস্তিদাতা আল্লা; শাস্তিদাতা হিসাবে তাঁহার ঠিক নিম্নে গণ্য তাঁহার Brother. "বুদ্ধ্যা বিক্রমণেন চ"। প্রথমে কিছু চেষ্টা করিবে যদি বুদ্ধিদ্বারা কাজ হাসিল হয়। যদি না হয়, অগত্যা বিক্রম করিবে। অন্যথায় শান্তি নাই। এইজন্যই আরবদের মধ্যে একটি প্রবচন আছে—

"Peace dwelleth in the shadow of the sword"

সত্যই, নিজ তলওয়ারের ছায়া ভিন্ন অন্য কোথাও শান্তির আশা করা ভুল। যাঁহারা এই পরম ও চরম সত্য ভুলিয়া (বা বুঝিয়াও অপলাপ করিয়া) শান্তিকামী সাজিয়া স্থানে অস্থানে "মেরেছ কলসীর কানা তা' বলে কি প্রেম দিব না" গাহিয়া নিজ জাতিকে আত্মঘাতের পথে আগাইয়া যাইতে উপদেশ দেন, তাঁহারা (আবার বলি) হয় মূর্খ নয় ধূর্ত।

শান্তি না হইলে অগ্রগতি হয় না। অগ্রগতি না হইলে পশ্চাদ্গতি অবশ্যম্ভাবী, কি ব্যক্তির, কি সমাজের। পশ্চাদ্গতি অর্থে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়া। কিন্তু বলী না হইলে শান্তি ও অগ্রগতি অসম্ভব। এই ভাবিয়াই এক জন মনীষী বলিয়াছিলেন—"Force is the midwife of progress, delivering the old pregnant with the new." অগ্রগতি, শান্তি, স্বাধীনতা, পরস্পর সংসৃষ্ট। বল সকলেরই মূলে।

যাঁহার চক্ষু, কর্ণ ও কিঞ্চিন্মাত্র বিচারশক্তি আছে, তিনি একটু আশেপাশে চাহিয়া দেখিলেই বুঝিবেন যে, বল কত আবশ্যক (অবশ্য যে লোক আত্মঘাতী হইবে, তাহার পক্ষে ছাড়া)। যে বলী, সেই জীবিত থাকিতে সক্ষম হয়। যে দুর্বল, বলী তাহাকে পরাভূত করিয়া তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ করে। এইজন্যই জীব মাত্রেই, সম্ভব অসম্ভব সর্বস্থলেই, বল আশ্রয় করিয়া থাকে। নিতান্ত অসহায় কীট সম্বন্ধে ইংরেজী প্রবচন মনে পড়ে "Even a worm will turn." এ অবস্থায় যদি কেহ উপদেশ দেয় "শান্তিকামী হও, তোমার আততায়ীকে প্রেম কর", কি বলিব? এক জন আমার অস্তিত্ব লোপের জন্য ঘাত করিতে উদ্যত। পরামর্শ পাইলাম "তুমি প্রতিঘাত করিও না।" এ কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝা দরকার—বলের আধান এবং স্থানে বিশিষ্ট ভাবে প্রয়োগ যদি না করিতে পার, তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমিই যদি মরিলাম, পৃথিবী থাকিল বা গেল, আমার কি আসে যায়?

ইহাতে মনে হইতে পারে, বল বুঝি শুধু জীবন রক্ষার জন্য। তাহা নহে। বল যাবতীয় কল্যাণের ভিত্তিস্বরূপ। এ কথা বৈদিক ঋষিগণ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে পাই—যখন সর্ববিদ্যাবিশারদ নারদ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি এত পড়িয়া শুনিয়াও শোক পাইতেছেন, তখন সনৎকুমার বলিলেন যে, নারদ যাহা কিছু পড়িয়াছেন তাহা প্রকৃত সার পদার্থ নহে। তখন নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার জ্ঞাত বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি না। সনৎকুমার বস্তু-বিশেষের উল্লেখ করিয়া সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ায় নারদ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কি না? এই ভাবে, একের পর এক, অর্থাৎ পূর্ববর্তী অপেক্ষা পরবর্তী শ্রেষ্ঠ, বলিতে বলিতে সনৎকুমার যখন চরমে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন দেখা গেল যে, সে বস্তু হইতেছে "বল"। তিনি বলিলেন—

বলং বাব বিজ্ঞানাদ্ ভূয়োঽপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়তে, স যদা বলী ভবতি অথোত্থাতা ভবতি, উত্তিষ্ঠন্ পরিচরিতা ভবতি, পরিচরন্নুপসত্তা ভবতি, উপসীদন্ দ্রষ্টা ভবতি, শ্রোতা ভবতি, মন্তা ভবতি, বোদ্ধা ভবতি, কর্তা ভবতি, বিজ্ঞাতা ভবতি। বলেন বৈ পৃথিবী তিষ্ঠতি, বলেনান্তরিক্ষং, বলেন দ্যৌর্বলেন পর্বতা, বলেন দেবমনুষ্যা, বলেন পশবশ্চ বয়াংসি চ তৃণবনস্পতয়ঃ শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকম্। বলেন লোকস্তিষ্ঠতি বলমুপাস্বেতি। (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৭, ৮, ১)

ঠিক ইহার পূর্বেই তৎকাল পর্যন্ত শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সনৎকুমার নাম করিয়াছেন "বিজ্ঞান"-এর অর্থাৎ যাহার দ্বারা বেদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি সর্ববিধ জ্ঞান এবং অপর সব প্রকার জ্ঞাতব্য বস্তুর এবং এই লোক ও ঐ লোক, এই সমস্তের অন্তরতম তথ্য নিপুণভাবে জানা যায়।

এখন বলিতেছেন—"বল" এই "বিজ্ঞান"-এর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ খুবই স্পষ্ট। বলিতেছেন—এক জন বলবান্ ব্যক্তি এক শত জন বিজ্ঞানবান্ ব্যক্তিকে কাঁপাইয়া দেয়। লোক যখন বলী হয় তখন সে উত্থাতা হয়, অর্থাৎ উঠিয়া দাঁড়ায়, বা তীব্রভাবে সক্রিয় হয়। উত্থাতা হইলেই সে তাহার গুরুর বিশেষ ভাবে পরিচর্যা করিতে সক্ষম হয়। তাহা হইলেই সে গুরুর নিকটে বসিতে পায়। নিকটে বসিলেই সে সম্যক্ ভাবে সমস্ত দেখিতে ও শুনিতে পায়।

সম্যক্‌ভাবে দেখিতে ও শুনিতে পাইয়াছে বলিয়াই শ্রুত ও দৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে সে ঠিক ভাবে মনন করিতে পারে। ঠিক ভাবে মননক্রিয়াদ্বারা সে বস্তুটি বেশ বুঝিতে পারে। ঠিক বুঝিতে পারার দরুন বস্তুটিকে সে কাজে আনিতে সক্ষম হয়। এইরূপে কাজে আনিতে পারায় সে "বিজ্ঞাতা" হয়, অর্থাৎ সে সেই বস্তুর সূক্ষ্মতম তথ্য জানিতে পারে। বল আশ্রয় করিয়াই পৃথিবী বর্ত্তমান রহিয়াছে। বল আশ্রয় করিয়াই অন্তরীক্ষ, দ্যৌঃ, পর্বত, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশু, পক্ষী, তৃণবনস্পতি সকল, কীট-পতঙ্গ পিপীলিকা হইতে শ্বাপদগণ পর্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। বল আশ্রয় করিয়া লোক (অর্থাৎ সারা সৃষ্টি) বর্ত্তমান রহিয়াছে। বলেরই উপাসনা কর।

এই কথাগুলি কত সত্য, বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, এই "বল" অর্থে সামর্থ্য নহে, সাহস। সাহসেই সামর্থ্য আনে। সাহসের অভাবে প্রচণ্ড সামর্থ্যও লোপ পায়। মনে পড়ে "হুজুগে বাংলা" বহুকাল পরে একবার স্বরূপ ধারণ করিয়াছিল—যখন ১৯০৫ সালে গোটাকয়েক বাঙালীর ছেলে সৈন্য-সামন্ত-লোক-লস্কর-চাকর-খানসামা-খিদমৎগার-পরিবৃত প্রবল-পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যাভিমানী ইংরেজের সহিত প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। দুই পক্ষের মধ্যে "অন্তরং মহদন্তরম্"। ছেলেগুলার সম্বল শুধু সাহস। এই সাহস মাত্রে ভর করিয়াই Gil Blas তে বর্ণিত Licentiate Pedro Garcias-এর soul স্মরণ করিয়া বাঙালী স্থির করিল—"ইংরেজ Pedro Garcias-এর জাত, তার soul তার পকেটে। সেখানে সবপ্রাণেন, সমস্ত সাহস ও তজ্জনিত সামর্থ্যের সহিত আঘাত কর, শত্রু কাবু হইবে। তাহাই হইয়াছিল।

এ স্থানে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় একটি কথা—বাংলার এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা তৎকালীন সমস্ত ভারতীয় নেতারা করিয়াছিলেন, এক জন ছাড়া—বাল গঙ্গাধর টিলক। সাধে গোখলে বলেন নাই—"What Bengal thinks today, India will think tomorrow."

এখন বোধ হয় "বল" আধান করিবার একান্ত আবশ্যকতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। আধানের পর বিচার্য্য বিষয়—"প্রয়োগ", অর্থাৎ দেশকালপাত্র ও মাত্রা বিবেচনায় বলের ব্যবহার।

বলা বাহুল্য, অস্থানে বা অকালে বল প্রয়োগ করিলে অকল্যাণই হয়। পাত্র ত আততায়ী, ব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন: ব্যক্ত ত বুঝিতে পারি, সে আমার নমস্য কেন, প্রণম্যও বলিতে পারি, কারণ সে নীচ ভাবে ছলের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। কিন্তু যে প্রচ্ছন্ন, অর্থাৎ হয় ত আমার পাশের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া এক জনকে আড়াল করিয়া আমাকে মারিবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ সাহস নাই যে প্রত্যক্ষভাবে শত্রুতা করে, তাহাকে কি বলিব?

ব্যক্তই হউক, প্রচ্ছন্নই হউক, আততায়ী আমাকে মারিবার উপক্রম করিতেছে, তাহাতেই দেশকালপাত্রের নির্দ্ধারণ হইয়া গেল।

তার পর "মাত্রা", অর্থাৎ শত্রু তোমাকে যে পরিমাণ আঘাত করিবে, তুমি ফেরত দিবে সহস্র গুণ। যখন ভবভূতির "মহাবীরচরিতম্" পড়িলাম, তখন দেখিলাম যে রামের এই সম্বন্ধে খেদ কত গভীর—

"অনিন্দ্যঃ পৌলস্ত্যো ব্রজতু পরিবাদো মযি পুন-
র্যতো রূঢ়ে বৈরে বহুগুণমনেন প্রতিকৃতম্।"

অর্থাৎ রাবণ চলিল সর্বপ্রকার নিন্দার অতীত হইয়া, আর যত নিন্দা আমার কপালে! কারণ, শত্রুতা আরম্ভ হইতে আমি তার যা অনিষ্ট করিয়াছি, সে তার বহু গুণ আমার অনিষ্ট করিয়াছে।

রাম বহু সহস্র রাক্ষস মারিয়াছিলেন, কিন্তু রাবণ এক সীতাহরণ দ্বারা যে ঘা দিলে!

এই "মাত্রা"র কথাই পাই বিবেকানন্দের "ভাব্‌বার কথা" পৃঃ ৪২এ, আমার একটা এই ঘটনার বর্ণনান্তর শোনা আছে। মোদ্দা কথা একই, তবে বোধ হয় আমার শোনা বর্ণনান্তরটা একটু ফলাও, কথাটা হইতেছে এই—দুই জন পাড়াগেঁয়ে রাজপুত (ঠাকুর সাহেব), মাথায় পাগড়ী, হাতে লাঠি, জীবনে প্রথম আসিয়াছে রাজধানী লক্ষ্ণৌ-এ। লড়াই-ই জানে, লেখাপড়া নয়। তখন মহরম চলিতেছে বিখ্যাত ইমামবাড়ায়, সেটা শিয়াদের। শিয়াদের মহরম হইতেছে শোকের পর্ব। হাসেন হোসেনের জন্য "মরশিয়া" পড়ে। মড়া কান্নার এমন নকল করে যে আসল বলিয়া ভুল হয়। ঠাকুর সাহেবরা ইমামবাড়ার ভিতর যেতে চাইলেন। পাহারা বললে "এই কাঠের মূর্ত্তিকে যদি পাঁচ জুতা মারো, তাহা হইলে ভিতরে যাইতে দিব।" ঠাকুর সাহেবরা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "একে পাঁচ জুতা মারতে হবে কেন? আর, এ কে?" পাহারা বলিল "এটা হ'ল এজিদের মূর্ত্তি, সে হাসেন হোসেনকে মেরেছিল।" ঠাকুর সাহেবরা জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে?" পাহারা বলিল "প্রায় হাজার বৎসর আগে।" এমন সময় ভিতর থেকে প্রাণকাঁপানো মড়া কান্না শোনা গেল। ঠাকুর সাহেবরা চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করলেন "মরিলো কে?" পাহারা বলিল "এখন কেউ মরে নি।" ঠাকুর সাহেবরা বলিল "তবে কাঁদে কেন?" পাহারা বলিল "ওরা কাঁদছে হাসেন হোসেনের জন্য।" ঠাকুর সাহেবরা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন "তা'রা ত মরেছে হাজার

বৎসর আগে।" পাহারা বলিল "হ্যাঁ, তাদের জন্যই কাঁদছে।" তখন ঠাকুর সাহেবরা কোথায় এক্সিদের মূর্ত্তিকে জুতা মারিবেন, না পাগড়ি খুলিয়া সেই মূর্ত্তির পায়ের কাছে রাখিয়া লাঠি শুদ্ধ মূর্ত্তির পায়ের কাছে দণ্ডবৎ, আর বলেন—"বেঁচে থাক্, ভাই, এমন মার মেরেছিস্ যে, তোর শত্রুর কান্না আজ হাজার বৎসরেও থামে নি।"

এর নাম "মাত্রা।"

এইখানে বলি একটা কথা—আমরা নাকি "স্বাধীন" হইয়াছি। অত শত "স্বাধীন" কথাটার বিচার না করিয়া বলিতে পারা যায় যে, ইংরেজ আমাদের দেশ আংশিক ভাবে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, কতকগুলা বাঙালীর ছেলের বলের আধান এবং উপযুক্ত স্থানে ও উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করাই এই বাধ্য হওয়ার ভিত্তিতে—এটা অস্বীকার করলে বোধ হয় বিষম অবিচার হইবে।

আর, সেই হুজুগে বাংলা এখন কোথায়? এমন কি, অমন বাংলা ভাষা পর্যন্ত ঠাঁই পাচ্ছে না। মনে হয় "অর্থকরী রাজনীতি"র প্রসার বাংলার জাতীয় জীবনে ঘুণ ধরিয়ে দিয়াছে। সে "হুজুগে বাংলা" আবার পাঁকে পড়িবে না কি?

হাওয়ায় যেন শুনিতে পাইতেছি—"বলমুপাস্স্বেতি"।

ইংরেজীর বাংলা অনুবাদ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

বাংলা ভাষা যুগে যুগে বিভিন্ন ভাষার শব্দসম্পদে সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই সম্পদকে সে গ্রহণ করিয়াছে প্রয়োজনমত নিজের উপযোগী করিয়া। পরের জিনিষকে সে আপন করিয়া ঘরে আনিয়াছে—তাহার আকৃতি ও প্রকৃতিকে সে এমন ভাবে বদলাইয়া দিয়াছে যে আজ বাঙালীর মধ্যে চলাফেরায় তাহার কোন অসুবিধা নাই—তাহাকে কোথাও বেমানান বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ দু-চার জন সন্ধানী পণ্ডিত ছাড়া তাহার বংশের পরিচয় আর কেহ জানে না—জানিবার দরকারও বোধ করে না। অবশ্য এ বিষয়ে বাঙালীর যে কোনও নূতনত্ব বা বৈশিষ্ট্য আছে তাহা বলা চলে না। এই ভাবেই এক দেশের ভাষা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত অন্য দেশের ভাষার সাহায্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। ইহার অন্যথা হইলে ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হয়—ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়।

দুঃখের বিষয়, ইংরেজ জাতি ও ইংরেজী ভাষার সম্পর্কে আসিয়া বাঙালী সকল ক্ষেত্রে এই চিরাচরিত নীতির সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই বা করে নাই। ফলে ইংরেজী জানা শিক্ষিত বাঙালী পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় অজস্র ইংরেজী শব্দ মিশাইয়া যে ভাষা ব্যবহার করে ইংরেজী না জানা লোক তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করে। লিখিবার সময়ও অনেক স্থলে ইংরেজী হাবভাব, ইংরেজী ঢঙে বাংলায় প্রকাশ করিয়া সে ভাষাকে কিম্ভূত-কিমাকার করিয়া তোলে। সাহেবী বাংলার মত এই বাংলাও বাঙালীর তৃপ্তিবিধান করিতে পারে না। এই বিদেশীয়ানা ভাষার পরিপুষ্টিসাধন না করিয়া তাহার বিকৃতি সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রত্যেক ভাষারই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি আছে—বিদেশী উপকরণ গ্রহণ করিবার ও আত্মসাৎ করিবার একটা বিশিষ্ট শক্তি সকল ভাষারই আছে। কিন্তু নিজের বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করিলে সৌন্দর্য্য বা সম্পদ কোন দিক দিয়াই তাহার লাভ হয় না। তাহা ছাড়া কোন ভাষাভাষীই এ বিষয়ে কোনরূপ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতে রাজী হয় না। ইংরেজ জাতি ও তাহার ভাষা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—বিভিন্ন দেশের সহিত ব্যবহারে ও ভাবের আদান-প্রদানে সেই সব দেশের ভাব ও শব্দ তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু কোনরূপ বিদেশী ভাব ও শব্দের দ্বারা ইংরেজ তাহার রাজকীয় ভাষাকে (King's English) অভিভূত বা আচ্ছন্ন হইতে দেয় নাই। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ভাষার রাজ্যেও ইংরেজ তাহার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক। তাহার এই স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কিছু কিছু বিদেশী শব্দ ইংরেজী ভাষা গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ভাষার কোনরূপ বিকৃতি ইংরেজ জাতি মানিয়া লয় নাই। বিদেশীর ব্যবহারের ফলে এই বিকৃতি কচিৎ কখনও ঘটিয়া থাকিলে ইংরেজ উহাকে চীনা ভারতীয় বা মার্কিন প্রয়োগ বলিয়া ব্যঙ্গ বা উপেক্ষা করিতে দ্বিধা বোধ করে না। সকল দেশের ব্যবহারের সুবিধার জন্য ইংরেজীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (Basic English) প্রবর্ত্তন করিতে ইংরেজের আপত্তি নাই, কিন্তু ইহাকে কখনই সে তাহার জাতীয় ভাষার স্থান অধিকার করিতে দিবে না। বস্তুতঃ দেশাত্মবোধের মতই ভাষার প্রতি একান্ত মমত্ববোধ ইংরেজ জাতির প্রকৃতিগত।

দীর্ঘকাল ইংরেজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সত্ত্বেও আমরা তাহার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য অধিগত করিতে পারি নাই—তাহার বাহ্যিক আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছি, কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠত্বের মূল উৎসের সন্ধান

করার প্রয়োজন বোধ করি নাই। আমরা স্বদেশপ্রীতির গুণগান করি বটে, কিন্তু দেশের প্রতিটি জিনিষের প্রতি আমাদের গভীর মমত্ব-বোধ নাই—পরস্পরের ক্ষতিবৃদ্ধিতে পরস্পরের প্রাণে বেদনা বা আনন্দের সঞ্চার হয় না। অন্যান্য বিষয়ের কথা যাহাই হোক না কেন ভাষা সম্পর্কে এ কথা আদৌ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

সত্য বটে, আজ আর আমরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখি না—সত্য বটে, আজ আর বাংলা ভাষা পূর্ব্বের মত ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়—উচ্চশিক্ষিত অল্পশিক্ষিত ছোট বড় সকলেই আজ মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাধনাসমৃদ্ধ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গৌরবে গৌরবান্বিত। কিন্তু তথাপি বাংলা ভাষাকে আমরা কার্য্যতঃ যথোচিত সম্মান দান করি না। বাংলা ভাষা এতদিন মুখ্যতঃ অন্তঃপুরচারিণীই ছিল—গৃহকার্য্যের ক্ষুদ্র পরিধির বাহিরে এখনও তাহার স্বচ্ছন্দ চলাচলের দাবি আশানুরূপ স্বীকৃত হয় নাই—সকল কার্যে তাহাকে নিযুক্ত করিতে আমাদের দ্বিধা ও সংকোচের সীমা নাই। কেবলমাত্র বিদেশী শাসনের অজুহাত আমাদের আচরণের সঙ্গত কৈফিয়ত বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। ভাষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগের অভাব, ইহার শক্তি সম্বন্ধে আমাদের অবিশ্বাস, সর্ব্বোপরি যথোচিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার অভাবে ইহাকে যথাযথ ব্যবহার করিবার অক্ষমতা—আমাদের এই বিসদৃশ আচরণের জন্য দায়ী। তাই আমরা অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজীর অন্ধ অনুকরণ করিয়া বাংলার স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক রূপকে বিকৃত করিতেছি—বিশুদ্ধ বাঙালী ধরণেও যে আধুনিক ভাবধারা প্রকাশে কোন অসুবিধা হইতে পারে না এ ধারণা অনেকেরই নাই।

ইংরেজ জাতির সহিত সম্পর্ক স্থাপনের সময় হইতেই আমরা বহু ইংরেজী শব্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তখনও বাংলা ভাষা শিক্ষিত বাঙালীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই—তাই কোন শব্দ সুন্দর কি অসুন্দর, মানানসই কি বেমানান সে দিকে কেহ তেমন নজর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আজ বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পাইলেও ইংরেজীর অনুবাদে আমরা গড্ডলিকা প্রবাহের মত গতানুগতিক পথে চলিয়াছি—কেহ একটি শব্দ চালাইলেই নির্বিচারে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিতেছি। শব্দটির সঙ্গে যাঁহার পূর্ব্বপরিচয় ঘটে নাই তিনি ইংরেজী মূল শব্দটির সাহায্যে অর্থ বুঝিয়া লন—ইংরেজী-না-জানা লোকের পক্ষে উহার অর্থ গ্রহণ করা কঠিন। কালক্রমে আমাদের দেশে ইংরেজীর প্রচলন যখন বিলুপ্ত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে তখন এই জাতীয় শব্দ হয়ত সাধারণ বাঙালীর নিকট, সংস্কৃতানভিজ্ঞ তিব্বতীয়ের পক্ষে সংস্কৃত গ্রন্থের প্রাচীন তিব্বতীয় অনুবাদ যেরূপ দুর্বোধ্য—সেইরূপই দুর্বোধ্য হইয়া পড়িবে। বস্তুতঃ এখনই ত আমরা বাংলা সংবাদপত্র, পাশ্চাত্য দর্শন, বিজ্ঞান বা অন্য বিষয়ের বাংলা গ্রন্থ, এমন কি বাংলা সাহিত্যের পাশ্চাত্য রীতি-সম্মত সমালোচনা-গ্রন্থ স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারি না—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু পারিভাষিক শব্দ নহে ইংরেজী বচনভঙ্গীও ইহার অন্যতম মুখ্য কারণ। চলতি বাংলায়ও অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজীগন্ধী ভাষা উহাকে শ্রীহীন না করিলেও সাধারণ বাঙালীর নিকট দুর্বোধ্য করিয়া তুলিতেছে। 'মেতৃত্ব দিতে ইচ্ছা করা' 'আইন স্বহস্তে লওয়া,' 'ঘোড়ার সামনে গাড়ী', 'চায়ের বাটিতে তুফান,' 'কোন পাথরই ওলটাতে বাকি না রাখা', 'চটবার কারণ দেওয়া', 'পাদুকায় পদ প্রবিষ্ট করা'—প্রভৃতি প্রয়োগ সাহেবী বাংলার চরম নিদর্শন হইলেও বাঙালীর ব্যবহারযোগ্য নহে। আমরা এখন কেবল 'পারলৌকিক তৃপ্তি'তে সন্তুষ্ট না হইয়া বিদেশী মতে 'পরলোকগত আত্মার তৃপ্তি' কামনা করি—অথচ আমরা জানি আত্মার জন্মমৃত্যু নাই, সুখদুঃখ নাই। 'অরণ্যে রোদন করা' আমাদের সহিয়া গিয়াছে, 'সুবর্ণ সুযোগের' সদ্ব্যবহারেও তেমন আপত্তি নাই—কিন্তু 'উলঙ্গ সত্যকে' স্বীকার করা বা 'কুম্ভীরাশ্রু মোচন করা' আমাদের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। 'সুপ্রভাতের' সহিত আমাদের নিত্য পরিচয়, কিন্তু তাই বলিয়া 'শুভরাত্রিকে'ও নিত্য ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা শোভন বা সমীচীন নহে। 'ফুলশয্যা'তেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত—'মধুচন্দ্রিমা'র জন্য লালায়িত হওয়া আমাদের পক্ষে প্রশংসার বিষয় হইবে না। অবশ্য 'হনিমুনে'র জন্য কাহারও আগ্রহাতিশয্য থাকিলে বাধা দেওয়া সঙ্গত হইবে না।

বস্তুতঃ বাংলার প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, অর্থের অনুসন্ধান না করিয়া আক্ষরিক অনুবাদের রীতিতে অজস্র বিকৃত শব্দের সৃষ্টি ও প্রয়োগ করা হইতেছে। এইরূপেই নলকূপ (tubewell), নামভূমিকা (title-role), আখ্যাপত্র (title-page), অর্দ্ধবাৎসরিক (half-yearly), পাদপ্রদীপ (foot-light), পুনর্মিলন (re-union), পুনর্লিখন (re-write), আন্তর্জাতিক (inter-national), প্রাগৈতিহাসিক (pre-historic), গোল টেবিল বৈঠক (round table conference) প্রভৃতি শব্দের প্রচলন হইতেছে। স্থানবিশেষে আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়োজন থাকিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাবানুবাদই সাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য—তাহা ছাড়া, হুবহু আক্ষরিক অনুবাদ অনেক স্থলেই বিসদৃশ ও হাস্যকর হইয়া উঠে। উহার সাহায্যে সাধারণ লোকের কোন বিষয় বুঝিবার পক্ষে বিশেষ কোন সুবিধাই হয় না। অনুবাদের মূলীভূত ভাষার কোন শব্দ বা তাহার অংশ অর্থহীন বাক্যালঙ্কার মাত্র হইতে পারে—কোন শব্দের গঠনে ত্রুটি থাকিতে পারে। সে সব ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা বাতুলতামাত্র। এক দেশের ভাবধারা, রীতিনীতি, বচনবিন্যাস-প্রণালীর সহিত অন্য দেশের প্রচুর পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্য এক দেশের

ভাষার শব্দকে অন্য দেশের ভাষায় রূপান্তরিত করিবার সময় এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ অবহিত না হইলে রূপান্তর বা অনুবাদ নিরর্থক ভারস্বরূপ হইয়া পড়ে। তাই ইংরেজী paying guest-এর আক্ষরিক অনুবাদ হিসাবে 'অর্থদায়ী অতিথি' বলিলে লোকে হাসিবে। ইংরেজের guest আর বাঙালীর অতিথি এক নয়—অতিথির নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ ভারতীয় সংস্কারের বিরোধী অথচ আত্মীয়স্বজনের গৃহে খাইখরচ দিয়া থাকা একেবারে অপ্রচলিত নয়। অনাত্মীয় অপরিচিতের গৃহে এইরূপ ব্যবস্থা এখনও সমাজে প্রচলিত হয় নাই। সুতরাং আত্মীয়ের বা বন্ধুর বাড়ীতে আত্মীয় বা বন্ধু খাইখরচ দিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে অর্থদায়ী অতিথি বলা চলিবে না। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের চন্দ্রগুপ্তের ভূমিকাকে ইংরেজীর অনুকরণে নামভূমিকা (title-role) রূপে নির্দেশ করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না, (tubewell)-এর সঙ্গে নলকূপের বিম্ব-প্রতিবিম্ব সম্বন্ধ থাকিলেও হাল-আমলের ব্যবহৃত 'পাতাল-কল' শব্দ বেশী অর্থদ্যোতক বলিয়া মনে হয়। অর্দ্ধ বাৎসরিক শব্দ half-yearly-র অন্ধ অনুকরণ মাত্র—ষাণ্মাসিক শব্দ বাংলাভাষীর নিকট অধিকতর পরিচিত ও স্পষ্ট। প্রাগৈতিহাসিক, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি শব্দ pre-historic inter-national-এর অনুকৃতিপ্রসূত, কিন্তু ভারতীয় ভাষার রীতিবিরোধী। ইতিহাস-পূর্ব pre-historic-এর স্থান অনায়াসে অধিকার করিতে পারে—এই জাতীয় অন্যান্য শব্দের স্থলে অনুরূপ প্রয়োগ চলিতে পারে। নিখিল জাতিনিষ্ঠ বা নিখিল জাতিগত বা চলন্তিকায় নির্দিষ্ট অধিরাষ্ট্রীয় শব্দ আন্তর্জাতিক শব্দের কাজ চালাইতে পারে কিনা সুধীগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। আন্তর্জাতিকের দৃষ্টান্তে আন্তঃ-প্রাদেশিক, আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তঃডোমিনিয়ন প্রভৃতি যে সমস্ত বিকটাকার শব্দের আবির্ভাব বাংলাভাষাভাষীকে শঙ্কিত ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার একটা ব্যবস্থা করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য ভাষার দরবারে যেরূপ ইহারা জাঁকিয়া বসিয়াছে তাহাতে ইহাদের হটান মোটেই সহজ নহে। সম্মেলনকে বাতিল করিয়া দিয়া পুনর্মিলন শব্দের প্রবর্তনের দ্বারা re-union-এর কথঞ্চিৎ মর্য্যাদা রক্ষার চেষ্টা দেখা গেলেও বাংলার গৌরব রক্ষিত হইতেছে না। অনুবাদ হিসাবে বৃহৎ নেতৃত্ব High Command-এর অনুগত হইতে পারে, কিন্তু মূল কর্তৃপক্ষ বা মুখ্য নেতৃবর্গ বাংলা ভাষায় মানায় ভাল। যুগ্মসম্পাদক প্রভৃতি যে সকল পদ joint secretary প্রভৃতির অনুবাদ হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহাতে যুগ্মশব্দের পূর্ব্বপদ হিসাবে প্রয়োগ বাংলার রীতিবিরোধী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগী সম্পাদক বা সম্পাদকযুগল শব্দ সুবিধামত ব্যবহার করা যাইতে পারে। Home Department, Home Minister প্রভৃতি শব্দে Home-এর প্রতিশব্দরূপে 'স্বরাষ্ট্র' পররাষ্ট্রের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে কিনা বিবেচ্য। অন্তরঙ্গ শব্দের প্রয়োগ এস্থলে চলিতে পারে কিনা ভাবিয়া দেখা দরকার। একই শব্দের অনুবাদে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শব্দের দরকার হইতে পারে—একই প্রতিশব্দ সকল স্থলে চলিতে পারে না। Interesting শব্দের বিভিন্ন প্রতিশব্দ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সম্প্রতি সরকারী ঋণের বিজ্ঞাপনে এই বিষয়ে অনবধানতার একটি চমৎকার উদাহরণ পাওয়া গেল। বিজ্ঞাপনের ভাষায় ঋণ নগদ চাঁদার পরিবর্তে পাওয়া যাইবে। সাধারণ পাঠক হয়ত স্বাধীনতার শুভ সূচনায় সরকারকে চাঁদা দেওয়ার কথায় বিস্মিত হইবেন। চাঁদা দিয়া ঋণ কিরূপে পাওয়া যায় তাহা ভাবিয়া হয়ত বা আকুল হইবেন। কারণ বাঙালী জানে চাঁদা সাহায্য হিসাবেই দিতে হয়। নগদ টাকার পরিবর্তে ঋণপত্র পাওয়া যাইবে ইহাই লেখকের বক্তব্য—ইংরেজীর হুবহু অনুবাদ বিরুদ্ধ ধারণা জন্মাইবার কারণ। কলিকাতার অধিবাসীদের রেশন কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে তাহাদের কার্ড পুনর্লিখনের জন্য জমা দিতে বলেন—জনসাধারণ বিজ্ঞাপন দেখিয়া নিজেদের কর্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। পুরাতন কার্ডের পরিবর্তে নূতন কার্ড লিখাইতে, কার্ড সংশোধন করাইয়া লইতে বা উহাতে নূতন বিষয় সংযোজন করাইয়া লইতে অনুরোধ করিলে কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হয় না। 'হিমকক্ষ' শব্দের দ্বারা refrigerator কোনরূপে বুঝান গেলেও refrigeration, refrigerated প্রভৃতি শব্দের বেলায় অসুবিধায় পড়িতে হয়। শীতকযন্ত্র, শীতন, শীতিত এই তিনটি শব্দের দ্বারা বোধ হয় সংক্ষেপে সকল কার্য্যই চলিতে পারে। Martyr-এর স্থানে শহীদ শব্দের বহুল প্রয়োগ চলিতেছে। উহার স্থানে আত্মোৎসর্গী শব্দ ব্যবহার করিতে কেহ সম্মত হইবেন কিনা জানি না—তবে শব্দটির অর্থ বুঝিতে বাঙালী জনসাধারণের বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না বোধ হয়। Tear-gas-কে কাঁদুনে গ্যাস বলিয়া প্রচার করায় ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় আপত্তি করিয়াছেন—কারণ গ্যাস ত কাঁদে না। কাঁদানো গ্যাস বলিলে এ আপত্তি এড়ান যাইতে পারে। হাসানো গ্যাস laughing-gas-এর প্রতিশব্দ হইতে পারে। Air-tight-কে বায়ুরুদ্ধ না বলিয়া বায়ুরোধী বলিলে সঙ্গত ও শোভন হয় না কি? Public health, public instruction প্রভৃতি শব্দে public কথাটির খুব বেশী তাৎপর্য্য আছে বলিয়া মনে হয় না—থাকিলেও তাহাকে 'জন' দিয়া অনুবাদ করার তেমন সার্থকতা দেখা যায় না—স্বাস্থ্যবিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ বলিলে বুঝিবার কোনও অসুবিধা হয় না। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত লোকশিক্ষা, লোকসাহিত্য শব্দ আজ আমরা বাতিল করিব কি? স্থিতাবস্থা, গণপরিষদ্ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের আলোচনা প্রবন্ধান্তরে করিয়াছি, কিন্তু সে আলোচনা

অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা কিছুরই সৃষ্টি করে নাই। ভাষা-বিষয়ে উদাসীন শিক্ষিতসমাজে এ আলোচনাও সেই ভাবেই উপেক্ষিত হইবে বলিয়াই মনে হয়।

তবে দেশ স্বাধীন হইবার পর দেশের ভাষা বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক। এত দিন ভাষাকে উপেক্ষা করিলেও বিশেষ কিছু আসিয়া যাইত না। লেখক যাহা খুশী লিখিলেন—পাঠক কতকটা বুঝিল, কতকটা বা অনুমান করিয়া লইল—তাহাতে কাহারও বিশেষ কিছু ব্যস্ত হইবার কারণ ছিল না। গভীর তত্ত্বালোচনা বাংলা ভাষার মাধ্যমে করিবার প্রয়োজন ছিল না—আইনের খুঁটিনাটি বিচার বাংলায় দরকার হইত না—শব্দপ্রয়োগের গূঢ় রহস্য বা সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য বিশ্লেষণের উপযোগিতা বাঙালী পাঠক বা লেখককে তেমন অনুভব করিতে হয় নাই। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। এখন বাংলার মধ্য দিয়া বিভিন্ন বিদ্যার অনুশীলন করিতে হইবে—দেশের আইন-কানুন বাংলা ভাষায় উপনিবদ্ধ হইবে -বিচার-আচার-ব্যবসা-বাণিজ্য বাংলা ভাষার মধ্য দিয়া চালাইতে হইবে—ফলে প্রতিটি শব্দ ওজন করিয়া বিশেষ ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্যবহার করিতে হইবে—শব্দের অস্পষ্টতা, ভাষার দুরূহতা প্রতি পদে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করিবে। অনেক শব্দ আমরা ইংরেজী হইতে গ্রহণ করিয়াছি আরও অনেক শব্দ অবিকৃত ভাবেই আমাদিগকে লইতে হইবে। কিন্তু আধুনিক ভাব প্রকাশের উপযোগী শব্দ গঠনের দায়িত্বও কম নয়—এরূপ অসংখ্য শব্দ আমাদিগকে গঠন করিতে হইবে। অসীম শক্তি ও অতুল সম্পদের আধার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য হইতে এ বিষয়ে আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারিব। সে সাহায্য যাহাতে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইতে পারি সেজন্য আমাদিগকে সংঘবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে হইবে, নূতন সৃষ্ট শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে—তাহার বিশুদ্ধি ও অর্থ-প্রকাশ ক্ষমতা সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে। কেবল পারিভাষিক শব্দ সংকলন করিলেই চলিবে না—দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন পণ্ডিত একক বা সমবেত ভাবে এ বিষয়ে যথেষ্ট কাজ করিয়াছেন—বর্তমানে সরকারের দৃষ্টিও এদিকে পড়িয়াছে। কিন্তু যে অগণিত সাধারণ শব্দ-রাশি আমরা অহরহ ব্যবহার করিতেছি কোন বিশিষ্ট শাস্ত্র বা বিদ্যার সহিত যাহাদের বিশেষ যোগাযোগ নাই তাহাদের সম্বন্ধেও উদাসীনতা অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত হইবে না, ভাষার প্রাণসত্তারে তাহাদের উপযোগিতা ভুলিলে চলিবে না। তাহাদের গুরুচাপে ভাষা যাহাতে বিকৃত ও পঙ্গু না হইয়া যায় সেদিকে আমাদিগকে বিশেষ অবহিত হইতে হইবে। প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যা-নিধি মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংবর্দ্ধনার উত্তরদান কালে এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহার দিকে বাংলা ভাষার অনুরাগী পরিপুষ্টিকামী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি—

'বাংলা সাহিত্যকে ইংরেজীর আওতায় রাখব না—এ সংকল্প আমাদের গ্রহণ করতে হবে।... ভাষার যাহাতে বিশুদ্ধি রক্ষা হয় সে বিষয়ে আপনারা সাবধান হবেন। তবেই এ ভাষা ঠিক থাকবে।...বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ যদি ২।৪।৫ জন লোক নিয়ে ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য সমিতি গঠন করেন ভাল হয়। তাঁরা বানান ঠিক করে দিবেন—অর্থ ঠিক করে দিবেন।...সমিতি মাঝে মাঝে ভুল দেখিয়ে দিবেন। এতে কিছু ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ হবে না।'

কোন ব্যক্তি বা সমিতির নির্দেশ ভাষার পক্ষে সর্বথা মানিয়া চলা সম্ভবপর না হইলেও উহা উপেক্ষার যোগ্য নহে—যেহেতু এইরূপ নির্দেশই সর্বত্র ভাষাকে উচ্ছৃঙ্খলতার হাত হইতে রক্ষা করে। তাই স্বাধীনতার উদ্দাম আবেগস্রোতের মধ্যেও আলোকস্তম্ভের মত এই জাতীয় নির্দেশদাতার প্রয়োজন আছে। প্রয়োগকারী ও নির্দেশদাতার ঘাতপ্রতি-ঘাতেই ভাষার কমনীয় রূপ বিকশিত হইয়া উঠিবে।

ভূমার আবির্ভাব

শ্রীহেমলতা দেবী

ভূমায় যাহার সুগভীর প্রীতি
মাটি ছুঁয়ে তাঁর আনন্দ
চিরদিন যে গো গন্ধ-বিহীন
তবু তাহে এত সুগন্ধ।
মাটির খেয়েছি মাটিতে শুয়েছি
বেঁধেছি মাটির ঘর
মাটি দিয়ে গড়া এ দেহ আমার
লভিছে ভূমার বর।
ভূমা আসি বসি মাটির শিয়রে
আলো করে কালো মাটি
রাশি রাশি ফুল ফুটায়ে সবারে
সুগন্ধ দেয় বাঁটি।
গন্ধরাজের আনন্দ মোর
অঙ্গে জড়ায়ে রয়
মাটিতে শয়ন বিছায়ে সে যে গো
আলোকের কথা কয়।
ক্ষণভঙ্গুর দেহে রবি মোর
চরম পরম লাভ
শয়নে স্বপনে ঘটে ক্ষণে ক্ষণে
ভূমার আবির্ভাব।

ব্রতচারিণী

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়

এক

সে এক মফস্বল হাসপাতালের নার্স। আজ পাঁচ বৎসর কর্মভার লইয়া এই হাসপাতালে আছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহার জীবনকাহিনী জানিতে পারে নাই। কোন দিন তাহার 'ডিউটি' পালনের ব্যতিক্রম হয় নাই। কেহ কখনো কাজে তাহার আলস্য দেখে নাই। রোগীদের প্রতি তাহার এত যত্ন যে দেখিলে মনে হয় যেন সে উহাদের নিতান্ত আপন জন। হাসপাতালের ডাক্তারগণ তাহার নাম দিয়াছেন নাইটিঙ্গেল। নামটা শুনিলে সে মাথা নীচু করিয়া হাসে, কোন উত্তর দেয় না।

সহকর্মিণী নার্সদের সহিত বাজে গল্প করিয়া কেহ কোন দিন তাহাকে সময় নষ্ট করিতে দেখে নাই। ডাক্তারদের সহিত কাজের কথা ছাড়া সে কখনও কালতো কথা কহে না। এই সকল কারণে আড়ালে তাহার সম্বন্ধে আলোচনা হয়। হয়ত সে আলোচনার দুই-এক টুকরা কখন কখন তাহার কানেও আসিয়া পড়ে। কিন্তু বিরুদ্ধ সমালোচনা তাহার অটল গাম্ভীর্য্যের কাছে চূর্ণ হইয়া যায়।

নার্সের শুভ্রবেশে রোগীর বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে যখন সে জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছেন—এবং রোগী থামিয়া থামিয়া কষ্টে উত্তর দেয়, ভাল না, বড় কষ্ট হচ্ছে—সে তখন তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে দরদ-ভরা কণ্ঠে বলে, 'ভয় কি? দুইএক দিনের মধ্যেই আপনি সেরে উঠবেন।' রোগী দুই চোখের আকুল দৃষ্টি তাহার মুখে স্থাপিত করিয়া বলে, 'সত্যি বলছেন? আমি ভাল হব?' সে কণ্ঠে জোর দিয়া বলে, নিশ্চয় সেরে উঠবেন। কেন, আপনার কি এমন হয়েছে যে সারবেন না?

ওপাশের বিছানা হইতে মাথা তুলিয়া একটি যুবক তাহাকে ডাকে, 'শুনছেন, এদিকে আসুন ত একবার।' সে ছুটিয়া গিয়া বলে, 'কি বলছেন? কিছু কষ্ট হচ্ছে কি?' যুবক কাতর কণ্ঠে বলে, 'বড় মাথার কষ্ট, একটু যদি টিপে দেন।' ছেলেটির মাথায় হাত দিয়াই সে চমকাইয়া উঠে। জ্বরের উত্তাপে যেন পুড়িয়া যাইতেছে। তখনই সে আইস্ ব্যাগের ব্যবস্থা করে। ছেলেটি সুস্থবোধ করিয়া বলে, "আঃ! আপনার বড় দয়া। এর আগে যিনি এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন তাকে কত ডাকলুম, কিন্তু তিনি ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপ করে শোও।' আচ্ছা, আপনার নাম কি বলুন তো।"

সে গম্ভীর ভাবে কহে, কনক।

—আপনি আমার বড়দির মত দেখতে, আপনাকে আমি দিদি বলে ডাকব।

যুবকের স্নেহোচ্ছ্বাসের উত্তরে কনক বলে, বেশী কথা বলবেন না।

ডাক্তার আসিলেন। কনক সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি প্রত্যেক রোগীকে পরীক্ষা করিয়া টেবিলের নিকট গিয়া চেয়ারে বসিলেন। নার্সরা রিপোর্ট দাখিল করিল। কনকের রিপোর্টগুলি পড়িয়া ডাক্তার কহিলেন, বার নম্বর রোগীর অবস্থা ভাল নয়, তার ঠিক কেয়ার নেওয়া হচ্ছে ত?

কি ভাবে কেয়ার লওয়া হইতেছে কনক তাহা বলিয়া গেল। প্রশংসমান কণ্ঠে ডাক্তার কহিলেন, আচ্ছা, তেত্রিশ নম্বর ভাল আছে? পনর নম্বরের পা টা কি রকম?

এমনিভাবে ব্যাধি আর মৃত্যুর লীলাক্ষেত্রের মধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে কনক। মফস্বলের হাসপাতাল বলিয়া তাহার শুশ্রূষার প্রশংসা সুদূরপ্রসারী হইয়াছে। ইহাতে হাসপাতালের বেশ সুনাম বাড়িতেছে। কত রোগী সুস্থ হইয়া কনককে কত ভাল ভাল উপহার দিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কনক কখনও গ্রহণ করে নাই। মাথা নাড়িয়া বলিয়াছে, সে কি? আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করেছি, এতে উপহার দেওয়া অনাবশ্যক। সরকার আমাকে মাইনে দেন, সেই আমার যথেষ্ট। আপনার মা-বোন যখন সেবা করেন, আপনি কি তখন তাদের ভেট দিয়ে ঋণমুক্ত হবার চেষ্টা করেন? আমাকেও আপনার ভগিনীর আসনে স্থান দেবেন।

কনকের কথা শুনিয়া রোগীর চোখ ছলছল করে। কনক তখন অন্য রোগীর কাছে গিয়া দাঁড়ায়। সকলেই তাহাকে একান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করে অথচ সে যেন সকলকার ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে।

দুই

বৈকালে ক্লান্ত দেহে কনক নার্স-কোয়ার্টারে ফিরিল। তখন ঘরে নার্সদের বেশ আড্ডা জমিয়াছে। কনককে দেখিয়াই করুণা বলিয়া উঠিল, কনক, তোর ফিরতে এত দেরি হল? ডিউটি ত অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে।

পোশাক ছাড়িতে ছাড়িতে কনক কহিল, একটি নতুন পেসেণ্ট এল, অবস্থা খুব সীরিয়াস। টেকে কিনা সন্দেহ। তার কাছে একটু দেরি হল। আহা, কি কাতরোক্তি তার স্ত্রীর, চোখের জল রাখা যায় না। ভাবছিলুম, মানুষ যদি সব অসুখ হাত বুলিয়ে আরাম করে দিতে পারত!

কথা শেষ করিতে না করিতেই কনক ক্লান্তিতে একটা ইজি চেয়ারে শুইয়া পড়িল। মীরা হাসিয়া কহিল, তুই দেখছি

সত্যিই অবাক করলি। অত কিসের বাধা, চাকরি করতে এসেছ, জান বাঁচিয়ে সরকারকে খুশি কর।

কনক কহিল, বুঝি সব। কিন্তু চাকরির উপরেও দরদ বলে একটা জিনিস আছে মীরা; যা স্বার্থের ধার ধারে না এবং যেটা সকলকারই সমান নয়।

হেড নার্স একখানা নোট বুঝিতে বুঝিতে ঘরে আসিলেন। কহিলেন, কি নিয়ে তর্ক হচ্ছে? এই যে কনক এসেছ। আজ এত দেরি?

করুণা কহিল, ও কোন্ রোগীর মাথায় হাত বুলোচ্ছিল আর কাঁদছিল।

কনক কহিল, তাতে কি অন্যায় হ'ল? সকলের দুঃখ কি আমারও দুঃখ নয়?

আভা কহিল, তোর মত অত দরদী হলে আর চাকরি করতে হয় না, বসে বসে শুধু কাঁদতেই হয়।

হেড নার্স কহিলেন, যাকগে ওকথা। নতুন সিভিল সার্জন আসছেন শুনেছ তোমরা?

করুণা কহিল, হাঁ শুনছিলুম বটে। কি জানি বাবা ইনি আবার কি রকম মেজাজের লোক।

মীরা কহিল, তাঁর মেজাজ নিয়ে তোর কি হবে? তুই ত থাকবি রোগীর কাছে।

কে আসিয়া হেড নার্সকে ডাকিতেই তিনি চলিয়া গেলেন।

করুণা মীরার কথার উত্তরে কহিল, তা থাকলেও, তিনি ত এক জন উপরওয়ালা মনিব।

আভা কহিল, চাকরিরই উপরওয়ালা, আর ত কিছুর নয়। অত ভয় কিসের?

করুণা তাহাকে ধাক্কা দিয়া কহিল, দূর মুখপুড়ী, যা তা বলিস।

মেয়েদের মধ্যে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। আভা কহিল, আচ্ছা, মেয়েগুলো বিয়ে করে কেমন করে পরের অধীন হয় বল ত?

সাধনা এতক্ষণ কথা কহে নাই। এইবার সে মুখ তুলিয়া কহিল, তুই যেমন চাকরি করে মনিবের অধীন হয়েছিস তেমনি করেই।

সাধনা বিধবা—স্বামী কি বস্তু তাহা সে জানে। কাজেই কথাটা তাহার গায়ে লাগিয়াছিল।

করুণা কহিল, আহা, সাধনা-দি স্বামী বেচারিকে নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করেছে কি না, তাই প্রশ্নটা দাঁতে ঘা দিয়েছে।

মীরা কহিল, আচ্ছা, কনক ত কখনো বলে না তার বিয়ে হয়েছে কি না, বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই চুপ করে থাকে। জিজ্ঞেস করলেও ত কিছু বলে না।

কনক কহিল, বলব আবার কি? আমায় দেখে কি মনে হয়?

করুণা কহিল, মনে হয় বিয়ে করিস নি।

—তবে অত জিজ্ঞেস করিস কেন?

আভা কহিল, কিন্তু বিয়ে না করলেও, কারও প্রেমে পড়েছিস্ এ আমি শপথ করে বলতে পারি।

কনক কহিল, বেশ তো, বল না তুই, কেউ তো বাধা করছে না।

আভা কহিল, আচ্ছা, সত্যি কনক, তুই এতদিন এখানে কাজ করছিস, আমাদের ভালবাসিস ঠিক আপন বোনের মতই, কিন্তু কখনও তোর ব্যক্তিগত কাহিনী আমরা কিছু শুনলুম না। তুই যেন ভুঁইফোঁড় মেয়ে, তোর আগুপিছু বলতে যেন কিছু নেই। না তাই?

কনক কহিল, ঠিকই ধরেছিস। আমি ভুঁইফোঁড়ই, আগুপিছু বলতে কিছু নেই আমার।

আভা কহিল, সত্যি, বলবি না?

—তারে বলবার যে কিছু নেই। বাবা-মাকে মনে নেই। একটা আশ্রমে মানুষ হয়েছি। বিয়ে করি নি। হাসপাতালে চাকরি করি। তোদের সহকর্মিণী। বাস্, শুনলি ত? ছোট আমি, তাই ক্ষুদ্র আমার জীবনকাহিনীও।

তিন

বর্ত্তমান সিভিল-সার্জনের বিদায়-সংবর্দ্ধনা-সভার পরদিনই নূতন সিভিল-সার্জনের অভিনন্দন উপলক্ষে হাসপাতালে একটা উৎসব হইল। নূতন সিভিল-সার্জন ডাক্তার বোসের স্ত্রী সুন্দরী এবং শিক্ষিতা বলিয়া নার্স মহলে জোর আলোচনা চলিয়াছে। কনক কোন কথাতেই থাকে না, নিজের কাজ করিয়া যায়।

সকালে নিজের ওয়ার্ডে সে ব্যস্ত ভাবে কাজ করিতেছে, এমন সময়ে ডাক্তার রায়ের সহিত সিভিল সার্জন ডাক্তার বোস রোগী দেখিতে আসিলেন।

প্রত্যেক বেডের পাশে কিয়ৎক্ষণ করিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার রায় রোগীর বিবরণ দিতে দিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হলের শেষের দিকে একটি রোগীকে কনক ফীডিং-কাপে করিয়া পথ্য খাওয়াইতেছিল। ডাক্তার রায়ের সহিত ডাক্তার বোস সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কনক তাঁহাদের দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার বোসের পানে চাহিয়াই কি-জানি-কেন সে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘামিয়া উঠিল। তাহার কম্পমান হস্ত হইতে ফীডিং-কাপটা মাটিতে পড়িয়া গেল। ঝন্ ঝন্ শব্দ হইতেই ডাক্তার-দ্বয় কনকের পানে চাহিলেন। মনে হইল যেন ডাক্তার বোসের চোখে বিস্ময় ঘনাইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। তাহার পরই তিনি সুপ্রোত্থিতের ন্যায় কহিলেন, ইয়েস্ ডক্টর রায়, তারপর?

কনক দ্রুতপদে হল হইতে বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার রায় কহিলেন, এই যে নার্সটিকে দেখলেন স্যার, এর বিপুল

সুনাম। রোগীদের এত যত্ন নেয় যে তাতে হস্পিট্যালেরও রেকর্ড ভাল হয়।

সিভিল-সার্জন অন্যমনস্কের মত উদ্বেগহীন ভাবে কহিলেন, তাই না কি? নাম কি এর?

ডাক্তার রায় তাঁহার পানে তাকাইয়া কহিলেন, কনক বসু।

ডাক্তার বোস অন্য দিকে চলিতে চলিতে ভিন্ন প্রসঙ্গ তুলিলেন। ডাক্তার রায় তাঁহাকে সহসা উদ্‌ভ্রান্ত হইতে দেখিয়া অবাক্ হইলেন।

কিয়ৎকালের মধ্যে কনক ফিরিয়া আসিয়া নূতন ফীডিং-কাপে রোগীকে আবার খাওয়াইতে লাগিল। সহসা রোগী কনকের হাত দুইখানা চাপিয়া কাতরস্বরে কহিল, মা, তুমি আর জন্মে আমার গর্ভধারিণী ছিলে।

কনক তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, ব্যস্ত হবেন না, কিছু ভয় নেই।

রোগী কহিল, মা, বাড়িতে তোমারই মত একটি মেয়ে রেখে এসেছি, তাকে দেখবার কেউ নেই।

এসব কাতরোক্তি শুনিলে কনকের চোখে জল আসে। হায় রে অসহায় মানুষ!

আর এক জন বিকারের ঘোরে ভয়ানক চেঁচাইতেছে। বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়া কনক ছুটিল তাহার কাছে। পাশের বেডের রোগীকে নীরা ঔষধ খাওয়াইতেছে। কনককে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া সে বিরক্তিভরা কণ্ঠে কহিল, জ্বালিয়ে মারলে! এমন বিকট চেঁচাচ্ছে কার সাধ্যি টেঁকে এখানে!

কনক দেখিল যন্ত্রণায় রোগী দন্তে অধর কাটিয়া চিবুক আর গণ্ডদেশ রক্তে রঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছে। দরদ-ভরা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আহা-হা! তাহার পর ভিজা বোরিক তুলায় তাহার মুখ মুছাইতে লাগিল।

চার

সকালে কনক নিজের কাজে ব্যস্ত। সিভিল-সার্জ্জনের আরদালী আসিয়া সেলাম দিয়া কহিল, ডাক্তার সাহেব আপনাকে তলব করেছেন। তিনি আপিস-ঘরেই অপেক্ষা করছেন।

কনক কহিল, আচ্ছা, তাঁকে আমার সেলাম দিয়ে বল, আমি এখন ডিউটিতে আছি, কাজ শেষ হলেই যাব।

আরদালী চলিয়া গেল। একটু পরে প্রবেশ করিলেন ডক্টর ব্যানার্জ্জি। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহ আঁট-সাট কোট-প্যাণ্টে সজ্জিত, নাকের উপর সোনার ফ্রেমওয়ালা চশমা। কনকের উপর দৃষ্টি পড়িতেই হাসিয়া কহিলেন, সুপ্রভাত! তার পর নাইটিঙ্গেল, শুনলুম নাকি আপনি পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছেন?

কনক অভিবাদন করিয়া কহিল, ঠিকই শুনেছেন, আপনি।

ডাক্তার রোগী দেখিতে দেখিতে কহিলেন, কিন্তু কারণ কি?

—কারণ খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়।

যে রোগীকে ডাক্তার পরীক্ষা করিতেছিলেন সে আকুল কণ্ঠে কহিল, আপনি চলে যাবেন?

কনক কহিল, না, সে এখন নয়, আপনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলে তার পর।

রোগী আশ্বস্ত হইল। ডক্টর ব্যানার্জ্জি আর এক জনকে দেখিতে দেখিতে কহিলেন, দেখুন ত, আপনি চলে গেলে এর প্রাণে কত বড় আঘাত লাগবে!

কনক নীরব হইয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, ছেড়ে দিন আপনার ও খেয়াল। সেবাব্রতই যখন নিয়েছেন, একটা খেয়ালের বশে ব্রতভঙ্গ করা ঠিক নয়।

কনক কহিল, ব্রতভঙ্গ ত করছি না, ডক্টর ব্যানার্জ্জি। এখানে থাকতে আর মন সরছে না, তাই অন্য হাসপাতালে যাব ঠিক করেছি।

ডাক্তার ব্যানার্জ্জি কহিলেন, আপনার মুখে তো ওকথা মানায় না। আপনার অভাবে এ হাসপাতালের কত ক্ষতি হবে ভেবে দেখছেন কি?

কনক মুখ ফিরাইয়া কহিল, আপনি কাজ শেষ করুন, বাজে কথায় কাজের ব্যাঘাত হচ্ছে।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, ও ইয়েস, ধন্যবাদ! কাজের দেরি হচ্ছে বটে, ঠিক কথা।

তিনি কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেলেন। ডিউটির শেষে কনক সিভিল-সার্জ্জনের আপিস-কক্ষে উপস্থিত হইল। আরদালীর হাতে একটা স্লিপে নিজের নাম লিখিয়া পাঠাইতেই ভিতরে প্রবেশ করিবার অনুমতি আসিল। কনক সিভিল-সার্জ্জনের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহার শুভ্রবসনা নিরাভরণা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ক্লান্ত মূর্তির পানে ক্ষণকাল নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া রহিলেন।

কনক অগ্রসর হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক অকম্পিত কণ্ঠে কহিল, স্যার, আমায় ডেকেছেন?

ডক্টর বোস্ গলা ঝাড়িয়া কহিলেন, হ্যাঁ।

তাঁহার বড় টেবিলের বিপরীত পাশের একটা চেয়ার দেখাইয়া কহিলেন, বোস।

কনক বসিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া সিভিল-সার্জ্জন কহিলেন, পদত্যাগপত্র দাখিল করেছ কেন জানতে পারি কি?

কনক কহিল, এখানে আর চাকরি করব না, তাই।

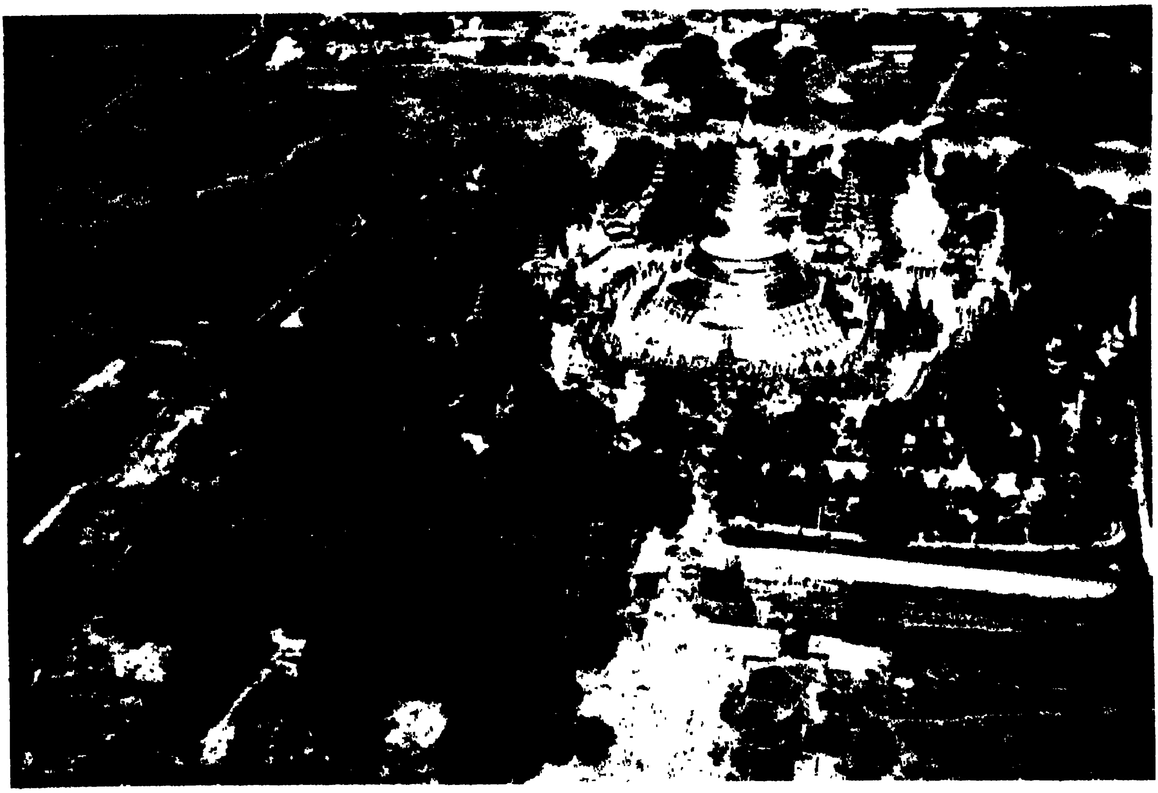
—কেন চাকরি করবে না, তার কারণটাই ত জিজ্ঞাস্য।

—মাপ করবেন, কারণ জানাতে আমি অক্ষম।

ডাক্তার সাহেব আবার কিয়ৎকাল কনকের পানে নীরবে



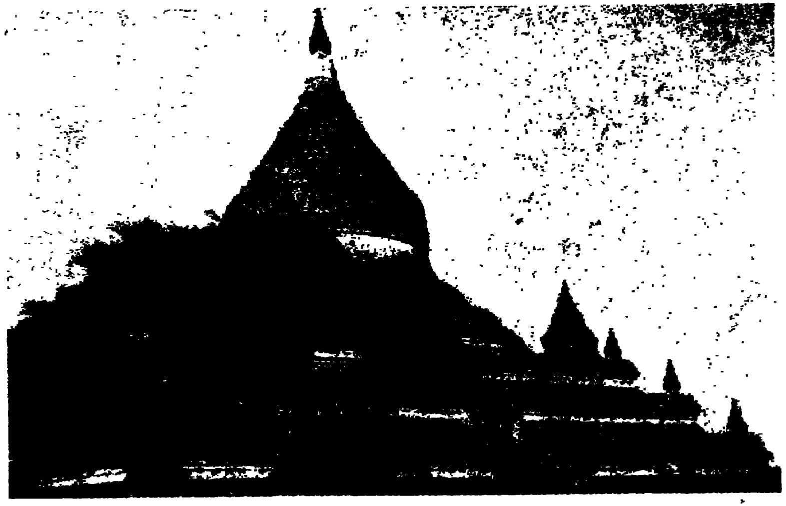
রাতের ওয়াশিংটনের আলোক-সজ্জা



রেঙ্গুনের স্বর্ণনির্মিত বৌদ্ধমন্দির শোয়ে ডাগো প্যাগোডা



প্রাচীন ব্রহ্মদেশের প্রথম রাজধানী (খ্রীঃ ২য় হইতে ১৩শ শতাব্দী) পাগানের বৌদ্ধ মন্দিরাবলী



রাজা আলাউং সিথু কর্তৃক ১১৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বৌদ্ধমঠ



পাগানের নানপায়া মন্দির—একাদশ শতাব্দীতে রাজা মানুহা কর্তৃক
ইহা রাজপ্রাসাদরূপে ব্যবহৃত হইত



পাগান নগরীর কেন্দ্র—পিছনে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত আনন্দ প্যাগোডা

চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা গভীর স্বরে ডাকিলেন, কনক।

কনক চমকাইয়া তাঁহার পানে চাহিল। মাথা নীচু করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, বলুন।

ডাক্তার কহিলেন, কিন্তু আমি জানি এর কারণ। তুমি আমাকে চিনিতে পেরেছ বলেই এই হাসপাতাল ছেড়ে যেতে চাইছ। তোমার জীবনের সকল ব্যর্থতা যেখানে চরম সার্থকতায় ভরে উঠবে বলে মনে করেছিলে, সেইখানেই আমার আগমনে আবার তোমার বুকে হাহাকার জাগল, নয় কি?

কনক মৃদু কণ্ঠে কহিল, হয় তো তাই। কিন্তু সারা পৃথিবীতে কোথাও কি হাহাকার ঘুচবে না? তা হয় তো ঘুচবে, অন্তত চেষ্টার ত্রুটি করব না।

ডাক্তার কহিলেন, কিন্তু আমি তোমায় সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে দেব না। আমি তোমার স্বামী, তোমাকে আমি চাই।

কনকের মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিল, আর তা হয় না। কনক শুধু স্বামীর উপাধিটার মধ্যেই আয়তির চিহ্ন বজায় রেখেছে—আর সব-কিছুতেই সে কুমারী। তার নেই কোন কামনা, নেই কোন অভিমান। সে এখন আর্তের বেদনা ঘুচিয়ে জ্যোতির্ময় আনন্দ-লোকে বিচরণ করে।

ডাক্তার সহসা উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, কনক মার্জ্জনা কর আমাকে। সত্যি, আমি সুখী নই। তোমার স্থান পূর্ণ হয় নি, হবেও না কোন দিন। যে দিন থেকে তোমায় হারাই সে দিন থেকে আমার জীবনের সকল আনন্দ বিদায় নিয়েছে। বাবা তোমার দুঃখের কারণ, আমি নয়। আমি তখন সুদূর রণ-ক্ষেত্রে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে। তোমার চিঠি যখন পাই তখন আমার উত্তর দেবার অবস্থা নয়। যখন উত্তর পাঠাই তার পর থেকে তোমার কোন সাড়া পাই নি। ফিরে এসে তোমাকে অনেক খুঁজেছি, কিন্তু কেউ তোমার সংবাদ দিতে পারে নি। পরে জানা গেল, তোমার বাবার মৃত্যুর পর তুমি না-কি কাউকে না জানিয়ে কোথায় চলে গেছ—হয় তো ভুল পথেই। আমি কথাটা বিশ্বাস করি নি, কিন্তু বাবা করলেন। তাই তাঁর জেদে এবং পাঁচ জনের অনুরোধে ফের বিয়ে করেছি। তবে এই সর্ত্তে বিয়ে করি যে তোমায় ভবিষ্যতে খুঁজে পেলে আবার গ্রহণ করবো আদর করেই।

কনক কহিল, কেন, তোমার বর্ত্তমান স্ত্রী তো শুনেছি খুব সুন্দরী এবং শিক্ষিতা। এঁকে পেয়ে আমাকে তো মনে রাখবার কথা নয়। আমি ঘরের বউ, আমার বাবার একটা সামান্য ত্রুটি এত বড় হয়ে উঠল যে তোমার পিতা তোমার অনুপস্থিতিতে স্বচ্ছন্দে আমায় পরিত্যাগ করলেন। একবার ভাবলেন না আমি কোথায় দাঁড়াব।

ডাক্তার বোসের চোখ ছল ছল করিতে লাগিল। তিনি কহিলেন, ফিরে এস কনক, ক্ষমা কর এ ভাগ্যহতকে।

কনক কহিল, আর তা হয় না।

—তা হলে চাকরি ছেড়ো না।

—না, তাও হয় না।

—আচ্ছা, তা হলে তুমি এখানেই থাক, আমি উপস্থিত ছুটি নিয়ে অন্য হাসপাতালে বদলি হবার চেষ্টা করি।

—তাও হয় না।

ডাক্তার ব্যথিত চক্ষু তুলিয়া কহিলেন, তবে তুমি কি একান্তই আমাকে ক্ষমা করবে না?

কনক আর থাকিতে পারে না। অশ্রুবিগলিত নয়নে ডাক্তারের পদপ্রান্তে বসিয়া কহিল, এমন করে অপরাধ বাড়িও না, প্রিয়তম! কনক তার স্বামীকে মনে মনে দিবারাত্র পূজা করে।

ডাক্তার তাহাকে উঠাইয়া কহিলেন, আমি তা জানি। তোমার সে পূজার গন্ধ নিত্য আমার হৃদয় স্পর্শ করে। আজ হাসপাতালে সকলেই কাঁদছে তোমার জন্যে। যেও না, লক্ষ্মীটি।

কনক হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল, আচ্ছা, এখন তো আসি।

ডাক্তার কিছুই বলিলেন না, শুধু স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পাঁচ

শুক তারা তখন আকাশে জ্বল জ্বল করিতেছে। ঊষার শীতল বায়ু প্রাণে কেমন একটা গাম্ভীর্য্যের সঞ্চার করে। নার্স কোয়ার্টার যাহারা আছে তাহারা সকলেই নিদ্রিত, শুধু কনক বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছে। সে পিছনে হাত দুইখানা রাখিয়া আনতশিরে তখন দালানে পদচারণ করিতেছে। সহসা মাথা তুলিয়া মনে মনে কহিল, ঐ যে হাসপাতাল আলোকের চক্ষু মেলিয়া আর্তের আকুল ক্রন্দনে বক্ষ ভরিয়া তুলিতেছে, হাঁ ঐ ত তাহার আনন্দধাম, মুক্তির তীর্থক্ষেত্র, হৃদয়ের স্বর্গলোক।

সহসা আকাশের পানে চোখ পড়িল। রাত্রি ও প্রভাতের সন্ধিক্ষণে গগন যেন পাণ্ডুর। মনে পড়ে পিতাকে, যিনি এ জীবনে কোন দিন তাহাকে অনাদর করেন নাই। অকালেই সে মাতৃহীনা। মা তাহাকে ভুলিয়াছেন, ভুলিয়াছে সংসার। কিছুদিন পরে ভুলিবে তাহাকে এই হাসপাতাল, ভুলিবে সহকর্ম্মিনীরা। হায়, কাহারো হৃদয়ে তাহার স্থান হইল না।

না, কনক আর ভাবিতে পারে না। শেষে কি পাগল হইয়া যাইবে? বাহিরের প্রকৃতির পানে দৃষ্টিপাত করিয়া সে চমকাইয়া উঠিল। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রভাত হইয়া

পড়িবে। ছয়টা হইতে তাহার ডিউটি। আর দেরি নয়, এখনই সকলে উঠিয়া পড়িবে।

নিঃশব্দচরণে ঘরে পুনঃ প্রবেশপূর্ব্বক খাটগুলার পানে সন্তর্পণে তাকাইল। তাহার স্যুটকেসটা তুলিয়া লইয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে একবারে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গিনীরা জানিতে পারিলে গোলমালের সৃষ্টি হইত। করুণা কাল বলিয়াছে ডাক্তার রায় আজ সকালেই তাহাকে 'কল' দিয়া রাখিয়াছেন। ডাক্তার রায়কেই তাহার সব চাইতে ভয়। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বিনয়মধুর বাক্যে যদি তাহার সঙ্কল্প ভাসিয়া যায়।

সে ত্বরিতপদে রাজপথ ধরিয়া চলিল। টাইম-টেবিলে দেখিয়াছে সাড়ে ছয়টায় কলিকাতাগামী ট্রেন আছে। কিন্তু পা দুটো কেন চলে না? পাঁচ বৎসরের সাধনাশ্রম ব্রত-চারিণীকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়া বলে এস, এস, তুমি যে, আর্ত্তের পীড়িতের দরদী সেবিকা তাই রোগীর জগৎ তোমায় চায়। ওকি! একে একে মানসপটে ফুটিয়া উঠিতেছে পাঁচ বছরের দেখা সব রোগীদের মুখগুলি! কে যেন বলে, মা! ঐ কে বলে, দিদি, দিদিমণি!...

না, না—কনক শুনিবে না। সে প্রায় ছুটিয়া চলিল। কিন্তু পারে না আর চরণদ্বয় তাহার বেদনা-কাতর ক্লান্ত দেহকে বহন করিতে। কনক হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া তাকায় হাস-পাতালের পানে। বৃষ্টিধারার মত নয়নাসারে ভিজিয়া গেল তাহার গণ্ডদেশ আর বক্ষঃস্থল। তখন কে পথে গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে—

ছাড়া পাওয়া নয়রে আমার,
সে যে বাঁধন চাওয়া।

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

২৩শে নবেম্বর শনিবার সকালে শ্রীযুত শুকিল ও মুখুজ্জে মহাশয়ের সঙ্গে ক্যাপিটল ও হোয়াইট হাউসে গেলাম। হোয়াইট হাউস প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন। সেদিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ওখানে ছিলেন না। দর্শনপ্রার্থীর বেশ ভিড়। নীচের তলায় একটি ঘরে রুজভেল্টের ছেলেমেয়েদের খেলনা দেখিলাম। দোতলায় পূবের হলঘরে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেসিডেন্টগণের বড় বড় ছবি দেয়ালে ঝুলিতেছে। মধ্যস্থলে বড় একটি আলোর ঝাড়। এটি অভ্যর্থনা-গৃহ। ইহার পশ্চিমে পর পর তিনটি সুসজ্জিত খাবার-ঘর। আরও কয়েকটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠ দেখিলাম। তিন তলায় দর্শকগণের প্রবেশাধিকার নাই। সেখানে প্রেসিডেন্টের শয়নকক্ষ ও বৈঠকখানা প্রভৃতি। কলিকাতা বা দিল্লীর গবর্ণমেণ্ট হাউসের তুলনায় হোয়াইট হাউস অনেক ছোট। আর সারি দিয়া লোক গবর্ণমেণ্ট হাউসে ঘুরিয়া আসিবে একথা ভারতবর্ষে অচিন্তনীয়।

ক্যাপিটলের সু-উচ্চ বৃহৎ গম্বুজটি বহু দূর হইতে দেখা যায়। এই গম্বুজের উপরে একটি বাতি জ্বলে। ভিতরে অনেকগুলি ঘর। একটিতে হাউস অব্ রিপ্রেজেন্টেটিভস্-এর এবং অন্য একটিতে সেনেটের অধিবেশন হয়। ঢুকিতেই গম্বুজের নীচের হলঘরে বহু ছবি টাঙান দেখা যায়। এই ছবিগুলি এ দেশের ইতিহাসের বিশিষ্ট ঘটনাবলী লইয়া অঙ্কিত। ইঁহা-দের স্বাধীনতা-যুদ্ধের শেষে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়ালিস যেদিন জর্জ ওয়াশিংটনের নিকট আত্মসমর্পণ করেন সেদিন ইঁহাদের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। এই 'আত্মসমর্পণে'র একটি খুব বড় ছবি এই ঘরে আছে। এই ঘরের পাশে একটি ছোট ঘর। সেখানে পূর্ব্বে সুপ্রীম কোর্ট বসিত। সেনেটের ৯৬ জন সভ্য। ছোটবড় নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক রাষ্ট্রের দুই জন প্রতিনিধি লইয়া সেনেট গঠিত। হাউস অব্ রিপ্রেজেন্টেটিভস্ এ জনসংখ্যা অনুপাতে সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। সভ্যসংখ্যা অনেক বেশী, ঘরটিও বড়। এই ঘরে যুদ্ধের সময় চার্চ্চিল সেনেট ও হাউসের সভ্যগণকে একত্রে তাঁহার বক্তব্য নিবেদন করিয়া-ছিলেন। দোতলায় একটি বড় হলঘরে প্রত্যেক রাষ্ট্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মর্ম্মরমূর্ত্তি আছে। কোন্ রাষ্ট্রের কাহার মূর্ত্তি থাকিবে তাহা সেই রাষ্ট্রই স্থির করিয়াছিলেন। এই ঘরের গঠনকৌশল এইরূপ যে মধ্যস্থলে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইলে ঘরের যে-কোন স্থান হইতে খুব ছোট শব্দও পরিষ্কার শোনা যায়। মেঝেতে একখানি নির্দ্দিষ্ট পাথরে দাঁড়াইলে নাকি মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এই ক্যাপিটল ভবন সমগ্র দেশের ঐক্যের প্রতীক এবং জাতীয় মর্য্যাদা-বোধের দ্যোতক।

পরদিন রবিবার: প্রাতরাশ সমাপন করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। পরিষ্কার আকাশ। বেশ রৌদ্র উঠিয়াছে। সোজা ওয়াশিংটন মনুমেণ্টে গেলাম। আধ ঘণ্টা পর পর লিফ্‌ট দর্শকগণকে লইয়া মনুমেণ্টের শীর্ষে উঠিতেছে, আবার আধ ঘণ্টা পরে নামাইয়া আনিতেছে। এই স্তম্ভটি জর্জ ওয়াশিংটনের জয়ধ্বজার মত আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্তম্ভটির উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্য পরম রমণীয়। পশ্চিমে লিঙ্কন-মেমোরিয়াল। দক্ষিণে জেফারসন মেমোরিয়াল। পূর্ব্বে

ক্যাপিটল ভবন। উত্তরে হোয়াইট হাউস। সমস্ত সহরটি সরল এবং সমান্তরাল রাজপথশ্রেণীদ্বারা সমভাবে বিভক্ত হইয়া



আব্রাহাম লিঙ্কনের উপবিষ্ট অবস্থার ১৯ ফুট দীর্ঘ মর্ম্মরমূর্ত্তি

সুবিন্যস্ত উদ্যানের মত শোভমান। পশ্চিমে পটোম্যাক নদী উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। পরপারে দূরে পর্ব্বত-শ্রেণী। শহরটি সত্যই মনোরম।

লিঙ্কন মেমোরিয়ালে মর্ম্মরগৃহে লিঙ্কনের মর্ম্মরমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। চতুষ্কোণ উচ্চ ভবন। সামনে স্থূল স্তম্ভের সারি। উচ্চ সোপানশ্রেণী বাহিয়া গৃহে উঠিতে হয়। গৃহমধ্যে উচ্চ মঞ্চোপরি মর্ম্মরনির্ম্মিত চেয়ারে পূর্ণাবয়ব লিঙ্কন উপবিষ্ট। উপর দিক হইতে মুখের উপর বৈদ্যুতিক আলো আসিয়া পড়িয়াছে। মূর্ত্তিটি যেন জীবন্ত। পার্শ্ব-লিখিত কথা কয়েকটির অনুবাদ এইরূপ: "যে জনগণের জন্য এব্রাহাম লিঙ্কন যুক্তরাষ্ট্রকে বাঁচাইয়াছিলেন, তাহাদের মনোমন্দিরের মত এই মন্দিরেও তাঁহার স্মৃতি চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হইল।" চারিদিকের দেয়ালে লিঙ্কনের গেটিসবার্গ বক্তৃতার অংশ উৎকীর্ণ। জগতে জনগণের স্বার্থে জনগণ কর্ত্তৃক জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে সমস্ত বীর আমেরিকার গৃহযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন, এই বক্তৃতায় লিঙ্কন তাঁহাদের প্রতি তাঁহার সহজ ওজস্বিনী ভাষায় অকপটে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন। মেমোরিয়াল গৃহের পূর্ব্ব দিকে রাস্তার পরপারে দীর্ঘ সরোবর ও সবুজ বৃক্ষশ্রেণী ওয়াশিংটন মনুমেন্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ওয়াশিংটন মনুমেন্টের পূর্ব্বে বৃক্ষশ্রেণী শোভিত ম্যাল নামক রাস্তা ক্যাপিটল ভবন পর্য্যন্ত গিয়াছে। মনুমেন্টের উপরে হোয়াইট হাউস পর্য্যন্ত খোলা সবুজ মাঠ। মাঠের পরে বিস্তৃত শহর।

ওয়াশিংটন শহর ক্যাপিটল ভবনকে কেন্দ্র করিয়া চারি ভাগে বিভক্ত। উত্তর-পশ্চিম ভাগই জনবহুল। ঐ দিকেই পটোম্যাক নদী পর্য্যন্ত শহর সম্প্রসারিত হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে, উত্তর-পূর্ব্বে বা দক্ষিণ-পূর্ব্বে শহর মোটেই বাড়ে নাই। ওসব দিকে বসতি কম। প্রত্যেক অংশে রাস্তাগুলি সরল এবং সমান্তরাল। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা রাস্তাগুলির নাম এক, দুই প্রভৃতি পর পর সংখ্যাদ্বারা যথাক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা রাস্তাগুলির নাম এ, বি, সি, ডি প্রভৃতি বর্ণানুক্রমে রাখা হইয়াছে। যে-কোন দুইটি রাস্তার মধ্যে দূরত্ব সমান। কাজেই শহরটি কতকগুলি সমায়তন আয়তক্ষেত্রে বিভক্ত। বড় বড় রাষ্ট্রের নামে কয়েকটি এভিনিউ আছে। এগুলি সিধা কোণাকুণি চলিয়াছে। বাড়ীর নম্বরগুলিও বেশ কায়দা করিয়া সাজান। ভারতীয় দূতাবাসের নম্বর ২১০৭



মর্ম্মর পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মান টমাস জেফারসনের ১৯ ফুট উচ্চ প্রতিমূর্ত্তি

ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ। অর্থাৎ যেখানে ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ ২১ নং ষ্ট্রীটকে ছেদ করিয়াছে সেখান হইতে সপ্তম বাড়ীতে এই দূতাবাস। এইরূপ যেখানে এফ ষ্ট্রীট ১৩ নং ষ্ট্রীটকে ছেদ করিয়াছে সেখান হইতে ত্রয়োদশ বাড়ীর নম্বর ১৩১৩ এফ ষ্ট্রীট। এইখানে ওয়াশিংটনের বৃহত্তম বইয়ের দোকান অবস্থিত, নাম ব্রেন্টানো। আমেরিকার সমস্ত



জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রনীতির ছাত্রছাত্রীগণ

শহরই এইরূপে সাজান। এখানে পথ ভুল করিবার সম্ভাবনা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। বাড়ীর নম্বর শুনিলেই বুঝা যাইবে সে বাড়ী আমি যেখানে আছি সেখান হইতে কত-দূরে ; কোন্ দিকে এবং কোন্ পথে সেখানে যাইতে হইবে। এখানকার আপিস ও হোটেলের ঘরগুলির নম্বরও অনুরূপ কায়দায় সাজান। সাত তলায় পাঁচ নম্বরের ঘরের নম্বর হইবে ৭০৫, ৮ তালার ১১ নম্বরের ঘরের নম্বর হইবে ৮১১, এইরূপ।

ওয়াশিংটন মনুমেণ্ট হইতে উত্তর দিকে তাকাইলে সুসজ্জিত শহরের সুন্দর রূপ চোখের উপর ভাসিয়া উঠে।

মনুমেণ্টের ঠিক দক্ষিণে জেফারসন মেমোরিয়াল, এদিকে লোকালয় নাই। মনুমেণ্টের পরেই খানিকটা মাঠ। তারপর প্রশস্ত মসৃণ রাস্তা, তারপর স্রোতোবহা সরোবর। তারপর প্রশস্ত সবুজবুক শুভ্র মর্ম্মরগৃহে দণ্ডায়মান পূর্ণাবয়ব জেফার-সনের মর্ম্মরমূর্ত্তি, তারপরে আবার ছোট একটি মাঠ, আবার একটি প্রশস্ততর রাস্তা, তার পাশ দিয়া প্রবহমাণ পটোম্যাক নদী। একটি খাল নদীর সঙ্গে সরোবরকে সংযুক্ত করিয়াছে। সেই খালের উপর সুদৃঢ় সেতু। একটি পরম রমণীয় জলরাশির চাঞ্চল্য, মর্ম্মরের শঙ্খশুভ্র শুভ্রতা এবং দূর্ব্বাদলের শ্যামলিমা জেফারসনের মহিমময়ী স্মৃতিকে ঘিরিয়া উদার নীলাকাশতলে যে অপরূপ অদ্ভুত রূপ রচনা করিয়াছে তাহার শোভা, সম্ভ্রম এবং পবিত্র গাম্ভীর্য্য অতুলনীয়। ওয়াশিংটন মনুমেণ্টের উপর হইতে এই দৃশ্য আমার দেহমনকে যুগপৎ আকর্ষণ করিল। মন্ত্রমুগ্ধের মত উপর হইতে নামিয়া গিয়া মেমোরিয়ালে গেলাম। সরোবরের পাড় দিয়া দীর্ঘ মর্ম্মর সোপানশ্রেণী বাহিয়া প্রশস্ত মর্ম্মরগৃহে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখে জেফারসনের মর্ম্মরমূর্ত্তি দাঁড়াইয়া। জেফারসন ছিলেন ভার্জিনিয়ার অধিবাসী, তিনিই আমেরিকার স্বাধীনতা-ঘোষণাপত্রের রচয়িতা। ভার্জিনিয়ায় ইঁহার সমাধির উপর প্রস্তরফলকে লিখিত আছে, "আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা-পত্রের রচয়িতা, ভার্জিনিয়ার ধর্ম্মগত স্বাধীনতা আইনের প্রণেতা এবং ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা টমাস জেফারসনকে এই স্থানে সমাহিত করা হইয়াছিল।" এই স্মারক লিপি তিনি নিজেই রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়া-ছিলেন। তাঁহার অসংখ্য কার্য্যের মধ্যে এই তিনটি কাজের জন্যই তিনি বিশেষরূপে পরিচিত হইতে চাহিয়াছিলেন। জেফারসন আমেরিকার স্বাধীনতার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। আর জর্জ ওয়াশিংটন এবং পরে এব্রাহাম লিঙ্কন সে পরি-কল্পনার রূপ দিয়াছিলেন। ওয়াশিংটন নগরী আজ আমে-রিকার ঐক্যের উৎস, ক্যাপিটল ভবন ও হোয়াইট হাউস ইহার গৌরবের প্রতীক এবং জাগ্রত প্রহরীস্বরূপ। ওয়াশিংটন মনুমেণ্টের উপর দাঁড়াইয়া এক দিকে জেফারসন-স্মৃতিগৃহ, অপর দিকে লিঙ্কন স্মৃতিভবন এবং অপর দুই দিকে ক্যাপিটল ভবন, হোয়াইট হাউস ও ওয়াশিংটন নগরী দর্শনে মন স্বতঃই ভাবে অভিভূত হয়। উপরোক্ত তিন জন মহাপুরুষই ওয়াশিংটন নগরী, ক্যাপিটল ভবন ও হোয়াইট হাউসের সত্যিকারের স্থপতি।

যে স্বাধীনতা-ঘোষণাপত্রের রচয়িতা হিসাবে জেফারসন নিজেও গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন তাহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ—

"স্বভাব এবং স্বভাবের নিয়ন্তা পরমেশ্বরের পরম বিধানে প্রত্যেক জাতি বিশ্বের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে পৃথক এবং সমান আসনের অধিকারী। অন্য জাতির সহিত রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ কোন জাতির পক্ষে যখন সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া তদীয় স্বতন্ত্র এবং সমান আসন গ্রহণ করা আবশ্যক হইয়া পড়ে তখন বিশ্বের বিচার বুদ্ধির প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা থাকিলে যে সমস্ত কারণে জাতি স্বতন্ত্র আসন গ্রহণে বাধ্য হইতেছে সেগুলি বিশ্বের দরবারে নিবেদন করা উচিত।

আমরা এই সত্যগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করি :—

১। ভগবান সকল মনুষ্যকে সমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন ;

২। স্রষ্টা তাহাদিগকে কয়েকটি অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রদান করিয়াছেন ;

৩। জীবন, স্বাধীনতা এবং সুখান্বেষণ এই অধিকারগুলির অন্তর্গত ;

৪। এই অধিকারগুলিকে নিরাপদ করিবার জন্যই মনুষ্য-

সমাজে গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা এবং গবর্ণমেণ্টের ন্যায্য শক্তিগুলি শাসিতের স্বীকৃতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

৫। যখন কোন গবর্ণমেণ্ট এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের পরিপন্থী হইয়া উঠে তখনই তাহার পরিবর্ত্তন বা উচ্ছেদ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকার জাতির আছে। নূতন গবর্ণমেণ্টের রূপ ও গঠন এইরূপে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে যাহাতে গবর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত ক্ষমতাগুলি জনসাধারণের সুখ ও নিরাপত্তা বিধানের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী হয়।

সামান্য এবং ক্ষণিক কারণে দীর্ঘকালের গবর্ণমেণ্টের পরি বর্ত্তন অকর্ত্তব্য ইহাই সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নির্দ্দেশ। এই জন্য সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে যত দিন দুঃখ অসহ্য না হইয়া উঠে তত দিন মনুষ্যগণ দুঃখ সহ্য করিয়াই চলে, তথাপি চিরাভ্যস্ত গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদসাধন পূর্ব্বক দুঃখ-প্রতিকারের চেষ্টা করে না। কিন্তু যখন একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অপহরণ পরম্পরার মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ স্বৈরতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করিবার পরিকল্পনা পরিস্ফুট হইয়া উঠে তখন উক্ত গবর্ণমেণ্টকে অপসারণ করিয়া ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার নূতন প্রহরীর ব্যবস্থা করা জাতির অধিকার এবং কর্ত্তব্য। এই উপনিবেশগুলি এইরূপেই ধৈর্য্যের সহিত দুঃখ ভোগ করিয়াছে এবং এইরূপ প্রয়োজনেই আজ তাহারা পূর্ব্বতন গবর্ণমেণ্টগুলির পরিবর্ত্তন সাধনে বাধ্য হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটেনের বর্ত্তমান রাজার ইতিহাস এই রাষ্ট্রগুলির উপর প্রজা-পীড়ন-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ অত্যাচার ও অধিকার হরণেরই ইতিহাস। পক্ষপাতশূন্য অকপট জগতের দরবারে আমরা প্রমাণস্বরূপ এই ঘটনাগুলি উপস্থাপিত করিতেছি :—



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় কলাশালা, 'নেশন্যাল গ্যালারি অব আর্ট'র গম্বুজযুক্ত-ভবন (দক্ষিণে), বামে উন্নত স্তম্ভের উপর 'স্বাধীনতা'র প্রতিমূর্ত্তি

জনহিতে অত্যাবশ্যক আইনে সম্মতিদানে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।

তিনি শাসকগণকে জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ আইনগুলিও তাঁহার সম্মতিলাভ পর্য্যন্ত চালু না করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন; অথচ শাসকগণ যখন আইনগুলিকে চালু করিবার জন্য তাঁহার সম্মতি প্রার্থনা করিয়াছে তখন সেগুলির প্রতি কোন মনোযোগ দেন নাই।

আইন-সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার জাতির পক্ষে অমূল্য, প্রজাপীড়ক রাজার পক্ষে ভয়াবহ।

এ অধিকার বর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত তিনি বড় বড় জনপদকে রাষ্ট্রমধ্যে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

আইন সভার সদস্যগণকে হয়রান করিয়া তদীয় ব্যবস্থা মানিয়া লইতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে তিনি আইন সভাগুলির অধিবেশন প্রথাবিরুদ্ধ, কষ্টদায়ক এবং সরকারী নথিপত্রাদি যে স্থলে রক্ষিত হয় সেখান হইতে দূরস্থিত স্থানে আহ্বান করিয়াছেন।

জনগণের অধিকারের উপর তদীয় আক্রমণের দৃঢ়ভাবে বিরোধিতা করে বলিয়া তিনি প্রতিনিধি-সভাগুলিকে পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

এইরূপে প্রতিনিধি-সভাগুলি ভাঙ্গিয়া দিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত তিনি পুনর্নির্ব্বাচনে স্বীকৃত হন নাই। ফলে অবিনশ্বর আইন প্রণয়নকারী শক্তি জনসাধারণের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্র বহিরাক্রমণ বা অন্তর্বিপ্লবে অরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে।

তিনি এই রাষ্ট্রগুলির জনবৃদ্ধি নিবারণ করিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি বিদেশীদিগকে স্বীকরণ-বিষয়ক আইন প্রণয়নে বাধা দিয়াছেন, আগন্তুকগণকে উৎসাহদান বিষয়ক আইন পাশ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং নূতন জমি চাষ করিবার বিধিনিষেধগুলি কঠোরতর করিয়াছেন। বিচারালয়গুলির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাবিষয়ক আইনে সম্মতি না দিয়া তিনি বিচার-ব্যবস্থায় বাধা দিয়াছেন।

কার্য্যকাল এবং বেতনের পরিমাণ ও প্রাপ্তির জন্য তিনি বিচারকগণকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিয়াছেন। জনসাধারণকে অন্তঃসারশূন্য করিবার জন্য তিনি অসংখ্য নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে নূতন কর্ম্মচারী এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন।

আমাদের আইন সভার সম্মতি না লইয়া আমাদের মধ্যে শান্তিকালে স্থায়ী সৈন্যবল রাখিয়াছেন।

তিনি সামরিক শক্তিকে স্বাধীন করিয়া অসামরিক শক্তির ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছেন—

আমাদের স্কন্ধে সুবৃহৎ সশস্ত্র সৈন্যদল চাপাইবার জন্য;

এই রাষ্ট্রগুলির অধিবাসিগণকে হত্যা করিবার অপরাধ হইতে কপট-বিচারের দ্বারা ঘাতকগণকে বাঁচাইবার জন্য;

বিশ্বের অন্যান্য সমস্ত অংশ হইতে আমাদের বাণিজ্যের বিলোপ সাধনের জন্য;

আমাদের সম্মতি ব্যতীত আমাদের উপর করভার চাপাইবার জন্য;

বহুস্থলে জুরীর বিচার হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য;

মিথ্যা অপরাধে বিচারার্থ আমাদিগকে সমুদ্রপারে প্রেরণ করিবার জন্য;

পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশে ব্রিটিশ আইনের স্বাধীন ব্যবস্থা রহিত করিয়া, স্বৈর শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া এবং সীমানা বাড়াইয়া এই উপনিবেশগুলিতে অনুরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের উপযুক্ত আদর্শ এবং উপায় স্থাপনের জন্য;

আমাদের অধিকার অপহরণের জন্য, আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান আইনগুলি প্রত্যাহারের জন্য, এবং আমাদের গবর্ণমেণ্টগুলির ক্ষমতা আমূল পরিবর্ত্তনের জন্য;

আমাদের স্বকীয় আইন সভা বন্ধ করিয়া দিয়া আমাদের উপর সর্ব্ববিষয়ে আইন করিবার ক্ষমতা তাহাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য;

আমাদের আইন বহির্ভূত এবং আমাদের কনষ্টিটুশন (শাসনতন্ত্র) বিরোধী শাসনব্যবস্থার অধীনে আমাদিগকে আনিবার জন্য;

তিনি অন্য লোকের সহিত যোগ দিয়া তাহাদের প্রণীত কপট আইনে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আমরা তাঁহার রক্ষণীয় নয় ইহা ঘোষণা করিয়া এবং আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া তিনি এদেশের শাসনভার পরিত্যাগ করিয়াছেন।

তিনি আমাদের সমুদ্র লুণ্ঠন করিয়াছেন; সমুদ্রতীর বিধ্বস্ত করিয়াছেন, নগরী পোড়াইয়া দিয়াছেন এবং জনগণের জীবন নাশ করিয়াছেন।

অরাজোচিত এবং বর্ব্বরযুগেও অনুপমেয় নিষ্ঠুরতা ও কপটতার সহিত তিনি যে হত্যা, ধ্বংসলীলা এবং অত্যাচার পূর্ব্বেই আরম্ভ করিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য বর্ত্তমানে দলে দলে ব্যবসাদার বিদেশী সৈন্য আমদানী করিতেছেন।

আমাদের সমনাগরিকগণকে সমুদ্রমধ্যে বন্দী করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে, বন্ধু ও ভ্রাতৃগণকে হত্যা করিতে অথবা তাহাদের হস্তে নিহত হইতে বাধ্য করিয়াছেন।

তিনি আমাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধাইয়াছেন এবং নিষ্ঠুর বর্ব্বর নিগ্রোগণ যুদ্ধকালে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্ব্বিশেষে সর্ব্বাবস্থার লোকদিগকে নির্ব্বিচারে হত্যা করে ইহা জানিয়াও তাহাদিগকে আমাদের সীমান্তবাসিগণের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়াছেন।

এই সমস্ত অত্যাচারের পদে পদে প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া আমরা অতি বিনীত ভাবে তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছি। পুনঃ পুনঃ আবেদনের উত্তরে আমরা শুধু বার বার শাস্তিই পাইয়াছি। যে রাজার চরিত্র এতাদৃশ প্রজাপীড়ক কর্ম্মসমূহ দ্বারা কলঙ্কিত তিনি স্বাধীন জাতির শাসক হইবার অযোগ্য।

আমাদের ব্রিটিশ ভ্রাতৃগণের প্রতিও আমরা কম মনোযোগ দিই নাই। তাহাদের আইন সভা আমাদের উপর অন্যায় অধিকার বিস্তার করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছে সে বিষয়ে আমরা তাহাদিগকে মাঝে মাঝে সাবধান করিয়া দিয়াছি। আমরা যে অবস্থায় এদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলাম তাহা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। তাহাদের সহজ ধর্ম্মবুদ্ধি এবং উদারতার নিকট নালিশ জানাইয়াছি। এই সমস্ত অধিকার হরণ অস্বীকার করিবার জন্য আমাদের ও তাহাদের সমান পূর্ব্ব-পুরুষগণের নামে তাহাদের নিকট আবেদন করিয়াছি। ইহাতে যে আমাদের সম্পর্ক ও আদান-প্রদান বিচ্ছিন্ন হওয়া অবশ্যম্ভাবী তাহাও তাহাদিগকে জানাইয়াছি। কিন্তু তাহারাও এই ন্যায় এবং রক্তের আহ্বানে বধিরতা অবলম্বন করিয়াছে। এতদবস্থায় আমাদের বিচ্ছেদ ঘটয়িত্রী নিয়তিকে স্বীকার করিতে এবং তাহাদিগকে মানবজাতির অন্যান্য অংশেরই মত যুদ্ধকালে শত্রু এবং শান্তিকালে মিত্র বলিয়া মনে করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি।

অতএব আমরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি রূপে

সাধারণ কংগ্রেসে মিলিত হইয়া জগতের পরম বিচারককে আমাদের উদ্দেশ্যের সততার সাক্ষী রাখিয়া সমস্ত উপনিবেশবাসী জনগণের নামে ও তাহাদেরই প্রদত্ত অধিকার-বলে দৃঢ় ভাবে প্রচার ও ঘোষণা করিতেছি যে,

(১) এই একতাবদ্ধ উপনিবেশগুলি মুক্ত ও স্বাধীন হইল এবং স্বাধিকার বলে তাহাদের তাদৃশ হওয়াই উচিত ;

(২) ব্রিটিশ-রাজের প্রতি সমস্ত আনুগত্য হইতে তাহারা মুক্ত হইল ;

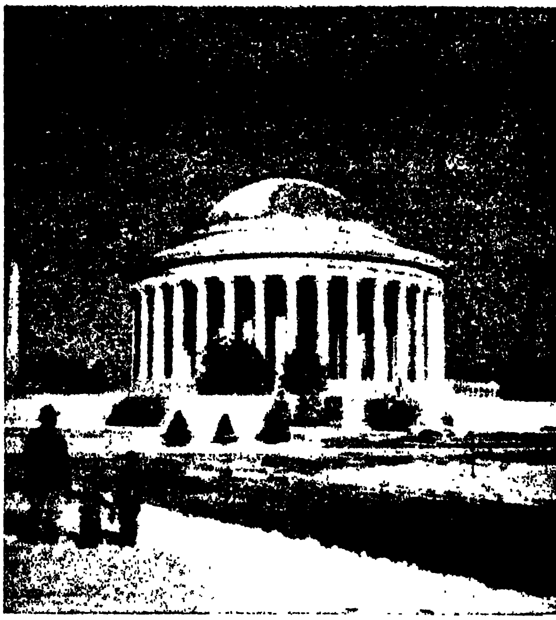
(৩) তাহাদের সহিত গ্রেট ব্রিটেনের সমস্ত রাজনৈতিক বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইল ; এবং

(৪) মুক্ত এবং স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন, মৈত্রী সম্পাদন, বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্রোচিত সর্ববিধ কার্য্য করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাহারা গ্রহণ করিল।

এই ঘোষণার সমর্থনের জন্য ঈশ্বরের উপর দৃঢ় নির্ভর রাখিয়া আমরা পরস্পরের নিকট আমাদের জীবন, সম্পত্তি এবং পবিত্র আত্মসম্মান আবদ্ধ রাখিতেছি।"

৮ই ডিসেম্বর রবিবার জর্জ ওয়াশিংটনের বাড়ী দেখিতে যাই। বাড়ীটির নাম মাউণ্ট ভার্ণন। ইহা ওয়াশিংটনের নিজের বাড়ী ; ভার্জিনিয়া রাষ্ট্রে অবস্থিত। এখানে তিনি সপরিবারে বাস করিতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মাউণ্ট ভার্ণন মহিলা সমিতি (লেডিজ এসোসিয়েশন) এই বাড়ীটি রক্ষা করিবার ভার নেন। তদবধি তাঁহারাই বাড়ীটির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। ওয়াশিংটন শহর হইতে ইহার দূরত্ব ১৬ মাইল। বাসে যাতায়াতের ভাড়া ১ ডলার ১৫ সেণ্ট।

সকালে প্রাতরাশের পর বাহির হইয়া পড়িলাম। দূতাবাসের কর্ম্মচারী শ্রীযুত শিবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গী করিলাম। ইনি আমার সমবয়স্ক এবং ওয়াশিংটনে নবাগত। অল্পদিন হইল দিল্লী হইতে বদলী হইয়া এখানে আসিয়াছেন। ক্ষতিপূরণ বাবদ "বিজয়ী" ভারতবর্ষ বিজিত জাপানের নিকট কি কি সম্পত্তি পাইতে পারে ইনি সে বিষয়ে ভারতের পক্ষে তদ্বির করেন। বড় পোষ্ট আপিসের নিকট হইতে মাউণ্ট ভার্ণনের বাসে উঠিলাম। জেফারসন মেমোরিয়ালের অনতিদূরে পটোম্যাক নদীর সুবৃহৎ সেতু অতিক্রম করিলাম। চমৎকার রাস্তা—নদীর ধার দিয়া বরাবর মাউণ্ট ভার্ণন পর্য্যন্ত গিয়াছে। বামে নদী, দক্ষিণে পাতলা জঙ্গল। জঙ্গলে এল্‌ম গাছই বেশী। দুইটি ছোট ছোট শহর অতিক্রম করিলাম। এগুলি নাকি এদেশের খুব প্রাচীন শহর—অর্থাৎ দেড় শত বৎসরেরও বেশী এদের বয়স। পটোম্যাক নদী বেশ বড়। কলিকাতার গঙ্গার মত, কোথাও তার চেয়েও একটু বড় হইতে পারে। নদীতীরে একটি টিলার উপর মাউণ্ট ভার্ণন অবস্থিত। নদী হইতে বাড়ীর এবং বাড়ী হইতে নদীর দৃশ্য তুল্য চিত্তাকর্ষক। বাড়ীটি



টমাস জেফারসনের স্মৃতিভবন ওয়াসিংটন

দোতলা, বাংলা ঘরের মত মট্‌কাযুক্ত ছাদ। উপরে নীচে ছুটা করিয়া ঘর। ওয়াশিংটনের সময় যেরূপ ছিল ঠিক সেই ভাবেই রাখা হইয়াছে। ঢুকিতেই বৈঠকখানা ঘর। ফ্রান্সের ষোড়শ লুই ওয়াশিংটনকে একটা কার্পেট তৈরি করাইয়া পাঠাইয়াছিলেন। কার্পেটটি বৈঠকখানায় পাতা রহিয়াছে। যে হার্পসি কর্ডে ওয়াশিংটনের পোষ্য নাতনী গান গাহিত তাহা পাশের ঘরে সেই ভাবেই সাজান আছে। এই ঘরগুলির সামনে বারাণ্ডা। তাহাতে চেয়ার পাতা রহিয়াছে। যেন ওয়াশিংটন ও তদীয় গৃহিণী এখনই আসিয়া বসিবেন। এখান হইতে নদীর দৃশ্য মনোরম। উপরে যে ঘরে ওয়াশিংটন মারা যান সেটা ঠিক সেদিনকার মত সাজান রহিয়াছে। বিছানাটি একটি হাতের কাজ-করা সুন্দর কাঁথা দিয়া ঢাকা। অনতিদূরে রান্নাঘর। সেখানে হাঁড়ি, কড়া, মুষল, কাহিলচিয়া প্রভৃতি তদানীন্তন বাসনগুলি পড়িয়া আছে। ওয়াশিংটন-গৃহিণীর হাতের স্পর্শ যেন তাহাতে লাগিয়া আছে। বাড়ীর চারিদিকে অনেক জমি ও বাগান। নামিয়া নদীর ঘাট পর্য্যন্ত যাইবার পথ আছে। সে গ্রাম্য পথ সেদিন যেমন ছিল আজও তেমন আছে। আমেরিকার সুনিপুণ ইঞ্জিনীয়ারগণ পথটিকে আধুনিক পদ্ধতির করিবার জন্য ইহার গায়ে হস্তক্ষেপ করে নাই, সশ্রদ্ধচিত্তে পাশ কাটাইয়াই চলিয়া গিয়াছে। ওয়াশিংটন হইতে ষ্টীমার যোগে আসিয়া এই ঘাটে নামা যায়। ঘাটের অনতিদূরে ওয়াশিংটনের সমাধি। বাড়ীটির বাহিরে আসিয়া একটি হোটেলে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিয়া ইতস্ততঃ পায়চারি করিতেছি। দেখি একটি ছোট এল্‌ম গাছের তলায় একখণ্ড

ফলকে লেখা আছে যে, ম্যাসাচুসেটস রাষ্ট্রে যে এল্‌ম গাছের তলায় ওয়াশিংটন বিদ্রোহী বাহিনীর সেনাপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এটি সেই বৃক্ষেরই প্রপৌত্র।

বৈকালে ফিরিবার পথে আমরা আর্লিংটনে জাতীয় সমাধিক্ষেত্রের নিকট নামিয়া পড়িলাম। বহু সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষের সমাধি এখানে আছে। পাহাড়ের গা বাহিয়া সমাধিশ্রেণী। পাহাড়টি খুব উঁচু নয়। পাহাড়ের উপরে সেনাপতি লি'র বাড়ী। সেনাপতি লি আমেরিকার গৃহযুদ্ধে দক্ষিণের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া পরাজিত হন। ইহারই আশেপাশে তখন অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল—বাড়ীটি এখন মিউজিয়মরূপে রক্ষিত। এই পাহাড়ের উপর হইতে পটোম্যাকের উপরে ওয়াশিংটন শহরের দৃশ্য পরম রমণীয় দেখায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও আমি ওখান হইতে হাঁটিয়াই ওয়াশিংটনে ফিরিলাম। পাহাড়ের অনতিদূরে পটোম্যাক সেতু। সেতু পার হইলেই ওয়াশিংটন শহর। আর্লিংটন সমাধিক্ষেত্র শহরের পশ্চিমে, পদব্রজে সাঁকো পার হইবার সময় আর্লিংটন পাহাড়ের পিছন দিয়া অস্তগামী সূর্য্যের শোভা আমাদের উভয়ের মনকেই পিছনে টানিতেছিল।

ওয়াশিংটন নগরী মার্কিন জাতির হৃৎপিণ্ড-স্বরূপ; ইহা সমস্ত দেশের জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। যে আটচল্লিশটি রাষ্ট্র লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত ওয়াশিংটন তাহাদের বহির্ভূত। ইহা সমস্ত রাষ্ট্রের তুল্য গৌরবস্থল। এই শহরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ইঁহারা সর্ব্বদা সচেষ্ট। সরকারী ইঞ্জিনীয়ারগণ এখানে শুধুই হিতকারীই নন; রূপকারও বটেন। সরকারী সৌধাবলীর এত শোভা অন্য কোন দেশে দেখি নাই। সরকারী বাড়ীগুলির চমৎকার ডিজাইন; নির্ম্মাণকার্য্যে নানাবিধ মর্ম্মরের ব্যবহার নয়নরঞ্জক। ক্যাপিটল আর্ট গ্যালারী, আর্কাইভ-ভবন ও হোয়াইট হাউসের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ট্রেজারী, ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট, সুপ্রীম কোর্ট, কংগ্রেসের লাইব্রেরি, প্যান-আমেরিকান ইউনিয়ন প্রভৃতি বাড়ীগুলি সত্যই রূপগৌরবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাস্তাগুলি সরল ও সমান্তরাল; প্রশস্ততা ও মসৃণতায় এদের তুলনা নাই। সুদৃশ্য সরকারী সৌধশ্রেণীর বিন্যাস এবং গঠন সুপরিকল্পিত। এই আকাশচুম্বী প্রাসাদের দেশে পাছে কোন কোন বাড়ী অতিরিক্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়া নগরীর দৃশ্য-সমতার হানি করে সেইজন্য দশ তলার বেশী বাড়ী তৈরি করা এখানে নিষিদ্ধ। নগরীর সৌধ-সমতাই ইহার সুষমা বৃদ্ধি করিয়াছে।

একদিন (৭ই ডিসেম্বর শনিবার, ২১শে অগ্রহায়ণ) এখানকার চিড়িয়াখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। উঁচু নীচু পাহাড়ে জায়গায় চিড়িয়াখানাটি অবস্থিত। ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে বেশ মনোরম। হাতী, সিংহ, জলহস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি জানোয়ার এদেশের সাধারণ লোকের নিকট বিস্ময়কর জীব। আমার কাছে পাখীর ঘরগুলি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগিল। রংবেরঙের রকমারি পাখী; এক একটি ঘরে যেন রামধনু উঠিয়াছে। আমাদের দেশের কাক কোকিল ও শকুন স্বত্নে রক্ষিত হইয়াছে। অতি যত্নেই যেন এদের উৎসাহ ও জীবনী-শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। নিঃসঙ্গ নিরানন্দ কোকিলটি ধুঁকিতেছে। অদম্য কাকও এখানে নীরব। এক রকমের কাক দেখিলাম; তার ঘাড় এবং বুক সাদা। ঈগল পাখী ও টিটপক্ষী অনেকগুলি দেখিলাম। টিটপক্ষীর ডিম প্রকাণ্ড; কয়েকটি সাজান রহিয়াছে। কণ্ডর নামক খুব বড় একটি মাংসাশী পক্ষী দেখিলাম। একটি কক্ষে দক্ষিণ মেরু-নিবাসী পেঙ্গুইন পক্ষী রহিয়াছে। দুই পায়ের উপর ভর দিয়া মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সামনের দিকে আরও দুইটা চামড়া পায়ের মত ঝুলিতেছে। জলে সাঁতার কাটিবার সময় এই দুইটি ব্যবহার করিতেছে। শীতের দেশের পাখী বলিয়া ঘরের মধ্যে বিস্তর বরফ রাখা হইয়াছে। মাঝে মাঝে সাঁতার কাটিবার জলকুণ্ড। নূতন জানোয়ারের মধ্যে আলপাকা ও সাদা বড় মহিষ দেখিলাম। আলপাকা মেষজাতীয়; তবে আকার একটু বড় এবং গলা লম্বা। বড় মহিষ অনেক রকমের আছে; তন্মধ্যে একটার সর্ব্বাঙ্গ দুধের মত সাদা।

আমার ওয়াশিংটনে পৌঁছিবার কয়েক দিন পরেই দেশ-ব্যাপী কয়লা-খনির মজুর ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। জন লুইস মজুরদের নেতা। মজুরদের মধ্যে তাঁহার অসীম প্রতিপত্তি। পূর্ব্বের একটি ধর্ম্মঘটের সময় মালিকদের হাত হইতে সরকার যুদ্ধকালের জন্য খনিগুলি পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। সে সময় সরকারের সঙ্গে মজুরদের মাহিনা এবং অন্যান্য বিষয়ে এক চুক্তি হয়। সে চুক্তির মেয়াদ ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত। ১৯৪৬ সালের নবেম্বর মাসেই লুইস গবর্নমেণ্টকে ১৫দিনের নোটিশ দিয়া বলেন যে তাঁহারা পুরাতন চুক্তি পনর দিন পরে বাতিল করিয়া দিবেন। ইতিমধ্যে সরকার যদি নূতন চুক্তি না করেন তবে তাহার পর মজুরগণ বিনা চুক্তিতে কাজে যাইবে না। খনিগুলির পরিচালনার ভার তখনও সরকারের হাতে।

এই ধর্ম্মঘটে সমগ্র আমেরিকা ও ইউরোপ চঞ্চল হইয়া উঠিল। শীত আগত। মধ্য ইউরোপে কয়লা নাই। বিলাতে কয়লার উৎপাদন অপ্রচুর। বিলাত, ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ আমেরিকার কয়লার উপর অনেকখানি নির্ভর করিয়া থাকে। কয়লার অভাবে দেশের বহু কারখানার উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাইবে। আগতপ্রায় শীতে কয়লার অভাব হইলে ত মানুষই জমিয়া যাইবে।

১৯৪৬ সালে আমেরিকায় যত ধর্ম্মঘট হইয়াছে এদেশে এত ধর্ম্মঘট পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের সময় ইহা স্বাভাবিক হইলেও সুচিন্তিত ও দৃঢ়নীতির আবশ্যকতা সূচনা করে।

খবরের কাগজগুলি তখন এই ধর্ম্মঘটের আলোচনায় ভর্তি।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কিরূপ মনোভাব অবলম্বন করিবেন তাহা লইয়া আলোচনা চলিতেছে। তিনি কিন্তু তখনও নীরব। যুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি হইতে নিউ ইয়র্ক পর্য্যন্ত হাজার হাজার মাইল বড় তেলের পাইপ মাটির নীচে বসান হইয়াছিল। সেগুলি তখন বেচিয়া দিবার কথা চলিতেছে। সরকার এখন সেগুলিকে কোন কোম্পানীর নিকট ভাড়া দিতে রাজী হইবেন কিনা এবং যদি হন তবে কোন কোম্পানী ঐগুলি ভাড়া লইয়া পেট্রোলের দ্বারা গ্যাস উৎপাদন করিয়া পাইপ-সাহায্যে সেই গ্যাস নিউ ইয়র্ক পর্য্যন্ত আনিয়া দেশের শীত এবারের মত নিবারণ করিতে পারিবেন কি না ইহা লইয়াও আলোচনা চলিতেছে।

মজুরদের কোন কোন বিষয়ে অসুবিধা থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা উচ্চ হারেই বেতন পান। বিশেষতঃ লুইসের সঙ্গে সরকারের চুক্তি বিদ্যমান। প্রশ্ন এই—সেই চুক্তি একতরফা ভাঙিয়া দিয়া কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সহসা সমগ্র জাতির টুঁটি টিপিয়া ধরিবার অধিকার লুইসের আছে কি না? যদি থাকে তবে আমেরিকার গণতন্ত্রের কি হইল? সমগ্র জাতিকে চাপে ফেলিয়া ও ভয় দেখাইয়া ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা ত ফ্যাসিষ্ট পন্থা। ইহা দস্যুতার নামান্তর মাত্র। আমেরিকার জীবন্ত গণতন্ত্র ইহা সহিবে কি? যদি সহ্য না করে তবে ইহার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র-সম্মত কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে?

কয়েক দিন নীরব থাকিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তাঁহার নীতি ঘোষণা করিলেন। তিনি বলিলেন, জাতির সঙ্গে চুক্তি করিয়া তাহা এক তরফা ভাঙিয়া দেওয়া বে-আইনী। কার্য্যে যোগদান না করিয়া মজুরগণ বে-আইনী কার্য্য করিতেছে। অতএব তিনি মজুরদিগকে কার্য্যে যোগদান করিতে আহ্বান করিলেন। ফল হইল না। তখন তিনি আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। নালিশ দুইটি—(১) ধর্মঘটটিকে চুক্তি-বিরুদ্ধ অতএব বে-আইনী ঘোষণা করা; (২) লুইস মজুরদিগকে যাহাতে এই বে-আইনী কার্য্যে লিপ্ত হইতে নির্দ্দেশ না দেন তজ্জন্য তাহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা। লুইস জবাবে বলিলেন—আমেরিকার একটি আইনে প্রত্যেক মজুরের ধর্মঘটের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এই আইনের বলে তাঁহার কাজ বৈধ। সরকার পক্ষের মতে সমগ্র জাতির প্রতিনিধি সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধাবস্থায় এ আইন অপ্রযোজ্য। যে জজের নিকট বিচার চলিল, তিনি পূর্ব্বে আইন সভার সভ্য ছিলেন এবং এই আইন প্রণয়নের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ইহার পূর্ব্বে লুইস একটি বড় ধর্মঘট-সংক্রান্ত মামলায় এই জজের নিকট জিতিয়াছিলেন। কিন্তু এবার রায় তাহার বিরুদ্ধে হইল। লুইসের উপর এবং ইউনিয়নের উপর দিন হিসাবে জরিমানা ধার্য্য হইল। যত দিন ধর্মঘট চলিবে জরিমানার পরিমাণ সেই হারে বাড়িবে। ইউনিয়নের তহবিলে মজুত অর্থের পরিমাণ এবং লুইস্ ইউনিয়নের নিকট যে বেতন পাইত তাহা আমাদের কল্পনাতীত। আমার যত দূর মনে আছে লুইসের বেতন ছিল বার্ষিক ২৫০০০ ডলার বা ৮৩০০০ হাজার টাকার কিঞ্চিদধিক। এই রায়ের উপর সুপ্রীম কোর্টের মতামত জানিবার জন্য সরকার নিজেই সুপ্রীম কোর্টে আপিল দাখিল করিয়া নিবেদন করিলেন যে ব্যাপারটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী, যাহাতে সরকার দ্রুত কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন সেইজন্য তাঁহারা অবিলম্বে সুপ্রীম কোর্টের মতামত প্রার্থনা করিতেছেন। লুইসের বিরুদ্ধে তখন জনমত বেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। মজুরদের বেতনের হার অসঙ্গত ছিল না। অন্ততঃ পৃথিবীর যে-কোন দেশের মজুরদের নিকট সে হার কল্পনারও অতীত। উপরন্তু সরকারের সঙ্গে তাঁদের চুক্তি বিদ্যমান। সে চুক্তির মেয়াদ মাত্র আর কয়েক মাস ছিল। সে অবস্থায় একতরফা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া জাতীয় গবর্ণমেন্টকে অগ্রাহ্য করিয়া জাতির উপর জবরদস্তি করা গণতন্ত্র-বিরোধী, অতএব নিন্দিত। সকলেরই প্রায় এই এক সুর। লুইস তখন সহসা এক দিন সকলকে বিস্মিত করিয়া ধর্মঘট প্রত্যাহার করিলেন। বলিলেন—সুপ্রীম কোর্ট যাহাতে ধীরে সুস্থে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় এই গুরুত্বপূর্ণ মামলায় বিচার করিতে পারেন সেইজন্য তিনি ধর্মঘট প্রত্যাহার করিলেন।

আমার ওয়াশিংটন পরিত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বেই ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হইল। জাতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত হইল। আমার এদেশে অবস্থান কয়লার অভাবে খণ্ডিত বা অসুবিধাগ্রস্ত হইবে না—মনে করিয়া আমিও শান্তি পাইলাম। কাগজগুলি তখন লিখিল যে ইহাতে সমস্যার সমাধান হইল না। আলোচনা দ্বারা মজুরদের দাবিগুলির মীমাংসা করিতে হইবে। নচেৎ বর্ত্তমান চুক্তির মেয়াদ ফুরাইলে অর্থাৎ ৩১শে মার্চের পর পুনরায় সমস্যা দেখা দিবে। লুইসের বিরুদ্ধে জনমত সুস্পষ্ট রূপে দেখা দিল। এক ব্যক্তি অন্যায় রূপে যাহাতে জাতির টুঁটি টিপিয়া না ধরিতে পারে তজ্জন্য আইন প্রণয়নের দাবি উঠিল। এ দেশের লোক আলোচনা দ্বারা বিরোধ-মীমাংসার পক্ষপাতী। নিয়োগ-কর্ত্তারা দাবি করিলেন যে, মজুরদের যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আলোচনা চালাইবার অধিকার থাকে তবে তাহাদেরই বা আলোচনা চালাইবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার থাকিবেনা কেন। উভয় পক্ষের আলোচনার জন্য এবং আলোচনা যাহাতে ফলপ্রসূ হয় তজ্জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করাই সরকারের কর্ত্তব্য। সরকারের এই কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা আছে না তাহার সংস্কারের প্রয়োজন? এইরূপ নানাবিধ আলোচনা তখন চলিতে লাগিল।

বাজেট ব্যুরোর ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সদয় ব্যবহারে

আমার কার্য্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্মচারী সযত্নে ও সাদরে আমার কার্য্যে সাহায্য করিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা আমার সমস্ত দ্বিধা ও প্রশ্নের নিরসন করিতেছেন। ইঁহারাই আমার আমেরিকার গোটা প্রোগ্রাম স্থির করিয়া সর্ব্বস্থানে কর্তৃপক্ষের নিকট আমাকে সকল প্রকারে সাহায্য করিবার জন্য আশ্বাস দিলেন।

বাজেট ব্যুরোর কর্ম্ম সমাপনান্তে ট্রেজারীতে যাই। সেখানে কয়েকদিনের জন্য আমার মূল কর্ম্মস্থল স্থাপিত হইল। আমার বসিবার জন্য যে ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহার পাশেই হোয়াইট হাউস, মধ্যে একটি রাস্তার ব্যবধান। এখানেও ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের মধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হইলাম। ইঁহাদের কার্য্য যেমন সুশৃঙ্খলাপূর্ণ তেমনি গভীর। ইহারা কোন বিষয়েরই একেবারে মর্ম্মস্থলে প্রবেশ না করিয়া এবং আদ্যোপান্ত না জানিয়া ছাড়ে না। ইহাদের ট্যাক্স রিসার্চ ব্রাঞ্চ বা কর বিষয়ক গবেষণা শাখার সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছিল। এক একজন কর্ম্মচারী এক একটি ট্যাক্স বিষয়ে গবেষণায় রত আছেন। পৃথিবীর কোথায় কিরূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে সে সম্বন্ধে ইঁহারা সর্ব্বদা সজাগ। এই কর্ম্মচারিবৃন্দের মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। তিনি আয়করে বিশেষজ্ঞ। এদেশের পুস্তক প্রকাশকগণের প্রচেষ্টাও আমাদের কল্পনাতীত। শিকাগোর কমার্স ক্লিয়ারিং হাউস নামক প্রকাশকগণের একটি ট্যাক্স-সার্ভিস আছে। তাঁহারা পৃথিবীর সমস্ত দেশের ট্যাক্স সম্বন্ধে যাবতীয় খবর সংগ্রহ করিয়া গ্রাহকগণকে নিয়মিত রূপে সরবরাহ করেন। সরকারী অফিসগুলিও ইঁহাদের গবেষণালব্ধ বিষয় মাঝে মাঝে সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করে। যে আপিসেই গিয়াছি সেখানকার লোকেরাই তাহাদের প্রকাশিত বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও রিপোর্ট বিনামূল্যে সাগ্রহে আমাকে দিয়াছে। অনেক সময় আমি সবগুলি নিতে পারি নাই—বাছিয়া লইতে হইয়াছে। ইহাদের কার্য্যপদ্ধতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, ইহাদের অমায়িক ব্যবহার আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। ইহারা নিজেরা ডাকখরচা দিয়া অনেক পুস্তক নিয়মিত রূপে এখনও আমাকে পাঠাইতেছে।

১০ই ডিসেম্বর সকলের নিকট (২৪শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার) বিদায় গ্রহণ করিয়া হোটেলে ফিরিলাম। পরদিন ওয়াশিংটন ত্যাগ করিব, আর এখানে ফিরিব না।

মহিলা-সংবাদ

ই, আই রেলের ডেপুটি চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাসের কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী গুহ এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরেজীতে অনার্স পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি ম্যাট্রিকুলেশন এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সরকারী বৃত্তি লাভ করেন।



শ্রীকল্যাণী গুহ

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর সমস্যা

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন ; ধূম যেরূপ বহ্নির প্রমাণ, পশ্চিমবঙ্গ—বিশেষতঃ কলিকাতা এবং তাহার শহরতলীর মধুচক্র সকল ঘিরিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণের ক্রমবর্দ্ধমান কল-গুঞ্জনই সেইরূপই এই চাঞ্চল্যের প্রমাণ। অন্তরে যাহার যাহাই থাক না কেন, মুখে আমরা অনেকেই এই চাঞ্চল্য-প্রসূত পলায়নী মনোবৃত্তির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান। এই পলায়নী মনোবৃত্তিকে কেহ কেহ অকারণ ভীরুতা বলিয়া অভিহিত করিতেছি, কেহ কেহ সকারণ অদূরদর্শিতা বলিতেছি, কেহ কেহ পরমুখাপেক্ষিকা মনোবৃত্তি বলিয়া ধিক্কৃত করিতেছি। কাহারও কাহারও হৃদয়ে আবার এরূপ একটা ভাবও রহিয়াছে, 'অ-জাতীয় পরিবেশ' হইতে যাহারা বীরের মতন 'জাতীয় পরিবেশে' ফিরিয়া আসিতে চায় তাহারা চলিয়া আসুক, যাহারা অপারগ তাহারা আবার বীরের মতন সংগ্রাম করিয়াই পূর্ববঙ্গে সশরীরে অবস্থান করুক! এই শক্তি এবং কিসে ইহার ভূমিকায় যে একটি অখণ্ড বীরত্ব কি ভাবে অনুস্যূত হইতে পারে তাহা জনসাধারণ সেই গভীর রহস্যটির এখন পর্য্যন্ত মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারে নাই ; ফলে তাহারা পূর্ব্ব-পশ্চিম জুড়িয়া একটি বৃহৎ দোলায় নিরন্তর দুলিয়া দুলিয়া আরামের সঙ্গে প্রাণান্ত করিতেছে।

গম্ভীর গঙ্গাতীরে বসিয়া পশ্চিম পদ্মাতীরের অধিবাসিগণ সম্বন্ধে অনেকেই অনেক গবেষণা করিতেছেন ; আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যদি সত্য হয় তবে এই গবেষণা হইতে যে নির্গলিতার্থটি উপদেশ এবং মন্তব্যাদি রূপে প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের পিত্ত-প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়া ব্যতীত আর বিশেষ তেমন কিছুই ঘটিতেছে না। গভীরমূল ক্ষতের উপরিভাগে অতিশয় উৎসাহসহকারে খানিকটা প্রশান্তিকর প্রলেপ জোরে জোরে ঘষিয়া দিবার চেষ্টা করিলে যে ফল হয়, এ ক্ষেত্রেও অনেকখানি সেই জাতীয় ফলই ফলিতেছে।

বাহির হইতে আমরা অনেকেই মনে করি, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুগণের বর্ত্তমান বিপর্য্যয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে একটা আকস্মিক বিপর্য্যয় মাত্র ; একটা উগ্র সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রব্যবস্থা চালু হইবার দরুন সমাজ-জীবন, আর্থিক-জীবন এবং রাষ্ট্র-জীবনে নিষ্পেষিত হইয়া যাইবার আশঙ্কা। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী লক্ষ্য করিয়া এই আশঙ্কাকে একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া আজ আর সম্ভব নয়। পূর্ব্ববঙ্গে মা-বোনের ইজ্জৎহানি, ধর্ম্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্রম-বিলোপের আশঙ্কাজনিত উদ্বিগ্নতাকেও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন এই, এই আশঙ্কার সম্মুখে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুগণ নিজেদের এতখানি অসহায় বোধ করিতেছে কেন? সম্ভাবিত বিপদের সম্মুখে আত্মরক্ষার জন্য দাঁড়াইবার সঙ্কল্প না লইয়া অধিকাংশ লোকই পলায়নের সুযোগ খুঁজিতেছে কেন? ব্রিটিশ কুশাসনের বিরুদ্ধে যাহারা এই অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সর্ব্বস্ব পণ করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিয়াছে তাহারা আজ সম্ভাবিত দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সাহস পাইতেছে না কেন? এই প্রশ্নগুলির যে উত্তর মনে আসে তাহাতেই প্রতীতি জন্মে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুগণের জীবনে নিশ্চয়ই প্রকাণ্ড একটা দুর্ব্বলতা দেখা দিয়াছে।

আরও ভাবিবার বিষয় এই, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্ব্ববঙ্গে আনাচে-কানাচে সর্ব্বত্রই যে একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা সংখ্যাগুরু-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহা মনে হয় না। আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীর অনেক অঞ্চল ঘুরিয়াও আমাদের এ কথা মনে হয় নাই যে পল্লীবাসী হিন্দু এবং মুসলমান প্রতিবেশিগণের ভিতরে বহুদিনকার সম্বন্ধের এমন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যাহাতে একে অপরের বৈরিতাভয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছে। পূর্ব্বে তাহারা প্রতিবেশী রূপে যেরূপ পরস্পর পরস্পরের সহিত দৈনন্দিন জীবনে জড়িত ছিল, এখনও প্রায় সেইরূপই আছে। অনেক শান্তি-সভা বা মিলন-সভার সঙ্কল্প লইয়া বাহির হইয়া মনে হইয়াছে, সভা ডাকিব কাহাদের জন্য? যাহারা দৈনন্দিন জীবনে পদে পদে অতি সহজভাবেই একে অপরের সহিত মিলিত হইয়া রহিয়াছে হঠাৎ নূতন করিয়া মিলন-সভা ডাকিয়া তাহাদের ভিতরে অমিলটাকে খোঁচাইয়া তুলিয়া লাভ কি? কিন্তু মজা এই, এই সাম্প্রদায়িক মিলন সত্ত্বেও এই সকল সুদূর পল্লী অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসিগণ প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে দেশত্যাগের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এসব স্থানের অধিবাসিগণের সহিত একটু ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাইলে দেখা যাইবে, যাহারা বহু পূর্ব্বেই নানা কার্য্য ব্যপদেশে পশ্চিম বঙ্গে আসিয়া আস্তানা গাড়িতে পারিয়াছে, লোকে তাহাদিগকে বিধাতার বিশেষ নির্ব্বাচিত ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতেছে ; যাহারা এখনও আসিয়া ঘাটে মাঠে বাটে তাঁবু খাটাইয়া কোনরূপে দিন কাটাইতেছে। তাহাদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে বাহিরে যেই যত সন্দেহ প্রকাশ করুক না কেন, ভিতরে ভিতরে অনেকেরই যেন ইহাতেও একটা সায় রহিয়াছে, এবং পারিলে হয়ত তাহারাও এই পথের পথিক হইবে ; বাদবাকি যে দল এদিকে আসিতে একেবারেই অক্ষম তাহারা হয় নীরবে নিজদিগকে হতভাগ্য বলিয়া ধিক্কার দিতেছে, নতুবা বড় গলায় গাল পাড়িবার চেষ্টায় আছে। আশা করি বলিয়া

দিতে হইবে না যে ইহার সবগুলিই একটা প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতার লক্ষণ।

আমাদের মনে হয়, এই পলায়নী মনোবৃত্তির কারণ সন্ধান করিতে গেলে দেখা যাইবে ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে আর্থিক জীবনের একটা বিরাট বিপর্য্যয়। বঙ্গবিভাগ এবং পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা আর্থিক জীবনের সেই বিপর্য্যয়কেই একটা শোচনীয় পরিণতি দান করিয়াছে, আমরা এই প্রত্যক্ষ নিমিত্তটাকেই একমাত্র হেতুর আসনে বসাইয়া সমস্ত সমস্যার বিচার করিতে বসি।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের এই আর্থিক বিপর্য্যয়ের কথা উঠিলেই আমরা একবাক্যে একটি কথা বলিতে শিখিয়াছি—ইহা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠারই প্রত্যক্ষ ফল। আমরা যাহারা আর একটু দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে চাই তাহারা আর একটু পিছনে ফিরিয়া বলি, এই দশ বৎসরের লীগ শাসনের ফলেই হিন্দুগণের এই আর্থিক বিপর্য্যয়। কিন্তু আমাদের ব্যাধি এবং তাহার কারণ এত সহজ এবং এত অল্পকালের মনে হয় না। এই আর্থিক বিপর্য্যয় পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার তিন চারি মাসের ভিতরেই ঘটে নাই—লীগ শাসনের দশ বৎসরের মধ্যেও ঘটে নাই—কোন আকস্মিক রাজনৈতিক কারণেও ঘটে নাই; এই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে যুগধর্ম্মের ধীরমন্থর আবর্ত্তনে, বিবিধ প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক শক্তির নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে এবং সেই বিপর্য্যয় ঘটিতেছে প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল ধরিয়া। জাতীয় জীবনের আবর্ত্তনের ভিতরে যে বিপর্য্যয়ের বীজ উপ্ত ছিল, গত দশ বৎসরের একটা বিশেষ রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সর্ব্বশেষে পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠারূপ একটি একান্ত অপ্রত্যাশিত বিরাট পরিবর্ত্তন সেই বিপর্য্যয়কে নানাভাবে সাহায্য করিয়া বর্ত্তমান পরিণতি দান করিয়াছে।

এই কথাটিকে পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইলে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুগণের আর্থিক জীবনের কাঠামোটি ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু বলিতে এখানে আমরা বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের কথাই বলিতেছি; আর্থিক জীবনে বিপর্য্যস্ত হইয়াছে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—এবং বাস্তুত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় খুঁজিতেছে মুখ্যতঃ ইহারাই। একটু ধীরভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইব, এই মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের আর্থিক বিপর্য্যয় ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে বছর পঁচিশেক আগে হইতে—আর তাহাদের বাস্তুত্যাগের সমস্যাও আজিকার নয়, এ জিনিষটিও আরম্ভ হইয়াছে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তজ্জনিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আজ আমরা একান্ত অসহায় হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই সমস্যাটি আজ এত বড় করিয়া চোখে পড়িয়াছে, স্বকীয় ধীরমন্থর রূপে এতদিন সে আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়াই চলিয়াছে। বহুদিনের ধাক্কাটা আজ কেন্দ্রীভূত হইয়া অকস্মাৎরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে পাকিস্তানের ধাক্কায়।

পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের আর্থিক জীবনের কাঠামোটি বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্রথমেই একটা জিনিস চোখে পড়ে, পূর্ব্ববঙ্গ কৃষিপ্রধান দেশ; এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্তও সেখানে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও শিল্প-সম্পদ গড়িয়া ওঠে নাই, এমন কি কোন খনিজ সম্পদও আবিষ্কৃত হইয়াছে কিনা সন্দেহ (এখানে পূর্ব্ববঙ্গ বলিতে আমি বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ অর্থাৎ পাকিস্থান রাষ্ট্রভুক্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কথাই বলিতেছি)। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এখানকার অধিবাসিগণের আর্থিক জীবনের বনিয়াদ মুখ্যতঃ কৃষি-সম্পদের উপরে স্থাপিত। কিন্তু যে উপায়-পদ্ধতিতে পূর্ব্ববঙ্গের বর্ণহিন্দুগণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে ঠিক সেই উপায়-পদ্ধতিতেই তাহারা আস্তে আস্তে ভূমি-সংস্রববিহীন হইয়া পড়িয়াছে। এইখানে গোড়ায়ই এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক বনিয়াদে একটা কৃত্রিমতা এবং তাহার ফলে একটা দুর্ব্বলতা দেখা দিল; অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গের জাতীয় জীবনের আর্থিক ভিত্তির সহিত এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক ভিত্তির যোগ রহিল না। ভূমি-সংস্রব ত্যাগ করিয়া এই সম্প্রদায়টি যদি পূর্ব্ববঙ্গে শিল্প-সম্পদ গড়িয়া তুলিতে পারিত তাহা হইলেও সে পূর্ব্ববঙ্গে শিকড় গজাইতে পারিত, কিন্তু যে কারণেই হোক, পূর্ব্ববঙ্গের কৃতীগণও তাঁহাদের শিল্প-বাণিজ্য প্রতিভার বিকাশের ক্ষেত্র পাইয়াছিলেন বা নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। আর্থিক বনিয়াদ স্ব-ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না থাকিবার ফলে এই মধ্যবিত্ত জীবনে একটা ভাসিয়া যাইবার প্রবণতা আপনা হইতেই আসিয়া গিয়াছিল।

জমির মালিক হইলেও পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুগণ জমির সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে অনেকদিন। এখন আমাদের জমির উপরে যাহা মালিকানা-স্বত্ব তাহা শুধু কাগজে-পত্রে, সুতরাং প্রাপ্য যাহা তাহাও আর চর্ম্মচক্ষুর গোচরীভূত কোন পদার্থ নহে, তাহাও নথি-পত্রে। আসলে আমরা জমিকে ভোগ করিবার জন্য যতখানি উৎসাহী ছিলাম জমির সহিত যোগ রক্ষায় ছিলাম ততখানি উদাসীন। যোগবিহীন ভোগের বিরোধটাই আজ মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আমাদিগকে দেশের মাটি হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে। আমরা অবশ্য আমাদের ছেলেবেলায় দু'এক ঘর তালুকদার দেখিয়াছি যাঁহারা খাসে জমি রাখিতেন এবং বাড়ীতে হাল-গরু রাখিতেন; কৃষকগণকে মজুর খাটাইয়া নিজেদের তত্ত্বাবধানে জমি চাষ করাইতেন এবং নিজেরাই সম্পূর্ণ ফসলের মালিক ছিলেন। বহুর পসর পূর্ব্বে এই শ্রেণীটিও নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন আমরা জমি-জমা হয় বিলিবন্দোবস্ত করিয়া পত্তনি দিয়া 'ভূঁইঞা' হইয়া বসিয়াছি, নতুবা জমাজমি ধান-কড়ারীতে বা বর্গাভাগে চাষ করাই। ফলে আস্তে আস্তে জমির স্বত্ব না হোক—তাহার ভোগস্বত্ব আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। যেটা ছিল 'ভূঁইঞা'-তন্ত্র, কালের আবর্ত্তনে তাহাই আজ দেখা দিয়াছে 'ভূয়া'তন্ত্র রূপে।

এই ভূমি-সংস্রবহীনতার ফলে পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের জীবন-যাত্রা মুখ্যতঃ নির্ভর করিত কতকগুলি মধ্যপন্থায় অর্জ্জিত অর্থের বিনিময়ে পরের শ্রম এবং শ্রমজাত দ্রব্যের উপরে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই আয়ের পন্থাগুলিকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিতরূপে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে,—

(ক) সরকারী এবং বে-সরকারী চাকুরী। ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হইবার পরে বর্ণহিন্দুগণই অগ্রসর হইয়া ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল, ফলে চাকুরীর ক্ষেত্রে তাহাদের ছিল প্রায় একচেটিয়া অধিকার। মুসলমানগণের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চেতনা সঞ্চারের ফলে আস্তে আস্তে অল্প স্বল্প মুসলমান উচ্চশিক্ষিত হইয়া কিছু কিছু চাকুরী অধিকার করিলেও দশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ-ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল হিন্দুগণেরই। লীগ-শাসনের আরম্ভ হইতেই এ ক্ষেত্রে ভাঁটা লাগিয়াছে; পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা এবং তাহার আনুষঙ্গিক কর্ম্মচারী-বিনিময় এই ভাঁটায় দুর্নিবার টান লাগাইয়া মধ্যবিত্ত জীবনের বালুচর জাগাইয়া দিয়াছে।

(খ) জমিদারী ও তালুকদারী। এই প্রথা বর্ত্তমান যুগধর্ম্মেরই বিরোধী; তাই যুগধর্ম্মের স্বাভাবিক নিয়মেই এই প্রথার বনিয়াদ টলিয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমানে অবশ্য ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশের সরকারই এই জমিদারী ও তালুকদারী প্রথার বিরোধী; কিন্তু এই সরকারী বিরোধ-নীতির বহু পূর্ব্ব হইতেই জমিদারী-তালুকদারী অনেক ক্ষেত্রে একটা ঋণাত্মক ভারস্বরূপ হইয়া উঠিতেছিল। বর্ত্তমানে একে জনমত তথা রাষ্ট্রমত জমিদারীর বিরুদ্ধে; তাহার পরে আবার মুসলমান জন-সমাজ বিশেষ করিয়া হিন্দু জমিদার-তালুকদারগণের বিপক্ষে। সুতরাং এই লোকসানের ব্যবসা চলিতেছেও না, কেহ চালাইতে তেমন উৎসাহিতও হইতেছে না।

(গ) এই জমিদারী প্রথাকে অবলম্বন করিয়া অল্প-শিক্ষিত বর্ণহিন্দুগণের ভিতরে একদল চাকুরাজীবীর সৃষ্টি হইয়া আসিতেছিল, ইহারা নায়েব-মুহুরির দল। পল্লী-অঞ্চলে এই শ্রেণীর চাকুরীয়াই ছিল খুব বেশী এবং পনর-বিশ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি, গ্রামের স্বাচ্ছন্দ্য এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করিত এই শ্রেণীর চাকুরীজীবীগণের উপরেই। কারণ, যাঁহাদের দেহের দুই পাশে উচ্চ শিক্ষা এবং উচ্চ চাকুরীর ডানা গজাইয়াছে তাঁহারা যে একবার উড়িয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছেন, আর ফিরিয়া তাকান নাই; ফলে এই সকল 'উপ-ভূঁইঞা' বা ক্ষুদে 'কর্ত্তামশাই'র দলই ছিলেন মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যমণি। বেতন ইঁহাদের খুব বেশী ছিল না, ঊর্দ্ধে মাসিক দশ বার টাকা হইতে নিম্নে তিন টাকা পর্য্যন্ত; কিন্তু তাঁহাদের নির্ভর ছিল বাজে আদায়ের উপরে, যেটার একটা গাল-ভরা ভদ্র নাম ছিল 'উপুরি'। সরল এবং অশিক্ষিত প্রজাগণ ভূমি এবং রাজস্ব-সংক্রান্ত সকল জটিলতা বুঝিতে পারিত না; এই অজ্ঞতার সুযোগে উপরি আদায়ের অনেক ফন্দি-ফিকির বাহির হইয়া পড়িত। ফলে প্রকাণ্ড বার্ষিক ছত্রিশ টাকার আয়কে অবলম্বন করিয়াই ছয় সাত জন লোকের একটি পরিবারের গ্রাম্য ভদ্রতা বজায় রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। ইহাদের আর্থিক জীবনের আরও একটু অন্দর মহলে প্রবেশ করিলে আরও তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইবে। প্রতাপান্বিত জমিদারের প্রতাপ-রশ্মি এই সকল ব্যষ্টি-কেন্দ্রের ভিতর দিয়াই প্রজা-সাধারণের সম্মুখে প্রতিফলিত হইত বলিয়া বাজারে ইহাদের একটা মর্য্যাদা ছিল, যাহার ইংরেজী নাম হইতেছে 'ক্রেডিট'; উপার্জ্জিত অর্থ ভাঙাইয়া বেশী দিন খাওয়া না চলিলেও উপার্জ্জিত 'ক্রেডিট' ভাঙাইয়া অনেক দিন চলিত। এই 'ক্রেডিটে'র বলেই ইহারা অতি সস্তা দরে ধান চাউল, ডাল, নারিকেল, লাউ-কুমড়া প্রভৃতি তরি-তরকারী 'কালে' সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিত, তার পরে মূল্য 'যখন শ্রেয় তখন দেয়'। এই প্রকারের দশ রকম টাল-বাহনার ভিতর দিয়াই দিন একরূপ ভালই কাটিয়া যাইত। কিন্তু 'তে হি নো দিবসা গতাঃ'; অতএব মধ্যবিত্ত হিন্দুর একটি বৃহৎ অংশ বৃত্তিহীন।

এই জমিদারী-তালুকদারীকে অবলম্বন করিয়া মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের আরও নানারূপ আয়ের পন্থা ছিল; তাহার সবগুলির উল্লেখ সম্ভব এবং সঙ্গত মনে না হইলেও কতকগুলির উল্লেখ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। যেমন সুদূর গণ্ডগ্রামগুলির হাতুড়ে ডাক্তার-কবিরাজ সম্প্রদায়। বড় বড় জমিদারের কাছারীবাড়ীই ছিল ইহাদের আশ্রয়। কাছারীবাড়ীর সংলগ্ন থাকাতে স্থানমাহাত্ম্য বশতঃ তাহাদেরও একটা 'ক্রেডিট' ছিল; আয়টা সর্ব্বদা ঠিক নগদ টাকায় ছিল না; এক সপ্তাহের কুইনাইন মিকচার বা 'জ্বরান্তক বটিকা'র মূল্য এক সের ধানে বা সাতটি হংসডিম্বেও চলিতে পারিত। এইরূপ মাধুকরী বৃত্তিতে যে আয় হইত তাহা সঞ্চিত হইলেই একটা উপজীবিকা পদবাচ্য হইয়া উঠিত। পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের অর্থনৈতিক কাঠামোকে পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে এই সব জমিদারী তালুকদারী-পৃষ্ঠপোষিত ডাক্তার-কবিরাজগণের কথা ভুলিলেও চলিবে না। সমূলে উৎপাটিত বনস্পতির সহিত এই সব ছিন্নমূল ব্রততীর বর্ত্তমান অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

(ঘ) মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের ভিতরে আর একটি সম্প্রদায় ছিল কুসীদজীবী। এই শ্রেণীটি আস্তে আস্তে শিকড় প্রসারিত করিয়াছিল সমাজের প্রায় সকল স্তরে। সংসারে যেমন এক জাতীয় বৃক্ষ রহিয়াছে যাহারা অতি শিশু অবস্থায়ও যদি একবার কঠিন-প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকাতেও শিকড় গাড়িতে পারে তবে কালে সেই শক্ত লোষ্ট্রেও ফাটল ধরাইবেই, ঠিক তেমনই ছিল এই কুসীদজীবি-মাহাত্ম্য। বাংলা দেশের ছোট ছোট তালুকদারগণের ইতিহাস খুঁজিয়া দেখিলে দেখিতে পাইব, তাহাদের শুধু শ্রীবৃদ্ধি নয়—তাহাদের উদ্ভবও ছিল এই লগ্নী-কারবারের সাহায্যে। বাংলা দেশের কৃষকগণই ছিল

প্রধান খাতকসম্প্রদায় এবং তাহাদের সহিত মহাজনগণের নগদ টাকার লেনদেন চলিত—প্রধানতঃ জমাজমির বা ভিটা-মাটির বন্ধকীতে। এই বন্ধকী জমি বা ভিটামাটি কিছুদিনের ভিতরে সুদের দায়েই হস্তগত হইত। ইহা ব্যতীত দায়সুদী বন্ধকীতেও বেশ একটা তালুকদারী গড়িয়া উঠিত। দেশগাঁয়ে সুদের হার ন্যূনকল্পে টাকা প্রতি মাসিক দু' পয়সা হইতে ঊর্দ্ধে দু' আনা পর্য্যন্ত ছিল; সুতরাং পল্লীবৃন্দাবনের টাকার গোপালকে উত্তমর্ণ গৃহ হইতে আনিয়া অধমর্ণ গৃহে একবার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই দেখিতে দেখিতে তিনি সুদরূপে কান্তিপুষ্ট হইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারিতেন। ঋণ-শালিসী বোর্ড স্থাপিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীটির উৎখাত হইয়া গিয়াছে।

(ঙ) হিন্দুগণের অর্থাগমের আর একটি পন্থা ছিল ছোট-খাটো ব্যবসায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূর্ব্ববঙ্গে প্রধানতঃ যান-বাহনের অসুবিধা এবং বাণিজ্যকেন্দ্রের অভাবে বড় ব্যবসা গড়িয়া ওঠে নাই। পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ কাঁচামালগুলির আমদানী-রপ্তানিও কলিকাতার মারফতে। কিন্তু স্থানীয় ছোটখাটো ব্যবসাগুলি হিন্দুদের হাতেই ছিল। কাপড়ের ব্যবসায়, চাউলের ব্যবসায় সুপারীর ব্যবসায়, অন্যান্য মুদি এবং মনোহারী দ্রব্যসমূহের ব্যবসায় প্রভৃতিতে কিছু কিছু মুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বী থাকিলেও এগুলি প্রধানতঃ ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের হাতেই। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য কিছু গেল দুষ্প্রাপ্য হইয়া, কিছু গেল সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে জন-সাধারণের হাত হইতে চলিয়া। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও স্বাধীন ব্যবসায়ের পথ রহিল না। যেটুকু ব্যবসায় চলিতেছিল তাহার পিছনেও আবার সম্প্রতি লাগিয়াছে সংখ্যাগুরুসম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একটি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অসহযোগের মনোবৃত্তি; ফলে ব্যবসায়ী তাহার ব্যবসায় গুটাইতে বাধ্য হইতেছে। সরকারী নিয়ন্ত্রণে যে ব্যবসায় চলিতেছে সেখানে হিন্দুগণ দন্তস্ফুট করিতে সক্ষম হইতেছে না। তা ছাড়া কতকগুলি পণ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য এবং নিয়ন্ত্রিত হইবার ফলে হিন্দুগণের কতগুলি স্বজাতি-ব্যবসায়ও বন্ধ হইতে বসিয়াছে; সুতা-অভাবে তাঁতী বা যোগীর তাঁত চলে না, তিল সরিষা অভাবে তেলীর ঘানি চলে না, মিছরির অভাবে ময়রার ব্যবসায় বন্ধ।

(চ) পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুগণের আর কতকগুলি ছিল তথা-কথিত 'স্বাধীন ব্যবসায়'। এই ব্যবসায়িগণের ভিতরে ছিলেন উকিল মোক্তার, ডাক্তার, অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইত্যাদি। ইহার ভিতরে উকিল মোক্তার ডাক্তার প্রভৃতি সম্বন্ধে দেখিতে পাই, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের ফলে এবং মুসলমান জনসমাজের মধ্যে একটা পৃথক্ জাতীয়তাবোধের ক্রম-প্রসারের ফলে বিশেষ প্রচার-প্রচেষ্টা ব্যতীতই একটা আর্থিক বর্জ্জন-নীতি দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে এই শ্রেণীর স্বাধীন ব্যবসায়িগণের ব্যবসায় ইতিমধ্যেই বানচাল হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে, কতকটা সঙ্গতি-সম্পন্ন অধিকাংশ পূর্ব্ববঙ্গবাসীর অপসারণের ফলে, কতকটা হিন্দু-সংস্কৃতির বিলোপের ভয়ে এবং কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষা-ব্যবস্থার অনিশ্চয়তার আশঙ্কায় ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া পলাইতেছে; অতএব স্কুল-কলেজগুলির এবং সেই সঙ্গে অধ্যাপক-শিক্ষক-শ্রেণীর দুরবস্থা অনিবার্য্য। যাঁহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাঁহারা স্বভাবতঃই গরিব; স্কুলের স্বল্প বেতনের উপরে নির্ভর করা তাঁহাদের কোন দিনই পোষাইত না। গ্রামাঞ্চলে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার ঊর্দ্ধে শিক্ষকের বেতন খুব কম। সুতরাং ইঁহাদেরও একটি 'পার্শ্ববৃত্তি' ছিল—ইহা গৃহ-শিক্ষকতা। সঙ্গতিসম্পন্ন গ্রামবাসিগণ নিজেরা এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে গ্রাম ছাড়িয়া না আসিলেও তাঁহাদের ছেলে-মেয়েদের ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং গরিব শিক্ষকগণও নিরুপায় হইয়া পড়িতেছেন।

মধ্যবিত্ত হিন্দু-সমাজের আর্থিক জীবনের আরও পরিপূর্ণ চিত্র পাইতে হইলে সমাজ-ব্যবস্থার আরও খুঁটিনাটির ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। উপরে যে সকল অর্থাগম-পন্থার আলোচনা করা হইল ইহা ব্যতীত নানা শ্রেণীর হিন্দুগণের ভিতরে কতকগুলি সমাজনির্ভর এবং জনকল্যাণের অর্থাগমের উপায় ছিল। যেমন, কুমার, নট, ধোপা, নাপিত, ভুঁইমালী, মালাকর প্রভৃতি। ইহাদের আর্থিক জীবন আবার প্রায় সম্পূর্ণই আবর্ত্তিত হইত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অবলম্বন করিয়া। হিন্দুগণের বার মাসের তের পার্ব্বণ হইবাবস্থা হইতে সমাজ-ব্যবস্থার সহিতই বেশী ভাবে জড়িত। এই বার মাসের তের পার্ব্বণ, এবং জন্মোৎসব, বিবিধ সংস্কার-অনুষ্ঠান (অন্নারম্ভ, নামকরণ, বিদ্যারম্ভ, উপনয়ন প্রভৃতি), বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি এবং ইহা ব্যতীত গৃহপ্রবেশ, বৃক্ষ-রোপণ, বৃক্ষ-বিবাহ, পুষ্করিণী-অভিষেক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের অর্জ্জিত অর্থ উপরি-উক্ত স্বব্যবসায়-নিষ্ঠ জাতিগুলির ভিতরে বণ্টিত হইত। আমাদের বর্ত্তমান নাগরিক জীবনে এই শ্রেণীসমূহ একান্ত অপরিহার্য্য নহে; কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও পল্লীর সমাজ-জীবনের সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানে ইহাদের ক্রিয়া-কর্ম্ম অপরিহার্য্যই ছিল। একটা ধর্ম্মানুষ্ঠানে কুমার প্রতিমা এবং ঘট-সরা প্রভৃতি না দিলে যেমন চলিত না, তেমনি একজন নট আসিয়া ঢোল না বাজাইলে উৎসব-অনুষ্ঠানের শুধু অসৌষ্ঠব হইত না, একেবারে শাস্ত্রবিরোধী অঙ্গহানি ঘটিত। আমার একদিনের একটি ঘটনা মনে আছে—সেদিন মালাকর সোলার টোপর দিয়া যায় নাই বলিয়া এক বর বিবাহের জন্ম যাত্রাই করিতে পারে নাই; গভীর রাত্রে সেই টোপরের ব্যবস্থা করিয়া তবে যাত্রার আয়োজন করিতে হইয়াছিল। এই শ্রেণীর লোকেরা নগদ পয়সায় কাজ করিত কম, ইহাদের অনেকেরই জায়গীর বা চাকরাণ ছিল। এই জায়গীর ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে ইহাদের কাজ-কর্ম্মের বিনিময়ে ইহারা

যথেষ্ট 'ভেট' বা 'সিধা' এবং ইনাম-বকশিস পাইত। এই 'সিধা' জিনিষটি খুব নগণ্য জিনিস ছিল না; তাহাতে চাউল-ডাল, তেল-নুন-লঙ্কা, তরিতরকারী, নারিকেল মিষ্টি প্রভৃতির প্রকার-ভেদ বা পরিমাণ কিছু কম ছিল না। এই 'ভেট' বা 'সিধা' যে কালেভদ্রেই প্রাপ্য ছিল তাহা নহে, এই প্রাপ্তিযোগের সুযোগ ছিল প্রায় হামেসাই। মোটের উপরে এই মধ্যবিত্তকে অবলম্বন করিয়া আর তাহারই সঙ্গে আর একটু এটা-সেটা করিয়াই এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এতদিন স্বজাতি ব্যবসায় অবলম্বনে বাঁচিয়া ছিল। মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের আর্থিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল জাতি হয় স্ব-ব্যবসায়চ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে। আমার পরিচিত পূর্ববঙ্গের বহু নাপিতকে কলিকাতায় 'সেলুন' স্থাপন করিতে বা রাস্তায় আস্তানা করিয়া ব্যবসায় চালাইতে দেখিয়াছি, বহু ধোপাকে কলিকাতায় আসিয়া 'ড্রাইং এণ্ড ক্লিনিং'-এর ব্যবসা খুলিতে দেখিয়াছি।

এই সকল ব্যবসায়ের কথা যখন আলোচনাই করিতেছি তখন আর এক উপ-ব্যবসায়ের কথাও এই প্রসঙ্গে আলোচিত হইতে পারে,—ইহা গুরু-পুরোহিতগিরি। কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত এই ব্যবসায় বেশ অর্থকরী ছিল; ব্যবসায়ীর সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। পাঁচ-সাত ঘর শিষ্য-যজমানকে অবলম্বন করিয়াই একটি গুরু-পুরোহিত পরিবার বাঁচিয়া থাকিত। আজকালের ক্রিয়াকাণ্ড এবং জাঁকজমকযুক্ত ধর্মানুষ্ঠান-গুলির সহিত ধর্মের সম্পর্ক একান্ত গৌণ, মুখ্য সে 'ভুইঞা'-তন্ত্রের বহির্বিকাশ। বারোয়ারির চণ্ডীমণ্ডপ, নাটমন্দির ও আটচালা ঘর যজমানের একটি সামাজিক মর্যাদাকেই সূচিত করিত। তাই দেখিতে পাই, সমাজ-জীবনের সেই মর্যাদা রক্ষা করিয়া সেই বিশেষ স্তরে অবস্থান করিবার জন্যই তাহার জীবনে অন্তঃসারশূন্য হইয়াও প্রাণপণে মধ্যবিত্ত হিন্দুগণ সেই সকল পাল-পার্বণ এবং ক্রিয়াকাণ্ডকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। যে লোক দু'বেলা অন্নসংস্থান করিতে পারে না, সেও কিছুতেই বৎসরান্তের দোল-দুর্গোৎসবকে বাদ দিতে রাজী নয়। পূর্বেই বলিয়াছি, এই 'ভুইঞা'-তন্ত্রের সমাধি ঘটিয়াছে—তাহারই সঙ্গে সহমরণে যাইতে হইতেছে গুরু-পুরোহিতগিরিকেও। এই সব দোল দুর্গোৎসবের কথা ছাড়িয়াই দিলাম; যেখানে নিত্যবিধানেও প্রাপ্তিযোগের যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল। দৈনন্দিন শালগ্রাম পূজায় নিযুক্ত পুরোহিত ব্রাহ্মণও দশ বাড়ী হইতে দিন দশ সের চাউল যোগাড় করিতে পারিতেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আতপ চাউল কাঁচকলাও শুধু দুর্মূল্য নয় দুষ্প্রাপ্যও হইয়া উঠিয়াছে, বহুক্ষেত্রে শালগ্রাম শিলাও চুরি হইয়া গিয়াছে।

আশা করি উপরের আলোচনা হইতে পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের আর্থিক জীবনের একটি মোটামুটি চিত্র পাওয়া যাইবে। এই চিত্রের পটভূমিকার উপরে যোগ করুন গত চারি-পাঁচ মাস ধরিয়া মণপ্রতি চল্লিশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা চাউলের মূল্য। তবেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ কেন বাস্তুত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে বা আরও পশ্চিমে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে।

ধান-চাউলের দুর্মূল্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই মুসলমানদের কথাও উঠিবে। তাহাদের ভিতরে সকলেই চাষী নয়, সুতরাং সকলের ঘরেই খাদ্যদ্রব্য কিংবা ধান-পাটের নগদ টাকা নাই। সকলেই কিছু চাকুরীও পায় নাই; কন্ট্রোলের শুক্রবাজার এবং কালোবাজারে সকলেরই কিছু সমান স্ফীতি-লাভও হয় নাই। মুসলমান এবং তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ভিতরেও ভূমিহীন এবং চাকুরিহীন লোক যথেষ্ট আছে। তাহাদিগকে ছাড়িয়া বর্তমান আর্থিক বিপর্যয়ের এবং দুর্ভিক্ষের চাপ সবটাই গিয়া মধ্যবিত্ত হিন্দুগণের ঘাড়ে পড়িতেছে কেন?

ইহার জবাব এই, ভূমিহীন অশিক্ষিত মুসলমান ও নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুরা এখন পর্যন্ত দৈহিক পরিশ্রম করিতে পারে, আর গত যুদ্ধের পর হইতে খাদ্যবস্তু এবং অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যও যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, কায়িক শ্রমের মূল্যও তেমনই বাড়িয়া গিয়াছে; ইহার ফলে এই জাতীয় বিত্তহীন শ্রমিকদের ভিতরে একটা আর্থিক সামঞ্জস্য আপনা আপনিই আসিয়া গিয়াছে। তা ছাড়া এই শ্রেণীর লোকের ধান-পাট জন্মাইতে না পারিলেও ফল-মূল, তরি-তরকারী, শাক-সব্জী প্রভৃতি অল্প-বিস্তর উৎপন্ন করিতে পারে, মাছ ধরিতে পারে, গোরু-পাঁঠা-ছাগল পুষিতে পারে, হাঁস-মুরগী পালিতে পারে; এই সকলের দ্বারা সে নিজের প্রয়োজনও মিটাইতে পারে, অথবা আবশ্যক অনুযায়ী বিক্রী করিয়া কিছু কিছু অর্থলাভ করিতে পারে

একটা জিনিস লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, গত পঞ্চাশের মন্বন্তরে চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল ভূমিহীন শ্রমজীবী সম্প্রদায় এবং খাদ্য উৎপাদনকারীর দল। তাহার কারণ ছিল এই—সেখানে ধান চাউলের দাম হঠাৎ যখন বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, তখন ফল-মূল, তরিতরকারী, মাছ-দুধ, মাংস-ডিম প্রভৃতির মূল্য ঠিক সমান অনুপাতে বাড়িয়া যাইতে পারে নাই; গ্রাম্য দিন-মজুরগণের শ্রমের মূল্যও অনুরূপ ভাবে বর্ধিত হয় নাই। এই আর্থিক অসঙ্গতিই এই শ্রেণীর জনসাধারণের চরম দুর্গতির প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু গত পাঁচ-ছয় বৎসরের ভিতরে একটু একটু করিয়া এই অসঙ্গতি অনেকখানি দূর হইয়াছে। তথ্য সংগ্রহ করিলে দেখা যাইবে, আজকাল পল্লী অঞ্চলে চাউলের দাম যখন সাতগুণ বৃদ্ধি পায়, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য এবং মাছ-মাংস, দুধ-ডিম প্রভৃতির মূল্যও প্রায় আনুপাতিক সমতা রক্ষা করিয়াই বৃদ্ধি পায়। জন-মজুরের পারিশ্রমিকও অনুরূপ ভাবেই বাড়িয়াছে। আমাদের গ্রামে যখন চাউলের দর চল্লিশ টাকা, অর্থাৎ স্বাভাবিক মূল্যের প্রায় আট গুণ হইয়াছে, তখন দেখিয়াছি আমাদের বাড়ী হইতে পাঁচ

মাইল দূরবর্তী ষ্টীমার ষ্টেশন পর্য্যন্ত নৌকাপথে ভাড়া লাগিয়াছে পাঁচ আনার স্থলে আড়াই টাকা। সুতরাং মোটের উপরে এই সব ভূমিহীন জন-মজুরদের অবস্থার বর্ত্তমানে কোন উন্নতি না হইলেও বিশেষ কোন অবনতিও ঘটে নাই। কিন্তু একজন স্কুল-শিক্ষকের কথা ভাবিয়া দেখুন। সাত-আট বৎসর পূর্ব্বে গ্রাম্য স্কুলের জন্য বি-এ পাস একজন শিক্ষক পঁচিশ টাকাতেই পাওয়া যাইত; এখন সেখানে না হয় চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা। আর এই যে আর্থিক অসমঞ্জস বৃত্তি তাহাও তাহার কবল হইতে সবই খসিয়া পড়িতেছে।

উপরের আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে আর্থিক জীবনে পূর্ব্ববঙ্গে আমরা একটু একটু করিয়া কিরূপে শিথিলমূল হইয়া পড়িয়াছি। বাহির হইতে সকলেই আমাদিগকে যতই সাহস অবলম্বন করিতে বলিতেছে, আমরা ততই যে কেন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি এইখানে তাহার মূল কারণের হদিস পাওয়া যাইবে। হিন্দুদের পদ্মাতীরে বহু দিন পূর্ব্ব হইতে ভাঙন ধরিয়াছে, সেই ভাঙনে চড়া পড়িয়াছে গঙ্গাতীরে; এবং তাহারই ফলে 'বালিগঞ্জে' পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা এই ভাঙনকে আগে কোন দিনই ঠেকাইতে চেষ্টা করি নাই; আজ যখন শেষ ভাঙনের ধাক্কা আসিয়াছে তখন আমরা নিয়োশিতের ন্যায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি।

অনেক দিন ধরিয়া আস্তে আস্তে যে গাছের মূলের মাটি ক্ষয় হইয়া শিকড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এবং প্রবল বাত্যায় সে যেমন তাহার প্রকাণ্ড কাণ্ড এবং বহুবিস্তৃত শাখাবাহু সত্ত্বেও আত্মরক্ষা করিতে পারে না, বরঞ্চ এগুলির দরুন বাতাসের ঝাপটাটাই আসিয়া বেশী লাগে, বিপর্য্যস্ত আর্থিক জীবন এবং শিথিলমূল সমাজ-জীবনের উপরে একটা প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িকতার ঝড় আসিয়া সেই ভাবেই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর উপরে আঘাত করিতেছে; কাণ্ডের প্রকাণ্ডত্ব এবং শাখাবাহুর বহুবিস্তার তাহাকে আরও অসহায় করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু এখন বিপদ যে শুধু মধ্যবিত্ত বর্ণহিন্দুরই তাহা নহে; আর্থিক সমস্যার সহিত একটা সাম্প্রদায়িক সমস্যা জড়িত হইয়া পড়িবার ফলে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে বিপদ সমগ্র হিন্দু-সম্প্রদায়েরই। মধ্যবিত্ত হিন্দুসকল দেশ-ত্যাগী হইলে কৃষক এবং শ্রমিক হিন্দুগণ আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেও হিন্দুসমাজের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না।

কিন্তু প্রতিকার কোন্ পথে? বাস্তত্যাগ এবং দেশত্যাগকেই একমাত্র পন্থা মনে করিয়া সেই দিকেই উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু ব্যাপারটাকে আপাতদৃষ্টিতে যত সহজ সমাধান বলিয়া মনে হইতেছে আসলে সেটা তত সহজ নহে। প্রথমেই আসে নিজের দেশ-গ্রাম বাড়ীঘর পাড়া-প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনকে অবলম্বন করিয়া একটা ভাব-প্রবণতার কথা; কিন্তু এই রূঢ় বাস্তব পারিপার্শ্বিকের ভিতরে হয়ত এই ভাব-প্রবণতা থই পাইবে না। তা ছাড়া এ কথাও সত্য যে মানুষের প্রাণরক্ষার প্রবৃত্তি তাহার সুকুমার হৃদয়বৃত্তি অপেক্ষা অনেক বেশী প্রবল।

কিন্তু সেই প্রাণরক্ষার দিক হইতে ভাবিয়া দেখিলেও উত্তর এবং পূর্ব্ববঙ্গের সোয়া কোটি হিন্দুকে পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত করিয়া রক্ষা করিবার সম্ভাব্যতা কতদূর প্রথমে সে প্রশ্ন আসে। দ্বিতীয়তঃ মনে রাখা উচিত, বহু বৎসর যাবৎ মাটি হইতে রস সংগ্রহ ও আলো-বায়ু অবলম্বন করিয়া যে গাছ বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহার শিথিল মূলে নূতন মাটি ও উপজীব্য প্রদান করিয়া তাহাকে সজীব রাখা যেরূপ সহজ, তাহাকে উপড়াইয়া লইয়া নূতন মাটিতে স্থাপন করিয়া রক্ষা করা তত সহজ নহে। সর্ব্বোপরি আর একটা কথা মনে রাখা উচিত, আমরা যে মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি এবং জীবনযাত্রার ধারাকে জীয়াইয়া রাখিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে পলাইয়া আসিতে চাই, পশ্চিমবঙ্গেও তাহা বেশী দিনের জন্য নিরাপদ নহে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মধ্যবিত্তের এই বিপদ শুধুমাত্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া আসে নাই, আসিয়াছে ধীরে ধীরে যুগধর্ম্মের আবর্ত্তনে, বহু বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ সামাজিক-শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুপ্রাধান্যমূলক রাষ্ট্র যদি প্রতিষ্ঠিতও হইয়া থাকে, তবে তাহারও এই মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি এবং জীবনযাত্রাকে আর বেশী দিন জীয়াইয়া রাখিবার সাধ্য নাই। কৃষির মূল্য এবং শ্রমের মূল্য সর্ব্বত্রই বাড়িয়া যাইবে; আয়ের মধ্যপন্থাগুলিও ক্রমে লোপ পাইবে; তখন আজ যে সমস্যা দেখা দিয়াছে পূর্ব্ববঙ্গে ঠিক সেই সমস্যাই আবার দু'দিন পরে আসিয়া দেখা দিবে পশ্চিমবঙ্গে। পলাইয়া পলাইয়া এই মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তিকে রক্ষা করার স্থান হইবে না হয়ত কোন রাষ্ট্রেই।

তাই সমস্যার সমাধানের জন্য চাই আমাদের মনোবৃত্তির এবং তৎসঙ্গে আমাদের জীবনযাত্রা পদ্ধতির অনেকখানি পরিবর্ত্তন। নূতন যুগের নূতন ধর্ম্ম তাহার চারি দিকে যে সমস্যা লইয়া আসিতেছে পুরানো যুগের মনোভাব লইয়া আমরা কিছুতেই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিব না। নূতন যুগে ভূমির সহিত সমাজ-জীবনের অভিনব যোগ স্থাপন করিতে হইবে, শ্রমের মূল্যকে নূতন করিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এবং সর্ব্বদা জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে পরের শ্রমকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার আদর্শ এবং অভ্যাসকে বদলাইতে হইবে। এই সব কথা শুনিয়া হয়ত অনেকের মনেই আশঙ্কার সঞ্চার হইতেছে যে এখন উপদেশ দেওয়া হইবে, সবাই সকল শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কার-সংস্কৃতি ছাড়িয়া মাঠে নাম, অথবা হাতিয়ার লইয়া জন-মজুর বা কুলি-মজুর হইতে আরম্ভ কর। এই আশঙ্কাটাই মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তিজাত। কৃষি শিল্প বা অন্যান্য শ্রমবৃত্তি গ্রহণ করিতে হইলেই যে শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কার-সংস্কৃতিকে

বর্জ্জন করিতে হইবে, এইরূপ পুরাতন মনোবৃত্তি পরিহার্য্য। কৃষি-শিল্পের সহিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে কোথাও কোন বিরোধ নাই, বরং একে অন্যের পরিপোষক এইটাই ত নূতন যুগের বাণী। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যাহারা উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভের পর কৃষিবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন তাহারও খাঁটি মাটির সংস্রবে আসিতে চাহেন না, সরকারী কৃষি-বিভাগে চাকুরী খুঁজিয়া বেড়ান; যে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি মৎস্যের চাষ শিখিয়া আসেন, তিনিও আসিয়া চাকুরী খোঁজেন, যিনি উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব শেখেন তিনিও চাহেন বনবিভাগে একটা চাকুরী। এইরূপ আমাদের সর্ব্বক্ষেত্রে। আমরা আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সৌকার্য্যার্থে মানব-সমাজের ভিতরে একটা অজ্ঞ-অশিক্ষিত শ্রেণী পৃথক করিয়া রাখিতে চাই—আমাদের মতলব, তাহাদেরই স্কন্ধে আরোহণ করিয়া আমরা বরাবর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করিব এবং সভ্যতা সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলিব; জগতের নববিধান এই কুব্যবস্থাকে মানিয়া লইতে যে একেবারেই নারাজ, এ কথাটাকে এখন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে ও স্বীকার করিতে হইবে। একথা বুঝিবার প্রয়োজন শুধু পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুগণের নহে, সমানভাবে মুসলমানগণেরও, কারণ মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তি শুধু হিন্দুর ব্যাধি নয়, মুসলমান সমাজকেও তাহা হয়ত অদূর ভবিষ্যতেই আক্রমণ করিয়া বসিবে।

প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা উচিত, নবযুগের জাতীয় জীবনে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে হইলে শুধু আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিলেই চলিবে না, সমাজ-ব্যবস্থারও অনুরূপ পরিবর্ত্তন এবং সংস্কারের প্রয়োজন। বর্ত্তমানে বর্ণহিন্দু বলিতে যে একটা সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাহার অনেক বিধান যে আধুনিক জীবনের বাস্তব সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে এবং তাহার ভিতরকার এমন অনেক বিধান আমরা নির্ব্বিরোধে মানিয়া চলিতেছি যাহা সাধারণ মানবতারই পরিপন্থী, একথা এখন আমরা বুঝি কিন্তু প্রকাশ্যে স্বীকার করিতেছি না। সমাজ-ব্যবস্থার এই কৃত্রিমতা আমাদিগকে জীবন-সংগ্রামে নিরন্তর দুর্ব্বল করিয়া দিতেছে। তাই বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রথমে চাই আত্মশুদ্ধি। তাহাতে সমস্যার সম্যক্ সমাধান হইবে কি না বলিতে না পারিলেও ইহা বলা যায় যে সর্ব্বপ্রকার বিপদের সম্মুখে জীবন-সংগ্রামে আমরা সবল হইয়া উঠিব,—এবং সকলেরই পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারকে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া নিজেরাই বাঁচার মত বাঁচিব।

সীতাকুণ্ড

শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

বর্ত্তমান সময়ে মানুষের কর্ম্মবহুল জীবনে অবকাশের নিতান্তই অভাব। কর্ম্মক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত অবস্থায় তার যখন একটু অবসর মেলে, তখন সে তার আবাসস্থল ও নিত্য-পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে অন্য কোথাও একটু নিশ্চিন্ত হয়ে সময় কাটাতে—যেখানে জীবনধারণের সমস্যাসমূহ থেকে কিছু কালের জন্যেও সে রেহাই পাবে, তার দেহমনের শ্রান্তি বিচিত্র নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী দেখে অপনোদিত হবে।

দৈনন্দিন জীবনের এমনিধারা একঘেয়েমি থেকে মন যখন মুক্তিলাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল তখন হঠাৎ দিন-কতকের জন্যে মুঙ্গেরে যাবার সুযোগ আমার ঘটে গেল।

গত ২রা মে ট্রেনে জামালপুর ষ্টেশনে নেমে মোটরযোগে সাত মাইল পথ অতিক্রম করে মুঙ্গেরে গিয়ে পৌছলাম।

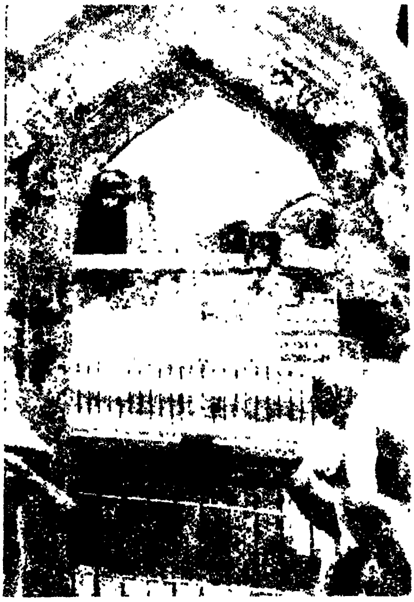
জামালপুর মুঙ্গেরের অন্তর্গত একটা মহকুমার হেড-কোয়ার্টার। বেশ বড় জায়গা বলে বোধ হ'ল। এখানে এংলো-ইণ্ডিয়ান কলোনিও আছে। এটি রেলের একটি বড় জংশন আর কারবারের জায়গাও বটে।

বাল্যকালে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতায় পড়েছিলাম—"মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া কাঁদিলাম জানকীর দুঃখে।" তখন থেকেই জায়গাটির ওপর কেমন একটা আকর্ষণ ছিল, এবার এতকাল পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে তা দেখবার সুযোগ হয়ে গেল।

মুঙ্গের জেলা ভাগলপুর ডিভিসনের অন্তর্গত। বিহার প্রদেশে সহর হিসাবে পাটনা ও গয়ার পরেই ভাগলপুরের স্থান। দরভঙ্গা সহরটিও ভূমিকম্পের পর বেশ সুন্দর ভাবে গড়ে উঠেছে।

বিহারের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভূমি বাস্তবিকই স্বর্ণপ্রসূ। প্রচুর শস্য ও খনিজ দ্রব্যের সমাবেশে এই অঞ্চলটি বিশেষ সমৃদ্ধ। কয়লা, লোহা, তামা, অভ্র, ম্যাঙ্গানিজ—কত খনিজ দ্রব্য যে এখানে ভূগর্ভে নিহিত রয়েছে তার আর অন্ত নেই।

এই প্রদেশের অধিবাসীর সংখ্যাও এখন তিন কোটির অনেক উপরে উঠে গিয়েছে। এখানকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাধিক্য, কলকারখানার প্রসার, মোটর ট্রাক্টারের প্রচলন ইত্যাদি দেখে মনে হয় যে প্রদেশটি সময়ের সঙ্গে



সীতাকুণ্ড (মুঙ্গের)
ফটো : দেবেন্দ্র বাজপেয়ী চৌধুরী

তাল রেখে দ্রুত প্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। ট্রেনে যেতে যেতে নজরে পড়ল প্রায় প্রত্যেক ক্ষেতে ষ্টিরাপ পাম্প দিয়ে জল তুলে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রামগুলিকেও দেখে বেশ সমৃদ্ধ বলেই মনে হ'ল। ট্রেনে এক গুজরাতী মুসলমান পরিবারের সঙ্গে আলাপ হ'ল। এই পরিবারের মহিলাদের দেখে মনে হয় না যে তাঁরা পর্দাপ্রথার যুগে আছেন—বেশ সহজ-স্বচ্ছন্দ ব্যবহার, পর্দার বালাই নেই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আধুনিক বেশভূষা, হাতে গুজরাতী ভাষার দেওয়ালী সংখ্যা এক অতিকায় মাসিকপত্র। তাঁদের নিকটে শুনলাম গুজরাতেও বাংলাদেশের ন্যায় হিন্দু-মুসলমান এক ভাষাতেই অর্থাৎ গুজরাতী ভাষাতেই কথা বলে এবং তাই তাদের উভয়েরই মাতৃভাষা। এঁরা যাচ্ছেন ধানবাদে—ঝরিয়াতে এঁদের কয়লার খনি আছে।

মুঙ্গের সহরটি ছোট হ'লেও ভারি সুন্দর। নদীর তীরেই রেলওয়ে ষ্টেশন। রাস্তাঘাট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। জিনিসপত্রের মূল্যও বাংলাদেশের চাইতে ঢের সস্তা।

গত বিহার ভূমিকম্পে মুঙ্গেরের প্রায় সব বাড়ীই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, কিন্তু এখন সেই সব ভগ্নস্তূপের উপর পুনর্নির্মিত সুন্দর সুন্দর হর্ম্যরাজি সহরের শোভা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে।

মীর কাশিমের বিরাট দুর্গটি এই সহরের অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য। এই দুর্গেই কালেক্টরী, জজ-আদালত ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ-সুপারের বাসভবন, উকীল-লাইব্রেরী ও অন্যান্য সরকারী আপিস অবস্থিত। ভিতরে সুন্দর পার্ক, ক্রীড়াস্থল এবং বেড়াবার জায়গাও আছে। কয়েকজন স্থানীয় জমিদারের বাটী এখানে বিদ্যমান। এঁদের মধ্যে দু-এক জন ইংরেজ জমিদারও আছেন।

মুঙ্গেরে অনেক প্রবাসী বাঙালী আছেন। এঁদের বর্তমান নেতা হচ্ছেন শ্রীনিরাপদ মুখোপাধ্যায় এম-এল-এ ও শ্রীঅঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিন সৌজন্যসহকারে এঁরা আমাকে বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভায় ও ক্লাবে নিয়ে গেলেন। সেখানে তখন মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল ও স্থানীয় শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রও গিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের, বিশেষ করে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক কথাই এঁরা জিজ্ঞেস করলেন। সংক্ষেপে বাংলার বর্ত্তমান পরিস্থিতির কথা তাঁদের নিকটে নিবেদন করে শেষে বললাম যে, বাংলাদেশে এবং বাংলার বাইরে যত বাঙালী আছেন সকলে



সীতাকুণ্ডের পাশের দৃশ্য
ফটো : রবি বাজপেয়ী চৌধুরী

সমবেত ভাবে বাঙালী জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগত অখণ্ডত্ব বজায় রাখবার জন্য মনোযোগী না হলে পূর্ব্ববঙ্গকে আসন্ন মহতী বিনষ্টির হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

সভা ও ক্লাবগৃহটি বেশ সুন্দর। পূজাবাড়ীও রয়েছে। ক্লাবে সাহিত্যালোচনাদি বেশ হয়ে থাকে। প্রবাসে থেকেও যে এখানকার বাঙালীরা নিজেদের দেশ ও সাহিত্যকে ভুলে যান্ নি, তার পরিচয় পাওয়া গেল।

একদিন আমরা কয়েকজন মিলে সীতাকুণ্ড দেখতে গেলাম। পথে একটি টিলার (ছোট পাহাড়ের) উপরে এক বাঙালী জমিদারের সুদৃশ্য বাসভবনটি দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মোটর চলাচলের রাস্তাটি এঁকে বেঁকে উপরের দিকে চলে গিয়েছে। পাহাড়ের গাত্রস্থিত গাছপালা বেয়ে উঠেছে নানা প্রকারের লতাগুচ্ছ, রাস্তার দু'পাশে দূরপ্রসারী নিবিড় অরণ্যের শ্যাম শোভা। চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য টিলাটির উপরে যেন এক মায়াপুরীর সৃষ্টি করেছে।

কিছুদূর গিয়েই মোটর থেকে নামতে হল। বড় রাস্তার পাশেই রয়েছে সীতাকুণ্ড ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য কুণ্ডগুলি। সব কয়টি কুণ্ডই প্রায় চতুষ্কোণ ও প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ভিতরে যাবার জন্যে বড় দরজা বা ফটক আছে—কুণ্ড পরিক্রমার জন্যে বাঁধানো রাস্তা রয়েছে।

সবশুদ্ধ এই পাঁচটি কুণ্ড আছে রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, ভরত-কুণ্ড, শত্রুঘ্নকুণ্ড ও সীতাকুণ্ড। সব কুণ্ডের জলই শীতল, কিন্তু সীতাকুণ্ডের জল বেশ উষ্ণ—ফুটন্ত জলের ন্যায় কুণ্ডের বুকে বুদ্বুদ্ উঠছে, কুণ্ডের জল যেন টগবগ করে ফুটছে। কুণ্ডের পার্শ্বদেশ লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। হাতে পাত্র দিয়ে জল তুলতে হয়। বহু লোক জল নিয়ে যাচ্ছে। অনেকের ধারণা এই জল পান করলে পেটের যাবতীয় ব্যারাম আরোগ্য হয়ে যায়। আমিও এক পাত্র জল তুলে নিলাম।

সীতাকুণ্ডটি সব চাইতে বড়। তার জল একটি নালী দিয়ে বাইরে বয়ে যাচ্ছে, ঐ নালীর জলে বহু স্ত্রী-পুরুষ স্নান করছে। অন্যান্য তীর্থস্থানের ন্যায় এখানেও পাণ্ডাদের অত্যাচার কোন অংশে কম নয়, তাদের হাত এড়াবার যো নেই। আমাদের এসে যখন ছেঁকে ধরলে তখন তাদের কিছু না দিয়ে অব্যাহতি পাওয়া গেল না।

এই কুণ্ডকে কেন্দ্র করে সীতাদেবীর পাতালপ্রবেশ, অগ্নিপরীক্ষা এই সব নিয়ে লোকমুখে অনেক কাহিনী গড়ে উঠেছে। এখানকার জলে নাকি প্রচুর সালফার আছে। আরো কিছুদূর এগিয়ে আর একটি কুণ্ড দেখলাম। সেটির বাহ্য আকৃতি কুণ্ডের মত বটে, কিন্তু ভিতরটা শুষ্ক—এক ফোঁটা জল নেই। এই কুণ্ড কাটানোর কাহিনীটি বেশ চিত্তাকর্ষক। কোন এক শ্বেতাঙ্গ—বোধ হয় তাঁর নাম ফিলিপ—এই কুণ্ডটি কাটিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে সীতাকুণ্ডের নিকটবর্তী স্থানে নূতন কুণ্ড খনন করলে তাতেও ঐ রকম উষ্ণ জল পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভূগর্ভ থেকে উষ্ণ জল নির্গত হওয়া দূরে থাকুক, ঠাণ্ডা জলও যথেষ্ট পরিমাণে বেরুল না। অল্পস্বল্প যা বেরুল তাও বেশী দিন কুণ্ডে স্থায়ী হতে পারল না।

সীতাকুণ্ডের জল কেন সব সময় ফুটন্ত জলের ন্যায় গরম থাকে, আর তার সন্নিকটস্থ আরো কয়েকটি কুণ্ডের জলই বা শীতল কেন, তার কারণ সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিকগণ সর্বসাধারণের গোচরীভূত করতে সক্ষম হবেন। আমরা কিন্তু আপাততঃ এই রহস্য ভেদ করতে না পেরে ফিরে এলাম।

আলোচনা

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ

অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএচ-ডি

গত অগ্রহায়ণ মাসের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সমালোচনার উত্তরে আমি যাহা লিখিয়াছিলাম, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রত্যুত্তরসহ তাহা প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণবন্দনা দ্বারা তন্ত্রসারের সূচনা করা হইয়াছে বলিয়া আমি গ্রন্থকার কৃষ্ণানন্দকে বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত অর্থাৎ বৈষ্ণব তান্ত্রিক বলিয়াছিলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রতিবাদে বলিলেন যে, শাক্তও কৃষ্ণবন্দনা দ্বারা গ্রন্থারম্ভ করিতে পারে। তাঁহার মন্তব্যে সন্তোষজনক কোন প্রমাণ না পাইয়া আমি উত্তরে লিখিলাম, "কৃষ্ণানন্দ যদি গোঁড়া শাক্ত ছিলেন, তবে তিনি কেন কৃষ্ণবন্দনা দ্বারা গ্রন্থরচনা করিলেন, ইহার ব্যাখ্যায় তিনি (ভট্টাচার্য্য মহাশয়) যে যুক্তি দিয়াছেন তাহার আলোচনা বাহুল্যমাত্র।" প্রত্যুত্তরে তিনি লিখিতেছেন, "গোঁড়াই হউক আর কোমলই হউক, 'শাক্ত' অর্থ শক্তিমন্ত্রদীক্ষিত তান্ত্রিক, বৈষ্ণবমন্ত্রদীক্ষিত তান্ত্রিক নহে।" অর্থাৎ আমি স্পষ্ট করিয়া কৃষ্ণানন্দকে বৈষ্ণব বলা সত্ত্বেও ভট্টাচার্য্য মহাশয় ধরিয়া লইতেছেন যে, আমি তন্ত্রসার রচয়িতাকে শাক্ত বলিয়াছি।

আমি মূল প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার অর্থ এই যে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে রামতোষণ সম্ভবতঃ বৃদ্ধবয়সে প্রাণতোষণী রচনা করিয়াছিলেন; সুতরাং তদীয় ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ কৃষ্ণানন্দ বৃদ্ধবয়সে তাঁহার প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে তন্ত্রসার রচনা করিয়া থাকিবেন; তবে যদি ১৫৮০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত তন্ত্রসার পুঁথির বিবরণ সত্য হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণানন্দ যৌবনে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গ্রন্থখানি লিখিয়া থাকিতে পারেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতিবাদে তন্ত্রসারের প্রাচীনতর পুঁথির উল্লেখ থাকায়, আমি উত্তরে লিখিয়াছি যে, কৃষ্ণানন্দের জীবনকাল যদি ১৫৯৫-১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ অনুমান করা যায় এবং যদি ধরা যায় যে, তিনি জীবনের প্রথমার্দ্ধে তন্ত্রসার রচনা করিয়াছিলেন, তবে আপত্তি করিবার কিছু নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার মূল প্রবন্ধের "যৌবন" এবং 'উত্তরে'র "জীবনের প্রথমার্দ্ধ" কথা দুটিতে তালগোল পাকাইয়া স্থির করিয়াছেন যে, আমার ঐ সিদ্ধান্তে এক পুরুষের গড়পড়তা ২৫।২৬ বৎসরের বেশী হইয়া পড়ে। কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য নাই যে, এই গড়ের হিসাবে রামতোষণের অজ্ঞাত জন্মতারিখটি একটি অত্যাবশ্যক অঙ্ক। রামতোষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া যদি ধরা যায় তবে এক পুরুষের গড়ে ২৫।২৬ বৎসরের বেশী হইবে কোন হিসাবে?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একখানি তন্ত্রসার পুঁথির রচনাকাল ১৫৫৪ শকাব্দ। আমি পুঁথিখানি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছি যে উহার অস্পষ্ট তৃতীয় এবং চতুর্থ অঙ্কের পাঠ অনিশ্চিত। তাঁহার পাঠকে অনিশ্চিত এবং কাল্পনিক বলা সত্ত্বেও আমি অপর কোন পাঠ দেই নাই, এই বিষয়ের প্রতি তিনি এবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। যাহার পাঠ অনিশ্চিত, তাহার যা হোক একটা পাঠ দিলেই কাল্পনিক পাঠের সৃষ্টি হয়। তাহাতে বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানে কোনই সহায়তা হইবে না।

রঘুনাথ শিরোমণির জন্মতারিখ অজ্ঞাত। আমি অজ্ঞাতের মতানুসারে ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দ লিখিয়াছিলাম। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে উহা ১৪৬০-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হইবে। কিন্তু এই তারিখও কাল্পনিক, অকাট্য প্রমাণসিদ্ধ নহে। এবার তিনি তাঁহার তারিখটিকে "বিনা যুক্তি বিচারে অগ্রাহ্য" করার উল্লেখ করিয়াছেন। যাহার পক্ষে বিশেষ কোন যুক্তি আছে বলিয়া আমি মনে করি না, তাহার বিচার করিব কি? বিশেষতঃ আমার প্রবন্ধ ছিল কৃষ্ণানন্দ সম্বন্ধে; রঘুনাথ শিরোমণির তারিখ উহাতে প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে।

তন্ত্রসারের খণ্ডিত পুঁথির সংখ্যাই বেশী। বঙ্গবাসী সংস্করণ তন্ত্রসারে ব্যবহৃত সর্ব্বপ্রাচীন পুঁথিতে পূর্ণানন্দ এবং তদীয় শ্রীতত্ত্ব চিন্তামণির উল্লেখকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াও কেন আমি ঐ পুঁথির তারিখের ১৫৮০ শকাব্দ পাঠে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছি, ইহাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৌতুক বোধ করিয়াছেন। অথচ লেখবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা সকলেই অবগত আছেন যে, সাধারণ লেখার পাঠোদ্ধার যত সহজ, অঙ্কের পাঠোদ্ধার তদপেক্ষা বহুগুণে কঠিন।

পরিশেষে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৬০১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত তন্ত্রসারের একখানি পুঁথির তারিখ পরীক্ষার জন্য তদীয় বাসগৃহে আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু এই তারিখ পরীক্ষায় লাভ কি? আমার মূল প্রবন্ধে তন্ত্রসার রচনার যে কাল নিরূপণ করিয়াছিলাম, এ তারিখ ত উহার পরবর্ত্তী। তিনি অপর যে দুটি পুঁথির উল্লেখ করিয়াছিলেন, উহার তারিখ প্রাচীনতর এবং পণ্ডিতগণের পরীক্ষণীয়। তন্মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানি পরীক্ষা করিয়া উহার তারিখ বিষয়ে আমার বক্তব্য আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ নরসিংহ বাচস্পতির নামাঙ্কিত যে তন্ত্রসার পুঁথির তারিখ তিনি ১৫৬৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে পুঁথির তারিখ অবশ্য পরীক্ষণীয়।*

* এই সম্বন্ধে আর কোন বাদানুবাদ প্রকাশিত হইবে না—প্রবাসী-সম্পাদক।

ঐতিহাসিক খননের কতিপয় সূত্র

শ্রীগোপীনাথ সেন

অনেকেই মনে করেন যেখানে সেখানে খনন করিলেই ঐতিহাসিক কোন নিদর্শন আবিষ্কার করা সহজসাধ্য হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ অবৈজ্ঞানিক ভাবে অনুসন্ধান করিতে গিয়া যে বিফলমনোরথ হইবার সম্ভাবনা আছে সে কথা ভুলিলে চলিবে না। বিশেষ ভাবে অধ্যয়নপূর্ব্বক বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিলেই তবে আবিষ্কারকের প্রয়াস সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে। কেবলমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া খননকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। আমি নিম্নে কয়েকটি প্রণালীর উল্লেখ করিলাম যাহা খননকারীদের সাহায্যে আসিতে পারে।

(১) গ্রন্থবিবরণী (Bibliography), মানচিত্রাঙ্কন বিদ্যা (Cartography), মুদ্রাবিজ্ঞান (Numismatics) এবং যাদুঘরের সংগৃহীত বস্তু হইতে প্রথমতঃ খননবিদ্যা আরম্ভ করিতে হইবে।

(২) প্রাথমিক ছাত্রগণকে নিকটতর কোন স্থানে খনন-কার্য্য করিবার জন্য যাইতে হইবে।

(৩) এই খননসূত্রগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে যে স্থানটি শিক্ষাবিদ্দের মনে ধরিবে সেই স্থানটি অঙ্কন করিয়া ঐ স্থানটির উপর এমন একটি চিহ্ন রাখিতে হইবে যাহাতে উড়োজাহাজের উপর হইতেও পরিষ্কার ভাবে স্থানটি সম্পূর্ণ দেখা যাইতে পারে। যে স্থানটি হয়ত সত্যই খুঁড়িবার প্রয়োজন ছিল, ভুলবশতঃ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে তাহার উপর বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হইবে।

প্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহের মধ্যে যদি কোন পুরনো দলিল পাওয়া যায় তাহা হইলে ইহার বিশুদ্ধতা, ভাবার্থ এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন ও ধৈর্য্য সহকারে অনুসন্ধান করিলে প্রাচীন আমলের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে পারা যাইবে। প্রাচীন তথ্য জানিতে হইলে প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদিও অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা আবশ্যক।

প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী হইতে খননকারীরা প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারেন। সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে একটি নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানের এবং সেখানকার গুহাদি

নির্ম্মাণের কাল নির্ণয় করা। কোন ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক কিংবা পরিব্রাজকের বিবরণী হইতে এ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ধরা যাক, প্রাচীন মহাকাব্যের যুগের কথা। রামায়ণে বর্ণিত আছে রামচন্দ্র অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। সেই কাব্যে রামায়ণী যুগে স্থানটির পারিপার্শ্বিকের যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে হয়ত বর্ত্তমান অযোধ্যার কিছু কিছু মিল আছে। সকল শ্রেষ্ঠ কাব্যে যে সকল স্থানের অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে তার মূলসূত্র পাই আমরা সাধারণ বটতলার অল্প-মূল্যের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে। সিংহল দেশীয় মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থের আখ্যান হইতে বহু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। মহাভারতে অঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র প্রভৃতি বহু দেশের নাম আছে। পৌরাণিক কাব্যের বহু গল্পের মধ্যে ইতিহাসের মালমশলা ভরপুর। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা পড়িয়া বৈদেশিক রাজগণ এই দেশ জয় করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। গ্রীসদেশীয় একজন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষে বহুজাতির বাস, তন্মধ্যে গঙ্গারিড জাতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (অথবা সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী)। ইহাদের চারি সহস্র বৃহৎকায় সুসজ্জিত রণহস্তী আছে, এই জন্যই অপর কোন রাজা এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই। স্বয়ং আলেকজাণ্ডারও এই সমুদয় হস্তীর বিবরণ শুনিয়া এই জাতিকে পরাস্ত করিবার দুরাশা ত্যাগ করেন।"

জি, এ, গ্রীয়ার্সন 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান' সংগ্রহ করিয়া উক্ত রাজার দেশ কোথায় ছিল, কাব্যের বর্ণনা অনুসরণ পূর্ব্বক তাহা আবিষ্কার করিবার প্রয়াস পান। তিনি বুকানন-বর্ণিত প্রণালীতে প্রথমে কাজ আরম্ভ করিয়া দেন। সেই কাব্যে লিখিত আছে 'কোট অর্থাৎ বহু স্থান ব্যাপিয়া মৃত্তিকার বৃহৎ একটি গড়' বিদ্যমান এই কথাটির উপর নির্ভর করিয়া তিনি রংপুরে উপরোক্ত স্থানটি আবিষ্কার করিতে যান। তিনি যাহা পড়িয়াছিলেন সে অনুযায়ী কোন চিহ্ন সেখানে দেখিতে পাইলেন না। তিনি ময়নামতীর পুর্ব্বে কোন প্রকার খাত কিংবা দেওয়া দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু ইহার চল্লিশ ফুট দূরে এগুলি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। নদীর মোহনা যেদিকে অবস্থিত বলিয়া কাব্যে বর্ণিত আছে তিনি ঠিক তাহার বিপরীত দিকে সেটি প্রবহমাণ দেখিলেন। শহরের দুই মাইল দক্ষিণে ময়নামতীর কোট তাঁহার নজরে পড়িল। তাঁহার পুস্তক হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"It is in the form of a parallelogram rather less than a mile from north to south, and half a mile from east to west. The following sketch taken in riding round it, will enable the reader more easily to understand it than my account. The defences consist of a high rampart of earth, which at the south-east corner is irregular, and retires back to leave a space that is much elevated, and is said to have been the house of

the Raja's minister (Divan-Khana). On the east side I observed no traces of a ditch, nor gate, but a ditch about 40 feet wide surrounds the other three faces. In the centre of each of these is a gate defended by outworks, and in these are a good many bricks. At each angle of the fort has been a small square projection, like a sort of bastion, extending however only across the counter scrap to the ditch; and between each gate and the bastion at the corner are some others of similar construction. The earth from the ditch has been thrown outwards, and forms a slope without a covered way. At the distance of about 150 yards from the ditch of the north-east and south sides, are parallel ramparts and ditches which enclose an outer city, where it is said the lower populace resided. Beyond these on the south is another enclosure, in which it is said the horses were kept. Parallel to the west side of the city at about the distance of 150 yards runs a fine road very much raised but its ends have been swept away by changes that have taken place in the rivers." (*T. R. A. S. B.*, 1778, pp. 136).

এই বিস্তৃত বর্ণনা হইতে সাধারণ খননকারিগণ আবিষ্কার করিবার পদ্ধতির হদিস পাইতে পারেন।

শিলা, মুদ্রা, মূর্ত্তি অথবা ধাতুফলকাদিতে উৎকীর্ণ লিপি পুস্তকগুলি (Epigraphic Texts) খুব মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। শিলালিপি ব্যতীত তাম্রফলক, বা পাহাড়ের গাত্রে লিখিত লিপি কিংবা স্মৃতিস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি-পুস্তকে কিছু তথ্য যদি পাওয়া যায় তাহা হইলে পাঠোদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। মুদ্রাগুলিতে খুব প্রাচীন আমলের রাজাদের সম্বন্ধে বহু তথ্য উৎকীর্ণ থাকে। যেমন অশোকের শিলালিপি হইতে সম্রাট্ অশোকের প্রজানুরঞ্জন-প্রবৃত্তির কথা জানা যায়। এই সকল শিলালিপি হইতে তৎকালীন দেশের অবস্থা অনুমান করিতে পারি। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় তাঁহার বীণাবাদনরত মূর্ত্তি দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় তিনি একজন সঙ্গীতপ্রিয় নৃপতি ছিলেন। গুপ্তরাজগণের শিলালিপিসমূহে বাংলার বহু পরাক্রান্ত নৃপতির নাম পাওয়া যায়। পাহাড়পুরের খোদিত প্রস্তর কিংবা পোড়ামাটির ফলক হইতে তদানীন্তন সমাজের বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

প্রাচীন মুদ্রাগুলি হইতে দেশের সভ্যতার স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। গুপ্তযুগের পরে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হয়। তৎপূর্ব্বে রৌপ্য এবং তাম্রমুদ্রার প্রচলন ছিল। আধুনিক যুগে প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার করিবার যে সকল প্রণালী সমুদ্ভূত হইয়াছে তন্মধ্যে শিলালিপিসমূহের পাঠোদ্ধারের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই সকল লিপি যে স্থানে আছে সেই স্থানে কিংবা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ যত্ন সহকারে পরিদর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সকলপ্রকার শিলালিপি, স্থূল নক্সা, মহাদৃশ্যাবলী (panoramas) এবং নানা প্রকার প্রাচীন চিত্রাবলী ইত্যাদি হইতে খননের সূত্র আবিষ্কার করিবার হদিস মিলিতে পারে।

প্রাচীন নাবিক এবং বণিকেরা বাণিজ্যব্যপদেশে দেশ-দেশান্তর হইতে এখানে আসিত। তাহাদের কাহিনীগুলি এক দিন ছিল ইতিহাসের বিষয়বস্তু, কিন্তু আজ তাহা ঐতিহাসিক সত্য ও তথ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া রূপকথা, লোকসাহিত্য এবং সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে। এই সমস্ত কাহিনী অনুধাবন করিলে অনেক ক্ষেত্রে খনন-কার্য্যে বিশেষ সাহায্য পাইতে পারি। চাঁদসদাগর, শ্রীমন্ত প্রভৃতি সওদাগরদের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী হইতে একদা যে ভারতের নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জের সহিত তাহাদের বাণিজ্যিক আদানপ্রদান ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, সিংহলদেশের প্রাচীন কাহিনী পড়িয়া সে যুগে সেই স্থানের সহিত পরিচিত হইবার জন্য কত ভারত-সন্তান ঘর ছাড়িয়া অজানার উদ্দেশে পাড়ি দিয়াছিল। সেই সকল দেশে প্রাচীন ভারতীয় পদ্ধতিতে নির্ম্মিত মন্দির দেখিয়া অতীত ভারতবর্ষের প্রভাব কতটা বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা অনুমান করা যায়। ঐরূপ দেশের নামের তালিকা (toponomy) হইতেও আবিষ্কারের অনেক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। এম, রেগে, ডুসাউড বলিয়াছেন—'toponomy and topology remain useful auxiliary training but are inadequate. It is necessary to call in archaeology.' প্রাচীন দেশগুলির নাম আবিষ্কার করা খুবই কঠিন, তাহা হইলেও এই বিষয়ে

সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইলে প্রত্নতত্ত্ব পড়া আবশ্যক। লোকসাহিত্য কিংবা প্রাচীন কাব্যগুলি খুব যত্ন সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করিয়া সেগুলিতে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলসমূহের নাম এবং বর্ণনা হইতে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া মোটামুটি একটি মানচিত্র আঁকিয়া বর্তমান মানচিত্রের সহিত তুলনা করিলে এ সম্বন্ধে অনেকটা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিবার সম্ভাবনা আছে। প্রত্নতত্ত্বাদি আবিষ্কারকার্য্যে স্থানীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রাম্য মোড়ল, কৃষক, সাধুসন্ন্যাসী, পিয়ন, পেয়াদা এবং অভিজ্ঞ বৃদ্ধব্যক্তি প্রভৃতি সকলের নিকট হইতেই নানা খবর সংগ্রহ করা যাইতে পারা যায়। যদি কোন স্থানে লোকমুখে তথ্য সংগ্রহ করিবার সম্ভাবনা না থাকে তাহা হইলে স্তূপ, ভগ্নপ্রাসাদ কিংবা অন্য কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া চেষ্টা করা প্রয়োজন। গ্রাম্য লোকদের মুখ হইতে নানা প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাকে ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে যাচাই করিয়া লইবার চেষ্টাও করিতে হয়। অবশ্য তাহাদের অনেক অবান্তর কথা শুনিতেও হইবে, কিন্তু তাহাতে বিরক্তি বোধ করিলে চলিবে না। গল্প শুনিতে শুনিতে স্থানগুলি কোথায় আছে তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য তাহাদের অনুরোধ করা প্রয়োজন। সেইস্থানে ঠিক তাহাদের এক জন হইয়া কাজ করিতে হইবে। তাহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য গ্রাম্য পঞ্চায়েতের বৈঠক ও বিভিন্ন পূজাপার্ব্বণ ইত্যাদিতে যোগদান করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে আবিষ্কারপ্রয়াসী তাহাদেরই এক জন। তাহাকে কিছু কিছু চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে। বিনামূল্যে গ্রাম্য লোকদের চিকিৎসা এবং সেবা-শুশ্রূষাদির ব্যবস্থা করিলে তাহারা কৃতজ্ঞতাবশতঃ প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কারে সাহায্য করিবে।

প্রাচীনকালে সমগ্র এশিয়ার বহু অঞ্চল এবং মিশর দেশের বড় বড় শহর ও গ্রামগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রত্নকথা খুবই চিত্তাকর্ষক। আর্ভিন সাহেব ঐতিহাসিক খননের নিম্নলিখিত আটটি ধারার উল্লেখ করিয়াছেন :—

(১) সাধারণ নগর বা জেলার বিস্তৃত বর্ণনা
(২) কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের সঙ্কেত
(৩) ভূতত্ত্বের সঙ্কেত
(৪) মানুষের কার্য্যপ্রণালী
(৫) বৃক্ষের বর্দ্ধনের সঙ্কেত
(৬) জমির রং
(৭) চৌম্বক সঙ্কেত
(৮) জীবিতদের সঙ্কেত

ঐতিহাসিকেরা ভগ্ন পাষাণ-স্তূপের মধ্যে অতীত যুগের প্রাণস্পন্দন শুনিতে পান, ভগ্নস্তূপ সরাইয়া তাঁহারা অতীত যুগের আত্মাকে উদ্ঘাটিত করেন।

চেষ্টা থাকিলে দুর্গম স্থানেও খননকার্য্য করা যায়। জে. ডি. মরগান মরুভূমিতেও কিরূপ প্রাগৈতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করা যায় তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"Prehistoric and primitive cemeteries can be recognized in the desert where the ground shows a quantity of spots, of clear sand very near one another. The spots corresponding to the tombs of which the earth is heaped up are caused by a depression which the wind fills afterwards with fire sand. The tombs show the same external appearance as the vaults of an early historic period, it is necessary to make some investigations, then, once the cemetery is discovered, it is enough to attack all the points in which an iron bar will easily pierce again."

আবিষ্কারের কতকগুলি মাত্র প্রণালীর উল্লেখ করা হইল। ভূগর্ভে প্রাচীন কৃষ্টি ও সভ্যতার অনেক সম্পদ নিহিত আছে। খননকারীদের স্মরণ রাখিতে হইবে তাহা আবিষ্কার করিতে হইলে ধৈর্য্য, অধ্যবসায় এবং শিক্ষা এই তিনটির বিশেষ প্রয়োজন।

পুস্তক-পরিচয়

স্বর্গাদপি গরীয়সী—(তৃতীয় খণ্ড) শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিঃ। ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—৪৲ টাকা।

তৃতীয় খণ্ডে এই সুবৃহৎ উপন্যাস শেষ হইয়াছে। বাংলা ও বিহারের পটভূমিতে সেকালের সমাজ ও রীতিনীতি-পরিপুষ্ট এক শুচিশুভ্র জননী-মূর্ত্তিকে লেখক পরিপূর্ণ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই মতিমময় জীবন বাহিরের সংঘাতে চঞ্চল নহে—কিন্তু চঞ্চল নহে বলিয়াই যে বৈচিত্র্যহীন তাহাও নহে। বিস্তীর্ণ ভারতের ক্ষুদ্র এক কোণে শান্তিময় নীড় বাঁধার মহোৎসব এর লাগিয়াই আছে। পুষ্পকোরক বৃন্তলগ্ন হইয়াও বাহিরের আলোককে আত্মসাৎ করিয়া মন্থের উত্তাপে যেমন বহু বর্ণরঞ্জিত হইয়া একদিন আত্মপ্রকাশ করে—তেমনি স্নেহ-প্রীতি-প্রেম-সখ্য-সঞ্জাত বৃত্তিগুলির বৈচিত্র্যে অন্তর-লাবণ্যে উদ্‌ভাসিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছেন এই মা। পলাতক কাল পৃষ্ঠে কোন চিহ্ন বহন করে না—স্মৃতিভারে সে লুব্ধ নয়, কিন্তু স্মৃতি-সৌরভে তার প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত অভিষিক্ত। নিরবধি কালের পৃষ্ঠপটে মাতৃ-কেন্দ্রিক বহু ছবি বহু রীতি-আচার—বহু কাহিনী-সংলাপ ফুটিয়াছে। যে দাগ জীবনের অস্থিমজ্জায় আঁকা থাকে—সে দাগ এই কাহিনীর মধ্যে নাই—থাকিলেও এ কাহিনীর উপজীব্য তা নয়। এর মধ্যে আছে মৃদু কমল-সৌরভ—যে কমলের চারিদিকে ঘিরিয়া আছে উর্ম্মিকম্পিত জলরাশি—কমলবৃন্তের প্রতি দণ্ডের—কাঁটার আঘাত অদৃশ্য, জলের দাগও পাপড়িকে ম্লান করে না। তবু সম্পদে-বৈচিত্র্যে-ভরা এই কাহিনীও হৃদয়ে কৌতূহল জাগায়—অন্তরকে আচ্ছন্ন করে—এবং মধুর রসে আপ্লুত করিয়া ঊর্দ্ধলোকে লইয়া যায়।

গভীর নিষ্ঠা ও বাস্তববোধের দায়িত্ব লইয়া লেখক স্বর্গাদপি গরীয়সী রচনা করিয়াছেন। এই রচনা তাঁর সার্থক ও সুন্দর হইয়াছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

নেতাজীর জীবনবাদ—শ্রীঅনিল রায়। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ৬৪, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১০৬, মূল্য ১৷০।

পাঁচটি অধ্যায়ে সংক্ষেপে অথচ পরিষ্কার ভাবে সুভাষচন্দ্রের আদর্শ ও কর্ম্মজীবনের আলোচনা করা হইয়াছে। নেতাজী একদিকে যেমন মহাত্মাজীর অনুরক্ত হইয়াও ভিন্ন আদর্শের অনুগামী, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার আদর্শ মার্ক্সবাদ ও নাৎসীবাদ হইতেও পৃথক। তিনি সমাজতন্ত্রবাদ মানেন অথচ তিনি জাতীয়তাবাদী—নাৎসী সম্প্রদায়ের মত বিকৃত সমাজতন্ত্রবাদী নহেন। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাই নেতাজীর জীবনের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। সুভাষচন্দ্রের জীবনবাদকে এজন্য ভারতীয় সাম্যবাদ বলা চলে। সমসাময়িক সাম্প্রদায়িকতা ও নানা মতবাদের ঊর্দ্ধে ও বাহিরে থাকিয়া বাঙ্গালী সুভাষচন্দ্র যে আদর্শ দেশের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা জাতীয় জীবনের অমূল্য সম্পদ। গ্রন্থকার অতি সুন্দর ভাবে নেতাজীর জীবনবাদ বাঙ্গালী পাঠকের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। দেশের যুবকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন।

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ— শ্রীঅনিল রায়। পৃষ্ঠা ২১৬, মূল্য ২৷০।

দমদম জেলে লেখক যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাকে ভিত্তি করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকে মার্ক্সবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদকে একই জিনিষ বলিয়া ভুল করেন। মার্ক্সের দর্শন পূর্ব্ববর্ত্তী সকল দর্শন হইতে পৃথক, ইহা জড়বাদের এবং ইতিহাসের আর্থিক ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রেণীসংগ্রাম ইহার মূল কথা এবং এই দার্শনিক মতবাদ অনুসারে শেষ পর্য্যন্ত শ্রেণীহীন ও রাষ্ট্রহীন সমাজই মানবজাতির পরিণতি। লেখক বহু যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা মার্ক্সবাদের অযৌক্তিকতা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। এই

গ্রন্থ পাঠে এদেশে বর্ত্তমানে বহুল প্রচারিত মারাবাদের প্রকৃত স্বরূপ ও ভারতীয় সভ্যতার উপর উহার প্রতিক্রিয়া কি তাহা সুপরিস্ফুট হয়। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

সমাজ, সংস্কার ও সংগঠন—নবভাব লাইব্রেরী, ১নং কাঁকুড়গাছী কার্ট লেন হইতে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ।/০ আনা মাত্র।

হিন্দু-সমাজকে সংহত ও শক্তিশালী করিবার ব্রত লইয়া এই পুস্তিকা প্রকাশিত। বর্ত্তমান যুগে যে প্রতিযোগিতার সম্মুখে এই সমাজ পড়িয়াছে তাহাতে বিজয়ী হইতে হইলে সুসম্বদ্ধ হইতে হইবে, অনেক সময় হইতে হইবে আক্রমণশীল। হিন্দু-সমাজ অনেক দিন হইতেই ছত্র-ভঙ্গ। এই সমাজকে নূতন ভাবে সংগঠিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা আরম্ভ হয় এক শত বৎসর পূর্ব্বে, রামমোহন রায়ের সময় হইতে। আজ স্বাধীন ভারতে সেই চেষ্টায় নূতন করিয়া হাত দিতে হইবে, এই পুস্তক তার সহায়ক হইবে। নোয়াখালিতে সম্প্রদায়-বিশেষের বর্ব্বরোচিত আক্রমণের পর সে সময়ে রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল ও এরূপ আপদ নিবারণের জন্য যে ব্যবস্থাদি প্রস্তাবিত হইয়াছিল, ইহাতে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ সংগ্রহের একটা মূল্য আছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব

জনগণ-অধিনায়ক (নাটক)—শ্রীসমর সরকার। এইচ, সরকার এণ্ড সন্স। ৩এ, লাইব্রেরী রোড, কলিকাতা। মূল্য—দুই টাকা।

দেশের জ্ঞানী, গুণী, কবি, মনীষী এবং মহান্ ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করিয়া জীবনী-নাট্য রচনার পথ প্রদর্শক সম্ভবতঃ 'বনফুল'। 'শ্রীমধুসূদন' এবং 'বিদ্যাসাগর' বাংলা নাটকের বহু দিনের এই অভাব পূর্ণ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বাংলার প্রখ্যাতনামা নাট্যকারেরা জীবনী-নাটককে প্রায় উপেক্ষা করিয়াই গিয়াছেন। আনন্দের বিষয় লেখক আমাদের এই ধরণের আর একখানি নাটক উপহার দিয়াছেন এবং বলিতে দ্বিধা নাই তিনি সাফল্যলাভও করিয়াছেন আশাতীত রূপে। বৃটিশ-শাসনে নিপীড়িত জাতির পরবশ্যতার অবসান ঘটাইবার জন্য 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' এবং তাহার সর্ব্বাধিনায়ক রূপে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অলৌকিক বীরত্ব এবং সংগ্রাম-কুশলতার কাহিনী আজ জনসাধারণের চিত্তে বিপুল মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। ভারতের বাহিরে দেশের মুক্তি-সংগ্রামের এই অধ্যায়টি গ্রন্থকার অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করিয়া নাটকের মাধ্যমে পরিবেশন করিয়াছেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনীতিক প্রজ্ঞা, ভবিষ্যদ্দৃষ্টি, ধৈর্য্য, সাহস, সংগ্রাম-পরিচালনায় তাঁহার অপূর্ব্ব দক্ষতা—সৈনিকদের উপর তাঁহার মহান্ ব্যক্তিত্বের অতুলনীয় প্রভাব—জাপানের সাহায্যগ্রহণ সত্ত্বেও 'আজাদ-হিন্দ-গবর্ণমেণ্ট'কে জাপানের তাঁবেদার হিসাবে বিনিয়োগ করিতে না দিবার জন্য তাঁহার দৃঢ়তা—আপন জীবননাশে উদ্যত গুপ্তঘাতকের প্রতি করুণাপ্রদর্শন প্রভৃতি নেতাজীর বিরাট্ ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম-প্রচেষ্টার উজ্জ্বল রূপটি ছোটখাটো ঘটনা-বিকাশের সাহায্যে কুশলী নাট্যকার পাঠকের মানসলোকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। স্বাধীনতা-যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ হোতা সুভাষচন্দ্রের 'নেতাজী' রূপটি তিনি সার্থক ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। সংলাপ মাঝে মাঝে একটু দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও তাহার মাধুর্য্যের গুণে পড়িতে কোথাও বিরক্তিকর মনে হয় না। 'জনগণ-অধিনায়ক' আপন রসমাধুর্য্যে জনচিত্তে আসন লাভ করিবে তাহা নিশ্চিত।

শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী

তন্দ্রাতুরা—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স। ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—৪৻৹।

রাজনৈতিক পটভূমিকায় লিখিত, ৩৯৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত একখানি সুবৃহৎ উপন্যাস। নানা প্রকৃতির বহু চরিত্র উপন্যাসে স্থানলাভ করিয়াছে, কিন্তু কোন একটি চরিত্রও বিশেষভাবে মনকে নাড়া দিতে সক্ষম হয় নাই। উপন্যাসের একটি প্রধান চরিত্র বিশু—কিন্তু যে রূপে উপন্যাসের সূচনায় তার দেখা পাওয়া গিয়াছিল একটি গুপ্তসমিতির সভ্যদের সংস্পর্শে আসিয়া, বিশেষ করিয়া

ইণ্টারন্যাশনালেরবইইণ্টারন্যাশনালেরবইইণ্টারন্যাশনালেরবইইণ্টারন্যাশনালেরবইইণ্টারন্যাশনালেরবইইণ্টারন্যাশনালেরবই

মানবিক ও পরমাণবিক

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়

মানবকল্যাণে নিয়োজিত পরমাণু শক্তি সমগ্র পৃথিবীতে কী স্বপ্নাতীত আশীর্বাদই না বহন করে আনতে পারে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীকে সেই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করে আর এক সর্বনাশা যুদ্ধের জন্য পরমাণু শক্তির একচেটিয়া মালিকানা অধিকারের যে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তারই চমকপ্রদ ও তথ্যপূর্ণ বিবরণ। দাম ২ টাকা আট আনা

অবরোধ

বিজন ভট্টাচার্য

ক্ষয়িষ্ণু ধনিক শক্তি আর আগামী সভ্যতার ধারক নবজাগ্রত শ্রমিক শক্তি—এই দুয়ের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ওপর ভিত্তি করে লেখা পূর্ণাঙ্গ নাটক। এই লেখকেরই লেখা কৃষক জীবনের অপরূপ আলেখ্য 'নবান্ন' নাটকের পর শ্রমিক সমস্যামূলক এই নাটক নাট্যসাহিত্যে নতুন পথের নির্দেশ দেবে। দাম ২ টাকা আট আনা।

প্যারীর পতন

ইলিয়া এরেনবুর্গ

স্টালিনপ্রাইজপ্রাপ্ত যুগান্তকারী উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। গত মহাযুদ্ধ এবং তার আগের ফরাসী সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবনের নিখুঁত ছবি। একটি মহান জাতি ও দেশের মর্মন্তুদ পতনের কথাচিত্র। অনুবাদ করেছেন : অমল দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র মজুমদার, অনিলকুমার সিংহ। দাম প্রতি খণ্ড : ৪৲, ৩৲, ৪৲। একত্রে তিন খণ্ড—দশ টাকা।

আধুনিক চীনা গল্প

লু স্যুন, লাও চাও, তিংলিং প্রভৃতি

নিষ্ঠুর বিদেশী শাসকের শোষণ ও অত্যাচারে রিক্ত ও বঞ্চিত চীনের সাধারণ মানুষ কি অমানুষিক ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে নতুন মানব-সমাজ গড়ে তুলেছে তা আজ জগতের বিস্ময়। নতুন চীনের জনজাগরণের কাহিনী—"আধুনিক চীনা গল্প"। বর্তমান চীনের শ্রেষ্ঠ লেখকদের আটটি সমাজ-সচেতন গল্পের সংকলন। অনুবাদ করেছেন : অমল দাশগুপ্ত। দাম তিন টাকা আট আনা।

নবজাতক

ম্যাক্সিম গোর্কী

বহু যুগের পুঞ্জীভূত অবহেলায় যারা ম্লান, যারা অবজ্ঞাত, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের ওপরে লেখা ম্যাক্সিম গোর্কীর সাতটি শ্রেষ্ঠ গল্পের সংকলন। শক্তিমান ও বিত্তশালীর বঞ্চনা যাদের দাবিয়ে রাখতে পারল না, নতুন কালের গণশক্তির বাহক সেই সব মানুষের রসোত্তীর্ণ কাহিনী। নীহার দাশগুপ্তের অনুবাদ। দাম তিন টাকা চার আনা।

পুতুলনাচের ইতিকথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকের মানিকবাবুর সমাজ-সচেতন সাহিত্যের মূলসূত্র রয়েছে—"পুতুলনাচের ইতিকথা"র জটিল আধুনিক সমাজব্যবস্থার চাপে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদে পদে বাধা পেতে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল মানুষ যেন অদৃষ্টের হাতে খেলার পুতুল। সেই যান্ত্রিক মানুষের ভাঙ্গা-গড়ার অপরূপ কথাচিত্র। দাম পাঁচ টাকা।

● ছোটদের জন্য ●

সকল দেশের সেরা

ব্রজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সকল দেশের সেরা কোন্ দেশ? সে তো আমাদেরই ভারতবর্ষ। এ দেশের বহু মণীষী আর আত্মত্যাগী বীর যে ভারতবর্ষকে ধ্যান করে আত্মদান করেছেন, তাদের সেই ধ্যানের ভারতবর্ষকে মূর্তিময়ী করে তোলার কাজে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের পক্ষে এ বই অপরিহার্য। ছবি আর সরস লেখায় গল্পের মত মনোরম হয়ে উঠেছে ভারতবর্ষের পরিচয়। দাম দু টাকা চার আনা।

ঘুমতাড়ানী ছড়া

সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

ছোটদের অপরূপ ছড়ার বই। ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান কয়েকটি ঘটনার ওপরে ছড়া কেটেছেন চারজন কবি চার রকম ভাবে। পাতায় পাতায় সুয রায়ের অজস্র রঙীন ছবি। দাম তিন টাকা।

অন্নদাতা

কৃষণ চন্দর

তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষলাঞ্ছিত বাংলায় মানবতার অপমৃত্যু ঘটাবার জঘন্য ষড়যন্ত্রের কাহিনী। কৃষণ চন্দরের বলিষ্ঠ লেখনীতে পদদলিত জীবনবোধ ও নীতিবাদের বীভৎস বিকৃতির প্রতিফলন। অবন্তী সান্যালের অনুবাদ। দাম এক টাকা আট আনা।

ইংরেজী ও বাংলা বইয়ের তালিকার জন্য চিঠি লিখুন

ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস লিমিটেড

৩০, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৬;

শাখা : 'নতুন বই' লালদীঘির পাড়, চট্টগ্রাম।

ডি, পি, চ্যাটার্জি, ৭৬০ পার্শি কলোনি, দাদার, বোম্বাই।

পুষ্পের সান্নিধ্য লাভ করিবার পর তার সে চরিত্রবল, ভদ্রতা, সভ্য আচরণ সবই টুটিয়া গেল এবং তার স্থানে আত্মপ্রকাশ করিল নারী-প্রসাদলোভী এক দুর্ব্বলচরিত্র পুরুষ। লেখকের সৃষ্ট নারী-চরিত্রগুলিও উদ্ভট। সংঘের কল্যাণের জন্য পুষ্প নিজের দেহকে পর্য্যন্ত বিশুর কাছে বিকাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল! আর বন্দনা—সে তো নর্দ্দমার দুর্গন্ধপূর্ণ আবর্জ্জনা। এই ধরণের নারী-চরিত্র উপন্যাসে কেন যে স্থানলাভ করিল তাহা আমাদের ধারণার অতীত। অথচ উপন্যাসের মধ্যে লেখকের ক্ষমতার পরিচয়ও যে পাওয়া যায় না, তাহা নহে। রজতকে মোটের উপর ভাল লাগিল। লেখকের ভাষা সহজ, বলার ভঙ্গী ভাল।

জাগ্রত-জীবন—রুবেন রায়। দেবশ্রী সাহিত্য সমিধ। ৯৯এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১২৭। দাম দুই টাকা।

গ্রাম্য জীবনের কয়েকটি সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া উপন্যাসখানি লিখিত হইয়াছে। যে সমস্যা গ্রাম্য সামাজিক জীবনে একটা মারাত্মক ব্যাধিস্বরূপ—গ্রন্থকার এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাহার বিচার করিয়াছেন। স্থানে স্থানে উপন্যাসখানি বেশ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আগাগোড়া এই গতি অব্যাহত থাকিলে আমরা একখানি ভাল উপন্যাস পাইতে পারিতাম। কিন্তু কতকগুলি অবাঞ্ছিত, অশোভন পরিস্থিতির সৃষ্টি করাতে রস কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

জনকল্যাণে সোভিয়েট বিজ্ঞান (সচিত্র)—শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পুস্তকালয়, ২৯ রামানন্দ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৫৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

কঃ পন্থা—শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়। বীণা লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৩৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে দুইখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, কারণ পুস্তক দুই খানি—রাশিয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছেন ও উচ্ছ্বাস বা দলগত সংস্কার হইতে বিমুক্ত হইয়া তথ্যপ্রমাণাদি সহযোগে বুঝাইতে চাহিয়াছেন এমন দুই জন অধ্যাপক কর্ত্তৃক লিখিত। আমরা ইউরোপের মধ্যে পূর্ব্বে জার্ম্মানীকে বিজ্ঞান বিষয়ে সমধিক অগ্রসর ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতাম, কিন্তু বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের সাহায্যে রাষ্ট্র, সমাজ ও দেশের বিভিন্ন বিভাগে সোভিয়েট রাশিয়া যে বিপুল বিস্ময়কর উন্নতি ও জনকল্যাণ সাধন করিতেছে তাহা প্রথম গ্রন্থখানি পড়িলে জানিতে পারা যায়। 'এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন', সত্যই রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইহার সার্থক প্রয়োগ বিস্ময়জনক ও পড়িতে কৌতূহলের উদ্রেক করে। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিজ্ঞান ও সোভিয়েট, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে রাশিয়ার ভৌগোলিক পরিচয় ও বৃহত্তর রাশিয়ার সংস্থান আলোচিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে রাশিয়ার শিল্পের প্রসার, কৃষি-উন্নয়ন, রাশিয়ার সমুদ্র ও মরুপথ, পশুসম্পদ্ ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ও শেষ অধ্যায়ে যন্ত্ররাক্ষসীর কল্যাণী মূর্ত্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সংখ্যাতত্ত্ব ও তথ্যপ্রমাণাদি সহকারে রাশিয়ার বিজ্ঞানের সাহায্যে এই সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের কাহিনী পড়িলে মানুষের বিরাট কার্য্যক্ষমতা ও উদ্যমের অনন্ত সম্ভাবনা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কঃ পন্থা'ও সোভিয়েট রাশিয়ার বিভিন্ন বিভাগের উন্নতি সম্বন্ধে লিখিত। কিন্তু বইখানির নামকরণ সমীচীন হয় নাই, কারণ ইহা কি কতকগুলি দার্শনিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রবন্ধের সমষ্টি, তাহা কিছুই বুঝায় না, সোভিয়েট রাশিয়া বা সোভিয়েট সংস্কৃতি বিকল্পে, কঃ পন্থা' নাম দিলে গ্রন্থকার ভাল করিতেন। এই গ্রন্থে রাশিয়ার সভ্যতার প্রগতি, শিক্ষার বিস্তার ও সংস্কৃতি-বিপ্লবের কথাই মুখ্যতঃ আলোচিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার রূপ-পরিবর্ত্তন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাশিয়ার বর্ত্তমান রাষ্ট্র-রূপ ও প্রকৃতি, তৃতীয় অধ্যায়ে বহু জাতি-অধ্যুষিত রাশিয়ার জাতি-সমস্যার সমাধানের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। রাশিয়ার শ্রম-শিল্প, কৃষি, বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও পুনর্গঠনের প্রসঙ্গে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে সংক্ষেপেই আলোচিত হইয়াছে। শেষ অধ্যায়ে কঃ পন্থা অর্থাৎ ব্রিটিশ ও আমেরিকার পুঁজিবাদ বনাম রাশিয়ার বলশেভিজম বা সাম্যবাদ, কোন্ পথ 'মহাজনের পন্থা' তাহাই প্রশ্ন করা হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর মহাকাল দিবে। তবে বর্ত্তমানে রাশিয়ার বিস্ময়কর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি ও রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—"রাশিয়ায় এসেছি, না এলে এ জন্মের তীর্থ-দর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত"—এ সম্বন্ধে খানিকটা ইঙ্গিত করে।

কবিতীর্থের পাঁচালী—শ্রীশচীন্দ্র অধিকারী।—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১২৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ২৷৹।

পদ্মার তীরে শিলাইদহের কুঠি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার পীঠস্থান বা কবিতীর্থ বলিয়া আগামীকালের সাহিত্যিকগণের নিকট পরিচিত হইবে, কারণ এখান হইতেই তিনি জমিদারি পরিদর্শন-ব্যপদেশে পদ্মার বক্ষে বোটে করিয়া জমিদারির অন্তর্গত নানাস্থানে পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং দিগন্তবিস্তৃত পদ্মার ক্রোড়ে ভাসমান বোটের উপর বসিয়া তাঁহার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস ও সঙ্গীতাদি রচনার প্রেরণা লাভ করিতেন। গ্রন্থকার মহাশয় ঘটনাস্থলে ঘুরিয়া ও লোকমুখে শুনিয়া 'বাবু মশায়' ও

পল্লীমাতার বিভিন্ন চরিত্রের যে সকল নক্সা ও চিত্র সহজিয়া ছন্দের কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অনবদ্য হইয়াছে, এগুলিকে তিনি সার্থক ভাবে 'কবি তীর্থের পাঁচালি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। শিল্পাচার্য্য নন্দলাল বসু পদ্মাবক্ষ, পদ্মার চর, ও পদ্মাতীরস্থ পল্লীর যে কয়েকখানি ছবি আঁকিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রসাহিত্যে নূতন উপাদান যোগাইবে। পল্লীজীবনের বিভিন্ন দৃশ্য ও চরিত্রের আরও বহু চিত্র কবিতাগুলিকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে। কবিতাগুলি পড়িয়া দরিদ্র অবজ্ঞাত পল্লীর বুকে রত্নখনির মত কবি-উপজীব্য নানা উপাদানের সাক্ষাৎ পাইয়া পাঠক আনন্দিত হইবেন।

জীবন ও যুদ্ধ—শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল। প্রবর্ত্তক পাবলিশার্স, ৬১ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯১ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

দিল ডাক—শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়। বুক ষ্ট্যাণ্ড, ১।১।১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ৩৲।

প্রথম গ্রন্থের লেখক ইতিপূর্ব্বে 'মরুপ্রদীপ' নামক গল্প-গ্রন্থে রেঙ্গুনে জাপানী বোমাবর্ষণের সময় বর্ম্মাপ্রত্যাগত ভারতবাসীর দুর্গম অভিযানের কাহিনী লিখিয়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই উপন্যাসে তাহারই বিস্তারিত বিবরণ সহ একটি করুণ কাহিনী বাঙ্গালার ১৩৫০ সালের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে। বিগত যুদ্ধের সময় জাপানীদের রেঙ্গুন আক্রমণের সময় লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যে ভয়াবহ দুঃখ-দুর্দ্দশার মধ্যে ভারতে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং ফিরিয়াও যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মুনাফাখোর, চোরাবাজার ও লীগ গবর্ণমেণ্ট সৃষ্ট ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া যে অবর্ণনীয় কষ্ট ও দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহার বর্ণনায় লেখকের লেখনী স্থানে স্থানে ভাবাতিশয্যে উচ্ছ্বাসের মাত্রা অতিক্রম করিলেও মোটের উপর উপন্যাসখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। পাপা ও সিন্ধুবৌদির স্নিগ্ধ মধুর চরিত্র মনে রেখাপাত করে। বিগত সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ ও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সর্ব্বহারা অপমানিতা দুর্ভাগিনী মুক্তার জীবনাবসানের বিয়োগান্ত করুণ কাহিনী অন্তর স্পর্শ করে।

দ্বিতীয় গ্রন্থ বর্ম্মা ও ভারতবর্ষের সীমান্তে যুদ্ধের প্রয়োজনে গঠিত এক বিরাট সৈন্যশিবিরের পটভূমিকায় রচিত হইয়াছে। Women's Auxiliary Corps ব্যতীত অন্য এক প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে বহু ভারতীয় ও অন্যান্য জাতীয় নারীর সমাবেশ হয়—যথা কর্ম্মের অবকাশে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর অবসর-বিনোদিনী সঙ্গিনী হিসাবে। এইরূপ একটি কর্ম্ম লইয়া একটি বাঙালীর মেয়ে স্বামীর সহিত বনিবনাও না হওয়ায় এই পরিবেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল এবং রূপের জৌলুসে, ফ্যাসানে ও চটুলতায় রঙ্গিনীসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিল। কিন্তু প্রজাপতির মত তীব্র আলোক, প্রাচুর্য্য ও ভোগবাসনার বিপুল সমারোহের মধ্যে থাকিয়াও অবশেষে স্বামী ও পুত্রের অন্তর্গূঢ় স্মৃতি ও ঘরের মায়া তাহাকে 'দিল ডাক' এবং সব ছাড়িয়া গৃহে ফিরিয়া সে স্বামীর সহিত নূতন করিয়া ঘর বাঁধিতে মনস্থ করিল কিন্তু আরম্ভেই গোরার গুলির আঘাতে শিশুপুত্র হারাইয়াও বাঁধনহারা জীবনের স্রোতে পুনরায় ভাসিয়া যাইতে অস্বীকৃতা হইল। মিতার চরিত্রে গ্রন্থকার মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, সৈন্যাবাসে ইংরেজ, আমেরিকান ও ভারতীয় বহু পুরুষ ও নারী চরিত্রের সহিত মিতার আলাপ ও সংলাপ উপভোগ্য। কিন্তু যে জন্য এই পুস্তক প্রশংসার দাবী করে তাহা এই—যে হতভাগিনী নারীগণ বহুর মন যোগাইতে পুরুষের কামনার বহ্নিতে যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মাহুতি দিল তাহাদের অন্তরের কোণে গৃহকোণের প্রতি, শান্তিপূর্ণ শাশ্বত জীবনের প্রতি নিরুদ্ধ কামনা এবং বাহিরের উচ্ছৃঙ্খল পঙ্কিল ভোগবহুল জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা সময়ে সময়ে রঙ্গিনীগণের জীবনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং গ্রন্থকার দরদী মনের অন্তর্দৃষ্টি লইয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল

কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স। ১০৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

কলিকাতা-নোয়াখালি-বিহার এই তিনটি নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মানসপটে ভাসিয়া উঠে হিংসা-দ্বেষে উন্মত্ত বাংলা ও বিহারের হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত প্রাণের তাণ্ডব-লীলা আর নরহত্যার নারকীয় দৃশ্যের ভয়াবহ চিত্রমালা। সভ্য মানুষের এই উলঙ্গ বর্ব্বরতা বহু কবি শিল্পী ও কথাসাহিত্যিকের অন্তরকে বিচলিত করিয়া তাঁহাদিগকে সাহিত্যরচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। বিভূতিবাবু খাঁটি শিল্পীর নিরাসক্ত মন লইয়া ঘটনাগুলিকে অনুধাবন করিয়াছেন এবং নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে 'বিশ্বাস', 'প্রায়শ্চিত্ত' এবং 'সত্যাগ্রহী' এই তিনটি গল্পে রূপায়িত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। গল্পগুলিতে লেখকের মনের খাঁজ মিশে নাই বলিয়া সেগুলি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। বইখানি শেষ করিলে একটি ছবি যেন জীবন্ত হইয়া চোখের সামনে ভাসিতে থাকে—'বিশ্বাস' গল্পের কাফের-হত্যার প্রধান নায়ক রহমান অগ্নিবেষ্টিত বাড়ীতে বসিয়া দেখিতেছে, তাহার হুকুমে পরিচালিত গুণ্ডাদের দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত সদা সকল স্বজনবিয়োগ-কাতর বাল্যবন্ধু পরেশ তাহারই কন্যাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া নিরাপদ স্থানে ব্যাকুল বাহুবন্ধনে আশ্রয় দিয়াছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে সামেদের মৃত্যুকালীন মর্ম্মান্তিক উক্তি: "আমি মুসলমান—কিরণ নয়—সামেদ—কি হবে-কে প্রায়শ্চিত্ত করবে—" পাঠকের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবাবেগের সঞ্চার করে। সত্যাগ্রহী গল্পে লেখক একটি প্রশ্নের উত্তর উহ্য রাখিয়াছেন। নারীর উপর অত্যাচারকারীকে হত্যা করিয়া মহাত্মার মন্ত্রশিষ্য, ত্রিশ বৎসর যাবৎ অহিংসাব্রতী রঘুবর সিংহ কি ব্রাত্য হইয়াছিলেন?...এর জবাব নোয়াখালিতে মহাত্মা স্বয়ংই দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্য আততায়ী নিধন প্রায়—অহিংসার কাছাকাছি—"Nearest approach to nonviolence."

এই গল্পপুস্তকখানি শুধু যে রসসৃষ্টি হিসাবেই সার্থক হইয়াছে তাহা নয়, ইহাতে ভাবনার খোরাকও আছে প্রচুর। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারই দৃষ্টি সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি দ্বারা আবিল হইয়া আছে, তিনিই এই পুস্তকে আত্মদর্শন করিবার সুযোগ লাভ করিবেন। এই আত্মধ্বংসী সাম্প্রদায়িকতার অবসান এক দিন হইবেই—এবং এই ধরণের সাহিত্যই আপাত বিচ্ছিন্ন, পরস্পর বিবদমান হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে বাণীমাল্যের বন্ধনে আবদ্ধ করিবে।

চায়নার সেরা কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু। কো-অপারেটিভ বুক ডিপো, ৫৪, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা—মূল্য তিন টাকা।

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পসমালোচকদের কল্যাণে চীনা চিত্রকলার রসের সহিত আমাদের অল্পবিস্তর পরিচয়সাধন হইয়াছে, কিন্তু চীনা সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙালী পাঠক-সাধারণের অজ্ঞতা অপরিসীম। অথচ চীনদেশে এমন কয়েকজন কথা-সাহিত্যিকের আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহাদের রচনা বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য। সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যের ন্যায় বর্ত্তমান চীনা সাহিত্যেরও চরম উৎকর্ষ তার ছোট গল্পে। সর্ব্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জ্জিত চীনা চিত্রকলা, যেমন স্বল্প রং ও সামান্য দু-একটি রেখার টানে বিশেষ একটি ভাবকে ফুটাইয়া তোলে, চীনা ছোট গল্পও সেই ধরণের—অনাড়ম্বর মিতবাক ও ভাবগর্ভ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার বসু কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চীনা গল্প অনুবাদ করিয়া বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তকে ইয়াও-শুয়ে-ইয়েন, সাই-চিয়েং-শুন, সেন-শুং শুয়েন চাং-সিয়েন-ঈ এই চার জন লেখকের চারিটি গল্প স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে সাই-চিয়েং-শুনের 'ক্ষুধিত প্রেম' গল্পটি শুধু চীনা সাহিত্যের নহে, বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম সেরা কাহিনী বলিয়া সমাদৃত হইবে। গল্পটি আগাগোড়া ব্যর্থ জীবনের বেদনারসে উচ্ছল, অথচ ইহাতে লেশমাত্র আতিশয্য নাই—করুণ রসের এমন সংযত প্রকাশ যে-কোনো দেশের সাহিত্যে দুর্লভ। 'তাফ রেকর্ড' আর 'ঘনান্ধকারে' এই দুইটি গল্পে চীন-জাপান যুদ্ধের নিপুণ আলেখ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এগুলির মধ্যে তাহার জাতীয় জীবনের স্পন্দন আমরা শুনিতে পাইতেছি। চাং-সিয়েন-ঈর গল্পটিতে চীনাদের সামাজিক পরিবেশের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। এই গল্প চারিটির ভিতর দিয়া চীনের জাতীয় আত্মার স্বরূপ যেন আংশিক ভাবে আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

'ইতালির সেরা গল্পের' অনুবাদক রূপে রবীন্দ্রবাবু যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন বর্ত্তমান পুস্তকে তাহার ক্রমবিকাশ, বিশেষতঃ সংলাপের ভাষান্তরকরণে তাঁর কুশলতা আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছে। যে সকল দিকপাল চীনা সাহিত্যিকের গল্পের অনুবাদ বর্ত্তমান পুস্তকে স্থান পাইয়াছে, ভূমিকায় লেখক সামান্য দু'চারটি কথায় তাহাদের সাহিত্য-রচনার মূল সূত্রটী ধরাইয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বইয়ের নামটি সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের আপত্তি আছে। চীনের সেরা কাহিনী হইলেই শোভন হইত—'চায়না' শুনিলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিশেষের কথাই আগে মনে পড়ে।

শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডী-পূজা ও কথা—শ্রীউমেশ চক্রবর্ত্তী। প্রাপ্তিস্থান—১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা গ্রন্থকারের নিকট। মূল্য দশ পয়সা।

ইহাতে সংস্কৃতে শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডী স্তোত্র, ধ্যান, প্রার্থনামন্ত্র এবং সরল বাংলায় পয়ার ছন্দে লিখিত মঙ্গলচণ্ডী দেবীর পাঁচালীকথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু পরিবারে গৃহপঞ্জিকার ন্যায় এই পুস্তকের আদর হওয়া উচিত।

লে মিজেরাবল—ভিক্তর হিউগো। অনুবাদক—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যিকা, ১২৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

বাংলাদেশের সাহিত্যরসিকদের নিকট ফরাসী কথা-সাহিত্যিক ভিক্তর হিউগো আর তাঁর অমর উপন্যাস লে মিজেরাবলের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন নাই। পুস্তকখানি বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন হিসাবে কালজয়ী হইয়া আছে। বহুপূর্ব্বে মনোমোহন রায় কৃত ইহার এক-খানি বাংলা অনুবাদ 'লা মিজারেবল' এই ভুল নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেখানি অক্ষম অনুবাদ। আমাদের দেশের কোন কোন শিক্ষিত মহলেও যে, ঐ ভুল নামই চলিতেছে সম্ভবতঃ উক্ত পুস্তকখানিই সেজন্য দায়ী। যাহা হোক, বর্ত্তমান অনুবাদ যিনি করিয়াছেন বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা আছে। পবিত্রবাবুর কৃতিত্ব এই যে, তাঁহার অনুবাদে মূলের রস ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ আছে, উপরন্তু তাহা সাহিত্যিক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়াছে। হিউগোর বিরাট সৃষ্টি তাঁহার হাতে পড়িয়া বিকৃত হয় নাই। এই উপন্যাসের নায়ক জন্মদুঃখী জাঁ ভালজাঁর বিচিত্র জীবনকে কেন্দ্র করিয়া অপরিসীম দরদ দিয়া হিউগো যে বিয়োগান্ত কাহিনী রচনা করিয়াছেন তাহা যুগ যুগ ধরিয়া বিশ্বের সকল দেশের সকল বয়সের পাঠকপাঠিকাদের আনন্দ-বিধান করিয়া আসিতেছে। পবিত্রবাবু বাংলার কিশোর-কিশোরীদের জন্য এই সংক্ষেপিত অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার কল্যাণে তাহারা হিউগোর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টির সহিত পরোক্ষভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

নিখিল-বঙ্গ আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

বিগত ৫ই পৌষ উত্তরপাড়া হরিনারায়ণ স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে ৩য় বার্ষিক নিখিল-বঙ্গ আবৃত্তি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীমন্মথমোহন বসু এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং প্রবাসীর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র প্রধান অতিথিরূপে ইহাতে যোগদান করেন। পাঠাগার-সম্পাদক শ্রীপাঁচু মুখোপাধ্যায়ের কর্ম্মতৎপরতায় অনুষ্ঠানটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। সভাপতি মহাশয় এবং নলিনীবাবুর বিচারে সাধারণ বিভাগে পাঁচু সান্যাল, ছাত্রবিভাগে অরুণ মুখোপাধ্যায়, এবং মহিলাবিভাগে মায়া মুখোপাধ্যায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।



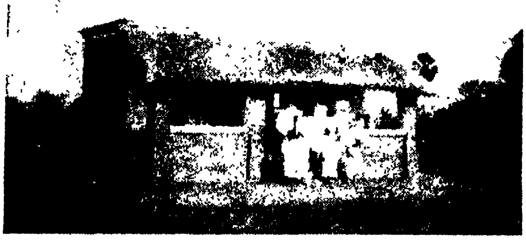
ঝাড়গ্রাম সেবায়তন কর্ম্মকেন্দ্রের আংশিক দৃশ্য

ঝাড়গ্রাম সেবায়তন

গত পৌষের উত্তরায়ণ সংক্রামণকালে ঝাড়গ্রাম সেবায়তনে ভারতের নানা স্থান হইতে আগত দর্শকমণ্ডলী এবং স্থানীয় সহর



সেবায়তনে: উত্তরায়ণ উৎসব উপলক্ষে বার্ষিক সভা



সেবায়তন চিকিৎসালয়

ও পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীবাসী জনগণের সমাবেশ দুই দিবসব্যাপী বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ অনুষ্ঠানসহ বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হয়। সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন মেদিনীপুর জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীদেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তিন বৎসর পূর্ব্বে স্বামী প্রেমানন্দ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমে আচার্য্য স্বামী সত্যানন্দ গিরি কয়েকটি উৎসাহী কর্ম্মীর সাহায্যে ভারতীয় সংস্কৃতি-মূলক আদর্শ ও পদ্ধতি লইয়া বাংলার এই অত্যন্ত অবহেলিত অথচ স্বাস্থ্যকর স্থানে কৃষি, গোপালন, শিল্প, চিকিৎসা, শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক সাধনার ব্যবস্থাসহ এই আশ্রম পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। জনগণের দেহ মন আত্মার উন্নতিবিধায়ক কর্ম্মানুষ্ঠানই এই আশ্রমের উদ্দেশ্য। এই সময়োপযোগী কল্যাণ-প্রদ প্রতিষ্ঠানটিকে যথাসাধ্য সাহায্য করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য।

আয়ুর্ব্বেদ সংস্কৃতি পরিষদ

সম্প্রতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় চিকিৎসা-রূপে আয়ুর্ব্বেদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকও উক্ত চিকিৎসাশাস্ত্রের পুনরুজ্জীবনকল্পে বিশেষ তৎপরতার সহিত কাজ শুরু করিয়া দিয়াছেন। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের প্রত্যেকটি বিষয় যাহাতে বর্ত্তমান কালোপযোগী হয় ও যথোচিত উৎকর্ষলাভ করে সে উদ্দেশ্যে তাঁহারা "আয়ুর্ব্বেদ সংস্কৃতি পরিষদ" (কার্য্যালয় ২২৩ ,চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা) নামে একটি সমিতি গঠনে ব্রতী হইয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদের প্রচার ও প্রসার ছাড়া একটি আয়ুর্ব্বেদীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করার সঙ্কল্পও তাঁহাদের আছে। সম্প্রতি উক্ত পরিষদ বহু তথ্য সম্বলিত একটি 'স্মারক পুস্তিকা' প্রকাশিত করিয়াছেন।

পশ্চিম বাংলা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতে পারিলে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটি দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের বিশেষ সহায়তা হইবে।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা



বাপুজী

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা [illegible]



প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৭শ ভাগ
২য় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৫৪

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

গান্ধী মহাপ্রয়াণ

১১ই মাঘ, শুক্রবার, ভারতের দুর্দিন। গান্ধীজীকে হত্যা করিয়া নাথুরাম বিনায়ক গডসে প্রমাণ করিয়া দিল যে হিংসায় পৃথিবী আজ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তার প্রভাব ভারতবর্ষেও ব্যাপ্ত হইয়াছে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট যে রক্তাবর্তের সূচনা হয় কলিকাতার বুকে, তাহা আজ প্রসারিত হইয়াছে চট্টগ্রাম হইতে পেশোয়ারে। ইহার দাপটে কত লোকের প্রাণ গিয়াছে, কত শিশু পিতৃ-মাতৃহীন হইয়াছে, কত সহস্র সহস্র স্ত্রীলোকের সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে এবং কত কোটি টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও নষ্ট হইয়াছে, তার হিসাব হয় নাই, কোনও দিন হইবে বলিয়াও মনে হয় না। এ ক্ষতি আমাদের হইল, যাহা অঙ্গের উপর দিয়া গেলে আমাদের মনে কোন ক্ষোভ থাকিত না হয়ত। কিন্তু মুসলিম লীগ প্রবর্তিত এই অমানুষ রাজনীতি যে আমাদেরও পতন অবধারিত করিয়া দিল, সেই অপমানে ও বিক্ষোভের জ্বালায় সতর মাস পুড়িয়া পুড়িয়া গান্ধীজী আমাদের মধ্য হইতে সরিয়া গেলেন; তার গ্লানি আমাদের সামাজিক জীবনকে বহু দিন ক্লিষ্ট করিয়া রাখিবে। গান্ধীজীর শ্রাদ্ধের উপলক্ষে যে কর্মব্যস্ততা ছিল, তাহা আজ অবসান হইয়াছে। সমাজের মনে দেখিতেছি একটা অবসাদ।

আমাদের কবি এক দিন আমাদের শুনাইয়াছিলেন, "মোর তরে না করিও শোক!" গান্ধীজীও তাঁর জীবনে এই শিক্ষাই আমাদের দিয়া গিয়াছেন যে ভগবানের কাজ তিনি করিয়া যাইতেছেন, সেই কাজের প্রয়োজনেই তাঁহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে এবং সেই কাজের প্রয়োজনে যত দিন তাঁহার উপস্থিতি প্রয়োজন, তত দিনই তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন। তিনি অনেক আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন যে এক শত পঁচিশ বৎসর তিনি বাঁচিয়া থাকিতে চান তাঁর কল্পনার ও আকাঙ্ক্ষার ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য। সেই কাজ অপূর্ণ রাখিয়া গেলেন। ইহার কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। একটা কথা আমাদের যন্ত্রণা দিতেছে। যে হিংসার উন্মাদনা পনর মাস ভারতবর্ষের বুকে তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছে, তাহার ফলে বাঁচিয়া থাকিবার স্পৃহাও তাঁহার মন হইতে শিথিল হইয়া যাইতেছিল। অনেক সময় তাই মনে হয়, নাথুরামকে নিমিত্তমাত্ররূপে ব্যবহার করিয়া তাঁহার প্রাণের ভগবান ভক্তের যন্ত্রণার লাঘব করিলেন কি?

আজ গান্ধীজীর পঞ্চভূতসমষ্টি দেহের অণুকণার ভস্ম ভারতের নদ-নদীর জলস্রোতের বুকে ভাসাইয়া দিয়া আমাদের দেশের লোক ফিরিয়াছে পূজামন্দিরে। সাধারণ মানুষ এই দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে। সাধক যাহারা তাঁহারা শূন্য মন্দিরে ভাব-মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন; সাধনায় নিমগ্ন হইয়া ধ্যান মূর্তিকে প্রাণময় করিতে। আজ ভারতের দিকে দিকে সেই অস্ফুট আকাঙ্ক্ষাই ধ্বনিত হইয়া উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। ভারতের "মহাত্মা" যে আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন তপস্যা করিয়া গিয়াছেন, যে প্রেমধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনের শেষ কয়েক মাস সীমাহীন আকুতি এবং অদম্য উৎসাহ লইয়া দিল্লীর প্রাসাদে-প্রান্তরে প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছেন, সেই ব্রত আজও অপূর্ণ। বোধন তিনি আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, হিংসুক তাঁহার মঙ্গলঘট ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। অসমাপ্ত পূজা আমাদের সমাপ্ত করিতেই হইবে। এই ব্রত ও এই পূজা আমাদের জাতীয় জীবনের মরণ-বাঁচন সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। এই সমস্যা সমাধান না করিলে আমাদের নব অর্জিত স্বাধীনতা ব্যর্থ হইবে, অসার্থক হইবে। ভারতের সমাজের বুকে দ্বেষ ও অনৈক্য জিয়াইয়া রাখিয়া এই স্বাধীনতা আমরা রক্ষা করিতে পারিব না, এই আশঙ্কায় গান্ধীজী আমাদের আত্মস্থ করিতে প্রাণপাত করিয়াছেন। গুপ্ত হত্যাকারীর গুলিতে তাঁহার সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার অশরীরী আত্মা ভারতবর্ষের এই কর্তব্য নির্দেশ করিতেছে।

আজ এই নির্দেশের কথাই আমাদের নূতন করিয়া ধ্যান করিতে হইবে। গান্ধীজীর উপস্থিতির সময় এই নির্দেশ সম্বন্ধে

আমরা নানা সংশয় প্রকাশ করিয়াছি, এই নির্দ্দেশ লইয়া নানা তর্ক করিয়াছি। এই নির্দ্দেশের ও তার সার্থকতার আলোচনা লইয়া সমাজতন্ত্রের মহাভারত সৃষ্টি হইয়াছে। আজ ভারতবর্ষের হিন্দুকুশ পর্ব্বত হইতে চন্দ্রনাথ পাহাড় বেষ্টিত ভূ-খণ্ডের মধ্যে যে উন্মত্ততার সৃষ্টি হইয়াছে, যে সমাজবিধ্বংসী কার্যাকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের নূতন করিয়া গান্ধীজীর নির্দ্দেশের প্রকৃত মর্ম্ম-কথা বুঝিয়া লইতে হইবে। ১৯১৯ সালের মধ্যভাগে যখন তিনি আসিয়া আমাদের রাজনীতিক জীবনের পুরোভাগে দাঁড়াইলেন, তখন আমাদের রাজনীতিক জীবন নানা কারণে ছত্রভঙ্গ। বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে; বৈধ রাজনীতিক আন্দোলন বন্ধ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। দেশের জনগণের মন এই সব ভাবনা চিন্তা সম্বন্ধে নিরুৎসুক; তাহা আপনার ভাবনায় মগ্ন। সেই মন ছিল মূঢ়, ম্লান, মূক; সে ভাবনা সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কোন সম্যক্ জ্ঞান ছিল না। শিক্ষিত সমাজ নিজেদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে, সমাজজীবনের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্যের তাড়নায়, জনগণ মনের ভাবনা-চিন্তার একটা অর্থ করিয়া তাহা প্রচার করিতেছিলেন। পরদেশী শাসন ও শোষণের ফলেই যে এই দারিদ্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিক্ষিত লোকের মনে অপমানের জ্বালা, দেশের জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের তাড়না—এই ভাবের ও বাস্তবের চাপে একটা বিক্ষোভ ঘনীভূত হইয়া প্রকাশের নূতন পথ খুঁজিতেছিল। গান্ধীজী সেই পথ কাটিয়া দিলেন। গোপনতার, বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী গোপনতার, বদ্ধ ঘরে মানব মন পীড়িত হইতেছিল; গান্ধীজী ভাঙিয়া দিলেন সে গোপনতার প্রয়োজন; রাজপথের মাঝে "প্রকাশ্য ষড়যন্ত্র" (open conspiracy) ঘোষণা করিয়া সকলের মন-বুদ্ধিকে করিলেন মুক্ত; লোকের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে করিলেন সহজ গতিশীল।

সেইজন্য দেখিতে পাই অসহযোগ আন্দোলনে আবালবৃদ্ধ-বনিতা মুক্তিস্নানের মতন একটা সহজ আনন্দ লাভ করিয়াছে। "স্বদেশী" যুগে, বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদী যুগে আমাদের দেশের মেয়েরা নানাভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন নিজেদের স্বভাবসিদ্ধ আবরুর পশ্চাৎ হইতে অভিভাবকদের অমতে ও অগোচরে। এই গোপনতার মধ্যে ছিল একটা ভয়, একটা উদ্বেগ, একটা অনিশ্চয়তার আশঙ্কা। গান্ধীজী-প্রবর্ত্তিত পথে এই ভয়, উদ্বেগ, আশঙ্কা দূরীভূত হইল। মুক্ত আকাশের নীচে, মুক্ত প্রান্তরে দেশের মেয়েরা নির্ভীক কর্ত্তব্যের একটা সন্ধান পাইলেন। তাহাও ত্যাগের পথ, জীবনব্যাপী সাধনার পথ, নীরব, শান্ত পল্লী-পথের মত।

এই সাধনা আত্মশুদ্ধির; এই সাধনা সংস্কার বর্জ্জনের, যে সংস্কার হিন্দু মুসলমানকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, হিন্দু সমাজের বুকের উপর দিয়া কালি কাটিয়া সবর্ণ অবর্ণ ভেদের সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভেদকে বিস্তার করিয়া সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে পরিণত করিয়াছে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমাজব্যবস্থাকে। এই সহস্র গণ্ডী ভাঙিবার জন্য গান্ধীজী আবেদন করিলেন মানুষের ভ্রাতৃত্বের নামে। সাম্প্রদায়িক প্রীতির ধ্বনি এই আকুতির বহিঃপ্রকাশ। ইংরেজের ব্যবসায় নীতির কল্যাণে ভারতবর্ষের নানা শিল্প বিনষ্ট হইয়াছে; গৃহে গৃহে সেই শিল্প চলিত। এই ধ্বংসের ফলে কোটি কোটি লোক বৃত্তিহীন হইয়া একমাত্র কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িল, এবং বৎসরের মধ্যে প্রায় চারি মাস কর্ম্মহীন, বেকার জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইল। ভারতের প্রাচীন অর্থনীতিক ব্যবস্থায় দরিদ্র, অপুত্রক বিধবার পর্য্যন্ত একটা বৃত্তি ছিল; "চরকা আমার নাতিপুতি" বলিয়া সে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিত। ইংরেজ সে বৃত্তি, সে ভরসা তাহার কাড়িয়া লইল। এই বৃত্তিহীনতার যন্ত্রণার কথা আমাদের কবি গাহিয়াছেন—"তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার"—এই-ভাবে দুরবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। এই দেশব্যাপী বৃত্তিহীনতার প্রতিকার চেষ্টা অনেকেই করিয়াছেন কলকারখানার প্রতিষ্ঠা করিয়া। কিন্তু যেখানে চারি-পাঁচ কোটি লোক বৃত্তিহীন, বেকার, সেখানে এক কোটি লোকের নূতন বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া সমস্যার সমাধান হয় না। সেইজন্য গান্ধীজী চরকা তাঁতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা বলিয়া গ্রাম্য শিল্পের প্রতি দেশের শিক্ষিত লোকের কর্ত্তব্যের কথা মনে করাইয়া দিলেন। এই প্রস্তাবে উপার্জ্জন হয়ত প্রচুর নয়, কিন্তু কর্ম্মহীনতার যে গ্লানি দেশের শরীর-মনকে আচ্ছন্ন করিয়া অপটু করিয়া তুলিতেছিল তাহা ত দূর হইতে পারে। সেইজন্য আপদ্ধর্ম্ম রূপেও এই নূতন সংগঠনের জন্য আহ্বান করিতে গান্ধীজী দ্বিধা করিলেন না। বর্ত্তমান যুগের যন্ত্রদানবের নানা ব্যবস্থার তুলনায় চরকা তাঁত তুচ্ছ হইতে পারে। কিন্তু এই যন্ত্রদানবের কল্যাণে মানুষ এত পরনির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে যে তাহার আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইলে তাহাকে হইতে হইবে স্বয়ং-সিদ্ধ, নিজের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আত্মনির্ভরশীল। এই ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়া গান্ধীজী যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া অনেকে তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না। শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রায় কেহই এই নূতন সত্য মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

ইংরেজের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা অসহযোগ আন্দোলনের আঘাতে দুর্ব্বল হইল, কিন্তু তাহার পুরাতন কাঠামোটা প্রায় অটুট থাকিয়া গেল। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এই সময় যে হানাহানি উগ্র হইয়া উঠিল, তাহার পূর্ণ সুযোগ ইংরেজ গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হইল না। প্রায় আট বৎসর ইংরেজের নানা কৌশল আমাদের সংগঠন শক্তিকে আঘাত করিয়াছে। লর্ড বার্কেনহেড ভারতবাসীর প্রতিনিধিকে বাদ দিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপায় উদ্ভাবনের জন্য পাঠাইলেন সাইমন

কমিশনকে। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনীতিক দল একত্র হইয়া তাহাতে বাধা দিল; ফলে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বস্তাপচা হইয়া পড়িয়া রহিল। লাহোর কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে যখন পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ গৃহীত হইল, তখন গান্ধীজী আর একবার রাজনীতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। লবণ আইন ভঙ্গ করিয়া ইংরেজের রাষ্ট্র শক্তিকে তিনি যে সংগ্রামে আহ্বান করিলেন তাহার মধ্যে দেশের লোকের যে সহযোগিতা পাওয়া গেল তাহা অভূতপূর্ব্ব। অসহযোগের গণজাগরণকে তাহা ম্লান করিয়া দিয়াছিল বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে না। মুসলমান জনসাধারণ ইহাতে তেমন সাড়া দেয় নাই। কিন্তু মুসলমান যাঁহারা এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন তাঁহারা খেলাফৎ আন্দোলনের ধর্ম্মোন্মাদনায় করিলেন না; একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে, রাজনীতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাঁহারা কারাগার ও অন্যান্য অত্যাচার বরণ করিয়া লইলেন। এই সময়েই মুসলমানগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গফুর খাঁর নেতৃত্বে এক অপূর্ব্ব গণজাগরণ স্ফূর্ত হইয়া উঠে। স্বভাবতঃ সীমান্তের দুর্দ্ধর্ষ পাঠানকে তিনি অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া এক নূতন কর্ম্মধারার সৃষ্টি করিলেন; দেশ তাঁহাকে "সীমান্ত গান্ধী" নামে অভিহিত করিয়া এই নূতন কর্ম্মধারাকে অভিনন্দিত করিল।

গান্ধীজী ও ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড আরউইনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়া এই আন্দোলনের শেষ হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করার পক্ষে এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু দেশের লোক গান্ধী-আরউন চুক্তির বলে এই ভরসা পাইল যে তাহাদের সংগঠন শক্তি বাড়িয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে কংগ্রেসের হাতেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হইবার পটভূমি প্রস্তুত হইতেছে। লর্ড আরউইনের পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড উইলিংডন কংগ্রেসের এই শক্তিবৃদ্ধির নিশ্চয়তা সহজ মনে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সুতরাং দ্বন্দ্ব আবার ফুটিয়া উঠিল; দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হইল। দমননীতির দাপটে দেশের মনে যে বিদ্রোহের আগুন ধিকি ধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল তাহা নূতন পথে আত্মপ্রকাশ করিল ১৯৩৫ সালের আইন অনুসারে নির্ব্বাচনের উপলক্ষে। এই নির্ব্বাচনে সর্ব্বদল নিরপেক্ষ হইয়া এগারটা প্রদেশের মধ্যে আটটায় কংগ্রেসের জয়লাভ হইল। কংগ্রেসের প্রভাব এইভাবে প্রমাণিত হইলেও বিরোধের অবসান হইল না। দুই বৎসর যাইতে না যাইতে আবার বিরোধ দেখা দিল।

প্রচারবিদ্ ইংরেজ মুখে প্রচার করিয়া দিল যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ভারতবাসীর ক্ষমতা লণ্ডন হইতে নিয়ন্ত্রিত হয় না যেমন হয় না কানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্র ব্যাপারে। এই দুই রাষ্ট্র প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন; লণ্ডন-প্রবাসী রাজার নামে শাসনকার্য্য চলিলেও, কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ার মন্ত্রিসভার কর্ত্তৃত্বে ও পরামর্শে রাজাকে চলিতে হয়। ব্রিটিশ দ্বীপের মন্ত্রী-সভার এই বিষয়ে কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। এই ব্যবস্থার নাম Dominion Status। ইংরেজ বলিল, ১৯৩৫ সালের আইনে এইরূপ অধিকারের কোন ইঙ্গিত না থাকিলেও ভারতবর্ষে Dominion Status in action, ভারতবর্ষে এই স্বাধিকার কার্য্যতঃ প্রচলিত আছে। এই কথাটা যে কত মিথ্যা তাহা প্রমাণিত হইল যখন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্র-সভা আলোচনা করিয়া, তর্ক করিয়া স্থির করিল জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে ও ব্রিটেনের পক্ষে তাহাদের যুদ্ধে যোগদান করা উচিত; দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্র-সভায় এই বিষয়ে ভোট লইয়া টায়ে টায়ে ব্রিটেনের পক্ষেই যোগদান বাঞ্ছনীয় মনে করা হইল; আয়ার (দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড) ও ব্রিটেনের এই জীবন-মরণ সমস্যায় নিরপেক্ষ থাকাই স্থির করিল এবং ব্রিটেন Dominion Status-এর এই স্বাধিকার মানিয়া লইল। কিন্তু ভারতবর্ষের বেলায় ইংরেজ এই সংযম দেখাইতে পারিল না। কোনও ভারতীয় নেতাকে বা কেন্দ্রীয় পরিষদকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই ব্রিটেন ভারতবর্ষের পক্ষে, ভারতবর্ষের অছিরূপে, জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিল; ভারতবর্ষকে ইউরোপের যুদ্ধে ঠেলিয়া দিল।

কার্য্যের দ্বারা ইংরেজ প্রমাণ করিয়া দিল যে ভারতবর্ষ তাহার খাস জমিদারী। এই অপমান কংগ্রেস মানিয়া লইতে পারিল না; কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী আটটি প্রদেশের শাসন কার্য্যের দায়িত্ব ত্যাগ করিল। আবার প্রমাণিত হইল যে ভারতবর্ষের জনমত পদদলিত করিয়া, দেশের জনমতের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসন ও শোষণ কার্য্য চালাইতেছে। গান্ধীজী এই অপমানজনক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কংগ্রেস মন্ত্রী-মণ্ডলীর পদত্যাগ বাঞ্ছনীয় মনে করিলেও, ব্রিটেনের বিপদের সময় তাহার যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে কোনরূপ বাধা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধি এইরূপ কাজের পক্ষে রীতিমত বিঘ্ন ঘটাইয়া বসিল। বিপন্ন শত্রুর গায়ে হাত তোলা প্রাচীন রণ-নীতির মতে অধর্ম্ম। এই ভাবাবেশে গান্ধীজী এই সমস্যার সময় তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করেন নাই; তাঁহার চক্ষে ব্রিটেন শত্রু ছিল না, জার্ম্মানীও মিত্র ছিল না, সমদর্শী তিনি; কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিলেন ধর্ম্মবুদ্ধির ও প্রেমধর্ম্মের প্রেরণায়। পাপী অপাপী সমজ্ঞান, এই শিক্ষা যুগযুগান্ত ধরিয়া ভারতবর্ষের জনগণকে চালিত করিতেছে এবং সে শিক্ষা জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য গান্ধীজী সাধনা করিয়া যাইতেছিলেন। এই সনাতন ঐতিহ্য রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে প্রবর্ত্তন করিয়া এক দ্বিধা ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করিল যাহা কংগ্রেসের চিন্তা ও কর্ম্মধারাকে অস্বচ্ছ ও জটিলতাসঙ্কুল করিয়া তুলিল। গান্ধীজীর এই মনোভাবের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র বসু প্রতিবাদের ধ্বনি তুলিলেন; ইংরেজের বিপদ ভারতবর্ষের সুযোগ—এই বাস্তব বুদ্ধির আলোকে চলিবার জন্য তিনি ব্যর্থমনোরথ হইয়া দেশ ত্যাগ

করিলেন এবং ইউরোপ ও পূর্ব্ব-এশিয়ার ইংরেজের বিরুদ্ধে আয়োজন করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, ভারতবাসী রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে ও সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিতে পারে। "নেতাজীর" চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে। কিন্তু যখন "আজাদ হিন্দ সরকার" ও "আজাদ হিন্দ সৈন্যবাহিনীর" কথা দেশের লোক জানিতে পারিল, তখন জন-গণ-মনের উচ্ছ্বাস গান্ধীজীর আদর্শের অনুকূল ছিল না, এই কথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

গান্ধীজীর মহানুভবতার সম্মান ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় দেখাইতে পারিল না। যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর মনোভাব সর্ব্বজনবিদিত। কংগ্রেসের নেতৃমণ্ডলী সকলেই এই মনোভাবের সমর্থক ছিলেন না। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপরিচালনায় ভারতীয় জনগণের অধিকার স্বীকৃত হইলে তাঁহারা ব্রিটিশের বিপদে সাহায্য করিতে পারেন, এই ভাবের প্রস্তাব নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির ১৯৪০ সালের জুলাই মাসের এক অধিবেশনে পাস হইয়াছিল। এই প্রস্তাব গ্রহণের ফলে গান্ধীজী প্রায় দুই বৎসরের জন্য কংগ্রেসের নেতৃত্ব হইতে সরিয়া দাঁড়ান। কারণ ভারতবর্ষের নামে নৈতিক সাহায্য ছাড়া অন্য কোন প্রকার সাহায্য ব্রিটেনকে দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এই মতভেদের মীমাংসা কখনও হয় নাই; তাঁহার দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাষ্ট্ররক্ষায় সংগঠিত সামরিক শক্তি প্রয়োগের সীমা কোথায় তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই। এই যুদ্ধের সময় কংগ্রেস-নেতৃবর্গ ঘোষণা করেন যে তাঁহারা ইংরেজের হাত হইতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা উদ্ধার করিবার জন্য হিংসা ও বল প্রয়োগের পক্ষপাতী নন, কিন্তু তাঁহারা এই কথা দিতে পারেন না যে স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রের রক্ষার জন্য বল প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে না।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনের উপর ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। তারপর সাড়ে পাঁচ মাস গান্ধীজী বাঁচিয়াছিলেন; নূতন রাষ্ট্রপরিচালনায় তাঁহার পরামর্শ ও উৎসাহ পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু প্রমুখ কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের মন্ত্রিবৃন্দ লাভ করিয়াছেন। রাষ্ট্র শাসন ও রক্ষার ব্যাপারে বলপ্রয়োগের প্রয়োজনে যে সমস্যা গান্ধীজীর মতকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার সুমীমাংসা হয় নাই। ইহা স্বীকার্য্য যে হিংসা ও বলপ্রয়োগ দ্বারা কোন বিষয়ের বা বিবাদের চূড়ান্ত সমাধান হয় না। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি, রাজনৈতিক বুদ্ধি আজ পর্য্যন্ত এমন কোন অস্ত্র আবিষ্কার করিতে পারিল না যার প্রয়োগে অবিচারের শেষ হয়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বলপ্রয়োগের স্থান নাই; ব্যষ্টির শারীরিক বল সংযত করিয়াই মানুষের সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সমষ্টির জীবনে এই সংযমের প্রয়োগ হয় না, এই ত ইতিহাসের অভিজ্ঞতা। গত ত্রিশ বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে যে সমষ্টির ব্যবহারে একটা অধৈর্য্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ পাইতেছে; ত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুইটা বিশ্বযুদ্ধ হইয়া গেল। ব্যষ্টির শুভবুদ্ধি বা সমষ্টির অনিচ্ছা তাহা আটকাইতে পারিল না। এক অশরীরী উন্মাদনা দেশে দেশে বিস্তারলাভ করিয়া মানুষের সহজবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহার বিচারবুদ্ধি ও স্বার্থবুদ্ধিকে হরণ করিয়া লয়। রণদেবতার পায়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক নিজেকে বলি দেয়; জাতি-বৈরের আগুনে কোটি কোটি লোকের শ্রমলব্ধ ধন পুড়িয়া যায় বন্দুক কামানের বারুদ ও গোলাবর্ষণে। এই ধ্বংসের সার্থকতা কিছুই নাই, এ কথা মূর্খেও বোঝে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি, ধর্ম্মবেত্তা, চিন্তানায়ক, বৈজ্ঞানিক—কেহই এই ধ্বংসলীলার অবসানের কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

পরাধীন ভারতবর্ষের একজন লোক এই যুগসন্ধিক্ষণে মানুষের এই দুর্বুদ্ধি, এই লোভ, এই অপরাধের বিরুদ্ধে জীবনব্যাপী সংগ্রাম করিয়া গেলেন। যে দেশের শাসক সম্প্রদায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল, তাহারা অহিংসায় বিশ্বাসী নয়। তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে দুই দুইটা মহাযুদ্ধে দুই শত বৎসরের সঞ্চিত তাহাদের ধনভাণ্ডার পুড়িয়া গেল। ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহারা নানা ভাবে অত্যাচারের বিভীষিকা বিস্তার করিয়াছে। শেষে তাহারা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে অবস্থার নিকট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সীমাহীন ক্ষতির নিকট। মনুষ্য সমাজের যে আকুতি মহাত্মা গান্ধীকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল এই নতি স্বীকার তাহার নিকট হইলে পৃথিবী আজ স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইত। স্বল্পবিশ্বাসী আমরা আজও ভাবিতে পারিতেছি না যে আমাদের একজন তাঁহার সাধনার বলে এই অসাধ্য সাধন করিয়াছেন; ইংরেজ অহিংসার নিকট পরাজয় মানিয়া লইয়াছে। একজন বিদেশী সাংবাদিক কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগের সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে গান্ধীজী জয়লাভ করিয়াছেন অর্থবলের সাহায্যে নয়, বলপ্রয়োগ দ্বারা নয়, খুব সুসংগঠিত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নয়। একটি বিশ্বাসের প্রয়োগ দ্বারা তিনি বিজয়ী হইয়াছেন; মন মুখ এক হইলে যে শক্তি লাভ করা যায় তাহার সাহায্যেই তিনি জয়লাভ করিয়াছেন; উপায় ও আদর্শের সততা রক্ষা করিলে যে আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্ভব হয়, তাহার সাহায্যেই তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যায়কে স্তব্ধ করিয়াছেন, বিধ্বস্ত করিয়াছেন। লুই ফিসারের "গান্ধী ও ষ্টালিন" এই বইয়ের কথাগুলি অনুধাবন করিলে এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়:

'Gandhi stood against the might of the British Empire—and won. He did it without money, without violence, without much organization. He did it with an idea, and through the power that comes from honest means and honest words."

কংগ্রেস সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর শেষ রচনা

'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী "Congress position" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। এইটিই তাঁহার শেষ রচনা। প্রবন্ধটির মর্ম্মানুবাদ এখানে দেওয়া হইল:

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দেশের সর্ব্বপ্রাচীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস অহিংস নীতি অনুসরণ করিয়া বহুবার স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইবার পর বর্ত্তমানে ইহার অস্তিত্ব বিলোপ হইতে দেওয়া চলে না। একমাত্র জাতি নিশ্চিহ্ন হইলেই কংগ্রেস ধ্বংস হইতে পারে। প্রাণবন্ত বস্তু ক্রমবর্দ্ধনশীল—অন্যথায় ধ্বংস অবধারিত। কংগ্রেস রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে—আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে তাহাকে স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। রাজনৈতিক বন্ধন মুক্তি অপেক্ষা শেষোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা অধিকতর কঠোর। কারণ উহা সংগঠনমূলক—উন্মাদনা সৃষ্টিকারী বাহ্যাড়ম্বর ইহার মধ্যে কিছুই নাই। প্রকৃত গঠনমূলক পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে দেশের নরনারী নির্বিশেষে সহযোগিতা প্রয়োজন।

লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য প্রাথমিক অধিকার মাত্র কংগ্রেস লাভ করিয়াছে। অগ্নিপরীক্ষা এখনও বাকী। ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সুকঠোর পথে যাত্রা করিয়া কংগ্রেস কতক দুর্নীতিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছে। এগুলি নামে মাত্র জনপ্রিয় ও গণতন্ত্রসম্মত। এই অবাঞ্ছিত পরিণতি হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় কি?

কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য-সংখ্যা কোনকালেই এক কোটির অধিক হয় নাই। এক কোটি নরনারী সদস্য হইয়াছেন ইহার অবশ্য সঠিক ভাবে নির্ণয় করা চলে না। এক্ষণে কংগ্রেস সদস্য-তালিকায় সেই বিশেষ রেজিষ্টারটি অবশ্যই বাতিল করিতে হইবে। যাহাদের কোনরূপ পরিচয় জানা যায় না, এইরূপ লক্ষ লক্ষ সদস্যের নামের তালিকাসম্বলিত অজ্ঞাত রেজিষ্টার আছে। ভোটদান ক্ষমতাসম্পন্ন নরনারীর তালিকার অনুরূপ যে একটি কংগ্রেসের রেজিষ্টার তৈরি হওয়া কর্ত্তব্য। উহার মধ্যে কোন ভুয়া নাম না থাকে এবং কোন ব্যক্তির নাম বাদ না যায়, তৎপ্রতিই কংগ্রেসকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই রেজিষ্টারে জাতির সেবকদের তালিকা থাকিবে এবং উক্ত কর্ম্মীদের উপর যখন যে কার্য্যের ভার প্রদত্ত হইবে তাহা তাঁহারা সুসম্পন্ন করিবেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমানে মুখ্যতঃ শহরবাসীদের লইয়া উক্ত তালিকা প্রস্তুত হইবে। তাঁহাদের অনেককেই হয়ত ভারতের পল্লীগুলিতে কাজ করিতে হইবে। পল্লী-অঞ্চল হইতে সংগৃহীত কর্ম্মীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

উল্লিখিত দেশসেবকদের আইনসম্মতভাবে স্ব-স্ব অঞ্চলের নরনারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। বহু নরনারী ও বহু দল তাঁহাদের খোসামোদে প্রবৃত্ত হইবেন। খাঁটি কর্ম্মীরাই সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। যেরূপ দ্রুত-গতিতে কংগ্রেসের মর্য্যাদা হ্রাস পাইতেছে, একমাত্র উল্লিখিত নীতি অনুসরণদ্বারা ইহা পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কংগ্রেস জাতির সেবক ঈশ্বরের ভৃত্য ছিল। আজ কংগ্রেসকে ঘোষণা করিতে হইবে যে, ঈশ্বরের ভৃত্যদের প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ইহা অপর কিছুই নহে। কংগ্রেস যদি ক্ষমতালাভের অবাঞ্ছিত দলাদলিতে লিপ্ত হয় তাহা হইলে অচিরাৎ দেখা যাইবে যে, কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে কংগ্রেস আজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী নহে।

এই সম্পর্কিত আলোচনার ইহা ভূমিকামাত্র—শরীর ভাল থাকিলে এবং সময় পাইলে দেশসেবকগণ কিভাবে দেশের পূর্ণবয়স্ক নরনারী নির্বিশেষের শ্রদ্ধাভাজন হইতে সমর্থ হইবেন, সেই সম্পর্কে 'হরিজনে' বিস্তারিত আলোচনা করিব।

গান্ধীজীর প্রতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিগত ৩০শে জানুয়ারি (১৬ই মাঘ) শুক্রবার বৈকালে আততায়ীর গুলির আঘাতে মহাত্মা গান্ধীর জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় দিল্লীর বেতার-কেন্দ্র হইতে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু পরলোকগত মহামানবের প্রতি নিম্নোক্ত রূপ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন,—

আমার দেশের ভাই-বোনেরা, এক নিদারুণ দুঃখশোকের অন্ধকার দেশের চারিদিক ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই অবস্থায় আমি আপনাদের কি কথা শুনাইব? কেমন করিয়া আমি আপনাদের বলি যে, আমাদের বাপুজী সমগ্র জাতির জনক আর ইহলোকে নাই। আর ত তাঁহাকে চক্ষে দেখিব না। দেশের নানা দুঃখ-দুর্য্যোগে আর ত তাঁহার কাছে মন্ত্রণার জন্য ছুটিয়া যাইতে পারিব না। দেশের এই পরম দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেও আমার মন সরিতেছে না। যে অনির্ব্বাণ দীপশিখা সুদীর্ঘকাল সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা বর্ত্তমানকে অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের মাঝে ব্যাপ্ত হইল। সেই আলোকই সত্যের পথে, এই সনাতন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে আগাইয়া দিয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান দুঃসঙ্কুল দিনে মহাত্মাজীর বাঁচিয়া থাকিবার কতই না প্রয়োজন ছিল, অথচ তিনি নাই। এক উন্মাদ গান্ধীজীর জীবননাশের কারণ হইল। যাহা হইবার তাহা হইল কিন্তু যে বাণী গান্ধীজী জীবনভোর আমাদের শুনাইয়াছেন তাহাকে সমগ্র জাতীয় জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। একনিষ্ঠ সৈনিকের ন্যায় তাঁহার দীপবর্ত্তিকা লইয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মাঝে এমন কোন স্খলন যেন না থাকে যাহাতে তাঁহার আত্মা ক্ষুব্ধ বা ব্যথিত হয়। জাতির এই ভীষণ দুর্দ্দিনে হিংসা, ভীরুতা ও সকল ক্ষুদ্র কলহের চিরতরে অবসান হোক।

অনেকে গান্ধীজীর দেহ কয়েক দিন রক্ষা করিবার কথা বলিয়াছেন। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে

শেষ দর্শনেচ্ছু অগণিত দেশবাসী আসিয়া তাঁহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার সুযোগ লাভ করিবেন। জীবিতাবস্থায় গান্ধীজী বারবার ইহার বিরোধিতা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য বহু লোকের এই প্রকার অভিলাষ থাকা-সত্ত্বেও গান্ধীজীর অন্তিম ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে হইবে। শনিবার সকাল সাড়ে এগারটায় শবযাত্রা যমুনার ধারে নীত হইবে। বিকাল চারটা নাগাদ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হইবে। কোন্ পথ ধরিয়া এই শবযাত্রা যমুনায় পৌঁছিবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পরে জানান হইবে। দিল্লীর লোকেরা, যাঁহারা গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে চান, তাঁহারা যেন পথের দুই ধারে নীরবে শান্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। বিড়লা ভবনে তাঁহারা যেন অযথা ভিড় না করেন। কোন বিক্ষোভ যেন না দেখান হয়। দিল্লীতে ও বাহিরে সর্বত্র প্রার্থনা ও উপবাসব্রত পালিত হোক। বিকাল চারটা নাগাদ যখন যমুনার তীরে গান্ধীজীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইবে সেই সময় দিল্লীর বাহিরে লোক যেন নদী অথবা সমুদ্রের তীরে গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানান। যে মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য গান্ধীজী জীবন হারাইলেন তাহাকে অন্তরে গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া জীবনপণ করিতে পারিলেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন করা হইবে। আজ আমরা তাঁহার জীবনের সাধনাকে স্মরণ, মনন ও পালন করিব।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের শ্রদ্ধাঞ্জলি

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর পরে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল উক্ত বেতারকেন্দ্র হইতে বলেন,—

আপনারা আমার প্রিয় ভাই জবাহরলালের বক্তৃতা এইমাত্র শুনিলেন। আমার বুক ব্যথায় ভরা—কি বলি, কি করি, কি না করি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমার মুখে কথা আসিতেছে না। ভারতের আজ দুঃখ শোক ও লজ্জার দিন।

আজ বিকাল প্রায় চারিটার সময় আমি গান্ধীজীর কাছে যাই। সেখানে তাঁহার সহিত আমার এক ঘণ্টা কাল কথাবার্তা হয়। তিনি ঘড়ি বাহির করিয়া বলেন যে, এখন প্রার্থনার সময় হইয়াছে—আমাকে যাইতে দাও। তিনি যখন রওয়ানা হইলেন তখন আমিও বাড়ীর দিকে চলিলাম। বাড়ী পৌঁছিবার আগেই এক ভাই আমার নিকট আসিয়া বলিল যে, এক হিন্দু যুবক গান্ধীজীকে প্রার্থনায় যাইবার সময় পিস্তল দিয়া তিন বার গুলী করিয়াছে। তিনি পড়িয়া গেলে তাঁহাকে উঠাইয়া বিড়লা ভবনে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

খবর পাইয়া সেখানে গেলাম। দেখিলাম শান্তি, সৌম্য ও ক্ষমার মধ্যে তিনি শায়িত আছেন। সেই শান্ত চেহারা! হৃদয়ে দয়ার প্রকাশে যে চেহারা তাঁহার দেখা যায়, সেই চেহারাই দেখিলাম। আশেপাশে বহুলোক জমায়েত হইয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজী চলিয়া গিয়াছেন।

সম্প্রতি অনশনের ঝুঁকি লওয়ার পরও গান্ধীজীকে বাঁচিয়া উঠিতে দেখা গিয়াছে। বোধ হয়, ভারতের জন্য তাঁহার কাজ তখনও অসমাপ্ত বলিয়া তাঁহার জীবনান্ত হয় নাই। কিছুদিন হইতে গান্ধীজীর মনে বেদনার ভাব লক্ষ্য করা যাইতেছিল। গত সপ্তাহে এক উন্মাদ হিন্দু যুবক তাঁহার উপর বোমা নিক্ষেপের চেষ্টা করে। তখনও তিনি বাঁচিয়া যান। কিন্তু এবারে এক উন্মাদ যুবকের গুলীতে তিনি চিরবিদায় লইলেন। ইহা লজ্জার কথা যে পৃথিবীর সেরা মানুষটি তাঁহার জীবন দিয়া জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলে ত চলিবে না। এখন ক্রুদ্ধ হইলে তিনি সারাজীবন ধরিয়া যাহা শিখাইয়াছেন তাহা আমরা ভুলিয়া যাইব। গান্ধীজীর জীবিতকালে তাঁহার যে আদেশ আমরা মানি নাই, সে আদেশ তাঁহার মরণের পরে আমাদের অবশ্যই মানা কর্তব্য। আমার প্রার্থনা এই যে যত দুঃখ ব্যথাই হোক, আর যত ক্রোধই হোক, আজ ক্রোধকে সামলাইয়া লইতে হইবে। তিনি তাঁহার সারা জীবনে যাহা শিখাইয়াছেন, তাঁহার মরণের পরে সেই শিক্ষারই পরীক্ষা দিতে হইবে।

শান্তি, ভাল ব্যবহার ও বিনয় সহকারে পরস্পরের সহিত মিলিয়া মাটিতে শক্ত হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। আমাদের উপর মহান্ দায়িত্ব বর্তাইয়াছে। আমাদের এখন কোমর ভাঙিয়া গিয়াছে। হিন্দুস্থানের মহান্ পুরুষ, আমাদের বিরাট্ ভরসা চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি চলিয়া গেলেও আমাদের সঙ্গে সব সময়েই আছেন ও থাকিবেন। তিনি যাহা দিয়াছেন তাহা যাইবার নহে, তাহা চিরকালই থাকিবে। আগামী কাল চারটার সময় তাঁহার দেহ মাটি হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার আত্মা আমরা কি করিতেছি তাহা দেখিবার জন্য জাগিয়া থাকিবে। তিনি ত অমর।

যে যুবক পাগল হইয়া গান্ধীজীকে হত্যা করিল সেই যুবকের পাগলামি হইতেই হিন্দুস্থানের যুবক জাগিয়া উঠিবে বলিয়া আশা করি। গান্ধীজীর জীবন বিনিময়ে গান্ধীজীর সাধনাকে সার্থক করিবার জন্য কে জানে ঈশ্বরই হয়ত এই মৃত্যু চাহিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের কাজ বাকী রহিয়াছে। আমাদের পিছাইয়া গেলে চলিবে না। একসঙ্গে দাঁড়াইয়া মিলিত ভাবে সকলকে বিপর্যয়কে রোধ করিতে হইবে। যে কাজ হয় নাই, তাহাই করিতে হইবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, আমরা যেন গান্ধীজীর আরব্ধ সাধনাকে সফল করিতে পারি।

ভারতীয় পার্লামেণ্টে পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পর গত ২রা ফেব্রুয়ারি দিল্লীতে ইউনিয়ন পার্লামেণ্টের প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ভারতীয় ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এই শোকাবহ দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়া নিম্নরূপ বক্তৃতা করেন—

এই দুর্ঘটনা (গান্ধীজীকে হত্যা) কোন উন্মাদ ব্যক্তির অনস্ত-

নিরপেক্ষ কার্য্য নহে। দীর্ঘকাল ধরিয়া, বিশেষভাবে গত কয়েক মাস দেশে যে হিংসা ও বিদ্বেষের বিষাক্ত পরিবেশ বিরাজ করিতেছে এই ঘটনা তাহারই ফল। এই পরিবেশ আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, ইহা আমাদের বেষ্টন করিয়া আছে। মহাত্মাজী আমাদের জন্য যে কার্য্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা করিতে হইলে আমাদিগকে এই পরিবেশের সম্মুখীন হইতে হইবে। ইহার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইবে। হিংসা ও বিদ্বেষরূপ অমঙ্গলের মূলোৎপাটন করিতে হইবে। গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ হইতে আমি বলিতে পারি, তাহারা এজন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করিবে না। কারণ আমাদের দুর্ব্বলতা বা অন্য কোন কারণে আমরা যদি ইহা না করি, এই হিংসা ও বিদ্বেষ প্রচার যদি বন্ধ না করি তাহা হইলে আমরা এই গবর্ন্মেণ্টে থাকিবার যোগ্য নই, তাঁহার অনুগামী হওয়ার যোগ্য নই, মৃত মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধার বাণী উচ্চারণের যোগ্যতাও আমাদের নাই।

শত শত এবং লক্ষ লক্ষ বর্ষ পরে লোক এই সময়ের কথা মনে করিবে যে জগতে এই ঈশ্বর-প্রেরিত মহামানব বিচরণ করিতেন। তাহারা হয়ত আমাদের কথাও ভাবিবে যে, যে-পবিত্রভূমিতে তাঁহার পদাঙ্ক পড়িয়াছে, আমরা যত ক্ষুদ্রই হই না কেন সেই ভূমিতে আমরাও বিচরণ করিয়াছি। আমরা যেন এই যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারি।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা, তাঁহাদের জন্য প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করা তাঁহাদের জন্য শোক প্রকাশ করা এই পরিষদের রীতি। আজ এই দিনে আমার অথবা এই পরিষদের অন্য কাহারও বিশেষ কিছু বলার যোগ্যতা আছে কিনা, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত হইতে পারিতেছি না। ব্যক্তিগতভাবে এবং গবর্ন্মেণ্টের কর্ম্মকর্ত্তা হিসাবে আমি বিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেছি। জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদকে আমরা রক্ষা করিতে পারিলাম না। ইহা আমাদের ব্যর্থতা। গত কয়েক মাসে বহু অসহায় নরনারী ও শিশুকে আমরা রক্ষা করিতে পারি নাই। আমাদের পক্ষে অথবা যে-কোন গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে ইহা দুঃসাধ্য কর্ত্তব্য হইতে পারে কিন্তু তবুও ইহা ব্যর্থতা। যে মহামানবকে আমরা অপরিসীম সম্মান করিতাম, ভালবাসিতাম, তিনি যে চলিয়া গিয়াছেন, আমরাই তাহার কারণ। একজন ভারতীয় তাঁহার বিরুদ্ধে হস্ত উত্থিত করিয়াছে সেজন্য ভারতীয় হিসাবে আমি লজ্জিত। একজন হিন্দু এই কার্য্য করিয়াছে, সেজন্য আমি হিন্দু হিসাবে লজ্জা অনুভব করিতেছি। বর্ত্তমান যুগের তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু ছিলেন।

প্রসিদ্ধ ও মহৎ ব্যক্তিগণের স্মৃতিস্তম্ভ ব্রঞ্জ ও মার্ব্বেলে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐশ্বরিক শক্তিবিশিষ্ট এই মহাপুরুষ লক্ষ লক্ষ হৃদয়কে তাঁহার জীবিতকালের মধ্যেই এমন ভাবে একাত্ম করিয়া লইয়াছিলেন যে বহুলাংশে ক্ষুদ্র হইলেও আমরা সকলেই যেন সেই একই উপকরণে গঠিত হইয়া গিয়াছি। তিনি আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন—রাজপ্রাসাদে নয়, শুধু নির্দিষ্ট স্থানে নয়; জনসমাবেশে নয়; দরিদ্রদের কুটিরে লাঞ্ছিত ও নিপীড়িতদের ভবনে তিনি আপনার স্থান করিয়া লইয়াছেন।

গত ৩০ বৎসর ধরিয়া এই দেশকে তিনিই প্রধানতঃ গড়িয়া তুলিয়াছেন। আত্মত্যাগের এত উন্নত স্তরে তিনি উঠিয়াছিলেন যে অন্যত্র তাঁহার তুলনা বিরল। তিনি সফল হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে তিনি ইহার জন্য পীড়া অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার মুখে যদিও সর্ব্বদা হাসি লাগিয়াই থাকিত, যদিও কখনও তিনি কাহারও প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, তবুও যাহাদিগকে তিনি শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাদের ভুলত্রুটির জন্য পীড়া অনুভব করিয়াছেন কারণ আমরা তাঁহার প্রদর্শিত পথ হইতে বিচলিত হইয়াছি। পরিশেষে তাঁহারই এক সন্তান তাঁহাকে হত্যা করিল, কারণ যে-কোন ভারতীয়ই তাঁহার সন্তানস্বরূপ।

প্রয়াগে পণ্ডিত নেহরুর বক্তৃতা

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর দেহাবশেষ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে বিসর্জ্জনের পর বিপুল জনতার সম্মুখে পণ্ডিত নেহরু তাঁহার সম্পর্কে এক মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন। ইহাতে তিনি বলেন,—

মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম বিসর্জ্জনের সঙ্গে তাঁহার সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক শেষ হইয়া যায় নাই, পক্ষান্তরে যোগসূত্র আরও দৃঢ় হইল।

আমাদের সৌভাগ্য যে, মহাত্মা গান্ধীর সমসাময়িক যুগে আমরা এই পৃথিবীতে জন্মিয়াছি এবং তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পরবর্ত্তী বংশধরগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না, কিন্তু তাঁহারাও আমাদের ন্যায় তাঁহার নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করিবেন, তাঁহার মহান্ ব্যক্তিত্ব অনন্তকালস্থায়ী।

তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমরা সর্ব্বদা তাঁহার নিকট যাইতে পারিতাম এবং তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উপকৃত হইতাম। এক্ষণে আমরা আর তাহা করিতে পারিব না। আমরা এক্ষণে আর তাঁহাকে আমাদের বোঝার অংশ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে পারিব না। আমাদিগকে এক্ষণে তাঁহার সাহায্য ব্যতীত সব কিছুরই সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু তিনি আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদাই আমাদিগকে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করিবে।

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম পরিচালনাকালে গান্ধীজী হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধেও প্রচারকার্য্য চালান। কিন্তু ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবার অব্যবহিত পরে তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং দেশ-ব্যাপী হিংসার তাণ্ডব চলিল। তিনি যেভাবে একটি নির্বীর্য্য জাতির স্বাধীনতা অর্জ্জনে সহায়ক হন তাহা ইতিহাসে অভূত-পূর্ব্ব। কিন্তু সম্প্রতি স্বাধীন ভারতই জগতের সমক্ষে অপদস্থ

হইয়াছে এবং ভারতবাসীর অন্তরাত্মা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। দেশের বিষাক্ত আবহাওয়ায় সাম্প্রদায়িকতা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে কয়েকটি সম্প্রদায় হিংস কর্ম্মতৎপরতা অবলম্বনের প্রতি ঝোঁক দেয় এবং পরিণামে সর্ব্বাধিক শ্রদ্ধাভাজন বাপুজীই নিহত হইয়াছেন।

এইরূপ হিংসাতৎপরতা বন্ধ না হইলে অর্জ্জিত স্বাধীনতার বিনাশ ঘটিবে। কাজেই হিংসার অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্য লইয়া সকলকে গঙ্গাতীর হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে। ভারতের বহু যুবক হিংসার পথ আশ্রয় করিয়াছে; তাহাদের এখন নিজেদের অনুসৃত উপায়ের অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া ভ্রান্ত বুদ্ধি পরিহার করিতে হইবে।

রাজনীতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিবার যে মনোভাব রহিয়াছে তাহা আমাদের নিকট অপ্রীতিকর এবং আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে বিপজ্জনক। আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক গবর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি। শান্তির বিঘ্ন না ঘটাইয়াও এখানে প্রত্যেক নাগরিকের স্বীয় অভিমত প্রচারের অধিকার আছে। তবে যে গবর্মেণ্ট জনসাধারণের অধিকাংশের বিশ্বাস অর্জ্জন করিবে, তাহারাই শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এ ধরনের গবর্ণমেণ্ট যাঁহারা পছন্দ করেন না এবং যাঁহারা বলপ্রয়োগে সরকারী শাসনযন্ত্র অধিকার করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের স্বাধীন ভারতে কোন স্থান নাই।

এদেশে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও হিংসাত্মক কার্য্যতৎপরতার প্রসার ঘটিল কি করিয়া? জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন কতিপয় ব্যক্তি যুব-সম্প্রদায়কে চালিত করিয়া নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করিয়াছে। অতীতে হয়ত আমরা ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করিতে পারিতাম না। কিন্তু আমাদের জাতির জনকের শেষকৃত্য সম্পন্ন হইবার পরও কি কেহ হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটাইতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইবে না?

ইহার পর আমরা বিষাদক্লিষ্ট অন্তরে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় বিরাট নেতাকে পাইয়া আমরা যে গর্ব্ববোধ করিতে পারি, এই মনোভাবও আমাদের মর্ম্মান্তিক বেদনার মধ্যে আনন্দ সঞ্চার করিতেছে। স্বাধীনতার যুদ্ধে তিনি আমাদের নূতন অস্ত্রের সন্ধান দেন এবং উহার ফলে আমাদের সংগ্রাম অহিংস ও শান্তিপূর্ণ হয়। তিনি আমাদের জন্য যাহা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য রহিয়াছে। তাঁহার আরব্ধ কার্য্য আমাদের সম্পন্ন করিতে হইবে এবং তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী ভারতবর্ষ গড়িতে হইবে। ভারতে ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেককে সম-অধিকার দানের ব্যবস্থা হইবে এবং বিশ্ববাসীদের প্রতিও আমরা অনুরূপ মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হইব। সর্বমানবের প্রতি সম-আচরণই হইল গান্ধীজীর প্রদত্ত শিক্ষা। আমরা যদি ইহাতে বিফল হই তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, তাঁহার মত বিরাট নেতা লাভের যোগ্য আমরা ছিলাম না। বিগত ৪০ বৎসরকাল ধরিয়া গান্ধীজীর জয়ধ্বনি করা হইতেছে। গান্ধীজী কখনও ব্যক্তিগত জয় কামনা করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে ভারতের জয়ই ছিল তাঁহার কাম্য। তিনি সত্য ও অহিংসার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভারতের স্বাধীনতা-সৌধ নির্ম্মাণ করেন; এরূপ অবস্থায় তাঁহার বিজয় সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে হইলে উহাকেই স্থায়ী করিয়া তুলিতে হইবে।

মহাত্মাজীর প্রতি বড়লাটের শ্রদ্ধাঞ্জলি

দিল্লীর বেতার-কেন্দ্র হইতে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ভারতের বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন,—

মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু-সংবাদে সমগ্র সভ্য জগতের লক্ষ লক্ষ লোক ব্যক্তিগত শোকের বেদনায় মুহ্যমান হইয়াছে। যাঁহারা সারাজীবন তাঁহার কর্ম্মসঙ্গী ছিলেন অথবা আমার মত যাঁহারা তাঁহার সহিত অল্পদিনের পরিচিত ছিলেন, কেবল যে তাঁহারাই বন্ধুবিয়োগের বেদনা বোধ করিয়াছেন তাহা নয়; যাঁহারা জীবনে গান্ধীজীর সহিত কখনও সাক্ষাৎ করেন নাই, তাঁহাকে একবারও দেখেন নাই কিংবা তাঁহার রচনাবলীর একটি বর্ণও পাঠ করেন নাই তাঁহারাও তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে বন্ধুবিয়োগের বেদনাই অন্তরে অনুভব করিয়াছেন।

"প্রিয় বন্ধু" বলিয়া সর্ব্বদা চিঠিতে আমাকে তিনি সম্বোধন করিতেন, আমিও তাহাই করিতাম। তাঁহাকে সম্বোধনের ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর কিছু যে ছিল না, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কথাটি আমার পরিবারের সকলে এবং আমি সর্ব্বদা মনে রাখিব।

গত বৎসর মার্চ্চ মাসে গান্ধীজীর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ভারতে পৌঁছিয়া আমার প্রথম কাজই হইয়াছিল গান্ধীজীর কাছে চিঠি লেখা, আমাদের উভয়ের মধ্যে যত শীঘ্র সম্ভব সাক্ষাতের প্রয়োজনের বিষয় উল্লেখ করা। যে দুরূহ সমস্যা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে তাহার সমাধান করিতে হইলে আমাদের ব্যক্তিগত সংযোগ অবিচ্ছিন্ন রাখার বিশেষ প্রয়োজন—ইহা আমরা আমাদের প্রথম সাক্ষাতেই স্থির করিয়াছিলাম। শেষ বার তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন ঠিক এক মাস আগে; যে প্রার্থনা-সভায় গান্ধীজী ঘোষণা করেন সাম্প্রদায়িক মিলন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হইলে তিনি আমৃত্যু অনশন করিবেন, তাহার কয়েক মিনিট পরেই তিনি আমার কাছে আসেন। তাঁহার অনশনের চতুর্থ দিবসে আমার স্ত্রীকে লইয়া তাঁহাকে দেখিতে যাই; জীবিত অবস্থায় গান্ধীজীকে উহাই আমার শেষবার দেখিতে যাওয়া। এই দশ মাস ধরিয়া আমরা পরস্পরকে জানিতে পারিয়াছিলাম; নিতান্ত মামুলি ধরনের দেখা-সাক্ষাতের মধ্যেই আমাদের পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাগুলি শেষ হইত

না। সে সব যেন ছিল দুই বন্ধুর মধ্যে কথাবার্ত্তা। আমরা উভয়েই উভয়ের প্রতি বিশ্বাস জন্মাইতে পারিয়াছিলাম। দুই জনেই দুই জনকে যেন বুঝিতে পারিয়াছিলাম। ইহার স্মৃতি এখন আমার কাছে চিরদিনের মত এক মূল্যবান সম্পদ হইয়া রহিল। ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতার দেহে যে মারাত্মক রোগের বীজাণু তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছে, সেই ধর্ম্মোন্মত্ততার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে গিয়া শান্তির অবতার, অহিংসার মূর্ত্ত প্রতীক গান্ধীজী এক জিঘাংসুর হাতে প্রাণ দিলেন, শহীদ হইলেন।

জাতিকে গড়িয়া তুলিবার যে গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে, সেই ভার লইবার আগে জাতির দেহ হইতে এই বিষাক্ত বীজাণুকে সমূলে উৎপাটন করিতে হইবে—ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন

আমাদের মহাপ্রাণ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু চিরস্থায়ী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ আমাদের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই রাষ্ট্রের সকলেই সার্থক ও নব উন্মেষময় জীবন যাপন করিতে পারিবে। এই রাষ্ট্রে যথার্থ প্রগতিশীল সমাজ গড়িয়া উঠিতে পারিবে, যাহার ভিত্তি হইবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য।

যে স্বাধীনতার ভিত্তি গান্ধীজী তাঁহার জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার যোগ্য সম্মান রাখিতে হইলে সেই ভিত্তির উপরে এইরূপ একটি সমাজ আমাদের স্থাপন করিতে হইবে। আমাদের হৃদয় মন ও কর্ম্মের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। যে শোকাবহ ও মর্ম্মঘাতী মুহূর্ত্তে গান্ধীজীকে আমরা হারাইলাম, সেই শোকের আঘাতে যদি আমাদের সকল বিভেদ দূর হইয়া যায়; যদি এখনই, এই মুহূর্ত্তেই আমরা স্থায়ীভাবে সম্মিলিত চেষ্টায় এক হইতে পারি তবেই গান্ধীজী যাহাদের এত ভালবাসিতেন সেই জনগণের প্রতি তাঁহার চরম সেবার সুযোগ আমরা করিয়া দিতে পারিব।

কেবল এই উপায়েই তাঁহার আদর্শ রূপায়িত হইতে পারিবে, ভারতবর্ষ তাহার পূর্ণ ঐতিহ্যের অধিকারী হইবে।

গান্ধীজীর নির্দ্দেশিত পন্থা ও ভারতবাসীর কর্ত্তব্য

ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু দিল্লীর বেতার কেন্দ্র হইতে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি জাতির উদ্দেশে একটি বক্তৃতা করেন। ইহাতে তিনি মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশিত পথ ও ভারতবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন। এই বক্তৃতার মর্ম্ম এই,—

যে শোচনীয় ঘটনার জন্য ভারতবর্ষের নাম কলঙ্কিত হইয়াছে তাহার পর হইতে দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইয়াছে। এই দুইটি সপ্তাহ জাতির জীবনের দুঃখময় অমানিশা, এই দুই সপ্তাহ ধরিয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ অধিবাসী বেদনাক্লিষ্ট অন্তরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে। আমরা মহান্ নেতার জন্য যে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি তাহা দ্বারা কি আমাদের অন্তরের দৌর্বল্য ও মালিন্য ধৌত হইয়া যাইবে? উহার ফলে কি আমরা তাঁহার এতটুকু উপযুক্ত হইতে পারিব? এই দুই সপ্তাহ ধরিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সাধারণ লোক হইতে রাষ্ট্রের অধিপতি পর্যন্ত মহাত্মার স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই ভাবাবেগ ধীরে ধীরে হ্রাস পাইবে, কিন্তু তাহা হইলেও আমরা পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পাইব না, কারণ তিনি আমাদের জীবন ও মনের প্রত্যেক স্তরে তাঁহার ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার জন্য ব্রোঞ্জ ধাতু অথবা মর্ম্মরের প্রতিমূর্ত্তি অথবা স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের জন্য অনেকে প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহার দ্বারা তাঁহাকে উপহাস করা হয় এবং বাণীর মূল্যকে হীন করা হয়। তাঁহার সম্মানযোগ্য কি স্মৃতিস্তম্ভ আমরা নির্ম্মাণ করিতে পারি। তিনি আমাদের জীবন ধারণের ও জীবন উৎসর্গের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা যদি সেই শিক্ষার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারি তবে তাঁহার জন্য কোন স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ না করাই ভাল; মহাত্মাজী আমাদের যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, শ্রদ্ধাবনতচিত্তে সেই পথ অনুসরণ করা এবং জীবনে ও মরণে আমাদের কর্ত্তব্যপালন করাই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার একমাত্র উপযুক্ত উপায়।

তিনি ছিলেন হিন্দু ও ভারতীয়; বহুকাল তাঁহার ন্যায় মহৎ লোকের জন্ম হয় নাই। ভারতীয় ও হিন্দু হওয়ার জন্য তিনি গর্ব্ববোধ করিতেন। ভারতবর্ষ তাঁহার নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিল, কারণ বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ শাশ্বত সত্যের প্রচার করিয়া আসিয়াছে। তিনি ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন এবং জাতির জনক বলিয়া অভিহিত হইলেও সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মভাব অথবা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধ তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। এইজন্যই তিনি আন্তর্জ্জাতিক-মনোভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হন। তিনি মানুষের ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন, প্রত্যেক ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যে তিনি আস্থাবান ছিলেন এবং দরিদ্র মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

তাঁহার স্মৃতির প্রতি অগণিত লোক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছে; ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই। পাকিস্থানের অধিবাসীরা যেরূপ স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে—ইহাতে তিনি বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিত হইতেন। সেই শোচনীয় ঘটনার পরদিন আমরা মুহূর্ত্তের জন্য সকল তিক্ততা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, গত কয়েক মাসের বিবাদ ও মতানৈক্য ক্ষণেকের জন্য আমরা বিস্মৃত হইয়াছিলাম—গান্ধীজী আমাদের মানসনেত্রের সম্মুখে ভারত বিভাগের পূর্ব্বে অখণ্ড ভারতের অবিসংবাদী ও প্রিয় নেতারূপে প্রতিভাত হইতেছিলেন।

মহাত্মাজী ছিলেন ভারতের মিলনকারী; তিনি কেবল আমাদের অপরকে সহ্য করিবার শিক্ষাই দেন নাই—পরন্তু তিনি আমাদের সেই সকল ব্যক্তিকে বন্ধু ও সহকর্ম্মী হিসাবে গ্রহণ করিবার শিক্ষাও দিয়াছেন। তিনি আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ

ও সংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠিতে এবং অন্তের মধ্যে শুভের লক্ষণ দেখিবার শিক্ষাও দিয়াছেন।

তাঁহার জীবনের শেষ কয়টি মাস এবং তাঁহার মৃত্যু হইতেছে ঐক্য, উদারতা এবং পরমত সহিষ্ণুতার মূর্ত্ত প্রতীক। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে আমরা ঐ সকল আদর্শ অনুসরণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম। আমরা সেই প্রতিশ্রুতি পালন করিব। আমাদের ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতে যাহারা বাস করে তাহারা যে ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন ভারত-বর্ষ তাহাদের মাতৃভূমি। তাহারা আমাদের মহান্ ঐতিহ্যের সমান অংশীদার। তাহাদের বাধ্যবাধকতা ও অধিকারও সকলের সমান। সকল বিরাট জাতির ন্যায় আমাদের জাতিও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক লইয়া গঠিত। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিলে অথবা এই বিরাট্ জাতিকে ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইলে তাঁহার শিক্ষার অবমাননা করা হইবে, উহার ফলে বিপদের সৃষ্টি হইবে এবং তিনি যে স্বাধীনতার জন্য সারাজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন ও যে স্বাধীনতা তিনি আমাদের জন্য অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন সেই স্বাধীনতাও নষ্ট হইবে।

অতীতে ভারতের সাধারণ ব্যক্তিরাও দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের ত্যাগও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহাদের দাবিও বিবেচনা করিতে হইবে। কেবল নৈতিক ও মানবতার দিক হইতে নহে, পরন্তু সাধারণ রাজনীতিক জ্ঞানের দিক হইতেও সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন করা এবং তাহাকে উন্নত করিবার সর্ব্ব প্রকার সুযোগ দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। যে সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষ এই সুযোগ লাভ করিতে পারে না তাহার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে।

মহাত্মাজী চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রভাব আমাদের অনুপ্রাণিত করিতেছে। কর্ত্তব্যভার এখন আমাদের উপর বর্ত্তাইয়াছে। সাধ্যমত সেই কর্ত্তব্য পালনে সচেষ্ট হওয়াই আমাদের সর্ব্বপ্রথম করণীয়। যে সাম্প্রদায়িকতার জন্য বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানবকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে সেই সাম্প্রদায়িকতারূপ বিষকে দূরীভূত করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমাদের সংগ্রাম করিতে হইবে। কোন বিপথগামী ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষভাব লইয়া আমরা এই বিষকে দূর করিব না, পরন্তু আমরা ঐ ক্ষতিকর মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করিব। গান্ধীজীকে হত্যা করিয়াই ঐ মনোবৃত্তির নিবৃত্তি ঘটে নাই। গান্ধীজীকে হত্যার পর আনন্দানুষ্ঠান আরও কলঙ্কের বিষয়। যাহারা উহা করিয়াছিল অথবা যাহারা ঐরূপ চিন্তা করে তাহাদের নিজেদের ভারতবাসী বলিয়া দাবি করার অধিকারও নষ্ট হইয়াছে।

আমি বলিয়াছি যে, এই সঙ্কট-সময়ে জাতির স্বার্থের জন্য আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব প্রকাশ্যে বাগ্‌-বিতণ্ডা এড়াইয়া প্রয়োজনীয় ব্যাপারে সকলে যাহাতে একমত হইতে পারি তাহাতেই গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। এই প্রয়োজনীয় কার্য্যে সাহায্যের জন্য আমি সংবাদপত্রসমূহের নিকট বিশেষ আবেদন জানাইতেছি। দেশে যাহাতে বিভেদ-মূলক মনোভাবের সৃষ্টি হইতে পারে তাঁহারা যেন এইরূপ কোন সমালোচনা করিতে বিরত থাকেন। কংগ্রেসে আমার যে সকল সহকর্ম্মী অনেক সময় ইতস্ততঃ করিয়া মহাত্মাজীর নেতৃত্ব অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকটও আমি বিশেষ ভাবে আবেদন জানাইতেছি।

সংবাদপত্রে ও অন্যান্য মহলে সর্দ্দার প্যাটেলের সহিত আমার মতানৈক্য সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে আমি ব্যথিত হইয়াছি। বহু সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে প্রকৃতিগত ও মানসিক পার্থক্য আছে। কিন্তু ভারতবাসীর জানা উচিত—আমাদের জাতীয় জীবনের প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আমাদের মতের ঐক্য সেই মতানৈক্যকে ম্লান করিয়া দিয়াছে এবং পঁচিশ বৎসর অথবা তাহারও অধিক কাল আমরা অনেক বড় বড় কাজ পরস্পর একযোগে করিয়াছি। আমরা পরস্পরের সুখদুঃখের অংশভাগী। জাতির এই সঙ্কটকালে আমাদের পক্ষে কি সঙ্কীর্ণচিত্ত হওয়া অথবা জাতির মঙ্গল ব্যতীত অন্য কিছু চিন্তা করা সম্ভব? সর্দ্দার প্যাটেল জাতির জীবনব্যাপী যে সেবা করিয়াছেন কেবল তজ্জন্য নহে পরন্তু তিনি ও আমি ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্য পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণের পর হইতে তিনি যে কাজ করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাকে অভি-নন্দিত করিতেছি। শান্তি ও সংগ্রামের সময় সর্দ্দার প্যাটেল জাতির একজন সাহসী অধিনায়ক। অন্যে যখন কোন কাজ করিতে ইতস্ততঃ করে তখন তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে সেই কাজ সমাধা করেন। তিনি একজন শক্তিশালী সংগঠক। বহু দিন হইতে আমি তাঁহার সংস্রবে আছি, যতই দিন যাইতেছে ততই আমি তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছি এবং তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতেছে।

সম্প্রতি একটি ঘরোয়া সভায় আমি যে বক্তৃতা করি সংবাদ-পত্রে তাহা প্রকাশিত হয়, তাহা অননুমোদিত, উহার ফলে লোকের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে, আমি পুরাতন বন্ধু ও সহকর্ম্মী শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের সমালোচনা করিয়া কঠোর ও তীব্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলাম। ঐ সংবাদ ঠিক নহে। আমি বলিতে চাই যে, সমাজতন্ত্রী দল কর্ত্তৃক অনুসৃত কয়েকটি নীতি আমি সমর্থন করি না এবং আমার বিশ্বাস এই যে, ঘটনার চাপে পড়িয়া অথবা ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাঁহারা ভ্রান্ত পথে চলিয়াছেন। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের কর্ম্মশক্তি সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাকে আমি বন্ধু বলিয়া মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এমন সময় আসিবে যখন ভারতের ভাগ্য নির্দ্ধারণের কার্য্যে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবেন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ সমাজতন্ত্রী দল দীর্ঘ দিন হইতে নেতিমূলক নীতি

অনুসরণ করিতেছে এবং যেসব বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করা প্রয়োজন, সেই সকল বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে।

জাতীয় জীবনে পরমতসহিষ্ণুতা ও সহযোগিতা করার জন্য এবং যাঁহারা ভারতীয়দের একটি বিরাট জাতিতে পরিণত করিতে চাহেন তাঁহাদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার আবেদন জানাইতেছি। সাম্প্রদায়িকতা এবং সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে আমি সকলকে অনুরোধ জানাইতেছি। ভারতবর্ষকে নূতনরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য শ্রমিক-মালিক বিরোধ বন্ধ করিতে সকলকে আবেদন জানাইতেছি। আমি এই সকল কাজ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি যে, এই জীবনেই আমরা মহাত্মাজীর স্বপ্ন কিয়ৎ পরিমাণে সার্থক করিতে পারিব। ইহা করিলেই তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইবে এবং ইহাই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার সর্ব্বোত্তম পন্থা।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রবিধি

ভারতের রাষ্ট্রবিধি রচনা কমিটি গণপরিষদের সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রবিধির খসড়া দাখিল করিয়াছেন। খসড়াটির মোটামুটি বিষয় হইতেছে—ভারতবর্ষ একটি যুক্তরাষ্ট্র হইবে; আপৎকালীন অবস্থায় প্রয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির (প্রেসিডেন্ট) হাতে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা থাকিবে; প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার প্রবর্ত্তিত হইবে এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের প্রতি এক লক্ষে এক জন করিয়া প্রতিনিধি থাকিবেন; মন্ত্রীমণ্ডল ব্যবস্থা-পরিষদের প্রতি দায়িত্বসম্পন্ন হইবেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের এবং প্রদেশসমূহের হাতে কোন্ কোন্ বিষয় থাকিবে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে উভয়েরই ক্ষমতা থাকিবে তাহা পৃথক পৃথক ভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। সংখ্যালঘুদের দশ বৎসরের জন্য পরিষদে আসন সংরক্ষণের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, তার পর উহা উঠিয়া যাইবে। বণিক প্রতিষ্ঠান, জমিদার প্রভৃতির স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রবিধি রচনার জন্য গণপরিষদের যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তাহার সদস্য ছিলেন: ডাঃ আম্বেদকর (চেয়ারম্যান), শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার, আল্লাডী কৃষ্ণস্বামী আয়ার, কে এম মুন্সী, এন মাধব রাও, ডি পি খৈতান ও সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লা।

খসড়ার প্রথম অংশে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এলাকা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্য কোন অঞ্চল অধিকৃত হইলে তাহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইবে। নূতন রাষ্ট্র গঠন ও নূতন রাষ্ট্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার বিধানও খসড়ায় আছে।

ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের আলোচনা করিয়া উহার শেষে নূতন প্রদেশসমূহের একটি তালিকা যোজনা করা হইয়াছে। উহাতে অন্ধ্রের নাম নাই। কারণ-স্বরূপ বলা হইয়াছে যে অন্ধ্রকে নূতন প্রদেশরূপে গঠন করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি প্রাথমিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। কেবল তালিকায় নামোল্লেখ করিয়া লাভ নাই। এ বিষয়ে এই যুক্তি দেওয়া হইয়াছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন অনুযায়ী উড়িষ্যা ও সিন্ধুর বেলায়ও ঠিক এইরূপ ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল। তবে কমিটি একটি সীমানা-কমিশন গঠনের সুপারিশ করিয়া বলিয়াছেন যে এই কমিশনে কেবল অন্ধ্রের ব্যাপারেই নহে, ভাষাগত ভিত্তিতে অন্যান্য প্রদেশ সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় বিষয়ে অনুসন্ধান করা হইবে। প্রদেশ গঠনের এইরূপ ব্যবস্থায় আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। বর্ত্তমান প্রদেশগুলি ইংরেজের দ্বারা তাহাদেরই সুবিধাজ্ঞানে গঠিত হইয়াছিল এবং তাহারা নিজের প্রয়োজনানুসারে প্রাদেশিক সীমা অনেক বার রদবদল করিয়াছে। স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রবিধি রচনার সময় ভারতের মানচিত্র হইতে ইংরেজের দেওয়া লাল ও হলদে রং মুছিয়া ফেলিয়া ভাষার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া প্রদেশ গঠনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন করা হইয়াছে; কাজেই কাজও এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হইয়া আছে। বহু দেশীয় রাজ্য ইতিমধ্যেই পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের স্বাতন্ত্র্যবোধক হলদে রং এখন আর মানিয়া চলিবার প্রয়োজন নাই। খসড়ায় প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার এবং নাগরিকের মৌলিক অধিকার যেখানে স্বীকৃত হইয়াছে সে সকল স্থানে রাজাদের দিক টানিবার প্রয়োজন শেষ হইয়াছে। ইংরেজ আমলে প্রতিক্রিয়াশীলতার স্তম্ভস্বরূপ দেশীয় রাজ্যের রাজাদের এখন পেন্সন দিয়া রাজ্যগুলিকে সমগ্রভাবে এবং প্রদেশের সহিত সম্পূর্ণ সমান স্তরে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে প্রজার অধিকারে পূর্ণ স্বীকৃতি হইত। কিন্তু তাহা করা হয় নাই, দেশীয় রাজ্যগুলিকে খসড়ায় সাধারণ প্রদেশ হইতে ভিন্ন করিয়া ধরা হইয়াছে। চীফ কমিশনারের কতকগুলি ছোট প্রদেশ বজায় রাখিবারও কোন আবশ্যকতা আর আছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। প্রদেশগুলিকে ষ্টেট আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, 'ভারত' উহার বাংলা করিয়াছেন 'অঙ্গরাষ্ট্র'।

রাষ্ট্রবিধির প্রথমাংশে বলা হইয়াছে যে ভারত একটি যুক্ত-রাষ্ট্র হইবে। কমিটি 'ফেডারেশন'-এর পরিবর্ত্তে 'ইউনিয়ন' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী। শব্দের প্রকারভেদে কিছু আসে যায় না বটে, তবু কমিটি মনে করেন যে ভারত ইউনিয়ন প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি অঙ্গরাষ্ট্রের সমষ্টি হইলেও 'ইউনিয়ন' শব্দ ব্যবহারে একতার ভাব বর্দ্ধিত হইতে পারে।

মৌলিক অধিকারের বিশদ বিবরণ খসড়ায় দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম ও সম্পত্তির মৌলিক অধিকার

স্বীকৃত হইয়াছে। মানুষে মানুষে ধর্ম্ম বা বর্ণগত কোন ভেদ ভারতে থাকিবে না। অস্পৃশ্যতা দণ্ডনীয় অপরাধরূপে গণ্য হইবে। রাজ্যের স্বাধীনতা, সঙ্ঘগঠন ও সভা করার স্বাধীনতা, দেশের সর্ব্বত্র অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা, সম্পত্তি অর্জ্জন রক্ষা ও দান বিক্রয়ের স্বাধীনতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে রত হইবার স্বাধীনতা মৌলিক অধিকাররূপে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এই কথা যে, মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। গণতান্ত্রিক সমাজে ইহা খুব বড় অধিকার।

ভারত রাষ্ট্রের প্রধান হইবেন ইহার প্রেসিডেন্ট। যাবতীয় শাসনক্ষমতাই প্রেসিডেন্টের থাকিবে এবং তিনি দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের পরামর্শানুযায়ী ঐ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের সদস্য এবং আইন সভার সদস্যগণ লইয়া গঠিত ইলেকটোরাল কলেজের দ্বারা প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইবেন। প্রেসিডেন্টের কার্য্যকাল হইবে পাঁচ বৎসর এবং তিনি কেবলমাত্র একবারের জন্য পুনর্নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। প্রেসিডেন্টের বয়স কমপক্ষে ৩৫ বৎসর হইবে এবং তাঁহার নিম্ন পরিষদের সদস্য হিসাবেও নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবার যোগ্যতা থাকিতে হইবে। রাষ্ট্রবিধি-বিরোধী কার্য্য করিলে প্রেসিডেন্টকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিচার করা চলিবে। খসড়া রাষ্ট্রবিধিতে একজন ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদও রাখা হইয়াছে। তিনি পদাধিকার বলে রাষ্ট্রপরিষদের চেয়ারম্যান হইবেন। উভয় পরিষদের সদস্যদের দ্বারা তিনি নির্ব্বাচিত হইবেন। সংখ্যানুপাতিক একক ভোটের দ্বারাই তাঁহার নির্ব্বাচন হইবে। তাঁহার কার্য্যকাল হইবে পাঁচ বৎসর। প্রেসিডেন্টের পদ শূন্য হইলে তৎস্থলে ভাইস-প্রেসিডেন্টই প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের ব্যাপারে যাবতীয় গোলযোগের নিষ্পত্তি করিবে সুপ্রীম কোর্ট। ঐ আদালতের রায়কেই চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

খসড়ার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিমণ্ডলীর কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের কাজ হইবে প্রেসিডেন্টকে তাঁহার যাবতীয় কার্য্যে সাহায্য করা। মন্ত্রিমণ্ডলী যুক্তভাবে জনগণের নিকট দায়ী থাকিবেন। ভারত-সরকারের যাবতীয় শাসনতান্ত্রিক কার্য্য প্রেসিডেন্টের মারফৎ হইতেছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। প্রেসিডেন্টের প্রয়োজনানুযায়ী প্রধান মন্ত্রী ইউনিয়নের যাবতীয় কার্য্যকলাপ ও নূতন বিধান রচনা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ করিবেন।

প্রেসিডেন্ট, রাষ্ট্রসভা ও লোকসভা লইয়া ইউনিয়ন পার্লামেন্ট গঠিত হইবে। রাষ্ট্রসভায় সদস্যসংখ্যা হইবে ২৫০। তন্মধ্যে ১৫ জনকে প্রেসিডেন্ট দেশের কলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে কৃতী ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনয়ন করিতে পারিবেন। অপর সকলে অঙ্গরাষ্ট্রসমূহের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন। লোকসভায় ৫০০ জন পর্য্যন্ত প্রতিনিধি থাকিবেন। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারে পাঁচ লক্ষ হইতে সাড়ে সাত লক্ষ লোকের জন্য একজন করিয়া প্রতিনিধি লোকসভায় নির্ব্বাচিত হইবেন। লোকসভা প্রতি পাঁচ বৎসর পর ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং নূতন নির্ব্বাচনের দ্বারা নূতন করিয়া গঠিত হইবে। রাষ্ট্রসভা ঐ ভাবে ভাঙ্গিবে না; তবে দুই বৎসর পর এক-তৃতীয়াংশ করিয়া সদস্যপদ ত্যাগ করিবেন। কাজেই আর্থিক বিল সম্বন্ধে বর্ত্তমান পদ্ধতি উঠিয়া যাইবে এবং তৎস্থলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনুসৃত পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে।

একজন প্রধান বিচারপতি এবং সাত জন বিচারপতি লইয়া ভারতের সুপ্রীমকোর্ট গঠিত হইবে। প্রয়োজনবোধে প্রধান বিচারপতি যে কোন হাইকোর্টের যে কোন বিচারপতিকে সুপ্রীমকোর্টের কোন মামলার বিচারের জন্য ডাকিতে পারিবেন। কানাডায় এই প্রথা আছে। ব্রিটেন ও আমেরিকার ন্যায় সুপ্রীমকোর্টে মামলার বিচারে হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের আহ্বান করিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। সুপ্রীমকোর্ট বা হাইকোর্টে বিচারপতিরূপে কাজ করিবার পর কেহ আর আদালতে ওকালতি করিতে পারিবেন না। সুপ্রীমকোর্ট মূল মামলা ও আপীল শুনিতে এবং ভারত-সরকারকে পরামর্শও দিতে পারিবেন। কমিটি সুপ্রীমকোর্ট সম্পর্কে একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। আমেরিকার সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণ যে কোন মামলার বিচারে উপস্থিত থাকিতে পারেন অর্থাৎ বিচারপতিগণ ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক মামলা সকল বিচারপতি লইয়া গঠিত বেঞ্চে হইতে পারে। সেখানে ডিভিসন বেঞ্চ-এর প্রথা নাই। কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে আমাদের দেশে অন্ততঃ দুই প্রকার মামলায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। যে সকল মামলায় রাষ্ট্রবিধির ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত প্রশ্ন উঠিবে সেইগুলির বিচারকালে এবং প্রেসিডেন্ট কোন বিষয়ে সুপ্রীমকোর্টের পরামর্শ চাহিলে তাহার বিবেচনা কালে সকল বিচারপতি উপস্থিত থাকিবার বিধান আমাদের গ্রহণ করা উচিত। কমিটির সুপারিশ সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য।

প্রদেশ বা অঙ্গরাষ্ট্রের শাসনকার্য্য পরিচালনার দায়িত্ব একজন গবর্ণরের উপর ন্যস্ত থাকিবে। গবর্ণর নির্ব্বাচনের জন্য দুইটি প্রস্তাব খসড়ায় করা হইয়াছে। গণপরিষদে এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ নির্ব্বাচনে যাহাদের ভোটাধিকার থাকিবে তাহাদের ভোটে সাধারণ নির্ব্বাচনের দ্বারা গবর্ণর নির্ব্বাচিত হইবেন। এ বিষয়ে কমিটির মত এই যে, গবর্ণর এবং প্রধান মন্ত্রী উভয়েই জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন কেবল প্রধান মন্ত্রী। এই ব্যবস্থায়

উভয়ের মধ্যে ঠোকাঠুকি হইতে পারে। সুতরাং গবর্ণর নির্বাচনের ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ব্যবস্থা অপেক্ষা ভিন্ন হওয়া উচিত। তাঁহাদের প্রস্তাব এই যে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ কর্তৃক গবর্ণরপদ-প্রার্থীদের মধ্য হইতে চারি জনকে নির্বাচন করা হউক এবং প্রেসিডেণ্টকে ঐ চারি জনের মধ্য হইতে একজনকে গবর্ণর পদে নিযুক্ত করিবার অধিকার দেওয়া হউক। গবর্ণরেরা প্রদেশের অধিবাসী না হইলেও চলিবে।

প্রদেশে বা অঙ্গরাষ্ট্রে একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী থাকিবে। গবর্ণর তাঁহাদের পরামর্শানুযায়ী কাজ করিবেন কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে তাঁহার নিজ বিবেচনানুযায়ী কাজ করিবার স্বাধীনতা থাকিবে, যথা—ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা ও ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং চীফ অডিটার নিয়োগ। প্রদেশের শান্তির কোন মারাত্মক বিঘ্ন উপস্থিত হইলে প্রয়োজনবোধে গবর্ণর মন্ত্রীমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু দুই সপ্তাহের অধিক কালের জন্য তিনি এই ক্ষমতা খাটাইতে পারিবেন না এবং ঐরূপ করিবামাত্র প্রেসিডেণ্টকে সকল ব্যাপার জানাইবেন। প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলী এইভাবে ভাঙ্গিয়া গেলে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিতে পারিবেন।

গবর্ণর এবং কয়েকটি প্রদেশে দুইটি ও অধিকাংশ প্রদেশে একটি আইনসভা লইয়া প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ গঠিত হইবে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে প্রতি এক লক্ষে একজন প্রতিনিধি হিসাবে প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যসংখ্যা স্থির হইবে, তবে কোন সময়েই ঐ সংখ্যা তিন শতের বেশী বা ষাটের কম হইতে পারিবে না। আসামের কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত জেলায় প্রতিনিধি নির্বাচন সম্পর্কে ভিন্ন ব্যবস্থা হইবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধে এই বিধান হইয়াছে যে উহার সদস্য-সংখ্যা ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের বেশী হইবে না। তন্মধ্যে অর্দ্ধেক ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্যেরা নির্ব্বাচন করিবেন এবং অর্দ্ধেক গবর্ণর কর্তৃক মনোনীত হইবেন। ব্যবস্থা-পরিষদের আয়ুষ্কাল হইবে পাঁচ বৎসর কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা কখনও ভাঙ্গিবে না, প্রতি তিন বৎসর অন্তর উহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করিবেন।

প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে গবর্ণর মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শক্রমে অর্ডিনান্স জারী করিতে পারিবেন। পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার ছয় সপ্তাহ পর অর্ডিনান্সের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবে।

১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে অনেকগুলি এলাকাকে শাসনসংস্কার বহির্ভূত অঞ্চলরূপে আলাদা করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার তাহাদের ছিল না এবং পরিষদেরও তাহাদের উপর কোন ক্ষমতা ছিল না; গবর্ণর স্বয়ং মন্ত্রীদের সহিত পরামর্শ না করিয়া ঐ সব এলাকার শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ইহার ফল হইয়াছে এই যে, গত দশ বৎসরের এই ব্যবস্থায় সরকারের চেষ্টায় স্থানীয় অধিবাসীদের কোন দিক দিয়া উন্নতি হয় নাই কিন্তু উহাদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে। মুসলমানদের ন্যায় আদিম অধিবাসী ও পার্ব্বত্য জাতিদের লইয়া আর একটা আলাদা শ্রেণীস্বার্থ গড়িয়া তোলার জন্য এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং উহার ফল সবেমাত্র ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, গণপরিষদ এই ব্যবস্থা বহাল রাখা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের আইন প্রণয়নের অধিকারের ক্ষেত্র গণপরিষদ যে ভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন খসড়ায় তাহাই রাখা হইয়াছে। তবে কমিটি এই কথা বলিয়াছেন যে, প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত কোন বিষয় যদি এমন গুরুত্বসম্পন্ন হইয়া উঠে যাহাতে ভারতীয় স্বার্থ উহার উপর নির্ভরশীল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে তবে তাহা আর প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত না থাকিয়া কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে। তবে এইরূপ হস্তক্ষেপের পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাষ্ট্রসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের মত লইতে হইবে। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদ নির্ব্বাচন যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় তাহার জন্য ইলেকশন কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের জন্য প্রেসিডেণ্ট এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদের জন্য গবর্ণর এই কমিশনের সদস্য মনোনীত করিবেন। নির্ব্বাচন কেন্দ্রের সীমা নির্দ্ধারণের ভার পার্লামেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

সংখ্যালঘুদের জন্য কয়েকটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় লোকসভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদে দশ বৎসরের জন্য মুসলমান, তপশীলী হিন্দু এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ খ্রীষ্টানদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকিবে। শিক্ষা ও চাকুরিক্ষেত্রে এংলো-ইণ্ডিয়ানরা যেসব সুবিধা পাইয়া আসিয়াছে দশ বৎসরের জন্য সেগুলিও বজায় রাখা হইয়াছে। অনগ্রসর জাতিদের অবস্থা অনুসন্ধানের জন্য ইউনিয়ন এবং প্রদেশ উভয়েই একজন করিয়া স্পেশাল অফিসার থাকিবেন। তপশীলী এলাকা ও জাতিসমূহের উন্নতি কতটা হইতেছে তাহা রিপোর্ট করিবার জন্য একটি কমিশন গঠিত হইবে।

রাষ্ট্রবিধির খসড়ার যে রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া এই পর্য্যন্ত লিখিত হইল। পূর্ণ রিপোর্ট হস্তগত হইলে বিশদ আলোচনা সম্ভব হইবে।

হায়দরাবাদী ব্যবস্থা

নিজাম বাহাদুর নাকি ইতিমধ্যেই এক বৎসর ব্যাপী চুক্তির দায়ে অসুবিধা বোধ করিতেছেন। গত ২৯শে নবেম্বর এই চুক্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরকারী ভারত-রাষ্ট্রের পক্ষে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন, হায়দরাবাদের পক্ষে নিজাম

মীর ওসমান আলী খাঁ। দুই মাস যাইতে না যাইতেই যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে এই সংবাদে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। কারণ নিজাম বাহাদুর যে খেলা খেলিতেছেন পাকিস্তানি পরামর্শদাতাগণের প্ররোচনায়, সেই ইতিহাস যাঁহারা জানেন, তাঁহারা এরূপ একটা পরিণতির কথাই ভাবিতেছিলেন। নিজাম বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ—এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বাস-ঘাতক মীর কমরুদ্দিন খাঁ—যে সময় মুঘল রাষ্ট্রের ধ্বংসে সাহায্য করেন, তখন হইতে হায়দরাবাদ রাজ্য দাক্ষিণাত্যের জীবনে একটা কাঁটার মতন যন্ত্রণাদায়ক হইয়া আছে। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর হইতে উত্তর-ভারতের সমস্ত মুসলমান ভাগ্যান্বেষী এই রাজ্যে আশ্রয় পাইয়াছে এবং এই রাজ্যকে আত্মসর্ব্বস্ব মুসলিম স্বার্থের কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। এই রাজ্যের জন-সংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ১৩ জনের বেশী হইবে না। কিন্তু এমনি হায়দরাবাদী বিধান যে রাষ্ট্রীয় কার্য্যে এই নগণ্য জন-সংখ্যার প্রাধান্য অটুট হইয়া আছে। একটা হিসাবে দেখিতে পাইলাম যে রাজ্যের নানা দফ্তরে মন্ত্রিবর্গের সংখ্যা ১৯ জন, ইহাদের শতকরা ৮১ জন মুসলমান; নানা দফ্তরে সেক্রেটরীর সংখ্যা ১৭, ইহাদের শতকরা ৮৩ জন মুসলমান; ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফি পদে মুসলমানের হার ৮০ জন; পুলিসে শতকরা ৯৫ জন মুসলমান; সৈন্য বিভাগাদিতে মুসলমানের হার শতকরা ৯৫ জন। এই হিসাবেই হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রকৃতি ও পাকিস্তানি মতিগতির হদিশ পাওয়া যায়।

নারী-উদ্ধারে বিপত্তি

অপহৃতা নারীদের উদ্ধারের জন্য ভারতে এবং পাকিস্থানে চেষ্টা হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে যত নারী উদ্ধার করিয়া পাকিস্থানকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে পাকিস্থান হইতে তাহার তুলনায় খুব কম নারী উদ্ধার হইয়াছে। অথচ ভারত হইতে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার নারী অপহরণ করিয়া পাকিস্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে ইহা এখন সর্ব্বজনস্বীকৃত। নারী-উদ্ধারের জন্য একটি উদ্ধার সপ্তাহ ঘোষণা করা হইয়াছিল এবং পাকিস্থানের বড় বড় নায়কেরা বক্তৃতাও অনেক করিয়াছেন। কিন্তু ফল এযাবৎ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আশাপ্রদ নহে। যত দূর বুঝা যাইতেছে তাহাতে ইহাই মনে হয় যে পাকিস্থানের মুসলিম সমাজপতিগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হন নাই। এ বিষয়ে পূর্ব্ববঙ্গের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উহা হইতে হিন্দু-নারী উদ্ধার সম্বন্ধে পাকিস্থান-কর্তৃপক্ষের মনোভাব অতি স্পষ্টভাবে জানা যাইবে। ঘটনাটি দৈনিক 'ভারত'-এর সম্পাদকীয় রূপে ১১ই ফাল্গুন তারিখে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা এইরূপ:

"নারী উদ্ধারের একটি মহান্ প্রয়াসে নিযুক্ত থাকিয়া ফরিদপুরের জননায়ক (রাজনৈতিক নায়ক নহে, সমাজ-সেবক) শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বসু মহাশয়কে যে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইতেছে, তাহা হইতে মনে হয় নারী-উদ্ধারে সহযোগিতা ও সহায়তা করিবার যে প্রতিশ্রুতি পাকিস্থানের নায়কেরা এবং রাষ্ট্রপরিচালকরা দিয়াছেন, তাহা শুধুই কথার কথা, উহার পিছনে কিছুমাত্র আন্তরিকতা নাই। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত বসু মহাশয় যে জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন তাহার বিবরণ এই:

গত বৎসর মে মাসে দুইটি নমঃশূদ্র ধরামী এক সম্পত্তি-শালী মুসলমানের বাড়ীতে কাজ করিবার সময় একটি অল্প-বয়স্কা মহিলা তাহাদিগকে বলে যে সে হিন্দু। মুসলমানরা তাহাকে মেদিনীপুর হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছে। ধরামী দুইটি এই সংবাদ চন্দ্রকান্ত বসুর গোচর করে। চন্দ্রকান্ত বাবু মুসলমানটিকে ডাকিয়া পাঠাইয়া সংবাদটি সত্য কিনা জানিতে চাহেন। বলা বাহুল্য, মুসলমানটি বলে, সংবাদটি সর্ব্বৈব মিথ্যা, এবং সে সেই রাত্রেই অপহৃতা নারীটিকে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে আর একটি মুসলমানের আশ্রয়ে রাখিয়া আসে। কিন্তু কথাটা জানাজানি হইয়া পড়ায় পরদিন বহু হিন্দু এবং বহু মুসলমান আশ্রয়দাতা ঐ মুসলমানের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। একটা দাঙ্গার উপক্রম ঘটে। তখন উভয় পক্ষই চন্দ্রকান্ত বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি মেয়েটিকে ফিরাইয়া দিতে বলেন। মেয়েটিকে জেনানা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া চন্দ্রকান্ত বাবুর হাতে সমর্পণ করা হয়।

এই পর্য্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে কাজ চলে। উহা চলিবার কারণ ঐ যে, চন্দ্রকান্ত বাবু হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলেরই কল্যাণকর কাজে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়াই ঐ অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান তাঁহার সম্মুখে কোনরূপ অন্যায় কাজ করিতে চাহে না। অপহৃতা নারীটিকে উদ্ধার করিয়া চন্দ্রকান্ত বাবু নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে ৯ জন হিন্দু ও ৯ জন মুসলমান মনোনয়ন করিয়া একটি কমিটি গঠন করেন এবং এই ঘটনা লইয়া যাহাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সৃষ্টি না হয় তাহাই দেখিবার ভার কমিটির উপর অর্পণ করিবার জন্য একটি জনসভার আয়োজন করেন। উভয় সম্প্রদায়ের জনগণের চেষ্টায় ঘটনাটিকে সন্তোষজনক পরিণতিতে টানিয়া লওয়া সম্ভব হইত, কিন্তু পাকিস্থানী পুলিস ঘটনাটিকে ঘোলাইয়া তুলিল মেয়েটির নামে তল্লাসী পরোয়ানা বাহির করিয়া। শুধু তাহাই নহে, যে মুসলমানটির বাড়ীতে মেয়েটিকে প্রথমে পাওয়া যায় পুলিস তাহাকে দিয়া এজাহার লিখাইয়া লইল যে, চন্দ্রকান্ত বাবু দুই সহস্র নমঃশূদ্র লইয়া তাহার বাড়ী ঘেরাও করিয়া সাত-আট জন সশস্ত্র লোকসহ তাহার বাড়ীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া তাহার বৈধ-বিবাহিত পত্নীকে জোর করিয়া হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

তল্লাসী পরোয়ানা বাহির করিয়াও পুলিস মেয়েটির সন্ধান পায় না। ওদিকে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য যে সভা আহূত হইয়াছিল দারোগা এবং সাম্প্রদায়িক বিরোধে উৎসাহী

মুসলমানরা সেই সভার অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া বলে, মেয়েটিকে সভায় হাজির করা হোক। তাহাকে নিজ মুখে তাহার জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে হইবে। মেয়েটিকে সভায় হাজির করা হয় না। দারোগা তখন বলে :

আজ যদি হিন্দুরা চোখ রাঙাইয়া মুসলমানের বাড়ী হইতে উপভোগ্যা হিন্দু নারীকে উদ্ধার করিতে সাহস পায়, তাহা হইলে দু'দিন বাদে তাহারা যে মুসলমান মেয়েদের ধরিয়া টান দিবে না, তাহাতে বিশ্বাস কি? অতএব পাকিস্থানে হিন্দুদের এই আস্পর্দ্ধা সহ্য করা হইবে না।

পাকিস্থানী পুলিস তাই চন্দ্রকান্ত বাবুর নামে অপরের বিবাহিতা স্ত্রী বলপূর্ব্বক হরণ করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিল। চন্দ্রকান্ত বাবু দেশত্যাগী হইলেন। অপহৃতা মেয়েটির আত্মীয়রা ইহার মাঝে এক সময়ে মেয়েটিকে লইয়া যায়। পাকিস্থানী পুলিস মেয়েটিকেও পাইল না, চন্দ্রকান্ত বাবুকেও পাইল না। তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া নমঃশূদ্রদের উপর উপদ্রব সুরু করিল। এই উপদ্রবের বিবরণ শুনিয়া চন্দ্রকান্ত বাবু গ্রামে ফিরিয়া গেলেন। পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পুরিল। পনর দিন তিনি হাজতে রহিয়াছেন। জামিনে খালাস করিবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে।

পাকিস্থানী পুলিস, পাকিস্থানী গবর্ন্মেণ্ট যাহা করিয়াছেন, তাহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম। এই ঘটনাটি হইতেই বুঝা যায়, অপহৃতা নারীর উদ্ধার সাধনের জন্য পাকিস্থানের পক্ষ হইতে যে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা একান্তই অন্তঃসারশূন্য উক্তি।

এরূপ একটি গুরুতর ঘটনা কেবল মাত্র 'ভারত'-এ প্রকাশিত হইল। আর কেহ ইহা লইয়া আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইলেন না কেন আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। 'ভারত'-এর ন্যায় আমরাও প্রশ্ন করি ;—বাংলা গবর্ণমেণ্ট ও ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধে কোন কর্ত্তব্য আছে কিনা? বাংলা গবর্ণমেণ্ট এবং ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই চন্দ্রকান্ত বাবুর ঘটনা লইয়া পাকিস্থান গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনার দায়িত্ব রহিয়াছে। যদি তাঁহারা উহা না করেন এবং মিথ্যা অভিযোগের দায় হইতে চন্দ্রকান্ত বাবুকে মুক্ত করিতে না পারেন তাহা হইলে অপহৃতা নারী-উদ্ধারের প্রয়াস পদে পদে ব্যাহত হইবে। ভারতবর্ষে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা খুব ঘটা করিয়া শোনানো হয় এবং রামধুন জাতীয় সঙ্গীত করিবার কথাও কেহ কেহ বলিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন বন্দিনী সীতার উদ্ধার না হইলে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা হয় না এবং সীতা উদ্ধারের জন্য রাম বলপ্রয়োগে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। পাকিস্থানে বন্দিনী পঞ্চাশ হাজার সীতার উদ্ধারের এবং সেই মহৎ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া কেহ বিপদে পড়িলে তাহাকে রক্ষা করিবার শক্তি যে গবর্ণমেণ্টের নাই, রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা তাহার কার্য্য নহে।

বাংলার বাজেট

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করিয়াছেন। বাজেটে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৪৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ এই সাড়ে সাত মাসের এবং ১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাব আলাদা ভাবে দেওয়া হইয়াছে। বাজেট বক্তৃতার প্রথমে অর্থসচিব বঙ্গবিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন এবং উহার আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা দেশের শিল্পাঞ্চলগুলি সবই পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে এবং বড় বড় শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৬ লক্ষের অধিক। ভারতে যত কারখানায় শ্রমিক কাজ করে তার শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে পড়িয়াছে। কলিকাতায় ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোক আছে এবং জনসংখ্যা এখন প্রায় পঞ্চাশ লাখ। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গে শহরবাসীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অনুপাতে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ অপেক্ষা বেশী হইয়া পড়িয়াছে। দামোদর পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে উহা আরও বাড়িবে।

চলতি বৎসরের সাড়ে সাত মাসে রাজস্ব আদায় হইবে প্রায় ১৭ কোটি টাকা এবং সাধারণ রাজস্বখাতে ব্যয় হইবে প্রায় সাড়ে ১৪ কোটি টাকা। প্রাদেশিক উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে দুই কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। বৎসরান্তে উদ্বৃত্ত থাকিবে প্রায় আড়াই কোটি টাকা। আয়ের দিকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় পাট শুল্ক ও আয়কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে যে টাকা পাওয়ার কথা তাহার পরিমাণ হ্রাস। নিমায়ার এওয়ার্ড অনুসারে বাংলাদেশ পাট রপ্তানী শুল্কের শতকরা সাড়ে বাষট্টি ভাগ এবং আয়করের যে অংশ প্রদেশসমূহকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় তার শতকরা ২০ ভাগ পাইত। বঙ্গ বিভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের ভাগে কত পড়িবে তাহা এখনও পাকাপাকি স্থির হয় নাই, তবে যতটা দেওয়া হইয়াছে তাহা অন্যায় রকমে কম। আগে অবিভক্ত বাংলা এই দুইটি জিনিষই রপ্তানী করিত, সুতরাং তখন উহাদিগকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এখন পূর্ব্ববঙ্গ রপ্তানী করে কাঁচা পাট এবং পশ্চিমবঙ্গ চট ও থলিয়া। অতএব এবার কাঁচা পাট ও পাটের তৈরি জিনিষে তারতম্য করা উচিত এবং তাহা করিলে পশ্চিমবঙ্গের হিসাবে অন্ততঃ এক কোটি টাকা পাওনা হয়। অথচ পশ্চিমবঙ্গ পাইয়াছে উহার অর্দ্ধেক। আয়করের ভাগও পশ্চিমবাংলাকে অন্যায় ভাবে কমাইয়া দিয়া শতকরা ২০ স্থলে শতকরা ১২ করা হইয়াছে। অবিভক্ত বাংলায় যে আয়কর আদায় হইত তার অধিকাংশ উঠিত কলিকাতা হইতে; পূর্ব্ববঙ্গে বা পশ্চিমবঙ্গের মফঃস্বলে খুব কমই আদায় হইত। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ বাহিরে গিয়াছে বলিয়া আয়করের ভাগ শতকরা ৮ কম করিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত হয় নাই। পূর্ব্ববঙ্গ

হইতে যে পরিমাণ আয়কর আদায় হইত সেই টাকাটা বাদ দিয়া দিলেই যথেষ্ট হইত। ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব শ্রীঅন্নদা চৌধুরী এ বিষয়ে কিছুই করেন নাই বলিয়া ব্যাপারটা বিসদৃশ আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন যে তাঁহারা এই অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং ভারত-সরকারের সিদ্ধান্ত বদলাইতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় স্বয়ং এই আলোচনার জন্য দিল্লী গিয়াছেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রায় এক কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে। বাজেটে মিতব্যয়িতার ক্ষেত্র কতখানি রহিয়াছে তাহা ভাল ভাবে দেখা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভাতা এবং কণ্ট্রাক্টর দিয়া কাজ করাইবার বরাদ্দগুলিতে মিতব্যয়িতা অবলম্বন ও পরিদর্শনের কড়াকড়ি করিলে অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কৃষি শিল্প এবং পথঘাট ইত্যাদির নামে প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হয় এবং খরচও হয়। বৎসরান্তে খরচের অনুপাতে কাজ কতখানি হয় পরবর্ত্তী বাজেট বক্তৃতায় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তন করা উচিত এবং তাহা হইলে অপচয়ও অনেক কমিয়া আসে। যাহাদের হাতে খরচের ভার আছে তাঁহারা যদি বুঝিতে পারে যে বৎসরান্তে কাজের হিসাবও দিতে হইবে তাহা হইলে কাজ অন্ততঃ এখনকার চেয়ে বেশী অগ্রসর হইবে। স্বাভাবিক অবস্থায় সমগ্র বাংলার তুলনায় এখন পশ্চিমবঙ্গের আয়ই প্রায় তিন গুণ হইবে, তথাপি খরচ কেন কুলায় না তাহা বুঝা কঠিন। গরীব দেশের গরীবের বাজেটে যদি কর হ্রাসের ব্যবস্থা না হয় তবে বাজেট একেবারেই মামুলী বলিয়া মনে হইবে। বর্ত্তমান ক্রয় শুল্কটি মধ্যবিত্ত সমাজের পক্ষে অত্যন্ত পীড়নমূলক। বিলাস দ্রব্যের উপর ক্রয় শুল্ক বহাল রাখিয়া বই, কাগজ, কাপড়, জামা, জুতা প্রভৃতির উপর হইতে উহা একেবারে তুলিয়া দেওয়া উচিত। শিক্ষা বিস্তার যেখানে একান্ত আবশ্যক, সেখানে বইয়ের উপর দুই বার করিয়া ক্রয় শুল্ক আদায় হইতেছে, একবার প্রেসে ছাপানো ফর্ম্মা ডেলিভারী দেওয়ার সময়, আর একবার বাঁধানো বই বিক্রয়ের বেলায়। বলা বাহুল্য দুইটা করই ক্রেতার ঘাড়ে গিয়া চাপিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পাট রপ্তানী শুল্ক ও আয়করের ভাগ আদায় হইলে এবার হইতেই ক্রয় শুল্কের অন্তর্গত বই এবং নিত্যব্যবহার্য্য অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি বাদ দিয়া অর্থসচিব দেশের নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজকে একটু স্বস্তি দিতে পারেন। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির তুলনায় ইঁহাদের আয় বাড়ে নাই, এই সামান্য সাহায্যটুকুও তাঁহাদের নিকট অমূল্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

মিত্র সেবাসঙ্ঘ

মিত্র সেবাসঙ্ঘ (ফ্রেণ্ডস সার্ভিস ইউনিট) একটি আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান। আজ ছয় বৎসর হইতে এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দ ব্যাপকভাবে ভারতবর্ষের দুর্গত জনের সেবাকার্য্য করিয়া যাইতেছেন। ইঁহারা একটি ধর্ম্মগোষ্ঠীর-সেবক, যাহার সংখ্যা ২০,০০০-এর বেশী নয়। অথচ ইঁহারা বিশ্বব্যাপী দুর্গতের সেবা করিয়া যাইতেছেন। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই ধর্ম্ম-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা জর্জ্জ ফক্সের অনুপ্রাণনায় ইঁহা'র সেবাব্রত আরম্ভ হয়। এই গোষ্ঠীর একটি কার্য্য-বিবরণীতে এই ইতিহাস দেখিতে পাই। "ফক্সের মতে প্রত্যেক লোকের মধ্যেই ভগবানের অংশ আছে, তা ভাল-মন্দ-গরীব-বড়লোক যাই হউক না কেন।" তাঁহার সম্প্রদায় বলেন,

> অন্তরের আলোক যীশুরই নির্দ্দেশ, এবং তা সব কাজেই মেনে নেওয়া উচিত।...অন্তরের আলো মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিবার নির্দ্দেশ দেয়। এই আলোর বলে সঙ্ঘের সভ্যরা যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরোধী।... মিত্র (সেবা) সমিতির সভ্যরা পুরোহিতের সাহায্যে পূজায় বিশ্বাস করেন না।...মানুষের তৈরী রং, জাতি ও ধর্ম্মের বৈষম্য তাঁরা মানেন না। এই কারণে মিত্র সমিতির সভ্যরা বরাবরই সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে। প্রায় এক শ' বৎসর আগে, সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক পরেই সমিতির প্রচার-পত্রে নিম্নলিখিত কথাটি প্রকাশিত হইয়াছিল: "সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষেই এক শ' বছর ধরে সামরিক শাসন ও বাণিজ্য একসঙ্গে চলতে দেখা যায়। সামরিক শাসন ও বাণিজ্য এক্ষেত্রে পরস্পরকে সাহায্য করে। সৈন্যরা দেশ জয় করে বাণিজ্যের সুবিধা করে দেয় এবং বাণিজ্য-লব্ধ টাকায় সামরিক অভিযান চলতে থাকে। এই ধরণের অত্যাচার কেবলমাত্র ভারতেই সম্ভব হয়েছে।"

ইংরেজ শাসনের গুরুত্তা এই প্রতিবাদে শিথিল হয় নাই। আজ স্বাধীন ভারতে ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্বন্ধ সহজ ও সরল হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মিত্র সেবা সমিতির সেবাকার্য্য এই আদর্শ পথে চলিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় নূতন ভাবে এই সঙ্ঘের সভ্যগণ ভারতবর্ষে কার্য্য আরম্ভ করেন। জাপানী বোমার আক্রমণে ভারতবর্ষের নাগরিক জীবন বিধ্বস্ত হইতে পারে—সেই আপৎকালে মিত্র সেবা সমিতির অভিজ্ঞ সেবার প্রয়োজনে তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নিকট আমন্ত্রণ পাঠান। তার পর আসিল মেদিনীপুরে ঝড় ও বন্যার ধ্বংসলীলা; সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের উপরে দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর অত্যাচারে পঁচিশ-ত্রিশ লক্ষ লোকের প্রাণহানি হয়। এই দুই বিপদে মিত্র সেবা সঙ্ঘের সভ্য-বৃন্দ ও সহায়কগণ যে সেবা করিয়াছিলেন তাহা বাঙালী কখনও ভুলিতে পারিবে না।

পত্রাবলী

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

খাসিয়া বালক দুটিকে লইতে আমার আপত্তি নাই। ব্যবস্থাপক সভার হাতে আপনার পত্রখানি দিয়াছি তাঁহাদের অধিবেশনে কর্ত্তব্য স্থির হইবে, কোনো বাধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে স্থানাভাব ঘটিয়াছে। ছুটির পরে জায়গা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করিতেছি।

১৩ই বৈশাখে ছাত্রগণ অচলায়তন অভিনয় করিবে—আপনি আমার মাতাদের লইয়া আসিতে পারিবেন ত? তাঁহাদিগকে আমার বর্ষারম্ভের আশীর্ব্বাদ দিবেন এবং আপনি সস্ত্রীক আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিবেন। ইতি ৩ বৈশাখ ১৩১৫*

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীনগর

শ্রীজগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাটি

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাশ্মীরে আসিয়া পড়িয়াছি—বোধ করি ভালই লাগিবে। এপর্য্যন্ত গিরিরাজের সঙ্গ পাইবার অবকাশ পাই নাই—সম্মান সৌজন্যের ব্যূহ যদি ভেদ করিতে পারি তবে কিছু আনন্দ সঞ্চয় করিতে পারিব বলিয়াই আশা করিতেছি।

ঠিক ঠাওরাইয়াছেন, অনুবাদক আমি; কিন্তু ঢাক-বাদকের হাতে সে কথাটা সমর্পণ করিবেন না। আর কিছুই নয় এই সমস্ত ছোট ছোট ব্যাপারে শাণ লাগিয়া ঈর্ষার মুখ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে। ইহাতে সত্যেন্দ্রের[1] পক্ষেও ভাল হইবে না, আমার পথও কণ্টকিত হইবে। তা ছাড়া কর্ম্মবন্ধনের আর একটা পাক বাড়িবে। অনেক বন্ধু এবং অবন্ধু আমার কাছ হইতে অনুবাদ সরবে ও নীরবে দাবী করিবেন—সে দাবী পূর্ণ না হইলেই বন্ধুর তটে শিকস্তি হইয়া অবন্ধুর তটে পয়স্তি হইতে থাকিবে। এমনি করিয়া জীবনের ভার কেবল বৃথা বাড়িয়া চলে। শরশয্যায় ত এতদিন কাটিল, একটুখানি অবসর-শয্যার সন্ধানে আছি জুটিবে কি না জানি না কিন্তু শরসংখ্যা আর বাড়াইতে ইচ্ছা হয় না।

* ইহা ১৩২১ হইবে। ১। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আপনার শরীর অনেকদিন হইতে খারাপ আছে শুনিয়া মন উদ্বিগ্ন আছে। অবকাশই আপনার একমাত্র পথ্য, কিন্তু জানি তাহা আপনার পক্ষে দুর্লভ। তবু একথাটা মনে রাখা উচিত যে অর্থ সম্বন্ধে দেনা করাটা যেমন অনুচিত প্রাণ সম্বন্ধেও তাই। আপনি কিছুকাল হইতে প্রাণের তহবিলে ঋণের দিকে ঝুঁকিয়া কাজ চালাইতেছেন—এ সম্বন্ধে একেবারে কি কোনো জবাবদিহি নাই?

শান্তা[2] সীতাকে[3] আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি আনুমানিক ২০শে আশ্বিন ১৩২২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ছাত্রশাসনের ইংরেজীটা+ যে তর্জ্জমা সে কথা বাদ দিলে ক্ষতি ছিল না—কেননা ইংরেজীতে কিছু কিছু বদল আছে এবং রচনাটা প্রায়শঃ আমার।

চারু[4]কে ইতিপূর্ব্বে লিখিয়া দিয়াছি যতদিন Modern Review-তে জীবনস্মৃতির অনুবাদ বাহির হইবে Yeats-কে[5] একখণ্ড ও Rhys[6]-কে একখণ্ড করিয়া পাঠাইতে। আপনিও তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবেন। ইতি ১৫ই চৈত্র ১৩২২।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

শ্রদ্ধাস্পদেষু

বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করে প্রবন্ধটি আর একবার শোধন করে লিখচি। কাল পরশু দুদিন সময় লাগবে বলে বোধ হচ্চে। প্রবাসীর দেড় ফর্ম্মার বেশি হবে বলে বোধ হয় না। ত্রিশ লাইনের চওড়া কাগজের দশ পৃষ্ঠা ভর্ত্তি হয়েচে—revise করবার সময় আমার যতটা ছাট পড়ে ততটা বাড়তি হয় না। এইজন্যে বলতে পারচিনে কতটা হবে। কাল এখানকার অধ্যাপক সভায় পড়েছিলুম—

২। শ্রীশান্তা দেবী ৩। শ্রীসীতা দেবী

+ "Indian Students and Western Teachers", *The Modern Review*, April, 1916.

৪। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ৫। আইরিশ কবি ডবলিউ বি ইয়েটস ৬। রীজ ডেভিডস।

সকলেই নিরতিশয় উৎসাহিত ও উত্তেজিত হয়েছিলেন। যদি আদৌ সভাস্থলে এটা পড়ি তা হলে প্রবাসী বাহির হবার পূর্ব্বেই। পৌষ মাস পর্য্যন্ত বিলম্ব করলে ভাল হবে না। অঘ্রানেই বাহির হওয়া চাই। Manchester Guardian আমার কাছে ভারতের আধুনিক সমস্যা সম্বন্ধে লেখা চাচ্চে। এইটেকেই ইংরেজী করে তাদের দিলে তাদের এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। বোধ হয় এ প্রবন্ধটা কিছু উপকারে লাগতে পারবে সেজন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আমি চাই ছুটি আপনারা মঞ্জুর করেন না, সেটাতে পরিণামে আত্মপ্রসাদ লাভেরই কারণ ঘটে। কিন্তু তাই বলেই Theistic Conference-এর সভাপতিত্ব আমার কর্ত্তব্যের একটা অঙ্গ এ আমি কোনো মতেই মানতে পারিনে। Social Conference-র চৌকিদারী করবার জন্যে পরশু দিন ভূপেনবাবুর পত্র পেয়েছিলুম। তাকে জানিয়েচি কোনো কন্‌ফারেন্সের চৌকির মাপে বিধাতা আমাকে তৈরি করেন নি সুতরাং তাতে আমারও কষ্ট, চৌকিটারও জখমের সম্ভাবনা। সুতরাং সভাপতিত্ব সম্বন্ধে আমি চিরকৌমার্য্যে সত্যবদ্ধ হয়ে পড়লুম—আমাদের দেশে আজকাল কন্যাদায়ের মতই সভাদায়টা খুব প্রবল হয়ে উঠেচে—অল্প দিনের মধ্যেই অনেকগুলি ঘটকালি আমার কাছে এসেচে—তার মধ্যে প্রথমটি ত লগ্ন পর্য্যন্ত পৌঁছলই না অথচ তার ঘটক বিদায় করতে আমার প্রাণ গিয়েছিল আর কি! আমার বয়সে এই সকল বিষয়ে খুবই সাবধান হওয়া উচিত। বোধ হচ্চে দু'চার দিনের মধ্যে অন্তত দু' চার দিনের জন্যে আমাকে কলকাতা যেতে হবে। ইতি ২২ কার্ত্তিক ১৩২৪।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

আপনি গল্প চান কিন্তু মনে ত হয় আমার বড় গল্প লেখবার শক্তি ফুরিয়ে গেছে। আসল কথা, ক্লান্তিতে আজকাল মনটা যেন ঝুঁকে পড়েচে। ইচ্ছা করচে কলমের গোলামী সম্পূর্ণ ত্যাগ করে এখানে ছেলেদের ক্লাশে মাষ্টারিতে ভর্ত্তি হই। দুটো ক্লাশ পড়াতে সুরু করেচি—বেশ ভাল লাগচে। সন্ধ্যার সময় মানুষের ঘরে ফেরবার সময় আসে—তখন বড় সংসারের কাজ আর চলে না। ছোট ছেলেদের মধ্যে আমি সেই ঘরটুকু পাই। আর ত পাব্লিকের হাটে কারবার করতে একেবারেই ভাল লাগে না। আমার একদিন ছিল যখন প্রকৃতির সঙ্গে আমার গভীর একটা মিল ছিল। মাঝে এল লোকালয়। সেখানে প্রায় পঁচিশ বৎসর ধরে ছুটোপাটি করেচি। আজ আবার দেখচি বিশ্বপ্রকৃতি আমার জানলায় এসে উঁকি মারচে। বড় আকাশ থেকে আমার ডাক আসচে। পৃথিবী থেকে আমার বিদায়ের রাস্তা ঐ দিক দিয়েই কোথায় চলেচে। এখানকার খাতাপত্র বন্ধ করে আবার আমাকে বেরতে হবে। জীবনের আরম্ভে বিশ্ব আমার কাছে এসেছিল, জীবনের পরিণামে আমাকেই সেই বিশ্বের দিকে চলতে হবে, সেই দিকেই আমার কিছু পাবার আছে, কিছু দেবার আছে—হয় ত ঐখান থেকেই সমস্ত ভাঙা জুড়ে নিয়ে, বেসুর সেরে নিয়ে তবে আবার রাজার আরেক দরবারে তালিম দিতে পারব।

এদিকে আবার ফেব্রুয়ারি মাসে বম্বাই এবং দক্ষিণ ভারতে আমার যাত্রা স্থির হয়ে গেছে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেচি। হয় ত মার্চ্চের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত ঘুরতে হবে। এই ভ্রমণের পরে যদি আবার হঠাৎ কলমের মুখে জোয়ার আসে বলা যায় না। তা হলে আবার লিখতে বসব। কিন্তু এর মধ্যে বিজ্ঞাপন দেবেন না। এবার টাকাও না। দরকার হবে না। খুব সম্ভব ফেব্রুয়ারি মাসে বিলাত থেকে বইয়ের টাকা আসবে। ওদিকে বম্বেতে কিছু অর্থোপার্জ্জনের আয়োজন চল্‌চে। "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি ছাপতে যদি ইণ্ডিয়ান প্রেস নারাজ হন তা হলে আপনি ওগুলি ছাপিয়ে নেবেন। সীতা আশা করি ভাল আছে। ইতি ২৬ পৌষ ১৩২৭

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধন সংবাদ* ১৩০৪ শালে, সুতরাং বছর বাইশ পূর্ব্বে, লিখিত।

যথারীতি জন্মোৎসব হয়ে গেল—সেদিন আমার নামের প্রথম অংশ বলবান ছিল—তার পর দিন থেকে দ্বিতীয় অংশ আপন পালা সুরু করেচে। বেশ পেট ভরে বৃষ্টি হয়েচে।

সংযুক্তা[১]কে আমার সংযুক্ত আশীর্ব্বাদ জানাবেন। ইতি ২৮ বৈশাখ ১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ইংরেজি "ঘরে বাইরে"র সমালোচনার cuttings আমার কাছে অনেকগুলি আসিয়াছে। সকলগুলিতেই সাধারণতঃ সাহিত্য ও উপদেশ ও বিচারের তরফ হইতে

---

* "গান্ধারীর আবেদন"—কাহিনী।

১। শ্রীশান্তা দেবী ও শ্রীসীতা দেবী।

বইখানির বিশেষ প্রশংসা প্রকাশ হইয়াছে। কেবল একখানি মাত্র কাগজে boycott সম্বন্ধে আলোচনা আছে এবং এই উপলক্ষ্যে গাঁধির চেষ্টার বিরুদ্ধে আমার মত খাড়া করা হইয়াছে। অনেক কাগজেই একথা বলিয়াছে যে এ বইখানিতে প্রকাশিত তত্ত্বগুলি য়ুরোপের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রযুজ্য। বস্তুত "ঘরে বাইরে" বইখানিকে বাঙালী পাঠক যেরূপ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিয়াছিল বিলাতের পাঠকেরা তেমন করিয়া দেখে নাই—ইহাতে আমি অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। আমি আমাদের দেশের পোলিটিক্যাল অবস্থাকে মুখ্য করিয়া সাহিত্য রচনা করিতে অক্ষম—অথচ সেই দিকে দৃষ্টিতে আমার লেখা পড়িলে পদে পদে উল্টা বুঝিতে হয়। এইজন্যই "অচলায়তন"কে কেবল হিন্দুসমাজের উপর আরোপ করিয়া ও বইটাকে অধিকাংশ পাঠক অত্যন্ত বাঁকা করিয়া ধরে। অচলায়তন যদি সকল দেশে সকল সম্প্রদায়েই না থাকিত তবে এ বই আমি কখনই লিখিতাম না। "ঘরে বাইরে"র মূল কথাটি রাষ্ট্রতন্ত্র সমাজতন্ত্র আকারে বর্ত্তমান কালের সকল জাতির মধ্যেই চিন্তায় ও কর্ম্মে ব্যাপকরূপে সংক্রামিত। সেই কারণেই এ বইটি আমার পক্ষে লেখা সহজ হইয়াছে। অবশ্য গল্পের মূল ভাবটি যতই সর্ব্বজনীন হউক না তাহার মূর্ত্তিটি বিশেষ দেশকালকে অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না—সেই কারণে "ঘরে বাইরে" বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোলন আশ্রয় করিয়া আপন আখ্যায়িকার কাঠামো বানাইয়াছে। ইহা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য নহে।

সুরেন[৮]কে "গোরা" তর্জ্জমা করিতে অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু ইহার তর্জ্জমা শেষ হইয়া প্রকাশ হইতে অন্তত আরো দেড় বৎসর লাগিবে। অতএব "ঘরে বাইরে"র প্রতিষেধকরূপে এখনি ফল দিতে পারিবে না। যাহা হউক সুরেনকে আর একবার তাড়া দিব।

আশা করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি ৭ই ভাদ্র ১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

···কে আপনাদের এখানকার কুটীরে বাস করিবার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন। আমার আশঙ্কা হয় পাছে সে মনে করে আমরা ব্যাঘাত ঘটাইতেছি এইজন্য এই ঘরখানি বিদ্যালয়ের তরফ হইতে ক্রয় করিয়া দখল করিবার প্রস্তাব পাকা করিতে পারিতেছি না। ··· মনে কষ্ট পায় বা অসুবিধা ভোগ করে ইহা আমি ইচ্ছা করি না। আপনাকে প্রতিবেশীরূপে পাইবার লোভ মনে প্রবল ছিল বলিয়াই এই কুটীরটিকে কোনমতে আপনার হাতে গছাইয়া দিয়াছিলাম—ভাবিয়াছিলাম আপনাকে intern করা গেল কিন্তু বন্দী করিয়া রাখিতে পারিলাম না। দীর্ঘকাল আপনার অন্তর্ধান বশত যখন সন্দেহ করিতেছিলাম যে আপনি হয়ত এখানকার মায়া কাটাইলেন তখন আপনার এই ঘরটাকে, নিকটবর্ত্তী পেয়ারা গাছ সমেত, পুনশ্চ আশ্রমে খাস করিয়া লইবার প্রস্তাব করিব বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু পাছে আপনার পুনরাবির্ভাবের কোনো সম্ভাবনা থাকে এই সংশয়ে দ্বিধা করিতেছিলাম। আমরা আপনার স্থলাভিষিক্ত কাহাকেও এই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই না—হয় আপনারা, নয় আশ্রম, এই ছিল আমার কামনা। ঠিক এখনি যদি এই কামনা পূর্ণ না হয় তবে অন্তত অদূরবর্ত্তী কোনো এককালে পূর্ণ হইবে এই আশা করি। ইহার মূল্য কি হইতে পারিবে আমাকে জানাইতে সঙ্কোচ করিবেন না।

চিঠি লিখিয়া সুরেনের কাছ হইতে জবাব পাওয়া কঠিন। যদি কোনো মধ্যাহ্নে তাহার আপিসে চারুকে পাঠাইয়া দেন—তবে সুরেনের কাছ হইতে গোরার তর্জ্জমা সম্বন্ধে পাকা কথা সে আদায় করিয়া আনিতে পারিবে। এ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তাহার মোকাবিলায় আলোচনা হইয়াছে কিন্তু তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিবেন না।

Autumn Festival তর্জ্জমার সম্মতি চাহিয়া আমার কাছে বিস্তর পত্র আসিতেছে। সম্ভবত আপনার কাছেও আসিয়াছে বা আসিবে—আপনি সম্মতি দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ইতি ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এবার কংগ্রেসে যে প্রার্থনা মন্ত্র তিনটি পাঠাইয়াছি মডার্ন রিভিয়ুর জন্য পাঠাইলাম। এবার ছাপিবার সময় ও স্থান আছে কিনা জানি না। কাল ৭ই পৌষ সমাধা হইয়া গেল—আপনাদিগকে স্মরণ করিয়াছি। আজও অতিথি অনেকে আছেন—উৎসবের পরিশিষ্ট চলিতেছে। শান্তা ও সীতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন। ইতি ৮ই পৌষ ১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সাংলি হইতে সেখানকার ভগিনী ও তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত পটবর্দ্ধন জানুয়ারির আরম্ভে আশ্রমে আসিবেন। পটবর্দ্ধন কেম্ব্রিজের গ্র্যাজুয়েট, তিনি আশ্রমের কাজে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন। ইঁহাদিগকে বাসের স্থান দিতে হইবে। এখানে নূতন ঘর নির্ম্মাণ করিতে সাত আট মাস লাগে, বারম্বার ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। সেই জন্য আপনার পরিত্যক্ত কুটীরটিকে শীঘ্রই তাঁহাদের বাসোপযোগী করিয়া মেরামত করিতে হইবে।

আপনার কুটীরের মূল্য সম্বন্ধে এখানকার অধ্যক্ষদের মত যাচাই করিলাম। তাঁহারা তিন শো টাকা দাম ধরিতেছেন। আপনার কি এই মূল্যে সম্মতি আছে? আপনি যাহা সঙ্গত বোধ করেন বলিয়া পাঠাইবেন। এবং যদি বিক্রয় স্থিরই করেন তবে আপনার আসবাবপত্র সরাইয়া লইবার ব্যবস্থা করিবেন। ৭ই পৌষের পূর্ব্বেই মেরামত সারিতে পারিলে সে সময়ে আপনার এই ঘর কাজে লাগাইতে পারিব। আজকাল এখানে স্থানের এত অভাব যে আমরা আশু প্রয়োজনের জ তাঁবু কিনিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু কিছুকাল হইল কানপুর এল্‌গিন মিলে পত্র লিখিয়াও ক্যাটালগ পাই নাই। শীঘ্র যে কোথাও তাঁবু পাওয়া যাইতে পারে তাহার খবরই পাইলাম না। এইজন্য উদ্বিগ্ন আছি। ইতি ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩২৬

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

মহেশবাবু[৯]র কথা আপনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন ইহাতে শাস্ত্রী মহাশয়[১০] রথী[১১] এবং অন্যান্য সকলেই উৎসাহিত হইয়াছেন। তিনি এখানে আসিতে সম্মত হইলে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইব।

আমার মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে এইজন্য রামমোহন রায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে কলম সরিতেছে না। ইতি ২রা আশ্বিন ১৩২৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

প্রীতিনমস্কারপূর্ব্বক নিবেদন

মহেশবাবু সম্বন্ধে আপনি যে কথা লিখেছেন আমার মনে লেগেচে। তিনি ঠিক বিশ্বভারতীর যোগ্য অধ্যাপক। শাস্ত্রী মশায়কে আমি তাঁর কথা বলব এবং তাঁকে আমাদের এখানে পাবার জন্যে চেষ্টা করব।

রামমোহন রায় স্মৃতি সভার সভাপতিত্বে যাব কিনা মনে সংশয় আসছে। কলকাতা আমার পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কটের স্থান—আমি শান্তি ও বিশ্রামের জন্যে অত্যন্ত উৎসুক আছি। আর আমি নানা মিথ্যা তর্কের জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে ইচ্ছা করিনে। এতে আমার শরীরও ক্লান্ত হয়ে পড়চে, নিজের কাজের ক্ষতি হচ্চে। মন উদ্‌ভ্রান্ত থাকাতে ভাল করে লিখতেও পারছিনে। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত লেখা হয়েই উঠবে না। মোটের উপর, কলকাতার আবর্ত্ত আমার পক্ষে আয়ুক্ষয়কর। কিছু না কিছু মিথ্যার আঁধি সেখানে সৃষ্টি হবেই। তাই আমি সেখানে কিছুকাল যাব না স্থির করেছি। ইতিমধ্যে লেখা শেষ হলে প্রবাসীতে পাঠাব। ইতি আশ্বিন ১৩২৮

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৯। মহেশচন্দ্র ঘোষ। ১০। শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী।
১১। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তন্ত্রের প্রাচীনতা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

ইং ১৯১০ সালে আমি কটকে ছিলাম। সে সময়ে রংপুর-নিবাসী মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কটকে ছিলেন। তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র ১৪।১৫ বৎসরের বালক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভটাচার্য রুগ্ন। তাহার স্বাস্থ্যোন্নতির আশায় তর্করত্ন মহাশয় কটকে তিন-চারি মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কটকের দক্ষিণাংশে আমার বাসা ছিল। তাঁহার বাসাও নিকটে। প্রায়ই আমি তাঁহার দর্শন পাইতাম। গ্রীষ্ম ঋতু আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যাকালে আমরা দশ-বার বন্ধু কাটজুড়ি নদীর পাষাণ-বাঁধা ঘাটে বসিয়া দক্ষিণ সমুদ্রের পবন উপভোগ করিতাম, নানা বিষয়ে কথাবার্তা হইত। তর্করত্ন মহাশয়ও সেখানে আসিয়া বসিতেন। একদিন আমি একখানা ইংরেজী বইতে পড়ি, আমাদের দেশের এক বিদ্বানের রচিত, তিনি লিখিয়াছেন, তন্ত্রশাস্ত্র হাজার। বার শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। আমার বিশ্বাস হইল না। কারণ বেদে যে শাস্ত্রের মূল নাই, সে শাস্ত্র এদেশে আদৃত হইতে পারিত না। আমি আমাদের কাটজুড়ি নদীঘাটের সান্ধ্য সমিতিতে তর্করত্ন মহাশয়ের মত জিজ্ঞাসা করি। "সে কি? কে এ কথা বলে? না জেনে শুনে মন্তব্য করা উচিত হয় নাই।" ইহার পর তিনি তন্ত্রের প্রাচীনতা ও ব্যাপ্তি বলিতে লাগিলেন, আধ ঘণ্টা বলিয়া চলিলেন। আমি অনধিকারী, যথোচিত মন দিয়াও তাঁহার যুক্তি ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। তিনি আমাকে স্নেহ করিতেন। আমার অনুরোধে "তন্ত্রের প্রাচীনতা" এই নাম দিয়া তিনি কলিকাতার "সাহিত্য-সভা"র মাসিক পত্রিকার ১৩১৭ সালের আশ্বিন সংখ্যায় অর্থাৎ ইংরেজী ১৯১০ সালের আশ্বিন সংখ্যা "সাহিত্য সংহিতা"য় প্রবন্ধ লেখেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারে আমাদের সান্ধ্য-সমিতির উল্লেখ করিয়া আমার অনুরোধ এই ভাবে লিখিয়াছেন—"এই অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের যুক্তিতর্কগুলি আপনি মুখে বলিয়া কাটজুড়ি নদীর প্রবল বায়ুরাশির হিল্লোলে ভাসাইয়া দিবেন না, এই বিষয়ের একটি প্রবন্ধ লিখিয়া সর্বত্র যাহার প্রচার আছে, এইরূপ একখানি পত্রিকায় প্রচারিত করুন, এই আমার অনুরোধ।" প্রবন্ধটিতে "সাহিত্য সংহিতা"র প্রায় বার পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে।

শুনিয়াছি, Arthur Avalon সাহেব (হাইকোর্টের বিচারপতি উডরফ সাহেব) তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার বৃহৎ ইংরেজী গ্রন্থের ভূমিকায় তর্করত্ন মহাশয়ের এই প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সাহেব তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তাঁহার গুরু ছিলেন। বিদ্যার্ণব বিখ্যাত বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক ছিলেন। ইনি প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে কাশীতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয়ের অগাধ পাণ্ডিত্য সর্বজনবিদিত। সেকালের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা এক এক গ্রন্থশালা ছিলেন। তাঁহারা যাহা জানিতেন, সব তাঁহাদের কণ্ঠস্থ থাকিত, আমাদের মতন তাঁহাদিগকে পুথী হাতড়াইতে হইত না। তাঁহার বাঙ্গালা রচনাও যেমন যুক্তিপূর্ণ তেমন মার্জিত ও সুখপাঠ্য ছিল। "ভারতবর্ষে" তাঁহার কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি হৃদয়-গ্রাহী বক্তৃতাও করিতে পারিতেন। তাঁহার স্মৃতিপূজার নিমিত্ত তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সঙ্কলন করিতেছি।

তন্ত্র এক বিপুল শাস্ত্র। ইহার অপর নাম আগম ও তান্ত্রিক মত। ইহার সপ্ত লক্ষণ কীর্তিত হইয়া থাকে। যথা—সৃষ্টি, প্রলয়, দেবার্চনা, সর্ববিধ সাধন, পুরশ্চরণ (মন্ত্র সিদ্ধির নিমিত্ত ইষ্ট দেবতার পূজা, মন্ত্রজপ, হোম ইত্যাদি), ষট্‌কর্মসাধন (রোগশান্তি, বশীকরণ,স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, মারণ), ও চতুর্বিধ ধ্যানযোগ। এই সপ্ত লক্ষণের মধ্যে সৃষ্টি ও প্রলয় পুরাণেও আছে। এক প্রকার ধ্যানযোগ পাতঞ্জল দর্শনে আছে। কিন্তু দেবার্চনা বিধি ইত্যাদি পুরাণের বিষয়ীভূত নহে। আমরা দেবার্চনা প্রত্যহ দেখিতেছি, আমরা রোগ ও গ্রহাদির শান্তি-স্বস্ত্যয়ন বুঝি, আর শুনি, তান্ত্রিক সাধকদিগের অলৌকিক শক্তি হয়, তাঁহারা স্তম্ভন, বশীকরণাদি ব্যাপার করিতে পারেন। শুনি, তাঁহারা অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে বসিয়া সাধনা করেন। কেহ কেহ শবাসন হইয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করেন। ইদানীং তান্ত্রিক সাধনা হ্রাস পাইয়াছে। কেহ কদাচিৎ গৃহে থাকিয়া তান্ত্রিক সাধনা করেন। অধিক দিনের কথা নয়, কাশীতে পূর্ণানন্দ সরস্বতী এক বিখ্যাত তন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন। শতবর্ষ পূর্ব্বে অনেকে তন্ত্রসাধনা করিতেন। ভারতের সকল প্রদেশেই তন্ত্রের প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বোধ হয়, আসাম ও বঙ্গে যত প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তত আর কোনও প্রদেশে হয় নাই। উপনয়নকালে দ্বিজ বালকের বৈদিকী দীক্ষা হয়। ইহা ব্রাহ্মী দীক্ষা। কিন্তু নারী, শূদ্র ও "সামান্য" জাতি বৈদিক মন্ত্রের অধিকারী ছিল না, এখনও নাই। পরম কারুণিক মহেশ্বর জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের নিমিত্ত তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন, সকলেই তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত

হইতে পারে, হইয়াও থাকে। এমন কি, কিছু বয়স হইলে বৈদিক দীক্ষিত দ্বিজ তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই দীক্ষা তিন প্রকার—বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত। কাহারও ইষ্ট দেবতা বিষ্ণু, কাহারও মহেশ্বর এবং কাহারও মহেশ্বরী। এই তিন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম অনুসারে এই তিন সম্প্রদায়ের ইষ্ট দেবতা হইয়া থাকেন। যে তন্ত্রের বক্তা শিব, তাহা শৈব, যাহার বক্তা শিবানী, তাহা শাক্ত। কে বৈষ্ণব তন্ত্রের বক্তা, তাহা আমি অবগত নহি।

তন্ত্রের মন্ত্র বীজসংযুক্ত। অকারাদি বর্ণে অনুস্বারযুক্ত করিয়া বীজ হয়। মন্ত্র, যন্ত্র (রেখা-চিত্র) ও ক্রিয়া—এই তিনের যোগ করিয়া দেবার্চনাদি হইয়া থাকে। সাধন-ক্রিয়া অতিশয় দুষ্কর। এ বিষয়ের শাস্ত্র সন্ধ্যা ভাষায় লিখিত। সন্ধ্যা ভাষার দুই অর্থ থাকে—লৌকিক ও নিগূঢ়। সাধারণ লোকে লৌকিক অর্থ বোঝে, সাধক নিগূঢ় অর্থ ধরেন. সে অর্থ গুরুমুখ ব্যতীত জানিবার উপায় নাই। গুরুও যে সে নহেন, যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই গুরু। গুরুও যাহাকে তাহাকে শিষ্য করেন না। তিনি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তন্ত্র-সাধনের উপযুক্ত মনে করিলে শিষ্য করেন। পশ্বাচার, বীরাচার, দিব্যাচার, কিম্বা মদ্য, মৎস্য, মাংস ইত্যাদি পঞ্চ মকার ইত্যাদির অর্থ উপরে যাহা, ভিতরে তাহা নহে। কেবল গুরু সে নিগূঢ় অর্থ জানেন। তন্ত্রশাস্ত্র অতিশয় গুহ্য, "মাতৃজারবৎ গোপনীয়।"

ভগবদ্গীতায় ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ,—এই ত্রিবিধ যোগের ব্যাখ্যা আছে। হঠযোগ তন্ত্রের বিশিষ্ট যোগ। মন নিশ্চল হয় না, বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। হঠযোগ দ্বারা চঞ্চল মনকে বলপূর্বক নিশ্চল করিতে পারা যায়। মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে ইড়া ও পিঙ্গলা, মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ী আছে। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন—এই তিন বাত-নাড়ীর ক্রিয়া ইচ্ছাধীন করিতে পারা যায়। সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডের নিম্ন স্থান হইতে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার ছয়টি বিশিষ্ট স্থান আছে। নাম চক্র। যিনি সেই ষট্‌চক্র নিরূপণ বা ষট্‌চক্র ভেদ করিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মের সহিত লীন হইয়া যান। তখন কেবল আনন্দ। প্রাণায়াম-অভ্যাস, অন্তর্ধৌতি প্রভৃতি হঠযোগের অঙ্গ। হঠযোগ অতিশয় দুষ্কর। তন্ত্রশাস্ত্র মতে পবন-রোধ দ্বারা মুক্তি ঘটিয়া থাকে।

অনেক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে "বৌদ্ধচর্য্যাপদ" নামে একখানি পুথী আনিয়াছিলেন। তাহা তান্ত্রিক সন্ধ্যা ভাষায় লিখিত। মীননাথ গোরক্ষনাথ তান্ত্রিক ছিলেন। আমাদের দেশে যে নাথ-সম্প্রদায় আছেন, তাঁহাদের গুরু শৈবতান্ত্রিক। এই কারণে সেই সম্প্রদায় যোগী নামে খ্যাত। "সহজ মত" বা "সহজিয়া মত" তান্ত্রিক মত। শতবর্ষ পূর্বেও বঙ্গে ও আসামে গোপনে কালিকা দেবীর সম্মুখে নরবলি প্রদত্ত হইত। ইহার পূর্বে প্রকাশ্যভাবে দেবার্চনার অঙ্গরূপে নরবলি হইত। তৎকালে বলির নিমিত্ত যুবা কিনিতে পাওয়া যাইত। রাজারা বিপক্ষের রাজ্য হইতে বলি বল পূর্বক সংগ্রহ করিতেন। বোধ হয়, প্রথম প্রথম সে বলির মাংসভক্ষণেরও বিধি ছিল। কারণ দেবীর প্রসাদ সাধকের গ্রহণীয় ছিল। অঘোর পন্থীদের শুচি অশুচি ভেদ নাই। অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে এই বাঁকুড়া জেলায় ইন্দাস থানায় শোনা গিয়াছিল, এক নর-পিশাচ মৃত শিশুর মাংস ভোজন করিত। অধিকাংশ তন্ত্রসাধক অলৌকিক শক্তি লাভের নিমিত্ত সাধনা করিতেন, অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি অষ্টসিদ্ধি লাভের মোহে জীবন ক্ষয় করিতেন। বিশেষতঃ, বশীকরণ মন্ত্র সিদ্ধ হইলে ধন লাভের ও সুখ ভোগের পথ উন্মুক্ত হয়। তান্ত্রিকের এক প্রকার দৃষ্টি আছে। দুর্বল-চিত্ত ব্যক্তি সে চক্ষুর দিকে চাহিলে তাহার চক্ষু স্তব্ধ হইয়া পড়ে। চৈতন্যদেব আসিয়া কদাচার তান্ত্রিকের হাত হইতে দেশ উদ্ধারের নিমিত্ত প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার তিরোভাবের পর শতবর্ষ গত হইতে না হইতে তাঁহার শিষ্যেরা সহজিয়া তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় প্রথমে তান্ত্রিক দীক্ষা পাইয়াছিলেন। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ব্রাহ্মণী ভৈরবীর নিকটে তন্ত্র-সাধনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে তিনি তোতাপুরী নামক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। যে সিদ্ধি লাভ করিতে তোতাপুরী ৪০ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা তিন দিনে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার তন্ত্র-সাধনা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায় হইয়াছিল।

১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের "সাহিত্য" নামক বার-মাসিক পুস্তকে পণ্ডিত শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ "তন্ত্রের ইতিহাস" নামে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে পূর্ণানন্দ গিরি প্রণীত তন্ত্রের (১৪৯৯ শক—১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সে তন্ত্রে আছে, "সংসার-সাগরমগ্ন জীবসমূহের উদ্ধারবাসনায় ভগবান্ পরম শিব পরম দেবতার রহস্যপূর্ণ আরাধনার প্রতিপাদক তন্ত্রের রচনা করিয়াছিলেন। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। যে পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না হয়, সেই পর্যন্ত জপ, হোম, পূজা, তীর্থস্নান আবশ্যক। এক সনাতন পরম ব্রহ্মই রসরূপী। তিনি প্রকৃতি দ্বারাই অভিব্যক্ত হন। অতএব প্রকৃতি-সংযোগই শীঘ্র ব্রহ্ম-প্রত্যক্ষের উপায়। প্রকৃতি-ব্যাপার ব্যতীত নিরাকার গুণাতীত ব্রহ্মকে বুঝিবার কোনও উপায় নাই। গুরুর উপদেশ, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি যাহা কিছু

অবগতির উপায়, সমস্তই প্রাকৃতিক ব্যাপার," ইত্যাদি। তন্ত্রশাস্ত্র কত বিপুল হইয়াছিল, তাহা উক্ত প্রবন্ধে লিখিত নিবন্ধের নামসমূহ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র নামে একখানি প্রসিদ্ধ তন্ত্র আছে।* এই তন্ত্রে পরমব্রহ্মের উপাসনা বিষয়ে উপদেশ আছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, তন্ত্রখানি আধুনিক, মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময়ে কোন ব্রহ্মজ্ঞানীর রচিত। এই অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ, ইহাতে তন্ত্রমতেই ব্রহ্মোপাসনা কথিত হইয়াছে। অবশিষ্ট একাদশ উল্লাসে প্রকৃতি-সাধনের উপদেশ আছে। আরও দেখা যায়, যে-কালে বঙ্গদেশে হিন্দু রাজত্ব ছিল, সেই কালের উপযোগী রাজধর্ম্ম ও ব্যবহার-বিধি বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয়, সে রাজা শৈব ছিলেন। এক স্থানে হূণ জাতির উল্লেখ আছে। বোধ হয়, হূণ শব্দে তুর্কী জাতিকে বুঝাইয়াছে। কিন্তু এই তন্ত্র রচনাকালে হূণেরা প্রবল হয় নাই। আরও কতিপয় কারণে মনে হয়, এই তন্ত্র দ্বাদশ খ্রীষ্টশতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। ইহাতে উল্লেখিত শাল মৎস্য ও পাষাণমন্দির হইতে মনে হয় রাঢ়ের পশ্চিমাঞ্চলে প্রণীত হইয়াছিল। ইহার চতুর্থ উল্লাসে প্রকৃতি ও ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম-সাধক ও শক্তি-সাধক যে একই বস্তু, তাহারও মীমাংসা আছে।

এক্ষণে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে তন্ত্রের প্রাচীনতার প্রমাণ যৎকিঞ্চিৎ সঙ্কলন করিতেছি। তিনি তন্ত্রের বিরুদ্ধে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। আপত্তিগুলি এই—(১) তন্ত্রের প্রতিপত্তি ভারতের সর্বত্র নাই, একমাত্র বঙ্গদেশে আছে। তখন বুঝিতে হইবে, তন্ত্র আর্যজাতির প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র নয়। উহা বাঙ্গালীর আদৃত, বাঙ্গালীর রচিত। (২) বৌদ্ধ মহাযানদিগের মধ্যে তারা, বজ্রযোগিনী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতির পূজা প্রচলিত ছিল। সেই সেই দেবতার পূজায় ও জপে বীজ-সংযুক্ত মন্ত্র আছে। তন্ত্রেও যখন সেই সেই দেবতার পূজা আছে, বীজমন্ত্রের বাহুল্য আছে, তখন তন্ত্র মহাযানদিগের ধর্ম-পুস্তকের আদর্শে রচিত। (৩) আদিম নিবাসীরা শক্তির উপাসক এবং ভূত, প্রেত, সর্প ও বৃক্ষ-বিশেষের পূজক ছিল। তন্ত্রেও যখন শক্তির উপাসনা আছে, ভূত, প্রেত, সর্প ও বৃক্ষ-বিশেষের পূজা আছে, তখন বলা বাহুল্য, সেই অসভ্যদিগের নিকট হইতেই তন্ত্রের সেই সমস্ত পূজা গৃহীত হইয়াছে। (৪) যোগিনী তন্ত্রে কোচবিহার রাজবংশের আদি পুরুষের নামোল্লেখ আছে। এইরূপ তিন শত বৎসরের ঘটনা তাহাতে থাকিলে, কি করিয়া তাহাকে প্রাচীন বলিব?

প্রথম আপত্তির বিরুদ্ধে তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, কেবল বঙ্গদেশেই তন্ত্রের প্রভাব নয়, ভারতের সর্বত্রই তন্ত্রের প্রতিপত্তি আছে। শক্তিমন্ত্র, শিবমন্ত্র, বিষ্ণুমন্ত্র তন্ত্রোক্ত। শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রও একমাত্র তন্ত্রেই উল্লেখিত আছে। কামরূপে, মিথিলায়, উৎকলে, কলিঙ্গে, দক্ষিণাপথে, কাশীতে, বৃন্দাবনে, উত্তর-পশ্চিমে ব্রাহ্মণ ও অন্য উচ্চ জাতিরা শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব, এই ভাগত্রয়ে বিভক্ত।

দ্বিতীয় আপত্তির বিরুদ্ধে বলিতে পারা যায়, মতদ্বয়ের সাদৃশ্য থাকিলে এক মতের অনুসরণে বা অনুকরণে অপর মত যে সৃষ্ট, তাহার প্রমাণ কই? প্রথমের অনুকরণে দ্বিতীয়ের সৃষ্টি ও দ্বিতীয়ের অনুকরণে প্রথমের সৃষ্টি বলিলে কিছুই বলা হয় না। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে তারা, হয়গ্রীব, বজ্রযোগিনী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতির পূজা, ধ্যান ও বীজ-সংযুক্ত মন্ত্র আছে। তন্ত্রেও তৎসমস্ত আছে। এস্থলে আমরা বলিতে পারি, তন্ত্রের বিষয় লইয়া সেই সম্প্রদায়-বিশেষের সেই সমস্ত পদ্ধতি গঠিত। বৌদ্ধ ধর্মের হৃদয়স্পর্শী ভাবে যদি হিন্দুর মনে উন্মাদনা আসিয়া থাকে, আত্মার নির্বাণের জন্য লালায়িত না হইয়া বৌদ্ধ প্রতিমার আদর্শে গঠিত প্রতিমার নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে "রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি" বলিয়া "রূপ দেও, জয় দেও, যশ দেও, শত্রু সংহার কর," এইরূপ প্রার্থনা করিবে? কোথায় বৌদ্ধ ধর্মে বাসনা-বিলোপের জন্য তাদৃশযোগ-সাধনা, আর কোথায় বৈদিক ধর্মের মত শত্রু-বিজয় ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য আরাধ্য দেবতার নিকটে প্রার্থনা ও কামনা! বৌদ্ধ ধর্মে কামনার উপদেশ, কি নিষ্কাম ধর্মের উপদেশ আছে? যদি বৌদ্ধ ধর্মে আকর্ষণের কিছু থাকে, তবে তাহা পশু-হিংসা-নিবারণ। সেটি বাদ দিয়া বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায়ের কল্পিত দেব-দেবীর পূজা হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্রে গৃহীত হইল, ইহা অপেক্ষা অপসিদ্ধান্ত কি হইতে পারে? শতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে দীক্ষিত শৌনকাদি ঋষি সূতের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতেন ও সেই যজ্ঞে পশু-হিংসা করিতেন। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব আলম্ভিত, হুত ও ভুক্ত হইয়াছিল। যজ্ঞে পশু-হিংসা হিংসা নয়। পিতৃ-পুরুষের তৃপ্তির উদ্দেশে মৃগয়ায় পশুবধ হিংসা নয়। "ললিত বিস্তার" শাক্যসিংহের প্রামাণিক জীবন-বিবরণ। তাহাতে আছে (১২ অঃ), নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদে সর্বাপেক্ষা তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। নিগম শব্দের অর্থ তন্ত্র। "ললিত বিস্তারে" (১৭ অঃ) আরও আছে, ভিক্ষুদিগকে শাক্যসিংহ বলিতেছেন, "মূঢ়েরা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু, দেবী, কার্ত্তিকেয়

* মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্,—কুলাবধূত শ্রীমৎ হরিহরানন্দ ভারতী-বিরচিত টীকা এবং শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ তীর্থনাথ-কৃত বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনী সমেত। কলিকাতা ৩১ নং শিবঠাকুরের লেন। ১০২০।

কাত্যায়নী ও গণপতি প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে ও তাহাদিগকে নমস্কার করে। কেহ কেহ শ্মশান, চত্বর আশ্রয়ে তপস্যা করে। পাষণ্ডিগের আচার উল্লেখ করিতে যাইয়া শাক্যসিংহের মুখ হইতে মদ্য, মাংস ও সুরাও উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত তন্ত্রোক্ত উপাসনা পূর্বে না থাকিলে শাক্যসিংহ কি করিয়া জানিলেন?

তৃতীয় আপত্তিটি অকিঞ্চিৎকর। ভারতের সর্বত্র শক্তিপূজা ও স্থাপিত শক্তিদেবতা দেখিতে পাই। শক্তি-পূজার বিধান আছে বলিয়া তন্ত্রকে আধুনিক বলিলে পুরাণ, মহাভারত, উপনিষৎ, বেদকে আধুনিক বলিতে হয়। মহাভারতে দেবীর স্তোত্র আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে উমা পূজার ব্যবস্থা আছে, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, দেবী পুরাণ ও কালিকা পুরাণে শক্তিপূজার প্রমাণ আছে। শারদীয়া দুর্গাপূজার উল্লেখ অনেক পুরাণে আছে। যদিও বঙ্গদেশের মত ভারতের অন্যত্র মৃন্ময়ী প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া আড়ম্বরের সহিত দুর্গাপূজা হয় না, তথাপি ঘটে দেবীর পূজা বা প্রসিদ্ধ স্থাপিত দেবী মূর্তির দর্শন, তাহাতে দেবীর পূজা, নবরাত্রিব্যাপী ব্রতধারণ, মহাষ্টমীর দিবস উপবাস ও চণ্ডী পাঠ সর্বত্র হইয়া থাকে। কেন, তলবকার প্রভৃতি উপনিষদে ইন্দ্রাদি দেবতা তেজঃপুঞ্জের ভিতরে হৈমবতী উমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ঋগবেদে সরস্বতী-সূক্ত আছে, যজুর্বেদে লক্ষ্মী-সূক্ত আছে, ঋগবেদের দশম মণ্ডলে দেবী-সূক্ত আছে। অন্যান্য দেশেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। শক্তিপূজার সমর্থক বলিয়া তন্ত্রকে আধুনিক বলিতে পারা যায় না। মনসা দেবীর পূজা তন্ত্রোক্ত নয়, পৌরাণিক। তুলসী, বিল্ব ও অশ্বত্থ বৃক্ষের পূজাও তন্ত্রে উল্লিখিত নহে, পুরাণে কথিত।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক স্মার্ত শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্যকৃত স্মৃতি-তত্ত্বে ও আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ তর্করত্নকৃত তন্ত্রসারে যোগিনীতন্ত্র শারদা-তিলক স্বচ্ছন্দ-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থের নাম আছে। মূল গ্রন্থ-রচনার অনেক পরে সংগ্রহ-গ্রন্থ সৃষ্টি হয়। অন্ততঃ, সহস্র বৎসরের ব্যবধান স্বীকার করিতে হয়। বেদের সায়ণ-মাধবীয় ভাষ্যকার মাধবাচার্য সর্ব-দর্শন-সংগ্রহের পাতঞ্জল দর্শনে তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ ও তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ষড়-দর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র পাতঞ্জল দর্শনের টীকায় তন্ত্রোক্ত দেবতার ধ্যান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্যও শারীরক ভাষ্যে তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই তিন মহা-পুরুষের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩।৪৭) আছে, তন্ত্রোক্ত বিধান মতে কেশবের অর্চনা করিবে। ব্রহ্ম পুরাণে আছে, একাম্র কাননে (ভুবনেশ্বরে) বেদোক্ত তন্ত্রোক্ত বিধানে মহাদেবের পূজা করিবে। কূর্ম পুরাণে আছে, অনেক শাস্ত্র করাল ভৈরব ও যামল প্রভৃতি বাম মার্গ অবলম্বনে রচিত। রামায়ণে (১।২২।১২,১৩,১৫) বলা, অতিবলা বিদ্যার উল্লেখ আছে। এই দুই বিদ্যা তন্ত্রোক্ত; তন্ত্রসারে উদ্ধার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। বরাহ পুরাণে আছে, বেদোক্ত বা আগমোক্ত বিধিদ্বারা জনার্দন অর্চনীয়। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে আছে, বৈষ্ণবী দীক্ষা ব্যতীত মনুষ্য কি করিয়া ভাগবত হইবে। নারদ পঞ্চরাত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ষট্‌চক্রে চিন্তা করিতে বলা হইয়াছে, চতুর্থাধ্যায়ে "লক্ষ্মীশ্বয়া কামবীজম্" ইত্যাদি তন্ত্রোক্ত পারিভাষিক শব্দ আছে। পাতঞ্জল দর্শনে, ভগবদ্গীতায়, মহাভারতের শান্তিপর্বে (২০১।১৭,১৯) তন্ত্রোক্ত প্রাণা-য়ামের কথা আছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে (২৫৯।৭,৮,৯) আছে, বেদসমূহ হইতে পুনরায় সর্বতোমুখ (সর্বতোব্যাপ্ত) বেদসমূহ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই বেদসমূহ কি? তন্ত্র সর্ব-বর্ণ সাধারণকে সমান অধিকার দিয়াছে। এইজন্য একমাত্র তন্ত্রই সর্বতোমুখ। শান্তিপর্বে (২৮৮।১২১-১২৪) দক্ষের প্রতি মহাদেব বলিতেছেন, "আমি সাঙ্গ বেদ ও সাংখ্য যোগ হইতে উদ্ধার করিয়া বেদাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মঙ্গলময়, সর্ববর্ণ ও সর্বাশ্রমের অনুকূল পাশুপত ব্রত উৎপাদন করিয়াছি।" এই পাশুপত শাস্ত্র তন্ত্রগ্রন্থ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। শান্তিপর্বে (২৮৪।৭৪) তন্ত্রের পারি-ভাষিক শব্দ, "ঘণ্টি, চক্র, চেলী, মিলী মিলী" গ্রহণ করিয়া মন্ত্রোদ্ধার প্রদর্শিত হইয়াছে। অনুশাসন পর্বের মোক্ষধর্মে (৩৫০।৬৪-৬৮) "পাশুপত ও পঞ্চরাত্রে"র উল্লেখ আছে। পঞ্চরাত্র তান্ত্রিক গ্রন্থ। কেবল মহাভারত নয়, সকল পুরাণেই অল্পবিস্তর দেবী-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। অথর্ব বেদের অন্তর্গত অনেক উপনিষদে তন্ত্রের ন্যায় উপাসনা-প্রণালী লিখিত আছে। মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্ট ২।১ শ্লোকের টীকায় হারীত-বচন বলিয়া লিখিয়াছেন, "শ্রুতিহি দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।" [মেদিনীকোষে তন্ত্রশব্দের এক অর্থ শ্রুতির শাখাবিশেষ।] বৃদ্ধ হারীত-সংহিতায় তান্ত্রিক দীক্ষা পদ্ধতি, উশনঃ সংহিতায় পঞ্চরাত্র ও পাশুপত ধর্মের স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে। কাত্যায়ন-সংহিতায়, ব্যাস-সংহিতায়, শঙ্খ-সংহিতায় ইত্যাদি সংহিতায় তন্ত্রোক্ত বিধির উল্লেখ আছে। সমুদয় স্মৃতি-সংহিতাতেই পুরাণের মত স্পষ্টতঃ ও ভাবতঃও তন্ত্রের উল্লেখ আছে; কিন্তু তন্ত্রে স্মৃতি ও পুরাণের নামোল্লেখ নাই।

এইখানে তর্করত্ন মহাশয়ের উদ্ধৃত প্রমাণ সমাপ্ত করি।

তন্ত্রের প্রাচীনতার বহুতর প্রমাণ আছে। একটা দিতেছি। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে

প্রণীত হইয়াছিল। কত পূর্বে তাহা আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রের অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক উপনিষদে প্রাণায়ামের ব্যবস্থা আছে। ইহাও সত্য, অনেক বৌদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। বৌদ্ধেরা এদেশেরই লোক। তাঁহারা হিন্দুর নিকট হইতে এবং হিন্দুরাও তাঁহাদের নিকট হইতে "রহস্য" পাইয়াছিলেন।

তন্ত্রশাস্ত্রের বহুল প্রচারের অনেক কারণ ছিল। পূর্বে কয়েকটির উল্লেখ করা গিয়াছে। মানুষের সৃষ্টির পর যখন সে ভয় ও ভাবনায় পড়িয়াছিল, তখন সে অসাধারণ দ্রব্য ও কর্ম দ্বারা নিরুদ্বেগ হইতে যত্নবান্ হইয়াছিল। এমন জাতি ছিল না, এখনও নাই, যে মণি, মন্ত্র ও ওষধির গুণে বিশ্বাস না করিত বা না করে। যথাবিহিত মন্ত্রপাঠ ও পূজা করিলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এই বিশ্বাস সকল জাতির আছে। মানব-চিত্তের স্বাভাবিক কামনা হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহার আরম্ভকাল নির্ণয়ের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

এই কথা স্মরণ রাখিয়া আর্য-শাস্ত্র অবলোকন করিলে দেখা যায়, ঋগ্‌বেদের কয়েকটি সূক্তে তন্ত্রযোগ্য মন্ত্র আছে। যথা—বিষঝাড়ার মন্ত্র (১।১৯১), শত্রুবিনাশের মন্ত্র (১০।১৬৬), সপত্নীবশীকরণের মন্ত্র (১০।১৪৪), গর্ভাধান সন্তানলাভের মন্ত্র (১০।১৮০), মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র (১০।৫৮) ইত্যাদি। অথর্ববেদে বিষ্কন্ধ (বাত) রোগ উপশমের নিমিত্ত বাহুতে ওষধি ধারণের বিধি আছে। এই বেদে বহুবিধ আভিচারিক মন্ত্রের ও ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে যেরূপ যন্ত্র (চিত্র) নির্মাণের বিধি আছে, সেইরূপ অথর্ববেদেও আছে। স্ত্রীবশীকরণ মন্ত্রে (৩।২৫), পুরুষ-বশীকরণ মন্ত্রে (৬।১৩০) প্রতিকৃতি লিখিয়া মন্ত্র আবৃত্তি করিবার বিধি আছে। দ্যূত ক্রীড়ায় জয়ী হইবার মন্ত্রের (৭।৫০।৫) ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য চিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

এ বিষয়ে মহীশূর রাজ্যের পণ্ডিত রুদ্রপট্টন শামশাস্ত্রী মহাশয় ইংরেজী ভাষায় সবিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় "একলিপি বিস্তার পরিষদ্" স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার মুখপত্রের নাম 'দেবনাগর' ছিল। প্রথম বর্ষের দেবনাগরে (কল্যব্দ ৫০০৯—১৯০৮ সালের) শামশাস্ত্রী মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধের হিন্দী অনুবাদ তিনটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি এই তিন প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু সঙ্কলন করিতেছি।

ভারতীয় অক্ষরমালার নাম ব্রাহ্মী। অষ্টমাতৃকার এক মাতৃকা ব্রাহ্মী। এই নাম কেন হইল? দেবনাগরী নামই বা কেন হইল

ইহার উত্তর এই,—বর্তমানকালে যেমন প্রতীকোপাসনা হইতেছে প্রাচীন ভারতে দেবীর চিত্রিত চিহ্ন পূজিত হইত। তৎকালে দেবীকে (প্রকৃতিকে) মাতা বলা হইত, সে দেবীর সাঙ্কেতিক চিহ্ন (প্রতিকৃতি) মাতৃকা নাম পাইয়াছিল। পাণিনি সূত্রে কন্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন রামক, লক্ষ্মণক শব্দের অর্থ রামের চিত্র, লক্ষ্মণের চিত্র। তেমনই মাতৃকা শব্দের অর্থ মাতৃচিত্র, মাতৃপ্রতিকৃতি, অন্য কোন অর্থ হইতে পারে না। পরে একই নামে দেবী ও দেবীর প্রতিকৃতি বুঝাইয়াছে। যেমন অক্ষর শব্দ। দেব দ্বারা দেবী, এবং দেবী দ্বারা দেব জ্ঞান হয়। কারণ দেব ও দেবী অভিন্ন, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। পরমাত্মা নপুংসক, স্ত্রী পুরুষ উভয় চিহ্নবিশিষ্ট।

তাম্রপত্রে কিম্বা বৃক্ষপত্রে প্রতীকোপাসনার পূর্বে মণ্ডল বা চক্র এবং ত্রিকোণ লিখিতে হয়। ইহার নাম যন্ত্র। এই যন্ত্রের মধ্যে দেব কিম্বা দেবীর প্রতিকৃতি লিখিতে হয়। এই দুই মিলিয়া নাম 'দেবনাগর' অর্থাৎ দেবের বাসস্থান চক্র। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১।২৭) ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।৩১) আছে; যথা—"দেবানাং নগরম্।" কতিপয় দেবনগর চিত্র দেবনাগরী অক্ষরমালায় পাওয়া যায়। তাহা হইতে সমুদয় মালার নাম দেবনাগরী হইয়াছে। যে বর্ণমালা দেবনগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম দেবনাগরী।

ঋগ্‌বেদের অন্তিমকালে, অথর্ববেদে ও উপনিষদে এক ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। অথর্ববেদে (১১।৪।৩২) দেহধারী পুরুষকে (মানুষকে) ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, কারণ মনুষ্যদেহে দেবতার বাস আছে। তন্ত্রের পঞ্চতত্ত্ব মানবদেহে বিদ্যমান। শামশাস্ত্রী অনুমান করেন দেবীর প্রতিমা-পূজা প্রচলিত হইবার বহুপূর্বে যন্ত্রে প্রতিকৃতির পূজা হইত। মনুষ্যরূপের অনুরূপ চিত্র করিয়া দেবতার পূজা হইত। পাণিনির পূর্ব হইতে প্রতিমা নির্মাণ ও বিক্রয় হইয়া আসিতেছে। ঋগ্‌বেদের দেবতার রূপ ছিল, রুদ্র ও মরুৎ দেবতার বর্ণনা পড়িলেই প্রতীতি হইবে। বরুণের বর্ণনা দেখুন। বহুস্থানে তনু, বপু, রূপ, সদৃশ শব্দ আছে। ঋগ্‌বেদে (৩।৪।৫) 'নৃপেশস্' মনুষ্য রূপধারী। দেবতার সাধারণ নাম "দিবোনরস্"—স্বর্গের নর।

অথর্ববেদের দার্শনিক মন্ত্রে (৩।৩৫, ৯।২) 'কাম' এক আদিবীজ কামমদন। পরবর্তী মন্ত্রে স্ত্রীবশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগে অথর্ববেদীয় কাম আর তন্ত্রশাস্ত্রের চিত্রিত যন্ত্র এক। কামের বাণ দ্বারা হৃদয় বিদ্ধ করিবার কথা আছে। এই মন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে চিত্র লিখিত হইত, ধনুঃ বাণ ইত্যাদির প্রতিকৃতি করা হইত। দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভের নিমিত্ত ৭।৫০ মন্ত্র আবৃত্তি ও চিত্র করা হইত (৭।৫০।৫)। যাহাকে বশ করিতে হইবে, তাহার চিত্র ও নাম লিখিয়া বশীকরণ মন্ত্র ধ্যান ও আবৃত্তি করা হইত। গোরোচনা ও রক্ত, পরবর্তীকালে সিন্দুর ও আলতা দ্বারা চিত্র লিখিত হইত।

তন্ত্র বিষয়ে গদ্য পদ্য সূত্রময় অগণিত গ্রন্থ আছে। শিবশক্তির যুগল মূর্তির পূজাই তন্ত্রশাস্ত্রের মুখ্য বিষয়। আদিতে শিবলিঙ্গ পূজা প্রচলিত ছিল। কারণ তন্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থে লৈঙ্গিক চিহ্নদ্বারা শিবশক্তি সূচিত হইত। প্রমাণ যথা—কাদিমত, জ্ঞানার্ণব, নিত্যাষোড়শিকার্ণব, ইত্যাদি।

অভিচার—মারণ উচ্চাটনাদি হিংসাক্রিয়া, বেদের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। (ঋগ্‌বেদ ৭।১০৪, ১০।৮৪, ১০।১২৮, ১০।১৫৫)। এমন কি উপনিষদেও যেমন বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।৪।১২ উল্লেখ আছে।

[আমার অনুমানে ঋগ বেদের দশম মণ্ডল খ্রীঃ পূঃ ৩৫০০—২৫০০ অব্দে এবং অথর্ববেদ খ্রীঃ পূঃ ২৫০০—২০০০ অব্দে প্রণীত হইয়াছিল। ইহাদের পূর্বে মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস নিশ্চয় ছিল।]

রামের টাকা

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

মনে হয়, চারিদিকেই পরিপূর্ণতা—

আকাশ পরিপূর্ণ নীল, তার আর চাই না; গৃহে গৃহে পরিপূর্ণতা—সেখানে আরও পাইবার ক্ষুধিত ক্রন্দন নাই; পথের দু'ধারে অগণিত পণ্যশালা, দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ—আরও লইয়া রাখিবার স্থান সেখানে নাই; গাছে গাছে ফুল ফুটিয়াছে, আরও ফুটাইবার আকাঙ্ক্ষা তাদের নাই; গৃহচূড়ায় কপোতের কূজন শুনিয়া মনে হয়, ক্ষুধাহীন পরিপূর্ণতায় তাহা বিহ্বল। শিশুর মুখে পরিপূর্ণ নির্লিপ্ততা, বালকের মুখে ক্রীড়াসক্তির পরিপূর্ণ আনন্দ, যুবকের মুখে পরিপূর্ণ সুখ, বৃদ্ধের মুখে পরিপূর্ণ শান্তি। সহস্র সহস্র লোক চলাচল করিতেছে—পরিপূর্ণতার গর্ব্বে তাহারা দৃপ্ত; পরিপূর্ণতার বার্ত্তা পরস্পরকে জানাইবার ব্যগ্রতায় তাহাদের দাঁড়াইবার ধৈর্য্য নাই···

কেবল যত ক্ষুধা রামের উদরে!

রামের হাতের ভিক্ষাপাত্র দেখিয়া লোকে আতঙ্কিত হয়, তাদের মনে হয়, ইহার ভিক্ষাপাত্র এ জীবনে ভরিবার নয়—এই ত সেদিনও দিয়াছি!

কিন্তু সেদিন দিয়াও আজ আবার দিতে চায় এমন গৃহস্থও আছে। তাহাকে দেখিয়া কি কারণে এই গৃহলক্ষ্মীটির মমতা জন্মে তাহা রাম জানে না—'মা' বলিয়া ডাক দিয়া দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইলেই তিনি মেয়েকে ডাকিয়া বলেন: "মাধু, রামকে দে তো, মা, দু'মুঠো চাল।"

মাধুই এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়া রামের নামটি জানিয়া লইয়াছিল।

মাধু একখানা সরায় করিয়া চাল আনে; রামের ঝুলির ভিতর অতি সাবধানে ঢালিয়া দেয়—একটি চাল মাটিতে পড়ে না। রাম ভাবে, যেমন মা তেমনি মেয়ে—দেহ যেমন সুশ্রী, মন তেমনি কোমল—ইহারাই স্নেহশীলা অন্নপূর্ণার সন্তান।

ওদিকে রামভজন আগরওয়ালার আড়তে গিয়া দাঁড়াইলেই তাকিয়ার উপর হইতে ঘাড় তুলিয়া রামভজন বলে: "সরকার ইসকো পয়সা দেও একঠো।" আরও ওদিকে গাঙ্গুলীর হোটেল; সেখানে গেলে ভাত থাকিলেই গাঙ্গুলী খাইতে দেয়। কিন্তু যে দেয় তাহারই কাছে নিত্য যাইতে লজ্জা করে; যে দেয় না, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারগৃহে যে বন্দী, সে যদি দৈবাৎ দেয় এই আশাতেই দানকুণ্ঠের সম্মুখেই নিত্য হাত পাতিতে হয়—তাহাতে রামের ভিক্ষাপাত্র ভরে না। কিন্তু আজ রামের প্রাতরুত্থান সার্থক, ভিক্ষা ভালই মিলিয়াছে; মনে হইতেছে, আর চাই না—যে পরিপূর্ণতার আনন্দ চতুর্দ্দিকে তরঙ্গে তরঙ্গে ছুটিতেছে তাহা যেন রামের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ছল ছল করিতে লাগিল।

রাম হৃষ্টচিত্তে সকাল-সকাল ঘরে ফিরিতেছিল—এমন সময় সদর রাস্তার উপর একটা সুবৃহৎ বাড়ীতে উৎসবের কলরব শুনিয়া সে দাঁড়াইল।

২

যার ভাগ্য ভাল তার এমনিই হয়। নীলকণ্ঠ মজুমদারের বরাত ভাল—সোনার সঙ্গে মাটি মিশিয়াছে, অর্থাৎ জঙ্গীপুরের মাতুল-সম্পত্তি তাঁহাতেই বর্ত্তিয়াছে। সে সম্পত্তির পরিমাণ ঢের—একটা জমিদারীই। নীলকণ্ঠ নিজে অবসরপ্রাপ্ত রাজ-কর্ম্মচারী; স্বাস্থ্যের আনন্দের উপর মাসিক তিন শত টাকা পেনসন তিনি ভোগ করেন; শহরের বুকের উপর পাঁচটি ভাড়াটিয়া ইষ্টকালয় তাঁহারই ভাগ্যগর্ব্বে শির উঁচু করিয়া আছে; এক শত টাকার ডাক না দিলে সকলের ছোটটিও মানুষের, অর্থাৎ নীচের, দিকে দৃষ্টিপাত করে না। নীলকণ্ঠের একটি কন্যার বিবাহ হইয়া গেছে; সুতরাং যে শত্রুরা বাঙালীর ভিটায় ঘুঘু ডাকিয়া আনে তারা নীলকণ্ঠের নাই। জামাই পশ্চিমের একটি কলেজের অধ্যাপক; বড় আর মেজ ছেলে যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়া লাট-দপ্তরের বড় দুখানি আসনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বসিয়া আছে—শূন্য হইলেই

যাইয়া বসিয়া পড়িবে। নীলকণ্ঠ বড় ছেলের বিবাহ দিয়াছেন যাঁর কন্যার সঙ্গে সেই বৈবাহিক মহাশয় এত বড় ডাক্তার যে, ভিজিট্ ছ' বৎসরে ষোলগুণ বাড়াইয়াও তাঁর বিশ্রামের সময় নাই; মেজ ছেলের শ্বশুর কোন্ এক স্বাধীন নৃপতির রাজস্ব-সচিব—সেই নৃপতি কলিকাতায় আসিলে কেল্লায় তোপ পড়ে। আরও সুখের বিষয় ইহাই যে, নীলকণ্ঠ শোক পান নাই; আঁতুড় হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁর সন্তানেরা ভালই আছে। তার উপর তাঁর স্ত্রী এবং বড় দুটি রূপে গুণে উত্তম।

ভাগ্যলক্ষ্মী মানুষকে আর কি দিতে পারে! সুখের উপর সর্ব্বব্যাপী দ্বিগুণ সুখের কারণ সম্প্রতি ঘটিয়াছে—নীলকণ্ঠের বাড়ীতে আজ প্রাতঃকাল হইতে রসুনচৌকি বাজিতেছে—তাঁর বড় ছেলে শৈলেন্দ্রর প্রথম পুত্রের আজ শুভ অন্নপ্রাশন। কুটুম্ব আর অভ্যাগতে বাড়ী পূর্ণ হইয়া ভারি সমারোহ লাগিয়া গেছে। নীলকণ্ঠের রান্না-বাড়ী হইতে বাহির-বাড়ী অনেকটা পথ—এতটা জায়গায় লোক একেবারে ঠাসা; দেখিয়া মনে হয় না, এ বাড়ীর বাহিরে আর মানুষ আছে। এক কথায়, পৃথিবীর সর্ব্বগত মহানন্দধ্বনি যেন শত মুখে উৎসারিত হইয়া নীলকণ্ঠের গৃহের চতুঃসীমা পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িতেছে। উৎসব জমিয়াছে বেশ, এবং খোকা স্বর্ণালঙ্কারে প্রায় আবৃত হইয়া গেছে।

বেলা প্রায় দুটো। নীলকণ্ঠের বাড়ীতে ভোজ আরম্ভ হইয়া গেছে; কোলাহল-ব্যস্ততা আর ডাকহাঁক দৌড়াদৌড়ির অন্ত নাই। প্রকাণ্ড আঙ্গিনা আর বারান্দা জুড়িয়া লোক বসিয়া গেছে—সব বড় বড় লোক; ধনে মানে নীলকণ্ঠের সমকক্ষ তাঁরা; তাঁরা সবাই সগোষ্ঠী আর সবান্ধবে আসিয়াছেন।

নীলকণ্ঠ একখানা চেয়ার পাতিয়া রাখিয়া তাহাতে না বসিয়া সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছেন; শৈলেন্দ্র তাঁর পাশেই হাজির আছে।

পিতা পুত্র উচ্চকণ্ঠে কেবুলি হাঁকিতেছেন: ঐ পাতে, ঐ পাতে…

তাঁরা আরও বলিতেছেন: দাও, ঠাকুর…

আপত্তি দেখিয়া আপ্যায়নের তেজ আরও বাড়িয়া যাইতেছে; বলিতেছেন,—নষ্ট হবে বলছেন? তা হয় হোক্। দাও ঠাকুর।

গরম পোলাও ঠাণ্ডা হইয়া অরুচি ধরিয়া গেলে, গরম-গরম আরও চার হাতা লইয়া তার তিন হাতাই ঠাণ্ডা করিয়া ফেলিয়া রাখিল—পেটে স্থান কম।

নীলকণ্ঠ যদি বলেন: আর দুটো দিক্?—শৈলেন্দ্র বাড়াইয়া বলে: খেয়ে ফেলুন। ঠাকুর আর দুটো দাও।

কিন্তু ঠাকুর দেয় আরও চারটে। লোকে শেষে রস-গোল্লা প্রভৃতি মিষ্টান্ন চিবাইয়া ঢালিতে লাগিল…

দেখিয়া নীলকণ্ঠ আর শৈলেন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল না—ইহারই নাম লোক-খাওয়ানো। প্রাচুর্য্যের উল্লাসে ওঁদের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইল।

এইবার বিদায়ের পালা—নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ কস্তুরীগন্ধযুক্ত পান লইয়া আর শিশুটিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একে একে দলে দলে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

যাইবার আগে সর্ব্বাগ্রগণ্য রায় বাহাদুর নিরঞ্জনপ্রসন্ন সর্ব্বাধিকারী নীলকণ্ঠকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন,—ভায়া একবার ভেতরে চল।

বুঝা গেল, খোকাকে তিনি আশীর্ব্বাদ করিবেন। ঘটিলও তাই; রায় বাহাদুর একটি 'ফুল' গিনি দিয়া খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং অধিকন্তু খোকাকে শ্যালক সম্বোধন করিয়া গৃহিণীকে তাঁহার অঙ্কে সমর্পণ করিবার নির্ঘাৎ প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। তাঁহার সাহস দেখিয়া খোকা বিচলিত হইল না; কিন্তু তাঁহার স্বার্থত্যাগের প্রস্তাবে নীলকণ্ঠ প্রমুখ সকলেই প্রচুর হাস্য করিলেন।

পশ্চিম দেশীয়া ধাই লক্ষ্মীর মা প্রসূতিকে "খালাস" করিয়াছিল; সেই গৌরবে সে একখানি হরিদ্রারঞ্জিত বস্ত্র পরিয়া, আর কৃষ্ণবর্ণ ত্বকের উপর খানিক অনাবশ্যক তেল ঢালিয়া আসিয়াছে…সে কথাও কহিতেছে ঢের; রায় বাহাদুরের কথার পর সে বলিল…ই মাগো; বাবুজীর কি কথা!…বলিয়া সকলের হাসির চতুর্গুণ হাসি সে একা হাসিল।

রায় বাহাদুরের গৃহিণীও সেখানে ছিলেন। খোকার সম্মুখস্থ রৌপ্যপাত্র মামুলি রৌপ্যমুদ্রায় পূর্ণ হইয়া গেছে; কে একজন একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক দিয়াছে, তাহার আনুমানিক মূল্য পাঁচ টাকার বেশী নয়; কিন্তু গিনি পড়িল মাত্র ঐ একটি। অম্বিকা দেবী সেই কারণে হাফ-ঘোমটার আড়ালে গর্ব্ব অনুভব করিতেছিলেন। খোকার অঙ্কশায়িনী হইতে তিনি মাথা নাড়িয়া রাজী হইলেন।

ইহাতেও সকলে লক্ষ্মীর মায়ের সঙ্গে প্রচুর হাস্য করিলেন।

নীলকণ্ঠের স্ত্রী হৈমবতী একটি ছেলেকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, রায় বাহাদুর খোকার একটি পছন্দসই নাম রাখুন

লক্ষ্মীর মা সব কথাতেই আছে; বলিল: হাঁ বাবুজী, একটা পয়মন্ত নাম।

রায় বাহাদুরের মুখে চোখে হর্ষ বিকশিত হইল; কিন্তু গিনি দেওয়া যত সহজ, নাম রাখা তত সহজ নহে, অনেক হাতড়াইতে হয়—বলিলেন: দেখে শুনে রাখব একটা। চলো হে। বলিয়া তিনি নত হইয়া দুটি আঙ্গুলের দ্বারা খোকার চিবুক স্পর্শ করিলেন এবং নীলকণ্ঠকে হাতের একটা ঠেলা দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন।

লক্ষ্মীর মা বলিল : পরে রাখবেন, এখন না। বলিয়া এমন আহ্লাদিত হইয়া উঠিল যেন অবলম্বনের জন্ত ঢলিয়া কাহারো গায়ে পড়িতে চায়।

নীলকণ্ঠের বহির্ব্বাটি হইতে রাস্তায় পৌঁছিতে একটা কক্ষ অতিক্রম করিতে হয়। সেটার উপরে নীলকণ্ঠের বৈঠকখানা, নীচেটা ভৃত্যবর্গের বিশ্রামকক্ষ। এই কক্ষ দিয়াই যাতায়াতের পথ। পাঁচটা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠান হইতে সেই ঘরে উঠিতে হয়। রায় বাহাদুর নিরঞ্জনপ্রসন্ন সর্ব্বাধিকারী সেই সিঁড়ির দু'ধাপ উঠিতেই অপর যে ব্যক্তি সেই সিঁড়ি দিয়াই উঠানে নামিতে উদ্যত হইয়া একেবারে দরজার মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তার চেহারা বীভৎস : হাড়ের উপর চামড়া খালি ; মুখে একমুখ দাড়ি গোঁফ ; চুলগুলি আন্দাজে আর অপটু হস্তে নিজেই কাটিয়াছে বলিয়া মাথাটা বড় অপরিপাটি হইয়া উঠিয়াছে ; পরিধানে মলিন বস্ত্রখণ্ড ; কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি··· অশেষ জীর্ণসংস্কারের দরুন তাহা বিবিধ বর্ণের আর বিবিধ আকারের কাপড়ে কাপড়-হাটার নমুনার মত দেখাইতেছে ; হাতে একটি বাঁশের লাঠি আছে।

এই মূর্ত্তি সম্মুখে পড়ায় রায় বাহাদুর বাধা পাইলেন··· সিঁড়ির উপরেই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

অঙ্গে যেমন ধার থাকে তেমনি রায় বাহাদুরের পাশেই ছিলেন নীলকণ্ঠ ; তিনি চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিলেন···কে রে তুই ?

রাম বলিল : আজ্ঞে, আমি রাম, ভিখিরী।···বলিয়া রাম নিজের পরিচয় সসঙ্কোচে নিবেদন করিল, কিন্তু মতিভ্রম-বশতঃ রায় বাহাদুরকে পথ দিয়া সে শশব্যস্তে সরিয়া গেল না।

নাম-সম্পর্কে পিছন হইতে একটি ইস্কুলের ছেলে বলিল : তুমি আরে রাম।

এই কথায় একটি হাস্যধ্বনি উঠিল···

রামের ধৃষ্টতায় আগুন হইয়া নীলকণ্ঠ হাস্যধ্বনিকে আবৃত করিয়া বজ্রকণ্ঠে হাঁকিলেন : তেওয়ারী ?

তেওয়ারী নীলকণ্ঠের দারোয়ান ; সে পোলাও পরিবেষণের শ্রমের পর গায়ের ঘাম মুছিয়া পৈতার ঘাম নিংড়াইতেছিল ; আহ্বান ধ্বনিত হইতেই 'হুজুর' বলিয়া সাড়া দিয়া সে ভোজ-পুরী বিক্রমে লাফাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। নীলকণ্ঠ তর্জ্জনী নাড়িয়া তাহার কাছে জানিতে চাহিলেন, বেতনভুক্ এত ভৃত্য বিদ্যমান থাকিতে রায় বাহাদুরের সম্মুখে এই লোক পড়ে কেন ?

কিন্তু তেওয়ারী কৈফিয়ৎ গড়িয়া তুলিবার পূর্ব্বেই ততক্ষণে কাজ সুরু হইয়া গেছে, অর্থাৎ নীলকণ্ঠের কোচম্যান শিউসেবক আসিয়া প্রশংসনীয় তৎপরতার সহিত রামের গলদেশ চাপিয়া আর টিপিয়া ধরিয়াছে এবং রাম আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে।

রায় বাহাদুর এতক্ষণে কথা বলিলেন—কোচম্যানকে রামের গলদেশ হইতে হাত তুলিয়া লইতে আদেশ করিলেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল দেখিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া নীল-কণ্ঠকে বলিলেন—আহা শুভ দিনে কেন হাঙ্গামা করছ!

ফরিয়াদি মামলা তুলিয়া লইতেছেন দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বিবাদের নিষ্পত্তি হইয়া শান্তি স্থাপিত হইল, নীলকণ্ঠ রুদ্রমূর্ত্তি সংবরণ করিলেন।

রায় বাহাদুর রামকে আরও কাছে ডাকিয়া পকেটে হাত দিলেন ; ব্যাগ বাহির করিলেন ; ব্যাগের ভিতর হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিতে গেলেন—

রাম তখন থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছিল ; কম্পিত করতল পাতিয়া সে দান গ্রহণ করিল।

রায় বাহাদুর নীলকণ্ঠকে পুনরায় বলিলেন, কিছু খাবার-টাবার দিয়ে একে বিদায় কর। আহা, আজ শুভ দিনে কি মারধোর করতে আছে!—বলিয়া তিনি এবার নির্ব্বিঘ্নে কক্ষ অতিক্রম করিয়া রাস্তায় আর মোটরের কাছে পৌঁছিলেন।

৩

রায় বাহাদুরের ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থাই নীলকণ্ঠ করিলেন। টাকার উপর নীলকণ্ঠের ছ'খানা লুচি রাম পাইল।

ঝুলির ভিতর টাকা আর লুচি লইয়া রাম যখন নীলকণ্ঠের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল তখন তার চিত্ত আনন্দে আকুল ; অশক্ত দেহে অপূর্ব্ব একটি শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। জন-স্রোতের দিকে পুলকিত নেত্রে চাহিতে চাহিতে রাম পথ চলিতে লাগিল···

পৃথিবী কেন আনন্দধাম, এই প্রশ্নের উত্তরটি এবং সানন্দে পথ চলিবার যে গূঢ় কারণটি লুকাইয়া রাখিয়া মানুষ এত দিন তাহাকে ঠকাইতেছিল আজ তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ; পৃথিবীর অর্দ্ধেক মানুষ আহরণ করিতে ছুটিতেছে—অপর অর্দ্ধেক আহরণ করিয়া ফিরিতেছে।

কিন্তু যে যতই আহরণ করুক তাহার মতও অমূল্য সঞ্চয়ন কাহারও নহে।···রামের পা দুখানা দ্রুততর চলিতে লাগিল —ঐ অমূল্য আহরণ, অর্থাৎ টাকাটা, লইয়া ঘরে পৌঁছিতে পারিলেই তাহা যেন তার সত্যকার আপনার হইবে।···তার মনে পড়িতে লাগিল সেই দাতাকে—চমৎকার গৌরবর্ণ ; বয়স সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ হইবে ; চুল পাকে নাই, কিংবা প্রচুর চুলের ভিতর সাদা দু-এক খেই তার চোখে পড়ে নাই ; গোঁফ দু-একটি পাকিয়াছে ; গায়ে মূল্যবান কোট ঝক্‌ঝক্ করিতেছে ; গণ্ডদ্বয় স্থূল, যেন গালের ভিতর গোল আর বড়পারা কিছু রহিয়াছে ; সুপুষ্ট আঙুলগুলি দেখিতে মোলায়েম ; একটি অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক আছে—তাহার উপর উজ্জ্বল একখানি পাথর বসানো ; পরিধানে জমাট-বোনা মিহি একখানি কোঁচানো ধুতি—থাকে থাকে ভাঁজ পড়িয়া প্রস্থে ক্রমশঃ বাড়িয়া একটি পরিমাণ-পরিপাট্যে কোঁচাটি সুন্দর দেখাইতেছে

—দুর্গাপ্রতিমার কার্ত্তিকের কাপড় ঠিক্ ঐ রকমই কোঁচান থাকে ; বুকে কোটের উপর সোনার মোটা চেন্ ঝুলিতেছে—খানিকটা ধনুকের মত বাঁকা, খানিকটা তীরের মত সোজা হইয়া ঝুলিতেছে—সোজা অংশের সঙ্গে আধুলির আকারের একটি চাকৃতি রহিয়াছে ; মানুষটির ঠোঁট দুখানি পাতলা, লাল ; চোখ বড়—কিন্তু হাস্যময় নয়, গম্ভীর, সরু, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ; পায়ের জুতা দর্পণের মতো স্বচ্ছ।

এই সুপুরুষটি জামার পকেটে হাত দিলেন ; ব্যাগ বাহির করিয়া টাকা বাহির করিলেন ; তাহার মুখের দিকে চাহিয়া টাকাটা তাহার হাতে দিতে চাহিলেন। তাঁর হাত কাঁপিতে-ছিল ; পাঁচটি আঙ্গুল জড়ো করিয়া তিনি টাকাটা ধরিয়া-ছিলেন···টাকাটা তিনি ছাড়িয়া দিলেন—টাকা তাহার হাতের উপর পড়িল—স্পর্শ ঘটিল ; স্পর্শের অপরিমেয় অনুভূতি মস্তিষ্ক হইতে পদতল পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে এক নিমেষে ছড়াইয়া গেল···

ভাবিতে ভাবিতে রামের প্রাণে আনন্দ-রস উদ্বেল হইয়া উঠিল ; কিন্তু বেশীক্ষণ ভোগ করিতে পারিল না—সকল আনন্দ লুপ্ত আর সকল চিন্তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ একটা বড় কঠিন কথা রামের মনে পড়িয়া গেল—যে দাতা তাহাকে টাকাটা দান করিয়াছে সে-ই আবার টাকাটা কাড়িয়া লইতে পশ্চাতে লোক ছুটাইয়া দেয় নাই ত ? এত বড় বস্তু দান করিয়া অকাতর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে এমন ত্যাগী মহানুভব ব্যক্তি পৃথিবীতে নাই বোধ হয়। শঙ্কায় রামের বুক টিপটিপ করিতে লাগিল ; এমন সাহস হইল না যে পিছন দিকে একবার তাকায়।···এমনও ত অনায়াসে ঘটিতে পারে যে, হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া চোর বলিয়া পুলিসে দিবে। বিশ্বাস নাই—এমন হয়। ত্রাসে অন্ধ হইয়া পলায়নের উদ্দেশ্যে ছুটিতে যাইয়াই রাম বাধা পাইল ; কে যেন কোন্ দিকে গর্জ্জন করিয়া উঠিল : "এইও"···

সে পৌঁছিয়া গেছে—দয়ালু লোকটি দানের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া লইতে কি ধরাইয়া দিতে যে বলবান্ আর অত্যাচারী ভোজপুরী দ্বারবান্ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন সে দৌড়াইয়া আসিয়া তাহার নাগাল পাইয়াছে—

কিন্তু তা নয় ; "চাপা পড়লে যে"! বলিয়া সদয় কণ্ঠে ভর্ৎসনা করিয়া একটি বাবু তাহাকে পাশের দিকে টানিয়া লইলেন। রাম দেখিল, সম্মুখেই গরুর গাড়ী—থামিয়া আছে। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান এবং দু-চার জন দর্শক দাঁড়াইয়া তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া হাসিতেছে···

গরুর গাড়ী চলিয়া গেল ; যাহারা দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহারাও চলিয়া গেল ; কিন্তু তীব্র ত্রাসের বিদ্যুতে আহত হইয়া ক্ষণিক মূর্চ্ছার যে আঘাত সহ্য করিয়া রাম এইমাত্র জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার অবসাদ ঠেলিয়া সে তখনই নড়িতে পারিল না। কিন্তু শুনিতে আশ্চর্য্য, রামের বুকের এই স্তব্ধতা দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল—ভয়ের কোন কারণই বিদ্যমান নাই জানিতে পারিয়াই তাহার কষ্ট ঘুচিয়া ক্লান্তি দূর হইয়া প্রাণে পুনরায় স্ফূর্ত্তি দেখা দিল। আবার রাম রওনা হইল।

ভৃত্যশ্রেণীর একটি যুবক বাটিতে করিয়া সেরখানেক ঘি, আর পাতার ঠোঙায় করিয়া সেরদেড়েক ময়দা লইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাম তাহাকে ডাকিয়া দাঁড় করাইল—জানিতে চাহিল "ঘিয়ের কি দর আজকাল" ?

রামের দিকে চাহিয়া হাসিয়া সেই লোকটি দর জানাইবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিল—মণের দর না সেরের দর ?

রাম বলিল, "সেরের দরই শুনি"।

—সাত সিকে ;

রাম বলিল, "দাম বেড়েছে"। বলিয়া চলিতে লাগিল।

রামের আজ কিছুই অপ্রাপ্তব্য নাই—কোন ভোগ্যবস্তু হস্তগত করিবার আশা আর দুরাশা নয়।

ঘরখানাকে রাম এখনো বাসোপযোগী মনে করে কি না বলা যায় না, কিন্তু তাহাকে সে ভালবাসে।

মাইলদেড়েক পথ অতিক্রম করিয়া শহর হইতে ঘরে পৌঁছিতে আগে তার হাঁটু ভাঙিয়া শরীর দুমড়াইয়া পড়িত, কিন্তু ঝুলির ভিতর ছ'খানা লুচি আর টাকাটা লইয়া সে আজ আপন গৃহে চলিয়াছে—দৈবদণ্ডস্পর্শে রোগমুক্তির মত কি একটা শক্তিমন্ত্র জাদুর খেলায় আজ তাহার পা কাঁপিল না।

রাম গৃহে পৌঁছিল। দুয়ারে দাঁড়াইয়া একটা নিঃশ্বাস সে ত্যাগ করিল ; তারপর দরজার শিকল নামাইয়া ঘরে ঢুকিল ; ঝুলিটা মেঝের মাটিতে নামাইতে যাইয়া তাহার জ্ঞান জন্মিল, মাটির সঙ্গে লুচি আর টাকার স্পর্শ ঘটান সঙ্গত নয়—আর একটু আগাইয়া গিয়া রাম মাটির দেয়ালের পেরেকের সঙ্গে তাহাকে ঝুলাইয়া রাখিল।

তারপর বসিয়া বসিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে আপন মনেই অনেক হাসিল। ঐ টাকাটা যেন মন্ত্র জানে—সে আসিতেই মাটির হাঁড়িটা, সরাটা, এনামেলের ফুটা বাটিটা পর্য্যন্ত যেন হাসির রজতচ্ছটা ছড়াইতেছে।

কিছুক্ষণ এই হাসিটা উপভোগ করিয়া রাম উঠিল ; ঝুলিটা পাড়িয়া আনিল ; ঝুলিটা কোলের উপর রাখিয়া তার মুখ খুলিল ; অতি সন্তর্পণে তাহার ভিতর হইতে লুচি ক'খানা বাহির করিল ; এক হাতেই-গামছাখানা মেঝেয় পাতিয়া তাহার উপর ধীরে ধীরে লুচিগুলি নামাইয়া রাখিল—যেন রৌপ্যনির্ম্মিত একটি পরম উপাদেয় দৃশ্য তার পরিতৃপ্ত আর অপূর্ব্ব একটা আলোকে উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া রহিল।

রাম তখন ক্ষুধিত ; কিন্তু লুচির দিকে চাহিয়া চাহিয়া আর টাকার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া তার দিনব্যাপী ক্ষুধাবোধ অন্তর্হিত হইয়া গেল। ঝুলির ভিতর হাত ভরিয়া টাকাটা

সে বাহির করিয়া আনিল—করতলে লইয়া নির্নিমেষ চক্ষে সেটির দিকে চাহিয়া রহিল : টাকার গায়ে একটা মুখাবয়ব অঙ্কিত রহিয়াছে—মানুষের মুখ বটে, কিন্তু কোন্ মানুষের মুখ তাহা সে স্বপ্নেও জানে না। উল্‌টাইয়া দেখিল, এদিকেও ছবি রহিয়াছে; অক্ষরগুলিকে অক্ষর বলিয়া সে চিনিতে পারিল না।

একটা লোক, ধর সে-ই, যদি এই রকম একটি টাকা তৈরি করিতে বসে তবে তাহাকে পরিশ্রম করিতে হইবে বিস্তর—যন্ত্রপাতিও অনেক লাগে বোধ হয়—ভাবিয়া রাম বিস্মিত হইল। টাকাটা অঙ্গুষ্ঠ আর তর্জ্জনীর মাঝে ধরিয়া রাম তাহাকে পরম স্নেহ আর সম্ভ্রমের সহিত একবার কপালে ছোঁয়াইল; তারপর তাহাকে মুষ্টির ভিতর আবদ্ধ করিয়া ক্রমশঃ মুষ্টি দৃঢ়তর করিয়া তাহাকে অনুভব করিতে লাগিল; হাত গরম হইয়া উঠিল। মুষ্টি খুলিয়া চাহিয়া দেখিল, টাকাটা রহিয়াছে; দেখিয়া নূতন করিয়া আর একবার সে অবাক হইল। পুনরায় মুঠা বাঁধিয়া তার মনে হইতে লাগিল : যদি এইবার হাত খুলিয়া দেখা যায়, একটি টাকা দুটি হইয়াছে! রামের গা সিরসির করিয়া উঠিল। তাহা কি একেবারেই অসম্ভব! ভগবান দয়ালুর হাত দিয়া একটা টাকা দিয়াছেন—তিনিই পুনরায় দয়াপরবশ হইয়া কি একটিকে দুটি করিতে পারেন না! এমন কি ঘটে না? ঘটিতে পারে না, ভগবানের রাজ্যে এমন কিছু নাই। অমনি করিয়া টাকা যদি বাড়িতে থাকে! রামের চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল।

চোখ খুলিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিয়া রাম হতাশ হইয়া ভাবিতে লাগিল, ঘরে এমন স্থান নাই যে অনেক টাকা রাখা যায়। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল : টাকা হইলে সেই টাকাতেই ত ঘর হইতে পারিবে, সিন্দুকও হইতে পারিবে। রামের মনে অতঃপর টাকার স্রোত বহিতে লাগিল।

এক সময় সে মুষ্টি খুলিয়া দেখিল, টাকা একটাই আছে, দ্বিগুণ হয় নাই, দেখিয়া তার মনে হইল, একটাই যথেষ্ট। তারপর কি মনে করিয়া সে পরম লালসার সঙ্গে জিহ্বা বাহির করিয়া টাকাটার এপিঠ ওপিঠ দুবার চাটিল; তারপর তাহাকে লুচির স্তূপের পাশে অতিশয় যত্নের সহিত নামাইয়া রাখিল।

একটি একটি করিয়া তুলিয়া লুচি ক'খানা গণিয়া দেখিল—ছ'খানা। একখানার এক টুকরা ভাঙিয়া মুখে দিতে যাইয়াই রাম হাত নামাইল; একবার অঙ্গহীন লুচির দিকে, একবার টুক্‌রাটির দিকে চাহিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া রহিল—যেন নিজের হাতে নিজের পায়ে কুঠার মারিতে গিয়াছিল, প্রলোভনের বস্তুকে পরিহার করিতে এমনি শশব্যস্তে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং প্রকৃতিস্থ হইতে তার কিছু সময় লাগিল। তারপর সে লুচি ক'খানার কান্না ধরিয়া বহন করিয়া চক্ষুর অন্তরালে হাঁড়ির ভিতর রাখিয়া দিল—হাঁড়ির মুখে সরা চাপা দিয়া, আর টাকাটা খুব মজবুত করিয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া পুনরায় সে ভিক্ষায় বাহির হইল। নূতন হাঁড়ি আর সরা কিনিবার পয়সা তাহার চাই।

৪

আজ রামের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—তার দিন আজ সার্থক হইতে কিছু বাকি রহিল না।

বাঘডাঙ্গার শ্রীবাস সরকার পুত্রের বিবাহ দিয়া বধূ, বর এবং বহু অনুচর আর প্রচুর প্রাপ্তিসহ দেশে ফিরিতেছেন : তাঁর হিসাবরক্ষক হীরালাল ব্যতীত আর সবারই বিশ্বাস, শ্রীবাস পয়সাওয়ালা লোক; সুতরাং সেই বিশ্বাসটা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া বৈবাহিকের টাকায় তিনি বিবাহে ঘটা করিয়াছেন আশাতীত।

যাহা হোক, তিনি ফিরিতেছেন এবং বৈবাহিকের ব্যবহারে খুশী হইয়াই ফিরিতেছেন। খানিকটা পথ গো-যানে আসিয়াছেন, খানিকটা পথ রেলগাড়ীতে যাইতে হইবে। তিনি হাতে "কিছু সময়" রাখিয়া গাড়ীর সময়ের বহু পূর্ব্বেই ষ্টেশনে পৌঁছিয়া সম্প্রতি ষ্টীল ট্রাঙ্কের উপর আসন গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন।

শ্রীবাসের মন সন্তুষ্ট হইয়া আছে।' বউটি সুন্দরী এবং বৈবাহিক সৎলোক, ইহা তিনি পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। আবার ইহাও সত্য যে, লোকে কস্মিন্‌কালেও বলিতে পারিবে না, শ্রীবাস সরকার গরীবের ঘরের 'হাভেতে' মেয়ে আনিয়াছে, কিংবা ধনীর ঘর হইতে কুৎসিত বউ আনিয়াছে।

শ্রীবাসের এ কথায় পুরোহিত দশরথ তর্কবাগীশ, পরামাণিক যুধিষ্ঠির এবং প্রতিবেশী সৃষ্টিধর সমস্বরে এবং প্রবল কণ্ঠে সায় দিয়াছে—কদাচ না বলিতে পারে নাই।

সুতরাং শ্রীবাস আরও খুশী হইয়া গেছেন এবং আল্‌পাকার কোটের উপর ফরাসডাঙ্গার চাদর ফেলিয়া সকলের সঙ্গেই হাসিমুখে আলাপ করিতেছেন, আর অতি সামান্য কথাতেই হাস্যবেগে তাঁর বোতাম-আঁটা ভুঁড়ি নাচিতেছে।

রাম ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া তাঁহারই অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। ভুঁড়ি-নাচানো হাসির শেষে একবার হঠাৎ মুখ ফিরাতেই রাম শ্রীবাসের চোখে পড়িল।

শ্রীবাসের মন প্রফুল্ল ছিল—বলিলেন, হুঁ, বুঝেছি। বলিয়া তিনি পকেটের ভিতর হইতে একটি চতুষ্কোণ দু'আনি বাহির করিয়া রামের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। কিন্তু শূন্যের জিনিস লুফিয়া লওয়ার তৎপরতা রামের নাই, দু'আনিটা তার হাত এড়াইয়া মাটিতে পড়িল। রাম শ্রীবাসের পদতলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইল; তারপর দু'আনিটা কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

টাকাটা ট্যাঁকে আছে, আর তার অস্তিত্বের অনুভূতি রামের রক্তে জীবন্ত হইয়া আছে। তার উপর এই দু'আনি। মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতায় রামের চোখ সজল হইয়া উঠিল।

শ্রীবাসের দেওয়া দু'আনি ভাঙাইয়া রাম হাঁড়ি আর সরা কিনিল। মনে মনে অনেক তর্কবিতর্ক তোলাপাড়া আর লোভ সংবরণের বৃথা চেষ্টার পর আধলার তামাক, ঐ মূল্যের টিকে এবং ঐ মূল্যের দিয়াশলাই এবং ঐ মূল্যেরই একটি কলিকা কিনিয়া রাম যখন বাড়ীর দিকে পা চালাইল তার বহু পূর্ব্বেই তার মন যাইয়া পড়িয়াছে হাঁড়ির লুচিতে; যাইয়া দেখিতে পাইব কিনা ঠিক কি!

যথাসাধ্য দ্রুতপদে ঘরে ফিরিয়া রাম সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য করিল দরজার মাথাটা—শিকল চড়ানোই আছে; শিকল খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, হাঁড়ির আবরণ ঠিক আছে এবং ঢাকনা তুলিয়া দেখিল, লুচিও আছে।

শান্তির, তৃপ্তির এবং স্বস্তির একটি গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাম বিশ্রাম করিতে বসিল।

—

রামের দিন যাইতেছে।

চাল সিদ্ধ করিবার নূতন হাঁড়ি আনা হইয়াছে; কাজেই লুচিগুলিকে স্থানভ্রষ্ট করিতে হয় নাই। তিন রাত্রি না যাইতেই পরিষ্কার সুখাদ্য লুচিগুলি পরস্পরের বুকে পিঠে সংলগ্ন হইয়া একটা নিরেট পিণ্ডে পরিণত হইল; আগে পচিয়া দুর্গন্ধময়, পরে শুকাইয়া নির্গন্ধ হইল এবং তারপর আরও শুকাইয়া ঝরিয়া ঝরিয়া গুঁড়া হইয়া গেল; কিন্তু রাম সরা তুলিয়া আর তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল না—আছে, তার নিজস্ব স্বেচ্ছা-ভোগ্য হইয়া তাহা মজুত আছে, ইহাই মনে করিয়া রাম ক্ষুধার সময়ও সুখ পায়।

কিন্তু ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রাটির দেহ কঠিন—তাহার দেহ পচিয়া উঠিল না।

রাম প্রত্যহই নিয়মিতভাবে ভিক্ষায় বাহির হয়; বাহির হইবার পূর্ব্বে টাকাটা হাতে লইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ করে—জিব দিয়া আর ঠোঁট দিয়া তার দুই পিঠ বারংবার চাটে; তারপর তাহাকে আবার ঝুলিতে ফেলে—আনন্দে তার পা অনায়াসে চলে।

টাকা পচিয়া উঠিল না; কিন্তু লেহনের ফলে তার দু-পিঠের ছবি আর লেখা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল।

এমনি মন্থর ক্ষয়ের রাহুগ্রাসে পড়িয়া একেবারে নিঃশেষ হইয়া যাওয়া টাকার অদৃষ্টের কথা নয়, কাজেই এক দিন বড় দুর্দ্দৈব ঘটিয়া গেল। যে পেরেকটার সঙ্গে ঝুলি টাঙানো থাকিত সেই পেরেকটা ঝুলি ঝুলাইবার আর পাড়িবার টানা-টানিতে নোনা-লাগা মাটির ভিতর কবে ঢিলা হইয়া গিয়াছিল রাম তাহা ঘুণাক্ষরেও টের পায় নাই।

ঝুলি সেদিন ভারী ছিল।

পেরেকে ঝুলি ঝুলাইয়া রাখিয়া রাত্রে রাম ঘুমাইয়াছিল; ঝুলির ভারে পেরেক খুলিয়া পেরেক সমেত ঝুলি কখন ভূপতিত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। সকালে ঘুম ভাঙিয়া চোখ মেলিতেই যে দৃশ্য রামের নজরে পড়িল ঝুলির ভূতলে পতন তার সবটা নয়; ঝুলির কেবল ধরাপৃষ্ঠে পতনের ফলও তেমন সাংঘাতিক নয়; কিন্তু সাংঘাতিক ব্যাপার এই যে, দেখা গেল, ঝুলির গা ঘেঁষিয়া ইঁদুরের মাটি রাতারাতি পর্ব্বতাকার হইয়া উঠিয়াছে।

রামের শরীর সেদিন ভাল ছিল না। ঝুলির ভিতর টাকা আছে; সেই ঝুলি ইঁদুরের গর্ত্তের মুখে পড়িয়া আছে দেখিয়া আতঙ্কে উদ্বেগে রামের প্রাণ যত দ্রুতবেগে ধড়ফড় করিতে লাগিল তত দ্রুতগতিতে সে গা তুলিতে পারিল না। ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া সে ঝুলির কাছে আগাইয়া গেল, ঝুলিটাকে টানিয়া তুলিল—ঝরঝর করিয়া অনেকগুলি চাল ইঁদুরের মাটির উপরেই স্তূপীকৃত হইয়া পড়িল—রাম তাহা অঞ্জলি ভরিয়া তুলিয়া তুলিয়া পাশের দিকে রাখিয়া দিল।

টাকাটা ছিল চালের নীচে। রাম তাড়াতাড়ি ঝুলির ভিতর হাত ভরিয়া দেখিল, টাকা নাই, ইঁদুরের দাঁতের করা ছিদ্র রহিয়াছে—ঝুলি হাতড়াইতে যাইয়া ছিদ্রের ভিতর আঙুল ঢুকিয়া আট্‌কাইয়া গেল। ঝুলির ভিতরটা বাহিরে উল্‌টাইয়া আনিয়া রাম দু'হাতে করিয়া সেটাকে বাতাসের উপর আছড়াইতে লাগিল; চালের গুঁড়া তার চতুর্দ্দিকে উড়িতে লাগিল···তার চোখে মুখে প্রবেশ করিল, কিন্তু টাকা পড়িল না।

রাম ঝুলি ফেলিয়া পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইল; তার ভোঁতা দা-খানা কোথায় পড়িয়া ছিল, সেই দা আনিয়া দুই হাতে ইঁদুরের মাটি সরাইয়া মেঝের মাটি খুঁড়িতে বসিয়া গেল।

অল্পক্ষণেই সুড়ঙ্গের মুখ দেখা গেল; কিন্তু সুড়ঙ্গ কোন্ অতলে প্রবেশ করিয়াছে, দুই হাত গর্ত্ত খুঁড়িয়াও তাহা আবিষ্কৃত হইল না।

ক্লান্তিতে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল; দা রাখিয়া রাম অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে গহ্বরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল···বিসর্পিত রেখায় প্রবাহিত হইয়া অসংখ্য স্থানে নিজেকে ভেদ করিয়া সেই সুড়ঙ্গের যেখানে শেষ হইয়াছে সেই অতি দুর্গম দূরে আয়ত্তাতীত একটা অন্ধকার স্থানে মূষিক-বাহিত টাকাটা পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, রাম পুনঃপুনঃ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অবাধ ঋজু দৃষ্টিতে তাহা যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিল।

সুখ ও স্বস্তি

শ্রীবিজয়কেতু বসু, এম্‌-বি, বি-এস্‌সি

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল এ কথা প্রায়ই বলিয়া থাকি। বোধ হয় সাধারণ গৃহস্থ বাঙালীর এই স্বস্তির চেয়ে বেশী আর কিছু আশা করিবার নাই। এখন বাংলাদেশের অবস্থা এমন যে জীবনে সুখ তো নাই-ই, স্বস্তিও মরীচিকার মত ক্রমশঃ মিলাইয়া যাইতেছে। এ দশা কেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা করা দরকার। সুখ কি? স্বস্তিই বা কি? কেন স্বস্তি আমাদের কাম্য? শিক্ষা, দীক্ষা এবং পূর্ণাঙ্গ দেহ সত্ত্বেও কেন আমরা লক্ষ্যভ্রষ্ট? এই প্রশ্নগুলি বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। শাস্ত্রোক্তি আছে—ভূমৈব সুখং, কি অর্থে ইহা বলা হইয়াছে সে তর্ক না তুলিয়া আমরা যদি ধরিয়া লই "প্রাচুর্য্যেই সুখ" খুব বেশী ভুল করা হইবে না। কিসের প্রাচুর্য্য?—কাম্য বস্তুর প্রাচুর্য্য। প্রাচুর্য্য ও অপ্রাচুর্য্যের বিচার প্রয়োজনের মানদণ্ডেই হইয়া থাকে। কিন্তু কেবল পর্য্যাপ্ততায় মানুষ সুখী নয় কেন? কেন প্রাচুর্য্য না হইলে মানুষের মন তৃপ্ত হয় না? তাহার কারণ বাস্তবিক সুখটা প্রাচুর্য্যের মধ্যে নাই, আছে প্রয়োজনীয় বস্তুটাকে ব্যবহার করার মধ্যে। কাজেই প্রয়োজনীয় বস্তু যত সুলভ এবং প্রচুর, তাহাকে ইচ্ছামত অবাধে খরচ করিবার সুযোগও তত অধিক। প্রয়োজনীয় বস্তু যখন দুর্লভ তখন তাহাকে ব্যবহার করিবার সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। প্রয়োজন বস্তুটা আবার এমন যে মানুষকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় না, তাড়না করে। এই অবস্থায় যদি প্রয়োজনীয় বস্তু কিছু পাওয়া যাহাতে তাড়না হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটে, তবেই মানুষ স্বস্তি পায়। যে অবস্থায় মানুষের প্রয়োজনের তাড়না নাই অথচ প্রয়োজনীয় বস্তুকে অবাধে ব্যবহার করার সুখও নাই তাহারই নাম 'স্বস্তি'।

এবার 'প্রয়োজন' কি দেখা যাউক। প্রয়োজন কি তাহা আমরা অনুভব করিয়া থাকিলেও তাহার সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলে দোষ হইবে না। প্রয়োজনের সঙ্গে প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রাণিমাত্রই ক্রিয়াশীল, প্রাণীর জাতি হিসাবে ক্রিয়ার ধরণটা নির্ভর করে বটে, কিন্তু প্রাণ থাকিতে নিষ্ক্রিয় হইবার উপায় নাই। বৈজ্ঞানিকেরা দেখিয়াছেন এই ক্রিয়াশীলতার মূলে প্রেরণা দিতেছে প্রয়োজনের তাড়না। প্রাণীর ক্রিয়াশীলতা বজায় রাখিতে প্রতিবেশ শক্তি সরবরাহ করে। যে সমস্ত বস্তু শক্তির উৎস সেগুলির প্রতি প্রাণী প্রয়োজনের তাগিদেই আকৃষ্ট হয়। প্রয়োজন আমাদের স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতার প্রপন্থী অর্থাৎ ইহার পরিবর্দ্ধন এবং পরিস্ফুটনের সহায়ক। মানুষের এই ক্রিয়াশীলতা একান্ত যান্ত্রিক ব্যাপার নহে বরং প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যেই একটা সুখানুভূতি আছে—এ কথা প্রত্যক্ষদর্শী বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়াছেন। এই সুখের লোভও ক্রিয়াশীলতায় প্ররোচনা দেয় অর্থাৎ প্রয়োজনের তাগিদ যেমন মানুষকে সক্রিয় করে, ক্রিয়াজনিত সুখও তেমনি মানুষকে সক্রিয় করে।

ক্রিয়াশীলতার প্ররোচক দুই রকমের উদ্দীপকের কথা বলিলাম। যখন কোন কারণ বশতঃ সুখের লোভে মানুষ সাড়া দেয় না তখন স্বস্তিই একমাত্র লক্ষ্য হয় অর্থাৎ প্রয়োজনের তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই আমরা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ি। ইহা স্বাভাবিকতার লক্ষণ নয়, ব্যাধির পরিচায়ক। এই ব্যাধি দুরারোগ্য কিন্তু অধ্যবসায়ের সঙ্গে চিকিৎসা করিলেও আরোগ্য অসম্ভব এমন নয়। সুখ যখন ক্রিয়াশীলতার উদ্দীপক হয় সে অবস্থাই মানুষের পক্ষে আদর্শরূপে কাম্য। প্রত্যেক ক্রিয়াতেই সুখ আছে বলিয়াছি, এমন কি যে ক্রিয়া মানুষের বিনাশকর তাহাতেও সুখানুভব সম্ভব। অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে মানুষ যদি নিজের দেহে নিজে অস্ত্রাঘাত করে তাহা হইলেও অবস্থা বিশেষে সুখানুভব তাহার পক্ষে সম্ভব। বাস্তবিক অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিতে পারেন এমন অনেক পর্য্যটক সন্ন্যাসী আছেন যাঁহারা নিজ দেহে ক্ষত উৎপাদন করিয়া আনন্দ পান। এখানে অবশ্য ক্ষতটা আনন্দদায়ক নয়, ক্ষত উৎপাদনের ক্রিয়াটাই আনন্দের কারণ। ক্ষতটা আসলে কষ্টপ্রদ, কিন্তু তাঁহাদের কাছে ক্ষত উৎপাদনের ক্রিয়াতে যে সুখ তার আকর্ষণ ক্ষতজনিত কষ্টকেও অতিক্রম করে। উদাহরণটা চূড়ান্ত ধরণের, সাধারণ ক্ষেত্রে এতটা দেখা যায় না, তাহা ছাড়া এই সব মর্ষকামীরা মোটেই স্বাভাবিক নহেন কেননা সকল প্রকার ক্রিয়াতে ইঁহারা সুখ পান না কেবল এক জাতীয় ক্রিয়াতেই সুখ পান। আদর্শ অবস্থায় সকল প্রকার ক্রিয়াতেই সুখ পাওয়া সম্ভব—দানেও সুখ, গ্রহণেও সুখ, খাইতেও সুখ খাওয়াইতেও সুখ, আঘাত করিতেও সুখ, আহত হইতেও সুখ।

সুখই যদি মানুষের পূর্ণতর লক্ষ্য হয় আমরা কেন নিকৃষ্টতর স্বস্তিকে আমাদের লক্ষ্য করিলাম? তাহার কারণ আমাদের কষ্টভীতি ও ক্লৈব্য। প্রতিবেশের বৈচিত্র্য বশতঃ সুখের আশায় আমরা যে সমস্ত ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হই তাহাদের কোন কোনটায় অন্তর্নিহিত কষ্টের সম্ভাবনাও কিছু আছে। এখন আমরা যদি এই কষ্টের ভয়ে সুখ প্রাপ্তির চেষ্টা ছাড়িয়া দিই তবে তাহা আমাদের দুঃখভীতি। এই দুঃখভীতি অল্পবিস্তর মানুষ মাত্রেরই আছে। যতক্ষণ তাহা সাধারণ গণ্ডীর মধ্যে থাকে ততক্ষণ তাহা স্বাভাবিক। যখন সাধারণ গণ্ডী অতিক্রম করে তখন মানুষের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ বাধা পায় এবং তাহা চিন্তার কারণ। আবার যখন এই দুঃখভীতি

মানুষের অজ্ঞাতসারে তাহার বুদ্ধি পর্য্যন্ত বিকল করিয়া দেয় তখন তাহার নাম ক্লৈব্য। এই অবস্থা অতি আশঙ্কাজনক এবং ইহার পরিণাম সম্পূর্ণ বিনাশ।

যদি এই বিপদ হইতে উদ্ধার চাই তবে স্বস্তির পরিবর্ত্তে সুখকেই লক্ষ্য করিতে হইবে। ক্লৈব্য না গেলে এ লক্ষ্য লাভ করা সম্ভব নয়। দুঃখভীতি না গেলে ক্লৈব্য যাওয়া সম্ভব নয়। দুঃখভীতি মানুষের জন্মগত বৃত্তি নয় ইহা সংস্কার-লব্ধ। এই বিষময় সংস্কার অভ্যাস দ্বারা অতিক্রম করা সম্ভব। এই অভ্যাস দুই ধাপে আয়ত্ত করা যায়। যে সকল প্রয়োজনীয় কাজে কষ্টের সম্ভাবনা আছে তাহা করিতে অনিচ্ছা হইলেও অনিচ্ছা চাপিয়া রাখিয়া কাজ করিতে হইবে—ইহা প্রথম সোপান। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজ করিতে করিতে সেই কাজের মধ্যে সুখোপলব্ধি চেষ্টা করা—ইহা দ্বিতীয় সোপান। এক মনে যে কোন কাজই করা যায় তাহার মধ্যে একটা আনন্দ পাওয়া যায়। এই আনন্দ চর্চ্চায় দ্বারা বাড়ান সম্ভব।

পরিশেষে বক্তব্য আমরা যদি নিষ্ক্রিয়তা বর্জ্জন করিয়া যে কাজ আমাদের মঙ্গলকারক মনে করি তাহার যতটুকু সম্ভব, তাহা যত অল্পই হউক না কেন, করিয়া যাই তবে নিশ্চয় এই ক্ষয়কর অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইব। যদি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজে নামিয়া কাজের মধ্যে দুঃখের উপাদান যতটা আছে তাহাকে উপেক্ষা করি এবং সুখের উপাদান যতটা আছে তাহা শান্ত চিত্তে গ্রহণ করি, তবে নিশ্চয় অচিরেই আমরা প্রতিকূল ভাগ্যকে বশে আনিতে সমর্থ হইব। হিন্দুর গীতাও এই কথাই বলে যে, দুঃখে কষ্টে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হইয়া, ফলাফলে সমবুদ্ধি রাখিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদনের চেষ্টাতেই শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে।

প্রশান্ত মহাসাগরের আদিম অধিবাসী

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

এক কোটি ত্রিশ লক্ষ বর্গ মাইল পরিধিবিশিষ্ট প্রশান্ত মহাসাগরের অগণিত দ্বীপসমূহ লইয়া সাম্রাজ্যবাদীদের কলহের অন্ত নাই। মনোরম নারিকেলকুঞ্জ পরিবেষ্টিত এই সকল দ্বীপের অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ সকলেরই ঈর্ষার বস্তু। অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া এত দিন প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ড, স্পেন, ফ্রান্স, পর্ত্তুগাল এবং জাপানের আধিপত্য ছিল। জাপান ১৯৪৫ সালে এই অঞ্চল হইতে অপসৃত হইয়াছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্যদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ও অসম্ভব নহে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য ক্রমশঃই জাঁকিয়া বসিতেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের আবিষ্কারের কাহিনী অনুধাবন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সর্ব্বপ্রথম পর্ত্তুগীজরাই ইহার বুকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ নাবিক এন্টনিয়ো ডি'এব্রু ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ হইয়া পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়া উপস্থিত হন এবং তথায় পর্ত্তুগীজ পতাকা উত্তোলন করেন। এই কাহিনী ইউরোপে রাষ্ট্র হইলে অন্যান্য ইউরোপীয় নাবিকগণও ঐ অঞ্চলে গমন করিতে আরম্ভ করেন। আমেরিকার কথা তখনও ভালভাবে সভ্যজগতের গোচরীভূত হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দী হইতে সুরু করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের মধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরের যাবতীয় দ্বীপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া গেল। সেই সাম্রাজ্যবাদী কলহ ও স্বার্থপরতার কাহিনী আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয়েরা প্রথম বিস্তৃতভাবে ঐ সকল দ্বীপে তথ্যানুসন্ধান করিতে থাকে। তৎপূর্ব্বে শত শত বৎসর আগেও সভ্যতাগর্বিত ভারতের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অনেক দ্বীপের যোগাযোগ ছিল।

কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে যাহারা প্রথম ঐ সকল দ্বীপে বাস



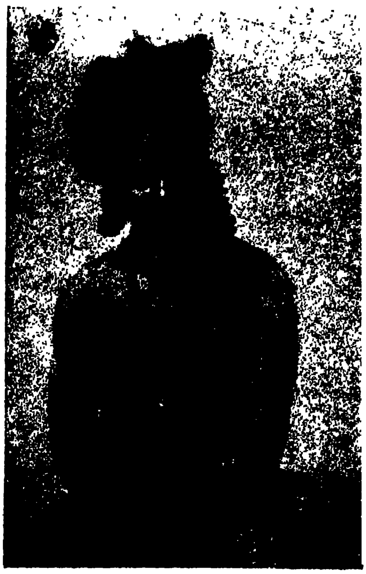
রণসাজে সজ্জিত গুয়াম দ্বীপের এক দল আদিম অধিবাসী



সাণ্টা ক্রুজ দ্বীপের একজন অধিবাসী। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া পাইপ টানিতে শিখিয়াছে

করিত সেই আদিবাসীদের সম্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা করিব।

ঐ সকল আদিম অধিবাসীর বীরত্বের কাহিনী পাঠ করিয়া আমরা বিস্মিত না হইয়া পারি না। বর্ত্তমানে উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাবিকেরাও প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকে। কিন্তু বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঐ সকল অনুন্নত লোক কাঠের একখানি ভেলামাত্র সম্বল করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে হাজার হাজার মাইল কি করিয়া যে ঘুরিয়া বেড়াইত তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।



আদিম অধিবাসীদের একজন সর্দ্দার

যত দূর জানা যায় প্রাগৈতিহাসিক কালে কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্বাকার, মাথায় মেষের লোমের মত কুঞ্চিত কেশ, চেপ্‌টা নাক এবং পুরু ওষ্ঠবিশিষ্ট নিগ্রোজাতির একটি শাখা আফ্রিকা হইতে আরব, ইরাণ ও বেলুচিস্থানের উপকূল ধরিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। ইহারা প্রথম প্রথম ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয় এবং ক্রমে দ্বীপময় ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম, উদ্যম ছিল অটুট। ক্রমে ক্রমে ইহারা নিউ গিনিতে গিয়া হাজির হয় এবং তথা হইতে মেলানেশিয়া, পলিনেশিয়া এবং মাইক্রোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে গিয়া বসতি স্থাপন করে। নৃতত্ত্ববিদেরা ইহাদিগকেই প্রশান্ত মহাসাগরের



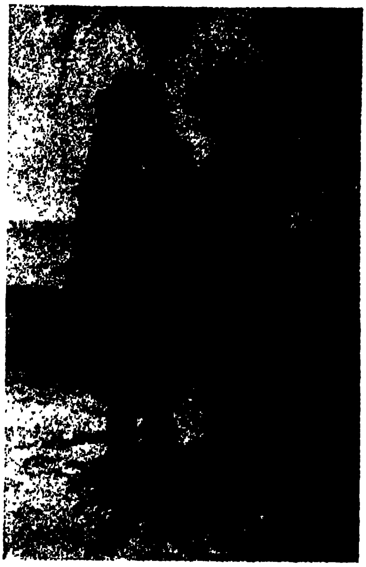
বংশদ্বারা নির্ম্মিত এক প্রকার নৌকা। পালের সঙ্গে সংযোজিত রজ্জুগুলি বিদ্যুৎ-বাহী তারের মত দেখাইতেছে

আদিম অধিবাসী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সাম্রাজ্যবাদী শ্বেত জাতিদের কৃপায় এই আদিম অধিবাসীরা আজ লোপ পাইতে বসিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ার মত একটি মহাদেশে শ্বেতাঙ্গেরা সংখ্যায় মাত্র ৭০ লক্ষ। কিন্তু পাছে কৃষ্ণাঙ্গদের স্পর্শে শ্বেতসভ্যতা ধ্বংস হইয়া যায় এই ভয়ে অষ্ট্রেলিয়া হইতে আদিম অধিবাসীদের প্রায় উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে এখনও কিছু কিছু আদিম অধিবাসী আছে। তাহাদের কথাই আমরা বলিব।

প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলিকে কতকগুলি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। আদিম অধিবাসীরা প্রধানতঃ (১) মেলানেশিয়া অর্থাৎ কৃষ্ণকায় দ্বীপবাসী; (২) পলিনেশিয়া অর্থাৎ বহুদ্বীপের অধিবাসী এবং (৩) মাইক্রোনেশিয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসী। উপরোক্ত এক একটি অঞ্চলে বহুসংখ্যক দ্বীপ রহিয়াছে। তন্মধ্যে মেলানেশিয়ার উল্লেখযোগ্য দ্বীপ হইতেছে নিউগিনি, নিউ আয়র্লণ্ড, ফিজি, সলোমন এবং সান্টাক্রুজ; পলিনেশিয়ার—নিউজিল্যাণ্ড, হাওয়াই,

ত্যাহিটী এবং মার্কুইস দ্বীপপুঞ্জ ; আর মাইক্রোনেশিয়ার—মেরিয়ানা, গুয়াম, মার্শাল, গিলবার্ট এবং কেরোলীন দ্বীপপুঞ্জ। ইহা ছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরের মালয়েশিয়া অঞ্চলে অর্থাৎ ফিলিপাইন, যবদ্বীপ, বোর্ণিয়ো—এক কথায় পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জেও কিছু কিছু আদিম অধিবাসী আছে। সমগ্র প্রশান্ত মহাসাগরে এখনও দশ লক্ষ আদিম অধিবাসী বাস করে।

প্রথমতঃ এই সকল আদিম অধিবাসী স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া তাহাদের নিজ নিজ অঞ্চলে বসবাস করিত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহারা বিভিন্ন দলের মধ্যে বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করিল। ফলে আদিম অধিবাসীদের সহজাত কুসংস্কারগুলি অনেকটা দূর হইয়া গেল। ইউরোপীয় শক্তিসমূহ গোড়ায় এই সকল আদিম অধিবাসীকে 'আপদ্-বালাই' বলিয়া ভাবিয়াছিল। কিন্তু পরে তাহারা লক্ষ্য করিল যে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিলে এই



মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের আদিম জাতীয়া দুইটি বালিকা

সকল আদিম অধিবাসীর দ্বারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সহায়তা হইতে পারে। আমেরিকাবাসীদের কার্য্য এই দিক দিয়া খুবই প্রশংসনীয়। তাহাদেরই চেষ্টায় হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীরা আধুনিক মানদণ্ডে অনেকটা উন্নতিলাভ করিয়াছে।

যে সকল আদিম অধিবাসী এখনও আধুনিক কেতাদুরস্ত হয় নাই তাহাদের আচার-ব্যবহার অনেকটা আমাদের দেশের পাহাড়িয়া জাতিদের মত। ইহাদের মধ্যে অসংখ্য গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক গোষ্ঠীর লোকদের এক একজন করিয়া সর্দ্দার থাকে। এই সর্দ্দারই হইতেছে তাহাদের রাজা, শাসক, পুরোহিত—সব কিছু। এই সর্দ্দারের নির্দ্দেশই তাহাদের নিকট বেদবাক্য। মাঝে মাঝে বিভিন্ন দলের মধ্যে



টাহিটীর কয়েকজন আদিম অধিবাসী কাষ্ঠের ভেলার সাহায্যে দুস্তর সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছে

সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে। তখন ইহা খণ্ডযুদ্ধে পরিণত হয়। তীর ধনুক, বল্লম ও বর্শা এই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র।

আদিম অধিবাসীরা সাধারণতঃ দ্বীপের অরণ্য অঞ্চলে বাস করিয়া থাকে। স্বচ্ছন্দবনজাত নারিকেল, কলা এবং নানাবিধ ফল ইহাদের প্রধান খাদ্য। পশুপক্ষী শিকার করিয়া কাঁচা মাংসও ইহারা খাইয়া থাকে।

আদিম অধিবাসীরা খুবই সঙ্গীত এবং নৃত্যপ্রিয়। ইহাদের দ্বারা প্রস্তুত বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্র আছে।

ইহাদের বিবাহপ্রথা বিচিত্র। স্ত্রী সাধারণতঃ ইহাদের নিকট অস্থাবর সম্পত্তির মত গণ্য হয়। কোন কোন শ্রেণীর আদিম অধিবাসীর মধ্যে সহোদরা ভগ্নীকে বিবাহ করিবার রীতি প্রচলিত আছে।

আদিম অধিবাসীদের দ্বারা অনুসৃত ধর্ম্মের কোনরূপ সংজ্ঞা দেওয়া খুবই শক্ত। অরণ্য অঞ্চলে এবং সমুদ্রতীরে বাস করে বলিয়া ইহারা অহরহই নানাবিধ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকটার মধ্যেই অপদেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া তাহারা ইহাদের উপাসনা করিয়া থাকে।



প্রস্তরখণ্ডের মধ্যে ছিদ্র করিয়া ওগুলি নাখা হইয়াছে



মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বেষ্টিত কেরোলীন দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদের একটি গ্রাম

প্রশান্ত মহাসাগরের তথা পৃথিবীর এই আদিম অধিবাসীদের ভাষা, আচার-ব্যবহার, জীবনযাপনপ্রণালী প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে সবিশেষ যত্নবান। এইজন্য ইহাদিগকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য তাহাদের চেষ্টারও অন্ত নাই। কিন্তু এই চেষ্টা অনেকটা মৃত্যুকালে হরিনাম শ্রবণ করাইবার মত। প্রথমে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাহাদের ধ্বংস করা হইয়াছিল এখন সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার প্রয়োজনে তাহাদের ডাক পড়িয়াছে। যাহারা একদা ছিল প্রাণশক্তিতে উচ্ছল, বন্যপশুর মত তাড়িত হওয়ার ফলেই আজ তাহারা নির্জ্জীব। কাজেই সাম্রাজ্যবাদীদের আহ্বানে যথোচিত সাড়া পাওয়া যাইতেছে না।

পদ্মানদীর চরে।

শ্রীপিনাকীরঞ্জন কর্ম্মকার

পদ্মা নদী ঘাটের পারে।
উঠছে চাঁদ অন্ধকারে॥
তারই মাঝে জাগলো মনে।
ছোট্ট স্মৃতি ফুলের বনে॥
চাঁদের হাসি গাছপালাতে।
ঝক্‌ঝকিলো জ্যোৎস্নারাতে॥
জাগছে জোয়ার ঝড়ের টানে।
অট্টহাসির ঘুর্ণি গানে॥

আবছা সুদূর তেপান্তরে।
বাউড়ী হাওয়া নৃত্য করে
চলনা রে ঐ দিগন্তরে।
গাইছে পাখী বালুর চরে॥
স্বপ্নলোকের ঝর্ণা ধারা।
অন্তরে দেয় পুলক সাড়া॥

স্বরাজের সাধনা

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

আমরা ইংরেজের হাতছাড়া কতকটা হইলেও এখনও পূর্ণ-স্বরাজ পাই নাই। দেশের বড় বড় নেতারা বলেন আমরা পূর্ণ স্বরাজের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছি। বামপন্থী নেতাগণ বলিয়া থাকেন যে, স্বরাজ এখনও বহু দূরে—এখনও জনগণের হাতে রাষ্ট্র আসে নাই, প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। তবে ইংরেজের পরিবর্ত্তে দেশবাসীদের হাতে যে ক্ষমতা আসিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অবশ্য যে ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহাতে বড় রকমের একটা ওলটপালট হয় নাই। অর্থাৎ কোন বৃহৎ বিপ্লবের ভিতর দিয়া আমরা স্বরাজ লাভ করি নাই। ফরাসী বিপ্লবে (১৭৮৯) বা রুশ বিপ্লবে (১৯১৭) যাহা হইয়াছিল এদেশে তেমন কিছুই হয় নাই। এজন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। যদি কোন ধ্বংসমূলক বিপ্লব ব্যতীতই আমরা আমাদের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও আর্থিক কাঠামো ঢালিয়া সাজিতে পারি তাহাতে ইষ্ট ছাড়া কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

ইংরেজ কেবল আমাদের তাড়া খাইয়াই এ দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে এরূপ আত্মপ্রসাদ অনেকের মনে জাগিলেও ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন বহু কারণে হইয়াছে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন অবশ্য ইহার একটি হেতু। আপাত দৃষ্টিতে ব্রিটিশ ভারত ত্যাগ করিয়া গিয়াছে মনে হইলেও ইহা ধরিয়া লইলে ভুল হইবে যে ইংরেজের শাসনভার পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বেকার সমস্ত অমঙ্গল দূর হইয়া গিয়াছে। সোজা কথায়, ইংরেজ ভারত ছাড়িলেও এদেশে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে অথবা ইংরেজের আমলে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল সেগুলির কিছুমাত্র সমাধান হয় নাই। অর্থাৎ আমাদের উপরেই সকল সমস্যার সমাধানের ভার পড়িয়াছে। এই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে যাঁহারা রাষ্ট্রের পরিচালক হইয়াছেন তাঁহাদের দায়িত্ব কিরূপ গুরুতর ইহা হইতেই বুঝা যাইবে। আজ কাহারও পক্ষে বিরুদ্ধ সমালোচনা করা খুবই সহজ সন্দেহ নাই, কিন্তু সমালোচনা অপেক্ষা আজ কাজের দরকারই বেশী। যেখানে বহুবিধ সমস্যা বিদ্যমান সেখানে শুধু সমালোচনাতেই কর্ত্তব্য শেষ করা সমীচীন নহে।

অন্নাভাবের কথাই ধরা যাক। ইংরেজের ভারত-শাসনের ইতিহাস ভারতে ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্র্য ও দুঃখের ইতিহাস। আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের অঙ্ক দেখাইয়া ইংরেজ এতকাল পৃথিবীর লোককে ভারতের ঐশ্বর্য্য ও উন্নতির ভুল সংবাদ দিয়া আসিয়াছে। এই বিরাট দেশে কোটি কোটি অনাহারী ও অর্দ্ধাহারী নরনারীর চিরদারিদ্র্যের কথা ইংরেজের বিবরণীতে অতি নগণ্য স্থানই অধিকার করিয়াছে। বাহিরের চাকচিক্য দ্বারা অন্তরের গভীর দুঃখ ও দারিদ্র্য এই ভাবে ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে। ফলে যখন পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী দুইটি মহাযুদ্ধে ভারতের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও আর্থিক কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িল তখন ইংরেজের আর এদেশে থাকিবার উপায় রহিল না। নিতান্ত অবস্থার চাপেই তাহাকে নিজ হাতে গড়া সাম্রাজ্যের কর্ত্তৃত্বভার পরিত্যাগ করিতে রাজী হইতে হইল। অবশ্য ইহাও ইংরেজের পক্ষে বাহাদুরী বটে। কারণ ইহাকেই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের আত্মবিলোপ বলা যাইতে পারে। ওলন্দাজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে এরূপ আত্মবিলোপ হইলে তাহাদের পক্ষেও ইহা গৌরবের হইত সন্দেহ নাই। যে দেশে একরূপ অন্নাভাব ছিল না বলা চলে, ব্রিটিশ শাসনের গুণে সে দেশে অন্নাভাব কায়েম হইয়াছে। যে টুকু বাকী ছিল গত মহাযুদ্ধে তাহা পূর্ণ হইয়াছে। তথাকথিত স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে। 'আরও খাদ্য উৎপাদন কর' রব সর্ব্বত্র উঠিলেও খাদ্য কোথায়? ক্ষুধা বাড়িতেছে, কিন্তু খাদ্যের বরাদ্দ কমিতেছে। বৎসরে আমাদের ৭৫ হইতে ১০০ কোটি টাকার খাদ্য আমদানী করিতে হইবে ইহা শুনিলে আমাদের খাদ্য-পরিস্থিতি বুঝিতে কাহারও আর কষ্ট হইবে না। এই ভবের হাটে কি চড়া দামে আমরা ক্ষুধার অন্ন ক্রয় করিতেছি সে সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কোথাও আমরা প্রচলিত দামের তিন-চার গুণ বেশী না দিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। আমাদের দেশের খাদ্যসঙ্কট বিশ্ব-খাদ্যসঙ্কটের অংশমাত্র বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেন। সে যাহাই হউক, উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া আমাদিগকেই এই খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আন্দোলন করিয়া ক্ষুধা বাড়ান যায়, কিন্তু উৎপাদন বাড়াইয়াই প্রকৃত প্রস্তাবে খাদ্যসঙ্কটের সমাধান হয়। অথচ আমাদের দেশে যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহারা একমাত্র আন্দোলনকেই সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করেন। ফলে কথা বাড়িয়া চলে অথচ অভাব থাকিয়াই যায়—বরং বাড়ে। এইজন্যই "গ্রো মোর ফুড" আন্দোলনে যতটা অর্থ খরচ হইল তাহার বেশীর ভাগই হইল অপব্যয় এবং খাদ্য-সমস্যার সমাধান হইল খুবই কম। আমাদের কথা ও কাজে সামঞ্জস্য অবশ্য আমরা খুবই কামনা করি। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বেশী দরকার কথা কমাইয়া কাজ বাড়ান। সাধারণতঃ যাহারা কথা বেশী বলে তাহারা কাজ কম করে। একথা সকল দেশের ও সকল লোকের পক্ষেই প্রযোজ্য। আমরা এতকাল ইংরেজের কাজের

সমালোচনা করিয়াছি। কাজ, অকাজ বা কুকাজ ইংরেজ করিয়াছে বা আমাদের মধ্যেকার ভাড়াটিয়া লোকদ্বারা করাইয়াছে। আমাদের এই পুরাতন অভ্যাস বেশ কিছু পাকা হইয়াছে বলিয়া আজ স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে বসিয়াও যতটা সমালোচক হইয়াছি কর্ম্মী ততটা হই নাই; এবং কর্ম্মী হই নাই বলিয়াই কর্ম্মের ফলও পাইতে দেরী হইতেছে। আজ আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত—কাজ। কথা বলিবেন, মাথা খাটাইবেন মাত্র নেতৃস্থানীয় লোকেরা—যাহাদের সংখ্যা খুবই কম হওয়া প্রয়োজন। গুরু অপেক্ষা চেলার সংখ্যা বাড়িয়া গিয়া যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার সমাধান করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন।

তার পর বস্ত্র-সমস্যা। হিসাবমত কাপড় ব্যবহার করিতে হইবে কারণ এখানেও অপ্রাচুর্য্য। যে দেশে বস্ত্রের উৎপাদন প্রচুর নহে সে দেশে সমস্যার সমাধান এরূপ ভাবেই করিতে হয় নতুবা বিত্তশালী ব্যতীত অপরকে নগ্ন রাখিবার ব্যবস্থা কায়েম হইয়া বসে। আমাদের দেশে যে পরিমাণ সুতার ও কাপড়ের কল আছে তাহার সংখ্যা এবং হাতে চালিত তাঁতেরও একটা হিসাব অনেকেরই জানা আছে। সবগুলিতে কাজ করিলেও আমাদের অভাব মিটে না। এ ক্ষেত্রেও উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। দেশের লোকের ক্ষুধা দূর করিলেই চলিবে না, তাহাদের বস্ত্রাভাব দূর করিতে হইবে। আমরা যদি সভ্যতাভিমানী হই তবে আমাদের সকল 'অভাবকে' জয় করিতে হইবে। সভ্যতার অভিযান হওয়া উচিত অভাব জয়ে, কেবলমাত্র অভাব সৃজনে নহে। কিন্তু বস্ত্র-সমস্যার সমাধান সহজ নহে। বিদেশ হইতে কলকব্জা আনাইতে হইলে প্রচুর রপ্তানী-বাণিজ্যের প্রয়োজন, কিন্তু বৎসরে ৭৫ হইতে ১০০ কোটি টাকার খাদ্য আমদানী করিতে হইলে আমাদের সেরূপ সচ্ছলতা কোথায়। যদি এতগুলি টাকা খাদ্যের জন্য বিদেশে না খরচ হইত তবে ঐ অর্থ দ্বারা আমরা কলকব্জা আমদানী করিয়া বিরাট বস্ত্র-শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের পত্তন ও উন্নতি করিয়া দেশের দুঃখ দূর ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারিতাম। কাজে কাজেই খাদ্যোৎপাদন-প্রচেষ্টা জোর চালাইয়া যাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যত দূর সম্ভব এই অসুবিধার মধ্যে কিছু কিছু কলকব্জা আমদানী করিয়া শিল্পোন্নতি করিতে হইবে। অবশ্য এই সঙ্গে দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহশিল্প—যাহা এখন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তাহারও উন্নতি করিতে হইবে এবং সেগুলি যাহাতে দেশে পুনরুজ্জীবিত হয় এরূপ কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। সমস্যাটা খুব সহজ নহে। পাশ্চাত্য দেশে বড় বড় ধনতান্ত্রিক শিল্পের চাপে ছোট ছোট কুটীরশিল্প ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আমরা কিরূপে আবার উভয়কে রক্ষা করিয়া জাতীয় জীবনে উভয়কে খাপ খাওয়াইয়া পরস্পরের সহায়করূপে দাঁড় করাইয়া রাখিব ইহা খুবই একটি জটিল প্রশ্ন। গান্ধীজীর অর্থনীতির সহিত বর্ত্তমান জগতের অর্থনীতির সামঞ্জস্য বিধান সহজ তো নহেই, বরং বেশ কিছু জটিল। আমাদের দেশের চিন্তাশীল জননায়কেরা মনে করেন বড় বড় শিল্পগুলিকে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে ও নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া শোষণের হাত হইতে জনগণকে যেমন রক্ষা করিতে হইবে সেইরূপ কুটীর-শিল্পের সম্প্রসারণ দ্বারা জনগণের পারিবারিক ও আর্থিক জীবনের পুনর্গঠন করিতে পারিলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন আজ নূতন সমাজ-জীবনের প্রধান সমস্যা। ইংরেজের সাম্রাজ্যিক শোষণের অন্তরালে যে স্বৈরাচারমূলক ব্যবস্থা বা অব্যবস্থা এত দিন ভারতের জাতীয় জীবনে প্রবল স্রোতে প্রবাহিত হইতেছিল আজ তাহার পরিসমাপ্তি করিয়া নূতন জীবন-গঙ্গা বহাইতে হইবে। এই মুক্ত মন্দাকিনীর পুণ্য সলিলে স্নান করিয়া ভারতের জনগণকে স্বাধীন ভারতের মানুষ হিসাবে নূতন ভাবে জীবনযাত্রা সুরু করিতে হইবে।

আমাদের শিক্ষা-সমস্যাও খুবই জটিল। যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্বাধীন দেশে পুরাতন ধরণের শিক্ষা অচল হইয়া পড়িয়াছে এবং দিন দিন এবিষয়ে নূতন নূতন গবেষণা দ্বারা নব নব আলোকপাত করা হইতেছে। আমাদের দেশের শিক্ষা এতকাল ইংরেজের পুরাতন ও পরিত্যক্ত পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ মাত্র ছিল। ইহার উপর আবার ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বাহন হওয়ার দরুন এত দিন মুষ্টিমেয় দেশবাসীর কিছু কিছু জ্ঞানলাভ হইলেও দেশের কোটি কোটি নরনারী অজ্ঞানতার অন্ধকারে থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। এই বিজাতীয় শিক্ষা সমাজে নূতন জাতিভেদের সৃষ্টি করিয়া জাতীয় জীবনকে খণ্ডিত করিয়াছে। আজ পুরাতন শিক্ষার রঙীন চশমা খুলিয়া ফেলিতে হইবে তবেই আমরা দেশের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইব। এখন সকলেই স্বীকার করিতেছেন—দেশীয় ভাষার মাধ্যমে যাবতীয় শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। আজ সরকারী দপ্তরে দেশীয় ভাষার কদর বাড়িয়াছে। আজ বক্তৃতার ভাষা, পুস্তকের ভাষা—দেশীয় ভাষা। আজ ইহার প্রয়োজন দেশবাসীর এবং দেশের, ইংরেজের নহে। ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় যে এই দেশের লোক হইয়াও এতদিন আমরা ইংরেজের চোখেই দেশের চেহারা দেখিয়াছি। ইংরেজের স্বার্থের মাপকাঠিতে নিজেদের প্রয়োজনের পরিমাপ করিয়াছি এবং যেখানেই খট্‌কা বাধিয়াছে অমনি ইংরেজ-গুরুর ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া নিজেদের মঙ্গলকে ব্যাহত করিয়াছি। আজ স্বাধীনতার দ্বারে উপনীত হইয়াও, আমাদের মধ্যে যিনি যতটা বেশী ইংরেজী ঘেঁষা তিনি নিজেকে ততটা অসহায় মনে করিতেছেন। এখনও তাই মাঝে মাঝে শোনা যায় ইংরেজী ছাড়া, ইংরেজ ছাড়া এটা ওটা কিরূপে হইবে। ইঁহারা ভুলিয়া যান যে ইংরেজ চিরকাল এদেশে থাকিবে ইহা বিধাতার বিধান নহে। কাজেই এখন অতীতের মত পরের মস্তিষ্কের সাহায্যে চিন্তা

করিয়া লাভ নাই। আমেরিকার স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নিগ্রো দাসদের মত নিজেদের অক্ষম মনে করিবারও কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই। কারণ নিগ্রোরা শ্বেতাঙ্গের আনুকূল্যে স্বাধীন হইতে পারিয়াছিল আর ভারতবাসী নিজের চেষ্টায় এবং জগতের আর্থিক বিপর্য্যয়ের সুযোগেই নিজের জন্মগত অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

স্বাস্থ্য-সমস্যাও আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা। ইহার সমাধানের উপরে জাতীয় কর্ম্মক্ষমতা ও ক্রমোন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। শরীরকে গড়িয়া তোলা যেমন দরকার, মনকে গঠন করাও তেমনই আবশ্যক। শিক্ষার অভাবেই আমাদের দেশবাসী দেশের বৃহৎ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন নহে। দৈনন্দিন জীবনকে আরও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিতেও শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। শিক্ষাদ্বারা মানুষ যখন নিজেকে প্রকৃত মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারিবে, মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা ততই বৃদ্ধি পাইবে এবং তখন মানুষ স্বীয় অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বাবলম্বী হইবে। ইংরেজ কেবল সম্পত্তি হরণ করিয়া আমাদিগকে নিঃস্ব করে নাই, অশিক্ষা ও কুশিক্ষার দ্বারা আমাদের মানসিক ও নৈতিক শক্তিও অনেকটা বিনষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছে। অবশ্য ভারতের প্রতিভা নানা অসুবিধা ও কূটচক্রের মধ্যেও নিজের শাশ্বত সাধনা অম্লান রাখিতে পারিয়াছিল বলিয়াই আজ সে আবার পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে স্থান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এইখানেই ভারত তাহার অমর আত্মার এবং মরণজয়ী সাধনার প্রমাণ দিয়াছে। এই সাধনার পূর্ণতা আসিবে বিরাটভাবে শিক্ষাবিস্তার দ্বারা জনগণকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় প্রবুদ্ধ করিয়া। শিক্ষাই ভাল চাষী, ভাল কারিগর, ভাল শিক্ষক, ভাল বৈজ্ঞানিক, ভাল শ্রমিক, ভাল নাবিক, ভাল বৈমানিক, ভাল চিকিৎসক এক কথায় সব কিছু উৎকৃষ্ট গড়িয়া তুলিবে। এইজন্য স্বাস্থ্য-সমস্যা ও শিক্ষা-সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এবং দুইয়ের সহিত আবার জাতির কর্ম্মক্ষমতা অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত।

সরল কথায় স্বাধীন ভারতে আমরা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি চাই। এই উন্নতি হইবে সার্ব্বজনীন। কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের উন্নতি আমাদের কাম্য নহে। আমাদের বিশ্বাস ব্যক্তি ও সমষ্টির উন্নতি একমাত্র স্বাধীন দেশের পক্ষেই সম্ভব। এইজন্যই আমরা স্বাধীনতা চাহিয়াছিলাম। আজ এই স্বাধীনতাকে সার্থক করিতে হইলে এই নবলব্ধ শক্তিকে আর্থিক উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগাইতে হইবে। ইহাকে ব্যাহত করিলে চলিবে না। কেহ কেহ বলিবেন স্বাধীনতা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পড়িয়াছে, ইহাকে জনগণের হাতে দিতে হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোক জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি কিনা ইহাই বিবেচ্য। কোন দেশেই বিরাট জনগণ রাষ্ট্র পরিচালন করে না, তাহাদের প্রতিনিধিরা করিয়া থাকেন। যত দিন প্রতিনিধিগণ দেশের স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালন করেন ও জনগণের আস্থাভাজন থাকেন তত দিনই তাঁহারা রাষ্ট্র পরিচালনের অধিকারী অন্যথা নহে।

আমাদের দেশে কংগ্রেস বর্ত্তমানে কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে রাষ্ট্র চালনা করিতেছেন। দেশে অন্যান্য দলও রহিয়াছেন কিন্তু রাষ্ট্রের উপর তাহাদের কর্ত্তৃত্বাধিকার নাই অথচ সকলেই জনগণের প্রতিনিধি বলিয়া নিজেদের দাবি করিয়া থাকেন। গত নির্ব্বাচনে কংগ্রেসই বিপুলসংখ্যক দেশবাসীর সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন এবং এইজন্যই ইংরেজ নিজেদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাহাদের উপরেই ভারতের শাসনের দায়িত্ব হস্তান্তরিত করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইংরেজ হাত বদল করিয়াছে কিন্তু কোন সমস্যারই সমাধান করিয়া যায় নাই। সমাধানের ভার পড়িয়াছে বর্ত্তমান রাষ্ট্র-পরিচালকগণের উপরে। অবশ্য এই সকল সমস্যার সমাধান ইংরেজের পক্ষে সম্ভব ছিল না; স্বাধীন ভারত তাহার নিজের সমস্যার সমাধান করিবে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে সমস্যার বিরাটত্বের কথা ভাবিলে ইহা সময়সাপেক্ষ স্বীকার করিতেই হইবে।

প্রথমেই বলিয়াছি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট আকারে দেখা দিয়াছে অন্ন ও বস্ত্র-সমস্যা। অবশ্য অন্নসমস্যা বস্ত্রসমস্যা হইতেও গুরুতর। কারণ বস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য হইলেও বরং ভারতের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কিছুকাল বাঁচিয়া থাকা সম্ভব কিন্তু খাদ্যাভাবে মনুষ্যমাত্রেরই মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং সমস্যার সমাধান একমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধিতেই। এখন প্রশ্ন হইতেছে না খাইয়া, না পরিয়া, রোগে ভুগিয়া কিরূপে আমরা খাদ্য-শস্যের ও বস্ত্রের উৎপাদনবৃদ্ধি করিব। এই প্রশ্ন লইয়াই বর্ত্তমানে দেশের খাদ্য ও বস্ত্রোৎপাদন ক্ষেত্রে নানা শ্রেণীর মধ্যে মন কষাকষি ও সময় সময় সংঘাত চলিতেছে; এক দল বলিতেছেন খাদ্য ও বস্ত্রাভাবের অন্যতম কারণ দেশে এখনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রচলন। ইহার ফলেই এক দল লোক বিত্তশালী আর অধিকাংশ গরীব। অবশ্য পুঁজিবাদী প্রথায় ছোট-বড়র তফাৎ থাকিবেই—এজন্য সমাজতান্ত্রিক নীতি দ্বারা পুঁজিপতিদের নিকট হইতে অর্থ-সম্পদ আহরণ করিয়া সমাজে সুষ্ঠুভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এক ব্যবস্থা হইতে অন্য ব্যবস্থায় যাইতে হইলে কিছু সময়ের প্রয়োজন। হিংসা এবং বিপ্লব দ্বারাও পরিবর্ত্তন আনা চলে, কিন্তু তাহাতে সমাজশৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হইয়া এরূপ সমস্যাসমূহের উদ্ভব হয় যে তাহাতে অনেক সময়ই জাতির কর্ম্মক্ষমতার ও গঠনমূলক কার্য্যের বহু অপচয় হয়। ইহাতে ধ্বংসের কার্য্য ব্যাপকভাবে হয়, কারণ কায়েমী স্বার্থকে হঠাৎ ধ্বংস করিতে গেলে সেও বেপরোয়া হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং ইহাতে এরূপ এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে সাময়িক ভাবে গঠনমূলক কার্য্যের পরিবর্ত্তে ধ্বংস-মূলক কার্য্যই চলিতে থাকে। রুশদেশে যখন ১৯১৭ সনের বিদ্রোহের পর রাষ্ট্রনায়কগণ ভূম্যধিকারী 'কুলাক'-দের উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছিলেন তখন এরূপ এক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল

এবং ইহার ফলস্বরূপ বহু গৃহপালিত পশুর বিনাশ সাধিত হইয়াছিল, শস্যোৎপাদনেও তখন প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। এজন্য লেনিন সাময়িকভাবে এই নূতন ব্যবস্থা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে কুলাকগণের সম্পত্তি ও ভূমি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণও স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে জমিদারীপ্রথা লোপ করিয়া কৃষককে জমির মালিক করিতে হইবে। বড় বড় শিল্প জাতির কর্তৃত্বাধীন হইবে। বৃহৎ বৃহৎ পুঁজীদারী কারবারকে রাষ্ট্রের কল্যাণে বেশী করিয়া কর দিতে হইবে। এই সকল ও অন্যান্য সমাজ কল্যাণমূলক ও জনহিতকর পরিকল্পনা যাহাতে সহজে এবং সুষ্ঠুভাবে কার্য্যে পরিণত হয় সেজন্য দেশের নেতাগণ মালিক, শ্রমিক ও জনগণের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কারণ বর্ত্তমান সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে জাতির শক্তিকে অপচয় হইতে রক্ষা করিতে হইবে যাহাতে আমাদের অন্ন ও বস্ত্র সমস্যার অচিরে সমাধান হয়।

প্রায়ই শুনা যায় এখানে ওখানে ধর্ম্মঘট হইতেছে। বর্ত্তমানে যে দুর্দ্দিন চলিতেছে এবং দ্রব্যাদির মূল্য দিন দিন যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে লোকের পক্ষে ধৈর্য্য হারান খুব অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু কেবল ধর্ম্মঘটই আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের একমাত্র পন্থা নহে। আমাদের সকল রোগের ঐ একই দাওয়াই যাঁহারা ব্যবস্থা করেন তাঁহারা ঠিক রোগ ধরিতে পারেন নাই, সুতরাং সুচিকিৎসকের গৌরবের অধিকারী নহেন। ধরুন কৃষকেরা রীতিমত অন্নবস্ত্র পাইতেছে না বলিয়া যদি চাষের সময় ধর্ম্মঘট করে তাহা হইলে কি অন্ন বস্ত্র বাড়িবে না তাহাদের ভাগে বেশী পড়িবে। এইরূপ ধর্ম্মঘটের ফল হইবে খাদ্যোৎপাদনে বাধা অর্থাৎ খাদ্য-হ্রাস। ফল আরও অন্নাভাব। বস্ত্রোৎপাদনকারী ও অন্যান্য উৎপাদনকারীর পক্ষেও ঐ একই কথা। ঐ উৎপাদনবৃদ্ধি বন্ধ করিয়া নিজেদের ভাগ বাড়াইব—ইহার মধ্যে যেটুকু যুক্তি আছে তাহা এই যে, পুঁজীদারের ভাগ কমাইব—অন্য যুক্তি নাই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উৎপাদন ব্যাহত হইলে সকলেরই ভাগে কম পড়িবে ইহা নিশ্চিত। উৎপাদন কমাইয়া সকলের ভাগ বাড়াইব ইহা কোন যুক্তির কথা নয়, রাগের কথা। তবে এ কথা ঠিক যেখানে শ্রমিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত এবং অন্নবস্ত্রহীন সেখানে উৎপাদন সুষ্ঠুভাবে হইতে পারে না। উৎপাদনবৃদ্ধি সমাজের মঙ্গলের জন্য, বিশেষভাবে কোন শ্রেণীবিশেষের সমাজবিরোধী অতিরিক্ত স্বার্থের জন্য নহে। পুঁজিপতিদের দেখা উচিত—যত দূর সম্ভব শ্রমিককেও সুস্থ সবল সুখী রাখা আর এই কার্য্যে অবহেলা করিলে রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য তাহার বিহিত করা। এজন্য বর্ত্তমানে শ্রমিক-মালিকে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে আইনের সাহায্যে সরকার নিরপেক্ষ বিচারক দ্বারা উহার মীমাংসা করিয়া দেন এবং ধর্ম্মঘট এড়াইবার ব্যবস্থা করেন। নিরপেক্ষ বিচারকের নির্দ্দেশমত যাহাতে বিরোধের মীমাংসা হয় এবং উভয় পক্ষ তদনুযায়ী কার্য্য করে সরকারের তাহাও দেখা প্রয়োজন।

বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থায় শ্রমিকগণকে দেশের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া কোনরূপে উৎপাদন ব্যাহত করা উচিত নহে। ধনিকগণেরও দেশের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া যত দূর সম্ভব শ্রমিকগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষার চেষ্টা করা উচিত। কারণ পরস্পরের সহযোগিতার উপরেই দেশের আর্থিক মঙ্গল নির্ভর করিবে। ভবিষ্যতে আমাদের সমাজে ধনিকশ্রেণী যদি আদৌ থাকে তবে দেশ ও দেশবাসীর সেবকরূপেই থাকিবে, দেশের স্বার্থকে ব্যাহত করিয়া বা দেশবাসীকে পীড়ন করিয়া কোন ধনিকশ্রেণীই সমাজে থাকিতে পারিবে না। সমাজতন্ত্রের গতি অব্যাহত ভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে চলিয়াছে ; ইহাকে ধীরে ধীরে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে নতুবা প্রবল বিপ্লবের ভিতর দিয়া ইহা পথ করিয়া লইবে, কেহ ইহাকে রোধ করিতে পারিবে না।

এইজনাই এখন রাষ্ট্রপরিচালক, এবং শ্রমিক-নেতাদের দায়িত্ব খুবই বেশী। ক্ষুধা দূর করিতে যাইয়া আহার্য্য নষ্ট করা চলিবে না, বস্ত্রাভাব দূর করিতে গিয়া কারখানার কাজ বন্ধ করিলে চলিবে না এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রসমূহে কাজ প্রাণপণ চেষ্টায় চালু রাখিতে হইবে আর এই ব্যাপারে দেশের জনগণকে সহৃদয়তার ও দৃঢ়তার সহিত সাহায্য করিতে হইবে। কেবল হুজুগে মাতিয়া সস্তা বাহবা লইলে চলিবে না। রুশদেশ একনায়কত্বের অধীনে কঠোরতার চরম পরীক্ষা দিয়া মহাদুঃখের মধ্যেই তাহার লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছিল—আমাদের দেশের পন্থা বিভিন্ন হইলেও লক্ষ্য এক। এই মহৎ কার্য্যে দেশের ও দেশবাসীর সর্ব্বশক্তি নিয়োগের প্রয়োজন। বাহিরের শত্রু ও ভিতরের জড়তা কাটাইয়া উঠিবার একমাত্র উপায় অবিচলিত ভাবে নিজ নিজ কাজ করিয়া যাওয়া। দেশের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা যে যাহার কড়াগণ্ডা বুঝিয়া পাইতে থাকিব, কারণ আমরা এরূপ স্বাধীন রাষ্ট্রের অংশীদার যেখানে, শোষণ-বর্জ্জিত শাসন কায়েম করাই আদর্শ।

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৫

এগিয়ে গেলে কেমন যায় না…। নদীর স্রোত সামনে চলে—দিন চলে যায় সামনে—আর সব ঘটনার গতিও সোজা। মানুষের বয়স—শৈশব থেকে কৈশোর—কৈশোর পেরিয়ে যৌবন—তার পর বার্দ্ধক্য—সেও সময়ের স্রোতে সামনে চলছে ভেসে।…পরিবর্ত্তন আসে দেহে—পরিবর্ত্তিত হয় মন। উনিশ-শো বিয়াল্লিশ আর উনিশ-শো ছ'চল্লিশ এক নয়। সেদিনকার ক্রীপস দৌত্য নিয়ে ভারতে এসেছিলেন—ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। স-চার্চ্চিল টোরিগোষ্ঠী আজ ক্ষমতার শিখর থেকে নেমে পড়েছেন—শ্রমিক গবর্ণমেন্ট সেখানে সমাসীন। আজও ক্রীপস এসেছেন দৌত্য নিয়ে—তবু উনিশ-শো বিয়াল্লিশের পটভূমিকায়…কতকগুলি সীমাবদ্ধ ক্ষমতা প্রদানের সর্ত্ত নিয়ে যিনি এসেছিলেন—সে ব্যক্তির সঙ্গে এ ব্যক্তির অনেকখানি তফাৎ। 'ভারত ছাড়' এই শ্লোগানের অন্তর্নিহিত শক্তি উনিশ-শো বিয়াল্লিশে গণ-অভ্যুত্থানে আগষ্ট-বিপ্লবের মধ্যে সার্থকতার পথ খুঁজেছিল। নেতাহীন সে বিপ্লব বন্দুকের গুলিতে বায়ুযান-বাহিত মেসিনগানের মৃত্যু-বীজ বর্ষণে গ্রাম ধ্বংসের লীলায়—পাইকারী জরিমানার আবর্ত্তে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল। ঝড় উঠলে সমুদ্রের রুদ্র ঢেউ—কূলে এসে সগর্জ্জনে আছড়ে পড়ে—আবার ফিরে যায় সমুদ্রের গর্ভে। ফিরে যায় বলেই কি সে লুপ্ত হয়ে যায়? তবু…এই পরিবেশে যুদ্ধোত্তর শোণিত-ক্ষরিত অবসন্ন পৃথিবীতে স্বস্তি-বাচনের প্রয়াস দেখা যাচ্ছে। যাদের মুঠি আলগা হয়ে পড়েছে—তাদের থেকে যা কিছু পার ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাও—যুদ্ধক্ষত হৃতসর্বস্ব রাষ্ট্রগুলির দিকে। যারা পরাধীন তাদের শোনাও শান্তির ললিতবাণী। যুদ্ধ ভাল নয়—যুদ্ধ রাষ্ট্রকে করে ধ্বংস, মানুষকে করে নীতিহীন—শক্তিহীন। বিশ্ব-মৈত্রীর বাণী নিয়েই এসেছেন মন্ত্রী-মিশন—এশিয়ার পুণ্য-ক্ষেত্রে মানব-মহিমার জয়গান ঘোষিত হচ্ছে। আজিকার পট-ভূমিকায় যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মধ্যে নিজ নিজ নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করে নিলে পরমাণু-শক্তি তোমাকে ক্ষমা করবে না। কালের স্রোত সামনে বয়ে চলেছে। ফ্যাসিবাদের অবসানে—ডিমক্রেসির কাঁধে কাঁধ মেলাতে এত দ্বিধা, এত সন্দেহ কেন। সুপারিশ না হলে যেমন চাকরি মেলে না—তেমনি মুখ ফেরালে মিলবে না স্বাধীনতা। পিছনে তাকিও না—হাত বাড়িও না—সামনে যা পাচ্ছ তাই নাও দু'হাত ভরে। অঞ্জলি কিংবা মুঠিতে ভরে—বিনা রক্তপাতে—বিনা বিপ্লবে আরাম-কেদারায় শুয়ে চুরুট টানতে টানতে যদি পেয়ে যাও এ জিনিষ—পৃথিবীর ইতিহাসে—সে কি অভিনব বলে সোনার অক্ষরে খোদা থাকবে না?

এই পর্য্যন্ত লিখে প্রশান্ত থামলে। ও লেখা মিটিংএ পড়া চলবে না। রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্ত্তন সুরু হয়েছে। তাই ব'লে হৃদয়-গলার সততা নিয়ে গদ্‌গদ্‌ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ চলবে না। এত দর কষাকষির পেছনে বণিক-মনোবৃত্তির খেলা—কি স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি? নতুন পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ ভিত্তি দৃঢ় করতে চাইছে—চতুঃস্বাধীনতাকে আপাতত ভাষায় কীর্ত্তন করতে ক্ষতি কি।

বাইরে গোলমাল হচ্ছে—কারা যেন আন্দোলন করছে। কলকাতা শহরটাই কোলাহলে ভরা।

দুপ দাপ করে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল।. চারু, অতীন আরও অনেকে আসছে বুঝি। লেখাটা সে তাড়াতাড়ি জামার পকেটে পুরলো।

ওরা বারান্দায় এল—ঘরে ঢুকল না।

বিস্মিত প্রশান্ত প্রশ্ন করলে, কে?

বাইরে আসুন!—বাইরে আসুন! চার-পাঁচটি কণ্ঠস্বর একসঙ্গে ধ্বনিত হ'ল।

এদের কাউকে প্রশান্ত চেনে না। তবে এরা যে শুভার্থী সুহৃদ-গোষ্ঠীর নয়—এটা বুঝা গেল এদের উত্তেজিত হাবভাবে। এরা চায় কি?

আপনার নাম কি? আপনি মেয়েটির কে হন? এক সঙ্গে চার-পাঁচটি স্বর।

প্রশান্ত বললে, একে একে জিজ্ঞাসা করুন…কিন্তু আপনারা কে আগে তাই বলুন।

আমাদের পরিচয় পেলে খুব খুসি হবে না যাদু। আর পরিচয় দিলেও চিনতে পারবে না।

ভদ্রলোকের পাড়ায় বসে খুব মজা মারছ তো! ভাবছ আইন বাঁচিয়ে চালাকি করে ফুর্ত্তি করছি যখন কার কি বলবার আছে!

প্রশান্ত অনুমানে বুঝলে—ওরা গুণ্ডাদের প্রতি প্রসন্ন নয়।

কথাগুলিও ওদের ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়েছে। মনে ঘৃণা জাগল—ক্রোধ হ'ল—কিন্তু এসব প্রকাশের ক্ষেত্র এ নয় ভেবে সে দৃঢ়স্বরে বলল, পরের বাড়ি চড়াও হবার ক্ষমতা কে দিলে আপনাদের?

যেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা পড়ল। সবাই একসঙ্গে কোলাহল করে উঠলে, ইস্‌—আবার রোয়াব দেখ—এ্যাইসা রদ্দা লাগাব গালপাট্টা খসিয়ে দেব। পাড়ার মধ্যে বেলেল্লা-গিরি—এটা কি সোনাগাছি পেয়েছ যাদু!

নিরুদ্ধ ক্রোধে ফুলতে লাগল প্রশান্ত—কোন উত্তর দিলে না।

ওরই মধ্যে বয়সে প্রবীণ গোছের একজন ভিড় ঠেলে

এগিয়ে এসে বললে, মিত্তির মশাই আপনাকে ডাকছেন, আসুন।

প্রশান্ত বললে, কিন্তু এ ভাবে অভদ্র গালাগালি করছেন কেন এঁরা।

সবাই হুমকি দিয়ে উঠতেই প্রবীন লোকটি হাত উঠিয়ে একটা ধমক দিলে, এই—চুপ চুপ। একটি কথা কয়েছ কি— যাও নেমে যাও সিঁড়ি দিয়ে—যাও বলছি।

জলের স্রোতের মত হুড় হুড় করে সবাই নেমে গেল। নেমে তারা সঙ্কীর্ণ উঠোনে দাঁড়িয়ে কোলাহল করতে লাগল।

প্রবীণ লোকটি বললে, আসুন আমার সঙ্গে।

প্রশান্ত বললে, আপনার মিত্তির মশাইকে আমি জানি না—

জানেন না! অত্যন্ত বিস্ময়ে সে মিনিটখানেক চোখ কপালে তুলে রইল—তারপর একটু হেসে বললে, এ পাড়ার বলতে গেলে উনিই মাথা। পুলিসে কাজ করতেন—এক একটা জেলা চড়িয়ে এসেছেন। ওঁর প্রতাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেয়েছে। এখনই না হয় রিটায়ার করেছেন— তবু পুলিস কমিশনার…

প্রশান্ত অধৈর্য্যকণ্ঠে বললে, কিন্তু আমি ওঁকে চিনি না— উনিও আমায় চেনেন না…

বিলক্ষণ! তোমরা ওঁকে না চিনতে পার—কিন্তু ওঁর চোখ এড়িয়ে কাকে পক্ষীতে কিছু করতে পারে না—তা মানুষ তো মানুষ! আসুন আসুন।

প্রশান্তর ত্বরা দেখা গেল না। ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলে সে। বললে, আমায় বোধ হয় আপনি ভুল করছেন—এ বাড়ি আমি ভাড়া নিই নি—ওঁর প্রতিবেশীও নই আমি। আমাকে উনি ডাকতেই পারেন না।

এই কথায় লোকটির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চীৎকার করে উঠল সে, বটে—ইয়ারকি পেয়েছ! বাড়ি যদি তোমার নয় তো কি সুবাদে এখানে আস বলতে পার বাপু? মজা লুটতে বুঝি?

ওঁর চীৎকারে নীচের লোকগুলি কলরব করে উঠল, কি হ'ল মেজদা—আমরা যাব কি?

মেজদা গলা বাড়িয়ে বলল, না। প্রশান্তর পানে ফিরে বললে, সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না জানি। তার ব্যবস্থাও করা আছে। বলি যাবে কি যাবে না?

প্রশান্ত কোন উত্তর দিলে না।

মেজদা গলা বাড়িয়ে বললেন—ওহে কালীপদ—রায় সাহেবকে বল যে বাবু যাবেন না। তিনি যেন এর ব্যবস্থা করেন। আর শোন—পুলিস না আসা পর্য্যন্ত তোমরা পাহারা দাও—কিছু যেন সরাতে না পারে।

প্রশান্ত বিদ্যুদ্বেগে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বললে—বাড়ি সার্চ্চ করাবেন মানে?

মানে—রায় সাহেবের পেছন দিকেও দুটো চোখ আছে। তাঁর নাকের ওপর বসে তোমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করবার মতলব আঁটবে—সেটি বড় সোজা কথা নয়। ওঁর নিজের একটা দায়িত্ব নেই?

প্রশান্ত বললে, আমি যদি ওঁর সঙ্গে যাই তা হলেও বাড়ী সার্চ্চ হবে?

লোকটি আড়চোখে প্রশান্তর পানে চেয়ে মনে মনে হাসলে। হাঁ ঠিক জায়গাতেই পড়েছে আঘাতটা। সে অত্যন্ত উদাসীন ভাবে বলল—বাড়ী সার্চ্চ করা-না-করা রায় সাহেবের ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছা না হয় যেও না।

এ বাড়ীর মালিক না আসা পর্য্যন্ত আমি কোথাও যেতে পারি না—আপনি সার্চ্চ ওয়ারেণ্ট নিয়েই আসবেন।

লোকটি এই কথায় দমে গেল—কিন্তু মুখে বলল— আচ্ছা যাদু—কুঁদের মুখে বাঁক কতক্ষণ সোজা না হয় দেখা যাক।

ওঘরের জানালাটায় টক্ টক্ করে শব্দ হতেই লোকটি বললে—গ্যাঁট হয়ে বসে থেক না যাদু—মেয়েরা ডাকছে তোমাকে।

প্রশান্ত উঠে গেল। শুভার মা উদ্বেগে আকুল হয়ে উঠেছেন— ওকে দেখেই কেঁদে ফেললেন, তাই ত বাবা—কি হবে!

ভয় নেই, কিছুই হবে না। প্রশান্ত ওঁকে আশ্বাস দিলে।

না বাবা—তুমি এঁদের জান না। আমাদের অবস্থা খারাপ হওয়া ইস্তক ওঁরা কম গণ্ডগোল করছেন না। এখন তো বাড়ীতে ঢিল পড়া বন্ধ হয়ে গেছে তবু।

বলেন কি - এরা আপনাদের প্রতিবেশী!

শুভার মা বললেন—প্রতিবেশীদের মত বন্ধুও নেই—শত্রুও নেই।

ও মশাই—বলি জমে গেলেন নাকি? মেজদার কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল।

শুনছ তো বাবা—আমাদের পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই বলে—ওরা যা খুসি তাই অপমান করে। শহরের লোক-গুলো—

প্রশান্ত বললে—দোষ শহরের লোক বলে নয়, এক শ্রেণীর লোক আছে যারা এই ধরণের।

শুভার গলা শোনা গেল—কি চান আপনারা? কাকে চান? বিনা অনুমতিতে বাড়ী ঢুকেছেন, আইন জানেন না?

ভীড় মনে হ'ল—উঠোন থেকে পথের দিকে সরে গেল। সেই সঙ্গে শাসানিও কানে এল। আচ্ছা—আইন আমরাও জানি। দেখাচ্ছি—দাঁড়াও।

শুভা গলির প্রান্ত থেকে তীক্ষ্ণ গলায় বললে—চলুন তো আপনাদের রায় সায়েবের কাছে—

প্রশান্ত বারান্দায় এসে দেখলে—মেজদা নেই—উঠোনেও

কেউ নেই। সত্যিই কি শুভা রায় সায়েবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেল। এতগুলি লোকের বিরুদ্ধে ও একা যুঝবে কি করে? যাদের ভদ্রতার বালাই নেই—তাদের কাছ থেকে ও কি-ই বা প্রত্যাশা করতে পারে। একটা বিশ্রী রকমের ব্যাপার না ঘটে।

ও তাড়াতাড়ি নেমে বাড়ীর বাইরে এল।

বাইরের জনতা অভদ্র ভাবে চেঁচিয়ে উঠল—মাণিকজোড় দেখেছিস—মাইরি!

শুভা ঘাড় ফিরিয়ে বললে—তুমি আবার কেন এলে প্রশান্ত?

রায় সায়েবকে দেখতে। মৃদু হেসে সে উত্তর দিলে।

ভাল করলে না। সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে শুভা হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল।

১৬

বৈঠকখানা দেখে মনে হয়—রায় সাহেব দু'হাতে উপার্জ্জন করেছেন। যে লাইনে চাকরি করতেন,...সে লাইনের সততাকে সাধারণে ভুলেও সত্য বলে মনে করে না অথচ সাধারণের চাটুবাদে তাঁর বৈঠকখানা দিন রাত যে মুখরিত থাকে—ক্ষমতার শিখর থেকে নেমে এলেও আজ সে প্রমাণের অভাব হবে না। খেতাব আর চাকরী—দুইই পার্থিব নিরাপত্তার মস্ত বড় সহায়, এ কথাটা সাধারণে বোঝে। তারা আরও বোঝে মরা হাতি লাখ টাকা—এ প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা রায় সাহেবের পদমর্য্যাদায় নিহিত। ওঁর একটি কথা—গুরুত্বে বহুদূরপ্রসারী।

খাটো চৌকির ওপর ঢালা ফরাস পাতা আসর। কয়েকটা তাকিয়া এদিকে ওদিকে গড়াচ্ছে—নক্সা-কাটা হুঁকোদানে একটা হুঁকো—আর একটা হুঁকো ফিরছে—লোকের হাতে হাতে। গড়গড়ার নলটা কখনও রায় সায়েবের হাতে, কখনও বা তাকিয়ার ওপর—পানের ডাবরে এক ডাবর সাজা পান আর বড় অ্যাশ-ট্রেটা ফরাসের মাঝখানে, চুরোটের ছাইয়ে প্রায় ভর্ত্তি হয়ে গেছে। কাপ ডিস জমতে পায় না ফরাসের ওপর। সময় মত বেয়ারা ট্রেতে করে কাপ সাজিয়ে নিয়ে আসে—আর চা খাওয়া হয়ে গেলে, কাপ ডিস গুছিয়ে নিয়ে যায়।

সবচেয়ে দেখবার জিনিস হচ্ছে ঘরের দেওয়াল। নক্সা-কাটা, সবুজ রঙ দেওয়া দেওয়াল। কিন্তু নানান সাইজের ছবির বাহুল্যে, দেওয়ালটা যেন অলঙ্কারভারগ্রস্তা সেকেলে গৃহিণীর মত। রায় সায়েবের কর্ম্মজীবনের গৌরব আর ইতিহাস বহন করছে ছবিগুলি। এগুলি দেখলে মনে হবে—মহাবোধি হলের জাতক-কাহিনী। আজ মেদভারবহুল ভিটামিন ক্যালসিয়ম পুষ্ট যে দেহখানি তাকিয়া আশ্রয় করে, মজলিসের মধ্যমণি-স্বরূপ ঘরের শোভাবর্দ্ধন করছে—ছবিগুলি তারই পূর্ব্ব জন্মের কাহিনীর মতই লাগে। রাজা-রাণীর ছবির নীচের লেখা 'গড সেভ দি কিং'। আর সম্প্রতি পশ্চিমের দেওয়ালে একখানি ছবি যুক্ত হয়েছে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ত্রাণ-কারী চার্চ্চিলের। শ্রমিক গবর্ণমেন্টের চাপে টোরীগোষ্ঠীসহ তিনি নেপথ্যে অবস্থিত হলেও—রায় সায়েব আশা করেন, সঙ্কট মুহূর্ত্তে আবার তাঁকে মঞ্চাবতরণ করতেই হবে। সব দেশেই এমন একজন দবরদস্ত লোক সঙ্কট মুহূর্ত্তের পরিত্রাতা হয়ে দেখা দেয়—বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ আর কি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ক্ষমতা হারিয়েও ইনি এখনও বেঁচে আছেন।

বৈঠকখানায় আগেই বহু লোক জমা হয়েছিল। শুভা আসতেই—পিছনেও রীতিমত ভিড় জমল।

শুভা স্পষ্ট কণ্ঠে বললে, আপনিই হরিপদ মিত্র—? নমস্কার।

নমস্কার নয়—মনে হ'ল যুক্ত কর বিচ্ছিন্ন হয়ে সজোরে রায় সাহেবের দুটি গালে পড়ল। ঘরের মধ্যে অখণ্ড নিস্তব্ধতা।

শুভার কণ্ঠস্বর দেওয়াল থেকে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হ'ল। সে বললে, শুনি আপনি লোকের অন্যায়কে শাসন করেন, পাপীকে শাস্তি দেন। জানতে পারি কি—কোন্ সাহসে পাড়ার লোকে কোন ক্ষতি বা অপরাধ না করা সত্ত্বেও আমাদের ওপর অত্যাচার করেন? একলা মেয়েছেলের ওপর জুলুম করতে তাঁদের বাধে না—কি লজ্জা হয় না?

দেওয়াল-ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে শব্দ করতে লাগল শুধু—রায় সায়েব পর্য্যন্ত বাক্যহীন বিস্ময়ে শুভার পানে চেয়ে রইলেন।

শুভা একজন যুবকের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললে, ঐ লোকটি কাল আমায় অভদ্র ইসারা করেছে—আমার বাড়ীর সামনে যখন তখন শিস্ দেওয়া কি সিনেমার গান গাওয়া এটাও বোধ হয় ভয়ানক ভদ্রতার অঙ্গ!

রায় সাহেব এতক্ষণে জ্বলে উঠলেন। তাঁর মনে হ'ল মেয়েটি ধৃষ্ট—অসহ্য রকমের প্রগল্‌ভা। কথাগুলি তাঁকেই উদ্দেশ করে বলছে—আর তাঁরই ভদ্রতা নিয়ে ব্যঙ্গোক্তি করছে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, যারা নির্দ্দোষী কেউ তাদের কোন কথা বলতে সাহস করে না। পাড়ার এত লোক রয়েছে—ভাড়াটে স্থায়ী বাসিন্দা কেউ ত তোমার মত তেড়ে এসে নালিশ করে নি আমার কাছে।

তাঁদের বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক আছেন তাই তাঁদের আসবার দরকার হয় নি!

না—তা নয়। পুরুষ অভিভাবক তোমারও কম নেই—কিন্তু সম্ভ্রম-মর্য্যাদা বোধ তাঁদের আছে।

কি বললেন? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শুভা প্রশ্ন করলে।

যা বলেছি—সবাই শুনেছেন। গম্ভীর স্বরে বললেন রায় সায়েব। কথা হচ্ছে কি জান—তোমরা কম্যুনিষ্ট নয়?

শুভা গ্রীবা উন্নত করে বললে, তাতে কি!

রায় সায়েব বললেন, কম্যুনিষ্টরা সমাজ মানে না ধর্ম মানে না, ঈশ্বর মানে না—

শুভা বললে, যে ঈশ্বর মানুষের অর্থ সঞ্চয়ের নেশাকে বাড়ান—যে ধর্ম একজন মানুষকে দশজন মানুষের মাথায় তোলে—সে সমাজ নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু আমাদের মাথাব্যথা আছে। এই সমাজের মধ্যে বসে তুমি যা খুশী তাই করতে পার না। রায় সায়েব বিচার নিষ্পত্তির ভঙ্গিতে গড়গড়ার নলটি হাতে তুলে নিলেন।

কিন্তু আমাদের সাধারণ নাগরিকত্বে বাধা দেবার কোন অধিকার আপনার নেই।

তাই নাকি! ব্যঙ্গ ভরে রায় সায়েব একটু হাসলেন। সৎ নাগরিক হও—নিজের মর্য্যাদা নিজে রাখতে জান—সে তো ভালই। কিন্তু যেখানে পাঁচ জন সৎ নাগরিক বাস করেন সেখানে ব্রথেল রাখবার আইন নেই···

শুভা চীৎকার করে কি বলতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে প্রশান্ত এল এগিয়ে। বললে, কথা কাটাকাটি শক্তি পরীক্ষার পথ নয়। এখানে আর দাঁড়িও না।

রায় সায়েব বললেন, তুমি কে হে? ওর আত্মীয়?

মেজদা বললে ভিড়ের ভেতর থেকে, হাঁ—পরমাত্মীয়। যাকে বলে—হরিহর আত্মা।

একটা হাসির ঢেউ ঘরের মধ্য থেকে বাইরে গড়িয়ে এল।

রায় সায়েব বললেন, সামাজিক অনাচার বাদ দিলেও রাজনৈতিক অপরাধ তোমাদের গুরুতর। বাড়ী সার্চ্চ হলেই বোঝা যাবে।

আমাদের অপমান করা···

তোমাদের আবার অপমান! পথের ঘেয়ো কুকুরকে লাঠি পেটা না করলে নিজের বিপদ—জান ত!

আবার একটা হাসির ঢেউ সজোরে আছড়ে পড়ল।

সত্যিই বাড়ীটা সার্চ্চ হ'ল। আপত্তিকর পুস্তিকা দুই একখানা পাওয়া গেল—প্রশান্তর পকেট থেকে বেরুল একটু আগে লেখা কাগজখানা। সেটা মারাত্মক প্রমাণ না হলেও প্রমাণ ত বটে। তা ছাড়া সম্পূর্ণ অনাত্মীয় যুবক অভিভাবকহীন মেয়েদের সঙ্গে বাস করলে সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্নামের ভাগী হতে হবেই।

রায় সায়েবের পাশের বাড়ীতে থাকেন সুনীতি কর—কংগ্রেসের মাথা ধরা লোক। যদিও তাঁর সঙ্গে রায় সায়েবের আদা-কাঁচকলাজাতীয় সম্বন্ধ—তবু সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য তাঁকেও আহ্বান করা হল।

আহূত হয়ে তিনি বললেন, কংগ্রেসের সঙ্গে ও পার্টির বহু দিন সম্বন্ধচ্ছেদ হয়েছে। উনিশ-শো বিয়াল্লিশে গণ-যুদ্ধের নামে সরকারকে সাহায্য করেছিল ওরা। আগষ্ট বিপ্লবকে পর্য্যন্ত ওরা ফ্যাসি ষড়যন্ত্র বলতে দ্বিধা বোধ করে নি। কংগ্রেসকে ধ্বংস করবার জন্য সরকারের হাতে হাত মিলিয়েছিল যারা—তারা কি কারণে স্বয়োরাণীর পদ থেকে সরে এল তিনি বলতে পারেন না। কংগ্রেসের কোন গুপ্তনীতি নেই বলেই রাজনীতির চাতুরী বুঝতে তিনি অক্ষম।

শুভা উত্তর দিলে, তা হলে রাজনীতি না করাই ওঁর পক্ষে মঙ্গলজনক।

রায় সায়েব বললেন, দেশে এত যে ধর্ম্মঘটের প্রসার—এর মূলে এরা।

শুভা বললে, হাঁ—দুর্ভিক্ষে যেমন লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে কুকুর শেয়ালের মত পথে পথে মরে পড়ে ছিল অথচ আঙুলটি তোলে নি আজও তাই হলে ভাল হয়। যুদ্ধের আগেকার বাজার ফিরিয়ে আনুন না রায় সায়েব।

ফিরিয়ে আনবার মালিক যেন আমরাই।

তবে কম খেয়ে একটু কম চর্ব্বি জমান দেহে—তাতেও গুটি কয়েক লোক বাঁচবে। একটি ছোকরা ভিড়ের মধ্য থেকে মন্তব্য করলে। হাসির উচ্চরব উঠল।

কর্ণমূল আরক্ত হয়ে উঠল রায় সায়েবের। পুলিস অফিসারের পানে চেয়ে বললে, আপনার কাজ করুন—এদের—

পুলিস অফিসার রায় সায়েবকে একান্তে ডেকে চুপি চুপি বললেন, এত অল্প প্রমাণে ওদের অ্যারেষ্ট করা যাবে না। তা ছাড়া—আরও ফিস ফিস করে তিনি কি সব বললেন।

রায় সায়েব বিষণ্ণ সুরে বললেন, যা খুসি করুন। তবে—ভদ্রলোকের পাড়া এটা—সবাই যাতে মান সম্মান নিয়ে বাস করতে পারে···

অবশ্য—অবশ্য, এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে।

ওদের সতর্ক করে—শাসিয়ে ছেড়ে দিলেন তিনি।

এই ঘটনায় আর কিছু না হোক—এদের চারদিকে বাইরের পৃথিবীটার স্বরূপ বুঝতে পারা গেল। প্রশান্ত নিজ চিত্তের দৃঢ়তার সন্ধান পেলে। কোথা থেকে ও শক্তি পেলে অপরিমিত—লাঞ্ছনা অপমান অগ্রাহ্য করে শুভার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে? দ্বিধা সন্দেহে দুলছিল মন—অকস্মাৎ উৎপীড়নের আগুনে খাদ নিষ্কাশিত হয়ে খাঁটি সোনার জ্যোতি প্রকাশিত হ'ল! দুর্ব্বলের পক্ষ নিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যৌবনের ধর্ম্ম বলেই প্রশান্ত নবীন উৎসাহে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল বুঝি?

ভিড় পাতলা হয়ে গেলে প্রশান্ত দেখলে শুভার থেকে সে অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। শুভার কয়েকজন বন্ধু এসেছিল, তাদের বৃত্তলীন হয়ে ও তর্ক করতে করতে এগিয়ে চলেছে। বাড়ির দিকে না গিয়ে ওরা ভিন্ন পথ ধরলে। প্রশান্ত ওদের অনুসরণ করবে কি?

একটি ছোকরা তার কাছে এসে বললে, সুনীতি বাবু—আপনাকে ডাকছেন—ঐ যে—।

অদূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুনীতি কর। ওদিকে চাইতেই তিনি হাত উঠিয়ে ডাকলেন তাকে। প্রশান্ত সেই দিকে গেল।

প্রশান্তকে দেখে তিনি বললেন, আমার সঙ্গে একটু আসবেন—মানে আমার বাড়িতে।

প্রশান্তর ইতস্তত ভাব দেখে তিনি হেসে বললেন, ভয় নেই আপনার—আমরা রায় সায়েব-জাতীয় জীব নই—পুলিসের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কও রাখি না।

প্রশান্ত বললে, পুলিসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেই বা ভয় করব—এ আপনি ভাবছেন কেন?

না—তাও ভাবি না। আপনাকে ওদের মাঝখানে কেমন মিস্‌ফিটেড মনে হতেই ডাকলাম।

প্রশান্ত অল্প একটু হেসে বললে, চলুন—কোথায় যাবেন।

বাইরের ঘরে প্রশান্তকে বসিয়ে সুনীতি কর আর সকলকে বাইরে যেতে বললেন। সকলে বাইরে গেলে বললেন, চা খাবেন?

প্রশান্ত বললে, না—থাক এখন। ঘরের চারদিকে সে কৌতূহলী দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। তিন-রঙা পতাকা—মহাত্মা গান্ধী, জবাহরলালের ছবি—বন্দেমাতরম্ গানের চার লাইন তুলোর অক্ষরে কাঁচের ফ্রেমে আটকানো—একটা চরকা—একরাশ তুলো—খানিকটা কাটা সুতো জড়ানো রয়েছে লাটাইয়ে—তার তকলি গোটা কতক পড়ে রয়েছে এলোমেলো ভাবে। মোট কথা ঘরটাই এলোমেলো—বিশৃঙ্খল।

সুনীতি কর বললেন, আপনি কত দিন হ'ল যোগ দিয়েছেন ওদের পার্টিতে? মাপ করবেন…

প্রশান্ত বললে, এ অত্যন্ত সোজা কথা—জবাবও এর সোজা। খুব অল্পদিন হ'ল…

তার কথা শেষ না হতেই সুনীতি কর সোৎসাহে মাথা নেড়ে বললেন, আমি তা অনুমান করেছি।

প্রশান্ত বললে, পার্টিতে যোগ দিয়েছি বললে ভুল বলা হবে—ওঁদের কাজ আমার ভাল লাগে…

সুনীতি কর বললেন, আপনাদের মত দেশভক্ত যুবকদের দেশের কাজ ভাল ত লাগবেই। কিন্তু কংগ্রেসে যোগ না দিয়ে…

প্রশান্ত হেসে বললে, তাতে আর ক্ষতি কি—ওঁরাও ত ক্যাপিটালিজমের শত্রু।

সুনীতি কর হাসলেন। জানালার ধারে উঠে গিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে চেয়ারে এসে বসলেন। বললেন, জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে কংগ্রেসই হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যার শক্তিকে শাসকরা স্বীকার করেন।

প্রশান্ত বললে, তাই বা কেমন করে বলি। মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে তা হলে ইন্টারিম গবর্ণমেন্ট গঠিত হ'ত।

সুনীতি কর বললেন, কিন্তু একথাও ত এ্যাটলি ঘোষণা করেছেন—মেজরিটির অগ্রগতি মাইনরিটি বন্ধ করতে পারবে না।

প্রশান্ত বললে, তা হলে—কংগ্রেস যখন ১৬ই মের ভাষ্য মেনে নিলে—তখন লীগকে এর মধ্যে পুরে দেবার চেষ্টা করছেন কেন?

সুনীতি কর বললেন, এই চেষ্টার মধ্যে আমরা দেখছি ব্রিটিশ ডিপ্লম্যাসি। গান্ধীজী বলেন—ওদের আন্তরিক ইচ্ছাকে বিকৃত করে ধরা সত্যাগ্রহীর নীতিতে বাধে।

আপনি কি মনে করেন?

সুনীতি কর বললেন, ব্যক্তিগত মনে করা-করির কোন মূল্য নেই—আমাদের চেষ্টা যাতে সফল হয়—সমবেত ভাবে সেই চেষ্টা করাই হ'ল ঠিক পথ। একটু থেমে বললেন, তুমি বুদ্ধিমান্—একথা নিশ্চয় বুঝেছ গান্ধীজী আশাবাদী। রাজনীতির ক্ষেত্রে আশাবাদ হ'ল সবচেয়ে দামী কথা।

সুবিধাবাদ বলতে পারেন। প্রশান্ত হাসল।

যাই হোক—এখন কথা হচ্ছে ক্ষমতা যা হাতে পাচ্ছি তা আদায় করে নিয়ে আরও ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করা উচিত নয় কি। আর তা করতে হলে—একটি শক্তিশালী দল গড়া উচিত—সব শক্তিকে এক জায়গায় এনে—অর্থাৎ সহযোগিতার দ্বারা ক্ষমতা লাভ…

প্রশান্ত বললে, তা হলে কোন দলকে বাদ দিলে চলবে না। মাইনরিটি বলে কাউকে অগ্রাহ্য করে সর্ব্বভারতীয় শাসন-পরিষদ গড়া যাবে না।

কংগ্রেস ত আপোষের জন্য বহুদূর এগিয়েছে।

বাজারদর কষাকষিকে এগুনো বলা ঠিক নয়…

সুনীতি কর বিচলিত কণ্ঠে বললেন, তা হলে—পাকিস্থান কায়েম হোক ভারতবর্ষে এটিই চাইব আমরা। দ্বিতীয় অল্‌ষ্টার কি প্যালেষ্টাইন গড়ে ওদের সুযোগ দেব অছিগিরির?

প্রশান্ত বললে, মিশরও কত দিন আগে এই শাসন-সংস্কার মেনে নিয়েছিল—কিন্তু বৃটিশ সৈন্য অপসারণের কথা উঠলে জাতির নাবালকত্ব নিয়ে আজও তর্কবিতর্ক হয়। মাপ করবেন কর-মশায়—যাঁরা আমাদের সৎ ছেলে দেখে ভাল চরিত্রের সার্টিফিকেট দেবেন—কিংবা সাবালক বলে ঘোষণা করবেন—তাঁরা যে জীবন-মরণের স্বার্থে জড়িয়ে আছেন এর মধ্যে। আমরা সুবোধ হলেও—তাঁদের নির্ব্বুদ্ধিতা কোন দিন প্রকাশ পাবে না।

সুনীতি কর বললেন, তা হলে বলছ নানান দলে নানান মতে ভাগ হয়ে থাকব আমরা। আমরা যুদ্ধ করব কিন্তু একতার নীতি মানব না। বলব স্বাধীনতা চাই—অথচ রকম রকম শাসনতন্ত্র রচনা করব। হঠাৎ তিনি বললেন, কংগ্রেসকে শক্তিমান্ বলে স্বীকার কর কিনা?

করি।

তা যদি কর—হঠাৎ তিনি চেয়ার ছেড়ে প্রশান্তর সামনে

এসে ওর একখানা হাত চেপে ধরলেন ; তা হলে কংগ্রেসে যোগ দিতে তোমার আপত্তি কি!

প্রশান্ত কোন কথা বললে না। খানিক নীরবে ওঁর মুখের পানে চেয়ে হাতখানি তার মুক্ত করে নিলে। বললে, আমাকে মেম্বার করে নেবার জন্য আপনার এই চেষ্টাকে স্নেহ বলেই মানছি—কিন্তু...

এর মধ্যে কিন্তু নেই—তুমি মাত্র অল্পদিন হ'ল এ পাড়ায় যাতায়াত করছ—দুর্নামকে ভয় করতে বলছি না—কিন্তু অসত্যকে ঘৃণা করবে না কেন। সব বাঁধন কাটা মানেই স্বৈরাচার নয় এ যেমন স্বীকার কর তেমনি বাঁধন না কেটেও কলুষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করা যায় এটাও মান তো?

প্রশান্ত কিছুই না বুঝে ওঁর পানে চেয়ে রইল। এ কথা বলার তাৎপর্য্য কি?

সুনীতি কর বললেন, ওই মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। রায় সায়েবের মত নীতিবাগীশ আমি নই—তবু ওদের সমর্থন করতে পারি নি।

মানুষের রটনা সব সময়ে সত্য হয় না।

সুনীতি কর বললেন, প্রমাণ দেওয়াটা আমার পক্ষে শক্ত নয়, তবে সম্মানজনক নয় বলেই তা দেব না। ওদের বাড়ির দুখানা বাড়ি পরে—শৈলেশ্বর বোস থাকেন—তাঁর ছেলে মন্টু—নিজের কথায় অসঙ্গতি বুঝতে পেরে তিনি সহসা চুপ করলেন।

প্রশান্ত উৎসুক হ'ল যথেষ্ট। শুভা সম্বন্ধে—নিজেই সে নিঃসংশয় পীড়া অনুভব করে কেন? একান্ত করে পাওয়ার মধ্যেই কি এই ঈর্ষাবাদ লুকানো থাকে। পুরুষের সম্পত্তি নারী—এই পৌরুষ বোধের উগ্রতায় তার যুক্তি হয়েছে আবিল। নারীচিত্ত জয়ের সাধনা আর কিছুই নয়—ধন সঞ্চয়ের নেশার মতই এক আদিম প্রবৃত্তি।

চেয়ার ছেড়ে উঠতেই তিনি বললেন, কিছু মনে করলে না তো ভাই।

প্রশান্ত মুগ্ধ চোখে তাঁর পানে চেয়ে মাথা নাড়লে। এই মিষ্ট সম্বোধনের পর মনে করাচ লে না কিছু। ইচ্ছে হ'ল পা ছুঁয়ে একটি প্রণাম জানিয়ে আসে। লজ্জায় সঙ্কোচে তাও পারলে না।

১৭

অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলছিল প্রশান্ত। মনের মধ্যে বিচার চলছে—কোন্‌টা শ্রেয়। উনিশ-শো বিয়াল্লিশের আগষ্টে বোম্বাইয়ে 'কুইট ইণ্ডিয়া' প্রস্তাব পাশ হবার পরমুহূর্ত্তে জেলের কটক খুলে গিয়েছিল—আন্দোলন চালাবার মত বাইরে ছিলেন না কেউ। গেল বার এমনি সময়ে জার্ম্মেনী ভেঙে পড়েছিল—জাপানের বুক লক্ষ্য করে প্রতিপক্ষ তুলেছিল শক্তি-শেল। তার পর আণবিক বোমার প্রথম পরীক্ষা হ'ল হিরোসীমার অর্দ্ধেক ধ্বংস করে—আর কয়েক লক্ষ প্রাণ আহুতি দিয়ে। তার পর নাগাসাকিতে হানা দিল মৃত্যুদূত ; জাপান নতজানু হ'ল। জগৎ থেকে ফ্যাসিবাদ নিঃশেষিত হ'ল। জার্ম্মেনী হ'ল চার টুকরো—জাপান গেল আমেরিকার উদরে। বিশ্বশক্তি-পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হ'ল মার্কিন। কংগ্রেস তখন কারা-প্রাচীরের বাইরে। দেশের মধ্যে তার শক্তি ও প্রভাব বেড়েই চলেছে দিন দিন। নির্ব্বাচন-যুদ্ধে কংগ্রেস হ'ল জয়ী। তার পর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি (আই, এন, এ-র) দিল্লীর লাল কেল্লায় বিচার হ'ল যার নায়কদের। লোকচক্ষুর সামনে থেকে উঠে গেল রহস্যের যবনিকা—দীপ্ত তেজে প্রকাশিত হলেন দেশবন্দিত নেতা সুভাষ বসু। দু'শো বছরের ভুলে-যাওয়া-সুর ফিরে এল কণ্ঠে—অবরুদ্ধ কণ্ঠ ফিরে পেল ভাষা—ধ্যানের দেবতা মূর্ত্তিতে উঠলেন জেগে।

কংগ্রেস ঘোষণা করলেন: আমরা স্বাধীনতার দ্বার-দেশে। সাম্রাজ্যবাদ এখনও তৈরি হচ্ছে শেষ আঘাত দেবার জন্য। শেষ আঘাতই সেটা, কারণ এর নাভিশ্বাস হয়েছে। সকলে এক হয়ে, ঠেকাও সে আঘাত, ধ্বংস হোক দানবটা।

দানবের মায়া, সে বড় ভয়ঙ্কর। রাজনীতিতে সততার স্থান কতটুকু সে বিচার ইতিহাস করেছে বার বার। নৈরাজ্য-বাদ রাজনীতির অঙ্গ নয়। আজকের ত্যাগ, আগামী কালের পাওয়ার সঙ্গে, লাভ-ক্ষতির জের টানছে। সে হিসাব-নিকাশের জের, এক পাতা থেকে আর এক পাতায়, এক যুগ থেকে আর এক যুগে, টেনে চলেছে সবাই। তার সাক্ষ্য-প্রমাণও আছে ইতিহাসে। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, পথ বেছে নিতে ভুল করলে সে অতলে যাবে তলিয়ে। বিশ্ব-বিপ্লবের ভূমিকায় আজ যাঁরা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ ক'রে, নতুন বিশ্ব রচনার স্বপ্ন দেখছেন, তাঁদের সামান্য-তম ভুলও ক্ষমা করবে না মহাকাল। এক হাতে খর্পর আর এক হাতে বরাভয় শান্তির আশ্বাস জানাচ্ছে। কিন্তু এ বরাভয় বিশ্ব-পালিনীর মাতৃপাণি-প্রসূত নয়, এ বজ্র নিক্ষেপের ভয় দেখিয়ে শান্তি রক্ষার প্রয়াস-মাত্র। চতুর রাজনীতিবিদ্‌ এই শুভ মুহূর্ত্তেই যথাসম্ভব ক্ষমতা বাড়িয়ে নিচ্ছেন ; নিরাপত্তার নামে, সাম্রাজ্যের শৃঙ্খলে গেঁথে ফেলছেন, স্বামীহীন ভূমি-ও সমুদ্র-স্বত্ব।

ভাবতে ভাবতে চলেছিল প্রশান্ত। মাথার উপর কখন ঘনিয়ে এসেছে মেঘ, ও টের পায় নি। বর্ষাকালের আকাশ, বিনা সতর্কতায় বর্ষণ ওর রীতি। হঠাৎ বৃষ্টি চেপে এল। পথের ধারে বড় মত একটা গাড়ী-বারান্দার নীচেয় ছুটতে ছুটতে আশ্রয় নিলে, মানুষ আর পশু। বায়ুবেগে বৃষ্টির ছাঁট যতই অগ্রসর হচ্ছে, মানুষ আর পশুতে ততই জমাট বাঁধছে।

কি দাদা, রেলোয়ে ষ্ট্রাইকটা আর হ'ল না?

না—সাড়ে চার টাকা ইণ্টারিম রিলিফ দেবে, এ্যাড-জুডিকেশনে কতক বিষয় যাবে। পয়লা জানুয়ারী থেকে মাইনে বাড়বে।

তবে আর কি, সাড়ে চার টাকায়, সব দুঃখ হরিপাল যাবে তো?

আমাদের পোষ্টাল ষ্ট্রাইকের ঠেলাটা বুঝবে। এ আর রেলোয়ে ইউনিয়ন নয়, রীতিমত হাংরি ব্যাচ পরিয়ে ষ্ট্রাইক নোটিশ দেয়া হয়েছে।

ট্রাম কোম্পানী কি বলে?

সে দিন য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটুট হলে আমাদের মীটিং হবে—কলেজ স্কোয়ারে দু'দলে দেখা। খুব ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ করা গেল। ওরা বললে, দাবী ছেড় না ভাই, হুমকি চালাও। লাখ লাখ টাকা কামিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে কোম্পানী, ইয়ারকি আর কি!

হবে কি, রক্তারক্তি কাণ্ড।

এমনিতেই না খেতে পেয়ে মরচি, না হয়—

শুনেছ দাদা, মুসলীম লীগ মন্ত্রী মিশনের খসড়া বাতিল করে দিলে।

কাগজে বেরিয়েছে?

দেখো আমার কথা যদি সত্যি না হয়—

দুস্—তোরা সব ক্ষুদে সত্যপীর কিনা! বাতিল করাই উচিত। এ, বি, সি গ্রুপ করে ভারতবর্ষকে টুকরো করে ফেলতে পারলেই তো—আরও দুশো বছর রে দাদা।

একটা পাওয়ারফুল সেণ্টার—

দুস্—পাওয়ারফুল! পলিটিক্‌স্ এ আমরা তো নাবালক রে দাদা। ওদের বুঝতে পারবি! বলে এক একটা আইনের ভাষা বুঝতেই বড় বড় মাথা সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে। দশ-বারো দিন ধরে মীটিং করে তবে রেজলুশন পাশ করছে। আমাদের মত গোলা লোকরা কি করবে শুনি?

বাইরে যাবার উপায় নেই—খোলা গাড়ী বারান্দার নীচেয়—সাধারণের রাজনীতির বিতর্ক জমে উঠল। বেশিক্ষণ চলল না রাজনীতি। মাছ, আনাজপাতি, সরষের তেল, আপিসের মাইনে, এইসব স্তরে নেমে এল বাদানুবাদ। প্রশান্ত স্বীকার করলে, এই স্তরেই আলোচনা বাস্তব রূপ পেয়েছে। স্বাধীনতার অর্থ সাধারণে বোঝে এই মাপকাঠির সাহায্যে। যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেশগুলিতে প্রাণ ধারণের সমস্যা এমন তীব্র হয়ে উঠেছে কি? হাজার হাজার লোককে বেকার বানাবার আয়োজন চলেছে। তারা বলছে এ কি সর্ব্বনাশ! এ জগতে আমাদের টিঁকে থাকবার অধিকার দাও। তোমাদের জন্য আমরা সর্ব্বস্ব দিয়েছি—আর তোমরা—

বিক্ষোভ এই কারণেই প্রবল হয়েছে।

জীবন বাঁচাবার কোন্ পথ? পেটে না খেয়ে বিপ্লব আনা সম্ভব কি? মানি—বেয়নেটের সামনে বুক পেতে দিলাম, লাঠি চার্জকে উপেক্ষা করলাম। উত্তেজিত মুহূর্ত্তে শ্লোগান আউড়ে গলা ভেঙ্গে ফেলে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে বুক একবারও কাঁপল না। কিন্তু এই মৃত্যু—! অন্ন-বঞ্চনার অভিনয় বস্ত্র-বঞ্চনার নীতি অন্তরালে চলছে সমৃদ্ধ জীবন-প্রবাহ কোটিকে মেরে গুটির অতিকায় হবার সাধনা—এর প্রতিকার কোথায়? শুধু মীটিং করে ঈর্ষ্যাত্মক শ্লোগান আউড়ে তাল ঠুকে অত্যন্ত অসহায়ের মত পথ দিয়ে শোভা যাত্রা করে গেলেই কি ধনিকতাবাদ বিপন্ন হবে?

একদিন শুভার সঙ্গে এই নিয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল। ও বলেছিল, ছলে বলে অথবা কৌশলে—এই নীতি নিতে হবে। উপার্জ্জন প্রাণ বাঁচাবার জন্য করতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছিলে তোমরা।

নিয়েছি তো। পুঁজিবাদ ধ্বংস করবার সঙ্কল্প আমাদের—শক্তি সঞ্চয়ের দরকার নেই?

কিন্তু নীতিবিরুদ্ধ।

আমাদের নীতি হ'ল বেঁচে থাকা ও বাঁচিয়ে রাখা। ক্ষমতা লাভ হ'ল আসল বস্তু। ভাল কথারও দাম থাকে না—জীবনের সঙ্গে যদি তার তাল না মেলে।

যথা?

'পরদ্রব্য অপহরণ করিও না'—সর্ব্বোত্তম নীতিকথা। কিন্তু অনাহারগ্রস্তের কাছে এ নীতির কোন দাম নেই।

তা বটে—আমাদের কোন নেতা সেদিন বলেছেন ক্ষুধার্ত্ত মানুষকে ভগবানের নাম দিয়ে ভোলান মিছে। কিন্তু এই ভাবে চেঁচিয়ে ওদের শাসন করতে পারবে?

শুভা হেসেছিল, ভুল বুঝো না প্রশান্ত—শ্লোগান আর কিছুই নয়, সকলকে এক করার মন্ত্র। শোভাযাত্রার অর্থও হ'ল ওই। ধনী তার সব ক্ষমতা দিয়েও এ শক্তিকে ঠেকাতে পারবে না।

আমাদের দেশে—ধনীরা এতে কৌতুক বোধ করে না কি?

হাঁ, তাদের আশ্রয়দাতা হ'ল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। গুলি-গোলা রাইফেল মেসিনগান বোমারু নিয়ে ওদের দম্ভ। সংশয় এই নিয়ে তো?

শুধু প্রাণ দিয়ে লাভ কতটুকু···

শক্তি—শক্তি প্রশান্ত।

ওর হাসিতে প্রশান্ত কৌতুক বোধ করেছিল। কিন্তু সে দিন আর এই দিনে তফাৎ অনেকখানি। ময়লা ছেঁড়া ধুতি কামিজ পরে খালি পায়ে এক মাথা রুক্ষ চুল উড়িয়ে—শিরা আকীর্ণ-শীর্ণ হাতে নিশান দোলাতে দোলাতে প্রাণ ধারণের দাবি জানিয়ে চীৎকার করতে করতে রাজপথ দিয়ে যায় যে সব ছন্নছাড়া দুর্গতের দল তারা আজ স্রোতের মুখে শ্যাওলা কিংবা ঝড়ের মুখে তুলো নয়। তারা জন্মান্তরের পাপকে অস্বীকার করে আর অদৃষ্ট মানে না। নিজের কর্ম্মের ফল পুরোপুরি ভোগ করতে চায়। হ্যাংলা কুকুরের মত দু-টুকরো মাংস বা হাড়ের লোভে ল্যাজ নেড়ে ছুটে আসে না আমাদের

খিড়কীর দুয়োরে। হাঁ, শক্তি ওরা লাভ করবে ক্রমশঃ। ওদের চীৎকারে কেঁপে উঠছে প্রাসাদ-ভিত্তি—মর্ম্মর হর্ম্মের সুখশয্যাশ্রিত লক্ষ্মীর দুলালরা। ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হয়ে এল। দিন আগত ঐ।

সামনে দিয়ে একটা ছোট মত শোভাযাত্রা গেল। কোন্ ময়দাকলের না পটারির শ্রমিকরা অভিযোগ জানাচ্ছে। কুড়ি টাকা মাইনেতে এরা দুদিন আগেও মালিকের সেবা করেছে, মাগ্‌গি ভাতা স্বরূপ চেয়েছিল আর পাঁচটি টাকা। মালিক সাফ জবাব দিয়েছে। যুদ্ধের বাজারে তার এক লাখ দশ লাখে দাঁড়িয়েছে—সুতরাং মাসখানেক কারখানা বন্ধ রেখে এদের দাবিকে নরম করবার আশা সে করবে না কেন। শ্রমের মূল্য শ্রমিকদের জীবন ধারণ করবার জন্ম দেওয়ার রীতি নেই। ওরা বেশী চীৎকার করলে—কারখানার একাংশে একটা ঘরে ডাক্তারখানার ব্যবস্থা হয়—একটা ইস্কুল বস্তির মাঝখানে খুলে দেওয়া হয়—আর সামান্ত মাত্র কনসেশনে রেশন দেওয়ার প্রথা চালু করা হয়।

ছিটেফোঁটা দাক্ষিণ্যে—আকাশ-জোড়া দারিদ্র্য নিবারিত হয় না। শ্রমিক দেখায় ধর্ম্মঘটের হুমকি—ধনিক কাগজে বার করে তার দাক্ষিণ্যের সুবিস্তৃত বিবরণ। জনসাধারণ নামক এক তৃতীয় পক্ষের সহানুভূতি আকর্ষণ করবার জন্ম এই প্রচেষ্টা। জনসাধারণকে ভয় করবার হেতু—ওদের কাছ থেকে তিল কুড়িয়ে এরা তালে পরিণত হয় পাছে। মুনাফার নেশা যার লেগেছে—তার মৌতাতটুকু সে ছাড়বে কেন। শক্ত মুঠো খুলবার জন্ম হাতুড়ির ঘা পড়বে দমাদম—। এ যুদ্ধে কেহ নহে ঊন।

—দুনিয়ার মজদুর এক হও—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

পথে দেখা হয়ে গেল পুরোনো এক বন্ধুর সঙ্গে। জলে ছপ ছপ করতে করতে কোথায় চলেছ হে? বন্ধু জিজ্ঞাসা করলে।

কোথায় জানে না সে। কলকাতার নতুন রূপ দু'চোখ ভরে দেখতে দেখতে সে চলেছে। সিনেমার গেটে তেমন ভিড় নেই, দোকানের পণ্যে নেই বৈচিত্র্য—ক্রেতার চোখে নেই ক্রয়ের কৌতূহল। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তি—স্বস্তিবচন উচ্চারণ করলেই আসে না।

বন্ধু ওর পথ রোধ করলে। চল—চা খেয়ে আসি। চলতে চলতে বললে, কোন আপিসে কাজ করিস? রিট্রেঞ্চমেন্টের কাঁচির পাশ ঘেঁসে আছিস তো?

না—ওসব বালাই নেই।

সাবাস—! ধর্ম্মঘটের পাকে পড়বিনে তা হলে।

ধর্ম্মঘট খারাপ কিসে? ও জিজ্ঞেসা করলে।

খারাপ বলছি!...বন্ধু শব্দ করে হাসলে। ধর্ম্মঘট কারও কারও কাছে শাপে বর। হাসি থামিয়ে বললে, ধর্ম্মঘটের আগে পাচ্ছিলাম আশী—পরে দু'শো যোগ হয়েছে। অথচ ধর্ম্মঘটীদের সঙ্গে পথে পথে হল্লা করে বেড়াই নি—ওদের ইউনিয়নে এক পয়সা ঠেকাই নি—

প্রশান্ত বললে, ব্ল্যাক শিপ।

না—তাও নয়। শুধু প্রমাণ করে দিয়েছি—আশী টাকাতেও আমার দিব্যি বলে—, কলে দু'শো টাকা মাইনে বেড়ে গেল। এটা সত্যি কথা বলার পুরস্কার...আরে ওদিকে কোথায়?

এই দিকেই যাব।

চা খাবিনে?

প্রশান্ত ততক্ষণে অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

হাঁ, এরাও আছে। বেশী মাত্রায় হয়ত আছে। এরা সর্ব্বদাই সুযোগ খুঁজছে—নিজেকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ। এদেরও নেশা জমেছে। ক্ষমতা-মদের কিংবা ধন-মদের নেশা।

আর একজন বন্ধুকে মনে পড়ল। গেল বার কি যেন এক প্রতিবাদ-সভায় যেতে লাল ঝাণ্ডা ধরে অপরিমিত চীৎকার করতে করতে শহর প্রদক্ষিণ করেছিল সে। তার পর সে হ'ল এক ইউনিয়নের নেতা। তার পরে নিলে রেল আপিসে চাকরি। সেখানকার ইউনিয়নে দাঁড়াল পাণ্ডা হয়ে। এক সপ্তাহ আগে দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। পায়ে চকচকে জুতো, পোষাক-পরিচ্ছদ কণ্ট্রোলে কেনা নয়, রীতিমত সুট-পরা নেকটাই আঁটা, হ্যাট বগলে, মুখে প্রকাণ্ড বর্ম্মা, হাতে ইংরেজি কাগজ একখানা। নড করে বলেছিল, একটা শুভ সংবাদ দিচ্ছি...ডিপার্টমেন্টে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট অবস্তু অফিসিয়েট করছি চ'—চা খাবি।

চা খাবার প্রবৃত্তি হয় নি প্রশান্তর, বন্ধু এতকাল যা করেছে—তা নদীপারের আয়োজন মাত্র। শ্রমিকরা যা চায়, ও চেয়েছিল তাই। ভাল থাকা, ভাল খাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদে সাচ্ছল্য জীবনের চারিপাশে প্রাচুর্য্য। কিন্তু—প্রবৃত্তির সীমা টানছে কে? সে অন্তত টানতে পারে নি। সাধারণকে ডিঙিয়ে ও তাই অসাধারণ হতে পেরেছে।

হাঁ এরাও আছে। যাত্রাপথের অনেক বাধা—লক্ষ্যে পৌছানোর বিলম্বিত পদক্ষেপ। চলতে চলতে হাতছানি দিয়ে ডাকে প্রাসাদ, মোটর তার সুখাসনের গর্ভে কুটিয়ে তোলে যাত্রা-বিরতির স্বপ্ন। এরা ভিন্ন স্রোতে ভিন্ন দিকে ভেসে গেলে কোন ক্ষতি ছিল না—তবে সাধারণ শ্রমিককেন্দ্রে প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে অবিশ্বাস আর সন্দেহকে খাড়া করে যাত্রাপথ বিঘ্নিত করে—এই তো ভয়ের কথা।

অবশেষে পুরাতন মেসে ফিরে এল সে। বন্ধুরা অবাক হয়ে বললে, এ ক'দিন ছিলে কোথায় হে?

প্রশান্ত বললে, রান্না না হয়ে থাকে তো ঠাকুরকে বল—খাব এ বেলা। শোবার জায়গা পাব তো?

সুশীল বললে, সেজন্তে ভাবতে হবে না—আমার সীটেই কুলিয়ে যাবে'খন। একখানা চিঠি এসেছে—ক'দিন আগে।

চিঠিখানা পড়ে প্রশান্ত হাসলে।

সুশীল জিজ্ঞাসা করলে, খবর কি?

চাকরি। বাবা মাসখানেক আগে তাঁর এক বন্ধুকে অনুরোধ করেছিলেন···তার জবাব। ইনি একটা ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার, আর এনামেলের কারখানা খুলেছেন বছর চারেক হ'ল।

লেগে যাবে। না—পুঁজিবাদীর সঙ্গে···

মাইনেটা বোধ হচ্ছে ভালই দেবে। একবার ইন্টারভিউ দিয়ে আসি।

এখনই?

শুভস্য শীঘ্রম্!

যুদ্ধে কমলা যাঁদের কৃপা করেছেন, ইনি তাঁদের অন্যতম। প্রকাণ্ড প্রাসাদ, গেটে রাইফেলধারী গুর্খা প্রহরী, বাইরের একতলা ঘরগুলোতে আপিস বসেছে, টাইপ মেসিনের খটাখট শব্দ। উর্দ্দিপরা চাপরাসীরা ফাইল বগলে, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে ছুটোছুটি করছে।

পদোচিত মহিমায় অফিসারের খাসকামরা বিরাজ করছে একধারে। সুইং ডোরের পাশে সুদৃশ্য ভেলভেট পর্দ্দাটা গুটোনো রয়েছে, চকচকে পালিশ করা কাঠের পার্টিশন, পার্টিশনের মাথায় ফিকে নীল রঙের ধোঁয়া আলস্যভরে নানা আকৃতিতে ভাসছে—মন্থর বায়ু মিষ্ট একটি গন্ধে নাসিকাকে করছে উতলা। টুলে বসে ঢুলছিল একটা উর্দ্দিপরা সুশ্রী বয়, সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চাই? কার্ড দিন।

কার্ড তো নেই, স্লিপে নাম আর পিতৃপরিচয় লিখে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক হ'ল।

একে অভ্যর্থনা বলাই সঙ্গত। বাপের বয়সী ষাটোত্তীর্ণ বৃদ্ধ, চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ওর হাত ধরে বিলাতী কায়দায় ঝাকুনি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন। ওকে চেয়ারে বসিয়ে নিজে বসলেন পাশের চেয়ারে। চাপরাশীকে হুকুম করলেন, চা আনতে অর্থাৎ টিফিন। প্রশান্ত অভিভূত হয়ে পড়ল।

তোমার মত উৎসাহী যুবক আমি চাই। বিশ্বস্ত স্নেহ-ভাজন। একটি চিরুণীর কারখানা খুলবার ইচ্ছে আছে, অনিলকে পাঠিয়েছি আমেরিকাতে। হাতে-কলমে কিছু শিখে আসছে, আর প্ল্যান্টস্ আপটু-ডেট মডেলের, দুটো কারখানার জন্তেই চাই। তার পর ভাবছি কাপড়ের কল—

অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। চা এল, কয়েকখানা কেক, স্যাণ্ডউইচ, অমলেট, টোষ্ট, মাখন এল। ভেলভেটের পর্দ্দাটা টেনে দিয়ে চাপরাশীটা বেরিয়ে গেল। খেতে খেতে তিনি ভবিষ্যৎ কল্পনার কথা বলে যেতে লাগলেন সোৎসাহে।

ষাটোত্তীর্ণ বৃদ্ধ, জরার থাবা কোন প্রত্যঙ্গে স্পষ্ট নয়। হয়ত আঁটসাঁট সুট, হয়ত কর্ম্মোৎসাহ, ধনোপার্জ্জন এ সবে জরাকে ঠেকিয়ে রাখা চলে। কিন্তু চোখে খেলছে যে বিদ্যুৎ তা অনেক যুবকের দৃষ্টিতে বিরল।

দুর্গামোহন অভাবগ্রস্ত নন। সংসার ভারী নয়, পেনসনের আয় সংসার চালিয়ে উদ্বৃত্ত হয়; খাওয়া-পরায় স্বাস্থ্য যাতে বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য তাঁর তীক্ষ্ণ। তবু ষাট তাঁকে স্তিমিত করে আনছে। মেদবহুল দেহের মাংস শিথিল, চলাফেরার বেগ মন্দীভূত, চোখের দৃষ্টিতে ক্লান্তি। অর্থ উপার্জ্জনের উৎসাহই কি মনের পরম রসায়ন।

কেমন তোমাকে পাব তো? আপাতত এনামেল ফ্যাক্টরীর চার্জ্জটা বুঝে নাও। হাঁ—কলকাতার বাইরে, মাইল দশেক দূরে। ওখানেই কোয়ার্টার, মোটর থাকবে একখানা। যখন খুসি কলকাতায় আসবে, বেড়িয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি প্যাড থেকে একখানা কাগজ টেনে নিয়ে ফাউন্টেন পেন দিয়ে খস্ খস্ করে কয়েকটি অঙ্কপাত করলেন তাতে। তার পর প্যাডসমেত সেখানা প্রশান্তের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, আপাতত এই তোমার মাইনে, প্লাস এ্যালাউন্স থার্টি পারসেন্ট। কেমন, অসুবিধা হবে?

প্রশান্ত সত্য সত্যই অভিভূত হ'ল। তিনশো টাকা বেতন আর নব্বুই টাকা ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স। তা ছাড়া কোয়ার্টার, মোটর এবং একটা গোটা ফ্যাক্টরীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। ব্যাপারটা আবুহোসেনীয় জাতীয়। আলনাস্কারের দিবাস্বপ্ন নয় তো? ডান পায়ের জুতোর ডগা দিয়ে বাঁ পায়ের গোড়ালীতে আঘাত করলে ঈষৎ জোরে। পেরেকওঠা জুতোর ঘা খেয়ে পা'টা বুঝি কেটে গেল; জ্বালা করছে।

সম্মতি জানিয়ে সে বাইরে এল। রূপালী জ্যোৎস্নায় নীচের রাস্তা চক্ চক্ করছে, গ্যাসের আলোর নীচেয় তারও নিজস্ব একটি রূপ আছে, অভাবিত মুহূর্ত্তে সে সৌন্দর্য্য সুরার মতই চিত্তে উত্তেজনা সঞ্চার করে। সে যেন তারই জগতে ফিরে এসেছে। স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যে ঝলমল জগতে, প্রাচুর্য্যে আর নির্ভাবনার মধ্যে। টুং টুং ঘণ্টা বাজিয়ে বাঁ ফুটপাত ঘেঁসে একখানা রিক্সা যাচ্ছিল মন্থর গতিতে। প্রশান্ত হাত উঠিয়ে চীৎকার করলে, এই রিক্সা, রিক্সা···

চালক রিক্সা ঘুরিয়ে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, কাঁহা-পর যানে হোগা বাবু?

মেটিয়া কলিজ কা পাশ। বলে দরদস্তর না করেই ও রিক্সায় চেপে বসলে।

রিক্সাওয়ালা বললে, এক রূপয়া।

মিলে গা। রিক্সার গুটানো হুডের আশ্রয়ে মাথা রেখে, আধ-বোজা চোখে ও নিস্পৃহকণ্ঠে বললে। ক্রমশঃ

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

১৮৬১—১৯০৭

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : বংশ-পরিচয়

৯ জুন ১৮৬১ (২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৮) তারিখে কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে কালীপ্রসন্নের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রাখালচন্দ্রের আদি নিবাস ২৪-পরগণার অন্তর্গত ইছাপুর গ্রামে। শৈশবে তিনি অগ্রজের নিকট ভবানীপুরে থাকিয়া স্থানীয় মিশন-স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং উত্তরকালে ঐ বিদ্যালয়েরই শিক্ষকশ্রেণীভুক্ত হন। রাখালচন্দ্র কালীঘাটের কালীমাতার অন্যতম সেবায়েৎ গিরিশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা বেচামণি দেবীকে বিবাহ করেন এবং ভবানীপুরে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী হন। কালীপ্রসন্ন তাঁহার অষ্টম পুত্র। কালীমাতার প্রসাদে জন্ম বলিয়া তিনি পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন—কালীপ্রসন্ন।

শৈশব-শিক্ষা

কালীপ্রসন্ন শৈশবে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ভবানী-পুরের চড়কডাঙ্গা বঙ্গবিদ্যালয়ে তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। কিছু দিন পরে ইংরেজী শিক্ষার জন্য তিনি স্থানীয় লণ্ডন মিশনরী সোসাইটির স্কুলে প্রবিষ্ট হন। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে তিনি ১৮৭৬ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিছু দিন এফ-এ পড়িবার পর কলেজের শিক্ষায় বীতরাগ হইয়া তিনি 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট কাব্য-ব্যাকরণাদি অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি বিদ্যা-ভূষণের নিকট হইতে "কাব্যবিশারদ" উপাধি লাভ করেন।

সাহিত্যানুরাগ

পঠদ্দশা হইতেই কালীপ্রসন্ন মাতৃভাষায় অনুরাগী ছিলেন। ১৮৭৪ সনে 'সোমপ্রকাশ'-কার্য্যালয় ভবানীপুরে স্থানান্তরিত হয়; এই সময়ে কালীপ্রসন্ন পত্রিকা-সম্পাদনে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সহকারিতা করিতেন ('জন্মভূমি' শ্রাবণ ১৩০৮)। তিনি 'সোমপ্রকাশে' কবিতাও লিখিতেন। তাঁহার প্রথম পুস্তক—১৮৭৮ সনে প্রকাশিত 'সভ্যতা-সোপান' নামে সমাজ-চিত্র। গবর্মেণ্টের মতে ইহাতে রাজভক্তির অভাব সূচিত হইয়াছিল ('ক্যালকাটা গেজেট,' ২৯-১-৭৯)। ইহার প্রতিবাদে কালীপ্রসন্ন "নির্দ্দোষীর অপরাধ (সভ্যতা-সোপান প্রণেতার জন্য লিখিত)" নামে যে কবিতাটি 'সোমপ্রকাশে' লিখিয়াছিলেন, তাহার কয়েক পংক্তি এইরূপ :—

ভাবি নাই রাজকুল,
এত দূর ভয়াকুল,
সত্য বাক্যে রাজহৃদে ভয়ের সঞ্চার।
জানি নাই সত্যচিত্র
রাজনেত্রে অপবিত্র,
অসন্তোষ বৃদ্ধিকারী অজ্ঞান প্রজার।
স্বাধীন ইংরাজ মতি
বিচিত্র তাহার গতি
দেশী হওয়া বড় দোষ বুঝিলাম সার॥

সত্য বলিবারে হবে হৃদয়েতে ভয়?
রাজারে কি ভয় মম,
আসুন পুরুষোত্তম,
তাঁর কাছে সত্য কথা বলিব নিশ্চয়।
করুন মস্তকচ্ছেদ
করুন হৃদয় ভেদ
তাহাতে ডরিবে কেন নির্দ্দোষ হৃদয়?
প্লীহা ফেটে মফস্বলে,
কত ভ্রাতা কাল জলে
ভেসে গেল, শুনেছি ত তাহার বিষয়।
সত্য যদি হয় ইহা,
আমারও ফাটুক প্লীহা,
ভীরু বাঙ্গালীর, সত্য, তথাপি আশ্রয়।
মনে জানি দ্রোহী নই
জানি নাকো ভক্তি বই,
তবে কেন ডরিবে এ বঙ্গের তনয়?···('চিন্তাকুসুম')

এই সময়ে কালীপ্রসন্ন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৭৯ সনে ইন্দ্রনাথ ভবানীপুরে বাসা করেন; তিনি লিখিয়াছেন :—"কলিকাতা হইতে ভবানীপুরে আমার বাসা উঠিয়া গেলে পর, ভূধর গঙ্গোপাধ্যায়···প্রভৃতি কতকগুলি যুবক 'পঞ্চানন্দ' বাহির করিবার প্রস্তাব করিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন। বোধ হয়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। যাহা হউক, তাঁহারা কাগজ চালাইবেন, ছাবাইবার সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দেওয়াতে আমি লিখিতে সম্মত হইলাম" ('বঙ্গ-ভাষার লেখক')। ১৮৮০ সনে ভবানীপুর হইতে ১০ সংখ্যা 'পঞ্চানন্দ' বাহির হইবার পর সাময়িক ভাবে উহার প্রচার স্থগিত থাকে। ইন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণা লাভ করিয়া কালীপ্রসন্ন এই সময়ে ব্যঙ্গ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। "ফকিরচাঁদ বাবাজী" নাম গ্রহণ করিয়া তিনি 'পঞ্চানন্দে' "বঙ্গীয় সমালোচক" নামে একটি ব্যঙ্গ-কবিতা প্রকাশ করেন; উহা পুস্তিকাকারেও মুদ্রিত হইয়াছিল।

১৮৮১ সনে কালীপ্রসন্ন ছদ্ম নামে আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে কটাক্ষ করিয়া 'অবতার' নামে একখানি ক্ষুদ্র প্রহসন প্রকাশ করেন। তাঁহার অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা 'মিঠে-কড়া' (এপ্রিল ১৮৮৮)। ইহা রবীন্দ্রনাথের ১ম সংস্করণ 'কড়ি ও কোমলে'র কয়েকটি কবিতাংশের "প্যারডি"। রচনার নিদর্শন-স্বরূপ ইহা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

মথুরায়।
মিশ্রকাফি—একতালা।
(৩৪-৩৬ পৃষ্ঠা পড়িয়া)
দারুণ দৈবের দোষে
পড়িলাম "মথুরায়।"
সুমধুর কথাগুলি
সুললিত পদাবলি
কড়ি কি কোমল বলি ?
—ঠিক করা হ'লো দায়।
দারুণ দৈবের দোষে
পড়িলাম "মথুরায়"
একে রবি তায় কবি,
তায় মথুরার ছবি
তায় প্রাণ খায় খাবি
বাঁশরী বাজে না তায়।
বাজ্ তোর পায়ে পড়ি
বাজ রে কোমল কড়ি
কচুবনে গড়াগড়ি
নহিলে যাইবি হায়!
দারুণ দৈবের দোষে
পড়িলাম "মথুরায়"।
"একবার রাধে রাধে
ডাক্ বাঁশী মনোসাধে"—
শুনে ব্যাকরণ কাঁদে
হেন সন্ধি শুনি নাই!
ব্যাকরণ হারায়েছে
শুধু এক বাঁশী আছে
ভয় হয় কবি পাছে
হারাইয়া ফেলে তাই।
এ শিঙা হারালে পর
কি করিবে কবিবর
কি বাজাবে অতঃপর
ভেবে দুঃখে হাসি পায়।
দারুণ দৈবের দোষে
পড়িলাম "মথুরায়"!!

সাময়িক-পত্র সম্পাদন

'প্রকৃতি'।—কালীপ্রসন্ন ১৮৭৯-৮০ সনে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার-প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা'র মন্দিরে স্বেচ্ছানুরূপ বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন। বাংলায় বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকার অভাব অনুভব করিয়া তিনি ১৮৮০ সনের ১৯এ এপ্রিল (বৈশাখ ১২৮৭) ভবানীপুর সুধাকর-যন্ত্র হইতে 'প্রকৃতি' নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, পত্রিকাখানি দীর্ঘজীবী হয় নাই।



কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

'এণ্টি-খ্রীষ্টিয়ান'—মিশনরীরা হিন্দুধর্ম্মের নিন্দাসূচক বক্তৃতা ও পুস্তিকাদি প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। ইহা কালীপ্রসন্নের নিকট অসহনীয় ছিল। তিনি খৃষ্টধর্ম্মের দোষ প্রদর্শন করিয়া মাঝে মাঝে বক্তৃতা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ১৮৮২ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি ভবানীপুর হইতে *Anti-Christian* নামে ২৪ পৃষ্ঠার একখানি মাসিকপত্রও প্রকাশ করিয়াছিলেন। পত্রিকা-প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি প্রথম সংখ্যায় লেখেন :—

"Fully aware that the thunderbolts of hostile reception and adverse criticism will fall upon its devoted head, the Anti-Christian comes boldly forward to expose the absurdities, inconsistencies, errors, and immoralities of Biblical fictions."

'এণ্টি-খৃষ্টিয়ান' অনিয়মিতভাবে প্রায় দুই বৎসর চলিয়াছিল; ইহার ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যার প্রকাশকাল—২ ডিসেম্বর ১৮৮৩। পর-বৎসর কালীপ্রসন্ন ইহার প্রচার রহিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন 'এণ্টি-খৃষ্টিয়ানে' মুদ্রিত কতকগুলি প্রবন্ধ (Evils of Imparting Christian Education to Tender Minds, Eternal Damnation,

The Faults and Frailties of Jesus Christ, the son of Mary and * * * ? প্রভৃতি) পুস্তিকাকারে পুনর্মুদ্রিত করিয়া, এবং বাংলাতে 'অনন্ত নরক', 'খৃষ্টের চরিত্র' প্রভৃতি পুস্তিকা রচনা করিয়া বিনামূল্যে প্রচার করিয়াছিলেন।

'কস্‌মোপলিটান'—কালীপ্রসন্ন ১৮৯০ সনের জানুয়ারি মাসে *The Cosmopolitan* নামে আর একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ইহা ভবানীপুরে স্থাপিত তাঁহার পার্থিব যন্ত্রে (Secular Press) মুদ্রিত হইত। 'কস্‌মোপলিটান' আড়াই বৎসর চলিয়াছিল। ইহার ৩য় খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যার প্রকাশকাল—২৪ জুলাই ১৮৯২।

* * *

কালীপ্রসন্ন এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত পণ্ডিত অযোধ্যানাথের (মৃত্যু: ১১-১-৯২) 'ইণ্ডিয়ান হেরল্ড' (১৮৮১?), এবং কলিকাতার 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় বিভাগে কিছু দিন কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি অল্প দিন 'বঙ্গ-নিবাসী' সংবাদপত্রও পরিচালন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

'হিতবাদী'—১৮৯১ সনের ৩০এ (?) মে যৌথ মূলধনে 'হিতবাদী' নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রথম প্রচারিত হয়। "যাঁহারা ইহার জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমল বাবু, সুরেন্দ্রবাবু ও নবীনচন্দ্র বড়ালই প্রধান।" আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ইহার প্রধান সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-বিভাগের সম্পাদক ছিলেন। কিছু দিন পরে পত্রিকাখানির অবস্থা শোচনীয় হয়। এই সময়ে কালীপ্রসন্ন, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ ও অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায়, উহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্পাদনায় 'হিতবাদী'র ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—২১ মে ১৮৯৪ (৮ বৈশাখ ১৩০১)। পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও কর্ম্মতৎপরতাগুণে কালীপ্রসন্ন 'হিতবাদী'কে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে পরিণত করিয়াছিলেন।

২৪ জুলাই ১৮৯৬ তারিখের 'হিতবাদী'তে "রুচি-বিকার" নামে একটি প্রাপ্ত কবিতা মুদ্রিত করায় রাজদ্বারে তাঁহার বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ উপস্থিত হয়। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কালীপ্রসন্ন "রুচি-বিকার" রচয়িতার নাম আদালতে প্রকাশ না করিয়া সকল দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। বিচারের ফলে তাঁহার ৯ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়; কিন্তু ৫ মাস পরে—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিলী উৎসব উপলক্ষে (জুন ১৮৯৭) তিনি মুক্তিলাভ করেন।

হিতবাদীর সংস্রবে কালীপ্রসন্ন 'হিতবার্ত্তা' নামে একখানি হিন্দী সাপ্তাহিক ও হিতবাদীর একটি দৈনিক সংস্করণও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এগুলির প্রচার রহিত হয়।

সাংবাদিক হিসাবে কালীপ্রসন্নের বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী ছিলেন, স্বীয় মত প্রকাশে তেজস্বিতার পরিচয় দিতেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ, কঠোর সমালোচনা ও তীব্র ভাষা প্রতিপক্ষ ও দেশ-বৈরীর চৈতন্য সম্পাদনে তৎপর ছিল। সুরেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে কালীপ্রসন্ন সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

> . . . one of the ablest and most patriotic journalists, who wielded the resources of our language with a power that made him the terror of his enemies and of the enemies of his country.—*A Nation in Making* (1925).

'সাহিত্য-সংহিতা'—১৯০০ সনের ১২ই মার্চ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের উদ্যোগে 'সাহিত্য-সভা'র প্রতিষ্ঠা হয়। সূচনা হইতেই কালীপ্রসন্ন সাহিত্য-সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে সাহিত্য-সভার মাসিক পত্রিকা 'সাহিত্য-সংহিতা' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "অবতরণিকা" অংশ তাঁহারই রচনা; তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"দেশবিদেশের চিন্তাপ্রসূত ফলে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টিসাধন কার্য্য বড়ই দুষ্কর। মহান্ধতমসে সমাচ্ছন্ন জগতে যখন গ্রীক ও রোমক জাতির সভ্যতালোক বিকীর্ণ হয় নাই, যখন আমাদিগের সুসভ্য ও সুশিক্ষিত রাজপুরুষদিগের পিতৃ-পিতামহবর্গ বিচিত্রবর্ণে অঙ্গ চিত্রিত করিয়া ওকবৃক্ষের পূজায় আনন্দোৎসব করিতেন, তখন হিমালয়ের অত্যুন্নত শিখরদেশ হইতে কুমারীণ অন্তরীপের দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত আর্য্য-ঋষিগণের সামগানে বিচলিত হইয়াছে। তখন এই ভারতবর্ষে বিজ্ঞান গণিতের চর্চ্চা হইয়াছে, নীতিগ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার সভ্যতার অঙ্কুর রোপণে ভারতের জ্ঞানক্ষেত্র সুশোভিত হইয়াছে। এখন সেদিন নাই, এখন আমরা অধঃপতিত হইয়াছি—জগৎ উন্নতির সোপানে উঠিতেছে ও উঠিয়াছে। তাই এখন আমাদিগের শিখিবার, চর্চ্চা করিবার, অনুকরণের সময় আসিয়াছে। এ সময়ে, আমাদিগের পূর্ব্বসঞ্চিত পৈতৃক জ্ঞানধন, ও বৈদেশিক মনীষিবর্গের অনুশীলনের ফল—সমস্তই আমাদিগের চক্ষে নূতন বলিয়া প্রতিভাত হয়। সেই জন্য এ দেশে পরিশ্রম করিবার জন্য, কার্য্য করিবার জন্য, আলোচনার পথ প্রসারিত করিবার জন্য যাঁহারা চেষ্টা করেন তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী নহেন—সহযোগী ও সহচর। সেই জন্য আমরা সহচরবর্গের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া যথাসামর্থ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।"

কালীপ্রসন্ন 'সাহিত্য-সংহিতা'র ২য় বর্ষের দশ সংখ্যা (আষাঢ়-চৈত্র ১৩০৮) ও ৫ম বর্ষের (বৈশাখ-চৈত্র ১৩১১) পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই দুই বর্ষের পত্রিকায় তাঁহার গদ্য-পদ্য কয়েকটি রচনা আছে।

রচনাবলী

কালীপ্রসন্নের রচিত গ্রন্থগুলির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে; আমরা যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি তাহার একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিলাম। তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী

প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তক-তালিকা হইতে গৃহীত।—

১। সভ্যতা-সোপান (প্রহসন)। ইং ১৮৭৮ (১৮ সেপ্টেম্বর)। পৃ. ৩৬।

১৮৭৮ সনে ভার্ণাক্যুলর প্রেস এক্ট জারি হইলে ক্ষুব্ধ কালীপ্রসন্ন এই সমাজচিত্র প্রকাশ করেন। ইহা "প্রজাহিতাকাঙ্ক্ষিণাকেনচিদ্বাঙ্গবেনাভিপ্রণীতম্।"

২। দেশাচার (কাব্য)। ১২৮৬ সাল (২ মে ১৮৭৯)। পৃ. ২৪।

৩। লুক্রেশিয়া (খণ্ড-কাব্য)। ১২৮৬ সাল (৯ ডিসেম্বর ১৮৭৯)। পৃ. ৭২+৩ নির্ঘণ্ট।

"গ্রন্থকার বি. এস্. এসোসিয়েশন হইতে বিদেশীয় রমণীর চরিত উপলক্ষ করিয়া এই কাব্য রচনা করায়, মেডাল পাইয়াছেন।"—'আর্য্যদর্শন,' চৈত্র ১২৮৭।

৪। বিষাদ-প্রতিমা (নাট্যগীতি)। ১২৮৭ সাল (৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮০)। পৃ. ২৪।

ইহার বিষয়—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

৫। বঙ্গীয় সমালোচক (কাব্য)। ১২৮৭ সাল (ইং ১৮৮০)। পৃ. ১৮।

"শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী বিরচিত।" বঙ্কিম, হেম, ঈশান প্রভৃতিকে কটাক্ষ করিয়া লিখিত।

৬। অবতার (প্রহসন)। ইং ১৮৮১ (১০ অক্টোবর)। পৃ. ২০।

"স্বনামখ্যাত বাউল শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী বিরচিত।" আচার্য্য কেশবচন্দ্রকে কটাক্ষ করিয়া লিখিত।

৭। চিন্তাকুসুম (খণ্ড-কবিতা)। ১২৮৮ সাল (৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২)। পৃ. ১২০।

ইহাতে "বিনা দোষে রাজরোষ," "সোমপ্রকাশের পুনর্জ্জন্ম," "নির্দ্দোষীর অপরাধ" প্রভৃতি ৩১টি কবিতা আছে।

৮। মিঠেকড়া (ব্যঙ্গকাব্য)। ? (১৭ এপ্রিল ১৮৮৮)। পৃ. ২২।

"রাহু-রচিত।" রবীন্দ্রনাথের ১ম সংস্করণ 'কড়ি ও কোমলের (নবেম্বর ১৮৮৬) কয়েকটি কবিতাংশের "প্যারডি"।

৯। *Mrs. Besant in India.* Her stratagem and foolishness exposed. 1894 (1 June), pp. 31.

১০। রুচি-বিকার (ব্যঙ্গকাব্য)। ভবানীপুর, ১৩০৪ সাল (ইং ১৮৯৭)। পৃ. ৩২+২০

"হিতবাদী হইতে পুনমু্দ্রিত।" ইহার পরিশিষ্টে ২১ জুন ১৮৯৭ তারিখের *Calcutta Weekly Notes* হইতে উদ্ধৃত হিতবাদী-মানহানি-মামলার বিবরণ (অভিযুক্ত "রুচি-বিকার" কবিতাটি সহ) স্থান পাইয়াছে।

১১। মাইকেলের ও হেমচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত। ? (১৪ অক্টোবর ১৯০০)। পৃ. ২০।

বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ১৮৯৬ সনের ২৫এ মে প্রকাশিত 'ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামে কালীপ্রসন্নের একখানি ১৮ পৃষ্ঠার পুস্তিকার উল্লেখ আছে।

কালীপ্রসন্ন যে-সকল গ্রন্থ সঙ্কলন ও সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যাও বড় অল্প নহে। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে নিম্নের কয়খানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

১। প্রসাদ-পদাবলী অর্থাৎ রামপ্রসাদের সমগ্র রচনা সংগ্রহ। ১ আষাঢ় ১৩০১ (ইং ১৮৯৪)। পৃ. ১৯২।

কালীপ্রসন্ন-লিখিত রামপ্রসাদের জীবনবৃত্তান্ত ও গ্রন্থাদির বিবরণ সম্বলিত। ১৩০৬ সালে মুদ্রিত দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :—"বাগাচাঁড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রামপ্রসাদের যে সকল পদাবলী সংগ্রহ করিয়া সময়ে সময়ে হিতবাদীতে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, এই সংস্করণে তাহার মধ্যে কতকগুলি সন্নিবিষ্ট হইল।"

২। বিদ্যাপতি বঙ্গীয় পদাবলী। ১৩০১ সাল (৩০ অক্টোবর ১৮৯৪)। পৃ. ২৫০।

টীকা, কবির জীবনবৃত্তান্ত এবং বাঙ্গালা ও মৈথিলী ভাষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ। এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণের (আশ্বিন ১৩০৫) বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :—"এই সংস্করণে কতকগুলি নূতন পদের সন্নিবেশ এবং টীকার পরিশোধন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। টীকা বিষয়ে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কয়েকটি পরামর্শ দিয়া অনুগৃহীত করিয়াছেন। রবীন্দ্র বাবু তাঁহার একখানি পুরাতন খাতা দিয়াও আমাকে বাধিত করিয়াছেন।...এক শ্রেণীর লোকে আমার প্রতি প্রীতিবাহুল্য প্রকাশ করিয়া 'নবভারত' নামক একখানা মাসিক পত্রে একটা বিদ্বেষমূলক প্রবন্ধের প্রচার করে। এরূপ অনুগ্রহের নিবারণ কামনায় আমি উক্ত প্রবন্ধ ও আমার উত্তর এই সংস্করণের পরিশিষ্টে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। "পূর্ব্বভাষে" উল্লিখিত "বিদ্যাপতি-বধ" শীর্ষক প্রবন্ধগুলিও এবারে পুনর্মুদ্রিত হইয়া এই পুস্তকের অঙ্গীভূত হইল।"

কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর, ১৩১৭ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের ৩য় সংস্করণের পরিশিষ্টে "বিদ্যাপতির টীকা (প্রত্যুত্তর)" নামে একটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ; ইহা 'প্রবাসী'তে মুদ্রিত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের লেখার প্রতিবাদে 'সাহিত্য-সংহিতা'য় (আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩১১) প্রথমে প্রকাশিত হয়।

৩। পেনেল প্রসঙ্গ। ১৩০৮ সাল (২৮ মে ১৯০১)। পৃ. ৫৯+১২।

এই পুস্তকে ১৮৯৯ ও ১৯০১ সনে সংঘটিত "ছাপরার মোকদ্দমা" ও "নোয়াখালির হত্যাকাণ্ডের মোকদ্দমা"র সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সেসন্স জজ পেনেলের রায়ের অংশ-বিশেষ প্রদত্ত হইয়াছে। কালীপ্রসন্নের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি পাঠ করিলেই ব্যাপারটি পরিস্ফুট হইবে :—

"পেনেল সাহেবের সুদীর্ঘ রায় পাঠ করিয়া দেশের লোকে যে কি পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়াছে, তাহা বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলা অসম্ভব। বিচার ও শাসন-বিভাগের অপবিত্র সম্মিলন যে নানা প্রকার অনিষ্টের আকর, এই অপূর্ব্ব রায় তাহার অন্যতম উদাহরণস্থল। পেনেল সাহেব ছাপরার মোকদ্দমায় শাসন-বিভাগের যে কলঙ্ককাহিনী জনসমাজে বিবৃত করিয়াছেন, নোয়াখালির মোকদ্দমায় তাহারই যেন প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়াছে। ছাপরায় রক্ষকেরা কিরূপে ভক্ষক হয়, তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইয়াছিল। নোয়াখালিতে তাহার ঠিক বিপরীত দৃশ্য পরিস্ফুট হইয়াছে। ছাপরায় রাজকর্ম্মচারীরা নির্দ্দোষের নিগ্রহে কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, নোয়াখালিতে দোষীর পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহাদিগের পারদর্শিতা প্রকাশ পাইয়াছে। কোথায় দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন হইবে, না নির্দ্দোষের নিগ্রহ ও দুর্জ্জনের সমর্থনে রাজপুরুষদিগের শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। এই দুইটি চিত্রের জন্য আমরা পেনেল সাহেবের নিকট ঋণী।...অনেকে "প্রেষ্টিজ" রক্ষার নিমিত্ত সুবিচারের পথ কণ্টকিত করেন, পেনেল সাহেব সে শ্রেণীর লোক নহেন। কর্ত্তৃপক্ষের মুখ চাহিয়া, বন্ধুত্বের মমতায়, পদোন্নতির লোভে, উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের অনুরোধে, তিনি বিচারাসন কলঙ্কিত করেন নাই। তাঁহার নাম এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা কৃতজ্ঞতার সহিত বহুকাল স্মরণ করিবে। এ জগতে তাঁহার পুরস্কার নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকৃত হউক।" (পৃ. ১৬-১৭)

৪। শব্দকল্পদ্রুম।

"স্যার রাজরাধাকান্তদেববাহাদুরেণ বিরচিতঃ। পূর্ব্বগ্রন্থাতিরিক্তৈর্ব্যুৎপত্তিবিশ্লেষণাদিভিঃ সহ শ্রীকালীপ্রসন্ন-কাব্যবিশারদেন সংস্কৃতঃ।" আনুমানিক ১৯০৩ সনে ইহা হিতবাদী-কার্য্যালয়ে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়।

৫। স্বদেশ-সঙ্গীত। ১৩১২ সাল (১০ নবেম্বর ১৯০৫)। পৃ. ৬৮।

এই পুস্তকে অন্যান্য বঙ্গীয় কবির স্বদেশানুরাগোদ্দীপক পদাবলীর সহিত কালীপ্রসন্নের রচিত স্বদেশ-সঙ্গীতগুলিও স্থান পাইয়াছে। ইহা ভবানীপুর স্বদেশসেবক সম্প্রদায়ের জন্য সঙ্কলিত; "বন্দেমাতরম্" ও অপর কয়েকটি গানের স্বরগ্রাম সম্বলিত। 'স্বদেশ-সঙ্গীত' কালীপ্রসন্নের পার্থিব যন্ত্রে মুদ্রিত; ইহাতে প্রকাশক-রূপে "যোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা"—এই ছদ্ম নাম আছে।

৬। লাঞ্ছিতের সম্মান। ১৩১৩ সাল (৬ জুন ১৯০৬)। পৃ. ৯০।

ইহাও "যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়" এই ছদ্ম নামে সঙ্কলিত। বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় ইহা "৭০ কলুটোলা ষ্ট্রীট [হিতবাদী-কার্য্যালয়] হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত" এইরূপ উল্লেখ আছে। পুস্তকের "পূর্ব্বভাষে" প্রকাশ :—"এই পুস্তকে সংগৃহীত লাঞ্ছিতদিগের বিবরণ এবং বরিশাল খিত্রাটের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রধানতঃ হিতবাদী, সঞ্জীবনী, চারুমিহির, বরিশাল হিতৈষী, প্রভৃতি সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাতে কয়েক জন নিগৃহীত বঙ্গ-সন্তান ও কতিপয় স্বদেশী প্রচারকের প্রতিকৃতি সন্নিবিষ্ট হইল।...যদি এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে কাহারও স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহারে অনুরাগ বৃদ্ধি হয় এবং দেশের জন্য কষ্ট সহিবার প্রবৃত্তি মনে বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে শ্রমসার্থক জ্ঞান করিব।...শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।"

স্বদেশী আন্দোলন

কালীপ্রসন্নের নাম স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসের সহিত বিশেষ ভাবে বিজড়িত। ১৯০৫ সনের ২০এ জুলাই বঙ্গব্যবচ্ছেদের সংবাদ ঘোষিত হইলে দেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়; বিদেশী-বর্জ্জন পণ এই আন্দোলনেরই ফল। স্বদেশপ্রাণ কালীপ্রসন্ন স্বদেশী আন্দোলনে মাতিয়া, চারি দিকে সভা-সমিতি, বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। স্বদেশী সভায় তিনি একটি নূতনত্বের আমদানী করেন; উহা—সভার সূচনায় ও শেষে স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক সঙ্গীতের আয়োজন। নিজে সুগায়ক না হইলেও সঙ্গীত-রচনায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা ছিল। স্বদেশী সভায় যোগদানকালে তিনি দুই জন বেতনভোগী সুকণ্ঠ গায়ককে সঙ্গে রাখিতেন; তাঁহার রচিত জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া তাঁহারা সভাস্থ শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেন। কালীপ্রসন্নের রচিত কয়েকটি স্বদেশ-সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি :—

(বাউলের সুর)

মা গো, যায় যেন জীবন চ'লে,
শুধু জগৎমাঝে তোমার কাযে
"বন্দে মাতরম্" ব'লে॥
(যখন) মুদে নয়ন, করবো শয়ন
শমনের সেই শেষ জালে—
তখন, সবই আমার হবে আঁধার
স্থান দিও মা ঐ কোলে॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে॥
(আমার) মান অপমান সবই সমান
দলুক না চরণ তলে।
যদি, সইতে পারি মায়ের পীড়ন,
মানুষ হব কোন্ কালে? (আর)
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে॥
লাল টুপি কি কালো কোর্ত্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে?
(আমি) মায়ের সেবায় রইব রত
পাগল বলে দিক্ ছেলে।
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে॥

আমায়—বেত মেরে কি "মা" ভোলাবে ?
আমি কি মা'র সেই ছেলে ?
দেখে, রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি
কে পালাবে মা ফেলে ?
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
আমি, ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের, বেত্রাঘাতে, কারাগারে
ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিলে ॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥
যে মা'র, কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে।
বল, লাঞ্ছনার ভয়, কার কোথা রয়
সে মায়ের নাম স্মরিলে ?
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥

বিশারদ কয় বিনা কষ্টে
সুখ হবে না ভূতলে।
সে ত, অধম হয়ে সইতে রাজি
উত্তমে চাও মুখ তুলে ॥
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥

(রাগ ভৈরব তাল একতালা)
সেই ত রয়েছ মা তুমি।
ফলফুলে সুশোভিতা শ্যামা জন্মভূমি ॥
শিরোপরি গিরিবর
সেই শুভ্র কলেবর
পদতলে সেই সিন্ধু
আছে অনুগামী ॥
তেমনি বিহঙ্গকুল
কলরবে সমাকুল
তেমনি শুনিতে পাই
মধুপ-ঝঙ্কার—
সেই ত সকলি আছে
তবে মা সবার পাছে
তোমার সন্তান কেন,
অধঃপথগামী ॥
কোথা তব সে গৌরব
সে সম্পদ কোথা সব
সকলি হয়েছে আজি
নিশার স্বপন—
ফিরিয়া আবার কি মা
আসিবে গো সে মহিমা
গাইবে তোমার কবি
তোমারে প্রণমি ॥
কি জানি কি পাপফলে
পড়ি পর পদতলে
শক্তিহীন তব সুত
ধুলাতে লুটায়—
বিশারদ সে বিষাদে
হতাশ হৃদয়ে কাঁদে,
তারে আজি কে দেখালে
এ দশা দশমী ॥

কালীপ্রসন্নের একটি হিন্দী গানও উদ্ধৃত করিতেছি ; উহা ১৯০৬ সনে কলিকাতায় কংগ্রেস উপলক্ষে সগৌরবে গীত হইয়াছিল :—

ভেইয়া দেশ্ কা এ কেয়া হাল্।
খাক্ মিট্টি, জহর হোতি সব, জহর হোই জঞ্জাল।
ঘর ছোড়্ কে সব পরকে সেবে
ভাই কো দেত্ ভগাই।
সাগর পার সব ধন গয়া আওর
ঘরমে লছ্মি নাই।
পীতল কাঁসা রহে ক্যায়সা
সোনা চাঁদি শেষ।
অব ইনামেল গিল্টি সীসা
ঘর্ ঘর্মে পর্বেশ।
পাট রুই সব য়ঁহাসে যাকর্
জাহাজ ভর্কে আতে।
দেশ্ কা আদ্মি মুরখ্ বন্কর্
চাঁদি দে কর্ লেতে।
গৌ শূয়র্কে লহুসে শোধিত্
চিনি নিমক্ খাওয়ে।
সফেদি দেখ্ কর্ মন্ ললচাতা
হাত্ মে মোক্স পাওয়ে।
গো-শালামে গৌয়ে কিত্নী
কিসিকো ইহ ন সুঝে
টিন ভরে যো দুধ বিলাতী
উস্কো মিঠা বুঝে।
দেশ্ কে ধন সব চৌপট্ করকে
লেত্ পরদেশিয়া
ইঁহাকে লোগ্ সব্ ফকির বন্ যায়
না পাওয়ে রুপেয়া।
বেনারসি আওর শাল্ দোশালা
রেশম পশম ছোড়ি।
ছিট্ পাট্ নকলি মখ্মল্ গোটা
মোল্হি দেকর্ কৌড়ি।
গৌ শূয়র্কে চর্ব্বি দেকর্
যো বনাইলে বাস।

পেছনে ওহি ভারতবাসী
ধরম করুকে নাশ।
পুণ্যস্থান ইহ আরিয়া বর্ত্তমে
নাহি মিলে কোই চিহ্ন,
আদমি বৌরা মুরখ হোকর্
ছোড় দিয়া তত্ত্ব বীজ।
আঁখকে আগে সবৃহি পড়া খায়
কোইনা পাওয়ে রুখা।
ঘর্‌কে লছ্‌মি পর্‌কে দেকর্
সব কোই রহেঁ ভুখা।
দীন বিশারদ গনই বিপদ
ভনো দুঃখ কি গীত।
হো মতিমান্ দেশ কে সন্তান
করো স্বদেশ কি হীত।

কালীপ্রসন্ন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। দেশের কাজে বহুবার তাঁহাকে লাঞ্ছনা নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে। বরিশাল-বিভ্রাটের ইতিবৃত্তের সহিত যাঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, তাঁহারাই এ-কথা স্বীকার করিবেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্নের গুরু ছিলেন—স্বদেশহিতব্রত সুরেন্দ্রনাথ। মাদ্রাজ, অমরাবতী ও লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস (ইং ১৮৯৪-৯৭-৯৯) এবং বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলন (এপ্রিল ১৯০৬) উপলক্ষে কালীপ্রসন্ন ছায়ার ন্যায় গুরুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনী—*A Nation in Making* গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

We returned home from Madras (Congress, 1894) by the British India Steam Navigation Company's steamer *Rewa*..........Kali Prosanna Kavyavisarad, editor of the *Hitabadi*, was one of our party, and he used to entertain the European passengers on board with his card-tricks and his feats of jugglery. Visarad, whose versatility was wonderful, was a past master in this art.* One of the most genial of men, a brilliant Bengalee writer, a poet of no mean order, a composer of songs of exquisite beauty and pathos, which thrilled the audience at our *Swadeshi* meetings. . . (pp. 137-38).

In ill-health, suffering from a fatal ailment (Bright's disease), he was present at every *Swadeshi* meeting to which he was invited. He introduced a new element into the *Swadeshi* meetings, which is now largely employed in our public demonstrations. They usually begin with some patriotic song, appropriate to the occasion. Kavyavisarad had a fine musical talent. He himself could not sing, but he composed songs of exquisite beauty, which were sung at the *Swadeshi* meetings and never failed to produce a profound impression. He had a natural gift for musical composition, and, though he had an imperfect knowledge of Hindi, his Hindi song (*Deshki e kaya halat*) was one of the most impressive of its kind. It was a fierce denunciation of the passion for foreign goods in preference to domestic articles, and, when it was sung at the great Congress at Calcutta in 1906, attended by thousands of our people, it threw the whole audience into a state of wild excitement.

Kavyavisarad was always attended by two musical experts, who opened and closed the proceedings of *Swadeshi* meetings with their songs. They were taught, paid and maintained by him ; and, though by no means rich, he sought no extraneous assistance for their upkeep. He was not much of a speaker, but as a writer he was the master of a vigorous and caustic style which he ruthlessly employed against the enemies of Indian advancement. A devoted patriot, he never spared himself in the service of the motherland : and I remember his attending the Lucknow Congress of 1899, with fever on him, and a warrant in a defamation case hanging over him. He was reckless of health and life; strong-willed, and even obstinate, above all advice and remonstrance. (p. 202).

মৃত্যু

'হিতবাদী' সম্পাদনের গুরুভার, কংগ্রেসের কাজ ও স্বদেশী-প্রচারে অতিরিক্ত শ্রম কালীপ্রসন্নের স্বাস্থ্যের অন্তরায় হইয়াছিল। তিনি কিছু দিন হইতে রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহার এক বন্ধু জাহাজের ডাক্তার-রূপে জাপান যাইতেছিলেন। সমুদ্র-ভ্রমণে পীড়ার উপশম হইতে পারে এই আশায় কালীপ্রসন্ন বন্ধুর পরামর্শে জাপান যাত্রা করেন। জাপান হইতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে ৪ জুলাই ১৯০৭ (১৯ আষাঢ় ১৩১৪) তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। দেশভক্ত কালীপ্রসন্ন মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে জন্মভূমির উদ্দেশে যে কবিতাটি লিখিতেছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিতেছি :

এই কি জীবন শেষ ? জীবন-রঙ্গিনি !
কোথা প্রিয় জন্মভূমি ?
কোথা আমি ? কোথা তুমি ?
পড়িল কি যবনিকা সহসা এখনি ?
উচ্চ আশা উপদেশ,
সকলেরি এই শেষ ?
জীর্ণ ক্লিষ্ট চিন্তাকুল রোগীর শয্যায়
সমুদ্রে বাষ্পীয়-পোতে—বারিচর প্রায়।

তোমার মহিমা গাব, ওমা বঙ্গভূমি !
লাঞ্ছিত তোমার নাম,
দেখে তবু চলিলাম,
এ দীর্ঘ জীবন বৃথা দেখিলে ত তুমি !
এ দুঃখ রহিল মনে,
তোমার সন্তানগণে,
না দেখিয়া সমাদৃত,—শমন সদনে
যেতে হ'লো—মন সাধ রহিল মা মনে !

* পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কালীপ্রসন্ন ১৮৭৯-৮০ সনে ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভার মন্দিরে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে কিছু দিন তাঁহার মন যাদু-বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি কতিপয় বন্ধুর সহযোগে 'আর্য্য ইন্দ্রজাল সমিতি' গঠন করিয়া, দেশ-বিদেশে ইন্দ্রজাল-ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এই সময়ে সম্মোহন-বিদ্যা বা মেসমেরিজমেও তিনি পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভ

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

এক শতাব্দীর ঊর্দ্ধকালের পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করিয়া গত ৪ঠা জানুয়ারী ব্রহ্মদেশ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। একারণ এই দিনটি ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিবস। যে স্বাধীনতা-সূর্য্য ব্রহ্মদেশের পশ্চিমাকাশে দীর্ঘ ১২৩ বৎসর পূর্ব্বে অস্ত গিয়াছিল গত ৪ঠা জানুয়ারী তাহা সেদেশের পূর্ব্বাকাশকে নানা বর্ণে ও আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া পুনরায় উদিত হইয়াছে। এশিয়ার দেড় কোটি নরনারীর অঙ্গ হইতে পরাধীনতার কঠিন ও কঠোর শৃঙ্খল খসিয়া



রাজা থিবোর কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সিংহাসন

পড়িয়াছে। আজ তারা আনন্দে আত্মহারা। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে, ব্রহ্মের যে শুধু আত্মারই অপমৃত্যু হইয়াছিল তাহা নয়, বৃটেন ব্রহ্মবাসীর দেহকে পিষ্ট ও নিপীড়িত করিয়া সর্ব্ব-প্রকারে তাহার রস শুষিয়া লইয়াছিল। এই স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে ব্রহ্মবাসীর আত্মার মুক্তিলাভ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার দেহের বিমুক্তি কবে হইবে তাহা এখনও অজ্ঞাত। ব্রহ্মবাসিগণের তৈল ও খনিজ সম্পদ, বৃহৎ ব্যবসায় ও বাণিজ্য আজ স্বাধীনতা লাভের পরও বিদেশীর করতলগত। তার যানবাহন চলাচলের উপরও তার কোন অধিকার নাই।

সে আজ প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। ভারতের ভাগ্যাকাশে তখন ব্রিটিশ-রাহু উদিত হইয়া স্বাধীনতা-সূর্য্যকে গ্রাস করিতেছে। লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিভূরূপে ভারত ও পূর্ব্ব-এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর। ব্রহ্মদেশের ভিতর দিয়াই তখন ভারতবাসী এক দিকে চীন ও অপর দিকে শ্যাম ও মালয়দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া আসিতে-



ব্রহ্মের শেষ গবর্ণর সার হিউবার্ট র‍্যান্স এবং ব্রহ্মের প্রথম সভাপতি সাও সুই থাইক

ছিল। সেই সময় ব্রহ্মদেশে এক শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন আলোম্প্রা নামে এক রাজা। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ব্রহ্মের বাহিরেও রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন। তাঁহারা একে একে আরাকান, মণিপুর এবং আসাম প্রদেশটিকেও তাঁহাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। আসাম ও আরাকানের বহু আশ্রয়প্রার্থী ব্রিটিশ রাজ্যে আশ্রয় লইয়া সেখান হইতে ব্রহ্মদেশের উপর চড়াও হইবার উদ্যোগ করে। ব্রহ্ম-সেনাপতি মহাবন্দুলও সেই সংবাদ পাইয়া বাংলাদেশ আক্রমণের আয়োজন করেন (১৮২৪)। বাংলাদেশ তখন ব্রিটিশের অধীন। সুতরাং ব্রিটিশ ও ব্রহ্মবাসীর মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। ব্রিটিশ সৈন্য আসাম অধিকার করিল, কিন্তু আরাকানে রমু নামক স্থানে তাহাদের পরাজয় ঘটে। কিছুকাল পরে ব্রিটিশ সৈন্য রেঙ্গুন অধিকার করিল এবং ব্রহ্ম-সেনাপতি মহাবন্দুল গুলির আঘাতে নিহত



কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ব্রহ্মের স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করিয়াছেন

রাজধানী মান্দালয় অধিকৃত হইল ও ব্রহ্মরাজ থিবো ভারতে নির্ব্বাসিত হইলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র উত্তর ব্রহ্ম ব্রিটিশের করায়ত্ত হইল। সংক্ষেপে ইহাই পররাজ্য-লোলুপ ইংরেজের ব্রহ্ম অধিকারের ইতিহাস।

ব্রহ্মদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, তৈল ও খনিজ সম্পদ, যানবাহন প্রভৃতি যাবতীয় সম্পদ ব্রিটিশ করায়ত্ত করিয়াছিল। সম্প্রতি তাহারা ব্রহ্মের শাসনভার পরিত্যাগ করায় জনগণের উপর কঠোর নিষ্পেষণের নিবৃত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রিটিশ শোষণ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই।

এখানকার প্রচুর ও উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ-সম্পদ, চাউল ও তৈল-সম্পদ, এখানকার টিন রবার প্রভৃতি প্রথমেই ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তদুপরি এখানকার প্রভূত শিল্পবিষয়ক ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে গোড়ায়ই তাহারা সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজের এই দেশ অধিকার

হইলেন। তারপর ব্রহ্মরাজ ব্রিটিশের সঙ্গে এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া (১৮২৬) আসাম, আরাকান, টেনেসেরিম উপকূল এবং মার্ত্তাবানের কিয়দংশের অধিকার ব্রিটিশকে দান করিলেন। উপরন্তু যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ এক কোটি টাকা দিলেন। তা ছাড়াও তখনকার ব্রহ্মের রাজধানী আভা নগরীতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাখা স্থির হইল। এই ঘটনাই ইতিহাসে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ নামে খ্যাত।

ব্রহ্মদেশের সঙ্গে দ্বিতীয় যুদ্ধ যখন বাধে তখন লর্ড ডালহৌসী ভারতের বড়লাট। ব্রহ্মে ব্রিটিশ বণিকসম্প্রদায়ের উপর নানারূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতেছে এই অজুহাতে লর্ড ডালহৌসী নৌ-সেনাপতি ল্যাম্বার্টকে ব্রহ্ম আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। ল্যাম্বার্ট ব্রহ্মদেশের একখানি জাহাজ দখল করিয়া রেঙ্গুন বন্দর অবরোধ করিয়া বসিলেন। তত্রাপি ব্রহ্মরাজ কিছুতেই ইংরেজের সহিত সন্ধি করিলেন না। তখন কৌশলী ইংরেজ উর্ব্বর পেগু প্রদেশটি অধিকার করিয়া (১৮৫২) চতুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল।

এতদূর করিয়া ইংরেজের লোভ আরও বাড়িয়া গেল। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মের রাজা ছিলেন থিবো। এবার ইংরেজ সমগ্র ব্রহ্মদেশটি ব্রিটিশ করায়ত্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এবারও অজুহাত ব্রিটিশ বণিকের উপর ব্রহ্মবাসীর উৎপীড়ন। তদুপরি সন্দেহ হইল—ব্রহ্মরাজ ফরাসীদের সহিত মিশিয়া ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পরামর্শ করিতেছে। এই অছিলায় লর্ড ডাফ্‌রিন ব্রহ্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে

করার মূলে ছিল এদেশের অতুলনীয় খনিজসম্পদ অধিকার করিবার জন্য তাহার লোভ।

ব্রহ্মদেশের ন্যায় এত অধিক পরিমাণ চাউল রপ্তানী পৃথিবীর আর কোন দেশ করিতে পারে না। নদীবহুল ব্রহ্মদেশে ধান্যই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃষ্টিহীন স্থানে গম, বাজরা, ডাল ও তামাক প্রচুর পরিমাণে জন্মে। বনবিভাগ হইতে প্রচুর সেগুন কাঠ বিদেশে রপ্তানী হয়। ব্রহ্মদেশে খনিজ তৈল, টিন, রৌপ্য, সীসা, উলফ্রাম প্রভৃতি পাওয়া যায়। উলফ্রাম যোগে লৌহ হইতে ইস্পাত প্রস্তুত হয়। ব্রহ্মদেশ মূল্যবান প্রস্তর ও মণির জন্যও বিখ্যাত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্রহ্মের ব্যবসা-বাণিজ্যের শতকরা ৮০ ভাগ আজও বিদেশীয়ের করায়ত্ত। ব্রহ্মদেশ যদি সেই আর্থিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে তবেই তাহার প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হইবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াও ভারতবাসীর ন্যায় ব্রহ্মদেশ যদি অন্নবস্ত্রহীন হইয়া থাকে তবে তাহার স্বাধীনতার কোন মূল্যই থাকে না।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া ব্রিটিশ সরকার ইহাকে ভারতের অঙ্গীভূত করেন এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মশাসনের ভার একজন লেফটেন্যান্ট গবর্ণরের উপর অর্পণ করেন। ১৯২৩ সালে ব্রহ্মদেশের শাসনভার পুনরায় ভারত-গবর্ণমেন্টের অধীন একজন গবর্ণরের হস্তে অর্পিত হয়। তার পর হইতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারত ও ব্রহ্মের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এক যোগেই পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। আ-ব্রহ্ম-ভারত একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত



গণপরিষদে ইউনিয়ন জ্যাকের অপসারণ ও স্বাধীন ব্রহ্মপতাকা উত্তোলন উৎসব

ছিল। পরে ব্রহ্মের একটি রাজনৈতিক দল ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য আন্দোলন সুরু করেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে হীনবল করিবার জন্য এবং তাহাদের সাম্রাজ্যবাদের আয়ুষ্কাল বাড়াইবার জন্য ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কার দ্বারা ব্রহ্মকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন।

অতঃপর ব্রহ্মদেশ পরাক্রান্ত জাপানের "এশিয়া এশিয়া-বাসীদের জন্য" এই আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। দোবামা আন্দোলনে ব্রহ্মদেশের যুবশক্তি যোগদান করিল; তখন দেখা দিল এক বিরাট গণ-আন্দোলন। জাপান যখন মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন ব্রহ্মের প্রতিনিধি-পরিষদ যুদ্ধ-বিরোধী হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মিওচিত দলের নেতা উ স। উ স যখন নিউইয়র্ক হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া উত্তর-আফ্রিকার উগাণ্ডা প্রদেশে অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। এই অন্তরীণের কারণ—জাপানের সহিত তাঁহার যোগাযোগ আছে এই সন্দেহ। তখন আউঙ্গ সান ছিলেন দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছাত্র-নেতা। তাঁহার সংগঠনশক্তি ও অপূর্ব্ব দেশপ্রেম তাঁহাকে নেতৃবর্গের শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলিয়াছিল। জাপানের সহায়তায় ব্রহ্মদেশ হইতে ইংরেজকে বিদূরিত করিবার আশায় তিনি টোকিওতে গমন করেন। সেখানে সামরিক শিক্ষালাভ করিয়া তিনি দেশে ফিরিলেন এবং এক সশস্ত্র সেনা-বাহিনী গঠন করিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, জাপান ব্রহ্মকে ইংরেজের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিতে সহায়তা করিবে। কিন্তু তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। তখন বা-ম ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে জাপানীরা ব্রহ্মে জাপ কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে জেনারেল আউঙ্গ সান তাহার মুক্তি-ফৌজকে অতি গোপনে ও সুকৌশলে গণফৌজে পরিণত করেন। ইংরেজ তখন আতঙ্কে ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করিয়াছে।

আউঙ্গ সান গুপ্তভাবে দেশের মুক্তিকামীদের সংগঠিত করিতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জাপানী সৈন্যদের অত্যাচার নিবারণের চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। জাপানী সৈন্য তখন প্রকাশ্যে দোকানপাট লুঠ এবং নারীদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি বর্ব্বরোচিত আচরণের অনুষ্ঠান করিয়া চলিয়াছিল। এদিকে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর পুনরায় রেঙ্গুন প্রবেশের দুই দিন পূর্ব্বে আউঙ্গ সানের গরিলা সৈন্যবাহিনী উক্ত শহর দখল করিয়াছিল। ব্রহ্মদেশ পুনরায় অধিকারের পর ব্রিটিশবাহিনীর সহিত আউঙ্গ সানের সৈন্যদলের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আউঙ্গ সান তখন ব্রহ্মদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। ব্রহ্মের গবর্ণর



স্বাধীন ব্রহ্মের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন

ডরমান স্মিথ ইহা পুনরাধিকারের পর এখানে ফিরিয়া আসেন। তিনি আউঙ্গ সান ও তাঁহার আট হাজার সহকর্মীকে কারারুদ্ধ করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু এই সময় পূর্ব্ব-এশিয়ার সৈন্য-বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন গবর্ণর ডরমান স্মিথকে পরামর্শ দেন যে সঙ্কটাগ্রস্ত ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশের মামুলি দমননীতি কার্য্যকরী হইবে না। তাঁহারই পরামর্শে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আউঙ্গ সানের সহিত চুক্তি অনুসারে তাঁহার ফ্যাসীবিরোধী সেনাবাহিনীর এক অংশকে ব্রিটিশ সেনানায়কের অধীন সশস্ত্র ব্রহ্মবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং অবশিষ্ট সেনাবাহিনীকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। যুদ্ধের পর বিলাতে চার্চিল মন্ত্রীসভার পতন হইলে রক্ষণশীল দলের হাত হইতে ক্ষমতা খসিয়া পড়িল। বৃটেনে শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। অতএব শান্তিপূর্ণ ভাবে ব্রহ্মের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইবে এই আশায় আউঙ্গ সান লর্ড মাউণ্ট-ব্যাটেনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি আরও মনে করি-লেন—তাঁহার সেনাবাহিনীর এক অংশ ত ব্রহ্মবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে ডরমান স্মিথ শাসন-পরিষদ পুনর্গঠিত করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি শাসন-পরিষদের ১৪টি আসনের মধ্যে আউঙ্গ সানের দলকে ছয়টি আসন দিতে চাহিলেন। আউঙ্গ সান এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। কৌশলী ইংরেজ গবর্ণর তখন অন্তরীণাবদ্ধ উ স-কে লইয়া নূতন শাসন-পরিষদ গঠনে উদ্যোগী হইলেন। তখন আউঙ্গ সানের দল ব্রিটিশ কূটনীতির বিরুদ্ধে এক বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তখন ডরমান স্মিথের পরিবর্ত্তে হিউবার্ট রান্সকে ব্রহ্মের গবর্ণর করিয়া পাঠাইলেন। নূতন গবর্ণর আউঙ্গ সানের দলকে শাসন-পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদান করেন। আউঙ্গ সান গং-পরিষদের সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া ঘোষণা করেন যে, ব্রহ্মের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি সার্ব্বভৌম গণপরিষদ গঠন করিতে হইবে এবং ১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রহ্মকে পূর্ণ স্বাধীনতা (ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস নয়) দিতে হইবে।

এই বিষয়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা চালাইবার জন্য আউঙ্গ সান বিভিন্ন দলের সদস্যগণের সহিত ১৯৪৭ সালের জানুয়ারী মাসে লণ্ডন গমন করেন। সেখানে ২৭শে জানুয়ারী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর সহিত তাঁহার এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে ধার্য্য হয় যে ব্রহ্মের শাসন-পরিষদ অন্তর্ব্বর্ত্তী জাতীয় গবর্ণমেণ্ট হিসাবে কার্য্য করিবেন।



শেষ বৃটিশ গবর্ণর স্যার হিউবার্ট রান্স ও ব্রহ্মের প্রথম সভাপতি সাও সুই থাইক সৈন্যগণের অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন

এপ্রিল মাসে গণপরিষদের নির্ব্বাচনে ২০২টি আসনের মধ্যে আউঙ্গ সানের দল ১৯৬টি আসন লাভ করেন। বাকী ৬টি আসন কমিউনিষ্টরা লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ১৬ই জুন গণপরিষদে ব্রহ্মকে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করা হইল। ইহার এক মাস পরে ১৯শে জুলাই যখন আউঙ্গ সান ও তাঁহার সহকর্ম্মী মন্ত্রিগণ সরকারী ভবনে মন্ত্রণায় নিযুক্ত, সেই সময় তাঁহাদের সহিত ব্রহ্মের এই জনপ্রিয় নেতা আততায়ীর হস্তে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইলেন। এই অপরাধের জন্য প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী উ স প্রমুখ কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই শোচনীয় ঘটনা যে দিন ঘটে সেই তারিখেই রাত্রিকালে আউঙ্গ সানের সহকারী নেতা থাকিন নু প্রধান মন্ত্রীরূপে ঘোষিত হইলেন।

আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়া ব্রহ্মবাসীরা তাহাদের মহান্ নেতা আউঙ্গ সানকে স্মরণ করিতেছে। তাঁহার নশ্বর দেহ তাঁহার দেশবাসী সসম্মানে সংরক্ষিত করিয়াছে। তিনি আজ ইহলোকে নাই, কিন্তু তাঁহার সাধনা সফল হইয়াছে।

থাকিন নু প্রধান মন্ত্রী হইয়া ইঙ্গ-ব্রহ্ম চুক্তি স্বাক্ষর করিতে লণ্ডনে গেলেন। ১৭ই অক্টোবর চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। এই চুক্তি জানুয়ারী মাস হইতে কার্য্যকরী হইয়াছে এবং ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রের মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী ও ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী থাকিন নু-র মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার একটি সর্ত্ত এই যে, ব্রহ্মদেশে অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য ব্রিটেন যে ব্যয়ভার বহন করিয়াছে তাহার জন্য সে কোন দাবি করিবে না। তা ছাড়া ব্রিটেন ব্রহ্মদেশকে যে দেড় কোটি পাউণ্ড ঋণ দিয়াছে, তাহার উপরে ব্রিটেনের কোন দাবিদাওয়া নাই। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মদেশের নিকট ব্রিটেনের আর যাহা পাওনা আছে তাহা ব্রহ্মদেশ ১৯৫০ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২০টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করিবে এবং এই ঋণের জন্য কোন সুদ দিতে হইবে না।

ব্রহ্মদেশ ব্রিটেনের নিম্নলিখিত প্রাপ্যগুলি পরিশোধ করিবে:—(১) চুক্তি বলবৎ হইবার পর ব্রহ্মের অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মপ্রবাসী ব্রিটিশ প্রজাদের প্রাপ্য পেনসন ও বেতন মিটাইয়া দিবেন, (২) ব্রিটিশ সেনা-বিভাগীয় দ্রব্যাদির বিক্রয়-লব্ধ সমুদয় অর্থ ব্রহ্ম-সরকার পরিশোধ করিবেন, (৩) বাণিজ্য ও জাহাজ চলাচল সম্পর্কে যথাসম্ভব শীঘ্র উভয় পক্ষ একটি চুক্তি সম্পাদন করিবেন, (৪) ক্ষমতা হস্তান্তরের পর যথাসম্ভব শীঘ্র ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ব্রহ্মদেশ হইতে ইংরেজ সৈন্য সরাইয়া লইবেন, এবং ব্রহ্ম-গবর্ণমেণ্ট ব্রিটেন হইতে নৌ, বিমান ও স্থল-বাহিনী সংক্রান্ত একটি মিশন আমন্ত্রণ করিবেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে কোন দেশ হইতে এরূপ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া উভয় দেশের জাহাজই উভয় দেশের বন্দরে প্রবেশ করিতে পারিবে এবং উভয় দেশের বিমান উভয় দেশের আকাশ-পথে চলাচল করিতে পারিবে। ব্রিটেন সম্প্রতি ব্রহ্মদেশকে ৩৭খানি জাহাজ ধারে প্রদান করিবে। দেশরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তিন বৎসর বলবৎ থাকিবে, তারপর এক বৎসরের নোটিশে উভয় পক্ষই এই চুক্তি বাতিল করিতে পারিবেন। চুক্তির ব্যাখ্যা ও

প্রয়োগ সম্বন্ধে কোন মতভেদ হইলে আন্তর্জ্জাতিক আইন-পরিষদ তাহার মীমাংসা করিবে।

ব্রহ্মের গণপরিষদের শীর্ষে যে ইউনিয়ন জ্যাক এতদিন উড্ডীন ছিল গত ৪ঠা জানুয়ারী প্রভাতে তাহা অপসারিত করিয়া সেই স্থানে সাধারণতন্ত্রের তারকালাঞ্ছিত ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রভাত হইবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে সেই অপস্রিয়মান ইউনিয়ন জ্যাককে ব্রহ্মের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ অভিবাদন করেন। তূর্য্য, শঙ্খ ও ঢক্কানিনাদের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের অনুষ্ঠান ঘোষিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৭ই অক্টোবরের চুক্তি এইদিন ব্রহ্ম ইউনিয়ন পার্লামেন্টে অনুমোদিত হয়। ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব্ব শেষ হইবার পর গণপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ব্রহ্ম সাধারণতন্ত্রের সভাপতি সাও সুই থাইক আনুষ্ঠানিকভাবে কার্য্যভার গ্রহণ করেন ও স্বাধীন ব্রহ্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন।

জাতীয় সঙ্গীতের পর স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রধান নেতা আউঙ সান ও অন্যান্য নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। তারপর প্রেসিডেন্ট থাকিন নু-কে প্রধান মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন।

ব্রহ্মের শেষ গবর্ণর সার হিউবার্ট র‍্যান্স ৪ঠা জানুয়ারী প্রত্যূষে বার্মিংহাম নামক ক্রুজারযোগে রেঙ্গুন ত্যাগ করেন।

ব্রহ্মের এই স্বাধীনতা-উৎসবে যোগদানের জন্য ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিমানযোগে রেঙ্গুন গমন করেন। তিনি সারনাথ হইতে পবিত্র মহাবোধি বৃক্ষের শাখা ও পূত গঙ্গোদক সেখানে লইয়া যান। সোয়ে ডাগন প্যাগোডার প্রাঙ্গণে এই বোধিবৃক্ষের শাখা মহাসমারোহে ধর্ম্মানুষ্ঠানসহ নীত ও রোপিত হয়। উক্ত গঙ্গাবারি তদুপরি সিঞ্চিত হয়। দিল্লীতে ভারতের বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ঘোষণা করেন যে, ব্রহ্মের শেষ রাজা থিবোর কার্ষ্ঠনির্ম্মিত সিংহাসন ব্রহ্মকে প্রত্যর্পণ করা হইবে।

চকিত চাহনি

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

যেদিন প্রথম নয়ন সুমুখে
উদয় লভিলে তুমি,
কচি তৃণভারে মুকুলি' উঠিল
মোর মনোমরুভূমি।
হেরিনু তোমারে ওগো অনামিকা,
কিছু রূপে লিখা, কিছু প্রহেলিকা,
নদী বহে নিতি জলধির পানে
তোমার চরণ চুমি'।

আকাশ যে কথা কহে ইসারায়
বাতাসের কাণে কাণে,
তোমার ভাষণ-সঙ্গীতে তারি
বারতা লভি যে প্রাণে;
তুমি কিছু ভাব, কিছু বা ভাবনা,
কিছু আল্‌পনা, কিছু কল্পনা,
কখনো সুরের আড়ালে লুকাও,
কভু ধরা দাও গানে।

তোমার আঁখির চপলতা লয়ে
তারা কাঁপে নীলাকাশে,
সাহারা সহসা শিহরিয়া ওঠে
কাঁচা শ্যামা ঘাসে ঘাসে;
তুমি কিছু ছায়া, কিছু তুমি ছবি,
কিছু ভৈরবী, কিছু বা পূরবী,
তোমার মুখের হাসি চুরি করে
গাছে গাছে ফুল হাসে।

তোমার ললাট-লালিমা-লীলায়
ভোরে ওঠে রাঙা-রবি,
বিধুর বুকের বাণী হরি' নিয়া
গান গাহে রাজকবি।
কিছু বা আভাসে, কিছু বা প্রকাশে,
কিছু বা বর্ণে, কিছু বা বিলাসে,
কখনো বা জ্ঞানে কখনো বা ধ্যানে
তোমার ধারণা লভি।

তোমারি বাসনা-উচ্ছ্বাসে, বায়ু
বসন্তে উতরোল,
তটিনীর তট-নীরে ধীরে ধীরে
বাজে কলকল্লোল;
তুমি কিছু বাণী, কিছু বা বাহার,
কিছু সুর আর কিছু ঝঙ্কার,
কখনো গতিতে কখনো বাধায়
ছন্দের হিল্লোল।

আমার প্রাণের প্রতিমা—সে যেন
তব অপরূপ ছায়া,
আমার কামনা-সায়র মথিয়া
তুমি ধরিয়াছ কায়া,
তুমি কিছু রূপ, কিছু আরোপণ,
কিছু বা সত্য, কিছু বা স্বপন,
কিছু বা মানুষী, কিছু বা মানসী
কিছু মোহ, কিছু মায়া।

খাদ্য-সমস্যার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান

শ্রীকস্তুরচাঁদ লালুয়ানী

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হ'ল এই যে কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও খাদ্যাভাব আমাদেরই সব চেয়ে বেশী। বিয়াল্লিশের মন্বন্তর থেকে সুরু করে যে খাদ্য-সমস্যা আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে আজ যুদ্ধোত্তর কালেও তার আশানুরূপ সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত আমাদের খাদ্য-সমস্যা ছিল মূল্য-সমস্যা মাত্র। অর্থাৎ ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্কটের ফলে কৃষিসামগ্রীর মূল্য যে ভাবে কমে গিয়েছিল তার দরুন ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত কৃষি-ব্যবসায়ে তেজির সূত্রপাত হয় নি। এইজন্যই ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত কি ভাবে কৃষিসামগ্রীর মূল্য বাড়ান যায় তাই ছিল আমাদের সমস্যা। এখানে একথা বলা আবশ্যক যে, ১৯২৯ সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে দেখা দিলেও আমাদের দেশেই তা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর আকার ধারণ করে। কারণ আমাদের দেশে এক দিকে যেমন সুসমঞ্জস অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করবার উপযোগী শিল্পের অভাব অন্য দিকে ঠিক তেমনি বিদেশী সরকার নিষ্ক্রিয় থাকায় কোন উপযুক্ত অর্থনৈতিক পরিকল্পনাও এদেশে গৃহীত হতে পারে নি। সব দিক থেকেই আমাদের সমস্যা জটিল হয়ে উঠল ; ব্যবসায়ে মন্দা আমাদের আর্থিক ব্যবস্থায় পাকাপাকি হয়ে বসল। তাই বলছিলাম, ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত আমাদের কৃষির প্রধান সমস্যাই ছিল মূল্য-সমস্যা—কি ভাবে কৃষিকে মন্দার হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে, কি ভাবে আবার কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে কৃষি-ব্যবসায়কে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে, তাই নিয়েই তখন কৃষিবিদগণ মাথা ঘামাতেন। কিন্তু এর পর যে সমস্যা আরম্ভ হ'ল সে আরও জটিল, আরও ভয়াবহ অদৃষ্ট-পূর্ব্ব এবং অভূতপূর্ব্ব। একথা অবশ্য ঠিক যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অভ্যুদয়ের পর থেকে ছোট বড় অনেক দুর্ভিক্ষের কথাই আমরা ইতিহাসে পাই, অনেক লোকক্ষয় তাতে হয়েছে। প্রথম মহাসমরের সময়ও খাদ্য-সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিতরণ-ব্যবস্থা মোটামুটি অব্যাহত থাকায় সমস্যা গুরুতর হলেও মাত্রা অতিক্রম করে নি,—অন্ততঃ আধুনিকতম অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করলে এ কথাই আমাদের মনে হয়। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু স্বাভাবিক সময়েও আমাদের দেশ খাদ্যশস্য সম্বন্ধে ষোল আনা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। বিশেষ করে আমাদের চালের সরবরাহ চাহিদার অনুপাতে কম বলেই যুদ্ধপূর্ব্ব সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায়ও আমাদের ব্রহ্ম-দেশ থেকে চাল আমদানী করতে হ'ত। ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশের হস্তচ্যুত হবার পর আমাদের বাইরের সরবরাহেও ঘাটতি পড়ল। সেই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বিতরণ ও যানবাহন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ায় আমাদের খাদ্যসমস্যা আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়াল।

যুদ্ধ-পূর্ব্বকালে আমাদের খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজনের চেয়ে কম হলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সারা পৃথিবীর হিসাব ধরলে খাদ্যসরবরাহের তখন ঘাটতি ছিল না বরং কোন কোন দেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হওয়ায় বাড়তি মাল জমে উঠছিল। তাই যাঁরা একথা বলেন যে, পৃথিবীতে কোন দিনই চাহিদার অনুযায়ী পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ ছিল না তাঁদের যুক্তি যাচাই করে দেখবার প্রয়োজন আছে। যুদ্ধপূর্ব্বকালে অনেক দেশের পক্ষেই সমস্যা ছিল কি ভাবে বাড়তি সরবরাহ উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করা যেতে পারে। মার্কিন দেশের কথাই ধরা যাক। মার্কিন দেশ শিল্পপ্রধান হলেও সেখানকার কৃষিসম্পদও উপেক্ষণীয় নহে। প্রথম মহাসমরের পূর্ব্বে মার্কিন দেশে গমের আবাদ মোটামুটি স্থিতাবস্থায় ছিল, ফলে রপ্তানীর পরিমাণ ক্রমশঃ কমে আসছিল। তারপরই এল মহাসমর। ইউরোপের দেশসমূহ রণতাণ্ডবে এত মেতে উঠল যে তাদের পক্ষে উৎপাদন-ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। তাই এই সব দেশের আভ্যন্তরীণ সরবরাহ কমে যাওয়ায় বিদেশ থেকে আমদানী খাদ্যশস্যের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। এই অবস্থায় গমের দাম বাড়তে আরম্ভ হয়। ১৯১৪ সালে যে গমের দাম ছিল প্রতি বুসেলে ৯৮·৮ সেণ্ট, ১৯১৯ সালে তার দাম হ'ল ২·৩২ ডলার। সাধারণ মূল্য-হারও এই সময়ে ৬৮·১ থেকে ১৩৮·৬-এ দাঁড়াল। এই যে যুদ্ধকালীন তেজি এর সুযোগে আবাদের প্রসার আরম্ভ হ'ল। ১৯০৯-১৩ সালে যেখানে গমের আবাদী জমির গড় আয়তন ছিল ৪৮০ লক্ষ একর, ১৯১৯ সালে সেই জমির আয়তন হ'ল ৭৩০ লক্ষ একর। ১৯২০ সালের পর থেকে আবার মন্দা আরম্ভ হয় এবং ১৯৩২ সালে এই মন্দা চরম সীমায় পৌঁছে। কিন্তু মন্দার অনুপাতে আবাদ নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় আবাদী জমির পরিমাণ মোটের উপর অপরিবর্ত্তিতই থেকে যায়। এর ফলে ১৯১৪ সালের আগে মার্কিন দেশে যে পরিমাণ গম উৎপন্ন হ'ত, প্রথম মহাসমরের পর এর পরিমাণ সর্ব্বদাই শতকরা ৩৫ ভাগের চেয়ে বেশী ছিল।

উপরে মার্কিন দেশ সম্বন্ধে যে কথা বলা হ'ল পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি কৃষিপ্রধান দেশের পক্ষেই সে কথা সমভাবে

প্রযোজ্য। পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা বিষয়ক যে বিবরণী ব্যবস্থাপক পরিষদ পেশ করেছেন তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মজুত করা গম সম্বন্ধে যে তুলনামূলক সংখ্যা সংগ্রহ করা হয়েছে তা নীচে দেওয়া হ'ল। এ থেকে পৃথিবীর মোট বাড়তি গমের পরিমাণ সম্বন্ধে বেশ পরিষ্কার ধারণা করা চলে।

যাকে আমরা খাদ্যশস্যের বাড়তি বলে উল্লেখ করেছি স্বাভাবিক আর্থিক পরিবেশে তা বাড়তির বদলে বরং ঘাটতি বলেই প্রমাণিত হবে। যে হারে আমাদের লোকসংখ্যা বাড়ছে তার জন্যে যদি উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হয় তা হলে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ

(হাজার টনের হিসাবে)

	কানাডা	আর্জেন্টিনা	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	অষ্ট্রেলিয়া	মোট	সারা পৃথিবীর মোট মজুত গম
১৯২২-২৬ গড়	১০০৭	১৭১৫	৩২৬৬	৭৮৯	৬৭৭৭	১৬৯২৮
১৯২৭-৩১ গড়	২৩৯৫	২৩৯৫	৫৮৭৯	১১৯৮	১২৪১১	২৩৫৫১
১৯৩২	৩৭০১	১৭৬৯	১০৬৪২	১৩৬১	১৭৪৭৩	২৭৮১৫
১৯৩৩	৫৯৩৩	২০৪১	১০৩৯৭	১৪৯৭	১৯৮৬৮	২০৬১৮
১৯৩৪	৫৫২৫	৩২১২	৭৪৫৭	২৩১৩	১৮৫০৭	২২২৭৮
১৯৩৫	৫৮২৪	২৩১৩	৪০০১	১৫৫১	১৩৬৯০	২৫১২৮
১৯৩৬	৩৪৫৬	১৭৬৯	৩৮৬৫	১১৭০	১০২১০	২১৩৬৭
১৯৩৭	১০০৭	১৩৮৮	২২৫৯	১১১৬	৫৭৭০	১৫৪৩২
১৯৩৮	৬৫৩	১৭৬৯	৪২১৯	১৩৬১	৮০০১	১৭১৮৮
১৯৩৯	২৮৫৮	৪৮৮৯	৭৪৮৪	১৯০৫	১৭১৪৬	২২৪৯২
১৯৪০	৫৫৭৯	৬৩৯৬	৭৪৮৪	২৮৫৮	২২৩১৭	২৫৭২৫

উপরের হিসাব থেকে একথা বোঝা যাচ্ছে যে, যুদ্ধ-পূর্ব্বকালে সারা পৃথিবীর মোট মজুত গমের পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য ছিল না। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত আবাদ নষ্ট হওয়ায় সঞ্চিত গমের পরিমাণ পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের অনুপাতে কমে গেলেও প্রয়োজনাতিরিক্ত গম কিছু ছিল। ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত প্রায় এই অবস্থাই চলল। ফলে, এই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কোন কোন দেশে গমের দর বজায় রাখার জন্য আবাদের নিয়ন্ত্রণও করতে হয়েছে। আমাদের দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। আমাদের দেশে খাদ্যশস্যের সরবরাহ চাহিদার অনুপাতে কম হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩১ সালের পর থেকে গমের মূল্য আশাতিরিক্তরূপে হ্রাস পায় এবং বিদেশ থেকে আগত খাদ্যশস্যের উপর শুল্ক ধার্য্য করা হয়। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হ'ল এই যে, যুদ্ধপূর্ব্বকালে একদিকে পৃথিবীতে যখন এই অবস্থা চলেছে তখন পৃথিবীর অনেক অনগ্রসর দেশের লোকই উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে অনশন বা অর্দ্ধাশনক্লিষ্ট হয়ে রয়েছে। এক দিকে হ'ল বিশ্বব্যাপী মন্দার সমস্যা; অন্যদিকে লোকের আয় না থাকায় টাকার অভাবে বাজারের চাহিদা কমে গেছে। এই ভাবে যুদ্ধপূর্ব্ব কালের খাদ্যসমস্যা ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের।

উপরের আলোচনা থেকে একথা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, যুদ্ধপূর্ব্বকালে বাড়তি খাদ্যশস্যের মজুত হওয়ার মূলে ছিল ক্রয়শক্তির অভাব—স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী খাদ্যের দিক দিয়ে বিচার করলে কিন্তু এই বাড়তি শস্যকে মোটেই বাড়তি বলা চলে না। লোকের যদি যথোচিত ক্রয়শক্তি থাকত, তারা যদি উপযুক্ত খাদ্য আপন প্রয়োজন অনুসারে ক্রয় করতে পারত তা হলে আর এ সমস্যা থাকত না। কিন্তু বর্ত্তমান অর্থ-নৈতিক পরিবেশে তা হতে পারছে না। অর্থাৎ উপরে বলা যায় যুদ্ধপূর্ব্বকালের খাদ্যসরবরাহের চেয়ে ১৯৬০ সালে যে পরিমাণ খাদ্যসরবরাহ বাড়াতে হবে তার শতকরা পরিমাণ হ'ল নিম্নলিখিত প্রকার: খাদ্যশস্য শতকরা ২৯, চিনি ২৫, তৈলজাতীয় উপাদান ১১৩, ডাল ৮৪, ফল ও শাকসব্জী ৩০০, আমিষ জাতীয় উপাদান ২০৫ এবং দুগ্ধজাতীয় পদার্থ ৬০। এদিক থেকে যাচাই করলে আমাদের খাদ্যসরবরাহে যে যুদ্ধপূর্ব্বকালেও ঘাটতি ছিল একথা মানতে হবে। ফলকথা হ'ল এই যে, ১৯০০ সাল থেকে আরম্ভ করে আমাদের লোকসংখ্যা বেড়েই চলেছে, কিন্তু ফসলের উৎপাদনে পরিমাণ বৃদ্ধি হতে পারেনি। এই যে মৌলিক সমস্যা, মহাসঙ্কটের চাপে এটা মাথা তুলবার অবসরও পেল না। বাড়তি মজুত অবিক্রীত থেকে সমস্যাটির জটিলতা আরও বাড়িয়ে তুলল।

এই চাপা পড়া মৌলিক সমস্যা যুদ্ধের সুযোগে নূতন করে দেখা দিলে। এই নূতন সমস্যার দুটো দিক আছে। এক দিকে যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্ফীতির ফলে এক দল লোকের আয় বাড়ল এবং পণ্যমূল্য একাদিক্রমে অবাধে বেড়ে চলল, অন্য দিকে উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় খাদ্যসরবরাহ ব্যবস্থাও ভেঙে পড়ল। অন্যান্য দেশে এই সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করার আগেই কিছু না কিছু প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। ইউরোপে খাদ্যশস্য উৎপাদন ব্যবস্থার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রিত খাদ্য বিতরণব্যবস্থা কায়েম করা হয়, সেই সঙ্গে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। আমাদের দেশে কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় এ ব্যাপারেও অব্যবস্থা চলতে থাকে। ১৯৪২ সাল পর্য্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি এবং সামরিক খরিদের জন্য প্রকৃত মূল্য বাড়তে

থাকে; কিন্তু এই অবস্থা যুদ্ধপূর্ব্ব মন্দার প্রতিকার হিসাবে গৃহীত হওয়ায় কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করাই সম্ভবপর হয় নি। কোন কোন খাদ্যশস্যের মূল্যনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা অবশ্য করা হয়েছিল; কিন্তু সে চেষ্টা কার্য্যকরী না হওয়ায় সরকার কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। ১৯৪২ সালে জাপানীগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্ম বিজয়ের পর খাদ্যপরিস্থিতি আরও সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। কারণ ব্রহ্মদেশ থেকে প্রতি বৎসর যে ১০ লক্ষ টনেরও অধিক চাল আমদানী করা হ'ত সেই চাল পাবার আর কোনও উপায় রইল না। সারাটা দেশ অব্যবস্থার যে কুফল ভোগ করেছে সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এই সভ্যতাগর্ব্বী বিংশ শতাব্দীতে এত বড় একটা মন্বন্তর দেশের বুকের উপর দিয়ে যে অবাধে সংঘটিত হয়ে গেল এর আর তুলনা হয় না।

বহু তর্কবিতর্ক যুক্তিবিচার ও আলোচনার পর ভারত-সরকার ১৯৪৩ সালে খাদ্যশস্য বিষয়ক পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী একটা স্থূল খাদ্যনীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল নিম্নলিখিত প্রকার :—

(ক) বিদেশ থেকে খাদ্য-শস্যের আমদানী যথাসম্ভব বাড়ানো এবং কোন আকস্মিক পরিস্থিতিতে খাদ্য সংস্থান করার জন্য ৫০০,০০০ টন খাদ্যশস্য মজুত রাখা।

(খ) দেশের আবাদ বাড়ানোর জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন—যেমন, খাদ্যশস্যের ফসল বাড়াবার অনুকূলে উৎসাহ প্রদান, অন্যান্য কার্য্যের জন্য জমির ব্যবহার স্থগিত রেখে তাতে খাদ্যশস্যের আবাদের বিস্তার, জলসেচন ব্যবস্থা, উৎকৃষ্টতর বীজধানের সরবরাহ, প্রভৃতি।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশানুযায়ী উপযুক্ত মৌলিক পরিকল্পনা গ্রহণ।

(ঘ) বড় বড় শহরে নিয়ন্ত্রিত খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা কায়েম করা।

(ঙ) আইনদ্বারা খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ।

* * *

দ্বিতীয় মহাসমরের অবসান হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের সমস্যার-সমাধান হ'ল কোথায়? সত্য বটে, পৃথিবীময় আজ যে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে আমাদের খাদ্যসমস্যা তারই অঙ্গীভূত; কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে সারা দুনিয়ায় আমাদের সমস্যাই সবচেয়ে জটিল। যুদ্ধোত্তর আমলের প্রথম বৎসরে অনাবৃষ্টি, জলপ্লাবন, ও ঝড়ঝঞ্ঝা ইত্যাদির দরুন আমাদের খাদ্যসমস্যা গুরুতর হয়ে উঠেছিল। এ সময় বিদেশ থেকে চালের আমদানী একেবারে বন্ধ ছিল; গম ও অন্যান্য খাদ্য-শস্যের সরবরাহও ছিল খুব নৈরাশ্যজনক। মোটের উপর, জীবনযাত্রার বর্ত্তমান মান অনুসারে আমাদের খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিমাণ ১৯৪৫-৬ সালে প্রায় ৮০ লক্ষ টন ছিল। পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করার জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক জরুরী খাদ্যপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই খাদ্য পরিষদের অধীনে কয়েকটি সমিতি গঠিত হয়েছে। খাদ্য সরবরাহ ও মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এই পরিষদের কোন হাত নাই; তবে এই পরিষদের অনুমোদন অনুসারে মোটামুটিভাবে খাদ্যশস্যের বিলিব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং রুশিয়া ও আর্জেন্টিনা ছাড়া পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি রপ্তানীকারী দেশই এই পরিষদের অনুমোদন অনুসারে কাজ করতে রাজী হয়েছে।

এই সব আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থা সত্ত্বেও আমাদের দেশের খাদ্যপরিস্থিতিতে কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নি। ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে খাদ্যশস্যের অভাবে নিয়ন্ত্রিত খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বার জোগাড় হয়েছিল। এই বৎসর আমাদের ৪০ লক্ষ টন ঘাটতির মধ্যে আমরা মাত্র ১৭ লক্ষ টন বিদেশ থেকে পাই এবং এর জন্যে ভারত সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়। বর্ত্তমান বৎসরেও খাদ্যপরিস্থিতি মোটেই সন্তোষজনক নয়। এই বিষয় নিয়ে খাদ্য ও কৃষি সংসদ ১৯৪৬ সালের মে মাসে ওয়াশিংটনে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এই সংসদ যে বিবরণী পেশ করেন তদনুসারে সারা পৃথিবীর খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ১০০ লক্ষ টন রয়েছে এবং বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী এই ঘাটতির সামান্য অংশ মাত্র পূরণ হওয়া সম্ভব।

ভারত বিভাগের ফলে আমাদের খাদ্যসমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। ফসলের দিক থেকে বর্ত্তমানে ভারতে প্রায় ১৭২ লক্ষ টন চাউল এবং ৪১ লক্ষ টন গম উৎপন্ন হয় এবং পাকিস্থানে এই দুই ফসলের পরিমাণ যথাক্রমে ৫৩ লক্ষ টন এবং ২১ লক্ষ টন। আমাদের প্রয়োজনের অনুপাতে এই ফসলের পরিমাণ অনেক কম। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতে প্রায় ১০০ কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমাদের বিদেশ থেকে আমদানী করতে হচ্ছে। যুদ্ধের কয়েক বৎসরব্যাপী অস্বাভাবিক পরিস্থিতির দরুন খাদ্যশস্যের চাহিদা বেড়েছে অনেকখানি; কিন্তু আবাদী জমির আয়তন সে অনুপাতে কিছুই বাড়ে নি বরং ফসলের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। বিদেশী সরবরাহের উপর বরাবর নির্ভর করা অযৌক্তিক। এতে নিজেদের অর্থনৈতিক দুর্ব্বলতাই সূচিত হয় এবং মুদ্রাসমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পায়। কারণ বিদেশ থেকে আমরা যখন খাদ্যশস্য আনব তখন আমাদের তার পরিবর্ত্তে কিছু দিতেই হবে। নইলে, বরাবর বিদেশী মুদ্রার যোগান দেওয়া যাবে কোথা থেকে?

স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যা খুবই জটিল। আমাদের বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কট শুধু বর্ত্তমানেরই সমস্যা নয়। আমাদের লোকসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে এবং আবাদের যা অবস্থা তাতে এ সমস্যা যে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে কায়েম হয়ে বসেছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানী করে এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে

পারে না; এর জন্ত চাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন যার ফলে ফসল বাড়বে এবং প্রয়োজনের অনুপাতে খাদ্যশস্য দেশের মধ্যেই উৎপন্ন হতে পারবে। কৃষিতে উৎপাদনের প্রসার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে যেতে পারে না; কারণ কর্ষণযোগ্য জমি প্রকৃতির দান, তাতে মানুষের হাত নেই। তাই বিঘাপ্রতি ফসল উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ানই হ'ল আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। এর জন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ সুরু করতে হবে এবং একে সফল করতে হলে কৃষি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করতে হবে।

চীনের সাম্প্রতিক অর্থনীতি

শ্রীশান্তিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

কয়েক বৎসর হ'ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। কিন্তু যে সব দেশ যুদ্ধে নেমেছিল তাদের সবাইকে প্রায় একই স্তরের অর্থনৈতিক দুরবস্থায় এসে পৌঁছুতে হয়েছে। যুদ্ধে অপরিমেয় অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল, তার যোগান দিতে গিয়ে বহু দেশকেই নিজেদের মুদ্রানীতির স্বাভাবিক এবং সাম্যাবস্থা হারাতে হয়েছে এবং তারই ফলে সে সব দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটা বিরাট ওলটপালট হয়ে গেছে। চীনের পক্ষে এ অবস্থাটা যেন অনিবার্য্য হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৬ সন থেকে জাপানের মত একটা বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে চীনকে লড়ে আসতে হচ্ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে তারও ইতি হয়েছে, কিন্তু এই সুদীর্ঘ আট নয় বছর লড়াই চালিয়ে যাওয়ায় চরম দুর্দ্দশা ভোগ করা সত্ত্বেও আধা সামন্ততন্ত্রী চীনের ভাগ্যে শান্তি আসে নি। ঘরোয়া বিবাদ এখনও চলেছেই। যুদ্ধের প্রয়োজনেই অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ সংগ্রহ করা হয়—সাধারণতঃ সরকারের তরফ থেকে ধার করে, কর বসিয়ে ও নোট ছাপিয়ে বা টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে। তৃতীয় উপায়টিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে এবং সবগুলো নীতিই মিলিয়ে মিশিয়ে এই টাকা যোগানোর কাজটা সারতে হয়। কিন্তু সরকারের গাফিলতি, উদাসীনতা ও অকর্ম্মণ্যতার ফলে নানা কারণে সবচেয়ে অপকৃষ্ট ঐ তৃতীয় উপায়টিকে চীন গ্রহণ করেছে; অর্থাৎ সেদেশে অবাধ মুদ্রাস্ফীতি চলেছে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জার্ম্মানীরই মত এবার চীন ধীরে ধীরে সর্ব্বনাশের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে।

কিছুকাল আগে এক খবরের কাগজে চুংকিঙে প্রচলিত দ্রব্যমূল্যের একটা হিসাব দেওয়া হয়। তার থেকে এই অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ের স্বরূপ খানিকটা বোঝা যাবে। নীচে তালিকাটি দেওয়া গেল।

একটি ফেল্টের টুপি	৬৫০ ডলার
এক জোড়া জুতা	২৬০ "
এক প্রস্থ সুট	২৬০০ "
এক বোতল হুইস্কী	২৪০০ "
এক পাউণ্ড মাখন	২৩০ "
একটা লিপষ্টিক	১৩০ "

(রয়টার, ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪৪)

সে সময়কার সংবাদপত্রে প্রকাশিত আর একটা খবরও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এক চীনা অধ্যাপক বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। তাতে হিসাব করে দেখা যায় যে, তিনি বিপুল পরিমাণ ডলারই পেয়েছিলেন বটে তবে তার ক্রয়মূল্য আমাদের দেশের মাত্র পঁচিশ টাকার সমান! অথচ এই নোবেল পুরস্কারস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ পান একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন গত ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সনে চীনে জিনিষপত্রের দর বেড়েছে ১৯৩৭ সনের মূল্যের চেয়ে ৪১৫ গুণ বেশী। অথচ বিশাল চীনের অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র। আমাদের দেশের মত সে দেশের বেশীর ভাগ লোক পল্লীবাসী। শতকরা প্রায় আশী জনই গ্রামে থাকে, আর তাদের পেশা চাষবাস। গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হচ্ছেন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ সব জমিদার। এদের অনেকেরই আবার বড় বড় ব্যবসাও আছে; সেই সূত্রে সরকারের সঙ্গে এদের গলাগলি ভাব। সরকার কর্ত্তৃক তাই সাধারণতঃ গরীব চাষীদের কল্যাণকর কাজ বিশেষ হয় না। সত্যি কথা বলতে গেলে, চীনা সরকারের শিল্পনীতি, বাণিজ্যনীতি মুদ্রানীতি—এক কথায় অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত যত নিয়মাদি আছে তার সবগুলোর সাহায্যে গ্রামগুলোকে শোষণ করে দুর্দ্দশার নিম্নতম সোপানে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সেখানে চাষীদের মধ্যে সঙ্ঘ, সমিতি ইত্যাদি তেমন কিছুই নেই। থাকা সম্ভবও নয় যত দিন সামন্ততন্ত্রের প্রতাপ না কমছে। তাই দরদস্তুরের সুবিধামত একটা বন্দোবস্ত করারও পন্থা নেই। এরা একদিকে যেমন কম দরে উৎপাদিত শস্যাদি বেচতে বাধ্য হয় অন্যদিকে তেমনি আবার বেশী দরে সব দরকারী জিনিষপত্র তাদের কিনতে হয়।

১৯৪৫ সনের জানুয়ারীতে চুংকিঙে এক সিতান (প্রায় দু'মণ) ভাল চালের দাম ছিল ১৬৫০ চীনা ডলার। ফেব্রুয়ারীতে তা দাঁড়ায় ২৪০০ ডলারে আর মার্চে চোরা-বাজারে ৫৪০০ ডলার পর্য্যন্ত দর ওঠে। অথচ সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনুসারে এক সিতানের দর তখন ৪০০০ ডলার। জানা যায় যে, মে মাসে চোরাবাজারে এই দর ৮০০০ ডলার অবধি উঠেছে। এর তুলনায় আমাদের দেশে আর কি হয়েছে? মণপ্রতি দেড়শো হয়েছিল; না হয়, দু'শই ধরা ।

যাক। তার ধাক্কা সামলানোই দায়। কথা হচ্ছে, আমাদের কতটুকুই বা আয়। সে অনুপাতেই তো হবে কেনার ক্ষমতা? আর সেদিক থেকে সাধারণ চীনা আর সাধারণ ভারতীয়ের অবস্থা একই। চীনের প্রথা মত জমিদার প্রভৃতি যাঁরা জমি বর্গা দেন, তাঁরা খাজনাটা আদায় করেন ধানে-চালে। খাজনার হারও খুব বেশী। আজকাল এগুলো প্রায় সবই বিক্রি হয়ে মোটা অঙ্ক হয়ে জমিদারের পকেটে ফিরে আসে। দামও এখন খুব চড়া। ওদিকে সব দিয়ে থুয়ে গরীব চাষী নেজেদের পেট চালানোর জন্যে বড় কিছু থাকে না। এর উপরেও যদি বাজার থেকে কিনে খেতে হয় তবে তার খরচ যোগাতে গিয়ে পরনের কাপড় সংক্ষিপ্ত করতে হয়। পেটের দায় বড় দায়।

বিশেষজ্ঞেরা এ সব নিয়ে নানা রকম তথ্য সংগ্রহ করেছেন ও করছেন এমনি অনুসন্ধানের ফলে কাঁপা টাকার মহিমা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। নীচে তারই একট নমুনা দেওয়া হ'ল:

উত্তর কোয়াংটুঙ জেলা
(শতকরা হিসেবে)

	১৯৩৯	১৯৪২	বাড়তি কমতি
জমিদার	১২	১৮	+৬
ধনী চাষী	৭	১০	+৩
মাঝারি চাষী	৪০	২০	−২০
গরীব চাষী	৩৫	৪২	+৭
দিনমজুর	৬	১০	+৪

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে গরীব এবং বড়লোক দুয়েরই সংখ্যা বেড়েছে। এমন কি, খানিকটা স্বাধীন মধ্যবিত্ত চাষীদেরও প্রায় অর্দ্ধেকসংখ্যককে সামাজিক ও অর্থনীতিক অবনতির নিম্নতম সোপানে নেমে আসতে হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই একটি জেলার হিসাবকে মোটামুটি অন্যান্য জেলার নমুনা স্বরূপ বলা চলে।

এরও উপর আছে আর এক মুশকিল। জমি বারবার হাতবদল হচ্ছে। অসাধুতালব্ধ অর্থ ব্যাঙ্কে থাকিলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। আসবাবপত্র, সোনা-গয়না বা জমিজেরাতে ওসব হাঙ্গামাহুজ্জত কম। তাই সামরিক কর্ম্মচারী ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে জমি কেনার হিড়িক পড়ে গেছে। কাজেই জমির দরও হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৩ সনের মধ্যে জমির দর পাঁচ থেকে দশগুণ বেড়েছে। নূতন জমিদার বেশী লাভের আশায় অধিক খাজনায় নূতন লোকের হাতে জমি ছেড়ে দিচ্ছেন। তার কাছে প্রধান কথা হ'ল মুনাফা। সাধারণ চাষীদের তাই দুর্দ্দশার অন্ত নেই। একজন বিশেষজ্ঞের মতে:

"What formerly was assessed at one dollar for land tax, is now assessed at thirty-three cattis (app. a seer) of unhusked rice. Together with land tax an equal amount of grain must be sold to the Government, for which only 30 per cent payment at the official price is given and 70 per cent in exchange for Government Treasury notes to be paid at some distant date. Thus a major part of the compulsory sale of grain merges into tax proper, and for one dollar of land tax before the war something like fifty dollars must now be paid."

আগে যেখানে জমির খাজনা ছিল এক ডলার এখন সেখানে নেওয়া হয় প্রায় ৩৩ সের ধান। এর সঙ্গে সরকারকে আবার এই সমান ওজনের ধান বেচতে হয়। তার শতকরা ত্রিশ ভাগের দাম দেওয়া হয় সরকারী নিয়ন্ত্রিত দরে আর বাকী সত্তর ভাগের জন্যে দেওয়া হয় সরকারী বিল। এই ভাবে জোর করে যে পরিমাণ শস্য বিক্রি করানো হয়, তার বেশীর ভাগই আসল খাজনার মধ্যে পড়ে, আর তার ফলে, আগে যেখানে ১ ডলারে সারা যেত এখন সেখানে লাগে ৫২ ডলার।

গ্রাম ছেড়ে শহরে এলেও দেখা যায় একই অবস্থা—শুধু স্থানপরিবর্ত্তন বা পটপরিবর্ত্তন হয় মাত্র। শহরগুলির অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে মনে হয়, চীনের শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। বর্ত্তমান যান্ত্রিক যুগে বড় একটা শিল্প-কারখানা চালাতে হ'লে কয়লা অপরিহার্য্য। চীনে ১৮৬টা কয়লার খনি আছে। ১৯৪৪ সনের প্রথম দিকটাতে জানা গেল যে এই একশো ছিয়াশিটা খনির মধ্যে চুয়াল্লিশটা খনির কাজ বন্ধ হয়ে গেছে; একশোটা কাজ কমিয়ে দিয়েছে; বাকীগুলি জাতীয় সম্পদ কমিশনের সাহায্য নিয়ে চলছে। এই দুর্দ্দশার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, যে সব শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনে কয়লার সাহায্যের প্রয়োজন হয় সেগুলির মধ্যে প্রায় পনর আনা জিনিষের দর যখন (১৯৩৭-১৯৪৩) বেড়েছে তিনশো পঁচিশ গুণ, তখন কয়লার দর বেড়েছে মোট একশো আঠারো গুণ। এই বাড়তির অনুপাতে কয়লার দর যদি অন্ততঃ টনপ্রতি ৩২১৪ ডলার অবধি বাড়তে পারত তো কিছু কাজ ঠিক মত চলতে পারত। কিন্তু সরকার ওদিকে কয়লার দর নিয়ন্ত্রিত করেছেন টন প্রতি ১১১৫ ডলারে। এতে শুধু চুংকিঙের কাছাকাছি চয়ালিং নদীর পাশের খনিগুলিতেই মাসিক ক্ষতি হচ্ছে ১,৮০,০০,০০০ ডলার। কয়লা ছাড়া বৃহৎ শিল্পের মধ্যে রইল লোহা আর ইস্পাত নির্ম্মিত দ্রব্যাদি। এই শিল্পে খরচ এত বেড়েছে যে, মাঝারি ধরণের কারখানাগুলি পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিতে হয়েছে। চীনে এখন লোহার কারখানা আছে আঠারোটা। গত ১৯৪৩ সনের এক নবেম্বর মাসেই তার মধ্যে চৌদ্দটার চুল্লী নেবাতে হয়েছে। ইস্পাতের কারখানা-গুলির হিসাব নিলে দেখা যায়, ঐ সময়ের মধ্যে চারটে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে; গোটা তিনেক কোন গতিকে কাজ চালাচ্ছে আর বাকী চারটির মধ্যে দুটি ব্যক্তিগত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং বাকী দুটি জাতীয় কমিশনের অধীনে থেকে ভাল কাজ করে যাচ্ছে।

তার পর ব্যবসা-বাণিজ্য। উনিশশো তেতাল্লিশ সনে এক চুংকিঙেই এক হাজার দোকান গণেশ উল্টিয়েছে। সেই সময়ে হুনানের হেংগিয়াঙ শহরের (ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা বড় কেন্দ্র) প্রায় এক তৃতীয়াংশ দোকানেরও একই অবস্থা হয়। এক তৃতীয়াংশ কোন রকমে চলে আর বাকী এক

তৃতীয়াংশ ভাল ভাবেই কাজ চালিয়ে যায়। চোখের ওপর এই সব দেখে শুনে উনিশশো চুয়াল্লিশে কি হবে ভেবে না পেয়ে, চীনারা সে বছরটার নাম দিয়েছিল "শোকো নিয়েন" অর্থাৎ "দিন আনি দিন খাই বছর"। চুংকিঙের সবচেয়ে বড় তিনটে দোকানের একত্রে গড়ে যে লাভ-ক্ষতি হয়, তা থেকে এসব ব্যবসায়ের অবস্থা বোঝা যাবে। ১৯৪৫ সনের প্রথম ছ'মাসে এসব প্রতিষ্ঠানের দৈনিক বিক্রি হয় গড়ে ১১২০০০ ডলার, আর তার অর্দ্ধেক যায় দৈনিক খরচ।

জিনিষপত্রের দর এমনি ভাবে বেড়ে যাওয়াতে ব্যাঙ্ক ব্যবসাতেও পরিবর্ত্তনের ঢেউ লেগেছে। সুদের মাসিক হার এখন চলছে শতকরা দশ ডলার; অর্থাৎ বছরে একশো কুড়ি ডলার। ফাট্‌কা কারবার চলছে পুরোদমে। তাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা সরকারের বড় একটা দেখা যায় না। নামকা-ওয়াস্তে একটা আইন আছে—তাতে নূতন ব্যাঙ্ক খোলা বা মহাজনী কারবার-গুলোর ভোল বদলান নিষিদ্ধ। কিন্তু এই সামান্ত হুকুমদারীতে কি মানুষের মুনাফার লোভকে ঠেকানো যায়? আর এইখানেই মানুষের পাটোয়ারি বুদ্ধির চরম প্রকাশ দেখা গেছে। আইনে ব্যাঙ্ক করা নিষিদ্ধ—বেশ! দেশময় অমনি গজিয়ে উঠল হাজার বীমা কোম্পানী। গত ১৯৪৪ সনের এক এপ্রিল মাসেই এমনিভাবে এগারোটা নূতন কোম্পানী খোলা হয় শুধু চুংকিঙ শহরে। কিসের এবং কাদের বীমা এরা করে, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু তেমন প্রশ্ন করার মত উৎসাহী ব্যক্তি সরকারে নেই। লোকে পুরোনো আইন বাঁচিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, তাতেই সরকার খুশী। নতুন আইনের ঝক্কি পোহায় কে? নতুন আইন বা 'ন্যায়' চীনে তবু আছে এবং বিশেষভাবেই চলছে, আর তার নাম দেওয়া যায় মাৎস্য ন্যায়। ছোট উবে গড়ে উঠল মাঝারি; আবার কতকগুলো মাঝারি লোপ পেয়ে মোটে কয়েকটা বড় বড় কোম্পানী এখন চলছে। অন্য কথায়, সমস্ত সম্পদ এবং শক্তি —যা দেশের লোকের মধ্যে এবং জাতীয় জীবনের নানা স্তরে ছড়িয়ে ছিল তা মুষ্টিমেয় লোকের হাতে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। শুধু মোটা পুঁজি যার আছে, সে-ই এখন ব্যবসায়ে বেশী লাভ করতে পারে। এদের সম্পর্কে চীনারা একটা কথা ব্যবহার করছে। বহুল ব্যবহারে তা একটা প্রবাদে দাঁড়িয়ে গেছে। কথাটা বাংলাতে তর্জ্জমা করলে দাঁড়ায়—"যার আস্তিন যত লম্বা, সেই তত ভাল নাচে।"

এই তো দেশের অবস্থা। সত্যি বলতে গেলে সরকারের দুরবস্থা আরও বেশী। তার ঘরে বাইরে সব জায়গাতেই হাঙ্গামা। যুদ্ধ তো চলছেই; তার উপর এসব হাঙ্গামা এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন দল ও প্রতিষ্ঠানের হুমকির বিরাম নেই। গত ১৯৪৪ সালের মে মাসে পাঁচটা প্রধান শিল্পসঙ্ঘ সরকারের কাছে এক আরজি পেশ করেছে। তাতে দেশের ধন, জন ও জীবনযাত্রার মানরক্ষার জন্য আকুল আবেদন জানানো হয়েছে। চীনের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল "ডেমোক্র্যাটিক পার্টি" (সরকারী ও সাম্যবাদী দলের মধ্যপন্থী) এক ফতোয়া জারী করে সরকারকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করার প্রয়াস পেয়েছে। ফতোয়াতে দাবি করা হয়েছে যে চীনের পক্ষে এখন প্রয়োজন হ'ল সব কুচক্রীদের সরিয়ে নতুন করে এবং সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। জাতি হিসেবে মহাচীনের চরম অধোগতি হওয়ার আগেই যেন এই সতর্কবাণী সরকারের কানে পৌঁছায় সে ইচ্ছাও জানানো হয়েছে।

সরকারের সত্যিই চেতনা হয়েছে কিনা সে প্রশ্ন মনে উদিত হয়। চীনের সর্ব্বোচ্চ অর্থনীতিক পরিষদের উদ্বোধন করতে গিয়ে সর্ব্বাধিনায়ক চিয়াং কাই শেক বলেছেন,

We must not allow internal disturbances to make us lose sight of the basic need of the Chinese people for a higher standard of living than they have now . . . It is my intention to assume personally the direction of China's economic reconstruction and development. —*Reuter*, Nov. 26, 1946 .

—চীনের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান যে বাড়ানো দরকার, আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিতে সে কথাটি যেন ভুলে বসে না থাকি। আমি ভাবছি কেমন করে চীনকে নতুন করে, উন্নত করে গড়ে তুলতে হবে, সে পথ আমি নিজেই বাতলে দেব।

নূতন চীন গড়ে তোলার জন্য চিয়াং কাইশেক ছটি নির্দ্দেশ দিয়েছেন:

(১) দেশময় যানবাহনের সুবন্দোবস্ত করার একটা কর্ম্ম-পন্থা গ্রহণ করিতে হবে।

(২) চাষ-বাসের উন্নতির জন্য আরও মনোযোগী হতে হবে।

(৩) চীনা শিল্পগুলোর উৎপাদন যাতে বাড়ে তার ব্যবস্থা এখনই করা হোক। বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে জ্বালানি, কয়লা, কাপড় ও বাড়ীঘর তৈরীর শিল্পগুলোর ওপর।

(৪) চীনের বহির্বাণিজ্য বাড়ানোর জন্যে নূতন পথের সন্ধান করা হোক।

(৫) মন্ত্রিপরিষদকে জনস্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

(৬) মন্ত্রী, স্থানীয় কর্ম্মচারী ও উপযুক্ত শিক্ষিতসম্প্রদায় থেকে লোক নিয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটা কর্ম্মসূচী এখনই গ্রহণ করা হোক।

কোন বিশেষ কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে কিনা তার খবর এখনও পাওয়া যায় নি। তবুও বলা যায় যে, কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা সহজ—কাগজেকলমে অনেক ক্ষেত্রেই তা করা হয় কিন্তু আসল কাজটুকুই বাদ পড়ে যায়। জাপানী আক্রমণ ব্যাহত করতে গিয়ে চীনের আফিমের নেশা কেটেছে। কিন্তু আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বের যে সর্ব্বনাশা নেশা চীনকে পেয়ে বসেছে তার অবসান কবে হবে কে জানে? চিয়াং কাইশেক যতই চেষ্টা করুন, একথা অতি সত্যি যে রাজনৈতিক স্থৈর্য্য না এলে অর্থনৈতিক কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় না। তাই তাঁর নির্দ্দেশে যে খুব কার্য্যকরী হচ্ছে এ কথা বলা যায় না। এই সে দিনের কাগজেও দেখা যায়,

China is in the grip of a fast developing trade-slump. Government sources admit that in Tsingtao, an important port of the Shantung peninsula and a former German con-

cession, 80 concerns have closed their doors in the last two months and many more are expected to do so.

(চীন ব্যবসা মন্দার কবলে পড়েছে। সরকার পর্য্যন্ত স্বীকার করেছেন যে সিংতাও-য়ে (সিংতাও হচ্ছে শান-তুং উপদ্বীপের একটা বড় বন্দর ; আগে জার্ম্মানদের দখলে ছিল, গত দু'মাসের মধ্যে আশীটা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান কাজ বন্ধ করেছে। তা ছাড়াও আরো বেশ কতকগুলোর নাভিশ্বাস উঠেছে।

বিলাতের মানচেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার এক সংবাদদাতা হিসাব করে দেখেছেন যে এক সাংহাইয়েই রকমারি কাজের প্রায় পাঁচশ'টা কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। চুংকিঙের অবস্থাও সুবিধার নয়। এর কারণ নাকি এই যে বিদেশী জিনিষ সস্তায় বিক্রি হয়ে বাজার মাৎ করে দিচ্ছে। তার উপর জ্বালানির অভাব, কাঁচা মালের অভাব, যানবাহনের অসুবিধা, জিনিষপত্রের চড়া দাম ইত্যাদি ত আছেই। কিন্তু এত সব হাঙ্গামা কিসের জন্মে? তা কি মেটানো যায় না? ইংরেজ সাংবাদিক অল্প কথায় সার সত্যটি সুন্দর ভাবে বলেছেন,

"The majority of these causes could be obvious : stop the Civil War."

(এক কথায় যাবতীয় কারণের মূল কথা হচ্ছে : মুদ্রাস্ফীতি—বাড়তি টাকা। আর এর আসল ওষুধও জানা আছে —সেটা হচ্ছে, এই ঘরোয়া যুদ্ধের অবসান করা।)

তা হলে দেখা যাচ্ছে দু'বছর আগে যে অবস্থা ছিল আজও তার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি বরং অবস্থা ক্রমশঃ মন্দের দিকে এগিয়ে চলেছে। বাইরে থেকে সবাই এ সব দেখছে। চীনারা নিজেরাও দেখছে কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা নেই কেন? এ কথার উত্তর দিতে গেলে অর্থনীতির দেউড়ি পেরিয়ে বিশ্বরাজনীতির প্রাঙ্গণে পা বাড়াতে হয়। আর এ ক্ষেত্রে প্রথমেই মোলাকাত হয় আমেরিকার সঙ্গে। রুশ শক্তির বিরুদ্ধাচরণের ও চীনের চল্লিশ কোটি লোকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙবার দুর্দ্দমনীয় স্পৃহাতেই আমেরিকা অনবরত চিয়াং কাইশেককে অর্থ সরবরাহ করে যাচ্ছে। এমন কি, নানা অছিলায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পর্য্যন্ত দ্বিধা করছে না। চীন আজ আমেরিকার হাতের পুতুল মাত্র। অথচ চীনের খনিজ সম্পদ অতুলনীয়। তার জনসম্পদও প্রচুর। চীনারা যেমনি ধৈর্য্যশীল ও পরিশ্রমী, তেমনি কৌশলী। এসব সত্ত্বেও চীন সান-ইয়াৎ-সেনের "সান-মিন-চু-আই"-এর আদর্শ ভুলে যাচ্ছে। সেই আদর্শে প্রণোদিত হয়ে মহাচীন এশিয়াতে তথা পৃথিবীতে তার যথাযোগ্য গৌরবের স্থান অধিকার করুক। ভারতবাসীরা নিশ্চয়ই এই কামনাই করে।

বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

তিমিরাবৃত বন্ধুর পথ ঝঞ্ঝামুখর রাতি,
নাহি ধ্রুবতারা, কাণ্ডারী-হারা মরণোন্মুখ জাতি।
সহসা রাতির তিমির বিদারি শোনা গেল কার বাণী,
"সাধনা আমার সফল হবে কি? জীবনের পণ মানি।"

শৃঙ্খল বাজে জননীর পায়ে, সন্তান-বুক ফাটে।
বন্দিতে মায়ে হাজারে হাজারে বীর সন্তান জোটে।
মহা মানবের মিলন-যজ্ঞে জীবন আহুতি দানি,
ঘুচাবে তাহারা সুজলা সুফলা জন্মভূমির গ্লানি।

দুষ্ট দমনে শিষ্ট পালনে খর্পরধারী নারী।
কামনা শূন্য শুভ্র-হৃদয় অনন্ত-পথ-চারী।
শ্রীকৃষ্ণ পায়ে নিবেদি সকল দূর করে সংশয় ;
এক চোখে তার ধ্বংসের জ্বালা, আর চোখে বরাভয়।

সাহিত্য-রথী, স্বদেশ-প্রেমিক, ব্রাহ্মণ-সনাতন,
ক্ষাত্রধর্ম্মী তুমি বঙ্কিম, বীর্য্যাতে নিমগন।
জ্ঞানদীপ জ্বালি দিয়েছ উজলি নিয়ত আপন পর।
যুগের সারথী, সুধী সন্ধানী, তুমি সে যুগন্ধর।

রূঢ় কষাঘাতে মিথ্যা শাসিয়া সত্য করেছ খাড়া।
নিদ্রিত এই বাংলার বুকে জাগালে তীব্র সাড়া।
কমলাকান্ত অতি প্রশান্ত মিঠে রসিকতা দিয়া,
অমরতা লভি যুগ-সাহিত্যে, জিনেছে সবার হিয়া।

মাতৃভক্ত, শক্তিসাধক, সত্যদ্রষ্টা ঋষি।
তোমার মাতৃ-মন্ত্র মোদের রক্তে গিয়াছে মিশি।
কিন্তু দেবতা, পারি নি ঘুচাতে মায়ের পায়ের বেড়ি।
ছাড়ি নি চেষ্টা, শিকল ছিঁড়িতে জানি না কত যে দেরী।

স্বাধীন ত্রিপুরার রাজমালা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পূর্ব্বভারতের পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য আজ ভারতের নবযুগারম্ভে অভিনব অরুণালোকে রঞ্জিত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। স্মরণাতীত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে রাজবংশ প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় নানা বিপর্য্যয় অতিক্রম করিয়া নাতিক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা আজ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার গৌরবোজ্জ্বল কথা প্রত্যেক বাঙালীর হৃদয়ে এখন আনন্দলহরী উৎপাদন করিবে সন্দেহ নাই। ইংরেজ রাজত্বকালে সভ্যতার গতি পশ্চিমাভিমুখী হইয়া পড়িয়াছিল এবং ফলে শিক্ষিত বাঙালী প্রায় সর্ব্বদাই পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নবগঠিত জমীদার সভার (Landholders' Society) প্রথম অধিবেশনে সভাপতি রাজা রাধাকান্ত দেব বলিয়াছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজবংশই বাংলার প্রাচীনতম জমীদার ("the most ancient landholder in Pengal")। এই অমূলক উক্তির প্রতিবাদে *Friend of India* পত্রের সম্পাদক স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে ত্রিপুরার মাণিক্য রাজগণই বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীনতম রাজা সন্দেহ নাই :—"The noblest and most ancient chief in Bengal is, without doubt, the Raja of Tipperah, of the illustrious family of Manick" (*Friend of India*, 29 March 1838)। ত্রিপুরা রাজ্যের ঐতিহ্য বিষয়ে বাংলার জনসাধারণের অজ্ঞতা বিগত এক শতাব্দীমধ্যে অনেকাংশে দূর হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও কয়জন বাঙালী অবগত আছেন যে ত্রিপুরার রাজবংশ কেবল বাংলার নহে, পরন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজমণ্ডলীর মধ্যেই প্রাচীনতম? এই রাজ্যের প্রত্নসম্পদ এযাবৎ আবিষ্কৃত মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন পুথি ও দলীলপত্রদ্বারা এত প্রচুর পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তাহার তুলনা অন্যত্র আছে কি না সন্দেহ। দুঃখের বিষয়, মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে রাজকোষের সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় হইয়া থাকিলেও ত্রিপুরার ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এখনও রচিত হয় নাই। ত্রিপুরার ইতিহাসের প্রধান উপাদান "রাজমালা" গ্রন্থ নাতিদীর্ঘ হইলেও সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় নাই—যে তিন "লহর" বৃহদাকার চিত্রাদি-শোভিত রাজমালা এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ এবং বহুলাংশে অপ্রামাণিক। তথাপি গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হইলে ত্রিপুরার ইতিহাসের একটিমাত্র উপাদান ঐতিহাসিকের হস্তগত হইতে পারে। রাজব্যয়ে মুদ্রিত উক্ত গ্রন্থের প্রচারপদ্ধতিও অতি বিচিত্র—ইহা বিনামূল্যে জনৈক রাজপুরুষের অভিরুচিমতে বিতরিত হয়, বিক্রয় হয় না। ফলে, যাচ্ঞা করিয়া বহুকষ্টে ইহা আমাদের সংগ্রহ করিতে হইয়াছে, যদিও আমরা দেখিয়াছি রাজ্যের অযোগ্য ব্যক্তির হস্ত হইতে ইহা মুদী দোকানের ঠোঙায় পরিণত হইয়াছে। ইংরেজশাসনের বিচিত্রবিধানে দেশীয় রাজ্যের রাজারা বহুস্থলেই বিদেশী অর্থগৃধ্নু মোসাহেব দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিত, ত্রিপুরায়ও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এইরূপ কতিপয় চক্রান্তকারী মহারাজা বীরচন্দ্র-মাণিক্যকে প্রতারিত করিয়া সংস্কৃতরচনায় সিদ্ধহস্ত এক পণ্ডিত দ্বারা "রাজরত্নাকর" নামক এক কৃত্রিম গ্রন্থ রচনা করাইয়াছিল। দ্বাদশসর্গে সম্পূর্ণ ইহার "পূর্ব্ববিভাগ" ১৩০৫ ত্রিপুরাব্দে (১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে) রাজব্যয়ে মুদ্রিত হয় (নাগরাক্ষরে ১২৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ)। গ্রন্থমধ্যে ইহার কৃত্রিমতার বহু অকাট্য নিদর্শন বিদ্যমান আছে। রাজমালার সম্পাদক স্বর্গত কালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহাশয় অসত্যনিষ্ঠ রাজতন্ত্রের ভয়ে রাজরত্নাকরের কৃত্রিমতা অগ্রাহ্য করিয়া স্থানে স্থানে তাহা হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া নিজগ্রন্থের প্রামাণ্য ব্যাহত করিয়াছেন। আমরা আশা করি বর্ত্তমান নূতন পরি-স্থিতিতে ত্রিপুরারাজ্যের প্রকৃত তথ্যমূলক ইতিহাস রচনায় সকল বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া শ্রীশ্রীযুক্তা মহারাণী ও তদীয় মন্ত্রিবর্গ বাংলার ইতিহাসের একটি অভাব পূরণ করিতে সমর্থ হইবেন।

প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ আমরা ত্রিপুরার ইতিহাসের যে সকল উপকরণরাজি সংগ্রহ করিয়াছি তাহা হইতে সারসঙ্কলন করিয়া ত্রিপুররাজবংশের বিবরণের মূলসূত্র লিপিবদ্ধ করিতেছি।

পৌরাণিক যুগ :—ত্রিপুররাজবংশের আদিপুরুষের নাম "দৈত্য"। প্রাচীন রাজমালার মতে তিনি চন্দ্রবংশীয় বিখ্যাত রাজা যযাতির বংশধর ছিলেন :—

চন্দ্রবংশে মহারাজা যজাতি নৃপতি।
নিজবাহুবলে সাশে সপ্তদ্বিপ ক্ষিতি ॥
তান বংশে জন্মিলেক দত্য নাম বলি।
বিধিমতে মেদনি সাসিল কুতুহলি ॥
বিধাতা নির্ব্বন্দ হেতু সেই মহাজন।
অগ্নিকোণে দেসপতি হইল রাজন ॥

(রাজমালা ২।১ পত্র)

রাজমালার প্রথমাংশ যে ধর্ম্মমাণিক্য রচনা করাইয়াছিলেন তাহার প্রকৃত নাম "দৈত্যখণ্ড।" ১২৩৮ ত্রিপুরাব্দে দুর্গামণি উজীর প্রাচীন রাজমালা সংশোধন করিয়া অনেক ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ বিষয় সংযোগ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই সংশোধিত গ্রন্থই মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতেই সর্ব্বপ্রথম দ্রুহ্যুর নাম পরিগৃহীত হয় :—

"দ্রুহ্যু বংশে দৈত্য রাজা কিরাতনগর।
অনেক সহস্র বৎসর হইল অমর॥" (পৃ ৫)

পরে রাজরত্নাকর প্রভৃতি কৃত্রিম রচনাদ্বারা দ্রুহ্যু হইতে দৈত্য পর্য্যন্ত ৩৮ পুরুষের কাল্পনিক নাম সৃষ্টি করিয়া রাজবংশের গৌরব (?) বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রাচীন রাজমালার বহির্ভূত বিষয়মাত্রই প্রমাণবিরুদ্ধ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। দৈত্য হইতে "যুঝার ফা" পর্য্যন্ত (৭২ পুরুষে) ৭৪ জন রাজার কাল অলৌকিক কথায় পরিপূর্ণ পৌরাণিক যুগ বলিয়া খ্যাপন করা যায়। ত্রিপুরারাজ্য ক্রমশঃ দক্ষিণে প্রসারলাভ করে। দৈত্যের রাজধানী ছিল কপিলানদীর তীরবর্ত্তী ত্রিবেগনগরে। তাহার পৌত্র ত্রিলোচন শিবের ঔরসে "তিন চক্ষু" হইয়া জন্মেন এবং যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। তৎপুত্র দাক্ষিণ বড়বক্রনদীর তীরে "খলংমা" নামক স্থানে রাজধানী করেন। তাহার ভ্রাতা হেরম্বাধিপতির রাজ্য ও বংশ বহুকাল লুপ্ত হইয়াছে। বহুপুরুষ পরে প্রতীত রাজা হেরম্বের সহিত বিরোধ হেতু খলংমা ত্যাগ করিয়া "ধর্ম্মনগরে" নূতন রাজধানী করেন। প্রতীতের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ হামতার ফা।

হামথার ফার পুত্র পুনি জুঝার ফা হইল।
বহু জুদ্ধ করিয়া সে রাঙ্গামাটি লইল॥
(রাজমালা ১২।১ পত্র)

এই রাঙ্গামাটি অর্থাৎ রক্তমৃত্তিকাময় অধুনাতন উদয়পুর অঞ্চল জয় হইতেই রাজমালার দৈত্যখণ্ডে আধুনিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভ হইল বলিয়া ধরা যায়।

রাঙ্গামাটিদেশের লিকা নামক সামন্ত রাজা ও তাহার দশ হাজার সৈন্য পরাজিত করিয়া "জুঝার নৃপতি তথা হইল নরেস" (১২।১ পত্র) এবং পরে সেখান হইতে "বঙ্গদেশে"র অন্তর্গত বিশালগড় আদি স্থান অধিকার করেন। অর্থাৎ যুঝার ফার সময় হইতেই ত্রিপুরারাজ্যের মূলাংশ প্রায় অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। যুঝার ফার কালনির্ণয়ের একমাত্র প্রমাণ পুরুষগণনা। রত্নমাণিক্য যুঝার হইতে অধস্তন ২৫ পুরুষ। রত্নমাণিক্য হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত রাজাদের রাজত্বকাল সুনির্দ্দিষ্ট আছে এবং তাহা হইতে রাজত্বকাল ও জন্মকাল ধরিয়া গণনাদ্বারা এক পুরুষের গড়পড়তা পাওয়া যায় ২৭ হইতে ৩১ বৎসর। তদনুসারে যুঝার ফার রাজ্য আরম্ভ খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে কিম্বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে পতিত হয়। রাজমালায় পাওয়া যায় যুঝার ফার সময় হইতেই উদয়পুরে রাজাদের শ্মশান "বৈকুণ্ঠপুরী" নামে পরিচিত হয় এবং যুঝার ফার শ্মশানোপরি মঠ নির্ম্মিত হয়। এই মঠই ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুররাজগণের প্রাচীনতম কীর্ত্তি, যদিও ইহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমানে চিহ্নিত করা অসম্ভব। বুঝা যায় রাজমালার দৈত্যখণ্ড রচনাকালে ধর্ম্মমাণিক্যের সময়েও প্রাচীরবেষ্টিত এই মঠের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। খ্রীঃ ৭০০ হইতে অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রায় ১২৫০ বৎসর ধরিয়া একই রাজবংশ এক স্থানে রাজত্ব করিতেছেন, ইহার দ্বিতীয় উদাহরণ ভারতের কিম্বা জগতের ইতিহাসে পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। অথচ আমরা পৌরাণিক যুগের পূর্ব্বতন ৭২ পুরুষের নাম বাদ দিতেছি।

রত্নমাণিক্যের বৃদ্ধপ্রপিতামহ "ছেংথু ফার" সহিত গৌড়াধিপতির যুদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই যুদ্ধে রাজমহিষী স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মেহেরকুল পরগণার চৌধুরী হিরাবন্ত খাঁর সহিত সংঘর্ষে এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। যদিও খাঁ উপাধি হইতে গৌড়ের সুলতানদের আনুগত্য সূচিত হয়, তথাপি "গৌড়রাজা" বলিতে রাজমালায় সম্ভবতঃ সমতটাধিপতি দামোদরদেব (১২৩১-৪৪ খ্রীঃ) কিম্বা দেববংশীয় অপর কোন নরপতিকে বুঝাইতেছে। কারণ খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন গৌড় সুলতানের পক্ষে ত্রিপুরা-রাজ্য আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালে দ্বিজবঙ্গচন্দ্র রচিত "ত্রিপুরবংশাবলী" নামক গ্রন্থানুসারে উক্ত রাজমহিষীর নাম "ত্রিপুরাসুন্দরী" এবং ৬৫০ ত্রিপুরাব্দে সেনরাজাদের সহিত ঐ যুদ্ধ হইয়াছিল। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, উক্ত গ্রন্থ ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ একটি তুচ্ছ বস্তু, ইহার কোন উক্তিই বিনা প্রমাণে গ্রহণীয় নহে। উক্ত যুদ্ধের ফলে রাঙ্গামাটি "সুস্থির" হইল বটে, কিন্তু মেহেরকুল পরগণা ত্রিপুররাজের অধিকারে আসে নাই (দুর্গামণি সংশোধিত রাজমালার উক্তি এস্থলে ভ্রমাত্মক)। কারণ, ধন্যমাণিক্যই সর্ব্বপ্রথম মেহেরকুল প্রভৃতি বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলন, এইরূপ স্পষ্টনির্দ্দেশ পরে পাওয়া যায়।

ডাঙ্গর ফার কনিষ্ঠপুত্র রত্নফা সর্ব্বপ্রথম "মাণিক্য" উপাধি ধারণ করিয়া ত্রিপুরারাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ১৩১৪ ত্রিপুরাব্দে (১৯০৪ খ্রীঃ) উদয়পুরে মৃত্তিকাগর্ভ হইতে ৫০টি রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়, তন্মধ্যে ২০টি এই রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালীন বটে। রাজদরবারের ত্রুটিতে

ত্রিপুরাধিপতিগণের এই সকল প্রাচীনতম গৌরবচিহ্ন নানা স্থানে নানা লোকের হস্তগত হইয়া বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে। আমরা সৌভাগ্যবশতঃ ৪টি মুদ্রা পরীক্ষা করিতে পারিয়াছি। তন্মধ্যে প্রাচীনতম মুদ্রার তারিখ ১২৮৬ শক (১৩৬৪-৫ খ্রীঃ), ইহাই সম্ভবতঃ তাঁহার অভিষেকমুদ্রা। এই মুদ্রায় তাঁহার রাজধানীর নাম "রত্নপুর" অঙ্কিত আছে। বুঝা যায় রাজা নিজ নামানুসারে রাঙ্গামাটির নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১২৮৯ শকের অপর একটি মুদ্রায় রাজমহিষীর নাম উৎকীর্ণ আছে "শ্রীলক্ষ্মীমহাদেবী"। মুদ্রানুসারে দেবকৃপায় তিনি বিজয়ী হইয়াছিলেন ("শ্রীশ্রীদুর্গারাধনাপ্তবিজয়ঃ")। রাজমালা অনুসারে তিনি গৌড়েশ্বরের সাহায্যে পিতা এবং ১৭ জন ভ্রাতাকে পরাজিত করিয়া রাজ্য উদ্ধার করেন এবং গৌড়েশ্বরই তাহাকে "মাণিক্য" উপাধিতে ভূষিত করেন। রত্নমাণিক্যের সুশাসনে আকৃষ্ট হইয়া বঙ্গদেশের নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণাদি বহু জাতি এবং কতিপয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান তাঁহার রাজ্যে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রত্নমাণিক্যের দুই পুত্র প্রতাপ ও মুকুট এবং মুকুট-মাণিক্যের পুত্র মহামাণিক্যের নামোল্লেখমাত্র করিয়াই রাজমালার প্রথমাংশ দৈত্যখণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। ইঁহাদের রাজত্বকালীন কোন ঘটনা লিখিত নাই। ইঁহাদের এক-জনের সময়েই রাজা গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন ত্রিপুরা জয় করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা বাহুল্যবোধে বিবরণ দিলাম না। মহামাণিক্যের পুত্র ধর্ম্মমাণিক্যের প্রধান কীর্ত্তি সভাসদ বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর দ্বারা রাজমালা রচনা। এই গ্রন্থ ১৩৮০ শকের (১৪৫৮ খ্রীঃ) পরে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। ইহাই বাঙ্গালাভাষায় প্রাচীনতম ইতিহাসগ্রন্থ।

রাজমালার দ্বিতীয়াংশ অমরমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৫৭৭-৮৬ খ্রীঃ) রচিত হইয়াছিল এবং ইহার নাম রাখা হইয়াছিল "দুর্জ্জয়খণ্ড" :—

দুর্য্যখণ্ড বলিয়া পুস্তক নাম রাখে।
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য হতে রাজা তাতে লিখে॥

(রাজমালা ৩৩।২ পত্র)

বস্তুতঃ এই নামকরণ সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে, ধর্ম্মমাণিক্য হইতে উদয়মাণিক্য পর্য্যন্ত রাজগণের বৃত্তান্তই ত্রিপুরার ইতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ বটে। তন্মধ্যে ধর্ম্মমাণিক্যের পুত্র ধন্যমাণিক্য (১৪১২-৪৮ শক) সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী ছিলেন। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি সুলতান হুসেন শাহের সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া তিন বার চাটিগ্রাম অধিকার করা—প্রথম যুদ্ধ ১৪৩৫ শকে হইয়াছিল।[১] ১৪৪২ শকে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া চাটিগ্রাম হইতে আনিয়া 'ত্রিপুরা-সুন্দরী' মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মূল শিলালিপিতে মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৪৪২ শক লিখিত ছিল। রামমাণিক্য ১৬০৩ শকে মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করিয়া শিলালিপি যোজনা করেন, তাহাতে উল্লিখিত মূল মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল ("শাকে বহ্ন্যক্ষিবেধোমুখধরণিযুতে" অর্থাৎ ১৪২৩ শক) ভ্রমাত্মক।

ধন্যমাণিক্যের পুত্র ধ্বজমাণিক্যের নাম অলীক, রাজ-মালার কোন প্রতিলিপিতেই ইহা নাই। দেবমাণিক্যই তাঁহার পুত্র ছিলেন। তাঁহার অভিষেকমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তারিখ ১৪৪৮ শক ও মহিষীর নাম "পদ্মাবতী"। তৎপুত্র বিজয়মাণিক্যের বিক্রমকথা এখন অনেকটা পরিচয় লাভ করিয়াছে। তাহার অভিষেকমুদ্রার তারিখ ১৪৫৪ শক এবং দুই মহিষীর নাম "লক্ষ্মীবালা" (লক্ষ্মীরাণী নহে) ও "সরস্বতী"। তাঁহার রাজত্বকালীন একটি তাম্রশাসন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার বিবরণ প্রবন্ধান্তরে লিখিত হইবে।

বিজয়মাণিক্যের নাম আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপুত্র অনন্তমাণিক্য (অভিষেকমুদ্রা ১৪৮৭ শক, মহিষীর নাম "রত্নাবতী") সেনাপতির হস্তে নিহত হইলে ত্রিপুরার সিংহাসন ১০ বৎসরকাল রাজবংশের অধিকারচ্যুত হইয়া উক্ত সেনাপতি উদয়মাণিক্য (অভিষেকমুদ্রা ১৪৮৯ শক, মহিষী "হিরা") ও তৎপুত্র জয়মাণিক্য (অভিষেক-মুদ্রা ১৪৯৫ শক) করতলগত হইয়াছিল। তৎপর বিজয়-মাণিক্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অমরমাণিক্যের (অভিষেকমুদ্রা ১৪৯৯ শক, মহিষী অমরাবতী) প্রবলপরাক্রমে রাজত্ব করিয়া মঘরাজা সেকান্দর সাহার হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করেন। তৎপুত্র রাজধরমাণিক্য (অভিষেকমুদ্রা ১৫০৮ শক, মহিষী সত্যবতী)। রাজধরের পুত্র যশোমাণিক্য (মুদ্রা ১৫২২ শক, মহিষী লক্ষ্মী, গৌরী ও জয়া) মোগলসৈন্যের হস্তে পরাজিত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করেন

১। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র বর্দ্ধণ মহাশয় এই মুদ্রা আবিষ্কার করেন। তাঁহার সৌজন্যে তাঁহার নিকট রক্ষিত ত্রিপুররাজগণের নবাবিষ্কৃত মুদ্রাগুলি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ধন্যমাণিক্যের মুদ্রার তারিখ প্রকৃতপক্ষে ১৪৩৫ শক, ১৪৩৬ শক নহে (আনন্দবাজার, ১৯ পৌষ ১৩৫৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) এবং রাজমালায় এস্থলে কোন ভুল নাই। প্রাচীন রাজমালার পুথি দেখার সুযোগ পাইলে শ্রীযুত বর্দ্ধণ মহাশয় দেখিতে পারিতেন যে তাঁহার প্রদর্শিত ভ্রমপ্রমাদগুলির অধিকাংশ মূল গ্রন্থে ছিল না।

এবং ধর্ম্মমাণিক্যের ধারা তাহাতেই সমাপ্ত হয়। রত্নমাণিক্য হইতে যশোমাণিক্য পর্য্যন্ত মোট ৯ পুরুষে রাজত্বকাল পাওয়া যায় ২৬০ বৎসর অর্থাৎ একপুরুষের গড়পড়তা হয় ২৯ বৎসর। রত্নমাণিক্যের বয়স অভিষেককালে ন্যূনপক্ষে ২৫ ধরিয়া যশোমাণিক্য (জন্মাব্দ ১৫০১ শক) পর্য্যন্ত গণনা করিয়া একপুরুষের গড়পড়তা হয় ৩০ বৎসর।

১৫৯১ শকে (১৬৬৯ খ্রীঃ) গোবিন্দমাণিক্য রাজমালার তৃতীয়াংশ অমরমাণিক্য হইতে কল্যাণমাণিক্য পর্য্যন্ত রচনা করেন—ইহার নাম "উত্তরতুর্জ্জয়খণ্ড"। কল্যাণমাণিক্য (জন্মাব্দ ১৫০২ শক) ধর্ম্মমাণিক্যের ভ্রাতা গগন খাঁর অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ অর্থাৎ যশোমাণিক্যের "জ্ঞাতিভ্রাতা" ছিলেন—তাঁহার পিতার নাম বসন্ত ও পিতামহের নাম ইন্দ্র। ঊর্দ্ধতন দুই পুরুষের নাম পাওয়া যায় না। কল্যাণমাণিক্যই রাজবংশের বর্ত্তমান ধারার আদিপুরুষ এবং মোগল বিজয়ের পরে রাজ্যকে পুনরায় স্বাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজমালার রচয়িতা তাঁহাকে ত্রিলোচনের সহিত তুলনা করিয়া অপূর্ব্ব সম্মান দেখাইয়াছেন। তাঁহার সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক রাজার বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়, কিন্তু ত্রিপুরার রাজদরবার হইতে তাহা প্রকাশের কোন ব্যবস্থা এযাবৎ হয় নাই। কল্যাণমাণিক্যের অভিষেকমুদ্রার তারিখ ১৫৪৮ শক এবং ১৫৮২ শকে পূর্ণ ৮০ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গী হন। ত্রিপুরা রাজবংশে ঐতিহাসিক যুগে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। আমরা ইংরেজ অধিকারকাল বাদ দিয়া অধস্তন রাজগণের নামমালা ও প্রকৃত রাজত্বকাল উল্লেখ করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

গোবিন্দমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৫৮২ হইতে ১৫৯৫ শক। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছত্রমাণিক্য ১৫৮৬ শকে কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে এযাবৎ মুদ্রিত সমস্ত বিবরণই ভ্রমাত্মক। গোবিন্দের পুত্র রামমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৫৯৫-১৬০৭ শক, মধ্যে কয়েক মাস নরেন্দ্রমাণিক্য বিদ্রোহী হইয়া রাজত্ব কাড়িয়া লন। রামমাণিক্যের পুত্র রত্নমাণিক্য (১৬০৭-১৬৩২ শক), মধ্যে ১৬১৫ শকে নরেন্দ্রমাণিক্য পুনঃ রাজত্ব অধিকার করিয়াছিলেন। এস্থলেও প্রচলিত গ্রন্থাদির বিবরণ ভ্রমাত্মক। ভ্রাতৃদ্রোহী মহেন্দ্রমাণিক্য মাত্র দুই বৎসর রাজত্ব করেন (১৬৩৩-৪ শক)। অপর ভ্রাতা ধর্ম্মমাণিক্যের (অভিষেক মুদ্রা ১৬৩৬ শক) সময়ে ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে নবাব সুজা খাঁ ত্রিপুরারাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মমাণিক্য রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইয়া রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া এক বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা মুকুন্দমাণিক্যের রাজত্বকাল ১৬৫১-৬০ শক। তৎপর সুদীর্ঘ ২০ বৎসর ত্রিপুরারাজ্যের ঘোরতর অন্ধকার যুগ, তন্মধ্যে ইন্দ্রমাণিক্য, জয়মাণিক্য, উদয়মাণিক্য ও সর্ব্বশেষে বিজয়মাণিক্য সময়ে সময়ে রাজত্ব করিয়াছেন। মধ্যে লক্ষ্মণমাণিক্যকে রাজা করিয়া ডাকাত সমসের গাজিও রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সমসের গাজি নিহত হইলে মুকুন্দমাণিক্যের পুত্র কৃষ্ণমাণিক্য রাজত্ব অধিকার করেন—তাঁহার অভিষেক মুদ্রার তারিখ ১৬৮২ শক অর্থাৎ ইংরেজ অধিকারের সূত্রপাত বৎসর ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ। স্বর্গত মহারাজা বীরবিক্রমকিশোর-মাণিক্য কৃষ্ণমাণিক্যের ভ্রাতা যুবরাজ হরিমণির অধস্তন অষ্টম পুরুষ এবং কল্যাণমাণিক্যের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। এস্থলেও রত্নমাণিক্য ও কল্যাণমাণিক্যের জন্মাব্দ হইতে গণনা করিয়া এক পুরুষের গড়পড়তা পাওয়া যায় ৩০ বৎসর। যাঁহারা এক পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া গণনা করেন তাঁহাদের মত ত্রিপুরার রাজবংশের ৬০০ বৎসরের ইতিহাস দ্বারা সমর্থিত হয় না।

আশ্রয়প্রার্থী

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

নোয়াখালিতে সঞ্জাত ভ্রাতৃবিদ্বেষের বিষবাষ্প দেখতে দেখতে পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা জেলায়ও ছড়িয়ে পড়ল। এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী লোকের অপপ্রচারের ফলে নিভৃত পল্লীগ্রামগুলোতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেদের মনে পরস্পরের বিরুদ্ধে সন্দেহ আর অবিশ্বাস জমা হতে লাগল।।

নূরপুরের অঘোর রায় ছিলেন বীর্যবান তেজস্বী পুরুষ। তাঁর পরাক্রমের জন্যে লোকে তাঁর আখ্যা দিয়েছিল 'বাঘা রায়'। তিনি বিপত্নীক, সংসারে তাঁর একমাত্র বন্ধন ষোল বছরের ছেলে টিপু—তাকে নিয়ে প্রকাণ্ড বাড়ীতে তিনি একলা থাকেন—বাড়ীতে অন্য আত্মীয়-স্বজন আর কেউ নেই। অঘোর রায় বিত্তশালী নন, কিন্তু ব্যক্তিত্বের গুণে আর চরিত্র-মাধুর্যে গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন।

নিজের বাড়ীতে দুই পক্ষেরই মাতব্বর গোছের লোকদের ডেকে এনে তিনি যা বললেন, তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করা চলবে না, নূরপুরের শান্তিকে যেমন করেই হোক অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

সকলেই তাঁর কথা অনুমোদন করলে, কিন্তু দুই দলেই এমন কয়েকজন ছিল বিবাদ বাধিয়ে তোলাই যাদের মনোগত অভিপ্রায়। তারা তাঁকে বিষনজরে দেখতে লাগল।

শান্তি স্থাপন করতে গিয়ে অঘোর রায়কে নানা প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হ'ল এবং অচিরেই তাঁকে এমন এক স্থানে যেতে হ'ল যেখানে সাম্প্রদায়িক কলহ নেই এবং যেখানে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত।

একদিন সারারাত তিনি আর বাড়ী ফিরলেন না, দু'তিন দিন পরে দেখা গেল যাদুকাটা খালের পাড়ে তাঁর দীর্ঘ দ্বিখণ্ডিত দেহ পড়ে আছে।

সকলের সঙ্গে খালের পাড়ে গিয়ে টিপুও পিতার বিকৃত বীভৎস শবদেহ দেখে এল।

অঘোর রায়ের অপমৃত্যুর পর গ্রামের স্বাভাবিক জীবনধারায় কেমন একটা বিপর্যয় দেখা দিলে। সকলেরই মনে হতে লাগল যে, এটা যেন একটা আসন্ন ব্যাপক দুর্ঘটনার পূর্ব্বসূচনা। ঝড়ের পূর্ব্বেকার প্রকৃতির মত পল্লীর বুকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব বিরাজ করতে লাগল। নূরপুরে সুরু হ'ল নীড় ভাঙার আয়োজন। ভাবী বিপদের আশঙ্কায় বহু লোক ঘরবাড়ী জমিজমা ছেড়ে যেদিকে দু'চোখ যায় পালাতে সুরু করলে।···

টিপুর মাথায় আকাশ যেন ভেঙে পড়ল। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তার জীবনে যে দুর্য্যোগ ঘনিয়ে এল বুঝি তার তুলনা নেই। এ বয়সেই সে হয়ে পড়ল সম্পূর্ণরূপে নিরাশ্রয়—যে নীড় আশ্রয় করে সে এতদিন কাটিয়েছে আজ তা প্রবল ঝটিকায় ছিন্নভিন্ন হবার মুখে। এখন সে যায় কোথায়—এত বড় সংসারে কোথায় গিয়েই বা দাঁড়ায়। শেষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতি খুড়ো চন্দ্রশেখর রায়ের কাছে গিয়ে সে পরামর্শ চাইলে।

তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"টিপু, তুই এক কাজ কর, চৌধুরীপাড়ার বিনয় আজ যাচ্ছে কলকাতায়, তাঁর সঙ্গে তুই সেখানে তোর মামার বাসায় চলে যা। তাঁর সঙ্গে বিনয়ের আলাপ-পরিচয় আছে। ওখানে গেলে তোর মামা তো তোকে আর ফেলতে পারবেন না।"

মামাকে টিপু দেখেছিল মাত্র একবার মা বেঁচে থাকতে তার ছয় সাত বৎসর বয়সে···তারপর আর তিনি দেশেও আসেন নি, বা তাদের সঙ্গে কোনো যোগও রাখেন নি। তা হোক, তবু তো একটা জায়গায় গিয়ে মাথা গুঁজবার উপায় হবে—একথা ভেবে টিপু যেন অকূলে কূল পেলে।

নদীর ঘাটে নৌকা বাঁধা। নদীপথে চৌদ্দ মাইল উজিয়ে নোয়াপাড়া ষ্টেশনে পৌঁছে টিপুদের কলিকাতাগামী ট্রেন ধরতে হবে।

পৈতৃক ভিটা থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে যাবার সময় বেদনায় টিপুর সমস্ত শিরা-উপশিরা যেন টনটন করে উঠল। আশৈশব সে মাতৃহীন—এই বাড়ীতে পিতার স্নেহচ্ছায়ায় ষোলটি বছর তার কেটেছে। এ বাড়ীর গাছপালা, বাঁশঝাড় পচা পুকুর সব কিছুরই সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ—এখানকার প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে মিশে রয়েছে তার পিতৃপিতামহের পদরেণুকণা। টিপু ভাবতে লাগল, তার জীবনের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থভূমি থেকে কার অভিশাপে আজ সে চিরতরে নির্ব্বাসিত হতে চলেছে। অভিমানে বুকখানি তার ভরে উঠল, তারপর ভুঁয়ে লুটিয়ে পড়ে সে একেবারে ছোট্ট শিশুটির মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। অজস্রধারায় অশ্রু ঝরে পড়ে তার জন্মমাটির বুক ভিজিয়ে দিলে।

ওদিকে বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে—বিনয় এসে তাড়া দিলে "টিপু, উঠ ভাই, আর সময় নেই—এখনি নৌকো ছেড়ে দেবে।"

মন্ত্রচালিতের মত দাঁড়িয়ে উঠে সে বিনয়ের অনুসরণ করলে। সে চলে গেল—কিন্তু তাঁর জন্মনিকেতনের মাটির বুকে মিশে রইল তার অশ্রুধারা—বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল বাস্তুত্যাগী ছেলেটির সকরুণ দীর্ঘশ্বাস।···

বাঘারায়ের বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়ে আমবাগান পেরিয়ে রাণীদীঘির পাড় দিয়ে চলতে চলতে তারা নদীর ঘাটে এসে নৌকায় উঠল—মাঝি নৌকা ছেড়ে দিলে।

ছইয়ের উপর বসে টিপু তিতাস নদীর তটভূমির ক্রমবিলীয়মান ছবিটুকু নিজের নিজের মনের পটে এঁকে নিতে লাগল।

নদীর ঘাটে মালীপাড়ার বৌঝিরা জল নিতে এসেছে—আবক্ষ-লম্বিত ঘোমটা ফাঁক করে তারা কৌতূহলভরা চোখে তাদের নৌকার পানে তাকিয়ে আছে, গ্রামের ভেতরে বাঁশঝাড়ের ফাঁকে ফাঁকে মঠমন্দিরের চূড়ো নজরে পড়েছে। নদীর ওপারে সবুজ ঘাসে ঢাকা সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের স্থানে স্থানে সরষে ক্ষেতে হলুদবরণ অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে—স্বর্ণখচিত সবুজ মখমলের সাড়ী পরিহিতা পল্লীলক্ষ্মী যেন রূপের ছটায় ঝলমল করছেন। এপারে একক দাঁড়িয়ে আছে একটি সুপ্রাচীন বটগাছ। শাখাপ্রশাখা তার জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। গাঁয়ের ছেলেরা এর কোলেপিঠে চড়ে মানুষ। এর কাণ্ডে দোলনা টাঙিয়ে তারা দোল খায়—এর ডালপালায় পল্লীর দুরন্ত দুলালদের দাপাদাপির আর অন্ত থাকে না। নৌকা যখন তটভূমি ছেড়ে বেশ খানিকটা দূরে ভেসে এল তখন টিপুর মনে হতে লাগল এই বুড়ো বটগাছ যেন শত শাখাবাহু প্রসারিত করে তাকে পল্লীর স্নেহক্রোড়ে ফিরে আসবার জন্যে আকুল আহ্বান জানাচ্ছে।...টিপু আর ওদিক পানে তাকাতে পারে না, চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে—অবাধ অশ্রুজলে মঠ-মন্দির বাঁশঝাড় নদীতট বটগাছ সব কিছু ঝাপসা হয়ে যায়।

নৌকা চলে উজান ঠেলে—নদীর এপারে গ্রামতরুশ্রেণীর শ্যাম সমারোহ—ওপারে শস্যাবৃত প্রান্তরের অনন্ত প্রসার—নদীমাতৃক পূর্ব্ববঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা।...

সন্ধ্যা নাগাদ ষ্টেশনে পৌঁছে তারা কলিকাতাগামী ট্রেন ধরলে।

কলকাতায় পৌঁছে টিপুকে নিয়ে বিনয় তাদের বৌবাজারের মেসে এসে উঠল। মহানগরীতে এসে টিপু কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গেল।

দু' তিন দিন বাদে এক দিন সন্ধ্যার পরে বিনয় টিপুকে নিয়ে হরিমোহন সাহা লেনে তার মামার বাসায় এসে হাজির হ'ল। কড়া নাড়তেই মামা নীচে এসে হাজির হলেন। ভদ্রলোককে দেখলে প্রথমেই মনে এই অনুভূতি জাগে যে, "এ বড় কঠিন ঠাঁই।" চোখে তাঁর তীব্র ভ্রূকুটি—মনে হয় ভদ্রলোক সমস্ত বিশ্বের উপর চটে আছেন।

বিনয়ের দেখাদেখি টিপু তাঁকে প্রণাম করলে। মামা বললেন—"তার পর বিনয়কৃষ্ণ, দেশ থেকে ফিরলে কবে? দেশের খবর কি বল। আরে, সঙ্গে এটি কে হে? চেনা বলে মনে হচ্ছে না তো।"

বিনয় বললে—"দেশ থেকে এসেছি দু' তিন দিন হ'ল—দেশের বড় দুর্দ্দিন মামাবাবু! আপনি কোন খবর পান নি বুঝি? অঘোর কাকাকে দিনকতক আগে কারা খুন করেছে। টিপুকে চিনতে পারলেন না—এ হচ্ছে অঘোর কাকার ছেলে। গাঁয়ের সবাই যে দিকে দু'চোখ যায় পালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এর তো আর যাবার ঠাঁই নেই, তাই আপনার এখানে নিয়ে এলাম।"

মামার ভাবান্তর দেখা গেল। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন—"খুব সৎকর্ম্ম করেছ। এদিকে রেশনের ঠেলা আর দাঙ্গার ঝামেলা সামলাতে সামলাতেই প্রাণ অতিষ্ঠ—নিজেদেরই না খেয়ে মরবার জোগাড়...তার উপর আবার পুষ্যিবৃদ্ধি...(একটু থেমে টিপুর দিকে তাকিয়ে) কি নাম বললে, টিপু—তা একেবারে স্বয়ং টিপু সুলতানের আগমন, নামের বাহার আছে বটে—তা তোর মাথায় এত লম্বা চুল কেন রে, তুই কবি হয়েছিস না সাধু হয়েছিস?"

টিপু চুপ করে রইল—এ কথার কি উত্তর দেবে সে। মাকে টিপুর মনে পড়ে না...কিন্তু তার মায়েরই তো আপন ভাই ইনি, কিন্তু এ কি ধরণের সম্ভাষণ!...

যাই হোক্, চক্ষুলজ্জার খাতিরে মাতুল মহাশয় অবাঞ্ছিত আত্মীয়কে আশ্রয় দিতে বাধ্য হলেন...বাইরের ঘর থেকে টিপুকে অন্তঃপুরে চালান দেওয়া হ'ল। সেখানে হ'ল আর এক পালা অভ্যর্থনা। মামীর বচনবিন্যাস আরও পরিপাটি—তার ঝাঁজ অনেক উগ্র...ক্যাঁটকেঁটে কথাগুলো যেন টিপুর একেবারে মর্ম্মস্থলে কেটে কেটে বসতে লাগল।...

ফণীন্দ্রনাথের সংসার-তরণীর কর্ণধারণ করে রেখেছিলেন তদ্গৃহিণী তরঙ্গিণী। ফণীন্দ্রনাথ শুধু টাকারোজগার করেই খালাস। সেই টাকা কি ভাবে খরচ হবে, কি উপায়ে সংসার খরচ চালিয়ে দুটো পয়সা বাঁচবে এই সমস্ত গার্হস্থ্য অর্থনীতির বিধানকর্ত্রী ছিলেন তরঙ্গিণী। ফণীন্দ্রনাথও সকল ভার গৃহিণীর হাতে ছেড়ে দিয়ে 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি' এই নীতি অনুসরণ করে চলতেন—সাংসারিক কোন ব্যাপারে স্বমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তিনি কখনো করেছিলেন এমন অপবাদ তাঁর শত্রুতেও দিতে পারবে না। টিপুর আগমনের দিনকতক পরে তরঙ্গিণী এক দিন স্বামীকে বললেন—"বাজার করা, রেশন আনা এ সমস্ত টেপাকে (তরঙ্গিণীকৃত টিপুর অপভ্রংশ) দিয়েই হবে—ছোকরা চাকরটাকে ছাড়িয়ে দিই কি বল?"

ফণীন্দ্রনাথ একেবারে সবিনয় নিবেদন হয়ে বললেন—"এর আর বলা বলি কি তুমি যখন..."

কাজেই তিনি যখন এটা চান তখন তড়িঘড়ি ছোকরা চাকরটিকে বিদায় করা হ'ল এবং এমন সব কাজের ভার বিন্দুকে দেওয়া হ'ল যা সম্পন্ন করতে গিয়ে ভূত্যটি পর্য্যন্ত হিমসিম খেয়ে যেত।

তরঙ্গিণী ভেবে দেখলেন, বিন্দুকে দিয়ে যদি এক বেলা রান্নার পাট সারিয়ে নেবার ব্যবস্থা করা যায় তা হলে প্রচুর সময় পাওয়া যাবে। নভেল পড়েই হোক বা পরচর্চ্চা করেই হোক্ সেই সময়টার বেশ সদ্ব্যবহার করা যাবে। কাজেই বিন্দুকে তিনি মহা উৎসাহে রান্নার পাট সম্বন্ধে পাঠ দিতে সুরু করলেন। কি ভাবে ঘুঁটে সাজাতে হয়, উনুন ধরাতে হয়, কত চালে কত জল লাগে—এ সকল বিষয়ে বক্তৃতা আর হাতেকলমে শিক্ষা চলল সমান তালে। এত সব শিক্ষণীয় বিষয় যে সংসারে ছিল বিন্দু কি আর তা জানত!

প্রথম দিন উনুনে আঁচ দিতে গিয়ে টিপুর চোখের জলে নাকের জলে এক হ'ল। বহু কষ্টে উনুন ধরানোর পর ভাত যদি বা সিদ্ধ হ'ল তো ফেন গালতে গিয়ে হাঁড়ি ভদ্ধুতি ভাত মেঝের ওপর পড়ে গিয়ে সব একশা হয়ে গেল। গৃহস্থালিতে এটা অবশ্য রীতিমত বিপর্য্যয় কাণ্ড, কিন্তু তরঙ্গিণী হাল ছাড়লেন না—কেননা এখন ধৈর্য্য ধারণ করলে আখেরে লাভ আছে; ঠাকুর-চাকর না রেখে আর নিজের গতর যথাসাধ্য কম খাটিয়ে সংসার-চক্রটিকে সচল রাখা যাবে। ভাগিনেয়কে পাক-প্রণালীতে পাকাপোক্ত করে তুলবার জন্তে তিনি প্রাণপণে তালিম দিতে লাগলেন। এদিকে টিপুর অপটু হস্তে স্বাদে-বর্ণে-গন্ধে অতুলনীয় যে-সকল ব্যঞ্জনাদি রন্ধিত হতে লাগল, নিতান্ত পরমহংস অবস্থা না হলে সেগুলো গলধঃকরণ করা সম্ভবপর নয়। এক দিকের ক্ষতি আর এক দিকে পুষিয়ে নেওয়া যাবে এই ভেবে, মামী সান্ত্বনা পেলেন, কিন্তু বেচারা ফণীন্দ্রনাথের অবস্থা কাহিল হয়ে উঠল, অবশ্য তরঙ্গিণীর বিধানের বিরুদ্ধে মুখ ফুটে কিছু বলবার মত বুকের পাটা তাঁর ছিল না।...

এমনি ভাবে কাটল মাস দুই। টিপুর মন এখান থেকে দিনরাত শুধু পালাই পালাই করতে লাগল। আশৈশব সে ছিল ভাবপ্রবণ—কাজকর্ম্মে একদম আনাড়ী। দেশে থাকতে খড়-কুটোটি পর্য্যন্ত কখনও তাকে নড়াতে হয় নি, আর এখানে এসে সে করছে কিনা বাসা-চাকরের কাজ! সে ভাবলে, নিজের জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়ে শুধু আহার আর আশ্রয়ের বিনিময়ে এমন ভাবে দেহের রক্ত তিল তিল করে ক্ষয় করে কি লাভ?

মনে পড়ল বাবার কথা। তিনি তাকে মহাপুরুষদের জীবনী পড়ে শোনাতেন, মহত্তর জীবনের আদর্শে তাকে অনুপ্রাণিত করে তুলবার জন্তে তাঁর চেষ্টার বিরাম ছিল না। তাঁর মুখে দেশের মুক্তি-সাধকদের কাহিনী শুনে শুনে নিজের জীবনকে তাঁদের আদর্শে গড়ে তুলবার জন্তে কি ব্যাকুলতাই না তার মনে জাগত! কিন্তু মহানগরীতে এসে তার জীবনের ও জীবনীশক্তির কি শোচনীয় অপচয়ই না হচ্ছে! এই কি জীবন? এমনি ভাবে বেঁচে থাকার সার্থকতা কি!

অনেক ভেবে চিন্তে সে স্থির করলে মামামামীর আশ্রয় থেকে চলে সে যাবেই—তারপর যা হয়। বিরাট মহানগরীতে মানুষের মত বাঁচবার ঠাঁই কি তার একান্তই হবে না!

নিজের মনের সঙ্গে অনেক বুঝাপড়া করে নিয়ে ইতিকর্ত্তব্য স্থির করে সে কাজ কর্ম্মে ঢিলে দিলে। তরঙ্গিণী ফাইফরমাস খাটাবার জন্তে আর তাকে সময়মত ডেকে পান না। সন্ধ্যার সময় সে হেদুয়ায় গিয়ে একলা চুপ করে বসে থাকে... রাত আটটা নয়টায় সময় ফিরে এসে কোন দিন রান্না চাপায়, কোন দিন বা সটান নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। অগত্যা তরঙ্গিণীকে সুখ-শয্যা থেকে ওঠে এসে রান্নার আয়োজন করতে হয়; দুপুর রাত্রে শেষ হয় রাতের ভোজনপর্ব্ব।...

শুধু তাই নয়, সাত চড়ে যে কথা কইত না, এখন সে মুখে মুখে জবাব দেয়। তরঙ্গিণীর মেজাজ গরম হয়ে উঠল। ফণীন্দ্রনাথকে একদিন তিনি বললেন—"আপদ বিদেয় কর"। পত্নীর হুকুম তাঁর নিকট বেদবাক্য, তিনি অতি সংক্ষেপে তাঁর কথার জবাব দিলেন, বললেন—"তাই হবে।"

বিদায়ের পালাও হ'ল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসতে ভাসতে টিপু এক দিন মাতুল-পরিবারে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, দু'দিন যেতে না যেতেই সে আশ্রয়ও তার টুটল। নিজের ক্ষুদ্র বিছানা আর কাপড়-চোপড়ের পোঁটলাখানা বগলে করে সে পথে বেরিয়ে পড়ল।

মাতুল-পরিবারে স্বল্পকাল থেকে সে দেখে গেল মানুষের স্বার্থপরতার অত্যুগ্র রূপ, সঞ্চয় করে গেল জীবনের প্রথম তিক্ত অভিজ্ঞতা।

সটান সে বৌবাজারে বিনয়দের মেসে গিয়ে হাজির হ'ল। বিনয় তখন আপিসে যাবার জন্তে তৈরি হচ্ছিল, অস্থাবর সম্পত্তি সহ টিপুর অপ্রত্যাশিত আগমনে সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। খানিকক্ষণ নির্ব্বাক থেকে জিজ্ঞেস করলে—"ব্যাপার কি টিপু?" টিপু জোর করে মুখে ঈষৎ হাসি (অবশ্য তা কান্নার চেয়ে করুণ) ফুটিয়ে জবাব দিলে—"মামার বাড়ীতে ঠাঁই হ'ল না বিনুদা, সেখান থেকে চিরতরে চলে এসেছি; আপাততঃ তোমার এখানেই দিনকতকের জন্তে আমায় আশ্রয় দাও।" শুনে বিনয়ের মাথা বন বন করতে লাগল। সর্ব্বনাশ, ও যদি এখন তার কাঁধে এসে চেপে বসে তা হলেই হয়েছে আর কি! কাজেই গোড়ায় সাবধান হওয়া ভাল। বিরক্তিপূর্ণ স্বরে সে বললে—"না হে! ও সব আশ্রয়-টাশ্রয় দেওয়া আমা দ্বারা হবে না। বলে, আপনি শুতে পায় না ঠাঁই শঙ্করাকে ডাকে। তোমার ব্যবস্থা তুমি করো বাপু—ওদিকে আমার আবার আপিসের বেলা হ'ল।" বলেই সে হন্ হন্ করে চলে গেল। টিপু নিরালায় বসে বসে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগল।

নির্ম্মলবাবু বলে এক ভদ্রলোক মেসে থেকে গ্রামোফোনের কারবার করতেন। একলা মানুষ, একটা চাকর নিয়ে তিনি থাকেন। তিনি মেসের তিনটে রুম ভাড়া নিয়েছিলেন। একটাতে তিনি থাকতেন আর একটাতে তার রান্নাবান্না হ'ত, আর একটা ছিল তার আপিস-ঘর।

টিপুর অবস্থা দেখে তাঁর দয়া হ'ল। আপিস-ঘরে তিনি তাকে শোবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু রেশনের দিনকাল—চাল আটা যা জোটে তাতে নিজেরই দু' বেলা পেট ভরে খাওয়া হয় না। টিপুকে আশ্রয় দেওয়া যদি বা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'ল, তার আহার্য্যের সংস্থান করা যে তাঁর সাধ্যাতীত সে কথা তিনি খোলাখুলি ভাবে তাকে জানিয়ে দিলেন।

কলকাতায় এসে অবধি টিপু কেবল মনুষ্য-প্রকৃতির নিকৃষ্ট দিকটারই অভিব্যক্তি দেখেছে। এর বিপরীত দিকও যে এখানে আছে এটা তার নূতন অভিজ্ঞতা। এই সামান্য সমবেদনার স্পর্শেই তার চোখে জল এল। নির্ম্মল বাবুর কথার কোন জবাব সে দিলে না, উদ্গত অশ্রু রোধ করবার জন্যে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে।...

বিচিত্র মেসের জীবন! ষাট সত্তরটি প্রাণী এখানে বাস করে, সবাইকার জীবন যেন এক ছাঁচে ঢালা। সকালে সবাই নাকে মুখে চারটি ভাত গুঁজে আপিসে চলে যায়, ফেরে সন্ধ্যার পর—তারপর সুরু হয় সশব্দে তাস পেটা অথবা বাজে আড্ডা ইয়ার্কি মারার পালা। আপিস আর মেসের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ এদের জীবন—বাইরের বৃহত্তর জগতের সঙ্গে তাদের কারুর কোন সম্পর্ক নেই। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে, কাজের চাপে আর সংসারের বোঝার ভারে এদের আত্মার হয়েছে অপমৃত্যু, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে থেকে এদের হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলো মরে গেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া আর কোন কথা এরা ভাবতে চায় না, পারে না—তাই অপরের দুঃখ এদের মনে সমবেদনার সঞ্চার করে না, এমন কি নিজেদের আশেপাশেই কে বাঁচল আর কে মরল সে সম্বন্ধেও তাদের কোন মাথাব্যথা নেই।

কাজেই পুরা তিন দিন অভুক্ত অবস্থায় থেকে টিপু যখন ক্ষুধার চোটে একেবারে নেতিয়ে পড়ল তখনো কারুরই দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হ'ল না—তাদের নির্ব্বিকার ঔদাসীন্য সমানই রইল।

মেসে আসবার পর চার দিন কেটে গেল—আজ পঞ্চম দিন, এর মধ্যে পেটে এক কণা খাদ্যও পড়ে নি। সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাদের উপর একান্তে বসে টিপু আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। ক্ষুধার জ্বালা যে এত মারাত্মক, এর চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক যে সংসারে আর কিছু নেই তা কে জানত! ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে রেলিং ধরে ঠায় বসে আছে, মাথা ঝিম ঝিম করছে; সমস্ত শরীর অবশ হয়ে এসেছে। পেটের ভেতরে একটা অসহ্য যন্ত্রণা। তার আর সকল অনুভূতি যেন লোপ পেয়ে গেছে, কেবল একটা কথাই তার মনে জাগছে যে, যেমন করেই হোক খাদ্য তাকে যোগাড় করতেই হবে; কিন্তু কোথা থেকে কি ভাবে তা সম্ভব হবে...দুর্ব্বল মস্তিষ্ক আর চিন্তা করতে পারে না। ভাবতে ভাবতে সব কেমন যেন গুলিয়ে যায়। আচমকা বিদ্যুৎচমকের মত একটা উপায়ের কথা তার মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে গেল। সকল ক্লান্তি, সকল দুর্ব্বলতা আর অবসাদ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু দাঁড়াবার সঙ্গে মনে হ'ল তার পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে, পৃথিবীটা দুলছে আর সব কেমন যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। খানিকক্ষণ বারান্দার রেলিং ধরে সে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর শরীরের কাঁপুনি থামলে পর রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে কলেজ স্ট্রীট ধরে চলতে চলতে সে একেবারে হরিমোহন সাহা লেনে তার মামার বাসার সামনে এসে থামল। সদর দরজা খোলাই ছিল, চট্ করে সে ভেতরে ঢুকে পড়ল। নীচের তলায় রান্নার জায়গা, সেখানটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভাল করে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে—কেউ কোথাও নেই, কণীন্দ্রনাথ বাড়ী ফেরেন রাত আটটার পরে, ওদিকে পাশের ঘরে তরঙ্গিণী নিবিষ্ট মনে সঙ্গীতচর্চ্চায় রত। সন্তর্পণে পা ফেলে যেখানে চাল ডাল ইত্যাদি থাকত সেখানে গিয়ে অন্ধকারে হাঁটকাতে হাঁটকাতে সে মুঠো মুঠো চাল ডাল পকেটে পুরতে লাগল, তার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল, সারা গা ঘামে ভিজে গেল; বুকের কাছ থেকে কি যেন একটা গলা পর্য্যন্ত ঠেলে উঠতে লাগল।...দুই পকেট চাল ডালে ভরতি করে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে টিপিটিপি সে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

বড় রাস্তায় পা দেবার পর তার হৃৎপিণ্ডের গতি স্বাভাবিক হ'ল। একটু ধাতস্থ হবার পর সে ভাবতে লাগল, এ ধরণের হেয় এবং নিজের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ তার দ্বারা কিরূপে সম্ভবপর হ'ল, মনে হ'ল যেন অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় এমন একটা কাজ সে করে ফেলেছে যার জন্যে সারা জীবন তাকে নিজের বিবেকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। উঃ! ক্ষুধার তাড়নায় সে অধঃপতনের কোন্ নিম্ন স্তরেই না নেমে গেছে!...

হেদুয়ায় অনেকক্ষণ কাটিয়ে যখন সে মেসে ফিরে এল তখন রাত বেশ হয়েছে। নির্ম্মলবাবুর চাকর উমেশ তাদের রান্নার পাট প্রায় শেষ করে এনেছে। উমেশকে বলে করে সে তাদের উনুনে চাল ডাল এক সঙ্গে ফুটিয়ে নিলে, তার পর গপাগপ তা মুখে পুরতে লাগল। সেই অখাদ্য তিন দিন উপবাসী তার রসনার নিকট অমৃতাস্বাদনবৎ লাগল।

খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমে তার চোখ দুটি জড়িয়ে আসতে লাগল। নির্ম্মলবাবুদের আপিস-ঘরে মাটিতে নিজের ছিন্ন বিছানাখানি বিছিয়ে সে শুয়ে পড়ল...কেমন যেন একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি তার স্নায়ুমণ্ডলীকে আচ্ছন্ন করে ফেললে...আঃ কি আরাম! গভীর তন্দ্রাবেশে তার চোখের পাতা দুটি মুদ্রিত হয়ে এল।

এমনিভাবে চাল চুরির ব্যাপারটা চলল কয়েক দিন মন্দ নয়।...কিন্তু চার পাঁচ দিন পরে টিপু একদিন মামার বাসার সামনে গিয়ে দেখে সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ; পরদিনও গিয়ে দেখে একই অবস্থা...বুঝলে টের পেয়ে মাতুলানী সাবধানী হয়েছেন।

কয়েকদিন পেটে কিছু পড়বার পর আবার সুরু হ'ল উপবাসের পালা। একদিন দু'দিন নয় পুরো একটি সপ্তাহ টিপুর শুধু জল খেয়ে কাটল। নির্ব্বান্ধব নিঃসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় টিপু মেসে মৃত্যুরই প্রতীক্ষা করতে লাগল।

এমন সময় মড়ার ওপর পড়ল খাঁড়ার ঘা। সেদিন দুপুর-বেলা ছাদের একান্তে বসে ক্ষুধার জ্বালায় ধুঁকতে ধুঁকতে টিপু তার জীবনটাকে নিয়ে বিধাতার যে নিষ্ঠুর খেলা সুরু হয়েছে তার শেষ পরিণতি কি তাই ভাবছিল এমন সময় নির্ম্মলবাবুর চাকর উমেশ এসে বললে, বাবু তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

অশুভ ঘটনার আশঙ্কাই টিপুর মত জন্ম-অভিশপ্ত দুর্ভাগাদের মনে আগে জাগে···তার বুক দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল। কেন তার ডাক পড়ল কে জানে! তার অবশ পা'দুটো যেন তার ক্লান্ত দেহটাকে বহন করতে পারছিল না। অতি কষ্টে সে আপিস-ঘরে নির্ম্মলবাবুর কাছে গিয়ে হাজির হ'ল। তিনি তার আপাদমস্তক ভাল করে একবার নিরীক্ষণ করলেন —দারুণ বুভুক্ষার ছাপ তার মুখের প্রতিটি রেখায় পরিস্ফুট। দেখলে মায়া জাগে, কিন্তু যা দিনকাল পড়েছে মায়ামমতা দেখাবার সময় এখন নয়—'আত্মানং সততং রক্ষেৎ' এইটেই হচ্ছে আজকের দিনের নীতি। একটু ইতস্ততঃ করে তিনি বললেন—'ওহে ছোক্‌রা, আজ দেশ থেকে চিঠি পেলাম, আমার এক আত্মীয় দু'একদিনের মধ্যেই দেশ ছেড়ে সপরিবারে কলকাতায় চলে আসছেন, আমার এই আপিস-ঘরেই তাঁদের আশ্রয় দিতে হবে। কাজেই এখন তুমি অন্যত্র তোমার ব্যবস্থা কর।" বলেই তিনি সাজ-পোষাক নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

টিপুর চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ঘুরতে লাগল। টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে রান্নাঘরের পাশে ধপ করে বসে পড়ল। তার পর হাঁটুতে মুখ গুঁজে গুম হয়ে বসে রইল।

এমনি ভাবে কাটল বহুক্ষণ। টিপু ভাবনার অথৈ সমুদ্রে একেবারে তলিয়ে গেছে। ওদিকে রান্নাঘরে উমেশ পাক করছে। রান্নার সুগন্ধ তার নাকে এসে পৌঁছে তাকে পাগল করে তুলছে। মনে হচ্ছে এই আহার্য্য থেকে অন্ততঃ কয়েকটি গ্রাস যদি সে মুখে তুলতে পারত!

রান্নার পাট চুকিয়ে ঘরে শিকল দিয়ে উমেশ বেরিয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ কাটল—তার পাত্তা নেই। ঘরের ভেতরকার সযত্নরক্ষিত খাদ্যদ্রব্যের কথা ভাবতে ভাবতে টিপুর রসনা লালায়িত হয়ে উঠল, একটি চিন্তাই শুধু তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রইল যে তার কিছু খাওয়া চাই—নইলে সে বাঁচবে না—ঘরের ভিতর রকমারি খাদ্যবস্তু রক্ষিত অথচ আজ সাত দিন সে অভুক্ত! সে আর ভাবতে পারে না—তাকে বাঁচতে হবে, এমন ভাবে না খেয়ে মরা কিছুতেই চলবে না।···ক্ষুধার জ্বালা তাকে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পাগলের মত করে তুলল—সে এদিক ওদিক একবার তাকাল, তার পর গুটিগুটি রান্নাঘরের দিকে এগুতে লাগল। তার হৃৎপিণ্ড এত জোরে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল যে মনে হ'ল কে যেন তার বুকের ভেতর সজোরে হাতুড়ি পিটছে। কম্পিত করে শিকল খুলে সে ঘরের ভিতর গিয়ে ঢুকল। হাঁড়িকুঁড়ির ঢাকনা খুলে হরেক রকম ব্যঞ্জনের দিকে নজর পড়বামাত্রই আনন্দে তার চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হ'ল। ভাবলে, মেস থেকে বিদায়ের সময় আসন্ন—তার আগে সুযোগ যদি ঘটল তো যতটুকু সম্ভব রসনায় তৃপ্তি সাধন করে—পেটে রসদ বোঝাই করে নেওয়া যাক।

ডেকচি আর কড়াই থেকে খাবলা খাবলা ভাত তরকারী সে গোগ্রাসে গিলতে লাগল। আঃ কি তৃপ্তি! এক সর্ব্ব-গ্রাসী বুভুক্ষা যেন তাকে খাওয়ার নেশায় মাতিয়ে তুলল—ইচ্ছে হ'ল ঘরে যত খাবার আছে সব নিঃশেষে সাবাড় করে দেয়। খাওয়ার নেশায় সে জগৎ-সংসার ভুলে গেল। উমেশ যে, যে-কোনো মুহূর্ত্তে ফিরে আসতে পারে সে খেয়াল তার রইল না।

ইতিমধ্যে নির্ম্মলবাবু বাইরের কাজ সেরে ফিরে এলেন। উমেশের খোঁজে রান্নাঘরে এসে তিনি দেখেন অপ্রত্যাশিত কাণ্ড। বহুক্ষণ বাইরে ঘোরাঘুরি করে এসেছেন, ক্ষিদেও পেয়েছিল বেজায়। রাগে আগুন হয়ে তিনি দিলেন টিপুর পিঠে বিরাশী সিক্কা ওজনের এক প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে, তারপর "চোর চোর" বলে তার স্বরে চেঁচামেচি সুরু করলেন।

হট্টগোল শুনে মেসের আরো অনেকে নির্ম্মলবাবুর রান্না-ঘরের নিকটে এসে জড়ো হলেন। নির্ম্মলবাবু টিপুকে কাণ ধরে হিড় হিড় করে টেনে বাইরে নিয়ে এলেন। টিপুর অবস্থা অবর্ণনীয়—মুখে একদলা ভাত—গালে হাঁড়ির কালি—জামায় ঝুলে ঝোলের দাগ। দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ। পৃথিবীকে দ্বিধা হতে বলবার এর চাইতে গুরুতর প্রয়োজন বোধ করি আর কারো কখনো হয় নি।

নির্ম্মলবাবু টিপুর কাণ দুটো আচ্ছা করে মলতে মলতে গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলতে লাগলেন—"হতচ্ছাড়া ছোঁড়ার কাণ্ডটা দেখলেন মশাই—ব্যাটা ছিঁচকে চোর। দয়া করে আশ্রয় দিয়েছিলাম, তার ফলটা এই—দিলে এবেলার খাওয়াটাই মাটি করে!"

তার পর চলল কিছুক্ষণ ধরে নানা জনের নানা মন্তব্য, গালিবর্ষণ, আর পাইকারী হারে প্রহার। টিপু টুঁ শব্দটিও করলে না, নীরবে নতমুখে সব সহ্য করতে লাগল। তার মুখের চেহারা এমনি বেদনাকরুণ হয়ে উঠল যে তা দেখলে অতি-বড় পাষাণেরও বোধ করি চোখ ফেটে জল বেরুত। কিন্তু মেসের ভদ্রলোকেরা সবাই তার অনাচারে এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, তার মুখখানির পানে কৃপা দৃষ্টিতে তাকাবার মত মনোভাব কারুর হ'ল না।

ক্রমে উত্তেজনা কমল, মারপিটের পালাও শেষ হ'ল। তখন একজন বললেন—"ভদ্রলোকের মেসে এ সমস্ত চোর বাটপাড়দের আবার জায়গা দেওয়া কেন মশাই! পাজী ছোঁড়ার একগালে কালি তো লেগেছেই—দিন না আরেক গালে চুণ লেপে রাস্তায় বের করে!". নির্ম্মল বাবু তার গালে

চুণ লেপন করলেন মা বটে, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে তাকে মেস থেকে বেরিয়ে যাবার নোটিশ দিলেন।

পোটলাটি বগলে নিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে টিপু সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গিয়ে মহানগরীর শব্দময় জনাকীর্ণ রাজপথে বেরিয়ে পড়ল, তার পর চলতে লাগল উদ্‌ভ্রান্তের স্থায় লক্ষ্যহীন ভাবে। অপমানের জ্বালা তার সমস্ত শরীরে যেন জ্বলুনি ধরিয়ে দিয়েছে—সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে থর থর করে। সংসারে সে যে কত একা আজ সমস্ত অন্তর দিয়ে তা উপলব্ধি করলে।

সে চলতে লাগল কলেজ ষ্ট্রীট ধরে। সবে সে মেছুয়া বাজারের মোড় ছাড়িয়েছে এমন সময় অনতিদূরে একটা সোরগোল উঠল। একজন পথচারী ছুটতে ছুটতে এসে বললে, 'পালাও ভাই, আবার দাঙ্গা সুরু হয়েছে—গলির ভেতর থেকে গুণ্ডারা ছুটে আসছে।" সঙ্গে সঙ্গে সবাই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যে যেদিকে পারে ছুট দিলে—ঝটপট দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল।

ভাগ্যিস সামনে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর গেট খোলা ছিল—ফটকে সঙ্গীনধারী গুর্খা প্রহরীরা দাঁড়িয়ে। টিপু এবং আরো কয়েক জন ভেতরে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই ফটক বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে আরো বহুলোক আশ্রয় নিয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই অকুস্থলে এল মিলিটারী লরী—পর পর শোনা গেল কতকগুলো বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ।

ঘণ্টাখানেক পরে গেট খুলে দিলে। গুণ্ডারা পালিয়ে গেছে। সবাই যে যার বাড়ীতে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার জন্যে দ্রুত পা চালিয়ে দিলে। টিপুও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল—যদিও কোথায় গিয়ে সে উঠবে তার কিছু স্থিরতা নেই। আশ্রয়ের প্রয়োজন যখন সব চেয়ে বেশী সেই চরম সঙ্কট-সময়ে সে হয়েছে আশ্রয়হীন।

চলতে চলতে চলতে শেষে হেদুয়াতে গিয়ে একটা বেঞ্চির সে শুয়ে পড়ল। এদিকটায় দাঙ্গাহাঙ্গামার বালাই নেই—ধীরে ধীরে গভীর নিদ্রায় সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল—ঘুম যখন ভাঙল তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়।…শহরের বিভিন্ন এলাকায় সান্ধ্য আইন জারী হয়েছে…সবাই এরি মধ্যে যে যার ঘরে চলে গিয়েছে, হেদুয়ার প্রায় জনশূন্য।

* * * * *

হেদুয়া ছেড়ে টিপু বিবেকানন্দ রোড ধরে মাণিকতলা বাজারের দিকে চলতে লাগল। বাজারের ফটক তালাবন্ধ, কলকোলাহল এরই মধ্যে নির্ব্বাপিত। বিবেকানন্দ রোড আর সারকুলার রোডের সংযোগস্থলে এসে টিপু থমকে দাঁড়াল। কারফিউর দরুন সারকুলার রোডের ওপর যানবাহন আর লোকজনের চলাচল বন্ধ। রাস্তার এপারে রোয়াকে কেউ কেউ বসে গল্পগুজব করছে, পথ দিয়ে চলছে দু'একজন পথিকের আনাগোনা—কিন্তু ওপারে অন্ধকারাবৃত নিশীথ নগরীর বুকে নেমেছে মৃত্যুপুরীর সুগভীর নিস্তব্ধতা—যতদূর দৃষ্টি চলে জনমানবের চিহ্ন নেই। তমসাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ নগরী নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে যেন এক চরম দুর্ঘটনার প্রতীক্ষা করছে। এই অন্ধকারের বুকে এখন হয়ত চলছে কত গোপন হত্যালীলা, মিলিটারীর গুলিতে কত নিরপরাধ প্রাণ দিচ্ছে, দূরে কোথাও হয় তো মরণাহত অসহায়ের আর্ত্তনাদে মুখরিত হয়ে উঠছে রাত্রির আকাশ। হঠাৎ টিপুর মনে হ'ল যেন সুমুখের অন্ধকারের পটে ভেসে উঠেছে যাহ্নকাটা খালের পাড়ে পিতার রক্তরঞ্জিত গলিত শবদেহের বীভৎস দৃশ্য…সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎচমকের মত বাবার কাছেই শেখা একটি শ্লোকাংশ তার মনে পড়ল—"যেনাস্য পিতরো যাতা……" ; বাস্তবিকই কি পিতা যে পথে গিয়েছেন সেই পথেই তারও জীবনের শেষ পরিণতি, অপমৃত্যুই কি তারও অদৃষ্টলিপি? সে ভাবতে লাগল এই নীরন্ধ্র অন্ধকারের বুকেই আছে তার সকল দুঃখ অপমান বুভুক্ষার জ্বালা—সব কিছুর শেষ—গৃহহারা গতিহীনের সকল দুর্গতির অবসান।

এই অন্ধকার যেন দুর্ব্বারভাবে তাকে মৃত্যু-উৎসবে আহ্বান করতে লাগল, একদিকে বাঁচবার আশা অপর দিকে মরণের নেশা এ দুয়ের দ্বন্দ্ব চলল কিছুক্ষণ—খানিকক্ষণ সে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল…শেষে তার স্নায়ুমণ্ডলীতে জাগল এক উৎকট উত্তেজনা—তার শ্রান্তক্লান্ত চরণে সঞ্চারিত হ'ল গতিবেগ।…এক পা এক পা করে সেই সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকারের অভিমুখেই সে অগ্রসর হতে লাগল।

চিরন্তনী গীতি

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

সে দিনের চলা পথ পড়িয়া পিছনে
আজিকার পথ-প্রান্তে বাহু প্রসারিয়া
আমারে বাঁধিতে চাহে ; চরণে ঘিরিয়া
পথরোধ করিবারে চাহে ক্ষণে ক্ষণে।
সে দিন বসন্ত-প্রাতে মুকুলে ভরিয়া
বৃক্ষশাখা-বাহু মেলি' পিক-কলস্বনে
মধুপগুঞ্জন-ভরা দক্ষিণ পবনে
ঝরা পত্রে বিদায়ের গীতি মর্ম্মরিয়া—

চলে গেল, বলে গেল—তবু ভালবাসি
পড়ে-থাকা পিছনের বিস্মৃত সে স্মৃতি,
ফুটে-ওঠা পুষ্পে পুষ্পে সুমধুর হাসি ;
ধরা-বক্ষে বিকশিত সে দিনের প্রীতি
আবার এ পথ-প্রান্তে উঠুক উচ্ছ্বাসি'
মর্ম্মরিয়া মর্ম্মে পুনঃ চিরন্তনী গীতি।

ভরত, কণ্ব ও বিশ্বামিত্র

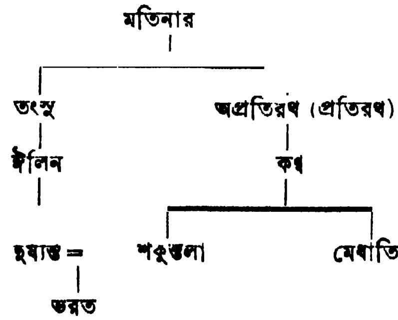
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

মহাভারতের আদিপর্ব্বের শকুন্তলোপাখ্যানে শকুন্তলাকে বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভজাত কন্যা বলা হইয়াছে। ইহা স্পষ্টত: একটি উপকথা মাত্র। পুরাণ-ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে শকুন্তলার পক্ষে কণ্বের ঔরসজাত কন্যা হওয়াই সম্ভব; তিনি কখনই বিশ্বামিত্রের সহিত সম্পর্কিত ও সমকালীন হইতে পারেন না। পার্জিটার সাহেব কান্যকুব্জ বংশের সহিত পুরুবংশের সমকালীনত্ব নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন (দ্রষ্টব্য *Ancient Indian Historical Tradition* পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৬) :—

	কান্যকুব্জ	পৌরব
১।	সুহোত্র	মতিনার
২।	...	তংসু
৩।	...	...
৪।	...	...
৫।	জহ্নু	...
৬।	সুহ্রহ	...
৭।	অজক	...
৮।	বলাকাশ্ব	...
৯।	...	...
১০।	কুশ	...
১১।	কুশাশ্ব (কুশিক)	...
১২।	গাধি	...
১৩।	...	...
১৪।	বিশ্বামিত্র	...
১৫।	...	...
১৬।	অষ্টক	...
১৭।	...	...
১৮।	লৌহি	...
১৯।	...	...
২০।	...	...
২১।	...	...
২২।	...	...
২৩।	...	...
২৪।	...	...
২৫।	...	দুষ্যন্ত
২৬।	...	ভরত

পার্জিটার সাহেবের গণনা অনুসারে বিশ্বামিত্র হইতে দুষ্যন্ত ১১ পুরুষ অধস্তন। এইজন্য তিনি মনে করেন দুষ্যন্ত বিশ্বামিত্রবংশীয়া শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। তিনি শকুন্তলাকে আদি বিশ্বামিত্রের কন্যা স্বীকার করেন না। অন্য পক্ষে তিনি তংসু হইতে ২৩ পুরুষ নিম্নে দুষ্যন্তকে স্থাপন করিতেছেন। ইহা মহাভারত ও সমস্ত পুরাণের বিরুদ্ধ মত। দুষ্যন্ত কিংবা ভরতের জীবনে বিশ্বামিত্রের আর কোনও প্রসঙ্গ দেখা যায় না। কিন্তু কণ্বকে আমরা দেখি শকুন্তলার পালক পিতার অতিরিক্ত ভরতের যজ্ঞের পুরোহিতরূপে, যাহাকে ভরত প্রচুর ধন দান করেন (মহাভারত আদি ৭৪, দ্রোণ ৬৮, শান্তি ২৯ অধ্যায়)। এক্ষণে পুরাণ অনুযায়ী কণ্বের সমকালীনত্ব স্থির করা যাউক।

বায়ু (৯৯।১৩০-১), বিষ্ণু (৪।১৯।২), হরিবংশ (৩২।১৭।১৮), ভাগবত (৯।২০।৬-৭), অগ্নি (২৭৮।৫) প্রভৃতি পুরাণে মতিনারের তিন পুত্র তংসু, অপ্রতিরথ (প্রতিরথ) এবং সুবাহু (ধ্রুব)। অপ্রতিরথের পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। মহাভারত (আদি ৯৪।১৪-১৯ ; ৯৫।২৬-২৯) অনুসারে মতিনারের চার পুত্র, তংসু, মহান, অতিরথ, দ্রুহ্য। তংসুর পুত্র ঈলিন, ঈলিনের পুত্র দুষ্যন্ত, তস্য পুত্র ভরত। মহাভারত ও পুরাণ মিলাইয়া আমরা এইরূপ বংশ-তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি—



তংসুর পুত্র যে ঈলিন, তাহা মহাভারতে (আদি ৯৫।২৭) উদ্ধৃত প্রাচীন অনুবংশ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে।

তংসুং সরস্বতী পুত্রং মতিনারাদজীজনৎ।
ঈলিনং জনয়ামাস কালিঙ্গ্যাং তংসুরাত্মজম্॥

সুতরাং পার্জিটার সাহেবের পক্ষে পুরুবংশ হইতে ঈলিনকে বাদ দেওয়া সঙ্গত হয় নাই। পার্জিটার কণ্বকে ভরতের অধস্তন পুরুষ অজমীঢ়ের পুত্ররূপে নির্দ্দেশ করেন। তিনি তাঁহার প্রমাণে বায়ু (৯৯।১৬৯-৭০), মৎস্য (৪৯।৪৬-৭), বিষ্ণু (৪।১৯।১০) ও গরুড় (১৪০।৯) পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে বায়ু ও বিষ্ণু পুরাণ আমাদের মতেরও সমর্থন করিতেছে। আমরা মহাভারতের অনুকূল পুরাণের উক্তিই গ্রহণ করিয়াছি। পার্জিটারও দুষ্যন্তের সমসাময়িক শকুন্তলা-পালক এক কণ্বের কথা



দিল্লীস্থ বিড়লা-ভবনে অন্তিম শয্যায় মহাত্মা গান্ধীর শবদেহ—শিয়রে একজন শিখ পুরোহিত ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন



বিড়লা-ভবন হইতে যমুনাতীর পর্য্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর শব লইয়া দীর্ঘ পাঁচ মাইলব্যাপী শোকযাত্রা



যমুনাতীরে গান্ধীজীর জলন্ত চিতা অবলোকনরত (বাঁ দিক হইতে) রাজকুমারী অমৃত কাউর, লেডি মাউণ্টব্যাটেন, লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন, পামেলা মাউণ্টব্যাটেন, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং ডাঃ লো চিয়া লুয়েন



গত ২রা ফেব্রুয়ারী দিল্লীর রামলীলা-প্রাঙ্গণে মহাত্মা গান্ধীর শোকসভায় পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন

করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাকে কাশ্যপ কণ্ব বলিয়াছেন (পৃ ২২৭)।

পার্জিটার কান্যকুব্জ বংশকে চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার পুত্র অমাবসুর বংশজাত নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার প্রমাণ-স্বরূপ তিনি সাতটি পুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন—ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, ব্রহ্ম, হরিবংশ, বিষ্ণু, গরুড় এবং ভাগবত (পৃঃ ৯৯, পাদটীকা ১)। অগ্নিপুরাণ মতে (২৭৭।১৬-১৮) কান্যকুব্জ বংশ পুরুবংশীয় অজমীঢের পুত্র জহ্নুর বংশজাত। ব্রহ্মপুরাণ ও হরিবংশের এক মত অগ্নিপুরাণের অনুরূপ।—মহাভারতের আদিপর্ব্বের ৯৪ অধ্যায় এবং অনুশাসন পর্ব্বের ৪র্থ অধ্যায়ে কুশিক (কান্যকুব্জ) বংশকে অজমীঢের পুত্র জহ্নুর বংশজাত বলা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।৩৩।৫) এবং শাংখায়ন শ্রৌতসূত্র (১৫।২৫) বিশ্বামিত্রকে ভরতর্ষভ বলিয়াছে।* ইহাতে তিনি যে ভরতবংশীয় জহ্নুর অধস্তন পুরুষ, তাহাই বুঝাইতেছে। আমরা পুরাণে তিন জন জহ্নুর উল্লেখ দেখি। প্রথম জহ্নু পুরূরবার পুত্র অমাবসুর বংশজাত। ব্রহ্মপুরাণ ও হরিবংশের মতে এই জহ্নু যুবনাশ্বের কন্যা কাবেরীকে বিবাহ করেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে কাবেরী যৌবনাশ্বের (মান্ধাতার) পৌত্রী। বায়ুপুরাণের মতে তিনি যুবনাশ্বের পৌত্রী। ইনি সৌহোত্রি (সুহোত্রের পুত্র) জহ্নু। হরিবংশ, মৎস্যপুরাণ এবং বায়ুপুরাণ মতে মতিনারের কন্যা গৌরী যুবনাশ্বের স্ত্রী, মান্ধাতার জননী ছিলেন। এই মতে বংশ-তালিকা নিম্নলিখিত রূপ :

মতিনার

সুহোত্র যুবনাশ্ব = গৌরী তংসু অপ্রতিরথ প্রতিরথ

জহ্নু = কাবেরী মান্ধাতা ঈলিন কণ্ব

দুষ্মন্ত = শকুন্তলা মেধাতিথি

ভরত

দ্বিতীয় জহ্নু অজমীঢের পুত্র। এই দ্বিতীয় জহ্নুর সহিত প্রথম জহ্নুর গোলযোগে বিশ্বামিত্রকে পুরূরবাবংশীয় স্থির করা হইয়াছে। তৃতীয় জহ্নু কুরুর পুত্র (বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি মতে)।

বিশ্বামিত্রকে আমরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করিব। তিনি ভরতবংশীয় বিখ্যাত রাজা সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। ঋগ্‌বেদ (৩য় মণ্ডল) তাঁহার সাক্ষী। তিনি ৩য় মণ্ডলের ৩৩ সূক্তের ৫ ঋকে নিজকে কুশিকের পুত্র বলিয়াছেন "কুশিকস্য সূনুঃ"। ঐ মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ৯ ঋকে বলা হইয়াছে—

"বিশ্বামিত্রো যদবহৎ সুদাসমপ্রিয়ায়ত কুশিকেভিরিন্দ্রঃ।"

অর্থাৎ বিশ্বামিত্র যখন সুদাসের যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইন্দ্র কুশিকবংশীয়দিগের সহিত প্রিয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ঐ ৫৩ সূক্তের ১৫ ও ১৬ ঋকে বিশ্বামিত্র জমদগ্নির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। দশম মণ্ডলের ১৬৭ সূক্তটি বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি উভয়ের মিলিত রচনা। সেখানে ৪র্থ ঋকে ইন্দ্রের উক্তিতে আছে—

"সুতে সাতেন যদ্যাগমং বাং প্রতি বিশ্বামিত্রজমদগ্নী দমে।"

অর্থাৎ হে বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নি ! তোমরা সোম প্রস্তুত করিলে আমি যখন ধন লইয়া তোমাদিগের গৃহে আগমন করি, তখন তোমরা উত্তমরূপে স্তব কর। (রমেশ দত্তের অনুবাদ)

সুতরাং এই বিশ্বামিত্র সুদাস ও জমদগ্নির সমকালীন। কিন্তু পার্জিটার বিশ্বামিত্র হইতে সুদাসকে ৩৬ পুরুষ অধস্তন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারত ও পুরাণের সর্ব্ববাদী মতে বিশ্বামিত্র ও জমদগ্নির সম্পর্ক এইরূপ—

কুশিক

গাধি

ঋচীক = সত্যবতী বিশ্বামিত্র

জমদগ্নি রেণু

রাম (পরশুরাম) পরাবসু

বায়ু, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্ম ও হরিবংশ মতে কুশিক পৌরুকুৎসীকে বিবাহ করেন (১৫২ পৃঃ)। পার্জিটার তাঁহার ভ্রান্ত পৌরাণিক 'বংশাবলী'র উপর নির্ভর করিয়া এই পৌরুকুৎসীকে পুরুকুৎসের কন্যা না বলিয়া পুরুকুৎসের অধস্তন ষষ্ঠ কন্যা মনে করিয়াছেন। কিন্তু ঋগ্‌বেদের প্রমাণে পৌরুকুৎস ত্রসদস্যু সুদাসের সমকালীন ছিলেন। সপ্তম মণ্ডলের ১৯ সূক্তটি বসিষ্ঠ মুনির রচিত। বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র সুদাসের পুরোহিত ছিলেন। সুতরাং এই সূক্তটি একটি সমসাময়িক প্রমাণপত্র। ইহার ৩য় ঋকে উক্ত হইয়াছে।—

ত্বং ধৃষ্ণো ধৃষতা বীতহব্যং প্রাবো বিশ্বাভিরূতিভিঃ সুদাসং।
প্র পৌরুকুৎসিং ত্রসদস্যুমাবঃ ক্ষেত্রসাতা বৃত্রহত্যেষু পূরুং॥

অর্থাৎ হে ধর্ষক ! হব্যদাতা সুদাসকে ধর্ষক (বজ্রের) দ্বারা সমস্ত রক্ষার সহিত রক্ষা কর, যুদ্ধে তুমি লাভের জন্য পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যুকে ও পুরুকে রক্ষা কর।

(রমেশ দত্তের অনুবাদ)

বেদ, মহাভারত ও পুরাণ আলোচনা করিয়া আমরা নিম্নলিখিতরূপ বংশতালিকা প্রস্তুত করিতে পারি।—

---

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ খণ্ডে বিশ্বামিত্রকে জহ্নুবংশীয় বলা হইয়াছে।

১। মতিনার (রন্তিনার, অন্তিনার)
|
২। তংসু (বৈদিক তৃংসু)
|
৩। ঈলিন (" উলান)
|
৪। দুঃষন্ত
|
৫। ভরত
|
৬। ভূমন্যু (নামান্তর বিতথ, বৈদিক বিদথী)
|
৭। সুহোত্র
|
৮। অজমীঢ়

৯।	দুঃষন্ত (সুশান্তি)	জহ্নু
১০।	পুরুজানু (পুরুজাতি)	সিন্ধুদ্বীপ (সুনহ, সুনক্ষ সুহোত্র)
১১।	ঋক্ষ (ঋক্ষ, পৃথু, চক্ষুঃ)	অজ (অজক)
১২।	ভূম্যশ্ব (ভদ্রাশ্ব, বাহ্যাশ্ব)	বলাকাশ্ব
১৩।	মুদ্গল	কুশ (কুশাশ্ব, বল্লভ, বৈদিক ইষীরথ)
১৪।	বধ্যশ্ব	কুশিক
১৫।	দিবোদাস	গাধি (বৈদিক গাথী)
১৬।	পিজবন	বিশ্বামিত্র (বিশ্বরথ)
১৭।	সুদাস	রৈভ্য

ভরত হইতে ১১ পুরুষ অধস্তন বিশ্বামিত্র কখনও ভরতের মাতামহ বা পূর্ব্বপুরুষ হইতে পারেন না। সুতরাং ইহা অলীক উপকথা মাত্র। ভরতের মাতামহ কণ্ব ইহাই ঐতিহাসিক সত্য।

উপরি-উক্ত বংশতালিকা হইতে স্পষ্টতঃ বোধ হইতেছে যে অজমীঢ় হইতে বিশ্বামিত্র নবম পুরুষ অধস্তন। আমরা ইহার পরিপোষক প্রমাণ পাইতে পারি। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৪৯ অধ্যায় অনুসারে বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবসুর সমকালীন হইতেছেন জামদগ্ন্য রাম, পুরুবংশীয় বিদূরথ-পুত্র ঋক্ষ এবং বৃহদ্রথ (মগধরাজ)। ঋক্ষ এবং বৃহদ্রথ উভয়েই অজমীঢ়-বংশীয়। মহাভারত এবং পুরাণ অনুসারে তাঁহাদের বংশ-পরিচয় এইরূপ—

১।	অজমীঢ়	অজমীঢ়	অজমীঢ়
২।	জহ্নু	ঋক্ষ	ঋক্ষ
৩।	সিন্ধুদ্বীপ	সংবরণ	সংবরণ
৪।	অজ	কুরু	কুরু
৫।	বলাকাশ্ব	অবিক্ষিৎ	সুধন্বন্
৬।	কুশ	পরিক্ষিৎ	সুহোত্র
৭।	কুশিক	জনমেজয়	চ্যবন
৮।	গাধি	সুরথ	কৃত
৯।	বিশ্বামিত্র	বিদূরথ	বসু
১০।	রৈভ্য	ঋক্ষ	বৃহদ্রথ
১১।	পরাবসু		

কণ্বকে শকুন্তলার পিতা বলিয়া উল্লেখ না করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে পৌরাণিকের নিকট এইরূপ সগোত্র বিবাহ ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু বৈদিক যুগে এইরূপ সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে—"তস্মাদ্ বা সমানাদেব পুরুষদত্তা চাভশ্চ জায়তে। উত তৃতীয় সংগচ্ছাবহৈ চতুর্থে সংগচ্ছাবহৈ।" সেই একই পুরুষ হইতে ভক্তক (স্বামী) এবং ভক্তা (স্ত্রী) জাত হয়। পৌরাণিক উপাখ্যানে এইরূপ বিবাহের কোন নিদর্শন না থাকিলেও বৌদ্ধজাতকে (৫৩৯ নং) আমরা এইরূপ বিবাহ দেখিতে পাই—

মহাজনক
|
অরিট্ঠজনক — পোলজনক
| |
মহাজনক = সীবালী
|
দীঘাবুকুমার

সিন্ধি কবি শাহ্ আবদুল লতিফ

এ এন এম বজলুর রশীদ

সিন্ধুর অমর কবি ভীট শরীফের বিখ্যাত শাহ আবদুল লতিফের● জীবনকাল ইংরেজী ১৬৮৯ থেকে ১৭৫২ সাল পর্য্যন্ত। তাঁর জীবন ও লেখার আলোচনার পূর্ব্বে সে সময়কার সিন্ধুর ইতিহাস কিছু জানা দরকার।

প্রায় চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধু উপত্যকা ও ইরাকের প্রসিদ্ধ বাগদাদ শহরের নিকটবর্ত্তী অতি-প্রাচীন উর শহর ও তার প্রত্যন্তভূমিকে কেন্দ্র করে যে এক সভ্যতা গড়ে ওঠে তারই ভগ্নাবশেষ সিন্ধুর অন্তর্গত মহেঞ্জোদড়োতে আবিষ্কৃত হয়েছে। তার বহু পরে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩২৫ সালে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার সিন্ধুর নিম্নভূমি দিয়ে সিন্ধুনদ অতিক্রম করে ভারত থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ আরবী যুবক মুহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু উপত্যকার নিম্নভাগে অবতরণ করে সর্ব্বপ্রথম ভারতভূমিতে ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তোলন করেন। তারপর নানা বিপর্য্যয় ও দুঃখ-বিপদের মধ্যেও সিন্ধুপ্রদেশ আপন স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখেছিল।

সিন্ধুদেশ তখন দু'ভাগে বিভক্ত ছিল।—উত্তর সিন্ধু উপত্যকা ও নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা। এই দুই ভূমিতে বিভক্ত হয়েও সিন্ধু প্রদেশের ঐক্যের হানি হয় নি। পূর্ব্ব দিকের বিশাল মরুভূমি ও পশ্চিমের উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা দেশটিকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে স্বতন্ত্র ও স্বপ্রতিষ্ঠ করে একটি বিশেষ একক সত্তা দান করেছে। ১৫৪২ সালে শের শাহ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়ে হুমায়ুন সিন্ধুর অমরকোটে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এই স্থানেই তাঁর পুত্র আকবরের জন্ম হয়। আকবর দিল্লীর বাদশাহ হয়েই ১৫৯২ সালে সিন্ধু অধিকার করেন। সে সময় তাত্তা ও বাখার এই দুই শহরই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান সিন্ধুর বিখ্যাত করাচী, হায়দরাবাদ, শিকারপুর ও সুক্কুর শহর অষ্টাদশ ও বিংশ শতকের মধ্যে গড়ে ওঠে।

মোগল শাসনাধীনে এলেও সিন্ধুপ্রদেশ তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করে নি। স্থানীয় শক্তিশালী অধিবাসীদের মধ্য থেকেই সিন্ধুর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হতেন। দিল্লীর সঙ্গে সিন্ধুর সম্বন্ধ ছিল রাজস্ব আদায়ের। নিয়মিত খারাজ (ভূমিকর) পেয়েই দিল্লীশ্বর সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু সিন্ধুর অধিবাসীদের শিক্ষা বা অন্যান্য সুখসুবিধা বিধানের জন্য তিনি এক পয়সাও খরচ করতেন না।

সিন্ধুর বিখ্যাত কালহোরা বংশ প্রথমে জায়গীরদার রূপে আবির্ভূত হয়ে ধীরে ধীরে দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে এবং এই বংশের লোকেরাই মোগল বাদশাহ কর্ত্তৃক সরকারের শাসনকর্ত্তা মনোনীত হতেন। ইয়ার মুহাম্মদ কালহোরা এই কালহোরা বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নিজে হজরত মুহাম্মদের খুল্লতাত হজরত আব্বাসের বংশধর বলে দাবি করতেন। দেশের শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও এই বংশ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের চারিদিকে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল; অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত শাসনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র দিল্লীর সামরিক শক্তি শিথিল হয়ে এল। ইউরোপীয় বণিকদের আগমনে তখন ভারতভূমিতে নূতন ভাবধারা ও নানা অভাবনীয় সমস্যার সৃষ্টি হ'ল। এই নবজাগরণ ও চিন্তাধারার সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারায় মোগল সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। এই সুযোগে ১৭০৭ সাল থেকেই কালহোরা বংশ সিন্ধুর সার্ব্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা ঘোষণা করে দেশের পূর্ব্ব-গৌরব ও স্বাতন্ত্র্য ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সিন্ধুর বুকে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ল না। তখন এক যুগ সন্ধিক্ষণ দেখা দিয়েছে—পুরাতনের সঙ্গে নূতনের বিরোধ সুরু হয়েছে। অশান্তি, অরাজকতা ও আত্মকলহে দেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠল। ১৭৩৮ সাল পর্য্যন্ত কালহোরা বংশ স্বাধীন ভাবে সিন্ধু শাসন করলেন। ১৭৩৯ সালে নাদির সাহের ভারত আক্রমণের ফলে সিন্ধু আবার স্বাধীনতা হারিয়ে পারস্যের সামন্তরাজ্যে পরিণত হ'ল। ১৭৪৭ সালে সিন্ধুকে আহমদ শাহ ইরাণী কাবুলের অধীনে নিয়ে আসেন। ১৭৭৩ সালে আহমদ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু আবার বহিঃশক্তির হাত থেকে বিচ্যুত হয়ে আপন স্বাধীন সত্তা ফিরে পেল। বৈদেশিক শক্তির প্রাধান্য যথাসাধ্য অস্বীকার করে, বিদেশীদের প্রবেশ নিষেধ করে এবং অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের নানা প্রভাব থেকে আপনাকে রক্ষা করে চারদিকের দুর্গম অচলায়তনের মধ্যে সিন্ধু আপনার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুন্ন রেখেছিল। এমন কি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বাণিজ্যকুঠি নির্ম্মাণ করা সত্ত্বেও শাসকদের আনুকূল্যের অভাবে সিন্ধু ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়।

পাঠানদের হাত থেকে মুক্তি পাবার পর—কালহোরা বংশকে আর একটি ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির সম্মুখীন হতে হ'ল।

● সিন্ধি কবি শাহ আবদুল লতিফ বাঙালী পাঠকের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় বিশ্বভারতী পত্রিকার এক সংখ্যায় তাঁর জীবনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেন

একদা শক্তির চরম শিখরে উঠে কালহোরা-রাজ মিয়া মীর মুহাম্মদ উত্তরে অবস্থিত কৃষ্ণ ও অনুবর্বর পর্বতমালার অধিবাসী বেলুচদের আপন রাজ্যে অতি সমাদরে আহ্বান করেন। শুধু তাই নয়, এই মেষপালক বেলুচদের তিনি নানা উপহার দিয়ে বিশেষ ভাবে অনুগৃহীত ও আপ্যায়িত করলেন। তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি যে এই নিরীহ বেলুচরা এক দিন সিন্ধুর সামরিক ক্ষমতা লাভ করে তাঁরই বংশের বিলোপ সাধন করবে।

বিদেশী প্রভাব থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কালহোরা বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক গুলাম শাহ দেশে আবার শান্তি ও শৃঙ্খলা কতক পরিমাণে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। ১৭৭১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খাঁ সিন্ধুর সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তিনি ছিলেন অদূরদর্শী ও স্বেচ্ছাচারী। তাঁর প্ররোচনায় বেলুচ তালপুরীদের এক জন নেতা মীর বাহরাম খান তালপুর নিহত হলেন। বেলুচ জাতির অন্যতম বিশেষ একটি শাখা এই তালপুররা সিন্ধুর রাজ-দরবারে অশেষ শক্তির অধিকারী হয়ে পড়ে। এই হত্যা সংঘটিত হবার পর থেকেই কালহোরা ও তালপুরদের মধ্যে এক বিপুল রক্তক্ষয়ী ঘরোয়া যুদ্ধের সুরু হ'ল এবং তার ফলে অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে তালপুর-বংশ সিন্ধুর সিংহাসন অধিকার করে বসল।

এই হ'ল সিন্ধু প্রদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এখন মূল প্রসঙ্গে আসা যাক্। শাহ অবদুল লতিফ ১৬৮৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনকালের আরম্ভ থেকেই সিন্ধুর শাসনভার মোগলদের হাত হতে কালহোরাদের হাতে এসে পড়ে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময় আবদুল লতিফ ছিলেন আঠার বৎসরের যুবক। তাঁর বয়স যখন পঞ্চাশ তখন নাদির শাহ দিল্লীর ধ্বংস সাধন করে সিন্ধুকে পারস্যের সামন্তরাজ্যে পরিণত করেন। আটান্ন বৎসর বয়সে তিনি আর একটি বিপুল পরিবর্তন ঘটতে দেখলেন। মরণোন্মুখ দিল্লীর সাম্রাজ্যকে চুরমার করে দিয়ে আহমদ শাহ্ আধুনিক আফগানিস্তান রাজ্য সৃষ্টি ক'রে সিন্ধুকে তার অন্তর্ভুক্ত করলেন। এর পাঁচ বৎসর পরে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যকুঠি নির্ম্মাণের ছয় বৎসর পূর্ব্বে শাহ লতিফ তেষট্টি বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

উপরের এই বিবরণ থেকে দেখতে পাই, শাহ লতিফের জীবিতকালে সিন্ধু তথা মোগল সাম্রাজ্যের বুকে নানা বিপর্য্যয় ঘটে এবং তার দরুন যে বিক্ষোভ ও অরাজকতার সৃষ্টি হয় তার ঢেউ এসে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের মনকেই স্পর্শ করে। এতে শাহ লতিফের কবি-মন যে বিচলিত হবে তাতে আর বিচিত্র কি! কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, চারদিকের এই তিক্ততা ও অনিশ্চয়তার মধ্যেও শাহ লতিফ অচঞ্চল ও অপ্রমত্ত চিত্তে অসংখ্য গান ও কবিতা রচনা ক'রে সেই পরমসুন্দর এক আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর ভক্তি ও প্রেমার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন। বাইরের ঘটনাবহুল ও পরিবর্ত্তনশীল জীবনযাত্রাকে তিনি বড় করে দেখেন নি। অন্তরের যে ভাবধারা চিরন্তন, যে সত্য চিরকালের তারই সাধনায় তিনি অন্তর্মুখী মন নিয়ে এক পরম নিভৃতি রচনা করেছিলেন। কালহোরা বংশের আত্মকলহ, রাজনীতিক্ষেত্রের নানা ভেদ-বিদ্বেষ ও অভিজাত-বিলাসী জীবনের বিকৃত অভিব্যক্তি তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু না হয়ে আল্লাহ্‌র ধ্যান ও সহজ বোধময় আনন্দই ছিল তাঁর জীবন-প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন ও উপজীব্য।

শাহ লতিফের জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও বৈচিত্র্যহীন। কিন্তু তাঁর অন্তরের অপার ঐশ্বর্য্য বিচিত্র ভাবমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হয়ে চিরসুন্দর ও অমর হয়ে আছে।

তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল হায়দরাবাদ (সিন্ধুর) জেলার উত্তরে অবস্থিত হালা হাবেলি, কোত্রী এবং ভিটশাহ এই তিনটি গ্রামের গভীর নির্জ্জনতার মধ্যে অতিবাহিত হয়। রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন আন্দোলনেই তিনি যোগদান করেন নি।

বাস্তবকে এ ভাবে অস্বীকার করার মধ্যে কোনও পলায়নী মনোভাবের পরিচয় নেই। যারা গভীর জীবনের সন্ধান পেয়েছেন জীবনের গভীরতাকে স্পর্শ করেছেন তাঁদের চিত্ত বস্তুজগতের চাঞ্চল্য ও পরিবর্ত্তনশীলতার অনেক ঊর্দ্ধে বিরাজ করে। স্থায়ী জীবন তাঁদের কাম্য, সঞ্চারী জীবনের আনন্দ-বেদনা তাঁদের মনকে চঞ্চল করতে পারে না।

বাল্যে ও যৌবনে তিনি লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় দেন। পীর-দরবেশ ও সাধক-ফকীরদের সাহচর্য্য তাঁর ভাল লাগত। নির্জ্জনে চিন্তা করা—সকল কলকোলাহল ও জীবনের সর্ব্বগ্লানি থেকে বহুদূরে গভীর গোপনে বসে আল্লাহ্‌র ধ্যান করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র আনন্দ। এক দিন অন্যান্য মুসলমান সাধকদের মত তিনি দেশভ্রমণে বার হলেন। পথ তাঁকে ডাক দিয়েছিল। সুদীর্ঘ দিনের আকুল প্রতীক্ষা ও অন্তরের একান্ত বেদনাবোধ তাঁকে এক দিন পথের বুকে ডেকে নিয়ে এল। তাঁর অন্তরাত্মা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে যেন ব্যাকুল স্বরে বলে উঠল—

> 'পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে—
> পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া—
> যাত্রাপথের আনন্দ গান যে গাহে
> তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।'

শেখ সাদী এক দিন এমনি করে পথে বার হয়েছিলেন। আইন-ই-আকবরীর বিখ্যাত রচয়িতা আবুল ফজলের পূর্ব্ব-পুরুষ শেখ মুসাও এক দিন অজানার সন্ধানে পথকে বরণ করে নিয়েছিলেন।

বাল্যকালের একটি ঘটনায় তাঁর ভগবৎ প্রেমের এক অপূর্ব্ব নিদর্শন পাওয়া যায়। আরবী বর্ণমালা শিখবার সময় বালক লতিফ 'আলিফ' বর্ণ ছাড়া অন্য কোন বর্ণ শিখতে অস্বীকার করেন। এই আলিফ দিয়েই আল্লাহ্‌র পবিত্র নামের সুরু।

শাহ্ লতিফ ছিলেন হিরাটের অধিবাসী এক বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রাণ সৈয়দ সাধকের বংশধর। সিন্ধুতে এই বংশের মহাজনগণ ধর্ম্মগুরু বা পীরের সম্মানজনক আসন লাভ করেছিলেন। শাহ লতিফের পিতার নাম সৈয়দ হাবীব শাহ। প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস করলেও শাহ লতিফ কোন দিন জীবনের সহজলভ্য আরাম আয়েস বা জাঁকজমক ভালবাসতেন না। তাঁর জীবন ছিল অপূর্ব্বভাবে সংযত। শান্তধীর, মিতভাষী ও সৌজন্যের আধার শাহ লতিফের প্রাণ ছিল অত্যন্ত কোমল। মানুষ এমন কি ইতর প্রাণীর দুঃখকষ্ট পর্য্যন্ত তিনি সহ্য করতে পারতেন না। সেই সময়কার অভিজাত বংশের উচ্ছৃঙ্খল ও ভোগসর্ব্বস্ব জীবনযাত্রার পরিবেশের মধ্যে থেকেও তিনি যে আত্মসংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তাঁর এই সহজ সুন্দর ও নির্লিপ্ত সাধক জীবনের প্রতি অনেকেই শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ে। এক জন যুবকের এই জনপ্রিয়তা দেখে ব্যবসায়ী ধর্ম্মগুরু যাঁরা তাঁরা নানাভাবে তাঁর অনিষ্টের চেষ্টা করতে লাগলেন। কালহোরা বংশের উপর সৈয়দদের প্রভাব ছিল অতুলনীয়। তাঁদেরই প্ররোচনায় নূর মুহাম্মদ কালহোরা উদারহৃদয় শাহ লতিফের জীবন অতিষ্ঠ করে তুললেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রেম যাঁর কাম্য মানুষের অসন্তুষ্টি বা অহেতুক রোষ তাঁকে কখনও বিচলিত করতে পারে না। নূর মুহাম্মদ অবশেষে তাঁর ভুল বুঝতে পেরে তরুণ সাধক কবি শাহ লতিফকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। নূর মুহাম্মদের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। জনপ্রবাদ যে শাহ লতিফের আশীর্ব্বাদেই তাঁর পুত্র গুলাম শাহ কালহোরার জন্ম হয়।

ধীরে ধীরে তিনি সাধনার পথে অগ্রসর হতে থাকেন। আধ্যাত্মিক ভাবাবেগপূর্ণ কবিতা ও গান রচনা করে তিনি জনসাধারণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু জনপ্রিয়তা ও প্রশংসা তাঁর মনকে পীড়া দিতে থাকে। শেষে লোকালয় ত্যাগ করে ভিট (সিন্ধি শব্দ, অর্থ বালুর পাহাড়) নামক একটি নির্জ্জন স্থানে তিনি তাঁর কুটীর নির্ম্মাণ করেন। তার পার্শ্বদেশ দিয়ে কিঝার হ্রদের স্বচ্ছ বারিধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে, আর তার চারদিকের শ্যামল প্রান্তর ও তরুশ্রেণী সিন্ধুর রুক্ষ প্রকৃতির মধ্যে ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছে। ভিট শরীফ শাহ লতিফের সাধনার উপযুক্ত স্থানই বটে। ধীরে ধীরে ভিটকে কেন্দ্র করে একটি গ্রাম গড়ে উঠল। শাহ লতিফ নিজের হাতে ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করতে সাহায্য করলেন। কিন্তু নির্জ্জনতা চাইলে কি হবে, তিনি যে অধ্যাত্ম-সম্পদের অধিকারী হয়েছেন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভক্ত জনগণ দলে দলে ভিট শরীফে জড় হতে লাগল।

শাহ লতিফ ছিলেন সুফী সাধক। পারস্যের সাধকশ্রেষ্ঠ সুফী কবি মৌলানা জালালুদ্দিন রুমী ছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয়কবি। শাহ লতিফের গুণমুগ্ধ নূর মুহাম্মদ কালহোরা তাঁকে রুমীর একখণ্ড 'মসনভী' কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়ে তাঁর প্রসন্নতা অর্জ্জন করেন। তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল পবিত্র কোরান গ্রন্থ, একখণ্ড 'মসনভী' ও সিন্ধি কবি শাহ করীমের একখানি কবিতা-পুস্তক। আল্লাহ্‌র ধ্যান ও স্মরণে আপনার ব্যক্তিসত্তা ভুলে তিনি দীর্ঘদিন এক বৃক্ষকোটরে বাস করেন। এই সময় তিনি বহির্জ্জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। শাহ লতিফের এই বহুকষ্টলব্ধ সাধনার অপূর্ব্ব ভাব ও আনন্দরসে তাঁর সমস্ত রচনা রূপায়িত হয়েছে। সাধক মনের বেদনা ও সন্ধানপরতা চিরকালের ব'লে তাঁর কবিতা ও গান চিরদিনের সম্পদ হয়ে থাকবে।

১৭৫২ সালে তিনি অনন্তলোকে যাত্রা করেন। ভিট শরীফে তাঁর কবরের উপর গুলাম শাহ কালহোরা বহু অর্থব্যয়ে একটি সুন্দর সমাধিসৌধ তৈরী করে দিয়েছেন। আজও প্রতি শুক্রবার শাহ লতিফের সমাধিস্থানে তাঁর কবিতা আবৃত্তি করা হয় আর তার চারদিকের গভীর নির্জ্জনতা ভেদ করে ধ্বনি ওঠে 'আল্লাহু—আল্লাহু'।

সুফী কবি শাহ লতিফের কবিতা সঞ্চয়ন (রিসালে জু মুনতাখাব) সিন্ধি ভাষার এক অমূল্য সম্পদ। আজ পর্য্যন্ত তাঁর সমকক্ষ কবি সিন্ধুতে জন্মগ্রহণ করেন নি। সিন্ধি ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত। আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত করে শাহ লতিফ সর্ব্বপ্রথম সিন্ধি ভাষার প্রাণশক্তিকে পূর্ণস্ফূর্তি দান করেন। সিন্ধুর নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, রাখাল বালক, কুমোর প্রভৃতি অতি পরিচিত ও সাধারণ বিষয়বস্তু ব্যবহার করে তিনি সিন্ধি ভাষার শক্তি বৃদ্ধি করেন ও তাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। সিন্ধি জনগণের মুখে ভাষা দিয়ে, নতুন ভাবের ব্যঞ্জনা দিয়ে তিনিই সিন্ধি ভাষার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং সর্ব্বত্র তার সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছেন—এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। বাংলার মরমী সাহিত্যের ভাণ্ডারী পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রদ্ধেয় ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় সুদূর ভিট শরীফে গমন করেছিলেন। এই সঙ্গে শাহ লতিফের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ দেওয়া গেল :

দুর্গম পথ

আমার দুর্ব্বলতা আমারে দেয় আনন্দ—আল্লাহ্‌র কানে কানে
ধ্বনিত হয় আমার প্রেমাও বেদনার আর্ত্তনাদ—
ফাঁসীর মঞ্চ-বৃক্ষে করেছি আস্বাদ (প্রেমের)
দুঃখ আমার জন্য নিয়ে এসেছে কি অপূর্ব্ব মহত্ত্ব!
ফাঁসী-মঞ্চ আমারে ডাকে—ওগো আমার বন্ধুরা
তোমরা কেউ কি যাবে আমার সাথে?
প্রেমের নাম যারা জেনেছে আসবে শুধু তারাই
প্রেমের দায়ে।
ফাঁসীর কাঠ—তার প্রলোভন দেয় বিছিয়ে,
ডাকে প্রেমিকদের। পেয়েছ কি সন্ধান—
প্রেম বলে কারে? যাত্রা করো না (সেই দুর্গম রহস্যের পথে)

(তোমার গর্ব্বিত) শিরের মূল্য দিও না কিছু—
তখন কর জিজ্ঞাসা প্রেমের অর্থ কি—তারপর বল কথা।

কাঁসীর ফাঁস (বস্ত্র-আবর্ত্তন জালে তার অস্তিত্ব)
অলঙ্কৃত করে প্রেমিকদের। সৈয়দ করে গান—
তারা দেখেছিল প্রেমের বর্শা—কম্পিত হয়নি তাতে
স্থির পদে দাঁড়িয়ে ছিল তারা।

প্রেম তাদের দিয়েছিল ডাক—তারা আপনাদের করে নি আবৃত
প্রেমই তাদের সেখানে গেছে নিয়ে—প্রেমের আদেশ।
নির্ম্মম হাতে প্রেম যখন নেয় ছুরি—
তা ধারাল নয় মোটে—বরং ধারে নেই তার তীক্ষ্ণতা।
তাই প্রেমাস্পদের হাত অনেকক্ষণ ধরে
চলবে তোমার উপর দিয়ে
প্রেম কেন আসে—কি করে যে আসে জান কি তাহা ?
ছুরি পড়ে যায়—মুখে বলো নাক' উহু ও আহা।

কি ক্ষতে তোমার বুক জ্বলে যায় অপর জনে—
বলো না তাহা—মনের বেদনা মনেই রেখো।

সারি সারি দাঁড়ায়েছে প্রেমিকের দল—
মস্তক প্রস্তুত করি—স্থির অচঞ্চল
ছিন্ন কর শির তাহে না হয় অন্যথা
হয়ত লভিতে পার তার প্রসন্নতা—
ভূমিতে লুটায়ে পড়া রক্তমাখা শির
ব্যর্থতায় করিবে না অন্তর অধীর।
প্রেমের শরাবখানে হত্যা অগণন
বন্ধহীন বন্যাস্রোতে চলে অনুক্ষণ।
প্রেমের মদিরা যদি শুধু এতটুক
পান করিবারে চাহ একান্ত উৎসুক—
পানশালা হবে তব একমাত্র নীড়;
পানপাত্র—পার্শ্বে তব পড়ে আছে শির
মূল্য দিয়া কর পান উন্মাদ অধীর।

শিল্পশিক্ষা ও স্বাধীন রাষ্ট্র

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

বাংলার স্বদেশী যুগের গোড়া হইতেই জাতীয় শিক্ষা বলিয়া একটা কথা উঠিয়াছিল; এবং বাংলার স্থানে স্থানে জাতীয় বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯২১ সনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইলে সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি হইতে ছাত্রদের চলিয়া আসিতে বলা হয়। স্বদেশী যুগের আন্দোলন বিশেষভাবে বাংলায় আবদ্ধ ছিল, কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন সারা ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং ভারতের স্থানে স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। জাতীয়তাবাদী চিন্তানায়কগণ বলেন যে শিক্ষা আমাদের মনে দাসসুলভ মনোবৃত্তির সৃষ্টি করে, তাহা আমাদের জাতীয় জীবনের বিকাশের পরিপন্থী। ভারত আজ স্বাধীন, আজ বিকাশের ঐরূপ চিন্তাধারার তাৎপর্য্য আমাদিগকে অনুধাবন করিতে হইবে।

আজ আমার আলোচ্য বিষয় শিল্পশিক্ষা, অর্থাৎ আর্ট চিত্রকলা ভাস্কর্য্য প্রভৃতি। আর্ট প্রত্যেক জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে; অতএব সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন আছে। সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়, কিন্তু শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে তেমন আলোচনা হয় না। এখন স্বাধীন ভারতের উপযোগী আর্ট গড়িয়া তোলার দরকার যাহাতে দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দেশের শিক্ষা, দেশের সংস্কৃতি আর্টের ভিতর দিয়া প্রকটিত হইতে পারে। এখন আর্ট হওয়া উচিত যুগোপযোগী।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নানা জনের নানা অবদান আছে। শিল্পীর কোনো অবদান আছে কি? স্বাধীন ভারতে প্রকৃত মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে, এমন চিত্র সে আঁকিয়াছে কি? এমন চিত্র সে আঁকিয়াছে কি যাহা হইতে মানুষ প্রেরণা পাইতে পারে? বহুক্ষেত্রে আমরা শিল্প সৃষ্টি করিয়াছি ধনীর বাসনের জন্য। শিল্প হইয়াছে তার ড্রয়িং-রুমের আসবাবপত্রের মত। যাহা হওয়া উচিত অন্তরের জিনিষ, তাহা হইয়াছে বাহিরের ভোগের বস্তু। এক সময়ে আমাদের দেশে সমাজের সঙ্গে ছিল আর্টের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আমাদের দেশে সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য সকলেরই যোগ ছিল সমাজদেহের সঙ্গে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় আর্ট সে স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।

আজকাল সাহিত্য-শিল্প-সমালোচকগণ ইউরোপ হইতে একটি নূতন কথার আমদানী করিয়াছেন, তাহা হইতেছে সমাজচেতনা, এ জিনিষ কি আমাদের দেশে ছিল না?

আমি আমাদের দেশের বহু শিল্পী বিশেষ করিয়া আর্টের ছাত্রদের সঙ্গে মিশিয়াছি, অনেক স্থানে তাহাদের ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং অশ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়াছি। আজ বাংলায়

সাহিত্যে, কাব্যে, সঙ্গীতে যে স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত হইয়াছে, চিত্রে তাহা সম্ভব হইবে কি করিয়া? শিল্পীরা আজও তাকাইয়া আছে পশ্চিমের দিকে, তাহাদের মোহ আজও কাটে নাই; নবীন ভারতকে সে আজ কি বাণী দিবে? আজও সে যে আশা করিতেছে—রাজা মহারাজা, রায় সাহেব এবং খান বাহাদুররা তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিবে। আর্টকে শুধু অর্থ উপার্জনের উপায়-স্বরূপ মনে করিলে চলিবে না, আর্টিষ্টের আরও বড় দায়িত্ব আছে; এ কথা আজ তাহাদের স্মরণ করাইয়া দেওয়ার দরকার। কমলা লেকচারে ডাঃ এনি বেসান্ট বহু পূর্বে এ কথা বলিয়াছেন; আজ স্বাধীন ভারতে এই মহীয়সী মহিলার বাণী শিল্পীদের আবার নূতন করিয়া শোনানো প্রয়োজন তিনি বলিয়াছেন—

"Art as I have oftentimes said, must be no longer a luxury for the rich, but the daily bread of the poor. This is part of India's Dharma. For Beauty diversified into Arts is the true refiner and uplifter of Humanity. It is the instrument of culture, the broadener of the heart, the purifying Fire which burns up all prejudices, all pettin all coarseness. Without it true Democracy is impossible, equality of social intercourse an empty dream.

অর্থাৎ, "আমি প্রায়ই বলিয়াছি, আর্ট আর ধনীর বিলাস হইবে না, ইহা হইবে গরীবের রোজকার খোরাক। ইহা হইল ভারতীয় ধর্মের অঙ্গীভূত। কারণ সৌন্দর্য্য যখন আর্টের মধ্য দিয়া বিকীর্ণ হয়, তখন তাহা মানবতাকে বিশোধন ও উন্নয়ন করে। ইহা সংস্কৃতির বাহন এবং ইহা অন্তঃকরণকে উদার করে। ইহার পূত অগ্নিশিখা সকল কুসংস্কারকে, ক্ষুদ্রতাকে, স্থূলতাকে দগ্ধ করে। ইহা ছাড়া প্রকৃত গণতন্ত্র অসম্ভব এবং সামাজিক সাম্য একটা মিথ্যা স্বপ্ন।" ডাঃ বেসান্টের এই উক্তির মূল্য আজ সমধিক।

ভারতবর্ষের আর্ট স্কুলসমূহে যে সব ছাত্র শিক্ষা পায়, তাহাদের অধিকাংশেরই ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নাই। বিলাত যাইতে পারিলেই তবে তাহাদের শিক্ষার সার্থকতা—অনেকে মনে মনে কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু কয়জনের এমন বাসনা মনে জাগে যে, ভারতবর্ষটা ভ্রমণ করিয়া দেখি—অজন্তা, এলোরা, কোনারক প্রভৃতি দেখি। ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া শিল্পশিক্ষার কিছু সুবিধা হইবে একথা তাহারা কল্পনা করিতে পারে না। তাহারা ইউরোপীয় চিত্রের পুস্তকই পড়ে, ছবি দেখে; ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে তাহাদের এমনি ধারণা যে, তাহা সর্ব্ব রকমে পরিত্যাজ্য। আমাদের ছাত্রেরা ইউরোপে গিয়া ইউরোপের চিত্র-কলার সঙ্গে পরিচিত হোক, ইহার বিরুদ্ধ মত পোষণ করা অবশ্য সমীচীন নয়; কিন্তু যে নিজের দেশকে জানে না, তার পরের দেশকে জানিয়া লাভ কি?

বিদেশে শিল্পশিক্ষার জন্য বৃত্তি আছে, বর্ত্তমানে ইহার কোনো সার্থকতা উপলব্ধি করি না। অন্ততঃ ৫ বৎসরের জন্য এ বৃত্তি বন্ধ থাকা উচিত। এখন ছাত্রবৃত্তি দেওয়া উচিত ভারত ভ্রমণের জন্য; শিল্পীরা ভারতের প্রাচীন শিল্পকলার নিদর্শনসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবে। পরে যখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে, বিদেশের বৃত্তি পুনঃপ্রবর্ত্তন করিলে চলিবে। বিদেশে যাহারা শিল্পশিক্ষার জন্য যাইবে, তাহাদের ভারতীয় এবং ইউরোপীয় শিল্পের ইতিহাসের একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকার দরকার, তাহা হইলে তাহারা লাভবান হইতে পারিবে। আঁরি মাটিস এখন ফ্রান্সের জীবিত শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তাঁহার কাছে একজন এদেশীয় শিল্পী শিক্ষালাভ করিতে গেলে তিনি বলিয়াছিলেন "এখানে আসিয়াছ কেন, তোমাদের দেশে বড় আর্ট আছে, সেখানে ফিরিয়া যাও।"

সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে রাজনীতিতে ভারত এমন বহু মনীষীর সৃষ্টি করিয়াছে, যাহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে সমান আসন লাভ করিবার যোগ্য। কিন্তু সেই স্তরের শিল্পীর সংখ্যা খুবই কম। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলালকে বাদ দিলে এমন কয়জন শিল্পী আছেন যাহারা ভারতের গৌরবকে পৃথিবীর সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া ধরিতে পারেন?

জবাহরলাল বলিয়াছেন, ভারত বহুকালের পরাধীনতা এবং ঝড়ঝাপটার মধ্যেও টিকিয়া আছে; কি প্রকারে আছে? আছে তার নিজের ঐতিহ্যের জোরে।

সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন,

"There is a continuity, historical and cultural continuity, extending from the ancient till the present day—which is in some ways a remarkable thing in history. Now in order to understand India this fundamental fact should first be understood, namely, that the India of the past is not dead. India of the past lives in the present, and will live on in the future."*

অর্থাৎ "প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভারতের ইতিহাসের এবং সংস্কৃতির একটি নিরবচ্ছিন্নতা আছে, যাহা ইতিহাসের এক অভিনব জিনিষ। ভারতকে বুঝিতে হইলে গোড়ার এই কথা বুঝিতে হইবে, অতীতের ভারত আজ মৃত নহে, এবং ইহা ভবিষ্যতেও বাঁচিয়া থাকিবে।"

শিশুকাল হইতেই বালকবালিকাদের মনে ভারতীয় শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইতে হইবে। চার বৎসর হইতে বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—বাল্যকালে—মনে সহজেই সব কিছুর ছাপ পড়ে, তখন মনে যাহা ঢুকাইয়া দেওয়া যাইবে, তাহা স্থায়ীভাবে থাকিয়া যাইবে। এখন স্কুলের দেওয়ালে টাঙানো থাকা উচিত, প্রাচীন ভারতীয় চিত্র, ভাস্কর্য্য স্থাপত্যের প্রতিলিপি। সরকার হইতে এসকল প্রতিলিপি ছাপানোর ব্যবস্থা করা উচিত। অধুনা ভারতীয় ইতিহাসে অজন্তা, এলোরা, যবদ্বীপ এবং বৃহত্তর ভারতের উল্লেখ

* নবেম্বর, ১৯৪৪ সনে, টোকিওর বক্তৃতা

দেখা যায়; ইহা খুবই সমীচীন। পূর্ব্বে বালকদের বিদ্যালয়-পাঠ্য ইতিহাসে জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় থাকিত না বলিলেই চলে, থাকিত শুধু রাজা-বাদশাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা। কিন্তু এখন ইতিহাসকে ঢালিয়া সাজা উচিত। ছেলেরা যাহা ইতিহাসে পড়িবে, চোখের সামনে যেসব দেখিলে ভারতের ঐতিহ্য তাহাদের কাছে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে, ল্যাণ্টার্ণ-স্লাইড সাহায্যে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা মাঝে মাঝে সেই সব প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া উচিত। প্রত্যেক বালকবালিকা আর্টিষ্ট হইবে এরূপ আশা করা যায় না, কিন্তু সকলেরই মনে সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত হওয়া উচিত।

স্কুলে ড্রইং ক্লাস নামে যে ক্লাস থাকে তাহা মোটেই চিত্তাকর্ষক নহে। বর্ত্তমানের শিক্ষাপদ্ধতি এরূপ যে, ড্রইং মাষ্টার ইহাকে চিত্তাকর্ষক করিতে পারেন না; চিত্র সম্বন্ধে ছাত্রদের কোন ঔৎসুক্য জাগে না, তাহারা এই ক্লাসকে ফাঁকি দিতে পারিলে বাঁচে। যদিও বা কাহারও চিত্র সম্বন্ধে ঔৎসুক্য থাকে ড্রইং ক্লাসের যাঁতাকলে পড়িয়া তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

ফলে এই হয়, আর্ট স্কুলে যখন ছাত্রেরা ঢোকে, তখন শিল্পকলা শিখিবার জন্য প্রকৃত আগ্রহ তাহাদের বড় একটা থাকে না। তাহারা শুধু পাস করিয়া উপার্জ্জনক্ষম হইতে চায়। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যে বহু পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, 'আগে আর্টিষ্ট হও, পরে আর্ট স্কুলে ঢোক', কার্য্যক্ষেত্রে তাহা অনুসৃত হইতেছে কি?

অভিভাবকদের এবং শিক্ষাব্রতীদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। অনর্থক এক দল আগ্রহ ও ঔৎসুক্যহীন ছাত্রকে আর্ট স্কুলে পাঠাইলে শিল্পশিক্ষা ব্যাহত হয়, তাহাদের আর্ট শিক্ষার জন্য সময় ও অর্থের অপব্যয় না করিয়া অন্য লাইন বাছিয়া লওয়া উচিত।

মস্তিষ্ক, হৃদয় এবং হস্ত এই তিনের সংযোগে শ্রেষ্ঠ শিল্পের উৎপত্তি—অর্থাৎ ইহার ভিতর থাকিবে বুদ্ধিবৃত্তি, ভাবাবেগ এবং টেকনিক বা কলাকৌশল এই তিনের সমন্বয়। শিল্পীদের এই তিনটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত, শুধু টেকনিক বা ব্যাকরণের দিকে দৃষ্টি দিলে চলিবে না।

শিল্পীগোষ্ঠী এবং রাষ্ট্রপরিচালকদের পারস্পারিক সহযোগিতা দরকার। গত যুদ্ধের সময় জাপানী আর্টিষ্টদের যুদ্ধের প্রাচীর-চিত্র আঁকিতে হইয়াছিল। আজ আমাদের শিল্পীরা স্বেচ্ছায় রাজনীতি, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক পোষ্টার আঁকুক না? কংগ্রেস শিল্পীদের সহযোগিতা এতদিন তেমনভাবে প্রার্থনা করে নাই, আজ রাষ্ট্র অথবা কংগ্রেস স্বাধীনতার ও জাতীয় সংস্কৃতির বাণী চিত্রের সাহায্যে ঘরে ঘরে পৌছাইয়া দিক, যাহাতে নিরক্ষরেরাও স্বাধীনতার মর্ম্ম বুঝিতে পারে সেই ব্যবস্থা করুক। শিল্পীরা এতদিন নিজেদের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ ছিল, আজ তাহাদের শক্তি দেশসেবায় নিযুক্ত হোক। জনগণের মধ্যে দেশের মর্ম্মবাণী চিত্রের সাহায্যে পৌছাইয়া দিক।

A man does not live by bread alone. স্বাধীন ভারতকে শুধু রুটির ব্যবস্থা করিলে চলিবে না, জনগণের জন্য চাই সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, চাই আনন্দ। ভারতের মুক্ত আত্মা শিল্পের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করুক।

ফরাসী বিপ্লবের সময় দেখা গিয়াছে, শুধু সাহিত্যে সঙ্গীতে বিপ্লবের বাণী ধ্বনিত হয় নাই, চিত্রেও তাহার প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে। নেপোলিয়নের দামামা ধ্বনি, তাহার যুদ্ধবিরতির ধ্বনি শিল্পীর কানে পৌছিয়াছে। স্পেনের বিখ্যাত শিল্পী গইয়া দেশের নিপীড়িত জনগনের বেদনাকে চিত্রে মূর্ত্ত করিয়াছেন।

দিন আগত ঐ, ভারতীয় শিল্পী এখন কোথায়? সে কি লুপ্ত থাকিবে? সকলের পিছনে পড়িয়া থাকিবে? দেশের বিপুল জনসঙ্ঘের সঙ্গেই যে তাহাকে চলিতে হইবে!

বাপুজী

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

হিংসার সমুদ্র 'পরে শান্তিময় প্রভাত-তপন
তোমার পবিত্র আত্মা উজলিল মৃত্যুর আকাশ,
জ্যোতির্মালা জ্বলে জলে, উদ্ভাসিত নিখিল ভুবন,
তোমার অমৃতবিভা মর্ত্যে আনে স্বরগ-আভাস।

কত দ্বেষ, কত নিন্দা, কত হীন সন্দেহ সংশয়,
তোমার নির্মল হাস্য প্রতিদিন গেছে তুচ্ছ করি,
আপন হৃদয়-বলে সর্ববাধা করিয়াছ জয়,
স্থিরলক্ষ্য চলিয়াছ আপন আদর্শ অনুসরি'।

ক্ষণস্থায়ী বর্তমান, ফেনসম প্রবৃত্তি-সংক্ষোভ,
আমরা তাহারি দাস, মিথ্যা মায়ামুগ্ধ অনুক্ষণ,
শক্তিহীন নিষ্ঠাহীন,—আমাদের মূঢ় শক্তি লোভ
ভীরুতার পদতলে পূজা-অর্ঘ্য করিছে অর্পণ।

অস্ত্রহীন মহাবীর, অস্ত্ররাজি তব পদতলে
সম্ভ্রমে লুটায়ে পড়ে, মহাযুদ্ধে চির রণজয়ী।
দেখায়েছ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র প্রতিজন পায় মনোবলে,
উদ্যত অসির মাঝে চলিয়াছ প্রেম-বার্তা বহি'।

বিদেশীর ষড়যন্ত্র, উন্মদ সে হত্যা-আয়োজন
উপেক্ষিয়া চলিয়াছ স্মিত মুখে দক্ষিণাফ্রিকায়,
সহিয়াছ কারাবাস, গুরু দুঃখ করেছ বরণ,
দৃঢ়পদে চলিয়াছ আপন কঠোর সাধনায়।

মানুষ মানুষ হোক্, জীবনের একটি কামনা,
অগ্নিদগ্ধ নোয়াখালি তাই তব হ'ল তীর্থভূমি,
ভয়াকুল দেশবাসী রুদ্ধগৃহে করেছে জল্পনা
আত্মজন ক'টি নিয়ে শূন্যহস্তে ছুটে গেছ তুমি।

মনোবল হ'ল জয়ী। তবু শুনি কত নিন্দাবাদ,
আরাম কেদারাশায়ী তরুণের বীরত্বাভিনয়,
যাহাদের নেতা তুমি, তারা ধরে শত অপরাধ,—
বিশৃঙ্খল লক্ষ্যহারা দেশের শক্তির অপচয়।

তুমি নাকি ধনিবন্ধু! দূর দেশে কৃষিব্রত লয়ে
দীনজনসঙ্গে তুমি রচিলে আদর্শ পরিবার,
সংঘ-জীবনের বাণী—বাণী নয়, মূর্ত সত্য হয়ে
উঠেছে সে দিন হতে সুদীর্ঘ এ জীবনে তোমার।

আজিকার অপমৃত্যু—আকস্মিক কুজ্ঝটিকাজাল
অকালে ঘনায়ে এলো, অশ্রুবাষ্পে আঁধার নয়ন।
ছিন্ন হবে এ কুহেলি, 'ব্যাপ্ত করি' সর্বদেশকাল
তোমার মহিমাদীপ্তি উদ্ভাসিবে জীবন-মরণ।

ক্ষমা-সুন্দর

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

সর্পের মত খল ষড়রিপু মন্ত্রমোহিত সম
শতফণা যার চরণে ঠেকায়ে ফুকারিল, 'নমোনমঃ'
বিদগ্ধ-জনা যার এক-কণা পদরেণু-প্রত্যাশী
বুদ্ধ যীশুর গোত্রীয় সেই কৌপীনী সন্ন্যাসী,
নিয়ে হরিজনে মেলা বসাইল ভাঙী-বস্তীর মাঝে
পঙ্ক-মলিন সরসীতে যেন স্বর্ণ-কমল রাজে!
আধো-শতাব্দী খোলা ছিল যার জীবনের খাতাখানি
যার খুসী সেই পড়িয়া জেনেছে জীবনই তাঁহার বাণী।

সে যে নিখিলের মর্মের কোষে মূল্যবিহীন নিধি
ধরিত্রী যার চরণ-পরশে পবিত্র মানে হৃদি।
ধরণীর ধূলি ধন্য করিল অমরার জ্যোতি নামি'
বুকের শোণিতে ধুয়ে মুছে দিতে এ ধরার পাপ, গ্লানি।
ত্রিশো কোটি লোক যাহার ছায়ায় অর্দ্ধশতক ধরি'
ধন্য হয়েছে; বংশধরেরা যুগে যুগে তাঁরে স্মরি'
জীবনের পথে লভিবে পাথেয় নিশ্চিত বিশ্বাসে
একথা ভাবিতে নয়নে আমার বাষ্প নামিয়া আসে!

এমন রত্ন সহিতে নারিল যে অভাজনেরা আজি
বিধাতা! তোমার কঠোর করুণা বজ্রদণ্ডে বাজি'
তাদের অন্ধ নয়নে ফোটাক্ মোহ মুক্তির আলো
শাপ-মোচনের অন্তে তাহারা চিনুক মন্দ-ভালো।
যে হৃদয়ে ছিল তাহাদের তরে নিশ্চিত আশ্রয়
অগ্নি-গলিত ধাতু-গুটিকায় তাহারই ঘটায়ে ক্ষয়
আশ্রয়হারা ভ্রান্ত পথিক—সে মূঢ়জনেরা শেষে
প্রায়শ্চিত্ত করুক এবার, মানুষেরে ভালোবেসে।
হাত-যোড়-করা ক্ষমা-সুন্দর মৃত্যু-বরণ-ক্ষণে—
এর চেয়ে বড়ো কোনো অভিশাপ আসে না আমার মনে।

অস্ত-রবির তমোঘন ক্ষণে এ আমার সান্ত্বনা
তাঁহারে দেখিয়া ধন্য যাহারা আমি তারি এক জনা!
তাঁর ভাবে যবে ভাসিল ভুবন—প্রেমগঙ্গার বানে
আমিও তখন ছিনু ধরণীতে—তাকায়ে সে মুখপানে!

মৃত্যু অমৃত করে দান

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সেদিন সহসা-স্তম্ভিত মানুষের অন্তরের যে আকুল আর্তনাদ হস্তিনার প্রান্তরে ধ্বনিত হ'ল তা রাজধানীর সীমা ছাড়িয়ে, দেশের সীমা ছাড়িয়ে, মহাদেশের সীমা ছাড়িয়ে সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ল। ভারতের বেদনা বিশ্ব-বেদনায় রূপান্তরিত হ'ল।

গান্ধীজীর বিচ্ছেদে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম, ক্রমে সেই আচ্ছন্ন ভাব সেই বিমূঢ়তা ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে। আজ আমরা বুঝতে পারছি আত্মার মৃত্যু নাই, মহাত্মা অমর। দেশের গণ্ডী, কালের গণ্ডী পার হয়ে তাঁর প্রেরণা বিশ্বমানবকে উদ্বুদ্ধ করবে।

গান্ধীজী কি শুধু ব্যক্তি-বিশেষ? তা হলে সারা পৃথিবীর লোক এমন করে সাড়া দিত না।

মহাত্মার সাধনা মুক্তির সাধনা। কিন্তু মোক্ষের সাধনা নয়।

তিনি জনসাধারণের মধ্যে এক জন নন, তিনিই জনসাধারণ। চল্লিশ কোটি লোকের সঙ্গে তিনি নিজেকে একীভূত করেছিলেন। জনগণ হতে তিনি অনন্য, এই তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

জনগণের নানা ধর্ম্ম, নানা ভাষা, বিভিন্ন আচার; তবু তারা ভারতীয়, এত বিভেদের মধ্যেও তারা এক। সেই এক, সেই ভারতের জনগণ মহাত্মার মধ্যে মূর্ত হয়েছিল। তাই মহাত্মা মূর্ত ভারতবর্ষ, ভারতের জনসাধারণের প্রতীক।

ভাষা জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণকে নিজের মধ্যে অনুভব করতেন বলেই হিন্দু-মুসলমান শিখ-খ্রীষ্টানের কোন প্রভেদ তাঁর কাছে ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ তাঁর কাছে এক হয়ে গিয়েছিল। নানা দ্বিধা, বিভিন্ন ভাব অন্তরে উত্থিত হলেও মানুষের মন যেমন এক, গান্ধীজীর নিকটেও বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে জনসাধারণ তেমনি এক। সেই জনসাধারণ যা মূঢ় ভাবে আত্ম-অগোচরে অনুভব করত মহাত্মা তা সচেতন ভাবে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুটভাবে অনুভব করতেন। তাই তাঁর লবণ-আন্দোলন। তাই তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ। তাই তিনি রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে ভারতবর্ষের একক প্রতিনিধি হয়েছিলেন।

যিনি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনা আপনার মধ্যে অনুভব ক'রে ছন্দে ব্যক্ত করেন তিনি মহাকবি। যিনি তা কর্ম্মে প্রকাশ করেন তিনি মহামানব। গান্ধীজী মহামানব।

কবি বলে গেছেন, "এই সব মূঢ় মূক ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা।" কবি ভাষা দিয়েছিলেন, সে অন্তর্লোকের ভাষা, সূক্ষ্ম অনুভূতির ভাষা। মহাত্মা ভাষা দিলেন, তা কর্ম্মজগতের ভাষা; মহাত্মার ভাষা জনসাধারণের প্রতিদিনের ভাষা। সঙ্গে সঙ্গে সেই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে বিপুল আশা ধ্বনিত হয়ে উঠল।

আমরা স্বাধীনতা-আন্দোলন করেছি—শ্রেণীবিশেষে, বিচ্ছিন্ন ভাবে। মহাত্মার আন্দোলন সর্ব্বসাধারণকে নিয়ে। সকলের সহযোগে ব'লে অ-সহযোগ আন্দোলন এত বিপুল হয়ে উঠেছিল, এবং ভারতবর্ষ সাধারণভাবে হিংসাহীন বলেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন অহিংস। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে ভারতবর্ষ চিরদিন হিংসা-বিরত থাকতে চেয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা—সম্রাট অশোক তাই, স্থানের উপর নয়, মানুষের মনের উপর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তাই মহাত্মা-প্রবর্ত্তিত মুক্তির সংগ্রামও অহিংস।

শক্তি দু-প্রকার। দুঃখ দেবার শক্তিকে আমরা সহজেই চিনতে পারি। সহনশীলতার মধ্যে যে অসীম শক্তি নিহিত আছে তা আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। জগতের দুই জাতির লোক এই দুই ধরণের শক্তির অধিকারী। পাশ্চাত্য জাতি আক্রমণাত্মক প্রভুত্ব-শক্তির সাধনা করেছে। ভারতবর্ষ সহন-শক্তির ভাণ্ডার। অপূর্ব্বপরিচিত আণবিক শক্তির মত এই বিপুল সঞ্চিত-শক্তিকে জাগাতে পারলে অসাধ্য-সাধন করতে পারা যায়। গান্ধীজী ভারতবর্ষের সেই বিশাল সুপ্ত-শক্তিকে জাগ্রত প্রেরিত করতে পেরেছিলেন। সেই শক্তির আলোড়নে শিথিল-ভিত্তি সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল।

ভারতবর্ষের জ্ঞানের মধ্যে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে আছে তা এই—ব্যবহারিক জগতে কর্ম্ম করতে হবে, কারণ কর্ম্ম ভিন্ন আমাদের গতি নাই, তৎসত্ত্বেও প্রকৃত উপলব্ধিতে জগৎ মায়া মাত্র। সত্যাগ্রহ, অসহযোগ এবং আত্মিক প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে মহাত্মা এই সত্যই আমাদের মনে প্রতিভাসিত করেছেন যে বিদেশীর শাসন একান্ত মায়া, সেই মিথ্যা আমাদের ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সহযোগিতার অপসারণে সেই অসত্য-সাম্রাজ্য প্রভাত-কুহেলিকার মত অন্তর্হিত হবে।

প্রথম মহাযুদ্ধে যার আরম্ভ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যার শেষ সেই নিবিড় অন্ধকার-যুগের নিকষকৃষ্ণ পটভূমিকায় নৈরাশ্য-পীড়িত মানবের আর্ত হৃদয়ে মহাত্মার অহিংসার বার্ত্তা অমৃত-বর্ত্তিকার উজ্জ্বল আলোক ফুটিয়ে তুলেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র মাতাকে বন্দনা করতে শিখিয়েছেন, গান্ধীজী শিখিয়েছেন, বন্দনা করতে হলে অন্তরকে শুভ্র শুচি নির্ম্মল হিংসাহীন অসূয়াশূন্য করতে হবে। একদা বাংলার এক সন্ন্যাসী শিখিয়েছিলেন ছুৎমার্গ পরিহার ক'রে দরিদ্রনারায়ণের সেবার মধ্যেই আমাদের সার্থকতা, গান্ধীজী সেই সেবাধর্ম্মের বিরাট যে বাধা অস্পৃশ্যতা তা-ই দূর করতে আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন।

সকল বিবাদের অবসান হোক। সকল দ্বন্দ্ব দূর হোক। মহাত্মার মধ্যে মুক্ত ভারতবর্ষের মহান্ আত্মাকে প্রণাম করি। সমস্ত ম্লানিমা এবং গ্লানি বিধৌত করে অশ্রু আজ অন্তরকে উজ্জ্বল বিশুদ্ধ করুক। মহাত্মার আদর্শ জয়যুক্ত হোক। জয়তু গান্ধীজী। মৃত্যু অমৃত করে দান।

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

টেনেসি উপত্যকা

১১ই ডিসেম্বর ২৫শে অগ্রহায়ণ বুধবার প্রত্যুষে ওয়াশিংটন বিমান ঘাঁটিতে পৌছিলাম। পৌনে ন'টায় বিমান উড়িল। বিমানটির দুইটি ইঞ্জিন, ২৪টি আসন। পথে তিনটি ষ্টেশন: লিঞ্চবার্গ, রোয়ানোকে ও জনসন্ সিটি। কুয়াশার জন্য বিমান শেষেরটিতে নামিল না। নীচে শুধু জনবসতি-বিরল সীমাহীন প্রান্তর। ফসল বিশেষ দৃষ্টিগোচর হইল না। ক্রমশঃ লাল মাটির দেশ ও ছোট ছোট দু-একটা পাহাড় দেখা গেল। বেলা ১২টা ৪৯ মিনিটে নক্সভিল ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। চারিদিকে মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। সেখান হইতে নক্সভিল শহর ১২ মাইল। ট্যাক্সিযোগে নগরে পৌছিলাম। এখানে টেনেসি উপত্যকা কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান আপিস। হোটেলে গিয়া মধ্যাহ্নভোজন সমাপনান্তে টেলিফোনযোগে আমার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া আপিসে উপনীত হইলাম। সেখানে সাদরে গৃহীত হইলাম।

টেনেসি উপত্যকার ভূমি অনুর্ব্বর। বন্ধুর পর্ব্বত-সঙ্কুল দেশ। মাটি লাল। দো-ফসলী জমি নাই বলিলেই হয়। ভুট্টা প্রধান ফসল। চাষ পশুদ্বারাই হয়। গরুগুলি ক্ষীণ। জনবসতি বিরল। ডিসেম্বর হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত বর্ষাকাল। বার্ষিক বারিপাত প্রায় ৫০ ইঞ্চি। ফসলের পক্ষে বারিপাত প্রচুর। মেঘ কালবর্ষী। জলসেচের দরকার নাই।

দুই শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে যখন ইউরোপীয় জাতি এদেশে প্রথম বসতি স্থাপন করে তখন এ দেশের জমি উর্ব্বর ছিল। জমির পর জমি লাঙ্গলের নীচে আসিল। জঙ্গল কাটিয়া সাফ করা হইল। ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া জমির বেহিসাবী ব্যবহার চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ টেনেসি নদীতে বন্যা দেখা দিল। বন্যায় দেশ ভাসিয়া যাইত। জমির উপরের মাটি বন্যায় ধুইয়া গেল। বন্যার জলে মাটি কাটিয়া খাল হইয়া গেল। অনেক জমি চাষের অনুপযুক্ত হইল। দেশ ব্যাপিয়া অনুর্ব্বরতার সমস্যা দেখা দিল। যে সব জমিতে সোনা ফলিত তাহাদের এখন নিজ দেহের নগ্নতা ঢাকিবার মত ঘাস জন্মাইবারও ক্ষমতা রহিল না। নদী বর্ষাকালে বন্যাপ্লাবিত হইত—গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যাইতে লাগিল। নদীপথে যানবাহনের চলাচল বন্ধ হইয়া গেল। দেশ সর্ব্বতোভাবে দারিদ্র্যের সম্মুখীন হইল।

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলিতেছে। সরকার আলাবামা রাষ্ট্রের মাস্‌ল শোলস্ নামক স্থানে একটি বারুদের কারখানা স্থাপন করেন। নিকটবর্ত্তী টেনেসি নদীতে একটি বাঁধ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিয়া এই কারখানা চালাইবার সিদ্ধান্ত করা হয়। বাঁধ নির্ম্মাণকার্য্য ১৯১৮ সনে আরম্ভ হইয়া ১৯২৪ সনে শেষ হয়। তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। কাজেই কারখানা ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন গৃহ অকেজো পড়িয়া রহিল। এগুলিকে বিক্রয় করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু উচিত মূল্যের খরিদ্দার জুটিল না। তখন সেনেটের নরিস প্রমুখ কতিপয় দূরদর্শী ব্যক্তি একটি স্বতন্ত্র কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ইহা পরিচালিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাবিত কর্ত্তৃপক্ষ এই কারখানা ও বাঁধের ভার লইবেন, নদীতে প্রয়োজনমত আরও বাঁধ তৈরী করাইবেন এবং তদ্দ্বারা বন্যাশাসন, নদীর নাব্যতা সম্পাদনও বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া টেনেসি উপত্যকার সর্ব্বতোমুখী উন্নতি সাধন করিবেন। এই কর্ত্তৃপক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে স্বতন্ত্র ভাবে জনস্বার্থে কাজ করিবেন; লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিবেন না। ১৯৩৩ সনে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের চেষ্টায় 'টেনেসি উপত্যকা কার্য্যপরিচালনা আইন' পাস হয়। আইনে উক্ত সংসদ প্রতিষ্ঠার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি লিপিবদ্ধ আছে; যথা (১) টেনেসি নদীর নাব্যতাসাধন ও বন্যাশাসন; (২) বন উৎপাদন এবং যে সমস্ত জমি কৃষির অনুপযুক্ত হইতে চলিয়াছে সেগুলির সদ্ব্যবহার; (৩) টেনেসি উপত্যকার কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন; এবং (৪) আলাবামার মাস্‌ল শোলসের বারুদের কারখানার ভার লইয়া দেশরক্ষা বিষয়ে যথোচিত সাহায্য দান।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পর ১৫ বৎসর অতীত হইয়াছে। টেনেসি উপত্যকা কর্ত্তৃপক্ষ বাঁধের পর বাঁধ তৈরী করাইয়াছেন। বর্ত্তমানে নদীতে ২৭টি বড় বাঁধ আছে। ৯টি টেনেসি নদীতে; ১৮টি টেনেসির উপনদীসমূহে। প্রত্যেক বাঁধের পশ্চাতে বৃহৎ সরোবর এবং সম্মুখে নীচে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্ম্মিত হইয়াছে। এই কেন্দ্রসমূহে টারবাইনের বিপুল চক্রের অবিরত আবর্ত্তনে প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। বর্ষার জল যখন প্রবল বেগে পাহাড় হইতে নামে তখন বাঁধে বাধা পাইয়া পিছনের সরোবরে গিয়া পড়ে। বিপুল জলরাশি তখন উদ্দাম মত্ততা পরিত্যাগ করিয়া সরোবরের মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করে। সারা বছর ধরিয়া জলপ্রবাহ ধীরে ধীরে বাঁধের নীচে দিয়া অপ্রতিহত গতিতে নামিয়া আসে এবং তত্রত্য পাওয়ার হাউসের বিরাটকায় লৌহচক্রকে সজোরে ঘুরাইয়া দিয়া ফেনায়িত অবস্থায় ফুঁসিয়া ফুলিয়া সগর্জ্জনে নদী-খাদে চলিয়া যায়। শক্তি-গৃহের বাহিরেও জল নামিবার একটি পথ থাকে। বেশী জল নীচে পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে এই পথটি ব্যবহৃত হয়। এইরূপ পাহাড়ের উপর হইতে নীচে পর্য্যন্ত নদীর খাটিতে

ঘাটিতে বাঁধ। সমস্ত বাঁধ একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাধীনে ব্যবহৃত হইতেছে। যত জলই পাহাড় হইতে নামুক না কেন, তাহাদিগকে বিভিন্ন সরোবরে আটকাইয়া রাখিয়া প্রয়োজনমত বিলি করা হইতেছে। রেলের সাহায্যে যেমন ইচ্ছামত যথাস্থানে ও যথাকালে মাল পাঠান যায় এই বাঁধগুলির সাহায্যে তেমনি জলরাশিকে ইচ্ছানুরূপ গতিতে যথাস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। টেনেসির বৃহত্তম বাঁধ অপেক্ষাও বড় বাঁধ এই দেশেই আছে। কিন্তু ৪০,০০০ বর্গ মাইল পরিমিত একটি সমগ্র উপত্যকার সমস্ত জলরাশিকে একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অধীনে নানাবিধ জনকল্যাণে যুগপৎ নিয়োজিত করিবার উদাহরণ পৃথিবীতে আর নাই।

উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যাবলীকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—

(১) শক্তি উৎপাদন, নদীর নাব্যতা সাধন এবং বন্যাশাসন,
(২) রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন,
(৩) আঞ্চলিক উন্নতি বিধান।

প্রথম শ্রেণীর কার্য্যাবলী সত্যই বিস্ময়কর। ইহার কল্পনা-মহিমা, সম্পাদনচাতুর্য্য, কল্যাণপ্রসূত্ব এবং ব্যাপকত্ব যুগপৎ চিত্তকে অভিভূত করে। যে জলরাশি জমির সার ভাসাইয়া লইয়া সমুদ্রে ফেলিতেছিল এবং বন্যার সৃষ্টি করিয়া দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছিল আজ তাহা সম্পূর্ণরূপে জনকল্যাণে নিয়োজিত।

১৯৪৫ সনে উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষ বার শত কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা পরিমিত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করেন। অর্থাৎ তাহাদের মাসিক উৎপাদনের পরিমাণ ছিল এক শত কোটি কিলো ওয়াট ঘণ্টা। পৃথিবীর কোন প্রতিষ্ঠানই একক এত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করে না।

টেনেসি নদী কেণ্টাকি রাষ্ট্রের পাডুকা নামক স্থানে মিসিসিপি নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পাডুকা হইতে নক্সভিল নদীপথে ৬৫০ মাইল। টেনেসি নদীর এই ৬৫০ মাইল খাদে বারমাস নয় ফুট গভীর জল রক্ষা করা উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষের একটি বিশেষ দায়িত্ব। এই দীর্ঘ পথে বারমাস ষ্টীমার চলাচলের ব্যবস্থা হওয়ায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইতেছে।

উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষ যে সরোবরমালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহার জলধারণশক্তি জানুয়ারী মাসে এক কোটি কুড়ি লক্ষ একর-ফুট এবং এপ্রিল মাসে এক কোটি পাঁচ লক্ষ একর-ফুট। এই সরোবরশ্রেণীর দ্বারা টেনেসি রাষ্ট্রের ছাতানুগা অঞ্চলের বৃহত্তম বন্যাজলের উচ্চতা অন্ততঃ ১৬ ফুট নামাইয়া দেওয়া সম্ভব। এখন এই অঞ্চলে বন্যা অসম্ভব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মাস্‌ল শোল্‌সের কেমিক্যাল কারখানা লইয়াই উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষ কাজ আরম্ভ করেন। বর্ত্তমানে এখানে যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে তন্মধ্যে ফস্‌ফরাস, এমোনিয়াম্ নাইট্রেট ও ক্যালসিয়াম কারবাইড প্রধান। উৎপন্ন রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ সামরিক প্রয়োজন মিটাইয়া জমিতে সাররূপে ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট। ক্যালসিয়াম কারবাইড কৃত্রিম রবার উৎপাদনেই ব্যবহৃত হয়।

আঞ্চলিক উন্নতি বিষয়েও উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা বহুমুখী; যথা: (১) কৃষির উন্নয়ন, (২) বনের প্রসার ও উন্নতি; (৩) খনিজ সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি, (৪) বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা, (৫) জনস্বাস্থ্য, (৬) মাছধরা ও শিকারের ব্যবস্থা, (৭) ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্য নির্দ্দেশক মানচিত্র নির্ম্মাণ; (৮) বিশেষ গবেষণা।

হৃতশক্তি ভূমির উর্ব্বরতা কিরূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যায় সে বিষয়ে উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য বিশেষ প্রশংসার্হ। শাসন এবং বন প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক ভূমিক্ষয় নিবারণ করিয়া, ফসলের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করিয়া, ভূমির ক্ষয়িত উপাদান যথাসম্ভব বাতাস হইতে আহরণ করিয়া, এবং হিসাব করিয়া জমির ব্যবহার করতঃ কর্ত্তৃপক্ষ কৃষির যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন। শুনিলাম জমির প্রয়োজনীয় যাবতীয় নাইট্রোজেন শুধু ফসলের পৌর্ব্বাপর্য্য দ্বারাই পাওয়া যায়। সারের মধ্যে শুধু ফস্‌ফরাসই ইঁহারা ব্যবহার করেন। জনৈক কৃষি-বিশেষজ্ঞ আমাকে বলিলেন যে, ফসলের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয়ই যে ব্যয়িত নাইট্রোজেন পুনঃপ্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট এ ধারণা তাঁহারা প্রাচ্য দেশ হইতেই পাইয়াছিলেন।

উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষের যুদ্ধকালীন সাহায্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যখন শত্রুপক্ষ এবং মিত্রপক্ষের এরোপ্লেন নির্ম্মাণের আপেক্ষিক দ্রুততার উপর যুদ্ধজয় সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছিল তখন উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষের চেষ্টায় উৎপন্ন অফুরন্ত বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যেই অসংখ্য এরোপ্লেন ক্ষিপ্রতার সহিত নির্ম্মাণ করিয়া যুদ্ধের গতি ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

এখানে অফুরন্ত বিদ্যুৎশক্তি ছিল বলিয়াই টেনেসি রাষ্ট্রের ওকরিজ নামক স্থানে আণবিক গবেষণা সম্ভব হইয়াছিল। যে আণবিক বোমা জাপানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহা এই গবেষণারই ফল।

উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষের কর্ম্মচারিগণ বিমানগৃহীত ছায়াচিত্র হইতে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের ভূমির উচ্চতা নির্দ্দেশক মানচিত্র নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই মানচিত্রগুলি আক্রমণ পরিচালনায় বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

ছাঁচে ঢালা বাড়ী তৈরীর কার্য্যে উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষের অভিজ্ঞতা যুদ্ধের সময় বিশেষ কাজে লাগিয়াছিল।

মাস্‌ল শোল্‌স-এ যুদ্ধের জন্য প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী হইয়াছিল। ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য ডি-ডি-টি ও অন্যান্য সরঞ্জাম উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছিল।

উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষকে অনেক দুর্গম পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে বাঁধ নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। সেজন্য সেইসব স্থানে প্রথমেই

মজুরদের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যেই তাহাদের ছাঁচে ঢালা বাড়ী নির্ম্মাণ এবং ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের কার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইয়াছে।

উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষের উন্নতিমূলক কার্য্যব্যবস্থাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষি প্রভৃতির উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তথা রাষ্ট্রীয় সরকারের নানা বিভাগ বর্ত্তমান। আঞ্চলিক কর্ত্তৃপক্ষ কদাপি তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেন নাই; সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াই কাজ চালাইয়াছেন। অথচ লোকে এখন নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছে যে, সরকারী প্রচেষ্টা হইতে স্বতন্ত্র আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়াস অধিক ফলপ্রসূ।

সমস্ত জগতের উৎসুক দৃষ্টি বর্ত্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির উপর নিবদ্ধ। বিভিন্ন দেশ হইতে ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিকর্ম্মী, একাউট্যাণ্ট, অর্থনীতিবিদ, শাসনপরিচালক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বিশেষজ্ঞগণ ইহার কার্য্যপ্রণালী দেখিবার জন্য নক্সভিলে সমাগত হইতেছেন। আমাদের দামোদর উপত্যকা করপোরেশন ইহারই আদর্শে পরিকল্পিত হইয়াছে।

১২ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার—প্রাতরাশের পর বাহির হইয়া পড়িলাম। উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষের আপিসে দুইটি গ্রীক ভদ্রলোকের সঙ্গে মিলিত হইলাম। তাঁহারা আমারই মত কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যাবলী দর্শন-মানসে আসিয়াছেন। তাঁহাদের নাম মাইকেলিডিস্ ও পেট্রিয়াস্। মাইকেলিডিস্ ইঞ্জিনীয়ার। পেট্রিয়াস্ আঙ্কিক, জলবিষয়ক অঙ্কে বিশেষজ্ঞ। আমরা ফন্টানা বাঁধ দেখিতে যাইব। কর্ত্তৃপক্ষ জনৈক তরুণ ইঞ্জিনীয়ারকে আমাদের সঙ্গে দিলেন। যুবকটি গাড়ী চালাইয়া আমাদিগকে লইয়া চলিল।

সুন্দর মসৃণ রাস্তা। বিশাল প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। মাটি লাল। লোকালয় বিরল। দুই একটি গ্রাম্য নরনারী কচিৎ দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে। দু'পাশের ক্ষেত হইতে ভুট্টা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। শুক্‌না ভুট্টার ডাঁটা খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত পুনরায় চাষ করা হইয়াছে। চাষে যন্ত্রশক্তির ব্যবহার দেখিলাম না। মাঝে মাঝে গরু বা ঘোড়া চরিয়া বেড়াইতেছে। শীতের প্রকোপ বেশী নয়। তাপ ৪০ ডিগ্রীর কাছাকাছি হইবে। চমৎকার রোদ উঠিয়াছে। মাঝে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। মনে হইতেছে যেন সাঁওতাল পরগণা বা ভুবনেশ্বরের প্রান্তরের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। মেরিভিল ও এল্‌কোয়া নামক দুইটি ছোট শহর অতিক্রম করিলাম। শহর দুইটিতে 'এল্যুমিনিয়াম কোম্পানী অব আমেরিকা'র কর্ম্মচারিগণের বসতি বিদ্যমান। কোম্পানীর নামের শব্দচতুষ্টয়ের প্রথমাংশ সন্নিবেশে দ্বিতীয় শহরটির নামকরণ হইয়াছে। ক্রমশঃ জমি উচু হইতে সুরু করিল। পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। ছোট টেনেসি নদীর পাশ দিয়া চলিয়াছি—দু'দিকে পাহাড়। রাস্তার পাশ দিয়া নদী নৃত্যচ্ছন্দে চলিয়াছে। পথে কল্‌ডার উড বাঁধ, চিওয়া হ্রদ এবং সেন্টিনেলের একটি পাওয়ার হাউস দৃষ্টিপথে পতিত হইল। টেনেসি রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করিয়া নর্থ ক্যারোলাইন রাষ্ট্রের মধ্যে পড়িলাম। চারিদিকে পাহাড়। এ অঞ্চলের সর্ব্বোচ্চ পাহাড়ের উচ্চতা নাকি প্রায় ৬০০০ ফুট। তরঙ্গায়িত পাহাড় ভেদ করিয়া চলিয়াছি। প্রায় দু' হাজার ফুট উচ্চে ফন্টানা বাঁধ। ফন্টানা বাঁধ নক্সভিল হইতে ৭০ মাইল। প্রায় দ্বিপ্রহরে তথায় উপনীত হইলাম। ছোট নদীটির উপর একটি ছোট সেতু। সেতুটি সম্পূর্ণ খোলা, ঈষৎ বক্র। প্রায় ১০০০ মাইল ব্যাসার্দ্ধের বৃত্তপরিধির মত ইহার বক্রতা। এই বক্রতাটুকু সেতুটিকে বেশ সুদৃঢ় করিয়াছে। এপারে উচ্চ পাহাড়। ওপারে পাহাড়ের গায়ে ইঞ্জিনিয়ারগণের আপিস। সেখানকার দুইজন ইঞ্জিনিয়ারের সহিত মিলিত হইলাম। বাঁধের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন সামান্য টুকিটাকি কাজ চলিতেছে। বাঁধটি সম্পূর্ণ কংক্রিটের। ৪৮০ ফুট উঁচু; অর্থাৎ মিশরের পিরামিডের সমান ইহার উচ্চতা। ইহার পিছনে সুবিশাল হ্রদ কাটানো হইয়াছে; সম্মুখে বিরাট পাওয়ার হাউসে সগর্জ্জনে টারবাইন ঘুরিতেছে। স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ প্রথমে চিত্র ও নক্সার সাহায্যে বাঁধের পরিকল্পনাটি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। কিরূপ এই পর্ব্বতসঙ্কুল নির্জ্জন অরণ্যময় প্রদেশকে ম্যালেরিয়ার কবলমুক্ত করা হইল; কিরূপে ছাঁচে ঢালা সুন্দর সুন্দর বাড়ী আনিয়া বসান হইল; কিরূপে নানাবিধ সুবিধা ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া এখানে গ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হইল; কিরূপে সেই গ্রামে মজুর ও ইঞ্জিনিয়ারগণের বসতি স্থাপন করা হইল; কিরূপে বাঁধের যাবতীয় উপকরণ এখানে আনিবার ব্যবস্থা করা হইল; স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ এই সমস্ত বিষয় আমাদিগকে বলিলেন। তারপর আমাদিগকে পার্শ্ববর্ত্তী সেই গ্রামে লইয়া গেলেন। ছাঁচে ঢালা বাড়ীগুলি দেখিতে বেশ মনোরম। বাড়ীগুলির মধ্যে বাসোপযোগী সমস্ত ব্যবস্থাই আছে। বাড়ীগুলি এখন খালি পড়িয়া আছে। ভ্রমণকারিগণ যাহাতে এ জায়গার প্রতি আকৃষ্ট হয় সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এখনও সফল হন নাই। লোকালয় হইতে বহুদূরে এই নির্জ্জন পর্ব্বতময় স্থানে বাস করা আপাততঃ কাহারও মনঃপূত হইতেছে না। গত গ্রীষ্মকালে এক নবদম্পতি নাকি শিকাগো হইতে আসিয়া মাসাধিককাল এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন।

গ্রামের কেফিটেরিয়াটি এখনও আছে। খাবার সাজাইয়া বিক্রয়কারিণীগণ বসিয়া আছেন। ক্রেতা নাই। এখানে আমরা মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিলাম। অন্য কোন ভোজনার্থী দেখিলাম না। আহার ভালই হইল। আহারান্তে বাঁধে উঠিলাম। স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ সোৎসাহে আমাদিগকে সব তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। এই জনবিরল প্রদেশে আমাদিগকে পাইয়া তাহাদের উৎসাহ ও আনন্দের সীমা নাই।

মাইকেলি ডিসের প্রশ্নে তাঁহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং আমারও বিষয়টি বুঝিবার অনেক সুবিধা হইল। মাইকেলি ডিস বেশ ইংরেজী বলেন। পেট্রিয়াস ভাল ইংরেজী বলিতে পারেন না, কাজেই তাঁহাকে প্রায়ই নীরব থাকিতে হইতেছে। বাঁধের উপর দর্শকগণের বসিবার জন্য একটি সুন্দর ঘর আছে। সেটি গোল্ডেন বাফ বা স্বর্ণাভ মর্ম্মরে নির্ম্মিত। এ প্রদেশে বহুবিধ মর্ম্মর পাওয়া যায়। তন্মধ্যে স্বর্ণাভ মর্ম্মরই সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য। এই কার্য্যে মর্ম্মরের ব্যবহার শুধু ধনকুবেরের দেশ আমেরিকায়ই সম্ভব। বাঁধের রক্ষী সোৎসাহে তাঁহার বইয়ে আমাদের সই লইয়া গেল। কলিকাতা হইতে দর্শক আসিয়াছে শুনিয়া তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ হইয়াছে। দিনান্তে ক্লান্ত দেহে হোটেলে ফিরিলাম।

পরদিন শুক্রবার সকালে উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষের আপিসে পুনরায় হাজির হইলাম। এই দিনের মধ্যে আমার এখানকার কাজ শেষ করিতে হইবে। কাজেই সমস্ত বিভাগ দেখা সম্ভব নয়। বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি বিভাগের কার্য্য দেখিলাম। প্রথমে বাজেট বিভাগের সি, ডব্লু, কোর্স মহাশয়ের সঙ্গে ইঁহাদের বাজেট সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলাম। পরে চলচ্চিত্রে কর্ত্তৃপক্ষের যাবতীয় কার্য্যকলাপ ইঁহারা আমাকে দেখাইলেন। মধ্যাহ্নভোজনের পর হিসাব বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ, কৃষি ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ এবং ফুড্ ফ্রিজিং বা খাদ্য জমান বিভাগের কার্য্যাবলী দেখিলাম। হিসাব বিভাগে জনৈক মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইনি মাদ্রাজের একটি হাইড্রোইলেক্‌ট্রিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিরূপে বিদ্যুৎসরবরাহের দাম নির্ণয় করা হয় তাহা দেখিবার জন্য ইনি এখানে আসিয়া মাসাধিককাল আছেন। ভদ্রলোকটি আধাবয়সী, এঁদের নিয়মাবলী সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিয়াছে দেখিলাম। বৈদ্যুতিক শক্তিকে সুলভ করিয়া কৃষকের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিবার জন্য ইঁহাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা দেখিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। যে কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল সকলেই অমায়িক, সকলেই তাঁহাদের কার্য্যাবলী আমাকে বুঝাইবার জন্য উৎসুক। ইঁহাদের মধ্যে কৃষি-ইঞ্জিনিয়ার এল, এন্, বেকার হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা ও সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের "হিন্দু ভিউ অব লাইফ" পড়িতে পরামর্শ দিলাম।

পরদিন শনিবার। আপিস আদালত ছুটি। হোটেলে বসিয়া কিছু কাজ করিলাম। পরে শহর দর্শনে বাহির হইলাম।

শহরের মধ্য দিয়া টেনেসি নদী প্রবাহিত। তাহারই অনতিদূরে আমার হোটেল। হোটেলটির নাম এণ্ড্রু জনসন্। এণ্ড্রু জনসন এব্রাহাম লিঙ্কনের পরবর্ত্তী প্রেসিডেন্ট। তিনি টেনেসি রাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন। হোটেলটি ১৭।১৮ তলা হইবে। আমি ১৬ তলায় ছিলাম। শহরটি ছোট। প্রায় ৭৫ হাজার লোকের বাস। ১৭।১৮ তলা বাড়ী আর নাই। ১৬ তলার উপরে বসিয়া আমি নদীর তীর দিয়া বহুদূর বিস্তৃত শহরের সুবিন্যস্ত সৌধশ্রেণী দেখিতাম। সমস্ত আমেরিকান শহরের মত এটিও সরল ও সমান্তরাল রাজপথশ্রেণী দ্বারা পরিশোভিত। হোটেলের সম্মুখ দিয়া যে রাস্তাটি গিয়াছে তাহাই শহরের বড় রাস্তা। দু'ধারে শ্রেণীবদ্ধ দোকান। বড়দিন আগতপ্রায়। তদুপলক্ষে দোকান ও রাস্তা সুসজ্জিত। আলো ও রঙীন কাগজ প্রভৃতির সাহায্যে সুন্দর সজ্জা রচনা করা হইয়াছে। করুণাবতার সান্তা ক্লজের শ্মশ্রুল ছবি সর্ব্বত্র। সান্তা ক্লজ সাজিয়া কেহ বড়দিনে ছেলেপেলেদের উপহার দিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। ছেলেবুড়ো সকলেই বড়দিনে কিছু কিছু উপহার পাইবে। সর্ব্বত্র আশা ও আনন্দের আভাস।

এখানে ভার্জ্জিনিয়া তামাকের একটি বাজার আছে। কৃষকগণ স্ব স্ব তামাক আনিয়া এখানে নিলামে বিক্রয় করে। সিগারেট প্রস্তুতকারকগণ আসিয়া এই তামাক কিনিয়া লইয়া যায়। এখানে প্রচুর ও রকমারি খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়।

১৩ সংখ্যাটির প্রতি ইহাদের কুসংস্কার নানা ব্যাপারে পরিস্ফুট। হোটেলে ১৩ নম্বরের কোন তলা নাই। বারোর পরেই চোদ্দ। ১৩ তলায় থাকিলে নাকি ভাগ্যহানি হয়।

ঐদিন রাস্তায় অপর একজন ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইনি যুক্তপ্রদেশের অধিবাসী। দিল্লীর কৃষিগবেষণাগারে কাজ করেন। কৃষি-গবেষণা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হইবার জন্য এদেশে কয়েকমাস যাবৎ সফর করিতেছেন। ইঁহার বয়স চল্লিশের বেশী হইবে।

পর দিবস রবিবার নক্সভিল ত্যাগ করিয়া শিকাগো রওনা হইব। দুপুরে প্লেন ছাড়ে। কোম্পানীর গাড়ী হোটেল হইতে আমাকে তুলিয়া লইয়া যাইবে। প্রস্তুত হইয়া লাউঞ্জে বসিয়া আছি। সেখানে মাইকেলি ডিস ও পেট্রিয়াসের সঙ্গে অনেক কথা হইল। প্রাচীন কালে সভ্যতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত গ্রীস ও ভারতবর্ষ এই দুই দেশের যোগাযোগের কাহিনী জানিবার জন্য ইহাদের আগ্রহ লক্ষ্য করিলাম। আমাদের তারিখযুক্ত ইতিহাস যে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের ভ্রমণবৃত্তান্তই যে তৎকালীন ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ ইহা শুনিয়া তাঁহাদের আগ্রহ বর্দ্ধিত হইল। কথোপকথনের মধ্যে অলক্ষিতে ইঁহাদের সঙ্গে আমার চিত্তের যোগ স্থাপিত হইয়া গেল।

গাড়ী আসিয়া আমাকে তুলিয়া লইল। সে গাড়ীতে আর একটি আমেরিকান ভদ্রলোক অন্য একটি হোটেল হইতে উঠিলেন। উভয়ে সীমাহীন প্রান্তরের মধ্য দিয়া বিমান ঘাঁটির দিকে চলিয়াছি। ভদ্রলোকটি মধ্যাহ্নভোজনাদির পর

একটু আলাপেচ্ছু হইয়া উঠিয়াছেন। নানা বিষয়ে কথা বলিয়া চলিয়াছেন, মাঝে মাঝে বলিতেছেন—"আমি বেশী কথা বলিয়া আপনার বিরক্তি উৎপাদন করিতেছি না তো?" সুন্দর রৌদ্র। আকাশ পরিষ্কার। তাপ ৪০ ডিগ্রির কাছা-কাছি। ভদ্রলোকটি বলিলেন—"শীতকালে বসন্তের আবির্ভাব হইয়াছে।" উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষের কথা উঠিল। ভদ্রলোকটি বলিলেন—"পূর্ব্বে লোকে বলিত যে উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষ পাগলের মত বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়াই চলিয়াছেন। এত বিদ্যুৎ কোন্ কাজে লাগিবে? যুদ্ধ আসিল। সব বিদ্যুৎ কাজে লাগিয়া গেল। কিন্তু উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষ এখন এক আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। এই বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ওকরিজে আণবিক গবেষণার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে দিন আণবিক শক্তি সুপ্রতিষ্ঠ হইবে সেদিন তো বৈদ্যুতিক শক্তির দিন ফুরাইবে। আণবিক গবেষণার ব্যবস্থা করিয়া উপত্যকা-কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের মৃত্যুই ডাকিয়া আনিতেছেন।"

ভারতবর্ষে মজুর ধর্ম্মঘট

শ্রীদীনবন্ধু দাস

১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষে মজুর ধর্ম্মঘটের বেলায় হিড়িক পড়িয়াছিল। যুদ্ধকালে মূল্যবৃদ্ধির দরুন জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু মজুরের মজুরি অথবা ভাতা সেই পরিমাণে বাড়ে নাই। যত দিন যুদ্ধ চলিয়াছিল তত দিন মানুষের মনে কেমন যেন একটা ধারণা ছিল যে, যতই হোক মূল্যবৃদ্ধিটা সাময়িক, যুদ্ধ থামিয়া গেলে পরে মূল্যও পুনরায় কমিয়া যাইবে। এই ধারণার কোন সত্য ভিত্তি ছিল না। ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল—অতঃপর দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, পুরাতন বৎসর শেষ হইয়া নূতন বৎসর আরম্ভ হইল, কিন্তু মূল্য কমিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না; বরং মূল্য আরও বাড়িয়া চলিল।

১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসকে ১০০ ধরিলে বোম্বাই শহরে মজুরশ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় ১৯৪৫ সালে ছিল ২২৮—সেই স্থলে ১৯৪৬ সালের মার্চ্চ মাসে ব্যয়সূচী বাড়িয়া ২৩৫ হয়। জুন মাসে হয় ২৪৭, অতঃপর সেপ্টেম্বরে ২৫৭ এবং ডিসেম্বরে ২৬৬ হইল।

যাহারা এতদিন সুদিনের আশায় যুদ্ধশান্তির অপেক্ষা করিতেছিল তাহারা নিরাশ হইল। মজুরেরা আরও বেতন বৃদ্ধির দাবি করিল। কোন কোন ক্ষেত্রে মালিকের নিকট হইতে যৎসামান্য পাইল; ক্ষেত্রবিশেষে তাহাও পাইল না। পেটে ক্ষুধা রহিয়া গেল। তা ছাড়া, যুদ্ধের মধ্যে দুনিয়ার বিভিন্ন রাজ্য-সাম্রাজ্যের ভাঙা-গড়ার বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া মজুরেরা ইতিমধ্যে অনেকখানি চেতনা লাভ করিয়াছিল, তাহারা নিজেদের সঙ্ঘশক্তি সম্বন্ধে অনেক বেশী প্রত্যয়শীল হইল, নিজেদের মানুষ বলিয়া ভাবিতে শিখিল এবং মালিকের নিকট হইতে তদনুরূপ ব্যবহার পাইবার আশা পোষণ করিতে লাগিল। যেখানেই তাহাদের সেই নবলব্ধ আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানে আঘাত পড়িয়াছে, সেইখানেই তাহারা পাল্টা আঘাত দিয়া নিজেদের দাবি ও মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী প্রথম শান্তির বৎসর ১৯৪৬ সাল মজুর আন্দোলনের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয়। [১৯৪৬ সালে ভারতে মজুর ধর্ম্মঘট সম্পর্কিত বিস্তৃত তথ্যাবলী ভারত-সরকারের মজুরদপ্তর কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ইণ্ডিয়ান লেবার গেজেট" (ভারতীয় মজুর বিবরণী) নামক মাসিক পত্রিকায় ১৯৪৭ সালের জুলাই সংখ্যায় দেওয়া হইয়াছে।]

ধর্ম্মঘট ও ধর্ম্মঘটীদের সংখ্যা এবং ধর্ম্মঘটজনিত ক্ষতি

১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ ভারতে ১৬২৯টি ধর্ম্মঘট হয়। '৩৯ সালে ৪০৬টি এবং '৪৫ সালে ৮২০টি ধর্ম্মঘট হয়; অর্থাৎ '৪৬ সালে পূর্ব্ববৎসরের দ্বিগুণ এবং '৩৯ সালের ৪ গুণ ধর্ম্মঘট হয়।

'৪৬ সালে ১,৬২৯টি ধর্ম্মঘটে মোট ১৯ লক্ষ ৬২ হাজার মজুর যোগ দিয়াছিল। পূর্ব্ববৎসর ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার মজুর ধর্ম্মঘটে যোগ দেয়। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় এবৎসর ২½ গুণ বেশী মজুর ধর্ম্মঘট করে।

এক জন মজুরের এক দিনের কাজকে (১ × ১ =) ১ "জন-

রোজ" বলিয়া ধরিলে, '৪৬ সালে মজুর ধর্ম্মঘটের ফলে ১ কোটি ২৭ লক্ষ "জন-রোজ" নষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসর নষ্ট হইয়াছিল ৪০ লক্ষ ৫৪ হাজার জন-রোজ। '৪৬ সালে পূর্ব্ববৎসর অপেক্ষা ৩২ গুণ বেশী জন-রোজ নষ্ট হইয়াছিল।

যুদ্ধপূর্ব্ব '৩৯ সালের তুলনায় '৪৬ সালে ধর্ম্মঘটের সংখ্যা ৪ গুণ, ধর্ম্মঘটীর সংখ্যা ৪ গুণ এবং জন-রোজ হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ ২ গুণের কিছু বেশী হইয়াছিল।

'৪৬ সালের মার্চ্চ মাস হইতে ধর্ম্মঘটের সংখ্যা ও ব্যাপকতা বাড়িতে থাকে। জুলাই মাসে ধর্ম্মঘটের হিড়িক চরমে উঠে। আগষ্ট মাসেও আবহাওয়া খুব গরম ছিল, অতঃপর ক্রমে ক্রমে হিড়িক কমিয়া যায়। '৪৬ সালের জুলাই মাসের ভারতব্যাপী ডাক ও তার বিভাগের কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

কোন্ শিল্পে কত ধর্ম্মঘট হইয়াছিল

এবারে কোন্ শিল্পে কত ধর্ম্মঘট হইয়াছিল, তাহার ফিরিস্তি দিতেছি।

সবচেয়ে বেশী ধর্ম্মঘট হয় বয়ন-শিল্পে। কার্পাস, পশম ও রেশম শিল্পের কারখানায় সর্ব্বসমেত ৬৩১টি ধর্ম্মঘট হয়। এই সব ধর্ম্মঘটে সাড়ে দশ লক্ষ মজুর যোগ দিয়াছিল এবং প্রায় ৫৩ লক্ষ জন-রোজ নষ্ট হইয়াছিল। বয়ন-শিল্পে '৪৬ সালের ধর্ম্মঘটের ৩৮'৭ শতাংশ, ধর্ম্মঘটি সংখ্যা ৫৩'৬ শতাংশ এবং নষ্ট জন-রোজের ৪১'৭ শতাংশ হইয়াছিল।

বয়ন-শিল্পের পরেই ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের স্থান। এ বৎসর ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ১৩৩টি ধর্ম্মঘট হয়, ১ লক্ষ ধর্ম্মঘটী এই সকল ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছিল এবং ক্ষতির পরিমাণ হইয়াছিল ২৫ লক্ষ ৩৪ হাজার জন-রোজ। এ বৎসরে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ধর্ম্মঘটের ৮'২ শতাংশ, ধর্ম্মঘটি সংখ্যার ৫'২ শতাংশ এবং নষ্ট জন-রোজের ১৯'৯ শতাংশ হইয়াছিল।

এ বৎসর পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩ গুণ বেশী জন-রোজ নষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু খনির কাজে পূর্ব্ববৎসরের তুলনায় ৩১ গুণ বেশী জন-রোজ নষ্ট হয়।

কোন্ প্রদেশে কত ধর্ম্মঘট হইয়াছিল

'৪৬ সালে সবচেয়ে বেশী ধর্ম্মঘট হয় বোম্বাই প্রদেশে, অতঃপর বাংলায়। বোম্বাইয়ে ৫৪২টি ধর্ম্মঘট হয়, বাংলায় হয় ৩৬৯টি, মাদ্রাজে ২৭১টি, মধ্য প্রদেশে ১৩৭টি এবং যুক্ত-প্রদেশে ১০৮টি। এই সকল প্রদেশে যথাক্রমে ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার, ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার, ২ লক্ষ ২৩ হাজার, ১ লক্ষ ৬৮ হাজার এবং ১ লক্ষ ৫২ হাজার মজুর ধর্ম্মঘট করে।

বোম্বাই প্রদেশে ধর্ম্মঘট সবচেয়ে বেশী হইলেও ধর্ম্মঘটের ফলে জন-রোজ নষ্ট হইয়াছিল সবচেয়ে বেশী বাংলাদেশে। বাংলায় এ বৎসর ধর্ম্মঘটের ফলে ৪৬ লক্ষ ৮২ হাজার জন-রোজ নষ্ট হইয়াছিল। বোম্বাইয়ে ৩৩ লক্ষ, মাদ্রাজে ১৩ লক্ষ, যুক্তপ্রদেশে ১১ লক্ষ, মধ্য প্রদেশে ৮½ লক্ষ জন-রোজ নষ্ট হয়।

এ বৎসর ধর্ম্মঘটের ফলে সকল প্রদেশে একত্রে যত জন-রোজ নষ্ট হইয়াছিল, শুধুমাত্র বাংলায় ও বোম্বাইয়ে নষ্ট হয় তাহার দুই-তৃতীয়াংশ।

ধর্ম্মঘটের কারণ

১৬২৭টি ধর্ম্মঘটের মধ্যে ৬০৪টি প্রধানতঃ মাহিনা-বিষয়ক, তা ছাড়া আরও ৭৯টি বোনাস বা লভ্যাংশ সংক্রান্ত। ২৮০টি ধর্ম্মঘট ব্যক্তিবিশেষের আচরণ বা আনুষঙ্গিক অভিযোগ হইতে উদ্ভূত, ১৩০টি ছুটি এবং কার্য্যকাল বিষয়ক। বাকী ৫৩৪টি ধর্ম্মঘটের উদ্ভব অন্যান্য নানা কারণে হইয়াছিল।

'৪৬ সালে মাহিনাসংক্রান্ত ধর্ম্মঘটের অনুপাত ছিল ৩৭.১ শতাংশ, পূর্ব্ববৎসরে ছিল ৪৩.৭ শতাংশ। ব্যক্তিবিশেষের আচরণসংক্রান্ত ধর্ম্মঘটের অনুপাত এই বৎসর ১৭.২ শতাংশ ছিল, পূর্ব্ববৎসরে ছিল ১৭.৮ শতাংশ। "বিবিধ কারণ"-ঘটিত ধর্ম্মঘটের অনুপাত বাড়িয়া পূর্ব্ব বৎসরের ১৮.১ শতাংশ স্থলে এ বৎসর ৩২.৮ শতাংশ হইয়াছিল।

ধর্ম্মঘটের ফলাফল

'৪৬ সালের ১৫৬৫টি ধর্ম্মঘটের ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে, ২৭৮টি ধর্ম্মঘট সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল, ২৭৪টি অংশতঃ সফল, আর ৬৯৬টি বিফল হইয়াছিল। বাকী ৩১৭টি ধর্ম্মঘটের ফলাফল সম্পর্কে ঠিক করিয়া কিছু বলা চলে না। সফল, অংশতঃ সফল এবং নিস্ফল ধর্ম্মঘটের অনুপাত যথাক্রমে ১৭.৮ শতাংশ, ১৭.৫ শতাংশ, এবং ৪৪.৫ শতাংশ ছিল। ধর্ম্মঘটের ফলাফলের দিক দিয়া পূর্ব্ব বৎসরের সঙ্গে এ বৎসরের অনুপাতের বিশেষ তফাৎ হয় নাই।

ধর্ম্মঘটের স্থায়িত্ব

নষ্ট জন-রোজ সংখ্যাকে ধর্ম্মঘট মজুর সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে ধর্ম্মঘটের গড়পড়তা স্থায়িত্বকাল পাওয়া যায়। এই হিসাবে '৪৬ সালে ধর্ম্মঘটের স্থায়িত্বকাল ছিল ৬½ দিন। পূর্ব্ব বৎসরের স্থায়িত্বকাল ছিল ৫.৪ দিন। পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় '৪৬ সালে ধর্ম্মঘটের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু '৩৯ সালের তুলনায় ধর্ম্মঘটের স্থায়িত্ব কমিয়া গিয়াছিল। '৩৯ সালে ধর্ম্মঘটের স্থায়িত্বকাল ছিল গড়ে ১২.২ দিন।

বাংলাদেশেই ধর্ম্মঘটের গড়পড়তা পরমায়ু সবচেয়ে বেশী ছিল। '৪৬ সালে বাংলাদেশে এক একটি ধর্ম্মঘটের স্থায়িত্বকাল ছিল গড়ে ৯.৯ দিন, বোম্বাইয়ে ৪.৩ দিন আর মাদ্রাজে ৫.৯ দিন। বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং-শিল্পে ধর্ম্মঘট সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। সমস্ত ভারতে সকল শিল্পে ধর্ম্মঘটের গড়পড়তা পরমায়ু ছিল ৬½ দিন, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে প্রত্যেকটি ধর্ম্মঘটের পরমায়ু ২৫ দিন করিয়া ছিল। খনিশিল্পে ধর্ম্মঘটের স্থায়িত্ব ছিল গড়ে ১০ দিন। ধর্ম্মঘটের পরমায়ু সর্ব্বাপেক্ষা কম ছিল রেল-শিল্পে। '৪৬ সালে রেল-শ্রমিকদের ধর্ম্মটের গড়পড়তা পরমায়ু ছিল মাত্র ৩.৭ দিন।

পুস্তক-পরিচয়

শেষ বসন্তে—শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। পুস্তকালয়, ২৯ বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

"শেষ বসন্তে" কাব্যগ্রন্থ। বইখানি কয়েকটি গীতি-কবিতার সমষ্টি। প্রথম কবিতা 'শেষ বসন্তে' যে সুর উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাই কাব্যের মূল সুর।

"বেলা যায়, বেলা যায়,
আপন অজ্ঞাতে তোর জীবনের ঐশ্বর্য্য হারায়।"

এইটিতে অথবা বসন্ত-প্রয়াণ, অতীত ও বর্ত্তমান, পূর্ব্ব-স্মৃতি বিড়ম্বনা প্রভৃতি কবিতায় পশ্চাতে-ফেলিয়া-আসা জীবনের জন্য নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়ের যে আর্ত্তধ্বনি শুনিতে পাই তাহাই কিন্তু কবির শেষ কথা নহে। তিনি বার বার প্রশ্ন করিয়াছেন,

"বসন্তের প্রাণরস নিঙাড়িয়া যে সৌন্দর্য্য ফোটে
পলক ফেলিতে কেন গর্ব্ব তার ভূমি পরে লোটে?"

প্রশ্ন করিয়াছেন,

"পাতাল-পুরীর মাঝে যে রূপসী ঘুমাইয়া রহে
মাঝে মাঝে ধরা দেয় যৌবনের মধুর বিরহে,
সে কি লুকাইয়া যাবে একেবারে জনমের মত?"

প্রশ্নের উত্তর কবি ক্রমে নিজের শান্ত অন্তরের মধ্যে পাইয়াছেন। বেদনা জীবনতন্ত্রী স্পন্দিত করে,

"যুগে যুগে অকারণ বঞ্চনার ব্যথায় কাতর
মানবের অশ্রুজল রচিতেছে লবণ-সাগর।"

'বাতাবী-সৌরভ-ভারে মদালস মধ্যাহ্ন-পবন' 'নিকুঞ্জ-ছায়ার তলে' আর সঞ্চরণ করে না, 'সুন্দর আজ ধূলায় ধূসর লুণ্ঠিত'—'কে বহে সর্ব্বস্বহারা জীবনের সেই বিড়ম্বনা?'

সকল জীবনেই এই সমস্যা উদিত হয়। কেহ সমাধান পায়, কেহ পায় না। সমস্যা আসে, 'জীবন সম্মুখে ধায়, মন কেন ফিরি চায় পশ্চাতের পানে?' কিন্তু তাই বলিয়া কি পরাজয় মানিতে হইবে? না। 'নির্ভয় জীবন করে অবিশ্রান্ত রণ।' হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়, বলিতে হয়, 'যে দীপ নিভিয়া গেল নামুক তাহারে ঘেরি বিস্মৃতি-আঁধার।' কিন্তু সে ত ব্যথার বাণী। অন্ধকার গভীর হইয়া আসিলে আলোকের আবির্ভাবের সময় নিকটবর্ত্তী হয়। অভয়ের বাণী শোনা যায়,

"আশা আছে জীবনের শেষে
আবার ভিড়িবে তরী কোনো নব প্রভাতের দেশে।"

'অনাগত' কবিতায় কবি বলিয়াছেন,

"নবীন পথিক নূতন তরী আসবে বেয়ে এই দেশে
আমার চলা সাঙ্গ যখন হবে।"

সুতরাং 'প্রাণভরা দারুণ পিপাসা' লইয়া 'বিপুল উৎসব মাঝে-

উপবাসী' থাকিবার প্রয়োজন নাই ; 'ক্ষণিকের এই উপহার' 'একবার বহি গেলে এ জীবনে আসিবে না আর।' অতএব 'বসন্তেরে করো পান যৌবনের সুধাপাত্র ভরি।' কেন-না,

"একটি মুহূর্ত্ত মাঝে মূর্ত্ত হয় কাল অন্তহীন,
জন্ম-জন্মান্তের স্মৃতি—ধরা দেয় সব এক দিন।"

অপেক্ষায় রহিও না, 'পরিপূর্ণ পানপাত্র এখনি অধরে' তুলিয়া লও।

কবিতাগুলি আবেগ-স্পন্দিত। সেই আবেগ পাঠকের হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করে। যে বেদনা কবি অনুভব করিয়াছেন, তাহা সকল মানুষের। 'শেষ বসন্ত' সার্থক হইয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

স্বাধীনতার অভিযান যুগে যুগে—শ্রীবামাপ্রসন্ন সেনগুপ্ত এম, এ, বি, এল, এগাক্ষী গ্রন্থমন্দির, ১৫৯, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১১৪, মূল্য দুই টাকা।

এই গ্রন্থের প্রথম দিকে অতি সংক্ষেপে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পরে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত ভাবে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। ভারত-ইতিহাসের প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। লেখক ১৯৪৭ সনের জুন পর্য্যন্ত সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটি পরিশিষ্টদ্বারা পুস্তকখানিকে সুপাঠ্য করিয়াছেন।



এইরূপ স্বল্পপরিসর গ্রন্থে বহুল ঘটনার সুবিন্যাসে লেখক তাঁহার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দেশের যুবকগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

মার্কসীয় অর্থ-শাস্ত্র —অধ্যাপক শ্রীকস্তুরচাঁদ লালুয়ানী এম, এ। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাব্লিসার্স লিঃ, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ১০৭। মূল্য ২৲ টাকা।

গ্রন্থের প্রথমে মার্কস লিখিত ক্যাপিটাল গ্রন্থের ভূমিকার কিয়দংশের অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং পরে দ্বাদশটি অধ্যায়ে মার্কসের অর্থনীতির আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচনায় মার্কসের নিজের মতবাদের সহিত লেখক নিজের মতামতও স্থানে স্থানে দিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রের বাংলা পরিভাষা এখনও সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয় নাই এজন্য একই ইংরেজী শব্দের পরিবর্ত্তে নানা লেখক নানা প্রতিশব্দ ব্যবহার করেন। ফলে পাঠকের অসুবিধা হয় ও আলোচ্য বিষয়ের জটিলতা বাড়ে। সমালোচ্য গ্রন্থে বাংলা পরিভাষাগুলি কোন্ কোন্ ইংরেজী শব্দের বদলে ব্যবহৃত হইয়াছে উহার কোন ইঙ্গিত না থাকায় পাঠকের অসুবিধা হইবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। ভবিষ্যৎ সংস্করণে এই ত্রুটি বর্জ্জন করিলে পুস্তকখানি আরও সুখপাঠ্য হইবে। পুস্তকের গাণিতিক উপমাগুলি অনেক ক্ষেত্রে দুর্ব্বোধ্য হইয়াছে।

স্বাধীন ভারত—শ্রীবিরজাচরণ নন্দ। পৃষ্ঠা ৬৪+৬২, মূল্য ৸০ আনা। গদ্যে ও পদ্যে উচ্ছ্বাসপূর্ণ লেখার সমষ্টি।

আর্জেন্টিনার স্বদেশসেবক পেরোঁ—শ্রীদিলীপ-কুমার মালাকার। ডি, এম লাইব্রেরী, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৪, মূল্য ।৴০ আনা।

বিখ্যাত ফাসিষ্ট নেতার জীবনী। ইনি সমস্ত দক্ষিণ-আমেরিকার দেশসমূহকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ইংরেজ ও মার্কিনের আর্থিক দাসত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ফ্রীডরীশ লিষ্ট ও জার্ম্মেনী—শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৪৮, মূল্য ১৷০ আনা।

বিখ্যাত জার্ম্মান অর্থনীতিবিদের (জন্ম ১৭৮৯: মৃত্যু ১৮৪৬) জীবনকাহিনী। যখন ইংরেজ ধন-বিজ্ঞানীরা অবাধ বাণিজ্য-নীতি প্রচার করিতেছিলেন তখন এই মনীষী রক্ষণশীলতার যৌক্তিকতা (বিশেষতঃ শিল্পে অনগ্রসর দেশের পক্ষে) ঘোষণা করিয়া চিন্তাজগতে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি এক বিরাট্ জার্ম্মানীর স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিয়াও গিয়াছেন। বিসমার্ক, কাইজার এবং হিটলার সকলেই লিষ্টের বাণী হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। লিষ্ট জার্ম্মানীর জাতীয় জীবনের এক মহাসম্পদ। আমাদের দেশের যুবকগণ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মহাকাশ—শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়। আশুতোষ লাইব্রেরী, ঢাকা ও কলিকাতা। পৃঃ ৮৪; মূল্য দশ আনা।

ছেলেমেয়েদের পক্ষে সহজবোধ্য করিবার জন্য গ্রন্থকার পুস্তকখানিতে কথোপকথনচ্ছলে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্রসূর্য্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ছেলেমেয়েদের পক্ষে বইখানি ভালই হইয়াছে; কিন্তু দুই-একটি ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের বক্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। যেমন—২৮ পৃষ্ঠায় পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ দিবার জন্য নদীর উপর পালতোলা নৌকার কথা বলা হইয়াছে। দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রবক্ষে জাহাজের দৃষ্টান্তের স্থলে নদীবক্ষে পালতোলা নৌকার উদাহরণের একটা মিল থাকিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তাহাতে ফলে মিলিবে কিনা পরীক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

দীপশিখ — শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী। 'আশ্রমিকা' বাগোয়ান। খাসমিথুরাপুর, নদীয়া। দাম এক টাকা মাত্র।

ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন, "কবি আমি নই, তবে কাব্যের মধ্যে যারা খুঁজে পেয়েছে সান্ত্বনা, আমি তাদেরই একজন।" কারুকৌশলের প্রতি তাঁহার আগ্রহ কম, কিন্তু আন্তরিকতা গুণে কবিতাগুলি হৃদয় স্পর্শ করে।

জাওয়াহির—ছৈয়দ জহরুল হুছেন। ন্যাশনাল বুক এম্‌পোরিয়াম, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট। মূল্য ১।০।

আধ্যাত্মিক ভাবরসে যাঁহারা মজিয়াছেন, সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি তাঁহাদের কাছে বিলুপ্ত। বাংলাদেশের জনসাধারণ দীর্ঘকাল এই ভাবরস আস্বাদন করিয়া আসিয়াছে বাউল-ফকিরদের গানে। তেমনি কতকগুলি গানের সমষ্টি এই বইখানি। হিন্দু-মুসলমান উভয় ভাবধারার এই সঙ্গমক্ষেত্রে ভাবের তীর্থযাত্রী শান্তিলাভ করিবেন।

কঙ্কর—শ্রীললিত মুখোপাধ্যায়। বুক এম্পোরিয়ম। ২৪ বি, নূরমহম্মদ লেন, কলিকাতা। দাম বার আনা।

কঙ্করের মধ্যেও ফুল ফুটি-ফুটি করিতেছে, ভাল করিয়া ফুটিতে পারে নাই। ভাব সরল, কিন্তু প্রকাশ সাবলীল নয়। কবি সে বিষয়ে সচেতন; ভূমিকায় বলিয়াছেন, "অনুভূতিটুকু এক অপরিমিত রুক্ষতায় জড়িয়ে রয়েছে।" ভাল কবিতা লিখিবার ক্ষমতাও যে তাহার আছে, সে পরিচয়ও এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দি হার্টলেস উওম্যান : বলজ্যাক—অনুবাদক : শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষাল। সুধাংশু সাহিত্য মন্দির। ২০৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৪৲।

বর্ত্তমানে বাংলাদেশে অনুবাদ-সাহিত্যের কদর বাড়িতেছে। ইহা আশার কথা। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টির সমাদর আছে; এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য্য। আজিকার দিনে দেশ-বিদেশের চিন্তাধারার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

থাকা একান্ত আবশ্যক এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে তা পরিবেশিত হওয়া উচিত।

"বলজ্যাকের" দি হার্টলেস উওম্যান একখানি বিখ্যাত পুস্তক। ঘোষাল মহাশয় পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ করিয়া রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। লেখকের ভাষা এবং রচনা-ভঙ্গী ভাল, কিন্তু মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ ইংরেজী-গন্ধী হইয়া পড়িয়াছে। ঘোষাল মহাশয় এই দিকে একটু দৃষ্টি দিলে আরও ঢের বেশী আনন্দ পাইতাম।

পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল। প্রচ্ছদপট মনোরম।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

দুঃস্বপ্ন—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'গলি গরু ও গৌরী' নামক গল্পটি লিখিয়া রামপদবাবু বাংলাদেশের পাঠক সম্প্রদায়ের মন জিতিয়া লইয়াছিলেন, তারপর বহু গল্প রচনা দ্বারা তিনি পাঠকচিত্তে স্বীয় প্রতিষ্ঠাভূমিকে দৃঢ়তর করিয়া লইয়াছেন। 'দুঃস্বপ্ন' তাঁহার কয়েকটি ছোট গল্পের সঙ্কলন। ইহাতে রাজমাতা, বেমানান, বন্যা, নীতিকথা, দুঃস্বপ্ন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে, দীপশিখা ও তৈল, নারী ও পরশু এবং বিনোদ অপেরা পার্টি এই নয়টি গল্প আছে। পুস্তকের নাম-গল্পটি এবং 'বন্যা', নীতিকথা' ও 'সন্ধ্যার পূর্ব্বে' এই গল্প তিনটি বিগত মহাযুদ্ধের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে পটভূমিকা করিয়া রচিত। যুদ্ধ থামিয়াছে, দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেছে, কিন্তু তাহার জের আজও মিটে নাই। কণ্ট্রোলের লাইনে দাঁড়াইয়া এখনো আমরা ধৈর্য্যের চরম পরীক্ষা দিতেছি। উপরোক্ত গল্প কয়টিতে আমরা মহানগরীর বিপর্য্যস্ত সমাজ-জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি এবং নিজেদের রেশন-কণ্ট্রোল-কণ্টকিত বিড়ম্বিত জীবনের প্রতিরূপ দেখিয়া বিস্মিত হই। রামপদ বাবুর লেখার সবচেয়ে বড় গুণ দরদ। এই দরদের জন্য তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির সহিত পাঠকের এক গভীর মানসিক আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই পুস্তকের অধিকাংশ গল্পই স্নিগ্ধ করুণরসে আর্দ্র। এমন কি কৌতুকের পিছনেও যে মানব-হৃদয়ের কত বড় বেদনা লুকানো থাকিতে পারে তাহার সার্থক রূপায়ন 'বেমানান' আর 'বিনোদ অপেরা পার্টি' এই দুইটি গল্পে। 'নারী ও পরশু' এই গল্পসংগ্রহের শ্রেষ্ঠ গল্প। ইহাতে বীভৎস ও করুণ রসের এক অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে। তিন তিনটি স্ত্রীর উপর অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন সন্দেহপ্রবণ ঘনশ্যামের অমানুষিক নির্য্যাতনের কথা, পরশুদ্বারা তার স্ত্রী-হত্যার বর্ণনা পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, অথচ ঘটনাবিন্যাস ও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের এমনি মুন্সীয়ানা যে তার আচরণকে মোটেই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। ভাষার তীক্ষ্ণতায় ও বর্ণনা-চাতুর্য্যে গল্পের উপসংহারটি যেন ঘনশ্যামের শাণিত পরশুর মতই ঝক ঝক করিতেছে।

কল্লোল—শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ব্বাশা লিমিটেড। পি ১৩, গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা। মূল্য ৫৲ টাকা।

বহু দিন আগে স্যর আশুতোষ চৌধুরী বলিয়াছিলেন—"A subject nation has no politics"। সেদিন রাজনীতির সঙ্গে আমাদের দেশের জনগণের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না। কিন্তু জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করায় রাজনীতি এখন ভারতীয় জনগণের অন্তরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে, ইহার সহিত আপামর সাধারণের গভীর যোগ স্থাপিত হইতে চলিয়াছে। এই রাজনীতি-সচেতনতা হইতেছে বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম। যুগধর্ম্মের প্রভাবে বর্ত্তমান বাংলা-সাহিত্যের সহিত রাজনীতির মিতালি ঘটিয়াছে এবং বিগত কয়েক বৎসরের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন, এমন কি রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনাকে পর্য্যন্ত কেন্দ্র করিয়া বাংলা-সাহিত্যে বহু গল্প উপন্যাস এবং সাহিত্য-গ্রন্থ (যেমন 'দৃষ্টিপাত') রচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক জীবনকে বাংলা-সাহিত্যে প্রতিফলিত করিবার সাধনায় যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য্য তাঁহাদের অন্যতম। কতকগুলি সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ঘটনার উপর কল্পনার রং চড়াইয়া তিনি বর্ত্তমান উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন। কাহিনীর যবনিকা উত্তোলিত হইয়াছে ২২শে নবেম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছাত্রদের উপর পুলিসের গুলিবর্ষণ হইতে। তারপর সোদপুরে গান্ধীজীর প্রার্থনা-সভার অনুষ্ঠান, নেতাজীর জন্মতিথিতে কলিকাতায় শাহ নওয়াজের আগমন ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনার ভিতর দিয়া কাহিনীটি সুষ্ঠু পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। এই সকল ঘটনা আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু সঞ্জয় বাবুর চোখ দিয়া এগুলিকে যেন নূতন করিয়া দেখিলাম। তিনি এই সকল পরম্পরবিচ্ছিন্ন ঘটনাকে দেখিয়াছেন এক অখণ্ড সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা। এই বিপ্লব বিদ্রোহ বিক্ষোভ ধর্ম্মঘট রক্তপাত ইত্যাদির ভিতর দিয়া জাতি মুক্তিস্নান করিয়া পবিত্র হইতেছে, পুরাতনের ধ্বংসস্তূপ হইতে জন্মলাভ করিতেছে নূতন পৃথিবী—এই মূল সুরটি উপন্যাসখানির মধ্যে আগাগোড়া অনুস্যূত। আদর্শবাদ এই উপন্যাসের কাহিনী এবং প্রায় সবগুলি চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। নায়ক প্রতীপ সেই আদর্শেরই মূর্ত্ত বিগ্রহ, নায়িকা সুজাতার নিকট সে 'পাথরের মূর্ত্তি'। সকলে মিলিয়া যে অভ্রভেদী মহিমার অত্যুন্নত আসনে তাহাকে বসাইয়াছিল সেখান হইতে সাধারণ মানুষের স্তরে নামিয়া আসিয়া জীবনের স্বাভাবিক সহজ দানগুলিকে উপভোগ করিবার অধিকার হইতে সে চিরতরে বঞ্চিত। সে মহাজীবনের সাধক, তাহার নিঃসঙ্গ একক জীবনের ট্রাজেডিও বিরাট। প্রতীপ-চরিত্রটি সঞ্জয় বাবুর সার্থক সৃষ্টি এবং তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশেষতঃ নিঃসঙ্গ নির্জ্জন মুহূর্ত্তে নিজের প্রকৃত সত্তার সহিত তাহার মুখোমুখি পরিচয়ের বর্ণনায় তিনি মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। কাহিনীটিতে মাঝে মাঝে রোমান্সের রং ফলিয়াছে এবং লেখকের মনের উত্তাপ বর্ণনাকে আবেগমুখর করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই কম্যুনিজম, মার্কসবাদ, গান্ধীবাদ ইত্যাদি গুরু বিষয়ের আলোচনা-সমন্বিত এই সুদীর্ঘ উপন্যাসখানি রসোত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে। সুজাতা-চরিত্রটির ক্রমবিকাশ লেখক দেখাইতে পারেন নাই। চরিত্রটিকে খুব জীবন্ত বলিয়া মনে হয় না। সে যেন কতকগুলি মতবাদের বাহনমাত্র—আগাগোড়া কেবল বড় বড় বুলিই কপচাইতেছে।

বইখানি শেষ করিবার পর একটি প্রশ্নই সবচেয়ে বেশী করিয়া মনে জাগে। ভারতের গণ-জীবনে এই যে মহা কল্লোল-ধ্বনি শ্রুত হইতেছে তাহা ভবিষ্যতের কোন্ বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করিতেছে। সে কি জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির অগ্রসূচনা নয়? কে সেই নবভগীরথ যিনি এই অভিনব মুক্তি-গঙ্গাকে দেশের বুকের উপর দিয়া প্রবাহিত করাইবেন? উপসংহারে সুজাতা আর প্রতীপের আলোচনা-প্রসঙ্গে লেখক বলিয়াছেন যে, জাতির সেই মহামুক্তি-সাধক মহাত্মা গান্ধী। জাতি যদি তাঁহার নির্দ্দেশ না মানিয়া চলে তাহা হইলে চরম ভুল করিবে। প্রতীপ বলিতেছে—"গান্ধীজীর আশা কি আজ ছেড়ে দেওয়া যায় সুজাতা—তিনি আজ একাই একটা প্রতিষ্ঠান।" লেখক যখন এই কথাগুলি লেখেন তখন গান্ধীজী জীবিত থাকিয়া হিন্দু-মুসলমানে সৌভ্রাত্র, মৈত্রী ও অহিংসার আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

কৃতী ঐতিহাসিকের সম্মান

সম্প্রতি 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' গোয়ার কৃতী ঐতিহাসিক শেভালিয়ে পাণ্ডুরঙ্গ এস. পিস্সুরলেঙ্কারকে মধ্যযুগীয় ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার জন্য 'সর যদুনাথ সরকার স্বর্ণপদক' পুরস্কার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন।



পাণ্ডুরঙ্গ এস. পিস্সুরলেঙ্কার

এই নবসৃষ্ট পুরস্কার ইনিই প্রথম লাভ করিলেন। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন আমল প্রত্নতত্ত্ব জাতিতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহের জন্য পদক ইত্যাদি দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু গত বৎসর ইহার সভাপতি শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা মহাশয়ের প্রযত্নে মুসলমান আমল ও মারাঠা ইতিহাসের (১৩০০ খ্রীঃ-১৮০২ খ্রীঃ) গবেষণার জন্য এই নূতন পদক-প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার মূল্য ৪৮০৲ টাকা। ইহার একদিকে আছে সর যদুনাথের আবক্ষ-মূর্ত্তি এবং অন্যদিকে পদকলাভকারীর নাম খোদিত। মূল পর্ত্তুগীজ ভাষায় হস্তলিখিত বিবরণী হইতে শেভালিয়ের পিস্সুরলেঙ্কারের গবেষণার উপকরণ সংগৃহীত এবং ভারত-বর্ষের সঙ্গে পর্ত্তুগীজদের সম্পর্ক এবং মারাঠা ও দাক্ষিণাত্যের রাজাদের (এমনকি হায়দর আলি ও টিপু সুলতান পর্য্যন্ত) সম্বন্ধে পর্ত্তুগীজ ভাষায় হস্তলিখিত উপকরণ অবলম্বনে যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন তন্মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি খননকার্য্যদ্বারা গোয়াতে কতকগুলি বিস্ময়কর প্রত্নসম্পদও আবিষ্কার করিয়াছেন।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

গত ১৮ই মাঘ কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী ৬৯ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১২৮৫ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ মুর্শিদাবাদ জেলার খাগড়া গ্রামে যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয়। বহরমপুর এস এম এক স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিবার পর তিনি উচ্চশিক্ষা লাভার্থ কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং যথাক্রমে কলিকাতা হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ এবং ডফ কলেজ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পাস করেন।

যতীন্দ্রমোহনের প্রথম মুদ্রিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'লেখা'। রবীন্দ্র-যুগের কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গদ্যরচনায়ও তাঁহার হাত ছিল। তাঁহার সর্ব্বশেষ পুস্তক 'রবীন্দ্রনাথ ও যুগ-সাহিত্যে' তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রথম জীবনে কয়েক বৎসর তিনি মানসী ও যমুনা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইদানীং বৎসরাধিককাল যাবৎ তিনি 'পূর্ব্বাচল' নামক মাসিক পত্রিকাখানি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত সম্পাদনা করিয়া আসিতেছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ঐ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার মত একজন সুকবি, সুসাহিত্যিক ও সুযোগ্য সম্পাদকের অভাবে বাংলা-সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

পুষ্পকুন্তলা রায়

কলিকাতা কর্পোরেশনের কিউরেটার যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্নী পুষ্পকুন্তলা রায় গত ২৩শে পৌষ সন্ন্যাস রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। সূচীশিল্প ও রন্ধন-বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার লেখা বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্রকলায়ও তাঁহার নৈপুণ্য ছিল। ১৭ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অনুরক্ত বন্ধুবান্ধবেরা "পুষ্পকুন্তলা মিলনী" নামে একটি আলোচনা-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। পুষ্পকুন্তলা অধিকাংশ সময়ই পূজা-অর্চনায় কাটাইতেন। দরিদ্রনারায়ণের সেবায় তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা



মা ও ছেলে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



একটি পল্লীর স্ত্রীলোকেরা মনোহর ভঙ্গীতে তুষ ঝাড়িতেছে



পল্লীগ্রামের একটি দৃশ্য

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৪৭শ ভাগ ২য় খণ্ড | চৈত্র, ১৩৫৪ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর ভবিষ্যৎ

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার আশু প্রতিকার প্রয়োজন। এই প্রতিকারের দুইটি মাত্র পথ আছে। প্রথমতঃ পূর্ব্ববঙ্গের অমুসলমানের পুনর্বসতি ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতরাষ্ট্র ও পূর্ব্ব পাকিস্থানের মধ্যে লোক-বিনিময়। তৃতীয় পন্থা—যাহাকে বিপথ বলা উচিত এবং যাহা বর্ত্তমানে অবলম্বিত হইতেছে—সম্বন্ধে ইহা মাত্র বলা প্রয়োজন যে ইহা বাঙালী হিন্দুর পতন ও ধ্বংসের চরম পথ। আজ চতুর্দ্দিকে কেবল এই পথেরই কথা চলিতেছে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা। ইহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গের অমুসলমান সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, আত্মসম্মান হারাইয়া পথে দাঁড়াইবে, পশ্চিমবঙ্গবাসী বিব্রত ও অতিষ্ঠ হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক আগুনে সকলেই পুড়িবে। অথচ পথে ঘাটে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় কেবল এই পথেরই আলোচনা চলিতেছে, পরিণামের কথা কেহই ভাবিবার সময় পাইতেছেন না বা বলিবার সাহস রাখিতেছেন না।

সত্য কথা এই যে, এক কোটি ত্রিশ লক্ষ লোকের এক-তৃতীয়াংশেরও পশ্চিমবঙ্গে—শুধু পশ্চিমবঙ্গে কেন সারা ভারত-যুক্তরাষ্ট্রে—পুনর্বসতি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই, যদি-না সেই পরিমাণ লোক এই অঞ্চল হইতে পাকিস্থানে চলিয়া যায়। যাঁহারা এখানকার লোক না সরাইয়া ওদিক হইতে লোক আনিবার কথা বলিতেছেন বা ভারত-সরকারকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার কথা লিখিতেছেন, তাঁহারা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা হারাইয়া ভবিষ্যতে বিষম বিপদ ডাকিয়া আনিতেছেন। ভারত-সরকারকে এখন প্রথমে বিচার করিতে হইবে যে মিঃ জিন্না ও খাজা নাজিমুদ্দিন পরোক্ষভাবে পূর্ব্ব বঙ্গের অমুসলমানকে ভিটামাটি ছাড়িতে বাধ্য করিতে চাহেন কিনা। যদি পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এবং ভারত-সরকার এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ দেখেন তবে তাঁহাদের দৃঢ়তার সহিত শান্তি ও শৃঙ্খলার পথে লোকবিনিময়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে, কেননা অন্য পথ নাই। যে পথে এ কাজ এখন চলিতেছে তাহাতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর ও মুসলমানের মধ্যে অন্তঃকলহ ও বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিবে মাত্র।

যদি খাজা নাজিমুদ্দিনের গবর্ণমেন্ট শান্তির পথ চাহেন তবে পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উচিত শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়কে সকল প্রকারে সাহায্য করা। বিগত ১৭ই চৈত্রের ভারতে তাঁহার লিখিত "পুনর্ব্বসতি কোন্ পথে" প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের এবং ভারত-সরকারের প্রত্যেক মন্ত্রীর বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমরা তাহার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :

"পূর্ব্ববঙ্গ হইতে লোক আতঙ্কেই চলিয়া আসিতেছেন। ইহাদের বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর লোক। জমি বর্গা লইয়া ও চাকুরী বা ব্যবসা দ্বারা উপার্জ্জন করিতেন কিন্তু বর্ত্তমানে পাকিস্থানে সেইভাবে উপার্জ্জন করা সম্ভব নয় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। এজন্য বাড়ী ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে উপার্জ্জনের জন্য আসিতেছেন। গবর্ণমেন্টের কোনও কোনও কর্ম্মচারীর অসদ্ব্যবহারেও পীড়িত হইয়া কেহ নিরাশ হইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য বোধ করিতেছেন। কিন্তু বাধ্যতার মূলে জাগ্রৎ বা প্রসুপ্ত ঐ বোধ আছে যে এদেশে আর ডাক্তারী, মোক্তারী ও ওকালতী, বাণিজ্য-ব্যবসা বা মহাজনী করিয়া উপার্জ্জন করার দিন নাই। কাজেই হার মানিয়া দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছেন। এই প্রক্রিয়া মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দুর পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশের উপর ও সমাজের উপর কর্ত্তব্যের প্রশ্ন হইতে বিচার করা হয় না।

"ইহা দোষের। সমাজ ও দেশের হিতাহিত সম্পর্কে বিচার-হীনতাদ্বারা মানুষ নামিয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু নামিয়া যাইতেছেন। প্রবল স্বার্থবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চলিলে সমূহ অমঙ্গলকেই ডাকিয়া আনা হয়। হইতেছেও তাহাই।

"তবে গবর্ণমেন্ট কি করিবে? পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর দুর্দ্দশার দিকে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট চোখ বুজিয়া থাকিবে? ইহাদের দুঃখ দেখিয়া কোনও প্রতিকার করিবে না? ইহাও ত হয় না। বাংলা ভাগ হইলেও বাংলার হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেন্ট এই পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। ইহার প্রতিকারই করিতে হয়। কিন্তু প্রতিকার কি? কতককে পশ্চিমবঙ্গে বসতি করাইয়া দিলে সমস্যা আরও জটিলই যদি হয় তবে করা কি?

"করার রহিয়া গিয়াছে ইহাদিগকে যত অর্থব্যয়ই হউক বসতি করাইয়া দেওয়া, তবে পশ্চিমবঙ্গে নয়—পূর্ব্ববঙ্গে।"

ঢাকায় মিঃ জিন্না

মিঃ জিন্না ঢাকায় আসিয়া প্রায় এক সপ্তাহ কাটাইয়া গিয়াছেন। চট্টগ্রামেও তিনি গিয়াছিলেন। বাংলা ভাষাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করিবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে যে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল খাজা নাজিমুদ্দীনের গবর্ণমেণ্ট তাহা দমন করিতে পারিতেছিলেন না বরং এই আন্দোলনে তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডল বজায় রাখা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই মিঃ জিন্নার পূর্ব্ববঙ্গে আগমন।

ঢাকায় আসিবার অব্যবহিত পরে মিঃ জিন্না এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। উহাতে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ইহাই জানাইয়াছেন যে, "উর্দ্দু পাকিস্থানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হইবে ইহাই আমি চাই।" ইহা তাঁহার প্রধান বক্তব্য হইলেও হিন্দুদের লক্ষ্য করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাও উপেক্ষার বিষয় নহে। পাকিস্থানে হিন্দুরা ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমান অপেক্ষা অনেক সুখে আছে, তাহাদের ন্যায়সঙ্গত কোনই অভিযোগ নাই, হিন্দুদের উপর অত্যাচারের যে সব বিবরণ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে তাহা নিছক মনগড়া কল্পনা মাত্র, পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বাস্তত্যাগী হিন্দুদের যে সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে প্রকৃত সংখ্যা তাহার তুলনায় নগণ্য, পূর্ব্ববঙ্গে পূজার সময় ৪০ হাজার শোভাযাত্রা বিনা বাধায় বাহির হইতে দেওয়া হইয়াছে ইত্যাদি অনেক কথা মিঃ জিন্না বলিয়াছেন এবং পূর্ব্ববঙ্গের কংগ্রেস নেতারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মিঃ জিন্নার নিকট কতকগুলি অভিযোগ জানাইলে তিনি তাচ্ছিল্যভরে উহা অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই খাজা নাজিমুদ্দীনের নিকটেই প্রতিকারার্থ যাইবার জন্য বলিয়া দিয়াছেন। ঢাকায় ও চট্টগ্রামে মিঃ জিন্না যে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে এই কথাই নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের অবস্থিতি তাঁহার কাম্য নহে। নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের pressure tactics-এর দ্বারা বিতাড়িত করিয়া অনুন্নত সম্প্রদায়কে মেরুদণ্ডবিহীন করিয়া ফেলিয়া তাহাদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া লওয়াই পাকিস্থানী নেতাদের আসল অভিপ্রায়। মিঃ জিন্না স্পষ্ট ভাষাতেই জানাইয়া দিয়াছেন যে পাকিস্থান ঐস্লামিক রাজ্য হইবে, যে গণতন্ত্র সেখানে প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা হইবে ঐস্লামিক গণতন্ত্র, আধুনিক যুগের ধর্ম্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্র সেখানে চলিবে না এবং পাকিস্থানের প্রত্যেক অধিবাসীকে নিজেকে পাকিস্থানী বলিয়া ভাবিতে হইবে। মিঃ জিন্নার ঢাকার বক্তৃতাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :

"আমাকে যে বিরাট অভ্যর্থনা জানান হইয়াছে তজ্জন্য আমি এই প্রদেশের জনগণ, অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান ও ঢাকাবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইহা না বলিলেও চলে যে, পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে আসিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের তুলনায় একই স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী মুসলমানের বাস হিসাবে পূর্ব্ববঙ্গের গুরুত্ব সমধিক। ইহা পাকিস্থানের একটি শক্তিশালী অংশ। আমি বহুদিন পূর্ব্বেই পূর্ব্ববঙ্গ সফরে আসিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্যান্য গুরুতর প্রয়োজনের খাতিরে আমার আসা হইয়া উঠে নাই। আপনারা এই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কিছু কিছু অবগত আছেন। দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই পঞ্জাবে যে ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয় ও যাহার ফলে পূর্ব্ব-পঞ্জাবের লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে নিজ বাসভূমি হইতে উৎখাত হইতে হয়। তাহার কথা আপনারা জানেন। পূর্ব্ব-পঞ্জাবের সঙ্গে দিল্লী ও প্রতিবেশী অঞ্চলসমূহের নিরাশ্রয় মুসলমানদের রক্ষা ও আশ্রয় দেওয়ার দায়িত্ব আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। কোনও নবজাত রাষ্ট্র দক্ষতা ও সাহসের সহিত এইরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিয়াছে পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ দেখা যায় না। আমাদের শত্রুরা ভাবিয়াছিল, পাকিস্থান শিশুকে গলা টিপিয়া হত্যা করিবে কিন্তু পাকিস্থান বিজয়ী ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কেবল বাঁচিয়াই নাই ইহার যে মহৎ উদ্দেশ্য তাহাও ইহা সাধন করিবে।

"আপনাদের স্বাগত সম্ভাষণে এই প্রদেশকে কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ করার উপর আপনারা জোর দিয়াছেন। ঐ সঙ্গে এই প্রদেশের যুবক-যুবতীদের পাকিস্থানের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ, চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতিসাধন, পাকিস্থানের অন্যান্য অংশের সহিত এই প্রদেশের সংযোগ সাধন, শিক্ষার সুব্যবস্থা এবং পাকিস্থান সরকারের সমস্ত কার্য্যে পূর্ব্ববঙ্গের যোগ্য অংশ গ্রহণের কথাও আপনারা উল্লেখ করিয়াছেন। আমি আপনাদিগকে আশ্বাস দিতেছি যে, পাকিস্থান সরকার এই সকল বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিবেন এবং পূর্ব্ব-পাকিস্থান যাহাতে যথাসম্ভব দ্রুত তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করে তৎপ্রতি সরকার দৃষ্টি দিবেন। এই প্রদেশের লোকেরা যে সামরিক শক্তিসম্পন্ন ইতিহাসে তাহার নজির আছে এবং সরকার ইতিমধ্যেই এই দেশের যুবকদিগকে সামরিক বাহিনীতে গ্রহণোপযোগী শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ ও পাকিস্থান ন্যাশনাল গার্ড দলে ভর্ত্তি হওয়ার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন যে, রাষ্ট্ররক্ষা কার্য্যে এই প্রদেশের যুবকদিগকে পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হইবে।

"এখন আমি এই প্রদেশের কতকগুলি সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাই। গত সাত মাস যাবৎ আপনারা যেরূপ ভাবে কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়া কাল কাটাইয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে ও আপনাদের সরকারকে অভিনন্দন জানাইতেছি। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পরে যে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাহা দমন করিয়া যে ভাবে আপনাদের সরকার একটি কার্য্যক্ষম শাসনব্যবস্থা চালু করিয়াছেন তজ্জন্য আমি সরকারী কর্ম্মচারীদের ধন্যবাদ জানাইতেছি। ১৫ই আগষ্ট তারিখে ঢাকায় অবস্থিত প্রাদেশিক সরকারের অবস্থা নিজ বাসভূমে পরাশ্রয়ীর মত

ছিল। সরকারকে সঙ্গে সঙ্গেই হাজার হাজার সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হয় অথচ দেশ বিভাগের পূর্ব্বে ঢাকা একটি ক্ষুদ্র মফস্বল শহর ছিল মাত্র। সরকার শাসনতান্ত্রিক সমস্তায় যখন সবেমাত্র হাত দিয়াছে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই দেশ বিভাগের ফলে ভারত হইতে ৭০ হাজার রেলকর্ম্মচারী ও তাহাদের পরিবারবর্গ অকস্মাৎ এই প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা ছাড়া হিন্দুকর্ম্মচারিগণ চলিয়া যাওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সাময়িক ভাবে বিকল হইয়া পড়ে। এই কারণে শাসন-সঙ্কট এড়াইবার জন্ত সরকারকে অবিলম্বে শাসন সংক্রান্ত পুনর্গঠন কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে হয় এবং এই কাজ প্রাদেশিক সরকার যথেষ্ট দ্রুততা ও দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করে। অব্যাহত গতিতে সরকারের কাজ চলিতে থাকে এবং সামাজিক জীবনধারায়ও কোনপ্রকার বিঘ্ন জন্মায় নাই। কেবলমাত্র শাসনতান্ত্রিক পুনর্গঠন কার্য্যই যে দ্রুততার সহিত সম্পন্ন হয় তাহা নহে, এমনভাবে সকল ব্যবস্থা করা হয় যাহা দ্বারা আসন্ন দুর্ভিক্ষের হাত হইতে প্রদেশটি রক্ষা পাইয়াছে। অবশ্য এই কার্য্যের সাফল্যের জন্ত পূর্ব্ব-বঙ্গবাসিগণ প্রশংসার পাত্র, বিশেষ করিয়া সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোককে প্রশংসা করিতে হয় কারণ দেশবিভাগের ঠিক পরেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও উহাদের নির্ব্বিচারে হত্যা সত্ত্বেও ইঁহারা দারুণ উত্তেজনার মধ্যে শান্ত থাকেন। এই ঘটনা সত্ত্বেও গত পূজার সময় হিন্দু সম্প্রদায় ৪০ হাজার শোভাযাত্রা বাহির করে কিন্তু একটি ক্ষেত্রেও কোনরূপ গোলযোগ দেখা যায় নাই, এবং সংখ্যালঘুদের উপর মুসলমান সম্প্রদায় একবিন্দু অত্যাচারও করে নাই। নিরপেক্ষ সমালোচকগণ আমার সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের অনেক বেশী আন্তরিকতার সহিত রক্ষা করা হইয়াছিল। পাকিস্থানে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হইয়াছে। আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বলিতে চাই যে, কেবল ঢাকাতেই নহে—পাকিস্থানের সর্ব্বত্রই সংখ্যালঘু-দের রক্ষা করা হইয়াছে। আমরা একথা স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছি যে, পাকিস্থানে শান্তিভঙ্গ হইতে দেওয়া হইবে না এবং কোন প্রকার গুণ্ডামি সহ্য করা হইবে না। এই যে শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন, আসন্ন দুর্ভিক্ষ এড়াইয়া লক্ষ লক্ষ লোকের খাদ্য সংস্থান ও শান্তি রক্ষা করা—ইহার প্রতি আমি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে চাই, কারণ অনেকেই বিষয়গুলিকে তত গুরুত্ব দিতে চাহেন না এবং ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মনে করেন।

"সমালোচনা করা ও দোষ বাহির করা খুবই সহজ কিন্তু প্রাদেশিক সরকারকে যে পরীক্ষার মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন। আমি বলিতেছি না যে, আপনাদের শাসন-ব্যবস্থা ত্রুটিহীন অথবা ইহার উন্নতি সাধনের প্রয়োজন নাই। যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা সর্ব্বদাই বাঞ্ছনীয় কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে আমি দেখিতে পাইয়াছি যে, কেবল অভিযোগ জানান ও দোষ বাহির করা কতিপয় ব্যক্তির কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আপনাদের সরকার দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া যাহা করিয়াছে তাহার জন্ত প্রশংসাসূচক কিছু বলাও ত প্রয়োজন। উঁহারা যে সকল ভাল কাজ করিয়াছেন তাহার প্রশংসা জানাইয়া উঁহাদের সমালোচনা করুন। বিরাট শাসন-ব্যবস্থায় ভুলত্রুটি স্বাভাবিক। আপনারা বলিতে পারেন না সবকিছু ত্রুটিহীন হইবে—ইহা কখনও হইতে পারে না। আমাদের ইচ্ছা যে, ইহা যথাসম্ভব ত্রুটিহীন হউক। সরকারের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে জনগণের সেবা করা—উহাদের মঙ্গলসাধনের জন্তই নানারূপ পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মনে রাখিবেন, সরকার এখন আপনাদেরই হাতে—সুতরাং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়া কিছু করিতে যাইবেন না। ক্ষমতা যখন আপনাদেরই হাতে তখন উহাকে কিরূপ ভাবে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা শিখুন। শাসনযন্ত্র সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞান থাকা চাই। নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আপনারা এই সরকার বদলাইয়া অন্ত সরকার স্থাপন করিতে পারেন, অবশ্য যদি আপনাদের অসন্তোষ ততটা উগ্রই হইয়া থাকে। সমস্ত ক্ষমতা যখন আপনাদের হাতে তখন যাঁহারা রাষ্ট্র পরিচালনা করিতেছেন তাঁহাদিগের সহিত ধৈর্য্য ধরিয়া আপনাদের সহযোগিতা করিতে হইবে, তাহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হইতে হইবে। তাঁহাদের আপদে বিপদে সাহায্য করিতে হইবে, কারণ তাহারাই আপনাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবেন। তাহা না করিয়া আপনারা কি লব্ধ পাকিস্থানকে নির্ব্বুদ্ধিতার দ্বারা ধ্বংস করিতে চাহেন? (না-না ধ্বনি।) আপনারা কি ইহাকে গড়িয়া তুলিতে চাহেন? (হ্যাঁ হ্যাঁ ধ্বনি।) তাহা যদি চাহেন তবে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির চেষ্টা করুন।

"আমি আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, আমাদের মধ্যে ভাড়াটিয়া শত্রুচর রহিয়াছে। উহারা পাকিস্থানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া উহাকে নাশ করিতে চাহে। আপনা-দিগকে সতর্ক থাকিতে হইবে।

"আমি শুনিয়াছি হিন্দুদের কেহ কেহ এই প্রদেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে। অল্প লোকের এই স্থান ত্যাগকে বাড়াইয়া দশ লক্ষের একটা অবিশ্বাস্য সংখ্যারূপে খাড়া করিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রচার করা হইতেছে ইহাও আমি দেখিয়াছি। এই সংখ্যা খুব বেশী হইলে ২ লক্ষ হইবে, সরকারীভাবে ইহাই বলা যায়। তবে আমি ইহা জানিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি যে মাইনরিটিদের উপর কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার এই স্থানত্যাগের কারণ নহে। তাহাদের উপর কোন উৎপীড়ন তো হয়ই নাই, বরং ভারতীয় ডোমিনিয়নে মাইনরিটিদের সহিত যে দুর্ব্যবহার

হইতেছে এখানে সেরূপ কিছুই হয় নাই ; এখানকার মাইনরিটিরা ভারতীয় ডোমিনিয়নের মাইনরিটিদের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে এবং তাহাদের প্রতি অনেক ভাল ব্যবহার করা হইতেছে। ভারত-পাকিস্থান যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতীয় ডোমিনিয়নের কোন কোন সমরলিপ্সু নেতার অবিবেচনাপ্রসূত উক্তি, ভারতীয় ইউনিয়নে মাইনরিটিদের উপর যে সব দুর্ব্ব্যবহার হইতেছে পাকিস্থানে তাহার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা এবং ভারতের কোন কোন নেতা কর্তৃক পাকিস্থানের মাইনরিটির দুরবস্থার কাল্পনিক বিবরণ প্রচার এই স্থানত্যাগের প্রকৃত কারণ। এখানে ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু শান্তিতে ও সুখে বাস করিতেছে এবং স্থান ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়াছে, ইহার দ্বারাই বুঝা যায় পূর্ব্ববঙ্গে মাইনরিটির উপর অত্যাচারের কাহিনী কত বড় মিথ্যা। আমি আগে যাহা বলিয়াছি, এখনও তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি :— মাইনরিটিদের সহিত আমরা ন্যায়সঙ্গত ও ভাল ব্যবহার করিব। ভারতবর্ষের মাইনরিটিদের জীবন ও সম্পত্তি যতখানি নিরাপদ এখানকার মাইনরিটির জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা তার চেয়ে অনেক বেশী। আমরা শান্তি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিব এবং জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিব।

"পূর্ব্ববঙ্গের অবাঙালী মুসলমানদের প্রতি কোন কোনও লোকের মধ্যে একটা বিরূপ মনোভাব রহিয়াছে। বাংলা অথবা উর্দ্দু পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা হইবে তাহা লইয়াও কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। আমি আমার ছাত্রবন্ধুদিগকে বলিতে চাই যে, আপনারা যদি রাজনৈতিক দল-বিশেষের দ্বারা পরিচালিত হন তাহা হইলে মারাত্মক ভুল করিবেন। মনে রাখিতে হইবে যে, বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আপনারাই ত পাকিস্থানের ভরসাস্থল। রাষ্ট্রের হিতার্থে আপনাদের কর্ত্তব্য পড়াশুনায় মনোনিবেশ করা। আপনারা যদি ছাত্রাবস্থাতেই শক্তিকে অযথা ব্যয় করিয়া ফেলেন তাহা হইলে রাষ্ট্রের সেবা করিবেন কিরূপে? শত্রুরা প্রাদেশিকতার নামে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। সমাজদেহ হইতে এই প্রাদেশিকতার বীজ দূর করিতে না পারিলে আমরা এক জাতি গঠন করিব কিরূপে? বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, বালুচী প্রভৃতি হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিলে চলিবে না। ১ হাজার ৩ শত বৎসর পূর্ব্বে আমরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম তাহা ভুলিতে বসিয়াছি। আমি বলিতে চাই যে আমরা সকলেই এখানে বিদেশী। বাংলার আদি অধিবাসী কাহারা? আজ যাহারা বাস করিতেছে তাহারা নহে। সুতরাং 'আমি বাঙালী', 'আমি পাঞ্জাবী' না বলিয়া বলুন 'আমি মুসলমান।' ইসলাম আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছে। যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন আপনি মুসলমান। আমরা এখন এক বিরাট জাতি; এক বিশাল অঞ্চলের অধিবাসী। ইহা কোনও সম্প্রদায়-বিশেষের বাসভূমি নহে। ইহা আমাদের সকলের। প্রাদেশিকতার মত সিয়া, সুন্নিজাতীয় ধর্ম্মীয় বিভাগও অভি-শাপ বিশেষ। আজ আর আমাদের এই সরকার ইংরেজের হাতে নাই। তাহারা ভারতকে যথাসম্ভব শোষণ করিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে সবকিছু আমাদেরই হাতে। আমেরিকার কথা ধরুন। আমেরিকা যখন স্বাধীন হয় তখন তাহাদের মধ্যে ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইতালীয় প্রভৃতি কত জাতিই না ছিল। তাহারা অনেক বিপদ অতিক্রম করিয়া এক জাতি হইয়াছে। উহারা কেবল একটি কথাই বলে আমি আমেরিকান। অনুরূপ ভাবে আমাদেরও বলিতে হইবে আমি পাকিস্থানী।

"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ভাষা সমস্যা সৃষ্টি করা হইয়াছে। আমি আনন্দিত—আপনাদের প্রধান মন্ত্রী এই সম্পর্কে কোনও গোলযোগ ঘটিতে দিবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বাংলা এই প্রদেশের রাষ্ট্রভাষা হইবে কি না তাহা নির্ব্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের বিবেচ্য বিষয়। আমার কোনও সন্দেহ নাই যে, প্রদেশবাসীর ইচ্ছানুসারে যথাসময়ে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। আমি স্পষ্টভাবে বলিতে চাই যে, বাংলা ভাষার ব্যাপার লইয়া আপনাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার বিপর্য্যয় ঘটান হইবে—এই অভিযোগের মূলে কোনও সত্য নাই। প্রদেশের ভাষা কোন্‌টি হইবে তাহা আপনাদেরই বিবেচ্য ; তবে স্পষ্ট জানিয়া রাখুন যে, পাকিস্থানের রাষ্ট্রভাষা উর্দ্দু ছাড়া আর কিছুই হইবে না। যাহারা অন্য কিছু করিতে চাহেন তাঁহারা পাকিস্থানের শত্রু। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ইতিহাস দেখুন। একটিমাত্র রাষ্ট্র ভাষা ছাড়া কোন রাষ্ট্রের সংহতি বজায় থাকিতে পারে না। আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, 'আপনারা কি পাকিস্থানে বিশ্বাস করেন?' (হ্যাঁ, হ্যাঁ ধ্বনি।) আপনারা কি পাকিস্থান পাইয়া সুখী হইয়াছেন? (হ্যাঁ, হ্যাঁ ধ্বনি।) আপনারা কি চাহেন যে, পাকিস্থানের কোনও অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হয়? (না, না ধ্বনি।) যদি ইহাই আপনাদের অভিলাষ হয় তাহা হইলে শপথ করুন যে, আপনি মুসলিম লীগ দলে যোগ দিয়া যথাসাধ্য পাকিস্থানের সেবা করিবেন।

"অনেকেই বলিয়া থাকেন যে পূর্ব্ববঙ্গ পাকিস্থানের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন। ইহা সত্য যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকি-স্থানের মধ্যে যথেষ্ট দূরত্ব বর্ত্তমান। কিন্তু ভাবিবেন যে, আমরা ঢাকার ও পূর্ব্ববঙ্গের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছি। এবার আমি মাত্র এক সপ্তাহের জন্য এখানে আসিয়াছি কিন্তু রাষ্ট্র-প্রধান হিসাবে আমি এখানে প্রায়ই আসিব এবং বহুদিন থাকিব। পাকিস্থানের মন্ত্রিগণও এখানে সচরাচর আসিবেন ও যোগাযোগ রক্ষা করিবেন। আপনাদের মন্ত্রীরাও পাকিস্থানের রাজধানীতে গিয়া নানারূপ পরামর্শ করিবেন। ধৈর্য্য ধরুন। আপনাদের সহায়তায় পাকিস্থান এক বিরাট শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইবে।

পরিশেষে সকলের মঙ্গলের জন্ত আমি আপনাদিগকে যাবতীয় অভাব অসুবিধা সহ্য করার জন্ত আবেদন জানাইতেছি। এইভাবে আপনারা পাকিস্থানকে কেবল জনবলের দিক দিয়াই যে পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারিবেন তাহা নহে, পরন্তু ইহা এইরূপ শক্তির আকর হইবে যাহা সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। আপনাদের মঙ্গল হউক।"

সাম্প্রদায়িক প্রয়োজনে একজন রাষ্ট্রনায়ক কত দূর নির্জ্জলা বাজে কথা বলিতে পারেন, পূর্ব্ববঙ্গের মাইনরিটিদের সম্বন্ধে মিঃ জিন্নার মন্তব্য তাহারই পরিচয়।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রকৃত অবস্থা

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের ৪০ হাজার শোভাযাত্রা নির্ব্বিবাদে যাইতে দেওয়া হইয়াছে এবং সেখানকার হিন্দুদের ধর্ম্মকর্ম্মে কোন বাধা দেওয়া যে হয় না ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—মিঃ জিন্নার এই উক্তির অসারতা রাজসাহীর জননায়ক শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশনে দেখাইয়া দিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন বরিশালের সতীন সেন এবং রাজসাহীর প্রভাস লাহিড়ী। একটি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া লাহিড়ী মহাশয় বলেন যে পূর্ব্ববঙ্গের শাসন-ভার তিনটি শক্তির হাতে রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে, প্রথম গবর্ণেন্ট, দ্বিতীয় মুসলিম ন্তাশনাল গার্ড এবং তৃতীয় গুণ্ডা। তাঁহার নিজের অভিজ্ঞতা এই যে ন্তাশনাল গার্ড এবং গুণ্ডারা গবর্ন্মেন্টের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান্। শ্রীযুক্ত লাহিড়ী কর্ত্তৃক 'গুণ্ডা' শব্দ ব্যবহারে পরিষদের জনৈক মুসলিম লীগ সদস্য আপত্তি করিলে তিনি তীব্রকণ্ঠে তাহার জবাব দিয়া বলেন যে গুণ্ডা সব সমাজেই আছে। তারপর লাহিড়ী মহাশয় বলেন, "ঢাকার আবহমানকাল প্রচলিত জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা গবর্ণর, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্তান্ত মুসলিম নেতাদের উপস্থিতিতে গুণ্ডারা জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা শোভা-যাত্রীদিগকে অগ্রসর হইতে দিতে পারেন নাই। রাজসাহীর সরস্বতী নিরঞ্জন শোভাযাত্রাও কয়েকটি গুণ্ডার আপত্তির জন্ত বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে।

বরিশালে পটুয়াখালি শহরেও সরস্বতী নিরঞ্জন শোভাযাত্রা বন্ধ করিয়া দিতে হইতেছে ইহাও আমি জানি। প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনকে সমস্ত ঘটনা জানানো হইয়াছে, কিন্তু তিনি শোভাযাত্রা লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন নাই।"

পাকিস্থানে যাহারা বাস করিতে চাহিতেছে তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করা হইতেছে তার একটি উৎকৃষ্ট বিবরণ দিয়াছেন শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা। পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা-পরিষদে চট্টগ্রামের হিন্দুদের উপর উৎপীড়নের নিদর্শন তিনি দিয়াছেন এবং অন্ত সমস্ত জিলাতেও উহাই ঘটিতেছে।

শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা বলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের উপর অসম্ভব চড়া হারে আয়কর ধার্য্য করা হইয়াছে। যে ব্যবসায়ী গত বৎসর আয়কর দিয়াছেন ৯০ হাজার টাকা, এ বৎসর তাঁহার উপর চাপানো হইয়াছে ৪ লক্ষ টাকা। আর একজন গত বৎসর দিয়াছেন ৯ হাজার, এবার তাঁহার উপর কর ধার্য্য হইয়াছে ৫০ হাজার টাকা। এই অবস্থায় বহু ব্যবসায়ী পলাইতেছেন এবং তাঁহাদের সম্পত্তি নিলাম করা হইতেছে। সংখ্যালঘুদের যাহাদের নিজের বাড়ী আছে তাহাদের প্রত্যেককে বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন গৃহহারা হইয়া আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে ইহা তিনি নিজে জানেন। একজন কনট্রাক্টর বহু জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানে টাকা দিয়াছেন, তাঁহাকেও এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ী ছাড়িতে বাধ্য করা হইয়াছে। ইঁহাদের মত লোকেরাই যদি এই ব্যবহার পান, তবে সাধারণ লোকের অবস্থাটা কি তাহা সহজেই বোঝা যায়। মুসলমান নেতাদের অনেকেই মুখে বলিতেছেন যে সংখ্যালঘুরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায় ইহা তাঁহারা চাহেন না, তাঁহাদের আচরণ কিন্তু মুখের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে।

পূর্ব্ববঙ্গের দূরস্থিত গ্রামের হিন্দুদের অবস্থা কিরূপ নিম্ন-লিখিত পত্রখানি হইতে তাহা বুঝা যাইবে। পত্রপ্রেরক উৎপীড়িত হইবার আশঙ্কায় নামধাম গোপন রাখা হইল,—

"সন্দীপের পরিস্থিতি বড়ই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। কাল রাত্রে ...... চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীর ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া একদল লোক টাকার জন্য তাঁহাকে বেদম মারপিট করিয়াছে ও তাঁহাকে দা দিয়া কোপাইয়াছে। তাঁহার অবস্থা সংকটাপন্ন। তাঁহাকে টাউনে আনা হইয়াছে। মাথায় হাতে ও গায়ে বহু জখম হইয়াছে। ...... গোলমাল শুনিয়া ঘটনাস্থলে দৌড়াইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সেও প্রহৃত হইয়া পুকুরে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছে।

এই ঘটনার তিন দিন আগে ...... বাবুর (আহত ব্যক্তির) ঘরে সিঁদ দিয়াছিল কিন্তু কিছু নিতে পারে নাই। গত ৫ই মার্চ্চ মুছাপুর গ্রামেও এক দাঙ্গাদুর্গতের বাড়ীতে একদল লোক রাত্রে ঢুকিয়া ঘরের বেড়া কাটিয়া লোকজনকে মারপিট করিয়া সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় দাঙ্গা-দুর্গতেরা ভীষণ ভয় পাইয়া গিয়াছে। লোকের মনের বল নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

লোকের মনের বল নষ্ট হওয়াই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুর সর্ব্ব-নাশের প্রধান কারণ দাঁড়াইয়াছে। পুলিসে এজাহার দেওয়া শুধু নিষ্ফল নহে, অধিকতর বিপদের কারণ হইতে পারে ইহাই সাধারণ লোকের ধারণা। পুলিস ও উচ্চতর অধিকারীবর্গের নিকট প্রতিকারের ক্রমাগত চেষ্টা করা এবং লোকের মনে দলগত সাহসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা যাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহারা তো সর্ব্বাগ্রেই পলাইয়াছেন। এখন সেই সব পেশাদার "কংগ্রেসী" নেতার বদলে প্রকৃত সত্যাগ্রহী কর্ম্মীর প্রয়োজন, নহিলে ভয়ার্ত্ত লোক বিকৃত ও বর্দ্ধিত সংবাদে আরও ভয়াকুল হইতে থাকিবে।

যশোহরের প্রকৃত ঘটনা এইরূপ :

গত ১৮ই মার্চ একদল বিহারী মুসলমান লাঠি ও ছোরা লইয়া দিবা দ্বিপ্রহরে বাজারের কতকগুলি দোকান আক্রমণ করে। স্থানটি কালেক্টরীর নিকটে। কিছু বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের দোকান লুঠ হয় এবং কয়েকজন জখম হয়। পুলিশ আসিলে ইহারা প্রস্থান করে।

ইহার কিছুক্ষণ পরে আর একটি বড় দল কালেক্টরীর সম্মুখে জমা হইয়া লাঠি ও ছোরা লইয়া আস্ফালন করিতে থাকে। কর্তৃপক্ষ তাহাদের বুঝাইয়া শুঝাইয়া ঘরে ফিরাইয়া দেন। ইহাদের শায়েস্তা করিবার কোন ব্যবস্থা হয় না।

সন্ধ্যার দিকে ষ্টেশনে বরিশাল এক্সপ্রেস আসিয়া পৌছিবা মাত্র ইহারা আবার আবির্ভূত হয় এবং বেপরোয়াভাবে লাঠি ও ছোরা চালাইতে আরম্ভ করে। স্ত্রীলোক ও শিশুসহ ১১ জন জখম হয়, তন্মধ্যে একজন মারা গিয়াছে। বিহারী মুসলমানদের আড্ডা হইতে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গিয়াছে কিন্তু কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ষ্টেশনে পুলিশ ছিল, তাহারাও গুণ্ডাদের বাধা দেয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট বিহারী মুসলমান, তিনি ঘটনাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দীন সাহেবও সেই চেষ্টাতেই ব্যস্ত।

পূর্ব্ববঙ্গে যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহাদের অবস্থা উপরোক্তরূপ। শ্রীসতীন সেন, শ্রীপ্রভাস লাহিড়ী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কোন প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না। প্রধান মন্ত্রী নাজিমুদ্দীন সাহেবও স্বীকার করিয়াছেন যে চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি বড় বেশী চলিতেছে কিন্তু উহা বন্ধ করিবার জন্ত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তিনি অপারগ। ট্যাক্স, বাড়ী দখল প্রভৃতি সম্পর্কে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা এবং আরও অনেকে যে সব অভিযোগ করিয়াছেন তাহারও প্রতিবিধান হইতেছে না। উদ্ধৃত পত্রখানি হইতে দেখা যাইবে যে হিন্দু নারী নির্যাতন এবং হিন্দুর বাড়ী ডাকাতি হইলে লোকে থানায় এজাহার দিতেও সাহস পাইতেছে না। অথচ পূর্ব্ববঙ্গে একজন উপযুক্ত দৃঢ়চিত্ত ডেপুটি হাই কমিশনার বসাইয়া এই অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টাটুকু অন্তত: অবিলম্বে আরম্ভ হইতে পারে।

উত্যক্ত হইয়া যাঁহারা চলিয়া আসিতেছেন বা কার্য্যব্যপদেশে যাঁহাদিগকে অল্পদিনের জন্ত কলিকাতা আসিতে হইতেছে তাঁহাদের উপর রেলের ষ্টেশনে ষ্টেশনে অবর্ণনীয় অত্যাচার ও জুলুম আরম্ভ হইয়াছে।

ময়মনসিংহের একজন লোকের অভিজ্ঞতার নিম্নলিখিত বিবরণ 'ভারত'-এ প্রকাশিত হইয়াছে :

ভুক্তভোগী ভদ্রলোক কয়েকজন মহিলাকে লইয়া সিরাজগঞ্জের পথে কলিকাতা যাইতেছিলেন। প্রথম জগন্নাথগঞ্জে পুলিস তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজে তল্লাস করে। নৌকাযোগে সিরাজগঞ্জে গিয়াই ভদ্রলোক বিপদে পড়েন, দাঁড়াইবার যায়গা নাই। তিনি একজন এ-এস-এম'কে বলিয়া মহিলাদিগকে একটা ঘরের বারান্দায় বসাইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন এমন সময় অপর একজন আসিয়া গালাগালি করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে বাহির করিয়া দেয়। টিকেট করিতে গিয়া ভদ্রলোক ইণ্টার ক্লাসের টিকেট পাইলেন না। টিকেট করিতে হইল থার্ড ক্লাসের—তাও কলিকাতার টিকেট মিলিল না। দর্শনার টিকেট পাওয়া গেল। ইহার জন্ত অতিরিক্ত দক্ষিণা দিতে হইল ৫৲ টাকা। মাল বুক করার জন্তও অতিরিক্ত ৫৲ দিতে হইল। একজন ন্যাশনাল গার্ড আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি নিলেন ৫৲ টাকা। তারপর একটু আগে ট্রেনের দরজা খুলিয়া মেয়েদের বসিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবার অজুহাতে ট্রেন একজামিনার নিলেন টিকিট পিছু একটাকা করিয়া। ভদ্রলোক অনুমান করেন, নানা প্রকারে হাজার টাকার উপরে টাকা আদায় করা হইয়াছে।

ঈশ্বরদীতে অবস্থা আরও খারাপ। আগেই খবর পাওয়া গিয়াছিল যে, সেখানকার অত্যাচার অসহ্য। কয়েকজন যাত্রী গার্ড সাহেবকে কিছু টাকা গছাইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী ছাড়িবার ব্যবস্থা করেন, যাহাতে অত্যাচারিগণ বেশী সময় না পায়। কিন্তু গাড়ী ছাড়িবামাত্র কয়েকজন গুণ্ডা শ্রেণীর মুসলমান গাড়ীতে উঠে এবং কথা নাই বার্ত্তা নাই চারটি ট্রাঙ্ক তাহাদের গাড়ী হইতে জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়। সেগুলি নাকি খানাতল্লাস করা হইবে। অথচ ঐ লোকগুলি কোন সরকারী লোক নয়। বাক্সগুলির মালিকগণও নামিয়া পড়েন। মহিলাগণকে একজন পরিচিত ব্যক্তির জিম্মা করিয়া দিয়া যিনি এই বর্ণনা দিতেছেন তিনিও নামিয়া পড়েন। তাঁহার বাক্সও নামাইয়া নেওয়া হইয়াছিল।

বে-সরকারী লোকগুলি জিনিষপত্র রেল পুলিসের নিকট লইয়া যায়। সেখানে একজন দারোগা ছিলেন। তাঁহাকে সকলেই ছোটবাবু ডাকিতেছিল। ছোটবাবু জানাইয়া দিলেন, যাহারা জিনিষ দাবি করিবে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া নাটোর পাঠান হইবে। আর যাহারা দাবীদাওয়া না করিবে তাহাদের মাল 'দাবীদার নাই' বলিয়া সরকারে জমা দেওয়া হইবে। আমাদের ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করেন পুলিস নিজেরা জিনিষপত্র না ধরিয়া বাজে লোক কেন জিনিষ ধরিয়া প্রধান মন্ত্রীর আদেশের অন্যথা করিতেছে? ফলে ছোটবাবুটি একটি রুল দিয়া তাহাকে আঘাত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী ও ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে কুৎসিত অশ্লীল গালাগালি করেন। ভদ্রলোক তাঁহার জিনিষপত্রের মায়া ছাড়িতে পারিলেন না। অনেক অনুনয় বিনয় করিলেও ছোটবাবুর

করুণার উদয় হইল না। তিনি বলেন একটি দিয়াশলাই'র কাঠিও ভারতীয় ইউনিয়নে নিতে দেওয়া হইবে না।

একজন অভিযোগ করিলেন, তিনি তিন দিন যাবৎ আটক আছেন। তাঁহার এমন পয়সা আর হাতে নাই যে, তিনি কিছু কিনিয়া মুখে দেন। আমাদের সংবাদদাতাটি পনরটি টাকা ছোটবাবুকে দিয়া আবার ময়মনসিংহে ফিরিয়া আসিবেন, এই সর্ত্তে মুক্তি পান। তাঁহাকে ময়মনসিংহের টিকেট কিনিয়া ট্রেনে উঠাইয়া দিয়া ছোটবাবু আশ্বস্ত হন।

এক ভদ্রলোক তাঁহার জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসের শীল দেওয়া ছাড়পত্র দেখাইয়াও মুক্তি পান নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভারত-সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কেহই পরিষ্কার করিয়া কোন কথা বলিতেছেন না। অনিশ্চিত ও সংশয়াকুল অবস্থায় উপরোক্ত পরিবেশের মধ্যে বাস করিয়া মানুষ দিশাহারা হইতে বাধ্য এবং ইহারই ফলে এক দল চলিয়া আসিতেছেন, অন্যেরা মেরুদণ্ডবিহীন হইয়া অত্যাচারীদের হাতে আত্মসমর্পণ করিতেছেন। বলা বাহুল্য এই দুইটাই সমান ক্ষতিকর। এক কোটি কুড়ি লক্ষ হিন্দুর এক পঞ্চমাংশও চলিয়া আসিতে পারিবেন না ইহা নিশ্চিত। আবার তাঁহাদের নেতৃস্থানীয় মধ্যবিত্ত ও সমৃদ্ধিশালী হিন্দুরা চলিয়া আসিলে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুরা শেষ পর্য্যন্ত মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে ইহাও নিশ্চিত। মোল্লারা এখনই গ্রামে এই উদ্দেশ্যে খোয়াকেরা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা নেতারা মানিয়া লইয়াছেন কিন্তু জনসাধারণ মানিয়া লয় নাই। নেতারা মানিয়াছিলেন এই আশায় যে উহাতেই হয়ত সাম্প্রদায়িক বিরোধ এবং হানাহানির অবসান ঘটিবে। কিন্তু তাহা হইল না। পশ্চিম পাকিস্থান জয়লাভ করিয়াই তাহার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ভিন্ন ধর্ম্মীকে বিতাড়িত করিল এবং কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া পাকিস্থানের সীমানা বিস্তারে অগ্রসর হইল। পাকিস্থানের উচ্চতম নেতাদের সঙ্গে আপোষ অসম্ভব ইহা কাশ্মীরের ব্যাপারে প্রমাণিত হইয়াছে।

এখন সমস্যা পূর্ব্ববঙ্গ। পূর্ব্ব বাংলার মুসলমানেরা নিজেদের পাকিস্থানীরূপে জাহির করিয়া পঞ্জাবের দাস হইয়া থাকিতে স্বীকার করিতেছে না, উর্দ্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলিয়া মানিতেও তাহারা রাজী নয়—তাহারা বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা করিতে চায়। এদিক দিয়া পাকিস্থানের চেয়ে বাংলার সহিত তাহাদের যোগ ঘনিষ্ঠতর। মিঃ জিন্না ঢাকায় আসিয়া বাঙালী মুসলমানদের বাঙালীত্ব ভুলাইবার জন্ত অনুনয়-বিনয় এবং তর্জ্জনগর্জ্জন সবই করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্ত্তনে জিন্না সাহেবের বক্তৃতার বিরুদ্ধে বাঙালী মুসলমান ছাত্রেরা কায়েদে আজমের মুখের উপর প্রতিবাদ করায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে শিক্ষিত মুসলমান তরুণ দল জিন্না সাহেবের অন্যায় হুকুম এবং জবরদস্তি নতশিরে মানিয়া লইবে না। ঢাকা সমাবর্ত্তনের এই ছোট অথচ অর্থপূর্ণ ঘটনাটিকে 'ডন' পত্রিকা হিন্দুদের ঘাড়ে চাপাইয়া লিখিয়াছেন যে হিন্দু ছাত্রেরাই কায়েদে আজমের মুখের উপর তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া 'না, না' বলিয়াছিল। বঙ্গভাষা আন্দোলনের দায়িত্ব হিন্দুদের ঘাড়ে চাপাইয়া তাহাদিগকে পাকিস্থানের শত্রু বলিয়া খাড়া করিবার চেষ্টা খাজা নাজিমুদ্দীন নিজেও করিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেই মনোভাব চাপা দিতে বাধ্য হইয়াছেন। যশোহর ষ্টেশনের ঘটনাও ইহাই বুঝাইতেছে যে হিন্দুদের উপর দোষারোপ করিয়া তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবার প্রধান কারণ মুসলমানদের নিজেদের অন্তর্বিরোধ চাপা দিবার প্রয়াস। পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর আক্রমণের অর্থ এত স্পষ্ট যে ভারতীয় ইউনিয়নের তরফ হইতে উহার প্রতিকারের জন্ত এত দিন খুব জোরালো ভাবে রাষ্ট্রনৈতিক চাপ দেওয়া উচিত ছিল। নচেৎ মুসলমানদের প্রত্যেকটি অন্তর্বিরোধ এবং দলাদলি চাপা দেওয়ার জন্ত হিন্দুরা লক্ষ্যস্থানীয় হইয়া উঠিলে সেখানে তাহাদের বাস করা অসম্ভব হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের জানা এবং বোঝা দরকার যে তাহারা অসহায় নহে, তাহাদের পিছনে ভারতীয় ইউনিয়নের প্রবল শক্তি রহিয়াছে; মুসলমানেরা ইহা উপলব্ধি করিলে হিন্দুর উপর অত্যাচারে সাহসী হইবে না। দক্ষিণ-আফ্রিকার বা সিংহলের ভারতবাসীদের জন্ত ভারত-সরকার যতটা মনোযোগ দেন, পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের জন্ত সেটুকুও দেওয়া হইতেছে না ইহা বস্তুতঃই দুঃখের বিষয় এবং ভারতীয় ইউনিয়নের পক্ষে চরম দৌর্ব্বল্যের পরিচয়।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যাঁহারা বাস্তুভিটা ছাড়িয়া আসিতেছেন এবং যাঁহারা আসিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের উভয়েরই জানা দরকার যে স্বাবলম্বন ভিন্ন বর্ত্তমান অবস্থায় উপায় নাই, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থসাহায্য করিবেন তাহা অকিঞ্চিৎকর। যে কয়েক লক্ষ লোক আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ৫ কোটি টাকা ভাগ করিয়া দিলে জনপ্রতি ২৫।৩০ টাকা পড়ে। ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক ঐ টাকার উপর ভরসা করিয়া চলিয়া আসিতে চাহিলে জনপ্রতি পাঁচটা টাকাও পড়িবে না। তার পর আছে স্থানাভাব। ইংরেজ যাওয়ার সময় পশ্চিমবঙ্গের আয়তন এমন করিয়া দিয়া গিয়াছে যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দু কিছুতেই এখানে না আসিতে পারে। বিহার বাঙালী এলাকা ছাড়িবে না বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার অনুগত সেবক ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়াছেন যে উহা হইবার নহে কারণ ইহাতে ওয়ার্কিং কমিটির মত নাই। বিহারে গিয়া বাঙালীর পক্ষে বাঙালী হিসাবে বাস করা দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। আসাম দরজা বন্ধ করিতেছে। এই অবস্থায় ভারত-সরকারের সাহায্য পাইলেও পূর্ব্ব বাংলার হিন্দু ভিন্ন প্রদেশে বসতি স্থাপন করিতে পারিবে

না, প্রাদেশিক সরকারগুলি তাহাদের জীবন নানা ভাবে দুর্ব্বহ করিয়া এবং জীবনযাত্রার পথ সঙ্কুচিত করিয়া তাহাদের বাস অসম্ভব করিয়া তুলিবে।

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদের আশ্রয়দানের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত এবং ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকার এত দিনে এ বিষয়ে কতকটা অগ্রণী হইয়াছেন। তবে এই সাহায্য অসহায় ও অসমর্থরাই যাহাতে পায় তাহা দেখা প্রয়োজন। পঞ্জাবের ৪০ লক্ষ লোক ভারতে আসায় ভারত-সরকার হিমসিম্ খাইয়া গিয়াছেন এবং পৃথিবী-ব্যাপী একটা বিরাট হৈ চৈ পড়িয়াছে। এদিকে পূর্ব্ববঙ্গ হইতে লক্ষ লক্ষ বাঙালী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকার কাহাকেও ইহাতে বিব্রত হইতে হয় নাই, একটি পয়সাও তাঁহাদের খরচ হয় নাই। বাঙালীর সহিষ্ণুতার ইহা কম পরিচয় নহে।

কলিকাতা কর্পোরেশন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা কর্পোরেশন ভাঙ্গিয়া দিয়া উহার পরিচালনভার একজন এডমিনিষ্ট্রেটরের হাতে অর্পণ করিয়াছেন। এডমিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত হইয়াছেন মিঃ এস, এন, রায়। বলা বাহুল্য প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান রায়ের এই কার্য্যে শহরবাসী মাত্রেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। মাত্র এক বৎসরের জন্য কর্পোরেশন এডমিনিষ্ট্রেটরের হাতে গিয়াছে, ইহার মধ্যে উহার অনেক গলদ দূর করিতে হইবে। কর্পোরেশনের দুর্নীতি দূর করিবার জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হইতেছে। দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের কর্পোরেশন হইতে বিতাড়ন, ভবিষ্যতে দুর্নীতি বন্ধ করিবার পথ নির্দ্দেশ এই কমিশনের কাজ হইলে লোকে আরও সন্তুষ্ট হইবে। ইতিমধ্যেই কর্পোরেশনের সিটি আর্কিটেক্ট, পলতা পাম্পিং ষ্টেশনের ওয়াটার ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি কয়েকজন দুর্নীতিপরায়ণ কর্ম্মচারী বরখাস্ত হইয়াছেন।

দীর্ঘকাল যাবৎ কর্পোরেশন নাগরিকদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন। জলসরবরাহ নিতান্ত অসন্তোষজনক, পরিস্রুত এবং অপরিস্রুত উভয়বিধ জলই প্রয়োজনের তুলনায় কম। অথচ এদিকে শহরে লোক বাড়িয়াই চলিয়াছে। কলের জল সরবরাহ বাড়াইতে হইলে পাম্পিং ষ্টেশনে একটি অতিরিক্ত ফিলটার এবং পলতা হইতে টালা পর্য্যন্ত একটি অতিরিক্ত মেইন পাইপ বসানো একান্ত দরকার, অথচ এবিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কিছুই করা হয় নাই। ফিলটার বসাইতে অন্ততঃ দুই বৎসর দরকার অর্থাৎ এখনই উহার কাজ আরম্ভ হইলে আগামী গ্রীষ্মের পরের গ্রীষ্মে লোকে কিছু বেশী জল পাইবে। বৎসরাধিক কাল যাবৎ এই প্রস্তাব লইয়া কেবল আলোচনাই চলিতেছে, গত বৎসর কাজ আরম্ভ হইলে আগামী গ্রীষ্মেই বেশী জল পাওয়া যাইত, এখন দুই বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। নূতন মেইন পাইপ না বসাইলে পর্য্যাপ্ত জল সরবরাহ হইতে পারে না, এখন যে তিনটি মেইন পাইপ আছে সেগুলি দিয়া আর এক গ্যালন জলও বেশী দেওয়া সম্ভব নয়। নূতন মেইন পাইপ বসাইয়া শেষ করিতে প্রায় পাঁচ বৎসর লাগিবে, সুতরাং যত আগে কাজ আরম্ভ করা যায় ততই মঙ্গল। ডাষ্টবিনের জমাট ময়লা পরিষ্কার কিছুতেই নিয়মিত হইতেছে না, পথঘাট পরিষ্কার রাখা তো দূরের কথা। আগে ভোর না হইতে রাস্তা জল দিয়া ধুইয়া দেওয়া হইত, লোক পথে বাহির হওয়ার আগে জল শুকাইয়া যাইত। এখন বেলা আটটা-নয়টায় জল দেওয়া হয়, ফলে সারাটা রাস্তা ধুইয়া সাফ হওয়ার পরিবর্ত্তে কাদা হইয়া আরও নোংরা হয়, আরও বেশী ধুলা হয়। অধিকাংশ রাস্তারই আলো খারাপ, কতকাল যে মেরামত হয় নাই তার ইয়ত্তা নাই। কোথাও একটা বাল্‌ব নষ্ট হইয়া গেলে উহা বদলাইতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া যায়। রাস্তাগুলির অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। প্রত্যেক রাস্তায় অসংখ্য গর্ত্ত। গাড়ী চালানো যেমন বিপজ্জনক, বাস যাত্রীদেরও তেমনি নির্ম্মম ঝাঁকুনি সহ্য করিতে হয়। বৃষ্টির দিনে জলময় রাস্তা পার হইবার সময় গর্ত্তে পা পড়িয়া পা ভাঙ্গিবার এবং মচকাইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। রাস্তার পাশের শৌচাগারগুলি নরককুণ্ডে পরিণত হইয়া রোগের বীজাণু ছড়াইতেছে, বোধ হয় এক যুগ ঐগুলিতে হাত দেওয়া হয় নাই। কোন কোন স্থানে মিলিটারী লরীর ধাক্কায় ঐগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়াছে, তৎস্থানে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করা হয় নাই। ভূগর্ভস্থ ড্রেনগুলি ভাল ভাবে পরিষ্কার হয় না, ময়লা জমিয়া ঐগুলির পরিসর ছোট হইয়া আসিতেছে। এইগুলির প্রতিবিধান অনতিবিলম্বে আরম্ভ হওয়া উচিত।

আয়ের অবস্থাও তদ্রূপ। প্রতি বৎসরই অর্থাভাবের কথা বলা হয় এবং বাজেটেও ঘাটতি হয়। কিন্তু যে সব টাকা কাউন্সিলার বা তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন ও অনুগৃহীতদের নিকট বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায় হয় না। আমাদের বিশ্বাস বাকী টাকার পরিমাণ লাখ পঞ্চাশের কম হইবে না। তার উপর কমাইয়া ট্যাক্স ধরা তো আছেই। প্রথমে যে অ্যাসেসমেন্ট করা হয় একটু তদ্বিরাদি করিতে পারিলেই আপত্তি দিয়া তাহা অনেক কমাইয়া লওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অ্যাসেসমেন্ট প্রথমেই অত্যন্ত কম ধরা হয়, পরে আপত্তি দিলে আরও কমাইয়া দেওয়া হয়। এই সমস্ত টাকা এখন কঠোরহস্তে আদায় আরম্ভ হওয়া দরকার।

কর্পোরেশনের অল্পসংখ্যক কর্ম্মচারী ভিন্ন আর কেহই বড় একটা কাজ করেন নাই, কাউন্সিলারদের তুষ্ট রাখিয়া গতানুগতিকভাবে চাকুরি বজায় রাখিয়াছেন, অনেকে কাজ না করিয়া বা অন্যায় কাজ করিয়াও উন্নতি করিতে পারিয়াছেন। সৎ ও দক্ষ কর্ম্মচারীরা পদে পদে কাউন্সিলারদের অন্যায় হস্তক্ষেপের জন্য কর্ত্তব্য পালনে বাধা পাইয়াছেন, অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া হাত গুটাইয়া থাকিতে হইয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকার একান্ত আবশ্যক এবং

সহজেই ইহা করা যায়। আমাদের মনে হয় কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, ডেপুটি এক্সিকিউটিভ অফিসার, চীফ ইঞ্জিনিয়ার, সেক্রেটারী, অ্যাসেসর, কালেকটর, সিটি আর্কিটেক্ট, ওয়াটার ওয়ার্কস ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি গুরু দায়িত্বপূর্ণ উচ্চতম পদগুলি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে পূর্ণ করা উচিত। পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই সব পদের এক একটির জন্ত দুই তিন বা চার জন প্রার্থী বাছিয়া দিবেন, কর্পোরেশন তাহার মধ্য হইতে একজনকে নিযুক্ত করিবে। চাকুরি বা পদোন্নতির জন্ত ইহাদিগকে কাউন্সিলারদের উপর নির্ভর করিতে না হইলে দুর্নীতির পথ অনেকটা বন্ধ হইয়া আসিবে। কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদের মনোবল ফিরাইয়া আনিবার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় এবং তাহাদের মনোবল দৃঢ় করিতে না পারিলে কর্পোরেশন কখনও ভাল ভাবে চলিবে না।

কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করিয়াছেন এবং পার্টির ১৯৫ জন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। নামকরা কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীরা সকলে ধরা পড়েন নাই, অনেকে আত্মগোপন করিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ কম্যুনিষ্টদের কার্য্যকলাপের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল যে দেশের স্বার্থ অপেক্ষা বিশেষ একটি বহিঃশক্তির স্বার্থসাধন তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য। কংগ্রেস গবর্ন্মেণ্ট দেশে যাহাতে শক্তিশালী হইয়া উঠিতে না পারে তাহার জন্ত ইঁহারা সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। কম্যুনিষ্টদের প্রধান লক্ষ্য ছিল দ্রব্যমূল্যের বর্ত্তমান হার বজায় রাখা, কারণ ইহাতে লোকে কংগ্রেস গবর্ন্মেণ্টের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্তসাধনের জন্ত কম্যুনিষ্টরা কলকারখানার সামান্তমাত্র অছিলায় ধর্ম্মঘট বাধাইয়া উৎপাদনে বাধা দিত এবং ঐ সঙ্গে মজুরী বৃদ্ধিতে মালিককে বাধ্য করিয়া উৎপাদনের ব্যয় বাড়াইয়া তুলিত। তেভাগা আন্দোলনের নামে কৃষাণদের জমি চাষে নিষেধ করিয়া এবং উৎপন্ন ফসল না কাটিয়া উহা মাঠে পচাইয়া জমির মালিককে জব্দ করিবার নামে উৎসাহ দিয়া তাহারা প্রচুর খাদ্য নষ্ট করিয়াছে এবং এই উপায়ে খাদ্যসমস্তা সমাধানে বাধা দিয়াছে। শস্ত সংগ্রহেও ইহারা গবর্ন্মেণ্টকে প্রবল ভাবে বাধা দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা এবং লাল ফৌজকে অস্ত্র চালনা শিক্ষাদানের আয়োজন। ইহারা তিনটি মূলনীতি অবলম্বন করিয়া কাজ করিয়াছে :

(১) দেশের অর্থনৈতিক অসন্তোষ বজায় রাখিয়া জনগণকে কংগ্রেস গবর্ন্মেণ্টের উপর ক্রমশঃ বিরূপ করিয়া তোলা, (২) কংগ্রেস গবর্ন্মেণ্টের কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বড় করিয়া তুলিয়া কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি এবং নিজেদের জনগণের বন্ধু বলিয়া প্রচার এবং (৩) সুযোগ প্রাপ্তি মাত্র কংগ্রেসকে বিতাড়িত করিয়া গবর্ন্মেণ্ট দখল করিবার জন্ত অস্ত্রশস্ত্র, সুশিক্ষিত ফৌজ ও সুগঠিত দল লইয়া প্রস্তুত থাকা। ইহাদের কার্য্যক্রমের এই তিনটি ধারা ক্রমেই পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট এ বিষয়ে একেবারেই নির্ব্বিকার ছিলেন। ডাঃ বিধান রায় কম্যুনিষ্ট মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র উপর সামান্ত একটি সতর্কতামূলক আদেশ দিয়া দুই দিনের মধ্যে উহা প্রত্যাহার করিলে কম্যুনিষ্টরা উহাকে সরকারের দুর্ব্বলতা বলিয়া প্রকাশ্তে প্রচার করে এবং ইহাতে ডাঃ রায়ের গবর্ন্মেণ্টের উপর জনসাধারণের বিশ্বাস অনেকটা আঘাত প্রাপ্ত হয়। শ্রীকিরণশঙ্কর রায় কঠোর হস্তে কম্যুনিষ্টদের দেশদ্রোহিতামূলক কার্য্যকলাপ বন্ধ করিতে অগ্রণী হওয়ায় লোকে সন্তুষ্ট হইয়াছে। এই কার্য্য আরও আগে হওয়া উচিত ছিল, এখন তো আর দেরি করিবার কোন উপায়ই ছিল না। বোম্বাই হইতে সোস্যালিষ্ট দল কম্যুনিষ্টদের বিতাড়িত করিয়াছেন; কানপুরে শ্রীহরিহরনাথ শাস্ত্রীর নিকট ইহারা পদে পদে হটিতে বাধ্য হইতেছে। এমতাবস্থায় কম্যুনিষ্ট দলের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় কলিকাতায় স্থানান্তরিত করিবার আয়োজন হইতেছিল।

এখন একটি বিষয়ে বাংলা সরকারকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। খাদ্য বস্ত্র এবং অন্তান্ত নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্য জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য করিয়া দিয়া তাহাদিগকে সপ্রমাণ করিতে হইবে যে কম্যুনিষ্টদের জ্বালাতেই ইহা এত দিন পারা যায় নাই। সমাজের শত্রু চোরাকারবারীরা যদি এখনও অভাব জীয়াইয়া রাখিতে পারে তবে সমস্ত দোষ আসিয়া পড়িবে গবর্ন্মেণ্টের উপর এবং লোকে কম্যুনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া পড়িবে। কম্যুনিষ্টদের একটি অতিশয় শক্তিশালী ও বৃহৎ অংশ ধরা পড়ে নাই। তাহারা গুপ্ত সমিতি গঠন করিয়া কাজ চালাইবে। সরকারের প্রতি আপামর সাধারণের বিশ্বাস যদি টলিয়া যায় তবে কম্যুনিষ্ট গুপ্ত সমিতি দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে, দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। দেশে অসন্তোষের ন্যায়সঙ্গত কারণ বজায় থাকিলে গুপ্ত সমিতির মোহ হইতে তরুণদলকে রক্ষা করাও অসম্ভব হইবে। গবর্ন্মেণ্ট যদি এখন তাঁহাদের কার্য্যের দ্বারা প্রমাণ করিতে পারেন যে ক্যাপিটালিষ্টদের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া কম্যুনিষ্টরা যে বদনাম দিয়া থাকে তাহা মিথ্যা কথা, বস্তুতঃ এমন কোন সম্পর্ক তাঁহাদের নাই, কম্যুনিষ্টদের ন্যায় ক্যাপিটালিষ্টদের মধ্যে যাহারা দেশের স্বার্থ বিরোধী আচরণ করিতেছে, তাহাদিগকেও তাঁহারা সমান ভাবে কঠোর হস্তে দমন করিতেছেন তাহা হইলে কম্যুনিষ্ট পার্টির ভবিষ্যতে মাথা তুলিবার সমস্ত পথ নির্ম্মূল হইবে।

হরিণঘাটা পরিকল্পনা

দৈনিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় এই বিষয় লইয়া, এই পরিকল্পনার অপব্যয় লইয়া কিছু আলোচনা হইয়াছে। সমস্ত ব্যাপারটা

বুঝিতে হইলে এই পরিকল্পনার জন্ম-বিবরণ জানা থাকা চাই। ১৯৪৪ সালে মিঃ রবার্ট কেসি বাংলার গবর্ণর নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি বাংলার নানা অভাব দূর করিবার জন্ত চেষ্টিত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশের কৃষির উৎপাদনশক্তি বর্ত্তমান যুগের অনেক দেশ হইতে কম; বাংলাদেশের গো-জাতি ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশের সঙ্গে তুলনায় অপুষ্ট ও অসুস্থ; বাংলাদেশে দুগ্ধের আয়োজন প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রচুর। কলিকাতা নগরীর দুগ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত যে ব্যবস্থা আছে, গরু ও মহিষের খাটাল যেরূপ বিক্ষিপ্তভাবে কলিকাতার স্বাস্থ্যের হানি করিতেছে, তাহা দেখিয়া কেসি সাহেবের মাথায় একটা খেয়াল খেলে। বাংলাদেশের গো-জাতির উন্নতির জন্ত নদীয়া জেলার হরিণঘাটা অঞ্চলে ৭,০০০ হাজার বিঘা জমি লইয়া একটা "গোকুল" তৈয়ার করিবার জন্ত নিউ-জিল্যাণ্ড দেশ হইতে তিন জন কৃষিবিদ ও গো-বৈদ্য আনয়ন করেন। একটা পরিকল্পনার কাঠামো প্রস্তুত হয়। শ্রী-নিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা এলমহার্ষ্ট সাহেবের নামও এই উপলক্ষে শোনা যায়; দুই-এক জন বাঙালী আই-সি-এসের কল্পনা-শক্তিও এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। লাট বাহাদুরের খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্ত অঢেল টাকার ব্যবস্থা হইল। সুতরাং হরিণ-ঘাটায় "গোকুলের" জন্ত এই দুই-তিন বৎসরে ব্যয় হইয়াছে ৫৫ লক্ষ টাকা—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটি গোরুও ঐ স্থানে দেখা দেয় নাই। ৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে কর্ম্মচারী শ্রেণীর ঘরবাড়ী তৈয়ার করিতে, বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনানুযায়ী মাত্র ৫০০ শত গোরু থাকিবার ব্যবস্থা করিতে।

এখন প্রশ্ন উঠিয়াছে—এই ঘরবাড়ী, খাটাল লইয়া কি করা যায়। ইহা পশ্চিম বাংলার গলায় কাঁটার মতন ফুটিয়া আছে। ইচ্ছা থাকিলেও ফেলিয়া দিবার উপায় নাই; ৫৫ লক্ষ টাকা জলে ফেলা যায় না। সুতরাং প্রস্তাব হইয়াছে যে এই পরিকল্পনার পূর্ণ রূপ দিবার জন্ত আরও বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন, এবং বাৎসরিক নয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই স্থানকে "গোকুলে" পরিণত করিতে হইবে। রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার ইহার জন্ত এই পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং আমরা আশ্চর্য্য হইব না যদি আগামী দুই-তিন বৎসরের মধ্যে এই কাজে এক কোটিও ব্যয় হয়। এই ব্যয়ের সার্থকতা কোথায় এই সংশয় অনেকের মনে দেখা দিয়াছে। কারণ ইংরেজ আমলের বহু ব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা আমাদের অদৃষ্টগুণে ব্যর্থ হইয়াছে। এই কথা বুঝিয়াই প্রায় আশি বৎসর পূর্ব্বে বড়লাট লর্ড মেয়ো তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁর সময়েই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অঙ্গস্বরূপ একটি ব্যবসায় ও কৃষি-বিভাগ স্থাপিত হয়। কৃষি বিভাগের কার্য্য সম্বন্ধে লর্ড মেয়ো এই কথা বলেন—

"In connection with agriculture we must be carful of two things. First, we must not ostentatiously tell native husbandmen to do things which they have been doing for centuries. Second, we must not tell them to do things which they can't do, and have no means of doing."

অর্থাৎ, ভারতবর্ষের কৃষি সম্বন্ধে উপদেশ দিবার সময় দুইটি বিষয়ে সবধান হইতে হইবে। প্রথম, খুব ঘটা করিয়া এমন কিছু বলা যা ভারতবর্ষের কৃষক যুগযুগান্ত হইতে করিতেছে; দ্বিতীয়, এমন কিছু বলা যাহা ভারতবর্ষের কৃষকের করিবার সঙ্গতি নাই।

হরিণঘাটার পরিকল্পনা প্রস্তুতিতে লর্ড মেয়োর এই কথাগুলি মনে রাখিলে বাংলাদেশের গলায় এই কাঁটা আটকাইত না। এখন এই কথা লইয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই। ইংরেজ আমলের বহু ব্যবস্থা ও আয়োজনকে আমাদের দেশের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হইতেছে। সেই জন্ত হরিণঘাটায় যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহার পিছনে আরও কিছু অর্থ ফেলিতে হইবে। গো-জাতির উন্নতি না হইলে কৃষির উন্নতি হইতে পারে না। সেই জন্ত হরিণঘাটায় পশ্চিম বাংলার কৃষির উন্নতি-কল্পে সমস্ত কর্ম্ম-প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করিলে হয়ত নূতন যুগোপযোগী একটা আদর্শ কৃষি-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারা যাইবে। এই পরীক্ষাগারের ফল দিকে দিকে ছড়াইয়া দিতে হইবে; নূতন জ্ঞান চাষীর দুয়ারে লইয়া যাইতে হইবে; তাহার সঙ্গতি ও সামর্থ্যের পক্ষে সহজসাধ্য করিতে হইবে. এই আশা বাংলাদেশের সরকারী কৃষিবিদ-দিগকে নূতন কর্ম্ম-স্থলে আহ্বান করিতেছে। হরিণঘাটায় ৫০০টি গোরু রাখিলে চলিবে না। কলিকাতায় যে ৩০,০০০ হাজার গোরু-মহিষ আছে, তাহাদিগকে হরিণঘাটার পল্লী পরিবেশের মধ্যে লইয়া যাইতে হইবে। জাত গোয়ালাকে নূতন শিক্ষা দিতে হইবে; নূতন "গোয়ালা" শ্রেণীর সৃষ্টি করিতে হইবে। পশ্চিম বাংলায় কোন কৃষি বিদ্যালয় নাই। হরিণঘাটায় তাহার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। তার জন্ত চাই এই অঞ্চলের নদী-নালার উন্নতি; সারা বৎসর যেন এই অঞ্চলে জলের ব্যবস্থা থাকিতে পারে; যমুনা নামে যে নদী মরিয়া গিয়াছে, তাহাকে ভাগীরথীর সঙ্গে আবার সংযোগ করিয়া দিতে হইবে। হয়ত এমনও প্রয়োজন হইতে পারে যে মুর্শিদাবাদ, নদীয়ার নদী-সমূহের জল-স্রোত সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া মধ্য বঙ্গের পূর্ব্বের কৃষি-সম্পদ ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তখন হরিণঘাটায় যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহা সার্থক হইতে পারে। কোন্ "ভগীরথ" এই পুণ্য কার্য্যে অগ্রণী হইবেন?

আমাদের জাতীয় জীবনে সর্ব্ব ক্ষেত্রে আজ একটা রিক্ততা ও রুক্ষতা পরিলক্ষিত হইতেছে। নানা জনে নানা ভাবে তাহার প্রতিকার চেষ্টায় কথা চিন্তা করিতেছেন। নানা ভাব ও নানা পরিকল্পনার হাটে আমাদের হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা

দেখা দিয়াছে। খাদ্যশস্যের ফসল বাড়াইতে হইবে, শিল্প-দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে ; নূতন নূতন শিক্ষা দিয়া মানুষ তৈয়ার করিতে হইবে ; তাহারা হইবে আমাদের নব-লব্ধ স্বাধীনতার ধারক ও রক্ষক। এই তিনটি কর্ত্তব্যের মধ্যে কোন্‌টি প্রথমে হাতে লইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে নানা তর্কের উৎপত্তি হইয়াছে। এই তর্কের ধূম্রজাল ভেদ করিয়া রাষ্ট্র-নায়কদের অগ্রসর হইতে হইবে। যাঁহার নেতৃত্বে আমাদের দেশ ইংরেজের শাসন ও শোষণের পাপ মুক্ত হইয়াছে, তাঁহার মনে এই সম্বন্ধে কোন দ্বিধা ছিল না। তিনি খাওয়া পরার ব্যবস্থার কথা, এই সম্বন্ধে আত্ম-নির্ভরশীল হওয়ার কথা আমাদের প্রথম হইতেই শুনাইয়াছিলেন। নানা সংস্কারের বাধায় আমরা তাঁর নির্দ্দেশানুযায়ী চলিতে পারি নাই। তাঁর তিরোধানের পরেও সেই কর্ত্তব্য অপূর্ণ হইয়া আছে। হরিণ-ঘাটায় যে কর্ম্ম-প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা সেই অপূর্ণ কার্য্যের ইঙ্গিত দিয়া আমাদের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চিম বাংলার মন্ত্রি-মণ্ডলী, পশ্চিম বাংলার জন-মণ্ডলী মন স্থির করিতে পারিলে পশ্চিম বাংলা খাদ্য-শস্যের জন্য বিশ্বের দরবারে হাত পাতিতে যাইবে না। হরিণঘাটায় পশ্চিম বাংলার শক্তি পরীক্ষা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান

শ্রীকিরণশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গের শান্তি রক্ষার ভার পাইয়াছেন ; সরকারী ভাষায় তিনি স্বরাষ্ট্র-সচিব ; লোকের প্রাণ, মান, ধনরক্ষার দায়িত্ব তাঁহার। পশ্চিমবঙ্গের ১৯৪৮-৪৯ সালের আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ লইয়া আইন-সভায় বিতর্ক চলিয়াছে। এই আয়-ব্যয়ের মধ্যে পুলিসের খাতে বিতর্কের সময় তিনি নাকি "আর একদফা আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন" সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে। "ইত্তেহাদ" পত্রিকা এই ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন ; পড়িয়া মনে হয় পাকিস্থানী দৈনিকখানি পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিবের কথায় "আশ্বাস" পাইতেছেন না। আমাদের প্রতিবেশী সমাজের মনোভাব বুঝিবার জন্য নিম্নলিখিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি। গত ২রা তারিখের সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল :

> ভারত বিভাগের পর উভয় ডোমিনিয়নের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন অত্যন্ত বিড়ম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যেমন নিজেদেরকে অসহায় 'বলীর ছাগ' বলিয়া ভাবিতেছে, পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও ঠিক তেমনি নিজেদেরকে নিঃসঙ্গ এবং বিপদগ্রস্ত মনে করিতেছে। দেশের বৃহত্তর রাজনৈতিক জীবনের রাজপথে ভ্রমণ করা ত দূরের কথা, দৈনন্দিন জীবনের অলিগলিতেই আজ তাহারা ঠাঁই পাইতেছে না। তবে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এই হতাশাব্যঞ্জক মনোভাব হইতে যদি কেহ মনে করে যে, উভয় বঙ্গে সাম্প্রদায়িক অশান্তির দরুণই এরূপ ঘটিতেছে, তাহা হইলে খুবই ভুল করা হইবে। অত্যন্ত আনন্দের কথা উভয় বঙ্গে সাম্প্রদায়িক অশান্তি আজ নাই, তবু কেন এরূপ ঘটিতেছে ? সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানসিক ভাবধারা আজ যে পর্য্যায়ে নামিয়াছে, তাহাতে সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপারই তাদের জীবনে শেলসম বাজিতেছে। ছোটখাটো মানসিক নির্যাতন আজ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবনকে দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের দেশের পাকিস্থানীরা কি মনে করিয়াছিলেন যে তথাকথিত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় কেবলমাত্র ভাগবাটোয়ারার ফলেই খুব শান্তিতে থাকিবে ? রাতদিন চীৎকার করিয়া "ইত্তেহাদ"-গোষ্ঠী ত মুসলমানের চক্ষে হিন্দুকে দুষমন বানাইয়াছিল, এই প্রচারণার ফলে মুসলমানের মনোভাব কোন্ ধারায় বহিয়াছিল এবং কোন্ কর্ম্ম-পন্থা তাহারা অবলম্বন করিয়াছিল তাহা আজ সর্ব্বজনবিদিত। হিন্দু ও শিখ কলসীর কাণায় রক্তাক্ত হইয়া প্রেম দিতে পারে নাই, ইহা সত্য। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট হইতে দেশে যে তাণ্ডবের সৃষ্টি হইল তার শ্রেষ্ঠ বলি গান্ধীজী। তাঁহার আত্মত্যাগে মুসলমান সম্প্রদায়ের কেহ কেহ তাঁহাদের আত্মঘাতী নীতির ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হাত হইতে পাশা চলিয়া গেলে যেমন তাহা ফিরাইয়া আনা যায় না, সেইরূপ পাকিস্থানী ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের কোন আশা নাই। অনেক পাকিস্থানী সংবাদপত্র গান্ধীজীর প্রশস্তি পাইয়াছেন তাঁহার দেহত্যাগের পর। তাঁহাদের কায়েদে আজম যে ভাষায় গান্ধীজীর প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহা পাকিস্থানী মনোভাবের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরিচয়। এইরূপ প্রশংসার মধ্যেও হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টার অন্ত নাই। "পাকিস্থান টাইমস্" নামে একখানি পত্রিকা লাহোর হইতে প্রকাশিত হয়। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে গিয়া যে ভাষায় এই পত্রিকাখানি তাহার মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে, তাহা প্রণিধানযোগ্য।

> "There have been great heroes in history who lived and fought and died to preserve their own people from dangers that threatened and from enemies lying in wait. It would be hard to name any one who has fallen fighting his own people to preserve the honour of a people not his own. No greater sacrifice could be rendered by a member of one people to another . . ."

এই প্রশস্তিলেখকের মতে ভারতীয় মুসলমান—যাহাদের জন্য গান্ধীজী জীবন বিসর্জ্জন দিলেন—তাহারা তাঁহার আপনার জন নয় ; তাহারা প্রতিবেশী হইয়াও পরদেশী। এই কথার মধ্যে যদি কোন সত্য থাকে, তবে ভারতবর্ষের মুসলমান, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান, কখনও ভারতবর্ষের বা পশ্চিমবঙ্গের আপনার হইতে পারে না। এবং পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু তার প্রতিবেশী মুসলমানের আপনার হইতে পারে না, কখনও আপনার হইতে পারিবে না। "ইত্তেহাদ"-সম্পাদক পূর্ব্ববঙ্গের

ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী। তিনি পশ্চিমবঙ্গে বিদেশী, পরদেশী। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি করার প্রলোভন ছাড়িতে পারেন না। "পশ্চিমবঙ্গের শাসনযন্ত্রের প্রত্যেক বিভাগে, বিশেষ করিয়া পুলিস ও সামরিক বিভাগে সংখ্যালঘুদলের ন্যায়সঙ্গত দাবি যদি স্বীকৃত হয় তবেই তাহারা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে যে তাহারাও রাষ্ট্রীয় যন্ত্রের সক্রিয় পরিচালক ...।" যে আপনার জন নয় ("a people not his own") তার হাতে পুলিস ও সামরিক বিভাগের ক্ষমতা কি ভাবে দেওয়া যাইতে পারে? পাকিস্থানী মনোভাব যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই ফলভোগ পশ্চিমবঙ্গের ষাট লক্ষ মুসলমান ও পূর্ব্ববঙ্গের এক কোটি বিশ লক্ষ হিন্দুকে আজ করিতে হইতেছে।

আজমীর দরগাহ্

প্রায় আট শত বৎসর পূর্ব্বে সাধক খাজা মৈনউদ্দিন চিস্তি আজমীর শহরে এক দরগাহ্ স্থাপন করেন, এবং ঐ স্থানে তাঁর দেহ রক্ষা করেন। আজ পৃথিবীব্যাপী মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট এই দরগাহ্ পুণ্যস্থান বলিয়া সম্মানিত যেমন শ্রীহট্টের শাহ্ জালালের দরগাহ্। কালে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকের নিকট, উত্তর-ভারতের অনেক হিন্দুর নিকট, এই দরগাহ্ পীরস্থান বলিয়া সম্মানলাভ করিয়াছে। গত অক্টোবর মাসে এই দরগাহ্-র শান্তি নষ্ট হয়, যখন পশ্চিম পঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অমানুষিক অত্যাচারের খবর দিকে দিকে বিস্তৃত হয়। কেবল মুসলমান বলিয়া অনেকে অত্যাচরিত হন, যেমন পশ্চিম পঞ্জাবে হিন্দু ও শিখেরা হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট এই উন্মাদনা অতি শীঘ্র কঠোরহস্তে দমন করেন। গত ২৯শে ফাল্গুন তারিখের সংবাদপত্রে এই দরগাহ্-র এমাম সৈয়দ গিয়াস-উদ্দিন খাজা সাহেব এক বিবৃতি দিয়া ভারতবর্ষের গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক "দরগাহ্ সরিফ ও আমাদের খাদেম সম্প্রদায়ের বিশেষ ভাবে যত্ন নিতেছেন" এই কথা স্বীকার করেন। ভবিষ্যতেও এই শান্তি অব্যাহত থাকিবে এই বিশ্বাসে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে খাজা সাহেবের "ওরষ" আগামী ২৭শে বৈশাখ (১০ই মে) হইতে আরম্ভ হইবে। এই সম্পর্কে পাকিস্থান গবর্মেণ্টের আচরণ লক্ষ্য করিবার বিষয়। "নানকানা সাহেব" গুরু নানকের জন্ম-স্থান, শিখ সম্প্রদায়ের পবিত্রতম তীর্থ-স্থান। গুরু নানকের জন্ম-দিবস উপলক্ষে বাহিরের কোন শিখকে "নানাকানা সাহেব" শহরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। বর্ত্তমানে এই তীর্থ-স্থানের অবস্থা কি তাহা আমরা জানি না; শিখ সম্প্রদায় বিনা বাধায় 'নানকানা সাহেবে' যাইতে পারেন কিনা জানি না। 'আজমীর সরিফ ও নানকানা সাহেব' সম্বন্ধে একটা বোঝা-পড়া করা ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য।

পাকিস্থানীর প্রত্যাবর্ত্তন

গত জুলাই মাসে তদানীন্তন ভারত গবর্মেণ্ট ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কর্ম্মচারিবৃন্দকে তাঁদের রাষ্ট্র বাছিয়া লইবার অধিকার দেন। তখন স্থির হইয়া গিয়াছে যে ভারতবর্ষে দুইটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। রাষ্ট্র বাছিয়া লইবার অধিকার পাইয়া কর্ম্মচারীবৃন্দ নিজ নিজ জ্ঞান-বিশ্বাস অনুসারে রাষ্ট্রের সেবা করিয়া নিজ নিজ সার্থকতা লাভ করিবার এই যে অধিকার পাইল, তাহা গণতন্ত্রের নীতি সম্মত। সেই ব্যবস্থা অনুসারে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের অধীনস্থ প্রায় ৫০,০০০ হাজার কর্ম্মচারী—রেল বিভাগ, ডাক বিভাগ ও তার বিভাগের কর্ম্মচারীই তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ—পাকিস্থান রাষ্ট্র বাছিয়া লয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে ৪০,০০০ হাজার কর্ম্মচারী চিরকালের জন্য পাকিস্থান বাছিয়া লয়, এবং ১০,০০০ হাজার সাময়িক-ভাবে পাকিস্থানে চলিয়া যায়। তাহাদের মত পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার থাকে। অর্থাৎ তাহারা ভারত রাষ্ট্রের চাকুরীতেও ফিরিয়া আসিতে পারে। গত ৭ই মার্চ তারিখের একটি সংবাদে জানা যায় যে প্রায় ১২,০০০ কর্ম্মচারী এই ভাবে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। এই সংবাদে দিল্লীর রাজনীতিক মহলে নানা সমস্যার আলোচনা হইতেছে। এই ১২,০০০ হাজার কর্ম্মচারীর মনোভাব কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই; ইহাদের ভবিষ্যৎ বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে কেহ কোন নিশ্চয়তা দিতে পারে না। এইরূপ প্রস্তাব করা হইতেছে যে বিশেষ কোন প্রতিজ্ঞা দ্বারা ইহাদের সততার পরীক্ষা করিতে পারা যায়। এরূপ প্রতিজ্ঞার কোন মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ পাকিস্থান রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অনেকেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া প্রত্যবায় ভাগী হইবার জন্য প্রস্তুত হইবে। ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান দুই "নেশ্যন" এই তত্ত্বের উপরেই ভারতবর্ষকে ভাগ করা হইয়াছে; কারণ মুসলিম লীগের মতে দুই "নেশ্যন" এক রাষ্ট্রের ছায়াতলে বাস করিতে পারে না। এই তত্ত্ব স্বীকার করিয়া এখন "পাকিস্থানী" ভাবাপন্ন লোকে কেন অপর রাষ্ট্রের সেবা করিতে আসিবে, তৎসম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উদয় হইতে পারে।

অপর পক্ষে ইহা বলা হইতেছে যে ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আছেন যে ছয় মাসের মধ্যে, ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে, যদি কোন "পাকিস্থানী" কর্ম্মচারী ফিরিয়া আসিতে চায় তবে তাহাকে তাহার পূর্ব্ব-পদে বহাল করিতে হইবে। পাকিস্থান রাষ্ট্র এরূপ কোন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল কিনা জানি না। মনে হয় না যে, একতরফা ব্যবস্থায় ভারত রাষ্ট্রের শাসক সম্প্রদায় রাজী হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সেই পরীক্ষাটা হইয়া গেলে মন্দ হয় না। পাকিস্থানের অধিবাসী যাহারা ভারত রাষ্ট্রে চাকুরী করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদেরও ইচ্ছা পরিবর্ত্তন

করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। সেইরূপ লোকের সংখ্যা কত তাহা আমরা জানি না। ইহা জানি যে একমাত্র শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসী কর্ম্মচারী, যাহারা ভারত রাষ্ট্রে চাকুরি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০০ শত জন। ইহাও আমরা জানি পূর্ব্ববঙ্গের গবর্মেণ্ট তাহাদের আমল দেন নাই এবং ভারত রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ এই অবিচারের কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। ১২,০০০ পাকিস্থানীর প্রত্যাবর্ত্তন উপলক্ষে এই অবিচার সম্বন্ধে একটা হেস্ত-নেস্ত করা উচিত। পূর্ব্ববঙ্গ গবর্মেণ্টকে চাপ দিতে হইবে। ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ এই কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলে, লোকমত তাহা সহ্য করিবে না। এই পরিণতির কথা মনে রাখিয়া নেহরু গবর্মেণ্টকে কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। এই সুখ-সন্ধানী পায়রাদের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

মাতৃভাষা ও প্রদেশ বিভাগ

মাতৃভাষার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশকে বিভক্ত করার নীতি জাতীয় মহাসমিতি বহুদিন পূর্ব্বে, প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, গ্রহণ করিয়াছিল। এই নীতি অনুসারে বিভিন্ন ভাষার ভিত্তিতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই সংগঠন ইংরেজ কর্তৃক প্রদেশ বিভাগের ব্যবস্থা অনুসরণ করে নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায় যে মান্দ্রাজ প্রদেশে চারিটি ভাষাভাষী লোকসমষ্টির আকাঙ্ক্ষা অনুসারে চারিটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সংগঠিত হয়—যথা, তেলুগুভাষী অন্ধ্র কংগ্রেস কমিটি, তামিল নাদ (দেশ) কংগ্রেস কমিটি, কর্ণাটক কংগ্রেস কমিটি ও কেরালা কংগ্রেস কমিটি। এই ভাবে মান্দ্রাজ প্রদেশে ইংরেজ নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে চারিটি স্বয়ংসিদ্ধ প্রদেশের গোড়াপত্তন হয়। সেইরূপ সুরমা উপত্যকার অন্তর্ভুক্ত শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা ইংরেজী বিধানে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু কংগ্রেসী গঠন-তন্ত্রে এই দুই জেলা বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধীন ছিল। আজ কংগ্রেসের হাতে শাসনক্ষমতা আসিয়াছে, এবং দেশের লোকে মনে করে যে কংগ্রেসের এই প্রাচীন নীতির রূপ দিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের উপর পড়িয়াছে। এই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে দেশের চতুর্দ্দিকে নানা প্রদেশের সীমানা পরিবর্ত্তন করিয়া কয়েকটি নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিতে হইবে, এবং কোন কোন পুরাতন প্রদেশের সীমানা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইবে। এই পরিবর্ত্তন গণতন্ত্রের মূলনীতি অনুসরণ করিবে—সংসৃষ্ট জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থবুদ্ধির পরিপোষক হইবে। এই নীতিকে রূপদান করিতে হইলে একভাষাভাষী জনগণের ভাবকে প্রাধান্য দিতে হইবে। আমরা আশা করিয়াছিলাম যে আমাদের কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট এই কর্ত্তব্যে কর্মিংকর্ম্মা হইবেন, নিজেরা উদ্যোগী হইয়া কোটি কোটি লোকের বহুযুগসঞ্চিত আবেগের প্রতি সম্মান দেখাইবেন।

কিন্তু কার্য্যতঃ দেখিতেছি যে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু প্রভৃতি কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্টের কর্ণধারবৃন্দ এই বিষয়ে টালবাহানা করিতেছেন, এবং নানা স্থানে নানা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া সকলকে বিভ্রান্ত করিতেছেন। কেন্দ্রীয় আইন সভার অধিবেশনে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়; ভিজাগাপটমে পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেন যে অন্ধ্র প্রদেশের জন্ম অদূরবর্ত্তী। কিন্তু তেলুগু ভাষাভাষী লোকসমষ্টিই কেবলমাত্র এই বিষয়ে আগ্রহশীল নহে। তামিল, কর্ণাটক, কেরালা, মহারাষ্ট্র, এই কয়টি প্রদেশ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি আছে, এবং নব গঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের পশ্চিম সীমান্তে বিহার ও উৎকলে অন্তর্ভুক্ত বঙ্গভাষাভাষী লোকের দাবি আজ পঁচিশ বৎসর হইতে অপূর্ণ হইয়া আছে। অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রের গঠনমূলক কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে, তাহা ভারত-রাষ্ট্রের নেতৃবর্গের অজ্ঞাত নয়। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিলে এই প্রশ্নের সুমীমাংসা করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন; নানা উপলক্ষে নানা পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা বলিয়া ও কাজ করিয়া জনগণের মনে বিক্ষোভ সৃষ্টির সম্ভাবনাকে এরূপ ভাবে অবহেলা করিতেন না। তিনি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে তেলুগু, তামিল, বাঙালী মারাঠিরূপে এখন আর ভাবিলে চলিবে না; ভারতবাসীরূপে ভাবিতে হইবে, সর্ব্বভারতীয় সমস্যা সমাধানের কথা অগ্রে ভাবিতে হইবে; তাহা হইলে এই প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতা অবান্তর হইয়া পড়িবে।

এরূপ কথার না আছে মাথা, না আছে মুণ্ড। তেলুগু, তামিল, মারাঠি, কর্ণাটি, বাঙালী ভাবে ভাবুক হইলে ভারতীয় হইবার পথে প্রতিবন্ধক জন্মায় এরূপ অশ্রদ্ধেয় কথার উচ্চারণ আমরা তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাশা করি নাই। গত এক শত বৎসরের ইতিহাস এইরূপ কথার প্রতিবাদ করিতেছে। বাংলা দেশের ইতিহাস বরং তার বিরুদ্ধ কথার সাক্ষ্য দিতেছে। যে পরিমাণে আমাদের বাঙালীত্ব, বাঙালী সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধা ও মমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সে অনুপাতে আমাদের ভারতীয় অনুভূতি সচেতন হইয়াছে। এই সত্য স্বীকার না করিলে আমাদের এক শত বৎসরের ইতিহাস অর্থহীন হইয়া পড়ে; তার মধ্যে কোন সঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। প্রদেশ গঠন বা পুনর্গঠন কঠিন কার্য্য হইতে পারে; বর্ত্তমানে এই কার্য্যে হাত দিবার অবসর নাই বা এই কার্য্য সময়োপযোগী নয়, এইরূপ যুক্তিতে কোন লোক কান দিবে না। স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসন কার্য্য কঠিন, তাহা জানিয়া শুনিয়াই আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র চাহিয়াছি ও তাহা আদায় করিয়াছি। ভারত রাষ্ট্রের চতুর্দ্দিকে যে সব দেশীয় রাজ্য বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়াইয়া আছে, তাদের নৃপতিবর্গকে ভারত-রাষ্ট্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া

লওয়া সহজ কাজ ছিল না। এই প্রায় ছয় শত নৃপতির ভয়-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, শ্রেণী ও বংশের স্বার্থের সমন্বয় সাধন সহজ কাজ ছিল না। আজ শুনিতে পাই তাহা সম্ভব হইয়াছে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের কৌশলে, এবং বর্তমান কেন্দ্রিয় গবর্মেণ্টের পক্ষ হইতে এই কৃতকার্য্যতার জন্য প্রশংসার দাবী করা হইতেছে।

প্রদেশ গঠন বা পুনর্গঠন এই কাজ হইতে কঠিন নয়। তবুও এই কাজে হাত দিতে কেন্দ্রীয় গবর্মেণ্ট অনিচ্ছুক বা অপারগ কেন, তার পক্ষে কোন যুক্তি আজ পর্য্যন্ত আমরা শুনি নাই। নব-বঙ্গ সমিতির স্মারকলিপির উত্তরে ভারত রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন যে পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উৎকলের মধ্যে সীমানা পরিবর্তন করিবার সময় এখনও আসে নাই। কেন আসে নাই, এবং কখন তাহা আসিবে তৎসম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরু নীরব। এদিকে ভারত রাষ্ট্রের গঠন-তন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে; তার খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে। এবং এরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে যে আগামী জৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসের মধ্যে এই খসড়ার আলোচনা শেষ হইবে, এবং ভারত-রাষ্ট্রের গঠন-তন্ত্র চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হইবে। এই খসড়ার ১৫৯ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই কেবলমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশের নাম; খসড়া প্রণয়ন কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে একটি অনুসন্ধান কমিশন নিযুক্ত করিতে হইবে, তার কর্তব্য হইবে ভাষাগত সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া নূতন প্রদেশ গঠন বা পুরাতন প্রদেশের সীমানা পরিবর্তন বা পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারের অনুসন্ধান করিয়া নিজের প্রস্তাব করা। এই প্রস্তাব অনুসারে নূতন প্রদেশ গঠন বা পুরাতন প্রদেশের সীমানা পরিবর্তনের উল্লেখ ভারত রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে স্থান পাইবে। এত সব ব্যবস্থা বাকী তিন মাসের মধ্যে কি করিয়া সম্পূর্ণ করা হইবে তাহা জানি না। প্রদেশ গঠন বা পুনর্গঠন সম্বন্ধে এত দাবী দাওয়া আছে যে তাহার সমাধান সহজ নয়।

একটি মাত্র দাবীর প্রতি মনোযোগ দিলে তাহা স্পষ্ট হইবে। যে বাঙালী অধ্যুষিত স্থানকে ১৯১২ সালে বিহারের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, আজ ৩৫ বৎসরে তার সংশোধন হইল না। ১৯১২ সালের জানুয়ারি মাসে নব সৃষ্ট বিহার প্রদেশের কয়েকজন নেতৃবৃন্দ লিখিতে পারিয়াছিলেন যে,

> "বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বাংলাদেশের সঙ্গে যোগ করিয়া বাংলাদেশের শাসন-ব্যবস্থার অধীনে আনিতে হইবে; হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চল বিহার প্রদেশের শাসনাধীনে থাকিবে। এই ব্যবস্থানুসারে মহানন্দ নদীর পূর্ব্ব তীরের পূর্ণিয়া ও মালদহের অংশবিশেষ...বাংলা দেশে যাইবে...। সেইরূপ সাঁওতাল পরগণার যে সব অঞ্চল বাংলাভাষাভাষী লোকের বাসস্থান তাহা বাংলায় যাইবে...। ছোট নাগপুর সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করা যায়; সমগ্র মানভূম জেলা, সিংহভূম জেলার ধলভূম পরগণা বাঙালী অধ্যুষিত এবং এই দুই অঞ্চল বাংলাদেশে যাইবে...।"

আর ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে বিহারের নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কি উপদেশ দিতেছেন? কোন কৌশলে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলকে হিন্দীভাষাভাষী অঞ্চলে রূপান্তরিত করিতে পারা যায় তাহাই ভর্ৎসনার ছলে তিনি বলিতেছেন:

> "বিহার হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের অক্ষমতার জন্যই আজ বাঙালীরা সিংহভূম ও ধলভূমের উপর দাবী করিতেছে...সিংহভূম ও ধলভূম অঞ্চলে হিন্দী ভাষার প্রচার করিতে হইবে; তখনই আমরা এই সব অঞ্চল হিন্দীভাষাভাষী বলিয়া দাবী করিতে পারিব।"

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেসের সভাপতি। তিনি গান্ধীজী প্রবর্ত্তিত সত্য ও ন্যায়ের নিষ্ঠাবান সাধক এবং জননায়ক। বিহার হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতার যে অংশ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তার উদ্দেশ্য ঠিক সত্য ও ন্যায়ের অনুমোদিত নয়। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত নেতা যখন এমন কৌশলের উপদেশ দিতে পারেন, তখন প্রদেশ গঠন বা পুনর্গঠনের পথে বাধা কি, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। তবুও এই কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে। ভারত রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে এই ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করিয়া লইতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্ত্তন উৎসব উপলক্ষে গুজরাটের চিন্তানায়ক ও হায়দরাবাদ রাজ্যে ভারত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি শ্রীকানাইয়ালাল মুন্সীকে সমাবর্ত্তন ভাষণ প্রদান করিবার আমন্ত্রণ করা হয়। তাঁহার মুখে আমরা কোন নূতন কথা শুনিতে পাইলাম না। "সৃষ্টি-মূলক শিক্ষার" ("Creative education") সম্বন্ধে তিনি ইঙ্গিতে মাত্র কিছু বলিয়াছেন এবং ইংরেজ আমলের শিক্ষাকে নস্যাৎ করিয়া নূতন কোন পথ দেখাইতে পারেন নাই। ইংরেজ "তার শক্তি জিয়াইয়া রাখিবার জন্য উকীল, মোক্তার, অফিসার সৃষ্টি করিত", এই কথা সত্য। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা জবাহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল ও "নেতাজীর" মতন লোকেরও সৃষ্টি করিয়াছে। এই কথাটাও ঐতিহাসিকের মনে রাখিতে হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চান্সেলর শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নূতন স্কুল কলেজ স্থাপনের সংবাদ দিয়া ও অর্থাভাবের কথা নানা ভাবে, নানা সুরে জানাইয়া তাঁর বক্তৃতা শেষ করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীনে বাৎসরিক ৫০,০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে "কৃষি বিষয়ক গবেষণা" ও কৃষির উন্নতিকল্পে একটা আয়োজন চলিতেছে; একজন বদান্য ব্যক্তির ৫০,০০০ হাজার টাকা দানে একটি "সঙ্গীত বিভাগের" প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে; একজন "বিশিষ্ট সাংবাদিকের" নিকট হইতে "পর্য্যাপ্ত দানের প্রতিশ্রুতি" পাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়

একটি "সাংবাদিকতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের" কার্য্য আরম্ভ করিবেন আগামী আষাঢ় মাসে। এই সব সংবাদের মধ্যে আমরা কোথাও স্বাধীন ভারতের নাগরিক সৃষ্টি করিবার জন্ত কোন সার্থক আয়োজনের ইঙ্গিত পাইলাম না। গতানুগতিক পরীক্ষা, স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা শুল্ক পাঁচ টাকা বৃদ্ধি—ব্যবসায় বুদ্ধির এই সব কথার মধ্যে উৎসাহ পাইবার কিছু নাই।

ভারতবর্ষের "ঐতিহ্য"

আজ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের কল্যাণে নানা শিল্পের কল্পনাতীত উন্নতি হইয়াছে। সেইজন্ত বিজ্ঞান ও শিল্পের কথা বলিতে লোকে আত্মহারা হইয়া পড়ে, এবং স্বাধীন ভারতের জীবন-যাত্রা পুনর্গঠনের জন্ত বিজ্ঞানের প্রয়োজন, শিল্পের প্রসারের প্রয়োজন—এই কথা বেদ-বাক্যের ন্যায় আমরা সকলে স্বীকার করিয়া লইতেছি। এরূপ একতরফা আলোচনা কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রায়ই শোনা যায়। গত ২৭শে ফাল্গুন এই বিষয়ে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বিতর্কের উত্তরে অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা প্রণিধানযোগ্য,—"বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার উপর জোর দিলেই চলিবে না। যুগান্তব্যাপী ভারতীয় ঐতিহ্যকে কোনক্রমে উপেক্ষা করা যায় না।" সঙ্গীত, কলাবিদ্যা, স্থপতিবিদ্যা, নাটক, নৃত্য, চিত্রবিদ্যা এই ঐতিহ্যের বাহ্যিক রূপ। এই রূপকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার জন্ত গুণী ও জ্ঞানীর প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ শহরের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বিদ্যালয়টিকে সম্প্রসারিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে; দক্ষিণ-ভারতে কর্ণাটের সঙ্গীত চর্চার জন্ত আর একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। একটি "জাতীয় সংস্কৃতি ট্রাষ্ট" গঠন করিবার চেষ্টা চলিতেছে; তাহার অধীনে তিনটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিশ্ব-ভারতীর প্রসার কল্পে ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এই প্রতিষ্ঠানে কলাবিদ্যা, হস্তনির্ম্মিত শিল্প, নৃত্য, গীত ও "বুনিয়াদি" শিক্ষার বিরাট পরিকল্পনাকে রূপদান করিবার আয়োজন চলিতেছে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের প্রামাণ্য ইতিহাস প্রণয়নও অবশ্য কর্ত্তব্য। আচার্য্য সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে সভাপতি করিয়া ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাস প্রণয়ন করিবার জন্ত একটি নূতন কমিটি গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়নের জন্তও আর একটি কমিটি গঠিত হইবে—এই সব সংবাদ মৌলানা আবুল কালামের বক্তৃতায় আমরা পাই।

সর্ব্বোদয় সমাজ

গান্ধীজী জীবনে আচরণ করিয়া দেশের জনগণের সম্মুখে নূতন সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার ভক্তগণের উপর তৎসম্বন্ধে নূতন দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে তাঁহারা অবহিত হইয়া আছেন বলিয়া মনে হয়। গত ১৮ই চৈত্র ওয়ার্দ্ধাগঞ্জে অনুষ্ঠিত সভায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিন দিন এই সভায় কার্য্য চলিয়াছিল। তাহাতে গান্ধীজী প্রচারিত "সর্ব্বোদয় সমাজের" আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয়। এই আদর্শানুযায়ী সমাজে ভেদাভেদের স্থান নাই; নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া সমাজের সেবা-ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে জন্মগত শক্তির যে পার্থক্য লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তাহা এক নূতন একপ্রাণতায় মুছিয়া যায়। এই আদর্শ অনুযায়ী নিজের জীবন গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব ব্যক্তির নিজের; সেইজন্ত ওয়ার্দ্ধাগঞ্জের সভায় স্থির করা হইয়াছে যে গান্ধী-ভক্তবৃন্দের কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকিবে না যাহার চাপে পড়িয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইতে পারে। একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি যে গান্ধীজীকে নূতন দেবতায় রূপান্তরিত করিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টাকে নিরুৎসাহিত করা হইয়াছে; অথচ কত সহজে এই দেশে এক নূতন দেবতার প্রতিষ্ঠা করিয়া নূতন মোহান্তশ্রেণীর সৃষ্টি করা যাইত। আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার যোগ্য। পণ্ডিত জবাহরলাল প্রমুখ কেন্দ্রীয় গবর্ন্মেন্টের নেতৃবৃন্দ গান্ধীভক্তির সুযোগ গ্রহণ করেন নাই; পণ্ডিতজী এই সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে তাঁহারা এই নূতন কাজে—'সর্ব্বোদয় সমাজ' প্রতিষ্ঠার কাজে পার্শ্বচর (camp followers) হইয়া থাকিবেন। এই ঘোষণা দ্বারা এই ভরসা আমাদের মনে উদয় হইয়াছে যে ভারতবর্ষের গঠনাত্মক কর্ম্মপদ্ধতির সেবকবৃন্দ রাজনীতির ক্রীড়নকরূপে ব্যবহৃত হইতে স্বীকার করিবেন না; কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এরূপ চেষ্টায় প্রশ্রয় দিবেন না।

এই সম্বন্ধ যদি সত্য হয় তবে আচার্য্য ভিনোবা ভাবের নেতৃত্বের মধ্যে একটা সার্থকতা লাভ করিবার আশা দেখা যায়। ওয়ার্দ্ধাগঞ্জের সভায় তিনিই গঠনাত্মক কর্ম্মিবৃন্দের নেতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। কোন নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব পাস করিয়া এই মনোনয়ন অস্বীকৃত হয় নাই; আচার্য্য ভিনোবা মনোনীত হইয়াছেন আদর্শনিষ্ঠার আকর্ষণে। তিনি এই সম্মেলন উপলক্ষে অহিংসার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। ব্যক্তিগত হিংসা-প্রবৃত্তি সংযত হইয়া সমাজ—সমষ্টিগত জীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমষ্টিগত জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে তাহা কেন প্রয়োগ করা হইবে না, এই সংযমের প্রবৃত্তি কেন কার্য্যকরী হইবে না, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ দেওয়া যাইতে পারে না। এই প্রশ্ন ও তাহার উত্তর বর্ত্তমান জগতের বৃহত্তম সমস্যা। বিজ্ঞানের অনুগ্রহে মানুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; প্রকৃতির শক্তিকেন্দ্র হইতে নানা মারণাস্ত্রের রহস্য সংগ্রহ করিয়াছে। মানুষ এখন ইচ্ছা করিলে সৃষ্টি ধ্বংস করিতে পারে। এই অবস্থায় অহিংসা ছাড়া গত্যন্তর নাই, এই হইল আচার্য্য ভিনোবার প্রতিপাদ্য বিষয়। ক্ষমতার লোভে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া আপনার বুদ্ধি ও শক্তির অপব্যবহার করিতেছে। এই বিপদ

হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে সকল শক্তি বিকেন্দ্র করিতে হইবে। তখনই সম্ভব হইবে সর্ব্বোদয় সমাজের জন্ম।

বি. এস. মুঞ্জে

মহারাষ্ট্রীয় নেতা ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিলেন। টিলক যুগের একজন দিকপাল গান্ধী যুগে বাঁচিয়া থাকিয়া, গান্ধী যুগের ভাব ও কর্ম্ম প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া, অনবনত-মস্তকে কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গেলেন। বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হয় তখন এই ক্ষাত্রধর্ম্মী ব্রাহ্মণকে যে ভাবের ভাবুক রূপে দেখিয়াছিলাম, নাসিকের শিবাজী ভোঁসলে সামরিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রূপে তার পূর্ণ পরিণতি লক্ষ্য করিয়াছি। আজীবন তিনি বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন যে ব্রিটিশ রাজশক্তির সম্মোহন নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া যাইতে হইবে—যে নীতি দেশের জনসাধারণকে "ভেড়ার পালে" পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, দেশের মন হইতে সমস্ত সামরিক ঐতিহ্য মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে। সেইজন্য আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই বুয়র যুদ্ধে—ডাক্তার রূপে সামরিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার প্রয়াসী। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকে সামরিক বিভাগের বাহিরে রাখিবার নীতি এই ভাবে কলে কৌশলে অতিক্রম করিয়া যখন তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেশের মনে নূতন জীবনের স্পন্দন শিহরিয়া উঠিয়াছে। ইহার দুই-তিন বৎসর পরেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে আশ্রয় করিয়া দেশের মন দুই-তিন বৎসরে পঞ্চাশ বৎসর আগাইয়া গেল। মহারাষ্ট্রের ও বাংলাদেশের বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদীরা এই যুগ-পরিবর্ত্তনের ধারক ও বাহক ছিলেন। গান্ধী যুগে এই ভাব ও কর্ম্মধারার গতি পরিবর্ত্তিত হয়। মহারাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গ এই পরিবর্ত্তনে হৃদয় দিয়া যোগদান করিতে পারেন নাই; যদিও তাঁহারা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত সব আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন। ডাঃ মুঞ্জে ১৯৪২এর আন্দোলনে যোগদান করেন নাই, কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজ দায়ে পড়িয়া ভারতবর্ষের জনসাধারণকে অল্পবিস্তর সামরিক ভাবাপন্ন করিয়াছিল; জ্ঞান অর্জ্জন করিবার এই সুযোগ নষ্ট হইতে দিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন; গান্ধীজীর অসহযোগ নীতি এই আপদধর্ম্মের পরিপন্থী ছিল।

ইহার বহু পূর্ব্ব হইতে কংগ্রেসের রাজনীতি মুসলমান সমাজের সংকীর্ণ মনোভাবের চাপে দিশেহারা হইয়া পড়িতেছিল। সাত-আট কোটি লোককে বাদ দিয়া রাজনীতি করা যায় না; আবার এই সাত-আট কোটি লোকের মনোভাব অনুযায়ী চলিতে গেলে দেশের ত্রিশ কোটি লোকের মন হারাইতে হয়। এই দোটানায় পড়িয়া কংগ্রেসের সংগ্রাম নানাভাবে বাহত হইতেছিল। ব্রিটিশ রাজশক্তি আমাদের অন্তর্বিরোধের সুযোগে নিজের খেলা খেলিতে লাগিল; মুসলমান সমাজকে এই খেলায় সহায়করূপে পাইয়া কংগ্রেসের দাবি-দাওয়া অস্বীকার করিতে পারিল। ফলে, কংগ্রেস-নিরপেক্ষ একটি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয় হইল। এই প্রতিষ্ঠানের (হিন্দু মহাসভার) পুরোভাগে দেখিতে পাই পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে, লালা লাজপৎ রায়কে, ডাক্তার মুঞ্জেকে ও ভাই পরমানন্দকে। এই প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের ভাব ও আদর্শকে ম্লান করিতে পারিল না; হিন্দু সমাজের একাংশের মনে যে বিক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছিল ইহা তাহা প্রকাশ করিয়া দিতে পারিল মাত্র। আজ তাঁহার তিরোধান উপলক্ষে সে সকল কথার বিচারের অবসর নাই। আমরা একজন মহারাষ্ট্রীয় দেশপ্রেমিকের দেহত্যাগে আত্মীয়জন বিয়োগব্যথা অনুভব করিতেছি।

ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া অকালে পরলোকগমন করিলেন; বাংলাদেশ একজন পণ্ডিত হারাইল। আমাদের দেশের জীবনে ইতিহাসের নানা পরিহাস অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যে ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি প্রায় হাজার বৎসর দেশের ইতিহাস সৃষ্টি করিল ও তার গৌরব ধারণ করিল তার চিহ্ন আমাদের দেশের জীবনে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নানা লেখায় প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সংস্কৃতির নানা ধারা আমাদের রীতিনীতির মধ্যে লুকাইয়া আছে এমন কৌশলে যে আমরা তৎসম্বন্ধে অবহিত নহি। কেন এরূপ ঘটিল, কি করিয়া হিন্দুধর্ম্ম এমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের নানা বৈশিষ্ট্যকে গ্রাস করিয়া বসিল, তাহা ইতিহাসের এক রহস্য। সিংহল হইতে অনাগরিক ধর্ম্মপাল আসিয়া এই স্মৃতি পুনরুদ্ধার করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া সেই ধারার স্রোত অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ দান। বৈদিক ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম মিলিত হইয়া বা পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে কিরূপে বর্ত্তমান হিন্দু-ধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়াছে, তার সম্যক পরিচয় এখনও আমরা পাই নাই। সেই যুগের ইতিহাস না বুঝিলে আমরা ভারতবর্ষের জীবনধারার গতি-পরিণতির সন্ধান পাইব না। আমাদের দেশ দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। একদিকে পশ্চিমে আমাদের ইসলামের আকর্ষণ; অন্যদিকে পূর্ব্বে আমাদের বৌদ্ধ ভাবের আকর্ষণ। একদিকে ২৫ কোটি লোকের নব-জাগরণের আহ্বান; অন্য দিকে ৫০ কোটি লোকের আহ্বান; প্রাচীন যুগের সংস্কৃতির স্মৃতি ৩০ কোটি হিন্দুকে আজ এক নূতন জগতের রঙ্গভূমিতে আহ্বান করিতেছে। চীন, জাপান, শ্যামদেশ, ব্রহ্মদেশ, নূতন করিয়া আমাদের নিকটে আসিতেছে প্রাচীন পরিচয় ঝালাইয়া নূতন সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য। এই দুই ভাব-জগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভারতবর্ষকে কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। মুসলীম জগতের ও বৌদ্ধ জগতের মধ্যে ভারতবর্ষ করিবে দূতিয়ালী। সেই কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে চাই জ্ঞান। ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া আমাদের বৌদ্ধ জগতের বার্ত্তা কিছু কিছু শুনাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করিবে, তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

পত্রাবলী

[রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে প্রকাশিত

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

অল্পকালের মধ্যে যে গল্পের বই পড়িয়াছি তাহার মধ্যে **The Charwomen's Daughter** নামক বইখানি বড় ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থকার একজন আধুনিক কবি এবং তাহার গদ্যরচনা ইংলণ্ডের পাঠকসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। জানি না বাংলায় তর্জ্জমা করিতে হইলে কাহারো অনুমতির প্রয়োজন হইবে কিনা। গ্রন্থকারের নামটি **James Stephen**। রথী[1]র কাছে এই বই আছে। রথী রাঁচি গিয়াছে—ফিরিলে পাওয়া যাইতে পারে। সত্যেন্দ্র[2]র চোখ খারাপ নহিলে তাহারই হাতে তর্জ্জমা হইত ভাল। চারু[3]কে চেষ্টা করিতে বলিবে। আবশ্যক মত কিছু কিছু বাদসাদ দেওয়া দরকার হইতে পারে। গল্পটি ভাল সন্দেহ নাই—কিন্তু যাহারা গল্প পড়ে তাহাদের ভাল লাগিবে কিনা সে কথা বলা কঠিন। **Joseph Conrad** এখনকার কাগজের গল্পলেখকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়—তাঁহার ছোট গল্প কিছু কিছু পড়িয়াছি—পড়িয়া ভাল লাগিয়াছে। ইতি রবিবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

তত্ত্ববোধিনীতে আমার ও বড়দাদা[4]র যে লেখা বাহির হইতেছে চারু তাহা প্রবাসীর জন্য চাহিয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ দুইটি কতক ছাপানো ফর্ম্মা ও প্রুফ এবং কতক কাপি আকারে পাঠাইতেছি। বৈশাখের তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে সঙ্গেই যদি প্রবাসীতে দিতে ইচ্ছা করেন ত দিবেন।

আমার বড় মেয়ে একটি ইংরাজি গল্পের তর্জ্জমা করিয়াছেন পাঠাইতেছি যদি পছন্দ করেন ত প্রবাসীতে দিবেন নচেৎ ভারতী প্রেসে পাঠাইয়া দিবেন।

আগামী ১লা বৈশাখে আমাদের আশ্রমে নববর্ষের উৎসব হইবে সে জন্য আপনাকে নিমন্ত্রণ রহিল। তখন Easter-এর ছুটি আছে। মেয়েদের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল—তাহারা এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য উৎসাহিত হইয়াছে—আপনি তাহাদের সহায় না হইলে তাহাদের গতি নাই—এই কারণে আপনাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিব এইরূপ ভরসা তাহাদিগকে দিয়াছি।

ব্যাকরণের প্রথমাংশ পুনরায় সংশোধন করিয়া লিখিতে হইবে এই জন্য এবার দেওয়া সম্ভব হইবে না—জ্যৈষ্ঠে যাইবে।

বোলপুরে কলেজ স্থাপন সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে আর একবার আলোচনা করিয়া দেখিব। ইতি মঙ্গলবার

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধটি সংশোধন করিয়া পাঠাইলাম। বোধ করি সবশুদ্ধ এক ফর্ম্মার অধিক হইবে না। আমার ইচ্ছা প্রবাসীতে এই প্রবন্ধটি ছাপা হইলে সেই সঙ্গে চটি আকারে ইহাকে বাহির করিয়া চার পয়সা দামে বিক্রয় করা হয়। ছাপিবার খরচ বোধ করি বেশি হইবে না—সে খরচটা বিক্রয়ের মূল্য হইতে তুলিয়া লইতে পারিবেন। এইরূপ সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া আমাদের বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা সুলভ চটি আকারে প্রচার করিলে উপকার হইতে পারে। যদি আমার এ প্রস্তাবে আপনার সম্মতি থাকে তবে চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। লাভের টাকা এইরূপ সুলভ পুস্তিকা প্রচারকার্য্যেই নিযুক্ত করা যাইবে।

এখনো নদীর উপকূল পথ গুণ টানিয়া চলিবার পক্ষে সর্ব্বত্র সুগম হয় নাই অতএব শিলাইদহের নিকটেই পদ্মার চরে বোট বাঁধিয়া থাকিব। প্রুফ ও পত্রিকা প্রভৃতি "শিলাইদা, নদিয়া" ঠিকানাতেই পাঠাইবেন।

শান্তা[5] ও সীতা[6]কে আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ জানাইবেন ইতি মঙ্গলবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১। শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
৩। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫। শ্রীশান্তা দেবী ৬। শ্রীসীতা দেবী

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সেই পাঠ্যবহিটির কাপি পাঠাই। ইহার সঙ্গে গোটা দুই তিন গল্প যোগ করিতে হইবে। তাহার মধ্যে "রাসমণির ছেলে" একটি এবং "গুপ্তধন" একটি। গুপ্তধন গল্পটি "আটটি গল্পে" পাইবেন, আরও গল্প যদি দেওয়া দরকার বোধ করেন তবে সেই আটটি গল্প হইতে বাছিয়া লইবেন। বলা বাহুল্য যদি এই কাপির মধ্যে কোনো কারণে কোথাও কিছু পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন আবশ্যক বোধ করেন তবে কুণ্ঠিত হইবেন না। বইয়ের নাম কি হইবে যদি ভাবিয়া ঠিক করেন তবে আমি বাঁচি। নামকরণ আমার আসে না।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রাথ ঠাকুর

ওঁ

বুধগয়া

শ্রদ্ধাস্পদেষু

চারুর ছুটি শেষ হইয়াছে কিন্তু এখনো তাহাকে আমি ছুটি দিতে পারিতেছি না। সোমবারে এলাহাবাদে যাইব মঙ্গলবারে পৌছিব সেখানে চারুকে আশ্রয় করিয়া ইণ্ডিয়ান প্রেসের কিছু কাজ সারিবার ইচ্ছা আছে। এই দুই তিন দিনের জন্য প্রবাসীর কাজের যদি কিছু ক্ষতি হয় তবে সে অপরাধে আমাকেই অপরাধী করিবেন এবং ক্ষমাও করিবেন আপনার কাছে এই প্রার্থনা করি। ইতি রবিবার

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমার দৌহিত্রের জন্ম উপলক্ষ্যে আমাকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে।

"রূপ ও অরূপ" বলিয়া একটি লেখা প্রবাসীর জন্য পাঠাইয়াছিলাম পাইয়াছেন কি?

হেমলতা[৭] বৌমার কবিতাটি আপনার নিকট পাঠাইবার জন্য জ্ঞানের[৮] নিকট দিয়াছিলাম—পান নাই কি?

আপনার প্রেরিত কাগজগুলি ষ্টেশনেই পাইলাম সুতরাং সঙ্গেই আসিয়াছে তাহার একটা সদ্গতি করিবার চেষ্টা করিব।

গল্প সম্বন্ধে আপনার প্রস্তাব ত আমার কাছে ভালই ঠেকিতেছে। ১১ই মাঘের পূর্ব্বে গল্প লেখায় হাত দেওয়া ঘটিবে না। ইতি শুক্রবার

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

দীর্ঘকাল কন্যার পীড়ার উদ্বেগে Theistic Conference-এর জন্য "ধর্ম্মশিক্ষা" প্রবন্ধটি লিখিতে পারি নাই। এখানে আসিয়া সেটি লিখিয়াছি। কিন্তু এখানে নিরুদ্বেগ অবকাশ এত বেশি যে প্রবন্ধটি বিনা বাধায় যথেষ্ট দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। এত বড় বাংলা প্রবন্ধ কনফারেন্স সভায় পাঠ করা সঙ্গত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। যদি সময় থাকিতে লেখা শেষ করিতে পারিতাম তবে ইংরেজি অনুবাদের চেষ্টা করিয়া ওটাকে বিদেশীদের কাছে ব্যবহার-যোগ্য করিয়া তুলিতে পারা যাইত। কিন্তু আর তাহার সময় নাই। অতএব যদি আমাকে অব্যাহতি দেন তবে লেখাটা আর কোনো সময়ে বাঙালী শ্রোতাদের কাছে পড়িয়া চুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। মনে ভাবিয়াছিলাম লেখাটা পাঠাইয়া দিব তাহার পরে আপনারা যা খুসি করিবেন কিন্তু তাহার চেয়ে নিজে উপস্থিত হইয়া পাপক্ষালন করাই ভাল। কাল সন্ধ্যার সময় কলিকাতায় পৌছিতে চেষ্টা করিব। মঙ্গলবার আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে। কি বলেন? মঙ্গলবার সকালে আপনার সঙ্গে দেখা হইতে পারিবে কি? যদি জোড়াসাঁকোয় ইহার উত্তর পাঠাইয়া দেন তবে কাল সন্ধ্যার সময়েই পাইব। ইতি রবিবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কবিতা প্রবাসীর জন্য পাঠাইলাম। যে খুসি নাম দিবেন। এক একটা লাইন বড় আছে, বোধ হয় দুই কলামকে এক করিয়া যদি এটা ছাপান তবে স্থানাভাব হইবে না। আমার বোধ হয় কবিতা সেইরূপভাবে ছাপানো হইলে গদ্য প্রবন্ধের সহিত তাহার একটু বিশেষত্ব রক্ষা হয়।

মার্কাস অরেলিয়াসের আত্মচিন্তা সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুচার লাইনের বেশি লিখিতে পারিব না। মন এখন অন্য কাজে ব্যস্ত আছে এবং বিশ্রামও অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

আশা করি ভালো আছেন। ইতি ১৯ ফাল্গুন

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭। শ্রীহেমলতা দেবী ৮। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

ওঁ

শান্তিনিকেতন।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই সঙ্গে একটি ইংরেজি কবিতা পাঠাইতেছি। কবিতাটি আমার বন্ধু Mrs. Seymour-এর রচনা। এটি আমাদের সকলেরই বিশেষ ভাল লাগিয়াছে বোধ হয় আপনারও পছন্দ হইবে সেই আশায় পাঠাইলাম—যদি Modern Reviewতে ছাপান তবে এক কপি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন—

Mrs. Seymour
909 Nevada Street
Urbana. Illinois
U. S. A.

প্রবাসীর জন্য আমার খাতায় অনেকগুলি গান জমিয়া উঠিয়াছে—কুঁড়েমি করিয়া কপি আর হইয়া উঠে না। শুনিয়াছি চারু পূজার ছুটিতে শান্তিনিকেতনে আসিবেন তিনি পছন্দ করিয়া বাছিয়া লইতে পারিবেন। আশা করি ভাল আছেন—ছুটিতে কি কোথাও যাইবেন?

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাল রেজিষ্ট্রি ডাকে আপনাকে সেই সংকলিত স্কুল বইয়ের কাপি পাঠাইয়াছি। তাহার মধ্যে "রাসমণির ছেলে"র গল্পটা দিতে বলিয়াছি। কিন্তু আমার বোধ হয় সেটা না দেওয়াই ভাল। কারণ এই নূতন গল্পটি আর একটি বইয়ে ছাপান হইতেছে এবং এ বইটি বিদ্যালয়ের সম্পত্তি ইহা পাব্লিশারের হাতে দিই নাই—সে বই হইতে গল্প চুরি করিয়া আমাদের বিদ্যালয় কেন নিজেকে নিজে ঠকাইবে? আপনি আটটি গল্প বই হইতে অনধিকার প্রবেশ, কাবুলিওয়ালা, সাক্ষ্যদান প্রভৃতি তিন চারিটি গল্প বাছিয়া লইয়া এই বইয়ের মধ্যে পুরিয়া দিলে কোন ক্ষতি হইবে না এবং সেই ছোট ছোট গল্প ছেলেদের পড়িবার পক্ষেও সুবিধা হইবে। কি বলেন? জীবনস্মৃতির প্রুফটা পাঠাইবেন।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার অনুরোধ মত সুরেন[১] চোখের বালির প্রথম কিস্তি ওখানে পাঠাইয়াছেন। অত্যন্ত গোলমালের মধ্যে আছি। একবার চোখ বুলাইয়া লইলাম। মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা পেন্সিলের লেখায় পরিবর্তন করিয়াছি মাত্র। মোটের উপর আমারও বোধ হয় ভালই হইয়াছে, আপনি পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। আগামী বুধবারে সায়াহ্নে কলিকাতায় পৌঁছিব। ইতি সোমবার

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

১। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

প্রতিভা তোমার নহে সাধারণ—জ্ঞানভূয়িষ্ঠ মন
সাধকের মত ছিল তব আচরণ,
অক্রোধী, শুধু অসত্যে ক্রোধ, ন্যায়ের পক্ষপাতী,
দুর্ব্বাসা নয়—কপিলের তুমি জাতি।
সহিতে নারিতে অতি প্রবলেরো অসাধুতা অবিচার,
কঠিন-কঠোর সমালোচক যে তার।
রাজদুয়ারেতে কখনো যাও নি চাওয়ার কিছুই নাহি
তুমি নৈষ্ঠিক অশূদ্র প্রতিগ্রাহী।
করিতে চেয়েছ দেশ জাতি ভাষা শুচি ও সমুন্নত
পূত নির্ম্মল করা ছিল তব ব্রত।
ফিরালে জাতির দৃষ্টিভঙ্গী দেখাইয়া ভুলগুলি
বিনয়-বধিরে চোখে দিয়া অঙ্গুলি।
যাহা কুৎসিত, ঘৃণ্য, দুষ্ট, সমাজের জঞ্জাল,
সরাইতে তব চেষ্টা যে চিরকাল।
তুমি জ্ঞানযোগী, কর্ম্মযোগী যে, সদা দেহেমনে শুচি
বদলিয়ে দিলে তুমিই দেশের রুচি।
সংস্কারক যে ছিলে তুমি বড়, সমনিন্দাস্তুতি
জাতিকে দিয়াছ সূক্ষ্ম রসানুভূতি।
যে ছদ্মবেশে দেবতা আসিয়া অভয়ের বাণী কন
তুমি ছিলে সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

সিন্ধু সভ্যতা ও মেশোপটেমিয়া

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মোহেঞ্জোদারো স্তূপের খননকার্য্য আরম্ভ হইবার বহুপূর্ব্বে মেশোপটেমিয়ার প্রাগৈতিহাসিক আমলের নগরসমূহের ধ্বংসস্তূপগুলি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ খনন করিয়া প্রভূত পরিমাণে মূল্যবান নিদর্শন উদ্ধার করিয়াছিলেন। এইগুলি এবং মিশর প্রভৃতি দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ সম্বন্ধে আলোচনার ফলে মেশোপটেমিয়ার বিভিন্ন যুগের প্রাচীন কৃষ্টিগুলির মোটামুটি ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। মোহেঞ্জোদারোর স্তূপ খনন করিয়া যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার চিত্র ও বিবরণ দিয়া সর জন মার্শাল বিলাতী কাগজে প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার পর মেশোপটেমিয়া, পশ্চিম ও মধ্য-এশিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে প্রত্নতত্ত্বের কাজ যাঁহারা করিয়াছিলেন তাঁহাদের দৃষ্টি সিন্ধু উপত্যকার লুপ্ত সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হইল। মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার নিদর্শনগুলির মধ্যে মেশোপটেমিয়ার নিদর্শনের অনুরূপ বস্তু কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। মেশোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত কয়েকটি নিদর্শনও সিন্ধু উপত্যকার জিনিস বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই প্রমাণের বলে প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার সভ্যতা ও সিন্ধু সভ্যতার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল পণ্ডিতগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন মেশোপটেমিয়া ও তাম্রযুগের সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদিগের মধ্যে জাতিগত, বাণিজ্যিক ও কৃষ্টিগত সংযোগ ছিল তাঁহারা এইরূপ মনে করেন; বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই তিন প্রকারের সংযোগ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ কি মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহার সমর্থনে কি প্রকারের যুক্তিপ্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা হইবে।

এই তিন প্রকারের সংযোগ সম্বন্ধে আলোচনায় অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আলোচনার পটভূমি রচনা করিবার জন্য মেশোপটেমিয়ার ইতিহাস ও তাহার প্রাচীন সভ্যতা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বলা আবশ্যক।

মেশোপটেমিয়া ট্রাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিশ নদীর মধ্যবর্ত্তী সমতলভূমি। ইহার উত্তরে আর্ম্মেনীয়া, কুর্দ্দীস্থান ও তুর্কী, পশ্চিমে সিরিয়া ও আরব, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর এবং পূর্ব্বে ইরাণ। তুর্ক জাতি এই অঞ্চলের আদিবাসী নহে। তাহাদিগকে বাদ দিলে দেখা যায় পশ্চিমে সেমিটিক আরব জাতি ও উত্তর এবং পূর্ব্বে ইরাণী গোষ্ঠীর জাতি মেশোপটেমিয়াকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণে মেশোপটেমিয়া ভারত মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত।

প্রাচীন ইতিহাসে ইউফ্রেটিস উপত্যকার দক্ষিণাংশ সুমের নামে পরিচিত। বাইবেলে দেখা যায় বাবেল, এরেক, আক্কাদ ও কালনে সিনার বা সুমেরের অন্তর্ভূক্ত। বলা হইয়াছে যে সিনার হইতে প্রস্থান করিয়া অসুর নিনেভে, রেহোবোথ ও কালা নির্ম্মাণ করেন (Gen. 10)। বাইবেলের মতে দেখা যাইতেছে যে উত্তর-মেশোপটেমিয়ার সভ্যতা দক্ষিণ অঞ্চলের সভ্যতার নিকট ঋণী। বাবিলোন নগর বাগদাদের ৬০ মাইল দক্ষিণে ইউফ্রেটিস তীরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু বাবিলোনীয়া বলিতে উত্তরে আসিরীয়া, দক্ষিণে চ্যালডিয়া (কাল্দু) ও পারস্য উপসাগর, পূর্ব্বে এলামের পর্ব্বতমালা (দক্ষিণ-পশ্চিম ইরাণ), পশ্চিমে সিরিয়া ও আরব,—এই সীমানার মধ্যে অবস্থিত টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল বুঝাইত। প্রাচীন ম্যাপে সিনারের দক্ষিণে, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের সঙ্গমের উত্তরে, চ্যালডিয়া অবস্থিত। সুমেরীয় ইতিহাসে বিখ্যাত উর, এরেক প্রভৃতি নগর এই অঞ্চলে। চ্যালডিয়ার অধিবাসীরা চ্যালডু বা ক্যালডু নামে পরিচিত। নাবোপোলাসারের (Nabopolassar, খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী) আমলে সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ বাবিলোনীয়া চ্যালডিয়া নামে পরিচিত হয়। সুমেরের উত্তরে বাবিলোন, বাবিলোনের উত্তরে টাইগ্রিসের পশ্চিমতীরে ২০ মাইল ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল প্রথম সারগণের রাজধানী আক্কাদ বা আগেদ। আক্কাদের উত্তরে ট্রাইগ্রিসের পূর্ব্বতীরে প্রাচীন অসুর নগর। অসুর হইতে টিগ্লেথপিলেসরের সাম্রাজ্যের নাম হইয়াছে আসিরীয়া। নিনেভে ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। আজারবাইজান ও মিডিয়ার পশ্চিমে মেশোপটেমিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলের নাম আসিরীয়া। কোন কোন পণ্ডিতের মতে প্রাচীন আক্কাদজাতি পরবর্ত্তীকালে আসিরীয় (Assyrians) নামে পরিচিত হয়।

মেশোপটেমিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানের কথা বলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে মেশোপটেমিয়া আরবজাতির অধ্যুষিত দেশ। পশ্চিমে আরব ও সিরিয়া হইতে আরব জাতির চাপ মেশোপটেমিয়া বা ইরাকের সীমানা অতিক্রম করিয়া ইরাণের খুজিস্থান, লারীস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রসারিত হইয়াছে। সেমিটিক গোষ্ঠীর প্রবাহ প্রথমে পশ্চিমের মরু অঞ্চল হইতে আসিয়া সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন প্লাবিত করিয়া

মেশোপটেমিয়ার উত্তর অংশে পৌছায়। অনুমান করা হয় ইহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ সহস্রকের ব্যাপার। উত্তর-মেশোপটেমিয়ায় সেমিটিক প্লাবন আসিবার পূর্ব্বে দক্ষিণে সুমেরীয়গণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অনুমান করা হয় ইহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম সহস্রকে ঘটিয়াছিল। দক্ষিণ-মেশোপটেমিয়ার সুমেরীয় সভ্যতা এবং সুমেরের পূর্ব্বে এলামের সভ্যতা প্রায় সমসাময়িক বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন এবং এলামাইট ও সুমেরীয়গণ কোন কোন পণ্ডিতের মতে এক গোষ্ঠীভুক্ত বা সমগোষ্ঠীয় জাতি ছিল।

প্রাচীন মেশোপটেমিয়া বহু গৌরবময় সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের জন্মভূমি। উত্তরে আর্ম্মেনীয়ার উচ্চভূমি হইতে ক্রমে ঢালু হইয়া দক্ষিণে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত ও পূর্ব্বে জাগ্রোস পর্ব্বতমালার সানুদেশ হইতে ঢালু হইয়া আরবের বালুকারাশি পর্য্যন্ত যে ভূখণ্ড বিস্তৃত সে দেশের মধ্যে এমন কি বিশেষত্ব ছিল যে এতগুলি সাম্রাজ্যের উৎপত্তি সেখানে সম্ভব হইয়াছিল? ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের জলে এমন কোন গুণ ছিল যে বিভিন্ন যুগে এতগুলি সভ্যতার উৎপত্তি মেশোপটেমিয়ায় সম্ভব হইয়াছিল? পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে মেশোপটেমিয়া, মিশর ও সিন্ধু উপত্যকা লইয়া। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস, নীল ও সিন্ধু নদ প্রায় একই যুগে সভ্যতার জন্মদাত্রী হইয়াছিল। তার পরের অধ্যায় ঈজিয়ান বা প্রাক্-হেলেনিক সভ্যতা। তৃতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল ইরাণকে লইয়া। আকাদ, বাবিলোন ও আসিরীয়ার সভ্যতাকে সেমিটিক সভ্যতা বলা হইয়াছে। বাবিলোন ও আসিরীয়ার সাম্রাজ্য সেমিটিক গোষ্ঠীর উত্তর শাখাভুক্ত জাতির কীর্ত্তি। এই উত্তর শাখাভুক্ত আরমীয়ান জাতি উত্তর মেশোপটেমিয়া ও সিরিয়ার মধ্যবর্ত্তী আরম নগরে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। প্রাচীন ম্যাপে ও বাইবেলে আরম পদন (Padan Aram) আরম বলিয়া উল্লিখিত। আরমাইক লিপি ও ভাষা বাবিলোন ও আসিরীয়ায় গৃহীত হয়। হিব্রু জাতির এই শাখার সঙ্গে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। আরবগণ দক্ষিণ সেমিটিক শাখাভুক্ত। সাসানীয়ান আমলের পূর্ব্বে আরবজাতির কোনরূপ বৈশিষ্ট্যের প্রমাণাভাব।

মেশোপটেমিয়ায় প্রাচীন সভ্যতা বিকাশের ব্যাপারে উহার ভৌগোলিক অবস্থানের কিছু পরিমাণে হাত ছিল। মেশোপটেমিয়া ছিল মধ্য-এশিয়া হইতে স্থলপথে ও পূর্ব্ব-এশিয়া হইতে জলপথে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগের পথের মধ্যে। মেশোপটেমিয়ায় প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির অভ্যুদয়ে এই বাণিজ্যিক সংযোগ যে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মেশোপটেমিয়া ও পারস্যে আরব অধিকার বিস্তৃত হইলে এই বাণিজ্যিক সংযোগ সুদৃঢ় করিবার জন্য খলিফ ওমর পারস্য উপসাগরের মুখে বস্‌রা বন্দর প্রতিষ্ঠিত করেন। ইরাণের সুফাইদ সম্রাট শাহ আব্বাস ঐ উদ্দেশ্যে বন্দর আব্বাস প্রতিষ্ঠিত করেন। সিন্ধু সভ্যতার যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে মেশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক সংযোগের কথা পরে বলা হইবে।

প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাস পূর্ব্বের এক প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে। (প্রবাসী পৌষ, ১৩৫২)।

উত্তর মেশোপটেমিয়ায় আকাদীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম সারগনের দ্বারা। ইহা কোন কোন মতে খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৮০০ সনের ব্যাপার। অন্যমতে খ্রীঃ পূঃ ২৮৭২ সনে আকাদীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সারগণের সাম্রাজ্যকে প্রথম সেমিটিক সাম্রাজ্য বলা হইয়াছে। মেশোপটেমিয়ার দক্ষিণে সুমেরের অভ্যুদয়ের দুইটি যুগ লক্ষিত হয়। প্রথম যুগ আকাদের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী এই রূপ বলা হয়। পূর্ব্বের এক প্রবন্ধে (সিন্ধুযুগ হইতে বৈদিক যুগ, প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩৫৪) মার্শালের এই মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে সিন্ধু উপত্যকার সহিত মেশোপটেমিয়ার সংযোগের যে সকল নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা সারগণের পূর্ব্বেকার বা তাঁহার সমসাময়িক। সুমেরের অভ্যুদয়ের প্রথম যুগ অন্তে উহা আকাদীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহার পর সুমেরের অভ্যুদয়ের দ্বিতীয় যুগ আসে। দ্বিতীয় যুগের সুমেরীয় সাম্রাজ্য উত্তর ও দক্ষিণ মেশোপটেমিয়া, পূর্ব্বে এলাম ও উত্তরে এশিয়া মাইনর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। ইহার পরে বাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। হাম্মুরাবি যখন বাবিলোনের সিংহাসন অধিকার করেন (খ্রীঃ পূঃ ২১২৩) এশিয়া মাইনরের হিটাইটগণ হাম্মুরাবির বংশকে বিতাড়িত করিলে বাবিলোন কাসাইটগণের অধিকারে আসে। কাসাইটগণ পুষ্ট-ই-কোহর পার্ব্বত্য অঞ্চলবাসী ছিল কেহ কেহ এইরূপ বলেন। পুষ্ট-ই-কোহ লুরীস্থানের লুরীকুচাক বিভাগের মধ্যে। লুরীস্থানের অপর বিভাগ লুরীবুজুর্গের অধিবাসী বকতিয়ারীদিগকে কাসাইটগণের প্রতিনিধি বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। লুরীকুচাকের পশ্চিমে আসিরীয়ার সমতল ভূমি। বহুকাল বাবিলোনের অধীন থাকিবার পরে খ্রীঃ পূঃ ১১২০ অব্দে আসিরীয়ার টিগ্লেথপিলেসর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বাবিলোন বিজয় করেন। তাঁহার পরবর্ত্তিগণের আমলে আসিরীয় সাম্রাজ্যের এবং মেশোপটেমিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসের গৌরবময় যুগ। মীড ও বাবিলোনীয়দিগের আক্রমণে আসিরীয়ার রাজধানী ধ্বংস হইল খ্রীঃ পূঃ ৬০৭ সনে।

আসিরীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস হইবার সঙ্গে মেশোপটেমিয়ার

সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইল। পশ্চিম এসিয়ায় সেমিটিক প্রাধান্য লুপ্ত হইয়া ইরাণীয় গোষ্ঠীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। নিনেভে ধ্বংসের সময় হইতে (খ্রীঃ পূঃ ৬০৭) কাদিসীয়া ও নেহাভেন্দের যুদ্ধে (খ্রীষ্টাব্দ ৬৩৭ ও ৬৪২) সেমিটিক আরব জাতির হস্তে সাসানীয় রাজশক্তি বিধ্বস্ত হইবার সময় পর্য্যন্ত ইরাণীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী পার্সিপোলিস, একবাটানা ও টেসিফোন (Ctesiphon.) হিন্দুকুশ হইতে হেলেস্পণ্ট ও পরে ইউফ্রেটিশ এবং উত্তরে আর্ম্মেনীয়া, ককেশাস ও কাস্পিয়ান, দক্ষিণে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের প্রধান রাজনৈতিক কর্ম্মকেন্দ্র ছিল। আরসিকিডান ও সাসানীয় আমলে রাজধানী ছিল টেসিফোন। পার্সিপোলিস ধ্বংস হইয়াছিল বিজয়ী গ্রীক সৈন্যের হাতে। টেসিফোন ধ্বংস হয় বিজয়ী আরব সৈন্যের হাতে।

হাকামণি সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে বাল্খ হইতে পশ্চিম গ্রীস পর্য্যন্ত অঞ্চল গ্রীকদিগের দখলে যায়। সেলুসিড রাজাদের রাজধানী ছিল আসিরীয়া ও বাবিলোনের মধ্যে টাইগ্রিসের তীরে নির্ম্মিত সেলুসিয়া নগরী। রোমান আমলে ইউফ্রেটিস ছিল ইরাণীয় ও রোমক সাম্রাজ্যের সীমানা নির্দ্দেশক। আরবদখলে প্রায় হাজার বৎসর থাকিবার পর খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে মেশোপটেমিয়া তুর্কদিগের দ্বারা বিজিত হয়।

উপরে বলা হইয়াছে মেশোপটেমিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সহিত বাণিজ্যিক সংযোগের পথের মধ্যে অবস্থিত। মেশোপটেমিয়া ভারতবর্ষের এত নিকটে অবস্থিত যে অতি প্রাচীন যুগ হইতে ভারতবর্ষ ও মেশোপটেমিয়ার মধ্যে যে বাণিজ্যিক ও অন্যবিধ সংযোগ ছিল ইহা অনুমান করা কঠিন নহে। এই সংযোগ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এখানে তাহার দুই-একটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কোন কোন পণ্ডিত মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে সিন্ধু সভ্যতার বাহকগণ মেশোপটেমিয়া হইতে সমুদ্রপথে সিন্ধু উপত্যকায় উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন সুমের জাতি ভারতবর্ষ হইতে দক্ষিণ মেশোপটেমিয়ায় গিয়াছিল। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে যদু, তুর্ব্বশ, ভরত, পুরু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদীয় গোষ্ঠী সিরিয়া ও উত্তর মেশোপটেমিয়া হইতে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছিল। একজন পণ্ডিত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পশ্চিম-ভারতের সহিত মেশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক সংযোগ খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের প্রাচীন, ইহা খ্রীঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর অপেক্ষাও প্রাচীন হইতে পারে। খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বা ৪০০০বৎসর পূর্ব্বে এই দুই দেশের মধ্যে সেগুন কাঠ ও মসলিনের ব্যবসায় চলিত (*J. R. A. S. XX. 336, 337; XXI. 204*)। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে মিশরের খ্রীঃ পূঃ ১৭০০ বৎসরের প্রাচীন কবরে ভারতীয় মসলিন ও নীল (indigo) পাওয়া গিয়াছে (*J. R. A. S. XX 206*)। হিন্দুদিগের মধ্যে চান্দ্র মাস গণনার রীতি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছে এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। অনুমান করা হয় যে চন্দ্রের উপাসনা ও চান্দ্র মাস গণার রীতি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়া থাকিলে খ্রীঃ পূঃ ৪০০০ বৎসরের পূর্ব্বে উহা আসিয়াছিল, কারণ সারগণের সময়ে উহা প্রাচীন বলিয়া পরিগণিত হইত। একটি মত অনুসারে "**The trade records of the black-headed, perhaps Dravidian-speaking Sumris of the Euphrates mouth prove so close relation with the peninsula of Sinai and Egypt as to make a similar conection with India probable as far back as 6000 B.C.**" (*J. R. A. S. XXI. 325, 326*)। সেইস কতকটা এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। (*Hibbert Lectures 33*)। ওসীথানার সু বা সৌ (Sus or Saus) জাতীয় বণিকগণ বেলুচীস্থানের পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পাতালে (দক্ষিণ সিন্ধু দেশ) বাস করিতে আরম্ভ করে। পরে ইহারা উত্তর গুজরাতে চলিয়া যায়। তাহাদের নাম হইতে সৌরাষ্ট্র নাম আসিয়াছে। সুদিগের পূর্ব্বে চন্দ্র উপাসক সুমরীগণ পশ্চিম-ভারতে আসিয়াছিল এইরূপ বলা হইয়াছে।

সে যাহা হউক, মেশোপটেমিয়ার ইতিহাসের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার সভ্যতা বিকাশের যুগকে প্রাক্-সেমিটিক ও সেমিটিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রাক্-সেমিটিক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল দক্ষিণে সুমেরে, সেমিটিক সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল উত্তরে। সিন্ধু সভ্যতার বাহকদিগের সঙ্গে মেশোপটেমিয়ার সংযোগের কথা বলিতে প্রধানতঃ দক্ষিণের সুমেরদিগের সঙ্গে সংযোগ বুঝায়।

সুমেরীয়গণ কোন্ গোষ্ঠীর জাতি ছিল সে সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীদিগের মত এই যে সুমেরীয়গণের মধ্যে লম্বা মুণ্ড ও গোল মুণ্ড এই দুই টাইপের লোক ছিল। প্রথম গোষ্ঠীর নাম ভূমধ্যসাগরীয় (**Mediterranean**) এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীর নাম আর্ম্মেনয়েড (**Armenoid**)। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মতে লম্বা মুণ্ড গোষ্ঠীর উৎপত্তিস্থান ভূমধ্যসাগরের উপকূল অঞ্চল ও গোল মুণ্ড টাইপের উৎপত্তিস্থান আর্ম্মেনীয়ার মালভূমি। কিন্তু দেখা যায়, যে উচ্চভূমির পশ্চিম প্রান্ত কুর্দ্দীস্থান, আজারবাইজান হইয়া আর্ম্মেনীয়ার পর্ব্বতগ্রন্থিতে মিলিয়াছে, তাহার পূর্ব্বপ্রান্ত ইরাণ, বাল্খ ও বাদাকসান

হইয়া পামীরের পর্ব্বতগ্রন্থিতে মিলিয়াছে। এই পূর্ব্ব প্রান্তের অধিবাসীরাও গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর। এই গোষ্ঠীকে আলপাইন, পামীরীয় বা ইরাণো-পামীরীয় বলা হয়। গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর এবং মোটামুণ্ড এক ভাষা গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা ভাষাভাষী দুই প্রান্তের অধিবাসীদিগকে দুইটি গোষ্ঠীর নাম নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীরা দিয়াছেন। ইহা উদ্দেশ্যমূলক অথবা ইহার কোন প্রকৃত কারণ আছে কিনা পরে দেখা যাইবে। দেখা যায় যে বিভিন্ন দেশের প্রাগৈতিহাসিক আমলের স্তূপসমূহ হইতে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর লোকের অস্তিত্বের প্রমাণ যেখানে পাওয়া গিয়াছে সেখানেই ঐ গোষ্ঠীকে আর্মেনয়েড বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সুমেরের লম্বা-মুণ্ড গোষ্ঠীকে কেহ কেহ দ্রাবিড় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তাহারা সেমিটিক। সুমেরীয়গণের মধ্যে ভূমধ্যসাগরীয় ও আর্মেনয়েড ব্যতীত অন্য গোষ্ঠীর লোকও ছিল, এইরূপ বলা হইয়াছে। কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর মতে লম্বামুণ্ড **Northern steppe** folk অর্থাৎ প্রোটো নর্ডিক এবং পামীরীয় গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর লোক সুমেরে বর্ত্তমান ছিল।

সুমেরের পূর্ব্বে এলাম। সুমেরীয় ও এলামাইট কৃষ্টি প্রায় সমসাময়িক এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে। ল্যাংডন এবং আরও কেহ কেহ বলেন সুমেরীয় ও এলামাইটগণ একই গোষ্ঠীর এবং এই দুই কৃষ্টি মূলে এক। ডিকসন ও হেমীর (Hamy) মতে প্রকৃত সুমেরীয়গণ (এবং এলামাইটগণ) গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতি।

মোটামুণ্ড দেখা যাইতেছে যে দক্ষিণ মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন অধিবাসী সুমেরীয়গণের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জাতি থাকিলেও অনেক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর মতে গোল মুণ্ড গোষ্ঠীর জাতি প্রকৃত সুমেরীয়ান ও তাহারাই প্রাক্-সেমিটিক মেশোপটেমিয়ার সভ্যতার বাহক।

সিন্ধু উপত্যকা ও মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন সভ্যতার বাহকদিগের মধ্যে জাতিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে যে সকল মত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক দলের মত এই যে লম্বা ও গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতি মেশোপটেমিয়া হইতে সমুদ্রপথে সিন্ধু উপত্যকায় আসিয়াছিল। ডাঃ হাটন প্রমুখ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মত এইরূপ। অপর দলের মত এই যে সুমেরীয়গণ সম্ভবতঃ সিন্ধু উপত্যকা হইতে দক্ষিণ মেশোপটেমিয়ায় গিয়াছিল। ডাঃ হল প্রমুখ পণ্ডিতগণের মত এইরূপ। এই দুই মতের মধ্যে প্রথম মতটি বেশী প্রচলিত এবং সাধারণের মধ্যে এই ধারণা প্রচলিত যে প্রাক্-আর্য যুগে বিদেশ হইতে আগত ভূমধ্যসাগরীয় আর্মেনয়েড গোষ্ঠীর জাতি সিন্ধু সভ্যতার পত্তন করিয়াছিল। সিন্ধু সভ্যতার বাহকদিগের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণ সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বলা হইবে।

সিন্ধু জাতি এবং সুমেরীয় ও এলামাইট জাতির মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মতবাদের ভিত্তি কতকগুলি নিদর্শন। সিন্ধু উপত্যকার বৈশিষ্ট্যসূচক সীলের অনুরূপ কয়েকটি সীল সুমেরের (উর ও কিস) কয়েকটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্তূপ হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল স্তূপ খ্রীঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের। সিন্ধু উপত্যকার সীলগুলি ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে ব্যবহৃত হইত বলিয়া একটি মত প্রচলিত আছে।

প্রাচীন মেশোপটেমিয়া ও সিন্ধু উপত্যকার বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে প্রাচীন যুগে মেশোপটেমিয়ার অভ্যুদয়ের অন্যতম কারণ এই যে, উহা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্যিক সংযোগের পথে অবস্থিত। একজন ঐতিহাসিক বলিতেছেন, **"Babylon and Nineveh owed their greatness to their being entrepots of trade passing from the East to the West."**

অতি প্রাচীনকাল হইতে তিনটি পথে পশ্চিম জগতের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্য চলিত, লোহিত সাগরের পথ, পারশ্য উপসাগরের পথ এবং উত্তরে সিন্ধু-কাস্পিয়ানের পথ। পারশ্য উপসাগরের পথে যে বাণিজ্য চলিত সেই পথ মেশোপটেমিয়া হইয়া বরাবর দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া মাইনরের সিলিসিয়ান উপকূল পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। লোহিত সাগরের পথে যে বাণিজ্য চলিত তাহার ঘাঁটি ছিল মিশরের বন্দর। উত্তরের পথে সিন্ধু উপত্যকা হইতে অক্সাস নদী পর্য্যন্ত উটের পিঠে মাল চালান হইত। অক্সাস বাহিয়া এই মাল আরল সমুদ্রে পৌছিত এবং কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী অঞ্চলে বিলি হইত। গ্রীক আমলে আলেকজান্দ্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে লোহিত সাগরের পথ প্রবল ও পারশ্য উপসাগরের পথ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমূহে ভারতের মাল সরবরাহ করিত কার্থেজের বাণিজ্যবাহিনী। রোমের অভ্যুদয় হইলে এই বাণিজ্যের অধিকার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল; ফলে পিউনিক যুদ্ধ ঘটিল। রোম মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া দখল করিয়া লোহিতসাগরের বাণিজ্যপথ দখলে আনিল। তারপর সিরিয়া দখল করিয়া ইউফ্রেটিস পর্য্যন্ত সাম্রাজ্যের সীমানা প্রসারিত করিলে পারশ্য উপসাগরের পথও তাহার আয়ত্তে আসিল। রোমের সহিত দক্ষিণ-ভারতের বাণিজ্যিক সংযোগ প্রমাণিত হইয়াছে। কুশান আমলে অক্সাস-কাস্পিয়ান পথেও ভারতের সহিত পশ্চিম জগতের সংযোগ ছিল। ইহার পর আরবগণ মিশর জয় করিয়া

লোহিতসাগরের পথের বাণিজ্যঘাঁটি আলেকজান্দ্রিয়া দখল করিল। পারস্য জয় করিয়া খলিফ ওমর টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মোহনায় বসরা বন্দর প্রতিষ্ঠিত করিলেন যাহাতে ভারতীয় বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করা যায়। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর য়ুরোপীয়গণের পক্ষে বন্ধ হইয়া গেল। দুইটি জলপথ এই ভাবে রুদ্ধ হওয়ায় আবার উত্তরের স্থল পথের দিকে দৃষ্টি পড়িল।

ইউরোপীয়গণ এই রুদ্ধ জলপথ মুক্ত করিবার চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিল খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে (১৪৯৮ খ্রীঃ অঃ) যখন উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া ভাস্কোডাগামার পরিচালনায় তিনখানি পর্তুগীজ জাহাজ ভারতীয় সমুদ্রে আবির্ভূত হইল।

সে যাহা হউক, সিন্ধু উপত্যকার সঙ্গে প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রশ্ন উঠে, এই বাণিজ্য চালাইত কাহারা? যে বাণিজ্যিক সংযোগের নিদর্শনের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা পাওয়া গিয়াছে কিশ ও উরে। মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা ও বেলুচিস্থানের বিভিন্ন স্তূপ হইতে সুমেরীয় ও এলামাইট বাণিজ্যের সংযোগের নিদর্শন কি পাওয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখ দেখা যায় না। অবশ্য কৃষ্টিমূলক সংযোগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে পণ্ডিতগণ এ কথা বলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে মিশরে খ্রীঃ পূঃ ১৭শ শতাব্দীর কবর হইতে ভারতের সহিত বাণিজ্যিক সংযোগের নিদর্শন যে মসলিন ও নীল পাওয়া গিয়াছে তাহাও ভারতের জিনিস। অবশ্য ইহা হইতে এরূপ অনুমান না করিলেও চলে যে এক পক্ষই বাণিজ্য চালাইত। আর একটি কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা, এই উভয় স্থানই সমুদ্রতীর হইতে দূরে অবস্থিত। ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সংযোগ রক্ষা করিতে হইলে সিন্ধুর মোহানায় ঘাঁটি রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইত। এই ঘাটি এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। এই ঘাঁটি মাক্রাণ উপকূল, কাথিয়াবাড় বা কোঙ্কণ উপকূলেও হইতে পারিত।

সিন্ধু উপত্যকার সহিত প্রাচীন মেশোপটেমিয়ার কৃষ্টিমূলক সংযোগ সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে এইবার দেখা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, মেশোপটেমিয়ার সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার কৃষ্টিমূলক সংযোগ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করিতে হইলে সুমের, আকাদ, বাবিলোন ও আসিরীয়ার সভ্যতা বিকাশ ও রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের যে ক্রম নির্দ্দেশ ও মোটামুটি কাল নির্ণয় করা হইয়াছে তাহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন কোন পণ্ডিতের মতে আকাদ, বাবিলোন ও আসিরীয়ার কৃষ্টির কাঠাম সুমেরীয়। পণ্ডিতগণের অনুমিত প্রাচীনত্বের হিসাব করিলে সিন্ধু উপত্যকার সহিত কৃষ্টিমূলক সংযোগ বলিতে প্রধানতঃ প্রাক্‌-সেমিটিক সুমেরের সহিত সংযোগ বুঝায়।

এই সংযোগ সম্বন্ধে তিনটি মতবাদের উল্লেখ করা যায়। একটি মত এই যে, সুমেরীয় কৃষ্টি সম্ভবতঃ সিন্ধু কৃষ্টি হইতে উদ্ভূত। ডাঃ হলের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে সুমেরীয় কৃষ্টির উৎপত্তি হইয়াছে প্রাক্‌-আর্য যুগের ভারতীয় কৃষ্টি হইতে। পূর্ব্বের একটি প্রবন্ধে সর জন মার্শালের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুমেরীয় প্রাচীন নিদর্শনের অনুরূপ নিদর্শন মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পা স্তূপের উপরের স্তরগুলিতে পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলেন,—কেহ কেহ বলেন সুমেরীয়গণ অন্য স্থান হইতে দক্ষিণ-মেশোপটেমিয়ায় গিয়াছিল। এই মত গ্রাহ্য করিলে ভারতবর্ষ সুমেরীয় কৃষ্টির জন্মভূমি হওয়া আশ্চর্য্য নহে। সর জন মার্শাল সাবধানী পণ্ডিত, ইহার বেশী অগ্রসর হওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই। তাঁহার মত কতকটা এই যে সিন্ধু কৃষ্টির কতকগুলি অঙ্গ মেশোপটেমিয়া হইতে প্রাপ্ত কিন্তু উহার যথেষ্ট স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। যাঁহারা বলেন যে সিন্ধুকৃষ্টি মেশোপটেমিয়া হইতে আমদানী হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ হার্টনের নাম করিতে হয়। তাঁহার মত এই যে, সিন্ধুকৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল এবং উহা আনিয়াছিল ভূমধ্যসাগরীয় ও আর্মেনয়েড গোষ্ঠীর লোক।

কৃষ্টিমূলক সংযোগের প্রমাণ হিসাবে যে সকল নিদর্শনের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার দুই-চারিটির কথা বলা হইতেছে। সিন্ধু উপত্যকার স্থাপত্য সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা হইতেছে না। মার্শাল ইহাকে সিন্ধু উপত্যকার নিজস্ব জিনিস বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাঃ ম্যাকে কিশ ও মোহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত পোড়ামাটির তৈজসের (ceramic wares) সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। হাম্মুরাবির সময়ের একটি মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত একটি সীলের সহিত মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পায় প্রাপ্ত সীলের সাদৃশ্যের কথা তিনি বলিয়াছেন। নাগপুর সেণ্ট্রাল মুজিয়মে রক্ষিত বাবিলোনের প্রথম রাজবংশের আমলের একটি সীলের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। হরাপ্পায় প্রাপ্ত একটি প্রসাধন বা টয়লেট-সেটের গঠনপ্রণালী উর নগরের ধ্বংসস্তূপ হইতে প্রাপ্ত টয়লেট-সেটের গঠন প্রণালী হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। এইরূপ আরও কতকগুলি খুচরা জিনিসের নক্সা বা কারুকার্য্যে মেশোপটেমিয়ায় প্রাপ্ত অনুরূপ বস্তুর নক্সার সহিত সাদৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে। তারপর উল্লেখ করিতে হয় কতকগুলি অদ্ভুত জন্তুর মূর্ত্তি খোদিত সীলের।

একটি সীলে মানুষের মুখ কিন্তু ছাগল বা ভেড়ার দেহবিশিষ্ট কাল্পনিক জন্তুর মূর্ত্তি দেখা যায়। আসিরীয় শিল্পের মানুষের মুখ ও সিংহের দেহবিশিষ্ট কল্পিত জন্তুর সহিত ইহার তুলনা করা হইয়াছে। অর্দ্ধেক মানুষ ও অর্দ্ধেক ষণ্ডের দেহবিশিষ্ট একটি সীলের সঙ্গে সুমেরীয়ার এয়াবনি বা এলিডুর তুলনা করা হইয়াছে। এয়াবনি সুমেরীয় পুরাণের একজন রাক্ষস, গিলগামেশকে বধ করিবার জন্য অরুরা দেবী তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। মোহেঞ্জোদারোর সীলে দেখা যায় এই অদ্ভুত জীব একটি শৃঙ্গধারী সিংহকে আক্রমণ করিতেছে। কতকগুলি সীলে শৃঙ্গধারী মানুষ মূর্ত্তি দেখা যায়। মার্শালের মতে "there is a strong presumption for connecting them with the Sumerian hero-god Eaboni." একটি মূর্ত্তির গাত্রাবরণের নক্সা (trefoil patterning) কতকগুলি সুমেরীয় মূর্ত্তির ("Bulls of Heaven") গাত্রাবরণের নক্সা হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে।

উপরে যে সাদৃশ্যের কথা বলা হইয়াছে সেই ধরণের সাদৃশ্য সিন্ধু উপত্যকা ও মেশোপটেমিয়ার মধ্যে কৃষ্টিমূলক সংযোগের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই প্রকার প্রমাণের বলে ইহার বেশী অগ্রসর হওয়া চলে না, কিন্তু পণ্ডিতগণ অগ্রসর হইয়াছেন। সিন্ধু উপত্যকার ধর্ম্মের আলোচনার সময়ে ইহা বিশেষভাবে দেখা যাইবে। এখানে সংক্ষেপে দুই-একটি কথা বলা হইতেছে।

বেলুচীস্থান ও অন্যত্র কতকগুলি স্তূপ হইতে বহু ক্ষুদ্র পোড়ামাটির ষণ্ডের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার কতকগুলি সীলে ষণ্ডের মূর্ত্তি দেখা যায়। ষণ্ড প্রাচীন মেশোপটেমিয়া, মিশর, ঈজিয়ান সাগর অঞ্চলে পূজিত হইত। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মে ষণ্ড শিবের বাহন ও অবতার রূপে পূজিত। সুতরাং অনুমান করা হইয়াছে সিন্ধু উপত্যকায় ষণ্ড উপাসনা প্রচলিত ছিল এবং উহা বিদেশ হইতে আসিয়াছে। বহুসংখ্যক পোড়ামাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ত্রীমূর্ত্তি মোহেঞ্জোদারো, হরাপ্পা ও বেলুচীস্থানে পাওয়া গিয়াছে। উপরে উল্লিখিত দেশসমূহে স্ত্রীদেবতার উপাসনা প্রচলিত ছিল, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মেও স্ত্রীদেবতার উপাসনা রহিয়াছে। অনুমান করা হইয়াছে এই সকল অদ্ভুত স্ত্রীমূর্ত্তি সকলেই দেবীপ্রতিমা এবং স্ত্রীদেবতার উপাসনা বিদেশ হইতে আসিয়াছিল। সিন্ধু ধর্ম্মের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যাখ্যায় মেশোপটেমিয়া, সিরিয়া, মিশর, আনাতোলিয়া, প্যালেষ্টাইন, ক্রীট, সাইপ্রাস প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন ধর্ম্মের নিদর্শন প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করান হইয়াছে। সিন্ধু ধর্ম্মে স্ত্রীদেবতার উপাসনা সম্বন্ধে প্রচলিত মত শেষ পর্য্যন্ত এই দাঁড়াইয়াছে যে, গোড়ায় স্ত্রীদেবতার উপাসনার উৎপত্তি হইয়াছিল আনাতোলিয়ায় (ফ্রিজিয়ায়) এবং সেখান হইতে উহা সিরিয়া ও মেশোপটেমিয়ায় এবং মেশোপটেমিয়া হইতে সিন্ধু উপত্যকায় প্রচলিত হইয়াছিল। পণ্ডিত ডাঃ হাটন এ সম্বন্ধে এতটা নিঃসন্দেহ সে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে দেবদাসী প্রথা, হিন্দু সামাজিক অনুষ্ঠানে মৎস্য উপাসনা, সর্প উপাসনা, fire walking বা অগ্নি সঞ্চরণ (যেমন চড়কপূজায়, দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে ধর্ম্মপূজায় এই প্রথা প্রচলিত আছে) প্রভৃতি দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর দ্বারা এশিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশ হইতে আনীত হইয়াছি ; ডাঃ হাটনের মতে এই গোষ্ঠীর লোকেই সিন্ধু সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল। আমাদের অনুমান করিতে হইবে যে সিন্ধু ধর্ম্মেও এই সকল বৈশিষ্ট্য ছিল এবং অন্য প্রমাণাভাবে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর কল্পনা-বিলাসকে এক্ষেত্রে প্রমাণ বলিয়া মনে করিতে হইবে।

সিন্ধু কৃষ্টির সহিত মেশোপটেমিয়ার প্রাচীন কৃষ্টির সংযোগ সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজে যে বিতর্ক হইয়াছে উপরের বিবরণ হইতে তাহার যৎসামান্য ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যাইবে। তিন প্রকারের সংযোগ সম্বন্ধে যে সকল মতের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা হইতে বাস্তবিক এই সংযোগ কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে কোন পরিচ্ছন্ন ধারণা করা সহজ নহে। পণ্ডিত সমাজের এই বিতর্কের মধ্যে কয়েকটি জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ এই বিতর্কের গোড়ায় যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটুকু আছে অতি সহজে পণ্ডিতগণ তাহা অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত। যদি একথা সত্য হয় যে সুমেরীয় কৃষ্টির সহিত যাহাতে সংযোগ প্রমাণ হয় সেই সকল নিদর্শন মোহেঞ্জোদারো ও হরাপ্পার উপরের স্তরগুলিতে পাওয়া গিয়াছে এবং তাহার নীচে বহু স্তর আছে তাহা হইলে সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তি বিচারের প্রসঙ্গে যে প্রকার প্রমাণের সাহায্য লওয়া হইয়াছে তাহার অনেকখানি অর্থহীন হইয়া যায় এবং বলিতে হয় যে এই সংযোগ সিন্ধু-সভ্যতার শেষ আমলের ব্যাপার। যদি সিন্ধু-সভ্যতার যে কাল নির্ণয় করা হইয়াছে (খ্রীঃ পূঃ ৩২৫০) নানা প্রকার ত্রুটী সত্ত্বেও তাহাই আলোচনার ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করা হয় তাহা হইলেও দেখা যাইবে সংযোগ প্রমাণ করিবার জন্য যে সকল যুক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে তাহার বারো আনা অগ্রাহ্য করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে কোন প্রকারে হউক সিন্ধু সভ্যতা মেশোপটেমিয়ার নিকট ঋণী প্রমাণ করিবার প্রবল আগ্রহ। আগ্রহের প্রাবল্যে যে ধরণের যুক্তি ব্যবহার করা হইতেছে তাহার অসারতা নজর এড়াইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ সিন্ধু সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতা বলিয়া মত প্রকাশে কোন কোন বৈদেশিক পণ্ডিতের বিবেচনায়

দায়িত্ববোধ লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহা বৈজ্ঞানিক মনোভাব নহে। তৃতীয়তঃ, সিন্ধু সভ্যতাকে বৈদিক আর্য সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী ও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দ্রাবিড় সভ্যতা বলিয়া প্রমাণ করিবার প্রয়াস। সিন্ধু লেখনসমূহের পাঠোদ্ধার করা এ পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই কিন্তু সিন্ধু সভ্যতার বাহক গোষ্ঠীকে দ্রাবিড় ভাষাভাষী বলিয়া প্রচার করিতে অনেক পণ্ডিতের বাধে নাই। এই গোষ্ঠী মেশোপটেমিয়া হইতে আসিয়াছিল, এজন্য মেশোপটেমিয়াতে দ্রাবিড় ভাষা প্রচলিত ছিল এরূপ অনুমান করা হইয়াছে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, বিতর্কের মূল কথা বিভিন্ন পণ্ডিতের পূর্ব্বগঠিত মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিবার উৎসাহ। এই উৎসাহ প্রায় নিরঙ্কুশ।

অপক্ষপাত পণ্ডিতের বাহুল্য না থাকিলেও অভাব নাই। সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনসমূহের সহিত যাঁহাদিগের পরিচয় ঘনিষ্ঠ এবং অপরের অপেক্ষা অধিক এইরূপ দুই জনের মতের উল্লেখ করা যাইতেছে।

সার জন মার্শালকে সাবধানী পণ্ডিত বলা হইয়াছে। মেশোপটেমিয়ার কৃষ্টির সহিত সিন্ধু কৃষ্টির সংযোগের প্রমাণগুলির উল্লেখ করিয়া তিনি সিন্ধু কৃষ্টির বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই কৃষ্টির স্বকীয়তার, অন্যান্য প্রাচীন যুগের কৃষ্টির সহিত পার্থক্যের প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে। সিন্ধু উপত্যকার স্থাপত্য তাহার নিজস্ব জিনিস। উহার সাধারণ স্নানাগারগুলির মত জিনিস রোমান যুগের পূর্ব্বে আর কোথাও দেখা যায় না। সিন্ধু উপত্যকার শিল্পের স্বাভাবিকতা তাহার নিজস্ব জিনিস, এলাম, সুমের বা মিশরের সমসাময়িক শিল্পের সঙ্গে উহার কোন মিল নাই। সিন্ধু উপত্যকার পটারির নক্সা, এখানে তুলার কাপড়ের ব্যবহার, সিন্ধু উপত্যকার লিপিমালার উৎকর্ষ সিন্ধু কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। সিন্ধু ধর্ম্মের সম্বন্ধে যতটুকু খবর পাওয়া যায় তাহাতে সিন্ধু কৃষ্টির স্বকীয়তার দাবি সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে হইবে। সুমের বা বাবিলোনের দেবমন্দিরগুলির স্থাপত্যের মত কোন স্থাপত্যের নিদর্শন সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া যায় নাই ইহা উল্লেখ করিয়া ডাঃ ম্যাকে বলিতেছেন এই এক মাত্র তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় সুমেরীয় ও সিন্ধু জাতির ধর্ম্মের মধ্যে কোন মিল বা সংযোগ ছিল না, ("This alone would, in my opinion, suffice to show that the religion of the Sumerians and of the Indus valley people were dissimilar")।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পুরাতন বাংলা পত্র-পত্রিকা

শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্নচিন্তায় সাত সমুদ্র তের নদীর পারে আসিয়া পড়িয়াছি। অবসর মিলিলেই ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টা করি। মিউজিয়মে রক্ষিত একটি জিনিষের প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে; উহা বাংলাদেশের পুরাতন পত্র-পত্রিকা। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপদেশে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসের উপকরণ-স্বরূপ, এই সকল বাংলা সংবাদপত্র হইতে প্রয়োজনীয় সংবাদগুলি সঙ্কলন করিবার বাসনা বলবতী হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার সূচনা করিলাম।

গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি

('সমাচার চন্দ্রিকা', ২২ জুলাই ১৮৩০। ৮ শ্রাবণ ১২৩৭)

বিদ্যালয়। সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মোকাম গরাণহাটার শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ডাক্তারখানার দক্ষিণ ৩২৮ নং বাটীতে ওরিএনটাল শিমিনরি নামক বিদ্যালয় দুই বৎসর সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা প্রায় অনেকেই জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন তথাচ ধনি গুনি বিশিষ্টশিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু গুণগ্রাহক মহাশয়েরদিগের নিকট এই নিবেদন যে এই বিদ্যামন্দিরে আপনারদিগের পুত্র পৌত্রাদি প্রভৃতি অনেক ছাত্র ইংরেজী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন এবং এক্ষণে ঐ বিদ্যার্থির লেটিন ক্রান্‌স ইংরাজী হিষ্টোরি জিওগ্রেফি এষ্ট্রনমি ফিলাসাফি মেথেমেটিক্‌স্ এও আলজেব্রী অর্থাৎ নব্য এবং প্রাচীন রাজ্যের বৃত্তান্ত ও ভূগোল বৃত্তান্ত এবং জ্যোতিষ বিদ্যা ও পদার্থ বিদ্যা এবং অঙ্ক বিদ্যা ইত্যাদি শাস্ত্র পূর্ণরূপ শিক্ষার্থে জার্জ আলেগজেণ্ডর টরনবুল এবং জার্জ এড্বার্ড মালিস নিযুক্ত হইলেন এবং ঐ শিক্ষকেরদিগের নাম সকলেই প্রায় শ্রুত হইয়া থাকিবেন কারণ ঐ প্রথম ব্যক্তি শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায়ের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি শ্রীযুত মেষ্টর হের সাহেবের বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পরন্তু ঐ পাঠশালাস্থ বালকেরদিগের তরজমা সদ্ব্যবহার এবং সাধু ভাষাদি শিক্ষার নিমিত্তে একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন এবং ঐ সকল বালকেরদিগের মধ্যে যিনি পারসী ভাষা অধ্যয়ন করেন এবং করিতে ইচ্ছুক হয়েন তাহারদের শিক্ষার্থে একজন মুনসি নিযুক্ত হইবেক ইহাতে ঐ ছাত্রেরদিগের নানাপ্রকার

বিদ্যা উপার্জ্জনে ন্যূনতা হইবেক না এবং যদ্যপি কোন মহাশয়েরা আপন আপন পুত্র পৌত্রাদি প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হয়েন তবে এই পাঠশালাতে পাঠাইলে নিযুক্ত করিতে করা যাইবেক এবং ঐ পাঠশালার নিয়মিত হার ।৩।৪।৫ টাকা পর্য্যন্ত ইতি বিজ্ঞাপনং শ্রাবণস্য শ্রীগৌরমোহন আঢ্য। সাং শিমলা।

শ্যামবাজার-নিবাসী জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন

('সমাচার চন্দ্রিকা', ১৯ আশ্বিন ১২৩৭)

পণ্ডিতের মৃত্যু। আমরা মহা দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে শ্যামবাজার নিবাসী ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত ১৫ আশ্বিন বৃহস্পতিবার পরলোক গমন করিয়াছেন ভট্টাচার্য্যের বয়ঃক্রম অনুমান ৫৫ বৎসরের অধিক নহে ইনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু ন্যায় দর্শনে বিশেষ পারগতা প্রযুক্ত তৎশাস্ত্রাধ্যাপনা করিতেন ইহাতে মহাখ্যাত্যাপন্ন ও মান্য হইয়া অনেক স্থানে অধ্যাপক নিমন্ত্রণ ও বিদায় করণের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইতেন অতএব তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে দুঃখিত হইয়াছি এবং অনেকেই খেদিত হইবেন বিশেষতঃ অধ্যাপক মহাশয়েরা তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের গুণ স্মরণ করিয়া অবশ্যই চিন্তিত হইবেন।

ওরিয়েন্টাল একাডিমি

('সমাচার চন্দ্রিকা', ১১ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

ওরিএনটেল একাডিমি নামক বিদ্যালয় মেং ই, বি, কেনজি সাহেব বিনয়পূর্ব্বক কলিকাতাস্থ ও তৎ ইতস্ততঃ স্থানস্থিত লোকদিগকে জ্ঞাত করাইতেছেন যে এতদ্দেশীয় বালকদিগের ইংরাজী বিদ্যা অভ্যাসের নিমিত্ত এক্ষণে ওরিএনটেল একাডিমি নামক এক বিদ্যালয় খোলা গিয়াছে তজ্জন্য দুই জন পারগ শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন একজনের নাম মেথিনস ইনি পূর্ব্বে গরাণহাটায় ওরিএনটেল শিমিনরি নামক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন অন্য এক জন সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছেন। হিন্দু কালেজের রীত্যনুসারে এই পাঠশালা চলিবেক। প্রধান বালকেরদিগের মাসিক বেতন ৩ টাকা অল্প পাঠার্থিদিগের ২ টাকা কিন্তু কেতাব ছাড়া। ঠিকানা হেদোপুষ্করিণীর থানার নিকট।

শেরবোর্ণ সাহেবের ইংরেজী বিদ্যালয়

('সমাচার চন্দ্রিকা,' ২ চৈত্র ১২৩৭)

বিজ্ঞাপন। মেং সেরব্রোন সাহেব যাঁহার যোড়াসাঁকোর ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল তিনি এই রাজধানীর তাবৎ বাঙ্গালিদিগকে বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছেন যে ত্রিংশ বৎসর গত হইল তিনি উক্ত বিদ্যালয় বিলক্ষণ রূপে সম্পন্ন করিয়াছেন এবং এক্ষণেও সেই মত চলিবেক সেই বিদ্যালয় এক্ষণে যোড়াসাঁকো হইতে বহুবাজারে উঠিয়া গিয়াছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

('সংবাদ প্রভাকর,' ২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৭২)

কলিকাতা পুলিসের প্রধান মাজিষ্ট্রেট ব্রান্‌সন সাহেব অশ্ব হইতে পতিত হইয়া আপাততঃ বিচারালয়ে আগমনে অশক্ত হওয়াতে উপযুক্ত অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার কার্য্য করিতেছেন। থিয়োডোর ডিকেন্সের মৃত্যুর পর ব্রান্‌সন সাহেবের নিয়োগের পূর্ব্বে এই বাবু কিছুদিন পুলিসের প্রধান আসনোপবিষ্ট হইয়া সদ্বিচার বিতরণ দ্বারা বিলক্ষণ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

"প্রথম"

('সংবাদ প্রভাকর'; মাঘ ১২৮২)

ইংরাজ শাসনে এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটি প্রধান ঘটনা হইয়া গিয়াছে, সমস্ত ঘটনাই ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা সম্পাদিত। ভাল মন্দ উভয়ই সেই ব্রাহ্মণবর্গের দ্বারা সাধিত। আমরা একে একে নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেখাইতেছি। বঙ্গদেশের প্রথম বাঙ্গালী জজ ব্রাহ্মণ রায় রমাপ্রসাদ রায়। প্রথম গবর্ণমেণ্ট উকীল বাবু বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম ইংলণ্ডগমনকারী রাজা রামমোহন রায়। প্রথম বাঙ্গালী সিবিলিয়ান বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম বিখ্যাত বাঙ্গালী খৃষ্টান বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম বিধবাবিবাহকারী বাবু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। প্রথম শবচ্ছেদক অর্দ্ধ ব্রাহ্মণ (বৈদ্য) বাবু মধুসূদন গুপ্ত। প্রথম ভারতেশ্বরীর সহিত আহারকারী বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রথম সি, এস, আই অর্থাৎ ভারতনক্ষত্র উপাধিধারীর নাম প্রসন্নকুমার ঠাকুর। প্রথম রেলওয়ের অধ্যক্ষ বাবু রামগতি মুখোপাধ্যায়। প্রথম ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া "কারঠাকুর এবং কোম্পানি" নামক বাণিজ্যাগার স্থাপন কর্ত্তা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রথম ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক স্থাপনকর্ত্তা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রথম কৌনসিলের সভ্য বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। প্রথম গবর্ণর জেনেরেলের সভার সভ্য রাজা রমানাথ ঠাকুর বাহাদুর। প্রথম ম্লেচ্ছের নিকট বেদপাঠকারী পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী। প্রথম ইংলণ্ডে শিক্ষিত ডাক্তার সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী। প্রথম ইংলণ্ডীয় যুবরাজের পাদপূজাকারী পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি। প্রথম ভারতের ইংরাজ মিত্ররাজ্যের বিচারপতি বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়। প্রথম বিজাতীয় ধারায় উপন্যাস লেখক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রথম ইংরাজী ধরণে "ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন" নামক সভার সৃষ্টিকারী বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর। প্রথম শিক্ষাবিভাগের ইনস্পেক্টর বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়। প্রথম পদচ্যুত সিবিলিয়ান বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম বাঙ্গলা বিখ্যাত নাটক লেখক পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন। প্রথম অন্তঃপুরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া বিজাতীয়কে প্রকাশ্যরূপে বঙ্গকুলবতীদিগের মধ্যে আনয়নকারী বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়। এইরূপ যত ভালমন্দ কর্ম্ম, সকলই ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা সম্পাদিত। ['সংবাদ প্রভাকর' প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের নামোল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন]

আজ—আগামী কাল

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৮

বাড়িটাকে দেখলে মনে হবে—একটা বন্দী-নিবাস। টানা ব্যারাকের মত লম্বা চলে গেছে—গলিটাকে পাকে পাকে জড়িয়ে। আগে ছিল দোতলা—সম্প্রতি উপরে আর একটা তালা উঠেছে—আয়ও বেড়েছে দু'গুণ। ঠিক ফ্ল্যাট সিষ্টেমে তৈরি হলে—কল, জল, আরও অনেক বিষয় নিয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের অহোরাত্র বিবাদ বাধত না। তা ছাড়া উনুনের ধোঁয়া—কচি ছেলের কান্না—তার চেয়ে বড় ছেলেদের ঝগড়া মারামারি—দৌরাত্ম্য—তা নিয়ে মায়েদের কলহ—তার ওপর রেডিওর বিচিত্র অনুষ্ঠানে বহু কণ্ঠের বহু ঢঙের আবৃত্তি, গান, যন্ত্রসঙ্গীত, সংবাদ পরিবেশন—কি না আছে এখানে। উঠোন নেই, ছাদ নেই, কাপড় শুকোতে দেবার বারান্দা আছে—কিন্তু কাপড় মেলে দিয়ে ঠায় তার দিকে চেয়ে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। এমনি একখানি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে মলয়।

ভাল আশ্রয় অন্যত্র মিলত—কিন্তু সুচিত্রা আত্মীয় বাড়িতে যেতে চায় নি।

বাড়ি থেকে বেরিয়েছি—আরাম আশা করে নয়। এই তো ভাল।

এ হাটের মাঝে ঘর পাততে পারবে? আমার ঘর বাইরের কাজ আছে—পা মেলে বেড়াবার অফুরন্ত পথ আর ফাঁকা জায়গা আছে—

আমাকেও তোমার কাজে টেনে নেবে। পারবে না?

তুমি যাবে?

অবশ্য যদি তোমার মর্য্যাদায় না বাধে। দুষ্টামিভরা হাসি সুচিত্রার ওষ্ঠপ্রান্তে মিলিয়ে গেল।

মলয় বললে—মর্য্যাদা? কিসের মর্য্যাদা?

কেন—বাঙালীর অন্তঃপুরের একটা শুচিতা আছে তো?

মলয় উচ্চরবে হেসে বললে—পরীক্ষা করছ? অন্তঃপুর কোথায় যে তার শুচিতা বজায় রাখবার জন্য—

বাঃ রে, যেখানে অন্তঃপুরিকা—সেইখানেই কি অন্তঃপুর নয়? সুচিত্রা কলকণ্ঠে হেসে উঠল।

মলয় বললে—রহস্য রাখ—সত্যিই কি তুমি আমার সঙ্গে কাজে নামতে চাও?

না হলে তোমার সঙ্গে এসেছি কেন?

কিন্তু এরও পরীক্ষা আছে।

বেশ, কর পরীক্ষা।

প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা। দুঃখ কষ্ট—এসব সহ্য করার দৃষ্টান্ত দেব না—কারণ তাতে তোমরা অপরাজেয়। তবে সম্ভ্রম শুচিতা—এ সব খুঁৎখুঁতুনি মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। মোট কথা পর্দার মধ্যে গজায় যে সব সংস্কার—হয়ত ভাল—হয়ত মঙ্গলজনক—তাও ত্যাগ করতে হবে।

সুচিত্রা বললে—মঙ্গলজনক যে সংস্কার তা ত্যাগ করবার প্রয়োজন হবে না। মেয়েদের হাতে দিব্য অস্ত্র আছে—তার সন্ধান তোমরা রাখ না বলেই এত সতর্কতা—উপদেশ বর্ষণ।

সে দিব্য অস্ত্রটি কি?

দিব্য অস্ত্রের সন্ধান অপর পক্ষকে দেওয়া নিষিদ্ধ।

সে তো শত্রুপক্ষকে।

তা হলে যারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে ফ্যাসি শত্রু ধ্বংস করলে—তারা দিব্যাস্ত্রের সন্ধান অপর মিত্র পক্ষকে জানাচ্ছে না কেন?

সন্দেহবশতঃ। ভাবছে—নীতিতে যারা ভিন্ন পথের পথিক—তারা মিত্র হলেও মিত্র নয়—এই তো? এ একটা কারণ বটে—কিন্তু নিজেকে গুরুত্বে গুরুতর করে রাখা মানুষের অন্যতম অভ্যাস—

সে অভ্যাস রাখা চলবে না। বদ অভ্যাস।

দু'জনেই কৌতুকে হেসে উঠল।

স্বল্পপরিসর ঘরে মানিয়ে নিলে সুচিত্রা।

প্রয়োজনের বাইরে এতটুকু বিলাসকে কোন দিক দিয়ে ও প্রশ্রয় দিলে না। আর ছোট্ট ঘরে রান্না খাওয়ায় অল্প সময়ই তো ব্যয় হয়। কোন কোন বাসিন্দার মত—কর্ত্তারা কার্য্যক্ষেত্রে চলে গেলে—একখানা নভেল হাতে করে—বিছানায় শুয়ে শুয়ে পড়া—কিংবা ঘুম—তাস খেলা বা গল্প এ সবে সময় কাটানো দুষ্করই ঠেকবে। একখানি ঘরে—রোজকার রোজ—একঘেয়ে কাজ—বন্দী জীবনের অনুবৃত্তি ছাড়া কি? যেখানে মাঠ নেই—আকাশ নেই—নিস্তব্ধতা নেই—গাছপালা নেই—যেখানে দিনদিন খাওয়া-শোওয়া-গল্প-কলহ চলেছে তো চলেছেই—বাইরের জগৎ কচিৎ দেখা দেয়—কালীঘাটে পুজো দিতে গিয়ে—দক্ষিণেশ্বরে বা বেলুড় মঠে বেড়াতে গিয়ে কিংবা পর্ব্বোপলক্ষে গঙ্গাস্নানে—পথে ও গঙ্গার ধারে। আর আছে প্রমোদ বিলাসের জন্য মাসে দুটি কি তিনটি দিন—সিনেমা দর্শন।

কোনটিই বন্দীর এক সেল থেকে আর এক সেল-এ যাবার পথ ছাড়া কি? সেই ভীড়—সেই কোলাহল—কলহ—ঠেলাঠেলি—মারামারি। পৃথিবী পরিপূর্ণ হয়েছে বন্দী-নিবাসে অথবা জনসংখ্যা বেড়েছে—যাতে সঙ্কীর্ণ হয়েছে তার ভূমি। একটা কথা শোনা গিয়েছিল—যুদ্ধের পুরো যৌবনকালে।

বোমারুর উৎপাতে—অভিজ্ঞজনেরা কতোরা দিয়েছিলেন (কোন কোন ক্ষেত্রে কার্য্যত সে উপায় গ্রহণও করেছিলেন) যে, শিল্প-কেন্দ্রগুলিকে ছড়িয়ে দিতে হবে দেশের অভ্যন্তরে। অতি স্ফীত দেহের অংশে নিশানা করা সোজা—তার ফলও অল্প আয়াসে মেলে। এখন যুদ্ধের বিভীষিকা মিলিয়ে গেছে—তৃতীয় মহাযুদ্ধের দুঃস্বপ্ন দেখলেও—আর তা নিয়ে সাবধান বাণী প্রয়োগ করলেও অতি সাবধানীর চিত্ত-উৎক্ষেপ বলে তা কানে তুলছে না কেউ।

মলয়ের পাশটিতে এসে দাঁড়াল সুচিত্রা। বাইরের জগৎ বিস্তীর্ণ এবং বিচিত্রও বটে। এ জগতে দুঃখ যেমন আসে অভাবিত—দুঃখ তেমনি ভেসে যায় নানা কর্মের প্রবাহে। আজ—কাল—পরশু প্রতিটি দিন—সময়ের দাগে দাগ মিলিয়ে আসে আর চলে যায় না। একক জীবনের প্রবাহে—কখনো শ্যাওলা—কখনো শতদল—কখনো তরঙ্গ—কখনো তুফান—এই বৈচিত্র্য-বৈভবে ভেসে আসে ঘটনা। ভেসে চলে যায় দূরে—কখনো শোভা কখনো বা সৌরভের স্পর্শ দিয়ে। দাগে দাগ মেলে না—কিছুই থাকে না চিরস্থায়িত্বের প্রলোভন দেখিয়ে। আর তাতেই বুঝি মন ওঠে ভরে। সঞ্চয়কে একটি জায়গায় স্তূপীভূত করলেই না মমতা।...স্রোতের জলকে খালের মধ্যে এনে জমা করা। লক্ষ্মী কৃপাদৃষ্টিতে চান—অস্বাস্থ্যও ভালবেসে এগিয়ে আসে। সংসারে ঠাঁই বাঁধলে—জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। ঘর ছাড়বার পর এই অনুভূতি প্রবল হয়েছে সুচিত্রার মনে—সম্পূর্ণকে পাওয়ার সাধনা সর্ব্বস্বকে বিলিয়ে দিয়েই করতে হয়।

মলয়কে সে এক দিন বললে—তোমরা কংগ্রেসের সব নীতি মাননা তো?

মানি—কিন্তু সমর্থন করি না। মন্ত্রী-মিশনের সঙ্গে এই আলাপ-আলোচনায় দেশের স্বাধীনতা আসবে না—এটা আমরা বিশ্বাস করি।

সুচিত্রা বললে—তবে আলাপ না চালিয়ে দেশকে বিদ্রোহের পথে টেনে আনলেই কি তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

মলয় বললে—টেনে আনার কথা নয়—কিন্তু এটা সর্ব্বদা মনে রাখা দরকার—আমরা আগুন চাইছি—পাচ্ছি আলেয়া। আর তাতেই ভুলে সব পেয়েছি বলে যদি নিরুদ্যম হই তো কোথায় পিছিয়ে পড়ব ভাব কি?

কংগ্রেসের নেতারা কি এ কথা বোঝেন না?

নিশ্চয় বোঝেন। কিন্তু তাঁরা আশাবাদী। তাঁরা হয়ত এ-ও বোঝেন যে যুদ্ধের ধাক্কায় আমাদের সঙ্কল্প স্বভাবতই শিথিল হয়েছে কিছুটা। তা ছাড়া বিপ্লব বাধাবার উপযুক্ত সময়ও এটা নয়।

সে কথা কি তোমারও মনে হয় না?

হয়। তবে—এ কথা কি আরও সত্য নয় যে—যুদ্ধের ইচ্ছাটা—যুদ্ধের কারণ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত জাগিয়ে রাখা কর্ত্তব্য? কারও সৎ প্রতিজ্ঞায় অবিশ্বাস করি না আমরা—

একটু থেমে হেসে বললে—কি জান—কালস্ত কুটিলা গতি। এখন কি পরিবেশ সৃষ্টি করে;—রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে পটক্ষেপণ আর পটোত্তোলন—এ তো সাধারণের মত অনুসারে ঘটে না।

সুচিত্রা বললে—লিখিত সর্ত্ত অবস্থার চাপে এক মুহূর্ত্তে বাতিল হয়ে যায়।

মলয় বললে—বিপ্লব খড়ের আগুন নয়—ওপরের একটু দাহ্য পদার্থের সংযোগে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। মানুষকে রাষ্ট্রসচেতন করতে হলে সমাজ-সংস্কার প্রথমে দরকার।

মোট কথা তোমরা বাম-পন্থী।

রক্ত গাঢ় হলেই মানুষ যে পন্থা নেয়—তা দক্ষিণ পন্থা নয়—ওটা আপোষ-নিষ্পত্তি—বিচার-বিবেচনা মানিয়ে চলার একটি দিক।

মানিয়ে চলাটাই—অর্থাৎ সহযোগিতাই সবচেয়ে বড় কথা নয় কি?

তারও আগে কতকগুলি ধাপ আছে—যা উত্তীর্ণ হওয়া দরকার। তুমি তেতলা থেকে হাত বাড়িয়ে দিলেই আমি একতলা থেকে কিছু সে হাত ধরতে পারি না।

তারই ব্যবস্থা তো হচ্ছে। সিঁড়ি—ইণ্টারিম গভর্ণমেণ্ট হ'ল সেই সিঁড়ি যা দিয়ে এক তলার মানুষ পৌঁছতে পারে ওপর তলায় কিংবা তেতলার মানুষ নামতে পারে এক তলায়।

মলয় বললে, সিঁড়িটা তাই মজবুত হওয়া দরকার। ও সিঁড়ি যদি পলকা হয় কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না।

তাই বুঝি এত কথা কাটাকাটি—এক একটি ধারার ভাব ভাষ্য নিয়ে মাথা ঘামোনো চলছে!

ওসব সিঁড়ি তৈরির প্ল্যান—ওটাও দরকার। তার চেয়ে দরকার ভাল মশলার, ভাল কারিগরের। মশলা হ'ল ভারতের সব জাতির একসঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা—কারিগর হলেন যাঁরা কাজ করবেন, দায়িত্ব নেবেন—একসঙ্গে আর একমত হয়ে।

তা কি করে হবে! লীগ আপত্তি তুলছে।

কংগ্রেসও তুলেছিল। তবু কিছু ছেড়ে মানিয়ে না নিলে আসল কাজটাই পণ্ড হয়ে যাবে।

তা হলে মানিয়ে চলায় তোমাদের আপত্তি কেন?

আমাদের আপত্তি হ'ল ভারতের খণ্ড সত্তায়। আমাদের আপত্তি নকল পাথর হীরে বলে আদর করায়। স্বাধীনতা পেয়ে গেলেই যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লম্বা একটা ঘুম দেওয়া যাবে—ও ধারণা জন্মানোর পক্ষপাতী নই আমরা।

তবে কি করবে ?

কত যুগের জঞ্জাল আমাদের চারদিকে গজিয়ে উঠেছে, তার উচ্ছেদ চাই। স্বাধীনতার প্রথম যুগে আত্ম-উৎসর্গের আয়োজন চাই। আমাদের যুগটা কাটবে—উদ্যোগ—শ্রম—বিপ্লব আর গঠনের দায়িত্বে। পরিবর্ত্তনের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করে যারা তাদের ঘুম মানায় না।

কংগ্রেস যদি নরম পন্থায় আপোষ করে ?

আমরা তা করতে দেব কেন!

কংগ্রেস যদি তোমাদের কথা না শোনে ?

সত্যিই হাসালে চিত্রা। কংগ্রেস কি ? নানা জাতির মিলন-প্রতিষ্ঠান মাত্র। জাতি যা চাইবে কংগ্রেস তা অস্বীকার করবে কেন ? তাই ত আমরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে সৃষ্টি করব না নতুন দল—

তবু তোমরা নতুন দলই—বামপন্থী। বলে সুচিত্রা হেসে তর্কের পরিসমাপ্তি করলে।

এক দিন মণীশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মিটিঙে যাবার মুখে।

সুচিত্রা মণীশকে লক্ষ্য করেনি। মণীশই প্রণাম করে বললে, মাপ করবেন বউদি—প্রথমটা আপনাকে চিনতেই পারি নি।

অপরাধ মণীশের নয়—এ ধরণের পটভূমিকায় সুচিত্রাকে ও আশা করে নি।

সুচিত্রা নত নেত্রে বললে, অপরাধ আমারই—

মণীশ বললে, না বউদি—

মলয় বললে, যাক অপরাধতত্ত্ব—কিন্তু কোথায় তুমি গা ঢাকা দিলে এত দিন কোন পাত্তা লাগাতে পারি নি।

গিনি হাউসে আমাদের আস্তানা—যদি খোঁজ করতে অন্তত—

মলয় বললে, অণিমা কোথায় ?

ঐ যে ডায়াসের একধারে যেখানে মেয়েরা বসে। এস, তোমাদের পেলে ও ভারি খুশী হবে।

মিটিং ভাঙলে—ওরা পার্কের একধারে বৃত্তাকারে বসলে। তারপর চলল আলোচনা। মন্ত্রীমিশন আর কংগ্রেস—ভারতের যুগবিপ্লবী পরিবর্ত্তনের কথা।

মণীশ বললে, আলোচনা আর ব্যাখ্যা এ সবে স্বাধীনতা আসবে বিশ্বাস হয় ?

আলোচনা যদি আন্তরিক হয়—

বাধা দিয়ে মণীশ বললে, বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ শুনতে সোনার পাথর বাটির মত। তা হয় না—আমাদের তৈরি হতেই হবে।

বাড়ি এসে সুচিত্রা বললে, ওঁরা তোমাদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। তোমরা বিশ্বাস কর না আলাপ-আলোচনায় স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে—ওঁরাও মনে করেন স্বাধীনতা হাটের জিনিষ নয়।

তা হলে আমরা তো একই হলাম।

না—ওঁরা জানেন হাতে কলমে দেখিয়েও দিয়েছেন সে বস্তু কোন উপায়ে হস্তগত করা যায়—তোমরা দেখছ বিপ্লবের স্বপ্ন। সেদিন সুমিত্রাদির সঙ্গে কথা হচ্ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলন নিয়ে। সুমিত্রাদি বললেন, নাই যদি আসে ওরা আমরাই গণ-পরিষদে আইন তৈরি করব স্বাধীন রাষ্ট্রের। বললাম, সে কি করে হবে ? দেশের সিকি ভাগকে বাদ দিয়ে—। উনি এটলির উদ্ধৃতি দিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বাধা জন্মাতে পারবে না সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাজে।

সে ভাষ্যও তো বদলেছেন এটলি। সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে নিয়ম খাটত জাতি সম্বন্ধে তা খাটবে না। ও—বুঝেছি তোমার কথা! তুমি বলছ বাদ দেওয়া যখন চলবে না কোন জাতিকেই তখন—'যে আসে আসুক' এ নীতি চলবে না। আই, এন, এ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে একীকরণের যে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে দেশের সামনে—তাই বা স্বার্থান্ধ মানুষ নিতে পারছে না কেন। এটি অগ্রগতি মানি কিন্তু ফল হচ্ছে কই!

আর একটি শক্তিশালী দল ফরওয়ার্ড-ব্লক। ওঁরাও আই, এন, এর নীতিতে আস্থাবান—এবং নেতাজীর আদর্শ মেনে চলেন। ওঁরাও বলছেন—দরাদরি করে জিনিষ কেনা যায়, স্বাধীনতা লাভ হয় না।

মলয় বললে, তুমি কি বলতে চাও সুচিত্রা স্পষ্ট করে বল ত।

সুচিত্রা বললে, স্পষ্ট করে কি বলব—মন্ত্রীমিশন যা বলছেন তারও মানে যেমন নানা রকম—তোমাদের নানা দলে যে মন্তব্য করছ তাও বিচিত্রধরণের। এই সব দলের মন্তব্য থেকে আমার মনে হয়—অবশ্য সেটি আমারই মত—যে কংগ্রেস রক্ষা-নিষ্পত্তির মনোভাব নিয়ে সদিচ্ছার সঙ্গে এগিয়েছেন—ওদের মনোভাব বদলে দেবেন এই আশায়—তোমাদের বামপন্থী দলগুলি তা বিশ্বাস করছে না। অথচ তোমরা এক ধরণের বিশ্বাস নিয়েও দল আলাদা আলাদা। এটা আশ্চর্য্য বোধ হয় না।

মলয় বললে, সোস্যালিষ্ট আর কম্যুনিষ্ট পার্টি যেমন··· খানিকটা এক হয়েও সবটা এক নয়—আমাদের এই বিভিন্ন দলগুলি—

সুচিত্রা বললে, আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় তোমরা এক হয়ে একটি সাধারণ কর্ম্মপন্থা বেছে নাও না কেন। দল যত বড় হয় তার ক্ষমতাও তত বেশি হয়—এ তো জান।

মলয় উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসলে। বললে, কিছু খাওয়াবে ? খিদে পেয়েছে।

আমার কথা এড়িয়ে যেতে চাইছ কিন্তু।

তা চাইছি। কারণ সব দলগুলিকে এক করার বিরাট ব্যক্তিত্ব আমাদের কারও নেই—আমরা তা পারি না।

সুচিত্রা বললে, তা হলে তোমরা স্বপ্ন দেখবেই চিরকাল।

না চিত্রা। শহরে আন্দোলন করে ছাত্র আর শ্রমিক খেপানো ছাড়া বিশেষ কিছু ফল হয় না, অস্বীকার করি না —ওটাও গণজাগরণের একটি অংশ। তবে প্রকৃত কাজ আরম্ভ করতে হবে গ্রামে—কৃষক আর মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে। এর জন্ত চাই সংগঠন—সমাজকে সুস্থ ও সক্ষম করে গড়ে তোলার কাজ। সে কাজও আরম্ভ করেছি আমরা।

সুচিত্রা বললে, খাবার খেয়ে কিন্তু খুলে বলতে হবে কি ধরণের কাজ আরম্ভ করেছ তোমরা।

১৯

শহরে বিক্ষোভ লেগেই রয়েছে। ডাক ও তার ধর্ম্মঘট চলছে—প্রেস-ধর্ম্মঘটের নোটিশ দেওয়া হয়ে গেছে। বাটা মজদুর ইউনিয়ন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বেলুড়ে লোহা-ঢালাইয়ের কারখানায় অর্দ্ধভুক্ত শ্রমিকরা করছে ঘন ঘন মিটিং। পৃথিবীর চার দিক থেকে খবর আসছে ধর্ম্মঘটের। যুদ্ধের জোয়ার সরে গেছে—দেশপ্রেমের মোহ—জীবন ধারণের সমস্যা সংঘাতে রূপ বদল করছে। যুদ্ধোত্তম মানুষের চিত্তক্ষেত্র অধিকার করে আছে, প্রকৃত যুদ্ধ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজনেই আরম্ভ হ'ল বুঝি!

ইতিমধ্যে কলকাতা বেশি রকম বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কংগ্রেস মন্ত্রীমিশনের দীর্ঘমেয়াদী সর্ত্ত মেনে নেওয়াতে—লীগ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী দুই সর্ত্তই বাতিল করে দিয়েছে। শুধু বাতিল করেই ক্ষান্ত হয় নি—অন্তর্বর্ত্তী গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলে। ঐ সংগ্রাম প্রথম সুরু হবে ষোলই আগষ্ট।···নেতারা কেউ কেউ বলেছেন—অহিংস সংগ্রাম আমাদের নীতি নয়। সংগ্রামের আগের দিন ঘোষণা করা হ'ল—ঐ দিন পূর্ণ হরতাল পালন করা হবে। যারা যোগ দিতে চায়—তারা যোগ দেবে—যারা যোগ দেবে না—তাদের ওপর জুলুম করা হবে না। যথাসম্ভব নিরুপদ্রবে প্রতিবাদ দিবস পালিত হবে। তবে যদিই কোন অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে এইজন্য ঐ দিন সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

ছুটি দেওয়ার বিরুদ্ধে যথেষ্ট বাদ-প্রতিবাদ হ'ল। সিন্ধুর গবর্ণর ছুটির ঘোষণা বাতিল করে দিলেন—বাংলার লাট তুষ্ণীভাব অবলম্বন করলেন। এমনি করে ষোলই আগষ্ট এল। ষোলই আগষ্ট এল অকল্পিত রূপে। সভ্যতার পাদপীঠ থেকে গড়িয়ে পড়ল মানুষ। গড়াতে গড়াতে চলে গেল তারা আদিম যুগের আশ্রয়ে। পশু-জগতেও হননরীতির একটি সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে—জন্মস্বত্বে পাওয়া পশু-বিবেক বলা যায় তাকে। ষোলই আগষ্ট আরণ্য রীতিকেও অতিক্রম করলে অনায়াসে।

শহরের রাজপথ শবে আচ্ছন্ন হ'ল—আকাশে উড়ল চিল আর শকুনেরা। আকাশে উঠল—নিরীহ যে-কোন-নীতি-অনভিজ্ঞ দলনিরপেক্ষ হিন্দু-মুসলমানের মরণ আর্ত্তনাদ, উঠল প্রাসাদ ও বস্তি লেহনকারী আগুনের লকলকে শিখা। বাতাসে বারুদের গন্ধ—রক্তের গন্ধ—শবের গন্ধ। গুণ্ডা-দলের উন্মত্ত চীৎকারে মথিত হ'ল বায়ুমণ্ডল। মানুষ নয়—গোটা শহরটাকে হত্যা করা হ'ল। নাদির তৈমুরের কীর্ত্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আর একবার বৃটিশ-শাসিত শহরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ষোলই আগষ্ট ঐ তারিখটিতেই নিঃশেষিত হ'ল না—পর পর তারিখগুলি তার জের টেনে চলল। জয় হিন্দ আর আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি বায়ুস্তর বিদীর্ণ করে এক প্রান্তের অরাজকতাকে অন্য প্রান্তে বিস্তীর্ণ করে দিলে। মন্ত্রীমিশন তখন বিলাতের ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় দুশ্চিন্তামুক্ত চিত্তে সুনিদ্রার আয়োজন করছে।

শহর দুঃস্বপ্নপীড়িত, পথে ঘাটে লোক চলাচল নেই বললেই হয়। এক সম্প্রদায়ের এলাকা দিয়ে অন্য সম্প্রদায় চলাফেরা তো করছেই না—সঙ্গীন উঁচানো প্রহরার সামনে পাশাপাশি দুই সম্প্রদায় দোকান খুলতে ভরসা পায় নি। দুধ সজীর অভাবে গৃহস্থের নাকালের অন্ত নেই—প্রচণ্ড আঘাতে শহর মূর্চ্ছাহত। এমন সময়ে মণীশের সঙ্গে মলয়ের দেখা।

রেড ক্রসের গাড়িতে ওরা আর্ত্ত উদ্ধারে নিযুক্ত ছিল—এক পোড়াবস্তির গলিপথে দুখানা মোটর এসে দাঁড়াল।

খবর কি মলয়—তোমাদের পাড়াটা—

হাঁ—স্বরাজ্যে সুস্থ শরীরেই আছি। তুমি?

বাসা বদল করা দরকার।

আসবে আমার বাসায়?

আপত্তি নেই।

বাসায় ওরা কতটুকুই বা থাকে। সুচিত্রা কি অণিমা ওরাও অহোরাত্র খাটছে। কাজের সীমা সংখ্যা নেই। এত রকমের দুঃখ ও দুর্ভাগ্য আছে—যা কল্পনাতেও মানুষ আনতে পারে নি। সাম্প্রদায়িকতার বিষ-নিশ্বাসে শহর ঢুলে পড়েছে। কাগজে কাগজে যে কাহিনী পরিবেশিত হচ্ছে—তা সত্য কিংবা সত্য-মিথ্যা জড়িত, অথবা কাল্পনিক এ নিয়ে বিচার নেই মানুষের মনে। মন বিভীষিকায় আচ্ছন্ন, অবিশ্বাসে ও বেদনায় অনুভূতি উগ্র, দৃষ্টিতে ধরেছে তারই রং, বাক্যে প্রকাশ পাচ্ছে উত্তেজনা। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে কৃতজ্ঞতার বন্ধন—প্রতিবেশীসুলভ সৌভ্রাত্রবোধ—দুঃখে মমত্ববোধ ও ঐশ্বর্য্যে প্রীতি প্রকাশ মানব কর্ত্তব্যের অঙ্গ ছিল তা বিলুপ্তপ্রায়। প্রতিবেশী দোষ না করেও পাড়া ছেড়ে পালাচ্ছে—প্রতিবেশী দোষী না হয়েও তাকে ভরসা দেবার সংসাহস দেখাতে পারছে না। পরস্পরের দীর্ঘ দিনের আলাপ আত্মীয়তার মাটি থেকে এতকাল রস শোষণ করেছে—এই ক'টি দিনের হাঙ্গামায় সে মাটি শুকিয়ে গেছে; তারা হারিয়ে ফেলেছে সে দৃষ্টি—সে মন। সৈনিক প্রহরায় পাড়া ছেড়ে পালাচ্ছে সেই প্রতিবেশী—জানালা খুলে দেখবার সাহসটুকু নেই প্রতিবাসীর। দু' পক্ষের মাঝখানে অমানবীয়

আচরণ উত্তরঙ্গ সমুদ্রের ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। সভ্যতার অগ্রগামী স্রোত—আদিম কালের গুহায় ফিরে চলেছে। এই লজ্জাকে জয় করা সহজসাধ্য নয়।

এই নিদারুণ লজ্জার মধ্যেই আর এক পরম লজ্জাকর ব্যাপার ঘটল। ব্যাপারটি হ'ল হিসাব-নিকাশ। প্রথম উত্তেজনা কেটে গেলে সুরু হ'ল বাগবাজার আর ট্রেটিবাজারের হিসাব-নিকাশ। মৌলালী-মাণিকতলা এরা বড়বাজার আর শ্যামবাজারকে ছাপিয়ে যেতে পেরেছে কি? ভবানীপুরের সঙ্গে মেটিয়াবুরুজের পাল্লা দেওয়া চলল। লুণ্ঠিত সম্পত্তির মূল্য হিসাব আর নিশ্চিহ্ন প্রতিবেশীর সংখ্যার গণনা কাগজে আর লোকের মুখে—পথে, বস্তিতে, ক্লাবে, বাড়িতে, আপিসে আর দোকানে প্রতিনিয়ত চলল। শহর গুজবের আবর্ত্তে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল—স্বাভাবিক অবস্থা ফিরতে হ'ল দেরি।

ইতিমধ্যে দুর্গাপূজা এল—ঈদ সমাধা হল। গুপ্ত ছোরা মারার সংবাদ—সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়ে—কিন্তু ব্যাপক হাঙ্গামা বাধল না। তবে বড় রকমের একটা বিক্ষোভ পাক খেতে লাগল—হিসাব-নিকাশের অন্তরালে। তারপর এল দশই অক্টোবর। শহর থেকে বিক্ষুব্ধ ঢেউ সবেগে আছড়ে পড়লো নোয়াখালিতে। কলঙ্ক কাহিনীর আর এক পৃষ্ঠা ইতিহাসে সংযোজিত হ'ল। আবার কাগজে কাগজে আর্ত্তনাদ হিসাব-নিকাশ। বাংলা থেকে বিহারে আছড়ে পড়ল ঢেউ। বিহার থেকে তার গতিবেগ প্রবল হয়ে হাজারায় আঘাত করলে—তারপর সৈয়দপুর। গৃহযুদ্ধের পটভূমিকা বিস্তৃত হ'ল।

দোসরা সেপ্টেম্বর কংগ্রেস যোগ দিয়েছে মধ্যবর্ত্তী গবর্ণমেণ্টে। দিল্লীর বড় দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। একটি চুরুট মধ্যবর্ত্তী সরকারের—মহামান্য সদস্যের মোটরে মাত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, অগ্নিকাণ্ড ঘটে নি। কিন্তু সে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে—রাজধানীর বাইরে। তারপর লীগের সদস্যেরা যোগ দিয়েছেন সরকারে তবু আগুন নেভে নি। একটা গোল বাধল ষোলই মে-র ভাষ্য নিয়ে। গণপরিষদে যোগ দেবার প্রতিশ্রুতিতে লীগ নাকি মধ্যবর্ত্তী সরকারে প্রবেশ করেছিল—অথচ লীগ বর্জ্জন করলে গণপরিষদ। বড়লাটের মধ্যস্থতায় বিবাদ মিটল না—তিনি এ পক্ষের দু'জন আর ও পক্ষের দু'জনকে টেনে নিয়ে গেলেন বিলাতে মোকাবিলা করতে। গণ্ডগোলটা গ্রুপিং সম্বন্ধে। অনিচ্ছুক আসাম বাংলার সঙ্গে হাত মেলাবে না—পঞ্জাবে আর সীমান্ত প্রদেশেও সেই সমস্যা। আর একটা বড় প্রশ্ন উঠল—লীগ যদি গণপরিষদ বর্জ্জন করেই আর তার অনুপস্থিতিতে সেখানকার অধিবেশন চলে ও আইনকানুন বিধিবদ্ধ হয়,—সে আইন লীগ মানতে বাধ্য কি না।

৬ই ডিসেম্বরে এটলি রায় দিলেন: অনিচ্ছুক যে কোন অংশের ওপর জোর করে শাসনবিধি চাপানো চলবে না। গণপরিষদের অধিবেশন যথাসময়েই বসবে ও যথানিয়মেই চলবে—তবে তার বিধিবিধান গ্রহণ বা বর্জ্জন করার স্বাধীনতা যে কোন দলেরই থাকবে। ১৬ই মে-র দ্ব্যর্থবাচক ঘোষণায় একটি গ্রন্থি পড়ল।

২০

শহরতলীর এ জায়গাটায় আগে ঘন দুর্ভেদ্য বাঁশবন ছিল। প্রকাণ্ড—পড়ো জমি—আগাছা—লতাগুল্ম আর ছোট ছোট ডোবায় ছিল ভর্ত্তি। এখান থেকে এনোফিলিসরা ম্যালেরিয়া বীজ বহন করে আশেপাশের গ্রামে দিত হানা—ম্যালেরিয়ার ডিপো বলে অর্দ্ধমৃত গ্রামগুলি বসতিবিরল হয়ে আসছিল ক্রমশঃ। শুভক্ষণে একাধিক কোম্পানীর নজর পড়ল এদিকে। বাংলায় অনাবাদী জমি কৃষিকর্ম্মে যা এনে দিত সিন্দুকে—ব্যবসায়ে তা ভরিয়ে দিতে পারবে ব্যাঙ্কের খাতাকে! প্রথমে বড় একটা কাপড়ের মিলের জন্য কয়েক শ বিঘা জমি লীজ নিয়ে জঙ্গল সাফ সুরু হ'ল। তার দেখাদেখি—আরও কয়েকজন ব্যবসায়ী ঝুঁকে পড়লেন এদিকে। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে—দুটো কাপড়ের মিল—একটি এনামেল ও একটি গ্লাস ফ্যাক্টরী চালু হয়েছে—আর একটা মিলের জন্য জমি দখল করা আছে—কাগজে কাগজে শেয়ার বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন বার হচ্ছে। ফলে হাজার হাজার বিঘার জঙ্গল—বাঁশবন পচা ডোবা মশককুল সমেত নিশ্চিহ্ন হয়েছে—আশপাশের গ্রামে নবজীবনের স্রোত বইছে।

মিল বা ফ্যাক্টরীর অধিকৃত শ্রমিক ব্যারাক ও ম্যানেজার ইন্‌স্‌পেক্টার প্রভৃতির কোয়ার্টার্স ও তৈরি হয়েছে। কোয়ার্টারে বৈদ্যুতিক আলো—সংরক্ষিত ট্যাঙ্ক থেকে পাইপবাহী পানীয় জলের ব্যবস্থা এ তো আছেই, যুদ্ধের শেষ ভাগে রেশন ব্যবস্থা চালু হওয়াতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দোকানও খুলেছে কোম্পানী। দুটি বাজার প্রত্যহ বসে। আর যেসব দোকান গ্রামের অভ্যন্তরে আছে—সেগুলোরও শ্রী ফিরেছে। বিশেষ করে দেশী মদের দোকানের আয় বেড়ে গেছে অসম্ভবরূপে। শহর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে গ্রামের দিকে।

কলকাতার প্রতিক্রিয়া এখানেও হয়ত সুরু হ'ত—মিল কর্ত্তৃপক্ষ ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলির চেষ্টায় তা হয় নি। অত্যাচারের তালিকা, নিহতের সংখ্যা নিয়ে তর্কবিতর্ক ও মনোমালিন্য যে ঘটে নি তা নয়—তবে সেটা দেশী মদের দোকানের এলাকাতেই নিবদ্ধ ছিল।

দোতলার দক্ষিণ-খোলা বারান্দায় ইজিচেয়ারে দেহ এলিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে প্রশান্ত। সন্ধ্যার মুখে এক পেয়ালা চা ও টোষ্ট মাখম ডিম জলযোগ করে বিশ্রামের মুহূর্ত্তে কাগজ পড়া তার নেশা। বিশেষ করে আজকালকার অন্তর্বিপ্লবোন্মুখ ভারতবর্ষ যথেষ্ট কৌতূহল সঞ্চার করে মনে। নেতারা বলেন—দুটি বছর অন্তত অশান্তি হানাহানি

কাটাকাটির মধ্য দিয়ে চললে তবে পরীক্ষার প্রথম ক্ষেত্রটি পার হওয়া যাবে। স্বাধীনতা অমনি আসবে না—মূল্য দিতেই হবে।

প্রশান্ত কাগজ পড়ছিল। শহরে—শহরের চারপাশে এ প্রভিন্সে ও প্রভিন্সে ধর্ম্মঘট লেগেই আছে। যারা কলম পিষে দশটা পাঁচটা বজায় করে—তারাও ধর্ম্মঘট করছে। সাপ্লাই আপিসের চল্লিশ হাজার কেরাণী ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এক দিন কলম চালনা বন্ধ করেছিল—ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক এই তো সেদিন ধর্ম্মঘট সেরে কাজে যোগ দিয়েছে—পোষ্ট আর টেলিগ্রাফ ওরাও কম দিন কাজ বন্ধ করে বুঝিয়ে দিলে না—যুদ্ধোত্তর যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে সক্ষম। রেঙ্গুন ডক ধর্ম্মঘট তারপর সিঙ্গাপুর—জগৎটা শ্রমিক আন্দোলনে পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। নাঃ—একঘেয়ে এই সব খবর ভাল লাগে না।

টিপয়ের ওপর কাগজখানা রেখে টিনের কৌটো থেকে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে ধরালে। শীতকালের আকাশে সাদা সাদা মেঘ ভাসছে। আবহাওয়ার রিপোর্ট বলে—পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে সামান্য বারিপাত হবে। উড়িষ্যার উপকূল ভাগে মেঘগুলি অভিযান সুরু করছে। বাতাসের কাঁধে চড়ে ভারতবর্ষের কোন্‌দিকে কতদূর ছড়িয়ে পড়বে তার মোটামুটি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

চেয়ারে পা তুলে দিয়ে অলসভাবে একটার পর একটা সিগারেট ধরিয়েই চলেছে সে। সোনালী মেঘে সন্ধ্যা নামবে এখনই—ব্রীজের আড্ডা বসবে নীচের হল ঘরে। খেলার সঙ্গে চা—পান—সিগারেট আর গল্প—সন্ধ্যাটা রঙীন আলো ভরা ফানুসের মত গভীর রাত্রির দিকে উড়ে যাবে। এই জীবনের তৃষ্ণাই কি তবে সাম্যবাদের অভ্যন্তরে লুকিয়ে ছিল? হাঁ—সার্থক হতে না পারায় ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল একটি মতবাদ—অক্ষম ঈর্ষার আক্ষেপ কিছুটা—আসলে প্রাসাদের শোভায় আর মোটরের পালিসে জড়িয়ে ছিল বাসনা। শৈশবে মা-ঠাকুরমার মুখে রূপকথাপায়ী শিশু যেমন উত্তর জীবনের সমৃদ্ধ ছবি কল্পনায় এঁকে বাসনাকে কথঞ্চিৎ পূরণ করে—বহু কল্পনা সার্থক হলে আনন্দে দিশেহারা হয়—তেমনি একটা ভাব—সার্থক হওয়ার ভাব সিগারেটের প্রতিটি টানে—শিরায় শোণিতে সঞ্চরণ করে ফেরে আজকাল। শুভাকে মাঝে মাঝে মনে পড়ে। ওর সেই চন্দ্র-সূর্য্য-বঞ্চিত বাড়ি—অথর্ব্ব দিদিমা আর রুগ্না মা—ছোট ভাইটি ওদের নিয়েই কাটিয়ে দেবে সারাটি জীবন! বেচারী শুভা! পার্টির মিটিঙে ওর শাণিত যুক্তির সামনে প্রতিপক্ষ দাঁড়াতে পারে না—অথচ রায় সায়েবের সামনে ওর মত অসহায় দুটি নেই। ওদের অত্যাচার উপেক্ষা করবার মনোবল ওর আছে···প্রচুর মনোবলই আছে।

প্রায়ই ইচ্ছা হয় শুভার ওখানে গিয়ে ওকে ভাল করে বুঝিয়ে দারিদ্র্যের অন্ধকূপ থেকে টেনে নিয়ে আসে এই আলোর পৃথিবীতে। বুদ্ধিমানেরা যদি জগতের সম্পদ সৃষ্টি না করলে তো পৃথিবীর গৌরব কতটুকু! বুদ্ধিমানেরা যদি জ্ঞানে স্বাস্থ্যে চারুকলায় সংস্কৃতির শিখাকে উজ্জ্বল করে না তুললে তো সভ্যতার উন্মেষ হ'ল কেন? সুখী হবার অধিকার সকলেরই আছে, শুভারও আছে। শুভাকে সে স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করবে।

দক্ষিণের বারান্দায় চেয়ারে পা তুলে আধ-বোজা চোখে চুরুটের দীর্ঘ শিথিল টানের সঙ্গে চিন্তাগুলি কল্পনার মধ্যে রঙ লাগায়—বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ালে সেই ঘর আর সেই পরিজন আর শুভার সেই দারিদ্র্যবহনের অটল সঙ্কল্প এতটুকু প্রশ্রয় দেয় না অলস কল্পনায়। ওর বাঁকা ঠোঁটের কোণে শাণিত এক টুকরা হাসি—বিদ্রূপে ঝলমল করে সর্ব্বদা। যুক্তির চেয়ে বড়—অনুনয়কে টুকরো টুকরো করে দেয় অনমনীয় সেই পাতলা হাসি তার মত মারাত্মক অস্ত্র শুভার ভাণ্ডারে বুঝি দ্বিতীয় নেই। প্রশান্ত মনে মনে হার স্বীকার করে।

তবু প্রত্যহ মনে হয়—শুভা একবার আসবে না এখানে? প্রশান্তও পৃথিবীকে সৌন্দর্য্যশালিনী করতে পারে—প্রশান্তরও সৃষ্টিক্ষমতা কম নয়। ক'টি মাসই বা এই ফ্যাক্টরীর ভার নিয়েছে সে। চারদিকের আগুনের ছোঁয়াচ থেকে সে যে এটিকে রক্ষা করতে পেরেছে—এ কৃতিত্ব তারই তো। দু' দুবার ঢেউ উঠেছিল। পুজোর বোনাস আর মাগ্‌গি ভাতা বাড়ানোর দাবি। মালিক হাল ছেড়ে বললেন, যা ভাল বোঝ কর—কিছু টাকা মঞ্জুর করে দিচ্ছি।

অর্দ্ধেক মাইনে বোনাস—আর দু' টাকা মাগ্‌গি ভাতা বৃদ্ধি—ধর্ম্মঘটের প্রগাঢ় ছায়া—ফ্যাক্টরীর পাশ কাটিয়ে গেল।

রতন কটন মিলের ম্যানেজার সর্ব্বেশ্বর বাবু বললেন—কাজটা ভাল করলেন না প্রশান্ত বাবু। ঘি দিলেই আগুন জ্বলবে—বারো মাস ঘি ঢালবার ব্যবস্থা করতে পারবেন তো?

প্রশান্ত বললে—অসন্তুষ্ট লোক নিয়ে কাজের পড়তা হবে কেন সর্ব্বেশ্বর বাবু। গো স্লো ট্যাক্‌টিক্‌স্‌-এ ব্যবসা চলে না কখনো।

কিন্তু লাভের মার্জ্জিন কমে এলে—আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে—

তাও কি ভাবি নি সর্ব্বেশ্বর বাবু। টাকায় টাকা লাভ—এ তো যুদ্ধের বাজারেই সম্ভব হয়েছে, টাকায় সিকি লাভ এ নিয়েও তো না বাঁচবার কথা নয়।

সর্ব্বেশ্বর বাবু রাগ করে কথা বলেছিলেন কিছু, প্রশান্ত রাগ করে নি। লাভের অংশ কমে গেলেই এদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। এরা দু' চোখের সীমানায় যতটুকু পড়ে, তারই মাপজোপ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু দৃষ্টির দোষ, অহঙ্কারে আঘাত লাগলেই কেটে যায়, নতুন করে রফা-নিষ্পত্তি করে বেশি লোকসানই দিয়ে বসে এরা। সর্ব্বেশ্বর বাবু

শ্রমিকদের দাবী পুষিয়ে এক দিন দুঃখ করেছিলেন, মিল তুলে দেব, এত কম লাভে ভূতের খাটুনি খেটে পোষায় না।

মিল তুলে দেন নি তিনি। ভূতের কাঁধে চেপে আছেন বলেই ভূতেদের নাচের ধকল তাঁকে সইতেই হয়।

নীচের হলঘরে আলো জ্বলে উঠল, কোলাহল শুরু হ'ল। চাকর এসে খবর দিলে বাবুরা এসেছেন।

সিগারেটের টিন আর চা নীচের ঘরে পাঠানোর হুকুম দিয়ে প্রশান্ত নেমে গেল।

সর্বেশ্বর বাবু বললেন, এই শুনুন এঁদের মুখে, ব্যাটারা কি বলে।

লক্ষ্মী গ্লাস ওয়ার্কস্‌-এর ম্যানেজার কমল মিত্র বললেন, টোয়েনটি-ফাইভ পারসেন্ট পে ইনক্রীজ প্লাস টোয়েনটি পারসেন্ট এ্যালাউন্স। নিন ঠেলা, কি দিয়ে সামলাবেন সামলান।

আচ্ছা, বসুন স্থির হয়ে। একটা পরামর্শ করা যাক।

পরামর্শ আর ছাই। সব ক'টি মিল, ফ্যাক্টরী এক জোট হয়েছে, ইউনিয়নের থ্রু দিয়ে নোটিশ দেবে পনেরো দিনের। একেবারে মোক্ষম কাছিমের কামড়। হতাশ সর্বেশ্বর টিন থেকে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে চেয়ারের হাতলে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন।

বেঙ্গল কটন মিলের ম্যানেজার অনন্ত দোবে বললেন, পুরা মাহিনায় ছুটি, ক্যাজুয়াল লিভ পনের দিনের, আউর মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ভি ডিমাণ্ড করছে।

প্রশান্ত বললে, ছুটি তো এ্যাডজুডিকেশনে যাবে, সেদিন মিল ওনার্স এসোসিয়েশনে ঠিক হ'ল না? আর মেডিক্যাল ট্রিটমেণ্ট! কেন ডাক্তার নেই আপনার মিলে?

আরে ডকটার আছে, দাওয়াই ভি আছে, লেকিন উ আদমী আচ্ছা দাওয়াই মাংতা হয়।

বেশ ত...তাও কিছু রাখবেন। লাভের একটা সামান্য অংশ দিলেই তো ভাল ডাক্তারখানা ও ভাল ডাক্তারের ব্যবস্থা হতে পারে।

সর্বেশ্বর বাবু মুখ ভার করে বললেন, পারে তো সবই মশায়...কিন্তু লাভের মার্জিন কমে গেলে...ভূতের ব্যাগার খেটে লাভ!

প্রশান্ত হেসে বললে, ভূতদের যখন ছাড়াই যাবে না, আর আদায় করতে হবে ভাল কাজ, তখন ওদের ভাল থাকা আর ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে বৈকি?

সর্বেশ্বর রাগ করে বললেন, আপনার তো ফ্যাক্টরী নয়, কাজেই ও কথা বলবেন বৈকি।

প্রশান্ত বললে, মালিকের মনের ইচ্ছে না জানলে কি এ কথা বলবার সাহস আমার হয়। ভাল খাওয়া পরা আর ভাল থাকার দাবি আমার আপনার যেমন আছে, ওদেরও তেমনি আছে।

কমল মিত্র বললেন, আচ্ছা সে না হয় যতদূর সম্ভব ব্যবস্থা করা গেল, কিন্তু পে আর এলাউন্সের দাবি মেনে নিলে, এই সর্বেশ্বর বাবু যা বলেছেন, ভূতের ব্যাগার দেওয়া ছাড়া, আর কিছুই হবে না।

প্রশান্ত সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, কাল কি পরশু দুপুর বেলায়—একটা মিটিং কল করা যাক। তার আগে মিলের আয়ব্যয়ের হিসেবটা ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার।

অনন্ত দোবে বললেন, আমেরিকা মাল ছাড়লে তো তেজ থাকবে না—বিলকুল ডাউন হয়ে যাবে।

হাঁ—সে হিসেবও মোটামুটি কষতে হবে। তবে যাই বলুন—এ বাজার নামতে এখনও দু' বছর তো যাবেই।

সর্বেশ্বর বললেন, তা হলেও তো বাঁচি। বাজার নামলে ব্যবসা তো গুটোতেই হবে। ভাববেন না একবার দাবি বাড়িয়ে আবার তা কমানো যাবে।

প্রশান্ত বললে, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং যেমন তেমনি আয়-ব্যয় চলবে। একটা কম—আর একটা বেশি এ টপসি-টারভি কন্‌ডিশনে পৃথিবী চলতে পারে না।

ব্রিজের আসর বসল—অন্য দিনের মত জমল না। সকাল সকাল খেলা ভেঙে সবাই উঠলেন।

কমল মিত্র বললেন, হিসেব-নিকেশ করতে দু'চার দিন সময় নেবে—মিটিংটা আসচে সপ্তাহেই হোক।

সর্বেশ্বর বললেন, তাই হোক—ওরা তো এখনও নোটিশ দেয় নি।

সবাই চলে গেলে প্রশান্ত আপন মনে খানিকটা হাসলে। মুঠো শক্ত করে রাখবার চেষ্টা কোথায় নেই। চার্চ্চিল, জেনেরাল স্মাটস্‌—থেকে চুনোপুঁটি সর্বেশ্বরবাবু পর্য্যন্ত। সাম্রাজ্যবাদ আর পুঁজিবাদে আঁতাত চিরকালের। সাম্রাজ্যবাদ না টিকলে পুঁজিবাদ বাঁচে কি করে। একের সম্পদ-সৃষ্টির মূলে বহুর দুর্দ্দশা ও দাসত্ব—এ কলঙ্ক অপসারিত না হলে পৃথিবী সুস্থ হবে না। লোভের ত সীমা নেই—সে চায় আরও। অঙ্গুষ্ঠ থেকে পর্ব্বতপ্রমাণ। টলষ্টয়ের সেই গল্পটা মনে পড়ল—একটা লোকের কতটা জমি আবশ্যক। লোভের বশে সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যে সব জমির উপর দিয়ে সে ছুটে ছুটে চলল—মনে করলে সবই তার অধিকারে—তার দুরাশা তাকে সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিল। সূর্য্যাস্তের মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যেখানে সে থামল—চিরদিনের মত—সেই সাড়ে তিন হাত জমিটুকু তার দেহকে দিলে যথার্থ আশ্রয়। প্রয়োজন মিটিয়ে বাইরে হাত বাড়ানোই ত অনধিকার। অথচ পুঁজিবাদ তা স্বীকার করবে না—সাম্রাজ্যবাদ ত বুক দেখি বলে দাঁড়িয়েছে।

সুখী হবার অধিকার সকলের আছে—এ কথা স্বীকার করে প্রশান্ত—কিন্তু কারো সুখ কেড়ে নিয়ে সুখী হওয়া নয়। কারও দাসত্বে নিজের প্রভুত্ব কায়েম করার বাসনাও তার নেই। এগুলি হ'ল দুর্ব্বল—দাম্ভিক—ক্ষমতালোভীর বর্ব্বর

বাসনা। লাভটাকে সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া দরকার—হাতের পাঁচটি আঙুল সমান না হতে পারে—একটা রুগ্ন আর একটা অত্যন্ত স্ফীত হবে কেন?

রোজই মোটর নিয়ে সে কলকাতায় যায়। মালিকের সঙ্গে পরামর্শ করে। তিনি ওর কাজে অত্যন্ত সুখী। বলেন আমরা বাণপ্রস্থের যাত্রী—কিছু শুনিও না। কারখানা আর শ্রমিক দুটি পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এটি সর্ব্বদা মনে রাখবে।

আপনার প্রফিট কমলে—

ন্যায্য প্রফিট পেলেই যথেষ্ট। আরে যুদ্ধের কথা বাদ দাও—অবশ্য ইনফ্লেশনের ব্যাপারটা চট করে নষ্ট হবে না—তবে তোমার হাতে জিনিস নষ্ট হবে না—

কিন্তু আমি ত নতুন।

নতুন বটে—আনাড়ী নও। আয়বায় আর চলতি বাজার ষ্টাডি করে নিয়েছ—কোন দিন তোমায় ঠকতে হবে না।

একে অগাধ বিশ্বাস বলা যায়। প্রশান্ত নিজের মতামত খাটাতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। অর্থের সুপরিচালনায় মানুষের কল্যাণ। খেয়ে পড়ে সুস্থদেহে সে যদি কাজ করে যায়—যে কাজের ত্রুটি কোন দিক দিয়ে কোন মুহুর্ত্তেই প্রকাশ পাবে না। অভাব বোধ হতেই বিক্ষোভের জন্ম যে সম্ভাবনা সে উঠতে দেবেই বা কেন?

হেড আপিসটা ঘুরে প্রশান্ত এল শুভাদের বাড়ির সামনে। ঠিক সামনে নয়—কেননা সে গলি পায়ে-হাঁটার গলি—মোটর সেখানে অচল। বাঁধানো গলি চারবার পাক খেয়ে যেখানে শেষ হয়েছে—তারই একপ্রান্তে শুভাদের বাড়িখানা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল প্রশান্ত।

ভেতরে অনেক কণ্ঠের মিশ্রস্বর—যেমন উদ্দাম আলোচনা চলে প্রত্যহ তেমনি চলছে। শহরের আবর্জ্জনারূপী ওই বাড়ীখানিতে বসে—ভারতবর্ষের অসংখ্য শ্রমিক ও দরিদ্রদের মুক্তি চিন্তা করছে যারা—এ তাদের বিলাস না ক্ষেপামি! কয়েকটি মিটিঙে বক্তৃতা করলেই সাম্যনীতি চালু হবে না—কিংবা সিনেমার রূপালী পর্দ্দায় লাখ দেড় লাখ টাকার চুক্তি-নামার স্বাক্ষরকারিণী নায়িকার মুখনিঃসৃত মন-তাতানো বক্তৃতাও কোন ফল প্রসব করবে না। সে বক্তৃতা করতালির সমর্থনে প্রেক্ষাগৃহ কাঁপিয়ে তুলবে শুধু। কৌতুকলোভী পুঁজি-বাদীর দল বক্সের টিকিট কিনে মুচকি মুচকি হাসবেন সস্তা ভাব-বিলাসিতার অভিব্যক্তিতে। স্বৈর শাসনের আওতায় বসে আরও বহুকাল মঞ্চে বা ময়দানে এ ধরণের বক্তৃতা শুনে তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না। এই সোজা কথাটা শুভারা বুঝতে চায় না। রাজনীতিবিদ্‌ মানেই তো যে কোন সুযোগের সাহায্য নেওয়া একথা কত দিন বলেছে শুভা অথচ কার্য্যক্ষেত্রে সে পিছিয়ে পড়ছে না কি।

কড়া নাড়বে কিনা ভাবছে—ওপর থেকে হাসির হল্লা গলির বুকে আছড়ে পড়ল। দীর্ঘ বিলম্বিত হাসি। হয় তর্কে কেউ হেরে গেল নতুবা পুঁজিবাদের ওপর কটাক্ষ করে কোন শাণিত মন্তব্য বর্ষিত হ'ল।

কে—কাকে চান?

ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে একটি ছেলে। হাতে তার বইয়ের গোছা—জামা কাপড়ে তার সত্যকার পরিচয় লেখা। বইগুলি কলেজের পাঠ্য হতে পারে, কমিউনিষ্ট লিটারেচারও হতে পারে।

প্রশান্ত উত্তর দেবার আগেই সে বললে, বিশেষ সুবিধা হবে না—এটা বুর্জ্জোয়াদের ক্লাব ঘর নয়। সরে পড়ুন।

প্রশান্তর বেশবাস দেখেই ছোকরা আঘাত দেবার লোভ সামলাতে পারলে না। ওর অপরাধ কি—বুদ্ধির অপরিপক্ক অবস্থায় সাম্য-দর্শন স্বভাবতই অসহিষ্ণু ও উগ্র হয়ে থাকে।

ছোকরা চলে গেলে প্রশান্তও ফিরে এল। ধনের অহমিকায় আর দারিদ্র্যের অহমিকায় তফাৎ কিছু নেই; দুইই দুর্ভেদ্য। আঘাত দেওয়াই হ'ল তার প্রকাশ ধর্ম্ম। মাঝখানের সেতুবন্ধন কেউই স্বীকার করে না। ভালবাসার প্রশ্ন তুললে—পুঁজিবাদী ভাববে এটা সহজাত সেবার প্রবৃত্তি—নিঃস্ব ভাববে ওটা বুর্জ্জোয়া বনবার একটি পরিচিত ভঙ্গি। কিছু দিন আগে তার দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তারীতি ওই ধরণেরই তো ছিল।

মোটরের কাছে ফিরে এল প্রশান্ত।

একটি সুবেশ যুবক গ্যাসপোষ্টের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল—হয়ত প্রতীক্ষা করছিল প্রশান্তর। প্রশান্তকে দেখে সে এগিয়ে এসে নমস্কার করে বললে, আপনাকে আমি চিনি—বত্রিশ নম্বর বাড়ীটাতে দিন কয়েক আপনাকে দেখেছি। আর একদিন দেখেছিলাম মেয়েটির পক্ষ সমর্থন করে যেদিন রায় সায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করলেন।

ঝগড়া।

যুবকটি হেসে বললে, রায় সায়েব তো আপনাদের ভদ্রতা রেখে কথা বলেন নি। যাই হোক—ওই মেয়েটির সম্বন্ধে—

প্রশান্ত বিরক্ত হ'ল। তৃতীয় ব্যক্তির মুখে শুভাকে নিয়ে আলোচনা করতে সে রাজী নয়। মোটরের দুয়োরটা খুলে নিঃশব্দে সে তার ভেতরে আশ্রয় নিলে।

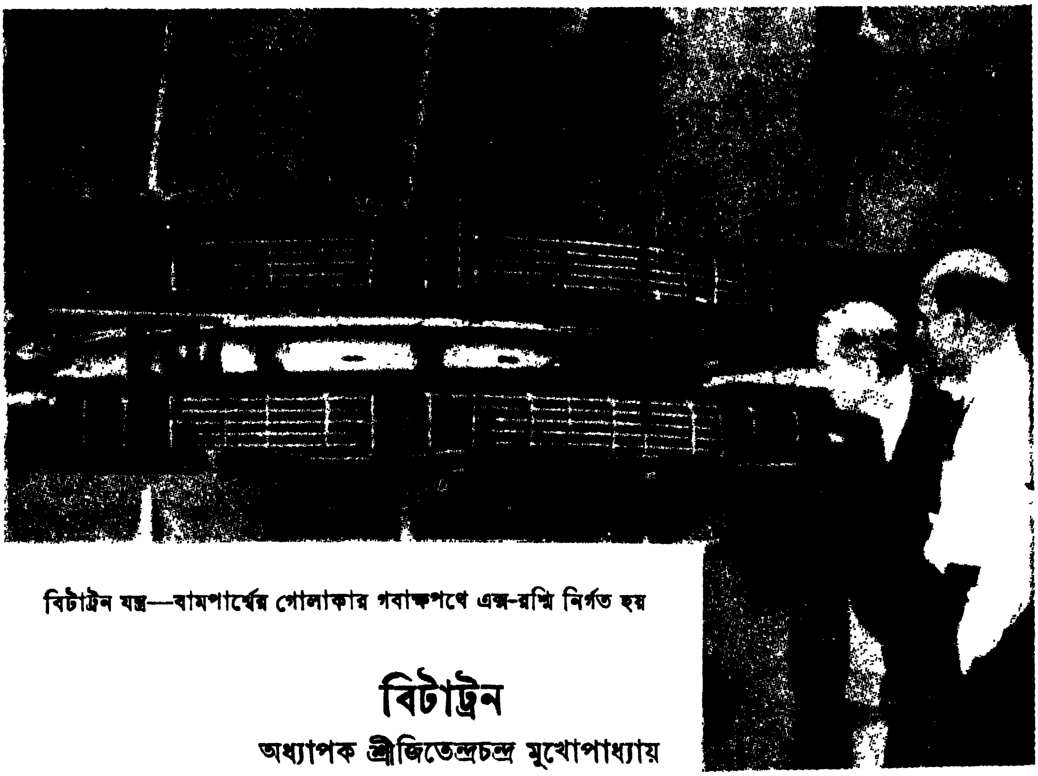
যুবক এগিয়ে এসে বললে, আপনি রাগ করবেন জানি—তবু ও যে সাংঘাতিক মেয়ে সে কি আপনি বুঝতে পারেন নি?

না—বুঝতে চাইনে। তীব্র ভর্ৎসনায় প্রশান্ত প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। ড্রাইভার ষ্টার্ট দাও।

যুবক সিগারেট ফেলে দিয়ে হেসে উঠল হো হো করে। সে দিন তো পায়ে হেঁটে এসেছিলেন—আজ একখানা মোটর হয়েছে—তবুও বলছি সাবধান। শৈলেশ্বর বোসের তিনখানা মোটর আছে—

শৈলেশ্বর বোস! কথাটি চাবুকের মত সপাং করে প্রশান্তর পিঠে পড়ল। স্মৃতিশক্তি তার দুর্ব্বল নয়।

ড্রাইভারের পিঠের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, রাস্তার ওপিঠে গাড়ী থামিও তো। এক জনের সঙ্গে দেখা করে আসি। [ক্রমশঃ



বিটাট্রন যন্ত্র—বামপার্শ্বের গোলাকার গবাক্ষপথে এক্স-রশ্মি নির্গত হয়

বিটাট্রন

অধ্যাপক শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পরমাণুর অভ্যন্তরে অপরিমেয় তেজ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। অনুরূপ শক্তির অধিকারী না হইলে তার মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। পরমাণুর উপাদান ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন—নানা উপায়ে ইহাদের পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়। কোনও প্রক্রিয়াদ্বারা সংগ্রহ করিয়া ইহাদের কোনটিকে অপর কোন পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রেরণ করিতে চাহিলে তাহাকে তেজযুক্ত করিয়া দিতে হইবে, নতুবা পরমাণুরাজ্যের সীমান্ত হইতেই সে বিদায় হইয়া আসিবে। পরমাণুকেন্দ্রের তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ও সেখানকার তেজোভাণ্ডারের চাবিকাঠির সন্ধানমানসে অনেককাল ধরিয়া চেষ্টা চলিতেছে। এই জাতীয় প্রচেষ্টার সবগুলিরই মূল করণীয় ছিল পরমাণুলোকে হানা দিবার জন্য কণিকাদের অমিত শক্তিধর করিয়া তোলা।

চলন্ত পদার্থের শক্তির পরিমাপ হয় উহার বেগের পরিমাপদ্বারা। কোন বস্তুর বেগ যত বেশী হয় উহাতে সংশ্লিষ্ট শক্তি তত বেশী হইয়া থাকে। মৌলিক কণিকাদের বেগপ্রদান করিয়া উহাদের শক্তিসম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই নির্ম্মিত হইয়াছিল পরমাণু বিভাজন যন্ত্র সাইক্লোট্রন। সাইক্লোট্রন আবিষ্কৃত হইবার পর মৌলিক কণিকা প্রোটন ও তৎগোত্রীয় ডয়েট্রন কিংবা আলফা কণিকাকে প্রচণ্ড বেগ প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এই যন্ত্রও কার্য্যকারিতায় সর্ব্বথা উপযোগী নহে। পজিটিভ তড়িৎ-গ্রস্ত ভারী কণিকা ভিন্ন হালকা ও নেগেটিভ তড়িৎ-গ্রস্ত ইলেকট্রনকে এই যন্ত্রদ্বারা বেগযুক্ত করা সম্ভব নহে। তাই সাইক্লোট্রন আবিষ্কারের পরেও মৌলিক কণিকাকে বেগযুক্ত করিবার প্রয়াসের সমাপ্তি হয় নাই। ইলেকট্রনকে অনুরূপ বেগপ্রদান করিবার জন্য যে যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে তাহারই নাম বিটাট্রন।

আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল, সে গতির স্বরূপ উপলব্ধি করা মানুষের সাধ্যাতীত। অথচ মানুষের হাতেই আজ ইলেকট্রন যে গতি পাইতেছে তাহার পরিমাণ পুরাপুরি এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল না হইলেও অন্ততঃ উহার ৯৯.৯৯৮% ভাগে পৌঁছিয়াছে। বিটাট্রন যন্ত্রের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া ইলেকট্রন এক সেকেণ্ডের আড়াই শত ভাগ সময়ের অবসরেই ঐ গতি পাইয়া থাকে, যাহার ফলে উহার ভর প্রায় দুই শত গুণ বর্দ্ধিত হয়।

তড়িৎ-গ্রস্ত পদার্থ ও চৌম্বকশক্তি এতদুভয়ের মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। উহারা একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করে। তড়িৎ-গ্রস্ত কণিকা যদি গতিশীল হইয়া কোন চুম্বকের প্রভাবে আসিয়া পড়ে এবং চৌম্বকক্ষেত্রের সমকোণে চলিতে থাকে তবে চুম্বকের আকর্ষণে তড়িৎগ্রস্ত কণিকা সরল রেখায় না

চলিয়া বৃত্তাকার পথে পরিক্রমণ করে। ইলেকট্রনকে গতিশীল করিয়া চৌম্বকক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিলে উহারও অনুরূপ অবস্থা হয়।

সকল পদার্থের ভিতর দিয়া তড়িৎপ্রবাহের চলাচল সম্ভব হয় না। যে পদার্থের তড়িৎসংবহন করিবার উপযুক্ততা আছে তাহাদের পরমাণুর একটি বৈশিষ্ট্য থাকে। উহাতে এমন কতকগুলি শিথিল ইলেকট্রন থাকে যাহারা সহজেই পরমাণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কোন সংবাহক তারের ভিতরে এই জাতীয় ইলেকট্রনগুলি বাহির হইতে কোন প্রেরণা পাইলেই একটা বিশিষ্ট দিকে চলিতে আরম্ভ করে। কয়েকটি উপায়ে এই প্রেরণা সৃষ্টি করা সম্ভব, তন্মধ্যে তড়িৎকোষের ক্রিয়া অন্যতম। তড়িৎকোষের দুই প্রান্ত সংবাহক তার দিয়া জুড়িয়া দিলে প্রবাহ পাওয়া যায়, এই প্রবাহ প্রকৃত পক্ষে তারের ভিতর দিয়া তড়িৎকোষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে শিথিল ইলেকট্রনদের গমনকার্য্য বা স্থানান্তর ভিন্ন আর কিছু নহে। একথা এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত যে, কোন একটি বিশেষ ইলেকট্রন বেগপ্রাপ্ত হইয়া তড়িৎকোষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে সরাসরি গমন করে না। একটি ইলেকট্রন কোন পরমাণু হইতে নির্গত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী অন্য পরমাণুতে সংলগ্ন হয় আবার এই শেষোক্ত পরমাণুর ইলেকট্রন তৎপরবর্ত্তী পরমাণুতে যুক্ত হয়; এই প্রকার বিনিময়-কার্য্যের ফলেই এক প্রান্তের ইলেকট্রন অপর প্রান্তে পৌঁছায়, তবে কার্য্যত আমরা মনে করিতে পারি যেন একটি ইলেকট্রনই তারের ভিতর দিয়া বরাবর চলিয়া আসিল। ইলেকট্রনের এবম্প্রকার চলাচল যত দ্রুত হয় প্রবাহের তীব্রতা তত বৃদ্ধি পায়।



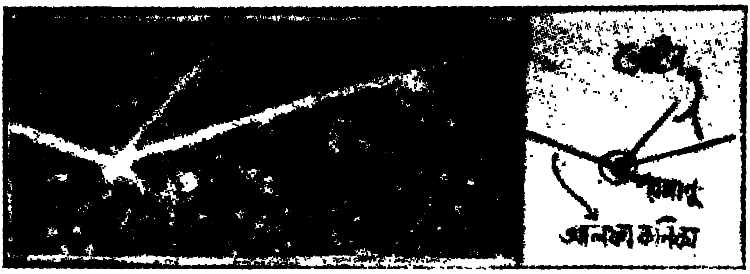
সাইক্লোট্রন যন্ত্র (ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়)

যদি কোন গতিশীল ইলেকট্রন মুক্ত অবস্থায় শূন্যমার্গে একটি নির্দ্দিষ্ট বৃত্তাকার কক্ষে পরিক্রমণ করে তবে ঐ গতিশীল একক ইলেকট্রন ও তাহার কক্ষ কার্য্যত তড়িৎসংবহনকারী তারের কুণ্ডলী (তড়িৎচক্র) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

এই আলোচনা হইতে একথা সিদ্ধান্ত করা চলে যে কোন গতিশীল ইলেকট্রন চৌম্বক ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলে উহা চক্রপথে পরিক্রমণ করিবে এবং তৎকালে উহাকে তড়িৎ-চক্রের সমতুল্য বলিয়া মনে করা চলিবে।

কোন তড়িৎচক্রের ভিতরে যে কারণেই হোক চৌম্বক প্রভাবের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে থাকিলে তারের আভ্যন্তরীণ ইলেকট্রনেরা গতিশীল হইয়া উঠে এবং তজ্জন্য তৎকালে চক্রে তড়িৎপ্রবাহের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। ইহার নাম আবেশ। এই কারণে একটি তারের কুণ্ডলী লইয়া উহার ভিতরে একটি চৌম্বকদণ্ড প্রবেশ করাইতে থাকিলে কুণ্ডলীতে তৎকালে ক্ষণস্থায়ী প্রবাহ উৎপন্ন হয়। চৌম্বকদণ্ড কুণ্ডলী-অভিমুখে অগ্রসর বা কুণ্ডলী হইতে নির্গত হইতে থাকিলে চৌম্বকদণ্ড ও কুণ্ডলীর পারস্পরিক দূরত্ব পরিবর্ত্তনে চক্রাভ্যন্তরে চৌম্বক-প্রভাব বর্দ্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং ইহার জন্যই উপরোক্ত আবেশের সৃষ্টি হয়। চৌম্বকদণ্ড কোন বিশেষ অবস্থায় (কুণ্ডলীর অভ্যন্তরে বা বাহিরে) স্থির হইয়া থাকিলে কোন প্রবাহ পাওয়া যায় না, কারণ এই সময়ে চক্রাভ্যন্তরীণ চৌম্বকপ্রভাব অপরিবর্ত্তিত থাকে। চৌম্বকপ্রভাবের পরিবর্ত্তনের ক্ষিপ্রতার উপর আবেশোদ্ভূত প্রবাহের তীব্রতা নির্ভর করে। চৌম্বক-দণ্ড ব্যবহার না করিয়া অন্য কোন উপায়ে চক্রে চৌম্বক-প্রভাবের পরিবর্ত্তন করিলেও আবেশের উৎপত্তি সম্ভব।

পর্য্যবেক্ষণে ইহাও দেখা যায় যে, কোন তড়িৎকুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহিত হইতে থাকিলে তৎকালে উহা স্বয়ং একখণ্ড চুম্বকের ন্যায় আচরণ করে। কুণ্ডলীতে প্রবহমান তড়িৎ পরিবর্ত্তনশীল হইলে কুণ্ডলীতে সঞ্জাত চৌম্বকপ্রভাবও পরিবর্ত্তিত হয়। আবার কুণ্ডলীর অভ্যন্তরে এক খণ্ড লৌহ রাখিয়া দিলে এই চৌম্বকপ্রভাব তীব্রতর হয়। আবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য পূর্ব্বে উল্লিখিত কুণ্ডলী সন্নিকটে চুম্বক আনয়ন না করিয়া যদি উহাকে ঘিরিয়া আর একটি লৌহসম্বলিত তড়িৎচক্র স্থাপনা করা হয়, তবে এই শেষোক্ত তড়িৎচক্রে (ইহাকে অতঃপর মুখ্যচক্র বলা



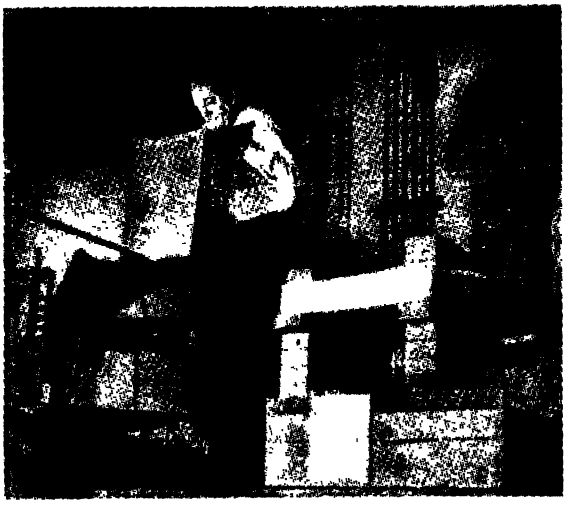
বিটাট্রনের রশ্মিপ্রভাবে পরমাণু চূর্ণীকৃত হইবার পর আলফা কণিকা ও প্রোটন বিপরীত দিকে যাইতেছে (উইলসন প্রকোষ্ঠে গৃহীত ফোটো)

হইবে) পরিবর্তনশীল প্রবাহ চালনা করিলে প্রথমোক্ত চক্রে (গৌণ) আবেশজনিত প্রবাহ পাওয়া যাইবে। একথা এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত যে মুখ্যপ্রবাহ পরিবর্তিত না হইয়া স্থির থাকিলে গৌণচক্রে প্রবাহ পাওয়া যাইবে না, কারণ মুখ্য চক্রে প্রবাহিত তড়িতের পরিবর্তনের ভিতরেই রহিয়াছে গৌণচক্রাভ্যন্তরে পরিবর্তনশীল চৌম্বকপ্রভাব তথা আবেশ উৎপত্তির হেতু। গৌণপ্রবাহের স্বরূপ সম্পূর্ণরূপে মুখ্য প্রবাহের স্বরূপ ও পরিবর্তনের ক্ষিপ্রতার উপর নির্ভর করে, পরিবর্তনের বর্দ্ধিত হার আবেশকে তীব্রতর করিয়া তুলে। মুখ্য প্রবাহ ক্রমবর্দ্ধমান হইলে গৌণ প্রবাহও তদনুসারী হইয়া থাকে।

একণে আবেশের উদ্ভবের জন্ত প্রয়োজনীয় পূর্ব্বোক্ত সজ্জাকে একটু বদলাইয়া লইলে অন্ত প্রকার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাইতে পারে। মনে করা যাক, গৌণচক্রে ব্যবহৃত তারের কুণ্ডলীর পরিবর্তে বৃত্তাকৃতি কাচের আধারে রক্ষিত ভ্রাম্যমাণ ইলেকট্রনকে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তারের কুণ্ডলী ও ভ্রাম্যমাণ ইলেকট্রন রচিত চক্রের মধ্যে তড়িৎপ্রভাব বিষয়ক ঐক্য আছে। এইরূপ সজ্জা করিয়া লইয়া যদি মুখ্য চক্রে ক্রমবর্দ্ধমান প্রবাহ চালনা করা যায় তবে আবেশবশত 'ভ্রাম্যমাণ ইলেকট্রন চক্রে'ও অনুরূপ গৌণ প্রবাহের উদ্ভব হওয়া সম্ভব, এই স্থলে ইহার স্বরূপ কি হইবে দেখা যাক্।

সাধারণ তারের ভিতরে যখন প্রবাহ চলে তখন প্রবাহের বৃদ্ধি হইলেই ইলেকট্রনগুলি তারের অভ্যন্তরে বর্দ্ধিত বেগে চলিতে আরম্ভ করে। উপরোক্ত ইলেকট্রনচক্রে তড়িৎ-প্রবাহের শক্তিবৃদ্ধি হওয়ার ফলে চলমান ইলেকট্রনের গতি বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, এই চক্রে একই ইলেকট্রন সমস্ত চক্র পরিক্রমণ করিয়া আসিতেছে; (তারের কুণ্ডলী নির্ম্মিত চক্রের সঙ্গে এখানে প্রভেদ রহিয়াছে) —সুতরাং প্রবাহের বৃদ্ধি সেই একই ইলেকট্রনকে বারংবার বর্দ্ধিত বেগ প্রদান করিবে। তাহা হইলে অবস্থাটা দাঁড়াইতেছে এইরূপ যে, বৃত্তপথে ভ্রমণকালে মুখ্য প্রবাহের দ্রুত পরিবর্তনের জন্ত ইলেকট্রন প্রতি মুহূর্ত্তে বেগবৃদ্ধির প্রেরণা পাইতেছে এবং এই কারণে একবার ভ্রমণশেষে ইলেকট্রন যখন পুনরায় যাত্রারম্ভস্থলে ফিরিয়া আসিতেছে তখন উহার বেগ বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। যখন মুখ্য-প্রবাহ ক্ষিপ্রগতিতে চরম মাত্রায় উঠিতে থাকে সেই অবসরে যদি ইলেকট্রন বহুবার বৃত্তপথে পরিক্রমণ করিবার উপযুক্ত হয় তবে প্রবাহের চরম বৃদ্ধির মুহূর্ত্তে এই ইলেকট্রন প্রচণ্ড বেগযুক্ত হইবার সুযোগ পাইতে পারে। এই ব্যবস্থায় মুখ্যপ্রবাহের পরিবর্তনরীতি যত ক্ষিপ্রতর হইবে ইলেকট্রনের বেগ তত প্রচণ্ড হইবে। বিটাট্রন যন্ত্রে এই প্রক্রিয়া দ্বারাই ইলেক-ট্রনকে পূর্ব্বোক্তপ্রকার বেগ প্রদান করা সম্ভব হইয়াছে।

এই পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্ত বলয়াকৃতি ফাঁপা একটি কাচের পাত্র বা নল লওয়া হয়। একটি লাইফ বেল্টের আকৃতি করিলে এই নলের স্বরূপ উপলব্ধি হইবে। নলের ভিতরটা বায়ু-বর্জ্জিত; ইহার এক পার্শ্বে ইলেকট্রন উৎপন্ন করিবার ব্যবস্থা আছে—বন্দুকের গুলির মতই ইলেকট্রনকে এই যন্ত্র হইতে বেগে ছুড়িয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয় বলিয়া ইহার নাম দেওয়া হয় "ইলেকট্রন গান্"। সমস্ত নল ঘিরিয়া উপরে ও নীচে রহিয়াছে ১৮০ × ৭৬ × ১০৮ ইঞ্চি আকৃতিবিশিষ্ট



বিটাট্রন-সংশ্লিষ্ট উইলসন প্রকোষ্ঠ (পরমাণু চূর্ণীকরণ স্থান) ও আনুষঙ্গিক ফোটো তোলার ব্যবস্থা

লৌহসম্বলিত তারের কুণ্ডলী—১২৫ টন ওজনের ইস্পাত ও তদুপরি জড়ানো সংবাহক তার—যাহার ভিতর দিয়া ২৪ হাজার ভোল্ট উদ্ভূত ১০০ এম্পিয়ার শক্তির পরিবর্তী প্রবাহ চালানো হইতেছে। এই প্রবাহ সেকেণ্ডে ৬০ বার



বিটাট্রন সঞ্জাত রশ্মির ছবি তুলিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে

আন্দোলিত হয় অর্থাৎ কমে বাড়ে এবং এক সেকেণ্ডের ২৪০ ভাগ সময়ের মধ্যে শূন্য হইতে চরম মাত্রায় পৌঁছায়।

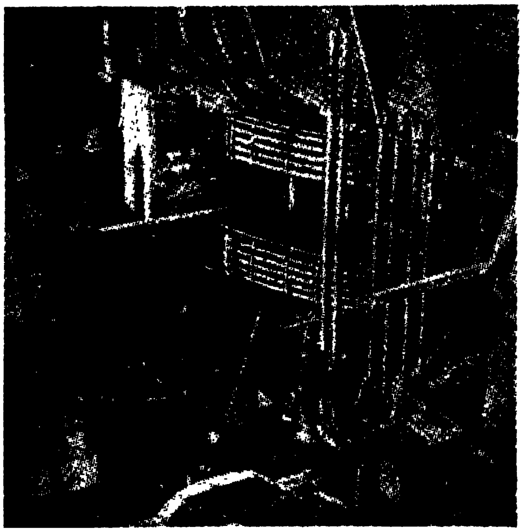
বেগযুক্ত ইলেকট্রন উৎস হইতে মুক্ত হইবার পূর্ব্ব হইতেই নলবেষ্টনকারী কুণ্ডলীতে তড়িৎ চালনা করা হয় যাহাতে কুণ্ডলীর অভ্যন্তরস্থিত লৌহ চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। নলে প্রবেশ করিয়াই ইলেকট্রন তড়িৎচুম্বকের প্রভাবে পড়ে ও চক্রাকারে নলের ভিতর ঘুরিতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে কুণ্ডলীতে প্রবহমাণ তড়িতের শক্তি বাড়িতে থাকে এবং আবেশক্রিয়ার ফলে নলমধ্যস্থ ইলেকট্রনের বেগও ক্রমে বাড়িয়া যায়। তড়িৎ-প্রবাহের শক্তি যখন চরম মানে পৌঁছায় সেই অবসরে ইলেকট্রন আড়াই লক্ষ বার নল পরিক্রমণপূর্ব্বক এক সেকেণ্ডের ২৪০ ভাগ সময়ে ৮০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রচণ্ড বেগপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই অবস্থায় ইলেকট্রনকে সহসা অপর কোন তড়িৎ-ক্ষেত্রের সাহায্যে চক্রপথ হইতে সামান্য বিচলিত করিয়া আনিয়া নিক্ষেপ করা হইবে নলের এক পার্শ্বে রক্ষিত এক ধাতু-পদার্থের উপর। পরমাণুকেন্দ্রের দিকে এই পদার্থের অগ্রসর হইবার কালে ইলেকট্রনের সঙ্গে পরমাণুকণিকার সংঘর্ষ বাধে, তাহারই ফলে সেখান হইতে এক্স-রশ্মিরূপে অমিত তেজোরাশির উদ্ভব হয়।

এই রশ্মি প্রচণ্ড শক্তিসমন্বিত। সাধারণ এক্স-রশ্মি নলেও বেগযুক্ত ইলেকট্রনের আঘাতেই এক্স-রশ্মির উৎপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু এই সকল নলে ইলেকট্রনকে কয়েক হাজার ভোল্ট শক্তির তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবে বেগপ্রদান করা হয়। সে তুলনায় বিটাট্রন হইতে ইলেকট্রন যে বেগ প্রাপ্ত হয় তাহা দশ কোটি ভোল্ট হইতে উৎপন্ন তড়িৎক্ষেত্রের প্রভাবপ্রাপ্তির সমতুল্য। মাত্র চব্বিশ হাজার ভোল্ট ব্যবহার করিয়া এই শক্তি পাওয়া যায়। বিটাট্রনের কার্য্যকারিতার ফলেই শক্তির এবম্প্রকার অসাধারণ পরিবর্দ্ধন সম্ভব হইয়াছে।

মানুষের শরীরে যে শক্তির এক্স-রশ্মির নিরাপদ প্রয়োগ সম্ভব, বিটাট্রনসঞ্জাত রশ্মি তাহা হইতে পনর হাজার গুণ বেশী শক্তিশালী। রেডিয়ম হইতে যে তীব্রতম গামা রশ্মি উদ্ভূত হয়, বিটাট্রনের রশ্মি তাহার চেয়ে অন্ততঃ বিশগুণ তীব্রতর। যে কক্ষে এই বিটাট্রন সঞ্জাত রশ্মির সৃষ্টি হয় সেখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া প্রবেশ করিলে মৃত্যু অস্বাভাবিক নয়। অমিত তেজযুক্ত এই রশ্মির অনেক প্রকার ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে—দুই-একটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই রশ্মির সাহায্যে বার ইঞ্চি পুরু এক খণ্ড ইস্পাতের ভিতরকার সকল অবস্থা মাত্র পাঁচ মিনিটে জানিয়া লওয়া সম্ভব। চিকিৎসাক্ষেত্রে এই রশ্মির প্রয়োগ অনন্তসাধারণ ফলপ্রদ। ইহারই সাহায্যে মানুষের দেহাভ্যন্তরীণ পরীক্ষা কার্য্যাদি সুষ্ঠু ও সূক্ষ্মতরভাবে করা সম্ভব।

কিন্তু বিটাট্রনসঞ্জাত রশ্মির প্রকৃত প্রয়োগক্ষেত্র রহিয়াছে পরমাণু বিষয়ক গবেষণা ব্যাপারে। কস্মিক রশ্মির সঙ্গে যে



বিটাট্রনযন্ত্র (পিছনের দিক হইতে)

তেজ সংশ্লিষ্ট থাকে বিটাট্রনসঞ্জাত রশ্মির তেজসম্পদ তাহার সহিত তুলনীয়। কস্মিক রশ্মি সম্পর্কিত ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিবার বিবিধ সার্থকতা আছে, কারণ পরমাণুর গঠন বিষয়ে কস্মিক রশ্মি নবতম সমস্যা আনয়ন করিয়াছে। কস্মিক রশ্মির আঘাতে পরমাণু হইতে মেসোন নামক কণিকা নির্গত

হয়, উহার স্বরূপ আজও রহস্যাবৃত। কস্‌মিক রশ্মির উৎপত্তি নিতান্ত অনিশ্চিত ও দৈবাধীন সেজন্য মেসোনের সাক্ষাৎলাভ করিতে হইলে গবেষণাকারীকে অনির্দিষ্ট কাল যাত্রাদি লইয়া অপেক্ষা করিতে হয়। বিটাট্রনসঞ্জাত রশ্মিদ্বারা মেসোনের উৎপত্তি সম্ভব হইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। এই কার্য্য করিবার জন্য বিটাট্রনকে আরও শক্তিশালী রশ্মি সৃষ্টি করিবার উপযুক্ত করা প্রয়োজন বলিয়া অনুভূত হইয়াছে। নবতম পরিকল্পনায় উন্নত ধরণের বিটাট্রন নির্ম্মাণের নানা উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। তন্মধ্যে রাশিয়ার ভেক্সলার পরিকল্পিত সিনকোট্রন অন্যতম।

অজ্ঞাত রাজ্য হইতে আগত কসমিক রশ্মির তেজোভাণ্ডার সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক মহলে ঔৎসুক্যের সঞ্চার করিয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে বিটাট্রন কৃত্রিম কসমিক রশ্মির সৃষ্টি করিলেও বিস্ময়ের কিছু নাই। কসমিক রশ্মির সমতুল্য তেজসৃষ্টির কৌশল মানুষের করায়ত্ত হইলে ভাবীকালের পৃথিবী আবার কোন্ নবতম মারণাস্ত্রের সম্মুখীন হইবে কে জানে? বিজ্ঞানের সাফল্য ও মানবের শুভবুদ্ধি অবিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হইয়া না চলিলে ক্ষমতার দাম্ভিক প্রতিযোগিতার কবলে পতিত বিজ্ঞানের পরমপ্রাপ্তি হইতেই উদ্ভূত হইবে মানব সভ্যতার মর্ম্মান্তিক ও অকরুণ চরম পরিণতি।

ভারতীয় সঙ্গীতে সাত স্বরের জন্মকথা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

ভারতীয় সঙ্গীতে সাত স্বরের জন্মকথার পরিচয় দেবার আগে 'সঙ্গীত' শব্দটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা দরকার। 'সঙ্গীত' শব্দটির ভেতর তিনটি কলার সমাবেশ পাওয়া যায় ও সে তিনটির নাম নৃত্য, গীত ও বাদ্য। সঙ্গীতের রূপই এ তিনটি কলার একত্র সমাবেশে সার্থক হয়। কিন্তু 'সঙ্গীত' শব্দটির প্রাচীনত্ব ও ইতিকথা যতটুকু আমাদের জানা আছে—মকরন্দকার নারদই বোধ হয় প্রথমে 'সঙ্গীত' এই শব্দটি সঙ্গীতশাস্ত্রে ব্যবহার করেছেন—"গীতং বাদ্যং চ নৃত্যং চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে"।[১] মকরন্দকার নারদের আগে নাট্যশাস্ত্রকার ভরত থেকে আরম্ভ ক'রে দত্তিল (বা দন্তিল), ব্রহ্মা, কশ্যপ, যাষ্টিক, দুর্গাশক্তি, কোহল, বিশাখিল, অশ্বতর, বিশ্বাবসু, তুম্বুরু, শিক্ষাকার নারদ,[২] মতঙ্গ এবং এমন কি পার্শ্বদেব পর্য্যন্ত এ 'সঙ্গীত' শব্দটি তাঁদের সঙ্গীতগ্রন্থের কোথাও উল্লেখ করেছেন ব'লে মনে পড়ে না। এ ছাড়া প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষার যুগে,—ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব এ চার বেদের কোনটির প্রাতিশাখ্যে অথবা নারদী, যাজ্ঞবল্ক্য, মাণ্ডুকী, মনঃসার প্রভৃতি শিক্ষাগুলিতেও 'সঙ্গীত' শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। ব্রাহ্মণ, সংহিতা ও ধর্মসূত্রের ভেতরেও 'সঙ্গীত' শব্দটির কোন উল্লেখ নেই। যা আছে তা বর্তমান সঙ্গীতকে বোঝাবার জন্যে 'গান', 'গীত' বা 'গীতি,' 'গাথা' অথবা 'গান্ধর্ব' শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে; অথচ বৈদিক সাহিত্যের সবগুলিতেই বাদ্যযন্ত্র যেমন বীণা, মৃদঙ্গ, বেণু প্রভৃতি এবং নৃত্য ও গানের পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ আছে। যজুর্বেদীর চারদিকে করতালি দিয়ে নৃত্য অথবা নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে ঋক্‌ছন্দ গাথিক, সামিক ও স্বরান্তর প্রভৃতি স্বরযোগে গান করার উল্লেখও বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। তবে নাট্যশাস্ত্রকার ভরত নাট্যকলার পরিচয় দিতে গিয়ে "এবং গানং চ নাট্যং চ বাদ্যং চ বিবিধাশ্রয়ম্"[৩] শব্দগুলির উল্লেখ করেছেন যদিও 'নৃত্যং' বা 'নৃত্তং' শব্দের জায়গায় 'নাট্যং' শব্দটিই সেখানে তিনি ব্যবহার করেছেন। নাট্যের সার্থকতা আঙ্গিক লীলায়িত গতি ও ছন্দকে নিয়ে, কাজেই 'নাট্য' শব্দটির ভেতর 'নৃত্য' শব্দটির যে অন্তর্নিবেশ আছে এ কথা ধরে নেওয়ায় কোন দোষ নেই। আর এ জন্যেই বলা যায়, ভরত সঙ্গীতের ত্রৌর্যত্রিক রূপটির আভাস পাকেপ্রকারে দিয়েছেন যদিও তার স্পষ্ট উল্লেখ কিছু করেন নি। স্পষ্ট উল্লেখ একমাত্র ৭ম থেকে ১১শ শতাব্দীর ভেতর মকরন্দকার নারদই করেছেন বলা যায়।[৪]

মোট কথা ৭ম, ১১শ শতাব্দী থেকেই সুস্পষ্ট ভাষায় নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমবেত রূপ হিসাবে আমরা সঙ্গীতের উল্লেখ পাচ্ছি। তার আগেও প্রাতিশাখ্যে 'গণগীতিভ্যঃ', 'উহ্যগানে', 'স্তোভস্ক সামান্তঃ' প্রভৃতি এবং শিক্ষাদিতে গান, গীতি, গাথা ও গান্ধর্বগানের উল্লেখ নৃত্য ও বাদ্যের সহমিলনে পেয়ে থাকি। এ ছাড়া আর্ষেয় ও সামবিধানব্রাহ্মণে এবং মামতন্ত্রে অরণ্যেগেয়গান, গ্রামেগেয়গান, উহ্যগান ও স্তোভ গানের মারফতে সামগানের পরিচয়ও আমরা যথেষ্ট পেয়েছি। তা ছাড়া নাট্যশাস্ত্র থেকে আরম্ভ ক'রে বৃহদ্দেশী, মকরন্দ,

১। সঙ্গীত মকরন্দ ১৩,৯।

২। 'প্রবাসী', বৈশাখ ১৩৫৩ (পৃ. ৪৪-৫০) সংখ্যায় লেখকের "সঙ্গীত মকরন্দ ও শিক্ষাকার নারদ" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৮।৭

৪। 'প্রবর্তক', কার্তিক ১৩৫৩ (পৃ. ৩১৭-৩২০ সংখ্যায় লেখকের "গান্ধর্বশাস্ত্রে সঙ্গীত" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

রত্নাকর, পারিজাত, রাগবিবোধ, সঙ্গীতদর্পণ-সঙ্গীত ও সময়সারের সময় পর্যন্ত গীত, বাদ্য ও নৃত্যের প্রচলন অব্যাহত ছিল ব'লে মনে হয়। কিন্তু বর্তমানে সঙ্গীতের কোঠায় এ তিনটির একত্র সমাবেশ একেবারে অপরিহার্য ব'লে পরিগণিত নয় যদিও নাট্যকলার ভেতর তার প্রচলন এখনো রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতের সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলে সঙ্গীতের উৎপত্তি বা জন্মকথার পরিচয় দেওয়া আগে দরকার। সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা বেশীর ভাগই সঙ্গীতের উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন "গীতং নাদাত্মকং", অর্থাৎ নাদ বা শব্দই গীত তথা সঙ্গীতের শরীর অথবা শব্দ থেকেই সঙ্গীতের উৎপত্তি হয়েছে। নৃত্য ও বাদ্যের বেলায়ও তাই—"বাদ্যং নাদব্যক্ত্যা প্রকাশতে। তদ্দ্বয়ানুগতং নৃত্তং নাদাধীনমতস্ত্রয়ম্।"[৫] এই নাদ অথবা শব্দকে আদি অথবা সূক্ষ্ম শব্দ বলা হয়েছে যে শব্দের ভেতর শাস্ত্রকার ও দর্শনকারেরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই আদি বা সূক্ষ্ম শব্দকে অনাহত ও আহত ভেদে দু'ভাগে ভাগ ক'রে আহত শব্দ থেকেই সঙ্গীতের সুক্ষ্মমূর্তির জন্ম এ কথা সঙ্গীতশাস্ত্রকারেরা বলেছেন।

কিন্তু এ গেল নিছক দর্শনের কথা। কারণ যে কোন শব্দ স্থূলরূপে প্রকাশ পাবার আগে সূক্ষ্ম আকারে নাভিতে প্রথমে, তার পর হৃদয়ে ও কণ্ঠে ও শেষে মুখে স্থূল আকারে প্রকাশ পায়। বাতাসই শব্দের কারণ। শব্দ হবার আগে বাতাস অর্থে প্রাণবায়ু দেহের ভেতর পাঁচটি স্থানকে অতিক্রম ক'রে স্থূল শব্দরূপে বাইরে প্রকাশিত হয়। এই প্রাণবায়ুকেই দর্শনশাস্ত্রে শব্দব্রহ্ম, তন্ত্রে কুণ্ডলিনী, কালী প্রভৃতি বলা হয়েছে।

কিন্তু দর্শনের কথা বাদ দিলে ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের দিক থেকে সঙ্গীতের জন্মকথার একটি ইঙ্গিত আমাদের পেতে হবে। সঙ্গীত তথা সঙ্গীতের স্বর, সুর বা রাগরাগিণী একেবারে আকাশ থেকে অকস্মাৎ সৃষ্ট হয় নি। সমাজের মানুষই প্রতিভা ও প্রচেষ্টা দিয়ে সঙ্গীতকে প্রকৃতির অন্তর থেকে আবিষ্কার করেছে—তাও করেছে সকলে ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুসরণ করে। ভারতীয় সংস্কৃতি যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিশাল ক্ষেত্রকে অতিক্রম ক'রে ঋগ্বৈদিক যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল; তারপর বৈদিক যুগেরও পরে ঔপনিষদিক যুগে বাহ্যিক ও আন্তর উভয় দিকেই সংস্কৃতি যেমন আবার বিকাশের পরাকাষ্ঠায় উপস্থিত হয়েছিল, একেবারে নয়, যুগ-যুগান্তের ক্রমোন্নতির ধারাকে অনুসরণ ক'রে, সঙ্গীতকলাও তেমনি অসভ্য আদিম বিকাশের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে উন্নত হতে হতে দেশী ও মার্গ—অসংস্কৃত ও সংস্কৃত এ দুটি রূপের ভেতর দিয়ে ক্রমে রাগ, অলঙ্কার, মূর্ছনা, তান ও সঙ্গীতের বিচিত্র রূপভেদের সম্ভারে বর্তমান উন্নত আকারে এসে উপস্থিত হয়েছে। কাজেই ক্রমোন্নতির ধারাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সঙ্গীতের পরিপূর্ণ রূপও এই ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশের পথে ধীরে ধীরে প্রাগ্বৈদিক ও বৈদিক যুগকে অতিক্রম ক'রে ঐতিহাসিক তথা হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বের বিভিন্ন যুগে বিচিত্র রূপে প্রকাশ পেয়েছে একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। নারদীশিক্ষা ও রত্নাকরের আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, ওড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ স্বরগুলির পরিচয় দিলেই সে ক্রমিক স্বরবিকাশের কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

একেবারে গোড়াকার দিকে সঙ্গীত একটি মাত্র স্বরকে নিয়েই পরিপূর্ণ ছিল আর সে যুগের নাম ছিল আর্চিক। সঙ্গীতের প্রাণই স্বর। সুর বা রাগ-রাগিণীর রূপও এই স্বরের বিন্যাস-বৈচিত্র্যের ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। আর্চিক যুগে স্বর মাত্র একটি ছিল, কিন্তু তা ষড্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সাতটি স্বরের ভেতর কোন্ স্বরটি ছিল একথা এখনো ঠিকরকম ভাবে আবিষ্কার করা হয় নি। সঙ্গীতের বিকাশযুক্ত ঐতিহাসিক দিকটাও এখনো আমাদের কাছে অজ্ঞাতই বলা যায়। তারপর সঙ্গীত কখন থেকে আমাদের সমাজে প্রবেশলাভ করেছে তারও ঠিক ঠিক ইতিহাস আমরা জানি নি। শুধু আমরাই বা কেন, পৃথিবীর সমস্ত জাতির ইতিহাসেই সঙ্গীতের জন্মকথার তারিখ এখনো পর্যন্ত নির্ণয় করতে পারে নি। পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ্ এরিক ব্লোমও একথা স্বীকার ক'রে বলেছেন:

"We do not know when music became a consciously cultivated art in England, * * nor can we tell how it first shaped itself."

রাশিয়ান সঙ্গীতবিশারদ ক্যাল্‌ভোকোরেশীও স্বীকার করেছেন:

"As to the music, all that could be said would be merely conjectural." কেননা, "No actual example of primitive Russian music is known, * * ."

ভারতীয় সঙ্গীতের কথাও তাই। সত্যিকার ইতিহাসও ভারতীয় সঙ্গীতের নাই, কাজেই ব্লোমের মতই আমাদেরও স্বীকার করতে হবে:

"Unfortunately for history music was for centuries transmitted merely by ear and by tradition, and even when some system of notation was in use, it long remained so inexact as to serve merely as a rough remainder of what was already known to the performers from aural teaching."[৬]

৫। সঙ্গীতরত্নাকর (Adyar ed.) pt. I, পৃ. ২২

৬। Vide *Music in England*, p.

যাই হোক, সঙ্গীতের ঐতিহাসিক গবেষণা যাঁরা করেন তাঁদের ভেতর অনেকের অভিমত : মধ্যমই (মা) আদি স্বর যাকে আর্চিকের স্বর ও সুর দুইই বলা যেতে পারে। অনেকে বলেন নিষাদই (নি) আদি স্বর। মিঃ শেষগিরি শাস্ত্রী সামগান নিয়ে আলোচনা করার সময় উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর নিয়েই বেশী আলোচনা করেছেন, এবং উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর তিনটির জায়গায় নিষাদ, ষড়্‌জ ও ঋষভ স্বরের পরিচয় দিয়ে বরং সামিক যুগের কথাই টেনে এনেছেন বলতে হবে।[৭]

ছলুগার কৃষ্ণচারিয়ারও এই সামিক যুগের কথা তুলে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তবে সেখানে তিনি গানে একটিমাত্র স্বরের তিন রকম ভাবে উচ্চারণ-ভঙ্গীর ওপরই বেশী জোর দিয়েছেন, তিনটি পৃথক স্বরের কথা কিছুই বলেন নি। উদাহরণরূপে আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের (১।১।১) একস্বরীগায়ন বা আর্চিকগায়ন—"একশ্রুত্যাম=একশ্রুতিসততমনুক্রমাৎ। পরঃসন্নিকর্ষঃ।" কথাগুলির উল্লেখ করেছেন।[৮] এখানে শাস্ত্রীজী কিন্তু সাতস্বরের ভেতর কোন্ স্বরটি এই "fixed one note" হবে তার কোন নামোল্লেখ করেন নি। "সঙ্গীত" পত্রিকায় প্রকাশিত (*Sangeeta*) *An Hypothesis of the Origin and Development of the 22 Srutis* প্রবন্ধে বিদুষী শিল্পী রাগিণী দেবীও এই আদি বা প্রথম স্বরকে নিষাদ (নি) বলতে চেয়েছেন, আর এর নজিরও তিনি দেখিয়েছেন সামপরিভাষার নাম দিয়ে। তিনি বলেছেন :

"In the Samaparibhasa, the note 'NI' is described as the starting point of the Saman scale."[৯]

কিন্তু নারদী-শিক্ষাকার নারদ "যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ" বলে যে মিলনের ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে বোঝা যায়, বৈদিক স্বরের অবরোহণ ধারাকে (descending order) অটুট রেখেও মধ্যমকেই (মা) প্রথম স্বর হিসাবে গণ্য করা যায়। সামবেদের ভাষোপক্রমণিকায় আচার্য সায়ণের মতে আবার প্রথম স্বর হয় ধৈবত (ধা), কেননা সাতস্বরের বিকাশভঙ্গীকে তিনি আরোহণ গতিতে (ascending order) স্বীকার করেছেন।

মিঃ সুব্বা রাও তাঁর *A Plea for A Rational Interpretation of Sangita Sastra* প্রবন্ধে সাতস্বরের উৎপত্তি নিয়ে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন তাতেও প্রথম স্বর হিসাবে মধ্যম স্বরকেই তিনি গ্রহণ করেছেন।[১০]

এ ছাড়া *The Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus* বইয়ের সুপণ্ডিত লেখক স্বামী শংকরানন্দও বৈকাশিক ধারাকে অনুসরণ ক'রে বৈদিক দেবতাদের উৎপত্তির মতো সাত সুরের উৎপত্তির একটা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "This evolutionary process of the musical notes is very much the same as that of the Vedic deities in the Arya society."[১১] তিনি বৈদিক দেবতাদের ক্রমবিকাশের মতো স্বরের বিকাশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, বরুণ বা আকাশই সৃষ্টির প্রথম দেবতা। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের গোড়াকার দিকে এই বরুণ দেবতার উল্লেখই করা হয়েছে, যদিও তা দু'এক বারই মাত্র। স্বামী শংকরানন্দ বলেছেন :

"* * We find that the Tantric division of the sound reappears in the musical science."

বরুণ বা আকাশের তান্ত্রিক বর্ণবীজ (code) মধ্যম (মা) অথবা ঋষভ (রে)। কাজেই এখানেও আদিস্বর হিসাবে মধ্যমকেই (মা) পাওয়া যায়। এই মধ্যম স্বরকে সোমনাথ তাঁর রাগবিরোধে স্বয়ম্ভু ('unborn' and 'uncreated') স্বর বলেছেন।[১২] শার্ঙ্গদেব তাঁর সঙ্গীতরত্নাকরেও (১.৪.৬) বলেছেন : "গ্রামে স্যাদবিলোপিত্বান্মধ্যমস্ত পুরঃসরঃ"এবং কল্লিনাথ তাঁর টীকায় "মধ্যমাস্তবিনাশিত্বমিতি" ব'লে প্রকারান্তরে মধ্যম স্বরেরই অবিনাশিত্বের তথা স্বয়ম্ভুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। ভরতের সমসাময়িক দত্তিলও একথা স্বীকার করেছেন। টীকাকার সিংহভূপালও দত্তিলের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন—"মধ্যমস্তাবিলোপিত্বমুক্তং দত্তিলেন—'* * অলোপিনং বিজানীয়াৎ সর্বত্রৈব তু মধ্যমম্।" কাজেই সকল অবস্থায় অর্থাৎ ষাড়ব, ওড়ব ও সম্পূর্ণ ঠাটের বেলায়ও মধ্যমের লোপ নেই। সিংহভূপালও 'ষাড়বিতশ্চ উড়বিতত্বে চ মধ্যমস্য লোপো নাস্তি' ব'লে একথা সমর্থন করেছেন আর এজন্যে প্রশংসার ছলে 'দেবকুল উৎপন্নত্বাৎ'—দেবকুলে উৎপন্ন কথাগুলিও উল্লেখ করেছেন। আজকাল তাই সম্পূর্ণ ঠাটের মাঝামাঝি হিসাবে মধ্যম স্বরকেই আমরা গ্রহণ ক'রে থাকি,আর উত্তরাঙ্গ ও পূর্বাঙ্গ রাগের নির্ণয়ও ঐ মধ্যম স্বরকে ধরে করা হয়। বিস্তৃত আলোচনার ভেতর না গিয়ে সংক্ষেপে সকল দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যায়, আর্চিকযুগের স্বর নিষাদ, অথবা

৭। রামচন্দ্রন : *The Ragas of Karnatic Music* (1938), পৃ. ১৩

৮। Vide *The Journal of the Music Academy*. Vol. I, Jan. 1930, No. 1, p. 158.

৯। Vide *Sangeeta*, Vol. June 1931, No, 3, p, 12,

১০। Vide *The Journal of the Music Academy*, vol. IX, 1938, pts. I-IV, pp. 49-61

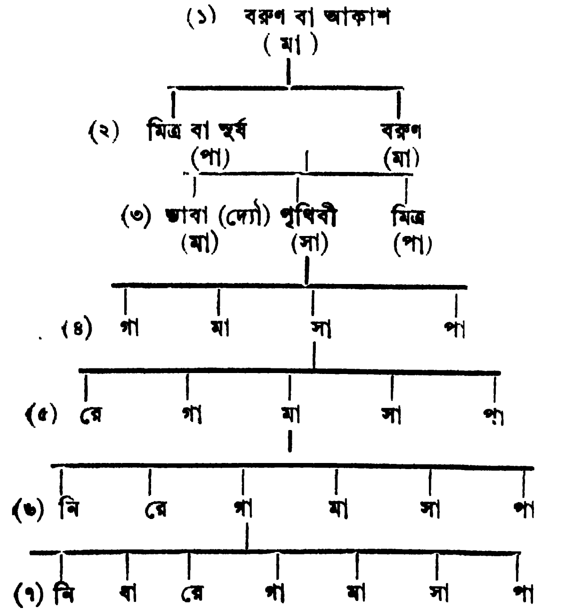
১১। Vide *Rigvedic Culture of the Pre-historic Indus*, vol II, p. 50.

১২। শুধু মধ্যম স্বরকে নয়, পঞ্চম ও ষড়জ স্বর দুটিকেও রাগবিবোধকার স্বয়ম্ভু ('unborn') স্বর বলেছেন।

ধৈবত না হয়ে মধ্যমই বরং হওয়া উচিত—বিকাশের ধারা ও বিজ্ঞানের দিক থেকে অন্তত।

সঙ্গীতে আর্চিকযুগের পর আমরা পাই গাথিকযুগের বিকাশ। এই গাথিকযুগের স্বর বৈদিক দেবতা মিত্র ও বরুণের মতো পঞ্চম ও মধ্যম (পা ও মা) স্বর দুটি হবে, কেননা মিত্র ও বরুণের বর্ণবীজ হবে পঞ্চম ও মধ্যম স্বর। এই রকম সামিক যুগ বা তিন স্বরের যুগে তিনটি দেবতা দ্যৌ (আকাশ) পৃথিবী ও মিত্রের বর্ণবীজ অনুযায়ী মধ্যম, ষড়্জ ও পঞ্চম (মা সা পা) স্বরের উৎপত্তি বুঝতে হবে। এই মধ্যম, ষড়্জ ও পঞ্চম অথবা 'সমপা' স্বর তিনটিই সোমনাথের মতে স্বয়ম্ভু—"কিং চ স্বভুবঃ সমপ" অথবা "সমপাঃ ষড়্জপঞ্চমধ্যমাঃ স্বস্মাদেব ভবন্তীতি স্বভুবঃ স্বপ্রকাশাঃ ; নো তু কল্পিতাঃ।" পণ্ডিত হলুগার কৃষ্ণচারিয়ারও এটিকে সঙ্গীতের তৃতীয় স্তর ও সামিক যুগ ব'লে স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া তিনি বলেছেন :

"** it is clear that the *Samic* scale was repeated in three ways—from স, ম, প, which are the bases for the higher and lower registers or octaves."[১৩] মিঃ সুব্বা রাওয়ের স্বীকৃতিও তাই : "It must be remembered that basic note or *Sadja* was in the centre of the scale, *ma* the upper limit and *pa* the lower limit"[১৪] তবে রাগিনী দেবীর স্বর তিনটির সঙ্গে এই স্বর তিনটির কোন মিল নেই। সামিকের পর স্বরান্তর বা চার স্বরের যুগ আর সে চার স্বর গান্ধার, মধ্যম, ষড়্জ ও পঞ্চম। এর পর ওড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ স্বরের যুগ। এই স্বরগুলির বিকাশ-পারম্পর্যকে ঠিক এরকমভাবে বোঝান যায়,



১৩। Vide *The Journrl of the Music Academy*, Vol. I, April 1930, No. 2, p. 159.

১৪। *Ibid.*, Vol. IX, 1938, pts. I-IV, p. 49.

অবশ্য হলুগার কৃষ্ণমাচারিয়ার ও সুব্বা রাওয়ের বিকাশ-পারম্পর্য এই ধারার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এই রকম ভাগ ও পারম্পর্য বৈদিক বিকাশের পারম্পর্যকে অনুসরণ করেই করা হয়েছে।

এ ছাড়া বৈদিক স্বর উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের (এবং প্রচয়ের) প্রসঙ্গও আসতে পারে। উদাত্ত বলতে উচ্চ স্বর, অনুদাত্ত নিম্ন বা খাদ স্বর আর স্বরিত উচ্চ ও নীচ স্বর দুটির সমতারক্ষক (balancing) স্বর। উদাত্তাদি স্বর তিনটি ইতিহাসের গোড়াকার দিকে স্বর হিসাবে পরিচিত থাকলেও পরে "ত্রীণি মন্দ্রং মধ্যমমুত্তমঞ্চ"—মন্দ্র (খাদ) মধ্য ও তার (উচ্চ) হিসাবে (স্বরোচ্চারণের স্থান বলেই পরিচিত হয়েছিল)। যাজ্ঞবল্ক্য, নারদী, পাণিনীয়, মাণ্ডুকী প্রভৃতি শিক্ষাগুলি আবার উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি (বৈদিক) স্বর থেকে লৌকিক সাতটি স্বরেরও উৎপত্তির কথা বলেছেন। যেমন,

উচ্চৌ নিষাদগান্ধারৌ নীচাবৃষভধৈবতৌ।
শেষাস্তু স্বরিতা জ্ঞেয়াঃ ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ॥

অর্থাৎ (বৈদিক) উদাত্ত প্রভৃতি তিন স্বর থেকে উৎপন্ন লৌকিক সাত স্বরকে বিভাগ করে দেখালে পাওয়া যায়,

রধা	সমপা	নগা
অনুদাত্ত (মন্দ্র)	স্বরিত (মধ্য)	উদাত্ত (তার)

কিন্তু সাত স্বরের ক্রমবিকাশের রীতিকে লক্ষ্য করলে উদাত্ত ও অনুদাত্তের সমতারক্ষক স্বর স্বরিত তথা 'সমপ' স্বরকেই আদিম বা সামিক যুগের স্বর বলা উচিত। ষড়্জ-মধ্যম-পঞ্চম স্বর তিনটিকে সোমনাথ তাঁর রাগবিবোধে স্বয়ম্ভু ও অবিনাশী স্বর ব'লে উল্লেখ করেছেন তা আগেই আমরা উল্লেখ করেছি। কাজেই এক স্বরিত স্বর থেকেই যদি অবিনাশী ও অপরিবর্তনীয় স্বয়ম্ভু তিনটি স্বরের উৎপত্তি সম্ভব হয় তবে স্বরিতকেও স্বয়ম্ভু ও অবিনাশী বলে গণ্য করতে হবে। কিন্তু শিক্ষাকারদের ভেতর কারো ইঙ্গিতেই তার আভাস পাওয়া যায় না ; স্বরিত স্বরকে তাঁরা উদাত্ত ও অনুদাত্তের পরে উৎপন্ন স্বর ব'লেই বরং পরিচয় দিয়েছেন। কাজেই শিক্ষাকারদের অভিপ্রায়কে আমরা এখানে রহস্যপূর্ণ ব'লেই মনে করি। সাত স্বরের ক্রমবিকাশের রীতি অনুযায়ী স্বয়ম্ভু স্বর তিনটির ভেতর মধ্যম তথা প্রথম স্বরকেই আমরা প্রথমে উৎপন্ন স্বর ব'লে গণ্য করব। মধ্যমের পর অবরোহণ গতিক্রমে পঞ্চম ও পরে ষড়্জ স্বরের জন্মকেই আমরা শাস্ত্র ও বিজ্ঞানসম্মত ব'লে মনে করব। কাজেই শিক্ষাকারদের যদি সত্যই অভিপ্রায় হয় যে, উদাত্তাদি স্বর তিনটি থেকে লৌকিক সাতটি স্বরের উৎপত্তি হয়েছে তা হলে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বরিত স্বরকেও সামিক যুগের স্বর ব'লে গণ্য ক'রে উদাত্ত ও অনুদাত্তকে আমরা স্বরিত তথা 'সমপা' অথবা 'পসমা' স্বর তিনটির অন্তর্নিবিষ্ট স্বর ব'লে মনে করব।

নারদীশিক্ষা, অথর্ববেদীয়া মাণ্ডুকীশিক্ষা প্রভৃতি, সঙ্গীত-রত্নাকর, রাগবিবোধ, পারিজাত ইত্যাদি গ্রন্থে পশু-পক্ষীদের অভিম স্বর থেকে সপ্ত স্বরের জ্ঞান লাভ করার কথা আছে। মাণ্ডুকীতে দেখা যায় বলা হয়েছে,

"ষড়্জং বদতি ময়ূরো গাবো রম্ভন্তি চর্ষভং।
অজা বদতি গান্ধারং ক্রৌঞ্চ নদতু মধ্যমং॥
পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলঃ পঞ্চমে স্বরে।
অশ্বস্তু ধৈবতে প্রাহ কুঞ্জরস্তু নিষাদবান্॥১৫

রত্নাকরের টীকাকার কল্লীনাথ এসম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন: "লোকতোঽপি ষড়্জাদিস্বররূপরিজ্ঞানায় ময়ূরাদিপ্রাণিবিশেষ-ধ্বনিং নিদর্শনাভিপ্রায়েণাহ—ময়ূরেতি।" টীকাকার সিংহ-ভূপালও বলেছেন: "ময়ূরঃ ষড়্জমুচ্চরিয়তি, চাতক ঋষভম্, ছাগো গান্ধারম্, ক্রৌঞ্চো মধ্যমম্, কোকিলঃ পঞ্চমম্, দর্দুরো ধৈবতম্, গজো নিষাদমিতি চ"। আমরা কিন্তু এ উদাহরণটিকে নিছক উপকথা বা পৌরাণিক কাহিনী (mythological) ব'লেই মনে করি, কেননা আজ পর্য্যন্ত এসব প্রাণীর অন্ত বা শেষ শ্রুতি নিয়ে সাত স্বরের ধ্বনির সঙ্গে কোন রকম মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয় নি। ডাঃ কুহ্নন্ রাজাও সঙ্গীতরত্নাকরের ইংরেজী সংস্করণে স্বীকার করেছেন:

"The question of the correspondence in pitch among the sound of the seven birds and animals is an old one. It has to be tested." আসলে একথা সত্য যে, পশুপক্ষীরা প্রতীকবিশেষ (symbol),—কোন-না-কোন বৈদিক দেবতাদের প্রতিনিধি রূপে এরা ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। এর সত্যতা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণাও আজ পর্যন্ত হয় নি। সঙ্গীত-সাধকেরা নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গীতের অনুশীলনই ক'রে থাকেন, কিন্তু স্বর, রাগ-রাগিণী অথবা শ্রুতি প্রভৃতির ভেতর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক কোন রহস্য আছে কি না অথবা ঐতিহাসিক উপাদানও তাদের ভেতর ক্রম-বিকাশের দিক থেকে কিছু থাকতে পারে কি না সেসব নিয়ে সময় নষ্ট করতে তাঁরা মোটেই রাজী নন। অনুশীলনের অভাবে শুধু সঙ্গীতের কেন—অনেক বিষয়ের আসল তথ্যই আমাদের কাছে এখনও রহস্যময় হয়ে লুকোনো রয়েছে। নারদী ও মাণ্ডুকী প্রভৃতি কয়েকটি শিক্ষা আবার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেকেও সাত স্বরের উৎপত্তির কথা উল্লেখ করেছে। যেমন মাণ্ডুকী বলেছে,

"কণ্ঠাদুত্তিষ্ঠতে ষড়্জঃ ঋষভঃ শিরসস্তথা।
নাসিকায়াস্তু গান্ধার উরসো মধ্যমস্তথা॥
উরঃশিরোভ্যাং কণ্ঠাচ্চ পঞ্চমঃ স্বর উচ্যতে।
ধৈবতশ্চ ললাটাদ্বৈ নিষাদঃ সর্ব্বরূপবান্॥"

অর্থাৎ কণ্ঠ থেকে ষড়্জ (সা), শির থেকে ঋষভ (রি), নাসিকা থেকে গান্ধার (গা), উর থেকে মধ্যম (মা), উর+শির+কণ্ঠ থেকে পঞ্চম (পা), ললাট থেকে ধৈবত (ধা) ও সর্বরূপবান বলতে সমস্ত অঙ্গের সন্ধি থেকে নিষাদ (নি) স্বর উৎপন্ন হয়েছে। এ রকম হাতের পাঁচটি আঙুল থেকেও আবার সাত স্বরের উৎপত্তির কথা মাণ্ডুকীশিক্ষা উল্লেখ করেছে। কিন্তু সেগুলিকে সাত স্বরের উৎপত্তিস্থান ব'লে গণ্য না ক'রে বরং সাঙ্কেতিক চিহ্নজ্ঞাপক প্রতীক ব'লে মনে করাই উচিত। তবে সাতস্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে নারদীকার নারদ যে কথা বলেছেন সেটাই বরং যুক্তিসঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক ব'লে আমরা ধ'রে নিতে পারি। নারদ তাঁর শিক্ষার পঞ্চমী কণ্ডিকার ৭ম থেকে ১২শ পর্যন্ত শ্লোকগুলিতে নাভি থেকে বায়ু উঠবার সময় স্থানবিশেষকে স্পর্শ করার জন্যে যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ শব্দ বা ধ্বনি উৎপন্ন ক'রে সে ধ্বনিগুলির তন্ন তন্ন ভেদেই স্বরগুলির নাম হয়েছে ব'লে মন্তব্য করেছেন। যেমন "নাসাং কণ্ঠমুরস্তালু জিহ্বাদন্তাংশ্চ সংশ্রিতঃ ষড়্ভিঃ সঞ্জায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ ষড়্জ ইতি স্মৃতঃ।" অর্থাৎ নাভি থেকে বাতাস ওপর দিকে ওঠার সময় নাসা, কণ্ঠ, উর, তালু, জিহ্বা ও দন্ত এই ছটি স্থানকে স্পর্শ ক'রে শব্দ উৎপন্ন করে ব'লে সে শব্দের নাম ষড়্জ। এই ভাবে ঋষভাদি স্বরের এবং বৈদিক প্রথমাদি স্বরগুলিরও একটা যুক্তিযুক্ত পরিচয় দিতে নারদীকার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষাগুলিতে ষড়্জাদি লৌকিক সাত স্বর ভিন্ন অভিনিহিত, প্রাশ্লিষ্ট, জাত্য, ক্ষৈপ্র, পাদবৃত্ত, তৈরবঞ্জন এবং তিরবিরাম (বা তৈরবিরাম) এই সাতটি বৈদিক স্বরেরও আবার পরিচয় আছে।[১৬] এ ছাড়া ছান্দোগ্য উপনিষদে (১।১২।১) সামগানের বিনর্দি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মৃদু, শ্লক্ষ্ণ, ক্রৌঞ্চ ও অপধ্বান্ত এই সাত স্বরের উল্লেখও পাওয়া যায়। কিন্তু এসবের প্রচলন বর্তমান সমাজ থেকে একেবারে লোপ পাওয়ার জন্যে এগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলো-চনায় আর আমরা প্রবৃত্ত হলাম না।

১৫। মাণ্ডুকীশিক্ষা ৯-১০; রত্নাকর (Adyar ed.), p. 91

১৬। শিক্ষাসংগ্রহ (কাশী সং), পৃঃ ৪৬৯ দ্রঃ।

শুকতারা

শ্রীরমা সরকার

কার্ত্তিক মাস। শিশিরভেজা ভোরের বাতাসে শীতের অল্প আমেজ দিয়েছে। রিক্ত-বর্ষণ লঘু-শুভ্র মেঘের দল নীল আকাশের কোণে কোণে ক্ষণিক বিশ্রামে মগ্ন। দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপালী চূড়া শরতের সোনালী কিরণে ঝলমল করছে। জেল রোডের ছোট যক্ষ্মা-হাসপাতালের বাগানে ফুটেছে অজস্র গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা; রং-বেরঙের ডানা-মেলে-দেওয়া প্রজাপতির দলের ব্যস্ত আনাগোনার বিরাম নেই।

বেলা আটটা বাজে। ডাক্তারবাবুর পরিচিত, কালো মোটর গাড়ীটা কংক্রিটের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে উঠে এল হাসপাতালের দরজার সামনে। এংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স মিসেস্ সিমসন দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরই প্রতীক্ষায়—ডাক্তার বাবুকে নিচু গলায় কিছু বললেন। দু'জনে একটু দ্রুতপদে এগিয়ে চললেন সিঁড়ি বেয়ে তের নম্বর কামরার দিকে। লোহার রেলিং-দেওয়া খাটে শুয়ে ছিল মুদিত শ্বেত কলিকার মত একটি ক্ষীণাঙ্গী মেয়ে। ডাক্তারবাবু ধীরে ধীরে তুলে নিলেন তাঁর হাতের মধ্যে মেয়েটির তুহিনশীতল ছোট হাতখানি। ষ্টেথিস্কোপ দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করলেন—জীবনের কোন স্পন্দন মিলল না কোথাও। ডাক্তার, নার্স দু'জনেই প্রতিদিনই দেখছেন জন্মমৃত্যুর খেলা—তবু আজ ডাক্তারবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, প্রৌঢ়া মিসেস্ সিমসন পরম স্নেহভরে একটি চূর্ণ অলক সরিয়ে দিলেন মেয়েটির কপোলের উপর থেকে। মৃদুভাষিণী, স্বল্পবাক্ এই মেয়েটি যেন তাদের অন্তর স্পর্শ করেছিল। যে কয়দিন সে এখানে ছিল—বেশীর ভাগ সময় আয়ত চোখ দুটি মেলে বাইরের দিকে চেয়ে থাকত, প্রাণ ভরে উপভোগ করত রূপ-রস-গন্ধে ভরা ধরণীর বৈচিত্র্য। বাইশ বছর ধরে প্রকৃতির কোলে হেসে খেলে আজ যখন ঘুমিয়ে পড়ল—সে রেখে গেল না কারও প্রতি কোন অভিযোগ, কোন ক্ষুব্ধ অভিমান। হাসপাতালের খাতায় লেখা হ'ল—মালতী সাহার মৃত্যুর কথা।

মালতীর শিথিল হাতের তলায় পড়ে ছিল একটি খাম—সাগরপারের ঠিকানা বহন করে। তাতে ছাপ পড়ে নি কোন ডাকঘরের।

প্রীতিভাজনেষু…

আমার এ চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছবে, তখন আমি জীবনের মেয়াদ শেষ করে অনেক দূরের পথে পাড়ি দিয়েছি। তেল-ফুরিয়ে-যাওয়া প্রদীপের মত জীবন আমার বেশী দিন জ্বলবে না জানি। এ চিঠি লেখার প্রয়োজন হয়ত আজ শেষ হয়েছে—তবুও বাইরের নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আজ তোমার কথাই বার বার করে মনে পড়ছে। ছ' মাস হ'ল আমি এসেছি এই হাসপাতালে, ডাক্তার এবং নার্সের সব প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে আজ দাঁড়িয়েছি জীবনের প্রান্তসীমায়।

সাত বছর আগে এই দার্জ্জিলিঙেই প্রথম দেখা হয় তোমার সঙ্গে। অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক পিতা তাঁর শেষ জীবনটা এখানে কাটাবেন বলে জলাপাহাড়ের উপর ছোট্ট একটি বাড়ী করিয়েছিলেন—"সান্ধ্যনীড়" তার নাম। চারদিকের ঘন পাইনবনের মাঝে আমাদের বাড়ীটা দেখাত হরিৎ সাগরে মাথা-তুলে-থাকা একটি ছোট দ্বীপের মত। কাচের জানালার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার দিনে দেখতে পেতাম—বরফের পাহাড়ের চূড়াগুলো। পাশের 'কটেজ'টা অনেক সময়ই খালি থাকত; কদাচিৎ কোন বিদেশী লোককে দেখা যেত কয়েক মাসের ভাড়াটিয়া রূপে। সেবারও এক দিন দেখলাম, পায়ে চলা পথ দিয়ে পাহাড়ী মেয়েরা পিঠে বেঁধে মোটঘাট আনছে। প্রতিবেশী সম্বন্ধে আর কোন কৌতূহল জাগে নি। পরদিন সকালে চায়ের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বাবার জন্য কফি তৈরি করছিলাম। বাবা তাঁর আরাম-কেদারায় বসে পড়ছিলেন খবরের কাগজ; মা ছিলেন রান্নাঘরে নিজের কাজে ব্যস্ত। আমাদের জিমি কুকুরটা বাইরে কাকে দেখে দু-এক বার ডেকে উঠে চুপ করে গেল। এমন সময় রান্নাঘরের দরজার কাছে অপরিচিত কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল—"মাসীমা, খুব যে ফোড়নের গন্ধ বেরুচ্ছে! পেটুক মানুষ আমি, আসন পেতে বসে পড়ি এখানে।" মা স্নিগ্ধ সুরে তাকে বললেন—"বেশ তো।" কাছে এসে দেখি শ্যামবর্ণের একটি ছেলে, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা হাসিতে উজ্জ্বল। পরিচয় হতে বেশী দেরি হ'ল না। তোমার মধ্যে সবার সঙ্গে সহজ ভাবে মেশবার ক্ষমতা ছিল বিধিদত্ত। তখন গরমের ছুটিতে দাদাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দার্জ্জিলিঙে এসেছে—শিশুমহলে "মণিকাকা"র সমাদর সহজেই হ'ল। কখনও দেখতাম তোমাকে বাবার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে তুমুল তর্ক করতে; কখনও বা দেখতাম মায়ের কাছে রান্নাঘরে আসন পেতে বসে কি কি তোমার খেতে ভাল লাগে তার লম্বা ফর্দ্দ দিতে।

আমাদের পরিবারে তিন ভাইয়ের পর অনেক দিন বাদে জন্মেছিলাম আমি—একটি বোন। আদরের হয়ত অভাব ছিল না, কিন্তু আমাদের পরিবারে উচ্ছ্বাসের আতিশয্য জিনিষটা কোন দিন ছিল না। আমি একটু বড় হবার আগে দাদারা সকলেই কৃতবিদ্য হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিদেশের

বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সুগম করেছে তাদের ক্রমোন্নতির পথ। তারা থাকত যে যার কাজের জায়গায়, কোন ছুটিতে হয়ত দেখা হ'ত ওদের সঙ্গে। স্কুলে পড়তাম, কিন্তু আমার কোন বিশেষ বন্ধু ছিল না। কৈশোরের নিঃসঙ্গ দিনগুলো আমার কাটত বাবার লাইব্রেরিতে। বাবা ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক, দেশ-বিদেশের কাব্য-সাহিত্যের বইয়ের অভাব ছিল না বাড়ীতে। অপরিণত কিশোর-মন হয়ত অনেক কিছুই বুঝতে পারত না—তবু কি এক অন্ধ আকর্ষণ অনুভব করতাম ওই প্রায়ান্ধকার ঘরে আলমারিতে সাজান বইগুলোর প্রতি। তুমিই প্রথম দেখা দিলে, প্রাণের সতেজ চাঞ্চল্য নিয়ে আমার সরম-কুণ্ঠিত জীবনে।

তুমি ছিলে বিজ্ঞানের ছাত্র—পদার্থবিদ্যা তোমার পাঠ্য বিষয়। সাহিত্যচর্চ্চা ছিল তোমার অবসর সময়ের চিত্ত-বিলাস। কিন্তু বিদেশী কাব্যসাহিত্যে তোমার গভীর জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-প্রতিভা যে-কোন উঁচুদরের সাহিত্যরসিকের গৌরবের জিনিষ হতে পারত। আমাদের বেড়াতে যাবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। কতদিন মেঘমেদুর অলস মধ্যাহ্নে বেরিয়ে পড়েছি অকল্যাণ্ড রোড দিয়ে "ঘুমে"র পথে। কখনও বা গিয়ে বসেছি পাহাড়ী ঝরণার ধারে—যেখানে দু-পাশের লতাপাতা নত হয়ে চঞ্চল জলে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাওয়া শ্যামছবি ফেলেছে। তুমি পড়ে শোনাতে কোন প্রিয় কবির কবিতা। কখনও বা 'ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্'-এর রাস্তা বেয়ে নেমে যেতাম পাহাড়ীদের কোন গ্রামের দিকে। কত সন্ধ্যা কেটে গেছে ওদের দেহাতি বাঁশীর সুর শুনে।

স্কুলের পড়া শেষ হ'লে, কলকাতায় কলেজে পড়তে এলাম। তুমি তখন পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ছুটির দিনে নিয়ে যেতে ট্রামে করে ডালহাউসি, রেড রোড, কিংবা লেকের ধারে। কখনও কখনও বা দু'জনে বেরিয়ে পড়তাম দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, শিবপুরের পথে। তোমার সঙ্গে থাকত কেক আর ফ্লাস্কে ভরা চা। বোর্ডিঙে আমি কারও সঙ্গে বিশেষ কথা বলতাম না। চিরদিন একলা কাটিয়ে লোকের সঙ্গে ভাল করে মিশতে পারতাম না। মেয়েরা সেটাকে ভুল করত ভাল মেয়ের অহঙ্কার বলে। সহপাঠিনী মহলেও নীরস গ্রন্থকীট বলেই পরিচিত ছিলাম। শুধু তোমার কাছে আমি এত প্রগলভ হয়ে উঠতাম। পথে দেখা কত ছোটখাট জিনিষ নিয়ে, নিজেদের বোর্ডিং এবং কলেজের খুঁটিনাটি ঘটনা নিয়ে অনর্গল বকে যেতাম। মন কোথাও বাধা পেত না।

দু-বছর পর তুমি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়ে গবেষণা সুরু করলে। বিভিন্ন বস্তুর বর্ণচ্ছত্রের অনুশীলন ছিল তোমার বিষয়। সারা দিনই তোমার কাটত বিজ্ঞান কলেজের লেবরেটরিতে, গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যস্ত থাকতে নিজের পড়াশুনা নিয়ে। তবু ছুটির দিনটা আমাকে নিয়ে যেতে কখনও তোমার ভুল হ'ত না। কত সময় শোনাতে তোমার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার কথা। মেধাবী ছেলেরা অনেক সময় ভাল চাকরী পেলে গবেষণার পথ ছেড়ে দেয়—এ নিয়ে তোমার মনে ছিল একটা গভীর দুঃখ। তোমার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হ'ল, তুমি ডি. এস-সি হয়ে বিলেত যাবার জন্য ষ্টেট্‌স্ স্কলারশিপ পেলে। যাবার সব আয়োজন সারা হ'ল তোমার।

তখন আমি ছিলাম দার্জ্জিলিঙে। এসে সবাইকে শোনালে তোমার যাবার কথা—সকলেই খুব খুশী হলেন। তারপর এলে তুমি আমার পড়ার ঘরে। প্রথানুযায়ী শুভেচ্ছা জানাতে সেদিন পারলাম না, খবরটা শুনে চুপ করে বসে রইলাম। তুমি টেবিল থেকে একটা মাসিক পত্রিকা তুলে দেখছিলে। টিক্ টিক্ করে বেজে চলছিল শুব্ধ ঘরে একটা ছোট ঘড়ি। আমার নিস্পন্দ ভাব তোমাকে বিস্মিত করেছিল—হঠাৎ মুখ তুলে চেয়ে দেখলে আমার নীরব চোখের জল। কাছে এসে সেই প্রথম সবল দুটি বাহুর আকর্ষণে টেনে নিলে আমাকে তোমার বুকের মাঝে, আমার জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখেছিলে। তোমার সদাচঞ্চল চোখে ছিল না সেদিন তার চিরাভ্যস্ত হাসিটি, তোমার গভীর কালো নয়নে দেখেছিলাম শুধু বেদনার নিবিড় ছায়া। খুব ধীরে আমার কপোলে একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে বলেছিলে—"দুঃখ করো না– আমি ফিরে আসব।" আমাদের দু'জনের মধ্যে এ ধরণের কোন কথা এর আগে কোন দিন হয় নি, বিচ্ছেদের দিন যখন এগিয়ে এল দুঃসহ বেদনার মধ্যে উপলব্ধি করেছিলাম সেদিন—কত ভাল লাগে তোমাকে। সমস্ত মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে তার স্মৃতি আজও ভাসে, সেখানে আর কারও আসন হবে না কোন দিন। বেশী কথা সেদিন হ'ল না। আমার ক্ষীণ, ভীরু হাত দুটি তোমার মুঠোর মধ্যে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিলে। তোমার নীরব পরশ সকল মুখরতাকে অতিক্রম করে অতলস্পর্শ গভীরতার মাঝে নিয়ে গিয়েছিল। পাশের ঘরে রেডিওতে বাঁশী বাজছিল আশাবরীর সুরে। প্রিয় বিরহের কান্নাঝরানো সুরের মূর্চ্ছনা সকালের সোনালী আলোয় বেদনার জাল বুনে চলছিল। তোমার সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

তোমার বন্ধনে ধরা দিয়ে, নারীজীবনের চরম সার্থকতা লাভ করতাম এ কথা জানি। কৈশোর-জীবনের ভাবনাবিহীন দিনগুলো কাটে হাল্কা হাওয়ায় ভেসে-চলা মেঘের মত; আত্মীয়পরিজন ঘিরে থাকে চারদিকে। কিন্তু তারপর মন চায় একজনের নিবিড় সঙ্গ, মিলিত প্রেমে গড়ে তোলে শান্তিনীড়। জানি তুমি আমাকে অপছন্দ করতে না। কত দিন যখন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি—আমি এত সাধারণ মেয়ে—কেন তোমার আমাকে ভাল লাগে? তুমি হেসে বলতে—"সাধারণ ছেলের জন্য তো সাধারণ মেয়েই ভাল।" তবু

দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ছিল দু'জনের মিলনের পথে। প্রাচীনপন্থী পিতার একমাত্র সন্তান তুমি। মা হারা ছেলেকে বুকে করে মানুষ করেছিলেন জননীর স্নেহে। এখনও আমার চোখে ভাসে তোমার বাবার আভিজাত্যমণ্ডিত ব্রাহ্মণ্য মহিমা-দীপ্ত মূর্ত্তিখানি। স্নেহের অভাব তাঁর ছিল না—কন্যাধিক বাৎসল্য পেয়েছি তাঁর কাছে। আমার মুখে মীরার ভজন শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন। কত দিন আমাকে নিজে পড়ে শুনিয়েছেন উপনিষদের বাণী। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের ধ্বনি আজও আমার কানে বাজে। তবু তিনি কোন দিন আমাকে তোমাদের ঘরে বধূরূপে নিয়ে যাবার কথা কল্পনা করতে পারতেন না। এ শুধু ব্রাহ্মণ্যের অহমিকা নয়—অশিক্ষিত মনের অন্ধ বিশ্বাসও নয়। তাঁর মত বিদ্বান্, মননশীল লোক কমই দেখা যায়। কিন্তু তিনি এ কথা প্রাণ দিয়ে মানতেন—সমাজের কল্যাণ ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের অনেক উপরে। তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল এই সংস্কারের উপর। তাঁর জীবনাদর্শের ভিত্তিমূলে নাড়া না দিয়ে আমাদের মিলন সম্ভবপর ছিল না। আর এত বড় আঘাত দিতে আমরা কিছুতেই পারতাম না। কাজেই মিলন আমাদের হ'ল না, তুমি বিলেত চলে গেলে।

ইতিমধ্যে আমাদের সংসারের উপরে দুঃখের কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। মা হয় ত তাঁর স্নেহপ্রবণ মন দিয়ে আমার মনের কথা বুঝেছিলেন। একমাত্র মেয়ের ব্যথায় তাঁর মন ভেঙে গিয়েছিল কিছুই করবার ছিল না। তার পর কয়েক-দিনের সামান্য অসুখে আমাদের চিরদিনের মত ছেড়ে চলে গেলেন। বাবা এ চরম আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর মুখের সদাপ্রসন্ন হাসিটি আর কোন দিন দেখি নি। কয়েক মাসের মধ্যেই মনে হতে লাগল—যেন কত বছর পার হয়ে বার্দ্ধক্যের প্রান্তসীমায় পৌঁছেছেন। আমাদের সংসারের সব দায়িত্ব চির দিন বহন করেছেন মা। শাঁখা-পরা দুটি শুভ্র কল্যাণহস্তের স্পর্শে আমাদের সংসারে যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটেছিল—তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বাবাও এক বছরের মধ্যে মায়ের পথ অনুসরণ করলেন। মেয়ের নিরাশ্রয়তার কথা মনে করে শেষ সময়েও তাঁর অশ্রুর বিরাম ছিল না। আমার পায়ের তলা থেকে আশ্রয় সরে গেল। আমাদের আনন্দ-মুখরিত সান্ধ্যনীড় একেবারে শূন্য হয়ে গেল, কেউ কোথাও নেই, এত বড় পৃথিবীতে নিজেকে একান্ত রিক্ত, ব্যর্থ মনে হ'ল।

দাদারা আমাকে নিয়ে গেল তাদের বাড়ীতে—আমাকে অন্যমনস্ক রাখতে চেষ্টা করল। কিন্তু একক জীবনে অভ্যস্ত আমি তাদের সংসারে একান্ত বেমানান ছিলাম। আগে থেকেই ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছিল। ডাক্তার এসে রোগ নির্ণয় করলেন—উপদেশ দিলেন বায়ু পরিবর্ত্তনের। ভাইয়েরা বললে আলমোড়া, নৈনীতালের কথা—আমি চাইলাম দার্জ্জিলিং যেতে। যেখানে জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনগুলো কাটিয়েছি, যেখানে তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়—সহস্র সুখস্মৃতি-বিজড়িত সেই দার্জ্জিলিঙেই যাত্রা করলাম। 'ডি, এইচ, আর'-এর ছোট গাড়ীতে চড়ে সেই চিরপরিচিত পথ দিয়ে চললাম।

তখন এপ্রিল মাস। শৈলশিখরে বর্ষা এসেছে মঞ্জীর-রণিত চরণে তার নীলাঞ্চল উড়িয়ে। তিস্তা নদীর গৈরিক জলে জেগেছে উদ্দাম কলকল্লোল। সেই পাহাড়ের বুকে আঁকাবাঁকা পথ; কাঠগোলাপের বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট বাড়ী, রেল-লাইনের দু'পাশে দাঁড়িয়ে পাহাড়ী ছেলের দল। মাঝে মাঝে এক একটা ছোট ষ্টেশন। জানতাম, এ পথ দিয়ে আমি কোন দিন ফিরব না।

আজ হাসপাতালে দিনগুলো কেটে চলেছে একঘেয়ে ভাবে। বাইরে তাকিয়ে দেখি আকাশের রং বদলায়; প্রকৃতি দেখা দেয় তার নিত্য নবসাজে। ঐ দেখতে পাচ্ছি, রাত্রি শেষ হয়ে আসছে, ভোরের আকাশের শুকতারা ম্লান হয়ে এল। তোমারও প্রবাসের দিন শেষ হয়ে আসছে। জানি এক দিন তুমি ফিরবে গৌরবমণ্ডিত হয়ে—আমি সেদিন থাকব না। মালতী—

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সমাজ-দর্শন

শ্রীউমা সেন

বার্ট্রাণ্ড রাসেল বর্ত্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাগুরু। পাণ্ডিত্যের গভীরতা, চিন্তার স্বচ্ছতা ও যুক্তির তীক্ষ্ণতা তাঁকে দর্শন-জগতে উন্নত আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। বর্ত্তমান শতাব্দীতে নবজাগ্রত তরুণদের উদার ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে যাঁদের চিন্তাধারা সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে, রাসেল তাঁদের মধ্যে একজন প্রধান চিন্তানায়ক। যুদ্ধোত্তর যুগে সামাজিক পুনর্গঠনের দিনে তাঁর চিন্তা ও বাণী বাস্তবিকই অনুধাবনযোগ্য।

রাসেলের সমাজ-দর্শন বিভিন্ন সূত্রে তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় আলোচিত হয়েছে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য হ'ল তাঁর *The Principles of Social Recon-stuction* নামক গ্রন্থখানি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়ায়

(১৯১৪-১৮) গ্রন্থখানি রচিত হলেও, সময়ের এই দীর্ঘ ব্যবধানে তাঁর মূল বক্তব্যের মূল্য বিন্দুমাত্রও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি; বরং পরবর্তী ঘটনাস্রোতের নানা বৈচিত্র্য তাঁর চিন্তাধারার উপর নতুন আলোক-সম্পাত করে তাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে।

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাসেল তথাকথিত বস্তুবাদী চিন্তাবীরদের থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। তিনি বস্তু, প্রকৃতি ও সমাজের প্রভাবকে স্বীকার করেও তাদের সর্ব্বময় কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেছেন। আর বার বার একথাই ঘোষণা করেছেন যে, প্রকৃতিতে ও সমাজে শতসহস্র বন্ধন থাকা সত্ত্বেও মানব-মনের স্বাধীনতা ও স্বরাজ বিদ্যমান।* প্রকৃতি তাকে বাধা দিচ্ছে। প্রতি নিমেষে তার স্বপ্ন চূর্ণিত হয়ে যাচ্ছে অন্ধ প্রকৃতির নির্দ্দয় আঘাতে। তবুও মানুষ কল্পলোকে গড়ে তোলে আদর্শের স্বপ্ন আর তাকে বাস্তবে রূপ দিতে বিপুল ভাবে প্রয়াসী হয়। প্রকৃতির বন্ধনের কাছে মানুষ তার আত্মার স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দেয় নি, সে নিজেকে প্রকাশিত করতে চেয়েছে স্মরণাতীত কাল থেকে। প্রকৃতির বন্ধন সত্ত্বেও সে বার বার গড়ে তুলেছে তার আদর্শের অনুকূল অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান। সে চেয়েছে বার বার বন্ধন ভেঙে সম্মুখে এগিয়ে যেতে। কে দিয়েছে ধাক্কা আর কার প্রেরণায় সে ভাঙতে চেয়েছে অগ্রগতি-পথের সহস্র বন্ধন আত্মবিকাশের বিপুল উন্মাদনায়? রাসেল এই মূলগত উন্মাদনার সংজ্ঞা দিয়েছেন "Impulse of Growth"। একেই ফরাসী দার্শনিক বার্গস বলেছেন "লেল্যাঁ ভ লা ভী" অর্থাৎ "জীবনের ধাক্কা।" এই ধাক্কা বা উন্মাদনাই মানুষকে টেনে নিয়ে চলেছে বিবর্ত্তন বা উন্নতির পথে। মানবের উন্নতির মূল চাবিকাঠি হ'ল এখানে। যারা বস্তুবাদী অর্থাৎ যারা জড় থেকে চৈতন্যের বিকাশ হয় এই মতবাদী বা যারা চৈতন্যের চেয়ে জড়ের প্রাধান্য ঘোষণায় তৎপর, রাসেল-দর্শন স্বভাবতই তাদের দার্শনিক মতের সগোত্র নয়।

রাসেল-দর্শনের গোড়াকার কথা হ'ল মানুষ; ও তার স্বাধীন সৃষ্টিধর্ম্মী মন। তাঁর বিচারে বস্তুর চেয়ে ব্যক্তি বড়, অন্ধ প্রকৃতির আধিপত্যের চেয়ে মানব-মনের সজ্ঞান সাধনা বড়। সমাজের গতি অন্ধ বা যান্ত্রিক নয়। মানুষের ইচ্ছা, চিন্তা ও কর্ম্মের দ্বারাই সামাজিক বিবর্ত্তন বা বিপ্লব নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। প্রকৃতপক্ষে মানুষই শেষ-বিশ্লেষণে ইতিহাসের গতিনিয়ামক, নির্দ্ধারক ও স্রষ্টা। সমাজের কেন্দ্রস্থলে তার আসন। তাকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে আইন ও কানুন, ধর্ম্ম ও শাস্ত্র, সমাজ ও রাষ্ট্র। এদের সকলের চেয়ে বড় হ'ল মানুষের মহিমান্বিত জীবন। প্রত্যেক জীবনের ভেতর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। তাকে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যই এ বিশ্বের যত কিছু আয়োজন। "The whole theory of the universe is directed unerringly to one single individual—namely to you." অর্থাৎ, "তোমার মত প্রত্যেকটি নরনারীর জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ক'রে তোলার জন্যই এ পৃথিবীর যত কিছু আয়োজন ও তার সার্থকতা।" ওয়াল্ট হুইটম্যানের এই বাণীর ভেতর রাসেল-দর্শনের মর্ম্মবাণীও ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। মানুষকে বাদ দিয়ে এ সংসারে কোন কিছুর মূল্য কাণাকড়িও নয়। তার কল্যাণের আদর্শের সঙ্গে সবকিছুর মহিমা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। যা তাকে ক্ষুদ্র থেকে বৃহতে, বন্ধন থেকে মুক্তিতে, উপভোগ থেকে সৃষ্টিতে নিয়ে যায় অর্থাৎ যা-কিছু তার অন্তর্নিহিত Impulse of Growth-এর সহায়ক, তাই কল্যাণপ্রদ ও সার্থক। এর ব্যাঘাত ঘটলেই সবকিছু ব্যর্থ ও আপন দীনতায় পঙ্গু হয়ে যায়।

বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা, তার পুঁথি ও শাস্ত্র, বিধি ও বিধান, সবকিছুই তার আপন গৌরব থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। মানুষকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে বস্তু, ব্যক্তির চেয়ে বড় হয়েছে সমাজ। মানুষের জন্যই সমাজ, কিন্তু সমাজের জন্য মানুষ নয়। মানুষ হ'ল লক্ষ্য, আর সমাজ হ'ল উপলক্ষ্য মাত্র। অথচ মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, লক্ষ্য প্রায়ই উপলক্ষ্যের চাপে গৌণ হয়ে পড়ে। এ দুর্ভাগ্য ঘটেছে মানুষের ইতিহাসে বারে বারে। বর্ত্তমানে সেই দুর্ভাগ্যের এক অতি বিকট মূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করেছে। বিজ্ঞানের বলে এখন দেশ ও কালের ব্যবধান অনেকখানি অবলুপ্ত হয়েছে, প্রকৃতির উপর আমাদের কর্তৃত্ব বেড়েছে, সম্পদের দিক দিয়েও ঘটেছে আমাদের অভূতপূর্ব্ব বিপুল প্রাচুর্য্য। তবুও মানুষের যুগ-যুগ সঞ্চিত দৈন্য ঘুচল না, তবুও মানুষ আজ অসহায় ও অভিশপ্ত জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছে। এ সাঙ্ঘাতিক অন্তর্বিরোধ কেন? কোথায় রয়েছে জীবনের মধ্যে সেই অপূর্ণতা যার জন্য মানুষ এত ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও এমন অসুখী ও দরিদ্র? এ হ'ল বর্ত্তমান কালের আদর্শবাদীদের চরম জিজ্ঞাসা। যাঁরা বলেন, ধনবৈষম্যই এর কারণ, রাসেল স্পষ্টতঃ তাঁদের দলভুক্ত নন। ধনবৈষম্য অন্যতম কারণ বটে, তবে একমাত্র কারণ নয় বা মূলগত কারণও নয়। মূলগত কারণ, রাসেল সন্ধান করেছেন বাইরের ঘটনাস্রোতের মধ্যে নয়, মানব-মনে। মানব-মনের মধ্যে সহজাত যে অধিকার-মূলক বৃত্তি (possessive impulse) তারই প্রাধান্য সমাজ-জীবনে ঘটিয়েছে এই নিদারুণ সর্ব্বনাশ। বাইরের ঘটনা-স্রোতের পশ্চাতে রয়েছে মানব-মনের গতি। মনের পরিবর্ত্তনই রূপায়িত হয়ে ওঠে বাইরের পরিবর্ত্তনে। রাসেল-দর্শনের প্রথম বক্তব্য হ'ল সমাজকে সুন্দর ভিত্তিতে সুগঠিত

---

* Bertrand Russell: *A Free Man's Worship* (i.e. Mysticism and Logic, Chap. III.)

রূপায়ণের জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন মানস-পটভূমির পরিবর্ত্তন বা বিপ্লব। এ বিষয়ে মনীষী রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে রাসেল-দর্শনের মিল আছে যথেষ্ট।*

মানুষের অন্তরের গহন-গভীরে রয়েছে বিচিত্র আশা ও আকাঙ্ক্ষা, আবেগ ও উন্মাদনা। এগুলিই তার জীবনে বৃহত্তর অংশ অধিকার করে রয়েছে। যুক্তি, বিচার, জ্ঞান ও বুদ্ধির সীমানা অত্যন্ত অল্প, তাদের শক্তিও অনেক কম। অন্ধ আবেগ ও উন্মাদনাগুলিই কর্ম্মের মূল উৎস বা প্রেরণা। বুদ্ধি-বিচার দিয়ে আমরা তাদের স্বরূপকে নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করি—আমাদের কর্ম্ম ও চিন্তাগুলিকে সমর্থন বা সমালোচনা করি। জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য বুদ্ধি-বিচারের অশেষ মূল্য নিশ্চয়ই রয়েছে, তবে সেটুকুই চরম নয়। সকলের আগে প্রয়োজন মানসলোকের পরিবর্ত্তন বা psychological revolution। মানসিক বিপ্লব সাধনের পূর্ব্বে মানস-পটভূমি সম্বন্ধে তাই সুস্পষ্ট ধারণা অত্যাবশ্যক।

মানব-মন সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন আবেগ ও কামনাগুলি বিচিত্র ও অনেকাংশে পরস্পরবিরোধী। এই কামনা ও আবেগগুলিকে রাসেল দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক শ্রেণীর নাম তিনি দিয়েছেন "possessive impulse" বা অধিকারমূলক প্রবৃত্তি আর এক শ্রেণীর নামকরণ তিনি করেছেন "creative impulse" বা সৃষ্টিমূলক আবেগ। যা মানুষকে মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, নিজের বৃহৎ 'আমি'কে ক্ষুদ্র 'আমি'র কারাগারে বন্দী করে রাখে, সেটা হ'ল possessive impulse-এর অন্তর্গত। পক্ষান্তরে যা-কিছু, মানুষকে মানুষের নিকট থেকে নিকটতর করে তোলে, যা ক্ষুদ্র থেকে মানুষকে মুক্তি দেয় বৃহতে, তাই হ'ল creative impulse-এর অন্তর্ভুক্ত। ক্রোধ, অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, ক্ষমতাপ্রিয়তা ইত্যাদি হ'ল অধিকারমূলক বৃত্তির বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। পক্ষান্তরে ভালবাসা, ত্যাগ, ক্ষমা ইত্যাদি হ'ল সৃষ্টিমূলক বৃত্তির বিভিন্ন রূপমাত্র। অধিকারমূলক বৃত্তির তাড়নায় মানুষের দৈন্য, ক্ষুদ্রতা ও বন্ধন ; সৃষ্টিমূলক আবেগের ধাক্কায় মানুষের ঐশ্বর্য্য, বিরাটত্ব ও মুক্তি। বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা কুৎসিত ও কদর্য্য, কারণ এই প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের creative impulse-এর থেকে বড় স্বীকৃতি পেয়েছে তার possessive impulse। সমাজ-বিপ্লবীদের ভেতরও যারা cult of power বা শক্তিযোগের পূজারী, তারাও শেষ পর্য্যন্ত possessive আদর্শেরই উপাসক। রাসেল চান এমন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যেখানে মানুষের সৃষ্টিমূলক দিকটাই বড় হয়ে উঠবার সুযোগ পাবে। প্রকৃতপক্ষে জীবনের সৃষ্টিমূলক দিকটার প্রাধান্যের ফলেই আদর্শ সমাজ-গঠনের সম্ভাবনাও হবে জয়যুক্ত।

এই জ্যোতির্ম্ময় ভবিষ্য-সমাজ সৃষ্টির মূল ভিত্তি হবে কিসের ওপর? বিজ্ঞানের ওপর না ঐশ্বর্য্যের ওপর? এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, এ দুটির কোনটির উপরেই নয়। কেননা, বিজ্ঞান বা ঐশ্বর্য্য মানুষের সৃষ্টির পথে উপকরণ মাত্র। তাদের সার্থকতাও বিপুল। তবে মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলে তারা অনেক সময় আশীর্ব্বাদের পরিবর্ত্তে অভিশাপই বহন ক'রে আনে। রাসেলের বিচারে ভবিষ্য-সমাজের মূল ভিত্তি হবে অগাধ শ্রদ্ধা-প্রীতির ওপরে। শ্রদ্ধা মানুষকে সত্যদৃষ্টি প্রদান করে আর সে দৃষ্টিতে মানুষ উপলব্ধি করে জীবনের অমর মহিমা। প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে আত্মবিকাশের এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, "something sacred. indefinable unlimited, something individual and strangely precious, the growing principle of life, an embodied fragment of the dumb striving of the world"।† জীবনের এই মহান দাবিকে শ্রদ্ধার স্বীকৃতি দেওয়া হবে ভবিষ্য-সমাজগঠনকারীদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে যারা জীবনকে দেখতে পেরেছে তাদের পক্ষে অপরের অধিকারের প্রতি,—সামাজিক আর্থিক ও রাষ্ট্রিক যে-কোন অধিকারই হোক না কেন, তার প্রতি—শ্রদ্ধাশীল হওয়া অতি স্বাভাবিক। এই মূলগত শ্রদ্ধার অভাব ঘটলে কি বিজ্ঞান, কি ঐশ্বর্য্য কোন কিছুই জীবনে সৃষ্টিমূলক আনন্দের সুর আনয়ন করে না।

বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের মন ও বুদ্ধিকে যে ছাঁচে ঢালাই করা হয়, যে শিক্ষার বাণী তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়, তাতে মানুষের সৃষ্টিমূলক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে না—মানুষ হয়ে পড়ে কর্ত্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্ধ অনুকরণের যন্ত্রমাত্র। নিজেকে উপলব্ধি করবার ও আপন ঐশ্বর্য্যে নিজেকে পূর্ণ করে তোলবার জন্য অন্তরের যে গভীর কামনা তা হয়ে থাকে শ্রেণী, দল বা রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে নিদারুণ ভাবে নিঃশেষিত। এরা নিজেদের মন দিয়ে ভাবে না ; বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে না, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে না। যন্ত্রের মত অন্ধ অনুকরণের মানসিক পটভূমিতে এদের জীবনের অভিব্যক্তি। এরা সারা জীবন অপরের কাছে নতি স্বীকার করে চলে, অপরের মতবাদকে নিজেদের মতবাদ বলে ঘোষণা করে, অপরের সিদ্ধান্ত ও সত্যকে নিজেদের সিদ্ধান্ত ও সত্য বলে গ্রহণ করে। এখানেই হ'ল বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার শোচনীয় ব্যর্থতা। মানুষকে অন্তরের দিক থেকে ক্রীতদাস বানিয়ে তার যথার্থ কল্যাণসাধন অসম্ভব। রাসেল তাঁর *Let the people think* গ্রন্থে এ প্রসঙ্গ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা

* Sir S. Radhakrishnan : *East and West in Religion* (Chap III : *Chaos and Creation*, pp. 90-92)

† *The Principles of Social Reconstruction*, p. 147

করেছেন। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে আপন স্বাতন্ত্র্যে ফুটিয়ে তোলার পথ প্রশস্ত করা। রাষ্ট্র ও সমাজের অন্যতম প্রধান সার্থকতাও এখানে।

মানসিক দাসত্বের নাগপাশ থেকে মানুষের মনকে মুক্ত করা আজ একান্ত প্রয়োজন। মানুষের অন্তরে শিক্ষার মারফত সঞ্চারিত করতে হবে আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের মহামন্ত্র, তার চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে সৃষ্টিমূলক আনন্দের জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্ন। ত্যাগের মধ্যে, ভালবাসার মধ্যেই মানুষের আত্মার যথার্থ আনন্দ। নির্ম্মল আনন্দের অভাবেই মানুষের ক্ষুব্ধ অশান্ত মন অধিকারমূলক বৃত্তিগুলির তৃপ্তিসাধনে এত বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই বৃত্তির প্রাধান্যের দরুনই দিকে দিকে আজ বর্ব্বরতা, ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা এত নগ্নমূর্ত্তিতে প্রকটিত। এই অধিকার-মূলক বৃত্তির প্ররোচনায়ই মানুষ যুদ্ধ চায়, প্রতিযোগিতা কামনা করে। বিপুল উন্মাদনা ও আলোড়নের মধ্যে সে ভুলে থাকতে চায় তার জীবনের শতসহস্র ব্যর্থতা দুর্ভোগ ও দুর্দ্দশা। এ পথ ভ্রান্ত। আনন্দের উৎসকে আবিষ্কার করতে হবে হৃদয়ের গভীরে। আনন্দ বাইরের কোন বস্তু নয়। ইহা একান্তভাবে আপন অন্তরের ঐশ্বর্য্য। বহু ত্যাগ, তপস্যা ও দুঃখের দুর্গম পথে সংগ্রাম করেই সেই ঐশ্বর্য্যকে আবিষ্কার করতে হয়। সাধনা ছাড়া নূতন সৃষ্টি অসম্ভব। জড়জগতের সম্পদের প্রাচুর্য্যের মধ্যে জীবনের যথার্থ তৃপ্তি নেই—নিজেকে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিকশিত করে তোলার প্রয়াসেই মানুষের প্রকৃত আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় লিখেছেন,

"The abiding cause of our misery is not so much in the lack of life's furniture as in the obscurity of life's significance"

অর্থাৎ—আমাদের দুঃখের চিরন্তন কারণ বস্তুর বা উপকরণের অভাব ততটা নয়, যতটা হ'ল জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উদাসীনতা। এ সুরেরই অনুরূপ সুস্পষ্ট ধ্বনি রাসেলের *Scientific Outlook* গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে শুনতে পাওয়া যায়। শেষ অধ্যায়টির নাম হ'ল "Science and values।" রাসেল সেখানে বলতে চেয়েছেন যে, প্রকৃতির সম্পদ বা বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্যের মূল্য আছে নিশ্চয়ই; তবে সব কিছুর মূল্যই হচ্ছে বৃহত্তর জীবনসৃষ্টির পথে উপকরণ হিসাবেই, অন্যথা নয়। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণনও বার বার এই মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর নিম্নলিখিত উক্তিসমূহ প্রণিধানযোগ্য:

"Science and its inventions are concerned with the outer organisation, not the inward living. They can remove the hindrances to good life but cannot create it. They can diminish illness but cannot tell a man what he shall do with his health. They can remove poverty and cure unemployment but connot tell a man what he shall do with his wealth and leisure. While science gives us the capacity to control the conditions of life, it does not help us to use these conditions for fine living. We have to go beyond science to get the ideal values.*

এই ideal values-এর স্বপ্ন দৃষ্টির সম্মুখে সদা জাগ্রত না থাকলে বৃহত্তর জীবনসৃষ্টি অসম্ভব। রাসেল তাঁর *Scientific Outlook* গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে এ কথাই তাঁর অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর বিচারে এই ideal values-এর একমাত্র লক্ষ্যই হবে বৃহত্তর জীবন-সৃষ্টি—যে জীবনে অধিকারমূলক বৃত্তির পরিবর্ত্তে সৃষ্টিমূলক আবেগের বিপুল প্রাধান্য থাকবে। এই নব-সৃষ্টির পথে বিজ্ঞানের অফুরন্ত দানকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। বিজ্ঞান দেয় আমাদের বিশেষ জ্ঞান, আর জ্ঞানই শক্তি। তবে সেই জ্ঞানকে করতে হবে প্রেমের সঙ্গে সংযুক্ত,—শক্তিকে করতে হবে সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের আদর্শের দ্বারা সক্রিয়। শুধু বুদ্ধির বিপ্লব ঘটলেই যথেষ্ট হবে না। সেই বিপ্লবকে সার্থক ও জয়যুক্ত করে তুলতে হলে সেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির আমূল পরিবর্ত্তন-সাধনও একান্ত প্রয়োজন। বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের প্রচ্ছন্ন আবেগগুলিকে পরিমার্জ্জিত করতে না পারলে বহির্জ্জগতের স্থায়ী বিপ্লব কখনই সার্থক হয়ে উঠবে না। বাইরের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানকে ভেঙে চুরে অভিনব রূপ দেওয়াটাই একমাত্র বড় কথা নয়; সেই সঙ্গে মানসিক গঠনেরও আমূল পরিবর্ত্তন একান্তভাবে দরকার। সেজন্য যে অভিনব ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, তারই সুস্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায় রাসেল-দর্শনে।

* Sir S. Radhakrishnan : *Progress and Spiritual Values* (Philosophy, July, 1937.)

সিংহলের স্বাধীনতা লাভ

শ্রীসুবোধচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বাঙালী রাজপুত্র সাত শ' অনুচর সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর তাম্রলিপ্ত থেকে এক দিন সমুদ্রে তরী ভাসিয়েছিলেন। মাসের পর মাস অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এক দিন তাঁরা লঙ্কাদ্বীপে এসে নামলেন। তার পর যক্ষিণী কুবেণীর সহায়তায় লঙ্কার রাজা কালসেনের বিবাহের রাত্রে বিজয় সিংহের সাত শ' সঙ্গী কালসেনের অনুচরদের তাড়িয়ে দিয়ে রাজপুরী দখল করে বসল। পরদিন প্রভাতে সমগ্র দ্বীপে ঘোষণা করা হ'ল বাংলার নির্ব্বাসিত রাজপুত্র বিজয় সিংহ লঙ্কার রাজা, আর নতুন রাজার নাম অনুসারে লঙ্কাদ্বীপের নাম হ'ল সিংহল। সিংহাসনে বসে বিজয় সিংহ ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পাণ্ড্য দেশের রাজার কাছে রাজকন্যার পাণি প্রার্থনা করে দূত পাঠালেন। দূত সে রাজ্যে গিয়ে বিজয় সিংহের জন্য রাজকন্যা ও সাত শ' অনুচরের জন্য সাত শ' সখী প্রার্থনা করলে। রাজা সম্মত হলেন। অতঃপর বিজয় সিংহ ও তাঁর অনুচরবর্গ বিবাহ ক'রে সিংহল দ্বীপে মনের আনন্দে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে লাগল। তা ছাড়া অনেক বাঙালী ব্যবসায়ীও উক্ত দ্বীপে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের বংশধররা সকলেই সিংহলবাসী হয়ে গিয়েছিলেন। সে-দেশে যে সকল প্রাচীন খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে তার সঙ্গে প্রাচীন বঙ্গলিপির অনেক সাদৃশ্য আছে। সুতরাং এই সিংহলের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ শুধু রক্তের সম্বন্ধ নয়, বাংলা কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস তার সঙ্গে মিশে আছে। এইজন্যই সিংহলীদের সঙ্গে বাঙালীদের আকৃতিগত ও ভাষাগত সাদৃশ্য আছে। প্রাচীন সিংহলী ভাষার অর্দ্ধেক শব্দ বাংলা শব্দ। তদুপরি ভারতের সঙ্গে সিংহলের ধর্ম্মগত সুদৃঢ় যোগসূত্র বিদ্যমান। মহারাজ অশোক তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মই এখনও সিংহলবাসীদের প্রধান ধর্ম্ম।

কাণ্ডি ছিল সিংহলের প্রাচীন রাজধানী। একটি কৃত্রিম হ্রদের তীরে সমুদ্র থেকে ২০০০ ফুট উচ্চে এই শহরটি অবস্থিত। এখানকার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দিরটির নাম দালাদা মালিগাওয়া বা দন্তবিহার। এই বৌদ্ধ তীর্থস্থানটির মাহাত্ম্য অপরিসীম। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে বৌদ্ধগণ এখানে এসে থাকেন। এই মন্দিরে বুদ্ধদেবের একটি দাঁত সযত্নে রক্ষিত বলে সকলের বিশ্বাস। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস-পাঠকেরা জানেন যে, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁর চিতাভস্ম এবং অস্থি, দন্ত বা কেশগুচ্ছ ইত্যাদি রক্ষা করবার জন্যে তাঁর ভক্তেরা বহু চৈত্য ও স্তূপাদি নির্ম্মাণ করেছিলেন।

কাণ্ডির এই দালাদা মালিগাওয়া বা দন্তবিহারে বহু হস্তলিখিত পুঁথি আছে। সিংহলের প্রাচীন আমলের রাজাদের



সিংহলের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডন ষ্টিফেন সেনানায়েক

সিংহাসন আরোহণের সময় এখানকার রাজপুরীতে যে সিংহাসন ব্যবহৃত হ'ত সেটি লণ্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ১৯৩৪ সালে ডিউক অফ গ্লষ্টার যখন সিংহলভ্রমণে আসেন তখন তিনি এই সিংহাসনটি সিংহলবাসীদের প্রত্যর্পণ করেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কাণ্ডি ইংরেজ অধিকারে এসেছিল।

পর্ত্তুগীজরা ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্যবসায় সূত্রে কলম্বোতে আসে। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে তারা কলম্বো শহর অধিকার করে। সেই সময় পর্ত্তুগীজেরা খ্রিষ্টোফার কলম্বাসের নামানুসারে এই বন্দরের নাম রেখেছিল কলম্বো। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগীজদের কাছ থেকে এই বন্দরটি বলপূর্ব্বক অধিকার করে। পুনরায় সেই "জোর যার মুল্লুক তার" নীতিতেই ইংরেজেরা ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদের কাছ থেকে কলম্বো অধিকার করে। সম্প্রতি ১৯৪৮ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সমগ্র সিংহল বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ করেছে। সুতরাং দেখাযায়, ১৫২ বৎসর কলম্বো শহর ইংরেজদের অধিকারে থাকার পর মুক্ত হয়েছে। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, কলম্বোবাসীরা প্রথম স্বাধীনতা হারিয়েছিল ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ



সিংহলের এসেমব্লি হলে ডিউক অব গ্লষ্টার কর্ত্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা।
বামে উপবিষ্ট প্রথম—প্রধানমন্ত্রী মিঃ সেনানায়েক

দস্যুদের কাছে। এ বিষয়ে ভারতবাসীদের অপেক্ষা তাহাদের দুর্ভাগ্য অধিক। কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতার পর সিংহলের এই সদ্য শৃঙ্খলমুক্তি ঘটল। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও কলম্বো এক মহাজাতির অন্তর্গত ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শক্তি উপলব্ধি ক'রে চতুর ও কৌশলী ইংরেজ একে একে সিংহল ও ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। এত করেও এদের কাউকেও সে পরাধীন রাখতে পারল না। গত ৪ঠা জানুয়ারী ব্রহ্মদেশ প্রধান মন্ত্রী থাকিন নুর নেতৃত্বে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছে। সেই দিন সেখানে ব্রিটিশ পতাকা অবনমিত হয়ে স্বাধীন ব্রহ্মের পতাকা উত্তোলিত হয়। আর সেই দিনই ব্রহ্মের বিটিশ শাসনকর্ত্তা সার হিউবার্ট র‍্যান্স ব্রিটিশ পতাকা সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ভারত ও সিংহলের সে সৌভাগ্য লাভ ঘটে নি। সিংহলের ইংরেজ শাসনকর্ত্তা সার হেনরি মঙ্কমুর মেসনের গবর্ণর উপাধি পরিবর্ত্তিত হ'ল। তিনি গবর্ণর-জেনারেল হলেন। তাঁর বেতন হ'ল বৎসরে ৮০০০ পাউণ্ড। বর্ত্তমান লাটপ্রাসাদ "কুইনস্ হাউস" তিনি অধিকার করবেন। আগামী ১৯৪৯ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তিনি অবসর গ্রহণ করবেন এবং আশা করা যায় তাঁর স্থলে সিংহলের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডন ষ্টিফেন সেনানায়েক গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হবেন।

সিংহলের এই স্বাধীনতা-উৎসব সারা দেশময় দুই সপ্তাহ-ব্যাপী আনন্দ অনুষ্ঠানের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এই উৎসব উপলক্ষে ডিউক অফ গ্লষ্টার ইংলণ্ড থেকে সিংহলে আগমন ক'রে ১০ই ফেব্রুয়ারী ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টের উদ্বোধন করেন। বর্ত্তমান পার্লামেন্ট ভবনটি এই স্বাধীনতা-উৎসব যথোচিত ভাবে সম্পন্ন হওয়ার উপযোগী নয় বলে টোরিংটন স্কোয়ারে রিজওয়ে গল্‌ফলিঙ্কের উপর এক বিরাট সভাগৃহ নির্ম্মাণ করা হয়েছিল। পুরোপুরি প্রাচীন সিংহলী প্রথায় এর পরিকল্পনা করা হয়। অনুরাধাপুর, পোলন্নারুয়া এবং কাণ্ডি প্রভৃতি সিংহলের প্রাচীন রাজধানীসমূহের দরবার-গৃহগুলির অনুকরণে এই সভাগৃহ নির্ম্মাণ করা হয়েছিল।

এই বিরাট দরবারগৃহে পার্লামেন্টের সভ্যসমূহ, প্রধান রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ, বৈদেশিক গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিবর্গ এবং বিশিষ্ট অতিথি প্রভৃতি ৬০০০ ব্যক্তির স্থান সঙ্কুলানের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই দরবারগৃহের বাইরে ১২০০০ নিমন্ত্রিত অতিথির বসবার আসন ছিল। তাদের মধ্যে সমগ্র দ্বীপের বিদ্যালয়সমূহের ১৫০০ ছাত্রেরও স্থান ছিল। অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে দরবারগৃহের প্রধান প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে কাণ্ডির শেষ রাজা শ্রীবিক্রম রাজা সিংহের সিংহচিহ্নিত পতাকা উত্তোলন উৎসব সম্পন্ন হয়। পতাকাটির বর্ণ সম্পূর্ণ লাল—তার ওপর একটি হরিদ্রা বর্ণের সিংহের থাবায় একটি পতাকা অঙ্কিত আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কাণ্ডির যুদ্ধের পর ইংরেজগণ এই পতাকাটি ইংলণ্ডে নিয়ে যায়। সাম্প্রতিক স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে সেই পতাকাটি সিংহলে পুনরায় আনীত হয়েছে। যদি সিংহলের সমস্ত রাজনৈতিক দলের ঐক্যমত থাকে তবে এটিই সিংহলের জাতীয় পতাকারূপে গণ্য হবে। কিন্তু এ বিষয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী গবর্ণর-জেনারেলের বাসস্থান "কুইনস্ হাউস" থেকে ডিউক অফ গ্লষ্টার রাজোচিত সম্মানে দরবারগৃহে গমন করেন। সেখানে সভারম্ভে তিনি ইংলণ্ডের রাজার বাণী পাঠ করেন। এখানকার কৃত্যশেষে তিনি কলম্বো থেকে ৭২ মাইল দূরবর্ত্তী মাহাওয়েলি গঙ্গার তীরে অতি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত পার্ব্বত্য রাজধানী কাণ্ডি গমন করেন। এই দীর্ঘ পথের শোভাযাত্রা পাঁচ মাইল লম্বা হয়েছিল। সেখানে তিনি সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হলের ভিত্তি স্থাপন করেন।

এতদুপলক্ষে সিংহলে গত দুই সপ্তাহব্যাপী বিচিত্র উৎসবাদির অনুষ্ঠান হয়। অনেক সিংহলী দৈত্যদানবের মুখাবরণ পরিধান



৪ঠা ফেব্রুয়ারি সিংহলের এসেমব্লি হলের দৃশ্য

করিয়া সারা শহরের রাজপথ পরিভ্রমণ করেন। তার পর আরম্ভ হয় বাজী পোড়ান উৎসব। এই আনন্দোৎসবে সেদিন সিংহলের রাত্রের আকাশ বিচিত্র বর্ণের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠেছিল। এই উৎসবের পরদিন আরম্ভ হয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান। তারপর ১৩ই ফেব্রুয়ারী সিংহলের প্রাচীন রাজধানী কাণ্ডিতে শতাধিক সুসজ্জিত হস্তীর এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। হস্তীগুলি স্বর্ণময় কারুকার্য্যযুক্ত লোহিতবর্ণ অঙ্গাবরণে শোভিত। এই অঙ্গাবরণের সঙ্গে সংযুক্ত শত শত ছোট ছোট ঘণ্টা। এই হস্তী-শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলেছিল কাণ্ডির পবিত্র দন্ত-মন্দিরের এক বৃহৎকায় সুশোভিত দ্বিরদ। তার পর রাজপথ দিয়ে সার বেঁধে চলেছিল শতাধিক হস্তী। পথের দুই পার্শ্বে সিংহলের অগণিত নরনারী। কত দূরদূরান্তর থেকে, কত পল্লীগ্রাম থেকে তারা এসেছিল তাদের এই স্বাধীনতা উৎসবে যোগদান করতে। সিংহলের স্বাধীনতা দিবস ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রভাতে প্রাচীন অনুরাধাপুর নগরীর বহির্ভাগে একটি মধ্যমাকৃতি হস্তীশাবক ধরা পড়ে। সিংহলবাসিগণ এটাকে শুভলক্ষণ মনে ক'রে এই হস্তীশাবকটিকেও সুসজ্জিত করে হস্তী-শোভাযাত্রার সহিত যোগদান করায়। এই শোভাযাত্রার পশ্চাতে ছিল দৈত্য-দানবের মুখাবরণ পরিহিত চারিশত সিংহলবাসীর শোভাযাত্রা। শত শত ঢাক, বাঁশী ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে এই মুখোস-পরা নাচ দর্শকদের পরম উপভোগ্য হয়েছিল।

এই শোভাযাত্রার পর আরম্ভ হয় কাণ্ডি সরোবরের মধ্যস্থলে অবস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপে নানা বর্ণবৈচিত্র্যময় আলোকসজ্জা অনুষ্ঠান ও আতসবাজি পোড়ান। ১৩২ বৎসর পরে দালাদা মালিগাওয়া অথবা দন্তমন্দিরসংলগ্ন আট-কোণ-বিশিষ্ট স্থানে কাণ্ডি-সিংহচিহ্নিত পতাকা উত্তোলন উৎসব সম্পন্ন হয়। বায়ুহিল্লোলে যখন সেই পতাকা পত্‌পত্‌ শব্দে আকাশে উড়তে থাকে তখন সিংহলবাসিগণের হৃদয় এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে ওঠে।

১৩ই ফেব্রুয়ারীর প্রভাতে সিংহলের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডন ষ্টিফেন সেনানায়েক এই পতাকা-উত্তোলন-উৎসব সম্পন্ন করেন। ডিউক অফ গ্লষ্টার ও গবর্ণর-জেনারেল সার হেনরি মঙ্কমুর মেসন প্রমুখ সকলে সেই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

এইরূপে দুই সপ্তাহব্যাপী স্বাধীনতা-উৎসব পরম আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে মহাসমারোহে সমাপ্ত হয়েছে। তারপর হয়েছে দেশবিদেশে এই অনুষ্ঠানের অনুবৃত্তি। লণ্ডন, নয়া দিল্লী ও কলিকাতায় এই স্বাধীনতা উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। ভারতে সিংহলের বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ ডি সিলভা তাঁর নূতন দিল্লীস্থ গৃহে এই উৎসবের আয়োজন করেন। ভারতের গবর্ণর-

জেনারেল লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ও তাঁর পত্নী, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল ও কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিবর্গ এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় পণ্ডিত নেহরু সিংহলের প্রতি ভারতের শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, ভারত ও সিংহলের অধিবাসিগণ একই রক্তসম্ভূত নিকট আত্মীয় এবং তাঁহাদের মানসিক গঠনের মধ্যেও সাদৃশ্য আছে।

অতঃপর লর্ড মাউণ্টব্যাটেন এক বক্তৃতায় বলেন, সিংহল সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। সেইজন্য তিনি সিংহলের এই পতাকা উত্তোলন উৎসবে যোগদান করতে পেরে যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করেছেন। বিগত যুদ্ধের সময় দেড় বৎসরকাল দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় তাঁর প্রধান ঘাঁটি ছিল কাণ্ডিতে। তিনি সে সময় এই দ্বীপের বহু স্থান পরিভ্রমণ ক'রে দেখেছেন; এমন মনোরম স্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্য পৃথিবীতে দুর্লভ।

তিনি আরো বলেন, সৌভাগ্যক্রমে তখন সিংহল যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় নি। ১৯৪২ সনে কয়েকটি বোমাবর্ষণ ব্যতীত এখানে আর কোনো ধ্বংসলীলা হয় নি। কাজেই অন্যান্য যুদ্ধক্ষেত্রের ন্যায় সিংহল বিধ্বস্ত হয় নি। সুতরাং এখানকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিপর্য্যয় ঘটে নি। তিনি সিংহলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রার্থনা জানান।

সভার প্রারম্ভে মিঃ ডি সিল্ভা বিনা রক্তপাতে সিংহলের স্বাধীনতালাভে নিরতিশয় আনন্দপ্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বহু বৎসর যাবৎ সিংহলবাসিগণ তাঁদের জন্মভূমির স্বাধীনতা-লাভের জন্য চেষ্টা ক'রে আসছেন। পরিশেষে তিনি শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও তাঁদের লক্ষ্য এই মন্তব্য ক'রে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

সিংহলের ইতিহাসে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী এক স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। এই দিন সিংহল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভ করেছে। তার অঙ্গ হতে খসে পড়েছে সাম্রাজ্যবাদের কঠিন নিগড়। আজ সিংহল এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হ'ল: সিংহলের ৬০ লক্ষ নিপীড়িত নরনারী স্বাধীনতা লাভ করল। স্বাধীন সিংহল সমৃদ্ধ হোক।

সাধ

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ চন্দ্র

দুর্গম পথে যাত্রী যাহারা লঙ্ঘিল গিরি-বর্ত্ম,
আঁধার-বক্ষ বিদারি ছুটিল রচিতে মোহন মর্ত্ত্য,
যজ্ঞ-অনলে জীবনের হবি অনায়াসে দিল অর্ঘ্য,
বিজনে বিপিনে ভূধরে গহনে খুঁজিয়া ফিরিল স্বর্গ,
মৃত্যু-শাসনে ব্যাকুল হৃদয় গরজি' জলদ-মন্দ্র,
নাগেরে পাকড়ি' মথিয়া জলধি উচ্চারে মহামন্ত্র,
সেই সাধনার শবাসন হ'তে ভেসে আসে শোনো সুর গো,
দুর্গম পথে যাত্রী চলেছে রচিতে অমর দুর্গ।

ঊষর মরুর ধূসর ধূলায় তাদের চরণ-চিহ্ন
রঞ্জিত আজো রক্তের রাগে নিঃস্থত হৃদি ভিন্ন;
সেই পথে তাই নিত্য রবির উদয় এবং অস্ত;
ধীর মৃদু বায় বুলাইয়া যায় কুসুম পেলব হস্ত;
ধূম্র মেঘের পথ বহি' আসে অশ্রু-সজল সৃষ্টি
হানি' ধূলি-ভরা ধরণীর বুকে বজ্র-কঠোর দৃষ্টি;
ডম্বরু-নাদে দুর্জয় জাগে শোন শোন তার সুর গো,
রক্ত চরণ দুর্গম পথে খুঁজিছে অমর দুর্গ।

দিকে দিকে আজ দানব অসুর, জাগিয়াছে শত কংস,
প্রলয়ের ক্ষুধা সৃষ্টির সুধা করিতে চাহিছে ধ্বংস;
জেগেছে শুম্ভ, জাগে নিশুম্ভ, জাগিয়াছে মধুকৈটভ,
মাতিয়াছে তারা হরিয়া লইতে দেবের বিভূতি-বৈভব,
রাক্ষস হেথা হইয়াছে জয়ী, রচিছে স্বর্ণলঙ্কা,
দেবতারা বহে রক্ত-পতাকা, অন্তরে জাগে শঙ্কা,
চেয়ে থাকে তারা মর্ত্ত্যের পানে—ধ্বনিছে কি সেই সুর গো,
মানবের সাধ দানব-বিজয়ী রচিতে অমর দুর্গ।

জাগরণী সুর ধ্বনিতেছে আজ তোমার আমার বক্ষে,
প্রত্যাশা-ভরা চাহনি কি তার দেখ নি চক্ষে চক্ষে?
স্বপ্ন-পাগল মানুষের সাধ কখন হয়েছে মিথ্যে?
যুগে যুগান্তে মূর্চ্ছনা তার রণিয়া ওঠে যে চিত্তে।
দেখিয়াছি সেই বাণী বহে চলে তরুণ যতেক যাত্রী,
নির্ভয়ে চলে দুর্গম পথে ভেদিয়া তিমির রাত্রি।
ভয় নাই আর, ভয় নাই—শোন, ধ্বনিতেছে সেই সুর গো,
মানবের সাধ ব্যর্থ হবে না, রচিবে অমর দুর্গ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১৮৬৩—১৯১৩

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : শৈশব-শিক্ষা

১৮৬৩ সনের ১৯এ জুলাই (১২৭০, ৪ঠা শ্রাবণ) নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা—কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়, কৃষ্ণনগরের মহারাজার দেওয়ান ; মাতা—শান্তিপুরের অদ্বৈত ঠাকুরের বংশধর কালাচাঁদ গোস্বামীর ভগিনী।

শৈশবেই মেধাবী বলিয়া স্বজনগণ-মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতি ছিল। তিনি ১৮৭৮ সনে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এনট্রান্স, ১৮৮০ সনে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে দ্বিতীয় বিভাগে এফ-এ, ১৮৮৩ সনে হুগলী কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে বি-এ, এবং ১৮৮৪ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইংরেজীতে ২য় শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

দ্বিজেন্দ্রলাল শৈশবাবধি প্রায়ই ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেন। এম-এ পরীক্ষা দিবার বৎসর তিনি ম্যালেরিয়ায় শয্যাগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে দেওঘর যাইতে পরামর্শ দেন। সর আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রসন্নময়ী দেবীর সহিত দ্বিজেন্দ্রলাল দেওঘর যাত্রা করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের বাসা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল রোহিণী গ্রামে। প্রসন্নময়ী লিখিয়াছেন :—

"তা'র বাবা বলিলেন, 'দুর্গাদাস বাবুর মেয়ে—তোমার দিদির সঙ্গে তুমিও দেওঘরে যাও।' আমি, আমার মাসিমা এবং দ্বিজু, এই তিন জনে এক সঙ্গে গিয়াছিলাম। সেইবার দ্বিজু এম-এ পরীক্ষা দিতেছে। এমন সরল ও শিশুর মত স্বভাব ছিল যে, কোন বিষয়ে কিছুমাত্রও সঙ্কোচ করিতে জানিত না,—ঠিক যেন ছোট ভাইটি।...আমরা প্রত্যহ পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতাম ; আর সে কোন একটা পাহাড়ের উপর উঠিয়া, বসিয়া বসিয়া গাইত,— 'জানি না জননি, কেন এত ভালবাসি তোরে'। এ জননী—তাহার সেই স্নেহময়ী মাতা ও জন্মভূমি। এই সময়ে পূজ্যপাদ রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে তাহার প্রথম আলাপ।...আমিই সেখানে দ্বিজুকে তাঁহার সঙ্গে প্রথম আলাপ করাইয়া দিই। তাহার পর তিনি সতত আমাদের কাছে আসিতেন, গান-গল্প-আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইত,...দ্বিজু প্রিয়-দর্শন ও গৌরবর্ণ ছিল, গানে সুকণ্ঠ এবং সেই গান আবার নিজেই রচনা করিত। কাজেই রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার নিজগুণে তাহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। আমরা তখন দুই ভাই-বোনে মিলিয়া, এক সঙ্গে বসিয়া ইংরাজী কবিতা পড়িতাম, আর শেলী, বায়রণ, কীটস হইতে অনুবাদ করিতাম।" (দেবকুমার : 'দ্বিজেন্দ্রলাল,' পৃ. ৮৩-৮৪)

দেওঘরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দ্বিজেন্দ্রলালকে মুগ্ধ করিয়াছিল। "দেবঘরে সন্ধ্যা দেখিয়া" তিনি "শ্মশান সঙ্গীত" রচনা



দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

করিয়াছিলেন ; উহা ১২৯০ সালের অগ্রহায়ণ (নবেম্বর ১৮৮৩)-সংখ্যা 'নব্যভারতে' মুদ্রিত হয়। পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন।

বিলাত-যাত্রা

দ্বিজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন :—এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার "অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ ঐ বৎসরে এপ্রেল মাসে আমি কৃষি-শিক্ষার্থে ষ্টেট স্কলারশিপ পাইয়া ইংলণ্ডে যাই এবং সেখানে এম-আর-এস-এ-ই, এবং এম-আর-এ-সি, এই দুইটি ডিপ্লোমা পাই।"..."বিলাতে গিয়া ইংরাজিতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করি এবং সেই কবিতাগুলি একত্রিত করিয়া স্যার এড্‌উইন আর্ণল্ডকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি চাহি এবং তৎসঙ্গে কবিতাগুলির পাণ্ডুলিপি পাঠাই। তিনি কবিতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাকে উৎসাহিত করিয়া পত্র লেখেন ও সে কবিতাগুলি তাঁহাকে উৎসর্গ করিবার অনুমতি সাগ্রহে দান করেন। তখন সেই কবিতাগুলিকে *Lyrics of Ind* আখ্যা দিয়া প্রকাশ করি [সেপ্টেম্বর ১৮৮৬]।" "তাহা দুই একখানি বিখ্যাত বিলাতী কাগজে (যেমন *Westminster Review*, *Scotsman* প্রভৃতি) অত্যধিক প্রশংসিত হয়।...বিলাত প্রবাসকালে আমার মাননীয় ভ্রাতা শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত 'পতাকা' নাম্নী পত্রিকায় নিয়মিতরূপ বিলাতের চিঠি লিখি।"

বিবাহ; 'একঘরে'

বিলাত হইতে ফিরিবার পর যে স্বদেশে সামাজিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, এ-কথা যাত্রার প্রাক্কালে কার্ত্তিকেয়চন্দ্র পুত্রকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন; তিনি নিজে কিন্তু পুত্রের উচ্চ শিক্ষার পথে বাধা দেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাতে অবস্থানকালেই পিতা-মাতাকে হারাইয়াছিলেন। ১৮৮৬ সনের ২৩এ ডিসেম্বর স্বদেশে ফিরিয়া তিনি একঘরে হইলেন—হিন্দুসমাজ বিনা প্রায়শ্চিত্তে তাঁহাকে অঙ্কে স্থান দিতে অস্বীকার করিলেন। এই সময়ে কলিকাতার হোমিও-প্যাথি ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীর সহিত হিন্দু মতে তাঁহার বিবাহ হয় (এপ্রিল ১৮৮৭)। কৃষ্ণনগরের যে কয়জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু তাঁহার ভ্রাতাদের সহিত বরানুগমন করিয়াছিলেন, সমাজের শাসানিতে তাঁহারা সহসা ফিরিয়া আসেন।

"চীন গেলে জাত যায় না, গোপনে অখাদ্য খাইলে জাতি যায় না—প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, তখন বিদ্যাশিক্ষার্থে বিলাত গেলে জাতি যাইবে কেন?" সমাজের এই অনুদার-তার প্রতি কটাক্ষ করিয়া ক্ষোভে ও অভিমানে দ্বিজেন্দ্রলাল 'একঘরে' নামে একখানি নক্‌শা প্রচার করিয়াছিলেন (ইং ১৮৮৯)। তিনি লিখিয়াছেন, "বিলাত প্রত্যাগত হইয়া... আমি 'একঘরে' নামক একখানি সামাজিক পত্র ছাপাই ও তাহার জন্ম শত্রু মিত্র প্রায় সকলের কাছেই গালি খাই।" কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী-সম্পাদিত 'ভারতী ও বালক' (ভাদ্র ১২৯৭) সমালোচনা প্রসঙ্গে নক্‌শাখানির প্রশংসাই করিয়াছিলেন। সমালোচনাটি এইরূপ:—

"পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, লেখক এই পুস্তকে হিন্দুসমাজকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন, বইখানি পড়িয়া আমাদের সে ভুল ভাঙিল। ইহাতে হিন্দু সমাজের প্রতি কঠোর প্রয়োগ আছে সত্য কিন্তু তাহা অসঙ্গত অমূলক শ্লেষ বাক্য নহে। বইখানি পড়িলে মনে হয় হিন্দুসমাজের শোচনীয় অবস্থায় লেখক মর্ম্ম-পীড়িত হইয়াই এরূপ লিখিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা গালি দেওয়া নহে, তাঁহার ইচ্ছা সমাজের চক্ষুদান। তবে বইখানিতে বেশ একটু খাঁটি হাস্যরস আছে এবং কলমের জোরও বেশ একটু দেখিতে পাওয়া যায়—ইহার প্রধান কারণ তিনি সত্য কথা বলিয়াছেন।"

সরকারী চাকুরী

বিলাত হইতে ফিরিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল ছোটলাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন তাহাতে ছোটলাট অন্তরে খুশী হইতে পারেন নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল ভাল চাকরি পাইলেন না—ডেপুটিগিরিতে নিযুক্ত হইলেন। তিনি বিলাতে কৃষিবিদ্যার যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাহারও প্রয়োগ করিবার সুবিধা পান নাই। আমরা তাঁহার রাজকার্য্যের ইতিহাস সরকারী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি:—

জমির জরিপ ও রাজস্ব-নিরূপণ কার্য্য শিক্ষার জন্ত মধ্যপ্রদেশে গমন	...	২৫ ডিসেম্বর ১৮৮৬
কলিন্ সাহেবের অধীনে, দপ্তর-রক্ষা-প্রণালী আয়ত্ত করিবার জন্ত মজঃফরপুরে গমন	...	২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৭
(ছুটি: ২২-৯-৮৭ হইতে বিনা-বেতনে ২৫ দিন; ডাক্তারের সার্টিফিকেটে ১৭-১০-৮৭ হইতে ২½ মাস)		
মুঙ্গের ও ভাগলপুরের অন্তর্গত শ্রীনগর ও বনেলি রাজ-এষ্টেটের সেটেলমেণ্ট অফিসার	...	১ জানুয়ারি ১৮৮৮ হইতে ১৯ জানুয়ারি ১৮৯৩
ডেপুটেশনে ...	ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর ...	২৭ অক্টোবর ১৮৮৮
" ...	" (৭ম শ্রেণী) ...	২০ জুলাই ১৮৯১
দিনাজপুর ...	" " ...	২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩
" ...	" (৬ষ্ঠ শ্রেণী, অস্থায়ী) ...	৪ মার্চ ১৮৯৩
বাঁকিপুর-পাটনা	" আবকারী বিভাগের ১ম পরিদর্শক ...	১৮ আগষ্ট ১৮৯৪
ঢাকা ...	" " ...	১৮ অক্টোবর ১৮৯৪
" ...	" (ষষ্ঠ শ্রেণী) ...	১২ মার্চ ১৮৯৫
(প্রিভিলেজ লীভ: ২৬ ৫ ৯৭ হইতে ২ মাস)		
কলিকাতা ...	" বঙ্গীয় ভূমি, রাজস্ব ও কৃষি বিভাগের সহ-ডিরেক্টর (অস্থায়ী)	১৭ মার্চ ১৮৯৮
" ...	" (৫ম শ্রেণী, অস্থায়ী)	৮ ডিসেম্বর ১৮৯৯
" ...	" (৫ম শ্রেণী) ...	৩০ জানুয়ারি ১৯০০
(প্রিভিলেজ লীভ: ২১ ৪ ১৯০০ হইতে ২ মাস ২৯ দিন)		
" ...	" " ...	২০ জুলাই ১৯০০
কলিকাতা ...	" বঙ্গীয় আবকারী কমিশনরের পার্সন্যাল অ্যাসিষ্টাণ্ট (অস্থায়ী)	১৩ অক্টোবর ১৯০০
" ...	" ও পশ্চিম-কেন্দ্রের আবকারী পরিদর্শক ...	১৩ নবেম্বর ১৯০০
" ...	" (৪র্থ শ্রেণী, অস্থায়ী) ...	১ জুলাই ১৯০৪
" ...	" (৪র্থ শ্রেণী) ...	১৫ মার্চ ১৯০৫
(প্রিভিলেজ লীভ: ২০-৪-১৯০৫ হইতে ১ মাস)		
খুলনা ...	" ও পশ্চিম-কেন্দ্রের আবকারী পরিদর্শক ...	৭ নবেম্বর ১৯০৫
(এতদ্ব্যতীত ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য ১১-১৬ জানুয়ারি ১৯০৬)		
" ...	" (৫ম শ্রেণী) ...	১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬
" ...	" (৪র্থ শ্রেণী, অস্থায়ী) ...	২১ মার্চ ১৯০৬
মুর্শিদাবাদ ...	" ...	১৭ এপ্রিল ১৯০৬
" ...	" (৪র্থ শ্রেণী) ...	২৯ এপ্রিল ১৯০৬
কাঁদি-মুর্শিদাবাদ	" অস্থায়ী ভাবে সব-ডিবিসনের ভারপ্রাপ্তি ...	১ মে ১৯০৬
গয়া ...	" ...	২ জুলাই ১৯০৬
জেহানাবাদ ...	" ...	৩০ মে ১৯০৭
গয়া ...	" ...	১৭ জুন ১৯০৭
(ফার্লো: ২৮-৪-১৯০৮ হইতে ১ বৎসর)		
২৪-পরগণা (আলিপুর)	...	২৮ এপ্রিল ১৯০৯*

* History of Services of Officers holding Gazetted Appointments under the Government of Bengal.

সরকারী কার্য্যে দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় কৃতী পুরুষের আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। স্বরচিত জীবনীতে তিনি ইহার কারণ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বিলাত হইতে ফিরিয়াই সেটেলমেণ্ট কার্য্য শিখিবার জন্য বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট আমাকে ভারতের মধ্যপ্রদেশে (Central Provinces) পাঠান। সেখান হইতে ফিরিয়া আমি উক্ত কাজ শিখিতে আবার মোজাফরপুরে প্রেরিত হই। এই দুই কার্য্য ১৮৮৭ সালের মধ্যে শেষ হইলে, ১৮৮৮ সালে আমি শ্রীনগর ও বনেলি এষ্টেটের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার হইয়া ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত ধাপার পরগণায় যাই। সেখান হইতে মুঙ্গের ও তথা হইতে পুর্ণিয়ায় উক্ত কাজ শেষ করিয়া ১৮৯০ সালে আমি বর্দ্ধমান ষ্টেটে সুজামুটা পরগণায় সেটেলমেণ্ট অফিসর নিযুক্ত হই। উক্ত কাজ তিন বৎসর কাল করি। উক্ত সেটেল্‌মেণ্ট সংক্রান্ত একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে বঙ্গদেশে একটি উপকার সাধিত হয়। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সেটেল্‌মেণ্ট অফিসরেরা জরীপে জমী বেশী পাইলেই খাজনা বেশী ধার্য্য করিয়া দিতেন। আমি সুজামুটা সেটেল্‌মেণ্টে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি যে, এরূপ খাজনা বৃদ্ধি করা অন্যায় ও আইন-বিরুদ্ধ। প্রজার সহিত যখন পূর্ব্বে জমী বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়, তখন মাপিয়া দেওয়া হয় না, আন্দাজ করিয়া সেই জমীর পরিমাণ হস্তবুধে লেখা হয়। এমন কি এরূপ সম্ভব যে, সেই জমীই এখন জরীপে তাহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীত হইতেছে মাত্র। তাহার জন্য তাহার নিকট বেশী খাজনা চাওয়া অন্যায়। অতএব রাজা যদি বেশী জমীর জন্য বেশী খাজনা দাবী করেন, ত তাঁহার দেখাইতে হইবে যে, প্রজা কোন্ বেশী জমীটুকু অধিকার করিয়াছে। আরও ডেনেজ খাল বন্ধ হওয়ায় জমীর বাৎসরিক ফসল কম হইয়া যাওয়ার জন্য আমি প্রজাদিগের খাজনা কমাইয়া দিই। ঐ রায় হইতে জজের নিকট আপীল হয় এবং তাহাতে জজ সাহেব উক্ত রায় উল্টাইয়া প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই সময়ে স্যর চার্লস এলিয়ট বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন। তিনি উক্তরূপ বিভ্রাট দেখিয়া উক্ত বিষয় তদন্ত করিয়া স্বয়ং মেদিনীপুর আসেন ও কাগজপত্র দেখিয়া আমাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করেন। আমি আমার মত সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশীয় সেটেল্‌মেণ্ট আইন বিষয়ে তাঁহার অনভিজ্ঞতা বুঝাইয়া দিই। ছোট লাট ক্রুদ্ধ হইয়া আমার পূর্ব্ব ইতিহাস জানিতে চাহেন ও তাহা অবগত হইয়া কলিকাতায় গিয়া ভবিষ্যতে সেটেল্‌মেণ্ট অফিসরদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে এক দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং তাহাই আইনে ঢুকাইয়া দেন। ইত্যবসরে জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হয় ; হাইকোর্ট জজের রায় উল্টাইয়া দিয়া আমার মতের সহিত ঐক্য প্রদর্শন করেন এবং সেই হাইকোর্ট "রুলিং" অনুসারে এখন সমস্ত বঙ্গদেশে সেটেলমেণ্ট কার্য্য চলিতেছে। এখন জরীপে জমী বেশী পাইলেই প্রজার অসম্মতিতে আর খাজনা বৃদ্ধি হয় না। ইত্যবসরে হাইকোর্টে আর একটি আপীলে স্যর চার্লসের উক্ত মন্তব্যও নির্দ্দয়ভাবে সমালোচিত হয়। তাহাতে তিনি সেগুলি সেটেল্‌মেণ্ট ম্যানুয়াল হইতে উঠাইয়া লইতে বাধ্য হন।



কবি-জায়া

উপরে সম্ভবতঃ আমার একটু অহমিকা প্রকাশ হইল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ কথাটি প্রকাশ করিবার প্রবল প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলাম না। আমি সত্যই ইহা শ্লাঘার বিষয় বিবেচনা করি যে, আমি এই ক্ষুদ্র ক্ষমতাতেই উক্ত কার্য্যে নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিলেও সমস্ত বঙ্গদেশব্যাপী একটি উপকার সাধিত করিয়াছি—নিরীহ প্রজাদিগকে অন্যায় করবৃদ্ধি হইতে বাঁচাইয়াছি। ভবিষ্যতে এরূপ কার্য্য আর যে করিতে পারিব, তাহার আশা নাই।

ঐ সেটেল্‌মেণ্টের পরে আমি সেটেল্‌মেণ্ট কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাই ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া দিনাজপুরে প্রেরিত হই। এবং ১৮৯৪ সালে তথা হইতে বঙ্গদেশে আবকারি বিভাগের প্রথম পরিদর্শক (Inspector) নিযুক্ত হইয়া আসি। সেই কার্য্য অদ্যাবধি করিতেছি।" ('জন্মভূমি,' কার্ত্তিক ১৩০৪)

পরবর্ত্তী কালে স্বদেশী-আন্দোলনে যোগ দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল

গবর্ণমেন্টের অধিকতর বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। দেবকুমারকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ :—

"ক্রমাগত transfer (বদলি) আমাকে যথার্থই যেন অস্থির ক'রে তুলেছে। এত বদলি কচ্ছে কেন জান? আমার বিশ্বাস—স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান, আর ঐ প্রতাপসিংহ নাটকই তার মূল। কিন্তু, কি বুদ্ধি! এমনি একটু হয়রান কর্লেই বুঝি আমি অমনি আমার সব মত ও বিশ্বাসকে বর্জ্জন কর্ব্ব?"

স্ত্রী-বিয়োগ

সুরবালাকে লাভ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের দিনগুলি সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটিতেছিল। এই ভাবে ষোলটি বৎসর কাটিবার পর বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের স্তায় অকস্মাৎ একদিন তাঁহার পত্নী একটি মৃত কন্তা প্রসব করিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্ধান করিলেন (২৯ নবেম্বর ১৯০৩)। কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীকে হারাইয়া, তদুপরি মাতৃহারা শিশুসন্তানদের লইয়া, দ্বিজেন্দ্রলালের যে অবস্থা হইয়াছিল, "হতভাগ্য" কবিতায় তাহার চিত্র আছে। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

একখানি তার তরী ছিল বিজন শূন্ত ঘাটে বাঁধা ;—
একদিন হঠাৎ ডুবে গেল ঝড়ে ;
একখানি তার কুঁড়ে ছিল নদীর ধারে ; পুড়ে গেল
একদিন হঠাৎ আগুন লেগে খড়ে।

একটি ছেলে একটি মেয়ে,—একটি ডাইনে একটি বাঁয়ে,
হাতে ধ'রে ঘুরে বেড়ায় পাড়ায় ;
সারা বছর ঘুরে বেড়ায় ; জানে না সে হতভাগা
তাদের নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

... ...

ছেলে মেয়ের ছিল না মা ; চ'লে গেছে আটটি বছর,
দেশান্তরে—কাল-স্রোতের টানে ;
যে দেশেতে মানুষ গেলে আর সে ফিরে আসে না-ক,
যে দেশ কোথায়—কেহই নাহি জানে।

ভালবাসৃত ছেলে মেয়ের—যেমন সব মা ভালবাসে—
প্রবল, গভীর, বিরাট্‌, ঘন স্নেহে ;
এখন তাদের রেখে গেছে তাদের বৃদ্ধ বাপের কাছে,
এখন তাদের দেখেও না-ক চেয়ে!

তবে কি না, যাবার সময় রেখে গেছে স্নেহটুকু
ছেলে মেয়ের বাপের কাছে জমা ;
হাতে সঁপে দিয়ে গেছে সর্ব্বস্বধন পুত্রটিরে,
দিয়ে গেছে কন্তা প্রিয়তমা।

এখন তাদের বাপই আছে, সে-ই বাবা, সে-ই মা,—
সে-ই তাদের
বাপের চিন্তায়, মায়ের যত্নে রাখে ;—
দিনের বেলায় মজুর খেটে রোজগার করে আনে কড়ি ;
রাতের বেলায় জড়িয়ে শুয়ে থাকে। ('আলেখ্য')

পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও দ্বিজেন্দ্রলাল দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি বন্ধু দেবকুমারকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন :—"আমি আবার বিবাহ করিব কি? এ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, আমার মানস-মন্দিরে এখনও আমি সেই অনুপম স্বর্ণ-প্রতিমার ধ্যান-ধারণা, পূজা ও আরতি করিয়া থাকি। স্থুল-দৃষ্টি এই সব লোক বাহির হইতে তাহার কি জানে—কিইবা বোঝে!"

স্ত্রীবিয়োগের পাঁচ বৎসর পরে দ্বিজেন্দ্রলাল ২-নং নন্দকুমার চৌধুরীর লেনে একখানি সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি পত্নীর নামানুযায়ী এই অট্টালিকার নামকরণ করেন—'সুরধাম'। "তাঁরই যত্ন-সঞ্চিত অর্থের পুণ্যমন্দিরে, তাঁরই স্মৃতির আশ্রয় ছায়ায় শূন্ত জীবন কাটাইয়া দিবার" অভিপ্রায়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ১৩১৬ সালের ১লা বৈশাখ (১৯০৯, ১৪ এপ্রিল) গৃহপ্রবেশ করেন ; তাঁহার বাকী দিনগুলি প্রধানতঃ সুরধামেই কাটিয়াছিল।

পূর্ণিমা-মিলন

দ্বিজেন্দ্রলাল বন্ধুমহলে সদালাপী ছিলেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে, বিশেষ করিয়া পত্নীবিয়োগের পর হইতে, তাঁহার গৃহে বন্ধুবান্ধব ও সাহিত্যিকের সমাগম হইত। তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্ত তিনি একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করেন। দেবকুমারকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে প্রকাশ :—

"এক নূতন খেয়াল মাথায় আসিয়াছে।...আমি (অর্থাৎ আমরা) ইচ্ছা করিয়াছি, প্রতি পূর্ণিমায় দেশ-শুদ্ধ সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগীদের একত্র করিয়া, এক-এক স্থানে এক-এক বার প্রতি 'পূর্ণিমা' উপলক্ষে 'মিলন' করা যাইবে। নাম হইবে, "পূর্ণিমা-মিলন"। ইহাতে কলিকাতার সমুদায় সাহিত্যিকদের মধ্যে অবারিতভাবে মেলা-মেশা, ভাব-বিনিময়, প্রীতি-বর্দ্ধন ও পরিচয়াদি হইবে ; আর তাহার সঙ্গে সেখানে (যেখানে যখন হইবে) গৃহ-স্বামীর প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যানুসারে, অল্প কিছু জলযোগ,—এই ধর যেমন চা, সরবৎ প্রভৃতি ও চুরুট তামাকের (সিগারেটেরও!!) ব্যবস্থা থাকিবে। আগামী দোল-পূর্ণিমার সন্ধ্যায় প্রথমে আমার গৃহে এই মিলন। তারপর প্রতি পূর্ণিমায় (যদি কেহ চান ত তাঁর বাড়িতে নইলে আমারই এখানে) মাতৃভাষার সেবকগণ—আমাদের জাতভাইরা—একত্র হইবেন।"

১৩১১ সালে দোল-পূর্ণিমার দিন (ইং ১৯০৫) ৫ নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে দ্বিজেন্দ্রলালের আবাসে 'পূর্ণিমা-মিলনে'র প্রথম অধিবেশন হয়। এই দিন রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন এবং স্বরচিত "সে যে আমার জননী" গানটি গাহিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন। 'পূর্ণিমা-মিলন' অনেক দিন চলিয়াছিল।

সঙ্গীত, আবৃত্তি, হাসির গান, রসরচনা পাঠ ইহার একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল।

শেষ-জীবন ; মৃত্যু

পত্নী-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায়ে যবনিকাপাত হইয়াছিল ; ইহার পর তিনি যে কয় বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, সে নামেই জীবনধারণ। বন্ধু দেবকুমারকে তিনি লিখিতেছেন :—

"মাঝে মাঝে মনে হয় যে, আমার জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এ জীবন কেবল ধারণ করা মাত্র। পুত্র-কন্যা যদি না জন্মিত ত হয়ত এক দিন সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতাম। নিজের ভোগ-লালসা বড় বেশী নাই —যা আছে তা বোধ হয় বিনা বেশী আয়াসে ত্যাগ কর্ত্তে পারি। তবে সাহিত্যিক যশ—এখনও আমার কাছে অতি প্রিয়, আর সর্ব্বাপেক্ষা মণ্টু-মায়ার মায়াই ত্যাগ করা শক্ত। সে টান বিষম টান। তাদের জন্যই আজো এই দাস্ত কর্চ্ছি।—গয়া, ২২ জুলাই ১৯০৬।

"আমি যতই ভেবে দেখছি, বুঝতে পাচ্ছি যে, 'এ জীবনটা কিছু না।'…এই অসার গণ্ডময় চাকরি। কোন অর্থ নেই। ঠিক 'সোনার তরী'। জীবন-পথে যতই অগ্রসর হচ্ছি, চারি দিক থেকে শুধুই ঔদাস্য আর অবসাদ আমায় যেন ঘিরে ফেল্‌ছে। 'অসার সংসার' আগে বিচারে ও অনুমানে বুঝতাম,—এখন প্রতি পদে 'হাড়ে হাড়েই' বুঝছি। আপন মনের দিকে চেয়ে দেখি, সেখানে এ সংসারের উপরে অবিমিশ্র বিতৃষ্ণা ছাড়া আর তো কিছুই খুঁজে পাই না। আসক্তি বা ভোগলিপ্সা তিলার্দ্ধ নাই। তবে, কেন—কিসের জন্য এই পুঞ্জীভূত বিড়ম্বনা নিরন্তর ভোগ ক'রে মরি?" গয়া, ১৩ জানুয়ারি ১৯০৭।

এই ঔদাস্য ও অবসাদ দূর করিবার জন্য তিনি পরিমিত সুরাপানে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন ; তিনি বলিতেন, "তোমাদের স্ত্রী আছেন, সংসারে অন্যান্য নানারূপ আশ্রয়-অবলম্বন আছে ; কিন্তু আমার তা'র কোনটাই নাই, কিছুই নাই। এইজন্য, ভয়ানক ঔদাস্য ও অবসাদ আসিয়া যখন আমার দেহ-মনকে অভিভূত করিয়া, জড়াইয়া ধরে তখন—In order to shake off that lethargy, dullness and depression আমার একটু একটু পান করা দরকার বোধ করি। ওটা যে আমার পক্ষে শুধু একটা support or strength (সহায় ও বল) তা নয়,—Necessityও (প্রয়োজনও) বটে।"

গয়া হইতে ফিরিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় চারি বৎসর কলিকাতায় অবস্থান করেন। বঙ্গভঙ্গ রহিত হইয়া বিহার-উড়িষ্যা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে গঠিত হইবার প্রাক্‌কালে তিনি ১৯১২, ২৯ জানুয়ারি বাঁকুড়ায় প্রেরিত হন। তথায় তিন মাস কার্য্য করিবার পর মুঙ্গেরে বদলি হন। মুঙ্গের-যাত্রাকালে কলিকাতায় আসিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল সন্ন্যাস রোগে শয্যাগ্রহণ করেন। পীড়ার উপশমের কোন লক্ষণ না দেখিয়া তিনি এক বৎসরের ছুটি লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু শরীর উত্তরোত্তর অপটু হওয়ায় এবং সরকারী চাকুরীতে উন্নতির আশা না থাকায়, তিনি ১৯১৩ সনের ২২এ মার্চ অবসর গ্রহণ করেন।

অবসরগ্রহণের অল্প দিন পূর্ব্ব হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল একখানি উচ্চাঙ্গের সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশের উদ্যোগ করিতেছিলেন। পত্রের নামকরণ হয়—'ভারতবর্ষ' ; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ইহার প্রকাশ-ভার গ্রহণ করেন। প্রথম সংখ্যার (আষাঢ় ১৩২০) জন্য তিনি প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিয়া, "সূচনা" অংশও লিখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু উহা প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই তাঁহার ডাক পড়িয়াছিল। ১৯১৩, ১৭ই মে (৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০) অপরাহ্নে 'সুরধামে' যখন তিনি বাণী-সেবায় নিরত, সেই সময় অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পায় ; বিলুপ্ত সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসে নাই।

"রোগাক্রান্ত হইবার মাত্র ৪॥ ঘণ্টা পরেই শুক্ল-দ্বাদশীর চন্দ্রকরোজ্জ্বল রাত্রি ৯॥ ঘটিকার সময় 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে এসে' সত্যই যেন দ্বিজেন্দ্রকে 'মধুর তানে কাতরপ্রাণে' ডাকিল, 'আয় চ'লে আয়, ওরে—আয় চ'লে আয় আমার পাশে' ;—তিনি সেই ঈপ্সিত আহ্বানে 'মহানন্দে'র স্নেহ-ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন ; তিনি গাহিয়াছিলেন 'এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভাল, সে মরণ স্বরগ সমান' তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইল। তিনি কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার লোকান্তরিতা গৃহলক্ষ্মীকে সকাতরে আহ্বান করিয়াছিলেন 'যখন আমার সাঙ্গ হবে খেলা, তুমি আমার এসো,'—কে বলিতে পারে—কবি যখন তাঁহার 'হেথায় যাহা কিছু প্রেয়' তাহা ছাড়িয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহার সেই মহাযাত্রার অজানা আঁধার পথ আলো করিতে সুরবালা 'সুরধামে' আসেন নাই! বর্ষদ্বয় পূর্ব্ব হইতে কবি করুণ সুরে, আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে গাহিতেছিলেন—

পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন মা শায়িত অন্তিম শয়নে ;
বরিষ শ্রবণে, তব জলকলরব, বরিষ সুপ্তি মম নয়নে।
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে, বরিষ অমৃত মম অঙ্গে
মা—ভাগীরথি, জাহ্নবি সুরধুনি, কল কল্লোলিনি গঙ্গে॥"*

সাহিত্য-সাধনা

দ্বিজেন্দ্রলাল মাতৃভাষার প্রতি আশৈশব অনুরক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার প্রাথমিক রচনাগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"বিলাত যাইবার পূর্ব্বে 'আর্য্যদর্শন,' 'নব্যভারত' ইত্যাদিতে লিখিতাম।…বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে আমার

* নবকৃষ্ণ ঘোষ : 'দ্বিজেন্দ্রলাল,' পৃ. ৩৬৩।

বিশেষ আসক্তি ছিল। আমার পিতা একজন সুবিখ্যাত গায়ক ছিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি যখন ভৈঁরো, আশোয়ারি ইত্যাদির সুর ভাঁজিতেন, আমি অন্তরালে থাকিয়া শুনিতাম। শৈশব হইতেই আমি গান ও কবিতা রচনা করিতাম। 'আর্য্যগাথা'র [১ম ভাগ, ইং ১৮৮২] প্রকাশিত নক্ষত্রবিষয়ক গীতটি আমি দ্বাদশ বর্ষে রচনা করি।...১২ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর পর্য্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে 'আর্য্যগাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোন কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল "দেবঘরে সন্ধ্যা" নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা 'নব্যভারতে' [ইং ১৮৮৩] প্রকাশিত হয়।"

১৮৮২ সনে ১ম ভাগ 'আর্য্যগাথা' প্রকাশের ১১ বৎসর পরে ১৮৯৩ সনে যখন উহার ২য় ভাগ প্রচারিত হয়, তখন দ্বিজেন্দ্রলালের "জীবনে যুগান্তর হইয়াছে"...তখন তিনি "আর সেই পাঠাধ্যায়ী, অমুঢ়, জগতের দুরন্ত-পরিদর্শক বিস্মিত বালক নাই।

আজ যেন রে প্রাণের মত কাহারে বেসেছি ভাল ;
উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ নূতন আলো।"

ইহার পরবর্ত্তী নয় বৎসর তাঁহার দাম্পত্য-জীবন পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছে। জীবনের এই সুখকর অংশেই তাঁহার অধিকাংশ হাসির গান ও ব্যঙ্গকবিতা, চারিখানি প্রহসন ('কল্কি-অবতার', 'বিরহ','ত্র্যহস্পর্শ', 'প্রায়শ্চিত্ত'), ব্যঙ্গকাব্য— 'আষাঢ়ে', গীতিকাব্য—'মন্দ্র', ও তিনখানি নাট্যকাব্য— 'পাষাণী', 'সীতা' ও 'তারাবাই' রচিত হয়। 'তারাবাই' প্রকাশের দুই মাস পরে পত্নীবিয়োগে যেমন তাঁহার জীবনে সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হয়, অন্য দিকে তেমনি তাঁহার নাট্যগ্রন্থ রচনার ধারাও ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

নাট্যকার হিসাবে দ্বিজেন্দ্রলাল দেশবাসীর নিকট সুপরিচিত। কিন্তু কি কি ব্যাপার তাঁহার নাটক লিখিবার প্রবৃত্তির সহায়তা করিয়াছিল তাহা জানিতে মনে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। এ বিষয়ে তিনি "আমার নাট্য-জীবনের আরম্ভ" প্রবন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য :—

"বাল্যাবধি কবিতা ও নাটক পাঠে আমার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। এত অধিক ছিল যে বিদ্যাভ্যাসকালে বাইরণের Manfred ও Childe Haroldএর দুই Canto এবং মেঘদূত ও উত্তরচরিতের কাব্যাংশ আমি মুখস্থ করিয়াছিলাম। বিলাত গিয়া ক্রমাগতঃ Shelley পড়িতাম এবং তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্রমাগত Wordsworth ও Shakespeare বার বার পড়িতাম ; ও শেষোক্ত কবির নাটকের যে যে অংশ কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ বোধ হইত, মুখস্থ করিতাম।

বিলাতে যাইবার পূর্ব্বে আমি 'হেমলতা' নাটক ও 'নীল-দর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক সৌখীন অভিনেতৃদল কর্তৃক অভিনীত 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একখানি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addisonএর *Cato* এবং Shakespeareএর *Julius Caesar*এর আংশিক অভিনয় দেখি। সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া উঠে।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি কলিকাতার রঙ্গমঞ্চসমূহে অভিনয় দেখি। এবং সেই সময়েই বঙ্গভাষায় লিখিত নাটকগুলির সহিত আমার পরিচয় হয়।...

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বাংলা ভাষায় হাস্যরসাত্মক কবিতার অভাব পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে Ingoldsby Legendsএর অনুকরণে কতকগুলি হাস্যরসাত্মক বাংলা কবিতা লিখিয়া, 'আষাঢ়ে' নামে প্রকাশ করি। সেই সময়ে আমি ইংরাজি গান খুব গাইতাম। ইংরাজি গান প্রায় বাঙালী শ্রোতারই ভাল লাগিত না। তখন ইংরাজি গান গাওয়া ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গালায় গান রচনা করিয়া গাহিতে আরম্ভ করি। বিবাহান্তে অনেকগুলি প্রেমের গান রচনা করিয়া 'আর্য্যগাথা' দ্বিতীয় ভাগ নাম দিয়া ছাপাই এবং কতকগুলি হাসির গানও রচনা করি। এই হাসির গানগুলি অবিলম্বে অনেকের প্রিয় হয় এবং আমি কার্য্যোপলক্ষে কোন নগরে যাইলেই ঐ সকল গান আমায় স্বয়ং গাহিয়া শুনাইতে হইত। সেগুলি একত্রে গ্রন্থাকারে বহুদিন পরে প্রকাশিত হয়।...

প্রথমতঃ প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে 'কল্কি-অবতার' একখানি প্রহসন গদ্যে পদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পূর্ব্বরচিত কতকগুলি হাসির গান একত্রে গাঁথিয়া 'বিরহ' নাটক রচনা করি। এবং ক্রমে সে নাটক ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। তৎপরে উক্তরূপ 'ত্র্যহস্পর্শ' রচনা করি এবং উহাও ষ্টারে অভিনীত হয়। পরে 'প্রায়শ্চিত্ত' রচনা করি এবং সেখানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে আমার গম্ভীর রচনাও চলিতেছিল। মৎপ্রণীত 'সীতা' নাট্য-কাব্য 'নব-প্রভা'য় প্রকাশিত হয়। পরে 'পাষাণী' নাটক প্রকাশ করি। তৎপরে আমি 'তারাবাই' নাটক প্রকাশ করি।

যে কারণে আমি প্রহসন লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম তাহার অনুরূপ কারণে আমি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বাঙলা ভাষার নাট্য-সাহিত্যে স্বাভাবিকতা ও আখ্যানবস্তুগঠনে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিতাম, কিন্তু তাহাতে কবিত্বের অভাব বোধ হইত। আমার কাব্যশক্তি (যাহা কিছু ছিল) আমি আমার নাটকে প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমে Shakespeareএর অনুকরণে Blank Verseএ

নাটক লিখিতে আরম্ভ করি। 'তারাবাই' প্রকাশিত হইবার পরে স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেনকে তাঁহার অনুরোধে এক কাপি পাঠাই। তিনি পড়িয়া এই মত প্রকাশ করেন যে এ নূতন ধরণের অমিত্রাক্ষর—মাইকেলের ছন্দোমাধুরী ইহাতে নাই—এ অমিত্রাক্ষর চলিবে না। সেই সঙ্গে স্বর্গীয় মাইকেল মধুসূদনের দৈববাণী মনে হইল—যে অমিত্রাক্ষরে নাটক এখন চলিতে পারে না। দীর্ঘ বক্তৃতা অমিত্রাক্ষরে চলে। কিন্তু দ্রুত কথোপকথনে কথা ত গদ্যের মত হইতেই হবে। Shakespeareএর অমিত্রাক্ষর Miltonএর অমিত্রাক্ষর হইতে পৃথক্। Of man's disobedience ইত্যাদির একটা ঝঙ্কার আছে। কিন্তু To be or not to be that is the question—ইহা ত গদ্য বলিলেই হয়। তবে কবিতা বলিয়া ইহা চালান কেন? গদ্যে লিখিলে কি ক্ষতি হইত। কিন্তু তৎপরেই Who would bear the whips and scorns of time কিম্বা For in that sleep of death what dreams may come ইহা দস্তুর মত কবিতা! দেখিলাম যে Shakespeareএ খানিক গদ্য খানিক পদ্য তথাপি দুইটি খাপ খাইতেছে। কারণ ইংরাজি ভাষায় সেরূপ অবস্থা আসিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলাতে "তুমি যদি আস সখি, আমি সেথা যাবো" ইহার পরে "নবীন নীরদ শ্যাম নিকুঞ্জবিহারী" এরূপ রচনা অসহ্য বিসদৃশ বোধ হইবে। কিন্তু গদ্যে একত্রে উভয়ই চলে। গদ্যের এখন সে অবস্থা আসিয়াছে।

Carlyleএর মতে সামান্য হইতে গভীরতম এমন কোন ভাব নাই যাহা পদ্য অপেক্ষা গদ্যে সুন্দরতররূপ প্রকাশ করা না যায়। পদ্যের ঝঙ্কার গদ্যে দেওয়া যায় কিন্তু গদ্যের স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছগতি পদ্যে নাই।

বঙ্কিমবাবুর গদ্য অনেক স্থলে ত পদ্য। Schiller, Lessing, Ibres, Moliere ইত্যাদি মহা নাট্যকারগণের বহু মহা-নাটক গদ্যে লেখা আছে, তাহাতে ত তাঁহাদের মহিমা কমে নাই। Schillerএর গদ্যের ভাষা ও রূপক অনুপ্রাসে পদ্যের চৌদ্দপুরুষ।

তদুপরি নাটক অভিনয় করিবার জিনিষ। অভিনয়-ঘটনাগুলি যত প্রত্যক্ষবৎ হয় ততই ভাল। সেইজন্য উক্তিগুলি যত স্বাভাবিক হয় (ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অবশ্য) ততই শ্রেয়। লোকে কথাবার্ত্তা পদ্যে করে না, গদ্যে করে। অতএব পদ্যে নাটক রচনা করিলে উক্তিগুলি অস্বাভাবিক ঠেকিবেই।

এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি তখন হইতে নাটকগুলি গদ্যে রচনা করিতে মনস্থ করিলাম। সেইজন্য আমি আমার তারাবাইয়ের পরবর্ত্তী নাটকগুলি (রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, মেবারপতন ও সাজাহান) যথাক্রমে গদ্যেই রচনা করি। কিন্তু কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তি থাকায় আমি গদ্যের ভাষাকে কবিতার আসনে বসাইবার প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। অথচ যেখানে সংস্কৃত শব্দ অপেক্ষা প্রচলিত শব্দ বেশী জোরের সহিত ভাব প্রকাশ করে বলিয়া বোধ হইয়াছে সেখানে প্রচলিত শব্দই ব্যবহার করিয়াছি।

যখন উক্ত গদ্য নাটকগুলি রচনা করিতেছিলাম তখন একখানি অপেরা (সোরাব রুস্তাম) পদ্যে গদ্যে রচনা করি। কারণ 'অপেরা'র কথাবার্ত্তা স্বাভাবিক হওয়ার চেয়ে শ্রুতিমধুর করাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়াছিলাম। সে অপেরাখানি অনেকস্থলে Shelleyর অনুকরণে প্রণয়ন করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ তাহা কবিতায় আমার অত্যধিক আসক্তির ফল। মাঝে মাঝে কবিতায় দুই একখানা নাটক লিখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারি নাই।" ('নাট্য-মন্দির,' শ্রাবণ ১৩১৭)

গ্রন্থাবলী: জীবিতকালে বা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত। পুস্তকে প্রকাশকাল নির্দ্দেশের অভাব প্রশ্নচিহ্ন দ্বারা সূচিত হইয়াছে।

১। আর্য্যগাথা (কবিতা ও গান):

১ম ভাগ। ইং ১৮৮২ (৫ মার্চ)। পৃ. ৯১।

২য় ভাগ। ইং ১৮৯৩ (২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪)। পৃ. ৬০ + ৪৬।

২। *The Lyrics of Ind.* London, Sep. 1886. pp. 79.

৩। একঘরে (নকৃশা)। ? (২ জানুয়ারি ১৮৮৯)। পৃ. ৩৫

৪। সমাজবিভ্রাট ও কল্কি-অবতার (সামাজিক প্রহসন)। ১৩০২ সাল (৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫)। পৃ. ১০৩।

৫। বিরহ (নাটিকা)। ১৩০৪ সাল (ইং ১৮৯৭)। পৃ. ১০৯

৬। আষাঢ়ে। বা গুটিকতক রহস্য গল্প (ব্যঙ্গকাব্য)। ১৩০৫ সাল (২২ ডিসেম্বর ১৮৯৯)। পৃ. ১৪৮

৭। হাসির গান। ১৩০৭ সাল (১৮ জুলাই ১৯০০)। পৃ. ৫১।

৮। পাষাণী (গীতি-নাটিকা)। আশ্বিন ১৩০৭ (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯০০)। পৃ. ১২২।

৯। ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী পরিবার (প্রহসন)। ১৩০৭ সাল (২৩ ডিসেম্বর ১৯০০)। পৃ: ৯৬।

১০। প্রায়শ্চিত্ত (নাটক)। ৫ মাঘ ১৩০৮ (১৯ জানুয়ারি ১৯০২)। পৃ. ৯৪।

ক্লাসিক থিয়েটারে 'বহুৎ আচ্ছা' নামে প্রথমে অভিনীত।

১১। মন্দ্র (কাব্য)। ১৩০৯ সাল (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০২)। পৃ. ১০৪।

১২। তারাবাই (ঐতিহাসিক নাটক)। ১৩১০ সাল (২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৩)। পৃ. ১৫৬।

"এই নাটকের উপাদান টড-প্রণীত রাজস্থান হইতে গৃহীত।"

১৩। প্রতাপসিংহ (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (৮মে ১৯০৫)। পৃ. ১৬২।

১৩১১ সালের 'নবপ্রভা'য় প্রথম প্রকাশিত।

১৪। *The Crops of Bengal.* Cal. 1906 (23 March), pp. 23+184.

১৫। দুর্গাদাস (ঐতিহাসিক নাটক)। আশ্বিন ১৩১৩ (৫ নবেম্বর ১৯০৬)। পৃ. ১৯৪।

১৬। আলেখ্য (কাব্য)। ১৩১৪ সাল (৮ জুলাই ১৯০৭)। পৃ. ১১২।

১৭। *Lessons in English*:
Pt. i. (20 Dec. 1907), pp. 7+56.
Pt. ii. (2 May 1908), pp. 1+68.
Pt. iii. (20 Jany. 1909), pp. 1+80.

১৮। নুরজাহান (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (১ মার্চ ১৯০৮)। পৃ. ১৭৬।

১৯। সোরাব রুস্তাম (নাট্যরঙ্গ)। ১৩১৫ সাল (২৩ অক্টোবর ১৯০৮)। পৃ. ৯২।

"এই নাটকের গল্পটি আমি ফার্ডউসির 'শাহনামা' নামক গ্রন্থ হইতে লইয়াছি।"

২০। সীতা (নাট্য-কাব্য)। ? (৬ নবেম্বর ১৯০৮)। পৃ. ১২৮।

ফাল্গুন ১৩০৭—পৌষ ১৩০৯ সালের 'নবপ্রভা'য় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত।

২১। মেবার পতন (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (২৭ ডিসেম্বর ১৯০৮)। পৃ. ১৭১।

২২। সাজাহান (ঐতিহাসিক নাটক)। ? (৮ আগষ্ট ১৯০৯)। পৃ. ১৬১।

২৩। চন্দ্রগুপ্ত (নাটক)। ? (২৪ আগষ্ট ১৯১১)। পৃ. ১৬৭।

২৪। পুনর্জন্ম (প্রহসন)। ? (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯১১)। পৃ. ৩৭।

২৫। পরপারে (সামাজিক নাটক)। ? (২৮ আগষ্ট ১৯১২)। পৃ. ১৮১।

২৬। ত্রিবেণী (খণ্ডকাব্য)। ২৫ শ্রাবণ ১৩১৯ (৫ সেপ্টেম্বর ১৯১২)। পৃ. ৮৫+২

২৭। আনন্দ-বিদায় (প্যারডি)। ? (১৬ নবেম্বর ১৯১২)। পৃ. ৬৪।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

২৮। ভীষ্ম (নাটক)। ? (৮ জানুয়ারি ১৯১৪)। পৃ. ২৩৬।

২৯। কালিদাস ও ভবভূতি (সমালোচনা)। ১৩২২ সাল (১০ আগষ্ট ১৯১৫)। পৃ. ১৬৯।

ইহা প্রথমে ১৩১৭-১৮ সালের 'সাহিত্যে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়।

৩০। গান। ১ আশ্বিন ১৩২২ (২ অক্টোবর ১৯১৫)। পৃ. ১৯৯।

অন্যূন ২৩০টি গানের সমষ্টি।

৩১। সিংহল বিজয় (ঐতিহাসিক নাটক)। ২৩ আশ্বিন ১৩২২ (১৩ অক্টোবর ১৯১৫)। পৃ. ২৩৬।

৩২। বঙ্গনারী (সামাজিক নাটক)। ১৩২২ সাল (১০ এপ্রিল ১৯১৬)। পৃ. ১৪১।

"স্বর্গীয় পিতৃদেব এই নাটকখানি তাঁহার মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রণয়ন করেন।...তিনি ইহার এক অংশ লইয়া 'পরপারে' রচনা করেন।"

দ্বিজেন্দ্র-গ্রন্থাবলী। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ:

১ম ভাগ (কবিতা ও গান)। আশ্বিন ১৩৫৩ (ইং ১৯৪৬)। পৃ. ৭৩৬।

সূচী: আর্য্যগাথা, ১ম-২য় ভাগ; আষাঢ়ে; হাসির গান; মন্দ্র; আলেখ্য; ত্রিবেণী; গান; *The Lyrics of Ind.*

গদ্য-রচনাবলী: সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলালের বহু গদ্য-রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এগুলি সংগৃহীত ও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই শ্রেণীর রচনার একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা আমি ১৩৫৪ সালের ১ম-২য় সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশ করিয়াছি।

পত্রাবলী: এম. এ. পরীক্ষাদানের প্রাক্কালে রাজনারায়ণ বসু ও তৎপুত্র যোগীন্দ্রনাথ বসুকে লিখিত দ্বিজেন্দ্রনাথের দুইখানি পত্র আমি ১৩৫১ সালের ৩য়-৪র্থ সংখ্যা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশ করিয়াছি। দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত 'দ্বিজেন্দ্রলালে'ও অনেকগুলি পত্র বা পত্রাংশ স্থান পাইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল ও বাংলা-সাহিত্য

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানতঃ নাট্যকার এবং হাসির গান ও স্বদেশী গানের রচয়িতা হিসাবে খ্যাত। তিনি জীবিতকালে স্বীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কবি-খ্যাতির যে সৌধশিখরে আরূঢ় ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর নানা কারণে সে প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে তিনি বিচ্যুত হইয়াছিলেন, প্রধান কারণ রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র-প্রতিভার দীপ্তি অত্যধিক উজ্জ্বল ছিল বলিয়া অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ জ্যোতিষ্কেরা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল বিরোধের ফলও দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ, দ্বিজেন্দ্রলালের অপ্রিয় সত্যভাষণের সর্ব্বনাশা অভ্যাস। তিনি ঋজু মেরুদণ্ডের লোক ছিলেন, অত্যধিক নমনীয়তা বা ন্যাকামি বরদাস্ত করিতে পারিতেন না; কঠোর হস্তে ইহার বিরুদ্ধে তিনি কশাঘাত

করিয়াছেন, ফলে তাঁহার শত্রুবৃদ্ধি হইয়াছে। যে কারণেই হউক, 'আষাঢ়ে,' 'মন্দ্র,' 'আলেখ্য' ও 'হাসির গানে'র কবি যে প্রায় অপরিচিত থাকিয়াই বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন, ইহা বাংলাদেশ ও সাহিত্যের পক্ষে দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই।

দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতায় ও গানে ছন্দের, ভঙ্গির ও সুরের বিবিধ বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যের অনেক বিভাগে তিনি প্রথম পথপ্রদর্শকের গৌরবও দাবী করিতে পারেন। নাটকের গদ্য কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁহার নিজের গবেষণা আছে, এবং এই গবেষণার ফলে তিনি নিজস্ব এক ভঙ্গির প্রবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের একান্ত বৈশিষ্ট্য তাঁহার পৌরুষ। "কাপুরুষতার প্রতি যথোচিত ঘৃণা এবং ধিক্কারের দ্বারা তাহা গৌরববিশিষ্ট।" ইহাই প্রধানতঃ বিপরীত-প্রকৃতিবিশিষ্ট রবীন্দ্র-যুগের বাঙালী সমাজে তাঁহাকে অপ্রিয় করিয়াছিল। আজ যুগপরিবর্ত্তন হইয়াছে। আশা করা যায়, স্বাধীন দেশে দ্বিজেন্দ্রলাল পুনরায় সমাদৃত হইবেন।

আলোচনা

দুর্গাদেবীর বোধন ও বিসর্জন

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

গত মাঘের প্রবাসীতে শ্রীরাজমোহন নাথ শারদীয়া পূজার অঙ্গীভূত দেবীর বোধন ও বিসর্জন সম্বন্ধে আসামের বহু তথ্যপূর্ণ বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। বহুদিন পূর্বে তিনি "ময়নামতী গানে"র কদলীরাজ্য ও বিজয় নগর আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই তথ্যানুসন্ধানে আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির ইংরেজী মাসিক পত্রিকায় তিনি আসামের নানা স্থানের পুরাতন অজ্ঞাতপূর্ব মন্দিরের বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি ইঞ্জিনীয়ার; আসামের নানাস্থানে ঘুরিয়াছেন, সামাজিক আচার-ব্যবহার জানিয়াছেন। সেই জ্ঞানেরই কিঞ্চিৎ মাঘ মাসের প্রবাসীতে আমাদিগকে শুনাইয়াছেন।

এই প্রবন্ধে তিনি বহুবিধ কার্যের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। আমি আসামের পুরাতন কিংবা বর্তমান ইতিহাস কিছুমাত্র অবগত নই। কিন্তু তিনি তাঁহার অনুমানের যে সকল হেতু প্রদর্শন করিয়াছেন, আমার নিকট সে সকল পর্যাপ্ত বোধ হইল না।

১। প্রথমে বোধন দেখি। আশ্বিন শুক্লা ষষ্ঠীর সায়ংকালে দেবীর বোধন হয়। যুগ্ম বিল্বফল-যুক্ত শাখায় বোধন হয়। পার্শ্বে নবপত্রিকা স্থাপিত হয়। তখন তাহার স্নান, পূজা কিছুই হয় না। সপ্তমীতে নবপত্রিকা স্নানের পর বস্ত্রাবৃত করিয়া প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত ও পূজিত হয়। অতএব সপ্তমী হইতেই নবপত্রিকার প্রয়োজন আসিতেছে। ষষ্ঠীর সায়াহ্নে সূতিকা-গৃহে কে জন্মগ্রহণ করে? নাথ মহাশয় বলেন নাই। যে যুগ্ম ফলযুক্ত বিল্বশাখায় বোধন হয়, সে শাখা নবপত্রিকার অন্তর্গত নয়। দুইটি যুক্ত বিল্ব-ফলের প্রয়োজন কি? নয়টি শাখা বা পত্রের মধ্যে রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, মান ও ধান্য—এই পাঁচটি কৃষিজাত। হরিদ্রা খাদ্যদ্রব্য বলিতে পারি না। অন্য চারিটি,—জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম ও অশোক। নাথ মহাশয় ইহাদের আয়ুর্বেদীয় গুণ উল্লেখ করিয়াছেন। সে সময় আশ্বিন মাসে বিল্ব পাকে না। অপক্ব বিল্ব অতিশয় ধারক; কোষ্ঠবদ্ধ করে। দাড়িমও পাকে না। দাড়িমের কষায় রস ধারক। দুইটিই গর্ভিণীর হিতকর নয়। অশোকও আয়ুর্বেদে কষায় ও গ্রাহী। জয়ন্তী আমার অজ্ঞাত। আসামের কোন্ জাতি এত দ্রব্যগুণ জানিয়া নবপত্রিকার অন্তর্গত করিয়াছিল তাহা জানিতে কৌতূহল হয়। বোধন আশ্বিন শুক্লা ষষ্ঠীতে হয়, তাহার হেতু কি? সায়ংকালে হয়, তাহারই বা হেতু কি? দেবীপুরাণে নবপত্রিকা নাই, নবদুর্গা আছে। মনে হয় নবপত্রিকা বিল্ববাসিনী দেবীর নয় মাসের নয়টি প্রতীক। দেবী নয় মাস গর্ভবতী থাকেন, এইরূপ কোন ভাব হইতে নবদুর্গার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

২। দেবীর বিসর্জন। প্রতিমার বিসর্জনের সহিত নবপত্রিকারও বিসর্জন হয়। যে সন্তান রক্ষার জন্য ভূতাপসরণ হইয়াছে, প্রসূতির আবশ্যক ঔষধ সংগ্রহ হইয়াছে, সেই নবপত্রিকা তিন দিন পরে জলে নিক্ষিপ্ত হইল, তাহার সন্তানের দশা কি হইল? ইহার তুল্য নিষ্ঠুর আচরণ আর কিছুই হইতে পারে না। নবপত্রিকা দুর্গাস্থানীয় হইয়া পূজিত হইয়া থাকেন, ইহা বাঁকুড়ায় শুনিয়াছি। যাহার আবাহন ও বিসর্জন হয় তাহাকে কৃষিকর্মের অঙ্গীভূত করিতে পারি না।

নাথ মহাশয় লিখিয়াছেন, "বস্তুতঃ বোধন তথা দুর্গাপূজাও শবর জাতির কৃষি-উৎসব।" আসামে শবর জাতি আছে কি? আর যদি থাকে, উৎসব আগে না পূজা আগে, তাহা স্পষ্ট না জানিলে কার্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে পারা যায় না। কার্য-কারণ সম্বন্ধ না থাকিলেও দুই-ই সমকালীন হইতে পারে। কে শবর জাতিকে আশ্বিন মাস বলিয়া দিবে? কে তাহাদিগকে আশ্বিন শুক্লা দশমী বলিয়া দিবে? আরও অনেক তর্ক আছে; একটার উল্লেখ করি। কামরূপের পূর্বনাম জ্যোতিষপুর নয়, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। এই নাম কত বৎসর হইতে আসিয়াছে? কারণ, মহাভারতে ও রামায়ণে এক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের উল্লেখ আছে। সে নগর ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে ছিল না; উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল। ইতি।

নববঙ্গের বয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষার কার্য্যকরী পরিকল্পনা

শ্রীজীবনময় রায়

The measure of illiteracy is no adequate measure of the prevailing ignorance.—*M. K. Gandhi.*

বাংলাদেশে তথা ভারতে বয়স্কদের ভোটাধিকার লাভ স্বাধীনতার একটি মূল্যবান দান। এই ভোট যাতে মানুষে স্ব-ইচ্ছায়, স্বচ্ছন্দচিত্তে এবং স্ব-জ্ঞানে দিতে পারে, পরস্বৈপদী ভোটানুগমন না হয়, তার ব্যবস্থা জাতীয় গবর্ণমেণ্টের অগৌণে করা কর্ত্তব্য। কেন, কার এবং কিসের জন্যে ভোট দিচ্ছি, তাতে কি লাভ বা ক্ষতি হবে, ভোটারের সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নিজের থাকা দরকার।

কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণ যে গভীর অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছে তা প্রায় দুর্ভেদ্য। এই জনসাধারণের মধ্যে লিখতে ও পড়তে অল্পাধিক জানে এমন মানুষও আছে। বোঝবার ক্ষমতা এবং সে বোধকে প্রয়োগ করবার ক্ষমতায় আমাদের দেশের মানুষ কারো চেয়ে কম নয়। কিন্তু এই যে নানা বিষয়ে ঠিকমত যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের অভাবে দেশের লোক সভ্যজগতের সম্পদসম্ভার থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। এ জ্ঞান যে মাত্র সামান্য লেখাপড়া শিখিয়ে দেওয়া যাবে না তা আমাদের লেখাপড়া শেখা মানুষদের পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যাবে। মহাত্মা গান্ধীর উক্তি "Litera y itself is no edu ication"—যে কত সত্য, কাজ করতে গেলে পদে পদে তা বুঝতে পারা যায়। সুতরাং বর্ত্তমানে এই মোহনিদ্রায় অভিভূত বিপুল জনশক্তিকে জাগিয়ে দেশগঠনের কাজে লাগাতে হলে, তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে জ্ঞানের আলোকের রাজ্যে পৌঁছে দিতে অসম্ভব দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে হবে। চারদিকে শত্রুপরিবেষ্টিত অবস্থায় সে দীর্ঘসূত্রতারূপ বিলাসের আমাদের অবসর নেই। সম্প্রতি বয়স্কদের পক্ষে, লেখাপড়াকে গৌণস্থান দিয়ে, তাদের সর্ব্ববিষয়ে অজ্ঞানতা দূর করার প্রয়োজনে শিক্ষা দেওয়া দরকার এবং সে শিক্ষা যদি আমরা মুখে মুখে দিই তা হ'লে বই পড়িয়ে শেখানোর চেয়ে দশগুণ বেশী এবং খুবই সহজে তা শেখানো যাবে।*

সুতরাং অক্ষর পরিচয় করে, তাদের জ্ঞান দান করবার চেষ্টা না করে মুখে মুখে, নিম্নলিখিত নানা উপায়ে তাদের অজ্ঞানতা দূর করাই প্রথম, প্রধান এবং অগৌণে কর্ত্তব্য। এর উপর, তাদের নিজেদের উৎসাহ জাগলে, তারা অনেকেই তাদের জন্যে লেখা খবরের কাগজটুকু পড়তে পারে এমন একটু লেখাপড়া শিখতে চাইবে এবং ততটুকু ব্যবস্থা অবশ্য থাকবে।

১। এই শিক্ষা প্রচারের জন্যে জাতীয় গবর্ণমেণ্টকে গ্রামে গ্রামে বয়স্ক জনগণের শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত শ্রমশিল্পের সঙ্গে যোগযুক্ত করতে হবে। ক্ষুধার্ত্ত, অন্নচেষ্টায় অনন্যচিত্ত জনগণের ক্ষুধাশান্তি এবং নিজেকে ও পরিজনবর্গকে সুস্থ রেখে সংসার-যাত্রার ব্যবস্থা করে না দিলে তারা শিক্ষার দিকে মন দিতে পারবে না। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করতে হলে:—

২। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে এক একটি মণ্ডল স্থির করতে হবে। প্রতি মণ্ডলের জন্যে একটি করে শিক্ষা প্রচারকের দল থাকবে এবং তাদের এক একজন এক একটি বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দেবে।

৩। আপাতত প্রধান চারটি বিষয় শিক্ষা দিতে হবে। যথা—

(A) (i) দেশের কথা। তাতে থাকবে (a) দেশের অতীত গৌরবের ইতিহাস। (b) স্বাধীনতা ও কংগ্রেস। (c) দেশের কাজে জনগণের স্থান। (d) দেশের শাসনব্যবস্থা এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতি। তার সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়। (e) জাতীয় পতাকা এবং তার ইজ্জৎরক্ষায় দেশের জনগণের কর্ত্তব্য। দেশের প্রতি মানুষের মনে দেশের উপর ভালবাসা যাতে হয় এবং একতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা যাতে বাড়ে সে দিকে প্রধান দৃষ্টি দিতে হবে। দেশের সংগঠনে দেশের জনগণই যে প্রধান, সেই বোধটুকু জাগাতে হবে।

(ii) দেশের ভূ-বিবরণ এবং পৃথিবীর কথা মোটামুটি। দেশের উদ্ভিদ্, প্রাণী, সম্পদ।

(iii) দেশের শিল্পগঠন ও তাতে দেশের জনগণের লাভ।

(iv) চাষের উন্নতির কথা। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধান ও তরকারির চাষ।

(B) (i) স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীরগঠনের উপায়। পরিচ্ছন্নতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, সময়ের জ্ঞান ও তার সদ্ব্যবহার।

(ii) ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি থেকে বাঁচবার উপায়।

(iii) নাগরিকের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব।

(iv) সাধারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব।

(C) মুখে মুখে দরকারী হিসাব—যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ।

---

* "গান্ধীজীর কথায়, "by transmitting such general information by word of mouth, for one imparts ten times as much in this manner as by reading and writing." M. K. G.—*Harijan* 13. 7. 37.

(D) (ii) দেশের প্রধান প্রধান মানুষদের পরিচয়। জাতীয় সঙ্গীত।

৪। প্রতি গ্রামে আবশ্যক অনুযায়ী একাধিক রাত-পাঠশালা থাকবে। সেখানে থাকবে জাতীয় পতাকা; পড়া, লেখা এবং হিসাব শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে। সামরিক ড্রিলের ব্যবস্থাও থাকবে। কাজ শেষ হলে তারা রোজ জাতীয় সঙ্গীত গান করবে পতাকার তলে সমবেত হয়ে এবং পতাকা অভিবাদন করে বাড়ী যাবে। এই কাজে মণ্ডলের স্কুল ও কলেজের ছেলেরা সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে।

৫। (i) প্রত্যেকটি বিষয় চলচ্চিত্র যোগে প্রত্যক্ষ করে শেখানো হবে।

(ii) বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি বিষয়ে সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করেও দেখানো হবে।

(iii) অতীত ও বর্ত্তমান, প্রধান প্রধান মানুষদের পরিচয় আলোকচিত্র এবং চলচ্চিত্র যোগে বলা হবে।

(iv) দেশের রাজ্যব্যবস্থা চলচ্চিত্রে অভিনয় সহযোগে প্রত্যক্ষ করানো হবে।

৬। দেশের বৈজ্ঞানিকদের এবং নির্ব্বাচিত লেখকদের সাহায্যে, গবর্ণমেন্টের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় প্রত্যেকটি বিষয়ে সুনির্দ্দিষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত অথচ আবশ্যক জ্ঞান দেবার মত যথেষ্ট বস্তু সন্নিবেশিত করে সরল, সর্ব্বজনবোধ্য ভাষায় বই লেখানো হবে। শিক্ষাপ্রচারকেরা এই বইয়ের সাহায্যে কথকতা করবেন। [এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে সভাপতি করে এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদকে এ বিষয়ে ভারার্পণ করে কাজ সুরু করা যেতে পারে। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিকাল ইনসটিট্যুটে পরীক্ষিত সরল বাংলা শব্দপুঞ্জ ব্যবহার করে বই লেখা আরম্ভ করা যায়।]

প্রত্যেকটি লেখার মূল সুর হবে দেশের উপর নিষ্ঠা জাগানো। দেশের উপর নিষ্ঠা জাগলেই অন্যান্য কাজ সহজ হয়ে আসবে এবং অপরাধপ্রবণতাও কমবে।

৭। গবর্ণমেন্ট লোকশিক্ষার উপযোগী করে এবং দেশ ও রাজ্যব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণকে ওয়াকিবহাল রাখার এবং দেশের বিষয়ে উৎসাহ জন্মাবার জন্যে সরল সর্ব্বজনবোধ্য বাংলায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা একটি খবরের কাগজ (আপাতত সাপ্তাহিক) প্রকাশ করুন। এতে (i) দেশের মোটামুটি খবর, (ii) চাষ-আবাদ, (iii) সরল বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ, (iv) দেশের শ্রমশিল্প ও বাণিজ্য এবং তাতে জনগণের অংশ ও অধিকার, (v) আদর্শ গ্রাম গঠনের উপায় ও তাই নিয়ে রচিত শিক্ষাপ্রদ গল্প। (vi) বিদেশের কথা ইত্যাদি থাকবে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের উপর এর পরিচালনার ভার দেওয়া যেতে পারে এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল লেখকেরা একে উপযুক্ত সংগঠনমূলক যন্ত্রে পরিণত করতে পারেন। [ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনষ্টিট্যুটের "সরল শব্দপুঞ্জ" এ বিষয়ে কাজে লাগতে পারে; এবং পরে তাকে ব্যবহারের আবশ্যকে ক্রমে বাড়িয়ে, কমিয়ে পরিবর্ত্তিত করে নেওয়া যেতে পারে।]

৮। ব্যাপক ভাবে ছায়াচিত্র, আলোকচিত্র এবং চলচ্চিত্র দেশের সমস্ত শিক্ষার কাজে ব্যবহার করতে হবে। নইলে জ্ঞান চিরকাল যেমন ছিল তেমনই অবাস্তব থেকে যাবে। সুসম্বদ্ধ এবং সুপরিকল্পিত ভাবে বিশেষজ্ঞ এবং সুলেখকদের দিয়ে বই লেখালে তাকে চলচ্চিত্রে রূপ দিতে বেশী সময় লাগে না। [এ সম্বন্ধে, চলচ্চিত্রে প্রচারকার্য্যে নিপুণ এবং অভিজ্ঞ শ্রীযুত পি. এন রায়কে ভার দিলে কাজ সহজে এবং অল্প সময়ে হবে।]

৯। প্রত্যেকটি নৈশ-বিদ্যালয়ের নিজস্ব ছায়া-ছবির ব্যবস্থা থাকবে। বিশুদ্ধ আনন্দ দান ও ক্রীড়া-কৌতুকের ও নৃত্যগীতেরও ব্যবস্থা থাকবে। রেডিওর ব্যবস্থা রাখতে হবে, এবং গ্রামের লোকের শিক্ষার উপযোগিতাতে বিশেষ প্রোগ্রাম থাকবে।

১০। প্রত্যেকটি গ্রামে যথাপরিমাণে কুটির ও কারিগরী শিল্পের ব্যবস্থা করতে হবে। যৌথ চাষী কার্য্যের ব্যবস্থা করে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের উন্নতির উপায় শেখাতে হবে।

এইজন্য পরীক্ষামূলকভাবে আপাতত কলকাতা থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে দূরে, ব্যাপক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা করে, তিনটি উল্লিখিতরূপ মণ্ডলে কাজ সুরু করে দেওয়া হোক। কাজ সুরু করে দিলেই তবে কাজের ক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি এবং সুযোগসুবিধার হদিস পাওয়া যায়। ডাঙ্গায় বসে সাঁতার শিখে জলে নামতে গেলে জলে নামতে দেরি হবে এবং জলে নেমে জলে ডুবতে দেরি হবে না।

গবর্ণমেন্টের প্রধান লক্ষ্য থাকবে এবং প্রাথমিক কর্ত্তব্য হবে এইটে দেখা যে পরীক্ষা সংক্রান্ত মণ্ডলে কোনো সক্ষম বয়স্ক (১৬ থেকে উর্দ্ধ) মানুষ (স্ত্রী ও পুরুষ) যাতে বেকার বা অলস না থাকে। তাঁদের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য হবে—যাতে প্রত্যেকটি শ্রমিক, তা সে যে ভাবেরই হোক; ১। উপযুক্ত মজুরী পায়; ২। আহার্য্য ও বস্ত্র পায়; ৩। সুস্থ থাকবার সুযোগ পায়; ৪। শিক্ষা পায়; ৫। সম্মান পায়। এজন্য প্রত্যেক গ্রামে উপযুক্ত সংখ্যক শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মণ্ডলের প্রত্যেকটি ব্যক্তির নাম রেজিষ্ট্রিভুক্ত থাকবে এবং তাদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টকে অবহিত হয়ে সেই মণ্ডলগুলির সমস্ত মানুষকে স্বচ্ছন্দে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে। আবার সেই সঙ্গে তাদের নিয়মানুবর্ত্তী, পরিচ্ছন্ন এবং প্রতিবেশীর প্রতি সহৃদয় থাকার অভ্যাস করাতে হবে।

গ্রামের যে সমস্ত বয়স্কেরা গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত কলে, কার্য্যে বা গৃহশিল্পে নিযুক্ত না হয়ে অন্যত্র কাজ করবে তারাও প্রত্যেকে রেজিষ্ট্রিভুক্ত থাকবে এবং উক্ত সর্ব্ব বিষয়ে গবর্ণমেন্টের অভিভাবকতার আশ্রয় পাবে।

ঐ মণ্ডলে কোনো সক্ষম মানুষকে গবর্ণমেণ্ট বেকার থাকতে দেবেন না। অদূর ভবিষ্যতে, দেশের বিপদ নিবারণ এবং সম্পদবৃদ্ধির জন্যে, ব্যাপকভাবে উৎপাদনের আবশ্যকতা ঘনিয়ে এসেছে। এখন আর সেই পুরাতন দীর্ঘসূত্রতা বা চিরন্তন নিষ্ক্রিয় পরিকল্পনা-বিলাসের সময় নাই। কোমর বেঁধে কাজে এখনি নেমে না পড়লে এত সাধের স্বাধীনতা সমূলে বিনষ্ট হবে। কাজে নামলেই কাজ নিজের পথ দেখাবে।

ঐ মণ্ডলে ভিক্ষার ব্যবসা একেবারে উচ্ছেদ করতে হবে। দেশের মজ্জাগত আলস্য এবং নিষ্কর্মতাকে আবশ্যক হলে কঠোর আইন করেও দূর করতে হবে। এই সূত্রে স্বল্পক্ষম বৃদ্ধ এবং যে সমস্ত মেয়ে শ্রমশিল্পে নিযুক্ত হবে না তাদের ঘরে বসে করার মত হাতের কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে, এবং গবর্ণমেণ্ট সেই সব কাজ কিনে নেবেন। নিজের উপার্জনে, আত্মসম্মানে এবং আত্মশক্তিতে নির্ভর করতে শেখাতে হবে।

বহুযুগাবধি পরমুখাপেক্ষী বিশৃঙ্খল স্বভাবের অলসচিত্ত জাতিকে কর্মপ্রবৃত্তিতে জাগাতে হলে কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিকে চেয়ে সামরিক বিধানে ঐ মণ্ডলগুলিকে পরিচালনের ব্যবস্থা করবেন। দেখবেন, অতি অল্পকালের মধ্যেই তারা এই ডিসিপ্লিনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে এবং এরই অনুকরণে গ্রাম সংগঠনের চাহিদা চারদিকে বেড়ে যাবে।

প্রত্যেক মণ্ডলে অন্তত শিশু, রোগী ও বৃদ্ধদের দুধের ব্যবস্থার জন্যে গবর্ণমেণ্টের অধীনে পরিচালিত গোয়াল এবং গোচারণ ক্ষেত্র অবশ্য থাকবে। প্রত্যেক মণ্ডলকে ব্যাধিমুক্ত করতে হবে এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য চিকিৎসার সুব্যবস্থা রাখতে হবে ; নইলে সাধারণ ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশক্তিরও অপচয় ঘটবে।

ছ' মাসের মধ্যে এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে খবরের কাগজ পড়ার মত বিদ্যা তারা পেতে পারবে।

এ জন্যে যে অর্থের আবশ্যক হবে তা অনেক রকমে সংগৃহীত হতে পারে—কয়েকটি প্রস্তাব করছি।

১। কর্মীনির্বিশেষে নিয়োক্তৃগণ প্রত্যেক মজুরি বাবদ ৵১০ দুই পয়সা বেশী দেবেন। তাকে মণ্ডলের স্বাস্থ্য চাঁদা বলা হবে। এর দ্বারা উপযুক্ত চিকিৎসাদির ব্যবস্থা হবে।

২। বাংলাদেশের প্রত্যেক বাস ট্রামের টিকিটের মূল্য ৵৫ এক পয়সা করে বেশী দিতে হবে। তাকে বলা হবে সংগঠন চাঁদা।

৩। গবর্ণমেণ্ট বাংলার যুদ্ধ বাজারে পুঁজি করা কোটি কোটি টাকা ধারের জন্যে চাইতে পারেন। উপযুক্ত সুদ কবুল করলে সে টাকাও কম হবে না।

৪। সপ্তাহে অন্তত একদিন ছ' ঘণ্টা মণ্ডলের প্রত্যেক সমর্থ (১৬ থেকে ৪৫) মানুষকে গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজ করতেই হবে।

এই সঙ্গে বলা দরকার যে ১৮ বছর থেকে ৩৬ বছরের মত মানুষ থাকবে, তাদের সামরিক শিক্ষা দিতে হবে।

কোনো অতিবিরাট পরিকল্পনার জন্যে বসে না থেকে এই রকম ছোট পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নামবার উদ্দেশ্যে এখনি প্রস্তুতির কাজ সুরু করা হোক। এর জন্যে প্রস্তুত হতে ছ' মাসের বেশী লাগার কথা নয়।

এই সূত্রে বাংলাদেশ সংগঠনের প্রধান অন্তরায় দূর করার কথা মনে রাখতে হবে। বাংলায় চৌত্রিশ হাজার গ্রাম আজ পরিত্যক্ত শ্মশান। গ্রাম যদি ক্রমে শূন্য হয়ে যায় তবে সংগঠন হবে কাদের নিয়ে? সামান্য কল্পনাশক্তি খাটালেই আমরা দেখতে পাব যে কলকাতাটা সমস্ত বাংলাদেশের দেহে একটা বিষাক্ত কার্বাংকলের মত ক্রমে স্ফীত হয়ে সমস্ত বাংলার রস রক্ত স্বাস্থ্য বিত্ত এবং খাদ্য আকর্ষণ করে বাংলাদেশকে শ্মশানে পরিণত করেছে। পাগলের মত সকলে সব নিয়ে ছুটেছে কলকাতার দিকে—টাকা টাকা টাকা। নীতিধর্ম মনুষ্যত্ব দেশ এবং দশের কল্যাণ চুলোয় গেল। এমনি করে নানা প্রতিষ্ঠান, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির আধার এই কলকাতাও যে ধ্বংসের মুখে চলেছে তা আমরা চোখ মেলে দেখি না। তারও সমস্যা এবং বিপদ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এমন কি শয়তানকে আমরা প্রলুব্ধ করে তুলছি একদিন অকস্মাৎ একে হিরোশিমায় পরিণত করতে। দেশ সংগঠন এবং কলকাতার ক্রমবর্দ্ধমান পুঞ্জীভূত সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় কলকাতাকে বিকেন্দ্রিত (decentralize) করা। অর্থাৎ কলকাতা শহরকে সমস্ত বাংলাদেশময় ছড়িয়ে দেওয়া। পাঁচ-সাতটি গ্রাম নিয়ে এক একটি ছোট কৃষি শিল্প শহর (যাতে শহরের আরাম এবং গ্রামের পরিবেশ থেকে কেউ বঞ্চিত না হয়) ক্রমে ক্রমে গড়ে তোলা।

Back to the village—নয়। এ কাজ এখনি সুরু করে দেওয়া দরকার—কেননা এ বিরাট ব্যাপার কাজে পরিণত করতে সময় লাগবে। নইলে হঠাৎ একদিন একটি আণবিক বোমার "ফুৎকারে কাটিবে এই দম্ভমঞ্চখানি, জলবিম্বসম।"

সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা তথা বাঙালীর খাদ্য ও দুগ্ধ সমস্যা, বাসগৃহ ও স্বাস্থ্য, জলসরবরাহ, শহরের পরিচ্ছন্নতা, আদর্শ কলেজ ও স্কুলের জন্য ভূমি প্রভৃতির সমস্যা এবং কলকাতার ধনিক জমিদারদের চিরদিনের লজ্জা—কলকাতার সর্ব্বরোগ ও পাপের আধার কুষ্ঠক্ষতরূপী চার হাজার বস্তি সমস্যা ; অপিচ নৈতিক, রাজনৈতিক, শাসন ও দুষ্টের দমন প্রভৃতি আরও অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হয়ে আসবে।

কলকাতার বিপদ একলা বাংলার বিপদ নয়, এ বিপদ

নিখিল ভারতের। অতএব কলকাতা বিকেন্দ্রিত করার কাজে সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে ঋণ সংগ্রহ করে এবং অন্যান্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে ভারত গবর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে বাংলা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে অগ্রসর হতে হবে। নইলে আসন্ন তৃতীয় মহাযুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা বিপদগ্রস্ত হবে। মোহ-মুক্ত মন নিয়ে, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিকে পরিচ্ছন্ন রেখে স্থিরচিত্তে চিন্তা করে দেখলেই একথা হৃদয়ঙ্গম করতে কষ্ট হবে না।

শিল্পী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাস্কর্য্য-শিল্প

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

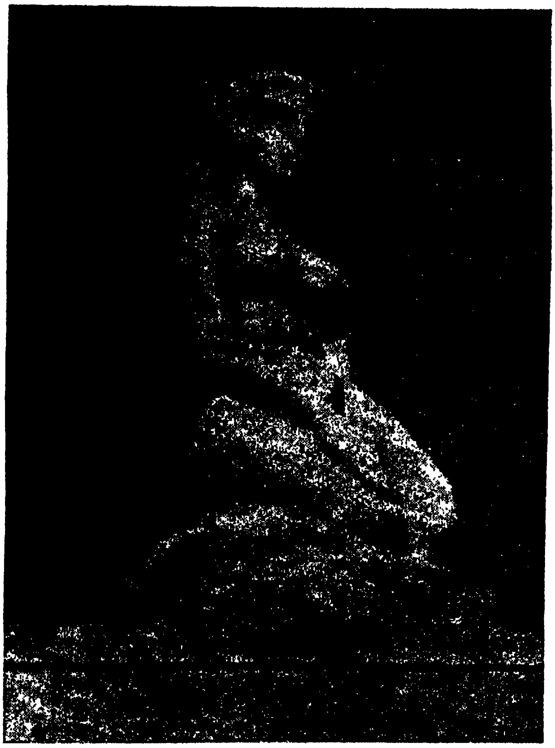
উদীয়মান শিল্পী শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের অঙ্কিত বহু ছবি ইতিপূর্ব্বে প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া শিল্পরসিকদের আনন্দদান করিয়াছে। Wilfrid S. Lynch ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারী সংখ্যা মডার্ন রিভিয়ুতে "Sushil Mukherjee—An Artist" নামক প্রবন্ধে সুশীলকুমারের শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। ১৩৫২ সনের চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে 'বর্ত্তমান ভারতীয় চিত্রকলা ও শিল্পী সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়' নামক প্রবন্ধে এই কুশলী শিল্পী সম্বন্ধে আমরা মন্তব্য করিয়াছিলাম যে, ইঁহার ভবিষ্যৎ বিপুল সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। সম্প্রতি এই রূপকারের প্রতিভার একটি নূতন দিক খুলিয়া যাওয়ায় আমরা এঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অধিকতর আশান্বিত হইয়াছি।

সুশীলকুমারের কর্ম্মক্ষেত্র এতকাল ছিল মাদ্রাজে। বর্ত্তমানে তিনি সিন্ধিয়া পাবলিক স্কুলের জুনিয়র বিভাগে শিল্পশিক্ষক-রূপে নিযুক্ত হইয়া গোয়ালিয়রে চলিয়া আসিয়াছেন এবং পাহাড়ের উপরিস্থিত গোয়ালিয়র দুর্গে বাসা বাঁধিয়াছেন। এই দুর্গে প্রাচীন ভাস্কর্য্যশিল্পের যে সমস্ত নিদর্শন রহিয়াছে তাহা এই কলারসিকের বিমুগ্ধ দৃষ্টির সমক্ষে এক অভিনব রূপলোকের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় এবং তাঁহাকে নব নব রূপসৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে—স্বল্পকাল মধ্যেই পাথর কুঁদিয়া তিনি কতকগুলি চমৎকার মূর্ত্তি গড়েন।

ম্যাথু আর্ণল্ড বলিয়াছেন, "Without sincerity no vital work in literature is possible"। একথা শুধু সাহিত্যে নয়, যাবতীয় কলাবিদ্যা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যে আন্তরিকতার স্পর্শ সুশীলকুমারের চিত্রগুলিকে এমন প্রাণবন্ত করিয়া তুলে তাহা তাঁহার ভাস্কর্য্যেও সুপরিস্ফুট। সুশীলকুমারের চিত্রে এবং ভাস্কর্য্যে আরও একটি বিশেষত্ব লক্ষণীয়—সেটি হইতেছে তাঁহার রচনার বলিষ্ঠতা।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে সুশীলবাবুর ক্ষোদিত যে তিনটি প্রস্তরমূর্ত্তির প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হইল তাহা হইতে তাঁহার ভাস্কর্য্যশিল্প-নৈপুণ্যের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

প্রথম মূর্ত্তি 'উপবিষ্টা রমণী'তে নারীদেহের গঠনসৌষ্ঠব ও সুষমা অনিন্দ্যভাবে রূপায়িত। মহিলাটির বসিবার দৃপ্ত মনোহর ভঙ্গিটি নয়নমনোমুগ্ধকর। শিল্পীর অপূর্ব্ব দক্ষতা-গুণে নীরস পাষাণে নারীর দেহলাবণ্য পরিপূর্ণ মাধুর্য্যে

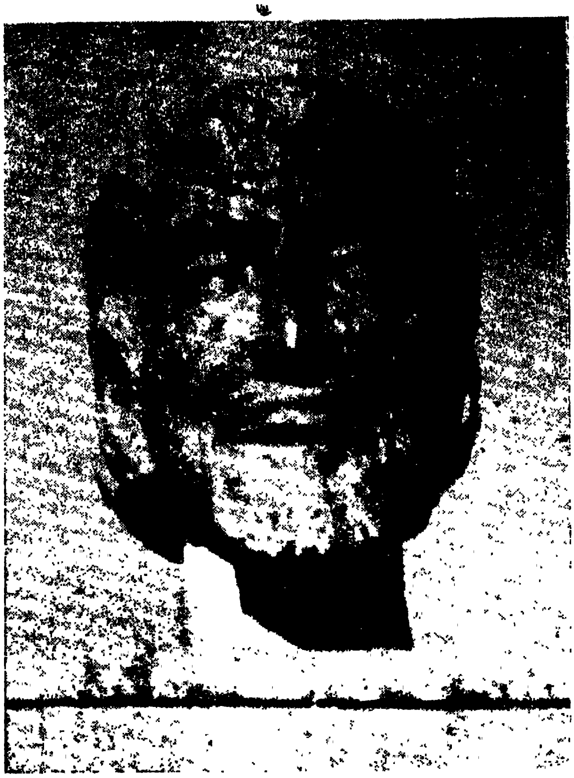


উপবিষ্টা রমণী (১নং)

ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'মুখাবয়ব' (২নং) মূর্ত্তিটিও চিত্তাকর্ষক। স্ত্রীলোকটির অন্তর্গূঢ় বেদনা যেন তার আননে প্রতিফলিত। 'ধর্ম্মোন্মাদ' (৩নং) মূর্ত্তিটির মুখের প্রতিটি রেখায় ধর্ম্মোন্মত্ততা-জনিত মূঢ়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। হৃদয়হীনতা, কঠোরতা এবং সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এই তিনের সংমিশ্রণ লোকটির চেহারাকে একটি লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে। আধুনিক কালের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিসঞ্জাত শোচনীয় বীভৎসতার ইতিহাস যেন এই মূর্ত্তিটিকে ঘিরিয়া বিরাজ করিতেছে।



মুখাবয়ব (২নং)



ধর্ম্মোপাদ (৩নং)

ভারতীয় ভাস্কর্য্যের অতীত ইতিহাস গৌরবময়। ইহার প্রভাব একদা চীন, জাপান, ব্রহ্ম, ইন্দোচীন এবং যবদ্বীপে বিস্তৃত হইয়াছিল। পাল সম্রাটদের আমলে বাংলার ভাস্কর্য্য সুদূর নেপালে পর্য্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় নব্য বাংলার চিত্রকলার তুলনায় ভাস্কর্য্যশিল্পের তেমন উন্নতি হয় নাই। বর্ত্তমান বাংলার কৃতী ভাস্করদের মধ্যে দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী, সুধীর খাস্তগীর, সুনীলকুমার পাল প্রমুখ মাত্র কয়েক-জনেরই নাম উল্লেখযোগ্য। দেবীপ্রসাদ সুনিপুণ ভাস্কর হিসাবে সর্ব্বভারতীয় খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

সম্প্রতি বাংলার ভাস্কর্য্যশিল্পের পুনরুজ্জীবনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ভাস্কর সুনীল পাল নেপালে গিয়া দীর্ঘকাল পরে আবার সেখানে বাংলার ভাস্কর্য্যের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া আসিয়াছেন। দেবীপ্রসাদের সুযোগ্য শিষ্য সুনীল-কুমারের পাথরে খোদাই করা প্রাথমিক কাজগুলি দেখিয়া মনে হয় ভবিষ্যতে তাঁহার হাতেও তুলির সঙ্গে সঙ্গে ছেনি ও বাটালি সমান তালে চলিবে এবং তাঁহার সৃজনীপ্রতিভার নব নব অবদানে আমাদের দেশের ভাস্কর্য্য-শিল্প-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইবে।

সোনার সন্ধ্যা

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

সোনিয়াকে আমি ডাকতাম সোনা বলে। এমন একটা সার্থক-মনা বোধ হয়, পৃথিবীতে কেউ তার প্রেয়সীকে দেয় নি।

সোনিয়ার গায়ের রং ছিল সোনারই মত সুন্দর ও উত্তাপের আভাসে ভরা। সাধারণ রাশিয়ানের মত রঙের আভাহীন সাদা নয়। কৃষ্ণসাগরপারের রোদ তার শুভ্র সৌন্দর্য্যকে স্নিগ্ধ সোনালী রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল, আর তার বিস্রস্ত কেশরাশিতে মনে হ'ত বর্ষার জলগা নদীর সুবর্ণধারা ঝরে ঝরে পড়ছে। দেখলেই মনে পড়ে বৈষ্ণব কবিতার অমর বর্ণনা—থির বিজুরী বরণ গোরী। সোনার বরণী ছিল আমার সোনা।

আর সোনাকে এ নাম দিয়েছিলাম আমি—স্বর্ণময় সেন, যার কথা বাংলাদেশে কারও এই ত্রিশ বছর পরে মনে নেই। যার বাপ-মা ছেলের এই নাম রাখবার সময় ভাবেন নি স্বপ্নেও ভবিষ্যতে কত সুবিধা হবে এই নামে। তাদের সোনার চাঁদ ছেলে—কাঁচা সোনার মত ছিল রং, আমার ও আমাদের দেশের হিসাবে, আর চাঁদের মতই ছিল আমার মুখচন্দ্র—সহজেই চীনে বলে বিদেশে নিজেকে চালিয়ে দিয়েছিল। নামটাও তখন সান ইয়াৎ সেনের পৃথিবীজোড়া নামের কল্যাণে চীনে বলেই চলে যেত। আহা বাপ মার এত আদরের ছেলে হয়ে গেল ভবঘুরে—ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে গেল বিশ বছর বয়সে, কেবল শুধু অনির্দ্দিষ্ট অজ্ঞাত এডভেঞ্চারের আলেয়ার পেছনে। সম্বল রইল শুধু বাঙালী-দুর্লভ দেহসৌষ্ঠব ও বিদেশী ভাষা চট করে আয়ত্ত করবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা। এই দুটি মূলধন নিয়েই আমি কয়েক বছর মস্কোতে একটা বিদেশী রাজদূতাবাসে অনুবাদকের কর্ম্ম নিয়ে ছিলাম। শুধু যে অনুবাদক তা নয়, এত দিন পরে স্বীকার করতে লজ্জা বা বিপদ নেই যে মঙ্গোলিয়ান চেহারা ও সানো মায় সেন এই নামের সুবিধা নিয়ে সেই রাজদূতা-বাসের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তিও যে না করতাম তা নয়। ফলে স্বর্ণময় সেনের পকেটে স্বর্ণের অভাব মস্কোতে কখনও হয় নি। ১৯১৭-১৮তে মস্কোর কোন্ নাচঘর, কোন্ থিয়েটার বা নাইট ক্লাব সেনস্কিকে না চিনত?

আজ বার্দ্ধক্যের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আমার সমবয়সী স্বদেশী বাঙালীদের কাছে বাড়ির কোণের পার্কে বসে রোজ বিকেলে শুনি ওসব দেশের কাফে রস্তোরাঁ, নাচঘর এসবের অসারতা আর মেকী সোনালী রঙের সমালোচনা। চুপ করে শুনি; আর চুপ করে শোনে দেবদারু গাছগুলি। ওরা মাথা দুলিয়ে নীরবে প্রতিবাদ করে; আমি অতীতের সেনস্কি তাও করি না। শুধু ভাবি কি যে সোনার সন্ধান পেয়েছিলাম তা তোমরা স্বর্ণময় সেনের স্বদেশের লোকরা সন্দেহও করতে পারবে না। তোমরা অন্ধকারেই থাক; আমার সোনার দীপ্তি আমারই অন্তরকে উজ্জ্বল করে থাক সংগোপনে।

হোটেল মেট্রোপোল সেদিন শনিবার রাত্রিতে উৎসব-মত্ত হয়ে, আত্মহারা হয়ে আনন্দের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। এত আলো, এত রং, এত সৌরভ। ছোট ছোট ঝোলানো বারান্দা প্রকাণ্ড হলটাকে ঘিরে রেখেছে; তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে ক্যাবিনেট অর্থাৎ নিভৃত কামরাগুলি, যেখানে সকলের উৎসুক সন্ধানী নয়ন এড়িয়ে রুবল (রাশিয়ার টাকা তখনকার দিনে ১৵০ আনা আন্দাজ মূল্য ছিল) ও শ্যাম্পেনের খেলা চলে, আর তার সঙ্গে ভাড়াটে প্রেমের লীলা। রেস্তোরাঁর হলে গোলকধাঁধার সৃষ্টি করেছে ছোট ছোট টেবিলগুলি। চারজনের টেবিলই বেশী; কিন্তু বেশী প্রিয় হচ্ছে দু'জনের টেবিলগুলি; সেখানেই সঙ্গীত ভেসে আসে বেশী—যদিও তা কানে ঢোকে না। শ্যাম্পেন আনন্দ-বুদ্বুদে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে যদিও দু'জনের আত্মহারা আনন্দের তন্ময়তা অতিক্রম করে সে সুরা মধুরাধরে উঠাবার সৌভাগ্যই হয়ত পেলে না। কিন্তু রেস্তোরাঁর যত মৃদু গুঞ্জন সবই ওঠে ওই টেবিলগুলি থেকে। পানাহারের জন্য দু'জন ও দু'জনের জন্যই পানাহার আসে। সবাই ওদিকে চোরা চাহনিতে তাকায় যদিও মনে হবে যে তাকিয়ে দেখছে না কেউই। ঘরের একটা প্রান্তে উঁচু বেদীর ওপর অর্কেষ্ট্রা পরিচালনা করছে এক শিল্পী। দেখে পুলিস মনে হয়। রাশিয়াতে বিদেশী না হলে শিল্পীর আদর তখন হ'ত না।

শিল্পেরও আদর হ'ত না বিদেশী না হ'লে। তাই একটা যাযাবর-সঙ্গীত বাজান হচ্ছিল; তার করুণ মূর্চ্ছনা বেহালার ছড়ের আঘাতে কেঁদে কেঁদে ঘরময় লুটাচ্ছিল আর আমি হাতলওয়ালা ফুলের সাজির আকারের একটা গরম রুটির ওপর রাখা দামী "কাভিয়ার" খাচ্ছিলাম। সুরের করুণতার সঙ্গে মিতালি রেখে ঘরটিকে প্রায় অন্ধকার করে ফেলেছে আর তার মধ্য থেকে ফুটে বের হচ্ছে হীরাজহরতের দ্যুতি। চারদিকে রূপসী নারী, তাদের অঙ্গসৌরভ ও দেহসৌষ্ঠব মদিরার মত সঙ্গীত ও সঙ্গীতের মত মদিরা, আমার সামনে বিশ্ববিখ্যাত "কাভিয়ার"। স্বর্ণময় সেন তখন কোথায়? সেনস্কি স্বর্ণময় হয়ে আবেশে চোখ বুজে জিপসী সঙ্গীতের তালে তালে দামী কার্পেটে পা ঠুকছে সবার অগোচরে। এমন সময়ে তীব্র আওয়াজ হ'ল রিভলভারের। উপরের এক ঝুল বারান্দায় একটা তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ ও তার পরেই সামরিক বুটের আওয়াজ সব কোলাহল ও কলকাকলি ছাপিয়ে জেগে উঠল হলটাতে।

পুলিসের ও মিলিটারীর খানাতল্লাসী সুরু হ'ত যথারীতি। ১৯১৭ সালের মস্কোতে মোটেই এটা নূতন জিনিষ নয়। ওদের সন্ধানের রূঢ়তা ও ভীষণতা সাধারণ লোকের বেলা যেমন ভাবে ফুটে উঠত অভিজাত বা রাজপুরুষদের বেলা ঠিক তার বিপরীত। বিদেশী রাজদূতাবাসের লোক বলে আমিও নামমাত্র প্রশ্ন ও পরিচয়ের পরেই নিষ্কৃতি পেলাম। কিন্তু পেলে না সোনার বরণী এক তরুণী।

ওই বিরাট্ হলে শুধু তারই সন্তোষজনক কোন পরিচয় বা ওখানে আসার উপযুক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। পাশের টেবিলেই সে একা বসেছিল, তা দেখেছিলাম; ভীরু হরিণীর মত চাহনি ছিল তার, সন্ধ্যাতারার মত সুদূর কুতূহলী দৃষ্টি তার এই অনভ্যস্ত অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সম্মেলনের উপর নৈর্ব্যক্তিক ভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। প্রলোভন হচ্ছিল যে উঠে তার টেবিলে গিয়ে বসি, পরিচয় করি এই কুণ্ঠিত সলজ্জ বিদেশিনীর সঙ্গে, পরিচয় করিয়ে দিই তাকে এই আনন্দশালার গোপন রহস্যের সঙ্গে। কিন্তু পারি নি। তার কুণ্ঠার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে তপোবনবাসিনী শকুন্তলাকে প্রমোদসভার অনাবরণ বিপণিতে নিয়ে আসার প্রলোভন সংবরণ করেই বসে ছিলাম।

এখন বুঝতে পারলাম যে, রাজনৈতিক গুপ্তহত্যার দায়ে এই নিরপরাধ তরুণী ধরা পড়েছে। অতএব একে পুলিপোলাও চালান যেতে হবে সাইবেরিয়ায়। ভাবতেই—ওই তুষারের মত চিরশীতল নির্জ্জন নির্ব্বাসনের কথা ভাবতেই মাথা গরম হয়ে গেল। এগিয়ে গেলাম দৃঢ়পদে পুলিশের সামনে।

আমার বিদেশী রাজদূতাবাসের মর্য্যাদা ও তার চেয়ে বেশী কাঞ্চনমূল্যে সোনিয়া ছাড়া পেল সেই রাত্রেই। নিরাপরাধ বালিকা বিদেশে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে স্কলারশিপের উপর নির্ভর করে। তারুণ্যের অদম্য কৌতূহল তাকে এই নৈশ বিলাসশালায় টেনে এনেছিল এক রাত্রির জন্ত। গোপনে সে একটি বার মাত্র হোটেল মেট্রোপোলের শনিবার রাত্রিটিকে দেখে যাবে; এই অভিসার কেহ জানতে পারবে না এই ছিল তার অভিলাষ। তার পরিবর্ত্তে হঠাৎ এল সাক্ষাৎ শমনের মত সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনের সম্ভাবনা, নিদেন পক্ষে চারদিকে জানাজানি, স্কলারশিপ হারানো ও ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কার। কিন্তু সব কিছুর বদলে তরুণ উষার মত তার নিষ্কলুষ জীবনে উদয় হ'ল সেনস্কি।

উষার অরুণরাগে ভরে উঠল দুটি জীবন।

তার পরের দিনগুলির কাহিনী সেই অরুণরাগে রঞ্জিত। একই পৃথিবীতে আমরা দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছি। সে যায় কলেজে, আমি যাই আপিসে, কিন্তু সন্ধ্যাগুলি যেন রামধনুর মত বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত হয়ে, আকাশকে স্পর্শ করে নেমে আসে আমাদের দু'জনের মধ্যে সেতু রচনা করে। সেই সেতু বেয়েই ত আমরা সারা দিনের দুস্তর বিরহ, দুই দেশের দুই মনের দুরতিক্রম ব্যবধান সত্ত্বেও দুজনের কাছে আনাগোনা করি গোপনে। এমন ভাবেই দিনগুলি চলছিল।

অপরাহ্নের মিলন নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে আসন্ন সায়াহ্নের পদধ্বনি শুনতে শুনতে ম্লান হয়ে আসে। ক্ষণস্থায়ী সে সুখচঞ্চল চরণে আমাদের নিয়ে যায় নাচঘরে, অপেরায়, রেস্তরাঁয়। চারুহাসিনী সোনিয়ার মুখে হাসি ফুটে উঠতে না উঠতেই নির্জ্জার ঘড়ি সচকিত করে তোলে তাকে। উপায়ই বা কি? আমাদের সময় কাটে পথে, না হয় প্রমোদ-গৃহে।

তারই মধ্যে অবকাশ একটু বিস্তৃতি লাভ করে শনিবার-গুলিতে। দুপুরের পরে আমার কাজ নেই, বিকালে নেই তার ক্লাস। একদিন আমরা শহর ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেলাম জিপ্সী সঙ্গীত শোনবার জন্ত। "ট্রয়কা"য় (আরব ঘোড়ায় টানা গাড়ী) চড়ে আমরা পাড়ি দিলাম সুদূরে।

সে দিন বিকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছে। ক্ষুরধার শীত আর মুষলধার বৃষ্টি দুয়ে মিলে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে যদিও আমি রুশীয় মঙ্গোলীয়ান সানো-যায়-সেন, মস্কোতে সেনস্কি নামে অভিহিত, আমার উর্দ্ধতন চৌদ্দ পুরুষ বাঙালী।

একটা কাচের প্রাসাদ—বরফে ঢাকা—তার ভিতরে গরম দেশের পামগাছ সাজান। অদ্ভুত, একেবারে প্রাচ্য ব্যাপার। কাঠের গনগনে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে খোলা 'ফায়ার প্লেসে'। তার কাছে আমরা বহু দর্শক ও শ্রোতা জমা হয়েছি। এক জিপসী গায়িকার সঙ্গে এল চারজন বেদে রঙীন ট্রাউজার ও শাদা ব্রোকেডের জামা পরে ও চারজন বেদেনী রঙীন রেশমী রুমাল মাথায় বেঁধে। সামনে প্রকাণ্ড লম্বা গ্লাসে ঢেলে দিলে চারোচকা নামে পানীয়। গান শুনতে শুনতে পান করতে হবে এক চুমুকে ও এক নিঃশ্বাসে—কিন্তু কেবল তখনি যখন গায়িকা এসে সামনে দাঁড়াবে। তারপর গ্লাস উপুড় করে রেখে দেখিয়ে দিতে হবে যে একটি বিন্দুও বাকী নেই।

আমার মন কিন্তু ছিল না এ গানে। যদিও দরদী গলায় আদিম বিষাদ ও অনন্ত কারুণ্যে ভরা গান তারা গাইছিল, যদিও ক্লান্ত জাতির বিশেষত্ব, বঞ্চিত মানবতার ব্যথা ছবির মত সে গানে ফুটে উঠছিল, আমি মনোযোগ দিতে পারি নি এ গানে। আমি অনুভব করছিলাম যে আনন্দ-সন্ধানের মধ্যে সোনিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ও এতদিন সান্ধ্যবিহার হ'ল হয়ত এই জীপসী গানের সুরের মতই শীঘ্রই হবে তার শোচনীয় অবসান। বাইরে যুদ্ধে পরাজয়, ভিতরে খাদ্যাভাব ও বিরাট অসন্তোষের ফলে রাশিয়ার রাষ্ট্রতরণী প্রায় বানচাল হয়ে এসেছে। যে-কোন সময়ে উল্টে গেলে আমরা সবাই একসঙ্গে ডুবে যাব।

সত্য কথা বলতে কি, রাশিয়া দেশটাই হচ্ছে বিষাদের দেশ। ওরা জন্ম থেকেই অনুভব করে বিষাদ—যেমন ভাবে আমরা অনুভব করি অবসাদ। কিন্তু যাযাবর গৃহত্যাগী

সেনস্কির তো বর্ত্তমান অবস্থায় বিষাদ বা অবসাদ কোনটাই অনুভব করবার কথা নয়। সোনিয়ার সঙ্গ সোনালী আগুনের উত্তাপে ভরা, সে হচ্ছে আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। তার সঙ্গে পরিচয়ের পর থেকে তো আর বিষাদ বা অবসাদ কোনটারই প্রাবল্য হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমি যখন ওকে ভালবাসতে আরম্ভ করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম যে সেও আমাকে আগে থেকেই ভালবাসতে সুরু করেছে তখন থেকেই আমি রাশিয়ান বিষাদের প্রভাবে পড়লাম। আজ ভেবেছিলাম যে শহর থেকে অনেক দূরে নূতন রকমের সন্ধ্যা যাপনের মধ্যে, হাসি গান কলরবের মধ্যে এ বিষণ্ণতাকে বিদায় দিতে পারব। সে আশাতেই এখানে এসেছিলাম। জিপসীরা একটার পর একটা "চারোচ কি" গান গেয়ে যাবে আর স্বহস্তে একটার পর একটা গ্লাস ভরে দিয়ে যাবে চারদিকে। সবাই হয়ে উঠছে মাতোয়ারা; প্রাণে ফুটবে সুখের ফোয়ারা আর চারদিকের ছড়ানো আনন্দ-কাকলির মধ্যে আমরা ডুবে যাব।

গানের ঘরটি খুব সরগরম হয়ে উঠেছিল; আস্তে আস্তে আমরা দু'জনে বাইরে চলে এলাম। ছোট্ট একটা হ্রদের পাশে এই জিপসী প্রাসাদ। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে জলের ধারে আমার মনে আনন্দ ও বেদনা একসঙ্গে দোলা দিতে লাগল। অতি ধীরে সন্তর্পণে আলগোছে আমার হাতে একটু চাপ দিয়ে সোনা প্রশ্ন করল, 'তুমি আজ অত কি ভাবছ?'

'না, কই কিছু ত ভাবছি না।'

না, কিছু ভাবছ না ত করছ কি? বেদের গানে এত কি মজা পাচ্ছ তা হ'লে যে কথাও কইছ না! তা আমি তো ভেবেছিলাম যে তোমাদের অঞ্চলেও বেদেরা আছে অনেক আর তাদের গান তোমার কাছে নূতন নয়।'

'কিন্তু আমি তো মঙ্গোলীয় রুশ নই। আমি ভারতীয় আর কলকাতায় আমার বাড়ী।'

মধুর ভাবে হেসে উঠল সোনিয়া। বললে—সেনস্কি, তুমি বোধ হয় নূতন একটা তামাশা সুরু করলে আমার সঙ্গে। টাগোরের ছবি আমি দেখেছি। তুমি যদি তার দেশের লোক হও তবে আমিও নূতন একটা দেশ বেছে নেব নিজের বলে চালাবার জন্ত।

আমি চঞ্চল হয়ে প্রতিবাদ করলাম। বললাম—জীবনে বহু মিথ্যার আশ্রয় আমি নিয়েছি সোনা আমার ভবঘুরেবৃত্তির তাড়নায়। আমি ভারতীয় এ কথা জানাজানি হলে আমার চাকরি নিয়েও টানাটানি হবে হয়ত এই যুদ্ধের বাজারে। তবু তোমার কাছে আমি সত্য প্রকাশ করবই। আমি রুশীয় নই, ভারতীয়।

চুপ করে রইল সোনা। চুপ করে নিস্তব্ধ হয়ে রইল হ্রদের অচঞ্চল জলরাশি—শুধু আমার হৃদয়ের রক্তস্রোত অধীর চঞ্চল হয়ে সোনার মুখের কথার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইল।

খানিক পরে আমিই সে নীরবতা ভাঙলাম। বললাম—সোনা, সোনিয়া, আমার দেশ আমাদের মধ্যে কি কোন ব্যবধান আনল?

কোন উত্তর নেই। শুধু চাঁদের আলো বিরাট্ বার্চ গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে বিষাদময় মায়াজাল রচনা করে নীরব হয়ে রইল। আবার ভাবলাম, কিন্তু কোন সাড়া নেই।

বুঝলাম যে সে মায়া লোপ পেয়ে গেছে কোন কারণে; সে বীণার সোনার তার কেটে গেছে হয়ত অকারণে। কিন্তু আজ, আজ আর প্রশ্ন করে লাভ নেই। রাশিয়ান মন আজো আমি বুঝে উঠতে পারি নি। না হলে সোনা শুধু একটি তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এমন করে ভাবলেশহীনা হয়ে গেল।

'ট্রয়কা'তে চড়ে একসঙ্গেই ফিরে এলাম। পথে যেতে যেতে আকাশপাতাল কত কি যে ভাবলাম তার ইয়ত্তা নেই। কেন সোনা এত নীরব রইল। সে কি বিদেশী বলে বিদ্বেষ করবে আমায়? না, রাশিয়ার প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি ত প্রায় বিদেশই বটে আর সে তো আমায় মঙ্গোলীয় বলেই ধরে নিয়েছিল? ভারতীয় কি তার চেয়েও বেশী বিদেশী?

তবে কি ভারতীয় বলে সে আমায় হেলা করলে? তাও ত নয়। যে রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখেছে, তাঁর কবিতার অনুবাদ পড়েছে সে ত এ রকম করতে পারে না। আর রাশিয়ানরা তো ভারতবিদ্বেষী মোটেই নয়।

তবে? পুরো একটা সপ্তাহ অভিমান? প্রশ্নাকুল চিত্তে আমি চুপ করে রইলাম। রেস্তোরাঁ ও রাজপথ দুই-ই ছেড়ে দিলাম; আপিস থেকে বাসায় সোজা চলে এসে ডাকের প্রতীক্ষা করতাম। কিন্তু তার কোন সাড়াই পেলাম না। সারাটা সোনার সন্ধ্যা ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থেকে থেকে অধীর হয়ে যখন পোশাক ছেড়ে কালো পাড় দেওয়া লাল রঙের কশাক পায়জামা পরে বিছানায় শুয়ে পড়তাম নিজেকে এত অসহায় মনে হ'ত। এতদিন প্রেমের কবিতা পড়িনি; ভাবতাম ওসব জিনিষ মানুষের উদ্ভট কল্পনার ছবি। নিজের জীবনে যখন প্রেমের সত্যিকার অনুভূতি এল তখন কবিতা পড়ার সময় বা প্রয়োজন ছিল না। দুই-ই এল তখন যখন প্রেম সোনালী সন্ধ্যার মত জীবন থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে।

ভাল লাগত না কিছুই। প্রেমের কবিতাও নয়। শেষে এল অভিমান। বেশ শুধু একটা সত্য কথা, যেটা অগৌরবের নয়, অপকারেরও নয়, তারই প্রকাশে যদি প্রেম উবে যায় কর্পূরের মত, তাকে যেতে দাও। এই রাশিয়ার বরফের মতই যদি তা সত্যের উত্তাপে গলে যায় তবে যাক। বুঝে নিলাম যে রাশিয়ান প্রেম তুষারশীতল, কিন্তু তা গলে প্রাণগঙ্গারূপে প্রবাহিত হবার নয়।

কিন্তু হায়, অভিমানে ত মন মানে না। নিয়তির মত

চিরন্তন যে প্রেম তাকে কি এত সহজে মন থেকে সরিয়ে রাখা যায় ? সোনিয়া না হয় আর নাই দেখা করতে আসে, আমিও ত আর তার খবর নিই নি। কে জানে সে হয়ত এর মধ্যে আমার সন্ধান করে ফিরে যাচ্ছে কতদিন ; সে নিজেও হয়ত কত কষ্ট পাচ্ছে আমার কথা ভেবে, আমি তার খবর নিচ্ছি না বলে। অথবা কে জানে হয়ত তার অসুখও করে থাকতে পারে সে দিনকার দুরন্ত শীতে নৈশ অভিযানের পর।

এ কথা মনে হবার পর আর চুপ করে থাকতে পারি না। তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা কইলাম এবং আবার দেখা হওয়ার বন্দোবস্তও করলাম। যাতে ভাল ভাবে কথাবার্ত্তা হতে পারে এবং তার মন বুঝতে পারার মত প্রচুর সময় পাই তার জন্ত একটা ভাল সুযোগও মিলে গেল। আমারই আপিসের এক বন্ধু ভ্যাসিলি সপরিবারে শহরের বাইরে একটা 'ডাসা'য় সপ্তাহান্ত কাটাতে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে সম্প্রতি সোনিয়ার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, আমার সামান্ত ইঙ্গিতেই ভ্যাসিলি ও তার স্ত্রী সব বুঝে নিলে। তাদের নিমন্ত্রণ সোনিয়া সানন্দেই গ্রহণ করলে। ভ্যাসিলি বড় ভাল লোক আর দরদী বন্ধু।

তারই সহানুভূতির সুযোগ নিলাম আমরা। তারা সন্ধ্যার দিকে বাইরে বেড়াতে গেছে এমন সময় এল ঝড়বৃষ্টি। শুধু সোনিয়া ও আমি মুখোমুখি বসে আছি দুটো চেয়ারে। এর মধ্যে সেদিনের ব্যাপার সম্বন্ধে কোন কথা হয় নি, যথেষ্ট সময় আমরা পাই নি বলে। আজ আমি সে কথা তুললাম। কিন্তু গৌরচন্দ্রিকা ছাড়া কোন কথাই সুরু করতে সাহস পাই না, বাঁশীতে ফাটল ধরেছে কিনা আগে একটু বাজিয়ে দেখা ভাল।

ঘরটার মাঝখানে দেওয়ালে হেলান দেওয়া একটা আয়নার সামনে ঝড়ের হাত থেকে আশ্রয় নিয়ে বসেছে দুটো পাখী—চড়ুই পাখীর মত দেখতে। বললাম—দেখেছ সোনা, ওদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে ; তাই ঠোঁটে ঠোঁটে ঠোকাঠুকি করে সরে যাচ্ছে আয়নার সামনে থেকে।

হেসে সে বললে—সেনস্কি, তুমি বোধ হয় মস্কোর পাখীদের কথা ভাবছ ; এরা কিন্তু হচ্ছে বনের পাখী। তাই ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে আদর করছে ; ঠোকাঠুকি নয়।

'তা হ'লে আয়নার সামনে থেকে সরে যাচ্ছে কেন ?'

বাঃ রে, ওদের বুঝি লজ্জাসরম নেই ; আয়নায় নিজেদের কাণ্ড দেখে নিজেরাই কুণ্ঠায় সরে যাচ্ছে, কিন্তু দেখ আবার এগিয়ে আসছে।'

ওর কথায় আশা ও আশ্বাসের আভাস পেলাম, বললাম—দেখ এই ঝড়ের মধ্যে পড়ে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে আমরাও হয়েছি ঝড়ের পাখী ; আমার সোনা পাখী কিন্তু সে দিন শুধুই সরে গেল, আর এগিয়ে এল না।

'কে বলে সে সরে গিয়েছিল ?'

'তবে তুমি এমন চুপ করে ছিলে কেন ?'

'বাঃ আমার বুঝি ভাবতে নেই ?'

'আর আমার বুঝি ভাবনাকে ভাগ করে নিতে নেই ?'

'কিন্তু সব জিনিষ ত ভাগাভাগি করে নেওয়া যায় না।'

'এ জিনিষটা নিশ্চয়ই নেওয়া যায়। আর তুমি ত জিজ্ঞেসও করলে না কেমন ভাবে আমি কাটিয়েছি এই কটা দিন।'

খাঁটি রাশিয়ান প্রকৃতি তার। সে হেসে বললে—যা কাটিয়ে দিয়েছ তার কথা থাক। কি করেছ তুমি তা আমি ভাল করেই জানি। ওই তোমার প্রিয় পুশকিনের কবিতা আওড়েছ। এখনি হয় তো অভিযোগ করে বলবে :

When you're away, I yawn and mope ;
When you are here, I ache and prie :
I recognise by every sign
I 've lost my heart beyond all hope.

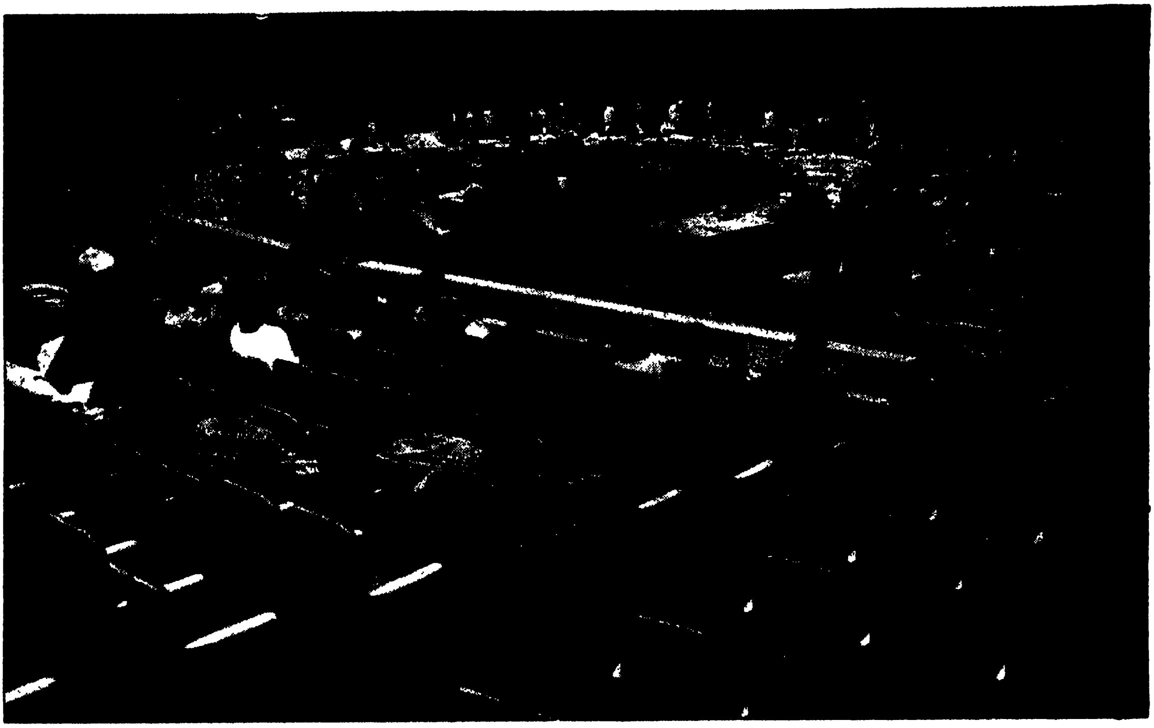
অভিমান করে বললাম—থাক থাক, আমি কেমন করে কাটিয়েছি তার কথা থাক। তুমি ত পরমানন্দে আপদ চুকল মনে করে স্কলারশিপ পাবার পথটা ভাল করে তৈরি করছিলে। যেমন মনের আনন্দে কবিতা আওড়াচ্ছ তাতেই বোঝা যাচ্ছে।

সে ক্ষুণ্ণ হ'ল এ কথাতে ; কিন্তু ক্ষোভের চেয়ে বেশী তার সহানুভূতি। স্বরে আড়ষ্টতা নেই একটুও, কিন্তু প্রচুর কারুণ্য ভরে সে বললে—না তা নয়, আমি সব পথই আঁধার দেখছি। আমাদের দেশের চারদিকে যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, সমাজে রাষ্ট্রে যে বিপ্লব নির্ঘাত এসে পড়ছে তার মধ্যে কোন আলো, কোন আশা খুঁজে পাচ্ছি না।

ঝড়ের গর্জ্জন আরো প্রবল হয়ে এল ; বজ্রগর্জ্জনে মস্কোর আকাশ মুখরিত হয়ে উঠল ; বহুদূরে ক্রেমলিন প্রাসাদের নীল ও সোনালী চূড়ার উপর বিদ্যুতের আতসবাজী খেলতে লাগল। সোনিয়া তার চেয়ারটা টেনে এনে একটু নিবিড় হয়ে আমার পাশে বসল।

সে বলতে লাগল—জান, আজ রাশিয়াতে প্রত্যেক অল্পবয়স্ক বা চিন্তাশীল পুরুষ ও নারী হচ্ছে বিপ্লবী। আমরা এই অত্যাচার, অবিচার ও অনাচার ভরা রাজত্ব উচ্ছেদ করে দিতে চাই। যুদ্ধে আমরা হেরে যাচ্ছি, আমাদের অবস্থাপন্ন লোকেরাও কাশা (সরু চাল ও মাংসের ঝোল) পর্য্যন্ত খেতে পাচ্ছে না ওই ঘুষখোর ঘুণধরা রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার জন্ত। সব তো তুমি জান ; তোমাদের রাজদূতাবাসে কোন খবরই অজানা থাকবে না। একটু থেমে সে আবার বললে—ওই দেখ দূরে ক্রেমলিনের চূড়াগম্বুজের চার পাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আমাদের পার্টির সভ্যেরা এই মুহূর্ত্তে লোকদের মধ্যে প্রচার

স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর-প্রসঙ্গ



স্বস্তি পরিষদের একটি সভার অধিবেশন—(বামদিকে) ভারতের প্রতিনিধি ডাঃ পদ্মনাভ পি পিল্লাই কাশ্মীর-প্রসঙ্গে বক্তৃতা করিতেছেন



স্বস্তি পরিষদের একটি সভায় বক্তৃতা প্রদানরত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এম. এ. হাসান ইস্পাহানী



কাশ্মীরের গিলগিট অঞ্চলে সর্দ্দারদের বার্ষিক সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক পোলো প্রতিযোগিতা



কাশ্মীরের হুনজা অঞ্চলে একটি যবের ক্ষেতে শস্য আহরণরত বালিকাদ্বয়

করছে যে ওই বিদ্যুৎ চমকানতেই জার সাম্রাজ্য যে ছারখার যাবে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে।

বললাম—সে সবই ত জানি। চাকরীর খাতিরে আমি নিরপেক্ষ হলেও তোমার মনকে যে এ সব ব্যাপার তোলপাড় করে তুলবে তাও বুঝতাম। কাকেই বা না করে? কিন্তু তুমি কি লেনিনের দলে সত্য সত্যই ঢুকেছ?

সন্ধ্যাতারার মত উজ্জ্বল অচপল চোখ দুটি আমার দিকে তুলে সে বলল—হ্যাঁ, সম্প্রতি আমি ঢুকেছি আর সেজন্যই আমি তোমায় ভালবেসে কষ্ট দিলাম ও পেলাম। ছাড়াছাড়ি আমাদের মধ্যে ত হবেই।

ম্লান চঞ্চল চোখে আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কি বলব ভেবে পেলাম না। আবেগে উদ্বেগে মনে হ'ল শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। সে বলে চলল—আমি ভেবেছিলাম, তোমাকেও আমাদের গোপন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে নেব। কিন্তু তোমার যা চাকরী তাতে তোমায় চাকরী ছাড়তে হবে। তা ছাড়া হায় তুমি ত বিদেশী এবং এ মন্ত্রে অবিশ্বাসী; তোমার ও আমার এক পথ নয়।

সে কথা ঠিক। আমি কোনদিনই গোপন অগ্নিমন্ত্রে বিশ্বাস করি নি। ভবঘুরে ডানপিটে হতে পারি কিন্তু গুপ্ত হত্যা ও গোপন প্রচার আমার মেরুদণ্ডে সইবে না। তা ছাড়া ভালবেসে সোনিয়া হয়েছে মরিয়া আর আমি চেয়েছি বাঁচতে, এবং এখন চাই তাকে বাঁচাতে।

তবু বললাম—এখন বুঝছি তুমি সেদিন কেন এমন করে চুপ করে গেলে আমি ভারতীয় শুনে। কিন্তু তাতেই বা কি? তোমাদের মন্ত্র ত শুধু রাশিয়ার জন্য নয়, বিশ্বের জন্য। কাজেই আমি তোমাদের দলে না গেলেও তোমার ভালবাসা ত পেতে পারি। তুমি আর আমি যেমন আছি তেমনই থাকব। তুমি আমায় ভালবাস এমনি করে। ম্লান অথচ বলিষ্ঠ একটা হাসির আভাসের মধ্য দিয়ে তার কথা ফুটে বের হ'ল—তা হয় না সেনস্কি। তুমি আমায় ভালবাসবে অথচ আমার পথে আসবে না; আমাদের লোকরা তোমায় জারের বা শত্রুপক্ষের চর মনে করবে। তুমি আমার পথে বিশ্বাস না করেও বিদেশী হয়েও আমাদের সঙ্গে নাম লেখাবে এমন অন্যায় আমি হতে দেব না কিছুতেই। বলতে বলতে আত্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা তার মুখে একটা অপরূপ জ্যোতির আভাস এনে দিল।

সে আভাসে আমারও মন আলোয় ভরে গেল। আমি সোৎসাহে বললাম—কিন্তু আমিও যদি তোমার পথে আসি, তোমার মন্ত্রে দীক্ষা নিই তা হলে ত কোন বাধা নেই।

দৃঢ় ভাবে তার অধর চেপে একটুখানি চুপ করে রইল সোনিয়া; পরে বলল—তাতেও বাধা আছে। আমি তোমায় ভালবাসি এবং সেজন্যই ভালবাসার ব্যভিচার তোমায় করতে দেব না। তুমি আমায় ভালবাস কিন্তু আমার দেশকে নয়, আমার মতকে নয়।

তবে, তবে আমাদের ভালবাসা কি এখানেই শেষ হবে? ব্যাকুল প্রশ্নে আমার একটা হতাশা ও বেদনার সুর ফুটে উঠল।

যে উত্তর পেলাম তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। ইহলোকের বাসনা কামনা সব কিছুকেই আমরা ভারতীয় মনে অতীন্দ্রিয় রূপ দিয়ে পরলোকের হিসাবের কোঠায় তুলে দিয়েছি। সে প্রেমমিলনকে দিয়েছে মাধুরী, বিচ্ছেদকে দিয়েছে সান্ত্বনা। কিন্তু রাশিয়ান চরিত্র অন্য ধাতুতে গড়া। সোনিয়া তারই প্রাণময় স্ফুরণ; তারই সবল সহজ বাস্তব বিকাশের ফলে সে আমায় ভালবেসেছিল। সে বললে—সেনস্কি, তোমাদের টাগোরের প্রেমের কবিতা আমি পড়েছি আগেই; তোমার মনের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার সামঞ্জস্য আমি অনেক দিন আগে থেকেই লক্ষ্য করেছি। কারণ অবশ্য আগে জানতাম না। তুমি রাগ করো না, দুঃখ করো না। নিরভিমান মন নিয়েই আমি বলছি যে তোমরা আকাশে মাথা তুলে হাঁট আর আমরা মাটিতে পা ফেলে চলি। সবাই এগিয়ে যাই, কিন্তু আদর্শ আমাদের আলাদা।

বেদনার্ত কণ্ঠে আমি বলে উঠলাম—না, না সোনা, আদর্শ কখনো আলাদা হতে পারে না। আমরা ভালবাসি, সেটাই সত্য, আজকের ঝড়, বিপ্লব সবই ত শেষ হয়ে যাবে এক দিন; তোমার মনে রেখো ভালবাসা, আমার মনে রাখব আশা। সেটাকে আমাদের অবলম্বন হতে দাও। বলতে বলতে তার শীতল বিবশ হাত দুটি চেপে ধরলাম।

কড় কড়াৎ শব্দে একটা বজ্র কাছেই ফেটে পড়ল। বিদ্যুতের আলোয় চকিতের জন্য উদ্ভাসিত তার মুখখানি দেখলাম চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। আর আমি? লোকে বলে পাথরের মত দেহের ভিতরে আমার পাথরেরই মত মন; তা যে একবার মাখনের মত গলে গিয়েছিল তা কেহ জানে না।

সোনা বললে—তুমি নিশ্চয়ই এত দিনে বুঝতে পেরেছ আমরা মাটির মানুষ, আমাদের প্রেম মাটির, যদিও আগুনের আভায় তা সোনা হয়ে ওঠে। আমি তোমার মত ভালবাসার আশা নিয়ে মন বেঁধে বসে থাকায় সান্ত্বনা পাব না। আমার হাত দুটিকে সে সবলে নিজের আয়ত্ত করে বললে, বুঝতে কি তুমি পার না আমার কামনা আকাঙ্ক্ষা সবই পেয়ালার শেষ তলানিটুকু পর্য্যন্ত আমি পেতে চাই। যাকে ভালবাসি তাকে শুধু হৃদয়ে নয়, গৃহে, শুধু প্রিয়রূপে নয়, স্বামীরূপে পেতে চাই।

আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি, ততক্ষণে বললাম আমিও ত ঘর বাঁধতে চাই, এদেশেই এখানেই হবে আমার ঘর। হও তুমি আমার সহধর্ম্মিণী।

বেদনার্দ্র কণ্ঠে সোনা বললে—না না, আমার যে চাই সহকর্ম্মী। যে নিজে থেকে নিজের বিবেক নিয়ে আমার

পাশে এসে দাঁড়াবে সে ত তুমি নও। আর তোমার বদলাবারও সময় নেই, মেঘ জমে গেছে; বজ্রপাত হচ্ছে, ঝড় বইছে দু'এক দিনের মধ্যেই।

তা আমি জানতাম; কিন্তু এত শীঘ্র যে তা আমি কেন, জার দ্বিতীয় নিকোলস নিজেও জানতেন না। ভ্যাসিনীরা এসে পড়ায় সেদিন আর কথাবার্ত্তা হয় নি। ওরা যদি ঘুণাক্ষরেও সোনিয়ার ইতিহাস জানত তা হলে তাকে পরদিনই ১১ নং লুবিয়ান্‌কাতে অর্থাৎ মস্কোর 'চেকা' পুলিসের অতিথি হতে হ'ত।

পরদিন সকালেই সরকারী আদেশে আমায় চলে যেতে হ'ল একটা প্রাদেশিক শহরে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের জন্য। শুধু টেলিফোনে সোনাকে জানিয়ে যেতে পারলাম—আবার যেন দেখা হয়। বুকে তখন আসন্ন ঝঞ্ঝার পূর্ব্বাভাস বইছে, বাজছে গুরু গুরু ডমরু রব।

হাঁা, আবার দেখা হয়েছিল বই কি। দিন সাতেকের মধ্যে আদেশ পেলাম পত্রপাঠ ফিরে আসতে। ফিরবার পথেই দেখলাম জার পদত্যাগ করেছেন ও বিপ্লবীরা নূতন সরকার গড়ছে। আপিসে ছুটে এসে পৌঁছাতেই আদেশ পেলাম যে আমাদের রাজদূতাবাসের কয়েকটি চিহ্নিত লোককে রাশিয়া থেকে বাইরে সরাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে, এখনি আমায় মোটর ভ্যানে উঠতে হবে। সময় পেলাম না; বিনীত প্রার্থনা করেও সময় পেলাম না একটি দিন পরে রওনা হবার; এমন কি চাকুরী ত্যাগ করে নিজের দায়িত্বে থেকে যাবারও অনুমতি পেলাম না। বাকী সবার মঙ্গলের জন্য আমাকে এ দেশ থেকে হঠাৎ এমনি চলে যেতে হবে।

বাইরে শত শত বৎসরের বাঁধ ভেঙে রাশিয়ার জন-প্রবাহ বিপ্লব বন্যায় দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। যে লাল চৌকায় (Red Square) আইভান দি টেরিবলের সময় থেকে বলশেভিকদের মে দিবস পালনের সময় পর্য্যন্ত সহস্র নির্যাতন হয়েছে সেখানে ক্রেমলিনের রক্তবর্ণের উচ্চ প্রাচীরগাত্রের পটভূমিকায় চল্লিশ সহস্র বিপ্লবী সৈন্য সগলব্ধ স্বাধীনতা ঘোষণা করে মার্চ্চ করে যেতে লাগল। তাদের পিছনে চলতে লাগল বৈপ্লবিক বাহিনী, ছাত্র, কেরাণী, আইন-ব্যবসায়ী, শহুরে চিন্তাশীলের দল। সবাই তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে টুপী উড়িয়ে; বিজয় গৌরবে, আদর্শের সাফল্যে তাদের মুখ উদ্ভাসিত। আমি কিন্তু প্রাণপণে চোখ মেলে চারদিক দেখছি; কোথায় সোনা। সে যে আশ্বাস দিয়েছিল আবার শীঘ্র দেখা হবে।

পরে দেখা হয়েছিল। বিপ্লবী বাহিনীর অভিযান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তাকে দেখতে পাবার আশা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বুকের মধ্যে একটা দুঃসহ বেদনা মূর্চ্ছিত হয়ে রয়েছে এমন সময় আমারই ভ্যানের পাশে হঠাৎ সে বাহিনীর গতি ভঙ্গ হ'ল; কে একজন হঠাৎ পড়ে গেল; তাকে পিছনের কয়েক জন তুলে ধরল কিন্তু তার পা চলতে চাইছে না। বুঝলাম সে হয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য ইচ্ছা করে অথবা মানসিক উত্তেজনায় সে পা পিছলে পড়েছিল। তার সন্ধ্যাতারার মত দীপ্ত চোখ দুটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার পরেই মাটির মেয়ে সোনা তার মর্ত্ত্যের স্বর্গ অভিমুখে আবার মার্চ্চ করে এগিয়ে যেতে লাগল। বুক ফেটে একটা আহ্বান বেরিয়ে আসছিল; কিন্তু মুখ ফুটে তা বের হবার আগেই আমার সহকর্ম্মীরা মুখ চেপে ধরল। নীরবে নতমুখে বিনা প্রতিবাদে আমি বসে পড়লাম। আমার নিজের হৃদয়ের চেয়ে, আমার মানসী প্রতিমার চেয়ে আমার সহকর্ম্মীদের নিরাপত্তার দাম অনেক বেশী।

সে দিন মস্কোর আকাশে কিন্তু মেঘ বা বিদ্যুৎ কিছুই ছিল না। আসন্ন সন্ধ্যার সোনালী আলো লাল চৌকার লাল দেওয়ালে প্রতিফলিত হয়ে আরও বেশী সুন্দর দেখাচ্ছিল। আর ভল্‌গার স্রোতধারার মত সোনার সোনালী কেশরাশি সে আলোয় মার্চ্চের তালে তালে দুলতে দুলতে জনতার মধ্যে শেষবারের মত মিলিয়ে গেল।

শ্রী:যোগেশচন্দ্র রায়

শ্রীগোপাল লাল দে

নগরীর প্রান্তদেশে স্বস্তিপূর্ণ 'স্বস্তিক' ভবনে,
বিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধ ঋষি শ্বেত শ্মশ্রু, শ্বেত উত্তরীয়;
তীক্ষ্ণ অবধানী দৃষ্টি জ্ঞানাগ্নিতে নিয়ত হবনে,
নিরন্তর ঋষি যজ্ঞে দীপ্ত করে আত্মা ভারতীয়।

মৃত্তিকায় বাস তার, মানস ভ্রমিছে নভোঙ্গনে,
ভাষা'কহে আধুনিক, অতীত সাহিত্যে সঞ্চরণ;
অবসরে নিরলস, শিক্ষা দেয় সারস্বতগণে,
রাজা আসে নতশিরে বিনীত বিবুধ জগণন।

বিলাস করেনি স্পর্শ, সম্পদ দিল না মলিনতা,
দর্পহীন বিদ্যা তার, দাহহীন জ্ঞান সমুজ্জ্বল;
খ্যাতির প্রশস্ত ক্ষেত্র রাজধানী হেলি' ত্যজিল তা',
আদরে পশ্চিম রাঢ়ে আশ্রম রচিল সুবিমল।

কৃষক, সরল শিশু জানে তারে বান্ধব স্বকীয়,
বুধগণ জানে তারে পণ্ডিতেরো অনির্ব্বচনীয়।

মানুষ ও মুসলমান

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

উদার এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টি সকল ধর্ম্মের মূলেই এক শাশ্বত সত্য দেখিতে পায়। ইস্‌লামের মূলেও এই সত্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত। এই শাশ্বত বস্তু মানবত্বের পরিপোষক, পরিপন্থী নয়। কিন্তু সকল ধর্ম্মেই এবং ইস্‌লামেও এমন সব তথাকথিত ধার্ম্মিক আছেন যাঁহাদের নিকট এই শাশ্বত সত্য অপেক্ষা ধর্ম্মের বহিরঙ্গ আচার, অনুষ্ঠান প্রভৃতির মূল্য বেশী। এইখানেই ধর্ম্ম মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করিয়া—'মুসলমান' মানুষকে খর্ব্ব করিয়া—বড় হইয়া পড়ে। কিন্তু ইহা একটি ভ্রম,—শুধু ভ্রম নয়, বিপজ্জনক ভ্রম। ইহার ফলে শুধু যে মানুষ হইতে ধর্ম্ম বড় হইয়া পড়ে তাহা নয়, ধর্ম্ম হইতেও সম্প্রদায় বড় হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানে মুসলমান-সমাজে—বিশেষতঃ ভারতের মুসলমান-সমাজে এই ভ্রান্তির বিস্তৃতি ও প্রভাব দেখিয়া মনে হয় ইহার উৎপত্তি এবং উৎসাদনের কথা চিন্তার অযোগ্য নয়। সেই জন্যই কথাটা তুলিতেছি। আর মানুষ ও মুসলমানের মধ্যে যে একটা প্রভেদ সম্ভব, এই কথাটার উপরও আমাদের সেইজন্যই জোর দিতে হইতেছে।

ঈশা মূসা কিংবা বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতির প্রচারিত ধর্ম্ম মানুষের সমাজের বাহিরে যায় নাই, ইহা সব সময় মনে না রাখিলেও আমরা জানি। ইসলামও তেমনই মানুষের বাহিরে কোন উদ্ভিদ্ বা প্রাণী গ্রহণ করে নাই। স্বর্গের ফেরেশতারা ঈশ্বরের আদেশে চলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত ধর্ম্ম অনুসরণ করেন, এরূপ কথা কোন কোন ধর্ম্ম বলে। আর জগতের সকল ধর্ম্মই একথা বলে যে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী প্রভৃতিও ঈশ্বর-শাসিত। কিন্তু এই সমস্ত কথার অর্থ এই নয় যে, ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝায় মানুষ ছাড়া আর কেহ তাহা অনুসরণ করিতে পারে। সুতরাং ইস্‌লামও মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; অর্থাৎ মুসলমান সকলেই মানুষ।

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে করা উচিত যে, সকল মানুষই মুসলমান নয়। অ-মুসলমানকে 'কাফের' বলা চলে, এবং অনেক সময় বলা হইয়াও থাকে; কিন্তু তাহাকে অমানুষ বলা চলে না। সুতরাং মানুষ ও মুসলমানের দুইটি বৃত্ত আঁকিলে দ্বিতীয়টি প্রথমটির একাংশ থাকিবে, উহার সমান হইবে না। মানুষ মাত্রেই মুসলমান নয় বলিয়া উভয়ের মধ্যে একটা প্রভেদও রহিয়াছে; মানুষত্ব ও মুসলমানত্ব একত্র অবস্থান করিতে পারিলেও সর্ব্বদাই একত্র থাকে না; সুতরাং উহারা পৃথক্-গুণ।

কেহ হয় ত ইহারই মধ্যে বিরক্ত হইয়া ভাবিতেছেন, ইহা এমন কি একটা গূঢ় তত্ত্ব যে উহাকে লইয়া এত আলোচনা? আমাদের প্রয়োজন এই যে, মাঝে মাঝে মানুষ ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তখন কোন্‌টি বড় তাহা প্রশ্ন হইয়া দাঁড়ায়। উভয়ের প্রভেদ জানা না থাকিলে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। যে যে-ধর্ম্মের অনুসরণ করে, তাহার কাছে সেই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সনাতন সত্য, এবং চরম আবিষ্কার। সেই অনুসারে প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছেই নিজের ধর্ম্মের বাহিরের লোকেরা দ্বিপদ হইলেও মানুষের ষোল আনা মর্য্যাদার অধিকারী নয়। প্রাচীন ভারতের আর্য্য অনার্য্য, ও প্রাচীন ফিলিস্তিনে ইস্‌রায়েল ও ইস্‌রায়েলের বাহিরের লোকেদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে আমরা এই সত্য উপলব্ধি করি। তেমনই বর্ত্তমান ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে যাহারা অত্যুগ্র বিশ্বাসী তাহাদের কথায় ও আচরণে আবার এই সত্যের সাক্ষাৎ মিলে। এই মত অনুসারে ধর্ম্মবিশেষ যে অনুসরণ করে সে ভিন্নধর্ম্মী হইতে বড়।

প্রত্যেক ধর্ম্মেরই প্রচারের প্রথম দিকটায় দেখা যায় যে, কতকটা আত্মরক্ষার জন্য এবং কতকটা প্রচারের সুবিধার জন্য সেই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তকেরা যথাসম্ভব সঙ্ঘবদ্ধ হইতে চেষ্টা করে। বৌদ্ধদের মঠের এবং খ্রীষ্টানদের গীর্জ্জার সংগঠনের ইতিহাসে আমরা ইহা দেখিতে পাই। প্রথম খলিফাদের আমলে ইস্‌লামেও উহা দেখা যায়। এই ভাবে ধর্ম্ম বৃদ্ধি ও প্রসার লাভ করে। তার পরের স্তরে দেখা যায়—ধর্ম্ম রাষ্ট্রের অধিকারী হয়, রাষ্ট্রশাসনের কৌশলও আয়ত্ত করে এবং দায়িত্বও গ্রহণ করে। ইস্‌লামের খলিফারা তাহা করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ভিক্ষুরা কিংবা হিন্দু সন্ন্যাসীরা তাহা করেন নাই সত্য, কিন্তু ঐ ধর্ম্মাবলম্বী সম্রাটেরা তাহা করিয়াছেন, যেমন অশোক, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি। আর খ্রীষ্টান পোপের রাজশক্তি এখনও একেবারে লোপ পায় নাই।

অতীতে এইরূপ ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রের মিলিত ক্রমবিকাশে দেখা যায় যে রাষ্ট্রবোধ প্রবল হইলেই ধর্ম্মের শাসন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং ধর্ম্ম রাষ্ট্রীয় ব্যাপার হইতে ক্রমে সরিয়া পড়ে। আরও পরে ধর্ম্ম স্বয়ং রাষ্ট্রের অধীন হইয়া পড়ে। ইউরোপের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই, আর ইস্‌লামেরও পরবর্ত্তী খলিফারা এবং আরও পরে বিভিন্ন দেশের বাদশাহেরা ধর্ম্মকে অস্বীকার না করিলেও ধর্ম্মের অধীনতাও স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা নিজের ধর্ম্মের

লোকদিগকে অতিরিক্ত সুবিধা দিলেও অন্য ধর্ম্মের অস্তিত্বও বরদাস্ত করিয়াছেন এবং সেই সেই ধর্ম্মের লোকদিগকে আশ্রয় দিতে এবং রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। ধর্ম্ম অস্বীকৃত না হইলেও ধর্ম্মের ভিত্তিতেই ঠিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ও শাসিত হইত না। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য রাজ্য দখল অনেক মুসলমানই করিয়াছেন। খ্রীষ্টানদের মধ্যেও সে জিনিসটা একেবারে অজ্ঞাত নয়। মধ্য যুগে প্যালেস্টাইন ও জেরুজালেম মুসলমানদের হাত হইতে ছিনাইয়া লওয়ার জন্য যে 'ক্রুজেড' বা 'জেহাদ' হইয়াছিল, তাঁহারও মূলে ঐ আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান ছিল। রাজ্য বিস্তৃত করিয়া ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা সকলের অপেক্ষা কম করিয়াছেন বোধ হয় হিন্দুরা ও বৌদ্ধেরা। তাঁহারা ঐ কাজটি করিয়াছেন সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক ও ভিক্ষুদের সাহায্যে।

কিন্তু রাজ্য বিস্তারের মূল উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, রাজ্য বিস্তৃত হইয়া গেলে পর সুশাসক মাত্রেই পরধর্ম্ম সহ্য করিতে শিখিয়া লইতেন। ভারতের মুসলমান শাসকদের মধ্যে আকবর ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইসলামের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে।

ক্রমে মানুষ রাষ্ট্রের উন্নতিবিধানের জন্য অনেক রকম চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে ধর্ম্মের স্থানই প্রধান ছিল না। ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টের সূচনা, রাজার পদচ্যুতি ও মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি অনেক বড় বড় ঘটনা মানুষের অধিকারের দাবিতে—রাজার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের, উচ্চ শ্রেণীর বিরুদ্ধে নিম্ন শ্রেণীর অধিকারের দাবিতে ঘটিয়াছে, কোন ধর্ম্মবিশেষ বা ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষের উন্নতির জন্য নয়। রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্টদের মধ্যে যে মারামারি কাটাকাটি হইয়াছে তাহা আমরা ভুলিতেছি না। তাহার মধ্যেও অনেক সময় রাষ্ট্রীয় অধিকারের কথাও ঢুকিয়াছিল, কিন্তু খুব বেশী নয়, এবং উহা খুব বেশী দিন ছিলও না। অবশ্যই এখনও কোন রোম্যান ক্যাথলিক ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসিতে পারেন না। কিন্তু এই পর্য্যন্তই। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় অধিকারে ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় অনুসারে পার্থক্য খুবই কম। স্পেনে এবং ফরাসী দেশেও ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্টদের কলহ ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এবং ইহাতে জয়-পরাজয় রাষ্ট্রীয় অধিকারেও পার্থক্য ঘটাইয়াছে। কিন্তু ফরাসী ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঘটনা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লব তাহা মানুষের অধিকারের জন্যই ঘটিয়াছিল—ধর্ম্মবিশেষের সুবিধা বা সমৃদ্ধির জন্য নয়। আর আধুনিক যুগের প্রকাণ্ড ব্যাপার রুশ বিপ্লব ধর্ম্মকে একেবারে প্রকাশ্যে তিরস্কার ও বর্জ্জন করিয়াই হইয়াছে। এই সব ব্যাপারে দেখা যায় যে, মানুষ ও ধর্ম্মবিশেষের অনুসরণকারীর মধ্যে একটা প্রভেদ আছে, সুতরাং মানুষ ও মুসলমানের মধ্যেও একটা পার্থক্য রহিয়াছে, আর এই পার্থক্য ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের চিন্তা মনুষ্যত্বকে ধর্ম্মবিশেষ অনুসরণ করা অপেক্ষা অনেক বড় মনে করিয়াছে।

মানুষের অধিকারের আলোচনায় সকল ধর্ম্মেরই কম-বেশী দান রহিয়াছে। যে ধর্ম্ম যখন আবির্ভূত হইয়াছে, তখন উহা মানুষকে উন্নত করিবার জন্যই আসিয়াছে—তাহাকে খর্ব্ব করার জন্য নয়। পরে যখন ধর্ম্মে ধর্ম্মে কলহের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন ধর্ম্মবিশেষ অন্য ধর্ম্ম হইতে নিজেকে বড় মনে করিয়াছে এবং সেইজন্যই অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে হেয় মনে করিয়াছে। এই ভাবেই কখনও কখনও ধর্ম্ম মানুষের উপরে নিজের স্থান করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং ঠিক এই ভাবেই ইসলামও মানুষ ও মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ করিয়া মুসলমানকে মানুষের উপরে স্থান দিয়াছে এবং এখনও দিতে চায়।

ইসলাম মানুষকে কি কি দিয়াছে, তাহা একটা ঐতিহাসিক প্রশ্ন। মুসলমানেরা সব সময় ভাবিতে না চাহিলেও ঐতিহাসিক ভাবিতে পারেন। তবে, খুব সূক্ষ্ম বিচার না করিয়াও ইহা সহজেই স্বীকৃত হওয়া উচিত যে, মানবের বিরাট সভ্যতা-সৌধের সবকিছু উপাদানই ইসলাম দেয় নাই। যেমন শুধু রোম, গ্রীসের সভ্যতাই জগতের সভ্যতা সৃষ্টি করে নাই, অন্যের দানও ইহাতে রহিয়াছে, তেমনই জগৎ শ্রেষ্ঠ যাহা কিছু শিখিয়াছে, সবই ইসলামের কাছেই শিখে নাই; সব কিছু ভাল কোন এক বিশেষ ধর্ম্ম জগৎকে শিখায় নাই, সকলের দানের সমন্বয়ে, সকলের চেষ্টার সমবায়ে, মানবসভ্যতা নামক বিশাল পদার্থটি উৎপন্ন হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারতের অনেক মুসলমানই খুব গর্ব্ব করিয়া বলেন যে, ইসলামই জগৎকে 'ডিমোক্রেসী' বা গণতন্ত্র শিখাইয়াছে। অনুরূপ উক্তি সকল ধর্ম্মের অনুবর্ত্তকেরাই করিয়া থাকেন। সনাতনী হিন্দু বলিবে, যাহা কিছু সনাতন সত্য, তাহা হিন্দু ধর্ম্মই জগৎকে শিখাইয়াছে। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অনুবর্ত্তকেরাও এরূপ কথা বলিতে অধিকারী। এরূপ মনোভাব ইতিহাসকে অতিক্রম করিয়াই বৃদ্ধি পাইতে পারে, অনুসরণ করিয়া নয়। যাঁরা ইসলামের বাহিরে 'ডিমোক্রেসী' দেখিতে পান না, তাঁরা ইসলামও বেশী জানেন না, ইতিহাসও পড়েন না। 'ডিমোক্রেসী' কথাটার সৃষ্টি হয় ইসলামের জন্মের হাজার বছরেরও বেশী আগে, এবং জিনিসটিও প্রথম গ্রীসের লোকেরাই আবিষ্কার এবং প্রবর্ত্তন করে। তার পর স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর কথা খ্রীষ্টান-জগৎও কম শুনায় নাই। খ্রীষ্টের ধর্ম্মের ভিতরও এ সকলের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ইসলাম যদিও জাতি-

ভেদ কিংবা অস্পৃশ্যতা মানে না এবং সেই হিসাবে সব মুসলমানই—সব মানুষ ঠিক নয়—সমান, তথাপি মনে রাখা উচিত যে, রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বলিতে যাহা বুঝায়—অর্থাৎ জনগণের ভোটাধিক্যে শাসননীতি নিয়ন্ত্রণ—তাহা ইসলামের ইতিহাসে খুব বেশী দেখা যায় না। ভারতে-মুসলমান-শাসনে ঐ জিনিসটি মোটেই ছিল না, ভারতের বাহিরেও কম। এখনও কোন মুসলমান রাজ্যই খাঁটি গণতন্ত্র নয়। কামাল পাশার তুরস্কে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ইউরোপের অনুকরণে, খাঁটি ইসলামের শাসন অনুযায়ী নয়। অবশ্যই ইস্লামের প্রবর্ত্তকের চরিত্রে এবং প্রথম খলিফাদের জীবনে এমন সব বস্তু আমরা পাই যাহা ইতিহাস চিরকাল প্রশংসা করিবে। ইঁহাদের নিকট মানবসভ্যতার ঋণ কোন অনুসন্ধিৎসু কিংবা জ্ঞানীই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু তথাপি একথাটা আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, কোন এক ব্যক্তি বা কোন এক ধর্ম্ম জগৎকে সব কিছুই দেয় নাই। আরও একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, মহাপুরুষদের আবির্ভাবের উপযুক্ত প্রতিবেশ সমাজ আগে হইতেই সৃষ্টি করিয়া রাখে। পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু সামজের উৎস হইতেই জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং পুরোগামী য়ীহুদী ধর্ম্ম ও সমাজের শিক্ষা হইতেই খ্রীষ্টের শিক্ষা উদ্ভূত হয়। ইহা ইতিহাসের সত্য, মহাপুরুষদের প্রতি অগৌরব দেখাইবার জন্য নয়, তাঁহাদিগকে বুঝিবার জন্য, বলা হইতেছে। তেমনই ইহাও ত স্পষ্ট যে, মহম্মদের আদর্শ এবং শিক্ষাও য়ীহুদী এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্মের পরিবেশের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়াছিল এবং সেইজন্যই উহা উভয়ের নিকটই কম-বেশী ঋণী। মহম্মদ যাঁহাদিগকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে য়ীহুদী মুসা প্রভৃতি আছেন এবং ঈসাও রহিয়াছেন; আর প্রথম নর-মিথুন আদম ও হাওয়াকে তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং একান্ত মৌলিকত্ব দাবি করিবার অধিকার কোন ধর্ম্মেরই বাস্তবিক নাই। মানুষের চিন্তা হাওয়ায় চলিয়া ফিরে, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত কোথাও উহা উত্তুঙ্গ হইয়া উঠে; সেখানেই আমরা দেখি মহাপুরুষ।

সুতরাং নিজেদের ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকিলেও মুসলমানদের ইতিহাস অস্বীকার করা উচিত নয়। কিন্তু ইহাই আমাদের একমাত্র বক্তব্য নয়। বর্ত্তমানে আরও একটা চিন্তাধারা ও কর্ম্মপদ্ধতি নানা জায়গায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে যাহা দেখিয়া মনে হয়, 'মানুষ'ত্ব ও মুসলমানত্বের তুলনায় শেষোক্তটিকেই বড় কল্পনা করা হয়। সোজা বাংলায়, অনেকের মতে মানুষ হওয়া অপেক্ষা মুসলমান হওয়া বড়! মুসলমান হইয়া জন্ম নিলেই কিংবা মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই কেহ মহাপুরুষ হইয়া যায় না, এবং মুসলমান নয় অথচ উচ্চ চরিত্রের অধিকারী এমন মানুষ আছে। মানবত্বের উচ্চ গুণ বিরহিত হইয়া শুধু মুসলমান ধর্ম্ম মানিলেই কাহাকেও পূজ্য মনে করা যায় না। কথাটা অতি সরল। কিন্তু এক শ্রেণীর লোক বর্ত্তমানে এদেশে দেখা যায় যাহাদের মতে চরিত্র যেমনই হউক না কেন, শুধু ধর্ম্মে মুসলমান হইলেই তাহার মূল্য যে-কোন অমুসলমান মহাপুরুষ হইতেও অধিক। এরূপ ধারণার অসারত্ব প্রমাণ করার জন্য যুক্তি দেখাইতে গেলে শিক্ষিত লোকের বুদ্ধিকে অপমান করা হয়। কয়েকটা অন্ধ বিশ্বাস গ্রহণ এবং কয়েকটা অর্থ না জানা আচার অনুসরণ করিলেই মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করে না। কোনও ধর্ম্মের একান্ত মৌলিকত্ব দাবি যেমন ইতিহাস-বিরুদ্ধ তেমনই ধর্ম্ম অনুসরণ করাটাকে মনুষ্যত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করাও যুক্তি-বিরুদ্ধ।

ভারতে বহু মুসলমান যে অনেক সময় মানুষ হওয়া অপেক্ষা মুসলমান হওয়া শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহার একটা কারণ তাহাদের চিত্তে একটা আহত আত্মাভিমান রহিয়াছে। তাহারা একটা সাম্রাজ্য হারাইয়াছে, নিজেদের দোষেই হারাইয়াছে, কিন্তু তথাপি হারাইয়াছে। যারা শাসক ছিল আজ তারা শাসিতের পর্যায়ে নামিয়া আসিতেছে। সেই ক্ষোভ তাহাদিগকে বৈরাগ্যের দিকে না লইয়া আরও লুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ফল ভাল হয় না। লুপ্ত রোমক গৌরব—রোমান সাম্রাজ্য—পুনর্জীবিত করিবার আকাঙ্ক্ষা সেদিন প্রকাশ পাইয়াছিল মুসোলিনীতে; তাহার সমাপ্তি এখনও আমাদের চোখের সম্মুখে রহিয়াছে। লুপ্ত আর্য্যমহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল হিটলারে। তাহারও পরিণতি আমরা দেখিয়াছি। কাহারও মহিমা লুপ্ত হইলে তাহার মনে বাসনা দ্বিগুণিত না হইয়া বৈরাগ্যও আসিতে পারে, যেমন আসিয়াছিল হিন্দুর মনে। একটি প্রাচীন শ্লোক বলি—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী?
রঘুপতেঃ ক্ব গতা উত্তরকোশলা?
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগৎ ইত্যবধারয়।"

বিভিন্ন রাজ্যের পতন দেখিয়া ইহাই সিদ্ধান্ত করা উচিত যে এই জগৎ সৎ নয়, এ জগতের মহিমা গরিমা চিরস্থায়ী নয়। ভোগের সময়ও এ কথা যে মনে রাখে সে ধীমান্; আর এ সকলের লোপের পর বাসনা উদ্রিক্ত না করিয়া বৈরাগ্যের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলে হয় বিজ্ঞ। কিন্তু সাধারণ ভাবে ভারতের মুসলমান-মন বাসনার লোপের কথা ত ভাবিতেই পারে না, উহার সংকোচকেও মনে করে কাপুরুষতা। সে চায় লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্য দ্বিগুণ উদ্যম করিতে। কিন্তু এরূপ উদ্যম কদাচিৎ সফল হয়, প্রায়

সর্ব্বদাই রক্তপাত ঘটায়, এবং মানুষের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি উদ্রিক্ত করিয়া তাহাকে নীচের দিকে টানিয়া নামায়। আর মুসলমানশাসনই শ্রেষ্ঠ শাসন, সমাজে মুসলমানের কর্ত্তৃত্বই সহনীয়, এরূপ ধারণার মূলেও রহিয়াছে মানুষ হইতে মুসলমানকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবার প্রবৃত্তি।

এই প্রবৃত্তিরই একটা দিক অন্যভাবে প্রকাশ পায় 'মুসলিম জগৎ গঠনের' আকাঙ্ক্ষায়। ইহাও ভারতে শিকড় গাড়িয়াছে। জগতের মুসলমান সব এক হও—ইহাই তাহার ধ্বনি। অর্থ কি? দেশ, ভাষা, চেহারা, আচার, পোশাক ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের প্রভেদ কিছু নয়, শুধু মক্কার দিকে মুখ করিয়া যারা নমাজ করে এবং মহম্মদকে আল্লার পয়গম্বর জানিয়া তাঁহার বিধান মান্য করে তারা এক, অন্যেরা পৃথক। এই ভাবে মঙ্গোলিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া মরোক্কো পর্য্যন্ত এবং তুরস্ক হইতে আরম্ভ করিয়া মলয় উপদ্বীপ পর্য্যন্ত যত মুসলমান আছে তাহাদিগকে সমগ্র অমুসলমান জগৎ হইতে পৃথক করিয়া একটা বিরাট সংহতিতে পরিণত করিবার আকাঙ্ক্ষা ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও অনেক মুসলমানের মনে দেখা দিয়াছে। এই সংহতিই একমাত্র লক্ষ্য নয়। সংহতিবদ্ধ এই বিরাট জনসমষ্টি জগতের অন্য সকল মানুষের উপর প্রভুত্ব করিবে, এই ইচ্ছাও অস্ফুট নয়।

শুনিতেছি পাকিস্থানের রাজধানী করাচীতে শীঘ্রই একটা সর্ব্ব-জাগতিক মুসলিম সম্মেলন হইবে। তাহা যদি হয় তবে উহার মূলে ঐ একই আহ্বান—জগতের মুসলমান সব এক হও, রুদ্ধকণ্ঠে আরও একটু ইহার সঙ্গে যোগ করিয়া দিতে হয়—অমুসলমানদের বিরুদ্ধে সংহত হও, সম্ভব হইলে তাহাদের উচ্ছেদ কর অথবা মুসলমান করিয়া লও, এবং ক্রমে এক ধর্ম্মের ভিত্তিতে এক রাষ্ট্র স্থাপন কর।

মুসলমানকে সর্ব্বজগতের মানুষ হইতে পৃথক করিয়া দেখার এবং সকল মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিবার গূঢ় প্রবৃত্তির আর একটা প্রকাশ দেখা যায় ঔরঙ্গজেবের পরে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী মুসলমান মহম্মদ আলি জিন্নার বাক্যে ও কার্য্যে। জিন্নার জীবন আলোচনার স্থান ইহা নয়, আমাদের প্রয়োজনও নাই। তবে ভারতের মুসলমানদের অনেকের মুখেই শুনি তিনি একজন শ্রেষ্ঠ মুসলমান এবং সেইজন্যই বোধ হয়, এক জন মহামানবও বটেন। প্রকৃত ইসলাম অতি সামান্যই তিনি জানেন, এবং যাহা জানেন তাহাও কার্য্যে, আচারে, পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি অনুসরণ করেন না। তথাপি ভারতের মুসলমানদের ইতিহাসে তাঁহার একমাত্র তুলনা নাকি বাদশাহ ঔরঙ্গজেব। তিনি যে বর্ত্তমান ভারতের মুসলমানদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, রাজ্যলিপ্সা, জিগীষা—এবং বলিতে যাইতেছিলাম, জিঘাংসার—মূর্ত্ত প্রতীক, ইহাও তাঁহার নিজের এবং অন্য অনেকের উক্তি হইতেই প্রমাণ করা যায়। ইসলাম অহিংসায় বিশ্বাস করে না, মুসলমান লড়াই করিতে জানে, ভেড়ার মত শুধু জেলে যায় না, ইত্যাদি উক্তি লীগপন্থী মুসলমানেরা একাধিকবার করিয়াছেন, আর, ইংরেজেরা শক্তিতে বিশ্বাস করে, শক্তের ভক্ত, ইত্যাদি ধরণের বাণী জিন্নার শ্রীমুখ হইতেও নিঃসৃত হইয়াছে। সুতরাং মানুষ হইতে পৃথক্ মুসলমানদের বিজয়লিপ্সা জিন্নায় মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

এই মহা মুসলমান এবং তথাকথিত মহামানব জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব গান্ধীর মৃত্যুতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং আমাদেরও অনুধাবন-যোগ্য। যাঁহাকে জাপানের সম্রাট্ এবং আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান হইতে আরম্ভ করিয়া শহরের রিক্সা-ওয়ালা পর্য্যন্ত 'মহাত্মা' বলিয়া শ্রদ্ধা দেখাইয়াছে—যাঁহাকে সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক 'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ,' যীশুর সমান এবং বুদ্ধের সমান প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছে—কায়েদ-এ-আজম জিন্না তাঁহাকে একজন বিশিষ্ট 'হিন্দু' নেতার বেশী ভাবিতে পারেন নাই। জিন্নার ইতিহাস বুঝিবার এবং মূল্য মাপিবার শক্তি এত কম যে গান্ধীজী যে হিন্দুত্বের কত ঊর্দ্ধে তাহা তিনি আন্দাজও করিতে পারেন নাই। সে দিন আবার পাকিস্তানের পার্লামেণ্টে আরও একটু মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিয়াছেন, গান্ধী তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতে গিয়া মরিয়াছেন। অর্থটা অস্পষ্ট; তবে বোধ হয় এই যে, ভারতের মুসলমানদের রক্ষার চেষ্টা করা ত তাঁহার কর্ত্তব্যই ছিল। ইহার নির্গলিতার্থ এই—পাকিস্তানের অমুসলমানদের রক্ষা করা কাহারোই কর্ত্তব্য নয়—জিন্নার ত নিশ্চয়ই নয়।

জিন্না নিজেকে খুবই যে বড় মনে করেন তাহার প্রমাণ দেওয়া চলে। গান্ধী তাঁহার সমকক্ষ, এ কথা তাঁহার মনের অন্ধকারে কোথাও প্রকাশ পায় না, তিনি গান্ধী হইতে বড়, ইহাই বরং তিনি ভাবেন। কিন্তু একথা আমরা লিখিয়া রাখিলাম, গান্ধী জীবনে এবং মৃত্যুতে জগতের যতখানি সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, জিন্না জীবনে তাহা পান নাই, মরিয়াও পাইবেন না। ভারতের ধর্ম্মান্ধ মুসলমানেরা তাঁহাকে বড় ভাবে ঠিক, কিন্তু এক মুসলমান ছাড়া আর ত কিছুর কথা তিনি ভাবিতে পারেন না। তাঁহার সমস্ত উক্তি একত্র করিলেও মানুষের হিতের কথা তিনি চিন্তা করিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ মিলিবে না। ইদানীং আবার তাঁহার মুখে মুসলমান ধর্ম্মের কথাও শোনা যায়, কিন্তু মানুষ তাঁহার বাক্য ও চিন্তায় কোথাও স্থান পায় নাই। যেখানে শ্বেত জাতিরা অ-শ্বেত জাতিদের উপর প্রভুত্ব কিংবা অত্যাচার

করে—যেমন দক্ষিণ-আফ্রিকায় কিংবা ইন্দোনেশিয়ায়—সেখানেও তিনি অশ্বেত মুসলমানদিগকে অশ্বেত অ-মুসলমানদের হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া মুসলমানদের জন্য একটু পৃথক্ সুবিধা আদায়ের কথা ভাবেন এবং সেইরূপ চেষ্টা করেন। এই মনোভাব কি ইহাই প্রকাশ করে না যে মুসলমান হওয়ার মত মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ অথবা প্রশংসার যোগ্য আর কিছু নাই?

জিন্না এবং তাঁহার অনুচরদের মনে আরও একটা গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা আছে যাহা কথায় এবং কার্য্যে অনেক সময় প্রকাশ হইয়া পড়ে। ইহারা ভারতবর্ষকে আবার একটা মুসলমান রাজ্যে পরিণত করিতে চান, যেমন ঔরঙ্গজেবের সময় ছিল ঠিক তেমনই। এই রাজ্যে অমুসলমানেরা হয় পবিত্র ইসলাম গ্রহণ করিবে, না হয় মুসলমানের পদানত হইয়া থাকিবে। এই মনোবৃত্তিও প্রমাণ করে যে, মানুষের অধিকার হইতে মুসলমানের অধিকার বড়, এবং মুসলমানত্ব মনুষ্যত্বের উপরে।

মুসলমান ধর্ম্মে মেহেদিবাদটা কখনও কখনও দেখা গেলেও অবতারবাদ নাই। তথাপি ভারতের বহু মুসলমানের নিকট জিন্না পয়গম্বরের সমকক্ষ ত বটেনই, হয় ত বা কিছু উপরে। সুতরাং তাঁহার যে চিন্তা, সেটা মুসলমান-সমাজের বহু লোকের চিন্তা, এরূপ মনে করিলে কাহারও প্রতি অবিচার করা হইবে না। একটা কথা আছে, 'যথা দেব তথা ভক্ত,' অর্থাৎ যে যাহাকে উপাসনা করে, সে তাহার গুণাবলীও অনুকরণীয় মনে করে। উপাস্য দেবতার প্রকৃতি হইতে উপাসকের প্রকৃতিও বুঝা যায়। তাই যদি হয়, তবে জিন্নাভক্তদের সম্বন্ধে আমাদের কি ভাবা উচিত?

পৃথিবী হইতে বর্ব্বর ও বর্ব্বরতা এখনও লোপ পায় নাই অর্থাৎ সকল মানুষ এখনও সমান সভ্য হয় নাই। বর্ব্বর জাতি প্রাচীন গ্রীসের চারিদিকে ছিল, আর, রোমক সাম্রাজ্যকে ধ্বংসও   ও পূর্ব্ব ইউরোপের বর্ব্বরেরা। কিন্তু ইউরোপের এই বর্ব্বরেরা খ্রীষ্টানধর্ম্মের প্রভাবে সভ্য হইয়া যায়, এবং তাহাদেরই বংশধর বর্ত্তমান ফরাসী ও জার্ম্মান জাতি ইউরোপের দুইটি শ্রেষ্ঠ জাতি। মুসলমান-ধর্ম্মের প্রভাবে কোন বর্ব্বর সভ্য হয় নাই, একথা বলিব না। উত্তর-আফ্রিকায় এবং নিজ আরবভূমিতে অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন বর্ব্বরেরা ইস্লামের প্রেরণায় আলোক দেখিয়াছিল। তার পর পারস্যের আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া ইস্লাম আরও বিকশিত হইয়া উঠে এবং স্পেন হইতে ভারত পর্য্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডে বহু জ্ঞানচর্চ্চার কেন্দ্র উদ্ভূত হয়। কিন্তু এসব প্রাচীন ইতিহাসের কথা। বর্ত্তমানে ইস্লামের একটা প্রকাণ্ড অংশে যে মনোভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে মানুষকে সভ্য করিবার জন্য ইস্লামের দান অপেক্ষা অমুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানকে উত্তেজিত করার জন্য ইহার ব্যবহার করিবার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় বেশী। মুসলমান মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ, এই বিশ্বাস হইতেই এরূপ আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয়। পার্ব্বত্য অঞ্চলের বর্ব্বর আফ্রিদি প্রভৃতি জাতিরাও শুধু মুসলমান বলিয়া যে কোন অমুসলমান হইতে শ্রেষ্ঠ—আইনষ্টাইনের মত য়ীহুদী কিংবা রবীন্দ্রনাথের মত হিন্দু অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ—এইরূপ ধারণার আভাস পাওয়া যায় ভারতের অনেক মুসলমানের বাক্যে ও কার্য্যে।

বর্ত্তমান যুগে 'কম্যুনিজম্' বা সাম্যবাদ প্রকাশ্যে ধর্ম্ম-বিরোধী। উহার মতে ধর্ম্ম আফিমের নেশার মত—মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করিয়া রাখে। সুতরাং ধর্ম্মকে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের বেলায় একেবারে বর্জ্জন করাই সাম্যবাদের অভিপ্রেত। ধর্ম্মের যে একটা উন্মত্ততা আছে তাহার প্রমাণ ইতিহাসে বহু মিলে। ধর্ম্ম সমাজের উপকার করিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিব না, কিন্তু অপকারও যে করিয়াছে তাহাও আমাদের স্বীকার করা উচিত। সাম্যবাদ যে একেবারে ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিতে বলে সে মত সকলে গ্রহণ না করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মোন্মাদের অনিষ্টকারিতা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ধর্ম্মোন্মাদ বলিতে যাহা বুঝি, এই বিংশ শতাব্দীতে তাহার সাক্ষাৎ ভারতের মুসলমান সমাজের বাহিরে কমই মিলে। 'ভারতের' বলিলাম এইজন্য, যে, তুরস্ক, ইরাণ, ইরাক প্রভৃতি মুসলমান দেশে ইহার প্রকাশ তেমন দেখা যায় না।

ভারতের কতক অংশের চিন্তায় এই যে মুসলমানকে মানুষের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়, ইহা একটি বিষাক্ত জিনিস, ইহার ভিতর বিপদের বীজ নিহিত রহিয়াছে। ইহার প্রমাণ নানা ভাবে গত দুই বৎসরে এই হতভাগ্য দেশে দেখা দিয়াছে। ইহা যে অমুসলমানের পক্ষে বিপজ্জনক, তাহা প্রমাণ করা সহজ। কিন্তু মুসলমানের পক্ষেও যে ইহা নিরাপদ নয়, তাহা চিন্তাশীল মুসলমানেরাও স্বীকার করিবেন, আশা করি। ইহা ধর্ম্মোন্মাদেরই একটা রূপান্তর, সুতরাং মানুষের সভ্যতাবৃদ্ধির পরিপন্থী। মনুষ্যত্বকে অবহেলা করিয়া শুধু ধর্ম্মবিশেষকে বড় করিয়া তোলার অর্থ বর্ব্বরতার দিকে অগ্রসর হওয়া। প্রত্যেক ধর্ম্মই তাহার অনুসরণকারীর নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সুতরাং সকলের সম্মতিক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। যদি তাহা সম্ভবও হইত তথাপি উহাকে মানবধর্ম্ম অপেক্ষা বড় মনে করা চলিত না। ধর্ম্ম মানুষের বিকাশের—তাহার সভ্যতার একটা অঙ্গ মাত্র, ধর্ম্মই সব নয়। দর্শন, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতিও সভ্যতার পরিপোষক। শুধু ধর্ম্মে মানুষের পূর্ণ প্রকাশ হয় না। আর, ধর্ম্ম ছাড়াও যে সভ্যতা সম্ভব,

ইহাও আজ মানুষের চিন্তা স্বীকার করে। সুতরাং কোনও একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ, এরূপ মনে করার মত সঙ্কীর্ণতা আর নাই। কোন ধর্ম্মবিশেষের শাস্ত্র কথায় কথায় অনুসরণ না করিয়া কিংবা উহার বিহিত আচার সব পরিপূর্ণ ভাবে পালন না করিয়াও মানুষ ধার্ম্মিক হইতে পারে। আধুনিক জগতে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মহাত্মা গান্ধী। সুতরাং মুসলমানত্বকে মানবত্বের উপরে যাহারা স্থান দেন, তাহারা ভাল মুসলমান হইতে পারেন, কিন্তু পূর্ণাবয়ব মানুষ নন। মনে রাখা উচিত যে, মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়া অপেক্ষা বড় আর কিছু নাই। হিন্দু অথবা মুসলমান হইয়া যেমন মানুষ হওয়া চলে, তেমনই এ উভয়ের একটিও না হইয়াও মানুষ হওয়া চলে এবং উহার কোন একটি হওয়া অপেক্ষা মানুষ হওয়ার দাম বেশী। যদি প্রশ্ন এই হয় যে হিন্দু হইব না মানুষ হইব, অথবা মুসলমান হইব না মানুষ হইব, তাহা হইলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই নির্ভয়ে উত্তর দিবেন; মানুষ হওয়াই শ্রেয়ঃ। অবশ্যই, হিন্দুত্ব কিংবা মুসলমানত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যে এমন কোন বিরোধ নাই যে, উভয়ের একত্র অবস্থিতি সম্ভব নয়। কিন্তু সব সময়েই মনে রাখা উচিত যে, মানবত্বকে অবনমিত করিয়া শুধু ভাল মুসলমান বা ভাল হিন্দু হওয়ার যে ইচ্ছা সেটি ধর্ম্মোন্মাদেরই নামান্তর, সুতরাং বর্জ্জনীয়। আমাদের ভাবা উচিত যে, মানবধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের উপরে এবং মানবজাতি সকল জাতির উপরে, "জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম 'মানব জাতি'।"

বিমানে ভূ-প্রদক্ষিণ

শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত

মধ্য-পশ্চিম

আমেরিকাকে পূর্ব পশ্চিমে চারি অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে। আটলান্টিক উপকূলে নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি স্থান পূর্বাঞ্চল। শিকাগো ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল। তাহার পশ্চিমে পার্বত্য অঞ্চল। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী প্রদেশ পশ্চিমাঞ্চল। এই চারিটি অঞ্চলে চারি প্রকার সময় অনুসৃত হয়। দুইটি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে সময়ের পার্থক্য এক ঘণ্টা। নিউ ইয়র্কে যখন সকাল ১০টা, তখন শিকাগোতে সকাল ৯টা, পার্বত্য প্রদেশে সকাল ৮টা, এবং পশ্চিম প্রদেশে সকাল ৭টা। আটলান্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত আমেরিকার বিস্তার ৩০০০ মাইল।

নক্সভিল হইতে শিকাগোর দূরত্ব সিধা পথে বেশী নয়। কিন্তু আমি ওয়াশিংটন হইয়া যাইব। ওয়াশিংটনে বিমান বদল করিতে হইবে।

১৫ই ডিসেম্বর রবিবার বৈকাল আড়াইটায় নক্সভিল বিমানঘাটি হইতে বিমান উড়িল। বিমানটি একঘণ্টা বিলম্বে চলিতেছিল। ওয়াশিংটনে গিয়া শিকাগোর বিমান পাইব কি না সন্দেহ।

সাড়ে চারিটারও পরে ওয়াশিংটন বিমানঘাটিতে নামিলাম। শিকাগোর বিমান তখন প্রস্তুত। সোজা সেই বিমানে গিয়া উঠিলাম। পাঁচটায় বিমান উড়িল। রাত্রি নয়টা নাগাদ শিকাগো পৌঁছিবে। দূরত্ব প্রায় ৮০০০ মাইল। এর মধ্যে বিমান কোথাও নামিবে না। সন্ধ্যার অন্ধকারে পৃথিবী ও আকাশ আবৃত হইল। অন্ধকার ভেদ করিয়া বিমান সগর্জ্জনে ছুটিয়াছে। বাক্‌চতুরা ষ্টুয়ার্ডেস যাত্রীগণের সঙ্গে নানাবিধ আলাপ করিয়া তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিতেছেন। তাঁহার ধারণা তাজমহল একটি দেব-মন্দির। ইহা একটি স্ত্রীলোকের সমাধি-মন্দির শুনিয়া ভারতীয় স্ত্রীজাতির পোশাক-পরিচ্ছদ ও কাজকর্মাদি সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করিলেন। ভারতীয় স্ত্রীলোকেরা কাজের উপযোগী খাটো কাপড় পরিয়া এরোপ্লেনের ষ্টুয়ার্ডেস্ হয় কিনা, অভিজাত সমাজের রুচিসম্মত আভূমি-বিলম্বিত পোশাক-পরিবার সুযোগই বা তাহাদের কিরূপ ইত্যাদি নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছিলেন। বিমানটি মাঝে মাঝে আলোকোদ্ভাসিত এক একটি সহর অতিক্রম করিতেছিল। তন্মধ্যে পিটস্‌বার্গের দৃশ্য সত্যই অপরূপ। কি অপূর্ব্ব আলোকসজ্জা! রঙে ও উজ্জ্বলতায় তাহা অতুলনীয়। রাস্তা ও বাড়ীগুলি সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রাস্তা দিয়া আলো ছড়াইয়া মটর ছুটিতেছে। স্থানে স্থানে আলোকমালা জ্বলিতেছে ও নিবিতেছে। যাত্রীগণ সে রমণীয় দৃশ্য হইতে চোখ ফিরাইতে পারিতেছেন না। অন্ধকার মহাসমুদ্রে দ্বীপের মত জাগিয়া থাকা ক্লিভল্যাণ্ড প্রভৃতি আরও কয়েকটি সহর অতিক্রম করিলাম। যেন অনন্ত মহাশূন্যের মধ্য দিয়া উড়িতেছি। মাঝে মাঝে এক একটা ব্রহ্মাণ্ড সেই মহাশূন্যে ভাসিতেছে। তারকাখচিত আকাশের নীচে তাহাই ক্বচিৎ কখনো দৃশ্যমান হইতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে।

সহসা পরিষ্কার আকাশে মেঘোদয় হইল। শিকাগোর নিকটবর্তী হইতেছি। ষ্টুয়ার্ডেস্ সকলকে বলিয়া গেলেন যে, শিকাগোতে বরফ পড়িতেছে। সেখানে বিমান নামিতে পারিবে না।

শতাধিক মাইল দক্ষিণে ইণ্ডিয়ানা পলিস্ বিমানঘাঁটিতে বিমান নামিল। যাত্রীগণের মধ্যে অনেকেই প্রভাতে শিকাগো পৌঁছিবার জন্য উদ্বিগ্ন। বিমানের কর্মচারিগণ খবর লইয়া বলিলেন যে শীঘ্রই শিকাগো যাইবার ট্রেন আছে। যাত্রীগণ দ্রুত স্ব স্ব মাল খালাস করিয়া লইলেন। ঘাঁটির কর্মচারিগণ ভাড়ার কিয়দংশ যাত্রীদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং বাসে করিয়া তাঁহাদিগকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিলেন।

মাল খালাস করিতে যাইয়া দেখি আমার মাল আসে নাই। বুঝিলাম ওয়াশিংটনে সময়াভাবে মালের প্লেন বদল সম্ভব হয় নাই। এবার আমার কাগজপত্রের এবং প্রসাধনের থলিটি হাতেই রাখিয়াছিলাম। মনে করিলাম বড় থলি দুইটি ওয়াশিংটন হইতে পরবর্তী প্লেনে শিকাগো পৌঁছিবে। ভালই হইবে। ঘাঁটির আপিসে আমার শিকাগোর ঠিকানা লিখাইয়া দিয়া অন্যান্য যাত্রীগণের সঙ্গে ষ্টেশনগামী বাসে গিয়া উঠিলাম, বাস আলোকোজ্জ্বল নগরীর মধ্য দিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিল।

এখানে রেলের প্রধানতঃ দুই শ্রেণী। কোচ এবং পুলম্যান্। পুলম্যানের মধ্যে দিনে প্রত্যেককে একটি করিয়া সোফা দেওয়া হয়। এরূপ সোফাসজ্জিত গাড়ীকে পার্লার কার বা বৈঠকখানা গাড়ী বলে। রাত্রে পুলম্যানের মধ্যে রকমারি বন্দোবস্ত থাকে। কোন গাড়ীতে শুধু শুইবার বার্থ থাকে। নীচের বার্থের ভাড়া কিছু বেশী। দিনের পার্লার কারই রাত্রে বার্থে পরিণত হয়। কোন গাড়ী কতকগুলি বেড রুম বা শয়ন কক্ষে বিভক্ত। এক একটি ছোট ছোট শয়নকক্ষে দুইটি করিয়া বার্থ এবং আলাদা বাথরুম। দিনে এই বার্থগুলি সোফায় পরিণত হয়। সমস্ত ট্রেনে একটি ক্লাব কার বা মিলনকক্ষ এবং একটি রেষ্টুরাণ্ট কার বা ভোজনকক্ষ থাকে। ক্লাব কারে যাত্রীগণ একত্র বসিয়া কথাবার্তা বলেন বা পুস্তকাদি পাঠ করেন। গাড়ীর মধ্যে পুস্তক ও মাসিকপত্র ইত্যাদি থাকে। কোচে শুধু বসিবার স্থান। তবে প্রত্যেক আসনেই পুরু ও কোমল গদি আঁটা। বার্থ বা শয়নকক্ষে কোম্পানী সম্পূর্ণ বিছানা দেয়। কোচে কোন বিছানা নাই।

কোচ ভিন্ন অন্য কোন গাড়ীতে স্থান পাওয়া গেল না। কোচের প্রত্যেক যাত্রী দুইটি করিয়া আসন পাইলেন। কোম্পানী কিঞ্চিৎ ভাড়া লইয়া কোচের যাত্রীগণকে বালিশ সরবরাহ করেন। এক ব্যক্তি কতকগুলি বালিশ আনিয়া গাড়ীর মধ্যে হাঁকিয়া গেল—"ভাল ঘুম, ভাল স্বপ্ন, চাই বালিশ"। একটি বালিশ লইলাম বটে। তবে ভাল ঘুমও হইল না; ভাল স্বপ্নও দেখিলাম না। ট্রেন যখন শিকাগো পৌঁছিল তখন ফর্সা হইয়া আসিতেছে। ট্যাক্সি লইয়া হোটেলে চলিলাম।

সমস্ত শহর বেশ পুরু বরফে ঢাকা। রাস্তা দিয়া যে মোটর গাড়ীগুলি যাইতেছে তাহাদের উপরে ৪।৫ ইঞ্চি পুরু বরফ। সারারাত্রি জাগিয়া মিউনিসিপ্যালিটির লোক রাস্তার বরফ ঠেলিতেছে। তাহাতে রাস্তার দুই পাশে উঁচু বরফের লাইন সৃষ্টি হইয়াছে। মাঝে মোটর চলিবার মত খানিকটা রাস্তা। তাহাও অবশ্য বরফে আর্দ্র ও পিচ্ছিল। এ বছর এই প্রথম বরফ পড়িল। তবে প্রথম দিনই মাত্রাটা একটু বেশী।

শিকাগো বিরাট শহর। ইহার লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ। সমগ্র আমেরিকার মধ্যে নিউ ইয়র্কের পরেই ইহার স্থান। ব্যবসায়কেন্দ্র হিসাবে নিউ ইয়র্ক অদ্বিতীয় হইলেও শিল্পকেন্দ্র হিসাবে শিকাগোরই প্রাধান্য অধিক। আমেরিকার বড় বড় কলকারখানা এই অঞ্চলে এবং তাহাদের প্রধান কার্য্যালয় প্রায়ই শিকাগো শহরে। শীতের দিনে আকাশ হইতে পতিত যে রজতশুভ্র হিমকণা শহরটিকে আবৃত করিয়া ফেলে তাহা শীঘ্রই এখানে ধূম্রমলিন হইয়া যায়। ইহা আমেরিকার বৃহৎ বাণিজ্যের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র। রিপাবলিকান দলের প্রভাব এখানে খুব বেশী। ইহা ইলিনয় রাজ্যের অন্তর্গত, কিন্তু রাজ্যের রাজধানী অন্যত্র। সরকারী আপিস এখানে বিশেষ নাই। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের পাবলিক্ ডেট্ আপিস এই শহরে বিদ্যমান। নগরোপকণ্ঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট হর্ম্যরাজি। শহরের চারিদিক হইতে অনবরত বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীগুলি যাতায়াত করিতেছে। ইহারা ঘনসন্নিবিষ্ট ষ্টেশনসমূহে বিপুল জনস্রোত ক্রমাগত কবলিত করিতেছে, আবার উদ্গীরণ করিতেছে। যাতায়াতের ইহাই প্রশস্ত উপায়। মাটির নীচে কোন লাইন নাই। এখানে খুব বড় বড় ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরস্ আছে। এই ষ্টোরগুলির ডাকে কারবার যথেষ্ট। বড়দিনের প্রাক্কালে এগুলির বিক্রয় পুরাদমে চলিতেছিল। এবার যুদ্ধের পর বিক্রয়ের হার খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। খবরের কাগজে রোজই এ বিষয়ে তথ্যপ্রকাশ ও আলোচনা চলিতেছিল। এখানকার মার্শাল ফিল্ডের ষ্টোর সমধিক প্রসিদ্ধ। স্প্রিংফিল্ডে এক পদস্থ ব্যক্তি কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন, "এ যেন মার্শাল ফিল্ডের বিল পরীক্ষা করা। ইঁহার আয় যে স্তরে সেখানে বেশী আমদানী সত্বেও আয়-কর দিয়া কিছুই উদ্বৃত্ত থাকে না। ইহার বিল পরীক্ষা করিয়া সময় নষ্ট করা মূর্খতা।"

আমি যে হোটেলে ছিলাম তাহার নাম ব্লাকষ্টোন হোটেল। হোটেলটি সুপ্রসিদ্ধ; শহরের শ্রেষ্ঠ রাজপথ মিসিগ্যান এভিনিউতে অবস্থিত। হোটেলটি ১৮ তলা। আমি ছিলাম ১৪ তলায়। প্রকাণ্ড হোটেল। ওয়াশিংটন বা নয়াদিল্লির হোটেল হইতে এই হোটেলে কর্মব্যস্ততা অনেক

বেশী দেখিতেছি। ভোজনকক্ষের শোভা, পরিবেশন-নৈপুণ্য এবং খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য্য তুল্যরূপেই চিত্তাকর্ষক। লাউঞ্জ কক্ষটি নাতিবৃহৎ; আসন্ন বড়দিন উপলক্ষে সুসজ্জিত। বড়দিনের সজ্জার দুইটি বিশেষত্ব—খ্রীষ্টমাস তরু ও সান্তাক্লজের মূর্ত্তি। মধ্যস্থলে একটি বড় খ্রীষ্টমাস তরু জরি ও আলোকমালা দ্বারা শোভিত। এটা একটা বড় পাইন গাছের ডাল; শীতে তাহার ঘনসবুজ পাতা একটিও পড়ে নাই। পাতার উপর মাঝে মাঝে সাদা রাঙতা বসান। মনে হইতেছে যেন পাতার উপর বরফ পড়িয়াছে। নানা রঙের আলো গাছের শাখা-প্রশাখায় লগ্ন। গাছটিকে ঘরের মধ্যস্থলে একটি বরফের স্তূপের মধ্যে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। অপর কোণে করুণাবতার সান্তাক্লজের সহাস্য প্রফুল্ল মূর্ত্তি। নিশাকালে আলোকোদ্ভাসিত মুখখানি স্বতঃই ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া যেন আগন্তুকদিগকে স্বাগত করিতেছে। ঘরটি ইতস্ততঃ-সঞ্চরমান সুদর্শন নরনারী সমাগমে পুলকোজ্জ্বল।

ভোজনকক্ষে একটি পরিবেশকের সঙ্গে আলাপ হইল। সে ব্রিটিশ আর্মির সঙ্গে বোম্বাই গিয়াছে; কিছুদিন ব্রিটিশ উপনিবেশ ট্রিনিদাদে বাস করিয়াছে। ইহার মতে ব্রিটিশরা যে-হারে বেতন দেয় তাহা তাহাদের মারাত্মক অবিবেচনা ও নির্ম্মমতার পরিচায়ক। এদেশে বর্ত্তমানে দারিদ্র্য-সমস্যা দেখিতেছি না। বেকার কেহ নাই। মজুরীর সর্ব্বনিম্ন হার মাসিক ১৭৫ ডলার বা প্রায় ৬০০৲ টাকা। শুধু সাধারণ কায়িক পরিশ্রমেরই এই মূল্য। বাড়ীতে চাকর রাখিবার প্রথা নাই বলিলেই হয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ করে। তাহাতে লজ্জা বা মর্য্যাদাহানি হয় না। চাকরের মাহিনা মাসিক প্রায় ২০০ ডলার। সাধারণতঃ শ্রমিকগণ সপ্তাহে ৫ দিনে মোট ৪০ ঘণ্টার বেশী খাটে না। শনি ও রবিবার দুই দিন পুরা ছুটি। অন্য দিন ৮ ঘণ্টা করিয়া খাটিবার নিয়ম। যন্ত্রপাতির ব্যবহার এদেশে খুব বেশী। নিজেরাও যন্ত্রের মত নিয়মানুবর্ত্তী ও কঠোর পরিশ্রমী। অল্প পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন করে বলিয়া ইহাদের মজুরীর হার এবং বিশ্রামের সময় উভয়ই খুব বেশী। এদেশের ট্রেড ইউনিয়ন কদাপি যন্ত্রের বিরোধিতা করে না। ইহারা জানে যে যন্ত্র ব্যতীত উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়; আর উৎপাদন বৃদ্ধি না করিয়া মজুরী ও বিশ্রামকাল বৃদ্ধির আশা করা মূর্খতা। বর্দ্ধিত উৎপাদনের উপযুক্ত অংশ হইতে মজুরগণ যাহাতে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়ে অবশ্য ইহাদের কড়া নজর। ট্রেড ইউনিয়নগুলি বড় বড় অর্থনীতিবিদ্ ও সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ নিযুক্ত করিয়া সর্ব্বদা হিসাব রাখে কি হারে মজুরের উৎপাদন-শক্তি বাড়িতেছে। তদনুসারে ইহারা মজুরীবৃদ্ধি দাবি করে। ১৯৪৫ সালের নবেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কের ১৮১৯ নং ব্রডওয়েতে অবস্থিত ন্যাশন্যাল ব্যুরো অব ইকনমিক্ রিসার্চ মার্কিন শিল্পে শ্রমসংক্ষেপ বিষয়ে একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। নিবন্ধটির নাম "লেবর সেভিং ইন্ আমেরিকান ইন্ডাষ্ট্রি, ১৮৯৯-১৯৩৯"—লেখক সোলোমন ফেব্রিক্যান্ট। তাঁহার হিসাবমত ১৮৯৯ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্য্যন্ত আমেরিকায় শ্রমিক-পিছু জাতীয় উৎপাদন ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ে সাপ্তাহিক শ্রমকাল উৎপাদন-শিল্পে পঞ্চমাংশ হ্রাস পাইয়াছে। ফলতঃ প্রতি জনের ঘণ্টায় উৎপাদন শত শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে বা ঠিক দ্বিগুণ হইয়াছে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি এক ঘণ্টা খাটিয়া ১৮৯৯ সালে যত মাল উৎপাদন করিত ১৯৩৯ সালে করিত তার দ্বিগুণ।

এই দারিদ্র্যহীন দেশে কম্যুনিজমের প্রভাব নাই। ইহারা যে হারে মজুরী দেয় এবং এখানে মজুরগণ সপ্তাহে যত বিশ্রামকাল প্রাপ্ত হয় তাহা রাশিয়ার মজুরদের স্বপ্নাতীত। শিকাগো পরিত্যাগ করিবার পর একটি কাগজে দেখিয়াছিলাম যে শিকাগোর জনৈক বড় ব্যবসায়ীকে একটি কাগজে কম্যুনিষ্ট ভাবাপন্ন বলিয়া অভিহিত করায় উক্ত ভদ্রলোকটি কাগজের নামে আদালতে মানহানির মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রি পাইয়াছেন।

শিকাগোর যে বাড়ীটিতে আমার প্রধান কর্ম্মস্থল ছিল তাহা পূর্ব্ব ষষ্টিতম ষ্ট্রীটের ১৩১৩ নম্বর বাড়ী। বাড়ীটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনতিদূরে, শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। এই বাড়ীটিতে সাতটি এসোসিয়েশন্ বা সমিতির মূল আপিস। তাহাদের নাম ও বিবরণ এইরূপ :

১। কাউন্সিল্ অব্ ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট বা প্রাদেশিক সরকার পরিষৎ। আমেরিকার ৪৮টি ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ, আলোচনা ও গবেষণা চালানই এই পরিষদের কাজ।

২। পাবলিক্ এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সার্ভিস বা সরকারী শাসনপ্রণালীর সহায়ক সমিতি। সরকারী শাসনপ্রণালীর সংস্কার সাধনপূর্ব্বক কিরূপে উহাকে উন্নততর করা যায় তাহাই ইহাদের গবেষণার বিষয়। ইহাদের নিযুক্ত সুনিপুণ তথ্যবিশারদ ও তত্ত্বজ্ঞগণ রহিয়াছেন। ষ্টেট গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যালিটিগুলি নিজেদের শাসনপ্রণালীর সংস্কার-মানসে এই সমিতির সাহায্য চাহিলে ইঁহারা গিয়া সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দাখিল করেন।

৩। ফেডারেশন অব্ ট্যাক্স অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরস্ বা কর নিয়ামকদের সমিতি। আমেরিকার সমস্ত রাষ্ট্রের কর নিয়ন্ত্রণাদি সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব এখানে সংগৃহীত হয়।

৪। ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব্ এসেসিং অফিসার্স বা করনির্দ্ধারক কর্ম্মচারিগণের জাতীয় সমিতি। আমেরিকার সমস্ত নগরে মিউনিসিপ্যাল কর কিরূপে ধার্য্য হয় এবং তদর্থে বাড়ীর মূল্য নির্দ্ধারণ কিরূপে করা হয় ইঁহারা সে বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ ও তত্ত্বালোচনা করেন।

৫। সিভিল সার্ভিস এসেম্ব্লি বা সরকারী চাকুরিয়া সমিতি। সরকারী চাকুরীকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করিয়া

কিরূপে শুধু গুণমূলক করিয়া তোলা যায় ইঁহারা সেই বিষয়ে চিন্তা করেন।

৬। আমেরিকান সোসাইটি অব্ প্ল্যানিং অফিসিয়ালস্ বা মার্কিন পরিকল্পনাকারী কর্ম্মচারিগণের সমিতি। সর্ব্বাঙ্গীণ পরিকল্পনা দ্বারা কিরূপে রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন করা যায় ইঁহারা সে বিষয়ে গবেষণায় রত আছেন।

৭। পাব্লিক এডমিনিষ্ট্রেশন্ ক্লিয়ারিং হাউস বা সরকারী শাসন বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ ভবন। প্রথমোক্ত ছয়টি সমিতি যত গ্রন্থ প্রণয়ন বা নিবন্ধাদি রচনা করেন এই সমিতি সেগুলি প্রকাশ ও বিক্রয় করেন।

প্রত্যেকটি সমিতির সদস্য-সংখ্যা সহস্রাধিক। সরকারী কর্ম্মচারী, অধ্যাপক ও ব্যবসায়ীগণ ইহাদের সদস্য। সদস্য-গণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও চিন্তা দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ের উপর যে আলোকপাত হয় তাহাতে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে।

আমেরিকার বাহিরে এই জাতীয় গবেষকমণ্ডলী কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের আলোচনা দ্বারা যে-কোন দৈনন্দিন কার্য্যের উন্নতিসাধন চেষ্টা এদেশের একটি বিশেষত্ব। এই সমস্ত সমিতির কর্মিগণ স্ব-স্ব কার্য্যে সর্বদা মনোযোগী। প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটি সংবাদ ইঁহাদের নখদর্পণে। ইঁহাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে দিনের পর দিন আলোচনা করিয়া বহু জ্ঞানলাভ করিয়াছি। ইঁহারাও আমাকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন এবং পরম যত্ন সহকারে আমার সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিয়াছেন। কখনও কখনও প্রশ্ন করিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমার নিকট হইতে জানিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহারা এক দিন আমাকে বলিলেন, "এদেশে বর্ত্তমানে ভারতীয় ছাত্র পূর্বাপেক্ষা বেশী আসিতেছে। তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। পূর্বে ইঁহারা সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি পড়িত; এখন কাজ শিখিবার দিকেই ঝোঁক বেশী।"

১৩১৩ নম্বরের বাড়ীর অদূরেই বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়। বহুদূর ব্যাপিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌধশ্রেণী। এখানে একটি বইয়ের দোকানের শো রুমে জবাহরলালের "ডিস্কভারি অব্ ইণ্ডিয়া" দেখিলাম। বিশ্বভালয়ের কেফিটেরিয়ায় প্রায়ই মধ্যাহ্নভোজন করিতাম। আসন্ন বড়দিন উপলক্ষ্যে কেফিটেরিয়ার প্রবেশকক্ষ খ্রীষ্টমাস তরুদ্বারা সজ্জিত।

কয়েকটি ভারতীয় ছাত্র দেখিলাম। ১৩১৩ নং বাড়ীতে সস্ত্রীক মুজেন সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়। ইনি ব্রেজিল নিবাসী পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। ব্রেজিলের অনেক কথা ইঁহাদের নিকট শুনিতাম। মুজেন-পত্নী আমার দশবর্ষীয়া কন্যার সম্বন্ধে প্রায়ই প্রশ্ন করিতেন।

১৯শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার বৈকালে মার্কিন সরকারের পাবলিক ডেট আপিস দেখিতে যাই। যে বাড়ীর একাংশে আপিসটি অবস্থিত তাহার নাম মার্চাণ্ডাইস্ মার্ট বিল্ডিং। বাড়ীটি শহরের কেন্দ্রস্থলে—নদীতীরে। সেতু পার হইয়াই ইহার সদর। অত্যুচ্চ বিরাট বাড়ী—১৮ তলা বিশিষ্ট। অসংখ্য দোকান ও আপিস এই বাড়ীতে অবস্থিত। এই বাড়ীটি পৃথিবীর বৃহত্তম বাড়ী বলিয়া পরিচিত। নিউ ইয়র্কের ১০২ তলা এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিংও নাকি ইহা অপেক্ষা ছোট।

মাত্র ১৮ তলা বাড়ীটি পৃথিবীর বৃহত্তম বাড়ী কিনা সে বিষয়ে আমার মনে অবশ্য কিছু সংশয়ের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু এই পাব্লিক ডেট আপিস যে পৃথিবীর বৃহত্তম পাব্লিক ডেট আপিস সে বিষয়ে কেহ বলিয়া না দিলেও আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছিলাম। গত বিশ্বযুদ্ধ চলিয়াছিল আমেরিকার টাকায়। আর সেই টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল এই পাব্লিক ডেট আপিস। বর্ত্তমানে টাকাসংগ্রহের পর্ব শেষ হইয়াছে। এখন সুদ দিবার পালা। শুনিলাম মাসে ৫০।৬০ লক্ষ চেক এই আপিস হইতে বর্ত্তমানে বিলি হইতেছে। সুদ কষা, চেক লেখা ও চেকগুলিকে যথানামে প্রেরণ করা এক বিরাট কাজ। তৎসহ খতের মালিকের নাম পরিবর্ত্তন, উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ ইত্যাদি নানাবিধ আনুষঙ্গিক কাজও কম নয়।

মাত্র ৫।৬ হাজার কর্ম্মচারী এই সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাহ করে। আপিসের সমস্ত কাজেই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ এত খত রাখিবার স্থান নাই, কাজেই খতগুলির ফটো তুলিয়া ফিল্ম করিয়া কাটিমে জড়াইয়া অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে রাখা হয়। কোন খত লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে ফিল্মটিকে যথাস্থান হইতে বাহির করিয়া বৃহত্তর আকারে পরিণত করিয়া কোর্টে পেশ করা হয়। সুদের হিসাব তো যন্ত্রে হয়ই, চেক লেখা, সই করা, খামে পোরা, ঠিকানা লেখা প্রভৃতি সমস্ত কাজই যন্ত্রে হইতেছে। যন্ত্রের বহুল ব্যবহার আছে বলিয়া অল্প লোকে এত বেশী কাজ করিতে পারে। সেজন্য ইহারা কর্ম্মচারীদের উঁচু হারে মাহিনা দিয়াও কম খরচে কার্যনির্বাহ করে। নিউ ইয়র্ক ও মন্ট্রিয়লের বিক্রয়-কর আপিসে দেখিয়াছি বেতনের সর্বনিম্ন হার মাসিক ১৭৫ ডলার হওয়া সত্ত্বেও আদায়-খরচ মাত্র সংগৃহীত করের ২ কি ৩ শতাংশ। আমাদের দেশে বেতনের সর্বনিম্ন হার মাত্র ৩৫৲ হওয়া সত্ত্বেও আদায়-খরচ তদপেক্ষা অনেক বেশী। শিকাগোর পাব্লিক ডেট আপিসের ডিরেক্টর মাইকেল ই. ম্যাক্ ঘোগান্ আপিসের যন্ত্রাধ্যক্ষ ডোলে মহাশয়ের সঙ্গে পরম যত্নসহকারে আমাকে আপিসের যাবতীয় কর্মপদ্ধতি দেখাইলেন। আমি সবিস্ময়ে ইঁহাদের কর্মকুশলতা দেখিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি ইণ্ডিয়ানাপলিসে আমার মাল না পাইয়া বিমান কোম্পানীর নিকট আমার শিকাগোর ঠিকানা রাখিয়া আসিয়াছিলাম। একটি মার্কিন যুবক আমার সেক্রেটারীরূপে আমেরিকা ও ক্যানাডায় সর্বত্র আমার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিল। যুবকটি যুদ্ধের সময় প্যারাস্যুট-বাহিনীতে ছিল। তদুপলক্ষে

গ্রীস ও রাশিয়ায় গিয়াছে। স্প্যানিশ, গ্রীক এবং রুশ ভাষায় কথা বলিতে পারে। দ্রুতশ্রুতিলিখনে খুব নিপুণ। যুবকটি যেমন কর্মঠ তেমনি চরিত্রবান, নাম ওয়েবষ্টার। তাহাকে দুই দিন বিমান আপিসে পাঠাইলাম। মালের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। পরদিন খবর লইয়া জানিলাম যে, কোম্পানীর হেড আপিস নিউ ইয়র্ক হইলেও এখানে একটি বড় শাখা আপিস আছে এবং সে আপিসের স্থানীয় অধ্যক্ষ কোম্পানীর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। তাঁহার নাম কিং। ১৮ই ডিসেম্বর সকালে ওয়েবষ্টারকে মিঃ কিঙের নিকট পাঠাইলাম। ওয়েবষ্টার আসিয়া বলিল "মিঃ কিং শুনিয়া বিশেষ দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। এবং প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে যেরূপেই হোক তিনি আজকের মধ্যে মাল সন্ধান করিয়া হোটেলে পৌঁছাইয়া দিবেন। তিনি উপহার-স্বরূপ আপনাকে চুরুট ও পানীয় দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আপনি খান না বলিয়া আমি উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।" তৃতীয় দিবসেও মাল না পাওয়ায় মিঃ কিঙের কথায় খুব আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই, সারাদিন কাজকর্ম করিয়া সন্ধ্যার পর সংশয়ান্দোলিত চিত্তে হোটেলে ফিরিলাম। অভ্যর্থনাকক্ষে ঘরের চাবি আনিতে গিয়া দেখি সম্মুখে আমার থলিদ্বয়। ওয়েবষ্টারকে বলিলাম, "মিঃ কিংকে পরদিন টেলিফোনযোগে বিশেষরূপে ধন্যবাদ দিয়া দিও।" পরে ওয়েবষ্টার কিং মহাশয়ের নিকট হইতে জানিয়াছিল যে মাল ডেট্রয়েটের মালগুদামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

শিকাগোর কর্মবহুল দিনগুলি দ্রুত কাটিয়া যাইতেছিল। বাহিরে তীব্র শীত। রবিবার বৈকালে যে বরফ পড়িয়াছিল সোমবারের মধ্যে তাহা অনেকটা পরিষ্কার করিয়া ফেলিলেও রাস্তার বাহিরে সর্বত্র বরফ জমিয়াছিল। ১৩১৩নং বাড়ী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে একটা খোলা জায়গায় বরফের মসৃণ ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া ছেলেমেয়েরা স্কেট করিত। রাশীকৃত বরফ রোলার দিয়া সমতল করিয়া তাহার উপর সূক্ষ্মধারায় জল ছিটাইয়া দিলেই সেই পাতলা জলের পর্দাটা জমিয়া জমাট সিমেণ্টের মত শক্ত ও মসৃণ ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। আর বাহিরে যে তাপ তাহাতে বরফ গলে না। স্কেট-রত বালকবালিকাদের ভিড় দেখিতে বেশ লাগিত। সোমবার ঠাণ্ডা খুব বেশী ছিল না। মঙ্গলবার হইতে খুব শীত পড়ে। তাপ ৫ ডিগ্রি হইতে ১৮ ডিগ্রি পর্য্যন্ত ওঠানামা করিতেছিল। পরে সর্বোচ্চ তাপ ৩০ পর্যন্ত উঠিয়াছিল। দুদিন বেশ উত্তুরে হাওয়াও বহিতেছিল। কাজের চাপ ও বাহিরের আবহাওয়া কোনটিই বাহিরে বেড়াইবার পক্ষে অনুকূল নয়। কিন্তু আমার হোটেলের নিকটবর্তী মিশিগান হ্রদ আমাকে অনবরত আকর্ষণ করিতেছিল। ১২শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পাবলিক ডেট আপিস হইতে ফিরিয়াই হ্রদের দিকে গেলাম।

মিশিগান এভিনিউর উপর হোটেল। রাস্তার অপর পারে অদূরে বিরাট সমুদ্রতুল্য হ্রদ। অপর পার দৃষ্টিগোচর হয় না। হ্রদটি আমেরিকা ও ক্যানাডার মধ্যস্থ মহা হ্রদমালার অন্যতম। হ্রদের পারে বেড়াইবার প্রশস্ত স্থান ও চমৎকার বন্দোবস্ত আছে। সেখানে একটি একোয়েরিয়াম বা জলজন্তু-সংগ্রহ-গৃহ এবং একটি প্লানেটোরিয়াম বা গ্রহঘর আছে। এগুলি পরম চিত্তাকর্ষক। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি এখানে দেখিলাম না। শীতের আধিক্যে কেহ আর এখানে বেড়াইতে আসে না। গ্রীষ্মকালীন জনসমাগম ও নরনারীর আনন্দ-কোলাহল সহজেই অনুমান করিয়া লইলাম। সাঁতারের সুন্দর বন্দোবস্ত আছে, কিন্তু এখন লোকজন নাই। শুনিলাম পরদিন গ্রহঘরে একটি বক্তৃতা হইবে।

পরদিবস ১৩১৩ নং বাড়ী হইতে ফিরিয়াই গ্রহঘরে বক্তৃতা শুনিতে যাইব মনস্থ করিলাম। ট্রেন হইতে নামিয়া ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করিতেছি। গ্রহঘরটি যদিও খুব দূরে নয়, তথাপি সময় অল্প ছিল এবং আমার মত নবাগতের পক্ষে পথ চিনিয়া হাঁটিয়া যাওয়ায় সময় বেশী লাগিবার সম্ভাবনা। কিন্তু ট্যাক্সি পাইতেছি না। মাঝে মাঝে দু-একটি ট্যাক্সি যাত্রী লইয়া আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ অপেক্ষমাণ জনতার মধ্য হইতে কেহ কেহ তাহাতে চাপিয়া বসিতেছেন। প্রতিযোগিতায় আমার মত নবাগতের সফল হইবার আশা কম। একটি পুলিস নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। সে এই বিদেশী লোকটিকে যথেষ্ট সাহায্য করিল। আমাকে লইয়া বড় রাস্তার ধারে গিয়া চলন্ত ট্যাক্সি থামাইয়া আমাকে চাপাইয়া দিল। আমি বকশিশ দিতে গেলে সিপাহীটি বলিল, "আপনি বিদেশী। আপনার নিকট হইতে বকশিশ লইব না। আপনাকে সাহায্য করিয়াই আমি আনন্দ বোধ করিতেছি।"

গ্রহ-গৃহটি দেখিবার জিনিষ। স্থানে স্থানে আকাশে গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান সুন্দর করিয়া ছবির সাহায্যে দেখান আছে। ৩টায় বক্তৃতা সুরু হইল। ঘরের মধ্যে মাথার উপর একটা কৃত্রিম আকাশ তৈরি করা হইয়াছে। সেই আকাশে সত্যিকার আকাশেরই মত গ্রহ-উপগ্রহ চন্দ্র-সূর্য্য ও তারকারাজি উঠিতেছে আবার অস্ত যাইতেছে। মনে হইতেছে যেন সব সত্য। ঋতু অনুসারে এবং কালচক্রের আবর্তনে আকাশে তারকাবলীর সংস্থানের যে যে পরিবর্তন হয় তাহা দেখান হইল। যীশুর জন্মের পূর্বে জ্ঞানিগণ যে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দেখিয়াছিলেন তাহার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই ছিল অদ্যকার বক্তৃতার বিষয়। বক্তৃতার ভাষা অতি প্রাঞ্জল। বক্তা বলিলেন যে, অঙ্ক কষিয়া দেখা যায় যে, যীশুর জন্মের সময় মীন রাশিতে বৃহস্পতি ও শনির মিলন হইয়াছিল এবং মঙ্গল আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিয়াছিল। এরূপ ঘটনা ৮০০ বছরে একবার হয়। বৃহস্পতি ও শনির মিলন হয় ১২৫ বছর অন্তর। আর তিন গ্রহের মিলন হয় ৮৫০ বছর অন্তর। বক্তার মতে জ্ঞানিগণ হয়তো এই মিলন দেখিয়াই ঐশ্বরিক ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন। বড়দিন আসন্ন। এ

সময়ে প্রথম বড়দিনের রাত্রিতে জেরুজালেমে আকাশের অবস্থা কিরূপ ছিল এবং সে আকাশে তারকাবলীর সংস্থানই বা কিরূপ ছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রোতৃবর্গ পুলকিত হইয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্মক্ষেত্র শিকাগো নগরী ভারতবাসীর নিকট তীর্থস্থানস্বরূপ। প্রাতঃকালে টেলিফোন গাইড দেখিয়া স্থানীয় বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলাম। তাঁহার নাম স্বামী বিশ্বানন্দ। তিনি টেলিফোনে সহসা বাঙালীর কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়াছিলেন নিশ্চয়। নৈশ ভোজনের পর তাঁহার আশ্রমে যাইব, কথা হইল। ভোজনান্তে ট্যাক্সিযোগে অত্যুজ্জ্বল আলোকমালা-শোভিত শহরের মধ্য দিয়া আশ্রমের দিকে চলিলাম। এক স্থানে বহু খ্রীষ্টমাস তরু বিক্রয়ার্থ রাখা হইয়াছে। তাহারই নিকট আশ্রম। নীচে কলিং বেল টিপিলাম। সঙ্গে সঙ্গে উপর হইতে স্বামীজীও একটি বেল টিপিলেন। তাহাতে দরজায় একটি শব্দ হইল এবং তৎক্ষণাৎ দরজার অর্গল মুক্ত হইল। তখন ধাক্কা দিতেই দরজাটি খুলিয়া গেল এবং ভিতরে ঢুকিতেই পুনরায় বন্ধ হইয়া গেল। এদেশে সমস্ত ফ্ল্যাট বাড়ীতেই উপর হইতে বোতাম টিপিয়া নীচের দরজা খুলিবার যান্ত্রিক বন্দোবস্ত আছে।

স্বামীজীর সহিত আমার পূর্বপরিচয় ছিল না। কিন্তু তাঁহার পরমাত্মীয়ের মত ব্যবহারে পরিতৃপ্ত বোধ করিলাম। উপরে দুইটি ঘর দেখিলাম। যেটিতে আমরা কথা বলিতেছিলাম সেটি বড় ঘর। স্বামীজীর অনেক বই ঘরের চারদিকে সাজান। একটি বড় তৈলচিত্রে পরমহংসদেবের সেই সমাধিস্থ চিরপরিচিত মূর্তি। স্বামীজী বলিলেন, একজন সুইডিস ভক্ত চিত্রটি আঁকিয়াছেন। চিত্রটি খুব ভাল লাগিল। পাশের ছোট ঘরটি পূজার ঘর। সেখানে সন্ধ্যারতি হয়; উৎসব উপলক্ষে এদেশের লোকেরা আসিয়া গৈরিক পরিহিত স্বামীজীর পূজারতি দর্শন করেন। স্বামীজী বলিলেন এদেশে তাঁহাদের মোট বারটি আশ্রম আছে। নিউ ইয়র্ক, বষ্টন ও লস্ এঞ্জেলসের আশ্রমের কথা বিশেষ করিয়া বলিলেন। দার্শনিক হাক্সলি শেষোক্ত আশ্রমের একজন ভক্ত। রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত পরমানন্দে সদালাপে কাটাইয়া হোটেলের দিকে ফিরিলাম। তীব্র শীতের মধ্যে স্বামীজী আমার সঙ্গে রাস্তা পর্য্যন্ত আসিয়া ট্যাক্সি ডাকিয়া আমাকে তাহাতে তুলিয়া দিয়া আশ্রমে ফিরিলেন।

মিশিগান হ্রদের দক্ষিণ প্রান্তে শিকাগো শহর অবস্থিত। শহরটি খুব বড় এবং বিস্তীর্ণ। শহরটির একটি বিশেষ রূপ আছে। বিরাট হ্রদ। বিস্তীর্ণ উদ্যান ও বেড়াইবার জায়গা। মিশিগান এভিনিউর উপর শ্রেণীবদ্ধ বিরাটকায় ২০।২৫ তলা সৌধাবলী। হ্রদ হইতে ক্ষীণকায়া স্রোতস্বতী নির্গত হইয়া শহরের মধ্য দিয়া চঞ্চল চরণে চলিয়াছে। উভয় পার্শ্বে বড় বড় বাড়ী। বাড়ীগুলির উচ্চতা সুষম। কোন বাড়ী হঠাৎ অন্য সকলকে অসম্ভব রূপে ছাড়াইয়া গিয়া সে সুষমা ভঙ্গ করে নাই। মানুষ সর্বদা কর্মব্যস্ত। এখানে দক্ষিণের বর্ণ-বৈষম্য নাই। মানুষ মাত্রই এখানে মানুষ। শহরের এই বিশিষ্ট রূপ দেখিতে দেখিতে রাত্রি ১১টার পর হোটেলে ফিরিলাম। লিফটের মধ্যে একটি ভদ্রলোক আমার দিকে তাকাইতে তাকাইতে বলিয়াই ফেলিলেন, "আপনি কি ভারতবর্ষ হইতে আসিতেছেন?"

আমি—"হাঁ"

ভদ্রলোক—আমি আপনাকে কয়েকদিন যাবৎ লক্ষ্য করিতেছি; আর আপনি ভারতবাসী কি না একথা জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেছি। আজ প্রশ্নটা করিয়াই ফেলিলাম। আমি বহুবৎসর ভারতে ছিলাম। বম্বেতে ডাক্তারি করিতাম। আপনি কত দিন এখানে থাকিবেন।

"আমি কাল সকাল ১১টায় এ শহর ত্যাগ করিব।"

"আমার দুর্ভাগ্য। আপনার সঙ্গে বেশী আলাপ হইল না। যদি অন্ততঃ এখন একবার আমার ঘরে আসেন।"

ভদ্রলোকটির আগ্রহ দেখিয়া, নিদ্রাকর্ষণ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার ঘরে গেলাম। তিনি পরম আগ্রহে ভারতবর্ষের অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, "ভুলাভাইয়ের খবর কি? তাঁহার খবর অনেকদিন পাই না।"

বলিলাম—"তিনি কয়েক মাস হয় মারা গিয়াছেন।" ভদ্রলোক বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন, বলিলেন—"তাই তাঁর খবর পাই না। তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমাদের কি সৌহার্দ্যই ছিল! তাহার ছেলেকে আমি কালই চিঠি দিব। আপনার কথা আমি তাঁহাকে লিখিব।"

আমি আমার একটি কার্ড তাঁহাকে দিলাম। তিনিও তাঁহার কার্ড আমাকে দিলেন। ভদ্রলোকটির নাম ডাক্তার গিলবার্ট একলাও। বর্তমানে আমেরিকার নেভাডা রাজ্যের রাজধানী রেনোতে ডাক্তারি করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "আমি পরশু এ স্থান ত্যাগ করিব। এবার রেনোতে বড়দিনে আমাদের একটি পারিবারিক সম্মেলন হইবে। আমরা সমস্ত ভ্রাতাভগিনী বার বৎসর পর একত্র মিলিত হইতেছি।

ভদ্রলোক অনেক কথা বলিলেন। রাজাগোপালাচারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন, "তিনি আমার একজন রোগী ছিলেন।" ভারতবর্ষের রাজনীতির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা খুব সঙ্গীন। বলিলেন, "জিন্না যে এত জেদ করিবেন তাহা আমরা কেহই পূর্বে ভাবি নাই।"

ভদ্রলোক একদিনও অন্ততঃ আমাকে খাওয়াইতে পারিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি সস্ত্রীক সিনেমায় গিয়াছিলেন। স্ত্রী নীচে লাউঞ্জে আছেন। শীঘ্রই

আসিবেন। আমাকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ঘুমে চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল—কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া ঘরে আসিলাম। পরদিন প্রাতরাশের সময় খাবার ঘরে ভদ্রলোক আমার টেবিলের নিকট উপস্থিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনার আজ যাওয়াই কি ঠিক ?'—ভদ্রলোকের আগ্রহ দেখিয়া ভাল লাগিল।

মহাচীনের এক দশক (১৯২৭-৩৭)

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

নব্য চীনের স্রষ্টা ডাঃ সুন্ ইয়াট্ সেন ১৯২৪ সালে তৎপ্রতিষ্ঠিত ক্যুওমিণ্টাঙ দলকে নূতন করিয়া গঠন করেন। এই সময় বরোডিন সোভিয়েট প্রতিনিধিরূপে চীনে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারই প্রভাব এবং পরামর্শে সুন্ ক্যুওমিণ্টাঙ দলকে ঢালিয়া সাজিয়াছিলেন। এই বৎসরই আনুষ্ঠানিক ভাবে চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টি অর্থাৎ সাম্যবাদী দল গঠিত হয়। সুন্ ইয়াট্ সেন সাম্যবাদিগণের সহিত একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। এই চুক্তি অনুসারে কম্যুনিষ্টগণ নিজেদের পৃথক সংগঠন বজায় রাখিয়া ক্যুওমিণ্টাঙ দলে প্রবেশ করিলেন। চীনের মহাবিপ্লবে (১৯২৫-২৭) কম্যুনিষ্টগণ একটি বিশিষ্ট গৌরবময় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু মহাচীনের দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯২৭ সালের প্রথম দিকে কম্যুনিষ্ট ক্যুওমিণ্টাঙ উভয় দলের সম্মিলিত বাহিনী কর্তৃক সাঙহাই বিজয়ের পর চীনের বিপ্লবী শক্তি দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িল। বিপ্লবের অবসানে প্রতিবিপ্লবী শক্তি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। সৈন্যাধ্যক্ষ চিয়াঙ কাইশেক নান্‌কিঙে জাতীয় সরকারের রাজধানী স্থাপন করিলেন। এই বৎসর জুলাই মাসে চীনে প্রেরিত সোভিয়েট প্রতিনিধি বরোডিন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। চীন-সোভিয়েট এবং কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাঙ মৈত্রীবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল। এই ভাবে অতি অল্পকালের মধ্যে চীন-ইতিহাসের পট পরিবর্তিত হইল।

ক্যুওমিণ্টাঙের দক্ষিণ এবং বাম শাখার মধ্যে মিলন ঘটাইবার জন্য চিয়াঙ কাইশেক্ নান্‌কিঙ সৈন্যাধ্যক্ষ এবং রাষ্ট্রপতির পদ পরিত্যাগ করিয়া আগষ্ট মাসে জাপানে চলিয়া গেলেন। ডিসেম্বর মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি ডাঃ সুনের কনিষ্ঠা শ্যালিকা মাই-লিঙ সুঙের পাণিগ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি পুনরায় নান্‌কিঙ সরকারের সৈন্যাধ্যক্ষ এবং রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করিলেন। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই যে সমস্ত রণনায়ক তখন পর্য্যন্ত জাতীয় সরকারের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদের শক্তি চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। ১৯২৮ সালের প্রথম দিকে চীনের জাতীয় জীবনের দুর্গ্রহ, রণ-নায়কগণের প্রায় সকলেরই শক্তি চূর্ণ হইয়া গেল। মুখ্যতঃ জাপানের প্ররোচনায় পিকিঙ তখনও আত্মসমর্পণ করিল না। জাপানের ভয় যে, চীন ঐক্যবদ্ধ হইলে সাণ্টুঙ মুকুডেনে তাহার স্বার্থ বিপন্ন এবং মর্য্যাদা নষ্ট হইবে। মে মাসের প্রথম দিকে একই সময় দক্ষিণ এবং পশ্চিম হইতে নান্‌কিঙ বাহিনী পিকিঙ অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ইতোমধ্যে সাণ্টুঙের বন্দর সিঙটাওর পথে জাপ সৈন্যের একটি শক্তিশালী দল চীনে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রেল লাইন ধরিয়া পিকিঙের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পিকিঙের অল্প দক্ষিণে উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে নান্‌কিঙ বাহিনী পরাজিত হইয়া সাময়িকভাবে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল।

এই বিপর্যয়ের পর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পিকিঙের রণনায়ক চ্যাঙ সো-লিন্ নান্‌কিঙ সরকারের সহিত সুবিধা-জনক সর্তে আপোষ করিবার আশায় জাপানের সহিত তাঁহার যে মৈত্রীবন্ধন ছিল তাহা ছিন্ন করিয়া সসৈন্যে মাঞ্চুরিয়া চলিয়া গেলেন। চীন-সীমান্ত অতিক্রম করিবার পরই যে ট্রেনে তিনি যাইতেছিলেন বিস্ফোরণের ফলে তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। খুব সম্ভব জাপান কর্তৃক এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র চ্যাঙ সুয়ে লিয়াঙ জাপানের নিষেধ এবং ভীতি-প্রদর্শন অগ্রাহ্য করিয়া নান্‌কিঙ সরকারের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। জুলাই মাসে পিকিঙ আত্মসমর্পণ করিল। পিকিঙের নূতন নাম হইল পিপিঙ।

এইভাবে বাহ্যতঃ চীনে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আজ পর্য্যন্তও ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। পিকিঙের পতনের পূর্ব্বেই দক্ষিণ-চীনের ক্যাণ্টনে একটি স্বতন্ত্র সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ক্যাণ্টন সরকার নান্‌কিঙের বশ্যতা স্বীকার করিল না। এদিকে পিকিঙের পতনের পর উত্তর-চীনের কোন কোন রণনায়ক অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত রহিলেন। ইঁহারা মধ্যে মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধনেও আবদ্ধ হইতেন। কাগজে কলমে নান্‌কিঙ সরকার ক্যাণ্টন ব্যতীত সমগ্র চীন শাসন করিতেন। আসলে কিন্তু দেশের অনেক জায়গাতেই এই সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইত না। এই প্রসঙ্গে দেশের অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত কম্যুনিষ্টশাসিত বিরাট একটি অঞ্চলের কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য।

চীনে সুবিধাভোগী সাম্রাজ্যাধিকারী শক্তিসমূহের প্ররোচনায় নান্‌কিঙ্‌ সরকার প্রথম হইতেই সোভিয়েট বিরোধী নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। ১৯২৯ সালে নান্‌কিঙ সরকারের ইঙ্গিতে মাঞ্চুরিয়ার সোভিয়েট দূতাবাস আক্রান্ত হয়। অতঃপর 'চায়নিজ ইষ্টার্ণ' রেলপথের রুশীয় কর্ম্মচারিদিগকে গ্রেপ্তার করা হইতে থাকে। রুশিয়া এবং চীন এই রেলপথের সমান অংশীদার। নান্‌কিঙের অসঙ্গত ঔদ্ধত্যের প্রতিকারের জন্য সোভিয়েট রাষ্ট্র হইতে মাঞ্চুরিয়াতে সৈন্য প্রেরিত হইল। কয়েক মাস বিরোধ চলিবার পর নান্‌কিঙ সরকার 'চায়নিজ ইষ্টার্ণ' রেলপথের পরিচালনা সংক্রান্ত পূর্ব্ব-ব্যবস্থা বজায় রাখিতে সম্মত হইলেন।

এদিকে কম্যুনিষ্টদের সহিত ক্যুওমিন্টাঙ দলের বিরোধিতা তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া উঠিতে লাগিল। নান্‌কিঙ সরকারের আদেশে সাম্যবাদী ভাবধারা প্রচার করা এবং সাম্যবাদী দলভুক্ত হওয়া প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধের মধ্যে পরিগণিত হইল। চীনের জাতীয়তাবাদের দুইটি আদর্শ—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং গণ-বিপ্লব—প্রকৃত প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইল। নান্‌কিঙ সরকার কর্ত্তৃক অনুসৃত প্রতিক্রিয়া-পন্থী নীতির জন্য যাঁহারা এই সময় চীন হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মাদাম সুন্ ইয়াট সেনের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য নান্‌কিঙ সরকার প্রধানতঃ সাঙহাই বন্দরের ধনকুবের ব্যাঙ্কারগণের মুখাপেক্ষী ছিলেন। এই সরকারের অনুগত বিভিন্ন সৈন্যাধ্যক্ষের অধীন বিমানবাহিনীগুলি অসহায় কৃষককুলের রক্ত শোষণ করিতে লাগিল। বহু প্রাক্তন সৈনিক জীবিকার অন্বেষণে দেশময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই নিরুপায় হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিল। পুরাতন রণ-নায়ক সম্প্রদায়ের স্থলে অভিনব রণ-নায়ক সম্প্রদায় আবির্ভূত হইল। গৃহ-যুদ্ধ এবং ক্রমবর্দ্ধমান কৃষক-আন্দোলন দমনে সরকার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিলেন। সহস্র সহস্র সাম্যবাদী এবং কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন এবং সংগঠনের প্রাক্তন নেতারা সরকারের দমন-নীতির ফলে প্রাণ হারাইলেন। সর্ব্বপ্রকার বিরোধিতার মূলোচ্ছেদ করিয়া একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব (Totalitarian Dictatorship) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হইতে লাগিল।

চিয়াঙ কাই-শেক্ পরিচালিত নান্‌কিঙ সরকার ক্রমশঃই বৈপ্লবিক নীতি এবং আদর্শ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিলেন। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রার মান অতি-দ্রুত নামিয়া যাইতে লাগিল। পিপিঙ হইতে প্রকাশিত 'ডেমোক্রেসি' নামক দৈনিকে, ১৯৩৭ সালের ১৫ই মে তারিখে প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখা যায় যে চীনের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সেজিতে ৪০০,০০০-এর অধিক, কান্‌সুতে ১,০০০,০০০-এর অধিক, হোনানে প্রায় ৭,০০০,০০০ এবং কিয়াঙ চারতে ৩,০০০,০০০ জন বুভুক্ষু খাদ্যান্বেষণে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ঐ কাগজের একই সংখ্যায় প্রকাশ যে, কিয়াঙ চাঙ প্রদেশে ৬০টি জেলা দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে এবং বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে এইরূপ প্রলয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ আর হয় নাই। সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'সেণ্ট্রাল নিউজ এজেন্সি' কর্ত্তৃক এই সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

মার্কিন সাংবাদিক ও গ্রন্থকার এড্‌গার স্নো-র বহুল-প্রচারিত গ্রন্থ 'রেড ষ্টার ওভার চায়না' ১৯৩৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি বলিয়াছেন যে, সেচোয়াঙ ও অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশে আগামী ৬০ বৎসর বা তাহারও অধিককালের জন্য রাজস্ব আদায় করা হইয়া গিয়াছে এবং রাজস্ব ও সুদের হার অত্যন্ত বেশী বলিয়া বহু কর্ষণযোগ্য ভূমি মালিক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অকর্ষিত পড়িয়া রহিয়াছে।

একদিকে পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত অধিবাসিগণ যেমন দিনের পর দিন দেউলিয়া হইয়া যাইতে লাগিল, অপর দিকে তেমনই আবার দেশের যাবতীয় ভূসম্পত্তি এবং নগদ টাকা মুষ্টিমেয় ভূমাধিকারী এবং কুসীদজীবীর হাতে কেন্দ্রীভূত হইতে লাগিল। ইহারই ফলে আধুনিক চীন-সমাজ হইতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

কম্যুনিষ্ট নেতা মাও সে তুঙের ১৯২৬ সালে প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে প্রকাশ যে, সমগ্র চীনের মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির শতকরা ৭০ ভাগই জমিদার, সম্পন্ন কৃষক, সরকারী কর্ম্মচারী এবং কুসীদজীবী সম্প্রদায়ের কবলিত হইয়াছে, অথচ পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৬৫ জনই দরিদ্র কৃষক, রায়ত এবং ক্ষেতমজুর হইলেও মোট কর্ষণযোগ্য ভূমির শতকরা ১৫ ভাগের বেশী তাহাদিগের অধিকারে নাই। নান্‌কিঙ সরকার কর্ত্তৃক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা পরিত্যক্ত হওয়ার ফলেই পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদিগের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিয়াছিল। কম্যুনিষ্টগণও এই কথাই বলেন।

এদিকে নান্‌কিঙ সরকার যখন স্বীয় শক্তির দৃঢ়তা সম্পাদনে ব্যাপৃত ছিলেন, কম্যুনিষ্টগণ তখন নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকেন নাই। ১৯২৭ সালে ক্যুওমিন্টাঙ দলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইবার পর তাঁহারা ইয়াংসি উপত্যকায় কিয়াঙ্‌সি প্রদেশে প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বৎসর নভেম্বর মাসে চীনে সর্ব্বপ্রথম সোভিয়েট সরকার স্থাপিত হয়। কোয়াণ্টুঙ প্রদেশের অন্তর্গত হাইফেঙ জেলাতে প্রতিষ্ঠিত এই সরকার হাইফেঙ সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র নামে পরিচিত। চার বৎসর পর ১৯৩১ সালে চীন-সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিয়াঙসি প্রদেশের সীমান্তে অবস্থিত এই জুই-চিন ইহার রাজধানী হইল। সোভিয়েটশাসিত অঞ্চল ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইতে থাকে। ১৯৩২ সালের মধ্যভাগে মহাচীনের প্রায় একষষ্টাংশ পরিমিত স্থান সোভিয়েট ব্যবস্থায়

শাসিত হইত। এই সময় ইহার আয়তন ২৫০,০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ৫০,০০০,০০০ ছিল।

১৯২৮ সালে চীনে সর্ব্বপ্রথম লালফৌজ গঠিত হয়, এই সময় ইহার সৈন্য-সংখ্যা ২,০০০-এর অধিক ছিল না। চু-টে এই বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন। জাপ-যুদ্ধ কালে ইনিই সুবিখ্যাত 'এইটথ রুট আর্ম্মি'র সর্ব্বাধিনায়ক ছিলেন। চু-টে গেরিলা রণনীতিতে বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার সংগঠন-নৈপুণ্যে ১৯৩০ সালের মধ্যে লালফৌজের সৈন্যসংখ্যা ১০ গুণ বর্দ্ধিত হয়। ইহার দুই বৎসর পর ১৯৩২ সালে চীনের লালফৌজের সৈন্যসংখ্যা আরও বাড়িয়া ৪০০,০০০ হইয়াছিল। লালফৌজের সৈনিকদিগকে সামরিক এবং রাজনৈতিক উভয়বিধ শিক্ষাই দেওয়া হইয়া থাকে।

সোভিয়েট ব্যবস্থায় শাসিত অঞ্চলসমূহে নূতন করিয়া জমি বণ্টন করা হইল। কৃষকদিগের করভার হ্রাস করিয়া অনেক যৌথ কৃষি এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। ১৯৩৩ সালের মধ্যে একমাত্র কিয়াঙসি প্রদেশেই ১,০০০-এরও অধিক সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালিত সোভিয়েট গঠিত হইয়াছিল। বেকার-সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা হইল এবং অহিফেন সেবন পতিতাবৃত্তি, শিশুদিগের দাসত্ব এবং বাধ্যতামূলক বিবাহ-প্রথার বিলোপসাধন করা হইল। শিক্ষাবিস্তারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইল এবং চীনের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা লালচীনে অধিকতর দ্রুতগতিতে শিক্ষার বিস্তার ঘটিল।(১) যে সমস্ত অঞ্চলে যুদ্ধের আগুন ছড়াইয়া পড়ে নাই সে সমস্ত অঞ্চলে শ্রমিক এবং কৃষকদিগের জীবনযাত্রার মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইল।

১৯৩০ সালের জুলাই মাসে কম্যুনিষ্টগণ হুনান প্রদেশ আক্রমণ করিয়া ইহার রাজধানী অবরোধ করিলেন। নানকিঙে পৌঁছিবার জন্য তাহারা এই সময় বিভিন্ন দিক হইতে আক্রমণ চালাইতেছিলেন। চিয়াঙ কাইশেকের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, কম্যুনিষ্টদল কুওমিণ্টাঙের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে এবং নানকিঙের সরকারকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া কম্যুনিষ্ট দলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

১৯৩০ হইতে ১৯৩৪ সালের মধ্যে নানকিঙ সরকার কর্ত্তৃক চীন সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের বিরুদ্ধে পর পর ৬টি অভিযান প্রেরিত হয়, কিন্তু এত করিয়াও চূড়ান্ত জয়পরাজয় নির্দ্ধারিত হইল না। কম্যুনিষ্টগণের বিরুদ্ধে ষষ্ঠ অভিযানকালে নানকিঙ-বাহিনী তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে। শেষে খাদ্য ও লবণের অভাবে চীন-সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র এক ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হইল। কিন্তু কম্যুনিষ্টগণ তখনই আত্মসমর্পণ না করিয়া কিয়াঙসি হইতে অধিকতর নিরাপদ কোন স্থানে সরিয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। কিয়াঙসি হইতে কম্যুনিষ্টগণের অপসরণ "লং মার্চ্চ" নামে অভিহিত হয়। কিছুদিন শতবর্ষ পূর্ব্বে ১৮৩৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র কৃষকগণের উত্তরাভিমুখী অভিযানের সহিত এই "লং মার্চ্চের" খুব নিকট সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের মধ্যে তুলনায় প্রথমোক্তটি নিঃসন্দেহে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে।

১৯৩৪ সালের ১৬ই অক্টোবর কিয়াঙসি হইতে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে কম্যুনিষ্টগণের যাত্রা আরম্ভ হইল। মানুষের ইতিহাসে এই অভিযানের তুলনা মিলে না। এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দলে কেবল মাত্র সৈন্যগণই ছিল না। সহস্র সহস্র কৃষকও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যাত্রা করিল। নারী-পুরুষ যুবক-বৃদ্ধ এবং শিশু সকলের সমবায়ে এই অভিযাত্রী দল গঠিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে সকলেই কিছু কম্যুনিষ্ট ছিল না। জুইকিন পরিত্যাগ করিবার সময় কম্যুনিষ্টগণ অস্ত্রাগার হইতে যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। কারখানা-সমূহ হইতে যাবতীয় যন্ত্রপাতি খুলিয়া লইয়া গাধা এবং খচ্চরের পিঠে চাপাইয়া দেওয়া হইল। এক কথায় বলিতে গেলে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারা যায় এমন কিছুই পরিত্যক্ত হইল না। পরে অবশ্য বহু জিনিসই পথে ফেলিয়া যাইতে হইয়াছিল। কম্যুনিষ্টগণ বলেন যে কিয়াঙসি হইতে কানসুর পথে বিভিন্ন স্থানে পথিপার্শ্বে হাজার হাজার রাইফেল ও মেসিন-গান, প্রচুর যন্ত্রপাতি এবং রৌপ্য ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে।

অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া, পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে করিতে কখনও বা আবার শত্রুর আক্রমণ এড়াইয়া স্বীয় আদর্শে আস্থাবান্ এই দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দল প্রথমে পশ্চিম দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়া সুদূর পশ্চিমে তিব্বত সীমান্তে উপস্থিত হইল। এখান হইতে আবার উত্তর এবং পূর্ব্ব দিকে চলিতে সুরু করিয়া এই দল অবশেষে সেন্‌সি প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে উপস্থিত হইল। সাম্যবাদিগণ এই অঞ্চল নিজেদের অধিকারভুক্ত করিয়া তথায় সোভিয়েট শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিলেন। ইয়েনান সোভিয়েট চীনের নূতন রাজধানী হইল। ইয়েনানের ভূমি বন্ধ্যা এবং অর্থনীতির দিক হইতেও ইয়েনান একান্তই অনগ্রসর। কিন্তু রণনীতির দিক হইতে ইহার গুরুত্ব মোটেই উপেক্ষা করিবার মত নহে। ইয়েনানের পশ্চিমেই চীনের মুসলমান-অধ্যুষিত একটি প্রধান অঞ্চল। এইখানে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু হইলেও বেশ শক্তিশালী। সেন্‌সির উত্তরে বিরল-বসতি অন্তর্মঙ্গোলিয়া। ইহার রক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। জাপ মোটরবাহিনী অনায়াসেই এই প্রদেশ অধিকার করিতে পারিত। সেন্‌সির পূর্ব্ব দিকে শৈলশ্রেণীপরিবেষ্টিত সেন্‌সি প্রদেশ অবস্থিত। সেন্‌সি খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই সম্পদ গ্রাস করা জাপানের চীন অভিযানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেন্‌সির ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত সিয়ানের বিস্তীর্ণ প্রান্তর চীনের একটি অতিশয় সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল।

দুর্গম পথের এই অভিযাত্রিগণ প্রায় ৮,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া যখন সেন্‌সিতে উপস্থিত হইল তখন যাত্রা

(1) "Mass education made much progress in the stabilized Soviets. In some countries, the Reds attained a higher degree of literacy among the populace in three or four years than had been achieved anywhere else in rural China after centuries. This did not exclude even the Rockfeller-backed *de luxe* mass education experiment at Ting Hsien, run by "Jimonie" Yen. In Hsin Kuo, the Communists' model hsien, there was a populace nearly 80 per cent literate—much higher than in the famous Rockfeller country." —*Red Star Over China* by Edgar Snow, pp. 183-84.

যাহারা আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই আর বাঁচিয়া ছিল না। কিয়াংসি, কোয়াণ্টুং, কোয়াংসি এবং হুনানের ভিতর দিয়া চলিবার সময় কম্যুনিষ্ট বাহিনীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।[১]

কম্যুনিষ্টগণের এই অপসরণ নানকিঙ সরকারের শক্তি-বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছিল। কোন কোন অঞ্চলের রণনায়ক ১৯৩৪-১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত নানকিঙ জাতীয় সরকারের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। এই সমস্ত অঞ্চলের ভিতর দিয়া যখন কম্যুনিষ্ট বাহিনী অগ্রসর হইতেছিল, তখন রণনায়কগণ আত্মরক্ষার গরজে অনন্যোপায় হইয়া নানকিঙের সরকারী বাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহারই ফলে তাঁহাদিগকে পরে শাসন এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে নানকিঙ জাতীয় সরকারের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

এদিকে কম্যুনিষ্ট-ক্যুওমিণ্টাঙ বিরোধে চীন যখন বিব্রত, তখন জাপান দেখিল ইহাই তাহার চীনে স্বীয় কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং বিস্তারের স্বুবর্ণ সুযোগ। কিয়াঙসির কম্যুনিষ্টদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ সালে চিয়াং কাইশেক যখন সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, জাপান তখন মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিয়া বসিল। চিয়াঙ আশা করিয়াছিলেন যে 'জাতি-সঙ্ঘ' এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করিবেন। কিন্তু দুর্ব্বলের পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া কোন বুদ্ধিমানই প্রবলের অসন্তোষ উৎপাদন করেন না। এই ক্ষেত্রেও এই নিয়মের অন্যথা ঘটিল না। 'জাতি-সঙ্ঘ' প্রবল জাপানকে ঘাঁটাইতে সাহস করিল না, নানকিঙ সরকার মাঞ্চুরিয়ার উপর হৃত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টাই করিলেন না। ফলে জনমত সরকারের প্রতি কিছু বিরূপ হইয়া উঠিল।

এই সময় হইতেই চিয়াঙ কাইশেক জাতীয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করিতেছিলেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক বাহিনীগুলি এতদিন পর্য্যন্ত স্থানীয় সৈন্যাধ্যক্ষগণের অধীনে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত। সৈন্যগণ মনে করিত যে স্ব স্ব প্রদেশের জন্য যুদ্ধ করিলেই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল। সমগ্রভাবে দেশের প্রতি তাহাদের যে কোন কর্ত্তব্য আছে তাহা তাহারা বুঝিত না। চিয়াঙ কাইশেক এই বিচ্ছিন্ন সামরিক শক্তিকে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীনে সুসংহত করিলেন অর্থাৎ সমস্ত প্রাদেশিক বাহিনীর সমবায়ে একটি জাতীয় বাহিনী গঠন করিলেন। সৈন্যগণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইল, দেশরক্ষার পবিত্র কর্ত্তব্যভার তাহাদেরই উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক চীন নাগরিককে যুদ্ধবিদ্যা শিখিতে হইত। সরকারী আদেশে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইল। ইউরোপীয় এবং আমেরিকান উপদেষ্টার সহায়তায় অল্পকালের মধ্যেই আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত বিরাট একটি বাহিনী গড়িয়া উঠিল। সামরিক প্রয়োজনে রেলপথ এবং রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধিত হওয়ার ফলে যাতায়াতের অসুবিধা বহুল পরিমাণে কমিয়া গেল। সৈন্যবাহিনীর পক্ষে প্রয়োজনীয় বিবিধ পণ্যের উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানকে সরকারী তহবিল হইতে অর্থ এবং অন্যবিধ সাহায্য করা হইতে লাগিল।

সুসজ্জিত বিমানবহর এবং সুশিক্ষিত বৈমানিকবাহিনী আধুনিক সমর-যন্ত্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ। চিয়াঙ কাইশেকের আদেশে বিমানবহরের উন্নতির জন্য একটি ত্রৈবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হইল। বিদেশ হইতে বিমান ক্রয় করিয়া শিক্ষিত বৈমানিক দল গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা হইল। যুক্ত-রাষ্ট্রের কর্ণেল চিনল্ট নানকিঙ সরকারের বিমানবহরের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন।

চিয়াঙের সমর্থকবৃন্দ বলেন যে, ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সময় কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যেই তিনি একট আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত শক্তিশালী বাহিনী গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। নানকিঙ সরকারের পরবর্ত্তীকালের কার্য্যকলাপ কিন্তু এই মতের পোষকতা করে না।

সমরবিভাগের আধুনিকতা সম্পাদন, সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য বিবিধ শ্রমশিল্পের উন্নতিসাধন, জাতীয় অর্থনীতিক কাঠামোর সংস্কার, বাণিজ্য বিস্তার, বেকার-সমস্যার সমাধান, জনসাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষাদান—এই সমস্তই সময়সাপেক্ষ। যুদ্ধজয়ের জন্য ইহাদের কোনটিই অদরকারী নহে। চিয়াঙের সমর্থকগণ বলেন যে, সেইজন্যই প্রতিকূল সমালোচনা এবং জাপানের তরফ হইতে পৌনঃপুনিক উত্তেজনা সত্ত্বেও তিনি জাপানের সহিত শক্তিপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি নিজেও একাধিক বার বলিয়াছেন যে চীনের দুর্ব্বলতার জন্যই তিনি যুদ্ধবিগ্রহ এড়াইয়া চলিতে চাহেন। তুলনীয়:— "We are still a weak people and we dare not provoke a war. But if we are forced to fight, we shall not stop until the last man has fallen, or until we are victorious." অর্থাৎ, "জাতি হিসাবে আমরা এখনও দুর্ব্বল, আমরা গায়ে পড়িয়া যুদ্ধ বাধাইতে সাহস করি না। কিন্তু যদি আমাদিগকে যুদ্ধ করিতেই হয়, শেষ সৈনিকটির দেহে প্রাণ থাকা অথবা জয়লাভ না করা পর্য্যন্ত আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইব না।" কিন্তু একথা বলা সত্ত্বেও জাতীয় দৌর্ব্বল্যের অন্যতম প্রধান কারণ অন্তর্বিরোধ দূর করিবার কোন চেষ্টা করা দূরের কথা, তিনি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে এই বিরোধ না মিটিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছিল।

কম্যুনিষ্ট দলকে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিতে চিয়াঙ কাইশেকের চেষ্টার বিরাম ছিল না, অথচ ১৯৩২ সালেই জাপানের সহিত একটা আপোষ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন সময়ে সাত বার আলোচনা চালাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক বারই আপোষের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তরের অনমনীয় মনোভাবই এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী। জাপ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ হিরোটা দাবি করেন যে চীন যদি তাঁহার 'তিনটি

১। *Red Star Over China* by Edgar Snow, pp. 183-208 দ্রষ্টব্য।

নীতি' মানিয়া লইতে রাজী হয়, আপোষ হইতে পারে। এই তিনটি নীতি দ্বারা দাবি করা হইল যে—

(১) চীনকে জাপ-বিরোধী যাবতীয় সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ভাঙিয়া দিতে হইবে এবং পাশ্চাত্য শক্তিপুঞ্জকে জাপানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে ;

(২) মাঞ্চুক্যুও (মাঞ্চুরিয়ার জাপ-প্রদত্ত নাম) এবং জিহোলকে স্বাধীন (!) কিন্তু জাপ-তাঁবেদার রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; এবং

(৩) চীনে অবস্থানকারী জাপবাহিনীকে 'কম্যুনিষ্ট দস্যু'-দিগের দমনে সহযোগিতা করিতে দিতে হইবে।

অত্যুগ্র কম্যুনিষ্ট-বিদ্বেষ সত্ত্বেও চিয়াঙ তথা নান্‌কিঙ সরকারের পক্ষে এই সর্ত্তগুলি গ্রহণ করা সম্ভব হইল না। আপোষের যাবতীয় প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে চীন-জাপান সংঘর্ষ অনিবার্য্য এবং আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

এদিকে দেশের জনমত দিনের পর দিন নান্‌কিঙ সরকারের নীতির প্রতিকূল সমালোচনায় মুখর হইয়া উঠিতেছিল। মহাচীনের ছাত্রসম্প্রদায় বরাবরই আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া এবং বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে রহিয়াছে। ১৯৩১ এবং ১৯৩২ সালে ছাত্রগণ মাঞ্চুরিয়া এবং সাংহাইয়ের ওপর বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রতিরোধ-প্রচেষ্টাকে সহায়তা করিবার জন্ম দেশবাসীর নিকট আবেদন করিয়াছিল এবং দেশময় জাপানী পণ্য-বর্জ্জনের আন্দোলন গঠন করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহাদেরই আহ্বানে দেশের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিগণ নান্‌কিঙে সমবেত হইয়া সরকারী জাপ-তোষণ নীতির পরিবর্ত্তন দাবি করিলেন। পররাষ্ট্রসচিব ডাঃ সিং চিং ওয়াঙ একদল প্রতিনিধির প্রশ্নসমূহের সন্তোষজনক উত্তর দিতে সক্ষম না হওয়ায় নিজের দপ্তরখানার মধ্যেই প্রহৃত হইলেন। ভয় পাইয়া ওয়াঙ পদত্যাগ করিলেন। ছাত্র-আন্দোলন দমন করিবার জন্ম চিয়াঙ কাইশেক চণ্ডনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চীনের ছাত্রগণের পক্ষ হইতে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে দেখা যায় যে ১৯২৭ হইতে ১৯৩৫ সালের মধ্যে নান্‌কিঙ জাতীয় সরকারের আদেশে ৩০০,০০০ তরুণকে গ্রেপ্তার এবং হত্যা করা হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ছাত্রগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়া দাবি করিলেন যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে এবং অবিলম্বে লালচীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দেশের সমগ্র সামরিক শক্তিকে সমস্ত দেশের শত্রু জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিতে হইবে।

১৯৩৬ এবং ১৯৩৭ সালের প্রারম্ভে দেশে ঐক্য স্থাপন করিয়া জাতীয় শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার মনোভাব সমগ্র সমাজদেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সমাজের সর্ব্ব স্তর হইতেই এই দাবি উত্থাপিত হইল। জাপ-মালিকগণের কাপড়ের কলসমূহের সহস্র সহস্র চীনা শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিল। ইহাদিগের সাহায্যের জন্ম বিশিষ্ট এবং সম্রান্ত উদারনৈতিক ব্যক্তিগণের একটি কমিটি গঠিত হইল। অবিলম্বে সাংহাইয়ে এই কমিটির সাত জন গণ্যমান্ত সদস্তকে গ্রেপ্তার করিয়া 'চীন সাধারণতন্ত্রের নিরাপত্তা বিপন্ন করিবার অপরাধে' অভিযুক্ত করা হইল। এদিকে ন্তাশনাল স্তালভেশন এ্যাসোসিয়েসনও ছাত্র এবং উপরোক্ত ধর্ম্মঘটীদিগের দাবির অনুরূপ দাবি উপস্থিত করিল। ক্যুওমিণ্টাঙ বাহিনীও সরকারী নীতিতে ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িতেছিল, সৈন্তগণ খুব ভাল করিয়াই জানিত যে জাতির অস্তিত্ব, স্বার্থ এবং মর্যাদা রক্ষা করাই সৈন্তবাহিনীর প্রধান এবং একমাত্র কর্ত্তব্য, ফলে কম্যুনিষ্টগণের সহিত সংঘর্ষের সময় ক্যুওমিণ্টাঙ সৈন্তদল সাগ্রহে যুদ্ধ করিত না। কখনও তাহারা দলে দলে কম্যুনিষ্টগণের সহিত যোগদান করিত। কিন্তু জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইহারা প্রাণপণে জয়লাভের চেষ্টা করিত। ১৯৩৩ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া জেনারেল ফেঙ ইউ সিয়াঙ, জেনারেল ক্যাঙ চেন্ উ এবং জেনারেল চি হুঙ চাঙের নেতৃত্বে চাহার প্রদেশে অবস্থিত সৈন্তবাহিনী নান্‌কিঙ হইতে আদেশের অপেক্ষায় না থাকিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এই অপরাধে জেনারেল চি ক্যুওমিণ্টাঙ সৈন্তের হাতে প্রাণ হারাইলেন। জেনারেল ক্যাঙ প্রাণভয়ে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ১৯৩৪-৩৫ সালে কম্যুনিষ্টগণের 'লং মার্চ্চে'র সময় তাঁহারা চীনের জাতীয়তার নবমন্ত্র—'চীনের অধিবাসিগণের পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করা অবিধেয়', 'জাপানকে প্রতিরোধ কর'—প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। এই প্রচার একেবারে নিরর্থক হয় নাই।

আধুনিক চীনের ইতিহাসে ১৯৩৬ সাল একটি স্মরণীয় বৎসর। পিতার অপঘাত-মৃত্যুর পর চ্যাঙ সো লিনের পুত্র চ্যাঙ সুয়ে লিয়াঙ মাঞ্চুরিয়ায় কর্ত্তৃত্বলাভ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই ইহার উল্লেখ করিয়াছি। নান্‌কিঙের আনুগত্য স্বীকার করিবার পর তাঁহাকে চীন সাধারণতন্ত্রের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশের সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইয়াছিল। চ্যাঙের সৈন্তগণের অধিকাংশই মাঞ্চুরিয়াবাসী ছিল। জাপান কর্ত্তৃক ১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া গ্রাসের পর হইতে তাহারা স্বদেশের মুক্তিসাধনের জন্ম উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নান্‌কিঙ-সরকার তাহাদিগকে জাপানের বিরুদ্ধে নিয়োজিত না করিয়া কম্যুনিষ্ট দমনে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ইহার ফলে চ্যাঙের অধীনস্থ সৈন্তবাহিনীর মধ্যে তীব্র অসন্তোষের সঞ্চার হয়। এদিকে কম্যুনিষ্টগণের সংস্পর্শে আসিয়া চ্যাঙের সৈন্তদল ক্রমশঃ সাম্যবাদী ভাবধারার সহিত পরিচিত হইতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইহার অন্তর্নিহিত শক্তি এবং সত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। কম্যুনিষ্ট এবং চ্যাঙের বাহিনীর মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান হইতে থাকে। চ্যাঙের সৈন্তগণ দেখিল যে সাম্যবাদিগণ রক্তপিপাসু হিংস্র দস্যু মাত্র নহে। তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বুদ্ধিমত্তার সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে এবং ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতি বা দলীয় স্বার্থ অপেক্ষা চীনের স্বার্থকেই তাহারা বড় মনে করে।

এদিকে ১৯৩০-৩১ সাল হইতে কম্যুনিষ্টগণ পুরাতন নীতি

পরিত্যাগ করিয়া অভিনব নীতি এবং কৌশলের সাহায্যে তাঁহাদের আদর্শকে রূপদান করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯৩০ সালের পূর্ব্বে চীনের কম্যুনিষ্টগণ মনে করিতেন যে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্য্যায় হইতে খুব তাড়াতাড়ি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্য্যায়ে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং চীনে ইতিমধ্যেই সেই অবস্থান্তর আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শিল্পের ক্ষেত্রে ইঁহাদিগের সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগ করিবার চেষ্টার ফলে শহরের ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা পর্য্যন্ত বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল। এই ১৯৩০-৩১ সাল পর্য্যন্ত কম্যুনিষ্টগণ ক্যুওমিণ্টাও দল এবং বিত্তশালী সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন এবং সুযোগ পাইলেই এই দুই প্রতিপক্ষকে পর্য্যুদস্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু ১৯৩১ সালে জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকৃত হইবার পর ইঁহাদিগের ক্যুওমিণ্টাঙ বিদ্বেষ জাপান বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছিল। কম্যুনিষ্টগণ এই সময় জাপানকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সর্ব্বশ্রেণীর লোককে ক্যুওমিণ্টাঙ সরকারের পতাকাতলে সমবেত হইতে আহ্বান করিলেন।

১৯৩৬ সালের শেষের দিকে চীনের জনমতের জাপান-বিদ্বেষী হইয়া উঠিবার কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। গোড়ায় যাঁহারা সাম্যবাদ বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাও এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন জাপানই চীনের প্রকৃত শত্রু। কম্যুনিষ্টগণ তখন দেশের কেন্দ্রস্থল হইতে সুদূর সীমান্তে সরিয়া যাওয়ার ফলে এক হিসাবে পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগের পক্ষে সমগ্র দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করা তখন আর কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। পক্ষান্তরে জাপান উত্তর-চীন আক্রমণ করিলে তাঁহাদিগেরই আক্রমণের প্রাথমিক বেগ প্রতিহত করিতে হইত।

চ্যাঙ শুয়ে লিয়াঙের বাহিনী সেন্‌সি এবং কান্‌সু প্রদেশের কম্যুনিষ্টদিগকে চতুর্দ্দিক হইতে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। অবরোধকারী বাহিনী অবরুদ্ধগণের প্রতি অনুকূল মনোভাব পোষণ করিত। স্থানে স্থানে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্কও স্থাপিত হইয়াছিল। উভয় বাহিনীর উচ্চপদস্থ সৈন্যাধ্যক্ষগণের মধ্যে একটা অলিখিত আক্রমণ-চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। ফলে সামরিক শৃঙ্খলা এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষা করা একটি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই সংবাদে বিচলিত হইয়া ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চিয়াঙ কাইশেক উত্তর-চীনের সিয়ান্ নগরে গেলেন। সিয়ানে পৌঁছিবার পরই কয়েক দিনের জন্য তিনি শহরতলীতে চলিয়া গেলেন। এখানে আসিবার পরদিন সকালবেলা তিনি অধ্যয়নরত আছেন এমন সময় সদর দরজায় একটা গোলমাল শুনিতে পাইলেন। কতকগুলি লোক হল্লা করিতে করিতে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। চিয়াঙ বুঝিলেন ইহাদের উদ্দেশ্য কি। অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে খিড়কির দরজা দিয়া পলায়ন করিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী 'ব্ল্যাক হর্স হিলে' আরোহণ করেন। শত্রুগণ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া সিয়ানে লইয়া আসিল। নান্‌কিঙ হইতে যে সমস্ত সেনানী তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন, তাঁহারাও অনেকেই বন্দী হইলেন। চ্যাঙের আদেশেই চিয়াঙকে বন্দী করা হইয়াছিল। চ্যাঙ দাবি করিলেন যে, চিয়াঙ কাইশেককে

(১) কম্যুনিষ্ট বিরোধিতা পরিত্যাগ করিতে হইবে;

(২) নান্‌কিঙ জাতীয় সরকারকে নূতন করিয়া গঠন করিতে হইবে; এবং

(৩) জাপ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

চ্যাঙের দাবি মানিয়া লওয়া দূরের কথা, চিয়াঙ তাঁহার সহিত দেখা করাও বন্ধ করিয়া দিলেন। স্বামী বিপন্ন হইয়াছেন এই সংবাদ পাইয়া মাদাম চিয়াঙ কাইশেক বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া নান্‌কিঙ হইতে বিমানযোগে সিয়ানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার পর যে বিশদ আলাপ-আলোচনা চলে, তাহাতে কম্যুনিষ্টগণের পক্ষ হইতে চৌ এন্‌লাই চিয়াঙের মুক্তি দাবি করিলেন।

চিয়াঙ মুক্তিলাভ করিলেন এবং সস্ত্রীক বিমানযোগে নান্‌কিঙে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বলা বাহুল্য চিয়াঙের মুক্তির পূর্ব্বে চ্যাঙ এবং চিয়াঙের মধ্যে একটা আপোষ হইয়াছিল। চ্যাঙের পক্ষ হইতে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইল। এই বিবৃতিতে ছাত্র-সম্প্রদায়ের শ্রমিকগণের এবং 'ন্যাশনাল স্যালভেশন এসোসিয়েশনের' দাবি সমর্থিত হইল। এই দাবিগুলি নিম্নে দেওয়া হইল—

(১) জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে;

(২) গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটাইতে হইবে;

(৩) জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তি দিতে হইবে; এবং

(৪) চীনের অধিবাসীদিগের পৌর স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।

চিয়াঙ কাইশেককে এই দাবিগুলি মানিয়া লইতে হইল। এই সময় চিয়াঙের সহিত কম্যুনিষ্টগণের এই মর্ম্মে এক চুক্তি হয় যে, কম্যুনিষ্টগণ জাপ-বাহিনীর পশ্চাদ্ভাগে সংগ্রাম চালাইবে এবং কৃষকগণের প্রতিরোধ-শক্তিকে সংগ্রামশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে সংগঠিত করিবে। জাপ যুদ্ধকালে দেখা গেল যে জাপানীরা যতই চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল, কম্যুনিষ্টগণ ততই বেশী করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া বৈদেশিক আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ-শক্তিকে সংগঠিত করিয়া তুলিতে লাগিল। মহাচীনের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল আজ কম্যুনিষ্টগণের অধীনে থাকিবার ইহাই মূল কারণ।

চিয়াঙ-কম্যুনিষ্ট চুক্তির পর কম্যুনিষ্টগণ ভূস্বামী এবং বিত্তবান্ সম্প্রদায়ের ভূমি ও বিত্ত বাজেয়াপ্ত করিবার নীতি পরিত্যাগ করিলেন। সাময়িকভাবে হইলেও সমগ্র চীন এত দিনে ঐক্যবদ্ধ হইল। জাপানের দীর্ঘকাল পোষিত অনায়াসে চীন জয়ের আশার মূলে কুঠারাঘাত করা হইল। এই একতা যাহাতে চীনের শক্তিবর্দ্ধনে নিয়োজিত হইতে না পারে সেই জন্য সিয়ানের ঘটনার কয়েক মাসের মধ্যে জাপান চীনের বিরুদ্ধে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল (জুলাই ১৯৩৭)।

মহিলা-সংবাদ



শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী



শ্রীযুক্তা সীতা দেবী

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথিতযশা গল্প ও উপন্যাস লেখিকা শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী এবং শ্রীযুক্তা সীতা দেবী যথাক্রমে ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক (১৯৪৭) এবং লীলা-প্রাইজ (১৯৪৮) লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা।



কুমারী বাসনা সেন

প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেনের কন্যা কুমারী বাসনা সেন এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত বিভাগে বেদান্তে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

'গোরা'র ভাবের আধুনিকতা

শ্রীগোপাললাল দে, এম-এ

বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে যে সকল প্রধান প্রধান ভাব অতিশয় প্রকট হইয়া প্রতিনিয়ত আমাদের শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করিতেছে, তাহাদের মধ্যে 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য', 'সর্ব্বপ্রকারের বন্ধন হইতে মুক্তি', 'স্বজাতি প্রেম', 'স্বাদেশিকতা', 'অহিংসা', 'সত্যাগ্রহ' প্রভৃতি সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসটিতে এই আধুনিক ভাবধারাসমূহের কি পরিচয় পাওয়া যায় দেখা যাক। 'গোরা' রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তম উপন্যাস। ইহা ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাস হইতে ১৩১৬ সালের চৈত্র পর্য্যন্ত 'প্রবাসী' পত্রিকাতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং এই গ্রন্থে নিবদ্ধ ভাবগুলি চল্লিশ বৎসরেরও অধিক কালের পুরাতন।

গোরা ও বিনয় দুই বন্ধু। কালেজে পাস করা যখন একটাও আর বাকী রহিল না তখন তাহারা এক 'হিন্দুহিতৈষী সভা' করিয়া বসিল। আমরা পরে দেখিতে পাইব, এই 'হিন্দু' শব্দ কোনও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। সভার যে সভাপতি তাহার নাম গৌরমোহন; তাহাকে আত্মীয়বন্ধুরা গোরা বলিয়া ডাকে। বিনয় সে সভার সেক্রেটারি। গোরা অত্যুগ্র ও উৎকট স্বদেশীভাবাপন্ন। তাহার স্বদেশপ্রেম আপাতদৃষ্টিতে দেখায় অনেকটা গোঁড়ামির মত। কিন্তু জ্ঞানের অভাবে, বুদ্ধির অল্পতায়, চিন্তার দীনতায় সঞ্জাত যে গোঁড়ামি, সে গোঁড়ামি গোরার নয়। উচ্চতম পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার যে বিপুল প্রভাব শিক্ষিত ব্যক্তিকে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত ও স্বাজাত্যাভিমানে গর্ব্বিত করিয়া তোলে গোরার সেই ধরণের দেশপ্রেম। 'স্বরাজ ব্যতীত জীবন দুঃসহ'; যাঁহারা এই কথা বলিয়া উচ্চপদ, রাজসম্পদ এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছেন, গোরা তাঁহাদের সগোত্র।

হিন্দু জাতির বহুবিধ দুর্ভাগ্যের মধ্যে একটি এই যে এতাবৎকাল যাঁহারা হিন্দু জাতির কোনও সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ পূর্ব্বাহ্ণেই আপনাকে হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক বলিয়া ধরিয়া লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। হিন্দুসমাজও তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে স্বীয় গণ্ডীর বহির্ভূত করিয়া দিয়া তাঁহাদের বিজাতীয় প্রভাব হইতে নিজ দেহকে মুক্ত রাখিতে চাহিয়াছে। ফলে তাঁহারা হিন্দুসমাজের আশানুরূপ উপকার করিতে পারেন নাই, আবার অপর দিকে প্রচুর শক্তি সত্ত্বেও নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া যেন কতকটা ম্লান হইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থা সম্বন্ধে এই কথা খাটে। এ বিষয়ে গোরার জবানীতে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন তাহা গভীর অর্থপূর্ণ। নব যৌবনের জোয়ারের মুখে গোরা ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বলিতেছে, 'ব্রাহ্ম হয়ে বাহাদুরী করবার সখ যাদের আছে অব্রাহ্মরা তাদের সব কাজেই ভুল বুঝে নিন্দে করবে, এইটুকু তাদের সহ্য করতেই হবে। ইচ্ছামত সমাজ ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার যতগুলো শাস্তি আছে এও তার মধ্যে একটা।' দোষযুক্ত জানিয়াও দেশের আচারবিচার সম্বন্ধে গোরা বড় সতর্ক; সে বলে, 'কোন ছুতোয় সূচ্যগ্র ভূমি ছাড়তে আরম্ভ করলে শেষ কালে কিছুই বাকী থাকবে না।' উপস্থিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে গোরা বলে, 'এখন আমাদের একমাত্র কাজ এই যে যা-কিছু স্বদেশের, তারই প্রতি সঙ্কোচহীন সংশয়হীন সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রকাশ করে দেশের অবিশ্বাসীদের মনে সেই শ্রদ্ধার সঞ্চার করে দেওয়া। দেশের সম্বন্ধে লজ্জা করে করে আমরা নিজের মনকে দাসত্বের বিষে দুর্ব্বল করে ফেলেছি।' গোরার বজ্রকণ্ঠে একথাও ধ্বনিত হইয়া ওঠে, 'আমার আপন দেশকে বিদেশীর আদালতে আসামীর মত খাড়া করিয়া বিদেশীর আইন মতে বিচার করিতে আমি দিবই না। বিলাতের আদর্শের সঙ্গে খুঁটিয়া খুঁটিয়া মিল করিয়া আমরা লজ্জাও পাইব না, গৌরবও বোধ করিব না।...দেশের যাহা কিছু তাহার সমস্তই সবলে ও সগর্ব্বে মাথায় করিয়া লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা করিব।' 'আমরা ভাল কি মন্দ, সভ্য কি অসভ্য তাহা লইয়া জবাবদিহি কারও কাছে করিতে চাই না—কেবল আমরা ষোল আনা অনুভব করিতে চাই যে আমরা আমরাই।' গোরার স্বজাতিপ্রেম কোন্ ধরণের এই কথাগুলি তাহার পরিচায়ক।

এই ভাবের প্রণোদনেই তখনকার সেই নিরাকার উপাসনার জয়যাত্রার দিনেও গোরা সাকার উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বরদাসুন্দরীকে বলিতেছে, 'আকার জিনিষটাকে বিনা কারণে অশ্রদ্ধা করব আমার মনে এমন

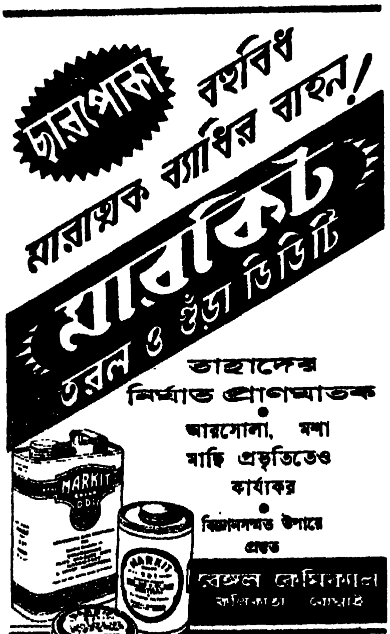
কুসংস্কার নেই।...আকারের রহস্য কে ভেদ করতে পেরেছে?' 'অন্ত না থাকলে যে প্রকাশই হয় না। অনন্ত আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যই অন্তকে আশ্রয় করেছেন—নইলে তাঁর প্রকাশ কোথায়? যার প্রকাশ নেই, তার সম্পূর্ণতা নেই। বাক্যের মধ্যে যেমন ভাব তেমনি আকারের মধ্যে নিরাকার পরিপূর্ণ।' 'নিরাকারই যদি যথার্থ পরিপূর্ণতা হ'ত তবে আকার কোথাও স্থান পেত না।'

গোরা বলিতে চায়, নিরাকার ও সাকার একই মুদ্রার যেন দুইটি দিক।

সাকার-নিরাকারবাদ সম্পর্কিত এই সকল তর্কাতর্কির উর্দ্ধে উদার রবীন্দ্রনাথকে বোঝা যায় পরেশ বাবুর স্বল্প কথায়, 'মতামত কিছুই নয়, অন্তঃকরণের মধ্যে পূর্ণতা, শুদ্ধতা ও আত্মপ্রসাদ ইহাই সকলের চেয়ে দুর্লভ। প্রাপ্তির মধ্যে যেটা সত্য সেইটাই আসল।'

ভারতের এই অতি-প্রাচীন আধ্যাত্মিক আদর্শটি পাশ্চাত্য প্রভাবিত ভারতবাসী যেন ভুলিয়াই গিয়াছিল, আধুনিক কালে আবার যেন তাহা ভারতীয় মনে স্থান লাভ করিতেছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ দৃঢ়তার সহিত এই ভাবটি প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

একদা আলোচনা কালে সুচরিতার প্রাণে গোরার নিম্নলিখিত কথাগুলি গভীর সাড়া জাগাইয়াছিল, 'আপনারা যাদের অশিক্ষিত বলেন, আমি তাদেরই দলে—আপনারা যাকে কুসংস্কার বলেন আমার সংস্কার তাই। যতক্ষণ না আপনি দেশকে ভালবাসবেন এবং দেশের লোকের সঙ্গে এক জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার মুখ থেকে দেশের নিন্দা আমি এক বর্ণও সহ্য করতে পারব না।' হারাণ বাবুকে উদ্দেশ্য করিয়া এই কথাগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল। হারাণ বাবু সংশোধনের কথা বলিলে গোরা গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল, 'সংশোধন! সংশোধন ঢের পরের কথা। সংশোধনের চেয়েও বড় কথা ভালবাসা, শ্রদ্ধা। আগে আমরা এক হব, তা হলেই সংশোধন ভিতর থেকে আপনিই হবে।...আমি কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে কারও থেকে পৃথক হব না, এই আমার সকলের চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা।'



ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের যিনি একজন, তিনি এক দিন গোরার মুখে নিজের আকাঙ্ক্ষা এমনি ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। গান্ধীজীর হরিজন-আন্দোলনের বীজও যেন এইখানেই নিহিত আছে।

বিনয় বলিয়াছে, 'আমার বন্ধু গোরা ভারতবর্ষের সেই আত্মবোধের প্রকাশরূপে আবির্ভূত হয়েছে।'

কবির সেই ভাবরূপের মূর্ত্ত বিকাশ কি গান্ধীজী? না জবাহরলাল? না সুভাষচন্দ্র? অথবা এঁরা সকলেই?

বিনয়, ললিতা, সুচরিতা এবং পরেশবাবু এঁরা তিনজনেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূর্ত্ত বিগ্রহ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যই বিনয় পরম বন্ধু গোরাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত আর ললিতা এবং পরেশ গৃহ ও সমাজ ছাড়িতে বদ্ধপরিকর।

সমাজ-জীবনে নারীকে উপযুক্ত মর্য্যাদা না দেওয়ার কুফল সম্বন্ধে বিনয় বলিতেছে, 'আমাদের স্বদেশপ্রেমের মধ্যে একটা গুরুতর অসম্পূর্ণতা আছে। আমরা ভারতবর্ষকে আধখানা করে দেখি।' 'আমরা ভারতবর্ষকে কেবল পুরুষের দেশ বলেই দেখি, মেয়েদের একেবারেই দেখি না।' 'মেয়েরা প্রচ্ছন্ন থাকাতে আমাদের স্বদেশ আমাদের কাছে অর্দ্ধ সত্য হয়ে আছে—আমাদের হৃদয়ে পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ শক্তি দিতে পারছে না।' কবি-কথিত সেই অভাব আজ পূরণ হইতে চলিয়াছে। ইদানীং জাতীয় সরকার প্রদেশের শাসনকর্ত্তা, রাষ্ট্রদূত, গণপরিষদের সভ্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পদে মহিলাদের নিযুক্ত করিয়াছেন।

গোরা দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছে। 'সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া...খোলা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িবার একটা প্রবল আনন্দ তাহাকে পাইয়া বসিল।'

চরঘোষপুরে নীলকুঠির সাহেবেরা নিরীহ গ্রামবাসী চাষীদের উপরে অত্যাচার করিতেছে, তাহারা অধিকাংশই মুসলমান। তাহার প্রতীকারার্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নিষ্ফল আবেদন করিয়া অবশেষে গোরা বলিল, 'আমি গ্রামের

লোকদের নিজের চেষ্টায় পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যে উৎসাহিত করব।'

চম্পারণে ও বারদোলি তালুকে এই কৃষক-সত্যাগ্রহের বিকশিত রূপ আমরা দেখিয়াছি।

উপরোক্ত চরঘোষপুরের ঘটনার পরে আমরা গোরাকে হাজতে দেখিতে পাই। কয়েকজন ছাত্রের সহিত সে গ্রেপ্তার হইয়াছে, পর দিন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে প্রথম এজলাসেই তাহার বিচার হইবে। জামিনে খালাসের প্রস্তাবে গোরা বলিল, 'না, আমি উকীলও রাখব না, আমাকে জামিনে খালাসেরও চেষ্টা করতে হবে না।' 'দৈবাৎ আমার টাকা আছে আর বন্ধু আছে বলেই হাজত আর হাতকড়ি থেকে আমি খালাস পাব সে আমি চাই না।' 'বিচারে যদি উকীলের সাহায্যের প্রয়োজন থাকে ত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ কেন নিজের উকীল নিজে জোটাতে বাধ্য হবে? এ কি প্রজার সঙ্গে শত্রুতা? এ কি রকমের রাজধর্ম্ম?' 'কোন চেষ্টা না করে যে গতি হতে পারে আমার সেই গতিই হোক্। এ রাজ্যে সম্পূর্ণ নিরুপায়ের যে গতি আমারও সেই গতি।'

সুতরাং দেখা যায় বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থন না করার নীতির কথা গোরার প্রমুখাৎ রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্ব্বেই আমাদের শুনাইয়াছেন।

বাহির হইতে খাদ্যাদি দিতে চাহিলে গোরা বলিল, 'বাইরে থেকে আমি কিছুই চাই না। হাজতে সকলের ভাগ্যে যা জোটে আমি তার চেয়ে কিছু বেশী চাই নে।'

জেল হইতে গোরা মাকে পত্র লিখিয়াছে, 'কারাবাসে তোমার গোরার লেশমাত্র ক্ষতি করিতে পারিবে না।' 'আরও অনেক মায়ের ছেলে বিনা দোষে জেল খাটিয়া থাকে, একবার তাহাদের কষ্টের সমান ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার ইচ্ছা হইয়াছে।' 'আমি ইচ্ছা করিয়াই জেলে যাইতেছি। আমার মনে কোন কষ্ট নাই, কাহারও উপরে রাগ নাই। জেলে আমি আতিথ্য লইতে চলিলাম। ইচ্ছা করিয়া যাহা গ্রহণ করি সে কষ্ট ত কষ্টই নয়। জেলের আশ্রয় আজ আমি ইচ্ছা করিয়াই গ্রহণ করিব।'

আরও লিখিয়াছে, 'আরাম ও সম্মানকে ধিক্কার দিয়া, মানুষের কলঙ্কের দাগ বুকে চিহ্নিত করিয়া বাহির হইব, মা তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ করো।'

স্বেচ্ছায় কারাবরণ করায় যে কত আনন্দ গোরার চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

একথা গোরাও লিখিয়াছিল, 'তোমার দুঃখই আমার দণ্ড, আমাকে আর কোন দণ্ড ম্যাজিষ্ট্রেটের দিবার সাধ্য নাই।' তাঁহার বিরুদ্ধে গোরার ক্রোধ বা বিদ্বেষ ছিল না। ইহাই তো পরিপূর্ণ অহিংস নীতি।

গোরা উপন্যাসকে সত্যাগ্রহ নীতির ভাষ্যস্বরূপ বলা চলে। এই গ্রন্থের সকল পাত্র-পাত্রীই নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী সত্যাগ্রহের পথে চলিয়াছেন। ললিতা, সুচরিতা, বিনয় সত্যাগ্রহী; বরদাসুন্দরী নিজ জ্ঞানবুদ্ধিমতে সত্যপথে চলিতে চেষ্টিত আছেন, হরিমোহিনী নিজ শিক্ষাসংস্কার অনুযায়ী সত্যকে আশ্রয় করিয়া অকূলে ভাসিয়াছেন, কৃষ্ণদয়াল নিজ সাধনাশ্রমে রুদ্ধকক্ষে নানা যাগযোগের সাহায্যে সত্যলাভের নব নব পরীক্ষণে রত আছেন, অবিনাশকে মূঢ় বলা যায় কিন্তু সত্যানুসরণ বিষয়ে তাঁহাকে কপট বলা চলে না; আর গোরার অন্তরে সত্য আপনার পরিপূর্ণ বিকাশের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে প্রলয় মন্থন আরম্ভ করিয়াছে। তাই বিনয় লক্ষ্য করে, 'সত্যের বাহকদের বাক্যে মনে ও কর্ম্মে যে একটি সহজ ও সরল শান্তি থাকা উচিত তাহা গোরার নাই।' কিন্তু তাহার পূর্ণ আবির্ভাবের আর বিলম্বও নাই; অচিরেই সে যখন আসিয়া পড়িল তখনই পরিপূর্ণতার অতল প্রশান্তির মধ্যে আধ্যাত্মিকারও যবনিকা পড়িল।

পূর্ব্বাপর সত্যে অবিচলিত শ্রদ্ধা দেখা যায় আনন্দময়ী এবং পরেশবাবু এই দুইটি চরিত্রে। গোরাকে যেদিন হইতে আনন্দময়ী কোলে তুলিয়া লইয়াছেন সেই দিন হইতেই তিনি সকল সংস্কারের উর্দ্ধে উঠিয়া একমাত্র সত্যকেই আশ্রয় করিয়া আছেন; সে সত্য দেশকাল এবং বিশেষ সমাজবন্ধনের গণ্ডীর দ্বারা অবচ্ছিন্ন নয়। পুত্র ও পুত্রবধূ তাঁহাকে দূরে সরাইয়া রাখে। স্বামী তাঁহাকে স্পর্শ করেন না, এমন কি গোরাও তাঁহার ছোঁয়া খাইতে দ্বিধা বোধ করে। আনন্দময়ী হাসিমুখে সকলই উপেক্ষা করিয়াছেন, ধরিয়া আছেন শুধু সত্যকে, অথচ এমনি গোপনে যে পৃথিবীর কেহ তাহা জানিতে পারে না; তাঁহার আচারকে অনাচার এবং আচরণকে মূঢ়তা মনে করিয়া করুণা করে।

আর পরেশবাবু? তিনি বলেন, 'আমি ঈশ্বরের কাছে সর্ব্বদাই এই প্রার্থনা করি যে ব্রাহ্মের সভাতেই হোক আর হিন্দুর চণ্ডীমণ্ডপেই হোক আমি যেন সত্যকে সর্ব্বত্রই নত শিরে অতি সহজেই বিনা বিদ্রোহে প্রণাম করতে পারি—বাইরের কোন বাধা আমাকে যেন আটক করে না রাখতে পারে।'

'পরেশবাবু' চরিত্রটির প্রতি বিদগ্ধ সমালোচকগণও সুবিচার করেন নাই। ডক্টর সুবোধকুমার সেনগুপ্ত বলিয়াছেন—পরেশবাবু আদর্শ কাঠের পুতুল; দুর্ব্বল চিত্ত পরেশবাবুর বক্তৃতা জায়গা জুড়িয়াছে, পরেশবাবু বুঝেন নাই সত্য কোন চরম স্থাবর বস্তু নয়, তা একান্ত ভাবে গতিশীল।

কিন্তু উপরে উদ্ধৃত পরেশবাবুর নিজের উক্তি তো এই মত সমর্থন করে না।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও পরেশবাবুর সম্বন্ধে কিছু অবিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মানুষের মানসিক নমনীয়তার বিচারে পরেশবাবু অস্বাভাবিক, অতিশয় ভাল—অন্ততঃ মানসিক কোন্ ভাঙ্গাচোরার বিবর্ত্তন পথে তিনি ঐ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন তাহা আমাদিগকে দেখানো হয় নাই।

কিন্তু মনে রাখা উচিত, আমরা পরেশবাবুকে দেখিতেছি তাঁহার জীবনসায়াহ্নে, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া অসংখ্য ভাঙ্গা-চোরার পথে তিনি বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। আর অস্বাভাবিক যদি হয়ও, তবু তাঁহার চরিত্র অসম্ভব নয়, তাঁহার চরিত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রের কিছু ছায়াপাতও হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মহাত্মা গান্ধীর মতই পরেশবাবু আজন্ম সত্যাগ্রহী। তফাৎ শুধু—পরেশবাবু অনেকটা নিষ্ক্রিয় ও দ্রষ্টা মাত্র।

সর্ব্বশেষে আসে গোরার সেই জ্বলন্ত দেশপ্রেমের কথা।

গোরা বলিয়াছে, 'স্বদেশপ্রেম যেদিন আমার সম্মুখে এমনি সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে প্রত্যক্ষগোচর হবে সেদিন আমারও আর রক্ষা নাই—সেদিন সে আমার সমস্তই আকর্ষণ করে নিতে পারবে; স্বদেশের সেই সত্য মূর্ত্তি যে কি আশ্চর্য্য অপরূপ, কি সুনিশ্চিত সুগোচর, তার আনন্দ তার বেদনা যে কি প্রচণ্ড প্রবল, যা বন্যার স্রোতের মত মৃত্যুকে এক মুহূর্ত্তে লঙ্ঘন করে যায় তা আজ তোমার কথা শুনে অল্পস্বল্প অনুভব করতে পারছি।'

পড়িতে পড়িতে মনে হয় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে গোরার মুখে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলিয়াছেন তাহারই প্রতিধ্বনি উঠিয়াছিল তিন বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মের অরণ্যপ্রান্তে—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মুখে।

পুস্তক-পরিচয়

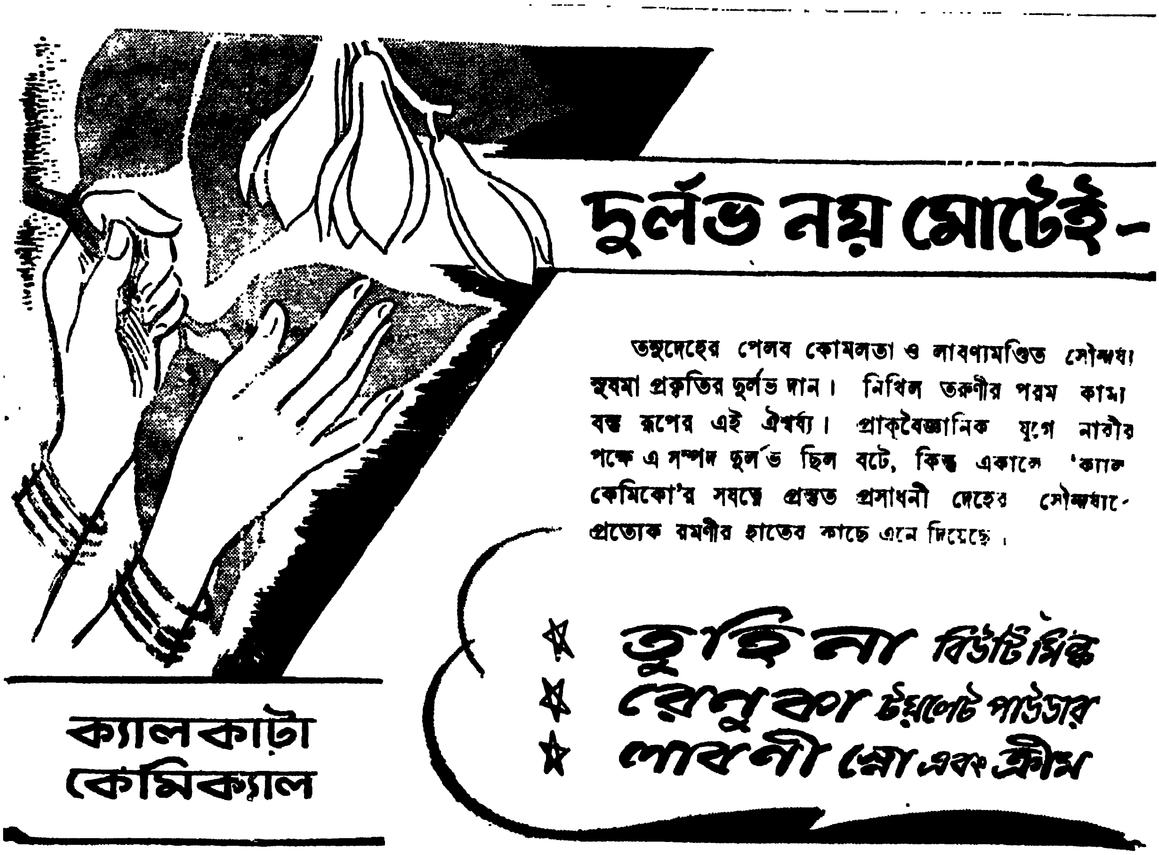
শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংকলিত। বুকল্যাণ্ড লিমিটেড, ১নং শঙ্কর ঘোষের লেন, কলিকাতা ৭×৫ ইঞ্চ, ১৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা।

কীর্ত্তিমানের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর কীর্ত্তি, আর কিছু না জানলেও আমাদের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু কীর্ত্তিই সমগ্র পরিচয় নয়, তাঁর আকৃতি প্রকৃতি পছন্দ অপছন্দ প্রভৃতিও লোকে জানতে চায়। বিশেষত যিনি জনপ্রিয় গল্পলেখক এবং বিচিত্র চরিত্রাবলীর স্রষ্টা, তিনি স্বয়ং কি রকম সে সম্বন্ধে লোকের কৌতূহলের অন্ত থাকে না।

মৃত ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাবার শ্রেষ্ঠ উপায় তাঁর চিঠিপত্র। 'শরৎ চন্দ্রের পত্রাবলী' তাঁর গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক। এই চিঠিগুলির বেশীর ভাগ তিনি স্বচ্ছন্দে বিশ্বস্ত জনকে লিখেছিলেন, ভবিষ্যতে ছাপা হবে এমন চিন্তা তাঁর মনে ছিল না। সতর্কভাবে লেখা না হলেও এগুলি তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভায় মণ্ডিত। এই সংকলনে আমরা যে ব্যক্তির পরিচয় পাই তিনি সরল, বন্ধুবৎসল, স্নেহাকাঙ্ক্ষী, একটু অভিমানী, বিনয়ী ও পরিহাসপ্রিয়। তিনি খোলাখুলি মতামত প্রকাশ করেন, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করেন, পরের দুঃখে কাতর হন, বাড়ির পশুপক্ষীর মৃত্যুও সইতে পারেন না। প্রায় অসুখে ভোগেন, ছবি আঁকেন, বিস্তর বই পড়েন, হার্বার্ট স্পেনসারের দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে ইচ্ছা করেন, 'আবগারী ব্যাটাদের হার মানিয়েছিলাম' ব'লে গর্ব করেন, কারও কাছে অপরাধ করেছেন মনে করলে অসংকোচে মার্জ্জনা চান। তিনি জানিয়েছেন যে তিনি [illegible] বোঝেন, কারও চেয়ে কম বোঝেন ব'লে মনে করেন না; শুধু গল্প নয়, সকল বিষয়েই তিনি প্রবন্ধ লিখতে পারেন, কেবল পদ্য পারেন না। আবার লিখেছেন—'আমার বাঙলা ভাষার উপর দখল নেই বললেই চলে, শব্দসঞ্চয় খুব কম, কাজেই আমার লেখা সরল হয়; আমার পক্ষে শক্ত ক'রে লেখাই অসম্ভব।' কয়েক জন ছাড়া উচ্চশিক্ষিতা—মহিলাদের উপর তাঁর শ্রদ্ধা নেই। তাঁর ধারণা'—মেয়েদের মধ্যে সাড়ে পনর আনাই কুরূপা, কেবল সাবান পাউডার আর জামা-কাপড়ের ঘারা আর নাকী খোনা গলায় কথা কয়ে যত দূর চলে।'

শরৎ চন্দ্রের অনুরাগী মাত্রেই এই পত্রাবলী উপভোগ করবেন এবং সংকলনের জন্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

রাজশেখর বসু



দাঁ-গোঁসাই ও আরো গল্প—শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ক্যালকাটা বুক ষ্টোরস, ৪।৫ সি, হেরম্ব দাস লেন, কলিকাতা। পৃঃ ১৯১। মূল্য তিন টাকা।

শ্রীমোহিনীমোহন রায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত কয়েকটি গল্প এই সংগ্রহে আছে। বাংলা সাহিত্যে লেখকেরা অপরিচিত নহেন—গল্পগুলিও ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পমাত্রই রসোত্তীর্ণ এমন কথা বলা কঠিন হইলেও—এই সংগ্রহের গল্পগুলি সুখপাঠ্য। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নাস্তিক সদানন্দ' গল্পটি বহুদিন পূর্ব্বে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইলেও পাঠকের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই; 'ভক্তি বিলাস' গল্পটি তো পরিণত বয়সের অনবদ্য দান।

গল্প-সংগ্রহখানি রসপিপাসু পাঠককে পরিতৃপ্তি দান করিবে—এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

পথ নির্দ্দেশ—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ষ্টাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী, ২১৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৮৫, মূল্য ১।০।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইয়াছে বটে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত উহাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলা চলে না। দেশের নেতারাও একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। লেখক কংগ্রেসকর্ম্মীরূপে নিজের জীবনে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন তাহারই আলোকে স্বদেশের যুবকগণকে নেতাজীর পথে চলিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করিয়া সর্ব্বদলীয় একতার ভিত্তিতেই ভারতীয় স্বরাজসাধনার সফলতা আসিতে পারে। লেখক ভারতের অতীত ইতিহাসের শিক্ষায় আস্থাবান্ এবং প্রাচীন ঋষিগণের প্রদর্শিত পথে চলায় সার্থকতায় বিশ্বাসী। লেখকের আদর্শ-ভারত প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সামঞ্জস্য বিধান করিবে এবং এরূপ এক নূতন ভারতবর্ষ রচনা করিবে যাহা শক্তি ও শান্তি উভয়ের প্রতিষ্ঠা দ্বারা পৃথিবীতে নব যুগ আনয়ন করিবে। লেখক ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই নূতন ভারত গড়িতে চাহেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীর মতবাদ ও আদর্শের সহিত লেখকের মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে। এই পার্থক্যের স্বরূপ লেখক তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থ—"গান্ধীজীর মত ও নেতাজীর পথ" নামক পুস্তকে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস এরূপ পুস্তক পাঠকের চিন্তার খোরাক যোগাইবে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ৬৬ : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

সাহিত্যের দিক্‌পাল এই তিন জনের চরিত একই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে। তিন জনের নামই সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত, তিন জনের রচনার পরিমাণও অল্প নয়, অথচ তিন জনের লেখাই লোকে ভুলিতে বসিয়াছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ সমসাময়িক। দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে এবং কালীপ্রসন্ন ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ একাধারে কবি, দার্শনিক, গণিতবিৎ, প্রাবন্ধিক, জাতীয় এবং ব্রহ্ম-সঙ্গীত রচয়িতা, বাংলায় রেখাক্ষর বর্ণমালার উদ্ভাবক এবং বাংলার এক শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক। কংগ্রেসের অগ্রদূত চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা অনুষ্ঠানের প্রেরণা অনেকটা তাঁহারই।

'ভারতী'র তিনি প্রথম সম্পাদক। অনেক বিষয়েরই তিনি পথপ্রদর্শক। লেখায় এবং জীবনে-দ্বিজেন্দ্রনাথ একজন খাঁটি বাঙালী। তাঁহার 'স্বপ্নপ্রয়াণ' এক অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ। আজ কয়জনই বা সেই কাব্যের সহিত পরিচিত?

কালীপ্রসন্ন পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান সাহিত্যিক। তাঁহার রচনারীতি অপূর্ব্ব। 'ভ্রান্তি-বিনোদ', 'প্রভাতচিন্তা', 'নিভৃতচিন্তা', 'নিশীথ-চিন্তা' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এবং তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধাবলীর মধ্যেই ভাবগাম্ভীর্য্য এবং শব্দমাধুর্য্যের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পাদিত "বান্ধব" বঙ্কিম-যুগে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাঁহার বাগ্মিতা-শক্তিও ছিল অসাধারণ।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বয়সে এই দুই জনের অনেক ছোট, তিনি রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ তাঁহার জন্মকাল। নগেন্দ্রনাথের শক্তি বহুমুখী। ইংরেজী এবং বাংলা রচনায় তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। এক শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক এবং সম্পাদক রূপে তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মিথিলা হইতে বিদ্যাপতির সম্পূর্ণ পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উপন্যাস এবং ছোট-গল্প লেখক হিসাবে নগেন্দ্রনাথের দান সামান্য নহে। তাঁহার অনেকগুলি গল্প বাংলা-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার যোগ্য। এই সুলিখিত, সুনির্দিষ্ট তারিখ সম্বলিত পুস্তকখানি বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

অসি বাজে ঝম্ ঝম্—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর। প্রগতি প্রকাশনী ১৮, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৶৹।

ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লিখিত ছেলেদের উপন্যাস। ঝরঝরে ভাষা এবং চিত্তাকর্ষক ঘটনাসংস্থানই পুস্তকখানির বিশেষ আকর্ষণ। বর্ত্তমান (দ্বিতীয়) সংস্করণে পুস্তকখানি আরও অধিক সমাদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।

বিবর্ত্তন—শ্রীসচ্চিদানন্দ পাঠক। ভারত সাহিত্য ভবন। ২০৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গল্প-সংগ্রহ। ইহাতে ছয়টি গল্প স্থান লাভ করিয়াছে। লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত হইলেও গল্পগুলি মোটামুটি ভাল হইয়াছে। বিশেষ করিয়া "বিবর্ত্তন" গল্পটি এবং "পাগল" শীর্ষক চিত্রটি আকর্ষণীয় হইয়াছে। লেখকের ভাষা সহজ ও বেগবান, কিন্তু স্থানে স্থানে উচ্ছ্বাস কিছু বেশী মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এদিকে লেখক একটু দৃষ্টি দিলে গল্পগুলি আরও উপভোগ্য হইতে পারিত।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

অনাবশ্যক—শ্রীমাণিকলাল সিংহ। এস কে পালিত এণ্ড কোং। ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

আধুনিক গীতিকবিতা হইতে গীতিসুর বিদায় লইতে বসিয়াছে। এমন দিনে এই খাঁটি গীতিকবিতা কয়টি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম।

"ঐ যে তুমি ঢেউ হয়ে যাও নগর গাঁয়ে গাঁয়ে
সবার সুরে সুর বিলায়ে সবার পায়ে পায়ে"

—জীবনের গতিচ্ছন্দ কবিতায় মধুর সুরে বাজিয়াছে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ফরিয়াদ—মতিউল ইসলাম। আলহামরা-লাইব্রেরী, ১৮ মুসলমান পাড়া লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹ টাকা।

মহানগরীর বুকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে ধ্বংসের যে তাণ্ডবলীলা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া কবির হৃদয় নিবিড় বেদনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সেই অন্তর্গূঢ় বেদনাকে তিনি 'ফরিয়াদে' কাব্যচ্ছন্দে রূপায়িত করিয়াছেন। শত শত নিরপরাধ নরনারী আজ

পূর্ব্বাশা

পূর্ব্বাশা মাসিক পত্রিকার জন্ম ১৩৩৯ সালে বাংলাদেশের পূর্ব্বসীমান্তের একটি ছোট শহরে। তখন কলকাতায় 'কল্লোল' আর 'কালিকলম' নেই—ঢাকার 'প্রগতি'-ও বন্ধ হয়ে গেছে। যে একটা নূতন হাওয়ায় বাংলাসাহিত্যের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল—মনে হল, তা যেন পথিকহাওয়া সৃষ্টির একটা ক্ষণিক উৎসব জাগিয়ে দিয়ে উধাও হয়ে গেল। মাটির ফসলের বেলায় তা হয়ত সত্যি কিন্তু এই নূতন হাওয়ার সঙ্গে সাহিত্যের ফসলের সম্বন্ধ তেমন নয়। 'কল্লোল' 'কালিকলম' 'প্রগতি'র পর পূর্ব্বাশার আবির্ভাব তা-ই প্রমাণ করে। সবুজপত্রের উত্তরাধিকার যেমন শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-সম্পাদিত 'পরিচয়' বহন করেছে তেমনি সাহিত্যের নূতন আন্দোলনের উত্তরাধিকার বহন করেছে 'পূর্ব্বাশা'। ১৩৩৯-৪০-৪১-৪২ এ-চার বছর কুখ্যাত 'আধুনিক সাহিত্যে'র বাহন ছিল পূর্ব্বাশা। কিন্তু '৪০ সাল থেকে '৪২ সাল পূর্ব্বাশা আর ছোট মফঃস্বল শহরের সঙ্কীর্ণ পরিধিতে পড়ে থাকে নি—কলকাতার বিস্তৃত পরিমণ্ডলে 'আধুনিক সাহিত্যে'র উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছে। যেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রে তেমনি ঠিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আন্দোলন নামক বিষয়টি ব্রিটিশ সরকারের কোপদৃষ্টি কখনও এড়াতে পারেনি। আধুনিক সাহিত্যের সমর্থনে রচিত শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর 'জুজুবুড়ি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে ১৩৪০ সালে পূর্ব্বাশাকে বঙ্গীয় সরকারের হাতে খানিকটা লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু এ-লাঞ্ছনা উপেক্ষা করবার শক্তি পূর্ব্বাশার ছিল—কেননা সাহিত্যিকদের কাছে যে আন্তরিক সহানুভূতি পূর্ব্বাশা পেয়েছে তার দামের কাছে সরকারী লাঞ্ছনার গ্লানি অকিঞ্চিৎকর। বাংলাদেশের সাহিত্য শিল্পীদের স্নেহে ধন্য পূর্ব্বাশা এই তিনটি বছরের স্নেহের ঋণ ভুলতে পারবে না। **রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ, প্রমথ চৌধুরী, নরেশচন্দ্র, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, মনোজ বসু, শৈলজানন্দ, নজরুল ইসলাম, নলিনী গুপ্ত, দিলীপ রায়, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর, সুধীন্দ্র দত্ত, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, প্রভু গুহঠাকুরতা, জগদীশ গুপ্ত, মন্মথ রায়, দিনেশরঞ্জন, সুরেশ চক্রবর্ত্তী, অজয় ভট্টাচার্য্য, হুমায়ুন কবির, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে**—এদের সাহায্য লাভ করেই পূর্ব্বাশা তার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছিল। নূতন যুগের সাহিত্য-প্রেরণাকে পাঠকের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া ছাড়াও সে সময়কার পূর্ব্বাশা মুদ্রণসৌষ্ঠবে একটি অভিনব সুরুচির পরিচয় দিয়েছিল। বাংলা অক্ষরের বিচিত্র রূপদান পূর্ব্বাশার মাধ্যমেই আজ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে—রচনার শিরোনামা এবং অবয়ব দুটি বিভিন্ন অথচ সঙ্গতিপূর্ণ বর্ণে মুদ্রণ ১৩৪১ সালের পূর্ব্বাশাকে অপূর্ব্ব রূপময় করে তুলেছিল। সাহিত্য পরিবেশনে পূর্ব্বাশার সৌন্দর্য্যবোধ তার সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠারই অপর দিক। পরবর্ত্তী কালে বাংলাসাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ বলে পরিকীর্ত্তিত বহু গল্প ও উপন্যাস এসময়কার পূর্ব্বাশাতেই প্রকাশিত হয়—বুদ্ধদেব বসুর 'রাধারাণীর নিজের বাড়ী'—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'হুইসল্'—প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'অরণ্যপথ', 'ভূমিকম্প'—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' 'পদ্মানদীর মাঝি'-র নাম উদাহরণত উল্লেখ করা যায়। ডি-এইচ-লরেন্সের সঙ্গে বাংলাপাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার সৌভাগ্যও পূর্ব্বাশারই হয়েছিল।

১৩৪৩ থেকে ১৩৪৯ সাল পূর্ব্বাশা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়নি—দেশব্যাপী অর্থসঙ্কট, যুদ্ধ এবং আগষ্ট বিপ্লবই তার মুখ্য কারণ। তবু রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে 'রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্ব্বাশা' নামে পূর্ব্বাশার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এ-অর্ঘ্য রচনা করেন বাংলাদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দ।

১৩৫০-সাল থেকে পূর্ব্বাশা আবার নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। ভারতীয় সংস্কৃতিকে আজকের দিনের নূতন পরিবেশে নূতন পরিচ্ছেদে প্রতিষ্ঠা করবার আদর্শই আজ পূর্ব্বাশার। ভারতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি আলোচনা করে ভারতীয় ঐতিহ্যকে নূতন দিনের আলোতে উজ্জ্বল করে তোলার আদর্শ নিয়েই পূর্ব্বাশার এবারকার যাত্রা সুরু। ভারতীয় সমাজ-রাষ্ট্র সংস্কৃতি নিয়ে যাঁরা-ই নূতনভাবে চিন্তা করছেন—পূর্ব্বাশা তাঁদের চিন্তাধারা পাঠকের কাছে উপস্থিত করে দিতে উন্মুখ। সাহিত্যের নূতন আন্দোলনের স্পর্শে জন্ম নিয়ে পূর্ব্বাশা আজ নূতনের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে আত্মপরিণতি লাভ করেছে। পূর্ব্বাশার জীবনের সঙ্গে বহু সাহিত্যিকের পরিণতির ইতিহাস জড়িত—নূতন ভারতবর্ষের নূতন মানুষের জীবনে যদি পূর্ব্বাশার বিন্দুমাত্র দান থাকে তবে তার চেয়ে বড়ো সার্থকতা পূর্ব্বাশা কল্পনা করতে পারে না।

আগামী বৈশাখ মাস থেকে একাদশ বর্ষ সুরু হবে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ধারাবাহিকভাবে লিখবেন 'কল্লোল যুগ'-এর ইতিহাস

বার্ষিক মূল্য মনিঅর্ডারে ছয় টাকা * সম্পাদক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য * প্রতি সংখ্যা আট আনা

প্রকাশক : পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি-১৩, গণেশচন্দ্র এভিনু, কলিকাতা

অসহায় শিশুর রক্তে রঞ্জিত রাজপথের দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থল মথিত করিয়া 'ফরিয়াদ' উত্থিত হইয়াছে :—

—"স্বপ্নাতুর শয্যা হতে উঠি
দেখিলাম পুষ্পগুচ্ছে কীটের ভ্রুকুটি ;
নর-নারী শিশুদের শতখণ্ড অগণিত শব,
বিপ্রস্ত পথের প্রান্তে ঐশ্বর্য্য বিভব
রক্তাক্ত নগরী কলিকাতা।
কোথায় বিধাতা ?"

আজিকার দিনের গভীর দুঃখবেদনা কবির কাব্যে ছায়াপাত করিয়াছে, কিন্তু কবি মানুষের শুভবুদ্ধিতে আস্থাবান। তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে জানেন সাম্প্রতিক ভেদবুদ্ধিসঞ্জাত বিরোধ সাময়িক বিভ্রান্তি মাত্র; এই দুর্দ্দিনের অবসান অচিরেই হইবে, এই অন্ধকার ভেদ করিয়া অদূর ভবিষ্যতে নূতন উষার অরুণালোকে সারা দেশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। তাই তো ব্যবধান কবিতায় তিনি বলিয়াছেন—

"তবু অন্তরে আছে বিশ্বাস আমাদের হবে জয়
আমরা দেখছি প্রতিদিন প্রাতে আশার সূর্য্যোদয়।
আমাদের শত কোটি কঙ্কালে ফুটবে রঙিন ফুল,
সোণালী ফসলে সুশোভিত হবে বিস্তীর্ণ তরুমূল।"

কবির কণ্ঠে ভাবীকালের মিলনমন্ত্র উদ্বোধিত হইয়াছে—তাঁহার স্বপ্ন সার্থক হইয়া উঠুক।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আজই নয় কেন ?—শ্রীনারায়ণ গুপ্ত। প্রকাশক—শ্রীনীরেন লাহিড়ী। প্রগতি প্রকাশ ভবন, গৌহাটী, আসাম, মূল্য ।• আনা।

লেখক বামপন্থী, বৈপ্লবিক রাজনৈতিক মতাবলম্বী। বর্ত্তমান পুস্তকে তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা মোটামুটি এই যে, ভারতীয় কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদ ধনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আশু সমগ্র দেশব্যাপী ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া ধনতন্ত্র তথা বর্ত্তমান রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংস-সাধনপূর্ব্বক মজুর-চাষী বা পঞ্চায়েৎ-রাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ নিহিত—এবং মজুর ধর্ম্মঘট প্রভৃতি এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার প্রধান অস্ত্র। বিষয়টি বিতর্কমূলক—বামপন্থী অনেকেও মনে করেন যে, ধনতন্ত্রের আশু উচ্ছেদসাধন না করিয়া বা সঙ্ঘবদ্ধ রাষ্ট্রযন্ত্রটি ভাঙিয়া না দিয়া ধন-তন্ত্রকেই ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করা অসম্ভব নয়। গান্ধীজীর রাষ্ট্র-পরিকল্পনায়ও বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত কৃষক-মজুর-রাজকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সেই 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হইবে রক্তপাত বা বিপ্লবের দ্বারা নয়—স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমবিকাশের পথ ধরিয়া। যাই হোক্ রাজনৈতিক মত ও পথ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার স্থান ইহা নহে। তবে একথা সত্য যে, যিনিই পুস্তকখানি পড়িবেন তিনিই লেখকের চিন্তার স্বচ্ছতা এবং প্রকাশভঙ্গীর সাবলীলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। তাঁহার যুক্তিগুলা জোরালো, বক্তব্য এবং ভাষায় কোথাও অস্পষ্টতা বা ধোঁয়াটে ভাব নাই। উচ্ছ্বাসের রাশকে আগাগোড়া টানিয়া রাখিয়া তিনি যুক্তিতর্কের উপর নিজের সিদ্ধান্তগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবাগত হইলেও রাজনৈতিক সন্দর্ভ-রচনায় যে মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ।

বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন-প্রশ্ন—শ্রীশৈলেশ বিশী। জ্যোতি প্রকাশালয়, ২০৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা।

লেখক অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার এবং তাঁহার স্নেহভাজন হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২১ হইতে ১৯৩৯ সাল এই আঠারো বৎসর কলিকাতার বিভিন্ন পল্লী এবং কলিকাতার বাহিরে বাজে শিবপুর, নবদ্বীপ, কাশী, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি নানা স্থানে শরৎচন্দ্রের সাহচর্য্য লাভ করিয়া এই সাহিত্য রথীর ব্যক্তিগত জীবনের বহু খুটিনাটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ তাঁহার হইয়াছিল। বর্ত্তমান পুস্তকে তিনি যে সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা শরৎ চন্দ্রের ব্যক্তিত্বের উপর অভিনব আলোকসম্পাত করে এবং শিল্পী শরৎ চন্দ্রের চেয়ে মানুষ শরৎ চন্দ্র যে অনেক বড় ছিলেন সে কথাই বিশেষ করিয়া প্রমাণিত করে। ব্যক্তিগত স্মৃতিকথাকে চিত্তাকর্ষক করিয়া বলিবার একটা বিশেষ আর্ট আছে। লেখক ইতিপূর্ব্বে 'চিত্তকথা' লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, সেই কৌশলটি তাঁহার আয়ত্ত। বর্ত্তমান পুস্তকে তাঁহার বলার ভঙ্গীটি আরও উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের স্মৃতিকথা লেখক এমনি আন্তরিকতার সহিত বলিয়াছেন যে, তাহা পাঠকমাত্রেরই মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় বইখানির কোনো কোনো জায়গায় লেখক শালীনতার সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। ২৬-২৮ পৃষ্ঠায় লক্ষ্ণৌ-র ঠোঁটে ঘা-ওয়ালা

বাইজীসম্পর্কিত যে শুঙ্কারজনক বর্ণনাটি তিনি দিয়াছেন তাহার সঙ্গে শরৎ চন্দ্রের জীবন অথবা জীবনপ্রশ্নের কোন সম্বন্ধ নাই। কাজেই বর্ত্তমান পুস্তকে সে প্রসঙ্গের অবতারণা অবান্তর হইয়াছে। নবদ্বীপে শরৎ চন্দ্রের নিশিজাগরণের কাহিনীটিও তাঁহার সম্বন্ধে অনেকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতে পারে। পুস্তকের একটি দিক হইতেছে ব্যক্তিগত স্মৃতিকথার দিক—আর একটি হইতেছে তাঁহার জীবনদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা। সারা জীবন কোন্ প্রশ্নের সমাধান তিনি খুজিয়াছিলেন, তাঁহার সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের সমালোচনাচ্ছলে তারই বিশ্লেষণ লেখক করিয়াছেন। এই শেষোক্ত দিকটার আলোচনায় তিনি তেমন কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। এই দুটাকে গুলাইয়া না ফেলিয়া যদি বর্ত্তমান পুস্তকখানিকে তিনি শুধু ব্যক্তিগত স্মৃতিকথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিতেন তাহা হইলে রস আরও দানা বাঁধিত।

রাষ্ট্রপতি কৃপালনী—শ্রীগোপাল ভৌমিক। কংগ্রেস পুস্তক প্রচার কেন্দ্র। ২৩, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ॥০ আনা।

একাদিক্রমে ১২ বৎসর কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীরূপে আচার্য্য কৃপালনী যে নিরলস কর্ম্মক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই। এই অক্লান্ত কর্ম্মী দেশসেবককে রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত করিয়া জাতি তাঁহার প্রতি চরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিল। বর্ত্তমান পুস্তকে তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার ঘটনাবহুল জীবন উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক। লেখক কৃপালনীর বহুমুখী ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া তাঁহার ব্যক্তিমানস কিরূপে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বেশ গুছাইয়া বলিয়াছেন—এইজন্য পুস্তকখানি ক্ষুদ্র হইলেও মূল্যবান।

পতাকা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। পূর্ব্বাশা লিমিটেড, পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনু্য, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

আজ কাল সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত যে দু'একজন শক্তিমান লেখকের ছোট গল্প মনে চমক লাগাইয়া দেয় এবং শুধু লেখকেরই নহে, বাংলাসাহিত্যেরও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহাদের অন্যতম। লেখক ইতিমধ্যেই বাংলা গল্পসাহিত্যের আসরে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, এবং তাঁহার শক্তির নব নব উন্মেষ আমাদিগকে আশান্বিত করিতেছে। বৎসর দুই আগে 'অলকা' পত্রিকায় তাঁহার 'ক্রৌঞ্চ মিথুন' নামক একটি গল্প পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। যে দরদ মাত্রাবোধ ও সংযত প্রকাশভঙ্গীর পরিচয় তাহাতে পাইয়াছিলাম তাহা বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে দুর্ল্লভ বলিয়াই গল্পটি মনে গাঁথিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান পুস্তকে দেখিতেছি সেই গল্পটি স্থান পাইয়াছে। এ ছাড়া পদক, নাম, কুলপী বরফ, ঘুষ, পতাকা এই পাঁচটি গল্প ইহাতে আছে। প্রত্যেক গল্পই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। তবে যে গল্পের নামে পুস্তকের নামকরণ করা হইয়াছে সেই পতাকা গল্পটির সুর যেন এই বইয়ের সুরের সঙ্গে মেলে নাই। সবগুলি গল্প হৃদয় দিয়া লেখা, আর এটির প্রেরণা যোগাইয়াছে লেখকের বিচারপ্রবণ বুদ্ধিজীবী মনে এবং এটির মধ্যে প্রচারও প্রচ্ছন্ন ভাবে রহিয়াছে। পতাকা ছাড়া অন্যান্য গল্পগুলি অতি সাধারণ ঘরোয়া ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত। কলমের উপর নরেন বাবুর সংযম অসাধারণ। পাঠকের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করিয়া ঠিক কোথায় থামিতে হয় তাহা তিনি ভালো করিয়া জানেন। মানুষ কল্পনায় যে স্বর্গলোক রচনা করেন অলক্ষ্যে ফাটল ধরিয়া অকস্মাৎ কত সহজে তাহা ধূলিসাৎ হইয়া যাইতে পারে তাহা কুলপী বরফ আর ঘুষ এই দুটি গল্পে সার্থকভাবে রূপায়িত করা হইয়াছে। নরেন বাবুর গল্পে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু তাহা গল্পত্বকে ছাপাইয়া উঠিতে পারে না। পুস্তকখানি আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের উৎকর্ষের অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলিয়া গণ্য হইবে সন্দেহ নাই।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশ-বিদেশের কথা

ডাক্তার শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ রায়

কলিকাতা নেশন্যাল মেডিকাল ইনষ্টিটিউটের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যক্ষ ডাক্তার শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ রায় সম্প্রতি বিলাতের এফ আর সি ও জি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইহা চিকিৎসকদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সম্মান। ডাক্তার রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকালটীর সদস্য। তিনি চিত্তরঞ্জন সেবাসদন ও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

শ্রীবিমলাদেবী চক্রবর্ত্তী

বিমলাদেবী চক্রবর্ত্তী ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে এক পঞ্জাবী ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে কিছুকাল বেলুচিস্তানে কাটাইয়া তিনি পিতামাতার সঙ্গে কলিকাতায় আসেন। এখানে আসিবার পর তাঁহাকে একটি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয় এবং ক্রমে ক্রমে তিনি



শ্রীবিমলাদেবী চক্রবর্ত্তী

প্রবেশিকা ও আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৫-এ লেডি ব্র্যাবোর্ণ কলেজে বি-এ পড়িবার কালে সুন্দরবন ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের তদানীন্তন সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মধুসূদন চক্রবর্ত্তীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ঐ বৎসরেই তিনি সামরিক বিভাগের চাকরিতে যোগদান করেন এবং বোম্বাইয়ে নৌবিভাগের কাজে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হয়। বৎসরখানেক পূর্ব্বে তাঁহাকে এই কর্ম্ম হইতে অবসর দেওয়া হয়। বিমলাদেবী সম্প্রতি ইংলণ্ডে গিয়া উচ্চাঙ্গের ধাত্রীবিদ্যা অধ্যয়ন করিবার জন্য ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটি হইতে একটি বৃত্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে তিনি বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। এই আত্মনির্ভরশীলা মহিলার উদ্যম ও কর্ম্মশক্তি প্রশংসনীয়।

সিংহলের স্বাধীনতা উৎসবে বাঙালা শিল্পীর অবদান

২৪শে ফেব্রুয়ারি সিংহলের স্বাধীনতালাভ উৎসব উপলক্ষ্যে পশ্চিম বঙ্গের গবর্ণর শ্রীরাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে কলিকাতায় যে সভা হইয়াছে তাহাতে শিল্পী শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত নিজের আঁকা তিনখানি চিত্র সিংহলবাসীদের দান করিয়াছেন। সিংহল গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই দান তাঁহাদের প্রতিনিধি কলম্বোর জাতীয় চিত্রশালার জন্য গ্রহণ করিয়াছেন। তিনখানি চিত্রের বিষয়বস্তু হইতেছে সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস—যাহার সঙ্গে ভারতের যোগ রহিয়াছে। চিত্রগুলির নাম (১) বিজয় সিংহের লঙ্কায় অবতরণ, (২) মিহিনতালে মহেন্দ্র ও রাজা তিস্‌স, (৩) অনুরাধাপুরে বোধিবৃক্ষের শোভাযাত্রা। এই তিনখানি চিত্রই প্রবাসী ও মডার্ণ-রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারত ও সিংহল স্বাধীন হওয়ার পর দুই দেশের সাংস্কৃতিক মৈত্রী স্থাপনকল্পে এই দান উল্লেখযোগ্য।

বাঁকুড়ার ভাদুল গ্রামের শ্মশানঘাটে মহাত্মা গান্ধীর চিতাভস্ম বিসর্জ্জন অনুষ্ঠান

অন্যান্য স্থানের ন্যায় বাঁকুড়া জেলার ভাদুল গ্রামেও গান্ধীজীর চিতাভস্ম বিসর্জ্জন অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্য্যাদার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। গ্রামবাসীরা বহু আয়াসে গান্ধীজীর পূত চিতাভস্ম কিয়ৎপরিমাণে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ভাদুল পল্লীমঙ্গল সমিতির যুবকবৃন্দের কর্ম্মতৎপরতায় সমগ্র দিনব্যাপী (১২ই ফেব্রুয়ারী) অনুষ্ঠানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। স্থানীয় দ্বারকেশ্বর নদীর যে ঘাটে এই পবিত্র চিতাভস্ম নিমজ্জন করা হয় সেই ঘাটের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "গান্ধীঘাট" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ গান্ধীজীর পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে শ্মশানক্ষেত্রে একটি পাকা ঘর নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

নরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

গত ১৬ই মার্চ্চ সুপরিচিত গীতিকার ও ঔপন্যাসিক নরেশ্বর ভট্টাচার্য্য পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৩ বৎসর হইয়াছিল। গত দশ বৎসর যাবৎ তিনি বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া বহুসংখ্যক রেকর্ড-সঙ্গীত রচনা করিয়া একজন শ্রেষ্ঠ গীতিকাররূপে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নরেশ্বর বাবু 'চিরকুমার সভা' ও 'দেবদাস'কে বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত রেকর্ড-নাট্যে রূপায়িত করেন।

উপন্যাস-রচনায়ও তাঁহার হাত ছিল। তাঁহার 'পাষাণপুরী' নামক উপন্যাসখানি সুপাঠ্য। সম্প্রতি তিনি 'মাতাজী চিত্র প্রতিষ্ঠান' নামক একটি সিনেমা কোম্পানী গঠন করেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি চিত্রনাট্যও রচনা করেন।

নরেশ্বরবাবু শ্রীহট্ট জেলার বেজড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা